প্রিণ্টার- শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

পঞ্চদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র



কল্যাণবর —শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] —[illegible]

Bharatvarsha Ptg. & Halftone Works.

ভারতবর্ষ



আষাঢ়, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চদশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

নমস্কার

শ্রীসাহানা দেবী

তোমায় নমি! তোমায় নমি! নমি বারম্বার!
ব্যথার ব্যথী, চির সাথী,—রঞ্জক আমার!
দুঃখ-রাতে, একলা পথে, চল্‌ছিনু যে অশ্রু-রথে
ভেবেছিনু ফুরিয়ে এলো এ জীবনের বেলা—
কান্নারই সে সুরে সুরে, তোমার বাঁশী বাজল দূরে,
ডাকল আমায়, পথ ভোলালো তোমার সুরের খেলা!
ভেবেছিলাম গেছে সবই—কিবা আছে বাকি,
সবই বুঝি দুর্দিনেরই—সবই কেবল ফাঁকি!
কাঁদার তরেই বাঁচা শুধু, কাঁদার তরেই আসা,
কাঁদার মাঝেই হাসিরে তার বাঁধতে হয় যে বাসা।
দুঃখ পাওয়ার মাঝে তখন কেই বা জেনেছিল,
গোপন-বাণীর আগমনীর আনন্দ-গান ছিল!
বুঝিনি তো এ অশ্রুতে গাঁথা হয় যে মালা,
সেই ফুলেরই দলগুলিতে অচিন সুবাস ঢালা।
প্রতি অশ্রুবিন্দুতে যে তারি পরশ মাখা,
প্রতি ব্যথার বিধুর ভালে তারই ছবি আঁকা!
দুঃখ কেবল আঘাত ব'লেই নিয়েছিলাম তুলে,
তাই ত ব্যথা, ব্যথা হয়েই উঠেছিল দুলে!
তাই তো আমি পাইনি তখন ভরে নেবার কিছু।
রিক্ততারেই বক্ষে লয়ে চলেছিলাম পিছু;—
হঠাৎ দেখি—তুমি পাশে দাঁড়ায়েছ এসে—
দুঃখ তখন ঘোমটা তুলে করুণ মধুর হেসে,
ব্যথায় ঘেরা প্রদীপ জ্বেলে তোমার আসন পাতে-
—শূন্য ঝুলি পূর্ণ হোল—সেদিন মিলন-রাতে!

দুঃখ সেদিন প্রিয় হোল, প্রিয় সে বারতা
নিবিড় তোমার পরশ-সুধায় জাগলো মাদকতা !
দুঃখ পাওয়া মধুর হোল—তোমার আঁখি-তারা
আন্‌ল যেদিন অন্তরে মোর প্রেমের প্রিয় সাড়া !
সেদিনই তো প্রথম বুঝি দুঃখ যে প্রবল—
তোমায় আরো প্রিয় করে, করে যে সবল !
তোমারে যে আপন করে তোমার ব্যথার দান,
তোমার প্রেমের আঘাতে যে তোমায় সঁপি প্রাণ !
বিশ্বে তখন কাঁপন জাগে তোমার আত্মদানে,
আকাশ তখন রঙের খেলায় মত্ত তোমার গানে ;
সেদিনই যে তোমার মাঝে আমার পরিচয়
নতুন করে পাই গো আমি, সেদিনই গাই 'জয়' !
তোমার চরণ-তলে তখন আমার হৃদয় লতা
জড়িয়ে গেছে দেখি—শুনি তারই মর্ম্ম-কথা !
তখন শুনি এই ব্যথারই গুঞ্জরণের তালে
দুঃখ কখন হয়েছে সুখ তারই অন্তরালে—
তখন দেখি এই হিয়ারই গোপনতম তলে,
আঁধার-ঘেরা হৃদয়ে মোর মুক্তি মাণিক জ্বলে !
অশ্রু-ফোঁটার মালা গেঁথে তোমায় বরি যবে,
তোমার মাঝেই—আপন যারা—তাদের হারাই সবে !
জীবনের এই ঝড়ের হাওয়ায় তুমি এলে পাশে
বাঁধন যত ছিল, দেখি শিথিল হয়ে আসে ;
ব্যথা তখন উঠল কেঁপে তোমার বুকের মাঝে,
হারিয়ে যাওয়া গানে তখন মিলনের সুর বাজে !

এই কি তোমার প্রেমের লিপি পাঠাও দ্বারে দ্বারে ?
আঘাত তারেই কর' বেশি, প্রিয় কর' যারে ?
ভাল যারে বাস' তারে এই কি সম্ভাষণ ?
ব্যথার সুরে শেখাও তারে আত্ম-নিবেদন ?
নইলে কিগো হয় না তোমার পূজা সমাপন ?
অশ্রু-ফুলের অর্ঘ্যে সাজাও সকল আয়োজন ?
না পাওয়ারই মাঝে চেনাও চাওয়া সুমধুর ?
ব্যাকুলতার বক্ষে দোলাও সমাহিতের সুর ?
এমনি কোরেই প্রিয় ওগো ! হও কি প্রিয়তম ?—
দুঃখ-রাতের অভিসারের এই পথই লও নম !
ব্যথা দিয়েই পূর্ণ করো, ব্যথা'তে দ্বার খোলাও,
সৃষ্টি-রসের প্রেরণা যে বেদন-সুরে মেলাও ;
অমৃতেরই আভাষ ব্যথা, ব্যথাই পরশমণি,—
ব্যথার বুকে তাই ত শুনি তোমার আগমনী !
আনন্দ যে উঠে আসে ব্যথার দুয়ার ঠেলে,
সে হাসিতে চিত্তকমল পাপ্‌ড়ি তাহার মেলে !
হাল্কা সুখের কোলাহলে যে আনন্দ ভরে,
তৃপ্তি তাহে মেলে কোথায় ? তোমায় যে পর করে !
সস্তা হাসির আলোড়নে যে গান তোমার বাজে,
একতালারই ঢিমা ছন্দে একটানা সুর রাজে ;
বেদন-তারে বাঁধো যখন হৃদয়-বীণাখানি,
নব সুরে ছন্দে কীর্ণ তোমার অমর বাণী !
নিত্য নব তালে তালে ঢালে তোমার সুধা,
অমর্ত্ত্যেরই গুপ্ত কীলাল মর্ত্ত্যে জাগায় ক্ষুধা !
ব্যথার চোখেই রঙীন দেখি তোমার বিশ্বাকাশ,
ব্যথার আলোয় উজল করে তোমার পরকাশ !
তাই ত যদি বল তুমি—"ব্যথা নিই তোর তুলে ?"—
বলব আমি—"না গো, আমার থাক্ সে জীবন-মূলে"—
বলব আমি—"কাজ কি তোমার অভিশাপের বরে ?
দয়া নয় কো, নিঠুর তুমি হও গো আমা 'পরে"—
বলব তোমায়—"পরশ তোমার আঘাতই মোর ভাল
আঘাত-সুখেই উৎসারিত হোক তোমারি আলো"—
তাই হে প্রিয় ! প্রিয় আমার ! বেদন-পুরস্কার
দাও গো নিত্য মোরে,—তোমায় করি নমস্কার !

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

আজ হইতে আমাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আশা করি আপনারা অদিতি সমাচার ভুলিয়া যান নাই। অদিতি দেবগণের প্রসূতি। জগতের গোড়ায় এবং জগতে ওতপ্রোতভাবে যে অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডিত বস্তুটি রহিয়াছে তাহাই অদিতি। ঋগবেদের সেই "অদিতি দ্যৌরদিতি-রন্তরিক্ষং" ইত্যাদি স্মরণীয়। চরম ভাবে দেখিতে যাইলে, এ বস্তুটি যে চৈতন্য, তাহা আমরা সে দিন একরকম মোটামুটি বুঝিয়াছিলাম। দেশ, কাল, ঈথার প্রভৃতির সঙ্গে এই চিদ্‌বস্তুর সম্পর্কও সে দিন কতকটা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, চরম দৃষ্টিতে যে বস্তুটি চৈতন্য বা আত্মা, একটু খাটো করিয়া দেখিলে, সেই বস্তুটিই দেশ, কাল, ঈথার প্রভৃতি। Continua বা অখণ্ডিত বস্তুগুলিকে এক রকম শ্রেণীর হিসাবে সাজাইয়া লইতে পারি; সর্ব্বোচ্চ স্তরের যে অখণ্ডিত সামগ্রী, অথবা নিরতিশয় অখণ্ডিত যে সামগ্রী, ("Continuum in the limit"), তাহাই চৈতন্য এবং তাহাই পরমা-অদিতি যাঁহার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি ও নিখিল দেবতা জন্মগ্রহণ করেন (ঋগবেদ, ১০।৭২ সূক্ত)। এ আধ্যাত্মিক রহস্যের বিস্তার গত বারেই করিয়াছি, আপনাদের হয়ত স্মরণ আছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি অদিতির সন্তান। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৯ অনুবাক)— "অদিতিঃ পুত্রকামা" ইত্যাদিতে অদিতিকে পুত্রকামা দেখিতে পাই। এ কথাটার মর্ম্ম এই যে, গোড়াকার অখণ্ড বস্তুটিকে নানান্ দিক্ হইতে দেখিতে গেলেই নানান্ দেবতা; বস্তুতঃ তত্ত্ব এক বই দুই নহে। একই জিনিষকে নানান্ ভাবে দেখা। এই হিসাবে নিখিল শ্রুতিবাক্যের পর্য্যবসান চৈতন্যে বা আত্মায়। ছান্দোগ্য এই চৈতন্যকেই ক্রমশঃ পরোবরীয়ান্ ভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে শেষকালে জ্যায়ান্ ও পরায়ণ আকাশরূপে পাইয়াছেন—ছান্দোগ্য (১।৯।১)। এ সমাচার পূর্ব্বে একাধিকবার দিয়া রাখিয়াছি। নিরুক্তদের মতে বেদের বহু দেবতা তিন দেবতারই রূপান্তর মাত্র। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য্য। কিন্তু ইহাও চরম দৃষ্টিতে দেখা নয়। ইহাও একটা মোটামুটি হিসাব। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।৪।৪) অগ্নিকে অগ্রজ, জাতবেদাঃ, ছন্দোবপুঃ, হব্যবাহ ইত্যাদি বলিতেছেন। পুনশ্চ, ১।২।১ অনুবাক—অগ্নিকে "ভুবনস্য রেতঃ" বলিতেছেন; আবার বলিতেছেন—"দিবস্ত্বাবীর্য্যেণ। পৃথিব্যৈ মহিম্না। অন্তরিক্ষস্য পোষেণ।" স্বয়ং বেদ অগ্নিকে পৃথিবীতে ইন্দ্র বা বায়ুকে অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্যকে আকাশে বাঁধিয়া রাখেন নাই। ঋগবেদ, ১০ম মণ্ডলের ৭৯ প্রভৃতি সূক্ত দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের প্রত্যেককেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাশ্রয় বস্তু রূপে অনেক মন্ত্রে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আমরা সে রকম মন্ত্র আগে কতক কতক শুনিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও বিস্তর শুনিব। ফল কথা, বেদ দেবতাদের গণ্ডী বাঁধিয়া দিতে এবং স্বতন্ত্র এলাকা সাব্যস্ত করিয়া দিতে একান্ত নারাজ। এ কথা প্রাচীনেরা জানিতেন না এমন নহে, তবে বিভিন্ন অধিকার ও প্রয়োজন বুঝিয়া বিভিন্ন ভাবে কথাটাকে বলিতেন। স্বয়ং বেদই যে সব একাকার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কথাটাকে না বলিয়া পার পাইবেন কে? সংহিতা-গুলিতে যে মহাবাক্যকে অন্বেষণ করিয়া, সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, উপনিষদে সেই মহাবাক্যের শঙ্খধ্বনি আমাদের শ্রুতিকুহর ও বুদ্ধিগুহাকে সর্ব্বতোভাবে আপূরিত করিয়া দেয় দেখিতে পাই।

আজ অগ্নির পরিচয় লইতে হইবে। অদিতির গর্ভেই ইঁহার জন্ম; কাজেই ইনি সেই অখণ্ড বস্তুরই একটা বনাম। অর্থাৎ, চরম দৃষ্টিতে, অগ্নি আত্মা বা চৈতন্য বই আর কিছুই নহেন। সন্ধ্যা করিতে বসিয়া আমরা আওড়াইয়া থাকি— "প্রণবের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং অগ্নি দেবতা।" "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম"—ছান্দোগ্য, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে আমরা শুনিয়াছি। মানে হইতেছে যে, প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম বা আত্মা, অথবা সেই নিরতিশয় অখণ্ডিত বস্তু, যাঁরি

আলোচনা কয় দিন ধরিয়া আমরা করিয়া আসিতেছি। এই প্রণবের দেবতা হইতেছেন অগ্নি। সুতরাং অগ্নিকে ব্রহ্ম বা আত্মা করিয়া প্রাচীনেরা দেখিতেন, এবং এখনও সন্ধ্যায় প্রাণায়াম করিতে বসিয়া শুধু নিজের নাক মলিয়া খালাস হইতে যদি না চাই, তবে আমাদিগকেও অগ্নিকে ব্রহ্ম বা আত্মা করিয়াই ভাবিতে হয়। খাস সংহিতাগুলিতে ওটা ছিল না, পরে ঐ রকম সব আধ্যাত্মিক ভাবের কথা আমরা ভাবিতে সুরু করিয়াছি,—সাহেব পাণ্ডাদের এবং তাঁহাদের দেশী ছড়িদারদের এমন কথায় আপনারা কর্ণপাত করিবেন না। ১।১৮।৭ (ঋগবেদ) বলিতেছেন—"যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি" ইত্যাদি। সদসস্পতি বা অগ্নি লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ হইয়াছে। "যিনি ব্যতীত বিপশ্চিৎ অথবা জ্ঞানবানের যজ্ঞও সিদ্ধ হয় না, সেই অগ্নি আমাদের "ধীনাং যোগমিন্বতি" —অর্থাৎ, আমাদের মানসিক বৃত্তি সমূহের যোগ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সায়ণ লিখিতেছেন—"সোঽয়ং সদসস্পতি র্দেবোধীনাং মনোহুষ্ঠান বিষয়াণাং অস্মদ্ বুদ্ধীনামনুষ্ঠেয় কর্ম্মণাং বা যোগং সম্বন্ধমিন্বতি ব্যাপ্নোতি।" আমাদের মনোবৃত্তি-গুলির মধ্যে যোগস্থাপন করিয়া যে পদার্থটি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সে পদার্থটি যে আত্মা বা চৈতন্য, সে পক্ষে সন্দেহ আছে কি? মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির তর্ক এখানে তুলিব না, তবে আমাদের মন যে একটা একটানা প্রবাহ-ধারা (continuum stream), তাহা Ward সাহেব, William James সাহেব প্রভৃতি হালের অধ্যাত্ম-ব্যবহারবিৎ পণ্ডিতদের ওকালতি শুনিয়া খুব পাকা কথা বলিয়াই মনে হয়। সাগরের জলে খুব ঢেউ হইতেছে। রৌদ্রের আলোতে অথবা জ্যোৎস্নার আলোতে তাকাইয়া সেই লহরীমালার শুভ্রোজ্জ্বল কিরীটগুলিই (crests) দেখিতে পাই। ঢেউ-গুলির যে আবার চড়াই, উৎরাই (slopes) আছে, মাঝখানে উপত্যকা (hollows, Troughs) আছে, তাহা যেন খেয়ালই হয় না। আমাদের ধী-বৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও এই প্রকার হইতেছে। মোটা মোটা বৃত্তি যেগুলি, যেগুলিকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, সেইগুলিতেই আমাদের বিশেষভাবে অভিনিবেশ হয়। কিন্তু সেই মোটা মোটা বৃত্তিগুলি ছাড়া তাদের মাঝে মাঝে ও তাহাদিগকে ঘেরিয়া অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বৃত্তিও হইয়াছে। ধরুন, লেক্চার শুনিতে আসিয়া এই ঘরের দেওয়ালে ছবিগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছি। একদিক হইতে সুরু করিলাম। একখানা ছবি দেখিয়া তার পর আর একখানা—এই ভাবে সব ছবিগুলি দেখিয়া ফিরিলাম। ঐ হংসের ছবিখানা দেখিয়া তার পর আগাইয়া আসিয়া ঐ গোস্বামী মহাশয়ের ছবিখানা দেখিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ঐ দুইখানা ছবি দেখার ব্যবধান সময়ে আমার মন কি "ফাঁকা" ছিল? মাঝখানে আর কিছুই কি দেখি নাই, শুনি নাই, স্পর্শ করি নাই, মনে কল্পনা জল্পনা ভাবনা চিন্তা করি নাই? প্রথম ছবিটার কাছ হইতে দ্বিতীয়টার কাছে আসিতে আমায় কয়েকবার পা ফেলিতে হইয়াছে, তার দরুণ মাংসপেশীগুলির সঞ্চালন জন্য যে অনুভব বিশেষ তাহা আমাকে অনুভব করিতে হইয়াছে; চলিয়া আসিতে চোখ কাণও বুজিয়া ছিলাম না, কাজেই কিছু না কিছু দেখিয়াছি শুনিয়াছিও এই ব্যবধান সময়টুকুর ভিতর। তবে কথাটা এই যে, ছবি দেখাই আমার দরকার বলিয়া এই সকল মধ্যবর্ত্তী বৃত্তিগুলিতে আমার খেয়াল হয় না। আমি ভাবি ও বলিয়া থাকি—যেন মাঝখানের ঐ সময়টুকুতে আমার মনে কিছু হয়ই নাই। "ছবি দুখানা দেখিলাম"—শুধু এই বলিয়াই ভাবি আমার সব বলা হইল। সমস্ত ঘরটা ঘুরিয়া আসিয়া কেবল কয়খানা ছবি দেখারই হিসাব আমি দিয়া থাকি।

কিন্তু খেয়াল করিলেই বুঝিতে পারি যে এ হিসাব মোটামুটি, কাজ চালানো রকমের হিসাব; এ হিসাবে ছুট্‌ছাট্ ঝড়্‌তি পড়্‌তি অনেকই গিয়াছে। সে দিন বলিয়াছিলাম আমাদের দেখাশোনা প্রভৃতি অনুভবে কতকটা ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া আমাদের লইতেই হয়; নির্ব্বিশেষে, অপক্ষ-পাতে সব দেখিতে শুনিতে গেলে আমাদের কাজ চলে না। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম জেমস্ মোটা মোটা বৃত্তিগুলিকে "Substantive States" এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ভাব-গুলিকে "States of transition" বলিয়া গিয়াছেন। এই স্থূল সূক্ষ্ম, স্পষ্ট অস্পষ্ট, কে'জো অকে'জো সকল রকম ধী-বৃত্তিতে ওতপ্রোত হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন যিনি, তিনিই চৈতন্য বা আত্মা। প্রত্যেক মানসিক বৃত্তিই, ছোটই হউক আর বড়ই হউক, অনুভবের বা জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ। আমরা খেয়াল করি আর নাই করি, প্রত্যেকটাই এক প্রকার "জানা" বা "সম্বিৎ"। স্পষ্টভাবেই হউক আর

অস্পষ্ট ভাবেই হউক, "জানা" তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ধারাটিকে আত্মা বা চৈতন্য বলে। আপাততঃ সময়ের হিসাবে বলিতেছি, তাই ইহাকে ধারা বলিতেছি। সত্য-সত্যই চৈতন্যকে একটা ধারা ভাবিবার এক্তার আমাদের আছে কি না, তাহার বিচার আপাততঃ করিয়া কাজ নাই। এখন বেদমন্ত্র "ধীনাং যোগমিন্বতি" বলিয়া যে পদার্থটির সন্ধান আমাদের দিতেছেন, তিনি যে চৈতন্য বা আত্মা, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না কি? মন্ত্রেই মিলিতেছে যে, ধী-বৃত্তিগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা নহে; অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধশূন্য নহে; একটা ঢেউর মাথা এবং আর একটা ঢেউর মাথার মধ্যে যেমন চড়াই উৎরাই এবং উপত্যকা থাকে এবং তাদের দিয়াই যেমন ঢেউ দুইটির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেই রকম স্পষ্ট মনোবৃত্তির মাঝে মাঝে অস্পষ্ট মনোবৃত্তিগুলি গা ঢাকা দিয়া বাস করে, এই সব গুলির হিসাব পাইলে আমরা দেখিব যে ধীবৃত্তিগুলি ছাড়া ছাড়া (discrete) নহে; তাহাদের মধ্যে যোগ বা মিলনের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৃত্তি এবং তাহাদের সন্ধি বন্ধনের মধ্যে অন্বিত, কিনা মালার ফুলগুলির মধ্যে সূত্রের মত অনুস্যূত, হইয়াছে যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই অগ্নি।

উদ্ধৃত ঋকে দুইটি কথা আপনারা খেয়াল করিয়া যাইবেন। প্রথম, আমাদের ধীবৃত্তি কার্য্যতঃ ছাড়া ছাড়া বোধ হইলেও তাহাদের মধ্যে যোগ আছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলিতেছেন—তথাস্ত। আর, শেষ পর্য্যন্ত যে ছেদহীন, অটুট (Seamless) অদিতি পটের উপর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সকল রকম চিত্তবৃত্তিগুলি বায়স্কোপের ফিল্মগুলার মত বহিয়া যাইতেছে, সেই পটই হইতেছে সদসম্পতি অগ্নি। বায়স্কোপের ছায়া চিত্রগুলি যে তাহাদের আধারপট হইতে ভিন্ন, তাহা ত' সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু চিত্তবৃত্তির আধার ভাবে যে একটা আত্মা বা চৈতন্য রহিয়াছেন, এবং সেই আধার বা আলম্বনের বস্তুটি যে চিত্তবৃত্তিগুলির সঙ্গে এক নহেন, এ কথাটা আমাদের উচ্চ-প্রস্থানের দর্শনগুলিতে, অর্থাৎ সাংখ্য-যোগ-বেদান্তে, একরকম স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকিলেও পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এ কথায় এখনও একযোগে সায় দিতে পারেন নাই। সে বিচারও এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না; তবে সকল ধীবৃত্তিগুলিকে গাঁথিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছেন যে বস্তুটি, তাঁহার নাম "অগ্নি" দেওয়া হইলে, সে অগ্নি যে কোন্ অগ্নি তাহা বুঝিতে প্রাচীন অর্ব্বাচীন, প্রাচ্য প্রতীচ্য কোন পক্ষেরই খট্‌কা বাধিবার সম্ভাবনা নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, অগ্নিতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদৃষ্টি সংহিতা করিতেন না এমন নহে, ঠিক 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' বা 'চৈতন্য' এই রকম শব্দগুলির ঐ ভাবে প্রয়োগ তিনি করুন আর নাই করুন; (ঋং সং ১০।৮১ সূক্তে ব্রহ্মা = পরব্রহ্মই)। সংহিতা আত্মা নামে না ডাকিয়া অগ্নি নামে ডাকিতেছেন বলিয়াই সব পচিয়া গেল না। "ধীনাং যোগমিন্বতি"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কোথায় তাহাই আমাদের সুস্থির হইয়া দেখিতে হইবে।

বেদে অগ্নির ঐকান্তিক তাৎপর্য্য ইহাই। এখন দুই চারিটা মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি, ঋষিরা অগ্নিকে কি চক্ষে দেখিতেন। ১।৬৯।১ বলিতেছেন—"পরিপ্রজাতঃ" ইত্যাদি—"হে অগ্নি! তুমি প্রজাত হইয়া কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত কর; তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা।" মন্ত্রে পাইলাম যে অগ্নি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। কিন্তু মন্ত্রের শেষ ভাগটা হেঁয়ালির মত। তিনি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতা কিরূপে? সায়ণ দুই রকম ভাষ্য লিখিয়াছেন। "দীব্যন্তীতি দেবা ঋত্বিজঃ"—'দেব' কথাটার মানে ঋত্বিক্। অগ্নি ঋত্বিক্‌দিগকে পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহাদের পুত্র, আবার তাঁহাদের পালয়িতা, এই ভাবে পিতা। "যদ্বা দেবানামিন্দ্রাদী নামেব পুত্রঃ সন্ পুত্র 'ইব দূতোভূত্বা পিতা হবির্ভিঃ পালয়িতা ভবসি।"—যজ্ঞে অগ্নিই ইন্দ্রাদি দেবগণের দূত; দূত বলিয়াই যেন পুত্র; আবার অগ্নিই হবিঃ দ্বারা দেবতাগণের পালন করেন বলিয়া তাঁহাদের পিতা। এরকম অর্থ মন্দ নয়। কিন্তু গূঢ় অর্থও আছে। দেবতা মহাশক্তির এক এক মূর্ত্তি। যে শক্তি দ্বারা জগতের উদয়,স্থিতি ও লয় হইতেছে, সেই শক্তিকে নানা ভাবে দেখিলে নানা দেবতা পাই। বলা বাহুল্য, শক্তি মূলতঃ চিৎশক্তি। জড়ের মধ্যে চলা ফেরা (motion) হইতেছে দেখিয়া আমরা তাহার হেতু স্বরূপ শক্তি (force)র কল্পনা করি। আতা ফলটা গাছ হইতে মাটিতে পড়িল দেখিলাম; ভাবিলাম কোনও শক্তি উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিতেছে; সেই শক্তির নামকরণ হইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই শক্তি আমি কল্পনা করিতেছি মাত্র। আমি শক্তিকে

অনুভব করি যখন নিজে চলাফেরা করি, নিজের শরীরটাকে নাড়িচাড়ি, বাহিরের জিনিষগুলাকে টানিয়া লই বা ঠেলিয়া দিই; মনে মনেও যখন কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ করি, ধ্যান ধারণা করি, তথনও শক্তিকে অনুভব করিয়া থাকি। এই যে অনুভূত ও পরিচিত শক্তি, ইহা চিৎশক্তি। বাহিরে শক্তির অনুভব করি না, কল্পনা করি—বাহিরেও চলাফেরা হইতেছে দেখিতে পাই, কাজেই শক্তির কল্পনা করি। বাহিরের বেলায় অনেক স্থলেই কিন্তু শক্তিকে আর চিৎশক্তি না ভাবিয়া শুধুই শক্তি ভাবি—যেমন ঐ ট্রাম গাড়ীর বেলায়, আতা ফল ও পৃথিবীর বেলায়।

চিৎ বাদ দিয়া শক্তিকে লওয়ার অধিকার আমাদের সত্য সত্যই কতখানি আছে তাহার বিচার দার্শনিকেরা করিতেছেন ও করিবেন। তবে মানবের যে দৃষ্টি শক্তি মাত্রকেই চিৎশক্তি বা আত্মার শক্তিরূপে দেখে, সে দৃষ্টিকে শৈশবের দৃষ্টি—animism, spirition বলিয়া হেয় ভাবিবার কোনও উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া ত' আমাদের মনে হয় না। বরং জড়বিদ্যা (Physical Science) যে ম্যাটার ও ফোর্সের দ্বারা এই জগতের বিবরণ দিয়া থাকে, সে ম্যাটার ও ফোর্স অনেকটা কল্পিত মনগড়া জিনিষ বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞান কারবার করে এক ইউক্লিডের জ্যামিতি লইয়া—বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্ত ইত্যাদি লইয়া; সেগুলা ত অনেকটাই মনগড়া জিনিষ (concepts); তার উপর, বিজ্ঞান যাহাকে ম্যাটার ও ফোর্স ভাবে ব্যবহার করে, তাহারাও খাঁটি সত্যকার জিনিষ নহে, কাটা-ছাঁটা ফরমাসি জিনিষ। আমরা বাহিরে ঠিক যে জিনিষটাকে অনুভবে পাইতেছি, বিজ্ঞান সেটিকে তাঁহার লক্ষণের ছাঁচে ঢালিয়া হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' করিয়া তবে ব্যবহার করেন। তাঁর বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া তিনি সে জিনিষ হইতে রূপ রস গন্ধাদি অনেক সত্যকার খোলস ছাড়াইয়া ফেলেন; শেষ পর্য্যন্ত যে জিনিষটা বাহাল রাখেন, তিনি একটা মনগড়া ভূত—তাঁর ঠাঁই আছে, নড়ন চড়ন আছে, কিন্তু আর বড় একটা কিছু আছে কি না বলা যায় না। শক্তির বেলাতেও সত্যকার চিৎশক্তিকে ফরমূলার রোলারের নীচে চিৎ করিয়া ফেলিয়া একেবারে পেষাই করিয়া ছাড়িয়া দেন। বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা কর—ফোর্স কি, এনার্জি কি, মোমেন্টম্ কি, ওয়ার্ক কি—তিনি নিশ্চিত ভাবে একটা একটা ফরমূলা আওড়াইয়া দিবেন। ফরমূলাগুলা আবার সেই হেঁয়ালির সাপ দুইটার মত পরস্পরের ল্যাজ ধরিয়া গিলিয়া থাকেন। সে অনুযোগ আপাতত করিব না, তবে আসল মুস্কিল এই যে, এই সব ফরমূলার দৌরাত্ম্যে সত্যের চেহারাখানি এতই বদলাইয়া গিয়াছে যে, সে সত্যকে আর সত্য না বলিয়া ভেল্কি বলিতেই প্রবৃত্তি হয়। আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক হইয়াও কথাটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেন, এবং বিজ্ঞানের আয়তনটাকে মায়াপুরী রূপেই আমাদিগকে চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই জন্য বলিতেছিলাম, ঋষিরা দেবতাগণকে চেতনশক্তি ভাবিয়া বলবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এ কথা সহসা মানিয়া লইতে আমরা নারাজ। আমরা বলি, শক্তি আত্মারই শক্তি; চৈতন্যেরই শক্তি—ভিতরেই হউক, আর বাহিরেই হউক। এই শক্তির নানান্ রূপ নানান্ দেবতা!

এখন অগ্নির কথা শুনুন। শক্তির একটা নাম দেওয়া যাক্ "বল"। বেদ অনেক স্থলেই অগ্নিকে বলের পুত্র ("সহসঃ সূনুঃ" ইত্যাদি) বলিয়াছেন। দুইখানা অরণি কাঠ বলের সহিত ঘষিলে আগুন হয়, এই জন্যই নাকি অগ্নি বলের পুত্র—সায়ণ এইরূপ বলিতেছেন। ১।৪৫।৯, ১।২৬।১০, ১।২৭।২ ইত্যাদি অনেক জায়গাতেই অগ্নিকে বলের পুত্র বলা হইয়াছে,—ঠিক অভিপ্রায়টা যে কি, তাহা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ সায়ণ যাহা বলিলেন তাহাই হউক। বল প্রয়োগে অরণিদ্বয় হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, কাজেই অগ্নি বলের পুত্র। বলের উৎপত্তি কোথা হইতে? অরণি ঘষিতেছে কে? আত্মা। আত্মাই যে অগ্নির চরম অর্থ তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাজেই কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ—আত্মারূপ অগ্নি বল প্রয়োগে অরণি হইতে মূর্ত্ত (visible) অগ্নি উৎপাদন করিতেছেন; অতএব অগ্নি পিতা হইয়াও পুত্র হইতেছেন। কাহার পিতা ও কাহার পুত্র?—বল বা শক্তিরূপ দেবতার। ১।১১।২ ঋকে ইন্দ্রকে "শবসঃ পতে" কি না বলের অধিপতি, বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। ১।৫৭।৬ ঋকে ইন্দ্রকে বলা হইতেছে "তুমি বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর।" ইন্দ্র ও অগ্নি ও আত্মা অভিন্ন। ঋগবেদ দশমমণ্ডল এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের সেই "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ" ইত্যাদি বাক্য স্মরণীয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।১।৬) প্রজাপতি হইতে "প্রথমজ" অগ্নিকে

উৎপাদন করিতেছেন। মূর্ত্ত, পরিচ্ছিন্ন অগ্নি অমূর্ত্ত অপরিচ্ছিন্ন অগ্নির পুত্র। অগ্নি সম্বন্ধে হেঁয়ালিটার এই রকম মানেই সঙ্গত বোধ হয়। সে দিন আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম, কিরূপে অদিতি দক্ষের মাতা হইয়াও কন্যা হইলেন।

অগ্নির অমূর্ত্ত, অপরিচ্ছিন্ন রূপের সন্ধান অনেক বেদমন্ত্রের মধ্যেই আমরা পাইয়া থাকি। ১।৬৮।১ বলিতেছেন—"স্থাবর জঙ্গমাদি মধ্যে বর্ত্তমান অগ্নি মহত্বে সকল দেব অপেক্ষা অধিক।" ঐ সূক্তের ৫ ঋক্ বলিতেছেন অগ্নি আকাশকে নক্ষত্রে ভূষিত করিয়াছেন। ১।৫৯ অনেক কথাই বলিয়াছেন—"হে অগ্নি, অন্য অগ্নি সমূহ তোমার শাখা মাত্র; হে বৈশ্বানর, তুমি মনুষ্যদের নাভি স্বরূপ; তুমি স্তম্ভের ন্যায় লোকদিগকে ধারণ কর। অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অধিপতি। তোমার মাহাত্ম্য আকাশ হইতেও অধিক।" ১।৭৭।৩ বলিতেছেন—"অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্ত্তা ও উৎপাদয়িতা।" ১।৭৩।২ বলিতেছেন—"পৃথিব্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুজাতের মূলতত্ত্বটি বা স্বরূপের মত অগ্নি পরিবর্ত্তন-রহিত; আত্মার ন্যায় সুখকর—'আত্মেব শেবঃ'।" ১।২৬।৯ ঋক্ অগ্নিকে অমর বলিতেছেন: ১।২৭।৩ ঋক্ তাঁহাকে সর্বত্রগামী বলিতেছেন; ১।২৭।১১ ঋক্ তাঁহাকে মহৎ ও পরিমাণরহিত বলিতেছেন। ১।৭৫।৩ ঋক্ প্রশ্ন করিতেছেন—"হে অগ্নি, কে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ? তুমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান কর?" ১।৭৩।৮ ঋক্ বলিতেছেন—"তুমি আকাশ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছ; এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করিতেছ।" ১।৭৯।১২ ঋক্ অগ্নিকে সহস্রাক্ষ, সর্ব্বদর্শী বলিতেছেন। ১।৭২।১ ঋক্ অগ্নি সম্বন্ধে "বেধসঃ শশ্বতঃ"—অর্থাৎ জ্ঞানী ও নিত্য বলিতেছেন। ২ ঋক্ বলিতেছেন—"সকল অমর দেবগণ মোহশূন্য মরুদ্‌গণ অনেক কামনা করিয়াও আমাদের প্রিয় ও সর্ব্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নাই।" ৪ ঋক্ বলেন—"মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।" ৬ ঋকে অগ্নির নিগূঢ় পদ ("গুহানি পদা") এর কথা আছে। ১।৬৫।১, ১।৬৭।২, ১।৭৬।৩ ও ৪ অগ্নিকে গুহাস্থিত বলিয়াছেন। ১।৬৬।৪ বলিতেছেন—"যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে সে সমস্তই অগ্নি।" ১।৬৭।৫ বলিতেছেন—'যে অগ্নি ওষধিগণ মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ গুণ নিহিত করিয়াছেন ও মাতৃস্থানীয় ওষধিগণ মধ্যে উৎপন্ন ফল-পুষ্পাদি স্থাপিত করিয়াছেন, ধীরগণ জল মধ্যস্থিত এবং জ্ঞানদাতা সেই বিশ্বায়ু অগ্নিকে পূজা করিয়া কর্ম্ম করে।"

রাশি রাশি ঋক্ রহিয়াছে; কত আর উদ্ধার করিয়া শুনাইব; প্রথম মণ্ডল হইতেই কতকগুলি শুনাইলাম, কারণ সাহেব পণ্ডিতেরা ভাবেন গোড়াকার মণ্ডলগুলি মোটামুটি ঋষিদের আধ্যাত্মিক উন্মেষের অপেক্ষাকৃত নীচের স্তর। ধরুন তাহাই; কিন্তু এই নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া অগ্নির যে রূপ আমরা দেখিলাম, তাহা যেন শ্রীভগবানের সেই বিশ্বরূপ, যাহা অর্জ্জুন দিব্যচক্ষে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। ফল কথা, ঋষিরা অগ্নিকে সত্য সত্যই ছোট, অল্প করিয়া দেখিতেন না, বড়, ভূমা করিয়াই দেখিতেন। অরণি ঘর্ষণে সমুৎপন্ন অগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি; সূর্য্য—এ সবই একটা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অগ্নিরই প্রতীক বা সঙ্কেত ভাবে তাঁহারা দেখিতেন। ১।৯৫।২ ঋক্ বলেন—"দশ অঙ্গুলি একত্র হইয়া অবিরত কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান অগ্নিকে উৎপন্ন করে।" ৩ ঋক্ বলেন—"অগ্নির জন্মস্থান তিনটি—সমুদ্র, আকাশ ও অন্তরীক্ষ।" তিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী বস্তু হইলেও, তাঁহার বিকাশ সমুদ্রে বড়বানলরূপে, আকাশে সূর্য্যরূপে, এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে। আর প্রমাণ প্রয়োগ করিব না, আপনারা ব্যাপারখানা ভাবিয়া দেখুন। অগ্নি যে বেদে শুধু সাধারণ আগুন নহেন, সে পক্ষে আর বোধ হয় আপনাদের সন্দেহ নাই। সাধারণ অগ্নি আসল অগ্নির একটা শাখা মাত্র, একটা অভিব্যক্তি মাত্র। মূল জিনিষটা একটা গাছের মত বাড়িয়া যেন সৃষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আমরা যাহাকে আগুন বলি সেটা সেই বিশ্বমহাবৃক্ষের একটা শাখা বই আর কিছুই নহে।

ঋষিরাও সৃষ্টির উন্মেষ ব্যাপারটাকে একটা গাছের বিকাশরূপে কখন কখন দেখিতেন ও বলিতেন। ১০।৭২।৩ ও ৪ এর ঋক্ শুনুন:—"দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত। তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥৩॥" "ভূর্জ্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত। অদিতের্দ্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥৪॥"—"দেবোৎপত্তির পূর্ব্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্

হইতে দিক্ সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল” ইত্যাদি। ‘উত্তানপদ্’ মানে সম্ভবতঃ গাছ। এ গাছের উদাহরণেও গূঢ় রহস্য আছে। সৃষ্টির একটা আরম্ভ আদৌ মানিতে গেলে বলিতে হয় যে, সেটা শক্তিসমূহের বা প্রকৃতির একটা সাম্যাবস্থা (Static, equilibrated condition)। তখন, অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনার পূর্ব্বে, শক্তিসমূহের কোনও দিকে যেন অভিমুখীনতা নাই। খানিকটা শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু এ দিকে বা ও দিকে বা অন্য দিকে কাজ করিতেছে না। আমরা অনুভবের মধ্যে যে সব দৃষ্টান্ত পাই, তাদের দ্বারা একেবারে গোড়ার কথা একান্তভাবে বুঝা যাইবে না। গাছের বীজের দৃষ্টান্তে মোটামুটি খানিকটা বুঝা যাইতে পারে মাত্র। বীজ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বীজ হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে যেন সুস্থির বলিয়া মনে হয়। তার ভিতরে যে এনার্জি রহিয়াছে, তাহা যেন কোন দিকে কাজ করিয়া নিজেকে জাহির করিতেছে না। কিন্তু যাই বীজ অঙ্কুর হইতে সুরু করিল, ধীরে ধীরে লতা বা গাছ হইতে লাগিল, সেই বীজের ভিতরকার শক্তিটি বা শক্তিব্যূহটি নির্দ্দিষ্ট দিকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করিতে লাগিল। বটের বীজের অঙ্কুর, গাছ ডাল পাতা, ফল ঠিক বটের মতই ক্রমে ক্রমে হইতে লাগিল, আম কাঁটালের মত হইতে লাগিল না; লাউ কুমড়োর বীজ অভিব্যক্ত হইয়া ঠিক লাউকুমড়োর লতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিলে তিলে অতি সাবধানে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। কাজেই—এ অভিব্যক্তিতে বেশ একটা ব্যবস্থা ও লক্ষ্যাভিমুখীনতা আছে। গোড়ায় যখন শুধু বীজটা, তখন তাহার ভিতরকার প্রকৃতির যেন এদিক্ ওদিক্ নাই। একটা বটের বীজ আর একটা সরিষার বীজ হাতে করিয়া, তাদের যে চেহারা আলাদা তাহা দেখিতে পাই; কিন্তু সেই ছোট বীজ দুইটার মধ্যে যে দুইটা প্রকৃতি রহিয়াছে, তাহাদের কোনও “বিশেষ” ধরিতে পারি না। তাদের প্রকৃতির বিশেষত্বের ঠিকানা পাই কখন?—যখন বীজ দুটাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেখি, একটার বিকাশ এক দিকে গেল, অপরটার বিকাশ অন্য দিকে গেল। একটা হইতে অঙ্কুর যেমন ধারা বাহির হইল, যেমন ধারা ডাল পাতা প্রভৃতি হইল, অন্যটা হইতে তেমন ধারা অঙ্কুর, ডাল পাতা প্রভৃতি হইল না। এই গাছের দৃষ্টান্তে সৃষ্টির উন্মেষ বুঝিতে ঋষিরা আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। ছান্দোগ্য, শ্বেতকেতু-আরুণি সংবাদ,—৬ষ্ঠ প্রপাঠক দ্বাদশ খণ্ড ন্যগ্রোধ ফলের দৃষ্টান্তে বিশ্বের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন। গোড়ায় শক্তির বা প্রকৃতির যে অবস্থা তাহাতে যেন এদিক্ ওদিক্ নাই। যতই সৃষ্টি চলিতে লাগিল, ততই প্রকৃতি নানাদিকে পরিণত হইতে লাগিল। শক্তিগুলার যেন directedness পাইল। এখন আমরা যেগুলিকে শক্তি বলি সেগুলি এক দিকে না এক দিকে directed; বীজের মধ্যেও তাহাই, তবে সে অভিমুখীনতা এত সূক্ষ্ম যে, আমরা সহজ বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে পারি না; ধরিতে পারি না বলিয়াই বীজের উদাহরণ দিয়া প্রকৃতির উন্মেষ বুঝিবার প্রস্তাব করিলাম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে হয়ত বীজের ভিতরটাকে একেবারে ঘুমন্ত বলিয়া দেখা যায় না। আমাদের সাধারণ দেখায় পরদার আড়াল আছে। যাহা হউক, এইবার আমরা কতকটা বুঝিলাম, কেন বেদ গোড়াকার বিদ্যমান বস্তুকে উত্তানপদ্ বা গাছ বলিয়া ফেলিলেন, এবং কেনই বা সেই গাছ হইতে দিক্ সকলকে জন্মাইলেন। আরম্ভে একটা undirected, scalar condition, তার পর directed, vector condition—প্রথমে যেন ফোর্সের একটা অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, তার পর তাহা হইতে “লাইন্‌স অফ ফোর্স”। এই মূলতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে ঐ উত্তানপদ ও দিক্ সমূহের জন্ম-বিবরণ দিয়া।

এ মূলতত্ত্বের আলোচনা এখানে মুলতুবি থাকুক—ফল কথা, আমরা যেটাকে সাধারণতঃ আগুণ বলিয়া থাকি, সেটা ঐ বেদোক্ত উত্তানপদেরই একটা শাখা। শাখা লইয়া গাছটাকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। আপাততঃ আর শাখায় শাখায় বেড়াইয়া লাভ নাই, তবে কথাটা ভুলিবেন না যে, অগ্নি পরীক্ষায় আমরা আজ যে নীতির অনুসরণ করিলাম, যে সূত্রের প্রয়োগ করিলাম, ইন্দ্রাদি অপরাপর দেবতাগণের আলোচনা প্রসঙ্গেও সেই নীতি, সেই সূত্রের অনুসরণ আমাদিগকে করিতেই হইবে। সূত্র হারাইলে বেদ-গহনে প্রবেশ করিয়া পথহারা দিশেহারা হইয়া পড়িব। সাহেব পণ্ডিতদের মুখে আমাদের বেদ Veda হইয়াছেন, শতপথ ব্রাহ্মণ ছটাপটা ব্রাহ্মণা হইয়াছেন, আর আমরা যদি গীতোক্ত সেই সাত্ত্বিক দৃষ্টি বা জ্ঞান (১৮শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক) অর্থাৎ, বহুর মধ্যে এককে আঘত, ওতপ্রোত দেখার সামর্থ্য হারাইয়া বসি, তবে আমাদের মধ্য হইতে পূর্ব্বপুরুষ-পুণ্যার্জ্জিত

ধর্ম্মপ্রবণতা ও আস্তিক্য 'ভেদ' হইয়া নামিয়া যাইবে; এবং সেই 'ভেদে'র ফলে এই অতি প্রাচীন কোলাপ্সের রোগীটা 'ছুটাপটা' করিয়াই আশু পঞ্চত্ব পাইবে। এ প্রাচীন হিন্দু সমাজ কোলাপ্সের রোগীর মত পড়িয়া আছে, কিন্তু এখনও ধাত্ ছাড়ে নাই। লক্ষণ দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে আশাও জাগে যে, সে আবার নবীন বলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশান্ত "না-বালক" বিশ্ব-মানবকে নিজের মঙ্গল ক্রোড়ে তুলিয়া শান্ত করিবে, ধরিত্রীর ধী-বৃত্তিগুলিকে আবার সনাতন কল্যাণ-মার্গেই প্রবাহিত করিয়া দিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে কোলাপ্সটাও বড় সাধারণ নহে; ইহার উপর বিলাতী জোলাপের ব্যবস্থা হইলে—ঐ যা বলিলাম, 'ভেদ', 'ছুটাপটা' এবং 'ছুটি'। অতএব অতি সাবধানে আমাদিগকে বেদ-রহস্য অন্বেষণ করিতে হইবে।

আপাততঃ অগ্নির কথা চলিতেছিল। চরম দৃষ্টিতে তিনি ত চৈতন্য বা আত্মা। এখন তাঁহাকে কতকটা খাটো করিয়া দেখিতে চেষ্টা করা যাক্। আধ্যাত্মিক রহস্য শুনাইবার জন্য ঠিক আসরে আমি দাঁড়াই নাই। মহাজনেরা সে ভার লইবেন। আমি খাটো করিয়া দেখিতে ও দেখাইতেই আসিয়াছি—কারণ, আমার লক্ষ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া করার দিকে। তবে খাটো করিয়া দেখিতে গিয়া সত্য সত্যই বেদকে খাটো করিয়া না ফেলি, এই জন্য অদিতির ও অগ্নির গোড়ার সমাচার, ঘরের খবরও আমরা লইয়া রাখিলাম। নহিলে, আপনারা হয়ত ভাবিতেন যে, আমি ঋষিদের অভিপ্রায়ের ছায়াস্পর্শ করিতে না পারিয়া, অদিতিকে ঈথার, অগ্নিকে বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্রিসিটি বানাইয়া ছাড়িয়া দিতেছি। আর যাহাই বলুন, সে দুষ্কর্ম্মের অপবাদ আমায় দিবেন না। আমি ঈথারকে অদিতির মোটামুটি প্রতীক বলিয়াছি মাত্র, এবং সম্ভবতঃ, ইলেক্ট্রিসিটিকে অগ্নির ঐ রকম প্রতীক বলিতে যাইতেছি। 'প্রতীক' কথাটাকে লইয়া গোলে পড়িবেন না। দুইটা আলাদা জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে, একটাকে অপরটার প্রতীক মনে করা হয় বটে, যেমন জলের ঢেউকে বাতাস বা ঈথারের ঢেউএর কতকটা প্রতীক আমরা মনে করিয়া থাকি। কিন্তু আমি অদিতি ও ঈথারকে আলাদা করিতেছি না; অগ্নি ও ইলেক্ট্রিসিটিকেও আলাদা করিতেছি না। অদিতি নিরতিশয়রূপে অখণ্ডিত ও ব্যাপক বস্তু, কাজেই ইহা ঈথার সিরিজের পরাকাষ্ঠা; খাঁটি করিয়া দেখিলে যে জিনিষটা অদিতি, মোটামুটি ভাবে দেখিলে তাহাই ঈথার; অদিতি "ফ্যাক্ট", ঈথার "ফ্যাক্ট—সেক্সন"। অগ্নি ও ইলেক্ট্রিসিটির বেলাতেও এই হিসাব। এই কথা মনে রাখিয়া তবে বৈজ্ঞানিকের কথায় কাণ দিবেন।

আপাততঃ প্রশ্ন এই—বেদ যে অগ্নিকে সর্ব্বভূতে আমাদের দেখাইলেন—মেঘের বিদ্যুৎ এবং মহানসের বহ্নি যে বিশ্বায়ু অগ্নিরই শাখা মাত্র, তাঁহার চৈতন্যমত্তা না হয় আপাততঃ ছাড়িয়া দিলাম—অর্থাৎ, আপাততঃ এটা না হয় নাই মনে করিলাম যে, সে বস্তুটি চৈতন্য বা আত্মাই। কিন্তু চৈতন্য বাদ দিলে, জিনিষটা দাঁড়াইল কি? প্রশ্ন শুনিয়াই আপনারা লক্ষ্য করিলেন কিরূপে এখন আমরা খাটো করিয়া, কতকটা মনগড়া করিয়া লইয়া, অগ্নিকে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে লইয়া যাইতেছি। 'মনগড়া" বলিলাম এই জন্য যে, চৈতন্য বা অনুভব (Experience) ছাড়া আর সবই অল্পবিস্তর রূপে মনগড়া। যাহা সত্য সত্যই অনুভব হইতেছে তাহাকে উড়াইয়া দিবার যো নাই; কিন্তু কোন কিছু পদার্থকে অনুভবের বাহিরে বসাইতে গেলেই, আমাদের কল্পনা করিতে হয়, বাদ সাদ দিতে হয়। আশা করি, এ সোজা কথাটার দৃষ্টান্তের ও নজিরের জন্য আপনারা বায়না করিবেন না।

আচ্ছা, অগ্নিকে বিজ্ঞানের বহির্মুখী দৃষ্টিতে, অথবা আধিভৌতিক দৃষ্টিতে, দেখিতে গিয়া কি মনে করিব বলুন দেখি? হিট্ বা তাপ বলিলে চলিবে কি? অথবা ইলেক্ট্রিসিটি বলিতে হইবে? আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভাবের কথা ছাড়া, বেদেই অগ্নি সম্বন্ধীয় যে সকল আধিভৌতিক ভাবের কথা আমরা পাই, তাদের তাৎপর্য্য কোন্ দিকে—হিটের দিকে, না ইলেক্ট্রিসিটির দিকে, না অন্য কোনও দিকে? প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইবে না। দু'টো একটা অগ্নি-মাহাত্ম্য শুনিলে এ প্রশ্নের সমাধানে একটা কষ্টিপাথর (test) আমরা পাইবার আশা করিতে পারি। তবে বলিয়া রাখি যে, অগ্নিকে সরু মোটা মাঝারি নানা রকম করিয়াই ঋষিরা দেখিয়াছেন; কাজেই বেদোক্ত অগ্নির কোনও কোনও পরিচয় শুনিয়া যদি আমাদের মনে হয়—তিনি ইলেক্ট্রিসিটির মতন একটা জিনিষ, আবার আর

আর পরিচয় পাইয়া মনে হয় তিনি ছিটের মতন একটা ব্যাপার, তবে সব বোঝাপড়া ভণ্ডুল হইয়া গেল, এমনটা আপনারা ভাবিবেন না। বিজ্ঞানের শক্তি ও তাদের ব্যাপার গুলা ত' সব "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া নাই—বিজ্ঞানের পরিবার একান্নবর্ত্তী পরিবার।

এখন ১।৯৫।৪ ঋকটি আবার শুনুন—"অন্তর্হিত অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন।" গত বারে এই ঋকটি উদ্ধার করিয়া আপনাদিগকে বৈদিক হেঁয়ালির নমুনা দেখাইয়াছিলাম। "বৎসঃ মাতৄঃ জনয়ত" এই বাক্য আছে। সায়ণ মানে করিয়াছেন—বৈদ্যুতাগ্নি মেঘরূপ জলের পুত্র হইয়াও আবার বৃষ্টি জলের কারণ হইয়া থাকে। কেন না, পার্থিব অগ্নিতে যে হব্য অর্পিত হয় তাহাই সূক্ষ্মভাবে আদিত্য-মণ্ডলে যাইয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে। কথাটা আজগবি ঠেকিতেছে, তলাইয়া দেখা দরকার। অগ্নি জলের গর্ভ, কি না পুত্রস্থানীয়, এ কথা অনেক মন্ত্রে আছে, আবার অগ্নি জলের গর্ভ রচনা করেন,—অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া, অগ্নিকে ধারণ করিয়াই, মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে, এ কথার প্রমাণও ভূরি ভূরি আছে। সম্প্রতি উদ্ধৃত মন্ত্রের ভাষ্যে 'অন্তর্হিত' এই বিশেষণটি সায়ণ বসাইয়াছেন, লক্ষ্য করিবেন। ১।৭০।২ বলিয়াছেন "গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চ রথাং" ইত্যাদি। অর্থাৎ, অগ্নি অন্তর্হিতভাবে নিখিল ভূতেই আছেন। অগ্নি জলের গর্ভে বাস করেন, আবার জলকে উৎপাদন করেন, এমন কথা শ্রুতি কেন বলিতেছেন? আর একটা ঋক্ (১।৯৫।৮) শুনুন—"যখন অগ্নি অন্তরীক্ষে গমনশীল জল দ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সেই কবি সর্ব্বলোক ধারক অগ্নি সকল জলের মূলভূত অন্তরীক্ষ তেজোদ্বারা আচ্ছাদন করেন। অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সেই তেজ সংহতি প্রাপ্ত হয়।" "তেজসাং সংহতির্ভবতি"—সায়ণ। এ মন্ত্রেরই বা ঠিক তাৎপর্য্য কি? ১৬৫।২ বলেন "অগ্নি উদক গর্ভে প্রাদুর্ভূত; উদক সমূহ (সেই অগ্নিকে গোপন করিবার জন্য) বর্দ্ধিত হইল।" ৫ ঋক্ বলেন—"জলমধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায় অগ্নি জলের ভিতর প্রাণ ধারণ করেন। তিনি গর্ভস্থিত পশুর ন্যায় জলের মধ্যে ছিলেন, পরে প্রবর্দ্ধিত হইলে তাঁহার প্রভা সুদূর বিস্তৃত হইল।" অগ্নির গুহালীনতার কথাও আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। বিজ্ঞানের এ সব মন্ত্রের উপর ভাষ্য লিখার দরকার হইবে কি? জল ও অগ্নির সম্পর্কের কথা ভবিষ্যতে আরও বিস্তারে বলিব; আজ যে দুই একটি মন্ত্রোদ্ধার করিলাম, তাহাদের উপর বিজ্ঞান কেমন ধারা ভাষ্য লিখেন, তাহাই দেখিয়া ছুটি লইব।

'আইওন্' শব্দটার লক্ষণ আপনারা বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই। কোনও দ্রব্যের দানা বা পার্টিকেল যদি কিঞ্চিৎ তাড়িতশক্তি (পজিটিভ অথবা নেগেটিভ) বহন করিয়া বেড়ায়, তবে সেই দানাকে আইওন বলে। অর্থাৎ, ইলেক্‌ট্রিক চার্জবিশিষ্ট দানাই আইওন। কোনও তরল বা বায়বীয় পদার্থের দানাগুলি যদি এইভাবে ইলেক্‌ট্রিক্ চার্জের বাহন হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই তরল বা বায়বীয় পদার্থ ionised হইয়াছে, ইহা আমরা বলিয়া থাকি। ধরুন কোনও গ্যাস। ঐ গ্যাস ionised হইলে, তার ফলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইবে? ঐ গ্যাস Conductor of Electricity, অর্থাৎ তাড়িতের পরিচালক বস্তু হইবে। সেই গ্যাসের মধ্যে কোনও তাড়িত-বোঝাই দ্রব্য থাকিলে, সেই তাড়িত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। তাড়িতের বোঝাই ক্রমশঃ খালি হইয়া আসিবে। ইহাকে বিজ্ঞানে "Leak" (লিক্) বলে। গ্যাসকে 'আইওনাইজ' করার উপায় নানাবিধ। X-Rays অথবা Ultra-violet raysএর সম্পাত, রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের সান্নিধ্য, ইত্যাদি নানা কারণে গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলা তাড়িত-বাহক হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, 'আইওনাইজেসন্ অব গ্যাস' যে মোটামুটি কি ব্যাপার, তাহা আমরা সংক্ষেপে শুনিয়া লইলাম। এখন একটা কথায় অবধান করুন। বৈজ্ঞানিকদের অনেক দিন হইতেই জানা ছিল যে gases from flames are conductors of electricity. Sir J. J. Thomsonএর গ্রন্থ হইতে খানিকটা পড়িয়া শুনাইতেছি—"The gases which come from the flame, even when they have got some distance away from it and have been cooled by the surrounding air, possesses for some time considerable conductivity and will discharge an isolated conductor placed within their reach. The conductivity can be taken out of the gas by

making it pass through a strong electric field. This field abstracts the ions from the gas, driving them against the electrodes so that when the gas emerges from the field, although its chemical composition is unaltered, its conducting power is gone. * * * If not driven out of the gas by an electric field, the ions are fairly long-lived. Giese noticed that the gas regained appreciable conductivity 6 or 7 minutes after it had left the flame. The ions stick to any dust there may be in the air and then move very slowly so that their rate of re-combination becomes exceedingly slow. * * To produce the ionised gas high temperature as well as chemical action is required. That chemical action alone is insufficient to produce ionisation is shown by the case of hydrogen and chlorine which do not conduct (electricity) even when combining under ultra-violet light." এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছেন ও করিতেছেন; আমরা কথাটা পাইতেছি যে, অগ্নিশিখায় দ্রব্য পুড়িয়া গ্যাস হইয়া উঠিতে থাকিলে, তাহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলি ions, কিনা তাড়িতশক্তিযুক্ত, হইয়া যায়। আকাশে ধূলিরেণু পাইলে তাহাদের ঘাড়েও চাপিয়া বসে।

এখন ধরুন আমি যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতেছি। হুত-দ্রব্য অবশ্য কতক কতক ধোঁয়া হইয়া উপরে উঠিতেছে—এ ওঠাতেও লাভ আছে। আবার, হুত দ্রব্যের কতক অংশ গ্যাস হইয়া অগ্নিশিখা হইতে নির্গত হইতেছে—তীব্র তাপ ও রাসায়নিক সংযোগ, এ দুই অনুষ্ঠানের কোনটারই সে ক্ষেত্রে অভাব নাই। ফলে হইবে কি? সেই হুত দ্রব্যের গ্যাস তাড়িতশক্তিবিশিষ্ট, 'আইওনাইজ্‌ড' হইয়া উঠিবে। অগ্নিশিখা ছাড়াইয়া অনেক দূর গেলেও, এবং ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও, সে গ্যাসরেণুগুলি তাহাদের 'চার্জ' সহজে ইস্তফা দিবে না। খাস ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটরি ইস্তফা হইতে নারাজ, করা যায় কি? সেই আইওনগুলি ধূমকণা বা ধূলিকণার সঙ্গে যোট বাঁধিয়া উপরে যাইতে পারে। ধরুন, তাড়িত-শক্তি-বিশিষ্ট কণাগুলি নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইল। ফলে কি হইবে? আপনারা বেদবাক্যে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বিজ্ঞান বলিতেছেন, সে সমস্ত চার্জড্ পার্টি-কেল্‌স উপরে উঠিয়া বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাইয়া মেঘ করিয়া দিতে চাহিবে। জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় কি কি কারণে, তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই পরীক্ষাদি করিতেছেন। ধরুন, একটা বয়লার হইতে ষ্টিম্ বাহির হইয়া আসিতেছে—Ultra-violet light, X-rays প্রভৃতির সংস্পর্শে তাহাকে ঘনীভূত হইতে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন। ধূলিকণা প্রভৃতিও বাষ্পের ঘনীভূত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়, তাহাও বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়াছেন। টম্‌সন সাহেব লিখিতেছেন—"The discovery of the effect of dust on the condensation of water vapour (by providing the drops to start with a finite radius) produced a tendency to ascribe the formation of clouds in all cases to dust and to dust alone. Von Helmh olt ও Richarz মনে করিতেন অন্যরূপ—শুধু ধূলিকণা নহে, আইওনও জলীয় বাষ্পের ঘনীভাব-কেন্দ্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তাড়িতশক্তি বিশিষ্ট পার্টিকেলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাষ্প জমাট বাঁধিয়া মেঘ হইয়া থাকে। ১৮৯৭ অব্দে পরীক্ষা দ্বারা এ কথাটা সপ্রমাণ হইয়াছে।

মেঘ তৈয়ারি করিতে গেলে দুইটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। গ্যাসের আয়তনটাকে একটুখানি বড় করিয়া দিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা হইতে দিতে হয়। এই এক ব্যবস্থা। তার পর, সেই বাষ্পের মধ্যে কতকগুলি ঘনীভাব-কেন্দ্র (ধূলি-কণাই হউক আর আইওনই হউক) যুটাইয়া দিতে হয়। ধূলিকণাই যে আবশ্যক এমন নহে। পরীক্ষার ফল শুনুন—"Using an arrangement of this nature, Wilson found that when dusty air filled the expansion chamber, a very slight expansion was sufficient to produce a dense fog, if this (fog) was allowed to settle and the process repeated, the air by degrees got deprived of the dust which was carried down by the fog; when the air became dust-free no fogs were produced by

small expansions." ধূলিরেণুর সাহায্যে যতটা ঘনীভাব করা যাইতে পারে তাহার শেষ হইল; ধূলিগুলাও বারবার কোয়াসায় ধুইয়া নীচে পড়িয়া গেল; আর ধূলি নাই। এখনও মেঘ চাই; করিব কি? গ্যাসের আয়তন আরও বাড়াইয়া দাও। "On increasing the expansion beyond 1·38 a much denser cloud was produced in the dust-free gas, and the density of the cloud now increased very rapidly with the expansion. Thus we see that even when there is no dust, cloudy condensation can be produced by sudden expansions if these exceed a certain limit." অতএব মেঘ হইতে গেলে ধূলিকণা চাই-ই চাই, এমনটা নহে। তার পর, ঐ গ্যাসের মধ্যে নানা রকমে আইওন উৎপাদন করিয়া উইলসন সাহেব দেখাইলেন যে, গ্যাসটা কতকটা গা হাত পা ছড়াইতে (অর্থাৎ expand) যদি পায়, তবে, তাহার মধ্যে আইওন ছড়ান থাকিলে মেঘ হবার খুবই সুবিধা হয়। রঞ্জন-রে লইয়া পরীক্ষা হইল। দেখা গেল যে, গ্যাসটা কতকটা বেশি এলাইয়া থাকিলে, উক্ত "রে" গুলি তাহার মধ্যে অচিরাৎ ঘন ও অস্বচ্ছ মেঘ রচনা করিয়া দেয়। গ্যাসটা এলাইয়া আছে, এখনও রঞ্জন-রে সম্পাত করা হয় নাই। হয়ত' গোটা দুচ্চার জলবিন্দু দেখা যাইতেছে। যাই "রে" সম্পাত করা হইল, অমনি অক্ষৌহিণীর মত জল-কণিকারা দেখা দিল। ইউরানিয়াম প্রভৃতি রেডিও-এক্টিভ বস্তু সকল হইতে সে সমস্ত আইওন বিকীর্ণ হয়, তারাও এই যাদু দেখাইতে সমর্থ। Ultra-violet rays গুলারও এ খেলা দেখাইবার শক্তি আছে। "Wilson has also shown that when electricity is discharged from a pointed electrode in the expansion chamber, cloudy condensation is, as in the case of exposure to Rontgen rays, much increased for expansions between 1·25 and 1·38."

আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করিয়া পুঁথি বাড়াইব না, তবে, ইহাদের সঙ্গে পুরানো বেদমন্ত্রের সম্পর্ক আপনারা খেয়াল করিয়া যাইবেন। যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি বায়ু হইয়া কেমন ধারা বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার প্রমাণ শিষ্ট বৈজ্ঞানিকের লেখা হইতেই দিলাম। তবে যজ্ঞে ঘি ঢালিতেছি কেন, মন্ত্র পড়িতেছি কেন—এ সব কৈফিয়ৎ আজই দিতে পারিতেছি না। সুতরাং, বিশেষ ভাবে, যজ্ঞ হইতেই যে কেন পর্জন্য হইবে, তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি না। না বুঝিলেও, একটা মস্ত কথা বুঝিতেছি যে, অগ্নির যেটা বৈদ্যুৎরূপ (অর্থাৎ ions), তাহা কেমন করিয়া জলের গর্ভ রচনা করে। যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা আমি আপনাদিগকে শুনাইলাম, সে গুলিতেও ionগুলাকে জলের দানা বাঁধিয়া দেওয়া ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেখিলাম না কি? "জলের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে অগ্নি রহিয়াছেন"—বেদ বলিতেছেন, "তিনি গভস্থিত পশুর ন্যায় জলের মধ্যে ছিলেন"; "অগ্নি উদক গর্ভে প্রাদুর্ভূত; উদক সমূহ (অগ্নিকে গোপন রাখিবার জন্য) বর্দ্ধিত হইল"; "অগ্নি অন্তরীক্ষে গমনশীল জলের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেন";—ইত্যাদি ভূরিভূরি বেদ-বাক্য অগ্নি ও জলের সম্পর্ক আমাদিগকে হেঁয়ালির ভাষায় শুনাইতেছেন। উইলসন সাহেবের হোটেলে নয়, পরীক্ষাগারে, এই সমস্ত হেঁয়ালির উপর বিশদ টীকা লেখা হইতেছে না কি? বৈদ্যুৎ কণিকাকে মাঝে করিয়া জলের দানা বাঁধিয়া থাকে—এই সিদ্ধান্ত পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া "গুহাস্থিত" অগ্নির "নিগূঢ় পদ" অনেকটা আমাদের কাছে খোলসা করিয়া দিতেছে না কি?

এ বোঝাপড়া করিতে বসিয়া, অগ্নিকে বিদ্যুৎ ভাবার আমাদের কি এক্তার, এ জেরা কাটিয়া অনর্থক গোল তুলিলে চলিবে না। অগ্নির জন্মস্থান দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ—এ সব কথা বেদমুখে শুনিয়া আর অগ্নিকে 'আগুণ' বানাইয়াই, বামন করিয়া, রাখিব কিরূপে? আর যদিই বা অগ্নিকে আগুণই ভাবি, তবুও আমরা গ্যাস ও অগ্নিশিখার সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ভূতলে কোনও একটা অগ্নিকাণ্ড হইলে, তার ফলে প্রচুর আইওনের ফসল হয়; এবং সেই আইওনের পাল, স্বাধীনভাবেই হউক আর ধূলো ধোঁয়ার কাঁধে ভর করিয়াই হউক, উপরে উঠিয়া মেঘ জমাইয়া দিতে পারে। যে কোন অগ্নিকাণ্ড হইতেই এরূপ হইতে পারে; যজ্ঞের এ কাজে বিশেষ কৃতিত্ব কতটুকু, তাহা না হয়, আপাততঃ আলোচনা নাই-ই করিলাম। ফলে পাইলাম যে, বেদ নানান্ সঙ্কেতে অগ্নির যে একটা "নিগূঢ়-

পদ" আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞানাগারে অন্বেষণ করিতে করিতে, জলবিন্দুর মধ্যে গর্ভস্থ শিশুর মত শায়িত অগ্নির সেই পদটা, হালের অপরাবিদ্যা ধাত্রীর মত সন্তর্পণে টানিয়া বাহির করিতেছেন। আমরা বেদের সঙ্কেত-বাক্য-গুলার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি; যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতিও, যে কারণেই হউক, সঙ্কেত সব যায়গায় ভাঙ্গিয়া দেন নাই। জলের গর্ভে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য অনেক দিন হইতেই ছট্‌ফট্ করিতেছিল; এতদিন এ সব চাঞ্চল্যের সাড়া পাই নাই। পশ্চিমের ধাত্রীরা খুব সতর্ক। তাই অগ্নি বিজলি-কুমার-রূপে প্রসব হইলেন, আমাদের কাশী নৈমিষারণ্যে নয়, পশ্চিমের ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটারিতে। ইহাতে আপ্-শোষের কিছুই নাই; তবে ঘরের ছেলেকে পর ভাবিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আর যেন আমরা না করি। অগ্নিকুমারের একবিংশতি নিগূঢ়পদের কথা বেদ বলিয়াছেন; আজ আমরা শুধু একখানি পদ চিনিয়া যাইতে পারিলাম। অবশ্য, আবার বলিতেছি যে, এ চেনা পরিচয় আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, আধিভৌতিক ভাবে। আধ্যাত্মিক ভাবে হয়ত' জল ও অগ্নি—প্রকৃতি ও আত্মা। সঙ্গীতে গুণী তানসেন বলিয়াছেন—"সপ্তস্বর তিনগ্রাম একইশ মূর্ছন";—বেদ-ব্যাখ্যারও সেইরূপ নানান স্তর।

আর একটা কথা আজ প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছিল। অগ্নিতে প্রাপ্তাহুতি আদিত্য-মণ্ডলে যায় কিরূপে? অগ্নি-শিখায় হুতদ্রব্য ionised হয়; তার দানাগুলার কতক "ধন" তাড়িত কতক বা "ঋণ" তাড়িত বহন করিয়া বাহির হয়। সূর্য্যের charge positive; সে চার্জ্জের মাত্রা (voltage) ও ভয়ানক। তার ফলে সূর্য্য নেগেটিভ তাড়িত-কণাগুলিকে (অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রণগুলাকে) নিজের দিকে টানিয়া লইতে চাহিতেছেন। Arrheneus প্রমুখ হালের বৈজ্ঞানিক অনেকে এটা মানিতেছেন। অতএব, হুতপদার্থের নেগেটিভ তাড়িত-কণিকাবলীর আদিত্যের দিকে অভিসারিকা হওয়ায় খুব সম্ভাবনা আছে। কথাটা সংক্ষেপে পাড়িয়া রাখিলাম।



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] পূজারতা



পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৮)

প্রকাশ কলিকাতায় কোন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ছুটি হইলেই সে সোজা দেশে চলিয়া আসিত।

এবার যখন সে দেশে আসিল, তখন তাহার মুখখানা ভারি প্রফুল্ল। বাড়ী আসিয়া সেই সন্ধ্যাবেলায়ই সে উপেন্দ্রনাথের বাড়ী চলিল।

উপেন্দ্রনাথ তখন পূজার গৃহে সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছিলেন, দেবী তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিল। গলায় অঞ্চলটা জড়াইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ রাখিয়া নতজানু বসিয়া—যে স্বামী তাহাকে চিরকালের মতই পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, সেই স্বামীরই কল্যাণ কামনা সে করিতেছিল। এটী তাহার দৈনন্দিন কার্য্য। কোন্ সেই অপরিচিত দেশে অপরিচিত জনের মাঝে একা তাহার স্বামী, অসুখ বিসুখ হইলে দেখিতে কেহই নাই,—এই কথাটা মনে করিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে আকুল হৃদয়ে দেবতার চরণে নিবেদন করিত,—"নিজের জন্যে কিছুই কোন দিন চাই নি ঠাকুর, কোন দিন চাইব না, তাঁর জন্যে তোমার কাছে চাচ্ছি, তাঁর জন্যেই, তাঁকে ভাল রাখ।" হৃদয় যতই কেন না ব্যাকুল হইয়া উঠুক, ভগবানের চরণে হৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা নিবেদন করিয়া দিয়া দেবী যেন শান্তি পাইত।

"বউদি যে, ভাল তো সব—?"

হুড়মুড় করিয়া প্রকাশ ঢুকিয়া পড়িয়াই সম্মুখে দেবীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

আজকাল দেবী আর প্রকাশকে দেখিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া গৃহমধ্যে পলাইত না। আগে সে বধূ ছিল, হঠাৎ কখন্ গৃহিণীর পদে বরিত হইয়া গিয়াছে। ভবানী যতদিন ছিল ততদিন সে কাহারও সম্মুখে বাহির হয় নাই, কাহারও সহিত কথা কহে নাই, নিজের নিভৃত নির্ব্বাচিত স্থানে অটল হইয়া বসিয়া ছিল। ভবানী চলিয়া যাইবার পরও কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু লঘুপ্রকৃতি, পরিহাসপ্রিয়, সরলহৃদয় প্রকাশ তাহাকে কথা না বলাইয়া, অবগুণ্ঠন না খুলাইয়া কিছুতেই ছাড়ে নাই। সেবারে উপেন্দ্রনাথের অসুখের সময় তাহাকে বাধ্য হইয়া মুখ খুলিতে হইয়াছিল। তাহার পর উপেন্দ্রনাথের অসুখ আরোগ্য হইলে আবার সে তাহার নিভৃত দুর্গে আবদ্ধ হইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু প্রকাশ হাসিয়া বলিয়াছিল—"বউদি, 'কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি' এই প্রচলিত নীতিটা আর তোমার কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলো না, ওটা আমি আদতেই দেখতে পারিনে। আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত, তোমায় আমি ছোট্ট

বোনের মত দেখি, তুমি কি আমায় ঠিক তোমার ভাইয়ের মত ভাবতে পারবে না?"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা সত্যকার ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে দেবী আর অবগুণ্ঠন টানিতে পারে নাই, প্রকাশের সহিত তাহাকে কথা কহিতেই হইল।

আজ প্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে একটা ছোট্ট "হাঁ" দিয়া তাহাকে প্রণামান্তে তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কখন এলেন?"

প্রকাশ বলিল, "এই আসছি; এসেই তোমাদের একটা সুসংবাদ দিতে এসেছি।"

সে সুসংবাদটা যে কি দেবী তাহা জানিত, তাই তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া প্রকাশ বলিল, "জিজ্ঞাসা করলে না বউদি—সে সংবাদটা কি?"

দেবী একটু হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র, তাহাতে মুখটাই তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল,—সে বলিল, "কতক জেনেছি দাদা, তাই জিজ্ঞাসা করলুম না।"

বিস্ময়ে প্রকাশ বলিল, "কতক জেনেছ? সত্য বুঝি তোমায় পত্র দিয়েছে?"

দেবী মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমায় নয়, বাবাকে পত্র দিয়েছেন; আজ কয়দিন হল সে পত্র পাওয়া গেছে।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আসার কথা লিখেছে?"

দেবী অত্যন্ত লজ্জিতা ও কুণ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছিল। তাহার স্বামীর কথা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা—এ তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। লজ্জায় আরক্তিম মুখখানা নত করিয়া সে তুলসীতলার প্রদীপটির সলিতা বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "না, আসবার কথা কিছু লেখেন নি।"

প্রকাশ চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কি জানি, কেন সে সে-কথা কিছু লেখেনি। আমায় সে লিখেছে, এই সামনের নভেম্বর কি ডিসেম্বরের প্রথমেই ফিরে আসবে। এখানেও সে বাংলায় ফিরেই আসবে, তাই—"

বিবর্ণ মুখে দেবী বলিয়া উঠিল, "এখানে কেন?"

প্রকাশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "এখানে আসবে না?"

দেবী উত্তর দিল না, শুধু মাথা নাড়িল।

প্রকাশ তাহার বিবর্ণ মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "সে এখানে আসবার অধিকার কি একেবারেই হারিয়েছে, আর কি সে এখানে আসতে পাবে না?"

মাটীর পানে দুই চোখের দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দেবী শুধু মাথা নাড়িল, উত্তর দিতে তাহার ভয় হইতেছিল—পাছে কথা কহিতে গেলে চাপা উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

"কিন্তু কেন বউদি, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

শান্তকণ্ঠে দেবী বলিল, "সে কথা বাবার কাছে শুনতে পাবেন। বাবার আদেশ—বেঁচে থাকতে ছেলেকে এ ভিটেয় পা দিয়ে কলঙ্কিত করতে দেবেন না।"

প্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে নিভন্তপ্রায় প্রদীপটির পানে তাকাইয়া রহিল। একটু পরে দেবীর পানে তাকাইয়া বলিল, "বুঝেছি—তিনি কিছুতেই ছেলেকে ক্ষমা করবেন না, কিন্তু তুমি,—তুমি বউদি।—"

দেবী স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি তখনও মাটীর উপরে।

প্রকাশ ব্যগ্রভাবে বলিল, "তোমারও ওই কথা, তুমিও তাকে ক্ষমা করবে না?"

দেবী বলিল, "তিনি আমার কাছে কোন দোষ করেন নি দাদা; যদিও করে থাকেন আমি তা করবার আগে হতে তাঁকে ক্ষমা করে এসেছি, কিন্তু—"

প্রকাশ বলিল, "কিন্তু কি?"

"না, কিছু নয়" বলিয়া দেবী ফিরিল।

প্রকাশ বলিল, "জ্যেঠামশাই কোথায়?"

"তিনি আহ্নিক করছেন ও-ঘরে—" বলিয়া দেবী সরিয়া গেল।

আকাশে সে দিন পূর্ণাকার চাঁদখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। আজ রাস-পূর্ণিমার নিশি; চারিদিক অনাবিল জ্যোৎস্না-ধারায় ভাসিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল চাঁদের আলো। মৃদুল বাতাসে সামনের জ্যোৎস্নাসিক্ত নারিকেল পাতাগুলি সর সর করিয়া কাঁপিতেছিল, নীচেয় তাহার ছায়া তর তর করিয়া কাঁপিতেছিল।

দেবী বারাণ্ডায় বসিয়া একদৃষ্টে চাঁদের পানে চাহিয়া ছিল। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল নীল আকাশের বুক বাহিয়া ক্ষুদ্র একখানি মেঘ সারা গায় চাঁদের আলো মাখিয়া শুভ্র সুন্দর রূপে হেলিতে দুলিতে ভাসিয়া আসিতেছিল,

সেই ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ-উজ্জ্বল মেঘখানার উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, সমসুখদুঃখভাগিনী ভবানীর দুর্ভাগ্যের কথা, নানা রকম দুর্ভাবনায় তাহার মনটা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, সে জন্য দেবী এতটুকুও কোন দিন ভাবে নাই। নিজের অভাব তাহাকে কোন দিনই পীড়ন করিতে পারে নাই; সুখ আসিলে তাহা অগ্রসর হইয়া বরিয়া লইতে হইবে,—দুঃখ আসিলে কেন আসিল বলিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবে—এ শিক্ষা সে পায় নাই। সে জানে সুখ দুঃখ চিরন্তন নিয়মে আসা-যাওয়া করিতেছে, লইব না বলিলে হইবে না, লইতেই হইবে।

নিজের জন্য সে অধীর ব্যাকুল না হইলেও পরের ভাবনায় সে অধীর হইয়া পড়িত,—নিজের কষ্ট ভুলিয়া পরের কষ্ট ভাবিত। ভবানীর জন্য সে ভাবিত খুব বেশী রকম, ভবানীর দুঃখ অনুভব করিত সে নিজের হৃদয় দিয়া। নিজে ব্যথা না পাইলে কেহই পরের ব্যথা অনুভব করিতে পারে না। যে দরিদ্র সে দরিদ্রের কষ্ট যতটা বুঝে এতটা অপর কেহই বুঝিতে পারে না।

বিমর্ষ প্রকাশ সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। দেবীর পানে ফিরিয়া বিষণ্ণ সুরে বলিল, "তোমার কথাই ঠিক হল দিদি, জ্যেঠামশাই কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে রাজি নন।"

দেবী ভাঙ্গা সুরে বলিল, "আমি আগে হতেই তা জানি।" কথাটা এত আস্তে বাহির হইল যে তাহার সুরটা ফুটিতে পাইল না, কথা কয়টা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই শুনাইল।

প্রকাশ বলিল, "সে কিছু টাকা—সেখানকার খরচ হতে বাঁচিয়ে পাঠিয়েছে; দিতে গেলুম, জ্যেঠামশাই কিছুতেই নিলেন না। তিনি বললেন,—সে নিজের রক্ত নিজে বিক্রী করে টাকা পাঠিয়েছে—আমি ও-টাকায় হাত দিতে পারব না। এটা কিন্তু খুব ভাল কাজ হ'ল না; তাকে ক্ষমা না করলেও করতে পারেন, না হয় তার মুখ দেখবেন না, টাকা নিতে কি দোষ আছে দিদিমণি? তোমাদের তো এই অবস্থা। গোপনই কর আর যাই কর, আমার চোখে তো এতটুকু এড়ায় না,—আমি ঘরের ছেলে, সবই জানি। তার কাছ হতে টাকা নেবার দাবী তোমরা অনায়াসে করতে পার,—তোমাদের সে জোর চিরকালের জন্যেই আছে। জ্যেঠামশাই না নিলেন, তুমি রেখে দাও। এমন দিনও আসতে পারে, যে দিন এই টাকা তোমাদের সংসারেরই কাজে লাগবে।"

সরিয়া গিয়া আর্ত্তভাবে দেবী বলিয়া উঠিল, "না দাদা, মাপ কর আমায়, আমি ও-টাকা নিতে পারব না।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

দেবী উত্তর দিল, "তাঁর বাপ যখন টাকা নিলেন না, তখন আমি কেন নিতে যাব দাদা? আমি এ সংসারে এসেছি কার দয়ায়, কে আমায় এ সংসারে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে কথাটা ভেবে দেখুন। মানি—স্বামী নারীর একমাত্র দেবতা—কিন্তু সেই দেবতাকে আমি তো এই গুরুর আশীর্ব্বাদেই লাভ করেছিলুম,—গুরুকে হেলা করে দেবতার কৃপা আমি লাভ করতে চাইনে। স্বামী আমায় ত্যাগ করে গেছেন, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি, কিন্তু বাবা আমায় ত্যাগ করেন নি, গভীর স্নেহে "মা" বলে আমাকেই জড়িয়ে ধরে বেঁচে আছেন। সংসারে আমরা দুজনে দুজনের অবলম্বন। আমাদের মাঝখানে আজ স্বামী নেই, পুত্র নেই, আছে মা ছেলে—বাপ মেয়ে এই মধুর ভাবটা। তিনি যা নিতে পারলেন না, আমিও তা নিতে পারব না, এর জন্যে আমায় মাপ করবেন। এ টাকা যাঁর তাঁকেই আপনি ফিরিয়ে দেবেন।"

প্রকাশ একটুখানি স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, "তা হলে সে এলে আমি তাকে কি বলব, সেটা আমায় ঠিক করে বলে দাও, আমি সেই কথাই তাকে বলে দেব।"

দেবী স্থিরকণ্ঠে বলিল, "বলবেন—আমি তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করেছি। স্বামী যতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা স্ত্রীর কাছ হতে পাওয়ার আশা করতে পারেন, আমি ততখানিই চিরকাল তাঁকে দেব, কিন্তু চিরজীবন এমনই তফাতে থাকব, জগতে আর কেউ জানবে না কখনও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কি না। আমি এ জীবনে কখনও কারও কাছে তাঁর স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দেব না, তিনিও যেন কখনও, স্ত্রী ভেবে, আমি যেখানে থাকব, সেখানে না আসেন, কারণ সে সম্পর্ক উঠে গেছে।"

"বউমা—"

"বাবা ডাকছেন—

দেবী উঠিল।

(১৯)

মাস খানেক পরে সত্য দেশে ফিরিবে এ সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"বউমা, শুনছো, সত্য আসবে ?"

দেবী কি কাজ করিতেছিল, তেমনি ভাবেই উত্তর দিল, "শুনেছি বাবা।"

উপেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া বলিলেন, "আরও শুনেছ যে সে এখানে আসবার কথা বলেছে ?"

দেবী ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, তাহাও সে শুনিয়াছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু এও তো তেমনি জানো বউমা—আমি বেঁচে থাকতে তাকে কিছুতেই এখানে আসতে দেব না। সে আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক উঠিয়ে কি করে দূরে সরে গেছে, তা তো তুমি বেশ জানো। উঃ, সেদিনকার কথা মনে হলে আমার আর জ্ঞান থাকে না, যেদিন তার সঙ্গে দেখা করব বলে জিতেনের বাড়ীতে গেলুম, আর সে কি না তার দ্বারোয়ানকে দিয়ে—"

অধৈর্য্যভাবে দেবী বলিল, "যাক গিয়ে সে কথা বাবা, যখন বারণ করে দেওয়া হয়েছে, টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, তখন আর আসবেন না। নিজেরও একটা অপমান বোধ আছে তো। ও সব কথা যাক, আমি আজ আপনাকে একটা কথা বলতে চাই—।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি কথা মা ?"

দেবী বলিল, "ঠাকুরঝিকে একবার দেখতে যাওয়ার—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। সত্যর ভাবনায় উপেন্দ্রনাথ এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ভবানীর কথা তাঁহার মোটে মনেই ছিল না। হঠাৎ আজ সেই দুর্ভাগিনী কন্যার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায়, বুকের মধ্যটায় কে যেন সজোরে আঘাত করিল, মাথাটা টন টন করিয়া উঠিল, তিনি দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিলেন।

তাঁহার বিশুষ্ক মুখখানার পানে তাকাইয়া দেবী বলিল, "আপনি একবার যান না বাবা, তাকে একবারটি দেখে আসুন। যদি সে রকম বোঝেন, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। এত লাঞ্ছনা উৎপীড়ন সয়েও সেখানে পড়ে থাকবে কেন বাবা ? যদি সেখানে একজন কেউ তার ব্যথার ব্যথী থাকত, সে তার কাছে মনের দুটো কথা বলে অনেকখানি শান্তিলাভ করত। সেখানে যে কেউ নেই বাবা, যে তাকে একটু প্রবোধ দিতে পারে, যার কাছে দুটো কথা বলে সে তার মনের গুরুভার লাঘব করতে পারে। আপনি তো এখনও বর্ত্তমান রয়েছেন বাবা, ভাই যেন থেকেও নেই, আপনি তো আনতে পারেন।"

অস্ফুট কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়ে হলে অনেকটা সইতে হয় মা,—তুমি এত দুঃখ সয়ে রয়েছ কি করে ?"

অনুনয়ের সুরে দেবী বলিল, "আমার কথা বলবেন না বাবা, এখানে আমার থাকতে ভাল লাগে বলে আমি নিজেই বাপের বাড়ী যাই নি। আমার মত যদি সে থাকতে পেত সে যে তার স্বর্গধামে থাকা হতো। তার মাতাল স্বামী তাকে এক এক দিন যা মারে, শাশুড়ি কত দিন তাকে না খেতে দিয়ে রাখে, সে সব তো এক দিনও সে আপনার কাছে বলে নি বাবা। মেয়ে হয়ে জন্মালেই যে এত কষ্ট সইতে হবে এ কথাটা বলে আপনি এত বড় ঘটনাটাকে উড়িয়ে দেবেন না। একটা মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আশা উৎসাহ, এমন কি জীবন মরণ পর্য্যন্ত এ রকম করে তাচ্ছিল্য করতে গেলে বড্ড অবিচার হয়ে যায় বাবা।"

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সব বুঝি মা, সব বুঝি, কিন্তু বুঝেও যে অবুঝ হয়ে থাকতে হয়। টাকা দিতে পারলে ভবানী সকল রকম অপমান লাঞ্ছনার হাত হতে নিস্তার পেতে পারে, কিন্তু টাকা আমি পাই কোথায় ? আগেই তো বলেছি মা, আমি ভিখারীর চেয়েও দীন ; কারণ, তার পাঁচ দরজায় হাত পেতে দাঁড়াবার উপায় আছে, আমার সে অধিকারটুকুও নেই।"

দেবী বলিল, "সেটা আপনার বেহানকে জামাইকে বুঝিয়ে বলবেন বাবা, আপনার দুই ছেলের ব্যবহার তাঁদের জানাবেন, তাঁদের কাছে লজ্জা সরম করবেন না। আপনি তা হলে কাল সকালেই যান, রাত্রে আবার ফিরে আসবেন, আমি বেশ থাকতে পারব, ভয় হবে না। সে রকম যদি বোঝেন, দেখেন, তবে তাকে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।"

পরদিন ভোর বেলাই সে এক রকম জোর করিয়া উপেন্দ্রনাথকে ভবানীর শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল।

সারাদিনটা একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় সে কাটাইয়া দিল ;

সন্ধ্যা দিনের আলোকে ঠেলিয়া দিয়া পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া আসিল, তখনও উপেন্দ্রনাথ আসিলেন না।

দামোদরকে সন্ধ্যা দেখাইতে গিয়া সে কতক্ষণ সেখানে মাথা নত করিয়া পড়িয়া রহিল।

"মা—"

উপেন্দ্রনাথের আহ্বান কাণে আসিতেই সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিল।

ততক্ষণে হাতের বোঁচকাটা মাটিতে ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ নিজে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বারান্দার এক পাশে বসিয়া পড়িয়াছেন। দেবী তাড়াতাড়ি কলিকায় আগুন দিয়া আনিল।

তাহার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া উপেন্দ্রনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "বস মা, তামাক পরে খাচ্ছি, আগে সব কথাগুলো তোমায় বলি। যে জন্যে এত করে আমায় আজ পাঠালে, তার আগাগোড়া সব কথাগুলো শুনবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার মনে কৌতূহল হচ্ছে।"

তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে সব ভাল দেখলেন তো বাবা?"

উপেন্দ্রনাথ স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সব ভাল মা, একেবারে সব ভাল হয়ে গেছে; সেখানকার কাজ সব মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।"

উৎসুক ভাবে দেবী বলিতে গেল, "ঠাকুরঝি—"

তেমনি সংযতকণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই ত বলছি মা, সব শেষ হয়ে গেছে, সে অভাগিনীও জুড়িয়েছে, আমিও বেঁচেছি। আঃ, এমন আরাম আর কিছুতেই নেই মা আমার। সে নিজে তো বুকভরা শান্তিলাভ করেছেই, আমারও তাপিত বুকখানা শান্তিতে ভরে দিয়ে গেছে।"

দেবী কিছুই বুঝিতে পারিল না, বিস্ময়পূর্ণ উৎসুক দৃষ্টি শুধু তাঁহার মুখের উপর ফেলিয়া রাখিল।

আপন মনে উপেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "যথার্থ বড় শান্তি পেয়েছি মা। বুকের এই খানটায় দিবানিশি রাবণের চিতা জ্বলিতেছিল; কে যেন সেখানে কলসী কলসী জল ঢেলে দিলে, আমার সকল জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে গেল। এত সুখের মধ্যে একটা দুঃখ তবু জাগছে মা—আমি তাকে দেখব বলে গেলুম—দেখতে পেলুম না। যদি আর কয়টা দিন আগে আমায় এমনি করে পাঠাতে, তবে তাকে একটীবার——মা, বউ মা—"

মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিকৃত হাসিয়া দেবী বলিল, "কি বাবা? না, আমার কিছুই হয় নি, বুকটায় কেমন ব্যথা ধরে উঠেছিল, গলার কাছে অস্থির প্রাণটা ঠেলে এসেছিল, সব সেরে গেছে বাবা, আমি বেশ আছি। আপনি বলুন তার কথা—না আর বলবেনই বা কি? যা বলবেন তা আমি সবই বুঝেছি, আর কিছু আপনাকে বলতে হবে না।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বুঝেছ,—সবই বুঝেছ মা? না, সব এখনও বোঝ নি, তুমি তো সব কথা জান না, তবে সব তুমি বুঝবে কি করে? বাণীকে আমার—খুন করেছে, গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে। এত লাঞ্ছনা, এত অত্যাচার, মা আমার নীরবে সব সয়ে গেছে, কোন দিন তার মুখ ফুটে একটী আর্ত্তস্বর তবু বার হয় নি মা, কিন্তু এবার আর সে সইতে পারলে না। অকালে রোদে শুকিয়ে ফুলটী যেমন করে ঝরে পড়ে যায়, আমার বাণী তেমনি করে সংসারের তাপে শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেছে। শুনলুম সে তার ভাইদের কাছ হতে টাকা এনে দিতে পারে নি তাই হতভাগা—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন—তারা—তারা!

বড় শোকের সময় নিষ্ঠাবান হিন্দুর বড় সান্ত্বনাপ্রদ নাম এইটী। হৃদয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, ধূলার মত ধূলা হইয়া মিশিয়া যাইতে চায়, সে তখন এই নামটী মুখে আনিয়া অন্তরে সেই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আবার দাঁড়াইতে চায়।

দেবী ছবির মত আড়ষ্ট নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া ছিল, একটা কথা কহিবার শক্তিও তখন তাহার ছিল না।

সে রাতটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল তাহা দেবী জানে না। সে সেই বারাণ্ডাতে পড়িয়াই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যে সময়ে সে অন্য দিন উঠে, আজ তাহার চেয়ে অনেক দেরীতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। তখন মুক্ত সূর্য্যের আলো সমস্ত বারাণ্ডাখানা ভরাইয়া দিয়াছে, মুখ চোখের উপর সূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে।

ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল,—তাই তো, আজ যে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে!

ঠাকুরঘরে শব্দ শুনিতে পাইয়া সে মুক্ত দ্বার-পথে উঁকি দিয়া দেখিল, উপেন্দ্রনাথ নিজেই পূজার যোগাড় করিয়া লইয়া পূজায় বসিয়াছেন। দুই হাত ভরিয়া পুষ্পাঞ্জলি লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রু-বিগলিত নেত্রে তিনি বলিতেছেন, "এই নাও ঠাকুর, এই নাও, আমার সব নাও, আমায় তুমি মুক্তি দাও, আমার সব জ্বালা জুড়াও—আমায় মৃত্যু দাও। আর কিছু চাইনে ঠাকুর, সংসারের সব চাওয়ার আশা আমার মিটে গেছে, আমার সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছ প্রভু, এতটুকু অপূর্ণ রাখ নি। আমি এখন চাই ধ্বংসকে—আমার এই বিনশ্বর দেহটাকেও আমি উপহার দিতে চাই। আমার ইহকাল নাও, আমার পরকাল নাও, আমায় শুধু মৃত্যু দাও।"

দেবীর দুই চোখে জল বাধা না মানিয়া উপছাইয়া পড়িল, দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে সে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল।

আজ রন্ধনে তাহার মন বসিতেছিল না। নিজের জন্য হইলে সে আজ রাঁধিতে যাইত না, কেবল বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যই তাহাকে আবার ভাত তরকারী রাঁধিতে হইল।

দুপুরে সে জায়গা করিয়া দিয়া ভাত বাড়িয়া উপেন্দ্রনাথকে ডাকিল। মন্ত্র-চালিতের ন্যায় উপেন্দ্রনাথ আসিয়া আসনে বসিলেন।

ভাতে তিনি হাত দিতে পারিলেন না, সজল নেত্রে থালার পানে তাকাইয়া রহিলেন। দেবী বলিল, "খান বাবা—"

"বউ মা, ভবানী দুদিন ভাত খেতে পায় নি—"

অধর চাপিয়া বৃদ্ধ অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

দেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আর সে কথা বলে কি করবেন বাবা, যা হয়ে গেছে তার তো কোন প্রতীকার হবে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথাটী একবার দুলাইয়া উপেন্দ্রনাথ চিন্তিতমুখে বলিলেন, "প্রতীকার হবে না, যথার্থই এর আর প্রতীকার হবে না। হিন্দু ঘরের মেয়েকে অবশ্যই এমনি করে নির্য্যাতন সইতে হবে, এ কি ভগবানের ইচ্ছা? না বউ মা, ভগবানকে নির্ব্বাক পেয়ে তাঁর মাথায় এত বড় একটা অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে বড়ই অন্যায় হবে। ভগবান নরনারীকে জগতে পাঠিয়েছেন, অবলা দুর্ব্বলা বলে পুরুষ তাদের এতটা অবনত করতে পেরেছে। কিন্তু আর তো নয় মা, এ অত্যাচার যে সহ্যশীলতার সীমা অতিক্রম করে চলেছে; নারীর রোদন, নারীর দীর্ঘশ্বাসে বিশ্বস্রষ্টার আসন যে কেঁপে উঠেছে। তিনি এখন চেয়ে দেখছেন তাঁর আইন নেমকহারাম মানুষ কি করে বিকৃতাবস্থায় এনেছে। পাছে নারী কোন বিষয়ে নরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তাই নর নারীকে রেখেছে পায়ের তলায়; নিজেকে সে প্রভু বলে পরিচয় দিচ্ছে, আর তার কাছ হতে ষোল আনা পূজা আদায় করছে। ওরে মদান্ধ, দেহটাকে তার পায়ের তলায় চেপে রাখতে পারিস, কথা না বলতে পারে তাই তার মুখও বন্ধ করে রাখতে পারিস; তার দীর্ঘশ্বাসকে তো বন্ধ করে রাখতে পারিস নে। ওই দীর্ঘশ্বাস যে বাতাসের সঙ্গে মিশে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে যাচ্ছে, আকাশের কোলে—বিশ্বপিতার চরণমূলে জমা হচ্ছে, সেটা কি জানতে পারছিস নে? উঃ, এত নির্য্যাতন, এত অত্যাচার! মা গো, গোপনে কত চোখের জল ফেলেছিস মা, সে জল কি সাগর হয়ে উঠল না? কত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলি মা, সে দীর্ঘশ্বাস কি ঝড় হয়ে সমস্ত জগৎটাকে রসাতলে নিয়ে যেতে পারলে না?"

আর্ত্তকণ্ঠে দেবী বলিয়া উঠিল, "উঠবেন না বাবা, মুখের ভাত ফেলে উঠবেন না। এখনও যে হাতও দেন নি—"

"বউমা, বাণী খেতে বসেছিল। দুদিনের ক্ষুধার্ত্তা সে, সবেমাত্র চারটী ভাত নিয়ে সে বসেছিল। এক মুঠো ভাত তার হাতে, সে সবেমাত্র মুখে দিতে গিয়েছিল, এমন সময় তার স্বামী—সেই নরাকারে পিশাচ, তার হাত ধরে টেনে তাকে উঠিয়ে দেছে। দুদিনের তৃষ্ণা ক্ষুধা তার, বুক তার প্রবল তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছিল, ক্ষুধায় সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, কানে শুনতে পাচ্ছিল না; সে এক ফোঁটা জল পেলে না। হাতের ভাত তার হাত হতে খসে পড়ল, সে চলে গেল। না জানি সে কি লাথি বউমা, উঃ! অনাহারে দেহ তার নুয়ে পড়েছে, মাতাল দুর্দ্দান্ত পশুটা তার পাঁজরায় যে লাথি মারলে, তাতে মা আমার সেই যে পড়ে গিয়েছিল, আর ওঠেনি। আমি কেমন করে ভাত মুখে দেব বউমা! এই ভাতের পানে তাকিয়ে আমার বুক যে শতধা হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি—হায় অন্ন, তোমায় সামনে নিয়ে বসেও সে অভাগিনী মুখে দিতে পারলে না, আর আমি—; আমি তাকে এতটুকু বেলা হতে এই বুকে করে মানুষ করেছি, আমি—"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া পড়িলেন।

"উঠবেন না বাবা, উঠবেন না, আমার মাথার দিব্য বাবা, আমার মুখের পানে একবার তাকান বাবা—!"

উপেন্দ্রনাথ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, দ্রুত চলিয়া গেলেন। দেবী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে স্থান পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। সেদিন সেও অন্নস্পর্শ করিল না।

সমস্ত দিন উপেন্দ্রনাথ গৃহের বাহির হইলেন না। সন্ধ্যার একটু আগে দরজা খুলিতেই পার্শ্বে দেবীকে শুষ্কমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন!

"তোমার খাওয়া হয়েছে মা ?"

দেবী রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "খেয়েছি বাবা।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার কাছে এই মিথ্যে কথাটা অনায়াসে বলতে পারলে মা? তুমি যে খাওনি তা আমি তোমার মুখ দেখে আর কথা শুনে বেশ বুঝতে পারছি। আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছ মা—ভাবছ বুড়ো হয়েছি, কিছু জানতে পারব না। আমি সব জানতে পারি, আমায় কিছুতেই ঠকাতে পারবে না।"

জীবনে কখনও দেবী উপেন্দ্রনাথের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলে নাই, আজ এই মিথ্যা কথাটা হঠাৎ ঝোঁকের বশে বলিয়া ফেলিয়া সে নিজেই লজ্জিতা কুণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "সত্যিই বাবা, আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি আজ কিছু খাই নি।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাও মা, ভাত চড়িয়ে দাও গিয়ে, এ বেলা আমি না খেলে তোমার খাওয়া হবে না দেখছি। আমার দুই এক দিন উপবাসে কিছু হয় না, এ রকম উপবাস আমার মাসে পনেরটা করে আগে ছিল। এখনও বেশ থাকতে পারি; কিন্তু আমার জন্যে যে তুমি শুদ্ধ উপবাস করে থাকবে, এ হতে পারে না। যাও মা, ভাত রাঁধ গিয়ে, সন্ধ্যেটা কেটে গেলেই খাব এখন।"

দেবী চলিয়া গেল।

আহারে বসিয়া ভাত যেন গলা দিয়া নামে না, শ্বাসনালী যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কোনক্রমে সামান্য রকম খাইয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন "আর যে খেতে পারছি নে মা।"

দেবী জোর করিয়া বলিল, "পারবেন বই কি বাবা। কাল জলস্পর্শও করেন নি, আজও একটু জল ছাড়া কিছু খান নি, তাইতেই মুখে কিছু ভাল লাগছে না। একটু বসে খান, ভাল লাগবে এখন।"

"ভাল লাগবে এখন—" কথাটা শুনিয়া অত দুঃখের মধ্যেও উপেন্দ্রনাথের মুখে হাসি আসিল; আর কথা না বলিয়া তিনি দেবীর কথামত আর দুই এক গ্রাস খাইয়া উঠিলেন।

আচমনাদি সমাপনান্তে তিনি বাহিরে বারাণ্ডায় বসিলেন, দেবী তামাক দিয়া আহার করিতে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম সারা হইয়া গেলে উপেন্দ্রনাথ ডাকিলেন "বউ মা, একবার এ দিকে এসো তো।"

দেবী নিকটে আসিল।

উপেন্দ্রনাথ অন্যমনাভাবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন "হ্যাঁ, বলছিলুম কি, তুমি যতীশকে আর একবার আসবার জন্যে একখানা পত্র লিখে দাও তো। তাকে তখন অমন করে ফিরিয়ে দেওয়া তোমার কোনমতেই উচিত হয় নি। হাজার হোক সে তোমার বড় ভাই, তোমারই কষ্টের কথা শুনে তোমায় নিতে এসেছিল, তুমি তাকে অনায়াসে কি না ফিরিয়ে দিলে। যাক, কাল সকালেই একখানা পত্র লিখে কারও হাতে পোষ্ট আফিসে ফেলে দিয়ে আসতে বলো, সে যেন পত্রপাঠ এসে তোমায় নিয়ে যায়।"

তিনি যে এবার সকল বাঁধন কাটিয়া ফেলিয়া মুক্তিলাভ করিতে চান, তাহা দেবী বেশই জানিত। সে আছে বলিয়াই উপেন্দ্রনাথকে আবার উঠিতে হয়, খাইতে হয়, সংসারে মাথা দিতে হয়; সে চলিয়া গেলে তিনি একেবারেই নিশ্চিন্ত হন, কেহ তাঁহাকে একটা কথা বলিতেও থাকে না।

সে সব কথা বলিয়া তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্ককে আরও বিকৃত করিয়া দিতে সে পারিল না, অলসভাবে উত্তর দিল, "আচ্ছা বাবা কাল লিখে দেব।"

সে কালও আর আসিল না, পত্র লেখাও হইল না।

(ক্রমশঃ)

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(Paul Richard)

নীস, ফ্রান্স।

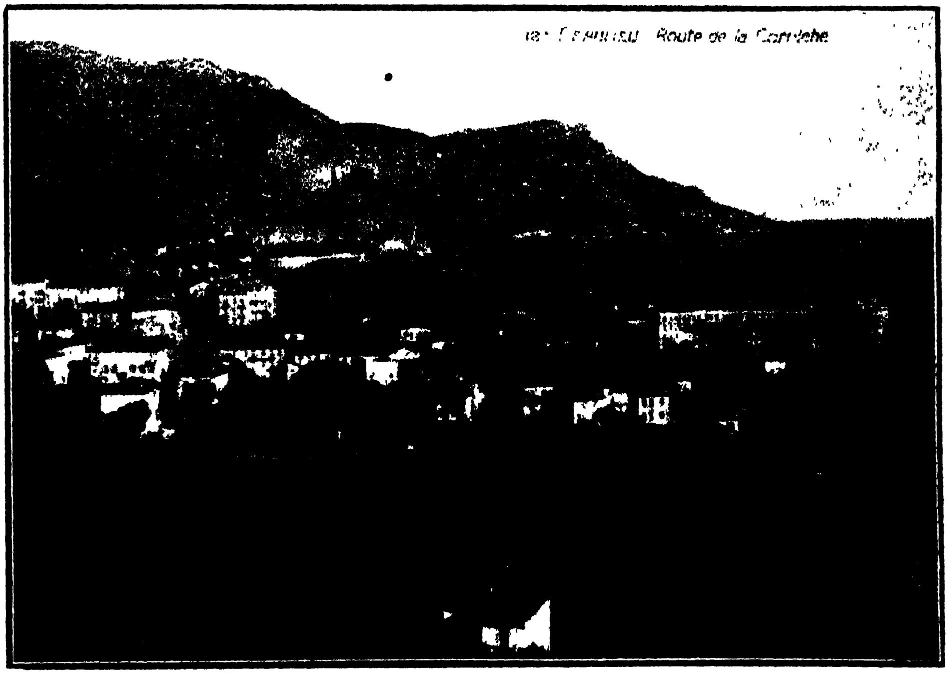
১লা এপ্রিল।

কাল সন্ধ্যেবেলা আমার বন্ধু (জেকোশ্লোভাকিয়ার ভাইস-কনসাল) তাঁর ফরাসী স্ত্রী ও আমি আমাদের হোটেলে সান্ধ্যভোজন সমাপন করছি, এমন সময়ে শ্রীযুত পল রিশার এসে হাজির। এঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি খুব উৎসুক ছিলাম—অরবিন্দের 'আর্য্যে' এঁর লেখা পড়ার পর থেকে। তাছাড়া আমার এক ফরাসী বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম পল রিশার মহোদয় অসাধারণ বুদ্ধি ও ধীশক্তি-সম্পন্ন।

সান্ধ্যাহার সমাপন ক'রে তাড়াতাড়ি আমার বন্ধু-দম্পতীর ঘরে আসর করা গেল। প্রায় তিন ঘণ্টা কথা হ'ল।

কি সুন্দর কথা বলেন পল রিশার। আর চেহারাটিও সুদর্শন। শ্বেত শ্মশ্রু, দীর্ঘ কেশ—দেড় হাত লম্বা—দীপ্ত বুদ্ধি-উজ্জ্বল আনন। তাছাড়া এত পরিষ্কার ও সুন্দর ফরাসী কমই শুনেছি। যেমন বাঙালী মাত্রেই ভাল বাংলা বল্‌তে পারেন না, তেম্‌নি ফরাসী মাত্রেই যে ভাল ফরাসী বল্‌তে পারেন না এটাও বলাই বেশি। কিন্তু একটু তফাৎ আছে। ফরাসী জাতি কথা বলায় বিশ্বাস করে। তাই তারা কথা বলাটাকে প্রায়ই অনেকটা আর্ট হিসেবে আয়ত্ত করে, দেখা যায়। ফরাসী জাতির মধ্যে অল্প-স্বল্প শিক্ষিতেরাও তাই প্রায়ই বড় সুন্দর কথা বল্‌তে পারেন।

কিন্তু তবু সব তাতেই শক্তির কমবেশি আছে। পল রিশার মহোদয়ের কথাবার্ত্তার সুসম্বদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা ও



নীস সহরের দৃশ্য

স্রোতস্বিনীর মতন গতিভঙ্গী উপভোগ করতে করতে একথা যেন সেদিন আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করা গেল ও সঙ্গে সঙ্গে মনটা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে বস্‌ল "হাঁ একটা আর্ট বটে!"

ভাল কথা বলাটা একটা আর্ট একথা স্বীকার ক'রে নিলে মান্‌তেই হয় যে শুধু চেষ্টা করলেই এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, সব আর্টে উৎকর্ষ লাভ করার মতন এ আর্টেও প্রথমতঃ চাই ওদিকে একটা সহজ শক্তি ও দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি যোগাযোগ, যথা:—নানা দেশ দর্শন, নানা রকম মানুষের সঙ্গে মেশা, নানা রকম ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, নানান যোগাযোগে উপস্থিত-বুদ্ধির অনুশীলন করা, পড়াশুনো, শোন্‌বামাত্র প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা ইত্যাদি। পল রিশার মহোদয়ের চরিত্রে প্রায় সব যোগাযোগগুলিই ঘটেছে। কাজেই তাঁর কথাবার্ত্তার সরসতা অনুমেয়।

পল রিশার মহোদয়ের ভ্রমণ খুব বেশি, পড়াশুনো যথেষ্ট, জানাশোনাও যথেষ্ট—তদুপরি অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ত' আছেই। তাছাড়া এঁর প্রতি ভঙ্গীর মধ্যে একটা আত্মসমাহিত ভাব আছে যা মুহূর্ত্তে মানুষের মনে ছাপ এঁকে রেখে দিয়ে যায়। এক-কথায় এঁকে বলা চলে একটা personality.

বান্ধবী বল্‌ছিলেন এঁর আর একটা বিশেষ ক্ষমতা এই যে এঁর মতের প্রতিবাদ করলে ইনি এতটুকুও বিচলিত হন না—বা প্রতিপক্ষের ভুল দেখাবার জন্যে এতটুকুও ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না, যেটা তর্কস্থলে বড় কঠিন কথা হ'য়ে দাঁড়ায় অনেক সময়ে। কথাটা সত্যি। এবং বোধ হয় ঠিক্ সেই জন্যেই তর্কস্থলে আমরা এঁর কথা মন দিয়ে শুনতে বাধ্য হ'য়েছিলাম—এমন একটা সমাহিত ভাব আছে এঁর মধ্যে।

কেবল এঁর বেশ একটা জ্ঞান আছে মনে হয় যে ইনি বেশ সুন্দর কথা বল্‌তে পারেন। একে ইংরাজীতে বলে self-consciousness। কথাটি ইংরাজী ভাষায় অল্প নিন্দার্হ। কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে বোধ হয় এ চরিত্র লক্ষণটিকে ঠিক্ দোষের বলা চলে না। কারণ এমন সুন্দরী তরুণী যেমন জগতে মেলা ভার যিনি জানেন না যে তিনি সুন্দরী তেম্‌নি এমন বাক্‌পটু লোক মেলাও কঠিন হইতে বাধ্য যিনি নিজের বাক্‌চতুরতা সম্বন্ধে সচেতন না হ'য়ে থাক্‌তে পারেন। কারণ যে গুণ আমাদের মধ্যে সাধারণের চেয়ে বেশি বিকাশ পেয়েছে তাকে অস্বীকার করা কেমন ক'রে সম্ভবপর? বিশেষতঃ যখন ফরাসী ভাষায় যাকে বলে amour-propre (অহমিকা) সেটা আমাদের মনের অত্যন্ত গভীর স্তরে শিকড় পেতে থাকে। তাই তাকে উৎপাটন করতে গেলে আমাদের সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপই যে টলমল ক'রে ওঠে।

পল রিশার মহোদয়ও হেসে বললেন—অনেকটা এই ধরণের কথাই। তিনি বল্‌লেন: "আমাদের অহমিকা একেবারে যাবার নয় কখনই। কারণ মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মানেই হচ্ছে যে তার মধ্যে অহমিকাটি স্ফুট। যে মুহূর্ত্তে আমাদের ব্যক্তিগত অহমিকা লুপ্ত হবে, সে মুহূর্ত্তে আমাদের সত্তার বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অস্তিত্বটিও যে লীন হয়ে যাবেই একটা রূপহীন সীমাহীন সত্তার মধ্যে।"

ব'লেই বল্‌লেন: "তাই আমি মনে করি না যে বেদান্তের কথাটা সত্য যে ভগবান্ ব্যক্তিগত মানুষকে সৃষ্টি ক'রেছেন। ব্যক্তিগত মানুষই আপনাকে সৃষ্টি ক'রেছে। জীব নিজের আলাদা একটি রূপ নিয়ে সত্তা নিয়ে তবে জন্মেছে।"

কথাটা মূলতঃ বোধ হয় সত্য। কেবল মনে হয় বেদান্তও অনুরূপ কথাই ব'লেছে। কারণ যে মুহূর্ত্তে সীমাহীন রূপহীন চৈতন্যময় সত্তা সসীম রূপের ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে আংশিক ভাবে বিকশিত হ'তে চান, সে মুহূর্ত্তে সসীম সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না ক'রেই উপায় নেই। এ আইডিয়াটা উপলব্ধিতে অনেকটা বোঝা যায়—কেবল মুস্কিল এই যে এ আইডিয়াটি কেবল তাকেই আভাষে ইঙ্গিতে দেওয়া যায় যে এ উপলব্ধির চেষ্টা করেছে। তাই এসব কথা বেশী লিখ্‌তে যাওয়া একদিক দিয়ে বাহুল্য মনে হয়। পল রিশার মহোদয়ও অম্‌নিই একটা কথা বল্‌ছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন যে "আমরা আমাদের গভীরতম চিন্তাগুলি প্রকাশ করতে যতটা ব্যগ্র হয়ে উঠি ততটা ব্যগ্র না হ'লেও চল্‌তে পারে। কারণ যে মুহূর্ত্তে একটা চিন্তা চিন্তাজগতে মূর্ত্তি ধরে সে মুহূর্ত্তে সে তার অস্তিত্বের দাবী নিয়ে জন্মায়, তাকে মুখে বা লেখায় প্রকাশ করি বা না করি।"

যাই হোক্ উপরিউক্ত কথাগুলি পল রিশার মহোদয়ের

চরিত্রের একটা খুব দার্ঢ্যতার দিক্‌কে অন্ততঃ আমাদের তিনজনের চোখে ফুটিয়ে তুলেছিল। কারণ তাঁর সব কথাগুলির মধ্যেই চিন্তাশীলতার সঙ্গে এই দৃঢ়তা বা আত্ম-প্রত্যয়টি প্রতি পদেই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে।

এই আত্মপ্রত্যয় জিনিষটি আমার বিনয়ের অত্যুক্তির চেয়ে ঢের বেশি ভাল লাগে। আত্মপ্রত্যয় বল্‌তে অনেকে একগুঁয়েমি মনে করেন। কিন্তু এভাবে আত্মপ্রত্যয়কে দেখাটার মানে হচ্ছে মানুষের আত্মসম্মানের মূলে কুঠারাঘাত করা। আত্মপ্রত্যয় মানে নিজের চিন্তাকে একটু শ্রদ্ধার

"কবি বটে! গন্ধর্ব্ব! রূপদেব! কিন্তু জীবনে কুশ্রীর সংস্পর্শে আসেন নি মনে হয়। মানুষের সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাই তাঁর স্থান।"

আমি বল্‌লাম: "মন্দ কি!"

পল রিশার বল্‌লেন: "মন্দ নয়। তবে জীবনে আসুরিক দিক্‌টার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে বলীয়ান্ হওয়া সম্ভব নয়। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কর্ম্মজগতে এত দুর্ব্বল।"

আমি বল্‌লাম: "কর্ম্মজগতে সবল বল্‌তে আপনি কি বোঝেন? আর কাকেই বা সবল মনে করেন?"



পুষ্প-তোরণ—নীস

চোখে দেখা। অযথা বিনয়ের আঁধিতে তার শ্বাসরোধ হয়। এমার্সন এক জায়গায় এই রকমই একটা কথা লিখেছেন যে আমরা নিজের মনের গভীর স্বরটি কান পেতে শুনি না ব'লেই কোনও মহৎ লোকের মুখে সে কথাটি ধ্বনিত হ'তে না শুন্‌লে সে সম্বন্ধে সচেতন হই না।

পল রিশারকে জিজ্ঞাসা করলাম, রবীন্দ্রনাথকে জানেন কি না। তিনি বল্‌লেন যে তাঁর সঙ্গে একত্রে জাপানে ছিলেন যে! তাছাড়া শান্তিনিকেতনেও ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন:

পল রিশার বল্‌লেন: "কেন গান্ধি বা অরবিন্দ!"

বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করলেন: "গান্ধি সম্বন্ধে কি মনে হয় আপনার?"

পল রিশার বল্‌লেন: "আমেদাবাদে তাঁর সঙ্গে খুব তর্ক হ'ত। গান্ধি শক্তিমান্ পুরুষ। মনে আছে তখন সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য মনে হ'ত যে এই কৌপীনধারী ক্ষীণদেহ মানুষটি আজ ভারতের অধীশ্বর! কিন্তু—"

ব'লে থেমে গেলেন।

বান্ধবী জিজ্ঞাসা করলেন: "কিন্তু কি?"

পল রিশার বল্‌লেন: "গান্ধির কল্পনা নেই। বড় একরোখা, সঙ্কীর্ণ। ঐখানে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তফাৎ।"

বন্ধু বল্‌লেন: "কি রকম?"

পল রিশার বল্‌লেন: "কি জানেন? যখন ননকো-অপারেশন খুব সতেজে বইছিল, তখন অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আমাকে ব'লেছিলেন বেশ মনে পড়ে যে গান্ধি তাঁর একরোখা অহিংসার আইডিয়ার পায়ে দেশকে বলি দেবেন, দেখে নিও।"

বান্ধবী বল্‌লেন: "আমার মনে হয় আপনার বিশ্লেষণ খুব ঠিক্।"

প্রয়োগটা মূর্খতা। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। যেমন ধরুন চৈতন্যহীন বস্তুজগতে ও বুদ্ধিশীল মনোজগতে। একটা পেরেক যদি মাটিতে বসাতে হয় তাহ'লে হাতুড়ির দরকার ও সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগে শক্তির অপচয়ই হয়। তেম্‌নি যদি একজন বুদ্ধিমান্ লোককে কোনও বিশেষ পথে পাঠানো আবশ্যক হয় তাহ'লে তাকে গায়ের জোরে ঠেলে দিলেই সব চেয়ে সহজে কাজ হাসিল হয় না। সেক্ষেত্রে আমি যুক্তি তর্ক বিচার প্রীতি প্রভৃতি নানান্ মনঃশক্তির আশ্রয় নেব। নয় কি? গান্ধিকে আমি বল্‌তাম জীবনে শিবই ত একমাত্র শক্তি নন। রুদ্রও যে



নীসগামী রাজপথ

আছেন, তাঁকে অস্বীকার করলে হবে কি? অর্থাৎ রাজনীতিরূপ আসুরিক ক্ষেত্রে যে আসুরিক শক্তিরও মস্ত সার্থকতা আছে।"

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু আপনার মতটা কি শুনি! আপনি কি মনে করেন অহিংসার সমর্থন ক'রে গান্ধি ভুল ক'রেছিলেন?"

পল রিশার বল্‌লেন: গান্ধি যা ভেবেছিলেন সে দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে ভুল বৈকি।"

বন্ধু বল্‌লেন: "তার মানে?"

পল রিশার বল্‌লেন: "অর্থাৎ আসল কথাটা এই যে আসুরিক আখড়ায় আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগটা ঠিক্ তেম্‌নি অসমীচীন যেমন আধ্যাত্মিক আখড়ায় আসুরিক শক্তি

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন না যে আসুরিক জগতেও আসুরিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিই অনেক সময়ে বেশি কাজ করতে পারে?"

পল রিশার বল্‌লেন: "করি। কিন্তু তার ফল ফল্‌তে সময় নেয়। জগতে খৃষ্ট প্রমুখ শত শত অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মানুষ যে প্রাণ দিয়েছেন সেটা এই অধ্যাত্মশক্তির সঞ্চিত তেজকে

আরও প্রদীপ্ত করার জন্যে—যাতে ক'রে শেষে একদিন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এই আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেটা যে সময়সাপেক্ষ। কেননা দেখতেই ত' পাওয়া যাচ্ছে এ সঞ্চিত তেজ এখনও কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠেনি।"

আমি বল্লাম: "ধরুন না কেন গান্ধি সেই উদ্দেশ্যেই অহিংসাপন্থী হ'য়েছিলেন!"

পল রিশার বল্লেন: "তা বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু গান্ধি এ কথা স্বীকার করবেন না, অথবা এ কথা স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।"

বান্ধবী বল্লেন: "কেন?"

পল রিশার বল্লেন: "শুধু এই জন্যে যে তিনি যদি বল্‌তেন যে তিনি অহিংসা সমর্থন করছেন শুধু ভবিষ্যৎযুগে মানুষের মধ্যে হিংসাকে বর্ব্বরতা প্রমাণ করবার জন্যে—দেশের স্বাধীনতার জন্যে নয়—তাহ'লে দেশ তাঁর কথা শুনত না। কবে কোন্ যুগে অহিংসার শক্তি কার্য্যকরী হবে ভেবে কি আর মানুষ আজ ও এখুনি কোন কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়? জগতে পনর আনা মানুষের কাছে নগদ বিদায়ের লোভই যে সব চেয়ে বেশি মাদাম!"

ব'লে একটু থেমে বল্লেন: "তাই আমি যখন একবার গান্ধি ও তিলকের তুলনা ক'রে ব'লেছিলাম যে তিলক যেমন দেশের জন্যে আইডিয়াকে ছাড়তে রাজি ছিলেন, গান্ধি তেম্‌নি আইডিয়ার জন্যে দেশকে ছাড়তে রাজি ছিলেন; তখন অনেকেই আমার ওপর ভারি রাগ ক'রেছিলেন।"

আমি বল্লাম: "কেন?"

পল রিশার বল্লেন: "উল্টো বোঝার দরুণ। লোকে ভাবল আমি গান্ধির সঙ্গে তিলকের তুলনা ক'রে কোনো মন্দ অভিসন্ধি সাধন করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তুলনা করতে যাইনি। আমি, দুজনেই ব্যথা সহ্য করার দিক্ দিয়ে কত বড়, সেইটা প্রমাণ করতেই ও কথাটি বলেছিলাম।"

বন্ধু বল্লেন: "কি রকম?"

পল রিশার বল্লেন: "তিলকের মতন দার্শনিকের কাছে আইডিয়ার দাম যদি খুব বেশি এ কথা ধ'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে ভেবে দেখুন ত' সেই আইডিয়াকেও দেশের জন্যে বিসর্জ্জন দিতে তাঁকে কত ব্যথা সহ্য করতে হ'য়েছিল! তেম্‌নি যে-গান্ধি দেশের জন্যে বারবার জেলে গেছেন ও কি না সহ্য ক'রেছেন—চৌরিচৌরার হাঙ্গামের পর আইডিয়ার জন্যে সেই দেশকেও তাঁর ছাড়তে হ'ল। ভাবুন ত একবার এ কি তাঁর কম ব্যথা? অপরের ব্যথা আমরা কতটুকু কল্পনা করতে চেষ্টা করি? আমরা শুধু তাকে বিচার করি।"

কথাটি বড় ভাল লাগ্‌ল। পল রিশারের সব বিশ্লেষণের মধ্যেই এম্‌নিতর একটা নতুন ভাবে দিক্-নির্ণয় করার প্রয়াস প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি শেষটায় বল্লাম: "আর অরবিন্দের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

পল রিশার বল্লেন: "আমি প্রায় সারা জগত ঘুরেছি, কিন্তু অরবিন্দের মতন চিত্তাকর্ষক মানুষ কখনো দেখিনি আজ অবধি।"

বান্ধবী বল্লেন: "কি রকম?"

পল রিশার বল্লেন: "অরবিন্দ আজও একবার যদি ইচ্ছা করেন তাহ'লে তাঁর প্রতিপত্তির কাছে অন্য সকলের প্রতিপত্তি পাণ্ডুর হ'য়ে যায় ব'লে আমি মনে করি। এই প্রতিপত্তি ধন মান যশ—সমস্ত তিনি যে-ভাবে একটা আইডিয়ার জন্যে বিসর্জ্জন দিয়েছেন সে রকম ভাবে আইডিয়াকে বরণ করা কি সহজ ব্যাপার!"

আমি বল্লাম: "কিন্তু আমাদের দেশে অনেক যোগীকেই ত এমন সব ছাড়তে দেখা যায়?"

পল রিশার বল্লেন: "কিন্তু তারা যে যোগ না করলে অন্য একটা মস্ত কিছু হ'তে পারত এটা ত বলা চলে না? অরবিন্দ কি না হ'তে পারতেন? তিনি একাধারে কবি সমালোচক দার্শনিক নেতা ও ত্যাগী। এতবড় আধার জগতে আমি কোথাও দেখি নি এবং জগতে আমি ভবঘুরে হ'য়ে নিতান্ত কম বেড়াই নি। তাই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি, একটা অনিশ্চিত আইডিয়ার জন্যে নিজের সমস্ত নিশ্চিত আশা ভরসাকে ছাড়া মুখের কথা নয়। কি অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁর। দেখেছি ত স্বচক্ষে!"

বান্ধবী বল্লেন: "তাঁর আইডিয়াটি কি?"

পল রিশার বল্লেন: "তাঁর আইডিয়াটি হচ্ছে—অতি-মানুষ হওয়া।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার কি মনে হয় এ আইডিয়াটিকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব?"

পল রিশার বল্লেন: "এ বিষয়ে আমি অরবিন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এটা শুধু সম্ভব নয়—নরলীলার শ্রেষ্ঠতম

বিকাশ এই অতি-মানুষ, যেমন জীবলীলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মানুষ।"

বন্ধু বল্‌লেন: "অতি-মানুষের আইডিয়াটি কি?"

পল রিশার বল্‌লেন: "যেমন উদ্ভিদ-জগত হ'তে জীব-জগতে আসার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য পশুর দেহ অবলম্বন কর্‌ল ও পশুজগত হ'তে নরজগতে আসার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য আমাদের এই নরের দেহ ও মস্তিষ্ক অবলম্বন কর্‌ল; তেমনি মানুষ-জগত হ'তে অতিমানুষ-জগতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উচ্চতর দেহ ও মস্তিষ্ক অবলম্বন করবে।"

আমি বল্‌লাম: "বুদ্ধ খৃষ্ট প্রভৃতিকে কি এই অতি-মানুষের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না?"

পল রিশার বল্‌লেন: "না। কারণ তাঁরা নিজেদের দেহকে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। নরজগতের যাবতীয় সীমার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে উচ্চতর শক্তির কোটায় পৌছন এক, আর মানুষকে ছাপিয়ে এক উচ্চতর জীবের বিকাশ করা আর।"

বান্ধবী বল্‌লেন: "কিন্তু এ কি সম্ভব!"

পল রিশার বল্‌লেন: "নিশ্চয়ই। শুধু সম্ভব নয়, এই উচ্চতর জীবের জন্মের জন্যেই এখন জগতে যুদ্ধবিগ্রহ হাহাকার প্রভৃতির প্রসববেদনা জেগেছে। কারণ সব বড় শক্তির জন্ম ও বিকাশ হয় এই বেদনার মধ্যে দিয়ে।"

বন্ধু বল্‌লেন: "আপনি কি বল্‌তে চান?"

পল রিশার বল্‌লেন: "মনে আছে ১৯১৪ সালে যুদ্ধারম্ভের মাস দুই আগে অরবিন্দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বল্‌ছিলেন যে য়ুরোপে সমস্ত বিকাশের পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে ও তার জন্য এশিয়াও মুহ্যমান বিবর্ণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম উপায় কি? অরবিন্দ হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন 'বিরাট যুদ্ধ—বিরাট শ্মশানের হাহাকার নইলে মানুষ আর এগুবে না।' আমিও ব'লে উঠ্‌লাম ঠিক্, যুদ্ধ চাই। দুমাস বাদেই যুদ্ধ বাধল। তখন আমাদের কেবল এই ভয় হ'ত পাছে য়ুরোপের রাজনীতিকের দাবা-খেলায় বাজি চ'টে যায়, পাছে খেলার নেশায় মানুষ মাতোয়ারা হ'য়ে কুরুক্ষেত্র হ'তে অর্জ্জুনের মতন নিরস্ত হয়। তাই অরবিন্দ ও আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম পাছে দু-চারজন সাবধানী কৃপণের দূরদর্শিতায় য়ুরোপে শ্মশানকালীর উলঙ্গ নৃত্যে বাধা পড়ে।"

এ কথায় বান্ধবী দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লেন: "কিন্তু এতে কি ভাল হ'য়েছে মসিয়ে রিশার। য়ুরোপ যে হাহাকারে ভ'রে গেল! সভ্যতার যে প্রায় ভরাডুবি হ'ল!"

পল রিশার বল্‌লেন: "কিন্তু আপনি নিজেদের কথাই কেবল ভাব্‌ছেন কেন! ওদিকে এশিয়া যে এর ফলে জাগ্‌বার সুযোগ পেল সেটা মানুষের একটা কত বড় লাভ ভাবুন না। ভেবে দেখুন একবার আজকের দিনে চীনকে সাহায্য করছে রুষজাতি। একটা য়ুরোপীয় জাতি এর আগে কখনও কি য়ুরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার কোনও পদদলিত জাতিকে সাহায্য করেছে?"

বন্ধু বল্‌লেন: "কিন্তু মনে করেন কি যে এতে ভাল হচ্ছে মোটের ওপর!"

পল রিশার তাঁর সৌম্য হাসি হেসে বল্‌লেন: "একটা জাতির স্বার্থের আইডিয়া যখন সমগ্র মানবের স্বার্থের আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তখন সেটাকে মন্দ বলি কি করে? নৈকট্যের মানদণ্ডে কোনও আন্দোলনকে বিচার করা ত' চলে না। বিস্তৃত সময়ের দিগন্তে তাকে দেখ্‌তে চেষ্টা করলে তার স্বরূপটি বোঝা যায়। রুষিয়ায় আজকের দিনে যতই কেন না শোচনীয় ঘটনা ঘটুক, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে রুষ জাতিই হচ্ছে ভবিষ্যতের বরপুত্র। য়ুরোপ? L' Europe est condamné (য়ুরোপের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হ'য়ে গেছে)।"

বান্ধবী বল্‌লেন: "এটা কি ঠিক্ কথা?"

পল রিশার বল্‌লেন: "La moitié de l'Europe est déblayée (অর্থাৎ য়ুরোপের অর্দ্ধেক ঝেঁটিয়ে দেওয়া হ'য়েছে), এখন আর একটা যুদ্ধ বাধ্‌লেই বাকি অর্দ্ধেক সাফ হ'য়ে যাবে। সেইজন্যেই ত অপেক্ষা করছি।"

বন্ধু বিরসবদনে বল্‌লেন: "কিন্তু এটা কি আনন্দের বিষয়—মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে?"

পল রিশার বল্‌লেন: "উপায় কি? মানুষ অতীতকেও আঁকড়ে থাক্‌তে পারে না, বর্ত্তমানকেও একান্ত ক'রে ধরতে পারে না। সে যে ভবিষ্যতের প্রিয় সন্তান। তাই তাকে বার বার অভ্যুত্থানের চরম শিখর হ'তে পতনের গহ্বরে নাম্‌তে হয়ই হয়। কেন না পর্ব্বতমালা ত সমতল নয়। তাই আমি বরং বলি যে, য়ুরোপকে যত তাড়াতাড়ি পতনের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় ততই ভাল। কারণ তা নৈলে যে পরের শিখরে ওঠা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপ এখন পতনের দিকে

চ'লেছে ও ঠিক্ সেই জন্যেই এশিয়া আবার অভ্যুত্থানের দিকে এগুচ্ছে। তাই ত আমার এত খারাপ লাগত যখন দেখ্‌তাম ভারতে ভারতীয়েরা কেবল অতীতের গৌরবকে কোলে নিয়ে ব'সে থাক্‌তেই এত ব্যগ্র। এ পথে মুক্তি মিল্‌বে না। অতীত অবশ্য বর্ত্তমানকে গড়েছে, কিন্তু অতীত চিরকালই অতীত, তা কখনও ফেরে না। মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে চিরকাল।"

বান্ধবী বল্‌লেন: "কিন্তু কেমন ক'রে বলি যে রুষিয়া অতীতকে বর্জ্জন ক'রেছে? তারা বরং ডিমক্রাসিকে ছেড়ে আবার ত অতীতের অটক্রাসিকেই বরণ ক'রেছে মনে হয়।"

পল রিশার বল্‌লেন: "না তা নয়। ভবিষ্যতের বীজ তাদের নব-চীনে আছে যে। তাই কাছ থেকে দেখে তাদের দোষটিকে বড় ক'রে দেখ্‌লে রুষিয়াকে ত বোঝা হবে না।"

বন্ধু বল্‌লেন: "তার মানে?"

পল রিশার বল্‌লেন: "রুষ জাতির Third International-টা কি? সমস্ত জগতের মানুষ এর প্রতিনিধি ত? এবং এই সমস্ত সমগ্র জগতের ভিন্নদেশী মানুষই ত আজ রুষিয়ার শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করছে? এর আগে কখনো এমন জিনিষ কি মানুষ কল্পনাও ক'রেছে?"

আমি বল্‌লাম: "কি রকম জিনিষ?"

পল রিশার বল্‌লেন: "—যে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে জগতের সমস্ত জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা?"

আমি বল্‌লাম: "তাই কি হ'য়েছে রুষিয়ায়?"

পল রিশার বল্‌লেন: "হয় নি? থার্ড ইন্টারন্যাশন্যালই ত রুষিয়ায় আজ সর্ব্বেসর্ব্বা এবং থার্ড ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিগণের মধ্যে জগতের সব জাতির মানুষই ত রয়েছে। রুষিয়ার আন্তর্জাতিক শাসনকর্ত্তার সর্ব্বোচ্চ দলের মাথা নোয়াতে হয় এই থার্ড ইন্টারন্যাশন্যালের কাছে। অর্থাৎ এ একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। একে অটক্রাসি, বুরক্রাসি, প্লুটক্রাসি প্রভৃতি নাম দিয়ে নিন্দা কর্‌লে ত হবে না। এর মধ্যে আপাততঃ যতই দোষ থাকুক যতই খাদ থাকুক যতই অসারতা থাকুক—এটা একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা ত' আর অস্বীকার করা চলে না।"

—"কিন্তু এতে সুফল ফল্‌বে কি না—"

পল রিশার বল্‌লেন: "সে গোলাগুলির বিচার রুষিয়া আজ করছে না। তারা উধাও হ'য়ে শুধু চ'লেছে। অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে তারা ছাড়তে প্রস্তুত। তারা বল্‌ছে পার্লামেণ্টের পদ্ধতি জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে। তাকে যত শীঘ্র শ্মশানে চিতায় বসিয়ে দেওয়া যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। এবং যতদিন না একটা শ্রেষ্ঠতর শাসন-পদ্ধতি আস্‌বে ততদিন শত দুঃখ কষ্টও সহ্য কর্‌ব আমরা, কিন্তু শবদেহকে আর ঘাড়ে করে বেড়াব না। এইখানেই ত রুষিয়ার গৌরব। তাই মনে হয় যে রুষিয়াই ভবিষ্যতের অগ্রদূত···য়ুরোপ নয়। আমেরিকা নয়।"

মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কবিতাটি:

"আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে,
রৈল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চল্‌ব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে;
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।"

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১

কয়েক দিন বীণা জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ পড়িয়া রহিল। অসহ্য যাতনা হইতে মুক্তি দিবার জন্য ডাক্তার ঔষধের সাহায্যে কতকটা এই অবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

মিসেস রায় এই আকস্মিক বিপদে শোকে দুঃখে বিভ্রান্ত ও উন্মাদপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। বীণার সেবা করা, বা তাহার অবস্থা বুঝিবার মত সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। মাঝে মাঝে কেবল তাহার ঘরে ছুটিয়া গিয়া গোলযোগ ও বিলাপ

করা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার দ্বারা হইত না। নর্সেরা সেই জন্য জোর করিয়া তাঁহাকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত।

তখন তিনি বাহিরে আসিয়া কেবল লীলাকে তিরস্কার করিতেন। তিনি নিজেও যে সে সময় ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন ও অন্য দিনের মত ব্রাজে গল্প করিয়া কাটাইতেছিলেন, সে কথা কখনো তাঁহার মনে পড়িত না। তিনি লীলাকে বলিতেন,—তুমি যে তখন কোথায় ছিলে, আর কিই বা কাযে ব্যস্ত ছিলে—যে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটলো, তার কোন খোঁজ খবর রাখলে না? জানিই ত, কি আত্ম-সুখী আর স্বার্থপর মেয়ে তুমি,—চব্বিশ ঘণ্টা কেবল নিজের আমোদ আর সুখ নিয়েই আছ। সেদিনও তেমনি নিজের আমোদে নিজেই মেতে ছিলে,—তাকে দেখবার তোমার অবসরই বা কোথায়? তার কাছে কাছে থাকলে কি এমন ধারা হতে পারতো?

লীলা অবশ্য সেদিন নিজের বিষয়েই আত্মহারা হইয়া ছিল, স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার কিছুই বলিবার ছিল না। সে বেচারা রাত-দিন মিসেস রায়ের এই অন্যায় বকুনি নীরবে সহ্য করিত।

হায়! আমার সোনার প্রতিমা! জীবন-ভোর তার এই কষ্ট, এই ব্যথা—আমি কি করে সহ্য করবো! আমার বুক ফেটে কেবলি কান্না আসছে। ডাক্তাররা সবাই বলছে—এ কালো দাগ কখনো যাবে না। এত লোকের এত মেয়ে—সবাই ত সেখানে ছিল—কারু কিছু হলো না; যত দৈব দুর্ব্বিপাক এসে পড়লো আমারি পোড়া কপালে? আমার এমন ঘর-আলো-করা মেয়ে—আমি তার এ দশা কি করে দেখবো, কি করে সহ্য করবো?

মিসেস রায় কাঁদিয়া আকুল হইতেন। লীলা এই অসহনীয় দৃশ্যে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিল। তবু সে মাকে বুঝাইত—সে যে এত সঙ্কটের মধ্যেও প্রাণে বেঁচেছে, এতেই ত তোমার সুখী হওয়া উচিত মা। কিন্তু মিসেস্ রায় এ কথা কাণে তুলিতেন না। এই পোড়া দাগ তাহাকে চিরজীবনের মত কুৎসিত করিয়া দিল, আর কেই বা তাহাকে বিবাহ করিবে? এই বয়সে চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিতে হইলে বীণা কখনো সুখী হইবে না। এ যে তাহার পক্ষে জীবন্মৃত হইয়া থাকার সামিল।

এই চিন্তায় মিসেস্ রায়ের চোখের জল শুকাইতে চাহিত না। লীলা নিজেও এ কথা ভাবিয়া অত্যন্ত বেদনা পাইত। সেই সৌন্দর্য্যাভিমানিনী বীণা নিষ্ঠুর নিয়তির এ লাঞ্ছনা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহার অবশিষ্ট জীবন কি ভাবে কাটিবে—কে জানে!

আবার কখনও কখনও তাহার আশা হইত, হয় ত এই ঘটনায় তাহার অসার লঘু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তাহাকে যথার্থ নারীজনোচিত কমনীয় গুণে ভূষিত করিতে পারে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, আর বীণার কি কিছুই বদল হইবে না?

অরুণ এই সব গোলমালে দিন দিন বিমর্ষ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। লীলা এখন প্রায়ই বীণার কাছে থাকে, অরুণের কাছে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাওয়া ছাড়া আর সে কিছু করিতে পারে না। বাড়ীর এই বিপদে অরুণ স্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতে পারিত না—কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে চঞ্চল হইয়া উঠিত।

কিরণ প্রায়ই বীণার সংবাদ লইতে আসিত ও আশা করিত, কোন দিন যদি লীলার সঙ্গে তাহার নিভৃতে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু লীলা সে সময় নিজেকে এমন করিয়া নানা দিকে ব্যাপৃত রাখিত, যে, কখনও কিরণের সহিত বিরল সাক্ষাতের অবসর ঘটিত না।

এ সব দিকে সর্ব্বক্ষণ অরুণের মন ও দৃষ্টি সচেতন ছিল। যদিও সে কখনো লীলাকে কিরণের কাছে দেখিতে পাইত না, তবুও কিরণ যে সর্ব্বদা সেই অবসরই খুঁজিতেছে, সে যে বীণার খবর লইবার ছলে লীলার জন্যই যাওয়া-আসা করে, এই বিশ্বাসে তাহার মনের জ্বালার ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। একবার তাহাদের বিবাহটা ঘটিয়া গেলে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। আর এক দিনও সে লীলাকে এই সব সংস্রবে রাখিবে না।

সর্ব্বদা একা থাকার ফলে ও মনের এই হিংসা ও বিরক্তি হইতে অন্যমনা থাকিবার জন্য অরুণ আজকাল প্রায়ই তাহার বই লিখিতে বসিত। অতি পরিশ্রমে চোখ টন্ টন্ করিলেও সে সহজে উঠিতে চাহিত না। দিনের অধিকাংশ সময় বই লেখা ও সংশোধনেই কাটিত।

বীণা যেদিন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল, সে প্রথমেই নর্সকে ডাকিয়া ডাক্তার তাহার সম্বন্ধে

কি মত দিয়াছে জানিতে চাহিল। তাহার মুখে, কাঁধে, বাহুতে তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তাহার অর্দ্ধদগ্ধ মাংসের যাতনা—সবই—তাহার অবস্থা যে শোচনীয় তাহারই সাক্ষ্য দিতেছিল। নর্স তাহাকে তবু মোটামুটি একটা আশাপ্রদ ভাল কথাই বলিয়া বুঝাইল।

বীণা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, আমার কাছে অত কিছু ঢাকাঢাকির দরকার নেই। সত্যি যা—আমি তাই জানতে চাই।

নর্স বলিল, সত্যি কথাই বলছি—পোড়া ঘাগুলো খুব শীগ্‌গির সেরে এসেছে! এটা খুব ভাল লক্ষণ বলতে হবে।

বীণা অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—লীলাকে ডাক। আমার ঘায়ের লক্ষণ জানবার জন্য আমি তোমায় ডাকিনি। জ্বালাতনে পড়া গেছে!

লীলা আসিয়া দাঁড়াইতেই বীণা বলিল—লীলা! ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে কি বলছেন? আমি সত্যি কথা জানতে চাই।

লীলা বলিল, ভালই। তুমি ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সেরেই উঠেছ!

আঃ! তোমরা আমার কথাটা না বোঝবার ভান কচ্ছো কেন? আমি আমার গায়ের পোড়া দাগগুলোর কথা বলছি।

লীলা শান্তভাবেই বলিল, দাগগুলো অবশ্য একবারে যাবে না। কিন্তু ভেবে দেখ, আরও কত মন্দ ঘটনা ঘটতে পারতো! তোমার প্রাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা হয় নি। তোমার চোখ যেতে পারতো, তা হলে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধ হয়ে থাকতে! সে সব দুর্ঘটনা থেকে তুমি ত বেঁচে গেছ দিদি! যে ব্যাপার ঘটেছিল, তার কাছে দু একটা দাগ থাকা কি বেশি কথা?

বীণা বলিল, ডাক্তাররা কি বলেছে—আমার চোখ যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল?

কি করে—আর কত অল্প স্থানের জন্যে যে তোমার চোখ দুটো বেঁচে গেছে, তাই দেখে তাঁরা অবাক্ হয়ে গেছেন। তোমার দৃষ্টিহীন হওয়া বা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি রকম ছিল।

বীণা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, উঃ! চোখ গিয়ে বেঁচে থাকা যে কি ভয়ানক—আমি ত এ কথা ভাবতেই পারি না। আমি তা হলে ঠিক অরুণের মত অসহায় হয়ে থাকতুম! যখন আমি তাকে ছেড়ে দিই, সেই সময়ের মত! আমি তা হলে খুব বেঁচে গেছি!

শান্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে বীণা লীলার হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

লীলা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কাঁদো কেন ভাই? বিপদ ত কেটে গেছে—আর কান্না কেন?

বীণা বলিল, ওঃ! আমি কি জানোয়ারের মত ব্যবহার করেছিলুম লিলি? আমার এ শাস্তি ঠিক উপযুক্তই হয়েছে!

লীলা সজলনেত্রে তাহার ললাটের উপর নত হইয়া চুম্বন করিল; বলিল, ও সব ভেবে আর কষ্ট পেয়ো না। বুদ্ধি ত সকলের সমান হয় না। তুমি হয় ত চিন্তাশীল না হতে পার, তবে তোমার স্বভাব দুষ্ট নয়! আমি আর সে সব কথা ভাবি না। সেই বিপদের মুখ থেকে তোমায় যে ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট।

বীণা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, তুমি ত জান না লীলা! আমি কত বড় অন্যায় করেছি! তুমি আমার কত যত্ন করেছ, আমি কিন্তু তোমার এত ভালবাসা ও যত্ন পাবার উপযুক্ত নই! তুমি বিবাহিত হয়ে চলে যাবে, আমি তাতে খুব খুসী হব! এখানকার সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি হবে তোমার! বল! আমায় মাপ করেছ—তা হলে?

লীলা বলিল, নিশ্চয়ই। এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছো? আমিও তো যে-কোনও সময় হয় ত এমন একটা প্রলোভনে পড়তে পারি! তার আর আশ্চর্য্য কি? এ কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ ভাই?

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া কতক্ষণ মনের আবেগে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বীণা যখন আবার কথা কহিতে সমর্থ হইল, তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি সব কথা একবার খুলে তোমার কাছে বল্‌তে চাই লিলি! না হলে আমি মনে শান্তি পাব না। তোমায় বলা হলে পর আর যত দিন বাঁচবো, কোন দিন এ কথা মনে আনবো না। তাহার পর সে খানিক নীরব থাকিয়া বলিল, যে রাত্রে আমি পুড়ে যাই, তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন,—কার কথা বলছি—বুঝছো ত?

লীলা বলিল, হ্যাঁ! কুমার তোমার কাছে ছিল, আমি জানি!

"সে রাত্রে তিনি আমায় বলছিলেন, সব ঠিক হয়ে গেছে! আমি যেন কাল রাত বারোটার সময় দরজার বাইরে অপেক্ষা করি—তিনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন। সেই দিন শেষ রাত্রের ট্রেণ ধরে আমরা আগে কলকাতায় আসবো—তার পর একেবারে ভারতবর্ষের সীমা ছেড়ে চলে যাব। সেখানে আমাদের বিবাহ হবে।"

ওঃ! বীণা! বিস্ময়ে ও আতঙ্কে লীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

বীণা বলিল, আমি এত বড় সাহস ও প্রতারণার কাজ করতে কিছুতে রাজি হই নি। তিনি কেবল জোর করে আমায় সম্মত করাবার চেষ্টা করছিলেন। অন্যমনে কখন যে জ্বলন্ত বাতির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তা খেয়ালই ছিল না।

লীলা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, তোমার এ বিপদ যে তোমায় এর চেয়েও গুরুতর আর একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, তা আমি জানতুম না। যদি তুমি তার সঙ্গে যেতে, তা হলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকতো না! তার মত বদমাইস কি কখনো কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে? সে শুধু তোমায় জনমের মত নষ্ট করতে চেয়েছিল!

বীণা সজলনেত্রে বলিল, আমি কিন্তু তাকে সত্যি ভালবেসেছিলুম ভাই! তুমি তার স্বভাব জেনে আমায় কত সাবধান করেছ, কত বুঝিয়েছ; কিন্তু কেমন যে সে সময় তার উপর একটা মোহ এসেছিল, কিছুতে তাকে ছাড়তে পারতুম না। তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের দাসীকে টাকা দিয়ে তার দ্বারায় আমি তাকে চিঠিপত্র লিখতুম। কতদিন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে বাগানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতো!

লীলা বীণার চাতুরী ও সাহসের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল! বীণার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে গালাগালি করা মিসেস রায়ের একটা নিত্যকর্ম্ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, আজ যদি তিনি একবার বীণার নিজের মুখের স্বীকারোক্তিগুলি শুনিতেন!

বীণা যখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া নিজের অঙ্গের অবস্থা দেখিতে পাইল, সেদিন সে শোকে ও নিরাশায় মৃতপ্রায় হইয়া গেল!

ডাক্তাররা তাহার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিলে মিসেস্ রায় তাহাকে দেখিয়া সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেদিন সমস্ত সময় তাঁহার বিলাপ ও রোদনে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল!

'সকলে যখন আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আমি সে দৃষ্টি কেমন করে সহ্য করবো?' কান্নায় ফাটিয়া পড়িয়া বীণা লীলাকে বলিল, 'আমি কারু সামনে বেরুব না, কারুকে মুখ দেখাব না!'

লীলা বলিল, তোমার আবার সব তাতে বাড়াবাড়ি! সুস্থ হও! মন প্রফুল্ল কর! সত্যিকার ভালবাসা এত তুচ্ছ নয় যে দুটো দাগ দেখলেই সরে যাবে!

'এখন আর আমায় কেউ ভালবাসবে না! যথার্থ ভালবাসা আমি মোহে পড়ে নষ্ট করেছি!' চৌধুরীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিজের ব্যবহার মনে করিয়া বীণা অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। সে কাঁদিয়া বলিল, আমি যথার্থ ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি, রূপের গর্ব্বে ও অভিমানে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছিল। যা সহজেই আমার হতে পারতো, সে সবই গেছে! এখন সারা জীবনের মত এই চোখের জল আর অনুতাপই আমার সঙ্গী হয়ে রইল।

লীলা তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, অত নিরাশ হয়ো না ভাই! এই ত আমি তোমায় আগের চেয়ে আরও কত বেশি ভালবাসি। মায়ের, বাবার ভালবাসাও আগের চেয়ে এখন ঢের বেড়েছে! কেন মিছে দুঃখ করছো? সবাই তোমায় ভালবাসবে!

বীণা অবশ্য সে সময় অন্য ভালবাসার কথা ভাবিতেছিল। তবু লীলার এই উচ্ছ্বাস তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে বলিল—এখন থেকে আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসবো, পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করবো। আগে যদি সেটা হতো, তাহলে হয় তো আমি বিভিন্ন রকমের হয়ে উঠতুম। এ দুর্গতি হতো না তাহলে।

বীণা দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার লুপ্ত সৌন্দর্য্যের শোকও ক্রমশঃ তাহার অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তাহার সুগৌর উজ্জ্বল ত্বকের বর্ণলালিত্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনিন্দ্যসুন্দর বাহু দুটিও পুড়িয়া একবারে কালো হইয়া গিয়াছিল।

কৌতূহলী হইয়া অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিত। বীণা প্রায়ই কাহারও সহিত দেখা করিত না। তাহারা জজ সাহেবের সুন্দরী কন্যার ঈদৃশ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা চারিদিকে গল্প করিয়া বেড়াইত। দুঃখে পড়িয়া বীণা বুঝিল—অনেক জনে বেষ্টিত থাকিলেও যথার্থ বন্ধুর সংখ্যা তাহার নিতান্ত অল্প।

অপরাহ্নে লীলা অরুণের সঙ্গে তাহাদের বাগানে বেড়াইতেছিল। বহু দিন পরে সেই সময় চৌধুরী আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল।

লীলা দেখিল, চৌধুরী অত্যন্ত কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! বহু দিন চৌধুরীকে না দেখিয়া লীলা অনেক সময় তাহার জন্য ভাবিত ও দুঃখিত হইত,—সে ত কই একবারও বীণার খবর লইতে আসিল না।

উৎসবের দিন কুমার বীণার নিকটে আসার পর সে রাগে ও হিংসায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে এ অগ্নিকাণ্ড দেখে নাই, তাহার পর হইতে আর সে এদিকে আসে নাই। অনেক ভাবিয়া লীলা সিদ্ধান্ত করিল, এতদিনে হয় ত সে বীণাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই আর আসে না।

চৌধুরী লীলা ও অরুণের সঙ্গে দুই একটি কথা বলার পর লীলাকে বলিল, তাহার কিছু বলিবার আছে, সে নির্জ্জনে কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা বলিতে চায়।

লীলা তখন অরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চৌধুরীর সহিত ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিল।

তাহারা দুইজনে একা হইতেই চৌধুরী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল—সে—বীণা কেমন আছে?

লীলা তাহার এত দিনের উদাসীনতার শাস্তি দিবার জন্য তাচ্ছিল্য ভাবে বলিল—ও রকম ঘটনার পর যেমন থাকা সম্ভব—তেমনি আছে। তোমার বুঝি এত দিন পরে তার খোঁজ নেবার সময় হলো?

'আমি যে বড় অসুখে পড়েছিলুম লীলা! তোমরা কি শোন নি—ডবল নিউমোনিয়ায় এতদিন ভুগছিলুম! সবাই জানে ত? উৎসবের দিন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমি মাঠের ধারে একটা গাছতলায় বসে ছিলুম। তার পরে কখন যে বসে থাকতে থাকতে সেইখানে ঘুমিয়ে পড়েছি, সে আর কিছু বুঝতে পারি নি। সেই ঠাণ্ডা লেগে বাড়ী যেতে না যেতেই জ্বর—কাসি—এত দিন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, সবে আজ প্রথম বাইরে বেরোতে পেরেছি।

লীলার বিরক্তি দূর হইয়া গেল। সে অনুতপ্ত চিত্তে চৌধুরীর রুগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তাই তোমার এমন চেহারা হয়ে গেছে! আমরা ত কিছুই শুনি নি সে কথা! আর কি করেই বা শুনবো বলো? আজ দুমাস ধরে বীণাকে নিয়ে যে করে আমাদের দিন কাটছে! এবার তা হলে বড় শক্ত অসুখে পড়েছিলে?

চৌধুরী বলিল, এত দুর্ব্বল আমায় করে ফেলেছে লীলা! কিছুতে সামলাতে পারছি না। ভেবেছি কিছুদিন পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে থাকবো। সবই এখন বীণার উপর নির্ভর করছে! তাই ত উঠতে পেরেই আগে এখানে ছুটে এলুম!

লীলা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া বলিল, কেন, বীণার উপর নির্ভর করছে কেন?

আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না! আজ যা হয়, একটা স্থির কিছু জানতে চাই যে সে আমার সম্বন্ধে কি ভাবে—আমার হতে সে চায় কি না। যদি সে অসম্মত হয়, আমি স্থির করেছি যে বিলাতে চলে যাব। দেখি—তাতেও আমার মনের পরিবর্ত্তন হয় কি না? এমন করে আর কতদিন চলবে—তুমিই বল?

লীলা বলিল, কিন্তু চৌধুরী! তোমায় বলতে আমার ভয় হচ্ছে—তুমি কিছুই জান না! সে ভয়ানক পুড়ে গেছে!

আমি সব জানি! চৌধুরী সরলভাবেই বলিল, আমি তার কথা সব শুনেছি! শুনে পর্য্যন্ত আমার মনেও যে তার জন্য কি ব্যথা লাগছে, সে তুমি বুঝতে পারবে না। আহা! বেচারা কি কষ্টই সহ্য করেছে! এখন আমি কি তাকে একবার দেখতে পাব লীলা?

লীলা ভাবিল, বীণার মুখ যে কি কুৎসিত হইয়া গিয়াছে, চৌধুরী তাহা জানে না। জানিলে হয় ত দেখা করিতে চাহিত না। তাই সে বলিল, সে আজকাল প্রায়ই কারুর সঙ্গে দেখা করে না! তার রূপ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! আর কেউ তাকে কোন দিন সুন্দরী বলবে না!

চৌধুরী বিচলিত না হইয়া খুব সহজ ভাবে বলিল, সেটা হয় ত তার পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে। অসার রূপের গর্ব্বে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

লীলা বলিল, চৌধুরী! যখন বীণা অত্যন্ত রূপগর্ব্বিতা

লঘু-প্রকৃতি ছিল, তখন তাকে তুমি অসার জেনেও ভালবেসেছ, আর আজ? আজ সে কুৎসিতা—করুণার পাত্রী—আজ সব জেনেও তোমার ভালবাসা এখনো তেমনি অটুট আছে?

চৌধুরী লজ্জিতভাবে বলিল, আমি তাকে এক দিন তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্য—তার আত্মম্ভরিতা জেনেও তাকে ভালবাসতুম। আর এখন তাকে কুৎসিত জেনেও তার চেয়ে আরও বেশি ভালবাসি। এখন তাকে দেখার যে কত প্রয়োজন—তা খুব কম লোকেই বুঝবে। আমি তাকে আজ একবার দেখতে যেতে পারি কি?

লীলা প্রসন্নমুখে বলিল, নিশ্চয়ই পার। এস, আমার সঙ্গে।

সে চৌধুরীকে লইয়া বীণার দরজার কাছে গিয়া ডাকিল—বীণা! একজন বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!

বীণা জানালার কাছে একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া উদাসনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। বিগত দিনের প্রেম ও স্মৃতির মাধুর্য্যে তাহার অন্তর তখন পূর্ণ—সেই সঙ্গে ইহাও মনে উদিত হইতেছিল, এবারের মত সে সব দিনই গত হইয়াছে।

লীলার কথা শুনিয়া সে বলিল, আমি যে এখনো কাপড় ছাড়তে যাই নি লিলি। এখন কি করে কারুর সঙ্গে দেখা করবো? কে এসেছেন?

লীলা ভিতরে আসিয়া বলিল—চৌধুরী।

চৌধুরী! বীণার স্বর কাঁপিয়া গেল। চৌধুরী! এত দিন পরে! কেন লিলি?

'তোমার দেখতে এসেছেন!'

ওঃ! না! লিলি! আমি সহ্য করতে পারবো না! ফিরিয়ে দাও তাকে!

কেন? ফিরিয়ে দিতে যাব কেন? আমি ডাকছি তাকে!

বীণা ব্যাকুল হইয়া বলিল—না লিলি! লক্ষীটি ভাই! ডেকো না তাকে! ভেবে দেখ—শেষবারে সে আমার কি রকম দেখে গেছে! এখন এ মুখ আমি কি করে তাকে দেখাব? তা ছাড়া—সে এত দিন এলো না কেন?

'সে অসুখে পড়েছিল!' লীলা তাহার উৎসবের দিন মাঠে গাছতলায় পড়িয়া থাকা, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হওয়ার কথা সব বলিল।

'সবই আমার দোষ!' বীণা শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলে ভাসিয়া বলিল, আমি তার সঙ্গে কি অন্যায় ব্যবহার করেছিলুম! সে রাত্রে আমার জন্য সে কি কষ্টই পেয়েছে!

লীলা বলিল, এখন সে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! ডাকি তাকে?

লিলি! লিলি! আমি এ পোড়া-মুখ কি করে তাকে দেখাব?

লীলা বাহিরে আসিয়া চৌধুরীকে পাঠাইয়া দিল।

মানুষ ভালবাসে কি শুধু রূপের জন্য—বীণা? চৌধুরী বীণার একখানি হাত ধরিয়া ধীরে বলিল—তার অন্তরটা কি কিছুই নয়?

চৌধুরীর গভীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ লুকাইয়া বীণা কাঁদিয়া বলিল,—কিন্তু তুমি আমায় আর কখনও ভালবাসতে পারবে না—নির্ম্মল!

'পারবো না? শুধু তোমার একটু অনুমতি পেলে আমি দেখাব সারাজীবন ধরে—আমি শুধু তোমায় পূজা করতে চাই!'

৪২

সে রাত্রে শোবার ঘরে পদার্পণ করিতেই কান্ত অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল, বলি—হ্যাঁগা দিদিমণি! পোড়া কোম্পানীর লোক কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? না চোকের মাথা খেয়েছে? কালে কালে এ সব কি হতে চল্লো বল দেখি? এর কি কোন দাব নেই? শাসন নেই?

লীলা সহসা এরূপে আক্রান্ত হওয়ায় ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিল না; বলিল—আবার কি হলো তোর? চেঁচিয়ে মরছিস কেন?

'চেঁচিয়ে মরছি সাধে! শোন তবে বলি—আজ অনেক দিনের পর বাজারে গিয়েছিলুম—কাপড় কিনতে—বামাও আমার সঙ্গে ছিল—সে এখন মিশনে জোছনার কাছে থাকে কি-না? ঐ নীলমণি কাপড়ওয়ালা—ও লোকটা ভাল—দোকানদার হলে কি হয়—বয়েসও হয়েছে—ধর্ম্মজ্ঞানও আছে—কখনো ঠকামি করে না—তা আমিও দরকার পড়লে ওর কাছ ছাড়া আর কারু কাছে যাই না। হলো কি আজ—কাপড় কিনে চলে আসছি—বুড়োর ছেলে



বিরহী যক্ষ

শিল্পী— শ্রীযুক্ত চারু রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বেরিয়ে এসে বল্লে—এই যে ক্ষান্ত মাসি! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো! একটা কথা বলবার আছে। তুমি সেটা তোমার মনিবদের কাণে তুলে দিতে পার? বুড়ো বল্লে—হ্যাঁ! হ্যাঁ! খুব পারবে! ওকে সব বুঝিয়ে বলে দে তুই! জজসাহেব যেন মনে জানেন—যে নীলমণি দাস আর তার ছেলে এসব বেইমানদের দলে নয়। কিন্তু খুব সাবধান! বাইরে যেন কথাটি না যায়—তা হলে হয় অন্ধকার রাতে তোমার গলা থেকে মাথাটি বেশ বেমালুম ভাবে খসে পড়বে বাবা! কেউ টেরও পাবে না! আর না হয় ত রাতে আমার ঘরে-দুয়ারে আগুন লাগবে। আমাদের মত ভালমানুষদের উপরে এসব দলের লোকেরা বড় চটা।

আমি দেখলুম—তারা বাপ বেটায় বড় ভয় পেয়েছে—দুজনেই তারা কাঁপছিল। বল্লুম—ব্যাপার কি? তোমরা এত ঘাবড়ে গেছ কেন?

তারা বল্লে, কোম্পানী যদি আর কিছু দিন এমনি চোখ বুজে থাকে, তা হলে তার সর্ব্বনাশ হবার আর দেরি নেই! এই যুদ্ধের সময় চারদিকে নানা গোলমাল—এই সময়ে কতকগুলো বদ লোকে মিলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা না কি সব গোরাব্যারাকে গিয়ে দেশি ফৌজদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে—তাদের যে দিন ঠিক হবে—সেদিন তারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়বে, আর তাদের বেরিয়ে পড়ার খবর পেলেই দেশি ফৌজরা সব হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে—ব্যস্! কাটাকাটি মারামারি—যত সাহেব মেম—আর কোম্পানীর নুন খায় যে সব লোক—সব কুচিকাটা করবে একেবারে। দেশের লোকও বাদ যাবে না দিদিমণি! এ কি সব্বনেশে কথা গো দিদিমণি! শুনে পয্যন্ত গা হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে! সাহেব ত বাড়ী নেই—কি হবে?

লীলা কথাটা বিশ্বাস করিল না। তবু বলিল—পুলিশ কি করছে? তারা কি এ সব খবর রাখে না কিছু?

ক্ষান্ত হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, আহা! পুলিশের কথা আর বলো না কিছু! তারা দিব্বি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারা গরিব লোকের যম—বড়লোকের কাছে পয়সা খায়—আর চোখ বুজে থাকে। খামকাই মুখপোড়ারা পাগড়ী বেঁধে বেঁধে রাস্তায় ঘুরে মরছে! ওদের দিয়ে কখনো কোন কাজ হয়? এই যে সব তলে তলে সলা-পরামর্শ চলছে—ওরা কি জানে না কিছু? সব জানে! মুখবন্ধ করে থাকবার ওষুধ দেওয়া হয়েছে—কথা কয় কি করে?

মিঃ রায় তখন পাটনায় ছিলেন না। লীলা ভাবিল—হয় ত মন্দ লোকের উত্তেজনায় এখানে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারে—এখন কি করা যায়!

অরুণকে কথাটা বলিতে সে ইতস্ততঃ করিল না; বলিল—দেশে যখন একদল লোকের মনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, আর নানা স্থানে অনেক রকম গোলমাল চলছে, তখন কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। আমি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডরাণ্টকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে দেখবো।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে লীলা মিশনের কর্ত্রীর নিকট হইতে এক অদ্ভুত রহস্যময় পত্র পাইল। পত্রে স্পষ্ট কিছু লেখা ছিল না—শুধু ছিল—এই কয়েকটি কথা—

"প্রিয় লীলা! আমার দাসী বিশ্বাসী, তার সংবাদ সব সত্য। তার কাছ থেকে ঘটনা শুনে শীঘ্র উপায় স্থির করো—না হলে দেশ রক্তে ভাসবে।"

লীলা দেখিল—পত্র আনিয়াছে সেই জোছনার দাসী-বামা।

বামা বলিল—আমি তোমার কাছেই মিশন থেকে এসেছি—দিদিমণি! তোমার বাড়ীর সকলেই আমার কাছে অচেনা—শুধু তুমি—তুমিই আমার জোছনাকে বাঁচিয়েছ—পথের লাঞ্ছনার জীবন থেকে তাকে নতুন জীবন দিয়েছ তুমি—তাই তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও পারি! না হলে কি আজ আমি রাস্তায় বেরোতুম? গা আমার কাঁপছে! জিভ্ শুকিয়ে আসছে! জানি না—কালকার সুয্যি ওঠবার আগে কি কাণ্ড হবে!

লীলা বলিল, কি হয়েছে বামা? দেরি না করে শীঘ্র বল!

'হয়েছে কি—আমি সরষের তেল কিনতে বাজারে গিয়ে-ছিলুম। দোকানটা হল গিয়ে—নীলমণি কাপড়ওয়ালার দোকানের কাছে। তেল নিয়ে ফিরছি—হঠাৎ দুটো লোকের কথার শব্দ কাণে এলো। একজন বলছে—ঐ গোয়াল-ঘরটায় বেশ হবে! গরুগুলো মাঠে গেছে—ঘরটা খালি—

আজ রাত্রের কথাগুলো আমি ওখানেই দলের সকলকে বলে দিতে পারবো। তারা ঐখানেই জমবে ত ?

আমি এর আগে এই রকম একটা কথা শুনেছিলুম। তাই কথাটা শুনেই তাড়াতাড়ি আমি বোতলটা আঙ্গুলে ঝুলিয়ে ছুটলুম। একটা সরু গলির মধ্যে সেই গোয়ালটা—পাশে আরো কয়েকটা খালি গোয়াল ছিল। আমি ত সেখানে গিয়েই বুঝলুম—এখানে একটা ব্যাপার হবে। অনেক লোক চারদিক থেকে এসে জমা হচ্ছিল, ও গোয়াল-ঘরটায় ঢুকছিল। যতক্ষণ তারা আসছিল, আমি তখন রাস্তায় আশে পাশে ঘুরছিলুম। যখন লোক আসা বন্ধ হলো, আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে পাশের গোয়ালের একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের পাশে লুকোলুম। তারা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল—তবে এক-একবার দু এক জনে জোরে যা দু একটা কথা বলছিল, তাই আমি শুনতে পেলুম। একজন বল্লে,—আঃ! পল্টন যদি ঠিক সময়ে আমাদের সাহায্য করে, তা হলে যে কাণ্ডটা হবে—একেবারে রক্তগঙ্গা!

তাদের ছাড়া-ছাড়া কথা থেকে বুঝলুম, আজ রাত্রে একটা বোমার আওয়াজ করে সঙ্কেত করা হবে। সেই শব্দ শুনলে এদের দল বেরিয়ে পড়বে—দেশি ফৌজরা পর্য্যন্ত—তারা যেখানে যত সাহেব মেম আছে, আর সব সরকারী লোকজন—সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবে! কি হবে কাল দিদিমণি ?

লীলা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, তুমি এ সব কি বোলছো বামা ? আজ রাত্রে এই সব কাণ্ড হবে ? এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে ?

বামা বলিল, কাল যদি কথা বলবার জন্য বেঁচে থাক দিদিমণি! তা হলে এ সব কথা সত্যি কি না—কাল জিজ্ঞেস করো! আজ আর জিজ্ঞেস করবার সময় নেই! পার তো—কোন উপায় কর! আমি ত সেই কথা শুনেই আবার মিশনে ছুটলুম! সে কি ছুট গো দিদিমণি! পড়ি কি মরি জ্ঞান নেই! হাঁপিয়ে গেছি! পা টন্ টন্ করছে! তবু ছুটছি! মেমকে গিয়ে সব বলতে মেম এই চিঠি লিখে দিয়ে তোমার কাছে আসতে বল্লে—তাই আবার ছুটে ছুটে এসেছি!

লীলা উদ্বেগ ও আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া ছিল! বামার ভীত শঙ্কিত মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের কম্পন—তাহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর ত বিলম্ব করা চলে না! লীলা বামাকে টাকা দিয়া বিদায় করিয়া অরুণের সন্ধানে গেল। কখন যে হত্যাকাণ্ড ঘটিবে—তাহার সময় অজ্ঞাত! বামা সেই সাঙ্কেতিক শব্দ কখন হইবে, তাহা কিছুই শোনে নাই!

অরুণ নিজের ঘরে বসিয়া একমনে লিখিতেছিল। লীলা ডাকিতে বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছিল! চোখের দৃষ্টিও যেন নিস্তেজ ও পরিশ্রান্ত!

লীলা বলিল, তুমি বড় বেশি পরিশ্রম করছো অরুণ! কিছু অসুখ বোধ করছো না ত ?

মাথাটা একটু ধরেছে! তা হলেও আমি এখনো এক ঘণ্টা খাটতে পারি!

তা হোক! তোমার চোখের চেয়ে কিছু আর বই বেশি দামি নয়। এখন ও-সব রেখে দাও! আমি তোমার কাছে একটা কাজের জন্য এসেছি! বাবা বাড়ী নেই—আমি যে সব কথা শুনলুম, তাতে তোমাকে আর একবার মিঃ ডরান্টের কাছে যেতে হবে!

অরুণ সব কথা স্থিরভাবে শুনিয়া তাহার ঘোড়া সাজাইয়া আনিতে আদেশ দিল। তাহার চোখের তারায় যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—শীঘ্র প্রতিকার না করিলে রাত্রের হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যাইবে না। যাইতেই হইবে!

লীলা বলিল—তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে—না হয় তুমি বাড়ীতেই থাক—আমিই গিয়ে দেখি—কি করতে পারি ?

অরুণ বলিল, পাগল! তুমি এই গোলমালের মধ্যে কোথায় যাবে ? আমি সর্ব্বপ্রথমে ক্যান্টনমেন্টে যেতে চাই! সেদিন মেজর স্মিথ বলছিলেন—এক দল সিপাহী অবাধ্যতা আরম্ভ করেছে! এ সব বাজে কথা নয় লীলা! ভাগ্যে সময়ে খবর পাওয়া গেল! হয় ত সত্যিই কিছু ঘটা অসম্ভব না হতে পারে।

অরুণের ঘোড়া সাজাইয়া আনিলে লীলা বলিল, তুমি কিন্তু বেশি দেরি করো না! আমার একলা থাকতে বড় ভয় হচ্ছে!

অরুণ বলিল, ভয় কি ? আমি ঘণ্টা দুয়েের মধ্যে ফিরে

আসছি, তুমি মাকে বা বীণাকে যেন এ সব কথা কিছু বলো না! কথা পাঁচ কাণ হলেই ছড়িয়ে পড়ে! সাবধানে থেকো, যতক্ষণ না ফিরি!

অরুণ চলিয়া গেলে লীলা তাহার কুকুরকে লইয়া মাঠে গিয়া খেলা করিতে লাগিল—যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে!

কিন্তু মনশ্চক্ষে সে দেখিতে লাগিল—যেন দলের পর দল লোক ভীষণ ভাবে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে! চারিদিকে লুট—হত্যা—আর্ত্তনাদ—চীৎকার!

ভয়ে তাহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া গেল! যদি অকৃত-কার্য্য হয় অরুণ? যদি সে খবর দিবার আগেই বিদ্রোহীরা বাহির হইয়া পড়ে? কুকুরটা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখে একটা টেনিস বল্। সে সেই বল লইয়া লীলার সঙ্গে খেলিতেছিল!

কিন্তু লীলার হৃদয় ক্রমে অবসন্ন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে-ছিল। সে বলিল, আজ আর খেলা হবে না জিমি! ভাল লাগচে না কিছু! বল্টা তুলে রেখে এসো।

সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। অরুণ ফিরিল না—রাত্রের আহারের সময় হইয়া গেল, তবু সে আসিল না, বা কোন খবর পাঠাইল না। লীলা বুঝিল—ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইয়াছে!

মিসেস রায় ভাবিলেন, অরুণ তাহার কোন বন্ধুগৃহে গিয়াছে। বীণা সমস্ত দিন চৌধুরীর সঙ্গে কাটাইয়া বড় সুখে ছিল,—সেও অরুণের কোন খবর করিল না। চৌধুরীর ভালবাসায় তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহার নষ্ট সৌন্দর্য্যের জন্যও আর তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। এত দিন পরে সে নিজেও ভালবাসিতে শিখিতেছিল, সেই প্রেমের আভাষে তাহার অন্তর সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণ হইয়া থাকিত।

রাত্রের আহার শেষ হইল। লীলা বীণার সঙ্গে গল্প করিয়া অন্যমনা হইবার চেষ্টা করিতেছিল,—সেই সময় তাহার সহিস আসিয়া তাহাকে ডাকিল।

লীলা বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিল, সহিস ভয়ে ও উদ্বেগে মৃতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সে অবাক্ হইয়া বলিল, কি হয়েছে বংশীরাম?

'মিসবাবা! আমার ভাই বসন্তপুর থেকে একটা ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছে! আমি তার মত এমন মূর্খ কখনো দেখি নি। যেকথা সাহেবকে আগে বলা উচিত ছিল, সে তা না করে এখানে ছুটে এসেছে!

লীলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কি হয়েছে শীঘ্র বল!

কি বোলবো হুজুর! আজ রাতে সেখানে একটা খুনোখুনী কাণ্ড হবে! সাহেব কিছুই জানেন্ না, জানবারও উপায় নেই। তিনি এখনো বাড়ী ফেরেন নি। কি হবে এখন?

তখন রাত্রি দশটা। মিসেস রায় তাঁহার শোবার ঘরে গিয়াছেন। লীলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! আজ এ সব কি কাণ্ড ঘটিতে চলিয়াছে? সে জানিত, কিরণ সহর হইতে তিন মাইল দূরে নিরাপদে আছে। সে নিশ্চয় সময় মত খবর পাইয়া নিজেকে বাঁচাইবার উপায় করিতে পারিবে। কিন্তু এখন বিপদ তাহারই সম্মুখে!

সে কিরণের সহিসকে বলিল, কি হয়েছে সব বুঝিয়ে বল! বাড়ীর যত আরদালী চাপরাশী ভৃত্যবর্গ যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া সেইখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সহিস রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, সাহেবের জমিদারীর ভিতর একটা গ্রাম যত সব বদমাইস প্রজায় ভরা। তারা প্রায়ই গোলমাল বাধাত। তাদের গ্রামে একটা পচা পুকুর ছিল। তার জল খেয়ে সবাই অসুখ হয়ে মরে যেত, সাহেব তাই পুকুরটা বুজিয়ে দিয়ে দুটো ইঁদারা কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই তাদের রাগ। তা ছাড়া তাঁর বাগানের মধ্য দিয়ে একটা সরু রাস্তা ছিল, গ্রামের দিকে বর্ষায় বড় কষ্ট হত যাওয়া-আসার পক্ষে। সাহেব সে রাস্তা বন্ধ করে একটা পাকা বড় রাস্তা করে দিয়েছেন। সে রাস্তা তৈরি করতে যাদের জায়গা নেওয়া হয়েছিল, সবাই সাহেবের কাছে উচিত মত দাম পেয়েছে। তবু তারা সাহেবের উপর চটে আছে। তাদের না কি সাতপুরুষের ভিটে ও জমির উপর দিয়ে সাহেব রাস্তা তৈরি করেছেন। জনকতক বদমাস লোক এই সুযোগে লুটপাট করবে বলে কেবলি তাদের সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। আজ তারা খবর পেয়েছে বসন্তপুর আর চার-পাশের সব গ্রামে যত পুলিশ ছিল, সব সহরে চলে এসেছে। এখানে না কি আজ রাত্রে একটা দাঙ্গা হবে! সেই জন্য সব পুলিশ এসে সহরে জড় হয়েছে। তারা তাই আজকার সুযোগে সাহেবকে খুন করে বাংলা লুট করবে, স্থির করেছে।

এ হপ্তায় অনেক খাজনার টাকা আদায় হয়েছে। সে সব এখনো বাংলাতেই আছে, তাও তারা খবর রেখেছে!

লীলা বলিল, তুমি এত কথা কি করে জানলে? আর এসব যে বাজার-গুজব, বাজে কথা নয়, তাই বা বুঝবো কি করে?

সহিস বলিল, এ সব সত্যি মিসবাবা! আমি নিজের কাণে শুনেছি। আমি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম। তারা এক জায়গায় জটলা করে এই সব বলাবলি করছিল! সাহেব যদি এখানে থাকেন—তাই আমি ছুটে এখানেই চলে এসেছি! তিনি ত এখানে নেই—আর কোথায় তবে খুঁজবো?

গোলমাল শুনিয়া মিসেস রায় বাহিরে আসিলেন। বারাণ্ডায় এত লোকজনের ভিড় দেখিয়া বলিলেন—কি হচ্ছে এখানে? ব্যাপার কি?

একজন চাপরাসী তাঁহাকে ঘটনাটা বুঝাইতে লাগিল। লীলা ততক্ষণ চাকরদের মধ্যে সবাইকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ ঘোড়ায় চড়িতে জানে কি না? কিন্তু কেহই জানিত না।

লীলা আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল। এখন সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। এতক্ষণে কিরণ নিশ্চয় বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। এখন যদি কেহ তাহাকে গিয়া খবরটা দিয়া সাবধান করিয়া দেয়, তবেই রক্ষা। নয় ত সে বিঘোরে বিদ্রোহীদের হাতে মারা যাইবে! কিন্তু এক অশ্বারোহী ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে কে তাহাকে খবরই বা দিতে পারে?

মিসেস রায় বলিলেন, এ লোকটা বলে কি লীলা? মিউটিনি হবে এখানে?

লীলা বলিল, ভয় পেয়ো না। এই রকম একটা খবর পেয়ে অরুণ সন্ধ্যা থেকে ক্যাণ্টনমেণ্টে আর পুলিশ কমিশনারের কাছে খবর দিতে গিয়েছে! এখানে যা হত, তা বোধ হয় বন্ধ করা যাবে, কারণ আগেই খবর পাওয়া গেছে! আমাদের বিপদ বোধ হয় কেটে গেল, কিন্তু কিরণের কি হবে? সে ত কিছুই জানে না, হয় ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে—আর এই সব বদমাইসের হাতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই খুন হবে! তার কাছে একজনের এখনি খবর দিতে যাওয়া দরকার!

'গোপাল সিংকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে এখনি তার কাছে পাঠিয়ে দাও! কি ভয়ানক কাণ্ড! তোমার বাবা এ সময় বাড়ী নেই,—এই সময়ে চারিদিকে এত গোলমাল! আমায় আগে বল নি কেন?'

লীলা এ প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া বলিল, গোপাল সিং হেঁটে যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে! এখনি ত রাত এগারোটা বাজে!

তা কি করা যাবে! আমি ত এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাই না! তুমি ভেবেই বা আর করছো কি?

লীলা অধীর হইয়া বারাণ্ডায় ঘুরিতে লাগিল! কি করা যায়—কিরূপে তাহাকে একটু খবর দিতে পারা যায়? অরুণ যদি বাড়ী থাকিত, সে ঘোড়া ছুটাইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে বলিয়া আসিতে পারিত! কিন্তু অরুণ যদি পারে, ত সেই বা পারিবে না কেন? তাহার যাওয়া এতই কি অসম্ভব?

মিসেস রায় বলিলেন—তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে? এটা অবশ্য বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা—তবে সে নিশ্চয়ই বুঝবে, আমাদের এক্ষেত্রে কিছু করবার উপায় ছিল না!

'সে বুঝবে কি? এতক্ষণ সে হয় ত খুন হয়ে গেল! হয় ত তার বিছানার ধারে ডাকাতরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে! সে হয় ত প্রাণের দায়ে ঝটাপটি করছে!' লীলা শিহরিয়া উঠিল!

'তা তুমিই বা কি করতে পার—এক গোপাল সিংকে পাঠান ছাড়া?'

'ওঃ! অসহ্য! কিরণ সেখানে খুন হবে, আর আমি এখানে বসে বসে তাই শুনবো? সহিস! আমার ঘোড়া আন! আমি তার কাছে যাব!'

মিসেস রায় অবাক্ হইয়া বলিলেন, তুই কি সত্যি পাগল হলি লীলা?

'না! মা! এখনো হই নি! তবে আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে হয় ত পাগল হয়ে যাব! আমার প্রাণ কি করছে, সে তুমি বুঝবে না! সহিস! জল্‌দি! আমার ঘোড়া এখনই নিয়ে এসো!'

মিসেস রায় প্রভুত্বসূচক স্বরে বলিলেন, সহিস! মিস-বাবার এ হুকুম তুমি কখনো শুনবে না! সাহেব ফিরলে এ জন্য তোমায় জবাবদিহী করতে হবে—মনে থাকে যেন!

গোঁলমাল শুনিয়া বীণা বাহিরে আসিয়াছিল, সব কথা শুনিয়া সেও লীলার যাইবার পক্ষে বাধা দিতে লাগিল।

লীলা কোন দিকে না চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি যাবই! বংশীরাম, তুমি যদি আমার ঘোড়া না নিয়ে এস, আমি নিজেই গিয়ে আনবো! আমার বাবার কাছে আমার কাজের জবাবদিহী করবার ভার আমারই! তোমাদের কারো নয়!

বীণা কাঁদিয়া বলিল, লিলি! লিলি! তুই এ কি করতে যাচ্ছিস ভাই? লীলা শুনিল না। সে ঘরে গিয়া ক্লোক গায়ে দিল ও আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল।

মিসেস রায় তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ দিতেছিলেন, কিন্তু কেহ নড়িতে সাহস করিল না। লীলা যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই, কেহ বাধা দিলে তাহাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়া শাসন করিতেও ইতস্তত: করিবে না— তাহারা সে কথা বিশেষ রূপেই জানিত।

অগত্যা মিসেস রায়, লীলা ফিরিয়া আসিলে তাহার কি কি শাস্তির ব্যবস্থা হইবে, তাহাই বলিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শেষে সে সত্যিই চলিয়া যায় দেখিয়া, আসন্ন মূর্চ্ছাকে স্থগিত রাখিতে স্মেলিংসল্টের শিশি নাকে দিলেন। বীণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, অরুণ গেল কোথা? সে থাকলে ত এমন কাণ্ড হতে পারতো না। সত্যিই যদি তারা কিরণকে আক্রমণ করে থাকে, ও সেখানে কি করতে যাচ্ছে বল দেখি? লোকে বলবে কি ওকে?

লোকে কি বলিবে সে দিকে মন না দিয়া বীণা কাঁদিতে কাঁদিতে লীলার পিছনে পিছনে চলিল।

লীলা ঘোড়ায় উঠিবার আগে তাহার কাছে আসিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—কেঁদো না! আমি খুব সাবধানে থাকবো! হয় তো কিরণকে নিয়ে ফিরে আসতেও পারি! অরুণ এলে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলো—আমি যেতুম না—কিন্তু কিরণ এমন বিপদের মুখে—এ জেনেও বাড়ী বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! তাই যাচ্ছি! মা-কে দেখো! সাবধানে থেকো! আসি তবে? পরমুহূর্তে সে লাফাইয়া ঘোড়ায় উঠিল ও গেটের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল!

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন-ভঙ্গ

হুমায়ুন কবির

আপনার অন্তরের　　অন্তরালে বসিয়া একাকী,
　　গহন গোপনে,
মায়ার প্রাসাদ রচি'　হৃদয়ের আশা দিয়া আঁকি
　　সোণার স্বপনে।
তাহারি নিভৃত কক্ষে　সবাকার আঁখির আড়ালে
　　সযত্ন প্রয়াসে,
আপনার মানসীরে　　সাজাই কাঞ্চন-মণি-জালে
　　অপরূপ বাসে।

দেখেছিনু পথে যেতে কবে কোথা নীল আঁখি দুটী,
　　কার হাসিখানি,
অশান্ত অলকচূর্ণ　　পড়েছিল আঁখি পরে লুটি'
　　কেন নাহি জানি।
চকিত চোখের তারা　চেয়েছিল বুঝি মোর পানে
　　কৌতূহল ভরে,
সকল জীবন মম　　স্মৃতি তা'র ভরি' দিল গানে
　　গভীর অন্তরে।

আপনার মনে আমি　　রচি-তারে নূতন করিয়া
　　যারে ভালবাসি,
সাজাতে মোহন বেশে　খুঁজে' ফিরি ভুবন ভরিয়া
　　সুধাগন্ধ হাসি।
যে হাসি স্বপনসম　　ভেসেছিল ক্ষণিকের তরে
　　অধরের কোণে,
আমার প্রিয়ারে ঘেরি　সে হাসির সুধারাশি ঝরে
　　আমার ভুবনে!

স্বপ্ন হায় যায় টুটে,　　অন্তরের প্রাসাদ মোহন
　　লোটে ধূলিতলে,
নিমেষে মুছিয়া যায়　　হৃদয়ের প্রেমের স্বপন
　　তিক্ত অশ্রুজলে।
যারে ভালবেসেছিনু　　সেই যবে দেয় ফিরাইয়া
　　কঠিন আঘাত,
সিন্ধুসম সুখ-দুঃখ-　　হাসি-অশ্রু-তরঙ্গিত হিয়া
　　স্তব্ধ অকস্মাৎ।

হলাণ্ডে

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২)

হোটেলকর্ত্রী বল্লেন, আপনি মারকেনে (Marken) যাবেন না? হলাণ্ডে এসে কোন ভ্রমণকারী মারকেন না দেখে ফেরেন না।

বল্লুম, মারকেনে কি দেখবার আছে?

বল্লেন, মারকেন একটি ছোট দ্বীপ, জেলেদের গ্রাম। সেখানকার দেখবার বস্তু হচ্ছে, সেখানকার লোকদের সাজসজ্জা। আমাদের বেশভূষা হচ্ছে একেলে, নতুন; কিন্তু মারকেন দ্বীপের লোকেরা—আমাদের পুরাতন বেশভূষা বজায় রেখেছে। হলাণ্ডে কয়েকটি পুরাতন গ্রাম, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরে জেলেদের গ্রামে গেলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি রকম সাজসজ্জা করতেন, তার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। মারকেনে যদি যান, ওই সঙ্গে ভোলেনডাম (Volendam) ও ঘুরে আসতে পারেন। এটিও একটি জেলেদের গ্রাম, কিন্তু অনেক চিত্রশিল্পী সেই ছোট গ্রাম থেকে ছবি আঁকবার অনেক আইডিয়া, অনেক মালমশলা পেয়েছেন। সেখানকার হোটেল স্পানড়ারে ঢুকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। পুরাকালের হলাণ্ড এই সব গ্রামে এখনও বেঁচে আছে।



মা ও মেয়ে (মারকেন)

সুতরাং সকালবেলা ডাচ্ ব্রেকফাষ্ট খেয়ে দুখানি চিজ্-স্যাণ্ডউইচ ও দু'খানি হ্যাম-স্যাণ্ডউইচ পকেটে পুরে মারকেনের দিকে যাত্রা করলুম। আমষ্টারডাম থেকে আই (Ij) নদী পেরিয়ে ষ্টীম-ট্রামে Monnikendam বলে একটি সাগরের তীরের ছোট সহরে এলুম। সেখান থেকে ছোট ষ্টিমারে করে মারকেনে যেতে হবে। ষ্টিমারে পাড়ি আধঘণ্টা হবে। এখন শীতকালে ভ্রমণকারীর দল নেই। ষ্টিমারে আমরা চারজন যাত্রী ও একজন যাত্রিণী। যাত্রিণীটি মারকেন দ্বীপবাসিনী, তা তার সাজ দেখেই বুঝা যায়। Zuider See বা দক্ষিণ সাগর শান্ত স্তব্ধ, ষ্টিমারের পেছনে পেছনে সি মিউলের দল উড়ে আসতে লাগল।

ডেকে একটি ডাচ্-যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। অবশ্য ইংরাজীতে। ডাচেরা প্রত্যেকে নিজেদের ভাষা ত শেখেই; তাছাড়া অনেকেই, বিশেষতঃ যারা ব্যবসা করতে যায়, তারা জারমান, ইংরাজী ও ফরাসী জানে। এই ছোট ব্যবসাদার জাতির লোকদের বিদেশী ভাষা শিখতেই হয়। ইংরাজীতে যেখানে আটকায় সেখানে জার্ম্মান বল্লে অনেকেই বোঝে। ইংরাজী-জার্ম্মাণ মিশ্রিত ভাষায় যুবকটির সঙ্গে আলাপ সুরু করলুম। সে মারকেনে যাচ্ছে, জেলেদের কাছে কাগজের ঠোঙা ইত্যাদির অর্ডার আনতে। সমুদ্রের চারিদিকে

ছোট ছোট জেলে-নৌকা দেখা যেতে লাগল। যুবকটি বল্লে, সব মাছ ধরতে বাহির হয়েছে। এই মাছ দেশবিদেশে চালান হয়। হেরিং মাছই বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য সব মাছও আছে। এই মাছের ব্যবসা হলাণ্ডের একটি প্রধান ব্যবসা।

বল্লুম, হাঁ, হলাণ্ড সম্বন্ধে একটি বইতে পড়ছিলুম, শুধু হেরিং fisheriesএর মূল্য সাত মিলিয়ান গুল্‌ডেনের ওপর হবে।

তার পর যুবকটি সমুদ্র সম্বন্ধে কথা তুল্ল। এই Zuider See শান্ত হ্রদের মত দেখাচ্ছে,—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এটি একটি হ্রদ ছিল। এতে নানা ছোট নদী এসে মিলেছে, এখন এ সমুদ্র—নর্থ-সি'র সঙ্গে যুক্ত।



জেলে-রমণীর ঘর (মারকেন)

মারকেনের ছোট ঘাটে আমাদের ছোট ষ্টিমার এসে থামল। আধখানা চাঁদের মত বেঁকা ঘাটটি একটি ছবির মত। ছোটবড় জেলেদের নৌকা বাঁধা। তাদের মাস্তুলের সারি পাতাহীন পাইনগাছের বনের মত। ঘাটের তীর ঘিরে একসার সাদা কালো লাল নীল সবুজ বেগুনি রংএর কাঠের



ছেলেমেয়ে (মারকেন)

একতোলা বাড়ীর সারি। নৌকার মাস্তুলগুলি যেন তোরণ-পথের মত, তাদের পেরিয়ে এই রং-বেরংএর বাড়ীর শ্রেণী। বাস্তবিক এই ছোট কাঠের বাড়ীর সারি বড় অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। এক এক বাড়ীতে তিনচার রংএর ছোপ; কোনটির কালো ছাদ, সবুজ দেওয়াল, নীল জানলা; কোনটির লাল ছাদ, হলদে দেওয়াল, বেগুনি জানলা—এম্নি তিন চার রংএর সমাবেশ। প্রত্যেক বাড়ীতে নতুন নতুন রংএর সামঞ্জস্য।

ঘাট থেকে নামতেই একটি ছবি ও সাজসজ্জার দোকান। দোকানের দরজায় একটি তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। সে এসে ধরলে, কোন ছবি বা জিনিষ কিনবেন কি?

বল্লুম, আগে তোমার সাজটা ভাল করে দেখি। সে হেসে বল্লে, এই আমাদের সাধারণ সাজ, আমাদের পুরাতন সাজ। আপনার দেখে মনে হবে যেন থিয়েটারের বা ফ্যান্সি ড্রেস নাচের সাজ। তা নয়। এই আমার সাজ-পরা ছবি—আপনি কিনতে চান্ কি?

তার একটি ছবি কেনা গেল। বেশভূষা বেশ সুন্দর ও মজার। পায়ে কাঠের জুতো। হলাণ্ডে অনেক যায়গায় লোকেরা কাঠের জুতো পরে। বিশেষতঃ সমুদ্রতীরের গ্রামের পুরুষ ও মেয়ে সবাইএর পায়ে কাঠের জুতো। অনেক সময় জুতোর ওপর নানা রকম খোদাই কারুকার্য্য করা থাকে। জুতোর মূর্ত্তি দেখলে মনে হয় যেন ছোট একটি নৌকা। সেই

তরুণীর পায়ের সুন্দর কারুকার্য্যময় কাঠের জুতো ও ঘাটের নৌকাগুলি দেখে মনে হল, নৌকাগুলিও যেন কোন দৈত্যের পায়ের কাঠের জুতো।

Skirt বা ঘাঘরাটি স্নিগ্ধ নীল রংএর, যেন সমুদ্রের নীল নিংড়ে ছোপান। গায়ের ব্লাউস্‌টি লাল ও সাদার ডোরা-কাটা। তার ওপর জ্যাকেট—হলদে নীল নানা রংএর সুতোর ফুলের কাজ করা। নীল ঘাঘরার ওপর সেই জামাটা দেখাচ্ছে যেন রং-বেরংএর ফুলের গুচ্ছ নীলজলে টলমল করছে। মাথায় সাদা লেসের টুপি, তার দুধার দিয়ে



জেলেদের বাড়ী (মারকেন)

সোনার সুতার মত চুলের গুচ্ছ ঝুলছে—সমস্ত সাজটি যেন রংএর ইন্দ্রজাল;—জুতোর হলদে ঘাঘরার নীলে, জামার রামধনুর মত রংএ, টুপির সাদায়, চুলের সোনালীতে মারকেনের তরুণীটিকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। রংগুলির মধ্যে একটা সুন্দর ছন্দ বা সমাবেশ না থাকলেও, অনেকগুলি জলজলে রং মিলে একটা রঙীন মূর্ত্তি করে তুলেছে।

তরুণীকে ছেড়ে গ্রামের দিকে চল্লুম। মারকেনে পথ জিজ্ঞাসা করবার বা পথ হারাবার জো নেই। কারণ সেখানে একটি পথ। সে পথ দিয়ে ঘাট থেকে গ্রামে যেতে হয়, আবার গ্রাম থেকে ঘাটে ফিরে আসতে হয়। জোলো জমির মধ্যে দিয়ে ইঁটবাঁধান উঁচু পথ চলে গেছে। মাঝে মাঝে উঁচু জমির ওপর জেলেদের ছোট রঙীন কাঠের বাড়ী। বাড়ীর পেছনে জলের ধারে মেয়েরা তাদের রঙীন ঘাঘরা জ্যাকেট কাচ্‌ছে। কোন বাড়ীর সামনে দড়ির ওপর লাল নীল হলদে সবুজ কত রংএর পুরুষ ও মেয়েদের কাপড় শুকাচ্ছে। শীতের দিনে জেলে মেয়েদের কাপড় কাচার ধূমটা দেখে বুঝলুম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাই হলাণ্ডের জেলে মেয়েদের মধ্যেও কিছু কম নয়।

গ্রামের ভিতর ঢুকতে সামনেই একটি গির্জ্জা। গির্জ্জার সামনে দাঁড়াতে একটি মধ্যবয়স্কা রমণী হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার সজ্জার ধরণ ঘাটের তরুণীরই মত, তবে তার লাল ঘাঘরার ওপর একটি ফিকে নীলের অ্যাপ্রন্ জড়ান।

রমণীটি বল্লে, আপনি কি এই দ্বীপ দেখতে এসেছেন? আসুন, আমি আপনাকে আমার বাড়ীঘর দেখাতে পারি।

মারকেনে লোকেরা এই জেলেদের বাড়ীঘর, তাদের সাজ-সজ্জা দেখতে, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাদের জীবন-যাপন-প্রণালী জানতেই আসে। সুতরাং, বল্লুম, বেশ, আপনার বাড়ী কোথায়?

গির্জ্জার পাশেই তার বাড়ী। এক-সার কাঠের বাড়ী চলে গেছে, তার প্রথমটা। কোন কোন ধনী জেলের পরিবার একখানি সমস্ত বাড়ী জুড়ে থাকে। সাধারণতঃ এক জেলে-পরিবার এক বাড়ীর দু'খানি বা তিনখানি ঘর জুড়ে থাকে।

রমণীটি ইংরাজীতে আমার সঙ্গে কথা কইছিল। তাছাড়া সে জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষাও জানে। বস্তুতঃ, এই ছোট দ্বীপের জেলে-রমণীর পক্ষে চার পাঁচ ভাষা জানা আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে। কিন্তু এ দ্বীপের অনেক রমণীই চার পাঁচ ভাষা জানে, অর্থাৎ বিদেশীদের সঙ্গে সামান্য কথা কইতে ও কিছু কিছু বোঝাতে পারে। কারণ, এই দ্বীপে পৃথিবীর নানা দেশ হতে ভ্রমণকারীরা হলাণ্ডের পুরাকালের সাজসজ্জা দেখতে আসে। সেই সব আমেরিকান ফরাসী ইংরাজ জার্ম্মান রুস ইতালীয়ান ভারতবাসী ভ্রমণকারীদের নিজেদের বাড়ী দেখান, নিজেদের ছেলে-

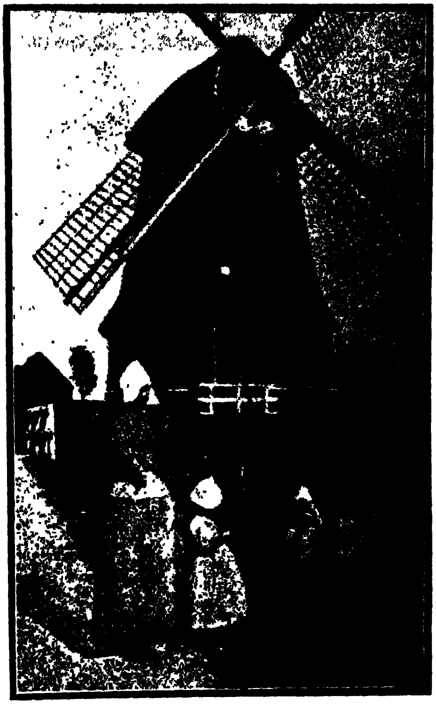
মেয়েদের সাজসজ্জা দেখান, চা বা কফি তৈরী করে খাওয়ান, নিজেদের ছবি বা সাজসজ্জা বিক্রী করা ইত্যাদিতে এই জেলে-রমণীদের বিশেষ লাভ হয়। সেজন্য তারা নানা ভাষা শেখে।

সোনালী হলদে রংএর কাঠের বাড়ী, রক্তের মত লাল টালি দিয়ে ছাওয়া। দরজা জানালার ফ্রেম সাদা। দরজার রং নীল, জানালা সবুজ। জানালায় সাদা কাঁচের আবরণ, তাতে সাদা ধপ্‌ধপে লেসের পর্দ্দা—দেখে জেলের বাড়ী ব'লে মনেই হয় না। ভেতরে ঢুকে আরও অবাক্ হতে হয়। ঘরগুলি কি সুন্দরভাবে সাজান, কত রকমের সুন্দর জিনিষ।

রমণীটি বল্লে, আমার এই পাশাপাশি দুটি ঘর,—এইটি রান্নাঘর, পাশেরটি বসবার ও খাবার ঘর।

প্রথম যে ঘরটিতে ঢুকলুম, সেটি রান্নাঘর। রমণীটি দরজার গোড়ায় তার কাঠের জুতো খুল্লে। আমায় বল্লে, না, আপনার জুতো খোলবার দরকার নেই,—আপনার জুতায় তত ময়লা নেই, আর আমার ঘরও তত পরিষ্কার নয়। আমি জুতোটা ঝেড়ে ঢুকলুম। কিন্তু Volendamএ দেখেছি, অনেক জেলে-গৃহিণীর তক্‌তকে পরিষ্কার ঘরে প্রবেশ করতে হলে বাহিরে জুতো খুলে ঢুকতে হয়।

ঘরের কোণের একটি কাঠের ঢাকা তুলে রমণীটি বল্লে, দেখুন, এইখানে আমাদের শীতকালের জন্যে জল জমা করে রেখেছি। দেখি, ইঁট-বাঁধান একটি ছোট কূয়ার মত, ১৫।২০ ফিট গভীর হবে। অবশ্য স্বাভাবিক কূয়া নয়, জল রাখবার জন্যে তৈরী লম্বা গর্ত্ত। ঘরের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে নানা রকমের চিনেমাটির রেকাব সাজান। ঘরের এক কোণে একটি বড় আলমারি। তার ভেতর নানা রকমের বাসনের সারি



উইণ্ড মিল (ভোলেনডাম)

সাজান। রূপার, এনামেলের ছুরি কাঁটা, ডিস ইত্যাদি ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘরের শেষে, জেলের ঘরের চিহ্ন স্বরূপ দু'টি বড় বড় জাল কোণে ঝুলছে।

রান্নাঘরের শেষে একটি ছোট ঘর। তাতে উঁকি মেরে দেখলুম, লাল রংএর বড় মাঝারি কাঠের বাক্স সাজান। ওই বাক্সেতে নানা রকম সাজসজ্জা বংশের পর বংশ ধরে জমছে।

বসবার ঘরে এসে বসা গেল। রমণীটি Fire-placeএ আগুন জ্বাল্লে এবং কফির জন্যে জল গরম করতে দিলে। ঘরটির দেওয়াল পর্সিলেনের নানা রকম



ছেলেমেয়েরা (ভোলেনডাম)

কাজ-করা প্লেটে ছাওয়া। প্লেটের সারির মধ্যে কয়েক-খানা পুরাতন ছবি রয়েছে। বেশীর ভাগ সমুদ্র ও জাহাজের ছবি। বহু পুরাতন ছবি, তা দেখেই বোঝা যায়।

রমণীটি এবার তার ঘরের দ্রষ্টব্য জিনিষ সব দেখাতে ও বোঝাতে আরম্ভ করলে।

প্রথমে এক সেট মেয়েদের পরবার কাপড় আনলে। বল্লে, এইটি পরে তার বিবাহ হয়েছিল। তার রঙীন ঘাঘরা ও রঙীন ফুলের ছোপভরা জ্যাকেট বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে দেখাতে লাগল। তার পর মেয়েদের টুপি সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা জুড়ে



জেলের মেয়ে (ভোলেনডাম)

দিল। এই বনেটের চারটি অংশ। প্রথমে একটি গোল সাদা টুপি মাথায় পরতে হয়। তার পর তার ওপর লাল ছোট টুপি, তার ওপর একটি লেসের টুপি পরে, সব শেষে মাঝখানে আবার লাল একটি ফুল। এ হচ্ছে অবশ্য মেয়েদের মাথার টুপি।

ড্রেস দেখান শেষ হলে বল্লে, বিক্রির জন্যে আমার এক রকম সাজ আছে, আপনি যদি কিনতে চান ত সুবিধা দরে দিতে পারি।

বল্লুম, তোমার বিয়ের সাজ তুমি বিক্রি করবে?

বল্লে, এটা না, তবে এই রকম সাজ ও একটা টুপি নিতে পারেন। কিন্তু যে রকম দাম হাঁকল, তাতে নেওয়া সুবিধে হল না।

সাজ দেখান শেষ হলে, তাদের পারিবারিক বাইবেল গ্রন্থ নিয়ে এল। মারকেনের জেলেরা হচ্ছে প্রটেষ্টাণ্ট। বাইবেলটি পুরাতন, ইয়োরোপের মধ্যযুগের বইএর মত চেন দিয়ে বাঁধা। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের বইখানি, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের আগে। বংশের পর বংশ বইখানিকে গৃহদেবতার মত সযত্নে রক্ষা করে এসেছে।

তার পর চিনে-বাসনগুলি গর্ব্বের সঙ্গে দেখাতে লাগল। বল্লে Delftর চায়না, খুব পুরাতন, sehr alt এই কথাটাই পর পর আবৃত্তি করতে লাগল। কিন্তু আমি বিশেষ উৎসাহ না দেখালেত বিক্রি করবার সম্বন্ধে কোন কথা তুললে না।

তার পর দ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করলে। বহু পুরাকালে এ জায়গা হলাণ্ডের ভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল, মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। ১৩ শতাব্দীতে এক ঝড়ের রাতে ক্ষিপ্ত সমুদ্র এ জায়গাটা হলাণ্ডের ভূমি থেকে ছিন্ন করে নেয়। প্রথমে এখানে একটী কন্‌ভেণ্ট ছিল। সেই মঙ্করা (monks) দ্বীপটি বেচে চলে যায়। তার পর দ্বীপটি অনেকের হাতে ঘোরে। ১৭ শতাব্দীতে এক বিষম বন্যাতে সমস্ত দ্বীপ ভেসে সব ডুবে যায়, শুধু সাতটা উঁচু ঢিপিতে কয়েকখানি বাড়ী বেঁচেছিল। তার পর ১৮ শতাব্দীতে চার বার আগুনে অনেক বাড়ী পুড়ে যায়, কিন্তু আবার নতুন রঙীন বাড়ী জেগে উঠেছে। তবে এখানে বাড়ী তৈরী করবার হাঙ্গামা আছে; জোলো জমি, নীচে কাঠের খুঁটি পুঁতে জমি শক্ত করতে হয়।

বল্লুম, তা জানি, আমষ্টারডামে সব বাড়ীর ভিত করতে অনেক কাঠের খুঁটি দিতে হয়েছে; আমষ্টারডামের রাজ-প্রাসাদ করতে নাকি সাড়ে তেরো হাজারের ওপর কাঠের খুঁটি লেগেছে।

কফির জল অনেকক্ষণ ফুটে উঠেছে। রমণীটি কফি তৈরী করে আমার এক কাপ খেতে দিলে ও নিজের জন্যে এক কাপ ঢাল্লে। তারপর বাড়ীতে তৈরী বড় কেক বাহির করল।

ঘরটির শেষে দেওয়ালে একটি সুন্দর রঙীন পর্দ্দা দেখে

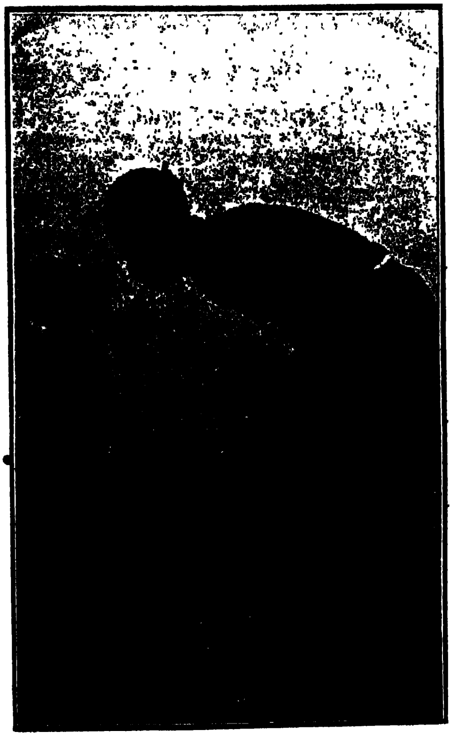
বল্লুম, সুন্দর পর্দ্দা ত'; কিন্তু-ও রকম ভাবে দেওয়ালে ঝোলান কেন?

রমণীটি হেসে বল্লে, ওদিকে আমাদের শোবার জায়গা ঢাকা আছে। তার পর পর্দ্দাটি সরিয়ে দেখালে। দেখলুম, দেওয়ালের ভেতর যেন একটা উঁচু লম্বা বাক্স লাগানো রয়েছে দেওয়াল-আলমারীর মত, তার মধ্যে সাদা নরম শয্যা তৈরী করা। দেওয়ালের ভেতর বড় খোপের মত এমন বিছানা কখনও দেখিনি। খোপের সামনে পর্দ্দা টেনে দিলে কিছুই বোঝা যায় না।

কফি শেষ করে বিদায় নিতে উঠলুম। ঘরবাড়ী ও সব জিনিষের প্রশংসা করে বিশেষ ধন্যবাদ জানালুম। অবশ্য কফির দাম বলে কিছু টাকা দিতে হল; কারণ, শুধু প্রশংসা ও ধন্যবাদে সব সময়ে চলে না। তবে রমণীটির টাকার জন্য তেমন মায়া নেই



দুধওয়ালী (ভোলেনডাম)



ভোলেনডামের লোক

দেখলুম। এ সময় ভ্রমণকারী বড় আসে না। বহুদিন সে তার ঘর, জিনিষপত্তর কাউকে দেখাতে পায় নি। তার সে সব দেখিয়ে গল্প করেই আনন্দ। আমায় বল্লে, আপনার যা ইচ্ছে হয় আমায় দিন।

তার বাড়ী থেকে বাহির হতে, বল্লে, আপনি আমাদের ছোট ছেলে মেয়ে দেখলেন না, আসুন আপনাকে আর এক বাড়ীতে নিয়ে যাই। কাছেই আর এক জেলে-বাড়ীতে এসে তার গৃহকর্ত্রীকে বল্লে, তোমার ছেলে মেয়ে দেখবার জন্যে ইনি এসেছেন। আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। গৃহকর্ত্রী সহাস্যবদনে অভ্যর্থনা করে বল্লে, আসুন ঘরের ভেতর। দরজার সামনে একটি বড় মেয়ে বড় কাঠের গামলায় কাপড় কাচছে। তার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকলুম। গৃহকর্ত্রী সুন্দর ইংরাজী বলে। তার পাশে একটি ৪।৫ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে। সেও দু'একটি ইংরাজী কথা শিখেছে।

গৃহকর্ত্রী বল্লে, আমার মেয়ের সাজ দেখুন। ধরণ আমাদেরই মত, তবে জ্যাকেট নোংরা করে বলে বড় আপ্রণ পরাতে হয়। আর এই দেখুন আমার ছেলে ঘুমুচ্ছে।

একটি বড় বেতের দোলনাতে বিছানায় একটি ২।৩ বছরের ছেলে ঘুমুচ্ছে। ছেলে মেয়ে দু'টিই বেশ নাদুসনুদুস সুস্থকায় মনে হল।

গৃহকর্ত্রী বল্লে, ছোট ছেলের সাজ মেয়েদের সাজের মতই।

দু'বছর পর্য্যন্ত ছেলেরা মেয়েদের মত সাজ পরে। শুধু তফাৎ হচ্ছে টুপিতে। ছেলেদের মাথার টুপিতে লাল তারা, মেয়েদের মাথার টুপিতে লাল ফুল। ছেলে ও মেয়ের টুপি খুলে সে আমায় তফাৎটা বোঝাতে লাগল।

ঘরের কোণে দেওয়ালের গায়ের ফুলকাটা পর্দ্দা সরিয়ে দেখালে, এই আমাদের বিছানা। এখানে তলায় বড়



একটি বৃদ্ধা (ভোলেনডাম)

বিছানার ওপর কোণে একটি ছোট বিছানা ছোট বাক্সের মত ঝুলছে। ওই ছোট বিছানা হচ্ছে ছোট ছেলের জন্যে। দেওয়ালের মধ্যে বৃহৎ খোপের মত এই বিছানাগুলি বড় মজার।

ছেলেমেয়েদের খাবারের জন্যে কিছু পয়সা দিয়ে ঘাটের দিকে ছুটলুম। মারকেন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছে, ষ্টিমার ছাড়বারও সময় হল।

গ্রাম ছেড়ে জোলো মাঠের ওপর ইঁটের পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, এই ছোট জেলের গ্রাম! পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্ত হতে কত লোক এখানে দেখতে এসেছে, কত আর্টিষ্ট এর ছবি এঁকেছে, কত লেখক এর কথা লিখেছে,—বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের মধ্যে পুরাতন ইয়োরোপের একটু ক্ষুদ্র খণ্ডের জন্যে লোকের কত আগ্রহ।

দ্বীপটি ছাড়বার সময় ডেক থেকে ঘাটটি বড় সুন্দর দেখাতে লাগল। নীল সমুদ্রের তীরে লাল ও ধূসর টালির ছাদ, হলদে সবুজ বেগুনা বাড়ীর দেওয়াল, সাদা নীল জানালার ফ্রেম—উদার নীলাকাশের পটে সাত রংএর আনন্দময় উচ্ছ্বাসের মত।

আবার Monnikendamএ ফিরে এসে ষ্টিমট্রামে করে Volendamএর দিকে যাত্রা করলুম। আধ ঘণ্টার পথ। সমুদ্রতীরে একটি ছোট গ্রাম, জেলেদের বাস। সমুদ্রের তীর দিয়ে বাঁধের মত একটি উঁচু লাল ইঁটের রাস্তা গেছে। তার এক ধারে জেলেদের কালো নৌকার সারি, আর এক ধারে রঙীন বাড়ীর সারি।

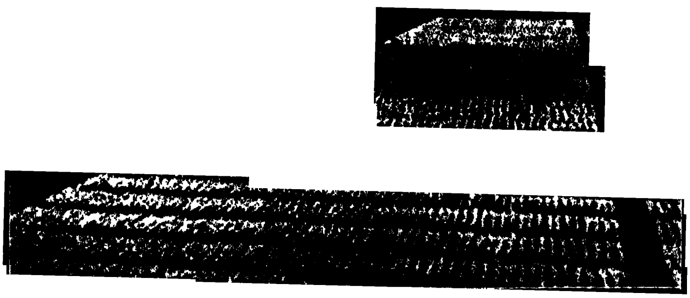
গ্রামে ঢুকতেই ছেলের দল এসে ঘিরে দাঁড়াল। এমন মজার সুন্দর ছেলের দল আমি কখনও দেখি নি। পায়ে কাঠের জুতো খটাখট্ করছে। ঢিলে ঘন নীল রংএর পাজামা পরা। গায়ে ডগ্‌ডগে লাল জামা, মাথায় কালো টুপি। গাল ফোলা, মোটা, এমন দুধ-মাখন-মৎস্য-পুষ্ট নাদুসনুদুস অথচ সুস্থ ছেলেমেয়ের দল আমি কখনও দেখি নি। দেখলে মনে হয়, যেন রঙীন পুতুল সব ছুটে হেসে বেড়াচ্ছে।

ভোলেনডামের মেয়েদের সাজ মারকেনের মেয়েদেরই মতন; শুধু মাথার টুপিতে বিশেষ প্রভেদ। এখানে মেয়েদের মাথার সাদা লেসের টুপি বড় সুন্দর, মনে হয় যেন

একটা আধ-ফোটা শ্বেত টিউলিপের। পুরুষ জেলেদের সাজটি বড় চোখে পড়ে। তাদের মাথার গোল টুপি অনেকটা তুর্কী টুপির মত। গায়ে লাল বা কালো জামা, তাতে রূপার বা তামার বড় বোতাম ঝক-ঝক করছে। তাদের ঢলঢলে ট্রাওজার বড় সুন্দর দেখতে। ঘন নীল রংএর, দেখে মনে হল যে, পাঞ্জাবী বা কাবুলি-ওয়ালার ঢলঢলে পাজা-মার মত।

ভোলেনডামে ঘর দেখাবার জন্যে কোন জেলে-গৃহিণী এসে ধরল না। সবাই প্রায় কাজে ব্যস্ত, কেউ সমুদ্রের ধারে কাপড় কাচছে, কেউ ঘর পরিষ্কার করছে, কেউ ছোট মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে বাহির হয়েছে।

সুতরাং এখানকার বিখ্যাত হোটেল স্পাণ্ডারে গিয়ে



ফুলের চাষ (হলাণ্ডে)

ঢোকা গেল। সামনে একটি মেয়ে মাথার লেসের টুপি বুনছিল, উঠে আমায় অভ্যর্থনা করলে। হোটেলের বড় ঘর ভরে নানা চিত্রশিল্পীর নানা ছবি। গ্রীষ্মকালে এ হোটেল নানা দেশের চিত্রকরে ভরে যায়। এই সব শিল্পীদের রঙীন তুলির গুণে লোকেরা এই ছোট গ্রামটিকে এত সুন্দর দেখে, না, এই গ্রামের মায়ার নরনারী ছেলেমেয়েদের বেশভূষার



সমুদ্রতীরে (ভোলেনডাম)

রঙীন সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রকরেরা সুন্দর ছবি আঁকে, এ বিষয় নিয়ে মতভেদ আছে। তবে আমার মনে হল, নীল সমুদ্রের কোলে নৌকার মাস্তুল লাঞ্ছিত এই রঙীন বাড়ী ও রঙীন সাজওয়ালা গ্রামের গুণেই শিল্পীদের মন দুলে ওঠে। লাল নীল নানা রংএর ডোরা-কাটা ঘাঘরা-পরা, মাথায় সাদা ঢেউখেলান টুপি, মুখে হাসি-ভরা জেলে মেয়েদের এই গ্রামে, সমুদ্রের ধারে লাল পথে দাঁড়ালে মনে হয়, এ যেন একটি ফ্যান্সি ড্রেসের গ্রাম, এ যেন সাজান, বায়স্কোপের ফিলম তোলবার জন্যে তৈরী করা, যেন একটা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ, একটা Masquerade চলেছে, একটা অদ্ভুত আশ্চর্য্যকর ঘটনা বুঝি ঘটবে, বুঝি চোখের সামনে একটা রঙীন সজীব ছবি দুলছে, পলকে মিলিয়ে যাবে। চিত্রশিল্পীরা হলাণ্ডের যখন ছবি আঁকেন, তখন এই পুরাতন বেশভূষার হলাণ্ডের, এই জেলের গ্রামের হলাণ্ডের ছবিই আঁকেন।

অগ্নি-শুদ্ধি

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন বেলা হবে ১১টা। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল একটি তরুণী। বয়স তার ২৪।২৫; একহারা চেহারা, রংটি উজ্জ্বল, পরণে সরু-পাড় শাড়ী, পায়ে জুতো, হাতে দুখানি সরু সোণার রুলী। সারা দেহে মাখানো শান্তশ্রী, চোখে মুখে একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা।

অদূরে মোটরে বসেছিল একটি মোটা গোলগাল চেহারার বাবু; দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার এই তরুণীর উপর। তরুণী মুখ ফেরাতেই বাবুটি বলে উঠলো—"যা ভেবেছি তাই, ভুল হবার যো কি!" মোটরের দরজাটা খুলে তরুণীর কাছে এগিয়ে এসে হেসে বল্লে "আরে কেও—বুঁচি না?··· একেবারে ভোল ফিরিয়েছিস···"

বাধা দিয়ে মেয়েটি ত্রস্তে চারিপাশে চেয়ে চোখটিপে বল্লে "চুপ, বুঁচি নয়, মিসেস্ তরু গাঙ্গুলী···"

"আচ্ছা তাই সই, মিসেস্ গাঙ্গুলী; কিন্তু ব্যাপার কি বল্ ত? তিন চার বছর কোথায় ডুব মেরেছিলি?"

"সে অনেক কথা—রাস্তায় বলা যায় না।"

"কোথায় যাবি এখন?"

"ভবানীপুর নার্সিং হোমে থাকি!"

"আমার মোটরে আয়, পৌঁছে দিচ্ছি,—পথে যেতে যেতে সব শুনবো!" মেয়েটি মোটরে উঠে বসতে, বাবুটি সোফারকে বল্লে "ভবানীপুর চলো।" পরে তরুর দিকে ফিরে বল্লে "কোথায় ছিলি এতদিন?"

"কটকে···পড়তে গিছলুম।"

বাবুটি হেসে বল্লে "রামবাগান থেকে একেবারে কটকে আটক! ব্যাপার কি? হঠাৎ এ খেয়াল মাথায় চাপলো কেন? তোর ত রোজগার মন্দ ছিল না?"

তরু ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলো "ছিঃ, সেই নরকে পড়ে থাকা,—সে কি একটা জীবন? তোমার হয় ত মনে নেই রাজাবাবু, কিন্তু তুমিই ত আমার মাথায় এ সুবুদ্ধি দিয়েছিলে?"

"আমি?···এই দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় আমি দিইছি?"

"হ্যাঁ, তুমি; দুর্ব্বুদ্ধি নয়, পথভ্রান্তকে পথ দেখিয়েছ। তুমিই একদিন নেশার ঝোঁকে বলেছিলে 'বুঁচি, তোদের দেখলে আমার কষ্ট হয়,—তোদের মতন দুঃখী আর নেই; তোদের মা নেই, বাপ নেই, স্বামী নেই, বন্ধু নেই,—নিজের কেউ নেই, কিছু নেই,—আছে জীবনব্যাপী অশান্তি, জগৎ-জোড়া বিপদ, উৎকট ব্যাধির যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অপমান! তুই ত লেখাপড়া জানিস, এর চেয়ে ধাইগিরী করলি না কেন?' কি শুভক্ষণেই কথাটা বলেছিলে রাজাবাবু, সে যেন যাদুমন্ত্রের মতন আমার মাথায় চেপে বস্‌লো! তার দুদিন পরেই সব বেচে-কিনে কাউকে না জানিয়ে খবর নিয়ে কটকে চলে গেলুম। সেখানের দিনগুলো কি আনন্দেই না কেটেছে! এমন মুক্তি যে কোন দিন পাব, কখনও আশা করি নি। তোমাকে সেখান থেকে উদ্দেশে প্রণাম করতুম। তুমিই আমার মুক্তিদাতা দাদাবাবু!"

"ও কি রে 'দাদা' হলুন আবার কবে থেকে? না—না, ওসব বেয়াড়া সম্পর্ক নয়···কতদিনের পর দেখা···তায় কত কালের বাসনা ..তখন না হয়···"

বাধা দিয়ে তরু বলে উঠলো "তোমার দুষ্টুমী আর গেল না· হ্যাঁ রাধিদি কেমন আছে,···সুশী···পটলী...চাঁদরী··· এরা সব ভাল আছে? এদের আমার দেখতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু ও-পাড়ায় যেতে আর প্রাণ চায় না দাদাবাবু। যাবার কথা মনে হলেও গা কাঁপে। আমি নিজেই অবাক্ হয়ে যাই—এ রকম হয় কেন?"

"তোর আর ওখানে গিয়েও কাজ নেই বোঁচন! এরা সব ভালই আছে। এদের দেহের ওজনও যেমন দিন দিন বাড়ছে, গহনার বাক্সও বড় হচ্ছে। আর না হবেই বা কেন?···তিন চার পুরুষ ধরে ব্যবসা· মা দিদিমা ছেলেবেলা থেকে তালিম দিচ্ছে, একেবারে জাত সাপের বাচ্ছা, রক্তের ঋণ যাবে কোথা বল, সে ত এক দিন শুধ্‌তেই হবে! তোর

মতন ত এরা নয়।···হ্যাঁ—তার পর তুমি যে মিসেস গাঙ্গুলী হয়েছ,—ভাগ্যবান এই মিষ্টার গাঙ্গুলীটি আবার কে ?”

“কে আবার ? ছেলেবেলায় গাঙ্গুলীদের বাড়ী বিয়ে হয়েছিল না ?···তার পর ত মাথা খেতে···”

“ও, পূর্ব্বের সম্বন্ধে ?···তিনি কি এখনও জীবিত ?—”

“এই রাখো! এইখানে আমি নামবো দাদাবাবু! এই গলিতে ১৭ নম্বর বাড়ীতে আমি থাকি! আচ্ছা, আসি তবে—নমস্কার, আবার হয় ত দেখা হবে!”····· গলির শেষে বাঁকের মাথায় যখন শাড়ীর শেষ প্রান্তটুকু মিলিয়ে গেল, রাজাবাবু তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সাফারকে বল্লেন “ফিরাও”—

২

তখন রাত ৯টা। সিক-নার্শদের বাসার ছোট ছাদে একটা ডেক-চেয়ারে তরু বসে ছিল ; আর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূর অন্ধকার আকাশের পানে। সেই দৃষ্টির অন্তরালে খেলা করছিল তার অতীত জীবন! সেই ছেলেবেলা······কত হাসি-খেলা, আনন্দের মাঝে কত শীঘ্র কেটে গেল সেই ভাবনা-বিহীন দিনগুলো! তার পর এক নব-জীবনের উন্মেষ! আকাশের নূতন রূপ, বিশ্বের নূতন রূপ! ভাল করিয়া না দেখিতেই, কল্পনার পটে রং না শুকাইতেই স্বপ্নের মতন সে রূপ-রাজ্য কোথায় মিলিয়ে গেল! তার পর এক সন্ধ্যালোকে আলো-উৎসবের মাঝে প্রাণের পথ বেয়ে এল এক তরুণ অতিথি···মুখে তার মৃদু হাসি ; চোখে মুগ্ধদৃষ্টি! তরু বিশ্ব-সংসার ভুলে গেল। একটা বছর কোথা দিয়ে কেমন করে কী সুখ-স্বপ্নের মাঝেই না কেটে গেল! তার পর আরম্ভ হল নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা! ধনীর দুলাল স্বামী-দেবতা স্বেচ্ছাচারের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে,—তরু পড়ে রইল দেবতাবিহীন মন্দিরে শূন্য নির্ম্মাল্যের ডালির মত! দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, সেই নির্জ্জন নীরবে বসে থাকা আকুল প্রতীক্ষায়! সুখ গেছে, হাসি গেছে, রূপ গেল, তবে আর কেন ?···নির্জ্জীব মনটা একদিন বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দাবী জানাতে গেল ; পেলে লাঞ্ছনা, অপমান, প্রহার!···দানের ওপর দাবী ?···এ কি দুঃসাহস! ঝড় উঠলো! সেই ঝড়ের ঝাপটে ঝরে পড়ে গেল ফুলটি সংসার-স্রোতের মাঝখানে, ভেসে চলে গেল কোন্ ধুধু মরুর তাতল তটের দিকে···আজ পর্য্যন্তআর ·····

“মা !”—

তরুর চমক ভাঙ্গলো, ফিরে জিজ্ঞাসা করলে—“কি রে দাই ?”

“ডাক্তারবাবু এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন !”

তরু চোখ মুছে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতে, বৃদ্ধ ভুবন ডাক্তার বল্লেন—“মা তরু, একটা টাইফয়েড কেশ আমার হাতে আছে। নার্শ করবার ভাল লোক সেখানে নেই। খুব অবস্থাপন্ন তাঁরা, বেশ কিছু টাকা পাবে, যাবে ? তোমার, হাতে কি কোন কেশ আছে ?”

“না বাবা, আমার সে রোগীটি পরশুদিন ভাল হয়েছে। সেখানে আমার আর যেতে হয় না !”

“তাহলে আমার সঙ্গে কি এখন যেতে পারবে ?”

“পারবো। আপনি দাঁড়ান, আমি কাপড়টা বদলে আসি।”

মিনিট পাঁচেক পরে তরু এসে ডাক্তারের মোটরে চড়ে চলে গেল।

আধঘণ্টা বাদে ভুবন ডাক্তারের সঙ্গে তরু যখন একটা বড়বাড়ীর সজ্জিত কক্ষে এল, তখন একটি বছর ৩৫ বয়সের গৌরবর্ণ চেহারার লোক রোগের উত্তেজনায় প্রলাপ বকছে ; আর এক বৃদ্ধা তার মাথায় বরফের থলি চেপে ধরে বসে আছে। ভুবনবাবু রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে বৃদ্ধাকে বল্লেন, “আপনি উঠুন, এখন থেকে ইনিই থাকবেন! সোমেন কোথায় ?”

“সে আপনাকে ডাকতে গেছে। জ্বরটা আজ বড় বেড়েছে বাবা, আর বড্ড ভুল বকছে।”

“হ্যাঁ, রোগের ভোগ ত আছে,—ভয়ের কোন কারণ নেই !”

“তাই বলুন বাবা, এই এক পলতে নিয়ে ঘর করি, এর যদি কিছু হয়······” বৃদ্ধা আর বলতে পারলেন না, আঁচলে চোখ মুছলেন!

তরু রোগীর শিয়রে এসে বসে মৃদুকণ্ঠে বৃদ্ধাকে বল্লে, “রোগীর কাছে কি কাঁদতে আছে ? ভয় কি, ইনি সেরে উঠবেন। আমি এখন রইলুম, আপনি অন্য কাজে যান।” বৃদ্ধা চলে গেল। ভুবনবাবু তরুকে ঔষধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বল্লেন, “রাতটা ভাল করে ওয়াচ করো!” তরু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। কি এক অজানা আশঙ্কায় তরুর বুকটা কেঁপে উঠতেই, সে জোর

করে তার মনটাকে অন্য দিকে ফেরালে। ঘরের আসবাব-গুলা নিরীক্ষণ করতে লাগলো। নির্জ্জন ঘর, কেবল ব্রাকেটে স্থাপিত ঘড়ীটা টিক্ টিক্ করছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি দেয়ালে টাঙ্গানো একখানা অয়েল-পেন্টিংএর প্রতি পড়তেই সে চমকে উঠ্‌লো! ছবিখানি একটি বছর ষোল বয়সের বধূর—হাতে পূজার সাজি, মুখে মৃদু হাসি! তরুর বুকটা দ্রুতভাবে স্পন্দিত হতে লাগলো! সে একদৃষ্টে রোগীর মুখের পানে চেয়ে মনে মনে বলে উঠলো "এ আমায় কোথায় আনলে ঠাকুর, তোমার এ কি নিষ্ঠুর খেলা?"

পাশে পদশব্দে মুখ ফেরাতেই দেখে একটি ১৭ বছরের ছেলে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে!

ছেলেটি মৃদুস্বরে তরুকে জিজ্ঞাসা করলে "এখনও কি বকছেন?"

"না, একটু স্থির হয়েছেন।"

সহসা রোগী উঠে বসতেই তরু দুই হাতে ধরে বাধা দিয়ে বল্লে "কোথা যান্?"

রোগী জড়িতকণ্ঠে বল্লে "তাকে ফিরিয়ে আনতে"......

"আপনি শুয়ে থাকুন। খোকা, বাতাস কর ত ভাই—"

রোগী তার রক্তচক্ষু তরুর মুখের উপর স্থাপন করে বলে উঠলো "তুমি?......তুমি?......কে তুমি?..... সোমেন, কাকে এনেছিস্?"...

"ইনি নার্স—বড়দা!" রোগী অবসন্নভাবে শুয়ে পড়লো।

৩

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। প্রথমটা রোগের অবস্থা বেড়েই চলেছিল,—তরু এক রকম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে রোগীকে নিয়ে কাটিয়েছে। ভুবন ডাক্তার অনুযোগ করলে হেসে বলেছে "এ ত আমার ডিউটি বাবা, না হলে লোকে ডাকবে কেন?" রোগী নরেন বাবুর মা তরুর অক্লান্ত সেবা দেখে তার মাথায় হাত দিয়ে বলত,"এমনটি আমি দেখি নি,—তুমিই আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছ মা,—তুমি আমার আর জন্মে কে ছিলে মা?" তরু হেসে সেই একই কথা বলত,—"এ যে আমাদের কর্ত্তব্য মা, সকল নার্স ই এই রকম করে!" রোগী নরেন পর্য্যন্ত মুগ্ধ! আজ কদিন থেকে একটা সংশয় তার মনের মাঝে তোলাপাড়া করছে—কিছুতেই তার হাত থেকে সে নিস্তার পাচ্ছিল না। কদিন থেকে তরু বিদায় প্রার্থনা করছিল; কিন্তু নরেন ভুবন ডাক্তারকে বল্লে, "আমি এখনও ভাল সারি নি, আমার মা একা, ওঁকে আরও কিছুদিন থাকতে বলুন।" কাজেই তরুকে থেকে যেতে হল! অথচ এই থাকা যে কত কঠিন, মনের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রাম—ইহা সে কেমন করে রোধ করবে? সেদিন সকালে নরেনের মা হরমোহিনী তরুর কাছে তাঁর সংসারের ইতিহাস বলছিলেন, তরু নীরবে শুনে যাচ্ছে! পুত্রগত-প্রাণ মা কত-ভাবে আপনার মনে ছেলের কথা বলেই চলেছে! তার ছেলেবেলার কথা, বিবাহের কথা, অতীতের কত কথা! বধূর কথা উঠতেই বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছে বল্লেন, "বউ আমার বড় ভাল ছিল মা, হতভাগীর পোড়া-কপাল—স্বামী নিয়ে ঘর করতে পেলে না · কোথায় যে গেল, আজ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধানই পেলুম না! দেশ থেকে কলকাতায় এসে ছেলেও ত খুঁজতে বাকী রাখে নি মা। কিন্তু সবই বৃথা! কেউ বল্লে 'মনের ঘেন্নায় গঙ্গায় ডুবে মরেছে'; কেউ মন্দ কথা বল্লে; কিন্তু কিছুই ত ঠিক হল না! সেই থেকে ছেলে আর বিয়ে করলে না মা! বাছার শরীরে এখন কোন দোষ নেই; কিন্তু সে হতভাগী ত দেখতে পেলে না! বেটাছেলে, ডবকা বয়েসে যদি কিছু করেই থাকে, সে কি মা ধরতে আছে?"

তরু কোন কথা বল্লে না। আর বলিবারই বা কি আছে! এ সত্য কি সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করে নি?·· এক দিনের একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে তাকে সারা জীবন ধরে করতে হচ্ছে! এখন সে ছটফট করছে—কতক্ষণে এখান থেকে পালাতে পারবে!·· নিজের সমস্ত জোর সে হারাতে বসেছে। নির্লজ্জ মনটা কল্পনায় স্বর্ণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই চলেছে—বিরাম নাই! কিন্তু সে ত হবার নয়, আর কেন? মনে মনে বলে উঠলো "ঠাকুর, তোমার অসীম দয়া, আমি আর কিছু চাই না। এই যেটুকু পেলুম, আমার সারা জীবনের সম্বল হল!"

. সোমেন এসে তরুকে বল্লে "দিদি, আপনাকে বড়দা ডাকছেন!"

"চল, যাচ্ছি!" এই এক মাসের মধ্যে বাপ-মা-হারা সোমেন ছেলেটি তরুর প্রাণে অনেকখানি যায়গা জুড়ে বসেছে! সে নরেন বাবুর খুড়তুতো ভাই! আজ তরুর যাবার কথা; সোমেনের পানে চেয়ে তার চোখ ছল-ছলিয়ে উঠলো! সে আপনার মনে বলে উঠলো "ছিঃ, পরের ছেলের ওপর মায়া কেন?"

তরু যখন নরেনের ঘরে এল, তার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগল! নরেন একটা সোফায় শুয়ে ছিল; উঠে বসে বল্লে, "আপনি কি আজই যেতে চান?"

তরু নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে "হ্যাঁ"—

নরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তরুর অবনত মুখের পানে চেয়ে বল্লে "আমার একটা কৌতূহল হচ্ছে আপনার পরিচয় জানতে……"

"আমি নার্স এই আমার পরিচয়!"

"এর বেশী……"

"জানা নিষ্প্রয়োজন! আচ্ছা আসি তবে, নমস্কার!"

"আপনার কা…"

"ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন!"

তরু যখন দরজার কাছে গেছে, হঠাৎ নরেন ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরে বল্লে—"একটা কথা বলে,—যাও……"

তরু দেহ মনে কেঁপে নরেনের পানে চাইতেই, নরেন বলে উঠলো "বল,—তুমি সেই কি না, আমি তোমায় চিনেছি, বল, তুমি আমার সেই তরু—"

তরু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে নরেনের পায়ের ওপর মুখ রেখে কেঁদে বল্লে "ওগো, আমি সেই পাপিষ্ঠা, তোমার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন আমার শক্তি কোথায়? যদি জানতে আমি কি—"

নরেন দুহাতে তরুকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বল্লে,—"তুমি কি তা জানতে চাই না,—শুধু এই জানি, তুমি আমার চির-আকাঙ্ক্ষিতা অনাদৃতা স্ত্রী। মানুষের দেহটাই শুধু মানুষ নয়! তোমার যদি বিচার করতে হয় তাহলে আমার অপরাধেরও বিচার দরকার! এস, তোমার আমার দুজনের বিচারের ভার সেই বিচারকর্ত্তার হাতেই ফেলে দিই। যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তিনিই বিচার করবেন যিনি দুইটি হৃদয় এক করেছেন। তাঁর শাস্তি বা আশীর্ব্বাদ যা আসে দুজনে এক সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেব।"

তরু কোন কথা বলতে পারলে না, নরেনের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে তার বুকে মুখ লুকিয়ে তেমনি কাঁদতে লাগলো।

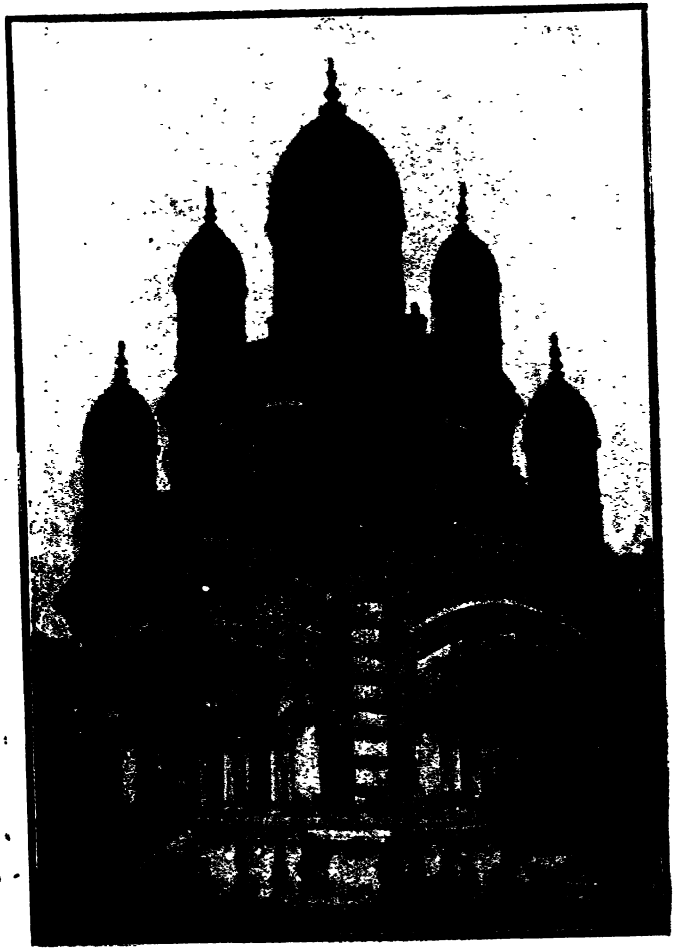


শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর　　ফল-আহরণ

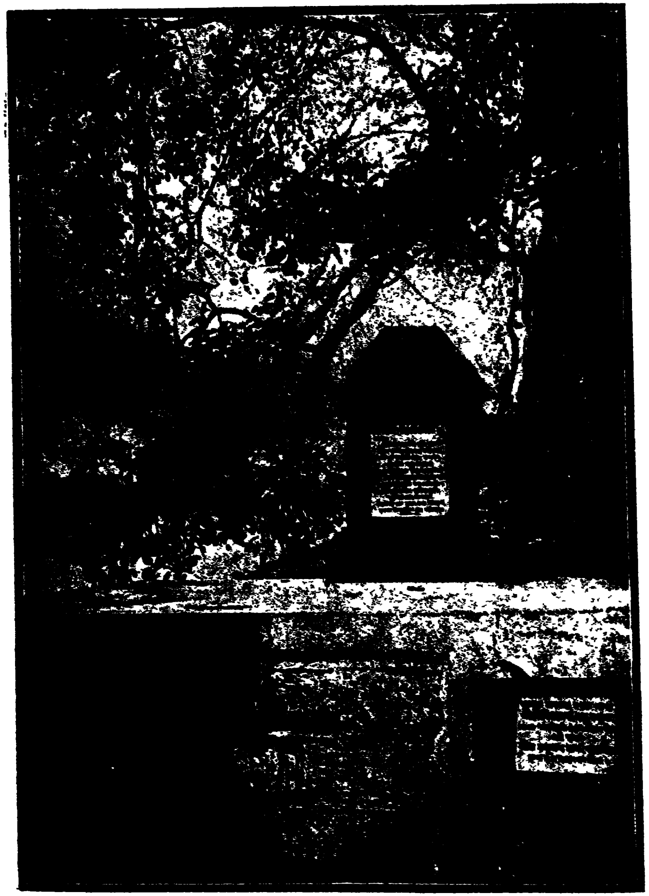
ভাগীরথী-তীরে

শ্রীহরিহর শেঠ

দক্ষিণেশ্বর হইতে ভাকুলেরপাট

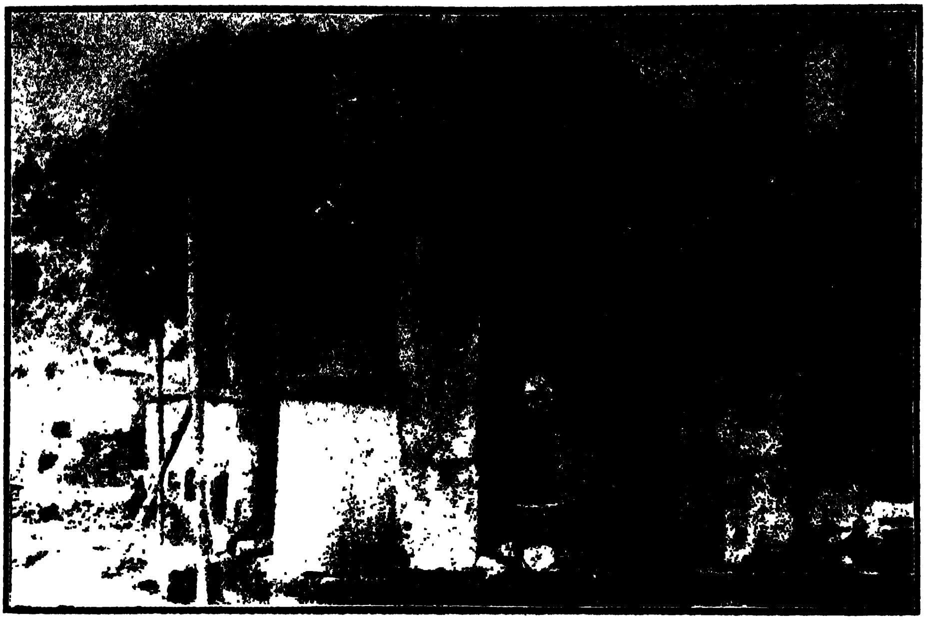


কালী মন্দির—দক্ষিণেশ্বর। স্বনামধন্যা রাণী রাসমণির দ্বারা উৎসর্গীকৃত পুণ্য কীর্ত্তি। ইহার সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির মধ্যেই পরমহংসদেব মার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

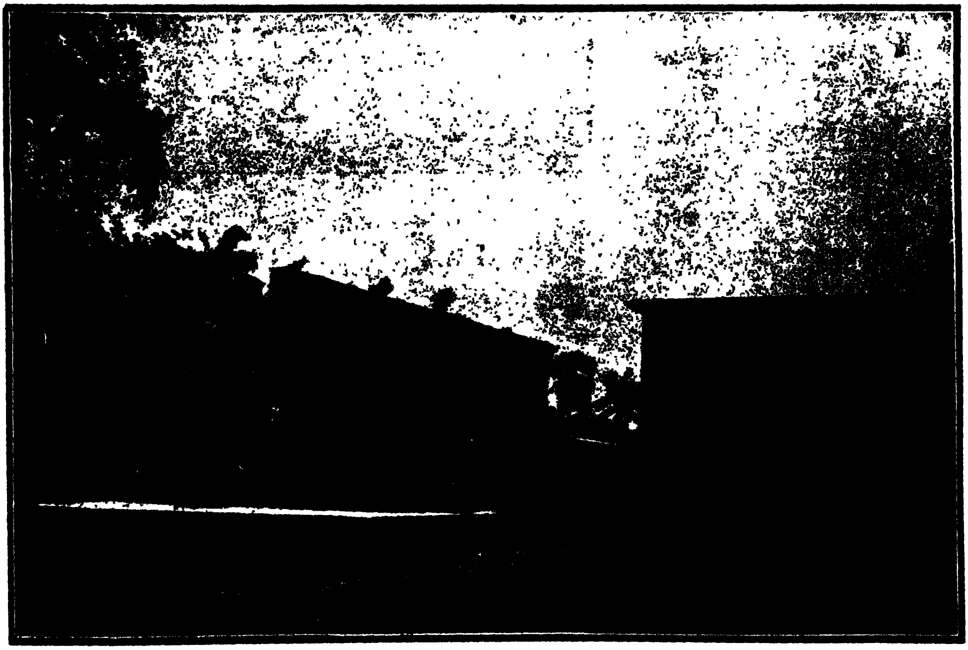


বটবৃক্ষ—পাণিহাটী

রাসযাত্রার সময় এবং বৈষ্ণবী মেলা নামে এখানে বৎসরে দুইটী মেলা হইয়া থাকে। এই সময় এখানে বহু লোক সমাগম হয় এবং সকলেই ভক্তিভরে এই বটবৃক্ষ ও মাধবীলতা দর্শন করিয়া থাকেন।



রাঘবপণ্ডিতের মাধবীলতা ও সমাধি—পাণিহাটী
কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবরের দ্বারা এই মাধবীলতা রোপিত হইয়াছিল। এইখানেই তাঁহার সমাধি আছে।



নেড়ানেড়ির মেলাস্থান—খড়দহ নিত্যানন্দ প্রভুর এই স্থানে আগমন ও বাস হইতে ইহার প্রসিদ্ধি। তাঁহার বাসকুটীরসংস্পৃষ্ট, খড়দহ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প প্রচলিত আছে। এখানে দোল ও রাসযাত্রার সময় বড় মেলা বসিয়া থাকে।

৺ব্রহ্মময়ী দেবী

কলিকাতার অনতিদূরে পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের শ্যামনগর ষ্টেসনের নিকটেই মূলাযোড় অবস্থিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মূলাযোড়ে এই ব্রহ্মময়ী কালীমূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পর পৃষ্ঠায় যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা গোপীমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবমন্দিরের দৃশ্য। গোপীমোহন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। তিনি তাঁহার পিতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কলিকাতা হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে ইনি যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে ইঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গবর্ণর থাকিবেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি মূলাযোড়ে যে কালীমূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ব্যয়ের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তির নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। তাঁহার স্থাপিত সংস্কৃত কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় এখনও তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কৃত কলেজের সহিত বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পণ্ডিত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের বিশেষ সংস্রব ছিল। তিনি কাশীধামে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখনও পৌষ মাসে মূলাযোড়ে ব্রহ্মময়ী দেবী দর্শনার্থ বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার দেবসেবা ও প্রতিষ্ঠানগুলির সুব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় মূলাযোড়ে যে অতিথিশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন, দেবদেবী সেবার ন্যায় সেই অতিথিশালার কার্য্যও সমভাবে সুপরিচালিত হইতেছে; যাত্রীরা কেহই প্রসাদে বঞ্চিত হয় না।

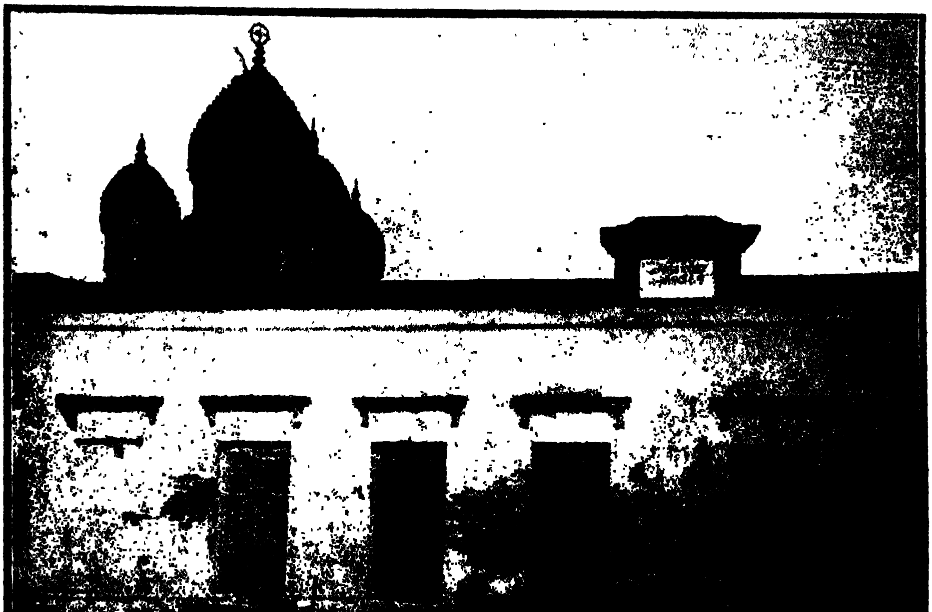


ব্রহ্মময়ী দেবী—মূলাযোড়



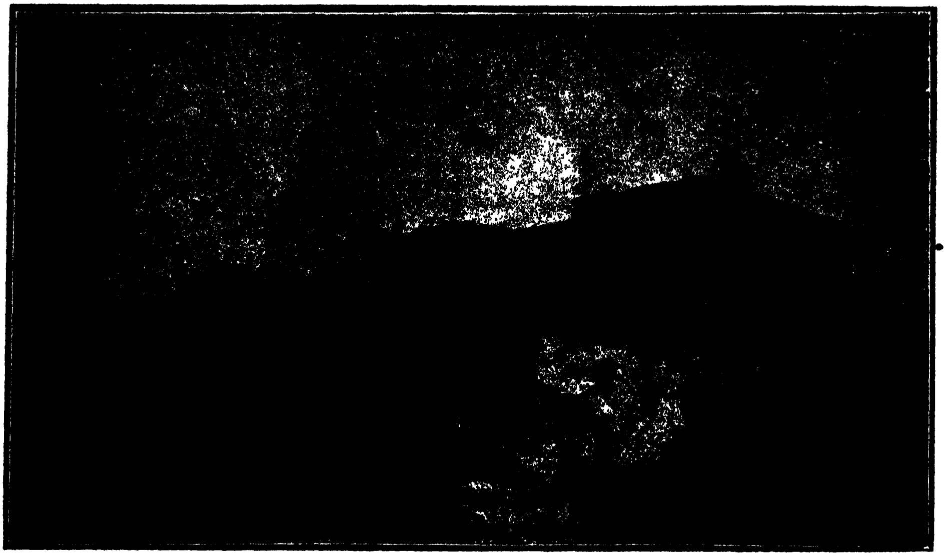
কালীমন্দির—মূলাযোড়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরদের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পার্শ্বেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।



বঙ্কিমবাবুর লিখিবার ঘর—কাঁঠালপাড়া

এই কক্ষে বসিয়াই বঙ্কিমবাবু তাঁহার অমর লেখনী চালনা করিতেন।

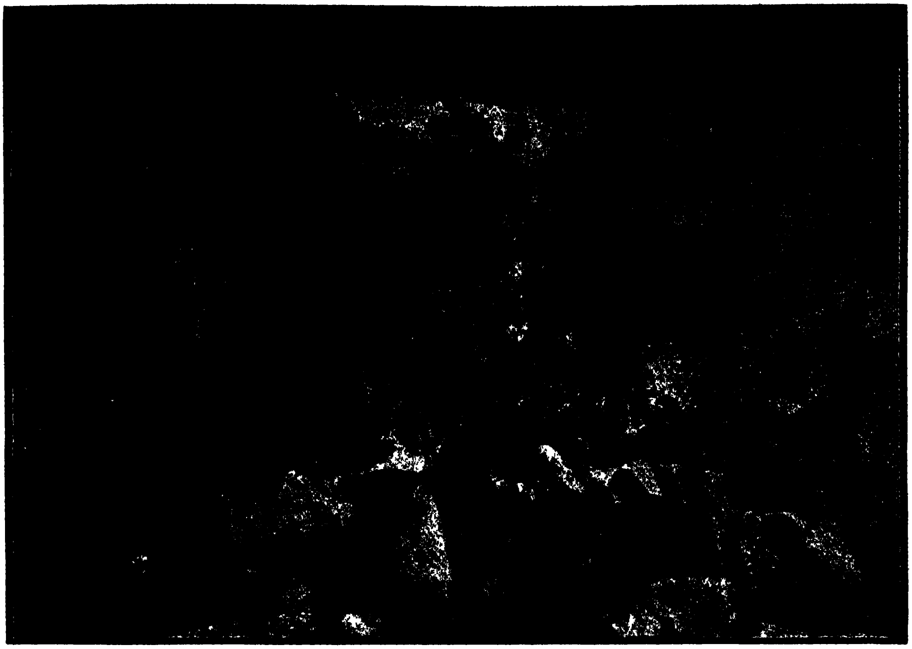


বঙ্কিমবাবুর বাটী—কাঁঠালপাড়া। ইহাই বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাসভবন।



হিমসাগর—ঘোষপাড়া

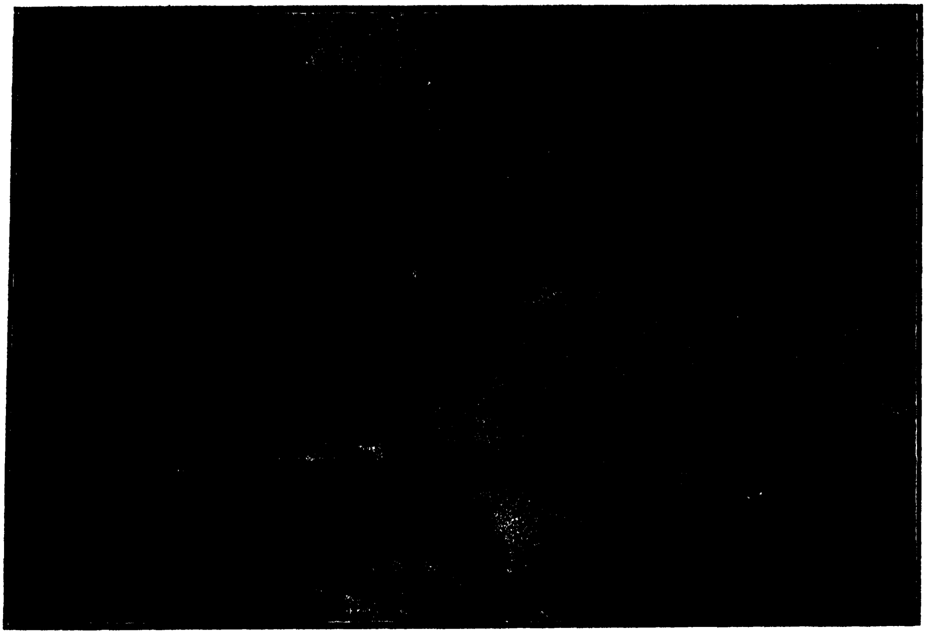
ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত দোল মেলা উপলক্ষে যখন এখানে অনেক জনসমাগম হয়, তখন এই জলাশয়ে বহু লোক স্নান করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস ইহার জলস্পর্শে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।



ডালিম গাছ—ঘোষপাড়া। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পালেদের উদ্যানে এই গাছটি আছে। এই উদ্যানেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী রামশরণ পালের সমাধি আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই দাড়িম্বতলের মৃত্তিকাস্পর্শে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।



আজু গোঁসাইয়ের ভিটা—হালিসহর। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভক্ত বৈষ্ণব আজু গোঁসাইয়ের জন্মস্থান।



চৈতন্য ডোবা—হালিসহর। চৈতন্যদেবের পুণ্য স্মৃতির সহিত ইহা বিজড়িত। বৎসরান্তে এখানে যে মেলা হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে বহু লোক ইহা দর্শন করিয়া যান।

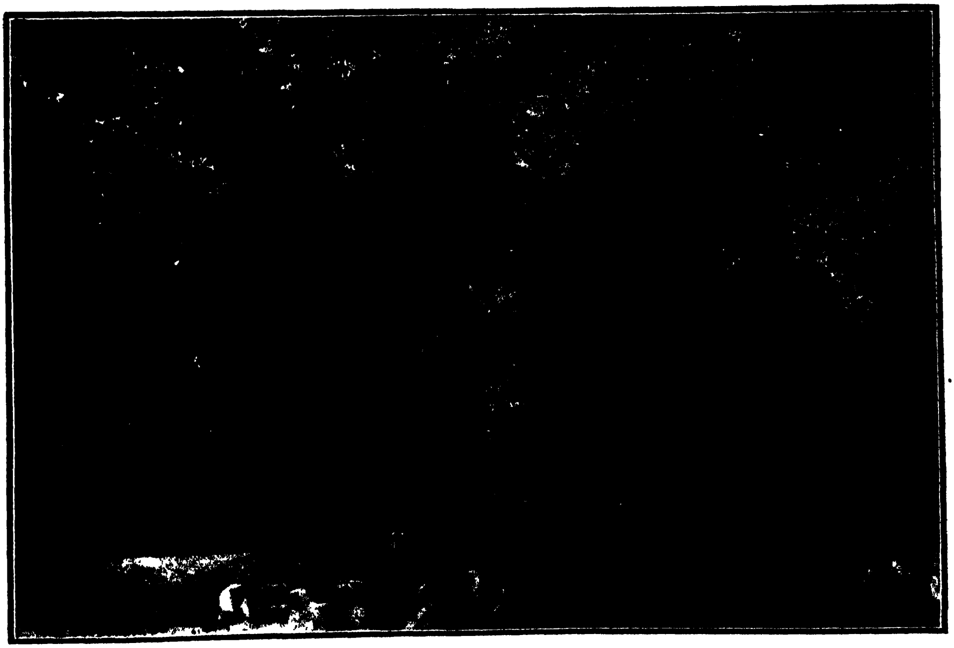


রামপ্রসাদের পঞ্চবটি—হালিসহর

কিছুকম দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সাধক কবি রামপ্রসাদ এই স্থানে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।



কুলেরপাটের মন্দির—কুলেরপাট। এখানে বৎসরান্তে অগ্রহায়ণ মাসের একাদশী তিথিতে দীর্ঘকাল হইতে শ্রীপাট অপরাধভঞ্জনের মহোৎসব ও একটি মেলা বসিয়া থাকে।



দ্বাদশ বকুল—কুলেরপাট। ইহা কুলেরপাটের একটি দ্রষ্টব্য স্থান



গৌর নিতাই ঠাকুর—কুলেরপাট। গ্রামের জাগ্রত দেবতা।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে দেবানন্দ নামে একজন সচ্চরিত্র মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভক্তিতত্ব মানিতেন না। চৈতন্ত মহাপ্রভু যখন কুলিয়ায় বাচস্পতির গৃহে কয়েকদিনের জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন দেশ ভাঙ্গিয়া লোক তাঁহাকে দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছিল; হরিধ্বনিতে গ্রাম পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; জনতা এত বেশী হইয়াছিল যে, বাচস্পতির বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল। এই দেখিয়া দেবানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি এত দিন মহাপ্রভুকে মানেন নাই। এখন তাঁহার কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া কুলিয়ায় আসিলেন। মহাপ্রভু দেবানন্দের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন এবং মধুর স্বরে বলিলেন "দেবানন্দ তোমার সমুদায় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বর দিন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই কুলিয়ায় আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাহারই অপরাধ ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন "তথাস্তু!" এইরূপে কুলিয়ায় অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইল এবং অসংখ্য নরনারী অপরাধ ভঞ্জনের জন্য এই 'কুলেরপাটে' সমাগত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, 'কুলেরপাট' বৈষ্ণবদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীতও অনেকে এই পাটে আগমন করিয়া থাকেন। পাটের যে আয় আছে এবং যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে প্রণামী ও দর্শনী পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা এই পাটের সমস্ত ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

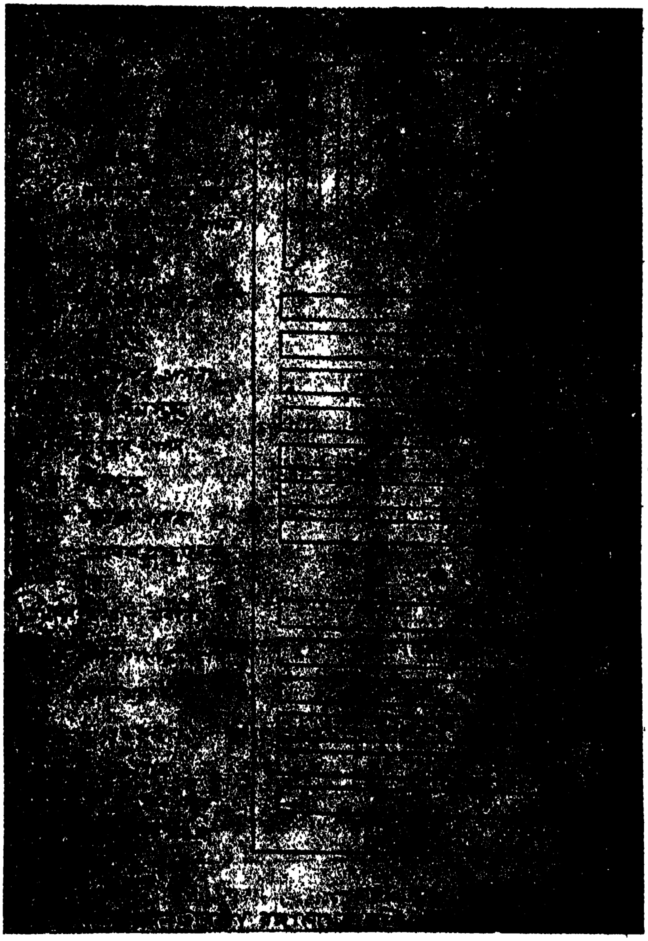
———

* প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা উপলক্ষে গৃহীত ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি।

প্রাচীন ভারতে দৃশ্য-কাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

কেহ কেহ কংসবধাদিকে ধর্ম্মমূলক রূপক-প্রধান (allegorical) দৃশ্যকাব্য বলেন। কৃষ্ণ-হস্তে কংস-নিধন প্রাচীন শস্যোৎসবের পরিমার্জ্জিত রূপক। জরাজীর্ণ কৃষিভাবের প্রতিনিধির বিনাশই ইহার প্রতিপাদ্য। ("the refined version of an older vegetation ritual in which the representative of the outworn spirit of vegetation is destroyed.") বর্ণবিপর্য্যয়ও খুব সম্ভব এইরূপেই হইয়াছে। রক্তমুখ (নবীন) কৃষ্ণানুচর কর্ত্তৃক কৃষ্ণমুখ (জীর্ণ) কংসানুচর বধ—"Slaying of the vegetation Spirit"এর রূপক (১)। মহাব্রতে ইহারই আভাষ পাওয়া যায়। গৌরবর্ণ আর্য্যবংশীয় বৈশ্য (নবীন) কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য শূদ্রের সহিত (প্রাচীন) শ্বেত-গোলাকার চর্ম্মখণ্ড লাভের জন্য (সূর্য্যের জন্য) বিবাদ করিতেছে। শেষে বৈশ্যের জয়। নবীন বর্ষের গ্রীষ্ম পুরাতন শিশিরের সহিত সূর্য্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছে;—গ্রীষ্মের জয় ও সূর্য্যের উদ্ধার—ইহাই রূপকের মূল।



গ্রীষ্ম কর্ত্তৃক শিশির-বিজয়ের রূপক অন্যান্য দেশেও দুর্লভ নহে। Dr. Furnell প্রবর্ত্তিত গ্রীসীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে ইহার অনুরূপ সৌরভ পাওয়া যায়। তবে ইহার ঘটনা ঠিক বিপরীত—শিশির কর্ত্তৃক গ্রীষ্ম-বিজয়। কৃষ্ণবর্ণ Melanthos, কৃষ্ণছাগ-চর্ম্মাবৃত Dionysosএর সাহায্যে গৌরবর্ণ Xanthosএর নিধন-সাধন করিলেন (২)। ইহা হইতেই গ্রীক্ ট্র্যাজিডির উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন "উর্ব্বরোৎসব" প্রভৃতি এখনও Northern Thraceএ প্রচলিত আছে। সে সকল আলোচনার অবসর ইহা নহে। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের সহিত ইহাদিগের মূলতঃ প্রভেদ এই

(১) পরের যুগে এ গূঢ় অভিপ্রায় অজ্ঞাত হইয়া গেলে, লেখকগণ প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া কৃষ্ণভক্তগণকে কৃষ্ণমুখ রূপে ও কংসভক্তগণকে রক্তমুখরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তা'ই এরূপ বিপরীত পাঠ দৃষ্ট হয়।

(২) Apatouria—the festival of deceit.

যে, ভারত নবীনের জয়, গ্রীষ্মের জয়ই দেখাইয়াছেন; পুরাতনের, শিশিরের পরাজয় স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্ত ভারতের দৃশ্যকাব্যে ট্র্যাজিডির একান্ত অভাব। অনেকে ভাসের উৎসৃষ্টিকাঙ্ক "উরুভঙ্গকে" ট্র্যাজিডি বলিয়া থাকেন; কারণ, দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে এ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। ইহা ঠিক নহে। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট এ পরিসমাপ্তি দুঃখময় নহে, সুখজনক। ভরতবাক্য দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং সংস্কৃতে ট্র্যাজিডি নাই বলাই সঙ্গত।

গ্রন্থিকগণের দুইদলে বিভক্ত হইয়া অভিনয় করার সহিত Aristotleএর বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে (৩)।

এ সকল দৈবানুগতিক সাম্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও মহাব্রত মধ্যে ব্রাহ্মণ ও গণিকার পরস্পর গালাগালি করার সহিত বিদূষক ও রাজ্ঞীর পরিচারিকার রসালাপের বেশ তুলনা হইতে পারে। গালাগালিতে পারদর্শী বলিয়াই ব্রাহ্মণের উপাধি বিদূষক হইয়াছিল বোধ হয় (৪)। ইহা হইতেও ধর্ম্মের সহিত দৃশ্যকাব্যের সম্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে।

ধর্ম্মের সহিত নাটকের (ক্রমাগত 'রূপক' ও 'দৃশ্যকাব্যে'র নাম করিতে থাকিলে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। এজন্য সাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে 'নাটক'শব্দের ব্যবহার করিব।) নিকট সম্বন্ধের আরও অনেক প্রমাণ আছে। কৃষ্ণ কর্তৃক কংসাবধাদি যত প্রকার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় "অনুকরণ"-ব্যাপার উৎসবাদিতে প্রদর্শিত হয়, সকলগুলিতেই ধর্ম্মরক্ষক পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট; জন্মাষ্টমী, রাস, দোল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। গীতগোবিন্দের ন্যায় কৃষ্ণ-প্রেমমূলক গীতিকাব্যাদির প্রচলন, বাঙলায় কৃষ্ণযাত্রার সমাদর প্রভৃতি দর্শনে বোধ হয় যে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণোপাসনা রূপকের উৎপত্তি বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অধ্যাপক Levi এই মতের প্রধান পরিপোষক। তাঁহার প্রধান যুক্তি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। শৌরসেনী প্রাকৃতই দৃশ্যকাব্যের চলিত প্রাকৃত। এদিকে শূরসেন শ্রীকৃষ্ণের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ। তাহা ছাড়া কৃষ্ণোপাসনার কেন্দ্রস্থল মথুরায় নিজস্ব দেশী ভাষা ছিল। শৌরসেনী প্রাকৃত (এখনও ব্রজবুলি বা ব্রজভাষা শৌরসেনীর অপভ্রংশ—ঐ অংশে প্রচলিত। কৃষ্ণোপাসনার পুনরভ্যুদয়ের ফল)। মথুরায় যে হোলী উৎসব (৫) এখন প্রচলিত, তাহার সহিত প্রাচীন ইংলণ্ডের May-day উৎসব বা প্রাচীন রোমের phallic orgiesএর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। Growse প্রথম এইরূপ তুলনার সূত্রপাত করেন। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাট্যারম্ভের পূর্ব্বে ইন্দ্রধ্বজ প্রণাম করিবার প্রথার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Maypoleএর সহিত ধ্বজমহের পার্থক্য এই যে, Maypole শীতের শেষের উৎসব, আর ধ্বজমহ শরতের পূর্ব্বের উৎসব। এইরূপ নানাপ্রকার খুঁটিনাটি, ধর্ম্মের সহিত নাটকের সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করে।

কৃষ্ণোপাসনার ন্যায় শিবোপাসনার প্রভাবও বড় অল্প নহে। নাট্যের দুইটি প্রধান অঙ্গ "তাণ্ডব" (পুং-নৃত্য) ও "লাস্য" (স্ত্রী-নৃত্য) শিব ও ভগবতীর আবিষ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহা ছাড়া এক ভাস ছাড়া শূদ্রক, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই মঙ্গলাচরণে শিবের স্তুতি করিয়াছেন। রাম, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার উপাসনার প্রভাবও অল্প-বিস্তর ছিল। প্রাচীনকালে রামায়ণ আবৃত্তির কথার পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখনও কথকতা, রামায়ণগান, রামলীলা, দশেরা প্রভৃতিতে রামোপাসনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর নাট্যশাস্ত্রোক্ত জর্জ্জরোৎসবে ইন্দ্রোপাসনার প্রভাব পরিদৃশ্যমান।

Ridgeway সাহেব কৃষ্ণোপাসনার সহিত দৃশ্যকাব্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীস্ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মৃত মহাপুরুষগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে

(৩) "...place played by dithyramb..." Poetics

(৪) বিদূষক-চরিত্রে মহাব্রতের শূদ্রপ্রভাবও আছে। বিদূষকের বিকট আকৃতি প্রহৃত শূদ্রচরিত্র হইতেই কল্পিত। "Prof. Hillebrandt compares the history of the Harlequin who was originally a representative of the Devil and not a figure of mirth—" S. Drama. P. 39. তবে বিদূষককে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনায় তাঁহার "বাচি বীর্য্যে"র অংশটাই প্রধান ভাবে মহাব্রত হইতে গৃহীত বোধ হয়।

(৫) এই "হোলী"নামটি প্রাচীন না হইলেও উহা প্রাচীনতর বসন্তোৎসবের আধুনিক রূপান্তরমাত্র।

সকল উৎসব প্রাচীন কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি। Norwood, Keith প্রভৃতি এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অন্য দেশের প্রথা যাহাই হউক না কেন, গ্রীসে এরূপ প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না। এই লইয়া বেল্‌ভাল্‌কর ও Ridgeway উভয়ে বেশ মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। বেল্‌ভাল্‌কর প্রথমে (Cal. Rev. May, 1922) Ridgeway'র সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু Ridgeway সাহেব Barnett, James Anderson প্রভৃতির সাহায্যে নানা দেশের মৃত-সৎকার-প্রথার উল্লেখ করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বেল্‌ভাল্‌কর তাহার উত্তর দেন নাই। Ridgeway সাহেব বৈদিক সংবাদসূক্ত বা কৃষ্ণোপাসনার প্রভাব একেবারে অস্বীকার না করিয়া স্বমতের পরিপোষক বলিয়া ধরিয়াছেন। রাম, কৃষ্ণ, শিব (৬) প্রভৃতি সকলেই ইঁহার মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্য। স্বীয় মাহাত্ম্যে দেবতারূপে নরলোকে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। Keith ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, সাধারণ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধভোজী অধিবাসিগণের সহিত রাম-কৃষ্ণাদি দেবগণের পার্থক্য আছে। দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির বহুপূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন (৭)।

Sir J. H. Marshall অনেক গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে রাম ও কৃষ্ণের আখ্যান অবলম্বনে রচিত হরেক রকমের নাট্য অদ্যাপি অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা এরূপ কিছু প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহাদের আত্মার তৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে ঐ সকল অভিনয় সম্পন্ন হয়। তবে মোটের উপর দ্রষ্টব্য এই যে, ইঁহারা কেহই নাট্যের উপর ধর্ম্মপ্রভাব অস্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে হরিবংশের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। (৮)

অন্ধক বধের পর ভানুমতী হরণের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ যাদবদিগের সহিত জলকেলি করিবার জন্য পঞ্চচূড়া, কৌবেরী, মাহেন্দ্রী প্রভৃতি বরাপ্সরোগণকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। যদুরমণীগণও স্ব-স্ব কান্তের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য, গীত ও কেলিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। বলদেব ও রেবতীর সম্মুখে অপ্সরোগণ কৃষ্ণের কংস, প্রলম্ব, শকুনি, ধেনুক ও চাণূর বধ, দামোদর খ্যাতি, ব্রজে নিবাস, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, বৃকসৃষ্টি, কালিয়দমন, হ্রদ হইতে শঙ্খ উত্তোলন, গোবর্দ্ধন ধারণ, কুব্জার কুব্জত্ব দূরীকরণ, বামনরূপ ধারণ, গান্ধাররাজকন্যার বিবাহ সময়ে মহারথ নরপতিগণের সহিত যুদ্ধ, সুভদ্রা হরণে অর্জ্জুনের জয়, মুরদৈত্যনাশ, ইন্দ্রসমীপ হইতে রত্নরাশি অপহরণ—ইত্যাদি নানাবিধ লীলা সঙ্গীত সহযোগে অভিনয় করিয়াছিল। এই অভিনয় দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত বলদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য যদুবীর ও বীরাঙ্গনাগণ আনন্দে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। তাহার পর জলকেলির অধিনায়ক হইলেন দেবর্ষি নারদ। তাঁহার নৃত্য দর্শনে যদুবীর ও রমণীগণ হাস্যে প্রবৃত্ত হইলে তিনিও সত্যভামা, কেশব, পার্থ, সুভদ্রা, বলদেব ও রেবতীর হাস্যকালীন ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন। Keith সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, নারদের এই অভিনয়ের সহিত বিদূষক চরিত্রগত অভিনয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ইহার পর রজনীতে (পাঠকগণ লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না—এ অভিনয় রজনীতে হয় নাই, শুধু পরবর্ত্তী "ছালিক্যগেয়" রাত্রিতে হইয়াছিল।) কৃষ্ণের আজ্ঞায় "ছালিক্যগেয়"র (৯) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নারদ বীণা, কৃষ্ণ স্বয়ং হল্লীশক, অর্জ্জুন মৃদঙ্গ, ও অপ্সরোগণ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় সে কালের কনসার্ট। ইহার প্রাচীন নাম "আসারিত"। টীকাকার বলিতেছেন যে, ভরতমুনি সম্মত চতুর্ব্বিধ

(৬) রাম বা কৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করা চলিলেও শিবের সম্বন্ধে ইহা বলাই চলে না।

(৭) "Rama and Krishna to their worshippers were long before the rise of so late an art as Drama, just like Siva, great Gods—of whom it would be absurd to think as dead men requiring funeral rites to give them pleasure. Nor is it necessary further to criticise his reconstruction of Vedic religion on the basis of his animistic theory, for these issues of origins have no possible relevance to the specific question of the origin of the Indian drama."

—Sanskrit Drama, p. 47.

(৮) হরিবংশ, বিষ্ণু পর্ব্ব ৮৮—৮৯ অধ্যায়।

(৯) মহাকবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে যে "শর্মিষ্ঠা রচিত দুষ্প্রয়োজ্য চতুষ্পাদোত্থ ছলিকে"র নাম করিয়াছেন ইহা কি তাহাই? উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ আসারিতের সহিত চতুষ্পাদ ছলিকের যেন বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ে বিচার করিবেন।

আসারিত। প্রথমে নর্ত্তকী প্রবেশ, পরে আসারিতার্থা-ভিনয় নাট্য. পরে তালের সহিত অঙ্গবিক্ষেপ, ও শেষে দেবতা চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য। সুতরাং প্রথমাংশ শেষ হইবার পর রম্ভা অভিনয় করিলেন। তাহার পর উর্ব্বশী, হেমা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা, পঞ্চচূড়া, কৌবেরী প্রভৃতিও সাধ্যানুসারে নিজ নিজ গুণপণা দেখাইলেন। এই ছালিক্যগেয়ের বর্ণনা নাট্য-শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। ইহা অভিনয়েরই শ্রেণীবিশেষ। তবে এত প্রমাণেও কোন ফল নাই। হরিবংশকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বলিলেই সব যুক্তি ভাসিয়া গেল।

এইবার বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত নাট্যের সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করা যাউক।

থেরগাথা প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি নাটকীয় রীতিতে লিখিত বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু সুত্তগ্রন্থগুলি যে কোন্ যুগের তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। বিসুকদস্সন, নচ্চ. পেক্খা প্রভৃতি শব্দ এই সকল গ্রন্থে ব্যবহৃত হইলেও উহাদিগকে Keith অভিনয়ের অঙ্গ বা দৃশ্যকাব্য সম্পর্কীয় বলিতে চাহেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে ভিক্ষুগণের এইরূপ উৎসবে যোগদান নিষিদ্ধ। এই নিষেধ-বিধি যে পরের যুগে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে, অশ্বঘোষের বৌদ্ধ দৃশ্যকাব্যগুলিই অধুনালভ্য প্রাচীনতম (?) ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের নিদর্শন।

ললিতবিস্তরে গৌতম বুদ্ধের অভিনয়-পারদর্শিতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, বৌদ্ধযুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং বুদ্ধের সময়েও এ দেশে দৃশ্যকাব্যের অস্তিত্ব ছিল; নাগরাজদ্বয়ের সম্মানার্থ বিম্বিসার বুদ্ধের জীবিত সময়েই রূপকাভিনয় সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। দিব্যাবদানেও দৃশ্যকাব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

অবদানশতকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে দৃশ্যকাব্যকে বহু প্রাচীন বলিতে হয়। ক্রকুচ্ছন্দ নামক অতি পুরাতন এক বুদ্ধের আদেশে শোভাবতী নগরীতে একদল অভিনেতার সাহায্যে বুদ্ধের জীবনী অভিনয় করান হয়। কিছুকাল পরে ঐ দলই গৌতম বুদ্ধের তত্ত্বাবধানে রাজগৃহে অভিনয় করে। ঐ সময় কুবলয়ানাম্নী জনৈকা অভিনেত্রী রূপ-যৌবন সাহায্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিতেন। অগত্যা বুদ্ধদেব তাঁহার রূপযৌবন হরণ করিয়া লন, এবং অনুতপ্তা নটী ভিক্ষুণী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ রূপক যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; ইহার মূল প্রমাণ সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক। ললিতবিস্তরের ন্যায় ইহাতে মহাকাব্যের (epic) বৈশিষ্ট্য নাই, পরন্তু নাটকীয় প্রণালীতে ইহা রচিত। অবতাররূপে পরিগণিত বুদ্ধের সহিত ভক্তগণের কথোপকথন লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। সিংহলে জনৈক রাজপুত্র কর্ত্তৃক যূপ প্রতিষ্ঠাকালে নৃত্যগীতাভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। মহাবংশে পাওয়া যায় যে, যূপ প্রতিষ্ঠাকালে অভিনয়-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। অজন্টার প্রস্তরচিত্রে (fresco) নৃত্যগীত ও অঙ্গ-ভঙ্গীর যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়; কিন্তু এ সকল বস্তু Keithএর মতে রূপকের প্রাচীনত্বের পরিপোষক নহে। তিব্বতে ও চীনে মনুষ্যের কু ও সু প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের রূপক অভিনীত হইত বলিয়া সূচনা পাওয়া যায়। এগুলি বাসন্ত ও শারদ উৎসবের অঙ্গীভূত।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কথা—বিনয়পিঠকে বর্ণিত রাজগৃহে মৌদ্গলায়ন ও উপতিষ্যের সম্মুখে রূপ-কাভিনয়। Keith প্রভৃতি অনেকেই এগুলিকে পুরামাত্রার অভিনয় বলিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন। তাঁহাদের মতে, প্রথমতঃ, বিনয়পিঠক খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে; দ্বিতীয়তঃ এতক্ষণ যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল, সকলগুলিই pantomimic artএর পরিচায়ক। বিনয়-পিঠকের বর্ণনাকে তাঁহারা জনশ্রুতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। Pischel সাহেবও ইহা জনশ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তবে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান না। আমাদের বোধ হয় এ সকল উক্তির মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। প্রাচীন বৌদ্ধনাটকাদিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা হইতেই অশ্বঘোষ নিজ রূপকের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন (১০)।

(১০) সম্প্রতি দক্ষিণভারতী সিরিস্ মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্নাগের কুন্দমালা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অনেক পরের—খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। তাহার উপর ইহা মোটেই আসল কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বৌদ্ধসাহিত্যের ন্যায় জৈনসাহিত্যের প্রমাণ লইয়াও অনেক গোলমাল। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে অভিনয়, নৃত্য, গীত প্রভৃতি চারুকলার নিন্দা দৃষ্ট হয়; অথচ এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সময় নিরূপণ করা দুরূহ। প্রাচীন জৈন রূপকের অস্তিত্ব অদ্যাবধি প্রমাণিত হয় নাই। এখন যেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—সব মধ্যযুগের রচনা।

এই সকল দিক্ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ধর্ম্মই ভারতীয় প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের জনক (১১)। শুধু ভারতের কেন গ্রীস্, মেক্সিকো, ইয়োরোপ, চীন প্রভৃতি সকল সভ্যদেশের সম্বন্ধেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। মহব্রতাদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান, কংস-বধাদির বর্ণনা প্রভৃতি দর্শনে স্পষ্টই বোধ হয় যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বেই ভারতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি ও প্রসার হইয়াছিল।

প্রবন্ধের প্রথমাংশ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে যে দৃশ্যকাব্য রচিত হইত তাহার ভাষা কি ছিল—সংস্কৃত, প্রাকৃত না উভয়ের মিশ্রণ? নাট্যশাস্ত্রের বর্ণনানুসারে রূপকের দুইটি অংশ—উন্নত কাব্যাংশ (epic) ও লৌকিকাংশ (popular)। সুতরাং কাব্যাংশ সংস্কৃতে ও লৌকিকাংশ প্রাকৃতে (শৌরসেনীই আবার তখনকার মূল প্রাকৃত—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) রচিত হইত এরূপ অনুমানে দোষ কি? Levi-র সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষা লৌকিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত না; সুতরাং রূপকের প্রথম প্রথম রচনা প্রাকৃত ভাষাতেই করা হইত। পরে সংস্কৃতের পুনরভ্যুদয়ের ফলে নাটকাদি মধ্যে সংস্কৃত স্থান পাইয়াছে। তাঁহার যুক্তি এইরূপ:—

(১) নাট্যশাস্ত্রের অনেক শব্দ (অবশ্য দৃশ্যকাব্য-সম্পর্কীয়) মূর্দ্ধণ্য. ধ্বনি বিশিষ্ট—ইহা প্রাকৃত উদ্ভবের পরিচায়ক।

(২) কেবল প্রাকৃতে রচিত দৃশ্যকাব্য (সট্টক) এখনও পাওয়া যায়—যেমন, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী। কিন্তু কেবল সংস্কৃতে রচিত রূপক দৃষ্টিগোচর হয় না; এরূপ রচনার বিধিও নাই। (১২)

অধ্যাপক মহাশয় কৃষ্ণোপাসনার সহিত রূপকোৎপত্তির সম্বন্ধ স্বীকার করেন; রূপকের 'লৌকিক উৎপত্তি' (Secular Origin) রূপ মতবাদ তাঁহার মতবিরুদ্ধ। ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত রূপকের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলেই ধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা সংস্কৃতের সহিত উহার সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত ও প্রাকৃত এ উভয়েরই সাহায্যে রূপকের উৎপত্তি, ইহা মানিয়া লওয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। (ক্রমশঃ)

(১১) আশা করি সম্প্রদায় বিশেষ ইহাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। অভিনয় দেখা যাঁহারা সুরুচিসঙ্গত মনে করেন না, তাঁহারা এই খানেই প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিবেন।—লেখক

(১২) ইহাও ঠিক নহে; ভাসের "দূতবাক্য" ব্যায়োগে প্রাকৃতের গন্ধমাত্রও নাই।

মরু-মরীচিকা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মালকোষ রাগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। খাঁ সাহেব বল্লেন—এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

শিষ্যবৃন্দ উৎসুক হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সেটা কি রকম?

খাঁ সাহেব বলতে লাগলেন—মর্ত্তের দরবারের জন্য মিয়া যেমন দরবারী রাগের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি স্বর্গের দরবারের জন্য সুরুন্দ্তীজী মালকোষের সৃষ্টি করেন। এই রাগ বাজালে স্বর্গবাসী আত্মাদের মর্ত্তের কথা মনে পড়ে যায়। নারদজী এই রাগ ধরাধামে প্রচার করেন।

তবলার ওপরে ডুগিটা উল্টে রেখে দর্শন সিং বল্লে—খাঁ সাহেব, ঐ যে বল্লেন মালকোষের ওপরে জিনের আসক্তি——এটা একেবারে নির্য্যস সত্যিকথা।

উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের আবার প্রশ্ন—সেটা আবার কি রকম?

তা হোলে বলি শোন—সে এক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে গয়া শহরে এই কাণ্ড। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, শহর একেবারে নিশুতি। ঢেঁড়িজীর বাড়ীতে জল্‌সা হচ্ছে, তিনি নিজে এস্‌রাজ্‌ ধরেছেন। মালকোষ আলাপ চলেছে, আসর খুব জমে উঠেছে—এমন সময় দেখলুম যে, আসরের এক পাশে আমাদের কিষণ দাস লণ্ঠন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবধি বলে ঠাকুর চোখ দুটো বুজিয়ে স্থির হোয়ে রইল। সিদ্ধির ঝোঁকে মধ্যে-মধ্যে কথার খেই হারিয়ে সে ঐ রকম স্থির হোয়ে বসে থাক্‌ত। তার অবস্থা দেখে আমরা বলে উঠলুম—হাঁ ঠাকুর,—কিষণদাস—

দর্শন সিং তার ভাঙা গলায় গর্জ্জে উঠল—হাঁ খাঁ সাহেব কিষণদাস—আরে রাম রাম—কিষণদাস দু-বছর আগে মারা গিয়েছে, সেই কিষণদাস এসে—ঠিক আগে যে রকম আস্‌ত—সেইভাবে লণ্ঠনটী নিভিয়ে দিয়ে তার নির্দ্দিষ্ট পেরেকটীতে ঝুলিয়ে একেবারে আমার গা-টী ঘেঁষে চেপে বস্‌ল। খাঁ সাহেব, আমার তো হাত-পা ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাঁপতে সুরু করলে। কি বল্‌ব, ঢেঁড়িজী আলাপ করছিলেন, গৎ তোড়া বাজালে আমাকে সেদিন ডাহা বেইজ্জৎ হোতে হোতো।

আবার মিনিটখানেক দম্‌ নিয়ে ঠাকুর সুরু করলে—ঢেঁড়িজীর আলাপ শেষ হোয়ে গেলে পাশ ফিরে দেখি, কিষণদাস গায়েব। মুখ তুলে পেরেকের দিকে চেয়ে দেখি লণ্ঠনও গায়েব।

হয়ত মনের ভুলে কি দেখতে কি দেখেছি মনে কোরে কথাটা আর কারুকে বল্লুম না। জল্‌সা ভেঙে যাবার পর বাড়ী চল্লুম। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, দলে দলে তাঁরা দু-পাশের বাড়ীর ছাতে বসে আছেন। পা-গুলো ঝুলিয়ে দিয়েছেন একেবারে রাস্তায় এসে ঠেকেছে।

ঠাকুরের গল্প শুনে শিষ্যবৃন্দ উৎসাহিত হোয়ে উঠল। তারা আশা করছিল, এর পর খাঁ সাহেব যা বল্‌বেন সেটা একটা শোনবার মতন জিনিষ হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরেও খাঁ সাহেবের দিক থেকে কোনো জবাবই এল না। সেদিন তাঁর মেজাজটা ভাল নেই স্থির কোরে আমরা যে যার বাড়ী চলে গেলুম।

এর কয়েক বছর পরের কথা। পুষ্কর তীর্থ থেকে ফেরবার পথে আজমীঢ়ে উরস্‌ পর্ব্ব দেখতে গিয়েছিলুম। বিখ্যাত মুসলমান সাধু মৈহুদ্দিন চিস্তির যে সমাধি সেখানে আছে, সেইখানে তাঁর মৃত্যুদিনে সাতদিন দিন-রাত্রি শ্রাদ্ধোৎসব হয়। উরস্‌ পর্ব্ব এখন কি কোরে সম্পন্ন হয় বলতে পারি না, যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন মুসলমানদের সঙ্গীতাতঙ্ক রোগটা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়ায়-নি। সাধুর শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের আনাচে-কানাচে বসে অনেক পণ্ডিত মিলে তখন গান-বাজনারও শ্রাদ্ধ করতেন। এইখানে, মসজিদের ভেতরে রোগী সুস্থ, রাজা ফকির, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি নানা রকমের মানুষ-খিচুড়ীর মধ্যে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল।

খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—আরে তুমি এখানে?

বল্লুম—পুষ্করে গিয়েছিলুম, মনে করলুম উরস্‌টাও দেখে যাই। এজন্মে হিন্দুমতে যত পাপ সঞ্চয় করা গেছে তাতে স্বর্গনাশ আমার কেউ মারতে পারবে না। এই সঙ্গে বেহেস্তে যাবারও যদি একখানা পাশ জোগাড় করতে পারি তো মন্দ কি?

খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যকে ভালো কোরেই চিনতেন। আমার পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে বল্লেন—বেশ করেছ বেটা। দেখ এখানে হিন্দু-মুসলমান সমানে পূজো দিচ্ছে। এ দৃশ্য না দেখলে একটা ক্ষোভ থাকৃত।

জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি এখানে?

খাঁ সাহেব বল্লেন যে, এখানে এক মেবারী সর্দ্দারের ছেলে তাঁর কাছে বাজনা শিখছে। তাঁকে উদয়পুরেই থাকতে হয়। সম্প্রতি তারা এখানে তাদের বাগান-বাড়ীতে এসে বাস করছে। এই শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে তাদের বাড়ী।

কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বিকেলবেলা বাক্স-পত্র গুচোচ্ছি, এমন সময় আমাদের হোটেলের সামনে প্রকাণ্ড এক জুড়ি-গাড়ী এসে দাঁড়াল। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে, খাঁ সাহেবের ভাতিজা গাড়ীর মধ্যে এমন জাঁকিয়ে বসে আছে যে, দেখলেই মনে হয় গাড়ী-ঘোড়ার মালিক সে নয়।

আমি ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি! চলেছ কোথায়?

আমাকে দেখেই সে গাড়ী থেকে নেমে একেবারে আমার

ঘরে এসে বল্লে—তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। সর্দ্দারজী আর খাঁ সাহেব তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, আজ ওখানে ভারি জলসা আছে।

আমি বল্লুম—সেকি! আজ রাত্রি ছটোর গাড়ীতে আমি যে আবু যাব, টিকিট কেনা পর্য্যন্ত হোয়ে গিয়েছে।

সে বল্লে—তার আগে তোমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। তোমায় না নিয়ে গেলে দুজনেই আমার ওপরে নারাজ হবেন।

অগত্যা বেরুতে হোলো। দু-ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা ছুটে অশ্বিনীতনয়-যুগল আমাদের ঠিকানায় পৌছে দিলে।

সর্দ্দারের বাড়ীতে যখন পৌছলুম তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। আসরে বাজনা সুরু হয়েছে। সেখানে যেতেই খাঁ সাহেব সর্দ্দারজীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। উভয়পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ আপ্যায়ন চলবার পর আসরে আসন নেওয়া গেল।

কয়েকজন স্থানীয় ওস্তাদের বাজনা হোয়ে যাবার পর খাঁ সাহেব স্বরোদ নিয়ে বসলেন। স্বরোদের তারে একবার মৃদু আঘাত দিতেই কোন্ থেকে একজন ফরমাশ করলেন—খাঁ সাহেব মালকোষ।

খাঁ সাহেব তার বেঁধে মালকোষ আলাপ সুরু করলেন।

আলাপ চলেছে। আসরে সকলেই সমজদার, বাজে লোক নেই। একটু কাশির শব্দ পর্য্যন্ত হচ্ছে না। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে। এক মনে শুনতে শুনতে আমার মনও সুরের স্রোতে ভেসে চলেছে,—হঠাৎ কে যেন কাণে-কাণে বল্লে—এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। বহুদিনবিস্মৃত আর এক রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়্‌ল দর্শন সিং ও তার গয়ার অভিজ্ঞতার কথা, আর তারি সঙ্গে মনে পড়্‌ল যে দর্শন সিং আজ আর ইহজগতে নেই।

শরীর ও মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হোতে লাগল। খাঁ সাহেব ততক্ষণে বিলম্বিত লয় শেষ কোরে মধ্য লয়ে বাজাতে সুরু করেছেন। মালকোষ রাগের গম্ভীর করুণ সুর চোখের সামনে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। সুরের সুরায় মাতাল মন আমার একেবারে স্বর্গের দরবারে গিয়ে হাজির। দেখতে লাগলুম যেন দেবী সরস্বতী মাঝখানে বসেছেন, তাঁর বীণা মোহন অঙ্গুলির আঘাতে শাপভ্রষ্ট বিরহী যক্ষের মত মালকোষের সুরে গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠছে। সুরপ্রিয় একধারে চক্ষু মুদে বসে আছেন, সুরায় তাঁর আজ রুচি নাই, ভৃঙ্গার আসরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পরলোক-প্রবাসী আত্মার দল চঞ্চল হোয়ে উঠেছে। মালকোষ যেন ইহ-লোকের সন্দেশহর, তাকে দেখে এই ধরণীর সুখ-দুঃখ আশা উৎসাহ বিরহ-মিলন যা-কিছু তাদের কাছ থেকে জোর কোরে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে ফিরে যাবার জন্য তারা উতলা হোয়ে উঠেছে।

মুখ তুলে একবার চারিদিকে চাইলুম। দেখলুম অধিকাংশ লোকই চোখ বুজিয়ে, বাকী যারা তাদের চক্ষুও অর্দ্ধ-নিমীলিত। দূরে দেওয়ালে একটা বড় লণ্ঠন ঝুলছিল, সেটাও যেন নেশায় ঘোলাটে হোয়ে উঠেছে।

মনকে একবার জোর কোরে নাড়া দিয়ে চাঙ্গা হোয়ে বসতে না বসতে আবার শুনতে পেলুম—কেয়া বুঢ়া বাবু মেজাজ শরীফ্।

পাশ ফিরে দেখি—আরে! ছ-ফুট তিন ইঞ্চি দর্শন সিং দাঁড়িয়ে।

পোড়া অদৃষ্টকেও বলিহারি! কোথায় উর্ব্বশী মেনকা এসে আসরে নৃত্য সুরু করবে, তা নয় আমার বরাতে এল কিনা—আরে ছ্যাঃ—!

চুপ কোরে আছি দেখে ঠাকুর বল্লে—ভয় নেই, আমি বেশীক্ষণ থাকব না।

এই বলে সে আমার পাশে বসে পড়্‌ল। আসরের আর কেউ ঠাকুরকে দেখেছে কিনা জানবার জন্য চারদিকে দেখতে লাগলুম। খাঁ সাহেব তখন মাথা গোঁজ্ কোরে দ্রুত লয়ে বাজিয়ে চলেছেন। যারা এতক্ষণ চোখ বন্ধ কোরে শুনছিল এবার তারা বিস্ফারিত নয়নে তাঁর আঙুল চালাবার কায়দা দেখছে। সবার চোখ তাঁর দিকে, এ দিকে আমার যে কি অবস্থা তা দেখবার অবসর কারুরই নেই।

মালকোষ শেষ হোতে প্রায় দশটা বাজ্‌ল। পাশ ফিরে দেখি দর্শন সিং উধাও। আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকা সুবিধের নয় এই ভেবে খাঁ সাহেবকে বল্লুম—এবার আমার যাবার ব্যবস্থা কোরে দিন। আজ রাতেই আমাকে রওনা হোতে হবে।

খাঁ সাহেব সর্দ্দারজীকে বলতেই তিনি ব্যস্ত হোয়ে গাড়ী আনতে হুকুম দিলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পরে লোক এসে

সংবাদ দিলে যে দুটি গাড়ীই ঠাকুরাণীদের নিয়ে শহরে গিয়েছে। অন্য সব ঘোড়াই বেদম্। একমাত্র গুল্‌কন্দ ছাড়া আর কেউ সোয়ারী দিতে পারবে না।

লোকটীর কথা শেষ হোতে না হোতে খাঁ সাহেব বলে উঠ্‌লেন—হাঁ হাঁ ঘোড়া হোলেই চল্‌বে। ভাল কোরে জিন চড়িয়ে দাও।

ঘোড়ায় চড়বার কথা শুনে তো একেবারে দমে গেলুম। এর চেয়ে যে সারারাত্রি জিনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি কোরে বসে থাকতে রাজি আছি! আমার মতন লোকের এই পনেরো মাইল রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে হোলে ঘোড়া কিংবা সওয়ার কারুরই যে উদ্দেশ মিল্‌বে না—সে কথাটা এখন এদের বোঝাই কি কোরে! একবার ভাবলুম এখানে থেকেই যাই, টিকিটের দামটা না হয় যাবে। পাঁচটা টাকার জন্য কি বেঘোরে প্রাণটা দেব।

মনের অশান্তি বোধহয় মুখে ফুটে উঠেছিল। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সর্দ্দারজী খাঁ সাহেবকে কি বল্লেন। তাঁর কথা শুনে খাঁ সাহেব বলে উঠলেন—আরে না না, সেজন্য আপনি কিছু মনে করবেন না। ও বিশ-পঁচিশ মাইল ঘোড়ার পিঠে যাওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।

মিথ্যা কথা বলা অন্যায় এই ব্যবস্থা সমাজকে যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা সত্যিই পণ্ডিত লোক। মনে পড়্‌ল কলকাতায় থাকতে খাঁ সাহেবের আড্ডায় বসে বড় বড় ঘোড় সওয়ারের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী একটু অদল-বদল কোরে বেমালুম নিজের বলে চালিয়েছি—এখন উপায় কি করি?

তবুও একবার খাঁ সাহেবকে বলা গেল—ওস্তাদ, আমি তো আজ রাত্তেই চলে যাব, ঘোড়ার কি হবে, কোথায় থাকবে?

খাঁ সাহেব বল্লেন—ঘোড়া হোটেলের আস্তাবলে থাকবে। শহরে আমাদের লোক রোজই যাচ্ছে, কাল গিয়ে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

কথাবার্ত্তা চল্‌ছে এমন সময় ঘোড়া এসে হাজির হোলো। শাদা কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া, তার ওপরে দেশী জিন চড়ান, ঠিক যেন একখানি রাজপুত চিত্র।

সর্দ্দারজী বলে দিলেন—ঘোড়াটার মুখ কড়া আছে।

ভাবলুম—আর কড়া আছে। আল্‌গা থাকলেই বা কি সুবিধা হবে আমার!

বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না কোরে গুল্‌কন্দের পিঠে সওয়ার হওয়া গেল। ডান পায়ের রেকাব লাগাতে না লাগাতে আরবী ঘোড়ার বংশধর চার পা তুলে ছুট্ দিলে। সর্দ্দারজীকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য একটা ধন্যবাদ দেবার অবসরও পেলুম না।

ছুটতে ছুটতে একটা তেমাথার কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে ফেল্লুম। কোন্ রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল কিছুতেই তা ঠিক কর্‌তে পারলুম না। রাস্তায় আলো নেই, লোকজনও নেই যে পথ জিজ্ঞাসা কোরে অগ্রসর হব। অনেক গবেষণা কোরে শেষে ডান দিকের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলুম।

গুল্‌কন্দ আবার ছুট্ দিলে। একে অনভ্যাস তার ওপরে সেই গদীওয়ালা দেশী জিন। কখনো ডাইনে কখনো বা বামে হেলে কোনো রকমে বসে আছি। একটু যে আস্তে চলে জিরিয়ে নেব তারও উপায় নেই। রাজপুতানার ঘোড়া আবার দুল্‌কী চাল জানে না। যেতে বল্লেই চার পা তুলে ছোটে আর রাশ টানলেই দাঁড়িয়ে যায়। পথ যে চিনে চল্‌ব তারও উপায় নেই, কারণ ঘোড়ায় চড়ার দিকেই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয়েছে।

ওদিকে আনাড়ি সওয়ার পিঠে নিয়ে গুল্‌কন্দেরও দম্ প্রায় বেরিয়ে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার ও তার দুজনেরই প্রায় সমান অবস্থা!

ঠিক পথে চলেছি কিনা তা জানবার জন্য এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারে পথ কিছুতেই চিনতে পারলুম না, মনে হোতে লাগ্‌ল যেন ভুল পথেই এগিয়ে চলেছি। ঘড়িতে দেখলুম একটা বেজে গিয়েছে। ভেবে দেখা গেল যে পথেই আসি না কেন আজ রাত্রে আজমীড় ত্যাগ করা অসম্ভব। আমি ঘোড়ার মুখ ধরে পথের ধারে এক গাছ তলায় টেনে নিয়ে গিয়ে, গাছের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে তার পিঠ থেকে গদি নামিয়ে তাই মাথায় দিয়ে বালির ওপরে শুয়ে পড়লুম।

মালকোষের প্রভাব তখনো কাটেনি। জলের মধ্যে ছুঁচোবাজি যেমন ঘুরে বেড়ায় খাঁ সাহেবের হাতের এক একটা গমক আমার মগজের মধ্যে তেমনি চোঁ চাঁ কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। শ্রান্তিতে হাত পা এলিয়ে এসেছিল, তার ওপরে নৈশ শীতল বায়ু লেগে ক্লোরোফর্ম্মের নেশার প্রথম

অবস্থার মতন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদ শরীরকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন কোরে ফেলতে লাগ্‌ল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানতে পারি-নি। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ চেয়েই দেখি কতকগুলো লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আর একটা ষণ্ডা মতন লোক অতি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বাংলা থিয়েটারের ভীমের মতন তার গালপাট্টা আর গোঁফ, দেহটা কিন্তু ভীমের চেহারার চারগুণ।

শুনলুম ভীমমুখো অন্য একজনকে বল্লে—নিশ্চয় সেই, এতে আর কোনো ভুল নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে বলে উঠ্‌ল—তবে আর কেন—লাগাও।

ধড়মড় কোরে উঠে একবার ভালো কোরে চারদিক চেয়ে দেখি যে, একব্যক্তি একটা লণ্ঠন আমার মুখের কাছে ধরেছে আর তিনচার জন লোক আমার দিকে চেয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হোলো না। দু-হাতে বেশ কোরে চোখ রগড়ে আবার দেখলুম—যথাপূর্ব্বং।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বল্লে—এই ওঠ্।

ব্যাপার কি? কারা এরা! এত ক্রোধেরই বা কারণ কি কিছুই বুঝতে পারলুম না। একবার মনে হোলো মাল-কোষের ঝোঁক কি এখনো কাটে-নি! এরা কি জিন না ডাকাত?

রাজপুতানায় ঘুরে ঘুরে যে কটি ঝাড়সাই বুলি শেখা গিয়েছিল তাই একরকম জোড়াতাড়া দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ কোরে বল্লুম—কে তোমরা? কি চাও?

ভীমরূপী লোকটা এক বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে বল্লে—চোপ্ রাও।

ভীমের পাশেই একটা রোগা মতন লোক দাঁড়িয়েছিল। এই ব্যক্তি এতক্ষণ কোনো কথা বলে-নি। ভীমের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সে কোমর থেকে সাঁই কোরে একখানা ছোরা টেনে নিয়ে তার বেদানার মতন তোবড়ান মুখ আরও বিকৃত কোরে বল্লে—বিনা বাক্যব্যয়ে এখান থেকে উঠে আমাদের সঙ্গে চল। আর একটি কথা বলেছ কি এই ছুরি বুকে বসিয়ে দেব।

বিনা বাক্যব্যয়েই উঠে দাঁড়ালুম। উঃ মালকোষে কি এতদূর পর্য্যন্ত হয়! কি করতে চায় এরা আমাকে নিয়ে! কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

কি একটা কথা তাদের জিজ্ঞাসা করব বলে ভাবছিলুম, এমন সময় একটা লোক আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে—আবার দাঁড়ালি যে?

—চল, কিন্তু আমার ঘোড়া—

ভীম একজনকে হুকুম দিলে এই, ঘোড়াটাকে নিয়ে এস।

চার পাঁচ জন প্রহরী পরিবেষ্টিত হোয়ে চলতে লাগলুম। কি যে হচ্ছে কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। বিপদে পড়লুম না এটা সৌভাগ্যেরই সূচনা হোলো তাও ধরতে পারছিলুম না। ও দিকে আমার প্রহরীদের মুখে গালা-গালির তুবড়ী ছুটেছে। মাঝে মাঝে পেছন থেকে আচম্‌কা এক আধটা গুঁতো, গোঁজা, ধাক্কা এতো চলেইছে।

প্রায় আধঘণ্টা এইভাবে চলবার পর তারা আমায় একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল। ভীম বল্লে—একেবারে ভেতরে নিয়ে চল, এখানে নয়।

তার কথা শুনে অন্য লোকগুলো আমায় ঠেলতে ঠেলতে দোতলার একখানা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। ঘর ও সেখানকার আসবাব-পত্র দেখলে মনে হয় যে বাড়ী যাদের তারা ধনী ও সৌখিন লোক। ঘরখানা ভালো কোরে দেখছি এমন সময় ভীম একটা চাবুক হাতে সেখানে এসে উপস্থিত হোলো।

চাবুকটা একবার শট্ কোরে আওয়াজ কোরে ভীম বল্লে—আজ তোমার শেষ দিন।

ভয়ে আমার কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। উঃ মালকোষের কী ভীষণ পরিণাম! এখন কি করি? কি কোরে এই সব দৈত্যদানাদের হাত থেকে উদ্ধার পাই! মনের মধ্যে একটা আশা হচ্ছিল যে কোনো রকমে রাতটা কাটাতে পারলে হয়। খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছিলুম যে দিনের আলোতে জিনের দেহ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। নানা রকম ভাবনায় মগজের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে সুরু হোলো। ভীমের কথার কি উত্তর দেব তাই ভাবছি, এমন সময় সেই বেদানামুখো লোকটা বল্লে—তোমার এ রকম ব্যবহারের কারণ কি?

এটা যে আমারই প্রশ্ন সে কথা এদের এখন বোঝাই কি কোরে? চুপ কোরে রইলুম।

এক ব্যক্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে আমার একটা লাথি মেরে বল্লে—আবার কথা কওয়া হচ্ছে না, মৌনী হয়েছেন।

আমি বল্লুম—কি কথা বল্‌ব? তোমাদের কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

ধাঁ কোরে গালে একটা চড় এসে পড়্‌ল। চড়্‌টা এত অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়্‌ল যে, কে যে সেটা মারলে তা বুঝতেই পারলুম না।

ভীম বলতে লাগল—অকৃতজ্ঞ! খেতে পেতিস না, আমার বাবা তোকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলে—তার মেয়েকে বিয়ে কোরে শেষকালে এই ব্যবহার!

বলতে বলতে ভীম উত্তেজিত হোয়ে চাবুকের বাঁট দিয়ে পায়ের গাঁটে ঠকাং কোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

আমি বল্লুম—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমরা নিশ্চয় ভুল করেছ, আমি সে ব্যক্তি নই।

—বদমাইস, মাথার চুল অন্য রকম কোরে ছেঁটেছ বলে মনে করেছ আমাদের চোখে ধূলো দেবে! তা পারবে না, আজ তোমাকে খুন কোরে এইখানে পুঁতে রাখ্‌ব।

আবার একটি চড়।

—পাজি, স্ত্রীকে এখানে ফেলে তুমি চারিদিকে মজা কোরে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে চোখের জলে তার দিন কাটছে। কোথায় ছিলি এতদিন বল্ শীগগীর?

আবার একটি বিষম গোঁজা।

উঃ! মনে হোলো এই অনাহূত কিল-চড়গুলো বাদ দিলে মোটের ওপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে মন্দ নয়। জিনদের রসিকতার মধ্যে দেখছি বেশ মৌলিকতা আছে।

—ওদিকে তুমি মজা কোরে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে তোমাকে ধরবার জন্য আমরা এই তিন চার বছরে প্রায় লাখ টাকা খরচ করেছি।

হায়! হায়! বলে কি এরা! আমার জন্য এক জায়গায় লক্ষ টাকা খরচ হোয়ে গেল, আর আমি কিনা খাতা বগলে নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দিলুম। দুরদৃষ্ট আর কাকে বলে?

চাবুকের বাঁট দিয়ে ভীম আর একটা খোঁচা দিয়ে বল্লে—এখন তোমার মতলোব কি বল? মনে রেখো আজ একটা হেস্ত নেস্ত হোয়ে যাবে!

মনটা তখনো মুগ্ধ ভ্রমরের মতন ঐ খরচ হোয়ে যাওয়া লাখটাকার চারপাশে ঘুরছিল। ভীম আর একটা খোঁচা দিয়ে আমায় সজাগ কোরে জিজ্ঞাসা করলে—চুপ্ কোরে থাকলে একেবারে জন্মের মত চুপ করিয়ে দেব বল্‌ছি। মতলোবখানা কি খুলে বল।

বল্লুম—মতলোব আর কি। আমার জন্য যদি আর কিছু খরচ করবার ইচ্ছা তোমাদের থাকে তো সেটা আমাকে নগদ ধরে দাও।

কাচের ওপরে পাথর ঘষ্‌লে যেমন শব্দ হয় ঠিক সেই রকম কঁ্যাককঁ্যাকে স্বরে কানের পাশে একজন ধমকে উঠ্‌ল—আবার রসিকতা হচ্ছে?

বল্লুম—সম্পর্কটা তো সেই রকমই সাব্যস্ত করবার চেষ্টা চলেছে বাপু।

—'চোপরও' বলে সেই কঁ্যাককঁ্যাকে লোকটা আমার বাঁ গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। এক চড়ে সর্ব্বাঙ্গ চিড়-বিড়িয়ে উঠ্‌ল। বুঝতে পারা গেল যে, আগেকার সেই চড়টি এই ব্যক্তির কাছ থেকেই এসেছিল। আর তো সহ্য হয় না! আর এ তো ঠিক জিনের ব্যাপার বলেও মনে হচ্ছে না। একজন বলে চুপ কোরে থাকলে একেবারে চুপ করিয়ে দেব, আর একজন কথা কইলে চড় হাঁকড়ায়। কথা বলা আর চুপ কোরে থাকার মাঝামাঝি কি হোতে পারে তাড়াতাড়িতে তাও ঠিক কোরে উঠতে পারলুম না। এদিকে মার খেতে খেতে বেদম্ হোয়ে পড়লুম। ঠিক করলুম, এবার যে মারবে তাকেই মারব। বসে বসে কাঁহাতক গালাগালি আর চোরের মার হজম করা যায়।

চুপ কোরে আছি দেখে ভীম আবার জিজ্ঞাসা কল্লে—এখন আমার মতলোব কি? এখানে ভদ্রভাবে থাকবে না যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব?

আমি বল্লুম—তা হোলে আমায় দিন কতক সময় দাও। ঘরে ব্রাহ্মণী আছেন তাঁর সঙ্গে পাকা রকমের একটা কাটান ছিটেন কোরে আসি। কথাটা তারা বোধ হয় বুঝতে পারলে না। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কি কি বল্লে?

আবার বল্লুম—দেশে স্ত্রী রয়েছে তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা কোরে আসতে হবে তো?

ভীম বল্‌তে লাগ্‌ল—আবার যে বিয়ে করেছ সে কথা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। এর মধ্যে নিশ্চয় অন্য স্ত্রীলোক আছে নইলে হঠাৎ তুমি তোমার ধর্ম্মপত্নীকে ফেলে পালাবেই বা কেন? পাষণ্ড!

ক্যাঁকক্যাঁকে লোকটা বল্লে—তবে আর ওর ওপরে মায়া কিসের? লাগাও।

ও বাবা! এতক্ষণ এঁরা তা হোলে আমার প্রতি মায়া করছিলেন। মায়ার অবতারেরা এবারে সাংঘাতিক একটা কিছু করবেন এই আঁচ পেয়ে একটা কিছু অস্ত্রের জন্য চারদিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু আমি প্রস্তুত হোতে না হোতে আবার সেই রকম একটা চড় এসে পড়্‌ল।

যা থাকে কপালে আর নয়—এই স্থির কোরে ক্যাঁক-ক্যাঁকের গালে ঠেসে একটি চড় কষিয়ে দিলুম। চড় খেয়েই সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। একবার উঠতে চেষ্টা করলে কিন্তু আবার ঘুরে পড়্‌ল। তার অবস্থা দেখে অন্য লোকগুলা চেঁচিয়ে আমাকে মারতে এল। আমি উঠে দেওয়ালে গা দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলুম। তারপরে রীতিমত যুদ্ধ। তারা দূর থেকে জুতো লাঠি গাড়ু, গামছা হাতের কাছে যে যা পেল তাই ছুঁড়ে আমাকে মারতে লাগ্‌ল।

গোলমাল শুনে ঘরের মধ্যে আরও তিন চার জন লোক এসে পড়্‌ল। তারা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, ঘরে ঢুকেই যুদ্ধে লেগে গেল।

সেই সাত আটজন লোক একদিকে আর আমি একা একদিকে—এইভাবে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব। শেষ-কালে একখানা বড় সতরঞ্চি চাপা দিয়ে তারা আমায় ধরে ফেল্লে।

তারপরে সেই আট দশ জনে মিলে আমার ওপরে কীল, গুঁতো, গাঁট্টা, গোঁজা, লাথি, চড়, ঠুসো, ঠাসা যার যা খুশী স্বাধীনভাবে চালাতে আরম্ভ কোরে দিলে। শুধু হাতে মারতে বোধ হয় তাদের অঙ্গে ব্যথা লাগ্‌ছিল তাই শেষ কালে তারা সশস্ত্র হোয়ে আসতে লাগ্‌ল। কেউ ছুরি, কেউ তলোয়ার কেউ বা লাঠি কেউবা সড়কী—। কিছুক্ষণ আগেও যদি তারা অস্ত্র নিয়ে আস্‌ত তা হোলে একজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করতে পারতুম। কিন্তু তখন আমার প্রায় হোয়ে এসেছিল। একজন দূর থেকে পায়ে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিতেই পড়ে গেলুম ও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হোয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলুম জানি না। চৈতন্য ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগলুম। বুঝতে পারলুম যে হাত পা দৃঢ়ভাবে বাঁধা। যে ঘরে আমায় প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছিল এটা সে ঘর নয়। ঘরের মধ্যে বাতি নেই, অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্‌ করছে।

আমার সেই অদ্ভুত অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরেই আবার অজ্ঞান হোয়ে পড়লুম।

এবার যখন জ্ঞান হোলো তখন শরীরের গ্লানি অনেক-খানি কেটে গিয়েছে। ঘরখানার একদিকের দেওয়ালে একটা ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে খানিকটা রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। আমার মনে হোতে লাগ্‌ল বদ্ধঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আমার জীবনবন্ধু অরুণ যেন মুক্তির খোশ-খবর ভরা একখানা খাম সম্মুখে ফেলে দিয়ে গেছে। একবার দাঁত দিয়ে হাতের বন্ধন খুলে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মানুষের দাঁত আহার্য্যের আস্বাদন পেতেই ব্যগ্র, মুক্তির আস্বাদ সে জানতেই চাইলে না। কিছুক্ষণ টানাটানি কোরে সে কার্য্যে ক্ষান্ত হোয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘুমের জন্য বেশী চেষ্টা করতে হোলো না। সে যেন মাথার শিয়রেই বসে ছিল, ডাক দিতেই চোখের ওপরে সে তার সুপ্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে।

সেবারে বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ক্লান্তির অবসাদে দেহ তখনো অবশ, চোখ চাইতে আর ইচ্ছা করছিল না। হঠাৎ নারীকণ্ঠের শব্দ কাণে এল। শুনলুম সে বল্‌ছে—আচ্ছা তোমরা যাও, আমি একবার গিয়ে দেখি।

নারী যে শক্তির অংশ এ বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নেই। মুমূর্ষুর মত নির্জ্জীব হোয়ে পড়েছিলুম, নারীর কণ্ঠস্বর কাণে যেতেই শরীরের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহের আবেগ সঞ্চারিত হোতে লাগ্‌ল।

তখুনি একজন পুরুষ বল্লে—দেখ যে আবার কি! ওকে আমরা খুন কোরে ফেল্‌ব।

নারীকণ্ঠ শুনে দেহে যতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল,

পুরুষের কণ্ঠে খুন হবার কথা শুনে উৎসাহের সে গতি দ্বিগুণ বেগে উৎস-মুখে ফিরে গেল।

নারীকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হোলো—তবুও আমি একবার দেখে নিই।

ভীম বল্লে—আচ্ছা দেখ। আজ সন্ধ্যের মধ্যে যদি ওর কাছ থেকে কোনো পাকা কথা না পাওয়া যায়, তা হোলে রাত্রেই ওকে শেষ কর্‌ব।

চুপ কোরে পড়ে রইলুম। মনকে প্রবোধ দিতে লাগলুম যে, খুনই হই আর মুক্তিই পাই, যা হয় একটা কিছু আজই সন্ধ্যার মধ্যে হোয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে দরজা খোলার শব্দ হয়েছিল, এবারে মনে হোলো দরজাটা যেন বন্ধ হোলো। বুঝতে পারলুম, ঘরের মধ্যে কেউ এসে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। যে এল, সে ধীরে ধীরে আমার সামনে এসে বস্‌ল।

অত্যন্ত বিপদের পাশেই শীকার থাক্‌লে কূর্ম্ম যেমন সাবধানে খোলের ভেতর থেকে মুখ বের করে, ঠিক সেই রকম সন্তর্পণে আমার চোখ দুটো একবার দেখে নিলে যে আমার সম্মুখে যে বসে আছে সে নারী।

ধীরে ধীরে সে আমার হাত ও পায়ের বন্ধন খুঁলে দিলে। শরীরের বেদনা তখনো যায়-নি। নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও কোনো রকমে উঠে বসলুম।

মুখ তুলে দেখলুম আমার সামনে বসে আছে এক নারী। মুখের পাতলা ওড়্‌না তার ঘাড়ের ওপরে ঢলে পড়েছে। মেঘাবৃত পূর্ণ শশীর মত বিষণ্ণ তার মুখ; নয়ন কোণে অশ্রুর জোয়ার সবে মাত্র তার রেখা ফেলে রেখে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি?

আমিও বল্লুম—কি!

আবার কিছুক্ষণ নীরব। যুবতীর দুই গাল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ কোরে অশ্রুজল ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

এ আবার এক নতুন বিপদ হোলো দেখছি! ভাবতে লাগ্‌লুম—খুন হবার জন্য বোধ হয় সন্ধ্যা অবধি আর অপেক্ষা করতে হোলো না। সামনে বসে অপরিচিতা সুন্দরী যদি এই ভাবে কাঁদতে থাকে, তা হোলে তো সন্ধ্যের আগেই আত্মহত্যা কোরে ফেলতে হবে। কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেব তাই ভাবছি, এমন সময় সে বল্লে—কেন তুমি আমায় ফেলে এমন কোরে চলে গিয়েছিলে?

আমি তাকে বল্লুম—সুন্দরী তোমরা যাকে মনে করেছ সে ব্যক্তি আমি নয়। আমি মুসাফের, পথ হারিয়ে এইদিকে এসে পড়েছিলুম। তোমার বাড়ীর লোকেরা ভুল কোরে আমায় ধরে এনেছে। তুমি আমায় ভাল কোরে দেখ তা হোলেই বুঝতে পারবে।

যুবতী সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে—তুমি সেই—তুমি সেই। পোষাক বদলিয়ে আর মাথার চুল অন্য রকম কোরে ছেঁটে কি আমায় ভোলাতে পারবে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে বল্লে—তোমায় আমি আর ছাড়ব না। এইখানে বন্ধ কোরে রেখে দেব—আর পালাতে পারবে না।

একবার মনে হোলো, যা থাকে কপালে, থেকেই যাই; তারপর না হয় সময় বুঝে একদিন লম্বা দেব। বল্লুম—সুন্দরী, আমি তো বিদেশী, তোমাদের ভাষা কিছুই জানি না বল্লেই হয়। এই কিড়ির মিড়ির ভাষায় প্রেমের বুলি শিখতে যে অনেকদিন লেগে যাবে। ততদিনে আমার কথা তো ছেড়েই দাও—তোমার যৌবনই কি থাকবে?

কথাটা শুনে সুন্দরী চটে গেল। মুখটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন কোরে আমার দিকে রেগে চেয়ে রইল। এদের ধাতে দেখছি ঠাট্টা জিনিষটা একেবারেই সহ্য হয় না। সে কিছু বলবার আগেই আমি বলে ফেল্লুম—দেখ, আমায় ছেড়ে দাও। তোমরা যাকে মনে কোরে আমায় ধরেছ, আমি সে লোক নই।

এবার সে আমার একখানা হাত ধরে বল্লে—তোমায় ছাড়্‌ব না। কেমন যাবে যাও দিকিনি?

না, থেকেই যেতে হোলো দেখছি। সুন্দরীর এই অনুনয় ঠেলে যে পাষণ্ড চলে যেতে পারে সে যাক্‌। আমার সে চরিত্রবল নেই।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে বলে ফেলি—আচ্ছা সুন্দরী, তোমার কথাই থাক্‌, আমি রয়ে গেলুম। কিন্তু তখুনি মনে হোলো যে, এই নারী প্রতিদিন অন্য লোক মনে কোরে আমাকে তার প্রেম-নিবেদন করবে। ঐ মৃণাল-কোমল বাহুলতা অন্য লোক ভ্রমে আমায় আলিঙ্গন করবে। তার

পরে—তারপরে—যাক্ যাক্—আর চিন্তায় যোগাল না। জোর কোরে বলে ফেল্লুম—না সুন্দরী, আমি তোমার স্বামী নই। আমাকে ছাড়তেই হবে।

—হাঁ, তুমিই আমার স্বামী।

ব্যাপারটা যে গুরুতর হোয়ে দাঁড়াল দেখছি! আমি বল্লুম—আচ্ছা, তোমার স্বামীর অঙ্গে কোনো দাগ ছিল?

—হাঁ ছিল। ছিল কি আছে।

—কোথায়?

—আচ্ছা, তোমার জামাটা খোলো।

—না, আগে তুমি বল।

—বল্‌ব?

—হ্যাঁ বল।

—তোমার ডান দিকের পাঁজরায় একটা কাটা দাগ আছে।

তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে ফেল্লুম। সর্ব্বনাশ! ছেলে-বেলা ফুটবল খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে পাঁজরার কাছে কেটে গিয়েছিল। সেই দাগটা দেখিয়ে দিয়ে রমণী বলে উঠ্‌ল—এই দেখ। আমার সঙ্গে চালাকী?

আর কথা বলা অসম্ভব হোলো। এই একটা তুচ্ছ দাগ যাকে এতদিন অতি সামান্য বলেই বিবেচনা কোরে এসেছি, সেইটেই শেষে আমার জীবনে চির জীবনের দাগা হোয়ে রইল।

জয়ের আনন্দে সুন্দরীর মুখ খুশীতে ভরপুর হোয়ে উঠ্‌ল। এবার সে হাসতে হাসতে বল্লে—কেমন, আমার সঙ্গে আর চালাকী করবে? দেখি, আর কত চালাকী জানো তুমি। তোমাকে যে আমি তোমার চেয়ে বেশী চিনি, এই চার বছরেই সে কথা কি ভুলে গিয়েছ?

সত্যি কথা বল্‌তে কি আমারই তখন নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হোতে লাগ্‌ল—এতদিন কি তবে স্বপ্নে ছিলুম? না এটাই স্বপ্ন! স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, সহজে যা এসেছে সহজেই তাকে গ্রহণ কর। মানুষের জীবনে এমন অবসর কখনো আসে না। অধরের সম্মুখে এই যে পিয়ালা কেন তা নিঃশেষে পান কোরে ফেলি না। কদিনের এ জীবন? হয়ত কালের ফুৎকারে কালই বুদ্‌বুদের মত এ মিলিয়ে যাবে।

স্বপ্নের দোলায় চড়ে কল্পলোকের কুঞ্জবনে দোল খাচ্ছি, এমন সময় সুন্দরীর কণ্ঠস্বর কানে গেল।

—শুনেছি তুমি আবার বিয়ে করেছ।

যাঃ—নেশা ছুটে গেল।

সুন্দরী আবার বলতে আরম্ভ করলে—এখানে তাকে নিয়ে এস। আমরা দুজনে মিলেমিশে থাক্‌ব। আমায় যে দিব্যি কর্‌তে বল করছি—তার সঙ্গে আমি কখনো ঝগড়া করব না। শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে আবার টপ্ টপ্ কোরে জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখও জলে ভরে উঠ্‌ল। এই প্রেমপাত্র অবহেলায় ঠেলে ফেলে যে হতভাগ্য চলে গিয়েছে, তার প্রতি আক্রোশে আমার দেহ মন ভরে উঠতে লাগল।

সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে আবার বল্লে—কি গো, কথা কইছ না যে?

আমি বল্লুম—সুন্দরী, কি কথা বল্‌ব। তোমরা যে বিষম ভুল করেছ, সে কথা কি কোরে তোমাকে বোঝাব? কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে যে আমি তোমার স্বামী নই।

আমার কথা শুনে এবার সে কোনো উত্তর না দিয়ে ঘাড় হেঁট কোরে বসে রইল। অনেকক্ষণ সেইভাবে বসে থেকে সে মুখ তুলে বল্লে—বেশ, তুমি যদি চলে যেতে চাও তো আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হোতে চাই না। যাও তুমি, কিন্তু মনে রেখো আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আমি বল্লুম—যদি দয়া কোরে ছেড়ে দেবে তো এখুনি দাও। না হোলে সন্ধ্যাবেলা তোমার ভাইয়েরা এসে আমায় মেরে ফেল্‌বে।

যুবতী বল্লে—না তারা কেউ বাড়ী নেই, তাদের ফিরতে দেরী হবে। আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

—আমার ঘোড়া আছে তোমাদের আস্তাবলে। শাদা ঘোড়া. সেটাকে দাও।

একটু হাসবার চেষ্টা কোরে সে বল্লে—এখনো সেই রকম ঘোড়ার সখ আছে?

কথাটা শুনে অতি দুঃখেও হাসি এল। কিন্তু মুক্তির আশ্বাস পেয়ে মন তখন চঞ্চল হোয়ে উঠেছিল, তাই বাজে কথায় সময় নষ্ট না কোরে বল্লুম—দেখ, সহিসকে ঘোড়া আনতে বোলো না। আমায় আস্তাবলটা দেখিয়ে দাও,

আমি নিজেই জিন চড়িয়ে নেব। পালাচ্ছি সে কথা তুমি ছাড়া আর যেন কেউ না জানতে পারে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বল্লে—কেন আমি কি জিন চড়াতে জানি না?

আধঘণ্টা পরে সে ঘরের মধ্যে এসে বল্লে—এস, এরা এখন কেউ নেই, এইবেলা পালাও।

তারপর সে আমাকে কতকগুলো সরু দেওয়াল-ঘেরা গলি পথ দিয়ে একেবারে বাড়ীর পেছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে আমার ঘোড়াটা দাঁড়িয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় সে আমার একখানা হাত ধরে বল্লে—ওগো, তুমি কি এত নিষ্ঠুর হয়েছ? একবার ছেলেটাকে দেখে যাবে না।

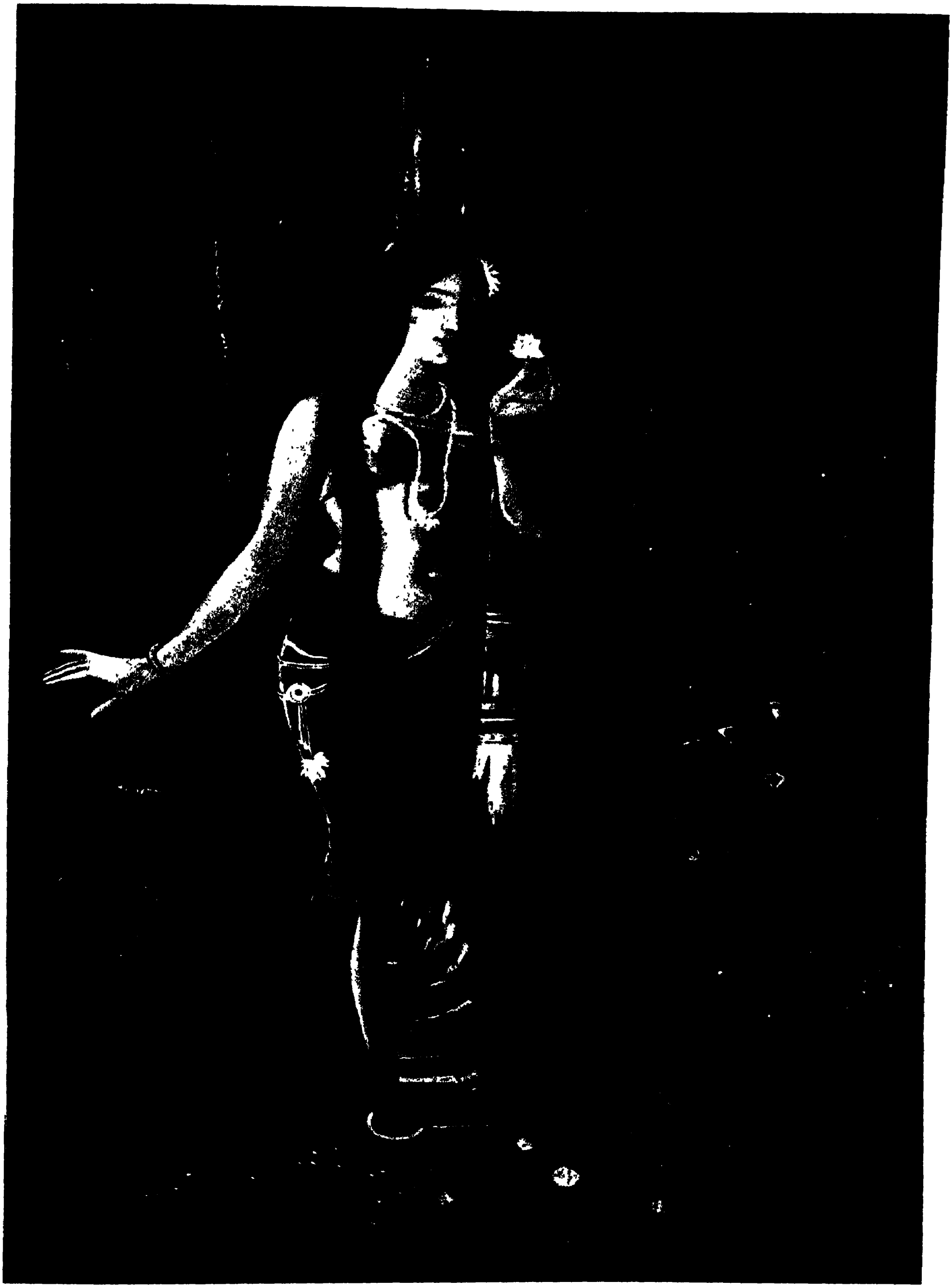
—ছেলে! হ্যাঁ কৈ ছেলেকে নিয়ে এস দেখি।

সুন্দরী ছুটে গিয়ে ছোট্ট একটি ছেলেকে নিয়ে এল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটী, তাকে দেখলে অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণও স্নেহে গলে যায়। তার কোল থেকে ছেলেটাকে নিয়ে দুগালে চুমু খেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লুম—সুন্দরী, তোমার উপকার জীবনে কখনো ভুলব না। তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করাই আজ থেকে আমার প্রধান ব্রত হোয়ে রইল। তোমার স্বামীর নাম কি?

সুন্দরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম—অশ্রুজলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হোয়ে এসেছে। ছেলেটাকে একহাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, একটুখানি ম্লান হেসে আমার মুখের ওপরে দরজাটা সে বন্ধ কোরে দিলে।



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] গৃহহারা



নববর্ষ

শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

উদ্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়া

(সার্ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার)

রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় বি-এ

চলা-ফেরা, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি সকল শারীরিক কাজের জন্য প্রাণীকে নিয়তই শক্তি ব্যয় করিতে হয়। কেবল প্রাণী নয়, উদ্ভিদও জীবনের কার্য্যে এই প্রকার শক্তি ব্যয় করে। মাটি হইতে জল টানিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠানো, দেহের অংশ-বিশেষকে তালে তালে স্পন্দিত করা, কম শক্তি-সাধ্য ব্যাপার নয়। এই শক্তি আসে কোথা হইতে? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের ভিতরে তাহাদের খাদ্য হইতে যে সার-বস্তু সঞ্চিত রাখে, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া শক্তির উৎপত্তি করে।

একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে-শক্তির দ্বারা জীবনের কার্য্য দেখায়, তাহার মূলাধার সূর্য্যের তাপালোক ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রাণীর প্রধান খাদ্য ফল-মূল শাক-সব্‌জি। এই সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্য প্রাণীকে পুষ্ট করে, এবং তাহার দেহে শক্তি-সঞ্চয় করে। কিন্তু উদ্ভিদের এই পত্র-পল্লব ফলমূল কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? উদ্ভিদ্ তাহার পত্রের হরিদ্বস্তুর (Chlorophyll) সাহায্যে সূর্য্যের তাপালোক শোষণ করে এবং বাতাস হইতে অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid) টানিয়া লয়। তার পরে সেই অঙ্গারক বাষ্পের অঙ্গার সূর্য্যের তাপালোকের শক্তিতে মিলিয়া দেহের ভিতরে যে সারবস্তুর উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদ্‌কে সজীব রাখে এবং তাহার জীবনের ক্রিয়া দেখায়। কাজেই সূর্য্যের শক্তিকে সর্ব্বশক্তির মূল না বলিলে চলে না। আজ যে-কয়লার তাপে রেলগাড়ি চলিতেছে, তাহা সূর্য্যের তাপই নয় কি? অতি প্রাচীন কালে উদ্ভিদ্ সূর্য্য-তাপের যে-শক্তি নিজের দেহের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কয়লায় পরিণত হওয়ায় ক্ষয় পায় নাই। আজ কয়লা নিজেকে পুড়াইয়া সেই সঞ্চিত শক্তিকেই প্রকাশ করিতেছে।

অঙ্গারই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। তাহারা বাতাসে ও জলে মিশানো অঙ্গারক বাষ্পকে দেহস্থ করে। খাটি অঙ্গারক বাষ্প উদ্ভিদের শরীর পোষণের কাজে লাগে না। সূর্য্যালোক কর্ত্তৃক দেহমধ্যে রূপান্তরিত হইলে পরে উহা হজমের উপযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে Photosynthesis বলা হয়। ইহাতে উদ্ভিদ্, সূর্য্যের চলৎ-শক্তি (Kinetic Energy) আলোকে শোষণ করিয়া স্থির শক্তি (potential Energy) রূপে শরীরে লুকাইয়া রাখে এবং পরে তাহাই তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি চলৎ-শক্তির আকারে প্রকাশ করে। আমরা যখন কাঠ বা কয়লা পুড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করি, তখন উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত সূর্য্যের স্থির-শক্তিই চলৎ-শক্তির আকার গ্রহণ করে।

বাতাস হইতে বা জল হইতে উদ্ভিদ্ কতটা অঙ্গার দেহস্থ করিল, তাহার মোটামুটি হিসাব কঠিন নয়। কতটা অঙ্গারক বাষ্প দেহে প্রবেশ করিল, তাহা মাপিতে পারিলেই অঙ্গারের পরিমাণ বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকার পরিমাপে ঝঞ্চাট অনেক এবং সময়ও লাগে যথেষ্ট। তা' ছাড়া সাধারণতঃ হিসাব নির্ভুল ও-সূক্ষ্ম হয় না। ইহা দেখিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অঙ্গার গ্রহণ পরিমাপ করিবার জন্য একটি যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমরা এখন তাঁহার Automatic Recorder for Photosynthesis নামক যন্ত্রটি পাইয়াছি। কতটা অঙ্গার হজম হইল, তাহা উদ্ভিদ্ এই যন্ত্রে সংলগ্ন কাগজে নিজেই লিখিয়া দেয়। কখন অঙ্গার হজম আরম্ভ হইল এবং কখনই বা শেষ হইল, তাহা যন্ত্রের ঘণ্টা শব্দ করিয়া আমাদের গোচরে আনে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অঙ্গার হজম সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

কেবল স্থলজ উদ্ভিদ্‌ই যে অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া অঙ্গার গ্রহণ করে, তাহা নয়; জলজ উদ্ভিদেরও দেহ পোষণের জন্য অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। ইহারাও অঙ্গারক বাষ্প হইতে

অঙ্গার গ্রহণ করে,—কিন্তু এই বাষ্প থাকে জলের সঙ্গে মিশানো। জলজ উদ্ভিদ জল হইতে তাহা চুষিয়া লয় এবং তা'র পরে সূর্য্যের আলোকে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া অঙ্গার ও অক্সিজেনে পরিণত হইলে, সে অঙ্গারটুকুকে (Carbohydratesএর আকারে দেহস্থ করে, বাকি অক্সিজেন বুদ্বুদের আকারে জল ভেদ করিয়া উপরে উঠে। পুষ্করিণীর জলে যে শেওলা জন্মে, রৌদ্রের সময়ে পরীক্ষা করিলে, পাঠক তাহার দেহ হইতে ঐ প্রকারে অক্সিজেন বাহির হইতে দেখিতে পাইবেন। পরিশ্রুত জলে জলজ উদ্ভিদ্ অনাহারে মারা যায়,—কারণ তাহাতে অঙ্গারক বাষ্প থাকে না; কাজেই সে অঙ্গার খাইতে পায় না। কিন্তু সেই জলেই খানিকটা সোডা-ওয়াটার ঢালিয়া দিলেই উদ্ভিদের মুখ চলিতে আরম্ভ করে,—কারণ সোডা-ওয়াটারে প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানো থাকে। এই অবস্থায় উদ্ভিদ্ যেমন অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক অক্সিজেন বুদ্বুদের আকারে উদ্গার করিতে থাকে। কাজেই উদ্ভিদ্ কতটা অক্সিজেন উদ্গার করিল, তাহা পরিমাপ করিলে সে কতটা অঙ্গার হজম করিয়াছে তাহা ধরা পড়ে। কোনো উদ্ভিদ্ কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতটা অঙ্গার হজম করিল, তাহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন।

যন্ত্রটীর গঠন খুব জটিল না হইলেও, ইহার নির্ম্মাণকালে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা দিয়াছিল। জগদীশচন্দ্র সমস্ত বাধা কাটাইয়া এখন যন্ত্রটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। আমরা এখানে ইহার কেবল একটা মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। প্রচুর অঙ্গারক-বাষ্প-মিশানো এক বোতল পুষ্করিণীর জলে একটি জলজ উদ্ভিদ্ (Hydrilla Verticillata) রাখিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোতল ছিপিবদ্ধ করা ছিল, কিন্তু ছিপির সঙ্গে ইংরাজি "U" অক্ষরের আকারের একটা বাঁকানো নল লাগানো ছিল এবং তাহার মুক্ত প্রান্তটি কয়েক বিন্দু পারদ দিয়া আটকানো হইয়াছিল। অঙ্গার হজম করার সঙ্গে বোতলের গাছটি যে অক্সিজেন উদ্গার করিতেছিল, তাহার চাপে ছিপির নলের পারদ-বিন্দু স্থির থাকিতে পারে নাই,—তাহা মাঝে মাঝে উপরে উঠিয়া সঞ্চিত অক্সিজেন ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং পরক্ষণে নীচে নামিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। পারদ-বিন্দুর এই সঞ্চালনে যাহাতে যন্ত্রসংলগ্ন কলম নড়াচড়া করে এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া ঘণ্টাকে বাজায়, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে। কাজেই অঙ্গার হজম করার সময়ে উদ্ভিদ্ আপনিই ঘণ্টা বাজাইয়া বা যন্ত্র-সংলগ্ন কাগজে রেখাপাত করিয়া পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যন্ত্রটির কার্য্য এত সূক্ষ্ম যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে দ্বিধাবোধ হয়। মনে করা যাউক, যন্ত্রের বোতলে কোনো উদ্ভিদ্ রাখিয়া যেন তাহার অঙ্গার হজম পরীক্ষা করা যাইতেছে। উদ্ভিদ্‌টির উপরে সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে, সে আনন্দে হজম কার্য্য চালাইয়া যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইতেছে। এখন যদি কেহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আলো অবরুদ্ধ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার হজম কার্য্য রোধ পায় এবং ঘণ্টা ধীরে বাজিতে আরম্ভ করে। উদ্ভিদ্ যে এ প্রকারে আলোক অনুভব করিয়া ভোজন-কার্য্য চালায় তাহা আচার্য্য বসু মহাশয়ের যন্ত্রেই ধরা পড়িল। কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কত আলোকপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র (Photometers) আছে। জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, উদ্ভিদের সাহায্যে আলোক পরিমাণ করিলে, পরিমাপ সূক্ষ্ম হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবল ইহাই নয়, মেঘে বা কুয়াসায় ক্ষণকালের জন্য হঠাৎ সূর্য্যের আলো রোধ পাইলেও, এই যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। তখন যন্ত্র-সংলগ্ন বিদ্যুৎ দীপ আপনিই জ্বলিয়া উঠে—এবং সূর্য্য মেঘনির্মুক্ত হইলে তাহা আপনিই নিভিয়া যায়।

দিনের কোন্ সময়ে উদ্ভিদ্ বেশি আহার করে, তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারো জানা ছিল না। আচার্য্য বসু মহাশয়ের যন্ত্রটিতে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। তিনি যন্ত্রের কাছে বসিয়া ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন বেলা সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে সূর্য্যের যে-মৃদু আলোক উদ্ভিদের শরীরে পড়ে, তাহা উহার ক্ষুধার উদ্রেক করিতে পারে না। খুব ভোরে আমাদের যেমন গুরুভোজনে অরুচি থাকে, উদ্ভিদেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। তার পরে বেলা সাড়ে সাতটায় যেই প্রখর সূর্য্যালোক গায়ে লাগে, অমনি সে আহারে মন দেয়। আমরা আধ্-ঘণ্টায় বা এক ঘণ্টায় আহারের কাজ সারিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। তা'র পরে তিন চারি ঘণ্টা চুপ—এই সময়ে আর আহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উদ্ভিদের প্রকৃতি সে রকম নয়—যত বেলা

বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের ক্ষুধা জাগিয়া উঠে এবং ততই তাহারা খাইতে থাকে। ক্ষুধার মাত্রাটা চরম হইয়া দাঁড়ায় বেলা একটার সময়; প্রাতে যতটা খায় এই সময়ে তাহার চারি গুণ আহার করিয়াও তাহাদের পেট ভরে না। কিন্তু যেই বেলা পড়িতে আরম্ভ করে অমনি তাহাদের ভোজনও কমিয়া আসে। শেষে যখন রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া যায়, তখন তাহারা একদম মুখ বন্ধ করিয়া দেয়—এ সময়ে আর ভোজনকার্য্য চলে না।

খাদ্য হজম করা একটি জীবনের ক্রিয়া। তাই অসাধারণ উত্তেজনা হজমের ব্যাঘাত করে। প্রফুল্লচিত্তে আহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার জন্য ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়েরা আমাদের যে পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা নিঃসন্দেহ সুপরামর্শ। হজমের সময়ে উত্তেজনা আসিলেই বদ্ হজম হয়। একটি উদ্ভিদ্ রৌদ্রে পিঠ দিয়া যখন হজমে ব্যস্ত ছিল, এবং যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইয়া যখন হজমের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, আচার্য্য বসু মহাশয় হঠাৎ তাহার শরীরে বিদ্যুৎ চালনা করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্ চমকাইয়া উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার বন্ধ করিয়াছিল। আহারের সময়ে পিঠে গুম্‌গুম্ করিয়া কিল্ মারিলে পরম ভোজন-বিলাসীরও যেমন ভোজনস্পৃহা দূর হয়, এই ব্যাপারটা কতকটা সেই রকমেরই নয় কি?

এই যন্ত্রটি লইয়া গবেষণা করিবার সময়ে আচার্য্য বসু মহাশয় দেখিয়াছেন, হজমের সময়ে কতকগুলি বস্তু অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদের দেহস্থ করিলে তাহাদের হজমের কার্য্য হঠাৎ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। আমাদের পরিপাক-শক্তি বাড়াইবার জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা বড় বড় বড়ি সেবনের ব্যবস্থা করেন; আবার তাহার সঙ্গে অনুপানও থাকে অনেক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একশত কোটী ভাগ জলে কোনো কোনো দ্রব্যের কেবল এক ভাগমাত্র মিশাইয়া সেই জল উদ্ভিদ্‌দেহে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই অতি সূক্ষ্ম কণিকায় উদ্ভিদের হজম-শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কেবল ইহাই নয়, একশত কোটী ভাগ জলে একভাগ মিশাইয়া তিনি যে ফল পাইয়াছিলেন, দুইশত কোটী ভাগ জলে একভাগ মিশাইয়া তাহারি দ্বিগুণ ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ জিনিষটি যত অল্প পরিমাণে দেহস্থ করানো যায়, পরিপাক-শক্তির উপরে তাহার ক্রিয়া ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? আমাদের ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা এই তত্ত্ব লইয়া কোনো গবেষণা করিতেছেন না কেন, তাহা জানি না। ইহাতে ভেষজ-তত্ত্বের কোনো এক বৃহৎ আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যতই ডাইলিউসন বাড়ানো যায় ততই তাহা শক্তিমান্ হয় বলিয়া একটা কথা আছে। আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে, ইহার যেন কতকটা মিল ধরা পড়িতেছে। একভাগ থাইরয়েড গ্রন্থির রসের (Extract of Thyroid gland) সহিত এক-শত কোটী ভাগ জল মিশাইয়া জগদীশচন্দ্র তাহারি একটু উদ্ভিদ্ দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার হজমের মাত্রা শতকরা সত্তর অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই প্রকারে আয়োডিন্ (Iodine) প্রয়োগ করিয়াও একই ফল পাওয়া গিয়াছিল। জীবনের ক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্মতম কণিকার এই প্রকার কার্য্য হঠাৎ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্য। উদ্ভিদের দেহে যে সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, প্রাণীর জীবনক্রিয়া যে সেই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভিটামিন (Vitamin) এবং হর্মোনস্ (Hormones) প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য প্রাণী-শরীরে অতি অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া বৃহৎ কার্য্য দেখায়, তাহাদের প্রকৃতি আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট আজো অস্পষ্ট রহিয়াছে। হয় ত একদিন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্যের আলোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

তপনালোকের আকারে সূর্য্যের যে-শক্তি উদ্ভিদের উপরে আসিয়া পড়ে, তাহার কত ভাগ সে গ্রহণ করিয়া জীবনের ক্রিয়া চালায়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক শত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল এক ভাগ মাত্র উদ্ভিদে গ্রহণ করে, বাকি ৯৯ ভাগ তাহাদের কাজে লাগে না! পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকেরা খুব স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে এই হিসাব দাঁড় করাইয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার magnetic Radiometer নামক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ঐ ফলের সহিত মিলে নাই। তাঁহার হিসাবে সৌর-শক্তির শতকরা প্রায় সাড়ে সাত ভাগ উদ্ভিদেরা কাজে লাগায়। কম তফাৎ নয়। ষ্টীম-এন্‌জিনে কয়লা পুড়াইয়া আমরা তাপ উৎপন্ন করি—এবং

সেই তাপে কল চালাই। অর্থাৎ কয়লার স্থির-শক্তিকে (Potential Energyকে) আমরা চলৎ-শক্তিতে (Kinetic Energy) পরিণত করি। কিন্তু কয়লার তাপের সমস্তটাই কি কল চালানোর কাজে ব্যয়িত হয়? কল সবটাই কাজে লাগাইতে পারে না,—শতকরা ১৪ বা ১৫ ভাগের বেশি তাপ কল চালানোতে খরচ হয় না। কাজেই বলিতে হয়, সুব্যবস্থার অভাবে শতকরা ৮৫ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এন্‌জিনের কার্য্যকরী শক্তি (Efficiency) উদ্ভিদের কার্য্যকরী শক্তির প্রায় দ্বিগুণ। আচার্য্য বসু মহাশয় বলিতেছেন, যে-উপায়ে উদ্ভিদ সূর্য্যালোকের চলৎ-শক্তিকে স্থির-শক্তিরূপে দেহে সঞ্চিত রাখে, সেই রকম কোনো উপায়ে সূর্য্যালোকের শক্তিকে আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখা অসম্ভব হইবে না। *

* লেখকের "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক যে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতেছে—এই রচনা তাহারি একটি অধ্যায়।

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলার সমস্ত ঘটনাই যে নিতান্ত তুচ্ছ, একেবারে ছেলেখেলা, এ কথা আমি মান্‌তে চাইনে। জীবনে এমন এক দিন আসে, যখন ছেলেবেলার প্রতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নেড়েচেড়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে যে, তা'র কোথায় কোন্ মধুর স্মৃতি লুকোনো আছে; এবং সেই সময় ছেলেবেলা এমন মধুর ঠেকে যে, জীবনের কোনো সময়ই তেমন মধুর ঠেকে না। আবার সেই হঠাৎ-হারানো বাল্যকাল খুঁজে বের কর্‌তে ইচ্ছে করে। যে সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে কাটিয়ে আসা যায় তাই তখন জীবনের মধ্যে বড়ো হ'য়ে উঠে। তার পর অনেক সময় সেই অবহেলিত জীবনের সামান্য একটা ঘটনা সারা জীবনকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে রাখে এবং সমস্ত জীবন তা'র স্মৃতির বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হয়। সেই জন্যেই ছেলেবেলাকে যতো অবহেলার মনে করি, সেটা ঠিক ততোখানি অবহেলার নয়।

আমার জীবনেও ছেলেবেলার একটা ঘটনা, অন্যের কাছে তুচ্ছ হ'লেও, আমার সমস্ত জীবনকে মহিমান্বিত ক'রে দিয়েছে। আর আজ এই জীবন-মধ্যাহ্নে তা'রই পুণ্যস্মৃতি বুকে বহন ক'রে জীবনের অপর পারে পৌঁছতে চলেছি।

আমি তখন বলাগড় স্কুলে প'ড়ি। ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু নিরীহ ভালোমানুষ ছিলাম। ক্লাশে এক পাশে চুপচাপ ব'সে থাক্‌তাম। পড়াশোনাতেও মন্দ ছিলাম না। স্কুলের কারো সঙ্গেই মিশ্‌তাম না। সকলকেই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চল্‌তাম। বিশেষ ক'রে তা'কে।

তা'র নাম ছিলো সুবোধ। সু-বোধ তা'র থাক্ বা না থাক্ কু-বোধ তা'র যথেষ্টই ছিলো। সে যেনো বাপমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্যই সুবোধ নামের অপব্যবহার করতো। কিন্তু তা'র মধ্যেও যে একটি মহাপ্রাণ লুকোনো ছিলো তারই মাধুর্য্য আমায় মোহিত ক'রে দিয়েছে।

আমি ছিলাম ক্লাশের মধ্যে সবার হ'তে ছোট, আর সুবোধ সব চেয়ে বড়ো। তা'কে চিন্‌তো না এমন ছেলে বা মাষ্টার ছিলো না। দুষ্টুমিতে সে পাকা ওস্তাদ। কিন্তু তা'র মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিলো। সে এমন ভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তো যে, সহজে তা'র দুষ্টুমি ধরা পড়্‌তো না। তা'র বদলে অন্যে তিরস্কৃত হ'তো। অথচ সকলেই জান্‌তো যে, এই দুষ্টুমির মূলে সুবোধ। কিন্তু কেউ তা'র এতটুকুও অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌তো না।

গায়ে তা'র অসীম ক্ষমতা ছিলো। ততোধিক ক্ষমতা ছিলো মনে। গঙ্গায় অবলীলাক্রমে সাঁতার কেটে এপার ওপার করতে তা'র কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হ'তো না। চলন্তি নৌকোর হাল ধ'রে ঘুরিয়ে সে নৌকোকে বেঁকিয়ে দিতো; ডুব সাঁতার কেটে স্নানার্থীদের পা ধ'রে টেনে জলে নাকানি চোবানি খাওয়াতো। স্কুলের গা ঘেঁষে একটা সরু খাল

ছিলো।—এককালে গঙ্গা যে সেইখান দিয়ে প্রবাহিতা ছিলেন তারই ক্ষীণ স্মৃতিটুকু রেখে গেছেন। গ্রীষ্মকালে খাল শুকিয়ে যেতো, আর বর্ষায় জলপূর্ণ হ'য়ে দূরাগস্হতা গঙ্গার সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যেতো। বর্ষাকালে স্কুলের ছুটি হ'লে, স্কুলের পাশেই যে বাঁশ ঝাড় ছিলো, সেই ঝাড়ের একটা বড়ো বাঁশ দেখে তা'তে উঠে ডগা ধ'রে সে জলের উপর ঝুলে পড়্তো। বাঁশটা তা'র ভারে স্প্রীংয়ের মতো দোল খেতো —একবার তা'কে জলে তলিয়ে দিতো, পরক্ষণেই উঁচুতে তুলে নিতো। এইটাই তা'র সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিলো। অন্য কেউ এই দুঃসাহসিকতায় অগ্রসর হ'তো না। লোকের বাগান থেকে ফল পেড়ে, খেজুর রস চুরি ক'রে খেতে সে অদ্বিতীয় ছিলো। কিন্তু কোনো দিনই কোনো নিষ্ঠুর কাজ তাকে কর্‌তে দেখিনি।

ক্লাশের ছেলেরা সকলেই তা'কে ভয়ে ভক্তি কর্‌তো,— তা'কে মেনে চল্‌তো। কেবল আমিই তা'কে এড়িয়ে চল্‌তাম। সেইজন্যে তা'র হাতে আমায় নাকালও কম হ'তে হ'তো না।

সেদিন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘট্‌লো, যার পর থেকেই তা'র সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেলো; এবং জীবনে তা'কে কোনো দিনও ভুল্‌তে পার্‌লাম না, আর বোধ হয় পার্‌বোও না।

স্কুলের যে ঘড়িটা বাইরে দালানে টাঙানো থাক্‌তো, সেটা দেখে ঘণ্টা পড়্তো। সেই ঘড়িটাকে জলখাবারের ছুটির পর অসম্ভব রকমে দ্রুত চ'ল্‌তে দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। কানাই বেয়ারা ঘড়ির খবরদারী কর্‌তো। প্রথমেই প্রধান শিক্ষক তা'র কৈফিয়ৎ তলব কর্‌লেন। সে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না। তার পর প্রধান শিক্ষক ছেলেদের সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, ঘড়ি কে দ্রুত ক'রে দিয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সব ছেলেই আমার নাম কর্‌লে। এমন কি অনেকে বল্‌লে যে, তা'রা আমায় অনেক বারণ ক'রেছে কর্‌তে তবু আমি করেছি। প্রধান শিক্ষক একটু বিস্ময়ান্বিত হ'য়ে গেলেন। কারণ তিনি আমায় ভালো রকমই জান্‌তেন। তবু তিনি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি এ কাজ করেছি কি না। আমি এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম যে, কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লাম না। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, এ সুবোধের কারসাজী। সেদিন সে স্কুলের একটা ম্যাপ ছিঁড়ে ফেলেছিলো। সে জান্‌তো যে, আর কেউ তা'র ভয়ে এ কথা বল্‌বে না। কিন্তু আমি সত্য কথাই বল্‌বো। সুবোধ আমায় অনেক অনুনয় ও ভয় দেখিয়ে বল্‌তে বারণ কর্‌লে। আমি তা'র কথা না শুনে প্রধান শিক্ষকের জিজ্ঞাসায় সত্য কথাই বলেছিলাম এবং তা'র ফলে তা'কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হ'তে হ'য়েছিলো। তারই প্রতিশোধ সে আজ আমার উপর তুল্‌তে চায়।

আমাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে প্রধান শিক্ষকের রাগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি দ্বিতীয় কথা না ব'লে আমায় অনবরত বেত্রাঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেন। বিস্ময় ও অভিমানে কান্নায় আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো; কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল বের হ'লো না। সমস্ত শরীর ফুলে উঠ্‌লো। আমায় চুপ ক'রে স্থির হ'য়ে মার খেতে দেখে প্রধান শিক্ষকের কেমন রোখ চেপে গেলো—তিনি অনবরত প্রহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হ'য়ে এলো। শরীর ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌লো। কারো সাহস হ'লো না যে, এসে মারের প্রতিরোধ ক'রে।

হঠাৎ সুবোধ এসে আমার সাম্‌নে আমায় আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে জোর গলায় প্রধান শিক্ষককে বল্‌লে—আমি ঘড়ির কাঁটা সরিয়েছি, এ আপনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। ওকে শুধু শুধু মার্‌ছেন। ব'লে আমায় এক ঠেলা দিয়ে বল্‌লে— স'রে যা। কেনো মিথ্যে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিস্।

আমি অবসন্নের মতো বেঞ্চিতে ব'সে পড়্‌লাম। আজ প্রথম দেখ্‌লাম—সে নিজে দোষ স্বীকার ক'রে শাস্তি নিলে।

বিকেলবেলা ছুটির পর সুবোধ আমার সঙ্গ নিলে। তা'র বাড়ী এবং আমার বাড়ী এক পাড়াতেই ছিলো—স্কুল থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। রাস্তার মাঝখানে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরের বাড়ীর কাছে একটা ঘন জঙ্গল ছিলো। প্রবাদ, এখানে ডাকাত থাক্‌তো এবং অনেক অপদেবতা এখনো থাকেন। দিনের বেলায় সেখান দিয়ে একলা চল্‌তে গা ছম্ ছম্ কর্‌তো। তা'র চারপাশে বাগদীদের বাস। সেই নির্জ্জন বনের ধারে যখন এলাম, তখন আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই—কেবল আমি আর সুবোধ চুপ ক'রে চলেছি। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর কাছে এসে সে খপ্ ক'রে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্‌লে—আমার মাপ কর্ প্রিয়। আমি তোকে শুধু শুধু মার খাইয়েছি। তুই কেনো আমার কথা শুন্‌তিস্

নে? এতটা যে হবে তা আমি মনে করিনি। বল্ ক্ষমা কর্‌লি।

এতক্ষণে আমার চোখ দিয়ে বন্যার বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। সুবোধ আমায় বুকে টেনে নিলে। আমি তা'রই বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লাম। একটু শান্ত হ'য়ে যখন মুখ তুল্‌লাম, তখন দেখ্‌লাম সুবোধের চোখেও জল। আমার মন নরম হ'য়ে গেলো। তা'র উপর যেটুকু রাগ হয়েছিলো সেটুকু কোথায় ভেসে গেলো। সুবোধ বল্‌লে—এই সিদ্ধেশ্বরীর নামে দিব্যি কর্‌ছি, আর কোনো দিন তোকে জ্বালাতন কর্‌বো না। বল আমায় মাপ্ কর্‌লি।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, মাপ করেছি। তার পর দুজনে বাকি পথটুকু নানা গল্প ক'রে চল্‌তে লাগ্‌লাম। এতদিন ধ'রে আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিলো আজ তা কোথায় কেমন ক'রে দূর হ'য়ে গেলো। সুবোধ আজ নিজের দোষ স্বীকার ক'রে, আমার কাছে তা'র চির-উন্নত মাথা নত ক'রে, আমায় জয় ক'রে ফেল্‌লে। তা'র প্রতি এতটুকু দ্বেষ ও ঘৃণা মনের মধ্যে রাখ্‌তে দিলে না।

* * * *

সেদিনের সেই ঘটনা অন্যের কাছে তুচ্ছ হ'লেও আমার কাছে তা' নয়। সেই সামান্য ঘটনার পর হ'তেই তা'র এবং আমার মনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিলো তা' দূর হ'য়ে গেলো। সুবোধের বাহ্যিক দুষ্টামি ও বদমায়েসীর আড়ালে যে একটি সত্যকার প্রাণ ছিলো, তা'রই কোন্ গোপন সাড়া আমার প্রাণে, আমার নিজের অজান্তেই এসে হয়তো আঘাত ক'রেছিলো। তা'র ফলে দু'জনে দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌লাম। তা'র মতো ছেলের সঙ্গে আমার মতো শান্তশিষ্ট ছেলেকে মিশ্‌তে দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। কিন্তু আমি মোটেই আশ্চর্য্য হোইনি। শেষে এমন হ'লো যে, আমি তা'র পিছনে পোষা কুকুরের মতো বেড়াতাম। তা'র কাজ ক'রে, তা'র ফরমাশ্ খেটে, নিজেকে ধন্য মনে কর্‌তাম। সুবোধ কিন্তু আমায় তা'র সঙ্গে বেশীক্ষণ থাক্‌তে দিতো না—আমায় জোর ক'রে তাড়িয়ে দিতো। বল্‌তো—দেখ্, আমার সঙ্গে বেশী বেড়াস্‌নে—পড়াশুনো ক'র্‌গে। সব সময় আমার সঙ্গে তোকে কিছুতেই থাক্‌তে দেবো না।

আমি হেসে বল্‌তাম—কেনো, তোমার সঙ্গে মিশ্‌লে খারাপ হ'য়ে যাবো ব'লে?

সুবোধও হেসে বল্‌তো—হ্যাঁ, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না। আর তা ছাড়া তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে, মানুষ হ'তে হবে।

আমি বল্‌তাম—তুমিও কেনো লেখাপড়া শেখো না।

সুবোধ গম্ভীর হয়ে বললে—ও আমার দ্বারা হবে না। তুই শেখ, তা হলেই আমার কাজ হবে।

এমনি ক'রেই সে আমায় দূরে দূরে রাখতো। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতো। আমি ও তার সন্ধানে ফিরতাম। চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর সামনের ইট-পাঁজার ধার দিয়ে যে রাস্তাটা বরাবর গঙ্গার ধারে তাদের আমবাগানে গিয়ে পড়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে আর কেউ চল্‌তো না, কেবল সুবোধ চল্‌তো। আর সেই আমবাগানের একটা বড়ো আমগাছতলায় তার লুকিয়ে তামাক খাবার আড্ডা ছিলো। এ কেউ জানতো না, এমন কি আমিও। পরে হঠাৎ এক দিন তা'কে খুঁজতে গিয়ে দেখে ফেলেছিলাম। সে দিন যে তিরস্কার তার কাছ হ'তে পেয়েছিলাম, তা আর বল্‌বার নয়। তা'র সঙ্গে মিলনের দিন থেকে সে তার কোনো রকম অসৎ কর্ম্মের সাক্ষী আমায় কর্‌তে চায় না। আমার মনে হয়, এর আর একটা কারণ ছিলো।

মানুষের মন স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। পাছে তা'র সমস্ত কাজ আমি তা'র প্রতি অনুরাগ বশতঃ অনুকরণ ক'রে ফেলি, এই জন্যেই সে আমায় এড়িয়ে চল্‌তো। অথচ আশ্চর্য্য—সে নিজে কোনো দিনই এ সমস্ত হ'তে মুক্ত হ'তে চাইতো না। বললে শুধু হাসতো।

আর একটা জিনিস আমার বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌তো। দু'জনে এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম এবং স্কুল হতে আসতাম। সিদ্ধেশ্বরী তলায় যখনই কোনো বাগ্‌দীর সঙ্গে দেখা হ'তো, তখনই তারা আভূমি নত হ'য়ে আন্তরিক ভক্তিভরে সুবোধকে প্রণাম করতো। আমি এর কারণ বুঝতে পার্‌তাম না। জিজ্ঞাসা কর্‌লে উত্তর পেতাম না। যতই সুবোধের সঙ্গে মিশতে লাগ্‌লাম, ততই তাকে প্রহেলিকার মতো মনে হ'তে লাগ্‌লো। সেও ধরা দিতে চায় না, আমিও তাকে না ধ'রে ছাড়বো না। এই ভাব কিন্তু বেশী দিন রইলো না। আর সেই দিনই তাকে বিশেষ ক'রে চিন্‌লাম যে, সে কতো উঁচুতে।

বিকেল বেলা কোনো দিনই তার দেখা পেতাম না। স্কুল থেকে এসে যে সে কোথায় চলে যেতো, তা কাউকে বল্‌তো না। সেদিন বিকেল বেলা কি খেয়াল হ'লো, বেড়াতে বেড়াতে আমবাগানের রাস্তা ধর্‌লাম—যদিও জান্‌তাম, তার দেখা পাবো না। কিন্তু বাগানে এসে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। সুবোধ গম্ভীর ভাবে অন্যমনস্ক হ'য়ে ব'সে আছে। আমার পায়ের শব্দেও তা'র চমক ভাঙলো না। আমি তা'কে চমকে দেবার জন্যে একটা শব্দ কর্‌লাম। সে চম্‌কে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরভাবে বল্‌লে—প্রিয় এসেছিস, আমি তোর কাছে যাবো ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে এক যায়গায় যাবি? খুব লুকিয়ে যেতে হবে কিন্তু। কেউ জান্‌তে না পারে।

একে গোপনীয়, তায় সুবোধের কাজ কর্‌বার সুযোগে আমার অন্তর আনন্দোৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। আমি ব্যগ্র ভাবে উত্তর কর্‌লাম—যাবো।

সুবোধ আস্তে আস্তে উঠে এগুলো। আমি তা'র পিছন পিছন অবুঝ-বিস্ময় নিয়ে চল্‌লাম। সিদ্ধেশ্বরীতলায় এসে থেমে সে আমায় বল্‌লে—একটু দাঁড়া, গোটা কতক ওষুধের গাছ তুলে আনি—ব'লে বনের মধ্যে ঢুক্‌লো। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে অনেক রকম গাছ-গাছড়ার গুণ জানতো, আর সে সব দিয়ে নানান রোগ ভালো কর্‌তো। সে এই সব শিখেছিলো চাঁড়ালপাড়া থেকে এবং সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে।

কিছুক্ষণ পরে সুবোধ কতকগুলো শিকড় তুলে এনে আমায় নিয়ে চাঁড়ালপাড়ায় ঢুক্‌লো। পাড়ায় ঢুক্‌তেই কতকগুলো শিশু এসে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লো। সে কারো পিঠ চাপড়ে, কাউকে কোলে নিয়ে আদর কর্‌তে লাগলো। শুন্‌লাম, সে তাদের নিজে লেখাপড়া শেখায়।

আমায় সঙ্গে করে একটা কুঁড়ের ভিতর ঢুক্‌লো। একটি ছোট ছেলে কলেরাক্রান্ত হ'য়ে নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়ে আছে। সুবোধ কদিন তা'র সেবা ক'রে ওষুধ দিয়ে কতক ভালো ক'রে এনেছে। একলা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো ব'লে আজ সে আমার সাহায্য চেয়েছে। আমিও তার সাহায্য কর্‌বার এমন সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। দু'জনে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ছেলেটিকে প্রায় সুস্থ ক'রে তুল্‌লাম। সুবোধের এই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা আমায় আরো মুগ্ধ করে তুললে।

আমি চিরকালই একটু দুর্ব্বল ছিলাম। এই রোগীর সেবা কর্‌তে কর্‌তে কখন আমার দুর্ব্বল শরীরের সুযোগ গ্রহণ ক'রে কলেরা বিষ শরীরের ভিতর প্রবেশ করেছিলো। সেদিন ছেলেটিকে দেখে আমি আর সুবোধ বাড়ী ফির্‌ছিলাম, পথের মধ্যেই হঠাৎ আমার পেট ব্যথা ক'রে উঠলো এবং আমিও কলেরাক্রান্ত হলাম। আমার অবস্থা দেখে সুবোধের মুখ শুকিয়ে গেলো। আমারও যে একটু ভয় না হলো তা নয়। কোনো রকমে ধরে সে আমায় বাড়ী নিয়ে এলো। আমার অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়লো! সুবোধ প্রথম দিন থেকেই একবারও বাড়ী যায় নি,—অনবরত আমার সেবা করেছে। সে রকম সেবা বোধ হয় নিজের অতি নিকট আত্মীয়েও কর্‌তে পারে না। আর কেবল বলেছে—আমিই তোর অসুখের কারণ হলাম। কেনো তোকে নিয়ে গেলাম। নিয়ে গেলাম তো তোকে পূর্ব্বে হ'তে সাবধান ক'রে নিয়ে গেলাম না কেনো। তোকে কিছুতেই মর্‌তে দেবো না।

না খেয়ে না দেয়ে সে আমার সেবা কর্‌তে লাগলো। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ওষুধের গুণে আমি ভালো হ'য়ে উঠলাম। তার কি আনন্দ! তা'র প্রতি অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের শিহরণ জেগে উঠলো। যেনো কি একটা মহামূল্য বস্তু, যা সে হারাতে বসেছিলো, তাই ফিরে পেয়েছে।

দু'জন রোগীর সেবা করে এবং বিশেষতঃ না খেয়ে না দেয়ে আমার সেবা করাতে তার মতো সবল ও সুস্থ শরীরেও কলেরা বিষ ঢুক্‌লো—সেও আক্রান্ত হ'লো। তার কিন্তু কিছু মাত্র দুঃখ নেই। সে যে আমায় ভালো ক'রে তুল্‌তে পেরেছে এতেই সে সুখী। আমার অসুখ যেনো তার দোষেই হয়েছিলো। সেইজন্যে সে সদাই কুণ্ঠিত হ'য়ে থাক্‌তো; কিছুতেই তাকে বোঝাতে পার্‌তাম না যে, এতে তার দোষ নেই। আমি তো নিজে ইচ্ছা করেই গিয়েছিলাম। এখন আমায় আরোগ্য হ'তে দেখে সে যেনো নিজের মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিলে।

আমি আমার প্রাণপণ করে তার সেবা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কারণ আমি তো জানি যে, শুধু তার জন্যেই আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। এ জীবন এখন তারই দান। কাজেই তার দেওয়া জীবন তারই কাজে উৎসর্গ কর্‌লাম। সুবোধ আমায় বক্‌তো। আমি তার বারণ শুন্‌তাম না। সে আমার

সেবা নিতে কুন্ঠিত হলেও বেশ বুঝতে পারতাম আমার সেবায় সে তৃপ্তি পেতো। আমিও সেই আনন্দে তার সেবা করতাম।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—তার চিরবিদায়ের দিন নিকট হ'য়ে এলো। বিদায়ের দিন আমি তার বুকের উপর পড়ে কেঁদে বল্লাম—এ কি করলে ভাই, আমায় এই বাঁচার ভিতর দিয়ে চিরজীবনের মতো মেরে রেখে গেলে। তোমার কাজ কে করবে?

সুবোধ ম্লান হেসে আমার চোখের জল মুছিয়ে বল্লে—তোর ভিতরেই আমি বেঁচে থাকবো। তুই সব কাজ করবি। আর শেষ অনুরোধ,—সত্যের জন্তে লোকাচার, লোকলজ্জা কিছু মানবি না। যা সত্য বলে বুঝবি, তা করবি।

তার পর আর সে কথা বলতে পারলে না। তার মুখের ম্লান হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতে চোখের কোলে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তার পর সব স্থির।

তার ভিতর যে মহাপ্রাণ লুকোন ছিলো, তার পরিচয় আমি দু'একটা কাজেই পেয়েছিলাম। আজ তাই মনে হয় আমি না বেঁচে যদি সে বাঁচতো, তা হলে পৃথিবীর অনেক কাজই সে করতে পারতো। কিন্তু সে আমার মতো অক্ষম লোকের উপর তার বিদায় দিনের শেষ আদেশ করে গেলো। জানি না আমি তার আশা কতোটা সফল করতে পেরেছি। শুধু তার চিরজাগ্রত স্মৃতিটুকু বুকের মাঝে রেখে, তার আদেশ মাথায় ক'রে নিয়ে এই অপটু দেহকে টেনে জীবন-খেয়ার শেষ পাড়ি জমিয়েছি।



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] মা

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি

৺ রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত

সম্পদ ও মূল্য

যে সকল প্রচেষ্টা দ্বারা মানবজাতি আদিম অনুন্নত অবস্থা হইতে দৈনন্দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কৃষিকার্য্যই তাহার মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান। বর্ত্তমান গ্রন্থের * অবতরণিকা অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষকগণ শস্যোৎপাদন করিয়া তাহার কিয়দংশ আপনাদের ব্যবহারে নিয়োজিত করে এবং অবশিষ্টাংশ শিল্পী এবং অন্যান্য অকৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। শিল্পী-সম্প্রদায় আপন আপন শিল্প-সম্ভার-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা কৃষকগণ হইতে প্রয়োজনীয় শস্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। ইহাই মানবের জাতি-গঠনের মূল সূত্র।

খাদ্যই জীবন-ধারণের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। এই খাদ্যের নিমিত্ত সহরের অকৃষক-মণ্ডলী চিরকালই কৃষকবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে; কারণ পল্লী ভিন্ন নগর কিম্বা নগরোপকণ্ঠস্থিত জমিতে নগরবাসিগণের আহার্য্যের পরিমাণ শস্যোৎপাদন কিছুতেই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং আহার্য্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগের পর-প্রত্যাশী না হইয়া গত্যন্তর নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষক সম্প্রদায় প্রতি বৎসর তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য কেন উৎপাদন করে? ইহার উত্তর এই যে, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য খাদ্য ব্যতীত এমন কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন হয়, যাহা উহারা স্বয়ং প্রস্তুত করিতে অক্ষম। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র, তৈজস, অস্ত্র এবং যন্ত্রাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য কৃষক-সম্প্রদায়কে শিল্পী-সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং এই সকল বস্তু পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে যে মূল্য দিতে হয়, উহা লাভ করিবার অভিপ্রায়েই কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মানবমাত্রেরই এমন কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন, যাহা তাহারা স্বয়ং উৎপাদন বা নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম। ঐ সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনের অক্ষমতাই কৃষক বা অকৃষক সম্প্রদায়কে পরস্পরের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে এবং এই অবস্থার উপরই মানবজাতির অর্থনৈতিক উন্নতির মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

কৃষক ও অকৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লিখিত আদান-প্রদান দ্বারা তাহাদের পরস্পরের অপরিহার্য্য অভাবগুলির নিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু মানবের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মানব-জাতির পক্ষে স্বাভাবিক এবং সহজাত। যেসকল অকৃষক অর্থাৎ শিল্পী এবং ব্যবসায়ীগণ নগরে বাস করে, তাহারা তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবন-যাত্রার জন্য অপরিহার্য্য প্রাথমিক অভাবগুলি পূরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ছাতা, জুতা, জামা প্রভৃতি পরিহার-যোগ্য বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ নিয়োজিত করিয়া থাকে। মোটকথা, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণের উপরই তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি নির্ভর করে। উপার্জ্জন বাড়িলে যে কাজ পায়ে হাঁটিয়া করা যায়, তাহা গাড়ী চড়িয়া সম্পন্ন করে; এবং ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্ত্তে শেষে মোটর-গাড়ী কিনে। উল্লিখিত দুই-শ্রেণীর অ-কৃষক লোকের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ ব্যবসায়ী-শ্রেণীর লোক-দিগকে ঐশ্বর্য্যশালী বলা যায়। যাহাদের প্রচুর সম্পদ আছে, তাহারাই ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া গণ্য। ঐশ্বর্য্যশালীগণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনী আখ্যাও প্রদান করা যায়। এই নিমিত্তই বাঞ্ছনীয় পদার্থমাত্রকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। সম্পদ শব্দের ইহা মোটামুটি ব্যাখ্যা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পদ শব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক। যে পদার্থ মানবের বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া মানবের সমস্ত অভিলষিত পদার্থই সম্পদ শব্দ বাচ্য নহে। কুব্জের সোজা হইয়া হাঁটিবার ইচ্ছা এবং কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তের সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে পারে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই; কারণ স্বাস্থ্য অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারা যায় না। যে সকল বাঞ্ছনীয় পদার্থের বিনিময়ে অন্য-কোনো পদার্থ ক্রয় করিতে পারা যায়, তাহাকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হয়। উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে সকল বস্তুকে সম্পদ বলা হইয়াছে, উহারা পার্থিব বা জড় পদার্থ। অপার্থিব কিছুই সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জগতের প্রায় যাবতীয় জড় পদার্থকেই সম্পদ বলা যাইতে পারে। রাস্তার ধূলি-কণাও ব্যক্তিবিশেষের নিকট সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আবার সমস্ত অপার্থিব পদার্থই যে সম্পদ নহে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। কোন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী কিম্বা চিকিৎসক

* লেখকের সুবৃহৎ কৃষি-গ্রন্থ।

ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ কালে তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। ব্যবসায়ের প্রসার অপার্থিব হইলেও উহা মানবের বাঞ্ছনীয় এবং হস্তান্তর-যোগ্য; সুতরাং ইহা প্রকারান্তরে সম্পদ বলিয়া গণ্য। উপরে সম্পদ বিষয়ে মোটামুটি ভাবে বলা হইল; কিন্তু এতদপেক্ষা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নতুবা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় অর্থনীতির তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জড় পদার্থকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে এবং পথের ধূলি-কণাও ব্যক্তি-বিশেষের নিকট সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হীরক এক প্রকার সম্পদ; কারণ মানবের বাঞ্ছনীয় এবং হস্তান্তরযোগ্য। হীরক প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়; সুতরাং প্রস্তরগুলি হইতে উত্তোলন করিয়া না ভাঙ্গিলে হীরক পাওয়া যায় না। কাজেই উহা সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবামাত্রই হীরক সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। নানাপ্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে মানবের বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিতে পারিলেই উহা সম্পদ শব্দ-বাচ্য হইতে পারে। প্রস্তর ভাঙিয়া বাহির করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাকে প্রচ্ছন্ন সম্পদ বলা যাইতে পারে। এইরূপ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং অন্যান্য যে সকল উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে, উহাকেও প্রচ্ছন্ন সম্পদ বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ সকল গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদগণ মানবের প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয় পদার্থ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে; এবং ঐ সকল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে কৃষকগণ অন্যান্য সামগ্রী লাভ করিতে পারে।

সম্পদ মানবের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী এবং মানবের এই আশঙ্কা-প্রসূত আগ্রহের প্রবলতা দ্বারাই সম্পদের গুরুত্বের তারতম্য এবং মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে দ্রব্যের সহিত উহার মূল্যের সম্বন্ধ বাহ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে একই পদার্থের মূল্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের আকাঙ্ক্ষার তারতম্যই এইরূপ মূল্যের ইতর-বিশেষের প্রধানতম কারণ। আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি এবং আকাঙ্ক্ষার অল্পতা হইতে মূল্য হ্রাস হইয়া থাকে। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মানবের আকাঙ্ক্ষারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউল, ডাউল প্রভৃতি খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যে-কোনো স্থানের অধিবাসীবর্গের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট থাকে; কারণ ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-শস্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হ্রাস হইয়া যায়। শস্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর সমান হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অন্য কোনও প্রকার প্রাকৃতিক কারণে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ এত কম হইতে পারে যে, স্থানীয় চাহিদা উহা দ্বারা কিছুতেই সঙ্কুলান হইতে পারে না। এই অবস্থায় খাদ্য-শস্যের জন্য যাহাদের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারা ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অন্য প্রকারের বহু পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও একটি পদার্থের মূল্য ঐ পদার্থ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যের পরিমাণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এই পরিমাণের তারতম্যের মূল বা ভিত্তি কি? কোনও একটা জিনিষের মূল্য টাকাতে প্রচলিত আছে। যেমন কাপড়ের দর জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিবে এক-জোড়া কাপড়ের মূল্য চারি টাকা। চাউলের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে এক টাকাতে পাঁচ সের অথবা এক মণ ৮ টাকায়। এইরূপ কোনো ব্যক্তির সম্পদের আভাষ দিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি ঐ ব্যক্তির এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা আছে। কিন্তু এইরূপ টাকার দ্বারাই সম্পদের ধারণা করা যায় না। সম্পদের যথার্থ ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ টাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইবে। টাকা সম্পদ হস্তান্তর করিবার একটি সুবিধাজনক অভিজ্ঞান বা নিদর্শন স্বরূপ। মনে কর কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর চাউলের প্রয়োজন হইয়াছে। এখন যদি এমন কোনো চাউলের ব্যবসায়ী পাওয়া যায়, যাহার বস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা হইলে অন্য-কোনও প্রকার নিদর্শন ব্যতীত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে চাউল পাওয়া যাইতে পারে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন টাকার পরিমাণের সহিত দ্রব্যের মূল্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় একটি দ্রব্যের মূল্য অপর একটি দ্রব্যে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়।

হীরক সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, হীরক প্রস্তর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদরূপে থাকে বলিয়া, প্রচ্ছন্ন সম্পদকে কার্য্যকরী সম্পদে পরিণত করিতে দুইবার উহাকে অবস্থান্তরিত করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ দুইটি অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এইরূপে প্রচ্ছন্ন বস্তুকে কার্য্যকরী অবস্থায় পরিবর্ত্তন করাকে উৎপাদন বলে এবং যাহারা উৎপাদন করে তাহাদিগকে উৎপাদক বলে। প্রত্যেক মনুষ্যই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদক। এই উৎপাদন করিবার ক্ষমতাই মনুষ্যকে অন্যান্য প্রাণী হইতে প্রভেদ করিয়া প্রাণী-জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া আসিতেছে। ইতরপ্রাণীবর্গের মধ্যে পাখীগণ নীড় নির্ম্মাণ করে; কিন্তু ঐ নীড় নির্ম্মাণ কার্য্যকে উৎপাদ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না; কারণ, উহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং নির্ম্মাণপ্রণালী একপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয়। জীবন-ধারণের জন্য অহরহঃ যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হইতেছে, তাহা প্রকৃতিই উৎপাদন করিতেছে। চিরদিন প্রকৃতি দ্বারা এই উৎপাদন কার্য্য চলিতে থাকিলে পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ক্রিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। উহার নাম ভোগ। সুতরাং উৎপাদক এবং ভোগ পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাত্মক। ভোগ চিরকালই উৎপন্ন সম্পদের ক্ষয় বা ধ্বংস করিয়া আসিতেছে। যদ্দারা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই সম্পদ শব্দ বাচ্য; আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য সম্পদের অবস্থান্তরের নাম ভোগ। যেমন আমরা বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। এই বস্ত্র কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি উৎপাদকগণের কার্য্যের ফল। ইহা নূতন অবস্থায় আমাদের গাত্র আচ্ছাদনের যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে, পুরাতন হইলে সেই আকাঙ্ক্ষা তদ্রূপ নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য দিন দিন উহার আবশ্যকতা কমিয়া যায় এবং অবশেষে আমরা উহাকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বর্জ্জন করি।

অর্থনীতি সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা বলা হইল, উহার সহিত কৃষিকার্য্যের কোনো প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। ধান্য উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১০ সের বীজ বপন করিতে হয়। এই বীজ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত; কারণ ইহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিবার শক্তি আছে। নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপযুক্ত চাষ-আবাদ ও বীজ বপন করিলে ঐ বীজ মাটি হইতে উপযুক্ত রূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া গাছের সৃষ্টি করে। আর ঐ গাছ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে উপযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ এবং পরিপাক করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে। মনে কর এইরূপে কৃষক দশসের বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে ছয়মণ ধান্য উৎপাদন করিল। সুতরাং তাঁতি, জোলা, দরজী এবং স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পী যেমন বস্ত্র ও অন্যান্য বেশ-ভূষার উৎপাদক, কৃষকও তদনুরূপ ধান্যের উৎপাদক। কৃষক একাধারে যেমন উৎপাদক, তেমন ভোগীও বটে; কারণ সে তাহার উৎপাদিত শস্যের কিয়দংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে জগতের অন্যান্য উৎপাদকের তুলনায় কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎপাদক; কারণ সে মানব জাতির অত্যাবশ্যক বস্তু উৎপাদন করে।

ভূমি, পরিশ্রম, ও মূলধন।

কৃষকগণ অন্যান্য উৎপাদকের ন্যায় আপন পরিশ্রম দ্বারা প্রচ্ছন্ন সম্পদকে অবস্থান্তরিত করিয়া প্রাপ্তব্য সম্পদে পরিণত করে। এই অবস্থান্তর করা ব্যাপারে কোন কোন বিষয় সবিশেষ প্রয়োজনীয় তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

ইন্ধন বা জ্বাল্যানী কাষ্ঠ মনুষ্যের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ; কারণ ইন্ধনের অভাবে রন্ধন অচল হইয়া পড়ে। যে সকল পল্লীর নিকট জঙ্গল আছে, ঐ সকল পল্লীর অধিবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই উহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এস্থলে ইন্ধন একটী প্রচ্ছন্ন সম্পদ এবং পল্লীবাসিগণের অরণ্যে যাইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ ও আনয়ন দ্বারাই এই সম্পদের অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, সম্পদ অল্প হইলেও কেবল পরিশ্রম দ্বারাই তাহারা উহা উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে উহা সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। কারণ এই উৎপাদকের জন্য যে কাঁচা মালের (Raw materials) প্রয়োজন, তাহা সহজ লভ্য নহে। বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, অথবা অনেক সময় বৃক্ষের তলদেশেও উহা পড়িয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষের অবস্থিতির জন্য ভূমির প্রয়োজন; সুতরাং দেখা যাইতেছে, উহা উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম ব্যতীতও আর একটী দ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে। উহা মৃত্তিকা। পল্লী-বাসিগণ নিত্য ব্যবহারের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করে; সুতরাং এখানে উৎপাদন এবং ভোগ সমতুল।

মনে কর, কোন এক নগরে ইন্ধনের যথেষ্ট চাহিদা আছে; অথচ নগরের প্রত্যেক পরিবার হইতে এক এক ব্যক্তিকে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রেরণ করাও সম্ভব পর নহে; এবং নগরের সন্নিকটে অরণ্য না থাকাও সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কাষ্ঠ সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাপার কোন একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় হইয়া পড়িবে। ঐ সকল লোক যেখানে অধিক কাষ্ঠ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তথায় যাইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক নগরে আনিয়া বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা আপন আপন আহার্য্যের সংস্থান করিবে। এখানেও ঐ কাষ্ঠ-ব্যবসায়িগণের প্রত্যেকেই যদি কাষ্ঠ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে উৎপাদন ও ভোগ তুল্যাতুল্য হইবে। এখন এই কাষ্ঠ-সংগ্রাহকগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তির একখানা কুঠার থাকে, তাহা হইলে সে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিবে; অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একখানা কুঠারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ করিলে, তাহার সংগৃহীত কাষ্ঠের পরিমাণ এইরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে, কাষ্ঠ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সম্পূর্ণরূপে তাহার খাদ্য-সংগ্রহের জন্যই ব্যয় হইয়া যাইবে না; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানবের খাদ্যাকাঙ্ক্ষা নির্দ্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ। এখানে দুইটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। প্রথম কুঠার এবং দ্বিতীয় উৎপাদন অপেক্ষা ভোগের অল্পতাহেতু সম্পদের সঞ্চয়। কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য কুঠারের প্রয়োজন, কারণ, কুঠারের সাহায্যে ঐ কার্য্য সহজসাধ্য হয় এবং এই জন্যই কাঠুরিয়া কুঠার পাইতে ইচ্ছা করে। কুঠার পাইতে হইলে, যে শিল্পী কুঠার প্রস্তুত করে, তাহাকে উহার পরিবর্ত্তে এমন সম্পদ দান করিতে হইবে, যাহা তাহার কোন এক ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কুঠারও একপ্রকার সম্পদ। এই প্রকার সম্পদকে মূলধন কহে। এখন মনে রাখিতে হইবে, উৎ-পাদনের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—(১) ভূমি, (২) পরিশ্রম, এবং (৩) মূলধন।

কৃষকগণের পক্ষে ভূমি যে অতি প্রয়োজনীয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সকল প্রকার উৎপাদনের জন্যই ভূমির প্রয়োজন হয়। বৃহৎ বৃহৎ কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়েও ভূমির প্রয়োজন। মনুষ্যের কার্য্যকারিতার ফলেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। মানুষের দাঁড়াইবার জন্যও মাটির প্রয়োজন হয়। অর্থনীতি অনুসারে জমি কি এবং উহার বিশেষত্ব কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়, সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভূমি মৌলিক পদার্থ (Material), এবং মানবের পক্ষে ইহা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ভিন্ন ইহা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া সম্পদ মধ্যে পরিগণিত। এই শ্রেণীর সম্পদের বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্থাবর এবং ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই ইহার মূল্য আয়তন অপেক্ষা, সংস্থানের উপর অধিক নির্ভর করে। কৃষিকার্য্যের জন্য যে জমির প্রয়োজন তাহার মূল্য ঐ জমির গুণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যে ভূমি সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন, অথবা জলপ্লাবিত সে ভূমি কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সহর অথবা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী স্থান কারখানার জন্য উপযোগী নহে। কারণ, কারখানা চালাইতে হইলে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল এবং বহু-সংখ্যক জন-মজুরের প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কৃষি কার্য্যোপযোগী ভূমির মূল্য ভূমির গুণের উপর নির্ভর করে। যে ভূমি চাষের পক্ষে উপযোগী এবং যাহাতে উত্তম

ফসল উৎপন্ন হয়, সেই জমিই কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত। মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডলস্থিত জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলি স্বতন্ত্রভাবে গুণহীন হইলেও, উহাদের বিবিধ প্রকার সংমিশ্রণ শস্যোৎপাদনের সহায়তা করে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন সম্পদের অর্থাৎ উল্লিখিত জৈব ও অজৈব পদার্থগুলির সহজ-প্রাপ্য অবস্থাই মাটির গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যদি মৃত্তিকামধ্যে ঐ সকল প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হয়, অথবা তাহারা সহজ-প্রাপ্য অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃত্তিকার গুণের ব্যত্যয় ঘটে। উৎপাদন কার্য্যের দ্বিতীয় সহায়তাকারী পরিশ্রম। ছুতার কোনো একটি গাছের গুঁড়ি অথবা স্থূল শাখা হইতে লাঙলের গাদা এবং লোহার মিস্ত্রি একখণ্ড লৌহ হইতে ফলা প্রস্তুত করে। এই দুই-শ্রেণীর পরিশ্রমের ফলে লাঙল উৎপন্ন হয়। ইহা একটি সহজ উৎপাদনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি বিশেষ উৎপাদনের বিষয় চিন্তা করিলে পরিশ্রমের পরিমাণ সহজ বলিয়া মনে হইবে না। এস্থলে বিবিধ প্রকার পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানাতে বহুসংখ্যক লোক শারীরিক পরিশ্রম আর কতকগুলি লোক মানসিক পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদান কার্য্যের সহায়তা করে। উৎপাদন কার্য্যের প্রত্যেক অবস্থা বা স্তর যাহাতে সমভাবে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে কাঁচা মাল ক্রয় এবং উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের সর্ব্বদা সুবন্দোবস্ত থাকে, এইরূপভাবে কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। শারীরিক এবং মানসিক দুইপ্রকার পরিশ্রমের বিভিন্নতা এইখানে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সুব্যবস্থামূলক উৎপাদন কার্য্যেই যে কেবল এই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, সহজ উৎপাদন কার্য্যেও একই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূত্রধর লোহার মিস্ত্রির কার্য্যে অপারগ বলিলে এ কথা বুঝা যায় না যে, সূত্রধর লৌহকারের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। আসল কথা, লৌহের কার্য্যে যে মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যক তাহা সূত্রধরের আয়ত্তে নাই।

উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহার বিশেষত্ব কি, এবং কেনই বা মনুষ্য ঐ পরিশ্রম স্বীকার করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক মনুষ্যেরই আকাঙ্ক্ষা আছে এবং এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য তাহার সম্পদের প্রয়োজন। কারণ সম্পদের বিনিময় ব্যতীত কোন আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ লাভ করা যায় না। আবার পরিশ্রম ব্যতীতও সম্পদ লাভ হয় না বলিয়া মানব মাত্রকেই পরিশ্রম করিতে হয়। এখন দেখা গেল যে, কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে হইলেই পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। অতঃপর আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কোথায় এবং কি ভাবে পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে হইবে। পরিশ্রম বিবিধ প্রকারের, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোকের আবশ্যক হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ লাভ করিবার জন্য যেমন পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি তাহাকে এমন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যে স্থানে পরিশ্রম দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু উৎপাদন করিলে অনায়াসে তাহা বিক্রীত হইতে পারে। ভূমির ন্যায় পরিশ্রম নিশ্চল বা স্থাবর নহে, কিন্তু পরিশ্রমের বিশেষত্ব এই যে ইহার গতিক্ষমতা অসম্পূর্ণ। জনসাধারণেরই কোন-একটা বিশেষ স্থানের প্রতি একটা ভালবাসার আকর্ষণ আছে। ঐ স্থানকে বসত-বাটী বলে। ঐ বসত-বাটীতে বাস করিয়া পরিশ্রম দ্বারা আশানুরূপ সম্পদ না পাইলেও, অর্থাৎ ঐ পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ দ্বারা তাহার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হইলেও এবং বিদেশে যাইয়া পরিশ্রম দ্বারা অধিক সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও আপন বসত-বাটী ছাড়িয়া তাহারা তথায় যাইতে চাহে না।

শারীরিক ও মানসিক ভেদে পরিশ্রম দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানব-জাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আকাঙ্ক্ষাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য সম্পদও পরিমাণে অধিক এবং বিবিধ প্রকার হইয়াছে। 'যে সকল কার্য্যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, সেইদিকেই মনুষ্যের অধিক আকর্ষণ; কারণ এইরূপ কার্য্যে অধিক পরিমাণ সম্পদ লাভ হয়। লৌহকার বুদ্ধিমান ও উন্নতিশীল হইলে ক্রমে সাধারণ দোকান ছাড়িয়া ছোট কারখানা খুলিতে পারে এবং ঐ কারখানাতে কলের সাহায্যে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। ইহার ফলে সে শারীরিক পরিশ্রম লাঘব করিয়াও অধিক সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কায়িক পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য কলের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করাই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে এই বিষয়টির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে এই প্রশ্ন এখন পর্য্যন্তও জটিল হয় নাই, সুতরাং এখানে ইহার কেবলমাত্র উল্লেখ করা গেল।

উৎপাদনের নিমিত্ত আর একটি পদার্থ অতি প্রয়োজনীয়, উহাকে মূলধন বলে। ইতঃপূর্ব্বে কাঠুরিয়ার প্রসঙ্গে তাহার কুঠারকে মূলধন বলা হইয়াছে; কারণ কুঠারের সাহায্যে সে সম্পদ অর্জ্জন করে। কুঠার কাঠুরিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং ইহা ক্রয় করিতে তাহাকে সম্পদ ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং এই সম্পদ সঞ্চয় করিতে তাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহার ভোগের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক সম্পদ অর্জ্জন করিয়া তাহাকে তাহা সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। কুঠার ক্রয় করিবার পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাহার সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহার খাদ্যের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা এখন সে ভোগের জন্য অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ।

কুঠার মূলধন বলিয়া সম্পদ মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহের নিমিত্ত কুঠার ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পদ উপার্জ্জনের সহায়তা করে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে সম্পদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ সম্পদ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অতএব মূলধনমাত্রই সম্পদ; কিন্তু সম্পদমাত্রই মূলধন নহে। কৃষক কৃষি-কার্য্য দ্বারা অধিক ধান্য উৎপাদন করিলে, এ ধান্য তাহার সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়। এই ধান্যের যে অংশ তাহার আহার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়, তাহাকে মূলধন বলা যায়; কিন্তু উহা প্রত্যক্ষভাবে মূলধন নহে, পরোক্ষভাবে মূলধন। কারণ আহারের অভাব হইলে কৃষক কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম হইত, সুতরাং সম্পদ উৎপাদন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। এই উৎপাদিত ধান্যের যে

অংশ বিক্রয় করিয়া কৃষক তৈজস এবং অলঙ্কার ইত্যাদি ক্রয় করিল, ঐ তৈজস এবং অলঙ্কারাদিও সম্পদ; কিন্তু উহা মূলধন নহে; কারণ ঐ সকল ক্রয় করিতে যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হইয়াছে, উহা বিক্রয় করিলে তদতিরিক্ত সম্পদ লাভ করা যাইবে না। কিন্তু ঐ উৎপাদিত ধান্তের অবশিষ্ট যে অংশ বীজের জন্ম রক্ষিত হইয়াছে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ ঐ বীজ ধান্ত বপন করিয়া, পরবর্ত্তী বৎসর যে ধান্ত উৎপাদিত হইবে, তদ্দারা ঐ কৃষকের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যের জন্যও জমি, পরিশ্রম এবং মূলধন এই-তিনটী পদার্থ অতি প্রয়োজনীয়।

জাতি-তত্ত্ব

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

১। অথাতো জাতি-জিজ্ঞাসা।

বড় ফ্যাসাদে পড়িলাম। সূত্রকার চিরকালই সূত্রকার,—তিনি সূত্র করিয়াই খালাস। ভাষ্য কিম্বা টীকা টিপ্পনির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাই সনাতন প্রথা। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র সঙ্কলন করিলেন; কিন্তু তাহার ভাষ্য তিনি করেন নাই। গৌতমাদি সূত্রকার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। কিন্তু আমি যে সূত্র করিতেছি, ইহার ভাষ্য করিবেন কে বা কাহারা? শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি বহুকাল হইল গত হইয়াছেন। আর যে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন, এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার, পৃথ্বী বিপুলা এবং কাল নিরবধি হইলেও, আমার তুল্য সমানধর্ম্মা অর্থাৎ আমার মত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত আর যে কেহ আছে বা হইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? কাজেই দেখিতেছি, সনাতন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া, আমারই কৃত সূত্রের ভাষ্য আমাকেই করিতে হইবে। অনেক ভাগ্যবান্ পুরুষ যেমন জীবিত থাকিতে নিজেদের শ্রাদ্ধ নিজেরাই করিয়া যান, সূত্রকারেরও অনেকটা তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে।

প্রথমেই "অথাতোর" ভাষ্য। এ সম্বন্ধে যুগ যুগান্তর ধরিয়া এত রাশি রাশি ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে যে, আমার নূতন করিয়া আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। নূতন যে কিছু বলিতে পারি না, তাহা নহে। কিন্তু নূতন কিছু বলিতে আমার আপত্তি আছে। আমি যাহা বলিব, তাহা পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই;—অন্ততঃ আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহার ফল হইবে কি? তাহার ফল হইবে এই যে, শঙ্করের আসন টলিবে রামানুজের আসন হেলিবে, এবং অনেক তথাকথিত দার্শনিকের গৌরব চিরকালের জন্ম বিনষ্ট হইবে। ফল কথা, ইঁহাদের সকলেরই জাতি যাইবে। জাতি-তত্ত্ব লিখিতে বসিয়া কাহারও জাতি মারা আমি সঙ্গত মনে করি না। অতএব "অথাতঃ"—পদটি অনন্ত কালের জন্ম ভাষ্যশূন্য রহিয়া গেল।

এখন "জাতি জিজ্ঞাসা।" ইহার সরল অর্থ হইতেছে এই—জাতি-তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা। কাহার বা কিসের জাতি-তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা? বানর, বানর হইয়া জন্মিল কেন, কেন সে মানুষ হইল না? আবার, অনেক মানুষ মনুষ্যবংশে জাত হইল কেন, কেন তাহারা বানর-বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিল না? ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, প্লীহা-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী জাতি কালে কালে সচল বাঁশ হইবে কি না, পক্ষান্তরে একটি শুষ্ক বংশ-দণ্ডের উপর একটা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হাঁড়ি রাখিয়া দিলে তাহাকে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর বলা চলে কি না,—ইত্যাদি বিষয় জাতি-তত্ত্বের আলোচ্য নহে। আবার, কোন কোন মনুষ্যের মধ্যে সর্প-বৃত্তি বা কুকুর-বৃত্তি বা ব্যাঘ্র-বৃত্তি খুব প্রবল দেখা গেলেও, তাহাদিগকে সাপ, কুকুর বা বাঘ না বলিয়া মানুষ বলা হয় কেন, তাহাও জাতি-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নহে। আবার, মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দিবসে হবিষ্যান্ন এবং রাত্রে কুক্কুট-মাংস ভোজন করেন, ধর্ম্মহিসাবে তাঁহারা কোন্ জাতির অন্তর্গত, তাহাও জাতি-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু এরূপ নেতি-নেতি ব্যাখ্যার দ্বারা ইতির দর্শন কখনও মিলিবে কি না, তদ্বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। অতএব, জাতি-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মনুষ্যগণের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাংশ হিন্দু নামে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি কতকগুলি জাতি আছে। এই শাস্ত্রে তাঁহাদের তত্ত্ব আলোচিত হইবে। কি প্রকারে ঐ সকল জাতির উদ্ভব হইয়াছে, উহাদের আকার প্রকার বিকার সংস্কার—অর্থাৎ বহু উপসর্গযুক্ত কৃ ধাতুর উত্তর ঘঙ্-প্রত্যয় এই শাস্ত্রে আলোচিত হইবে।

২। জন্মনা জাতিঃ।

লোকে জন্ম দ্বারাই জাতি লাভ করে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্র শূদ্র হয়। ইহার ব্যত্যয় হয় না, হইবার উপায় নাই। এ নিয়মটি খুবই স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিংহ-পুত্রের যেরূপ শৃগাল এবং শৃগাল-নন্দনের যেরূপ সিংহ হইবার উপায় নাই; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ-কুমার কখনও শূদ্র এবং শূদ্র-পুত্র কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

আমি জানি, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের তথা হিন্দু সমাজের আত্মশ্রাদ্ধ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, তাঁহারা হিন্দুদিগের এই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিস্তর কথা বলিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিতে পারিলেই যে তাঁহারা মক্ষিকা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া হংস-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা নহে। তথাপি এ সম্বন্ধে দুটো কথা বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, তাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের বংশপরম্পরাগত আচারে নিষ্ঠা অচলা হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্ম হিন্দু সমাজের জাতির স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আমি এ স্থলে কিছু বলিতেছি।

গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার একটা কথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রাইচরণ রজক তাহার গাধাটাকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলিয়াছিল;—তথাপি সেটা

মরিবার পূর্ব্বে ঘোড়া বা ঘোড়ার মত অন্ততঃ কতকটাও হয় নাই। অতএব, যাহা গাধা, তাহা আমরণ গাধাই রহিয়া যায়। এমন কি, আমার মনে হয়, মৃত্যুর পরও তাহার গর্দ্দভত্ব ঘুচে না। কারণ, যে যেরূপ সংস্কার লইয়া দেহ-ত্যাগ করে, প্রেত-লোকেও তাহার সেই সংস্কার রহিয়া যায়। গাধার মৃত্যু পর্য্যন্তও সংস্কার থাকে যে, সে গাধা ;—সে ঘোড়া বা অন্য কিছু নহে। অতএব, মৃত্যুর পরও তাহার ঐ সংস্কার রহিয়া যায় এবং প্রেত লোকেও সে গর্দ্দভত্ব প্রাপ্ত হয়। খুব সম্ভবতঃ সেখানেও তাহার ধোপার বোঝা বহিতে হয়। এই জন্যই আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এই যুক্তি অনুসারে, যে যাহা হইয়া জন্মিয়াছে, সে আমরণ এবং সম্ভবতঃ তৎপরও তাহাই রহিয়া যায়। তাহার অন্য কোন বস্তু বা জীব হইবার উপায় নাই। সুতরাং বাঘ কখনও সিংহ হইবে না, সিংহ কখনও হাতী হইবে না, হাতী কখনও বানর হইবে না, এবং বানর কখনও (নিপাতনে ব্যতীত) মানুষ হইবে না। আশা করি, এ স্থলে Darwinএর দোহাই দিয়া কেহ কুতর্ক তুলিবেন না। Darwin যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বজাতির পক্ষেই খাটে ;—হিন্দুর পক্ষে খাটে না। Darwinএর Theoryর প্রধান ভ্রম এই যে, তিনি তাঁহার স্বজাতি ও তাহার আদি পুরুষের মধ্যে যে চমৎকার ঐক্যটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অপ্রচুর কারণে generalise করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা বলে জাতি জিনিষটা যখন গুণ ও কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, তখন গুণবান্ সুকর্ম্মা শূদ্র কেন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে না, এবং নির্গুণ কুকর্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণ কেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে না? কেন জাতি জিনিষটা stereotyped রহিয়া যাইবে? অবস্থা বিশেষে জাতির উন্নতি বা অধোগতি কেন হইবে না?

এ বড় গভীর তত্ত্ব। যে হিন্দু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, সে এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আবার, হিন্দুসন্তান মাত্রেই যে ইহা বুঝিতে পারিবে, এমনও বিশ্বাস করি না। দীর্ঘকালের টিকি ধারণ এবং পুরুষানুক্রমিক তিলক-করণ প্রভৃতি কঠোর সাধনা ব্যতীত এ তত্ত্ব বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি আমি এ তত্ত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। লক্ষের মধ্যে একজনও আমার কথাটা বুঝিতে পারিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, যখন সকলেই মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে জাতির এ পার্থক্য কেন? যদি গুণ বা কর্ম্ম হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটা বিভাগ করিতে চাও, কর ;—আপত্তি নাই। কিন্তু গুণ বা কর্ম্মের ব্যত্যয়ে জাতির ব্যতিক্রম হইবে না কেন? শাস্ত্রেই ত আছে, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" শাস্ত্রেই ত দেখিতে পাই, গুণকর্ম্মপ্রভাবে উচ্চ জাতির নীচ এবং নীচ জাতির উচ্চ হইবার বিধান আছে। আমাদের পুরাণেতিহাসে ইহার প্রমাণও আছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরাশর বৈশ্যের কন্যাগর্ভজাত এবং তৎপুত্র ব্যাসদেব জেলেনীর ছেলে হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। জমদগ্নি এবং প্রমতির মাতাদ্বয়ও ব্রাহ্মণী ছিলেন না, তথাপি তৎপুত্রগণের ব্রাহ্মণত্বে বিঘ্ন হয় নাই। এরূপ আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তবে বর্ত্তমান সময়ে জাতি জিনিষটা stereotyped হইবে কেন?

কেন হইবে, তাহা বলিতেছি। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বচন বা পুরাণেতিহাসের দোহাই দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রের দুই-চারিটা বচন বা পুরাণের দুই-চারিটা উপাখ্যান দ্বারা যাঁহারা সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের নাড়ী পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্তই কুবৈদ্য। আমাদের অনন্ত শাস্ত্রাম্বুধির কয়টি রত্ন তুমি উদ্ধার করিতে পারিয়াছ? তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত দুই-চারিখানি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াই যদি তুমি আমাদের শাস্ত্র-সাগরের রত্নের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, এবং বাতুল, এবং আহাম্মক, এবং দুর্ম্মুখ, এবং অর্ব্বাচীন,—এবং তুমি তৎসমুদায়, যেগুলি প্রকাশ করিয়া বলিলে আমার মানহানির মোকদ্দমায় পড়িবার সম্ভাবনা আছে। বলি, যাহা সত্য বা ত্রেতা বা দ্বাপর যুগে হইয়াছিল, কলিযুগেও কি তাহাই হইতে হইবে? তবে, কলিযুগটা কেন সত্য বা ত্রেতা দ্বাপর হইল না? কলিযুগটা কলিযুগ হইল কেন? অতএব, অকাট্যরূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের বা পুরাণ-ইতিহাসের নজীর দেখানো চলে না।

এখন, বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা। এটা না কি বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞানের দ্বারাই এখন না কি আমরা সকল বিষয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাই,—তাই বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারাই আমি এখন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে, দ্বিজসন্তান সহস্র প্রকারে কুক্রিয়াসক্ত হইলেও, কখনও শূদ্র হইতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে শূদ্রপুত্র যতই গুণবান্ ও ক্রিয়াবান্ হউক না কেন, শতধৌত অঙ্গারের মলিনত্বের ন্যায় তাহার শূদ্রত্ব কিছুতেই ঘুচিতে পারে না।

আম, নানাজাতীয় আছে। ফজলি, ল্যাংড়া, বোম্বাই—এ সমস্ত আম, আবার, যশোহর খুলনার কীট-গর্ভ তীব্র যমদূতিকাপরাক্রমী আমও আম। চেষ্টা করিয়া দেখ ত, এই শেষোক্ত আমকে তুমি ফজলি বা ল্যাংড়াতে পরিণত করিতে পার কি না? তাহা যদি না পার, শত সাধনায়ও তাহা যদি অসম্ভব হয়, তবে তমোগুণের ডিপো শূদ্রকে তুমি কেমন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিবে? আবার, স্থান ও তদ্বিরের দোষে ফজলি আম যতই ক্ষুদ্র ও স্বাদহীন হউক না কেন, তথাপি তাহা ফজলি আমই রহিয়া যাইবে ;—তোমার ঐ কীটক্ষত টকো আম অপেক্ষা চিরকালই শ্রেষ্ঠ থাকিবে। কর্ম্মদোষে দ্বিজসন্তানের যতই অবনতি হউক না কেন, শূদ্র অপেক্ষা চিরকালই সে শ্রেষ্ঠ থাকিবে, তাহার হৃদ্গুহাভ্যন্তরস্থিত ব্রহ্মাগ্নি যতই নির্ব্বীর্য্য হউক না কেন,—সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত কখনই হইতে পারে না। চাষ ও যত্নের গুণে যেমন ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত স্বাদহীন ফজলি আম ক্রমে বড় ও সুস্বাদু হইতে পারে, সেইরূপ অধোগত ব্রাহ্মণকুমারও অনুশীলন ও তপোপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্বের মহামহীরুহে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ত তাহা সম্ভব নহে। কেন না, শূদ্রের পক্ষে একে ত তপস্যা নিষিদ্ধ ; তার পর, তপস্যা ও অনুশীলন করিলেই বা ফল কি? উষর ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ

অনুষ্ঠিত হয় না, হইতে পারে না;—তপস্যা দ্বারা শূদ্রেরও তদ্রূপ কোন উন্নতি হইতে পারে না। এই জন্য দ্বিজ-নন্দন যতই অনাচারী বা কুক্রিয়াসক্ত হউন না কেন, তাঁহার পদ পরম ভাগবত শূদ্রের মস্তকে চিরকালই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অতএব, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই কলিযুগে কোন কারণেই কোন ব্যক্তির জাতির ব্যত্যয় হইতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুর জাতি stereotyped। কিন্তু এই কথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধি ভগবান্ যাহাকে দেন নাই, আমি তাঁহাকে ইহা কেমন করিয়া বুঝাইব!

৩। অনাদ্যনন্তা সা।

সেই জাতি আদিহীন ও অন্তহীন। যাহার আদি নাই, তাহার অন্তও থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখন কথা এই, হিন্দুর জাতি আদিহীন হইল কি করিয়া? স্বয়ং ভগবান্ই ত বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রেও ত দেখিতে পাই, ব্রহ্মার অঙ্গ-চতুষ্টয় হইতে বর্ণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা সৃষ্ট, যাহা উৎপন্ন, তাহা ত অনাদি হইতে পারে না,—তাহারি ত আদি আছে। তবে, এই সূত্রে যে জাতি জিনিসটাকে অনাদি বলা হইল,—এটা কি সূত্রকারের গঞ্জিকা-প্রীতির লক্ষণ বা তাঁহার বাতুলতার পরিচায়ক?

অনেক বাতুলই এই সূত্রকারকে বাতুল মনে করিয়া থাকেন, এবং অনেক গঞ্জিকা-সেবীই এই সূত্রকারকে তাঁহাদের স্বসমাজভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। তাহাতে এই সূত্রকারের কিছুই আসিয়া যায় না। সে সব কথায় সূত্রকার মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৭ সূক্তে (যাহা হিন্দুসমাজে পুরুষ সূক্ত নামে বিখ্যাত এবং যাহা ম্লেচ্ছ-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বিরীকৃত হইয়াছে) সেই পুরুষ-সূক্তে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ ছিলেন মুখ, ক্ষত্রিয় ছিলেন বাহু, বৈশ্য ছিলেন উরু এবং শূদ্র ছিলেন পদ। এই যে বিরাট পুরুষ,—বলা বাহুল্য ইনি অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার অঙ্গীভূত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ও যে অনাদি ও অনন্ত, তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আবার, বেদ জিনিষটাই অনাদি। যাহা অনাদি জিনিষে বিবৃত হইয়াছে, তাহা ত অনাদি হইবেই। তবে, যাঁহারা বেদ মানেন না, সে সকল ম্লেচ্ছাচারী অহিন্দুর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ধর্ম্মসর্ব্বস্ব হিন্দু মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য যে জাতি অনাদি ও অনন্ত।

৪। এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পঞ্চাদিক্রমেণাসংখ্যেয়া।

হিন্দুর জাতি প্রথমে ছিল এক, পরে হইল দুই, তার পর তিন, তার পর চারি, তার পর পাঁচ,—এইরূপে ক্রমে যাহা হইল তাহা আর গণনা করিয়া নির্ণয় করা যায় না। এই সূত্র যাহা বলা হইল, তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। যখন আর্য্যগণ এ দেশে আসেন নাই, অন্য কোন শ্রেণীর মানুষের সহিতও তাঁহাদের তেমন কোন সংস্রব হয় নাই, তখন তাঁহারা ছিলেন মাত্র একজাতি। সে সময়ে সম্ভবতঃ তাঁহারা আপনাদিগকে "দেব" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা যখন এ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, এবং এ দেশের আদিম-নিবাসিগণের সহিত নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট হইলেন, তখন এই "দেবগণ" হইলেন আর্য্য ও এ দেশের আদিমনিবাসিগণ হইল অনার্য্য। এই প্রকারে দুই জাতির উদ্ভব হইল। পরে যখন শ্রমবিভাগের গুণেই হউক, কিম্বা যে কারণেই হউক, আর্য্যগণের মধ্যে জাতি-বিভাগের উৎপত্তি হইল, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত হইলেন, এবং অনার্য্যগণ হইল শূদ্র-নামে অভিহিত হইলেন। ফলে চারি বর্ণের উদ্ভব হইল। যে জাতিভেদ কালে হিন্দু-সমাজে মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন কালে এইরূপে তাহার শাখা-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এখন একটা কথা এই, বৈদিক যুগের জাতি-বৃক্ষটি কি শাখা-চতুষ্টয়-সমন্বিত ছিল, কিম্বা উহা পঞ্চশাখ হইয়াছিল? ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে "পঞ্চক্ষিতি", "পঞ্চজন" এবং "পঞ্চকৃষ্টি" এই শব্দগুলির প্রয়োগ আছে। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদেও এই শব্দগুলির উল্লেখ দেখা যায়। সায়ণ এই শব্দগুলির নানাস্থলে নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার একটি অর্থ হইয়াছে এই—চারি বর্ণ এবং নিষাদ জাতি। যদি সায়ণের এ ব্যাখ্যা খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে মনে করিতে হইবে যে বৈদিক যুগেই হিন্দুর জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল।

তার পর, এই জাতি বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া এখন কত শত বা কত সহস্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?" "At the census of 1901 no less than 2300 distinct castes were recorded and there can be no doubt that the number now cannot be far short of 3,000." (Gour's Hindu Code, General Introduction, P 215.) অতএব, মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আপাততঃ হিন্দুর জাতির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। কাল যখন নিরবধি, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, এক দিন হিন্দুসমাজে যত লোক তত জাতি হইবে। কিন্তু দুঃখ এই, সূত্রকার সে শুভদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন না!

এখানে একটা দার্শনিক তর্কের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। পূর্ব্ব সূত্রে দেখানো হইয়াছে, হিন্দুর জাতি অনাদি। এই সূত্রে প্রমাণ করা হইল, হিন্দুদিগের নিত্য নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। যাহা অনাদি, তাহার ত উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে, এ ব্যাপারটা হইল কি?

ব্যাপারটি অতি সরল। এই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কোন মতেই পূর্ব্ব সূত্রের বিরোধী নহে এবং তদ্দ্বারা জাতির অনাদিত্ব ধ্বংস হইতেছে না। অতি ক্ষুদ্র একটা বীজের মধ্যে যেমন সহস্রশাখ প্রকাণ্ডকায় বটবৃক্ষ latent অবস্থায় বিরাজিত থাকে, হিন্দুর সেই সর্ব্বপ্রথম এক-জাতির মধ্যে কোটি কোটি জাতি latent অবস্থায় বিরাজিত ছিল। ইংরাজিতে যাহাকে বলে latent life, আদিকালে হিন্দুর জাতির অবস্থা তদ্রূপ ছিল। সময় ও সুযোগ পাইয়া, সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে।

ফল কথা, পুরুষ সূক্তে ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে যেরূপ বলা হইয়াছে "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" ;—হিন্দুদিগের জাতিসম্বন্ধেও সেইরূপ বলা চলে যে, তাহাদের জাতি বর্ত্তমানে যতটা দেখিতেছ তাহার উপরও দশ অঙ্গুলি আছে এবং চিরকালই থাকিবে।

৫। দেবানামপি দৈবতম্।

হিন্দুর জাতি যে শুধু হিন্দুর নিকটই অর্চ্চনীয় তাহা নহে ;—হিন্দু যে তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্চ্চনা করেন, সেই দেবগণও ইহার পূজা করেন। ইহার স্থূলার্থ এই, হিন্দুর উপাস্য দেবগণও এই জাতিভেদের নিগড় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পারিবার উপায় কি? দেবগণের আদি আছে, কিন্তু জাতি যে অনাদি। যাহা অনাদি, তাহা আদির উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই ত!

আপনারা হয় ত বলিবেন, দেবগণের আবার জাতি কি? কিন্তু দেবগণেরও জাতি আছে। বহু হিন্দুশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ আছে। "মনুষ্যের ন্যায় দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত। দেবগণের মধ্যে অগ্নি বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র বরুণ সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়, বায়ু রুদ্র আদিত্য বিশ্বদেব ও মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য, পূষা প্রভৃতি শূদ্র।" (৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ, ৫৪ পৃষ্ঠা।) দেবগণের এই জাতি মাত্র চারিটি বর্ণে সীমাবদ্ধ আছে, কিম্বা স্বর্গলোকের আবহাওয়ার গুণে বহুসহস্রে পরিণত হইয়াছে, সে সংবাদ আমি অদ্য আপনাদিগকে দিতে পারিলাম না। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে মনে করিতে হইবে যে, স্বর্গলোকের মৃত্তিকা ও জল-বাতাস তেমন ভাল নহে। অথচ এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমরা কতই না ব্রত-নিয়ম পালন করি, এবং গোটাকতক অনুস্বার ও বিসর্গের বিনিময়ে কষ্টার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করি! তবে, সম্ভবতঃ এ বিষয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। হিন্দুদিগের তিন হাজার জাতি হইতে নিত্য যে সকল লোক স্বর্গে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, তাহাতে কি এখনও তথায় অন্ততঃ তিন হাজার জাতির উৎপত্তি হয় নাই?

৬। মরণেঽপি মরণ-রহিতা।

হিন্দুর মৃত্যু হইলেও তাহার জাতির বিনাশ হয় না ;—জাতি জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে যায়। মনু বলিয়াছেন, একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদ্ কেন না নিধন-কালেও তাহা অনুগমন করে ;—কিন্তু আর সকলই শরীরের সঙ্গে বিনষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি না, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কারণ, দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক—অর্থাৎ টিকি রাখে, মৃগচর্ম্মের জুতা পরে, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটে এবং রাস-লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে, মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রগণও তাহাকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিস্তর হাঙ্গামা করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, ঘটা করিয়া কাঙ্গালী বিদায় করে এবং গয়ায় যাইয়া বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ড দেয়। ধর্ম্ম যদি সঙ্গেই যায়, তবে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠার জন্য এত হাঙ্গামা কেন? অতএব, ধর্ম্ম সঙ্গে যায় কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু জাতি যে সঙ্গে যায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন না, তিনি নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীর পণ্ডিতসমাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, ক্ষত্রিয়ের পিণ্ডদানকালে যদি "বর্ম্মা" উল্লেখ না করিয়া "শর্ম্মা" বলা হয়, তবে সে পিণ্ড কখনও ঠিকানায় পৌঁছে না, দাতার নিকটও তাহা ফিরিয়া আইসে না ;—সম্ভবতঃ তাহা প্রেত-লোকের Dead letter office-এ জমা হইয়া থাকে এবং ঐ আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ হয়ত উহা লইয়া বিলক্ষণ একটু বিব্রত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে, মানুষ অর্থাৎ হিন্দু মরিলেও তাহার জাতি মরে না।

৭। দৃঢ়সংস্কার মূলা হিসা।

হিন্দু সন্তানের মনোভূমিতে জাতিবিষয়ক যে সংস্কাররূপ বৃক্ষ, তাহার মূল অতিশয় দৃঢ়। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে হিন্দুর মনে জাতি-বিষয়ক যে সংস্কার বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহার মূল উচ্ছেদ করা স্থল-বিশেষে শুধু কঠিন নহে,—একেবারেই অসম্ভব। "তোলা ভার একবার গজালে শিকড়" ;—এ লক্ষমূল বৃক্ষের শিকড়গুলি এরূপভাবে গজাইয়াছে যে, কাহার সাধ্য সেগুলি তুলিয়া ফেলিতে পারে? এই জন্য দেখা যায়, যে সকল হিন্দুসন্তান খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম বা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে নীত হন, জাতির সংস্কার হইতে তাঁহারাও অনেক সময়ে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্ম হইলেও কন্যার বিবাহের সময়ে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মের পুত্রেরই অনুসন্ধান করেন। কায়স্থের ছেলে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পারতপক্ষে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিনী গুণবতী নমঃশূদ্রকন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন না। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী পারিয়া-মুসলমান বা নমঃশূদ্র-খৃষ্টানের নিকট "আমি ব্রাহ্মণ-মুসলমান" বা "আমি কায়স্থ-খৃষ্টান" বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্ম হইলেও সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের অন্নে রুচি বোধ করেন না। এ বিষয়ে আরও যে সকল কথা বলিবার আছে, তাহা কোন সম্প্রদায়েরই মুখরোচক হইবার সম্ভাবনা নাই। সূত্রকার নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা হইলেও অবস্থায় ফেরে কিঞ্চিৎ শঙ্কাযুক্ত ও পরমুখপ্রেক্ষী ;—কাজেই এ সূত্রটার ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করিতে হইল।

৮। প্রতিষ্ঠাপ্রদাত্রী সা জন্মাধিকারহন্ত্রী চ।

জাতি লোককে প্রতিষ্ঠা প্রদান করে, আবার স্থলবিশেষে তাহার জন্মাধিকারও হরণ করে। তুমি মূর্খ কুক্রিয়াসক্ত ও তমোগুণের আধার হইলেও জন্ম মাত্রই তুমি ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ক্ষত্রিয় যতই গুণবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হউক না কেন, সে তোমার পদধূলি গ্রহণ করিতে বাধ্য ;—তোমার উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ-স্বরূপ তাহার পরম ভক্ষ্য ;—তোমার শ্রীমুখোচ্চারিত অস্থানে অনুস্বারযুক্ত ও যথাস্থানে বিসর্গ-বিরহিত গোটাকতক শব্দ তাহার ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল-নিদান। আবার, ঐ লোকটি

চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই তোমার সহিত একই আকাশ-বাতাস উপভোগ করিতে নিষিদ্ধ, একই জলাশয়ের জল ব্যবহারে অক্ষম এবং যে মন্ত্রে তুমি দেবতার অর্চ্চনা কর তাহা উচ্চারণ করা দূরে থাকুক,—শ্রবণ করিতেও সে অসক্ত। এমন কি, তোমার সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতাও তাহার স্পর্শে অপবিত্র হইয়া পড়েন,—তাঁহাকে গোমূত্র দ্বারা স্নান এবং গোময় অনুলেপন করিয়া দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। হিন্দুসমাজের এই নিয়মটি যে পরম সঙ্গত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, হিন্দুসমাজের এই বিধিটাকে যাঁহারা পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত মনে করেন, সেই মিশনারি সম্প্রদায়ের জাত-ভায়ারাও আচরণের দ্বারা পদে পদে ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের আচরণের দ্বারা স্পষ্টই এ কথাটা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের মতে তাঁহারা সাহেবের জাতি বলিয়াই এ দেশীয়গণের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহারা যে সকল সুখ-সম্ভোগের অধিকারী, শুধু ভারতীয় বলিয়াই আমাদের সে সকল দাবী করিবার অধিকার নাই ;— এমন কি, স্থলবিশেষে আমাদের কতকগুলি জন্মাধিকারও আমাদের দাবী করা চলে না। সুতরাং জাতি-জিনিষটা যে স্থল-বিশেষে প্রতিষ্ঠা প্রদান করে এবং অবস্থা-বিশেষে জন্মাধিকার হরণ করে, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

৯। হেয়াঃ হীনজাঃ স্বধর্ম্মে সম্পূজ্যাস্তদপরিবর্জ্জনে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা নিম্ন জাতীয়, তাহারা যতকাল স্বধর্ম্মে থাকে ততকাল ঘৃণার পাত্র। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া উঠে। পারিয়া নিম্নজাতীয় হিন্দু ,—অতএব, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট সে ঘৃণার পাত্র। তাহাকে দেখিলে স্নান করিতে হয়, তাহার ছায়াস্পর্শে গোময়-ভক্ষণে শুদ্ধ হইতে হয়, এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া গোমুখী হইতে সাগর পর্য্যন্ত সমুদায় গঙ্গাটায় অবগাহন স্নান করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয়। কিন্তু সেই পারিয়া যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান বা মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সেলাম করিতে বাধা নাই, তাহার সহিত করমর্দ্দন অনেক সময়ে বাঞ্ছনীয় হয়, স্থানবিশেষে তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করিতে পারিলে গৌরব বাড়ে, এবং অবস্থাবিশেষে তাহার সহিত রাত্রে এক টেবিলে আহার করিতে পারিলে জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। নমঃশূদ্র হিন্দু, কিন্তু নিম্নজাতীয়। অতএব, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর নিকট সে হেয়। সে এতই হেয় যে, উচ্চ শ্রেণীর পরামাণিকেরা পর্য্যন্ত তাহার ক্ষৌরি কার্য্য করে না। কিন্তু এই পরামাণিক নন্দনেরা পরধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টান ও মুসলমানগণের পিঁয়াজ-রসুন-গন্ধামোদিত দাড়ি কামাইতে ও নখ কাটিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না। ধোপারা তাহার কাপড় কাচে না, বেহারারা তাহার পাল্কী বহে না ;—যদিও অহিন্দুর কাপড় কাচিতে ও পাল্কী বহিতে ইহারা এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের এইরূপ আচরণ দ্বারা স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের সংস্কার—এইরূপ ব্যবহার দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন। বরঞ্চ এইরূপ আচরণ দ্বারা পরধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু কতটা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন, তাহাই প্রমাণ হয়। ফলতঃ, এরূপ ব্যবহার একমাত্র উদার ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব ;—অনুদার খৃষ্টান বা মুসলমানের পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব।

১০। বহিষ্পূজ্যা অন্তস্ত্যজ্যা।

জাতি-জিনিষটার বাহিরেই পূজা করা বিধি, লোক-লোচনের অন্তরালে উহা ত্যাগ করাই নিয়ম। হিন্দুর জাতির এই একটি চমৎকার বিশেষত্ব। যদি দশের সম্মুখে ইহার ঠাট বজায় রাখিয়া গোপনে ইহার আদ্যকৃত্য কর, তবে তাহাতে তোমার হিন্দুয়ানির কোন বিঘ্ন হয় না। গুরু যখন শিষ্য বাড়ী যাইবেন, তখন হবিষ্যান্ন আহার করিবেন, গেরুয়া বসন পরিবেন, টীকিটায় একটা বৃহদাকার পুষ্প বাঁধিবেন, এবং শিষ্য স্বজাতীয় হইলেও তাহার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু গাড়ীতে চলিবার সময়ে পরিচিত লোকের অসাক্ষাতে তিনি মুসলমানের সহিত এক বেঞ্চে বসিয়া মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে পারেন, কিম্বা ষ্টীমারে জীবন-রক্ষার জন্য চাটিগাঁয়ের বাদশাহ-বংশধরগণের পক্কান্ন গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত গোপনে কুক্কুট মাংস ভোজন করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার সাত্বিকতার নাশ হয় না এবং জাতিও যায় না। এসব আচরণ পরিচিত লোকে দেখিয়া ফেলিলেই যা কিছু একটু দোষের হয়, অন্যথা ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু পরিচিত লোকে দেখিয়া ফেলিলেও আচরণটি যদি সমাজের নিকট অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ভোক্তার সাত্বিকতা মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ যে সকল শিরোমণি-চূড়ামণি-সার্ব্বভৌম মহোদয়গণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে নিয়ত কণ্ঠ-কসরৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও গুপ্ত আচরণে এই কথাটাই প্রমাণ হয় যে জাতি-জিনিষটা যখন নিত্য পদার্থ বলিয়া অব্যয় ও অক্ষয়, তখন গোপনে উহার সহিত কতকগুলি উপসর্গ যোগ করিয়া দিলেও উহার কোনই ক্ষতি হয় না। এই জন্য সত্যনিধি শর্ম্মা যখন প্রকাশ্যে মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন রীতিমত মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহার জাতিতে উঠিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি দিয়াছিলেন যিনি, সেই স্মার্ত্তচূড়ামণি মহাশয় নিত্যরাত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গোপনে কুক্কুট-মাংসের কাবাব গ্রহণ করিয়াও জাতিচ্যুত হয়েন নাই। বর্ত্তমান্ হিন্দুসম্প্রদায়ের এই আচরণটি যেমনই স্বাস্থ্যকর তেমনি উদারতার পরিচায়ক। ইহাতে একপক্ষে যেমন শাস্ত্রোপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, তেমনি পরধর্ম্ম-বিহিত খাদ্যের প্রতি হিন্দুর যে একটুও বিদ্বেষ নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

১১। নিত্যাপি সা অব্যবস্থিতা।

হিন্দুর জাতি নিত্য পদার্থ হইয়াও অব্যবস্থিত। যাহা নিত্য পদার্থ, সর্ব্বাবস্থায় তাহার একই রূপ থাকে ;—তাহার রূপান্তর সম্ভব নহে। কিন্তু জাতি জিনিষটা নিত্য হইয়াও কলিকালে নিপাতনে ছন্নছাড়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথাটা বুঝাইতেছি।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ সমুদ্র-যাত্রা করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জাতি যাইত না, কেন না জাতি নিত্য পদার্থ। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগেও এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু কলিযুগের ব্যবস্থা অন্তরূপ। কলিতে সমুদ্রযাত্রা করিতে নাই, করিলে জাতি যায়;—অর্থাৎ যাহাদের অবস্থা খুব ভাল নহে তাহাদের জাতি যায়;—কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল, যাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিত্য প্রত্যাশী এবং বিলক্ষণ কিছু পাইয়াও থাকেন, তাঁহাদের জাতি যায় না। অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রা করিলে যাঁহাদের জাতি মারিবার লোক আছে তাঁহাদের জাতি যায়;—কিন্তু যাঁহাদের জাতির উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না, তাঁহাদের জাতি যায় না। অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রা দ্বারা জয়পুরের মহারাজা বা বিকানীরাধিপতির জাতি যায় না, কিম্বা পাথুরিয়াঘাটা-রাজ বা তত্তুল্য ব্যক্তিদের জাতি যায় না;—কিন্তু জাতি যায় এর-ওর-তার এবং জাতি যায় তোমার ও আমার। যদি বল, কলিকালে কেন এমন নিয়ম হইল? তদুত্তরে বলিব—এই ত কলির বিশেষত্ব! এটুকু বিশেষত্ব না থাকিলে, কলির কলিত্ব কোথায়! যদি বল, তবে সমুদ্রযাত্রায় রাজা-মহারাজার জাতি যায় না কেন? ইহার উত্তর আমি দিব না। ইহার উত্তর তাঁহাদেরই নিকট অনুসন্ধান করিও যাঁহারা হাজার কতক অনুষ্টুপের ছন্দে হিন্দুর ধর্ম্ম এবং জাতি, ইহকাল ও পরকাল, স্বর্গ এবং নরক তাঁহাদের মুঠার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন;—যাঁহারা গোটকতক বচনের বলে তোমার জাতিটা রাখিতেও পারেন, মারিতেও পারেন;—এবং কয়েকটা মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে মহাপাতকীকেও স্বর্গলোকে অক্ষয় পদ প্রদান করিয়া থাকেন।

কলিকালে সমুদ্রযাত্রায় জাতি যায় বটে, কিন্তু কতটুকু সমুদ্র-যাত্রায় এ বিপদ্ ঘটে? সমুদ্রে একটা ডুব দিয়া বা একটু সাঁতার কাটিয়া আসিলেই কি জাতি যায়?—অথবা খানিকটা নির্দ্দিষ্ট দূর গমন করিলে এই বিপদ্ ঘটে? ইহার উত্তর আপনারাই একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন। সকল কথার উত্তর আমি দিলে আপনাদের চিন্তাশক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে কেন? তবে, আপনাদের চিন্তার সাহায্যের জন্য আমি এইটুকু বলিতেছি যে, সমুদ্র-পথে লঙ্কায় গেলে জাতি যায় না, বর্ম্মায় গেলে জাতি যায় না, মালয়ে গেলে জাতি যায় না, আফ্রিকায় গেলেও জাতি যায় না;—আপনারা এইরূপ নেতি-নেতি বিচার করিতে থাকুন;—আশা করি, এইরূপ বিচারের দ্বারা এক দিন ইতির দর্শন পাইবেন;—অর্থাৎ কোথায় গেলে জাতি যায় তাহার সন্ধান মিলিবে।

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাণ-বাবুর কাছ থেকে বিদায় হয়ে রামযাদু নীচে নেমে এসেই দেখ্‌লে থাকোহরি নীচের দালানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার পরণে মিহি দেশী ধুতি, গায়ে জালী-গেঞ্জির উপরে আদ্দির পাঞ্জাবী পিরাণ, পায়ে পেটেন্ট্ লেদারের চটি! অধিকন্তু তার চোখে সোনার চশ্‌মা চ'ড়েছে, আর হাতের মণিবন্ধে সোনার বন্ধনীতে সোনার হাতঘড়ী বাঁধা আছে! তাকে দেখেই রামযাদুর মন ঈর্ষায় জ'লে ব'লে উঠ্‌লো—ঈস্! ঠিক যেনো জামাই-বাবু! বেশ আছো বাবা!……

রামযাদুকে আস্‌তে দেখেই থাকোহরি হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

থাকোহরিকে তার দিকে আসতে দেখে রামযাদু বল্‌লে—কি হে থাকোহরি! বলি খবর কি?

থাকোহরি রামযাদুর নিকটস্থ হয়ে তাকে প্রণাম করবার জন্য নত হতে হতে বল্‌লে—আজ্ঞে ভালো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—ভাল যে তা তোমার চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। তা এখন করা হচ্ছে কি? পড়াশুনো বেশ হচ্ছে তো?

থাকোহরি বল্‌লে—কর্ত্তা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন……

রামযাদু আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—কর্ত্তা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন! কেনো?

থাকোহরি একটু কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—কর্ত্তা বল্‌লেন, আজকাল পাস-টাস ক'রে তো বিশেষ কিছু হয় না, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুক্‌লে কাজ-কর্ম্ম শিখে উন্নতি হতে পারে। তাই তিনি আমাকে তাঁর আপিসে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন; আর দুজন প্রাইভেট টিউটার রেখে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে সকাল সন্ধ্যায় আমি লেখাপড়াও করি……

রামযাদুর মন ঈর্ষায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো—এ'কেই বলে পাতা-চাপা কপাল! ছোঁড়া এগ্‌জামিনে ফেল্ ক'রে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলো, আর এখন একেবারে এগ্‌জামিনের

ঝপ্পাট কাটিয়ে নবাব ব'নে গেছে! আমার আগে হতভাগা আপিসে ঢুকেছে—এইবার আমায় ডিঙিয়ে চল্‌বে দেখছি!

রামযাদুকে মৌন ও বিস্ময়াপন্ন দেখে থাকোহরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বল্‌লে—আমার এই সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মূল আপনারই দয়া! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে ·····

এতোক্ষণে রামযাদু আত্মসম্বরণ ক'রে বল্‌লে—না না, আমি আর তোমার কী ক'রেছি! সকলের সকল সুখদুঃখের মূল নিজের নিজের প্রাক্তন কর্ম্ম-ফল আর শ্রীভগবানের দয়া!

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—ভগবানের দয়াই আপনার দয়া-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলো!

রামযাদু একটু বিরক্ত স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—তোমার জ্যাঠামি রেখে দাও তো ছোক্‌রা!······আপিসে কি কাজ করা হয়? ··অ্যাপ্রেন্টিস্ আছো বুঝি?······পেড্, না, আন্-পেড্?···

থাকোহরি রামযাদুর তিরস্কারে অপ্রস্তুত হয়েও রামযাদুর আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অধিক ভক্তিমান্ হয়ে বল্‌লে—কর্ত্তা আমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ কেশিয়ার ক'রে দিয়েছেন······

বিস্ময়ের আতিশয্যে রামযাদুর মুখ থেকে নির্গত হতে যাচ্ছিলো—"একেবারে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ কেশিয়ার!" কিন্তু সে তার এই বিস্ময়োক্তি দমন ক'রে সহজ ভাব অবলম্বন ক'রে বল্‌লে—কতো মাইনে?—

দেড়শো টাকা থেকে আড়াইশো টাকা গ্রেড্···

আবার রামযাদুর মনের মধ্যে বিস্ময় উন্মুখ হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—আরে বাস্ রে! একেবারে দেড়-শো টা-আ-কা!

তার পর সে প্রকাশ্যে থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেশিয়ারের কাজে টাকা জমা দিতে হয় না?···কর্ত্তা তোমার জামিন হয়েছেন বুঝি?

—সাহেবরা কর্ত্তার উপরেই লোক বাহালের সব ভার দিয়ে রেখেছেন; তাই কর্ত্তা নিজের লোককে কেবল জামিন হয়ে বাহাল কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন না, তিনি এক লাখ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট ক'রে দিয়েছেন।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে থাকোহরির চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌লো—তার এতোখানি সৌভাগ্য এবং পরাণ-বাবুর এতোখানি দয়া তার হৃদয়কে অভিভূত ক'রে তুল্‌লে।

রামযাদুর মন আবার বিস্ময়-ভরে ব'লে উঠ্‌লো—আরে বাস্ রে! এ-ক লা-খ টা-কা!

কিন্তু সে বিস্ময় বাহিরে প্রকাশ না ক'রে হর্ষের ভাব দেখিয়ে বল্‌লে—বেশ! বেশ! বড্ড কষ্ট পেয়েছো, এখন ভগবানের কৃপায় আর কর্ত্তার অনুগ্রহে তোমার ভাল হোক। খুব সাবধানে কর্ত্তার মন জুগিয়ে চোলো, তাঁর সুনজরে যখন প'ড়েছো তোমার আখেরে ভালাই হবে।

রামযাদুর এই আশীর্ব্বাদে থাকোহরির পূর্ণ চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌লো; কিন্তু সে রামযাদুর তিরস্কারের ভয়ে তাকে মুখে কিছু না ব'লে নীরবে নত হয়ে তার পায়ের ধুলা নিলে।

রামযাদু চিন্তিত মনে সেখান থেকে চ'লে যেতে যেতে বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, আমি এখন তবে আসি······

থাকোহরি মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকালে। রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

রামযাদু রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—বেটা ঘুঁটে কুড়ুনির ছানা একেবারে হঠাৎ-নবাব! এ যে দেখি রাই কুড়ুতে বেল! পরাণে-ট্রা একে এতো তোয়াজ কর্‌ছে কেনো?······বেওরাখানা কি?······পরাণে ছোঁড়ার চাঁদ-পানা মুখ দেখে ভুলে গেছে! সাধে কি বঙ্কিম-বাবু লিখেছিলেন—সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র!····· কিন্তু একটা ছোঁড়ার সুন্দর মুখের দাম কি এ-ক লা-খ টা-আ-কা! ছুঁড়ি হলেও বা একটা মানের নাগাল পাওয়া যেতো!······ ছোঁড়ার মা-মাগীকেও তো এনে বাড়ীতে ভরেছে! এই ছেলেকে কোলে ক'রে মাগী বিধবা হয়েছিলো, আর ছেলে হয় নি; আমি আগে মনে ক'রেছিলাম মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে ব'লে নাম রেখেছিলো থাকোহরি, কিন্তু তা তো নয়, বিধবার ছেলে ব'লে ঐ নাম।

রামযাদু ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্তে আস্তে রাস্তায় চল্‌ছিলো। এখন থাকোহরিকে পরাণ-বাবুর যত্ন কর্‌বার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছে মনে ক'রে সে হনহন ক'রে পথ হাঁট্‌তে লাগ্‌লো।

* * * *

পরদিন সকালে রামযাদু নিয়মিত পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো; এটি তার প্রাত্যহিক কর্ম্ম। সে পরাণ-বাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই দেখ্‌লে—কৃষ্ণকলি তার

ফ্রকের কোঁচড়ে কতকগুলো মটর নিয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর এক পাল সাদা পেখম-ধরা পায়রা তাকে ঘিরে মটরগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর মদ্দা পায়রাগুলো থেকে থেকে গলা ফুলিয়া ঘাড় নেড়ে নেড়ে বকম-বকম ক'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ঘুরপাক খাচ্ছে। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে দেখেই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ও স্নেহসিক্ত ক'রে বল্‌লে—এই যে খুকুমণি? কি হচ্ছে মা-লক্ষ্মীর! পায়রাকে খাওয়ানো হচ্ছে? সর্ব্বজীবে সমান দয়া তোমাদের! এ যেনো লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ!

রামযাদু কথাগুলো একটু উঁচু গলাতেই বল্‌লে; তার কথা কৃষ্ণকলি বুঝতে পারবে এমন সম্ভাবনা যে নেই তা জেনেও সে ঐসব কথা বল্‌লে এই ভেবে, যে, যারা বুঝতে পারলে সাক্ষাতে খোসামোদ না ক'রেও খোসামোদ করার কাজ হবে তারা যদি কোনো রকমে শুন্‌তে পেয়ে যায়।

রামযাদুর ডাক শুনেই কৃষ্ণকলি একবার তার মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, না ছুটে পালাবে ভাবছিলো; তার উপর আবার রামযাদুর মুখে দুর্ব্বোধ্য অনেক কথা শুনে তার বুক দুরদুর ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো—ঐ লোকটা এখনই বুঝি আবার তাকে মুখ ভেংচে ভয় দেখাবে!

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পালিয়ে না গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে চল্‌লো। কৃষ্ণকলি রামযাদুর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবং অনেক পায়রা কলরব ক'রে মটর খুঁটে খাচ্ছিলো ও উঠানের শানের উপর পায়রার ঠোঁট ঠোকার ঠকঠক শব্দও হচ্ছিলো, তাই সে রামযাদুর নিকটে আসা দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পায় নি। রামযাদু পায়রার গণ্ডীর একেবারে কিনারে গিয়ে আবার ডাক্‌লে—খুকুমণি! তোমার পায়রাগুলি তো বেশ!··

কৃষ্ণকলি একেবারে তার পিঠের কাছে রামযাদুর কথা শুনতে পেয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো এবং মুখ ফিরিয়েই রামযাদুকে শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখে বড়ো বড়ো সাদা সাদা দাঁত বাহির ক'রে হাস্‌তে দেখ্‌লে। কৃষ্ণকলি তৎক্ষণাৎ কোঁচড়ের সমস্ত মটর পায়রাদের উপরে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলো। আর সমস্ত পায়রা একসঙ্গে পাখা ফটফট ক'রে ধূলো উড়িয়ে রামযাদুকে চকিত ক'রে উড়ে' গেলো এবং কতকগুলো উঠানের চারিধারের কার্ণিশের উপরে গিয়ে বস্‌লো, আর কতকগুলো আবার উঠানে নেমে মটর খুঁটতে প্রবৃত্ত হলো।

রামযাদু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে মনে মনে বল্‌লে—বেটি রক্ষাকালীর বাচ্চা! তোকে দেখ্‌লেই গাটা ঘিনঘিন করে! কিন্তু তবু তোর সঙ্গে আমার ভাব করতেই হবে—বাপ-মার একমাত্র আদুরে মেয়ে—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!

রামযাদু উপরে পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে; দেখ্‌লে এক-ঘর লোক।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে দেখেই হেসে বল্‌লেন—আস্‌তে আজ্ঞে হোক মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো? কলির সঙ্গে বুঝি?

রামযাদুর মন ব'লে উঠ্‌লো—কলি! কলি—হুঁকো! কালী—কালীর ছানা—বঙ্কিম-বাবুর ইন্দিরার কালীর বোতল—শরৎ-বাবুর পোড়া-কাঠ!

কিন্তু রামযাদুর মুখ হাস্যে বিকশিত হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—আজ্ঞে হ্যাঁ। মা-লক্ষ্মীর জীবে দয়া দেখে বড়ো আনন্দ হলো!

অমনি ঘরে উপবিষ্ট লোকেদের মধ্যে দু-তিনজন সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—হবে না কেনো? কেমন পিতা-মাতার কন্যা! পিতা সাক্ষাৎ মহাদেব আর মাতা দুর্গা! তাঁদের কন্যা তো লক্ষ্মী হবেনই।

একজন ভট্টাচার্য্য কেবল-মাত্র উত্তরীয় গায়ে দিয়ে ব'সে ছিলো; সে টিকি দুলিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—হাঁ হাঁ, সঙ্গত কথাই ব'লেছেন—আকরে পদ্মরাগানাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ!

পরাণ-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হয়েও যেনো কেউ তাঁর প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করে নি অথবা তিনি তা শুন্‌তে পান নি এমনি ভাবে রামযাদুর কথারই উত্তরে স্মিতমুখে বল্‌লেন—হাঁ কলি জীব-জন্তু খুব ভালোবাসে—তার একটি চিড়িয়াখানা আছে—পায়রা, বেরাল, কুকুর, ময়না·········তাতেও ওর মন ভরে না, মাসে অন্ততঃ একদিন ওকে আলিপুরে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতে হয়······

একজন লোক ব'লে উঠ্‌লো—The child is the father of the man!

ভট্টাচার্য্য বল্‌লে—এতদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ সূচনা করছে—জীবধাত্রী বসুন্ধরার ন্যায় বহু পোষ্য পালন করতে হবে তো!

রামযাদু মনে মনে বল্লে—রোস্ বেটী রক্ষাকালীর ছানা! তোর মরণ-বাণের সন্ধান পেয়েছি! তোর সঙ্গে যুঝ কর্‌তে আর বেগ পেতে হবে না!

পরাণ-বাবু পারিষদদের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে রামযাদুকে বল্লেন—তার পর মুখুজ্জে মশায়, সব ঠিক। আজ থেকেই তা হলে কাজে লেগে যাবেন।

রামযাদুর মুখ লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো, তার ইচ্ছা দুর্নিবার হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো যে সে জিজ্ঞাসা করে তার কতো বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে; কিন্তু এতো লোকের সাম্‌নে সে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পার্‌লে না; সে উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ কর্‌লে।

ঘরে যারা যারা নিজের বা ছেলে ভাই ভাইপো ভাগ্নে শালা ভগ্নীপতি প্রভৃতির চাকরী বা মাইনে বৃদ্ধি বা বৃত্তি প্রভৃতির আশায় উমেদার হয়ে ব'সে ছিলো তাদের সকলের উৎসুক দৃষ্টি পরাণ-বাবুর মুখের উপর থেকে ঈর্ষাকুল হয়ে রামযাদুর মুখের উপর গিয়ে পড়্‌লো; তাদের দৃষ্টি যেনো বল্‌তে চাইছিলো—তুই কে বেটা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ছিস! আর আমরা এতোকাল থেকে নিষ্ফল উমেদারীতে টানা হাঁটা কর্‌ছি! তারা সকলেই প্রার্থী, কাজেই নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার পূর্ব্বে অপর কারো সফলতা দেখ্‌লেই তাদের আতঙ্ক হয় সফল ব্যক্তি বোধ হয় তাদেরই স্বার্থসিদ্ধির জায়গাটি অধিকার বা অবরোধ ক'রে বস্‌লো! পরাণ-বাবুর মন দরাজ ও ক্ষমতা অসাধারণ হলেও তারও তো একটা সীমা আছে! সীমাবদ্ধ স্থানে বস্তু-সমাবেশ যতো হবে অপর বস্তুর স্থান ততো সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌বে এবং অবশেষে স্থানাভাবই ঘট্‌বে। তাই উমেদারেরা অপরের সফলতায় কখনো প্রসন্ন হতে পারে না।

তাই ভট্টাচার্য্য মনের ক্ষোভ দমন ক'রে রাখ্‌তে না পেরে ব'লে উঠ্‌লো—ধন্যোঽসি কৃতপুণ্যোঽসি!

পরাণ-বাবু সে কথার দিকে কর্ণপাত না ক'রে রামযাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—আপনার মতন একজন পণ্ডিত আর রোজগারী উকিলের জাত মার্‌তে যখন বসেছি তখন তার উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হবে তো, তাই ঠিক হয়েছে আপনি মুন্সেফের মাইনে পাবেন।

রামযাদুর একেবারে আশাতীত লাভ! তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো, তার ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌লো সে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে পরাণ-বাবুর পায়ের ধূলা নেয়। কিন্তু অনেক লোক ব'সে রয়েছে ব'লে লজ্জায় আর পরাণ-বাবুর কাছে নিজের বামনাই-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবার ভয়ে সে আত্মসম্বরণ ক'রে ব'সে রইলো, কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। একটা চাকরী জোটাবার জন্য সে কতোবার কতো চেষ্টা করেছে, কতো লোকের দ্বারে গিয়ে ধন্না পেড়েছে, কিন্তু সুবিধা মতো চাকরী জোটে নি, জুটেছিলো হতাশ হওয়ার দুঃখ আর ধনী বা পদস্থ লোকেদের কর্কশ বাক্য ও অনাদর উপেক্ষা অবহেলা। আর এ একেবারে আড়াই শো টাকা আয়ের চাকরী এক কথায় পেয়ে যাওয়া! রামযাদুর সমস্ত শরীর-মন আনন্দে বিগলিত হয়ে অশ্রুপ্রবাহ পরিণত হতে চাচ্ছিলো।

রামযাদুর এইরূপ ভাবাবেশ দেখে পরাণ-বাবু অত্যন্ত পরিতুষ্ট হলেন; একজন অভাবগ্রস্ত যথার্থ গুণী ব্যক্তির অভাব মোচনের উপলক্ষ্য হতে পেরেছেন মনে ক'রে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণও রামযাদুর রকম দেখে নিজেদের কথা ভুলে গেলো এবং তার লাভে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো—বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! মহতের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছেন তখন গুণের পুরস্কার লাভ তো হবেই! অগতির গতি, দীনশরণ, আশ্রিতবৎসল মহাপুরুষের কৃপা লাভ গুণ না থাক্‌লেও হয়, আর আপনি তো বিদ্যায় তপস্যায় সিদ্ধপুরুষ!……

উমেদারেরা পরাণ-বাবুকে ও পরাণ-বাবুর প্রিয়পাত্র বিবেচনায় রামযাদুকে একসঙ্গেই স্তুতি কর্‌তে লাগ্‌লো, এই রামযাদুর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা যে তাদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে কতোখানি কার্য্যকরী তা তো ঠিক জানা নেই, অতএব সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য।

পরাণ-বাবু প্রশংসায় পরিতুষ্ট হলেও যেনো কোনো কথাই কানে তোলেন নি এমনি ভাবে বল্লেন—আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, বেলা হচ্ছে, আপিসে সাড়ে দশটায় পৌঁছতে হবে……

রামযাদু নীরবে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। তার মন অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দে এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যে সে অবশ মনে কিছুই ভাব্‌তে পার্‌ছিলো না। (ক্রমশঃ)

নানকানা সাহেব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, আই-এ-এস্

শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানক যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রাচীন নাম তালবণ্ডী এবং বর্ত্তমান নাম নানকানা সাহেব। নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য 'নানকানা' আর 'সাহেব' একটি সম্মানজনক পদবী * মাত্র। নানকানা সাহেব লাহোর হইতে ২৪ ক্রোশ পশ্চিমে। আজকাল রেল হইয়াছে, সকালে লাহোর হইতে রওনা হইলে নানকানা সাহেব দেখিয়া বৈকালে অনায়াসে ফিরিয়া আসা যায়।

পঞ্জাবের দীর্ঘকালস্থায়ী নিদারুণ গ্রীষ্মকালের অবসান হইয়া আসিতেছিল। তখনও দিনমানে খুব রৌদ্র হইত, কিন্তু প্রভাত ও সন্ধ্যা বেশ রমণীয় হইয়াছিল। এইরূপ এক দিবসে আমরা নানকানা সাহেব দেখিতে যাইব স্থির করিলাম। খুব সকালে ট্রেণ। পূর্বদিন হইতে টাঙ্গাওয়ালাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রি থাকিতেই সে গাড়ী আনিয়া ডাকাডকি আরম্ভ করিল। রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্বদিন হইতেই সংগৃহীত ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া টাঙ্গাতে উঠিলাম। জনবিরল সুদীর্ঘ পথগুলি অতিক্রম করিয়া টাঙ্গা ক্ষিপ্রগতিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। আমরা পশ্চিম মুখে চলিয়াছিলাম। বামে নগরীর ঘনসন্নিবিষ্ট উচ্চ সৌধমালা; মধ্যে মধ্যে মন্দির ও মসজিদ। দক্ষিণে বিশাল প্রান্তর। নগর অতিক্রম করিয়া নগর-প্রান্তস্থ উপবনের পাশ দিয়া চলিলাম। রক্ত প্রস্তর-নির্মিত বিশালকায় বাদশাহী মসজিদ দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। যে পথে রাবী পূর্বে প্রবাহিত হইত তাহা অতিক্রম করিলাম। ইহা 'ছোট রাবী' নামে পরিচিত এবং ইহাতে সচরাচর স্বল্পমাত্র স্রোতোহীন জল থাকে। পূর্বে এই পথে রাবী লাহোরের ঠিক পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত, এক্ষণে নদী প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরে আমরা রাবী নদীর পুলের উপর উপস্থিত হইলাম। রাবী সিন্ধুনদের প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখার অন্যতম। ইহার প্রাচীন নাম ইরাবতী। নদীগর্ভ অতিশয় বিস্তৃত, কিন্তু তাহার মধ্যে জলধারা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এক্ষণে নদীগর্ভের অধিকাংশ বালুকা-সমাচ্ছন্ন। ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে বেশী খাল কাটা হইয়াছে। সিন্ধুর প্রায় প্রত্যেক শাখা হইতে দুইটি করিয়া বড় খাল কাটা হইয়াছে। এ কারণে শাখাগুলির জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও বর্ষার সময় নদীর জল নদীগর্ভ পরিপূর্ণ করিয়া উভয়কূল ছাপাইয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়। বেশী বন্যা হইলে সহরের ধার পর্য্যন্ত জল আসে। নদী পার হইয়াই আমরা নূরজাহানের সমাধি দেখিতে পাইলাম। সমাধিভবনটি ক্ষুদ্রকায়, কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, সম্প্রতি চাঁদা তুলিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ভারতের প্রসিদ্ধতম মুসলমান সম্রাজ্ঞী তাঁহার প্রথম-বিবাহজাত কন্যা লাড়লি বেগমের পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনন্তকালের জন্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে নূরজাহান আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য যেন কোন বৃহৎ সমাধি-ভবন নির্মিত না হয়; একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সমাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সমস্ত পার্থিব উচ্চ আশা পরিপূর্ণ হইবার পর, জীবনের অপরাহ্নকালে বোধ

---

* পঞ্জাবে সম্মানজনক ব্যক্তি বা বস্তু মাত্রেরই নামের শেষে 'সাহেব' এই শব্দ সংযোজিত করিবার প্রথা আছে। শিখদের মধ্যে এই শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রথা সমধিক প্রচলিত। তাঁহারা মন্দিরকে বলেন 'দরবার সাহেব', ধর্মপুস্তকের নাম দিয়াছেন 'গ্রন্থ সাহেব'। বাঙ্গলা ভাষায় 'সাহেব' মানে 'ইংরেজ'। কিন্তু কোনও ইংরেজ সম্মানার্হ না হইলে, তাঁহাকে সাহেব বলা যায় না, এবং যে কোন মাননীয় বাঙ্গালীকে সাহেব বলিয়া উল্লেখ করিলে সাহেব শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ করা হয়। আমরা সচরাচর যেস্থলে 'সাহেব' শব্দ প্রয়োগ করি, সেখানে 'সাহেব' না বলিয়া 'ইংরেজ' বলা উচিত। নচেৎ দাসসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ 'ইংরেজ' মাত্রই সাহেব, বা 'মাননীয়' নহেন; এবং সাহেব মাত্রই ইংরেজ নহেন।

। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য াড়ম্বর ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা। নূরজাহানের সমাধির দূরেই জাহাঙ্গীরের সুবৃহৎ সমাধি-ভবন। নূরজাহান বহুব্যয়ে ই সমাধি-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ভারতের াজধানী দিল্লী হইতে লাহোরে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন, ধিকাংশ সময় এখানেই থাকিতেন। জাহাঙ্গীরের সমাধির নিকটেই নূরজাহানের ভ্রাতা, বাদশাহের মন্ত্রী আসফ উদ্দৌলার সমাধি। দেখিতে দেখিতে আমরা এই সকল ঐতিহাসিক হর্ম্ম্যরাজি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম। দুই পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ,—গম, সরিষা এবং কাপাসের ক্ষেত। ক্ষেতে হলদে এবং লাল ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও বা কাপাস ফল ফাটিয়া সমস্ত ক্ষেত সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে পাঞ্জাবী বালিকারা কাপাস সংগ্রহ করিতেছে। শাহদারা জংশন ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। এখান হইতে একটি লাইন রাওলপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার চলিয়া গিয়াছে, অপর লাইনে আমরা নানকানা সাহেব চলিলাম। পথে নদীর মত বিস্তৃত একটি সুন্দর খাল দেখিলাম। কয়েকটি ছোট ষ্টেশন পার হইলাম। কিল্লা সত্তর শা দিদোকি মালিয়ান, বহারিয়ানওয়ালা—এই সব নাম। অবশেষে যথাসময়ে নানকানা সাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেশনে একটি টমটম ছিল। আমরা টমটমে চড়িয়া "জনম্-আস্থান্" অর্থাৎ গুরু নানকের জন্মভূমি দেখিতে গেলাম। মাইলখানেক দূরে একটি পুকুরের নিকট গিয়া আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। পুকুরকে এখানে তলাও বলে। পুকুরের চারিদিক বাঁধান, তীরে কয়েকটি বড় গাছ। পুকুরের পাশে প্রকাণ্ড সরাই বা অতিথিশালা। এখানে আমরা একটি ঘর লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলাম। মধ্যস্থলে একটি সুবিস্তৃত অঙ্গন, তাহার চারিপাশে সারি সারি ঘর; কিয়দংশ অতিথিশালা, কিয়দংশ স্কুল, বোর্ডিং এইরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা বড় কূপ। আমরা স্নানাহার শেষ করিয়া গুরুদ্বার দেখিতে চলিলাম। একটি প্রকাণ্ড তোরণের মধ্য দিয়া গুরুদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণের দুইদিকে সারি সারি দোতালা ঘর। সম্ভ্রান্ত অতিথি আসিলে এখানে বাস করেন। তোরণ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দির, চারিদিকে কক্ষশ্রেণী। একটি মর্ম্মর-সোপানের উপর দিয়া আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। কক্ষমধ্যে বিচিত্র রেশমি বস্ত্রে আবৃত গ্রন্থসাহেব পূজিত হয়। সম্মুখে বসিবার ঘর। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, পূজারির নিকট আমরা তাহার বৃত্তান্ত শুনিলাম।

পঞ্জাবের নানা স্থানে শিখদের যে সকল মন্দির বা গুরুদ্বার আছে সে সকল মন্দিরে এক এক জন মোহান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মন্দিরগুলির ভূসম্পত্তি এবং প্রণামী হইতে যথেষ্ট আয় ছিল। কোন কোন মোহান্ত মন্দিরের অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেন। মন্দিরগুলির কর্ত্তৃত্ব যাহাতে মোহান্তদের হাত হইতে উঠাইয়া শিখদের প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে শিখদের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনকারীরা 'আকালি' নামে পরিচিত। এক এক দল আকালি এক একটি গুরুদ্বারে গিয়া বসিত, মোহান্তরা তাহাদিগকে মারপিট করিত, অনেক স্থলে পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। আকালিরা সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙমুখ হইত না। এই উদ্দেশ্যে আকালিদের একটি 'জাঠা' অর্থাৎ দল, নানকানা সাহেবের গুরুদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই জাঠাতে ২০০ লোক ছিল। সকলেই শুনিয়াছিল যে এই জাঠার লোকদিগকে হত্যা করিবার জন্য মোহান্ত অস্ত্র এবং পাঠান গুণ্ডা সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু কেহই আত্মরক্ষার কোনও বন্দোবস্ত করিল না। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও আকালিরা মন্দির পরিত্যাগ করিল না। ক্রমে রাত্রি হইল। জাঠার কয়েকজন মন্দিরমধ্যে বসিয়া ছিল, অধিকাংশ লোক বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিল। মোহান্তের লোকেরা প্রাঙ্গণের চারিদিকে যে সকল ঘর ছিল তাহার ছাদের উপর হইতে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কতক-গুলি আকালি গুলিতে হত বা আহত হইলে অবশিষ্ট আকালিরা মন্দিরমধ্যে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। দরজার উপর গুলি চলিতে লাগিল। দরজায় অনেক গুলির চিহ্ন দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরে মোহান্তর লোকেরা মন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং আকালিদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। আমরা মেজের উপর বহু অস্ত্র-চিহ্ন দেখিলাম। প্রাঙ্গণের উপর যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এখনও তাহার চিহ্ন দেখা

যায়। দুর্বৃত্তরা মৃতদেহের উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। এই ভাবে দুই শত লোক ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় তাহাদের প্রাণ উৎসর্গ করিল। মোহান্ত এক্ষণে কারাগারে। মন্দির আকালিদের হাতে আসিয়াছে।

গুরু নানকের বাল্য জীবনের বিবিধ ঘটনা স্মরণার্থ এখানে কয়েকটি গুরুদ্বার নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহার হাতে একটি চিনির পাত্র এবং তাহার উপর পাঁচটি টাকা রাখিয়া গোপাল পাধা বা পণ্ডিতের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। এখানে যথারীতি পূজার পর নানকের হাতে খড়ি হইল এবং নানক লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, এখানে পড়িবার সময় নানক অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। নানক যে স্থানে পাঠ-অভ্যাস করিতেন, তাহার স্মরণার্থ একটি গুরুদ্বার নির্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'পট্টি সাহেব'। পুকুরের পাশ দিয়া পথ। সেই পথে আমরা পট্টি সাহেব দেখিতে চলিলাম। গুরুদ্বারের মধ্যে গ্রন্থসাহেব পূজিত হয়। অপর কোনও মূর্ত্তি নাই। গুরুদ্বার দিবারাত্রি খোলা থাকে। পূজারি যাত্রীদিগকে বাতাসা ও ইযুগণ্ড প্রসাদ দেয়।

নানকানা সাহেবে অপর একটি গুরুদ্বারের নাম 'বাললীলা'। নানক যে যোগী বৈরাগীর সংস্কার লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার খেলা সাধারণ বালকের খেলার মত ছিল না। তপস্বীদের ন্যায় যোগাসনে বসা তাঁহার খেলা ছিল; সন্ন্যাসীদের ন্যায় বেশভূষা করা তাঁহার আর একরূপ খেলা ছিল। পথে সন্ন্যাসীকে যাইতে দেখিলে তিনি তাহাকে গৃহে ডাকিয়া আনিতেন এবং ভক্তিভরে সেবা করিতেন। নানকের বাল্যকালের এই সকল ঘটনা স্মরণার্থ বাললীলা নামক গুরুদ্বারটি নির্মিত হইয়াছে।

আর একটি গুরুদ্বারের নাম 'কিয়ারা সাহেব' অর্থাৎ গোচারণভূমি। কথিত আছে, নানকের বাল্যকালে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, এবং বিষয়কর্ম্মে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে নানা রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিতার ইচ্ছায় নানক পিতার গরু মহিষ লইয়া প্রান্তরে চরাইতে যাইতেন। 'চরাইতে যাইতেন' অর্থাৎ মাঠে পশুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন। কথিত আছে যে, এক দিন তিনি এই ভাবে সারা দিন বসিয়া আছেন, গরু ও মহিষ নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রের শস্য নির্মূল করিয়া খাইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। সন্ধ্যার সময় কৃষক আসিয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি দেওয়াতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কৃষক তাঁহাকে বাড়ী যাইতে দিল না—জমিদারের নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। জমিদার রায় বুলার নানকের পিতাকে ডাকিয়া কৃষকের ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন। পিতা পুত্রকে ভৎর্সনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষক নানকের পিতাকে সংবাদ দিল—তাহার ক্ষেত্র পূর্ব অপেক্ষা বেশী শস্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, পূর্বদিনের ক্ষতির চিহ্নমাত্র নাই। আর এক দিন নানক গরু চরাইতে গিয়া রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃক্ষের পত্রাবলির মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। একটি কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতে লাগিল। জমিদার রায় বুলার মৃগয়া করিতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। সেই দিন হইতে জমিদার নানকের বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন। 'কিয়ারা সাহেব' নামক গুরুদ্বারে বসিয়া শিখ নরনারীগণ ভক্তিপ্লাবিত চিত্তে এই সকল ঘটনা স্মরণ করে।

বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানক তালবণ্ডী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বয়সের সহিত তাঁহার ঈশ্বরভক্তি বাড়িতে লাগিল, এবং তিনি সংসারে অধিকতর উদাসীন হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কপূরথালা রাজ্যের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী সুলতানপুর গ্রামের জয়রাম নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির সহিত নানকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী নানকীর বিবাহ হইয়াছিল। তালবণ্ডী গ্রামের জমিদার নানককে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। ভগিনী এবং ভগিনীপতি নানককে সাদরে আশ্রয় দিলেন। নানক বিবাহ করিয়া কিছুদিন সংসার ধর্ম করিয়াছিলেন। তাহার পর ধর্মপ্রচার করিয়া নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে আর একবার তালবণ্ডী গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। গ্রামের জমিদার রায় বুলার অনেক

বিষয়সম্পত্তি দিবেন বলিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল—গৃহে তাঁহার মন টিকিল না। তালবণ্ডী গ্রামে কয়েক দিন থাকিয়া বালা এবং মর্দনা নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া নানক চিরদিনের জন্যে জন্মস্থান ত্যাগ করিলেন।

নানকানা সাহেবে আরও কয়েকটি গুরুদ্বার আছে। একটির নাম তাম্বু সাহেব, একটির নাম মালজি সাহেব (বা খাজনাখানা ; এখানে বোধ হয় জমিদারের বাড়ী ছিল), একটির নাম গুরু হরগোবিন্দ। রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর হইয়াছিল। এজন্য সকল গুরুদ্বার দেখা সম্ভব হইল না।

গুরুদ্বারগুলি আকালিদের হাতে আসিবার পর যাত্রীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে। আকালিরা সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন সরাই-রক্ষক আমাদের জন্য ঘর খালি করিয়া, ফিনাইল দিয়া ধুইয়া দিল, রন্ধনের জন্য কাঠ দিল। আসিবার সময় আমরা বখশিশ দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে লইল না। বলিল, "তঙ্কা (বেতন) লই, বখশিশ লইব না।"

অপরাহ্ণে আমরা ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম। দূর হইতে দুইটি কল দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, এখানে তূলার বীজ ছাড়াইয়া, তূলার গাঁটরি বাঁধিয়া চালান দেওয়া হয়। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নানকের জন্মদিন উপলক্ষে নানকানা সাহেবে খুব বড় মেলা বসে।

সন্ধ্যার সময় আমরা লাহোর পৌঁছিলাম।

শিল্পী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

অম্বরের অরুণ-মন্দিরে ইন্দ্রায়ুধ-বর্ণরেখা টানি'—
রঞ্জিছ' বিচিত্র-ছবি কে গো শিল্পী ভাব-রস ছানি' !
ব্যথা ও আনন্দ অশ্রুধারে
চিরন্তন চিত্র খানি ধু'য়ে ধু'য়ে আঁক' বারে বারে !
না জানি অঙ্কিতে চাহ কা'রে !

উদয়াচলে'র প্রান্তে যবে
স্বয়ম্বরা-বেশা উষা লাজ-কম্প্র-চরণে নীরবে
সূক্ষ্ম-স্বর্ণাঞ্চল-প্রান্ত লুটাইয়া নেমে আসে ধীরে,
তন্দ্রা-ভাঙা পদ্মমুখ ঘিরে—
শ্লথ-কবরীর বন্ধ হারা
সুরঞ্জিত মেঘদাম উড়ে পড়ে চূর্ণালক পারা !
নিশার আঁধার সদ্য-ধোয়া
আলোক-আভাস-মুগ্ধ প্রাচী-পট, বাঞ্ছিতা'র ছোঁয়া
লভে যবে বর্ণ-আলিম্পনে,—
পুলক-কম্পনে
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মৌন-অনুরাগে,
সমীরণে শিহরণ জাগে !
স্নিগ্ধ-শুভ্র আলোকে'র সনাল-কমল দোলাইয়া
নিশা'র বিদায়-ব্যথা উষালক্ষ্মী দেয় ভোলাইয়া।

হে মোর অন্তরচারি, কহ
কোন্ ইন্দুবল্লী-রস পিয়ে
আরক্ত যুগল-নেত্র নিয়ে
ফিরিতেছ, প্রার্থিতে অন্বেষি' অহরহ
যুগে-যুগে অনন্ত আগ্রহে !
অন্তহীন জীবনের হাসি, অশ্রু, বেদনা, বিরহে
মরণের সোপান বাহিয়া
কাহারে চাহিয়া
চলেছ অশ্রান্ত-গতি অর্থহারা-সঙ্গীত গাহিয়া।
হে নিপুণ রূপদক্ষ, কবি !
বল, কোন্ ছবি

ফুটাইতে চাহ মর্ম্ম-পাতে—?
অব্যক্ত-ভঙ্গিমা তব অশ্রুস্রাবী পূর্ণ বেদনাতে।
ওগো মূক, স্তব্ধ, বাক্যহারা!
চক্ষে বহে ধারা
কোন্ ব্যথা মথিয়াছে বন্ধু তব মর্ম্ম-পুণ্ডরীক,
কল্পনা'র মিলেনি প্রতীক্?
ধ্যানমগ্ন-প্রায়
বর্ণ-তুলিকাটি শুধু বুলাইছ' হায়
ব্যাকুল আগ্রহ-স্পন্দ-বুকে।
পট-অভিমুখে
বিথারি তৃষিত-আঁখি-কখন দেবীর পাবে দেখা—!
এই বর্ণ-লেখা
তোমার চিত্তের চির-প্রকাশ বেদনা রূপায়িত করি'
মূর্ত্ত-স্ফূর্ত্তি চিত্রে দিবে ধরি।

হিয়ার মঞ্জুল হেম-কূটে
নিত্য স্মিত-কোবিদার ফুটে!
হে বন্ধু! প্রজল্প তব শুধুই আপন মর্ম্ম-সনে,
কর্ম্মখ'নে
শয়নে স্বপনে জাগরণে।
প্রচ্ছায়-প্রাণের তলে প্রতনু-কল্পনা পাখা মেলি
জ্যোতির্লোকে উড়ে করে কেলি
ছায়াপথ-সেতু বাহি' সপ্তর্ষির পানে।
নীল-তারকার মৌন-গানে
মিলাইতে চাহে নিজ স্বর,
রসে পরিপূর।
অভ্রপুষ্প চয়নের খেলা
হে আত্মবিস্মৃত, মুগ্ধ! ক্ষান্ত দাও; বেলা
আর নাহি। পশ্চিম গগন
লাক্ষারাগে আরক্তিম, উৎসবে মগন।
মুহূর্ত্তেক পরে
নীলাঞ্চলা সন্ধ্যাসতী শান্ত নীলাম্বরে'
নক্ষত্রের লক্ষ-দীপ জ্বালি'
তমসা'র গাঢ়চ্ছায়া স্নেহে দিবে ঢালি'।

অঙ্কুরকে ঘুমাইবে পাখী
মুগ্ধ মৌন শাখী
নিশা'র নেশায় ঢুলি' ধীরে
প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে কা'র
বন্দনার
নির্ব্বাক সঙ্গীত গা'বে নীরব-গম্ভীরে!
রাথ চারু-স্বপ্ন-কারু ওগো কলাবিদ্!
ঘন-ঘুমে ঘেরিয়াছে প্রাণ
স্বপনে মানস মজ্জমান,
চিরতরে টুটিয়াছে নয়নের নিদ্।
অতনু-মানসী মাগে সকাতরে শরীরিণী-রূপ,
সৌন্দর্য্য—অনুপ
যায় তার বৃথা বহি।
রহি রহি
সপ্তগ্রামে ঝঙ্কে অই ক্রন্দন তাহার,—
"খুলে দাও, খুলে দাও, দাও খুলে দ্বার!"
অবরুদ্ধ-ভাবপুঞ্জ গুচ্ছ গুচ্ছ কল্পনার কুঁড়ি
চিত্ততল ফুঁড়ি'
ব্যথিত কাতর-সুরে ডাকিতেছে অই
"—আলো কই—কই!"
ওই ক্লিষ্ট-সুর
করিয়াছে তোমারে বিধুর।

হে অলক্ষ্য! হে সুন্দরতম!
রসিক-পরম!
ছন্নছাড়া-অভাগা'র ঘন-স্বপ্নরস
পায় যদি তোমার পরশ
এখনি' সার্থক হবে জানি,—
আপনি উঠিবে ফুটি' অস্ফুট অরূপ চিত্র খানি।
বেদনা-শিশির-অশ্রুজলে
কল্পনা-কোরক গুলি
পেলব-বন্ধন খুলি
আনন্দে ঝরিবে পদ-তলে॥

রাজস্থান

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

২

উদয়পুর থেকে হল্‌দীঘাট যেতে হোলে উদয়পুর-চিতোরগড় রেল কোম্পানীর নাথদুয়ার-রোড ষ্টেশনে নামতে হয়। এখানে মোটর-বাস পাওয়া যায়, সেই গাড়ীতে নাথদরজা নামক তীর্থে যাওয়া যায়। নাথদরজা মেবারের একটি বড় তীর্থস্থান। এখানে শ্রীনাথজী আছেন। ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে অনেক যাত্রী এই দেবতা দর্শন করতে আসেন। শ্রীনাথজীর সেবায়েত মহারাণা নিজে। আমরা শুনলুম যে মেবার রাজ্যের অর্দ্ধেক আয় একা শ্রীনাথজীই দিয়ে থাকেন। এইখান থেকে হলদীঘাট যাবার জন্য গাড়ী সংগ্রহ করতে হয়। গাড়ী মাইল সাত-আট গিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেবে, তারপর হলদীঘাট যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজে নিতে হবে। শোনা যায় যে, চৈতক্ কা চবুত্‌রা আজও খাড়া আছে।

শীতের সময় সেখানে কেউ যাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ মেবারী শীত সহ্য করা শক্ত। বিশেষ যদি নাথ দুয়ারায় রাত কাটাবার জন্য স্থান না পাওয়া যায় তা হোলে তো সোনায় সোহাগা। গ্রীষ্মে সেখানে যাবার কল্পনাও কেউ মাথায় আনবেন না। কারণ সেখানকার শীত বেশী কষ্টকর না গ্রীষ্ম বেশী কষ্টকর সে তর্কের মীমাংসা এখনও হয়-নি। শীত ও গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য ঋতুও সেখানে নেই। আমাদের কষ্ট দেখে ইংরেজদের চোখে যেমন মাঝে মাঝে সাঁতার-পানি ঝরে মেবারের তপ্তবুকে বরুণদেবের কৃপাবৃষ্টি তদপেক্ষাও কম হয়। তার ওপরে জঙ্গলে বাঘের উৎপাত আছে। যে বাঘের পদচিহ্ন চার আঙুলের বেশী সে বাঘ মারবার হুকুম নেই। জঙ্গলে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর যদিই বা কোনো রকমে তার পায়ের থাবাটা মেপে ফেলা সম্ভব হয় তা হোলেও নিস্তার নেই। কারণ যদি তার থাবা চার আঙুলের বেশী হোয়ে যায় তবে সেই হরিণ-খেকো বাঘকে মানুষ-খেকো হবার সুযোগ দিতেই হবে। থাবার মাপ চার আঙুলের কম হোলে তার সঙ্গে লড়তে সরকারের মানা নেই। এই রকম গুটিকয়েক সামান্য অসুবিধা ছাড়া সেখানে যাতায়াতের অন্য কোনো হাঙ্গামা নেই।

উদয়পুর শহরের বাইরে, খাস শহর থেকে মাইল তিন-চার দূরে একটি জায়গা আছে তার নাম মহাসতী। এইখানে মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণাদের এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য লোকদের স্মৃতি-মন্দির আছে। এই স্মৃতি-মন্দিরগুলি দেখবার জিনিষ। অধিকাংশ মন্দিরই শ্বেত পাথরের তৈরি এবং সেগুলির মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের খুব সুন্দর সুন্দর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। রাজপরিবারের যে সকল নারী তাঁদের স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন তাঁদের কল্পিত মূর্ত্তি এই মন্দিরের ওপরে প্রস্তর-ফলকে খোদাই করা আছে। কোনো কোনো মন্দিরে একটি পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি আট দশটি নারী মূর্ত্তিও দেখেছি। পুরুষ ছাড়া এখানে অনেক নারীরও স্মৃতি-মন্দির আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই স্মৃতি মন্দিরগুলির মধ্যে কোন্‌টি কার তা জানবার কোনো উপায় নেই। মন্দিরে কারুর নাম লেখা নেই। মন্দির-প্রাঙ্গণ অত্যন্ত অযত্নে রক্ষিত। একদিকে ঘন জঙ্গল, কিছুদিন বাদে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হবে। পুরাতন মন্দিরগুলির অধিকাংশই ভেঙে পড়ছে। একদিন আমরা এই স্মৃতির শ্মশানে মেবারকুলরবি রাণা প্রতাপ সিংয়ের স্মৃতি-মন্দির অন্বেষণ করছিলুম। এই স্থানের রক্ষক একটা পুরাতন মন্দির দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—এইটে প্রতাপ সিংহের স্মৃতি-মন্দির। পরে আমরা জানতে পারলুম যে প্রতাপসিংয়ের স্মৃতিমন্দির মহাসতীতে নেই। রাজপুতানার রীতি অনুসারে ভগ্ন স্মৃতি-মন্দিরের সংস্কার নিষিদ্ধ। এ কথার অর্থ ভাল বুঝতে পারা গেল না। যদি তাই হয়, তা হোলে স্মৃতি-মন্দির খাড়া করবার কোনো অর্থই থাকে না।

মহাসতীতে আসবার পথে একটি ছোট্ট সুন্দর ভাঙা প্যাথরের মন্দির আছে। এই মন্দিরটী মীরাবাইয়ের মন্দির। মুসলমানেরা এই মন্দির ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে এখনো বিগ্রহ আছেন, নিত্য পূজা হয়। কিন্তু মন্দিরটীকে এখনো সেই ভাঙা অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ভাঙা মন্দির সারাতে নেই।

উদয়পুর থেকে চিতোরগড় পঞ্চাশ কি ষাট মাইল দূরে। আমরা উদয়পুর থেকে বেলা চারটের সময় চিতোর যাত্রা কোরে সেখানে রাত্রি সাড়ে নটার সময় পৌচেছিলুম। উদয়পুর-চিতোরগড় ষ্টেট রেলের ট্রেনে দেশী রেস্তরাঁ আছে। এখানে চা রুটি ডিম পুরী প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঠিক এই রকম দেশী রেস্তরাঁ যোধপুর-বিকানীর রেলেও আছে।

সকাল বেলা নটা কি সাড়ে নটার সময় আমরা টাঙ্গায় চড়ে চিতোরগড় দেখতে বেরুলুম। চিতোরগড় পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট্ট শহর। লম্বায় তিন মাইল, চওড়ায় আধ মাইল, কোনো কোনো স্থানে পৌনে এক মাইল হবে। আমাদের টাঙ্গা গাম্ভেরী নদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে চিতোরের পাদমূলে তৌলায়তি শহরের দরজার মধ্যে প্রবেশ করলে। এই স্বল্পতোয়া নদীটি চিতোরগড়ের নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অতীত যুগে বহুবার গৃহবিবাদ ও মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে গাম্ভেরীর স্বল্প নীর রক্তরঞ্জিত হয়েছে। আজও সে নদীর জল লাল; কিন্তু সে রাজপুত অথবা মুসলমান শোণিতে নয়, রজকের অনুগ্রহে।

আমাদের টাঙ্গা তৌলায়তি শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়াল। এইখানে চিতোরগড় যাবার জন্য পাশ নিতে হয়। এইখান থেকে পাশ সংগ্রহ কোরে টাঙ্গা চিতোরগড়ের প্রকাণ্ড ফটক পার হোয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগল। পাহাড় কেটে ঘোরান রাস্তা উঠে গেছে একেবারে ওপরকার সমতলভূমি পর্য্যন্ত। রাস্তার একদিকে দুর্গ প্রাকার, অন্য ধারে পাহাড়। এক একটি ঘোরের মোড়ে মোড়ে প্রকাণ্ড দরজা। প্রায় প্রত্যেক দরজার সঙ্গেই কোনো না কোনো যুদ্ধ অথবা কোনো মেবারী বীরের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী জড়িত। তৃতীয় ও চতুর্থ দরজার মাঝে জয়মল্ল ও পুত্তের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। চিতোর ধ্বংসের দিন এই দুই বীর মোগল সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এইখানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। এই দুই বীরের নাম মেবারের গৃহে গৃহে আজও প্রত্যহ ধ্বনিত হয়। মেবারবাসীরা তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন হোলেও 'জয়মল ফাত্তা'র নাম সেখানকার সকলেই জানে।

এই রকমে ঘুরে ঘুরে সাতটী দরজা পার হোয়ে শহরে পৌছতে হয়। শেষ দরজার নাম রামপোল।

ওপরে উঠে যেদিকে চোখ ফেরান যায় সেদিকেই কেবল ভগ্নস্তূপ। পম্পিয়াই ধ্বংস হয়েছিল প্রকৃতির অত্যাচারে। কালের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেক শহরের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হোতে মুছে গিয়েছে; কিন্তু চিতোর ধ্বংস হয়েছিল মানুষের শক্তির অপব্যবহারে। ভারতবর্ষের বড় বড় হিন্দুরাজ্য যখন মুসলমান বাদ্‌শাদের বশ্যতা স্বীকার করতে লাগল তখন কেবলমাত্র শক্তির অহঙ্কারে মত্ত হোয়ে সম্রাট আকবর চিতোর ধ্বংস করেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই চোখের সম্মুখে ধ্বংসের একখানা জাজ্জ্বল্যমান ছবি ফুটে ওঠে।

রামপোল দরজা পেরিয়ে গিয়েই দরবার ঘর। দরবার ঘরের পরেই ভবানীর মন্দির। মন্দির ছাড়িয়েই তোপখানা। তোপখানার মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি কামান সাজান রয়েছে। কতকগুলো পাথরের গোলাও একপাশে সাজান রয়েছে দেখা গেল। তোপখানার সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ওপাশে রাণা প্রতাপ সিংয়ের সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ভামশার প্রাসাদ। এই প্রাসাদটী একেবারে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌচেছে। এই স্থানের একটু দূরে রাণা কুম্ভের মহল। কুম্ভ মহল নাম হোলেও মনে হয় এইটিই ছিল চিতোরের রাণাদের প্রাসাদ। এই প্রাসাদটীর অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। আস্ত ঘর একখানিও নেই। ঘরের দেওয়ালে কোনো কোনো স্থানে পাথরের সুন্দর কাজ দেখতে পাওয়া যায়। দুই এক জায়গায় দেওয়ালের গায়ে নীল মীনার কাজও আছে। এই মহলের নীচে এক জায়গায় রাজপুত রমণীদের জহর ব্রত করবার ঘর ছিল। এক জায়গায় একটা বড় গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে, সিঁড়ির শেষেই সেই ঘর। মুসলমানদের হাতে চিতোরের যেবার শেষ পতন হয় সেইদিন অপমান থেকে আত্মরক্ষার জন্য আটহাজার রাজপুত রমণী এইখানে জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। রাণা কুম্ভের সেই অভ্রভেদী প্রাসাদ দিনে দিনে ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে। জহর ব্রতের সেই ঘর, যে ঘর আজ সমস্ত ভারতবাসীর তীর্থে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, সে ঘরে এখন

শেয়াল কুকুরেরও ঢুকতে সঙ্কোচ হয়। কুম্ভ মহলের ভাঙা ঘরগুলি এখন গোয়ালে পরিণত হয়েছে—অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি। মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাজা সজন সিং এই মহলের কিছু কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অকাল-মৃত্যুতে সে কাজ সেই অবধি হোয়েই শেষ হয়েছে।

কুম্ভ মহলের ঠিক সম্মুখেই একটি শ্বেত পাথরের মণ্ডপ। এখানে চিতোরের রাণাদের বিবাহ হোতো, এটির নাম সিঙ্গার ছাউড়ি। ভিতরে বিবাহের বেদী হোমকুণ্ড ইত্যাদি আছে। এর ভিতরে বাহিরে সুন্দর খোদাই করা কাজ। চারিদিককার সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু এই রকম অরক্ষিতভাবে থাকলে যে কতদিন এর অবস্থা ভাল থাকবে তা বলা যায় না। কুম্ভ মহলের একটু দূরেই বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিংয়ের ঝক্‌ঝকে শাদা বিরাট প্রাসাদ ফতে মহল তৈরি হচ্ছে। ধ্বংসের এই শ্মশানের বুকে চক্‌চকে নতুন ফতে মহল চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে। যেখানে রাণা কুম্ভ, রাণা মুকুল, জয়মল্ল, পুত্ত, বাদল প্রভৃতি বীরের মহল ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে, সেখানে এই সব সত্যিকারের বীরের স্মৃতির প্রতি নির্ম্মম অবহেলা দেখিয়ে নিজের নামে প্রাসাদ তৈরি করাটা শোভন তো নয়ই, সঙ্গত কিনা তাও বিচার্য্য। শোনা গেল যে ফতে মহল তৈরি করতে অনেক লক্ষ টাকা খরচ হোয়ে গিয়েছে। আজ বিশ বছর ধরে এই প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। যে অর্থ ও পরিশ্রম এই প্রাসাদের জন্য ব্যয় অথবা অপব্যয় করা হয়েছে, সেই অর্থ যদি বর্ত্তমান মেবারের রাণা তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি ও স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যয় করতেন, তা হোলে এক সঙ্গে হাজারটা ফতে মহল তৈরি করার কাজ হোতো।

ফতে মহল থেকে খানিকটা দূরে একটি ছোট জৈন মন্দির আছে। মন্দিরটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। চারদিক ভেঙে পড়েছে। জলমন্দির ও গর্ভগৃহ কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে ঢুকতে ভয় করে। এই মন্দিরটীর গায়ের কারুকার্য্য এত চমৎকার যে তা লিখে জানানো যায় না। এটি যখন আস্ত ছিল তখন বোধ হয় তার চেয়ে সুন্দর মন্দির ভারতে আর ছিল না। হিন্দু স্থপতি যে উন্নতির কোন্ শিখরে উঠেছিল, এই মন্দিরটী তার পরিচয়। চিতোরের অন্যান্য বাড়ী ঘরের মত এটিও রক্ষার কোনো বন্দোবস্ত নেই। বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে এর আর কোন চিহ্নও থাকবে না। এই মন্দিরটীর প্রায় সম্মুখেই বিখ্যাত মীরা বাইয়ের মন্দির। মীরা বাইয়ের মন্দির শ্বেত পাথরের, তার আগাগোড়া খোদাই করা কাজ। এই মন্দির থেকে একটু দূরেই কুম্ভরাণার জয়স্তম্ভ। কুম্ভরাণার এই জয়স্তম্ভের জোড়া ভারতবর্ষে আর নেই। কি স্থপতি বিদ্যায় কি ললিত কলায় ও গঠন সৌন্দর্য্যে এই স্তম্ভ হিন্দু চারু শিল্পের বিজয়স্তম্ভ হোয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কুতব মিনার বা ভারতের অন্যান্য স্তম্ভের বাহিক সৌন্দর্য্যের দিকেই শুধু দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে,—সেগুলির ভিতর দিক যেমন অন্ধকার তেমনি সৌন্দর্য্য-বিহীন। কিন্তু এই স্তম্ভটির ভিতর বাহির সুন্দর। ভিতরেও এমন এক হাত পরিমিত স্থান নাই, যেখানে শিল্পী একটা না একটা কিছু ফুটিয়ে তুলেছে। এমনি তার গঠন-কৌশল যে নীচের প্রবেশ-দ্বার থেকে আরম্ভ কোরে একেবারে ওপর পর্য্যন্ত কোনো স্থানই অন্ধকার অথবা বায়ুহীন নয়। এর সৌন্দর্য্যের তুলনা ভারতে তো নেই-ই—জগতে আছে কি না সন্দেহ।

শহরের আর এক কোণে এই স্তম্ভের নকলে ছোট্ট আর একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে হোলো। কি উপলক্ষে এবং কার দ্বারা এই স্তম্ভ গড়া হয়েছিল সেখানে কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না।

কুম্ভ রাণার জয়স্তম্ভের পাদমূলেই রাণা মুকুলের মহল। এ স্থানের প্রাসাদ বা অন্য ঘর বাড়ী সমস্তই ভূমিসাৎ হয়েছে, কেবল কতকগুলো পাথর ও ভগ্ন স্তম্ভের অংশ অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ এখানে সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এইখান থেকে একটা ঢালু জায়গা নেমে গিয়েছে একেবারে গোমুখী-ধারা পর্য্যন্ত। গোমুখী-ধারা থেকে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত জল পড়ছে। একটা পুকুরের মতন চৌবাচ্ছায় সেই জল ধরে রাখবার ব্যবস্থা আছে। গোমুখীর পথে পাহাড়ের গায়ে বিন্দারাণীর গহ্বর। এই গহ্বরের মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। এইখানে একবার বারো হাজার চিতোর-ললনা জহর ব্রত করেছিলেন।

চিতোর পাহাড়ের ওপরে ছোট বড় অনেকগুলি জলাশয় আছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ জলাশয়ই প্রায় শুষ্ক। এই জলাশয়গুলি থাকার জন্যই সে যুগে পাহাড়ের ওপরে দুর্গ ও শহর তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল।

মীরা বাইয়ের মন্দির ছাড়া সেখানে একটি কালী

মন্দির আছে। এই দুটি মন্দিরের পূজা, বলি ও অন্যান্য ব্যয়ভার মেবার রাজসরকার বহন করেন। হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমানদের হাত থেকে চিতোরের এই মন্দির দুটি যে কি কোরে রক্ষা পেয়েছিল তা ভেবে ঠিক করতে পারা যায় না। কালী মন্দিরে যাবার পথে জয়মল্ল ও পুত্তের বাড়ী পড়ে। এই দুই বীরের পরিবারের সঙ্গে চিতোরের শেষদিনের সেই করুণ কাহিনী চিরদিনের জন্য জড়িয়ে রয়েছে। এই বাড়ী দুটিও ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এক দিন যে বীরেরা সপরিবারে তাঁদের রাণা ও দেশবাসীদের অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে নিজেদের প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন, আজ তাঁদের দেশের রাণার অবহেলায় তাঁদের ইহলোকের শেষ স্মৃতিটুকু চামচিকে ও বাদুড়ের লীলাভূমি হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

জয়মল্ল ও পুত্তের বাড়ী ছাড়িয়ে পথের ধারে সুরয কুণ্ড। এই কুণ্ড সম্বন্ধে মেবারে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। সুরয কুণ্ড, কালী মন্দির ইত্যাদি পেরিয়ে গিয়ে পদ্মিনী মহল। এই বাড়ীটি আস্ত আছে এবং কিছু দিন পূর্ব্বে এর সংস্কারও হয়েছে দেখা গেল। পদ্মিনী মহলের একটা ঘরের মেঝেতে কার্পেট ও টেবিল চেয়ার পাতা। শোনা গেল মাঝে মাঝে ইংরেজরা এখানে এসে আমোদ প্রমোদ করেন। সংস্কারের গোপন কারণটুকু বুঝতে পারা গেল। পদ্মিনী মহলের গা ঘেঁসে প্রকাণ্ড একটি হ্রদ। হ্রদের মধ্যে একটি ঝক্‌ঝকে বাড়ী। এটি ছিল গ্রীষ্ম-নিবাস, বর্ত্তমান রাণা এটিকে মেরামত করিয়েছেন। মাঝে মাঝে অতিথি এলে সেখানে থাকেন। এই হ্রদের ওপারে প্রকাণ্ড চৌগান (arena)। আগে এখানে বাঘে আর বুনো মহিষে লড়াই হোতো। বীরত্বের অনেক ক্রীড়া ও অস্ত্রবিদ্যার অনেক কৌশল এখানে দেখানো হোতো। এখনো রাজপুতনার প্রায় সমস্ত রাজ্যেই একটা কোরে চৌগান-ভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

পদ্মিনী মহলের একটু দূরেই বাদল মহল। এ বাড়ীখানির আর কিছুই নেই, সমস্তই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই স্থান থেকে রীতিমত জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। চিতোর শহরের প্রায় অর্দ্ধেক এখনো জঙ্গলাকীর্ণ। জঙ্গলের মাঝে মাঝে এক একটা ভাঙা বাড়ী, কোথাও বা একটা ছত্রি দেখতে পাওয়া যায়। শুনলুম যে, চিতোরে কোনো লোক বাস করতে চাইলে মহারাণা তাকে বিনা খাজনায় জমি ছেড়ে দেন। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত সেখানে মানুষের বাস একেবারে ছিল না, এখন অনেক পরিবার সেখানে বাস করছে দেখা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, সমস্ত জাতি মিলিয়ে সেখানে এখন প্রায় দুশো পরিবার বাস করছে। এক জায়গায় খুব সুন্দর খদ্দর তৈরি হচ্ছে দেখা গেল। অনেক স্থানে চাষবাসও চলেছে। ক্ষেতে মহজে বিস্তর স্ত্রী পুরুষ কাজ করছে; কিন্তু তারা চিতোরে বাস করে কি না জানতে পারলুম না।

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় আমরা রামপোল দরজার কাছে ফিরে এলুম। পাহাড়ের আধখানা তখন ছায়ায় ঢেকে গিয়েছে, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কিরণ আমাদের সম্মুখের সেই মহান অতীতের করুণ দৃশ্যকে কিছুক্ষণের জন্য একবার ভালো কোরে ফুটিয়ে তুল্লে। সূর্য্য কিরণ ক্রমে ভগ্নস্তূপগুলির ওপর থেকে সরে সরে একবার কুম্ভরাণার বিজয়স্তম্ভের মাথার ওপরে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে যেন বিদায় নিলে। এই ধ্বংস স্তূপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একবার মনে হোলো—শক্তির গর্ব্বে মত্ত হোয়ে একদিন যারা এই বীর জাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল আজ তারা কোথায়?

সেদিন ছিল ২৫ শে ডিসেম্বর। রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে আমরা চিতোরগড় থেকে আজমীর যাত্রা করলুম। সে রাত্রে পথে শীতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়েছিল। এ রাস্তায় প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই রেল কোম্পানীর একদল লোক মোতায়েন আছে। ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছবামাত্র তারা ঘুমন্ত যাত্রীদের জাগিয়ে দেয় আর চেঁচিয়ে বলতে থাকে—ভাই সব ঘুমিও না। মাল পত্র একবার সামলে নাও—এখানে চোরের বড় উৎপাত ইত্যাদি। ঘুমের সময় মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে চোরের উৎপাতের চেয়ে এদের উৎপাতই বেশী। কিন্তু এরা যে যাত্রীদের কতখানি উপকার করে তা একবার জিনিষপত্র চুরি গেলেই বুঝতে পারা যায়।

ভোরবেলা গাড়ী আজমীরে গিয়ে পৌঁছল। আজমীর পুরোনো শহর। অনেক হাত বদলে এখন খাস ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এসেছে। এ জায়গাটা বম্বে-বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার হওয়ায় অনেক ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি বাস করে। তা ছাড়া সরকারী স্কুল কলেজও এখানে আছে। এখানকার রাজকুমার কলেজ

একটা দেখবার জিনিষ। ভারতবর্ষের অনেক স্বাধীন রাজার ছেলেরা এখানে ইংরেজি ধরণে শিক্ষিত হয়।

আজমীর থেকে পুষ্কর তীর্থে যাওয়া যায়। ঘণ্টা তিন চারের মধ্যে গাড়ী কোরে পুষ্কর তীর্থ সেরে আসা যায়। গাড়ীভাড়াও বেশী নয়। পাঁচ টাকার মধ্যে সুন্দর টাঙ্গা পাওয়া যায়।

এখানে একটি বড় জৈন মন্দির আছে। মন্দিরটীর মধ্যে সুন্দর পাথরের কাজ আছে। আজমীরের অন্যতম দেখবার জিনিষ হচ্ছে অন্নসাগর। এটি একটি প্রকাণ্ড হ্রদ; হ্রদের উত্তর দিকে বাগান। সম্রাট শাজাহান এই বাগানের হ্রদের দিকটা শ্বেত পাথরের চত্বর কোরে দিয়েছিলেন। সে চত্বর আজও নূতনের মতন রয়েছে। হ্রদের আর তিন দিক উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পূর্ব্ব দিকের পাহাড়ের উপরে ছবির মতন একখানা সুন্দর বাড়ী। শুনলুম যে, এই বাড়ীখানায় রাজপুতানার স্বাধীন রাজ্যগুলির Agent General বাস করেন। এমন সুন্দর জায়গায় বাড়ীখানা তৈরি করা হয়েছে যে দেখলেই সেখানে থাকতে ইচ্ছে করে। এখান থেকে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখলে অকবি যে তাকেও আত্মহারা হোয়ে যেতে হয়। বাংলা দেশের যে সব কবি কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতি দেবীর বন্দনা করেন, তাঁরা দিন কয়েক এই সব জায়গায় বাস করলে যে অনেকখানি অনুপ্রেরণা পাবেন তাতে আর সন্দেহ নাই।

আজমীরের অন্যতম দর্শনীয় হচ্ছে বিখ্যাত মুসলমান সাধু মইনুদ্দিন চিস্তির সমাধি। জগতের নানা স্থান থেকে ভক্ত মুসলমান নরনারী এই মহাত্মাকে ভক্তির অর্ঘ্য দিতে আসে। প্রতি বৎসর সাধু মইনুদ্দিনের মৃত্যু তারিখের দিন থেকে আরম্ভ কোরে এখানে সাত দিন দিবারাত্রব্যাপী উৎসব হয়। এই উৎসবের নাম উরস্। জিজ্ঞাসা কোরে যতদূর বুঝতে পারা যায় তাতে বুঝলুম যে, উরস্ শব্দের অর্থ 'নির্ব্বাণের' কাছাকাছি একটা জিনিষ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রাজপুতানায় থাকতে থাকতেই এই উরস্ পর্ব্ব হয়। আমরা জয়পুর থেকে এই পর্ব্ব দেখতে গিয়েছিলুম।

দিনের চেয়ে রাত্রিতেই এই উৎসবের সমারোহ হয় বেশী। সে সময় শহরে এত লোকের ভিড় হয় যে, দেখলেই বুঝতে পারা যায় সেখানে একটা কিছু হচ্ছে। শহরে বেরুলেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মুসলমান দেখা তো যাইই; তা ছাড়া ভারতের বাইরের যে সকল মুসলমানদের দেখবার সুযোগ আমাদের প্রায় হয় না তাদেরও দেখা যায়। পুরুষ ছাড়া নারীর সমাগমও বড় কম হয় না। মোট কথা, এই উরসের সময় আজমীরে কুম্ভ মেলার একটি ছোট খাট সংস্করণ হোয়ে যায়।

আমরা রাত্রি বারোটার পর উরস্ দেখতে বেরুলুম। আগে থাকতেই পাণ্ডা ঠিক করা ছিল, তিনি এসে আমাদের নিয়ে চল্লেন। শহরের মধ্যে ঢুকে একটা সরু রাস্তা দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হোলো। এইখানে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। এক দিকে পর্ব্বত প্রমাণ জুতো ঢিপি কোরে রাখা হয়েছে দেখা গেল। সে দৃশ্য দেখে আমরা পাণ্ডা মহাশয়কে অন্যত্র জুতো রাখবার ব্যবস্থা করতে বল্লুম। তিনি অন্য একটা জায়গায় জুতো রাখবার ব্যবস্থা করার পর সেখানে জুতো রেখে ফটকের মধ্যে ঢোকা গেল। মেবারের মতন মোজার ওপরে এখানে তেমন আক্রোশ নেই। বড় ফটক পার হোয়ে খানিকটা প্রাঙ্গণ, তার পরে একটা সরু ও খুব উঁচু ফটক পার হোয়ে আমরা একটা শ্বেত পাথরের চত্বরে এসে পড়লুম। এই চত্বরটী একটি মসজিদের সংলগ্ন। মসজিদের উপাসনা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। শোনা গেল যে, একটু পরেই পাঠ আরম্ভ হবে। মসজিদের মধ্যে অসংখ্য লোক শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চত্বর দিয়ে কিছু দূর গিয়ে বাঁ দিকে নেমে গিয়ে সাধুর সমাধি। সমাধি ঘরের সংলগ্ন একটা ছোট পাথরের ঘরে অনেক লোক বসে আছে, প্রায় প্রত্যেকেরই সম্মুখে একখানা বই। এই স্থানে দুই চারজন নারীকেও বসে থাকতে দেখেছি। সমাধি গৃহটি খুব সুন্দর ও সাজান, এইখানে বিষম ভিড়। অনেকে এখানে পূজো দিচ্ছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেক হিন্দুকেও এখানে পূজো দিতে দেখা গেল। পাণ্ডার অত্যাচারও হিন্দু তীর্থগুলিরই মতন। সমাধি গৃহের সম্মুখেই সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের জন্য শ্বেত পাথরের জাফরি ঘেরা একটা অঙ্গন আছে। তারকেশ্বর প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থানের মতন সেখানে অনেকে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকেন। সমাধি মন্দিরের বাইরে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। এখানে ভয়ানক ভিড়। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবক সেখানে কাজ করছেন। এই প্রাঙ্গণের অনেক স্থানেই গান বাজনার আসর বসেছে দেখা গেল। কলকাতায়

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা দেখে গিয়েই মুসলমানদের তীর্থস্থানে এই গানবাজনার ঘটা একটু আশ্চর্য্য বলে বোধ হোলো। পাণ্ডা মশায়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে আগে গান বাজনার ঘটা আরও বেশী হোতো, ক্রমে সেটা কমে আসছে। এই আচ্ছাদনহীন প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক শুয়ে আছে। অনেকে সপরিবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে সেই শীতে বসে বসে কাঁপ্‌ছে।

এখান থেকে আমরা সেই মসজিদে ফিরে গেলুম। সেখানে তখন পাঠ আরম্ভ হয়েছে। যিনি পাঠ করছিলেন গম্ভীর ও মধুর তাঁর গলা। সুর কোরে কি পাঠ করছিলেন সে ভাষা বুঝতে পারলুম না। বাইরের সেই গোলমাল থেকে ঘুরে এসে এই স্থানটি বড় ভাল লাগ্‌ল। এইখানেও অনেক লোক শুয়ে আছে। রোগী সুস্থ ধনী দরিদ্র সকলে নির্ব্বিচারে পাশাপাশি শুয়ে। এইখানে সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটি দীর্ঘকায় ব্যক্তি হঠাৎ উঠে আমায় আলিঙ্গন করলে। হঠাৎ সেই রকম আলিঙ্গনে আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হোয়ে পড়লুম; কিন্তু একটু পরেই তাকে চিনতে পারলুম। ছেলেবেলার বন্ধু আমার সে। আমরা একসঙ্গে পড়তুম। ধনীর ছেলে সে, স্কুলে জুড়ি গাড়ী চড়ে আস্‌ত। আজ দশ বারো বছর হোলো সে সংসার ত্যাগ কোরে ফকিরী গ্রহণ করেছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ কোরে প্রায় ভোর বেলা ফেরা গেল। ফেরবার সময় পাণ্ডা মশায় আমাদের একটি বিরাট ডেক্‌চির কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন, এর মধ্যে ভোগ তৈরি হোয়ে আছে, কাল সকালে সেই ভোগ লুট হবে। ভোগ আর কিছু নয় পোলাও। কতখানি পোলাও ভোগের জন্য তৈরি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে, এই ডেক্‌চিটাতে একশো মন পোলাও আছে। দুশো মন পোলাও তৈরি হোতে পারে এ রকম আর একটা ডেকচিও আছে। তিনি আরও বল্লেন যে, প্রতি বছরই পোলাও লুটের সময় দুটো চারটে লোক খুন হয়। সেই গরম পোলাও ভরা ডেক্‌চির মধ্যে অনেকে লাফিয়ে পড়ে। পোলাও লুটের ব্যাপারটা দেখবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করলেন; কিন্তু সে ব্যাপারটা আমাদের আর দেখা হয়-নি।

(ক্রমশঃ)



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] রাখাল



সুরের মোহ

শিল্পী শ্রীযুক্ত বলাইবন্ধু রায়

Bharatvarsha Halltone & Ptg. Works.

ভাই-বোন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রাস্তায় ভারী একটা গোলোযোগ শোনা গেল। রাস্তার দুই-ধারে পথিক ও দোকানদারেরা সমবেত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, 'গেল গেল'—'সর্ব্বনাশ হ'ল।' ব্যাপার কি? একটি বছর ছয়-সাতের ছেলে রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে করিতে চলন্ত ট্র্যামের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কচি দেহ ট্র্যামের চাকার নীচে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত; কিন্তু ট্র্যামের চালক খুব হুঁসিয়ার। বিদ্যুৎগতিতে প্রাণপণ বলে সে ব্রেক কষিল। গাড়ীশুদ্ধ লোককে একটা ঝাঁকানি দিয়া ছেলেটিকে গ্রাস করিবার পূর্ব্বেই ট্র্যাম থামিয়া গেল। রাস্তার লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিমূঢ় বালককে ঘেরিয়া তখন উল্লাস, বকুনি ও হা-হুতাশের ঘটা পড়িয়া গেল। বালক তাহার চতুর্দ্দিকের জনতা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন সময় আলুথালু ভাবে ভিড় ঠেলিয়া একটি ন'দশ বৎসরের বালিকা বালকটির কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাপড়ের খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন প্রশ্ন করিল, "ও কে খুকী, অমন করে কি রাস্তায় ওকে ছেড়ে দেয়, আর একটু হইলেই ও যে যেত!" বালকটিকে এ ভাবে অপদস্থ হইতে দেখিয়া খুকী তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, রোষ-কষায়িত দৃষ্টি তুলিয়া সে তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা ওকে অমন কর্‌ছ কেন? রাস্তা ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ী যাই।" বালিকা ছেলেটির দিদি। জনতা দিদিত্বের এই হাস্যকর দাবীতে হাসিয়া উঠিয়া ভিড় ছাড়িয়া দিল। ভাইয়ের হাত ধরিয়া দিদি সগর্ব্বে চলিয়া গেল। বাড়ীর সামনে আসিয়াই ভাইয়ের অতিক্রান্ত ফাঁড়াটার কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দুষ্টু ছেলে! অমন ক'রে কি রাস্তায় যেতে আছে!" ভাই-বোনে কান্নার পালা শেষ করিয়া বাড়ী ঢুকিল।

অনেক বছর পরের কথা। রাস্তার সেই বালক এখন বিলাত ফেরত ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জন। চিকিৎসা-বিভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা সুরু হইয়াছে, সমাজেও তাহার যথেষ্ট খাতির। মেডিকেল কলেজের মধ্যেই সে কোয়ার্টার্স পাইয়াছে। সদ্য-বিবাহিত পত্নী লইয়া সে সেখানে বাস করে। বিশেষ করিয়া এই বিবাহ সম্পর্কে অপূর্ব্বকুমারের প্রতিষ্ঠা সমাজে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপূর্ব্বকুমারের স্ত্রী লতিকার পিতা ব্রাহ্ম সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি—ধনে মানে শিক্ষায় ব্যবহারে।

ছেলেটির সেই বালিকা দিদি মাধুরী দরিদ্র স্বামীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতার এক দরিদ্র পল্লীতে আপনার ক্ষুদ্র সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সংসার বলিতে স্বামী বীরেন্দ্রনাথ ও একটি শিশু কন্যা। ভ্রাতার বিদেশে অবস্থান কালে বীরেন্দ্রনাথের সহিত মাধুরীর সবিশেষ পরিচয় হয় এবং একদিন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের অমতে সম্পূর্ণ নিজের প্রবল ইচ্ছার জোরে সে বীরেন্দ্রকে বিবাহ করে। বীরেন্দ্র ধনে মানে মাধুরীদের পরিবারের সমকক্ষ না হইলেও লোকটি চমৎকার। মাধুরী ও অপূর্ব্বর বড় দিদি অনুপমা কেবল মাত্র এই বিবাহের পক্ষে ছিল। অনুপমার নিজের বিবাহ কোন বড় ঘরে হইলেও ছোট বোনের এই প্রেমকে সে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিল, এবং পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটা করিয়া বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছিল। পিতা মাতার এই অপ্রীতি ও তাচ্ছিল্য মাধুরীকে বড় পীড়া দিতেছিল। তাই বিবাহের পরে সে পিতৃ-গৃহে বড় একটা আসিত না। স্বামী স্বভাব-সুলভ ভালোমানুষীতে মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে দেখা দিলেও, শেষে মাধুরীর পীড়াপীড়িতে সেও আসা-যাওয়া ত্যাগ করিয়াছিল। সত্যই ত! যাঁহারা আজিও তাহাকে উপেক্ষা করিতে ছাড়েন না, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখাটা নিজের দিক দিয়া যাহাই হউক, স্ত্রীর পক্ষে তাহা যথেষ্টই ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। পিতামাতার ও কন্যার মাঝে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই অভিমানের এক পরদা পড়িয়াছিল।

বীরেন্দ্র স্কুলে মাষ্টারী করিয়া যৎসামান্য রোজগার করিত, তাহাতে বাসা ভাড়া দিয়া কলিকাতায় বাস করা তাহার পক্ষে দুরূহ ছিল। সুতরাং তাহাকে সকালে বিকালে টিউশনী করিতে হইত। মাধুরীও পিতৃ-গৃহবাসের সকল স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। নিজেই সংসারের সকল কাজ করিত। পিতামাতার উপর অভিমান বশে সে গোপনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইত, স্বামীর নিকট কখনও পিতৃগৃহের উল্লেখ করিয়া সে কোনো কথা বলিত না।

মাধুরীর বিশ্বাস ছিল অপূর্ব্ব ফিরিয়া আসিয়া দিদিকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, দুই বোনের একটি মাত্র ছোট ভাই, অত্যন্ত স্নেহের সামগ্রী। কিন্তু সেই ভাই দেশে ফিরিয়া বোনের দারিদ্র্য ও স্বামী-নির্ব্বাচনের ভুলটা ভুলিতে পারিল না। দেশে ফিরিয়া সেই যে সে ঘণ্টা খানেকের জন্য তাহার সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত আর সে দিদির খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। দিদি অনুপমা তবু মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার বড় আদরের ভগিনী ও তাহার কন্যাকে এক-আধটু আদর দেখাইয়া যাইত।

এরূপ সম্বন্ধটা অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। পিতামাতার উপেক্ষা মাধুরী সহিয়াছিল; কিন্তু ভ্রাতার এই তাচ্ছিল্য তাহাকে বড় বাজিল। তাহার অশ্রুজল বারণ মানে নাই। মাধুরীর মন ক্রমশঃ কঠিন হইয়া আসিতেছিল। সে দিনে দিনে আপনার স্বামী সন্তানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আপনার সংসারেই ডুবিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব বিদেশে থাকিতে দিদির মতিচ্ছন্নতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দিদি!—এ কী করিয়া বসিল! বীরেনকে সে যে চিরদিন 'ন্যাকা' 'কাপুরুষ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—আর তাহাকেই কি না বিবাহ করিল তাহার ছোটদি—যাহার রুচির উপর তাহার একটা গভীর আস্থা ছিল! দেশে ফিরিয়া সে সর্ব্ব প্রথমেই বড়দিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল—"এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল দিদি?" অনুপমা শান্তভাবে বলিল, "ওরে, বীরেনকে মাধু বড্ড ভালবাসে!" ব্যস, এক কথায় সবটার মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু অপূর্ব্বর মনের গ্লানি কাটিল না। এই হীন সম্বন্ধের লজ্জা মাধুরী অনুভব না করিলেও অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গ যেন এই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। লোকের কাছে সে এই ভগ্নীপতিকে স্বীকার করিবে কি করিয়া!

অপূর্ব্ব এক দিন মাধুরীর বাসায় গিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসিল! দীর্ঘ চার বৎসর পরে ভাই-বোনে দেখা; কিন্তু কি যেন একটা ব্যবধান উভয়ে অনুভব করিল। ভাই-বোনের মিলনালাপ তেমন জমিল না। তার পর অপূর্ব্ব তাহার বাক্‌দত্তা পত্নীর পিছনে ছুটাছুটি করিয়া এক দিন শুভলগ্নে তাহাকে বিবাহ করিয়া নবোঢ়া পত্নীকে লইয়া মশ্‌গুল হইয়া গেল। বিবাহে আর পাঁচজনে যেমন আসে, মাধুরীও তেমনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া পিতা মাতা ভাইয়ের উপর অভিমানে সে যে কি কান্নাটাই কাঁদিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানে নাই।

ইহার কিছু দিন পরেই অপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজে চাক্‌রী পাইল, এবং তার পর এক দিন সে পত্নী লতিকাকে লইয়া তাহার কোয়ার্টার্সে উঠিয়া গেল।

মানুষ নিজের ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। মাধুরী, অপূর্ব্ব ও অনুপমা আপন আপন ভাগ্য বহন করিয়া সংসারে চলিতে লাগিল। দরিদ্র মাধুরীর কষ্টে দিন কাটে। অপূর্ব্ব আপনার শ্বশুরকুল ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সগৌরবে চলে ফিরে, পার্টি, নিমন্ত্রণ ষ্টীমার ট্রিপ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের অন্ত নাই। আপনাকে ও আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে কেন্দ্র করিয়া এই যে সুখ বিলাস, তাহার মাঝে ভগিনীর স্থান কোথায়? অপূর্ব্ব কতকটা ইচ্ছা করিয়া, কতকটা ঘনিষ্ঠতার অভাবে মাধুরীর কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। স্ত্রী লতিকা ত মাধুকে চেনেই না। বহু-সন্তান-পরিবৃতা অনুপমা আপন সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বাহিরের বিশ্বে কি ঘটিতেছে তাহা দেখিবার অবসর তাহার হয় না। পিতামাতা পঞ্চাশোর্দ্ধে গিরিডিতে নির্জ্জনে বাস করিতেছেন।

তবু অপূর্ব্বর বাড়ীর পার্টি ইত্যাদিতে বড়দিদি ও বড় ভগ্নীপতির স্থান ছিল, মাধুরী ও বীরেনের কোন স্থানই ছিল না। ইহা লইয়া অনুপমা এক দিন লতিকার কাছে অনুযোগ করিয়াছিল। লতিকা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়াছিল। ভাইয়ের ব্যবহারে অনুপমা বিরক্ত হইয়া ক্রমশঃ ভাইয়ের বাড়ীতে যাতায়াত ত্যাগ করিল।

মাধুরীর এখনো কিছু সম্বন্ধ ছিল এই দিদিটির সহিত।

সুখে দুঃখে তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে দিদিই এখন আসে। তবে তাহার অবসর কম,—বৃহৎ সংসার। মাধুরী এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকে। স্বামীর কাছে তবু দিদি তাহার মুখ রক্ষা করিতেছে!

বীরেন্দ্রের সঙ্গে মাধুরী কখনো বাপের বাড়ীর কথা লইয়া আলাপ আলোচনা করিত না, সেদিকে তাহার এখনো প্রচুর দুর্ব্বলতা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে অভিমানি। তাহার বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া সে কিছু প্রকাশ করিত না, পাছে স্বামী অপমানকর কিছু বলিয়া বসেন! বীরেন্দ্র স্ত্রীর এই দুর্ব্বলতাটুকুকে সম্মান করিয়া চলিত। কিন্তু অপূর্ব্বর সম্বন্ধে সে মাঝে মাঝে তীব্র কথা বলিতে ছাড়িত না। মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত, কিছু জবাব দিত না,—জবাব দিবারই বা কি আছে!

কোনো দিন সন্ধ্যায় পড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে খবর দিত, "আজকে তোমার ভাইয়ের বাড়ীতে বিরাট ব্যাপার মাধু, অপূর্ব্ব বাবুর শালী না কি বিলাত যাচ্ছেন, তাই তাকে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া হচ্ছে। হায় রে এই গরীবকে এক দিন ভুল করেও নেমন্তন্ন করে না, তবু দুই একটা মুখ-রোচক খাওয়া আর দৃশ্য দেখ্‌তে পেতাম।" মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত।

কয়েক বৎসর পরের কথা বলিতেছি। মাধুরীর বাবা মা উভয়েই গত হইয়াছেন। অনুপমাও পাচটি সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে। এখন অপূর্ব্ব আর মাধুরী দুই ভাই বোন,—সংসারে আপন আপন ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করিয়া চলিতেছিল। পিতার মৃত্যু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে,—কলিকাতা হইতে তিন সন্তানের কেহই পিতার সহিত শেষ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে পারে নাই। মাতাও ইহার পর অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। অনুপমা তখন অসুখে ভুগিতেছিল, সে যাইতে পারে নাই। মাধুরী আপনার কন্যাকে বীরেন্দ্রের নিকট রাখিয়া ক্রোড়স্থ পুত্রকে লইয়া গিরিডিতে মায়ের সেবা করিতে গিয়াছিল। অপূর্ব্বর স্ত্রী কখনও গিরিডি যায় নাই। মায়ের অসুখের সময় সে আবার অন্তঃসত্তা ছিল, সুতরাং সে পিতার গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাঝে মাঝে গিয়া মাকে দেখিয়া আসিত; কিন্তু কাজের অজুহাতে এক আধ দিনের বেশী থাকিত না। মাস খানেক ভুগিয়া মা মারা গেলেন। এই সময়টাতে ভাই বোনে দেখা সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা হইত না। দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত নারী তাহার বড় আদরের ভাইয়ের কাছে তাহার হৃদয়খানি উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইত, কিন্তু কথা বলিতে গিয়া বলা হইত না, কোথায় যেন কি একটা বিষম বাধা ছিল। বোনের মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবসর অপূর্ব্বর ছিল না,—আসন্ন-প্রসবা পত্নীর বিপদ কল্পনা করিয়া সে তখন ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুর পর, অপূর্ব্বই মাধুরীকে তাহার স্বামীগৃহে পৌছাইয়া দিল,—বহু বর্ষ পরে আবার অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে মাধুরীর গৃহে তাহার ভ্রাতার পদধূলি পড়িল। তার পর ধীরে ধীরে আবার নিদারুণ বিস্মৃতি!

মাধুরী দিদির সহিত দেখা করিয়া এবার আর কান্না রোধ করিতে পারিল না, বলিল, দিদি মেয়ে মানুষ ত ভুলিতে পারে না, বুকের রক্ত যে তোলপাড় করিয়া উঠে, রক্তের সম্বন্ধ—সে কি ইচ্ছা করিলেই ভোলা যায়! কিন্তু ভগবান পুরুষকে কি ধাতে যে নির্ম্মাণ করেন, নির্ম্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া বর্ত্তমানের তাড়ায় তাহারা ছুটিয়া চলে—সমস্ত রক্তের সম্বন্ধ শিথিল করিয়া। আমরা কেন পারি না দিদি?

রোগকাতর শীর্ণ মুখখানি তুলিয়া দিদি ভগ্নীর মুখখানি বুকে টানিয়া লইল, কিছু বলিল না।

আপনার বলিতে একমাত্র দিদিই ছিল, সেও আর রহিল না। এক দিন সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সেও চলিয়া গেল।

মাধুরী এক দিন যৌবনের জোরে আপনার চারিদিকে যে নিবিড় আবরণ রচনা করিয়াছিল,—দিনের কাজের অবসরে, স্বামী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া, গুটি পোকার মত সেই আবরণ ভেদ করিয়া সে বাহিরে আসিত, তখন তাহার নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইত। ছেলেকে আদর যত্ন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার বড্ড ভয় করিত। এও ত ওই অপূর্ব্বর জাত! কে জানে এক দিন হয় ত এও মায়ের নাড়ীর টান উপেক্ষা করিয়া আপনার অদম্য বলে আপন সংসারচক্র নির্ম্মাণ করিতে সুরু করিবে—মা থাকিবে না, ভগ্নী থাকিবে না, কোনো সম্বন্ধের প্রয়োজন এ অনুভব করিবে না। মাধুরী শিহরিয়া উঠিত,—বাপ রে, ভাইয়ের উপেক্ষাই যে তাহার

বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে, ছেলের উপেক্ষা সে কি সহিতে পারিবে!

অপূর্ব্বদের পরিবারে যে অবিশ্রান্ত বিয়োগান্ত পর্ব্বের সুরু হইয়াছিল, অপূর্ব্বর স্ত্রী লতিকার মৃত্যুর পর তাহা সমাপ্ত হইল। একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াই সে ইহলীলা সংবরণ করিল। অপূর্ব্ব চক্ষে অন্ধকার দেখিল। মানুষ এত বড় আঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকে না। এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ কেমন অন্ধকার হইতে পারে, অপূর্ব্ব তাহা কখনো ভাবে নাই।

ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন সে পিছনে একবার ফিরিয়া চাহিল,—মা, বাবা, বড় দিদি কেহ নাই, এক মাধুরী—সেই বা কেমন আছে কে জানে! মাধুরীর কথা আজ তাহার মনে জাগিল।

সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া অপূর্ব্ব বড় বিব্রত হইল। শাশুড়ী সেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব বিশেষ ভরসা পাইল না। এই কয়েক বৎসরের ব্যবহারেই সে ইহাদের ধাত বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। পরের সন্তানের ঝক্কি সহিবার মত মনোভাব ইঁহাদের নহে। বিশেষ করিয়া অপূর্ব্ব এবং অপূর্ব্বের এই শিশুটিই তাঁহাদের আদরের কন্যার মৃত্যুর কারণ। তাঁহারা যে অপূর্ব্বকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অপূর্ব্ব তাহা মনে করিতে পারিল না।

মাধুরী সব শুনিল। এক মুহূর্ত্তে সকল অভিমান তাহার ভাসিয়া গেল। আজ আর তাহার অশ্রু বাধা মানিল না। স্বামী অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে গেলেন, ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল, মেয়ে হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—মাধুরীর আজ কোনো খেয়াল নাই। তাহার বড় সাধের ভাই আজ সঙ্গীহীন হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, সে কি বসিয়া থাকিতে পারে?

বৈকাল পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিতে পারিল না। গাড়ী ডাকিয়া একেবারে অনিমন্ত্রিত অযাচিত ভাবে ভায়ের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। একবার ভাবিল না—হয় ত অপূর্ব্ব ইহাতে রাগ করিবে—বিরক্ত হইবে। শৈশবের একটা ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সেই যে দিন চলন্ত ট্রামের মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া তাহার ভাই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে তখন সব বাধা ঠেলিয়া ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। আজও যে তাহার বড় সাধের ভাই বিপন্ন হইয়াছে,—লজ্জা অভিমান তাহার আজ কি থাকিতে পারে।

মাধুরী ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব্বর শ্বশুরালয়ে পৌঁছিল। বাহিরের ঘরে অপূর্ব্ব একা বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল; কখন একটা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সামনে থামিয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ, 'ভাই অপু' বলিয়া কে তাহাকে ডাকিল! বড় পরিচিত সেই স্বর! অপূর্ব্ব চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার পরিত্যক্ত, তাহারই অনাদৃত বড় সাধের ছোট্‌দি মাধুরী! মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে কোলে টানিয়া লইল। দিদির চোখের জলে ভায়ের রুক্ষ কেশ সিক্ত হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব 'দিদি' বলিয়া বহুদিন পরে ডাকিল,—তাহার বুকের সমস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

পূর্ণকুম্ভ

শ্রীনন্দলাল কড়ুরী

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারে পুণ্যতোয়া সুরধুনীতে পূর্ণকুম্ভযোগে স্নান করিবার বাসনা হইয়াছিল; কিন্তু সেবার নানা কারণে যাওয়া হয় নাই। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বৎসর—এক যুগ চলিয়া গেল; আবার পূর্ণকুম্ভ যোগ আসিল;—বহু দিনের আশা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আবার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তীর্থেশ্বরীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিগত ১৪ই চৈত্র সোমবার দেরাদুন এক্সপ্রেস্ ট্রেণের একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৬।৫৪ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেসনে সঙ্গীগণের সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। বিখ্যাত কর্ম্মবীর স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কন্যা ও পুত্রবধূ এবং তাঁহাদের অন্য দুইজন আত্মীয় আমার সহযাত্রী ছিলেন।

পর দিবস বেলা ৯টার সময় ট্রেণ মোগলসরাই পৌঁছিলে যাত্রীগণ অনেকেই স্নান ও জলযোগ করিয়া লইলেন; আমিও স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ ফলাহার করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করিলাম এবং এই অবসরে সমগ্র ট্রেণের প্রকোষ্ঠগুলি একবার দেখিয়া লইলাম। তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠগুলিতে তিলধারণের স্থান ছিল না। যাত্রীদের কি কষ্ট হইতেছিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। গাড়ী যখন বেনারস রাজঘাটে পৌঁছিল, সেখান হইতেও অনেক যাত্রী উঠিল।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলে দেখিলাম, ষ্টেসনে অনেক যাত্রী উপস্থিত। মনে ভাবিলাম, ইহারা কিছুতেই গাড়ীতে উঠিতে পারিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি সকল যাত্রীরই গাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হইয়াছে;—কি ভাবে হইয়াছে তাহা আর বলিতে হইবে না! রাত্রিতে অযোধ্যা ষ্টেসনে দেখিলাম, অনেক যাত্রী আমাদের গাড়ীতে উঠিতে পারিলেন না।

পরদিন ১৬ই চৈত্র বেলা ৮টার সময় আমাদের গাড়ী যথাসময়ে পুণ্যভূমি হরিদ্বার ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত গাড়ী শূন্য হইয়া গেল। আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে যাঁহারা চতুর্থ শ্রেণীর অভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত (স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের পৌত্র হরিশঙ্কর বাবুর অনুরোধক্রমে) রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী মহারাজ আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার সহিত প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে কনখলে ৺গিরিশচন্দ্র বসুর গঙ্গা-ভাগীরথী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য একটী ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথায় আমাদের জিনিস-পত্র রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একজন সঙ্গী পাইয়া হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গমন করিলাম। টোঙ্গা ভাড়া প্রত্যেক জনের দুই আনা হিসাবে পড়িয়াছিল। রাস্তা তিন মাইল হইবে। যথাসময়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইলাম!

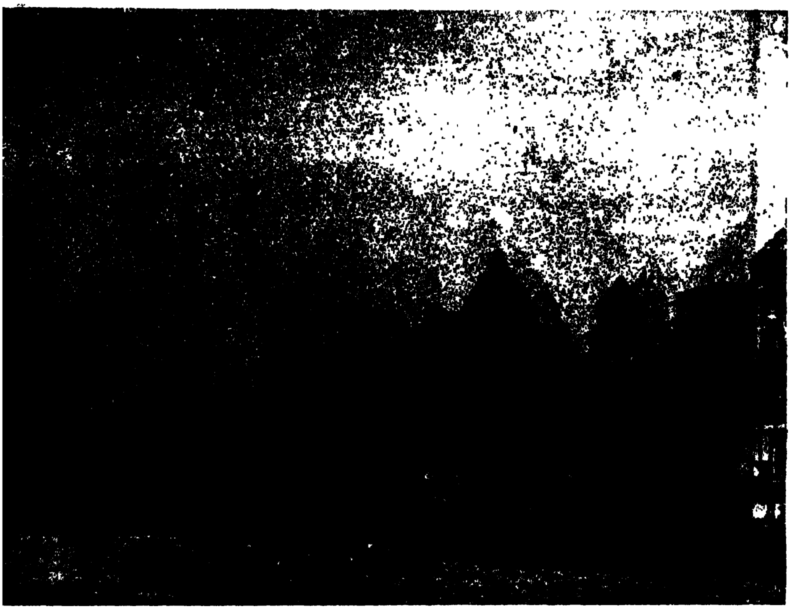
কুম্ভ স্নানের পূর্ব্বেই সহস্র সহস্র পুণ্যার্থী স্নান করিয়া ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিতেছেন, এবং বিধৌত-পাপ হইয়া পুণ্য সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যথাকালে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সহযাত্রী পাচক-মহাশয় সঙ্গীগণের ক্ষুন্নিবারণের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা জনার্দ্দন স্মরণ করিয়া আহারে বসিয়া গেলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম; কিন্তু এক বিষম দুশ্চিন্তা আসিয়া বিশ্রান্তির ব্যাঘাত ঘটাইল। আমাদের পরিচারিকার সঙ্গে চারিজন স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষ ছিল। তাহাদের বাসস্থান ঠিক করিবার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলাম। হরিদ্বারে কি কনখলে ঘর পাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। ৫৲ টাকায় পূর্ব্বে যে ঘর কেহ ভাড়া লইত না, এখন তাহার ভাড়া ৫০৲ টাকা হইয়াছে। হয়ত আর দুই একদিন পরে অত টাকা দিয়াও সামান্য আশ্রয়-স্থানও মিলিবে না। পূর্ব্বে পাণ্ডাগণ যাত্রী লইয়া কত টানাটানি করিত, এখন আর কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না।



সপ্তধারা—হরিদ্বার

আমাদের পরিচারিকা, পাণ্ডার নিকট তাহাদের ঘরের জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং দিবাকরও অবসর বুঝিয়া পশ্চিম শৈলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা আশ্রয়হীন যাত্রী কয়জনের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলাম এবং সন্ন্যাসী মহারাজও স্বভাবসিদ্ধ দয়াপরবশ হইয়া পাণ্ডাকে অনুরোধ করিলে পাণ্ডা আর একটী ঘর খুলিয়া দিয়াছিলেন। আশ্রিতকে পরিত্যাগ কখনই সমীচীন নহে; বিশেষতঃ তীর্থক্ষেত্রে। যখন উহারা আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে, যেরূপেই হউক উহাদিগকে স্থান দিতেই হইবে। আমরা তখন পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম যে, আমাদের একটী ঘরে মহিলাগণ থাকিবেন এবং অন্য ঘরে আগন্তুকগণের সহিত আমরা পুরুষ ছয়জন রাত্রি যাপন করিব। আমাদের অসুবিধা বা কষ্টের দিকে দৃকপাত করিব না। সে রাত্রির জন্য সেই ব্যবস্থাই করা গেল।

হরিদ্বারে আসিবার সময় আমার বন্ধুবর নরেন্দ্রবাবু, হরিদ্বারের সদাসুখ গম্ভীরচাঁদ বাবুর ধর্ম্ম-শালার ম্যানেজারের নিকট ঘরের জন্য একখানি অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনুরোধ-পত্রের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া একজন সঙ্গী লইয়া উক্ত ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। প্রতিহারী আমাদিগকে দ্বিতলে আসীন মালিকের নিকট লইয়া গেল। আমি বাবুর হাতে পত্র দিলে তিনি পড়িয়া বলিলেন, উপরে ঘর নাই। আমাকে গৈরিক-বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া ঈষৎ অবজ্ঞা-ভরে উপস্থিত একজনকে যদি অন্য ঘর থাকে দেখিবার জন্য অনুমতি দিলেন। আমি তখন নরেন বাবুর সহিত আমার বন্ধুত্বের পরিচয় দিলাম; কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হইল যে, বাবু কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে, একজন গৈরিক-পরিহিত দীনহীন সন্ন্যাসী কিরূপে একজন ধনীর বন্ধু হইতে পারেন। যাহা হউক কর্ম্মচারীর সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দুইটী ঘর চাবি দেওয়া আছে; কিন্তু সে দুইটী আমাদের দেওয়া সম্ভব হইল না। অন্য সময়ে মাড়ওয়ারীগণের ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালীর স্থান হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বদেশবাসীরাই সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গালীর স্থান নাই বলিলেও হয়।



কুশাবর্ত্ত ঘাট—হরিদ্বার

আমরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং যেখানে প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেখানেই, সমস্ত অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম।

ক্রমে সংবাদ পাইলাম, ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে তাঁহার শিষ্য সেবক অনেকেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। অধিকাংশ দরিদ্র ভিক্ষুকগণ গঙ্গাতীরে ঘাটের উপর রাত্রি কাটাইতে লাগিল। কেহ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে কুটীর বাঁধিয়া, কেহ বা তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ভারত সেবাশ্রম নাম দিয়া কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক একটী সম্প্রদায় গঠিত করিয়া ষ্টেসনের নিকট একটী মাঠে তাঁবু ফেলিয়া অনেকগুলি নিরাশ্রয় বাঙ্গালী যাত্রীকে স্থান দিয়া অশেষ উপকার করিয়াছিলেন।

জোয়ালাপুরে ঋষিকুলে কলেজ ও ছাত্রাবাসের বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিরাট পটাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে প্রত্যহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সঙ্গীত আলোচনা হইত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় সহস্রাধিক তাঁবু পড়িয়াছিল। কোন কোন তাঁবুতে স্বদেশী দোকান হইয়াছে; তবে অধিকাংশ তাঁবুতে তীর্থযাত্রীগণ স্থান পাইয়াছে। অবশ্য অর্থ দিয়াই স্থান পাইয়াছে। ইহাই এক্ষেত্রে পরম লাভ মনে করিতে হইবে। নিরঞ্জনী, নির্ব্বাণী, নির্ম্মল প্রভৃতি বিরাট আখড়াধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শিষ্যসেবকগণ তাঁহাদের পাকা মঠে স্থান পাইয়াছেন। অন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ নাগা বৈষ্ণবী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সম্প্রদায় গঙ্গার পরপারে অর্থাৎ চড়ার উপর বালীআড়ীর মধ্যে পর্ণ-কুটীর, তাঁবু অথবা আকাশাচ্ছাদনে দুই মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রশস্ত স্থানে আড্ডা করিয়া বাস করিতেছিল। এক এক দিন সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইত।

১৯শে চৈত্র। আজ মধ্যকুম্ভ স্নান। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড বা হরকা-পাড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে বাহির হইয়া দেখিলাম, জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত চলিয়াছে। আমাদের বাসা তিন মাইল দূরে অবস্থিত; তাহারও পরে কত দূর হইতে কত লোক আসিতেছে, অধিকাংশই পাঞ্জাবী; বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম! ব্রহ্মকুণ্ডের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, দুই চারি জন বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া গেল; এমন কি দুই একজন পূর্ব্ব পরিচিত লোকের সহিতও দেখা হওয়ায় আনন্দিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, অগ্রসর হওয়া ততই কষ্টকর হইতে লাগিল।

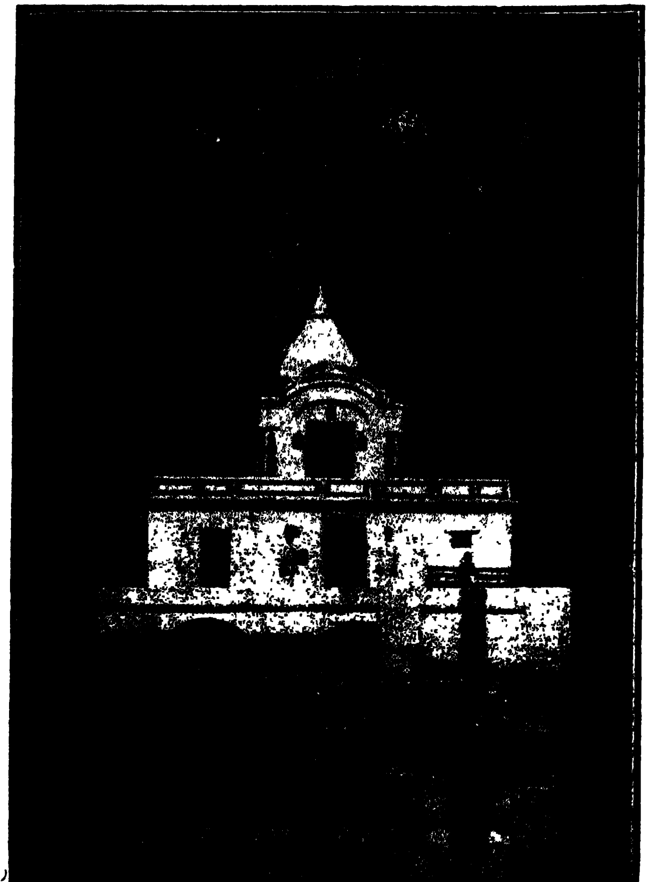


নীলধারা ঘাট—হরিদ্বার

অতি কষ্টে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। ঈপ্সিত স্থান লাভ করিয়া চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইল। সঙ্গীগণের নিকট বস্ত্র রক্ষা করিয়া গঙ্গা মায়ি কি জয় রবে ডুব দিলাম। অধিকক্ষণ জলে থাকিবার উপায় ছিল না। সকলেই স্নানার্থী—অল্প সময়ে সকলকে ব্রহ্মকুণ্ডের অল্প পরিসর স্থানে স্নান সমাধা করিতে হইবে; সেই জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ কৃতস্নান ব্যক্তিগণকে অন্য পথ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, লোক অসংখ্য! সে দৃশ্য না দেখিলে অনুভব করা দুঃসাধ্য। যেদিকে চাহিয়া দেখিবে, কেবল অসংখ্য নরমুণ্ড; স্ত্রী পুরুষ যেন একত্রে মিশিয়া

গিয়াছে। শুনিলাম, বেলা ১২টার মধ্যে গৃহস্থগণ স্নান করিবেন, পরে সাধু সন্ন্যাসীগণ স্নান করিবেন।

যত বেলা হইতে লাগিল, লোক সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলা ১২টার সময় নিরঞ্জনী আখড়ার সন্ন্যাসীগণ স্নান করিতে আসিলেন। ইঁহাদের আখড়া ছিল হরিদ্বার ও কনখলের সীমানায়—যেখানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খাল কাটিয়া গঙ্গার স্রোত ঝড়কির দিকে ফিরাইয়া জলস্রোত



ভীমগদা—হরিদ্বার

লইয়া কৃষির উন্নতির জন্য মা ভাগীরথীকে একেবারে ক্ষীণ-স্রোতা করিয়া কঙ্কালসার বা মধ্যস্থানে উচ্চ পর্ব্বতে পরিণত করিয়াছেন—যাহার জন্য বঙ্গজননী সুরতরঙ্গিনী সুজলা সুফলা বঙ্গদেশেও কচিৎছিন্না কচিদ্ভিন্না হইয়া কালপ্রভাবে বাঙ্গালীর অবস্থা মলিন করিয়াছে। ইহারা প্রথমে শোভা-যাত্রা করিয়া গঙ্গার পরপারে মৃত্তিকা নির্ম্মিত সেতু দিয়া গমন করিয়া আবার ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট বিপরীত দিকে সেতু পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গমন করিলেন। ইঁহাদের সহিত প্রায় ১৪।১৫টী হস্তী সুসজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছিল। হস্তি-পৃষ্ঠে রৌপ্য-নির্ম্মিত হাওদা কিংখাপের আস্তরণে শোভা বিস্তার করিতেছিল। তদুপরি মহান্ত মহারাজগণ বিরাজ করিতেছিলেন। শিষ্য সেবকগণ শ্বেত চামর ব্যজন করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে শ্বেতাঙ্গ অফিসরগণ, তৎপরে উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নাকাড়া বাজাই-তেছে। পদাতিক সন্ন্যাসীগণ কেহ লাঠি কেহ তরবারি খেলা করিতে করিতে শোভাযাত্রার সহিত গমন করিতেছে। অনেক উলঙ্গ সাধুও ইঁহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় দশ হাজার সাধু এই দলে ছিলেন। সন্ন্যাসিনীও প্রায় পাঁচ শত হইবে।

নিরঞ্জনী দলের পর নির্ব্বাণী দল ব্রহ্মকুণ্ডের রাজপথে বাহির হইল। ইঁহাদের আখড়া বা আশ্রম কনখলে প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যস্থিত মন্দিরে। মন্দির মধ্যে কপিল দেবের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। অসংখ্য কুটীর মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীগণের থাকিবার স্থান। বাগানের চারিদিক উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। আম্র লকেট প্রভৃতি নানারূপ ফলের বাগান, বাগা-নের মধ্যে ১০।১২টী হস্তী ও হস্তিনী বিরাজ করিতেছে। ইঁহাদের আগেও শ্বেতাঙ্গ অফি-সার দুইজন অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছে। পরে সন্ন্যাসী-চতুষ্টয় অশ্বপৃষ্ঠে নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে গমন করিতেছে। হস্তি-পৃষ্ঠে বৃহৎ পতাকা উন্নীত করিয়া চারিজন সাধু রজ্জু দিয়া ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। রজত-নির্ম্মিত হাওদায় মহান্ত মহারাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গেও প্রায় এক হাজার সন্ন্যাসী। উলঙ্গ সন্ন্যাসী বা নাগা দুই শত হইবে। ইহাদের মধ্যেও সন্ন্যাসীদের ভিতর লাঠিখেলা তরবারি খেলা প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক ক্রীড়া চলিতেছিল।

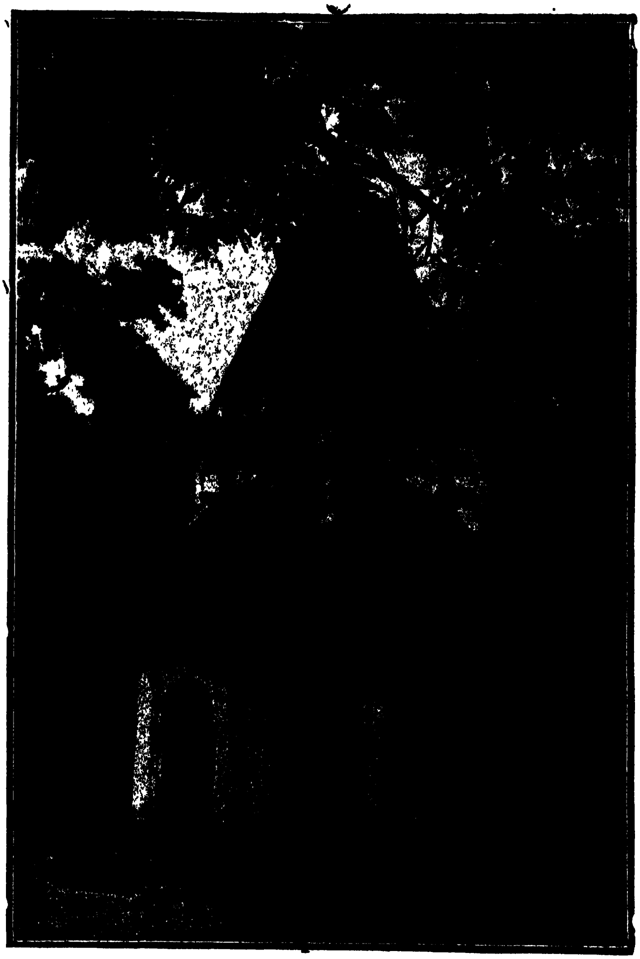
তাহার পর উদাসী আখড়ার দল। তাঁহারাও ঐরূপ ভাবে সুসজ্জিত হয়, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি লইয়া গমন করিলেন।

ই হাদের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনের অভাব নাই। যিনি যত হাতী সাজাইতে পারিয়াছেন চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের নিকট রাজন্যবর্গের ঐশ্বর্য্য মলিন হইয়া যায়।

তাহার পর কানকাটী সন্ন্যাসীর দল গমন করিল। এইরূপে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাধুদের ব্রহ্মকুণ্ড স্নান সমাপন হইল। রাত্রি ৮।৯টা পর্য্যন্ত স্নানার্থীগণ স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। সেদিনের স্নান নিরাপদে শেষ হইল।

২১শে চৈত্র প্রাতঃকালে উঠিয়া টোঙ্গা ভাড়া করিয়া লছমন ঝোলার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে সোয়ার প্রতি ছয় পয়সা ভাড়া ছিল, এবার তিন আনা লাগিল। উত্তর ভারতের নানা স্থান হইতে টোঙ্গা মটর বাস প্রভৃতিতে হরিদ্বার ভরিয়া গিয়াছে; তথাপি লোক সংখ্যার অনুপাতে উত্তরোত্তর ভাড়াও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারি মধ্যে হরিদ্বারের ন্যায় ক্ষুদ্র সহরে প্রায় দশলক্ষ লোক সমাগম হইয়াছে। শেষ কুম্ভের দিন বোধ হয় পনের লক্ষ লোক সমাগম হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত অতিশয় প্রশংসনীয়। এত লোক সমাগমেও কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হয় নাই। বাহির হইতে প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক পুলিশ প্রহরী আসিয়া সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর ছিল। যাত্রীগণের জন্য মিউনিসিপালিটীরও সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কোথাও সামান্য মাত্র অপরিষ্কার দেখা যায় নাই। বনে জঙ্গলে পর্ব্বত কন্দরেও মেথরের বন্দোবস্ত ছিল। পুলিশ প্রহরী সর্ব্বত্র সাবহিত হইয়া সহরের শান্তি রক্ষা করিয়াছিল।

আমরা তিনখানি টোঙ্গায় বার জন যাত্রা করিলাম। পথের মধ্যে একজন সহযাত্রী তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু পাইয়া তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন। আমরা একাদশজন ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে পৌছিয়া হৃষীকেশ উদ্দেশে পদব্রজে ভীমগাড়ায় গমন করিলাম। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন হাঁটু গাড়িয়া হিমবান ও মহাদেবকে প্রণাম করিয়াছিলেন। বীরবরের দেহের চাপে এখানে একটী কুণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সেই হইতেই এই কুণ্ডটী ভীমগাড়া আখ্যা পাইয়াছে। ভীমগাড়া হইতে মোটর বাসে চড়িয়া হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। জন-প্রতি ভাড়া পাঁচ সিকা লাগিল। ১লা এপ্রিল হইতে রেল কোং যাত্রী গাড়ী চালাইতেছেন। ভাড়া দশ আনা; কিন্তু ভীড়ের ভয়ে অনেকেই বাস আশ্রয় করিতেছেন।



বিল্বকেশ্বর—হরিদ্বার

এক ঘণ্টার পর হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া পূতসলিলা স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথীর বিমল সলিলে অবগাহন করিয়া

আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। সুবৃহৎ রোহিত মৎস্যগণকে স্বহস্তে আটার গুলি খাওয়াইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলাম।

হৃষীকেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বত শ্রেণী ভেদ করিয়া মা জাহ্নবী ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

স্নানান্তে রাম-সীতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেব-দর্শন করিলাম। পূজারি পরিচয় না দিলে রামসীতা মূর্ত্তি চিনিতে পারিতাম না। তাহার পর হৃষীকেশের মন্দিরে গমন করিলাম। ভরতের নামান্তর হৃষীকেশ, মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত দেখিলাম। চতুর্দশ বৎসর পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম যাইবার সময় এই মন্দির দেখিয়াছিলাম; তখন কিন্তু এই ক্ষোদিতাক্ষরগুলি দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। ইহার রহস্যভেদ করিবার ভার প্রত্ন-তত্ত্ববিদগণের উপর দিয়া আমরা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া সঙ্গীগণ লুচি, হালুয়া, তরকারী প্রভৃতি আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-সঞ্চিত ফলাহারের সুযোগ পাইয়া ক্ষুধানল নিবৃত্ত করিলাম। এখানে সকল রকম ভাল খাবার সুবিধাদরে পাওয়া গেল। পুরি দশ আনা সের, জিলেপী ৸৹ ও পেঁড়া ১৲ এক সের পাওয়া গেল।

এখান হইতে লক্ষ্মণঝোলা দেখিতে সকলেই পদব্রজে যাত্রা করিলাম। কেবল আমাদের সঙ্গী একজন মহিলার জন্য "ডাণ্ডী" করিতে হইয়াছিল। ভাড়া ৪৲ টাকা লাগিল। রৌদ্রে পুড়িয়া অতি কষ্টে লছমন ঝোলায় উপস্থিত হইলাম। সুরজমল ঝুনঝুন ওয়ালার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি আজ কালের কঠোর আঘাতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ঝোলার চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল এপারের হার্ডিং ব্রিজ বা যেস্থানে ঝোলা বা সেতুর মুখ ছিল, সেই স্থানের চিহ্ন রাখিয়া, ঝোলা ছিন্ন করিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। লোক-পারাপারের জন্য কয়েকখানি নৌকা রহিয়াছে। কাহাকেও পয়সা দিতে হয় না। বিনা কড়িতে সকলেই পার হইতেছে। পরপারে অনেকগুলি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী শত্রুঘ্নের মন্দির। দেবাদিদেব মহাদেবের জন্যও দুই-একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার যাহা কিছু দেখিবার আছে, যতদূর সম্ভব দেখিয়া অপরাহ্নকালে হৃষীকেশে ফিরিয়া আসিলাম। তিনখানি বাস উপস্থিত দেখিলাম, এবং তাড়াতাড়ি প্রত্যেকে ১৲ টাকা ভাড়া স্থির করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলাম। বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল। এখন পূর্ণকুম্ভের কয়দিন বাকি আছে। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছি। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন এখানে-ওখানে গিয়া অপূর্ব্ব পার্ব্বতীয় শোভা দেখিয়া জীবন ধন্য করিতে লাগিলাম। এক দিন চণ্ডীর পাহাড় দেখিতে গেলাম। গঙ্গার পরপারে ৴১০ পয়সা মাশুল দিয়া নৌ-সেতু পার হইয়া পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে "চড়াই" ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে চণ্ডীর পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে কালী মূর্ত্তি দেখিলাম। এখানে মহাদেবের মূর্ত্তিও কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। এই ক্ষুদ্র মন্দির ও দেবীর নামেই পাহাড়ের নাম চণ্ডী-পাহাড় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎ দূরে আর একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দূর-লেপিত মূর্ত্তি দেখিলাম। পূজারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, একটীর নাম অঞ্জনা অর্থাৎ হনুমানের গর্ভধারিণী; আর একটী তারা—বালীরাজ-মহিষী অঙ্গদ-জননী। বাসায় ফিরিতে ২টা বাজিয়াছিল।

২৩শে চৈত্র। আজ বেলা ১১টার সময় বৃন্দাবনধাম হইতে নাগা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ৬টী হাতী, আড়াই শত উট প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া কনখলে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়া পুলিশ প্রহরীগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইহাদের আনিতে গিয়াছিল। ইহাদের দলে প্রায় এক হাজার নাগা হইবে। গঙ্গার পরপারে নীলধারার তীরে চড়ার উপর ইহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেইখানে গিয়া তাঁবু খাটাইয়া ইহারা অবস্থান করিতে লাগিল। অভ্যাগত সাধুর দলকে সহরের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। ইঁহারাই বৃন্দাবনে মারামারি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যেস্থানে বাসস্থান হইল ইহার অনতিদূরেই রাইফলধারী মিলিটারী সৈন্যগণের তাঁবু পড়িল।

প্রত্যহ ধনীগণ এক এক সম্প্রদায়ের আখড়াধারী বা নবাগত সাধুগণকে ভাণ্ডারা দিতেছেন। ২৫শে চৈত্র নির্ব্বাণী মঠের ভাণ্ডারা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আমার সহযাত্রীগণ ছিলেন। প্রায় এক হাজার সাধু ভোজনে বসিলেন। গৈরিক বসনের কৃপায় আমিও ভোজন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কৃতাহার বলিয়া কোনরূপে

পংক্তি-ভোজনের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম এবং অদূরে দাঁড়াইয়া সাধুগণের ভোজন দর্শন করিলাম। প্রত্যেক সাধুকেই লাড্ডু, বালুসাই পুরি কচুরি ঘোলের সরবৎ ও এমন কি আলুর তরকারী পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। পরিবেশনান্তে আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেককেই ৮হাতী থান এক-একখানি দেওয়া হইল। আমিও বাদ পড়ি নাই, কিন্তু উপস্থিত বস্ত্রের আবশ্যক নাই বলিয়া সসম্ভ্রমে বস্ত্রখানি ফেরত দিলাম। শুনিলাম গয়া জিলার কোন মহান্ত মহারাজ এই ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন।

পূর্ণকুম্ভ স্নানের আর অধিক বিলম্ব নাই। এক্ষণে প্রত্যহ প্রায় ৮।১০ খানি স্পেশাল ট্রেণ নিয়ত যাত্রী লইয়া আসিতেছে। ২৮শে চৈত্র আমরা দেরাদুন দেখিতে গেলাম। বেলা ১২টার সময় দেরাদুন পৌঁছিয়া মোটর-যোগে (প্রত্যেকে ॥০ ভাড়ায়) রাজপুর গমন করিলাম। রাজপুরের ঠিক উপরে মসুরী সহর। মসুরী যাইতে ঘোড়া পাওয়া যায়, ভাড়া ৩৲ টাকা, ডাণ্ডী ৫৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। মসুরী যাইলে রাত্রিতে ফিরিতে পারা যাইবে না, সেইজন্য রাজপুরের পূর্ব্বে সহস্রধারা জলপ্রপাত দেখিতে পদব্রজে গমন করিলাম। যথাসময়ে অতি কষ্টে সেই স্থানে পৌঁছিলাম। একটী জল-প্রপাত পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া এক স্থানে পড়িতেছে। জল পান করিয়া জলে গন্ধকের আঘ্রাণ পাইলাম। জলও বেশ উষ্ণ। এই স্থানে স্নান করিয়া নদীর পরপারে ক্ষুদ্র মন্দিরে শিবলিঙ্গ দেখিলাম। তাহার উত্তর-গুহামধ্যে জলপ্রপাত পড়িতেছে। অতি সুন্দর গুহা। পর্ব্বত মধ্যে গুহার সৃষ্টি বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যে সহস্রধারে বারিধারার পতন দেখিয়া পথশ্রম বিস্মৃত হইলাম। আমাদের সঙ্গী প্যারীবাবু পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর দেখিতে যাইলেন না। ঐ স্থানের নিকট একটী পাহাড়ী ব্রাহ্মণ একটী সামান্য বিপণি খুলিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দোকানে কিছু খোয়া ক্ষীর পাওয়া গেল, তাহাই আহার করিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ক্লান্তদেহে সন্ধ্যার সময় রাজপুরে ফিরিয়া আসিলাম এবং পথ-প্রদর্শক সঙ্গীকে ৮০ আনা দিয়া বিদায় দিলাম। পরে মোটর-যোগে দেরাদুন ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব নাই, প্রথম ঘণ্টা পড়িয়াছে, তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। রাত্রি ৯॥টার সময় গাড়ী হরিদ্বারে আসিল। লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলপূর্ণ হরিদ্বার রাত্রিতে নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল ষ্টেসনের সম্মুখে বায়স্কোপ দেখিবার জন্য দুই একজন যাত্রী যাতায়াত করিতেছে। আমরা টোঙ্গা ভাড়া করিয়া

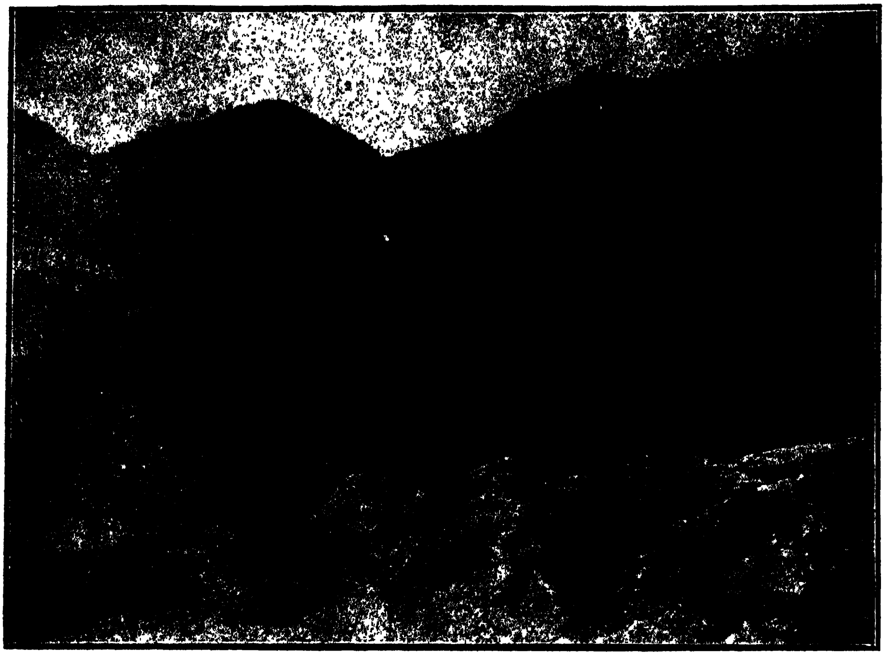


হৃষীকেশ মন্দির—হরিদ্বার

বাসায় ফিরিলাম। তখন রাত্রি সার্দ্ধ দশ-ঘটিকা হইয়াছে।

এই কনখলেই দক্ষপ্রজাপতির রাজধানী ছিল; এখনও একটী প্রাচীন ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী পুরাতন দক্ষালয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার কিছু পশ্চিমে রামকৃষ্ণ মিশনের পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার এক ক্রোশ দূরে একটী স্থানে দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞভূমি বলিয়া কিংবদন্তী আছে। নিকটেই একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহা সতীকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। ইহার উপর ভাঙ্গা স্তূপের উপর হস্তপদহীন প্রস্তরখণ্ড দক্ষপ্রজাপতির দেহ বলিয়া পরিচিত হইয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

লাগিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, জনতার মধ্যে প্রবেশ করা ততই দুঃসাধ্য হইল। হঠাৎ জনস্রোত ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিকে ছুটিতেছে দেখা গেল। ব্যাপার কি হইয়াছে বুঝিতে না বুঝিতে দেখিলাম—চারি জন অশ্বারোহী পুলিশ-প্রহরী জনতা মথিত করিয়া অগ্রগমনে বাধা দিতেছে। অগত্যা জনস্রোত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিতেছে। আমরা এমন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় পড়িলাম যে, কি সম্মুখে কি পশ্চাতে পাদবিক্ষেপ করাই দুঃসাধ্য হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া লোকমুখে শুনিলাম ব্রহ্মকুণ্ডের উপর রাস্তায় যে বেড়া বাঁধা হইয়াছিল, লোকের চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় ২৫।৩০ জন লোক পদতল নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। সেইজন্য পুলিশ আর স্নানার্থীকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। পার্শ্বে এক স্থানে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে হঠাৎ পুলিশ-প্রহরীর হস্তচ্যুত ডাণ্ডার আঘাতে মাথায় বিষম ব্যথা পাইলাম। যন্ত্রণায় হাত দিয়া



লছমন ঝোলা—হরিদ্বার

৩০শে চৈত্র। আজ মহাকুম্ভ বা শেষ স্নান। রাজপথে একখানিও গাড়ী নাই। সর্ব্ববিধ যানের চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। এরূপ সতর্কতার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। ভোরে উঠিয়া প্যারিবাবু ও আমি বাহির হইয়া আমাদের ব্রহ্মকুণ্ড যাইবার অভ্যস্ত পথে যাইয়া দেখি, সে রাস্তার ধারে কাটা-খালের মুখে বেড়া বাঁধিয়া সতর্ক প্রহরী পাহারা দিতেছে। অগত্যা অনেক ঘুরিয়া পোষ্টাফিসের সম্মুখ দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে গমন করিতে

মাথা চাপিয়া ধরিলাম এবং অতি কষ্টে পশ্চাৎদিকে ফিরিতে লাগিলাম। বিপদের উপর বিপদ, সহজে পশ্চাৎ ফিরিবারও উপায় নাই। যাহা হউক অতি কষ্টে অনেকদূর ফিরিয়া আসিলাম। মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল—এতদিনের আশা এত পরিশ্রম বুঝি বা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিফল হইয়া যায়। এমন সময় দেখিলাম, একজন প্রহরী একজন সাধু বেড়া ডিঙ্গাইয়াছে বলিয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সঙ্গে বচসা করিতেছে। হঠাৎ যেন কোন অপ্রত্যাশিত

দৈব-প্রেরণায় বৃদ্ধ প্যারিবাবু লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলেন। আমিও মহাজন যেন গতঃ স পন্থা এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারি প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া লম্ফ দিয়া নিমেষে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অদৃশ্য হইলাম এবং গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী ধরিতে আসিতেছে কি না পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবারও অবসর হইল না। যাহা হউক মধ্যপথে জনতার মধ্যে মিশিয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। পনের মিনিটের পথ অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল এবং চিরাভিপ্সীত ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পাইলাম। কতদিনের আশা, কত আনন্দের উৎস ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া শারীরিক ও মানসিক সকল কষ্টই নিমেষ-মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ১৯শে চৈত্রের জনতা অপেক্ষা আজ বোধ হয় জনতা দ্বিগুণ হইয়াছে। অথবা তাহারও অধিক হইবে। এই জনতার ত্রি চতুর্থাংশ পাঞ্জাব-দেশবাসী; বাকী চতুর্থাংশ বিশাল ভারতের সমগ্র হিন্দু দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। স্নানান্তে সফলকাম হইয়া কনখল ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

বর্ষার বেদনা

বাণীকুমার

(রুচিরা ছন্দের অনুকরণে)

পাগল বাদল— ঝুরিছে বারিদ অঝোর ধারে;
পেখম-পালক তুলিয়া ময়ূর খেয়ায় কা'রে?
কুসুম-সুবাস আসিছে আকুল সজল বায়ে,
মৃদুল নিশ্বাস সুরভি-আভাস লাগায় গায়ে।
সকল আগল ভাঙিয়া বাতাস চপল ছুটে—
দিগন্তরের বরিষা-বধূর সরম লুটে'।
বাঁধন-বিহীন বরষ মুখর ভাদর মাসে—
পরাণ অথির করিছে মদির যূথির বাসে।
কোথায় আমার মরম-সাধন এমন দিনে,
কে আর আবার বাজাবে সে-গান প্রাণের বীণে?
গোপন আঁচল ভরিয়া কে আর সোহাগ-মালা,
মোহন লীলায় পরাবে গলায় সে-কোন্ বালা?
চপল নয়ন গাহিবে কি আর বাদল-গীতি,
বিভোল হিয়ায় রাঙিবে কে আর মানস-প্রীতি?
মধুর কিশোর আজিকে বিরাজ হৃদয় চিরে—
অমর সুদূর স্মৃতিরে জাগাও জীবন ঘিরে'!

কোথায় এখন কোথা'রে আমার হিয়ার সাথী?
জলদ বিভায় দেখা যায় কা'র হাসির ভাতি?
ত্বরিত লেখায় চপলা কাহার চকিত হাসে—
কখন চেনায় নিমেষে লুকায় মেঘের পাশে!
বাদল-ধারায় ঝরোগো পরাণ 'বিলীন ত্বরা,
কিশোর-বিলাস ভুলোনা গো সই প্রেমের ধরা!
এমন ভাদর মহিমা তোমার মেঘের স্বরে—
মদির ব্যাকুল ব্যথিছে নবীন জীবন'পরে!
এখন কি আর আসিবে সে আর কিশোর বেশে?
বাসর-আবেশ ভুলেছে নূতন খেলার দেশে!
জাগাও জাগাও মোহিনী বীণায় সে-রাগ আজি,
বিলোল বিভোল কিশোরী লীলার স্বরগ-রাজি।
কোথায় কোথায় সাড়া নাহি হায় বারেক তুমি,
চোরের মতন যাহ'গো আমায় মৃদুল চুমি।
বিফল-বাদল শুধু নাহি মোর পরাণ-প্রিয়া,—
তরুণ বিধুর রচে' মেঘদূত বিধুর হিয়া!

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক বিপ্লব-যুগ। সেই যুগে ভারতের ভাগ্যচক্র এক প্রভুর কবল হইতে অন্য প্রভুর কবলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের এই বিরাট্ পরিবর্ত্তন একদিনে ঘটে নাই। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এই মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ঘটনার ধারাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়।

ক্লাইভের প্রথম শাসনকাল বঙ্গদেশে শুধু বৃটিশ-অধিকারের যুগ। বক্‌সার-যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের মন হইতে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের শেষ আশঙ্কাটুকু বিদূরিত হয়। তাহার পর ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকালে ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে দেশকে সুশাসন ও শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার পালা সুরু হইল। আরও পরে যখন কর্ণওয়ালিস আসিলেন, তখন অধিকারের যুগ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া কেবলমাত্র শাসন-সংস্কারের যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়কার রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহাদের চেষ্টায় ভারতে ইংরাজ-শাসনের বনিয়াদ পাকা হয়, তাঁহাদের মধ্যে সার উইলিয়াম জোন্‌স একজন প্রধান।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস গভর্ণর হইয়া বাঙ্গলায় আসেন। আসিয়াই তিনি শাসন-সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, এদেশে প্রচলিত বিচার-পদ্ধতিতে অনেক গলদ রহিয়াছে। সে-সময় সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচার মুসলমান-আইন-মতে, এবং দেওয়ানী মামলার বিচার হিন্দুদিগের জন্য হিন্দুমতে এবং মুসলমান-দিগের জন্য মুসলমান-আইন-মতে সম্পন্ন হইত। বাদশা আওরংজীব তাঁহার রাজত্বকালে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে, একদল উলেমার দ্বারা 'ফতাওয়া-ই-আলমগীরি' নামে এক সুবৃহৎ আইন-সারসংগ্রহ (digest) সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী মামলার বিচার হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের এই ধরণের কোন লিখিত ব্যবস্থা-পুস্তক ছিল না। বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাহার মীমাংসা করান হইত। হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কার্য্যোপযোগী করিয়া একখানি ব্যবস্থা-পুস্তক সংকলিত করাইবার প্রথম আয়োজন হেষ্টিংসই করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বাঙ্গলার এগারজন পণ্ডিতকে (১) কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন (মে ১৭৭৩)। গ্রন্থখানির রচনা সম্পূর্ণ হইতে দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু সে-সময় কোন ইংরাজই সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না বলিয়া গ্রন্থখানিকে ইংরাজ-বিচারকদিগের কাজের সুবিধার জন্য ফার্সীতে তর্জ্জমা করান হইল। কিন্তু শেষে বাঙ্গলা গভর্মেণ্ট দেখিলেন যে, দুইটি কারণে গ্রন্থখানিকে ফার্সী হইতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করান দরকার। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের ইংরাজ-জজেরা হিন্দু-বিধিব্যবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবেন, এবং পণ্ডিতদের সাহায্য-ব্যতিরেকে হিন্দুদের মোকদ্দমাগুলির সুবিচার করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, সে-সময় ইংলণ্ডে ভারতবাসিগণের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহাও দূর হইবে। এই স্থির করিয়া গভর্মেণ্ট ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হল্‌হেড নামক একজন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর এই অনুবাদ-কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। হল্‌হেড বাঙ্গলা ও সংস্কৃত জানিতেন। তিনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া গভর্ণর-জেনারেলের নিকট পেশ করেন। (২) ইহার নাম হইল *A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে মুদ্রিত)।

---

(১) রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

(২) Gleig's *Memoirs of Warren Hastings* iii. 156, 158, etc; Monckton Jones's *Warren Hastings in Bengal 1772-74*, pp. 337-38.

দুঃখের বিষয়, একবার ফার্সী এবং পুনরায় ফার্সী হইতে ইংরেজী—এই দুই বিভিন্ন প্রকার ভাষায় অনুবাদ হইবার ফলে গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য একখানি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিন্দু-বিধিব্যবস্থা পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। সার উইলিয়াম জোন্‌স সেই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-সেতু নির্ম্মাণ করেন।

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ সার উইলিয়াম জোন্‌স বঙ্গদেশে এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। আজও সুধীজন-সমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত। প্রাচ্যের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থার একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আমার দেশবাসীকে উপহার দিব—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। এই ইচ্ছার বশে আমি বহুদিন হইতে পরিশ্রম করিতেছি। এই সম্পর্কে শুধু ভাবার্থ ও অশুদ্ধ ফার্সী-তর্জ্জমাপূর্ণ একখানি পুস্তকের সাহায্যে আমি অতি পুরাতন সংস্কৃত আইন-গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি মনু ইংরেজীতে অনুবাদ করিতেছি। গত বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরবীয় আইন-পুস্তক অনুবাদ করিয়াছি। আমার একার দ্বারা যাহা সম্ভব, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহা সম্পূর্ণ করিব। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী, চ্যান্‌সেলার, বোর্ড অব কন্‌ট্রোল ও ডিরেক্টরদিগকে লিখিব। যাঁহারা আমাকে জানেন না, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে আমি যশ অথবা অর্থের লোভে এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র সাধারণের সুবিধা ও উপকার করিতে পারিব, এই আনন্দটুকু ছাড়া অন্য কোনরূপ পার্থিব সুবিধার আকাঙ্ক্ষায় আমি এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং আইন-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সার উইলিয়াম জোন্‌সকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়াছিল। তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রখানির অংশ-বিশেষ এইরূপ :—

"বঙ্গ ও বিহারের বিচার-বিভাগের দিকে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমার ছিল। হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মামলা-মোকদ্দমা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী নিষ্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহারা তাহাদের আবহমান প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকে অত্যন্ত মান্যের চক্ষে দেখে, এবং একেবারে নূতন কোন আইনের দ্বারা তাহাদের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে তাহারা অত্যন্ত নিগৃহীত হইতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থাসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও আরবী—এই দুই কঠিন ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিক্ষা করিবে, কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের পার্থিব কোন লাভ হইবে না। অথচ বিচার-সম্পর্কে যদি আমরা কেবল দেশীয় ব্যবহারজীব ও পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা যে প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

"জাস্‌টিনিয়ানের (রোম-সম্রাট্) আদেশে সঙ্কলিত, রোমীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা এ দেশীয় বিজ্ঞ ব্যবহারজীবদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত করাই, এবং তাহা সঠিকভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে প্রয়োজন-মত বিচারকেরা এই গ্রন্থ দেখিতে পারিবেন; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবীরা আমাদিগকে ভুলপথ দেখাইতেছে কিনা, তাহা ধরা সহজ হইবে।...আমাদের এই সঙ্কলন-কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হইতে পারিবে। আমরা কেবল উত্তরাধিকারী এবং চুক্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সংকলন করিতে চাই, কারণ এই দুই শ্রেণীর মামলাই সচরাচর বেশী হয়। আপাততঃ এই কার্য্যের জন্য খুব কঠিন পরিশ্রমও করিতে হইবে না। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় এই সম্পর্কে দুইখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। একখানি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশেরই রঘুনন্দন নামে একজন ব্রাহ্মণ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়খানি আলমগীর বাদশার হুকুমে তাঁহারই রাজত্বকালে 'ফতাওয়া-ই-আলমগীরি' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই দুইখানি গ্রন্থ আমাদের কার্য্যের যথেষ্ট সহায় হইবে।...হেষ্টিংসের অনুরোধক্রমে হিন্দু-আইনের যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা হইতেও কিছু পরিমাণে

সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।······হল্‌হেডের ইংরেজী অনুবাদে দোষ না থাকিলেও ভাষান্তরকালে তিনি যে ফার্সী-অনুবাদ ব্যবহার করেন, তাহার সহিত মূল সংস্কৃতের অনেক পার্থক্য আছে।······বর্ত্তমানে দুইটি প্রদেশই যখন একই গভর্মেণ্টের অধীনে শাসিত হইতেছে, এবং এই দুই স্থানের অনেক বিধিব্যবস্থা যখন স্বতন্ত্র, তখন এই কার্য্যের জন্য বাঙ্গলা ও বিহার—দুই প্রদেশ হইতে দুইজন পণ্ডিত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানদের মধ্যে শীয়া ও সুন্নী—এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে দুইটি মৌলবী গ্রহণ করা প্রয়োজন।······

"যদি প্রস্তাবিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গভর্মেণ্ট সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে ইহার ব্যয়ভার রাজসরকার হইতে বহন করিতে হইবে।···আমি পণ্ডিত ও মৌলবীদের প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট কাজ, এবং কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে সে বিষয়েও পরামর্শ দিব। স্বাস্থ্য অটুট থাকিলে আমি প্রত্যহ প্রাতে অন্য কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে, পণ্ডিতদের প্রতিদিনের সংকলন-কার্য্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিব।" (১৯ মার্চ্চ ১৭৮৮) ৩

লর্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ আইন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া, আনন্দের সহিত সার উইলিয়ামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সার উইলিয়ামের তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশ-মতে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু-আইন সার-সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন—"(১) রাধাকান্ত শর্ম্মণঃ—পাণ্ডিত্য ও বহু সদ্‌গুণের আধার বলিয়া বাঙ্গলা দেশের আপামর সাধারণের পূজ্য। (২) সর্ব্বর তিওয়ারী (পাঠান্তরে সর্ব্বরী)। ইনি একজন বিহারী পণ্ডিত;—পূর্ব্বে পাটনা কাউন্সিলের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। ব্যবহার-শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া স্বদেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। (৩) সংস্কৃত হস্তাক্ষরের জন্য মহতাব রায়—নিবাস দাক্ষিণাত্যে। তখনকার দিনে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে এরূপ নিপুণ লিপিকর ছিল না ৪।"

ইহার অল্পদিন পরেই সার উইলিয়াম বাঙ্গলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত—জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত পরিচিত হন। তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে গভর্ণর-জেনারেলের মিনিটে প্রকাশ :—

"গভর্ণর জেনারেল বোর্ডের সদস্যগণকে জানাইতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন সারসংগ্রহ সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার সহিত সার উইলিয়াম জোন্‌সের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। এই কাজের জন্য ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদিগকে লওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার জন্য সার উইলিয়াম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির বয়স অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মতামত, পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকই সর্ব্বোচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহার সাহায্য পাইলে এবং সঙ্কলয়িতারূপে তাঁহার নাম যুক্ত থাকিলে, গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা ও যশ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

"গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডের সদস্যগণকে আরও জানাইতেছেন যে, সার উইলিয়াম জোন্‌স জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মাসিক তিনশত, এবং তাঁহার সহকারী-দিগকে মাসিক একশত টাকা বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

"সুপারিশ গ্রাহ্য হইল এবং সেইমতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।" ৫

৯ই জুন, ১৭৯৩ সার উইলিয়াম মনুর "মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের" ইংরেজী-অনুবাদের পাণ্ডুলিপি গভর্মেণ্টের নিকট পেশ করেন (পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা মুদ্রিত হয়)। সার উইলিয়াম আশা করিয়াছিলেন, আর দুইটি ছুটিতে বসিয়া তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত আইন-গ্রন্থখানি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। ২৭শে এপ্রিল, ১৭৯৪, নিষ্ঠুর মৃত্যু

৩ *Public Proceedings* 19 March 1788, No 16 (India Govt. Records). এই দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ *Memoirs of the Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones* by Lord Teignmouth (ii. 163-78) পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪ *Public Proceedings* 14th April 1788, No. 15 (India Govt. Records). সর্ব্বরী ত্রিবেদী মাসিক দুইশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

৫ *Public Consultation* 22 August 1788, No. 28 (India Govt. Records).

তাঁহার ইহলোকের সমস্ত আশা বিফল করিয়া তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে জনসাধারণ এই সারসংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত তাঁহার স্বহস্তে রচিত অনুবাদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা হইতে বঞ্চিত হইল।

কিন্তু জোন্‌সের সাধু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, গভর্ণর-জেনারেল সার জন্ শোরের নির্দ্দেশে, মীর্জ্জাপুর জিলা আদালতের জজ এইচ-টি-কোলব্রুক তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত ব্যবস্থা-পুস্তকখানি *Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইহা শেষ করিতে কোলব্রুকের দুই বৎসরের কিছু অধিক সময় লাগিয়াছিল (ডিসেম্বর ১৭৯৬)। পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি গভর্মেণ্টের নিকট হইতে পনের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

তর্কপঞ্চাননের রচনা-সম্বন্ধে কোলব্রুক তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"অনেকগুলি হিন্দু-আইনের পুস্তক ও টীকা হইতে চয়ন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভক্তি-ভাজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে মূল সূত্রগুলির যতপ্রকার সম্ভব ভাষ্য করিয়াছেন। ...আধুনিক হিন্দু-আইন-সারসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য :—(১) হেষ্টিংসের আদেশে সঙ্কলিত 'বিবাদার্ণব-সেতু' (২) সার উইলিয়াম জোন্‌সের অনুরোধে, মিথিলার আইনজ্ঞ সর্ব্বরী ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বিবাদ-সারার্ণব' এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব'—যাহা (অর্থাৎ শেষখানি) অনূদিত হইল।"

হিন্দু-ব্যবস্থাশাস্ত্র মতভেদ-সঙ্কুল। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা করেন। ইহার দ্বারা তিনি দেশ ও দশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ সে-সময়কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ পিতার অধিক বয়সের সন্তান। তাঁহার জন্মকালে রুদ্রদেবের ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বাল্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আত্মীয়স্বজনেরা চমৎকৃত হইতেন, এবং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন অসামান্য ব্যক্তি হইবেন, সেই বয়সেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ২০ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অসাধারণ ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। এই সম্পর্কে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, শোর, এবং হ্যারিংটন্ (সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্ট্রার) প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য ত্রিবেণীতে ছুটিতেন। তাঁহার এই অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য দেশের উচ্চনীচ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত এবং অনেক ধনী জমিদারের নিকট হইতে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। জগন্নাথের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প প্রচলিত রহিয়াছে। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "রামচরিত" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক উল্লেখযোগ্য।

শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সে-সময়ে অনেক পণ্ডিত ও গুণীজনের সমাবেশ হইত। পণ্ডিত জগন্নাথও এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। "মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে একখানি তালুক ও পাকা বসতবাটি নির্ম্মাণের অর্থাদি সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা একবার তাঁহাকে বাৎসরিক লক্ষটাকা আয়ের একটি জমিদারী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা বিলাসী হইয়া পড়িবে—ধনগর্ব্বে বিদ্যাচর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিবে। মহারাজা নবকৃষ্ণের সুপারিশেই গভর্মেণ্ট তাঁহাকে হিন্দু-আইন-সংকলনে নিযুক্ত করেন।" ৬

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গভর্ণর-জেনারেল শোরকে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রখানি আমি ভারত গভর্মেণ্টের দপ্তরখানায়, হোম্ ডিপার্টমেণ্টের নথিপত্রের মধ্যে, আবিষ্কার করিয়াছি। ইহা হইতে তর্কপঞ্চাননের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় :—

"...হেষ্টিংস সাহেব যখন মহারাজা রাজবল্লভের সাহায্যে আমার নিকট হিন্দু-আইনগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন আমি উহাতে সম্মত হই নাই। হেষ্টিংস তখন পণ্ডিত রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার-প্রমুখ নদীয়ার এগারজন

---

৬ N. N Ghose's *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*, p. 185.

পণ্ডিতের উপর উক্তকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। বহু-পরিশ্রমের ফলে তিন বৎসরে সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলে, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে পাঠান হয়। কিন্তু ফল সন্তোষ-জনক না হওয়ায় উহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। একথা শোর সাহেব আমাকে জানান। তিনিই আমাকে হিন্দু-আইন-পুস্তক-সংকলনে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত নদীয়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পর, এখনও নিয়মিতরূপে মাহিনা পাইয়া আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলাম, কার্য্যশেষে আমিও তাঁহাদের মত আমরণ বেতন পাইতে থাকিব। এই আশাতেই আমি কার্য্যভার গ্রহণ করি। আমার সঙ্কলিত আটশত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি ঠিকরূপ অনূদিত হইলে, আপনি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে উহা প্রণয়ন করিতে আমাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে সার উইলিয়াম জোন্‌সকে দিয়াছি, এবং সেই অবধি আমার মাহিনা বন্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি পরিবার ও শিষ্যবর্গ প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলাম, কিন্তু এখন বৃহৎ সংসার পরিচালনে অশক্ত। ২২শে আগষ্ট, ১৭৮৮, আপনি অধীনকে এক খিলি পান দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল থাকিব। এই কারণে আমি আপনাকে মিনতিপূর্ব্বক জানাইতেছি যে, পূর্ব্বে আমাকে যাহা দেওয়া হইত, তাহা দিবার আজ্ঞা দিয়া, বৃদ্ধ-বয়সে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করুন।...” ৭

এই আবেদনের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ “বাঙ্গলার প্রাচীনতম পণ্ডিত” জগন্নাথ শর্ম্মার পাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণের সম্মান-স্বরূপ তাঁহাকে আমরণকাল মাসিক তিনশত টাকা পেন্‌সন্ দিবার ব্যবস্থা করেন। ৮

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১১ বৎসর বয়সে তর্কপঞ্চানন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর দিন অবধি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ম্লান হয় নাই। জগন্নাথ তিনপুত্র রাখিয়া যান—কালিদাস, কৃষ্ণচন্দ্র এবং রামনিধি। তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম সংস্কৃতশাস্ত্রে উচ্চ খ্যাতি ও সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। এ পরিবারের আর কাহারও নাম শুনা যায় না।

---

৭ *Public Consultation* 11th Jany. 1793, No. 11 (India Govt. Records)

৮ "On our Proceedings of 11th January 1793 a petition is recorded from Jagannath Sharma, the oldest Pandit in Bengal, and a man of great learning and of most respectable character. He represented that .although he singly completed the Digest of the Hindu Law, and delivered it to Sir William Jones, his salary was discontinued from the period of the completion of the work, yet the pandits (eleven in number) who, in Mr. Hastings's Government, prepared the first Digest, were still in the enjoyment of the pensions, granted them on that occasion, and he solicited a continuance of his allowance for the support of himself and his family.

"In consideration of the very favourable testimonies, we have received, of the petitioner, his great age, and numerous family, we have granted him a pension of Rs. 300 per mensem, but it is not to be continued after his death to his family or descendants."—*Bengal Public Letter to the Court of Directors,* dated Fort William 29th January, 1793, paras 56-57.' (India Govt Records).

বিদ্যুৎপর্ণা

[এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক]

মন্মথ রায় এম-এ

[দৃশ্য :— নাট-মন্দির

দেবদাসীগণের সন্ধ্যারাত্রির নৃত্যগীত। নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে যাইবে, এমন সময়, দ্বিতলের অলিন্দ হইতে মন্দির-পুরোহিতের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম শিষ্য ইন্দ্রজিৎ সোপান-পথে ছুটিয়া নিম্নে আসিয়া সেই যবনিকা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন

"বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!"]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!

বিদ্যুৎপর্ণা। [অন্তরাল হইতেই] না!…না! না!

ইন্দ্রজিৎ।…একটি কথা!…একরত্তি একটি কথা!… দাঁড়াও…শোন ..

বিদ্যুৎপর্ণা।… হয় না! হয় না!…এখন নয়, এখন নয়!

ইন্দ্রজিৎ। কখন? কখন?

বিদ্যুৎপর্ণা। ই ঁদুর যখন সাপ ধরবে তখন! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[পূর্ব্বোক্ত সোপান-পথে পুরোহিত ত্বরিৎ-পদে নামিয়া আসিয়া ইন্দ্রজিৎ-হস্তধৃত যবনিকা-প্রান্ত-দ্বয় মুক্ত করিয়া দিয়া ইন্দ্রজিৎকে মুখোমুখী দাঁড় করাইলেন।]

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। [অপরাধীর মত চমকিয়া উঠিয়া, পরে, সংযত ভাবে মাথা নীচু করিয়া]...পিতা!

পুরোহিত। এই বার বার তিনবার আমার উপদেশ… আমার আদেশ…তুমি লঙ্ঘন কর্লে!…কর্লে কি না বল!

ইন্দ্রজিৎ। [নতমুখে নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ ছিল তুমি পাতাল-গুহায় নির্জ্জনে একমনে তিনমাস যোগাভ্যাস করবে…কিন্তু, তার প্রথম তিন দিনেই তুমি তিনবার তোমার আসন ত্যাগ করে ছুটে এসেছ ঐ কালনাগিনীর পাশে!

ইন্দ্রজিৎ। [নতমুখে নীরবই রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ লঙ্ঘন কর্লে তার শাস্তি কি জানো?

ইন্দ্রজিৎ। [তথাপি নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। নীরব কেন? উত্তর দাও!…আমার আদেশ লঙ্ঘন কর্লে তার শাস্তি কি?

ইন্দ্রজিৎ। প্রাণদণ্ড।

পুরোহিত। আমি কিরূপে সে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি?

ইন্দ্রজিৎ। ক্ষুধিত সর্পের দংশনে অপরাধীর মৃত্যু-ব্যবস্থা হয়।

পুরোহিত। এখন?

ইন্দ্রজিৎ। আমার আপত্তি নেই। আমি প্রস্তুত। তবে…

পুরোহিত। তবে?

ইন্দ্রজিৎ। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি প্রার্থনা!

পুরোহিত। বল!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে…

পুরোহিত।…বল—

ইন্দ্রজিৎ। আমার একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন নিবেদন করে যাব!

পুরোহিত। বটে!

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ…মর্ত্তে যখন বসেছি, তখন ভয় নেই, লজ্জা নেই! হাঁ…একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন!… একরত্তি একটি চুম্বন!

পুরোহিত। ওরে নির্লজ্জ! আমি না তোর পিতা! তবু তোর এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ। [নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। ওরে অবোধ!...বিদ্যুৎপর্ণা কে জানিস?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত জানি...হয়ত জানিনে! নিমিষের দেখা...তাই দেখি!..কে ..জানতে চাইও নে! শুধু চাই ঐ আলোর একটি ঝলক্! কত সহস্রজনের রঙীন কামনা, রঙীন কল্পনায় ঐ রূপ · ঐ মূর্ত্তি গড়ে উঠেছে...আমার একটি চুম্বনে, একরত্তি একটি চুম্বনে ..ঐ মূর্ত্তি...ঐ রূপ আরো এক তিল সুন্দর হবে...আমি তাই চাই, আমি তাই চাই...

পুরোহিত। ওরে উন্মাদ! ও মানুষ নয়.. ও কাল-নাগিনী।...হাঁ কালনাগিনী।...জানিস?...এক বৃদ্ধ বেদে ওকে কোলে করে তিনটি সাপের চুপড়ি নিয়ে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমার মন্দিরে এসে উপস্থিত...সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমি আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিলুম। শুনলুম বেদেনী সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে, রেখে গেছে ঐ শিশুকন্যা। মেয়েটি মায়ের মত সাপের হাতে মারা না যায় এই ভয়ে বেদে একরূপ পাগল হয়ে গেছে। মেয়েকে দুধ খেতে দিলুম, বেদে সে দুধ সাপ দিয়ে খাওয়াল। মেয়েকে কি খাওয়াল জানো?

ইন্দ্রজিৎ। কি?

পুরোহিত। বিষ।...একতিল পরিমাণ বিষ। আমি অবাক!...সে বললে...ওকে সাপের বিষ তিল তিল করে খাইয়ে মানুষ করেছি...সাপের বিষে আর ওর মরণ নেই!... ও হচ্ছে সেই বিদ্যুৎপর্ণা। তার পর বেদেও কিছুদিন পর মারা গেল। কি এক খেয়ালে কালনাগিনীকে আমিও ওর পিতার মতই বিষ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি,...কিন্তু.. আজ বুঝছি...আজ কেন!...প্রতিদিন প্রতিরাত্রে প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝছি...আমি আমার আশ্রমে নিজ হাতে ঐ বিষ-বৃক্ষ রোপণ করেছি ..ওর ঐ ·নিষিদ্ধ ফল আমার স্বর্গকে নরক করেছে...আজ শয়তান শুধু তোমাদেরি স্কন্ধে ভর করে না... ও-হো-হো...আমি কি করেছি! আমি কি করেছি! [কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের বিদ্যুৎকে আপনি পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন!

পুরোহিত। [সস্নেহে ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিয়া] ওরে অবোধ! [নিম্নস্বরে] ওর চুম্বনে মরণের ছায়া পড়ে, ওর স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আড়ষ্ট হয়, ওর আলিঙ্গনে, মৃত্যু আলিঙ্গন দেয়!...সাবধান! অভিশাপে অভিশপ্তা ঐ নারী!.. সাবধান!

ইন্দ্রজিৎ। ঐ অভিশাপই আমার আশীর্ব্বাদ!

পুরোহিত। [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বজ্র-কঠোর স্বরে] তুমি তিন তিনবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ! তার শাস্তি নিজমুখেই স্বীকার করেছ মৃত্যু!

ইন্দ্রজিৎ। আমার প্রার্থনাও পূর্ণ হোক্।...একরত্তি একটি চুম্বন...তার পর মৃত্যু!...জীবনের সুধায় আমার মৃত্যু স্নান করে উঠুক!

পুরোহিত।—বটে!

ইন্দ্রজিৎ। [পুরোহিতের মুখের পানে হঠাৎ মুখ তুলিয়া]—হাঁ!

পুরোহিত। এই কি আমার শিক্ষা? আদর করে বুকে তুলে নিয়ে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সে কি এই শিক্ষা?

ইন্দ্রজিৎ।...আমি ভেবে দেখেছি।...আপনার শিক্ষা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আমি চাই জেগে থাকতে, আমি চাই আমার রক্তের তালে তালে নাচতে... যেমন নাচ ঐ বিদ্যুৎপর্ণা নেচে গেল! আমি কি জন্মেছি ঘুমিয়ে থাকতে?

পুরোহিত। এত অসংযম! এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ। সংযম তাদের জন্য যারা বিপদকে ডরায়, যারা মর্ত্তে ভয় পায়, যারা গণ্ডীর মধ্যে থেকে সুখে শান্তিতে জীবন নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দিতে চায়!..জীবনের ষোলআনা তারা চায়ও না, পায়ও না!...আমি ঠক্‌বার পাত্র নই, আমি জীবন মৃত্যু পরিপূর্ণভাবে ভোগ কর্ত্তে চাই। আমি চাই ঐ বিদ্যুৎ!...মাথায় বজ্র ভেঙ্গে পড়বে, জানি, কিন্তু বিদ্যুৎ! অমন আলো কি কেউ কখনো দেখেছে!

পুরোহিত।...বটে!...আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনলুম পুত্র! [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ! [ক্ষণকাল পর] তোমাকে নিয়ে আমি যে কি কর্ব্ব বুঝছি নে!

ইন্দ্রজিৎ।...আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক্!

পুরোহিত। [নীরব রহিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে ডেকে আনি! সে এসে

নৃত্য করুক! রূপে রসে গানে গন্ধে জীবন ভরপুর মাতাল হয়ে উঠুক!

পুরোহিত। তার পর?

ইন্দ্রজিৎ। মরণ! আমার সোণার মরণ!···সার্থক মরণ!···

পুরোহিত। কিন্তু...কিন্তু সে কি তোমাকে ভালো-বাসে?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত বাসে,···হয়ত...না।...কিন্তু, সে ভালো না বাসলেই আরো ভালো! আমার প্রেম আরো কামনা বুকে নিয়ে আরো সাধনা কর্ব্বে! আমার অর্ঘ্য আরো ফলে ফুলে ভরে উঠ্‌বে! আমার আরতির আলো আরো ভালো ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে! আমার ধূপ আরো ভালো করে পুড়বে!···তবু যদি বর না পাই, আবার নতুন করে তপস্যা আরম্ভ কর্ব্ব!···তপস্যায় তপস্যায়, আমি সুন্দর হতে সুন্দরতর হব..তার পর······কোনদিন হয় ত ঐ নীলাকাশে একটি তারা হয়ে আমি আকাশেরি বুকে স্থান পাব ··ঐ বুকে · যে বুকে বিদ্যুৎ খেলে! যে বুকে বিদ্যুৎ নাচে!···

পুরোহিত। কিন্তু রাজাও যে তাকে কামনা করে!··· আজ রাত্রির এই শৃঙার উৎসবে রাজার যোগদানও ঐ উদ্দেশ্যেই বৎস!···সে কি বুঝছ না?

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে কে না কামনা করে পিতা!

পুরোহিত। কিন্তু, তুমিই বা তা কেমন করে সহ্য কর্ব্বে!

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের ঐ চাঁদ···ঐ বিদ্যুৎ...ভালো-বাসে সবাই, কিন্তু তা নিয়ে কি হিংসা চলে কখনো?

পুরোহিত। তর্ক নয়, তর্ক নয়। বৌদ্ধ ঐ রাজা আমাদের এই লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের শেষ চিহ্ন এই মন্দিরটুকু ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে আমার নিকট ঐ দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণাকে তার সেবাদাসী করবার অন্যায় প্রস্তাব করেছেন। আমি অসম্মত হলে···যুদ্ধ···যুদ্ধে আমাদের অনিবার্য্য মৃত্যু। আর সম্মত হলে আমাদের ধর্ম্মের যুগযুগান্তব্যাপী অপমান, অপযশ। দশ বৎসর হ'ল ঐ হিন্দুদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে, এই দশ বৎসর আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ অপমান অপযশ আশঙ্কা করেছি!

ইন্দ্রজিৎ। প্রতীকার থাকে, প্রতীকার করুন।... কিন্তু···

পুরোহিত। কিন্তু?

ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন—

পুরোহিত। প্রতীকার আছে,—শুনবে কি প্রতিকার?

ইন্দ্রজিৎ।—[নিরুপায় হইয়া]···বলুন—

পুরোহিত। প্রতীকার ঐ বিদ্যুৎপর্ণা!

ইন্দ্রজিৎ। [চমকিয়া উঠিয়া উত্তেজিত বিস্ময়ে]— বিদ্যুৎপর্ণা?

পুরোহিত। হাঁ!..বিদ্যুৎপর্ণা। দশ বৎসর পূর্ব্বে··· যেদিন ঐ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে, সেইদিন হতেই আমি এই প্রতীকারের উপায় ঠিক্ কর্ত্তে পেরেছিলুম ঐ শিশুকন্যা বিদ্যুৎপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে।···ঐ শিশুর রূপলাবণ্য দেখে···তপস্বী আমি...সন্ন্যাসী আমি···আমি অকুতোভয়ে বলব...আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম! তার পর হতে আমি তাকে নিজহাতে নিজমনে গড়ে তুলেছি আমার হাতের সুদর্শন অস্ত্রের মতো!

ইন্দ্রজিৎ। অস্ত্র কিনা জানিনে, কিন্তু, সুদর্শনা বটে! ···সুদর্শনা, সত্য সত্যই প্রিয়দর্শনা আমাদের প্রিয়তমা ঐ বিদ্যুৎপর্ণা!

পুরোহিত। আবার প্রগল্‌ভতা!···তবে শোন—

ইন্দ্রজিৎ।—বলুন···আপনি বলুন—

পুরোহিত। বড় ভালোবাসি আমি তোমায় পুত্র!··· তুমি যদি আমার অবাধ্য হও...আমার জীবনের সর্ব্ব আশা সর্ব্ব কামনা সকল সাধনা ব্যর্থ হবে! আমি তোমাকে রাজা কর্ব্ব বৎস···তুমি শুধু ঐ বিদ্যুৎপর্ণার আশা ত্যাগ কর—

ইন্দ্রজিৎ। আমি রাজ্যের ভিখারী নই।

পুরোহিত। [স্তম্ভিত হইলেন। পরে, উত্তেজিত হইয়া] বেশ্‌ তাই হবে! তাই হবে!

ইন্দ্রজিৎ। হবে? হবে?

পুরোহিত।—হবে। কিন্তু, তার পূর্ব্বে—

ইন্দ্রজিৎ। তার পূর্ব্বে···?

পুরোহিত। হাঁ, তার পূর্ব্বে ঐ রাজাকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নাটমন্দিরে নিয়ে এস। তাঁর আসবার সময় হয়েছে···

ইন্দ্রজিৎ। তার পরই—

পুরোহিত। না,···তার পর বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য হবে।

নৃত্য শেষে রাজাকে বিদ্যুৎপর্ণার শয়নকক্ষে নিয়ে যাবে··· তার পর—

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, তার পর?

পুরোহিত। তার পরই তোমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার্লে বিদ্যুৎপর্ণাকে গ্রহণ করা না করা তোমার অভিরুচি!

ইন্দ্রজিৎ। অভিরুচি!···হাঃ হাঃ হাঃ!

পুরোহিত। হেসো না উন্মাদ!···তোমার কি পরীক্ষা শুনেছ?

ইন্দ্রজিৎ। বলুন···আপনি বলুন—

পুরোহিত। রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে আলিঙ্গনে চুম্বনে গ্রাস কর্ছে, সেই দৃশ্য তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, আকাশের চাঁদ আকাশের বিদ্যুৎকে বিশ্বশুদ্ধ লোকে ভালোবাসে, কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হিংসা করে না, তুমিও আজ ওখানে রাজাকে হিংসা কর্ত্তে পার্ব্বে না, প্রতিবাদে একটি কথাও বলতে পার্ব্বে না···

ইন্দ্রজিৎ। প্রতিবাদ কর্ত্তে চাইও না! বিদ্যুৎপর্ণা বিশ্বের বিদ্যুৎপর্ণা! সমগ্র পৃথিবী তাকে অভিনন্দন কর্ছে দেখলে আমার বুক ভরে উঠ্‌বে! সে ধরণীর বুক জুড়ে বাস কর্ছে। আমারি বুকের বিদ্যুৎ বিশ্বহিয়ায় তার নৃত্যের তালেতালে খেলা কর্ছে সে তো আমারি গর্ব্ব, আমারি গৌরব!

পুরোহিত।—যা বলতে হয় বল, কিন্তু ঐ তোমার পরীক্ষা। আমার এই সর্ত্ত তোমাকে পালন কর্ত্তে হবে ·· তুমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে ··তার পরও যদি তুমি ঐ বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা কর—

ইন্দ্রজিৎ।—আমি করি! আমি করি!

পুরোহিত। তখন আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না, ··তুমি তাকে গ্রহণ ক'রো—

ইন্দ্রজিৎ।—আমি চললুম! আমি চললুম! আমি রাজাকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসি! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানিনে, কিন্তু আমার সেই অজ্ঞাত ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশে, প্রণাম ··শত কোটি প্রণাম! আমি চললুম, আমি চললুম! [প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পুরোহিত ত্বরিৎপদে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সহসা স্পর্শ করিয়া ফিরাইলেন।]

পুরোহিত।···রাজ্য চাও?

ইন্দ্রজিৎ।—বিদ্যুৎ চাই!

পুরোহিত। দাঁড়াও।···ওরে আমার অবোধ পুত্র! তোর জন্যই যে আমার এই প্রচণ্ড সাধনা! যদি রাজ্য চাস্... বিদ্যুৎপর্ণাকে ভুলে যা—! আর যদি বিদ্যুৎপর্ণাকে চা'স্ তবে—

ইন্দ্রজিৎ।—তবে?

পুরোহিত। আমার হৃদয়-শ্মশানে তোর চিতা জলবে!

ইন্দ্রজিৎ। [সহসা রুদ্র আনন্দে অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ! বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।]

পুরোহিত। [বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে ইন্দ্রজিতের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপর লীলায়িত গতিতে চঞ্চল চরণে বিদ্যুৎপর্ণা আসিয়া তাঁহার সেই নির্ব্বাক বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তখনি ছুটিয়া যাইয়া পুরোহিতের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন।]

পুরোহিত। কে?

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি! হাঃ হাঃ হাঃ···ভয় পেয়েছ! চম্‌কে উঠেছ! হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে?

বিদ্যুৎ। "বিদ্যুৎ" "বিদ্যুৎ" বলে এখনি আমাকে ডাক্‌লো কে!

পুরোহিত। কে ডাক্‌লো?

বিদ্যুৎ। আমায় ভালোবাসে...যে!

পুরোহিত। আমি তোমায় রসিকতার পাত্র নই বিদ্যুৎ। আজ কিছুদিন হ'ল তোমার মধ্যে আমি দেবদাসীর সংযম দেখতে পাইনে।···পরিণাম অতি কঠোর,...বুঝলে?

বিদ্যুৎ।—নির্জ্জন কারাবাস?

পুরোহিত।—হ'তে পারে!

বিদ্যুৎ।—হয় না! হয় না! নির্জ্জন কারাবাস আমার হতে পারে না! কারাগারে তোমার রক্ষী আমার রূপের স্তব কর্ব্বে। শুধু কি তাই? কারাগারের আশে-পাশে অন্ধকারে মৃদু গুঞ্জন উঠ্‌বে ·

"কালো কালো ভোমরা করে হায় হায়!
বধূর অধরে মধু কোথা পাওয়া যায়!"

পুরোহিত। দুর্বিনীত অসংযমী তবে শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়—

বিদ্যুৎ।—না। আমি তার এক ধাপ উঁচু। সে নাচতে জানে না। আমি জানি। এমন নাচ নাচতে জানি, যা দেখলে ·

পুরোহিত।···এখনো তুমি সেই নাচ নাচো বিদ্যুৎ? আমার নিষেধ তবে তুমি অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা রাখো?

বিদ্যুৎ। "রক্তের ডাক"! "রক্তের ডাক"! আমি কি কর্ব্ব! আমার মা নেচেছে, আমি নাচব না?

পুরোহিত। কিন্তু···আমি তোমাকে "মানুষ" করেছি, সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছি—

বিদ্যুৎ। তারি ফলে আমার দেহে এই মিথ্যা আবরণ উঠেছে! কারাগার! কারাগারে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ! ঢেকে রেখেছ!···ভালো লাগে না! আমার ভালো লাগে না!...কোন্ দিন তোমরা বলবে এই যে আমার চোখ দুটি এরাও নরকের দুয়ার···ঢাকো···ঢাকো ওদের! ···কোথায় ঠুলি! কোথায় ঠুলি!

পুরোহিত। পাপ! মূর্ত্তিমান পাপ তোমার চোখে মুখে—

বিদ্যুৎ। শুধু চোখে মুখে কেন? বল···এই বুকে—!···সন্তানও যেন বুকের দুধ চোখ বুজে খায়!···হাঁ! ···ভয় নেই, আমার বসন সংযতই রয়েছে!

পুরোহিত। আর আমি বিস্মিত হচ্ছি নে!···এর আভাষ আমি ইন্দ্রজিতের মাঝেই পেয়েছি!···তোমাদের দুজনকে নিয়ে যে আমি কি কর্ব্ব বুঝতে পাচ্ছি নে!

বিদ্যুৎ। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি।··· আমাদের দুজনকে মুক্তি দাও·· আর হাতে তুলে দাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি "বঙ্করাজ" "শঙ্খচূড়" আর "দুধসাগর" ঐ সাপ তিনটি! আমরা সাপ খেলিয়ে জীবন কাটাব! দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব! নাচব! গাইব! মজব! মজাব!

পুরোহিত। আমি তোমাদের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি!

বিদ্যুৎ। নরক?

পুরোহিত। [মুহূর্ত্তকাল, রোষে নির্ব্বাক রহিয়া] হাঁ, নরক।

বিদ্যুৎ। তবে আমি একা যাবো না!···বোধ করি ইন্দ্রজিৎও যাবে। যাবে না?

পুরোহিত। সে তোমার সাথী, তোমার দোসর।··· যাবে বই কি?

বিদ্যুৎ। সেও যাবে, আমিও যাব। নরক গুলজার হয়ে উঠবে। সেই নরকই তবে আমাদের মিলন-স্বর্গ!··· কবে যাব?

পুরোহিত। তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করবার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই···রাজার আসবার সময় হয়েছে, আমাকে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু, তার পূর্ব্বে তোমাকে একটি কথা বলে যাই, রাজার সম্মুখে তুমি তোমার ঐ বর্ব্বর বেশভূষা, ঐ ইতর আচরণ, ঐ অসভ্য বন্য নৃত্যগীত নিয়ে বের হয়ো না, তিনি তোমাকে দেখলে বড়ই বিরক্ত হবেন, হাঁ—

বিদ্যুৎ। তিনি আমাকে দেখলে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বেন, হাঁ—

পুরোহিত। আমি না হেসে থাকতে পার্ছি নে! হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। তুমি হাস্‌ছো। তুমি হাসছো!

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। গুরু!

পুরোহিত। কি?

বিদ্যুৎ। যদি সে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ে, যদি আমি তা পারি,...তবে?

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। আমাকে ক্ষেপিয়ো না তুমি। সন্ন্যাসী যদি আমার জন্য ঘুমুতে না পারে, তবে···সে তো বিলাসী তার কথা···

পুরোহিত। [চমকিয়া উঠিয়া] তুমি কি বলছ?

বিদ্যুৎ। হাঁ···আমি সন্ন্যাসীর কথাও বলছি।

পুরোহিত। সন্ন্যাসী?

বিদ্যুৎ। হাঁ, সন্ন্যাসী! যে জীবনরসে ভরপুর, যে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে, যে ঘুমিয়ে নেই, যে জীবনের দুঃখ-সুখের উচ্ছলিত মদিরা পান করে মত্ত মাতাল, শুধু সে নয়··· শুধু সে নয়···

পুরোহিত। তবে আর কে?

বিদ্যুৎ। যে জীবনকে অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর বৈরাগ্য বরণ করে নিয়ে মনে করে পরমার্থের পথে চলেছি, হৃদয়কে শুষ্ক রেখে মরণকে তপস্যা করে জড়িয়ে ধর্ত্তে চায়,…কিন্তু, মনের এক কোণে, ঘুমের ঘোরে, অতি সংগোপনে কোনদিন বা স্বপ্ন দেখে চম্‌কে ওঠে যে সে হয় ত ঠক্‌ল…

পুরোহিত। [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] কে সে?

বিদ্যুৎ। যে জাগরণে ঘোষণা করে যে আত্মসংযম চিত্ত-সংযম…সকল রকমের সংযম সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু, ঘুমের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হয়ে নিজেরি অজ্ঞাতে অসংযমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—

পুরোহিত। তার মানে? তার মানে?

বিদ্যুৎ। তার মানে অনেকের সুনিদ্রা হয় না!

পুরোহিত। [সন্দিগ্ধ ভাবে] বটে।

বিদ্যুৎ।…তোমারো!…তুমি ঘুমের ঘোরে মনের কথা বিড় বিড় করে বল।

পুরোহিত। [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে]…কি বলি?

বিদ্যুৎ। ঠিক্ ঐ ইন্দ্রজিৎ যা বলে…তাই!

পুরোহিত। কন্যার স্নেহে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি, সাবধান…

বিদ্যুৎ। সে আমার বাল্যে।…কিন্তু…আজ সেজন্য হয় ত অনুতাপই হচ্ছে!

পুরোহিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। তাই বলছিলুম...সন্ন্যাসী যদি আমার জন্য ঘুমুতে না পারে, রাজা তো বিলাসী! তার কথা না বললেও চলে!

পুরোহিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার প্রলাপ আলাপ শুনলুম বিদ্যুৎ! কত কথাই না তুমি বলতে পার! হাঃ হাঃ হাঃ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন]…যাক্!

বিদ্যুৎ। [সঙ্গে সঙ্গে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। হাসির কথা নয়।…পার্ব্বে তুমি আমাদের ধর্ম্মের…আমাদের দেবতার…আমাদের তপস্যার সেই মহা-শত্রুকে বশ কর্ত্তে…জয় কর্ত্তে...জয় করে কৃতদাস করে রাখতে?

বিদ্যুৎ। [ক্ষণেক ভাবিয়া পার্ব্ব!…পার্ত্তুম্! …কিন্তু কর্ব্ব না। হাঁ, কর্ব্ব না!

পুরোহিত। কেন? কেন বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। সে তোমার শত্রু, কিন্তু তুমি আমার শত্রু…!

পুরোহিত। সে কি! সে কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। তুমি আমাকে কারাগারে রেখেছ! আমি যাদের ভালোবাসি, তুমি আমার নিকট হতে তাদের কেড়ে নিয়েছ, সরিয়ে রেখেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ!

পুরোহিত। বল কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। কোথায় ইন্দ্রজিৎ? কোথায় বঙ্করাজ? কোথায় শঙ্খচূড়? কোথায় দুধসাগর?

পুরোহিত। এই কথা!…তবে কি আমাদের চাইতে তোমার কাছে বিষধর সাপই প্রিয় হ'ল?

বিদ্যুৎ। হ'ল। হাঁ, হ'ল…আমি তাদের ভালোবাসি। তারা আমায় ভালোবাসে। এ আমাদের রক্তের টান।… কোথায় তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে। তাদের আমি দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছি!

বিদ্যুৎ।—মিথ্যা কথা। তারা বেঁচে আছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর যদিই বা বেঁচে থাকে, তাদের তুমি খেতে দাও না! বঙ্করাজ একবেলা কলা না পেলে ঢলে পড়তো! শঙ্খচূড় একবেলা ব্যাঙ না পেলে গোসা কর্ত্ত! দুধসাগর একবেলা দুধ না পেলে আমার মার বুকের দুধ চুষে খেত! সেই তারা! আজ কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা...আছে।

বিদ্যুৎ। ও কথায় আমি ভুলব না! একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, একসঙ্গে আমরা খেলা করেছি, দুধ খেয়েছি, আদর পেয়েছি, বড় হয়েছি! কই তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা…আছে, কিন্তু...অনশনে। আমি তাদের কিছুদিন হ'ল অনশনে রেখেছি!

বিদ্যুৎ। বটে! বটে! কিন্তু, কেন?

পুরোহিত। মাঝে মাঝে ঐরূপ প্রয়োজন হয়। কেন, তা কি জান না?

বিদ্যুৎ। জানতে চাইও না! তুমি আমার শত্রু!… তুমি আমার শত্রু!

পুরোহিত। যা বলতে হয়, পরে বল।…আগে শুনে নাও…কেন। তারা আমার অস্ত্র।…কামন্দককে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎ। কামন্দক!···কোথায় সে? রসের গল্প অমন আর কেউ বলতে পার্ত্ত না!···কোথায় সে?

পুরোহিত। এক দিন সে তোমার অধর দংশন কর্ত্তে ছুটে গিয়েছিল। উপবাসক্লিষ্ট বঙ্করাজ তার অধর দংশন করে তৃপ্ত হ'ল।

বিদ্যুৎ। সে কি?

পুরোহিত। হাঁ!··যুধাজিৎকে ভোল নি, না?

বিদ্যুৎ। শত যুদ্ধের বীর সেই যুধাজিৎ! সে আমাকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল!

পুরোহিত। এবং রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তোমার ভালে চুম্বন-তিলক এঁকে দিয়েছিল—

বিদ্যুৎ। তুমি তা জেনেছ?

পুরোহিত। জেনেছিলুম বলেই তো অনাহারী শঙ্খচূড় যুধাজিতের মণি-মুকুট-মণ্ডিত ভালে বিষ-চুম্বন এঁকে দিয়ে জীবনরসে ভরপূর হয়ে উঠ্‌ল!

বিদ্যুৎ। সত্যি? সত্যি?

পুরোহিত। তবে কি আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছি?

বিদ্যুৎ। কি করেছ! তুমি কি করেছ!···কেন তুমি তাদের এ শাস্তি দিতে গেলে?

পুরোহিত। কেন তারা আমার নিষেধ মানে নি?

বিদ্যুৎ। তোমার স্বপ্ন যে কতখানি সত্য, আজ তা বুঝছি! তুমি হিংসায় আকুল, তারা যে আমায় ভালবাস্‌তো তুমি তা সহ্য কর্ত্তে পার নি··, এখন বুঝছি তোমার ঐ নিষেধাজ্ঞা, ঐ দণ্ডাজ্ঞার মূলে তোমার কোন্ প্রবৃত্তি জল সেচন করে! এখন বুঝছি কামনা বয়সের অপেক্ষা রাখে না!··· এখন বুঝছি আমার শক্তি কতখানি! পুত্র আমার পদানত, পিতাও মনে মনে, স্বপ্নের সংগোপনে আমারি পদানত!

পুরোহিত। বল কি?

বিদ্যুৎ। হাঁ, পিতা হয়েও তুমি ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ প্রতি-মূর্ত্তি!···উভয়ের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত, না?

পুরোহিত। [বিচলিত হইয়া] না...না···না! এ তুমি কি বলছ?···তা কি হয় বিদ্যুৎ, তা কি হয়?···না···না··· না,·· তা নয়। তা কখনই নয়। তা হয় না। [ভাবিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ···না, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয়।··· কি বল?...না···না···না···, হাঁ, আমরা যেন প্রথমে কি কথা বলছিলুম?...হাঁ, মনে পড়েছে।···রাজাকে তোমার জয় কর্ত্তে হবে বিদ্যুৎ! আমি তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। প্রতিদানে তুমি যা চাও···পাবে।—রাণী হতে চাও···রাণী হও···কিন্তু রাজাকে জয় কর—

বিদ্যুৎ। তোমার এই আত্ম-প্রবঞ্চনা, তোমার এই অপ্রকৃতিস্থতা আমার বেশ লাগছে।—কিন্তু আমি এ সুযোগ হারাব না। আমি চাই মুক্তি, যদি দাও তবে—

পুরোহিত। তবে ঐ রাজাকে জয় কর্ব্বে?

বিদ্যুৎ। কর্ব্ব!

পুরোহিত। রাজা তোমাকে কামনা করে!

বিদ্যুৎ। কিন্তু···যদি তুমি—

পুরোহিত।—বল ··

বিদ্যুৎ। যদি তুমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে আমায় দান কর!... যদি তুমি ঐ বঙ্করাজ, শঙ্খচূড় আর দুধসাগরকে আমার হাতে তুলে দাও!

পুরোহিত। তার পর?

বিদ্যুৎ। তার পর আমরা এই কারাগার হতে বের হয়ে পড়ব। সমুদ্র আমাদের পথ চেয়ে আছে। পর্ব্বত আমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বন-বীথি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। ইন্দ্রজিৎ আর আমি হাত ধরাধরি করে পথ চলব। ও বাজাবে ডমরু, আমি বাজাব বাঁশী।·· বঙ্করাজ আমার গলা জড়িয়ে আনন্দে দুলবে! শঙ্খচূড় আমার মাথায় উঠে খেলা কর্ব্বে! দুধসাগর আমায় নাগপাশে বেঁধে দুধ খাবার জন্য বায়না কর্ব্বে!···ঠিক্ তেমনি করে চলব ...যেমনি করে আমার বাবা আর মা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে-ছিল!···বেদে আর বেদেনী! আমার জীবনের স্বপ্ন। আমার স্বপ্নের জীবন!

পুরোহিত। সে না হয় হবে এখন!···কিন্তু, রাজাকে বশ করা সহজ নয়। তোমার মত কত সুন্দরী তার কৃতদাসী! পার্ব্বে তো? তুমি পার্ব্বে তো?

বিদ্যুৎ। আমি আমার শক্তি জানি! যা জানতুম না, তাও জানিয়েছ তুমি! [ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] রাজার মত কত সুন্দর আমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য কৃতদাস হয়েছে!···বেশী নয়! বেশী নয়! এই বেদেনীর একটি চুম্বন!···রাজা আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে!··· আমি তা ভাবছি নে, আমি ভাবছি আমার স্বপ্নের জীবন!

জীবনের স্বপ্ন !...কোথায় আমার সাথী ?···কোথায় তার বাঁশী ?···বঙ্করাজ কি ঘুমিয়ে আছে ? শঙ্খচূড় কি কাঁদছে ? দুধসাগর কি রাগ করেছে ?

পুরোহিত। সব আছে···সব পাবে !···[বাহিরে ভেরী বাদ্য] ঐ শোন ভেরী বাদ্য !

বিদ্যুৎ। [নাচিয়া উঠিয়া] সে এসেছে ! সে এসেছে ! এইবার বঙ্করাজ লাফিয়ে উঠবে ! শঙ্খচূড় ফণা ধরবে ! দুধসাগর নাচবে !

পুরোহিত। রাজা এসে পড়েছেন। ও তারি আগমনী ভেরীবাদ্য। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আছে।

বিদ্যুৎ। আমি জানি ! আমি জানি ! সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে !...আমরা যাবো···ঐ সাগরের পারে···ঐ পাহাড়ের ধারে···ঐ বনের কোলে !

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ ! তুমি প্রস্তুত হও। রাজাকে গ্রহণ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ। আমি প্রস্তুত আছি ! আয় ! আয় ! আয় ! কে আসবি আয় !

"সাপের খেলা ভারী
যে না আসবে আড়ী !"

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ ! আজ দশ বৎসর হ'ল যে কামনা নিয়ে সসর্প গৃহে বাস করে তোমাকে লালন পালন করেছি, আমার সে কামনা আজ সিদ্ধ কর !···ঐ রাজা !···ঐ রাজা ! ওকে জয় কর··বশ কর···তোমার দেহের নাগপাশে ওকে জড়িয়ে ধর··চুম্বন দাও···আলিঙ্গন দাও···ও···তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে !···পড়বে, নিশ্চয়ই পড়বে···আমি জানি পড়বে।

বিদ্যুৎ। আয় আয় আয় !
চুমু খাবো বঙ্করাজ
আয় আয় আয় !
দুধ দেব দুধসাগর
আয় আয় আয় !
শঙ্খ বাজে শঙ্খচূড় !
আয় আয় আয় !
মা মনসা মা মনসা !
আয় আয় আয় !
[সর্প নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত। হাঁ···নাচো ! ঐ নাচ নাচো !···আর আমার নিষেধ নেই, নাচো বেদেনী, নাচো ! ঐ রাজা...বীরদর্পে আসছে ! ঐ অহঙ্কার চূর্ণ কর ! নাচো ! সৃষ্টির সেই আদিম নাচ নাচো ! সাপের নাচ নাচো !—নাগপাশে বাঁধো ! জয় কর ! বশ কর ! ক্রীতদাস কর !

বিদ্যুৎ। কালনাগিনী ! কালনাগিনী !
আজকে তুমি রাজরাণী !
মাথার মণির কিবা আলো !
বধূ তোমায় বাসে ভালো !
তোমার মুখে আছে মধু !
লোভে লোভে আসে বঁধু !
রাণী রাণী ওগো রাণী !
কালনাগিনী ! কালনাগিনী !
[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত। বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !···আমি···আমি···এ পৌরোহিত্য চাইনে !..আমি রাজা ! আমিই রাজা !··· দেবে ?···একটি চুম্বন...[বিদ্যুৎপর্ণার কাছে গেলেন।]

বিদ্যুৎ। হাঃ হাঃ হাঃ [পুরোহিতের মুখের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া অট্টহাস্য করিলেন।]

পুরোহিত। [সভয়ে পিছাইয়া যাইয়া] বিষ ! বিষ ! বিষ !···ওগো আমার বিষকন্যা ! ওগো আমার স্বহস্ত-রচিত বিষবৃক্ষ !·· ক্ষুধায় প্রাণ যায়··পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু ··তোমার ঐ ফলফুল ··আমি হাত বাড়িয়ে ধর্ত্তে পারি নে,···ও-হো-হো ! এ আমি কি করেছি ! এ আমি কি করেছি !

বিদ্যুৎ। [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ। [পুনরায় সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন।···ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দণ্ডধারী পারিষদগণ সেনানীগণ পরিবৃত হইয়া নীরবে রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের নিমিষে যবনিকা উঠিয়া গেল। সহস্র-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্ব হইতে দুইদল দেবদাসী চকিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া রাজার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুৎপর্ণার সহিত তালে তালে নাচিতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ সকলও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নর্ত্তকীগণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।]

বিদ্যুৎ। একটি পয়সা রাজা একটি পয়সা ! কে

দেখবে সাপের খেলা! শঙ্খচূড়ের পাগলামি! বঙ্করাজের মাতলামি! দুধসাগরের নষ্টামি! দেখবে যদি তাই বল··· যদি কেউ বাসো ভালো!

'রাজা। [ইন্দ্রজিতের প্রতি]···কে?

ইন্দ্রজিৎ।—সে!

রাজা। [পুরোহিতের প্রতি]···সে?

পুরোহিত। হাঁ···, সে!

বিদ্যুৎ। শঙ্খচূড়, বঙ্করাজ!
নাই ভয় নাই লাজ!
দুধসাগর দুধ চায়
সামলানো হ'ল দায়!
দেখবে যদি তাই বল!
যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা। ভালোবাসি! ভালোবাসি!

ইন্দ্রজিৎ। দেখব! দেখব!

সকলে। দেখব! দেখব!

[বিদ্যুৎপর্ণা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রদীপ আরো দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দিল। হাতছানি দিয়া রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎপর্ণা যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ও ইন্দ্রজিৎ পুরোহিতের প্রসারিত হস্ত-সঙ্কেতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া চোরের মত যবনিকার এক প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। দীপের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেবদাসীদের একটি করুণ সংগীত শ্রুত হইতে লাগিল। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল। দীপ নিভিয়া গেল। তখন দূরাগত এক বংশীধ্বনির মৃত্যু-মূর্চ্ছনা শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া গেল।···হঠাৎ সেই অন্ধকারের অন্তর হইতে বিদ্যুৎপর্ণার স্বর শোনা গেল।]

বিদ্যুৎ। জয়! জয়! জয়!···জয় করেছি! বশ করেছি!·· রাজা···দেশের রাজা···ধরণীর ঈশ্বর · কৃতদাস হয়ে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে!···মাত্র একটি চুম্বন! একটি আলিঙ্গন!

ইন্দ্রজিৎ।···কিন্তু তাকে কি হত্যা করে এলি পাষাণী!···ঐ শোন্ তার আর্ত্তনাদ! উঃ···কি কাতর আর্ত্তনাদ!

বিদ্যুৎ। মাতলামি! মাতলামি!···ও তার মাতলামি! ···গুরু কোথায়?···কোথায় তুমি?·· কোথায় আমার বঙ্করাজ! শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

ইন্দ্রজিৎ। ঐ শোন অসির ঝনঝনি!·· ঐ শোন রাজার মর্ম্মভেদী আকুল মৃত্যু-যন্ত্রণা···ঐ শোন তার সেনানীদের ক্ষিপ্ত কোলাহল ··ঐ আবার অসির ঝনঝনি! ·· রাজাকে তুমি হত্যা করেছ, হাঁ, নিশ্চয়ই হত্যা করেছ...তার সেনানীরা ক্ষেপে উঠেছে!···কিন্তু···কি নিদারুণ অন্ধকার! পিতা কোথায়! প্রভু কোথায়! আমার অসি কই?

বিদ্যুৎ। রাজাকে আমি চুম্বন করেছি, আলিঙ্গন দিয়েছি···

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ। কে ও?···ঐ অট্টহাস্যে পরাণ কেঁপে ওঠে...! কে তুমি!

পুরোহিত। আমি পুরোহিত!

বিদ্যুৎ। গুরু! গুরু! আমি জয় করেছি! আমি বশ করেছি!

পুরোহিত। বটে!

বিদ্যুৎ। এক চুম্বনে·· এক আলিঙ্গনে·· বেশী নয়; বেশী নয়,···তাতেই সে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে···

পুরোহিত। ঐ এক চুম্বনে···ঐ একটি আলিঙ্গনেই রাজা পঞ্চত্ব লাভ করেছে! তার মৃতদেহ তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে!·· ওগো বিষকন্যা! প্রতি দিন তিল তিল করে বিষ খাইয়ে আজ দশ বৎসর হল আমি যে কালনাগিনী সৃষ্টি করেছি···আজ সে আমার গোপন অভিসন্ধি পূর্ণ করেছে ঐ রাজাকে দংশন করে!

বিদ্যুৎ। সে মরে গেছে?

পুরোহিত। মরে গেছে।

বিদ্যুৎ। · চুম্বনেই বিষ? আলিঙ্গনেও বিষ?

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ! তুমিই উত্তর দাও! স্বচক্ষে তুমি দেখে এসেছ!

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। আমি কালনাগিনী? আমি কালনাগিনী?

পুরোহিত। তুমি বিষ কন্যা! ··তুমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। আমি নিজ হাতে তোমাকে গড়েছি।···কিন্তু···

বিদ্যুৎ। বল! বল—

পুরোহিত।···কিন্তু ঐ যে রাজা···ও তো মরে বাঁচলো, ···কিন্তু আমি! আমি যে দিবানিশি অনুতাপে জলে মর্চ্ছি! কে জান্‌তো আমারি বিষকন্যার একটি চুম্বনের জন্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মাঝে কামনার বিষে জর্জরিত হবে!··· হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ। আজ দেখছি সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমরা কি সবাই মাতাল হলে?···কিন্তু আমি ঠিক্ আছি...আমি ভুলব না···ঠক্‌ব না!···গুরু! রাজাকে জয় করেছি, এইবার আমার সাপ তিনটি দাও···ইন্দ্রজিৎ. কোথায় তুমি?··· কাছে এস·· ঐ কাণ পেতে শোন···সমুদ্রের গর্জ্জন! ডাক্‌ছে! আমাদের ডাক্‌ছে!···গুরু! আর বিলম্ব নয়, কোথায় আমার বঙ্করাজ? শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

পুরোহিত।···আছে, তারা আছে ··আমার সঙ্গেই আছে।...কিন্তু···বিদ্যুৎ!···আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বিদ্যুৎ। না—! না!···তুমি এই মন্দিরেই রইবে। আমরা আবার ফিরে আসব···ঠিক্ আমার বাবা সদল বলে যেমন ফিরে এসেছিল···সঙ্গে আনব আমাদের খোকাখুকু। গুরু! কাছে এস···শোন···আমাদের খোকাখুকু আরো সুন্দর হবে···আমার চাইতেও···ইন্দ্রর চাইতেও! তুমি তাদের আবার বুকে তুলে নিয়ো···আবার মানুষ ক'রো··· আবার ভালোবেসো···

পুরোহিত।···বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!···ভুল! ভুল! ভুল! ·· সব তোমার ভুল!···আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি!... কাকে নিয়ে তুমি জীবনের স্বপ্ন দেখছ! স্বপ্নের জীবন কল্পনা কর্চ্ছ·· তুমি কালনাগিনী! তুমি বিষকন্যা···রাজাকে হত্যা করেছ, ইন্দ্রজিৎকেও...

বিদ্যুৎ।···আবার সেই কথা?

পুরোহিত। আরো প্রমাণ চাও?

বিদ্যুৎ। তুমি আমার সাপ দাও···কোথায় তারা?··· আমি আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করব না, কোথায় তারা?

পুরোহিত।···সর্ব্বনাশ হয়েছে বিদ্যুৎ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! :··চুপড়ির আবরণ খুলে এই অন্ধকারে দুধসাগর বেরু হয়ে পড়েছে···আমি তাকে খেতে দেই নি, সে এইবার ছাড়া পেয়ে তার শোধ নেবে!···ঐ শোন তার গর্জ্জন! বাঁচাও বিদ্যুৎ, আমায় বাঁচাও! তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধর··· দুধসাগর বুঝবে আমি তোমার দেহলগ্ন···সে কাকে দংশন কর্ত্তে গিয়ে কাকে দংশন কর্ব্বে মনে করে আর দংশনই কর্ব্বে না!

বিদ্যুৎ। কিন্তু···ইন্দ্রজিৎ?

পুরোহিত। সে আলো নিয়ে আসুক···যাও ইন্দ্রজিৎ ...যাও···

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, আলো ··আমি আলো নিয়ে আসছি··· [প্রস্থান।]

বিদ্যুৎ। দুধসাগর! দুধসাগর! আমি বিদ্যুৎ! আমি তোর দুধবোন্! আমি তোকে দুধ দেব!...কিন্তু আমার কাছে আসিস না!···আমার গুরু আমার দেহ জড়িয়ে আছেন···বিশ্বাস না হয়···ঐ শোন আমি তাকে চুমু খাচ্ছি······সাবধান···কাকে দংশন কর্ত্তে কাকে দংশন কর্ব্বি·· ঠিক্ নেই কিন্তু···

পুরোহিত।···[চীৎকার করিয়া উঠিয়া] দংশন করেছে ··দংশন করেছে!

বিদ্যুৎ। সে কি! সে কি!

পুরোহিত।···কিন্তু দুধসাগর নয়···

বিদ্যুৎ। তবে?

পুরোহিত।···তুমি!···বিদায়! ইন্দ্রজিৎকে চুম্বন ক'রো না...আলিঙ্গন দিয়ো না!···আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি···যদি তোমার খোকাখুকু হবার কোন আশা থাক্‌তো···তবে আমি এই মন্দিরেই যেমন করেই হোক্ তাদের আশায় বেঁচে রইতুম ..কিন্তু...তা যখন নয়···তখন যাকে ভালোবেসে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তারি চুম্বন পেয়ে, আলিঙ্গন পেয়ে আনন্দে মলু্ম! প্রতি রাত্রের দুঃস্বপ্নের চাইতে এক দিন এ-ক মু-হূ-র্ত্তে ম-রা ভা-লো! তৃ-প্ত হ-য়ে ম-রা ভা-লো! বি-দা-য়!

বিদ্যুৎ।···গুরু!···গুরু! [উত্তর পাইলেন না!]

* * *

·· [ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল।] পরে আলো হস্তে ইন্দ্রজিৎ সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন বিদ্যুতের পদতলে পুরোহিতের মৃত দেহ লুটাইয়া

পড়িয়াছে! বিদ্যুৎ পাষাণ-মূর্ত্তির মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।]…দেখছ?

ইন্দ্রজিৎ। গুরু!

বিদ্যুৎ। গুরু নয়, গুরুর মৃতদেহ!…আমার একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে…পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে…আর উঠবে না!

ইন্দ্রজিৎ।…চলে এস বিদ্যুৎ…সেনানীরা উলঙ্গ অসি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে …এতক্ষণ অন্ধকারে নিরাপদে ছিলুম…এখন এই আলো ‥

বিদ্যুৎ। নিভিয়ে দাও…নিভিয়ে দাও…

ইন্দ্রজিৎ। বেশ.!…দিলুম। [দীপ নির্ব্বাপন।] এইবার এসো চল ‥তোমার সেই পাহাড়ের ধারে সমুদ্রের পারে বনানীর কোলে—

[কোন উত্তর পাইলেন না]

ইন্দ্রজিৎ।…বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

[কোন উত্তর পাইলেন না।]

ইন্দ্রজিৎ। [আরো উচ্চৈঃস্বরে] বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! [দূর হইতে উত্তর আসিল]

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [আরো দূর হইতে] বিদ্যুৎ আকাশে!… বাইরে এসে দেখে যাও…[পট পরিবর্ত্তন। মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ, মাঝে মাঝে মেঘ সরিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়িতেছে।… বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সরসীর বুকে কুমুদ কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, বাতাসে তাহারা দুলিতেছে। সরসীর একপারে ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

ইন্দ্রজিৎ।…বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [সরসীর অন্যপারে আবির্ভূত হইয়া] ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। অত…দূরে নয়!…কাছে এস! চল… চল ‥সেই পাহাড়ের ধারে সমুদ্রের পারে…বনানীর কোলে—

বিদ্যুৎ। [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।] ও—হো—হো—! না—না—না!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ।‥ আকাশের ঐ চাঁদ…দূরে…কতদূরে…তবু… সরসীর ঐ পদ্ম আনন্দে দুলছে!…চুম্বন নয়! আলিঙ্গন নয়!…তবু দোলে!…ঐ চাঁদ…আর এই পদ্ম!…ওর অর্থ জানো?…আমি জেনে আসি!

[জলে ঝাঁপ দিলেন।]

যবনিকা

ব্রিটিশ বোর্ণিওর অরণ্যবাসীদের কথা

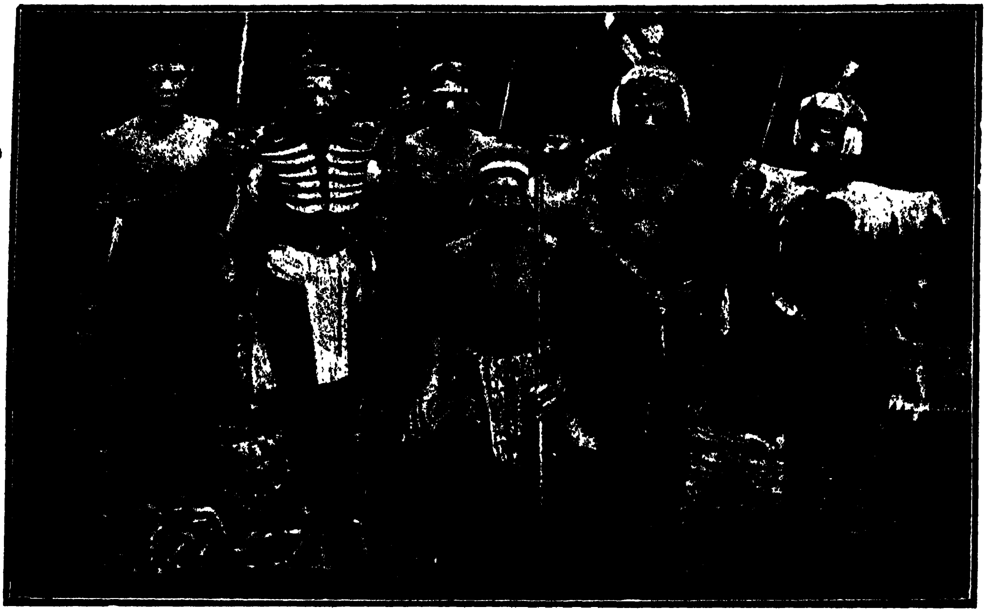
শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(১)

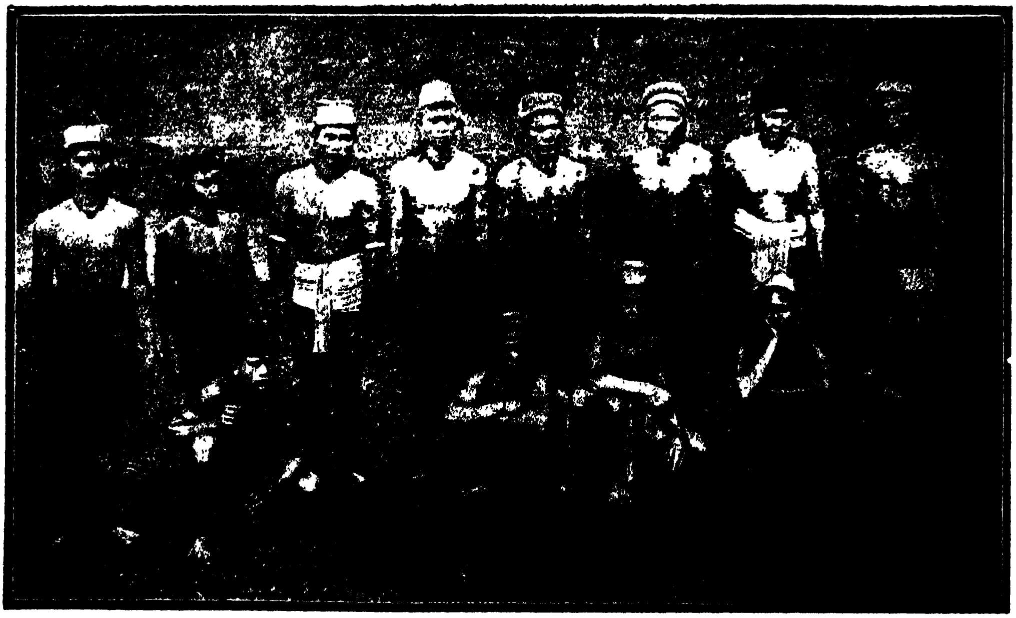
অনেক সভ্য দেশের লোকেদের ধারণা যে, বোর্ণিওতে এখনও নরখাদক এবং ভীষণদর্শন নানা অসভ্য জাতির বাস। এই দ্বীপে বুঝি সভ্যতার চিহ্নমাত্রও নাই এবং সভ্য দেশের লোকেরা এই দ্বীপে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাদের অসভ্যদের কবলে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু বোর্ণিওর যে পরিচয় পাঠকদের সামনে ধরা হইতেছে, তাহাতে পাঠকেরা দেখিবেন যে, তাঁহাদের বোর্ণিও সম্বন্ধে ধারণা কতদূর ভ্রমাত্মক। বোর্ণিওর নানা অসভ্য জাতির পরিচয় লাভ করিলে জানা যায় যে, তাহারা অসভ্য হইলেও নরখাদক এবং যতখানি ভীষণদর্শন আমরা তাহাদের মনে করি, তাহারা তা নয়।

বোর্ণিও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সৌন্দর্য্যে ভরপুর। এই দ্বীপের লোকেরা,—যাহারা সামান্য মাত্রায় আধুনিক শ্বেত সভ্যতার আলোক পাইয়াছে,—নানা প্রকার বিচিত্র পোষাক

এবং অলঙ্কারে দেহ ভূষিত করিয়া থাকে। তাহারা বুদ্ধিমান এবং নানা বিষয়ের খোঁজ-খবরও রাখিয়া থাকে। বিচিত্র বেশভূষা শোভিত এই অর্দ্ধসভ্য লোকেদের দেখিতে চমৎকার। ইহাদের পোষাকের উপর নানা প্রকার শিল্প কার্য্য



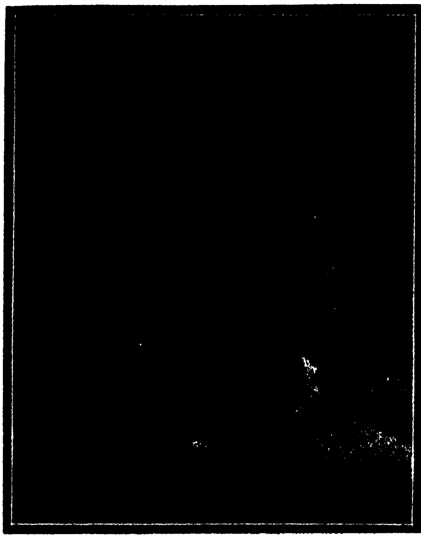
আপোষ মীমাংসা যাত্রা



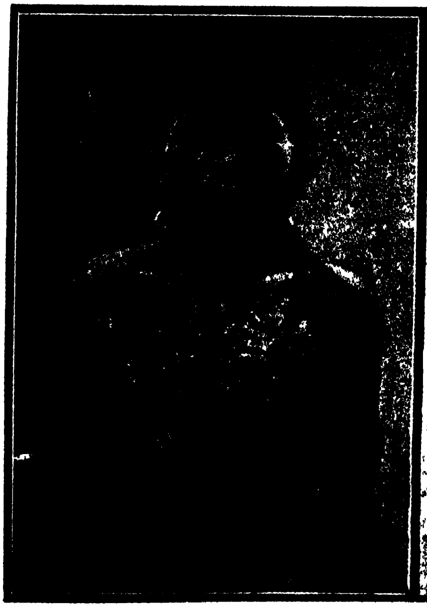
সারওয়াকি রাজের আনুগত্য স্বীকার

থাকে—তাহা নেহাৎ অসভ্যজনোচিত নহে। বোর্ণিও দ্বীপের ব্যবসাবাণিজ্য খুব বেশী প্রসার লাভ করে নাই,—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী এবং শ্বেতাঙ্গ পাদরীদের সুদৃষ্টি এই দ্বীপের এবং দ্বীপবাসীদের উপর অতি অল্প দিন হইল পড়িয়াছে।

বোর্ণিওর উত্তরাংশ ইংরেজদের। এইখানে ব্যবসা-


উল্কী সজ্জা


কর্ণভূষা


বক্ষঃস্থলে উল্কী


কর্ণে ব্যাঘ্র-নখর পরিধান



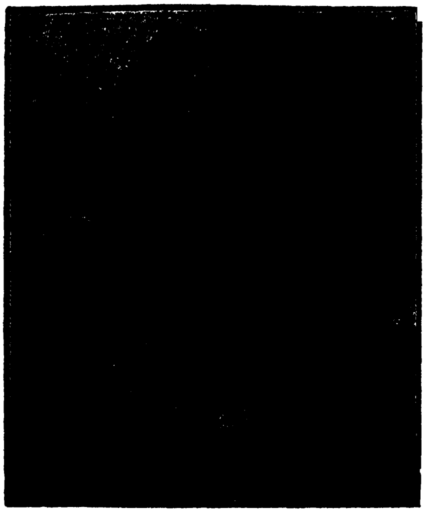
কায়ান স্ত্রীলোকগণ

বাণিজ্যের প্রসার অতি দ্রুত হইতেছে। ইংরেজ শাসনে দ্বীপ-বাসীরা শান্তিতে আছে এবং প্রবলের আশ্রয় লাভ করার দরুণ তাহারা চাষবাস ইত্যাদি নানা কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারিতেছে। আশা করা যায় ভারতবর্ষ, মিশর ইত্যাদি দেশ ইংরেজ শাসনে বিবিধ বিষয়ে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, বোর্ণিও অচিরে সেই প্রকার উন্নতি লাভ করিবে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসক কেবল মাত্র বোর্ণিও-দ্বীপ-বাসীদের স্বার্থ দেখিতে এবং রক্ষা করিতে এই দেশে গিয়াছেন। ইংরাজ লিখিত বোর্ণিওর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ইংরেজ-শাসনের মূলমন্ত্র বোর্ণিওবাসীদের স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষা করা। সভ্যতার আলোক বিস্তার করা আর একটি উদ্দেশ্য।

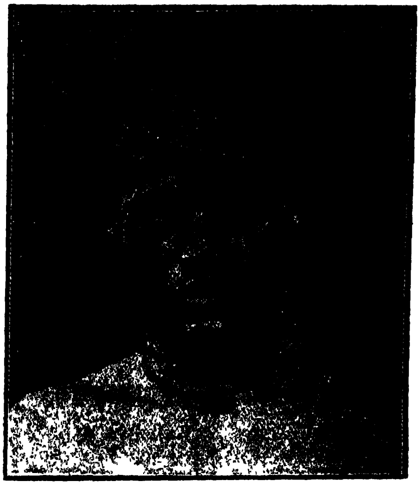


ক্লড টাউনে শান্তি-সভ্য

বোর্ণিও পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহার পরিমাণ ২৯০,০০০ বর্গ মাইল। অর্থাৎ ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের পাঁচগুণ। ইহার দৈর্ঘ্য ৮৫০ মাইল, প্রস্থ ৬০০ মাইল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান-দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এবং



কামারের হাপর



ক্লেমানটান সর্দ্দার

বিষুবরেখার উপর বোর্ণিওর অবস্থান। দ্বীপটি পর্ব্বত-সঙ্কুল—সমতলভূমি খুব সামান্য আছে। দ্বীপের চারিপাশে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; কিন্তু ইহাদের শক্তির পরিচয় এখন



পোষাকে ঝিনুকের চুম্‌কি



মোরগের লড়াই

আর পাওয়া যায় না। সবগুলিই প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কাছাকাছি অন্যান্য দ্বীপগুলির তুলনায় বোর্ণিও-দ্বীপের উর্ব্বরতা কম। দ্বীপের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাহাড় "কিনাবালু"—উচ্চতা ১৩,৫৯৩ ফুট। দ্বীপের অভ্যন্তরে এবং

অন্যান্য সকল অংশে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায়। ছোট বড় নদীও অনেক আছে। কয়েকটি নদী দিয়া ছোট-খাট জাহাজও বেশ সহজে চালান হইয়া থাকে।

ক্রুনেই সহর এই দ্বীপের পুরাতন রাজধানী। এই সহরের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে ২০,০০০। এই বিশ হাজার লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতির লোকেরা আছে :—ক্রেমা-নটনজাতি, ওরাং বুকিই জাতি, বিসায়া জাতি, এবং মালয় জাতি। ক্রুনেই সহরের লোকেরা পিতলের কাজ খুব ভাল করিয়া করিতে পারে।

ওরাং-ওটাং, গিবন এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার বানর, বন্য গো-মহিষাদি পশু, হরিণ, শূকর, ভালুক, বিড়াল, সজারু, কাঠবিড়ালি, চামচিকা, ইঁদুর ইত্যাদি বহু-প্রকার জন্তুর বাস এই দ্বীপে। উত্তর অংশে একপ্রকার ছোট হাতির দল দেখা যায়। ইহারা দল ছাড়া হইয়া প্রায়ই বাস করে না। বোর্ণিওর নদীতে কুমীর, কচ্ছপ, ব্যাং এবং বহুবিধ সর্প পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। মাছেরও কিছু কমতি নাই। বনে পাখী এবং পোকা মাকড় হাজার হাজার রকমের আছে। দ্বীপের উপকূলভূমি পলিমাটিতে ভরা। এই মাটি নদীর জলের সঙ্গে পাহাড়ের গা হইতে ভাসিয়া আসে। দেশের আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে—কিন্তু শীত বা গ্রীষ্ম কিছুর অত্যাধিক্য নাই। জঙ্গলে তক্তা করিবার উপযোগী শত সহস্র বৃক্ষাদি আছে। নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়াও এইখানে পাওয়া যায়।

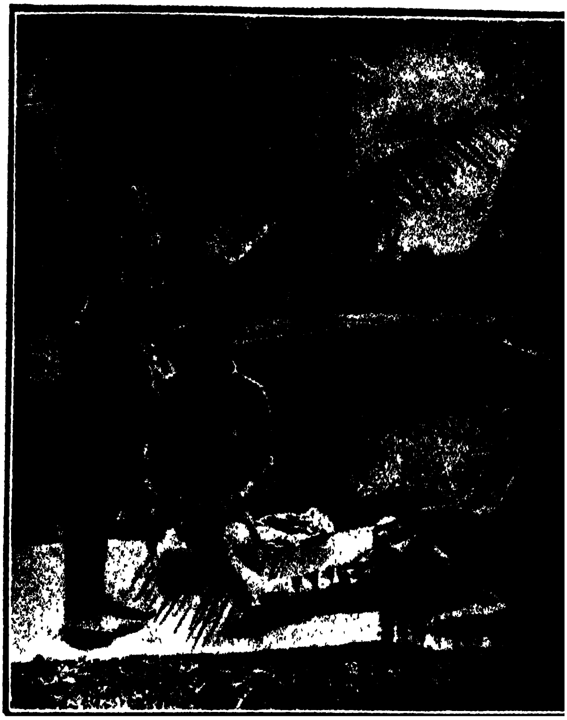
দ্বীপের মাঝে মাঝে শ্যামলগাছের সারির দৃশ্য অতি মনোহর। যতদূর চোখ যায়—কেবল সবুজের পর সবুজ—চোখ যেন শ্যামলতার স্নিগ্ধতায় জুড়াইয়া যায়। পর্ব্বতের উপরেরও গাছপালা এক প্রকার ঘন সোণালি রংএর মসে (শৈবালে) ঢাকা পড়িয়া থাকে। এই



আদিমকালের মানব-সন্তান



কায়ান কুস্তিগীর



কলাবিং-সুন্দরী

লোকেরা তাহাদের সর্দ্দারের শাসনাধীনে বাস করে। অনেক বিদেশী লেখক বোর্ণিওর সমুদ্রোপকূলবাসীদের "ডিয়াক" জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহারা সকলেই একজাতি। ইহা ঠিক নয়। এক একটি জাতির ধর্ম্মাচরণ, সংস্কার, আচার ব্যবহার অন্য জাতীয় হইতে এত বিভিন্ন যে তাহাদের এক জাতির লোক বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব।

বোর্ণিওর কয়েকটি বিশেষ জাতির নাম এইখানে দেওয়া হইল। সি ডিয়াক (ইহাদের "ইবান"ও বলা হয়) কায়ান, কেণিয়া, ক্লেমানটান, মুরুট এবং পুনান। এই জাতিদের মধ্যে সি ডিয়াক জাতির লোকেরাই শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ ভাবে পরিচিত। ইহারা চঞ্চল। ইহাদের রং অন্যান্য জাতির তুলনায় কাল; কিন্তু ইহাদের শরীরের গঠন-পারিপাট্য আছে—এবং সকলের দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

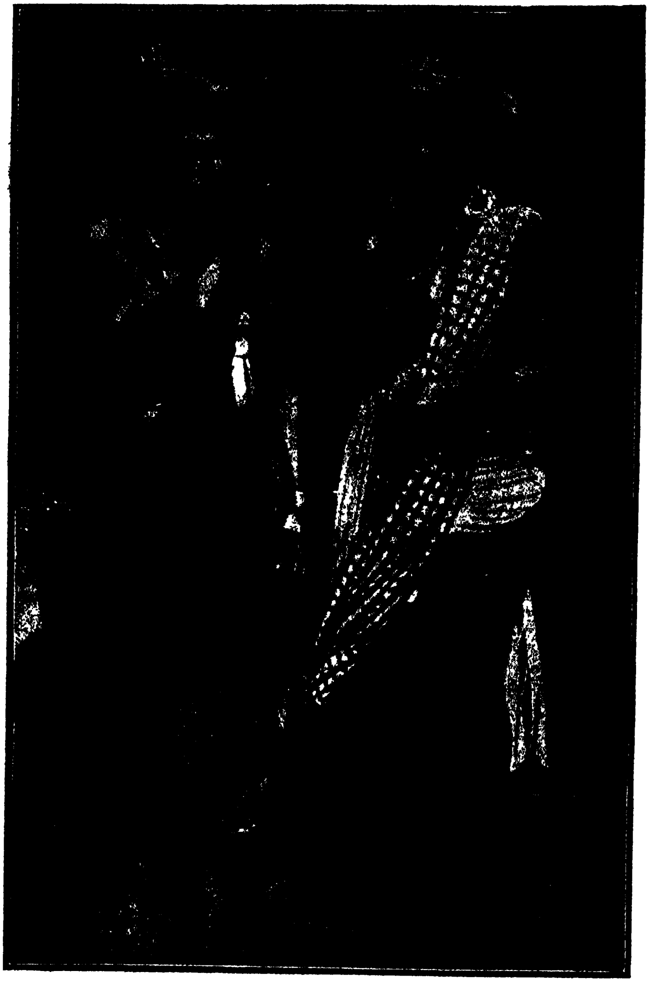
মস স্থানে স্থানে এত ঘন যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সমস্ত গাছপালা ও পর্ব্বতগাত্র কেহ একটা সোণার পাতে মুড়িয়া রাখিয়াছে। গাছপালা এই দ্বীপে অতি তাড়াতাড়ি গজায়। জঙ্গলের আশে-পাশে কোনো স্থানে গাছপালা কাটিয়া সাফ করিলে তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই আবার বৃক্ষলতাদিপূর্ণ হইয়া যায়।

বোর্ণিওর লোকসংখ্যা, চীনা, ভারত-বাসী এবং অন্যান্য বিদেশীদের বাদ দিয়া, প্রায় ৩,০০০,০০০। ইহাদের দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগ যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ২য় ভাগ যাহারা পৌত্তলিক। উপকূলের মালয় জাতিরা ছাড়া অন্যান্য সকল জাতির



ক্রীড়ারতবালা

বয়স্কদেরও বালকের মতন মুখভাব। ইহারা দিবারাত্রি সুপারি মুখে রাখে। এই জাতির লোকেরা অতি মিশুক এবং সদানন্দময়, ইহারা পরিশ্রমী এবং উৎসাহী। আমোদ-প্রমোদ ইহারা খুব বেশী ভালবাসে। এই সব কারণে সঙ্গী হিসাবে ইহারা চমৎকার। কিন্তু ইহাদের চরিত্রের আর একটি দিকও আছে। ইহারা সর্দ্দারের বিশেষ খাতির রাখে না, এবং অত্যন্ত মামলাবাজ। কলহ করিবার সুবিধা পাইলে তাহা সহজে ছাড়ে না। দরকার মত মাথা-কাটাকাটিও ইহারা অতি তৎপরতার সঙ্গেই করিয়া থাকে।



পুরুষবেশে নারী (উৎসবের প্রাক্কালে)

কায়ান জাতি মধ্য-বোর্ণিওতেই বেশীর ভাগ থাকে। নদীর ধারে গ্রামে ইহারা বাস করে। এই জাতি যুদ্ধপ্রিয় হইলেও ইহারা সি-ডিয়াক জাতির লোকেদের মত কলহপ্রিয় নয়। ইহাদের ধর্ম্মানুরাগ আছে। আচার ব্যবহারে গোঁড়ামিও আছে। ইহাদের বুদ্ধি কিছু কম হইলেও ইহারা পরিশ্রমী এবং বিবিধ শিল্পের কার্য্যে দক্ষ। ইহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা চটপটেও কম।

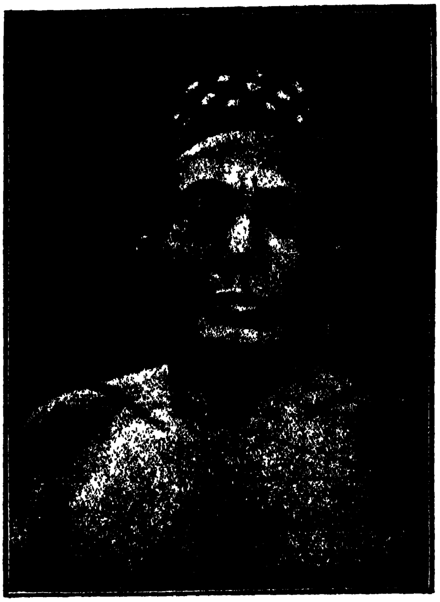
কেনিয়া জাতি মধ্য বোর্ণিওর উত্তর দিকের উচ্চভূমিতে বাস করে। শারীরিক সৌন্দর্য্যে এই জাতি বোর্ণিওর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ইহাদের রংও ফর্সা। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশীবহুল, দেখিলেই শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। ইহারা সাহসী, বুদ্ধিমান, উৎসাহী, মেজাজী এবং অতিথিপরায়ণ। ইহারা ভবিষ্যতের চিন্তা বিশেষ করে না।

মুরুট এবং কালনিট জাতি উত্তর অংশে থাকে। এইখানে ইহাদের আরো কয়েকটি ছোট ছোট শাখাজাতি বাস করে। ইহারা লম্বা চওড়া, এবং ইহাদের চামড়ার রং লালচে। চাষ-বাসের কাজে ইহারা এই দ্বীপবাসী অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত; কিন্তু ইহাদের মদে আসক্তি-বশতঃ অন্যান্য সকলে ইহাদের বহু পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে! এই জাতির একটি অদ্ভুত প্রথা আছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিকট গিয়া বিবাহ প্রস্তাব করে। পুরুষের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহার প্রণয়-পাত্রীকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না।

ক্লেমানটান জাতির লোকেরা বোর্ণিওর অংশবিশেষে বাস করে না, তাহারা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। ইহারও কয়েকটি শাখা-জাতি আছে। শাখা জাতিগুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার এবং ভাষার পার্থক্যও বহু পরিমাণে আছে।

পুনান জাতির সহিত অন্যান্য জাতির লোকদের মিল নাই—তাহারা একেবারে আলাদা ধরণের। কেনিয়া জাতির লোকদের অপেক্ষা ইহাদের গায়ের রং ফর্সা; কিন্তু অনেকের দেহে এই ফর্সা রঙে যেন সামান্য সবুজের ছিটা আছে বলিয়া মনে হয়। এই জাতির লোকেরা সুশ্রী, গঠনে পারিপাট্য আছে। ইহাদের জীবনযাত্রা আমাদের দেশের বেদেদের মত হইলেও ইহারা সকল সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কোনো প্রকারের নোংরামি ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী।

ইহারা গভীর জঙ্গলে ডালপালা দিয়া একপ্রকার ঘর তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। যেখানে ফলমূল এবং শিকার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থান বাছিয়া তাহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে।



কেনিয়া সর্দ্দার

আঁধার রাতের ডাক

শ্রীহরিধন মিত্র

জমাট করা অন্ধকারের মাঝখানেতে ওই
আমার নামে অমন ক'রে আজ কে ডাকে সই ?
যাকে আমি ফিরিয়ে দিছি সারা জীবন ভ'রে
আজকে সে কি ফির্‌লো আবার, ডাক্‌লো আবার মোরে ?

আজকে যে সই পার্ব্বো না আর ফিরিয়ে দিতে তারে,
অনেক ব্যথা দিয়েচি যে ফিরিয়ে বারে বারে;
সেবার যখন ফিরিয়ে দিলাম, নিলাম ক'রে ঠিক্—
আর কখনো ফেরাব না, এবার দেখা দিক্!

উপেক্ষা যে ঢের করেচি, কর্‌বো কত আর ?
আজকে জাগে আমার বুকে তাহার হাহাকার!
কোথায় আমি বিলিয়ে দেব আপনার যা সব—
তা না, আমি নিঃস্বতা তার করনু অনুভব!

আজকে ও সই ফেরাব না, যাবোই তাহার পাশে,
আজ না গেলে অভিমানে আর না যদি আসে;—
কোথায় তখন থাক্‌বে আমার মনের বিপুল জোর ?
ফিরে আসে, তাইতে না সই গর্ব্ব এত মোর ?

আর না যদি ফিরিয়ে পাই—কোথায় গরব রবে ?
মনের দুঃখে চোখের জলে কাঁদ্‌তে তখন হবে!
তাহার চেয়ে, এবার ছুটে দিইগে আমি ধরা
যায় না সই তাহার দুঃখ আর যে সহন করা!

ঝিঁঝিঁর গানে ঘুম-পাড়ানো আঁধার নিশীথ রাত
এই তো সই সময় ভালো যেতে তাহার সাথ!
যদি কখনো 'শুভ' কিছু আমার তরে চাও—
আজকে তবে হরষ মনে আমায় বিদায় দাও।

হয় ত তুমি ভাব্‌তে পার;—আজকে কেমন ক'রে
তোমায় আমি ছেড়ে দিয়ে পার্‌ছি যেতে স'রে;—
"মেয়ে হ'য়া পরের তরে"; জান না কি ভাই ?
অপমান কর্ব্বো আবার সে সাহসও নাই!

ফুল সে ফোটে ধীরে ধীরে, হৃদয় ভেঙে ফোটে;
নিজের বলে' লুকিয়ে কিছু রাখে না ক মোটে;
ফুলের মত আমরা যে ভাই—ভুল্‌চো কেন আজ ?
বিলিয়ে দেওয়া বিকিয়ে দেওয়া সেই যে নারীর কাজ!



'ভল্টা' শতবার্ষিকী

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

শত বর্ষ পূর্ণ হইল—আলেসাণ্ড্রো ভল্টা এই ধরাধাম ত্যাগ করেন।

জেমস্ ওয়াট বাষ্পীয় শক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ষ্টিম্-এঞ্জিন চালাইলেন—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব বলশালী হইয়া উঠিল। এডিসন্ শব্দের তথ্যগুলি কাজে লাগাইলেন—মানব মৃতের কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিল। তড়িতের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র বসু দেওয়াল ভেদ করিয়া বিনা তারে ওধরে সঙ্কেত পাঠাইলেন এবং মার্কনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া সংবাদ চালনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানকে আয়ত্তাধীন করিয়া যে সকল মনীষী মানবকে বলশালী করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন ইটালীবাসী আলেসাণ্ড্রো ভল্টা। এক শত বর্ষ চলিয়া গেল—১৮২৭ সালে ৫ই মার্চ্চ তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

এক শত বর্ষ পূর্ব্বে ধরিত্রী হইতে অপসৃত কোন লোককে আবার যদি এখানে আনিতে পারা যায় তো বোধ হয় সে চিনিতে পারিবে না এখানে এক দিন সে বাস করিয়া গিয়াছে। তড়িতের শক্তি প্রধানভাবে আজ ধরিত্রীর রূপ বদলাইয়া দিয়াছে। দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮১৫ সাল, ১৮ই জুন ওয়াটারলু ক্ষেত্রে ইংরাজ সৈন্য নেপোলিয়নের সৈন্যের সম্মুখীন; সেই দিন সন্ধ্যা ৯টার মধ্যে ইয়োরোপের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার স্থান বাছিয়া লইয়াছেন, নেপোলিয়ন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। ১৯শে জুন সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ইংলণ্ডবাসী কি হয় কি হয় জয় কি পরাজয়—এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিল। ২০শে জুন প্রাতে, যুদ্ধ শেষ হইবার ৩৬ ঘণ্টা পরে—একজন ঘোড়সওয়ার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল যে যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হইয়াছে; এবং ঘটনার তিন দিন পরে ওয়েলিংটনের নিকট হইতে প্রথম চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। আরো তিন দিন পরে ইংলণ্ডের উত্তরবাসীরা এ জয়ের সংবাদ পাইল; নিউইয়র্কে এ সংবাদ পৌঁছিতে তিন সপ্তাহ লাগিল; এবং ২২শে জুনের টাইমস্ কাগজ লইয়া একখানি জাহাজ বাতাসে দুলিতে দুলিতে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ছয় মাস

পরে যখন অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া পৌছিল, তখন অষ্ট্রেলিয়াবাসী ইংরাজ প্রথম জানিতে পারিল যে, নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করিয়াছে। এই হইল ১৮১৫ সালের ঘটনা। আর ১৯২৫ সালের একটী ঘটনা। ব্যাপারটা আর কিছু নয় —নিউজিলাণ্ড হইতে একটী দল আসিয়াছে ইংলণ্ডে ফুটবল খেলিতে। খেলা শেষ হইল—শেষ হইবার ৯০ সেকেণ্ড পরে —তখনও বোধ হয় সব খেলোয়াড় মাঠ ছাড়িয়া যায় নাই, এবং ১৮১৫ সালের ঘোড়সওয়ার সে সময়ের মধ্যে রেকাবিতে পা দিয়া ঘোড়ায় উঠিতে পারিত না—সেই দেড় মিনিটের মধ্যে নিউজিলাণ্ডবাসী নিউজিলাণ্ডে বসিয়া জানিল যে তাহাদের দল ইংলাণ্ডে খেলায় জিতিয়াছে।

এই অঘটন ঘটাইয়াছে—তড়িতের শক্তি। পাখা ঘুরিতেছে এবং কারখানা চলিতেছে তড়িতের শক্তিতে; বড় বড় সহরের তড়িতালোক একত্র করিলে তাহার রশ্মি বোধ হয় চন্দ্র অবধি পৌছায়। তড়িৎকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া টেলিফোনে দুই হাজার মাইল দূরে মানব সহজ গলায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তড়িতের বলে বাতাসের নাইট্রোজেন দ্বারা জমির সার প্রস্তুত হইতেছে—এলুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতু অতি সস্তায় পাওয়া যাইতেছে। তড়িতের সাহায্যে উদ্ভূত রঞ্জন-রশ্মি মানবের তৃতীয় নেত্র খুলিয়া দিল। বর্ত্তমান জগতের সভ্যতার মূল এই যে তড়িৎ—এই তড়িতের জন্মদাতা ছিলেন ইটালীবাসী ভল্টা।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ইটালীর কোনো সহরে ভল্টা জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন ইতস্ততঃ করেন যে তিনি কাব্য-লক্ষ্মীর সেবা করিবেন, না বৈজ্ঞানিক হইবেন। ভল্টা কবি হইলে তখনকার—

—কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,

—কোন রক্তরাগ

অনুরাগে সিক্ত করি'

আমাদের করে পাঠাইতে পারিতেন না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভল্টা পৃথিবীতে যে তড়িতের ধারা বহাইয়া দিলেন, তাহার শক্তির শেষ কোথায়—মানব তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছে না।

ভল্টা যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন একপ্রকার তড়িতের কথা বৈজ্ঞানিকদিগের জানা ছিল। একখণ্ড কাচ বা গন্ধককে ফ্লানেল বা রেশম দিয়া ঘষিলে উহাতে যে এক নূতন শক্তি লক্ষিত হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় তড়িৎ। খ্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই তড়িৎ আবিষ্কৃত হয়। কোন পদার্থে যখন ঐ তড়িৎ উৎপন্ন হয়—এখন ঐ তড়িৎ তাহাতে স্থির হইয়া অবস্থিতি করে,—শুধু যখন খানিকটা সংযোগ-তড়িৎ খানিকটা বিয়োগ-তড়িতের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন উহাদের মিলন ঘটে এবং একটী তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে এই তড়িৎ উদ্ভূত হয় এবং তথাকার বিভিন্ন তড়িতের মিশ্রণে বিদ্যুতের সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যে তড়িৎ এত প্রচণ্ড মাত্রায় উৎপন্ন হয়—পরীক্ষাগারে মানব তো তাহার কণামাত্র উৎপাদনে সমর্থ হয় না; তাই সে চেষ্টা করিতে লাগিল কি করিয়া এই ঘর্ষণ-জাত তড়িতের মাত্রা বাড়ান যায়। ভল্টা এই উদ্দেশ্যে দু' একটী যন্ত্র নির্ম্মাণে রত থাকেন, এবং কোমোতে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে এই তড়িৎ লইয়া পরীক্ষা করিতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাগার দর্শন করেন।

ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ পরীক্ষাগারগুলি ঘুরিয়া যাহা না পাইলেন ভল্টা তাঁহার এক দেশবাসীর পরীক্ষা হইতে তাহা লাভ করিলেন। বোলোনা সহরে এনাটমি শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন গ্যালভানি। গ্যালভানি ব্যাঙের ঠ্যাং লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। সেটা ছিল বারাণ্ডায় এবং ঝুলান ছিল একটা তামার হুক হইতে; বাতাসে দুলিতে দুলিতে যেই উহা লোহার বারাণ্ডার সংস্পর্শে আসে, অমনি গ্যালভানি দেখেন যে, ব্যাঙএর পেশী হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। পূর্ব্বে ঘর্ষণ-জাত তড়িৎ দ্বারা গ্যালভানি এইরূপ সঙ্কোচন দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঠিক করেন—উহা তড়িতেরই ফলে হইতেছে। তা যদি হয় তো এই তড়িৎ উৎপন্ন হইল কোথায়? গ্যালভানি বলিলেন, ব্যাঙএর পেশীতেই উহার উৎপত্তি। ভল্টা যখন এই পরীক্ষার বিষয় অবগত হইলেন, তিনি দেখিলেন যে, গ্যালভানির পরীক্ষার হুকটা এবং বারাণ্ডাটা যদি বিভিন্ন ধাতুর হয়, তো পেশীর সঙ্কোচনের মাত্রাটা বেশী হয়; পক্ষান্তরে উহা এক ধাতুর হইলে সঙ্কোচনের মাত্রাটা একেবারে কমিয়া যায়। ইহা হইতে তিনি স্থির করিলেন যে, যে তড়িতের ফলে পেশী সঙ্কুচিত হইতেছে, সেই তড়িতের

উৎপত্তি পেশীতে নয়—বিভিন্ন ধাতু হইতে। পেশী শুধু তড়িৎকে তাহার ভিতর দিয়া চালনা করিয়া দিতেছে, তাহার আর কোন কাজ নাই।

ভল্টা ও গ্যালভানির মধ্যে এইরূপ এক প্রবল মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। ভল্টা তাঁহার মত এই ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, যদি দুইটী বিভিন্ন পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত থাকে, তো একটায় সংযোগ তড়িৎ ও একটায় বিয়োগ তড়িৎ দেখা যাইবে। এই সময়কার প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা ভল্টার মত গ্রহণ করিলেন, ভল্টার জয়জয়কার হইল। অবশ্য পরে এটা প্রতীয়মান হইল যে, দুইটী বিভিন্ন দ্রব্যের কেবলমাত্র সংযোগেই তড়িৎ উৎপন্ন হয় না,—উহাদের মধ্যে আরো কিছু থাকা চাই, যাহার সহিত ঐ পদার্থ দুইটীর রাসায়নিক ক্রিয়া বিভিন্ন।

ভল্টার পূর্ব্বে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে তড়িতের বিষয় লোকের জানা ছিল, সে তড়িৎ এবং ভল্টা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তড়িতের মধ্যে মূলগত একতা থাকিলেও, তাহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বিভিন্ন। ঘর্ষণ-জাত তড়িৎ স্থির, পাত্র-বিশেষ আবদ্ধ; ভল্টা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তড়িৎ নিয়তই প্রবহমান। ভীমবেগে পতিত একটী ক্ষুদ্র জলধারাও প্রচণ্ড শক্তির আধার; কিন্তু পুষ্করিণী বা হ্রদে আবদ্ধ বিস্তীর্ণ জল-রাশি একটী ছোট নৌকাকেও নড়াইতে পারে না। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে যে তড়িৎ, উহা ঘর্ষণ-জাত তড়িৎ নয়—উহা ভল্টা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রবহমান তড়িৎ।

ভল্টা আর এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার ফলে তড়িতের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ব্যাপারটা এই—একটা কাঁচের বাটীতে যদি খানিকটা জলমিশ্রিত এসিড্ থাকে এবং যদি ঐ এসিডের মধ্যে একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তা খানিকটা করিয়া ডোবান থাকে, তবে ঐ তামা ও দস্তা বাহিরে একটা ধাতু নির্ম্মিত তার দিয়া সংযুক্ত হইলে, ঐ তারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। এখন এই ব্যাপারটা যদি খুব বড় করিয়া করা যায়—একটা পুকুরের জল ছেঁচিয়া যদি এসিড দিয়া বোঝাই করা যায় এবং পুকুরের দুই ধারে যদি প্রকাণ্ড দুইখানি তামা ও দস্তার চাদর ডোবান থাকে, এবং এই তামা ও দস্তা যদি পূর্ব্বের ঐ তার দিয়া সংযুক্ত হয়, তবে ইহাতে যে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইবে, তাহা আগেকার মতই হইবে—তড়িতের স্রোত এতটুকুও বাড়িবে না। কিন্তু এটা যদি অন্য রকমে করা যায়—ঐ তামা ও দস্তার চাদর হইতে যদি কতকগুলি চাকৃতি কাটিয়া লওয়া হয়, এবং একটা তামার চাকৃতি, একটা দস্তার চাকৃতি, মাঝে এসিডে ভিজান একখণ্ড ন্যাকড়া এইরূপ উপর উপর বরাবর সাজাইয়া দিয়া সব গোড়াকার তামাটা সব উপরকার তামার সহিত আগেকার তার দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাতে তড়িৎ-প্রবাহ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ভল্টা সর্ব্বপ্রথম এই উপায় অবলম্বন করিয়া তড়িতের শক্তি বাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে প্রথম ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির সৃষ্টি হইল। একটা কথা আছে; বর্ত্তমানে আলো জ্বালিতে, কল চালাইতে যে তড়িৎ উদ্ভূত হইতেছে, তাহা ভল্টা-প্রবর্ত্তিত দুই খণ্ড ধাতুর উপর কোন দ্রাবকের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নয়, তজ্জন্য অন্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু ভল্টা সর্ব্বপ্রথম ধরায় যে তড়িৎপ্রবাহ আনিলেন, তাহাই বিভিন্নদিঙ্মুখী হইয়া মানব সভ্যতাকে অত্যুচ্চ শিখরে তুলিয়া দিল।

তড়িৎ উৎপাদক বিভিন্ন যন্ত্রে তড়িৎ চালনা করিবার শক্তি বিভিন্ন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তির সহিত সশ্রদ্ধভাবে ভল্টার নাম সংশ্লিষ্ট রাখিয়া ঐ শক্তির মাপককে 'ভোল্ট' আখ্যা দিয়াছেন।

ভল্টার জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রতিভা সমাদৃত হয়। তাঁহার পরীক্ষা দেখিবার জন্য ১৮০১ সালে নেপোলিয়ন তাঁহাকে প্যারি নগরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে ইটালী সাম্রাজ্যের কাউণ্ট ও সেনেটর মনোনীত করেন।

আজ ভল্টার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইতালীবাসী তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত সকল দেশের সকল বৈজ্ঞানিককে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ দিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু যাইতেছেন। বিজ্ঞানেও জগৎ-সভায় ভারত তাহার যে আসন লাভ করিয়াছে, আমাদের ভরসা আছে—বাংলার এই দুই নবীন বৈজ্ঞানিক সেই আসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।



শ্রাবণ ও জবা

শিল্পী মনোরঞ্জন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

হাত-দেখা

জ্যোতি বাচস্পতি

জ্ঞানী হাত (১)

দার্শনিক পরিভাষায় জ্ঞানী হাতের নাম বিজ্ঞানময় হাত। একে জ্ঞানবাদীর হাত বা মানসিকতা-জ্ঞাপক হাত বলা যেতে পারে।

এই হাতের প্রধান লক্ষণ মানসিকতা। ভাবুক হাতের লোকের সব কাজ যেমন হৃদয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়, এঁদের সব কাজ তেমনি বুদ্ধি বা যুক্তিকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। এঁদের সব কাজের প্রথম প্রেরণা আসে বুদ্ধি থেকে। বাইরে প্রকাশ পাক আর না-ই পাক, এই হাতের লোকের মূলমন্ত্র জ্ঞান! এঁরা সব জিনিসকে যুক্তির তরফ থেকে যাচাই করে নিতে চান—এঁরা যুক্তি, সত্য ও স্বাধীনতার উপাসক।

দর্শন ও বিজ্ঞানের দিকে এঁদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়; এবং এঁরা সব জিনিসের ভিতরকার আসল তত্ত্বটুকু ধরবার চেষ্টা করে থাকেন। সব বিষয়েই এঁদের মনে প্রশ্ন আসে "কেন?" "কেমন করে?"—এমন কি, যা অনুভবের বিষয় তাকেও এঁরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান। চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য এঁরা উপভোগ করেন রসের দিক দিয়ে ততটা নয়, যতটা তাদের বিজ্ঞান বা techniqueএর দিক দিয়ে। সেই জন্য এঁদের মতে কাব্য হওয়া চাই ছন্দ ও অলঙ্কারে নির্দোষ, সঙ্গীত রাগরাগিণীতে ও তালে লয়ে বিশুদ্ধ, চিত্র বর্ণরেখা এবং পারস্পেক্‌টিভে দোষশূন্য। অবশ্য এঁদের যে এই কলাগুলি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকবেই এমন কোন কথা নয়। আসল কথা, এঁরা কলাগুলিকেও জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে নিতে চান। এঁদের যে কলার বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যতটুকু জ্ঞান, তারই মাপকাটিতে এঁরা সে কলার ভাল মন্দ বিচার করেন। রসোদ্ভাবনের চেয়ে techniqueএর আনুগত্যকে এঁরা বড় বলে মনে করেন। রসের অনুভূতি যে এঁদের মোটে নেই, তা নয়; কিন্তু রসকে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করে নিতে চান।

এঁদের মধ্যে মৌলিকতা খুবই দেখা যায়; কিন্তু সে মৌলিকতাও অনুসরণ করে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে। কর্ম্মী হাতের লোকের মধ্যে মৌলিকতা উদ্বুদ্ধ হয় নূতনের টানে—উত্তেজনার আকর্ষণে—কিন্তু জ্ঞানী হাতের লোকের মৌলিকতা আসে জ্ঞানের দিক থেকে। এঁরা সব জিনিস নিজের জ্ঞান, নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান; কাজেই সব বিষয়ে এঁরা নিজের মত একটা ধারণা গড়ে তোলেন। এঁরা হয় ত গতানুগতিক হতে পারেন—প্রচলিত রীতি নীতির বশবর্ত্তী হয়ে চল্‌তে পারেন; কিন্তু সেই প্রচলিত রীতি-নীতির প্রত্যেকটির সার্থকতা এঁরা নিজের নিজের হিসেব-মত যুক্তি দিয়ে বুঝে রাখেন। তেমনি যেখানে এঁরা সংস্কারের পক্ষপাতী হ'ন, সেখানেও পুরানো প্রথা ছাড়বার বিপক্ষে এবং নূতন পথ ধরবার স্বপক্ষে নিজের জ্ঞান-মত যুক্তি দিতে পারেন। আসলে এঁদের ঝোঁক বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে। সামাজিক বা ব্যবহারিক যা কিছু নিয়ম, যা কিছু আইন-কানুন—তা এঁরা তখনই স্বীকার করেন, যখন এঁরা বোঝেন যে সেগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এঁদের সব বিষয়ে এক একটা নিজস্ব মত আছে বলে' এঁদের মধ্যে অনেক সময় আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার দেখা যায়। যা এঁরা নিজে বোঝেন নি,—সত্য হলেও, এঁরা অনেক সময় তাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এঁরা

(১) ইংরাজি গ্রন্থগুলিতে Philosophical Hand বলে' যে গড়ন হিসেবে হাতের একটা শ্রেণী ধরা হয়েছে, তা এবং এই জ্ঞানী হাত এক নয়। ইংরাজিতে Philosophical হাতের যা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রেণী বিভাগের বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। কেন না সে Philosophical হাতের লক্ষণ অন্য সব বিভাগের হাতেও থাকতে পারে।

একরোখা হলেও একগুঁয়ে নন—যুক্তি দ্বারা কোনও মত ভুল বলে বুঝতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। মোট কথা, জ্ঞানী হাতের লোক বৈজ্ঞানিক। অনেক প্রতিভাশালী লোক জ্ঞানী হাত নিয়ে জন্মেছেন।

অপর সব হাতের মত জ্ঞানী হাতেরও তিনটি শ্রেণী আছে।

১ম—যে জ্ঞানী হাতের তেলো খুব নরম এবং বিজ্ঞানরেখা অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল ভাবে আঁকা। কড়ে আঙুলের নীচে তেলোর পাশ থেকে উঠে যে রেখা তেলোর মধ্যে মাঝের আঙুলের কাছে শেষ হয়েছে, তাকে বিজ্ঞানরেখা (২) বলে (গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় চিত্র দেখুন)।



গেঁটে হাত

এই হাতের লোকের প্রধান লক্ষণ স্বাধীনতা-প্রিয়তা। এঁরা সব বিষয়ে, সব কাজে, পুরো মাত্রায় নিজের কর্তৃত্ব চান। এঁদের উচ্চাভিলাষ খুব প্রবল এবং এঁরা সহজে অন্য লোকের মতে মত দিতে বা অন্য লোকের মতলব মত কাজ করতে চান না। এঁদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা খুব বেশী এবং যদিও ব্যবহারিক যোগ্যতা এঁদের মধ্যে কম—তা হ'লেও সব ব্যাপারে এঁরা নায়ক বা নেতা হয়ে থাকতে চান। কথনো কথনো এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রতিভার চমক দেখা যায় বটে, কিন্তু অহমিকার জন্য প্রায়ই তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। জ্ঞানী হাতের সাধারণ লক্ষণ সত্যপ্রিয়তা ও উদারতা এঁদের মধ্যেও আছে; কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার ঝোঁক এবং অপরিমিত আত্মপ্রত্যয় এঁদের প্রায়ই স্বার্থপর করে তোলে।

এঁরা বেশ ইঙ্গিতজ্ঞ এবং এঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আছে। কিন্তু এঁদের মধ্যে নরম হাতের চাঞ্চল্যও পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। বুদ্ধির চাঞ্চল্য ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের জন্য নিজের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্বেও এঁদের প্রায়ই আশানুযায়ী সাফল্য লাভ হয় না।

এঁদের মধ্যে অধীরতা বড় বেশী। কাজেই, একটানা কোন কাজে লেগে থাকা এঁদের পক্ষে শক্ত। এঁদের মাথায় নানা রকম অদ্ভুত ও দুঃসাধ্য কাজের মতলব আসে, এবং অর্থ উপার্জ্জনের নানারকম অদ্ভুত ফন্দী এঁরা প্রায়ই আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এঁদের ব্যবহারিক বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম; কাজেই সে সব ফন্দী বা মতলব বাস্তবে পরিণত করা বড় একটা হয়ে ওঠে না। যে সব কাজে খুব চট্‌পট্ ভাগ্যবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সব কাজ এঁদের খুব প্রিয়। সেই জন্য সব রকম ফাট্‌কা ও জুয়াখেলার দিকে এঁরা সহজেই ঝুঁকে পড়েন। শীঘ্র ও অধিক লাভের সম্ভাবনায় সে সব কাজের বিপদের দিকটা তাঁরা দেখেও দেখেন না। Speculatorদের মধ্যে অনেকের এই রকম হাত দেখা যায়।

এই রকম হাতে যদি শক্তিরেখা স্পষ্ট, পরিষ্কার এবং সোজা ভাবে থাকে, তাহলে সেই হাতের অধিকারী উচ্চ পদ এবং প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সীমাহীন অহমিকা ও প্রভুত্ব করবার অসঙ্গত ইচ্ছার জন্য প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ও সহযোগীর সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং সেই জন্য তাঁকে আজীবন ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কারো হাতে যদি বিজ্ঞানরেখা সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়, তাহ'লে তাঁর প্রকৃতিতে অবাঞ্ছনীয় গুণগুলি প্রায়ই চাপা থাকে; এবং তিনি প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ

(২) পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ্‌গণ একে Line of Heart বা হৃদয়রেখা বলেন। বাস্তবিক পক্ষে এ রেখাটি Line of the Higher Mind বা বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিরূপক। এই রেখা দেশীয় সামুদ্রিকবেত্তাগণের দ্বারা আয়ুরেখা বলে উল্লিখিত হয়েছে। Heartই বলা হোক বা আয়ুই বলা হোক, কোনটির দ্বারাই এই রেখার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। এই রেখা ভিতরকার আত্মার (The Inner Ego) দ্যোতক।

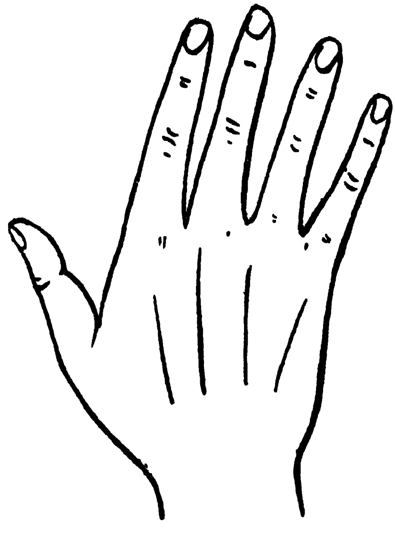
করতে পারেন। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এরূপ ব্যক্তির সাহিত্য বা শিল্প ক্ষেত্রে নিজের মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে বিখ্যাত হওয়াও অসম্ভব নয়।

২য়—যে জ্ঞানী হাতের তেলো শক্ত এবং বিজ্ঞান-রেখা স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে আঁকা। এই শ্রেণীর হাতের লোকে প্রথম শ্রেণীর হাতের লোকের চেয়ে গম্ভীর এবং এঁদের বাস্তবজ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশী। এঁদের সংগঠন-শক্তি খুব বেশী আছে; এবং যদিও এঁদের আত্মাভিমান বা গর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের চেয়ে কম নয়, তাহ'লেও এঁরা তা সহজে বাইরে প্রকাশ করেন না। এঁদের গাম্ভীর্য্যের জন্য এরা নিজেদের উচ্চাভিলাষ গোপন রাখেন এবং সংযত ভাবে ও ধীরতার সঙ্গে কাজে করতে ভালবাসেন। অন্য দুই শ্রেণীর জ্ঞানী হাতের মতই এঁদেরও জ্ঞানের স্পৃহা খুব প্রবল। তার সঙ্গে কঠিন হস্ততলের প্রধান লক্ষণ মানসিক দৃঢ়তা ও ব্যবহারিক যোগ্যতার সমাবেশ হওয়াতে, এঁরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জনও করতে পারেন; এবং অর্জ্জিত জ্ঞান দিয়ে অনেক বড় কাজও করতে পারেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের চেয়ে দর্শনের দিকে এঁদের ঝোঁক বেশী; এবং যদিও এঁদের মধ্যে যুক্তি যথেষ্ট আছে, তা' হলেও প্রেরণা (intuition) দ্বারাও অনেক সময় এঁরা অনেক কাজ করে থাকেন। এঁদের যদিও বাস্তব বা ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, তবুও সব জিনিসকে এঁরা ব্যবহারিক বা বাস্তব উপযোগিতার দিক দিয়ে দেখেন না। এঁদের অর্থ-সম্পত্তি যথেষ্ট হতে পারে বা থাকতে পারে; কিন্তু অর্থ-সম্পত্তিকে এঁরা কখনই মুখ্য লক্ষ্যে পরিণত করেন না। একটা না একটা বড় আদর্শ এঁদের থাকেই; এবং এঁদের সব কাজ সেই আদর্শের অভিমুখেই অনুষ্ঠিত হয়। এঁদের মধ্যে একটা সহজ আভিজাত্য লক্ষিত হয়; এবং যদিও এঁরা সমাজে যথেষ্ট মেলামেশা করে থাকেন, তাহ'লেও সর্ব্বদা নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব রক্ষা করে চলেন। এঁদের মধ্যে নাটকীয় জ্ঞান খুব পরিস্ফুট; এবং শিল্প কলার দার্শনিক দিকটা অতি সহজেই এঁদের নজরে পড়ে। এঁদের জ্ঞান অন্তর্ম্মুখী। এঁদের বেশীর ভাগ প্রেরণা আসে ভিতর থেকে। অবিশ্রান্ত চেষ্টা এবং অদম্য অথচ নীরব দৃঢ়তার সাহায্যে এঁরা জীবনে কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করেন।

এই শ্রেণীর হাতে, কারো যদি বিজ্ঞান-রেখা অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার হয়, তাহ'লে তিনি অতিমাত্রায় আত্মম্ভরী এবং অহঙ্কারী হয়ে থাকেন; এবং কথায় বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রকাশ করতে ব্যস্ত হ'ন। বাস্তবিক কৃতিত্ব যাই থাক্, ইনি জাহির করতে চান তার চেয়ে ঢের বেশী। ইনি সেই মনুষ্য শ্রেণীর অন্তর্গত—ইংরাজিতে যাদের snobs বলে। বাস্তবিক—snobbery তে এঁদের একটা সহজ পটুত্ব প্রকাশ পায়।

৩য়—জ্ঞানী হাতের মধ্যে যাঁদের হাতের তেলো খুব নরমও নয় খুব শক্তও নয়; এবং বিজ্ঞানরেখা সুন্দর না হ'লেও স্পষ্ট।

এই হাতের প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিত্ববাদ। এঁরা বাক্যে এবং কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী।



সরল হাত

এঁদের মনীষা প্রায়ই অসাধারণ হয়ে থাকে; এবং এঁদের মধ্যে মৌলিকতা খুব বেশী দেখা যায়। জ্ঞানী হাতের অন্যান্য শ্রেণীর মত এঁদেরও ব্যক্তিগত মতামত খুব সুস্পষ্ট; এবং সে মতামত নিজের নিজের হিসেব মত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-কোন যায়গায় যে-কোন বিষয়ে এঁরা নিজের নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। লেখার ও বলার স্বাধীনতা এঁরা খুব বেশী রকম মানেন; এবং রূঢ় হলেও সত্য এবং স্পষ্ট কথা বিনা দ্বিধায় বলে ফেলেন।

এঁদেরও টাকা-কড়ির উপর লক্ষ্য কম, যদিও বুদ্ধি বা

বিদ্যার জোরে এঁরা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকেন; এবং হয়ত অর্থশালীও হতে পারেন। শিক্ষা ও সুযোগ পেলে এঁরা বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেন।

এঁদের মধ্যেও কিছু অহমিকা আছে; কিন্তু সে অহমিকা অপরকে আঘাত করে না। এঁদের অহঙ্কার এই যে, জনসাধারণ হতে এঁরা স্বতন্ত্র। এঁরা অন্য লোকের দুর্ব্বলতা অতি সহজেই দেখ্‌তে পান্‌। সেই জন্য তর্ক-বিতর্কে এঁদের পটুত্ব আছে। সভায়, সংসদে, আদালতে, শিক্ষাগারে এঁরা এঁদের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল সুযোগ পেতে পারেন।

ধর্ম্মের দিকেও এঁদের কারো কারো ঝোঁক থাকতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রেও এঁদের একটা নিজস্ব মত থাকে; এবং এঁরা নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে কখনই পিছপাও হন না। সেখানেও নিজের মত—তা সে স্পষ্টই হোক আর অস্পষ্টই হোক—নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করে থাকেন; এবং নিজের ধর্ম্মমত প্রচারে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। লোকে সেই জন্য অনেক সময় এঁদের গোঁড়া বা অন্ধ বিশ্বাসী বলে মনে করতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক এঁদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস বলে কিছু নেই। উপযুক্ত প্রমাণ পেলে এঁরা নিজের মত বদলাতে নারাজ ন'ন। কিন্তু যখনই যে মত নিজের যুক্তির দ্বারা সত্য বলে মনে হয়, তখনই তা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং দ্বিধাশূন্য ভাষায় প্রচার করেন।

এই শ্রেণীর লোকের চিন্তা দ্বারা পৃথিবী অনেক বড় বড় আদর্শের সন্ধান পেয়েছে এবং বিশ্বাসের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

মন্তব্য

এই যে চার রকম হাতের বর্ণনা করা হ'ল, বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যে সর্ব্বত্রই এই চারটির একটি না একটির বিশুদ্ধ আদর্শ পাবেন, তা নয়। অধিকাংশ স্থলেই তিনি দেখবেন যে, একটি হাতকে খাঁটি ভাবে একটা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা চল্‌বে না। কোন যায়গায় হয় ত হাতটিতে দুটি বিভাগের লক্ষণ পাওয়া যাবে, কোন যায়গায় হয় ত তিনটি বিভাগেরও লক্ষণ মিশে থাকবে। হাতের তেলোর দুটো অংশ আছে—এক, হাতের তেলোটুকু, অপর, হাতের আঙুলগুলি। যেখানে হাতের আঙুল আর তেলো দুয়ের গড়নে একই বিভাগের লক্ষণ পাওয়া যায়, সেইখানেই তাকে খাঁটি ভাবে এক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। কিন্তু বেশীর ভাগ হাতেই হাতের তেলোর গড়ন হয় এক রকম, আঙুলের গড়ন হয় অন্য রকম। এমন কি, হাতের চারটি আঙুলের গড়নও অনেক সময় এক রকমের হয় না। দুটি আঙুল হ'ল হয় ত চৌকো; বাকি দুটি হ'ল ছুঁচলো। এমন কি চারটি আঙুল চার রকমের—এ-ও কখন কখন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রায়ই তর্জ্জনীটি হয় জ্ঞানী হাতের মত, মাঝের আঙুলটি হয় চৌকো, অনামিকাটি হয় মাথা মোটা এবং কড়ে আঙুলটি হয় ছুঁচলো।

হাতের গড়ন দেখে প্রকৃতি বিচার করতে হ'লে, হাতের তেলো এবং আঙুল এই দুটি মিশে কি প্রকৃতি হয়, তা বিবেচনা করে তার পর কিছু বলা উচিত। যেমন চৌকো বা বাস্তব তেলোর আঙুলগুলি যদি মাথা মোটা অর্থাৎ কর্ম্মী আঙুল হয়—তা হ'লে চৌকো হাতের সাবধানতা এবং গতানুগতিক ভাব কমে গিয়ে জাতককে (৩) অপেক্ষাকৃত সাহসী এবং সংস্কার-প্রিয় করে তোলে। সেখানে জাতক পুরো কর্ম্মী হাতের লোকের মত একেবারে গণ্ডীর বাইরে না যেতে চাইলেও, গণ্ডীর মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করে নিতে চান। তেমনি বাস্তব তেলোতে জ্ঞানী আঙুল হলে, জাতক খাঁটি জ্ঞানী হাতের লোকের মত একেবারে উঁচু আদর্শ খাড়া করতে পারেন না বটে, কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে ছোটখাট আদর্শ নিয়ে কিছু কাজ করে থাকেন। খাঁটি জ্ঞানী হাতের লোক যেখানে বিশ্বমানবতার পিছনে ছোটেন বা আত্মার অমরত্বের সন্ধানে ফেরেন—ইনি সেখানে হয় ত আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র বা দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই রকম ভাবে সর্ব্বত্র বিচার করা প্রয়োজন।

আগে হয় ত এক এক বিভাগের খাঁটি হাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়া যেত; কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে

(৩) যাঁর হাত অথবা কোষ্ঠী দেখে বিচার করা হয়—জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিকের ভাষায় তাঁকে "জাতক" বলা হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে মিশ্র হাতই বেশী হয়ে পড়েছে। এত মিশ্রণের ভিতরও এক এক জাতির মধ্যে এক এক হাতের প্রাধান্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কারো হাত মিশ্র হ'লেও, তাঁর জাতির মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে, তাঁর হাতে তার কিছু অংশ প্রায়ই থাকে। যেমন, যে-কোন ইংরেজের হাতে ইংরাজ জাতির বাস্তবপ্রিয়তার চিহ্ন স্বরূপ চৌকো হাতের কিছু লক্ষণ পাওয়া যাবে। তাঁর হাত খাঁটি চৌকো না হওয়াই সম্ভব; কিন্তু, হয় তেলো, না হয় আঙুল-গুলি, না হয় অন্ততঃ একটা আঙুলও চৌকো হওয়ার খুব বেশী সম্ভাবনা। তেমনি বাঙালী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায়ই জ্ঞানী হাতের লক্ষণ পাওয়া যায়; এবং বাংলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে ভাবুক হাতের প্রাধান্য বেশী। এ বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা "হাত দেখা" বিজ্ঞানের সত্যতা সহজেই প্রমাণিত হ'তে পারে; কিন্তু তার স্থান এ নয়; এবং তার জন্য সুদীর্ঘ কাল এবং স্বতন্ত্র পাত্রের প্রয়োজন।

সরল হাত এবং গেঁটে হাত

হাতের গড়নের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। কোন কোন হাতে দেখা যায়, হাতের তেলোটি বেশ নিটোল এবং সরল; আঙুলগুলি এক যায়গায় জড় করলে তার মধ্যে মোটে ফাঁক থাকে না। আবার কোন কোন হাতে তেলোর গাঁটগুলি সব উঁচু উঁচু, এবং আঙুলের গাঁটগুলি এমনি পরিস্ফুট যে, আঙুলগুলি এক যায়গায় জড় করলেও তাদের মধ্যে মধ্যে বেশ ফাঁক দেখা যায়। এই হিসেবে হাতকে সরল হাত ও গেঁটে হাত এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

পুরাকাল থেকে সকল সামুদ্রিকবেত্তা হাতের এই দু'রকম প্রভেদ লক্ষ্য করেছেন; এবং কেউ বা সরল হাতকে আকাশে তুলেছেন; আবার কেউ বা গেঁটে হাতের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। সংস্কৃত সামুদ্রিকে "নিবিড় ঘন সংবদ্ধ অঙ্গুলি"কে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ বলে ধরা হয়েছে; এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে গেঁটে হাতকে মনীষার লক্ষণ মনে করে' তাকে Philosophical Hand (দার্শনিক হাত) বলে' একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আসলে এঁদের কেউই এই প্রভেদের অর্থ ঠিক বোঝেন নি। অনেক ভিক্ষুকেরও "ধনসংবদ্ধ" আঙুল আছে, এবং অনেক নির্ব্বোধের মধ্যেও গেঁটে হাত দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, গেঁটে হাতকে বাস্তব, কর্ম্মী প্রভৃতি হাতের মত একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ধরে পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদেরা একটা মস্ত ভুল করেছেন। কেন না বাস্তব হাতও গেঁটে হতে পারে, কর্ম্মী হাতও গেঁটে হতে পারে, ভাবুক হাতও গেঁটে হতে পারে, জ্ঞানী হাতও গেঁটে হতে পারে। আবার ঐ সব হাতগুলিই সরলও হতে পারে।

আসলে গেঁটে হাত নির্দ্দেশ করে বিশ্লেষণ (Analysis), এবং সরল হাত নির্দ্দেশ করে আশ্লেষণ (Synthesis)। গেঁটে হাতের লোকের লক্ষ্য খুঁটিনাটির দিকে, আর সরল হাতের লোকের লক্ষ্য সমগ্রতার দিকে।

যাঁদের গেঁটে হাত, তাঁরা প্রত্যেক জিনিসের সূক্ষ্মতম অংশটুকু পর্য্যন্ত দেখে নিতে চান; সমগ্র বস্তুটির উপর তাঁদের তত লক্ষ্য থাকে না, যত থাকে তার ছোট ছোট অংশগুলির যোগ্যতার দিকে। অবশ্য যাঁর যে বিভাগের হাত, তিনি সেই দিক থেকে তার খুঁটিনাটিগুলি দেখবেন। যাঁর হাত বাস্তব অথচ গেঁটে, তিনি বাস্তব দিক থেকে, উপযোগিতার দিক থেকে জিনিসটিকে তন্ন তন্ন করে দেখবেন। যাঁর হাত কর্ম্মী অথচ গেঁটে, তিনি জিনিসটির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কার হতে পারে তাই লক্ষ্য করবেন। ভাবুক হাতের লোক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে জিনিসটিকে বিশ্লেষণ করবেন; এবং জ্ঞানী হাতের লোক বিজ্ঞানের দিক থেকে বা দর্শনের দিক থেকে তার প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্য্যবেক্ষণ করবেন।

গেঁটে হাতের লোকের দৃষ্টি চার দিকে। অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসও সহজে তাঁর নজর এড়ায় না; এবং প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি দেখে নিতে তাঁর মোটে আলস্য নেই। তিনি তাঁর জিনিসপত্র সুশৃঙ্খল ভাবে রাখ্‌তে ভালবাসেন। তাঁর ঘরে প্রত্যেক জিনিসের নিজের নিজের এক একটি স্থান আছে। তাঁর পোষাকের প্রত্যেক জিনিসটি যথাযথ ভাবে থাকে; এবং যেখানে যা দরকার, তার সন্নিবেশে ভুল হয় না। তিনি যদি বক্তা হ'ন, বক্তৃতার প্রত্যেক অংশটি তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখেন—কোন যায়গায় কোন ভুল চুক না হয়, সে বিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। যদি লেখক হ'ন, তাঁর প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দটি ওজন করে লেখেন,—লেখার বিষয়ের অংশগুলি আগে হ'তে নোট্ করে রাখেন, যাতে কোন অংশ

না এড়িয়ে যায়। তিনি যদি চিত্রকর হ'ন, চিত্রের প্রত্যেক detailটি নিখুঁত ভাবে দেবার চেষ্টা করেন।

গেঁটে আঙুলের লোকের বিশেষত্ব ভাল ও মন্দ দুদিক দিয়েই প্রকাশ পায়। ভালর দিকে তাঁদের যেমন সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা জন্মায়, মন্দর দিকে তেমনি অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যাপার নিয়ে তাঁরা বিরক্তিকর ভাবে তোলা-পাড়া করে থাকেন। যে সামান্য ব্যাপার অন্য লোকে হয় ত হেসেই উড়িয়ে দেয়, এঁরা সময় সময় তাই নিয়ে তুফানের সৃষ্টি করেন। খুঁটিনাটির দিকে বেশী লক্ষ্য থাকার দরুণ, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অসম্ভব রকম খুঁৎখুঁতে হয়ে পড়েন—কোন জিনিষই—কোন অবস্থাই যেন এঁদের মনের মত হয় না।

সরল হাতেরও দোষ গুণ দুইই আছে। সমগ্র বস্তুটির উপর লক্ষ্য থাকে বলে' একদিকে সরল হাতের লোক উদার-চিত্ত, বদান্য ও দূরদর্শী হয়ে থাকেন; তেমনি বস্তুটিকে দূর থেকে দেখার দরুণ, তার মধ্যে যে সকল মারাত্মক গলদ আছে, তা এঁদের চোখে ধরা পড়ে না। সেইজন্য কোন কোন যায়গায় একটা পদার্থ সম্বন্ধে এঁরা যা ধারণা করে বসেন, তা তার যথার্থ রূপের ঠিক বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। একটা জিনিসের খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া সম্বন্ধে অনেক সময় এঁদের আলস্য দেখা যায়, এবং এঁরা অনেক সময় অপাত্রে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়ে থাকেন। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, এঁরা সকলেই সরল বিশ্বাসী, কিম্বা এঁদের মধ্যে সন্দিগ্ধ-চিত্ততা মোটে নেই। এঁদের আসল কথা হচ্ছে—ঝঞ্ঝাটকে ভয়। একজন লোকের সাধুতা পরীক্ষা করতে হলে যে সব খুঁটিনাটি দেখা দরকার, তার ঝঞ্ঝাট পোহাতে এঁরা নারাজ। এঁদের মধ্যে যিনি বক্তা হ'ন, তাঁর লক্ষ্য থাকে "মোদ্দাকথা" ঠিক হ'ল কি না তারই উপর। যিনি লেখক হ'ন, তিনি মোট বক্তব্য ঠিক হলেই খুসী.—একটা শব্দ কোথায় অযোগ্য হয়েছে, একটা বাক্য কোথায় অপ্রযুক্ত হয়েছে, একটা প্যারা কোথায় নিরর্থক হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁর বড় একটা লক্ষ্য নেই।

এঁদের ঘরে গৃহসজ্জায় হোক্, আসবাব-পত্রে হোক্ বিশেষ গোছগাছের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না; এবং পোষাক পরিচ্ছদেও এঁরা তত ফিট্‌ফাট্ ন'ন। এঁদের প্রধান দোষ হচ্ছে আলস্য এবং আরামপ্রিয়তা। এঁদের মত—ফরাসী ভাষায় যাকে বলে laissez faire; যে যা করে করুক, কে অত হাঙ্গামা পোহায়। অনেক মনীষীও এই হাত নিয়ে জন্মেছেন, এবং অনেক বড় বড় সত্য তথ্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়েছে; কিন্তু তেমনি আবার অনেক মিথ্যাও সত্য রূপে তাঁদের মনে প্রতিভাত হয়েছে, যা তাঁরা সত্য বলেই প্রচার করেছেন। তাঁদের যদি সত্যটি বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি যাচাই করে নেবার ইচ্ছা বা শক্তি থাক্‌ত, তাহ'লে তাঁরা হয় ত তাঁদের ভ্রম বুঝতে পারতেন।

সরল হাতের লোক একেবারে সমগ্র বস্তুর জ্ঞান পেতে চান বলে' অনেক সময় একটা জিনিস দেখেই তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে বসেন; এবং সেই হিসেবে কাজও করেন। সেইজন্য তাঁদের কাজ অনেক সময় অস্থান-প্রযুক্ত হয়ে পড়ে। গেঁটে হাতের লোকের এ দোষ প্রায় ঘটে না।

হস্তাক্ষর ও চরিত্র

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

(১)

মানুষের চরিত্রের সহিত তাহার হস্তাক্ষরের যোগ আছে। চরিত্র দেহ মন ও বেষ্টনীর উপর নির্ভর করে, হস্তাক্ষরও তাহাই করে। চরিত্র স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। হস্তাক্ষরও তদ্রূপই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির যেমন বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যেও চরিত্রের একটা স্থায়ী আকার বুঝা যায়, তেমনই হস্তাক্ষরেরও বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা স্থায়ী ছাঁচ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাকে পাকা লেখা বলে।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রও যেমন এক প্রকার হয় না, হস্তাক্ষরও তেমনই এক প্রকার হয় না। আর মানুষের চরিত্র

যেমন চিরদিন সমান থাকে না, হস্তাক্ষরও তেমনই চিরদিন সমান থাকিতে দেখা যায় না; কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চরিত্র যেমন বাল্যকাল হইতে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে, হস্তাক্ষরও বাল্যকাল হইতেই ক্রমে গড়িয়া উঠে।

মানুষের চরিত্র যেমন সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, ক্ষুধা, কাম কিম্বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে অস্থায়ী অথবা স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, হস্তাক্ষরও তেমনই হইয়া থাকে। এ সকল কারণ মানুষের জ্ঞাতভাবে এবং অজ্ঞাতভাবেও ক্রিয়া করিয়া থাকে।

কোন দুইজন ব্যক্তির চরিত্র সমান হয় না, হস্তাক্ষরও কাহারও সহিত কাহারও একরূপ হয় না।

সুতরাং বুঝা কঠিন নহে যে, চরিত্রের সহিত হস্তাক্ষরের যোগ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বিভিন্ন চরিত্রের লোকদিগের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। কেহ বা বায়ুপ্রধান, কেহ বা পিত্তপ্রধান, কেহ বা শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুর লোক থাকে। তাহাদিগের চরিত্রও তদনুরূপ হয়। চরিত্রের যেমন এইরূপ বিভাগ করা চলে, হস্তাক্ষরেরও তেমনই শ্রেণী বিভাগ করা চলে। এক এক শ্রেণীর হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ স্থির করা যায়। আর সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হস্তাক্ষর দেখিলে লেখকের চরিত্রও অনুমান করা সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন একটী লক্ষণ দেখিয়া কোন মানুষের চরিত্র ঠিক বুঝা যায় না, তেমনই হস্তাক্ষরের একটী লক্ষণ দেখিয়াও লেখকের চরিত্র অনুমান করা সঙ্গত হয় না। একাধিক লক্ষণ এবং পরস্পর বিরোধী লক্ষণও বিবেচনা করিতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিবার পর লেখকের চরিত্র অনুমান করাই সঙ্গত। তাহা হইলে সেই অনুমান অনেকাংশে সত্য হইবার সম্ভাবনা থাকে। বহু সুপরিচিত ব্যক্তির হস্তাক্ষর ও চরিত্র তুলনা করিয়া, অপরিচিতেরও হস্তাক্ষর দৃষ্টে চরিত্র অনুমান করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া বালক লিখিতে শেখে, তাহার লেখার মতই বালকের হস্তাক্ষর হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। আমাদিগের শিশুকালে আঙ্গিনার উপর খোলা দিয়া গুরুজনে বর্ণ লিখিয়া দিতেন। আমরা অনেকে সেই লেখার উপর লিখিতাম। কিন্তু তথাপি সকল বালকেরই লেখা এক প্রকার হয় নাই। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। অনেকে যদি একজনের হস্তাক্ষরের উপর লিখিয়া লিখিয়া লেখা শেখে, তথাপি তাহাদিগের হস্তাক্ষর বিভিন্ন প্রকার হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং হস্তাক্ষরের ছাঁচ অনুকরণের উপর বিশেষ নির্ভর করে না।

মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে, ভিন্ন ভিন্ন দশায় এবং ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থায়, স্থায়ী অথবা অস্থায়ী চরিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, হস্তাক্ষরও সেইরূপই হয়। সুতরাং হস্তাক্ষর দৃষ্টে চরিত্র অনুমান করা বিজ্ঞান-সম্মত।

এই বিদ্যাকে বিজ্ঞান ও কলা (science and art) উভয়ই বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন হস্তাক্ষরকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষত্ব নির্ণয় করা এবং তাহা হইতে সুপরিচিত লেখকের চরিত্রের সহিত তুলনা দ্বারা কতিপয় সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা—ইহাই বিজ্ঞান। আর, সেই সকল নিয়ম হইতে অক্ষরের ছাঁচ দৃষ্টে অপরিচিত লেখকের চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা—ইহাই কলা। প্রত্যেক বিজ্ঞানই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যায় এবং সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার বিজ্ঞানের প্রধান কর্ম্ম। এ ক্ষেত্রেও হস্তাক্ষর দৃষ্টে চরিত্র অনুমান করিবার কতিপয় সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে সকল হইতে সন্তোষজনক ভাবে অপরিচিতের চরিত্র নির্ণীত হইতে পারে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম সকল নিশ্চয় সত্য হইবে, এমন কথা এখনও বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর নিয়মগুলি সন্তোষজনক বলিয়াই বিবেচনা হয়।

আমি নিজে এ বিষয় পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ নিয়ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসহ পূর্ব্ব-আবিষ্কৃত কতিপয় নিয়ম এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কিন্তু এই আলোচনার পূর্ব্বে একটা কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। আমরা সকলেই জানি, স্ত্রীগণের হস্তাক্ষর পুরুষ-দিগের হস্তাক্ষর হইতে পৃথক আকৃতির ও ছাঁচের হইয়া থাকে। ইংরাজের হস্তাক্ষর এবং বাঙ্গালীর হস্তাক্ষরও পৃথক হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন কোন পুরুষের চরিত্র স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়; এবং কোন কোন স্ত্রীলোকের চরিত্রও পুরুষের ন্যায় হয়। কোন কোন বাঙ্গালী প্রায় মেটে সাহেবের মত হইয়া উঠে। এই সকল ক্ষেত্রে হস্তাক্ষর দেখিয়া স্ত্রীলোকের কি পুরুষের

লেখা, ইংরাজের কি বাঙ্গালীর লেখা, ইহা বলা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি অসম্ভব হয় না।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহে ও মনে কতিপয় স্ত্রীজন-সুলভ লক্ষণ আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ অসাধারণ। তাঁহার চরিত্রে কোমল ও কঠিন, স্থির ও অস্থির একত্র মিলিত হইয়াছে। এই হেতু তাঁহার হস্তাক্ষরও মনে দ্বন্দ্বভাব উদয় করিয়া দেয়। কিন্তু এক দিকে তাঁহার চরিত্রে যেরূপ দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা লক্ষিত হয়, হস্তাক্ষরেও অনেক সময় তাহাই বুঝা যায়।

এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের হস্তাক্ষর পরীক্ষার সময় এই কথা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

তাহার পর অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সম-ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে চরিত্রের কোন কোন লক্ষণ একপ্রকার থাকে। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক; রাজনীতিক, সৈনিক; চিত্রকর, সঙ্গীত-সেবী; বিচারক, আইন-ব্যবসায়ী, জমিদার; সুদখোর মহাজন, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও কৃষক,—ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেক শ্রেণীতে কতিপয় সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের চরিত্রে কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। অথবা এই কথাই ঘুরাইয়া এরূপ ভাবেও বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি ব্যক্তির চরিত্রে একপ্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহারা কবি হয়; কতকগুলির অন্য প্রকার থাকিলে তাহারা দার্শনিক হয়। এইরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ যদি গত্যন্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া কোন ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে, স্বভাবতঃ যাহাদিগের চরিত্র কোন দিকে সমান তাহাদিগের হস্তাক্ষরও কোন কোন লক্ষণে একরূপই হইয়া থাকে। সম-চরিত্র বশতঃ সমকর্ম্মী ব্যক্তিগণের হস্তাক্ষরও সমধর্ম্মী হয়।

ইহা স্থায়ী ভাবেও হইতে পারে, অস্থায়ী ভাবেও হইতে পারে। কবির হস্তাক্ষর এক প্রকার হইল। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকের অন্য প্রকার হইল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও সময় সময় পরীক্ষিত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া কবির ন্যায় কল্পনার ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিতে পারেন। সেই সকল সময়ে তাঁহার হস্তাক্ষরও কবির হস্তাক্ষরের সহিত অস্থায়ী ভাবে সম-ধর্ম্মী হইতে পারে। গেটের ন্যায় কোন কোন বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে কবির লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সেই সকল ব্যক্তির হস্তাক্ষর ভাব-প্রধান দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ স্থলে হস্তাক্ষর কোমল ও দৃঢ় এতদুভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উঠে। এই ছাঁচ বর্ণসঙ্করের ন্যায় মিশ্রিত ছাচ।

ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে হস্তাক্ষর নির্দ্দিষ্ট কোন ছাচের, অনির্দ্দিষ্ট একাধিক ছাঁচের অথবা মিশ্রিত ছাঁচের হইতে পারে। কারণ মানবচরিত্রেও এই সকল প্রকার লক্ষিত হয়। এই নিমিত্তই যে ছাঁচের হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা হইতেছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সহিত অপর ছাঁচের কোনও কোনও লক্ষণ মিশ্রিত আছে কি না, ইহাও বিবেচনা করিতে হয়। তৎপর লেখকের চরিত্র অনুমান করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি "সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ * * * * * এ সকল মানুষের জ্ঞাত ভাবে এবং অজ্ঞাত ভাবেও ক্রিয়া করিয়া থাকে।" অজ্ঞাতভাবে ক্রিয়া করিবার দৃষ্টান্ত আমি অভিনব প্রকারে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র একটী পদ লিখিতে বলিলাম। সে তাহা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া আমাকে দিল। ঐ লেখা আমি তাহাকে আর দেখিতে না দিয়া বলিলাম "তোমার মা মারা গেলে তোমার গৃহস্থালী নষ্ট হইয়া যাইবে।" এই কথা বলার পর তাহাকে পূর্ব্বলিখিত ক্ষুদ্র পদটী আবার লিখিতে বলিলাম। সে ব্যক্তি আবার ঐ পদটী অন্য কাগজে লিখিয়া আমাকে দিল; আমি তাহাকে উহা আর দেখিতে না দিয়াই বলিলাম, "তুমি ঘোড়দৌড় খেলিয়া এক লক্ষ টাকা পাইয়াছ! জমি জমা, বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া করিয়া খুব সুখে ও আনন্দে আছ।" এই কথা বলিবার পরে তাহাকে পুনরায় ঐ পূর্ব্বলিখিত পদটি লিখিতে বলিলাম। সে পৃথক কাগজে লিখিয়া আমাকে দিলে আমি তাহাকে দেখিতে না দিয়া আবার বলিলাম, "ওহে, ঘোড়দৌড় খেলে না কি বহু টাকা দেনা হয়ে এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলে! এখন পরিবারবর্গ কি খেয়ে বাঁচবে?" এই কথা বলার পর আমার আদেশমত সেই ব্যক্তি পুনরায় ঐ ক্ষুদ্র পদটী অন্য এক কাগজে লিখিয়া আমার হস্তে দিল।

এইরূপে তাহার স্বাভাবিক হস্তাক্ষর, দুঃখের হস্তাক্ষর,

সুখের হস্তাক্ষর এবং পুনরায় দুঃখের হস্তাক্ষর,—এই চারিটি হস্তাক্ষরযুক্ত চারিখণ্ড কাগজ পাশাপাশি রাখিয়া মিল করিয়া দেখিয়াছি—অক্ষরগুলি ভিন্ন আকৃতির হইয়াছিল; এবং তাহার ছাঁচ ও লিখনভঙ্গীও বিভিন্ন প্রকার হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ সুখ দুঃখ কিছুই ঐ লেখকের ঘটে নাই। তাহার মাতাও মরেন নাই, সেও ঘোড়দৌড়ও খেলে নাই, লক্ষ টাকাও পায় নাই, অথবা সর্ব্বস্বান্তও হয় নাই। সে যেমন ছিল তেমনই ছিল। মা মরা কিম্বা লক্ষ টাকা পাওয়া মিথ্যা। ঐ সকল কথাতে লেখকের মনে তাহার জ্ঞাত ভাবে কোন ভাবই হয় নাই, সুখও না, দুঃখও না। কিন্তু নিশ্চয়ই তাহার অজ্ঞাতে সুখ দুঃখের ভাব তাহার মনে জাত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত শেষের তিনটী লেখা প্রথমবারের স্বাভাবিক লেখা হইতে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হইয়াছিল। এ পরীক্ষা অনেকবার করিয়াছি।

ইহা হইতে এবং আরও অনেক পরীক্ষা হইতে আমার মীমাংসা এই হইয়াছে যে, ব্যক্তির অজ্ঞাতে তাহার মনে অস্থায়ী কোন ভাব উদয় হইলেও, (নিতান্ত মিথ্যা কারণে উদয় হইলেও,) হস্তাক্ষর তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

নিখিল-প্রবাহ

মার্কিণ ভাস্কর্য্য—

ম্যাক্স কালিনের ভাস্কর্য্য মার্কিণ দেশে এবং বিদেশে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভাস্করের মূর্ত্তিগুলিতে অতীতের ছাপ নাই; ইহা বর্ত্তমানের আমেরিকান শ্রমিকদের জীবনকে যেন চোখের সামনে মূর্ত্তিমান করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তিতে শ্রমিকের যে রূপ চোখে ঠেকে, তাহাতে শ্রমিকের দুঃখ দারিদ্র্য নাই, প্রাণহীনতা নাই। সে রূপ দেখিলে মনে হয়, শ্রমিক যেন দাঁড়াইয়া আছে, এবং জগৎকে বলিতেছে আমি স্রষ্টা—আমি সৃজন করিয়া মানুষকে ভোগ করিতে দি। শ্রমিক মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত অঙ্গে উচ্চাশা, গর্ব্ব



কালিন ভাস্কর্য্য—কাঠুরিয়া



কালিন ভাস্কর্য্য—বার্দ্ধক্যে শ্রমিক



কালিস-ভাস্কর্য্য—কামার



মানুষ ও ঘোড়ার কঙ্কাল। (আর একই রকম
দেখিতে—কেবল মাপে ছোট-বড়)

ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিলে দাস বলিয়া মনে হয় না,—তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে, সে জয়যাত্রার পথে চলিয়াছে। সে চলিয়াছে চারিদিকে বাধা বিপত্তির জঞ্জাল কাটিতে কাটিতে। কালিসের মূর্ত্তিগুলিতে শ্রমিক-জীবনের সকল ছন্দ, সকল আশা নিরাশা অতি তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালিসের যে তিনটি মূর্ত্তি এইখানে দেওয়া হইল তাহা হইতে এই জগদ্বিখ্যাত ভাস্করের পরিচয় কিছু পাওয়া যাইবে।

মানুষ এবং ঘোড়ার কঙ্কাল—

সকল জীব যে এক সাধারণ কোন জীব হইতে বহু যুগ ধরিয়া ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার একটি প্রমাণ দিবার জন্য এক নরকঙ্কাল এবং এক অশ্ব-কঙ্কালকে পাশাপাশি ঠেকা দিয়া দাঁড় করান হয়। চিত্রে দুইটি কঙ্কাল দেখুন। তাহাদের মধ্যে কি ভয়ানক ঐক্য রহিয়াছে। অশ্ব-কঙ্কালের নীচে মানুষের নাম লিখিয়া দিলে তাহাকে নর-কঙ্কাল বলিয়া সকলেরই ভ্রম হইবে। অন্যান্য অনেক জন্তুর কঙ্কালের সহিতও আমাদের কঙ্কালের এই প্রকার সাম্য আছে।

জন্তুকে শিক্ষাদান—

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মতে এবং ধৈর্য্য ধরিয়া যে কোনো জন্তুকে অনেক প্রকার খেলা এবং কাজকর্ম্ম করিতে শিখান যাইতে পারে। প্রায় সকল জন্তুরই বুদ্ধি আছে ; তবে কাহারও বা বেশী, কাহারও বা কম। কোনো জন্তুর কিছু শিক্ষা করিতে বেশী সময় লাগে, আবার কোনো কোনো জন্তুর খুব কম সময় লাগে। গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে কুকুর, বাঁদর হাতী, এবং ঘোড়া, এই চারটি জন্তুর বুদ্ধি অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় প্রখর বলা চলে। আমরা যে গাধাকে একান্ত তাচ্ছিল্য ভাবে গাধা বলিয়া থাকি, সেই গাধারও অনেক কিছু শিখিবার ক্ষমতা আছে। তবে শিখাইবার যথোচিত বিধি জানা চাই। যে সকল লোক জীবজন্তু ভালোবাসে তাহারা অতি



জলহস্তী ও তাহার গুরু মহাশয়.



হস্তীমূর্খ নয়

সহজেই জন্তুকে পোষ মানাইয়া তাহাকে ইচ্ছামত অনেক কিছু শিখাইতে পারে—অথচ যে ব্যক্তি জীবজন্তু ভালোবাসে না, সে জন্তুকে শিক্ষা দিবার প্রণালী বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও কোনো জন্তুই তাহার পোষ মানে না—এমন কি কাছ ঘেঁসিতেও চায় না। কতগুলি বিভিন্ন জন্তুকে শিক্ষা দিয়া কত



বানরের পাঠশালা

রকম বিদ্যা দান করা যাইতে পারে, তাহা চিত্রগুলি দেখিলে জানা যাইবে। সকল জন্তুর মধ্যে বোধ হয় হিপপটোমাসকে কোনো কিছু শিখান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টকর। সামান্য একটা কিছু শিখিতে তাহার প্রায় ছয় সাত মাস সময় লাগে। এই জন্তুকে যথার্থ "গাধা" বলা উচিত।

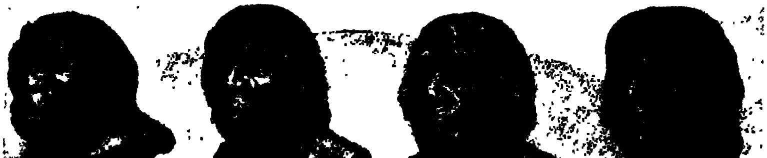




(ক) সার্কাসের অলঙ্কার—হস্তী-[illegible] (খ) সঙ্গীত-মুগ্ধ ভাল্লুক [illegible] (গ) মোটরবিশ্ব শিম্পাঞ্জী (ঘ) দণ্ডায়মান কেঙ্গেরু

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ—

নানা স্থানে বহু যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে সকল মাথার খুলি দাঁতের টুকরা ইত্যাদি প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহাদের মুখ কি প্রকার ছিল, তাহা এক প্রকার স্থির করা যায়। বাঁ দিক হইতে মূর্ত্তিগুলি দেখুন। (১) জাভার 'এপ ম্যান' ৫০০,০০০ বৎসর



চারি যুগের মানুষের মুখের আদল

পূর্ব্বের, (২) পিল্টডাউন ম্যান, ৩৭৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের, (৩) নিয়ানডারথাল ম্যান ২৫০০০ হইতে ৫০০০০ বছর পূর্ব্বের, এবং (৪) ক্রেম্যাগনন ২০০০০ বছর পূর্ব্বের।

এই মূর্ত্তিগুলিতে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা বেশ বুঝা যায়।

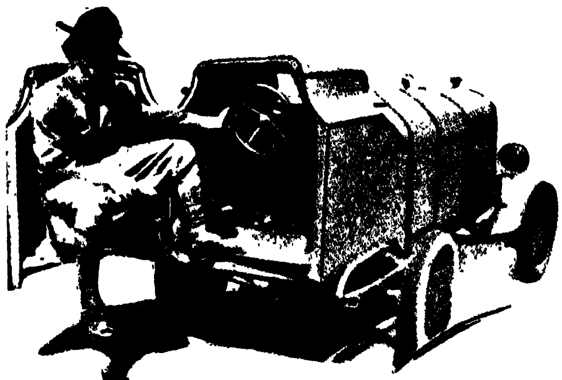
দুষ্প্রাপ্য পাখী—

আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় একটি অতি দুষ্প্রাপ্য পাখী আফ্রিকা হইতে আনা হইয়াছে। এই পাখী ইতিপূর্ব্বে মাত্র পাঁচটি ধরা হইয়াছে। জাহাজে আনিবার সময় ইহাকে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী করিয়া আনা হয়।



আফ্রিকান সারস

কামরাটির উপর বিশেষ চেষ্টা করে সকল সময় গরম করিয়া রাখা হয়। এই সারস পাখীর আহার কেবলমাত্র মাছ। জাহাজে ইহাকে নিয়ম করিয়া প্রত্যহ তিনবার তাজা মাছ খাওয়ান হয়। সারসটি নাইল নদীতে অতি বাচ্চা অবস্থায় ধরা হয়।



অভিনব মোটরকার

অদ্ভুত মোটরকার—

একজন সৈনিক এরোপ্লেনের ভাঙ্গা কলকব্জা দিয়া একটি অদ্ভুত গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। সৈনিক এই কিম্ভূতকিমাকার গাড়ীকে মোটরকার বলে। লোকে তাহা মানিতে চায় না। এই গাড়ী খুব জোরে চলে। গাড়ীতে কি ভাবে বসিতে হয় এবং বাহিরে আসিতে হয়, তাহা ছবি দেখিলে বুঝা যাইবে।

৭৫,০০০,০০০ বছর পূর্ব্বের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল—

ডাঃ জে সি এফ. সিজ্‌ক্রিট নামক একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মনটানা



ইহা কি আদিম মানবের কস-দাঁত ?

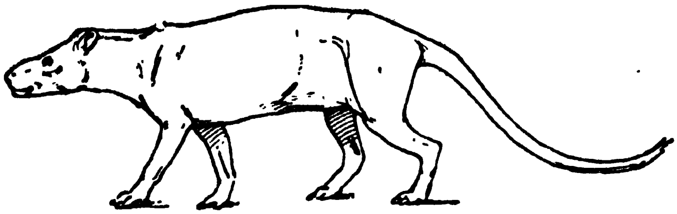
নামক সহরের নিকটে ঈগল কোল মাইন (কয়লার খনিতে) মানুষের দাঁতের মত দেখিতে একটি প্রস্তরীভূত হাড় আবিষ্কার করিয়াছেন। মাটির যে স্তরে এই হাড় পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের ভূমি পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে হাড়টি ইয়োসিন (Eocene) যুগের। এই হাড়টি খুব সম্ভবতঃ ৭৫,০০০০০০ হাজার বছর পূর্ব্বের। ইতিপূর্ব্বে এত পুরান প্রস্তরীভূত হাড় বা কঙ্কাল জগতের অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দাঁতের মত হাড়টি যদি সত্য সত্যই মানুষের দাঁত হয়, তবে ইহা আদিম যুগের মানুষের দাঁত। এই যুগে মানুষ নামধারী কোনো জীব বোধ হয় ছিল না। বৈজ্ঞানিক মহলে মহা আলোচনা চলিয়াছে এই লইয়া, যে, এই হাড় মানুষের দাঁত না অন্য কোনো জন্তুর।

ডাঃ সিজ্‌ক্রিট এই দাঁতটি যে পাথরের উপর পাইয়াছেন,—ইহা সেই পাথর সহ—বিখ্যাত বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের নিকট পরীক্ষার জন্য দিবেন। ইতিমধ্যে তিনি

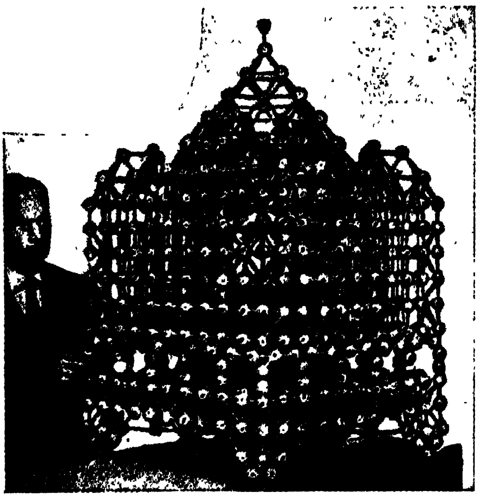
"উইক্‌লি সায়েন্স" নামক পত্রিকায় তাঁহার এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের সম্পূর্ণ বিবরণ চিত্র সহ প্রকাশ করিয়াছেন। পাথরটি যে যুগের, হাড়টিও যে সেই যুগের ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অনেকে যেমন এই হাড়টিকে মানুষের দাঁত বলিয়া মনে করিতেছেন, তেমনি অনেকে আবার ইহাকে বর্ত্তমান গৃহপালিত পশুদের পূর্ব্ব পুরুষ কোনো জন্তুর হাড় বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। অনেকে ইহাকে ইউপ্রোটোগোনিয়া নামক জন্তুর দাঁত বলিতেছেন। এই জন্তুর দাঁত নাকি মানুষের দাঁতের মত দেখিতে। কোন্ দলের কথা যে ঠিক, তাহা পরীক্ষা শেষ না হইলে বলা যায় না। তবে এই দাঁতটি যদি মানুষের হয়, তবে বিজ্ঞান-জগতে যে মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।



ডাঃ সিজ্‌ক্রিট। (ইনিই ঐ অদ্ভুত দন্তের আবিষ্কর্ত্তা)



ইউপ্রোটোগোনিয়া (দাঁতটি এই জন্তুর হওয়াও অসম্ভব নয়)



ভূমিকম্প-'প্রুফ' বাড়ীর মডেল

অভিনব গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি—

ছবিতে দেখুন, এক অদ্ভুত উপায়ে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার একটি মডেল দেখান হইতেছে। বাড়ীটির মধ্যে এবং চারিপাশে বহু শত স্প্রিংএর জোড় রহিয়াছে। এইগুলি থাকার দরুণ বাড়ীটি ভূমিকম্প সহ্য করিতে পারিবে। ভূমিকম্প হইলে সেই কম্পন বাড়ীর ভিত হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে মিলাইয়া যাইবে। বাড়ীর ধসিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। বাড়ীর কাঠামোটি ইস্পাতের ফ্রেমে তৈয়ারী। আবিষ্কর্ত্তা বলিতেছেন যে, খুব ভয়ানক ভূমিকম্পেও বাড়ী টিকিয়া থাকিবে।

বর্ষাবোধন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছন্দে বাজিয়ে বজ্রের ভেরী, চন্দ্র-তপন কজ্জলে ঘেরি,
এস আষাঢ়ের অন্তঃপুরিকা ! এস বাদলের আসরে !
জল-কুন্তল দুলিয়ে দুলিয়ে, ময়ূরের মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে,
মেঘডুম্বুর সাড়ী পরে' এস নব অভিসার-বাসরে !
ধরণীর তাপ-হরণী
এস এস ছায়া-বরণী !

* * *

গগন-পাত্র ভরিয়া ভরিয়া দিবস-রাত্র পড়িছে ঝরিয়া
চিত্ত হরিয়া নৃত্য করিয়া উথলি আকাশ-গঙ্গা !
বকুল-গুঞ্জে গীতিকা তুলিয়া জলদ-পুঞ্জে বীথিকা খুলিয়া,
চল-চপলার দীপিকা জ্বালিয়া এস গো নিদালী-ভঙ্গা !
হে মোর ভুবন-দুলালী,
যুগে যুগে মন ভুলালি !

* * *

আহা মরি মরি, কদম বাগানে, অমল ধবল পুলক-জাগানে
থর' থর' ফুল করে ঢুল্ ঢুল্ ! আঁখি ঢুল্ ঢুল্ নেহারি !
মাঠে-বাটে আর পথিক চলে না, ঘাটে বধূদের নয়ন জ্বলে না,
সুধু ঝুম্-ঝুমু ধারার ঝুমুর ধরার হৃদয়-বেহারী !
রাত-মাখা দিন শুনিছে,
নাচের মাত্রা গুণিছে !

* * *

সাগর-দিঘির হিয়ার উপরে বৃষ্টি-কুসুম ঝরে আর ঝরে,
কেতকী-কেশর কৌতুকভরে বিতরে সুরভি-রাগিণী !
কেকা-বাঁশী নিয়ে ঐ নাচে শিখী, কালো মেঘ-পটে স্বরলিপি লিখি' !
পুকুরের জলে সাঁতার-খেলায় বিহরে দামিনী-নাগিণী !
রবির বিরহে শুকিয়ে
নলিনী কাঁদিছে লুকিয়ে।

*

শোনে চম্পক, শোনে কহ্লার, বন-মর্ম্মরে ওঠে মল্লার !
বেলা-মল্লিকা-যূথিকা-মালিকা সাজিয়ে নাও গো থালিকা !
আজি কার সথ গেছে পরবাসে, স্মৃতি-স্বর আসে হতাশ বাতাসে,
যেন অঙ্গনে চোখ চঞ্চলি' ঝুরিছে পল্লী-বালিকা !
ধারা-তানপুরা বাজে রে
বিরহীর হৃদি মাঝে রে !

* *

চল আজ সখী, থাক্ কাজ বাকি, মিছে সাজ করা, এস লাজ রাখি,
দাদুরী-ডাকানো আদুরী বরষা বরণ করিব দুজনে,
চল ভুঁয়ে রেখে চরণের দাগ, তারি সাথে এঁকে আল্তার বাগ,
শুনিছ না রাণী, বাদলার তাল ভিজে কোকিলের কূজনে ?
হবে তরলিত সরলা !
মধুজা যে আজ তরলা !

* * *

নৌকাতে মোর ঘর আছে বাঁধা, সেইখানে সই, হবে গলা সাধা',
না হয় বরং নদীর সাধা শুনিব তোমার সঙ্গে ! .
কলতানে ঢেউ খুলিবে সরগি, জলের দোলায় দুলিবে তরণী,
ধোঁয়ার মতন বর্ষার 'ছাট' লাগিবে আসিয়া অঙ্গে !
শুন লো কমল-লোচনা,
মেঘলায় তুমি জোছনা !

* * *

আঁখি-শিশু তোর করিবে দেয়ালা, তাতে রবে মোর প্রাণের পেয়ালা,
চাতকের সাথে ভিজিয়ে নেব গো পরাণের যত পিয়াসা !
তোর মুখ হবে আমার তপন, তার পানে চেয়ে দেখিব স্বপন,
রাঙা অধরের পাপ্ড়ি-দুখানি জাগাবে মরণে কি আশা !
ও তোর বুকের কুঞ্জে
ফুলবাণ-ভরা তূণ যে !

* * *

মন্থরে তোর অন্তরে মোহ, আর চারিধারে মেঘ-সমারোহ,
নদীনীরে আর তীরে মাঠ ভ'রে জল-কল্লোল জাগে রে !
হাহাকারে বায়ু হ'ল গো বন্য ! দুলে দুলে পড়ে শ্যাম অরণ্য !
খুলে খুলে যায় বিজলীর মালা দেয়ার দীপক-রাগে রে !
কাজ্রীর-তান-ধরুনী,
আয় লো রূপসী তরুণী !



কথা—শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা, সুর—শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

তুমি আমার এতই কাছে কেউ তা জানে না!
বিশ্বমাঝে আমার তুমি
ছেড়ে রও যে সুদূর ভূমি—
এ কথা মোর বল্‌তে মুখে প্রাণ যে সরে না!
যেখানে যাই রও তো পাছে,
ঘুমোই যখন আছ কাছে,
(থাক) নয়ন জুড়ে স্বপন হ'য়ে, রূপ যে ধরে না।
যখন আমার বেসুর প্রাণে সুর ভ'রে দাও কি সন্ধানে,—
বাজে সে যে গভীর তানে—কেউ তা শোনে না;
উপেক্ষাতে ভগ্ন বুকে
অশ্রু ঝরে গোপন দুখে,
(তখন) তুমি ছাড়া বুকে ধরে' কেউ ত রাখে না!
(ওগো) তুমি আমার এতই কাছে কেউ তা জানে না!

ভীমপলশ্রী—একতালা (মধ্যলয়)

ঠাট জ্ঞ ণ ন, সম্পূর্ণ জাতি, বাদী ম, সংবাদী প, দিবা ৩য় প্রহর।

পণা	পর্সা	-া	ণা	পা	-	+ মা	জ্ঞমা	জ্ঞা	রজ্ঞা	সরা	ণ্া
তু	মি	-	আ	মা	র্	এ	ত	ই	কা	-	ছে
সা	রণ্া	সা	মজ্ঞা	মজ্ঞা	মা	(জ্ঞমা	পণা	র্সণা	পধা	মপা	জ্ঞমা)*
						পা	-া	মপা	জ্ঞমা	জ্ঞা	মা
কেউ	-	তা	-	জা	নে	না	-	-	-	-	- II

* যাঁহাদের গলায় দ্রুত গিট্‌কারী হয় না, তাঁহারা বন্ধনীযুক্ত অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া গানটি ঠা লয়ে গাহিবেন।

(ণ্সা জ্ঞসা জ্ঞমা | জ্ঞমা পমা পণা | পণা র্সণা ধণা | পমা জ্ঞমা পা)

মা - - - - - - - - - - -

ণা -া ণা | ণা র্সণা ধণা | মপা জ্ঞমা পণা | -া র্সা র্সা

বি - শ্ব মা ঝে - আ মা য় - তু মি

ণা র্সা -া | ণর্া ণর্রা র্সা | ণধা র্সণা ধণা | পা পা -া

ছে ড়ে - র ও যে সু দূ র ভূ মি -

মা পা ণধণ-া | পা জ্ঞা -া | মপা জ্ঞপা জ্ঞা | রজ্ঞা সা -া

এ ক - থা মো র্ ব -ল্ তে মু খে -

ণ্সা রণা সা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা | (পনা র্সর্রা র্সণা | ধপা মপা জ্ঞমা)

পা -া মপা | জ্ঞমা জ্ঞা মা

প্রা -ণ্ যে - স রে না - - - - - ||

(জ্ঞর্রা র্সণা ধণা | র্রর্সা ণধা পধা | পমা জ্ঞমা পণা | পমা জ্ঞমা পা

মা - - - - - - - - - - -

মপা জ্ঞমা জ্ঞা | -া মা পা | না -া র্সা | র্সা র্সা -া

যে থা - - নে যাই র ও তো পা ছে -

র্সর্রা ণর্সা র্মজ্ঞা | -া র্রা র্সা | নর্সা র্রনা র্সা | ণধা ণা পা

ঘু মো -ই - য খন্ আ - ছ কা - ছে

{ পনা র্সা | -া জ্ঞর্জ্ঞা ণা | র্সা -া -া | ণর্সা র্মজ্ঞা -া)

মা - - - - - - - - মা - -

র্রজ্ঞা র্রর্সা র্রণা | র্সা -া -া | ণর্সা জ্ঞর্রা র্সর্রা | ণর্সা ণধা পধা }

- - - - - - মা - - - - -

থা ক ন য়ন্ জু ড়ে • স্ব প ন হ য়ে -

রূ -প্ যে - ধ রে না - - - - - ||

এই দুই লাইনের স্বরলিপি "একথা মোর" লাইনের ন্যায়।

(ণ্সা জ্ঞমা পনা | র্সর্রা র্মজ্ঞা র্রর্সা | নর্সা ণধা পধা | মপা জ্ঞমা পা)

মা - - - - - - - -

মা	পমা	পা	|	জ্ঞা	মজ্ঞা	মা	|	ণ্া	সা	মজ্ঞা	|	রা	সা	-া
য	থ	ন্		আ	মা	র্		বে	সু	-র		প্রা	ণে	-
সা	ররা	ণ্া	|	সমা	মা	জ্ঞা	|	সা	জ্ঞরা	জ্ঞা	|	সা	রণ্া	-া
সু	র্	ভ		রে	দা	ও		কি	স	ন্		ধা	নে	-
সা	ণ্সা	জ্ঞমা	|	পা	র্সা	র্সা	|	র্সর্রা	র্সনা	র্সা	|	ণধা	ণা	পা
বা	জে	-		-	সে	যে		গ	ভী	র		তা	-	নে
মপা	জ্ঞমা	জ্ঞা	|	রসা	রণ্া	সা	|	মা	-া	জ্ঞমা	|	জ্ঞা	-া	-া
কেউ	-	তা		-	শো	নে		না	-	-		-	-	-
উ	পে	-		-	ক্ষা	তে		ভ	গ	ন		বু	কে	-
অ	-	-শ্		রু	ঝ	রে		গো	প	ন্		দু	খে	-
তু	মি	-		ছা	ড়া	-		বু	-	কে		ধ	রে	-
কেউ	-	ত		-	রা	খে		না	-	-		-	-	- II

এই কলির স্বরলিপি ৩য় কলির ন্যায়।

শূন্যতার প্রেম

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

— এক —

জীবনটা যতদিন "কলেজী-গন্ধে" ভরপূর থাকে, ততদিন বাঙালী ছাত্রদের চোখের সাম্নে যা বিরাজ করে, তা কল্কাতার ঐ লালদীঘির চারিপাশকার সরকারি ও বেসরকারি আপিস-বাড়ীগুলোর রৌদ্রতপ্ত দৃশ্য নয়।

তাদের চোখ যে-আকাশে এবং মন যে-কুঞ্জবনেই বিচরণ করুক, কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পাগুলো কিন্তু প্রতিদিন ঐ আপিস-পাড়ার ভিতরেই বিচরণ করতে বাধ্য হয়! এ যেন আমাদের জাতিগত সংস্কার!

এবং এ সংস্কারের মহিমায় আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা আর এত-যত্নে মুখস্থ করা শেলী-বাইরণ-সেক্সপিয়ার সমস্তই তলিয়ে যায় এক মৌন হাহাকারের মধ্যে এবং কাণে ও প্রাণে জেগে থাকে সুধু ভার্য্যার অভিমান, পুত্র-কন্যার কলরব, মুদী ও গয়লার ফর্দ্দ এবং ডাক্তারের বিল ইত্যাদি—সংসারীর কাছে যার কোনটাই লোভনীয় নয়!

কিন্তু এই সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি এখনো যুদ্ধ করছি!

কলেজের কাছ থেকে শেষ-বিদায় নিয়ে এক সুদূর পল্লীগ্রামের নির্জ্জন প্রান্তে এসে বাসা বেঁধেছি—কুহু-মুখরিত, ফুল-সুবাসিত, মর্ম্মর-পুলকিত প্রকৃতির মধ্যে, নদীর ধারে ঘাস-বিছানায় ব'সে কবিতার পর কবিতা লেখবার জন্যে নয়,—আমি এসেছি এখানে কাঠফাটা দুপুর রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে চাষবাস করবার জন্যে! আত্মীয়দের কাছে আমি তাই "এম-এ পাস-করা মূর্খ" ব'লে বিখ্যাত হয়েছি!

"পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যা" আমার গৃহের দ্বারে এসে পৌঁছায় নি এবং না-পৌঁছাবার আসল কারণ হচ্ছে, আমি এখনো বিবাহ করি নি।

একলাই থাকতুম। কিন্তু কিছুদিন থেকে প্রেমলাল এসে আমার সঙ্গে বাস করছে। সে আমার শৈশববন্ধু।

তার এই প্রেমলাল নাম যিনি রেখেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ভাববাদী। নামের এমন সার্থকতা দেখা যায় না।

তার মতন প্রকাণ্ড প্রেমিক আমি আর কখনো দেখি নি এবং তার প্রেমের ইতিহাস যেমন অপূর্ব্ব, তেমনি বিচিত্র!

তার প্রথম প্রেমের তারিখ কত, তা জানি না। তবে তার মুখেই শুনেছি, সে নাকি দশ বৎসর বয়সে প্রেমে নিরাশ হয়ে একবার চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। এ উক্তির মধ্যে হয়তো অতিরঞ্জন আছে।

ভগবান তাকে চেহারা দিয়েছিলেন। সুঠাম, বলিষ্ঠ গঠন, টকটকে রং। কিন্তু সব-চেয়ে সুন্দর হচ্ছে তার চোখের ভাব,—যা দেখলে অত্যন্ত-অসাড় প্রাণও চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য যে, আমি নারী নই। কিন্তু এতদিনের পরিচয়ের পরেও, আমিও যখনি প্রেমলালের চোখের দিকে তাকাই তখনি এক নূতন মধুর ভাবের সন্ধান পাই। তার চোখ দেখলে তাকে ভালো না বাসা অসম্ভব!

সে আবার কবিতা লিখত এবং বাংলা দেশের একজন ভালো কবি ব'লে পরিচিত ছিল। প্রেম থেকে কাব্যের জন্ম, না, কাব্য থেকে প্রেমের উৎপত্তি? আমি বলতে পারি না। তবে সে বলত, কবিতাই নাকি প্রেমকে তার কাছে সুলভ ক'রে তুলেছিল। এ কথার অর্থ যে কি, মহা-প্রেমিক প্রেমলালই তা জানে। আমি খালি এইটুকুই জানি যে, কবিত্বের জন্যে বাংলার অনেক নব্য-পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করবার সুযোগ লাভ করেছিল।

কিন্তু তার কোন প্রেমই স্থায়ী হ'ত না। সে যে কত হৃদয় শ্মশানে পরিণত করেছিল, তার সঠিক ইতিহাস আছে একমাত্র ভগবানের কাছেই! তার এই নির্দ্দয়তা ক্ষমার অযোগ্য। আমি মাঝে মাঝে তাকে বলতুম, "প্রেমলাল, তোমার এই হত্যার ব্যবসা আর কতদিন চালাবে? এইবারে তুমি বিবাহ কর!"

প্রেমলাল হো হো ক'রে হেসে উঠে বলত, "বিবাহ? সে আর এ জীবনে নয়! বন্ধু, আমি খালি প্রেমচর্চ্চা ক'রেই এবারকার মত জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই!"

—"কিন্তু তোমার এই নিত্য-নূতনের পিছনে ছুটাছুটি, একেই কি তুমি প্রেম বলতে চাও?"

—"নিশ্চয়! প্রেম যে চিরচঞ্চল—একঘেয়ে স্থায়িত্বের ভিতরে প্রেম কখনো বাঁচতে পারে না—প্রেম চায় বিচিত্রকে!"

—"না প্রেমলাল, এ প্রেম নয়, এ হচ্ছে কাম, এ হচ্ছে পশুত্ব!"

—"না বন্ধু, একেই আমি প্রেম বলি! ফুল আজ ফোটে, কাল ঝ'রে যায়—মানুষের মনের পটে একটি রাতের জন্যে সুগন্ধ রঙের তুলি বুলিয়ে। অস্থায়ী ব'লেই তার আদর এত বেশী! প্রেমের জীবনও যে ফুলের মত! অল্প-সময়ের মধ্যেই সে সার্থক হয়ে ওঠে, ক্ষণিকতার মধ্যেই তার নিবিড়তা আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি, তার পরেই তার গৌরবময় অবসান—প্রাণের ভিতরে সে রেখে যায় সুধু স্মৃতিটুকু—যে স্মৃতির মধ্যে এতটুকু মলিনতা নেই—যা চিরস্মরণীয়!"

তার সেই বিকৃত মনের যুক্তিহীন বিশ্বাস অনেক চেষ্টাতেও আমি টলাতে পারি নি।

কিন্তু প্রেমের এতখানি স্বাধীনতা সমাজ বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। প্রেমলালকেও হঠাৎ একদিন বিপদে পড়তে হ'ল! বিপদটা যে কি, তা আমি ভালো ক'রে শুনিনি, তবে আচম্বিতে সহর ছেড়ে একদিন সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল এবং আমাকে জানালে যে এখন কিছুদিন সে এইখানেই অটল ভাবে অবস্থান করবে! তার কথাবার্ত্তা শুনে বেশ বুঝলুম, কলকাতা সহর এখন প্রেমলালের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠেছে, আপাতত কিছুকাল তাকে বাধ্য হয়েই অজ্ঞাতবাস করতে হবে।

যতই তার দোষ থাক, অনেকদিনের বন্ধু ব'লে তাকে আমি ভালোবাসি। কাজেই আমার এই সঙ্গীহীন প্রবাসে তাকে পেয়ে আমি খুবই খুসি হয়ে উঠলুম।

কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি যে, প্রেমলালকে নিয়তিই এখানে টেনে এনেছে!

—দুই—

প্রেমলাল সেদিন আমাকে বললে, "দেখ প্রমোদ, তোমার এখানটি আমার বড় ভালো লাগচে! ধূলো নেই, জনতা নেই, গোলমাল নেই—চারিদিকে খালি সবুজ আর সবুজ রং!"

আমি হাসতে হাসতে বললুম, "কিন্তু তোমার প্রেমে পড়বার উপযোগী প্রেমিকার অভাবও এখানে অত্যন্ত!"

—"হ্যাঁ, তাই জেনেই তো এত দেশ থাকতে আমি তোমার এখানেই এসেচি! এমন কি, তুমি যদি বিবাহ করতে, আর এখানে তোমার স্ত্রী থাকতেন, তাহ'লে আজ আমি তোমারও আশ্রয় গ্রহণ করতুম না!"

—"কেন, আমার স্ত্রী থাক্‌লে তুমি কি তাঁরও প্রেমে পড়তে?"

—"তা জানি না। তবে প্রেমে না-পড়বার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতুম বটে!"—প্রেমলাল খানিকক্ষণ নীরবে সিগারেট টানতে লাগল, তারপর তিক্তস্বরে বল্‌লে, "এই নারীজাতির উপরে ক্রমেই আমার ঘৃণা ধ'রে যাচ্চে! ·· ··· তারা প্রেমকে জানেনা, জানে খালি বিবাহকে!"

—"কিন্তু সে বেচারীদের আর অপরাধ কি? পুরুষ সমাজের মধ্যে ব'সে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ না ক'রেও প্রেম-সাধনা করতে পারে, কিন্তু বিবাহহীন প্রেম যে নারীজাতির পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক!"

আমার কথায় কর্ণপাত না ক'রে প্রেমলাল বললে, "আমি আর নারীর ছায়াও মাড়াতে চাই না! তোমার এখানে নারী নেই, তাই আমি এসেচি!"—এই ব'লে সে উঠে গেল।

আমি মনে মনে প্রার্থনা করলুম, নারীর প্রতি এই বিতৃষ্ণার ভাবটা প্রেমলালের মনে যেন স্থায়ী হয়!

প্রথম মাসটা প্রেমলাল আমার বাংলোর হাতার ভিতরেই ব'সে ব'সে কাটিয়ে দিলে,—আমি অনুরোধ করলেও বাইরে যেতে রাজি হ'ত না।

সারাটা দিন বারান্দার উপরে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চুপ ক'রে সে প'ড়ে থাকত—মানুষ যে এমনভাবে দিন কাটাতে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। আলস্যকে সে যেন একটা 'ফাইন আর্টে' পরিণত ক'রেছিল

কিন্তু পাছে জড়ের মতন থেকে থেকে প্রেমলাল কোন শক্ত অসুখে পড়ে, সেই ভয়ে শেষটা আমি তাকে প্রত্যহ বৈকালে বেড়াতে যেতে বাধ্য করলুম।

আমার বাংলোখানি ছিল একেবারে গ্রামের একপ্রান্তে। প্রেমলাল প্রত্যহ বৈকালে বেড়াতে যেতে সুরু করলে বটে, কিন্তু গ্রামের ভিতরে কোনদিন যেত না। প্রতিদিন সে নদীর ধারে, মাঠে মাঠে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে আবার সন্ধ্যার মুখে বাংলোয় ফিরে আস্‌ত।

ক্রমে এই বেড়ানোর নেশা তাকে যেন একেবারে পেয়ে বস্‌ল! তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, কোন কোন দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে তবে সে বাংলোয় ফিরে আসতে লাগল! আগেকার মত এখনো সে গ্রামের ভিতরে যায় না, অথচ এত রাত পর্য্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরে কি আনন্দ সে পায়? জিজ্ঞাসা করলেও কিছুই বল্‌ত না, হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দিত।

এক এক দিন মনে হয়, সে যেন আমাকে কিছু বলতে চায়! অথচ কি যে বলতে চায়, কোনদিনই তা প্রকাশ পায় না। আমি আরো লক্ষ্য করলুম, এখানে সে যে বিমর্ষ ভাবটা নিয়ে এসেছিল, এখন আর তার সে ভাবটা মোটেই নেই। তার মুখ সর্ব্বদাই হাসিখুসিতে ভরা থাকে এবং আজকাল প্রায়ই সে নিজের মনে গান গায় ও কবিতা রচনা করে,—এতদিন যা করে নি!

—তিন—

প্রেমলালের ভাবান্তরের কারণ হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেলে।

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। প্রেমলালের শরীরটা কিছু অসুস্থ ছিল ব'লে সেদিন আমি আর তাকে বেড়াতে যেতে দিই নি।

বারান্দার উপরে দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে আছি। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না নীরবে পৃথিবীর বুকের উপরে ঝ'রে পড়ছে এবং চোখের সাম্‌নে দূর্ব্বা-সবুজ বাগান ও গাছের পর গাছের সারি জ্যোৎস্নার মায়া রঙের লীলায় অপূর্ব্ব-নূতন সৌন্দর্য্যে চমৎকার হয়ে উঠেছে! হাস্নাহানার বেড়া ছুঁয়ে সুগন্ধ বাতাস আমাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত ক'রে বহে যাচ্ছিল এবং কোথায় কোন্ গোপনে ব'সে কোকিল-পাপিয়া

সঙ্গীতের ঝঙ্কারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, আমরা নীরবে ব'সে ব'সে তাই শুনছিলুম।

প্রেমলাল যে কি ভাবছে তা সেইই জানে! আমি দুই একবার কথা কইবার চেষ্টা করলুম, সে কোন জবাব দিলে না। একবার তার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে সেই সুদূর মাঠের উপরে—জ্যোৎস্না যেখানে ঘুমন্ত।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, একবার বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত ঘুরে এসে আবার আমার সামনে ব'সে পড়ল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, "আচ্ছা প্রমোদ, তুমি বিবাহ কর না কেন?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে আমি একটু বিস্মিত হলুম। তার মুখের পানে তাকিয়ে বললুম, "তোমার মুখে আজ এ প্রশ্ন কেন প্রেমলাল? তুমিও তো বিবাহ কর নি!"

—"তা করি নি বটে!"—এই ব'লে সে আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু এইবারে আমি বিবাহ করব!"

মহা-বিস্ময়ে ইজি-চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে ব'সে আমি বললুম, "বল কি প্রেমলাল! তুমি কি সত্যি বলচ?"

প্রেমলাল চেয়ারখানা আমার আর একটু কাছে টেনে এনে গাঢ়স্বরে বললে, "হ্যাঁ প্রমোদ, তোমার কাছে আর লুকানো চলে না! সত্যিই আমি বিবাহ করব।"

—"তোমার সুমতি হয়েচে দেখে খুসি হলুম। কিন্তু কাকে তুমি বিবাহ করবে? কার মেয়ে সে?"

—"কার মেয়ে? আমি তো তা জানি না, কোনদিন তাকে জিজ্ঞাসাও করি নি! সে আমাকে ভালোবাসে, আমি তাকে ভালোবাসি,—আর কিছু আমি জানি না, জানতেও চাই না!"

—"প্রেমলাল, তুমি কি পাগল হয়েচ? এ-সব কি তুমি বল্‌চ? কে তোমাকে ভালোবাসে, কাকে তুমি ভালোবাসো? তাকে তুমি কোথায় দেখেচ?"

—"নদীর ওপারে—ঐ মাঠ পেরিয়ে রোজ আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, সে রোজ আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে!"

—"ঐ মাঠ পেরিয়ে?……ওদিকে তো কোন গ্রাম নেই, কারুর ঘর-বাড়ী নেই!"

—"সেইজন্যেই তো ঐখানে রোজ সন্ধ্যায় সে লুকিয়ে এসে অপেক্ষা করে, আমাদের আলাপে কেউ বাধা দিতে পারে না! প্রমোদ, তুমি জানো না, কি আশ্চর্য্য তার রূপ! তাকেই আমি পাব ব'লে বোধ হয় এতদিন আমার বিবাহ হয় নি!"

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। গ্রামের সকলকেই আমি জানি। কিন্তু এখানে এমন কোন সুন্দরী কন্যাকে আমি জানি না, যার জন্যে প্রেমলাল এতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে! আর, কোন কুমারী কন্যা নদী মাঠ পেরিয়ে একলা এক দুর্গম স্থানে গিয়ে প্রেমলালের সঙ্গে রোজ রাত্রে দেখা করবে, এও কি কখনো সম্ভব?

প্রেমলাল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে বললে, "তুমি আমাকে ধ'রে রেখেচ প্রমোদ, কিন্তু আজও সে আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার প্রাণ আমাকে ডাক্‌চে, আমি আর থাক্‌তে পারচি না—আমি আর থাক্‌তে পারচি না"—বলতে বলতে সে দ্রুতপদে বাগানের ভিতরে নেমে গেল, আমি তাকে বাধা দেবারও সময় পেলুম না!

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, ঘরের ভিতরে গিয়ে আমি আমার বন্দুকটা তুলে নিলুম, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি, প্রেমলাল বাগানের ফটক পার হয়ে গেছে!

আমিও তাকে অনুসরণ করলুম—কৌতূহলে আমার প্রাণ মন তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল!

—চার—

প্রেমলাল একবারও পিছন ফিরে চাইলে না, কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দ্রুতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হ'ল। তার ভাব দেখলে সন্দেহ হয়, সে যেন 'নিশির ডাক্' শুনে এগিয়ে চলেছে!

সাঁকো পার হ'য়ে সে নদীর ওপারে গিয়ে পড়ল। তারপর মাঠের ধার ধ'রে চলতে লাগ্‌ল।

ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলোয় চারিদিক ধব্‌ধব্‌ করছে। ধূ-ধূ মাঠে আমরা ছাড়া জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। বিজনতায় প্রাণ যেখানে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, প্রেমলাল সেখানে কোন্ প্রেমিকার সাক্ষাৎ পেলে? কে এই সাহসিকা?

প্রেমলাল হঠাৎ মাঠ ছেড়ে বনের পথ ধরলে। দুপাশে বড় বড় গাছ, হাওয়ায় দুলতে দুলতে আলো-পটে যেন ছায়া-তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে!

এ পথের নাম নীলকুঠির পথ। কবে কোন্ নীলকর সাহেবের আমলে এ পথে লোক চল্‌ত, কিন্তু এখন আর এদিক কেউ মাড়ায় না,—এখানে নাকি ভূতের ভয় আছে!

ভূত থাক্ আর নাইই থাক্, আমার কিন্তু এইবারে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল! কোথায় যাচ্ছি আমরা? প্রেমলালের মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? ভাবলুম—আর নয়, তাকে ডাকি! কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল—এতদূর যখন এসেছি তখন শেষ-পর্য্যন্ত দেখাই যাক্!

আরো খানিক অগ্রসর হয়েই পুরাণো নীলকুঠি দেখা গেল। একখানা বড় বাংলো, এখন তার আগাগোড়াই ভাঙাচোরা। আগে বাংলোর চারিদিক ঘিরে সাজানো বাগান ছিল, এখন সেখানে বিরাজ করছে কেবল কাঁটা-ঝোঁপ আর বুনো গাছপালা। স্থানে স্থানে জঙ্গল এত ঘন যে, পূর্ণিমার আলোও তার ভিতরে ঢুকবার পথ পায় নি।

দিনের বেলাতেই এখানে আসতে বুক ছম্-ছম্ করে! এবং এত রাত্রে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের ভিতরে এখানে আমরা ছাড়া নিশ্চয়ই আর কোন মানুষ আস্‌তে সাহস করে নি! আমার বার বার মনে হ'তে লাগল, আমি যেন পৃথিবীর বাইরে এসে পড়েছি!

প্রেমলাল কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রেই নীলকুঠির সেই ধ্বংসাবশেষের ভিতর প্রবেশ করল! পাছে সে আমাকে দেখে ফেলে তাই আমি বাইরেই একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ প্রেমলালের গলা পেলুম। কার সঙ্গে সে কথা কইচে! বলচে—"আজ আসতে বড় রাত হয়ে গেল,—রাগ কোরোনা, লক্ষীটি!"

উঁকি মেরে দেখলুম, একটা পেয়ারাগাছের তলায় প্রেমলাল দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কার সঙ্গে সে কথা কইছে? তার পাশে তো কেউ নেই! এ কী ব্যাপার?

প্রেমলাল কিন্তু সমান কথা কয়ে যেতে লাগল—"আচ্ছা নীরো, রোজ তুমি এই বসন্তী-রঙের কাপড়খানা পরে আসো কেন?..... না, না, আমি তা বলচি না, বসন্তী-রঙের কাপড়ে তোমাকে বেশ মানায়, তবে রোজই এক কাপড় পরো, তাই জিজ্ঞাসা করচি!

...কী সুন্দর তোমার চুলগুলি, একেবারে হাঁটুর নীচে এসে পড়েচে! এত চুল আমি আর কোন মেয়ের দেখি-নি! দেখ নীরো, তোমার গয়নাগুলো বড় সেকেলে, এখনকার মেয়েরা ও-রকম গয়না আর পরে না! আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তোমাকে কিন্তু ও-গয়নাগুলো ছাড়তে হবে! কি বল্‌চ? কবে বিয়ে হবে? যেদিন হুকুম কর!"

প্রেমলাল একলাই কথা কইচে,—আমি তার কাছে আর কারুকেই দেখতে পেলুম না—আর কারুর গলাও আমি শুনতে পেলুম না!

তার পাশে যদি তখন একটা জীবন্ত কঙ্কাল তার সমস্ত অমানুষিকতা নিয়ে এসে দাঁড়াত, তাহ'লেও আমি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হতুম! কিন্তু এ কী অভাব্য ব্যাপার—প্রেমলাল কথা কইছে এক শূন্যতার সঙ্গে! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল, হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, প্রাণ যেন হৃদয়ের ভিতরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল! সেই শূন্যতা গুটি গুটি এগিয়ে এসে ক্রমেই যেন আমার বুকের উপরে চেপে বসল,—নিঝুম রাত্রির অন্তরে ঝিল্লীর দীর্ণ কণ্ঠে যেন সেই অলক্ষ্য শূন্যতারই স্বর অশ্রান্ত তালে বেজে উঠছে,—তার কালো চোখের ছায়া লেগে চারিপাশের অরণ্য যেন ক্রমেই বেশী বিভীষিকায় ভ'রে আসছে,—আতঙ্কে আমি তখনি হয় তো চেঁচিয়ে উঠতুম, কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম!

পেয়ারাগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একটা পাণ্ডুর চন্দ্রকরলেখা নীচে নেমে এসেছে, প্রেমলাল হঠাৎ দুইহাত বাড়িয়ে যেন সেই আলোক-রেখাকেই আলিঙ্গন করলে! তার চুম্বনের শব্দও আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম—অশরীরীর অদৃশ্য ওষ্ঠে দেহীর রক্ত মাংসের তপ্ত চুম্বন!............উঃ! আর সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলুম না—দ্রুতপদে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম!

—পাঁচ—

মুখুয্যে-মশাই ছিলেন গাঁয়ের মধ্যে সব-চেয়ে বৃদ্ধ ও মাতব্বর ব্যক্তি। প্রতিদিন তিনি আমার বাংলোয় একবার ক'রে বেড়াতে আসতেন। পরদিন তিনি

যখন এলেন, তাঁর কাছে কথায় কথায় নীলকুঠির কথা তুললুম।

মুখুয্যে-মশাই বললেন, "ও নীলকুঠি হচ্চে ডিক্সন সায়েবের। তিনি আমার বাবার আমলের লোক।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তা অত-বড় নীলকুঠি অমন পোড়ো বাড়ীর মতন নষ্ট হয়ে যাচ্চে কেন ও জমির কি মালিক কেউ নেই ?"

—"না। বাবার মুখে শুনেচি, ডিক্সন-সায়েবের একটি রক্ষিতা ছিল, বাঙালীরই মেয়ে। সায়েব মারা যাবার সময়ে নীলকুঠিখানা তাঁর সেই রক্ষিতাকেই দান ক'রে যান।"

—"তারপর ?"

—"সেই স্ত্রীলোকটার নাম ছিল নীরদবাসিনী, লোকে তাকে নীরো ব'লে ডাকত। শুনেচি নীরো নাকি ভারি রূপসী ছিল, আর সব-চেয়ে সুন্দর ছিল তার চুল—মাথা থেকে নাকি পায়ের কাছ পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়ত! তার আর একটা অভ্যাস ছিল—রোজ বৈকালে একখানা বসন্তী-রঙের কাপড় প'রে নীলকুঠির বাগানে সে বেড়িয়ে বেড়াত। সে সময়ে যে তাকে দেখত সেইই তার প্রেমে পড়ত। তাকে নিয়ে শেষটা গাঁয়ের ছোক্‌রা-মহলে রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি হ'ল। তারপর একদিন দেখা গেল, বাগানের ভিতরেই নীরোর মৃতদেহ প'ড়ে আছে!"

—"মৃতদেহ ?"

—"হ্যাঁ, বোধ হয় কোন হতাশ প্রেমিক তাকে হত্যা করেছিল! তারপর থেকে ঐ নীলকুঠিতে আর কেউ থাকতে ভরসা করে নি।"

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল!

—ছয়—

আমার বিশ্বাস, প্রেমলাল সত্যসত্যই পাগল হয়ে গেছে—যদিও তার সাধারণ ব্যবহারে এখনো এ পাগলামীটা ধরা পড়ে নি! গ্রামের কোন লোকের কাছে নিশ্চয় সে নীলকুঠির গল্প শুনেছে এবং সেই গল্পই তার বিকৃত মস্তিষ্ককে উত্তেজিত-ক'রে তুলেছে!

কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে আমি হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে পারলুম না।

জন-কয়েক লোক সংগ্রহ ক'রে দিনের বেলায় আমি আবার নীলকুঠিতে গিয়ে হাজির হলুম। তারপর বাগানের জঙ্গলে আর ভাঙা বাংলোয় আগুন ধরিয়ে দিলুম!

হু-হু ক'রে আগুন জ্বলতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ে এসে লাগল যেন এক অমূর্ত্ত আত্মার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস! অগ্নি-শিখার শব্দ শুনে আমার মনে হ'ল, যেন কোন অতৃপ্ত বাসনা-ভরা আহত প্রাণ আর্ত্ত স্বরে কেঁদে কেঁদে উঠছে। অনুতপ্ত হত্যাকারীর মত সেখান থেকে আমি চ'লে এলুম!

প্রেমলালকে আমি কোন কথা জানালুম না।

বৈকালে যথাসময়ে সে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। তার অপেক্ষায় আমি বারান্দায় ব'সে রইলুম।

অনেক রাত্রে মড়ার মত হলদে মুখে, মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সে ফিরে এল। তার মুখে-চোখে কি এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও বিভীষিকার ভাব ফুটে উঠেছে! তাকে দেখে আমার বুকের ভিতরটা অজানা ভয়ে ছাঁৎ ছাৎ করতে লাগল!

আমার দিকে একটা তীব্র আগুন-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সে তার নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সে তীব্র দৃষ্টির অর্থ কিছুই বুঝলাম না এবং নীলকুঠিতে গিয়ে সে আজ আবার কি দেখেছে, তাও আমি জানতে পারলুম না।

—আর কখনো জানতেও পারি নি। কারণ পরদিন সকালে উঠে দেখি, প্রেমলাল আমাকে না জানিয়েই চ'লে গেছে!

আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি—সে জীবিত কি মৃত তাও আমি জানি না।

বিশ্বসাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা যাঁরা মন দিয়ে প'ড়েছেন, তাঁদের এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বার্নাডশ'র এই নাটকখানিকে যাঁরা দুর্নীতিমূলক বলে এতদিন বর্জ্জন করে রেখেছিলেন, তাঁরা এই মনীষী নাট্যকারের প্রতি ঘোর অবিচার করেছিলেন। রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে রেখে তাঁরা দীর্ঘকাল জনসাধারণকে অনেক নূতন সত্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

যাঁরা এই বিখ্যাত নাটকখানি পড়বার সুযোগ পান নি, তাঁদের বোঝাবার জন্য আমি "শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশার" প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমার এই প্রবন্ধে অনুবাদ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, এই নাটকখানিকে হয়ত' দুর্নীতিমূলক বলা চলতে পারতো, যদি নাট্যকার শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশাটাই শেষ পর্য্যন্ত সমর্থন করে যেতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি তাঁর এই নাটকে শুধু দেখিয়েছেন যে, নারী কেন তার সামাজিক মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে—তার পাপ পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল শিক্ষা দীক্ষাই অবহেলা করে—এই কুপথে আসতে বাধ্য হয়?—এর আসল প্রলোভনটুকু কোথায় এবং কারা এজন্য দায়ী?

অবস্থার বিপাকে প'ড়ে, দারিদ্র্যজনিত অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে উৎপীড়িত হ'য়ে যারা নিরুপায়ের মতো এ পথে পা' দেয়, শ' তাদের মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু শ্রীমতী ওয়ারেণের মতো যারা সৎপথে আসবার সুযোগ পাওয়া সত্বেও, কাঞ্চনের প্রলোভনে এটাকে তাদের 'পেশা' ক'রে তোলে—শ'র মতে তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাই ভাইভী শেষ পর্য্যন্ত তার জননীকে ত্যাগ করতে আর একটুও দ্বিধা বোধ করলে না! শুধু—জননীকে ত্যাগ করা নয়, তাঁর পাপ পথে অর্জ্জিত বিপুল ধনসম্পত্তির প্রলোভনও সে হেলায় পরিহার করলে! এইখানেই "শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা"কে বার্নাড্‌শ' সবচেয়ে বড় আঘাত করেছেন। এ সত্বেও যদি কেউ এ নাটকখানিকে দুর্নীতিমূলক বলবার স্পর্দ্ধা করেন, তাহ'লে বলতে হবে যে, হয় তিনি রুচিবায়ুগ্রস্ত;—নয় সুনীতি কা'কে বলে সে সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞানের অভাব! এই রকম বিকৃত মনোবৃত্তি ও অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ কাল এদেশে অনেক সমালোচকই সাহিত্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে নেমেছেন! যা কুৎসিত, যা কদর্য্য, যা নোংরা তা চিরদিনই আবর্জ্জনা হয়ে থাকবে, সাহিত্যের আসরে কোনও দিনই তার স্থান হবে না—এই অতি সাধারণ কথাটুকু বলবার জন্যে তাঁরা সারা শহরের নোংরা বোঝাই যে ময়লা-ফেলা গাড়ীখানা আমাদের দোরের সামনে এনে হাজির করেন, তা গলির একপাশের ছোট্ট একটু 'ডাষ্ট্‌বীনের' চেয়ে ঢের বেশী অসহ ও অস্বাস্থ্যকর!

'শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশার' আসল প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু যে সামাজিক নীতি-তত্ত্বেরই একটা মস্তবড় কথা, এ বোধ হয় কাউকে আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তবে সে কথা বলতে গিয়ে এই গম্ভীর জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লেখক ঠিক সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতোই মানব-জীবন, মানব-সমাজ ও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আরও যে সব নব নব তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন, সেগুলিও আমাদের বেশ ভাল করে ভাববার, বোঝবার এবং চিন্তা ক'রে দেখবার বিষয়।

প্রতি দিনের প্রচলিত ও যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত যে সকল ব্যাপার জগতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে, সেইগুলিকে নূতন নূতন দৃষ্টি নিয়ে নব নব দিক থেকে দেখবার ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা করবার—যে শক্তি, সাধনা ও প্রতিভা—সেইটেই হ'চ্ছে বার্ণাড্‌শ'র প্রধান সম্পদ ও বিশেষত্ব! তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীর আলাপ (Dialogue) এমন বিচিত্র—এমন সরস—এমন সজীব ও সতেজ—এমন নূতন ও বিস্ময়কর—যে তা' পাঠক ও শ্রোতা উভয়েরই অন্তর স্পর্শ ক'রে তাদের মনকে বেশ একটু নাড়া দেয়! তাই তাঁর নাটকের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিতন্ত্র, দর্শন,

মনস্তত্ত্ব ও যৌন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু গুরুতর, কঠোর ও নীরস বিষয়ের অবতারণা থাকলেও তার আগাগোড়াই প্রবল চিত্তাকর্ষক! কোথাও এতটুকু 'একঘেয়ে' মনে হয় না বা ক্লান্তি বোধ হয় না।

তবু, আমি যে আজ এইখানেই বার্ণাড্‌শ'র প্রসঙ্গ শেষ করছি তার দু'টি কারণ আছে। প্রথমতঃ—শ'র রচনা কারুর একঘেয়ে বোধ না হ'লেও তাঁর সম্বন্ধে আমার এই সুদীর্ঘ আলোচনা হয়ত অনেকের কাছেই একঘেয়ে লাগছে! দ্বিতীয়তঃ—'মানব ও অতিমানব' (Man and Superman) প্রভৃতি শ'র আরও যে দু' একখানি নাটকের একটু বিশেষ পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল, তা আর হবার উপায় নাই; কারণ তাঁর পুস্তক প্রকাশকদের ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিরা আমাকে পত্র লিখে এ বিষয়ে তাঁদের অসম্মতি জানিয়েছেন। সুতরাং বার্ণাড্‌শ' প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ ক'রে এবার আমি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের বিষয় কিছু আলোচনা করবো। এঁর নাম ইংরাজী শিক্ষিতগণের অবিদিত নয়। ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত 'জন গালসোয়ার্দ্দি' (John Galsworthy)। ঔপন্যাসিক হিসাবে যতটা না হোক নাট্যকার ব'লে এঁর খ্যাতি আজ একেবারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে সারে্য প্রদেশের কুম্বে সহরে এঁর জন্ম হয়েছিল। 'হ্যারো' এবং 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষা সমাপ্ত করে, ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আদালতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু আইন ব্যবসা তিনি খুব অল্পই করেছিলেন। সর্ব্বদা লেখা-পড়া করা এবং দেশে-দেশে বেড়ানো—এই ছিল এক সময়ে তাঁর প্রধান সখ। আমেরিকা, ইজিপ্ট, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজী দ্বীপ প্রভৃতি পৃথিবীর নানা প্রদেশ তিনি প্রদক্ষিণ ক'রে গেছেন; অথচ তাঁর উপন্যাস কিম্বা নাটকে এ সব ভ্রমণ-কাহিনীর কোনও পরিচয়ই নেই! গালসোয়ার্দ্দি যা কিছু লিখেছেন, তার অধিকাংশই ঘটেছে ইংলণ্ডের মধ্যে। ইংলণ্ডের বাইরে তিনি নিজে অনেকবার গেলেও তাঁর নাটক বা উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা কেউ কখন যায় না। যদি কেউ কখন যায় তো, বড় জোর আস্ট্রিয়া পর্য্যন্ত!

তিনি 'সারের' লোক হ'লেও প্রকৃত পক্ষে ডেভন্‌শায়ারের অধিবাসী। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেও তাই ডেভন্‌শায়ারের কথাই পাওয়া যায় খুব বেশী। গালসোয়ার্দ্দিকে ঠিক জড়-প্রকৃতি বা প্রদেশ-ভূমির পূজারীও বলা চলে না। তাঁর অতুলনীয় কথা ও নাট্যের ভিতর মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যটুকুই যেন ওতঃপ্রোত হ'য়ে আছে! স্থানীয় ব্যাপারগুলো তার কাছে অতি তুচ্ছ! তাঁর গ্রন্থের পাত্র পাত্রীর আশেপাশে যে আবহাওয়া তিনি সৃষ্টি করে চলেন তা কোনও বিশেষ স্থানের বা বিশেষ কালেরই বিশেষত্ব নয়;—বরং ঘটনা হিসাবে তা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজনের বলা যেতে পারে। দেহের চেয়ে মনের তত্ত্বই তাঁর গ্রন্থের মূল।

আধুনিক সাহিত্যে গালসোয়ার্দ্দি যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন সে কেবল তাঁর নাট্যাবলীর গুণে। সমালোচকেরা ঔপন্যাসিক হিসাবে বিচার করবার সময়—হয়ত তাঁকে কোনও কোনও বইয়ের কোথাও কোথাও একটু আধটু দমিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু অতি বড় নিন্দক সমালোচকও নাট্যকার হিসাবে বিচার করতে বসলে তাঁর প্রতিভার কাছে মাথা নত না ক'রে পারে না! তাঁর রচনা-ভঙ্গী বিশেষ রূপে নাটকেরই উপযোগী। তবে তাঁর অধিকাংশ নাটকই একটা না একটা কিছু নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যমূলক বলে আর্ট অনেক স্থলে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে, কিন্তু সে দোষ সম্ভবতঃ সু-অভিনয়ের গুণে ঢাকা পড়ে যায়। নীতি বা উদ্দেশ্যের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য থাকায় তাঁর নাটকে অনেক সময় human interest অর্থাৎ সার্ব্বজনীন ভাবের যেটুকু অভাব ঘটে, অভিনয়ের উৎকর্ষে তাও বোধ হয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবার অবকাশ পায় না!

গালসোয়ার্দ্দিকে সেই জন্য ঠিক জনসাধারণের 'প্রিয়' অথবা কেবলমাত্র সাহিত্য-রসিকদের অন্তরঙ্গ নাট্যকার বলা চলে না। তিনি এ দুয়ের মাঝা-মাঝি হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর নাটকগুলিও কেবলমাত্র সু-শিক্ষা বা শুধুই কেবল নিছক আমোদের জন্য রচিত নয়। তাঁর লেখনীও এ দু'য়ের মধ্য-পথটি বেছে নিয়েছে! বার্ণাড্‌শ' বা বার্কারের (Barker) মতো তিনি যেমন রঙ্গমঞ্চ থেকেই প্রচারক বা সংস্কারক হ'য়ে উঠবার চেষ্টা করেননি তেমনি ডেভিজ্ (H. H. Davies) বা ম্যঘামের (Somerset Maugham) মতো একেবারে নিতান্ত লঘু-চিত্তের স্ফূর্ত্তিদায়ক নাটিকাই রচনা করেন নি। মেজফিল্ডের (Masefield) মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দুরন্ত সাহস না থাকলেও তাঁর রচনা যে হাউটনের (Houghton) চেয়ে

অনেক বেশী মার্জ্জিত, উন্নত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

বাস্তবিকই নাট্যকার হিসাবে তাঁর নানা গুণের মধ্যে যদিও প্রধান হ'চ্ছে তাঁর রচনার গঠন-পারিপাট্য ও শিল্প-চাতুর্য্য,—তবু পিনেরো (Pinero) বা জোনসের (H. A. Jones) ধারা, এদের নাট্য রচনার প্রসিদ্ধ রীতি ও পদ্ধতির তিনি কোথাও অনুসরণ করেন নি!

গাল্‌সোয়ার্দ্দি তাঁর কি নাটকে—কি নভেলে—দুইয়েতেই দেখতে পাই, ঘটনা-বৈচিত্র্য ও ঘটনা-সমাবেশ নিয়েই খেলা করতে ভালবাসেন। আমাদের মনে হয়, এ জিনিস নভেলের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর; কারণ, এদিকে বেশী লক্ষ্য থাকলে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির দিকে দৃষ্টি থাকে না। উপন্যাস যদি একটা সোজা বা বাঁকা পথ ধ'রে কোনও সহজ পরিণতির দিকে এগিয়ে না চলে, তাহলে জিনিসটা পাঠকদের কাছে একটু ঘোরালো বা একঘেয়ে হ'য়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নাটকের পক্ষে এই ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশ একেবারে অপরিহার্য্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। একেই নাটকের ভিত্তি বলা চলে। গাল্‌সোয়ার্দ্দির ভাণ্ডারে এই উপাদান প্রচুর। তাঁর নাটকের যেটা প্রধান প্রতিপাদ্য বা মূল ঘটনা, অর্থাৎ যেটাকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর সমস্ত নাটকখানি গড়ে উঠেছে, তার ভিতরেও যেমন এ সম্পদের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়—তেমনি তাঁর নাটকের প্রত্যেক অঙ্কের যবনিকা এসে পড়েছে এমন সব চিত্তাকর্ষক ঘটনার মধ্যে—যে ঘটনাগুলো সেই-সেই দৃশ্য বা সেই-সেই অঙ্কের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলবার পক্ষে একেবারে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু! গাল্‌সোয়ার্দ্দির প্রত্যেক নাটকের মূল মন্ত্র হ'চ্ছে একটা না একটা সামাজিক বা নৈতিক সমস্যারই আলোচনা। তিনি তাঁর বক্তব্যকে বক্তৃতার সাহায্যে না ব'লে ঘটনা সমাবেশের দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন ব'লেই, বার্ণাড্‌শ' বা অন্যান্য সংস্কারপন্থী নাট্যকারের রচনার তুলনায় গাল্‌সোয়ার্দ্দির রচনা-ভঙ্গী কারু কৌশলে অনেক শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর মতামত প্রচারের জন্য কেবলমাত্র নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের উপরই নির্ভর করেন না। তিনি প্রয়োজন মত চরিত্র সৃজন ক'রে ও তাদের কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়েই তাঁর নীতি ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। এই-খানেই তিনি তাঁর সতীর্থদের অনেককেই অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন।

অধিকাংশের মতে গাল্‌সোয়ার্দ্দির নাটকের বহু চরিত্রই এক একটা বিশেষ টাইপের (Type) বা ধরণের! তারা কেউ একেবারে সৃষ্টি-ছাড়া না হ'লেও সাধারণ মানুষের মতোও নয়! আমাদের মনে হয় নাটকের পাত্র-পাত্রী এই রকম বিশেষ টাইপের হওয়াই উচিত। একেবারে সাদা-সিধে মানুষদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চের আসর জমানো বড় কঠিন। তা ছাড়া তাদের কাজ বা কথা দর্শকদের মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং নাট্যকারের উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, সেজন্য এই সব বিশেষ ধরণের চরিত্র চিত্রণ আবশ্যক! অভিনেতারা নিজেদের শক্তি বলে সেই চরিত্রকে যখন মূর্ত্ত করে তোলেন, তখন তা সত্যই জীবন্ত হ'য়ে ওঠে; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখের কথাগুলিও যেন মূল্যবান ও কাজের কথা বলে ধারণা জন্মে যায়। ফলে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ হবার সুযোগ ঘটে!

গাল্‌সোয়ার্দ্দির নাটকের মধ্যে—রচনা-পারিপাট্য ও নাট্য-সম্পদের দিক দিয়ে 'ষ্ট্রাইফ' (Strife) বা "দাঙ্গা"খানাকেই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে নাট্যকার তাঁর প্রধান বক্তব্যকে এমন চমৎকার কৌশলে বিরোধের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছেন যে, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয় না।

'দাঙ্গা'র আসল ঘটনা হ'চ্ছে কারখানার কর্ত্তাদের সঙ্গে কারিগরদের বিরোধ। কিন্তু সেটা যে কেন, বা কি নিয়ে—সেটা উভয় পক্ষের মনোভাব বুঝতে না পারলে ধরতে পারা যায় না। এই বিরোধের আসল কারণটুকু আপাত-দৃষ্টিতে একটু অস্পষ্ট বলেই মনে হয়। বইখানি পড়ে আমরা শুধু এইটুকু জানতে পারি যে, কারখানার অনেক মজুর দরিদ্রের নিষ্পেষণে প্রায় একরকম অনাহারী হ'য়ে পড়েছে; এবং কর্ম্ম-কর্ত্তারা লভ্যাংশের হ্রস্বতা ও অংশীদারদের বিরক্তির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। 'ট্রেড্ ইউনিয়নে'র (কর্ম্মী সম্মিলনী) প্রতিনিধি হার্ণেস্ মধ্যস্থ হয়ে এদের বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করছেন এবং উভয় পক্ষই ক্রমশ মিট-মাটের আশায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠছে।

নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে তারা এই লক্ষ্যের দিকেই

এগিয়ে চলেছে কেবল উভয়পক্ষের নেতা রবার্টস্ ও আন্থনি কিন্তু অটল ছিল। শেষটা বড় শোচনীয়। কারণ উভয় পক্ষই পরস্পরের কাছে প্রায় একসঙ্গেই আত্মসমর্পণ করলে এবং তাদের এই পরাজয়ে উভয় দলের নেতারই বুক ভেঙে গেল! এই দুই নেতার চরিত্র অসাধারণ! তাদের যোগ্যতা বিপুল এবং সাহস অপরিসীম! কিন্তু, দলের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এরা কিছুই করতে পারলে না। মিট-মাটে রাজি না হ'লেই যে তাদের জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, এই সহজ কথাটা বোঝবার মতো ধৈর্য্য ও বিশ্বাস তাদের দলের লোকগুলোর কারুর ছিল না।

কারিগরদের সর্দ্দার রবার্টস্ আর কারখানার কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সভাপতি (President of the Board of Directors) আন্থনি এরা দুজনেই যখন দলচ্যুত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করলে—সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! একটুখানি এখানে তুলে দিচ্ছি—এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে সে দৃশ্য কী মর্ম্মস্পর্শী!

রবার্টস্—(আন্থনির প্রতি) কিন্তু তুমি তো মিট্-মাটের সর্ত্ত এখনও সই করোনি! সভাপতি সই না দিলে তারা মেটাবে কেমন করে? আর তুমি নিশ্চয়ই কিছু ও মিট্-মাটের মধ্যে যাবে না?

(আন্থনি শুধু নীরবে অসহায়ের মতো রবার্টসের মুখের দিকে চেয়ে রইল)

রবার্টস্—বলো তুমি সই করোনি! দোহাই তোমার! একবার বলো আমাকে যে, সই করোনি! আমি যে তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি!

হার্নেস্—(মিট্-মাটের সর্ত্তখানি রবার্টসের সামনে খুলে ধরে) এই দেখ, কর্ম্ম-কর্ত্তারা সবাই সই করে দিয়েছে!

রবার্টস্—(কাগজখানিকে দেখে আন্থনিকে) তাহলে তুমি আর এ কারখানার প্রধান কর্ণধার নও! (পাগলের মতো অট্টহাস্য করে) ওহো! তাই বটে!—হাঃ হাঃ হাঃ! তাই বটে; হাঃ হাঃ হাঃ! তোমাকে এরা সরিয়ে দিয়েছে—তুমি আর এদের কর্ত্তা নও! সভাপতিকেও এরা ত্যাগ করেছে! ও ও!—হাঃ হাঃ হাঃ—(হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হ'য়ে) তাহ'লে দেখছি আমাদের দুজনেরই একদশা হ'ল আন্থনি!"

(ক্রমশঃ)

বিহারাঞ্চলে চাষ

(চিত্র)

রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর বি-এল্

প্রফুল্ল বাবু পেন্সন লইয়া প্রফুল্ল চিত্তে গৃহের এক কোণে তনু ত্যাগ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্র এমনিই, যে, তাঁহার এক বন্ধু জুটিয়া গেল, নরহরি দাস।

নরহরি দাস কৃষিবিভাগে একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন, কাসরোগের জন্য কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া তিনি সে রোগে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারার্জ্জিত চাষরোগ তখনও তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিল।

হঠাৎ এক দিন প্রফুল্লবাবুকে কার্য্যগতিকে কোদালি পাড়িতে দেখিয়া তিনি সানন্দে তাঁহার বাটীতে উত্তীর্ণ হইলেন।

নরহরি। দাদা, মনে পড়ে কি?

প্রফুল্ল। নাম কি? চেহারাটা মনে পড়ছে।

নরহরি। নরহরি দাস, ভূতপূর্ব্ব কৃষিবিভাগের ইন্-স্পেক্টর। সেই যে তালতলায় দুজনের সাক্ষাৎ!

প্রফুল্ল। তাই ত! আপনিই আমাকে সেই বুনো মহিষের হাত হ'তে বাঁচান! নমস্কার।

দুজনেরই মধ্যে বন্ধুত্ব দশ মিনিটের মধ্যে জমিয়া গেল। নরহরি বলিলেন যে প্রফুল্লবাবুর চরিত্র টলষ্টয়ের মত। কেবল বাকি চাষটুকু। চাষ না করিলে বিহারে বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

প্রফুল্ল। তবে, কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ভাবা দরকার। আমার এ বিষয়ে বিজ্ঞতা বড় কম। যদি আপনি অনবরত পরামর্শ দেন তবেই সাহস হ'তে পারে।

নরহরি। সে সম্বন্ধে আমি দায়ী। আপনার যদি লোকসান হয় সেটা আমি দেব'।

তার পরই তিনি কৃষিতত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। মাটি কত রকম হয়। ফস্ফরিক অ্যাসিড-যুক্ত এঁটেল মাটি, যাহা শীত-গ্রীষ্মে ফাটে, বালি-যুক্ত দোঁয়াশ, চুণ মাঝারি, কর্মাটি, বোদ মাটি, লোনা মাটি ইত্যাদি। সার কি করিয়া দিতে হয়। জলের ব্যবস্থা কি করিয়া হয়। কোন্ ফসলে কত লাভ। উপরন্তু আয়ুর্বৃদ্ধি, এবং ছেলেপুলেদের জন্য একটা উপায় করিয়া রাখা, কারণ চাকুরি আর জুটিবে না। চাষে শরীর সবল হয়। দেশকে বিপদ আপদে রক্ষা করা যায়।

শুনিতে শুনিতে প্রফুল্লবাবুর তাক্ লাগিয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে চাষই বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের উপায়। ব্যবসা কিংবা দোকান চালান' এদেশে সঙ্কটাপন্ন, ও বাঙ্গালীর উপযোগী নয়। এখন জমি সংগ্রহ করা যায় কি করিয়া?

তাহাতে বেগ পাইতে হইল না। জনকতক বৃদ্ধ ও বংশহীন চাষী ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া জমি বেচিবার জন্য উপস্থিত হইল। জমির রাইয়তি স্বত্ব। মূল্য সস্তা। জমিদারকে মূল্যের উপর শতকরা পঁচিশ টাকা সেলামি দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রি অফিস অনুসন্ধান করিয়া মোটে দুখানা বন্ধকি কবালার ঠিকানা পাওয়া গেল।

বিক্রয় কবালা প্রভৃতি রেজিষ্ট্রি হইয়া গেলে, দেখা গেল যে জমির দাম বিঘা-প্রতি পঞ্চাশ টাকার অধিক নয়। স্বাস্থ্যকর স্থান, রেলের সন্নিকট, পুলিশ থানা নিকটে নাই, গ্রামে জমিদারের দৌরাত্ম্য নাই।

নরহরি বাবু বলিলেন যে, পেঁপে গাছ পুঁতিলে ও কলিকাতায় চালান দিলে বৎসরে পাঁচ শত টাকা লাভ। যে দুইশত বিঘা ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ধান্য পঞ্চাশ বিঘা, রবিশস্য পঞ্চাশ, আখ পঞ্চাশ, ও আম জাম পেঁপে কলা প্রভৃতির বাগান পঞ্চাশ বিঘা চাষ করিলে, দশহাজার টাকা পাঁচ বৎসরেই শোধ হইয়া যাইবে। খাজনাও বৎসর বৎসর দেওয়া চলিবে।

গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল বাবু অবশেষে বলিলেন 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।

নরহরি বাবু সহৃদয় লোক। ত্রিসংসারে কেহই ছিল না। উদ্দেশ্য কেবল বন্ধুর হিতসাধন। প্রফুল্ল বাবুর তিনটি পুত্র—যাদব, মাধব ও টুনু। যাদব যদিও বয়াটে, কিন্তু লেখাপড়ায় খুব মজবুত। মাধবের ঝোঁক আর্টের দিকে। টুনুর বয়স মাত্র দশ বৎসর। সে গরু বাছুর ভালবাসিত। তিন জনেই চাষবাসের স্বাধীনতা দেখিয়া পিতাকে বলিল 'লেগে যান্'। যাদব বলিল 'একটা পুষ্করিণী করুন—মাছ ধ'রব'। মাধবের ইচ্ছা একটা নারিকেল-কুঞ্জ। টুনুর একটা বিরাট গোগৃহ।

জমির দখল লইবার পর কতকগুলি বিপদ আসিয়া জুটিল। গোটাকতক লোক পুরাতন প্রজার নামে হ্যাণ্ড-নোটের নালিশ করিয়া সেই জমি ক্রোক করিল। বাঁধের জল লইয়া একটা দেওয়ানি মামলা হইল। একটা বেনামি কবালা বাহির হইল। মিতাক্ষরা আইনের বলে পুরাতন প্রজার একজন বিধবা পুত্রবধূ নালিশ করিয়া বসিল। মহুয়া বৃক্ষের স্বত্বের জন্য জমিদার নালিশ করিলেন।

এই সকল দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে যদিও আরও পাঁচহাজার ব্যয় হইয়াছিল, তথাপি প্রফুল্ল বাবুর শরীর পতন হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ উত্থিত হইতেছিল। নরহরি বাবু বলিলেন 'কর্ম্মহীন জীবনই আয়ুক্ষয়ের কারণ। আপনি যে প্রশস্ত পথ অবলম্বন ক'রেছেন, তাহার ফলে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইতে পারে না।'

(২)

নরহরি বাবু সারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল বাবু লাঙ্গলের ও বলদের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

গ্রামের মাতব্বর চাষী গঙ্গারাম বুঝাইয়া দিল যে গরু জুটিলেই সার জুটিবে। অল্প খায়, অনেক সার দেয়, এবং ঠ্যাঙ্গাইলে বেদম খাটে, ইহাই ভারতভূমির বলদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক বলদের প্রায় চল্লিশ টাকা দাম। সারগ্রাহী প্রফুল্লবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন যে কেরানী হইতে ইহাদের মূল্য বেশী; সুতরাং দশটা বলদ ও দুগ্ধের জন্য একটা গাভী, সর্ব্বসমেত পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিলেন। গোশালা নির্ম্মিত হইল। লাঙ্গলও সংগ্রহ হইল। দুঃখের বিষয়, বলদগুলির সার সংগ্রহ দুর্ঘট হইয়া পড়িল।

নরহরি। আপনি গঙ্গারামের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভুল করেছেন। মাঠে গরু চরাবার সময় রাখাল ও তার পিসি গোবর চুরি করে। সেইটেই আসল সার।

প্রফুল্ল। উপায়?

নরহরি। টুনুকে গরু চরাইতে দেওয়া; কিংবা গোয়ালেই জাব দিয়ে বেশীক্ষণ রাখা।

টুনু যদিও রাজি, কিন্তু এক দিনের গোচারণের ব্যাপারে তাহার মাথায় আঘাত লাগাতে, শেষে স্থির হইল যে কলিকাতা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে সার সংগ্রহ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে নরহরি বাবুর বিজ্ঞতা অসাধারণ। মালগাড়ীতে বস্তা বস্তা সার আসিয়া চাষবাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। খইল, অস্থিচূর্ণ, চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, শৃঙ্গ, নখ, ভারতবর্ষের নানাস্থানের নানাবিধ জীবের শেষাবস্থা, ছাগল, ভ্যাড়া, ঘোড়ার লিদি, চামচিকার মল, সোরা, ক্যালসিয়ম ফসফেট, সোডা নাইট্রেট, সমস্ত তাল পাকাইয়া দিনকতক হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। দু'হাজার টাকার সার একত্র হইল।

মিশ্রিত সার দেখিয়া প্রফুল্ল বাবু প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন। নরহরি বাবু বলিলেন, যখন জমিতে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর লাঙ্গল পড়ে নাই, তখন সারের উপরই সব নির্ভর। তবে নীচু জমিটাতে ধান্য রোপন হইবে বলিয়া, কেবল সঞ্চিত গোময় ও কিঞ্চিৎ খইল দিলেই যথেষ্ট।

এদিকে যাদব ও মাধব দুইজনে পিতাকে পুষ্করিণী ও নারিকেল-কুঞ্জ কিংবা নিতান্ত পক্ষে কদলীকুঞ্জের জন্য প্রত্যহ জ্বালাতন করিতেছিল, এবং স্বপক্ষে গঙ্গারামকে সুপারিসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। বালকদ্বয়ের উপর মায়াধিক্য-বশতঃ গঙ্গারাম প্রফুল্লকে বলিল, হুজুর! এখানে যেমন জলকষ্ট, তাহাতে একটা পুষ্করিণী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রফুল্ল বাবু নরহরি বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। গৃহিণীর নিতান্ত ইচ্ছা যে পুষ্করিণীটা প্রথমেই হয়। সে তল্লাটে পুষ্করিণীগুলির অবস্থা দেখিয়া নরহরি বাবু বলিলেন যে, প্রতি বৎসর পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, তবে সেই পঙ্ক তুলিয়া জমিতে ফেলিলে সারের মত কার্য্যকরী হইতে পারে।

প্রফুল্ল। যদি মাছ ছাড়া যায়?

গঙ্গারাম। কই মাছ এদেশে হয় না, কিন্তু রুই, কাতলা প্রভৃতির পোনা ও মাগুরের শিশু সন্তান পাওয়া যায়।

প্রফুল্ল। রুই কাতলা কত বড় হয়?

গঙ্গারাম। প্রায় দুই সের পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব, যদি আহার যোগান যায়। এদেশের মাছের প্রধান খাদ্য ছাতু।

প্রফুল্ল। কত ছাতু লাগিবে?

গঙ্গারাম। একটা মাছ, বৎসরে আধ মণ ছাতু খায়। শৈশবাবস্থায় দশ সের ছাতু দিলেই যথেষ্ট। এটা পার্ব্বতীয় জমি, সুতরাং পোকা মাকড়, শিউলি, পানা, Vitamine-যুক্ত পাঁক প্রভৃতি পায় না। কিন্তু বেশী না বাড়িলেও শরীরে বল থাকে যথেষ্ট। ছিপে গাঁথিলে এক ঘণ্টা খেলে।

প্রফুল্ল। এক একটা মাছ ময়নার চেয়ে ছাতু বেশী খায়?

নরহরি। যদি একহাজার পোনা ছাড়া যায় তবে বৎসরে বিশ হাজার সের অর্থাৎ পাঁচশত মণ ছাতুর দরকার, তাহার মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা। কিন্তু ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই। আপনার রবিশস্যের জন্য যে পঞ্চাশ বিঘা রাখা হইয়াছে তাহাতে দুশ' মণ ছাতুর যোগাড় বেশ হবে। এদিকে, পোনার বংশের অর্দ্ধেক, কিংবা বার আনা, বঙ্গদেশের শিশুর অবস্থা পেয়ে অকালে অক্কা পাবে, সেটা যেন মনে থাকে।

প্রফুল্ল। এর চেয়ে মাছের জন্য চেষ্টা না ক'রে ছাতুটা খেলেই ত হয়।

গঙ্গারাম। আমরা ভক্ত লোক, তাই করিয়া থাকি, কিন্তু জীবহিংসায় সুখ আছে।

নরহরি। সেটা বাজে কথা। মাছের ঝোল হয়, অম্বল হয়, কোর্ম্মা হয়, অসময়ে কেবল ভাজা পোড়া চলে, আঁইসগুলো সার হয়, মুড়ো জামাইয়ের পাতে দেওয়া যায়, পোঁছাটা বরাবর খেলে গিন্নি কখন' বিধবা হয় না। ছাতুতে কি হয় রে বাপু?

গঙ্গারাম অনর্থক তর্ক না বাড়াইয়া স্বীকার করিল যে মাছের মর্য্যাদা ছাতু হইতে বেশী, তাহার প্রমাণ যে যখন হিন্দুস্থানী লোক মাছ ধরে' নাই, তখন তাহাদের বুদ্ধি বাঙ্গালী হইতে অনেক কম ছিল।

(৩)

সুতরাং পুষ্করিণী খনন স্থির হইয়া গেল। বাগানের পঞ্চাশ বিঘার মধ্যে চারি বিঘা কাটিয়া পুষ্করিণী আরম্ভ হইল। সচরাচর পুষ্করিণী চতুষ্কোণ হইয়া থাকে, কিন্তু মাধব একজন আর্টিষ্ট, ও যাদবের ইচ্ছা ছিল অন্ততঃ আটটা ঘাট

হয়, ও মাছ ধরিবার মনোরম্য স্থানগুলি নির্দিষ্ট হয়, এবং মাধবের ইচ্ছা যে নারিকেল ও কদলী বৃক্ষগুলি অষ্টভাগে বিভক্ত হয়। অতএব অষ্টকোণ পুষ্করিণী করাই স্থির হইল।

মজুরের অভাব হইল না। আসামের চা বাগানের কালাজ্বরগ্রস্ত পঁয়ষট্টিজন কুলি সেই সময় পথ ভাঙ্গিয়া অনাহারে দেশে ফিরিতেছিল, তাহারা তিন আনা রোজ হিসাবে খাটিতে রাজি হইল। প্রফুল্ল বাবুর ভয় হইয়াছিল যে মরিয়া গেলে তাহাদের সৎকার করিবে কে। নরহরি বাবু বলিলেন যে তিনি ব্রহ্মচারী কোম্পানীর ইন্‌জেক্সনের ঔষধ পূর্ব্বেই সারের সঙ্গে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ইন্‌জেক্‌সন দিতেও শিখিয়াছেন। প্রথমে একটু প্রোজেক্‌সন হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে ডি-জেক্সন্ হইলে তাহারা পুষ্করিণীতে জল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে নিশ্চয়। তাহার পর ভগবানের ইচ্ছা।

কোদালি ও বেতের ঝুড়ি সংগ্রহ হইয়া গেলে, আসাম-ফেরৎ কুলির দল প্রত্যহ এক ইঞ্চি করিয়া মাটি কাটিতে লাগিল। ক্রমে ইনজেক্‌সন্ ধরিলে পর তাহারা এক ফুট পর্য্যন্ত কাটিতে সক্ষম হইল। ইহাতে নরহরি বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন যে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে পুষ্করিণীতে জল বাহির হওয়া অসম্ভব। কিন্তু হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ফাল্গুনের শেষে, অমাবস্যার দিন, চারি বিঘার প্রায় সমস্তটাই ধসিয়া অধোভাগে বসিতে লাগিল, এবং মধ্য স্থলে একটা স্তম্ভের মতো পদার্থ বাহির হইয়া পড়িল। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া যাওয়াতে গ্রামের পঞ্চায়েত ও চৌকিদার-বর্গ তদন্তে আসিলেন এবং তাহাদের রিপোর্ট সদর মহকুমায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছিলে, সাহেব একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ মুসলমান সবডিপুটির সহিত ঘটনাস্থলে আসিয়া তাম্বু ফেলিলেন। তাঁহাদের সমাগম দেখিয়া কুলির দল কোদালি-গুলি আত্মসাৎ করিয়া রাতারাতি পলায়ন করিল।

প্রফুল্ল বাবু কিছু বিপদে পড়িলেন। মুসলমানগণ সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল যে, আবিষ্কৃত চূড়া একটা মস্‌জিদের। হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী তাহা দেব-মন্দিরের চূড়া বলিয়া দলে দলে লাঠি-হস্তে অগ্রসর হইতেছিল। একটা দাঙ্গা হইত নিশ্চয়। সৌভাগ্যক্রমে প্রত্নতত্ত্ববিৎ সবডিপুটি বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের কীর্ত্তি ছাড়াও অতিপূর্ব্বের আর একটা কীর্ত্তি ছিল, সেটা বৌদ্ধ-যুগের। আবিষ্কৃত চূড়া সূর্য্যগুপ্ত, কিম্বা চন্দ্র, কিংবা সমুদ্র গুপ্ত নামক কোনো নরপতির 'পিলার', এবং তাহার সংলগ্ন প্রস্তর-ফলক হইতে বুঝা যায় যে, এক সময় তিনি দিগ্বিজয়-মানসে এই দেশে আসিয়া জলকষ্ট পাইয়াছিলেন। সেই জলকষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সৈন্য-সামন্ত তিন দিনে অষ্ট-কোণযুক্ত পুষ্করিণী খনন করিয়াছিল, এবং স্মরণ-চিহ্নার্থ একটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সাহেব নিজেই বৌদ্ধভাষা জানিতেন। প্রস্তর-ফলক পাঠ করিয়া তিনি সাতিশয় সানন্দচিত্ত হইয়া গ্রামের অধিবাসীগণকে হুকুম দিলেন, 'তোমরা এক সপ্তাহের মধ্যে পুষ্করিণী উদ্ধার করহ'। হুকুম তামিলের জন্য পুলিস ফোর্স নিযুক্ত হওয়াতে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে সেই বিরাট কর্ম্মে লাগিয়া গেল, এবং ফলে বিনাব্যয়ে প্রফুল্লবাবুর অদৃষ্টে তিন সহস্র বৎসরের, পুরাতনী, স্বচ্ছসলিলা, কৃষ্ণোজ্জ্বলা, গভীর-সলিলা একটা অষ্টকোণ-যুক্তা সরসী বাহির হইয়া পড়িল!

সেই অদ্ভুত ঐতিহাসিক পদার্থের আবিষ্কারক, প্রফুল্ল-বাবুকে বহু ধন্যবাদ দিয়া সাহেব 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন, এবং তাঁহার ও নরহরিবাবুর চাষে আস্থা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন যে আগামী বৎসরের কৃষি-প্রদর্শনীর জন্য কোনো প্রকারের আশ্চর্য্যজনক তরি-তরকারি দিতে পারিলে, তিনি প্রফুল্লবাবুর একটা খেতাবের জন্য গবর্ণমেণ্টকে লিখিবেন। এই ক্ষণবিধ্বংসী মানব-শরীরের সহিত কল্পান্তস্থায়ী একটা রায় বাহাদুর প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মকগুণসম্পন্ন খেতাবের জন্য কাহার না লোভ হয়? সুতরাং নানাবিধ বিপদে পড়িয়াও প্রফুল্লবাবুর উদ্যম ও যত্নের সাধন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তিন সহস্র বৎসরের পুরাতন জল পাইয়া জমিগুলি সেই যুগের তেজ প্রাপ্ত হইল। কারণ জমিগুলিও পুরাতন। নূতন জল-হাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহ্য। সেটুকু আমরা বুঝি না বলিয়া আমাদের এত দুর্দ্দশা!

সেই জলের সাহায্যে চাষ আরম্ভ হইল। দশটী বলদের মধ্যে গোটা পাঁচ-ছয় আপিসের বাবু ও আদালতের হাকিমের মতো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চিৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার হইত। স্থানীয় গো-চিকিৎসক Zinc Valerian নামক ঔষধ প্রয়োগ করাতে ফল দর্শায় নাই। অগ্নিমান্দ্য লক্ষ্য করিয়া নরহরিবাবু হোমিওপ্যাথিক 'নক্স'

ও বায়োকেমিপ্যাথি 'ম্যাগনেসিয়ম্ ফস্' প্রভৃতি দিয়াছিলেন। অবশেষে সুদক্ষ ও প্রবীণ গঙ্গারামের লাঠিতে তাহারা ঠিক হইয়া গেল। তৎপর চাষের উপর চাষ! এই প্রকারে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটা চাষ হইয়া যাওয়াতে, ও তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সার পড়াতে, জমি চৌরঙ্গীর রাস্তার মত হাব্‌সি কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল।

(৪)

নরহরিবাবু খুসি হইয়া বলিলেন, একেই বলে আসল দোআঁশলা জমি। কতকগুলি সার একত্রে না মিশাইলে এমন জমি হয় না, যেমন নানাদেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, আহার প্রভৃতি একত্রে গ্রহণ না ক'রলে আমাদের দেশে সভ্য মানুষ হ'ত না।

প্রফুল্ল। কিন্তু ফলে কি দাঁড়াবে?

নরহরি। প্রদর্শনীর যোগ্য অদ্ভুত কোনো ফসল, যেমন সভ্যতার গুণে অদ্ভুত মহামানবের বিকাশ হয়ে থাকে। আজকাল অদ্ভুত না হলে বাজারে দর হয় না।

বাগানের জমি ঠিক তৈয়ারি হইয়া গেলে, প্রফুল্লবাবু নরহরিবাবুর পরামর্শে প্রথমেই রসাল ফলের চারা সংগ্রহ করিতে সুরু করিলেন। ফুলের বাগান কেহই পছন্দ করিতেন না, কারণ উহা পয়সার অপব্যয় মাত্র। কিন্তু বানর ও পক্ষী পুষ্পবাটিকা আক্রমণ করে না, সেই জন্য গোটাকতক রক্তকরবীর গাছ রোপণ করার সঙ্কল্প হইয়াছিল। রসাল ফলের মধ্যে নানাজাতীয় আম্র, কাঁঠাল, গোলাপজাম, লেবু, পেঁপে, জামরুল, খিরনি, লকেট, জাম, আনারস, তেঁতুল, বেল, তুঁত, বাতাবী, কমলা, ডালিম, খর্জ্জুর, তাল, সুপারি প্রভৃতির চারা সংগ্রহ করিয়া নব রস পরিপূর্ণ হইলে, এবং যথাস্থানে রোপিত হইলে, নরহরি বাবু তাঁহার নোটবুক দেখিয়া বলিলেন যে, একটা তিক্ত রসের ফলও দরকার। তিক্তরস নিকটে থাকিলে অন্য রসগুলি তটস্থ হয়, যেমন সমালোচকের লেখনীর সম্মুখে রসপটু উপন্যাস ও কাব্য লেখক। তিনি বলিলেন যে, কলিকাতার কোনো প্রধান মাসিক-পত্রিকার বাটীর পশ্চাতে একটা পুরাতন তিক্ত লাউ-বৃক্ষ আছে, তাহার বাৎসরিক ফলের বীচি আট আনা সের দরে বিক্রয় হয়। সেই বীচি হইতে বড় বড় লাউ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রফুল্লবাবুর সারযুক্ত জমিতে তাহা অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করিবে এমত আশা করা যায়।

প্রফুল্লবাবু। সেগুলো কি খাওয়া যাবে?

নরহরি। প্রদর্শনীতে কাজে লাগ্‌তে পারে—কে জানে? ভগবানের কৃপায় তাহার জোরেই আপনি খেতাব পেয়ে দেশবিখ্যাত হ'তে পারবেন।

সকল সাধই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া অবশেষে স্থির হইল যে, বাগান-বাটীতে আসিয়া বসতি না করিলে, ও নিজে তত্ত্বাবধান না করিলে চাষ হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ স্থানটা বোধ হইতে লাগিল যেন একটা তীর্থস্থান। বৌদ্ধযুগের পুষ্করিণী, অদূরে পার্বতীয় দৃশ্য, নিকটে সহৃদয় চাষীদিগের বস্‌তি, স্বহস্তরোপিত চারাগাছ, দুগ্ধবতী গাভী, মুক্ত মাঠের বাতাস! আর কি চাই!

বাগানবাটী প্রথমে একখানি কুটীরের মতো ছিল, তাহার চারিদিকে করুগেটেড্ আয়রণের বেড়া দিয়া, ও চালে খড় ও খাপরা বিছাইয়া, এবং কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ্মণসেনের দুর্গের বহির্ভাগের মতো একটা আকার দাঁড় করান হইল। পাছে চোরের উৎপাত ঘটে, সেই ভয়ে টিনের বেড়ার মাথায় মধ্যে মধ্যে একটা কেরোসিনের টিন ও দুইটি ঘণ্টা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রত্যেক শয়নাগারে একটা করিয়া Alarm-signal স্বরূপ পদার্থের সহিত সেই দড়ি সংযুক্ত করা হইল। এইরূপে অগ্নি, যম, বায়ু, বরুণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করতঃ গৃহিণী একটা তুলসীমঞ্চ স্থাপনা করিলেন। কারণ, ধর্ম্মই মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নরহরি চসমা পরিধানপূর্ব্বক সমস্ত কল-কারখানা আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'সবই হয়েছে ঠিক, কেবল কতকগুলি জিনিষের এখনো অভাব আছে। প্রধানতঃ, চাউল কুটিবার জন্য একটা ঢেঁকি, তুলা পিঁজিবার জন্য চরখা, মিস্ত্রির কাজের জন্য একটা বাটালি, বমুলা ও করাত, এবং আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি সুদৃশ্য হাতিয়ার, যেমন হাতুড়ি, তলোয়ার, ফরসা, ও লাইসেন্স পাইলে একটা একনালী-বন্দুক।

যখন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চাষ করিতেই হইবে তখন একপ্রস্থ খদ্দর ও বর্ষার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ক্যানবিসের গোটাকতক থলিয়া ও ওয়াটারপ্রুফ নরহরি বাবু সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সারের দুর্গন্ধ হইতে অব্যাহতির নিমিত্ত দুই শিশি ইউক্যালিপটাস ডাক্তারখানা হইতে আসিল, এবং তাহার সঙ্গে কুবিনিয় ক্যামফার,

ক্লোরোডাইন ও পার্ম্যেংগেনেট অফ পোটাস্‌ও তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

এদিকে বলদগুলি সায়েস্তা হইয়া গেলে তাহাদিগের পরীক্ষার জন্য একখানা গো শকট নির্ম্মিত হইল। তাহাতে চড়িয়া প্রফুল্লবাবু সপরিবারে পাহাড় পর্য্যন্ত বায়ুসেবন করিতেন।

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকায় এই সকল সুন্দর ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, ঘর বাড়ী, জমি, সার প্রভৃতি সংগ্রহ ও সুসম্পন্ন হইতে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

নরহরি বাবু সেই অবসরে তাঁহার কৃষি-পঞ্জিকা নামক বিখ্যাত বহির হস্তলিপি প্রস্তুত করিলেন। বীজধান্য বপন হইবার বন্দোবস্ত হইল। মৎস্যের পোনার জন্য বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সংবাদ পাঠান হইল। একটা ঘূর্ণিজালও সংগৃহীত হইল এবং যাদব তাহার কৌশল এক দিনেই শিখিয়া ফেলিল।

প্রফুল্ল বাবু সহর্ষচিত্তে চাষের ফসলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

(৫)

একটা বিষয়ে তাঁহারা বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, প্রতিবাসী চাষীগণ সকলেই ধর্ম্মভীরু, শ্রমসহিষ্ণু ও বিপদ আপদের বন্ধু। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের চালচলন ও চরিত্র সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ মজুরদের ধর্ম্মঘট। মজুরদিগকে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিতে দেখিলে আমরা বলি 'অপ্‌ষ্টার্ট',ভদ্রলোককে কৃষিকর্ম্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিলে তাহারা বলে 'ডাউন-ষ্টার্ট'। লাঙ্গলের মজুর তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বসাইয়া দিল, দৈনিক শ্রমজীবী, যাহারা কেবল কোদালি পাড়ে, তাহারা চতুর্গুণ। এই ত গেল দিবাভাগের। রাত্রিকালে কৃষকের দল প্রফুল্লবাবুর ধান্যক্ষেত্রে মহিষ ও গরু ছাড়িয়া দিয়া ধান চরাইত। এই প্রকারে ধান্যের ফসল অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া গেলে প্রফুল্লবাবু নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। নরহরি বাবু বুঝাইয়া দিলেন যে এগুলো গণতন্ত্র ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের পূর্ব্বযুগের সংস্কার। তখন গ্রামের কৃষকজাতি প্রায় একই পরিবারের মধ্যে গণ্য হইত, এবং এক জনের কোনো স্বতন্ত্র "স্বত্ব" নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পরস্পরের ফসলের উপর পরস্পরের একটা দাবী ছিল, সুতরাং লড়াই ঝগড়া বাধিত না। গোচারণের মাঠ বন্ধ হইয়া গেলে ও নানাবিধ শ্রেণীর ও বর্ণের লোক কৃষিক্ষেত্র অধিকার করিলে, আমাদের স্থূল-দৃষ্টিতে তাহাদের চালচলন চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির ন্যায় বোধ হয়।

প্রফুল্ল। তাহ'লে আমাকে ভিটা ত্যাগ ক'রে পালাতে হবে।

নরহরি। একটা উপায়, যাদবের হাতে বন্দুক দিয়ে অনবরত আওয়াজ ক'রতে থাকুন, তাতে এদেশের লোক ভয় পায়, এবং তাতেও নিবৃত্তি না হলে সম্পত্তির চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিতে হবে ও পুলিসের সাহায্য নিতে হবে।

প্রফুল্ল। খরচ ত কম নয়।

নরহরি। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের জন্য একটা পাকা কাজ হয়ে যাবে, ও ইতিহাসে একটা নাম থেকে যাবে।

কাজেই প্রফুল্লবাবু একজন ঠিকাদারকে ডাকিয়া তাঁহার দুইশত বিঘার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার গেটের সম্মুখে যাদব বন্দুক লইয়া শব্দ করিত।

কুলি মজুরের দৌরাত্ম্যের জন্য নরহরি বাবু একটা 'ট্র্যাক্টর' কিনিতে পরামর্শ দিলেন, এবং মাধব সেটা কলিকাতা হইতে আনিয়া অতি অল্প দিনেই চালাইতে শিখিল।

এই অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে সমগ্র কৃষিক্ষেত্র বর্ম্মাবৃত ও দুর্গবেষ্টিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য, পশু, এমন কি কীট পতঙ্গের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্রমে পুষ্করিণীর মধ্যে পোনামাছ ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহারা বৌদ্ধযুগের কলেবর ধারণ করিয়া কাতলাগুলি এক বৎসরের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ন্যায় জলের মধ্যে বিচরণ করিয়া কীটপতঙ্গের দিকে করুণা দৃষ্টিতে চাহিত। তাহা দেখিয়া প্রফুল্লবাবুও সপরিবারে হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া সপরিবারে মৎস্য মাংস ছাড়িয়া দিলেন।

এই প্রকারে নরহরি বাবুর সাহায্যে প্রায় ত্রিশহাজার টাকা কৃষিকার্য্যে ব্যয় করিয়া প্রফুল্লবাবু দেখিলেন, কর্ম্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করিতেই হয়। যাদব প্রথমে তাহা স্বীকার করে নাই, পরে গীতার মধ্যে সেটুকু পাঠ করিয়া তাহার গেরুয়াবসনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া গেল।

মাধব তাহার ছবিতে সেই অভিনব প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশেষতঃ তাহাদের কৃষিক্ষেত্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা, প্রকটিত করিয়া সিমলা আর্ট এক্জিবিশনে দশটাকা পুরস্কার পাইয়াছিল।

টুনু এতদিন গোগৃহ লইয়া থাকিত। গয়লা পলাইয়া গেলে সে নিজেই দুগ্ধ দুহিয়া সকলকে খাওয়াইত। অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পাইয়া গোবৎস হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সকলের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিত।

নরহরি বাবু বুঝাইয়া দিলেন যে টাকা কিছু নয়। কৃষিকর্ম্মটাই আসল। টাকা হাতে থাকিলে তাহা বিলাসের দিক দিয়া উড়িয়া যায়। কৃষি হাতে থাকিলে ভবিষ্যতের উপায় ও ধর্ম্মজীবন হাতে থাকে। যদি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন হয়, তাহা হইতে আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে। বহু ব্যয় করিয়াও রাজন্যবর্গ পৃথিবীর কোনো স্থানে এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই।

প্রফুল্ল। অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন বলুন ত প্রদর্শনীতে উপহার কি দেওয়া যায়?

নরহরি। সেটা আপনার গৃহিণী জানেন।

প্রফুল্ল বাবু গৃহিণীর নিকট গেলেন। তিনি তুলসীমঞ্চের নিকটে চরখা ও হরিনামের মালা লইয়া বসিয়া ছিলেন।

গৃহিণী। নতুন খবর কিছু আছে?

প্রফুল্ল। কিসের?

গৃহিণী। চাষের।

প্রফুল্ল। পেঁপেগুলো কল্‌কেতায় চালান হয়েছে। আখের গুড় হয়েছে। মাছগুলো বিক্রী করলে প্রায় পাঁচশ টাকা হবে। সবগুলা বিক্রী হয়ে গেলে কল্‌কেতায় গিয়ে এই সম্পত্তিটাই বিক্রীর চেষ্টা দেখ্‌তম।

গৃহিণী। তেমন বুদ্ধিমান লোক কেহ আছে?

প্রফুল্ল। গৃহিণী, তুমি আর্ট ও স্বাস্থ্যের মূল্য জাননা। অনেকের টাকা আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নাই ও কলিকাতায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পায় না। তারা এমন যায়গা পেলে ডবল্ দাম দিয়ে লুফে নেবে, মোটর গাড়ী আন্‌বে, মার্ব্বেল পাথরের ঘর তৈয়ারি ক'রবে, বাগান বাড়িয়ে ফেল্‌বে। তাদের বংশাবলীর আয়ু, বল ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হবে। আমরা সেই টাকার সুদে কাশী বাস ক'রব।

গৃহিণী। যদি দিন চলে যায় তবে অমন কাজ ক'রনা। আমাদের বংশটা কাশীতে লোপ হবার সময় যখন হবে, তখন দাঁও খুজ'। এখন চুপ ক'রে খেটে যাও।

প্রফুল্ল। নরহরি ভায়াও সেই কথা বল্‌ছিলেন। ভেবে দেখা যাক্। তিনি বল্লেন যে একটা কি ফসল হয়েছে যেটা প্রদর্শনীতে দেখান যায়।

গৃহিণী। একটা ফসল তোমার এখনকার চেহারা। দ্বিতীয় ফসল একটা লাউ এগার হাত লম্বা।

প্রফুল্ল। এগার হাত?

গৃহিণী। বোঁটা বাদে। ঐ দেখ!

প্রফুল্ল বাবু এতদিন লক্ষ্য করেন নাই। রান্নাঘরের পার্শ্বে একটা কৃষ্ণমূর্ত্তি এগার হাত লাউ শালগাছের আল্‌কাতরা মাখান খুঁটার মত দাঁড়াইয়া ছিল!

প্রফুল্ল। তাই ত! এ যে বিস্তীর্ণ ব্যাপার।

গৃহিণী। তোমার ভায়ার সারের গুণে এই অসার পদার্থ জন্মেছে। ওটাকে তুলে নিয়ে গেলে আমি বাঁচি।

প্রফুল্ল বাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন! সে বিরাট লাউ প্রদর্শনীতে দেখাইয়া তিনি দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং রায় লাউকৃষ্ণ বাহাদুর খেতাব পাইয়া ভায়া নরহরির সহিত দিন দিন কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশাবলী এখন সেই স্থানে বাস করে।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(২৪)

আজও সমস্ত দিন ধরিয়া ঝড় বহিয়া অপরাহ্ণের দিকে কমিয়া আসিয়াছিল। অচল-প্রায় সংসারকে কোনোরূপে একটু সচল করিবার আগ্রহে রমাপদ সেদিনের কোনো ইংরাজী দৈনিক সংবাদ-পত্রের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। এমন সময়ে তথায় সরমা উপস্থিত হইয়া বলিল, "হাওয়া ত' পড়ে গেছে, এখন একবার শরৎ বাবুকে নিয়ে আসবে?"

সরমার কথা রমাপদর কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণকাল

অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে সরমা বলিল, "বলি শুনছ ?"

এবার রমাপদ শুনিতে পাইল ; সংবাদ-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "শুনছি। কি বলছ বল।"

সরমা বলিল, "হাওয়া পড়ে গেছে।"

সংবাদ-পত্রের উপর যথাপূর্ব্ব মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে রমাপদ বলিল, "তা' ভালই ত হয়েছে !"

আপাততঃ বক্তব্য স্থগিত রাখিয়া সরমা স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণে সচেষ্ট হইল ; বলিল, "দয়া করে চোখ দুটো একবার এ-দিকে ফেল্‌বে কি ? মনটা যে সমস্ত চোখের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছ।"

এতক্ষণে রমাপদর সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। সংবাদ-পত্র-খানা হাত দিয়া একটু দূরে সরাইয়া দিয়া শয্যার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি বলছ বল ?"

সরমা বলিল, "বল্‌ছি। কিন্তু তার আগে, অত মন দিয়ে কি পড়ছিলে শুন্‌তে পাই কি ?"

সংবাদ-পত্রখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে রমাপদ বলিল, "ও এমন কিছু নয়।"

"এমন কিছু না হ'ক, সামান্য কিছুও ত বটে। বল না কি পড়ছিলে ?"

রাজসাহীর কোনো গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল ; রমাপদ সেই বিজ্ঞাপন পড়িতে-ছিল ; সংক্ষেপে সে-কথা সরমাকে জানাইল।

শুনিয়া সরমা বলিল, "তুমি সে চাকরী করবে নাকি ?"

"করা না করা ত পরের কথা। তার আগেকার কথা হচ্ছে পাওয়া।"

"ধর, যদি পাও ?"

"পেলে নিশ্চয়ই ক'রব।"

"মাইনে কত ?"

"চল্লিশ টাকা।"

সহসা একটা কথা মনে পড়ায় ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "রাজসাহীতে ত ভয়ানক ম্যালেরিয়া হয়।"

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থাকিয়া রমাপদ বলিল, "ভয়ানক হয় কিনা তা' ঠিক বলতে পারিনে ; কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে কি ?"

মাথা নাড়িয়া সরমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহলে তোমার সেখানে চাকরী করা হবে না।"

অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা রমাপদর ওষ্ঠাধরে স্ফুরিত হইল ; বলিল, "দেখ সরমা, ম্যালেরিয়া ত ম্যালেরিয়া—এমন কোনো জিনিষই আমার মনে হচ্ছে না যা আমার এই অবস্থার চেয়ে খারাপ বলে মনে করা যেতে পারে।"

গতরাত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সরমা রমাপদর বাক্যের মধ্যে ঈষৎ শ্লেষ-দংশন অনুভব করিতে ভুলিল না। ক্ষণকাল রমাপদর প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলিল, "শুধু তোমার অবস্থা ? আমার নয় ? আমাদের নয় ?"

খবরের কাগজটা ভাঁজ করিতে করিতে শান্ত-স্বরে রমাপদ বলিল, "তোমাদেরো ; তবে, প্রধানতঃ আমার ! কারণ, আমারি দায়িত্ব হচ্ছে—"

অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে রমাপদকে নিবৃত্ত করিয়া সরমা বলিল, "থাক্, দায়িত্বের কথা থাক্ ! সে কথা ত খুব ভাল করেই তুমি বুঝেছ, আর কাল সমস্ত রাত্রি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছ ; কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার কথা না হয় তর্কের জন্য ছেড়েই দিলাম, ঘিণ্টুকে তার এই রুগ্ন শরীরে ম্যালেরিয়ার দেশে নিয়ে যাওয়া ভাল হবে ?"

সরমার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "ঘিণ্টু কেন যাবে ? যদি যাই ত' আমি একাই যাব।"

"আর আমরা তোমাকে ছেড়ে একা ভাগলপুরে থাক্‌ব ?"

"তোমরা ভাগলপুরে থাক্‌বে কেন ? তোমরা ত কাশী যাচ্ছ !"

"সে-কি চিরদিনের জন্য ?"

আবার রমাপদর মুখে মৃদু হাস্য রেখা স্ফুরিত হইল ; বলিল, "আমি কি চিরদিনের জন্য রাজসাহী যাব সরমা ? দু-দিনের ব্যবস্থা করা যায় না, চিরদিনের ব্যবস্থা করবার দুঃসাহস কার আছে বল ?"

"তবে এ ব্যবস্থা কতদিনের জন্যে করতে চাচ্ছ ?"

"যতদিন চলে ততদিনের জন্য।"

আর কোনো কথা না বলিয়া সরমা নিবৃত্ত হইল। গত রজনী হইতে তাহার চিত্তাকাশের বায়ু-কোণে অভিমানের যে ঘন-মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, সহসা তন্মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের

'চিকিমিকি আরম্ভ হওয়ায় সে নিজেকে সম্বৃত করিতে চেষ্টা করিল।

অগত্যা রমাপদই কথা কহিল; বলিল, "তুমি যে-কথা বল্‌তে এসেছিলে কথায় কথায় সে কথা চাপা পড়ে গেছে। কি বল্‌ছিলে এবার বল শুনি।"

আরক্ত-মুখে সরমা বলিল, "সে কথা যদি দরকার হয়ত' পরে বলব। কিন্তু তুমি যদি রাগ না কর তাহলে প্রথমে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! রাগ করা ছাড়া কি আর অন্য কিছু করা যায় না? রাগই বা কেন করব? কি বল্‌বে, বল?"

একটু ইতস্তত: করিয়া আরক্ত-মুখে সরমা বলিল, "চেঞ্জের জন্য মিণ্টুকে নিয়ে কাশী যাওয়ার মধ্যে তুমি কি শুধু অন্যায়ই দেখছ?"

সরমার প্রশ্ন শুনিয়া একমুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ থাকিয়া রমাপদ বলিল, "দেখ, বার-বার এ-সব কথার আলোচনা করে কোনো লাভ নেই! কাশী যাওয়ায় আমার মত নেই সে-কথা যেমন বলেছি, আমার অমত দিয়ে তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দোব না, তা-ও তেমনি তোমাকে জানিয়েছি।"

এ কথায় নিবৃত্ত না হইয়া সরমা আরক্ত-মুখে বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি হ'লে অমতও করতাম না। ছেলের মঙ্গলের জন্যে আমি সমস্ত অহঙ্কার আর অভিমান, যাকে তুমি আত্মমর্য্যাদা বল্‌ছিলে, ভাসিয়ে দিতাম। তাছাড়া, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মেসোর সঙ্গে দু তিন মাসের জন্যে হাওয়া বদলাতে গেলে আত্ম সম্মান কি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়? তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, এ তোমার বেশী বাড়াবাড়ি কি না।"

"তোমার হিসাবে হার স্বীকার করছি সরো; এখন বল্‌বে ত বল কি বল্‌তে এসেছিলে।" বলিয়া রমাপদ খবরের কাগজখানা পুনরায় টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিবার উপক্রম করিল।

তর্কের মধ্যে সহসা রমাপদ এইরূপে হাল ছাড়িয়া দিয়া আত্ম-সমর্পণ করায় অসমাপ্ত দ্বন্দ্বের এই অনর্জ্জিত জয়ে তৃপ্ত না হইয়া ক্ষোভে ও অভিমানে সরমার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে সে বলিল, "শরৎবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এসো না। তাঁর মতে যদি মিণ্টুর চেঞ্জের কোনো দরকার না থাকে তা হলে যে সব গোলমালের শেষ হয়!"

এ কথার উত্তর দিতে গিয়া সরমার অশ্রু-সঞ্চারের উপক্রম দেখিয়া রমাপদ তাহার উদ্যত উত্তরকে যথা-সম্ভব নরম করিয়া লইয়া শান্ত-স্বরে বলিল, "তা বেশ, নিয়ে আস্‌ছি; কিন্তু শরৎবাবুর মতামত তোমার কোনো কাজে আস্‌বে না, তা দেখো।" (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

'ভারতবর্ষ' এই মাসে পঞ্চদশ-বর্ষে পদার্পণ করিল। বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষকাল যাঁহার কৃপায় 'ভারতবর্ষ' বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি। তাহার পর যে সকল মহানুভব সাহিত্যিক 'ভারতবর্ষ'কে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা যত্ন ও অনুগ্রহে 'ভারতবর্ষ' পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আর যে সকল পাঠক-পাঠিকা এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ'কে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে'র উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের গম্ভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা এই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষে'র জন্য কি করিয়াছি, না করিয়াছি, সে সকল কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভন হইবে না; তবে আমরা এ কথা বলিতে পারি, 'ভারতবর্ষ' স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে; "ভারতবর্ষ" বাঙ্গালা দেশের প্রবীণ, নবীন, হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্য-সেবকদিগকে সমভাবে সমাদরে অভিনন্দিত করিয়াছে, নবীন সেবকদিগকে উৎসাহ দানে 'ভারতবর্ষ' কখন পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, ভগবানের কৃপায়, পাঠকগণের সহৃদয় সহানুভূতিকে অমূল্য পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া

সু-সাহিত্যিকগণের সাহচর্য্যে এই পঞ্চদশবর্ষেও ভারতবর্ষ তাহার সাহিত্য-সাধনায় নিরত হইবে।

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পদে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম সার রমেশচন্দ্র মিত্র। ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান দমদমার নিকট রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে। ইনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসর বয়সে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এবং বারো তেরো বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বিচারপতি অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর ইনি হাইকোর্টের অন্যতম জজস্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, আইন-জ্ঞান ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি দুইবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজদিগের মধ্যে এ সম্মান ইনিই প্রথমে প্রাপ্ত হন। ইনি বড়-লাটের ব্যবস্থাপক সভার ও পাবলিক সারভিস্ কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে নাইট ও পরে কে-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। আদালতকে অবজ্ঞা করার অপরাধে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হাইকোর্টের ফুল-বেঞ্চের বিচারাধীন হন, তখন কেবল রমেশচন্দ্রই সুরেন্দ্রনাথের দণ্ড সম্বন্ধে অন্যান্য জজদিগের সহিত ভিন্নমত হন এবং যুক্তি-পূর্ণ সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই বহুমূত্র রোগে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। আমরা পরলোকগত সার রমেশচন্দ্রের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিবার পর শ্রীমান সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, যে সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায় সুভাষচন্দ্রকে একদিন অকস্মাৎ বঙ্গ-জননীর স্নেহের কোল হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সে সুভাষকে আর আমরা ফিরিয়া পাইলাম না—আসিলেন এক রোগজীর্ণ, শীর্ণকায়, কঙ্কালসার সুভাষচন্দ্র। তবুও, তাঁহাকে যে এই অবস্থাতেও আমরা



শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু

ফিরিয়া পাইয়াছি, তাঁহার সেবাশুশ্রূষার অবকাশ পাইয়াছি, তাহাতেই আমরা আনন্দিত, মৃত দেহের পরিবর্ত্তে যে জীবিত দেহ বঙ্গজননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই আড়াই বৎসর কাল শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য অন্তরীণে আবদ্ধ যুবকগণের মুক্তির জন্য দেশ-ব্যাপী যে কত আন্দোলন, কত আবেদন নিবেদন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; কিন্তু, রাজপুরুষগণ কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা অন্তরীণে আবদ্ধ যুবকগণকে এতই গুরুতর অপরাধে অপরাধী মনে করিয়াছেন যে,

তাঁহাদিগের অনেককে এ দেশের কোন কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখাও নিরাপদ মনে করেন নাই—সেই সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীমান সুভাষচন্দ্রও তাঁহাদের অন্যতম। বিগত বৎসর হইতেই শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সরকারী চিকিৎসকগণ প্রকৃত পক্ষে কি করিয়াছেন না করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন; তবে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, সুভাষচন্দ্রকে নিরাময় করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না। কিন্তু, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই শুনিতে পাওয়া গেল, সুভাষচন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। শেষে, রাজপুরুষগণও এ কথা স্বীকার করিলেন। তাঁহারা বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, তাঁহাকে ভারতবর্ষের ভূমিও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না; তিনি যদি নিজব্যয়ে সুইজরলণ্ডে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে চান, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। মাতৃ-ভূমির সুসন্তান, তেজস্বী, নিরপরাধ সুভাষচন্দ্র এ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এমন নির্দ্দয় দয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার আত্মাদর সঙ্কুচিত হইল। তিনি তখন একেবারে কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কম হইয়া গেল। তখনও গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া স্থির করিলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে কলিকাতায় আনিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া আলমোড়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে এবং সেখানেই যথাযোগ্য চিকিৎসা করানো হইবে। তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু, বাঙ্গালার নবাগত লাট মহোদয় সে ব্যবস্থা করিতে দেন নাই; তিনি আদেশ প্রেরণ করিলেন, তাঁহার সুসজ্জিত লঞ্চে সুভাষচন্দ্রকে গঙ্গার মধ্যে রাখা হইবে। লাট মহোদয় তাঁহার নিজের চিকিৎসককেও সুভাষচন্দ্রের রোগ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই চিকিৎসক, অপর একজন সাহেব ডাক্তার এবং সার নীলরতন ও বিধানচন্দ্র, এই চারিজনে সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অবস্থা যে ভীতিজনক এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই সংবাদ দারজিলিংয়ে লাট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তারযোগে বিনা সর্ত্তে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির আদেশ প্রেরণ করিলেন—আমরা মৃতকল্প সুভাষচন্দ্রকে ঘরে ফিরিয়া পাইলাম। কি অবস্থায় তাঁহাকে পাইলাম, তাহার আর বর্ণনা দিব না; 'ভারতবর্ষে' সুভাষচন্দ্রের বর্ত্তমান সময়ের দুইখানি প্রতিকৃতি দেখিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, কলিকাতায় আসিয়া সুভাষচন্দ্রের অবস্থা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ হইয়াছে। ভগবানের নিকট কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশের দুলাল মায়ের সুসন্তান সুভাষচন্দ্র অচিরে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভ করুন।

গত ২১শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে শুভাগমন করিলে, তিনি এখানকার নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির পরিদর্শনার্থ পদার্পণ করেন। এই স্থানে তাঁহাকে সব দেখান শুনান শেষ হইলে, শিক্ষামন্দিরের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও পরিচালকবর্গ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের যেমন ক্ষুদ্র সামর্থ্য সেই মত অভিনন্দিত করেন। পূর্ব্বে হইতে ব্যবস্থা ছিল এখান হইতেই তিনি এখানকার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মহোদয়ের ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাইবেন। সেজন্য যে সময় নির্দ্ধারিত ছিল, শিক্ষামন্দিরের দেখাশুনা এবং অভিনন্দনের উত্তরে উপদেশাদি দিতে সে সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু মন্দিরের শিক্ষয়িত্রীগণ পূর্ব্বে হইতেই মনে মনে প্রবল ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন, যে, সুযোগ পাইলেই কবির নিকট হইতে তাঁহার একটু হাতের লেখা প্রার্থনা করিবেন। সময়াভাব দেখিয়া তাঁহারা এ কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। তখন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা নীহারিকা মল্লিক, তাঁহার নারীজনসুলভ সরলতার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের বাসনার কথা কবিবরকে জানাইলেন। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও সেই সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। কবিবর সে কথা শুনিয়া তাঁহাদের নিরাশ করিলেন না। শিক্ষামন্দিরের কক্ষে বসিয়া একে একে সকলকার হাতের নূতন খাতাগুলিতে তাঁহার নাম ও তারিখ লিখিয়া, শেষের খাতাখানি হাতে লইলে উহার অধিকারিণী অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা চারুলতা সেন অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন—"আমায় শুধু নামটি লিখে দিলে হবে না—দু লাইন কবিতা লিখে দিতে হবে।"

নির্দ্ধারিত ব্যবস্থামত আর বিলম্ব করা চলে না, তথাপি তিনি এই স্নেহের আব্দার উপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই



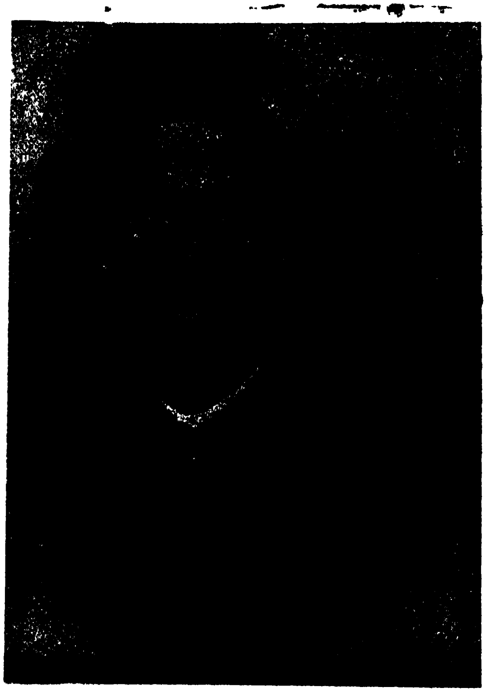
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষয়িত্রীর খাতা লইয়া নিম্নলিখিত দুই ছত্র কবিতা লিখিয়া দিলেন,—

"বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
পড়ুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে।"

এই প্রখর রৌদ্রে সারাদিনব্যাপী ব্যস্ততার মধ্যে, বিদ্যালয় গৃহে জনমণ্ডলী-পরিবৃত অবস্থায়, একজন অপরিচিতা ললনার কথা শুনিয়া, জগদ্বরেণ্য কবিগুরুর মনে হঠাৎ কোন্ সূত্রে কি ভাবিতে ভাবিতে এই সাধ বা প্রার্থনা লেখনীর মুখে বাহির হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে। যখন কবিবর নিবিষ্ট চিত্তে কবিতা দুই ছত্র লিখিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার অলক্ষিতে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার একখানি ফটো গ্রহণ করেন। সেই প্রতি-কৃতিখানির সহিত কবির লেখা দুই ছত্র কবিতা, আমরা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাপড়া-নিবাসী, কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক, ডাক্তার বিনয়লাল মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার এবার এলাহাবাদে গৃহীত আই-সি-এস্ পরীক্ষায় বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রলাল



শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই-এসসি পরীক্ষায় প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় স্থান এবং বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এই সাফল্যে পরম আনন্দিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে যশস্বী হউন।

শোক-সংবাদ

রায় ৺নিত্যচরণ নাগ বাহাদুর, বি-এল্



৺নিত্যচরণ নাগ

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বহরমপুরের রায় নিত্যচরণ নাগ বাহাদুর গত ১৭ই বৈশাখ রাত্রে কলিকাতায় হৃদ্‌রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত নাগ-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে আইন পাশ করিয়া বহরমপুর আদালতে ইনি ওকালতী আরম্ভ করেন, কিন্তু কূট আইন-ব্যবসায় তাঁহার রুচিকর না হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি জন-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। বহরমপুরের প্রায় সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ ছিল। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে ১৯১৫ সালে বহরমপুরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৯১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ ছিল তাঁহার অন্তরের মাধুর্য্য। যে কেহ একবারমাত্রও তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার নম্র আচরণ ও সরল অমায়িকতাগুণে মুগ্ধ হইতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে বহরমপুর একটি মহাপ্রাণ কর্ম্মী হারাইল। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার সদ্গতি বিধান করুন! আমরা তাঁহার শোকাহত পরিবারের গভীর শোকে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্ প্রণীত "তৃপ্তি"—২৲
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "রামধনু"—১৲
শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ প্রণীত "বর্ত্তমান জগৎ" পঞ্চমভাগ— ৪
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত "হিন্দু সংগঠন"—১৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত "আশমান তারা"—২।০
৺সিদ্ধেশ্বর রায় প্রণীত "দাদার ঘরে"—১৷০
মহাত্মা গান্ধী প্রণীত আরোগ্যদিগ্দর্শনের বঙ্গানুবাদ "স্বাস্থ্যনীতি"—১৲
শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত "স্বপনপুরী"—৸০
শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ প্রণীত "মাধবীর বিদ্রোহ"—১।০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'রাঙাবৌ"—৷৷০
শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মায়ের ডাক"—৷৷০
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "বন্দিনী রাজনন্দিনী" ৸০ ও "ডাক্তারের শয়তানী"—৸০

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1 1, Cornwallis Street, CALCUTTA.



শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

শিল্পী—শ্রীরণদাচরণ উকিল বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

ভারতবর্ষ



শ্রাবণ, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চদশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

মনের ভূত

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটিকে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ বিলাতী পণ্ডিতেরা "Song of Creation" বলিয়া তারিফ করিয়াছেন,—অবশ্য বেশ একটু-খানি "কিন্তু" রাখিয়া। History of Sanskrit Literature, Arthur A. Macdonell, Page 137—"Apart from its high literary merit, this poem is most noteworthy for the daring speculations which find utterance in so remote an age. But even here may be traced some of the main defects of Indian philosoply—lack of clearness and consistency, with a tendency to make reasoning depend on mere words. Being the only piece of sustained speculation in the Rigveda, it is the starting-point of the natural philosophy which assumed shape in the evolutionary Sankhya system. It will, moreover, always retain a general interest as the earliest specimen of Aryan philosophic thought. With the theory of the Song of Creation, that after the non-existent had developed into the existent, water came first, and then intelligence was evolved from it by heat, the cosmogonic accounts of the Brahmanas substantially agree. Here, too, the non-existent becomes the

existent, of which the first form is the waters. On these floats Hiranyagarbha, the cosmic golden egg, whence is produced the spirit that desires and creates the universe." এর সব উপর-উপর দেখা। "তত্ত্বের" চেহারা দেখিতে এবং কথা শুনিতে আমরা পাইলাম না। দেখার চোখ এবং শোনার কাণ আমরা একেবারে খোয়াইয়াছি কি? চতুর্থ মন্ত্রে "কাম" এই শব্দটি সহজ ভাবেই রহিয়াছে, কিন্তু "রেতঃ" এই শব্দটি সোজা সুজি নাই। "মনসোরেতঃ" এই পদ দুইটি রহিয়াছে। রেতঃ বলিতে যে সাধারণ রেতঃ বুঝাইতেছে না, তার প্রমাণ ঐ মন্ত্রের মধ্যেই রহিয়াছে; "মনসঃ" এই পদটি থাকায় আমরা বুঝিতেছি যে, ইহা স্থূল, "আটপৌরে" সামগ্রী নয়। সায়ণাচার্য্য "রেতঃ" মানে করিয়াছেন বীজ। ইহাতে বুঝায় যে, এই নিখিল সৃষ্টির বীজ বা মূল কারণ কাহারও মনের ভিতরে বীজভাবে বিদ্যমান ছিল।

"কাহারও মন" বলিতে গিয়া আমরা যেন অকারণ গোল বাধাইয়া না ফেলি। দর্শন শাস্ত্রে "মন" কথাটা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও বটে, আবার সাংখ্য বেদান্তেও বটে। দর্শন শাস্ত্রের এই যে পারিভাষিক মন, এটিকে সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় স্বীকার করিতে অনেকেই হয়ত নারাজ হইবেন। সাংখ্য বেদান্ত মন পদার্থটিকে খানিক পরে আনিয়া সৃষ্টির আসরে হাজির করিয়াছেন; অভিনয়ের গোড়াতে মনের কোন "পার্ট" দেন নাই। অথচ দেখিতে পাই, শ্রুতি অনেক স্থলে এবং বেদান্ত দর্শন সঙ্গে সঙ্গে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প, কামনা অথবা ঈক্ষা হইতে এই অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। এখন মনে সমস্যা জাগে যে মন যদি কোন আকারে এবং কোন ভাবে গোড়াতে না ছিল, তবে মূলের এই সঙ্কল্প, এই কামনা, এই ঈক্ষা কোথায় কেমন করিয়া জাগিল? মানসিক সত্তা ছাড়া এ সকল জাগিতে পারে কি? এসব মনের ধর্ম্ম নয় ত কার ধর্ম্ম? অতএব আমাদের বলিতে হয় যে, গোড়াতেই একটা বিরাট্ মন বিদ্যমান ছিল; সেই মনেরই সঙ্কল্প, কামনা অথবা ঈক্ষা হইতে এই সৃষ্টির চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। তবে এ কথাটা আমাদের খুব সতর্ক হইয়া বলিতে হয়। প্রথমতঃ, আমাদের ভিতরে যে বস্তুটি মনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সে বস্তুটি সসীম বস্তু—ন্যায় বৈশেষিক বলিবেন, সেটা একেবারে অণু। পক্ষান্তরে যে মনে সঙ্কল্প জাগিয়া এই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা হইয়াছে, সে মন সসীম, পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র কোন বস্তু নয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই মন আর এই মনে স্বভাবেও অনেক বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আমাদের কারবারী মন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নহে; সে যে শুধু নিজের সংস্কারের দাস এমন নয়, সে আবার বাহিরের জড়েরও গোলাম; বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতি তাকে যেভাবে নাচাইতেছে, সে, সেই ভাবেই নাচিতেছে, অবশ্য আপন সংস্কারের শিকল পায়ে দিয়াই। সেই শিকলটাই হইল আমাদের এই "পুঁতুলনাচে" পায়ের নূপুর—হয় ত সাধ করিয়াই পায়ে আমরা পরিয়াছি!

মন স্বরূপে আনন্দসত্তা সন্দেহ নাই; সুতরাং লীলার মালিক সেও বটে; কিন্তু সংস্কার এবং অবস্থার দশচক্রে পড়িয়া সে ভগবান ভূত বনিয়া গিয়াছে। এই ভূতগ্রস্ত মনের ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থাই হইতেছে সাধন। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িল,—কোন ব্যক্তি পিশাচ-সিদ্ধ হইয়াছিল। পিশাচ তাহাকে বর দিল—তোমার সকল হুকুমই আমি তামিল করিব, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও আমায় বসাইয়া রাখিতে পারিবে না। বসাইয়া রাখিয়াছ কি, তোমাকে ধরিয়া কিলাইতে থাকিব। মোট কথা, একটা না একটা কাজে আমাকে সব সময় বাহাল করিয়া রাখাই চাই। এই সর্ত্তে আমি তোমার গোলাম হইলাম। পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি এই গোলামটিকে লইয়া অতি সত্বরই বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, দুই চারিটা ফরমাইজ করেন; কিন্তু মুখ হইতে ফরমাইজ বাহির হইতে না হইতে কাজ হাঁসিল হইয়া যায়। বেচারির ফরমাইজের তহবিল সত্বরই শূন্য হইয়া গেল। তখন ভূতের কিল খাইতে খাইতে তার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয় আর কি! কাজেই ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়! গুরুজী বলিলেন, এক উপায় কর—উঠানের মাঝখানে একটা তেলালো বাঁশ পুঁতিয়া রাখ। যখনই ভূতটা বেগার বসিয়া থাকিয়া তোমাকে কিলাইতে আসিবে, তখনই বাঁশটা দেখাইয়া বলিবে—ঐ বাঁশে একবার উপরে উঠ, আবার নীচে নাম,—যতক্ষণ না অপর ফরমাইজ করি, ততক্ষণ এইরূপই করিতে থাক। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় ভূতবাবাজী জব্দ হইয়া গেল। সাধকেরা এই গল্পের মধ্যে ষট্‌চক্রভেদের রহস্য হয় ত লুক্কায়িত দেখিতে পাইবেন। ঐ তেলালো বাঁশটি আমাদের সুষুম্না মার্গ মধ্যস্থ

ব্রহ্মনাড়ী। আমাদের মনটিকে লইয়া একবার সেই নাড়ীপথে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইতে হয়—তখন হইল "সোঽহম্"। আবার সেই ব্রহ্মলোক হইতে এই স্থূল প্রপঞ্চের মাঝখানে ফিরাইয়া আনিতে হয়—তখন হইল "হংস"। চঞ্চল প্রমাথী মনটাকে এই কর্ম্মে লাগাইয়া দিতে পারিলে, সেও বেগার বসিয়া থাকিল না, আমাকেও তার কিল খাইয়া বিব্রত হইতে হইল না।

সাধকদের এসব গুহ্য কথা বাদ দিলেও, আমরা সোজা সুজিই এই গল্পের ভিতরে একটা মহা সত্য আবিষ্কার করিতে পারি। সেটা হইতেছে এই—মন আসলে আনন্দ স্বরূপ, লীলা রসিক, সুতরাং স্বাধীন, স্বতন্ত্র বটে, অর্থাৎ, সৃষ্টির মূলে যে বিরাট চৈতন্য সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র মন বেচারির স্বরূপে পার্থক্য নাই; ব্যবহারে, ঘটনাচক্রে পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। সে ঘটনাচক্র আর কিছুই নয়, মনের ভূতগ্রস্ত হওয়া; যেটা আপন ছাড়া আর কিছুই নয় সেটাকে পর ভাবিয়া, সেই পরের গোলামি স্বীকার করা। ইহারই ফলে মন বিরাট হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছে, স্বাধীন হইয়াও পরাধীন হইয়াছে, শুদ্ধ হইয়া মলিন হইয়াছে। আবার যদি কোন উপায়ে এই ভূতের বাতিকটি মনের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া নামাইতে পারা যায়, তবে আবার মন স্বরূপে যা ছিল, তাই হইল; অর্থাৎ, আবার স্বাধীন ও সত্যসঙ্কল্প হইল। সেরূপ হইলে দুনিয়ার গোড়াকার সেই মনের সহিত এ মনের তফাৎ চলিয়া গেল। এই ভৌতিক বন্দোবস্তের ফলে যে মন পয়দা হইয়াছে, সে মন লইয়া অবশ্য সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের নিদান লেখা যায় না; এ বন্দোবস্তের আগে যেমন ছিল, সেই মনই আসল মন, এবং সেই মনের "রেতঃ" ও "কাম" হইতে এই নিখিল সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। এইভাবে দেখিতে পারিলে একটা হেঁয়ালির সমাধান হইয়া যাইবে—মন ত মূলে ছিল না; যদি না ছিল, তবে মনের ধর্ম্ম, সঙ্কল্প প্রভৃতি আমরা মূলে পাইতেছি কেমন করিয়া?

গোড়ায় মন ছিল না, এ কথাও যেমন এক হিসাবে ঠিক, মন ছিল, এ কথাও তেমনি অন্য হিসাবে ঠিক। দুইটা আলাদা হিসাব, গুলাইয়া ফেলিলেই গোল; নচেৎ কোন গোল নাই। গোড়ায় যে স্বতন্ত্র, লীলাময়, অসীম চৈতন্য সত্তা, সেটিকে আমরা "মন" বলিলেও পারি, আবার না বলিলেও পারি। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, যে নামেই অভিহিত হ'ক না কেন, সেই মূল অখণ্ড চিৎ সত্তা হইতেই মন, প্রাণ এবং জড়ের নিখিল ধর্ম্মই জাগিয়া উঠিয়াছে; আবার এক দিন হয় ত এ সমস্ত তাতেই আবার লয় পাইবে। আমরা যে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির ধ্যান করি, সে ধ্যানটি এই বিরাটের আসরেও আমরা পাইতেছি না কি? বিরাটের আসরে এ অভিনয় আছে বলিয়াই, সমষ্টির ভিতরে এ খেলা চলিতেছে বলিয়াই, ক্ষুদ্রের আসরে এবং ব্যষ্টির ভিতরেও এ খেলা চলিতেছে। অখণ্ড চৈতন্য সত্তা সৃষ্টির উপক্রমে আপন খড়্গে যেন আপনাকে বলি দিতেছেন; তিনি অখণ্ড হইয়াও অখণ্ড না হ'বার মত নিজেকে দেখাইতেছেন—খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজেকে দেখাইতেছেন। ইহাই হইল তাঁহার আত্ম-বলিদান। এ মহা বলিদানের ফলে তাঁহা হইতে রুধির রূপে যে সৃষ্টির প্রবাহ নির্গত হইতেছে, সে প্রবাহেরও মুখ্যতঃ তিনটি ধারা—মন, প্রাণ, জড়; অথবা অন্যভাবে দেখিতে গেলে, শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়। এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গম বই আর কিছু নয়। তাঁহা হইতে এই তিনটি ধারা নির্গত হইয়া অনন্তের পথে নিরুদ্দেশ মহাযাত্রা করিয়া থাকে না কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া সে তিনটি ধারা আবার সেই অখণ্ড সত্তাতে গিয়া বিশ্রাম করে না কি? কোনও দিন বিশ্রাম করিবে বলিয়াই ত আমাদের মনে হয়; এবং তা যদি করে, তবে সেই দিনই হইল এ প্রপঞ্চের প্রলয়; যাহা হইতে এসব আসিয়াছিল, তাহাতেই আবার এসব ফিরিয়া গেল। ছিন্নমস্তার ধ্যানে এই ব্যাপারটিই হইল আপন রুধির আপনি পান। সে যাহা হউক, গোড়াকার সেই অখণ্ড চৈতন্য সত্তা, সেটাকে "মন" বলিতে আমাদের আপত্তি হয় হ'ক; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সেই সত্তা হইতে মনের যা কিছু ধর্ম্ম, সে সব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এবং তাতেই গিয়া সে সমস্ত লয় পাইতেছে অথবা পাইবে।

এখন আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন মনটাকে সেই বিরাট মনের মত করার প্রয়োজন হইলে আমাদের একটা ফন্দি বাহির করিয়া লইতে হয়। সে ফন্দি আর কিছুই নয়, যে ভূত আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, সেই ভূতকে তাড়াইয়া দেওয়া। তাকে তাড়ানর উপায় হইতেছে দুইটি—যদি তাকে গিলিয়া একেবারে হজম করিতে পারি, তবে ত তার হাত হইতে আমি খালাস হইলাম; আর যদি তাকে

একেবারে উগ্‌লাইয়া ফেলিতে পারি, তা হইলেও রেহাই পাইলাম। সাপে ছুঁচা গেলার অবস্থা ঘটিয়া থাকিলে যত গোল। হয় গিলিয়া ফেলিতে হইবে, নয় উগ্‌লাইয়া ফেলিতে হইবে। গিলিয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন অদ্বৈতবাদী বেদান্ত। তিনি বলিতেছেন—ওটাকে ভূত ভাবিতেছ কেন; ভূত ভাবিয়া ভয়ই বা পাও কেন? তুমি ছাড়া যখন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, সবই যখন আত্মা অথবা ব্রহ্ম, তখন ভূতই বা কি, আর ভূতের ভয়ই বা কি? অতএব এক কাজ কর, ভূতটাকে ধরিয়া স্বচ্ছন্দে গিলিয়া ফেল, আত্মসাৎ করিয়া ফেল; ভাব—ওটা চিন্ময় আত্মা বই আর কিছুই নয়। এই ভূত গিলিবার ব্যবস্থা অবশ্য চমৎকার ব্যবস্থা; তবে তিমিঙ্গিল ছাড়া এই বিশ্বভূতটাকে গিলিয়া ফেলার স্পর্দ্ধা রাখে কে? এভাবে মুক্ত হইয়াছেন কয়জন? শাস্ত্র তাই জেরা তুলিয়াছেন—"শুকো বা ব্যাসো বা বশিষ্ঠো বা"—শুকদেব কি মুক্ত হইয়াছেন, ব্যাস কি মুক্ত হইয়াছেন, বশিষ্ঠ কি মুক্ত হইয়াছেন? তা কে জানে? সে যাই হ'ক, এই এক ভাবে মনের ভূত ঝাড়ান যাইতে পারে। তাহা হইলে সেই মনে, আর স্থষ্টির গোড়াকার সেই বিরাট মনে তফাৎ থাকিল না। ভেদাভেদবাদী এবং দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ হয় ত ঠিক এই কথাটিতে সায় দিবেন না; তবে মোটামুটি এ কথাটিতে তাঁদেরও বিশেষ আপত্তি নাই। সে আলোচনা এ ক্ষেত্রে করিব না, তবে একটা কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত মনে করা চলিতে পারে—শক্তি-সঙ্কোচ হইয়াছে বলিয়া, গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, আমাদের মন আর সেই বিরাট মন এক জিনিস নয়; গণ্ডীমুক্ত হইলে এবং শক্তি অপরিমিত হইলে, দুই মনের সমীকরণ হইয়া গেল। স্থতরাং আমাদের এই মনের আদর্শ এবং মূল হইতেছে—সেই গোড়াকার মন। আমাদের এই মনের নমুনা দিয়াই সেই গোড়াকার মনটি ধরিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। গত্যন্তর নাই। আমাদের মনেই সঙ্কল্প কামনা ইত্যাদি জাগিয়া যেমন ধারা আমাদের ক্ষুদ্র এলেকার ভিতরে স্থষ্টি স্থিতি লয়ের খেলা করিতেছে, তেমনি ধারা আমরা ভাবিতে পারি যে, প্রকৃতির রাজ্যেও একটা বিরাট মনের ভিতর হইতে সঙ্কল্প কামনা প্রভৃতি জাগিয়া এই বিশ্ব-ভুবনের স্থষ্টি স্থিতি লয় করিয়া যাইতেছে। প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন আমরা বিম্বকে বুঝি, ফটো দেখিয়া যেমন ধারা আসল মানুষকে আমরা চিনি, তেমনি ধারা আমাদের মনের ভিতরে সেই বিশ্বাত্মার অনন্ত সত্তার যে কণিকাটুকু রহিয়াছে, সেই মহাবহ্নির যে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গটুকু আমাদের ভিতরেও জ্বলিতেছে, সেই কণিকা, সেই বিস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, সেই বিরাট্ অখণ্ড চিৎসত্তা কেমন ধারা, এবং কেমন করিয়া এই স্থষ্টির নিখিল অবয়বের ভিতরে তার মহা প্রেরণা চিরসজীব করিয়া রাখিয়াছে। নমুনা কেবল যে আমাদের ভিতর রহিয়াছে এমন নয়, ছোট বড় যা কিছু স্থষ্ট হইয়াছে, তার ভিতরেই ব্রহ্ম অনুপ্রবেশ করিয়াছেন; স্থতরাং, সে সবের ভিতরেই ব্রহ্ম-বস্তু নিজের নমুনা রাখিয়াছেন। সকল কারবারীই এই ভবের হাটে সেই নমুনা কিছু না কিছু নিজের দোকানে রাখিয়াছেন। নমুনাগুলির পরস্পরের মিল নাই। সকল মানুষের ভিতরে মন ও বুদ্ধি এক রকম হইয়া নাই। আবার মানুষে যে ভাবে আছে, পশু পক্ষীতে সে ভাবে নাই; এ সমস্তে যে ভাবে আছে, গাছপালায় অথবা মাটি পাথরে সে ভাবে নাই। গাছপালায় অথবা মাটি পাথরে মনের সত্তা বলিতে আমাদের শাস্ত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। বিজ্ঞানের কুণ্ঠাও বোধ করি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন এই যে হরেক রকমের নমুনা কারবারীদের দোকানে দোকানে মজুদ রহিয়াছে, সে সকলের আসল চিজটি কি, মূল বস্তুটি কি, তত্ত্বটি কি? সেই আসলটি আবিষ্কার করিতে পারিলেই, সেই Common denominatorটি বাহির করিতে পারিলে, আমরা স্থষ্টির গোড়াকার সেই বিরাট মনের রূপটি ধরিয়া ফেলিতে পারিলাম।

আসলটি চিনিয়া ফেলার উপায় হইতেছে দুইটি—দোকানে দোকানে ঘুরিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে হয়, এই হরেক রকম মালের মিলই বা কোন্ জায়গাটায় আর গরমিলই বা কোন্ জায়গাটায়। সকল নমুনার সাদৃশ্য যেখানটায়, সেইখানেই হইল আসলের স্থান। তবে এ ভাবে আসলকে চিনিয়া বাহির করিতে হইলে, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বিস্তর মেহন্নৎ করিতে হয় এবং খাটিয়া হয়রাণ হইতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ধরি ধরি করিয়াও আসলটিকে ধরিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান-বিদ্যা এই রকম ধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এক দোকানের নমুনা অন্য দোকানে যাচাই করিয়া, আসলটি বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কস্মিন্ কালেও আসল ধরা পড়িবে কি না,

তা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। ইহারই নাম হইল Inductive Method। শ' দুই আড়াই বছর হইতে বাজারে ইহার বড়ই পশার হইয়াছে; সম্প্রতি পশার একটু কমিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আসল ধরিবার অপর উপায়টি হইতেছে—"ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে। রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মিলে। তুই দম সামর্থ্যে ডুব দে রে মন, কুল-কুণ্ডলিনীর মূলে।" নমুনা হাতে করিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। নিজের ঘরে বসিয়াই নিজের নমুনা লইয়াই গুরূপদেশ মত নাড়া চাড়া করিতে থাক; নমুনাটিকে ঘষিয়া মাজিয়া ঝাড়িয়া লও; কাঁচা মাল হইলে একটুখানি জ্বাল দিয়া পাকা করিয়া লও; দেখিবে তোমার নমুনার ভিতরেই সেই আসল ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বড় বেশি গরজী হইলে চলিবে না, সবুরে মেওয়া ফলাইতে হইবে। আমাদের দেশের বাউল কর্ত্তাভজারা তাদের দেহ তত্ত্বের গানে এই আসলটি নিংড়াইয়া বাহির করার কৌশল খাসা করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন। এই দেহের খোলায় কি জানি কোন্ রসের পাক হইতেছে; কিসের জ্বালে পাক, তা গুরুই বলিতে পারেন; কিন্তু দেখিতেছি, গাদ উঠিতেছে বিস্তর। সকল গাদ কাটিয়া গিয়া জানি না কবে এই খোলার রস একেবারে সাফ হইয়া যাইবে! খোলায় ভিয়ান চাপাইয়া বেশি গরজী হইতে না কি গুরুর নিষেধ; যেমনটা রয় সয়, যেমন করিলে সহজে হয়, তেমনি ভাবে চলিতে গুরুর আজ্ঞা। এ প্রসঙ্গে এ কথার আর বিস্তার করার আবশ্যকতা নাই; তবে আমরা দেখিতেছি যে, আসলটি ধরিয়া ফেলার একটা "ঘরাও" ফান্দিও আছে; সকল দেশেই আছে, আমাদের এই ঋষি মহাজন-জুষ্ট কর্ম্মভূমিতে বিশেষ ভাবে।

ভূতটিকে গিলিয়া হজম করার ব্যবস্থা হইল এইরূপ। ভূতটিকে উগ্‌লাইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্র। তাঁরা বলেন, ও ভূত ত তুমি নও, মিছে ও ভূতের বোঝা তুমি বহিতেছ কেন, ভূতের ময়লা তুমি গায় মাখিতেছ কেন। ভূত এবং ভূতের গর্ভধারিণী প্রকৃতিকে তুমি বনবাস দাও, তুমি যেমন একা ছিলে তেমনি একা থাক, "কেবল" হও, দেখিবে তুমি শুদ্ধ নিরঞ্জন চৈতন্য মাত্র; তুমি কর্ত্তাও নও, ভোক্তা হবারও তোমার প্রয়োজন নাই। ইহাকে বলে,—"প্রকৃতি-বিবিক্ত-পুরুষ সাক্ষাৎকার"; এইটিই হইলে না কি মোক্ষ হয়। এ সিদ্ধান্তে ভূতটাকে গিলিয়া ফেলার ব্যবস্থা নাই, কেন না, পারা যেমন হজম হয় না, ভূতও সেইরূপ হজম হয় না; জোর করিয়া খাইলে গরহজম হয়, সে গরহজমের ফল হইতেছে ত্রিতাপ, যে ত্রিতাপে আমরা সংসারের জীব নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। যাহা উদরস্থ হইয়াছে, সেটিকে উগ্‌লাইয়া ফেলাই সুযুক্তি।

সে যাই হ'ক, এ সিদ্ধান্তে সৃষ্টির গোড়ায় কোনরকম একটা বিরাট্ মন আমরা পাই না—যে মন হইতে সঙ্কল্প জাগিয়া এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু তিনি "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরা সৃষ্ট পুরুষ বিশেষ"; সৃষ্টির মালিক তিনি মোটেই নন। হাল বাহালী সাংখ্য দর্শনে ত' প্রমাণের অভাব বলিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ। কাজে কাজেই, এই সিদ্ধান্তে সৃষ্টির সূচনাতেই একটা বিরাট মন এবং সেই মনের সঙ্কল্প কামনা ইত্যাদি কল্পনা করা চলে না; কেন না, সে রকম কল্পনা করিতে গেলে ঈশ্বরকে টানিয়া আনা হইল, যে ঈশ্বর সাংখ্য শাস্ত্রে তত্ত্বাবলীর নূতন বৈঠকে বসিবার জন্য এককোণে একখানা ভাঙ্গা ইঁটও পান নাই। অথচ সাংখ্য শাস্ত্র হইতেছে আস্তিক দর্শন—ঈশ্বর মানে বলিয়া আস্তিক নয়, বেদ বা শ্রুতি মানে বলিয়া আস্তিক। এখন, বেদে সৃষ্টির গোড়ায় কাম, সঙ্কল্প, তপস্যা, দীক্ষা, এ সকলই আছে আমরা দেখিয়াছি। নিরীশ্বর সাংখ্যকে এ সকল লইয়া কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের পুরাণগুলি সৃষ্টি প্রকৃতির বর্ণনায় অনেকটা সাংখ্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন; স্বয়ং গীতাও কতকটা সেইদিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিতে পাই। কিন্তু "সাংখ্যযোগ" আর সাংখ্যদর্শন এক জিনিষ নয়। বলা বাহুল্য যে, যেমন ধারা গীতায় ঈশ্বর বাদ যান নাই, পুরাণগুলিতেও তেমনি ধারা ঈশ্বর বাদ পড়েন নাই; বরঞ্চ গোড়াকার সেই একই তত্ত্ব সৃষ্টি কামনায় নিজেকে দুই করিয়া সব পয়দা করিয়াছেন লয়ে ও বিলোম ব্যবস্থা। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে।"

আমরা দেখিলাম যে, ঋগ্বেদ সংহিতা দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে যে মনের কাম ও রেতের কথা বলিয়াছেন, সে মনের হিসাবই আলাদা। তবে আমাদে

এই মন লইয়াই গোড়াকার সেই মনটিকে ধরিতে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ গোড়াকার কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে কোন কিছু বলা কহা করিতে গেলে, আমাদের আপন হিসাব লইয়াই বলা-কহা করিতে হয়। ইহাতে যদি "anthropomorphisn" হয় ত নাচার। জড়বাদীর হিসাবের চাইতে চিদ্‌বাদীর হিসাবটি পাকা। সে কথা আজ ও-দেশের দার্শনিক বলিয়া নয়, খোদ বৈজ্ঞানিকেরাও বুঝিতেছেন। Matter and Motion লইয়া আর কোন মতেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লেখা চলিতেছে না। জড়ের চাইতে প্রাণ, প্রাণের চাইতে আবার মন খাঁটি আসল তত্ত্ব। শক্তির দিক্ দিয়া এই কথা। শক্তির মূল মালেক হইতেছে আত্মা, অথবা আত্মার প্রতিনিধি, অন্তঃকরণ। আত্মায় বা চৈতন্যে যেটি স্বতন্ত্র শক্তি, মূল মালিকানা স্বত্ব, অন্তঃকরণে সে মূল স্বত্বের পত্তনি স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে; প্রাণে দরপত্তনি এবং জড়ে ছেপত্তনি। আমাদের সাধারণ হিসাবের নিম্ন আদালতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া যাইতেছে; তত্ত্ববিদ্যার উচ্চ আদালতে আপীল করিলেও এ বন্দোবস্ত একেবারে উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে সে আদালতের রায় একটু অদ্ভুত রকমের হইতে পারে। উচ্চ আদালত বলিতে পারেন—কেন, তোমরা মিছা ঝগড়া করিতেছ, মূলে তোমরা যে সকলে একই বস্তু, অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু; যে ভূত, সেই প্রাণ; সেই মন; যে মন, সেই আত্মা। একই মূল মালেক নানান্ মুখোস পরিয়া বিভিন্ন বাদী প্রতিবাদী সাজিয়াছেন, তিনি নিজেই বাদী এবং নিজেই প্রতিবাদী; তিনি নিজেই মূল মালেক এবং নিজেই পত্তনিদার; দরপত্তনি ছেপত্তনি প্রভৃতি এহাত ওহাত করবার, বেনামী করবার ফিকির বই আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য দেশও সম্প্রতি উচ্চ আদালতে মামলা রুজু করিয়া দিয়াছে; বড় বড় জাঁদরেল পণ্ডিতদের সওয়াল-জবাব এক রকম প্রায় শেষ হইতে চলিল; এখন জজ উঠিয়া গিয়া তাঁর খাস কামরায় বসিয়া যে কি রায় লিখিবেন, তাই শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা রায় অনেকটা আঁচও করিতে পারিতেছেন; রায় আর কিছুই নয়—"সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি উপাসীত"—ছান্দোগ্য শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্র। জড়ের ভিতরে জড়শক্তি রূপে, প্রাণীর ভিতরে প্রাণশক্তি রূপে, বুদ্ধিজীবীর ভিতরে চিৎশক্তি রূপে যে মূল তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তত্ত্বটি বৃক্ষের মূল কাণ্ডটার মত একই, নানা নহে; শাখা-প্রশাখা যতই বিবিধ বিচিত্র হ'ক না কেন, তাদের উদ্গম হইয়াছে, এবং তাদের নির্ভর রহিয়াছে, একই মূল কাণ্ডের স্কন্ধে।

গোড়াকার সেই মূল কাণ্ডটিকে বেদ "মন" বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এইজন্যই বেদমন্ত্রে "মনসো রেতঃ" এই পদটি আমরা দেখিতেছি। আমরা দেখিলাম যে, এই মন আমাদের সব ছোট ছোট মনের কেবল যে সমষ্টি এমন নয়, এদের আদর্শ এবং মূল স্বরূপ (prototype)। আমাদের মনের নমুনা দিয়া সে মন বুঝিতে হইলে, কতকটা নিষেধ মুখে, "নেতি নেতি" করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। যেমন, আমাদের মন ছোট; সে মন ছোট নয়; আমাদের মন পরিমিত, সে মন পরিমিত নয়; আমাদের মন পরাধীন (অবশ্য একান্ত ভাবে নয়), সে মন পরাধীন নয়; আমাদের মনে আনন্দস্বরূপ ও লীলাস্বরূপ যেন ঢাকা পড়িয়াই রহিয়াছে (অবশ্য একবারে ঢাকা পড়ে নাই), সে মনে আনন্দ ও লীলা মোটেই ঢাকা পড়ে নাই; আমাদের মন হইতেছে কার্য্য; সে মন কার্য্য নয়, কারণ; আমাদের মন হইতেছে বিকৃতি, সে মন হইতেছে প্রকৃতি; আমাদের মন হইতেছে নমুনা, সে মন হইতেছে আসল; আমাদের মন হইতেছে কলা, সে মন হইতেছে পূর্ণ। এই রকম ধারা আমাদের মনের চারিধারে যা কিছু গণ্ডী রহিয়াছে, সে গণ্ডীগুলি দূর করিয়া দিয়া তবে সেই মনকে আমাদের ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের মনের কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরের সিসৃক্ষা এবং সৃষ্টিকল্পনা এই প্রণালীতে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। দুই দিক্ বাচাইয়া হুঁসিয়ার হইয়া আমাদের চলিতে হইবে—এক দিকে এমন ভাবিলে চলিবে না যে, গোড়ায় মন-টন বলিয়া কিছুই ছিল না, কেবল জড়ই ছিল, অথবা রাত্রি ছিল; মন প্রাণ ইত্যাদি সব পরে দেখা দিয়াছে। এইটি হইল জড়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ। বেদে জড়বাদ ত নাই-ই, অজ্ঞেয়বাদ যে আকারে আছে, সে আকার দেখিয়া, সেটিকে পাশ্চাত্য agnosticism অথবা scepticisn মনে করা কোন ক্রমেই চলে না। ঋগ্বেদের সেই "নাস দাসীৎ ন সদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের মানেও ও রকম ধারা নয়, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি। এই গেল এক দিকের কথা। অন্য দিকে,

আমাদের এও ভাবিলে চলিবে না যে, গোড়াকার সেই মনটি এবং তাহার কাম রেতঃ প্রভৃতি ঠিক আমাদেরই এই "আটপৌরে" মনের এবং তাহার বৃত্তিগুলির মতন একটা কিছু। আসলে যে তাহা সেরূপ নয়, তা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। বেদ মন্ত্রের ভিতরের কোঠায় আমরা এই সব একটু খানি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছি।

কাম এবং রেতের মধ্যে আত্যন্তিক ভাবে কোন্‌টা যে আগে এবং কোন্‌টা যে পরে, কোন্‌টা যে কারণ কোন্‌টা যে কার্য্য, তা নিরূপণ করা যায় না। এক্ষেত্রে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কল্পনা করাই ভাল। সৃষ্টিও যেমন ধারা অনাদি, সৃষ্টির মূলীভূত কাম এবং রেতের পরস্পর অপেক্ষাও তেমনি ধারা চিরন্তন। কাম এবং রেতঃ এ দুইই হইতেছে শক্তির দুইটা অবস্থা; তার মধ্যে কাম হইল শক্তির ব্যক্ত অথবা পরিস্ফুট অবস্থা (Kinetic condition), আর রেতঃ হইল শক্তির অব্যক্ত অথবা অস্ফুট অবস্থা (potential condition)। একটা ছাড়িয়া যে অপরটা থাকে না, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। জড়ে, প্রাণে ও মনে সর্ব্বত্র এই দুই আকারে শক্তির খেলা চলিতেছে। তলাইয়া দেখিতে গেলে, এ ব্যাপারটিও হইতেছে ছিন্নমস্তার অভিনয়। রেতোরূপিনী শক্তি নিজেকে কামরূপে অভিব্যক্ত করিয়া আবার সেটিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মূল ব্যাপারটাই এই। কামের বর্ণ হইতেছে লাল; এই জন্য কামের অভিব্যক্তিকে আমরা রুধির-স্রাব রূপে সহজেই কল্পনা করিতে পারি। ছিন্নমস্তাভিনয়ের মূল রহস্য যে ইহাই, তা আমরা ছিন্নমস্তার পদতলে রতি-কামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীর পদতলে যেটা রহিয়াছে, সেইটাই হইল তত্ত্বের প্রকৃত চেহারা; আর দেবী নিজে হইতেছেন সেই তত্ত্বেরই রহস্য অথবা সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি। সত্য সত্যই পদতলের দিকে তাকাইয়াই তত্ত্বের রহস্য আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। গণপতি বিনায়কের বাহন হইতেছেন ইঁদুর। ঐ নেংটি ইঁদুরটিকে তুচ্ছ করিলে আমাদের চলিবে না। ঐ ইঁদুরের সাহায্যেই আমরা গণপতি রহস্যের গোপন কক্ষে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারি। ঐ ইঁদুরটি ঐখানে না থাকিলে আমরা রহস্যের কোনই কূল-কিনারা করিতে পারিতাম না। ইনি সাক্ষাৎ কালরূপী। দেবীর বাহন সিংহ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ব্রহ্মার বাহন হংস—এই রকম ধারা সকল রহস্য প্রতীক বুঝিতে হইলে আমাদের ঐ বাহনটির পানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। কালীর পদতলে শব শিব রহিয়াছেন বলিয়াই আমরা কালীর কাল রূপের ভিতরেও নিগূঢ় তত্ত্বের আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত দেখিতে পাই; নহিলে সে কাল রূপের অকূলে আমরা আদপেই থাই পাইতাম না। ঋষিরা এক একটা রহস্য সঙ্কেত বা প্রতীক ধ্যান করিয়া, তারই একপাশে চাবি-কাটিটির মত তার গূঢ় মর্ম্মের ইঙ্গিতটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন। গণেশ মূর্ত্তির রহস্য-গুহা উদ্ঘাটন করিতে হইলে যে চাবি-কাটির সাহায্যে আমরা উদ্ঘাটন করিতে পারিব, সে চাবি-কাটিটি ঐ মূষিক রূপে ধ্যান-কর্ত্তারা ঐ ধ্যানের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ মূষিকও আমাদের "মহাপূজার" একজন বখরাদার।

ছিন্নমস্তার পদতলে যেটি রহিয়াছে, তারই পানে সুধী-বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই "বিপরীত রতে রতা রতি-কামকে" জড়, প্রাণ এবং মন এই ত্রিবিধ পদার্থের অন্দর-মহলেই গোপন বিহার করিতে দেখিতেছি, এমন কি অণুর অন্দর-মহলে পর্য্যন্তও। বেদ-মন্ত্র যে কাম এবং রেতের কথা বলিলেন, সেই কাম এবং রেতঃকেই আমরা পরস্পরের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত দেখিতেছি। শক্তির অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা ফুটিয়া উঠে; এই হিসাবে অব্যক্ত শক্তি হইতেছে জননী, আর ব্যক্ত হইতেছে অপত্য। পক্ষান্তরে আবার ব্যক্ত শক্তি হইতে অব্যক্ত শক্তিরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; জোর করিয়া একটা ধনুকের ছিলা পরাইয়া দিলে এই রকম ধারা একটা ঘটনা ঘটে। আমি যে জোরটুকু ধনুকের উপর প্রয়োগ করিলাম, সে জোর গেল কোথায়? লোপ পাইল কি? না; শক্তির অক্ষর, শাশ্বতী তনু। সে বলটুকু ছিলা-পরান ঐ ধনুকের ভিতরেই অব্যক্ত ভাবে থাকিয়া গেল। যদি কোন কারণে ধনুকের ছিলা আবার খসিয়া যায়, অথবা কেহ যদি ছিলাটি কাটিয়া দেয় তবে, সেই গোপন শক্তি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই ভাবে দেখিতে গেলে ব্যক্ত হইল অব্যক্তের জনক। এ কথাটায় খেয়াল রাখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, কেন বেদের ঋষিরা ইন্দ্র অথবা অগ্নিকে আপন আপন মাতৃগণের জনকরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কথাটা শুনিতে হেঁয়ালির মত, কিন্তু এ হেঁয়ালি সৃষ্টির

সর্ব্বত্র সদাক্ষণ চলিতেছে। এ হেঁয়ালির শেষ এইখানেই নয়।

এক হিসাবে যে দুইটির ভিতরে মাতা-পুত্র সম্বন্ধ, অন্য হিসাবে সেই দুইটির ভিতরে আবার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ। ক হইতে খ জন্মিতেছে; জন্মিয়া ক'কে উপভোগ করিতেছে। সমজদারের পক্ষে এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শক্তি লইয়া যেখানে কথাবার্ত্তা, সেখানে নানান্ দিক্ দিয়া নানান্ সম্পর্ক পাতাইয়া কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। প্রাচীন পুরাণকারের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যত সব অদ্ভুত কল্পনা, সে সব একেবারে আজগবি বলিয়া উড়াইয়া দিবার আবশ্যক নাই। পুরাণে এমন কথা আছে যে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনকে গর্ভে ধরিয়া প্রসব করিলেন, পরে নিজেই আবার তিন দফা শক্তি সাজিয়া নিজের সেই তিনটি সন্তানকে স্বামিভাবে ভজনা করিলেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম সৃষ্টি কামনায় নিজেকে দুই করিলেন, এবং নিজের সেই দুইটিতে পরস্পর রমণ করিলেন; সে রমণের ফলে নিখিল প্রজাবর্গ সৃষ্টি হইল—এই রকম কথা দেখিতে পাই। পুরাণকারের আগেকার ঐ কল্পনা এবং শ্রুতির কল্পনা মূলে একই ছাঁচে ঢালাই।

তত্ত্বটি সোজাসুজি বুঝিতে গেলে এইরূপ—শক্তি অথবা শক্তিমান্ একই অখণ্ড, অদ্বৈত সত্তা। সেই সত্তা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অভিনয় চলিয়াছে। সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা যদি নিজেকে বহুধা বিভক্ত ও বিবর্ত্তিত না করে, তবে এই বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টির সংঘটন হইতেই পারে না। এখন, নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিতে গেলে, নানা ভাবে বিভক্ত করিতে হয়; আমরা সৃষ্টি ব্যাপারের মাঝে যত রকম সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি, সেই সকল রকম সম্বন্ধেই তাঁকে নিজেকে বিভক্ত করিতে হয়। তিনিই যখন এ কারবারের মূল কারবারী, এ সংসারের মূল সংসারী, তখন তাঁকে এই বিরাট সংসার পাতিতে গিয়া শুধু এক রকম সম্পর্কেই সেটি পাতিলে চলিবে কেন, শুধু মা ও ছেলে হইয়া বসিলে চলিবে কেন, স্বামী ও স্ত্রীও তাঁকে সাজিতে হইবে। এই রকম ধারা অশেষ সম্পর্ক পাতাইয়া নিজে নিজেই সাজিয়া না বসিলে, এই বিরাট বিচিত্র সংসারের আসর জমিয়া উঠে কেমন করিয়া? গাছের বীজ যদি সঙ্কল্প করিয়া থাকে,—আমি বীজ হইয়াই থাকিব, নিজেকে আর কিছু হইতে দিব না, তাহা হইলে বীজ হইতে গাছের জন্ম হইতে পারে কি? গাছের জন্ম হইতে গেলে, বীজকে দুই ভাগ কেন, নিজেকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই অসংখ্য ভাগের ভিতরে অসংখ্য রকমের সম্পর্ক পাতাইয়া লইতে হয়। গাছের মূল কাণ্ড শাখাপ্রশাখা পাতা ফুল ফল—এ সকল কতই না বিচিত্র, এবং এদের মধ্যে সম্পর্কও কত-না বিচিত্র রকমের! যে মূল বস্তু এই সৃষ্টি রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁকেও এই বৈচিত্র্যের খাতিরে নিজেকে নানান্ সাজে সাজাইতে হইয়াছে; কখনও বা মা ও ছেলে, কখনও বা স্বামী ও স্ত্রী, এই রকম আরও কত কি! যিনি কারণ রূপে কার্য্যকে প্রসব করিতেছেন, তিনিই আবার ভোক্তা হইয়া নিজের সৃষ্টিকে ভোগ করিতেছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার (৬।৪৭।১৮) সেই—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্যরূপং প্রতি চক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥"—
স্মরণ করা উচিত।

যে বেদমন্ত্রে কাম এবং রেতের কথা আছে, তার পরের মন্ত্রে এই কথা কয়টি রহিয়াছে—"রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ॥"—(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত পঞ্চমী ঋক্)। সেই মূল তত্ত্ব কেবল মাত্র যে রেতঃ অথবা বীজ স্বরূপ এমন নহে; আমরা ত আগেই বলিলাম, বীজ সঙ্কল্প করিয়া বীজ হইয়াই থাকিলে, তা হইতে গাছ জন্মে না। এই জন্য, যেটি রেতঃ, সেটি শুধু রেতঃ হইয়াই রহেন নাই। পুরুষের দেহে রেতোরূপী যে বীজটি রহিয়াছে, সেটি নারীর যোনিতে নিষিক্ত হইয়াও যদি বীজ রূপেই থাকিয়া যায়, তবে তা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। এই জন্য মূল তত্ত্বটি রেতঃ হইয়াও নিজেকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিতেছেন। এক ভাগে তিনি হইতেছেন "রেতোধা"—অর্থাৎ, রেতকে যিনি ধারণ করিয়া থাকেন, এবং "ক্ষেত্রে" যিনি রেতঃকে সেচন করিয়া থাকেন। বেদ এই রকম রেতোধার অন্য নাম দিয়াছেন "বৃষ"—যিনি বর্ষণ করেন। মূল তত্ত্ব এই ভাবে রেতোধা অথবা বৃষ সাজিয়া এই সৃষ্টির ব্যাপারটি চালাইয়াছেন এবং চালাইতেছেন। জড়ে, প্রাণে, মনে সর্ব্বত্র এই ভগবান্ বৃষকে আমরা বিচরণ করিতে দেখিতে পাই। একটা চুম্বকের কাছে খানিকটা ইস্পাত

লইয়া যাওয়া গেল। চুম্বক হইতে একটা শক্তি বাহির হইয়া আসিয়া ইস্পাতের ভিতরে প্রবেশ করিল। তার ফলে ইস্পাতও চৌম্বক-শক্তি-বিশিষ্ট হইল; অর্থাৎ, নিজের ভিতরে চুম্বকের সত্তাটি ধারণ করিল। এ ব্যাপারটিকে আমরা চুম্বকের সংসর্গে লোহার "অন্তঃসত্তা" হওয়ার ঘটনা বলিয়া সহজেই মনে করিতে পারি। চুম্বক এক্ষেত্রে হইলেন ভগবান্ বৃষ, অথবা রেতোধা। যতক্ষণ তাঁর ক্ষেত্র, লোহ, নিকটে নাই, ততক্ষণ তাঁর ভিতরে শক্তিটি অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ক্ষেত্র নিকটে উপস্থিত হইলে, সেই অব্যক্ত শক্তি, অর্থাৎ রেতঃ, কামরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেই কামের অভিব্যক্তির ফল আমরা দেখিতে পাই চুম্বকের লোহকে আকর্ষণ। এই আকর্ষণের ভিতর দিয়া, চুম্বকের রেতঃ অভিব্যক্ত হইয়া লোহের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে; লোহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে শক্তি আবার অব্যক্ত অথবা রেতঃরূপে থাকিয়া যায়। চুম্বকের প্রভাবান্বিত লোহের নিকটে অপর একখানা ইস্পাত আনিলে, সে ইস্পাত খানা হয় ক্ষেত্র, আর চুম্বক-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট আগেকার সে ইস্পাতখানা হয়, বৃষ অথবা রেতোধা। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, পহেলা নম্বরের বৃষ হইতেছেন খোদ চুম্বক, আর দোষরা নম্বরের বৃষ হইতেছেন তৎ প্রভাবান্বিত ইস্পাতখানা। যেমন ধারা একটা দীপ হইতে আর একটা দীপ জ্বালাইয়া লইতে পারা যায়, তেমনি ধারা একটা বৃষ বা রেতোধা হইতে অপর একটা বৃষ বা রেতোধা সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, সেই এক মূল বৃষ হইতে অসংখ্য বৃষের সৃষ্টি হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রে "রেতোনিষেক" চলিতেছে।

আমরা জড়ের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইলাম; আরও অনেক দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাইতে পারে, কেমন ধারা সেই মূল বৃষ জড়জগতের সর্ব্বত্রই সর্ব্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছেন। জল রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই সৃষ্টি হইতেছে না। যেই সেই জলের ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ হইল, অমনি সেই জড়ের মর্ম্মস্থলে একটা গভীর চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। জল আর জল হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিল না; তাকে দুই হইতে হইল; অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হইতে হইল। এ দৃষ্টান্তে, যাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি আসিতেছে, সেইটি হইল বৃষ; আর জল নিজে হইল সেই বৃষের ক্ষেত্র। বাতাসে খানিকটা বাষ্প মিলাইয়া রহিয়াছে, এখন জমাট বাঁধিয়া মেঘ হয় নাই। যতক্ষণ না অগ্নি তাড়িত-শক্তিরূপে সেই বাষ্পরাশির মধ্যে নিজের "বীর্য্য" সেচন করিবেন, ততক্ষণ সেই বাষ্প নিষ্ফল হইয়াই থাকিয়া যাইবে। বিদ্যুৎ-কণাগুলিকে কেন্দ্ররূপে না পাইলে জলীয় বাষ্পের জল-বিন্দু রূপে জমাট বাঁধা হয় না—এ কথা বৈজ্ঞানিকেরা ভাল মতেই জানেন; এবং আমরাও "বেদ ও বিজ্ঞানে" সে কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি। এ দৃষ্টান্তেও বিদ্যুৎরূপী অগ্নি হইতেছেন বৃষ; আর জলীয়-বাষ্প হইতেছে সেই বৃষের ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে বৃষ আপন রেতঃ সেচন করিয়া থাকেন। বেদের মধ্যে নানান্ জায়গায় আমরা এই তত্ত্ব কথাটি শুনিতে পাই। কোনো জায়গায় দেখি, অগ্নি শিশুরূপে অপের গর্ভে বিরাজ করিতেছেন; দেবতারা তাঁকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এখানে অপ হইল অগ্নির মাতৃস্থানীয়। আবার অপর কোনো কোনো জায়গায় দেখিতে পাই, অগ্নি বৃষরূপে অপের গর্ভে আপন রেতঃ সেচন করিতেছেন; তার ফলে মেঘ ও বৃষ্টি হইতেছে। কথাটা হেঁয়ালির মত শোনায়, কিন্তু কথাটা যে ঠিক, তা আমরা "বেদ ও বিজ্ঞানে" খোলসা করিয়া বলিয়াছি। কেবল জড় বলিয়া কেন, বিশ্বের ভিতরে বাহিরে, সদরে অন্দরে সর্ব্বত্র বিশ্বনাথের "বাহন" বৃষভরাজ অবাধগতি, সর্ব্বত্রগ হইয়া বেড়াইতেছেন।



দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(২৫)

আল্‌না হইতে একটা জামা লইয়া গায়ে দিয়া রমাপদ বাহির হইল শরৎবাবুর গৃহের উদ্দেশে। মিশন-স্কুলের মাঠ পার হইয়া সে যখন শরৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল, তখন শরৎবাবু রোগী এবং রোগীর আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঔষধ এবং উপদেশ দিতেছিলেন।

প্রবেশ-দ্বারে রমাপদকে প্রায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া এক ব্যক্তি ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "শরৎবাবু, একবার শীঘ্র চলুন, মেজকাকার নাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছে!"

এই 'মেজকাকার' রোগ এবং রোগের অবস্থার বিষয়ে সকল কথাই শরৎবাবু লোকমুখে অবগত ছিলেন। আগন্তুকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আর নাড়ী-শ্বাস আরম্ভ হয়নি?"

"তাও বোধ হয় হয়েছে!"

"কবিরাজ বিষ-বড়ী দেয় নি? সূচিকাভরণ?"

আগন্তুক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বোধ হয় দিয়েছে—কিন্তু কোনো ফল হয় নি!"

স্থির-নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "তা বাপু, এ অবস্থায় আমাকে ডাক্‌তে এসেছ কেন?—এখন ত তোমার বাঙ্গালীটোলায় দেবেনের খোঁজে গেলেই ভাল ছিল!"

মিনতি-পূর্ণ চক্ষে করুণা ভিক্ষা করিয়া আগন্তুক বলিল, "তা হ'ক, আপনি একবার চলুন। বাবার ভারী ইচ্ছে একবার আপনার অষুধ পড়ে।"

"তা হলে চল, তোমার বাবার ইচ্ছেটা পূর্ণ করেই আসি। কিন্তু এ ইচ্ছে তিনি যদি আর কিঞ্চিৎ আগে পূর্ণ করবার চেষ্টা করতেন, তা হলে রোগীর পক্ষে কিছু সুবিধা হবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পার্‌ত।" বলিয়া শরৎবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন এবং ভৃত্যকে দুইটি ঔষধের বাক্স গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে বলিলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন হইল না, আর এক ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল মুমূর্ষুর ছিন্ন নাড়ী একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে। নিজ আসনে বসিয়া পড়িয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে শরৎবাবু বলিলেন, "দেখ্‌লেন ত' হোমিওপ্যাথীর দুর্নাম কেমন করে হয়? আমাদের হাতে রুগী আসে প্রধানত দুটী অবস্থায়। রোগের একেবারে সূত্রপাতে যখন প্রাণের কোনো আশঙ্কা থাকে না, কাজেই যখন ওষুধ না দিলেও চলে; আর রুগীর একেবারে শেষ অবস্থায় যখন প্রাণের কোন আশা থাকে না, কাজেই তখনো ওষুধ না দিলে চলে। সুতরাং রুগী বাঁচলে আমাদের সুখ্যাতি হয় না, কিন্তু মরলে অখ্যাতি হয়।" তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কি হে রমাপদ, তুমি যখন দিব্যি পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত হয়েছ, তখন ত মনে হচ্ছে তোমার অবস্থা সূত্রপাতেরই?"

সকলে উচ্চ-স্বরে হাসিয়া উঠিল। রমাপদ স্মিত-মুখে বলিল, "আজ্ঞে না, আমার নিজের অবস্থা সূত্রপাতেরো আগের। আমি এসেছি খোকাকে দেখাবার জন্য আপনাকে একবার নিয়ে যেতে।"

"হোমিওপ্যাথী ছেড়ে অ্যালোপ্যাথী করাবে-কি-না সেই পরামর্শের জন্য না-কি ?"

পুনরায় একটা হাস্য-ধ্বনি উঠিল।

রমাপদ বলিল, "না, সে পরামর্শের জন্য নয়, তবে একটা কোনো পরামর্শের জন্য বটে।"

"আচ্ছা তাহলে বোসো ; এঁদের সেরে দিয়ে সুজাগঞ্জে যাবার মুখে প্রথমে তোমার বাড়ী হয়ে যাব।" বলিয়া শরৎবাবু অপরাপর রোগীর বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

শরৎবাবুকে লইয়া রমাপদ যখন তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন গৃহ-সম্মুখে পথে ঈশ্বর চাপকান ও শিরস্ত্রাণ পরিয়া সুসজ্জিত ঘিণ্টুকে একটা মূল্যবান পেরাম্বুলেটারে বসাইয়া ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইতেছিল। এবার আসিবার সময়ে সুকুমারী কলিকাতা হইতে ঘিণ্টুর হাওয়া খাইবার জন্য এই পেরাম্বুলেটারটি লইয়া আসিয়াছিল।

ষোল-আনা মনোযোগের মধ্যে পনেরো আনা ঈশ্বরের শিরস্ত্রাণের উজ্জ্বল রক্তাম্বরে ব্যয় করিয়া সকৌতূহলে শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কাদের বাড়ীর ছেলে রমাপদ ?"

আরক্ত মুখে রমাপদ বলিল, "আমারই ছেলে।"

"তোমার ছেলে! আমি ত চিনতেই পারি নি! তা একে আর কি দেখ্‌ব ?—এ ত বেশ আছে।"

পেরাম্বুলেটার হইতে ঘিণ্টুকে তুলিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "একবার ভিতরে চলুন! এর বিষয়ে একটু পরামর্শ আছে।"

ভিতরে গিয়া ঘিণ্টুর পেট টিপিয়া, চোখের কোলের রক্ত দেখিয়া, দেহের চামড়া টানিয়া, নাড়ী দেখিয়া, পায়ের গঠন পরীক্ষা করিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "আগেকার চেয়ে ত একটু ভালই দেখ্‌ছি। এখন পরামর্শ কি আছে বল ?"

ডাক্তারকে আহ্বানের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সুকুমারী নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্ববিধ উপদেশ দিয়া তাহার স্বামীকে উকিল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং নেপথ্য হইতে ইঙ্গিত এবং উৎসাহ পাইয়া নরেশই কথাটা খুলিয়া বলিল।

নরেশচন্দ্রের যুক্তি-বিচারের ঘাট-বাঁধা কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন "কাশীর স্বাস্থ্য এখন যখন ভাল বল্‌ছেন, তখন চেঞ্জে উপকার হবারই ত' সম্ভাবনা বেশী।"

নেপথ্যে সুকুমারীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সরমার দিকে চাহিয়া সে সহাস্য মুখে বলিল, "গরীবের কথা কি এখন মিষ্টি লাগছে সরো ? তা, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এক রকম ভালই হয়েছে, তোদের মন ঠাণ্ডা হ'ল।"

সরমা কোনো উত্তর দিল না ; ভিতরের দিকে রমাপদ চাহিলে ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে সে একাগ্র-চিত্তে রমাপদর দিকে চাহিয়া ছিল।

রমাপদ প্রথমে স্থির করিয়াছিল নিজে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না ; কিন্তু শরৎবাবুর মন্তব্যে একটা কথা পরিষ্কার হইল না মনে করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া কি একান্তই দরকার ? এখানে ভাল হবার সম্ভাবনা নেই ?"

বিচক্ষণ শরৎচন্দ্র রমাপদর এ প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পরামর্শ যে-রূপেই হউক, রমাপদর ঠিক মনঃপূত হয় নাই। প্রথমে রমাপদর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তিনি নরেশচন্দ্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি তোমার কে হন রমাপদ ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "ইনি ?—ইনি আমার ভায়রা-ভাই।"

নরেশচন্দ্র সহাস্যমুখে বলিল, "চলিত কথায় ভায়রা-ভাই ; আসলে বড় ভাই।"

ব্যস্ত হইয়া রমাপদ বলিল, "তা নিশ্চয়ই !"

শরৎবাবু সহাস্যমুখে বলিলেন, "তা হলে ভালই ত হয়েছে রমাপদ, যাও না, কিছু দিনের জন্য কাশী বেড়িয়ে এস না।"

রমাপদ বলিল, "কাশী যাওয়া ত' স্থিরই—আমি শুধু জান্‌তে চাচ্ছিলাম এখানেও ভাল হত কি-না।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "ভাল হ'ত কেন ? ভাল ত' এক রকম হয়েই গিয়েছে। তবে কি জানো ? জ্যাগ্‌ স্যুপ্‌ খাবার যার সুবিধে আছে মশুর ডালের জুস সে খাবে কেন ? কিন্তু তাই বলে জ্যাগ্‌ স্যুপ্‌ যারা খেতে পায় না তারা কি আর ভাল হয় না ? চারিদিকে চেয়ে যা দেখ্‌ছ সবই মশুর ডালের

দল। জ্যাগ্-সুপ্ আর ক'টা ?—দু চারটে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে শরৎচন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন।

নরেশচন্দ্র বলিল, "কিন্তু জ্যাগ সুপ খাবার যাদের সুবিধা আছে—জ্যাগ সুপ না খাওয়া তাদের পক্ষে অন্যায়।"

সহাস্যমুখে শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বেশ ত' সকলকে দিন কতকের জন্য কাশী নিয়ে যান না।" তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ফেরবার সময়ে আমার জন্যে একটা দাবা-ব'ড়ের বল এনো রমাপদ!"

নরেশ সাগ্রহে বলিল, "আপনি দাবা ব'ড়ে খেলেন নাকি? ফেরবার সময়ে কেন, আমরা গিয়েই একটা ভাল বল আপনাকে পাঠিয়ে দোব।"

ব্যস্ত হইয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "না, না, ও সব হাঙ্গামা করবেন না। ছেলেবেলা থেকে কেমন আমার কাশীর কথা শুনলেই দাবার বলের কথা মনে হয়। নইলে এখানেও ত' ও-সব যথেষ্ট পাওয়া যায়। ও একটা কথার কথা রমাপদকে বলছিলাম।"

শরৎচন্দ্র প্রস্থান করিলে সুকুমারী বলিল, "তোমার এ ডাক্তারটির বেশ বিবেচনা আছে বলে মনে হল রমাপদ।"

নরেশ বলিল, "মনে হবার প্রধান কারণ এই যে, তোমার বিবেচনার সঙ্গে তাঁর বিবেচনার বিশেষ কোনো বিরোধ ঘটে নি। লাল আমি তাকেই বলি যাকে আমি নিজে লাল দেখি; রমাপদ যাকে লাল দেখে তাকেই যে সব সময়ে আমি লাল বলি তা নয়।"

নরেশের এই পরিহাসে মনে-মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া সুকুমারী বলিল, "কি যে যা' তা' বল তার মানে মতলব কিছু নেই!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখলে ত রমাপদ? যে কথার নিজের মতলবের সঙ্গে যোগ থাকে না, তার মানেও থাকে না।"

সুকুমারী জানিত যে, নরেশকে কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করা যেমন সহজ, কথায় তেমন মোটেই নয়—বিশেষতঃ সে-কথা যখন পরিহাসের প্রণালীতে বহিয়া চলে। তাই কথা আর না বাড়াইয়া সে সরমাকে টানিয়া লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

নরেশ রমাপদকে বলিল, "পৃথিবীটা এমনভাবে গোল রমাপদ, যে, প্রত্যেকে মনে করে সে-ই ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবে—পৃথিবী একমাত্র তারই সেবা আর ভোগের উপযোগী হয়ে তৈরী হয়েছে। তাই নিজের স্বার্থের সঙ্গে না হিসাব করে আমরা কোনো জিনিষেরই বিচার করি নে। এ তোমার যত বয়স হবে ততই বুঝতে পারবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "এ কথা ত' আমারো বিষয়ে একই রকমে খাটে নরেশদা!"

নরেশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "তোমার এ কথা শুনলে সুকুমারী খুসী হ'ত—অত ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত না।"

রাত্রে গৃহকর্ম্মান্তে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রমাপদর নিকট উপস্থিত হইয়া সরমা দেখিল রমাপদ জাগিয়া শুইয়া আছে। শয্যাপ্রান্তে রমাপদর পদতলের দিকে বসিয়া সরমা তাহার ডান হাতখানা রমাপদর পায়ের উপর স্থাপন করিল—তাহার পর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া বাহু ধরিয়া সরমাকে নিজের কাছে খানিকটা টানিয়া আনিয়া রমাপদ বলিল, "এ তোমার কি পাগলামী হচ্ছে সরো?"

"আমার? না, তোমার? আচ্ছা, চিরকালই কি এক রকমে কাটাবে? কখনো কি আমার হাতে একটু সেবা নিতে ইচ্ছে হয় না?"

"ইচ্ছে হ'ক আর নাই হ'ক, তোমার সেবাতেই ত' জীবন কাটছে। কিন্তু তা বলে পদসেবা!"

সরমা আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এখন যেন তাহার মনে এমন একটুও উৎসাহ বা উদ্যম ছিল না যাহা লইয়া কোনো বিষয়ে বাদানুবাদ করে। রৌদ্র নাই বৃষ্টি নাই বায়ু নাই অথচ সমস্ত আকাশ সিসার মত মলিন মেঘে ভরিয়া রহিয়াছে—এরূপ নিষ্প্রভ দিবসের মত তাহার অনুদ্দীপ্ত মনে সুখ-দুঃখ, উদ্যম-উদ্দীপনার কোনো অস্তিত্ব যেন ছিল না।

"কি ভাবছ অত সরো?"

রমাপদর মুখের দিকে চাহিয়া সরমা বলিল, "ভাবছি—কার ভুল হচ্ছে; আমাদের কাশী যাওয়া, না তোমার কাশী না-যাওয়া।"

সরমার বাম বাহু দক্ষিণ হস্তে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া রমাপদ বলিল "বোধ হয় উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের এ অনিশ্চিত ব্যাপারে এখন কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া আরো বেশী ভুল হচ্ছে।"

"তুমি কি কাশী না-যাওয়া একেবারে নিশ্চয় করেছ?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "শুন্‌লে ত শরৎবাবুর মুখে মানুষ দু' দলের আছে; এক, যারা মশুর ডাল খায়; আর দ্বিতীয়, যারা ল্যাগ. সুপ খায়। আমি মশুর ডালের দলের; আমার পক্ষে ভাগলপুরই ভালো। তুমি সে জন্য কিছু ভেবো না।"

সরমা বলিল, "একলা তোমার খাওয়া দাওয়া এখানে কেমন করে চল্‌বে সে কথাও কি ভাবব না?"

"সে কথা ত' তোমার সঙ্গে কতবার হয়েছে যে কুকার আর ষ্টোভে আমার যা-কিছু রান্না অনায়াসে চলে যাবে। কুকারে ষ্টোভে রেঁধে আমি চালাতে পারি কি-না সে ত' তুমি তোমার সেবারকার অসুখের সময়ে পাঁচ-ছ' দিন নিজ-চক্ষে দেখেছিলে? তা ছাড়া, বিশুয়া থাকতে আমার যে বিশেষ-কিছু অসুবিধা হবে না এ ভরসাও ত' তোমার আছে।"

সরমা আর-কোনো কথা বলিল না; অন্যমনস্ক হইয়া সে মনে-মনে এলো-মেলো অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। রমাপদর মনও ধীরে-ধীরে নানাবিধ চিন্তার জালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া প'ড়ল। নির্ব্বাক্ নিঃশব্দে এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল।

"শুন্‌ছ?"

তন্দ্রামুক্ত হইয়া রমাপদ বলিল, "কি?"

"একটু পা-টিপ্‌তে দাও না! ভারী ইচ্ছে হচ্ছে! ধর, আর যদি—"

রমাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ তোমার এ কী সাধ হ'ল বল ত? একটু পা টিপে দিলে সত্যিই তুমি খুসী হবে?"

মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "হব।"

"তা হলে দাও। তোমাকে খুসী করবার উপায় আমার এত অল্প আছে যে একটা হঠাৎ উপস্থিত হলে সে-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।"

কোনো কথা না বলিয়া সরমা হৃষ্টচিত্তে শয্যার উপর ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর রমাপদর পদপ্রান্ত নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রমাপদর পায়ের উপর পড়িল। রমাপদ কোনো কথা বলিল না; সে জানিত এরূপ স্থলে চিকিৎসার চেষ্টায় রোগ বৃদ্ধি পায়।

(২৬)

পরদিন সকাল হইতে আর সমস্ত কাজ ভুলিয়া সরমা রমাপদর ব্যবস্থায় লাগিয়া রহিল। মুখ ধুইবার মাজন হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান করিবার গামছা, মাথা আঁচড়াইবার বুরুশ, বিছানার শিয়রের পাখা পর্য্যন্ত যত-কিছু নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সে যথাস্থানে গুছাইয়া গুছাইয়া রাখিল। বিছানার চাদরে ও বালিসের ওয়াড়ে নিজ হস্তে সাবান দিল। রমাপদর শুইবার ঘরের ঝুল ঝাড়াইল—তোষক, বালিস প্রভৃতি রৌদ্রে দেওয়াইল—খাটের নীচের ধূলা পরিষ্কার করাইল। ভাঁড়ার ঘর হইতে যত-কিছু আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিয়া কতকগুলি পাত্র ধুইয়া পুঁছিয়া প্রস্তুত করিল; তাহার পর নিজ সঞ্চিত অর্থে বিশুয়াকে দিয়া বাজার হইতে রমাপদর আহারের জন্য উৎকৃষ্ট চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, সুজি-চিনি এবং মসলা প্রভৃতি আনাইয়া পাত্রে পাত্রে ভরিয়া রাখিল।

কথায় কথায় সে বিশুয়াকে বারম্বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ বিশুনাথ, তোমার বাবুর যেন কোনো কষ্ট না হয়। বড় আত্মভোলা মানুষ। এই দেখ সুজি, চিনি, ঘি—সকালে হালুয়া করে দিয়ো। এই দেখ, এই চ্যাপ্টা বোতলে গাওয়া ঘি রইল—রোজ গরম করে পাতে দিয়ো। এই দেখ—

প্রতিবারই বিশুয়া বলে, "মা' জী, আমি নিজেই ত সব জিনিস কিনে আন্‌ছি—তোমার কোনো ভয় নেই—বাবুর কষ্ট হবে না।"

সরমা শোনে, কিন্তু তখনি ভুলিয়া গিয়া আবার বিশুয়াকে নানা প্রকার উপদেশ দেয়, অনুরোধ করে।

রমাপদ আসিয়া বলিল, "সরো, তুমি নিজের কাজ যে কিছুই কর্‌ছ না। কখন করবে?"

শুনিয়া সরমার চোখে জল আসিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "নিজের-কাজই ত' করছি।"

"কিন্তু, তোমার আর খোকার জিনিস-পত্রগুলোও ত' গুছিয়ে নিতে হবে?—সে কখন নেবে?"

"নোবো অখন। তার ঢের সময় আছে।"

"আমি তোমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে দোবো?"

"বেশ ত, পার ত' দাও না। হলদে রং-এর বড় ট্রাঙ্কটায় আমাদের দুজনের মত সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় আলমারী

থেকে বার করে ভরে দিলেই হবে। দিদি বলেছেন—বিছানা-পত্র একেবারে নেবার দরকার নেই।" বলিয়া সরমা তাহার চাবীর রিংটা খুলিয়া নতমুখে রমাপদর হাতে দিল।

কথায় বার্ত্তায়, কাজে কর্ম্মে সমস্ত দিন ধরিয়া সরমার মনের এক দিকে দুঃখ, এবং আর এক দিকে অভিমান সঞ্চিত হইতে লাগিল। কাশীর কথা ভাবিলে মনের একটা দিক বিষাদের কালো মেঘে মলিন হইয়া যায়,—ভাগলপুরের কথা মনে পড়িলে মনের অপর দিক্‌টা অভিমানের রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে! বারম্বার সরমার অকারণে কান্না আসিতে লাগিল; এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যাহা কিছু সত্তা ও সম্ভাবনা ছিল, একটা অনির্ণীত তিক্ততায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময়ে কাশী যাইবার গাড়ী। সুকুমারীর তত্ত্বাবধানে এবং ঈশ্বরের কার্য্য-কুশলতায় যথা-কালে প্রস্তুত হইতে কিছুই বাকি থাকিল না। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া রমাপদ ঘিণ্টুকে কোলে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং ট্রেণ আসিলে একটা খালি সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে সকলকে উঠাইয়া দিয়া মাল-পত্র ঠিক উঠিল কি-না দেখিবার জন্যে ব্রেক্‌-ভ্যানের দিকে চলিয়া গেল।

গাড়ীর ভিতর জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া বিমর্ষ অলস নত নেত্রে সরমা পাথর-বাঁধানো প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর চাহিয়া ছিল। ব্রেক্‌-ভ্যানের দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমাপদ সেই জানালার ধারে দাঁড়াইল। সরমা কোনো কথা বলিল না। শুধু নিঃশব্দে একবার চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় দৃষ্টি নত করিল।

সুকুমারী ঈশ্বরের সাহায্যে দ্রব্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, এবং নরেশচন্দ্র আসন্ন-বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীকে যথাসম্ভব বিশ্রম্ভা-লাপের সুযোগ দিবার জন্য প্ল্যাট্‌ফর্মে একটু দূরে দূরে পদ-চারণ করিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "আজ রবিবার; পশ্চিমে দিক্‌শূল। কাশীর দিকে আজ যাত্রা নাস্তি।"

দিন দেখিয়া যাত্রা করিবার বিষয়ে রমাপদ বা সরমা—কাহারো আস্থা ছিল না, তথাপি রমাপদর কথা শুনিয়া সরমা চমকিয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে বলিল, "এখন বল্‌ছ? আগে বল নি কেন?"

"আগে জানতাম না। এখন হরিপদ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বল্‌লেন।"

মনে মনে একটু কি ভাবিয়া সরমা বলিল, "তা হলে এ কথা এখন আমাকে না বল্‌লেই ভাল ছিল। এখন ত কোনো উপায় নেই।"

রমাপদ বলিল, "প্রথমে ভেবেছিলাম বলব না; তারপর ভাবলাম জেনে-শুনে কথাটা লুকিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। তা ছাড়া, এখন কোনো উপায় আছে কি নেই সে বিচারের ভার তোমারই উপর থাকা ভাল।"

নিমেষের জন্য সরমা রমাপদর প্রতি নিঃশব্দ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিবসের সকল তর্কের পুনরাবৃত্তি ছিল।

"চিঠি-পত্র দেবে?"

রমাপদ বলিল, "তোমার চিঠি পেলে তখনি তার উত্তর দোবো।"

সরমা পুনর্ব্বার সেইরূপ চাহিয়া দেখিল!

দূরে গার্ডের প্রথম হুইস্‌ল্ শোনা গেল। রমাপদ বলিল, "একবার খোকাকে দাও।"

সরমা তাড়াতাড়ি জানালার ফাঁক্ দিয়া ঘিণ্টুকে রমাপদর প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিল। নিমেষের জন্য একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ও মুখ-চুম্বন করিয়া রমাপদ সাবধানে ঘিণ্টুকে ফিরাইয়া দিল। তখন নরেশ গাড়ীতে উঠিয়া জানালায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুকুমারীও তাহার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বিশুয়া আগাইয়া আসিয়া নত হইয়া করযোড়ে সকলকে প্রণাম করিল।

সরমা বলিল, "বিশ্বনাথ, খুব সাবধানে থেকো তোমরা।"

বিশুয়া বলিল, "হাঁ মা'জী, আপনি কুছ ঘাবড়াবেন না।"

নরেশ বলিল, "কি-এমন দরকারী কাজের জন্যে তোমাকে ভাগলপুরে থাক্‌তে হল তা কিছুই বুঝলাম না ভাই। সরমার ইচ্ছামত তিন চার মাসের জন্যে কাশী গেলেই ত' ভাল হ'ত। দেখ, আমার মতো যদি তোমার সুবুদ্ধি থাক্‌ত তা হলে এ-সব বিষয়ে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে। স্ত্রীকে হীম্-ল্যাঞ্চ ক'রে যে সব স্বামীরা নিজেদের গাধা-বোট করে, আসলে তারাই গাধা নয়। যা হ'ক, সুবুদ্ধি একটু দেরী করে এলেও নিন্দের কথা নয়। কাশী থেকে সরমার আদেশ-পত্র পেলেই কাশী রওনা হ'য়ো।"

সুকুমারী বলিল, "ওঁর মতন হ'য়ো না রমাপদ, তবে উনি

যেমন হতে বল্‌ছেন তেমনি হ'য়ো। শীঘ্র কাশী এসো—বুঝলে?—লক্ষ্মীটি শীঘ্র এসো!"

রমাপদ কাহারো কোনো কথায় উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

গার্ডের দ্বিতীয় হুইস্‌ল্ বাজিল—সবুজ আলো সঞ্চালিত হইল—বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। রমাপদ নির্নিমেষ নেত্রে চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

সরমার মাথার স্বল্প-দৃশ্যমান বসন-প্রান্ত একটু যেন বেশী বাহির হইয়া আসিল, এবং ঘিণ্টুর মুখখানা একবার যেন নিমেষের জন্য গাড়ীর বাহিরে দেখা গেল। ক্রমশঃ গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম অতিক্রম করিয়া বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন শেষ গাড়ীর লাল আলো ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। রমাপদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌নাল ছাড়াইয়া যাওয়ার পর সিগ্‌নালের সবুজ আলো লাল হইয়া গেল। তখনো গাড়ীর লাল আলো দেখা যাইতেছিল—অবশেষে ক্ষণকাল পরে তাহা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া বনান্তরালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রমাপদ ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, "চল্ বিশুয়া, বাড়ী চল্।"

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া বিশুয়া একখানা টম্‌টম্ ভাড়া করিবার জন্য বলিল। রমাপদ বলিল, "কিছু দরকার নেই,—গ্রীষ্মকালের রাত—হেঁটে যেতেই ভাল লাগ্‌বে।"

পথ চলিতে চলিতে সম্মুখবর্ত্তী অন্ধকারে রমাপদ যেন দেখিতে লাগিল—কতকগুলা লাল সবুজ-শাদা আলো জ্বলিতেছে; তন্মধ্যে বহু উচ্চে আকাশের উপর একটা বড় লাল আলো জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে এবং নিম্নে রক্ত-রিপুর মত একটা ক্ষুদ্র লাল আলো ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া ক্রমশঃ দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে—অথচ অদৃশ্য হইতেছে না।

"বিশুয়া!"

পশ্চাৎ হইতে এক লম্ফে পার্শ্বে আসিয়া বিশুয়া বলিল, "বাবু?"

"তোর কার জন্যে বেশী মন কেমন করছে? মা'জীর জন্যে, না খোকাবাবুর জন্যে?"

উত্তর যেন বিশুয়ার ওষ্ঠাগ্রে লাগিয়াছিল; বলিল, "মা' জীর জন্যে।"

"দূর পাগ্‌লা! খোকাবাবুর জন্যে মন-কেমন করছে না?"

"খোঁকা-বাবুরও জন্যে করছে, লেকিন্ মা' জীর জন্যেই বেশী। বাবু, আপনার?"

বিশুয়ার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া রমাপদ নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। অল্পকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া পিছাইয়া আসিয়া বিশুয়া রমাপদকে পূর্ব্ববৎ অনুসরণ করিয়া চলিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বিলম্ব না করিয়া রমাপদ শুইয়া পড়িল—কিন্তু নিদ্রা আসিতে বহু বিলম্ব হইল। সে নিদ্রাও নিরুপদ্রব হইল না। রমাপদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল সম্মুখে ঘন মসীর মত দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ঊর্দ্ধে একটা বড় আলো জ্বলিতেছে, আর তাহাকে অতিক্রম করিয়া একটা ক্ষুদ্র লাল আলো অসীমের দিকে চলিয়াছে—কেবলই চলিয়াছে! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই!

রমাপদর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—দেখিল শয্যা ঘামে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

"বিশুয়া!"

পার্শ্বে ভূমির উপর বিশুয়া নিদ্রা যাইতেছিল, ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবু!"

"একটু জল দে ত';-বড় তেষ্টা পেয়েছে!"

জল দিয়া বিশুয়া বলিল, "বাবু, খোঁকাবাবুর জন্যে দিল্ ঘাবড়াচ্ছে?"

মৃদু ধমক্ দিয়া রমাপদ বলিল, "তুই ঘুমো! অসভ্য কোথাকার!"

মিশন-স্কুলের ঘড়ীতে ঘণ্টা বাজিল—রাত্রি দুইটা।

(ক্রমশঃ)

সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসাত

শ্রীকালিদাস দত্ত

মহানগরী কলিকাতার প্রায় ২৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সরিষাদহ নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। ইহা ইদানীং চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত সদর মহকুমার অধীন জয়নগর থানার মধ্যে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় রথারোহণ পূর্ব্বক ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল-পথের দক্ষিণ বিভাগের মগরাহাট ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে মোটর বাস যোগে সহজেই এখানে আসা যায়। এই স্থানটী কত প্রাচীন তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী নদীর আদিম স্রোত প্রবাহিত হইত, তৎকালে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ রূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। অধুনা উক্ত ভাগীরথী-প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহার শুষ্ক গর্ভ গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া এক্ষণে ইহার পশ্চিমে অবস্থিত আছে। কি জন্য ইহার নাম সরিষাদহ হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দহ অর্থে ঘূর্ণিযুক্ত জলময় স্থানকে বুঝায়। আমাদের বোধ হয় গঙ্গা মজিয়া আসিলেও, এখানে উহার জল গভীর ও ঘূর্ণিযুক্ত ছিল; এবং তজ্জন্য এই স্থানের ঐরূপ দহশব্দযুক্ত নাম হইয়াছে। ইহার উত্তরেও একটী স্থানের এইরূপ দহশব্দযুক্ত নাম দেখা যায়। প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর হইল এখানে লোকের বসতি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এতদঞ্চলের অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যাবৃত হইয়া সুন্দরবন রূপে রাজব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদকুলের আশ্রয়-স্থান ছিল। ইহার পূর্ব্ব দিকে দ্বারির জাঙ্গাল নামে একটী বহু পুরাতন পথ এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। উহাও অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেনেল সাহেবের অষ্টাদশ শতাব্দীর গঙ্গার বদ্বীপের মানচিত্রে এই পথটী প্রদর্শিত আছে। উহাতে দেখা যায় যে, তৎকালে ইহা গঙ্গাতীর দিয়া কালীঘাট হইতে নালুয়া পর্য্যন্ত সুগম ছিল এবং হাঁটা পথে এতদঅঞ্চলে আসিবার একমাত্র পথ ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নীলাচল গমনের জন্য প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গঙ্গার তীরে তীরে ইহারই উপর দিয়া আটীসারা গ্রাম হইতে ছত্রভোগে আসিয়াছিলেন। (১) কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণাংশে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গার বাদার অনতিদূরে ভূমি খনন কালে কাল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী প্রায় চারি ফিট উচ্চ সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিটীর একটি মুখ, চারিখানি হাত। একতম দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল কমল, অন্যতম বাম হস্তে শঙ্খ, অপর দক্ষিণ হস্ত, একটী দেবীমূর্ত্তির মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গদার উপর ও অন্যতম বামহস্ত, একটী দেব মূর্ত্তির পশ্চাৎস্থিত চক্রোপরি স্থাপিত। এই দেবমূর্ত্তিটী ত্রিভঙ্গাকারে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং বহু অলঙ্কারে সজ্জিত। দক্ষিণ দিকস্থ পূর্ব্বোক্ত দেবীমূর্ত্তিটীও ঐরূপ ভাবে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা ও বহু অলঙ্কারে ভূষিতা। বিষ্ণুমূর্ত্তিটী কুণ্ডল, অঙ্গদ, কৌস্তভ ও কিরীট প্রভৃতি বহু অলঙ্কারে সজ্জিত ও একটী অপেক্ষাকৃত বড় প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। ইহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে গোলাকারে তেজপুঞ্জ। গলদেশে আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশাবলম্বী যজ্ঞোপবীত। পাদপীঠের নিম্নে গরুড় সব্যজানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় উপবিষ্ট। হেমাদ্রি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর অনুসারে এইরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম বাসুদেব; এবং বামপার্শ্বস্থ দেবমূর্ত্তিটী স্বয়ং চক্র, উহার নাম লম্বোদর ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেবীমূর্ত্তিটীর নাম সুলোচনা, উনি আর কেহ নহেন স্বয়ং গদা দেবী। হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডে উক্তরূপ বাসুদেব মূর্ত্তির যে বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই :—

একবক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ সৌম্যরূপঃ সুদর্শনঃ।
পীতাম্বরশ্চ মেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥

---

(১) উক্ত ভাগীরথী প্রবাহের ও এই পথের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে মল্লিখিত "আদিগঙ্গাতীরস্থ সুন্দর বনের কথা" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা।
বরাভরণ যুক্তেন কুণ্ডলোত্তর ভূষিণা॥
উরসা কৌস্তুভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা॥
শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ।
পুষ্টিশ্লিষ্টায়ত ভুজস্তস্তাম্র নখাঙ্গুলিঃ॥
মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গ-শোভিতেন সুচারুণা।
স্ত্রীরূপধারিণী-ক্ষৌণী কার্য্যা তৎপদমধ্যগা॥
তৎকরস্থাঙ্ঘ্রি যুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
তালান্তর পদন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিক্রান্ত-দক্ষিণঃ॥
অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শিত-বিস্মিতা।
দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্য জান্ববলম্বিনা॥
বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী।
যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম্॥
উৎফুল্ল-কমলং পানৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে।
বামপানিং গতং শঙ্খং শঙ্খাকারন্তু কারয়েৎ॥
দক্ষিণেতু গদাদেবী তনুমধ্যা সুলোচনা।
স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা॥
পশ্যন্তি দেবদেবেশং কার্য্যাচামরধারিণী।
কার্য্যাস্তন্মূর্দ্ধি বিন্যস্তং দেবহস্তস্ত দক্ষিণম্॥
বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদর স্তথা।
সর্ব্বাভরণ সংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥
কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণ-তৎপরঃ।
কার্য্যং দেবকরং বামং বিন্যস্তং তস্য মূর্দ্ধণি॥

হেমাদ্রি ব্রতখণ্ড। ১ম অধ্যায়

এই বর্ণনার সহিত ঐ মূর্ত্তিটীর সুক্ষ্মরূপে মিল না হইলেও যতদূর মিল হয় তাহাতে উহাকে নিশ্চিত-রূপে উক্ত বাসুদেব-মূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার সহিত উক্ত বর্ণনার যেরূপ অসামঞ্জস্য আছে, শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তির ঐরূপ অসামঞ্জস্য প্রায়ই দেখা যায়। ইহার কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয় নামক পুস্তকে যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই :—

"বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচায়ক প্রমাণ যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের এক একটীর সহিত সুক্ষ্মরূপে মিলাইয়া দেখিতে গেলে এমন বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, যাহা প্রমাণের সহিত ঠিক মিলিয়া যায়।...ইহার কারণ যে কি, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। তবে আমার মনে হয়,



সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত বাসুদেব-মূর্ত্তি

মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা স্থপতিরা বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সময় শাস্ত্রবচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিত না। বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি ধারণরূপ ব্যাপার সাধারণতঃ হিন্দুমাত্রেরই বিদিত। সেই সাধারণ জ্ঞান অনুসারেই স্থপতিরা বোধ হয় বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিত।" (২) যে স্থানে ঐ মূর্ত্তিটী পাওয়া যায়—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় ভূগর্ভ খননকালে একটা কারুকার্য্য-খোদিত প্রায় ১০ ফিট উচ্চ কাল প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা আজিও সেখানে একটি বটবৃক্ষের নিম্নে পড়িয়া আছে।



সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভ



কাজির ডাঙ্গায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

উহার সমগ্র অংশ একটী প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া নির্ম্মিত। কথিত আছে, ঐ সময় তথাকার ভূগর্ভে ঐরূপ তিন চারিটী প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাংশ দেখা গিয়াছিল। আমাদের বোধ হয়, ঐ থামগুলি, উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিটীর যে মন্দির ছিল, তাহারই অঙ্গীভূত ছিল। ইহার সন্নিকটে এক স্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত পুরাতন ঘাটের ভগ্নাংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ—সেখানে ভূগর্ভে বহুসংখ্যক ইষ্টকরাশি প্রোথিত আছে। স্থানটীর অবস্থা দেখিলে উক্ত প্রবাদ একবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উত্তর দিকে মজিলপুরের জমিদার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছারি বাটী অবস্থিত। এই কাছারি বাটীর সংলগ্ন একটী পুষ্করিণীর সংস্কার-কালেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী কাল-পাথরের সুন্দর নৃসিংহ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইহা আমার নিকট হইতে কলিকাতা মিউজিয়ামে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে, নৃসিংহদেব পাদপীঠের উপর পতিত জনৈক দৈত্যের শরীরোপরি পাদদ্বয় রাখিয়া বামজানুর উপর হিরণ্য-কশিপুকে শায়িত করাইয়া দুই হস্তে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিতেছেন—প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার এক দক্ষিণ হস্তে চক্র ও এক বামহস্তে শঙ্খ আছে। দক্ষিণে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মহস্তে শ্রীদেবী দণ্ডায়মানা। ঐ পদ্মটী হিরণ্যকশিপুর পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়াছে। বামে

(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়। সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী। সংখ্যা ৭১। পৃষ্ঠা ৩১৫

ত্রিভঙ্গাকারে পুষ্টিদেবী বীণাহস্তে দণ্ডায়মানা। নৃসিংহদেবের মস্তকের কেশরসমূহ কিরণচ্ছটার ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। তদুপরি একটি মুকুট। মুকুটের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুইটী উড্ডীয়মান দেবমূর্ত্তি আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। পাদপীঠের নিম্নে শ্রী ও পুষ্টিদেবীর পদতলে দৈত্যগণ ভীত হইয়া বামপদ ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া করযোড়ে



সরিষাদহ গ্রামে আবিষ্কৃত নৃসিংহমূর্ত্তি

উপবিষ্ট। উহা ব্যতীত এইখানে একটি প্রায় ৩॥০ ফিট উচ্চ কাল-প্রস্তরের পেনেটসহ শিবলিঙ্গও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নভাগ ছয়কোণা। পেনেটটী হইতে আবশ্যক মত লিঙ্গমূর্ত্তিটাকে স্থানান্তরিত করা যায়। এই লিঙ্গমূর্ত্তিটী এক্ষণে উক্ত কাছারি-বাটীর উত্তরে একটী বহু প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে রক্ষিত আছে। সরিষাদহ প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু অধিবাসিগণ তথায় উহার পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানের উত্তর দিকে কাজীর ডাঙ্গা নামক একটী জঙ্গলাবৃত স্থান দেখা যায়। এখানেও কিছু দিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আজিও অন্য কোথাও এরূপ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। লতা-পাতার ন্যায় গুটান কারুকার্য্য-খোদিত একটী চক্রমধ্যে দ্বাদশটী অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্মপল্লব। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কারুকার্য্যশোভিত একটী ক্ষুদ্রতর চক্রমধ্যে গরুড়োপরি ত্রিভঙ্গাকারে দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহার পাদদ্বয় গরুড়ের দুইটী পক্ষোপরি স্থাপিত। দক্ষিণোর্দ্ধ ও বামোর্দ্ধ হস্তদ্বয় মস্তকোপরি অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় ন্যস্ত এবং দক্ষিণাধঃ হস্তে গদা ও বামাধঃ হস্তে চক্র। গলে আজানুলম্বিত বনমালা, কর্ণে কুণ্ডল, হস্ত-চতুষ্টয়ে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার। গরুড় দক্ষিণ ও বামজানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় উপবিষ্ট। সমগ্র চক্রটী দ্বাদশটী প্রস্ফুটিত পদ্মশ্রেণীর উপর রক্ষিত। উহা বসাইবার একটী স্বতন্ত্র গোলাকার পদ্মাসনও আছে। উহারও উপরিভাগে দ্বাদশটী প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত আছে। মূর্ত্তিটীর বিশেষত্ব এই যে, উহার উভয় দিকই সমভাগে খোদিত। দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, উহা স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল এবং উভয় দিক হইতে লোকে সমভাবে দেব-দর্শন করিত। এই কাজীর ডাঙ্গা নামক স্থানটী বহুসংখ্যক প্রাচীন ইষ্টক-সমাকীর্ণ। আমার বোধ হয়, এই স্থান খনন করিলে এখনও বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। ইহার উপর কয়েকটী মুসলমানের কবর আছে বলিয়াই লোকে এখনও স্থানটী খনন করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরিউক্ত নিদর্শনগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে গঙ্গা-তীরস্থ এই সকল স্থানে বিষ্ণুমন্দিরের সংখ্যাই অধিক ছিল। এই মূর্ত্তিগুলি কত দিনের প্রাচীন তাহা জানা যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাল ও সেন রাজ-গণের সময়েই বঙ্গদেশে ঐরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত।

এই সরিষাদহ গ্রামের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানটীও পুরাতন। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পুরাকালে উজানি নগরের প্রসিদ্ধ বণিক ধনপতি দত্তের পুত্র শ্রীমন্ত ভাগীরথী-পথে সিংহল যাত্রাকালে এই স্থানে আসিয়া শতবারার (৩) উপাসনা করিয়াছিলেন।

(৩) বারা—ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নাম।

তজ্জন্য ইহা বারাশত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যে উক্ত ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরদ্বয়ের ভাগীরথী-পথে সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে এই স্থানের নামোল্লেখ দেখা যায়। যথা :—

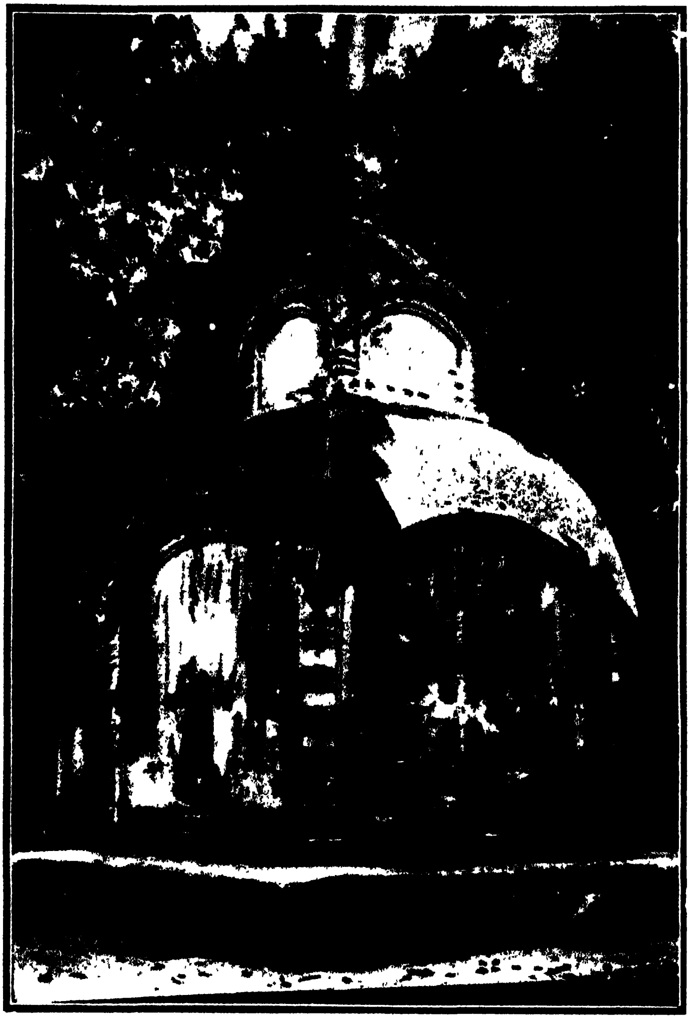
"বালুঘাটা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
কালীঘাটে এল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বয়ে যায় মাইনগর॥
নাচনগাছা,বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী--এলাহাবাদ সংস্করণ॥

এখানে এক্ষণে যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আদিমহেশ নামক এক অনাদি শিবলিঙ্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লিঙ্গমূর্ত্তিটী মাটীর নিম্নে জলমধ্যে বিদ্যমান। সিঁড়ী দিয়া প্রায় ৯।১০ ফিট নীচে নামিয়া গিয়া মূর্ত্তিটিকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রবাদ—এখানে উহার যে মন্দির দেখা যায় উহা আদিমহেশের প্রাচীন মন্দির নহে। ঐ মন্দির প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত নিমতানিবাসী কবি কৃষ্ণরায়ের ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান রায়মঙ্গল কাব্যে জনৈক সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে সদানন্দ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ॥
বাদ্য বাজে সুমধুর, বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর,
জয়নগর করিলা পশ্চাৎ॥
সঘনে দামামা ধ্বনি, শুনি রায় গুণমনি,
বহুসোত্র বাহিল আনন্দে।
'বারাসাতে উপনীত, হইয়া সাধু হরষিত
পুজিল ঠাকুর সদানন্দে॥"

ইহার পরে ১৬৪৮ শকাব্দে রচিত কবি অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণের পুঁথিতেও দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে রত্নাকর নামক একজন সওদাগর ভাগীরথী-পথে বাণিজ্য-যাত্রাকালে বারাসাতে আসিয়া নানারূপ উপহার দিয়া ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন।



আদি মহেশ্বর মন্দির—দক্ষিণ বারাসাত

"কালীঘাট পরিহরি বেয়ে চলে দ্রুত তরী
মহা আনন্দিত সদাগর।
বাজে দামা দড় মাশা বামে রহে গ্রাম রসা
গীত গায় গাঠের গাবর।
সাকুভাকু সাঁর ডাঁটা বাহিল বৈষ্ণবঘাটা
করে সব হরি হরি রব ॥
• বারুইপুরের পর রত্নাকর সওদাগর
সাধুঘাটা করিল পশ্চাৎ।
বারাসাত গ্রামে গিয়া নানা উপহার দিয়া
পূজা কৈল অনাদী বিশ্বনাথ ॥"

কিছুদিন পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার শাখা বিভাগের অন্তর্গত ২২ নম্বর লাট—বকুলতলায় ও বারুইপুরের সন্নিকটে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচানকালে আদিগঙ্গা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্বোক্ত সরিষাদহ প্রভৃতি স্থান প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী মণ্ডলের ও পশ্চিমতীরস্থ এই দক্ষিণ বারাসাত প্রভৃতি গ্রাম পুরাতন বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে মল্লিখিত—"আদি গঙ্গাতীরস্থ সুন্দরবনের কথা" নামক প্রবন্ধে উক্ত তাম্রশাসন দুইখানির কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আইন আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মুসলমান শাসন সময়ে এই সকল স্থান সরকার সাতগাঁর অধীন ছিল। ইংরাজ আমলে ১১৯০ সালের যে জরিপ হয়, ঐ কাগজেও এতদ্ অঞ্চল উক্ত সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল স্থান বরিদহাটী ও ময়দা পরগণার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন বিবরণাদি পাঠে জানা যায় যে, এই পরগণাগুলির খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হইয়াছিল। সুলতান সুজার আমলের জমাবন্দী কাগজে ইহাদের নাম দেখা যায়। আইন্ আকবরী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা টোডরমল্লের জরিপ-জমাবন্দীকালে উহাদের অস্তিত্ব ছিল না। তখন এতদ্ অঞ্চলে কেবলমাত্র হাতীয়াগড়, মুড়াগাছা ও মেদিনীমল্ল এই তিনটি পরগণা বিদ্যমান ছিল।

রঙ্গের খেলা

শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

শ্রাবণ-ধারা নাহিক এখন
নাহিক পবন-বেগ,
মেদিনীর আজ শান্ত মূরতি
শান্ত সারাটী দেশ।
মৃদু হিল্লোলে বহিছে পবন
বহিয়া ফুলের গন্ধ,
বঁধুয়া কাঁখে গাগরী লইয়ে
যায় সরে মৃদু মন্দ।
সরোবরে সেথা রঙ্গের খেলা
রঙ্গেতে রঙ্গিল-ঘাট,
আনন্দেতে মাতি' ব্রজবালারা
ভুলেছে আপন-পাট।
রঙ্গিল বসন জড়িত অঙ্গে
জড়িত সরমে তা'রা,
হোলীর দিন আনন্দে মাতিয়া
হয়েছে আপন-হারা।
কভু যমুনা পুলিনে কভু বা
সরসীর তীরে তীরে,
ব্রজ-নন্দন দিতেছে রঙ্গিয়া
ব্রজ-বালে ঘিরে ঘিরে
আনন্দ-মদিরা পিয়েছে আজি
যত ব্রজ-নর-নারী,
খেলিছে সবাই আবীর মাখি'
ছড়ায়ে রঙ্গিণ-বারি।
মরত হইল স্বরগ আজি
স্পর্শি ব্রজ-নর-নারী,
চরণ-রেণু এখন রয়েছে
ব্রজের হৃদয় ভরি।

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২০)

দিন যায়-না যায়-না করিয়াও দিন কাটিয়া যাইতেছিল। সুখে বলিলে সত্যের অপচয় হয়; যেহেতু বীথির মনে তিলার্দ্ধের জন্যও সুখ ছিল না; সর্ব্বদাই কি একটা উৎকণ্ঠায় সে দিন কাটাইতেছিল।

এখানে সামান্য একটী টিচার সে, বেতন মাত্র ত্রিশ টাকা। ইহার অধিক তাহার পরিচয় কেহই জানিত না। বীথি চাল চলনে আচারে ব্যবহারে কোন দিনই তাহার পূর্ব্বের ভাব দেখায় নাই, সে যেন তাহার এই অবস্থাতেই পরম সুখী, এমনই ভাব দেখাইত।

যখনই ছুটি পাইত, তখনই অতীতের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত। সে যতই অতীতকে ভুলিয়া বর্ত্তমান লইয়া সুখী হইবে মনে করিতে চাহিত, অতীত ততই জোর করিয়া বর্ত্তমানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত।

সে তো কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে নাই। কেবল দিদিমাকে মা-বাপের ভ্রূকুটী হইতে বাঁচাইবার জন্যই সে শেষটায় রাজি হইয়াছিল। নিজের পানে সে কোন দিনই তাকায় নাই, নিজেকে সে সংসারের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

সময় সময় সে অবাক হইয়া ভাবিত, সে কি সেই বীথি, যে এক দিন কাকিমাকে স্বামীভক্তি সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল—হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য মনে করাইয়া দিয়াছিল? নিজের বেলায় সে সব কথা সে ভুলিয়া গেল কেমন করিয়া, এই যে আশ্চর্য্য কথা! লোকে কি শুনিয়া হাসিবে না—সে যে উপদেশ দিয়াছে, কাজের সময় নিজেই সে ঠিক তাহার বিপরীত পথেই চলিয়াছে।

তখনি মনে হইত—না, অন্যায় সে কিছুমাত্র করে নাই। যদি তাহার কাকিমার অবস্থা তাহার মত হইত, তাহা হইলে সে ঠিক এই উপদেশই দিত। তাহার কাকিমার তো তাহার মত অবস্থা ঘটে নাই। তাহার কাকা স্ত্রীকে পরিত্যাগই করিয়াছেন, কাহারও পায়ে অর্ঘ্য দিতে তো লইয়া যান নাই! তিনি জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিলাত গিয়াছেন। অর্থ ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না, তাই তিনি ধনবতী ইলাকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি কাকিমার ভক্তির আধার যে স্বামী সেই স্বামীই রহিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু হায়, তাহার স্বামী—!

বীথির দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িত। আর্ত্ত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিত, "ভগবান, প্রভু, আমার কথা আমায় ভুলিয়ে দাও, কোন কথা যেন আমার মনে না জেগে ওঠে প্রভু!"

হায় রে, তবুও যে মনে পড়ে, সেই জন্যই যে সে কিছুতেই একা থাকিতে চায় না,—পাছে একা থাকিতে গেলে সেই সব কথা তাহার মনে পড়ে! বেশীর ভাগ সময় সে হেডমিষ্ট্রেস মিস রায়ের কাছে কাটাইয়া দিত।

সেদিন মিস্ রায়ের সহিত তাহার সতীধর্ম্ম লইয়া খানিকটা আলোচনা চলিতেছিল।

মিস রায় প্রবীণা, এম-এ; অনেক দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন। স্কুলের কাজেই তিনি তাঁহার সময় কাটান নাই, সকলের সহিত সাংসারিক আলোচনা, ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া, নানা রকমের বই পড়িয়া তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি ছোট বড়, উচ্চ নীচ সকলকেই সস্নেহ ব্যবহারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। যেখানে তিনি যাইতেন সেখানে দুদিনেই তিনি আপামর সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা নিজের পানে আকর্ষিত করিয়া লইতে পারিতেন, তাঁহার গুণাবলী তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিত।

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তিনি বেহুলার-উপাখ্যান পড়িতেছিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, দুপুরের দিকে কোন কাজকর্ম্ম ছিল না। বীথিও নিজের গৃহে শুইয়া পড়িয়া, বই পড়া বা নিদ্রা দুইয়ের মধ্যে কোনটাকেই আয়ত্তে আনিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মিস রায় সব টিচারদের চেয়ে তাহাকে ভালবাসিতেন, অনেক সময় তাহাকে নিজের কাছে রাখিতেন। এই সুন্দরী তরুণীটির মুখে

এত দিনের মধ্যে একবার মুহূর্তের জন্যও তিনি যথার্থ প্রসন্নতার হাসি দেখিতে পান নাই। ইহার অন্তরে যে একটা দারুণ ব্যথার আঘাত বাজিয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিতেন, তথাপি কোন দিন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কষ্টে-চাপিয়া-রাখা ব্যথাটাকে বাড়াইয়া তুলিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি বীথির পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বীথি যে তাঁহার কথা এড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

দরজার পর্দাটা একটুখানি সরাইয়া বীথি উঁকি দিয়া দেখিল। তাহার পর কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "এই তো মা, আপনি জেগেই আছেন। মতিয়া আগেই আমায় ভাগাবার চেষ্টা করেছিল। সে বললে, আপনি ঘুমিয়েছেন। শুনে ফিরে যাওয়ার বেলায় মনে ভাবলুম, একবার দেখেই যাই।"

বইখানা পাশে ফেলিয়া মিস রায় উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ে কিনা তুমি, তাই মায়ের প্রকৃতি ঠিক জেনেছ। আমি যে দিনের বেলা কিছুতেই ঘুমাতে পারিনে, সেটা তোমার অন্তর বেশ জানে বলেই তোমায় আমার পানে টেনে এনেছে। বস মা, এই বিছানাটাতেই বস, অত দূরে আর বস্‌তে হবে না।"

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বীথি বলিল, "এখানা কি বই পড়ছিলেন মা, দেখি।"

বইখানা তুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মিস রায় বলিলেন, "আমাদেরই দেশের একটী মেয়ের পুণ্যকাহিনী। কত দিন আগে এক দিন যা সত্যরূপেই লোকে দেখতে পেয়েছে মা, আমরা আজ তাই উপকথার মত পড়ে যাচ্ছি মাত্র।"

বইয়ের পাতা উলটাইতে উলটাইতে বীথি বলিল, "আপনি কি এ সব বিশ্বাস করেন মা?"

মৃদু হাসিয়া মিস রায় বলিলেন, "করি বই কি।"

বীথি গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু অনেকে এ সব কথা গল্প বলেই উড়িয়ে দিতে চান। এঁরা চাক্ষুস প্রমাণ চান; নইলে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না।"

মিস রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, এক শ্রেণীর লোক এ রকম আছেন বটে, তা আমি জানি। এখন কথা হচ্ছে কি—এ রকম সন্দেহবাদী লোকদের চাক্ষুস প্রমাণ দিতে অতীত কালকে টেনে আনাই মুস্কিল। ভবিষ্যৎ হয় তো কোন দিন অতীতের অনুরূপ একটা দৃশ্য দেখাতে পারে, এঁরা সেইটেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, এত বড় একটা সত্যকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে আমার মন কিছুতেই চায় নি মা, তাই আমি বিনা প্রমাণেই একে গ্রহণ করেছি। যাঁরা শুধু বাস্তব জগৎটা নিয়েই থাকতে চান, বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট হতে চান, পেছনে বা সামনে কোন দিকেই দৃষ্টি দেন না বা কোনটার কথাই ভাবতে চান না, তাঁরাই এ সব কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে চান, একটা কথায় সব শেষ করে দিতে চান। যাঁদের ভবিষ্যৎ বা অতীত নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে, তাঁরাই এর মধ্যে দিয়ে সত্য খুঁজে বার করেন, মিথ্যাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেন। জগতে কিছুই খাঁটি থাকে না মা, সত্যর সঙ্গেও অনেকটা মিথ্যা জড়ানো থাকে বই কি! বেছে দিতে পারলে কি আনন্দ যে হৃদয়ে পাওয়া যায়, তা যারা নেয় তারাই জানে। পরের দেশের কোন অতীতের কথা, তা সত্য হতে পারে মা; নিজের দেশের কালকের কথা আমরা সত্য বলে মানতে চাইনে, জানলেও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেই—এইটুকুই আমাদের বিশেষত্ব। নিজের দেশে কত মহামূল্য রত্ন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যায়,—এ দেশবাসী পরের দেশে মাটি খুঁড়ে কাচ তুলতে যায়। নিজের দেশের ইতিহাস গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, আমাদের ছেলেমেয়েরা পরের দেশের ইতিহাস মুখস্থ করে মরে। এ দেশবাসী কি ভাবে জীবন যাপন করে, সে খবর আমরা রাখিনে,—পরের দেশে কে কি খায়, কে কেমন পোষাক পরে, কে কখন শোয়—সে খবরটা আমরা বিশেষ করে নিই। আজকাল দেশের কেউ কেউ নষ্ট ইতিহাস পুনরুদ্ধার-কল্পে চেষ্টা করছেন,—এ দেশের মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণ-গ্রন্থের মধ্যেও যে সত্য আছে, সেটার প্রমাণ দিচ্ছেন। এখন কাউকে কাউকে স্বীকার করতে হচ্ছে—হ্যাঁ, এ দেশে এক দিন রাবণ রাজাও ছিল, রামও ছিল। এ দেশের সেকালের পুষ্পক রথকে মাঝে লোকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেছে, দশরথের শব্দভেদী বাণকে লোকে গাঁজাখুরি কথা বলে হেসেছে, কিন্তু আজ তো তা চলছে না মা। এই জার্ম্মাণ যুদ্ধে এরোপ্লেন—মানুষ-মারা নানারকম প্রণালী দেখে বিশ্বাস করতে হয়েছে, সেকালে এ সবই ছিল। প্রমাণ আনতে অতীতই বর্ত্তমান

রূপে দেখা দিচ্ছে, একে কি আর ঠেকিয়ে রাখবার যো আছে মা ?”

কথাটা শেষ করিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন, “তবে রামায়ণে কুম্ভকর্ণের সেই আশ্চর্য্য খাওয়া আর ঘুমটা আমি কিন্তু সত্যিকার বলে ধরতে পারব না মা, কিম্বা শ্রীমন্ত যে দেখেছিল এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী জলের উপর বসে একটা হাতী গলাধঃ করছে আবার বার কচ্ছে—এও আমি কোন দিন বিশ্বাস করতে পারব না। ওই যে কথাই আছে মা—হয় যদি এতটুকু, লোকে তা বাড়িয়ে এতখানি করে। কবি এঁকেছেন বড় সুন্দরী মেয়ে, সময়টা এবং স্থানটাও তেমনি সুন্দর—সবগুলিই আমাদের মনের ওপর দাগ দিতে পারে; কিন্তু এর মধ্যে ওই খানিকটে বীভৎসভাব এনে ফেলবার কারণ কি, তা বুঝতে পারি নে। কুম্ভকর্ণের খাওয়া আর ঘুমের কথা মনে হলেই আমার হাসি পায়।”

সে হাসিতে যোগ না দিয়া বীথি তেমনি গম্ভীরস্বরে বলিল, “কিন্তু মা, বেহুলা যে মরা স্বামী নিয়ে ভেলা ভাসিয়েছিল, তার পর দেবতারা তার নাচগানে প্রীত হয়ে তার সেই স্বামীর মরা দেহে জীবন ফিরিয়ে দিলেন, তারা স্বামী স্ত্রী আবার ঘরে ফিরে এল—এটা আপনি বোধ হয় অসঙ্কোচে মেনে নিচ্ছেন ?”

চকিতে হাসি থামাইয়া ফেলিয়া মিস রায় বলিলেন, “ওঃ, তুমিও ওই সন্দেহবাদীদের দলে ? দেখ মা, আমি তোমাদের মত—কিছু নয় বলে যে উড়িয়ে দিতে পারি নে, এর জন্যে নিশ্চয়ই তবে তোমরা আমায় নিন্দে করবে। আমার আগেকার গোটা দুই কথা তবে এই সময়ে বলে নিই শোনো। আমাদের যিনি গভর্ণেস ছিলেন, তিনি এক নতুন ধরণের মেয়ে ছিলেন। শুনেছিলুম, তিনি আগে হিন্দুর মেয়ে ছিলেন,—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড় হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুর কোন ঠাকুর-দেবতার নাম মুখে নেওয়া দূরে থাক, পাছে শুনতে হয়, তাই তিনি কানে আঙুল দিতেন। যেদিকে পূজো হতো—সেদিকে মরে গেলেও যেতেন না। অনেক লোক দেখেছি মা, এমন ধরণের স্বভাব জীবনে কখনও দেখি নি। অবশ্য তাঁর এ রকম করার কারণ পরে আমরা জানতে পেরেছিলুম; কিন্তু সে আমাদের শিশু-হৃদয় গঠিত হয়ে উঠবার অনেক পরে। শুনেছিলুম, তাঁর একটীমাত্র ছেলের মরণকালে তিনি না কি সকল দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছিলেন, অনেক জায়গায় দেবতার কৃপালাভ করবার জন্যে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু কোন দেবতাই তাঁর ওপর কৃপা করেন নি। ছেলের মরণের পরে তাইতেই তিনি এমনি কালাপাহাড়ী স্বভাবটা পেয়েছিলেন। এগুলো সবই বাড়াবাড়ি। আয়ু ফুরালে কেউই আয়ু যখন দিতে পারে না,—জেনে-শুনে তাঁর ও-রকমভাবে হত্যা দেওয়াও ভাল হয় নি; আবার তার পরেও এ রকম নাস্তিক হয়ে যাওয়াও উচিত হয় নি। যাক, তিনি এখন অনন্ত ধামে গেছেন, তাঁর দোষগুণ নিয়ে সমালোচনা করবার সময় এটা নয়। আমি যা বলছিলুম তাই বলি। একটা ভুলের বশে তিনি নিজে শুধু চলেন নি, তাঁর সেই গোঁড়ামীপূর্ণ অন্ধতার বীজ আমাদের সব ভাই-বোন কয়টীর অন্তরে রোপণ করেছিলেন। কোন দিনই কিছু মানতে পাবিনি, বাবাও আমাদের মানতে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। আমরা স্পষ্ট জানতুম, মানুষ মরে গেলে আর কিছু তার অবশিষ্ট থাকে না, তার সঙ্গে যায় না; পরলোক বলে কিছু নেই। তার পর—”

হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন! একটু দম লইয়া বলিলেন, “তার পর আমার মা মারা গেলেন! কি জানি কেন, আমার বাবা এর পর হতেই বিশ্বাস করতে লাগলেন—পরলোক বলে একটা আলাদা জগৎ আছে, সেখানে—এখান হতে যারা যায়—বিশ্রাম করে। আমরাও সেই প্রথম শুনতে পেলুম—পরলোক আছে, সেখানে ভগবান নামে কেউ আছেন। এই একটা বিশ্বাস করতে করতে অবিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে এল।”

আবার একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, “বোর্ডিংয়ে থেকে যখন আই-এ পড়ি, তখন আমাদের সঙ্গে একটী মেয়ে পড়ত, তার নাম ছিল দীপ্তি। সে হিন্দুর মেয়ে ছিল। তার সঙ্গে থাকতে থাকতে, হিন্দুদের সম্বন্ধে আগে যে ধারণা করেছিলুম, সে ধারণা কমে গেল। সেই মেয়েটি আমায় প্রথম বেহুলা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি মেয়েদের কীর্ত্তিগাথা শোনালে। সে মেয়েটীর ছোট বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামীই তাকে পড়াবার জন্যে বোর্ডিংয়ে রেখেছিলেন। যখন আমরা বি-এ পড়ি, সেই সময় এ দেশের সতী মেয়ের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলুম। স্বামীর অসুখের সময় স্ত্রীর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সে কি সেবা—অচল অটল সে ছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে স্বামী তার ইহলোক ত্যাগ করলে—দীপ্তি সেই যে তার

বুকের ওপর আছড়ে পড়ল, যখন তুলতে গেলুম—দেখলুম, স্বামীর জীবনসঙ্গিনী সে—স্বামীর সঙ্গেই চলে গেছে।”

কণ্ঠস্বরটা ধরিয়া আসিয়াছিল, ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, “সতীর পতিভক্তি এ ভারতবর্ষে এক অমূল্য বস্তু। সতীর অসাধ্য কাজ জগতে কিছু নেই। সতী জগতে মহাপ্রলয় ঘটাতে পারে। সতীর তেজে ভগবানের আসন কেঁপে ওঠে। সতীর চোখের জলে ভগবানকে টেনে আনে। ভারতবর্ষ সতীর দেশ। এখানে সতী সীতা সাবিত্রী বেহুলা দময়ন্তী ছাড়াও ঢের সতী জন্মেছে। এখনও এ রকম সতীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বেদবতীর উপাখ্যান বোধ হয় জানো না মা। কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামী তাঁর, এক দিনও তাঁর সেবায় সতী শৈথিল্য দেখান নি। কিসে স্বামীকে একটু স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারবেন, স্বামীর মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে দিতে পারবেন—এই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই স্বামীর জন্যে সতী বেদবতী সামান্য বারাঙ্গনা লক্ষহীরার ঘরে দাসীবৃত্তি পর্য্যন্ত করেছেন,—এই স্বামীর বাসনা-তৃপ্তির জন্যে তাঁকে বুকে করে লক্ষহীরার বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। কিছু নয় বলে এ সব উড়িয়ে দিতে গেলে যে ঠকতে হয় আমাদেরই। আমরা এ রকম কি পরের দেশে পরের ঘরে দেখতে পাব মা? আমাদের দেশের মত ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আর কোথায় আছে বল দেখি? যে দেশের নারী সতীত্ব-গৌরবে গরীয়সী, যে দেশের নারী স্বামীর আদেশে অকুণ্ঠিত পদে পরপুরুষের সেবা পর্য্যন্ত করতে যেতে পারে—”

আতঙ্কে বীথি চমকাইয়া উঠিল—“কে মা?”

মিস রায় শান্তস্বরে বলিলেন, “এই তো মা, দেশের কোন খবর তুমি রাখ না, কিছুই জান না। বিল্বমঙ্গলে বণিকের স্ত্রীর কথা তোমার অজ্ঞাত। এই ভারতের এমন একটী মহিয়সী নারীর পানে চাইতে তুমি ভারতের মেয়ে হয়েও যে এমন উদাসীনা, এ ভাবতেও মনে বড় ব্যথা লাগে। বিল্বমঙ্গল যখন নিজের পাপ অভিপ্রায় বণিকের কাছে জানালেন, তখন গৃহাগত অতিথির সম্মান রাখবার জন্যেই বণিক নিজের স্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাধ্বী সতী বণিকপত্নী স্বামীর আদেশে বিল্বমঙ্গলের কাছেও তো গিয়েছিলেন।”

বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া বীথি বলিল, “উঃ, কিন্তু এ কি মহাপাপ নয় মা? তার দেহ পরের উপভোগ্য হবে—”

বাধা দিয়া মিস রায় বলিলেন, “তা হোক না। যদি যথার্থই সে স্বামীকে ভালবেসে থাকে, তবে এতে তার এল-গেল কি? যদি যথার্থ স্বামীকে সে তার সকল অধিকার দিয়ে থাকে, তবে স্বামী তাঁর জিনিস যাকে খুসি দিন না, তাতে তার কি? সে নারী স্বামীকে যদি দেবতা বলেই জেনে থাকে, দেবতার আদেশ নীরবে শুধু পালন করে যাক, নিজের অস্তিত্ব সে ভুলে যাক। ভালবাসা কাকে বলে মা, সেটা কোন দিন বুঝতে পার নি, তাই পাপ-পুণ্যের নিক্তি ধরে ওজন করে যাচ্ছ। মুখের কথায় ভালবাসি বললেই তাকে যথার্থ ভালবাসা বলে না। যথার্থ ভালবাসা তাই, যা নিজের আত্মজ্ঞান ভুলিয়ে দিতে পারে। সে রকম জায়গায় নারী স্বামীর আদেশ পালনে অবশ্যই এগিয়ে যাবেন, পাপ-পুণ্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি তখন থাকে না।”

বীথি মাথা নত করিয়া নীরবে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার চোখের জল আর মানা মানিল না, টপ্ টপ্ করিয়া বইয়ের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সে করিয়াছে কি! যথার্থই সে আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছে যে! কোন্ পথে চলিতে সে কোন্ পথে আসিয়াছে!

সে রাত্রির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক—সে রাত্রে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে পলায়ন করা তাহার পক্ষে অনুচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর,—তাহার পরও এতটা বাড়াবাড়ি করা তাহার উচিত হয় নাই। অনিল অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল! বীথি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই, ঘৃণা দ্বারাই হৃদয় তাহার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল! তাহার পর এই যে বার মাস এখানে গোপনে কাটাইতেছে,—কাহাকেও এ সংবাদটা সে দেয় নাই।

তাহার চোখের জল মিস রায়ের চোখে পড়িয়া গেল। বিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি মা, তুমি কাঁদছ কেন?”

বীথির শ্লথ হাত হইতে বইখানা পড়িয়া গেল। সে নিজেকে কোনমতে সামলাইতে পারিল না, দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার হাত দুখানা সরাইয়া দিতে দিতে মিস রায় কোমল সুরে বলিলেন, “বুঝেছি, আমার কথা তোমার

মনের কোন গোপন স্থানে গিয়ে আঘাত করেছে। আমি জানি, তোমার কি একটা কথা আছে, যা উচ্ছ্বসিত হয়ে বার হয়ে পড়তে চায়,—তুমি প্রাণপণে তাকে চাপা দিয়ে রাখতে চাও। এই চেষ্টার ফলে তোমার মুখে হাসি প্রায়ই দেখা যায় না। আমায় মা বলে ডাক, আমিও তোমায় সন্তানের মত দেখি,—তোমার গোপন কথা কি তুমি আমার কাছেও ব্যক্ত করতে পারবে না সব ?"

বীথি চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, „না মা, আপত্তি নেই, আমি সব বলছি শুনুন।"

নিজের কথা আজ সে অকপটে আগাগোড়া ব্যক্ত করিয়া গেল,—শুনিয়া মিস রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিস রায় বলিলেন, "অনেক সয়েছ মা, বুঝতে পেরেছি, তোমার অন্তরে কঠোর আঘাত বেজেছে। আমি বলছি মা,—আমার ধারণায় যেটুকু বুঝেছি তাইতেই বলছি—তুমি যে সে রাত্রে চলে এসেছ, সে এক পক্ষে ভালই করেছ। বিল্বমঙ্গলের বণিক আতিথ্য-সৎকার করতে তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন, তোমার স্বামী কিসের জন্যে—কোন ধর্ম্মার্জ্জনের জন্যে নিজের পরিণীতা পত্নীকে নরপশুর পায়ে অর্ঘ্যস্বরূপ ধরেছিলেন ? নারীত্বের মূল্য নারী যতখানি বোঝে, পুরুষ তা বোঝে না; তাই সে নারীর ওপর যথেচ্ছাচার করে যায়। বিল্বমঙ্গলে বণিকের স্ত্রীর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল; কেন না,বিল্বমঙ্গল পাপী হলেও,তার অন্তরের এক কোণে বৈরাগ্য-পদ্ম ফুটে উঠছিল, তার অন্তরে হোম হচ্ছিল, বণিক-পত্নী তাতে পূর্ণাহুতি দিলে। তোমার স্বামী যার হাতে তোমায় দিয়েছিল, তার তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ ছিল না, নারীর নারীত্ব তার কাছে তুচ্ছ একটা কথা মাত্র। নিজের নারীত্ব রক্ষা করতে তুমি যা করেছ এ তোমার শক্তিরই পরিচয় দিয়েছে। তবে এক জায়গায় তুমি বড় অন্যায় করেছ মা,—নিজের দুদিককার মধ্যে একটা দিকই দেখেছ, আর একটা দিক দেখ নি। তোমার স্বামী যখন অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাঁকে তোমার ক্ষমা করা উচিত ছিল। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিয়ো না—বাইবেলে যে কথাটা বলেছে, সেটা কেন মা তখন মনে করলে না ? তার পর—রাগ করে চলে এলেও, এত দিন তোমার তাঁকে খবর দেওয়া উচিত ছিল, তাঁকে ক্ষমা করা উচিত ছিল।"

বীথি অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলিল, "আমার কিছু বুঝবার শক্তি নেই মা,—সেই দিন হতে আমি যেন কি রকম হয়ে গিয়েছি। লজ্জার কথা—কাউকে কিছু বলতেও তো পারি নি মা।"

মিস রায় ধীরভাবে বলিলেন, "তোমার কথা ঠিক, সত্যি —এ কথা কাউকেই বলতে পারা যায় না। স্বামী হয়ে তিনি যে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে অপরকে উপহার দেবেন, এ যে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। যাই হোক মা, এখন যদি তাঁকে বিশেষ অনুতপ্ত বলে মনে কর, তবে আর তোমার বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। যদি ওখানে আমি তোমার পাশে থাকতুম, তোমায় কখনই বার হতে দিতুম না, কাউকে জানাতেও দিতুম না। মিথ্যে একটা কলঙ্ক বই তো নয়। লোকে বলবে স্বামীর সঙ্গে তোমার বনিবনাও হয় নি, তাই তুমি ঝগড়া করে গৃহ ত্যাগ করেছ,—নামজাদা একটা লোকের মেয়ে, নামজাদা লোকের স্ত্রী হয়ে সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনে একটা স্কুলে কাজ করছো। তোমার কাণে তবু অনেক দূরের কথা আসছে না; কিন্তু তোমার স্বামী সকলের মাঝে রয়েছেন, লোকে তাঁকে যে নিন্দে করছে, এতে তাঁকে লজ্জিত হতে হচ্ছে বড় কম নয়। একটুর ভুলে অনেকটা এগিয়ে পড়েছ মা। সংসারে একজন কেউ গিন্নি না থাকলে তোমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এমনই ব্যাপার ঘটে। তোমাদের এখন রক্ত গরম, এক কথায় ধাঁ করে রক্ত গরম হয়ে ওঠে,—কি করতে যে কি করে বসো, নিজেরাই তা ঠিক করতে পার না।"

বাহির হইতে কে ডাকিল, "মেমসাব—"

বীথি কি কথা বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া মিস রায় বলিলেন, "চুপ কর, আর কথা তুল না। মিসেস দত্তের কথা শুনতে পাচ্ছি, তিনি আসছেন বোধ হয়। তোমার চোখে এখনও জল রয়েছে,—বাথরুমে গিয়ে মুখখানা ভাল করে ধুয়ে মুছে এসো।"

বীথি উঠিল।

(২১)

মিস রায়ের অমৃতমাখা উপদেশে বীথির মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল; তাহার মলিন মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিল। আগামী পূজার বন্ধের জন্য সে প্রস্তুত হইতে

লাগিল। পূজার বন্ধ হইলেই সে স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবে, স্বামীকে এবার সে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিবে, স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিবে, আবার তাহাদের মিলন হইবে। সে বলিয়া রাখিল, এই ছুটির মধ্যেই সে স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিবে; এবং বারাকপুরে মিস রায়ের বাড়ীতে গিয়া কয়েকদিন থাকিবে।

সে দিন একটা বাদলা দিনের সন্ধ্যা। আকাশ-জোড়া কাল মেঘ, তাহার কোলে চিকিমিকি বিদ্যুতের খেলা, সঙ্গে সঙ্গে শব্দের গুম গুম মেঘ-গর্জ্জন। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি অসহ্য গুমট গরম পড়িয়াছে। বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বীথি বসিয়া ছিল; নিকটে কালো মেঘের বুকে যেখানে বিদ্যুৎ ঝিকমিকিয়া উঠিতেছিল, তাহার দৃষ্টি সেইখানেই আবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে এক এক পসলা বৃষ্টি ঝর ঝর করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, আবার ধরিয়া যাইতেছিল। অন্ধকার অতি ধীরে কালো আকাশের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকখানাকে ছাইয়া ফেলিতেছিল।

গুণ গুণ করিয়া বীথি গাহিতেছিল—

বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙ্গা মেঘের ছায়া
কোথাও না ধরে।

"তার আছে!—"

হঠাৎ বীথির গান বন্ধ হইয়া গেল, বীথি চমকাইয়া উঠিল, —তার আছে? কাহার তার আছে, কেন তারের নামে তাহার বুকের মধ্যে এ কম্পন জাগিয়া উঠিল?

বীথির ভৃত্য শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের তার, কার?"

লোকটা কি উত্তর দিল তাহা বুঝা গেল না।

বীথি জিজ্ঞাসা করিল, "কার তার শ্যামা?"

শ্যামা উত্তর দিল, "আপনার নামে এসেছে।"

"আমার?" বীথির বুকটা কি রকম করিতেছিল, "নিয়ে এসো।"

শ্যামা টেলিগ্রামখানা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। বীথি ক্ষিপ্রহস্তে কভার ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না—এখানে যে সে আছে, এ সন্ধান কে কেমন করিয়া পাইল।

একবার টেলিগ্রামখানার পানে সে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল মাত্র; তাহার শ্লথ হস্ত হইতে সেখানা খসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সভয়ে শ্যামা ডাকিল, "দিদি সাহেব—"

বীথি উত্তর দিতে পারিল না, উত্তর দিবার মত সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না। তাহার পায়ের নীচে পৃথিবীটা তখন নাচিতে নাচিতে ঘুরিতেছিল। সে সম্মুখে দেখিতেছিল, সীমার অতীত অন্ধকার। মাথার উপরে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বীথি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া বসিয়াছিল।

তাহার ভাব দেখিয়া শ্যামা মিস রায়কে খবর দিতে ছুটিল। সংবাদ পাইবামাত্র মিস রায় যেমন ভাবে ছিলেন তেমনি ভাবেই ছুটিয়া আসিলেন।

তখনও বীথি তেমনি আড়ষ্টভাবে পড়িয়া। ব্যস্ত ভাবে মিস রায় শ্যামার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "খানিকটা জল আর একখানা পাখা শীগ্‌গির করে নিয়ে এসো, এঁর ফিট হয়েছে।"

আদেশমাত্র শ্যামা পাখা ও জল লইয়া আসিল। মিস রায় জল লইয়া বীথির মুখে চোখে দিতেই সে নড়িয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া সম্মুখে মিস রায়কে দেখিয়াই—মা—বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল।

"ব্যাপার কি বীথি, তুমি এ রকম করছো কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি নে কি হয়েছে।"

বীথি শুধু টেলিগ্রামখানা দেখাইয়া দিল। মিস রায় সেখানা তুলিয়া লইয়া সংবাদটা পড়িয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তাহাতে লেখা ছিল—'শীঘ্র আসুন; সাহেব সাংঘাতিক আহত, বাঁচবার আশা নাই। শঙ্কর।'

বীথি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমার কি হ'ল! আমার সর্ব্বনাশ কি এমনি করেই হ'ল মা?"

মিস রায় নিজের রুমাল দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে শান্তস্বরে বলিলেন, "এতটা অধীর এখনই হচ্ছো বীথি,—এ রকম দুর্ব্বলতা তোমার এখন সাজবে না;—এখন তোমায় শক্ত হতে হবে। এমনও হতে পারে যে এটা মিথ্যে খবর; তুমি সেখানে যাবে না,—তুমি সেখানে যাবে না তাই এই কথাটা বলে—"

অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া বীথি বলিল, "না মা, এ খবর

কথনই মিথ্যে নয়। আমার মনে আগেই এ বিপদের বার্ত্তা এসে পৌছেচে, আমার অন্তর দিনরাত কি একটা অনমুভূত যাতনায় ফেটে পড়তে চাচ্ছে। এমন খবর কি মিথ্যে হতে পারে মা? এ সত্য কথা, নিশ্চয়ই সত্য কথা,—তিনি কোন রকমে আহত হয়ে পড়েছেন। এ সময়ে সুখের বন্ধুরা সরে গেছে, তাই তাঁর বীথিকে মনে হয়েছে।"

স্বামীর অসহায় অবস্থা কল্পনা করিয়া আবার সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

মিস রায় তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "থাম, অবোধ অশিক্ষিতা মেয়ের মত শুধু কেঁদ না। সময় থাকতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রতীকার তুমি এক দিন যেমন করতে পারতে, কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্যেই পার নি, আজও তেমনি দুর্ব্বলতা জাগিয়ে তুলে সব নষ্ট করো না। মেল ছাড়তে আর দুই ঘণ্টা দেরী আছে,—এখনই উঠে পড়, এই মেলেই রওনা হয়ে যাও।"

বীথি চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনিও চলুন না মা?"

একটু থামিয়া মিস রায় বলিলেন, "পাগল মেয়ে, আমার কি যাওয়ার যো আছে? সোমবারে ইন্‌স্পেক্টর স্কুলে আসছেন,—আগেই খবর পাঠিয়েছেন,—এখন গেলে আমার যে সব দিকই নষ্ট হয়ে যাবে।"

তাঁহার দায়িত্ব বুঝিয়া বীথি বলিল, "তবে থাক মা, আপনাকে যেতে হবে না। আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত—"

"সে আমি এখনি ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি আর কান্নাকাটি কর না বাপু, তোমার জিনিসপত্র সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। আমি কাউকে দিয়ে গাড়ী আনিয়ে দিচ্ছি।"

মিস রায় চলিয়া গেলেন।

সত্যই এরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ বড় একটা কাহারও অদৃষ্টে জুটে না। মিস রায় বীথিকে কি চোখে দেখিয়াছিলেন বলিতে পারি না; বীথির সহিত যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

বিদায়-মুহূর্ত্তে বীথি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সজল চোখে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন মা, আমার স্বামী যেন ভাল হয়ে ওঠেন। আর যে এখানে আসা হবে সে সম্ভাবনা নেই। আপনি আমার অন্য বোনদের বলবেন—যাওয়ার বেলায় যে কারও সঙ্গে দেখা হল না, এর জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত রইলুম।"

মিস রায়ের কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, স্বর পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করছি মা, তোমায় যেন এখানে আর না আসতে হয়। মনে জাগিয়ে রেখো—তুমি এখন স্ত্রী, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তোমায় প্রাণপণে যথাযথ পালন করে যেতে হবে। মনে করে রেখো, তুমি ভারতের মেয়ে। ভারতের মেয়ে কতদূর ত্যাগশীলা, কতদূর সহশীলা, সেটা মনে করো। ভারতের মেয়ে স্বামীকে দেবতা বলে জানে; দেবতারও ভুল যদি হয়, যদি তিনি বিপথে যেতে চান, তাঁকে ফিরিয়ে সৎপথে আনা এই দেশের মেয়েদেরই কাজ; কেন না, তারা শুধু স্বামীর বিলাস-সঙ্গিনী নয়, স্বামীর ধর্ম্ম-সঙ্গিনীও বটে। তুমি নিজের ভুল শুধরে নিয়ে যদি তাঁর ভুল শুধরে দিতে, তাঁকে ক্ষমা করতে, তাহলে এত কষ্ট তাঁকে সইতে হতো না, তোমাকেও সইতে হতো না। তুমি তোমার মিথ্যা অভিমানে মত্ত হয়েছিলে তুচ্ছ মর্য্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে, তাই এতটা দুঃখ পেতে হল। সতীর আদর্শ বুকে নাও মা; বেহুলার চিত্র অন্তরে আঁকো, চোখের সামনে সেই চিত্রই পড়বে। তোমার স্বামী আরাম হবেন বই কি। মন তাঁর ওপর নিবিষ্ট রেখে ভগবানকে ডাক, তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শুনবেন। তোমার সেবায়—তোমার স্নেহে তোমার স্বামী ভাল হয়ে উঠুন, আমি পূজোর বন্ধে গিয়ে যেন তোমার হাসিমুখ দেখতে পাই। এখানকার সকলকে যা বলবার তা আমি কাল বলব, তুমি আর দেরী কর না মা, গাড়ীতে ওঠ।"

বীথি চোখের জলে ভাসিয়া আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। কয়েক মাসের পরিচিত এই স্থানটী ছাড়িয়া যাইতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। চোখ মুছিতে মুছিতে সে গাড়ীতে উঠিল, মিস রায় গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার চোখ দুইটী তখন ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ একা পথে সে, চিত্তে দারুণ উৎকণ্ঠা। চিন্তার ভারে মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। একাগ্রতা তাহার মনে জাগিয়া। পলকে তাহার অনেক ঘণ্টা বোধ হইতেছে। কোন দিকে চাহিতে,—কোন কথা শুনিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। এতক্ষণ অনিল কি করিতেছে, হয় তো সেই শয়ন-গৃহে একলাটি শুইয়া পড়িয়া তাহার প্রতীক্ষায় পথ পানে তাকাইয়া আছে। আসিবে কি আসিবে না এই ভাবিয়া তাহার

মুখখানা কখনও দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, কখনও অন্ধকারে মলিন হইয়া যাইতেছে।

প্রবীণা মিস রায় যাহা বলিয়াছেন সকলই সত্য। অনিল জীবনে সেই প্রথম ভুলটী করিয়াছিল; তাহাকেই সে শেষ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুতও হইয়াছিল; কিন্তু বীথি তাহাকে সে অবকাশ দিল কই? একটী কথায় তখন যাহা মিটিয়া যাইত, তাহার জন্য এতটা গোল বাধিত না, লোক-জানাজানিও হইত না! সত্যই সে স্ত্রী, আর স্ত্রীর দায়িত্বও তো বড় কম নয়। পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত হইলেও হইতে পারে, তাহাকে সংযত রাখা স্ত্রীর কাজ। সংসারে চলিতে গেলে স্বামীকে স্ত্রী যেমন সাহায্য করিবে, পুরুষ তেমনি স্ত্রীকে সাহায্য করিবে—এই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। স্বামীর যেমন ভুল ত্রুটী হইতে পারে, স্ত্রীরও তো তেমনি ভুল ত্রুটী হইতে পারে। পরস্পর পরস্পরের ভুল ত্রুটী সংশোধন না করিয়া দিলে চলিবে কি করিয়া? যে সংসারে নারী অসংযতা অভিমানিনী, সে সংসারে এমন গরলই উঠিয়া থাকে।

ইণ্টার ক্লাসে বীথি উঠিয়াছিল, সে কাম্‌রায় আরও কয়টী মেয়ে ছিলেন। নিজের চিন্তায় সে এতই বিভোর হইয়াছিল যে, কোন দিকে চায় নাই, কোন রকমে একধারে বসিয়া পড়িল।

মেয়েদের মধ্যে প্রথম চোখ-চাওয়াচাওয়ি, তার পর নির্ব্বাক্ হাসি, তার পর ফিসফাস কথা, শেষ গুঞ্জনস্বরে বীথিরই সমালোচনা চলিতেছিল।

শেষ রাত্রের দিকে সে গুঞ্জনধ্বনি একেবারেই থামিয়া গেল, সমালোচনাকারিণীরা কেহ বিছানা পাতিয়া ঘুমাইলেন, কেহ স্থানান্তরে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। বীথির বেঞ্চটা খালি পড়িয়া ছিল, সেদিকে কেহ যান নাই, ওদিক-কার দুখানা বেঞ্চের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিতেছিলেন।

একটী মেয়ে—তাঁহার কোলে একটী সাত আট মাসের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে,—তন্দ্রার ঘোরে ঝিমাইতে ঝিমাইতে পার্শ্বে নিদ্রিতা একটী প্রৌঢ়ার গায়ে পড়িয়া যাইতেই, তাঁহার নিদ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চোখ ডলিয়া নিদ্রাকে বিদূরিত করিয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। কথাটা এই—মেয়েটীর ভীষণ অপরাধ, সে ঘুমাইতে ঘুমাইতে তাঁহার গায়ে পড়িয়া গিয়াছে। সে তো "বেহ্ম" নয় যে দেশের প্রবাদ কথা কিছু জানে না? হিন্দু ঘরের মেয়ে যখন তখন নিশ্চয়ই জানে—ঘুমন্ত অবস্থায় যাহার ঘাড়ে পড়া যায়, ছয়মাসের মধ্যে তাহাকে এ জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবেই। জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া এ সংসার হইতে বিদায় দিবার উদ্দেশ্য তাহার কেন, তিনি তাহাই জানিতে চান।

বীথি নিজের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রবীণা যখন ছয় মাস পরে তাঁহাকে নিশ্চিতই মরিতে হইবে জানিয়া রীতিমত ঝগড়া এবং তাহার পরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খোকার মা সেই তরুণীটি লজ্জায় ঘৃণায় ক্রমে একেবারে নুইয়া পড়িল, কামরার আর সব মেয়েরা যখন প্রবীণার পক্ষ লইয়া তরুণীকে অসংযত ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন বীথি আর সহ্য করিতে পারিল না; তীব্রকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "থামুন থামুন, ছয় মাসের মধ্যে আর কেউ ময়লেও মরতে পারে, আপনি মরবেন না. মরবার মত লক্ষণ আপনার নেই। বেচারা ঘুমিয়ে আপনার গায়ে পড়েছে বলে আপনারা সকলে মিলে যে এমনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি করবেন, এ বড় অসহ্য। কবে কি হবে না হবে সেইটে ভেবে মাথা ঘামাতে আর চেঁচাতে পারেন তো বড় কম নয়।"

প্রবীণা দুটি চোখে তাহার উপর অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করি-লেন। এই জুতা-পায়ে চশমা-পরা মেয়েটী যে খাঁটি খৃষ্টান, তাহা এবার তিনি স্পষ্টই মুখের উপর বলিয়া দিলেন।

বীথি হাসিয়া ফেলিল, "খৃষ্টান নই মা! আর যদিও তা হই, আপনাদের চেয়ে তা অনেক ভাল। একটু ঘুমিয়ে গায়ে পড়লে আপনারা যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ মনে করেন, তা আমি জানতুম না, আজ এই নতুন জানলুম। এসো ভাই, আমার এই বেঞ্চটা খালি পড়ে রয়েছে, তুমি এইখানে ছেলেটীকে শুইয়ে দিয়ে নিজে খানিকটে ঘুমিয়ে নাও।"

তরুণীর মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; খৃষ্টান মেয়েটীর কাছে সে বসিবে! মহিলাগণের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল—খৃষ্টান মেয়েটী এইবার তাহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে আকর্ষণ করিয়া লইবে। তরুণী মাথা নাড়িল,—সাহস করিয়া, বীথির বেঞ্চ খালি থাকা সত্বেও, সে তাহার কাছে যাইতে পারিল না। বীথি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এস না ভাই; এত বড় বেঞ্চখানা খালি পড়ে থাকতে ছোট ছেলেটীকে নিয়ে কেন অত কষ্ট পাচ্ছো, আর ওদের এত অপমান সব সহ্য কয়ছো?"

প্রবীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কেন যাবে গা বাছা, ও কি দুঃখে তোমার কাছে যাবে? দেশী খিষ্টেনদের কি বিশ্বাস করতে আছে বাছা, তোমরা যে যাদুমন্ত্র জানো—দলে দলে হিঁদুর ছেলেমেয়েকে তোমাদের জাতে টেনে নাও। ও স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা, মা বাপের সন্তান, অমনি তোমার ডাকে তোমার কাছে গেলেই হল?"

বীথির ইচ্ছা হইল—তীব্রকণ্ঠে সেও একবার শুনাইয়া দেয়—সেও স্বামীর স্ত্রী, পিতামাতার সন্তান। তাহার ঠাকুরদাদা দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত, তাহার দাদামশাই হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভ; কিন্তু না, ছিঃ, এই ক্ষুদ্রমনা নারীর কাছে সে পরিচয় দিয়া কি ফল?

ঘৃণায় তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া খোলা জানালা পথে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

অন্ধকারের পর অন্ধকার গায়ে গায়ে জড়াইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই নিবিড়তার মাঝে এতটুকু ছিদ্র নাই, যেখান দিয়া একটু আলোর রেখা আসিতে পারে। কখন দমকা বাতাসের আঘাতে আকাশের জমাট-বাঁধা ঘন মেঘগুলা টুকরা-টুকরা হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে চলন্ত মেঘের ফাঁকে এক-একটা তারা একটুখানির জন্য ঝিকমিক করিয়া তখনই মুখ লুকাইতেছে। এই বিরাট অন্ধকারে পায়ের কাছে সামান্য একটু আলো ফেলিতে ফেলিতে ট্রেণখানা হুস হুস করিয়া ছুটিতেছে।

"ওগো, বলি ওগো বাছা, শুনছো,—জানালাটা বন্ধ করে দাওগে, বড্ড ঠাণ্ডা আসছে যে! এই ভোরের হাওয়াটা গায়ে লাগলেই অসুখ হবে।"

বীথি চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, প্রবীণা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কথাটা বলিতেছেন।

ভাদ্র মাসের এই দারুণ গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা? বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই; যদিও একটু ঠাণ্ডা লাগে, আপনার নিউমোনিয়া হবে না—সে রকম ঠাণ্ডা এখনও পড়ে নি। আপনি স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন। ভাদ্র মাসের গুমট গরম, মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর আপনি বলতে চান ঠাণ্ডা লাগবে। সব জানালাগুলো তো বন্ধ করেছেন, একটা দুটো খুলে না রাখলে হাঁফিয়ে মরবেন যে। ছয় মাসের মধ্যে মরণটাকে যদি নিজে ইচ্ছে করে টেনে আনেন, তাতে ও বেচারী মেয়েটার কোন অপরাধ হতে পারে না।"

এই কথার পরে আর কি মন্তব্য প্রকাশ হইবে তাহা পাছে শুনিতে হয় বলিয়াই সে মাথাটাকে জানালা পথে বাহির করিয়া দিল। সেখানে ট্রেণের নিরন্তর হুস হুস শব্দ, ভিতরের কথা তাহার কাণে আসিল না।

চুপচাপ সে একটু থাকিতে চায়, নানারূপ ফেঁসাদ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে মাথাটাকে ভিতরে টানিয়া আনিল, দেখিল, সব নিস্তব্ধ। তরুণীটিকে খৃষ্টান মেয়েটার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রবীণা তাহাকে নিজের স্থানটী ছাড়িয়া দিয়া কোণঠাসা ভাবে বসিয়া ঝিমাইতেছেন।

অপূর্ব্ব স্বজাতি প্রীতি—

বীথির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

রূপের নেশা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

জ্বলে কেবল জ্বলে,
আমার প্রাণের তলে,
রূপের নেশা ধূপের মতন
জ্বলে কেবল জ্বলে।
নিভিয়ে দিলে নীল সাগরের নীচে,
তবু আমার মরণ হ'ল মিছে,
মুক্তা হ'য়ে উঠছি গলে গলে,
ফেনিল সাগর জলে।

ওঠে কেবল ওঠে,
আমার প্রাণের ঠোঁটে,
সেই কথাটা যে কথাটা
প্রাণের তলে জোটে।
নাবিয়ে দিলে মাটির বুকের তলে,
তবু আমার মরণ গেল ছলে,
ব্যথায় যারা রাঙা হ'য়ে ওঠে,
ফুল হয়ে আজ ফোটে।

বাংলার আদি ছন্দ *

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল লাহিড়ী

মানব সৌন্দর্য্য-অনুরাগী। সৃষ্টির আদিম কালে মানুষ তাহার অস্ফুট, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরেই আবেগভরা ভাবের উৎসকে প্রকাশ করিয়া তৃপ্ত হইতেছিল; কিন্তু, বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর কৃপায় যখন তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল, ভাষার সঠিক আকৃতি হইল, তখন তাহার সেই অনাদি সঙ্গীতময় ভাষা কাব্য রূপে পরিণত হইয়া, বিশিষ্ট ধারায় জগতে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

সৌন্দর্য্য অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশিত হইলেই সেই অক্ষরসমূহের নাম হয় সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে যাহা কিছু পদ্যাংশ তাহাকেই কবিতা বলা হয়। প্রত্যেক কবিতারই এক একটা বিশিষ্ট ছন্দ আছে। তন্মধ্যে কোন কোন সাহিত্যের পদ্যাংশ সঙ্গীতের সহিত সংশ্লিষ্ট, যেমন সামগান প্রভৃতি। কিন্তু, ইহা ছাড়াও আরও অনেক পদ্যাংশ আছে, যাহাদের সঙ্গীতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যথা—নৈষধ, রঘুবংশ ইত্যাদি। তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গীয় কবিতা ছন্দের মূল কারণ সঙ্গীত। তবে শূন্যপুরাণ অথবা ডাকের বচন প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যের ছন্দ সঙ্গীত-জাত বলা চলে না, তাহারা গদ্যময় পদ্য; সুতরাং ঠিক কবিতাও নয়। এই সমস্ত গদ্যময় কাব্য ছাড়া, তৎপরবর্ত্তী যুগের পদ্যময় কাব্যে পয়ার, লাচাড়ী ও পাঁচালী এই তিন রকম সঙ্গীতজাত ছন্দের বেশীর ভাগ প্রভাব দেখিতে পাই। অতএব সেই সময় হইতেই বাংলা ছন্দের সৃষ্টি ও মূল ভিত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পয়ার, লাচাড়ী ও পাঁচালী এই তিনটি বাংলার নিজস্ব জিনিস—লয়বিশিষ্ট ছন্দোবদ্ধ কাব্যের প্রথম সোপান। অতএব পয়ার, লাচাড়ী ও পাঁচালী বাংলার তিনটি পুরাতন ছন্দ। উহাদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেই আমরা বঙ্গছন্দ সাহিত্যের নিদান পরিচয় সবিশেষ লাভ করিতে পারিব।

† পয়ার—যে সমস্ত কবিতাকে পায়ে পায়ে চলিয়া, অথবা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া, সুর করিয়া গাহিতে হয়, তাহাদিগকে পয়ার বলা হয়।

লাচাড়ী—আর যে সমস্ত কবিতাকে নাচিয়া নাচিয়া অথবা নৃত্যসহকারে গাহিতে হয়, তাহাদিগকে লাচাড়ী বলে। লাচাড়ীর অন্য এক নাম "লহরী" ছন্দ। প্রাচীনকালে কেহ কেহ নাচাড়ি, নেচাড়ি বা লাচাড়ি বলিতেন। আর পাঁচালী সকলেই জানেন, তাহার পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই।

যখন কোন কথা ছন্দকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রত্যেক পাদের নাম হয় পদ—শ্লোক পাদং পদং কেচিৎ। এই রকম পদ বা পদাকার হইতে পয়ারের উৎপত্তি। পয়ার বঙ্গভাষার একটি আদিম ছন্দ; কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন সংস্কৃত কবি জয়দেব হইতেই বাঙ্গালী কবিগণ এই পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দ ধার করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহা মোটেই সত্য নয়। দেখা যাউক—

১। বসতি বিপিন বিতানে। ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরণী তলে। বহু বিলপতি তব নাম॥

২। পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপ। যানম্।

৩। চল সখী কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল। নিচোলং॥

এই সমস্ত শ্লোক হইতে যদি আমরা বিভক্তি ও অনুস্বার-গুলি বাদ দিই, তাহা হইলে এইগুলি আমাদের বাংলা পয়ার এবং ত্রিপদী-লাচাড়ী হইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আমরা এই ছন্দগুলিকে সংস্কৃত ছন্দ হইতে ধার করিয়াছি বলি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা হইবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং আমরা মোটেই স্বীকার করিতে

---

* 'অভয় আশ্রম'এর একাদশ পাঠাগার-সম্মিলনীতে কুমিল্লা টাউনহলে পঠিত।—লেখক।

† পয়ারের সম্যক লক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এই ধরণের সঙ্গীতজাত ছন্দকে পুরাতন কবিরা সঙ্গীতজাত পয়ার ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার সঙ্গীতজাত পয়ার ছন্দ, চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার ছন্দ নয়, তবে চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার ছন্দের মূল ভিত্তি সঙ্গীতের উপর। অতএব এই চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার ছন্দ, সঙ্গীতজাত পয়ারছন্দের শাখা বিশেষ। যদিও অভিধানে পাওয়া যায় 'পয়'—গমন করা, তথাপি পয়ার শব্দের কোন্ শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা সঠিকরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পদচার হইতেই পয়ারের উৎপত্তি।

রাজি নই যে, বঙ্গ কবিরা সংস্কৃতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া, এই পাদছন্দ বা ত্রিপদী ছন্দ শিক্ষা দিয়াছেন।

ফল কথা, আদিমযুগে যে সমস্ত কবিতা লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জাতীয় কবিতা-ছন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি সঙ্গীতজাত ছন্দ—অন্যটি আবৃত্তিজাত ছন্দ। তাহাদের সম্যক পরিচয় অল্পবিস্তর নিম্নে প্রদান করিতেছি।

যে সমস্ত কবিতা-ছন্দ সঙ্গীত সহকারে গাহিবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গীত-জাত ছন্দ বলা হয়। এবং যাহাদিগকে আবৃত্তি করিয়া পড়িবার নিমিত্ত লেখা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আবৃত্তিজাত ছন্দ বলা হয়।

সঙ্গীতজাত কবিতার ছন্দ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গীত সহকারে মাত্রা বিভাগ করিতে হইবে এবং তৎপরে মাত্রানুসারে ছন্দের নামকরণ হইবে। তাহাদিগকে আবৃত্তি দ্বারা মাত্রা বিভাগ করিতে গেলে সমস্তই ভুল হইবে।

আবৃত্তিজাত কবিতারও ঠিক এই নিয়ম। তাহাদিগের ছন্দ আবৃত্তি দ্বারা বাহির করিতে হয়। সঙ্গীত সহকারে বাহির করিতে গেলে কেবল পণ্ডশ্রম হইবে।

পয়ার ও লাচাড়ী যদিও সঙ্গীতজাত ছন্দ, তথাপি তাহাদের মধ্যে আবৃত্তিজাত ছন্দের প্রভাব রহিয়াছে। যে সমস্ত কবিতা-ছন্দ চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার হইতে অষ্টাদশাক্ষরী পয়ার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তন্মধ্যে অল্প দুই চারিটি কবিতাই সঙ্গীতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই আবৃত্তিজাত ছন্দে লিখিত। লাচাড়ী ত্রিপদী ও চৌপদীতে আবৃত্তি-জাত ছন্দেরও অধিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিমিত্ত আবৃত্তিজাত এবং সঙ্গীতজাত কবিতার মাত্রা অক্ষর-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তাহাদের মাত্রা, সঙ্গীত বা আবৃত্তির লয় এবং তালের উপর নির্ভর করে।*

পয়ার

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, পয়ার কেবল চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত অক্ষরমাত্রিক ছন্দ, এবং আট মাত্রায় যতি পড়িবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নয়। পয়ার বর্ণসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, পয়ার, পরস্পর সংযুক্ত সঞ্চারী পদের উপর নির্ভর করে। এ যাবৎ বঙ্গভাষা ও তৎসম-সাময়িক দেশীয় ভাষা আলোচনা করিলে আমরা নয় রকমের পয়ার দেখিতে পাই। পয়ারের আর এক নাম পাদছন্দ।

১। নবাক্ষরী পয়ার—এই ছন্দের প্রত্যেক ছত্রে নয়টী অক্ষর থাকে। যতি পড়িবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই; তবে তিন মাত্রা, চার মাত্রা, পাঁচ ও সাত মাত্রা পরেও যতি পড়িতে দেখা যায়। যথা—

(ক) দেখ যদি | মাকুন্দা চোপা।
বাড়াওনা | এক পা বাপা॥—খনা।

(খ) সো চির | উলসিত কান।
তুয়া আশে | আওল জান॥—গোবিন্দদাস।

(গ) এ ধনি, কর অব | ধান।
তো বিনে উনমত | কান॥—বিদ্যাপতি

(ঘ) দুরজন সঙ্গ | সঞ্চারি।
বাধ মন্দিরে | অনুসারি॥—জ্ঞানদাস। ইত্যাদি।

২। দশাক্ষরী পয়ার বা দিগক্ষরা ছন্দ—এই ছন্দের কবিতাতে প্রতি ছত্রে দশটি করিয়া অক্ষর থাকে। যতি পতনের কোন স্থিরতা নাই। যথা—

(ক) যাঁহা যাঁহা | ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা | বিজুরি তরঙ্গ॥—বিদ্যাপতি

(খ) আজ কেন | দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি | দোঁহার চরিত॥—চণ্ডীদাস।

(গ) মৃদুমন্দ | দক্ষিণ পবন।
সুশীতল | সুগন্ধি চন্দন।
পুষ্পরস | রত্ন আভরণ।
আজ কেন | হল হুতাশন॥—আলাওল

৩। একাদশাক্ষরী পয়ার বা মল্লিকামালা বা একাবলী ছন্দ। যথা—

(ক) তাপর চঞ্চল | খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী | বেঢ়ল মোর॥ বিদ্যাপতি।

(খ) যথা তথা সদা করি | ভ্রমণ।
শীতল করিছ জীব | জীবন॥
কভু ধর বল | প্রবল অতি
কভু কর অতি | সুধীরে গতি॥ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

(গ) রজনী বিলাস | কহয়ে রাই।

* আমি এখানে যে সকল দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহাদের সকলেরই মাত্রা এবং অক্ষর-সংখ্যার ঠিক আছে। ইহাতে যথেষ্ট বুঝিবার সুবিধা হইবে।



হরিদাস ঠাকুর

শিল্পী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

সব সখীগণ | বদন চাই ॥
আঁখি ঢুলুঢুলু | অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল | সখীর করে ॥ চণ্ডীদাস।

(ঘ) কাঁপিছে দেহলতা | থর থর
চোখের জলে আঁখি | ভর ভর
দোদুল তমালেরি | বন ছায়া
তোমারি নীলবাসে | নিল কায়া।
বাদল নিশীথেরি | ঝর ঝর
তোমার আঁখিপরে | ভর ভর ॥ রবীন্দ্রনাথ

৪। দ্বাদশাক্ষরী পয়ার বা দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী ছন্দ। যথা,

(ক) আজি শচীমাতা | কেন চমকিলে।
ঘুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়া বসিলে ॥
লুণ্ঠিত অঞ্চলে | "নিমু" "নিমু" বলে।
দ্বার খুলি মাতা | কেন বাহিরিলে ॥
শিবনাথ শাস্ত্রী।

(খ) নয়ন যুগলে | সলিল গলিত।
কনক মুকুরে | মুকুতা খচিত ॥ রামপ্রসাদ।

(গ) নাহি উঠল দোঁহে | কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল | পাতল চীর ॥
অঙ্গে বানাওল | নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে | করল পরবেশ ॥
গোবিন্দদাস।

(ঘ) জীবনে যত পূজা | হ'লনা সারা।
জানিহে জানি তাও | হয়নি হারা ॥
রবীন্দ্রনাথ।

৫। ত্রয়োদশাক্ষরী পয়ার বা ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী ছন্দ। যথা,

(ক) কর ঠেলন নহে | ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল | মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব | পুন ফল তোরি।
এতহুঁ দূর তোরি | তোঁহে মিলে গোরী ॥
গোবিন্দদাস।

(খ) আপনি জল স্থল | আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য | আপনি প্রকাশ ॥
গোবিন্দচন্দ্র।

৬। চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার। যথা,

(ক) ক্ষুধায় আকুল তনু | ভ্রমে বন বন।
অর্কের কোমল পত্র | করয়ে ভক্ষণ ॥
* * * *
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ | দৈবের লিখন।
নিরুদক কূপ মাঝে | পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
কাশীরাম দাস।

(খ) চিরদিন পিপাসিত | করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু | করিল কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দে | খিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি | আপন দুহিতা ॥
কৃত্তিবাস ওঝা।

৭। পঞ্চদশাক্ষরী পয়ার বা মালতী ছন্দ। যথা,

(ক) সরোবরে স্নান হেতু | যেওনা লো যেওনা।
কমল কানন পানে | চেওনা লো চেওনা ॥

৮। ষোড়শাক্ষরী পয়ার বা কুসুম মালিকা বা *গজগতি ছন্দ। যথা,

(ক) যথা চাতকিনী কুতুকিনী | ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী | হিমাংশু মিলনে ॥

(খ) মরি কিবা মুরহর | পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে | মিলিত হয়ে রহে ॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

৯। অষ্টাদশাক্ষরী পয়ার বা হংসমালা ছন্দ। যথা,

(ক) আদিম বসন্ত প্রাতে | উঠেছিল মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধা পাত্র | বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ॥
রবীন্দ্রনাথ।

(খ) স্বাবস্থিত আমি কিন্তু | নহি কভু মায়ার অধীন।
অনন্ত-অনাদি-কল্প আমি | মাত্র সৃষ্টি লয় হীন ॥
ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ইহাই আমাদের বাংলা পয়ার ছন্দের মোটামুটি তালিকা। এই সব পয়ারের মধ্যে অনেক পয়ার আছে যাহাদের অক্ষরমাত্রিক ছন্দে স্বতন্ত্র নাম আছে; তাহাদের সেই নামও এখানে উল্লেখ করিলাম। উল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই, পয়ার নয় অক্ষর হইতে

* গজগতিছন্দে সাধারণতঃ চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু থাকে।

আঠারো অক্ষর অবধি বৃদ্ধি পাইয়া বাংলা কবিতাছন্দে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও এক রকমের পয়ার অক্ষরমাত্রিক ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার আলোচনা এখানে করিব না।

তার পর, রবীন্দ্রনাথ পয়ারের গৌরব আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি, উনিশ অক্ষরে যতিহীন পয়ার রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বশেষে পয়ারকে আরও উচ্চে টানিয়া লইয়া চব্বিশ অক্ষরে যতিহীন পয়ার রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই চব্বিশ অক্ষরযুক্ত যতিহীন পয়ারের চব্বিশটি অক্ষর দুই লাইনে থাকে; প্রথম লাইনে আঠারটি এবং দ্বিতীয় লাইনে ছয়টি। ফলকথা, এই সব ছন্দের উদাহরণ দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করি না; কারণ, ইচ্ছামত অক্ষর বা মাত্রা সংখ্যা বাড়াইয়া নিত্য নূতন ছন্দ তৈয়ারী করা যায়।

যৌবন-প্রয়াণ

শ্রীনিরুপমা দেবী

আমার জীবন-বন-গহনের তলে,
ক্ষণেক দাঁড়াও মন্ত্র-বলে
ওগো মোর যৌবনের পরিপূর্ণ প্রাণ!
কণ্ঠে নিয়ে গান
বক্ষে নিয়ে মিলনের আশা
ফুলময় বসন্তের মুগ্ধ ভালবাসা।

চোখে দাও প্রণয়ের হাসির কাজল
রূপ দাও ঢল ঢল
সর্ব্ব তনু ভরি
মধুভরা ফুটাইয়া সহস্র মঞ্জরী,
কেশে দাও আকুলতা, অধরে লালিমা;
প্রাণে দাও প্রেম মধুরিমা;
বুকে দাও গানে ভোলা মন;
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাঁড়াও মোর হে
শেষ যৌবন!

ঐ সন্ধ্যা নেমে আসে
পশ্চিম গগন-তলে পবনের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
ঐ মুদে আসে ধীরে আলোর কমল,
ঐ ছায়া সুনিবিড় শান্ত বনতল
ঝিল্লি মুখরিত—
ঐ শেষ বিহঙ্গম সঙ্গীহারা ভীত,
উড়ে যায় পশ্চিমের দূর অস্তপারে,
ঐ বনানীর ধারে
আঁধার ঘনায় ঘন স্নিগ্ধ ফুলবাসে,
সন্ধ্যা নেমে আসে।
সুলগন মধুময়,
এল বুঝি ঐ মোর বঁধুয়ার আসার সময়!
যদি এসে দেখে বঁধু
অঙ্গে অঙ্গে নাই মোর বসন্তের মধু
চোখে নাই সে চাহনি মধু মাদকতা,
দেহে মনে নাই আর মিলনের সে অসহ্য পুলকের ব্যথা
সেই কেশ সেই বেশ
প্রাণে সেই প্রেমের আবেশ
গানে গানে কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন,
নেই সেই চোখে চোখে সুরে সুরে প্রিয় সম্ভাষণ,
যদি দেখে নবস্ফুট ফুল্ল ফুলহার
ঝরাদল ছেঁড়াফুল ধূলি লীন সূত্রটুকু সার
বল বল তবে
সে মোর কেমনতর হবে?

আহা তুমি থাক থাক
এ মিনতি রাখ,
যতক্ষণ বঁধু নাহি আসে
আমার বুকের পাশে
বাজাও বাজাও তব প্রেমতন্ত্রী বীণ,
মিলন লগন মোর নাহি যেন কাটে সুরহীন,
নিভিতে দিওনা রূপবাতি,
অন্তরের শেষ ভাতি
থামিতে দিওনা গান শুধু ততক্ষণ
আমার জীবনতলে ক্ষণিক দাঁড়ায়ে যাও হে
শেষ যৌবন

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামযাদু পরাণ-বাবুর আপিসে পরাণ-বাবুর স্বকীয় কর্ম্মচারী পার্সোন্যাল্ অ্যাসিট্যাণ্ট্ নিযুক্ত হয়েছে। এতে প্রাচীন ও পুরাতন কর্ম্মচারীরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হ'লেও প্রকাশ্যে কিছু বল্‌তে পারে নি, কারণ পরাণ-বাবুর অবিচার সুবিচার বিচার কর্‌বার অধিকার কারো ছিলো না, তাদের অনেকের চাকরী বা পদোন্নতি যে বরাবর নিয়ম-সঙ্গত প্রণালীতেই হয়েছে এমন কথা অতি স্বার্থপর ব্যক্তিও নিজের মনে মনেও বল্‌তে পার্‌তো না; তাদের সকলের চাকরী ও বেতন-বৃদ্ধি বা পদোন্নতি সবই পরাণ-বাবুর একার খেয়াল ও খুশী অনুসারেই হয়ে এসেছে।

চতুর রামযাদু আপিসে এসেই বুঝলে তার আগমনটা সেখানে বিশেষ প্রীতির কারণ হয় নি। অমনি সে বৃদ্ধদের সঙ্গে জ্যেঠা-মশায় দাদা-মশায়, এবং সমান-বয়স্ক বা বয়ঃ-কনিষ্ঠদের সঙ্গে ভাই ভাই-পো ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্‌লে। সে অবসর পেলেই অপরের ডেস্কের কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাকে বলে—দাদা-মশায়, আপনার যদি কিছু বেশী কাজ জমে' থাকে তো দিন্ না, আমি খানিকটা ক'রে দি ··এখন আমার হাত খালি আছে।

এমনি ক'রে সে সকলের কাজ ক'রে সকলকে সাহায্য ক'রে অল্প দিনেই তাদের প্রীতিভাজন হয়ে উঠ্‌লো। কারো ছুটি নেবার দর্‌কার; পরাণ-বাবু ছুটি দিতে আপত্তি কর্‌লে রামযাদু বিনীতভাবে অনুরোধ ক'রে বলে—ভদ্রলোকের বিশেষ দর্‌কার ব'লেই ছুটি চাচ্ছেন, আপনি ছুটি মঞ্জুর ক'রে দেন, আমি ওঁর কাজ চালিয়ে দেবো।

পরাণ-বাবু রামযাদুর পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মে আগ্রহ দেখে খুশী হয়েও মুখে বলেন—আপনার অসুস্থ শরীর! খেটে খেটে কি শেষকালে মারা পড়্‌বেন!

রামযাদু পরাণ-বাবুর স্নেহবাক্যে কৃতার্থ হয়ে হেসে বলে—কাজ কর্‌তে না পেলেই আমি মারা পড়্‌বো।

প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়; সে রামযাদুর উপর খুশী হয়ে থাকে।

আপিসের কারো অসুখ-বিসুখ হ'লে রামযাদু নিত্য তার বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসে; রোজই সামান্য হ'লেও একটা কিছু পথ্য-সামগ্রী কিনে নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়ে আসে।

আপিসের সহকর্ম্মীদের কারো বাড়ীর কোনো লোকের অসুখ হয়েছে শুন্‌লেও রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বলে—যদি রাত জেগে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বার লোকের দর্‌কার হয় তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বল্‌বেন।

এইরূপে সকল লোকের বিপদে সম্পদে দুঃখ সুখের ভাগী রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই রামযাদু সকলের বন্ধু ব'লে গণ্য হয়ে উঠ্‌লো। এবং সকলের কাজ ক'রে দেবার সুযোগে সে আপিসের সকল রকম কাজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠ্‌লো; সমস্ত আপিসের মধ্যে এমন দশকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় রইলো না।

রামযাদুর কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে সাহেবেরা ও তার সহৃদয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে তার সহকর্ম্মীরা পরাণ-বাবুর কাছে তার প্রশংসা কর্‌লে পরাণ-বাবুর ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া হাসিতে ছড়িয়ে যায়, আর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, তিনি নীরবেই স্পষ্ট বল্‌তে চান—দেখেছো! কেমন লোক এনেছি!

সকলের কাজ ক'রে দিতে দিতে রামযাদু যেমন নিজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌ছিলো, তেমনি কোন্ কর্ম্মচারীর কোথায় গলদ ও ত্রুটি আছে তাও তার জানা হয়ে যাচ্ছিলো। তাদের সে মনে মনে শাসিয়ে রাখ্‌তো—রোসো বাছাধন, তুমি কোনো দিন আমার সঙ্গে লেগেছো কি আমি তোমার মরণ-কল টিপেছি!

আপিসের সাহেবেরা রামযাদুর সাম্‌নে তার প্রশংসা কর্‌লে সে বিনয়-নম্র স্বরে বলে—এতে তো তার প্রশংসা পাবার কিছু কারণ নেই, সে কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র; সে কর্ত্তব্য পালন না কর্‌লে অপরাধী হয়ে নিন্দাভাজন হবে।

সাহেবেরা আর কিছু বলে না; রামযাদু সেলাম ক'রে

চ'লে আসে এবং সে বেশ বুঝে আসে যে সে সাহেবদের খুব খুশী ক'রে দিয়ে এসেছে।

রামযাদুর সুখ্যাতিতে পরাণ-বাবু ছাড়া আর একজন সুখী হচ্ছিলো—সে থাকোহরি। রামযাদুর কাছে কৃতজ্ঞতায় থাকোহরির অন্তর পূর্ণ হয়ে ছিলো, তাই রামযাদুর সুখ্যাতিতে তার আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিলো।

রামযাদু কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি; সে প্রায়ই ভাবে—সবাইকে তো ঘায়েল করলাম, কিন্তু ঐ কালিন্দী ছুঁড়িকে এখনো বশ করতে পারলাম না! কি কুক্ষণেই তাকে মুখ ভেংচেছিলাম যে সে এমন ঘাবড়ে গেছে যে তাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। ছুঁড়ি জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে, কিন্তু সে-সব কিনতে তো কম খরচ নয়! কপালে কিছু অপব্যয় লেখা আছে দেখছি।

* * * * *

রামযাদু কৃষ্ণকলির সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টায় তার দিকে অগ্রসর হলেই সে ছুটে বাড়ীর ভিতর পালিয়ে যায়। একদিনও কৃষ্ণকলিকে ধরতে না পেরে রামযাদু হতাশ হয়েই একদিন একজোড়া সাদা খরগোশ কিনে তারের জালের খাঁচায় ক'রে নিয়ে এলো। তার মনে হচ্ছিলো—কৃষ্ণকলি হয় তো কিছুতেই পোষ মানবে না, মাঝে হ'তে গোটা কতক টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নাহক খরচ হয়ে গেলো।

রামযাদু পরাণ-বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় কৃষ্ণকলি আছে। এই তার পায়রা খাওয়াবার সময়, সে উঠানে থাকবার কথা। রামযাদু উঠানের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলে উঠানে কৃষ্ণকলি নেই; তার পায়রাদের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে; পায়রাগুলো একটি শুভ্র বৃত্ত ক'রে মটর খুঁটে খাচ্ছে আর কলরব করছে।

রামযাদু হতাশ ও বিপন্ন হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো; সে একবার ভাবলে—কোনো চাকরকে দিয়ে কৃষ্ণকলিকে ডেকে পাঠাই। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো—আমি ডাকছি শুনলে তো সে আসবে না। তবে কি চাকরের হাত দিয়ে খাঁচাটা বাড়ীর ভিতর তার কাছে পাঠিয়ে দেবো? কিন্তু তাতে আমার লাভ কি হবে? তার চেয়ে একটা অন্য কিছু ছুতো ক'রে তাকে ডাকিয়ে আনি, তার পর তার চোখে খরগোশের ছানা পড়লে রক্ষাকালীর ছানা জালে ধরা পড়বে।

এই কথা ভেবে সে কোনো একজন চাকরের সন্ধানে দালান দিয়ে অগ্রসর হয়ে চললো। একটু এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে ঠাকুরদালানের এক কোণে একটা মাটির কৃষ্ণমূর্ত্তি রঙীন পুতুল একটা ছোটো জলচৌকীর উপর বসিয়ে কতকগুলি ফুল নিয়ে ঠাকুর পূজার খেলা করছে।

রামযাদু আনন্দিত হয়ে প্রফুল্ল মুখে পায়ের শব্দ যথাসম্ভব নিবারণ ক'রে ঠাকুর-দালানে গিয়ে উঠলো।

রামযাদুকে দালানে উঠতে দেখেই কৃষ্ণকলি চমকে উঠলো; তার মুখটা ভয়ে ও অপ্রতিভ ভাবে অন্ধকার হয়ে গেলো; সে সেখান থেকে পলাবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পলায়নোন্মুখ দেখেই ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললে—খুকু সোনা, দেখো·· তোমার জন্যে কি এনেছি!······

রামযাদু খরগোশের খাঁচাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরলে। পালাবার উদযোগে কৃষ্ণকলির পিঠ রামযাদুর দিকে অর্দ্ধেক ফিরেছিলো; রামযাদুর কথা শুনে সে মুখ ফিরিয়ে পিঠের উপর দিয়ে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো এবং আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। রামযাদু দেখলে কৃষ্ণকলির আরক্ত ছোটো ছোটো চোখ দুটো আনন্দে ও কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রামযাদু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্নেহকোমল ক'রে বললে—খুকু সোনা, এসো · খরগোশ নেবে এসো··· কিচ্ছু বলবে না···

এই বলে সে খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলে। আর খরগোশের বাচ্চা দুটি খাঁচার ভিতর থেকে বাহির হয়ে লম্বা লম্বা কান নেড়ে নেড়ে আর শরীরের পশ্চাদর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত ক'রে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে তাদের বেঁড়ে লেজটুকু তুড় তুড় ক'রে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

কৃষ্ণকলির মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে; তার অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাচ্চা দুটির গায়ে হাত দেয়; কিন্তু রামযাদুর উপস্থিতি দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে তাকে নিরস্ত ক'রে রাখছে। সে চকিত স্মিত দৃষ্টিতে একবার বাচ্চা দুটির দিকে, একবার রামযাদুর দিকে দেখতে লাগলো।

রামযাদু একটি বাচ্চাকে ধ'রে কোলে তুলে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—তুমি কোলে নেবে?··· নাও না, কিচ্ছু ভয় নেই······দেখো, কেমন নরম!······

রামযাদু কৃষ্ণকলির কাছে এগিয়ে গিয়ে খরগোশটাকে তার দিকে বাড়িয়ে ধর্‌লে। কৃষ্ণকলি একটু লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে স্মিত মুখে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে খর্‌গোশের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে এবং তখনই আবার সঙ্কুচিত হয়ে হাত সরিয়ে নিলে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—কোলে নাও তুমি······

কৃষ্ণকলির মন কৌতুক ও ঈষৎ ভয়ের ভাবে আবিষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু যখন সে খর্‌গোশ্‌টাকে কোলে নিয়ে দেখ্‌লে সেটা তাকে কাম্‌ড়ালেও না, আঁচ্‌ড়ালেও না, তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে অপর খর্‌গোশ্‌টা লাফাতে লাফাতে গিয়ে কৃষ্ণকলির পূজার ফুল নৈবেদ্য খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। রামযাদু তা দেখে তাকে তাড়া দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—ধেৎ······ধেৎ······

কৃষ্ণকলি কোলের খর্‌গোশটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে লজ্জিত কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বল্‌লে—ও থাক! ও ফুল নৈবিদ্যি তো খেলা-ঘরের······

কৃষ্ণকলিকে কথা বল্‌তে শুনে রামযাদু আপনার উদ্দেশ্যের সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আমি আবার কাল তোমাকে সাদা ইঁদুর এনে দেবো······আর আমরা দুজনে একসঙ্গে তাদের নিয়ে খেলা কর্‌বো······কেমন?

কৃষ্ণকলি তার ঘাড় অল্প একটু কাত ক'রে সম্মতি জানালে; এবং কোলের খর্‌গোশ্‌টাকে খাঁচার মধ্যে পুরে, অপরটাকে ছুটে ধর্‌তে গেলো। কৃষ্ণকলিকে ছুটে নিকটে আস্‌তে দেখে খর্‌গোশ্‌টা ভয়-চকিত হয়ে তুড়ুক্‌ তুড়ুক্‌ ক'রে লাফাতে লাফাতে ঘরের অপর দিকে চ'লে গেলো। রামযাদু সেটাকে ধ'রে খাঁচায় পুরে দিলে।

কৃষ্ণকলি দুই হাতে খাঁচাটা টেনে তুল্‌লে এবং ভারী খাঁচা বহনের প্রযত্নে পিঠের দিকে একটু চিতিয়ে চল্‌তে চল্‌তে যেনো জনান্তিকে রামযাদুকে ব'লে গেলো—যাই, মাকে দেখাইগে······

রামযাদু বল্‌লে—কাল ইঁদুর আন্‌বো, মনে থাকে যেনো···

কৃষ্ণকলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, কিন্তু তখন সে পূজার দালান থেকে অন্দরে মহলে যাবার পথে বেরিয়ে পড়াতে রামযাদুর দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গিয়েছিলো; রামযাদু তার ঘাড় নাড়া যে দেখ্‌তে পেলে না তার সম্বন্ধে তার কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পেলো না।

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—টোপ গিলেছে, এইবার খেঁচ মার্‌লেই গেঁথে যাবে; তার পর বাছাধন আর যাবেন কোথা!

এর পরদিন রামযাদু একখাঁচা সাদা ও সাদায়-কালোয় ছিটে-ফোঁটা ইঁদুর নিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে ঢুকেই দেখ্‌লে কৃষ্ণকলি উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই কৃষ্ণকলির চোখ দুটি উজ্জ্বল ও মুখ প্রফুল্ল বিকসিত হয়ে ওঠাতে আরো কুৎসিত হয়ে উঠ্‌লো। রামযাদু দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে কৃষ্ণকলি তারই আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছে। রামযাদু ইঁদুরের খাঁচাটা তুলে ধ'রে কৃষ্ণকলিকে দেখিয়ে হাস্‌লে, তার মনে হলো এইবার কৃষ্ণকলি তার কাছে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু সে এক পাও অগ্রসর না হয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই-খানেই দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঈষৎ অবনত ক'রে লজ্জিত সুখের হাসি হাস্‌লে। কৃষ্ণকলির মুখ তাতে কদর্য্যতর হয়ে উঠ্‌লো। রামযাদুর মনটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌ ক'রে উঠ্‌লো, সে মনে মনে বল্‌লে—এঁঃ রামঃ! এক্কেবারে শেওড়া-গাছের পেত্নী! ঢের ঢের কুৎসিত কদর্য্য দেখেছি, কিন্তু এমন ফর্‌মাস-দেওয়া বে-ঢপ ভয়ঙ্কর চেহারা কখনো দেখিনি। ছোটো জাতের মেয়ে আর কতো ভালো হবে!

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রামযাদু অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ-কলির কাছে গেলো এবং চেষ্টা ক'রে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, এই দেখো কেমন ইঁদুর!

কৃষ্ণকলি দেখ্‌লে খাঁচার মধ্যে লোহার তারের তৈরি একটা ঘূর্ণী চাকায় চ'ড়ে দুটা ইঁদুর সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা দিয়া চড়বার ক্রমাগত চেষ্টায় চাকাটাকে বনবন ক'রে ঘোরাচ্ছে। ইঁদুরের এই খেলা দেখেই কৃষ্ণকলি উল্লসিত হয়ে হাততালি দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌লো; কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা-শঙ্কা-ভরা দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়েই নিজের চঞ্চলতা দমন ক'রে ফেল্‌লে।

রামযাদু জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার খর্‌গোশ তোমার পোষ মেনেছে তো?

কৃষ্ণকলি লজ্জিত স্মিত মুখে একবার রামযাদুর দিকে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কথা কওয়াবার জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে—খুকু সোনা, তোমার আর কি চাই বলো তো, আমি এনে দেবো।

কৃষ্ণকলি অৰ্দ্ধেক আনন্দ ও অৰ্দ্ধেক সন্দেহে দোলায়মান-চিত্ত হয়ে মৃদু অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—একটা কাকাতুয়া।

রামযাদু মনে মনে শিউরে উঠে ব'লে উঠ্‌লো—টিপ-কপালীর সখ কম না! এইবার আমায় সেরেছে! কাকাতুয়া তো দু-এক টাকার কর্ম্ম নয়!

কিন্তু সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—বেশ! কাল তোমার কাকাতুয়া আস্‌বে।

অসীম আনন্দে অধীর হয়ে কৃষ্ণকলি ইঁদুরের খাঁচা তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলো।

রামযাদু খুশী মনে পরাণ-বাবুর সাক্ষাৎ-কক্ষের দিকে প্রস্থান কর্‌লো।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে আস্‌তে দেখেই হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌লেন—আসুন মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। কলি তো আপনার খর্‌গোশ পেয়ে মহা খুশী! আপনি আবার সাদা ইঁদুর এনে দেবেন বলেছেন ব'লে সে ভোর বেলা উঠে কেবল ঘর-বার কর্‌ছে যে কখন আপনি আস্‌বেন। আপনি তাকে আচ্ছা লোভ দেখিয়েছেন!

রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রশংসায় ও সমাদরে গদ্‌গদ হয়ে দন্ত বিকাশ ক'রে বল্‌লে—ছেলেমানুষের খেলনা একটা তো চাই; কিন্তু কৃষ্ণকলি যে কেমন বাপ-মায়ের মেয়ে তা তার খেলা দেখ্‌লেই টের পাওয়া যায়। তার খেলা হয় ঠাকুরপূজা, নয় জীবসেবা। সেই খেলাচ্ছলে পুণ্যসঞ্চয়ের একটু ভাগ আমিও ফাঁকতালে নিয়ে নিলাম।

পরাণ-বাবু রামযাদুর কথায় খুশী হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন; অমনি ঘরে সমাগত সমস্ত লোক রামযাদুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠ্‌লো; কেউ বল্‌লে—সাধু সাধু! কেউ বল্‌লে—"এ রামযাদু-বাবুর প্রকৃতির অনুরূপ কথাই হয়েছে! এক টিকি-ওয়ালা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বল্‌লে—"যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বিধিস্ তৎ তেন যোজয়েৎ! এ একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ!" ব্রাহ্মণ রামযাদুকে উপলক্ষ্য ক'রে পরাণ-বাবুরও একটু প্রশংসা ক'রে নিলো দেখে একজন জ্যোতিষী ব'লে উঠ্‌লো—"এ একেবারে বুধাদিত্য যোগ, গুরু-শুক্রের রাজযোটক!" একজন বল্‌লে—আমাদের কৃষ্ণকলি তার পিতা-মাতার পুণ্যফল মূর্ত্তিমতী!

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হয়ে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লেন—আপনারা দশজনে প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুবেন, আমার ঐ গুঁড়োটুকু বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকুক আর ও যেনো জীবনে সুখী হয়।

অমনি সকলে সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—আমরা তো নিত্য নিরন্তর আশীর্ব্বাদ কর্‌ছিই; আপনার অনুগ্রহ আর কৃপা লাভ করে নি এমন লোক বাংলা দেশে অতি অল্পই আছে; অগণ্য কৃতজ্ঞ-হৃদয় হতে কল্যাণ-কামনা অহরহই উত্থিত হচ্ছে!

পরাণ-বাবু খুশী হয়েও বিনয় প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—আমি আর কি কর্‌ছি, আমার শক্তিই বা কতোটুকু?

রামযাদু ব'লে উঠ্‌লো—আপনি হচ্ছেন বাংলা দেশের পরাণ! দেহে প্রাণ যে কতো কাজ করে তা দেহই জান্‌তে পারে, পরাণের কৃপা হতে যার দেহ বঞ্চিত হয় সেই তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে যে পরাণের কাজ ও শক্তি কতো!

সেখানে একজন ডাক্তার ছিলো, সে মনে মনে রামযাদুর উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌লো, তার মনে হ'লো এই physiological খোসামোদটা তারই করা উচিত ছিলো, কিন্তু কর্‌লে কি না ঐ প্রত্নতাত্ত্বিক রামযাদু! একেই বলে কপাল! একেই বলে অদৃষ্টের অনুগ্রহ!

পরাণ-বাবু রামযাদুর বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি প্রত্নতাত্ত্বিক না হয়ে কবি হতেও পার্‌তেন!

রামযাদু লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাঁত বাহির ক'রে শীর্ণ মুখ হাসিতে ভ'রে বল্‌লে—আপনার কৃপা থাক্‌লে তাও বাকী থাক্‌বে না। আপনার কৃপা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্!......

রামযাদুর কথা শুনেই পণ্ডিতের মন হায় হায় ক'রে উঠ্‌লো—"আহা হা! এই শ্লোকটা তো আমার বলা উচিত ছিলো!" যেই এই কথা তার মনে হওয়া অমনি সে রামযাদুর মুখের অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—

যৎ কৃপা, তম্ অহং বন্দে পরমানন্দ-কারণম্॥

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হ'য়ে পণ্ডিতের কথা যেনো শুনতে পান নি এমন ভাবে রামযাদুকে বল্‌লেন—তা হলে আমাদের আর-একবার আশ্চর্য্য ক'রে দেবার আয়োজন মুখুজ্জে মশায় লুকিয়ে লুকিয়ে কর্‌ছেন! আপনি কবিতা লেখেন তা তো জান্‌তাম না! একেই তো বলে সাধনা! গোপনে শক্তিসঞ্চয় হচ্ছে; যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিন জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

রামযাদু বিনয় দেখিয়ে মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—না না, সে শক্তি আমার নেই, তবে কখনো-কখনো দু-একটা লিখ্‌তে চেষ্টা করি।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনার কবিতা দেখ্‌বার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলাম ; কিন্তু আপনি গবেষণা ত্যাগ কর্‌বেন না মুখুজ্জে-মশায়।

রামযাদু দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে—আপনার চেয়ে বেশী গবেষণা করবার শক্তি তো কারো নেই।

পরাণ-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—আমি গবেষণা করি!

রামযাদু পূর্ব্ববৎ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—হ্যাঁ, গো-এষণা ······গোরু-খোঁজা তো আপনার প্রধান কর্ম্ম।

পরাণ-বাবু রামযাদুর শ্লেষ বুঝ্‌তে পেরে—ও হো হো! ব'লে উচ্চ হাস্য ক'রে উঠলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি রামযাদুর কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে না পেরে ব'লে উঠ্‌লো—হাঁ হাঁ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখেরই বাণী তো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হয়েছে—

পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এ রকম তোষামোদ-বৃষ্টি অনন্ত কাল চল্‌তে পার্‌তো, কিন্তু পরাণ-বাবু তোষামোদ শুন্‌তে ভালোবাসলেও কাজের সময় মধ্যপথেই থামিয়েও দিতে পার্‌তেন। তিনি বল্‌লেন—আচ্ছা।

এই আচ্ছার মানে সবাই বুঝ্‌তো। সৈনিকের কাণে কমাণ্ডারের সঙ্কেত-ধ্বনি প্রবেশ করবামাত্র সে যেমন তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তেমনি ঘরে উপবিষ্ট সমস্ত লোক একটি স্প্রিঙের কল-টিপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ও ধীরে ধীরে বিদায় হয়ে চ'লে যেতে লাগলো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি যখন দরজার কাছে গিয়েছে তখন পরাণ-বাবু বল্‌লেন—বিদ্যারত্ন মশায়, আপনার সম্বন্ধীকে কাল একবার আমার আপিসে পাঠিয়ে দেবেন, দেখ্‌বো যদি কিছু কর্‌তে পারি।

বিদ্যারত্ন আনন্দে গদ্‌গদ হ'য়ে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

পরাণ-বাবুর এই "দেখবো যদি কিছু কর্‌তে পারি" কথা কয়টির যে কি শক্তি তা অনেকেরই জানা ছিলো। সকলে বিদ্যারত্নের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌লো, এবং ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌লো—কাল হতে তারাও কি রকম ভাবে খোসামোদ ক'রে পরাণ-বাবুর প্রসন্নতা লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

*　　*　　*　　*

রামযাদু সেইদিনই নিজের নাম-ধাম গোপন রেখে ও বক্‌স্‌-নম্বর দিয়ে তিনটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—কারও যদি অপ্রকাশিত কবিতার খাতা থাকে, তবে সে সেই খাতা দেখ্‌তে পেলে ও তার কাছে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হলে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে সে নিজের খরচে প্রকাশ কর্‌বে।

এবং সেই দিন বিকাল বেলা আপিসের ছুটির পর কৃষ্ণকলির জন্য একটা কাকাতুয়া, একটা ময়ূর ও একটা হরিণের ছানা কিনে গাড়ী ক'রে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হলো।

বাড়ীর উপর তলার বারান্দা থেকে কৃষ্ণকলি রামযাদুকে দেখ্‌তে পেয়েই উল্লাসে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—বাবা, বাবা, মুখুজ্জে-কাকা কাকাতুয়া নিয়ে এসেছে······শুধু কাকাতুয়া নয়,······একটা ময়ূর····· একটা আবার পুচ্‌কে হরিণ!···

কৃষ্ণকলি ছুটে নীচে নেমে গেলো, কিন্তু রামযাদুর সাম্‌নে গিয়েই তার সেই চাঞ্চল্য থেমে গেলো, উল্লাস সংযত হয়ে গেলো, সে প্রফুল্ল বিস্ফারিত নয়নে সেই উপহারগুলির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

রামযাদু তাকে দেখে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, তোমার জন্যে কতো কি এনেছি। এইবার আমার সঙ্গে ভাব কর্‌বে?······

কৃষ্ণকলি প্রফুল্ল মুখে লজ্জা মাখিয়ে মাথা কাত ক'রে নীরবে সম্মতি জানালে।

রামযাদু আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আর আড়ি নয় তো?

কৃষ্ণকলি আবার নীরবে মাথা নেড়ে জানালে—না।

রামযাদু মাথা দুলিয়ে ডাক্‌লে—এসো তবে আমার কাছে, কাকাতুয়া নেবে······

কৃষ্ণকলি কুণ্ঠিত মন্থর পদে অগ্রসর হয়ে আবার থম্‌কে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দিকে কাকাতুয়ার দাঁড়টা বাড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—ধরো ·····গায়ে হাত বুলিয়ে দাও······ঘাড় চুল্‌কে দাও দেখি, ও চুপ ক'রে ঘাড় নীচু ক'রে থাক্‌বে······

কৃষ্ণকলি সঙ্কোচের ও ঈষৎ ভয়ের সহিত কাকাতুয়ার গায়ে হাত দিলে। কাকাতুয়া অম্‌নি গলা নীচু ও কাত

ক'রে দিলে। কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার গলায় হাত দিতেই কাকাতুয়া মাথার ঝুঁটি খাড়া ক'রে তুল্‌লো। কৃষ্ণকলি দেখ্‌লে সেই দুধের মতন সাদা কাকাতুয়ার ঝুঁটিটার তলার রং হল্‌দে আর গোলাপীতে মেশা। কৃষ্ণকলির উল্লাসে হাততালি দিয়ে নেচে উঠ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিলো, কিন্তু সে আড়চোখে একবার রামযাদুকে দেখে নিজেকে সাম্‌লে নিলে এবং একমনে কাকাতুয়ার ঘাড় চুল্‌কে দিতে লাগ্‌লো। কাকাতুয়া তুষ্ট হয়ে ডেকে উঠ্‌লো—কাকাতুয়া! কৃষ্ণকলির মন আবার আনন্দে নেচে উঠ্‌লো।

রামযাদুকে গাড়ী থেকে পশু-পক্ষী নিয়ে নাম্‌তে দেখেই দুজন চাকর দৌড়ে এসেছিলো। তারা হরিণ-ছানার গলার শিকল ধ'রে ও ময়ূরের খাঁচা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। রামযাদু তাদের অপেক্ষা কর্‌তে দেখে কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—যাও খুকু সোনা, তুমি মাকে দেখাও গে তোমার পাখী হরিণ।

রামযাদুর কথা শুনে রামযাদুর সম্মুখ থেকে অপসৃত হবার সুযোগ পাওয়ার আগ্রহে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় কষ্টে বহন ক'রে প্রস্থানোদ্যত হলো।

রামযাদু বল্‌লে—কাকাতুয়াটা বোঁচার হাতে দাও।

কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় বোঁচার হাতে দিয়েই একছুটে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলো। সে দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে মাকে বল্‌লে—মা দেখো দেখো, আমার ভুলে কাকাতুয়ার গলা থেকে কেমন পাউডারের মতন রেণু লেগেছে!······

কৃষ্ণকলি চ'লে গেলে রামযাদু উপরে পরাণ-বাবুর ঘরে এলো।

রামযাদুকে চৌকাঠের কাছে দেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি যে আমার বাড়ীটা চিড়িয়াখানা ক'রে তুল্‌লেন!

রামযাদু ঘরের মধ্যে এসে একখানা চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—আপনি নিজেই তো অনেক আগে থেকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছেন। আপনি তো greatest menagerie-keeper in the world—হরেক রকম জানোয়ার আপনার চিড়িয়াখানায়!

পরাণ-বাবুর কাছে সমাগত লোকেরা পরাণ-বাবুর সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো বটে, কিন্তু রামযাদুর কথাটা সকলের গায়ে গিয়ে বিঁধ্‌লো। অনেকেই মনে মনে বল্‌লে—তুমি একটি মস্ত জানোয়ার! কিন্তু সেই জানোয়ারটি যে কি তৎসম্বন্ধে সনাক্ত করাতে মতভেদ হলো—কেউ মনে মনে বল্‌লে—তুমি একটি মর্কট! কেউ বল্‌লে—হনুমান! কেউ বল্‌লে—ধূর্ত্ত শৃগাল! কেউ বল্‌লে—ছিনে জোঁক!

পরাণ-বাবুর হাসির ঝোঁক থাম্‌লে তিনি বল্‌লেন—কিন্তু আপনি এতো পয়সা খরচ কর্‌ছেন, এ ভারি অন্যায়!

রামযাদু তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—এ কার পয়সা খরচ কর্‌ছি, এ পয়সাও তো আপনারই······এ আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ······কানে জল দিয়ে কানের জল বের কর্‌বার ফন্দি। আমরা কেউ বিনা স্বার্থে কি আপনার মতন কাজ করি?

পরাণ-বাবু রামযাদুকে এক-ঘর লোকের সাম্‌নে এমন অকপটে স্পষ্ট কথা বল্‌তে শুনে খুশী হয়ে আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন এবং পরে বল্‌লেন—জগতে সবাই স্বার্থ খোঁজে। আমিও কম স্বার্থপর নই, আপনারা কেউ টের পান না, ঐখানেই তো আমার বাহাদুরী!

একজন লোক মনে মনে বল্‌লে—A bit too frank!

ঘরের সকল লোক রামযাদুর কথায় অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লো; তারা রামযাদুর কথায় নিজেদের স্বরূপকে অকস্মাৎ উলঙ্গ ভাবে প্রকাশিত হয়ে যেতে দেখে যে লজ্জা পেলে তাতে তারা রামযাদুর উপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো, অথচ রামযাদু সত্য কথাই বলেছে ব'লে তার উপর যথেষ্ট বিরক্ত হতেও পার্‌ছিলো না।

পরাণ-বাবু ঘরের লোকদের মুখ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে দেখে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণ ক'রে বল্‌লেন—উঃ! এবার কী গরমই পড়েছে!

তখন বাক্যস্রোত গ্রীষ্ম থেকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় ও ক্রমে লেংড়া-আমের চড়া দর আলোচনায় এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে চল্‌লো। সকলে সহজ কথা আলোচনার অবসর পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। (ক্রমশঃ)



কথা স্বর ও স্বরলিপি——————শ্রীসাহানা দেবী

ভৈরবী——তেতালা

জানি গো জানি, আমায় নিয়ে,
খেলছ খেলা বেদন্ দিয়ে!

তোমার হাতের ব্যথার দাগে—
হৃদয় আমার রং যে লাগে!
বেদনার পরশ পরাগে—
ললাট যে মোর দাও রাঙিয়ে!

জানি গো জানি, এই জীবনে
এই খেলাতে চুপে চুপে,—
তোমার পূজার গন্ধরূপে,
জ্বাল্‌বে আমার হৃদয় ধূপে।

ক্ষত প্রাণের নীরব কোণে,
তোমার খেলা আমার সনে,
সেই ব্যথারই শূন্য ক্ষণে,
তোমায় চাওয়াও খেলা দিয়ে!

.   ০   ১   ২   ৩

II 'I { I স ণ্‌া সা | সঋজ্ঞা ঋা সা | -া সা সঋজ্ঞা | জ্ঞরা মজ্ঞরজ্ঞ
জা - নি গো - - জা নি - আ মা - য় নি - য়ে - -

ঋসা | সা -া ঋা | সা ণ্দা ণ্া | সা সঋমজ্ঞা রজ্ঞা | ঋা সা -া | }
- খে ল্ ছ খে লা - - বে দ - ন্ - দি য়ে - }

{ া ণ্া সা | ণ্সা ণ্সজ্ঞা মপদা | পা দা -া | পা পা -া | -া জ্ঞা পা !
তোমার হা - তে - র্ ব্য থার্ দা গে - - হৃ দয়
ক্ষ ত প্রা ণে র্ নী রব্ কো ণে - - তো মার্

পা দা -া | দপা মজ্ঞা মপদা | পমপা মজ্ঞমা জ্ঞঋসা | }
আ মা র্ র - - - ং যে - লা - - গে - -
খে লা - আ - - মা - - - র স - - নে - -

সা সা -া | সা ঋমা মা | জ্ঞমপদা পা মজ্ঞরা | মজ্ঞরজ্ঞা -া ঋসা |
বে দ - না - র্ প র - - প রা - গে - - - -
ও ই - ব্য থা - রি শৃ - - ঙ্গ ক্ষ - ণে - - - -

সঋা সঋজ্ঞমা -া | জ্ঞরজ্ঞা ঋসা ণ্সা | -া সা ঋা | মজ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | II II
ল - লা - - ট্ যে মো - - র্ - দা ও রা - ঙি য়ে
তো - মা - - র্ চা - ও য়া - - ও - খে - লা - দি য়ে

প্া ণ্া ণ্দা | ণ্সা ণ্সা -া | সা ঋা সণ্া | জ্ঞঋা সা -া | সা -া ঋা |
জা নি গো জা - নি - - এ ই জী ব - নে - এ ই খে

জ্ঞমা জ্ঞমা -া | জ্ঞমপা মজ্ঞমাঃ জ্ঞঃ | ঋা সা -া | সা সা দা | দা পা -া |
লা - তে - - চু - - পে - - চু পে - তো মা র্ পূ জা র্

পদণসা ণপা ণা | দপা মা মপা | জ্ঞমা ঋমজ্ঞা রজ্ঞা | ঋা সা -া |
গ ন্ ধ - - রূ পে - জ্বাল্ বে - - - আ মা র্

ণ্দা ণ্দা জ্ঞা | ঋা সা -া |
হৃ - দ য়্ ধূ পে -

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন পল রিশার মহোদয়কে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করা গেল। আমরা তিন বন্ধুতে অনেকদিন একত্রে ছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক ও সুবক্তা পেয়ে বৈচিত্র্যের খাতায় জমার ভাগ বড় মনোজ্ঞভাবে স্ফীত হ'য়ে উঠল।

পল রিশার মহোদয় নিরামিষাশী। খেতে ব'সেই তিনি প্রথমে আরম্ভ করলেন—আমিষভোজনকে আক্রমণ।

বল্লাম: "আজকাল ত' প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তবে ত আর বাঁচা চলে না—যদি প্রাণনাশ ক'রে বাঁচাটা পাপ ব'লে ধরা যায়।"

পল রিশার বল্লেন: "কিন্তু আমাদের হত্যাকাণ্ডে ত' একজায়গায় না একজায়গায় সীমারেখা টান্‌তেই হবে। আমরা প্রত্যহ প্রতি পদক্ষেপে শত শত জীবাণুর প্রাণনাশ করছি মানি। কিন্তু তাই ব'লে প্রমাণ হয় না যে বরাবরই যাবতীয় জীবজন্তুকে বধ করে জীবন ধারণ করতে হবে। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি জীবজন্তুর প্রাণনাশ নয়। আমার আপত্তি এই যে পশুর শব-ভক্ষণটা মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির পক্ষে গৌরবজনক নয়। বার্ণার্ড শর সঙ্গে এবিষয়ে আমি একমত।" পশুর শব কথা দুটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন।

আমি ঠাট্টা ক'রে বল্লাম: "তবে কি বল্‌তে চান যে আমাদের পক্ষে নরমাংস ভক্ষণটা বেশি শ্রেয়: ?"

পল রিশার অম্লানবদনে সস্মিতমুখে বল্লেন: পশুর মৃতদেহ ভক্ষণের চেয়ে ত নিশ্চয়ই। এ কথা কে না মানবে ?"

বান্ধবী হেসে বল্লেন: "এ আপনার বিচিত্র ঠাট্টা।"

পল রিশার মহোদয় বল্লেন: "অন্ততঃ যুক্তি এই কথাই বলে।"

বান্ধবী অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লেন: "যথা ?"

পল রিশার অবিচলিতস্বরে বল্লেন: "যাকে জীবদ্দশায় আমরা শ্রদ্ধা করি, স্পর্শ করি, চুম্বন পর্য্যন্ত করতে পারি, তার মাংস যদি তার মৃত্যুর পরে খেতে যাই তবে সেটা অন্ততঃ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যে জন্তুকে আমরা জীবদ্দশায় এড়িয়ে চলি, যার নাম একটা লোমহর্ষক গালাগালি (cochon—শূকর ফরাসী ভাষায় আমাদের ভাষারই মতন গালাগালি) যাকে জীবদ্দশায় এমন কি পা দিয়ে ছুঁতেও শিউরে উঠি—তার গলদেশে ছুরি চালাতে না চালাতে তাকে আমরা রসনার মতন চরম ছুৎমার্গপন্থীর নিবিড় আলিঙ্গনে গ্রহণ করি—এর চেয়ে অযৌক্তিক, হাস্যকর অসঙ্গত জিনিষ আর কি হ'তে পারে ?"

ব'লে একটু থেমেই হেসে বল্লেন: "পশুজগত বিধাতার দরবারে খুব সম্ভবতঃ নালিশ করবে। তখন আমরা নিরপেক্ষতার দাবী করতে পারতাম যদি আমরা নরমাংসও খেতাম। তবু আমাদের খানিকটা সাফাই এই যে আজকাল আমরা পশুদের বল্‌তে পারি 'দেখ হে, আমরা শুধু তোমাদেরই হত্যা করি না, যুদ্ধে অতি সুন্দরভাবে নিজেদেরও হত্যা করি।' য়ুরোপের হত্যানন্দের এই একটা যৌক্তিক দিক্‌ও আছে। কারণ আমাদের এ যুক্তিসঙ্গত নিরপেক্ষতা দেখে যাহোক্ তবু পশুরা একটুও ত সান্ত্বনা পায়। আমি আরও নিরপেক্ষ হবার জন্যে কশাইখানার পাশ দিয়ে কখনও গেলে টুপি খুলি।"

বান্ধবী বল্লেন: "কি রকম ?"

"কেন! কারণ ত খুব স্পষ্ট! মানুষের মৃতদেহের পাশে এসে পড়লে টুপি খুলি যে!" আমরা খুব হেসে উঠলাম।

য়ুরোপে আহারের সময় গল্পালাপকেই আহারের চেয়ে বড় ক'রে দেখাটা বড় সুন্দর। মানুষের সত্য সভ্যতার এটা

একটা মস্ত নিদর্শন। আমরা এ বিষয়ে বড় বেশি ব্রাহ্মণ-ভোজনপন্থী মনে হয়।

তিনচার দিন বাদে পল রিশার আবার এলেন আমাদের নিমন্ত্রণে।

প্রায় রাত বারটা অবধি অনর্গল গল্প ক'রে গেলেন তিনি। আর কি প্রাঞ্জল সহজ ফরাসীই না বল্লেন! বল্লাম "আপনার কথা সাজাবার ক্ষমতা অদ্ভুত!"

আমরা তিনজন একেবারে চুপ হ'য়ে গেলাম।

সেদিন সকালবেলা একটি ফরাসী তরুণীর সঙ্গে দেখা। তিনিও বল্‌ছিলেন পল রিশার মহোদয় অপূর্ব্ব কথা বলেন। সত্যি ঈর্ষা হয়।

পল রিশার গল্প করতে লাগলেন হিমালয়ে দুবৎসর কেমন ছিলেন; কেমন করে মাঝে মাঝে ভালুকের সঙ্গে পরিচয় হ'ত; হরিদ্বারের কাছে কেমন ক'রে মাঝে মাঝে বাঘের সঙ্গে দেখা হ'ত; বসোরায় কেমন ক'রে পাসপোর্ট না থাকা সত্বেও গিয়েছিলেন; পালেষ্টাইন বাবিলন গ্রীস মিসর প্রভৃতি দেশে কেমন ক'রে উপার্জ্জন করতে করতে চ'লেছিলেন; এক এক সময়ে কাল কি খাবেন না জানা সত্বেও কেমন কথনো তাঁর উপবাসে কাটেনি; কেমন ক'রে জীবনবিধাতা তাঁর সামনে অর্থোপার্জ্জনের উপায় ধ'রে দিতেন ইত্যাদি।

তিনি মিসরে একজন সুফী বন্ধুর সম্বন্ধে অনেক গল্প করলেন। ইনি ডিপ্লোমাট ছিলেন, কিন্তু তা সত্বেও অপূর্ব্ব মিস্‌টিসিস্‌ম্ তাঁর মনপ্রাণকে ভ'রে রেখেছিল। তিনি কেমন কথনো জীবনে আগে থাকতে জল্পনা করতেন না ভবিষ্যতে কি করবেন; কেমন ক'রে জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতেন যখন যেখানে পৌছন সেখানেই ওঠবার জন্যে; যুদ্ধের সময়ে কেমন ক'রে জীবনে তিন তিনবার শত্রুহস্তে বন্দী হ'তে হ'তে বেঁচে গিয়েছিলেন—সাবধানতা অবলম্বন না করার দরুণ; কেমন ক'রে একজন বন্ধু তাঁর নিতান্ত দরকারের সময় স্বপ্নে তাঁর অভাব জেনে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বল্‌তে বল্‌তে আমার বন্ধু ও বান্ধবীর মুখের দিকে চেয়ে পল রিশার হেসে বল্লেন: "এ রকম অভাবনীয় যোগাযোগ প্রাচ্য দেশে আমার জীবনেও বহুবার হ'য়েছে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে য়ুরোপে আসা যায় সে-মুহূর্ত্তে বোঝা যায়—জীবন-বিধাতার প্রভাব অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। য়ুরোপে মানুষ মিস্‌টিক নয়, সর্ব্বদা সাবধান, প্রত্যেকেই নিজের জন্যে বাঁচে। প্রাচ্যের ঢের দোষ আছে—কিন্তু এই মিস্‌টিসিস্‌মই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

হঠাৎ থেমে বল্লেন: "জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে অরবিন্দকে আমি মনে করি শিব, (divin) নরদেব। কারণ তিনি এই মিস্‌টিসিস্‌মের অগ্রদূত।"

বান্ধবী বল্লেন: "তার মানে?"

পল রিশার বল্লেন: "তার মানে ঐ সেদিন যা বল্‌ছিলাম যে মানুষকে অতিমানুষ হ'তে হবে। এ প্রেরণা আজকের দিনে এক অরবিন্দ ছাড়া আর কারুর মধ্যে বিধাতা দেন নি। অরবিন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার মতভেদ হ'তে পারে কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ নেই যে মানুষকে আজ মানুষ-হওয়ার গর্ব্ব পরিত্যাগ করে মানুষের পরের বিকাশের জন্যে ছুটতে হবে। নইলে তার মুক্তি নৈব নৈব চ।"

বন্ধু বল্লেন: "কিন্তু অতিমানুষ বল্‌তে আপনি সেদিন যা বল্‌ছিলেন সেটা কি একটা মরীচিকা নয়?"

পল রিশার বল্লেন: "কোন্ অধিকারে আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষই অনন্ত শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ? এ আত্মপ্রত্যয় যে কত অসার তা বোঝা যায় যদি আমরা জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সেই মর্কটপ্রবরের মনোভাব কল্পনা করি যে মর্কটজাতির মধ্যে প্রথম মানুষ হবার প্রেরণা পায়। তখন বাকী সব বিজ্ঞ মর্কটেরা নিশ্চয়ই তাদের গুম্ফদেশে চাড়া দিয়ে বল্‌ত যে অমুক মর্কটটা পাগল হ'য়ে গেছে, যেহেতু সে মনে করে যে মর্কটই বিধাতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নয়। আরে! মর্কট যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ বরপুত্র এ বিষয়ে যে মর্কট সন্দেহ করে তার চেয়ে হেয় মর্কট-কুলাঙ্গার আর কে হ'তে পারে? কি সর্ব্বনাশ—মর্কট কি না মানুষ হ'তে চায়!!"

আমরা হেসে উঠলাম।

পল রিশার বল্লেন: "আজ আমরা এ কথায় যেমন হাস্‌ছি—অতিমানুষ মানুষের আত্মপ্রসাদের কথা কল্পনা করে ভবিষ্যৎ যুগে তেম্‌নিই হাস্‌বে।"

বান্ধবী বল্লেন: "কিন্তু আমাদের জীবনে বিধাতা যে প্রেরণা দিয়েছেন—আমাদের মধ্যে যে-সব মহামানব পাঠিয়েছেন তার জন্যে কি আমাদের খুসি হবার কারণ নেই? খৃষ্ট বুদ্ধকে যদি ভগবানের একটা মহৎ শক্তির বিকাশ ব'লে

ধরা যায় তাহ'লে কেন মানুষকে অবজ্ঞা করাটা এত দরকার ব'লে গণ্য হবে ?"

পল রিশার বল্লেন : "কারণ তা নৈলে অতিমানুষের জন্ম যে অসম্ভব। পৌরাণিক মর্কট পরম সন্তোষে যদি চিরকাল কদলী ভক্ষণেই রত থাকৃত তাহ'লে কখনই সে মানুষ হ'ত না। অসন্তোষ নইলে বিকাশ হয় কি কখনো ?"

বন্ধু বল্লেন "কিন্তু খৃষ্ট, বুদ্ধ—"

পল রিশার বল্লেন : "যখন অতিমানুষের বিকাশ হবে তখন সে লজ্জিত হবে যে ভগবানকে নিজশক্তি প্রকট করবার জন্যে বুদ্ধ বা খৃষ্টের জঘন্য দেহ অবলম্বন করতে হ'য়েছিল। এ কি অনন্ত শক্তির একটা মহা অপমান নয় যে তাঁকে আজ অবধি এমন হীন খোলস অবলম্বন করতে হয়েছে—তাঁর বিভূতির লীলাখেলা দেখাবার জন্যে ? আমাদের দেবোপম চৈতন্য এ দেহ দ্বারা প্রতি মুহূর্তে কি গভীরভাবে অপমানিত হচ্ছে ভাবুন ত একবার! কাল কি হবে আমরা জানি না; এই ঘরের বাইরে কি ঘট্‌ছে বাইরে না গেলে কল্পনাও করতে পারি না; একটা সামান্য মাইক্রোব মুহূর্তে আমার পরম গর্বের বস্তু ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তির বিলোপ সাধন করতে পারে। এ সব কি পরিতাপের বিষয় নয় ? যদি ভাবা যায় যে মানুষ যখন সৃষ্ট হয়নি তখন অনন্ত শক্তি'কে মর্কটের দেহের মধ্যেই নিজের বিকাশকে আবদ্ধ রাখ্‌তে হ'য়েছিল। মর্কটের বুদ্ধির মধ্যেই নিজেকে সংহত রাখ্‌তে হ'য়েছিল, মর্কটের উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যেই নিজের কল্পনাকে উপবাসী রাখ্‌তে হ'য়েছিল—তা'হলে মনটা কি ভাবে সাড়া দেয় ? অথচ এ হীনতা যে কত গভীর সে চেতনা সে সময়ের মর্কট জাতির মধ্যে নিশ্চয়ই আসে নি, যেহেতু সে আমাদেরই মতন ভাব্‌ত যে মর্কট লীলাই বিধাতার পরম মহিমার শ্রেষ্ঠ লীলা। কোন্ যুক্তি-বলে আমরা মনে করি যে খ্রীষ্ট বুদ্ধ অনন্ত শক্তির গৌরব ? অনন্ত শক্তির লীলা কি খৃষ্ট বা বুদ্ধের সসীম লীলাখেলায় জগতে হতে পারে কখনো ? আমি এ বিষয়ে অরবিন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক-মত যে ভবিষ্য অতিমানুষের যুগে খৃষ্ট বুদ্ধকে শিশু অতিমানুষও ভাববে—des ekes misérables—হেয় জঘন্য জীব।"

বান্ধবী দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন : "তাহ'লে কি আপনি বল্‌তে চান—"

পল রিশার বল্লেন : "এই কথা যে আমরা যেন মানুষের নরত্বের গর্ব্ব আর না করি। কেন না এ গর্ব্ব যতদিন আমাদের মনোজগতে উপ্ত থাক্‌বে ততদিন সেখানে অতিমানুষের বীজ পথ হারিয়ে নষ্ট হবেই হবে। আমরা যেন মানুষ হওয়ার জন্যে আজ লজ্জা বোধ করি। যেন মনে করি যে অনন্ত শক্তির এত বড় অগৌরব আর কিছুই হ'তে পারে না যে এত দিন অবধি মানুষের কোটা তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না।"

বন্ধু বল্লেন : "কিন্তু কি উপায়ে অতিমানুষের বিকাশ সম্ভবপর হবে ?"

পল রিশার বল্লেন : "তা জানি না। তবে মনে হয় যে যে-পরিমাণে মানুষ-হওয়ার জন্যে ধিক্কার বোধ করব, যে-পরিমাণে মানুষকে মনুষ্যত্বের গণ্ডীর মধ্যে রেখে শিক্ষা প্রভৃতি দিয়ে বড় করতে চেষ্টা করা নিষ্ফল মনে করব—এক কথায় যে-পরিমাণে মানুষ অমানুষ হবে—মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃতিকে ঘৃণা করবে, সেই পরিমাণে সে অধিকারী হবে। রোমা রোলাঁ আজকাল বলেন মানুষকে নিয়ে অনন্ত শক্তি নিরাশ হ'য়েছেন—তিনি অন্য একটা প্রণালী কেটে সম্ভবতঃ অন্য দিক্ দিয়ে শ্রেষ্ঠতর জীবের বিকাশ করবেন। কারণ তিনি বলেন মানুষের শ্মশানযাত্রার হরিবোল আজ জগতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে।"

আমি বল্লাম : "তিনি কই এ কথা ত কোথাও লেখেন নি ?"

পল রিশার বল্লেন : "সব কথা কি আর মানুষে লেখে ? আমাকে তিনি সম্প্রতি তাঁর এ নিরাশার আদর্শ-বাদ বার বার ব'লেছেন।"

বন্ধু বল্লেন : "আপনার কি মনে হয় এ কথা সত্য ?"

পল রিশার বল্লেন : "না। আমার মনে হয় মানুষই অতিমানুষ হবে—যদি সে মানুষ হবার জন্যে গর্ব্বিত না হ'য়ে আগে লজ্জায় অপমানে আত্মহত্যা করতেও রাজী থাকে, যদি মানুষ বলে যা পেয়েছি তার কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই যদি যা পাই নি তাকে বরণ করতে না পাই। এক কথায় আজ নতুন বিধাতাকে পূজা করতে শিখ্‌বে হবে—C'est un nouveau Dieu qu'il faut adorer."

আমি বল্লাম : "কি রকম ?"

পল রিশার বল্লেন : "পশুর দেবতার ধারণার সঙ্গে

মানুষের দেবতার ধারণার যে প্রভেদ সেটা মূলগত। তেম্নি মানুষের ভগবানের ধারণার সঙ্গে অতিমানুষের ভগবানের ধারণার প্রভেদও মূলগত হবে। কারণ এ না হ'য়েই পারে না। আমরা ভগবানকে অনেকটা মানুষের perfectionএর আইডিয়া দিয়ে মণ্ডিত ক'রে দেখি। কিন্তু অতিমানুষের perfectionএর আইডিয়ার সঙ্গে মানুষের perfectionএর আইডিয়ার একটা মূলগত প্রভেদ থাকবে ব'লে তার ভগবানের ধারণার সঙ্গে আমাদের ভগবানের ধারণার কোনো মিলই থাকতে পারে না। নয় কি?"

বান্ধবী বল্লেন: কিন্তু মানুষের perfectionএর আইডিয়ার যে আরও ঢের বিকাশ হ'তে পারে এ কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ায় বাধা কি?"

পল রিশার বল্লেন: "কিন্তু সেটা চিরকালই মানুষের মানুষী ধারণার একটা সীমার দ্বারা আবদ্ধ থাক্‌বেই যে! কেন না অতিমানুষ যে মানুষেরই একটা শ্রেষ্ঠতর perfection নয় এটা ভুল্‌লে ত চল্‌বে না। যেমন মানুষ মর্কটেরই একটা শ্রেষ্ঠতর সংস্করণ নয়, যেমন মর্কট-শ্রেষ্ঠও মানুষের পর্য্যায়ে কখনো আস্‌তে পারে না, তেম্নি মানুষ হাজার উন্নত হোক্ অতিমানুষের পর্য্যায়ে কখনো আস্‌তে পারে না। মানুষ ও অতিমানুষের সহজ ক্ষমতা ও নিবিড় ধারণার মধ্যে একটা গভীর অতল মহিমময় প্রভেদ থাক্‌বেই থাক্‌বে।"

বন্ধু বল্লেন: "কিন্তু কেমন ক'রে মানুষ অতিমানুষ হবে?"

পল রিশার হেসে বল্লেন: "তা কেমন ক'রে বল্‌ব? C'est l'inconnu—সে পথ যে অজানার পথ। হয়ত অনেক তামসী রজনীই পথ-খোঁজায় কাটাতে হবে, হয়ত অনেক মহৎ জীবনকেই সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এ অভিসারে যাত্রা করতে হবে, হয়ত অনেক দুঃসহ বেদনার অশ্রুজলেই জীবনে শূন্যতার নৈশ উপাধান সিক্ত ক'রে কাটাতে হবে। কে জানে? হয়ত আবার পশু-জন্মকেই বরণ করতে হতে পারে—যেমন রোলাঁ আজকাল বল্‌ছেন—হয়ত মানুষকে একেবারে ধ্বংস হ'তে হবে, যাতে প্রকৃতি নতুন একটা প্রণালীতে তাঁর শক্তিকে পরিচালিত করতে পারেন। সবই হ'তে পারে, কিম্বা হয়ত এমন কোনও উপায়ে এ অচেনা দেবতা দেখা দেবেন যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারছি না। তাই কি উপায়—কেমন ক'রে বল্‌ব? কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি যে এই জ্ঞানকে বরণ করা দরকার যে 'এ নয় এ নয় এ নয়; মানুষ চাই না, মানুষের শ্রেষ্ঠতম বিকাশও হেয়; মানুষ বিধাতার বরপুত্র নয়, ক্রমবিকাশে একটা গ্রন্থিমাত্র।' মনে রাখতে হবে যে জীব চিরকাল অনন্তের পথেই ধাবিত হবে, সর্ব্বদা নিশ্চিতকে পদতলে দলিত ক'রেই চল্‌বে, নিরন্তর স্বর্গীয় অসন্তোষের মধ্যে দিয়েই আগতকে ছেড়ে অনাগতের ললাটে জয়টীকা পরাতে ছুটবে। সর্ব্বপ্রকার মানুষী ধারণাকে মন থেকে উপড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করতে হবে—অথচ একটা বিশ্বাসকে বরণ করতে হবে যে এ না হ'য়েই পারে না। Il faut dive: 'Je ne crois a rien mais j'ai confiance.'। আমার কোনও গণ্ডীবদ্ধ প্রত্যয় নেই কিন্তু বিশ্বাস আছে।"

পথহারা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পথ হারানোর গান গেয়ে সে উঠ্‌লো মেতে,
পথ হারালেম গানের পথে যেতে যেতে।
অনিমেষ ঐ তারায় তারায়
কে যে হারায় কেবল হারায়,
ছলভরা কার আঁখির বাঁধন
কেবল টানে বুকের পানে।

মন হারানোর গানখানি এই গভীর রাতে,
প্রাণের পথে ঘুরছে কেবল সাথে সাথে।
এই যে ফুরায় এই যে ফুরায়
এমনি ক'রেই কেবল কুড়ায়
প্রাণের কথা বুকের ব্যথা
প্রাণের তলে চোখের জলে।

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বস-বাস করিয়াছিলেন। কেহ বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়া-হুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্ব্বিঘ্ন জীবন। বাদসাহী আমলের কেল্লা ও ইমারৎ দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর ওমরাহ্‌গণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙা ও আ-ভাঙা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ব-বিশ্রুত তাজ-মহল তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া, যমুনার এপার হইতে ওপার হইতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙ্ড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোকে কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়-ঘর ছিল, কোন্ জাঠ্-সর্দ্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে,—সে কালির দাগ কত প্রাচীন,—কোন্ দস্যু কত হীরা মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত,—কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই। এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী-সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, অ্যামেরিকান টুরিষ্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরৎ বৈষ্ণবদের পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এম্‌নি সময়ে একজন প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী তাঁহার শিক্ষিতা সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে সহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা-বাবুর্চ্চি-দরওয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচয়ানে এতকালের এত বড় ফাঁকা বাড়ীর সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র যেন যাদু-বিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং, নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্ব্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ীর ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের পর করিয়া না রাখেন। এম্‌নি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুসি হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ী এবং মোটর যখন-তখন যাঁহার-তাঁহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনে হৃদ্যতা এম্‌নি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিম্বা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ খানেকের অধিক সময় লাগিলনা। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ, এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা

করে নাই ইঁহারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয়না। তবে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়া যতটা বুঝা যায় সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছিল যে ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ, বাচ-বিচার করিয়া চলেননা। বাড়ীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হৌন বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ বসু কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল,—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর দুই পূর্ব্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জরাক্রান্তা হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনী-পতি ছাড়িলেননা। সম্প্রতি গৃহে তিনিই কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন। বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে, বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ কোরোনা,—কপাল! নইলে, চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্ব্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ। নানা আকারের, নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিং,—মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এই দিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোক-সমাগম ঘটে। আজ কি একটা পর্ব্বো-পলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, জন দুই নিচের ঢালা-বিছানায় উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া-ছিলেন, এবং জন দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন, বাকি সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা-মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমনি সময়ে মস্ত একটা ভারি মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতে সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যস্ ইন্‌-ডিগ্‌নেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে প'ড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্ত্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চ-হাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু ব'দ্যির অসময়? এত বড় দুর্ণাম যে আমার ছোট খুড়োও দিতে পারেননা অবিনাশ বাবু!

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বোল্‌চ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক্ ছোট খুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি। কিন্তু, এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুণের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বোল্‌ব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে, যে পায়ের ধূলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখ্‌তে হোতো অবিনাশ বাবু। কিন্তু আজ আর বসবার যো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্য্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি,—সপরিবারে যেতে হবে। তার পরে একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবেনা।

আরও একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌স, মেয়েদের জন্য না

হোক্ আমাদের পুরুষদের জন্য দু'রকম খাবার ব্যবস্থাই,—অর্থাৎ কি না,—প্রেজুডিস্ যদি না থাকে ত,—বুঝলেন না ?

বুঝিলেন সকলেই, এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন ও-সকলেই যে তাঁহাদের প্রেজুডিস্ নাই।

আশুবাবু খুসি হইয়া কহিলেন, না থাক্‌বারই কথা। মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মত্যামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলোনা। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফির্‌তে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার সখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস, পিয়াজ-রশুন ও ত স্পর্শও করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না ?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারি অনিচ্ছে,—সে হল আবার সন্ন্যাসী গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি সমস্ত বলে যাচ্ছো বাবা !

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন, এবং কন্যার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিলনা।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিলনা, এবং আরও দুই চারি মিনিট যাহা ইঁহারা বসিয়া রহিলেন আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন এক প্রকার বিমনা হইয়া রহিল। এবং উভয়ে চলিয়া গেলে সকলেরই মনে হইতে লাগিল সহসা একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাতে সমস্ত মজলিসের যেন রস-ভঙ্গ হইয়া গেছে।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল-না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে ? আশুবাবুর পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে সে আজও অনূঢ়া,—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজা-সুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে ?

অথচ, এই সন্ন্যাসী গোছের বাবাজী যেই হৌন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ, তাঁহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এত বড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস-রশুন-পিয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

এবং, লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি ? পিতা সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল। এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলা-মিশার যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল অকস্মাৎ আজ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

(২)

মনে হইয়াছিল আশুবাবু সহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেননা। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন, বাড়ীর মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্ব্বেই আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলি ! মোষ্ট ওয়েলকাম্ !

ওস্তাদজিদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেননা যেন ! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যেই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুসি হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি, মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা' নয়,—সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। এই বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্য্যন্ত,—একটি মাত্র নর-দেহ এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে যে কি বিস্ময়ের বস্তু তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক্ লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতি-নমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এম্‌নি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদ-গৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক্। কই, আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিলেন, পাননি বুঝি? আশ্চর্য্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, কে জান্‌তো অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ-চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হোক ইঁহারা যে পূর্ব্বে হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাষে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু, অপ্রীতি-কর ও স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে কেবল মাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্য্যন্ত যেন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইলনা, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ীর সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা সুরু হইতে পারিতেছেনা।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল,—বিশেষত্ব-বর্জ্জিত মামুলি ব্যাপার,—কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসর সঙ্গীতের আসরে, এই স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত, অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহার পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া,—সেই সর্ব্বাঙ্গীন-তান-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমির খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা!

মনোরমা শিশুকাল হইতেই গান-বাজনার চর্চ্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টন্ টন্ করিতে থাকে তাহা সে জানিতনা। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায়না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয়না। এই বছর খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইম্‌প্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচ্চা লোক বলিয়া বন্ধু-মহলে খ্যাতি আছে। গান-বাজনা ভাল-লাগাটা

তাঁহার মতে চিত্তের দুর্ব্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে সহরের আব-হাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গম্ভীর শান্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ইঁহাদেরও ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়াছিল; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টিই লেগে থাক্ এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ, অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিলনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, গানের প্রাণ থাকা-না-থাকার সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় কাহারও ছিলনা। গুণ-মুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে এবং তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন, এবং অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর মহল। ক্রমশঃ, তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের আহারে রুচি ছিলনা, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলনা, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুন্‌ড্লা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই তিন দিনের আলাপেই কি করিয়া সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া আশুবাবু যখন নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, কিন্তু সব চেয়ে বাহাদুরি হচ্চে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক? বলিনি যে, মণি, এঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা?

কন্যা আনন্দে মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক্‌না অক্ষয় বাবু। থাক্‌না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার কয়েক মাথা নাড়িলেন. কহিলেন, না, অবিনাশবাবু, চাপ্‌লে চল্‌বেনা। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি।

আহা-হা,—কর কি অক্ষয়! কর্ত্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে,—হবে এখন আর একদিন—এই বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেননা। অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা টলিলনা। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই না কি? কিন্তু তার কি স্থান কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ সহরে যদি আর না আস্‌তেন, যদি ভদ্র পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ, কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাক্‌তেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, It is too much!

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, No, it is not!

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা—কোরচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেননা, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি কোরে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল—স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্যে।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন—মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল, মিছে কথাই ত। কারণ, প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ, আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হোতো। আর তাই ত হোলো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্যে।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সেই কখনো না কখনো মাতাল হয়। যে হয়না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাস্‌তে পারেন, কিন্তু এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন এ অপবাদ ত আমি দিইনি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করাবার জন্যে আপনারা যে স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা'হলে আশা করি আরও একটা সত্য এম্‌নিই স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানিনে। তবে, এ জানি অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেম্‌নি বিপুল। কি স্বীকার কর্‌তে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কি না?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন,—আপনি কি সব বল্‌ছেন অক্ষয় বাবু? এ কি কখনো হয়, না হ'তে পারে।

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে, আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চল্‌লো,—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট। তা'তে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে করে দাঁত পড়ে, চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হোলো।

আশুবাবু বিহ্বল চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—অ্যাঁ! শুধু এই জন্যে? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না। মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্ম্মল সাধুতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ লোকসান চুলোয় যাক্, একবার মিথ্যে করেই বল যে সে গভীর অপরাধ করেছিল। তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বেনা।

শিবনাথ রাগ করিলনা, শুধু কহিল, কিন্তু এ রকম অযথা কথা আমি বল্‌তে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথ বাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিলনা, শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই ত জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে,—অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথ বাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেননা। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হোলো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধ হয় বাপ মা নেই।

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝি'র বিধবা মেয়ে।

বাড়ীর ঝি'র মেয়ে? চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি টাঁতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারি হইয়া রহিল। কৌতূহল ও উত্তেজনা বশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা'হলে এটা বোধ হয়: সিভিল বিবাহই হোলো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না,—বিবাহ হোলো শৈব মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ, ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশ দিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশ বাবু। নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁকি ছিলনা, অথচ ফাঁক যথেষ্টই ছিল তার চোখ থাকা চাই অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলনা, শুধু সমস্ত মুখ তাহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে,—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়,—ঠিক এম্নি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন,—যাক্, যাক্, যাক্,—যাক্ এ সব কথা। শিবনাথ, তা'হলে সেই পাথরের কারবারটাই কোরচ? না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর না-বালক ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হল? তাদের মা আছেন না? অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন,—আমরা ভেবেছিলাম টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃদ্!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই এতখানি সে সময়ে করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক্, শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলেনা কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিলনা, কহিল, অংশ কিসের? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসরের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি রকম শিবনাথ বাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বই কি।

অক্ষয় বলিলেন, কখ্খনো না। আমরা সবাই জানি যোগীন বাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেণ্ট ছিল? শুনেছিলেন?

অবিনাশ চমকিয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল না কি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করে-ছিলেন। ডিক্রী আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বেশ হয়েছে। তা'হলে শেষ পর্য্যন্ত বিধবাদের দিতে কিছুই হ'লনা।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপ্‌টা খাসা রেঁধেচ হে। আর দু একটা আনো ত।

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কই আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্চেন?

মনোরমা এ কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না,—শুধু কেবল ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব দেহ ভরিয়া বার বার কাঁটা দিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

গীতবাদ্যের আবেদন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

হে, রাজা মাগি ভিক জুড়িয়া দুটী কর,
মৃদু এ সুর-মৃগে মের না খর শর।
দ্যুলোকে থাকি মোরা ভূলোকে আসি হায়,
পুলকে ভাসি স্বরে, সারঙ মিশে যায়।
শ্রবণ-পথ বাহি মরমে পশি মোরা,
বিমল সুধাধারা বিলায়ে খুসী মোরা।
অসুর নহি মোরা সুরের ব্যবসায়ী
বেসুরা কর না হে দশের মুখ চাহি।

২

মোদের মিনতিতে গলেছে ভগবান,
অসাড় পাষাণেও জাগাতে পারি প্রাণ।
উজান বহায়েছি অধীর যমুনায়,
নেমেছে সুরনদী আকুল কামনায়,
মহিমা আনিয়াছি শিখের কৃপাণেতে,
নদীয়া ডুবুডুবু প্রেমেরি তুফানেতে।
লভেছি স্বাধীনতা বাণীর বীণা চুমি,
বাঁধন পরায়ো না বিধান গড়ি তুমি।

৩

শানায়ে সাধি মোরা বোধন আগমনী,
ভাবুক ও অনুরাগী গোপনে কাঁদে শুনি।
বুকেতে খুঁজে আনি হারানো কত স্মৃতি,
পুরানো কত কথা, অতীত সুখ প্রীতি।
অকূলে কূলে আনি ক্ষমতা অনুপম,
দরদ দিয়া করি প্রিয়েরে প্রিয়তম।
ভজনে উৎসবে করিহে মাধুকরী,
অলকা করি ধরা সোহাগে যাদু করি।

৪

ঝুলন রাতে কত ঝুলন দোলায়েছি,
হোলিতে রাঙা ফাগে আদর বুলায়েছি।
বরের সাথে সাথে চলি যে গাহি গীতি,
বরণ করে মোরা বধূরে আনি নিতি।
প্রতিমা সাথে করি নিয়ত আনাগোণা,
অরূপে রূপ দেওয়া মোদের আরাধনা।
মোদের চারি পাশে অচল আয়তন
রচ না মহামতি, রাখ এ নিবেদন।

৫

মধুপে যে দিয়াছে মধুর গুঞ্জন,
ঝিঁঝির তালে তালে নূপুর শিঞ্জন।
কণ্ঠে বিহগের কাকলী মনোহর,
মেঘের মিছিলেতে মাদল গুরুতর।
নদীতে কলধ্বনি, বাতাসে হু হু রব,
শ্যামার মুখে শিষ, পিকের কুহু রব।
গীতেতে হবে আহা তাঁহারি অপমান,
শুনিয়া মাথা কুটে গুমরি কাঁদে প্রাণ!

৬

ইমন কল্যাণ পাবে না পথ আর,
বাদলে বাজিবে না সুরট মল্লার।
কাজরী গান গেয়ে যাবে না বধূদল
বিভাস বিপথেতে ফেলিবে আঁখি জল।
হবে যে বাজাইতে ললিত দ্বিপ্রহরে,
বেহাগে দিবালোকে আনিবে ঘাড়ে ধরে।
থমকি থেমে যাবে আধেক পথে গান
মীড়ের মধুরিমা মরমে ম্রিয়মাণ।

৭

এ দেহ অশরীরি তবুও আসে ক্রোধ।
কলের কামানেতে গীতের গতিরোধ।
গীতের দেশে প্রভু জনম জানি তব
মোদের এ পরিচয় নহে ত অভিনব।
কি সুধা ঢালি মোরা নিজে ত জান তুমি
ভরি যে পারিজাতে বুকের মরুভূমি।
রেখ না আমাদিকে আটকে মতিমান,
মের না সুর-মৃগে সায়ক খরশান।

ড্রেসডেনের চিত্রশালা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

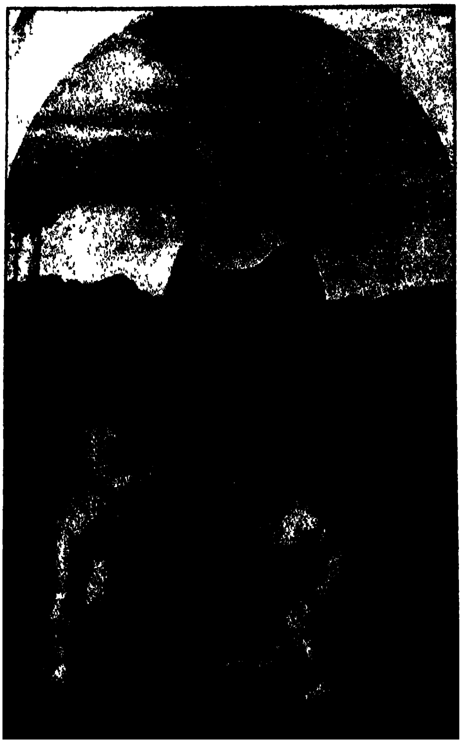
জার্ম্মাণীর সকল বড় সহরের মধ্যে সাক্‌সনী রাজ্যের রাজধানী ড্রেসডেন নগর (Dresden) সবচেয়ে সুন্দরী বলে সুখ্যাতি আছে। কিন্তু শুধু তার রূপ দিয়ে নয়, তার অনেক গুণ দিয়ে এই নগরী পথিকদের মন হরণ করে। সাক্সনীর তরুণীদের মত ড্রেসডেন রূপে-গুণে-সমন্বিতা। তার অপেরা, তার চিত্রশালা, তার নদীর ধার, তার ফুলের বাগান, তার পথের জনতা দিয়ে ড্রেসডেন বিদেশী পথিকের



সিসটিনে মাতৃমূর্ত্তি (রাফাএল)

অন্তর জয় করে। বার্লিন থেকে ড্রেসডেনে এলে বেশ বোঝা যায়, এ নগরীর হাওয়া অন্য রকমের; বণিকদের স্বর্ণমুদ্রার দীপ্তিতে নয়, রূপ-রসিক আর্টিষ্টদের অন্তরের আনন্দ-দীপ্তিতে এ স্থান উজ্জ্বল।

এলব্ (Elbe) নদীর দুধার জুড়ে ড্রেসডেন-সহর। এক দিকে পুরাতন সহর, আর এক দিকে নূতন সহর। এই দুই সহর যুক্ত করে যে ক'টি পোল আছে, তার মধ্যে অগষ্টস-সেতু (Augustus Brücke) সবচেয়ে সুন্দর। এক শরৎ সন্ধ্যায় এই সেতুতে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত দেখেছি, সামনে নদী বেঁকে গেছে, সহরের প্রাসাদশ্রেণী, তোরণ, গির্জ্জার চূড়ার ওপর অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভা ঝলমল করছে, আলো অন্ধকারে সমস্ত সহর রঙীণ স্বপ্নের মত মনে হয়।



সুন্দরী উদ্যান-পালিনী (রাফাএল)

এই সেতুটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ানের স্মৃতি-বিজড়িত। ড্রেসডেনের যুদ্ধে (Battle of Dresden) নেপোলিয়ান যখন ড্রেসডেন আক্রমণ করেন, তখন তাঁর অপর পক্ষ বারুদ দিয়ে পোলের মাঝখানটা উড়িয়ে দেয়।

নেপোলিয়ান তখন পোলের দুই ভাঙা অংশের মধ্যে এক কাঠের তক্তা পেতে পোল করে সৈন্যদের নদী পার হবার ব্যবস্থা করেন। শত্রুর কামানের মুখে কি করে সে তক্তার ওপর দিয়ে নদী পার হওয়া যায়! নেপোলিয়ান তখন নিজে তক্তার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে, কি করে তক্তার পোল পার হতে হবে, দেখান। এ যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৯৬,০০০; আর অপর পক্ষে ২০০,০০০। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধে একদিকে ফরাসী অপর দিকে মিত্রপক্ষ (Allies) অর্থাৎ ইংরাজ, প্রুসিয়ান, রুসিয়ান, অষ্ট্রিয়ান। তার এক শত বৎসর পরে ইয়োরোপে যে মহাযুদ্ধ হল, তখন মিত্রপক্ষদের দল বদল হয়ে গেছে। আবার ড্রেসডেন পৃথিবীর মধ্যে আর্টের এক প্রধান কেন্দ্র হয়েছে। তার অপেরা ও বিশেষ করে তার চিত্রশালা এই রাজবংশের অমর কীর্ত্তি।

ড্রেসডেনের চিত্রশালা পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান চিত্রশালা, ও উত্তর ইয়োরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে ইলেক্টার অগষ্টস্ নিজের প্রাসাদে চিত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। তৃতীয় অগষ্টস্এর সময় এই চিত্রশালা পৃথক ভাবে স্থাপিত হয়। তার পর অগষ্ট দি ষ্ট্রং ইয়োরোপের নানাদেশ হতে প্রধান প্রধান চিত্রকরদের চিত্র কিনতে আরম্ভ করেন। রাজকোষের অর্থ ছবি কেনবার জন্যে এরূপ অপরিমিতভাবে ব্যয় করাতে অনেকে তার



পাওলো ভেরোনেজে—কানাতে বিবাহ-দৃশ্য

ইয়োরোপের আগামী যুদ্ধে কি রকম দল বিভাগ হবে তা কে বলতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের আগে ড্রেসডেনে সাক্সনীর রাজা বাস করতেন। কিন্তু যুদ্ধের পর সাক্সনীতে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে গেছেন। তবে তিনি জনসাধারণের খুব প্রিয়। একবার তিনি তাঁর ভূতপূর্ব্ব রাজধানী দেখতে আসেন। তখন নগরবাসী সবাই তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ও তাঁর নামে জয়ধ্বনি করে। তা দেখে তিনি হেসে বলেছিলেন, Thr seid mir schöne Republikaner! তোমরা ত বেশ রিপাবলিকান দেখছি। বস্তুতঃ ড্রেসডেনবাসীর পক্ষে তাদের ভূতপূর্ব্ব রাজাকে ভালবাসবার বিশেষ কারণ আছে। এই রাজবংশের গুণে বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সব ছবি সংগ্রহের গুণেই এখন প্রতি বৎসর শত শত বিদেশী ড্রেসডেনের চিত্রশালা দেখতে আসেন। এ থেকে ড্রেসডেনবাসীর লাভ বড় কম নয়।

ড্রেসডেনের চিত্রশালায় প্রথম ইতালীয়ান চিত্রকরদের চিত্র থেকে বর্ত্তমান এক্সপ্রেসেনটি (Expressiant)দের চিত্র, ইয়োরোপের চিত্রের ইতিহাসের সকল পর্ব্বের চিত্রের নমুনা আছে। তার চিত্র-সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। তাছাড়া এনগ্রেভিং ও ড্রয়িংএর নমুনার সংগ্রহ চার লক্ষ। ড্রেসডেনের সব ছবির কথা লিখতে গেলে ইয়োরোপের চিত্রকলার ইতিহাস লিখতে হয়। আমি শুধু প্রধান প্রধান কয়েকখানি বিখ্যাত ছবির কথা বলব।

ড্রেসডেনের চিত্রশালা বলতে যে ছবিখানি সবাইকার মনে প্রথমেই জেগে ওঠে, প্রথমে সেই ছবির কথা বলি। সেটি হচ্ছে রাফাএলের সিস্‌টিনে মাডোনা বা সেণ্ট সিক্সটস্‌এর মাতৃমূর্ত্তি। অনেকে কেবল এই ছবিখানি দেখতে চিত্রশালায় আসেন। অনেকের মতে এইটি রাফাএলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র।

যিশুর মাতা মেরী খৃষ্টানদের বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিকদের নিকট দেবী-স্বরূপিণী। তাঁর মূর্ত্তি এঁকে অনেক গির্জ্জাতে তাঁকে দেবীরূপে পূজা করা হয়। তাঁর মাতৃ-রূপ হচ্ছে তাঁর ভক্তের বিশেষ প্রিয় রূপ। রাফাএল ইতালীর সান্‌ সিষ্টোর মঠের খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদের জন্য এই ছবিখানি এঁকেছিলেন (১৫১৫ খৃঃ অব্দে)। সাক্সনীর রাজা সেই মঠের নিকট থেকে প্রায় ৫১৫৫ পাউণ্ড দিয়ে এই ছবিখানি কিনে নেন (১৭৫৩ খৃঃ অব্দে)। ছবিখানি



মাগডালেন (পিয়েত্রো রোতারি)

তাঁর রাজপ্রাসাদে রাখা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ছবিখানি যখন রাজপ্রাসাদে এল, ঠিক হল তাঁর সভার ঘরে সেখানি রাখা হবে। কোন্‌ দেওয়ালে কোথায় রাখলে ছবিখানি



মাগডালেন (করেজিও)

ভাল দেখায়, বেশ আলো পড়ে, তাই পরীক্ষা করে নানা জায়গায় ছবি রেখে দেখা গেল, যে স্থানে রাজসিংহাসন আছে সেইখানে ছবি রাখলে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। কিন্তু রাজসিংহাসন সরিয়ে ছবি রাখতে সবাইএর সঙ্কোচ হল। কিন্তু রাজা তা বুঝতে পেরে নিজের হাতে সিংহাসন সরিয়ে কোণে ঠেলে দিয়ে বল্লেন, এইখানে ছবি রাখ, রাফাএলএর ছবির এইখানে উপযুক্ত স্থান, আমার সিংহাসন দূর করে দাও।

ছবিখানি এখন চিত্রশালায় একটি পৃথক ঘরে বিশেষরূপে যত্ন করে সাজান আছে। সে ঘরে ঢুকলেই মনে হয় যেন মন্দিরে ঢুকছি। সবাই ছবির সামনে মাথার টুপি খুলে মাথা নত করে দাঁড়ায়—যেন অপরূপা দেবীপ্রতিমা দেখছে, এম্নি স্তব্ধ ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এইখানে রাফাএলের কথা একটু বলি। পৃথিবীর সকল চিত্রকরদের মধ্যে তিনি বোধ হয় সর্ব্ব-পরিচিত ও সবাইকার প্রিয়। নিজের জীবনে তিনি যেমন সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সে সুখ্যাতি অম্লান চিরদীপ্ত হয়ে আছে। আর্ট-সমালোচনার ইতিহাসে দেখা যায়, কোন শতাব্দীতে কোন শিল্পীর নামে জয়ধ্বনি ওঠে, আবার পরের শতাব্দীতে সে নাম সবাই ভুলে যায়; কিন্তু রাফাএলের

নাম সকল শতাব্দীতে সমানভাবে আদৃত হয়ে এসেছে। তার কারণ হচ্ছে, রাফাএল যে শুধু মানবের অন্তরের সৌন্দর্য্যবৃত্তির চরিতার্থতা করেছেন, তা নয়, তিনি তার আত্মার স্বপ্ন ও অনুভূতিকে মূর্ত্তি দিয়েছেন। তাঁর ছবিতে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই।

১৪৮৩ খৃঃ অব্দে ইতালীর উর্‌বিনো সহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবাও চিত্রকর ছিলেন। তবে তিনি পিতার কাছ থেকে বিশেষ কিছু শিখতে পান নি। তাঁর এগারো বৎসর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর বিমাতা ও তাঁর বাবার যত্নে তাঁর শিক্ষার ব্যাঘাত হয় নি। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি সৈনিকের স্বপ্ন বলে যে ছবি আঁকেন, তাতে তাঁর প্রতিভার অদ্ভুত বিকাশ দেখা যায়। বিশ বৎসর বয়সে তিনি পাকা চিত্রকর হয়ে গেছেন। একুশ বৎসর বয়সে যখন তিনি ফ্লোরেন্সে আসেন, তখন তাঁর প্রতিভার অপূর্ব্ব প্রকাশ আরম্ভ হল। তখন ফ্লোরেন্স ইয়োরোপের মধ্যে আর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তখন সেখানে লেওনারদো দা ভিঞ্চি, মিকেল আঞ্জিলোর যুগ। ইতালীয়ান আর্টের সে স্বর্ণময় যুগ রাফাএল তাঁর প্রতিভার প্রদীপে আরও উজ্জ্বল করে তুল্লেন।

পারিষ লুভার মিউজিয়ামে La Belle Jardiniere ('সুন্দরী উদ্যান পালিনী') বলে, রাফাএলের এই সময়কার একটি ছবি আছে (১৫০৭ খৃঃ অব্দে)। ছবিখানি দেখলে বোঝা যায়, এই মাতৃমূর্ত্তি একটি তরুণ শিল্পীর অন্তরের কল্পনা। যেন তাঁর জন্মভূমি উম্‌ব্রিয়ার পাহাড় ও মাঠের মধ্যে এক গ্রামের ধারে স্বচ্ছ নীলাকাশ-ভরা আলোর মধ্যে একটি তরুণী মাতা তাঁর দুগ্ধ-পুষ্ট নধরকান্তি শিশু দুটিকে কোলে টেনে শান্ত, কল্যাণী মূর্ত্তিতে বসে আছেন। সুন্দর চোখ দু'টি থেকে স্নেহ-সুধা ঝরে পড়েছে। তাঁর কোমল সুন্দর মুখে, দেহের ভঙ্গীতে মাতৃত্বের ভাব ভরা।

এই মাডোনা বা মাতৃমূর্ত্তি, যিশুমাতা মেরীর নব নব রূপ রাফাএল তাঁর সমস্ত জীবনে কত মূর্ত্তিতে কত ভাবে এঁকে গেছেন। ইয়োরোপের নানা চিত্রশালায় তাঁর আঁকা প্রায় চল্লিশটি মাতৃমূর্ত্তির ছবি আছে। কোন চিত্রকর তাঁর মত এমন সুন্দর মাডোনা আঁকতে পারেন নি। এই মাডোনা-গুলি তাঁর আর্টের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই মাতৃ-



পুণ্যরাত্রি (করেজিও)

মূর্ত্তিগুলি যেমন সুন্দরী, তেম্নি মাধুর্য্যময়ী; যেমন কল্যাণদায়িনী, তেম্নি করুণাময়ী। এ দেবী মূর্ত্তি নয়, এ স্নেহময়ী মাতা, অথচ এ যেন বাস্তব পৃথিবীর নয়, আত্মার স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। মূর্ত্তিগুলির দেহে কি সৌন্দর্য্যময় ছন্দ, মুখে কি পবিত্র স্নেহময় ভাব, চোখে কি প্রেম ও করুণা, দেহের গঠন মাধুর্য্যে ভরা; কোলে সুকুমার শিশু স্নেহ-শক্তিময় হাতে

রক্ষিত। এ সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তির সামনে মাথা ভক্তিতে নত হয়ে আসে।

ফ্লোরেন্সে পিটি চিত্রশালায় রাফাএলের আর একটি মাতৃমূর্ত্তির ছবি আছে—Madonna della Seggiola বা

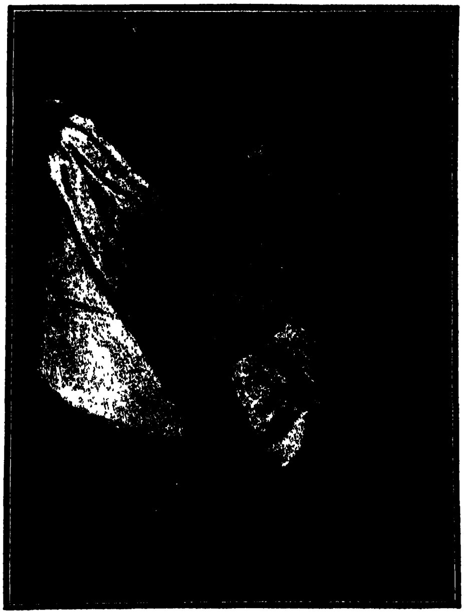


রাফায়েলো শান্তি—সিস্‌টিনে মাতৃমূর্ত্তি

চেয়ারে উপবিষ্টা মাতৃমূর্ত্তি। এটি তাঁর মাঝ বয়সে আঁকা (১৫১৪-১৬)।

কিন্তু ড্রেসডেনের মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা ও অঙ্কন-ভঙ্গীতে রাফাএলের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সহসা যেন নীলাকাশের পর্দ্দা কে সরিয়ে দিল, স্বর্গলোকের অপূর্ব্ব দীপ্তির মধ্যে মেঘলোকের ওপর মহিমান্বিতা মাতৃমূর্ত্তি দেখা দিল। এ মানুষের চোখ দিয়ে দেখা নয়, এ যেন সাধক সাধনা করতে করতে সিদ্ধিলাভ করে সহসা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেবীমূর্ত্তি দেখতে পেলেন।

জগৎতারিণী দেবীর মত, অভয়দায়িনী দুর্গার মত মাতৃমূর্ত্তি শান্তা গাম্ভীর্য্যময়ী, মায়ালোকে অবস্থিতা; তাঁর বক্ষে অমূল্য সন্তানরত্ন পৃথিবীকে মুক্তি দেবে, শান্তি দেবে। রাফাএলের তরুণ বয়সের মাতৃমূর্ত্তিকে দেখেছি—মাঠের মধ্যে নীলাকাশের তলে বসে পৃথিবীর মেয়ে; এ 'মাতৃমূর্ত্তিকে' দেখি, মেঘলোকের ওপর স্বর্গের দেবী, তাঁর এক দিকে ভক্ত সেণ্ট সিক্টস (St. Sixtus) আনন্দবিহ্বল বিস্মিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে করুণা ভিক্ষা করছেন; অপর দিকে ভক্তিমতী সাধ্বী সেণ্ট বারবারা (St. Barbara) এই দেবী-রূপ দর্শনে আপন জীবন কৃতার্থ ও মুক্ত ভেবে আনন্দে মাথা নত করছেন। পায়ের তলায় শুভ্র মেঘলোক শুদ্ধ স্বপ্নের মত, তাদের মধ্যে দুইটি ছোট দেবশিশু। এই দেবশিশু দু'টি রাফাএলের আঁকা কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, এ দু'টি পরে রাফাএল এঁকেছেন বা অন্য কোন চিত্রকর এঁকে জুড়ে দিয়েছেন। সে যা হোক, এ অতুলনীয় চিত্র মাতৃত্বের অপরূপ রূপক, তাই এখানি নিত্যকালের। তাই এই চিত্র শুধু রূপরসিকের অন্তর নয়, সকল ভক্ত ধর্ম্মপিপাসুর অন্তর জয় করেছে। এ ছবিখানিতে অঙ্কন-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয়

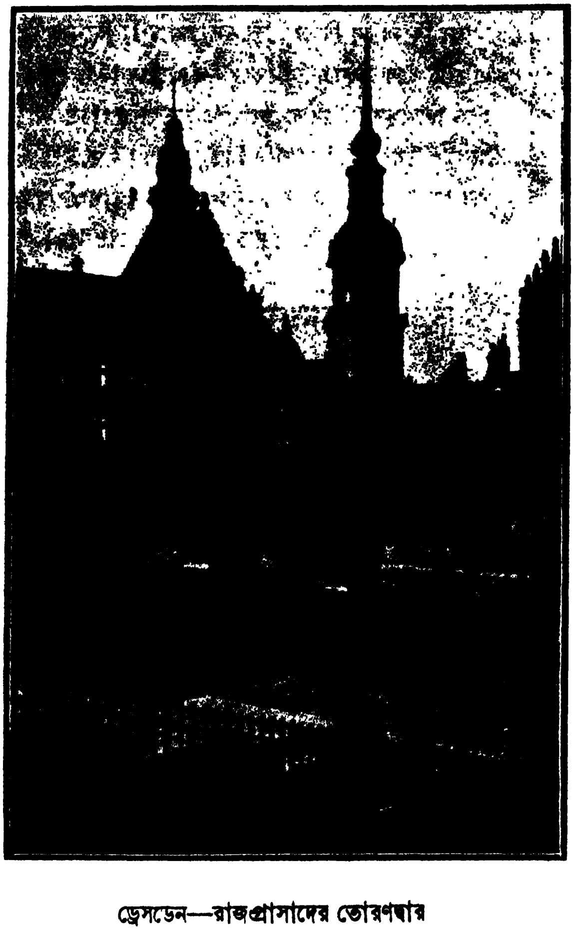


সাধ্বী আগনেস—রিবেরা

আছে, কিন্তু তুলির কায়দা রংএর সমাবেশের মধ্যে নয়; ছবির ভাবের মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠত্ব; এখানে রূপ ও ভাব এক হয়ে আর্টের অমর রূপ নিয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর লাগে মাতৃমূর্ত্তির চোখের চাউনি, চিরজাগ্রতা দেবীর মত সেই পলক-

হীন পুণ্যদৃষ্টি যেন আদিমকাল হতে পৃথিবীর শিয়রে জেগে এসেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত জেগে থাকবে।

৩৭ বৎসর বয়সে রাফাএলের মৃত্যু হয়। তাঁর এ অকাল-মৃত্যুর কথা ভাবলে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এই কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ হয় যে, জীবনে তিনি যশ, মান, অর্থ অর্জ্জন করে গেছেন। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরকে যেমন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে, তাঁর জীবনে তেমন



ড্রেসডেন—রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার

দুঃখদারিদ্র্য ভোগ হয় নি। রাফাএল শুধু নিপুণ রূপদক্ষ ছিলেন না, তিনি পরম সাধক ছিলেন। তাই সেই 'divino pittore'র মৃত্যুতে সমস্ত ইয়োরোপ শোকাকুল হয়ে উঠেছিল।

ড্রেসডেনে ইতালীর অন্য চিত্রকরদের আরও কয়েকটি মাডোনার ছবি আছে। তার মধ্যে করেজিওর (Correggio) মাডোনা (Madonna of St. Francis) সুন্দর ও প্রসিদ্ধ। করেজিওর আসল নাম হচ্ছে আন্তোনিও আলেগ্রি। তিনি ইতালীর যে সহরে জন্মেছিলেন (১৪৯৪ খৃঃ অব্দে) তার নাম করেজিও। সেই সহরের নাম থেকে তাঁর নামকরণ হয়েছে। সেই সহরের ফ্রান্সিসকান মঠবাসীদের জন্য তিনি এই চিত্র আঁকেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় কুড়ি। এই চিত্র তাঁর নগর-বাসীদের এত প্রিয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরে যখন (১৬৩৮ খৃঃ অব্দে) এই ছবিখানি ডিউক অব মোদেনা নিয়ে যান, তখন সব নগর-বাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং রীতিমত এক দাঙ্গা হয়ে গেছল।

করেজিও যদিও লেওনার্দ দ্যো ভিঞ্চি, রাফাএলো প্রভৃতি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ইতালীয়ান চিত্রকরদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাঁদের ধরণে শিক্ষিত হয়েছিলেন, তবু তাঁর পরিকল্পনা ও অঙ্কনরীতি তাঁর নিজস্ব বিশেষত্বে ও প্রতি-ভায় ভরা! এই মাডোনা ছবিখানিতে তাঁর তরুণ মনের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা দেখি। ভার্জ্জিন মেরী সন্তান কোলে সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর এক দিকে সাধু ফ্রান্সিস্ ও সাধু আন্তনি; অপর দিকে জন্ দি ব্যাপটিষ্ট ও ক্যাথেরিন। ওপরে আকাশে দেবশিশুগণ শুভ্র-পুষ্পের গুচ্ছের মত ঝুলছে। সমস্ত ছবির মধ্যে একটা উৎসবের আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে। অনেকে ছবিখানি সম্বন্ধে আপত্তি করেছেন যে, মাডোনাকে সুন্দরী তরুণীর মত দেখতে, তাঁর মুখের হাসিতে প্রেমের ভাব জড়ান, তিনি এক সুন্দর যুবা সন্ন্যাসীর প্রতি হাস্যভরা চোখে চেয়ে আশীর্ব্বাদ করছেন। তাঁদের বোঝা উচিত যে ছবিখানি একটি কুড়ি বৎসর বয়সের শিল্পীর অন্তরের পরিকল্পনা, সেই তারুণ্যের প্রেম ও স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্ট।

এ ছবিখানি করেজিওর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নয়। পুণ্য-রাত্রি (Holy night) বলে চিত্রশালায় যে ছবিখানি আছে, তাতে করেজিওর প্রতিভার বিশেষ অঙ্কনভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। ছবিখানির বিষয় হচ্ছে, যিশুর জন্ম।

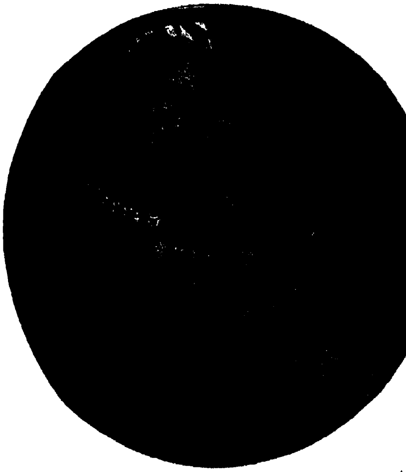
সেই পুণ্য-রাত্রের পরিকল্পনা অনেক চিত্রকর অনেক ভাবে করেছেন। করেজিওর চিত্রে দেখি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, তিমিররাত্রির শেষে সূর্য্যের উদয় হচ্ছে, চারিদিক আলোয় ভরে যাচ্ছে। খড়ের ওপর শোয়ানো ছোট শিশুর সর্ব্বদেহ হতে কি স্বর্গীয় তীব্রোজ্জ্বল দ্যুতি বাহির হয়ে সবাইকার আশা ও আনন্দময় মুখ জ্বলজ্বল করে তুলেছে—করেজিও এই আলোর জ্যোতি পরম নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। মাডোনা এক যুবতী মাতা, জোসেফ ও মেষপালকেরা সাধারণ গ্রাম্যলোকদের



গুইদো রেণি—যিশুখৃষ্ট

মত; কিন্তু এ আলোর মায়ায় তারা অপূর্ব্ব; মাথার ওপর দেবশিশুগুলি স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টির মত যেন ঝরে পড়ছে। পেছনে প্রকৃতির দৃশ্যও সুন্দর, যেন রাত্রিশেষে উষার আলোয় আকাশ ভরে উঠছে। সমস্ত ছবিখানিতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও আলো-অন্ধকারের অপূর্ব্ব লীলায় ভরা। স্নিগ্ধ আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; রহস্যময় ছায়াঘন অন্ধকার আলোর স্পর্শে কাঁপছে। এই মাধুর্য্য এই আলোর জয়ধ্বনি হচ্ছে করেজিওর ছবির বিশেষত্ব। তাঁর ছবির মূর্ত্তিগুলির কমনীয় ভাব রাফাএলের ছবির মাধুর্য্য থেকে বিভিন্ন, তাঁর রংএর জলজ্বলে দীপ্তি টিৎসিয়ানের রঙের লীলা থেকে তফাৎ। রাফাএলের অন্তর্দৃষ্টি বা ভেনিসিয়ানদের রংএর আগুন তাঁর মধ্যে ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর মূর্ত্তিগুলির সরল সহজ মাধুর্য্যে, তাঁর তুলির সুন্দর ছন্দময় রেখার টানে ও বিশেষ করে জলজ্বলে আলো থেকে ঘন অন্ধকার—সকল প্রকার আলো-ছায়ার অঙ্কনের শক্তিতে তাঁর ছবিগুলি অতুলনীয়। মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি আঁকতে ও স্নিগ্ধ আলোয় ছবি ভরে দিতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর আর্ট সম্বন্ধে এক আর্ট-সমালোচক বলেছেন 'His art excels in artless grace and melodious tenderness.'

চিত্রশালায় তাঁর আঁকা মাগ্‌ডালেনার যে ছবিটি আছে,



চেয়ারে উপবিষ্টা মাতৃমূর্ত্তি (রাফাএল)

তাতে তাঁর কমনীয় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তির পরিচয় পাই। এ ছবিখানি করেজিওর আঁকা কি না সে বিষয় নিয়ে আর্ট-সমালোচকদের ভিতর বিশেষ মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেছেন, করেজিও তাঁর কমনীয় তুলি দিয়ে এই যে রমণীয় মূর্ত্তি এঁকেছেন, এ তাঁর প্রতিভার চরম নিদর্শন। অপর পক্ষ বলেছেন, ছবিখানি সুন্দর বটে, কিন্তু এ করেজিওর আঁকা নয়। এ তাঁর ছবির কপি হতে পারে, বা অন্য কোন ডাচ্-শিল্পীর আঁকা। কিন্তু এই পাঠ-নিরতা যুবতীর মূর্ত্তি সত্যই সুন্দর; বিশেষতঃ, দেহের রং আঁকার বিশেষ নিপুণতা আছে। সে রং যুবতী-তনুর লাবণ্যের মত কমনীয় ও উজ্জ্বল।

চিত্রশালায় আর একটি বিখ্যাত ইতালীয়ান চিত্রকরের ছবি বিশেষ করে চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে টিৎসিয়ানের 'কর-মুদ্রা' (Tribute money) ১৫১৪ খৃঃ অব্দে আঁকা। বাইবেল যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, একবার এক Pharisee স্বর্ণমুদ্রা হাতে করে যিশুখৃষ্টের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে, প্রভু, সিজারকে এ মুদ্রা দেওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত হবে, তাঁকে কোন কর দেব কি? তখন যিশুখৃষ্ট বলেন, মুদ্রার ওপর কার নাম লেখা, কার ছবি খোদাই করা আছে? মুদ্রার ওপর সিজারের নাম ও মূর্ত্তি খোদাই করা দেখে, যিশুখৃষ্ট বলেন, Render unto Cæsar the things that are



মাতৃমূর্ত্তি (করেজিও)

Cæsar's and unto God the things that are God's. বাইবেলের এই ঘটনা নিয়ে ছবিটি আঁকা।

এই চিত্রে টিৎসিয়ানের পরিকল্পনা ও অঙ্কন-রীতির মধ্যে আশ্চর্য্যকর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি অতি সহজ সামান্য, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত আইডিয়া মহান ও সুন্দর। সেই আইডিয়াটি ছবির রং ও রেখায় মূর্ত্তি নিয়েছে। টিৎসিয়ান (১৪৯০-১৫৭৬) ছিলেন রংএর পূজারী। তাঁর ছবিতে তাঁর সমসাময়িক ভেনিসের চিত্রকরদের মত, দীপ্ত রংএর মত্ত হোলিখেলা দেখা যায়। তাঁর শিল্পী-জীবন ভেনিসেই কেটেছে। এ ছবিটিতেও রংএর উজ্জ্বল দীপ্তি, সুন্দর সমাবেশ ও বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি রংএর পাশে আর একটি তুলনামূলক রং দিয়ে ছবিটি আঁকা। যিশুখৃষ্টের শান্ত স্নিগ্ধ অথচ পুণ্যজ্যোতিময় তেজোব্যঞ্জক মুখ, যেমন মহান তেমি করুণামাখা। তার পাশে অর্থলোলুপ কুটিল-মনা ফারিসির মুখ সংসারের লোভ সন্দেহ ও নীচতায় ভরা। বস্তুতঃ ফারিসি যিশুখৃষ্টকে পরীক্ষা করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। তাঁর আশ্চর্য্যকর উত্তর পেয়ে সে চমকিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাত দুটি আঁকার পার্থক্যে যিশু ও ফারিসির মধ্যে ব্যবধান ও প্রভেদ আরও ফুটে উঠেছে। যিশুর কোমল সুন্দর শুভ্র হাত, আঙুলগুলি যেন আগুণের শিখা; তার পাশে ফারিসির কালো শক্ত হাত, আঙুলগুলি বাঁকা, যেন সব জিনিষ আঁকড়ে ধরতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায়। যিশুর লাল সুন্দর বেশ ফারিসির ময়লা সাধারণ সার্টের ওপর গিয়ে পড়েছে—দুই মূর্ত্তির মধ্যে এই রং ও রেখার পার্থক্যের পরিকল্পনায় চিত্রকরের নিপুণতা যেন স্বর্গের দীপ্ত স্নিগ্ধ আলোর পাশে পৃথিবীর কুটিল অন্ধকার।

টিৎসিয়ান এ ছবিটি বিশেষ নিপুণতা ও ধৈর্য্যের সহিত এঁকেছিলেন। সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একবার এক জার্ম্মাণ ভেনিসে টিৎসিয়ানের ষ্টুডিও দেখতে আসেন। তাঁর সব ছবি দেখে জার্ম্মাণটি বিশেষ প্রশংসা করলেন না, বল্লেন, আমাদের দেশের আলবার্ট ড্যুরারের মত কেউ ছবি আঁকতে পারল না। তাঁর মত ছবি finish করতে, সব খুটিনাটি জিনিষ (details) নিপুণ ভাবে আঁকতে আর কেউ পারল না। এ মন্তব্য শুনে টিৎসিয়ান রেগে যান। তিনিও যে ড্যুরারের মত নিপুণতায় ভরা ছবি আঁকতে পারেন, তা প্রমাণ করবার জন্যে এ ছবি আঁকেন। এখন তাঁর ছবি শুধু জার্ম্মাণ চিত্রশালায় স্থান পায় নি, প্রতি দিন শত শত জার্ম্মাণ বিমুগ্ধ হয়ে উচ্চ প্রশংসা করে যায়।

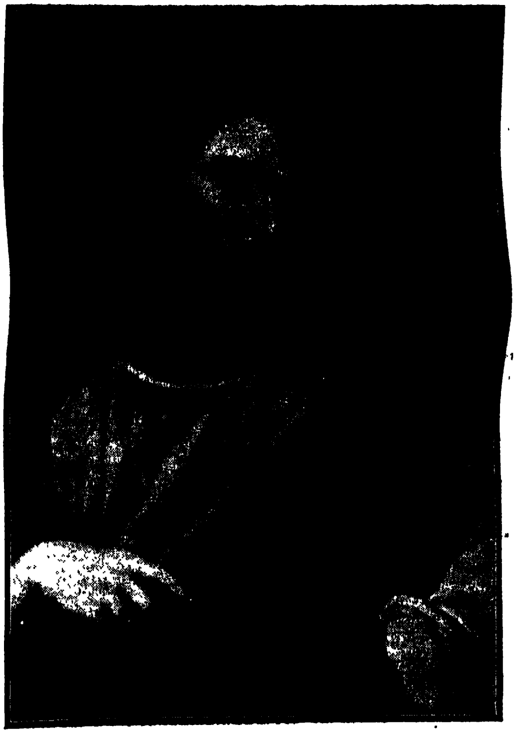
যিশুখৃষ্টের আর একটি ছবি চিত্রশালায় আছে। সেটি হচ্ছে গুইদো রেণির (১৫৭৪-১৬৪২) কণ্টকমুকুট-শোভিত যিশুখৃষ্ট। যিশুখৃষ্টের এ মূর্ত্তিকে প্রতীকের মত মনে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন,—আশা ও বিশ্বাসের মধ্যে,

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও তাঁর করুণার মধ্যে তাঁরা অপরিমেয় শক্তি, পরমা শান্তি পেয়েছেন। তাই কাঁটার জাল মুকুট হয়েছে, তা বিদ্ধ করে না। পৃথিবীর সব নৃপতির মণিমাণিক্যখচিত মুকুট সব এর গৌরবের তুলনায় ম্লান হয়ে গেছে। দুঃখ বেদনার মধ্যে আশা ও বিশ্বাসে যে শক্তি ও শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়, যিশুর মূর্ত্তি তারি রূপক।

রেণি অন্তরের কল্পলোকের সুন্দর মহান ভাবগুলিকে মূর্ত্তি দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। একবার তাঁর এক ছবির ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, মশাই, আপনি এমন সুন্দর মূর্ত্তি আঁকেন, এর মডেল কোথায় পান? রেণি হেসে বল্লেন, তা জানেন না? আচ্ছা, আমার ষ্টুডিওতে আসবেন, আমি মডেল দেখাব। এক দিন ভদ্রলোকটি উৎসুক চিত্তে তাঁর ষ্টুডিওতে এসে হাজির। রেণি ভদ্রলোককে বসিয়ে, যে কুৎসিত লোকটা তাঁর রং পেষে, তাকে ডাকলেন। তাকে খোলা জানালায় আকাশের দিকে মুখ করে মডেলের মত বসিয়ে আঁকতে সুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই কদাকার লোকটি যেভাবে বসেছিল, সেই ভঙ্গীতে বসা একটি সুন্দরী স্বর্গ পরী এঁকে দিলেন। যে ভদ্রলোক মডেল দেখতে এসেছিলেন, তিনি ত তা দেখে অবাক্। তখন রেণি হেসে বল্লেন, মশাই, সুন্দর মহান আইডিয়া শিল্পীর কল্পনায় থাকে, তা কোন মডেলে পাওয়া যায় না। শিল্পীর অন্তরলোক হচ্ছে সব সুন্দরী মূর্ত্তির, সব অপরূপ রূপের জন্মভূমি; শিল্পীর আইডিয়া মহান হলে যে কোন মডেলেই চলতে পারে।

শিল্পীর অন্তরলোকের এই পরম সুন্দরীর স্বপ্নের সুন্দর রূপ ভেনিসের চিত্রকর জিওরজিনির (১৪৭৬ ১৫১০) ভেনাস চিত্রে দেখতে পাই। ভেনাস হচ্ছে রোমান সৌন্দর্য্য-দেবী; কিন্তু জিওরজিনির চিত্র দেবীমূর্ত্তি বলে মনে হয় না, এ পৃথিবীর কোন পরমাসুন্দরীর রূপ, শিল্পীর মানস-প্রিয়া। কিন্তু এ নিদ্রিতা উর্ব্বশীর নগ্ন দেহ এমন সংযত ছন্দময় রেখায় টানা,—মাথার রাঙাশয্যা, বিছানার ওপর এলায়িত শুভ্রবস্ত্র এমন সুন্দরভাবে দেহের সঙ্গে ঢেউ-খেলিয়ে মেলান ও পেছনে শুভ্রলঘু মেঘভরা নীলাকাশ, সুনীল পাহাড়ের সারি, সোনালী ঢেউ-খেলান মাঠ ও স্বপ্নের মত একটি তরুবেষ্টিত গ্রাম—প্রকৃতির এই মায়াপট এমন নিপুণভাবে আঁকা, যে সমস্ত ছবিটি প্রেম-সৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মত মনে হয়। এ কোন লালসাদীপ্ত কল্পনা নয়, শিল্পী যেন আপন মানসীর শান্ত-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে বিভোর।

চিত্রশালার আর এক ইতালীয়ান চিত্রকর পালমা ভেকিওর (১৪৮০-১৫২৮) 'ভেনাস'-ছবির সঙ্গে এ ছবিখানির তুলনা করলে জিওরজিনির প্রতিভার নিপুণতা বোঝা যায়। ভেকিওর ভেনাস স্বপ্নোত্থিত কামনার মত, তাহা মানুষের মনকে প্রমত্ত করে তোলে। জিওরজিনির ভেনাসের শান্তি ও স্বপ্নের মত সৌন্দর্য্য নেই। তা'ছাড়া আঁকবার কায়দায়

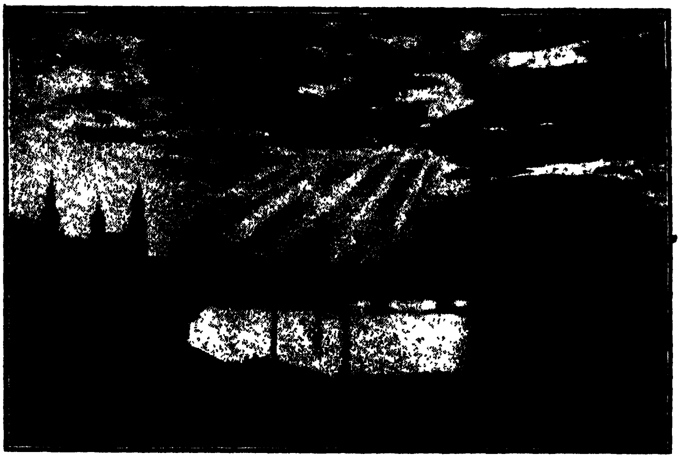


কর-মুদ্রা (টিৎসিয়ান)

একটি বিশেষ তফাৎ দেখা যায়। জিওরজিনি ছবি আঁকায় একটি নূতন ভঙ্গী সৃষ্টি করেন, তিনি বাস্তব এনাটমীর শাসন না মেনে, দেহের অসম মূর্ত্তি রেখার ছন্দে বেঁধে রংএর রসধারায় ধুইয়ে কোথায় মিলিয়ে দিয়েছেন, দেহের সীমান্ত-রেখা কোথাও ছন্দ-হারা বা উঁচুনীচু বেতাল হয়নি, দেহের গতিরেখা স্পষ্ট নয়, তা পারিপার্শ্বিক রংএর তলায় ডুবে কোথায় হারিয়ে গেছে। দুইটি ভেনাসের পা আঁকার ভঙ্গী

দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। সেইজন্তে তাঁকে বর্ত্তমান চিত্রকরদের সঙ্গে তুলনা করে।

তাছাড়া ছবির বিষয় সম্বন্ধেও তিনি বিদ্রোহ আনলেন। ইতালীয়ান চিত্রকলাকে খৃষ্টান চার্চ্চের অধীনতা হতে মুক্তি দিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মবিষয়ক ছবি তিনি এঁকেছেন বটে, কিন্তু পেগান দেবী ভেনাসের মূর্ত্তি এঁকে নিছক সৌন্দর্য্যের পূজার জয়গান গাইলেন। এই সৌন্দর্য্যপিপাসা রংএর পূজার মত্ত উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে আর্টের ধারা চার্চ্চের গণ্ডী ভেঙে ভাসিয়ে নব নব পথে চলে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীর ভেনিসের চিত্রকরদের ওপর এ বিষয়ে জিওরজিনির বিশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভেনিসের চিত্রকরেরা ধর্ম্মের ভাব ধীরে ধীরে হারাতে লাগলেন। তাঁরা রংএর খেলায় রূপের সন্ধানে মত্ত হয়ে উঠলেন।



ড্রেসডেন—নদীর ধার

পাওলো ভেরোনেজের Marriage at Cana বা 'কানায় বিবাহদৃশ্য' ছবিটি দেখলে বেশ বোঝা যায়, যে রংএর ঝলমলানি, নানা বর্ণের কারুকার্য্যময় সাজসজ্জা আঁকার প্রতিই চিত্রকরদের বেশী লোভ। ভেরোনেজে (১৫২৮-১৫৮৮) যেন ভেনিসের কোন লক্ষপতি বণিকের বাড়ীর বিবাহের উৎসব-দৃশ্য আঁকছেন। ভেনিসের ধনীদের ঐশ্বর্য্য, উৎসব-মত্ততাই চোখে পড়ে। ছবিটি খুব নিপুণভাবে আঁকা। তার পরিকল্পনা, আলোর সামঞ্জস্য, বর্ণের লীলা খুব সুন্দর; কিন্তু ধর্ম্মের আলোয় নয়, স্বর্ণের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরা। মধ্যে বিশুর উজ্জ্বল মুখ, তাঁর মাথার গঠন, বসার ভঙ্গী সুন্দর বটে; কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ে, তাঁর সম্মুখে মদের পাত্র হাতে যে সুসজ্জিত মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। মদের পাত্রটি খুব সুন্দর ভেনেসিয়ান কাচের তৈরী, সুন্দর আঁকা। তার পর চোখে পড়ে যে লোকটি খাবারের পাত্র নিয়ে আসছে। এরূপ উৎসব-সভা আঁকতে, সাজসজ্জার রংএর ঝলমলানি দেখাতে ভেরোনেজের আনন্দ ছিল। বাইবেলের ঘটনা উপলক্ষ মাত্র।

চিত্রকলা আদর্শবাদের যুগ পেরিয়ে বাস্তবের যুগে এসেছে তা বোঝা যায়। এ ছবির প্রায় মাঝখানে একটি ছেলে মেজেতে বসে বেড়াল নিয়ে খেলা করছে, আর বাঁ কোণে একটি মেয়ে একটি কুকুরের পিঠে হাত বুলোচ্ছে, দেখা যায়। ছবিতে এই বেড়াল কুকুর আঁকা শিল্পীর বিশেষ ইচ্ছাকৃত। চিত্রে তিনি এরূপ কুকুর বেড়াল বাঁদর টিয়াপাখী ইত্যাদি জন্তু অনেক ঢুকিয়েছেন। তা নিয়ে একবার তাঁকে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। ১৫৭৩ খৃঃ চার্চ্চের বিচার-সভায় (Inquisition) তাঁর আহ্বান হয়। তিনি কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রে বাঁদর বেড়াল ইত্যাদি নানা জন্তু এঁকেছেন, এজন্যে তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত, এই বলে চার্চ্চ থেকে তাঁর নামে নালিস করা হয়। বিচারকেরা কোন ছবি সম্বন্ধে বল্লেন, এ ছবি থেকে কুকুরের মূর্ত্তি সরিয়ে এক ম্যাগডালেনের মূর্ত্তি আঁকতে হবে। কিন্তু শিল্পী রাজী হলেন না। যা হোক শেষে কোন রকমে একটা মিটমাট হল।

ইতালীর চিত্রকরগণ বাস্তবের পূজারী হয়ে উঠতে লাগলেন বটে, কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ স্পেনে চিত্রকলা খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে পূর্ণ হতে লাগল। স্পেনিস চিত্রকর রিবেরার (১৫৮৮-১৬৫৬) সাধ্বী আগনেস (St. Agnes) ছবি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। রিবেরার জন্ম হয়েছিল স্পেনে ভেলেন্‌সিয়ার নিকট জাতিভা সহরে। কিন্তু তাঁর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা ইতালীতে হয়েছিল। ইতালীর চিত্রশিল্পীদের দেখেই তাঁর অনুপ্রেরণা হয়। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ

নেপল্‌সে ছিলেন এবং নেপল্‌স্-স্কুলের গুরু রূপে তিনি পরিচিত। সাধ্বী আগনেস এক রোমান কুমারী ছিলেন। তিনি খৃষ্টান ছিলেন, সেজন্য রোমের রাজা দিওক্লেনসিয়ানের সময় ৩০৪ খৃঃ অব্দে, তাঁকে বিধর্ম্মী বলে পুড়িয়ে মারা হয়। এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী তাঁকে তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন বলেন; কিন্তু আগনেস খৃষ্টান ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করতে রাজী না হওয়াতে, সে কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ হয়ে, আগনেসকে পুড়িয়ে মারবার পূর্ব্বে, তাঁকে নগ্না করে তাঁর ওপর ব্যভিচার করতে হুকুম দেন। কিন্তু তাঁর বস্ত্রহরণ করতে এলে স্বর্গ হতে দেবপরী তাঁকে বস্ত্র দিয়ে যান। এ গল্পটি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত। তার পর যখন তাঁকে কাঠে বেঁধে আগুন জ্বাললে, তখন কাঠে আগুন কিছুতেই লাগল না। অবশেষে সৈনিকেরা তাঁর মাথা কেটে ফেলে। তখন তাঁর বয়স তের বছর মাত্র। সেই জন্য তিনি বিশেষ করে তরুণীদের দেবী।

রিবেরা সাধ্বী আগনেসের এই অলৌকিক ঘটনা নিয়ে ছবি এঁকেছেন। তরুণী সাধ্বীর মূর্ত্তি অতি সরল সহজ ভাবে আঁকা—দেখলেই আমাদের মনে করুণা ও শ্রদ্ধা জাগে। কোমল সুন্দর মুখখানি বিশ্বাসের দীপ্তিতে ভরা, যেন পৃথিবীর দুঃখ নিন্দা লজ্জার ঊর্দ্ধে। যে স্বর্গের পরী সাদা কাপড়খানি তাঁর লজ্জানিবারণের জন্য জড়িয়ে দিচ্ছে, সে তার সমস্ত দেহ অলৌকিক দ্যুতিমণ্ডিত করে তুলেছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা-ভরা তরুণী সাধ্বীর মূর্ত্তি কুমারীর পবিত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রতীক। তাঁর দেহ ঘিরে আগুনের আভার মত রং ধীরে ধীরে কোন পরীর পেছনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কোথাও কোন কারুকার্য্য বা ভাবের বাহুল্য নাই। শুধু একটি আইডিয়া। একটি সুন্দর লিরিক কবিতার মত ছবিটি। একবার এই ভক্তিপূতা তরুণীমূর্ত্তি দেখলে বার বার মনে জেগে ওঠে, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে।

চা'এর দোকানে

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

"কি রে, কি রে, এত হাসির ধূম কেন রে? এ বুড়ো গগন রড়াল না আসতেই যে প্রিয়বাবুর দোকান সরগরম, দিব্বি জমিয়ে তুলেছিস্ যে, ব্যাপার কি?

"অ্যাঁ? সতীশ কাল স্বপন দেখেছে যে ও ডায়বির কাপ্টে প্রাইজ মেরেছে? আরে বাঃ, তবে আর কি—ও প্রিয়বাবু, নাও, সবাইকে এক এক পেয়ালা চা দাও, কেক দাও, চপ, ডিম, যা কিছু আছে সব বা'র কর, আর লেখ সব ঐ সতীশের হিসেবে। আজ যদি ও না খাওয়াবে তো খাওয়াবে কবে?

"সতীশ, তোর পোয়াবার যে, এখন সব আগে দে এই বুড়ো ঠাকুর্দ্দাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে, তার পর যাস্ এখন একটা মটোর-কার ফরমাজ দিতে।

"আরে চটিস্ কেন? তুই মায়লি ডায়বি, আর আমরা একটু আমোদ করলেই হয় যত দোষ! এও কি একটা কথা?

"জালাতন? জালাতন আবার আমরা কোন্‌খানটা করলুম? সত্যি কথাই তো বল্‌ছি; জানিস্ না কথায় বলে

'স্বপনে রাজার হয়েছি রাণী,
ফেলে দে আমার ছেঁড়া কানি।'

"আচ্ছা, না—না—রাগারাগি নয়, বোস্ ঠাণ্ডা হয়ে। স্বপনের কথা উঠল যদি তো বলি শোন।

"সেই ও-বছর আমি এক দিন দুপুরে ঘুমিয়ে স্বপন দেখি, যেন রাস্তায় একতাড়া নোট কুড়িয়ে পেয়েছি। তার পরদিন সকালে বাজারের সময় রাস্তায় একটা আধলা কুড়িয়ে পাই! হ্যাঁ, তা তো ঠিক কথা, কিছু তো পেলুম বটেই, কাজেই বলতে হবে স্বপন ফলে গেল। তবে আমাদের কপাল কি না!

'অদৃষ্টে করলা ভাতে
বিচি গজ গজ করে তাতে।'

এই মাত্তর যা তফাৎ। নইলে আর ভাবনা কি?

"আর একবার তোর ঠানদিদি স্বপ্ন দেখে যে তার একখানা কাপড় হারিয়ে গেছে। দিন চার পাঁচ পরে হল কি জানিস্, একখান্ ঢাকাই কাপড় কেচে শুকোতে দেয়। কোথা থেকে একটা উটকো বেরাল এসে নোথ বা'র করে থাবা দিয়ে দিয়ে সেটা বয়ে উঠতে চেষ্টা করে একেবারে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে দিয়েছিল। এও এক রকম সফল স্বপ্ন বই কি।

"আর সব খাঁটি সত্যি স্বপন দেখত প্রফুল্ল হাতী। আরে তোরা হাসিস্ কেন? বাস্তবিকই তার পদবী ছিল 'হাতী'। সে বড় মজা হয়েছেল; বলি শোন্।

"ও প্রিয়বাবু, বিশুকে বল না এক পেয়ালা চা দিতে। দাও, কি আর হবে, আমার নিজের একাউণ্টেই লেখ। ঠাকুর্দ্দাকে মনে পড়ে গল্প শোনবার বেলা। চা খাওয়াতে কি কেউ এগোবে? কেউ না। দে রে বিশু এদিকে দে, গলাটা শানিয়ে নিয়ে গল্প আরম্ভ করি;—বাইরে আবার চেপে জল এল দেখ্ছি, এই তো গল্প বলবার সময়। আজ শনিবার বাদলা নাবল, দেখ আবার কদিন ধরে চলে; জান ত

'শনিতে সাত, মঙ্গলে তিন,
আর সব বারে দিন দিন'—

"সে অনেক দিনের কথা, বছর কুড়ি একুশ হবে, তখন আমি 'সন্ধ্যা'র প্রিণ্টার। উপাধ্যায় মহাশয়ের সারস্বত প্রেস আর আয়তন তখন কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীটে সিমলের কাছে ছিল; তখনো আয়তন শ্রীরামপুরে উঠে যায় নি।

"প্রেসে প্রফুল্ল হাতী ছেল গিয়ে কম্পোজিটার। তার নামও হাতী, আসলেও ছেল সে একটা হাতী;—মোটা থপ্‌থপে, মিশ্‌কাল, বুক থেকে ভুঁড়ি পর্য্যন্ত থাকে থাকে মাংস ঝুলে থাকত। আর তার পা দুটো যদি দেখতিস্, যেন গরাণের গুঁড়ি। সেই পায়ে, কি শীত, কি গিরিষ্মি, মোজা চড়িয়ে সে আসত। ছিঁড়ে ধুকড়ি হয়ে যাচ্ছে, নতুন কেনবার পয়সা জুটছে না, তবু ছাড়বে না; মোজা না পায়ে দিয়ে কিছুতেই সে জুতো পরতো না। তাই তাকে দেখলেই আমি বলতুম—

'অষ্টাঙ্গে আস্‌লা
গোদা পায়ে পাস্‌লা'

আর সে ক্ষেপে উঠত। উপাধ্যায় মশাই তাকে এক দিন 'হাতীর পো' বলে ডেকেছিলেন, সেই থেকে তার নাম 'হাতীর পো'ই হয়ে গিয়েছেল। প্রফুল্ল নাম আমরা সবাই ভুলেই গিয়েছিলুম। তার একটা মস্ত গুণ ছেল, যখন যেখানে হোক শুলেই মিনিট-খানেকের মধ্যে দিব্বি নাক ডাকাতে সুরু করত! তখন কাজের জন্তে তাকে ডেকে তোলা ভার, হাজার ডাকলেও তার সাড় হত না! কিন্তু যদি তাস খেলতে, কি তামাক খেতে, কি অন্য কোন ফূর্ত্তির জন্য ডাকা যেত, তো তার ঘুম ভাঙতে আধ মিনিটও সময় লাগত না।

"এ হেন হাতীর পো এক দিন দুপুরবেলা ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ উঠে বসে হাসতে আরম্ভ করলে। উঃ সে কি হাসির ধূম! মাথা নেড়ে নেড়ে, ভুঁড়ি দুলিয়ে, থলথলে মাংসের খাঁজে খাঁজে কাঁপিয়ে হাসি;—হাসির চোটে দুপাটী দাঁত বেরিয়ে পড়ল। একেই তো তার গালের ওপোর গাল, তার পর আকর্ণ হাঁ-এর চোটে চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেল।

"আমরা তো সব অবাক্। হল কি? হঠাৎ এত হাসি কিসের? জিজ্ঞাসা-পড়া চলতে লাগল।

"অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে হাতীর পো জবাব দিলে, 'আমি স্বপন দেখ্‌ছিলুম যেন হরিশ শেঠ পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গেছে!' বলেই আবার হাসি।

"প্রুফ-রিডার হরিশ শেঠ সেখানেই বসে ছিল। সে শুনে একটু গরম হয়ে বলে উঠল, 'তাতে তোর দাঁত বার করে হাসবার কি আছে? মানুষের পা ভাঙ্গাটা ভারি মজার, না?'

"হাতীর পো বল্লে, 'আরে না—না; আমি কি তা বলছি; কিন্তু তুমি পা ভেঙ্গে মুখখান্ যে রকম করেছেলে, তা দেখলে হাসি চেপে কেউ রাখতে পারে না।

"তার রকম-সকম আর হরিশের রাগ দেখে আমরা আর হাসি থামাতে পারলুম না। হরিশ ঘুসি পাকিয়ে হাতীর পোকে শাসালে, যদি ফের অমুঙ্গুলে স্বপন দেখে সে দাঁত বের করে হাসে, তো তার সব দাঁতগুলো ভেঙ্গে দেবে!

"ব্যাপারটা তখনকার মত ঐখানেই চাপা পড়ল, আমরাও সে সব ভুলে-চুকে গেলুম। দিন সাতেক পরে, বল্লে না পিত্যয় যাবে, সত্যিই হরিশ সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নাবতে বেকায়দায় পড়ে এমনি পা মচ্‌কাল, যে তিন চার দিন বিছানা থেকে উঠতে পারলে না! আমরা সবাই

আশ্চর্য্যি হয়ে গেলুম, আর হাতীর পো বুক ফুলিয়ে—না, বুক ফুলিয়ে বল্লে একটু ভুল হয়, ভুঁড়ি ফুলিয়ে বল্লেই ঠিক হয়, কেন না গলা থেকে নাইএর নীচে পর্য্যন্ত সবটাই ছেল তার পেট। কোন্‌টা বুক, কোন্‌টা কোমর, কোন্‌টা পেট, তা আলাদা করবার যো ছেল না। সেই হাতীর পোর ভুঁড়ি ফুলিয়ে সবাইয়ের কাছে বাহাদুরী নিয়ে বেড়ান যদি একবার দেখ্‌তিস্‌! ক্রমাগতই বলতে লাগল যে সে যা স্বপন দেখে, তা সবই ঠিক ফলে যায়, কখনো ভুল হয় না। তার বাপ না কি একজন মস্ত গুণী লোক ছেলেন। তাঁর পেশাই ছেল লোকের হাত দেখা, ভূত তাড়ান, ওষুধ দেওয়া। তার মা'রও না কি জলপড়ায় তেলপড়ায় খুব নাম। এক কথায় সে খালি বলে বেড়াতে লাগল যে তাদের গুষ্টিটাই হচ্ছেগে গুণীর গুষ্টি!

"অপূর্ব্ব সেন বল্লে, 'তা হলে এতদিন আর কখনো আমাদের কিছু বলোনি কেন?' হাতীর পো জবাব দিলে, 'ভাই, বলব কি, পাছে তোমরা ভয় পাও, তাই বলি না। সেদিন নিতান্ত হেসে ফেলেছিলুন তাই, নইলে সে দিনও জানতে পারতে না। দিব্বি সবাই হেসে খেলে বেড়াচ্ছ, কেন তোমাদের আমোদে বাধা দেব? এই দেখ না কেন, এখানে যারা যারা এখন হাজির রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন দুজন আছে, যারা বছর খানেকের মধ্যেই পটল তুলবে। কেন তাদের সে কথা বলে মন মরা করে দিই?'

"আমরা তো শুনে একটু চম্‌কে উঠে এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। রসিক সরকার খানিক পরে জিজ্ঞেস করলে 'আচ্ছা পুরোপুরি না বল, একটু আভাষেও জানাও কে কে—'

"হাতীর পো রাজি হয় না, অনেক সাধাসাধির পর বল্লে, 'একজন হচ্ছে সব চেয়ে কুচ্ছিৎ দেখতে, আর একজন তত কুচ্ছিৎ নয়। এ থেকে যা পার বাপু বুঝে সুঝে নাও, এর বেশী আমি আর বলতে টলতে পারব না।'

"দিন দুই ধরে তো এই আলোচনাই চল্ল। হাতীর পোর চেয়ে কুচ্ছিৎ কেউই ছেল না, তাই সে দিকে সবাই নিশ্চিন্তি রইল; কিন্তু অন্য লোকটা যে কে, তা আমরা কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না।

"এর পর থেকে হাতীর পোর ঘুম আরো বেড়ে গেল, যখন তখন শুতে আরম্ভ কয়লে, আর ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের নানা জনের নাম ধরে নানা আবল তাবল বক্‌তে সুরু করে সবাইকে ভয়ে অস্থির করে তুল্লে। আমরা তাকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করতুম, সে কিন্তু গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়ত, কোন কথা বলতে রাজি হত না।

"এক দিন বিকেলে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠ্‌ল। রতনদাস কম্পোজিটর তাড়াতাড়ি যেমন একটা শার্শী বন্ধ করতে গেছে, আর ঝনাৎ করে একখানা কাঁচ ভেঙে তার মুখে পড়ে চার পাঁচ জায়গায় কেটে গেল। আমরা তো তাড়াতাড়ি কাঁচ পরিষ্কার করে তার কাটাগুলো ধুয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ করে দিলুম। রতন বসে বসে হা-হুতাশ করতে করতে হঠাৎ হাতীর পোকে বল্লে, 'আশ্চর্য্যি যে তুমি এতবড় ব্যাপারটা স্বপন দেখনি!'

"হাতীর পো ভুঁড়ি ফুলিয়ে বল্লে, 'নিশ্চয়ই দেখেছি। এই কাল ভোর রাত্রে,—যেমন যেমন তোমার ঘটল, ঠিক তেমনিই দেখেছি।'

"দাঁতে দাঁত চেপে চোখ পাকিয়ে রতন বল্লে, 'তা হলে আমায় এতক্ষণ বলনি কেন, আমি সাবধান হতুম!'

"মাথা নেড়ে মুচকে হেসে হাতীর পো বল্লে, 'আরে, তুমি ওসব কি বুঝবে—আমি যা স্বপন দেখি তা ঘটতেই হবে। তুমি হাজার সাবধান হলেও পার পাবে না। এই তো হরিশ শেঠের কথা, আগেই বলে ফেলেছিলুম, ওর পা ভাঙ্গা কি আটকেছেল? তাছাড়া—'

"তাছাড়া আর কি, তা আর হাতীর পো শেষ করতে পারলে না। রতন সরে এসে তার ভুঁড়ির ওপোর এমন এক ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, সে চিৎপাৎ হয়ে ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে লাগল। তার চেঁচানি শুনে আপিস শুদ্ধ লোক তাড়াতাড়ি দেখতে এলো কি হয়েছে। সবাই মিলে তো তাকে টেনে তুলে ঠাণ্ডা করলুম।

'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে!'

"এর পর থেকে এমনি হল, যে যখনি যার যা কিছু খারাপ ঘটে, সে একচোট হাতীর পোকে নেয়,—কেন আগে থাকতে সাবধান করে দেয়নি। অন্য কেউ হলে বোধ হয় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে ও-সব ছেড়ে দিত; কিন্তু হাতীর পোর বুদ্ধি-শুদ্ধিও ছেল তার শরীরের মত, সে তখনো স্বপনের জাঁক করতে ছাড়ত না।

"কিছুদিন পরে, তখন হরিশ শেঠের পা সেরে গেছে, সে কাজে ঠিক ঠিক আসছে, নেপাল মল্লিক এসে আমার কাছে হাজির। ছোকরার অল্প বয়েস, লেখাপড়া ছেড়ে বকামি সুরু করে দিলে দেখে তার বাপ তাকে নিজের বন্ধু হরিশ শেঠের সাকরেদ বানিয়ে দিয়েছেল। বাঙ্গলা লেখাপড়া সে মন্দ জানত না, তাই সে তখন হরিশের সঙ্গে প্রুফ-রিডারি করত।

"নেপাল বল্লে, 'ঠাকুর্দ্দা, বড় বিপদে পড়েছি, তুমি যদি একবার হাতীর পোকে বলে রাজি করতে পার তো হয়।'

"নেপালের সঙ্গে হাতীর পোর মাখামাখি কোনো দিন আছে বলে শুনি নি, তাই একটু আশ্চর্য্যি হয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারখানা কি। সে যা বল্লে, তা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলুম না।

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই। হরিশের ভাগ্নীর সঙ্গে নেপালের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ঘটকালিটা বোধ হয় হরিশই করেছিল। নেপালের হবু-শ্বশুর-বাড়ীর পাশেই তার এক ইয়ার থাকে, সে না কি বলেছে মেয়ে ভয়ানক কালো আর খোঁড়া। এই শুনেই তার মন বিগড়ে গেছে। বাপের কাছে ঠারে-ঠোরে জানাতে গেছল যে ওখানে সে বিয়ে করবে না। বাপ না কি জুতো উঁচিয়ে তাড়া করেছেল, 'ছেলেমেয়ের বিয়েতে আবার তাদের মত নিতে হবে না কি?' এখন ফাঁপরে পড়ে কি করবে ভেবে-চিন্তে শেষে হাতীর পোকে ধরে,—সে যদি তার সম্বন্ধে একটা কুস্বপ্ন দেখে হরিশকে জানায়, যাতে চটপট বে ভেঙ্গে যেতে পারে। হাতীর পো রাজি হয়নি, তাই আমায় খোসামোদ, যদি বলে কয়ে আমি তাকে রাজি করাতে পারি।

"আমিও প্রথমটা রাজি হইনি। শেষে তার হাতে-পায়ে ধরা-ধরিতে আর ছাড়াতে পারলুম না। হাতীর পোকে আড়ালে ডেকে বল্লুম। হাতীর পো মাথা নেড়ে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে মুখ ঘুরিয়ে যা বল্লে, তার মোদ্দাখানা হচ্ছে

'শূন্য কথার মূল্য কি,
রয়েছে ভাঁড় নেইক ঘি।'

"শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না দেখে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞাসা করলুম সে কি চায়। সে বল্লে নেপাল যদি একটা হাতঘড়ি দিতে পারে, তবেই সে রাজি, নইলে নয়।

"হাতীর পোকে যতটা মোটাবুদ্ধি ভাবতুম, আসলে দেখি মোটেই তা নয়। বিষয়বুদ্ধি তার বেশ আছে, ঝোপ বুঝে কোপ দিতে বেশ জানে।

"অনেক কথা-মাজার পর শেষে নগদ ২৲ রফা হল, নেপাল টাকা দুটো তখনি তো দিয়ে দিলে।

"তার পরদিন দুপুরবেলা হরিশ শেঠ প্রুফ দেখছিল, হাতীর পো এসে তার পাশেই শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করলে। আমি কাণ খাড়া করে রইলুম, কি হয়। নেপাল তখন কি কাজে বেরিয়েছিল।

"খানিক পরে ঘুমের ঘোরে হাতীর পো বক্‌তে সুরু করলে,—'ঐ দেখ, হরিশ শেঠ যাচ্ছে, কি সর্ব্বনাশ! ওর পেছনে ওটা কাল মতন কি?'—মিনিট দু-তিন চুপ। শুনে হরিশের মুখ তখন পাঙাস মেরে গেছে। তার পরই—'না, ওতো হরিশকে ছেড়ে দিলে;—কোন্ দিকে গেল? ঐ যে আর একজনের পেছু নিয়েচে! আরে, ও যে আমাদের নেপাল! কি ভয়ানক! এই বয়েসে তিন মাসের মধ্যে জলে ডুবে মিত্যু—ওঃ'—'হাঁউ-মাউ' করে হাতীর পো ধড়-মড়িয়ে উঠে বসল, যেন কত দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠেছে! দেখলুম হাতীর পো এক্টো করতেও ওস্তাদ! যদি থিয়েটারে যেত, ঢের বেশী রোজগার করতে পারত। লোকটার পেটে পেটে এত তা কে জানত! তার তখনকার চোখ-মুখ দেখলে কার সাধ্যি বলে যে সব মিথ্যে বানান!

"যাই হোক, হরিশ সবই শুনেছেল, হাতীর পোকে জেরা আরম্ভ করলে। সে তো কিছুই বলতে চায় না। শেষে হরিশ বল্লে যে সে সবই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলে ফেলেছে। তখন হাতীর পো স্বীকার করলে যে নেপাল তিন মাসের মধ্যে জলে ডুবে মারা যাবে, এই স্বপনই সে দেখেছে। 'কিন্তু ভাই, নেপালকে এ-সব কথা বোল না যেন,—আহা, সে ছেলেমানুষ, শুনে অস্থির হয়ে পড়বে।'

"হরিশ বল্লে, 'নেপালকে বলি না বলি তাতে তত কিছু এসে যাচ্ছে না; কিন্তু আমার ভাগ্নীটাকে যে বৈধব্যের হাত থেকে বাঁচালি এইটুকুই যথেষ্ট।'

"হাতীর পো যেন কিছুই জানে না, বিয়ের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল, মুখটা ভারি কাঁচু মাচু করে আপশোষ করতে লাগল।

"নেপাল ফিরলে তাকে চুপি চুপি আমি সব বল্লুম। সে তো নিশ্বেস ফেলে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

"তার দুদিন পরেই শুনলুম মেয়েদের তরফ থেকে বে ভেঙে দিয়েছে। আর তাই নিয়ে নেপালের বাপেতে আর হরিশ শেঠেতে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

"চার পাঁচ দিন পরে, ও হরি! নেপাল মুখ চুণ করে আমার কাছে এসে পড়ল। ব্যাপার গুরুতর! তার যে ইয়ার খবর দিয়েছিল যে মেয়ে খোঁড়া আর কালো, সব শুনে বলেছে, 'তুই কল্লি কি? আমি যে তোকে ক্ষেপাবার জন্যে মিথ্যে বলেছিলুম!' নেপাল নিজের চোখে তার বাড়ী বয়ে দেখে এসেছে, মেয়ে তো কালো, খোঁড়া নয়ই, বরং বেশ সুচ্ছিরি। তার ওপোর নেপালের ইয়ার বল্লে যে মেয়ের মাসি না কি মরবার সময় মেয়েকে দু' তিন হাজার টাকার গয়নাও দিয়ে গেছে। এখন তার হাত কামড়ান ছাড়া আর উপায় নেই,—মেয়ের নতুন বিয়ের সম্বন্ধ কাপড়ওলা কেশব দত্তের ছেলের সঙ্গে পাকাপাকি হয়ে গেছে, ও-মাসেই হবে। এখন হাতীর পো নতুন কিছু স্বপন দেখলেও তা আর বদলাবে না!!! কেশব দত্তর ঢের টাকা, তার ছেলেকে ছেড়ে কখনই নেপালের সঙ্গে বে দিতে রাজি কেউ হবে না।"

"দেখলে প্রিয় বাবু, বেইমান্ ছোঁড়ারা সমস্ত গল্পটা শুনে এখন কি না বল্লে ঠাকুর্দ্দার গ্যাঁজাখুরি! এদের একেবারে হায়া নেই, দুকান-কাটা বেহায়া। উপাধ্যায় মশাই বলতেন, এক কাণ কাটার তবু লজ্জা আছে, সে চোখ-মুখ ঢেকে সহরের বাইরে দিয়ে যায়, আর দুকান-কাটা যে, তার কোন লজ্জাই নেই, সে সহরের মধ্যেই মাথা উঁচু করে চলে। তোরা সব কটাই তাই। তোদের হবে কি বল্ ত?"

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

(১) নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির অনুকূল জাতীয় প্রভাব :—

অধ্যাপক Hillebrandt ও Konow মূলতঃ একমত যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে। হইতে পারে যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান এই বিষয়ে কিছু উপাদান যোগাইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাও ত' দেখা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপাদান লৌকিক আচার। অতএব লৌকিক নির্ব্বাক্ অভিনয় (popular mime) ও মহাকাব্যই (epic) রূপকের জনক।

ইহার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, রূপকোৎপত্তির পূর্ব্বে আঙ্গিক অভিনেতার (performer of mime) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। Konow বলেন যে, এই সকল অভিনেতা নৃত্য, গীত, বাদ্য, যাদুবিদ্যা, pantomime ও অনুরূপ কলায় সুশিক্ষিত হইতেন। এ বিষয়ে তিনি যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই মহাভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থের নহে। তাহার পর মহাভাষ্য মধ্যে নটগণের গীতের যে উল্লেখ আছে, সেখানে "নট" অর্থে performer of mime না ধরিয়া প্রকৃত "অভিনেতা" অর্থও বিনা আয়াসে ধরা যায়। নৃত্যগীতাদির লৌকিকাংশ বৈদিক যুগে বর্ত্তমান ছিল ইহার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায়। অশোক তাঁহার অনুশাসনে "সমাজে"র (সমজ) নিন্দা করিয়াছেন; কারণ উহাতে পশু-যুদ্ধের আয়োজন হইত। ইহাতেও নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। রামায়ণ-মধ্যেও নট, নর্ত্তক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু এই সকল শব্দে pantomime বুঝাইবে কি প্রকৃত অভিনেতা বুঝাইবে, তাহা বলা বড় কঠিন। Keithও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল মতবাদ কল্পনার সাহায্যে রচিত। (১) এবং এ বিষয়ে Hillebrandtএর মূল যুক্তি এই যে, মিলনান্ত দৃশ্যকাব্য মাত্রেই মানবের আদিম জীবনের সুখোপভোগ ও রসবোধের অভিব্যক্তি। আবার Dr. Gray বলেন যে, প্রাচীন নাট্যের প্রয়োগকালে কি অভিনেতৃ-মণ্ডলে কি

(১) "Our knowledge, in fact, of the primitive mime is hypothetical,......the drama as comedy is a natural expression of man's primitive life of pleasure and appreciation of humour and wit."

—Sanskrit Drama, p. 50.

দর্শক-সমাজে আদৌ রসানুভূতি হইত কি না সন্দেহ। "রসপিয়াসী ভাবুক ভারতবাসীর" নিকট Grayর এই সন্দেহ হাস্যকর বোধ হইলেও উঁহাদের মত রসজ্ঞান-বর্জ্জিতের পক্ষে এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে।

Hillebrandtএর মতে ভারতীয় প্রাচীন দৃশ্যকাব্য-মধ্যে সংস্কৃতের প্রয়োগ উহার লৌকিক উৎপত্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে আমরা পূর্ব্বেই দেখায়ইাছি যে, প্রাকৃত অংশই দৃশ্যকাব্যের উপর লৌকিক প্রভাবের পরিচায়ক।

বিদূষক-চরিত্রকেও ইঁহারা লৌকিক অনুষ্ঠান হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ করেন। ইহাও অমূলক। কারণ, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মহাব্রত-মধ্যে বিদূষক-চরিত্রের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। কোনরূপ লৌকিক অনুষ্ঠান হইতে এরূপ চরিত্রের সৃষ্টি, ইহা কেবল কল্পনামূলক; সুতরাং এ যুক্তিও গ্রাহ্য নহে। Hertelএর মতে বিদূষক-চরিত্রের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই। সেকালে রাজ-সভায় আনন্দ দিবার জন্য অন্ততঃ একজন করিয়া "ভাঁড়" থাকিত। বিদূষক-চরিত্রের কল্পনা সেই প্রথা হইতেই হইয়াছে। বাস্তবিক এরূপ প্রথা ছিল কি না, কোথাও স্পষ্ট কিছু বলা নাই। নাটকাদি হইতেই বরং আমরা অনুমান করি যে, রাজসভায় "ভাঁড়" একজন থাকিত। Hillebrandtও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে বিদূষকের অনুরূপ চরিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই গৃহীত। সুতরাং বিদূষক-চরিত্রের সাহায্যে রূপকের সহিত সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারের (secular) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করা যায় না।

প্রস্তাবনায় সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনকে কেহ কেহ প্রাচীন সঙ্‌-দেখানর প্রতিচ্ছবি বলিয়া বোধ করেন। ইহাও ঠিক নহে। প্রস্তাবনা রূপক মূল বস্তুতে উপনীত হইবার জন্য একটি অতি সুন্দর আলঙ্কারিক কৌশল (literary device) মাত্র। ইহাতে সুপ্রাচীন আদিম সঙের গন্ধও নাই। বরং প্রস্তাবনার অঙ্গীভূত নান্দী সম্পূর্ণ ধর্ম্মমূলক বস্তু। এত সত্ত্বেও Konow যে কেন যাত্রাকে ধর্ম্মোৎসবের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য বলিতে চাহেন, তাহা বুঝা যায় না। কৃষ্ণোপাসনাই যে বাঙ্‌লার যাত্রার প্রসূতি তাহা বোধ হয় বাঙালী মাত্রেই জানেন।

Pischel সাহেব বলেন যে, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য "পুত্তুল-নাচ" হইতে উৎপন্ন। হইতে পারে যে, পুতুলনাচ সম্পূর্ণ ভারতীয় বস্তু; কিন্তু তাই বলিয়া যে রূপকেরও উৎপত্তি তাহা হইতে স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন মানে নাই। 'সূত্রধার' ও 'স্থাপক'—দৃশ্যকাব্য-সম্পর্কীয় এই দুইটি শব্দ হইতেই পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, পুতুলনাচ হইতে রূপকের উৎপত্তি। মহাভারতে (২) দারুময়ী যোষিতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথাসরিৎসাগরে (বৃহৎকথা—খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী—অবলম্বনে রচিত) দেখা যায় যে, শিল্পী ময়ের কন্যার এমন সব পুতুল ছিল যে, তাহারা কথা কহিতে, নাচিতে, উড়িতে, জল আনিতে ও মালা গাঁথিতে পারিত। রাজশেখরের বালরামায়ণে আছে যে, রাবণ পুত্তলিকা-সীতা দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। পুত্তলিকার মুখমধ্যস্থ শুকপক্ষী তাঁহার কথার উত্তর দিত। শঙ্কর পণ্ডিত ও মহারাষ্ট্রের পরিব্রাজক পুত্তলিকাভিনয়ের (travelling marionette theatre) কথার উল্লেখ করিয়াছেন; সে অভিনয়াধ্যক্ষেরও নাম সূত্রধার (যিনি সূত্র ধরিয়া পুতুল নাচান)। আমাদের দেশেও তারের পুতুলনাচ এই ধরণের জিনিষ। Pischelএর মতে বিদূষক-চরিত্রও পুতুলনাচ হইতে গৃহীত।

Hillebrandt ইহার বিরুদ্ধবাদী। পুতুলনাচ বস্তুতঃ অভিনয়ের অনুকরণ। আসল বস্তুই যদি না থাকিল, তবে অনুকরণ হইবে কাহার! বিশেষতঃ মহাভারত, কথা-সরিৎসাগর বা বালরামায়ণের প্রমাণে পুতুলনাচের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয় না। পুতুলনাচ যে আমাদের দেশে খুব প্রচলিত ছিল, তাহা বেশই বুঝা যায়। ছেলেদের পুতুলখেলা হইতে পুতুলনাচের সৃষ্টি। এইজন্য পুতুলনাচের পুতুলের নাম—পুত্রিকা, পুত্তলী, পুত্তলিকা, পাঞ্চালিকা, দুহিতৃকা ইত্যাদি। পাঞ্চালী ও পাঞ্চালিকা শব্দ হইতে বোধ হয় যে, পাঞ্চাল দেশই পুতুলনাচের জন্মভূমি। যাহাই হউক, পুরা-দস্তুর অভিনয় হইতেই পুতুলনাচের উৎপত্তি—ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাধ্যক্ষের নাম সূত্রধার। সূত্রধার শব্দের অর্থ—যিনি মাপ ঠিক করিবার জন্য সূত্র ধারণ করেন,

---

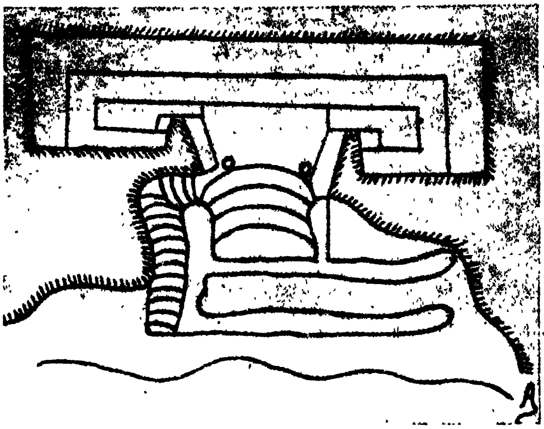
(২) যথা দারুময়ী যোষা নরবীর ! সমাহিতা।
ঈরয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তথা রাজন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥
বঙ্গবাসী সংস্করণ—বনপর্ব্ব, ৩০।২৩

অর্থাৎ সাদা বাঙলায় ছুতার (সূত্রধর)। এই যুক্তি সাহায্যে Lassen সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, পুরাকালে যজ্ঞীয় মণ্ডপাদি নির্ম্মাণের ভার যাঁহার উপর পড়িত, তিনিই সূত্রধর। যজ্ঞস্থলে নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠানের জন্যও মণ্ডপ নির্ম্মিত হইত, তাহার ভারও এই সূত্রধারের উপর থাকিত। পরের যুগে এই সূত্রধার মণ্ডপ-নির্ম্মিতা হইতে ক্রমে ক্রমে নাট্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হ'ন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্ত্তন হইল—যিনি আখ্যানাংশের সূত্র ধারণ করেন।

Pischelএর "পুতলো বাজী" সিদ্ধান্ত যখন ভূমিসাৎ হইল, তখন উহারই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া Luders ছায়া-নাট্যমতের প্রচার করিলেন। ইহার কিয়দংশ Konow অনুকূলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কৈয়টের শৌভিক শব্দের ব্যাখ্যা দেখিয়া Luders স্থির করিয়াছেন যে, তৎকালে নির্ব্বাক্ অভিনয় ও ছায়ানাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল, এবং শৌভিকগণ তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে উত্তররামচরিতের ছায়াসীতার মূল্য বাড়িয়া উঠে; অন্ততঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপই ধারণা। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিতেছি। (৩)

ছায়ানাট্যের সত্তা একেবারে অস্বীকার করিতে না পারা যাইলেও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অশোকের চতুর্থ শৈলানুশাসনে প্রাপ্ত "রূপ" শব্দ Konow সাহেবের মতে ছায়া প্রদর্শন মাত্রের সূচক। কিন্তু তাঁহার এ ধারণা ভুল। Vincent Smithএর 'অশোক' নামক পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা বৌদ্ধগণের যাত্রার বিষয় মাত্র সূচিত করিয়াছে। দৃশ্যকাব্যের বোধক পর্য্যায় শব্দ "রূপক"ও ছায়াপাতন হইতে আবিষ্কৃত, ইহা তাঁহার মত। কিন্তু রূপ শব্দের প্রাচীন ও প্রকৃত অর্থ হইতেছে চাক্ষুষ প্রদর্শন। রামগড় পর্ব্বতস্থ "সীতাবেঙ্গা" গুহায় যে রঙ্গমঞ্চ দৃষ্ট হয়, সেই গুহার দ্বারে দুই পার্শ্বে দুইটি গর্ত্ত দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, সেই গর্ত্তে খুটি লাগাইয়া পরদা খাটান হইত ও তাহাতে ছায়া ফেলিয়া রূপকাভিনয় হইত। ইহাও কোন বিশিষ্ট প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে। (৪)

সীতাবেঙ্গাগুহার নক্সা



(Bloch সাহেবের নক্সার অনুকরণে অঙ্কিত)

নেপথ্য (সাজঘর) প্রাকৃত "নেবচ্ছ" শব্দ হইতে কল্পিত কি না, ইহা লইয়া ছায়া-নাট্যবাদিগণের অনুকূল তর্ক আছে। সংস্কৃত "নৈপাঠ্য" শব্দ হইতে ইহা "নেপথ্যে" পরিণত হইয়াছে, এরূপ অনুমানেই বা দোষ কি—ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। কিন্তু এরূপ কোন সংস্কৃত শব্দ অদ্যাবধি কোথাও পাওয়া যায় নাই।

থেরী গাথায় (৫. ৩৯৪) "রূপ্‌পরূপকম্" শব্দের প্রয়োগ আছে। সম্ভবতঃ ইহা পুতুলনাচেরই সূচনা করে; কারণ, ঠিক ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পুতুলের উল্লেখ আছে। আর

(৩) 'The name Rupaka (lit, little forms or dealing with forms) as a generic name for Sanskrit Plays is best explained as a heritage from the Shadow play and the Shadow Sita introduced in Bhaba-bhuti's Uttararamacharita acquires a new theatrical value from this point of view.'

—Calcutta Rev, May 1922, p. 192.

(৪) মদীয় "রূপদক্ষ না কলাবিৎ" প্রবন্ধে (Presidency College Magazine vol. XII no. 2) এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। নাচঘরের ৩য় বর্ষ, ১১শ, ১২শ ও ১৬শ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি পরিবর্ত্তিতাকারে "রূপদক্ষ না শিল্পী" নামে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। তরুণ লিপির (১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) রামগিরি" প্রবন্ধও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তাহা না হইলেও টীকাকার সম্মত "ভোজবাজী" বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু থেরীগাথার সময় নির্ণীত হয় নাই; সুতরাং ইহা হইতেও "পুত্‌লোবাজী"র সময় ঠিক করা যায় না।

"মিলিন্দপঞ্‌হো" গ্রন্থে 'রূপদক্‌খ' বলিয়া যে শব্দটি পাওয়া যায়, তাহার অর্থ কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে নাট্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই ইহা বেশ বুঝা যায়। ইহারই অনুরূপ শব্দ মাগধী প্রাকৃতে "লুপদখে" শব্দ যোগীমারা গুহার শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার সংস্কৃত রূপ "রূপদক্ষঃ"। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে এই "রূপদক্ষ" শব্দটিকেই Artistএর পর্য্যায় রূপে ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের মনে হয় যে ওরূপ সাধারণ অর্থে উহাকে ব্যবহার না করিয়া 'অভিনেতা' অর্থে ব্যবহার করাই সঙ্গত (৫)।

মহাভারতে (৬) 'রূপোপজীবন' বলিয়া যে শব্দটি পাওয়া যায়, টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ছায়া প্রদর্শন।" কিন্তু নীলকণ্ঠ আধুনিক-যুগের লোক (খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী)। তিনি যে সাম্প্রদায়িক অর্থ পাইয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ, উহার ঠিক আগেই 'রঙ্গাবতরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রূপোপজীবন শব্দে রূপাজীবা নটী ও জায়াজীব নটের প্রতি বেশ একটু কটাক্ষ আছে। বৃহৎ-সংহিতার "রূপোপজীবিন্‌" শব্দও নটকে লক্ষ্য করিয়াছে। রত্নাবলী, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়, দশকুমার-চরিতের পূর্ব্ব-পীঠিকা প্রভৃতি-যে সকল স্থলে ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের লক্ষ্য যে ছায়ানাট্যাভিনেতার প্রতি, তাহাও তত্তৎস্থল দর্শনে বুঝা যায় না।

ছায়ানাটক বলিয়া কতকগুলি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য আছে। Pischel উহার অনুবাদ করিয়াছেন 'shadow-drama।' সুভটের (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) 'দূতাঙ্গদ' ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। ছায়া নাটক বলিতে কি বুঝায় তাহা ঠিক বলা যায় না। হইতে পারে যে, ইহার অর্থ "যে নাটক ছায়া-রূপে অবস্থিত"—পুরা নাটক নয়। এ অর্থও দূতাঙ্গদের পক্ষে খাটে। মেঘ-প্রভাচার্য্যের "ধর্ম্মাভ্যুদয়" "**ছায়ানাট্য-প্রবন্ধ**" নামে বিখ্যাত। ইহার Stage direction হইতে পাওয়া যায় যে, যখন রাজা সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সন্ন্যাসী-বেশী একটি পুতুল যবনিকান্তরালে স্থাপিত করিতে হইবে, ইত্যাদি। ইহা অবশ্য Shadow play বটে। কিন্তু ধর্ম্মাভ্যুদয় খুব বেশী প্রাচীন নহে। Luders এই সূত্রে মহানাটক ও হরিদূতকেও ছায়া-নাটক বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহা অসঙ্গত।

Dr. Hultzschও এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। 'সূত্রধার' শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন—সাময়িক রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাতা নাট্যাধ্যক্ষ।

Prof. Hillebrandt জাভা হইতে যে পুতুলনাচের উদাহরণ দিয়াছেন তাহাও অসঙ্গত। জাভাতে প্রকৃত অভিনয়ের প্রারম্ভের পূর্ব্বে যে পুতুলনাচের প্রচলন ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং এ সকল সিদ্ধান্ত একেবারেই পরিত্যাজ্য।

(৫) এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিচার "রূপদক্ষ না শিল্পী" প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

(৬) শান্তিপর্ব্ব ২৯৪ অ, ৫ শ্লোক—বঙ্গবাসী সংস্করণ।



নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে— —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী— [illegible] চক্রবর্তী

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩

সেই গভীর অন্ধকার নিশীথের ঘোর আঁধার ভেদ করিয়া লীলা উল্কার মত তীব্র গতিতে ছুটিতেছিল! যাহাকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন আজ প্রচ্ছন্ন বিপদের করাল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। আজ আর তাহার অন্য কিছু ভাবিবার বা নিজের বিষয় চিন্তা করিবার সময় নাই। যেমন করিয়াই হোক্—এখনি তাহার সেখানে গিয়া পৌঁছিতেই হইবে! জোরে! আরও জোরে! লীলা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে! থাকিয়া থাকিয়া ঘোড়ার খুরে আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! নির্জ্জন প্রান্তরের বুকের মধ্য দিয়া কেবল শব্দ উঠিতেছে—খটাখট্! খটাখট্!

তাহার গমন-পথ ষ্টেশনের সম্মুখের রাস্তার মধ্য দিয়া প্রসারিত। বড় রাস্তার আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। গ্রাম্য পথের গলি ও সরু রাস্তাগুলি আঁধারে ভরা,—বেড়া বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধা। চারিদিক গভীর অমঙ্গলসূচক নীরবতায় পূর্ণ; মাথার উপর আকাশে তারাগুলি কুয়াসার আবরণের মধ্য দিয়া নিষ্প্রভ ভাবে পথের উপর ম্লান আলো ছড়াইতেছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে বড় বড় বৃক্ষগুলি যেন নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ—সব ঘটনা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কখনও কোন পরিচিত শব্দে সে স্থানের গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, স্থানে স্থানে গ্রামবাসীদের ঢোলের শব্দ ও তার সঙ্গে গান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। কখনও বা একটা শৃগাল রব তুলিবার পর দলবদ্ধ শৃগালের একটা সম্মিলিত ডাক শোনা যাইতেছিল। অসংখ্য কীট পতঙ্গের দল, পাখীদের নিশ্চিন্ত আরামে বাধা দিয়া গাছের শাখায় শাখায় সশব্দে উড়িতেছিল।

লীলা মাঠের ঠিক মধ্য দিয়া তাহার গতি স্থির রাখিয়া ছুটিতেছিল, ও মাঝে মাঝে পশ্চাতে বাজারের দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আজকার রাত্রের প্রত্যেক শব্দটিই আশঙ্কাজনক। তাহার ভয় হইতেছিল কখন হয় ত বা সে সেই বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে, যাহারা প্রস্তুত হইয়া শুধু সাঙ্কেতিক শব্দটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শুষ্ক পাতার মর্মর্ শব্দে, হাওয়ার সন্ সন্ শব্দেও সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তবু নিজের এই বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিরণের চিন্তা সর্ব্বক্ষণ তাহার মনে জাগিতেছিল। হয় ত সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া আছে! হয় ত সে তাহার চারিদিকে কাপুরুষ হত্যাকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জাগিয়া উঠিবে! উঃ! অসহ্য! চিন্তার অতীত! কিরণ! কিরণ! লীলা আরও বেগে ছুটিল!

অবশেষে কিরণের অট্টালিকা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। লীলা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! এখনো চারিদিক শান্ত ও নীরব—হয় ত এখনো তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের দেরি আছে।

অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাগানের উচ্চ বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন বাংলার শুভ্র ছাত আকাশের দিকে উঠিয়াছে। ফটক ভেজান ছিল। হয় ত কিরণের লোকজনেরা এখন সকলেই নিদ্রামগ্ন—কারণ বাড়ীখানি একেবারে নিস্তব্ধ—কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। শুধু ফটকের আলো ছাড়া আর সব আলো নিবিয়া গিয়াছে। এখনও চতুর্দ্দিক শান্ত দেখিয়া লীলা বুঝিল—এখানকার বিদ্রোহীরা সহরের লোকদের সঙ্গে সময়ের স্থিরতা রাখিয়া কায করিতে মনস্থ করিয়াছে।

লীলা ঘোড়া হইতে নামিয়া দেখিল, গভীর উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে! সে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া অগ্রসর হইতেই যেন দূর হইতে বহুলোকের মিলিত উচ্চ চীৎকার-শব্দ তাহার কাণে আসিল! কিন্তু সে একটু স্থির থাকিতেই তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কল্পনায় অনেক সময় মিথ্যা বস্তুও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ড্রয়িংরুমে তখনো আলো জ্বলিতেছিল। কিরণ তখনো শুইতে যায় নাই। কিছুক্ষণ আগে সে বাড়ী ফিরিয়াছে।

লীলা কম্পিতবক্ষে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই উৎসবের দিনের পর হইতে আর সে সাহস করিয়া কিরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই! কিন্তু সে-দিন কিরণ তাহার মনে যে সংশয় জন্মাইয়া দিয়াছিল, সে কথা একবারও সে ভুলিতে পারে নাই। তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিত—সত্যই সে নির্দ্দোষ নিরীহ অরুণকে এতদিন ধরিয়া কি প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছে!

কিরণের ঘরে প্রবেশ করিয়া সহজভাবে সব কথা বলিবার সাহস তাহার ছিল না। সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় সে মরিয়া যাইতেছিল! যখন সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল, তখন এ-সব চিন্তা তাহার মনে ওঠে নাই; কিন্তু কিরণকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখিয়া তাহার পা কাঁপিতে লাগিল! তাহার সমস্ত সংযম শিথিল হইয়া আসিল!

একটা চাকর চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া তাহার ঘোড়া ধরিল! জজ সাহেবের কন্যাকে এত রাত্রে একা দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল!

লীলা অত্যন্ত লজ্জিত মুখে বলিল, সাহেব বাড়ীতে আছেন? তাহার আর উত্তর দিতে হইল না। লীলার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া কিরণ নিজেই, কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য বাহিরে আসিল।

'কিরণ!' লীলার সুমিষ্ট স্বর বাতাসে বাজিয়া উঠিল!

পর মুহূর্ত্তেই কিরণ তাহার পাশে!—ঘোর বিস্ময়ে স্তব্ধ ও মূক হইয়া সে দেখিল—অতিথি আর কেহ নয়—সেই লীলা—যে এক মুহূর্ত্তও তাহার চিন্তা হইতে অপসৃত হয় না! সে শুধু বলিল—'তুমি!'

লীলা তাহাকে তাহার এত রাত্রে আসিবার কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিরণ সে সময় আর কিছু বুঝিতে সক্ষম ছিল না। সে শুধু বুঝিল—অবশেষে লীলা তাহার কাছে আসিয়াছে! এই গভীর নিদ্রাভরা রজনী! যখন সমস্ত লোকে যে যাহার ঘরে সুপ্তিমগ্ন, সেই নির্জ্জন নিশীথে ঘোড়া ছুটাইয়া লীলা তাহার কাছে ধরা দিতে আসিয়াছে! এতদিনে তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের জয় হইয়াছে! লীলা আজ তাহারই!

'লিলি! আমার লিলি!'

লীলা সরিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, কিরণ! শোন! আমি বিশেষ দরকারে পড়ে তোমার কাছে এসেছি!

তোমার দরকার এখন থাক্! ঘরে চল আগে ঠাণ্ডা থেকে'? কিরণ তাহার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া জোর করিয়া চেয়ারে বসাইল!

লীলা বলিল, কিরণ! তুমি কি কিছুই শোন নি? তোমার প্রজারা দল বেঁধে আজ এখানে এসে তোমার বাংলা লুঠ করবে! চুপ করে শোন! একটা গোলমাল শুনছো না কি?

কিরণ উদাসীন ভাবে এ সব কথা শুনিল! তখনো তাহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি লীলার মুখেই নিবদ্ধ! বলিল—কে বলেছে তোমায় এ সব কথা?

লীলা আবার সব কথা গুছাইয়া বলিল। কিন্তু কিরণের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। লীলা তাহার কাছে আছে ইহাই যথেষ্ট! আর সে কিছু জানিতে চায় না—এই রকম ভাব!

লীলা তাহাকে ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া আবার সব বলিয়া বলিল—তুমি কিছু শুনছো না কিরণ! এখনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মূল্যবান! এমন করে সময় নষ্ট করো না! একটা কিছু উপায় কর।

কিরণ তখন বলিল—আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না! এমন কি করেছি আমি—যে তারা আমায় খুন করবে? আর তুমি—এই রাত্রে একা এই কথা বলতে এত দূরে এসেছ? বাড়ীতে আর কেউ ছিল না? অরুণ কোথায়?

লীলা তখন সেখানকার অবস্থা একে একে সব বর্ণনা করিল।

কিরণ সব শুনিয়া বলিল, তুমি এত পথ এই বিপদের মুখে আমায় সাবধান করে দিতে ছুটে এসেছ? তোমার ভয় হয় নি? যদি তাদের সামনে পড়ে যেতে?

লীলা দারুণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! কিরণের চোখে তখন যে আগুন জ্বলিতেছিল, লীলা আর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না!

বিপদ সম্মুখে আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিরণ সে দিকে মনোযোগ দিল না! লীলা যে অরুণের বাগ্দত্তা—তাহা সে ভুলিয়া গেল! লীলা ভালবাসার অধিকারে তাহারই! আজিকার রাত্রি এ ভাবে তাহার কাছে আসার পর আর এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অরুণকে এখন নিশ্চয়ই তাহার হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে! সে জানুক—লীলার প্রেম তাহার জন্য নয়! আজিকার রাত্রের পরে লীলা আর সে পুরানো দিনে ফিরিয়া যাইতে পারে না!

তাহাকে নীরব দেখিয়া লীলা অধীর হইয়া উঠিল! সে মিনতি করিয়া বলিল—একটা কিছু উপায় কর কিরণ! এখন কি অন্য দিকে মন দেবার সময়? তারা হঠাৎ এসে পড়লে তখন তুমি কি করবে?

কিরণ বলিল—কিন্তু লীলা! আজকার এ ঘটনার পরও কি তুমি বলতে চাও যে, তুমি আমার নও—তুমি অরুণের? তুমি কি শুধু আমায় ভালবাস বলেই এটা কর নি? আমার সেদিনকার যুক্তি ভেবে দেখো! তাকে এমন করে প্রতারণা করা ও তোমার-আমার এবং তার জীবন একটুখানি ভুলের জন্য নষ্ট করা উচিত নয়! আজ রাত্রে আমি একটু পরে মোটরে তোমায় নিয়ে তার কাছে যাব, ও সব কথা তাকে খুলে বোলবো—কেমন?

লীলা অবশ শরীরে চৌকির উপর লুটাইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল! কিরণের প্রতি দুর্নিবার ভালবাসা আর ত সে মনে মনে চাপিয়া রাখিতে পারে না! যা হবার হোক্! একজনের উপর এমন হৃদয়ভরা প্রেম বুকে লইয়া কেমন করিয়াই বা সে অন্যের পত্নী হইবে? এ দ্বন্দ্বে তাহারই পরাজয়! আর সে যুঝিতে পারে না!

কিরণ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল! বহুক্ষণ লীলাকে নির্ব্বাক্ অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিল, ও তাহার হাত ধরিয়া চুপি-চুপি বলিল—তা হলে তুমি আমারই ত লিলি?

সহসা দূরে বহুলোকের সম্মিলিত কণ্ঠের ভীষণ চীৎকার শোনা গেল! লীলা সেই শব্দে ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিল! ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল! সে বলিল—ঐ! ঐ তারা আসছে! তারা এখনি তোমাকে খুন করে ফেলবে! কি হবে—কি হবে এখন?

কিরণের কুকুর উচ্চরবে ডাকিয়া উঠিল! কিরণ উঠিয়া চৌকিদারকে ডাকিল; কিন্তু তখন সে ফটকের দিকে দৌড়িতেছে! গেটের কাছে চাকরেরা সব জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোলমাল শুনিয়া তাহারা ঘুম ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

ক্ষণেক পরেই তাহারা ভয়ে আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল; বলিল—অনেক লোক মশাল ও লাঠি সড়কী লইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে!

কুকুরটা বিকট চীৎকার করিতে করিতে ফটকের দিকে ছুটিয়া গেল! চৌকিদার বলিল—এ সব ভাল লক্ষণ নয়! লুট আর দাঙ্গা ছাড়া এদের আর কি মতলব হতে পারে?

একজন সহিস্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, সাহেব! সাহেব! আমরা সকলেই মারা যাবো! অনেক লোক—সে গোণা যায় না—অসংখ্য লোক সব লাঠি নিয়ে আমাদের বাংলার দিকে আসছে! এ গাঁয়ের পুলিশ সব আজ সহরে চলে গেছে! কি হবে?

কিরণ সর্ব্বপ্রথম ঘোড়াদের আস্তাবল হইতে সরাইয়া দূরে বাঁধন খুলিয়া রাখিতে বলিল—যদি দরকার হয়, তবে যেন তাহারা পলাইতে পারে।

তাহার পর সে লীলাকে বলিল, তুমি এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও! বাগানের পিছন দিয়ে একটা গুপ্ত পথ আছে, আমি সেই পথ দিয়ে তোমায় কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসি! সে-দিক দিয়া গেলে খুব শীঘ্র বাড়ী পৌঁছতে পারবে! ওঠো! দেরি করো না!

লীলা দৃঢ়ভাবে বলিল, না! তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমি কখনো যাব না! তোমার এখানে থাকা মানে ত খুন হওয়া!

আমি কি করে যাব লীলা? আমার বাড়ী ঘর সম্পত্তি এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে ত! তা ছাড়া আমার আশ্রিত এতগুলো লোক—এদের বাঁচাবার ও নিরাপদে রাখবার ভারও ত আমারই। এদের মৃত্যুমুখে ফেলে আমি কি নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারি? তুমি চলো, আমি তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে, তার পর ফিরে এসে এই বদমাস্দের সঙ্গে যুদ্ধ করবো!

লীলা চাহিয়া দেখিল, কিরণের সেই পূর্ব্বের সাহস, শক্তি ও সেই অবিচলিত দৃঢ়তা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! এ সেই—তাহার চিরদিনের বন্ধু সখা প্রিয়—সুখে দুঃখে

নির্ব্বিকার—ধৈর্য্যে শক্তিতে বীরত্বে অতুলনীয়—একমাত্র তাহার—তাহারই কিরণ! এর সঙ্গে মরিতেও কি সুখ, কি তৃপ্তি, কি আনন্দ! লীলা সেই মুহূর্ত্তে আর সব ভুলিয়া গেল! অরুণের কথা—তাহার দুর্ব্বলতা—সে যে লীলা ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না—সে সব আর তাহার মনে রহিল না; বর্ত্তমান অতীতকে ডুবাইয়া দিল। সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সব বিপদের অংশ গ্রহণ করিবে—যদি প্রয়োজন হয় তবে দুজনে এক সঙ্গেই মরিবে।

কিরণ তাহাকে আর একবার বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন আর বাদানুবাদের সময় ছিল না। লোকেরা লাফাইয়া বাগানের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, ও মহা উৎসাহে বেড়ার তার কাটিতেছিল।

কিরণ মনে মনে এই চিন্তায় সুখী হইল, যে, আজ সে ও লীলা এক সঙ্গে একই নিয়তির মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! যদি অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতরই দাঁড়ায়, তবে তাহারা দুজনেই একত্র তাহা বরণ করিয়া লইবে।

বাহিরে চীৎকার ক্রমেই বাড়িতেছিল। কিরণের কুকুরের ভীষণ গর্জ্জন এতক্ষণ শোনা যাইতেছিল,—এক সঙ্গে কতকগুলি লাঠির আঘাতে সে চিরদিনের মত নীরব হইয়া গেল!

কিছুদিন হইতে কিরণের বিরুদ্ধে তাহার কতকগুলি প্রজা ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কিরণের অপরাধ—সে তাহাদের ভাঙ্গা অপরিষ্কার কুঁড়ে ভাঙ্গিয়া ব্যারাকের সৃষ্টি করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া, পানা-পড়া পচা পুকুর বুজাইয়া ভাল ভাল কূপের বন্দোবস্ত করিয়া প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের পৈত্রিক ভিটায় হাত পড়ায় তাহাদের অসন্তোষ বাড়িতেছিল। কতকগুলি বদমাস্ গুণ্ডা তাহাদের বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া লুটের লোভে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া এই ব্যাপার বাধাইয়া তুলিয়াছে!

কিরণ তাহার রিভলভার ও কার্ট্রিজ সাজাইয়া লইল! তাহার পশ্চিমদেশীয় ভৃত্যেরা লাঠি লইয়া প্রত্যেক ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল। আজিকার রাত্রে বাড়ীর এই কয়েক জন ছাড়া সাহায্য করিবার মত আর কেহই ছিল না!

নিজে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভিতরে লীলাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়া কিরণ চুপি চুপি বলিল—তুমি আমার জন্য এ কি ঘোর বিপদে ঝাঁপ দিলে লিলি?

লীলা শান্ত ভাবে বলিল—আমার একলা নিরাপদে থাকার চেয়ে তোমার সঙ্গে বিপদের মুখে থাকা ঢের ভালো!

কিরণ দরজার বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—শোন সকলে! যে কেউ আমার বারাণ্ডায় পা দেবে, আমি তখনি তাকে গুলি করবো! ভাল চাও, ত—যে যার ঘরে ফিরে চলে যাও!

ওরে! সাহেব জেগে আছে, জেগে আছে রে! সে কথা বলছে! ভিড়ের মধ্য হইতে একজন চেঁচাইয়া উঠিল!

অন্যজন বলিল, বেরিয়ে এস না! ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কেন? আমরা যার কত কষ্ট করে তোমায় দেখতে এলুম!

একটা ভীষণ অট্টহাসির রোল উঠিল!

কিরণ লীলাকে আড়াল করিয়া রিভলভার হাতে বারাণ্ডায় আসিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল! বলিল,—কেন তোমরা এত রাত্রে আমার এখানে গোলমাল করতে এসেছ? কি চাও তোমরা?

বহুকণ্ঠ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—মাথাটা চাই! তোমার মাথাটা! তোমার মাথাটা পেলেই খুসি হয়ে যে যার ঘরে চলে যেতে পারি!

কয়েক জন বেগে বারাণ্ডায় উঠিতেছিল, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী একটা লোক কিরণের গুলি খাইয়া লুটাইয়া পড়িল!

একটা ভীষণ স্বর চীৎকার করিয়া উঠিল—খুন হয়েছে! খুন! দাঁড়াও তোমরা! বাড়ীটা সব ঘিরে ফেল! মস্ত বড় মদ্দ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে গুলি চালাচ্ছে! ঘের সব! ঘিরে ফেল! দেখি—ফাঁদে পড়ে কি না!

একটা ভয়ানক কোলাহল ও চীৎকার বাতাসে মিশিয়া গেল!

কিরণ আবার চেঁচাইয়া বলিল—তোমরা যদি আমায় খুন করতে চাও, তার আগে ঐ লোকটার মত অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোকের আমি প্রাণ নেব! যদি বেশী বাড়াবাড়ি করতে ও মরতে ইচ্ছে না হয়ে থাকে, তা হলে যে যার ঘরে ফিরে যাও!

কিরণের কথার শেষাংশ গভীর কোলাহলে ডুবিয়া

গেল! দাঙ্গাকারীরা সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল—এই! ভগবান দীন্ শিকারি কোথায়? ডাক তাকে! এই শিকারি! এদিকে! তোমার বন্দুক আছে! গুলি কর সাহেবকে! শীঘ্র গুলি কর!

কিরণ দেখিল, সত্যই একটা লোক বারাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিতেছে!

কিরণের অব্যর্থ সন্ধানে তখনি ভগবান্ চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল! তাহার পরিত্যক্ত বন্দুক আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিল না।

দলের মধ্য হইতে আবার একজন চেঁচাইয়া উঠিল—সকলে মিলে ঠেলে উঠে পড়! যদি দু একজন জখমও হয়, তবু কেউ গিয়ে ওকে ধরতে পারবে! টাকা অনেক আছে! যেমন করে হোক্—ঘরে ঢুকতেই হবে!

কিন্তু এ কথায় কেহই রাজি হইল না। কিরণের হাতের লক্ষ্য দেখিয়া আক্রমণকারীরা দমিয়া গিয়াছিল, প্রত্যেকেই ভাবিল, তাহারা গুলি খাইয়া প্রাণ দিবে, আর খাজনার টাকার ভাগ অন্যে লইবে।

বাংলার পিছনে মড় মড় করিয়া একটা শব্দ হইল, কিরণ বুঝিল, কাপুরুষের দল সম্মুখ হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পিছন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছে!

লাঠির ঠকাঠক্ শব্দ ও মাঝে মাঝে চীৎকার এবং আর্ত্তনাদে তাহারা বুঝিল, সেদিকে কিরণের লোকদের সঙ্গে তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে!

লাঠির আঘাতে একটা জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িল! একজন পিয়নের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—আমি এই হাতে দুজনকে ঘায়েল করেছি! কে আসতে চায় আর? আসুক! গোটাকতক মাথা এখনো বেশ ফাটাতে পারবো!

গ্রামবাসীরা অনেকে জাগিয়া উঠিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এ ব্যাপারের সমালোচনা করিতেছিল। কিরণ যে গোঁয়ারতুমি করিয়াই এই কাণ্ডটি বাধাইয়া তুলিয়াছে, এই তাহাদের চর্চ্চার বিষয়!

বারাণ্ডার নিকট হইতে একটা লোক পিশাচের মত অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল! খানিক চুপ করে থাক বাবা! ঘরের ভেতর থেকে বাছাধনকে বেরোতে হয় কি না দেখাচ্ছি আমি! মজাটা দেখ সব! বলিতে বলিতে সে একটা লোকের হাত হইতে জলন্ত মশাল কাড়িয়া লইয়া খোলার চালে আগুন ধরাইয়া দিল!

লোকেরা সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল! আগুনের শিখা জ্বলিতে জ্বলিতে বাংলার ছাত শুদ্ধ ধরিয়া উঠিল দেখিয়া তাহাদের আনন্দ ও উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল!

কিরণ প্রথমে তাহাদের এই অতিমাত্র উৎসাহ ও হর্ষের কারণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সম্মুখে ও পশ্চাতে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সে আর কোন দিকে মন দিতে পারে নাই।

কিন্তু যখন চারিদিক মশালের আলোর অপেক্ষাও উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল, যখন চারিদিক হইতে দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ হইতে লাগিল, তখন সে বুঝিল এইবার সব শেষ!

সে তখন হতাশ হইয়া বলিল, লিলি! আর আমাদের কোনও আশা নেই! আর তোমায় বাঁচাতে পারলুম না!

অগ্নিরাশি-বেষ্টিত হইয়া লীলা তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। সে কোন কথা না বলিয়া ধীরে কিরণের হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিল।

কিরণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—শেষ পর্য্যন্ত ওদের আমি তোমার গায়ে হাত দিতে দেবো না—কিন্তু তুমি আমায় মাপ করো—লীলা।

মাপ করবো? কিসের জন্য কিরণ?

কিরণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে চাহিল,—ক্ষমা—তোমার জীবন এমন ভাবে নষ্ট করলুম বলে—তোমার এই তরুণ জীবন—শোভা ও মাধুর্য্যে ভরা সুন্দর জীবন—আমারি জন্যে অসময়ে নষ্ট হল—লীলা—সেই জন্যে ক্ষমা চাইছি! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য কিছু করতে পারলুম না—ক্ষমা চাই!

কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিতে পারিল না! কেবল সজলনেত্রে লীলার অগাধ প্রেম ও বিশ্বাসে পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার সে সময়ের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

লীলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে বলিল—কেন ভাবছো এত? আমার জন্যে? আমি ত তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারিনি বলে নিজেই ছুটে এই নিয়তির মুখে এসে পড়েছি! বেশ ত! দুজনে একসঙ্গে যাব!

আগুনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতেছিল, বহুদূর পর্য্যন্ত ভীষণ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সরিয়া আসিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইল! আগুনের শিখা লাফাইতে লাফাইতে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল!

চারিদিক হইতে ফটাফট্ শব্দে ছাত, কার্ণিস, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! প্রবল বাতাসে দীর্ঘ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘর জ্বালাইয়া যেন মৃত্যুর প্রলয়কালীন নৃত্য করিতেছিল! ও সেই দৃশ্য দেখিয়া বিদ্রোহীদের সহর্ষ উচ্চ চীৎকার যেন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল!

দহ্যমান বাংলার আগুনের ভিতর হইতে এই দুইটি প্রাণীকে অনিবার্য্য ভীষণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই রহিল না।

বারাণ্ডা হইতে ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা কেহ করিল না—কিরণ তখনো রিভলভার হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া! পশ্চাৎ-ভাগ রক্ষা করিতে তখন কেহ ছিল না, অসহ্য উত্তাপ ও ধূমে নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসায় পিয়নরা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়াছিল! বহুলোকের সহিত যুদ্ধে রত তাহাদের লাঠির শব্দ তখনো লীলা ও কিরণের কাণে আসিতেছিল।

ক্রমে বিদ্রোহীদের অনেকেই বাংলার পিছন দিকে কোন প্রহরা নাই দেখিয়া সরিয়া সরিয়া সেইদিকে জড় হইতেছিল, আগুনে ঘর ধ্বংস হইবার পুর্ব্বে যদি কিছু লুটপাট করিবার সুবিধা হয় সেই চেষ্টায়—

অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঘরের কড়ি বরগা সব ধরিয়া উঠিল! ধূম ও উত্তাপ অসহ্য হইয়া তাহাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল!

কিরণ পরিষ্কার বাতাসের জন্য লীলাকে বারাণ্ডায় টানিয়া আনিল! আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষায় তাহার মুখ তখন কঠোর ও অবিচলিত স্থির! লীলার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে সেই জ্বলন্ত আগুন, অসহ্য উত্তাপ ও ধোঁয়া, মৃত্যুর সেই ভীষণ তাণ্ডবলীলা—তাহার সমস্ত সাহস নষ্ট করিয়া দিয়াছিল! আসন্ন মৃত্যুর এই উদ্বেগের অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল!

আগুনের একটা শিখা লাফাইয়া আসিয়া বারাণ্ডায় লাগিল। রেলিং ধরিয়া উঠিল! মড় মড় শব্দে ছাতের একাংশ ভাঙ্গিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া পড়িল!

কিরণ দেখিল আর আশা বৃথা! কোন দিক দিয়া রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই! বৃথা আর লীলাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি? এখন শেষ উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

লীলা আতপ-তাপ-তাপিতা লতার মত অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় চোখ বুজিয়া কাঁপিতেছিল! তাহার মুখ বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে!

কিরণ তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—লিলি! সোজা হয়ে দাঁড়াও! এবার আমাদের সব শেষ!

লীলা চাহিয়া দেখিল অন্তিম মুহূর্ত্ত নিকট! মৃত্যুর মধ্যেও একটা শান্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল—সে যাহাকে ভালবাসে—তাহারই সঙ্গে আজ সে সহমরণে যাইতেছে! তাহার এই মৃত্যু অরুণকেও তাহার জীবনব্যাপী গুপ্ত আঘাত হইতে রক্ষা করিল! ভালই হইল!

কিরণের হাত কাঁপিয়া গেল! সে আরও কঠোর ভাবে নিজেকে এই বিয়োগান্ত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া আবার হাত উঠাইয়াছে, সেই সময় বাহিরে একটা ভীষণ গোলযোগের রোল উঠিল!

জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে, প্রহার ও ধাক্কাধাক্কির বিষম গণ্ডগোল, চীৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল—বেড়ার ওপারে মোটর হইতে খাকি পোষাক-পরা লোকেরা লাফাইয়া পড়িতেছে ও বিদ্রোহীদের অসম্বদ্ধ ভাবে প্রহার করিতেছে।

প্রতিরোধ করার উপায় ছিল না, কারণ পুলিশের লোকের প্রাচুর্য্য দেখিয়া দাঙ্গাকারীরা অকস্মাৎ বিষম ভয় পাইয়া পলাইতেছিল, ও চীৎকার ও গোলমালের মধ্যে টেরিটোরিয়ালরা তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল।

কিরণ বিপদমুক্ত হইয়া লীলাকে লইয়া বাগানে পরিষ্কার বাতাসে বসাইল! সেই বিশাল অগ্নিকাণ্ডের রক্তশিখা তখনো সে স্থানের চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল—আকাশে স্থানে স্থানে কাল ধোঁয়া তখনো জমিয়া রহিয়াছে! পুলিশের লোকের সঙ্গে অনেক টেরিটোরিয়াল সৈন্য আসিয়াছিল—তাহাদের সমবেত চেষ্টায় আগুন ক্রমশঃ নিবিয়া আসিতে লাগিল।

একজন পুলিশ অফিসার তাহাদের বলিল—লেফটেনেন্ট ঘোষাল গিয়া তাহাদের সংবাদ দেওয়ায় তাহারা এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে !

সে আরও বলিল—সহরের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত আশ্চর্য্য ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। সময়ে খবর পাইয়া মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই সহসা বিদ্রোহী সৈন্যদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। পুলিশ সহরের নানা স্থান হইতে সমস্ত বিদ্রোহীদলকেও ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে লিখিত প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে যে রাত্রি বারোটার সময় একটি বোমার সঙ্কেত-শব্দ হইলেই সহরে হত্যা-মহোৎসব পড়িয়া যাইত।

তাহার কথা শেষ করিয়া সে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল—এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না ?

কিরণ বলিল—ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে—বাড়ীটা একেবারেই গেছে! তা যাক! প্রাণের কোন হানি হয় নি যে সেই ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে! আমার লোকজনেরা ও আমরা দুজনে সকলেই প্রাণে বেঁচে গেছি! আপনারা খুব সময়েই এসে পড়েছিলেন! বলিতে বলিতে সে শিহরিয়া উঠিল! তাহার মনে পড়িল—সে কিরূপ ভাবে তাহার বন্দুক লীলার দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল! একটি গুলিতে তাহারা দুইজনে মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরব হইয়া যাইত!

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি

৺রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর

আমদানী, চাহিদা ও বাজার

ইতঃপূর্ব্বে আমরা প্রচ্ছন্ন সম্পদ বাস্তব সম্পদে রূপান্তরিত করাকে উৎপাদন (Produ-tion) আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এবং যাহা কিছু মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে তাহাকেই সম্পদ নামে অভিহিত করিয়াছি। উৎপাদন-ক্রিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি পদার্থের সংবিন্যাস বা রচনা করিবার শিল্প নহে, এই সংবিন্যাস দ্বারা এমন একটি পদার্থ গঠিত হওয়া প্রয়ে জন, যদ্দারা মানবের কোন না কোন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে। এবং উৎপাদন-কার্য্য এমন স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, যে স্থানের অধিবাসী-বর্গের আকাঙ্ক্ষা এই উৎপন্ন পদার্থ দ্বারা চরিতার্থ হই:তে পারে। বাংলা দেশে পশমী পোষাক প্রস্তুত হইতে পারে ; কিন্তু বাংলা শীতপ্রধান দেশ নহে বলিয়া তথায় উহার অধিক প্রচলন নাই। যদি এই সকল পোষাক, যে স্থানে পশমী পোষাকের অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা আছে, তথায় চালান দিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না করা যায়, তাহা হইলে উহা উৎপাদন বলিয়া গণ্য হইবে না। সে স্থানের অধিবাসীবর্গ ইংরেজী ভাষাতে অনভিজ্ঞ, সে স্থানে ইংরেজী ভাষাতে পুস্তক মুদ্রণ করা উৎপাদন নহে, বরঞ্চ অপচয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; কারণ যে কাগজ এই ইংরেজী পুস্তক মুদ্রণে ব্যয় হইল, সেই কাগজে স্থানীয় ভাষাতে পুস্তক মুদ্রিত হইলে প্রকৃত উৎপাদন বলিয়া গণ্য হইত। উৎপন্ন পদার্থের জন্য জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা থাকা এবং যে স্থানে ঐ পদার্থের অভাব র'হিয়াছে, সেই স্থানে, সেই পদার্থ সরবরাহ করার উপর উৎপাদন-কার্য্য নির্ভর করে।

কেবলমাত্র নিজের অভাব মোচনের জন্য যে উৎপাদন, তাহা হইতেছে সহজ বা সরল উৎপাদনের উদাহরণ। যেমন ইতঃপূর্ব্বে আপন আপন ইন্ধনের উপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহের বিষয় আলোচনা হইয়া ছ। কৃষি সম্বন্ধেও অতি প্রাচীন কালে এইরূপ উৎপাদনের প্রথাই প্রচলিত ছিল ; কিন্তু ঐ প্রকার সরল উৎপাদনের অবস্থা বহুকাল যাবৎ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক উৎপাদকই প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজ পরিশ্রমের ফল দ্বারা কেবল নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিয়া, অন্যের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি উদ্দেশ্যে উৎপাদন-কার্য্যে রত হয়। এই নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত পদার্থটী সহজসাধ্য করিয়া তুলিতে হয়। কোন্ স্থানে, কোন্ পদার্থের চাহিদা আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ স্থানে ঐ পদার্থের আমদানীর ব্যবস্থা করিলেই কার্য্য শেষ হইল না। দেখিতে হইবে, যাহারা ঐ পদার্থ লা ' করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের উহা লাভ করিবার জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন, তাহার উৎপাদনের ক্ষমতা তাহাদের আছে কি না। মনে কর, একজন কৃষক একখানা লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল ; কারণ, সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, উহা দ্বারা কর্ষণের কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালিত হয়। ঐ স্থানেই আর এক ব্যক্তির লোহার লাঙ্গলের ব্যবসায় আছে। যদি ঐ কৃষকের লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে তাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর লাঙল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ থাকিলেও উহা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে সে অবশ্যই চিন্তা

করিয়া দেখিবে—যে অর্থ তাহার সঞ্চিত আছে, উহা হইতে লাঙ্গল ক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা চলিবে কি না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই লাঙ্গল ক্রয় করা না করা তাহার অন্যান্য কতকগুলি ইচ্ছা পূরণ করা না করার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ একদিকে লাঙ্গল ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা—এই উভয় আকাঙ্ক্ষার বলবত্তার উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। যদি উপরিউক্ত কৃষকের ন্যায় অপর এক কৃষকেরও একটি লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিবার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, এবং তথাকার লাঙ্গল ব্যবসায়ীর নিকট কেবলমাত্র একটী লাঙ্গলই মজুত থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝিয়া ঐ লাঙ্গলটির মূল্য এত বৰ্দ্ধিত করিয়া চাহিতে পারে, যে, পরস্পর প্রতিযোগী ক্রেতাদ্বয়ের মধ্যে একজনকে তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব দেখা যায়, দ্রব্যের মূল্য কেবল চাহিদার উপর নির্ভর করে না, চাহিদা ও আমদানী এই দুয়েরই উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে একজন সরবরাহকারী ও দুইজন ক্রেতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং এক্ষেত্রে মূল্য কি প্রকারে নিরূপিত হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। যে স্থানে বহু সরবরাহকারী এবং বহু ক্রেতা বর্ত্তমান সে-স্থানে মূল্য নিরূপণ-প্রণালী মূলতঃ পূর্ব্বের ন্যায় হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় সহজবোধ্য হয় না। পূর্ব্ব-বর্ণিত ব্যাপারে বিক্রেতার সংখ্যা এক এবং ক্রেতার সংখ্যা দুই; কিন্তু এস্থলে ক্রেতাগণের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা বলবতী নহে, তাহাদের ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপর মূল্য নিরূপণ নির্ভর করে। সেইরূপ যেখানে দুইজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা বর্ত্তমান, সেখানে বিক্রেতাগণের মধ্যে যাহার ইচ্ছা বলবতী নহে, তাহার বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপর মূল্য নিরূপণ নির্ভর করে। এখানে বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের নিরূপিত মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। আর যেখানে একই দ্রব্যের বহু বিক্রেতা এবং বহু ক্রেতা বর্ত্তমান, সেখানে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা একে অপরের বিরোধী হইয়া মূল্য-নিরূপণ ব্যাপারকে একটি সমস্যায় পরিণত করিয়া তুলে। কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধেই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মনে কর, একজন কৃষকের বিক্রয় করিবার জন্য কিছু ধান্য মজুত আছে। এই ধান্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিদিনই তাহাকে বাজারে যাইয়া দর ও ক্রেতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়; কারণ, তাহার ইহা জানা আছে যে, তাহার ন্যায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের বিক্রয়ের জন্য ধান্য মজুত আছে। এবং তাহারা উহা বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ইহা ছাড়া, তাহার আরও জানা আছে যে—যদি কোন প্রকারে ধান্য বিক্রয় করিবার কোন একটি সুযোগ তাহাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়, তবে তাহার সম-ব্যবসায়ীর মধ্যে যাহার বিক্রয়ের আকাঙ্ক্ষা অপরাপরের অপেক্ষা প্রবল, সে ব্যক্তি ঐ সুযোগ আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ফেলিবে; অর্থাৎ এই সুযোগে সে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। এখানে যে সকল অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা হাট বা বাজারের পক্ষে প্রযোজ্য। একদিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয়ের ইচ্ছা বা দ্রব্যের আমদানী এবং অপরদিকে ঐ দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ের ইচ্ছা অর্থাৎ চাহিদা বর্ত্তমান। ঐ আমদানী ও চাহিদার অনুপাতের উপরেই মূল্য বা বাজার-দর নির্ভর করে। আমদানী ও চাহিদা কতকগুলি বিশেষ ইচ্ছার সহিত জড়িত এবং উহা ঐ সকল ইচ্ছার প্রভাবের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কোন দ্রব্যের মূল্য বাজার অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে; কিন্তু এই প্রকার মূল্যের আধিক্য ক্রেতার ইচ্ছার বলবত্তার উপর নির্ভর করে। মনে কর, যখন চাউলের দর টাকাতে ৵৮ সের, এক ব্যক্তির তখন নিজ পারিবারিক খাদ্যের জন্য দৈনিক ৴৪ সের চাউলের প্রয়োজন। এখন যদি চাউল মহার্ঘ্য হইয়া টাকায় ৴৬ সেরে পরিণত হয়, তাহা হইলে হয় তাহাকে ঐ ৴৪ সের চাউলের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হইবে, অথবা তাহাকে ৴৪ অপেক্ষা কম চাউল ক্রয় করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইলেও এই বিরুদ্ধতার মীমাংসা আপোষেই হইয়া থাকে। তাহাকে চাউলও অল্প ক্রয় করিতে হয়, অথচ অর্থও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়। বাজার দর বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ চাহিদার হ্রাস হয়। মূল্য বৃদ্ধির কারণ ইহাতে বুঝা যায় না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রত্যেক হাট এবং বাজারেই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা আছে; এবং সেই চাহিদা সঙ্কুলানের জন্য আমদানীরও একটা নির্দ্দিষ্টতা আছে। যে পর্য্যন্ত আমদানী ও চাহিদা স্থির থাকে, সে পর্য্যন্ত দ্রব্য হস্তান্তরে মূল্যও নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু বাজারে আমদানীর পরিমাণ অথবা চাহিদা পূরণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্যের আবশ্যক, তাহার পরিবর্ত্তন হইলে, সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বিশদভাবে বুঝান যাক। মনে কর, কোন হাটে সমগ্র বৎসরব্যাপী যে ধান্য বিক্রয় হয়, তাহা ঐ হাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতে আমদানী হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক হাটের দিবস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য আনীত হইয়া থাকে। যদি কোন বৎসর ঐ সকল গ্রামের ধান্যের ফসল দৈবাৎ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি হাটে ধান্যের আমদানী স্বভাবতঃই হ্রাস হইয়া যাইবে; কিন্তু চাহিদা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইবে; সুতরাং ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আবার মনে কর, কোন ব্যবসায়ী বহুপরিমাণ ধান্য দূরদেশে চালান দেওয়ার জন্য চুক্তিগ্রহণ করিল। ঐ অবস্থায় ঐ ব্যবসার চাহিদা স্বভাবতঃই বাজারের নির্দ্দিষ্ট চাহিদা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। সুতরাং এই এক ব্যক্তির চাহিদার আধিক্যের জন্যও ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানীর হ্রাস হইলে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ চাহিদার হ্রাস ও আমদানীর বৃদ্ধি হইলে মূল্যের হ্রাস হওয়া সুনিশ্চিত।

এখন হাট বা বাজার বলিলে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যেখানে বিবিধপ্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহাকেই আমরা হাট বা বাজার বলিয়া থাকি; কিন্তু অর্থনীতির দিক্ দিয়া তাহাকে বাজার বলা চলে না। অর্থনীতি হিসাবে বাজার বলিতে

যেখানে কেবল একজাতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকেই বুঝায়। ধান্যের হাট বা বাজার অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বাজার হইতে স্বতন্ত্র। বিবিধ-প্রকার খাদ্যদ্রব্যের বাজার বিবিধপ্রকার ইচ্ছার উপরে অর্থাৎ বিবিধ-প্রকার দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। এই ইচ্ছা সমূহের পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয়। কোন দ্রব্য বা সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের স্থানকেও হাট বা বাজার বলা যায় না। অবশ্য এখানে ক্রয় করিবার ইচ্ছা বহু, কিন্তু বিক্রয়ের ইচ্ছা কেবল একটি; আর এ স্থানে চাহিদার বৃদ্ধির সহিত আমদানীর মোটেই বৃদ্ধি নাই। সুতরাং হাট এবং বাজার বলিতে এমন ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকে বুঝিতে হইবে, যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের সম্পদ এইরূপ অবস্থাতে হস্তান্তরিত হয় যে, চাহিদা এবং আমদানীর বহুবিধ স্বতন্ত্র ইচ্ছা একে অন্যের উপর সহজভাবে ক্রিয়া করিতে পারে।

প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে আমদানী ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার পরিশ্রম-লব্ধ দ্রব্য-বিশেষের বাজারে চাহিদা আছে কি না তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাকে আরও দেখিতে এবং শিক্ষা করিতে হইবে যে—কোন্ বাজারে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। অর্থনীতি হিসাবে বলিতে গেলে উৎপাদনকারী যে সম্পদ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা সে এমন স্থানে বিক্রয় করিবে, যে স্থানে ঐ প্রকার সম্পদ লইবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সম্পদ উৎপাদনের নিমিত্ত ভূমি ও মূলধনের আবশ্যক। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত বস্তুটি স্থাবর এবং উহা কেহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এবং শেষোক্তটি অস্থাবর এবং উহা উৎপাদন-সাপেক্ষ। এই উভয়েরই বাজার-দর আছে। মূলধনের বাজারও অন্যান্য বাজারের ন্যায় আমদানী ও চাহিদা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। কিন্তু জমির বাজার সম্বন্ধে এ বিষয় প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ উহার চাহিদা সর্ব্বদা সমান নহে; অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমদানী নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং জমির মূল্য সর্ব্বদাই অনিশ্চিত এবং উহা জমির সংস্থান ও সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ীর পক্ষে বাজারের মধ্যে দোকান স্থাপন করাই সুবিধা জনক; নতুবা তাহার দোকান জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু কৃষকের পক্ষে ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

জমির মূল্য একপ্রকার সম্পদ এবং ইহা এমন কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন একখণ্ড জমির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু মূলধনের বাজারের অবস্থা অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরূপ। ধান্যের মূল্যের ন্যায় মূলধনের মূল্যও সঠিক এবং উহা সহজে নির্দ্ধারণ করা যায়। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহার মূল্যও আমদানী এবং চাহিদার নিয়মের বিষয়ীভূত।

ধান্য বিক্রয়ের মূল্য পাকাপাকিরূপে স্থির করিবার সময়, যাহাতে কিছু লাভ থাকে, কারবারে এইরূপ ভাবেই বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ঐ মূল্য টাকাতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। মনে কর, দশ সের ধান্য ক্রয় করিয়া ১৲ টাকা দিলাম। ইহাতে ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্রেতার কারবার সিদ্ধ হইল। মূলধন বিষয়েও মূল্য এইরূপ টাকাতেই নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু এইপ্রকার কারবারের ধর্ম্ম এই যে, দাবীমাত্রই পাওনা চুকাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় না। আবশ্যক অনুযায়ী নগদ টাকা হাতে থাকিলে, ধার করিবার প্রয়োজন হয় না; নতুবা সম্পদ ধার দেওয়ার সময়, ঋণ-গৃহীতা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সম্পদ রাখিবে, ততদিন মাসিক বা বাৎসরিক হারে ঋণ-দাতাকে কতক টাকা দিবে। এইপ্রকার টাকার অঙ্ক সাধারণতঃ বাৎসরিক শতকরা হিসাবে ধরা হয়। বাৎসরিক শতকরা ১০৲ টাকার অর্থ এই যে—ঋণ-গৃহীতা ঋণ-দাতাকে প্রত্যেক একশত টাকার মূল্য বাবদ প্রতিবৎসর দশ টাকা দিবে। ইহাকেই চলিত কথায় সুদ বলে। এই সুদ মূল ঋণের টাকা হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ কেবল সুদ দিলেই মূল ঋণের টাকা দেওয়া হইবে না। দেনা-পাওনার কারবার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মূলধনও একপ্রকার সম্পদ, এবং ইহার মূল্য আমদানী ও চাহিদার অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনীয়। মূলধনের বাজার বড় বড় সহরে আছে—এবং এইগুলিকেই ব্যাঙ্ক (Bank) বলা যায়। অল্প সুদে টাকা গচ্ছিত রাখা এবং এই গচ্ছিত সম্পদকে মূলধনরূপে ঋণপ্রার্থীগণের নিকট উচ্চহারের সুদে ধার দেওয়াই ঐ সকল ব্যাঙ্কের কার্য্য। কতকগুলি ঋণদাতার সমবায়ে এই সকল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ইহারা গচ্ছিত সম্পদ ঋণগ্রহণেচ্ছুগণের নিকট ধার দেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে; এবং ইহার জন্য এক ব্যাঙ্কের সহিত অপর ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতার ফলে কোন ব্যাঙ্ক ঋণগৃহীতা-গণের নিকট হইতে কি হারে সুদ গ্রহণ করিবে তাহা ধার্য্য হয়। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় এই সুদের হারও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই উৎপাদনকারী আপন সাহায্যের জন্য অন্য লোক লইতে চেষ্টা করে। মজুরী দিতে স্বীকৃত হইলে মজুর পাওয়া যায়, কিন্তু মজুর বিষয়েও আমদানী এবং চাহিদা একে অন্যের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মজুরের অবস্থা এবং বাজারের অবস্থা একই প্রকার এবং মজুরও এক প্রকার সামগ্রী (Commodity)। তবে অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ইহার বিভিন্নতা এই যে, ইহার নিজের একটা ইচ্ছা আছে। মজুরের মজুরী কিম্বা বেতনের অঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি উহার আমদানী এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে। (ক্রমশঃ)

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীনরেন্দ্রমোহন রায় এম-এ

(১)

চীন ও ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দুইটী প্রাচীন সুসভ্য দেশ। উভয় দেশেই বহিঃপ্রভাবশূন্য দুইটী স্বতন্ত্র সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। কর্ম্ম-প্রবণ চীনজাতি বহু সহস্র বৎসর আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আজ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন সভ্যতার জের টানিয়া জগতের ইতিহাসে উদাহরণস্বরূপ ও

চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু ভাবপ্রবণ আর্য্যবংশধরগণ নিজেদের চিন্তার ধারায় এবং ভাবের বন্যায় নিজেরা অভিভূত হইয়া এবং জগতের বহু অধিবাসীকে অভিভূত করিয়া আজ বহু শতাব্দী যাবৎ রিক্ত হইয়া বসিয়া আছে। জাতীয় জীবনের উন্নতি-সাধন-পথে ভাবতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র এই উভয়েরই প্রয়োজন। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভাব ও অধ্যাত্ম সম্পদের অভাবে দুর্বিপ্লবে চীনের জাতীয় জীবন যখন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিখ্যাত কনফুশিয়স্ তাঁহার নৈতিক মতবাদের প্রচার দ্বারা চীনে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। কিন্তু কনফুসীয় নৈতিক মতবাদের দ্বারা চীনের আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ হইল না। তখন ভারতের অপূর্ব্ব সম্পদ্ শাক্যমুনির সাধনার ফল বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হইয়া চীনের জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করিল। এইভাবে চীন নববলে বলীয়ান হইয়া আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আজ পর্য্যন্ত একপ্রকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ। ভারতের ভাব ও চিন্তার ধারায় বস্তুতন্ত্রের সম্পর্ক খুব অল্পই ছিল। ভারত কর্ম্মযোগের আলোচনা ও আদর করিয়াছে সত্য,—কিন্তু তাহা গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহাতে বস্তুতন্ত্রের নামগন্ধ নাই। কৌটিল্যনীতি ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব বড় বেশী বিস্তৃত হয় নাই। চীনের জাতীয় জীবনের এক প্রধান অভাব যেমন ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছিল সেইরূপ ভারতের গৌরবময় যুগের অবসানে তাহার জাতীয় জীবনের অভাব পূর্ণ হয় নাই, তাই ভারতের আধুনিক ইতিহাস এত কালিমা-লিপ্ত।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীন ও ভারতের সংস্রব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ছিল কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না বটে, কিন্তু উভয় দেশ যে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা চীনপট্টের আমদানীর কথা জানিতে পারি। ঐতিহাসিক বুশেল অনুমান করেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মদেশ ও আসামের পথে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য চলিত এবং এই পথেই ভারতবর্ষের সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ চীনে প্রবেশ করিয়া চীনের 'তাও' মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। (১)

চীন ও ভারতবর্ষের সংস্রবের দীর্ঘ ইতিহাসে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না বলিলেই চলে। কেবলমাত্র মধ্য এশিয়ায় এই মৈত্রীভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের সময় অথবা তাহার কিছুকাল পরে ভারতবাসী প্রথমতঃ খোটানপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ও বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ চীনের সীমান্তে অবস্থিত লপনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইরূপে সমগ্র মধ্য এসিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বদ্ধমূল হয়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সার অওরেল ষ্টাইন প্রভৃত অধ্যবসায়ের দ্বারা ভারতীয় কীর্ত্তির যে বিরাট ধ্বংসাবশেষ মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব একপ্রকার অক্ষুণ্ণ ছিল। মধ্য এশিয়ায় প্রভুত্ব লইয়া চীনের সহিত ভারতের সংঘর্ষ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সংঘর্ষের ইতিহাস একপ্রকার অজ্ঞাত বলিলেই চলে। ছি-যু-চি গ্রন্থে উল্লিখিত একটী প্রবাদে আমরা চীন ও ভারতীয় বৌদ্ধ উপনিবেশিকগণের বিবাদের কিছু আভাস পাই। তার পর, মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য লইয়া ভারতীয় কুষাণ ও চীনসাম্রাজ্যের মধ্যে যে বিরাট যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যেই আছে; এ প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসানের পর অন্য কোন ভারতীয় শক্তি মধ্য এশিয়ায় অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় যে সকল ভারতবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং মধ্য এশিয়ার যে সকল জাতি ভারতীয় ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, রীতিনীতি, এক কথায় ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে চীনসাম্রাজ্যের সঙ্গে বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মধ্য-এশিয়া চীন ও ভারতের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইয়াছিল, তেমনি উভয়ের মিলনের পথেও প্রধান সহায়ক হইয়াছিল। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কৃতিত্ব অনেকাংশে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ অধিবাসিগণের প্রাপ্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই কোনও না কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস আছে। এক সময়ে বহু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের ধারণা ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে চীনদেশে প্রকৃতপক্ষে কোনও ধর্ম্মমত ছিল না। আজকাল অবশ্য এইরূপ ধারণা কেহ পোষণ করেন না। কনফ্যুশিয়সের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থসকল পাঠ করিলে সেই প্রাচীন যুগেও চীনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুশাসনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রচলিত ধর্ম্ম আজকাল কনফ্যুসীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইলেও কনফ্যুশিয়স প্রচারিত নীতির মধ্যে ধর্ম্মের নামগন্ধ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সক্রেটিসের মতবাদকে যেমন গ্রীসের ধর্ম্ম বলা যায় না, তেমন কনফ্যুশিয়সের মতবাদকেও চীনের ধর্ম্ম বলা চলে না। কনফ্যুশিয়াস পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন; অন্য কোন উচ্চতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোন শিক্ষা দেন নাই। তিনি বলিতেন, "জীবন সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান আমাদের নাই, মৃত্যুর পরপারের কথা আমরা কেমন করিয়া জানিব?" দেশের তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ তিনি ধর্ম্মশিক্ষার দিকে মন না দিয়া দেশের নৈতিক উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক সামন্ত রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার নীতির প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই চীনে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রচলিত ধর্ম্ম কনফ্যুসীয় নীতিবাদের দ্বারা সংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল।

এই ধর্ম্ম পরে চীনদেশে "জু-কিয়াও" বা জ্ঞানীর ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল এই ধর্ম্ম কনফ্যুসীয় ধর্ম্ম নামেই পরিচিত বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই প্রচলিত নামই ব্যবহার করিব।

(১) Bushell—Chinese Art, P. 22

কনফ্যুশীয়গণ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যত্নবান থাকিত। পিতৃপুরুষের পূজা ও তর্পণ তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল; সম্রাট তাহাদের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। কনফ্যুশীয়স্ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দী পুর্ব্বে লাউ-কিউন নামে এক ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লাউ-কিউনএর প্রচারিত ধর্ম্ম চীনে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্ম "তাও কিয়াও" বা বিচারব দীর ধর্ম্ম বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। "জু-কিয়াও" সাধারণতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং "তাও-কিয়াও" জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 'তাও'গণ জড়বাদী ছিল। তাহারা বলিত, শারীরিক নিয়ম পালনের দ্বারা আত্মা অমরত্ব লাভ করে। তাহারা স্বাস্থ্য আয়ু যুদ্ধ রোগ প্রভৃতির নিয়ন্তারূপে বহু দেবতার পূজা করিত। কোন উচ্চ চিন্তার বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বড় একটা ধার ধারিত না। ঐহিক সুখসম্পদের জন্য তাহারা কামনা করিত; তাহা পূর্ণ হইলেই প্রায় সন্তুষ্ট থাকিত। বিখ্যাত যোগী, চিকিৎসক, ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতির মৃত্যু হইলে তাওগণ তাহাদের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত। তাও অথবা কনফ্যুশীয় মতবাদের কোনটার দ্বারাই চীনের আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ হয় নাই। জড়বাদী কুসংস্কারাপন্ন তাও-মতবাদের নীচ আদর্শ যেমন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হেয় মনে হইত, তেমনি কনফ্যুশীয়গণের শুষ্ক নৈতিক আদর্শ জনসাধারণের নিকট এবং ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নীরস এবং অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হইত। এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া চীনের অভাবমোচন করিয়াছিল।

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম কোন্ সময়ে এবং কিভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। চীনভাষার কোন প্রাচীন পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, ২১৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ১৮ জন বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক চীনে আসিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, স্বয়ং সম্রাট অশোক এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই গৌরবময় যুগে এইরূপ কোন অভিযানের চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার অসম্ভব মনে হয় না। যাহা হউক, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে যে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কথিত আছে, পুর্ব্বদেশীয় হানবংশের দ্বিতীয় সম্রাট মিং-টি স্বপ্নে বুদ্ধদেবের তেজঃপুঞ্জ এক বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন (৫২ খৃঃ অঃ)। মিং-টি উয়েচি রাজ্যে এবং মধ্য এশিয়ার স্থানে স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খোটন দেশ হইতে কাশ্যপ মঙ্গে (শি-ম-টেং) এবং গোভরণ (কু-ফ-লন) নামক দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক এবং বহু ধর্ম্মপুস্তক সঙ্গে করিয়া দূতগণ একাদশ বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক মধ্যভারতের লোক ছিলেন এবং তিব্বতের উত্তরে অবস্থিত উয়েচিরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সম্রাট কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া রাজধানী লয়াং নগরে অবস্থান করেন এবং কয়েকখানা ধর্ম্মপুস্তক চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহাদের অনুদিত একখানি মাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি কতকগুলি নীতি-উপদেশের সমষ্টি। উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের জটিল তর্কবিতর্ক ছিল না, কেবলমাত্র যে-সব সত্য সকল ধর্ম্মের লোক নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে তাহাই ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনজাতি খুব রক্ষণশীল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ যদি প্রথম হইতেই আধুনিক খৃষ্টান মিশনরীগণের মত অন্য ধর্ম্মের অসারত্ব প্রমাণ এবং নিজধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের আশা মঙ্গে ও গোভরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইত। সে যাহা হউক, প্রাচীন গ্রন্থ সকল হইতে জানা যায় মঙ্গে ও গোভরণ পণ্ডিত এবং মনস্বী হইলেও নিজেদের পাণ্ডিত্য সর্ব্বদাই গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। চীনে আসিবার অল্পকাল পরেই তাঁহারা লয়াং নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রায় ৭০ বৎসর পরে অন্-শিকাও নামে পুর্ব্বপারস্যবাসী এক ধর্ম্মপ্রচারক চীনদেশে আসেন। তিনি লয়াং নগরে বাস করিয়া ১৭৬খানা পুস্তক অনুবাদ করেন। অন শি-কাও চীনদেশে অবলোকিতেশ্বর ও অমিতাভ বুদ্ধের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা চীনবাসীকে ততটা লুব্ধ করিতে পারে নাই; কিন্তু অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্গরাজ্যে সপরিবারে বাসের আকাঙ্ক্ষায় অনেকেই প্রলুব্ধ হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে "কুয়াঙ্গিন পুস" নামে স্ত্রী-দেবতার মূর্ত্তিতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুয়াঙ্গিন করুণার প্রতিমূর্ত্তি; ম্যাডোনা, যিশুমাতা মেরী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা যায়। আজ পর্য্যন্ত চীনে বৌদ্ধদেবতাগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সকল মন্দিরেই তাঁহার মূর্ত্তি আছে। চীনে একটী প্রচলিত কথার অর্থ, "সকল স্থানেই বুদ্ধ আছেন, সকল গৃহেই কুয়াঙ্গিন আছেন।"

২২৬ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতবাসী বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে আসিয়া দুই শতেরও অধিক পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরক্ষ নামক অন্য একজন ভিক্ষু ২৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লয়াং নগরে বাস করিয়া ১৬৫খানা পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুদিত উল্লম্বন সূত্রে মৃত পিতৃপুরুষের পূজা ও তর্পণের ব্যবস্থা থাকায় এই পুস্তকখানির প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

৩৩৫ খৃষ্টাব্দে চাউ রাজ্যের রাজা তাঁহার অধিকারে চীনবাসীদের বৌদ্ধ-সংঘে যোগদান করিবার বাধা রহিত করেন। এই সময় বৌদ্ধসিংহ নামক একজন ভারতীয় ভিক্ষু চাউরাজ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। তাঁহার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের এই সুবিধা হইয়াছিল। পরে ক্রমশঃ চীনসাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও এই বাধা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট ইয়াও-হিং বৌদ্ধ-মত গ্রহণ করেন। সংঘের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটী প্রবেশ করিয়াছিল, ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের অনুবাদের মধ্যেও যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি লক্ষিত হইয়াছিল। সম্রাট মধ্য এশিয়ার খরাকর হইতে কুমারজীব নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে একরকম বন্দী হইয়াই কুমারজীব চীনে আসিলেন। কুমারজীবের নেতৃত্বে প্রায় ৮০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু লইয়া এক ধর্ম্মসভা বসে। সম্রাট স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ধর্ম্মসভার বিচার ও গবেষণার ফলে বৌদ্ধসংঘের সংস্কার ও ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের ভুলভ্রান্তি সংশোধিত হয়। কুমার বিখ্যাত অশ্বঘোষ ও

নাগার্জ্জুনের গ্রন্থসকলের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে "ব্রহ্মজাল সূত্র" নামক পুস্তকখানা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই গ্রন্থের অনুশাসনের দ্বারাই সমগ্র চীন, জাপান এবং কোরিয়া দেশের বৌদ্ধসংঘগুলি পরিচালিত হইয়াছে। De Groot নামক জনৈক পণ্ডিত এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেন, "It is the most important of the Sacred Books of the East, and the principal instrument of the great Buddhist art of salvation." কুমারজীব হরিবর্ম্ম রচিত "সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র" নামক একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকও চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মার নাম ও তাঁহার রচিত পুস্তক আজ ভারত হইতে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সুদূর চীনদেশে আজও তাহা সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এইরূপ আরও কত পণ্ডিত ব্যক্তির নাম ও রচনা আমরা কালের মহিমায় বিস্মৃত হইয়াছি তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক কুমারজীব আরও অনেক পুস্তক অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

কুমারজীব যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘের সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা হিয়েন ভারতবর্ষে তীর্থভ্রমণ ও ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ করিতেছিলেন। ফা হিয়েন ভারতে প্রথম চীন পরিব্রাজক। তিনি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ফা হিয়েনএর পর সহস্রাধিক বৎসর পর্য্যন্ত অসংখ্য চীন পরিব্রাজক জলপথে ও স্থলপথে পবিত্রভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া নিজেদের ও দেশবাসীর জ্ঞানপিপাসা মিটাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত হিউয়েন সাং ও ই-সিংএর নাম প্রায় সকলেরই জ্ঞাত। চীন পরিব্রাজকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী ও সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে অধিক বলা সম্ভব নয়।

কাঁদরা

মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত এই গ্রাম বীরভূম জেলার আমদপুর হইতে উদ্ধারণপুর যাইবার পথের উপর—আমদপুর হইতে পূর্ব্বমুখে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। আমদপুর—কাটোয়া শাখা রেলপথের ষ্টেশন রামজীবনপুর—কাঁদরারই অপর নাম। কাঁদরা এখন বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অধীন। এই গ্রাম পূর্ব্বে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল—সন ১২৭২ সালের ৩২এ আষাঢ় বর্দ্ধমানের এলাকায় গিয়াছে।

কাঁদরা গ্রাম কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি, কবি চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের জন্মভূমি, সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া মনোহর দাস ও মঙ্গলঠাকুরের নিবাসভূমি। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রাম একদিন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে—

'রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
যথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়'।

এই দুই ছত্র কবিতা লইয়া অনেকে অনেক রকম গবেষণা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন মঙ্গল জ্ঞানদাসের অপর নাম। কেহ বলিয়াছেন মঙ্গল বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম। কেহ বলিয়াছেন জ্ঞানদাস দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন; তাই লোকে তাঁহাকে মদনমঙ্গল বলিত। আবার কেহ কেহ ভুবন মঙ্গল হরিনাম প্রচারের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু মঙ্গল ও জ্ঞানদাস দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি।

মঙ্গল ঠাকুরের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কীরিট কোণায়। কুল-পরিচয়ে ইনি কীরিট কোণার পালধী নামে পরিচিত। শৈশবে পিতৃমাতৃ-হীন অনাথ বালক বিবাগী হইয়া নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁদরার পশ্চিমে রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন।

রাঢ়ীপুরীর কথা কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ে আছে। কৃষ্ণমিশ্র খৃঃ ১১শ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। কে জানে রাঢ়ীপুরের সঙ্গে রাঢ়াপুরীর কোনো সম্বন্ধ আছে কি না? অজয়ের দক্ষিণে রাঢ়েশ্বর শিব আছেন, রাঢ়া নামে গ্রামও আছে। কাঁদরার ঐ ডাঙ্গাকেও লোকে রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গাই বলে। কাঁদরা নামটী খুব পুরানো নয়; নদীর কাঁদা বা বিলের কাঁদা হইতে কাঁদার বা কাঁদরা হইতে পারে। পূর্ব্বে অজয় নদ বা তাহার কোনো শাখা নানুরের পাশ দিয়া বহতা ছিল,—হয়তো কাঁদরার পাশেও ছিল। নদীর ভাঙ্গনে রাঢ়ীপুরী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লোকে এদিকে সরিয়া আসে; নদীর ধারে সেখানে নূতন গ্রামের পত্তন হয়, গ্রামের নাম হয় (এদিকের জলের কাঁদা বা কান্দার তখন মজিয়া ভরাট হইয়া যাওয়ায়) কাঁদরা।

মঙ্গলঠাকুর আসিয়া রাঢ়ীপুরে বাস করিলেন, সঙ্গে কুলদেবতা নৃসিংহদেব শালগ্রাম। শালগ্রামের ভোগের জন্য একবার ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়; দিন-রাতের অবশিষ্ট সময় নৃসিংহদেবের সেবা-পূজায় ও নিজের জপতপেই কাটিয়া যায়। কিছু দিন গেল,—ক্রমে তাঁহার সাধনার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। কথা শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অযাচিত ভাবে রাঢ়ীপুরে আসিয়া মঙ্গলঠাকুরকে দীক্ষাদান ও স্বপূজিত শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল বিগ্রহের সেবার ভারার্পণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করিলেন। তিনি শারদীয়া কল্পারম্ভের দিনে আসিয়া দীক্ষা দেন এবং পরবর্ত্তী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া যথাবশ্যক উপদেশাদি দিয়া প্রস্থান করেন। আজিও এই ঘটনার স্মরণার্থ কাঁদরায় ঐ কয়দিন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাকে সাঁজি উৎসব বলে। নানা স্থান হইতে কীর্ত্তনীয়াগণ আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন।

গদাধর পণ্ডিতের অনুমতি লইয়া মঙ্গলঠাকুর মাত্র তিনজন লোককে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ১ম কাঁকড়া হুসমপুরের একজন চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, ২য় নিকটবর্ত্তী রাজুড় গ্রামের নৃসিংহবল্লভ মিত্র, গুরুর কৃপালাভ করিয়া ইনি পরে মিত্র ঠাকুর নামে অভিহিত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর নৃসিংহবল্লভ অজয়-তীরবর্ত্তী ময়নাডাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ (ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ) বর্ত্তমান আছেন। ৩য় ময়নাডালনিবাসী একজন অধিকারী ব্রাহ্মণ। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মঙ্গলঠাকুর ইঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মঙ্গলঠাকুর বৈষ্ণব গ্রন্থে কখনো মঙ্গল, কখনো বা মঙ্গল বৈষ্ণব নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

কাঁদরার ঠাকুরগণ বলেন, গোপীরমণের বংশে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুলুকের পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর

ঠাকুর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত কয়েকটী পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে শশিশেখরের বন্দনার পদ ১টী। পদের নীচে লেখা আছে—

"সঙ্গিত গুরু শ্রীগোবিন্দানন্দ নন্দন শ্রীশশিশেখর ঠাকুর প্রভু শ্রীপাঠ কাঁন্দরা"। বন্দনার পদটী এইরূপ—

শ্রীশশিশেখর জয় জয়।
চন্দ্রশেখর অনুজ জয় পরম করুণাময় ॥
রসময় সঙ্গিত মনোহর সুরচন অনুপাম ভাব নিদান।
সুকবি সুগায়ক কোকিল সুস্বর মধুর বিনোদ তালমান ॥
কতেক জতনে মঝু শিক্ষা সমাধিলা হাম অধম বোধ হিন।
কহ বিশ্বম্ভর প্রণতি পুরঃসর চরণে শরণাগত দিন ॥

এতদিন অনেকের ধারণা ছিল শশি ও চন্দ্র একজন পদকর্ত্তা। আবার কেহ কেহ বলিতেন, কবি রায়শেখরেরই নাম ছিল শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। কিন্তু এখন মুলুকের পদে কাঁদরার প্রবাদ সমর্থিত হওয়ায়, মনে হইতেছে, এই তিনজন শেখর পৃথক ব্যক্তি। রায়শেখর উপাধি নহে—নাম। ইঁহার নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে। যদুনাথ দাসের সংগ্রহতোষণ হইতে জানা যাইতেছে, ইনি মহাপ্রভুর সমকালে বা তাঁহার অনতিপরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার সাধন-সঙ্গিনীর নাম ছিল দুর্গাদাসী। কবি রায়শেখর একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইঁহার 'দণ্ডাত্মিকাপদাবলী' বৈষ্ণবগণের সাধনের অন্যতম অবলম্বন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবা বর্ণনা এই পদগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য। ইঁহার পদে 'রায় শেখর,' 'কবি শেখর,' 'নৃপ কবি শেখর' এবং কেবল 'শেখর' ভণিতাও পাওয়া যায়। কবিত্ব, শব্দসম্পদ এবং ছন্দবৈচিত্র্যে ইনি প্রায় বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের সম-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য ইঁহার শেখর ও কবিশেখর ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে।

কাঁদরা জ্ঞানদাসের জন্মভূমি। জ্ঞানদাসকে লইয়াই কাঁদরার সর্ব্বপ্রধান গৌরব। জ্ঞানদাসের নামেই কাঁদরার সমধিক পরিচয়। কবির আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে তিনি যে খেতুরীর মহোৎসবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, কবি জ্ঞানদাস খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৫৩১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোনো পৌষ পূর্ণিমায় তাঁহার তিরোভাব ঘটিয়াছিল। কাঁদরায় প্রতি পৌষ-পূর্ণিমায় কবির তিরোভাব স্মরণে আজও (পূর্ণিমা হইতে তিন দিনব্যাপী) উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

কবি জ্ঞানদাসের সময়—খৃঃ ১৬শ সাল,—বাঙ্গালার সে এক অতুলনীয় গৌরবের কাল। কিন্তু এই সময়ের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বাঙ্গালীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—নদীয়ার গৌরাঙ্গচাঁদ অস্তমিত হইয়াছেন ; প্রিয়-সাথী নিতাইচাঁদও তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। যে সত্যসংকল্প আচার্য্যের কল্পনা-লোকে এই দুই চন্দ্রের উদয় সম্ভব হইয়াছিল, সেই শান্তিপুর-দয়িত অদ্বৈতও তিরোহিত হইয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালা এক অসহনীয় শোকে আকুল! কিন্তু জাতি যখন জাগ্রত হয়, মানুষ তখন অলসের মত বসিয়া বসিয়া শুধু চোখের জল ফেলিয়াই শোক প্রকাশ করে না। শ্রেয় লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, অভাবের বিপুল বেদনায়, মহীয়ানের জন্য ক্রন্দন জাতিকেও নিঃশ্রেয়স্ দান করে, মহৎ করিয়া তুলে। তাহার চোখের জলে অন্তর তখন অনাময় হইয়া উঠে। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের তিরোধানেও বাঙ্গলায় জাতি-গঠন-কার্য্য ব্যাহত হয় নাই। ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস ও প্রভু শ্যামানন্দ পূর্ণ-উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বাঙ্গালী যেন গোরা-প্রেমের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র দেশ যেন এক নব ভাবের বন্যায় টলমল করিতেছিল। সে দিন মলয়ান্দোলিত বনভূমির কুসুমশ্রীর মত এক বিরাট প্রাণের অনু-প্রাণনায় উদ্বুদ্ধ যে অগণিত প্রেমিক ভক্ত কবি দলে দলে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালার মাটীকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন,—কবি জ্ঞানদাস তাঁহাদিগের অন্যতম। বলিতে গেলে, চৈতন্য-পূর্ব্ব-যুগে যেমন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, তাঁহার সমকালে যেমন তরুণীরমণ ও রায়শেখর, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে তেমনি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

প্রায় প্রত্যেক পদকর্ত্তার পদাবলীর মধ্যে এমন দুই একটী পদ পাওয়া যায়, যাহা বাস্তবিকই সুন্দর, মধুর এবং উপভোগ্য। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, এমন পদকর্ত্তার সংখ্যা খুবই কম। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াও জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ-দাসের পর বলরাম ও ঘনশ্যাম এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বংশীবদন ও অনন্ত, রামানন্দ ও জগন্নাথ, গোপালদাস ও রায় বসন্ত প্রভৃতি পদকর্ত্তা-গণের নাম জ্ঞান গোবিন্দের পরে উল্লেখ করিতে হয়। অপরাপর কবিগণের মধ্যে অনুবাদে যদুনন্দন ও শব্দচিত্রে জগদানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য হইলেও, এই সমস্ত পদকর্ত্তাকে এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত কোনো শ্রেণীর মধ্যে আনিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। পরবর্ত্তী কালে শশি-শেখর, চন্দ্রশেখর, মোহন, উদ্ধব, নটবর, মাধব, প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণও যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার-ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। বাসুঘোষ হইতে নরহরি চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত তাঁহারই ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। আবার লোচনদাস সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইয়াও পদ-রচনায় এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে আর একজন স্বতন্ত্র রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ঠাকুর নরোত্তম। তাঁহার প্রার্থনার পদের তুলনা হয় না। এইরূপ বিশিষ্ট পদকর্ত্তাগণের মধ্যে কবি জ্ঞানদাসের নাম সগৌরবে উল্লিখিত হইতে পারে। পদ রচনায় তিনি চণ্ডীদাসের সুযোগ্য শিষ্য, কিন্তু তাঁহার রচনায় মৌলিকতারও অভাব নাই।

জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বরাগ, সখী-শিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড, মুরলী-শিক্ষা, গোষ্ঠ-বিহার, মান, মাথুর, ষোড়শ গোপালের রূপ বর্ণন, প্রেমদূতিকা প্রভৃতির পদ পদাবলী-সাহিত্যের অলঙ্কার। স্থানাভাব না ঘটিলে আমরা কবির প্রত্যেক বিষয়ের এক-একটী পদ তুলিয়া দেখাইতাম—তাঁহার রচনা কত মনোহারী, কেমন চমৎকার, কিরূপ রস-মধুর।

জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' প্রভৃতি পদ বহু-বিখ্যাত। আক্ষেপানুরাগের পদগুলি- চণ্ডীদাসের মত শোনায়।

মুরলী-শিক্ষার গানে জ্ঞানদাসের তুলনা হয় না। অন্যান্য পদকর্ত্তাগণের মত জ্ঞানদাসের পদেও ভেল ঢুকিয়াছে। জ্ঞানদাসের পদ যেমন অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি অন্যের পদও জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তথাপি জ্ঞানদাসের খাঁটী পদ চিনিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আমরা বাহুল্য ভয়ে জ্ঞানদাসের "পদাবলী নির্ব্বাচন" আলোচনায় বিরত রহিলাম।

প্রায় সকলেরই ধারণা—জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন। কিন্তু কাঁদরায় প্রবাদ আছে, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার দুইটী পুত্র হইয়াছিল। জ্ঞানদাস জাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। দেবী একচক্রায় আসিবার সময় একবার কাঁদরায় আসিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র প্রভুও কয়েকবার কাঁদরায় আসিয়াছিলেন। শেষবার যখন তিনি আগমন করেন, সে সময় কিছুদিন কাঁদরায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন বীরচন্দ্র প্রভু জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় জ্ঞানদাসের পুত্র দুইটী নানারূপে তাঁহার ধ্যানের বিঘ্ন উৎপাদন করে। প্রবাদ আছে, এই পাপে পুত্র দুইটীর অকালে মৃত্যু হয়।

মুস্কিল আসান

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

কলিকাতায় দাঙ্গার হাঙ্গামা তখন কমিয়াছে। কমিলেও গায়ের ছম্‌ছমানি ভাব তখনো কাটে নাই। সন্ধ্যার পর মুসলমান-পাড়ার পথ এখনো কেহ মাড়াইতে চায় না! নির্জ্জন পথে দৈবাৎ কোনো দফ্‌তরী কিম্বা কোচম্যান-সহিস দেখিলেও চমক লাগে! গেঁড়াতলা, না, সুন্দরবন!

আমাদের মেশ্‌ হ্যারিসন রোডে। সন্ধ্যার পর মেশের ঘরে দাঙ্গার গল্প চলিয়াছে—এমন সময় কোথা হইতে আনন্দ আসিয়া হাজির। তার মুখে-চোখে উদ্বেগের ভাব। কহিলাম,—ব্যাপার কি হে? এ সময় এখানে?

বুঝি, কোনো গুণ্ডায় তাড়া করিয়াছে! না হইলে আনন্দ থাকে দর্জ্জীপাড়ায়, হঠাৎ···

আনন্দ কহিল,—তোমার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে ··

গোপনীয় কথা! কহিলাম,—এসো আমার ঘরে।·· কোনো গুণ্ডায় তাড়া করেনি তো···? শরীরে শিহরণ জাগিল; আবার কহিলাম,—দেখো।

আনন্দ কহিল,—না।

আমার ঘরে আসিয়া কহিলাম,—চায়ের ফরমাশ করবো?

আনন্দ কহিল,—কর। মোদ্দা চায়ের জন্য খুব উৎসুক নই। তবে যখন বলচো···ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম,—কেটলিতে দু' পেয়ালার মত জল গরম করে আন্‌। ভৃত্য চলিয়া গেল।

আনন্দকে কহিলাম,—কি কথা হে?

আনন্দ পকেট হইতে একখানা খামে-মোড়া চিঠি বাহির করিয়া কহিল,—এইটে আগে পড়, তারপর সব বলচি ··

খাম হইতে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম—

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

মহেশমুণ্ডা
সোমবার

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সহস্র উপদেশ দিয়া তোমায় কলিকাতায় পাঠাইয়াছি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য। পাশ করিয়া চাকুরিও তোমায় করিতে হইবে না, ইহা তুমি জানো। তোমায় কলিকাতায় পাঠাইতে আমার বিস্তর আপত্তি ছিল; তার কারণ, কলিকাতায় উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা নাই। পান-ভোজন, আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠার একান্ত অভাব এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই হিন্দু-সমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। তুমি জানো আমাদের বংশে আজ পর্য্যন্ত বরফ বা বিলাতী জল চলে নাই। তুমি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ যে তুমি ঐ সকল অনার্য্য পান-ভোজন হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিয়া এ বংশের নাম রক্ষা করিবে। সেবার হারাধনের মুখে এ সংবাদও পাইয়াছিলাম, যে, তুমি মস্তকের শিখা ছেদন করিয়াছ! তোমায় তখনই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,—এরূপ অনাচার ঘটিলে

তোমার অচিরে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। তুমিও বলিয়াছিলে, এরূপ অনাচার আর ঘটিতে দিবে না। এখন এ পত্রে যে সমস্ত কথা জানাইয়াছ, তাহাতে তোমার মূঢ়তাই শুধু প্রকাশ পায় নাই। আমার পুত্র হইয়া এরূপ কল্পনাকে মনে স্থান দেওয়াকে আমি পিতৃদ্রোহিতা নামে অভিহিত করি। আমার সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন সমাজ, সনাতন আচার-ব্যবহার হইতে একতিল ভ্রষ্ট হইলে আমার সঙ্গেও সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে, জানিয়ো।

কোন্ রায় সাহেবের কন্যা দাঙ্গার সময় তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন,—এজন্য বহুপ্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। তাই বলিয়া তাঁকে বিবাহ—এত বড় বাতুলতার পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা তোমার কি করিয়া হইল, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি! তুমি লিখিয়াছ, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নন, হিন্দু; ব্রাহ্মণ। তবে মেয়েটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী—অর্থাৎ স্বাধীন জেনানা! স্ত্রীলোকে চাকুরি করে! তা তাঁরা যাই হৌন্, তাঁদের আচার-ব্যবহার কখনই আমাদের সনাতন আদর্শানুযায়ী নয়। যখন তাঁদের সঙ্গে পানভোজন চলিতে পারে না, তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা! ও সব আকাশ-কুসুম রচনার আশা ত্যাগ কর এবং এ বৎসর পরিশ্রম করিয়া শেষ পরীক্ষায় পাশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আইস। রায় সাহেবদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিবে না।

ইহার পরেও যদি শুনি, তাঁহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছ, তাহা হইলে তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করিব। আমার বিষয়ের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং মাসহারাও বন্ধ করিব। তাহা হইলে স্বোপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়ো। বড় হইয়াছ, লেখাপড়া শিখিয়াছ, বুদ্ধিও জন্মিয়াছে; অতএব বুঝিয়া কার্য্য করিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী

চিঠিখানি পড়িয়া আনন্দর পানে চাহিলাম। আনন্দ হতাশভাবে আমার পানেই চাহিয়া ছিল, কহিল,—পড়লে?

আমি কহিলাম,—ব্যাপার কি? লভ?

আনন্দ কহিল,—তাই। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কহিলাম,—কৈ, এর বিন্দুবিসর্গও তো জানিনা—শুনিনি কিছু!

আনন্দ কহিল,—কোত্থেকে শুনবে! এই দাঙ্গার মরশুমেই এর যা কিছু ঘটেচে।

আমি কহিলাম,—বাঃ!...স্তব্ধভাবে আনন্দর পানে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দ কহিল,—সমস্ত কথা তোমায় বলচি।...তোমার মাথায় বুদ্ধি খেলে,...শুনে উপায় নির্দ্ধারণ করো, ভাই। আমি তো নিরুপায়! মোদ্দা যামিনীকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।...আবার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যামিনীকে গ্রহণ,—তার মানে, দারুণ দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তার মধ্যে তাকে এনে পিষে মারা!—সে'ও ঠিক হবে না।

আমি কহিলাম,—শুধু লভ্ নয়! Love with every good sense তাহলে!...বেশ, এখন সব বুঝিয়ে বল দিকিন্...দাঙ্গার সময় কি বিপদে পড়লে, আর এঁরা তা থেকে তোমায় উদ্ধারই বা করলেন কি রকম করে! কিছুই তো জানি না...

আনন্দ কহিল,—কি করে জানবে! তারপর থেকে আমিও তো তোমাদের সঙ্গে দেখা করিনি।...অর্থাৎ আমি সেদিন বীডন্-রো ধরে উত্তর-মুখো চলেছিলুম—বেলা তখন তিনটে কি চারটে...ঐখানে এক মসজিদ আছে। তার সামনে কি একটা গোলযোগ চলছিল—মধ্যস্থতা করতে গেছলুম.. হঠাৎ দুটো ষণ্ডা মুসলমান গুণ্ডা আমায় তাড়া করে। একজনের হাতে ছিল ছোরা...আমি দৌড়ে পালাই,—তারা পাছু নেয়...কোথায় যে আশ্রয় নেবো, তার ঠিক ছিল না। কেননা, ওপাড়ায় সকলের বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ—দু'একটা পানের দোকান, খাবারের দোকান, তারা হাঁ-হাঁ করে দোকান বন্ধ করে ফেললে, ঢুকতে দিলে না! ছুটতে ছুটতে আমি এসে একটা দোতলা বাড়ীর দরজা খোলা পেয়ে তারি মধ্যে ঢুকে পড়লুম...সেটা এক গার্ল-স্কুল...মেয়েরা স্কুলে নেই। বোধ হয় ছুটি হয়ে গেছে। আমি ঢুকে পড়ে একেবারে তার অফিস-কামরায়...এক বেটা গুণ্ডাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। চৌকাঠে হোঁচোট্ খেয়ে আমি তো পড়ে গেলুম। তখন হঠাৎ এই যামিনী রায় সেই গুণ্ডার সামনে এসে দাঁড়ালেন—আর দাঁড়িয়ে সে কি heroic ভঙ্গীতে তাকে আদেশ করলেন—যাও! গুণ্ডা সুড়সুড় করে চলে গেল। আমায় তিনি আশ্রয় দিলেন।

আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালুম তার পর আলাপও ক্রমে নিবিড় হলো। এই যামিনী রায় হলেন সেই গার্ল স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেশ্—বি-এ অবধি পড়েচেন—

আমি কহিলাম,—অবিবাহিতা?

আনন্দ কহিল,—হাঁ। তাঁর মা আছেন, আর কেউ নেই। স্কুলের দোতলায় এক কামরায় মা ও মেয়ে থাকেন···তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে খুব—ব্রাহ্মণ ·· এবং এই ঘনিষ্ঠতা থেকে বুঝচি যে যামিনী দেবীকে পেলেই আমার জীবন সার্থক হবে। নাহলে···

আনন্দর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া আমি কহিলাম,—শূন্য, বিরাট শূন্য···কিন্তু তাঁর কথাও বিচার করতে হবে তো। তিনি বালিকা নন্, তায় বি-এ অবধি পড়েচেন···

আনন্দ কহিল,—তাঁরো খুব ইচ্ছা···অর্থাৎ এ বিবাহে তাঁদের আগ্রহও আমার আগ্রহের চেয়ে এক তিল কম নয়।

আমি কহিলাম,—কিন্তু হেড্ মিষ্ট্রেশ···অর্থাৎ তাঁর antecedents? মানে, আমাদের সমাজে মেয়েদের চাকরি করা যখন চলে না...

আনন্দ কহিল,—কেন চলবে না? কারো বাড়ী রাঁধুনিগিরি করা চলতে পারে, আর লেখাপড়া শিখে কারো গলগ্রহ হয়ে না থেকে ভদ্রভাবে পয়সা রোজগার করা দোষের! আনন্দ চটিয়া উঠিল; কহিল,—এঁদের বংশও বেশ সম্ভ্রান্ত জেনো। যামিনী দেবীর বাবা ছিলেন এক মার্চেণ্ট অফিসের একাউন্‌টাণ্ট—হিন্দু, ব্রাহ্ম নন,—তবে খুব নব্য প্রকৃতির। অবরোধপ্রথা মোটে মানতেন না; স্ত্রীকে নিয়ে মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন, সস্ত্রীক ট্রামে চড়তেন, এবং মেয়েটিকে বেথুনে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি থার্ড-ইয়ারে পড়বার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। সঞ্চয় কিছু ছিল না, কাজেই আত্মীয়-কুটুম্বের ঘৃণায় দেওয়া অন্ন ভিক্ষা না করে মেয়ে যামিনী দেবী ঐ ভগবতী গার্ল স্কুলে চাকরি নেন্। মাসে পঁচাশি টাকা মাহিনা পান, তাছাড়া ফ্রী কোয়ার্টার্স আর বিনা-বেতনে একজন দাসী। রূপে-গুণে যামিনী দেবীর তুলনা নেই। তাঁকে যে পত্নীত্বে বরণ করবে, সে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

আমি কহিলাম,—ব্যাপার তো বুঝলুম···এ যে বেশ একটি ছোটখাট উপন্যাসের প্লট···এ অবধি বেশ! তবে উপসংহারটুকুকে মিলনান্তক করে তোলবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না···

আনন্দ কহিল,—কেন?

আমি কহিলাম,—তোমার বাবার এই পত্র লগুড়ের মত সে উদ্যত মিলনের মাঝে থেকে বিঘ্নের সৃষ্টি করচে।

আনন্দ কহিল,—তাই তো তোমার কাছে এসেচি,—তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে···তার উপর তুমি গল্প লেখো···ধর, এটা একটা উপন্যাসেরই প্লট, বাস্তব ঘটনা নয়,—একে মিলনান্তক করবে কি-ভাবে, ভেবে ঠিক কর... তাহলেই···

হাসিয়া আমি কহিলাম,—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে গল্পর বাপেরা রক্ত-মাংসের জীব নন্, কলমের ইঙ্গিতে তাঁদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ফেরানো যায়! আর এখানে···? অর্থাৎ তুমি প্রেমে পড়ে বেকুবি করেচো···তোমার বাবার মত অমন সেকেলে মতের মানুষ আর বিশেষ আচার-নিষ্ঠার দিকে তাঁর এত বেশী টান যে ছেলের সুখ-দুঃখ সে আচার-নিষ্ঠার কাছে কিছু নয় ভাবেন যখন······

আনন্দ হতাশভাবে কহিল—বাবার ধারণা, আমাদের দেশটা সেই পলাশীর যুদ্ধের সময় যেভাবে চলছিল, সেইভাবেই তার চিরদিন চলা উচিত।

তাই-ই। আমি তো জানি, আনন্দর পিতা মথুরামোহন বাবু কতখানি সনাতন-পন্থী। পাবনা অঞ্চলে তাঁর মস্ত জমিদারী; স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে এই পাঁচ-সাত বৎসর তিনি জগদীশপুরের কাছে মহেশমুণ্ডায় বাড়ী তৈয়ার করিয়া সেইখানে বাস করিতেছেন। পূজা-পার্ব্বণ-উপলক্ষে ক্বচিৎ কখনো দেশে যান। দেশে স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, মহেশ-মুণ্ডার জলে কি নাকি সব উপকরণ আছে,···সে জল পান করিলে শরীর ভালো থাকে। কলিকাতা তাঁর মতে নরকের তুল্য। এখানে অনাচার, পাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। বিলাতী আবহাওয়ার স্পর্শ পাছে গায়ে লাগে, এই আশঙ্কায় তিনি ট্রেণে থার্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করিয়া ভ্রমণ করেন,—এ্যালোপেথি ঔষধ প্রাণান্তে সেবন করেন না, তাহাতে মদ আছে! মাথায় দীর্ঘ শিখা রাখিয়া, পূজাহ্নিক করিয়া—এই সবের সাহায্যে কোনমতে এই ভ্রষ্টাচারের যুগে তিনি হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আনন্দ প্রথম যখন কলিকাতায় আসে, তখন তার মা বাঁচিয়া ছিলেন। বি এ পাশ করিলে

কি হইবে, আনন্দর মাথায় টিকি আছে এবং সে হাঁসের ডিম খায় না। বরফ ও লেমনেড যা খায়, তা খুব গোপনে। এই পিতার পুত্র হইয়া আনন্দ কি করিয়া প্রেমে পড়িবার দুরাশা মনে স্থান দিল, আশ্চর্য্য! তার চেয়ে আরো আশ্চর্য্য, এ সম্বন্ধে বাপকে সে পত্র লিখিল কি বলিয়া!…আচারের দাম যাঁর কাছে স্নেহ-মমতার চেয়েও ঢের বেশী, তাঁর পক্ষে আঁচার পালনের জন্য একমাত্র পুত্রকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়!…বিরক্ত হইলাম।

আনন্দ কহিল,—তুমি তো জানো, বাংলা মাসিক-পত্রের ছোট গল্প আমি কি ভয়ঙ্কর আগ্রহে পড়ি। এখনকার নব্য লেখকদের লেখায় যে রোমান্সের আবহাওয়া ছুটে চলে, তার পরশ পেয়ে আমি এ পৃথিবীর ধুলোমাটীর কথা ভুলে যাই! এই সব গল্পে তরুণ-তরুণীর মধ্যে মিলনের কি আগ্রহ, কি ব্যাকুলতা, অথচ বাধা-বন্ধও কেমন শিথিল! পড়ে আমার কেবলি মনে হয়, আমার ভাগ্যে এমন রোমান্স ঘটবে না…

চোখে একরাশ বিস্ময় ভরিয়া আনন্দর পানে চাহিলাম। আনন্দ কহিল,—যামিনী দেবীর সঙ্গে একদিন এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনিও বললেন, এই সব গল্প পড়ে জীবন-সংগ্রামের দুঃখ-নৈরাশ্য কোনমতে তিনি ভুলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরো এই রোমান্সের দিকে খুব অনুরাগ…

বাধা দিয়া আমি কহিলাম,—তোমার বাবার এ বিবাহে আপত্তির প্রধান কারণ…?

আনন্দ কহিল,—যে, যামিনী দেবী কলেজে পড়েচেন, এবং চাকরি করেন…

আমি কহিলাম—এ ছাড়া আর কোন কারণ থাকা সম্ভব? মানে, তিনি কি-রকম মেয়ে চান্ তোমার বিবাহের জন্য?

আনন্দ কহিল—এক অতি-সেকেলে ঘরের মেয়ে—লেখাপড়া জানবে না, তার বয়স হবে দশ বছর কি এগারো বছর! নেহাৎ পুঁচকে! সুদীর্ঘ ঘোমটায় সারাক্ষণ মুখ ঢেকে থাকবে, চন্দ্রসূর্য্য মুখ দেখতে না পায়,—এবং কলের মত দিবারাত্র কাজকর্ম্ম করে বেড়াবে…

আমি কহিলাম,—এঃ, একেবারে অচল! তাছাড়া এ রকম ঘর, আর এ রকম মেয়ে কি বাংলা দেশে এখন মিলবে?

আনন্দ কহিল,—বহুৎ মিলবে।…এই ভয়েই এম-এ পড়ার অছিলায় কলকাতায় পড়ে আছি—মহেশমুণ্ডার 'সিনারি' খাসা, তবু সেদিকে যাই না…

আমি কহিলাম,—বহুৎ আচ্ছা!

বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম,—কল্পনার সাহায্যে বাস্তবকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক—অর্থাৎ এই যে সব গল্প লেখা হয়, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো খান্টা খাপ খায় কি না।

আনন্দ কহিল,—খাপ কেন খাবে না! বাস্তব থেকেই তো কল্পনা, আবার কল্পনা থেকেই বাস্তব।

আমি কহিলাম,—A vicious circle….তা যাক্—

সন্ধানে জানিলাম, মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহেশ-মুণ্ডাতেই বাস করিতেছেন। মহেশমুণ্ডায় যাইতে হইলে পঞ্জাব মেলে মধুপুর, তারপর মধুপুর-গিরিডি লাইনে জগদীশ-পুরের পর মহেশমুণ্ডা। মথুরামোহন বাবুর সুকঠিন চরিত্র-দুর্গের কোনোখানে ঈষৎ ভঙ্গুরতা আছে কি না, তারো সন্ধান লইলাম। অতঃপর একটা অভিসন্ধি স্থির করিয়া একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র পুরিয়া ও একটা বিছানার মোট লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। বার্থ রিজার্ভ করা ছিল,—ট্রেনে কাজেই আরামের কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না।

রাত্রি একটায় মধুপুর। ডাউন মেল ও-দিককার প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ফুঁশিতেছিল। ষ্টেশনে আমাদের ট্রেণ থামিলে নামিয়া গিরিডি লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভোর পাঁচটায় এ ট্রেণ ছাড়িবে। চার ঘণ্টা ঘুম মন্দ হইবে না! কামরায় আমি একা। শুইতে ভালো লাগিল না। উঠিয়া বসিলাম। প্লাটফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া চারিধার দেখিতেছিলাম। সাইডিংয়ে রক্ষিত কালো কালো গাড়ীগুলা অন্ধকারকে আরো গাঢ় আরো ঘন করিয়া তুলিয়াছে,—মাঝে মাঝে লাল আর সবুজ আলোর রশ্মি! সেগুলা যেন কোন্ প্রাণীর চোখ জ্বলিতেছে! ষ্টেশনগুলা আমার ভারী ভালো লাগে, বিশেষ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ঐ লাল, সবুজ আলোর রশ্মিগুলা…ওগুলা যেন শূন্য মনে কল্পনার দুই-একটা ক্ষীণ দীপ্তি-রেখা!…ভাবিতেছিলাম,

এতদূর তো আসিলাম,—আর কয় ঘণ্টা পরেই মহেশমুণ্ডায় মথুরামোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে···ভালো কথা, আসিবার সময় ওল্ড ক্লাব হইতে চাণক্যর শিখা-সমেত কৃত্রিম পরচুলাটাও আনিয়াছিলাম, তাছাড়া একজোড়া তালতলার চটি আর একশুট গরদের ধুতি ও নামাবলী। গরদটা ওল্ড ক্লাবের সম্পত্তি, চটি জোড়া নিজস্ব। এগুলা ব্যাগের মধ্যেই সংরক্ষিত ছিল।

হঠাৎ প্লাটফর্ম্মে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক তরুণী···রূপে যেন জ্যোৎস্না ঝরিতেছে! তরুণী বাঙালী, ব্রাহ্ম ধরণে শাড়ী পরা, হাতে একটি ছোট ব্যাগ; পিছনে কুলির মাথায় ছোট একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক।

স্বপ্ন?···চোখ দুইটাকে রগড়াইয়া সাফ করিলাম। ঘুমের ঘোর ছিল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি, না, স্বপ্ন নয়! তরুণী কল্পনার অশরীরী মূর্ত্তিও নন্!···তিনি বাস্তব জীব। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহারি পানে চাহিয়া আছি··· তিনি আমায় প্রশ্ন করিলেন,—এইটেই গিরিডির ট্রেন?

আমি কহিলাম,—হাঁ।

তরুণী কহিলেন,—ভোর পাঁচটায় মধুপুর ছাড়বে?

আমি কহিলাম,—হাঁ।

তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন,—আমি সেই গতিচঞ্চলা বিদ্যুল্লতার পানে চাহিয়া রহিলাম, মুগ্ধ নয়নে···

তরুণী তখনি ফিরিলেন, কহিলেন,—একখানি মাত্র সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা দেখচি···তা, এই চার ঘণ্টা একলা থাকা···ভাবনা হয়েছিল! আপনি বুঝি গিরিডি যাচ্ছেন এই ট্রেণে?

বীণার তারে সাতটা সুর যেন অতি অবলীলায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! আমি কহিলাম,—না, গিরিডি যাবো না। আমি যাবো মহেশমুণ্ডা।

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—মহেশমুণ্ডা! আপনি তাহলে মথুরাবাবুর ওখানে যাচ্ছেন?···কলকাতা থেকে আসচেন কি?

আমি কহিলাম,—হাঁ···

চকিতে একটা কথা বিদ্যুতের মতই আমার মনে ফুটিল। কহিলাম,—আপনি কি···

তরুণী কহিলেন,—শ্রীমতী যামিনী রায়। আপনিই আনন্দ বাবুর···?

আমি কহিলাম,—বন্ধু। বলিয়া তরুণীকে সসম্ভ্রমে কামরায় আহ্বান করিলাম। তরুণী উঠিয়া বসিলে আমি কহিলাম,—কিন্তু আনন্দ তো এ কথা আমায় বলেনি যে আপনিও···

যামিনী দেবী কহিলেন,—হঠাৎ স্থির হলো···

আমি কহিলাম,—আপনি কি মহেশমুণ্ডায় মথুরাবাবুর ওখানেই গিয়ে উঠবেন?

যামিনী দেবী কহিলেন,—না। আমি গিরিডি যাচ্ছি,—আমার এক মাসতুতো ভাই সেখানে থাকেন। তাঁর বাসাও খালি আছে। সেখানে গিয়ে উঠবো। তারপর যেমন স্থির হয়···

কহিলাম,—বুঝেচি। ভালোই হলো...

যামিনী দেবী সামনের বেঞ্চে বসিলেন। কুলি লগেজ নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমি তাঁকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। যামিনী দেবী সুন্দরী···খুব সুন্দরী··· ইঁহার জন্য আনন্দ যে অতখানি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—তার রুচির তারিফ করিতে হয়! কিন্তু সে অতি গর্দ্দভ! এই রূপ! এ রূপের জন্য রাজ্য ও রাজার সিংহাসন ত্যাগ করা যায়, পাবনা অঞ্চলের জমিদারী তো অতি তুচ্ছ, ছার! এঁকে দেখিয়া, এঁর ভালোবাসা পাইয়া আনন্দ বাপের সম্পত্তির কথা ভুলিতে পারে নাই? রাস্কেল! ইনি পাশে থাকিলে সাহারা মরুভূমিতেও যে স্বর্গ রচনা করা যায়! আমি হইলে ···কিন্তু না, ছি...সে কথা মনে আনা উচিত নয়! বন্ধুর প্রণয়িনী···বান্ধবী! তবে, এ শুধু কল্পনার কথা···একটা তুলনা মাত্র!

আমি কহিলাম,—আপনি একাই আসচেন?

যামিনী দেবী কহিলেন,—হাঁ।

—আনন্দ?

যামিনী দেবী কহিলেন, আনন্দর এক মাসিমা আছেন; তাঁর স্বামী ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। হাকিম হইলে কি হয়, এদিকে যেমন তিনি খুব নিষ্ঠাবান হিন্দু, কোর্টে মুড়ি ও ডাবের জল খাইয়া টিফিন করেন, ওদিকে তাঁর স্ত্রী তেমনি বিদুষী, মনটি মমতায় ভরা, মাসিক পত্রে তাঁর দুই-চারিখানি উপন্যাসও ছাপা হইয়াছে—আর এই মাসিটির কথা মথুরামোহন বাবু বড় ঠেলিতে পারেন না! তাঁকে ধরিয়া যদি এ বিষয়ে কিছু বিহিত করিতে পারেন···

একটু দুষ্টামি করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলাম,—কোন্ বিষয়ে?

যামিনী দেবী মুখখানি নত করিলেন। লজ্জা? বি-এ পড়া তরুণীও তাহা হইলে বিবাহের নামে লজ্জা পান্! জ্ঞানলাভ হইল। ভবিষ্যতে কোনো গল্পে এ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিব। যামিনী দেবী সলজ্জভাবে কহিলেন,—বিবাহের···

আমি কহিলাম—ওঃ!···তা আপনি হঠাৎ এ যুদ্ধযাত্রায় বেরুলেন যে ··

মৃদু হাসিয়া যামিনী দেবী কহিলেন,—ঠিক তা নয়। তবে, ছদ্ম পরিচয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো···আমি বি-এ পড়েচি স্ত্রীলোক হয়ে, আর চাকরি করি—এইটেই মস্ত বাধা না?

গাড়ীর সামনে ফিরিওয়ালা হাঁকিল,—পুরী, মিঠাই! এত রাত্রেও মানুষ অনাহারে আছে না কি? আশ্চর্য্য নয়! ট্রেণে চড়িলে কাহারো ক্ষুধা বিষম বাড়িয়া ওঠে! আমার কিন্তু পিপাসা বোধ হইতেছিল। তাকে ডাকিয়া কহিলাম,—পানিপাঁড়েকে ডাকিয়া দিতে পারো বাপু···?

···জী! বলিয়া সে হাঁকিল—এ পানিপাঁড়ে ··

যামিনী দেবীকে প্রশ্ন করিলাম,—জল খাবেন? চা?··· কেলনার থেকে ভালো চা? মথুরা বাবুর বাড়ী যাচ্ছি বলে ষ্টেশনের হিন্দু চা ফরমাশ করবো না।

যামিনী দেবী কহিলেন—না। কিছুই চাই না।

পানিপাঁড়ে আসিল। তাকে বলিলাম, কিছু বরফ লইয়া আয়। সে বরফ আনিতে ছুটিল।

যামিনী দেবীকে প্রশ্ন করিলাম,—আপনি···মানে, অর্থাৎ এই প্রেম জিনিষটাকে বিশ্বাস করেন? মানে, উপন্যাসের প্রেম?

যামিনী দেবী আমার পানে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম,—তামাসা করচি না এটা মস্ত সমস্যা—তাই প্রশ্ন করচি। আনন্দ বিশ্বাস করে। আপনি···?

যামিনী দেবী কহিলেন—গল্প পড়ে একটা সংশয় জাগতো বটে, কিন্তু···তাঁর কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল।

কহিলাম,—বুঝেচি। এখন বিশ্বাস করেন!

যামিনী দেবী কহিলেন—আপনি করেন না?...কিন্তু আপনি তো গল্প লেখেন ··

কহিলাম,—তা লিখি। কল্পনায় অনেক জিনিষ আসে। তবে বাস্তবের সঙ্গে তার কতখানি মেলে, এইটে বরাবরই সমস্যা হয়ে কাঁটার মত মনে খচ্‌খচ্ করে। যদিও আমার লেখা গল্পের বহু তারিফ পেয়েচি;···অবশ্য, বন্ধুদের কাছে।

জল আসিল। বরফও সঙ্গে-সঙ্গে। ব্যাগ হইতে ছোট এলুমিনিয়মের গ্লাশ বাহির করিয়া গ্রহণ করিলাম। পানান্তে আরাম বোধ করিয়া যামিনী দেবীকে কহিলাম,—আপনি এই চার ঘণ্টা জেগে বসে থাকবেন? সে তো ঠিক হবে না। শুয়ে নিদ্রা দিন। চোরের ভয় করবেন না। আমি প্রহরীর মত জেগে বসে থাকবো'খন।

যামিনী দেবী কহিলেন,—সে কি হয়!

আমি কহিলাম,—কেন হবে না? মানে, ট্রেণে আমার ঘুম হয় না,—তাই হুইলারের বুকষ্টল থেকে, এই দেখুন না, একখানা ছ'পেনি ডিটেকটিভ্ নভেল কিনে এনেচি। এ বস্তুর সঙ্গে পরিচয় খুবই কম,—আর সে পরিচয় এই ট্রেণেই আমার ঘটে আসচে চিরকাল।···

বেলা ঠিক ছ'টায় ট্রেণ আসিয়া থামিল মহেশমুণ্ডা ষ্টেশনে। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া লাইন চলিয়াছে। বাঁ দিকে ছোট পাহাড়—সামনে গিরিডির উঁচু পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। যামিনী দেবীকে অভিবাদন করিয়া নামিয়া পড়িলাম। তাঁর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যাঁরা বলেন, পাশ করিলে নারীর মন কঠিন হয়, তাঁরা মূঢ়! বেচারা! তাঁরা তো যামিনী দেবীকে দেখেন নাই! তরুণী করুণাময়ী। মনে মনে আনন্দর ভাগ্যের প্রশংসা করিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন,—আমি শীগগিরই আসবো'খন। ভালো কথা, আমার ঠিকানা, রতন ভিলা, গিরিডি। সুবিধামত বেড়াতে আসবেন···

আমি কহিলাম,—আসবো।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ষ্টেশন-মাষ্টার বাঙালী। তাঁর কাছে সন্ধান লইয়া জানিলাম, ডান দিকে প্রায় আধ ক্রোশ পার হইলেই একটা মস্ত পুকুর দেখিব; সেই পুকুরের কাছেই প্রাসাদের তুল্য একটি মাত্র অট্টালিকা—সেই অট্টালিকায় মথুরাবাবু বাস করেন।

ষ্টেশন পার হইতেই অনিবিড় জঙ্গল। খানিকটা আসিয়া চারিদিকে তাকাইলাম, কেহ নাই। তখন ব্যাগ

খুলিয়া চাণক্যর শিখাসমেত পরচুলা বাহির করিয়া মাথায় আঁটিলাম। আয়না বাহির করিয়া দেখি, চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। নাকের পাশে দুই-একটা কালির রেখা টানিয়া প্রবীণ সাজিলাম। তারপর তালতলার চটি ও গরদ পরিয়া মথুরামোহন বাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

···মস্ত পুকুর—খুব উঁচু পাড়। পাড়ের পরেই প্রাসাদ। প্রাসাদ-সংলগ্ন মন্দির—চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। গৃহের ফটকে আসিয়া দেখি, ফটকের সামনে সাদা পাথরের গায়ে কালো হরফে লেখা, আশ্রম। বায়োস্কোপে স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীন প্রাসাদের বহু ছবি দেখিয়াছি। এ আশ্রমের পাশে সেগুলাকে অতি তুচ্ছ মনে হইল।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।···সামনে বাগান। অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। বেশীর ভাগই দেশী ফুল। বাগানের পর কয়টা সিঁড়ি। তার পরেই ফ্লোরের উপর মস্ত দোতলা বাড়ী। বাড়ীর বহির্ভাগটুকুর গড়ন মন্দিরের অনুরূপ। পিছনে ছোট পাহাড়ের 'ব্যাক-গ্রাউণ্ড'—তার কোলে এই মন্দিরের মত চূড়া-বিশিষ্ট গৃহ—যেন একখানি ছবি! সামনের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চে এক ভৃত্য পড়িয়া ঘুমাইতেছিল,—তাকে ডাকিয়া তুলিলাম। সে উঠিতে গৃহস্বামীর সন্ধান করিলাম। ভৃত্য কহিল, বাবু উঠিয়াছেন; তবে প্রাতঃকৃত্য, আহ্নিক, জপ প্রভৃতি সারিয়া বেলা আটটায় নীচে নামিবেন, তারপর বেড়াইতে যাইবেন; একটু বেড়াইয়া দশটায় গৃহে ফিরিবেন ইত্যাদি।

আটটা—তার মানে, এখনো প্রায় দুই ঘণ্টা! ভৃত্যকে কহিলাম, আমার স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দাও। ভৃত্য তখনি আদেশ-পালনে উদ্যত হইল।

এমন চমৎকার চাকর দেখা যায় না! বড়লোকের বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে কিছু পরিচয় যে নাই, এমন নয়! কোনো ফরমাশ করিলে তাদের তা গ্রাহ্য করানো কতখানি কঠিন—কিন্তু মথুরাবাবুর ভৃত্য···নাঃ, সনাতন আচার-পালনে সুবিধা আছে বিলক্ষণ!

কুয়ার ধারে স্নান সারিয়া আবার সেই মেক্‌-আপ্ সারিয়া লইলাম। তারপর সন্ধ্যাহ্নিক! ধপধপে সাদা উপবীত, মাথায় দীর্ঘ শিখা—এ অবস্থায় মথুরাবাবুর গৃহে সন্ধ্যাহ্নিক না করিলে যে বিপদে পড়িব! ভৃত্যটা কি ভাবিবে? মন্ত্র মনে নাই—কোশাকুশি নাড়িয়া যা-তা করিয়া খানিকটা সময় কাটাইয়া দিলাম। তারপর চা···ভৃত্যকে গরম জল আনিয়া দিতে বলিলাম। জলের পর সনাতন পাথর বাটীও আসিল; এবং কোনোমতে বিশুদ্ধ হিন্দু-মতে চা তৈয়ারী করিয়া পান করিলাম। ভৃত্যকেও ভাগ দিলাম। সে চা পান করিয়া মহা খুসী হইল—কহিল, এ কি, বাবু?

আমি কহিলাম,—প্রসাদী চরণামৃত!

ভৃত্য কহিল,—খাসা!

ভাবিলাম, সনাতন আশ্রমই বটে! ভৃত্যটা চায়ের স্বাদ জানেনা! এ যেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালীর কথা!

মথুরাবাবু যথাসময়ে নীচে নামিলে পরিচয় দিলাম,—অধ্যাপক বলিয়া। নাম শ্রীচাণক্য শাস্ত্রী। আরো বলিলাম, আমি সনাতন হিন্দু সমাজে আচারের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বহি লিখিতেছি এবং সেই বহির মধ্যে নিষ্ঠাবান বাঙালী হিন্দু মাত্রেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ধাক্কায় আমাদের সনাতন আচার-নিষ্ঠা কি ভীষণভাবে পিষ্ট ও দলিত হইতে চলিয়াছে—এই বলিয়া কথা শেষ করিলাম।

মথুরাবাবু মহা খুসী হইলেন, কহিলেন,—একটা কাজের মত কাজ করচেন।

আমি তখন ইংরাজী শিক্ষা হইতে সুরু করিয়া বুট্ জুতা পায়ে দেওয়া, বিলাতী ঔষধ সেবন ইত্যাদির অশেষবিধ অপকারিতার উল্লেখ করিলাম। মথুরাবাবু কহিলেন,—এই যে আমায় দেখুন না এমনি অম্বলের ব্যথা ধরে! আমার এই পাঁজরার নীচে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেদনা বোধ করি, প্রাণ সংশয় হয়—তার উপর অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা—এ সবের উৎপাতও খুব আছে। অনেকে বলেন, বিলাতী চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। আমার পুত্র আনন্দ অনেক অনুনয় করেচে, শুনিনি। আমি ঐ কবিরাজী ঔষধই ব্যবহার করি। রোগের উৎপাত কমে না, তবু আমি যাতনা সত্ত্বেও বিলাতী ঔষধ, বিলাতী ডাক্তারীর ব্যবস্থা পালন করি না! তুচ্ছ শরীরের জন্য কি শেষে আচার-ভ্রষ্ট হব!

আমি কহিলাম,—ঠিক তো। শরীরং জন্মজন্মনি। কিন্তু আচার তো তা নয়।···তা আপনার ব্যাধি কি ঐ?

মথুরাবাবু কহিলেন,—হাঁ। সেই জন্যই দেশ ছেড়ে এখানে থাকা। মহেশমুণ্ডার জল ভালো···সকলেই বলে,—তাই···

আমি কহিলাম,—আপনার উপকার হয়েচে?

মথুরাবাবু কহিলেন,—না হোক্, আচার তো অক্ষুণ্ণ রাখতে পারচি ‥

পরের দিন দুপুর বেলায় শ্রীমতী যামিনী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে তখন হিন্দু সমাজের আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার আলোচনা খুব জমিয়া উঠিয়াছে। যামিনী দেবীর মূর্ত্তি শুষ্ক, বেশভূষায় কোন পারিপাট্য নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিতভাবে কহিলেন, তিনি গিরিডিতে বাস করিতেছিলেন,—সেখানে তাঁর বাঙলায় ডাকাত পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র ভাই—সেই অবধি নিরুদ্দেশ। নিরাশ্রয় হইয়া কোথায় যাইবেন? তাই গিরিডিতেই পাঁচজনের কাছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় পাইয়া আশ্রয়ের জন্ম তিনি আসিয়াছেন। হিন্দুর মেয়ে আশ্রয়-প্রার্থিনী! নারী—বয়সটা অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল, কাজেই···অর্থাৎ যামিনী দেবী কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে!

আমি অত্যন্ত বিচলিত ভাব দেখাইয়া কহিলাম,—আহা! যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী‥রূপে বরাভয় আর আশা নিয়ে যেন আশ্রমে উদয় হলেন!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনোনিবেশ-সহকারে যামিনী দেবীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতেছিলেন,—শাড়ী বাঙালী মেয়ের মত সাধারণভাবে পরা হইলেও পায়ের নাগরা জুতা-জোড়ার পানেই তাঁর নজর! আমি বুঝিলাম, ঐখানটাতেই তাঁর বাধিতেছে! নহিলে এমন রূপ লইয়া যদি কেহ আশ্রয় মাগে,···

কহিলাম—পায়ে জুতা দেওয়া তো হিন্দুর প্রথা নয়, লক্ষ্মী···

যামিনী দেবী কহিলেন,—আমাদের বাড়ী এই প্রথা চলে আসচে। পশ্চিমেই বরাবর থাকি কি না। এটা রাজপুতানার সতী পদ্মিনী দেবীর আদর্শে। আপনারা রাণা অমরসিংহের গ্রন্থাগারে পদ্মিনী দেবীর যে ছবি আছে, তা দেখেননি?

আমি কহিলাম—ঠিক! দেখেচি বটে! রাজপুত আদর্শ ঠিকই!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্ময়ে নির্ব্বাক! আমি কহিলাম,—তা, ঠিক জায়গায় এসেচো লক্ষ্মী। চক্রবর্ত্তী মশায়ের মত নিষ্ঠাবান হিন্দু আমি তো বঙ্গদেশে দেখিনি···শরণাগতকে রক্ষা করার জন্ম রাজা শিবির মতই ইনি ..

যামিনী দেবী রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হইল। যামিনী দেবীর পায়ে জুতা ছিল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন মন্দিরে আরতির আয়োজন দেখিতে গিয়াছেন।

আমি কহিলাম—ওঁর জন্ম আপনি বার্লি তৈয়ার করুন। ওঁর কাল রাত্রে কলিক হয়েছিল···অম্বলের ব্যাধি। বার্লিতে উপকার হবে। বার্লি জানলে উনি অবশ্য খাবেন না—কারণ, বিলাতী টিনে প্যাক হয়ে আসে। আমার কাছে টিনও আছে। বার্লি আর তার সঙ্গে বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা··· আনন্দর কাছে ওঁর অসুখের কথা শুনেছিলুম...আপনি ওঁর কাছে কথা পাড়বেন,—কি কথা,—শিখিয়ে দেবো। ওঁর মনখানি আপনাকে দখল করতে হবে। এবং দখল করা শক্ত হবে না—বিশেষ যখন সেবার জন্ম নারী-হস্তের এখানে একান্ত অভাব।

যামিনী দেবী কহিলেন,—উনি আমায় বলেচেন নাগরা খুলে ফেলতে।

আমি কহিলাম,—ওঃ, তাই খালি পা!

যামিনী দেবী কহিলেন,—হাঁ।

পরামর্শ হইয়া গেল।

রাত্রে ঠাকুরের আরতির সময় যামিনী দেবী শুদ্ধাচারে মন্দিরে গিয়া শাঁখ বাজাইলেন,—আরতির পর বহুক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তারপর মথুরামোহনকে কহিলেন—কাল থেকে আমায় পূজার পুষ্পপাত্র সাজাবার ভার দিন্ বাবা!

বাবা! চক্রবর্ত্তী চক্ষু মুদিলেন। কার কথা বুঝি মনে পড়িতেছিল! পিতৃ-হৃদয়ের ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা!···

যামিনী দেবীর পানে চাহিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন—আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, কুমারী!

আমি কহিলাম,—শাস্ত্রে ষোড়শী কুমারীকেই পূজা-য়োজনের যোগ্য অধিকারিণী বলেচে! কথাটা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পানে চাহিলাম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুসী হইলেন, কহিলেন,—বেশ।

মন্দির হইতে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কক্ষে বসিয়া

ছিলাম। যামিনী দেবী গীতা পড়িতেছিলেন। বহিখানি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন—নিশ্চয়, এ আনন্দর পরামর্শ! সুকণ্ঠে গীতার সংস্কৃত শ্লোক—আমার মত পাষণ্ডও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। শ্লোকের শক্তিতে, কি, পাঠিকার স্বরের মাধুর্য্যে, ঠিক বলিতে পারি না।

তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হঠাৎ শুইয়া পড়িলেন। যামিনী দেবী বহি বন্ধ করিয়া কহিলেন—আপনার শরীর অসুস্থ দেখচি···

অমোঘ বাণ! চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—সেই বেদনাটা···

যামিনী দেবীর পানে চাহিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন, —যেন হাজার ছুঁচ ফুটচে—না?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—ঠিক তাই।

যামিনী দেবী কহিলেন—আমি জানি। আমার বাবারও ঐ অসুখ ছিল। অনেক চিকিৎসা হয়, সারেনি। শেষে হরিদ্বার থেকে এক সন্ন্যাসী আসেন···উদ্দেশে যামিনী দেবী কাহাকে প্রণাম করিলেন! তারপর কহিলেন—তিনি এক ঔষধ দেন, সাদা গুঁড়ো, ময়দার মত। লছমনঝোলায় কি একরকম বদরী ফল আছে তার আঁটি, আর সেই গাছের ছাল চূর্ণ করে তৈরী। সেই চূর্ণ টা জলে ভালো রকম সিদ্ধ করে তাতে মিছরীর গুঁড়ো আর লেবুর রস দিয়ে রোজ রাত্রে খাওয়া—মাসখানেক খেয়ে তিনি আরাম হন···তারপর বরাবর ঐ ঔষধ তিনি খেতেন। কখনো আর এ রোগ হয় নি!···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—সে সন্ন্যাসীকে কোথায়ই বা পাওয়া যাবে, মা?

যামিনী দেবী কহিলেন—সন্ন্যাসীকে না পাই, চূর্ণ পাওয়া যাবে।

চক্রবর্ত্তী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যামিনী দেবী কহিলেন—সে চূর্ণ আমার কাছে আছে। বলেন তো ··

আমি কহিলাম—নিশ্চয়! এর আর বলাবলি কি! আপনি তাহলে তৈরী করে দিন, লক্ষ্মী···হিন্দু ঔষধ তো? অনাচারের কিছু নাই তো···?

যামিনী দেবী কহিলেন,—না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—বেশ, দাও মা···আমায় বাবা বলেচো, মেয়ের কাজ কর···

যামিনী দেবী উঠিয়া গেলেন; এবং ঘণ্টাখানেক পরে পাথর বাটীতে তরল পানীয় আনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিলেন, পানের জন্য।

ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলাম,—কি? সেই বার্লি আর সোডা?

চোখ টিপিয়া যামিনী দেবী জানাইলেন, হাঁ।

বার্লি পান করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটা উদ্গার তুলিলেন; একটু আরাম পাইয়া কহিলেন—আঃ!

আমি কহিলাম,—ভাগ্যে আপনার কাছে এ চূর্ণ ছিল!

পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখি, যামিনী দেবী একটা সাজি হাতে লইয়া বাগানের গাছে ফুল তুলিতেছেন। আমি কহিলাম,—বাঃ!

তারপর···চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্ধ্যাহ্নিক সারা হইলে যামিনী দেবী পাথরের গ্লাসে মিছরীর সরবৎ ও রেকাবি-সাজানো ফল সাম্‌নে ধরিয়া দিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এই সেবাটুকু · না পাইলে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রাণ একেবারে তাতিয়া ওঠে! আর পাইলে···কৃপণ বুড়াও বোধ হয় উইল লিখিয়া বিষয় দান করিয়া যাইতে পারে!

আমাদের তূণ হইতে এটি দ্বিতীয় তীর—চক্রবর্ত্তীর হৃদয়ে বেশ বিঁধিয়া বসিল! দু'রাত্রি বার্লি ও সোডা সেবন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সত্যই আরাম পাইলেন। পাইবার কথাও। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাই বলে! কলিকটা অম্বলের। সোডা ও বার্লি তার অমোঘ ঔষধ—এ কথা আমি জানিতাম। দুই-একটা এমন কেশ ভাগ্যে দেখিয়াছিলাম! এখন আনন্দর অদৃষ্ট!

সেদিন ঠাকুরের পূজায় এমন একটা কি ছিল, যা দেখিয়া আমার মত নাস্তিকও অভিভূত হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তো কথাই নাই! তিনি কহিলেন,—আজ আমার শ্যাম-সুন্দর যেন হাসচেন···কি গভীর তৃপ্তি ওঁর মুখে!

বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর। ফুলের গন্ধে মন্দির ভরপুর। শ্যামসুন্দরের কণ্ঠে প্রকাণ্ড সুন্দর পুষ্পমাল্য—শ্রীরাধার কণ্ঠেও গন্ধমাল্য। আমি কহিলাম,—লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পূজার পুষ্পপাত্র সাজিয়েচেন···

দুপুরবেলায় আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আবার আলোচনা চলিয়াছিল। আমি কহিলাম,—স্ত্রীলোকের পায়ে নাগরা থাকলে হিন্দুত্ব কি চিড় খায়? না। যেহেতু নাগরা সনাতন

কালের; হিল-উঁচু জুতায় হিন্দুত্বের পা পিছলানো বরং সম্ভব; কিন্তু যে নাগরা সতীকুলরাণী পদ্মিনী দেবী পায়ে দিতেন··· তবে দেশাচার···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—ঐ দেশাচার! নাহলে আমার মা-লক্ষ্মীকে পুত্রবধূ করতাম! কুমারী···তবে কিশোরী···

আমি কহিলাম,—তাতে শাস্ত্রে বাধে না। শাস্ত্র বলেচেন,—

ভাগ্যহীনে গৃহে যত্র শ্বশ্রূমাতা ন রাজতি
তৎগৃহে শোভতে লক্ষ্মী চার্ব্বাঙ্গী তরুণী বধূ।

অর্থাৎ, যে গৃহে শাশুড়ী নাই, সে গৃহে চার্ব্বাঙ্গী, কি না, সুন্দরী তরুণী বধূ লক্ষ্মীশ্রীতে শোভা পান্। তবে...? তাছাড়া শাস্ত্রীয় নজীর—দ্রৌপদী, দময়ন্তী···স্বয়ং সাবিত্রী দেবীও তরুণী কুমারী ছিলেন এবং একটু বেশী বয়সেই তাঁদের বিবাহ হয়! বাল্যবিবাহ মুসলমান আমলের; সুতরাং ম্লেচ্ছ প্রথা।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—বটে! তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস···সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—সমস্যা!

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিতরূপেই বিরাট আশার সূচনা জাগাইতেছিল। কিন্তু এক বিভ্রাট ঘটিল।

সন্ধ্যার পর আরতি সারা হইলে আমি বাগানে ঘুরিতেছিলাম। পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদের জ্যোৎস্না জলে-স্থলে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল। মন্দিরের পিছনে একরাশ হাস্নাহানা ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক মশগুল করিয়া তুলিয়াছে। গাছগুলার পাশে একটা পাথরে বাঁধানো বেদী···বেদীর উপর গিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এই জ্যোৎস্নার রূপালি পর্দ্দা ভেদ করিয়া একটা গল্পের প্লট যদি সংগ্রহ করিতে পারি···হঠাৎ অদূরে বাড়ীর শুভ্র মহিমা চোখে পড়িয়া গেল। যামিনী দেবীর কথা মনে হইল। আনন্দকে গর্দ্দভ বলিয়াছিলাম। কিন্তু না, তার বুদ্ধি আছে! বিবেচনারও সীমা নাই! যামিনী দেবীকে যদি গৃহলক্ষ্মী করার ভাগ্য কারো হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে এ গৃহটিকেও প্রয়োজন—নহিলে জীবনকে ঠিক উপভোগ করা চলে না! এ গৃহে লক্ষ্মীর আসনে বসিবে কোথাকার কে অনঙ্গমঞ্জরী ·· ধেৎ! এই···

চারিদিকের দৃশ্যে এমন আকুলতা···বাতাসেও কি চঞ্চলতা! রবিবাবু কি কোনো কালে এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে এ বেদীতে বসিয়া কবির চোখে চারিদিকে চাহিয়াছিলেন···? নহিলে এ গান লিখিলেন কি করিয়া···

এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির রসরাশি···?

বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, মত্ত হাওয়া যেন আমার কানের কাছে কেবলি হাঁকিতেছিল,—চলো, চলো···

আমার মাথায় পরচুলার শিখাটাকে আকাশ-বাতাস ঠিক চিনিয়াছিল, আরো চিনিয়াছিল আমার যৌবনকে··· বুকের মধ্য দিয়া চব্বিশ বৎসরের যে যৌবন উছল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে!

উঠিয়া অগ্রসর হইলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাগানে ফুলের রাশি জড়ো করিয়া ফুটাইয়াছেন! চারিদিককার সবুজ শোভা আর এই ফুলের গন্ধ···এ কি আচার-নিষ্ঠার কঠিন পাথরে কেহ রুখিয়া রাখিতে পারে!

সামনেই আতার কুঞ্জ! তার পাশে ও কি? কণ্ঠ-কাকলী! পাখীর? না ··তাই তো, এ যে যামিনী দেবী!···আর পাশে··· রাস্কেল আনন্দ! কোথায় ডায়মণ্ড হারবার, আর কোথায় এই মহেশমুণ্ডা! সূক্ষ্ম শরীর ..? না। এ যে স্থূল শরীরেই আনন্দ বিরাজ করিতেছে!···হাতে হাত, কণ্ঠস্বরে আবেশ, চোখের দৃষ্টিতে আকুলতা···আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল।··· যদি চিত্রকর হইতাম, একটা ছবি আঁকিতাম! যামিনী দেবীর মুখে-চোখে যে লজ্জা আর হর্ষের বিচিত্র মিকশ্চার—ছবিতে তা আঁকিবার মত!···

আনন্দ বলিতেছিল—ডায়মণ্ড হারবার যাবো বলে বেরিয়েছিলুম...আমার ট্যাক্সি রাজাবাজারের মোড়ে এলে দেখি, একটা মস্ত ভিড় জমেচে। ট্যাক্সির ড্রাইভারটা ভয় পেয়ে এগুতে চাইলে না। তাকে বললুম, চল্ তবে হাওড়া ষ্টেশন। এলো · সেখান থেকে গিরিডি গেছলুম, গিরিডি থেকে এখানে···

একটা শব্দ! মালীর গরুর একটা বাছুর হইয়াছে—গো-মাতার অতি-চঞ্চল শিশু ··এই রাত্রেও বুঝি, তার চাঞ্চল্যের সীমা নাই! জ্যোৎস্না দেখিয়া বেচারী গো-বৎসও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! পরক্ষণেই দেখি, না, যে শুভ্র কেশ-

গুচ্ছকে গোবৎসের পুচ্ছ ভাবিতেছিলাম, সে তো পুচ্ছ নয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিখা! সর্ব্বনাশ! শিখাসমেত চক্রবর্ত্তী মহাশয় দৃশ্যমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রণয়িযুগল তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—এ উত্তম! রাত্রে এক তরুণীর সঙ্গে নির্জ্জন বনে এই বিশ্রম্ভালাপ…

আমার পায়ে হোঁচট লাগিল। বোধ হয়, পথ না দেখিয়া নুড়ির উপর পা দিয়াছিলাম!…চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে হঠাৎ নাটকের ভাষা শুনিয়া আমার বাহ্যজ্ঞান মুহূর্ত্তের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল!…

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন—এর কি জবাব আছে?

আনন্দ! বেকুব আনাড়ি আনন্দ…একেবারে আমাদের জমাট উপন্যাস ফাঁসাইয়া বাপের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,—বাবা, এঁর কথাই লিখেছিলুম আপনাকে। ইনিই সেই রায় সাহেবের কন্যা, শ্রীমতী যামিনী দেবী…

এত বয়সে বুড়ার চোখেও আগুন জ্বলে! এ কিসের আগুন? আচার-নিষ্ঠার! তাই। হায়রে, এই আগুনেই তরুণ প্রাণ দগ্ধ হয়…রাজ্যের স্নেহ মায়া মমতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যামিনী দেবীর পানে চাহিলেন, কহিলেন,—তোমার গিরিডির কথা তাহলে মিথ্যা…? এ সব ষড়যন্ত্র! পরামর্শ করে আমায় ভোলাতে এসেচো…!

শুভ্র-বসনা যামিনী দেবী! চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়াছে…নির্ব্বাক নত মুখে দাঁড়াইয়া…আমার মনে হইল,—ধন্য শিল্পী! অপূর্ব্ব তার শক্তি! কি দিয়া যে সে এই শ্বেত-পাথরের প্রতিমাখানিকে গড়িয়াছে!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—আমার এত যত্নের শ্যামসুন্দর ..তার পর চুপ করিলেন। শ্যামসুন্দরের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন…কিন্তু কি কথা? পুষ্পমাল্যে আজ তাঁর কি শ্রীই ফুটিয়াছে,—তাই? না, শ্যামসুন্দরের জাতি-পাতের আশঙ্কা?…

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আমার সামনে থেকে চলে যাও, আনন্দ! যেখানে খুশী…ছলনার প্রশ্রয় দেওয়া পাপ। আর তুমি…চক্রবর্ত্তী যামিনী দেবীর পানে চাহিলেন। চাহিবা-মাত্র তাঁর চোখের দৃষ্টিতে সে আগুনের তেজ যেন মিলাইয়া আসিল! তিনি কহিলেন—তোমায় মা বলেচি…আমার বুকে স্নেহও ফুটিয়ে তুলেছিলে অনেকখানি…অনেকখানি মায়া…শ্যামসুন্দরকে ছাপিয়ে সে মায়া গাঢ় হয়ে উঠেছিল!… পাপ? বোধ হয়, তাই…যাক্—তুমি নারী, তায় কুমারী—আশ্রয় দিচ্ছি! গৃহেই থাকো, যতদিন খুশী…তবে শ্যাম-সুন্দরের পূজার পুষ্পপাত্রে কাল আর হাত দিয়ো না।

নাঃ...মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি! আমার মাথা দপ্ দপ্ করিতেছিল। বেকুব আনন্দ! কত করিয়া প্লটটাকে গড়িয়া কমেডির পুষ্প-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলাম, আর এমন অলক্ষিতে আমায় লুকাইয়া…হাড় অবধি জ্বলিয়া উঠিল! বেকুব, বেকুব, বেকুব! এখন এর কর্ম্মফল ভোগ করো!…

রাত্রে আবার আচার-নিষ্ঠার কথা উঠিল। ফন্দী-ফিকির খুব দূষণীয়…তবে মানুষের মনে সে একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র…চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কিন্তু এ উচ্ছ্বাস প্রাণের শিকড়কে গ্রাস করে যে…

নাঃ, উপায় নাই! · ···

সে রাত্রে হরিদ্বারের বদরীচূর্ণের তরল পানীয় আনিয়া কেহ চক্রবর্ত্তীর মুখে ধরিল না! পানীয় প্রস্তুত ছিল…যামিনী দেবী সেজন্য অধীরও হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি একান্তে পরামর্শ দিয়াছিলাম,—না, থাক্!

সেজন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বোধ হয় কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। হঠাৎ তিনি কহিলেন,—রায় সাহেব কথাটার কি অর্থ হতে পারে?…

আমি কহিলাম,—সাহেব কথাটা বিলাত থেকে আসেনি …মুসলমান যখন ভারতে আসে, তখন সাহেবকে তারাই সঙ্গে আনে। এবং সাহেব ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নয়—শব্দের টঙ্কার মাত্র!

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—কিন্তু শব্দই ব্যোম!..

তাঁর কথা লুফিয়া লইয়া আমি কহিলাম—আর ব্যোম কি? না, মায়া…শূন্য…অর্থাৎ চক্রবর্ত্তীও যেন এই শূন্যটাকেই খুঁজিতেছিলেন! সাহেব শূন্যে মিশাইলে রায়কে লইয়া কোনো কথা উঠিল না!—ভাবিলাম, এটা সুরাহা…সঙ্গে সঙ্গে রাগ ধরিল আনন্দর উপর! লক্ষীছাড়াটা যদি ডায়মণ্ড-হারবারেই থাকিত, তাহা হইলে ঐ চাঁদের জ্যোৎস্নায়

বেদীর উপরই গড়াইয়া আজ রাত্রি কাটাইতাম!···

বেইমান! ··মন বলিল,—না। এ প্রণয়ের অসহ্য আকুলতা··· অদর্শনে প্রাণ তার ব্যাকুল হইয়াছিল···সাহিত্যে এর রাশি রাশি নজীরও আছে!···

সে রাত্রির মত আলোচনা চাপা রহিল। প্রত্যূষে চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন,—ভালো ঘুম হয়নি কাল রাত্রে...সেই বেদনাটা···

আমি কহিলাম—শ্যামসুন্দরের পূজার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তো?

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ঠিক! মাধব ভৃত্যের ডাক পড়িল। সে আসিলে আদেশ হইল,—মাকে ডেকে আন্ ··

যামিনী দেবী আসিলেন। তাঁর দুই চোখ ফুলিয়া তার দিব্য শ্রীটুকুকে ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছে বিলক্ষণ, তবু সে চোখ···ফুলের গন্ধ কি কালো পর্দ্দায় ঢাকা পড়ে!···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কাল তোমার সেই বদরীচূর্ণ দাওনি তো মা!—শরীর কেমন বেজুৎ বোধ হচ্ছে ··সেই বেদনাটা···

যামিনী দেবী কহিলেন,—আপনার পাছে কোনো অপমান হয়, এই ভয়ে ··

আমি কহিলাম—বদরী-চূর্ণে মান-অপমান তো নাই, লক্ষ্মী! তবে আজ সকালে শ্যামসুন্দরের পূজার পুষ্প সংগ্রহ করতে যাওনি যে!

যামিনী দেবী চক্রবর্ত্তীর পানে একবার চাহিলেন, বাষ্পার্দ্র-স্বরে কহিলেন,—বাবার নিষেধ ··

নিষেধ! আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! কহিলাম,—কাল আরতির সময় অমন প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখেছি বিগ্রহের মুখে···ঠিক! সেই জন্যই শ্যামসুন্দর কুপিত হয়েছেন! এ তো উচিত হয়নি চক্রবর্ত্তী মশায়···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পানে চাহিলেন, চোখে খুব অপ্রতিভ দৃষ্টি! তার পর যামিনী দেবীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—যাও মা, সে নিষেধ প্রত্যাহার করলাম···পূজার পুষ্পপাত্র সাজাও গে···

যামিনী দেবী চলিয়া যাইতেছিলেন—চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাকিলেন,—মা···

যামিনী দেবী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আর সেই বদরীচূর্ণ টা···

আমি কহিলাম,—শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা! ··

যামিনী দেবী চলিয়া গেলেন।···

আমি কহিলাম,—যে কথা কাল রাত্রে হচ্ছিল···আচার-নিষ্ঠা!—এটা হলো বসন-ভূষণ···ভিতরের মানুষের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক অল্পই। শ্যামসুন্দরের অঙ্গে যে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়েচেন, তা খুলে নিন্—তাতে কি শ্যামসুন্দরের মর্য্যাদা কমবে?...

চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতেছিলেন, কহিলেন,—না।

আমি কহিলাম,—হিন্দুত্বও নাগরা জুতার মধ্যে নয়; হিন্দুত্ব মনে। যদি মনে খট্‌কা লাগে, বেশ, নাগরা পরা নিষেধ করে দিন। তবে তাতে ··এ পাহাড়ে দেশ···পায়ে চোট্ লাগতে পারে, আর সে চোট থেকে ক্ষত হওয়ারই সম্ভাবনা। এবং ক্ষত শরীরে পূজার আয়োজন করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ···

চক্রবর্ত্তী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—সমস্যা! ..

আমি কহিলাম,—এ সমস্যার মীমাংসাও আছে। শাস্ত্রে বলেচে, বাসাংসি জীর্ণানি···অর্থাৎ আচার-নিষ্ঠার বাস জীর্ণ হয়ে গেছে! হবেই তো—কতকালের পুরাতন বাস!···এই জন্যই তো শাস্ত্রে বলেচে, বিগ্রহের বাস বদলে তাঁকে নব কলেবর ধারণ করাতে হয়!···তার পর ধরুন, এই লক্ষ্মীর কথা··· নাগরা পায়ে দিয়ে এখানে এসেছিলেন, এখন আর পায়ে দেন না। ·যখন পায়ে দিতেন, তখন যে খাঁটী মানুষটি ওঁর মধ্যে ছিলেন, তিনি এখনো আছেন। কাজেই দেখচেন,—মানুষের অন্তরই আসল। নাগরা কিম্বা ঘাগরা, আর ঐ শাড়ী সাধারণভাবে পরা কি ঘুরিয়ে পরা ··এগুলো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। খাঁটী মানুষকে ও-সব স্পর্শও করতে পারে না। এই শ্যামসুন্দরকে কালো কাপড়ই পরান, আর রাঙা কাপড়ই পরান, শ্যামসুন্দর শ্যামসুন্দরই থাকবেন!

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—ঠিক! তাহলে যা ভাবছিলাম, অর্থাৎ সেই শাস্ত্রবাক্যটা কি?···চার্ব্বাঙ্গী শ্বশ্রূমাতা ..

কহিলাম,—শ্বশ্রূমাতা চার্ব্বাঙ্গী নন্। হতে পারেন না। চার্ব্বাঙ্গী বধূ···আর এই বধূই লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ···

যেন অকূলে কূল পাইয়াছেন, এমনি ভাবে চক্রবর্ত্তী কহিলেন—আর ঐ বদরীচূর্ণ···ও না হলে শরীরও তো রক্ষা করা যাবে না! তাহলে আনন্দকে ডাকাই···?

আনন্দকে পাওয়া গেল না! . নিশ্চয় শ্যামসুন্দরের রোষ!

চক্রবর্ত্তী শ্যামসুন্দরের অনুগ্রহ-লাভের আশায় মন্দিরে চলিলেন। আজ যামিনী দেবী বিগ্রহের পুষ্পশয্যার আয়োজন

করিয়াছেন। এ কি উপসংহারের পূর্ব্বাভাষ! বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি ফুল···নানা রঙের! যে রঙের পর যে রঙ মানায়, তাই দিয়াছেন,···আমি বলিলাম—নিপুণ শিল্পী··· শ্যামসুন্দরের মুখে কি মধুর হাসি!...

এ হাসির আরো প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলিল। মন্দির হইতে ফিরিবামাত্র দেখি, স্নান সারিয়া আনন্দ একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া গীতা পড়িতেছে। গীতার মাহাত্ম্যের জন্যই গীতার উপর অনুরাগ? না, এ গীতাখানি যামিনী দেবীর বহি বলিয়া?··

তার পর প্লটের উপসংহারটুকু একেবারে মিলনান্তক হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—শাস্ত্রে বলেচে না, চার্ব্বাঙ্গী শ্বশ্রূমাতা··?

আমি কহিলাম,—না। চার্ব্বাঙ্গী তরুণী বধূ···

চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ জলভারে আক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—গিন্নীর কথা মনে পড়চে...শাস্ত্রী।

আমি কহিলাম,—শুভ লক্ষণ! শুভ কর্ম্মে তাঁর অদৃশ্য-নেত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাত হচ্ছে, তাই···তাছাড়া স্বয়ং বিধাতা প্রজাপতির লেখা এ ভাগ্য-কাহিনী...এ তো ঐ আনাড়ি পরাগ মুখুয্যে, কিম্বা ঝর্ণা দেবীর দলের লেখা মাসিকপত্রের গল্প নয় তাই এর উপসংহারে এমন নিবিড় আনন্দ! পরাগ-ঝর্ণার দল হলে এ অবস্থায় নায়ককে রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কুলিগিরি করতে পাঠাতো; আর নায়িকাকে ষ্টেজে তুলে জীবন-নাটকে নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাসে ঝড় তুলে দিত!···এ বিধাতার পাকা হাতের প্লট—তাই নায়ক ওধারে গীতা পড়ছিলেন; আর নায়িকা শ্যামসুন্দরের মন্দিরে পূজার আয়োজন করচেন··

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তোমার পায়ে নাগরা জুতো যখন দেখেছিলাম, তখন মনে বিরূপতা জেগেছিল খুবই। কিন্তু হিন্দু হয়ে হিন্দু নারীকে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে পারি না তো···

আমি কহিলাম,—ওঁকে যখন নাগরা থেকে বঞ্চিত করেচেন, তখন আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত করবেন না···এত প্রচুর বঞ্চনায় মানুষের প্রাণ বাঁচতে পারে না···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কিন্তু মা-লক্ষ্মীর যে ভক্তি আর মমতার পরিচয় পেয়েচি, তাতে আমায় দেখার জন্য যে ওঁকে আজীবন আমার গৃহেই রাখতে চাই···

আমি কহিলাম,—তাহলে আশ্রিতা সম্পর্কের চেয়ে আর একটু স্নেহের সম্পর্ক-বন্ধন ওঁকে দিতে হয়, অর্থাৎ যে বন্ধন উনি কোনো কালে ছেদন করতে পারবেন না, আর তা না হলে ওঁর সঙ্কোচও কাটবে না···যে!

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আমি তা ভেবেচি,—তাই স্থির করেচি···কি সেই শাস্ত্রবাক্য?···চার্ব্বাঙ্গী···

তাড়াতাড়ি বলিলাম,—তরুণী বধূ··

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তাই হোক! তার উপর যখন শাস্ত্রী মশায় বলচেন, আচার-নিষ্ঠা বহির্বসন মাত্র···

আমি কহিলাম,—এবং শাস্ত্র আরো বলেচে, সে বসন বহু পুরাতন বলে জীর্ণ হয়েচে, তাই বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, —অর্থাৎ সে জীর্ণ বসন যথারীতি বিহায়···কি না, ত্যাগ কর··

চক্রবর্ত্তী একবার আনন্দর পানে চাহিলেন, পরক্ষণেই যামিনী দেবীর পানে···তারপর ডাকিলেন,—মাধব···

মাধব খাশ ভৃত্য। সে আসিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন—পাঁজিখানা নিয়ে আয়···

পাঁজিও আসিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—দ্যাখো তো শাস্ত্রী, শুভদিনের নির্ঘণ্ট······

* * * *
* *

বিবাহের পর সেই আতা-কুঞ্জের ধারে বেদীর উপর বসিয়াছিলাম,—তিনজনে...যামিনী দেবী, আনন্দ আর আমি। জ্যোৎস্না রাত্রি। আলোর ফিনিক ফুটিয়াছে! চাণক্যর স-শিখ পরচুলাটা খুলিয়া পাশে রাখিয়াছিলাম—স্নিগ্ধ বাতাসে মাথাটা আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছিল!

তর্ক চলিতেছিল। আনন্দ কহিল,—কিন্তু এই ব্যাপারই যদি গল্পচ্ছলে লিখতে তো পাঠক-পাঠিকা বলতো, আজগুবি!

আমি কহিলাম—বলুক! তারা অতি বেচারী! গতানুগতিকের অন্ধ দাস তারা। জানে না যে, মানুষের কল্পনার চেয়ে বিধাতার কল্পনার দৌড় কত বেশী! জীবনের ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চেয়ে কত বেশী আশ্চর্য্য··

আনন্দ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল,—ঠিক! এইজন্যই সেক্স্‌পীয়র বলে গেচেন, there are more things···

সবলে আনন্দর ঠোঁট চাপিয়া কহিলাম,—চুপ! জীবনে সব আমি সহ্য করতে পারি, শুধু পারি না সহ্য করতে যেখানে-সেখানে এই কোটেশনের বুলি!···

রাজনীতি ও কৌটিল্যবাদ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

ভারতবর্ষ যে ধর্ম্ম-প্রবণ এ কথা আমরা মানিয়া লই। এমন কি যে সকল সমালোচক আমাদের নানা দোষ ও গর্হিত আচারকে ভর্ৎসনার যোগ্য মনে করেন, তাঁহারাও কৃপার চক্ষে আমাদের ধর্ম্মপ্রবণতার দিকটা লক্ষ্য করেন। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতায় যে অক্ষয় বিত্ত আছে, ভারতবাসী বলিয়া সেই জ্ঞানের গৌরব আমাদের অন্তরাত্মাকে পূর্ণ, প্লাবিত করে—আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থার স্মৃতির দুঃসহ দুঃখ হৃদয় দগ্ধ করে। এই হীনতার দুঃখ দূর করিবার জন্য উপায় খুঁজি, কিন্তু পথ পাই না। এ নয়, ও নয় বলিয়া মন ক্রমাগতই বিচার করে, মাথা নাড়ে—ভ্রান্তি আসে। যাহা আমাদের ভাল তাহাই হীনতার কারণ বলিয়া মনে হয়। সমালোচকেরা বলে, ভারত ধর্ম্মপ্রবণ, ভারত ভাবপ্রবণ, ভারতীয়দের রাজনীতি বলিয়া কিছু ছিল না, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্ম লইয়াই তাহারা ব্যস্ত ছিল। এ কথায় আমরা বড় পীড়া পাই। তাই ত, Politics ছিল না! ইহা দারুণ অপবাদ বলিয়া মনে হয়। তখন আমরা পুঁথি খুলিয়া দেখাইয়া দিতে যাই যে, দেখ— রাজনীতি বা পলিটিক্স বলিতে তোমরা আর কত নষ্টামির কথা বলিতে জান। আমাদের রাজনীতি—যার নাম অর্থ-নীতিশাস্ত্র, তাহা দেখ। চাণক্যের কাছে তোমাদের বিস্মার্ক, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, ম্যাকিয়াভেলী কোথায় লাগে। সব একেবারে পাকা কূটবুদ্ধির কথা, সার সার রাজনৈতিক পলিসির কথা! তাহা শুনিয়া ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ হাসিয়া বলে, "হাঁ ঠিক, আমরা ইয়োরোপীয়েরা এমনি কূট চাল চালি বটে; তবে এত সাফ সাফ সাদা কথায় তাহা স্বীকার করি না।" আমাদের জিত থাকিয়া যায়, কিন্তু বুক ভরে না, মনে সন্তোষ পাই না। মুখের কথার সঙ্গে বুকের সাড়া পাই না। এমনি ধারা বিক্ষেপে আমাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত। ভাবি, তাই ত, সত্যই আমাদের সরলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার জন্যই আমাদের এই দুঃখ। ঐ গুলিকে ছাড়িয়া যদি শঠে শাঠ্যং করিতে পারি, তাহা হইলে আর কিছু না হউক, অবস্থা কতকটা ত ভাল হইবেই।

এইরূপ রাজনৈতিক চিন্তার ধারা যখন আমাদিগকে উদ্বেলিত করে, তখন সংযত হইয়া আমাদের সত্যিকার রত্নমণ্ডিত পুরাতন দরদালানের দরজা খুলিয়া একবার অভ্যন্তরস্থ সৌন্দর্য্যময় উজ্জ্বল রত্নবেদীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই যে, সেখানকার কোনও রত্ন আনিয়া আজিকার এই দৈন্য আমরা দূর করিতে পারি কি না। পুরাতন ভাণ্ডারের খোঁজে পুরাতন দিনেই আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। ভারতবর্ষ আজিকার সভ্য দেশ নয়। কবেকার কথা কে জানে, যখন ঋষিরা এ দেশ পাদস্পর্শে পুণ্য করিয়া গিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্মকে, আদিপুরুষকে অনলে অনিলে দেখিয়াছেন,—চক্ষুর চক্ষু, মনের মন বলিয়া জানিয়াছেন, ঊষার মহিমায় যখন গায়ত্রীর অপূর্ব্ব মন্ত্রে তাঁহারা হৃদয়কে চরাচরের সহিত এক করিয়া ভুবনে ভুবনে আলোকচ্ছন্দে বেড়াইতেন, সে ত আজিকার কথা নয়! সেই ঋষিরা একটা দুর্ল্লভ দ্রব্য অতি স্বাভাবিক ভাবে পাইয়াছিলেন; এবং তেমনি স্বাভাবিক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া গান করিয়াছিলেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আযে দিব্য ধামানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, শোন, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি আদিত্য বর্ণ এবং যিনি অন্ধকারের পরপারের।" তাঁহারা যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমাজ বলিষ্ঠ, সরল ও উদার হইয়াছিল। এই আনন্দ ও উদারতা দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম, অখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই—ব্রহ্মবাদীদিগের এই উদার জ্ঞানে সমাজের প্রত্যেক স্তর অণুপ্রাণিত হইয়াছিল। দ্বন্দ্ব ছিল কেবল মাত্র অনার্য্যদের সঙ্গে। প্রথম পর্ব্ব এই অবস্থায় শেষ হয়।

আর্য্যগণের সমাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িতে থাকে, অভাব মোচনের পথও বাড়িতে থাকে। সেই সঙ্গে কলাসৃষ্টি ও এবং সাহিত্যসৃষ্টিও হইতে থাকে। সমাজ-রক্ষায় যেমন রাজার আবশ্যক হইল, অমনি রাজার প্রজার

সম্পর্কও নির্ণীত হইল; বর্দ্ধিত সমাজ সুপরিচালনার জন্য গুণকর্ম্ম অনুসারেই বর্ণ-বিভাগ করা হয়। যে ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে কত বড় সম্পদ্, সে ধারণা তাঁহাদের ছিল। লিপিকলার যখন সৃষ্টি হয় নাই. তখন এবং তাহার পরেও এই আশ্চর্য্য, অতি পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য এক সম্প্রদায়কে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল—তাঁহারাই হইলেন ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় সমাজের রক্ষক হইলেন, সাহসে ও বলে তাঁহাদের অসীম অধিকার। তাঁহারাই আগত ও অনাগত বিপদ্ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার ভার লইলেন। বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য যথাক্রমে ব্যবসা ও সেবাকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইল। জীবন-যাত্রাও আবার প্রকার-ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা—এই চারি আশ্রম প্রতিপালনের ব্যবস্থাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে অভিহিত। সমাজ রক্ষা, পালন ও পুষ্টির সহায়তাকল্পেই ইহার সৃষ্টি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তৎকালের প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি যুক্ততা তাৎকালীন সমাজের জ্ঞান, সন্তোষ ও বলের দ্বারাই পরিমাপ করা যায়। এই সংস্কারের ভিতর এমন কিছু বিশ্ব-জনীন সত্য আছে, যাহার বলে ভারতবর্ষ আজও নানা দুঃখ-দুর্দ্দশার ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। অন্য কোনও জাতি এত ভাগ্য-বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া এতদিন টিকিতে পারিত না। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অনেক দোষ সত্ত্বেও যতটুকু শ্রেষ্ঠতা তাহার ছিল, তাহাই এত খাঁটি যে, কাল তাহার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই। নষ্ট করিবার কল্পনাও করা যায় না। যে মহা-নিয়ম কালও মানিয়া চলে, যে সত্যে ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, সেই বিশ্ব-সত্যের বীজ যতদিন ভারতীয় সমাজে থাকিবে, ততদিন তাহা অমর। বিকৃতি-বশেই আজ হীনতা দেখা দিয়াছে—বিকৃতি ও অপব্যবহার যত বাড়িবে এবং অন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা যতদিন না প্রচলিত হইবে, ততদিন এই ক্ষয়ের গতি নিবারিত হইবে না। আজকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ধারণাই আমরা পোষণ করি না কেন—যখন ইহা প্রথম দেখা দেয়, তাহার পর অতি দীর্ঘকাল ইহা অতি পবিত্র ও সৎ পদার্থ ছিল।

দ্বিতীয় পর্ব্বে যেমন সামাজিক ব্যবস্থা সুগঠিত হয়, তেমনি ধর্ম্মাচরণের দিক্ দিয়াও এক নূতন ধারা বাহির হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতাদের প্রীত্যর্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আধিক্যও দেখা দেয়। দেবতারা দেবলোকে বাস করেন। তাঁহারা মানুষের শুভাশুভ সাধন করিতে পারেন। অদৃশ্য জগৎ হইতে অদৃশ্য অথচ জ্যোতির্ম্ময় দেবতাগণ যজ্ঞে উপহৃত ভোজ্য গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠাতৃর সুখ ও সমৃদ্ধি উৎপাদন করেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়—রোষে ঝড় হয়। যদি অমঙ্গল নিবারণ করিতে হয়, যদি ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে হয়, তবে দেবতার সাহায্য ও দৈবী আশীর্ব্বাদ লাভ করা আবশ্যক। দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে যে লোকে আকৃষ্ট হইবে তাহা স্বাভাবিক। এইরূপে যে-পরিমাণ দেবতার আশ্রয়ে বিশ্বাস আরম্ভ হয়, সেই পরিমাণ পুরুষকারও খর্ব্ব হইতে থাকে। তার পর যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আনুষঙ্গিক মন্ত্র-শক্তির উপর বিশ্বাসের ফলে একটা বড় দুর্ব্বলতা সমাজে প্রবেশ লাভ করে। দেবতাদের পূজা ত আর যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবেই করা যায় না—বিশেষ শব্দ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হইলে তবে বিশেষ ফল লাভ হয়। এই বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়া অর্থশূন্য অনুষ্ঠানের ও মন্ত্রের বাঁধনে সাধারণ লোককে বদ্ধ ও পীড়িত করিতে থাকে। যজ্ঞের আদি কল্পনায় ত্যাগ বর্ত্তমান, যজ্ঞ মানেই ত্যাগ, ত্যাগেই ইহার প্রতিষ্ঠা,—দেবোদ্দেশ্যে অর্থাৎ কামনা-রহিত হইয়া কর্ম্ম করাই ইহার অন্তরের কথা। মানুষ যে-সভ্যতার, যে-পূর্ব্বীয় সমাজের নিকট ঋণী সেই সমাজের ঋণ—পিতৃঋণ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যজ্ঞানুষ্ঠান আংশিক ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ অপব্যবহারে দূষিত হয়। অন্য দিক দিয়া যজ্ঞে পশুবধের প্রশ্রয় দিয়া নিষ্ঠুর আচরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। আর্য্যেরা এককালে আমিষ আহার করিতেন—কালক্রমে হিংসা ত্যাগ করিয়া নিরামিষাহারী হন; এবং কেবলমাত্র যজ্ঞে হত পশু ভোজনে দোষ স্পর্শে না, এরূপ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তবুও পশুহত্যা যজ্ঞে বিষম প্রশ্রয় পায়। এইকালে একদিকে যেমন উপনিষদের উদার কল্পনায় পৃথিবীকে দেবস্থানে পরিণত করিবার পথ সৃষ্টি হইল, সেই সময়েই অন্যদিক দিয়া আবার নানা সামাজিক দুর্ব্বলতায় জনসাধারণ পীড়িত হইতে লাগিল। ইহাই ভারতে দ্বিতীয় পর্ব্ব।

অতঃপর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। সে আজ আড়াই-

হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার অভ্যুত্থানে ভারতের তৃতীয় পর্ব্ব সূচিত হইল। সমাজের দুঃখে—ততোঽধিক মনুষ্য-জীবনের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া তিনি মুক্তির পথের সন্ধান করেন, তাঁহার হৃদয় সুবিমল জ্ঞানের জ্যোতিতে প্লাবিত হয়। তিনি সমুদায় দেশকে আর্য্যপথে ফিরাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হন। সে পথ সনাতন ধর্ম্মের পথ। সর্ব্বজীবের দুঃখ স্বীকার করিয়া সেই দুঃখ অপনয়নের জন্য আত্যন্তিক মানুষী চেষ্টার পথ তিনিই দেখান। যাহা সৎ তাহাই বরণীয়, যাহা মিথ্যা, যাহা হিংসা, যাহা দ্বেষ তাহাই পরিত্যজ্য,—সৎজীবন, সাধুজীবন যাপন করিয়াই নিজের হিত ও সমাজের হিত—ইহাই তিনি জানেন, ও তাহাই তিনি শিক্ষা দেন। তাঁহার আনন্দ সংস্পর্শে, তাঁহার সনাতন ধর্ম্মে দেশ দিন দিন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। যে অসীম আনন্দ-ভাণ্ডার তাঁহার লাভ হইয়াছিল, সেই আনন্দের আতিশয্যে তিনি প্রচার করেন :—

"আমি সেই পথের সন্ধান পাইয়াছি, যে পথে অতীত-কালের জ্ঞানবৃদ্ধগণ বিচরণ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন মার্গ, সেই পুরাতন বীথিকা আমার নিকট সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে। দুঃখের অন্ত করিয়া জীবনধারা আনন্দময় করিবার জন্য তোমরাও আসিয়া যোগ দাও।" দ্বিতীয় পর্ব্বের বর্দ্ধিত ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, জ্ঞানবহুল, অজ্ঞানবহুল, জটিল অথচ ব্যথিত সমাজের সমক্ষে গৌতম পুরাতন ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া তাহার তাপ নিবারণ করেন। দুঃখ-নিবৃত্তির কৌশল তিনি পুরাতন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের পথেই প্রাপ্ত হন এবং সমগ্র ভারত-সমাজের দুঃখ-নিবৃত্তির ব্যবস্থা তৃতীয় পর্ব্বে করেন। বুদ্ধের প্রভাব সারা আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়ে। দলে দলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, আর্য্য ও অনার্য্য বুদ্ধের ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের শরণ লয়। অশোকের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ভারত ছাড়াইয়া পারস্য, ইরাণ অভিমুখে প্রসারিত হয়।

বৈদিক ধর্ম্মের জ্ঞানই ছিল আশ্রয়। বুদ্ধদেব কর্ম্মাশ্রয়ী ধর্ম্মপথ দেখান। সৎজীবন যাপন ও সদাচরণের মধ্যেই মোক্ষপথ। হিন্দু ধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবেশ করে—আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মে হিন্দুভাব মিশ্রিত হয়। বুদ্ধের সময়ের পাঁচশত বৎসর পরে দুই ধর্ম্মে ভেদ অল্পই থাকে ; এবং কালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে বিলীন হইয়া যায়। এই কালে উভয় ধর্ম্মেই ভক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে হিন্দুধর্ম্মের উজ্জল আলোক-সম্পাতে গার্হস্থ্য জীবন আলোকিত হয়। এই নির্ম্মল ধারা যদি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অপ্রতিহত থাকিত, তাহা হইলে হয় ত পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ হইত। গীতার ধর্ম্ম যদি ভারতবাসীকে ওতঃপ্রোত করিতে পারিত, তাহা হইলে জয়-পরাজয়ের বহু উর্দ্ধলোকে নীত হইয়া ভারত মুক্ত, স্বাধীন, স্বাশ্রয়ী এবং আদর্শ দেশ হইত। নলন্দার বাতি নিভিত না, তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের লোক ভারতীয় সভ্যতার স্নিগ্ধ প্রদীপ হইতে শিখা গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশে 'ভারতীয় আর্য্য আলোকে' পথ বাহির করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। তৃতীয় পর্ব্বে ভারতবর্ষ একীকৃত ও এক আর্য্য ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং এক আর্য্য-প্রথায় সমাজ শাসিত এবং একই আর্য্য রাজনীতি সর্ব্বত্র প্রবহমান ছিল সত্য—কিন্তু এই সৌভাগ্য অনেক শতাব্দী ধরিয়া স্থায়ী হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ছাপ বা হিন্দু ছাপ যে ছাপই এই যুগে লউক না কেন—সে ছাপের রং এক—একই আর্য্য ভারতীয় রঙের একরঙা ছাপ ভারতের ললাটে পড়ে। বৌদ্ধ ভারত, হিন্দু ভারত—এমন বিচার করা ভ্রম। আর্য্য ভারতের সমাজে ও ধর্ম্মে অন্তর্নিহিত ঐক্য সুস্পষ্ট। এই ঐক্যে তৃতীয় পর্ব্বের শেষ হয়। সে প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা।

সমাজ-দেহকে চতুর্থ পর্ব্বের সূচনাতেই বিশেষ করিয়া জঞ্জাল আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ভারতের দুয়ারে এই সময়ে বলবান্ বিদেশী দস্যু দেখা দেয়। মহম্মদ গজনী ইহাদের অগ্রণী। তার পর পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বিদেশীরা ভারতবর্ষকে বিধ্বস্ত ও চুর্ণ করিতে থাকে। যে রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল, সামাজিক আচরণ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে রাজধর্ম্ম অটুট ছিল, বহিরাক্রমণের ফলে সে রাজা আর টিকিতে পারেন নাই। আততায়ীরা দিনে দিনে রাজপদ অধিকার করিয়া বসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য রাজধর্ম্ম নির্ব্বাসন দেয়। লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে আর্য্যসমাজ তেমনি রাজাকে অবলম্বন করিয়া ছিল। সুতরাং অবলম্বন-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ ভূলুণ্ঠিত হইল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে রাজাতেই ক্ষাত্র ধর্ম্ম বিশেষ করিয়া বর্ত্তাইত। রাজা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম না মানায় ক্ষত্রিয়ের দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। রাজাকে ত্যাগ

করিয়া যদি সমাজ তখন নূতন সামাজিক শীর্ষ গড়িয়া তুলিত, তবে হয় ত ভারতবর্ষের এত দুর্গতি হইত না। কিন্তু একদিনে সে বোধ তাহার হয় নাই। ভারতবর্ষের বাহির হইতে উত্তর-পশ্চিমের পথে যাহারা দলের পর দল ভারত আক্রমণ করিতে আসে, এবং পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে—তাহারা প্রায় পাঁচশত বৎসর কাল আক্রমণকারী অথবা শাসক হিসাবে থাকে। তাহাদের শক্তির অবসানে ভারতবর্ষ পুনরায় যখন আর্য্যসভ্যতাশাসিত হইবার অবস্থায় আসে, সেই মহা-মুহূর্ত্তেই ইংরাজও এদেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্প আয়াসেই বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। ভারতবর্ষ মাথা তুলিয়া উঠিবার সময়ই পায় নাই। আফ্‌গান, তুর্কী, তাতারদের দ্বারা ভারত শাসিত হইতে হইতে ভারতবর্ষকে যখন এই বিদেশীরা কেবল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন কেবল তাহারা ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাহাদেরও রাজ্যভোগ কাল শেষ হইয়া ইংরাজ-শাসন আরম্ভ হয়। ইংরাজ যে মনোবৃত্তি লইয়া ভারতবর্ষে আসে এবং শাসনভার হাতে লয়, তাহার পরিচয় মেকলের গভীর তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক বিখ্যাত উক্তিতেই অল্প কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষকে অসভ্য জানিয়া অবজ্ঞার সহিত ভারতে যে ইংরাজশাসনের আরম্ভ, আজও সে অবজ্ঞা দূর হয় নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবার মত দিন যে আসে নাই তাহা নহে ; তথাপি স্বার্থবশে এই বিশাল দেশকে ইংরাজ লৌহমুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শাসন-পদ্ধতিতে আর্য্যনীতি নাই—ক্ষাত্র ধর্ম্ম উপেক্ষিত। ইহাই ভারতবর্ষের চতুর্থ পর্ব্ব।

আজ আর এক মহাত্মা জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চম পর্ব্বের সূচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই গভীর অন্ধকারেও তিনি পথ পাইয়াছেন। বুদ্ধদেব নানা তর্ক হইতে অবিচার হইতে দেশের মন ফিরাইয়া উদার সদাচরণের উপর সমস্ত ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি দুঃখের মুক্তি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন। তিনি আর্য্য পথে আর্য্য নীতিই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ন্যায় ও দর্শনের তর্ক-সমাকুল পথ ত্যাগ করিয়া অতি সাধারণ দৈনিক "দুঃখ নিবৃত্তির" ছোট কথা—সৎআচরণের গোটা কতক সাদা কথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আজ মহাত্মা গান্ধী চরম সত্য উপলব্ধি করতঃ দুঃখ-নিবৃত্তির এবং আরও গোড়াকার কথা, "ক্ষুন্নিবৃত্তি"র পথই দেশের সম্মুখে রাখিয়াছেন। বুদ্ধদেবের দিনে ভারতে ক্ষুন্নিবৃত্তির ভাবনা ছিল না, সেই জন্যই গৌতম দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখাইয়াছিলেন। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভারতবাসীকে ক্ষুধাই সর্ব্বাধিক পীড়ন করিতেছে। আজিকার জ্ঞানী, আজিকার মহাপুরুষ সেইজন্য ক্ষুন্নিবৃত্তির পথেই সকল মঙ্গলের পথ পাইয়াছেন। যে যন্ত্রী বুদ্ধের মধ্যে দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন ও পথ দেখাইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, সেই যন্ত্রীই আজ আড়াই হাজার বৎসর পরে পীড়িত ভারতে আর এক যন্ত্রের মধ্যে ক্ষুধা-নিবৃত্তির ইচ্ছা জাগাইয়াছেন ও তাহার পথ দেখাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যে যন্ত্রী ছোট বড় সকলকেই চালান, আজ মহাত্মার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে তাঁহারই ইঙ্গিত প্রকাশমান।

গান্ধী বলিতেছেন, "আমি আনন্দময় পথ পাইয়াছি। চরখাকে কেন্দ্র করিয়া এই পথ দিকে দিকে ছুটিয়াছে। মুমূর্ষু জাতি—ইহাতেই প্রাণ পাইবে। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যনীতি, আর্য্য-আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ নির্ম্মল ও বলশালী হইবে। হিন্দু-মুসলমানের কল্পিত বিরোধ পুনরায় কল্পনাতেই পরিণত হইবে—ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা যে উভয়কেই এক করিয়া রাখিয়াছে। প্রজারক্ষার ক্ষাত্রধর্ম্ম, রাজ্যরক্ষার ক্ষাত্রধর্ম্ম চরখার প্রভাবেই প্রবর্ত্তিত হইবে। তোমাদের হৃদয় পবিত্র হউক, নির্ম্মল হউক। ভগিনীগণ সীতাজীর মত হও, ভাই সকল রামচন্দ্রের মত হও। সীতা ও রামের দেশে আবার রামরাজত্ব ফিরিয়া আসিবে।"

কত বড় স্পর্দ্ধার কথা! শাসন-যন্ত্রের লৌহ-মুষ্টিতে দেশ যখন নিতান্তই পীড়িত—নিঃসহায়, যে সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি নারকীয় লীলা করিতেছে, সেই সময় হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টানের এই বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ এক চরখার অবলম্বনে ধর্ম্মাশ্রয়ী হইয়া রাম রাজত্ব ফিরাইয়া আনিবে, হিন্দু মুসলমান যে যাহার ধর্ম্ম আচরণ করিয়া দেশে ধর্ম্মবৃদ্ধি করিবে—এত বড় স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগে, সন্দেহ হয়।

সন্দেহ হইবারই কথা। গান্ধীর বাক্য আর্য্যঋষিগণের বাক্যের ন্যায়, গৌতমের সরল সহজ বাক্যের ন্যায় সকল ধর্ম্মানুমোদিত। তাঁহার বাক্যে সুবিধাবাদ বা পলিসির স্থান নাই। পলিসি, কূটনীতি যে-কালের কাল-ধর্ম্ম, সে-কালে

কেবল ধর্ম্মপথে থাকিয়াই গান্ধীজী বৈদেশিক শাসন সংস্কৃত, যা হয় দুরীভূত করিবেন—এতবড় স্পর্দ্ধায় বিশ্বাস হয় না। সত্যই কি এমন হইতে পারে? ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দুর্ব্বল প্রজা কি সবল আমলাতন্ত্রের কবল হইতে রাজ্য উদ্ধার করিতে পারে? ধর্ম্ম দ্বারা কি রাজ্যরক্ষা করা যায়? অহিংস আচরণ কি স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী নহে? মিথ্যাচারই কি রাজ্যশাসনের আবশ্যক অঙ্গ নহে?—এমন নানা সন্দেহপ্রসূত প্রশ্ন উত্থিত হয়। ধর্ম্মজীবন যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুপযোগী, এই সংস্কার পোষণ করিবার প্রবল কারণ বর্ত্তমান। তার পর অহিংসার সম্বন্ধেও সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু সমস্ত লোক যদি এই ধর্ম্ম আচরণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দ্বারে যখন আততায়ী উপস্থিত হইবে, তখন অহিংসাচারিগণের আততায়ীর হাত হইতে দেশরক্ষা করিতে অপারগ হওয়ার কথা। গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে এমন দিন কোনও দেশের উপস্থিত হইতে পারে, যখন সকল বয়স্ক পুরুষকেই যুদ্ধবৃত্তিতে বা যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহার্থ নিযুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। তেমন দিনে অহিংসার আদর্শে পুষ্ট দেশের ধর্ম্মপন্থী প্রজার—হিংসাচারে পুষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনাহীন জাতির সমক্ষে টিকিতে না পারাই সম্ভব। কিন্তু গান্ধীবাদ এমন সংশয় স্থলেও পরম নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দেয় যে, অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ জাতিও ধর্ম্মাধিষ্ঠিত জাতিকে পরাভূত করিয়া ভোগ করিতে পারে না। গান্ধীবাদ এ কথা বলে যে, ধর্ম্মপথে পরিচালিত জাতির শক্তি অতিবড় শত্রুর নিকটও দুর্ম্মদ। যাঁহারা এই সকল আশঙ্কার প্রশ্ন তোলেন, তাঁহারা কিছু একটা আকস্মিক যুদ্ধের কল্পনা করেন না। তবে গান্ধীবাদ শেষ অবধি গিয়া যে টিকিতে পারে না, এই ধারণা করিয়া—যাহা আজই গান্ধীপন্থায় পাওয়া যাইতে পারে সে বিশ্বাসের মূলও শিথিল করিয়া ফেলেন। গান্ধীপথে সত্য সত্যই ভারতবর্ষকে আমলাতন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করা যায়। এই বিষয়টা ভাল করিয়া বিচার করিতে হইলে—গান্ধীপথে আমাদের সংস্কার দৃঢ় করিতে হইলে, আমাদের অতীতকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। যে চারিটি পর্ব্বে ভারতবর্ষের অতীত যুগ বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্যই স্পষ্টীকৃত হইবে যে, গান্ধীপথই ভারতীয় আর্য্যপথ, ধর্ম্মপথ এবং প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক পথ। বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জ্জনের জন্যই এই আয়াস আবশ্যক। কংগ্রেস যে গান্ধীপথ পরিত্যাগ করিয়া কাউন্সিল-পথ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মূলেও গান্ধীবাদে বিশ্বাসের ক্ষীণতা ও পলিসীবাদে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। পলিসীবাদ দেশকে ভ্রমে নিপতিত করিয়াছে। কাউন্সিলের খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবর্গ ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে জনসাধারণ হইতে অসম্পৃক্ত হইয়া পড়িতেছেন। জনসঙ্ঘের বিরাট বলেই যে তাঁহাদের বল তাহা ভুলিয়া পলিসীর বলেই বিশ্বাস করায় আজ গান্ধীর আসন কংগ্রেস মণ্ডপে নাই। পলিসী বা কূটনীতির মোহ অতিশয় আকর্ষণকারী। কৌটিল্যে ত লেখাই আছে—

"যুদ্ধকালে পদাতিনিক্ষিপ্ত শর একটা লোককেও না মারিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞগণের কল্পিত নিপুণ চক্রান্ত গর্ভস্থ ভ্রূণকেও হত করিতে পারে।" কূটচালের এই মোহই ইহার বিশেষ আকর্ষণ। কূটচাল কিন্তু ভারতবর্ষে বরাবর কৌটিল্যনীতি বলিয়াই পরিজ্ঞাত। ভারতীয় ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সহিত ইহার ভুল করিলে চলিবে না। চাণক্য লিখিলেন কৌটিল্যশাস্ত্র আর সেই শিক্ষায় উৎপন্ন হইলেন সম্রাট্ অশোক! কংগ্রেস কবে এই কৌটিল্যশাস্ত্রটা পোড়াইয়া ফেলিয়া বুদ্ধ, অশোক ও গান্ধীবাদের আশ্রয় লইবে?

হাত-দেখা

জ্যোতি বাচস্পতি

হাতের আঙুল

হাতের পাঁচটি আঙুলের মধ্যে বুড়ো আঙুলের স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। কাজেই সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা দরকার। প্রথমে বুড়ো আঙুল বাদে বাকি চারটি আঙুল সম্বন্ধে কিছু বল্‌বো। পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে চারটি আঙুলের এক একটির আপেক্ষিক হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য ধরে এবং পাশাপাশি দুটি আঙুলের মধ্যে অবকাশের প্রশস্ততা ও সঙ্কীর্ণতা ধরে নানা রকম ফল কল্পনা করা হয়েছে—কিন্তু সে ফলগুলি সম্ভব কি না তা বিশেষ বিচার বা বিবেচনা করে কেউ দেখেন নি। তা ছাড়া, তাঁরা চারটি আঙুলের যে হিসেবে নাম দিয়েছেন তাও প্রত্যক্ষ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ এমনও লিখেছেন যে "হাতের আঙুলগুলি যদি হাতের তেলোর চেয়ে লম্বা হয়, তা হ'লে এইরকম ফল হবে"—অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শত শত হাতের মধ্যে এমন কোন হাত আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি, যার তেলোর চেয়ে আঙুলগুলি মাপে লম্বা। বস্তুতঃ হাতের তেলোর চেয়ে আঙুলগুলি কখনই লম্বা হয় না, তবে কারো কারো বা আঙুলের গড়ন মানানসই হয়, কারো কারো আঙুলগুলি লম্বাটে ধাঁজের হয়; আর কারো কারো বা বেঁটে ধরণের হয়ে থাকে।

আসলে হাতের তেলোটি নির্দ্দেশ করে প্রকৃতির কাঠামো এবং হাতের আঙুলগুলি নির্দ্দেশ করে সেই প্রকৃতির প্রকাশ। কাজেই আঙুলগুলি বেঁটে গড়নের হলে তার প্রকৃতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডী আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। যাঁর আঙুলগুলি বেঁটে গড়নের তাঁর কল্পনাশক্তি প্রায়ই কম হয়—আর সেইজন্য নিজের প্রকৃতির পূর্ণ স্ফূর্ত্তির অনুকূল পারিপার্শ্বিক নিজে তৈরী করে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর মৌলিকতা নেই বল্লেই চলে, যদিচ সৌভাগ্যবশতঃ অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করলে অনেক সময় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু সে যাই হোক্, যাঁর বেঁটে আঙুল, তিনি অনেকটা ভাগ্যের দাস। যখন যে আবেষ্টনের মধ্যে পড়েন, তখন তারই মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

হাতের আঙুলগুলি যাঁর লম্বাটে ধরণের, তাঁর প্রকাশক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে। তিনি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পড়ে থাকতে ভালবাসেন না; এবং যেখানেই যান, যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি নিজের প্রকৃতির প্রকাশের সুযোগ তৈরী করে নেন। বেঁটে আঙুলের লোকের চেয়ে এঁর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ঢের বেশী তীক্ষ্ণ; এবং এঁর কল্পনা-শক্তি সাধারণতঃ খুব উর্ব্বর হয়ে থাকে। ইনি ভালর দিকে যান আর মন্দর দিকেই যান, এঁর প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি প্রায়ই ফুটিয়ে তোলেন। এঁর মধ্যে সংযম কম; এবং বাক্যেই হোক্ কি চাল-চলনেই হোক্, বাড়ীতেই থেকে হোক্ কি সমাজেই হোক্, আরামেই হোক্ কি পরিশ্রমেই হোক্, এঁর অসংযম প্রকাশ পাবেই।

আঙুলগুলি মানানসই হলে প্রকৃতির প্রকাশও মানানসই ধরণের হয়ে থাকে। যাঁর আঙুল মানানসই, তিনি বেঁটে আঙুলের লোকের মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও পড়ে থাকেন না; আবার লম্বা আঙুলের লোকের মত প্রকৃতির অসংযত প্রকাশও খোঁজেন না। এঁদের প্রকৃতির প্রকাশ সঙ্গত ও সংযতভাবে হয়ে থাকে।

হাতের চারটি আঙুল প্রকৃতির চতুর্ম্মুখী প্রকাশ নির্দ্দেশ করে। আগে বলেছি যে আমাদের চৈতন্য চারটি স্তর আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়—সে চারটি স্তর যথাক্রমে জ্ঞান, অনুভূতি, শক্তি এবং জড় বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। আমাদের হাতের চারটি আঙুলের এক একটি এক এক স্তরের দ্যোতক। তর্জ্জনীটি জ্ঞানের আঙুল, মধ্যমাটি জড় বা বাস্তবতার আঙুল, অনামিকাটি শক্তির এবং কনিষ্ঠাটি অনুভূতির। এই চারটি আঙুলের মধ্যে যাঁর যে আঙুলটি সব চেয়ে মাথালো, তাঁর প্রকৃতির প্রকাশও হয় সেই স্তর আশ্রয় করে।

যে কোন হাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আঙুলগুলির গোড়া তেলোর উপর ঠিক এক লাইনে বসানো নয়,—কোন আঙুলটা উঠেছে একটু উপর থেকে, কোনটা একটু নীচু



উপেক্ষিতা

শিল্পী— শ্রীবলাইবন্ধু রায়

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

থেকে। তা'ছাড়া হাতের আঙুলগুলি মাপেও ছোট-বড় হয়ে থাকে। সাধারণ হাতে মধ্যমা বা মাঝের আঙুলটিই ওঠে তেলোর সব চেয়ে উপর থেকে; আর ঐ মধ্যমাটিই মাপে সব চেয়ে বড় হয়ে থাকে। একটু ভেবে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে এই-ই হওয়া উচিত। আমাদের চৈতন্য যতদিন জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছে, ততদিন জড়ের প্রভাব আমাদের উপর অন্য স্তরের প্রভাবের চেয়ে বেশী হচ্ছে। বিজ্ঞানে হোক্‌, ভাবুকতায় হোক্‌, কর্ম্মে হোক্‌,—যিনি যতই উন্নত হোন্‌, তবু জড়ের স্তর তাঁকে বেঁধে রাখ্‌বেই। সাধারণ হাতে মাঝের আঙুলের দৈর্ঘ অন্য আঙুলের তুলনায় ঢের বেশী; কিন্তু কোন কোন হাত এমনও দেখা যায়, যে হাতের তর্জ্জনী কি অনামিকার দৈর্ঘ্য মাঝের আঙুলের ঠিক সমান না হলেও কাছাকাছি—যাতে করে তারা মধ্যমার চেয়ে মাথালো হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ হাতে কনিষ্ঠা বা কড়ে আঙুলটি হয় লম্বায় সব চেয়ে ছোট, এবং ওঠে তেলোর সব চেয়ে নীচু জায়গা থেকে; কাজেই কড়ে আঙুল যদি একটু উঁচু থেকে ওঠে, কি, কড়ে আঙুলের মাথা যদি অনামিকার নখ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তা হলেই সে মাথালো হয়ে উঠে। মোট কথা, কোন ব্যক্তির হাতের সহজ ভঙ্গীতে যে আঙুলটি সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই আঙুল দিয়েই তাঁর প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে।

তর্জ্জনী

তর্জ্জনীটি জ্ঞানের দ্যোতক। পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে এই আঙুলটিকে যে বৃহস্পতির আঙুল নাম দেওয়া হয়েছে, তা কতকটা ঠিক হলেও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এ আঙুলটিতে বৃহস্পতি, রবি ও বুধ এ তিন গ্রহের লক্ষণই বর্ত্তমান। ফলিত জ্যোতিষের মতে রবি বিজ্ঞানময় কোষের কেন্দ্র। অতএব এ আঙুলের যদি কোন গ্রহের নামেই নামকরণ করতে হয়, তা হলে একে **রবির আঙুল** বলা উচিত।

ফলিত জ্যোতিষে রবির যে সব কারকতা নির্দ্দেশ করা হয়েছে, এই আঙুল সে সবই নির্দ্দেশ করে। মহিমা ও গৌরব, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উঁচু দিকে লক্ষ্য সবই তর্জ্জনীতে আছে। যাঁর তর্জ্জনী মাথালো তাঁর সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা—তা সে যে কোন বিষয়েই হোক্‌—প্রকাশ পাবেই। তিনি সব বিষয়কে জ্ঞানের বা বুদ্ধির দিক দিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করেন। তাঁর মানসিকতা খুব প্রবল এবং আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

এ আঙুলের মূল অর্থ হচ্চে মানসিকতা। হাতের তেলো যে শ্রেণীর হয় তর্জ্জনীর মানসিকতাও সেই শ্রেণীর পদার্থকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়।

যাঁর হাতের তেলোয় জ্ঞানী হাতের লক্ষণ পাওয়া যায়, তাঁর যদি তর্জ্জনীটি মাথালো হয়, তাহলে তাঁর মানসিকতার তুলনা পাওয়া কঠিন। জ্ঞানের কোন ব্যাপার তাঁর কাছে লুকানো থাকে না। তিনি প্রকৃত জ্ঞান-যোগী; এবং জ্ঞানের দুটো দিক—intuition এবং reason তাঁর মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে। ব্যবহারিক জগতের লোক হয় ত এঁর জ্ঞানের মূল্য বুঝতে পারেন না; সমসাময়িক সমাজে হয় ত এঁর জ্ঞান নিরর্থক বা অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজ প্রায়ই এঁর পূজা করে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরাই ধ্যানী বুদ্ধ, এঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, এঁরাই জ্ঞানের রাজ্যে যুগ-প্রবর্ত্তক।

বাস্তব হাতের তর্জ্জনী যদি মাথালো হয়, তাহলে জাতকের বাস্তব ও ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান খুব বেশী হয়ে থাকে। তাঁর মধ্যে সহজ জ্ঞান (Common Sense) খুব প্রবল হয়; এবং বাস্তবিক ব্যাপারগুলিকে তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রেরণার চেয়ে যুক্তিকে মানেন বেশী;—এবং তিনি জ্ঞানলাভ করতে চান প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে। কাজেই তাঁর কাছে বিজ্ঞানের অর্থ ব্যবহারিক বিজ্ঞান;—তাঁর জ্ঞানের মূল ততটা ভিতরে নয় যতটা বাইরে।

কর্ম্মী হাতের তর্জ্জনী যদি মাথালো হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে নেতৃত্ব করবার একটা সহজ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বটে এবং কোন জিনিষ বল্‌বামাত্র বোঝবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ বটে; কিন্তু তাঁর মধ্যে জ্ঞান কখনই গভীরতা লাভ করতে পারে না। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তিনি লোককে চমৎকৃত করে দেন—এবং এইজন্যই সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন ও নেতার স্থান অধিকার করেন। কূটতর্কে এঁদের যথেষ্ট পটুত্ব প্রকাশ পায় এবং এঁরা অযৌক্তিক ভ্রমপূর্ণ অনেক বিষয়কেও যুক্তিযুক্ত সত্য বলে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারেন—যা আপাতত লোকের চোখে ধাঁধাঁ দেয় বটে, কিন্তু ধীর ভাবে পরীক্ষা করলে যার হেত্বাভাস (fallacy) অনায়াসে ধরা পড়ে।

ভাবুক হাতের তর্জ্জনী যদি মাথালো হয়, তাহলে জাতকের উচ্চাভিলাষ খুব প্রবল হয়। তিনি যুক্তির চেয়ে প্রেরণা দিয়েই বেশী চালিত হ'ন। ইনি প্রায়ই মজলিসি লোক হয়ে থাকেন; এবং কথাবার্ত্তায় ও গল্পে স্বল্পে এঁর যথেষ্ট পটুত্ব প্রকাশ পায়। এঁর মুখস্থ করার শক্তি খুব বেশী; এবং একটা ঘটনা মনে রেখে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করবার ক্ষমতা অসাধারণ। এঁরও বুদ্ধি বেশ ধারালো; কিন্তু সে বুদ্ধি স্থির বা দূরগামী নয়। এঁর মধ্যেও বহুমুখীনতা আছে; কিন্তু এঁর একাগ্রতা বা ধারণাশক্তি কম। এক বিষয়ে অধিকক্ষণ লেগে থাকা এঁদের পক্ষে শক্ত।

মোট কথা, যে রকমেরই হাত হোক্, যাঁর তর্জ্জনী মাথালো, তিনি ভালমন্দ যে রকমের লোকই হোন্, তিনি বুদ্ধিমান বলে পরিচিত হবেন। শোনা যায়, নেপোলিয়নের তর্জ্জনী একেবারে মধ্যমার সমান ছিল। ইংরাজি গ্রন্থগুলিতে সেইজন্য বলা হয়েছে যে, তর্জ্জনী অতিরিক্ত বড় হলে জাতক অতিমাত্রায় প্রভুত্বপ্রিয় হ'ন, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়, ঐ রকম তর্জ্জনী থাকাতেই নেপোলিয়নের তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি, সংগঠনশক্তি প্রভৃতি অসাধারণ গুণ ছিল। সম্ভবতঃ নেপোলিয়নের হাতে কর্ম্মী হাতের প্রাধান্য ছিল এবং অঙ্গুষ্ঠেরও কোন রকম অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই ছিল; নতুবা তাঁতে দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সম্ভব হত না।

মধ্যমা

মধ্যমা বা মাঝের আঙুলটি নির্দ্দেশ করে জড়ের স্তরকে। আগেই বলেছি যে, প্রায় সব হাতেই মধ্যমাটি সব চেয়ে বড় হয়ে থাকে! দু' একটি অসাধারণ হাতে তর্জ্জনী বা অনামা মধ্যমার সমান হতে পারে; কিন্তু কোন আঙুলই মধ্যমার চেয়ে বড় হয় না। যে হাতে মধ্যমা তর্জ্জনী বা অনামার চেয়ে ঢের বেশী বড় এবং পুরুষ্ট সেই হাতেই মধ্যমাকে মাথালো বলা চলে।

যাঁর হাতে মধ্যমা মাথালো তাঁর প্রকৃতি বাস্তবতাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। তিনি সব জিনিষের অভিব্যক্তি খোঁজেন জড়ের মধ্য দিয়ে। সূক্ষ্ম ব্যাপার তিনি বুঝতে পারেন না যদি না তা স্থূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। জ্ঞানকেও তিনি নামিয়ে আনতে চান ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। যা অতীন্দ্রিয়, যার সত্তা বাইরে স্থূলরূপে ব্যক্ত হতে পারে না, তাকেও তিনি পেতে চান্ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের জড়প্রকাশে। আকারই তাঁর কাছে পরম সত্য—তিনি সব জিনিষের একটা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আকার পেতে চান। বাইরে যে ঘটনা ঘটছে তাই তাঁর কাছে সত্য—তার মধ্যে যে অব্যক্ত তত্ত্ব রয়েছে তার কল্পনাও তাঁর মনে আসে না। এই জন্য তাঁর চক্ষে জগৎ দুঃখময়—কেন না, জগতে অহরহ ধ্বংসের লীলা চল্‌ছে। বাস্তব জগতে অভাবেরই পূর্ণ রাজত্ব। তিনি অত্যন্ত সাবধানী ও হিসেবী প্রকৃতির লোক—প্রতি পদে তাঁর শঙ্কা, প্রতি পদে চিন্তা। তিনি খুব বেশী মিশুক হতে পারেন না, যদিও সামাজিক নিয়মগুলি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে ভালোবাসেন।

ভিন্ন ভিন্ন তেলোর সংশ্রবে মাথালো মধ্যমার কি অর্থ হতে পারে, তা শিক্ষার্থী নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন, বিভিন্ন তেলোর সম্পর্কে মাথালো তর্জ্জনীর বিচার তিনি যদি মন দিয়ে পড়ে থাকেন। একটা উদাহরণ দিলেই এ জিনিষটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যাঁর বাস্তব হাতে তর্জ্জনী (অর্থাৎ জ্ঞানের আঙুল) মাথালো, তিনি বাহ্যবস্তুর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজেন। আর যাঁর জ্ঞানী হাতে মধ্যমা (বাস্তবতার আঙুল) মাথালো, তিনি চান জ্ঞানকে বস্তুর মধ্যে নিয়ে আসতে। প্রথম ব্যক্তি হয় ত বাস্তব জগতে যে সব ঘটনা ঘটছে, তার ধারা, তার নিয়ম আবিষ্কার করতে যাবেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি হয় ত বিজ্ঞানময় পরমাত্মাকে স্থূল মূর্ত্তির মধ্যে দেখ্‌তে চাইবেন। প্রথম ব্যক্তির প্রকৃতির মূল হচ্চে বস্তুতে এবং প্রকাশ জ্ঞানে; দ্বিতীয় ব্যক্তির মূল হচ্চে জ্ঞানে, প্রকাশ বস্তুতে।

পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে মধ্যমাকে শনির আঙুল বলা হয়। অবশ্য তা কতকটা ঠিক—যদিও ফলিত জ্যোতিষের মতে জড়স্তরের কেন্দ্র পৃথিবী, এবং সে হিসাবে মধ্যমাকে **পার্থিব আঙুল** বল্লেই বেশী সঙ্গত হয়। এই আঙুলটিতে পৃথিবী, শুক্র ও শনি এই তিন গ্রহেরই লক্ষণ পাওয়া যায়।

অনামা

পাশ্চাত্য গ্রন্থকারেরা অনামাকে যে রবির আঙুল বলেছেন, তা ঐ আঙুলের লক্ষণের সঙ্গে মোটেই মেলে না। ঐ আঙুলটী প্রাণ বা কর্ম্মশক্তির দ্যোতক। ফলিত জ্যোতিষের মতে গ্রহের লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে অনামাকে মঙ্গল, প্রজাপতি

(হার্শেল বা ইউরেণাস) ও বরুণ (নেপচুন) এই তিনটী গ্রহের প্রভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রাণ বা শক্তির কেন্দ্র মঙ্গল, অতএব গ্রহের নামে নাম দিতে হলে, একে মঙ্গলের আঙুল বলা উচিত।

অনামা শক্তির দ্যোতক। যাঁর হাতে অনামিকা মাথালো, তাঁর প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ হবে সব ব্যাপারকে কাজে প্ররিণত করা। সেই জন্য তাঁর মধ্যে একটা চট্‌পটে ভাব এবং হঠকারিতা লক্ষিত হওয়া সম্ভব। তিনি প্রায়ই খুব উদ্যোগী এবং তৎপর হয়ে থাকেন, এবং সব রকম হাতের কাজের দিকে তাঁর একটা আকর্ষণ দেখা যায়। তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের চিন্তা ও দূরদর্শিতা কমই থাকে—সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল্‌বার দিকেও তাঁর ঝোঁক খুব বেশী। তিনি যা কিছু করতে যান, তারই মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য এবং সব রকম শিল্পের দিকে তিনি প্রায়ই ঝোঁকেন ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যে সব ব্যবসায়ে বা শিল্পকর্ম্মে খুব চট্‌পট্‌ ধনী হওয়া যায়, সেই দিকেই তাঁর টান বেশী। সেইজন্য ফাট্‌কা বা জুয়াখেলায় লিপ্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নয়।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হাতের সংশ্রবে এই প্রকাশের প্রাবল্যের তারতম্য হতে পারে ; কিন্তু কমই হোক্‌ আর বেশীই হোক্‌, তাঁর জীবন মোটের উপর অগ্রসর হবে উত্তেজনা ও অভিযানের মধ্য দিয়ে।

কনিষ্ঠা

গ্রহের নামে নাম দিতে হলে এ আঙুলকে বলা উচিত **চন্দ্রের আঙুল**। পাশ্চাত্য গ্রন্থকারেরা যে একে বুধের আঙুল বলেন, তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ আঙুলটি অনুভূতির সূচক এবং ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে অনুভূতির কেন্দ্র—চন্দ্র।

এই আঙুল যাঁর মাথালো, তাঁর প্রকৃতির প্রকাশ হবে তাঁর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে। তাঁর মধ্যে সহানুভূতি ও সামাজিকতা প্রবল হবেই। তাঁর মধ্যে অনুভূতি খুব প্রবল বলে নিজের সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই খুব সজাগ এবং কেউ সহজে তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে না। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রায়ই খুব প্রখর ; কাজেই যে-কোন বিষয় বা ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে রাখবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ হয়ে থাকে। তাঁর ধৃতিশক্তিও খুব বেশী ; একসঙ্গে তিন চারটী বিভিন্ন রকমের কাজ বিনা বিশৃঙ্খলায় অনায়াসে কর্‌তে পারেন। তিনি হয় ত একই সময়ে তিনজনের সঙ্গে দাবা খেলতে পারেন—একই সময়ে তিনজনের কথা শুনে প্রত্যেকের কথার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। তাঁর মধ্যে প্রায়ই বহুমুখীনতা লক্ষিত হয়। তিনি সামাজিক ও সদালাপী বলে সাধারণের মধ্যে প্রায়ই তাঁর খাতির দেখতে পাওয়া যায়। খুব উচ্চ পদ লাভ করলেও তিনি বাইরে কখনো গর্ব্ব প্রকাশ করেন না, মনে মনে যাই থাক। তাঁর মধুর ব্যবহারে তিনি সহজেই লোককে বশীভূত করতে পারেন ; এবং এই উপায়ে অনেক সময় অনেক দুষ্কর কার্য্যও সিদ্ধ করে থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন হাতের সংশ্রবে মাথালো কনিষ্ঠার কি অর্থ হতে পারে, তা শিক্ষার্থী সহজেই ঠিক করে নিতে পারবেন, যদি তিনি ভিন্ন ভিন্ন হাতের অর্থ ঠিক বুঝে থাকেন।

ঘর-ছাড়া

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আমারো গায় লেগেছে আজ ঐ ছোঁয়াচে বায়,
ঘর ছেড়ে' তাই বাহির হ'লাম—আর কে পাছে চায় ?
ঐ অজানার বাঁশীর গানে, ঐ অচেনার হাসির তানে,
আকুল হ'য়ে পথে এলাম ;—কূল গিয়াছে হায় !
আমারো গায় লেগেছে আজ ঐ ছোঁয়াচে বায় !

মাঠের পথে হাটের পথে আজকে যে এই চলা,
এ যে আমার সত্যি চলা—এতে যে নেই ছলা।
এ যে আমার হৃদির চলা, সাগর পানে নদীর চলা,
তীর্থ-পথের যাত্রী যেমন তীর্থ-কাজে যায়।
আমারো গায় লেগেছে আজ ঐ ছোঁয়াচে বায়।

খাঁচার পাখী চলেছে আজ বনের সবুজ-পানে—
পেছন হ'তে কে তাহারে কে রে অবুঝ টানে ?
প্রাণ চলেছে প্রাণের পানে, ঠেকায় কেরে প্রাণের টানে ?
অচল শাখী—আকাশ-পানে তার শাখা যে ধায়।
আমারো গায় লেগেছে আজ ঐ ছোঁয়াচে বায় !

ওড়্‌না আমার উড়ে' গেল—যাক্‌ না উড়ে' যাক্‌,
শুধু কেবল ঐ বাঁশীটি অম্‌নি সুরে গাক্‌।
ভালোবাসি, ভালোবাসি—ঐ অসীমার উদাস হাসি,
চল্‌ব এবার হারিয়ে সীমা—লাজ কি আছে তায় !
শঙ্কা-সরম সব যে গেছে ··কিই বা আছে হায় !

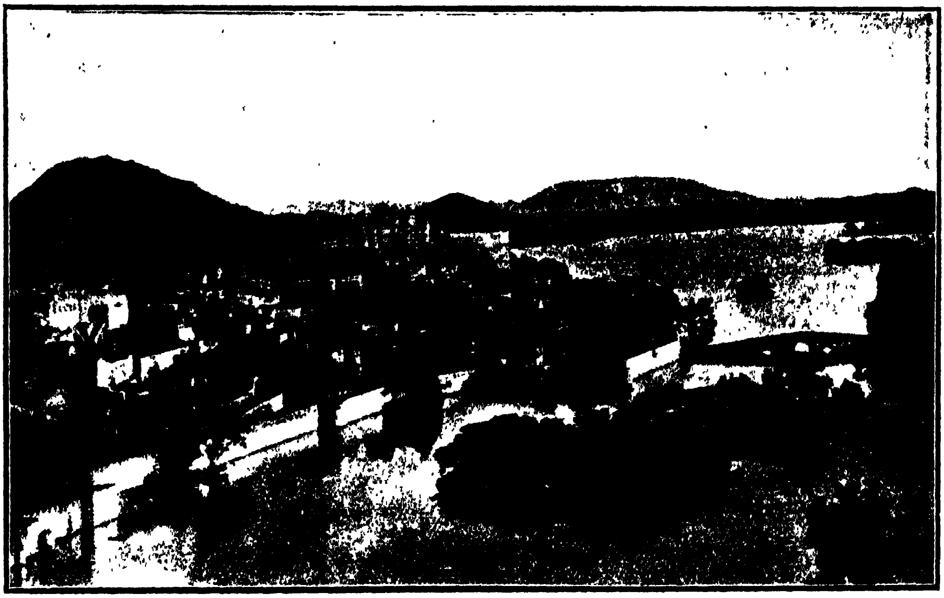
উদয়পুর

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ্-ডি

অপরাহ্নে চিতোর হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরে উদয়পুরে পৌঁছিলাম। চিতোর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়াই চলিলাম। রাজপুতানায়—বিশেষতঃ মেবারে—যে এত সুবিস্তৃত সমতল-ভূমি আছে, ইহা পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার পাহাড়ের রাজ্য দেখা দিল। চারিদিকেই কেবল পাহাড়—দক্ষিণে, বামে পাহাড় রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। অবশেষে সেই বিখ্যাত দেবারি গিরি-সঙ্কটে পৌঁছিলাম। এখানে দু'দিক হইতে দুটি উচ্চ পাহাড় প্রায় আসিয়া গায়ে গায়ে মিশিয়াছে। মাঝে অসমতল অতি সংকীর্ণ পথ—তাও পাহাড় কাটিয়া তৈরী। এই দেবারি গিরি-সঙ্কটই উদয়পুরকে শত্রুর নিকট দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। এখানেই রাণা রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের গতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ এই স্থানকে উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সেই গিরি-সঙ্কট-যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেবারি গিরি-সঙ্কটই উদয়পুরে প্রবেশের একমাত্র পথ। উদয়পুর হইতে এই গিরি-সঙ্কটের ব্যবধান ছয় মাইল।

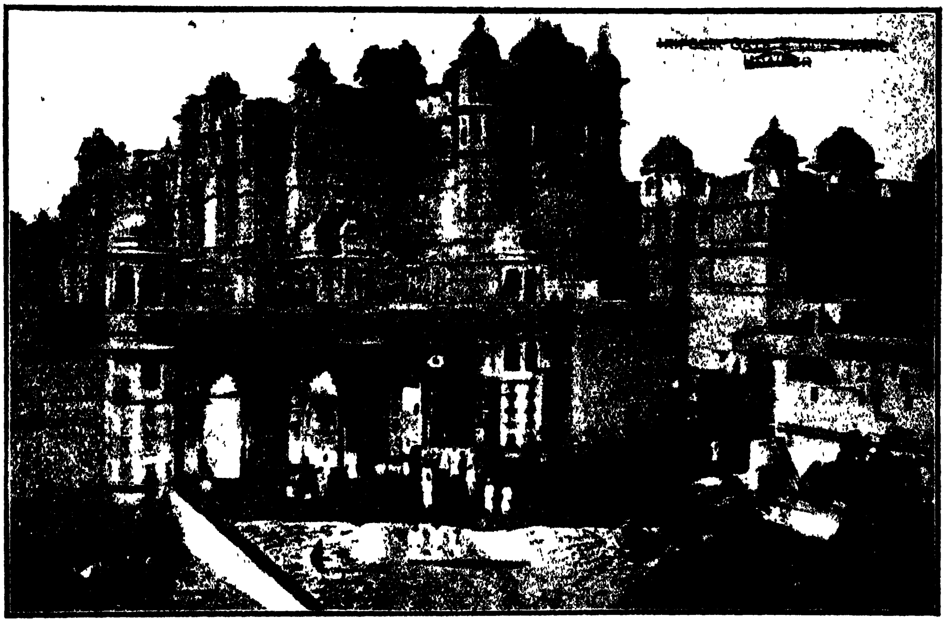
উদয়পুর সহরটি অপেক্ষাকৃত সমতল-ভূমির উপরই অবস্থিত—যদিও পাহাড়ের টিলা এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রায় সর্ব্বত্রই জমি উঁচু-নীচু। ইহার পার্শ্বেই উঁচু পাহাড়। সেখানে এখনও দুর্গের অবশেষ বিদ্যমান। উদয়পুরে কোন উঁচু টিলার উপর দাঁড়াইলে চারিদিকে কেবল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়—মনে হয় যেন সমকেন্দ্রবর্ত্তী কতকগুলি বৃত্তাকার গিরি-শ্রেণীর ঠিক মধ্যস্থলে উদয়পুর অবস্থিত। চিতোর মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলে, এই দুর্ভেদ্য সুরক্ষিত স্থানে মেবারের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ইহা চিতোর হইতে ৬০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

উদয়পুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহার



পিচোলা হ্রদ ও উদয়পুর

নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী হ্রদ ও গিরি-শ্রেণী ইহাকে অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে। পিচোলা ও ফতে-সাগর নামক দুইটি হ্রদের ধার দিয়া উদয়পুর সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই হ্রদের মধ্য হইতে একদিকে উদয়পুরের প্রাসাদাবলী, আর তিন দিকে নৈবেদ্যের মত পাহাড়শ্রেণী বড়ই সুন্দর দেখা যায়। হ্রদের ধার দিয়া-দিয়া বাঁধান পথ—পদব্রজে, অশ্ব-শকটে অথবা মোটর গাড়ীতে বেড়াইবার সুন্দর যায়গা। হ্রদের মধ্যে নৌকা করিয়া বেড়াইবারও ব্যবস্থা আছে।



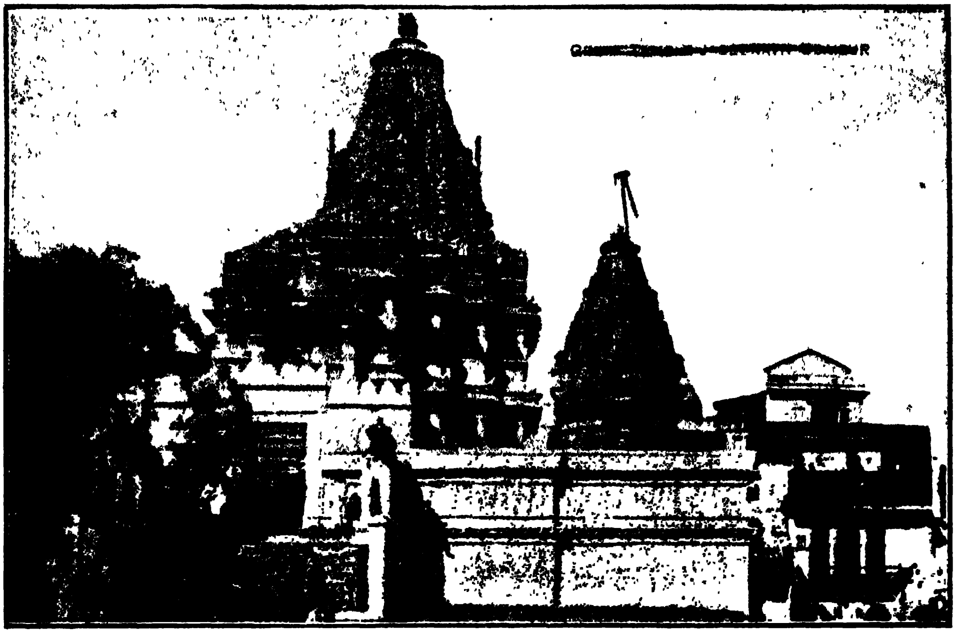
ত্রিপোলিয়া ফটক, গঙ্গোর ঘাট ও প্রাচীন রাজপ্রাসাদ

অপরাহ্নে এক নৌকায় পিচোলা হ্রদের মধ্য দিয়া চলিলাম। এই হ্রদের উত্তরাংশের নাম 'স্বরূপ-সাগর'। ইহার বাম দিকে 'সমসের গড়' এবং দক্ষিণ দিকে 'অম্বাও গড়' নামক দুইটি গিরিদুর্গ মারহাট্টাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মহারাণা দ্বিতীয় অরিসিংহ (১৭৬১-১৭৭৩) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারণ ইহার ঠিক নীচেই হাতি পোল এবং অম্বা পোল নামক নগরের দুই প্রবেশ-দ্বার। কিছুদূর গিয়া স্বরূপ-সাগরের দুই তীর প্রায় লাগালাগি হইয়া আসিয়াছে। এই সংকীর্ণ মুখ পার হইলেই পিচোলা হ্রদের দ্বিতীয় অংশে পৌছান যায়। ইহার নাম রঙ্গসাগর। এখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহা নানাজাতীয় পক্ষীর আবাসস্থান। এই রঙ্গসাগরের তীরেই একজন বিখ্যাত চারণ ও রাণার কুলপুরোহিতের বাটী—নৌকা হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। রঙ্গসাগর পার হইয়া একটি পোলের নীচে দিয়া গেলেই অমরকুণ্ডে পৌছান যায়। মহারাণা দ্বিতীয় অরিসিংহের (১৭৬১—১৭৭৩) মন্ত্রী বরুয়া অমরচাঁদের নামানুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই বিচক্ষণ রাজভক্ত মন্ত্রীর বুদ্ধিবলে সিন্ধিয়ার প্রবল আক্রমণ হইতে উদয়পুর রক্ষা পায়। অমরকুণ্ডের পরিসর খুব বেশী নহে। ইহার বাঁধান তীরে তীরে অনেক স্নানের ঘাট। দক্ষিণ দিকে মহারাণা ভীমসিংহের (১৭৭৮—১৮২৮ নির্ম্মিত ভীম পদ্মেশ্বরের মন্দির; আর জল-মধ্যে একটি দ্বীপে উপর মোহন-মন্দির। বামে আকাশের গায়ে একটি প্রকা রাজপ্রাসাদ। পূর্ব্বে যুবরাজ এই প্রাসাদে বাস করিতে বলিয়া ইহাকে 'কুণওয়ার পদে-কা মহল' বলে।

অমরকুণ্ডের পরেই প্রকৃতপক্ষে বিশাল পিচোলা হ্রদে আরম্ভ হইয়াছে। তবে পূর্ব্বোক্ত অংশগুলি পরস্পর সংল বলিয়া সমুদায় জলভাগকেই পিচোলা হ্রদ নামে অভিহি করা হয়। বাম দিকে ত্রিপোলিয়া ফটক ও গঙ্গোর ঘাট এখানে বসন্তকালে এক প্রকাণ্ড উৎসব হয়। মহারা

পারিষদ ও সামন্তবর্গের সহ শোভাযাত্রা করিয়া প্রাসাদ হইতে এই ঘাটে আসিয়া সুসজ্জিত প্রাচীন রাজ-তরণীতে আরোহণ করিয়া পিচোলা হ্রদে ভ্রমণ করেন। এই গঙ্গোর ঘাটের উপরেই জগদীশ অথবা জগন্নাথ রাইজীর মন্দির। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরেই মহারাণা প্রতাপসিংহের পিতা মহারাণা উদয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত উদয়শ্যামের মন্দির। ইহার নিকটবর্ত্তী এক বাটীতে বীর পত্তের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

পিচোলা হ্রদ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দূরে কোন দর্শক সসম্ভ্রমে ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছেন। এই কক্ষের আসবাব ও অন্যান্য উপকরণ বহু মূল্যবান। একখানি কাচের খাট; তাহার উপর ভেলভেটের শয্যা। কৌচ প্রভৃতিতেও মোটা কাচের পায়া। এগুলি শুধু দৃষ্টি-শোভার জন্য, কারণ—এই কক্ষ কেহ ব্যবহার করে না। বৃদ্ধ মহারাণা এখানে আসেন না; যুবরাজ প্রায় প্রত্যহই দ্বিপ্রহরে এখানে থাকেন। আমরা যখন যাই, তখন যুবরাজ দ্বিতলে তাঁহার কক্ষে ছিলেন। একটু পরেই বিচিত্র নৌকা-যাত্রা করিয়া তিনি জলপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন।



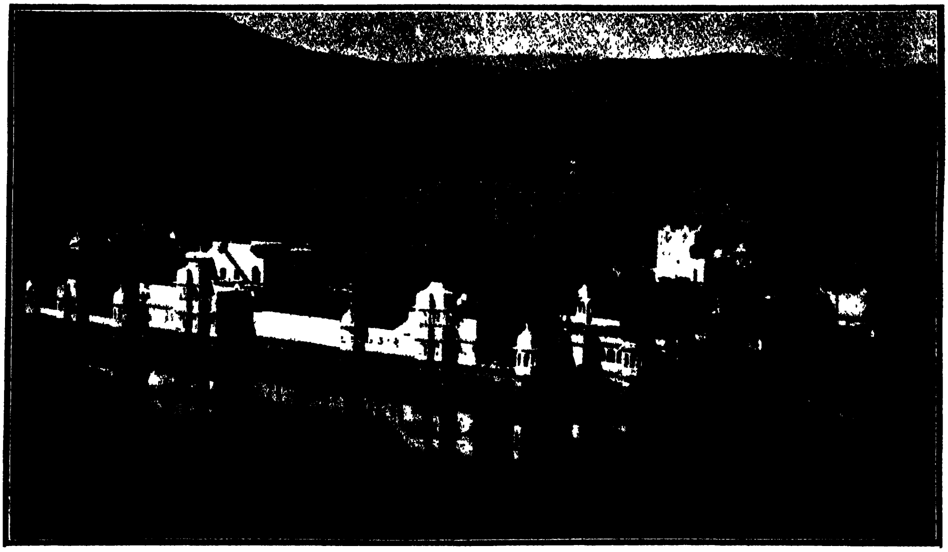
জগন্নাথ রাইজীর মন্দির—উদয়পুর

জগনিবাস দ্বীপ ও তাহার বিচিত্র প্রাসাদাবলী ছবির মত দেখা যায়। মহারাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ (১৭৩৪ ১৭৫১) এই জলপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। পরে মহারাণা সজ্জনসিংহ (১৮৭৪-১৮৮৪) ইহার উন্নতিসাধন করেন। এই জল-প্রাসাদটি উদয়পুরের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাতিবৃহৎ একটি দ্বীপকে ভিত্তি করিয়া একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাসাদের কক্ষগুলি ঠিক জলের উপরেই—ইহাদের সাজসজ্জা বহুমূল্য এবং প্রাচীরগুলি সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত। একটি কক্ষে বর্ত্তমান মহারাণার একটি সুন্দর প্রতিকৃতি দেখিলে হঠাৎ প্রকৃত মানুষ বলিয়াই মনে হয়। শুনিয়াছি কোন আমরা তাঁহার সদ্য-পরিত্যক্ত কক্ষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। এই কক্ষের গায়ে যে সুন্দর পদ্মফুল চিত্রিত আছে, তাহার তুলনা আর কোথাও দেখি নাই। প্রতি কক্ষপ্রাচীরই নানারূপ চিত্রে পরিশোভিত। ঘরের মেজে মার্ব্বেল পাথর ও নানা রংয়ের কাচে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে ফোয়ারায় জল উঠিয়া চতুর্দ্দিকের কক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। বস্তুতঃ স্থান-নির্ব্বাচন, গঠন-কৌশল ও সাজসজ্জার পারিপাট্যে এই জল-প্রাসাদটি একটি অপূর্ব শ্রী-মণ্ডিত হইয়া দর্শকের চক্ষে দেখা দেয়। হ্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি প্রাসাদ-প্রাচীরে প্রতিহত

হইতেছে। অদূরে এক দিকে শ্বেতবর্ণ বিশাল রাজপ্রাসাদ ও উদয়পুর নগরী; আর অপর তিন দিকে যতদূর চক্ষু যায় উঁচু নীচু পাহাড়ের রেখা ও তাহারই একটির মাথায় শ্বেত পারাবতের ন্যায় সজ্জনগড় প্রাসাদ—এই দৃশ্য একবার যে দেখিয়াছে সে আর সহজে ভুলিতে পারিবে না।

জগনিবাস দ্বীপ হইতে পুনরায় নৌকায় উঠিয়া দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই জগমন্দির দ্বীপ ও তাহার প্রাসাদাবলী। মহারাণা করণসিংহ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; এবং মহারাণা জগৎসিংহ (১৬২৮—১৬৫২) ইহা সম্পূর্ণ করেন। সৌন্দর্য্য, সাজসজ্জা ও শিল্পকলায় পূর্ব্বোক্ত কি না, সঠিক বলা যায় না। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ খুরম মহারাণার সহিত পাগড়ী বদল করিয়াছিলেন। এই পাগড়ীটি এখনও উদয়পুরের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। খুরমের মহিলাগণের বসবাসের জন্য যে হারেম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

জগমন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে একটি মুসলমান পীরের দরগা আছে। যুবরাজ খুরমের অবস্থানকালে ইহা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু উদয়পুর সরকার হইতে ইহার রক্ষা ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় এখানে দীপ জ্বালা হয়; এবং তাহার ব্যয়ও উদয়পুরের রাণাই নির্ব্বাহ করেন।



জগনিবাস প্রাসাদ (নিকটের দৃশ্য)

জগনিবাস প্রাসাদ অপেক্ষা এটি অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু এই প্রাচীন প্রাসাদটি ঐতিহাসিকের চক্ষে অধিকতর মূল্যবান। এই প্রাসাদের এক অংশ মোগল প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত। প্রবাদ এই যে, যুবরাজ খুরম (ভবিষ্যৎ সম্রাট শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল বিদ্রোহ করিয়া পলায়নকালে কিছুদিন উদয়পুরের মহারাণার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই বসবাসের জন্য প্রাসাদের এই অংশ মোগল-স্থাপত্য-রীতি অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। খুরম যে এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইহা সত্য; তবে তাঁহারই জন্য এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল

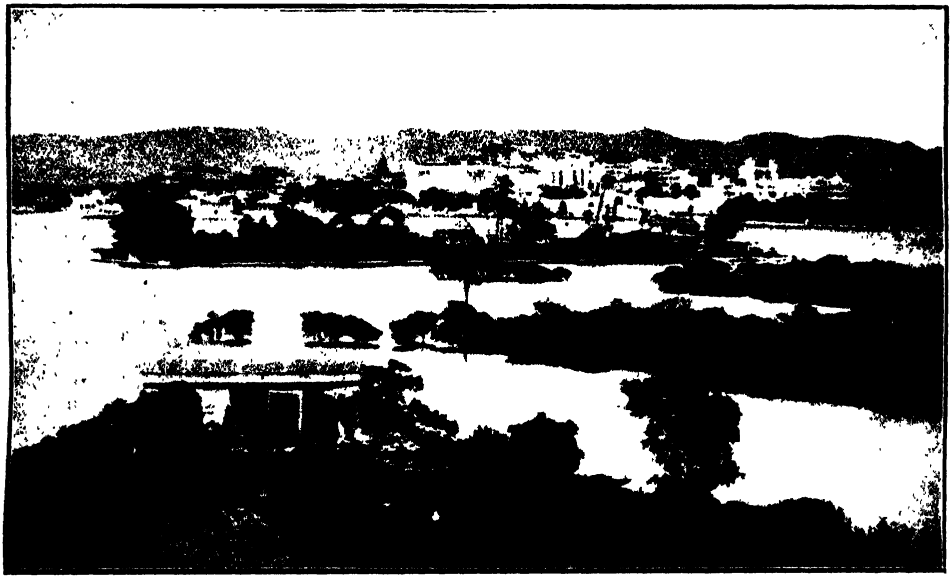
দুইশত বর্ষ পরে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে যে সমুদায় ইয়োরোপীয় নরনারী আত্মরক্ষার জন্য মহারাণার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও এই প্রাসাদে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

জগমন্দির হইতে পুনরায় নৌকা আরোহণ করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় পিচোলার অপর পারে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে সমুদায় উদয়পুরের একটি চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এখানে নৌকা হইতে নামিয়া, হ্রদের ধারে যে বাঁধান পাকা রাস্তা আছে তাহা দিয়া অশ্ব-শকটে অগ্রসর হইলাম। এই পথ বরাবর হ্রদের পার দিয়া একলিঙ্গ গড় ও রাজপ্রাসাদের

অভিমুখে গিয়াছে। অন্ধকারে নৌকাপথে না ফিরিয়া সান্ধ্য সমীর সেবন করিতে করিতে এই পথে ভ্রমণ বিশেষ সুখকর; বিশেষতঃ নূতন পথে নূতন দৃশ্য দেখা যায়। রাজপ্রাসাদ অতিশয় বৃহৎ; এবং ইহার কতকগুলি কক্ষ মূল্যবান ইয়োরোপীয় আসবাবে সজ্জিত। একটি কক্ষে ভূতপূর্ব্ব মহারাণাগণের তৈলচিত্র আছে। তন্মধ্যে রবি বর্ম্মার অঙ্কিত মহারাণা প্রতাপসিংহের তৈলচিত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক পুরুষোচিত মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না। উদয়পুর মিউজিয়মে মহারাণা প্রতাপসিংহের লৌহ বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, পায়জামা, বর্শা প্রভৃতি ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

প্রধান দুর্গ। উদয়পুরের নগর-প্রাচীর বরাবর এই পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়া ইহাকেও নগর-বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এই গিরিদুর্গের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। এককালে ইহার উপরে কামান বন্দুক ও লোকলস্কর থাকিত—এখন অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে লাট সাহেব বা মহারাণার শুভ আগমন উপলক্ষে এখান হইতে তোপ দাগা হয়।

উদয়পুরে আরও কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ফতেসাগর হ্রদের পারে 'শাহেলিওঁ—কি—বাড়ি' (ক্রীতদাসীর উদ্যান) একটি পরম রমণীয় উদ্যান। এখানে কয়েকটি



পিচোলা হ্রদের অপর পার হইতে উদয়পুরের দৃশ্য

রক্ষিত আছে। এই সমুদায়ের ওজন দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, রাণা প্রতাপসিংহ অতিশয় বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। উদয়পুরের কতকগুলি পাহাড়ের সহিত রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি বিজড়িত। কথিত আছে যে উদয়পুরে নগর পত্তন হইবার পূর্ব্বে চিতোর হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি এই সমুদায় পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইতেন। এতদ্ব্যতীত মহারাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি-বিজ্ঞাপক কোন চিহ্ন রাজপ্রাসাদে বা তাহার বাহিরে দেখি নাই।

রাজপ্রাসাদটি ঠিক পিচোলা হ্রদের তীরে। ইহার দক্ষিণে একলিঙ্গগড় নামে গিরিদুর্গ। ইহাই উদয়পুরের

উৎকৃষ্ট কৃত্রিম জলাধার আছে। ইহাতে অসংখ্য ফোয়ারা। একসঙ্গে সমস্ত ফোয়ারা খুলিয়া দিলে চমৎকার দেখায়। আর একটি জলাধারে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর পদ্ম ফুটিয়া আছে। ইহাতেও অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। তা ছাড়া ফল ও ফুলের গাছে বাগানখানি ভরা। ফুলের গাছগুলি কেয়ারি করিয়া সাজান—নানা পশু পক্ষীর আকার করিয়া কাটা। বাগানের মধ্যে ছোট একটি বাড়ী; ইহার কক্ষগুলি অপরূপ চিত্রশোভায় সজ্জিত। মহারাণা সর্দ্দারগণের সহিত মাঝে মাঝে এখানে আসেন এবং প্রাচীন রাজপুত প্রথামত তাঁহাদের সহিত ভোজন করেন। পিচোলা

হ্রদের তীরে প্রাসাদের নিকটে অর্জ্জুন-নিবাস নামক একটি রমণীয় উদ্যান আছে।

উদয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে 'মহাসতী' আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। চিতোর ধ্বংস হইবার পর এইখানেই মহারাণা, রাজবংশ এবং সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারগণের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়। প্রত্যেক মহারাণার চিতার উপরে একটি সুন্দর গম্বুজওয়ালা কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোনটি বেশ বড়; আবার কোনটি বা অপেক্ষাকৃত ছোট। যে সমুদায় রাণী স্বামীর চিতায় সহমরণে গিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিও রাণার স্মৃতি-ফলকের চতুর্দ্দিকে ক্ষোদিত আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে কোন কোন মহারাণার সঙ্গে ৭।৮টি মহিষীও সহমরণে গিয়াছেন।

সজ্জন-নিবাস উদ্যানের এক প্রান্তে 'ভিক্টোরিয়া হল'। ইহা একাধারে সাধারণ পাঠাগার, পুস্তকালয়, ও মিউজিয়ম। মিউজিয়মে অনেক মূল্যবান জিনিষ আছে। রাণা প্রতাপ-সিংহের ব্যবহৃত বস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র এবং খুরমের পাগড়ীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ভীলদের বসন-ভূষণ, উচ্চশ্রেণী রাজপুতের মস্তকাবরণ, হস্তিদন্ত, মিনা ও লাক্ষার কাজ, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক যন্ত্রপাতি, এবং মন্দিরে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির নমুনা সংগৃহীত দেখিলাম।

পুরাতত্ত্বের দিক হইতে মূল্যবান কয়েকটি জিনিষ এই মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। প্রায় ১৫।১৬ খানা শিলালিপি অযত্নে বারান্দায় পড়িয়া আছে। ঘোষুণ্ডির বিখ্যাত শিলালিপি ইহার অন্যতম। বারান্দায় যাইতে যাইতে ছোট একখণ্ড পাথরে কয়েকটি অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অক্ষরগুলি অতিশয় প্রাচীন—প্রায় অশোকের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হইল। এরূপ প্রাচীন শিলালিপি কোথা হইতে আসিল অনুসন্ধান করিলাম। সেখানকার কর্ম্মচারী বলিলেন চিতোরগড় হইতে। চিতোরগড়ে এরূপ প্রাচীন লিপি পাওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প; সুতরাং কথাটা বিশ্বাস হইল না। কিছুক্ষণ পরে বারান্দার অপর প্রান্তে রক্ষিত ঘোষুণ্ডি শিলালিপির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম যে, একই শ্রেণীর প্রস্তর এবং উভয়ের লিপিও এক প্রকার। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডও ঘোষুণ্ডি লিপির অংশ—এই ধারণাই আমার বদ্ধমূল হইল। পরে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের নিকট শুনিয়াছি যে, আমার ধারণাই ঠিক। ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে যে কয়েকটি অক্ষর আছে, তাহার মধ্যে 'অশ্বমেধ' এই কথাটি



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ (উত্তর-পূর্ব্বদিক হইতে)

স্পষ্ট পড়া যায়। সুতরাং লেখটি বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করিয়া, ইহার একটি ছাপ লইবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গে শুনিলাম যে, উদয়পুরের রাণা প্রত্নতত্ত্বের ঘোর বিরোধী। মিউজিয়ামের, বা বাহিরে অন্য কোন স্থানের কোন শিলালিপির ছাপ লইবার বা ইহা প্রকাশিত করিবার কোন হুকুম নাই। একজন পণ্ডিত উদয়পুর সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন; মহারাণার হুকুমে উহার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর একজন নবীন প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, তিনি মিউজিয়ামের প্রাচীন মূর্ত্তি ও শিলালিপি আছে। এই সমুদায়, এমন কি মিউজিয়মের অনেক শিলালিপিও, এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মহারাণার অদ্ভুত ধারণায় ইতিহাসের এই অমূল্য উপকরণগুলি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। আমি ঘোষুণ্ডির ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও আরও দুই একখানি প্রাচীন শিলালিপির ছাপ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারি নাই। শুনিলাম, পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের নিকট ইহার সবগুলির ছাপ আছে; এবং যদিও তিনি এগুলি প্রকাশ করিতে ভরসা পাইবেন না, তথাপি তাঁহার রাজপুতানার ইতিহাসে



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ—সম্মুখ ভাগ

চতুঃসীমানায় যাইতে পারিবেন না। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর এই মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ছিলেন; কিন্তু মহারাণার ভয়ে কোন শিলালিপি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি আজমীরে গিয়া ঐ সমুদায় শিলালিপির সাহায্যে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শুনিলাম, কোন একখানি প্রাচীন শিলালিপি প্রকাশের ফলে কোন অধীনস্থ সামন্ত সর্দ্দার কয়েকটি বিশিষ্ট অধিকার দাবী করিয়াছিল। এই জন্যই মহারাণা প্রাচীন ইতিহাস-চর্চ্চার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। উদয়পুরে এবং তাহার আশে পাশে বিশেষতঃ নাগদা নামক স্থানে অনেক তিনি এগুলির সদ্ব্যবহার করিবেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের সহিত আলাপ করিয়া আমারও এইরূপ ধারণা হইল।

বস্তুতঃ বৃদ্ধ মহারাণা ফতেসিং অতিশয় প্রাচীনপন্থী। তিনি ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী; কিন্তু মহারাজকুমার ভোপাল সিং একটু নব্যধরণের। তাঁহার চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা একটু একটু প্রসার লাভ করিতেছে। উদয়পুরে পর্দ্দার ভীষণ বাড়াবাড়ি। রাজমহিলাগণ সত্যসত্যই অসূর্য্যম্পশ্যা। মহারাণীরা যখন বাহির হন, তখন প্রথমতঃ তাঁহাদের পাল্কীটি একটি কাপড়ের থলের মধ্যে ভরা হয়। তার পরে মোটা কিংখাব কিংবা বনাত দিয়া এই বস্ত্রাচ্ছাদনের

চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে মুড়িয়া রাণীরা 'হাওয়া' খাইতে বাহির হন।

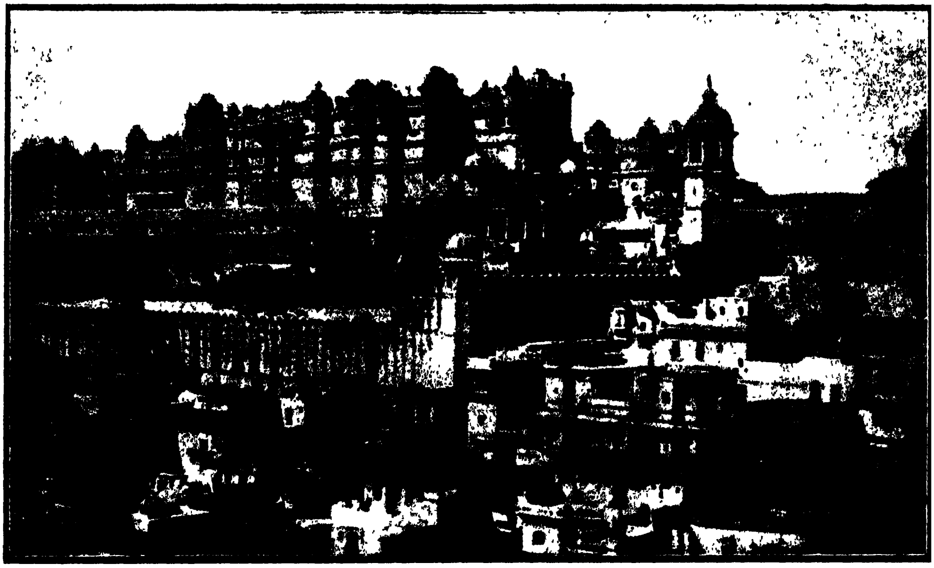
মহারাণা ফতে সিংএর বয়ঃক্রম প্রায় আশী বৎসর; কিন্তু এখনও বৎসরে তিন মাস তিনি শিকার করিয়া বেড়ান। তিনি প্রাচীন রাজপুত প্রথার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইতে দেন না। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী এখনও অধীনস্থ সামন্ত সর্দ্দারগণকে বৎসরে কয়েক মাস করিয়া উদয়পুরে বাস করিতে হয় এবং প্রত্যহ মহারাণার সম্মুখে হাজিরা দিতে হয়। সেখানে দ্বিপ্রহরে মহারাণার প্রাসাদেই প্রাচীন প্রথামত তাঁহাদের আহার করিতে হয়। মহারাণা প্রথমে অন্নস্পর্শ করিয়া দিলে ঐ অন্ন সর্দ্দারগণকে পরিবেশন করা হয়। রাজপ্রাসাদে কোন্ ব্যক্তির কোন্ পর্য্যন্ত হাতীতে অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার অধিকার আছে, কাহার বা পদব্রজে যাইতে হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে; এবং এগুলি বেশ কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হয়। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে প্রাসাদে যাইতেছিলাম। একটি ফটকের নিকট পৌছিলে আমাদের পথপ্রদর্শক তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া গেল; কারণ, তাহার অশ্ব-শকটে যাইবার অধিকার নাই।

মহারাণা ফতেসিং পোষ্যপুত্র হইলেও বাপ্পারাওয়ের বংশে ইঁহার জন্ম। বংশগত অভিমান ও মর্য্যাদা-বোধ ইঁহার বিলক্ষণ আছে। এ সম্বন্ধে উদয়পুরে অনেক গল্প শুনিয়াছি—সবগুলি লেখা সমীচীন নহে। দিল্লী দরবারে ইনি উপস্থিত হন নাই। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ যখন উদয়পুরে আসেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইনি ষ্টেশনে যান নাই। উভয় ঘটনা উপলক্ষেই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ। মাঝে একবার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; অতি কষ্টে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন; কিন্তু রাজক্ষমতা পরিচালনার ভার অনেকটা যুবরাজের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যুবরাজ পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও চলৎশক্তিহীন। অপরের সাহায্য ব্যতীত তিনি নড়িতে পারেন না। ইঁহার বয়স চল্লিশের অধিক; কিন্তু কোন সন্তানাদি নাই। সুতরাং অদূর-ভবিষ্যতে উদয়পুর ষ্টেট অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বৃটিশ রেসিডেন্টের হাতে আসিবে, ইহা একপ্রকার স্থির। অনেকে ইহাই উদয়পুরের উন্নতির একমাত্র আশা বলিয়া মনে করেন। আমি নিজেও এই মতের সমর্থন করি। বস্তুতঃ এই সমুদায় দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাপত্রের নমুনা দেখিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়। উদয়পুর রাজ্য এখনও মধ্যযুগেই আছে—নবযুগের আলোক এখনও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিছুদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিলে মধ্যযুগের সংস্কারের প্রাচীর আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। এইখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। উদয়পুর হইতে চিতোর পর্য্যন্ত যে রেলগাড়ী যায়, সেটি উদয়পুর রাজ্যের নিজস্ব সম্পত্তি। উদয়পুর হইতে চলিয়া আসিবার দিন আমরা যথা সময়ে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আছি—কিন্তু গাড়ী আর ছাড়ে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা পরে শুনিলাম যে, রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (জায়গীরদার, সামন্ত, সর্দ্দার বা ঐরূপ কিছু নহে—তার চেয়ে নীচু) সস্ত্রীক ঐ গাড়ীতে যাইবেন—তিনি আসিয়া পৌছিয়াছেন—কিন্তু তাঁর স্ত্রী আসিয়া পৌছান নাই। ক্রমে একঘণ্টা কাটিয়া গেল—তবু তাঁর স্ত্রীরও দেখা নাই—গাড়ীও ছাড়ে না। অবশেষে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী করিয়া এই স্ত্রীরত্নটিকে লইয়া রেলগাড়ী ছাড়িল। আমাদের দেশে কমিশনার সাহেব এমন কি কাউন্সিলের সদস্য অথবা মন্ত্রীর জন্যও কোন রেলগাড়ী ১৫ মিনিট থামিবে কি না সন্দেহ।

রাজপুত জাতির সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করিয়া উদয়পুর গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, সবই ভুয়া। বাঙ্গালা দেশে রাজপুতের ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান বা চর্চ্চা আছে, উদয়পুরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। আমি একজন চারণ কবির নিকট প্রাচীন গাথা শুনিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম। শুনিলাম চারণ শ্রেণী এখন লুপ্তপ্রায়। প্রাচীন চারণের বংশধরগণ টেনিস্ খেলায় বিশেষ পটু; কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেকেরই ধারণা আছে যে, রাজপুতানার অধিবাসী মাত্রই রাজপুত—বস্তুতঃ তাহা নহে। রাজপুত একটি শ্রেণীর নাম মাত্র। প্রত্যেক রাজপুত এখনও সর্ব্বদা একখানি তরবারি সঙ্গে রাখে; এইজন্য কে রাজপুত তাহা সহজেই চেনা যায়। উদয়পুরের রাস্তায় রাজপুত দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নহে। তাহাদের হাতে তরবারি আছে বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় না যে, আবশ্যক হইলে তাহারা ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে অনেক বড়

লোকের দেউড়ীতে যেমন বন্দুকধারী সিপাহী থাকে, এখানে রাজপুতদের দেখিলে সেই রকম মনে হয়। বস্তুতঃ একটা মহৎ জাতির অধঃপতন যে কত দ্রুত হইতে পারে, রাজপুতদের দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। রাজপুত জাতির সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চ ধারণা আছে—রাজপুতানায় আসিলে তাহা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া যায়। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই—কিন্তু খুবই সত্য। শিক্ষাদীক্ষায়, মনুষ্যত্বে ইহারা অতীত কালের তুলনায় কত হীন—অথচ রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা খুব বেশী দিন ভোগ করে নাই। দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ প্রভৃতি যে সমুদায় গুণাবলী প্রাচীন রাজপুতের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেও হয়। ইহাদের সাহিত্য নাই; ইতিহাস নাই; কোন মহৎ ভাবপ্রবাহ ইহাদিগকে আন্দোলিত করে না। কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখাই এখন ইহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। ভবিষ্যতে যে ইহারা আবার বড় হইতে পারিবে না আমি এ কথা বলি না; কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ও বড় রকমের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে এরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে; তবে অবশ্য প্রথমে কতকটা কুফল অবশ্যম্ভাবী। যদি অন্য কোন উপায়ে এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়, তবে ভালই; নচেৎ কিয়ৎকালের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসা ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না। মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি রাজ্যে ব্রিটিশের প্রভাবে নূতন প্রণালীর শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুতানায়ও অনুরূপ ফলের আশা করা যায়। কিন্তু যে উপায়েই হউক, মধ্যযুগের গণ্ডীর বাহিরে না আনিতে পারিলে, রাজপুতানার উন্নতির সম্ভাবনা নাই—এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

উদয়পুরে যে দুইজন রাজমন্ত্রী আছেন, তাঁহার মধ্যে একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম প্রভাসচন্দ্র চাটার্জী। উদয়পুরে প্রবাসকালে আমরা ইঁহার অতিথি ছিলাম। ইনি আমাদের উদয়পুর ভ্রমণের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃপায় সরকারী জুড়িগাড়ী ও নৌকায় স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়াছি। আমার পূর্ব্বে অন্যান্য বাঙ্গালীরাও ইঁহার আতিথেয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার এই আতিথেয়তার ও সৌহৃদ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমার উদয়পুর-কাহিনীর উপসংহার করিলাম।



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ ও সহরের দৃশ্য

ছেঁড়া ডায়েরী

শ্রীনির্ম্মল দেব

১৩ই বৈশাখ—উঃ, কী তীব্র ভীষণ রোদ! চতুর্দ্দিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু ধূ ধূ ক'রছে শুষ্ক-শীর্ণ মাঠ,—কোথাও একটু সবুজের চিহ্নমাত্রও নেই! ওই রিক্তা শূন্যা বিধবা ধরণীর পানে চেয়ে চেয়ে মনে হ'চ্ছে, যেন ও আমার সই,—আমারই মত ওর বুকের সব সবুজ রেখা নিঃশেষে মুছে গেছে! আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ক্লান্ত-চক্ষে ও যেন চেয়ে আছে উর্দ্ধে অকরুণ আকাশের পানে—চাইছে শুধু একটা বিন্দু করুণার বারি! ওরই নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে যেন এই বাতাস আজ তপ্ত হ'য়ে উঠেছে!

আজকের এই তারিখটাকে কি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না? সেই কবে এগারো বছর বয়সে পুতুল-খেলারই মতন একদিন আমাদের বাড়ীতে কত আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো, বাইরে দেউড়ীতে সানাই বাজ্‌তে লাগ্‌লো, নিমন্ত্রিতের কোলাহলে ঘর-দোর মুখর হ'য়ে উঠলো;—কত শাঁখের আওয়াজ, কত উলু-ধ্বনি, কত কৌতুক উচ্ছ্বাস! সেই সম্প্রদান-সভা, সেই মন্ত্র-পাঠ, সেই একখানি অজানা-অচেনা হাতের কম্পিত পরশ!—সেদিনের প্রত্যেকটি ঘটনা ছায়াচিত্রের মতন একটির পর একটি আজও আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সব চেয়ে মনে পড়ে সেই শেষ-রাত্রে একবার ছল ক'রে বাসর-ঘর থেকে উঠে এসে ওপরে তেতলার নির্জ্জন ঘরে বড় আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ার পানে বিহ্বল-নয়নে চেয়ে থাকা,—খোঁপায় গোঁজা কাজল-লতা, সিঁথি-জোড়া সেই লাল টক্‌টকে সিঁদুর-রেখা! ছোট ছেলের প্রথম রেলগাড়ীতে চড়ার মতন কী অদম্য কৌতূহলে আয়নায় নিজের সেই বিচিত্র নূতন মূর্ত্তির পানে চেয়েছিলুম!—সে যেন কী এক বিরাট রহস্য! তা'রপর তিনটা মাসও কাটেনি,—সেই উৎসবের গন্ধটুকু ফুরোতে না ফুরোতেই কখন একদিন বাড়ীতে কান্নার রোল উঠ্‌লো, কেমন যেন একটা কালো ছায়া বাতাসে থম্‌থম্‌ ক'রতে লাগ্‌লো, মা চোখে আঁচল ঢেকে আমার হাতের শাঁখা-নোয়া খুলে নিয়ে কপালের সেই সিঁদুরটুকু মুছে দিলেন!—কী যে হ'লো, কিছুই ভালো ক'রে বুঝতে পারলুম না, শুধু স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম!......তা'রপর দীর্ঘ সাতটা বছর কেটে গেছে,—কত ঝড়, কত জল, কত রোদ, কত হিম! তবু কি সেই পোড়া দিনটা মনের মধ্যে একটুও ক্ষ'য়ে গেল না!—এমনি ক'রে, একটা নিদ্রা-বিরল রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত কি সে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমার জীবনে লেপে থাকবে!

* * *

১৯শে বৈশাখ—এত ক'রেও পাখীর ছানাটাকে বাঁচাতে পারলুম না!—সে ম'রে গেল! কাল সন্ধ্যা-বেলা সেই ক্ষুদ্র প্রলয়ের পর ইচ্ছা হ'লো বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির মূর্ত্তিখানা একবার দেখে আসি। ঝড় থেমে গিয়ে চতুর্দ্দিক তখন শান্ত উদাস—চিতা নিভে যাওয়ার পর শ্মশানের মত! তুলসী-মঞ্চের পাশে দেখলুম একটি আহত পাখীর ছানা মাটির ওপর প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। তা'র মা কতদিন ধরে ঘুরে ঘুরে একটি একটি ক'রে কুটো সংগ্রহ ক'রে এনে তা'র সন্তানের জন্য একটি সামান্য বাসা বেঁধেছিল। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সেই বাসাটিকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছানাটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। তা'কে বুকে তুলে নিয়ে দেখলুম সবেমাত্র তা'র চোখ-দু'টি ফুটেছে,—বোধ হয় কালই প্রথম ভোরের আলো এসে তা'র সদ্য-উন্মীলিত চোখকে স্পর্শ ক'রেছিল, কালই সে প্রথম চেয়েছিল এই বিচিত্র বিশ্বের পানে তা'র বিস্মিত নয়ন মেলে! তা'রপর সে দিনের আলো নিভ্‌তে না নিভ্‌তেই তা'র সব দেখা ফুরিয়ে গেল! বুকে ক'রে বাড়ীতে এনে সারা রাত ধ'রে কত চেষ্টা ক'রলুম তা'কে বাঁচাতে, কিন্তু সে বাঁচ্‌লো না—চ'লে গেলো।

আজ সারাদিন কেবলই মনে হ'য়েছে—ওই যে একটা অতি অসহায় নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণ, জীবনের দুয়ারে পা বাড়াতে

না বাড়াতেই এমন ক'রে মরণ-পারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল,—না ফুটলো তা'র কণ্ঠের গান, না ছড়ালো তা'র অধীর ডানা মুক্ত উদার আকাশ পানে, এত বড় অপরাধ কার ?—ওই ঝড়ের, না যে তা'কে সৃষ্টি ক'রেছিল সেই বিধাতার ? না, না, অপরাধ কারুরই নয়,—অপরাধ তা'রই, যে ঝড়ে উড়ে যায় !

*   *   *

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—আজ বিকেলে শচীশ-দা'কে দেখতে গেছলুম। মাত্র একুশটি বৎসর তা'র বয়স ; এরই মধ্যে তা'র খেলা-ঘর গোটাবার পালা প'ড়েছে !—জীবনের বোধন-মন্ত্র থামতে না থামতেই তা'র বিসর্জ্জনের রাগিণী বেজে উঠেছে !

নির্জ্জন ঘরে বিছানায় সে চুপটি ক'রে শুয়েছিল। বাইরে তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে,—রৌদ্র-দগ্ধ আকাশটা গেরুয়া রঙে ছেয়ে গেছে। বাঁ পাশ ফিরে হাতের ওপর শীর্ণ গালটি রেখে শিয়রের খোলা জান্‌লার ফাঁক দিয়ে সেই গৈরিক সন্ধ্যাকাশের পানে নিষ্পলক নয়ন মেলে নিস্পন্দ হ'য়ে সে শুয়ে ছিল,—কি ভাব্‌ছিলো সেই জানে ! আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখেই তা'র নিষ্প্রভ মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, ব'ললে—"নন্দা, এসেছো !"

আমি কিছু না ব'লে আস্তে আস্তে তা'র বিছানার পাশে গিয়ে মেজের ওপর ব'সলুম।

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে ব'ললে—"আজ ডাক্তার কি ব'লে গেছে জানো, নন্দা ?—আর কোনোই আশা নেই, মিথ্যা চেষ্টা !"—এই ব'লে এমন একটা বীভৎস হাসি হাস্‌লে যে, আমার দেহ মন দু'টোই একসঙ্গে শিউরে উঠ্‌লো ! জীবনের শেষ প্রভাতে বধ্য-ভূমিতে দাঁড়িয়ে ফাঁসির আসামী নাকি কখনো কখনো হাসে শুনেছি। সে হাসির মূর্ত্তি কখনও দেখিনি, কিন্তু মনে হ'লো যেন এ হাসি ঠিক তেম্‌নি ধারা !

চ'লে আস্‌বার সময় আমার উন্মনা মুখের ওপরে দু'টি উৎসুক চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে শচীশ-দা' ব'ললে —"খেয়া এসে ভিড়তে যে-ক'টা দিন দেরী আছে, এমনি ক'রে মাঝে মাঝে আমার সামনে এসে একবার দাঁড়িও, নন্দা !"

...   .

এই গভীর রাতে থেকে থেকে আমার বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে অলক্ষ্য বিধাতার উদ্দেশে কেবলই এই ক্রুদ্ধ প্রশ্ন জাগছে—অন্ধ নিয়তির খেল্‌না ক'রেই যদি মানুষকে গ'ড়তে চেয়েছিলে, তবে তোমার সৃষ্টির অসংখ্য প্রাণীর মত শুধু একটা জীবন্ত প্রাণী ক'রেই তো তা'কে গ'ড়লে পারতে,—তা'র বুকের মধ্যে এত বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভ'রে দিয়েছিলে কেন, নিষ্ঠুর !

*   *   *

১১ই আষাঢ়—বর্ষার কাজল মেঘে সারা আকাশটা নিঃশেষে ছেয়ে গেছে,—এখনই উন্মাদ বর্ষণ সুরু হবে ! আষাঢ়ের মেঘে নাকি মানুষের মনের গোপন বিরহ-ব্যথা জেগে ওঠে। কিন্তু যে কোনোদিন কিছু পেলে না, হারানো সুখের স্মৃতির সম্বলটুকুও যে তা'র নেই ! এমন ব্যাকুল বাদল-সাঁঝে সে যে নিতান্তই নিঃস্ব, নিতান্তই দরিদ্র ! .....

*   *   *

৯ই শ্রাবণ—পোড়া চোখে কি আজ ঘুম আস্‌বেই না ? রাত বারোটা, একটা, দু'টো একে একে বেজে গেলো, তবু এ অশ্রান্ত চোখ-দুটো একবার জ'ড়িয়েও এলো না ! এম্‌নি ক'রে, বাইরের ওই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই কি আজ সারা রাতটা কেটে যাবে ?

কী সুন্দর কালো অন্ধকার !—কোথাও ওর একটু ফাঁক নেই ! অন্ধ মানুষ চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়, আঁধারের এমন মোহন রূপ দেখবার চোখ তা'র নেই। আলোর যে শেষ আছে,—সে যে ফুরিয়ে যায় ! কিন্তু অন্ধকারের তো শেষ নেই, সে যে আদি-অন্ত-হারা !—ফুলশয্যার রাতে নব-বধূর স্পন্দিত হিয়ার মত তা'র বুকের মধ্যে কত গোপন রহস্য ভরা ! ওগো স্তব্ধ মৌন আকাশ, উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে ওই দৃষ্টি-হারা আঁধারের লজ্জা-বস্ত্রের নীচে আমাদের এই নিরালা শুভদৃষ্টি !—আমাদের অন্তর-পটে তা' চিরদিন আঁকা থাক !

খোলা জান্‌লা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমার গালের ওপর, ঠোঁটের ওপর, বুকের ওপর ছ'ড়িয়ে প'ড়ছে। বিছানা-কাপড় সব ভিজে গেল, তবু জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে দিতে ইচ্ছে ক'রছে না। ওই বৃষ্টি-ধারার হিম স্পর্শে কী মাদকতা

আছে জানি না, আমার সমস্ত দেহ যেন ও বিহ্বল ক'রে তুলছে!—মনে হ'চ্ছে এই সুপ্ত নিবিড় নিশীথ-রাতে কেউ কি তা'র সহস্র ব্যগ্র বাহু মেলে এমন দুর্দ্দান্ত আবেগে আমার এই অনাবৃত বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না!—ছি, ছি, এ কি। আমি যে—! এ প্রলাপ শুনলে সমাজ যে কাণে আঙুল দেবে!

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য!—যে জ্ঞানী পণ্ডিতরা এই বিধান সৃষ্টি ক'রেছিলেন, তাঁদের মনে কি ছিল, তা' তাঁ'রাই জানেন। শুনেছি নাকি সমাজের কল্যাণের জন্যে এই বিধান। কিন্তু পুরুষ ও নারীর প্রেম—যে ঐশ্বর্য্যকে সম্বল ক'রে সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাতে অপরিচ্ছিন্ন ক্রম-বিকাশের পথে মানব তা'র মহাযাত্রায় রওনা হ'য়েছিল, যা'র সূত্র ধ'রেই মানুষের জীবনে ধর্ম্ম ও সমাজ ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হ'য়েছে, যা'কে কেন্দ্র ক'রেই মানব-প্রাণের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মহত্ত্ব, সমস্ত উদারতা বিকশিত হ'য়ে উঠেছে,—সে প্রেমকে শুষ্ক-নীরস বিধি-বিধানের চাপে সর্ব্বদিক থেকে নিষ্ফল ক'রে দিয়ে সমাজের আর যা'ই হো'ক, কল্যাণ তা'তে নেই—নেই—নেই!

* * *

১১ই ভাদ্র—অনেকদিন পরে বর্ষণ-শ্রান্ত আকাশে শরতের নীল আভা ছ'ড়িয়ে প'ড়েছে! কান্না থেমে গিয়ে মুখে হাসি ফুটলেও চোখের কোণে অশ্রুর ম্লান দাগটুকু যেমন ক'রে জেগে থাকে, ওই স্বচ্ছ নীল আকাশের কোলে শুভ্র খণ্ড-মেঘগুলো ঠিক তেমনি ক'রে ভেসে যাচ্ছে। আকাশের ওই মূর্ত্তি যেন মানব-জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি,—ওম্‌নি রোদ, ওম্‌নি মেঘ, ওম্‌নি হাসি, ওম্‌নি অশ্রুর আল্‌পনা!

* * *

২৩শে ভাদ্র—ওই পাশের বাড়ীর দরিদ্র পরিবারটি আমায় কী যে গুণ ক'রেছে জানি না—দিন-রাত ঘুরে ফিরে কেবলই এই তেতলার জান্‌লায় দাঁড়িয়ে নীচে ওদের ঘরের দিকে চেয়ে থাকি। স্বামী, স্ত্রী ও একটি তিন-বছরের ছেলে—এই নিয়ে ওই ছোট্ট সংসার। একতলায় দু'খানি ছোট অন্ধকার কুঠ্‌রী ভাড়া নিয়ে ওরা বাসা বেঁধেছে। স্বামীটি কি-একটা সদাগরী আপিসে বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি খেটে তিরিশটি টাকা মাইনে পান। তা'ইতেই কোনোদিন খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে ওই আড়াইটি প্রাণীর দিন কাটে। ভোর-বেলা উঠে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে, রান্না সেরে, বেলা ন'টার সময় আঁচল দিয়ে মেজেটা মুছে পিঁড়ি পেতে স্বামীকে আপিসের ভাত দিয়ে ছেলে-মানুষ বৌটি যখন পাশে ব'সে স্বামীকে পাখার বাতাস করে, তখন তা'র দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ-দু'টো ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে জান্‌লা থেকে স'রে আসি। দুপুর-বেলা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ছুঁচ-সুতো নিয়ে পা ছ'ড়িয়ে কোলের ওপর স্বামীর ছেঁড়া জামাটি কাপড়টি রেখে যখন সে সেলাই ক'রতে বসে, তখন ইচ্ছা করে একবার ছুটে গিয়ে ওর পা দুটিতে একবার মাথাটা ঠেকিয়ে আসি। বিকেলে ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে, বাসন-কোসন মেজে, কাপড় কেচে এসে চুলটি বেঁধে আয়নার দিকে চেয়ে যখন সে চিরুণীর আগায় সিঁদুরটুকু রেখে নিজের হাতে সিঁথির ওপর টেনে দেয়, তখন······!

* * * *

১৩ই আশ্বিন—আজ বুঝতে পারলুম দৈন্য-দারিদ্র্যকে দুঃখ ব'লে যা'রা অভিযোগ করে, তা'রা কতদূর ভ্রান্ত! সত্যিকারের দুঃখ দৈন্যে নয়, দারিদ্র্যে নয়, অভাবে নয়, অনটনে নয়। সত্যিকারের দুঃখ সেইখানে, যেখানে মানুষ নিজের স্থূল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আছে,—সেখানে তা'র ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সত্তাকে অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর ত্যাগের সত্তার মধ্যে সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি!

আজ সকালে যখন পাশের বাড়ীর বৌটি প্রতিদিনের মতন পাখা-হাতে স্বামীকে খাওয়াতে ব'সলো, তখন স্বামী পাতের দিকে চেয়ে অনুযোগের স্বরে ব'ললেন—"হ্যাঁগা, কী নিষ্ঠুর তুমি বল ত! সব ভাতগুলি আমায় এনে দিয়েছো! হাঁড়িতে আর কিছু নেই আমি দেখেছি, আর, ঘরে যে একটা খুদও নেই, তা'ও আমি জানি।" বৌটি স্নিগ্ধ হেসে সহজ-কণ্ঠে উত্তর দিলে—"আজ আমার একটা ব্রত আছে,—কিছু খেতে নেই।" স্বামীও প্রত্যুত্তরে ব'ললেন—"আমারও আজ একটা ব্রত আছে,—পেট ভ'রে খেতে নেই।"—এই ব'লে অর্দ্ধেকগুলি ভাত খেয়ে বাকী অর্দ্ধেকগুলি স্ত্রীর জন্যে সযত্নে সরিয়ে রেখে উঠে প'ড়লেন। আঁচিয়ে আসতে বৌটি ক্ষুণ্ণ-স্বরে ব'ললে—"এ ব্রত তোমার কবে উদ্‌যাপন হবে?" পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি হেসে দু'হাত

বাড়িয়ে স্ত্রীকে সস্নেহে বুকে টেনে এনে স্বামী উত্তর দিলেন—"মাস-কাবার হ'লে।"

জান্‌লায় দাঁড়িয়ে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য বিমুগ্ধ-নয়নে চেয়ে দেখলুম! আঁচলে ভিজে চোখ-দু'টো মুছে বৌটির উদ্দেশে মনে-মনে ব'ললুম—"আমি মরবার আগে তোমার ওই পায়ের ধুলো একবার আমার মাথায় দিয়ে যেয়ো, বোন!—যেন পর-জন্মে ওম্‌নি ক'রে বার-ব্রতর ছল ক'রে নিজেকে উপবাসী রেখে অমন হাসি-মুখে দরিদ্র স্বামী-পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারি!"

* * *

২৭শে আশ্বিন—ওপরে অম্লান নীল আকাশ, নীচে ধরিত্রীর বুকে সবুজের সমারোহ! ধানের থোড় হ'য়েছে, এইবার ফুলের শীষগুলি ফুটে উঠবে,—অন্তঃসত্ত্বা তরুণীর লাজ-নম্র হাসিটুকুর মত কী নিবিড় সার্থকতার আনন্দে তাই ওই সবুজ পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!

আজ পূজার সপ্তমী। দিকে দিকে বোধনের বাদ্য বাজ্‌ছে। কত বিরহিণী বধূর সারা বৎসরের পথ-চাওয়া প্রতীক্ষা আজ সার্থক হ'য়েছে! তা'দের অদম্য আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন কোন্ অদৃশ্য কল্পলোক হ'তে আমার চিত্ত-সৈকতে এসে ছ'ড়িয়ে প'ড়ছে—অন্ধকার বালু-তটে উদ্দাম সমুদ্র-তরঙ্গের মত!

... ...

বিকেলে শচীশ-দা'কে দেখ্‌তে গেছলুম। তা'র দিকে আর যেন চাইতে পারি না! সেই সুন্দর সবল যৌবন-দীপ্ত দেহখানি ধীরে ধীরে আজ শুধু একটা জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হ'য়েছে—ছিন্ন-তার বীণার ক্ষীণ রেশের মত! আমি যে কখন তা'র সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে টেরই পেলে না। খোলা জান্‌লার ভিতর দিয়ে বাইরে সায়াহ্নের স্তিমিত আকাশের পানে সে চেয়ে ছিল,—আসন্ন-সন্ধ্যায় নদী-তীরে সঙ্গীহীন পারের-যাত্রীর মত এ-পারের বেচা-কেনার হাটের চিন্তা বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়ে এখন যেন শুধু ওর মনে জাগ্‌ছে ও-পারের সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা ঘরখানি! আমি আস্তে-আস্তে তা'র শিয়রে গিয়ে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লুম।

আমার স্পর্শে তা'র চমক ভাঙলো, ব'ললে—"আজ সপ্তমী পূজা—না, নন্দা?"

আমি ব'ললুম—"হ্যাঁ।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল-কণ্ঠে ব'ললে—"আমায় ধ'রে একবার নিয়ে যাবে নন্দা, ঠাকুর দেখে আসি?"

আমি ব'ললুম—"তুমি যে বড় দুর্ব্বল, উঠ্‌তে পারবে না তো! তা'র চেয়ে রাত্রে আরতি হ'য়ে গেলে আমি তোমায় মা'র প্রসাদী ফুল এনে দেবো।"

একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে সে ব'ললে—"সে-ই ভাল, তুমি নিজের হাতে ফুল এনে আমার কপালে ছুঁইয়ে দিও,—আমি তোমার জন্যে জেগে থাকবো।"

তা'রপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে যেন ঘুমের ঘোরে আপন-মনে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আসছে বছর আবার যখন এই পূজা ঘুরে আসবে, আবার এম্‌নি ক'রে চারদিকে উৎসবের বাদ্য বাজ্‌বে,—তখন আমি কোথায়, নন্দা?"

উদ্গত অশ্রুকে চোখের কোণ হ'তে সজোরে ঠেলে দিয়ে আমি শান্ত-কণ্ঠে ব'ললুম—"তখন তুমি স্বর্গে—ভগবানের চরণে!"

সহসা আমার হাতখানাকে টেনে নিয়ে শীর্ণ বুকের ওপর চেপে ধ'রে ক্ষীণ আর্ত্ত-স্বরে সে ব'লে উঠ্‌লো—"না, না, নন্দা! আমি স্বর্গ চাই না! আমি এই শোক-তাপের জগতেই আবার ফিরে আসতে চাই, এই হাসি-কান্নার মাঝেই আবার এমনি ক'রে তোমায়—।" শেষ ক'রতে পারলে না,—কাশ্‌তে কাশ্‌তে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো!

* * * *

৩০শে আশ্বিন—বিজয়া দশমী!—আজ বাতাসে শুধু নিঃশব্দ বিদায়-রোদন! এম্‌নি ক'রে যুগে যুগে, মানুষ একদিন কত সমারোহের মাঝে যে প্রতিমার বোধন ক'রে, পূজা সাঙ্গ হ'লে উচ্ছ্বসিত চোখের জলে আবার একদিন তা'কেই নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে!

রাত্রে শচীশ-দা'কে প্রণাম ক'রতে গেছলুম। গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে যখন তা'র পায়ের ধুলো মাথায় নিলুম, তখন গাঢ়-স্বরে সে ব'ললে—"নন্দা, যদি আবার নারী হ'য়ে জন্মাও, তবে যেন ঠিক এম্‌নি প্রাণ নিয়েই ফিরে আসো,—আজকের দিনে এই-ই তোমায় আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ!"

*   *   *   *

১৯শে কার্ত্তিক—শরতের নীল আভা একেবারে মুছে গেছে, এখন আকাশে অলস হেমন্তের ধূসর ম্লানিমা! মাঠে মাঠে ধানের কাঁচা শীষগুলি হাওয়ায় দুলছে—চারিদিকে ফসলের আভাস। এরই আয়োজন চ'লেছিল সারা বৎসর ধ'রে—গ্রীষ্মের উন্মাদ উত্তাপে, শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণে, শরতের মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরীতে! পরিপূর্ণ সংসারের মাঝখানে বিগত-যৌবনা জননীর মত ধরণীর মূর্ত্তি আজ শান্ত অচঞ্চল।

আজ সন্ধ্যার পর যখন শচীশ-দা'র কাছে গেলুম, তখন খোলা জান্‌লা দিয়ে দূরে আমাদের চারতলার ছাদে উঁচু আকাশ-প্রদীপটাকে নির্দ্দেশ ক'রে ব'ললে—"দেখ নন্দা! তোমার আকাশ-প্রদীপটা আমার এই বিছানা থেকে কী চমৎকার দেখায়! আমি ওই দিকে চেয়ে সারা রাত জেগে থাকি, হিমের ভয়েও জান্‌লা বন্ধ ক'রতে দিই না।"

ক্ষণেক থেমে ব'ললে—"তোমার ওই প্রদীপটার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার কত রকম মনে হয় জান, নন্দা!—এক-একবার মনে হয় ওটা যেন এ পৃথিবীর আলো নয়—আকাশের ওই অগণিত তারারই একটা, অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে পৃথিবীর দিকে নেমে প'ড়েছে, এখন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত-চক্ষে ফিরে যাবার পথ খুঁজছে,—ঠিক যেন তোমারই মতন! আবার কখনও কখনও মনে হয় ও যেন আমার পথ-দেখানো প্রদীপ-শিখা,—এই অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ওই আলো হাতে নিয়ে কে যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে!"

খানিকক্ষণ একেবারে স্তব্ধ থেকে আবার ব'লতে লাগলো—"মনে পড়ে নন্দা, সেই ছেলে-বেলায় এম্‌নি একদিন কার্ত্তিকের সন্ধ্যায় নদী জলে সোদোর প্রদীপ ভাসিয়ে তুমি একদৃষ্টে সেই ভেসে-যাওয়া প্রদীপের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে, আমি কোথা হ'তে উপদ্রবের মতন ছুটে এসে অকারণে ঢিল মেরে তোমার প্রদীপটি ডুবিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি আমায় কিছু না ব'লে শুধু সেই অন্ধকারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলে, তবু কারুর কাছে অভিযোগ ক'রে আমার অত বড় অন্যায়ের শাস্তি দিতে চাওনি!—এখন মনে হয়, এই দু'টো-দিনের জীবনে কেন তোমায় অত দুঃখ দিয়ে গেলুম!"

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে আমি শুধু ব'ললুম—"তোমার জন্যে আমি যুগ-যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রবো, তুমি ফিরে এসো,—আবার আমি তেমনি ক'রে প্রদীপ ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি আবার তেমনি ক'রে উপদ্রবের মতন ছুটে এসে আমার প্রদীপ ডুবিয়ে দিও।"… …

*   *   *   *

২৭শে কার্ত্তিক—আজ ক'দিন ধ'রে মনটা কেন যে এ-রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তা'র কোনোই কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জীবনে কত দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু এ-রকম অস্বস্তি তো কোনোদিনই বোধ হয় নি! কিছুই ভাল লাগছে না, চতুর্দ্দিক যেন নীরস বিস্বাদ!

আজ দুপুর-বেলা যখন শচীশ-দা'কে দেখতে গেলুম, তখন শুধু একটা মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের দিকে চেয়েই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে—যেন আমায় চেনে না, কোনো দিন দেখেওনি। আমি কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে গিয়ে তা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

খানিকপরে কাতর-কণ্ঠে সে ব'ললে -"স'রে বসো নন্দা, আমার কাছে এসো না,—নিঃশ্বাসে এ রোগের বিষ ছ'ড়িয়ে পড়ে!"

এই কথা ব'লেই কি-রকম একটা অস্পষ্ট হাসি হেসে ক্ষীণ-কণ্ঠে আপন-মনে ব'লে উঠ্‌লো—"নন্দাকে আমার কাছ থেকে স'রে যেতে ব'লছি!—উঃ, ভগবান, এত বড় অভিশাপ কেন আমায় দিয়েছিলে!"

*   *   *

২৮শে কার্ত্তিক—তখন কত রাত জানি না। নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রার তলে তলিয়ে ছিলুম। হঠাৎ কি রকম একটা বীভৎস আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গিয়েই শুনলুম শচীশ-দা'দের বাড়ী কান্নার উচ্চরোল উঠেছে! মুহূর্ত্ত-কাল অভিভূতের মতন আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে থেকে বিছানা ছেড়ে বাইরে খোলা ছাতে এসে দাঁড়ালুম। নীরব নিথর সুপ্তির মাঝে কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি কাণে এসে লাগ্‌লো যেন যুগ-যুগান্তের অভ্রভেদী দুঃখ-গিরির তলে অশ্রুর পাগ্‌লা-ঝোরা!—ওপরে চেয়ে দেখলুম আমার আকাশ-প্রদীপের আলোটা নিভে গেছে!

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জন গাল্‌সোয়ার্দ্দি—

গাল্‌সোয়ার্দ্দি তাঁর 'বিচার' (Justice) নাটকখানিতে যে সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেটার সঙ্গে বিলাতের আইন-আদালতের একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ব্যাপারটা কতকটা সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। তাহ'লেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির জেলের মধ্যে শাস্তির পরিণাম যে কি শোচনীয় ও ভয়াবহ, এবং তার কুফল যে কতদূর বিষময় হ'য়ে ওঠে, তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই 'বিচার' নাটকখানির মধ্যে! অপরাধ-তত্ত্বের (Psychology of crime) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও এই 'বিচারে'র মধ্যে আছে বটে, কিন্তু সেটা অপরাধ-সংঘটনের চেয়ে অপরাধ-ভঞ্জনের দিকটাকেই বেশী করে ফুটিয়ে তুলেছে।

কিছুদিন জেলে বাস করার ফলে কেরাণী ফাল্‌দারের (Faldir) জীবন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছল, তার কারা-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিলাভের পর, তার জীবনের গতির উপর জেলের প্রভাব, ও শেষে তার নিরুপায়ের মতো বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করার ভিতর রাজদণ্ডের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার দায়িত্ব কতখানি—গাল্‌সোয়ার্দ্দি অতি নিপুণ শিল্পীর মতো তাঁর 'বিচার' নাটকে সেই সব কঠোর সত্যের অবতারণা করেছেন। 'বিচারে' শাসন-প্রণালীর দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি কোথাও অকারণ শাসকদের আক্রমণ করেন নি। ব্যক্তির দোষ না দেখিয়ে তিনি প্রকৃত বিজ্ঞের ন্যায় 'প্রণালীর' দোষটাই বড় করে দেখিয়েছেন; এবং এইটে দেখাবার জন্য তিনি কোথাও এমন কিছু বলেন নি বা করেন নি, যাতে দর্শকদের মনে হ'তে পারে যে, কেরাণী ফাল্‌দারের প্রতি অবিচার করে অন্যায় দণ্ডবিধান করা হয়েছে, কিম্বা তার প্রতি অযথা অত্যাচার বা কঠোর আচরণ করা হ'য়েছে। এইখানেই নাট্যকারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি ফালদারকে যতটা দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ক'রে এঁকেছেন, অতটা না ক'রলেও পারতেন। শাস্তি যে অপরাধীকে অনেক সময় সংশোধন না করে অধঃপতনের দিকেই অধিকতর অগ্রসর করে নিয়ে যায়—'বিচারে' গাল্‌সোয়ার্দ্দি এই সত্যটুকুই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ব'লেই, আমাদের মনে হয়, ফালদারের চরিত্রটা তাঁর একটু দৃঢ় করা উচিত ছিল। ফালদারকে তিনি যে-ভাবে এঁকেছেন, তাতে মনে হয় যে, একটু ধাক্কা খেলেই লোকটার পতন হবার সম্ভাবনা আছে—এমনই দুর্ব্বল-চরিত্র সে। কাজে-কাজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে তার স্বভাবের পরিবর্ত্তনটা অনন্যসাধারণ না হ'য়ে বরং স্বাভাবিকই হ'য়ে পড়েছে। তাইতে নাটকের প্রতিপাদ্য বস্তু সপ্রমাণের পক্ষে একটু গোল থেকে গেছে!

অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজপুরুষদের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের ফলে হয়ত' একটা ভাল লোক জন্মের মতো নষ্ট হ'য়ে গেল। কিন্তু ফাল্‌দার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। বরং ন্যায়-বিচারের যাঁতায় পিষ্ট হ'য়ে লোকটার অনিষ্ট হ'ল, এই কথাই বলা যেতে পারে। 'বিচারে' গাল্‌সোয়ার্দ্দির প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাই। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ন্যায়-বিচার ও সমুচিত দণ্ড মাত্রই অপরাধীর পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা নয়! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কি যে তাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, অসৎকে সৎপথে আনবার কৌশল যে কি—তার কোনও উপায়েরই তিনি কিছু ইঙ্গিত করেন নি।

গাল্‌সোয়ার্দ্দির 'দাঙ্গা'র মধ্যে যে নাটকীয় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, 'বিচারে' তা' নেই। এর প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ পাওয়া যায় না! দ্বিতীয় অঙ্কেও নাটক সেই একই জায়গাতেই পড়ে আছে, একটুও অগ্রসর হয়নি। ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশ এবং নাটকীয় চরম অবস্থার বিকাশের (climax) দিক দিয়েও 'বিচার' 'দাঙ্গা'কে একটুও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তবে 'বিচারে' অনেকগুলি দৃশ্য আছে ভারি সুন্দর; আর কতকগুলি চরিত্র আছে, যারা মনের উপর যথার্থই দাগ বসাতে পারে। যেমন কেরাণী কোক্‌শন্ (Cockson) একজন। এমন সদয়-হৃদয়, বিনয়ের অবতার, 'তৃণাদপি সুনীচেন' স্বভাবের লোক একান্ত বিরল। কোক্‌শন্‌কে ভাল না বেসে থাকা যায় না। তার পর ফাল্‌দারের সঙ্গে সেই রুথ্

হনীউইল্ মেয়েটির সম্বন্ধ এমন কোমল—এমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ক'রে এঁকেছেন যে, সেও মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

ফাল্দারকে বন্দী করার দৃশ্য, তার বিচারের দৃশ্য, এবং সবচেয়ে সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধ দৃশ্য—যে দৃশ্যে কারুর মুখে একটিও কথা না থাকা সত্ত্বেও নির্জ্জন কারাবাসের



জন গাল্সোয়ার্দ্দি

(solitary confinement) যা-কিছু যন্ত্রণা, যা-কিছু শাস্তি, যা-কিছু দুঃখ, যা-কিছু বিভীষিকা ও উন্মত্ততা—সে সমস্তই এমন সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে যে, বোধ হয় হাজার কথা দিয়েও সে সব তেমন ক'রে বোঝান চল্‌ত না! এই দৃশ্য-গুলির প্রভাব যেন মানুষের মনের মধ্যে কেটে বসে যায়!

নাটকখানি যে বিয়োগান্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য। শেষ দৃশ্যে জাল লোক সেজে জুচ্চুরি করে চাকরী বাগিয়ে নেওয়াতে ফাল্দার পুনরায় বন্দী হচ্ছিল; কিন্তু আবার জেলে যেতে হবে এই ভয়ে সে উপর থেকে নীচেয় লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করলে। এটা বড় মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! ফাল্দারের সেই নিস্পন্দ মৃতদেহের উপর ব্যাকুল হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে রুথের সেই রুদ্ধশ্বাস আর্ত্তনাদ—"এ কি! এ কি হ'লো?—ও মাগো!—এ যে নিঃশ্বাস পড়ছে না!" তার পর সেই বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে সেই বুকভাঙ্গা হাহাকার—"ওগো! প্রিয়, ওগো আমার বল্লভ!—" তার পর উন্মাদিনীর মত তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে সেই তার প্রলাপ—"না না না—না গো না—নেই নেই—সে নেই—সে চলে গেছে।"—কোক্‌শন্ ধীরে এগিয়ে এসে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"আহা! অভাগিনী!" রুথ্ চম্‌কে উঠে তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে। কোক্‌শন্ তাকে বললে—"আর ভয় নেই, আর কেউ ওকে ধরবে না! ও এখন ভগবানের আশ্রয়ে গিয়ে নিরাপদ হয়েছে।"

অসাড় নিস্পন্দ পাষাণ-প্রতিমার মতো রুথ অপলক দৃষ্টি নিয়ে কোক্‌শনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল!...

'দাঙ্গা' আর 'বিচার' নাটক দুখানিতে নাট্যকার দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্ব-মূলক সমস্যা নিয়ে যতটা সাধারণ ভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁর অন্যান্য নাটকে কিন্তু তা নেই। অন্যান্য নাটকগুলির অধি-কাংশই ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র নিয়ে। যেমন তাঁর 'রূপার কৌটো' (The Silver Box) বা "বড় ছেলে" (The Eldest Son) নাটক-খানিতে আছে। এ দুখানি নাটকে দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে নীতির আদর্শের পার্থক্য কতখানি তাই দেখানো হয়েছে। তাঁর 'পলাতকা' (The Fugitive) নাটকখানিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি অল্প-শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে যখন বাধ্য হ'য়ে তার নিজের ভরণ পোষণের ভার নিজেকেই নিতে হ'ল, তখন তার সে কি অসহায় ও নিরুপায় অবস্থা! 'জয়'

(Joy) নাটকখানিতে তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে একটা অপরিহার্য্য স্বার্থপরতা আছে, সেইটেকেই অনাবৃত করে দেখিয়েছেন।

'দাঙ্গা' বইখানিকে নাটক হিসাবে যেমন গাল্‌সোয়ার্দ্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে, তেমনি 'রূপার কৌটা' নাটকখানিকেও তাঁর একটি শ্রেষ্ঠতর রচনা বলা চলে। এই নাটকখানির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর 'বড় ছেলে' নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে, যদিও নাটক হিসাবে 'বড় ছেলে'র স্থান 'রূপার কৌটা'র অনেক নিম্নে। 'রূপার কৌটা' নাটকখানিতে কাটকুড়নীর স্বামী জেম্ জোন্‌স্ চুরি করার অপরাধে জেলে গেল; অথচ পার্লামেণ্টের একজন সভ্যের ছেলে বার্থউইক্ ঐ একই অপরাধে অভিযুক্ত হ'য়েও বেঁচে গেল! ধনীর ছেলে হ'য়ে তার পক্ষে চুরি করাটা যদিও একেবারে নিতান্তই অমার্জ্জনীয় অপরাধ হ'য়েছিল, কিন্তু তার পিতা একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলে সে রেহাই পেয়ে গেল!

'বড় ছেলে' নাটকখানিতে গরীব শিকারী যে গ্রাম্য বালিকাটিকে নষ্ট করেছিল, তাকে যদি সে বিবাহ না করে, তাহ'লে তাকে চাক্‌রী থেকে বরখাস্ত করা হবে ব'লে কর্ত্তা চোখ রাঙালেন; অথচ তাঁর বড় ছেলে 'বিল্' তরুণী পরিচারিকা 'ফ্রেডা'র প্রতি ঠিক সেই একই অন্যায় করেছিল বলে বিল্ যখন ফ্রেডাকে ন্যায়-ধর্ম্মের মুখ চেয়ে ত্যাগ করতে চাইলে না, তখন কর্ত্তা তাঁর বড় ছেলের উপর একেবারে খড়্গ-হস্ত হ'য়ে উঠলেন!

'রূপার কৌটা' নাটকে ধনীর ছেলে বার্থউইক্ এবং দরিদ্র জেম্ জোন্‌স্ দুইজনেই চুরি করেছিল! উভয়ের একই অপরাধ বটে, কিন্তু তবু তার মধ্যে অন্যায়ের গুরুত্ব হিসাবে অনেকখানি তারতম্য আছে। কারণ, একজন স্বভাবের দোষে চুরি করেছে; আর অন্যজন অভাবের তাড়নায় পড়ে চুরি করেছে! কিন্তু 'বড়ছেলে' নাটকে যদিও ধনীর পুত্র 'বিল্' যে অপরাধ করেছিল, দরিদ্র শিকারীও ঠিক সেই অপরাধই করে'ছে বটে; কিন্তু এই অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে তাদের মধ্যে কোনও তারতম্য খুঁজে পাওয়া যায় না! কারণ এটা এমন একটা অপরাধ—যেটা লোকে কেবলমাত্র স্বভাবের দোষেই করে থাকে! কাজে-কাজেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য নেই! অতএব এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে গাল্‌সোয়ার্দ্দির 'রূপার কৌটা' নাটকখানিই তাঁর বক্তব্য প্রচার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়েছে, এ কথা বলতেই হবে।

'পলাতকা' নাটকখানিতে গাল্‌সোয়ার্দ্দি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেটাকে বিলাতের সমস্যার চেয়ে অনেক দিক দিয়ে আমাদের দেশেরই সমস্যা বলা চলে! ক্লেয়ার দেদ্‌মণ্ডের সমস্ত জীবনটা—তার সেই বিদ্রোহ থেকে অধঃপতন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক মেয়ের ভাগ্যে ঘটতে দেখা যায়।

ক্লেয়ার্ দেদ্‌মণ্ডের চরিত্র বেশ চিত্তাকর্ষক করেই নাট্যকার এঁকেছেন। প্রথম অঙ্কে যদিও তার প্রতি আমাদের কোনও সহানুভূতিই হয় না, কারণ, সে যা করে, সেটা নেহাৎ ছেলেমানুষী বলেই আমাদের মনে হয়! তার স্বামী যদিও ঠিক তার মনের মত নয়, কিন্তু মনের মানুষ বলে মনে করে স্বামীকে ছেড়ে সে যার সঙ্গে চলে গেল, সেই 'ম্যালাইসে'র চেয়ে তার স্বামী কোনও অংশেই হীন ছিল না; কিন্তু, সে যাই হোক্, পরে যা ঘটে, তাতে ক্লেয়ারকে আর অবহেলা করা চলে না।

যে দৃশ্য থেকে নাটকখানি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে, সে দৃশ্যে ক্লেয়ার প্রেমকে সকল কর্ত্তব্যের চেয়ে বড় আসন দিয়ে—ম্যালাইসকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল; কারণ, সে বুঝতে পারলে যে, সে এসে প'ড়ে তার প্রেমাস্পদের জীবনকে একান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে; এবং তার জন্য ম্যালাইসের সমস্ত ভবিষ্যৎও নষ্ট হ'তে বসেছে। সে তখন আর মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না ক'রে—তার এই একমাত্র অবলম্বনটিও ছেড়ে দিলে!

'জয়' (Joy) নাটকে গাল্‌সোয়ার্দ্দি সামাজিক, নৈতিক বা আর্থিক—কোনও সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান নি। তিনি এতে শুধু দেখিয়েছেন যে, আত্মপরতার প্রভাবই প্রত্যেক মানুষকে তার সকল কার্য্যের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই 'জয়' নাটকের আর একটি উপসংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন—"আমিত্ব" (A Play on the Letter I)। এই নাটকের প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীই নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদা সচেতন—কেউ বা জ্ঞানতঃ, কেউ বা নিজের অজ্ঞাতে! কেবল একটিমাত্র চরিত্র এর মধ্যে আছে, যে নিজের কথা কোনও দিন ভাবে না—বরাবর পরের চিন্তাতেই তার দিন

কেটে যাচ্ছে! সে হ'চ্ছে মিস্ বীচ্—বাড়ীর বুড়ী গভর্ণেস্! কিন্তু এ চরিত্রটিকে অসাধারণ করতে গিয়ে নাট্যকার একে একটু অস্বাভাবিক করে ফেলেছেন। কিন্তু জয় মেয়েটি নিজে বা তার মা শ্রীমতী গায়্ইন্ (Mrs. Gwyn) একেবারে জীবন্ত চরিত্র! এমন কি শ্রীমতী গায়ইনের প্রণয়ী মরিস্ লিভারও (Mr. Maurice Lever) একটি বাস্তব ছবি; কেবল জয়ের প্রণয়ী ডিক্‌কে (Mr. Dick) একটু অবাস্তব চরিত্রের মানুষ বলে মনে হয়। এই নাটকের দুটি দৃশ্য একেবারে অতুলনীয়! একটি হচ্ছে, জয় আর ডিক্ এই দুটী তরুণ প্রণয়ীর নবীন প্রেমের দৃশ্য। আর একটি হ'চ্ছে, শ্রীমতী গায়্ইন আর মিঃ লিভার এই দুই পরিণত বয়সের নরনারীর প্রবীণ প্রেমের দৃশ্য! এ প্রেম একেবারে অনাবৃত লালসার নিরানন্দ মূর্ত্তি! এ ছাড়া মাতা ও কন্যার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য আছে—যেখানে জয় তার জননীর এই গুপ্ত প্রেমের রহস্য জানতে পেরে অনুযোগ ক'র্‌ছে!

জয় লজ্জায় দু'হাতে তার মুখ ঢেকে মাকে ব'লছে—ছি ছি—মা, লজ্জায় আমার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

শ্রীমতী গায়ইন্—আমি তোকে গর্ভে ধারণ করিছি, আমা হ'তে তুই এই জগৎ দেখলি,—আর আমাকেই এমন কথা তুই বলছিস্? কেন, আমি কি তোর কুমাতা?

জয়—ছি ছি—মা!

শ্রীমতী গায়ইন্—ছি ছি!—কেন? কিসের জন্যে ছি ছি? তোমার একটু লজ্জা বোধ হবে ব'লে কি সারা জীবনটা আমাকে একেবারে জীবন্মৃত হ'য়ে থাক্‌তে হবে? তুমি জীবনের রহস্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা এক বালিকা বলে কি আমাকেও জড়ের, মৃতের মতো বেঁচে থাকতে হবে? * * * তুমি কি ভেবেছো যে তোমার জন্মের সময় আমাকে প্রসব-বেদনা ভোগ করতে হ'য়েছিল বলে, এবং যখনই তোমার কিছু অসুখ-বিসুখ হ'য়েছে তখনই ভাবনায় চিন্তায় আমি আহার নিদ্রা ছেড়ে কত কষ্ট পেয়েছি বলে, তুমি সেই দাবীতে আজ আমার উপর চোখ রাঙাবার অধিকার পেয়েছো?—আমি চিরদিনই অসুখী, যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি এ জীবনে, এবং আরও হয় ত পাবো এর পর! ওরে, তুই যে জীবনের স্বাদ পাস নি এখনও—তাই তোর প্রাণ এমন লোহার মতো হিম-কঠোর!

জয়—মা মা, তোমার জন্যে আমি সব করতে প্রস্তুত আছি—

গায়ইন্—হ্যাঁ, কেবল আমাকে এই জীবনটা ভোগ করতে দিতে পারবি নি তুই—না জয়?—আমি বুঝিছি তোর অসুবিধে কি?

জয়—(হতাশ আক্ষেপে অনুচ্চস্বরে) কিন্তু, কিন্তু—এ যে তোমার পক্ষে মস্ত বড় অন্যায় মা—এ যে মহাপাপ!

গায়ইন্—যদি এ পাপই হয়, তা'হলে তার ফল আমিই ভুগবো, তোকে তো আর ভুগতে হবে না খুকী?

জয়—কিন্তু, আমি যে তোমাকে সে দুর্দ্দশা থেকে রক্ষে করতে চাই মা!

গায়্ইন্—আমাকে রক্ষে করবি—তুই? (শ্রীমতী গায়ইন্ হো হো করে হেসে উঠলেন)

জয়—মা, আমি যে সইতে পারবো না! তোমাকে লোকে মন্দ বলবে—সে যে আমার অসহ্য হবে!—তুমি যদি একটু—···আমি তোমাকে কোনও দিনই ছেড়ে যাবো না—কিন্তু—কিন্তু মা, আমার যে বড় কষ্ট হয়; আমি যে বড় লজ্জা পাবার ভয়ে করি—আমার মনে হয় বুঝি সবাই জান্‌তে পেরেছে।

গায়ইন্—তুই কি মনে করিস্ আমা হ'তে তুই কষ্ট পাবি—আমি তোর তেমনি রাক্ষসী মা? ও রে! পরে-পরে বুঝবি একদিন!

জয়—(সহসা অত্যন্ত ভীত হ'য়ে উঠে) না না—এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি নি তুমি—তুমি কি আমায় ছেড়ে চলে যাবে মা?—

গায়্ইন্—ওরে আমার অবুঝ মেয়ে! তুই যে বাছা—

জয়—(মায়ের মুখের পানে হঠাৎ চেয়ে দেখে নতজানু হ'য়ে বসে পড়ে) মা, মা! তবে কি আমার জন্যেই তুমি—

গায়ইন্—ভয় পাসনি জয়, তোর সুখের জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি মা—

(জয় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে—মাথা হেঁট করে রইল। শ্রীমতী গায়ইন্ নত হয়ে কন্যার শিরশ্চুম্বন করলেন! জয় সে স্পর্শে শিউরে উঠে সরে গেল—যেন তাকে কিসে দংশন করলে এমনি ভাব!) •

গায়ইন্—হ্যাঁ ভুলে গেছলুম ব'লতে—আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছিই বটে—

(শ্রীমতী গায়্ইন্ আর একটি কথাও না বলে, একবার মেয়ের দিকে ফিরেও না দেখে, বেরিয়ে চলে গেলেন। জয় একা ভূমিতে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল!) (ক্রমশঃ)

চেনা-অচেনা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মোটর কলিসনে 'কলার-বোন্' ভেঙে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে পড়ে ছিলুম।

মন্দ লাগ্‌ছিল না। একঘেয়ে জীবনের ভেতর যে ফাঁকেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দেয় তার ভেতর দিয়েই প্রাণে একটা দোলা জাগে। অবশ্য যাদের প্রাণ একেবারে মিইয়ে যায়নি তাদের। বেঁচে আছে অথচ প্রাণ নেই দুনিয়ায় এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নয়।

প্রকাণ্ড হল্—লোহার খাটিয়া একটির পর একটি ক'রে সাজানো। এই ময়ূর-সিংহাসনগুলো আলো ক'রে পড়ে ছিলুম, আমি এবং আমারই মতো আরো গুটিকত লোক যাদের খবরদারী কর্‌বার কেউ নেই, অথবা খবরদারী কর্‌বার লোক থাক্‌লেও অর্থ নেই সুতরাং সামর্থ্যও নেই।

কেউ কাশ্‌ছে, কেউ কাৎরাচ্ছে, কেউ পাশের সঙ্গীদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ কর্‌ছে। একটা লোক তার অব্যক্ত ব্যথার যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে না পেরেই হয়তো গুমরে কেঁদে উঠল। কিন্তু এই কান্নার জেরটাও সে বেশীক্ষণ টেনে চল্‌তে পারলে না। একটা নার্সের হৃদয়হীন শুষ্ক ধমকে কান্নাটা তার ফল্গুর জল-ধারার মতো খানিকটা জল ছেড়ে দিয়ে যেমন অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ বুকের কোন্ একটা কোণেই অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

এমন হামেসাই হয়। কারণে অকারণে নার্সগুলোর মুখ তো চলেই—সময়ে সময়ে হাতও যে না চলে তাও নয়। যখন হাসপাতালের বাইরে ছিলুম তখন নার্সগুলোর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল নির্ব্বাক বিস্ময়ের। ভাব্‌তুম এদের জীবনই সার্থক। দিনের পর দিন এরা আলো জ্বালিয়ে রেখেছে তাদেরি অন্ধকার পথে যারা মৃত্যুর সাথে একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যেখানে দু'দণ্ডের বেশী রোগীর ঘরে ব'সে থাক্‌তে মন হাঁপিয়ে ওঠে, সেখানে এরা কেবল হাজার হাজার রোগীর খবরদারীই করে না, সেবার ভেতর দিয়ে তাদের মুখে হয় তো আনন্দের হাসিটেও ফুটিয়ে তোলে। এই অফুরন্ত আনন্দের উৎস-ধারা এরা কোথায় পায়!

কিন্তু হাসপাতালে ঢুক্‌তেই তাদের যে রূপটা চোখে পড়্‌ল, তাতে ভুল তো ভাঙ্‌লই, ভুল যে হ'য়েছিল তার জন্যেও মনের ভেতর অনুশোচনার অন্ত রইল না। দেখ্‌লুম এখানেও চল্‌ছে রীতিমত ব্যবসাদারীর বেসাতি। ফুল দাও, ফল দাও, মুখের ক্রিম, গন্ধের এসেন্স দাও, মিষ্টি হাসির পুরস্কার হয়তো একটু পাবে—না দাও রাস্তার পাশে প'ড়ে থাক্‌লে যে সোয়াস্তিটুকু তুমি পেতে, এদের দোরের কাছে মাথা খুঁড়ে' মর্‌লেও সে সোয়াস্তিটুকু হয়তো তোমার অদৃষ্টে যুটবে না।

চোখের সাম্‌নে রহস্যপুরীর আগল খুলে' গেছে। দুদিনেই এদের জীবনগুলো পড়া-পুঁথির মতো পুরানো হ'য়ে গেল। এদের কেউ শ্বেতপদ্ম, রক্তগোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকা নয়, এমন কি যুঁই-জেস্‌মিনও নয়। সব কাঠ-মল্লিকার দল। মেজে ঘ'ষে বাইরের জলুস হয়তো একটু চক্‌চকে ক'রে তুলেছে, কিন্তু কুড়িয়ে নেবার মতো বেসাত এদের ভেতর এতটুকুও নেই।

হাল ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ এমনি সময় একদিন চম্‌কে উঠলুম এদেরি একজনকে দেখে। 'ডিউটি' বদ্‌লে গেছ্‌ল। রাত্রের অন্ধকারে নার্সটা এসে দাঁড়ালো—জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ার রহস্যালোকে ঘেরা অজানার রাজ্যটাকে তার পেছনে নিয়ে। তার চোখ, মুখ, চুলের ডগা—সব জায়গা দিয়েই যেন একটা দীপ্তি ঝরে। প্রত্যেক রোগীর শয্যার পাশটাতে সঞ্চারিণী দীপ-শিখার মতো সে ঘুরে' বেড়ায়। সেবায় তার শ্রান্তি নেই—দ্বিধা নেই—বিরক্তিও নেই।

কিন্তু তার সেবা, তার দীপ্তির চাইতেও আমার মন ভুলালো তার চার পাশে ধরা-ছোঁয়ার অতীত যে রহস্যের মায়াপুরীটা সে গ'ড়ে তুলেছে সেই মায়াপুরীর রূপটা। দেহের দুয়ার ঘিরে এই যে রহস্যের যবনিকা—এই যবনিকার অন্তরালের মোহই তো যুগে যুগে মানুষকে সোণার হরিণের লোভ দেখিয়েছে—মরীচিকার মায়ায় মরুর পাথারে পথিকের পথ ভুলিয়েছে!

. প'ড়ে প'ড়ে দু'পাশের লোকগুলোর দুঃখের কাহিনী শুন্‌ছিলুম। কোনো নতুনত্ব নেই। সমস্তই সাধারণ বাঙালী ঘরের দৈনন্দিন দৈন্য ও নিরাশার কাহিনী। বাড়ীতে খাবার লোকের অভাব নেই, অথচ উপার্জ্জন কর্‌বার লোকের অভাব পুরামাত্রায় আছে। খেটে খেটে এবং পেট ভ'রে খেতে না পেয়েই কেউ হয়তো ম্যালেরিয়ায় পড়েছে, আবার কারো স্বাস্থ্য বা জীবন-মধ্যাহ্নেই এমন চীর খেয়েছে যে, জোড়া লাগ্‌বার সম্ভাবনাও এ জন্মের মতো ঘুচে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এত সব দুঃখ তারা কি ক'রে সহ্য করে।

কেউ কিছু বল্‌বার আগেই শিবু মিস্ত্রি গলা বাড়িয়ে বল্‌লে—এ আর কি দেখ্‌ছেন মশায়, আমাদের দুর্দ্দশার ছবি? আমরা তো দিব্যি আরামে আছি—দু'বেলা যা হোক্ দু'-মুঠো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু বাড়ীর কথা ভাবতেও বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়। দুটো মেয়ে, একটি ছেলে, একটি বিধবা বোন্—তা ছাড়া পরিবারও আছে। মহাজন যে ধার দেওয়া বন্ধ করেছে সে তো আমিই দেখে এসেছি। দোকানীও বোধ হয় এতদিনে তাদের সুমুখে তার দোকানের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। অতগুলো ছেলে-মেয়ে নিয়ে দু'টো অসহায় নারী—কি ক'রে যে তাদের চল্‌ছে কে জানে? —বল্‌তে বল্‌তে দেখ্‌লুম, তার চোখ্ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

বালিসের তলা থেকে মণিব্যাগটা বে'র ক'রে তার ভেতর হ'তে দু'টো টাকা নিয়ে তার হাতে গুঁজে' দিয়ে বল্লুম—আজ যখন তোমার স্ত্রী বা আত্মীয় স্বজন তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে টাকা দু'টো তাদের হাতে দিয়ে ব'লে দিও, ছেলেগুলোর জন্যে যেন ভালো ক'রে দু'টো দানা-পানির ব্যবস্থা করে।

শিবু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম ক'রে বল্‌লে—বাবু আর জন্মে বোধ হয় আপনি আমার অতি আপনার জন কেউ ছিলেন—নইলে পথের লোকের প্রতি কে এতখানি দরদ দেখায়?

মনে মনে ভাব্‌লুম হয়তো বা তাই হবে।

দূরের একটা কাৎরানীর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। কাৎরানীটা কাণে বেজে বুকটাতে খচ্ ক'রে বিঁধ্‌লো। কিন্তু ঐ নার্সগুলো! রোগী ঘেঁটে ঘেঁটে হয়তো ওদের চামড়ার ঘাটা প'ড়ে গেছে। তাই এত বুক-ভাঙা আর্ত্তনাদও ওদের দেহের চামড়া ভেদ ক'রে মনের তারে ঘা দিতে পারে না।

চারদিকের রোগীর নিঃশ্বাসে ভরা রুগ্ন বাতাস নাকের কাছে যেন ভারি হ'য়ে আছে—নিঃশ্বাস টান্‌তেও সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। হঠাৎ কাণের কাছে একটা মিষ্টি আহ্বান শুনে' চম্‌কে উঠ্‌লুম। মুখ তুলে' দেখি—রাত্রের সেই নার্সটা একেবারে আমার খাটের পাশটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বল্‌লে,—আজ বুঝি তোমার মন ভালো নেই?

আমি বল্লুম—না ভালো নেই। কিন্তু তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ যে?

সে জবাব দিলে—তোমার মুখে প্রতিদিন যে একটা সজীবতার ছাপ থাকে আজ তা খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না। কি ভাব্‌ছ?

—ভাব্‌ছি অন্যায়ের নিঃশ্বাস ঘরের বাতাস যখন ভারি ক'রে তোলে তখন তোমরা সেই ভারি বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলো কি ক'রে?

—অর্থাৎ এ ঘরে আজ ঝড় ব'য়ে এতই ধূলো উড়িয়ে গেছে যে তোমার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দান-খয়রাতে-তো দেখ্‌ছি তুমি একেবারে রকফেলারের বড় ভাই। পকেটটাও হয়তো বেশ ভর্ত্তি আছে। তবু একটা ক্যাবিন ভাড়া নিচ্ছ না কেনো বলতো! তুমি ইচ্ছে ক'রেই তো সেই সব ঝামেলা সহ্য কর্‌ছ—যার দুঃখ দেহের দুঃখের চাইতেও অনেক সময় ভারি হ'য়ে দাঁড়ায়।

হেসে বল্লুম—অর্থাৎ তুমি আমাকে বিদেশে নির্ব্বাসন দিতে চাও।

বিস্মিত চোখ্ দু'টো আমার মুখের পানে মেলে ধ'রে সে বল্‌লে—ক্যাবিনে যাওয়াটা তুমি নির্ব্বাসন ব'লে মনে কর্‌ছ কেন? এই ঘরটাতেই বা তোমার কোন্ আত্মীয়-স্বজন আছে শুনি?

—সব—সব। বাংলা দেশটাকে তোমার ভাই-বন্ধুরা এমন অবস্থাতেই টেনে এনেছে যে, এখানকার লোকেরা এক রকমের দুঃখের হাপরে হাপিয়ে এক পরিবারের লোক হ'য়ে উঠেছে। এখানে যে কান্না তোমরা শোনো, বাংলা দেশের এমন বাড়ী নেই যে বাড়ীতে প্রতিদিন তারই অভিনয় না হচ্ছে। ক'টা লোককেই বা বন্দী ক'রে রেখেছ

তোমরা তোমাদের এই হাসপাতালে? বাংলা দেশের চারকোটি লোকই যে কারাগারে বাস করে তা জানো? একই ঘানিতে ঘুরে' আমরা সব আত্মীয় হ'য়ে গেছি। সুতরাং তোমাদের ঐ ভাড়াটে হাতের সেবা নেবার জন্যে ক্যাবিনের Solitary-imprisonment-এর দুঃখটা না হয় না-ই নিলুম।

নার্সের রহস্যময় চোখ দু'টোর ওপর একটা কালো মেঘের ছায়াও যেন ঘনিয়ে এলো। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বল্‌লে—বাবু, তোমার দেশ-প্রেমের আমি নিন্দে কর্‌ছিনে, কিন্তু আমাদের ওপরেও তুমি সুবিচার করোনি। হাসপাতালে দুঃখ হয়তো তোমাদের ঢের আছে—কিন্তু তোমাদের সে দুঃখ লাঘব কর্‌বার জন্যে যে আমরা চেষ্টা করিনে এমন অপবাদও আমাদের দিও না। যারা সেবার ব্রত গ্রহণ করে, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কয়েকটা টাকা তোমরা দাও ব'লে মনে ক'রো না তারা সব ভাড়াটে মেয়ের দল। এ হাসপাতালে যতগুলো নার্স আছে, যদি খোঁজ নিয়ে দেখো, দেখ্‌তে পাবে তাদের অনেকেরই জীবনের ইতিহাসে কোথাও না কোথাও এমন দু'টো-একটা ফাঁক আছে যা তোমাদের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো জিনিস দিয়েই পূর্ণ হয় না। আর পূর্ণ হয় না ব'লেই তারা রুগ্ন মৃত্যু-পথ-যাত্রীদেরও সঙ্গী ক'রে নিতে দ্বিধা করেনি।

তাকিয়ে দেখলুম—তার মুখের ওপর একটা করুণ বেদনার পর্দ্দা টানা। কিন্তু সেই পর্দ্দার ভেতর দিয়ে পেছনের আলোর টুকরোগুলোও যেন চোখে পড়্‌ছে। ওর সেবার রূপ অনেকবার তাকিয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মনের রূপ কখনো চোখে দেখিনি। আজ যেন তারই আভাসটা ঐ পর্দ্দার পেছনের আলোকেই একটু আল্‌গা হ'য়ে উঠল।

হঠাৎ কোন্ ফাঁকে হরিশ সর্দ্দারের গোঙরানীটা যে ঘরের বাতাসে ঘা দিয়েছে আমি তার কিছুই জান্‌তে পারিনি, কিন্তু ওর কাছে তা ধরা পড়্‌তে এক মুহূর্ত্তও যে দেরী হয়নি একটু বাদে মুখ তুল্‌তেই তারও পরিচয় পেলুম। দেখ্‌লুম সর্দ্দারের ব্যথা-বিকৃত কুৎসিত মুখখানি টেনে ও একেবারে কোলের কাছে তুলে' নিয়েছে। তার মুখের ওপর থেকে যন্ত্রণার চিহ্নটা তখনও নিঃশেষে মুছে যায়নি বটে, কিন্তু সন্ধ্যার মেঘে অস্তগামী রৌদ্রের রেখা যেমন আলোর একটা পাড় পরিয়ে দিয়ে যায়—সর্দ্দারের মুখটা ঘিরে তেমনি একটা আলোর রেখাও চক্ চক্ কর্‌ছে। ও যখন ঘরে ঢোকে তখন এম্‌নিই হয়। আস্তাকুঁড়ের এই বিশ্রী কদর্য্য পঙ্কগুলোর ভেতরেও পদ্মদলের দীপ্ত-শ্রী জেগে ওঠে।

* *

*

সেদিন অকস্মাৎ আকাশের দিগ্বিদিক্ ঢেকে কষ্টি-পাথরের মতো কালো দুর্য্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এলো। হাসপাতালের জানালার ভেতর দিয়ে তারই রূপটা স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো চোখ জুড়িয়ে দিলে। সাদা দেয়ালের বৈচিত্র্যহীন নিঃস্বতা দু'টো চোখের ক্ষুধা এই ক'দিনের ভেতরেই যে কতটা বাড়িয়ে তুলেছে এই মেঘের দিকে চেয়ে আজ তা আরো ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লুম। মেঘের ভেতর উৎসবের দামামা বাজ্‌ছে—আকাশের বুক চিরে দিয়ে চলেছে বিজ্‌লী-রূপসীদের চোখ্-ঝল্‌সানো উন্মাদ নৃত্য।

পথের কাঁকর উড়িয়ে, দরজা জানালার কপাটগুলোর ওপর ঝন্‌ঝনি জাগিয়ে ঝড় উঠ্‌ল। সাম্‌নে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেখানে আগুনের শিখা মেলে দিয়েছে তারি ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়ার ফণা দুল্‌ছে। এক মুহূর্ত্তেই গাছের তলায় লাল কার্পেটের একখানা আস্তরণ আস্তৃত হ'য়ে গেল।

'করিডোরে'র এখানে ওখানে নার্সগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পেছনে পেছনে মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টদের দল। অনেকের মুখে লালসার চিহ্ন বাইরের ঐ ঝড়ের মতোই সুস্পষ্ট।

এবার ঝড়ের সাথে সাথে আকাশের ঝরণাটাতে বাণ ডাক্‌ল। গাছের মাথা ভিজিয়ে, পথের ধুলো মাড়িয়ে বৃষ্টি ঝর্‌ছে ঝর্ ঝর্ ঝর্। বৃষ্টির ধারা বাতাসের বুক ঢেকে যে চিক্ ফেলে দিয়েছে তার ফাঁক দিয়ে রহস্যের শুধু একটা আভাস পাওয়া যায়—পেছনের আর কিছুই দেখা যায় না।

বৃষ্টির ছাঁট্ এসে গায়ে লাগছে একটা স্নেহ-শীতল হাতের স্পর্শের মতো! নিজেকে সরিয়ে নিতে চাচ্ছি—পার্‌ছিনে।

হঠাৎ সেই নার্সটা সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—ও কি হচ্ছে? জলে ভিজ্‌ছ্‌—অসুখের ভয় নেই?

কি খেয়াল হ'লো ব'লে ফেল্‌লুম—অসুখ ভালো হ'য়ে যাচ্ছে ব'লেই তো তোমাকে আর কাছে পাইনে। যদি বাড়ে তবে হয়তো একটুখানি বেশী ক'রেই কাছে পাবো।

অসুখ বাড়ার ভয়ের চেয়ে এই পাওয়াটার লোভ তো কম নয়।

তার চোখে সেই রহস্যময় দৃষ্টিটা আবার জেগে উঠ্‌ল। সে হেসে বল্‌লে—Please don't carry coal to New-Castle. এমনি ধরণের প্রেমের কথা যে কত শুনেছি তার ঠিক নেই।

ভারি রাগ হ'লো—বল্লুম—অসুখে প'ড়ে মানুষ যখন হাসপাতালের আশ্রয় নেয়, তখন যারা একটু আদর ক'রে দু'টো মিষ্টি মুখে কথা কয়, তাদের কাছে-আসাটা মানুষের ভালো লাগে। এই ভালো-লাগা আর ভালো-বাসা এক জিনিষ নয়। তা ছাড়া জানি, আমি বাঙালী আর তুমি তাদেরই জাত যারা আমাদের পা'র তলে চেপে রেখেছে।

একটু ব্যথার হাসি হেসে সে বল্‌লে—কিন্তু তুমি তো জানো না—বাঙালীকে ঘৃণা কর্‌বার আমার অধিকার নেই। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি কি না, তাই নতুন ক'রে কাউকে দুঃখ দেবার কথাটা মনে হ'লে বুকের ভেতর খচ্‌ ক'রে ওঠে।

একটা খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লুম না। ব'লে বস্‌লুম—কিন্তু তোমার সহ-কর্ম্মীদের ধর্ম্ম তো দেখ্‌ছি হাসপাতালের ধর্ম্ম নয়। তারা রুগ্নকে তো দুঃখ দেয়ই, সুস্থ মানুষকেও দুঃখ দিতে দ্বিধা করে না। চেয়ে দেখো তোমার সাম্‌নের ঐ 'করিডোর'টাতে।

খোঁচাটা গায়ে না মেখেই সে বল্লে—কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কি সুবাদ? আমি সেবা করি নিজের দুঃখটাই ভোল্‌বার জন্যে। তাই তো সেবা নিয়ে খেলা করা আমার পোষায় না।

একটা অপূর্ব্ব আন্তরিকতায় তার সুরটা যেন কান্নার মতো করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল। বাইরে বৃষ্টির ধারার ভেতর দিয়ে ধরণীর বুকের কান্নাও ঝ'রে পড়্‌ছিল একেবারে অজস্র ধারায়। দু'টো কান্নায় মিলে মনে যে মোহ জাগালে তারি ঝোঁক সাম্‌লাতে না পেরে খপ্‌ ক'রে তার হাতখানা ধ'রে ফেলে বল্লুম—তোমার মুখের ঐ যবনিকাটা খুলে ফেলো নার্স।

মুখের ওপর তা'র রহস্যের ছায়াটা আরো গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। তারপর ধীরে ধীরে রৌদ্রের দীপ্তিতে হেমন্তের কুয়াশা যেমন মিলিয়ে যায়, একটা স্নিগ্ধ করুণ হাসির দীপ্তিতে তার মুখের এতদিনকার আবরণের খানিকটাও যেন তেম্‌নি ক'রে মিলিয়ে গেল।

সে বল্‌লে—তুমি কি জান্‌তে চাও?

আমি বল্লুম—তোমার জীবনের ইতিহাস।

সে তো ভারি ছোট জিনিস। তোমাকে বল্‌তে হয়তো পাঁচ মিনিটেরও বেশী সময় লাগ্‌বে না। কিন্তু মনের ইতিহাস তো বলা যায় না—আমাদের বাইরের যবনিকাটা যে তারি একটা ছোট্ট খোলস মাত্র।

হেসে বল্‌লুম—মনের ইতিহাস বলা যায় না, কিন্তু তাকে বোঝা যায়। আমার এই বোঝ্‌বার শক্তিকে সন্দেহ না কর্‌লেও পারো।

সে বল্‌লে—কিন্তু সে যে দুস্তর সাগর। তার চেয়ে তোমাকে একটা গল্প বল্‌ছি শোনো।

বর্ষার সজল হাওয়ার ভেতর দিয়ে যে মোহ জেগে ওঠে, হল্‌টার এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তারি স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সুপ্তিকে সুরের মদে আরো গাঢ় ক'রে তুলেই সে বল্‌তে সুরু কর্‌লে—এ গল্প তোমরা রূপ কথার কল্যাণে অনেকবার শুনেছ। কিন্তু ঐ রূপ-কথাগুলোই তো মানুষের মনের আদিম ইতিহাস। তাইতো তারা কখনো পুরোণো হ'তে জানে না। এইবার শোনো—

পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার এক বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে এক বিদেশিনী রাজকুমারীর দেখা হ'য়ে গেল। আকাশে সেদিন জ্যোৎস্নাও ছিল না, তারাও ছিল না। তাদের চেনা হ'লো বিদ্যুতের দীপ্তিতে। আকাশের বজ্র তাদের মিলনের পথে মাদল বাজালে।

রাজকুমারী বল্লেন—আমার হৃদয় এইবার তবে তোমাকে দিই রাজকুমার!

রাজকুমার বল্লেন—ঐ হৃদয়ই আমার সব সম্পদের সেরা সম্পদ্‌।

হয়তো সেই সম্পদই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'তো, কিন্তু দুর্দ্দিনের বন্ধুকে দীপ্ত দিনের আলোকে মানুষ ভুলে' যায়। কুমার ও কুমারীর ভেতরেও সেই বিস্মরণীর ছায়া নেমে এলো। দু'টো তরুণ-তরুণীর জীবনের বেলা-তট ঘিরে যেমন অকস্মাৎ আলো জলেছিল, বাঁশী বেজেছিল, বসন্তের আনন্দ-মঞ্জরী-গুলো ফুটে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ আলোও নিব্‌লো, বাঁশীও থাম্‌লো, পুষ্প-মঞ্জরীগুলোও শুকিয়ে গেলো। গাছের

ফুলকে চয়ন ক'রে নিয়ে মানুষ যেমন দুদণ্ডের পরেই তাকে পথের ধুলোয় ফেলে দেয়, কুমারীকেও পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে দু'দিন বাদেই রাজকুমারও তেমনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। কুমার তো হৃদয় চাননি—চেয়েছিলেন দেহ ;—তাই দেহের প্রয়োজন যখন ফুরালো, হৃদয়টাকে উপেক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হ'লো না।

নার্সের কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে থেমে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তারপর ?

তারপর রাজকুমারী তাঁর অন্ধকার রাত্রির শিয়রে দুঃখের দীপ জ্বেলে ব'সে আছে। কান্না তার শুকিয়ে গেছে. কিন্তু দিনের আলো এখনো তার কাছে এসে পৌঁছোয়নি। তাইতো পরের কান্নার শিয়রে ব'সে ব'সে তার রাত কাটে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম - কিন্তু রূপকথার রাজকুমারী-তো আবার তার রাজকুমারকে ফিরে পায়, তোমার গল্পের রাজকুমারী তার রাজকুমারকে আর ফিরে পাননি বুঝি ?

সে বল্লে—পেয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ব্যবধানের রেখা রচিত হয়েছে এক রক্তের ধারা ছাড়া আর তাকে মুছে ফেল্‌বার উপায় নেই। বিদেশিনী কুমারীর প্রতিহিংসা হয়তো সেই রক্তের ধারার লোভেই মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ত, কিন্তু তার একটি ছোট বোনের মুখের দিকে চেয়েই সে তাকে মাপ করেছে।

আবার প্রশ্ন কর্‌লুম—কুমারী রাজকুমারকে ভুল্‌তে পেরেছে কি না জানো ?

উত্তরে নার্স একটু হাস্‌লে। তারপর বল্লে—এইবার ঘুমোও, রাত জেগে আর অসুখ বাড়িও না।

আমি বল্লুম—ঝড় যখন জাগে, না-ঘুমোনোই তো তখন স্বাভাবিক। ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো ঝড় একজনের মন হ'তে যে আর একজনের মনে প্রলয়ের দোলা জাগায় সে কথা তুমি মানো কি না জানিনে—কিন্তু আমি মানি!

যা বল্‌তে চেয়েছিলুম জানিনে তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল কি না। সে শুধু ধীরে ধীরে আমার মাথাটা নেড়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—বাদ্‌লার দোলা অনেকের মনেই ঝড় জাগায়। কিন্তু রৌদ্র যখন জাগে আকাশে তখন ঝড়ও থাকে না—মেঘও থাকে না। আজ হয়তো তোমাকে একটা ঘা দিয়ে গেলুম—কিন্তু কাল সকালে এ আঘাতের দাগটাও যে থাক্‌বে না তাও জানি।

মনে মনে বল্লুম—তুমি কিচ্ছু জানো না। অনেক দাগ আছে যা জীবন ক্ষ'য়ে যায় তবু মোছে না। তোমার নিজের বুকে যে দাগ পড়েছে সেই দাগটাকেই কি তুমি মুছে' ফেল্‌তে পেরেছ!

* *
*

বিকেলে বড় সাহেব এসেছিল। তাকে বল্লুম—শীতের দিনের ঠাণ্ডা জলের স্পর্শের মতোই একটা ব্যথায় এখনও হাড়টা মাঝে মাঝে কন্‌ কন্‌ ক'রে ওঠে। ডাক্তার দেখে বল্‌লে—ও কিছু নয়, দু'দিন বাদে আপনা থেকেই সেরে যাবে। সুতরাং হাসপাতালে থাক্‌বার আর আমার দরকার নেই।

মুক্তির পরোয়ানা পেলুম। দিনের আলোতেই সকলের কাছে বিদায় নেওয়ার পালাটাও শেষ হ'য়ে গেল। কেউ কাঁদ্‌লে, কেউ বুকে জড়িয়ে ধর্‌লে, কেউ বল্‌লে—ভুলে' যাও যদি তো ভারি গোসা কর্‌ব।

কি যে বল্‌তে হয় জানে না। ওদের দুঃখ মন দিয়েই বুঝে নিতে হয়। ওদের ব্যথা, ওদের দৈন্য, এমন কি ওদের হীনতা পর্য্যন্তও তাই আজ আমার মনের দোরে ছায়া ফেলেছে। নকড়ি হয়তো কাল আর কারো কাছে তার পারিবারিক সুখ-দুঃখের ফিরিস্তি খুলে' বস্‌বে না—হরিশ সর্দ্দারের কান্নাটা হয় তো একলা একলাই ঝ'রে কেবল তার নিজের চোখের কোলেই বান ডাকাবে।

সাম্‌নের অন্ধকারের রাজ্যটা পার হ'য়ে চাঁদের ফালিটা আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার পাল তুলে' দিলে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটে জ্যোৎস্না বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়্‌ল।

জ্যোৎস্নায় চোখ্ বুঁজে প'ড়ে আছি। টের পেলুম, নার্সটা দুতিনবার আমার বিছানার পাশটাতে এসে দাঁড়ালো। একবার ডাক্‌লেও—বাবু। ঘুমের ভান ক'রে জবাব দিলুম না। হঠাৎ কি মনে ক'রে সে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। সেটা এসে খচ্ ক'রে ঠিক যেন আমার বুকের মাঝখানটায় বিঁধে রইল। তবু বিদায়ের কথাটা তার কাছে বল্‌তে পার্‌লুম না। অথচ সকলের আগে তার কাছ থেকেই তো বিদায় নেবার জন্যে মন উন্মুখ হ'য়েছিল। মুক্তির পরোয়ানাটা আজ বিকেলে পেয়েও যে ভবঘুরে মনটা

এখনো এই হাসপাতালেই আট্‌কা প'ড়ে আছে তার কারণ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

ঘড়িতে বাজ্‌ছে দুই—তিন—চার। না ঘুমিয়েই তবে রাতটা শেষ হ'য়ে গেল! চোখ মেলে বাইরের আকাশের দিকে চাইলুম। সেখানে ভোরের শুকতারাটা জল্‌ছে একটা পথহারা উল্কার মতো। ওরি কাছ থেকে দীপ্তি নিয়ে বুঝি আমার মতো বেদুইনের দল দুস্তর মরু পাথারের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

এক একবার মনে হচ্ছে ভোরের রাত্রির এই নিস্তব্ধতার ভেতরেই না হয় নার্সটাকে কাছে ডেকে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখি। ব'লে যাই—চল্লুম—মনে রেখো। কিন্তু কেবলি ভয় হচ্ছে, মনের গোপনে যে কথাটা লুকিয়ে আছে, পাছে সেই কথাটাই তার কাছে ধরা প'ড়ে যায়। হয়তো বা এরই ভেতর মনের পুঁথিখানা ও প'ড়ে শেষ ক'রেও ফেলে দিয়েছে—সাবধানতার আর কোনোই দরকার নেই। কিন্তু আমার অবস্থা সেই হরিণগুলোর মতো যারা পালাবার পথ যখন ফুরিয়ে যায় তখন বালুর ভেতরেই মুখ গুঁজে দিয়ে মনে করে—শিকারীর দেখার পথটাও বুঝি বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সেই ভালো—না-বলা বাণী দিয়েই তবে আমার বিদায়ের গান রচিত হোক্।

শীতের কুয়াশায় স্থবির ধরণীর চুলগুলো যখন সাদা, তার চামড়া ঢিলে হ'য়ে গেছে এবং শরীরের যন্ত্রগুলো বিকল তখনই তার মনের বনে বসন্ত জাগে, ফুলের অপ্সরারা ফুটে' ওঠে। বান যখন ডাক্‌বার কোনোই সম্ভাবনা নেই তখনই আমার জীবনের নদীটাতে জোয়ার জাগ্‌ল। জোয়ার যখন জাগ্‌লই, তখন যে ভাস্‌তে হবে সেতো জানা কথা। তবু ভালো, যে দরিয়ায় ভাসালো সে তার মুখের অবগুণ্ঠনটাও তুলে' ধরেনি। অচেনা পথের হাতছানিতে দুর্গম পাথার তবু পাড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু চেনা পথের অবসাদ—সে তো সত্যিই অসহ্য।

পথের কথা মনে হ'তেই পথ হাতছানি দিলে। হাসপাতালের পোষাকটা ওয়ার্ডারের হাতে জেম্বা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম। পথে ভোরের বাতাসে ঝ'রে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো হোলির দিনের কুঙ্কুমের মতো মাটির বুকে প'ড়ে আছে। মাড়িয়ে যেতে যেতে মনে হ'ল, বুকের ভেতর এমনি রক্ত-রাঙা যে হৃদয়টা রয়েছে দু'পা দিয়ে কে যেন তাকেই মাড়িয়ে যাচ্ছে, পা দু'টো যার তাকে যেন চিনি। কিন্তু মুখের পানে চেয়েই চেনা অচেনায় মিশে গেল!

ওপর দিকে চেয়ে দেখি—নার্সটা একদৃষ্টে আমার পথের পানে চেয়ে আছে।

বোর্ণিও দ্বীপবাসীদের কথা

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(২)

সি-ডিয়াক জাতির নারীরা সূতার এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে। এই বস্ত্রে নানা রংএর সূতা থাকে। ইহারা বেতের তৈরী একপ্রকার করসেটের মত জিনিষ পরে। সূতা যেমন করিয়া বোনা হয় বেতকে সেই প্রকার বোনা হয়। মাঝে মাঝে পিতলের আঙ্গটা পরাইয়া ইহার শোভা বর্দ্ধন করা হয়। এই বেতের তৈরী করসেট নারীরা জীবনে বোধ হয় দু-এক বারের বেশী খোলে না। বোর্ণিওর অন্যান্য জাতির নারীরা কাপড় ব্যবহার করে। কাপড় ইহারা ঘাঘরার মত করিয়া পরে।

ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় অথবা নৌকা-ভ্রমণ করিবার সময় স্ত্রীপুরুষ সকলেই লম্বা-হাতা জামা ব্যবহার করে। ব্যাঙের ছাতার মত দেখিতে এক প্রকার টুপিও ইহারা ব্যবহার করে। টুপী ইহাদের রোদ হইতে বাঁচায়।

পুনান এবং উকিট জাতি ছাড়া অন্যান্য সকল জাতির

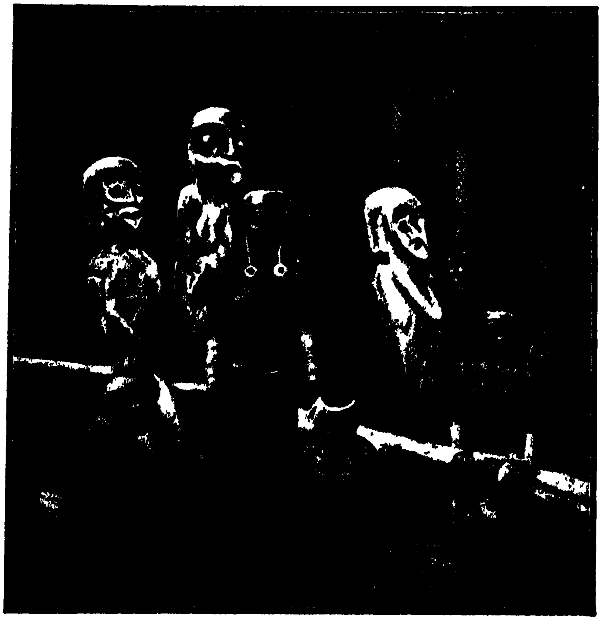


ক্রেমানটান পরিবার—(ইহাদের একই ঘরে শয়ন-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, রন্ধন-শালা

লোকে বিশেষ এক প্রকার বাড়ী নির্ম্মাণ করে। এক একটি বাড়ী এমন করিয়া তৈয়ার করা হয়, যাহাতে ৭০।৮০ বা তাহা অপেক্ষাও বেশী পরিবার বাস করিতে পারে। এক একটি বাড়ীকে একটি ছোটখাট গ্রাম বলা যায়। কটকের তেলেগুদের বাড়ীর সহিত ইহাদের বাড়ীর কিছু সাদৃশ্য আছে। নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়। এক একটি গ্রামের লোকরা এক সর্দ্দারের অধীন বাস করে। সর্দ্দার ছাড়া আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ে ইহারা একই প্রকার প্রথা ইত্যাদি মানিয়া চলে।

পুনান জাতি ছাড়া অন্যান্য সকল জাতিই ধান চাষ করিয়া থাকে। ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য।

শুভচিহ্ন দেখিয়া এবং শুভকার্য্য করিয়া তবে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। এই সময় ইহারা এক প্রকার বিশেষ বাদ্য বাজায়—নাচ-গানও হইয়া থাকে। ধান যাহাতে



সংক্রামক রোগ প্রতিষেধ। (রোগ শোকে এক ফরতা কেনিয়াদের রক্ষাকর্ত্তা। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে দেবতার দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামে প্রবেশের পথে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

পঙ্গপাল ইত্যাদিতে নষ্ট না করিয়া দেয়, তাহার জন্য নানা-প্রকার মন্ত্রাদি পড়া হয়, নানা প্রকার যাদুও করা হয়।

ধানের জমি জঙ্গল পোড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। ঝোপঝাড় গাছপালা পোড়াইয়া যে ছাই হয়—তাহা ক্ষেতের সার হয়। বড় বড় গাছ কাটিয়া কিছুদিন রোদেই রাখা হয়। তার পর তাহা শুকাইয়া গেলে তাহাতে আগুন লাগান হয়।



বানর-শিকার

গাছ পুড়িয়া ছাই হয়—এই ছাই ঠাণ্ডা হইলে পর চাষের কাজ আরম্ভ হয়। স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গেই কাজ করে। পুরুষেরা এক প্রকার কাঠের শাবল দিয়া ক্ষেতে ছোট ছোট গর্ত্ত করিতে করিতে যায়—স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পিছনে পিছনে গর্ত্তে ধানের বীজ ফেলিতে ফেলিতে যায়।

ধান ফেলিবার প্রায় ১৪।১৫ সপ্তাহ পরে ধান পাকে। ধান কাটার সময় খুব বড় উৎসব হয়। এই উৎসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রাণ খুলিয়া যোগদান করে। সমস্ত ধান কাটা হইলে পর—ধান গৃহসংলগ্ন খামারে চালান করা হয়। এই সময় গান বাজনা ইত্যাদি নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদ চলিতে থাকে।

উৎসবের প্রারম্ভেই আগামী চাষের জন্য বীজ ধান বাছিয়া রাখা হয়। স্ত্রীলোকেরাই এই কাজটি করে। বীজ ধান নতুন ফসল হইতে বাছিয়া তাহা গত বছরের সামান্য কিছু বীজ ধানের



ডায়াক সুন্দরী—(পিতল ও রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিতা)

সহিত মিশান হয়। গত এবং আগত এই দুই বছরের ধান মিশাইবার সময় স্ত্রীলোকেরা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে "হে দেবতা—আগামী বছর তোমার কৃপা যেন আমাদের চাষের উপর এই বছর এবং গত বছরের মতই বর্ষে।" এই উৎসবটিকে ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব বলা যায়। ক্ষেত উর্ব্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও উর্ব্বরা হউক, এই প্রার্থনাও করা হয়।

এই সমস্ত শেষ হইলে পর তাণ্ডব আনন্দ আরম্ভ হয়।



ড্যাণ্ডি ইবান যোদ্ধা



ডায়াক-পরিবার (পিতা, মাতা, পুত্র)

স্ত্রীলোকেরা ভাতের ডেলা তৈরী করিয়া তাহাতে হাঁড়ির কালি মাখাইয়া পুরুষদের মুখে পিঠে ছাপ লাগাইয়া দেয়। পুরুষেরাও এই কালি-মাখান ভাতের ডেলা নারীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করে। বহুক্ষণ ধরিয়া এই প্রকারে ভীষণ হল্লা চলিতে থাকে। তাহার পর সকলে মিলিয়া ভোজে মাতে।



মধ্য বোর্ণিওর লিসাম তরুণী

ভোরের আলো দেখা দিবা মাত্র নারীরা বিছানা ছাড়িয়া ওঠে এবং নিজের নিজের উনানে আগুন দিয়া নদীতে গিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া, বাঁশের চোঙ্গা ভরিয়া জল লইয়া আসে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহারা ভাত রান্না করে। এই সময় পুরুষেরা ঘুম হইতে উঠে। কেহ যায় স্নানাদি করিতে—কেহ বা দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতে থাকে। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহারা কাজে বা শিকারে বাহির হয়।

অসুস্থ এবং বৃদ্ধ পুরুষেরা গৃহে থাকে। যাহারা সবল, সুস্থ, তাহারা ক্ষেতে যায়—অন্যান্য কাজেও যায়। বৃদ্ধেরা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাঠ-খোদাই ইত্যাদি হালকা ধরণের কাজ করে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর চোখ রাখে। গ্রামের পুরুষদের মধ্যে



কেনিয়া যোদ্ধার ঢাল

কয়েকজন নৌকা নির্ম্মাণ, অস্ত্রাদি প্রস্তুত ইত্যাদি কাজে রত থাকে। ক্ষেতের কাজ না থাকিলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পুরুষেরা হরিণ, শূকর ইত্যাদি শিকার করিতে যায়। মাছও ধরে।

ধান বোনা এবং কাটার সময় ছাড়া বাকী সকল সময় স্ত্রীলোকেরা গৃহের কাজেই ব্যস্ত থাকে। ধান ভানিয়া চাল প্রস্তুত করা এবং পুরুষদের খাদ্য প্রস্তুত করাই ইহাদের প্রধান কাজ।



বারাণ্ডা, বারোয়ারীতলা ও গ্রাম্য-পথ। (কেনিয়ানদের বাড়ীর লম্বা ঘরে সব রকম কাজই চলে!)

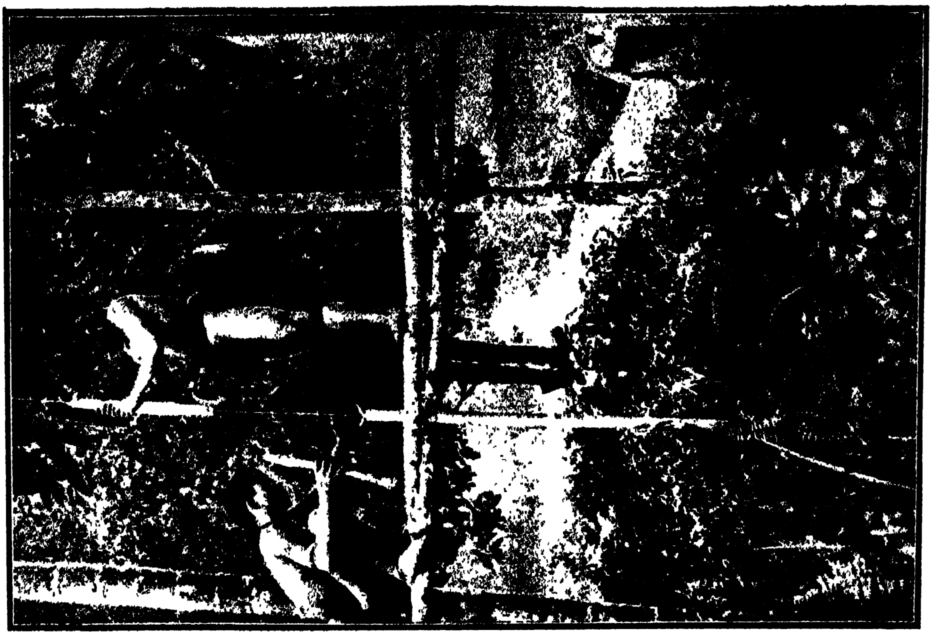
রাত্রি হইলে পর গ্রামের মাঝখানে আগুন জ্বালান হয়। পুরুষেরা এই আগুনের চারিদিকে বসিয়া দিনের ঘটনার আলোচনা এবং অন্যান্য খোশগল্প করিতে থাকে। রাত্রি নয়টা আন্দাজ হইলে প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে ঘুমাইতে যায়। দু-একজন বৃদ্ধ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গল্পগুজব এবং ধূমপান করে। বোর্ণিওবাসীরা মাতাল প্রায় কখনও হয় না। বিশেষ উৎসবের সময় ইহারা হয় ত মদ খাইয়া একটু হল্লা করে; কিন্তু মাতলাম খুব কম সময়েই করে। ইহারা ধেনো মদই খায়। মদ কখনও কেহ তাহার ঘরে বসিয়া খায় না—সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে খায়।

যুদ্ধ-নাচ দেখাইবার সময় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যোদ্ধা তাহার কল্পিত শত্রুর সহিত নানা প্রকার বিকট এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী ও মুখ বিকৃতি করিয়া যুদ্ধ করিবার ঢঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে।

কোনো যুবক যখন কোনো যুবতীর প্রেমে পড়ে, তখন সে প্রায়ই তাহার প্রণয়িনীর বাড়ী বেড়াইতে যায়। যুবকের বাড়ীর লোকেরা বলে—"অমুক অমুকের বাড়ী তামাক আনিতে গিয়াছে"—ইহার



কেনিয়া যোদ্ধার বিজয়োৎসব। (কোন কেনিয়া যোদ্ধা যুদ্ধ জয় করিয়া আসিবার পর প্রথম রজনী নিজ গৃহের সম্মুখে তাম্বুতে বাস করে; এবং নিহত শত্রুর মুণ্ড-হস্তে নারীরা নৃত্য করিয়া বিজয়ীর মনোরঞ্জন করে।)



তীর ছুঁড়িবার নল প্রস্তুত। (মাচার উপর দণ্ডায়মান লোকটি লৌহদণ্ড সঞ্চালন করিয়া ছিদ্র করিতেছে; উপবিষ্ট ব্যক্তি তাহাতে জল ঢালিতেছে; আর কাষ্ঠের চূর্ণগুলি ভাসিয়া উঠিয়া ছিদ্র করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে।)

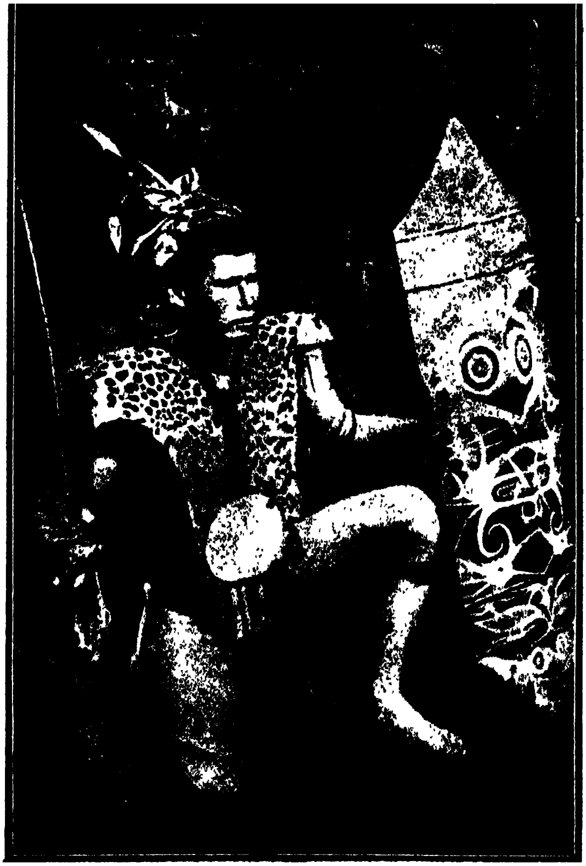


ইতে বিষ এই বিষ কিংবা বর্ষার মাথাই খা হয়। এই বিষা কর াঁচড় লাগিয়া একটু রক্তপাতই ষ্ট।)

মানেই যুবক তাহার যুবতীর নিকট হৃদয় নিবেদন করিতে গিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা হাত এবং কোমর ঘুরাইয়া এক প্রকার চমৎকার নাচে। স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া নৃত্য করে না—এক একজন পালা করিয়া নাচে। নৃত্য করিবার সময় নারীরা কাণে এবং অন্যান্য অঙ্গে নানা প্রকার অলঙ্কার পরে। নাচের জন্য ইহারা বিশেষ ভাবে সাজিয়া থাকে। হাত দিয়া নানা প্রকার ভঙ্গী করিতে করিতে যখন স্ত্রীলোকেরা নাচে—তখন তাহা দেখিতে চমৎকার হয়।

মিথ্যাবাদীকে ইহারা বড় ঘৃণা করে। কোনো লোক যদি কাহারও মিথ্যা নিন্দা করিয়া ধরা পড়ে, তবে সে যাহার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, সেই ব্যক্তি একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া অতি প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া দিয়া বলে "মিথ্যাবাদীর গাদায় যে একটি করিয়া এমনি কিছু না ফেলিবে তাহার মাথায় বেদনা হইবে।" যে কেহ ঐ স্থান দিয়া যায়—সকলেই ঐ গাদায় একটি করিয়া ডাল—মাথার বেদনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফেলিয়া দেয়। মিথ্যাবাদীর কথা এমনি করিয়া সকল লোকে জানিতে পারে।



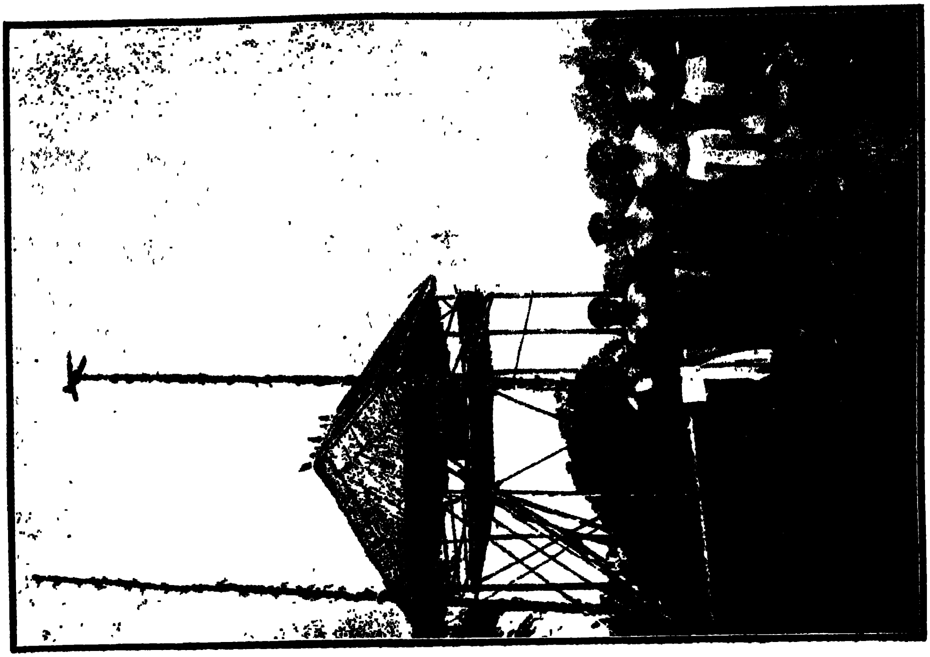
ক্রেমানটান সর্দ্দার

নদী দিয়া যে সকল গ্রামে যাওয়া যায় না—সেই সকল গ্রামে লোকে জঙ্গলের ভিতর সরু পথ দিয়া যাওয়া-আসা করে। জলাভূমির উপর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য বড় বড় গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি ভাবে ফেলিয়া রাখা হয়। যে দুইটি গ্রামের মাঝখানে এই জলাভূমি থাকে, সেই দুই গ্রামের লোকে এই গাছ কাটার ভার লয়। স্থলে স্থলে ৪।৫ মাইল-ব্যাপী জলাভূমির উপর গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি ফেলিয়া এইভাবে পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অসভ্য লোকেরা খালি পায়ে অতি সহজে এই পথ দিয়া দ্রুতবেগে চলা-ফেরা করে।



তূলার বীজ ছাড়ানো।

বোর্ণিওতে নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়।



যর পূর্ব্বে ফলাফল গণনা



ন মোক্তা—যুদ্ধের স্মৃতি

নদীতে মাছ প্রচুর। দড়িতে এক প্রকার বাঁকান কাঁটা বাঁধিয়া লোকেরা মাছ ধরে। জঙ্গলে বিশেষ কয়েক প্রকার গাছ হইতে প্রচুর গাটাপার্চ্চা পাওয়া যায়। কর্পূরও পাওয়া যায়। সাবুদানার গাছ পথে-ঘাটে। পুনান জাতির লোকেরা সাবু প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। অন্যান্য জাতির লোকেও ধান প্রচুর না হইলে ধানের বদলে সাবু ব্যবহার করে। বোর্ণিওর জঙ্গলে এক প্রকার পাখীর বাসা পাওয়া যায়। চীনারা এই পাখীর বাসা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে। চীনাদের নিকট এই পাখীর বাসা সুখাদ্য।

শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বিস্তার হইবার পূর্ব্বে বোর্ণিও-বাসীদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কলহ-প্রবৃত্তিও কমিয়া আসিতেছে। তবে এখনও কাহারো মৃত্যু হইলে মৃতদেহ সৎকারের জন্য কয়েকটি নরমুণ্ডের একান্ত প্রয়োজন হয়। নরমুণ্ড তাহারা কোনো শত্রুজাতীয় লোকের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সংগ্রহ করে। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে উভয় দলই উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হয়। বোর্ণিওবাসীরা অসভ্য হইলেও তাহাদের যুদ্ধের নিয়ম-কানুন আছে। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র তলোয়ার এবং বর্শা। কোনো কোনো জাতি ফুঁকো-নলের সাহায্যে বিষাক্ত ছোট ছোট বর্শাও যুদ্ধে ব্যবহার করিয়া থাকে। ফুঁকো-নলের ব্যবহারে ইহাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখা যায়।



কেনিয়া শিকারী—(শিকারসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন)

কেবলমাত্র ছুরি এবং কুঠারের সাহায্যে বিশেষ একপ্রকার গাছের ডালকে মাঝখান দিয়া ফুটা করিয়া নলের মত করে। মাঝখানের ফুটার ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চি হয়। নলটি বন্দুকের নলের মতই সোজা এবং নিখুঁত হয়। এই নলের মধ্য দিয়া ইহারা ছোট ছোট বিষাক্ত বর্শা শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করে। বর্শা প্রায় ১০ গজ পর্য্যন্ত যায়। ইহার আন্দাজও রাইফেলের গুলির মত। এই ফুকো নলের আগার দিকে রাইফেলের মত সঙ্গীন লাগান



বস্ত্র-বয়ন

থাকে। দরকার মত ইহারা এই সঙ্গীন ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষা করে। সব জাতির যোদ্ধারা কাঠের ঢাল ব্যবহার করিয়া থাকে।

যুদ্ধ-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শুভচিহ্ন দেখিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হয়। অমঙ্গল চিহ্ন দেখিলে যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়। গভীর রাত্রে আক্রমণকারীর দল শত্রুর গ্রামের



বৃক্ষ হইতে বিষ-সংগ্রহ

চারিদিক ঘেরাও করে। এত ধীরে এবং নিঃশব্দে গ্রাম ঘেরাও করা হয় যে গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারে না। আক্রমণকারীর দল নৌকাতে শুকনো কাঠ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বোঝাই করিয়া রাখে। ভোর হইবার কিছু পূর্ব্বে আক্রমণকারীরা ভীষণ চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাদের আক্রমণ করে। আক্রান্ত গ্রামবাসীরা কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই আক্রমণ করিয়া তাহাদের খুন জখম করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যুদ্ধ জয় করিয়া নৌকায় ফিরিবার সময় পাশের অন্যান্য গ্রামবাসীরা তাহাদের দেখিতে আসে। এই সময় যুদ্ধে যতগুলি কাঁচা মাথা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা যোদ্ধারা তুলিয়া তুলিয়া ভিন্ন গ্রাম-বাসীদের দেখাইতে দেখাইতে যায়। নৌকায় তুলিবার পূর্ব্বে মাথাগুলিকে আগুনে ঝলসাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বকালে কোনো সর্দ্দারের মৃত্যুর পর তাহার আত্মার জন্য পরকালেও দাসের দরকার হইত। সেইজন্য কয়েক জন ক্রীতদাসকে হত্যা করিয়া তাহাদের আত্মা-গুলিকে সর্দ্দারের আত্মার ক্রীতদাস হ বার জন্য পরলোকে পাঠান হইত। এই হইতেই বোধ হয় কাঁচা মাথা সংগ্রহের প্রথা আসিয়াছে। বোর্ণিওবাসীরা মনে করে, তাহাদের চারিদিকে বহু অদৃশ্য শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এই শক্তিগুলিই তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। এই শক্তিদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য দ্বীপ-বাসীরা নানা প্রকার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বিশেষ পাখীকে বিশেষ সময় দেখা ইত্যাদি দ্বারা ইহারা মঙ্গলামঙ্গল স্থির করে। নিহত শূকর এবং মুর্গীর নাড়ী-ভুঁড়ি দেখিয়াও ইহারা দেবতার ইচ্ছা নির্ণয় করিতে পারে।

কাহারো শক্ত রোগ হইলে চিকিৎসক আসে। শক্ত রোগ হইলে নাকি আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তার পর বৈদ্যের মন্ত্র এবং চিকিৎসার গুণে আত্মা অনেক সময় ফিরিয়া আসে, কখন কখনও অন্য দেহে প্রবেশ করে। বৈদ্য রোগীকে যে সমস্ত বিধি দেয়, রোগী তাহা সর্ব্বাংশে পালন করে। বৈদ্যেরা রোগী দেখিয়া তাহার পথ্য ও ঔষধাদি স্থির করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। তাহার পাওনা রোগীর বাড়ীর লোক পরে পাঠাইয়া দেয়। ভাল মনে যে যাহা দেয়, বৈদ্য তাহাই গ্রহণ করে। সভ্যজগতের বহু ডাক্তার অপেক্ষা অসভ্য বৈদ্য এই বিষয়ে ভাল—ইহা বলা যায়।

গৃহের সামনে কাঠের তৈরী দেব-মূর্ত্তি থাকে। এই মূর্ত্তির মাথায় একটি পিতলের ঘণ্টা লাগান থাকে এবং পাশে থাকে এক লম্বা গাছ, তাহার মাথার ডালগুলি বাদ দিয়া

আশে-পাশের আর সব ডালপালা ছাটিয়া দেওয়া হয়। পূজা দেবমূর্ত্তির সামনে হয়। পূজারীর প্রার্থনা মূর্ত্তির পাশে লম্বা গাছ দিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়। যে গাছ যত লম্বা হয়, সেই গাছ দিয়া প্রার্থনা তত তাড়াতাড়ি স্বর্গে যায়।

কলেরা এবং বসন্তে বোর্ণিওর বহু স্থান মাঝে মাঝে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয়। লোকেদের বিশ্বাস, কলেরা এবং বসন্ত নদীর জল বাহিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রাম আক্রমণ করে। এই জন্য কলেরায় আক্রান্ত গ্রামের লোক যাহাতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য লোকে তাহাদের গ্রামের চারিদিকের গাছ কাটিয়া বেড়ার মত করিয়া ফেলিয়া রাখে। নদীর উপরের এই প্রকার কাটা গাছ ফেলিয়া অথচ এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত দড়ি দিয়া পথ বন্ধ করিয়া দেয়। বোর্ণিওবাসীরা কোনো গ্রামে যাইবার নদীপথে যদি এই প্রকার দড়ি দেখে, তবে সেই গ্রামে তাহারা প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিলে প্রাণ-সংশয় ঘটে। শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীরা এই নিষেধ না মানিয়া অনেক সময় বিপদে পড়ে। বোর্ণি ও ভ্রমণ করিবার পূর্ব্বে এই দেশের লোকেদের আচার-বিচার সঙ্কেত-চিহ্ন ইত্যাদির সঙ্গে কিছু পরিচয় করিয়া লওয়ার প্রয়োজন। অসভ্য লোকদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করারও প্রয়োজন।

লালু নন্দলাল

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

লালু নন্দলাল কবিওয়ালা ছিলেন। লালু নন্দলাল একজনের নাম, কিম্বা রাসু নৃসিংহের মত দুইজনের নাম,—তাহা জানা যায় না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কবিওয়ালাদের কথা যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তার পর আর ইঁহাদের জীবনী লইয়া বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নাই; সুতরাং এখন এইরূপ প্রশ্নে কোনো ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা লালুর গানে, 'নন্দলাল ভণে' 'লালু ভণে', 'লালচন্দ্র কহে' 'লালু নন্দলাল ভণে' ইত্যাদিরূপ পৃথক পৃথক ভণিতাও পাইয়াছি।

লালুর নিবাস কোথায় ছিল, তাহা কেহ জানে না। যে কয়েক-খণ্ড পুরানো 'প্রভাকর' এখনও পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে লালুর বিশেষ কোনো পরিচয় নাই। রাজা রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ইনি চুঁচুড়া অঞ্চলের লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। লালুর একটী গানে আছে—'কলিকাতার লবণ গোলার মত চাঁদোয়া টানাই'। অপর কতকগুলি গানে বীরভূমের 'জয়দেব কেঁদুলী' 'বক্রেশ্বর' এবং 'গোদা কুড়ির আখড়া' ও 'মুড় মাঠ' নামে একখানি গ্রামের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে, ইঁহাকে বীরভূমের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত বলিয়া মনে হয়। গোদাকুড়ির আখড়াটির কোনো কালে কোনো খ্যাতি ছিল না। ইহার উল্লেখ দেখিয়া সন্দেহ হয়, হয় তো তিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। মুড়-মাঠের একজন সংগোপ এবং বরুলের বলহরি রায় তাঁহার শিষ্য ছিলেন। বলহরি বীরভূমের কবিওয়ালাদের গুরু বলিয়া পরিচিত।

আমরা ১২২২ সালের লেখা একখানি খাতায় লালু নন্দলাল, রামজীদাস, রঘুনাথ দাস ও ভারত—এই চারিজন কবিওয়ালার কতকগুলি গান পাইয়াছি। ইঁহাদের সকলের গানেই একজন চাষার নামে বিশেষ রকম গালাগালি আছে। লালুর গানে তাহার নাম পাইতেছি 'কালো পাল'। মুড়-মাঠে ইহার বাড়ী ছিল। লালুর গানে 'কালো পালের গড়ে'র পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে, এবং পালের সহকারী একজন বৈরাগী এবং একজন সুঁড়িকেও খুব গালি দেওয়া হইয়াছে। লালু যে তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন, গানে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা মুড়মাঠে গিয়া পালের গড় ও তাঁহার ভিটা দেখিয়া আসিয়াছি। অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁহার নাম ছিল হারাধন পাল,—কালো পাল ছেলেবেলার ডাক-নাম। তাঁহার সহকারী দুইজনের নাম গঙ্গাই দাস ও কার্ত্তিক সেট। তাঁহার ভিটায় এখন যিনি বাস করেন, তাঁহার নাম আনন্দময়ী দাসী, বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। ইনি হারাধনের পৌত্রী। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও

হারাধনের কোনো গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোনো কবিওয়ালার নিকটও ইঁহার গান পাওয়া যায় না। একজন কবিওয়ালা নিম্নের খণ্ডিত গানটী হারাধনের রচিত বলায় লিখিয়া লইয়াছিলাম,—এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

কাল মূর্ত্তি কালী নয়, উলঙ্গ বেশেতে রয়
শিবের বরেতে আমি হয়েছে সদয়,—
নাক কাটা কান কাটা বটে চোখে ঠুলী দিয়েচে
গর্দ্দান কাটিলে মুণ্ড বল কার জল খেয়ে বাঁচে।
যোগী ঋষি কি তপস্বী
তার রুধির পান করে তারা সবাই হয় খুসী,
তার অস্থি-মাংসে মুনিগণ সব বসে যজ্ঞ করেচে,
গর্দ্দান কাটিলে মুণ্ড বল কার জল খেয়ে বাঁচে॥

লালু কোন্ জাতি ছিলেন, জানা যায় না। তাঁহার একটী গানে কালো পালের কোনো আত্মীয়াকে তাঁত বোনা শিক্ষা দিবার কথা আছে। আর একটী গানে ঐ আত্মীয়াকে ভেক্ দিয়া বৈরাগী করিতে চাহিয়াছেন। গুপ্ত কবি লালু, রামজী ও রঘুনাথ দাসকে গোজলা গুঁইয়ের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

লালুর কোনো সম্পূর্ণ গান এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। একটী গান সকল সংগ্রাহকই প্রকাশ করিয়াছেন—

"হল এই সুখ লাভ পীরিতে,
চিরদিন গেল কাঁদিতে।
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার
গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর"
ইত্যাদি।

এ গানে ভণিতা নাই। বীরভূম অঞ্চলে 'ডুবেছি না ডুবতে বাকী পাতাল কত দূরে দেখি।' এই ধরণের একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, বোধ হয় অন্য অঞ্চলেও আছে। ইহা লালুর প্রভাবের ফল কি না কে বলিবে?

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় বৃটিশ মিউজিয়ম হইতে পুরানো বাঙ্গালার নমুনা হিসাবে একটী গান ও কয়েকখানি দলিল নকল করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য সহ সেগুলি 'ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজপত্র' নামে ১৩২৯ সালের ৩য় সংখ্যক পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাপার অক্ষরে লালু নন্দলালের ভণিতা সহ সম্পূর্ণ গান সেই প্রথম দেখিয়াছি। এই গান হইতে লালু নন্দলালের শক্তি অনুমান করা যায়। লালু রঘুনাথ দাসের সমসাময়িক। হরু ঠাকুর যৌবনে রঘুনাথের নিকট গান শিখিয়াছিলেন। হরুর জন্ম সন ১১৪২ সাল হইলে অন্ততঃ সত্তর সাল নাগাইৎ রঘুনাথ দাস বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমিত হয়। লালু তার পূর্ব্বে পরলোকে গিয়াছিলেন, কি বাঁচিয়া ছিলেন, জানি না; কিন্তু স্বীকার করিতে ক্ষতি নাই যে, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকট ঋণী!

সন ১১৫৯ সালের পরে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়; লালু তখন বিখ্যাত কবিওয়ালা। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের সংগৃহীত গান দেখিয়া আমাদের অনুমান হয় ভারতচন্দ্র লালুর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। গানটী উদ্ধৃত করিলাম—

ও কি অপরূপ দেখি ধনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিম্বা ফণী কিম্বা বেণী॥
অলকা বেষ্টিত কনকে রচিত সীঁথি কিম্বা সৌদামিনী।
তার অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দুর কি দিনমণি॥
খঞ্জন যুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অনুমানি।
কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি॥
কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িত পুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি কি কোকবিহীন পানি॥
কি মৃণাল দণ্ড কিবা করী শুণ্ড কিবা বাহুর সুবলনী।
ত্রিবলী ত্রিগুণো কি কাম সোপানো কিবা নাভী তরঙ্গিনী॥
কিবা কটীদেশ কিবা পশু ঈশ মধ্যে শোভিছে কিঙ্কিনী।
কিবা রম্ভাতরু কিবা যুগ্ম উরু কিবা মরাল চলনি॥
লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায় চলেছ লো বিনোদিনী।
নন্দলাল ভণে চেয়া আমা পানে হেসে কথা কহ শুনি॥

রচনার ছটা, উপমার পারিপাট্য ভারতচন্দ্রের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিশেষ 'কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর' ভারতচন্দ্রে অবিকল পাওয়া যায়। কবির গান মুখে মুখে ফেরে;—অসম্ভব নয়, রাঢ়ের কবি ভারতচন্দ্র বহুবার সে গান শুনিয়াছিলেন, পরে কাব্য রচনার সময় অজ্ঞাতে ঐ দুটা চরণ অবিকল মনে উঠিয়াছিল,—গুণাকর দ্বিধাহীন চিত্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য দুইজনেরই স্বাধীন রচনায়

একই কথা থাকাও সম্ভবপর হইতে পারে। গান রচনার যখন তারিখ নাই, তখন নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। আমরা আন্দাজ করিতেছিলাম মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি একখানা গানের খাতা পাইয়াছি। খাতায় ১২২২ সাল লেখা আছে। দাশুরায় তখন ৯।১০ বৎসরের বালক। পরবর্ত্তী কালে দাশরথী যখন পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, তখন লালুর গানের সাহায্য লইয়াছিলেন, ইহাও আমাদের একটা অনুমান। আমরা 'কৃষ্ণকালী' বিষয়ক লালুর ও দাশুর এক একটী গান পাশাপাশি তুলিয়া এই অনুমানের সমর্থন করিতেছি।

লালুর গান—

ঐ মহিষমর্দ্দিনী তারা চণ্ডিকে এনে দেখাইলে,
করে অসি মুক্তকেশী কালী চণ্ড মুণ্ডমালা গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী হুহুঙ্কার ছাড়ে, দানব নাশ করে,
শমনকে দমন করে ভবভয়ে ত্রাণ করতে পারে,
ঐ সদাশিবের হৃদিপরে এ যে কালী ব্রহ্মময়ী।
কই গো কুটীলে বনে দেখাও আজ নন্দের নন্দন কই,
করিতে সেই কালীয়ের তত্ত্ব হলেম কৃতার্থ,
পড়ে পেলাম পরমার্থ,
আমার গুরুদত্ত রক্তকালী করাল বদনা অই॥
দেখি পূর্ণ সনাতনী অই তারকব্রহ্মময়ী,
পদতলে মহাকাল যার করে সাধনা,
অন্ত পেলাম না, সংখ্যে করতে পারলেম না,
ঐ নামে যায় ভব যন্ত্রণা,
আমার ইচ্ছে হয় ঐ পদাম্বুজে রজে মন মজিয়ে রই।
তোরা ভাবিস্ আর, এখন অরি হলি শ্রীরাধার,
নিধুবনকে আনলি দেখাইতে,
এখন সেই কোথা তোমার ওলো কুটীলে
দিলি বদনামী আচম্বিতে,
তোর কথা শুনে খড়্গ হাতে আমি আজ
এলাম সেই কোপে,
এসে বনের মাঝে দেখিলাম আজ গো
মন আমার ভুলেছে রূপে,
জগত জননী ঐ হয়ে অধিষ্ঠান, দেখি মূর্ত্তিমান,
শীতল করে তাপিত প্রাণ, চতুর্ভূজে করে বর প্রদান,
কবি লালু বলে অন্তিমকালে ঐ চরণ ত ছাড়া নই॥

উপরের এই গানটীর সঙ্গে দাশুর নীচের গানটী মিলাইয়া দেখুন—

কৈ গো কুটীলে বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর হৃদি সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী॥
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব পড়ে পেলাম পরমার্থ,
আমার গুরুদত্ত রক্তকালী করাল বদনা অই।
গঞ্জনা দেই সাধে সাধে শ্রীরাধায় কি অপরাধে,
শ্রীগোবিন্দ অপবাদে সদা মন্দ কই,
স্বচক্ষে দেখিলাম আসিয়ে জবা বিল্বদল দিয়ে
যায় শিব আরাধে তায় আরাধে আমার রাধে রসময়ী॥

আমরা লালু নন্দলালের যে গানগুলি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে খেউড় গানই অধিকাংশ। এই খেউড গানের মধ্যেই মুড়মাঠ প্রভৃতি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। একটী গান হইতে সন্দেহ হয়—লালু হয় তো জাত খোয়াইয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন। আমরা এখানে লালুর আর একটী গান উদ্ধৃত করিলাম—

কান্দিছে যশোদারাণী করি হাহাকার,
এখনি আছিল ভাল নীলমণি আমার।
অচেতনে ধূলায় পড়ে কি হলো তা না জানি।
আয়গো আয় দেখে যাগো রোহিণী,
হায় কেমন করে নীলমণি,
ছল ছল দুটী আঁখি মলিন হলো মুখখানি॥
অনেক তপের ফলে আমি পেয়েছি গোপালে,
না জানি কি হবে নন্দ যশোদার কপালে,
নয়ানের তারা গোপাল নন্দ ঘোষের প্রাণ,
তিল আধ না দেখিলে বিদরে পরাণ,
আমি কেমন করে পাসরিব তোমার চাঁদ বদনখানি॥
কে আর সম্মুখে আসি বলিবে জননী,
কে আর মাগিয়া খাবে ক্ষীর সর ননী,
ঐ ঘরের আঙ্গিনার মাঝে কে আর নাচিবে,
নন্দ ঘোষের বাধা কে আর বহিবে
ব্রজাঙ্গনার ঘরে কে আর চেয়া খাবে নবনী।
আর না রাখিবে তুমি বৃন্দাবনের ধেনু,
কদম্ব তলাতে বসি কে পুরিবে বেণু,
আঁখি মেল প্রাণের গোপাল ডাক রে মা ব'লে,
ক্ষীর ননী দিব তোমার বদন কমলে,
বাঁচবে না তোর পিতা নন্দ লালুনন্দের এই বাণী॥

বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম এ

(৪)

ব্যাঙ্কের সহিত কারবারকারীগণের সম্বন্ধ

ব্যাঙ্কের সহিত তাহার কারবারকারীগণের দেনদার ও পাওনাদার সম্বন্ধ। যখন টাকা জমা লয় তখন ব্যাঙ্ক দেনদার, আর যখন টাকা ধার দেয় তখন পাওনাদার। কিন্তু সাধারণতঃ উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে যে একটা পরস্পর-বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বুঝায়, ব্যাঙ্ক ও তাহার সহিত কারবারকারীগণের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকা সত্বেও, সেই প্রকার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ নাই। এক শ্রেণীর মহাজন আছে, যাহারা ধার দিবার সময় কেবল নিজেদের সুবিধার উপরই লক্ষ্য করিয়া থাকে,—কি প্রকারে দেনদারের বন্ধকী সম্পত্তি আপনাদিগের করতলগত করিবে তাহারই চিন্তা করে। কিন্তু ব্যাঙ্কের লক্ষ্য দেনদারের সম্পত্তি নহে; প্রদত্ত টাকা ও তাহার সুদই ব্যাঙ্ক কামনা করিয়া থাকে। বাণিজ্যের সাহায্য করিয়া দেশ-সেবা করাই ব্যাঙ্কের মূলমন্ত্র। ব্যাঙ্ক-বিশেষের অনিষ্ট হইলে কেবলমাত্র যে তাহার অংশীদারগণের ও আমানতকারীগণের অনিষ্ট হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়েরও সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারবারকারীগণের উচিত ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করা। আপনাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে যত আগ্রহ, ব্যাঙ্কের টাকাও সেইরূপে ফিরাইয়া দিতে ততখানি চেষ্টা থাকা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। যে ব্যাঙ্ককে সম্যক বিশ্বাস হয় না, কেবলমাত্র নিজেদের সুবিধার জন্য সেখানে না যাওয়াই ভাল। কারবারে যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, বা যাহাকে ধার দিতে সাহস হয় না, তাহাকে ধার না দেওয়াই ভাল। তিন মাস পরে টাকা লইবার প্রতিশ্রুতিতে কাহাকেও ১০০০৲ টাকার মাল দিয়া, দশ দিন পরেই তাহার নিকট টাকা চাওয়ার অর্থ ক্রেতাকে সঙ্কটে ফেলা ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাতে ব্যবসা হয় না, ক্রেতার প্রতি শত্রুতা করাই হয়; আর নিজের উপকারও অনিশ্চিত। কারবারী লোক মাত্রেই কারবারে টাকা লাগাইয়া রাখে; তাহার পাওনাও থাকে দেনাও থাকে; কিন্তু একযোগে যদি সকল পাওনাদার হঠাৎ সমস্ত প্রাপ্য আদায় চাহে, দেনদারের পক্ষে তাহা দেওয়া কঠিন,—অন্য কেহ ধার না দিলে ঐরূপ অবস্থায় তাহার সম্মান বজায় রাখা অসম্ভব। পাওনাদার তাহার টাকা চাহিতে পারে; কিন্তু দেনদারগণ যে একত্র-যোগে তখন আপনাদের দেনা পরিশোধ করিতে ব্যস্ত হইবে, এরূপ আশা করাই বাতুলতা মাত্র। ব্যাঙ্কও কারবারী, এ কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। বিশ্বাস করিয়া টাকা দিবার পূর্ব্বে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা উচিত; কিন্তু টাকা দিয়া সময় না হইতেই ফিরাইয়া পাইবার ইচ্ছা করা অনুচিত। সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক মাত্রেই আমানতকারীগণের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখে; কিন্তু পাওনাদারগণ অনর্থক ভীত হইয়া যদি ২।১ দিনেই সমস্ত টাকা উঠাইতে চায়, তবে Bank of Bombayর মত গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ককেও টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। একবার People's Bankএর পাওনাদারগণের এই প্রকার অহেতুকী আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায়, টাকা উঠাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল; ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে Liquidatorগণ পাওনা টাকা আদায় করিয়া পাওনাদারদিগকে টাকায় ১৶০ দিয়াও কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকায় গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একটু বিচার করিয়া চলিলে এইরূপ অনর্থক তোলপাড় হয় না। 'চিলে কাণ লইয়া গিয়াছে' এই কথা শ্রবণমাত্র চিলের অনুসরণ করা যে প্রকার হাস্যাস্পদ, কাহারও 'ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে' শুনিয়াই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়াও তদ্রূপ। কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রকার একটী ঘটনা হইয়াছিল। কোনও ব্যক্তির অবস্থা খারাপ বলিয়া বাজারে প্রকাশ হইলে টাকা উঠাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

ঐ একই নাম-বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি ছিল—একজন ব্যবসায়ী, কোনও ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, অপর ব্যক্তি কোনও এক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর (Director)। বাজারে প্রকাশ হইল অমুক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ব্যবসা বন্ধ করিতেছে; আর যখন ডাইরেক্টরের এইরূপ অবস্থা, তখন ব্যাঙ্কও নিশ্চয় টলটলায়মান। কাজেই সেখান হইতে টাকা উঠান হইতে লাগিল। পরে যখন জানা গেল যে, যাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া শুনা গিয়াছিল, তিনি ব্যাঙ্কের কেহ নহেন—অপর ব্যক্তি, তখন আবার টাকা জমা দিবার ঘটা সুরু হইল। একটু অনুসন্ধান করিয়া চলিলে অনর্থক এই প্রকার আতঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারিত।

ব্যাঙ্কের দায়িত্ব

ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বড় সহজ নহে। ন্যায়তঃ ও আইনতঃ ব্যাঙ্ক তাহার সহিত কারবারকারীগণের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করিতে বাধ্য। চলতি হিসাবে টাকা লইলে আমানতকারীর নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার 'চেকের' উপর ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বাধ্য। কিন্তু যদি ডিপোজিটরের সহি জাল হয়, তাহা হইলে অসৎ উদ্দেশ্য না থাকিলেও প্রদত্ত টাকা ব্যাঙ্কের দণ্ড যাইবে;—কাজেই টাকা দিবার পূর্ব্বে চেক্‌খানিকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হয় ও তাহাতে কিছু সময়ও যায়। যাঁহারা টাকা লইতে আসেন, তাঁহারা এই ব্যাপারটী একটু বুঝিয়া চলিলেই কাজের অনেক সুবিধা হয়। কার্য্যতঃ প্রায়ই কিন্তু অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। টাকার প্রয়োজন বশতঃ কিংবা সময়ের অল্পতা বশতঃ অথবা নিজেদের একটু স্বার্থপরতার জন্য অনর্থক ব্যস্ত হইয়া তোলপাড় করিয়া তুলিলে ২।৪ জনের সুবিধা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশের বিশেষ অসুবিধাই হয়। টিকিট ঘর, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থানে একটু সংযম অভ্যাস করিলে সকলেরই মঙ্গল। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে করিতে সমস্ত ব্যাপারেই একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত স্থানে সিপাহী-সান্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। নিয়মই এরূপ হইয়া গিয়াছে—যিনি আগে আসিবেন, তিনি প্রথমে দাঁড়াইবেন; তাহার পর যিনি আসিবেন তাঁহাকে প্রথম ব্যক্তির পর দাঁড়াইতে হইবে; তাহার পর আসিলে তৃতীয় স্থান লইতে হইবে ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করা সেখানকার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে—কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। ইহা এতদূর মানিয়া চলা হয় যে, ৪র্থ ব্যক্তি যদি ৩য় স্থানে কিংবা ৭ম ব্যক্তি যদি ৫ম স্থানে যাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে অপেক্ষাকারী ব্যক্তিগণই নিয়মভঙ্গকারীকে তাহার স্বস্থানে ফিরিতে বাধ্য করে—পুলিসের জন্য ডাকা-ডাকি করিতে হয় না। ফলে সমস্ত কাজই সহজসাধ্য ও নিয়মমত হইয়া যায়।

নিজের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বাভাবিক; কিন্তু পরের অসুবিধা না করাও ন্যায়সঙ্গত; আর পরের অসুবিধা একটু বুঝিবার চেষ্টা করিলে, অনেক সময় কাজ সহজ হয়। একখানি কানপুরের চেক বা হুণ্ডি কলিকাতায় দিলে, যদি কানপুরেও ব্যাঙ্কের শাখা থাকে, তবে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সে ব্যাঙ্কের কোনও বাট্টা লওয়া অন্যায়। কিন্তু তখন যদি এটুকু বিচার করা যায় যে, কানপুর হইতে আদায়ী টাকা কলিকাতায় আনিতে ব্যাঙ্কেরও খরচ পড়ে, ও টাকা আদায় করিবার জন্য বেতন দিয়া দরওয়ান, কেরাণী ও খাজাঞ্চি রাখিতে হয়, তাহা হইলে এই বাট্টার বিরুদ্ধে আপত্তি কমিয়া যাইবে।

আরও একটী ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সহিত তাহার মক্কেলগণের সহযোগ ও বোঝাপড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত কাগজপত্র ও সন্ধান ব্যাঙ্ক চাহিয়া থাকে, উভয়ের মঙ্গলের জন্য যথাযথভাবে তাহা সরবরাহ করা কর্ত্তব্য। কোনও ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাস জন্মিলে ব্যাঙ্ক তাহা সম্পূর্ণভাবে দূর না করিয়া মক্কেলের সাহায্য করিতে পারে না। বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের প্রাণ। নির্ভর করিবার মত উপযুক্ত পাত্র না হইলে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়া অসম্ভব; কাজেই, যাহাতে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বাজারে নাম হইয়া গেলে টাকা পাওয়া সোজা। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্যাঙ্কের নিকট সোজা ও সরল কর্ম্মপ্রণালীই সাহায্য পাইবার অধিকারী, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় ও ইহার উপরেই দেনদারগণের নিকট হইতে Security বা বন্ধক লওয়া না লওয়া বা অল্পবিস্তর গ্রহণ করা নির্ভর করে। কোন্ কোন্ Securityর ব্যাঙ্কের নিকট কি প্রকার মূল্য, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

জামিন—Security

(১) কোম্পানীর কাগজ—ব্যাঙ্কের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Security গভর্ণমেণ্টের বা কোম্পানির কাগজ। এই কাগজের দর উঠা-নামা হয় অল্প, আর ইচ্ছামাত্র তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া বা অন্য স্থানে বন্ধক রাখিয়া টাকা পাওয়া যায় বলিয়া ইহা শীর্ষস্থানীয়। ব্যবসাদার কোম্পানির সেয়ারের ন্যায় ইহা হস্তান্তর করা কাহারও অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। হস্তান্তর করিতে হইলে কোনও ব্যয় নাই। কেবলমাত্র ইহার পিঠে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সহি করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দিলেই, ইহা শেষোক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত কারণে, ইহার বলে ঋণ লইলে, সুদ সর্ব্বাপেক্ষা কম পড়ে। তবে অপরিচিত ব্যক্তিকে ইহার উপরে টাকা দেওয়াও নিরাপদ নহে। এই প্রকার Security গ্রহণ করিবার সময়েও ব্যাঙ্কের সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহার পিঠের দিকে যে সমস্ত সহি থাকে ও যাহা দ্বারা হস্তান্তর করা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক। ইহা চুরির জিনিস হইলে, বা জাল সহি-বিশিষ্ট হইলে টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই পরিচিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করা নিরাপদ নহে।

(২) স্থায়ী জমা বা Fixed Deposit—কোম্পানীর কাগজের সহিত সমান স্থান পাইবার উপযুক্ত—ব্যাঙ্কের স্থায়ী জমা বা Fixed Depositএর রসিদ। এই রসিদ সহি করিয়া অপরকে বিক্রয় করা যায় না; তবে যে ব্যাঙ্ক ইহা দেয়, সেই ব্যাঙ্কের নিকট সহি করিয়া গচ্ছিত রাখিয়া ইহার উপর কম সুদে টাকা পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক যে সুদ দেয়, তাহার উপর শতকরা ১—১৷৹ টাকা সুদ বেশী লয়। আমানত-কারীর প্রাপ্য সুদ চলিতেই থাকে, জমা টাকা আবদ্ধ হইয়া পড়ে না, আর মাত্র যতদিন এই টাকা ব্যবহার করা যায়—তত দিনেরই সুদ দিতে হয়।

(৩) Bullion—সোনা রূপা রাখিয়া তাহার বাজার দরের উপর ৮০ হইতে ৯০ শতাংশ ধার পাওয়া যায়। ইহার উপর সুদও কোম্পানির কাগজের ন্যায়।

(৪) কোম্পানির সেয়ার—পরিচিত ও বাজারে চল্‌তি সেয়ারের উপর টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার মূল্য বাজারের অবস্থা ও পছন্দ-অপছন্দের উপর নিভর করে। আজ যাহার ১০০৲ টাকার অংশের মূল্য ৯০৲ টাকার বেশী, ৩।৪ মাসের মধ্যেই কোম্পানির অবস্থা-বৈগুণ্যে ১০০৲ টাকার অংশের মূল্য ১০৲ টাকার কম হইতে পারে। সেয়ারের মূল্যের উঠা-নামা কোম্পানির কাগজের ন্যায় নহে;—ইহা উঠিতেও সময় লাগে না, আবার পড়িতেও দেরী হয় না। আর সমস্ত কোম্পানির "সেয়ার" সকল বাজারে চলে না। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের অনেক চা-বাগানের অংশের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইলেও, কলিকাতা বা বোম্বাইয়ে অপরিচিত বলিয়া অচল। কাজেই জলপাইগুড়ি অঞ্চলে তাহার উপর টাকা পাওয়া গেলেও, অন্য স্থানে পাওয়া সম্ভব নহে। 'সেয়ারের' বাজার-মূল্যের ৪০ হইতে ৫০ শতাংশ হাতে রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা দেয়; তাহার কারণ, কোম্পানির কাগজের ন্যায় ইহার মূল্য নিশ্চিত নহে; আর সুদও অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে। এই কাগজ গ্রহণ করিবার সময় সাবধানতার আরও বেশী প্রয়োজন। সমস্ত কোম্পানিই ইহার হস্তান্তর গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখে; কাজেই কাগজ হাতে পাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। আর দেনদার অসৎ হইলে এক দিকে ব্যাঙ্ককে কাগজ দিয়া টাকা লইতে পারে—অন্য দিকে কোম্পানির নিকট হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ কাগজের বদলে অন্য কাগজ লইয়া যাইতেও পারে। ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত কাগজের তখন কোনও মূল্যই থাকে না। হস্তান্তর করিবার কাগজের (Transfer deed) উপর সহি জাল হইলে হস্তান্তর গ্রাহ্য হয় না। সময় সময় পরিচিত Brokerএর নিকট হইতে লইলেও নিস্তার পাওয়া যায় না। কোম্পানি স্বীকার না করা পর্য্যন্ত গোলমাল থাকিয়া যায়। কলিকাতার কোনও সেয়ারের দালাল কতকগুলি সেয়ার অন্য এক দালালের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইল যে তাহার উপর সহি বিক্রেতার হাতে আসিবার পূর্ব্বে জাল করা হইয়াছিল। বিক্রেতা বাজারে চলিত প্রথা অনুসারে ঐ সেয়ার প্রকাশ্যে পাইয়া থাকিলেও, এবং তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও, আদালতে স্থির হইল যে, বিক্রেতা প্রথম দালালের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য; কিন্তু 'সেয়ার' গুলির হস্তান্তর অগ্রাহ্য ও জাল হইবার পূর্ব্বে যাহার নামে ছিল তাহারই উহাতে অধিকার।

(৫) মালের রসিদ—রেলওয়ে কিংবা ষ্টীমার কোম্পানির

মালের রসিদের উপরও টাকা পাওয়া যাইতে পারে। প্রেরক রসিদ ও তাহার সহিত প্রেরিত মালের একটা ফিরিস্তি বা তালিকা পাঠাইয়া থাকে। তাহাতে প্রেরিত দ্রব্যের কোন্‌টার কত মূল্য ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়া থাকে। সেই কাগজপত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কত টাকার মাল ঐ রসিদের সহিত পাঠান হইয়াছে। তারপর দ্রব্যের বাজার-দর কত, তাহা বাজারে অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় ও মূল্যের কোনও অংশ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার পাওয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ঐ মাল আপনার গুদামজাত করিয়া রাখে; এবং যখন যে পরিমাণ টাকা আদায় পাইতে থাকে, সেই পরিমাণ দ্রব্য গুদাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। বাজারের বর্ত্তমান মূল্য, যাহাকে টাকা দেওয়া যাইবে তাহার সততা ও ক্ষমতা ছাড়া একটু ভবিষ্যতের চিন্তাও করিয়া লইতে হয়। মাল যদি এরূপ হয় যে শীঘ্রই তাহার আদর ও মূল্য কমিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপর বেশী টাকা দেওয়া যাইতে পারে না। আর মাল পৌঁছিবামাত্র যত বেশী সম্ভব তাহা Invoiceএর অনুযায়ী কি না তাহা পরীক্ষা করান উচিত। ময়দার পরিবর্ত্তে লবণ থাকিলে মূল্যের যে ফেরফার হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গুদামজাত করিবার পর মাল রীতিমত বীমা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কোনও ব্যবসায়ী এক স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইল চাউল, গম, পাট, কিংবা তূলা সস্তায় বিক্রয় হইতেছে; কিন্তু তাহার হাতে যথেষ্ট টাকা নাই যাহার দ্বারা সে তাহার ইচ্ছামত মাল ক্রয় করিতে পারে। উপযুক্ত পসার থাকিলে টাকা না আনাইয়াও তাহার হাতে যাহা আছে তাহার দ্বারাই সে বেশী পরিমাণ মাল ক্রয় করিবে। তাহার হাতে হয়ত ২৫০৲ টাকা আছে; কিন্তু সে ক্রয় করিতে চায় ১০০০৲ টাকার গম। ব্যাঙ্কে যাইয়া সে বন্দোবস্ত করিবে এইরূপ যে ১০০০৲ টাকার উপযুক্ত গম ব্যাঙ্কের গুদামে উপস্থিত হইলে ও নগদ ২৫০৲ টাকা পাইলে, ব্যাঙ্ক তাহার পাওনাদারগণের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবে। পরে বাজার চড়িতে আরম্ভ করিলে বা ব্যবসায়ী উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলে, ব্যাঙ্কও মূল্যের উপযুক্ত মাল গুদাম হইতে ছাড়িয়া দিবে। অবশ্য মূল টাকার উপর ব্যাঙ্ক গুদাম-ভাড়া ও সুদ পাইবার অধিকারী। মাত্র ২৫০৲ টাকা লইয়া ব্যবসায়ী ১০০০৲, ১১০০৲ টাকার মালের ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবে। নারায়ণগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যদি এই প্রকার গুদাম প্রস্তুত করিয়া কোনও ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করা যায় যে, সেখানে মজুত পাটের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট অংশমত টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ-স্বরূপ পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে দেশজাত পাটের ব্যবসায়ের উপর দেশীয় ব্যবসায়ীর অনেকটা ক্ষমতা স্থাপন করা যাইতে পারে। হিলি, দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার চাউলের গুদাম; জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে তামাকের গুদামও হইতে পারে। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক বা "লোন" আফিসগুলি কেবলমাত্র জমি ও বাড়ী বন্ধকের উপর টাকা ধার না দিয়া, যদি এই প্রকারে অন্ততঃ কিছু টাকাও খাটাইতে পারেন—তাহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

(৬) ব্যবসায়ীর আমানতী টাকা যাহাতে আবদ্ধ না হইয়া ক্রমাগত খাটাইতে পারা যায়, ব্যাঙ্ক সাধ্যমত তাহার বন্দোবস্ত করে। হাতে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা, কোম্পানির কাগজ বা 'সেয়ারে' ন্যস্ত থাকিলে, তাহার উপর টাকা উঠান যায়; সোনা রূপা থাকিলে পরিমাণ মত টাকা পাওয়া যায়; মাল পাঠাইয়া তখনই রসিদের কিংবা হুণ্ডির উপর টাকা পাওয়া যায়; আবার মাল আমদানি বা ক্রয় করিবার রসিদ কিংবা মাল ব্যাঙ্কের নিকট রাখিয়া টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ক্রয়, প্রস্তুত কিংবা বিক্রয়-কালে সব সময়েই অর্থের প্রয়োজন,—ব্যাঙ্কও উপযুক্ত জামিন রাখিয়া সর্ব্বদাই টাকা দিবার জন্য উন্মুখ। টাকা যতবার নিয়োগ করা যায়, লাভও তত বেশী হয়। ব্যাঙ্কও ইহার সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ১০০০৲ টাকার মাল কিনিয়া হয় ত ১০০৲ টাকা লাভ করা হইল। কিন্তু এই ১১০০৲ টাকা যদি বৎসরের শেষে পাওয়া যায়—তাহা হইলে বার্ষিক ১০ শতাংশ লাভ হইবে—আর যদি এই টাকা আটক না থাকিয়া আরও ২।১ বার ব্যবহার করা যায় ও ২০০৲ কি ৩০০৲ টাকা লাভ করা যায়—তাহা হইলে ব্যাঙ্কে সুদ দিয়াও ১৫—২৫ শতাংশ লাভ করা হইবে। যাহাতে টাকা আবদ্ধ না থাকিয়া এই প্রকারে বহুবার ব্যবহার দ্বারা বেশী লাভ দেয়, ব্যাঙ্ক তাহাই করিয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্যের উপর ব্যাঙ্কের এত প্রভাব। এমন হইতে পারে যে, হাতে দ্রষ্টব্য কোনও প্রকার Security নাই যাহার উপর টাকা উঠান

যাইতে পারে। কোম্পানির কাগজ, সোনা রূপা কিংবা মাল কিছুই নাই, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের নিদর্শন আছে; তখন এই নিদর্শনের উপরও টাকা পাওয়া যাইতে পারে। মাল বিক্রয় করিয়া কিছু মূল্য নগদ পাওয়া গেল; অবশিষ্ট টাকা ক্রেতা ২।১ মাসে দিবার জন্য অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিল। বিক্রেতার টাকার প্রয়োজন। সে সময়ে ব্যাঙ্কের নিকট এই অঙ্গীকার-পত্র দিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যদি পরিচিত ও সৎ ব্যবসায়ী বলিয়া পসারবিশিষ্ট হয়, তবে সুদ বাদ দিয়া এই টাকা পাওয়া যাইবে। সময়-মত ক্রেতা ও বিক্রেতাকে টাকা না দিয়া ব্যাঙ্কে যাইয়া টাকা পরিশোধ করিয়া দিবে।

(৭) "গ্যারাণ্টি"—ব্যবসায়ীর প্রতিপত্তি যখন জন্মে নাই, তখন হয় ত আফিসের সাজ-সরঞ্জাম বা বাড়ী প্রস্তুতের জন্য কিছু টাকা দরকার। ব্যাঙ্ক এরূপ স্থলে জিনিস-পত্র বা বাড়ী বন্ধক না লইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইবার তখনও উপায় আছে। ব্যবসায়ী নিজে প্রতিপত্তিশালী না হইয়াও ঐ সাজ-সরঞ্জাম কিংবা বাড়ী কোনও প্রতিপত্তিশালী আত্মীয় বা ব্যবসায়ীর নিকট জামিন স্বরূপ রাখিয়া তাহার নিকট হইতে ব্যাঙ্কে "গ্যারাণ্টি-পত্র" (guarantee) দেওয়াইতে পারে। এই গ্যারাণ্টির উপরও ব্যাঙ্ক টাকা দেয়। যিনি "গ্যারাণ্টি"-পত্র দিলেন, তাঁহার ঘর হইতে টাকা লাগিল না, তাঁহাকে আদায় করিবার জন্য তাগাদা করিতে হইবে না, দুইজনেই ব্যাঙ্কের নিকট দায়ী থাকাতে ঋণভার লঘু হইয়া যায়। অন্যদিকে টাকা গ্রহণকারী আত্মসম্মান-জ্ঞানী হইলে প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়ের নিকট হইতে টাকা লইবার দরুণ লজ্জা বোধ করিবে না, ও ব্যাঙ্কের সহিত আদান-প্রদান দ্বারা নিজের পসার স্থাপন করিবার সুযোগ পাইবে বলিয়া নিয়ম-মত টাকা পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যবসায়ীর আত্মসম্মানবোধ অহঙ্কারের নাম-ভেদ নহে—ইহার উপর ব্যবসায়ীশ্রেণীর ও তৎসঙ্গে সেই দেশের সুনামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটী কিংবা দুইটী অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোনও শ্রেণীর কিংবা জাতির অপযশ হয় না; কিন্তু এই অন্যায় আচরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রেণীর কিংবা জাতির সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হয়। "ব্যবসায়ী" বলিলেই বুঝা হইয়া থাকে যে, তাহার নিজের সুনামের জন্য সে বিশেষ যত্নবান,—ভাল ব্যবসায়ী ক্ষতিকে তত ভয় করে না যত ভয় করে সে তাহার সুনাম হারাইবার আশঙ্কাকে। ব্যাঙ্ক ধার দেয় ব্যবসায়ীকে। যে শ্রেণী বা জাতির নাম ভাল ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে, সেই শ্রেণী বা জাতির ব্যক্তিকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সামান্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত ইংরাজ বা ভাটিয়া বণিকের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া কঠিন ব্যাপার নহে: কিন্তু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বাঙ্গালী যে কোনও ছোটখাট ব্যাপারে সাহায্য পাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; তাহার কারণ, আমাদের "বণিক" জাতি বলিয়া খ্যাতি নাই।

(৮) কোনও কোনও ব্যাঙ্ক জীবন-বীমার "পলিসির" (Policy) উপরেও টাকা ধার দিয়া থাকে। কোনও Endowment Policy হয় ত ২।৪ বৎসরেই কাল পূর্ণ হইবে, এমন সময় বীমাকারীর টাকার প্রয়োজন। প্রায় সমস্ত বীমা কোম্পানিই এই প্রকার Policyর উপর টাকা ধার দিয়া থাকে। কোম্পানি ছাড়া ব্যাঙ্কও পলিসি বন্ধক রাখিয়া এরূপ অবস্থায় টাকা দিতে পারে। ইহার জন্য Policy ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক বলিয়া বীমা কোম্পানির আফিসে রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হয়। এই রেজেষ্টারী হওয়ার পর ব্যাঙ্ক টাকা দেয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট প্রিমিয়ম না দেওয়ার জন্য উহা বাতিল না হয়, ও সেজন্য বীমাকারীর ঐ প্রিমিয়ম দেওয়ার উপর নির্ভর না করিয়া ব্যাঙ্কই নিয়মমত ঐ হিসাবে খরচ লিখিয়া প্রিমিয়ম দিতে থাকে।

(৯) বন্ধক—জমি, কারখানা বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ঋণ দিলে অল্প সময়ের মধ্যে টাকা আদায় হয় না; তবে ইহাতে সুদ কিছু বেশী পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যাঙ্কের কিছু টাকা এই প্রকারে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। টাকা দিবার পূর্ব্বে দলিল উপযুক্ত আইন-ব্যবসায়ীর দ্বারা রীতিমত পরীক্ষা করান প্রয়োজন ও তাহার পর সেই সম্পত্তি দায়সংযুক্ত কি না, তাহার বাজার-মূল্য কত হইতে পারে, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাহাও পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য। গৃহ কিংবা কারখানা হইলে অগ্নি কিংবা ভূমিকম্প দ্বারা বিনষ্ট হইলেও যাহাতে টাকা মারা না যায় সেজন্য বীমা করা প্রয়োজন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি কোনও কোনও স্থলে কেবলমাত্র দলিল জমা রাখিলেই বন্ধক বলিয়া পরিগণিত

হয়; কিন্তু অন্যান্য স্থানে রীতিমত রেজেষ্টারী না হইলে mortgage হয় না। তাড়াতাড়ি টাকার জোগাড় করিতে হইলে, ঐ উপায়ে হয় না; কারণ, এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান, পরীক্ষা, মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক সময় কাটিয়া যায়। মূল্যের ৪০ হইতে ৭৫ শতাংশ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক এই প্রকার Securityর উপর টাকা দেয়। কোনও কোনও স্থলে ব্যাঙ্ক গোড়া হইতেই ভাড়া আদায়, বিলি-বন্দোবস্ত করা, কিংবা দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা লইয়া থাকে।

এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সিকিউরিটী ছাড়া ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র গ্রাহকের জামিন-বিহীন অঙ্গীকার-পত্র বা "হ্যাণ্ড-নোটের" উপরও প্রয়োজন-মত অল্প-স্বল্প টাকা দিয়া থাকে। তবে সমস্ত ব্যাঙ্কেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ঐ প্রকারে বেশী টাকা আবদ্ধ না হইয়া পড়ে। টাকা দেওয়ারও আবার প্রকার-ভেদ আছে। যত টাকা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা একেবারে দিলে গ্রাহক তাহা ইচ্ছামত খরচ করিতে পারে ও যখন যাহা ইচ্ছা শোধ করিতে পারে; কিন্তু যে অংশ শোধ হইয়া যায় তাহা পুনর্ব্বার লওয়া যায় না—ইহার নাম Loan account। দ্বিতীয় উপায়, ব্যাঙ্ক যত টাকা দিবে তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গ্রাহকের নিকট হইতে কাগজ-পত্র লইয়া রাখিয়া দেয়। কাগজ-পত্র সহি হইয়া যাওয়ার পর গ্রাহক আপনার প্রয়োজন মত চেক্ কাটিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত যে কোনও পরিমাণ টাকা উঠাইতে পারে। এই প্রণালীর নাম Cash credit। প্রতিদিন যত টাকা দিনান্তে দেনা থাকে, তাহার উপর সুদ কসা হইয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা—সুদ অপেক্ষাকৃত অল্প লাগে।

উপসংহার

টাকা না থাকিলে কিসের উপর টাকা উঠাইতে পারা যায়, কোন্ মন্ত্রের বশীভূত হইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণকে অর্থ-সাহায্য করে, আর এই সাহায্য দ্বারা দেশের ও দশের কি উপকার সাধিত হয়, তাহার অল্পবিস্তর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গহনা ইত্যাদিতে ব্যয় না করিয়া, কিংবা ভূমিগর্ভে প্রোথিত না রাখিয়া, টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলে, তাহার দ্বারা নিজের ও সেই সঙ্গে দেশের কত উপকার হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাণিজ্যে ও শিল্পে উন্নতি করিতে হইলে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে; ও ব্যাঙ্কগুলি সুপরিচালিত হইয়া যাহাতে উপযুক্ত ভাবে অর্থ নিয়োগ করে তাহা দেখিতে হইবে। সকলের পক্ষে টাকা খাটান বা তাহার ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু নিজে খাটাইতে না পারিলেও, অপরের হাত দিয়া নিয়োগ করিয়া যদি নিজের অপকার না করিয়া দেশের উপকার করিতে পারা যায়, তবে তাহা না করা আইনতঃ অন্যায় না হইলেও ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্ব্বাচন দ্বারা যে প্রকারে লোক-সমাজ তাহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেশের রাজতন্ত্রের উপর জনমতের প্রভাব স্থাপন করিয়া থাকে—বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া ও তাহাদের দ্বারা ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিয়া দেশ ব্যবসায়ের উপর সেইরূপ প্রভাব বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে। নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে কাউন্সিলের সভ্যগণ যেরূপ প্রত্যেক ভোটের কিংবা বক্তৃতার জন্য নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহে, তাঁহার কার্য্যের উপর যেরূপ তাঁহাদের হাত থাকে না, সেইরূপ টাকা জমা দিবার পর কি বিশেষ প্রকারে তাহার নিয়োগ হয় তাহার উপর ডিপজিটারগণের কোনও হাত থাকে না। কিন্তু একবার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইলে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচনের সময় ভোট দিতে অস্বীকার করিয়া ও ঐ প্রতিনিধিকে পুনর্ব্বার প্রেরণ না করিয়া যে প্রকারে পরোক্ষভাবে জনমতের প্রতিপত্তি রক্ষা করা যায়, যে ব্যাঙ্ক টাকার অপব্যয় করে, কিংবা কারবার-কারীগণের সহিত মন্দ ব্যবহার করে, অথবা দেশের স্বার্থহানি করে, সে ব্যাঙ্কে পুনর্ব্বার টাকা জমা না দিয়াও তাহাকে সেই প্রকার শাসন করা যাইতে পারে। দেশের অধিবাসী বলিয়া রাজতন্ত্রের বা শাসন-প্রণালীর উপর লোকের যে দাবী আছে, টাকা আমানতকারী বলিয়াও ব্যাঙ্কের সাধারণ কার্য্যপ্রণালীর উপরও তাহাদের সেই প্রকার ক্ষমতা আছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা এই ক্ষমতার অপব্যবহার অত্যন্ত সহজ। সঙ্গত ব্যবহার দ্বারা দেশের মঙ্গল, অসঙ্গত ব্যবহারে সর্ব্বনাশ। প্রকাশ্যে গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিলে কিংবা তাহার কার্য্য-বিশেষের প্রতিবাদ বা নিন্দা করিলে, গভর্ণমেণ্টের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, এই ব্যবহারে ব্যাঙ্ক-বিশেষের তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইতে পারে। সাধারণভাবে কার্য্য-পদ্ধতির বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা দোষ-মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে এই অনিষ্ট অনেকটা নিবারণ

করা যায়। যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা যায়, তাহার পদ্ধতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আর যখন মনে হয় ব্যাঙ্ক দেশের সম্যক উপকার করিতে কুণ্ঠিত, তখন সেখান হইতে টাকা উঠাইয়া লইয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করা বিধেয়। ডিপজিটরগণের ক্ষমতা ও তাহার অপব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা এই প্রবন্ধে আমার অভিপ্রেত নহে। তবে তাঁহারা টাকা জমা দিয়াই নিরুপায় হইয়া পড়েন না—তাহাই আমার জানাইবার উদ্দেশ্য ও এই ক্ষমতার সম্যক ব্যবহার দ্বারা যাহাতে দেশের উপকার হয়, দেশবাসীর নিকট ইহাই প্রার্থনা।

মানস-মুকুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

আমাদের চাড়ুয্যে মহাশয়কে সকলে 'মশাই' বলিয়া ডাকে। মশাই অমুক করিলেন; মশাই এই বলিলেন; মশাই বরযাত্র যাইতেছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেবলমাত্র প্রবীণতার দাবিতেই যে তিনি গ্রামের জনসাধারণের শ্রদ্ধেয় 'মশাই' হইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। বয়সে প্রাচীন আরও অনেক লোক আছে। রাধানাথ প্রামাণিক তাঁহার বিবাহ দিয়া আনিয়াছে; নিস্তারিণী চণ্ডালিনী শিশুকালে তাঁহাকে কোলে-পিঠে করিয়াছে। চাড়ুয্যে মহাশয় জ্ঞানী ও গুণী বলিয়াই জনসাধারণের 'মশাই' হইতে পারিয়াছেন। চাড়ুয্যে মহাশয় অতীতকালে কোথায় কর্ম্ম করিতেন, তাহা আমরা জানি না; ইদানীং তিনি অবসর-প্রাপ্ত হইয়া গ্রামে বসবাস করিতেছেন। হাতে দুই পয়সা আছে। নির্ঝঞ্ঝাট-লোক; নিজের বাড়ীতে বসিয়া পুঁথি-পত্র আলোচনা করেন; ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দেন; লোকের আপদে-বিপদে পরামর্শ দিতে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। অনেকে অনুমান করে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান আছে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্ঞান আছে বলিয়াছি বলিয়া কেহ যেন ভাবিবেন না যে, মশাইয়ের সামনে গিয়া হাত বাড়াইয়া বসিলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া দিয়া তিনি আপনার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে লাগিয়া যাইবেন। বরং ঠিক তাহার বিপরীত; কেহ হাত দেখাইতে আসিলেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন। প্রথমে মৃদুকণ্ঠে, পরে তীব্র তর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেন। তবে ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে, হাত না দেখিয়াই, তিনি যাহার সম্বন্ধে যতটুকু বলিয়া দেন, তাহা 'অকাট্যরূপে' ফলিয়া যায়। করকোষ্ঠি বিচার করিয়া বলার চেয়ে, হাত না দেখিয়া বলার বিদ্যা যে উচ্চতর জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয়, তাহা গ্রামবাসীরা বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা তাঁহাকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া জানিয়া 'মশাই' নামটি দিয়াছিলেন।

এই বিদ্যা একদিকে যেমন তাঁহার যশের কারণ হইয়াছিল, অন্যদিকে কোথাও কোথাও তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াও তুলিয়াছিল। বোসেদের নূতন জামাই, শ্যালক-গণ পরিবৃত হইয়া মশাইকে প্রণাম করিতে গিয়াছে। মশাই তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে কহিলেন—জামাইটাকে নিয়ে বোসেদের ভুগতে হবে।

লোক-পরম্পরায় কথাটা বোস্-বাবুদের কাণে গেল। তাঁহারা রুষ্ট হইলেন, কারণ, তাঁহাদের জামাতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌরব বিশেষ। এণ্ট্রান্স হইতে এম্-এ বরাবর প্রথম হইয়া পাশ করিয়াছে; স্বভাব-চরিত্র চমৎকার। দেখিতে ত কার্ত্তিক। বোস-বাবুরা বলিয়া বেড়াইলেন—ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার!

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, দ্বিতীয়-কার্ত্তিক ও চমৎকার স্বভাব-চরিত্র-সম্পন্ন বাবাজীবনটি একটি লিমিটেড কোম্পানী ফাঁকে করার অপরাধে অদূরদিনেই শ্রীঘরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জমিদার-বাবুদের এক নূতন নায়েব নিযুক্ত হইয়া আসিল। মশাই বলিলেন—লোকটা জালিয়ে খাবে দেখ্‌ছি। মশাইয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণীটা এমনই সত্য হইয়া ফলিয়াছিল

যে, সদর-আদালতের কয়েকজন উকীল মোক্তার সেই গ্রাম-বাসীর কল্যাণে কোঠা-বালাখানা গঠন করিতে পারিয়া-ছিলেন।

মামলা-মোকর্দমায় প্রজারা যখন জের-বার হইয়া পড়িতেছে, সেই সময় জমিদার-বাবুদিগের এক সরিক জমিদারি পরিদর্শনে বাহির হইয়া গ্রামের নদীতে বোট্ ভাসাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মশাই একদিন নদীতে স্নান করিতে গিয়া যুবা জমিদারকে দেখিয়া আসিলেন। জমিদার ভাউলের ছাদে বসিয়া কেতাব পাঠে রত। মশাই দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—তোমাদের দুঃখনিশা অবসান হইয়াছে। এই জমিদারবাবুর কাছে ধরণা দিয়া পড়।

নায়েবের শাসনে নৌকার ত্রিসীমানায় যাইবার সাধ্যও কাহারও ছিল না। প্রজারা আকুল-আগ্রহে প্রশ্ন করিল—আপনি কি তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন? তিনি কিছু বল্লেন?……

মশাই কহিলেন—না, আমি শুধু দূর থেকে তাঁকে দেখে এসেছি, আলাপ করবার সুযোগ হয় নি। তবে এ কথা ঠিক যে তোমরা যদি অত্যাচারের কথা তাঁর গোচর করতে পার, ভাল হ'বেই।

অনেক পরামর্শের পর, প্রজারা একদিন এক-জোট হইয়া নদীতটে নৌকা ঘিরিয়া ফেলিল। নায়েব কোন কথা বলিবার পূর্বেই, জমিদার ভাউলে হইতে নামিয়া আসিলেন; বলিলেন—কি তোমাদের বক্তব্য বল?

ফল হইল, নায়েব তদ্দণ্ডেই বিতাড়িত হইল। সমস্ত মোকর্দমা জমিদার উঠাইয়া লইলেন—হাড়ে বাতাস লাগিল।

প্রজারা মশাইয়ের পায়ের ধূলা চাহিল। মশাই বলিলেন—বাপু-সকল, জুতার দয়ায় পায়ে এক-রত্তি ধূলাও লাগে না—তোমাদের যে কিছু দিয়া দিব, সে সঙ্গতি কৈ?

প্রজারা পায়ের ধূলা পাইল না বটে, কিন্তু তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি যে শতগুণ বাড়িয়া গেল, তাহা বোধ করি আর বলিতে হইবে না।

নকুড় পরামাণিক বিবাহ করিয়া আসিল। 'নবশাখ' ভোজনের দিন 'মশাই' বেড়াইয়া আসিয়া, নকুড়কে ডাকিয়া বলিলেন—নকুড়, কাজটা ভাল করিস্ নি বাপু। বৌমাটিকে ভগবান তোর ঘরের জন্ম তৈরী করেন নি। সাবধান!

এক বৎসরের মধ্যে থালা-ঘটি পর্য্যন্ত বেচিয়া নকুড়-প্রণয়িনী একদা যামিনী-যোগে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিল, তাহার কোন সন্ধানই আর পাওয়া গেল না।

দক্ষিণ-পাড়ায় একঘর কায়স্থের বাস; তাহারা দুই ভাই এক সংসারে বেশ ছিল। বড় বিবাহিত, ছোট অকৃতদার। দুভা'য়ে খাটে-খোটে, রোজগার-পত্র করে,—সচ্ছল সংসার। এক সময়ে ছোট ভা'য়ের বিবাহ হইল। পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া, মশাই বড় ভাইকে ডাকিয়া চুপে-চুপে কহিলেন—ওরে ছোঁড়া, দুটো রান্নাঘর ক'রে রাখ্!

বড় ভাই হাসিয়া বলিল—সে কি মশাই, আমার অমন ভাই…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠক আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি, এক বৎসর গত হইবার পূর্বেই, শুধু দুইটা রান্না-ঘরই করিতে হয় নাই—পুকুর সরিবার দুইটা পথ ও দুইটা ঘাটও তাহাদিগকে বানাইতে হইয়াছিল।

একদল লোক এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর 'চোটে' যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, লোকটার জিভে বোধ হয় বিষ আছে। এমন না কি থাকেও।

যদিচ তাহারা এরূপ উক্তি খুব গোপনে করিয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া গ্রামের অন্য লোকের কাণেও তাহা উঠিয়া পড়িল। তাহারা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তাহাদের ক্রুদ্ধ হইবার কারণ ছিল।

মশাই কি শুধু খারাপটাই বলেন? কেন, ভাল কি তিনি বলেন না? নায়েবের অত্যাচার ও তাহার প্রতি-বিধানের ব্যাপারটা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু আরও উদাহরণের ত অভাব নাই।

সেবার রাখাল ঘোষের জন্য ক'নে দেখিতে গিয়া তিনি কি বলিয়াছিলেন, মনে আছে কি? একান্ত নিঃস্ব সেই গরীবের মেয়েটি দেখিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—রাখাল, স্ত্রীভাগ্যে যে ধন বলে, তাহা এই মেয়েটিই তোকে দেখাইয়া দিবে। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলের অমতে রাখাল তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। আজ কলিকাতায় হার্ডওয়ার মার্চেন্ট মিষ্টার আর, ডি, ঘোষের নাম বাঙলায় কাহার অজ্ঞাত?

গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস ছিল। সে-বছর

মস্‌জিদ ও বাদ্য সমস্যা বঙ্গের সর্বত্র যখন জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে এই গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পীড়ন করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে শুনিয়া মশাই মুসলমান-পাড়াটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া গ্রামের হিন্দু মাতব্বরগণকে ডাকিয়া বলিলেন—উহাদের হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই; উহারা কখনই তোমাদিগকে দুঃখ দিবে না। তোমরা যদি উহাদিগকে উত্যক্ত না কর, দেখিও উহাদের জন্য কখনও তোমাদের উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে না।

সারা বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানে কত কাটাকাটি, ফাটাফাটি, মারামারি হইয়া গেল, কত অঘটন ঘটিল; কিন্তু এখানে অদ্যাবধি কিছু হয় নাই; পরেও হইবে, এমন দুর্লক্ষণও দেখা যায় না।

সে যাহা হোক, একদল লোক বিমুখ হইয়াই রহিল; এবং কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অপ্রকাশ্যে মশাইয়ের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন বাদে একটা ঘটনায় তাহারা খুবই উত্তেজিত হইয়া পড়িল।

চর রুকুশপুর নামে একটা বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড নদীবক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল। গবর্ণমেণ্ট এগ্রিকালচ্যার কমিশনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য খাস-মহলটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বেকারদিগকে চাষ বাস করিবার জন্য বিলি করিলেন। দে বাবুদের ছেলেরা তাহাদের কলিকাতার কয়েকজন (Expert) বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আনিয়া সেই বিস্তীর্ণ ভূ খণ্ড জমা লইয়া বিলাতী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া, প্রায় লক্ষটাকা মূলধন করিয়া, একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিল ও একটি বন্ধুর উপর কার্য্য-পরিচালনের ভার দিল। ভারপ্রাপ্ত বন্ধু কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

মশাই বলিলেন—ছোকরারা কাজটা ভাল করলে না! একজনের উপর ভার দেওয়া ভাল কথা, কিন্তু নিজেদেরও দেখা-শুনা করা উচিত ছিল।

ভারপ্রাপ্ত বন্ধুটি কেমন করিয়া সে কথা শুনিলেন। অন্যান্য অংশীদারকে চিঠি লিখাইয়া আনিয়া ইস্তফা দিতে চাহিলেন। বন্ধুরা মশাইয়ের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানাইয়া দিলেন যে, অন্যের কথায় বিচলিত হওয়ার মত দুর্বলতা আর নাই।

দুইবৎসর যাইতে-না-যাইতেই দেখা গেল, গবর্ণমেণ্ট একদিন হঠাৎ নীলাম করিয়া খাস মহলটি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। দেড় বৎসরের খাজনা না কি বাকী পড়িয়াছিল। বিলাতী লাঙ্গলওয়ালারা খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল, কিন্তু কয়েক-খানি ভাঙ্গা লাঙ্গল ছাড়া গ্রহণযোগ্য আর কিছু না পাইয়া, তাহাই নৌকা বোঝাই দিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য অংশীদাররা যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, ভারপ্রাপ্ত বন্ধু তখন ভার নামাইয়া কোথায় যে উধাও হইয়াছেন, তাহার পাত্তা পাওয়া গেল না।

মশাইয়ের ছিদ্রান্বেষীর দল বন্ধুবর্গের রোষানলে ইন্ধন যোগান দিতে লাগিল; বলিল—সেইকালেই জানি যে এই হবে। বিষমুখে একবার যখন কথা বেরিয়েছে, তা কি আর অন্যথা হয়।

বন্ধুবর্গ মশাইয়ের বাড়ী গিয়া যা-নয়-তা বলিয়া আসিল, অপমান করিতেও ছাড়িল না। মশাই বলিলেন—বাপুহে, আগে ভাগেই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে আমি বন্ধুর কাজই করেছিলুম, তোমরা যদি মানুষ হ'তে……

কি! তাহারা মানুষ নহে? এইবার তাহারা এমন সব কথা কহিতে লাগিল, যাহা কলমের ডগায় আনা ত দূরের কথা, কাণে প্রবেশ করিতে দিতেও প্রবৃত্তি হয় না! ওঃ ভারি আমার গণৎকার রে! চাবির আওয়াজ শুনে স্ত্রীলোকের বয়েস বলে দিতে পারেন! ফের যদি মুখ খুলতে শুনি…ইত্যাদি, ইত্যাদি!

অনুরক্ত বন্ধুগণ কহিল—কাল যে কলি! ভাল করতে গেলে মন্দ বোঝে! আর কা'কেও কিছু বলবেন না মশাই! আপনি খামকা অপমান হ'লে আমাদের প্রাণে লাগে! দেখলেন ত, কি সব যাচ্ছে-তাই কথা বলে গেল! চেঁদের গণৎকার……

মশাই ধীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, ঐখেনেই ওরা ভুল করছে। আমি ত গণৎকার নই।

এই বিনয়জনিত অপলাপে অনুরাগী-জনগণ ক্ষুণ্ণ হইল; বলিল—পয়সা নিয়ে না গুণলে বুঝি গণৎকার হয় না। আপনার মত এমন নির্ভুল গুণতে কেউ পারে?

মশাই বলিলেন—কিন্তু আমি গুণি নে, গুণতে জানিও নে।

তখন তাহারা ধরিয়া পড়িল, কেমন করিয়া অভ্রান্ত-

ভবিষ্যৎ বলিয়া দেন, তাহা বলিতেই হইবে। গণনা যদি নয়, তবে তাহা কি?

মশাই বলিলেন—ইংরেজীতে একটি কথা আছে Face is the index of a man, অর্থাৎ মুখ দেখিয়া মানুষের ভিতরটা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের ভিতরটার সমস্ত ছবিটা মুখে প্রতিভাত থাকে, তাহা দেখিয়া লোকটাকে চিনিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই।

অনেকেই ব্যাপারটা বুঝিল না; বুঝিবার দরকারও ছিল না, কারণ মশাইয়ের উপর তাহাদের অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ বিষয়টা বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—উহা কি সকল সময়েই নির্ভুল হয়?

আজ পর্য্যন্ত ত হইয়াছে। বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভুল হইতে দেখি নাই। ছেলেবেলায় ঐ ইংরাজি কথাটা ইস্কুলের কেতাবে পড়িয়াছিলাম। তখন হইতেই লোকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম। দেখিতে দেখিতে যে ধারণা হইত, দেখিতাম—মিলিয়া যাইত। ভাল করিয়া মিলিল, নিজের জন্য ক'নে দেখিতে গিয়া। বাঁশবেড়েতে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি। তাঁহাদের প্রতিবেশীর একটি মেয়ে দেখিয়া মনে হইল এই মেয়েটির মুখে লক্ষ্মীমন্ত ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার স্বামী হইবে সে ব্যক্তি ভাগ্যবান। বন্ধু আমার মুখে কথাটা শুনিয়া আমাকেই প্রতিবেশীর কন্যাদায় মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। ঘর-কুল সব মিলিল, বিবাহ করিলাম। তদবধি দুঃখ কাহাকে বলে, ভগবান আমাকে জানিতে দেন নাই। নিজের জীবন দিয়া সত্য প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই অন্যের সম্বন্ধে কথা বলিতাম না। তবে আজ হইতে আর কাহাকেও কিছু বলিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—বাপু, বুড়া হইয়াছি, চোখের দোষ হইয়াছে, আর নির্ভুল বলিতে পারি না। মিথ্যা তোমাদিগকে ধোঁকা দিব কেন?—তাই ছাড়িয়া দিয়াছি।

অন্যের সম্বন্ধে বলিতেন না বটে তবে নিজের বা পরিবারের সকলের সম্বন্ধে যে সেই বিশ্বাসের বলেই চলিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মশাইয়ের একটি মাত্র কন্যা—বিবাহযোগ্যা। পল্লীরীতি হিসাবে অনেক দিন পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু মনের মত পাত্র পাওয়া যায় নাই।

গবর্ণমেণ্টের সেই খাস্ মহলটিতে এবার কলিকাতা হইতে এক উৎসাহী কর্মীর দল চাষ-আবাদ করিতে আসিয়াছে। প্রথম বছর তাহাদের ফসল দেখিয়া পঞ্চাশ ক্রোশের লোক অবাক্ হইয়া গেল। পুরাকালে বিশ্বামিত্রের তপোবনে এমন অসম্ভব ফসল সম্ভব হইয়াছিল, পুরাণে কেহ কেহ তাহা পাঠ করিয়াছে মাত্র।

কি-সূত্রে জানি-না, এই কর্মীর দল মশাইয়ের কাছে আসিত; বসিয়া গল্প শুনিত; মাঝে মাঝে মালী দ্বারা এটা-ওটা সেটা তরী-তরকারীর ডালি পাঠাইয়া দিত। তাহাদের প্রধানের নাম অমূল্য। তাহার এক ভাই প্রফুল্ল; সে ডেপুটী। কলিকাতায় অমুক মহারাজের বাড়ীর সামনে তাহাদের মস্ত বাড়ী আছে। সে ইতিপূর্বে কলিকাতায় একটা কৃষি-প্রদর্শনী করিয়া যথেষ্ট সুনাম ও সুযশঃ অর্জন করিয়াছে। লোকটি যখন নিজের মনেই বলিয়া যাইত, মশাই একদৃষ্টে তন্ময় হইয়া তাহার মুখের রেখা পাঠ করিতেন। কিছুদিন এইরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মশাই একদিন প্রশ্ন করিলেন—বাবাজী কি কৃতদার?

অমূল্য নতমুখে বলিল—না।

বিয়ে করবে?

সময় কই বলুন? কাজ করব, না সখ্ করে বেড়াব।

মশাই তখন বলিলেন—তোমায় কিছুই করতে হ'বে না। আমার একটি মেয়ে আছে। বয়স লোকে একটু বেশী বলে বটে; আমার মনে হয় বিবাহের উপযুক্ত বয়সই হয়েছে—এই সতেরো-আঠারো হ'বে। দেখতে—তুমি নিজেই দেখ না। পার্বতী, মা পার্বতী, একবার এদিকে আয় ত!

পার্বতী সুন্দরী। অমূল্য বলিল—আপনার মেয়ে সুন্দরী না হলেই বা কি হোত!

সঙ্গে সঙ্গেই দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

ভক্তগণ বলিল—একেবারে অপরিচিত লোক, আপনার ঐ একটি মাত্র মেয়ে, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে…

মশাই বলিলেন—আমার যা খোঁজ-খবরের দরকার তা ওর মুখেই পেয়েছি; তার বেশী আমার জানবার কিছু নেই।

কেহ বলিল—তা সত্যিই ত, আপনার যা কিছু সব ত মেয়েরই। ওর নিজের যদি কিছু না-ও থাকে,

আপনার মেয়ে যা পাবে, তাতে ওরা রাজার হালেই থাক্‌বে।

মশাই বলিলেন—আমার কিছুই ওরা পাবে না। সমস্ত আমি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে গবর্ণমেণ্টকে দোব ঠিক করেছি। বিয়ের একদিন আগে গবর্ণমেণ্টের হাতে দোব, তা'ও স্থির।

• অমূল্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুখে বা ভাবে তাহা প্রকাশ করে নাই।

গবর্ণমেণ্ট ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন; পরের দিন খবরের কাগজে-কাগজে এই দানের খবর ছাপা হইয়া গেল। দেশময় ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিল।

কন্যা-সম্প্রদান করিয়া আসিয়া, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মশাই বন্ধু-বান্ধবকে বলিলেন—ভাই, অনেকদিন অনেক উপদ্রব করেছি, এইবার আমাকে তোমরা বিদায় দাও—কাশী চলিয়া যাই।

বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা-সম্প্রদানের দৃশ্য অতীব করুণ, অতীব মহান। একটি-মাত্র টাকার বিনিময়ে কন্যা যখন পিতা-মাতার সব ঋণ পরিশোধ করিয়া একান্ত অপরিচিতের সঙ্গে চলিয়া যায়—তখনকার দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়। এ সময়ের বাপ-মা'র মনের ভাব বুঝাইতে পারি সে ভাষা আমার নাই; সে ক্ষমতা হইতেও আমি বঞ্চিত; এবং যিনি কখনও কন্যা দান করেন নাই, ব্যথার নিধিকে বিদায় দেন নাই, তিনি মেঘ-রৌদ্রের সে অপরূপ লীলার সুখ দুঃখের এক কণাও অনুভব করিতে পারিবেন না।

মশাইকে এত বিচলিত কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি যে একমাত্র প্রাণাধিকা দুহিতার বিচ্ছেদে অধীর হইয়াই করযোড়ে বিদায় চাহিতেছেন, তাহা বুঝিয়া সকলেই নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি যে মৌখিক বিদায় চাহেন নাই, পরন্তু সত্যই এখানকার বাস উঠাইতেছেন, তাহা অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। গ্রামের লোক সজল অন্তঃকরণে কহিল—কি দোষে আমাদের ত্যাগ করছেন।

মশাই হাউ-হাউ করিয়া অবোধ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—দোষের জন্যে নয় রে ভাই; পরকালের ভাবনা না ভেবে যে আর পারছিনে। নিজের জন্যে কিছুই ত রাখি নি। ঐ ক'বিঘে ধেনো জমি কেদারের জিম্মায় রইল; তাই থেকে সে মাসে-মাসে দশ পনেরোটি টাকা পাঠাবে, কর্ত্তাগিন্নির তাইতেই একরকম চলে যাবে। বাবা বিশ্বনাথের চরণতলায় পড়ে মা-অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাব। বামুনের ঘরের বুড়ো-বুড়ি এর চেয়ে আর বেশী কি চায়?

আগামী কল্য যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে। গোছান-গাছান সব শেষ। বাড়ীটি প্রাথমিক স্কুলের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। একটি ঘরে ইঁহারা আছেন, কাল তাহাও খালি হইয়া যাইবে। গ্রামের নর-নারী বিষাদক্লিষ্ট মুখে যাওয়া-আসা করিতেছে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে একখানা গোরুর গাড়ী আসিয়া মশাইয়ের দ্বারে থামিল। এক উঠান লোক, পার্ব্বতী নামিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—বাবা, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

পিতা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—তা কি হয় মা! তোমাকে যার হাতে দিয়েছি···

পার্ব্বতী বলিল—বাবা!

মশাই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—কিমা, কিমা?

বাবা সে জুয়াচোর! এইমাত্র পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তার আরও তিনটে বিয়ে আছে; ছেলে আছে। এক স্ত্রী খোরপোষের নালিস ক'রে ডিগ্রী করে পুলিস দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে গেল।

উঠান-ভরা লোক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মশাই-ও নীরব। মানস-মুকুর-দৃষ্ট সেই লোকটির মুখখানি কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইবার অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অশ্রুবাষ্পে অন্তর-বাহির ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

বন্ধুরা বলিতে গেলেন—আমরা সেই কালেই বলেছিলুম, কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে···

মশাই নতাননা কন্যার মুখখানি বুকে চাপিয়া বলিলেন—হ্যাঁ মা, তোকে সে কিছু বল্লে না?

কিছু না বাবা! যারা গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তারা বল্লে আদালতে তিন-তিনটে মোকর্দমা হয়েছে, সব খবরের কাগজে তার বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছে—জেনে-শুনেও···

মশাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তাই-ত, তার মুখে ত শয়তানির কোন চিহ্নই দেখি নি মা!

কেহ-কেহ বলিলেন—দেখুন, বিয়ে জিনিষটা না জেনে-শুনে…

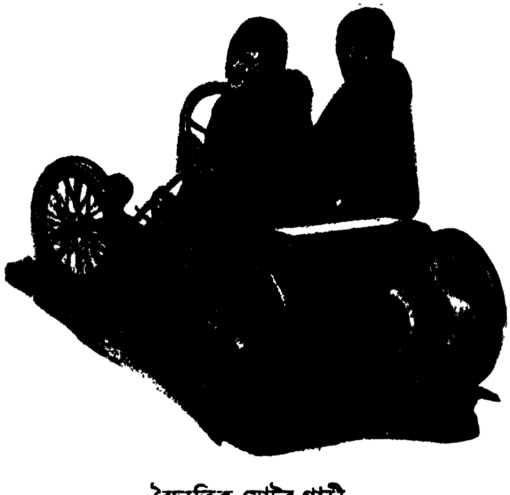
মশাই সিক্তকণ্ঠে কহিলেন—তবে আসল কথাটা বলি।—বলিয়া তিনি সস্নেহে পার্বতীর করুণ মুখখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—মেয়েটার মুখে বরাবর একটা তপস্বিনীর ভাব দেখতুম। ওর বিয়ে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছিল। বিশ্বনাথ যে ওকে তপস্বিনী করেই গড়েছেন; ওর মানস মুকুরে এখনও আমি সেই রেখাই দেখছি! তার বিরুদ্ধতা করতে গিয়েই এই দুঃখটা পেতে হোল। বিশ্বনাথ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বলিয়া কন্যাকে বুকে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পরদিন যথাসময়ে বাবা বিশ্বনাথের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। শোক-সন্তপ্ত গ্রামবাসী বলিল—মাথার একটু ছিট্ ছিল। পণ্ডিত মাত্রেরই থাকে।

নিখিল-প্রবাহ

অভিনব গাড়ী

একটি অভিনব গাড়ী তৈয়ার হইয়াছে—দেখিতে মোটর-কারের কাঠামের মত। এই গাড়ী বিদ্যুতের জোরে চলিবে এবং ইহাতে দুইজন লোক বসিতে পারিবে। গাড়ীখানির ওজন মাত্র ৩৪৪ পাউণ্ড। সেইজন্য, যে সকল জমিতে—যেমন সমুদ্রের ধারে—ভারী মোটর গাড়ী চালানো অসম্ভব

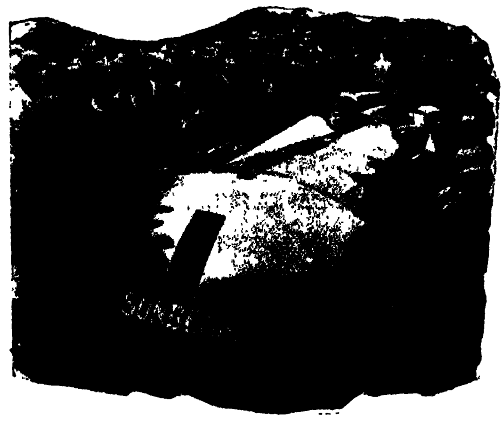


বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ী

সেই সকল স্থানে এই গাড়ী অনায়াসে চালানো যাইবে। তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য বাড়ীতেই ব্যাটারি রাখিবার বাক্স আছে। দরকার মত এই বাক্সে একজন লোকও বসিতে পারিবে। সাধারণতঃ এই গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল; কিন্তু তেমন জোরালো ব্যাটারি থাকিলে ঘণ্টায় ৩০ মাইল পর্য্যন্ত গতিবেগ উঠিতে পারে। গাড়ী চালাইবার এবং ঘুরাইবার ফিরাইবার কলকব্জা খুব সহজভাবে তৈয়ারী।

ঘণ্টায় ২০৭ মাইল

কয়েক মাস পূর্ব্বে মেজর সিগ্রেভ ঘণ্টায় ২০৭ মাইল বেগে মোটর দৌড়াইয়াছেন। এত ভীষণ বেগে যে মানুষ-নির্ম্মিত কোন যান দৌড়াইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে কেহ তাহা কল্পনাও



সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটর-কার

করিতে পারে নাই। মেজর সিগ্রেভ যে গাড়ীখানি ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাণ্ড,—প্রায় ৩০ ফিট লম্বা, ৬ ফিট চওড়া। এত প্রকাণ্ড রেসার গাড়ী ইতিপূর্ব্বে আর তৈয়ার হয় নাই। গাড়ী যখন পূরা বেগে দৌড়ায়—তখন দর্শকরা একবার পলক ফেলিবার পর গাড়ী আর দেখিতে পায় নাই—গাড়ী সেকেণ্ডে ৩০০ ফিট যাইতেছিল। বেগের মাথায় যদি গাড়ীর

সামনের চাকা দুটি নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে একচুল এদিক ওদিক হইত, তাহা হইলে দৌড়বাজকে আর বাঁচিতে হইত না—গাড়ীখানি এক পলকের মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত।

মেজর সিগ্রেভ ইংরেজ। ইঁহার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া মেজর সিগ্রেভ মোটর গাড়ী লইয়া ঘাঁটিতেছেন। বরাবর তাঁহার এক চিন্তা—কেমন করিয়া মোটর গাড়ীর রেকর্ড দৌড় তিনি করিতে পারেন। যে গাড়ীতে এই রেকর্ড-দৌড় হয়, তাহাতে দুইটি ইঞ্জিন আছে—প্রত্যেকটির জোর ৫০০ হর্স পাওয়ার। গাড়ীখানি কেবল কলকব্জা—বসিবার যায়গা অতি সামান্য—মাত্র চালকের। গাড়ীখানি তৈয়ার করিতে মোট খরচ পড়িয়াছে ৩০০,০০০, টাকা মাত্র! কিন্তু মোটর গাড়ীর গতির যে রেকর্ড গতিবেগ এত খরচ করিয়া দেখা হইল—তাহা মানুষের সুখ সুবিধা বা ব্যবসার কোনো কাজে লাগিবে না; কেবল মাত্র জানা গেল কত জোরে মানুষ গাড়ী চালাইতে পারে—এই পর্য্যন্ত।



পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটর গাড়ী

আমেরিকার ফ্লোরিডা নামক স্থানের ডেটোনা বীচে মোটর দৌড়ের যে "কোর্স" আছে সেইস্থানে এই দৌড় হয়। এই দৌড়-স্থানে পূর্ব্বে অনেকে মোটর দৌড় করাইয়াছেন, কিন্তু এত অসম্ভব প্রচণ্ড বেগে গাড়ী দৌড় করাইবার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন নাই। ১৯১২ সালে ৬ই এপ্রিল নরউইজেন "গতির রাজা" এই রেস-কোর্সে মিনিটে



১০০০ ঘোড়ার জোর মোটর গাড়ী

তিন মাইল বেগে গাড়ী দৌড় করান। এ পর্য্যন্ত লোকে ইহাকে মোটর গতির শেষ সীমা বলিয়া মনে করিত।

মেজর সিগ্রেভের গাড়ীর নাম "মিষ্টরী এস" অর্থাৎ "রহস্যময়ী এস্।" ইংলণ্ডের বাছা বাছা সাতজন মোটর মিস্ত্রি গাড়ীখানি তৈয়ার করে। ইচ্ছামত গতি বাড়াইবার জন্য যাহা দরকার—সবই এই গাড়ীতে আছে। ভরসা করিয়া চালাইতে পারিলে বেগ বোধ হয় ঘণ্টায় ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

২ কোটী বৎসর পূর্ব্বের প্রাণী

আমেরিকাতে সম্প্রতি এক অদ্ভুত প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কাল দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জন্তুর চেহারা কি প্রকার ছিল—তাহা তৈয়ার করিয়াছেন।



দুই কোটী বৎসর পূর্ব্বের গিরগিটি

কঙ্কালটি এক অদ্ভুত ধরণের গিরগিটির—বোধ হয় ২ কোটী বৎসর আগে পৃথিবীতে মনের আনন্দে বিচরণ করিত। এই অতি পুরাতন জন্তুর কঙ্কাল টেক্সাস্ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

কাঠের খেলনা

একজন সুইডিস্ ভদ্রলোক কাঠের টুকরাকে সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছাঁটিয়া নানা প্রকার চমৎকার খেলনা ইত্যাদি তৈয়ার করেন। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল চমৎকার খেলনা তৈয়ার হয়, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। মিস্ত্রি অতি সহজেই এই সকল খেলনা তৈয়ার করিয়া থাকেন। এক একটি কাঠের টুকরা হইতে এক একটি সম্পূর্ণ জিনিষ তৈয়ার হয়। জোড়া লাগাইয়া কোনো খেলনা ইনি তৈয়ার করেন না। এই মিস্ত্রির খেলনা আজকাল ইউরোপ আমেরিকায় খুব প্রসিদ্ধি এবং আদর লাভ করিয়াছে। ১২ বছর বয়স হইতে ইনি এই কাজ করিতেছেন।



কাঠের খেলনা

সুড়ঙ্গ-পথে হাওয়া-চলাচল পরীক্ষা

নিউইয়র্কের হাড্‌সন্ নদীর নীচে যে সুড়ঙ্গ কাটা হয়—তাহার হাওয়া-চলাচল পরীক্ষা করিবার জন্য সুড়ঙ্গের মাঝখানে কতকগুলি বোমা ফাটাইয়া সুড়ঙ্গ-পথের মাঝখান ধোঁয়াতে ভরিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই সুড়ঙ্গ পথ আবার পরিষ্কার হইয়া যায়। সুড়ঙ্গে ৮৪টি বৈদ্যুতিক পাখা আছে। ৪২টি পাখা সুড়ঙ্গের মধ্যে হাওয়া চালায় এবং বাকি ৪২টি সুড়ঙ্গ হইতে গ্যাস এবং অপরিষ্কার হাওয়া টানিয়া বাহির করে। লোকের এবং যান-বাহনের চলাচল দেখিয়া হাওয়ার তারতম্য করা হয়।



সুড়ঙ্গ-পথে হাওয়া-চলাচল পরীক্ষা

চীনের ভাগ্য-দেবতা

ছবিতে যে মূর্ত্তিটি দেখিতেছেন—ইনি চীনাদের ভাগ্য-দেবতা। যুদ্ধের ভাগ্য-নির্ণয় ইহাঁর হাতে। যে পক্ষ এই

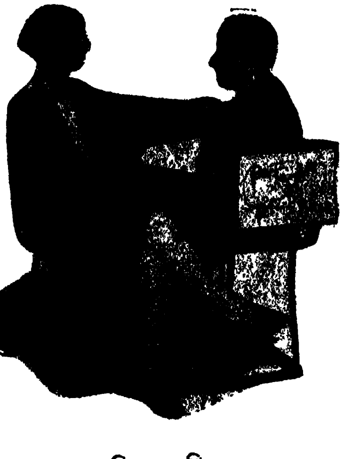


চীনের অদৃষ্ট-দেব

দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে—তাহাদের যুদ্ধজয় নিশ্চিত। চীনাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান, তাহারাও এই দেবতাকে বিশেষ খাতির করিয়া চলে।

অভিনব বেঞ্চি

আমাদের দেশের পার্ক ইত্যাদিতে লম্বা লম্বা বেঞ্চি



অভিনব বেঞ্চি

থাকে। তাহাতে দুইজন লোকের কথাবার্ত্তা বলিতে হইলে পাশা পাশি বসিয়া করিতে হয়। "ডনভার পার্কে"—এক প্রকার নতুন ধরণের বেঞ্চি বসান হইয়াছে—এই বেঞ্চিতে দুইজনে সামনা সামনি বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। ছবি দেখিলে বেঞ্চির পরিচয় পাইবেন। দেখিতে ঠিক চেয়ারের মত—কিন্তু দুইটি এক সঙ্গে আঁটা, আলাদা করিয়া নাড়াচাড়া করিবার উপায় নাই।

কুয়াসা-বাতি

লণ্ডনের পথঘাট যখন খুব গাঢ় কুয়াসায় ঢাকিয়া যায়, তখন ৪ হাত দূরের জিনিস দেখাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া



কুয়াসা মশাল

উঠে। এই সময় লণ্ডনের ট্র্যাফিক পুলিস কেরোসিনের এক প্রকার দমকা আগুন ব্যবহার করে। আগুনের শিখা দেখিয়া গাড়ী চালকেরা পথ ঠিক করিতে পারে—এবং ট্র্যাফিক পুলিসেরও গাড়ী চাপা পড়ার ভয় অনেক কমিয়া যায়।

বৃহত্তম মনসা গাছ

আমাদের দেশে মনসা গাছ আছে—তাহার উপর মই লাগাইয়া চড়া যায় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়াতে এক প্রকার মনসা গাছ হয়, তাহা অতি শক্ত এবং প্রকাণ্ড।

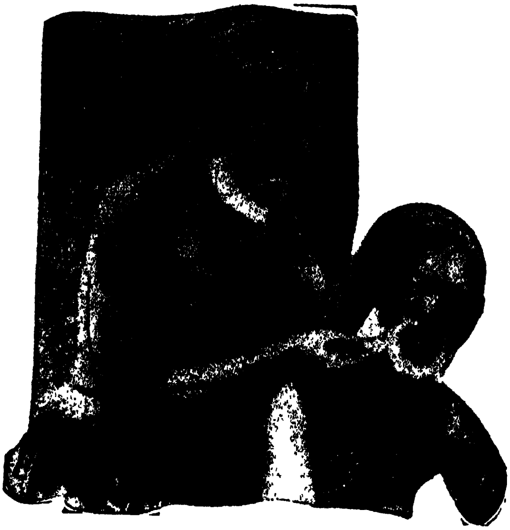


অতিকায় মনসা গাছ

ইহার মাথায় উঠিতে হইলে মই লাগাইয়া চড়িতে হয়। এই মনসা গাছের ডগায় গর্ত্ত করিয়া হুতুম পেঁচা এবং কাঠ ঠোকরা পাখীরা বাসা করে। এই মনসা গাছ টুকরা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া গবাদি পশুর উপকারী খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

দাড়ি কামাইবার পাথরের নির্ম্মিত যন্ত্র

নিউজিল্যাণ্ডের আদিম লোকেরা পাথরের টুকরা ঘষিয়া পাতলা করিয়া লইয়া দাড়ি কামাইবার কাজে ব্যবহার করিত। এখন অবশ্য এই প্রথা লোপ পাইয়াছে। ২০০০ বছর পূর্ব্বের "পাথর যুগে"র লোকেরা এই ভাবে দাড়ি গোঁফ কামাইত। বর্ত্তমান অধিবাসীরা ইহার ব্যবহার জানে। একটি বায়স্কোপের ছবি তুলিবার সময় এই পাথরের ক্ষুরে দাড়ি কামাইবার ছবি তোলা হয়। ছবিতে দেখুন যাহার দাড়ি কামান হইতেছে সে যে খুব আরাম পাইতেছে—তাহা তাহার মুখ দেখিলে একেবারেই মনে হয় না।



২০০০ বছর আগের পরামাণিক

৭০-তলা অট্টালিকা

সিকাগো শহরে "শ্রমিক-মন্দির" নাম দিয়া এক ৭০-তলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইবে। এই মন্দির জগতের সকল



৭০ তলা প্রাসাদ (সিকাগোর শ্রমিক-মন্দির)

দেশের শ্রমিকদের মিলনক্ষেত্র হইবে। শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত সকল প্রকার সভাসমিতি এই অট্টালিকাতে হইবে। কয়েকটি বড় বড় হলের ব্যবস্থা করা হইবে। বাড়ীটিতে হাজার হাজার লোক বাস করিতে পারিবে। অট্টালিকা নির্ম্মাণের খরচ মোট ২২৫,০০০,০০০৲ টাকা আন্দাজ হইবে বলিয়া মনে হয়

স্বয়ং-ক্রিয় গ্রামোফোঁ

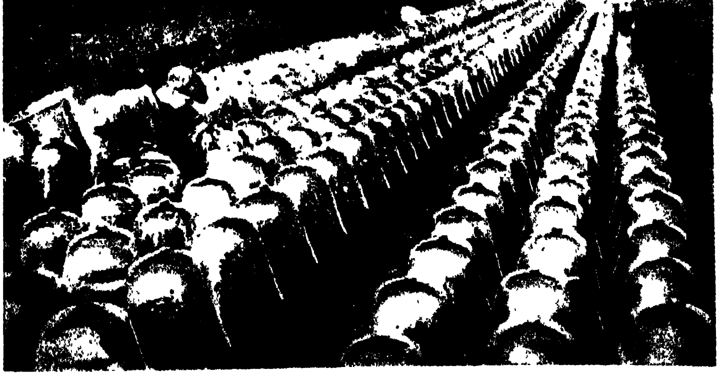
রেকর্ড বদলাইবার দরকার নাই—আরামে চেয়ারে বসিয়া বা খাটে শুইয়া ঘণ্টাখানেক ফনোগ্রাফ শোনা যায়—এমন ধরণের ফনোগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেকর্ডগুলিকে পর পর সাজাইয়া বিশেষ আধারে রাখিয়া গিয়া—তার পর কল চালাইয়া দিলেই হইল! একটি রেকর্ড শেষ হইলেই—একটি কলের হাতা বাজান রেকর্ডটিকে রেকর্ড রাখিবার চাকতি হইতে তুলিয়া অন্য আধারে নামাইয়া দিবে—সেই সঙ্গে আর একটি নতুন রেকর্ড চাকতিতে আসিয়া পড়িবে। কোন রেকর্ড ভাল না লাগিলে একটি বোতাম টিপিলেই সেই রেকর্ড পালটাইয়া অন্য রেকর্ড আসিবে। শেষ রেকর্ডখানি বাজিবার পর কল আপনি থামিয়া যাইবে। এই অভিনব ফনোগ্রাফে বারবার রেকর্ড এবং পিন বদলাইবার হাঙ্গামা দূর হইবে।



স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোঁ

চাষের কাজে কাচের ঢাকনা ব্যবহার

বিলাতের এক চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট গাছগুলিকে কাচের ঢাকনা দিয়া ঢাকা দিয়া রাখা হয়। রাত্রিকালেই এই আবরণের বিশেষ দরকার হয়। বরফের হাত হইতে চারা গাছ বাঁচাইবার এমন ভাল উপায় আর নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে খরচ কম অথচ লাভ বেশী। ফসলও পরিমাণে বেশী এবং গুণে ভাল হয়। ঢাকনাগুলি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও সহজ। ঢাকনা বসাইবার জন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত বা ছাউনির দরকার নাই।



কৃষিক্ষেত্রে কাচের শস্যত্রাণ

যাদুকর-কবিরাজের বিচিত্র পোষাক

সাইবেরিয়ার উত্তর অংশের "মেডিসিন-ম্যান" অর্থাৎ ডাক্তার তাহার ডাক্তারি বেশীর ভাগ মন্ত্র-বলেই চালাইয়া থাকে। ঔষধপত্রের দরকার খুব বেশী হয় না। সাইবেরিয়ার এই অংশের লোকেদের প্রায়ই ভূতে পায়। ডাক্তার যখন



সাইবেরিয়ার যাদুকর বৈদ্য

ভূত তাড়াইতে যায়—তখন তাহাকে এক অতি বিচিত্র এবং অদ্ভুত পোষাক পরিতে হয়। পোষাকের পিঠের দিকে ঘণ্টা, কাঁসা, লোহার টুকরা, সীসা, তামা, পিতল ইত্যাদি বহু ধাতুর টুকরা, কড়ি, শাঁক, ন্যাকড়ার পুঁটুলি ইত্যাদি বহু বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার ঝুলান থাকে। এই সমস্ত দ্রব্যের একত্র সমাবেশ এবং মন্ত্রবল—ভূতকে অত্যন্ত ভয়গ্রস্ত করে এবং সে অতি সত্বর "ভরকরা" লোককে ছাড়িয়া পালায়।

পার্ব্বত্য দুর্গের নিকট রেল বসাইবার চেষ্টা

জার্ম্মানিতে একটি জগৎপ্রসিদ্ধ অতি মনোরম দুর্গ আছে—ইহার নাম "কাস্‌ল্‌ অব্‌ লিচ্‌টেন্‌ষ্টিন্‌"। প্রতি বৎসর



গিরিদুর্গে রেলপথ

হাজার হাজার লোক এই দুর্গ দেখিতে যায়। দুর্গটি এক অতি খাড়া পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত। সম্প্রতি দুর্গ দুয়ার পর্য্যন্ত রেল চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।



শিক্ষার চুট্‌কী

—রণম্—

সেকালের স্ত্রীশিক্ষা

সেকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার খুব সামান্য হইলেও, অন্ততঃ সমাজের মধ্যস্তরের স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিতা ছিলেন,—এরূপ অনুমান, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে। সে সময়কার বর্ষীয়সী-দিগের ভিতর অনেকের অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না ;—কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করি। লিখিত ভাষাই শিক্ষার একমাত্র উপায় নয়। সেকালের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, তাঁহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ইত্যাদি পড়িয়া অবসর বিনোদন করিতেন, এবং পাড়া-প্রতিবাসিনীরা অনেকেই সেই সময় উপস্থিত হইতেন। এই দুই পুস্তকের ভিতর দিয়া, এবং ব্রতকথা যাত্রাগান, কথকতা, ভাগবত পাঠ, পুরাণ পাঠ, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, শিবায়ন, শীতলার গান, মনসার ভাসান ইত্যাদি দ্বারা যে শিক্ষা ও বিদগ্ধতা লাভ হইত, তাহার মূল্য কোন অংশেই হীন ছিল না। আজকালকার প্রচলিত সাহিত্য-পুস্তকগুলিই যে শিক্ষার বাহন, সে শিক্ষাই যদি মানুষকে শিক্ষিত পদবাচ্য করে, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি যে শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ ছিল, মৌখিক শিক্ষা হইলেও সে শিক্ষা যে বর্ত্তমানের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বহু বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। এই শিক্ষা তাৎকালিক বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে, বোধ হয়, একেবারে অপ্রচুর ছিল না।

মাতৃ প্রভাব

আজকালকার বিদ্যালয়ের বালকেরা রামায়ণের ও মহাভারতের গল্পের সহিতও বিশেষভাবে পরিচিত নয়। এটা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। এই দুইখানি পুস্তকের শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া, আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইকে বসিয়াছি। কিন্তু সেকালে এরূপ হওয়া, বোধ হয়, একরূপ অসম্ভব ছিল। আমার মাতা-ঠাকুরাণী সেকেলে লোক হইলেও, সামান্য লেখাপড়া জানিতেন; এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সমস্ত গল্পই তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রায় প্রতিদিন শয়নের পর নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ধারাবাহিক ভাবে এই সকল গল্প বলিতেন। এই রূপেই আমার গৃহের শিক্ষা আরম্ভ হয়, এবং উত্তর কালে এই শিক্ষার ফলে যাত্রা গান, কবির গান, কথকতা ইত্যাদি শুনা আমার একটী বাতিক হইয়া দাঁড়ায়। গ্রাম ও মহকুমা ছাড়িয়া যখন কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখায় অধ্যয়ন করিতাম, তখন অনেক দিন স্কুল কামাই করিয়া আম

পোস্তায় কথকতা ও যাত্রাদি শুনিবার জন্য সময় সময় বহু তিরস্কার আমাকে সহ্য করিতে হইত।

স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট রামায়ণ ও মহাভারতের ভিতর দিয়া যে শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, তাহার সুফল এই মধ্য-জীবনে বিশেষ ভাবেই অনুভব করি। এই শিক্ষার সহিত কত সুখ দুঃখের স্মৃতিই না জড়িত আছে! এই শিক্ষাই যে যৌবনের পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনার নাস্তিকতা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের ফলে যে মানুষ নাস্তিক হইবেই,—এরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি নিজের দিক দিয়াই কথাটী বলিয়াছি।

"ঠাকুমাবুড়ী"

আজকালকার নব্যশিক্ষিতা নভেলপড়া পিতামহীরা, বোধ হয়, গল্প বলিতে জানেন না, অথবা তাঁহাদের গল্প বলার শক্তি ও সামর্থ্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এরূপ অবস্থা ছিল না। আমার পিতামহী ছিলেন একেবারে নিরক্ষর। পিতাঠাকুর মহাশয় এবং আমার খুড়া ও জ্যেঠামহাশয়েরা তাঁহাকে ছোটমা বলিয়াই ডাকিতেন। অনুসন্ধানে আমরাও জানিয়াছিলাম যে তিনি আমার পিতামহের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই খুব কম বয়সে বিধবা হন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের সংসারে তিনি আমাদেরই একচেটিয়া "ঠাকুমাবুড়ী" রূপেই জীবন অতিবাহিত করেন। উপকথার ভাণ্ডার ছিল তাঁহার অফুরন্ত। নিত্য নূতন গল্প বলিতে তিনি যেমন পারিতেন, তেমন আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার অনেকগুলি গল্প কোন প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক সেই আকারে এখনও চক্ষে পড়ে নাই। "শুকপক্ষী" "মনপবনের না," "চাঁদন দড়ী চাঁদত," "হাতে যন্ত্র পায়ে ফন্দ্র নাম রেখেছি ফাম ফুন্দর" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক উপকথাই, বোধ হয়, এখনও কোন মুদ্রিত পুস্তকে স্থানলাভ করে নাই, এবং, বোধ হয়, ভবিষ্যৎবংশীয়-দিগের জন্য চিরকালের নিমিত্ত লোপ পাইয়াছে। চন্দ্র, শ্যাম, সুন্দর প্রভৃতি গুরুজনের নাম অথবা সেই নামগুলির কাছাকাছি ছিল বলিয়া, এই কথাগুলি তাঁহাকে বিকৃত করিয়াই উচ্চারণ করিতে হইত।

সন্ধ্যার আহার খুব সকাল সকাল শেষ করিয়া আমরা তাঁহার বৈঠকে ধন্না দিতাম। আহারের পূর্ব্বে গল্প বলিতে তিনি নানা প্রকার অছিলা উত্থাপন করিতেন, এবং মালা জপ শেষ করিয়াই আসরে অবতীর্ণা হইতেন। তখন আমাদের কি আনন্দ! যেদিন মালাজপ যথাসময়ে অথবা আমাদের প্রয়োজন-মত শেষ না হইত, তখন তাঁহার জপ ভাঙ্গাইবার জন্য, মাতাঠাকুরাণীর কঠোর আদেশ সত্ত্বেও, মালা ধরিয়া টানাটানি করিতে অনেকখানি সঙ্কোচ বোধ করিলেও, গোপনে এই বে-আদবী করিতে আমার মোটেই আটকাইত না। যতক্ষণ না আমাদের নিদ্রা আসিত অথবা নিদ্রার সময় হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিস্তার ছিল না। সেই কারণেই, বোধ হয়, ঘুম পাড়াইবার একটী কসরৎ তাঁহার বিশেষভাবে অভ্যস্ত ছিল,—তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা তিনি চুলের গোড়ায় এমনি সুড়সুড়ি দিয়া কুরিয়া দিতেন, যে, উপকথার স্বপ্নরাজ্যের তীব্র আকর্ষণ, দোরাণী সোরাণীর হিংসাদ্বেষ, রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র ও সওদাগর পুত্রের সাহচর্য্য—কোন্ ঘুমের দেশে মিলাইয়া যাইত, এবং তিনি তাঁহার অতি-ভক্তদের আত্যন্তিক আবদার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন!

স্বর্গীয়া পিতামহীঠাকুরাণীর গল্প বলার ধরণটী ছিল অতি সুন্দর, অতি মনোরম, অতি প্রাণস্পর্শী:—আর কি বিশেষণ দিব খুঁজিয়া পাইতেছি না! স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র ও রাজকন্যা ইত্যাদির ভিতর দিয়া তিনি যে স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেন, তাহার আধো-আলো—আধো-ছায়ায় আমরাও সেই কল্পপুরীর জনগণের সহিত এক হইয়া গিয়া, সেই অতি-বাস্তব কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিয়া, মনের, হৃদয়ের ও কল্পনার যে বিস্তৃতি, যে প্রশস্ততা লাভ করিতাম, কোন শিক্ষায় তাহার তুলনা নাই। বাল্যশিক্ষার অন্য কোন প্রণালীই তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। সেকালের ঠাকুমাদের অন্তর্দ্ধান বাংলা দেশের ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের শিক্ষার পক্ষে যে একটী অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সেকালের মেয়েলি শিল্প

সেকালের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ নিরক্ষর হইলেও, গৃহশিল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। শিল্পগুলিও সেকালের গার্হস্থ্য জীবনের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত

থাকিত। আমাদের অঞ্চলে খড় দিয়া ছাওয়া মাটীর দেওয়াল দেওয়া কোঠাবাড়ীর সংখ্যাই ছিল খুব বেশী। সেকালকার কারুশিল্পীরা এই গৃহগুলি প্রস্তুত করিবার সময় যেমন সেগুলি সুশোভন করিবার বহু প্রয়াস পাইত, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ গৃহ ও প্রাঙ্গণ বেলেমাটী ও গোময়ের সাহায্যে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতেন।

আমার পিতামহী ঠাকুরাণী খুব সুন্দর তূলার পাঁজ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। টেকোর সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম সূতা কাটিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহার তাল-কাঁড়ীর চরকাটী অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের কাঁচা রান্নাঘরের মাচায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিল! কড়ীর আলনা, ঝারা, লক্ষ্মীর কৌটা, সিঁদুর চুপড়ী, মঙ্গলচণ্ডীর থলী, ইত্যাদি তিনি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। খড়, শণ, ও পাট দিয়া গৃহস্থালীর অতি প্রয়োজনীয় শিকা তৈরীতেও তাঁহার দক্ষতা কম ছিল না। রন্ধনেও পিতামহী-ঠাকুরাণী বিশেষ পটু ছিলেন। আমাদের বংশের সমারোহ ব্যাপারে তিনিই ছিলেন মেট্ রাঁধুনী—মাষ্টার কুক! আশৈশব তাঁহার আচল ধরিয়া বেড়াইতাম বলিয়া তাঁহার এই আসরেও কালে আমার একটু স্থান হইয়াছিল; এবং সেটী তাঁহার সহকারী চাকনদার-রূপে! শুধু রন্ধনে কেন, বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন বিষয়ে তাঁহার মতামত সর্ব্বত্রই গৃহীত হইত। আজকালকার নবীনাদের রন্ধন-ক্ষমতা অনেকটা পুঁথিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল কিছু রাঁধিতে হইলেই তাঁহারা পুস্তক খুলিয়া বসিলেন! এই নব-সৌখীনতার ফলে এমন কি গ্রাম্য অঞ্চলের ক্রিয়াকাণ্ডেও পেশাদার রাঁধুনি বামুনের একাধিপত্য। রন্ধন যে যজ্ঞ-বিশেষ, তাহা আমাদের নবীনারা একরূপ ভুলিয়া যাইতেছেন; এই কর্ম্মে পুরাকালের আগ্রহ ও তটস্থতা এখন বড় একটা দেখা যায় না।

বার মাসের তের পার্ব্বণ ও তেইশ পূজার নানাপ্রকার আলিপনা দিতে এবং বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক ব্যাপারে পীড়ী, হাঁড়ী, সরা, প্রভৃতিতে নানাপ্রকার সুশোভন চিত্র অঙ্কনে স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি প্রায়ই বলিতেন, এই আলিপনা দেওয়া যাঁহাদের নিকট শিখিয়াছিলেন. তিনি তাঁহাদের পায়ের কড়ে আঙুলেরও যোগ্যা হন নাই। নানাপ্রকার পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতেও তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল।

আমার এক মাসীমাতাঠাকুরাণী নানাপ্রকার সুশোভন ক্ষীরের ছাঁচ প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এবং এই অতি উপাদেয় সুখাদ্যটী তৈরী করিবার নানাপ্রকার মাটীর ছাঁচ আধপোড়া মাটীর চাকতি ও একটি নরুণের সাহায্যে খোদাই করিয়া বহু আত্মীয় ও আত্মীয়াদিগকে উপঢৌকন দিতেন। এখনও আমাদের বাড়ীতে এইরূপ নানা সুন্দর ছাঁচ সযত্নে রক্ষিত আছে। আমার এক অগ্রজ সরকারী কলাবিদ্যালয়ে বহু বর্ষ শিক্ষালাভ করিয়াও এই মাটীর ছাঁচগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেন, এবং তাহাদের অনুকরণে অনেকগুলি নূতন ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার এই মাসীমাতা-ঠাকুরাণী বহুপ্রকার বড়ী তৈরী করিতেও পারিতেন। তাহাদের আকার কাহারো জিলাপীর মত, কাহারো অমৃতীর মত, কাহারো রথের মত, কাহারো চূড়াওয়ালা মন্দিরের মত, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকেই অত্যুৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন অপেক্ষাও এই সকল বড়ীকে অতি উপাদেয় ভোজ্য বলিয়াই মনে করিতেন। আমার আর এক মাসীমাতাঠাকুরাণী খয়ের গুলিয়া, কেয়াফুলের দ্বারা তাহাকে সুগন্ধি করিয়া, সেই মণ্ড হইতে নানাপ্রকার খেলনা ও সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থালীর বাসনকোসনের অনুরূপ ছোট ছোট বাসন তৈরী করিতেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনগুলি আবার মসলা সাজাইয়া নানাপ্রকার রেখাচিত্রে সুশোভিত হইত। ধারাল ছুরি, যাঁতী ও নরুণের সাহায্যে, ভিজান বড় বড় সুপারী দিয়াও এইরূপ নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হইত। এই সকল ছোট ছোট তৈজসপত্রগুলি বিবাহের ফুলসজ্জার তত্ত্বেই বিশেষ ভাবে আবশ্যক হইত।

কেশ প্রসাধনের জন্য ছেঁড়া চুলের কেশী ও ঐরূপ ছেঁড়া চুল বিনাইয়া খুব মিহি দড়ী প্রস্তুত করাও সেকালের মেয়েদের একরূপ নিত্যকর্ম্ম ছিল। বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁহাদিগকে কাপড়ের ফুল ও মালা প্রস্তুত করিতেও দেখা যাইত। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় আমাদের অঞ্চলের মহিলারা কোন কালেই তেমন সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। তবে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী কাঁথা তাঁহারা এক রকম মন্দ প্রস্তুত করিতেন না। বোধ হয় সেকালে আমাদের অঞ্চলে সূচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু যে যে শিল্প

প্রচলিত ছিল, তাহাদের সমস্তই ছিল তাৎকালিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনের অনুরূপ। নিজ নিজ গৃহের ভিতরই এই সকল শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইত;—যাঁহারাই কোন বিশেষ শিল্পে দক্ষতা অর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষানবীশি করিয়া বালিকা, কিশোরী ও যুবতীদিগের শিক্ষা হইত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই সকল সৌখীন গৃহশিল্প এখন হয় লোপ পাইয়াছে, না হয় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ-কালের নবীনাদের শিক্ষা ও রুচি ভিন্ন প্রকার। নব সৌখীনতার উজান স্রোতে প্রাচীন গৃহশিল্পগুলি কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে; অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এখন আর বড়-একটা শুনা যায় না।

বিলোপের কারণ

যে কারণে উপকথা বলার শক্তির হ্রাস হইতেছে, কতকটা ঠিক সেই কারণেই প্রাচীন গৃহশিল্পগুলি বিলুপ্ত হইতেছে। আজকালকার নবীনাদের নূতন সৌখীনতাই এই হ্রাস ও বিলোপের যথেষ্ট কারণ নয়। সমাজে যখন একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রভাব খুব সতেজ ছিল, তখনই সেকালের গৃহশিল্প ও উপকথাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষানবীশির অবসর ও সুযোগ ঘটিত। কিন্তু এখন পরিবারের সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান; আমরা এখন বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবন-যাপন করিতেই ভালবাসি, অথবা এরূপ জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হই। চাকুরিই এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের জীবিকা। এই চাকুরির জন্য এখন আমরা গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও, আমরা বিদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে বাধ্য হইয়া, আমাদের জীবন্ত বোচকা-বুচকীগুলিকে সঙ্গের সাথী করি! এইরূপে আমাদের নবীনারা গ্রাম্য-গৃহের আবহাওয়া হইতে সরিয়া পড়িয়া, একবার অনেকখানি স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া, আর সেখানে পুনর্ম্মূষিক হইতে ইচ্ছা করেন না। পিতৃ-গৃহের সামান্য দিনের যে কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহাই হয় তাঁহাদের নিজ নিজ গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র অবলম্বন। নূতন দেশের নূতন আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য হইলেও, নূতন সমাজের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। এই বিচ্ছিন্ন সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনই প্রাচীন শিল্পগুলির বিলোপের সর্ব্বপ্রধান কারণ। সেইরূপ আজকালকার নবীনারা যে পিতামহী রূপে গল্প করিতে পারেন না, নিজ নিজ পারিবারিক স্বজনগণের সহিত অসংযোগই ইহার প্রবল কারণ। তাঁহার সন্তান-সন্ততিরা ঠাকুমার গল্প শুনিতে পায় না, এবং বাল্যের ক্ষীণ স্মৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয় না। গ্রামের বাহিরে বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন পারিবারিক জীবনই শিল্প-শিক্ষা ও বাল্য-শিক্ষার উপায়গুলির অন্তর্দ্ধানের সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে বর্ত্তমানের পুংশিক্ষার অনুকরণে পরিচালিত স্ত্রীবিদ্যালয়গুলির আদর্শের পরিবর্ত্তন আশু প্রয়োজন। এখানকার শিক্ষয়িত্রীদিগকেই উপকথা সম্বন্ধে সেকালের ঠাকুরমার, শিল্প সম্বন্ধে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বর্ষীয়সীদিগের এবং মহাভারত ও রামায়ণ সম্বন্ধে প্রাচীন কথক ও পুরাণ-পাঠকদিগের স্থান অধিকার করিতে হইবে। ইহার জন্য রুচি, আদর্শ এবং বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালীর পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক।

পুস্তক-পরিচয়

তৃপ্তি।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। নরেশবাবুর প্রত্যেক উপন্যাসেরই যেমন কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকে, এখানিতেও তাহার অভাব নাই। "তৃপ্তি"র প্রথম বিশেষত্ব ইহার—কৈফিয়ৎ। একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়তে গ্রন্থকার তাঁহার সমালোচকদের সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। ইহার অপর একটা বিশেষত্ব—এই উপন্যাসে শ্রীযুক্ত নরেশবাবু প্রণয়-ঘটিত একটা জটিল সমস্যার উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নায়িকা মিনতি বিদুষী—বি-এ উপাধিধারিণী। সে নিজে একজন কবি, এবং টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিদের গোঁড়া ভক্ত। সে তাহার ভগিনীপতির কাছে টেনিসনের In Memoriam কবিতার দুইটা লাইন—

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all"

বুঝিতে আসিয়া নিজেই তাহার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া দিল, যে,

তাহার ভগিনীপতি-মাষ্টার বিনোদ এবং তাহার সম্ভ-বিপত্নীক বন্ধু শিশির বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং শিশির জোর করিয়া তাহাকে বিবাহই করিয়া ফেলিল। শিশিরের মুখে নিজের এবং তাহার কবিতার প্রশংসা শুনিয়া মিনতিও শিশিরকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পরদিনই শিশির তাহার পুত্রের নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া নব-পরিণীতা মিনতির উপর এমন হাড়ে চটিয়া গেল, যে, সেই দিনই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রেমের কারবারে "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই ভিত্তির উপরই সমগ্র প্লটটি গড়িয়া উঠিয়াছে। মিনতি শিশিরকে ভালবাসিয়াও, তাহাকে বিবাহ করিয়াও, প্রেমাস্পদকে পাইল না—to have loved and lost তাহার নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ ভাবে ফলিয়া গেল! সে তাহার এই হারানো প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই স্বামী-পুত্র হীন শূন্য স্বামীর ভিটায় তাহার প্রথম যৌবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আট-দশ বৎসর কাটাইয়া দিল। তার পর যদিও উভয়ের পুনরায় মিলন হইল, তখন শিশির বৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অতএব গ্রন্থকার যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সমাধান কিরূপ করিলেন, সেটা বড় স্পষ্ট বুঝা গেল না।

"তৃপ্তি"র আর একটী বিশেষত্ব—সপত্নী-পুত্রের প্রতি মিনতির পুত্র-বাৎসল্য। অন্য অনেক ঔপন্যাসিকই সৎ-মাকে দিয়া সপত্নী-পুত্রকে ভালবাসাইয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই যেন জোর করিয়া টানিয়া বুনিয়া ভালবাসা। সপত্নী পুত্রের প্রতি সেই হঠাৎ স্নেহ কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ হয়। "তৃপ্তি"তে নরেশবাবু মিনতিকে শৈশব হইতেই "মা" করিয়া গড়িয়াছেন। সাত-আট বৎসর বয়স হইতেই সে তাহার দাদাদের ছেলে-মেয়েদের জননী-স্নেহে পালন করিতে করিতে সন্তান প্রসব না করিয়াও যথার্থই "মা" হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বিবাহের প্রস্তাব মাত্রেই সে তাহার ভাবী স্বামীর পুত্রকে মনে মনে নিজের পুত্রের আসনে বসাইয়া বাৎসল্য-রসে অভিষিক্তা হইয়াছিল; এবং বিবাহের পরদিনই যদিও সে স্বামী ও পুত্র উভয়কেই হারাইয়াছিল, তথাপি, স্বামীকে যেমন অন্তরের মধ্যে ভালবাসিত,—একটী কুড়ানো নবীন সন্ন্যাসীকে তাহার সপত্নী-পুত্র দিলীপ ভাবিয়া তাহাকেও সেইরূপ সন্তান স্নেহে পালন করিয়াছিল। পরিশেষে স্বামী ও পুত্র উভয়েই তাহার হাতে ধরা দিলে তাহার হারানো ভালবাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটিল। বইখানি যে চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তে বিশেষ একটা সাড়া জাগাইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সেপাই ঝোরা।—শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০ মাত্র। এখানি পাঁচটী ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক। গল্প পাঁচটীর নাম—সেপাই ঝোরা, দীক্ষা, বার বেলা, লেণু মামা ও ব্যথা। গল্প কয়টীই সুলিখিত, ছোটও বটে, গল্পও বটে। লেখক নবীন হইলেও লেখার মধ্যে মাধুর্য্য আছে, গল্প বলিবার ভঙ্গীও সুন্দর। প্রথম গল্প সেপাই-ঝোরা আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। নবীন গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহা আমরা বলিতে পারি।

প্রাচীন চিত্র।—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য দশ আনা। পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তের আলোচনা না করিয়া যে সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, ইহাতে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু, যাঁহারা মাসিক-পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, পণ্ডিত মহাশয় সাহিত্যালোচনাতেই নিবিষ্ট-চিত্ত, তাহারই ফল এই প্রাচীন চিত্র। ইহাতে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, কালিদাসের শকুন্তলা, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী, উত্তর রামচরিত, এই চারিটী সন্দর্ভ আছে; তাহার মধ্যে উত্তর রামচরিতের বিশ্লেষণই একটু বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। প্রত্যেকটী সন্দর্ভেই সাহিত্য-রসজ্ঞান ও বিশ্লেষণ শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; ভাষা এমন মনোহর যে কোথাও পণ্ডিতী-গন্ধ পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর পুস্তক বিদ্যালয়-পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; কারণ ইহা পাঠ করিলে প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্যের শুধু পরিচয় পাওয়া যায় না, সেকালের সাহিত্যের প্রতি আদর ও আস্থাও বৃদ্ধি হয়।

ভিখারিণী।—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত, মূল্য একটাকা। ইহা কয়েকটী কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, কারণ ইহার প্রত্যেক কবিতা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। লেখক যে সুরে বীণা বাঁধিয়াছেন, তাহা কোন স্থলে নামিয়া পড়ে নাই, সুরের ঝঙ্কার সমভাবে চলিয়াছে। বিশ্ব-ভিক্ষা, শ্মশান ও বিশ্ব-প্রেম কবিতা তিনটী বড়ই প্রাণস্পর্শী। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

মেবার-কাহিনী।—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য একটাকা। এখানি ছেলেদের জন্য লিখিত মেবারের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মেবারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতি সুললিত ভাষায় সেই মেবারের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এই সচিত্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ-লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানির মঙ্গলাচরণে অন্য কোন কথা না বলিয়া গ্রন্থকার মহাশয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' হইতে 'মেবার পাহাড়' নামক সুপ্রসিদ্ধ গানটী তুলিয়া দিয়াছেন। এই সুন্দর বইখানি প্রত্যেক কিশোরের হস্তে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

মঞ্জরী।—শ্রীসুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য বার আনা। খুব ছোট ছোট নয়টী গল্প এই 'মঞ্জরী'তে আছে। নবীন লেখকের পরিচয় এই যে, তিনি ঠাকুরবাড়ীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র, সুতরাং উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার সাহিত্য সেবার ও গল্প, কবিতা প্রভৃতি লেখার অধিকার আছে। 'মঞ্জরী' পড়িয়া আমরা বলিতে পারি, শ্রীমান্ সুভগেন্দ্র তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—গল্পগুলি সুন্দর হইয়াছে, বেশ ঝরঝরে। লেখক আবার এই বইয়ের মধ্যে নিজের আঁকা দুইখানি ছবি দিয়াছেন। তারপর ছাপা; কাগজ, বাঁধাই সবই ঠাকুরবাড়ীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক মতে, **শিশুপীড়া চিকিৎসা।** মূল্য এক টাকা। সমালোচ্য পুস্তকখানি স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার একজন প্রবীণ চিকিৎসক। তাঁহার প্রণীত "সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব" এবং "সদৃশবিধান" চিকিৎসা;—"চিকিৎসক"

প্রভৃতি পুস্তক অতি সমাদরে কলিকাতায় কলেজে পঠিত হইতেছে এবং মফস্বলেও গৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত উৎকৃষ্ট পুস্তক—পিটার্স হেডেক্ (Peter's Headach.), কিঙ্স্ হেডেক্ (Kings Headache) প্রভৃতি গ্রন্থের সার সঙ্কলন। তদুপরি রাইমোহনবাবু ভারতীয় প্রধান হোমিওপ্যাথদিগের বহুদর্শিতা সংযোগ করাতে ইহার উপকারিতা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে একটী নির্ঘণ্ট (Repertory) সংযোগ করাতে গ্রন্থখানি বড়ই উপকারী ও ব্যস্ত চিকিৎসকের বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাসনা করি।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম।—শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম-বি বিরচিত, মূল্য প্রতি ভাগ দেড় টাকা। এখানি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানদর্শন ও বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত ব্যাখ্যান। এখনকার দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রের দোহাই মানিতে চান না, সকলেই বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ চান। এ অবস্থায় হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, থিয়সফি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, ঘোষ মহাশয় তাহার কোনটীই বাদ দেন নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের আলোচনারও সুবিধা হইবে। গ্রন্থকার যে এই পুস্তকখানি লিখিতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

নারী-মঙ্গল।—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। মূল্য বার আনা। শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার অনেক সুন্দর কবিতা মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, 'ভারতবর্ষে'ও অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গনারী, সীতা, সতী, গান্ধারী প্রভৃতি কবিতাগুলি যেমন সুন্দর, তেমনই প্রাণস্পর্শী। আমরা সুকবি পরিমল-কুমারের এই ছোট কবিতা-পুস্তকখানিকে সাদরে গ্রহণ করিলাম ; ছোট হইলেও কবিতাগুলি দমে ভারি এবং কবিত্বে ভরপূর। ছবি কয়েক-খানিও অতি সুন্দর হইয়াছে। কবিতাগুলি যেমন সুন্দর, বইখানি দেখিতেও তেমনই মনোরম।

আরতি।—শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়। তিনি সত্যই বলিয়াছেন "আরতি কবিতাই আরতি'-কাব্যের যথাযোগ্য মঙ্গলাচরণ।" আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই কথারই সমর্থন করিতেছি। কবিতাগুলি সমস্তই সুখ-পাঠ্য এবং বলিতে গেলে ইহার মধ্য দিয়া কবি-হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আমরা 'আরতি'র নবীন কবিকে সমাদরে বরণ করিয়া লইতেছি ; তাহার কবিতাগুলি সত্যসত্যই উপভোগ্য।

যমের মুখে।—শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত, মূল্য দশ আনা। ইহাতে তিনটী গল্প আছে—যমের মুখে, ছুটের পাল্লা ও গুইলে বাঘ ধরা। গল্প কয়টীর নাম পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, এ বইখানি ছেলেদের জন্য লিখিত। এই বলিলেই বইখানির পরিচয় দেওয়া হয় না ; লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের ছেলেরা 'সুবোধ বালক' না হইয়া একটু চট্‌পটে, একটু 'ডানপিটে' হয় ; সেই কথা মনে করিয়াই এই গল্প তিনটী লিখিত হইয়াছে। গল্প তিনটীই সুন্দর ও সুলিখিত। ছেলেরা যে গল্পগুলি পড়িয়া শুধু আমোদই পাইবে তাহা নহে, তাহাদের শিক্ষাও হইবে। আটখানি ছবিই ভাল হইয়াছে, প্রচ্ছদপটের ছবিখানিও সুন্দর।

বিশ্ব-বৈতালিক।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এই বইখানি কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি যেমন ছোট ছোট, তেমনই সুন্দর। সৌন্দর্য্য-পিপাসু কবি সত্যসত্যই প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন ; কোন স্থানে কষ্ট-কল্পনা নাই, কোথাও কৃত্রিমতা নাই, একেবারে খোলাপ্রাণে সহজ সুন্দর ভাবে সবগুলি কবিতা লিখিত। আমরা প্রত্যেকটী কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

প্রাচীন রাজমালা।—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য তিন টাকা। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া অনেক সময় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তিনি ১৩৩১ সালে "প্রাচীন রাজমালা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পুস্তকখানিতে স্বাধীন হিন্দু-ভারতের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বিজয়নগর রাজ্যনাশ পর্য্যন্তই হিন্দু-রাজত্ব। বিজয়নগরের পরও স্বাধীন রাজ্য হইয়াছে এবং এখনও আছে; কিন্তু বড় রাজত্বের এইখানেই শেষ। বইখা ন লিখিতে রামপ্রাণবাবু অনেক খাটিয়াছেন, কেমন করিয়া যে ময়মনসিংহের মফঃস্বলে বসিয়া এত বই ও ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করিলেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। চৌচাপটে ইতিহাসখানা লেখার জন্য তাঁহাকে অনেক দেশের জিনিস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। চীনেদের, তিব্বতীদের, তামিলদের ও এসিয়ার অন্যান্য জাতিরও সাহিত্য হইতে তিনি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিহাস লিখিতে গেলে দুইটা জিনিস দেখিতে হয়, দেশ ও কাল। কোন দেশের বা কোন কালের ইতিহাস বাদ দিলে চলিবে না। কাজটা অসম্পূর্ণ থাকিবে। রামপ্রাণ বাবু সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে বিজয়নগর ধ্বংস পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল এবং এই বিশাল ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ কিছু বাদ না দিয়া ইতিহাস লিখিবেন সংকল্প করিয়াই একাজে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যতদূর পারিয়াছেন স্থান ও কাল পূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অনেক যায়গার কথা এখনও কেহ জানে না, অনেক সময়ের কথাও প্রকাশ হয় নাই, কখনও হইবে কি না সন্দেহ। এরূপ জিনিস যদি বাদ পড়ে তাহার জন্য গ্রন্থকারকে দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ বাদ বহুদিন অবধি পড়িয়াছে এবং বহুদিন ধরিয়া পড়িবে, সবটা পুরিবে কি না বলা যায় না। রামপ্রাণবাবু একটা কাজ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ পাঠকের একটু উপকার হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যে এক একটা বিষয়ে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন সেরূপ নানা মত রামপ্রাণবাবুর নাই, সাধারণের উপকারার্থ তিনি যে মতটা খুব যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, বাকীগুলি উল্লেখই করেন নাই। ইতিহাসটা

একটানা বহিয়া গিয়াছে। তিনি আরও একটা কাজ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তবে পুরা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতিহাস যাঁহারা লেখেন, তাঁহারা সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের নিজের মতবাদ দিয়া থাকেন। একজন ইতিহাস-লেখক বলেন, যেই ভারতে একেশ্বর-বাদ চলে ও বিধবা-বিবাহ চলে অমনি তাহার উন্নতি হয়, আর সেই বন্ধ হয় অমনি অবনতি। এ পুস্তকে তেমন আজগবি মত নাই, কিন্তু দুএক জায়গায় ওরূপ মত প্রকাশের লোভ রামপ্রাণবাবু সামলাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার সঙ্করবর্ণ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা টিকিবে কিনা জানি না। বইখানি পাঠ্য হইয়াছে অথচ বিদ্যালয় পাঠ্য নয়, উহাতে সব খবর আছে অথচ পড়িতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। মূল্য সাধারণ সংস্করণ আড়াই টাকা। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শক্তি-তত্ত্বামৃত।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শক্তি-সাধনার মূল তত্ত্ব বিবৃত করিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে পণ্ডিত ব্যক্তি, তাহা এই গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এই পুস্তকখানিকে শক্তিতত্ত্ব না বলিয়া দেবী-মাহাত্ম্য কথা বলিলেই গ্রন্থের ঠিক পরিচয় প্রদান করা হয়। চণ্ডী, গীতা প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থকার যে দেবী-ভক্ত, তিনি যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য গ্রন্থখানি লেখেন নাই, তাহা এই গ্রন্থখানির দুই চারি ছত্র পড়িলেই জানিতে পারা যায়। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মানুরাগী, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণচিন্তা।—শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য বার আনা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ বাবু, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে উপরিউক্ত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকের বিষয়গুলি পূর্ব্বেই নানা মাসিক পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে লিখিত হইয়াছিল। সেইগুলিই তিনি এক্ষণে পুস্তকাকারে বাহির করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। জ্ঞান বাবু যে একজন উচ্চদরের চিন্তাশীল ও ভক্ত লেখক তাহা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি। আর্য্য-ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিলাতে দিলীপকুমার

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

আজ এই চার-পাঁচ মাসের উপর শ্রীমান দিলীপকুমার রায় ভারতবর্ষ হ'তে রওনা হ'য়ে কোথায় আছেন, এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কি প্রকার চর্চ্চা কর'ছেন,—অনেকেই তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নিকট এরূপ প্রশ্ন ক'রে থাকেন। সেই জন্য আজ এই 'ভারতবর্ষে'র মধ্য দিয়ে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যৎসামান্য প্রকাশ ক'রতে প্রয়াস পাব।

দিলীপকুমার এবার ভারতবর্ষ হ'তে রওনা হ'য়ে (Neice) নিসে পৌছান। সেখানে পৌছানর অব্যবহিত পরেই এক সম্ভ্রান্ত কাউণ্টেসের প্রাসাদে বহু জনসমাগমের মধ্যে দুই দিন ধ'রে তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হয়। এতদুপলক্ষে তিনি যে সেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবং তদুপলক্ষে নিজেও কি পরিমাণ সম্মান লাভ করেছেন, তা এখানে বিশদ ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যাঁরা ঐ সময়ের 'ফরোয়ার্ড' কাগজ প'ড়েছেন, তাঁরাই তা' অবগত আছেন।

দিলীপকুমার নিস হতে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে আসেন। প্যারিসে পৌছানর অব্যবহিত পরেই তিনি লণ্ডন হতে পুনঃ পুনঃ আহূত হন। লণ্ডনে পৌছানর পরই লণ্ডন ইউনিয়ন সোসাইটীর এক বিরাট সভায় সভ্যগণ দিলীপ-কুমারকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে ইউনিয়ন সোসাইটীর হলে এত স্ত্রী ও পুরুষের ভীড় হয় যে, তিনি যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করা ও গান গাওয়া সত্ত্বেও, এই বিরাট সভার প্রান্তদেশস্থ সকলে শুনিতে পান নাই ব'লে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তৃতা ও গান শেষ হলে সকলেই একবাক্যে খুব তারিফ করেন; এবং সভাপতি ও গণ্যমান্য সভ্যগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, ভারতীয় সঙ্গীত যে এত উচ্চ ও এত বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরে তৈরী, তা' তাঁ'রা অবগত ছিলেন না—ইত্যাদি। এই সভাস্থলেই দিলীপকুমার আরও তিন-চারটী সভার ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ও গান গাহিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। অতি সম্মান ও আদরের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও দিলীপকুমার দুই এক স্থানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করতে অপারক হ'য়ে পড়েন এই কারণে যে, ইতিমধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড হতে তিনি জরুরী তারযোগে সংবাদ পান যে, অবিলম্বে তথায় তাঁহাকে যে কোন প্রকারে হ'ক পৌঁছাতে হবেই, যেহেতু এডিনবরায় চাঁদা তুলে অড্‌ফেলোজ হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে; এবং ঘোষণা করা হয়েছে "Lecture on Indian Raga



এডিনবরা অড্‌ফেলোজ (Odd Fellows') হলে—শ্রীদিলীপকুমার

by one of the greatest Indian musicians of the day." অগত্যা তিনি অনতিবিলম্বে লণ্ডনে ফিরে আসবেন প্রতিশ্রুত হয়ে এডিনবরায় চলে যান। এখানে অড্‌ফেলোজ হলে এই বিরাট সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সভাপতি ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার বেইলী মহাশয়ের সঙ্গীত-বিদুষী পত্নী মিসেস বেইলী। ইনি স্কটল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদিনী। এই সভায় এত লোকের ভীড় হয়েছিল যে, অনেকেই স্থানাভাব হওয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই বিরাট জনসমাগমের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ স্কচ নরনারী এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

দিলীপকুমার এই সভায় সঙ্গীত ও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তার রাগের বিকাশে, যার বিচিত্রতা অফুরন্ত। তিনি আরও বুঝিয়ে দেন যে আমাদের সঙ্গীতের তানালাপের স্বাধীনতা খুব বেশী ইত্যাদি। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞেরা স্বীকার করেন যে, এ-রকম তানালাপ সত্যই অতিশয় কঠোর। দিলীপকুমার খেয়াল, ভজন, ঠুংরী ও তাঁর পিতার রচিত আমার "জন্মভূমি" ও "আমার দেশ" গানের ইংরাজি অনুবাদ গান করে সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করেন। সভাস্থ সকলেই তাঁর তান, লয় ও কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব খেলায় বিমোহিত হয়েছিলেন। সভাপতি মিসেস বেইলী বলেন যে, দিলীপকুমার ভারতীয় সঙ্গীতের এখনকার একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ; আরও বলেন যে, তাঁদের প্রতীচ্য জাতিদের মনে হয় আমাদের (ভারতীয়) সঙ্গীত সুন্দর, প্রকৃতির সব চেয়ে কাছে ও সব চেয়ে প্রাণময়ী (so near to nature and so beautiful in its sincerity)। এই প্রকার কথাবার্ত্তার পরেই রিপোর্টারগণ, হাতের-লেখা-সংগ্রহকারিণিগণ ও ফটোগ্রাফাররা দিলীপকুমারকে ঘিরে ফেলে। তারা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, হাতের লেখা নেবার জন্য ও ফটো তুলবার জন্য তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে।

অড্‌ফেলোজ হলে সঙ্গীত ও বক্তৃতার পর-দিনই স্কটল্যাণ্ডেই আর একটী বিরাট সভায় দিলীপকুমারকে সম্বর্দ্ধনা

করা হয়। এবার এটী স্কটল্যাণ্ড-প্রবাসী বাঙ্গালীদের তরফ হতে। দিলীপকুমারের সঙ্গীত ও বক্তৃতার পর তাঁকে ফ্রেমে বাঁধানো একটী সুন্দর "অভিনন্দন" দেওয়া হয়। শেষে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করবার জন্য দিলীপকুমারকে একশত টাকা দেবার প্রস্তাব করায়, তিনি বলেন যে, তাঁর নিজের এ প্রকার কোন Organisation নাই যা'ত তিনি এই টাকা খরচ করতে পারেন। অতএব যদি এই টাকা দক্ষিণ কলিকাতার সেবক-সমিতির সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস মহাশয়কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে তিনি আন্তরিক সুখী হবেন। এই প্রস্তাব স'লেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সেইমত কার্য্য করেন। দিলীপকুমারকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেটী এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

অভিনন্দন

এডিনবরা

১৫ই—মে ১৯২৭

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় করকমলেষু—

বন্ধুবর—আমরা এডিনবরা-প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির সভ্যগণ আপনাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। বিদেশীয় জনসাধারণের নিকট ভারতের সঙ্গীত-বিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান ও প্রতিষ্ঠা স্থাপনের যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়া আপনি দেশ হইতে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহাতে গৌরবান্বিত আমরা আপনাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলনকল্পে আপনার যে অসামান্য প্রচেষ্টা, তাহা কেবল প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরবকে আনয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না,—তাহা শিশিক্ষুর নিকট সঙ্গীত-বিদ্যার চেষ্টা সহজ করিয়া দিবে।

প্রার্থনা করি জীবনের মহা আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতমাতার মুখ পূর্ণ সাফল্যে গৌরবান্বিত করুন।

ইতি

আপনার শুভানুধ্যায়ী

বাঙ্গালী সমিতির বিনীত সভ্যবৃন্দ।

এই অভিনন্দনের পরই তিনি লণ্ডন হতে পুনরায় তারযোগে সংবাদ পান যে ভারতীয় ছাত্র-সমিতি হ'তে দিলীপকুমারের বক্তৃতার ও সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে; অতএব তিনি যেন অবিলম্বে তথায় চলে আসেন।

লণ্ডনে ফিরে আসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা স্বচ্ছন্দ না থাকায়, প্রথমতঃ সেদিন গান গাহিতে ও বক্তৃতা দিতে অপারগ ব'লে পাঠান; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধের সঙ্গে জানান যে, এই গান ও বক্তৃতার জন্য জনসাধারণ আজ এক সপ্তাহের উপর উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। অগত্যা তাঁহাকে ঐ দিনই বক্তৃতা দিতে হয়।

এদিকে বারট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন "প্রিয় দিলীপ, তুমি যে রকম man of impo tance হয়ে প'ড়েছ শুনছি, ও সংবাদপত্রে তোমার বক্তৃতা ও গানের খবর পাচ্ছি, তাতে যে তোমাকে দুদিন আমার এখানে এসে একান্ত আমার হয়েই থাকতে ব'লব, সে ভরসাও পাচ্ছি না। তবে যদি তুমি কিছুদিনের জন্য আমার এখানে চলে আস ও তোমার গলাটাকে ও শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দাও, তাহ'লে ভবিষ্যতে বক্তৃতা ও গানের সময় অপারগ হিসাবে বদনামের ভাগী হতে হবে না"—ইত্যাদি—

দিলীপকুমারকে Broad Casting হ'তে গান গাইবার জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করায় তিনি Bertrand Russalএর নিমন্ত্রণ আপাততঃ দুই চার দিন স্থগিত রেখেছেন।

দিলীপকুমার যে ভারতবর্ষের বাহিরে এই রকম ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে ঘুরে বেড়িয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান ক'রে সম্মান লাভ করছেন, তাতেই প্রত্যেক ভারতবাসীরই, প্রত্যেক হিন্দু বাঙ্গালীরই গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। এখানে দিলীপ-কুমারকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখলে চলবে না—এখানে দেখতে হবে, দিলীপকুমার একজন ভারতীয় বাঙ্গালী হিন্দু। তিনি যদি দিলীপকুমার না হয়ে অন্য যে কোন বাঙ্গালী, কি মুসলমান কি হিন্দুস্থানী হ'তেন, এবং এই প্রকার সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান লাভ করতেন, তাহ'লেও আমাদের পক্ষে সমানই গৌরবের ও আনন্দের কথা হোত।

শোক-সংবাদ

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অকস্মাৎ পরলোক-গমনের সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা এক দিনের জন্যও মনে করি নাই—এত শীঘ্রই ক্ষীরোদপ্রসাদের



পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা পতিত হইবে। বিগত ১৮ই আষাঢ় রবিবার রাত্রি দুইটার সময় ৬৯ বৎসর বয়সে ক্ষীরোদপ্রসাদ এ জগতের মায়া কাটাইয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে সুদূরে বাঁকুড়ায় তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। যাঁহারা এতকাল তাঁহাকে আপনার জন মনে করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই সেই অন্তিম সময়ে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি বাঁকুড়া সহরের অদূরবর্ত্তী একটী স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেখানে নির্জ্জন-বাস করিতেন। মৃত্যুর মাস দেড়েক পূর্ব্বে শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি বাঁকুড়ায় গমন করেন। সেখানে যাইবার পর প্রতিদিনই তাঁহার সামান্য একটু জ্বর হইত; কিন্তু, তাহা যে সাংঘাতিক হইবে, এ কথা কেহই মনে করেন নাই—তিনিও ভাবেন নাই। অকস্মাৎ ১৮ই আষাঢ় তাঁহার শরীর অধিক অসুস্থ হইয়া পড়ে। বাঁকুড়া সহরে তাঁহার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা চিকিৎসার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না—রাত্রির তৃতীয় যামে বাঙ্গালীর বড় আদরের, বড় শ্রদ্ধার আধার ক্ষীরোদপ্রসাদ সকল মায়া কাটাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবন-কাহিনী অনেকেই জানেন; তবুও এ স্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম এ পাস করিয়া কিছুদিন জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা করেন। সেই সময় হইতে, অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সাহিত্য-সেবার স্পৃহা জাগরিত হয়; এবং তিনি বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার এই বাসনা এত প্রবল হইয়াছিল যে, কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি সাহিত্য-সেবা, বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের চর্চ্চাকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্য অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য' তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে; তাঁহার আলিবাবা, রঘুবীর, আলমগীর, ভীষ্ম প্রভৃতি নাটক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের গৌরব-স্থানীয়। তাঁহার শেষ নাটক 'নর-নারায়ণ'। আমাদের মনে হয় 'প্রতাপাদিত্যে'র কথা ছাড়িয়া দিলে 'নর-নারায়ণ'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক! এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা-সাহিত্যের, বাঙ্গালা-নাট্য-

সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। আমরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়গণকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? আমারই যে ক্ষীরোদ-প্রসাদের পরলোকগমনে হাহাকার করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ

শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ বা ঠাকুর হরনাথ আর ইহ-জগতে নাই, গত ২৫শে মে রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার অসংখ্য ভক্তকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

সন ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ়, শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হরনাথ সোনামুখীর বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষায় ও ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কুচিয়াকোল ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধমান রাজকলেজ হইতে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে এল-এ (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা Metropolitan (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজে বি.-এ পড়েন।

বাল্যাবস্থাতেই হরনাথের প্রাণে ধর্ম্মভাব পরি-লক্ষিত হয় এবং বি-এ পড়িবার সময় সেই ধর্ম্মভাবের-বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময় তাঁহার কেমন একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় আর তাঁহার পড়াশুনায় মন বসিল না। আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথম বি-এ পরীক্ষা দেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। জননীর অনুরোধে হরনাথ ১৮৯০ এবং ১৮৯১ খৃঃ অব্দে আরও দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সময় তিনি পরীক্ষার পড়া পড়িবেন কি? এই সময় তিনি—

"চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরণে না য'য় মোর হিয়া"

গানখানি আপন মনে গাহিতেছেন। কখন বা

"বন্ধু আমার কালিয়া সোনা
স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা"

গানখানি গাহিতেছেন।



শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ

এই গানখানি 'সৈয়দ মর্ত্তুজা'র গান। এই গানখানি মুসলমান কবির রচিত বলিয়া—তাঁহার মুখে এই গান শুনিয়া যখন তাঁহার বন্ধুরা বিরক্ত হইতেন. তখন তিনি বলিতেন—"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

ইহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবনাথের তাড়নায় তিনি ১৯০২ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ অযোধ্যা

নামক স্থানের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার ছয়মাস পরে তিনি কাশ্মীর ষ্টেটের ধর্ম্মার্থ আফিসের ভার গ্রহণ করিয়া কাশ্মীর গমন করেন।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে তাঁহাকে অনেক সময় রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া শ্রীনগরে আসিতে হইত। রাওয়ালপিণ্ডির বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও তাঁহার কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হন। এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকায় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় হরনাথের সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনা সমূহ অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সেই সকল অলৌকিক ঘটনা তাঁহার সম্পাদিত "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে" প্রকাশ করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের লোকেরা তাঁহার বিষয় জানিতে পারেন ও দলে দলে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ গৃহী। তাঁহার স্ত্রী পুত্র সকলেই আছেন। তিনি কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই; অথচ তাঁহার অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা করা যায় না। ভক্তেরা তাঁহাকে গুরুরও অধিক মনে করিয়া থাকেন।

ভক্তেরা তাঁহাকে লইয়া বার মাসে তের পার্ব্বণের মত বারমাসই উৎসব করিয়া থাকেন এবং প্রতিবৎসর একটী করিয়া জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বহু দূর হইতে অসংখ্য ভক্ত সমবেত হইয়া থাকেন। এইবার মেদিনীপুরের জন্মোৎসবেও মাদ্রাজ প্রভৃতি হইতে বহুসংখ্যক ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। এই সব উৎসবে কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

পুরী, বৃন্দাবন, নাগপুর, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার নামে সভা, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। অনুকূলচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস নামক তাঁহার দুইটী পুত্র বর্ত্তমান। তিনি সংসারে থাকিয়া—সর্ব্বদাই ভক্তগণ সহ ধর্ম্মকথায় কালক্ষেপ করিতেন—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

সাময়িকী

এ মাসের প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বজন-পরিচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। 'কালী সিঙ্গীর মহাভারত' এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান। এই মহাভারতের অনুবাদক বলিয়াই তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। কালীপ্রসন্ন কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ-জমিদার-বংশে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ ইংরাজের প্রথম আমলে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই তিন ভাষাই ভাল জানিতেন। অতি অল্পকালই তিনি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু, এই বয়সেই সাহিত্যের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁহার ভবনে 'বিদ্যোৎসাহিনী-সভা' নামে এক সমিতি স্থাপিত করেন এবং সেই সভায় অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বলিতে গেলে বয়সে নবীন হইলেও তিনি তাৎকালিক সাহিত্যিকগণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারই ভবনে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হয়। তাহার পরই তিনি বিক্রমোর্ব্বশী ও মালতীমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন; এ দুইখানি নাটকের অভিনয়ও তাঁহার ভবনেই হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে তিনি উক্ত পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই প্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণে'র মামলায় রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইলে, কালীপ্রসন্নই ঐ দণ্ডের টাকা অযাচিত ভাবে দান করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের দুস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভারও কালীপ্রসন্নই গ্রহণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদকতা

পরিত্যাগ করিলে, কালীপ্রসন্ন কিছু কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত উক্ত পত্রিকা সম্পাদন করেন। সে সময়ে সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী হইলেও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্যই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে এবং অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্ত্তৃক 'মেঘনাদবধ' রচিত হইলে, কালীপ্রসন্ন নিজের বাটীতে একটী সভা করিয়া কবিবরকে সম্মানিত করেন এবং অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অকালে পরলোকগত হন। আমরা আজ তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

আমরা কলিকাতা বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন অনাথ-আশ্রমের বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েকটী স্বার্থত্যাগী যুবক, বলিতে গেলে এক প্রকার নিঃসম্বলে, আলমবাজারে একটী অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ১৯১২ অব্দের কথা। এই যুবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই ক্ষুদ্র আশ্রমটী চালান। তাহার পর, বরাহনগরের অধিবাসীবৃন্দ এই যুবকদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া আশ্রমটীকে ১৯১৫ অব্দে বরাহনগরে তুলিয়া আনেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অনাথ আশ্রম বরাহনগরের একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। কয়েক বৎসর এই আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে দেখিয়া, ইহার স্থায়িত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার জন্য ইহাকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আশ্রমের অনাথ-নিবাসে সর্ব্বদাই কুড়ি পঁচিশটী নিরাশ্রয় বালক বালিকা প্রতিপালিত হইয়া থাকে; তাহাদের শিক্ষা বিধানেরও সুব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত বরাহনগর অঞ্চলের নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য ঔষধ পথ্য, চাউল ও নগদ অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে; এতদ্‌সংসৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপেথি ও হোমিওপেথী উভয় মতেই রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই আশ্রমের কোন স্থায়ী আয় নাই, সন্ন্যাসীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই আশ্রমের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। নারায়ণের কৃপায় তাঁহাদের অভাবও নাই, স্বচ্ছলতাও নাই। আশ্রমের সেবকগণ এখন আশ্রমের জন্য একটা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন; অল্পমূল্যে সাড়ে সাত বিঘা জমি পাইবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন বাড়ী প্রস্তুতের জন্য তাঁহারা অর্থের ভিখারী। যাঁহারা এতদিন এই আশ্রমটীকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ত গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিবেনই, দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য দেশের লোককেও এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

যাভা ও মালয় অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বিদায় অভিনন্দন প্রদানের জন্য কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বৃহত্তর ভারত পরিষৎ (The Greater India Society) কর্ত্তৃক একটী সভা করা হয়। সভারম্ভে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় প্রথা অনুসারে ধান দূর্ব্বা দ্বারা কবিবরকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাহার পর উক্ত পরিষদের স্থায়ী সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কবিবরের সংবর্দ্ধনা করিয়া কয়েকটী সুন্দর কথা বলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ বলিয়াছিলেন—আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অদ্য এই স্থানে বর্ত্তমান ভারতের মহান্ সভ্যতার রাজদূত, ও এশিয়ার মর্ম্মবাণী প্রচারককে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের ঋষি ও জ্ঞানী-গণের অশরীরী আত্মা আমাদের সাথে রহিয়াছেন। প্রাচীন ভারত সুদূর প্রাচ্যে যে ঐক্য ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বর্ত্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন? প্রাচীন যুগের ঋষিদের যদি কোন প্রাণবান বংশধর আজিও বাঁচিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। শ্যাম, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা, যাভা, বালি, বোর্ণিও, তিব্বত এবং চীনে যে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা তরবারির বলে নহে; পরন্তু তাহা

হৃদয়ের প্রসার দ্বারা। আজ রবীন্দ্রনাথ নবজাগ্রত ভারতের নবযুগের সেই হৃদয় ও আত্মার বাণী লইয়া তথায় গমন করিতেছেন।"

কবিবর এই সংবর্দ্ধনার উত্তর প্রসঙ্গে বৃহত্তর ভারত পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাহার পর বলেন—যারা বর্ব্বর জাতীয় মানুষ, তারা আপনাদের পরিচয় ছোট ছোট জিনিসের ভিতর দিয়েই লাভ করে। যেমন কে কত নরমুণ্ড ছেদন করেছে, কার কতটুকু ভোগের বিস্তার হয়েছে। কিন্তু এ সব অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিচয়। যারা তার চেয়ে উপরের পদবীতে ওঠে, তারা তার চেয়ে বড় জিনিসের মধ্যে সত্য পরিচয় লাভ করে। আমাদের এই দেশেরও তেমনি একটা বড় পরিচয় আছে। যদি আমরা তা সত্য করে অনুভব করতে পারি, তবে তার চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই। দেশের যে একটা বাহ্য রূপ আছে, তা বালককালে দেখেছি; সূর্য্যের আলোর মধ্য দিয়ে, বাতাসের মধ্য দিয়ে, অনেক রং, অনেক রস, গভীর অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্য দিয়ে সেই বাহ্য রূপ প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই ধারা অবলম্বন করে ভারতের সভ্যতার ধারা যুগযুগান্ত ধরে বয়ে এসেছে, ভারতের সভ্যতার বাণী প্রচার হয়েছে।

তাহার পর কবিবর বলেন—ভারতের উপনিষদের বাণী তার সকলের চেয়ে বড় সত্য। ভারতের বাহিরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয় করে, পরধন লুণ্ঠন করে তার গৌরব নয়। অন্যদেশে এই সব দস্যুবৃত্তির কাহিনীই ইতিহাসে বড় বড় করে লেখা হয়েছে; আর আমাদের ইতিহাস তা জানতে দেয় নি; লজ্জার সঙ্গে সে-সব মুছে দিয়েছে। ভারতের বাহিরে ভারতের এই সত্য প্রচারিত হয়েছে,—আপনাকে সকলের মধ্যে অনুভব করতে হবে; কেবল নিজের মধ্যে নয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নয়। আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মৈত্রীই মুক্তির মন্ত্র। ভারতবাসীরা এই মন্ত্র প্রচার করতে কত দুর্গম পথ অতিক্রম করেছিল। ভারতের এই বড় পরিচয়,—নিজেকে তার মধ্যে পরিচয় দিতে পেরে আমরা বড় হই। ভারতের পূর্ণ সত্য এই পরিচয়েই, ইউরোপের পলিটিক্সে নয়, আধুনিক অর্থনীতিতে নয়। ভারতের যা চিরন্তন তপস্যার অক্ষয় বর, ভারত-ইতিহাসের সেই দিক, উপনিষদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গৃহস্থের যেখানে ব্যক্তিগত লাভ লোকসান, ঐশ্বর্য্যের দিক, সেখানে তার সঙ্গে আর সকলের যথার্থ যোগ নেই। যেখানে তার দান—দাক্ষিণ্য—ত্যাগ—সেইখানেই সকলের সঙ্গে যোগ। সেই রকম আমাদের দেশের সঙ্গে সকলের যে যোগ, সে যোগ বৈষয়িক নয়। সে ব্যাঙ্ক কখন ফেল করে না, সে পরিচয়ে কখন মাথা হেঁট হয় না। ভারতের ইতিহাসে এমনভাবে চীনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। চীনে গিয়ে সেই পরিচয় পেলাম, দেখলাম তারা আমাদের পর নয়, অত্যন্ত কাছে। জাপানেও তাই দেখেছি। জাপানের যে অনুপম রসবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ—জাপান বললে তার জন্য তারা ভারতের কাছে ঋণী। জাপানে এমন অনেক নৃত্যকলা আছে, যা ভারতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ভারতের সত্য-মহিমা একদিন বন্যার মত দুকূল ছাপিয়ে, চারিদিকে ছাপিয়ে পড়েছিল। তাতেই ভারতের গৌরব, সত্যিকার তপস্যা। এ কেবল পুরাতত্ত্ব নয়। এ সত্য আজও আছে। ভারতের সেই অমৃতবাণী, নূতন সুরে প্রচার করতে হবে। আর সব নকলের নকল, জীর্ণতা—নিষ্ফলতা, তার ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে। সেই সেই প্রাচীন তপস্যার ধারা কখন রুদ্ধ হয় না, সে তপস্যার ধারা চলে আসছে। মধ্যযুগে মুসলমান-বিজয়ের সময় নানারূপ বৈদেশিক উৎপীড়ন হয়েছিল। সে সময়েও ভারতের বাণী প্রচার করেছিলেন মানসিংহ প্রভৃতি নয়,—তাঁদের কথা কারো হৃদয়ে লেখা নাই। যেসব সাধু পুরুষ তখন ভারতের বাণী প্রচার করেছিলেন, কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না রেখে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করে, বিশ্বকে আপনার করেছিলেন, তাঁদের কথাই জাতির হৃদয়ে লেখা আছে। মুসলমান-বিজয়েও তাঁরা ভারতের বাণী ম্লান হতে দেন নি। অনেক কৃত্রিম জিনিস তখনও এসেছিল, কিন্তু ভারতের শাশ্বত সত্য—সকলের মধ্যে আপনাকে পাওয়াতেই যে মুক্তি, তা সকলের উপরে জয়লাভ করেছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক শ্রীরামচন্দ্র—১।০
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী প্রণীত—মগের মুলুক উপন্যাস—১।০
শ্রীযুক্ত বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—সোনাই বোয়া—১।০
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত—ভাবী সমাজ—১।০
শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত—নির্মাল্য—১৲
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় প্রণীত মুসোলিনী ও বর্তমান ইটালি—৸০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
Of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

ভারতবর্ষ



ভাদ্র, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

পাতঞ্জল-দর্শন ও গীতা

অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

গীতা মুখ্যতঃ যোগশাস্ত্র।—গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তি-প্রদর্শক যে সঙ্কল্প আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুউপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্‌ যোগশাস্ত্রে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্র। গীতায় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থাকিলেও, কেবল সেই বিদ্যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্যই গীতা রচিত হয় নাই। সেই বিদ্যার আলোকে কেমন ভাবে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হয়, কি ভাবে সংসারে থাকিয়া সংসারের কর্ম্মাদি করিলে এই সংসারেই দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারা যায়, প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ অর্থাৎ শরীর ত্যাগের পূর্ব্বেই কেমন করিয়া অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায়—গীতায় তাহার ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই অপূর্ব্ব সাধন-প্রণালীই গীতার যোগ।—চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গীতার উপসংহারে সঞ্জয় গীতোক্ত উপদেশের নাম "যোগ" দিয়াছেন—

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্‌।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥১৮।৭৫

স্বয়ং কৃষ্ণ এই যে যোগ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কি?

যোগশাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ পতঞ্জলির যোগসূত্রই বুঝায়। ঐ যোগ রাজযোগ। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যদি সিদ্ধান্ত করি যে গীতাতে পাতঞ্জল-যোগসূত্রে বর্ণিত রাজযোগেরই ব্যাখ্যা বা সঙ্কলন আছে, তাহা হইলে মহা ভুল করা হইবে। অনেক গীতা-আলোচনাকারী পতঞ্জলির যোগের সহিত গীতার যোগকে এক বলিয়া বুঝিয়া অশেষ গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতার

ইংরাজী অনুবাদক টম্‌সন সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, গীতার কর্ম্মযোগ পাতঞ্জল যোগেরই রূপান্তর। কিন্তু, একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, গীতার যোগ পাতঞ্জল-সূত্র-বর্ণিত রাজযোগ নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, গীতার সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের কি সম্বন্ধ, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সাংখ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে, তাহার উপরেই পাতঞ্জল-যোগের ভিত্তি। তফাতের মধ্যে সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, পাতঞ্জল-দর্শন স্বীকার করে। এই জন্য পাতঞ্জল-দর্শনের আর এক নাম সেশ্বর সাংখ্য। পদার্থ-নির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জলদর্শনের কোন ভেদ নাই। সাংখ্যে যেমন পুরুষ, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—এইজন্য পাতঞ্জল-দর্শনের আর এক নাম সাংখ্য-প্রবচন। তবে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর পাতঞ্জল ঈশ্বরতত্ত্ব যোগ করিয়াছে, ফলে পাতঞ্জলের হইয়াছে ষড়বিংশতি তত্ত্ব। কিন্তু, ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করায় সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জলের কার্য্যতঃ বিশেষ কোন তফাৎ হয় নাই; কারণ পাতঞ্জলের যোগে ঈশ্বরের স্থান খুবই গৌণ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল উভয়ের আরম্ভ ও লক্ষ্য এক। এই সংসার দুঃখময়; দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইতেই সংসার-লীলা এবং এই সংসারলীলাই যত দুঃখের মূল। পুরুষ অজ্ঞানের বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া মনে করে; তাহাতেই প্রকৃতি লীলার সুযোগ পায় এবং পুরুষকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। পুরুষ যে সংসারলীলায় সুখ অনুভব করে, তাহারও পরিণামে দুঃখ; অতএব সংসারে আগত অনাগত সমস্ত সুখ দুঃখই বস্তুতঃ দুঃখ; অতএব হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হইলে পুরুষ যখন নিজের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করে, প্রকৃতি হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে, প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেলা বলিয়া ভ্রম না করে, তখনই প্রকৃতির লীলা-সংসার বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষের দুঃখ-ভোগও বন্ধ হয়, পুরুষ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করে। এ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলে কোন তফাৎই নাই। তফাৎ হইয়াছে উভয়ের সাধন-প্রণালী লইয়া, কি উপায়ে এই মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করিতে পারা যায় তাহা লইয়া। পুরুষের যখন জ্ঞান হইবে, আপনার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে পুরুষ যখন সচেতন হইবে, তখনই তাহার মুক্তি হইবে—সাংখ্যের এই কথা পাতঞ্জল স্বীকার করিয়াছে—

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ

অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ সম্বন্ধে অটুট জ্ঞান যখন চরম ভাবে লাভ করা যায় তখনই হয় মুক্তি। অতএব, জ্ঞানই হান বা মুক্তির উপায়। কিন্তু, কেমন করিয়া এই বিবেকখ্যাতি, এই ভেদজ্ঞান লাভ করা যায়? সাংখ্য বলিয়াছে, বুদ্ধির দ্বারা বিচারের ফলেই এই বিবেক লাভ করা যায়। পতঞ্জলি বলেন, আগে চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হইতে পারে না। পতঞ্জলি যে প্রণালীর দ্বারা জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ চিত্তকে শুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ,

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ জ্ঞানদীপ্তিরবিবেকখ্যাতেঃ।

অর্থাৎ, যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে হইতে পরিণামে বিবেকখ্যাতি হয়। বিবেকখ্যাতিই জ্ঞানের শেষ সীমা। পতঞ্জলির যোগ, বুদ্ধির তর্ক-যুক্তি-বিচার রূপ জ্ঞানযোগ নহে। চিত্তের চাঞ্চল্যেই আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বা বিবেকের বাধা। জল যখন আলোড়িত হইতে থাকে, তখন তাহাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িতে পায় না। জল স্থির হইলেই স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনি, চিত্ত যখন স্থির প্রশান্ত হইবে, তখনই প্রকৃত জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। তাই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা, পাতঞ্জল-দর্শনের মূল সূত্র,—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল সাংখ্যের মূল কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে; কেবল তাহার উপর নিজের ঈশ্বরতত্ত্ব যোগ করিয়া দিয়াছে; এবং বিবেকখ্যাতির উপায় স্বরূপ কেবল বুদ্ধিবিচারের উপর নির্ভর না করিয়া এক বাঁধাধরা গোণাগাঁথা যোগপ্রণালীর শিক্ষা দিয়াছে। সাংখ্যকে লইয়া পাতঞ্জল যাহা করিয়াছে, গীতাও কতকদূর ঠিক তাহাই করিয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-প্রভেদ ও তত্ত্ববিশ্লেষণ লইয়াই গীতার আরম্ভ; কিন্তু, পাতঞ্জলের ন্যায় গীতাও বলিয়াছে যে, সাংখ্যের ন্যায় শুধু জ্ঞান ও

সন্ন্যাসের উপর নির্ভর করিলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়; কিন্তু, যোগের সাহায্য গ্রহণ করিলে সহজেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়—

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

সাংখ্যের সাধনায় কর্ম্ম বা ভক্তির কোন স্থান নাই—পাতঞ্জল ঈশ্বরে ভক্তি, ঈশ্বরার্থে কর্ম্মকে যোগের সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং এখানেও পাতঞ্জলের সহিত আমরা গীতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

কিন্তু পাতঞ্জলের সহিত গীতার এইরূপ কতকটা মিল থাকিলেও, গীতা পাতঞ্জলকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথমতঃ পতঞ্জলির যোগে কর্ম্মের স্থান খুব নীচে। যাহারা উচ্চাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে সমর্থ নহে—তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধনারূপে কর্ম্মের উপযোগিতা আছে; কিন্তু, যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম তাঁহাদের বাধা-স্বরূপ। প্রথমাবস্থায় কর্ম্মের দ্বারা যে যোগের পথে উঠিতে সাহায্য হয়, তাহাও সকল কর্ম্মের দ্বারা নহে। কর্ম্ম সকলই বন্ধনের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সকল প্রকার কর্ম্মেরই ফল আছে; এবং সেই ফল ভোগ করিতে জীবকে পুনঃপুনঃ সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব, শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে, সাংখ্যে যেমন কর্ম্মের কোথাও কোন স্থান নাই—কর্ম্মসন্ন্যাসই সাংখ্যের প্রাথমিক সাধনা, পাতঞ্জল তাহার পরিবর্ত্তে বলিয়াছে যে নিম্নাধিকারীর পক্ষে ক্রিয়াযোগ সহায়স্বরূপ। কিন্তু, সকল প্রকার কর্ম্ম নয়, —তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—এই তিনটিই ক্রিয়াযোগ। এই সকল কর্ম্মের সাধনা দ্বারা অজ্ঞান, বাসনা, অহঙ্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, সমাধির সহায়তা হয়—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥ যোগসূত্র
সমাধি ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ॥ যোগসূত্র

যখন সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে, তখন কর্ম্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না বটে, তবে তখন কর্ম্মের কোন উপযোগিতা বা সার্থকতা নাই। জীব তখন কৈবল্য লাভ করিয়াছে, তখন আর সংসারও নাই, কর্ম্মও নাই। তখন আছে শুধু অচল, অক্ষয় উদাসীন পুরুষের নীরব, নিথর শান্তি, শুদ্ধ নির্ম্মল চৈতন্য ও অনাবিল অখণ্ড প্রসন্নতা। অতএব, শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জল এক; কিন্তু গীতা উভয়কেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। গীতার মতে কর্ম্ম শুধু প্রাথমিক সাধনা নহে, কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত যোগের অঙ্গ; এবং সিদ্ধির পরও সংসার ও কর্ম্ম পূর্ণ মাত্রাতেই চলিতে থাকে। আর গীতার মতে, কর্ম্ম বলিতে কেবল তপস্যা, স্বাধ্যায় বা যাগযজ্ঞাদি ঈশ্বরোপাসনা নহে,—গীতার মতে সর্ব্বকর্ম্মাণি, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়াই যোগকে সার্থক করিয়া তুলিতে হয়—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

সর্ব্বদা সকলপ্রকার কর্ম্ম করিয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তি মৎপ্রসাদে অনাদি অব্যয় পদ লাভ করে।

পাতঞ্জল-যোগে কর্ম্মের স্থান যেমন গৌণ, ভক্তির স্থানও সেইরূপ গৌণ। সাংখ্যে ঈশ্বর-ভক্তির স্থান আদৌ নাই; কারণ সাংখ্যমতে ঈশ্বরই নাই—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। পাতঞ্জল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে যোগের সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অনুসরণ, ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্ত্তন, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন করা ইত্যাদি।—এখানে গীতার সহিত পাতঞ্জলের সাদৃশ্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু, তাহা খুব গভীর নহে। পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বরে ভক্তির বিশেষ কোন স্থান নাই। পাতঞ্জল ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগেরই সামিল করিয়া ধরিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এখানে ঈশ্বরে ভক্তি যোগের একটি প্রাথমিক সহায় মাত্র; কিন্তু ভক্তিকে, এমন কি ঈশ্বরকে, বাদ দিলেও যোগের কোন ক্ষতিই হয় না। প্রকৃত যোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান কেবল সেইরূপ একটি উপায় মাত্র,—ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা! যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি তপস্যার দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করাই প্রকৃত যোগ। যাহারা এইরূপ তপস্যার ব্রতী হইতে পারে, তাহাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু, গীতায় ঈশ্বরই সব, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া গীতায় কোন সাধনাই নাই,—যোগ অর্থে কোন না কোন উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। এই যোগ সকল জ্ঞান,

সকল তপস্যা সকল কর্ম্মের উপরে। আবার যোগীদের মধ্যে যাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন, ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৬।৪৬,৪৭

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা যোগ বলিতে পাতঞ্জল-বর্ণিত অষ্টাঙ্গ রাজযোগ বুঝে নাই। তৎকাল-প্রচলিত সাধনা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি ভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥

পুরাকাল হইতে সাধনার দুইটি পথ প্রচলিত রহিয়াছে, জ্ঞানের পথ এবং কর্ম্মের পথ। জ্ঞানের পথ হইতেছে সাংখ্যদের, এবং কর্ম্মের পথ হইতেছে যোগীদের। এখানে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গীতা যোগের প্রচলিত অর্থে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, পতঞ্জলির যোগসূত্রে কর্ম্মযোগের মূল কথাগুলি যদিও রহিয়াছে, তথাপি উহা কর্ম্মযোগ নহে। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করাই পাতঞ্জলের যোগ এবং সেই যোগ-প্রণালী রাজযোগ বলিয়া পরিচিত। গীতা কোথাও যোগকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে নাই। গীতা প্রচলিত কর্ম্মযোগকেই যোগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এবং কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব পূর্ণ যোগের শিক্ষা দিয়াছে।

তৎকালে সাধনার দুইটি প্রধান মার্গ প্রচলিত ছিল। একটি পথ জ্ঞানের পথ, এই পথে কর্ম্মকে অন্তরায় বলিয়াই ধরা হইত। অতএব, ইহা সন্ন্যাসেরও পথ। আর একটি পথ কর্ম্মের পথ। এই মতে কর্ম্ম কখনই সাধনার অন্তরায় নহে। কর্ম্মের দ্বারাই চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়,—কর্ম্মণ্যেবসংসিদ্ধি আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ, এবং সিদ্ধির পরও কর্ম্ম চলিতে থাকে। এই যে জনকাদি কর্ত্তৃক আচরিত কর্ম্মযোগ ইহাই যোগ শব্দে পরিচিত ছিল; এবং গীতা এই মহান্ কর্ম্মযোগের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু, গীতা দেখাইয়াছে যে, এই কর্ম্মযোগের সহিত সাংখ্যজ্ঞানের কোন বিরোধই নাই—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৫।৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫।৫

সাংখ্যেরা চায় কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞান; গীতা বলে কর্ম্মযোগ ঠিক ভাবে আচরিত হইলে তাহার মধ্যে এই দুইই আছে। জীবনে আমি যে সব কর্ম্ম করি, সে সব আমার নহে—প্রকৃতির; আমি কিছুই করিতেছি না; আমার ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু কর্ম্ম চলিতেছে, আমার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা ও প্রবৃত্তি, সে সবই প্রকৃতির ক্রিয়া, পুরুষের নহে, আত্মার নহে, আমার প্রকৃত "আমি"র নহে—এই ভাব অন্তরে রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান; সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া যাহারা মনে করে যে কর্ম্মের শেষ হইয়াছে, তাহারা অজ্ঞান, কর্ম্ম কখনও বন্ধ থাকে না—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কর্ম্মের মধ্যে যাহারা কর্ম্মহীনতা দেখে এবং কর্ম্মহীনতার মধ্যে যাহারা কর্ম্ম দেখিতে পায়, তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহা সম্ভবও নহে; আমি কিছু করিতেছি না, প্রকৃতিই সব করিতেছে—এইরূপ ভাবই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস; কারণ, এখানে কর্ম্ম আর আত্মার বলিয়া ভ্রম হয় না, কর্ম্ম প্রকৃতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, ইহাই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। সমুদায় কর্ম্মকে প্রকৃতির জানিয়া আত্মা যখন অহঙ্কার ও বাসনা হইতে মুক্ত হয়, তখন সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টার মধ্যেও হয় তাহার সন্ন্যাস, নৈষ্কর্ম্ম্য। এরূপ আত্মজ্ঞান যেখানে নাই সেখানে প্রকৃত সন্ন্যাস অসম্ভব; কেবল বাহ্যিক কর্ম্ম না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা যায় না। বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাস নহে।—ভিতরের ত্যাগই সন্ন্যাস। সাংখ্য-দত্ত প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অসম্ভব। আবার ভ্রমের বশে বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই যে মনে করে যে সন্ন্যাসী হইয়াছি, তাহার প্রকৃত জ্ঞানের স্ফূরণ হয় না। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করিতেছে, এই ভাবে নিষ্কাম নিরহঙ্কার

হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস, এবং প্রকৃত যোগ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।

স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬।১

এইরূপে গীতা সাংখ্যের জ্ঞান এবং যোগের কর্ম্ম এতদুভয়ের সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্যের জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্মযোগ সম্ভব হয় না; আবার সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা নাই; কারণ, তাহা কর্ম্মহীনতারই সমান, নৈষ্কর্ম্ম্য। গীতা চায় কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা করিতে; যোগ অর্থে গীতা প্রথমে কর্ম্মযোগই ধরিয়াছে; কিন্তু, গীতা সাংখ্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণও গ্রহণ করিয়াছে; এবং প্রথমেই বুঝাইয়া দিয়াছে যে, কর্ম্মযোগের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধই নাই—একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

কিন্তু, এই সমন্বয়ে একটি প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। যে ব্যক্তি সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে; কর্ম্ম হইল কি না হইল তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না—নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে কর্ম্ম করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু, কর্ম্ম করিতেই হইবে এমনও ত কোন কথা নাই, কর্ম্ম না করিলেও ত তাহার কোন অনর্থ নাই। তবে, কেন বলা হইল যে, তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর? প্রকৃতিই যখন সব করিতেছে, তখন কর্ম্ম চলুক বা না চলুক তাহা ত প্রকৃতিই ঠিক করিবে—অতএব, কর্ম্ম বন্ধ হইলেও ত বিচলিত হইবার কিছুই নাই। বরং কর্ম্মের মধ্যে থাকায় আশঙ্কা আছে যে পুনরায় হয় ত জ্ঞান হইতে, প্রকৃত সন্ন্যাস হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে পারে। অতএব, কর্ম্ম যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল; এবং যতদিন কর্ম্ম একেবারে বন্ধ না হয়, ততদিন যেটুকু না করিলে নয় কেবল ততটুকু কর্ম্ম রাখাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে ভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেন নিষেধ করিলেন? শুধু তাহাই নহে, এমন কর্ম্ম করিতে বলিলেন যাহা অপেক্ষা ঘোর হিংসাপরায়ণ কর্ম্ম আর কিছু হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য কি? তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব?

এই প্রশ্নের সমাধানই গীতা-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ রহস্য—এবং এই সমাধানের দ্বারাই গীতা কর্ম্মযোগের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে তাহা যে বন্ধনের কারণ হয় না, তাহা পাতঞ্জলও স্বীকার করিয়াছে; এবং ইহাই কর্ম্মযোগের ভিত্তি। পাতঞ্জল সূত্রে আছে, ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ, অর্থাৎ অজ্ঞান, অহঙ্কার ও আসক্তির সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই ইহজন্মে ও পরজন্মে ফলীভূত হয়। অতএব, পাতঞ্জল মতেও জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম করিতে কোন হানি নাই। তথাপি পাতঞ্জল কর্ম্মের কোন প্রয়োজন বুঝে নাই, গীতার ন্যায় কর্ম্মের উপদেশ দেয় নাই, সাংখ্যের ন্যায় সন্ন্যাস ও কর্ম্ম ত্যাগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের লক্ষ্য হইতেছে প্রকৃতিকে অতিক্রম করা, ত্রিগুণের অতীত হওয়া, বিবেক-খ্যাতির দ্বারা পরাবৈরাগ্য লাভ করিয়া পুরুষের নিত্য, সনাতন, অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, শান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করা;—এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলে কর্ম্মের স্থান নাই, প্রাকৃতিক লীলার কোন স্থান নাই। গীতাও ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে এবং ইহার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছে; কিন্তু, গীতা আর এক প্রকৃতির, ভগবানের পরা-প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে; এবং নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া সেই দিব্য-প্রকৃতির লীলাকে ফুটাইতে চাহিয়াছে—তাহাই দিব্য জীবন, মদ্ভাবমাগতাঃ, মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। অজ্ঞান প্রকৃতির খেলাকে ছাড়িয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া ভাগবতভাবে ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে দিব্য জীবনলীলার বিকাশ করিতে হইবে—ইহাই গীতার চরম লক্ষ্য। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই দিব্য সংসার-লীলার, এই ভাগবত জীবনের সন্ধান পায় নাই—তাহারা দেখিয়াছে শুধু নীচের প্রকৃতির অধীন দুঃখ ও অশান্তিময় সংসার এবং ইহার উপরে অনন্ত, অক্ষয়, পূর্ণ শান্তিময় পুরুষ বা আত্মার সচেতন প্রতিষ্ঠা। তাই তাহারা সংসার ছাড়িয়া এই অক্ষর প্রতিষ্ঠালাভ করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। গীতাও এই অক্ষরের শান্ত প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে, কিন্তু গীতা এইখানেই থামে নাই। অক্ষরই সব নহে, শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে; অচল, অটল শান্তি ও নীরবতা ভগবানের কেবল একটা দিক। ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটা দিক আছে ক্ষরের দিক, বিশ্বলীলার দিক। সাধারণ জীবে যে ক্ষরের খেলা তাহা অজ্ঞানের খেলা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখের

খেলা। কিন্তু, ভগবানের যে বিশ্বলীলা, তাহাতে দুঃখ নাই—তাহা অখণ্ড আনন্দের লীলা, সচ্চিদানন্দের খেলা। ভগবানের সেই লীলার সাথী হওয়াই জীবের পরমা গতি। ভগবানের ভিতরের দিকে আছে অক্ষরের শান্তি, বাহিরের দিকে আছে ক্ষরের লীলা। ক্ষর অক্ষর উভয়ই একই কালে ভগবানের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আবার তিনি উভয়েরই উপরে, অতএব তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৯

—মোহ হইতে মুক্ত যে ব্যক্তি এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝিতে পারে সে সর্ব্ববিদ্, তাহার আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না; এবং এই ভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সে সর্ব্বতোভাবে পুরুষোত্তমকে ভক্তি করে, ভজনা করে। সকল কর্ম্মের পরিণতি জ্ঞানে; সকল জ্ঞানের পরিণতি ভক্তিতে; জ্ঞান ও কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ভক্তি, তাহাই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হওয়াই গীতার যোগ।

জীব যখন পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠারূপে থাকে অক্ষরের অচল, অটল শান্তি—তাহাই ত্যাগ বা সন্ন্যাস। আর বাহিরের দিকে থাকে সজ্ঞানে ভগবানের দিব্য বিশ্ব-লীলার যন্ত্র হওয়া, সাথী হওয়া,—ইহাই ভোগ বা সংসার-লীলা। জ্ঞানের দ্বারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃতিকে ক্রমশঃ শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কর্ম্ম ক্রমশঃ নিষ্কাম ও সমত্বসম্পন্ন হইবে, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান ক্রমশঃ পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভক্তি ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে—তখন জীব ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিবে, ভগবানের মধ্যে বাস করিয়াই ভগবানের বিশ্বলীলার আনন্দ আস্বাদন করিবে। তখনও কর্ম্ম চলিবে, কারণ ভগবান কখনও কর্ম্ম বন্ধ করেন না,—বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। অতএব, যে ভগবানের ভক্ত, ভগবানের সখা—তাহারও কখনও কর্ম্মের শেষ নাই—তবে সে কর্ম্ম আর স্বার্থের বশে, অহঙ্কারের বশে হইবে না—হৃদিস্থিত ঈশ্বরের দ্বারা সজ্ঞানে পরিচালিত হইয়া সংসারের মধ্যে, ক্ষরের মধ্যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে, ভক্তির বশে, প্রেমের বশে সেই কর্ম্ম আচরিত হইবে।

ভক্তিযোগই গীতার চরম শিক্ষা। ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় সকল যোগ, সকল সাধনারই ফল লাভ করিতে পারা যায়; এবং সকলের উপরে যাহা, স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়, ভগবানের মধ্যেই বাস করিতে পারা যায়। তাই গীতা শিক্ষার সারাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

—"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, তোমার সকল চেষ্টা আমার দিকে দাও, আমাকে পূজা কর—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।" কিন্তু, ভগবান এই যে পূর্ণ আত্মসমর্পণকেই গুহ্যতম শিক্ষা বলিলেন, ইহা মুখের কথা নহে। আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মন প্রাণ সর্ব্বদা বাসনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে—আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করিব? আমাদের সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল চেষ্টাকে কেমন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিব? সকল বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া আত্মসমর্পণকে পূর্ণ করিবার উপায় স্বরূপ গীতা কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছে এবং জ্ঞানকে কর্ম্মযোগেরই একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াছে। জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ ও শান্ত হয়; তখন সেই শান্ত শুদ্ধ হৃদয়ে বিমল ভক্তি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু, আমাদের মন বড়ই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণ বড়ই প্রবল—তাহাদিগকে শান্ত করিবার যতই চেষ্টা করা যায়, ততই যেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সকলেই যে একভাবে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত ও সংযত করিতে পারিবে এমন কোন কথা নাই। সেই জন্য গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধারণ উপদেশ দিয়া তাহা ছাড়াও অতিরিক্ত সাধন-প্রণালী হিসাবে রাজযোগ-সাধনারও উপদেশ দিয়াছে। ইহাই গীতার মহত্ব। গীতা কোন সাধনা, কোন পন্থাকে অবহেলা করে নাই। সকল সাধনার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত রহিয়াছে, ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে সকল সাধনা হইতেই সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চিত্ত স্থির করিবার অন্যতম উপায় স্বরূপ গীতা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে

সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে, তাহা পাতঞ্জল-বর্ণিত রাজযোগেরই অনুরূপ। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে আছে—

স্পর্শান কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ।
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনি মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছা ভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

এখানে আমরা যে সাধন-প্রণালীর উপদেশ দেখিতেছি তাহা মোটেই কর্ম্মযোগ নহে, এমন কি তর্ক-বিচারযুক্ত জ্ঞানযোগও নহে—এখানে পাতঞ্জল-বর্ণিত রাজযোগের লক্ষণগুলি রহিয়াছে। মনের সমস্ত ক্রিয়াকে জয় করিতে হইবে, ইহাই পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মন করিতে হইবে, ইহাই প্রাণায়াম। ইন্দ্রিগণকে, দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে টানিতে হইবে, ইহাই প্রত্যাহার। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের লয় হইবে, সমাধি লাভ হইবে, মোক্ষ হইবে। তাহা হইলে এইরূপে চক্ষু বুজিয়া নাক টিপিয়া যে সমাধি ও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাই কি গীতার চরম শিক্ষা? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পাতঞ্জলের সহিত গীতার কোন তফাৎই নাই বলিতে হইবে—শেষ পর্য্যন্ত চিত্তের লয় কর্ম্মত্যাগ ও সংসার-নিবৃত্তিরূপ মুক্তিকেই গীতারও লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু, গীতা পরের শ্লোকেই এইরূপ ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা ঘুচাইয়া দিয়াছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্ব লোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

ভগবান সকল যজ্ঞ-কর্ম্মের ভোক্তা, সর্ব্বভূতের সুহৃদ, সকল জগতের মহান্ ঈশ্বর—তাঁহাকে জানিয়াই শান্তিলাভ করা যায়। এখানে আবার সেই ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্ম্মযোগেরই কথা আসিয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই এই অধ্যায়ের শেষ কথা। অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গীতা রাজযোগকেই চরম শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই;—তবে বহির্মুখী মনকে শান্ত ও সংযত করিবার একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রণালী বলিয়া উপদেশ দিয়াছে। মনকে এইভাবে ফিরাইয়া, একাগ্র করিয়া ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ জানিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনা করিতে হইবে, ঈশ্বরকে সমস্ত যজ্ঞাদির ভোক্তা জানিয়া যজ্ঞ কর্ম্মাদি করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা এবং ইহা জ্ঞান ও ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ের উল্লিখিত দুইটি শ্লোকে গীতা যে রাজযোগের উপদেশ দিয়াছে, সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টি একরকম তাহারই বিশদ বর্ণনা; এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা এই রাজযোগ-প্রণালীকে কত শক্তিশালী বলিয়া বুঝিয়াছে। কিন্তু, ষষ্ঠ অধ্যায়েরও শেষের শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সকল সাধনা, সকল যোগের উপরে হইতেছে ভক্তিযোগ এবং তাহাই গীতার নিজস্ব শিক্ষা—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

কে ?

শ্রীসাহানাদেবী

অমল প্রাতে সোনার হাতে আনন্দ কে বিলায়?
চন্দ্রিমাতে কিরণ পাতে কাহার আভাস মিলায়?
উষার আলোয় মেঘের কালোয় তারার নীরব ভাষে,
শৈল হিয়ায় নির্ঝর ধারায় কাহার চিহ্ন ভাসে?
সবুজ বীথির শ্যামল কোলে মর্ম্মর উচ্ছ্বাসে,
মেঘের তলে নীল মহলে কাহার ছবি হাসে?
ফুলের প্রাণে মাতন্ ঘ্রাণে গন্ধ কাহার লাগে?
পাখীর গানে মধুর তানে কণ্ঠ কাহার জাগে?
রঙের রাণী আঁচল খানি নিতুই নবীন বাসে,-
কাহার তরে বিছায় আনি পরম বিশ্বাসে?-
কোন্ সে পথিক নিত্য তারে আশ্বাসে সম্ভাষে?
কে সে? যারে নিত্য পবন দোলায় রে উল্লাসে
কে সে? জাগায় সবার বক্ষে নিত্য নবীন ইষ্য?
কে সে? যারে সম্ভ্রম্ ভরে নতি করে বিশ্ব?



পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২২)

আজ অনিলের পীড়িত-শয্যার পার্শ্বে কেহ নাই, একা সে পড়িয়া আছে।

খানসামার দল পূর্ব্ববৎই আছে, কিন্তু সেবা তো তাহারা জানে না, মানুষের হৃদয়ে কোথায় যে ব্যথা বাজে তাহাও তাহারা জানে না। আর তাহারা জানিবেই বা কি করিয়া? তাহারা সামান্য ভৃত্য মাত্র, মনিবের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কাজের বেলায়। বীথি থাকিতে কাজটা পুরা আদায় হইত, কেহ ফাঁকি দিতে পারিত না। বীথি গিয়া পর্য্যন্ত সবই বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, সকলেই রীতিমত ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া বীথির অন্যত্র যাইবার কথা বলিয়া বীথির লিখিত একখানি পত্র অনিলের হাতে দিয়াছিল। অভিমানী অনিল পত্র পাঠ করে নাই, সেখানা ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে নিতান্ত অবহেলার ভাবেই ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

হাঁ, সে যে দোষ করিয়াছিল তাহা নিজেই স্বীকার করিতেছে। সে অপরাধী, কিন্তু অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? সে ক্ষমা চাহিয়াছিল, বীথি তথাপি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না? সে ভবিষ্যতে বুঝিয়া চলিবে বলিয়া বীথির হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পাষাণী বীথি তাহার মুখের দিকে তাকায় নাই, তাহার হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়াছিল। হায় রে, তবু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—একবার একটু ভুলের জন্য অনিল আজীবনকাল অবিশ্বাসী হইয়া রহিল?

নিজের অপরাধের কথা মনে করিতেই তাহার বুকে আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিত, অনিল অধীর হইয়া উঠিত। কোন ক্রমে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া মদের মাত্রা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, নিজেকে যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিল।

এই যথেচ্ছাচারের ফলেই সে আহত, শয্যাগত; তাহার নড়িবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই।

পুরাতন ভৃত্য শঙ্কর অনেক খুঁজিয়া বীথির পত্রখানা উদ্ধার করিয়া ঠিকানা পাইয়াছিল; সেই ঠিকানাতে সে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছিল।

তৃষিতনেত্রে পথের পানে অনিল চাহিয়া ছিল,—আজ বীথি ব্যতীত আর কাহাকেও সে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিতেছিল না। তন্দ্রার ঘোরে সে কতবার বীথির কোমল স্পর্শ ললাটে অনুভব করিয়া ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দুজন নার্স অহোরাত্র তাহার কাছে রহিয়াছে; তবু তাহার মনে হইতেছে, বীথি থাকিলে যেমন করিয়া সেবা

করিত, তেমন সেবা আর কেহই করিতে পারিবে না। অন্তর তাহার বীথিকে চাহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল; কিন্তু কোথায় বীথি?

সেদিন সকাল হইতেই সে স্তিমিত ভাবে পড়িয়া ছিল। ডাক্তার সাহেব ইহারই মধ্যে তিন চার বার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। অন্য দিন অনিলের চোখে মোটেই ঘুম থাকিত না, আজ সে কেবলই ঘুমাইতেছে।

শঙ্করের আহার নিদ্রা নাই, আজ সকাল হইতে গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে চোখ দুইটা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। যত রাগ সব তাহার পড়িতেছিল বীথির উপর—অভিমানে তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বৈকাল বেলাটায় হঠাৎ বড় মাথা ঘুরিয়া উঠায় সে বাহিরে আসিয়াছিল—ইচ্ছা ছিল খানিকটা বেড়াইবে; কিন্তু চরণ তাহার আজ মোটে চলিতে চাহিতেছিল না। একটু বেড়াইয়া তাহার চরণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল; সে বাগানের দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অদূরস্থ বেলাভূমির পানে চাহিয়া ছিল। শুভ্র বালুকারাশির উপরে—যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর কেবল নীল জল-তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছে, তীরে প্রতিহত হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে, আবার পিছনে নূতন শক্তি লাভ করিয়া সশব্দে আসিতেছে। এমন কত আসিতেছে, কত যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের ছলছল, কলকল, ধড়াস্‌-ধড়াস্‌, কত রকমের কত শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

একখানা গাড়ী আসিয়া গেটের কাছে দাঁড়াইল। শঙ্কর বেদনাভরা চোখ দুটি একবার গাড়ীর উপর রাখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তখনই চোখ ফিরাইল। এমন গাড়ী নিত্য কত যাওয়া-আসা করে, নিত্য কত লোক দেখা করিতে আসেন। প্রত্যেক গাড়ীতেই বীথি আসিতেছে ভাবিয়া সে ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু তাহার সকল আশাই বৃথা হইয়া যায়, বীথি আসে না।

"শঙ্কর—"

এ কি অপ্রত্যাশিত আহ্বান! শঙ্কর চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। বীথিকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার মুখখানা আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। দুই পা অগ্রসর হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল, "দিদিমণি—"

শ্রান্তভাবে বীথি বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে শঙ্কর। কোথায়,—কেমন আছেন তিনি, আমায় তাঁর কাছে আগে নিয়ে চল।"

"একটু পরে দিদিমণি, এই সবেমাত্র ট্রেণ হতে নেমে এসেছেন, কয়দিন স্নানাহার কিছুই হয়নি—"

বীথি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "চুলোয় যাক স্নানাহার শঙ্কর, আমার স্নানাহার পরে হবে, আগে তাঁকে একবার দেখতে দাও।"

শান্ত ভাবে শঙ্কর বলিল, "সে আমায় বুঝাতে হবে না দিদিমণি, আমি আপনার দিদিমায়ের চাকর, আমি সব বুঝতে পারি। তিনি আজ সকাল হতে কেবল ঘুমাচ্ছেন, এখন গেলেও আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পাবেন না। আপনি ততক্ষণ—এ কি দিদি, আপনার হাত এতখানি কেটে গেছে কিসে? ইস, এতখানি কাটা—বাঁধতে পারেন নি? আগে বেঁধে দিই, তার পরে যা হয় বলবেন।"

ছুটিয়া আসিয়া খানিকটা কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া বীথির হাতে বাঁধিয়া দিতে দিতে সে বলিল, "এতখানি কেটে গেছে, বড় কম রক্তপাত হয় নি তা বুঝতে পারছি, সেই জন্যই আপনার মুখখানা ফেকাসে হয়ে গেছে। আসুন, এই চেয়ার-টায় বসুন, খানিক বিশ্রাম ক'রে তার পর দেখবেন তাঁকে।"

বাস্তবিকই বীথি আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তাহার পা দুখানা কাঁপিতেছিল;—চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল দিদিমণি?"

বীথি মলিন হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু হয় নি শঙ্কর। আমার দোষেই তিন চার ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল,—নিজের হাতেও অনেকটা চোট পেলুম, বেচারা কোচম্যানটাও জখম হয়ে গেল। ষ্টেশনে পৌঁছে তাকে বললুম, সে যদি আমায় আধঘণ্টার মধ্যে কুঠিতে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে পুরস্কার পাবে। সে পুরস্কার পাওয়ার আশায় খুব জোরে গাড়ী চালানতে' গাড়ী উল্টে পড়ে এই ঘটনাটা ঘটে গেছে। যাক গিয়ে, ওতে আমার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নি শঙ্কর, আমি যেমন মানুষ তেমনিই আছি। তুমি পাখাখানা রেখে দাও, আমায় একটীবার শুধু চোখের দেখা দেখতে দাও, আমি একটীও কথা বলব না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার চোখেমুখে এমন একটা উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, শঙ্কর আর বাধা দিতে পারিল না, সে বলিল, "আসুন, দেখবেন।"

অতি ধীরে দরজার পর্দ্দা সরাইয়া বীথি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

একখানা পালঙ্কের উপর অনিল পড়িয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটী মুদিত, অতি ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে। জীর্ণ শীর্ণ আকৃতি তাহার। সে পুষ্ট মুখ নাই, মুখখানা সরু লম্বা হইয়া গিয়াছে, চোখ দুইটী বসিয়া গিয়াছে। ললাটে চিন্তার রেখা, যেন সে ঘুমাইয়াও শান্তি পাইতেছে না।

স্বামীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া বীথির বুক ফাটিয়া রোদন বাহির হইয়া পড়িতে চায়। অতি কষ্টে সে উদ্গতপ্রায় অশ্রুধারা সামলাইয়া লইল। সে এক পা অগ্রসর হইতেই নার্স মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনি এসেছেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি,—চুপ করে বসুন, শব্দ করবেন না, একটী কথাও বলবেন না।"

বীথি সন্তর্পণে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিল,—ঝুঁকিয়া পড়িয়া, অতৃপ্তনেত্রে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

অতীতের শতসহস্র কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। কোন মতে সে আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

স্বামীকে হত্যা করিতে বসিয়াছে সেই নয় কি? স্ত্রীর কর্ত্তব্য সে পালন করিতে পারিল না, স্বামীর ভুল সংশোধন না করিয়া সে নিজেই ভীষণ ভুল করিয়া বসিয়াছে। এ ভুলের সংশোধন কি সে করিতে পারিবে? ভগবান কি সেই সুযোগ পাওয়ার দিন তাহাকে দিবেন?

বীথি দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে একবার মাত্র বলিয়া উঠিল, "মা—"

নার্স ওষ্ঠে অঙ্গুলী দিল, "চুপ—"

বীথি চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল।

মিস চৌধুরী তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি এ ঘর হতে চলে যান মিসেস চ্যাটার্জ্জি; আপনি এ ঘরে থাকলে রোগীকে বাঁচানোর যেটুকু আশা আমরা করছি, সে আশা নষ্ট হয়ে যাবে, কিছুতেই আমরা এঁকে বাঁচাতে পারব না।"

বীথি মলিন হাসিল, "না মিস চৌধুরী, আর কিছুতেই আমি অধীর হব না। আমি প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারি নি,—ভাবি নি, এখানে এসে স্বামীকে এ রকম ভাবে বিছানায় নিস্তব্ধ ভাবে পড়ে থাকতে দেখব। এ রকম ঘুমাচ্ছেন কখন হতে মিস চৌধুরী?"

মিস চৌধুরী উত্তর দিল, "আজ ভোর হতে এমনি স্তিমিত ভাব দেখছি। তার পর বেলা দুটো তিনটে হতে বেহুঁসে ঘুমাচ্ছেন, বড়-একটা সাড়াও দিচ্ছেন না। এই আধ ঘণ্টা আগে সাহেব এসে দেখে গেছেন, আবার খানিক বাদেই আসবেন বলেছেন। এর আগে তের চৌদ্দ দিন একটু ঘুমাতে পারেন নি, মিসেস চ্যাটার্জ্জি; একটু তন্দ্রা এসেছে—অমনি আপনার নাম করে চেঁচিয়ে জেগে উঠেছেন। আজ আপনি আসবেন বলেই বুঝি এমনি নিঃসাড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছেন।"

বীথি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি অবশ্যই জানেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি কি করে আহত হয়েছেন?"

মিস চৌধুরী বলিল, "আমরাও ব্যাপারটা শুনেছি মাত্র মিসেস চ্যাটার্জ্জি, শোনা কথার ভিত্তি কিসের ওপর তা বলতে পারি নে। শুনলুম ইনি অপর্য্যাপ্ত মদ খেয়ে মিঃ ম্যাকেণ্টাসের বাংলোয় গিয়েছিলেন, সাহেব সে সময় বাংলোয় ছিলেন না। ইনি নাকি মেমের ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় সাহেব ফিরে আসেন। সাহেবকে দেখেই বুঝি এঁর জ্ঞান ফিরে এসেছিল, তাই ছুটে পালিয়েছিলেন; কিন্তু মাতাল হয়ে পড়েছিলেন বলে বেশী দূর যেতে পারেন নি। সাহেব রিভলভার নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটে গুলি করেন। গুলিটা যদিও সম্পূর্ণ ভাবে লাগে নি, বুকের বাঁ-পাশ ঘেঁসে গেছে, তবু তাইতেই জীবন সংশয় হয়েছে। তার পর পথে পড়ে গিয়ে—দেখুন না, এই পাখানা আর হাত দুখানা কি রকম কেটে গেছে, এ সব ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে।"

সন্তর্পণে গায়ের কাপড়খানা সরাইতেই অনিলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল।

"বীথি—?"

প্রথমেই তাহার চোখ পড়িল বীথির উপর, সে ভাবিতেছিল স্বপ্ন দেখিতেছে।

"হ্যাঁ—আমি, আমিই বীথি—"

আবার চোখ ফাটিয়া জল আসে, গোপন করিবার জন্য বীথি মুখ ফিরাইয়া লইল।

বড় ক্ষীণ সুরে অনিল বলিল, "তুমি এসেছ? আমি

আশা করেও করতে পারি নি যে তুমি আসবে ; আমার মৃত্যুশয্যা যে স্বজনবিহীন হবে, আমি তাই ভেবেছিলুম বীথি। তাই যদি হতো বীথি—সেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হতো। বেঁচে থেকে যে শান্তি আমি পাই নি, মরণের কোলে পৌঁছে সেই শান্তি আমি লাভ করতুম। বীথি, আমার——"

আর কথা তাহার মুখে ফুটিল না, হতভাগ্যের দুই চোখ দিয়া শুধু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বীথি সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বিকৃত-কণ্ঠে বলিল, "না গো, মরে তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, তুমি বেঁচে ওঠো, বেঁচে থেকে যদি দরকার হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত করো।"

অতি কষ্টে অনিল একটু হাসিল, "আর ভাল হব। আমার ভাল হওয়ার দিন আর আসবে না বীথি,—আমি বুঝতে পারছি ভাল হব চিতায় শুয়ে। আমি নিজে ডাক্তার, নিজের শরীরের অবস্থা সব বুঝি! তাইতেই বুঝতে পারছি, আমায় যেতেই হবে, না গেলে চলবে না। তোমায় অনর্থক যন্ত্রণা দেবার জন্যেই আমি তোমায় বিয়ে করেছিলুম,—আজ এই বিদায়-মুহূর্ত্তে আমার কেবল সেই কথাগুলোই মনে পড়ছে।"

বীথি গোপনে চোখ মুছিল, বলিল, "সে সব তো মিটে গেছে, আমি আজ সব ভুলে গেছি, তুমি কেন সে সব কথা মনে করছ? আমি সে সব অতীতে মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বর্ত্তমানকে গ্রহণ করতে এসেছি, তোমার মধ্যে আমাকে লীন করে দিতে এসেছি। তুমিও কেন সে কথা ভুলে যাচ্ছ না, কেন আমার মনের মত মন গড়ে নাও না? মনে কর না কেন, আমরা আগেও যেমন ছিলুম এখনও তেমনি আছি।"

"কিন্তু বীথি——"

মিস চৌধুরী বলিল, "বেশী কথা বলতে দেবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জি, উত্তেজনা বেশী হয়ে পড়বে। অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগী, বুকে অতবড় একখানা ঘা রয়েছে, উত্তেজনার ফলে আবার রক্ত ছুটবে! সাহেব এই দিকটায় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলে গেছেন।"

বীথি সন্ত্রস্ত ভাবে অনিলের মুখে হাতখানা চাপা দিল, "ওগো, তুমি চুপ কর, চুপ কর, আর কথা বল না। বুকে যে তোমার মস্ত বড় ঘা রয়েছে, রক্ত ছুটলে তোমায় যে বাঁচাতে পারব না। ভাল হয়ে ওঠো, এর পর তোমার যত কথা আছে সব বোলো, আমি সব শুনব।"

মুখের উপর হইতে তাহার হাতখানা সরাইয়া দিয়া অনিল শ্রান্ত ভাবে বলিল, "মরতেই তো আমি চাই বীথি, বেঁচে থেকে আমার এই ব্যর্থ জীবনে আর কোন সার্থকতা লাভ করতে পারব না। শুধু তোমার কাছেই তো বিশ্বাস-ঘাতকতা করি নি বীথি,—তোমার কাছে যা ভুল করেছিলুম, তা কোন দিন না কোন দিন শোধরাতে পারা যাবে, এ আশা ছিল; কিন্তু এ যে সকলের কাছেই আমি জেনে-শুনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি,—এ জগতে আমার মুখ দেখানর পথ তো আমি রাখি নি। আমার পরম বন্ধু ম্যাকেণ্টাস্ সাহেব, কোন দিন আমায় এতটুকু সন্দেহ করেন নি,—আমি তার সেই অসীম বিশ্বাসের প্রতিদান ভাল করেই দিয়েছি। আমার চরিত্রকে, আমার ধর্ম্মকে আমি নিজের পায়ে দলন করেছি বীথি, আমার যশ, মান, চাকরী—একটী কথায় সব ঘুচে গেল। আমি আজ হৃতমান, হৃতধন, হৃতস্বাস্থ্য,—বিছানায় পড়ে দিন গুণছি, কবে আমার সকল শেষের সেই দিনটী আসবে। এ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন তো বড় কম করি নি বীথি, বিলাসিতায় তার সব ব্যয় করেছি, একটী পয়সা কোন দিন সঞ্চয়ের জন্যে তুলে রাখি নি। আজ জীবনের এই শেষ বেলায় সামনে চেয়ে দেখছি কেবল অন্ধকার,—পেছনে চেয়ে দেখছি কিছু রেখে আসি নি। আজ মনে ভাবছি বীথি, নিজের যশ অপযশ, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সবই তো সঙ্গে নিয়ে চললুম বীথি, তোমার জন্যে কি রেখে গেলুম? তোমায় যে জীবনের সহচারিণী রূপে গ্রহণ করেছিলুম, তোমার জন্যে তো কিছুই রেখে যেতে পারলুম না বীথি,—রেখে গেলুম তোমার বুকে ঘৃণা আর অবিশ্বাস! আমার কথা ভাবতে গেলেই তোমার মনে হবে—উঃ, জল দাও বীথি—বড় তৃষ্ণা।"

বীথি দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিতেছিল। মিস চৌধুরী রোগীর মুখে জল দিয়া জোর করিয়া বীথিকে উঠাইয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল।

"শঙ্কর—"

দুই হাতে শঙ্করের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া বীথি বলিল, "এ কি হ'ল শঙ্কর; সত্যই কি তোমার দাদাবাবু চলে যাবে, কিছুতেই ওকে আর বাঁচানো যাবে না?"

পিছনে মুখ ফিরাইয়া বীথির অজ্ঞাতে শঙ্কর চোখ মুছিয়া লইল। তাহার পর বীথির মুখের উপর বেদনাভরা দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিদি, আমি হিন্দু, কর্ম্মফল মানি, পাপের ফল দুদিন পরে যে পাওয়া যাবেই, এ কথা মানি। রামায়ণে রাবণ রাজার—যে এমন শক্তিশালী ছিল, দেবতারা যার ভয়ে থর থর কাঁপতেন,—অতখানি আয়ু থাকা সত্ত্বেও সতীর গায়ে হাত দেওয়ার পাপে সে আয়ু কমে গেল, জীবন থাকতেও তাকে মরতে হ'ল। দাদাবাবু নিজের সতী স্ত্রীর সতীত্বের অপমান করতে গিয়েছিলেন, সাহেবের মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছেন, তাঁর আয়ু সেই জন্যেই কমে গেছে। এ যে সতী-রাণী শক্তিদেবীর আইন মা, নারী-নির্য্যাতনকারীকে শাস্তি পেতেই হবে। এ কি বড় কম কথা দিদি? সতীর চোখের জল যে যায়গায় পড়ে, সে যায়গা যে জ্বলে যায়। সতীর দীর্ঘশ্বাস যে আগে গিয়ে ভগবানের কানে পৌছায়, সতীর ব্যথায় ভগবানের আসন কাঁপে। দিদি, সেই সতীর অপমান কি বড় কম কথা?"

বীথি হাহাকার করিয়া বলিল, "আমি তো কোন দিন ভগবানকে ডেকে তার কোন কথা জানাই নি শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিল, "আপনি করেন নি, করতে পারবেনও না। স্ত্রী যদি স্বামীর দ্বারা লজ্জিতা প্রতারিতা হয় তবু সে প্রার্থনা করতে পারে না তার স্বামী শাস্তি পাক। কিন্তু বুকের মধ্যে সে তো ব্যথা পায় মা। চামড়াটা গণ্ডারের মত শক্ত হোক, সেখানে যে আঘাত করা যাবে তা তাকে ব্যথা দিতে সমর্থ না হোক, অন্তর তো গণ্ডারের চামড়া দিয়ে মোড়া নয় দিদিমণি, কিম্বা পাথর দিয়েও তৈরী নয়। বড় কোমল অন্তরদেশ—কখন-কখনও একটা ছোট্ট কথাও সেখানে শেলের মত বিঁধে থাকে,—নড়তে চড়তে সেটা খচ খচ করে, বড় ব্যথা দেয়। নির্ব্বাক অবলার বন্ধু যিনি, তিনি সবই দেখে যান, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিরও ব্যবস্থা করেন।"

বীথি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভগবান, বীথির স্বামীকে বাঁচাও, বীথিকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবকাশ দাও। অনিল নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন কঠিন ভাবে করিতেছে,—বীথির পাপের পরিণাম যে আরোও বেশী, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আগে হোক প্রভু।

"শঙ্কর, ওঁকে কি আর বাঁচানো যাবে না? কি করলে বাঁচানো যেতে পারে আমায় একবার তা বল শঙ্কর, আমি তাই করব।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শঙ্কর বলিল, "আমি কি বলব দিদি? আয়ু মানুষে দিতে পারে না। তা যদি দিতে পারত, তবে তোমার মুখে হাসি ফুটিয়ে দিতে তোমার এই বুড়ো শঙ্কর দাদাই যে সব করতে পারত। মাকে ডাক, ভগবানকে ডাক, যদি দাদাবাবুর আয়ু তাঁরা দিতে পারেন। তোমায় সান্ত্বনা দিতে তাঁরা বই কেউ পারবে না দিদি, আর কারও ক্ষমতা নেই।"

"মাগো, সতীরাণী—"বীথি সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ডাকিতে লাগিল। সতীর যদি এত তেজ, তবে বীথি কেন স্বামী হারাইবে—মা, নিজের তেজে কেন সে মৃত্যুকে দূরে সরাইতে পারিবে না? ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে সে স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল। এ ভালবাসার গভীরতা একদিনও সে জানিতে পারে নাই। অকস্মাৎ একটা অতর্কিত আঘাতে তাহাকে যদি সচেতন করিয়া দিয়াছ মা, তবে তাহার ভালবাসার পাত্রকে অটুট রাখ মা। সতী বেহুলা মরা স্বামী বাঁচাইয়াছিল, সতী সাবিত্রী সত্যবানকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল; সতী যদি সবই করিতে পারে—বীথির সাধনা কেন ব্যর্থ হইয়া যাইবে মা?

(২৩)

"বীথি—"

"এই যে, কি বলছ বল, আমি তোমার পাশেই আছি।"

বীথি স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনিল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার যাওয়ার সময় হ'য়ে এল বীথি, বড় কষ্ট রয়ে গেল যে।"

বীথি নিজেকে অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কি কষ্ট?"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনিল বলিল, "এই কষ্ট, যে, তোমাকে কাছে পেলুম একেবারে শেষ সময়ে,—কিছুদিন আগে কেন পেলুম না! এখন পেয়ে কিছুই যে হলো না বীথি, দুটো কথা পর্য্যন্ত বলতে পেলুম না যে।"

তাহার মুদিত নেত্র-কোণ বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। বীথি সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে নিজে ঝরঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

মিস চৌধুরী তাহার বিহ্বলাবস্থা দেখিয়া বলিল, "আপনি উঠে যান মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার এখন এখানে থাকবার দরকার নেই।"

বীথি রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আপনি ভুল বুঝেছেন মিস চৌধুরী, এই সময়েই আমার এখানে থাকা বিশেষ দরকার। আমি এ সময় এ যায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।"

ধীরে ধীরে অনিলের দুটি চোখ মুদিত হইয়া আসিতেছিল, প্রাণপণে চাহিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে ডাকিল,—"বীথি!"

"কেন, এই যে আমি, আমায় দেখতে পাচ্ছ না?"

বীথি স্বামীর ললাটের উপর মুখ রাখিল।

"আঃ, বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি; বড্ড ঘুম আসছে যে বীথি, আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি নে। তবে, আমি ঘুমাই বীথি?"

বক্ষের ক্ষতস্থান দিয়া রাত্রি হইতে অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছিল, এই সময় তীরবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। বীথি দুই হাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ঘুমাও। বড্ড ঘুম আসছে তোমার, তিনদিন তোমায় জোর করে জাগিয়ে রেখে বড্ড কষ্ট দিয়েছি; আর কষ্ট দেব না, ঘুমাও।"

অনিল আরও দুই একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আর একটী কথাও তাহার মুখে ফুটিল না; দুই চোখের পাতা চিরতরেই মুদিয়া আসিল, ধীরে ধীরে তাহার প্রাণ ইহলোক ছাড়িয়া গেল।

বীথি উঠিল, তাহার হাত দুখানা তখন স্বামীর বক্ষ-রক্তে সিক্ত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া ব্যথাভরা কণ্ঠে সে বলিল, "ঘুমাও; বড় শ্রান্ত হয়েছ, ঘুমাও, ভগবান তোমার আত্মাকে শান্তি দিন। সংসারে এসে তোমায় অনেক সুখ দুঃখ সইতে হয়েছে, এবার সুখ দুঃখের অতীত লোকে যাও।"

তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, সে পলকহীন নেত্রে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে জল ছিল না, অন্তরের তাপে তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর একপাশে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। মিস চৌধুরী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওঁকে এ ঘর হ'তে নিয়ে যাও শঙ্কর, এখানে ওঁকে রাখা উচিত নয়। আমি বাইরে সকলকে খবর পাঠাচ্ছি—মিঃ চ্যাটার্জি অনন্তে যাত্রা করেছেন। ওঁর ভার তোমার ওপর, ওঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।"

বৃদ্ধ শঙ্কর নিজের চোখের জল সামলাইয়া লইয়া উঠিল। বীথির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ডাকিল, "দিদি-মণি—"

বীথি হাত ছাড়াইয়া লইয়া মলিন হাসিয়া বলিল, "না; যতটা অস্থির হব ভেবেছিলুম শঙ্কর, ততটা হই নি, আর হবও না। বড় ধাক্কাটা সামলে নিতে পেরেছি, আমায় তোমার ধরে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও, একবার শেষ পায়ের ধূলোটা আমায় নিতে দাও।"

স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পা দুখানার উপর মাথা রাখিয়া সে উচ্ছ্বসিতভাবে একবার কাঁদিয়া উঠিল, "সুখী করতে পারলুম না, কেবল দুঃখই দিলুম। এমন করে আমায় চির অপরাধিনী করে রেখে গেলে দেবতা? যখন জ্ঞান পেলুম, যখন চোখ চাইলুম, তখন আর তোমায় বর্ত্তমানে পেলুম না, একেবারেই সুদূর অতীতের কোলে মিশিয়ে গেলে? বর্ত্তমানকে জ্বালাপ্রদ করে রেখে গেলে, ভবিষ্যতের গায়ে অন্ধকার মাখিয়ে রেখে গেলে? এখন অতীত ছাড়া আর তো কিছুই আমার জন্যে রেখে গেলে না গো, ক্ষুদ্র অতীত আমার দগ্ধজীবনে কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারবে?"

ছায়ার মত সে উঠিল, ফিরিয়া কতবার স্বামীর পানে চাহিতে চাহিতে মূর্ত্তিমতী শোক বাহিরে মিলাইয়া গেল।

সে দিন গেল, পরদিনও কাটিয়া গেল। মুহ্যমানা বীথি পড়িয়া। তাহার পার্শ্বে দিনরাতের সঙ্গী তাহার বাল্যের শঙ্কর-দা। পরিচিত কতজন সহানুভূতি দেখাইয়া গেলেন, অনেকে দীর্ঘ পত্রও লিখিলেন। বীথি পিত্রালয়ে সংবাদ দিল না, কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

এখন সে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্কর বলিল, "এখানকার এত জিনিসপত্র সব কি হবে দিদি?"

শান্তভাবে বীথি বলিল, "সব নিলামে দাও শঙ্কর। শুনছি অনেক টাকা দেনা করে গেছেন, সে সব দেনা এখন আমাকেই শোধ দিতে হবে তো।"

বিস্ময়ে শঙ্কর বলিল, "সে তো বড় কম টাকা নয় দিদি।"

তেমনই শান্তভাবে বীথি বলিল, "যত টাকাই হোক না শঙ্কর, আমায় সব শোধ দিতে হবেই। তুমি কি মনে কর শঙ্কর, আমার স্বামী যাদের কাছে ধার করেছেন, আমি তাদের বঞ্চিত করব ? তারা কত আশা করে রয়েছে, যদিও তারা মুখ ফুটে আমায় তাদের কথা জানায় নি; তবুও আমায় তাদের সব দেনা মিটিয়ে দিতে হবেই। ছোটবেলায় যখন তোমার কাছে থাকতুম শঙ্কর, তুমিই না আমায় গল্প বলে শুনাতে—দেনা শোধ না করে যেতে পারলে আত্মা অধোগতি লাভ করে, উর্দ্ধগতি লাভ করতে পারে না ? শঙ্কর, গল্পের মধ্যে যে সত্যটা জেগে ছিল, সেটা আজ তুমি দিশাহারা হ'য়ে লক্ষ্য করতে না পারলেও, সেদিন লক্ষ্য করেছিলে; তাই শিশুহৃদয়ে সেই সত্যের বীজ বপন করবার চেষ্টা করেছিলে। আজ সামান্য এ বিপদে দিশাহারা হ'য়ে পড়লে চলবে কেন শঙ্কর! এখনও যে অনেক বিপদ আমার জীবনে বাকি আছে। বিপদের পথ বেয়ে যাত্রা এই তো সবে সুরু হ'ল। এই বিপদের মাঝখানে আমরা যেন বিলীন না হয়ে যাই, অটুট ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—আজ তাই প্রার্থনা কর শঙ্কর। প্রার্থনা কর শঙ্কর, আমাদের হৃদয়ের সত্যবিবেক যেন গল্পের মত এ সংসার-সমুদ্রে ভেসে থাকে, ঝড় তুফান যেন তাকে নষ্ট করতে না পারে।"

শঙ্কর নীরবে বীথির আদেশ পালনে তৎপর হইল।

বীথি সব বিক্রয় করিয়া স্বামীর সকল দেনা শোধ দিল। ইহার পর তাহার হাতে কয়েকশত টাকা মাত্র রহিল।

জন্মের মতই সে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অনেকে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিলেন। একটু হাসিয়া বীথি বলিল, "বিদেশে আপনাদের এ অনুগ্রহের জন্যে শত ধন্যবাদ। আমায় সাহায্য যা করেছেন, এই আমার পক্ষে আশাতীত পাওয়া হয়েছে। আমার স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করতে গেলেই আপনাদের দয়ার কথা মনে পড়বে। বিদেশে আপনাদের দয়া না পেলে আমার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হতো না, আমি তাঁর দেনা শোধ দিয়ে তাঁর আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারতুম না। আমায় আপনারা আরও সাহায্য করতে চাচ্ছেন, আমি আরও নিতে বড় লজ্জাবোধ করছি। আমি একটা মানুষ মাত্র, যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

খানসামা বাবুর্চ্চির দলকে সে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বিদায় দিল। যাওয়ার সময় সকলেই কাঁদিয়া গেল। সকল ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া একদিন রোরুদ্যমানা বীথি শঙ্করের হাত ধরিয়া জন্মের মত মেলে উঠিয়া বসিল।

অশ্রুজলে দুটি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল। বার বার চোখ মুছে, বার বারই চোখ ভরিয়া জল আসিয়া পড়ে। বিদায়, বিদায়, হাঁ, চিরজন্মের মতই বিদায়। আর কখনও সে বম্বের বক্ষে পা দিবে না, আর কখনও সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া নীচে নীলজলের খেলা, উপরে নীলাকাশে সূর্য্যের খেলা দেখিবে না। সন্ধ্যার তরল আঁধার সমুদ্রের নীলজল ভেদ করিয়া কুয়াসার মত কেমন নীলাকাশ ছাইয়া ফেলে, তাহার পর ধীরে ধীরে আবার ধরার গায়ে নামিয়া আসে, তাহাও সে আর দেখিতে পাইবে না। তবু মনে থাকিবে, চিরকাল মনে থাকিবে; কারণ; ওই সমুদ্রের কূলে সে তাহার প্রিয়তমকে রাখিয়া যাইতেছে।

"শঙ্কর, আমায় ঠাকুরদার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে?"

এখন সে শান্তির স্থান খুঁজিতেছিল যেখানে গেলে তাহার তপ্ত বুকখানা জুড়াইতে পারে। একদিন একটু-খানির জন্য মাত্র সে তাহার ঠাকুরদাদাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর পত্রের দ্বারা সে তাঁহার উদার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিল। আজ তাহার অন্তর এই জ্ঞানী বৃদ্ধের চরণতলে বিশ্রাম লাভ করিতে চাহিতেছিল, সহরের গোলমাল ছাড়িয়া পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধতার মাঝে সে ছুটিতে চাহিতেছিল।

মায়ের কাছে যাইবার ইচ্ছা একবার জাগিয়াছিল। সন্তান ব্যথা পাইলে মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া ব্যথা জুড়াইতে চায়। এ রকম সময়ে মা তাহার প্রতি করুণাময়ী হইবেন; কিন্তু যখন শুনিবেন, অনিল অপর্য্যাপ্ত দেনা রাখিয়া গিয়াছিল এবং বীথি তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে দেনা শোধ দিয়াছে, তখন তাঁহার মনটা কিরূপ ভাবে ভরিয়া উঠিবে। যে স্বামী শত সহস্র অন্যায় করিলেও আজ বীথি ভাবিতেছে তিনি কিছুই করেন নাই, যে স্বামীর মন্দগুলি সে ভালর প্রলেপ দিয়া তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে, সেই স্বামীকে মা যে যা-তা বলিবেন, সে তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া ? এই কথা ভাবিয়াই বীথি মায়ের কাছে যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিল।

দুদিন ঠাকুরদার কাছে থাকিয়া সে দাদামহাশয় ও

দিদিমার কাছে যাইবে। এখন ইঁহাদের নিকট ছাড়া তাহার আর আশ্রয় কই ?

সে রাজপুর যাইতে চায় শুনিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কল্‌কাতায় যাবেন না দিদিমণি ?"

বীথি বলিল, "যাব, কিন্তু এখন নয়। অন্তরটায় বড় আঘাত লেগেছে শঙ্কর, দুদিন আমায় এদিক ওদিক ঘুরতে দাও, মনটা একটু সবল হোক। তার পর দিদিমার কাছেই তো যাব শঙ্কর, আর কোথায় আমার যাওয়ার স্থান আছে ? এ মুখ এখনি দেখাতে পারব না শঙ্কর, বড় লজ্জা করছে। তুমি আমায় ঠাকুরদার কাছে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে দিদিমাকে মাকে আমার সব কথা জানিয়ো।"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; সে একপার্শ্বে সরিয়া বসিয়া বাহিরের পানে উন্মনা হইয়া তাকাইয়া রহিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলিয়া যাইতে লাগিল। হাওড়ায় নামিতে হইল, শিয়ালদহে আসিয়া আবার ট্রেণে উঠিতে হইল। সমস্ত পথটা বীথি নির্ব্বাক।

রাজপুর ষ্টেশনে যখন ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত। অদূরে গ্রামের বৃক্ষশ্রেণী। তাহার মাথার উপর খানিক আগে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশ তখনও সিঁদূরের মত লাল হইয়া রহিয়াছে। দুপুরের দিকে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথে-ঘাটে এখনও জল বাধিয়া আছে।

মুগ্ধনেত্রে দূর পল্লীর পানে তাকাইয়া বীথি বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর দেখতে, না শঙ্কর ? মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে উঠেছে এইখানে,—সহর হ'তে বহুদূরে স্থিত এই পল্লীগ্রামে। চিরকাল সহরেই কাটিয়েছি শঙ্কর, বাংলার পল্লীর কথা কাণেই শুনেছি মাত্র, চোখে কখনও দেখতে পাই নি। আজ আমার যথার্থই মনে হচ্ছে শঙ্কর, এখানে আমি খুব সুখে থাকতে পারব,—না শঙ্কর ?"

শঙ্কর শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "সেটা আপনার মনের ভুলও হ'তে পারে দিদিমণি। সহরের লোকেরা হঠাৎ পল্লীগ্রামে এসে গ্রাম দেখে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়, কোলাহলে শ্রান্ত প্রাণটা শান্ত বিশ্রামের আরাম পেতে চায়। তার পর দুদিন যেতে না যেতে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন পল্লীর নিন্দায় তাদের মুখের এক মিনিট বিশ্রাম থাকে না।"

বীথি হাসিল, "কি জানি, আমিও সহুরে লোকদের নীতি নেব কি না তা এখন বলতে পারছি নে,—সে পরে দেখা যাবে। আচ্ছা, ষ্টেশন হ'তে বাইরে চল, একখানা গাড়ী দেখ। যে জল-কাদা রাস্তার, সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে—তেমনি কিছু চিনিও না।"

শঙ্কর বলিল, "এখানকার এই রাস্তায় চলবার উপযুক্ত গরুর গাড়ী,—ঘোড়া গাড়ী পল্লীগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় না। গরুগাড়ী কয়েকখানা এখানে আছে দেখছি, আসুন একখানাতে।" গরু দুইটী ও গাড়ীর আকৃতি দেখিয়া বীথি বলিল, "না থাক, এ গাড়ীতে উঠে আর দরকার নেই, আমি হেঁটেই যাব শঙ্কর, চল।"

শঙ্কর বলিল, "হেঁটে যাবেন দিদিমণি, পথ যদি অনেকটা দূর হয়—যে জল কাদা রাস্তায়—হাঁটতে পারবেন কি ?"

বীথি দূরে বৃক্ষলতামণ্ডিত গ্রামের পানে চাহিয়া বলিল, "বড় বেশী দূর বলে মনে হচ্ছে না শঙ্কর, এই মাঠটুকু পার হ'লেই গ্রাম পাওয়া যাবে এখন। জল-কাদার কথা বলছো, একটু সাবধানে গেলেই চলবে। ঠাকুরদার বাড়ী চিনে নিতে দেরী হবে না; কেন না, তিনি একজন বিখ্যাত লোক,—অন্যদেশের লোকেরা তাঁকে চেনে, আর এদেশের লোকেরা চিনবে না—এমন হ'তে পারে না। হেঁটে যাওয়ার ভয়ে—আমি ওই আগাগোড়া ঢাকা গাড়ীর মধ্যে বসে, এই অসমতল পথে ঝাঁকানী খেয়ে গা ব্যথা করে যেতে কখনো পারব না। চল, ব্যাগটা তুমি হাতে করে নাও, এর পর সন্ধ্যে হয়ে গেলে সত্যিই মুস্কিলে পড়তে হবে।"

ব্যাগ হাতে লইয়া শঙ্কর অগ্রসর হইল, পিছনে বীথি চলিল। শঙ্কর বলিতে বলিতে চলিল, "আমাদের ঢের অভ্যেস আছে দিদিমণি, ঠিক এমনিধারা আমাদের গ্রামখানা, এমনি পথ-ঘাট সব। কাদাজলে হাঁটা বেশ দুরস্ত আছে; কিন্তু আপনার তো হাঁটাই মোটে অভ্যেস নেই দিদিমণি, তার ওপর আবার এই রাস্তা—"

বীথি হাসিমুখে উত্তর দিল, "কিছু না শঙ্কর, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, এ আমার বেশ ভাল লাগছে। গরুগাড়ীতে প্যাক হয়ে গেলে আমি কি এমন সুন্দর শোভা দেখতে পেতুম ?"

মাঠ পার হইয়া তাহারা গ্রামের সীমায় গিয়া পৌঁছিল। তখন মৃদু অন্ধকার কুয়াসার মত ঘনাইয়া আসিতেছে। গৃহস্থ বধূরা সুদূর নদী হইতে কলসী ভরিয়া জল লইয়া দ্রুত পদে ফিরিতেছে,—গৃহে সন্ধ্যা দিতে হইবে। পথে একটী অপরিচিতা অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে এই বৃদ্ধের সহিত হাঁটিতে

দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মেয়েরা গৃহিণীরা অবগুণ্ঠন-শূন্য মুখে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া ছিলেন, বধূরা মুখের দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দুই আঙ্গুলে ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাহারই ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল।

"হ্যাঁ মা, আপনারা কেউ বলে দিতে পারেন—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীটা কোন্‌খানে?"

শঙ্করের এই প্রশ্নে সকলেরই সংজ্ঞা যেন ফিরিয়া আসিল। বধূরা অবগুণ্ঠন ছাড়িয়া দিল, গৃহিণীরা নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত মাথার কাপড় নামাইয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্নটা তাঁহাদের করায় তাঁহারা যেন বড়ই লজ্জাবোধ করিয়াছেন—তাঁহাদের ভাবটা সেইরূপ।

বীথি আশ্চর্য্য হইয়া ইহাদের পানে তাকাইয়া ছিল। এতক্ষণ নির্লজ্জার মত চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের এই একটী প্রশ্নে হঠাৎ কোথা হইতে পাওয়া এতখানি লজ্জার ভারে একেবারে নুইয়া পড়িল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রবীণা দক্ষবালা না কি ছোটবেলা হইতে নানা দেশে-দেশে ঘুরিয়াছেন, সেইজন্য সাহসটাও তাঁহার একটু বেশী গোছের এবং এই জন্যই তিনি গ্রামের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কোনও নূতন লোক গ্রামে আসিলে, বাড়ীতে যদি পুরুষ না থাকিত, গ্রামবাসিনীরা তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত,—তিনি কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিতেন।

অন্য মেয়েদের পশ্চাতে রাখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "কোথা যাবে গা বাছা, কার বাড়ী?"

শঙ্কর বলিল, "উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী?"

দক্ষবালা বীথির পানে চাহিয়া উৎসুক ভাবে বলিলেন, "তাঁর যজমান বুঝি, কোথা হ'তে আসছ?"

শঙ্কর উত্তর দিল না। দক্ষবালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশেষ বুঝি দরকার আছে?"

বিরক্তি দমন করিয়া শঙ্কর বলিল, "হ্যাঁ, আছে।"

দক্ষবালা প্রশ্ন করিলেন, "কোথা হতে আসছ বললে কতকটা বুঝতে পারি।"

এবার শঙ্কর বিরক্তি দমন করিতে পারিতেছিল না, মনে হইল বলে—"আসছি চুলো হ'তে!" কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া সে বীথির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চলে আসুন দিদিমণি, ও সব কথায় কাণ দিয়ে কোন ফল হ'বে না। এখানে দাঁড়িয়ে শুধু একটা প্রশ্ন করে অনেকগুলো উত্তর দেওয়া দরকার—অতটা সহিষ্ণুতা আমাদের এখন নেই। আসুন, কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেই চলবে এখন।"

"আ মর পোড়রমুখো মিনসে, যেন রুখেই রয়েছে, সেপাই-দের মত ঢাল দেখে ভয়ে মরে গেলুম আর কি। ভাল কথা জিজ্ঞাসা করেছি তার উত্তর দেখ না, শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। মরুক গিয়ে পথে পথে ঘুরে, যাকে পাবে জিজ্ঞাসা করে নিক গিয়ে—আমার তাতে বয়ে গেল। ওগো, মেয়েটাকে যেন চেন চেন বোধ হচ্ছে, ওকে আমি যেন কোথায় দেখেছি, ঠিক করতে পারছি নে। রোসো, কাল আমি গিয়ে ঠিক ওকে উপেন ভশ্চার্য্যের বাড়ীতে ধরব।"

কথাগুলো উভয়েরই কাণে গিয়াছিল। খানিকদূর আসিয়া বীথি একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল মহিলাকুল স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

"ছিঃ শঙ্কর, ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া তোমার বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "সত্যি দিদিমণি, আমারই ভুল হয়েছে। এই সব দেশের মেয়েরা কথায় যেমন দক্ষ, কাজে যদি তেমন হতেন, তা হলে ভাবনাই থাকত না। আপনি এঁদের চেনেন না দিদিমণি, সরলভাবে এঁদের সঙ্গে মিশতে যাবেন না; এঁরা আপনার সরলতা বুঝবেন না, উল্টো চাপ দেবেন। এঁদের জীবনটা পূর্ব্বাপর একধারাতেই চলেছে, নতুন কিছু আমল দিতে চান না। গ্রামে কোথাও কিছু ঘটলে এঁরা গিয়ে জোটেন, তিলকে তাল করাই এ সব মেয়েদের স্বভাব। আশ্চর্য্য এই—কার বাড়ীতে ঝগড়া হ'ল, কে কাকে কি বলেছে, এমন কি কার বাড়ীতে কি রান্না হ'ল, কে কত-গুলো ভাত খেলে, সে খবরও এঁরা দৈনিক সংগ্রহ করেন। সাবধান থাকবেন, এঁদের মিষ্ট কথা শুনে যেন গলে যাবেন না।"

বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "না শঙ্কর, আমি ততদূর হালকা নই। আমি কারও সঙ্গে মিশতে যাব না, কিছুর মধ্যেই থাকব না।"

পথে একটা লোক চলিতেছিল, তাহাকে চার আনা পয়সা কবুল করিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিবার জন্য শঙ্কর সঙ্গে লইল। (ক্রমশঃ)

বাংলার আদি ছন্দ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

লাচাড়ী

লাচাড়ী বা নৃত্যচপল ছন্দও বাংলার নিজের সম্পত্তি। লাচাড়ী ছন্দের কখন উৎপত্তি, বলা কঠিন। কারণ, লাচাড়ীর ছড়া যে কেবল একমাত্র প্রাচীন কবিরাই লিখিয়াছেন তাহা নয়; তখন প্রতি ঘরে ঘরে ঠাকুরমাদের মুখেও লাচাড়ীর ছড়া শুনা যাইত। তাহা ছাড়া, তখনকার ছেলেমেয়েদের ছেলেমী খেলার ভিতর লাচাড়ী ছড়ার প্রচলন ছিল; অবশ্য সে সব ছড়ার প্রায়ই কোন অর্থ থাকিত না। ইদানীংও সেই সব ছড়ার চলন দেখা যায়। যাহা হউক, এক কথায় বলা যায়—বাংলার কবিগণ পয়ারের ওই একঘেয়ে মন্থর গতিতে অতিষ্ঠ হইয়া একটা দ্রুত-নৃত্যশীল ছন্দ বাহির করিলেন; তাহারই নাম লাচাড়ী ছন্দ।

যথা—

(ক) চাঁদ বদনী। তুহুঁ রামা
কাঁহে ভেলি। অতি বামা
হাম চকোর। তুয়া আশে
পিবইতে করু। অভিলাষে।

গোবিন্দদাস।

(খ) বিষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদী এলো বান।
শিব ঠাকুরের। বিয়ে হবে। তিন কন্যে দান॥
একটি কন্যা। রাঁধেন বাড়েন। একটি কন্যা খান।
আর একটি। রাগ করে। বাপের বাড়ী যান॥

ঠাকুরমা'র ছড়া।

(গ) আয়কম। বায়কম। তাড়াতাড়ি,
যদুমাষ্টার। শ্বশুর বাড়ী,
রেন কম। ঝমাঝম,
পা পিছলে। আলুর দম।

ছেলেমী খেলার ছড়া।

(ঘ) রাগ কোরোনা। নলিনী
রাঙা মাথায়। চিরুণী
বর আসবে। এখুনি
নিয়ে যাবে তখুনি।

ছেলে ভুলানো ছড়া।

(ঙ) আগাডুম। বাগাডুম। ঘোড়াডুম সাজে।
ঢোল। মৃদঙ্গ। ঘাগর বাজে।
বাজতে। বাজতে। কমল পুলি,
কমল গেল। কামার ফুলি।

ছেলে-ভুলানো ছড়া।

(চ) রসিক নাগরী। রসের ম'রা
রসিক ভ্রমর। প্রেম পিয়ারা।
অবলা মূরতি। রসের বান,
রসে ডুবু ডুবু। রসের পরাণ।
রসবতী সদা। হৃদয়ে জাগে,
দরশ বাঢ়ায়। পরশ মাগে। চণ্ডীদাস।

(ছ) এতল। বেতল। তামা তেতল,
ধও বেতল। ধরনা।
ক ধাপ খাবে। বলনা।
ইশ্ বিশ্। ধানের শিস্,
ক' ধাপ খাবি। বলে দিস্।

ছেলেমী-খেলার ছড়া।

(জ) মনে পড়ে। ঘরটি আলো। মায়ের হাসি মুখ।
মনে পড়ে। মেঘের ডাকে। গুরু গুরু বুক॥
বিছানাটির। একটি পাশে। ঘুমিয়ে আছে খোকা।
মায়ের 'পরে। দৌরাত্মি সে। না যায় লেখা যোকা॥

রবীন্দ্রনাথ।

(ঝ) বাঁশ বাগানের। মাথার উপর। চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়। মা গো আমার। কাজলা দিদি কই।
লেবুর তলে। পুকুর পাড়ে
ঝিঁ ঝি ডাকে। ঝোপে ঝাড়ে

ফুলের গন্ধে। ঘুম আসেনা। তাই তো জেগে রই
রাত্রি হ'ল। মা গো আমার। কাজলা দিদি কই।
যতীন বাগ্‌চী।

ইহাই লাচাড়ী ছন্দের নমুনা। যদিও ইহা স্বরের উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে, তথাপি ইহা স্বরমাত্রিক ছন্দ নয়। ইহাকে স্বরমাত্রিক ছন্দরূপে ধরিলে ভুল হইবে। দ্বিতীয় উদাহরণের দ্বিতীয় লাইনে "তিন কন্যে" কে যদি আমরা স্বরমাত্রিক ধরি তবে ছন্দ-পতন হয়। একমাত্রা কম পড়ার দরুণ ইহা ভুল হইবে। কিন্তু লাচাড়ী ছন্দানুসারে ইহার মাত্রা ঠিক আছে। কারণ, লাচাড়ী ছন্দ নির্দ্দিষ্ট মাত্রা কিংবা স্বরের উপর নির্ভর করে না, লাচাড়ী নির্ভর করে তাহার নৃত্যচপল গতি বা লয়ের উপর। সেই জন্যই লাচাড়ী ও স্বরমাত্রিক দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী দেখিতে মনে হয় একই রকম, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রায়ই এই "তিন কন্যে"র মত অনেক ভুল দেখিতে পাওয়া যায়।

এই লাচাড়ী হইতেই ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের উৎপত্তি। ত্রিপদী ছন্দে প্রত্যেক লাইন বা ছত্রে তিনটি করিয়া চরণ থাকে, ও প্রতিছত্রের অন্ত্যবর্ণ মিল-সংযুক্ত। আর, চৌপদী ছন্দে প্রতিছত্রে চারিটি চরণ থাকে ও প্রতি ছত্রের অন্ত্যবর্ণে মিল আছে। ত্রিপদী ছন্দ যথা—

চিকন কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ চোখে চায়॥ গোবিন্দদাস।

ত্রিপদী ছন্দের ইহাই গোড়ার কথা বা নমুনা। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকার ত্রিপদী ছন্দ আছে, তাহাদের মধ্যে পাঁচ রকম ত্রিপদী ছন্দ আমাদের কাব্য সাহিত্যে বেশীর ভাগ চলন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১ম। লঘুত্রিপদী ছন্দ—ইহাতে প্রতি ছত্রে কুড়িটি করিয়া অক্ষর আছে। প্রত্যেক লাইন তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ছয়টি অক্ষর, দ্বিতীয় ভাগে ছয়টি ও তৃতীয় ভাগে আটটি অক্ষর থাকে। প্রথম লাইনের তৃতীয় পাদের শেষ বর্ণের সহিত দ্বিতীয় লাইনের তৃতীয় পাদের শেষ বর্ণের মিল থাকে।

মাত্রা সূত্র— ৬ | ৬
৮
৬ | ৬
৮

যথা—

(ক) কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরাগণের বাস॥ ভারতচন্দ্র।

(খ) ঝরে সুমধুর কোকিল ঝঙ্কার
সকল কাননময়।
মধু বৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়॥ হেমচন্দ্র।

(গ) কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত বা গরব কেনে॥ জ্ঞানদাস।

(ঘ) যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার জ্বলিবেনা আর
নিশিতে প্রদীপভাতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

২য়। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ—ইহার প্রথম লাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটি করিয়া ও তৃতীয় চরণে দশটি অক্ষর থাকে।

মাত্রা সূত্র— ৮ | ৮
১০
৮ | ৮
১০

যথা—

(ক) মিলি সুর নর ঋভু প্রণমি তোমায় বিভু
তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়
দেও জ্ঞান দেও প্রেম দেও ভক্তি দেও ক্ষেম
দেও দেও ও পদে আশ্রয়॥
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ) এথার একটা ভূতে জলন্ত চিতার মূতে
আধপোড়া মরা টানে জোরে।
আমোদে ছিঁড়িয়া ভূড়ি কামড়ায় নাড়ি ভুঁড়ি
ভুঁড়ির ভিতরে মুড়ি পোরে॥

হরিশচন্দ্র কাব্যরত্ন।

(গ) দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধার করে সাক্ষী
কর্ণধার ক'রে নিবেদন।
করে পদ্ম শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিচারিল শ্রীকবিকঙ্কন॥

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম।

৩য়। তরল ত্রিপদী ছন্দ—ইহার প্রথম ভাগে ছয়টি, দ্বিতীয় ভাগে ছয়টি ও তৃতীয় ভাগে নয়টি অক্ষর থাকে।

মাত্রা সূত্র— ৬ | ৬
৯
৬ | ৬
৯

(ক) সেদিন হইতে অন্ধ মনগৃহ
পর-বল-অর্গল-পাতে।
সেদিন হইতে শ্মশান ভারত
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে॥

গোবিন্দচন্দ্র

(খ) এ কি মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কাম-মধু-ব্রত-পালিকা॥

ভারতচন্দ্র

(গ) গোকুল নগরে ইন্দ্র পূজা ক'রে
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর মহা কলরব
নাগর হইল পসারী॥

চণ্ডীদাস

(ঘ) পুনহি দরশনে * জীবন জুড়াবে
টুটবে বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

বিদ্যাপতি

৪। লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী ছন্দ—ইহা পাঁচটি চরণ-বিশিষ্ট। প্রথম পাদে বা ভাগে দুইটি চরণ, পরস্পর মিত্রাক্ষর। দ্বিতীয় পাদে দুইটি চরণ, তাহাদের অন্ত্যবর্ণ মিল-সংযুক্ত এবং তৃতীয় পাদে একটি চরণ আছে।

মাত্রা সূত্র— ৮ | ৮
৬ | ৬
৮
৮ | ৮
৬ | ৬
৮

যথা,—

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি।
শিরসি কমলে দশ শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণ হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি
সসঙ্কল্প গুণধাম॥ রামপ্রসাদ।

৫ম। দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী ছন্দ—এই ছন্দের কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে দশটি ও তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণে আটটি এবং পঞ্চম চরণে দশটি অক্ষর থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর।

মাত্রা সূত্র— ১০ | ১০
৮ | ৮
১০
১০ | ১০
৮ | ৮
১০

যথা—

কি কহব বিদ্যার কপাল পেয়েছিল মনোগত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে
মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥

---

* এই উদাহরণের প্রথম পাদে যদিও একটি অক্ষর বা মাত্রার আধিক্য দেখা যাইতেছে তথাপি ইহার ছন্দপতন হয় নাই। ইহা সঙ্গীত-জাত তরল ত্রিপদী ছন্দে লিখিত।

হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ
না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥

ভারতচন্দ্র

ইহাই ত্রিপদী ছন্দের কথা। তাহার পর চৌপদী ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

চৌপদী ত্রিপদী ছন্দেরই অনুরূপ, তবে ইহার প্রত্যেক লাইনে চারিটি চরণ থাকে। চৌপদী দুই প্রকার—দীর্ঘ ও লঘু।

১ম। দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ—ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর ও আটটি অক্ষর বা মাত্রা-বিশিষ্ট। তৃতীয় চরণেও আটটি অক্ষর থাকে। এবং চতুর্থ চরণে তাহাদের চেয়ে এক কিম্বা দুই অক্ষর কম থাকে।

মাত্রা সূত্র— ৮ | ৮
৮
৬
৮ | ৮
৮
৬

যথা—

বহুকাল সুপ্তে থাকি শুনেছিলে মুদে আঁখি
এই মহা সমুদ্রের
গতি চিরন্তন।
তারপর কৌতুহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিলে এ অনন্ত
রহস্য মন্থন। রবীন্দ্রনাথ।

২য়। লঘু চৌপদী ছন্দ—ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ছয়টি অক্ষর থাকে ও তাহারা পরস্পর মিল-সংযুক্ত। তৃতীয় চরণে ছয়টি অক্ষর এবং চতুর্থ চরণে পাঁচটি অক্ষর থাকে। (কখন কখনও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর হইতে দেখা যায়।)

মাত্রা সূত্র— ৬ | ৬
৬
৫
৬ | ৬
৬
৫

যথা—

(ক) নয়ন কেবল নীল উৎপল
মুখ শতদল
দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন
পল্লব দিল॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

(খ) নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে
বধু আসিয়া।
প্রেম-পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার
যাই ভাসিয়া॥

ভারতচন্দ্র

(গ) হেরিতে উপরে নীলকান্তি ধরে
শূন্যে ধূ ধূ করে
ছড়ায়ে কায়।
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া
ছুটিছে তায়॥

হেমচন্দ্র

ইহা ছাড়াও অনেক নূতন রকমের মিশ্র চৌপদী ছন্দ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দুই চারিটি উদাহরণ দিতেছি।

যথা—

(ক) বসন্ত রাজা আনি | ছয় রাগিণী রাণী
রচিল রাজধানী | অশোক মূলে।
কুসুমে পুন পুন | ভ্রমরে গুণ গুণ
মদন দিল গুণ | ধনুক হুলে॥

ভারতচন্দ্র

(খ) ওরে সুলোচনে | কটাক্ষ সন্ধানে
আপনার পানে | চেওনা চেওনা চেওনা।
উহার বেদনা | তুমিত' জাননা
অনর্থ যাতনা | পেওনা পেওনা পেওনা॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

(গ)　নিত্য তুমি খেল যাহা | নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি | সে খেলা খেলিও হে।
তুমি যে চাহনী চাও | সে চাহনী কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে | সে চাহনী চাও হে॥
ভারতচন্দ্র

(ঘ)　পিককুল কল কল | চঞ্চল অলিকুল,
উথলে সুরবে জল | চললো বনে।　মধুসূদন

(ঙ)　এই কালিন্দী তীরে
এই কালিন্দী নীরে
এই তরুতলে　এই গভীর কাননে।
বসি এই শিলাতলে
এই নির্ঝরিণী কূলে
বলেছিলে কত কথা　ভুলিলে কেমনে॥　নবীন সেন

(চ)　রাত্রি দিন | ধুক্ ধুক্
হৃদয় পঞ্জর তটে | অনন্তের ঢেউ।
অবিশ্রাম | বাজিতেছে
সুগম্ভীর সমতানে | শুনিছে না কেউ॥
রবীন্দ্রনাথ

(ছ)　অঙ্গ তরঙ্গিণী　অধর সুরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নব নব
রঙ্গিনীরে।
নব অনুরাগিনী　নিখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী
রূপিনীরে॥
(হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রিক চৌপদী)　গোবিন্দদাস

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে আমরা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মিশ্র চৌপদী ছন্দের চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাই। এই উৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই আমি প্রত্যেক উদাহরণ পর পর সাজাইয়া গেলাম। এই ক্রমোন্নতি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, বাংলার চৌপদী মিশ্রভাবে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র এইরূপ উন্নতিতেও তৃপ্ত হইলেন না; তিনি তখন হ্রস্ব দীর্ঘ নিয়মে ত্রিপদী এবং চৌপদী জুড়িয়া আর একটা নূতন ছন্দ বাহির করিলেন।

যথা—
নগনন্দিনি | সুরবন্দিনি | চিরনন্দিনি গো।
জয়কারিণি | ভয়হারিণি | ভবতারিণি গো।
জয়তি জননি | অন্নদা
গিরিশ-নয়ন | নর্ম্মদা
অখিল ভুবন | ভক্ত ভক্ত | ভক্তি-মুক্তি-শর্ম্মদা।
তরুণ কিরণ | কমল কোষ ; নিহিত চরণ-চারদা।

*　*　*　*　*

জয় সুরারিনাশন | বৃষেশবাহন | ভুজঙ্গভূষণ | জটাধর
জয় হিমালয়ালয় | মহামহোময় | বিলোকনোদয় | চরাচর।
ভারতচন্দ্র

ইহা হইল আমাদের লাচাড়ী ছন্দের শেষ সোপান। লাচাড়ীর ধ্বনিটুকু অনুকরণ করিয়া আধুনিক অনেক কবি অনেক রকম লিখিয়াছেন, কিন্তু সেইগুলি আমাদের পুরাতন কবিদের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৪)

সেই রাত্রে যখন তাহারা দুইজনে মোটরে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া অসিয়াছে। কিরণ তাহার দগ্ধ গৃহ রক্ষার ভার চাকরদের উপর ফেলিয়া লীলার সঙ্গে যাত্রা করিল। তাহারা দহ্যমান অগ্নিকুণ্ড হইতে কিছু রক্ষা করিতে পারুক আর নাই পারুক, তাহাতে তাহার কোন আগ্রহ ছিল না—লীলা যে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে তাহাই তাহার চরম পুরস্কার বলিয়া জানিয়াছে।

আজ সে অনেক সহ্য করিয়াছে, এবং এখনও অপর দিকে তাহার জন্য যাহা অপেক্ষা করিতেছে—তাহাতে তাহার উপস্থিতি ও বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রধান কাজ। শীঘ্রই সে

অরুণের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবে, ও শেষ একটা বোঝাপড়া হইবে। তাহার এক সময়ের পুরাতন বন্ধু যে আজ তাহার সহিত মনুষ্যোচিত বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার করিবে, তাহাতে কিরণের কোন সন্দেহ ছিল না।

অরুণ এখন দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছে, এখন লীলার স্বীকার-উক্তি সে সদাশয়ের মত গ্রহণ করিয়া লীলাকে তাহার সর্ত্ত হইতে মুক্তি দিবে—ইহা কিরণ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে; অবশ্য ইহার নৈরাশ্যও যে কত গভীর—তাহা কিরণ ভালই জানে; কিন্তু মানুষের জীবন ত অধিকাংশই নৈরাশ্যে পূর্ণ!

লীলা যে আজ সম্পূর্ণরূপে তাহার, এ চিন্তায় কিরণ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। তাহার কাছে আজ এই গভীর নিশীথে লীলার নিজে আসিয়া এই আত্ম-সমর্পণ—যেন তাহার জীবনে একটি স্মরণীয় ও পরম শ্রদ্ধার বিষয় বলিয়া মনে হইতেছিল। লীলার প্রকৃতির কোমল দিকটা—তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া তাহার মুগ্ধ-চিত্তে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি মোহময় চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই চিন্তায় সে তন্ময়, বিভোর!

কিরণ! যাকে ভালবাসা যায়, তাকে একেবারে পাওয়া বড় সুন্দর জিনিস—না? লীলা চুপি চুপি বলিল।

তাহার মনে যে উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল, তাহা বুঝিয়া কিরণ বলিল—এই আমি যেমন তোমাকে একেবারেই পেয়েছি!

লীলা বলিল—আমি তাই ভাবছি?

লীলা! আমায় তোমার চেয়ে অনেক বড় বলে তোমার মনে হয় না? সত্যি আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়!

তুমি যদি আরও বড় হতে, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না! তোমার চেয়ে প্রিয় জগতে আমার আর কিছু নেই!

লীলার এই সহজ সরল কথাগুলি সঙ্গীতের মত মধুময় সুরে কিরণের কাণে বাজিতেছিল। সে আপনাকে ধিক্কার দিল—কেন সে এতদিন লীলাকে তাহার নিজের করিয়া লয় নাই? অরুণ অন্ধ হইয়া তাহার কাছে আসিবার অনেক আগেই ত তাহারা স্বামী-স্ত্রী হইতে পারিত!

বাড়ী আসিয়া পড়িতে তাহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! সিঁড়ীর উপর পা দিতেই তাহারা বুঝিল—এবার তাহাদের কঠোর সত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে!

দুজনেই ভাবিয়াছিল, অরুণ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিবে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কেবল একটি ভৃত্য আগাইয়া আসিল। কেবল অরুণের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আর সব বাড়ী অন্ধকার! অরুণ তবে জাগিয়া আছে! কিন্তু তবু সে লীলার কোন খবর লইতে আসিল না!

ভৃত্য বলিল—মিসেস রায় বলিয়া রাখিয়াছেন—লীলা বাড়ী ফিরিলে তখনি যেন তাহাকে তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

লীলা ভাবিল—আর একটু হলে আমি আর বাড়ী ফিরতুমই না। প্রকাশ্যে বলিল—মা কি এখনো জেগে আছেন?

আজ রাত্রে কেউ ঘুমোয়নি হুজুর! যে ভয়ে ভয়ে আজ কার রাত সবাইকার কেটেছে!

কিরণ আর বিলম্ব সহিতে পারিতেছিল না। অরুণ যখন জাগিয়া আছে—তখন তাহাকে এখনি সব কথা বলা ভাল।

লীলা ব্যথিত চিত্তে বলিল—খুব নরম হয়ে তাকে বুঝিয়ে বোলো! সে এত কোমল—এত অল্পে ব্যথা পায়—কি কষ্টই তাকে দিচ্ছি আমি! একে আজ বেচারা অনেক সয়েছে!

কিরণ বলিল—আমি খুব বুঝে কথা বোলবো—লীলা! তবে সত্য কথাটা তার জানা উচিত। তুমি কিছু ভেবো না! এ ভারটা সম্পূর্ণ আমার উপর ছেড়ে দাও।

কি পশুর মত ব্যবহারই করছি আমি! তার যে আমায় ছাড়তে হলে কি দশাটাই হবে, আমি তাই ভাবছি!

কিরণ তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া অরুণের ঘরের দিকে চলিয়া গেল!

লীলা একটা অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহার মাতার ঘরের দিকে চলিল। বসন্তপুরে কি ঘটিয়াছে, তাহা মিসেস রায় কিছুই জানেন না; সুতরাং তাঁহার কাছে ভাল ব্যবহার পাইবার আশা বৃথা। যাহা হইবার, তাহা শীঘ্র শীঘ্র হইয়া গেলেই ভাল।

মিসেস রায় বিছানায় শুইয়া ছিলেন—লীলা ঘরে ঢুকিতে তিনি সস্নেহে তাহাকে তাঁহার বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

লীলা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল! তিনি ত কই অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন না? আজ তাঁহার

এ কি ভাব? তবে কি তাঁহার তাহাকে কোন অন্য সংবাদ দিবার আছে?

মিসেস রায় ধীরভাবে বলিলেন—তুমি আজ সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ; কিন্তু আমি সেজন্য তোমায় কিছু বলতে চাই না—বিশেষ এখন তুমি বড় ক্লান্ত। যাক্, বসন্তপুরে কি হলো?

লীলা সেখানকার সমস্ত ঘটনা ও তাহাদের আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার পাওয়া—সব বর্ণনা করিল। শেষে সে বলিল, কিন্তু এখানে কি হয়েছে মা? অরুণ কি ভাল নেই?

মিসেস রায় বলিলেন—না! আমি এই রাত্রে—এত গোলমালেও তার জন্য ডাক্তার আনিয়েছিলুম! আহা! বাছা আমার কি কষ্টের কপাল নিয়েই এসেছে!

লীলা উদ্বেগ ও ভয়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। আবার বুঝি এখনি কি শুনিতে হইবে!

মিসেস রায় অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—তুমি যাবার ঘণ্টা দেড়েক পরে সে ফিরে এলো! তখনো তার খাওয়া হয়নি। অত্যন্ত ক্লান্ত—মাথার ও চোখের যাতনায় সে তখন কাতর হয়ে পড়েছে! এসেই তোমাদের কথা শুনলে। তখনি সেই মুখে, না খেয়ে, না দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল! যাতে যত শীঘ্র তোমাদের সাহায্য করতে লোক পাঠাতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে! বল্লে—একটু দেরি হলে আর তারা প্রাণে বাঁচবে না! সেখানে তাদের সাহায্য করবার কেউ নেই!

লীলা কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল—সে কথা সত্যি! আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে আর আমাদের এখানে ফিরতে হত না!

মিসেস রায় বলিলেন,—সেই কথাই বলছি! সে ত স্বচ্ছন্দে নিজে না গিয়ে মিঃ ডরেণ্টকে একখানা চিঠি লিখে দিতে পারত! তা না করে সে নিজে তখনি ছুটে বেরিয়ে গেল—পাছে একটু দেরি হয়! পাছে সময়ে সাহায্য গিয়ে না পড়ে! তার এই নিঃস্বার্থপরতার জন্য চিরজীবন তার কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ক্রমে মিসেস রায় এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই একে একে লীলাকে শুনাইলেন। লীলা নিজের সমস্ত বিপদ ভুলিয়া মর্ম্মাহত হৃদয়ে অরুণের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল! এতক্ষণে কিরণও তবে সব শুনিয়াছে! তাহাদের উভয়ের এতক্ষণের সমস্ত আশা আনন্দ উৎসাহ—সবই শেষ; আবার লীলাকে তাহার পূর্ব্ব জীবনে ফিরিয়া যাইতেই হইবে!

লীলা এই অতর্কিত দারুণ আঘাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! মিসেস রায়ের কথা শেষ হইলে সে উঠিয়া আসিয়া ড্রয়িংরুমে একখানা চেয়ারের উপর লুটাইয়া পড়িল! মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাহার অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার চোখে এক ফোঁটা জল আসিল না!

কিরণ অরুণের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অরুণ টেবিলের ধারে চৌকিতে বসিয়া আছে! তাহার দুই বাহুর উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, যেন সে লীলার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

কিরণের পদশব্দে সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, কে ওখানে? ডাক্তার?

সে স্বরে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। কিরণ সে স্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! অরুণের সেই শবের মত রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখ—আর এই উদাস শুষ্ক স্বর—যেন তাহার মনের সমস্ত স্ফূর্ত্তি, আনন্দ সব নষ্ট করিয়া দিল! কি হইয়াছে—তাহা না জানিয়াও সে দমিয়া গেল! বলিল—ডাক্তার নয়! আমি! কিরণ!

কিরণ? অরুণ চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিল! লীলা? লীলা কোথায়?

অরুণের মুখের দিকে চাহিতেই একটা তীব্র অবর্ণনীয় যাতনায় ও নৈরাশ্যে কিরণের চিত্ত সেই মুহূর্ত্তে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! অরুণের চোখে এ কি লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি! সে বলিল—লীলা ভাল আছে, আমি তাকে বাড়ী ফিরিয়ে এনেছি! কিন্তু অরুণ! এ কি? এ কি দেখছি?

কি আর দেখবে? আমি অন্ধ! আবার আমি অন্ধ হয়েছি! আর এ সংসারে থাকবার আমার কি দরকার আছে? তোমরা এবার আমায় যেতে দাও! মুক্তি দাও আমাকে! ওঃ! ভগবান্! আবার! আবার আমি অন্ধ হলুম! সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কিরণ দেখিল—বুকফাটা কান্নায় তাহার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

স্তম্ভিত হৃদয়ে কিরণ দাঁড়াইয়া রহিল! ভুল নয়! স্বপ্ন নয়! সত্যই অরুণ আবার দৃষ্টি হারাইয়াছে! তাহার হৃদয় তখন অব্যক্ত রুদ্ধ যন্ত্রণায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল! তবু

তখনি তাহার মন হইতে স্বার্থপরতার সব চিন্তা লুপ্ত হইয়া গেল!

সে তখনি নিজেকে সংযত করিয়া অরুণের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ও অতি কোমল করুণাপূর্ণ চিত্তে অরুণের তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশরাশির উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

আমি অন্য লোকের চেয়ে এমন কি পাপ করেছি, যার জন্যে আমার জীবন এমন অভিশাপগ্রস্ত হলো—কিরণ?

কিরণ ধীর মৃদুস্বরে বলিল—কিসের জন্য যে সংসারে কি ঘট্‌ছে, তার কোন্‌টাই বা আমরা ধরতে পেরেছি ভাই? অন্ধভাবে নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর আমাদের কিই বা উপায় আছে? হয় তো তোমার যেমন এ অনিষ্ট হলো, তেমনি কোন উপায়ে ক্ষতিপূরণও হতে পারে!

কিরণের স্নেহপূর্ণ কোমল স্পর্শে ও নীরব সহানুভূতিপূর্ণ সান্ত্বনায় অরুণ একটু সুস্থ হইল! রুমালে মুখ মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিল,—হতে পারে? তুমি এ কথা বোলছো? কেবল একটিমাত্র উপায়ে এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে—যা আমি সর্ব্বক্ষণ মনে মনে ধ্যান করছি! কিন্তু আমার এ পোড়া ভাগ্যে আবার কি সে শান্তি ফিরে আসবে?

কিরণ বলিল,—আসবে না কেন? সন্দেহ করছো কেন—অরুণ?

দুজনেই লীলার কথা ভাবিতেছিল, পরস্পরের মনের ভাব তাহাদের পরস্পরের অজ্ঞাত ছিল না!

অরুণ বলিল—কেন সন্দেহ করছি, তা তোমায় খুলেই বলছি কিরণ! আমি যে কি যাতনা ভোগ করছি, সে তুমি বুঝতে পার্ব্বে না। মন আমার নরকের মত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যখন ফিরে এসে শুনলুম, লীলা তোমার কাছে ছুটে গিয়েছে, তখন থেকে আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছি! আমি যে সর্ব্বক্ষণ তোমাকে কি হিংসা কর্চ্ছি, সে তুমি মনে ভাবতেও পারবে না! কতবার মনে হয়েছে—একটি গুলিতে আমার এ দগ্ধ জীবনের অবসান করে দি! কিন্তু লীলা নিরাপদ হয়েছে, তার আর কোন ভয় নেই—এই খবরটুকু না জেনে মরবারও ইচ্ছা হল না আমার!

কিরণ বলিল,—এসব অনর্থক চিন্তা করে বৃথা কেন কষ্ট পাও অরুণ! লীলা তোমারই! সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ রেখ না!

কিরণের ঠোঁট কাঁপিতেছিল। লীলার উপর তাহার সব দাবী সে আজ ছাড়িয়া দিল! আজ হইতে লীলার সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া তাহার আর কোন সম্বন্ধই রহিল না!

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে বলিল,—তুমি ত সন্ধ্যা থেকে বাইরে বেরিয়েছিলে শুনলুম, তোমার আবার এ অবস্থা কেমন করে হলো?

আজ সমস্ত দিন ধরে লিখে লিখে চোখে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তার বার বার করে বারণ করে দিয়েছিল, চোখে যেন জোর না লাগে, চোখের পরিশ্রম যেন কোনদিন অতিরিক্ত না হয়ে যায়। সে হিসাবে কয়েক দিনই আমার চোখের কাজ বেশি হচ্ছিল। আজ যখন রাত্রের বিদ্রোহের খবর পেলুম, তখন বড় যাতনা-বোধ হচ্ছিল; কিন্তু এ খবর শুনে ত স্থির থাকতে পারি না। তখনি বেরিয়ে পড়লুম। আগে দানাপুরে ক্যানটনমেণ্টে গিয়ে মেজর স্মিথের সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে, তিনি বল্লেন, তাঁরা আগেই খবর পেয়ে সাবধান হয়েছেন,—ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে পায় নি। সেখান থেকে সহরে এসে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডরেণ্টের কাছে গেলুম।—সেখানেও শুনলুম, বিদ্রোহীদের অনেককেই ধরা হয়েছে; এখনও ধরপাকড় চলছে!

আর আমার সেখানে থাকবার দরকার নেই দেখে চলে আসছি—মনে ভাবলুম—বাড়ী এসেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাব, চোখের যাতনায় মাথাশুদ্ধ খসে পড়ছে। কিন্তু এসেই শুনি, তোমার বিপদের কথা—আবার লীলা একা এই রাত্রে সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিয়ে তোমার কাছে ছুটেছে! ব্যাপারটা যে আমার পক্ষে কত বড় আঘাত, তা অন্যে বুঝবে না। যাই হোক, এ বিপদ শুনেও কি আর এক মিনিট দাঁড়াতে পারি? সেই মুখে আবার ছুটলুম—পুলিশ আফিসে। তখন আবার সব পুলিশের লোক যায়গায় যায়গায় বেরিয়ে গেছে বিদ্রোহীদের সন্ধান করতে। অনেক চেষ্টায় টেলিফোন করে তাদের কতক লোককে ফিরিয়ে, জনকতক টেরিটোরিয়াল্‌ সৈন্য যোগাড় করে—মোটরে তাদের তুলে দিয়ে বাড়ী এলুম। তখন চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে—ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

ডাক্তার এলো। সে বল্লে, আমি যদি অন্ততঃ সন্ধ্যার পরেও তার কাছে যেতুম, তা হলে সে অস্ত্র করে আমার দৃষ্টি রক্ষা করতে পারতো। এখন আর উপায় নেই।

মর্ম্মান্তিক কষ্টে কিরণের মাথা নত হইয়া আসিল।

তাহার নিজের জীবনের সব ত গেলই, তাহার বন্ধুও যে অবশিষ্ট জীবন এইরূপ অন্ধ হইয়া থাকিবে—এই কষ্ট ও করুণায় তাহার অন্তর মথিত হইতেছিল,—সত্যই সে অরুণকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

বহুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এবার আর তাহলে কোন আশাই নেই ?

কিছু না! চোখের যাতনা আমার কমে গেছে—একটা লোশন ও একটা নার্ভ টনিকে। কিন্তু তাতে কি ? আমার দৃষ্টি ফিরে পাবার আর কোন আশা নেই! আমি ভিখারীরও অধম! আমার সবই শেষ হয়ে গেল!

কেন এত নিরাশ হচ্ছো অরুণ! অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তুমি আবার হয় তো সুখী হতে পার!

অরুণ বলিল—তা হতে পারতুম, যদি জানতুম, লীলা এখনো আমায় তেমনি ভালবাসে! কিন্তু সে আর হবার নয়। সত্যই সে যদি আমায় ভালবাসতো, তাহলে কখনো অমন পাগলের মত তোমার কাছে ছুটে যেতে পারতো না! সে আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। তুমি আমার চেয়ে তাকে ঢের বেশি সুখী করতে পারবে!

কিরণ এ কথা ভালরূপেই জানে, ও এ জ্ঞান তাহাকে উন্মাদ-প্রায় করিয়া তুলিতেছিল। লীলার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া তাহাকে অপরের হাতে তুলিয়া দিবার কি অধিকার আছে তাহার ? তবু, এ কথাও সত্য যে, অন্ধের হাত হইতে সে লীলাকে কাড়িয়া লইতে পারে না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অরুণ আবার বলিল—আমি কেমন করে বিশ্বাস করবো—সে তোমায় ভালবাসে না ? তুমি ত তাকে ভালবাস ?

অরুণের ঈর্ষাকাতর মুখ দেখিয়া কিরণ ব্যথিত হইল। বলিল, তাকে ত সকলই ভালবাসে। সে কিন্তু তোমাকেই ভালবাসে।

কিরণ! তোমার এ কথা যেন আমার দগ্ধ প্রাণে শান্তি দিলে! আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন এ কথা সত্য হয়! আমার জীবনের সর্ব্বস্ব সে! সে যদি আমায় ছাড়তে চায়, তবে আর আমি বাঁচতে চাই না!

সে কোন দিনই তোমায় ছাড়তে চাইবে না অরুণ! কেন এ-সব ভেবে বৃথা কষ্ট পাচ্ছ ?

কিরণ দৃঢ় ভাবে এ কথা বলিয়া অরুণকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। তাহার আঁধার জীবনের মধ্যে আলোকের, আশার সুখময় চিত্র দেখাইয়া, বহুক্ষণ একত্র গল্প করিয়া, তাহাকে অনেকটা সুস্থ ও অন্যমনা করিয়া রাখিল। অরুণের শোচনীয় অবস্থা, তাহার ভগ্ন হৃদয়, তাহার সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তা—এক মুহূর্ত্তেই তাহার উদার চিত্তের মহানুভবতা জাগাইয়া দিয়াছিল।

অরুণ একটু সুস্থির হইয়া নিজের স্বার্থপরতায় লজ্জিত হইয়া বলিল, আমি তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম! সেই থেকে কেবল নিজের কথা নিয়েই মেতে আছি! তোমরা কি করে রক্ষা পেলে ?

কিরণ বলিল, সে-সব লীলা তোমায় এর পর বলবে! এখন তুমি বিছানায় শোবে চল! বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

তা সত্য—আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার শুতে যেতে, বা কিছু করতে মোটে ইচ্ছে হচ্ছে না!

ও সব কেবল তোমার মনের নৈরাশ্যের জন্য। মন প্রফুল্ল কর। আমি বল্‌ছি—আবার তুমি সুখী হবে! চল! তোমায় বিছানায় শুইয়ে আসি!

আমি কি এখন একবার লীলাকে দেখতে পাব না ? অরুণ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মিনতির সুরে বলিল।

কিরণ বুঝিয়াছিল—এই অকস্মাৎ আশাভঙ্গে লীলা কি তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছে! এই মুহূর্ত্তে আবার অরুণের সঙ্গে দেখা করা তাহার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইবে!

সে তাহাকে এই অগ্নি-পরীক্ষা হইতে দূরে রাখিবার জন্য বলিল—আজ সে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে! বাকি রাতটুকু—অন্ততঃ ঘণ্টা দুই—তার একটু বিশ্রাম—একটু ঘুমানো দরকার। সকাল হয়ে এসেছে। কাল তুমি তাকে যতক্ষণ ইচ্ছা কর—ততক্ষণই পাবে! এটুকু সময় একটু ধৈর্য্য ধরে শোবে চল!

অরুণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কিরণ বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সে যখন আলো নিভাইয়া দিয়া অরুণের কাছে বিদায় চাহিল, অরুণ তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—তুমি আমায় মাপ করো কিরণ! আমি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা জীবনে কখনো ভুলবো না! তোমার সঙ্গে আমি বড় অন্যায় ব্যবহার করেছি!

কিছু ভেব না! আমার কাছে তুমি আমার চিরদিনের সেই প্রিয় বন্ধু! অরুণের করকম্পন করিয়া সে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ড্রেসডেনের চিত্রশালা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২)

নেদারলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের অনেকগুলি ছবি চিত্র-শালায় আছে। সতেরো শতাব্দীতে যখন ইতালীর



প্রমত্ত হারকিউলিস (রুবেন্‌স্)

চিত্রকলার নদীতে ভাটা পড়তে সুরু হল, তখন নেদারলণ্ডে চিত্রশিল্পীর প্লাবন বইল। নেদারলণ্ডে জান ভান ইয়াক (Jan van Eyck), মেমলিং (Memling) প্রভৃতি চিত্রকরদের সাধনায় একটি স্বতন্ত্র চিত্রকলা গড়ে উঠছিল। এই ফ্লেমিস আর্টের ক্ষীণ ধারায় ইতালীয়ান আর্টের ভরা জোয়ার এনে যিনি সমস্ত ইয়োরোপীয়ান চিত্রকলায় নব রূপ ও রসের প্লাবন আনলেন, সেই শ্রেষ্ঠতম ফ্লেমিস চিত্রকর রুবেন্‌স্‌এর কথা প্রথমে বলি। রুবেন্‌সের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি ব্রাসেল্‌স ও আণ্টওয়ার্পে আছে। ড্রেসডেনেও তাঁর কয়েকখানি সুন্দর ছবি আছে।

ওয়েষ্ট ফালিয়ার (West phalia) সিগেন (Siegen) বলে একটি ছোট সহরে রুবেন্‌সের জন্ম হয় (১৫৭৭—১৬৪০)। তাঁর বাবার আণ্টওয়ার্পে ওষুধের দোকান ছিল। তিনি বিদ্বান্ লোক ছিলেন, সহরের মিউনিসিপ্যালিটির একজন অলডারমান ছিলেন। কিন্তু তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম ছেড়ে ক্যালভানিষ্ট হওয়াতে তাঁকে স্পেন-শাসিত নগর ছেড়ে কোলনে পালিয়ে যেতে হয়। সেখানে তিনি আইনজ্ঞের কাজ করেন, কিন্তু রাজকার্য্যের চক্রে পড়ে কারাগারে বন্দী হন। তারপর তাঁকে পরিবার সহ সিগেনে নজরবন্দী করে রাখে। সেখানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রুবেন্‌সের জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর রুবেন্‌স মা'র সঙ্গে আণ্টওয়ার্পে ফিরে আসেন,—তখন তাঁর বয়স দশ বৎসর হবে। তাঁর স্কুল শিক্ষা বেশ ভালই হয়েছিল,—লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, স্পানিস, ইংলিস, ডাচ—সব ভাষাই তিনি শিখেছিলেন। এই ভাষা-শিক্ষা পরে তাঁর জীবনে খুব কাজে লেগেছিল।

তিনি প্রথমে আডাম ভান নুর্ট (Adam Van Noort) বলে একজন চিত্রকরের কাছে অঙ্কনবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই শিক্ষকের প্রভাব তাঁর চিত্রে



ধর্ম্মবীর (রুবেন্‌স্)

পাওয়া যায়। ভান্ নুরটের চিত্রের জলজলে ভাব, টকটকে রং-ভরা দেহ-আঁকা, দেহের চামড়াকে রক্তমাংসের দীপ্তিতে

রঙীন ঝলমল করান,—ইত্যাদি অঙ্কন-রীতিগুলি রুবেন্‌সের ছবিতে আরও বিকশিত, আরও পূর্ণ রূপে দেখতে পাই।

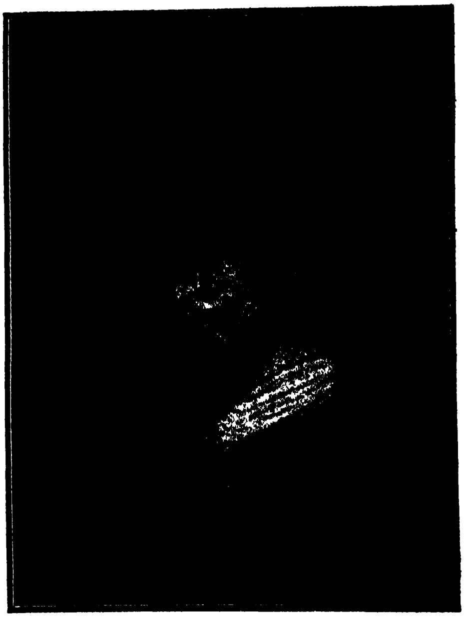
রাফাএল টিৎসিয়ানের ইতালীর আহ্বানে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি (১৬০০) ভেনিসে এলেন। টিৎসিয়ান, ভারোনেজে, টিন্‌টরেটোর ছবির বর্ণের লীলা তাঁকে মুগ্ধ করল। এই রঙের আগুন তাঁর ছবিতে জ্বলজ্বল করতে



নর-ছাগ উপদেবতা (রুবেন্‌স্)

দেখতে পাই। মাইকেল আঞ্জিলোর মূর্ত্তিদের বিপুল পরিকল্পনা, বিশাল চিত্রের ছন্দ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল। ফ্লেমিস চিত্রকরেরা খুব বড় ছবি আঁকতেন না। ইতালীর চিত্র সব দেখে, রুবেন্‌স্ প্রাসাদের সমস্ত দেওয়াল-জোড়া বৃহৎ ছবি আঁকার কল্পনা করতে লাগলেন। লুভারে তাঁর যে ছবিগুলি আছে, সেগুলিতে প্রাসাদের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে বৃহৎ ছবি আঁকার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখতে পাই।

তাঁর অঙ্কন-প্রতিভা দেখে মানতুয়ার ডিউক তাঁকে তাঁর চিত্রশিল্পী করে নেন। এই ডিউকের সঙ্গে ইতালীর নানা স্থানে ঘুরে রুবেন্‌স্ ইতালীয় চিত্রকলার রীতিনীতি আত্মসাৎ করলেন। চিত্রশালায় প্রমত্ত হারকিউলিস (Drunken Hercules) বলে তাঁর এই সময়ে আঁকা একখানি চিত্র আছে। ইতালীর নানা রাজসভার মত্ত উৎসব অভিজাত-বর্গের উন্মত্ত ইন্দ্রিয় সম্ভোগলীলা দেখেই বোধ হয় ছবিখানির পরিকল্পনা তাঁর মনে উদিত হয়েছিল। ছবিখানি একটি রূপকের মত। মানুষের শক্তি অত্যধিক লালসায়, সম্ভোগে, মদ্যপানে, বিলাস-ভোগে মত্ত দিশাহারা হয়েছে,—মানুষ আর তার আত্মার শক্তি দিয়ে চালিত নয়,—আপনাকে চালাবার, দাঁড়াবার শক্তি হারিয়েছে,—তার এক দিকে কালো পাপ, আর এক দিকে মোহিনী লালসা তাকে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে. তা সে জানে না। ছবিটি যদিও একটা বীভৎসতার ছবি, তবু তার পরিকল্পনা ও অঙ্কনরীতি আমাদের মন মুগ্ধ করে। হারকিউলিসের ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ ব্যথিত দেহের ছন্দে, তাহার দিব্য আলোকোজ্জ্বল দেহের পাশে অন্ধকারের সমাবেশে ছবিটি সুন্দর।



সাসকিয়া (রেমব্রাণ্ট)

রুবেন্‌স্ এরূপ উৎসবের প্রমত্ত চিত্র আঁকতে ভাল-বাসতেন। কিন্তু তিনি নিজে শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁর জীবনে কোন কামনার প্রমত্ত উচ্ছ্বাস বা দুর্নীতিমূলক আচরণের কথা জানা যায় না। তাঁর মনের ধর্ম্মভাব তাঁর আর একটি যুবা-বয়সের আঁকা ছবি থেকে বোঝা যায়। ছবিটি হচ্ছে 'ধর্ম্মবীর' (Champion of Virtue)। সুন্দরী

দেবী এসে এই বীরের কপোলে জয়মাল্য পরিয়ে দিচ্ছে। আত্মার শক্তির লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত এই তরুণ যোদ্ধা নগ্না-সুন্দরীর আলিঙ্গনের প্রলোভন জয় করেছে,—সে যে সত্যই 'ধর্ম্মবীর' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মাতার সঙ্কট-জনক পীড়ার খবর পেয়ে রুবেন্‌স্‌ তাড়াতাড়ি ইতালী ছেড়ে স্বদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু আণ্টোয়ার্পে পৌঁছে মাকে দেখতে পেলেন না। তাঁর পৌঁছাবার আগেই তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। রুবেন্‌স্‌ কিন্তু আর ইতালীতে ফিরতে পারলেন না। তাঁর দেশের রাজা ও রাণী তাঁকে তাঁদের রাজসভার চিত্রকর রূপে নিযুক্ত করলেন। মাতার মৃত্যুতে তাঁর শোককাতর চিত্ত সুন্দর ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রের পরিকল্পনা করতে লাগল। যিশুর জন্ম, ক্রুসে যিশুর মৃত্যু ইত্যাদি নানা চিত্র আঁকলেন। স্পেনের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ থামাতে নেদারলণ্ড তখন শান্তি ও সম্পদভরা। অনেক গিল্ড অনেক চার্চ্চ থেকে ছবির অর্ডার আসতে লাগল।



বাথসেবা (রুবেন্‌স্‌)

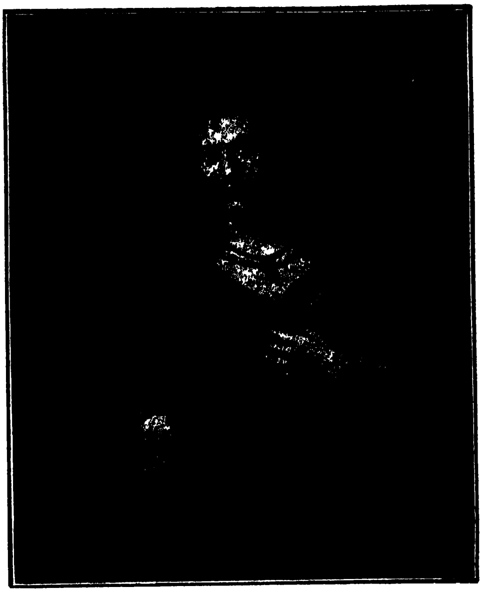
১৬০৯ সালে তিনি ইসাবেলা ব্রাণ্ট নাম্নী একটি সুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই সুন্দরী পত্নীর রূপ তাঁর অনেক ছবিতে দেখতে পাই। তার দাম্পত্য-জীবন বেশ সুখে কেটে গেছল। এই সময়ে তাঁর নাম ইয়োরোপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে গণ্য হলেন। পারীর রাজ-সভা থেকে ছবি আঁকবার জন্যে তাঁর কাছে আহ্বান এল। সেই ছবিগুলি লুভার মিউজিয়ামে দেখতে পাই।

রুবেন্‌সকে রাজসভার চিত্রকররূপে শুধু ছবি আঁকতে হয়নি, তাঁকে রাজদূতের কাজও করতে হয়েছিল। ১৬২১সালে স্পেন ও নেদারলণ্ডের মধ্যে শান্তির সম্বন্ধ শেষ হওয়াতে, তিনি স্পেনের রাজসভায় এই দুই রাজ্যের মধ্যে আবার শান্তির বন্দোবস্ত করতে প্রেরিত হন। এই সময় মাদরিদে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত স্পানিস চিত্রকর Velazquerএর সঙ্গে দেখা হয়। স্পেন থেকে পরে তিনি ইংলণ্ডের রাজসভায় শান্তি স্থাপনার জন্যে সন্ধির দূত হয়ে প্রেরিত হন। এই দুই রাজ-সভাতেই তিনি খুব সম্মানিত হয়েছিলেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Master of Arts উপাধি দেন।

১৬২৬ সালে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তার চার বছর পরে তিনি হেলেনা ফুরমেণ্ট (Helena Faurment) নামে একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ৫৩ বৎসর। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধুকে এক চিঠি লিখেছিলেন,—স্ত্রীহীন জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব দেখে, আমি আবার বিবাহ করছি। আমি যাঁকে বিবাহ করব তিনি মধ্যবংশীয়া, আমার মত চিত্রকরকে তাঁর বিবাহ করতে কোন সম্মানের হানি হবে না।

হেলেনার প্রভাব তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের অনেক চিত্রে দেখতে পাই। তাঁর এই দ্বিতীয় পক্ষের স্থূলকায়া সুন্দরী স্ত্রীকে তিনি কত বিচিত্ররূপে এঁকে আনন্দ পেয়েছেন। কখনও সুন্দর বসনাবৃতা, কখনও নগ্না,—কখনও সাধ্বীরূপে, কখনও

লালসাময়ী নারীরূপে! কিন্তু সব চিত্রেই সেই রক্তমাংস-বহুলা স্থূলকায়া শান্তিময়ী নারীর রূপের আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই স্থূলকায়া নারী আঁকার আনন্দ তাঁর প্রায় অনেক



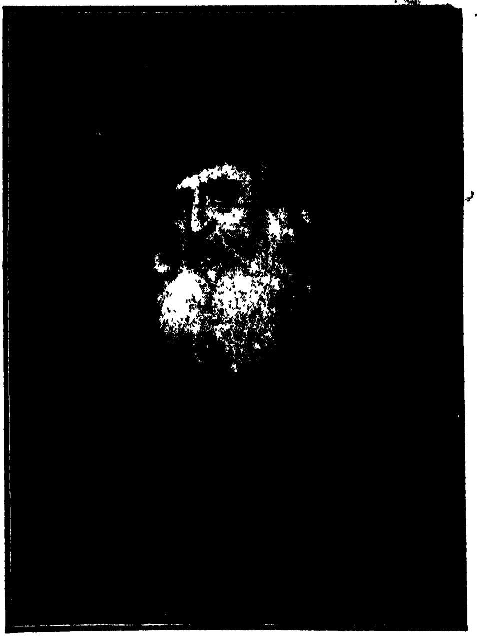
সাসকিয়া ফুল-হস্তে (রেমব্রাণ্ট)

ছবিতে দেখা যায়। রক্তমাংসবহুলা মূর্ত্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য অনেকে তাঁর আর্টকে উঁচু স্থান দেয় নি। কিন্তু রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষার মত, কূলে কূলে ভরা শরতের স্রোতস্বিনীর মত পূর্ণ যুবতীর নিটোল সুন্দর তনু এমন করে তাঁর মত কে আঁকতে পেরেছে; পূর্ণ মুঞ্জরিত কৃষ্ণচূড়ার মত এমন দেহের লাবণ্যকে কে তুলিতে চিরদিনের জন্য বন্দী করে রাখতে পেরেছে! অন্তরের উজ্জ্বল রক্তস্রোতের দীপ্তি যেন সমস্ত দেহ থেকে ফেটে পড়ছে;—এই রক্তমাংসের দ্যুতিকে অন্তরের স্বপ্ন ও বাসনার শিখার সঙ্গে মিশিয়ে এমন লাবণ্যময়ী যুবতী-তনু তাঁর মত কোন শিল্পী আঁকতে পারেনি।

ড্রেসডেনে 'স্নানের ঘরে বাথসেবা' (Bathseba) বলে একটি রংএ জলজল ছবি আছে। এটি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর ছবি, তাঁর শেষ বয়সের আর্টের রীতি অনুসারে আঁকা।

তাঁর ছবির রংএর মায়ায়, রক্তমাংসের দীপ্তিতে, বা তাঁর বিরাট পরিকল্পনায়, সুন্দর বৃহৎ মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মন মুগ্ধ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সব ছবি-ভরে উৎসবের সুর, আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে বলে রুবেন্স্ আমাদের প্রিয়। গম্ভীর শান্ত ফ্লেমিস আর্ট-ধারায় তিনি ইতালীয়ান আর্টের সৌন্দর্য্যের প্লাবন আনলেন। সুখদুঃখময় পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ, সূর্য্যালোকিত দিনের আনন্দ, পৃথিবীর রূপ ও রংএর মায়াপুরীতে মানব-জীবনের উৎসবের আনন্দ—এই প্রাণের প্রাচুর্য্যে, আলোর উজ্জ্বলতায়, আনন্দের দীপ্তিতে, রক্তমাংসের লাবণ্যে তাঁর চিত্রপট সুন্দর মধুর। সেইজন্য সেই মদ সৌন্দর্য্য-ধারা পান করে আমাদের নয়নযুগল তৃপ্ত হয়।

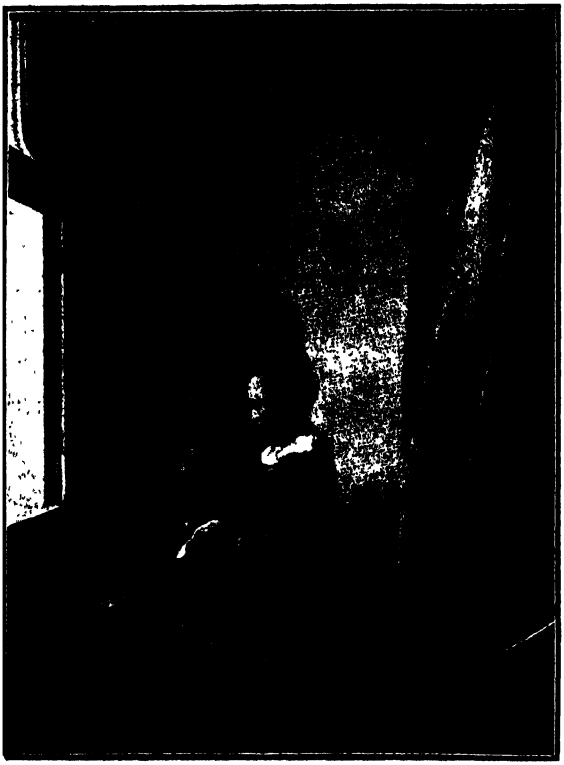
ডাচ আর্টিষ্টদের চিত্রে দেখতে পাই, তাঁরা যিশু-জীবন ছেড়ে মানব-জীবন আঁকতে আনন্দ পেয়েছেন। স্পেনের শাসন থেকে মুক্ত ক্যালভানিষ্ট হলাণ্ডের চিত্রকরেরা চার্চ্চের প্রভাব থেকে আর্টকে মুক্তি দিয়ে সরল সহজ দৈনন্দিন মানব-জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করলেন। তাঁদের লক্ষ্য ধর্ম্মভাবের দিকে তত নয়; নিখুঁত ছবি আঁকার আনন্দে তাঁরা বিভোর হয়ে গেলেন। এই নিছক ছবি আঁকা, Portrait



বৃদ্ধ (রেমব্রাণ্ট)

art তাঁদের বিশেষত্ব। সে ছবি কোন লোকের, কোন বাড়ীর, কোন পথের, কোন জন্তুর, প্রকৃতির কোন বিশেষ দৃশ্যের, কোন ফুল লতাপাতার, বা কোন মৃত-জন্তু-খাদ্যের,

বা বাড়ীর আসবাবের ইত্যাদি—মানবের সাধারণ জীবনের সকল জিনিস তাঁরা চিত্রকলার বিষয় করে তুল্লেন,—তা শুধু



বিলাসিনী (ভারমেয়ার)

যিশু ও মেরীর জীবনে, সাধু সাধ্বীদের চিত্রে আবদ্ধ রইল না। ছবির বিষয় যাহাই হোক, তার কাজ নিঁখুত হওয়া দরকার, তা বাস্তব বর্ণোজ্জ্বল হওয়া দরকার। একটি ভিক্ষুক, একটি উইণ্ড মিল, নদীর ধার, টেবিলে সাজান খাবার, মাংস, ফলের দোকান, শিল্পীর নিজের ছবি, তাসখেলা'ত ঝগড়া, ইত্যাদি জীবিত ও মৃত প্রকৃতির সকল রূপ, মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের ক্ষণ—সকল রকম ছবি,সপ্তদশ শতাব্দীর হলাণ্ডের চিত্রকরদের আঁকা দেখতে পাই। প্রায় সকল ডাচ চিত্রকরের কয়েকখানি করে ছবি চিত্রশালায় আছে। ইতালীর চিত্রশিল্পীদের ঘরগুলি দেখে, এই চিত্রকরদের ঘরে এসে ঢুকলে মনে হয়, পবিত্র গম্ভীর মন্দির থেকে মানব-জীবন-কল্লোলময় রাজপথে এলুম, স্বর্গের স্বপ্ন থেকে পৃথিবীর দুঃখ স্নেহ-ভরা কোলে এলুম।

'হলাণ্ড'-ভ্রমণ কাহিনীতে আমি রেমব্রাণ্টের কথা বলেছি. তাঁর ও তাঁর তরুণী স্ত্রীর যে মিলন-উৎসবের ছবি তিনি এঁকেছিলেন, তার কথাও লিখেছি। সেই আলো-ছায়ার যাদুকর সোণা-রংএর মায়াবীর আরো কয়েকখানি ছবি চিত্রশালায় আছে। তাঁর স্ত্রী সাস্কিয়ার আরও দু'খানি ছবি আছে। শিল্পী-দম্পতীর ছবির তরুণী স্ত্রীকে এখানে বর্ষীয়সী নারীরূপে দেখতে পাই। আর একটি ছবিতে হাতে লাল ফুল। শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের ছবিটি গম্ভীর, মহান, সুন্দর,—তুষারাবৃত প্রাচীন কোন পর্ব্বতের মত। রুবেন্সের সঙ্গে রেমব্রাণ্টের তুলনা করলে তাঁর আর্টের বিশেষত্ব বেশ বোঝা যায়। রুবেন্সের চিত্র জীবনের আনন্দভরা। সেখানে রং ফেটে পড়ছে। তাঁর বাণী সহজ সরল; ছবিতে পূর্ণ প্রকাশিত। কিন্তু রেমব্রাণ্টের ছবি কল্পনার রোমান্সভরা, সেখানে আলো-অন্ধকারের মায়া। সেখানে রহস্য, জীবনের শক্তি ও শান্তি মিশে গেছে। তাঁর ছবি যা প্রকাশ করে তার বেশী প্রকাশ করে না। তার রহস্যময় গভীর বাণী শুধু নয়নের উপভোগে নয়—অন্তরের উদাসতায়, বেদনায়।

ভারমেয়ার (Vermeer)এর পত্রপাঠনিরতা



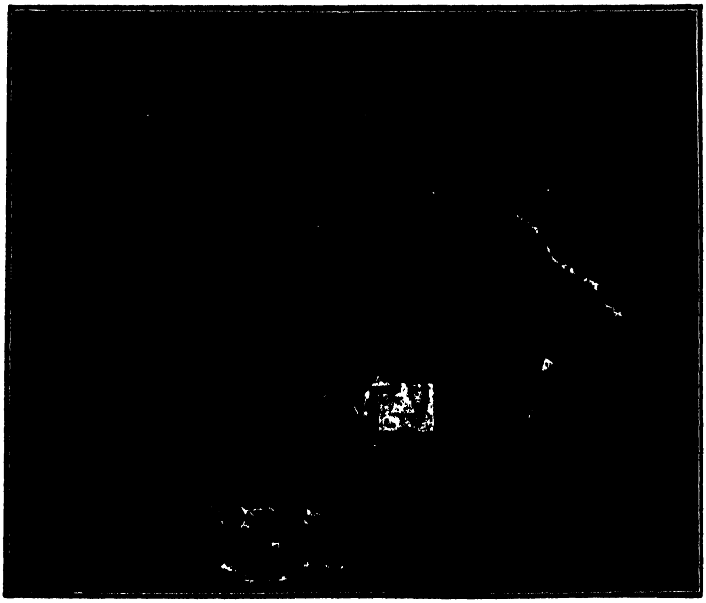
পত্রপাঠ-নিরতা তরুণী (ভারমেয়ার)



সাধুর প্রার্থনা (ডু)

তরুণীর ছবিটি আমাদের মুগ্ধ করে। ভারমেয়ার (১৬৩২-১৬৭৫) হলাণ্ডে ডেল্‌ফ্‌ট সহরে জন্মেছিলেন। সেইখানে তাঁর সারাজীবন ছবি এঁকে কেটেছে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জীবিতকালে বা পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ভাল চিত্রকর বলে তাঁর কোন খ্যাতি-লাভ হয় নি। তাঁর নাম লোকে জানত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তিনি হলাণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর সব ছবির বিষয় ঘরোয়া,—সহজ মানব-জীবনের শান্ত সুখময় ক্ষণগুলির মূর্ত্তি—একটি মেয়ে চিঠি পড়ছে, কোন যুবক তার প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমালাপ করছে, কোন নারী প্রসাধনে ব্যস্ত,—এই রকম তাঁর ছবিগুলি। তাঁর সব ছবিতে শান্তির ভাব দেখা যায়,—কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, শান্তস্নিগ্ধ জীবনের একটু রঙীন টুকরো, সেখানে সুখ আছে কিন্তু মত্ততা নেই,—একবিন্দু অশ্রুজল আছে, হাহাকার নেই।

ভারমেয়ারের 'বিলাসিনী' বা বারবনিতার ছবিটি তাঁর তরুণ বয়সের আঁকা। ছবিটিতে রংএর সমাবেশ সুন্দর। মদের পাত্র হাতে মেয়েটির বডিসের রং হচ্ছে হলদে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি তাকে পয়সা দিচ্ছে, তার টক্‌টকে লালকোট ও ধূসর রংএর টুপি। মনে হচ্ছে—যেন একটা আগুনের শিখা হলদে লালে ছড়িয়ে পড়ে ওপরে কালো ধোঁওয়াতে মিশে যাচ্ছে। যুবকটির পেছনে যে বুড়ী মাথা বাড়িয়ে দেখছে—যুবকটি কত টাকা দিচ্ছে, তার রং হচ্ছে কালো, যেন জলন্ত অঙ্গারের পাশে কালো কয়লা। তার পাশে আর একটি বীণা-বাদক (lute-player)



সমাধিক্ষেত্র (রয়েসডাল)

—সাদা ও স্নিগ্ধ নীলে আঁকা,—তার হাতের গ্লাসের মদ রাঙা টকটকে। মেয়েটির পায়ের ওপর যে রাগ্ রয়েছে,



প্রেমিক যুগল (মেট্সু)

তাতে এই লাল হলদে নীল কালো সব রংগুলি গিয়ে ছন্দের তালে মিলেছে। ধূমের মত ধূসর পটভূমিকায় এই কাঁচা সোণার হল্‌দে ও রক্তের লাল রংএর সমাবেশে ছবিটি সুন্দর।

ভারমেয়ারের অঙ্কন রীতির সঙ্গে রেমব্রাণ্টের অঙ্কন-রীতির একটা তুলনা করা যায়। রেমব্রাণ্ট পটভূমিকে ঘন কালো করেন,—সে যেন ঝড়ের মেঘের মত কালো। সেই কালোর মাঝে বিদ্যুতের ঝিলকির মত দীপ্ত তিনি সমস্ত মূর্ত্তিকে স্পষ্ট করেন না। তিনি যেটুকু দেখাতে চান, তাই আলোয় ভরে দেন।

ভারমেয়ারের পটভূমিকা ঘন কালো নয়,—তা হাল্কা রংএর। সেই ধূসর পটভূমিকায় চারিদিক থেকে আলো এসে উজ্জ্বল করে। আর সেই আলোর মুখে আলো-ছায়া-মণ্ডিতা হয়ে তাঁর মূর্ত্তি আঁকা। 'পত্রপাঠনিরতা তরুণী' ছবিতে তাঁর এই রকম অঙ্কন-প্রণালী দেখ্তে পাই। পেছনের দেওয়াল ও পর্দ্দা, জানালা হতে আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়েছে, তার মুখে তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। রেমব্রাণ্টের ছবি হচ্ছে অন্ধকার ঘরে প্রদীপের শিখা, ভারমেয়ারের ছবি হচ্ছে আলোর ঝর্ণার সম্মুখে অন্ধকার ছায়া।

রেমব্রাণ্টের ছাত্রদের মধ্যে জেরাড ডু'র (Gerad Dou) কয়েকখানি ছবি আছে। অবশ্য তাঁর চিত্রে রেমব্রাণ্টের বিশেষ ধরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে নিখুঁত কাজ করতে, ছবিতে বাস্তবতার সচল সূক্ষ্ম স্পর্শ ভরে দিতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন।

লিডেনে তাঁর জন্ম হয় (১৬১৩-১৬৭৫)। তাঁর বাবা কাঁচের ওপর এনগ্রেভিংএর কাজ করতেন এবং সেই কাজ তাঁর ছেলেকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁর এই শিক্ষার



খাবার (হেডা)

জন্তেই তাঁর চিত্রে অতিসূক্ষ্ম নিখুঁত কাজ পাই। এ জন্য তাঁর খুব নাম হয়েছিল। তাঁর ছবি হলাণ্ডের গভর্ণমেন্ট নানা দেশের রাজাকে উপহার পাঠাতেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের নিকট প্রেরিত একখানি ছবি সম্বন্ধে Evelyn তাঁর ডায়েরীতে লিখে গেছেন, 'Painted by Dou so finely as hardly to be distinguished from enamel'.

'জানালায় বেহালা-বাদক' ও 'সাধুর প্রার্থনা' বলে ডু'র দুখানি ভাল ছবি চিত্রশালায় আছে। জানালার সামনে কোন মূর্ত্তি আঁকা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। দেখলে মনে হয়—

ভেলভেটের মধ্যে জলজ্বল করছে। তার পাশে যুবকটির সাজের ট্যান ও নীল রং ধীরে মিলিয়ে গেছে। মিট্সুর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যুবাবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ছবিটি প্রায় ত্রিশবছর বয়সের সময় অঙ্কিত। মেয়েটির মুখ স্নিগ্ধ গম্ভীর, কিন্তু তার পাশে যুবকের আনন্দদীপ্ত মুখ ছবিখানিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

ব্রাউভেয়ারের (Adriaen Brouver) 'তাসখেলায় মারামারি' ছবিটিতে আমরা ডাচ আর্টে বাস্তবতার চরম দেখতে পাই। কিন্তু ছবিটিতে বিশেষ অঙ্কন-প্রতিভার পরিচয়ও আছে। ধূসর পটভূমিকায় স্নিগ্ধ দীপ্ত রংএর ছন্দে ছবিটি সুন্দর।



'ওয়াটার মিল' (হবেমা)

যেন তিনি পথে যেতে যেতে এই ছবিটি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর নিখুঁত কাজ দেখে বোঝা যায়, আঁকতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

মেটস্থ (১৬৩০-'৬৬৭) ছিলেন ডু'র শিষ্য। লিডেনে তাঁর জন্ম হয়, আমষ্টারডামে তাঁর জীবন কেটেছিল। তাঁর 'প্রেমিকযুগলের লাঞ্চ' ছবিটি দেখে রেমব্রাণ্টের 'শিল্পীও তাঁর স্ত্রী' ছবিটি মনে পড়ে। আমষ্টারডামে তিনি রেমব্রাণ্টের আর্টের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। হয় ত সে ছবি দেখেই এ ছবি আঁকা। ছবিখানিতে মেয়েটির সজ্জার লাল রং কালো

চিজের (cheese) জন্য প্রসিদ্ধ হারলেমে (Haarlem) ব্রাউভেয়ারের জন্ম হয় (১৬০৬-১৬৩৮)। তাঁর মা সহরের লোকেদের সাজসজ্জা তৈরী করতেন। ছেলেবেলা থেকে ব্রাউভেয়ার তাঁর মাকে পোষাক কাটতে, ফুলের প্যাটার্ন আঁকতে সাহায্য করতেন। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্স হাল্স্ বালক ব্রাউভেয়ারের অঙ্কন-প্রতিভা দেখে, চিত্রকররূপে শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁকে আপন ষ্টুডিওতে নিয়ে আসেন। কিন্তু এখানে ব্রাউভেয়ারের জীবন সুখের হয়নি। একবার তিনি পালিয়ে ক্যাথিড্রেলের পিয়ানোর তলায় লুকিয়ে

থাকেন। কিন্তু আবার হাল্‌সের কাছে ফিরে যেতে হয়। হাল্‌স্ নিজে আমোদপ্রিয়, বিলাসী ছিলেন,—কাফে, নৃত্যশালার জীবন ভালবাসতেন। তাঁর শিষ্যও বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। ছবি এঁকে যা পেতেন, তা মদ খেয়ে, জুয়া খেলে খরচ হত। এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য একবার তাঁকে জেলেও যেতে হয়। তিনি যে সব মাতলামি, জুয়াখেলা, নীচলোকদের কাফে বা নৃত্যশালার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দৃশ্য



জানালায় বেহালাবাদক (ডু)

এঁকেছেন, তা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আঁকা। তাঁর ছবির বিষয় উচ্ছৃঙ্খল বা বীভৎস হলেও, তাঁর বর্ণের মায়ায়, আমরা ছবির কদর্য্য বিষয় ভুলে গিয়ে রংএর লীলায় মুগ্ধ হই। 'মারামারি' ছবিটিতে মত্ত জন্তুর মত দুটি যুবার মারামারি চোখে পড়ে না, তাদের স্নিগ্ধ হলদে সবুজ নীল রংএর মায়ায় চোখ তৃপ্ত হয়।

সতের শতাব্দীর হলাণ্ডের প্রকৃতির চিত্রকরদের মধ্যে রয়েসডালকে (Jakob Van Ruisdael) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। ইনিও হারলেমে জন্মান (১৬১৮-১৬৮২)। তাঁর খুড়ো একজন চিত্রকর ছিলেন,—তাঁর কাছেই তাঁর ছবি আঁকার হাতে-খড়ি হয়। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকে বলেন, তিনি বিবাহ করেন নি, তাঁর জীবন খুব দুঃখ-দারিদ্র্যের ছিল। তাঁর জীবিতকালে তাঁর ছবির কোন আদর হয়নি। হাঁসপাতলে তাঁকে মরতে হয়। তাঁর এই আত্মার বেদনা, এই জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের ছায়া তাঁর প্রকৃতির ছবিগুলিতেও দেখতে পাই। রসিক সৌন্দর্য্যভোগী পথিকের মত তিনি প্রকৃতির চঞ্চল দৃশ্য উপভোগ করে তার সুন্দর রূপ আঁকেন নি,—তাঁর প্রকৃতি গম্ভীর বিষাদময়ী। প্রকৃতির কোন দৃশ্য যেন তিনি দীর্ঘকাল ধরে দেখেছেন, তাতে আপন অন্তরের বিষাদের করুণ ছায়া মিশিয়ে দিয়েছেন, তার পর পরম ধৈর্য্যের সহিত এঁকেছেন। আকাশ গম্ভীর বিষাদময়, গাছগুলি অতি পুরাতন বৃদ্ধ, ঝড়ের বাতাসে ক্ষুব্ধ, জল চঞ্চল অশান্ত—প্রকৃতির ভীমগম্ভীর রূপ তাঁর ছবিতে দেখি।

'ইহুদীদের সমাধিক্ষেত্র' বলে তাঁর যে ছবিখানি চিত্রশালায় আছে, তাতে তাঁর এই বিষণ্ণ নির্জ্জন মনের বিষণ্ণ ভাবের একটি মূর্ত্তি পাই। তাঁর এক একটি ছবি যেন তাঁর এক একটি moodর রূপক। এ ছবিখানি আমষ্টারডামের সমাধিক্ষেত্র দেখে আঁকা। একটি নির্জ্জন ঔদাস্যময় যায়গা, অনেক সমাধি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কেউ যত্ন করে না। তার পাশ দিয়ে একটি উন্মত্তা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছে; কোথাও সমাধি ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে; এ পবিত্র স্থানের প্রতি কোনরূপ মমতা নেই। একটা ঝড় হয়ে গেছে, ভাঙা গির্জ্জার ওপর এখনও কালো মেঘ পুঞ্জীভূত, জীর্ণ গাছটি এখনও বাতাসে কাঁপছে, কিন্তু দূরে রামধনুর একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত ছবি শূন্যতা, নির্জ্জনতা ও বিষাদভরা। কিন্তু তাঁর ছবির একটি রহস্যময় সৌন্দর্য্য আছে—শিল্পীর মনের সহিত

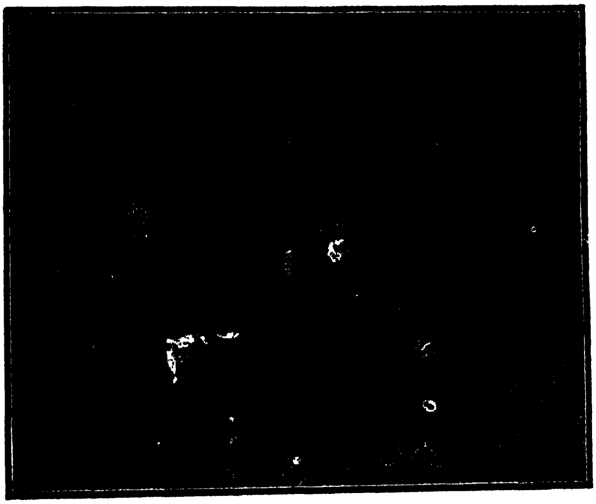
আমাদের মনও গম্ভীর মহান প্রকৃতির পূজায় যোগদান করে।

হলাণ্ডের প্রকৃতির দৃশ্য আঁকতে রয়েসডালের পর হবেমার স্থান (Hobbema)। তাঁর জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি বোধ হয় আমষ্টারডামে জন্মেছিলেন (১৬৩৮-১৭০৯)। আমষ্টারডামের বুর্গোমাষ্টারের একটি দাসীকে বিবাহ করেন, এবং সামান্য মাহিনার কাজ পান। তাঁর জীবনও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। তাঁর সময়ে তাঁর ছবির কোনই আদর হয় নি, ক্রেতা মিলিত না। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর আবিষ্কার ও নাম হয়।

তাঁর ছবিতে আমরা হলাণ্ডের স্বাভাবিক সুন্দর রূপ দেখতে পাই। সে স্নিগ্ধ, শান্ত, চিরপরিচিত হলাণ্ডের ছবি। তাঁর প্রকৃতি স্বাভাবিক আনন্দময়ী। ছোট খাল, তার স্থির স্বচ্ছ জলে উজ্জ্বল নীলাকাশের ছায়া পড়েছে। খালের ধারে ছোট লাল-টালি-ছাওয়া বাড়ী। তার পেছনে ওয়াটার-মিল বা জলচালিত যন্ত্র ধীরে ঘুরছে। গাছের সারি মৃদু বাতাসে দুলছে। হলাণ্ডের পরিচিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি।

হবেমা'র 'ওয়াটার-মিল' বলে একটি ছবি চিত্রশালায় আছে, তার স্নিগ্ধ সবুজে ও স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীলে মন মুগ্ধ করে।

আর একটি ছবির কথা বলে হলাণ্ডের চিত্রকরদের কথা শেষ করি। হেডার (Heda) লাঞ্চ বা খাবারের ছবিতে ডাচ চিত্রকরদের 'Nature morte' বা মৃত প্রকৃতির ছবি আঁকবার রীতির পরিচয় পাই। কাচের পেয়ালায় মদ থেকে ডিস চামচ খাবারের জিনিস সব রংএ জ্বলজ্বল টলমল করছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সত্যিকার একটি খাবার টেবিল সাজান—প্রত্যেক জিনিষ, স্বাভাবিক রংএ নিখুঁতভাবে আঁকা। এই বাস্তবতার সুর, রংএর অপূর্ব্ব দীপ্তি ও সমাবেশ নিখুঁত কাজ,—মানব-জীবনের সকল বস্তু ও দৃশ্যকে আর্টের আলোয় পূজা করা—এই হচ্ছে ডাচ আর্টের বিশেষত্ব।



তাসখেলায় মারামারি (ব্রাউভেয়ার)

ড্রেসডেন চিত্রশালার কতকগুলি প্রধান পুরাতন চিত্রের কথা বল্লুম। অনেক বাদ গেল। স্পানিস চিত্রকরদের কথা, ফরাসী চিত্রকরদেব কথা, পুরাতন জার্ম্মান চিত্রকরদের কথা বাদ গেল। ইয়োরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের মনে ঔৎসুক্য জাগানই হচ্ছে আমার ইচ্ছা। তাঁরা এ বিষয় ইয়োরোপীয় আর্টের ইতিহাস পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে দেখবেন।

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজার ছুটি আসন্ন। পরাণ-বাবুর আপিসে সাহেব কর্ত্তাদের মঞ্জুরী ছুটি মাত্র চার দিন। পরাণ-বাবু কর্ম্মচারীদের ভাগাভাগি ক'রে আরও বারো দিন ছুটি দিয়ে থাকেন; অর্দ্ধেক লোক দশমীর পরে বারো দিন ছুটি ভোগ করে এবং তারা ফিরে এলে বাকী অর্দ্ধেক ছুটি পায়। যাদের বাড়ী মফস্বলে দূরে, তারা প্রথম বারো দিন ছুটি নিয়ে থাকে।

রামযাদু থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হে থাকোবাবু, ছুটিতে বাড়ী-টাড়ী যাচ্ছো না কি?

থাকোহরি একটু বিষাদাচ্ছন্ন কুণ্ঠিত স্বরে লজ্জিত হাসিমুখে বল্‌লে—আমার আবার বাড়ী! আমার বলে—

চাল না চুলো
ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি!

রামযাদুর পরদুঃখ-কাতর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো, চোখ ছলছল কর্‌তে লাগলো; সে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—ঈশ্বর তোমার ভালো কর্‌বেন। যে মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছো, তাতে তুমি অচিরেই বাড়ী-জুড়ী ক'রে স্বাধীন হতে পার্‌বে। আর এই বাড়ীই তো এখন তোমার বাড়ী!

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ, সমস্তই আপনার আশীর্ব্বাদে হয়েছে; যা হবে তাও আপনার আশীর্ব্বাদেই হবে। কর্ত্তা আর গিন্নি-মা আমাকে নিজের ছেলের মতনই ভালোবাসেন; আমার কোনো অভাব নেই আপনার আশীর্ব্বাদে।

রামযাদুর স্বভাবটা একটু জটিল রকমের; সে লোকের দুঃখে ব্যথিত হয়, আবার কারো ভালো দেখ্‌লেও সে সহ্য কর্‌তে পারে না। থাকোহরির কোনো অভাব নেই শুনে রামযাদু প্রফুল্ল হয়েও একটু ঈর্ষা বিদ্ধ হয়ে বল্‌লে—বেশ্, বেশ্! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ ব'য়ে থাকেন। তা হলে তুমি এখানেই থাক্‌ছো? তবে তুমি শেষের দিকে ছুটি নেবে?

থাকোহরি বল্‌লে—আজ্ঞে না, কর্ত্তা কাশী যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন বল্‌ছেন।

—তা হলে তোমার মা-ঠাক্‌রুণও তীর্থ কর্‌তে যাচ্ছেন?

—না। মা তো এখানে নেই। আমরা এ বাড়ীতে আসার দিন পনেরো পরেই দেশে চ'লে গেছেন,...

রামযাদুর সকল আন্দাজ ভণ্ডুল হয়ে গেলো; থাকোহরির মা যদি এখানে না থাকে তবে থাকোহরির এমন রাজার হালে থাকার হেতু কি? বিস্ময়ে কৌতূহলে রামযাদুর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো।

রামযাদুর চক্ষু কৌতূহলে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো দেখে থাকোহরি বল্‌তে লাগলো—আমার এক মামা আছেন, তাঁর হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়েছে, মামী-মার ছেলে হয়েছে, তাই মাকে সেখানে যেতে হয়েছে।

রামযাদু চিন্তাসাগরে তলিয়ে যেতে যেতে শুধু বল্‌লে—ও!

সে থাকোহরিকে আর কিছু না ব'লে পরাণ-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে তাঁর বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগলো—আমি যা আন্দাজ ক'রেছিলাম তা তো নয় দেখ্‌ছি। তবে? এই ছোঁড়াকে এমন তোয়াজ কর্‌বার হেতু কি?

চতুর রামযাদুর তৎপর বুদ্ধি এইখানে সমস্যায় ঠেকে আট্‌কে গেলো। সে সমস্যার কোনো কিছু মীমাংসায় উপনীত হবার আগেই পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তাকে দেখ্‌বামাত্রই পরাণ-বাবু তাকে সম্ভাষণ ক'রে অভ্যর্থনা কর্‌লেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়, আস্‌তে আজ্ঞা হোক। প্রণাম হই!

পরাণ-বাবু মুখে মাত্র প্রণাম শব্দ উচ্চারণ কর্‌লেন, কিন্তু সেই প্রণাম-বোধক মাথা নত করা বা হাত তুলে কপালে ঠেকানো বা আর কোনো রকম অঙ্গ-চেষ্টা কিছুমাত্র প্রকাশ কর্‌লেন না। ব্রাহ্মণকে ভক্তি-বশতঃ তাঁর এই প্রণাম নয়; এই প্রণামের মধ্যে নিম্ন জাতিতে জন্মলাভের লজ্জা, নিজেকে বিনীত বলিয়া প্রকাশ করিবার অহঙ্কার

এবং নিজের পদমর্য্যাদার ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে সচেতনত্ব সম্মিলিতভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

পরাণ-বাবু প্রণাম বাক্য উচ্চারণ করতেই রামযাদু বল্‌লে—আপনি প্রণাম করলেই আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!......

পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চাপা হাসি ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে পড়্‌বার চেষ্টায় ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া ফুলে উঠলো; তিনি রামযাদুর তোষামোদ শোন্‌বার আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঘরের সকল লোকই উৎসুক দৃষ্টি রামযাদুর মুখের উপর স্থাপন করলে।

রামযাদু বল্‌তে লাগলো—আপনি কলিকালে ভগবান বিষ্ণুর একাদশ অবতার! মহাপুরুষ! পতিতপাবন! অগতির গতি! আপনি কাউকে প্রণাম করলে তার পাপ হয়। আপনাকে কী ব'লেই বা আশীর্ব্বাদ করবো? কিসের অভাব আছে আপনার? ইহ-পরকাল তো কর্ম্মে ও পুণ্যে জয় ক'রে ব'সে আছেন! ভগবান বিষ্ণু যেমন ভৃগুর পদাঘাত বক্ষে ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বাড়িয়েছিলেন, আপনিও তেমনি নিজে পরমপুরুষ হয়েও ব্রাহ্মণকে বাড়াচ্ছেন। আপনার যখন লীলা যে আমি বড়ো হই, তখন আমি সাহস ক'রে আশীর্ব্বাদ করি......

পরাণ-বাবু ও সমবেত লোকদের দৃষ্টি আর একটু আগ্রহান্বিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রামযাদু বল্‌লে—আপনি আরো বেশী ক'রে আমাদের মতন অভাজনদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, আমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

রামযাদুর এই বাক্‌পটুতায় পরাণ-বাবু খুশী হলেন; উপস্থিত উমেদারেরা খুশী হলো।

পরাণ-বাবু নিজের প্রশংসাটুকু শুনে নেন, কিন্তু তার অধিক আলোচনার অবসর দেন না; তিনি যে তোষামোদে তুষ্ট হয়েছেন এমন আভাসও প্রকাশ করেন না। চাটুবাদ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর কথা পেড়ে সেই প্রশংসার প্রসঙ্গ চাপা দেন। রামযাদুর বক্তৃতা বিরত হতেই পরাণ-বাবু বল্‌লেন—ছুটিতে বাড়ী যাবেন নাকি মুখুজ্জে মশায়?

রামযাদু একটি চেয়ারে উপবেশন ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ষষ্ঠীর দিন রাত্রের গাড়ীতেই......

—কিন্তু এ সময় তো আপনাদের দেশে বিষম ম্যালেরিয়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিই তো আমাদের যশোরে; দেশ-মাতা কি নিজের সন্তানের মমতা ত্যাগ করতে পারেন—সে সন্তান এখন যতোই বড়ো আর বিখ্যাত হোক না কেনো।

রামযাদুর বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হয়ে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়, ম্যালেরিয়াতে ভুগ্‌ছেন, এ অবস্থায়......

—তা বটে, কিন্তু অনেক দিন ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখি নি......

পরাণ-বাবু হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন—ছেলে-মেয়ের মা ও মেঘদূত হংসদূত পবনদূত প্রেরণ করছেন!

উপস্থিত একজন তিলক-কণ্ঠি-ধারী মুণ্ডিত-মস্তকে স্থূল-শিখা-ধারী বৈষ্ণব ব'লে উঠলো—পদাঙ্ক-দূতটাই বা বাদ যায় কেনো?

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উঠলো, সে অ্যাঁ ওঁ ক'রে বল্‌লে—আমাদের সে রসের বয়েস ব'য়ে গেছে...... এখন অন্ন-চিন্তা চমৎকারা! আধ দর্জ্জন ছেলে-মেয়ের চ্যা-ভ্যাঁ'র মধ্যে কি আর কবিত্ব জমে? তার উপর নিত্য চিন্তা কোন্ ছেলেটা কখন বা শিঙে ফোঁকে!......

হাস্যরসটা করুণরসে পরিণত হচ্ছে দেখে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনি বাড়ী গিয়েই বিজয়া-দশমীর দিনই বা কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার দিনই সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় চ'লে আসুন। ঐ দিন তো শুভযাত্রা, পাঁজি দেখ্‌বার দরকার হবে না।

রামযাদু হতাশ-ভাবে বল্‌লে—এতো বড়ো সংসার নিয়ে কল্‌কাতায় বাস করা কি মুখের কথা! বাড়ীভাড়া দিতে আর ছেলেদের দুধ কিন্‌তেই তো সব কটি টাকা উবে যাবে......

একজন লোক বল্‌লে—আপনি আর কটি টাকা বল্‌বেন না রাম-বাবু; কর্ত্তার কৃপায়......

রামযাদু বক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—কর্ত্তার কৃপায় আমি আমার যোগ্যতার অতিরিক্ত আশাতীত বেতন পাই সত্য, কিন্তু আমার খরচ অনেক......

তার পর সে পরাণ-বাবুর দিকে ফিরে বল্‌তে লাগলো—আমার পিতার মুনিব আর আমার বাল্যের সাহায্যদাতা কিরণ-বাবুর বিধবা নিরাশ্রয় স্ত্রীকে মাসে মাসে মাসহারা দিতে হয়; আমার পিতার আর কিরণ-বাবুর কিছু ঋণ আছে, তাও মাসে মাসে শোধ করতে হচ্ছে; কিরণ-বাবুর মেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, কিরণ-বাবুর স্ত্রী চিন্তিত হয়ে চিঠি লিখেছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের ভারও আমাকে নিতে হয়েছে······

রামযাদুর কথায় মুগ্ধ হয়ে পরাণ-বাবু গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়, মহাপুরুষ আমি, না আপনি? আমি পরের ধনে পোদ্দারী করি—পরের আপিসে চাকরী ক'রে দি, নিজের এক কড়া খরচ করি কি? কিন্তু······যাক সে কথা, আপনাকে প্রশংসা ক'রে আপনার সাত্বিক দানের অমর্য্যাদা করবো না।······আপনি আপনার পরিবার নিয়ে কল্‌কাতায় চ'লে আসুন, আপনার কিছু ভাব্‌তে হবে না। আপনি পরের ভাবনা ভাবুন, আপনার নিজের ভাবনার ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন ··

রামযাদু আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—থাকো-হরির মতন আমিও সপরিবারে আপনার বাড়ী দখল ক'রে বস্‌বো নাকি?

পরাণ-বাবু হাসিমুখে বল্‌তে লাগলেন—আপনি ব্রাহ্মণ না হলে সে ব্যবস্থাও হতে পার্‌তো······আমার এতো বড়ো বাড়ী, আর আমরা তিনটি প্রাণী, আমরা বাড়ীর এক টেরে প'ড়ে থাকি, আর একটা পরিবার স্বচ্ছন্দে এই বাড়ীতে আঁটে। কিন্তু আপনাকে তো এমন অনুরোধ করতে পারি নে।······আমার শিক্‌দার-বাগানের বাড়ীর ভাড়াটে উঠে গেছে; আমি আর সে বাড়ী ভাড়া দিই নি; মেরামত চুনকাম করাচ্ছি আপনারই বাসের জন্যে। আপনি পরিবার নিয়ে চ'লে আসুন, ততো দিনে মেরামত হয়ে যাবে।······আর আমার একটা গোরুর সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছে, সের দশ-বারো দুধ দিচ্ছে; দুধ খাবার লোক আমার বাড়ীতে তো এক কৃষ্ণকলি; কিন্তু সে তো তার মার সঙ্গে কালীপূজা পর্য্যন্ত কাশীতেই থাকবে; কিছুদিন গোরুটা আপনার কাছেই রেখে দেবো ভাবছি।

রামযাদু আশাতীত লাভের আনন্দে অভিভূত হয়ে অবাক্ হয়ে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার দুই চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

একজন লোক রামযাদুর সৌভাগ্যোদয় দেখে আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে পরাণ-বাবুকে বল্‌লে—আপনি আমাকে একখানা বাড়ী ক'রে দেবেন আশা দিয়েছিলেন......

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—পরাণ বিশ্বাসকে বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা কোরো, পরাণ বিশ্বাস কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

সেই লোকটি মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—মিষ্টার দত্ত-গুপ্তর বাড়ী হলো, দ্বিপেন হাজরার বাড়ী হলো···

পরাণ-বাবু হাসি চেপে গাম্ভীর্য্যের ভাণ ক'রে বল্‌লেন—তুমি আমার কাছে কতো দিন আস্‌ছো?

—আজ্ঞে ন-অ ব চ্ছ-র!

—দত্তগুপ্ত আমার কাছে আস্‌ছে চোদ্দ বচ্ছর, আর হাজরা আস্‌ছে তেরো বচ্ছর! তা হলে তোমার আরও চার বচ্ছর আস্‌তে হবে।

লোকটা এই বিলম্বের কথা শুনে দ'মে গেলো, সে নিতান্ত নির্লজ্জের মতন বল্‌লে—কিন্তু মুখুজ্জে মশায় তো······

পরাণ-বাবু এবার সত্যই গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—মুখুজ্জে মশায়ের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর মতন গুণ তোমাদের কারো নেই।····· যাক, Comparison is odious, তুমি তিসি আর শোরগোজা জোগাবার কনট্রাক্টের টেণ্ডার দিয়েছো তো? তুমিই অর্ডার পাবে, আর তাতেই তোমার বাড়ী হয়ে যাবে। কেমন, হবে না?

—আজ্ঞে, আপনার কৃপা থাক্‌লে তা হবে।

—আচ্ছা, তবে যাও······

পরাণ-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরের সকল লোকই এক স্প্রিং-টেপা পুতুলের মতন উঠে দাঁড়ালো এবং একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌লো। রামযাদু আর তিসির কনট্রাক্টর আপন আপন সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হলেও পরস্পরের প্রতি ঈষৎ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ অনুভব করছিলো, তাদের দুজনেরই মনের ভাবটা যেনো ঐ অপর ব্যক্তিটা কিছু না পেলে তার নিজের পাওনাটা হয়তো বেশী হতো। আর যারা আজ বিফল-মনোরথ হয়ে ফির্‌লো তারা ঐ দুজনের

সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত, নিজেদের নিষ্ফলতায় ক্ষুণ্ণ এবং ভবিষ্যতের আশায় লুব্ধ হয়ে বিদায় হলো।

রামযাদু অপ্রত্যাশিত লাভের অতি-আনন্দে থাকো-হরির সৌভাগ্য-সমস্যার কথা একদম ভুলেই গেলো।

*

* *

রামযাদু গ্রামের বাড়ীর দাওয়ায় মাদুর পেতে ব'সে তার বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে প্রেরিত কবিতার খাতার স্তূপ থেকে কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করবার সন্ধান করছে। সত্যদাস দত্ত নামক একটি লোকের খাতার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে রামযাদু বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠছে—এমন একজন প্রকৃত কবি আজও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে! এ কেবল রামযাদুকে প্রসিদ্ধ ক'রে তোলবার জন্য ভগবানের লীলা! সত্যদাসের কবিতার ছন্দ যেমন নিখুঁত ও বিচিত্র, ভাষা তেমনি পরিমার্জ্জিত, শব্দবিন্যাস তেমনি যথাযথ, ভাব তেমনি কবিত্বময় ও নূতন, তার অভিমত সাহসী সত্যমূল দৃঢ়। রামযাদু একেই অর্জ্জুন ক'রে নিজে শিখণ্ডী হয়ে এর শাণিত কবিত্ব বাণে পরাণ-বাবুকে কাবু করতে হবে সঙ্কল্প স্থির করছে, এমন সময় একজন স্থূলকায় শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ধরণের ভদ্রলোক রামযাদুর উঠানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ে একটা খদ্দরের বেনিয়ান জামা একপাশে ফিতে দিয়ে বাঁধা, তার খাটো হাতায় হাতের তিন ভাগ ঢেকেছে; সেই বেনিয়ানের উপরে মোটা খদ্দরের একখানি চাদর; পরণে খদ্দরের সাদা ধুতি; পায়ে তালতলার সাদা চটি জুতা; বাঁ হাতে একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, তার স্থূল উদর বেষ্টন ক'রে একটি আধ-ময়লা লালপাড়-দেওয়া সাদা গড়ার গামছা বাঁধা, তাঁর ডান হাতে একটি ছাতা ও তর্জ্জনীতে সোনার তারের পুঁটে-দেওয়া একটা আংটি; তাঁর দাড়ি-গোঁপ কামানো; তাঁর মাথার চুল হয় খুব খাটো ক'রে ছাঁটা, নয় মাস খানেক আগে একেবারে মুণ্ডনের পর উদ্গত হয়েছে, একটি স্থূল শিখা গ্রন্থি-বদ্ধ হয়ে মাথার পিছনে গুটিসুটি হয়ে আছে, লম্বিত হয়ে দুলছে না।

রামযাদুর মুখ কবিত্বখ্যাতি অর্জ্জনের আশু সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার দৃষ্টির সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হওয়াতেই তার মনটা দ'মে গেলো, মুখ ম্লান গম্ভীর হয়ে উঠলো। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তটস্থ ভাবে দাওয়া থেকে নামতে নামতে মুখে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন……

এবং সে সেই বৃদ্ধের নিকটস্থ হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে পদধূলি নিতে নিতে বললে—আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক রামযাদুর গুরুদেব; তাঁর নাম রাজচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যারত্ন বললেন—কল্যাণ হোক বাবা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্, স্বধর্ম্মে মতি হোক।……এখন নলডাঙা থেকে আসছি।

রামযাদু প্রণাম ক'রে উঠে গুরুর হাত থেকে ব্যাগ ও ছাতা নিয়ে তাঁকে অগ্রসর ক'রে দাওয়ায় এসে উঠলো এবং ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ ছাতা রেখে একটা গালিচার আসন এনে পেতে দিলে।

বিদ্যারত্ন আসনে উপবেশন করলে রামযাদু চীৎকার ক'রে ডাক দিলে—ওরে বিমলী, এক ঘটী পা ধোবার জল নিয়ে আয়, গুরুদেব এসেছেন!

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ীর সব কুশল তো বাবা? ছেলে পিলে সব ভালো আছে?……বৌমার শরীর ভালো? ..

রামযাদু হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে বুকের কাছে তুলে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে!

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে বললেন—লোক-পরম্পরায় শুনলাম যে কলকাতায় তোমার উত্তম চাকরী হয়েছে…

রামযাদু বিষ্ণুর সম্মুখে গরুড়ের মতন, রামচন্দ্রের সাক্ষাতে হনুমানের মতন, গুরুর সম্মুখে জোড় হাত বুকের কাছে তুলে ভক্তি-গদগদ স্বরে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে একটা জুটেছে একরকম, কায়-ক্লেশে সংসার চ'লে যাচ্ছে।

বিদ্যারত্ন একটা জার্ম্মান-রূপার কৌটা থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকে দিতে দিতে বললেন—তা বাবা, তুমি তো এমন শুভ সংবাদটা আমাকে জানাও নি! আমি কিন্তু তোমার কল্যাণ-কামনায় নিত্য স্বস্ত্যয়ন করেছি, নারায়ণকে তুলসী দিয়েছি……

রামযাদু যে গুরুকে চাকরী হওয়ার সংবাদ দেয় নি এই অনুযোগে সে একটু লজ্জিত হ'তে যাচ্ছিলো, কিন্তু গুরু নিত্য স্বস্ত্যয়ন করেছেন আর নারায়ণকে তুলসী দিয়েছেন

শুনেই রামযাদুর মন বিরক্ত হয়ে উঠলো—তার মনে হলো এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথাটা গুরুর না বললেও হতো। রামযাদু একটু শুষ্ক স্বরেই বল্‌লে—আমি সংবাদ দিই নি এই ভেবে যে বার্ষিক নেবার জন্যে তো আপনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন, তখনই জান্‌তে পার্‌বেন .. তা এবার যে পুজোর সময়ই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন?

বিদ্যারত্ন ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—আর বাবা, বাড়ী কি আছে? অগ্নিদেব সমস্তই গ্রহণ করেছেন। ছেলে-পিলেদের পরের বাড়ীতে রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছি; তোমরা পাঁচ জনে সাহায্য করলে তবে মাথা গুঁজবার একটু আচ্ছাদন তুল্‌তে পার্‌বো।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—আহা! আপনার মতন পুণ্যাত্মা লোকেরও এমন বিপদ হয়! কিছু টাকা কি সংগ্রহ হলো?

বিদ্যারত্ন নস্যের কৌটাটা বেনিয়ানের পকেটে রেখে বল্‌লেন—যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছি। তুমি লক্ষ্মীমন্ত আর ভক্তিমান শিষ্য, তোমার ভরসাই আমি অধিক করি।

এই সময় বিম্‌লী নামে পরিচিতা একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে এক ঘটী জল এনে রামযাদু ও বিদ্যারত্নের মাঝখানে রেখে দিয়ে গেলো, এবং তার পিছনে পিছনে রামযাদুর স্ত্রী মনমোহিনী মাথায় ঘোমটা দিয়ে একটা পিতলের গাম্‌লা এনে সেই ঘটীর কাছে রাখলে এবং কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে গুরুর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

বিদ্যারত্ন নিজের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ মনমোহিনীর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—সাবিত্রী সমা ভব, পতি-দেবতাকা ভব।

মনমোহিনী প্রণাম ক'রে উঠে ব'সে গাম্‌লার ভিতর থেকে এক জোড়া খড়ম ও একখানা গামছা বাহির ক'রে মাটিতে রাখলে। অমনি গুরু দুই হাতের আঙুল হাঁটুর সামনে শৃঙ্খলিত ক'রে ডান পা শূন্যে বাড়িয়ে গাম্‌লার উপর তুলে দিলেন। রামযাদু ঘটী থেকে জল পায়ে ঢেলে দিতে লাগলো এবং মনমোহিনী দুই হাতে গুরুর পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

পাছে গুরুর পা-ধোয়ানি জল কোথাও পড়ে ও কেউ মাড়িয়ে পাপগ্রস্ত হয় তাই এই সাবধানতা; এবং গুরু বার্ষিক আদায় কর্‌তে এলে পায়ে দেবেন বা ব্যবহার কর্‌বেন ব'লে রামযাদু খড়ম গামছা আসন শয্যা প্রভৃতি সব সামগ্রী এক প্রস্থ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ ক'রে রেখে দিয়েছে। রামযাদুর এই গুরুভক্তি গ্রামের আদর্শ, তার গুরুভক্তিতে গুরুও প্রসন্ন।

গুরুর পা ধোয়া হলে সেই জল একটু হাতে নিয়ে রামযাদু মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে উর্দ্ধমুখে হাঁ ক'রে আলগোছে মুখে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিলে এবং তার পরে মাথা সোজা ক'রে জলসিক্ত হাতটা মাথার চুলের উপর বুলিয়ে মুছে ফেল্‌লে।

মনমোহিনী গাম্‌লা শুদ্ধ জল ও গাম্‌ছা নিয়ে জড়োসড়ো ভাবে বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেলো।

গুরুদেব জলের ঘটীটি নিয়ে উঠানের এক পাশে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার আসনে বস্‌লেন।

বিম্‌লী এসে খবর দিলে—বাবা, মা বল্‌লে—গুরুঠাকুরের জল-খাবার দেওয়া হয়েছে।

রামযাদু হাত জোড় ক'রে বল্‌লে—তা হলে কৃপা করে একবার গা তুলুন।

বিদ্যারত্ন খড়ম পায়ে দিয়ে বাড়ীর ভিতরে চল্‌লেন, রামযাদু গুরুর আসনখানি তুলে নিয়ে অগ্রে অগ্রে পথ দেখিয়ে চল্‌লো।

গুরু গিয়ে দেখ্‌লেন—একখানি শ্বেতপাথরের রেকাবির উপর পেঁপে বাতাবী নেবু শশা কলা নারিকেল-কোরা ও একটু গুড় সাজানো আছে; পাশে আছে শ্বেতপাথরের গেলাসে কর্পূর-দেওয়া জল।

গুরু খেতে বস্‌লে রামযাদু স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে—গুরুদেবের জন্যে রাত্রে একটু ছানা কি ক্ষীর তৈরী কোরো, আর চারটি কাঁচা মুগের ডাল ভিজিয়ে দিয়ো।

গুরু শিষ্যবাড়ী এসে রাত্রে আচমনী কিছু খান না, যদিও নিজের বাড়ীতে অনেকেই এই নিষ্ঠা পালন করেন না।

রাত্রে আহারাদির পর বাহিরের ঘরে গুরুর শয্যা রচনা করা হলো। গুরুকে শয্যায় বসিয়ে রামযাদু বল্‌লে—ব্যাগটা বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাখি?

গুরু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—না বাবা, ওটা আমার কাছেই থাক……

এই ব'লেই গুরু গায়ের চাদরখানা লম্বা ক'রে তার এক প্রান্ত দিয়ে ব্যাগটাকে বাঁধতে প্রবৃত্ত হলেন।



বন্যা

শিল্পী- শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

রামযাদু এই দেখে বললে—গ্রামে বড্ড চোরের উপদ্রব হয়েছে……তা হলে আমিও এই ঘরে শোবো……

—তাই শুয়ো বাবা তাই শুয়ো……বলতে বলতে গুরু চাদরের অপর প্রান্তটা নিজের বালিশের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। বালিশে-ব্যাগে গাঁটছড়া বেঁধে গুরু 'পদ্মনাভ! পদ্মনাভ!' ব'লে শুয়ে পড়লেন।

গভীর রাত্রি। গুরুর নাসিকা-গর্জ্জনে ঘরের বাতাস আলোড়িত হচ্ছে। রামযাদু শয্যা ছেড়ে উঠলো এবং পাছে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে বাহিরে যাবার দরজার শিকল খুলতে লাগলো। শিকলে একটু খুট্ ক'রে শব্দ হ'তেই গুরু নাসাপথে নির্গমোৎসুক নিঃশ্বাস-প্রবাহটা মুখের মধ্যে হড়াৎ ক'রে টেনে নিয়ে শ্বাস-লালা-নিদ্রালস্যে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যা?

রামযাদু ধীরে উত্তর দিল—আজ্ঞে আমি রামযাদু।

গুরু নিদ্রাজড়িত স্বরে দুবার "রাম! রাম!" ব'লে পাশ ফিরে শুলেন।

রামযাদু গাড়ু হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

বিদ্যারত্নের আবার ঘুম এসে গেছে; রামযাদু ঘরে ফিরে আসতে আসতে শুনলে গুরুদেবের দুর্জ্জয় নাসিকা-গর্জ্জন হচ্ছে।

বিদ্যারত্নের মাথার তলা থেকে বালিশটা হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে স'রে যেতেই তাঁর মাথাটা হ'ড়কে বিছানার উপর প'ড়ে গেলো এবং তিনি থতোমতো খেয়ে ঘুমের ঘোরে জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আ-া া ..মা া-া…ব্যা-া-া…গ…

গুরুর সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি ডুবিয়ে দিয়ে রামযাদু চীৎকার ক'রে উঠলো—চোর! চোর! ধর! ধর!…

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দৌড়ে গেলো। চোর…চোর…ধর .. ধর…ঐ যায়…ইত্যাদি চীৎকারে সে সমস্ত গ্রামকে উচ্চকিত ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এ-বাগানের ভিতর দিয়ে সে-বাড়ীর উঠান দিয়ে, ও-বাড়ীর পাঁদাড় দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর চীৎকারে আচমকা প্রবুদ্ধ হয়ে ও ছুটে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনিও তার সঙ্গে সঙ্গে চোর ধরবার চেষ্টায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু স্থূল উদরের উপর খদ্দরের মোটা কাপড়ের পরিবেষ্টনী শিথিল হয়ে গিয়েছিলো, কাছা খুলে গিয়েছিলো; তিনি কাপড়ের কষি গুঁজতে-গুঁজতে ছুটে যাবার চেষ্টায় দাওয়ায় গিয়ে উপস্থিত হতেই মুক্ত কাছাটা তাঁর পায়ে জড়িয়ে গেলো এবং আচমকা ঘুম ভেঙে ওঠাতে ও ব্যাগ চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যস্ত হওয়াতে অচেনা দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে তিনি তালগোল পাকিয়ে দাওয়ার নীচে ছেঁচ-তলায় প'ড়ে গেলেন এবং আঘাতের বেদনায় ও ব্যাগের শোকে গোঁ গোঁ ক'রে কাতরাতে লাগলেন—ব্যা……ব্যা……

রামযাদুর চীৎকারে গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, অনেকেই লণ্ঠন জ্বেলে লাঠি নিয়ে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লো। ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বাগান তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হলো, কিন্তু চোরের পাত্তা পাওয়া গেলো না, ব্যাগেরও খবর মিললো না।

যখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রামযাদু বাড়ীতে ফিরে এলো তখন দেখলে গুরুদেব সেই ছাঁচতলাতে ব'সে দুই হাতে মাথা ধ'রে কেবল বলছেন—মধুসূদন! মধুসূদন!…মধুসূদন! মধুসূদন!…আর তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রামযাদু তাড়াতাড়ি এসে গুরুদেবকে ধ'রে তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাগের মধ্যে বেশী কিছু ছিলো কি?

বিদ্যারত্ন নাক ঝেড়ে আঙুলের কফ কাপড়ে মুছতে মুছতে বললে—ছিলো বৈকি বাবা, আমার সর্ব্বস্ব ছিলো… গৃহদাহের দায় জানিয়ে শিষ্য-বাড়ী থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা সংগ্রহ ক'রেছিলাম…আমার সব গেলো!…

বৃদ্ধ এবার প্রকাশ্যে কেঁদে ফেললেন।

রামযাদু বললে—আপনি জ্ঞানী, আপনি অধীর হ'লে আমরা কাকে দেখে হৃদয়ে বল সঞ্চয় করবো। স্থির হোন! কাল সকালেই পুলিশে খবর…

বিদ্যারত্ন কপালে করাঘাত ক'রে বললেন—আর পুলিশ! আমার গ্রহ-বৈগুণ্য উপস্থিত হয়েছে!

গ্রামের নানা লোকে নানা রকম আন্দাজ ক'রতে লাগলো, নানা উপায় নির্দ্দেশ করতে লাগলো।

রামযাদু তাদের বললে—আর রাত ভোর হয়ে এলো… তোমরা সব এখন বাড়ী যাও…সকালে যা হয় পরামর্শ করা যাবে……

সকল লোকে একে একে চলে গেলো। রামযাদু ও বিদ্যারত্ন বাকী রাত্রিটুকু জেগে ব'সেই কাটিয়ে দিলে।

রামযাদু ভোরবেলা শৌচে নদীর ধারে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে। গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে।

এই চীৎকারে পাড়ার দু-চারজন লোক আবার ছুটে বেরিয়ে এলো। লোকেরা সমাগত হ'লে রামযাদু গিয়ে ব্যাগটাকে তুল্‌লে...চোর ব্যাগ খুল্‌তে না পেরে ছুরি দিয়ে ব্যাগের পেট ফাঁশিয়ে ফেলেছে কিন্তু ব্যাগের উদর স্ফীত হয়েই আছে। রামযাদু তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—চোর বেটা ব্যাগটা কেটেও কিছু নিতে পারে নি; আমাদের তাড়াহুড়ো পেয়ে ব্যাগ ফেলেই পালিয়েছে।

সকলে বিজয়োল্লাস কর্‌তে কর্‌তে গুরুর কাছে এনে ব্যাগ দিলে। রামযাদু প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—ব্যাগের জিনিস কিছু নিতে পারে নি।

এই সুসংবাদ শোন্‌বা মাত্র বিদ্যারত্নের মৃতদেহে যেনো প্রাণ এলো; তিনি যেনো মৃতমগ্ন পুত্রকে ফিরে পাচ্ছেন এমনি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—কই বাবা কই দেখি?

রামযাদু গুরুর সাম্‌নে ব্যাগটি স্থাপন কর্‌লে।

বিদ্যারত্ন চাবি দিয়ে ব্যাগ খোলার বিলম্ব স্বীকার না ক'রে ব্যাগের বিদীর্ণ উদর থেকেই অভ্যন্তরের সমস্ত দ্রব্যাদি টেনে টেনে বাহির ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেল্‌তে লাগলেন।...কাপড়, উড়ানি, নামাবলী, রুদ্রাক্ষের মালা, পুরোহিত-দর্পণ, কোশা-কুশি এমনি কতো কি।

জিনিস যতোই বেরিয়ে আস্‌তে লাগলো বিদ্যারত্নের মুখ ততোই বিশুষ্ক ম্লান হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। সব জিনিস বাহির করা হলো, ব্যাগের ছিন্ন উদর চিপ্‌সে ঝলঝল কর্‌তে লাগ্‌লো, তবু বিদ্যারত্নের যেনো প্রত্যয় হয় না, তিনি ছেঁড়ার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগের উদরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কোথাও কোনো কোণে কিছু আট্‌কে লুকিয়ে আছে কি না। এই রকম অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আবার পৈতাতে আট্‌কানো চাবি দিয়ে ব্যাগের তালা খুলে ফেল্‌লেন এবং ব্যাগের মুখ বিস্তার ক'রে দু-মুখ-খোলা থলের মতন ব্যাগটাকে ঝেড়ে ঝেড়ে এবং তার মধ্যে উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগ্‌লেন।

রামযাদু বিষণ্ণ কাতর-মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আর কি খুঁজ্‌ছেন?

বিদ্যারত্ন হতাশ স্বরে বল্‌লেন—আমার টাকা! টাকার পুঁটুলিটা নেই……

রামযাদু বল্‌লে—আর-একবার সব জিনিসগুলো মিলিয়ে উল্টে পাল্টে দেখুন তো……কোনো কাপড়ের মধ্যে ঢুকে থাক্‌তে পারে……

বিদ্যারত্ন তন্ন তন্ন ক'রে দেখে বল্‌লেন—টাকার পুঁটুলিটা আর একটা নতুন গরদের জোড় নেই……আর সব আছে।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে "তাই তো" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে।

প্রভাতে রামযাদুর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বিদ্যারত্ন স্নানাহার কর্‌লেন। মাত্র ভাতে-ভাত রান্না কর্‌লেন, কিন্তু হাতে-ভাতে ক'রেই উঠে পড়্‌লেন, মুখে অন্ন রুচ্‌লো না।

রামযাদু কাতর স্বরে বল্‌লে—আপনার যে কেবল রন্ধনের ক্লেশ স্বীকার করাই হলো!

বিদ্যারত্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন…আর বাবা!

বিদ্যারত্ন আচমন ক'রে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—আমি এখনই যাবো বাবা, ……

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—এখনই?

—হ্যাঁ, এখনই। মনটা বড়ো উতলা হয়ে উঠেছে। একবার সিঙ্গেতে একটি শিষ্যের বাড়ী হয়ে আজকের ট্রেণেই বাড়ী চ'লে যাবো।

রামযাদু ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লে—যেমন আজ্ঞা কর্‌বেন তাই হবে। আমরা মনে ক'রেছিলাম দু-দিন প্রসাদ পাবো, পদ-সেবা কর্‌তে পার্‌বো……

—তোমরা কল্‌কাতায় গিয়ে স্থির হয়ে বস্‌লে আমাকে সংবাদ দিয়ো, আমি তোমাদের নূতন আবাসে গিয়ে আশীর্বাদ ক'রে আস্‌বো।

বিদ্যারত্ন ব্যাগের সামগ্রীগুলি একটি পোঁট্‌লায় বাঁধবার উদ্যোগ কর্‌ছেন। রামযাদু বাড়ীর ভিতর থেকে একটা ভালো কার্পেটের ব্যাগ এনে গুরুর সামনে রাখলে, এবং দশটাকার দশখানি নোট গুরুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম কর্‌লে।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর গুরুভক্তি দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, কেবল রামযাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

রামযাদু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—আমাকে সপরিবারে কল্‌কাতায় গিয়ে নতুন বাসা পত্তন কর্‌তে হবে, নইলে আরো কিছু আপনাকে দিতাম। আমারই বাড়ী থেকে যে টাকা চুরি হয়ে গেলো তার ক্ষতিপুরণ আমারই করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন এই সামান্য কিছু দিতে পার্‌ছি ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি।

বিদ্যারত্ন নূতন ব্যাগে জিনিসগুলি ভর্‌তে ভর্‌তে বল্‌লেন—এই আমার লক্ষ টাকা! শিষ্যে পুত্রে ভেদ নেই; তোমাদের উন্নতি হোক, আমরা তো তোমাদেরই প্রতিপাল্য।......

গুরু ছলছল চোখে বিদায় হলেন। রামযাদু সপরিবারে গুরুর পদধূলি মাথায় দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

শীঘ্রই গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেলো যে রামযাদু গুরুকে একশত টাকা প্রণামি দিয়েছে!

দুষ্ট লোকে চোখ টেপাটিপি ক'রে চাপা গলায় বল্‌লে—গোরু মেরে জুতো দান!

দুষ্ট লোকে কাণাঘুষা ক'র্‌তে লাগ্‌লো—ব্যাগ-চুরির ব্যাপারটা ধড়িবাজ রামযাদুরই কারসাজি! বেটা কী সয়তান! গুরুস্ব অপহরণ করতেও ওর বুক কাঁপে না!

রামযাদু এই দুর্নাম রটনা শুনে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—পরের ভালো কেউ দেখ্‌তে পারে না! আমার একটু উন্নতি হচ্ছে অমনি লোকের চোখ টাটাচ্ছে কিসে আমাকে খাটো কর্‌বে অপদস্থ কর্‌বে তার ছুতো খুঁজ্‌ছে!.. এমন ঈর্ষাকাতুর গাঁয়ে মানুষ বাস করে! এই গাঁ জন্মের মতন ছেড়ে চল্‌লাম, জীবনে যদি কখনো ফিরে আসি তো......

শপথটা রামযাদুর ক্রোধস্খলিত বাক্যে ভালো বোঝা গেলো না। (ক্রমশঃ)

উন্মাদ

হুমায়ুন কবির

সুদীর্ঘ রজনী ভরি বিনিদ্র শয়নে একা
স্বপ্ন শুধু গাঁথি।
চোখে ভাসে শ্রাবণের পুঞ্জীভূত স্তব্ধ মেঘরেখা
তারাহীন রাতি।
বৃষ্টিধারা নাহি ঝরে, থেমে গেছে বায়ু চলাচল,
স্তব্ধ চরাচর;
অদৃশ্য আঁধারতলে নদী বহে আবিল ধূমল
নিষ্ঠুর প্রখর!

তারি কূলে একা ফেরে দিশাহারা পাগল পথিক
উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে,
অন্ধকার যবনিকা ভেদ করি আঁখি নির্নিমিখ
চাহে কার তরে?
রুক্ষ জটাজাল কেশ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কঠিন উন্মাদ,
জ্বলে আঁখিতারা,
তারা-দীপ-নির্ব্বাপিত নভোপানে তীব্র আর্ত্তনাদ,
ওঠে বাক্যহারা।

শিহরিয়া চাহি বন্ধ করিবারে আঁখিতারা মম
দৃষ্টি ফিরাইতে,
অন্ধকার ভেদি' জ্বলে প্রজ্বলিত লৌহফলা সম
ভীত ত্রস্ত চিতে।
আঁখি শুধু অনিমিখ অপলক দৃষ্টি মেলি চাহে,—
শুধু দেখে তারে,
সমস্ত অন্তর জ্বলে অশ্রুহীন প্রখর প্রদাহে
মৃত্যু-অন্ধকারে!

শীর্ণ বাহু—অস্থি দুটী বিক্ষোভিয়া আকাশের পানে
উন্মাদ ব্যথায়,
লুটায়ে কণ্টকবনে ব্যথাবিষদিগ্ধ দীর্ণ প্রাণে
কাহারে সে চায়!
অন্ধকারে প্রেতসম গৃহহারা একা কেঁদে ফিরে
কাহার লাগিয়া?
বিস্ফারিত নেত্র মম দেখে তারে প্রোজ্জ্বল তিমিরে
সশঙ্কিত হিয়া!

লালু নন্দলাল

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

এই কবিওয়ালার সময় ঠিক্ করিবার আর একটী সূত্র পাইয়াছি। গতবারে উল্লেখ করিয়াছি, লালুর খেউড় গানের মধ্যে বোদাকুড়ির (ভুলক্রমে পূর্ব্ব প্রবন্ধে গোদাকুড়ি লেখা হইয়াছে) আখড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বোদাকুড়ির আখড়া প্রতিষ্ঠার একটী কিম্বদন্তী আছে; নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি——

"দিল্লীর বাদশাহ-বংশীয়া যুবতী আমিনা তাঁহার প্রণয়ী ওসমানকে লইয়া পলাইয়া আসেন। দিল্লী হইতে বহুদূরে বীরভূমে আসিয়া প্রণয়ী-যুগল আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া কৃষ্ণনগর দুর্গের ফৌজদার হাতেম খাঁর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণনগর রাজনগর রাজের শাসনাধীনে ছিল,— অপুত্রক দুর্গরক্ষক আমিনা ও ওসমানকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাই রাজনগর-রাজ বাদিওজ্জমানকে সুপারিশ করিয়া ওসমানের জন্ম আপনার সহকারী পদের নিয়োগপত্র আনাইয়া দিয়াছিলেন। এদেশে আসিয়া আমিনার নাম হয় শেরিণা, ওসমানের নাম হয় হাফেজ।

উপন্যাসে যেমন একটী নায়িকার দুইটী প্রণয়ী থাকে, আমিনার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আমিনা দিল্লী হইতে উধাও হইলে ব্যর্থ প্রণয়ী হুসেন তাহার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে এবং সন্ধানে সন্ধানে বীরভূমে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দেশে তখন বর্গীর বিপুল বাহিনী থানা পাতিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম—নগরের পর নগর শ্মশানে পরিণত হইতেছে। এবারে দলের নায়ক ছিলেন রঘুজী ভোঁস্‌লে। নবাব আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করিলে ভোঁস্‌লে সাহেব অত্যন্ত চটিয়া যান এবং পণ্ডিতজীর হত্যার প্রতিশোধ লইতে দ্বিগুণ উদ্যমে বাঙ্গালায় শুভাগমন করেন। বিষ্ণুপুরে হারিয়া তিনি বরাবর বর্দ্ধমানে আসেন, এবং মীরহবিবকে পরাস্ত করিয়া দলভুক্ত করেন। মীরহবিব শেঠের ধনাগার লুঠ করিয়া লক্ষ টাকা আনিয়া ভোঁসলের বিশ্বাসভাজন হন। এই দল যখন বীরভূম সিউড়ির দক্ষিণে কেঁদুয়াডাঙ্গায় ছাউনী ফেলেন, সেই সময় হুসেন আসিয়া মীরহবিবের শরণ গ্রহণ করেন।

হুসেন লোভ দেখাইল কৃষ্ণনগর দুর্গে বহু মণিমুক্তা আছে। চুক্তি হইল, দুর্গে তাহার প্রণয়িনী রহিয়াছে, সে তাহাকে লইবে, বাকী লুঠ সমস্ত বর্গীরা পাইবে। বর্গীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হাফেজ দুর্গের চারিধারে রীতিমত প্রাচীর দিয়া পরিখা কাটাইয়া দুর্গটীকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিল এবং কৃষ্ণনগর হইতে হাতেমখাঁর গড় পর্য্যন্ত একটী বাঁধ কাটাইয়া বিস্তীর্ণ জলপথে শত্রুর যাতায়াত কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। হুসেনের পরামর্শমত বর্গী দুর্গ আক্রমণ করিল, হাফেজ নিহত হইল। কৃষ্ণনগরে শেরিণাকে না পাইয়া হুসেন হাতেমখাঁর গড়ে গিয়া উপস্থিত হইল। শেরিণা তখন সদ্যোপ্রসূতা, তিনি হুসেনকে দেখিয়াই সূতিকাগার হইতে পলাইয়া গড়ের তালাবে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় চারিজন সৈনিকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইহাদের তিন জন মুসলমান, একজন হিন্দু বাঙ্গালী। মুসলমানদের নামের পূর্ব্বে 'সৈয়দ শাহ' সংযুক্ত আছে, সুতরাং তাহারা দিল্লীরও হইতে পারে, রাজনগর-প্রবাসীও হইতে পারে। ইহারা হুসেনের দল, কি হাফেজের দল, কি বর্গীর দল—প্রবাদ সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। ইহাদের হঠাৎ বৈরাগ্যের কারণ সম্বন্ধেও কোনো জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। চারিজনেই ফকীর, চারিজনেই বুজরুক! ইহাদের মধ্যে সৈয়দ শাহ আহম্মদ বিবাহ করিয়াছিলেন। বোদাকুড়িতে তাঁহার বংশধর আছেন। বাঙ্গালী সৈনিকের পূর্ব্বনাম কি ছিল জানা যায় না, তিনি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়া রঘুনাথ দাস নামে পরিচিত হন। বোদাকুড়ি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা-পথের দুবরাজপুর ষ্টেশনের অনতি-পশ্চিমে বক্রেশ্বর নদীর উপরে একটী জঙ্গলময় স্থান। সে সময় জঙ্গল

খুবই ছিল, এখনো আছে। সৈনিক চতুষ্টয় আত্মগোপনের অথবা সাধনের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া এই জঙ্গলেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। বোদাকুড়ির আখড়ার বর্ত্তমান আখড়াধারীর নাম বাউলদাস।

১৭৪৫ খৃঃ রঘুজী ভোঁসলের বাঙ্গলায় আগমন; মীর হবিবের বর্গীর দলে যোগদানের সময় ও ঐ সালেই ধরিতে হয়। প্রবাদে হুসেন ও মীর হবিবে মিলন ঘটিয়াছে। সৈনিক সাধুটীর খ্যাতি রটিতে বোধ হয় বেশী দিন লাগে নাই। যাই হোক লালুর গানে বোদাকুড়ির আখড়ার উল্লেখ দেখিয়া লালুকে অন্ততঃ দুইশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

লালুর প্রসিদ্ধ শিষ্য নিতাই বৈরাগীর নাম অনেকেই জানেন। এই নিতাইয়ের সঙ্গে রঘুনাথ দাস পাল্লা দিয়াছেন; রঘুর গানে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সে-কালে গুরু-শিষ্যে পাল্লা দেওয়ার রীতি ছিল না। কেবল মুড়মাঠের কালো পাল ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি লালুর শিষ্য হইয়াও লালুর সঙ্গে পাল্লা দিয়াছিলেন। এই গুরু-শিষ্যের হিসাব ধরিয়াও লালুকে দুইশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায়।

"যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ
তা কি ঘুচাতে পারে।
শুনেছ কখনো অঙ্গারের মলিনো
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।
নিম্বতরু যদি রোপণ হয় শতভার শর্করে,
সে মিষ্ট রস হয় না কখন
নিজগুণ প্রকাশ করে॥"

এই গানটী লালুর, কিন্তু ইহা হরু ঠাকুরের নামে চলিয়া গিয়াছে।

নীচের লিখিত টপ্পাটীর প্রথমার্দ্ধ মাত্র প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ ইহা নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকের বলিয়া উল্লেখ করেন। আমরা সম্পূর্ণ গানটী তুলিয়া দিলাম।

"আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান।
দেখি আমায় তুমি কেমন ভালবাস প্রাণ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান,
অন্তরে হরিষো মুখেতে বিরসো
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান।
তুমি বল প্রেয়সী আমি তোমার প্রেমাধীন,
অন্যনারী সহবাস নাহি কোনো দিন,
প্রত্যক্ষে সে কথা করি ঐক্যতা,
সরল কি তুমি পুরুষ পাষাণ" ॥

বলা বাহুল্য এ গান আমরা লালুর রচিত বলিয়া জানিয়াছি। লালুর ভণিতাযুক্ত আমাদের সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

লালুর গান—

(১)

বহু সাধে ওগো রাধে ঘসিলে চন্দন,
পরম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে করিতে লেপন
যারে আপনার বলে কর আকিঞ্চন,
তোমার হলোনা রাধে সে বংশীবদন,
কোথা কালিয়ে আছ মুখ চেয়ে
কোন্ রমণীর মন্দিরে রইলো মুরারী।
তোমার কুঞ্জেতে কালা এলনা প্যারী,
ওগো এ সুখ সময় কোথা রইল প্রিয়—
না আইল পোহাইল শর্ব্বরী॥
রাই কি মনে করেছ কিছু বুঝিতে নারি,
শঠ স্বভাব তার কপট বেবহার,
অধিক বাড়িল দুঃখ রাধেগো তোমার
মনে এ সন্তাপ বিনে প্রাণনাথ
বিচ্ছেদেতে সবে করে মন ভারি।
নিকুঞ্জে এলে শ্যাম আস্‌বে বলে
মিছে প্রত্যাশায়,
এলনা সে নিঠুর কালা নিশি' ব'য়ে যায়,
রাই গেঁথনা কুসুমের হার গলে দিবে কার,
বন্ধু বিনে হলনা সে সুখ বিহার,
সে লম্পট মন যোগাইলে যার
তার ভাবেতে ভেবে তনু ক্ষীণ হলো আমার,
নিশি প্রভাতো হলে শ্রীরাধে
বড় প্রমাদ ঘটাবে তাই ভেবে মরি॥
আসব বলে সে কালিয়ে এলনা কেনে
চন্দ্রাবলী লয়ে গেল নিজ ভবনে।
সে পুরাইলে মন বাসনা
তার ছিল কামনা

তার পথ চেয়ে উঠি আর বসি,
পোহায়ে পোহায় না কেনে দুঃখের এ নিশি।
দাগাদারি কল্লেন হরি লালু বলে ই কি শ্যামের চাতুরী ॥

টপ্পা ধরণের সখী-সংবাদের একটী গান—
ওগো কুঞ্জবনে বাজিল বাঁশী শুন ওগো রাই,
চল শীঘ্র করি যাই,
রঙ্গে রঙ্গে খলের বাঁশী ডাকে রাধার নাম।
চল গো প্যারী ত্বরায় করি দেখি জেগ্রে শ্যাম,
নটবর ত্রিভঙ্গরূপ অতি অনুপাম ॥ (ধুয়া)
চল চল কমলিনী দেখিতে শ্যামেরে,
বিকের ছলে কদম তলে দেখাব তোমারে,
তার চরণে চরণে ছাঁদা বঙ্কিম নয়াণ
হেরি জুড়াবে পরাণ,
তার কাল অঙ্গে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
কি কর কি কর রাধে মন্দিরে বসিঞা
শ্যামেরে দেখিবে চল আনন্দিত হঞা,
চৌদিকে বেড়িয়া যাব যত সখীগণ
অঙ্গে পরহ ভূষণ
ধীরে ধীরে চল মুখে জপ কৃষ্ণ নাম।
লালু নন্দলাল বলে শুন রসবতি
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে অখিলের পতি
জনমে জনমে প্যারী তুমি গো তাহার,
তোমার জন্যে অবতার
কিশোরা কিশোরী হয়ে পুরাও মনের কাম ॥

লালুর চাপান গান—
মা জগদ্ধাত্রী শব শিবে যত অবতার
যত দেখি সকলি মহিমা তোমার।
দেখে এলাম দশটা রমণী
তাদের দেহতে ওমা নাইক গো তুমি,
আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করী দেখে লাগে বড় ভয়।
বল মা তারা দুঃখহরা দেগো পরিচয়,
সেই দশটা মেয়ে বসে আছে ন'টা মুণ্ড কেনে হয় ॥
তোমার যত মহিমা আগম তন্ত্রে কয়,
যদি এই কথাটা আমার না বলবে,
দুর্গা নামেতে তোমার কলঙ্ক হবে,
আমি পদ্মা সখী সদাই থাকি
নিয়ে তোমার পদাশ্রয়।
মা আমি তোমার দাসী তেঁই সব কথা জিজ্ঞাসি—
এই নিগুঢ় কথা বলগো ভবানী!
আমি ভাবছি দিবে-নিশি,
তাদের রঙ্গ দেখে আমাকে লাগলো চমৎকার,
ওগো আমার মনের ভাবনা ঘুচাও মা এইবার।
তুমি দুঃখহরা পুরাণে শুনি,
হরের ঘরণী তুমি ভবের তরণী,
কবি লালু ভণে তোমার রণে কত অসুর হলো ক্ষয়।

এই চাপানের দ্বিতীয় গান—
এই পদ্মা বলে তোমার চরণ করেছি মা সার,
ওগো তুমি বিনে সন্দেহ কে ঘুচাবে আর।
সেই দশটার মধ্যে একটা রমণী
তার আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখেছি আমি,
তোমায় সদাশিবের দোহাই লাগে
বল্লাম আমি এককালে।
বল মা দুর্গে ধরি তোমার চরণ কমলে
কেনে একটা মেয়ের মস্তকেতে সপ্ততাল অগ্নি জলে ॥
এমন রূপ আর দেখি নাই মহীমণ্ডলে।
যদি হতো বাজীকরের বাজী,
বুঝে দেখেছি আমি নয় কারসাজী,
এমন হবে নাক হবার নয়ক
দেখি নাই কোনো কালে।
শিবের নাভিপদ্মবনে তারা খেলা করছে কেনে,
ওগো তাই দেখে ভুলেছে ভোলানাথ
সেই অগম্য শ্মশানে,
ওগো শিঙ্গা ডম্বুর লয়ে গান করে শূলপাণি,
তার নাভিপদ্মে নাচে সেই দশটা রমণী।
তাই দেখে আমি স্থির হতে নারি
জানাইতে এলাম শুন শঙ্করী
মা নিদানকালে ভুলনাক' লালু নন্দলাল বলে ॥

এইরূপ প্রশ্নমূলক গান আরো কয়েকটী আছে। এতদ্ভিন্ন আগমনী, লহর, খেউড় প্রভৃতির সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৫০টী হইবে। অতঃপর রামজীদাস ও রঘুর বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বাভাস

এস্, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যাণ্টাব), বার্-এট্-ল

ষ্টীমারে চড়ে কীর্ত্তনখোলা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম। তীরে মাইলের পর মাইল ধরে সুপারি আর নারিকেল গাছের সার। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম আর মাঠ। গাছ, মাঠ, পল্লী আর নদীতে মিলে সে এক চমৎকার ছবির সৃষ্টি করে তুলেছিল! মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে তাই দেখছিলুম।

চলতে চলতে একটী গণ্ডগ্রামের খড়ের ঘরগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। চারিদিকে ঘর; আর মাঝখানে বেশ মাঝারী রকমের একটি পুকুর। নারিকেল আর তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে চারিদিকে ঘাট বাঁধা। বেলা তখনও এক প্রহর অতিক্রম করে নি। গাঁয়ের মেয়েরা সব পুকুরের ধারে জটলা করছে। কেউ বাসন মাজছে, কেউ জল তুলছে, আবার কেউ বা কলসি-কাঁখে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরছে।

গাঁয়ের বাইরেই মাঠ। পুরুষেরা সেখানে কেউ লাঙ্গল দিয়ে মাটি চষছে, কেউ বীজ বুনছে, আবার কেউ বা জমির উপর মই চালিয়ে মাটি ভাঙ্গছে। সমস্ত দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি শান্ত স্নিগ্ধতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, যা দেখে Rembrandtএর Dutch ছবিগুলির স্মৃতি আপনা থেকেই আমার মনে জেগে উঠলো। কবে আমাদের দেশেও একজন Rembrandt জন্মাবে তাই ভাবতে লাগলুম!

গ্রাম পার হয়ে মাঠ অতিক্রম করে যেতে লাগলুম। খোলা যায়গায় গাঁয়ের ছেলেরা সব ছুটোছুটি করছে। তাদের মনে এখনও সাংসারিক ভাবনার ঘুণ ধরে নি! প্রাণ খুলেই তারা তাদের খেলা উপভোগ করছিল।

আমাদের ষ্টীমার দেখে কৌতুকের এক অদম্য প্রবৃত্তি তাদের মনে সহসা জেগে উঠলো। কেউ তার ছোট হাতটি নেড়ে আমাদের ডাকতে লাগলো, কেউ জিভ বার করে আমাদের প্রতি তার অহেতুক অথচ অপরিসীম অবজ্ঞা প্রকাশ করতে লাগলো, আবার কেউ জোরে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে তার লঘু মনের উচ্ছল আনন্দ ব্যক্ত করতে লাগলো।

এই ভাবনাহীন কৌতুক-নিরত শিশুর দলকে অতিক্রম করে আমাদের ষ্টীমার গম্ভীর প্রবীণ ব্যক্তিটির মত তার গন্তব্য পথে চলেছে। সেই ক্ষুদ্র লোকালয় ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি-পথ থেকে অদৃশ্য হলো। আমরা আবার নির্জ্জন প্রকৃতির সামনে এসে পড়লুম। আমি কিন্তু সেই পল্লীবাসীদের কথাই ভাবতে লাগলুম।

সভ্য জগতের উচ্ছল জীবন-প্রবাহ থেকে কতদূরে তারা পড়ে আছে! এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কত অল্প স্থান নিয়েই তারা সন্তুষ্ট! জীবনের কর্ম্ম-কোলাহল থেকে অতি দূরে অবস্থিত এই গণ্ডগ্রামে তারা জন্মেছে, আর এখানেই তারা মৃত্যুকে বরণ করবে। বাইরের জগৎ কখনো তাদের নামও শুনবে না, আর তাদের গাঁয়ের নামও শুনবে না!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময় একটি নূতন দৃশ্য আমার চিন্তার স্রোতকে হঠাৎ ভিন্ন পথে নিয়ে চললো। মাঝামাঝি রকমের একটি অশথ-গাছের ছায়ায় একটি ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল। তার বয়স দশ কি বারো বছর হবে। সেই গাছের ছায়ায় একেলা পড়ে সে দেখছিল, নদীর সেই অবিরাম অশ্রান্ত গতি; আর ভাবছিল—কি জানি, কত সে কথা!

গাছের ডালে পাখীরা আনন্দ-কলরব করছিল; দক্ষিণা বাতাস পাতাগুলির প্রাণে এক অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছিল; নদী তটভূমিকে তার সঙ্গে অনন্তের পথে যাবার জন্য সাধাসাধি করছিল। একটা উছল জীবন-প্রবাহ এসে যেন সমস্ত প্রকৃতিকে কোন্ সুদূর পূর্ণতার দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছিল। বাল-সুলভ খেলাধুলা ছেড়ে ছেলেটী চেয়ে ছিল এই জীবন-স্রোতের পানে; ছোট্ট তার মনটী বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কোন্ দূর-দূরান্তরের দেশে!

দূর পল্লী-প্রান্ত থেকে ছেলেদের হাসির রোল বাতাসে ভেসে ভেসে আসছিল; গরুর হাম্বারব, চাষীর চীৎকার লোকালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল; আমাদের সেই

ছেলেটির কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করবারও অবসর ছিল না। সে ভাসিয়ে দিয়েছিল নিজেকে বুঝি প্রকৃতির এই জীবন-প্রবাহের ঠিক মাঝখানে!

নদীবক্ষে তুমুল একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে আমাদের ষ্টীমার তার পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। ডাগর ডাগর স্বপ্নাবিষ্টের মত চোখ দুটী তুলে ছেলেটী আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। ডেকের উপর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখানে তার চোখ দুটী এসে একবার থামলো। আমি তার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে, লজ্জায় সে একবার মাথা হেঁট করে নিলে। তার পর, তার সেই স্বাভাবিক কুণ্ঠাকে দমন করে, স্থির প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে সে দেখতে লাগলো। শান্ত, স্নিগ্ধ, স্বপন-বিভোর সেই চোখ দুটীর মধ্যে কত প্রশ্নই যে লুকানো ছিল।

মূক স্নেহ-সম্ভাষণে আমরা পরস্পরকে দেখতে লাগলুম। সেই অতি ক্ষণিক পরিচয়েই মনে হলো—আমরা যেন চির-কালের বন্ধু।

ষ্টীমার তাকে ছেড়ে দূরে যেতে লাগলো। তার সেই উজ্জ্বল ঢলঢলে মুখটা ক্রমেই অস্পষ্টতর হতে লাগলো। আমরা একটা বাঁকের কাছে এলুম। ষ্টীমার আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বন্ধুত্বের উপর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে নির্ম্মম-গতিতে সেই বাঁক ফিরতে লাগলো। আমি হাত নেড়ে আমার সেই ক্ষুদ্র বন্ধুটীকে বিদায় অভিবাদন করে সামনের বাঁকের দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

বাঁক ফিরে ষ্টীমার যখন সোজা চলতে আরম্ভ করলে, তখন আবার একবার তীরের সেই ক্ষুদ্র বন্ধুটীর দিকে আমার দৃষ্টি ফিরলো। দেখলুম, সে হাঁটু তুলে বসে ঢেউগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছে, আর আনমনে ছোট ছোট ঢেলা তুলে নদীর জলে ফেল্‌ছে। আমার মনে হলো, এই ক্ষুদ্র গ্রামটী বোধ হয় চিরকাল অখ্যাত আর অজ্ঞাত থাকবে না।



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] ইরাণী

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

(খ)

দৃশ্যকাব্য ও Secular (বৈষয়িক) অনুষ্ঠান

(২) বিজাতীয় প্রভাব

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে গ্রীক্ প্রভাব—

এ পর্য্যন্ত নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তির অনুকূল জাতীয় প্রভাবের কথাই আলোচিত হইয়াছে। এইবার বিজাতীয় প্রভাবের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, প্রাচীন যুগে ভারতে নাট্য-সাহিত্যের সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতবাসিগণের পক্ষে আপনা হইতে এইরূপ সুবিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নাট্য-সাহিত্য গঠন করিয়া তোলা কখনই সম্ভবপর হয় নাই। Weber প্রথমে এই ধূয়া তুলেন। গ্রীক্‌গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ব্যাক্‌ট্রিয়া, পাঞ্জাব ও গুজরাটের রাজসভাতে যে সকল গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইত, তাহারাই ভারতীয় দৃশ্যকাব্য রচনার ভিত্তি পত্তন করে। কিন্তু মহাভাষ্যে দৃশ্যকাব্যাদির আভাষ পাইয়া Weber মত পরিবর্ত্তিত করিয়া বলেন যে, গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

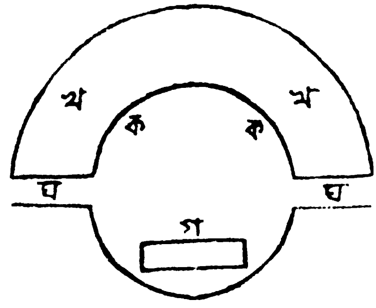
Pischel অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এ মত খণ্ডন করিবার পরেও Windisch পুনরায় এই গ্রীক্ প্রভাবের সূত্র ধরিয়া, কতদূর প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহা স্থির করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। Windischএর মতে ভারতীয় নাট্যের বিশেষত্ব—কাব্যাংশের আবৃত্তি ও নটের অনুকরণপ্রবণতা। "নট" শব্দটিই নৃত্ ধাতুর প্রাকৃত রূপ। ইহা হইতে বুঝায় আদিতে তিনি নর্ত্তক ছিলেন—অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতেন—অর্থাৎ গ্রীক্ বা রোমান্ পরিভাষায় তিনি—pantomime। তাহার পর মহাভাষ্যে যে দৃশ্য-কাব্যের আভাষ পাওয়া যায়, অধুনা প্রচলিত নাটকাদি সকলগুলিই তাহা হইতে বিশেষ বিভিন্ন। এইরূপ বাঁধাধরা রচনার ছাঁদ, গল্পাংশের পারিপাট্য, সংস্কৃত প্রাকৃতের মিশ্রণ প্রভৃতি নিবিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ইহাতে গ্রীক্ দৃশ্যকাব্যের সৌরভ অনুভব করিয়াছেন।

Windischএর মতবাদ প্রচারিত হইবার পর বহু মনীষী এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়া নানাবিধ বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। গান্ধার কলায় ভারতের পারদর্শিতা লাভের গুরু গ্রীস্। বুদ্ধের মূর্ত্তি রচনাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (বৌদ্ধগণের মধ্যে মূর্ত্তি উপাসনার ব্যবস্থা নাই—প্রতীকোপাসনাই প্রচলিত; তথাপি বুদ্ধমূর্ত্তির এত ছড়াছড়ি গ্রীক্ প্রভাব হেতু)। মহাযান মতোৎপত্তির হেতু-ভূতও বৈদেশিক প্রভাব। এমন কি Windischএর প্রবলতম বিরোধী Léviও অশ্বঘোষাদি প্রচারিত বৌদ্ধমত-বাদে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। তাঁহার রচিত রূপকই কিছু প্রাচীনতম রূপকের নমুনা নহে; সুতরাং খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে ভারতে রূপক-রচনা আরম্ভ হয় বলা যাইতে পারে। আর খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে Menander (মিলিন্দ)এর রাজত্বকালেই ভারতে গ্রীক্ প্রভাব চরমে উঠিয়াছিল। যদিও প্রায় একশত বৎসর পরে এ প্রভাব দূরীভূত হইয়া কুষাণ প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি গ্রীক্ প্রভাবের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

এখন মোটের উপর প্রশ্ন দাঁড়াইল এইরূপ যে, ভারতে গ্রীক্ নরপতিগণের সভাস্থলে গ্রীক্ রূপকের পুরা অভিনয় হইত কি না? এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিবরণ কিছুই নাই,

যাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শুনা যায়, প্রত্যেক যুদ্ধজয়ের পর আলেক্‌জান্দার এইরূপ অভিনয় দর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতেন। Ekbatana নামক স্থলে গ্রীস্ দেশ হইতে প্রায় তিনহাজার গ্রীক্ শিল্পী আসিয়াছিলেন— ইহাও জানা যায়। পারস্যের বালকগণ, Gedrosianগণ ও Susaর অধিবাসিগণ Euripides ও Sophoklesএর রূপক হইতে আবৃত্তি করিত। আর যদি Philostratos-

গ্রীক্ রঙ্গালয়—প্রাচীন



খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দীতে এথিনীয় রঙ্গালয়ের কল্পিত নক্সা

(Barnettএর নক্সার অনুকরণে অঙ্কিত)

[কক—অর্চেষ্ট্রা
খখ—প্রেক্ষাগৃহ
গ—Skene
ঘঘ—প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ]

"Such was the Simple "stage" on which the early dramas of Aischylos, and even of Sophokles, were played. Actor and chorus stood on the same level, often side by side. Scenery was unknown."

—Greek Drama—Barnett, P. 73.

বর্ণিত Tyanaর Apolloniosএর জীবনীকে সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে—একজন ব্রাহ্মণ যে Euripidesএর Herakleidai পড়িয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেন—তাহা সত্য। একদা Parthiaর অধিপতির (Orodes) সভাস্থলে Iason নামক অভিনেতা Bakchai নামক রূপক অভিনয় করিতেছিলেন। সহসা একজন দূত Crassusএর ছিন্ন মস্তক লইয়া উপস্থিত হইলে অভিনেতা তদ্দ্বারাই Pentheusএর মস্তকের কার্য্য সারিয়া ল'ন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আলেক্‌জান্দারাধিকৃত ভূভাগে গ্রীক্ রূপকের অভিনয় খুব প্রচলিত ছিল; ভারতে ছিল কি না তাহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নাই। কিন্তু মুদ্রাদি প্রস্তুতের জন্য যখন গ্রীক্ শিল্পী নিযুক্ত হইতেন, তখন নৃত্য, গীত, অভিনয়াদি চারুকলার প্রতি ভারতীয়গণ যে বীতরাগ হইতেন এরূপ কল্পনা করা যায় না।

Windisch বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৩৪০ অব্দ হইতে খ্রীঃ ২৬০ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রীসে New Attic Comedy প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উপর ইহারই ছায়া তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। গ্রীকগণের বিদ্যাপীঠ আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও উজ্জয়িনীর মধ্যে বেশ আদান প্রদান চলিত তাহা বুঝা যায়। আর মানবের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া নব comedyর পক্ষেই প্রভাব বিস্তার করিবার সৌকর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কিন্তু নব comedy ও সংস্কৃত রূপকের এই সাদৃশ্য বিশেষ কিছুই নাই। রোমান্ ও সংস্কৃত এই উভয়বিধ নাট্যেই অঙ্ক-বিভাগ এবং অঙ্ক-শেষে মঞ্চ হইতে সকলের নিষ্ক্রামণ প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য দৈবানুগতিক। দৃশ্য-পরিকল্পনা, নাট্যোক্তি-বিভাগ, প্রবেশ ও প্রস্থান এবং কোন নূতন পাত্রের প্রবেশের সময় রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত পাত্রান্তরের বাক্যে তাহার সূচনা ইত্যাদি বস্তুরও সাদৃশ্য আছে; এরূপ সাদৃশ্য থাকাও স্বাভাবিক। একই যুগে, একই অবস্থায় রূপক লিখিত হইলে দেশগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ সাদৃশ্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার উপর প্রাচীন যুগে যখন আজকালকার মত প্রোগ্রামের ছড়াছড়ি ছিল না, তখন উপস্থিত পাত্র দ্বারা অনুপস্থিত পাত্রের প্রথম প্রবেশ-সূচনাও স্বাভাবিক।

এইবার যবনিকার (প্রাকৃতে জবনিকা) পালা। পটী, অপটী, তিরস্করণী, প্রতিসীরা, যবনিকা ও পর্দ্দা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যবনিকা বুঝায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে টাঙান একখানি পর্দ্দা (১)। যবনিকাখানি দৃশ্যপট নহে; নাটকের মূল রসানুযায়ী রঙে ছোবান পর্দ্দা মাত্র। কেবল লালরঙের

(১) কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী হইতে বোধ হয় যে, প্রতিসীরা Drop অর্থেও ব্যবহৃত হইত; তিরস্করণীও বোধ হয় তাহাই।—ভামতী, ৫৪ পৃঃ, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ।

যবনিকার ব্যবহারও সর্ব্ব রূপেই চলিত। নেপথ্য-গৃহ ও রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে ইহা খাটান থাকিত (২)। যবনিকা শব্দটি Ionian শব্দের প্রতিরূপমাত্র। Ionian বলিতে যে কেবল গ্রীকগণকেই বুঝাইত তাহা নহে; গ্রীকবিজিত পারসিক ও গ্রীসাধিকৃত ঈজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাক্ট্রিয়া প্রভৃতির অধিবাসিগণকেও বুঝাইত। এইজন্যই মহাকবি কালিদাস পারসীক-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসেই যবনী-মুখপদ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাই হউক, যবনিকা অর্থে Le'vi বলেন পারস্যের কারুখচিত পর্দ্দা—গ্রীকগণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত। গ্রীক্ দৃশ্যকাব্যের প্রভাব এই একটি কথার সাহায্যে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নহে। তাহার দুইটি প্রধান কারণের এথানে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ গ্রীক্ নাটকে এরূপ পর্দ্দার ব্যবহার ছিল না—প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের অভিনয় খোলা মাঠেই সম্পন্ন হইত। Windisch বলেন তাহা নহে। গ্রীক রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগস্থ চিত্রিত দৃশ্যাবলী দৃষ্টেই ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, প্রাচীন গ্রীক নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যপটাদি ব্যবহৃত হইত না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে কুত্রাপি 'যবনিকা' শব্দের প্রয়োগ নাই; কেবল কর্পূর-মঞ্জরীতে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। রাজশেখরের কর্পূর মঞ্জরী বেশী প্রাচীন নহে—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর রচনা।

দৃশ্যকাব্যোক্ত নরপতির যবনী শরীর-রক্ষিণীগণের উল্লেখ হইতেও গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত হয় না। বড় জোর বলা যাইতে পারে যে, বিলাসী রাজগণ, হয়ত, সভায় যবনী শরীর-রক্ষিণী রাখিতে ভালবাসিতেন—কতকটা শোভার জন্য, কতকটা বা বিলাসের জন্য। এই সূত্রে গ্রীক্ ব্যবসাদারগণও নৌকা বোঝাই দিয়া এই সকল অনায়াস-লভ্যা মনোমোহিনী বিদেশিনী অর্দ্ধ-গণিকার আমদানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন (৩)।

সংস্কৃত নাটিকাগুলির সহিত Attic comedyর যথেষ্ট সাদৃশ্য এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞান-প্রদর্শনও এইরূপ একটি সাদৃশ্যস্থল। শকুন্তলায় অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক, বিক্রমোর্ব্বশীতে সঙ্গমমণি ও আয়ুর শর, রত্নাবলীতে সাগরিকার রত্নাবলী, নাগানন্দে আকাশপতিত মণি, মালতীমাধবে মালতীগ্রথিতা মালা, মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার রত্নালঙ্কার, মালবিকাগ্নিমিত্রে ধারিণীর সর্পমুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী, মুদ্রারাক্ষসে রাক্ষসের মুদ্রা প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রত্নাবলীতে রত্নাবলীর নৌকাডুবি ও Rudens নায়িকার সিসিলীর কূলে জাহাজডুবি একই ধরণের।

এই সকল প্রমাণের সাহায্যে যাঁহারা সংস্কৃত রূপকের উপর গ্রীক্ প্রভাব দেখাইতে চান, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত ঘটনাবলীর ভূরি ভূরি উদাহরণ পুরাণ ইতিহাসাদির মধ্যে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়; তাহার জন্য গ্রীসের দ্বারস্থ হইবার আবশ্যকতা নাই। Windisch যখন তাঁহার সিদ্ধান্ত খাড়া করেন, তখন মৃচ্ছকটিকই সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপক বলিয়া পরিগণিত হইত। মৃচ্ছকটিককে তিনি গ্রীক্ ছাঁচে ঢালা বলিয়াছেন। কয়েকটি সাদৃশ্য নিম্নে দেখাইতেছি—

(১) মৃচ্ছকটিক (ছোট বা খেলাঘরের মাটীর গাড়ী)—Cistellaria (little chest), Aulularia (little pot);

(২) মৃচ্ছকটিকে রাজনীতি ও প্রেমের সংমিশ্রণ। Plautusএর Epidicus ও Captiviতে সমসাময়িক রাজনীতি ও প্রেমের মিশ্রণ।

ইহা ছাড়া চারুদত্ত ও বসন্তসেনার পরস্পরানুরাগ, মদনিকাকে মুক্ত করিবার জন্য শর্বিলকের চুরি, মদনিকাকে মুক্ত করায় বসন্তসেনার মহাপ্রাণতা, ও গণিকা বসন্তসেনার বধূশব্দাবগুণ্ঠনলাভ ইত্যাদির সাদৃশ্যও গ্রীক নাটকে পাওয়া যায়। কিন্তু মৃচ্ছকটিক সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপক নহে। উহা ভাস-কৃত চারুদত্তের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। চারুদত্তের যতটুকু আমরা পাই তাহাতে অবশ্য রাজনীতির গন্ধও নাই। গণিকাপুত্রী বসন্তসেনার বধূশব্দাবগুণ্ঠনলাভ বস্তুতই বিচিত্র বস্তু। হিন্দুসমাজে ইহা কোন কালেই প্রচলিত ছিল না। ইহার সহিত গ্রীক্ নাটকের নায়িকার বিস্মৃতপ্রায় জন্মগত অধিকারলাভ তুলনীয় হইতে পারে না। Keith বলেন যে, পূর্ব্ব ঘটনাটি সম্পূর্ণ রাজনীতি-সম্পর্কীয়—আর পরেরটি সম্পূর্ণ সমাজনৈতিক। সুতরাং এ সাদৃশ্যের কোন ভিত্তি নাই।

অনন্তর নাটকীয় কালের সাদৃশ্য। Aristotle তাঁহার

---

(২) এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা "শকুন্তলায় নাট্যকলা" পড়িতে পারেন।

(৩) শকুন্তলায় নাট্যকলার ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত—এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

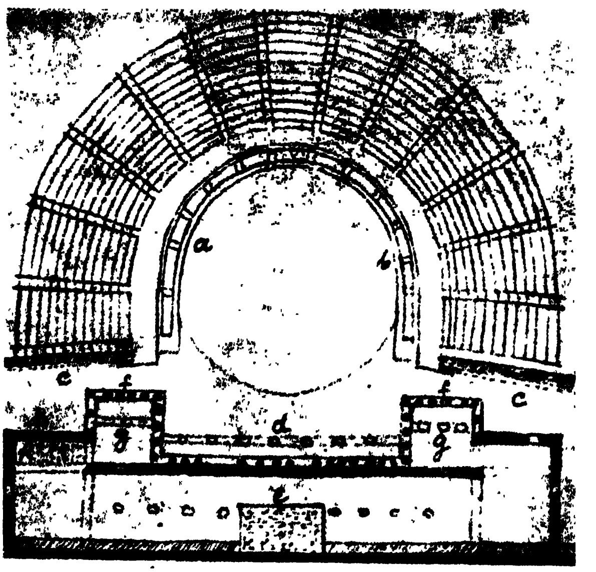
Poeticsএ বলিয়াছেন যে, নাটকীয় ঘটনা একদিন অপেক্ষা অতি অল্প সময় মাত্র অধিক হইতে পারে—বেশী নয়। আর সংস্কৃত রূপকে একাঙ্কের ঘটনা একদিনব্যাপী হওয়ার বিধি আছে। ইহাও সম্পূর্ণ দৈবানুগতিক সাদৃশ্য। তাহার পর বিশেষ পার্থক্যের বিষয় হইতেছে যে সংস্কৃত নাটকে দুইটি অঙ্কের মধ্যে বর্ষপ্রায় (এমন কি বর্ষাধিক, বহুবর্ষব্যাপী) ব্যবধান থাকে; গ্রীক্ নাটকে তাহা হওয়া অসম্ভব।

তাহার পর নাট্যে বর্ণিত চরিত্রগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজার পট্টমহিষী ও রোমান্ comedyর matronaর সাদৃশ্য; রাজার নবীনা প্রেয়সীর সহিত মিলনের মুখে রাণী কর্তৃক বাধা দেওয়া ও সেনেক্স কর্তৃক পুত্রের বিবাহে বাধা দেওয়ার সাদৃশ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যে দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত, সে দেশে এরূপ ব্যাপার কিছু অস্বাভাবিক নহে, বিশেষতঃ রাজারাজড়ার অন্তঃপুরে। এ সকল সাদৃশ্যও ধর্তব্য নহে। তবে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বিট, বিদূষক ও শকার চরিত্রের সহিত parasite, servus currens, miles gloriosus—এই তিনটি (গ্রীক্ নাটকের) চরিত্রের যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা বস্তুতই অদ্ভুত। Windischএর অপরাপর সকল যুক্তি অপেক্ষা এইটিই অধিক বলবান্। ইহা ছাড়া সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক চরিত্রের সাদৃশ্যও গ্রীক্ নাটকে আছে। শকার চরিত্রটির উপর গ্রীক্ প্রভাব স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। কারণ, চারুদত্ত, মৃচ্ছকটিক ও কালিদাসের নাটক ছাড়া পরবর্তী যুগের নাটকে শকার চরিত্রের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে শকার চরিত্র ভারতীয় রচনায় খাপ না খাওয়ায় ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিদূষক চরিত্র যে ধর্ম্মোৎসব হইতে গৃহীত তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বিটচরিত্রও Parasite চরিত্র হইতে যথেষ্ট মার্জ্জিত। শকার চরিত্রও যে সম্পূর্ণ অভারতীয়, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অতএব এইরূপ অস্পষ্ট সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় রূপকে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণ করা যায় না।

সংস্কৃত রূপকের প্রস্তাবনা ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস। কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রভৃতি প্রদানের জন্যই প্রস্তাবনার প্রবর্ত্তন। সূত্রধার ও তদীয় স্ত্রী নটীর (প্রধানা অভিনেত্রী) অনুরূপ চরিত্র অন্য দেশের নাটকে নাই। নাট্যাধিপতি শিবের সহিত Dionysosএর সাদৃশ্য হইতেও গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত হয় না (৪)। বসন্তকাল (নাট্যপ্রয়োগের উপযুক্ত সময়) ও Great Dionysia উৎসবের সাদৃশ্যও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। Protagonist (leader of the chorus) ও সূত্রধারের সাদৃশ্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়ও অকাট্য প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ চিরস্থায়ী ছিল না বলিয়া গ্রীক্ রঙ্গালয়ের

(Barnettএর অনুকরণে অঙ্কিত)
পরবর্তী যুগে গ্রীক্ রঙ্গালয়ের নক্সা



LYKURGUSএর রঙ্গালয়
[ab—orchestra. cc—parsdsi. d—proskenisn. e—skene. ff—paraskenia. gg—hellenistic paraskenia. h—staircase].—The Greek Drama-Barnett P. 93.

সহিত তাহার তুলনা সম্ভব নহে। কিন্তু রামগড় পাহাড়ের সীতাবেঙ্গা গুহাকে Bloch গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের ধরণে নির্ম্মিত

(৪) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Dionysus in Megasthenes; who was he?" নামক প্রবন্ধ (Third Oriental Conference) দ্রষ্টব্য। তিনি Dionysusকে সোম (শিব নহে) বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৫) এই প্রসঙ্গে আমরা গ্রীক্ রঙ্গালয়ের একটি চিত্র (নক্সা) পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দিয়াছি। দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সীতাবেঙ্গা রঙ্গমঞ্চের সহিত গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের বিশেষ কোনই সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ভারতীয় রূপকের উপর গ্রীক্ নাটকের প্রভাব কোনরূপেই স্বীকৃত হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে Keith এই সকল যুক্তির সার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় নাট্যে mimeএর প্রভাব প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ উভয়ত্রই কয়েকটি সাদৃশ্য দেখা যায়—

(১) উভয় স্থলেই মুখোস না ব্যবহৃত হওয়া;

(২) রোমান্ পর্দ্দা (Siparium) ও ভারতীয় যবনিকা;

(৩) উভয়ত্র চিত্রিত দৃশ্যপটের অভাব;

(৪) বহুভাষায় কথোপকথন;

(৫) বহু অভিনেতার সমাবেশ;

এবং (৬) Zelotypos ও শকারের, mokos ও বিদূষকের সাদৃশ্য।

এই সিদ্ধান্তটি প্রথমতঃ Reich কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। Konow ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন Keith তাহা অসার বোধ করেন। তবে mime ও নটের কার্য্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ, তাহা Keithও স্বীকার করেন। তাহার উপর চরিত্রগত সাদৃশ্যও অস্পষ্ট।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণ করিবার মত উপযুক্ত উপাদান এ পর্য্যন্ত পাওয়া না যাইলেও ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে বা অভিনয়-ধারার উপর যে গ্রীক্ প্রভাব প্রসারিত হয় নাই, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। হয়ত, যেটুকু প্রভাব পড়িয়াছিল, সুকৌশলী ভারতীয় কবিগণ তাহা এরূপভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহাতে বৈদেশিত্ব অনুভব করা দুরূহ। এ প্রসঙ্গে আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"Origin of the Hindu Drama :—The Hindu Theatre appears to have been of Indian growth. It shows no trace of foreign origin. Scenes in Hindu dramas are often separated by scores of years and by hundreds of miles, and there is so little of the lyric element in them that it is difficult to trace them to the Greek drama."

—A School History of India (1896), P. 51.

অর্থাৎ হিন্দু দৃশ্যকাব্য ভারতের নিজস্ব জিনিস। কোনরূপ বৈদেশিক প্রভাবের ছায়াও ইহাতে নাই। ভারতীয় রূপকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে (অঙ্কমধ্যে) শতাধিক যোজন পথ ও যুগাধিক কালের ব্যবধান দৃষ্ট হয়; তাহা ছাড়া গীতিবহুল অংশের অল্পতাও দৃষ্ট হয়। অতএব গ্রীক্ নাটকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।

শকাধিপত্য ও সংস্কৃত রূপক :—

অধ্যাপক Le'vi সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে গ্রীক্ প্রভাবের কথা মোটেই স্বীকার করিতে চাহেন না। এ হিসাবে তিনি Windischএর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের আদিম নমুনাগুলি প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল; পরে শকগণের আধিপত্য ভারতে বিস্তৃত হইলে উত্তর পশ্চিমাংশে গ্রীক্ প্রভাব বিদূরিত হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত বৈদিকী ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল; শকগণই প্রথম উহাকে লৌকিকী ভাষারূপে প্রচারিত করেন। তাহার পর হইতেই সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে প্রাচীন শিলালিপিগুলি সবই পালি অথবা প্রাকৃতে খোদিত। শিলালিপিতে সংস্কৃতের ব্যবহার রুদ্রদামনের গির্ণার প্রশস্তিতেই (খ্রীঃ ১৫০ অব্দ) প্রথম দেখা যায়। উষবদাত-(ঋষভদত্ত) শিলালিপিতেও (খ্রীঃ ১২৪ অব্দ) কিছু কিছু সংস্কৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ক্ষত্রপগণই (শকক্ষত্রপ=satrap) দেববাণীকে মর্ত্ত্যবাণী করিবার অগ্রণী; দাক্ষিণাত্যের শাতকর্ণিগণ ও অন্যান্য গোঁড়া হিন্দুর দল প্রথম প্রথম ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের শিলালিপিতে প্রাকৃতের ব্যবহার রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে Le'vi শকার-চরিত্রেরও আলোচনা করিয়াছেন। শকার—শকবিরোধী; এই জন্য সংস্কৃতপ্রিয় শকগণের উপর

(৫) তরুণ লিপির (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) মদীয় 'রামগিরি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রতিশোধ লইবার জন্যই যেন শকারের ভাষা অতি নীচ শ্রেণীর মাগধী প্রাকৃত।

Le´viর পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, শকরাজগণের শিলালিপিতে ব্যবহৃত অনেকগুলি শব্দ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। রুদ্রদামন তাঁহার পিতামহ চষ্টনের প্রতি 'স্বামী' ও 'সুগৃহীতনামা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নহপানের সময় হইতেই (খ্রীঃ ৭৮) 'স্বামী' শব্দটি শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। রুদ্রসেন (খ্রীঃ ২০৫) চষ্টন, জয়দামন ও রুদ্রদামন সম্বন্ধে 'ভদ্রমুখ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শব্দগুলি নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট সম্বোধন সূচক শব্দগুলির অন্তর্ভূত। রুদ্রদামন পুষ্যগুপ্তকে 'রাষ্ট্রিয়' বলিয়াছেন; রাষ্ট্রিয় শকারের অপর নাম। তাহার উপর পাশ্চাত্য শক ক্ষত্রপগণের রাজধানী ছিল—মালবান্তর্গতা উজ্জয়িনী। ইহারই চারিপাশে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধী এই তিনটি প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং Le´viর সিদ্ধান্তানুসারে প্রাচীনতর প্রাকৃত দৃশ্যকাব্য হইতে অর্ব্বাচীনতর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি বা ক্রমবিকাশ স্বীকার করিতে দোষ কি?

Konow বলেন যে, Le´viর সিদ্ধান্ত পুরামাত্রায় ঠিক নহে। অধুনা লভ্যমান অশ্বঘোষ ও ভাসের রূপকে মহারাষ্ট্রীর গৌরব না দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে Le´vi-কথিত উজ্জয়িনী সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্মভূমি নহে; শৌরসেনীর মাতৃভূমি মথুরাতেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। সে সময়ে মথুরাও শক ক্ষত্রপগণের অধীন বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং শক-প্রভাব অবশ্যই স্বীকরণীয়।

কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ প্রবল যুক্তির উপর অবস্থাপিত নহে। প্রাকৃত রূপকের উদাহরণ, রাজশেখরের সট্টক কর্পূর-মঞ্জরী। কেবল প্রাকৃতে রূপক-রচনার যে বিধি আছে, তদবলম্বনে ইহা রচিত। কেবল সংস্কৃতে এরূপ রূপক দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রাকৃত রূপক সংস্কৃত রূপক হইতে প্রাচীনতর। এই যুক্তি নিতান্ত অসার; রাজশেখর হইতে অন্ততঃ ৭০০ বৎসরের প্রাচীন ভাসের দূতবাক্যে প্রাকৃতের গন্ধও নাই। তাহার উপর, কেবল প্রাকৃতে রচনা করিলেই যে রূপক প্রাচীন হইবে, এ কিরূপ কথা! মহাভাষ্যে কোন প্রাকৃত কাব্যের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন (৬)। এমন প্রাচীন প্রাকৃত সংগ্রহ কাব্য হালা সপ্তশতীকেও Keith সংস্কৃতের অনুকরণ বলিয়া বোধ করেন। তাঁহার মতে উহার মহারাষ্ট্রী অংশটুকু সুপ্রাচীন হইলেও সংস্কৃত আদর্শের অনুকরণমাত্র। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের উদ্ভবসময় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী; হালের গ্রন্থেই উহার প্রথম প্রয়োগ। হাল ও প্রতিষ্ঠানের সাতবাহন একই ব্যক্তি। জৈনমতে তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীঃ ৪৬৭ অব্দ। আবার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, সপ্তশতী একাধিক ব্যক্তির রচনা। রচয়িতৃগণ কালিদাসের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। (৭) ইঁহার গুরু Macdonell সপ্তশতীকে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর রচনা বলিয়াছেন। ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও সংস্কৃত কাব্য অপেক্ষা প্রাকৃত কাব্যের প্রাচীনত্ব কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। সংস্কৃত বৈদিকী ভাষা ছিল, লোকে উহার ব্যবহার ছিল না—Le´viর এই ধারণা মূলতঃ Fergusson ও Maxmullerএর সংস্কৃতের নবাভ্যুদয় সিদ্ধান্তের (Renaissance Theory) ছায়া লইয়া গঠিত। এ সিদ্ধান্ত আপাততঃ ধূলিসাৎ হইয়াছে। সে সকল যুক্তি এখানে উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, মহর্ষি পাণিনির সময়েও সংস্কৃত লৌকিকী ভাষা ছিল; সেইজন্য তিনি উহাকে শুধু "ভাষা" বলিয়াছেন। তাহার উপর রুদ্রদামনকে লৌকিক সংস্কৃতের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরিতে হইলে অশ্বঘোষের রূপকে সংস্কৃতের ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ অশ্বঘোষ রুদ্রদামন অপেক্ষা অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার উপর Ludersএর কথামত অশ্বঘোষের পৃষ্ঠপোষক কনিষ্ককে বিক্রম-সংবৎ-প্রবর্ত্তক বলিয়া যদি ধরা হয়, তবে সংস্কৃতরূপকোৎপত্তির যুগ নির্ব্বিবাদে মহাভাষ্যকারের সমসাময়িক বলিয়া ধরা যাইতে পারে (ইহা অবশ্য অসম্ভব—অন্ততঃ Keithএর মতে)। অশ্বঘোষ গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, প্রাকৃত-রূপক

---

(৬) "বাররুচং কাব্যম্"—মহাভাষ্য ৪।৩।১০৩
"নাকমিষ্টসুখং যান্তি সুযুক্তৈর্বড়বারথৈঃ।
অথপৎকাষিণো যান্তি যেহচীকমতভাষিণঃ॥—ম, ভা, ৩।১।৪৮
"বরতনু সম্প্রবদন্তি কুক্কুটাঃ"—প্রভৃতি।

(৭) Keith, Classical Sanskrit Literature, P. 15, 50. and 114,

ও শকপ্রভাব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত কোনরূপেই রক্ষা করা যায় না। অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও যে সংস্কৃত-রূপক ছিল না, ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না; কারণ, একেবারেই অশ্বঘোষের রূপকের মত মার্জ্জিত রূপকের উৎপত্তি সম্ভব নহে।

তাহার পর রাষ্ট্রিয় প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উপর মাত্র নির্ভর করিয়া এতবড় একটা বিরাট ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। 'রাষ্ট্রিয়' শব্দটি সাধারণতঃ 'শাসক' অর্থের বোধক। উহা—রুদ্রদামনই হউক আর ভরতই হউন—কাহারও নিজস্ব নহে। 'স্বামিন্' শব্দ নাট্যশাস্ত্রের সম্বোধনসূচক শব্দ-রাশির মধ্যে ধৃত হয় নাই; কেবল দশরূপকে ও সাহিত্য-দর্পণে আছে। আর নাট্যশাস্ত্রে এ শব্দগুলি পাওয়া যাইলেও শকগণ ইহা নাট্যশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ অনুমানে দোষ কি? অন্ততঃ যে সময়টি নাট্যশাস্ত্রের রচনা-কাল বলিয়া আমরা নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তদনুসারে উহা শকরাজগণ হইতে প্রাচীন বলিয়া সহজেই স্বীকৃত হয়। তাহার পর নাট্যশাস্ত্রে যেরূপ সঙ্গত ভাবে শব্দগুলির প্রয়োগ-বিধি বর্ণিত হইয়াছে, শকশিলালিপিতে সে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের ইহাও একটি প্রধান প্রমাণ। অতএব সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে শকপ্রভাব অস্বীকার করিতে না পারিলেও, শকপ্রভাব উহার উৎপত্তির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃত লইয়া আলোচনা করিবার জিনিস যথেষ্টই আছে। Keith তাঁহার Sanskrit Drama নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণিত হইয়াছে যে, শিলালিপির প্রাকৃত সরল, স্বাভাবিক ও প্রাচীন;—কিন্তু রূপকে ব্যবহৃত প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত, কৃত্রিম ও আধুনিক। ইহা হইতে মনে হয়, প্রাচীনতম রূপকের নমুনাগুলি সম্ভবতঃ আগাগোড়াই সংস্কৃতে রচিত হইত, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে খুব সরল সংস্কৃতপ্রায় শৌরসেনী প্রাকৃত অল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হইত। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কৃত্রিম প্রাকৃতের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা যে সকল রূপক পাই, তাহাতে এইরূপ কৃত্রিম Grammatical (ব্যাকরণসম্মত) প্রাকৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা প্রকৃত প্রাকৃত (চলিত ভাষা) তাহা এখনকার রূপকে দুষ্প্রাপ্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সকল জটিল সমস্যাময় মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে আমরা কেবল দুইটি তথ্যে উপনীত হইতে পারি।

(১) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রূপকের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে ছিল,

(২) বোধ হয় তাহারও প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে রূপক-রচনা এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে কি ছিল তাহা সম্পূর্ণ তিমিরে।

ভারতের বিশেষত্বই এই যে, উহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না; ইহার কারণ স্বরূপে আমরা দেবেন্দ্রবাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি যে, ভারতে চিরদিনই "ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যক্ত" হইয়া আসিয়াছে। কেবল বর্ত্তমানযুগের পুরাতত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যেই ইহার ব্যতিক্রমের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। যাক্ সে কথা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণিকাধ্যক্ষ প্রকরণে (২।২৭।৪৪) বলা হইয়াছে যে, গণিকা (ও গণিকা-পুত্রগণ) "অষ্টবর্ষাৎ প্রভৃতি রাজ্ঞঃ কুশীলব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।" আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে—"এতেন নটনর্ত্তকগায়কবাদকবাগ্‌জীবনকুশীলব-প্লবকসৌভিকচারণানাং স্ত্রীব্যবহারিণাং স্ত্রিয়ো গূঢ়াজীবাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ।" ইহা ব্যতীত রঙ্গোপজীবিনী ও রঙ্গোপজীবীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"গীতবাদ্যপাঠ্যনৃত্তনাট্যাক্ষর চিত্রবীণাবেণু-মৃদঙ্গপরচিত্তজ্ঞানগন্ধমাল্যসংযূহন সম্পাদনসংবাহনবৈশিককলা-জ্ঞানানি গণিকা দাসী রঙ্গোপজীবিনীশ্চ গ্রাহয়তো রাজ-মণ্ডলাদাজীবং কুর্য্যাৎ। গণিকাপুত্রান্ রঙ্গোপজীবিনশ্চ মুখ্যান্নিষ্পাদয়েয়ুঃ……।" ইহা হইতে কি বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, মহাভাষ্যকারেরও বহুপূর্ব্বে চাণক্যের সময়েও ভারতে রূপকাভিনয় পুরামাত্রায় প্রচলিত ছিল; এবং নটের ব্যবসায় তখনও ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত বলিয়াই গণিকা ও গণিকাপুত্রগণকেই তিনি রঙ্গমঞ্চে নামাইবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। Keith এ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; বোধ হয় ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়াছে। এগুলিকেও কি তিনি pantomime সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহেন? না—Winternitz সাহেবের পদাঙ্কানুসরণে অর্থশাস্ত্রকে

তৃতীয় শতকের রচনা (৮) বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন?

প্রবন্ধটি আশাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ায়, যত শীঘ্র শেষ করা যায় ততই মঙ্গল। উপসংহারে বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই।

রূপক ও উপরূপকগুলির লক্ষণ লইয়া আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আলঙ্কারিকগণ দশবিধ রূপক (৯) ও অষ্টাদশবিধ উপরূপকের প্রকৃতি-স্বরূপ বলিয়া নাটককে গ্রহণ করিলেও নাটকই রূপক-রচনার সর্ব্বশেষ স্তর। ভাণ প্রভৃতি একাঙ্ক একভূমিকা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় monologue গুলিই প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে নাট্য-সাহিত্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রহসন, ব্যায়োগ প্রভৃতি বহুভূমিকাযুত ক্ষুদ্রকায় রূপক ও তাহা হইতে ক্রমশঃ সমবকার, নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় দৃশ্যকাব্য উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহার পর প্রকরণ, ও সর্ব্বশেষে নাটক (court drama)। নাটকেই প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের চরম পরিণতি।

উপসংহার—

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় রূপকোৎপত্তির তিনটি স্তর দেখাইয়াছেন:—

১। গ্রন্থিকদ্বারা পাঠ ও আনুষঙ্গিক অঙ্গ-সঞ্চালন,

২। যাত্রাগান,

ও ৩। প্রকৃত অভিনয়।

Macdonell ও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—"The primitive stage is represented by the Bengal Yatras and the Gitagovinda." (১০) কিন্তু আমাদের মনে হয় যাত্রাকে প্রকৃত অভিনয়ের পূর্ব্বাবস্থা বলিলে যাত্রার অসম্মান করা হয়। কাব্য-আবৃত্তি বা প্রাচীন কথকতা হইতে যাত্রা ও অভিনয়—এই উভয়ের উৎপত্তি সম্ভব হইলেও একটি অপরটির পূর্ব্বাবস্থা বা ভগ্নাবশেষ নহে; দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাত্রায় কেবল রসের উদ্বোধনই লক্ষ্য, অভিনয়ে রস ও বস্তু উভয়ের সমান সমতালতা রক্ষা প্রয়োজন। Action না থাকিলেও যাত্রা চলে, কিন্তু অভিনয় চলে না।

আর একটি কথা। প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া যে সকল পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল আর্য্যগণের মধ্যেই উক্ত কলার বিকাশের আলোচনাই করিয়াছেন। অনার্য্যগণের মধ্যে নাট্যকলার প্রসার হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু নাট্যকলা কেবল আর্য্যগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ের সূচনা পাওয়া যায়। দেবগণের মধ্যে যেমন ভরতমুনি নাট্যাচার্য্য, দৈত্যগণের মধ্যেও সেইরূপ কোহল (কোহেল) প্রভৃতি নাট্যাচার্য্যের নাম পাওয়া যায় (১১)। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোহল প্রভৃতি দৈত্য-নাট্যাচার্য্যগণ ভরতের পরিচিত ছিলেন।

এত আলোচনার পরও রূপকোৎপত্তির সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল—ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। আরও পর্য্যাপ্ত উপাদান সংগ্রহ না হইলে এ সকল দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। তবে আপাততঃ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সকলের সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারা যায়—

(১) বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত রূপকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,

(২) বৈদেশিক প্রভাবের বিষয়ে প্রমাণের অল্পতা,

(৩) রূপকাভিনয়ে স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়েরই ভূমিকা-গ্রহণ,

ও (৪) নটগণের অবশ্যম্ভাবী চরিত্রদোষ।

প্রাচীন ভারতীয় রূপকের বর্ণিতব্য বিষয় ছিল অতি বিস্তৃত। সাহিত্য-দর্পণাদিতে উল্লিখিত শুধু পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক আখ্যায়িকাগুলিই উহার মূল নহে। কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব রাম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা এ বিষয়ে যথেষ্ট

(৮) Winternitzএর এই সিদ্ধান্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাহা, শ্রীযুক্ত শ্যামাশাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। সাহেব তাহার প্রতিবাদকরণে সমর্থ হ'ন নাই।

(৯) সম্প্রতি আরও দুই জাতীয় নূতন রূপকের নাম পাওয়া গিয়াছে। Vide my article "Rupakas—how many are they?"
—Indian Historical Quarterly

(১০) History of Sanskrit Literature, p. 347.

(১১) "শেষং প্রস্তারতন্ত্রেণ কোলাহলঃ কথয়িষ্যতি (? কোহলঃ কথয়িষ্যতি)।" ৩৭।১৮
"কোহেলাদিভিরেবং তু বৎসশাণ্ডিল্যধূর্ত্তিভেঃ।" ৩৭।২৪
—নাট্যশাস্ত্র।

সহায়তা করিয়াছিল। বিভিন্ন দেবতার উপাসনার প্রকার-ভেদ লইয়াও রূপকের আখ্যানাংশের ইতর-বিশেষ কল্পিত হইত। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ ও জৈনগণের দার্শনিক ও ধর্ম্মমূলক নীতিবাদগুলি (Ethico-didactical preachings) রূপকের (play) উপর রূপকের (allegory) আবরণ দিতে সহায়তা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে নৃপতিগণ যখন কবিগণের পৃষ্ঠপোষক ও কাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিলেন, তখনই নাটকের (court drama) সৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই জন্যই নাটকে রাজা, রাণী, রাজার প্রণয়-পাত্রী ও পীঠমর্দ্দ বিদূষক প্রভৃতির এত বাহুল্য দৃষ্ট হয়। রূপকের পরিণতির চরমোৎকর্ষই এই নাটক।

ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজাতীয় (বিশেষতঃ গ্রীক্) প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার মত উপাদান যতই অল্প হউক না কেন, জিনিসটীকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। উৎপত্তি বিষয়ে না হউক, অন্ততঃ পরিপুষ্টি বিষয়ে, ভারতীয় কবিগণের নিতান্ত অজ্ঞাতসারে যাবনিক নাট্য-রচনানীতির অল্পাধিক অংশ-বিশেষ যে ভারতীয় দৃশ্যকাব্য-রচনানীতির মধ্যে গৃহীত হয় নাই, তাহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈদেশিক সংস্পর্শে আসিয়াও ভারতীয় কবিগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন,—বিজাতীয় ভাবটুকু এমন সুন্দরভাবে নিজস্ব করিয়া লইতেন যে, তাহা বিজাতীয় বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যকাব্য কোন একটি বিশেষ যুগের সম্পত্তি নহে। শতাধিক জাতীয় ও বিজাতীয় ভাবের অল্পাধিক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব, পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন একটিও রূপকোৎপত্তির কাল-সমস্যা-সমাধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রূপককে সাধারণতঃ "লোকানুকৃতিঃ" বলা হয়; কারণ, লোকচরিত্রের মত ইহাও একটি বিরাট প্রহেলিকা মাত্র।

রাজস্থান

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

(৩)

উদয়পুর থেকে জয়পুরে এসে মনে হোলো যেন একদিনে একেবারে দুশো বছর পার হোয়ে এসেছি। বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, লোকজন, চেঁচামেচি—প্রথম দৃষ্টিতেই—বিশেষ উদয়পুরে দেড় মাস কাটিয়ে—মনে হোলো, হ্যাঁ, একটা দেশ বটে। কলকাতার পিঁজরের মধ্যে থাকা অভ্যাস আমাদের, বেশী দিন নির্জ্জন স্থানে থাকাতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। জয়পুরে এসে এই সহর-ঘেঁষা প্রাণটা অনেকখানি আশ্বস্ত হোলো।

জয়পুর শহর বেশী দিনের নয়। দুশো বছর আগে মহারাজা জয়সিংহ এই শহরের পত্তনী করেন। আগে এই রাজত্বের নাম ছিল অম্বর রাজ্য। রাজস্থানে এখনো বোধ হয় অম্বর নামেই এই রাজ্য খ্যাত, কিন্তু সাধারণের কাছে এখন এর নাম জয়পুর রাজ্য এবং এই নামেই এখানকার সরকারী কাজকর্ম্ম চলে।

জয়পুর শহরটী ভারী সুন্দর। খুব চওড়া রাস্তা, রাস্তার দুদিকে চওড়া ফুটপাথ। শহর দেখলেই বুঝতে পারা যায় মার্কিনী রীতি অনুসারে আগে থাকতে ছক্ কেটে নিয়ে শহর তৈরি হয়েছে। রাস্তার দুধারের বাড়ীগুলি এক ধাঁচের, আর একই রংয়ের। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় রাস্তার দু-দিকে এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্য্যন্ত বুঝি একখানি বাড়ীই এতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বাড়ীগুলি প্রায় সবই মুসলমানী ধরণের। অনেক বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ছোট বড় নানা রকমের ছবি আঁকা। ছবিগুলি দেখলে রাজপুত চিত্রবিদ্যার যে কতখানি অবনতি হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এই সঙ্গে এও বলে রাখা উচিত যে, আমরা দু-একখানি নূতন এবং পুরাতন বাড়ীর গায়ের অঙ্কিত চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে,

জয়পুরে এখনো ভাল চিত্রকর আছে এবং উপযুক্ত উৎসাহ ও শিক্ষা পেলে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবে। রাস্তায় চলতে-চলতে মাঝে-মাঝে এক একখানা বাড়ী দেখে মনে হয় যেন ষ্টেজের বাড়ী।

জয়পুরের মতন সুন্দর সাজান শহর ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। দিনের বেলায় প্রখর রোদে কাজ কর্ম্ম গাড়ী ঘোড়া ও ব্যবসার কিচিমিচিতে এর সৌন্দর্য্য তেমন টের পাওয়া যায় না। অনেক রাত্রে পথ যখন জনবিরল হয়, তখন এই নগরী তার ঘোমটা খুলে রূপের পশরা নিয়ে পথিকের সম্মুখে দাঁড়ায়। দিনের বেলা যে পথ দিয়ে দশবার গিয়েছি, রাত্রে সে পথের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বেশী মনে হয়েছে।

শহরের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ। বাহির থেকে প্রাসাদের কিছুই দেখা যায় না, একটা চূড়া পর্য্যন্ত না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রাসাদের সীমা। এই জায়গার মধ্যেই সরকারী দপ্তর, মানমন্দির ইত্যাদি আছে। মোটকথা উদয়পুরের প্রাসাদের সঙ্গে জয়পুরের প্রাসাদের তুলনাই হয় না। সে প্রাসাদের তুলনায় জয়পুরের রাজবাড়ীকে প্রাসাদই বলা চলে না। উদয়পুরে বড় বাড়ী নেই, জয়পুরে বড় বাড়ী বহুৎ আছে; কিন্তু দুই একটি বড় বাড়ী সেখানে যা আছে জয়পুরের সমস্ত বাড়ীর সৌন্দর্য্য একত্র করলেও তার তুলনা হয় না।

জয়পুর শহর আয়তনে খুব বড় নয়। শহরের চতুর্দ্দিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কয়েকটি বড় দরজা আছে, রাত্রি এগারোটার সময় একটি দরজা ছাড়া সমস্ত দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া হয়। দেওয়ালের বাইরে যে শহর সেটা কলকাতার ইংরেজ-টোলার মত। ফুটপাথবিহীন চওড়া রাস্তাগুলি। রাস্তায় এখানকার মতই আসফাল্ট দেওয়া। শহরের ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই বড় রাস্তাগুলির খুব যত্ন নেওয়া হয়।

জয়পুর রাজ্যের সঙ্গে বাংলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বর্ত্তমান জয়পুর শহর একজন বাঙালীরই কীর্ত্তি। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্ত এখনো 'বিদ্যাধর কা রাস্তা' নামে একটি রাস্তা আছে। শহরে 'মোতি বাঙালীকা রাস্তা' নামে আর একটি রাস্তা দেখেছি। কিন্তু এই মোতি বাঙালী কে, তার সন্ধান পাইনি। বহুদিন আগে মহারাজা মানসিংহ সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত হোয়ে বাংলা দেশের জনকয়েক বিদ্রোহী জমিদারকে শাসন করতে এসেছিলেন। কার্য্য শেষ কোরে ফিরে যাবার সময় তিনি এখান থেকে একটি দেবী মূর্ত্তি নিয়ে গিয়েছিলেন; সেই সঙ্গে দেবীর পুরোহিত ব্রাহ্মণকেও তিনি নিয়ে যান। রাজা মানসিংহ এই দেবী মূর্ত্তি তাঁর রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবীর পুরোহিতকে জায়গীর দিয়ে সেইখানেই রাখেন। সেই থেকে দেবী ও তাঁর বাঙালী পুরোহিতেরা অম্বরেই বাস করছেন। দেবীর নাম 'শিলা' অথবা শলা দেবী। ছোট কাল পাথরের মূর্ত্তি। পুরোহিতেরা বলেন যে এই দেবী যশোরের প্রতাপাদিত্যের কালী মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী কিন্তু দুর্গা মূর্ত্তি বলেই মনে হয়। এই মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে জয়পুর মহারাজা কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় ও ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মূর্ত্তিটি আদৌ যশোর থেকে আনা হয়-নি। এটী বারো-ভূঁইয়াদের অন্যতম ভূঁইয়া কেদার রায়দের গৃহবিগ্রহ। মহারাজা মানসিংহ তাঁদের সায়েস্তা কোরে ফেরবার সময় মূর্ত্তিটী এবং সেই সঙ্গে পুরোহিতকেও নিয়ে আসেন।

অম্বরের এই শিলা দেবীর পুরোহিতদের একটি ছেলের সঙ্গে সেখানে ঘটনাচক্রে আলাপ হোয়ে যায়। সে যে এই পরিবারের ছেলে তা আগে জানতুম না। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যখন সে বুক ফুলিয়ে বল্লে—হাম বাংগালী হ্যায়—তখন বাস্তবিকই অবাক্ হয়েছিলুম। ঠিক এই রকম অবাক্ হয়েছিলুম আর একবার ফেরঙ্গ-ইংরেজী-ভাষিণী একটি বাঙালী মেয়েকে অন্য একটী বাঙালীর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে শুনে। তবে এদের দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একজন বাঙালী হোয়ে বাংলা ভাষা জেনে নিজের বাঙালীত্বের লজ্জাটুকু গোপন করবার জন্য হিন্দীতে কথা বলেছিলেন; আর একজন বুক ফুলিয়ে বাঙালী বলে গর্ব্ব করে, কিন্তু মুখে বাংলার বদলে হিন্দি ফোটে। ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি বাপু? সে বল্লে—সত্ত কালী ভট্টাচারি। আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ভট্টাচার্য্য? সে সংশোধন কোরে বল্লে—হাঁ ভট্টাচারি।

অম্বর দুর্গের পাশেই একটি ছোট পাহাড়ের ওপরে এদের প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর একটা দিক ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটী তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে। এদের সকলের নাম আমার মনে নাই। তবে সত্যকালীর দাদার নাম মনে আছে ভঁয়রো দাস। এদের পিতা এখনো জীবিত। সম্প্রতি ভঁয়রো দাসের বিবাহ হয়েছে। এদের বিবাহ হওয়া মুস্কিল! এঁরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; কিন্তু কোনও বাঙালীই এই হিন্দিভাষাভাষীর পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। রাজপুতানায় নাকি এই শ্রেণীর আরও কয়েক ঘর বাঙালী ব্রাহ্মণ আছেন। এতদিন তাদের সঙ্গেই এদের বিবাহাদি চল্‌ছিল, কিন্তু তারা সকলেই এত নিকট আত্মীয়ে পরিণত হয়েছেন যে বিবাহাদি চলা আর অসম্ভব। পরিবারের মধ্যে ভঁয়রো দাসের স্ত্রীই একমাত্র বাংলা জানেন। চার বছর অক্লান্ত চেষ্টার পর কাশীতে তার বিয়ে হয়েছে। এঁদের পরিবার এখন অনেক বড় হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মোত্তর না বাড়ায় এখন অবস্থার আর সে রকম জৌলুস নেই। আমি এই পরিবারেরই একজনকে জয়পুরে একজনদের বাড়ীতে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত দেখেছি।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি আছে। এঁর পুরোহিতও বাঙালী এবং তাঁদের অবস্থাও অম্বরের বাঙালী-দেরই মতন। এঁরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এঁদের নাকি বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল।

গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রত্যহ অনেক রাত্রি অবধি কীর্ত্তন হয়। হিন্দী কীর্ত্তন শোনবার লোভ সামলাতে না পেরে একদিন সন্ধ্যাবেলা দেব-দর্শনের উদ্দেশ্যে প্রাসাদে যাওয়া গেল। কিন্তু মন্দিরে যাবার সোজা রাস্তায় প্রহরী পথ আটকালে। পথ আটকাবার কারণ যা বল্লে তা বোঝা গেল না। সে অন্য একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলে বল্লে—এই রাস্তায় গেলে মন্দিরে পৌছতে পারবে। আমরা অন্ধকারে রাস্তা, মাঠ, ফটক পার হোয়ে প্রায় ঘণ্টা-খানেক ঘুরে তার পর মন্দিরের সন্ধান পেলুম। পরে শুনেছি যে, আমাদের অযথা ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। কারণ বাইরের লোক যাবার জন্য খুব সোজা রাস্তা আছে।

মন্দিরে গিয়ে দেখি কীর্ত্তন আরম্ভ হোয়ে গেছে। কৃষ্ণ-রাধার যুগল মূর্ত্তি। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক করতাল বাজিয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে কীর্ত্তন করছে, আর তার পিছনে প্রায় জন কুড়ি লোক করতাল নিয়ে দাঁড়িয়ে—এরা হোলো দোয়ার। দু-দুটো খোল বাজছে। রাজপুতানার এক রাজপ্রাসাদে আমার বাংলা দেশের শ্রীখোলের নিনাদ শুনে একটু গর্ব্ব অনুভব করলুম। দু-চার জন গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিতা, নেড়া-মাথা বাঙালী স্ত্রীলোককেও সেখানে দেখা গেল। যিনি মহড়ায় গাইছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর। কীর্ত্তনের সুর চেনা-চেনা বলে মনে হোতে লাগল, কিন্তু সে যে কি ভাষা তা ধরতে পারলুম না। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল। একবার বাংলা দেশেরই কোনো এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বদলী হওয়ার সময় অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছিল। সভায় একজন ইংরেজ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাংলা গান গাইতে পারতেন। তাঁকে একটি বাংলা গান গাইতে অনুরোধ করায় তিনি সুরু করলেন—টুম্ কাম্ অন্ কোর্ এ গ্যান্ কড় হো গ্যান্ ই, হাম হো বাক্ হো এ স্যন্ ই। গান শেষ হোয়ে গেলে ইংরেজ বাঙালী সকলেই তাঁকে গানের জন্য প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রশংসার কারণ বাঙালীরা মনে করেছিলেন যে তিনি ইংরেজী গান গাইলেন, আর ইংরেজরা মনে করলেন যে তিনি বাংলা গান গাইলেন।

আমার অবস্থাও প্রায় এই রকমই হয়েছিল। কারণ এই কীর্ত্তন শুনে আমি হিন্দী কীর্ত্তনের প্রশংসা করায় জয়পুরের এক বন্ধু বল্লেন—হিন্দী কি! এ যে বাংলা কীর্ত্তন।

এ কথা শোনবার পর একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝতে পারলুম—তাই ত। এ তো, আমার মাতৃভাষাই বটে! কিন্তু মা আমার হিন্দী খোলোষের মধ্যে এমন আত্মগোপন কোরে বিরাজ করছেন যে প্রথমে তাঁকে চেনাই দুষ্কর হোয়ে উঠেছিল।

দেব-সেবা ছাড়া আধুনিক যুগে অনেক বাঙালী রাজসেবা কোরেও সেখানে কীর্ত্তি রেখে গিয়াছেন। এঁদের মধ্যে পরলোকগত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেনের নাম বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত। সংসার বাবুর পুত্র পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র সেনও রাজ-সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এখনো রাজ-সরকারে কর্ম্ম করেন। কান্তি বাবুর দুই পুত্র এখনো জীবিত। এঁদের মধ্যে এখন যিনি বড় ঈশান বাবু, তিনি রাজ-সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি কর্ম্ম থেকে অবসর

গ্রহণ করেছেন। ঈশান বাবু সেখানে হাতী বাবু নামে খ্যাত। শহরের বাইরে জয়পুরী ঢংয়ে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ী। এঁর বাড়ীতে বাঙালীদের একটি ক্লাব আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় বাঙালীরা এসে মিলিত হন। হাতী বাবু এবং অবিনাশ বাবুর বড় ছেলে জয়পুর রাজ্যের এক একজন সর্দ্দার। এঁরা নাকি দরবারে উপস্থিত হোলে মহারাজকে গদি থেকে উঠে নমস্কার করতে হয়। এঁরা রাজ-সরকার থেকে জায়গীর পেয়েছেন এবং পুরুষানুক্রমে এঁদের বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই জায়গীর ভোগ করবেন। এ ছাড়া আরও অনেক বাঙালী সেখানকার রাজ-সরকারে কাজ করেন। শিক্ষা বিভাগেও অনেক বাঙালী আছেন। সেখানকার মহারাজা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় এবং একাধিক বাঙালী অধ্যাপকও আছেন। এখানকার কলেজে এম-এ ও এম এস্‌সি অবধি পড়ান হয়। কলেজটী এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন। আগ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোলে কলেজটী বোধ হয় তারই অধীনে যাবে। এখানকার স্কুলে ছাত্রদের দুটি বিভাগ আছে। একটি বড়-লোকের ছেলেদের জন্য, আর একটি সাধারণ লোকের ছেলেদের জন্য। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ঠেকে। শিক্ষায় মানুষের মনকে উদার করে; কিন্তু শিক্ষার গোড়াতেই এখানকার বড় লোকের ছেলেদের সেই প্রধান শিক্ষনীয় জিনিষটারই গোড়া মেরে রেখে দেওয়া হয়। বড়-লোকের ছেলেদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। বড়-লোকের ছেলে শিক্ষককে প্রশ্ন করলে—দরিদ্র কথার মানে কি হে!

শিক্ষককে মাষ্টার মশায় বা অন্য কোনো সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করা যায় না, কারণ ছাত্রের চেয়ে সে গরীব। শিক্ষক বল্লেন—আজ্ঞে, দরিদ্র মানে এ-বেলার পোলাওটা যে ব্যক্তি ও-বেলা খায়।

অর্থ ঠিক না হোলেও বড়লোকী চালটা বজায় রইল, আর বড়-লোকের ছেলেরও দরিদ্র সম্বন্ধে একটা কাছাকাছি ধারণা হোয়ে রইল।

জয়পুরে বড়-লোকদের ছেলেদের কি রকম শিক্ষা দেওয়া হয় জানি না; তবে শুনেছি যে যাঁরা ছেলেদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চান তাঁরা সাধারণ বিভাগেই ছেলেদের ভর্ত্তি করেন। মেয়েদের কোনো উচ্চ বিদ্যালয় নেই, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি স্কুল আছে। এই স্কুলটীর ভারও একটি বাঙালী মহিলার উপর ন্যস্ত। এঁর নাম শ্রীমতী গায়ত্রী রায় বি-এ। সেখানকার নারী-শিক্ষার প্রচার ও এই স্কুলটীর উন্নতির জন্য এঁর অদম্য চেষ্টা ও পরিশ্রম দেখলে অবাক্ হোতে হয়।

জয়পুর শহরে কলের জল ও ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে। কলের জল ও গ্যাসের আলো অনেক আগেই মহারাজা রাম সিংহ কোরে গিয়েছিলেন; আমরা সেখানে থাকতে থাকতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট হোলো। শহরের মধ্যে ও বাইরের আশে পাশে রাস্তায় গ্যাস জ্বলে। শহরের বাইরে একটু দূরে রাস্তার ধারে গ্যাসের থাম দেখেছি, কিন্তু অন্ধকার রাত্রেও আলো জ্বলে না।

জয়পুরে মুসাফেরদের জন্য দুটি বিলাতী ধরণের হোটেল ও একটি দেশী হোটেল আছে। দেশী হোটেলটীর নাম King Edward Memorial. এটির বাড়ী সরকার থেকে কোরে দেওয়া হয়েছে। আগে সরকারী তত্ত্বাবধানেই এটি চল্‌ত, কিন্তু বছরখানেক থেকে ঠিকেদারের হাতে দেওয়া হয়েছে। এ হোটেলটী সস্তা এবং ব্যবস্থাও মোটের ওপরে ভাল। আমরা পরে শহর থেকে দূরে একটা বাড়ী ভাড়া করেছিলুম, কিন্তু তার আগে প্রায় দিন পনেরো এই হোটেলে বাস করেছিলুম। এই কয়দিনের মধ্যে বিস্তর বাঙালীকে এই হোটেলে যেতে আসতে দেখা গেল।

উদয়পুরের মত এখানেও ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ খুব বেশী। তা ছাড়া এখানকার গরু একটা দেখবার জিনিষ। মালটানা গরুর গাড়ী ছাড়া এখানে মানুষ চড়বারও ভাড়াটে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। এ গাড়ীগুলি দেখবার মতন জিনিষ। অনেক বড়লোকের বাড়ীতে সেই পুরোণো যুগের গরুর গাড়ী এখনো আছে। এই গাড়ীগুলোর মধ্যে বসবার স্থান অতি কম, তার বাহুল্যই বেশী। এদেশী ভাষায় এই গাড়ীগুলির নাম রথ। এই রথগুলির ভাড়া অতি অল্প; এত অল্প ভাড়ায় সোয়ারী নিয়ে এদের যে কি কোরে পোষায় তা বোঝা মুস্কিল। কারণ সেই বৃহদাকার বলীবর্দ্দের খোরাক তো বড় কম নয়, আর সেগুলি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট। গরুর গাড়ী ছাড়া এক্কা, টাঙ্গা, ফিটন, ও মোটর তো আছেই। এর ওপর বাইসাইকেল ও মোটর গাড়ীও আছে। জয়পুরের কোনো বড় রাস্তায় কিছুক্ষণের

জন্য দাঁড়ালে মনে হয় যে, পাঁচ ছটা শতাব্দী যেন নির্ব্বিরোধে পাশাপাশি গড়িয়ে চলেছে। এ ছাড়া হাতী ঘোড়া ও উটের ব্যবহারও প্রচুর আছে। মহারাজা ছাড়া আরও অনেকের হাতী আছে এবং প্রয়োজন হোলে হাতী ভাড়াও পাওয়া যায়।

নিজ শহরের বাইরেই প্রকাণ্ড বাগান রামনিবাস বাগ মহারাজা রামসিংহের কীর্ত্তি। বাগানটি সুরক্ষিত। আমরা যে সময় সেখানে ছিলুম, সে সময় সমস্ত বাগানটা মরশুমী ফুলে একেবারে আলো হোয়ে থাকত। বাগানে যখনি ঢুকেছি, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যে কোনো সময়ে, তখনি দেখেছি বাগানের মাঠে ঘাসের জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে।

এই বাগানের মধ্যেই চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর। যাদুঘরের বাড়ীটি দেখবার জিনিষ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্থাপত্য মিলিয়ে এই বাড়ীখানি তৈরী করা হয়েছে। এটি আগাগোড়া পাথরে তৈরি এবং অনেক দামী রঙীন পাথরও ব্যবহার করা হয়েছে। যাদুঘরের একতলায় একটি ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজাদের প্রতিকৃতি আঁকা আছে। এই একতলারই দেওয়ালে দেশী ও ইউরোপীয় অনেক ছবির বড় বড় প্রতিলিপি আছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী নীতিগ্রন্থের বয়েৎ চারিদিকে লেখা। যাদুঘরটী ছোট হোলেও বেশ শিক্ষাপ্রদ। এই যাদুঘরও মহারাজা রামসিংহের অন্যতম কীর্ত্তি। এখানকার চিড়িয়াখানা অনেক দেশের চিড়িয়াখানার চেয়ে ভাল। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুদের জন্য আধুনিক খোলা খাঁচার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই খাঁচার মধ্যে তারা অনেকটা স্বাধীনভাবে জঙ্গলে থাকার অবস্থায় থাকতে পারবে। এই রকম বড় বড় খাঁচায় জানোয়ারদের বেশ প্রফুল্লভাবে থাকার কথা। জঙ্গলে থাকার সুবিধাটুকু তারা অনেকখানি পাবে আর অসুবিধাটুকু অর্থাৎ শীকার কোরে খাওয়ার কষ্ট আদৌ নেই, খাবার তাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনিই আসবে। জয়পুরের চিড়িয়াখানায় অনেক রকমের চিড়িয়া আছে, তাদের জন্যও স্বাধীনভাবে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। এত রকমের পাখী আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই। এ ছাড়া সেখানে আর একটি অদ্ভুত জন্তু আছে যার জোড়া বোধ হয় পৃথিবীর কোনো চিড়িয়াখানাতেই মেলে না। সেখানে একটি পুরুষ ছাগল আছে, তার একটি বড় লম্বা বাঁট এবং এই বাঁটে সব সময়েই দুধ থাকে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত ব্যতিক্রমটী প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার জিনিষ। এই ছাগলটীর ছবি ও বিবরণ ইতিপূর্ব্বে এখানকার অন্য এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জয়পুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার দুর্গ। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে অসংখ্য দুর্গ আছে। এখানে অনেক জমিদারেরও স্ব স্ব দুর্গ আছে। শহরের একেবারে গা ঘেঁষে পাহাড়ের ওপর যে দুর্গ তার নাম নাহার গড়। এই দুর্গ সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয় না। নাগা নামে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের হাতে এই দুর্গ-রক্ষার ভার আছে। এই দুর্গের মধ্যে নাকি জয়পুরের মহারাজার ধনরত্ন সম্ভার রক্ষিত আছে। এই রত্নরাজি ও ধনরাশি রক্ষা করবার ভার আছে নাগাদের ওপর। প্রত্যেক বছরের উদ্বৃত্ত টাকা এইখানে গিয়ে জমা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কবে কি উপলক্ষে যে এই টাকা খরচ হবে তা কেউ জানে না। এখানে কারুর প্রবেশের অধিকার নেই। সাধারণ তো দূরের কথা, স্বয়ং মহারাজার পর্য্যন্ত এই দুর্গে প্রবেশের হুকুম নেই। কিন্তু এই হুকুমটা কে দিলে অবিশ্যি তা কেউ জানে না। তবে হুকুমটা এমন প্রচারিত হয়েছে যে রাজ্যের কারুর সেটা জানতে বাকী নেই। মহারাজারা যখন গদী পান সেই সময় একদিন তাঁর চোখ বেঁধে নাহার গড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার পরে যে ঘরে তাঁর এই পুরুষানুক্রমসঞ্চিত অর্থ ও রত্নরাশি রয়েছে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হয়। তার পরে চোখ বেঁধে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়।

নাহার গড়ের রক্ষাকর্ত্তা এই নাগারা যে কে এবং কোথা থেকে তাদের উদ্ভব এ সম্বন্ধে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের গল্প শুনেছি যে সবগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে একটা সম্পূর্ণ গল্প তৈরি করা অসম্ভব। তবুও সেগুলির মধ্যে থেকে কেটে ছেঁটে যেটুকু দাঁড়ায় কৌতূহলী পাঠকদের সেটুকু বলছি। নাগারা এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী বিশেষ। কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লে যা বোঝায় এরা ঠিক তা নয়। এরা বিবাহাদি করে না, কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজকর্ম্ম করে, তা ছাড়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই রাজ-সরকার থেকে মাসে দুটি কোরে টাকা পায় এবং মহারাজার যখন প্রয়োজন হয় সেই সময়েই তাদের হাজির হোতে হয়। এদের তলোয়ার খেলা প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যা শিখতে হয়। আগে এরা অনেক

লড়াই করেছে এবং নাগা সৈন্তদের নামডাকও খুব ছিল। এরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে-ঘুরে নিজেদের দলপুষ্টির জন্ত ছোট ছোট ছেলে সংগ্রহ করে। প্রয়োজন হোলে অর্থব্যয় কোরেও ছেলে কেনে। জয়পুর শহরে অনেক নাগা দেখতে পাওয়া যায়।

অম্বর দুর্গের পাশেই পাহাড়ের ওপর জয়গড় দুর্গ। এখানকার সম্বন্ধেও ঐ রকম কিম্বদন্তী আছে। মহারাজা মান নাকি বাংলা থেকে লুট কোরে যত টাকা ও জহরত নিয়ে গিয়েছিলেন, এই দুর্গে তাঁরা বন্দী হোয়ে আছেন। এখানেও সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

জয়পুরে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শহর থেকে যাট মাইল দূরে টঙ্ক্ রাজ্য মুসলমানদের। শহর থেকে টঙ্ক অবধি সুন্দর রাস্তা আছে। টঙ্ক আগে জয়পুরেরই জমিদারী ছিল, পরে হাতছাড়া হোয়ে গিয়েছে। শহরের বাইরেই একটি বড় মসজিদ আছে এবং এখানে সেখানে এক আধটি পীরের দরগাও চোখে পড়েছে। সেখানে মুসলমান সর্দ্দারও আছে, তা ছাড়া মুসলমান বড় চাকুরেরও অভাব নাই।

জয়পুরে ছাত্রদের মধ্যে বেশ ব্যায়ামের চর্চ্চা আছে। বীরশ্রেষ্ঠ মেবারীদের বর্ত্তমান বংশধরদের মধ্যে এ জিনিষটীর অত্যন্ত অভাব। রামনিবাস বাগের মধ্যে সরকারী ব্যায়ামাগার আছে। এখানে ছেলেরা জিমন্যাষ্টিক, লাফান, লোহার গোলা ছোঁড়া প্রভৃতি অভ্যাস করে। তা ছাড়া কুস্তি শেখাবার জন্তও সরকারী পালোয়ান আছে। তলোয়ার, লাঠি, বিনোট প্রভৃতি খেলা শেখাবারও ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া ফুটবল, টেনিস্, ক্রিকেট প্রভৃতিও খেলা হয়।

জয়পুর রাজ্যের পুরোণো রাজধানী ছিল অম্বর, দেশী ভাষায় এই জায়গাকে আমের বলা হয়। এই স্থানটী বর্ত্তমান শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে রাজারা থাকতেন আমের দুর্গে। সে দুর্গ বা প্রাসাদ এখনো আছে এবং এই প্রাসাদের তত্ত্বাবধান করবার জন্ত সরকার থেকে লোকও মোতায়েন আছে। পাহাড়ের ওপরে দুর্গ। এখানে বড় পাথরের দরবার-গৃহ আছে। প্রাসাদের মধ্যে শীষ্ মহল দেখবার জিনিষ। আগ্রার শীষ্ মহলের চেয়ে আমেরের শীষ্ মহল ঢের ভাল। জয়পুরে দু' একজন সর্দ্দারের বাড়ীতেও শীষ্ মহল দেখেছি, সেখানকার কাজও খুব সুন্দর। আমেরের এই প্রাসাদে একটি মজার নিয়ম আছে। মেবারে যেমন সর্ব্বত্র দেশী লোককে জুতো খুলে ঢুকতে হয়, এখানে ঠিক তা নয়। এখানে দেশী লোকও জুতো পায়ে প্রবেশ কর্‌তে পারে, তবে বিলিতী ছাঁদের জুতো হওয়া চাই। অর্থাৎ নাগ্‌রা, লপেটা ইত্যাদি প'রে সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু সু কিংবা বুট পায়ে থাক্‌লে কেউ কিছু বলে না। মেবারে বিলিতী লোকের খাতির, আর অম্বরে বিলিতী জুতোর খাতির। অবিশ্যি বিলিতী লোকে দেশী জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে চাইলে কি হয় বলা যায় না। এই দুর্গেরই এক কোণে একটা সরু ঘরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শিলাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীর সম্মুখে প্রত্যহ একটি পাঁঠা-বলির ব্যবস্থা আছে। কালীপূজা কি দুর্গাপূজার সময় একশো আটটি পাঁঠা বধ হয় বলে শোনা গেল। এ ছাড়া দেবীর অন্যান্ত ভোগের ব্যবস্থাও আছে।

অম্বরের সে পুরোণো সমারোহ এখন আর নাই। তবে কেল্লা থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত ভাঙাবাড়ী পড়ে আছে দেখা যায়। এই পরিত্যক্ত শহরের মধ্যে এক-একখানা প্রাসাদের মতন বাড়ী দেখা যায়। মহারাণা জয়সিংহ যে কেন এই পুরোণো পাহাড়ে-শহর ছেড়ে সমতল জায়গায় গিয়ে শহর পত্তনী করেছিলেন তার কারণ অনুমান করতে পারা যায় না। হয় ত তাঁর প্রখর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহে তাঁদের লিপ্ত হবার আর প্রয়োজন হবে না।

উদয়পুরের মত জয়পুরে কোনো বড় হ্রদ নেই। আমেরের পথে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যিখানে সুন্দর একটি প্রাসাদ আছে। শোনা গেল যে এই প্রাসাদটী আগে মহারাজাদের গ্রীষ্মাবাস ছিল। ব্যবহার না থাকায় প্রাসাদটী এখন নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখা যায় যে, এর ছাদের ওপরে দস্তুরমতন জঙ্গল হোয়ে আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যেও জয়পুর উদয়পুরের মতন সুন্দর নয়। এখানেও চারদিকে পাহাড় দেখা যায় বটে কিন্তু উদয়পুরের মতন সে সমারোহ এখানে নেই।

মুরদাবাদের মতন এখানে মীনে-করা পিতলের নানা রকমের খেল্‌না, থালা, বাটি, ফুলদানী, প্রভৃতি বিক্রি হয়। এই সব জিনিষ এদেশের একটা মস্ত বড় আয়ের পথ। প্রতি-

বৎসর শীতের সময় ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে বিস্তর যাত্রী জয়পুরে আসেন ও অসম্ভব দাম দিয়ে এই সব জিনিষ কিনে নিয়ে যান। শুধু ইউরোপ আমেরিকার লোক নয়, দেশীয় লোকেরাও এ সব পিতলের জিনিষ আদর কোরে কেনে। এই রকম জিনিষ বাংলা দেশে তৈরি করা হয় না। বাংলা থেকে একদল উৎসাহী ছেলে গিয়ে যদি এই কাজ শিখে আসতে পারে তা হোলে তারা বেশ দু'পয়সা করতে পারবে। জয়পুরে আগে এ সব মাল তৈরি হোতো না, মুরাদাবাদ থেকে কারিগর আনিয়ে এই শিল্প এখানে প্রচার করা হয়। এখন সেখানে অনেক লোক এই কাজ কোরে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। এ ছাড়া সেখানে পাথরের কাজও অতি সুন্দর হয়। বাজারে এই সব পাথরের জিনিষের চাহিদাও বেশ আছে। জয়পুরের ছাপা কাপড়ও বিখ্যাত, বিদেশীরাও এই সব ছাপা কাপড় কিনে নিয়ে যায়। এ ছাড়া সেখানে এক রকম ভাল সতরঞ্চি তৈরি হয়। এই সতরঞ্চিকে সে দেশে কার্পেট-দরি বলে। সেগুলি দেখতেও কার্পেটের মতন। এই সব শিল্প থেকে জয়পুর রাজ্যের আয় বড় কম হয় না। এই সব শিল্প শিক্ষা দেবার জন্য সেখানে সরকারী স্কুল আছে। সেখানকার অধ্যক্ষও একজন বাঙালী। বাংলা দেশে অন্নসমস্যা দিনে দিনে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে, শিল্প ও বাণিজ্যে না নামলে দেশের এই অবস্থা যে আরও সঙ্কটাপন্ন হোয়ে পড়বে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাঙালী ছেলেরা যদি জয়পুর থেকে এই সব শিল্প শিখে আসতে পারে তা হোলে অন্নসমস্যা অনেকটা সরল হোয়ে আসতে পারে। জয়পুর রাজ্য আজ যে সব শিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়েছে, তার অধিকাংশই অন্য প্রদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। অধ্যবসায়ের জোরে আজ তারা এই সকল শিল্প এমন করায়ত্ত করেছে যে সেগুলেকে ধার-করা জিনিষ বলে আর মনেই হয় না।

জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা এখন নাবালক। তিনি ইংরেজদের হাতে মানুষ হচ্ছেন। আজমীরের রাজকুমার-কলেজে পড়েন। আমরা থাকতে থাকতে তিনি প্রায় বার তিনেক নিজের রাজত্বে এলেন। এর মধ্যে দুবার খুব ধূমধাম কোরে রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বেরুল। এই শোভাযাত্রা একটা দেখবার জিনিষ, সংক্ষেপে এর বর্ণনা করা যায় না। ব্রিটিশ সম্রাট সপ্তম জর্জ্জ যখন কলকাতায় পদার্পণ করেন, সে শোভাযাত্রা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু ছমাস আগে থাকতে বন্দোবস্ত কোরে সে সময় যে শোভাযাত্রা ভারতবর্ষের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা করেছিলেন, দেশীয় রাজ্যে একদিনের বন্দোবস্তে তার চেয়ে যে ঢের ভাল শোভাযাত্রা বের করা যেতে পারে এ কথা যিনি এই শোভা-যাত্রা দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন। ভিড়ের লোকদের পাগড়ী, জামা, পেশোয়াজ, ওড়না—সেও একটা দেখবার মতন জিনিষ।

জয়পুরেও শীকারের বেশ সখ আছে, কিন্তু উদয়পুরের মতন নয়। এখানেও সাধারণের পক্ষে বাঘ মারা নিষেধ। মহারাজা ও তাঁর মাননীয় অতিথিরা ছাড়া বাঘ মারবার হুকুম কারুর নেই। জয়পুরে ইংরেজ কর্ম্মচারী অনেক আছেন এবং তাঁরা বেশ সমারোহে বাস করেন। এখানে মাছ, মাংস, তরি-তরকারী বেশ পাওয়া যায় এবং চাল ও আটা ছাড়া জিনিষ-পত্র বেশ সস্তা বলেই মনে হোলো। মুসলমানের সংখ্যা অনেক হোলেও শুনেছি গো-বধ করবার হুকুম সেখানে নেই।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি

৺রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

ভূমির স্বত্বাধিকার

অর্থনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কৃষক একজন উৎপাদনকারী এবং তাহার উৎপাদন কার্য্যের জন্য ভূমি, পরিশ্রম এবং মূলধন, এই তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। এই তিনটি বিষয়ের বিশেষত্ব কি, তাহাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এখন কৃষকের সহিত ঐ তিনটী বিষয় কি ভাবে সংশ্লিষ্ট, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রত্যেক দেশেই, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ভূমির স্বত্ব কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের বা সমিতির অধিকারভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যের জন্য ভূমির প্রয়োজন হইলে, হয় তাঁহাকে উহা ক্রয় করিতে হইবে, কিম্বা ইহার স্বত্বে পত্তনি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সে যে একজন পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকের দখলী স্বত্ব স্বীকার করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। জমি ক্রয় করিবার কালে ক্রেতা, এই স্বত্বের অধিকার পুত্র-পৌত্রাদি কিম্বা তাহার স্থলবর্ত্তী-ক্রমে ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া, ইহার বিনিময়ে অন্য প্রকার সম্পদ প্রদান করে। কিন্তু জমি ইজারা পত্তনি গ্রহণ করিলে সে উহার স্বত্বের অধিকার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে মাত্র। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে জমি আর তাহার অধিকারে থাকে না,—উহা পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকের অধিকারে চলিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার প্রাপ্তির জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, ক্রয় করা জমির মূল্যের অনুপাতে তাহার পরিমাণ কম হয়; এবং ভোগের সময়ের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ঐ টাকার পরিমাণেরও ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরকালের জন্য ভূমি ক্রয় করে, তাহাকে জমিদার বা ভূম্যধিকারী বলা হয়; এবং যাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগের জন্য খাজনা দেয়, তাহাদের রায়ত বা প্রজা বলা হয়। ভূম্যধিকারী স্বয়ং তাঁহার অধিকারের জমি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে চাষ-আবাদ করিতে পারে; অথবা যে অংশ স্বয়ং চাষ-আবাদ করে না তাহা প্রজার নিকট পত্তনি দিতে পারে; সুতরাং ভূম্যধিকারী এবং রায়ত উভয়েই কৃষক বা চাষা হইতে পারে। ভূম্যধিকারীর স্বয়ং জমি চাষ করা অথবা প্রজার নিকট পত্তনি দেওয়া নানা অবস্থা ও বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এ পর্য্যন্ত আমরা জমির উপর স্থায়ী এবং অস্থায়ী এই দুই প্রকার স্বত্বাধিকারের বিষয় অবগত হইতেছি। ইহা ছাড়া অন্য একপ্রকার স্বত্বাধিকার আছে, উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষে পর্য্যবসিত নহে। উহাকে রাজকীয় অধিকার বলে। কোনও একটি বস্তু-বিশেষের উপর একাধিক অধিকার বর্ত্তমান থাকিলে, ঐ অধিকারসমূহের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, এবং সচরাচর হইয়াও থাকে। জমির স্বত্ব সম্বন্ধেও ইহার ব্যত্যয় হয় না। প্রজার স্বার্থ সহজবোধ্য। সে জমি চাষ-আবাদ করিয়া সম্পদ উৎপাদনের নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করে এবং ঐ অনুমতি প্রদানের পরিবর্ত্তে সে ভূম্যধিকারীকে কিছু টাকা দেয়। প্রজা ভূম্যধিকারীকে কি জন্য টাকা দেয় এবং ঐ টাকার পরিমাণ কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় বিবেচনা-সাপেক্ষ।

সে কোন প্রকার সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার থাকা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কি না, এ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কারণ প্রচ্ছন্ন সম্পদ বা বাস্তব সম্পদের উৎপত্তিস্থান কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; ইহা প্রকৃতির দান। অবশ্য এই প্রচ্ছন্ন সম্পদের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে প্রাথমিক যে উদ্যোগের প্রয়োজন, তাহা ব্যক্তিগত। এবং এই উদ্যোগের জন্য ব্যক্তিগত পুরস্কার বা লাভের আশা না থাকিলে উহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনে কর, কোনও এক ব্যক্তি একটি জেলার সমগ্র ভূমি ক্রয় করিয়া যদি অন্য কোনও ব্যক্তিকে ঐ ভূমিতে চাষ আবাদ বা ভোগ দখলের স্বত্ব না দেয়, এবং স্বয়ং উহাতে বাগ-বাগিচা ইত্যাদি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এখানে আমরা ভূমির স্বত্বাধিকারীর প্রথম বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তি দেখিতে পাই। এই কঠোর নিয়ম পরিবর্ত্তন করিলে জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ পাইবে; এবং এই স্বত্ব রাজকীয় স্বত্বে অর্থাৎ রাজাধিকারে পর্য্যবসিত হইবে। সকল দেশেই নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসন-পদ্ধতির বিকাশ ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ ও অশান্তির কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থাতে ভূম্যধিকারীর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। তখন তাহাকে শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক শত্রুগণের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিতে হইত। ভূম্যধিকারী শত্রুগণের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিয়াছে এবং ভূমিও রক্ষিত হইয়াছে—এই অজুহাতেই ভূম্যধিকারী জমির উপর একটা দাবী করিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে যাহারা বিশেষভাবে কার্য্য অথবা সহায়তা করিয়াছে, রাজ-সরকার হইতে তাহাদিগকে সরকারের খাস দখলীয় ভূমি দান করা হইয়াছে। আবার যে সকল দেশে লোক-সংখ্যা অল্প, সে সকল দেশের

উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজ-সরকার হইতে ভূমিদান করিয়া অন্য দেশ হইতে লোক আকৃষ্ট করিয়া আনা হয়। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই পন্থা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে ; কিন্তু এই ভাবে যে স্বত্বের উদ্ভব হইয়া রাজসরকার কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার বিলোপ করা অসম্ভব।

জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় সকল অবস্থাতেই একটি বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত হইয়া আছে। রাজসরকারের সাহায্যের জন্য যাহাদিগকে জমি দান করা হইত, সেই সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লওয়া হইত; পরে ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার উন্নতি ও শাসন-পদ্ধতির নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হ্রাস হইয়া যায় ; কিন্তু জমির অধিকার অটুট থাকিয়া যায়। রাজসরকার ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার এইরূপ নিয়মে মানিয়া লয়েন যে ভূম্যধিকারীর জমির উপরে যে স্বত্ব আছে, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং তাহার আপন স্বত্ব সে অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। তবে রাজসরকারের জমির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে, তজ্জন্য ভূম্যধিকারীকে রাজসরকারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজস্ব বা খাজনা জমা দিতে হইবে। ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্ব ক্রমিক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে ; এবং প্রত্যেক জাতির রাজত্বকালেই ভূমির বন্দোবস্তের ব্যবস্থার বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজগণ, হিন্দু ও মুসলমান আমলের ব্যবস্থার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলেও, মূল ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভূমির স্বত্বাধিকারের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার। ইংরেজগণের আমলে তাঁহারাও তাঁহাদের দেশের আইন এদেশে প্রচলন করিয়াছেন। এই সকল কারণেই আইনের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

আইনের ঈদৃশ বিভিন্নতা সত্বেও একটি বিষয়ের সত্তা সকল প্রকার স্বত্বেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা রাজসরকারকে সমগ্র ভূমির আংশিক স্বত্বাধিকারী বলিয়া মান্য করা এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ রাজসরকারে রাজস্ব প্রদান করা।

মোগল শাসন-কালে ভূমির রাজস্ব নির্দ্দেশ ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের উপর ন্যস্ত ছিল। উহারা আপন আপন পারিশ্রমিক বাবদে সংগৃহীত রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত এবং এই সকল রাজস্ব-ঘটিত কার্য্যের ভার বংশ-পরম্পরায় তাহাদিগকে প্রদান করা হইত। এই সকল করসংগ্রাহক বা তহশীলদারগণ মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ঐ সময়ের গোলযোগ ও রাজত্ব স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনেক দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর ঐ সকল দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ গোলযোগ-পূর্ণ অবস্থায় ইংরাজগণ, মোগল আমলের প্রকৃত করদাতা ভূম্যধিকারী, এবং কর-সংগ্রাহক বা তহশীলদার-শ্রেণী, এতদুভয়ের পার্থক্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই ইংরেজ-শাসনের প্রাক্কালে ভূম্যধিকারী বিষয়ে দুই প্রকার ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীই জমিতে আপন আপন স্বত্ব স্বীকার করে ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী রাজসরকারকে আপনাদের অংশীদার বিবেচনায় লাভের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজসরকারে জমা দেয়, এবং অপর শ্রেণী রাজসরকারের প্রতিনিধিরূপে কর সংগ্রহের নিমিত্ত বেতন স্বরূপ ন্যায্য প্রাপ্য গ্রহণ করে। ভূমির উন্নতি-জনিত রাজস্ব বৃদ্ধি হইলে লাভের অংশ তাহাদের প্রাপ্য নহে।

শাসন-পদ্ধতি পরিচালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বের মর্ম্ম অবগত ছিল। সেইজন্য তাহারা বলিত রাজসরকার জমির উপস্বত্বের কোন অংশ দাবী করিতে পারে না। তথাপি তাহারা দেশীয় পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়া বিবেচনা করিয়াছিল—রাজসরকারের দাবী টাকার অঙ্ক স্থায়ীভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, ভূমির উন্নতিজনিত লাভ রাজসরকারে না বর্ত্তিয়া, ভূমির মালিকেই পর্য্যবসিত হইবে, এবং ইহার ফলে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী প্রজাগণের ন্যায় এক শ্রেণীর লোকের স্বত্ব গণ্য করা হইবে।

জমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ঈদৃশ বিবিধ ধারণা পোষণ করাতে এবং দাবী বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত না হওয়ার ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে জমির বন্দোবস্ত-কার্য্য সংসাধিত হইত। অদ্যাপি ঐরূপ ধারণা-সম্ভূত বন্দোবস্তের আভাষ পাওয়া যায়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে রাজকর্ম্মচারীবর্গের মনে ইংলণ্ডের জমি সংক্রান্ত স্বত্ব ধারণা বলবৎ ছিল। রাজসরকারের পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে আর কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা হয় না।

ভূমির উপর তিন প্রকারের স্বত্ব বর্ত্তমান আছে, যথা, রাজসরকার সংক্রান্ত, ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত ও প্রজা সংক্রান্ত। ব্যবসায় মাত্রেই অংশীদারগণের স্বার্থ পরস্পর জড়িত থাকে। ব্যবসায়ের লাভের অংশ অংশীদারগণের মধ্যে তুল্য অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া প্রত্যেক অংশীদারই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। এই প্রথার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ সকল অংশীদার লাভের অঙ্ক তুল্যানুপাতে না পাইলে, যে অংশীদার কম লভ্যাংশ পাইবে, সে তাহার পরিশ্রমের ভাগ হ্রাস করিয়া দিবে, ফলে লাভের মাত্রা কমিয়া যাইবে। ইহাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ভূমির স্বত্বাধিকার বিষয়ে যদি ব্যবসায়ের অংশীদারগণের নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে রাজসরকার, জমিদার ও প্রজা ইহারা প্রত্যেকে জমির উন্নতির জন্য যে কার্য্য করে, তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্তরূপ পুরস্কার পাইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজসরকার, ভূম্যধিকারী ও প্রজা

ভূমিতে উৎপন্ন সম্পদের কতকাংশ রাজসরকারের প্রাপ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজসরকার ভূমির বাবদ যে রাজস্ব গ্রহণ করেন, তাহার পরিবর্ত্তে বহিঃশত্রু দমন এবং দেশের শান্তিরক্ষা করেন। এই আশ্বাস থাকা বশতঃ ভূম্যধিকারী ভূমির উন্নতি এবং কৃষক চাষ-আবাদ বিষয়ে

মনোযোগী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রাজসরকার জমিজমা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি প্রস্তুত এবং রক্ষা করিয়া থাকেন। জমিজমা সংক্রান্ত বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিবার জন্য রাজসরকার কর্ত্তৃক আদালতও স্থাপিত হইয়াছে। এইভাবে রাজসরকার হইতে যে সকল সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, ভূম্যধিকারী এবং প্রজা উভয়ই ইহার ফলভোগী, সুতরাং অংশীদার। এ ক্ষেত্রে রাজসরকারের কর্ত্তব্য-কার্য্য বিষয়ে আলোচনা করা হইল; এখন অন্যান্য অংশীদারগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রজার কর্ত্তব্য বিষয়েই আলোচনা করা যাক্। কৃষকের শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলেই ভূমিতে শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া শস্যোৎপাদনের অন্য কোন প্রকার পন্থা উন্মুক্ত নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারী ভূমির অংশীদাররূপে উৎপাদনের জন্য কি সুবিধা প্রদান করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উৎপাদন সম্বন্ধে কোন প্রকার আনুকূল্যই যদি ভূম্যধিকারী না করেন, তাহা হইলে উৎপাদনের অংশ তিনি কেমন করিয়া দাবী করিতে পারেন? সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীকে যে অবস্থায় ভূমির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অপলাপ হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর ভূমির জন্য যে দায়িত্ব ছিল, এখন তাহা রাজ-সরকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ববিষয়ে কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। উৎপাদন কার্য্যে ভূম্যধিকারী কোন প্রকার সহায়তা করেন না বলিয়া যদিও ন্যায়তঃ আপন অংশের দাবী করিতে পারেন না, তথাপি আইনতঃ তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ রাজ-সরকার পূর্ব্ব হইতেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। উন্নতিকামী ভূম্যধিকারিগণ কূপ, পুষ্করিণী, এবং পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি খনন দ্বারা কৃষিকার্য্যের উৎপাদন বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাজ-সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে কৃষক কৃষিকার্য্যে বিরত থাকিবে; কারণ, রাজসরকার প্রজার স্বত্ব-রক্ষণ ও শান্তি-রক্ষার কার্য্যে অবহেলা করিলে তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া ফসল উৎপাদন করার আশা করিতে পারে না। কাজেই দেশের সমগ্র ভূমি পতিত থাকিয়া যায়। এইরূপে অংশীদারগণের কর্ত্তব্যপালনের অবহেলায় উৎপাদন বিষয়ে সবিশেষ ক্ষতির কারণ হয়।

কৃষি-কার্য্যোপযোগী ভূমি হইতে যৌথভাবে যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহাতে তিন প্রকার স্বার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তিন প্রকার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই উৎপাদনের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই উৎপাদনের অংশ অংশীদারগণের কর্ত্তব্য-কার্য্যের গুরুত্বের অনুপাতে বিভক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কার্য্যতঃ ঐরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কারণ, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যকার্য্য সমূহের পারস্পরিক সার্থকতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যদিও কতকগুলি কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিবার পরিবর্ত্তেই সর্ব্ব প্রথম ভূমির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে এ সকল কর্ত্তব্য যথারীতি প্রতিপালিত না হওয়া সত্ত্বেও, আইনতঃ ঐ কর্ত্তব্যবিমুখ স্বত্বাধিকারিগণকে স্বত্বচ্যুত করা যায় না; কারণ, উহা প্রতিষ্ঠিত স্বত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজশক্তি রাজপ্রতিনিধি-বর্গের করতলগত হইয়াছিল। শাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে স্বভাবতঃই দেশে দারিদ্র্য ও লোকক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সময়েও দেশের অবস্থা ঐরূপই হইয়াছিল। অরাজকতার ভয়ে কৃষকগণ কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কাল কর্ত্তন করিত। ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহার ফলভোগী হইতে পারিবে না, এই ভয়েও অনেক কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইহার উপরে বর্গীগণের অত্যাচারে দেশবাসী নিতান্তই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ বিবিধ অশান্তি দ্বারা তদানীন্তন দেশবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পর সুশৃঙ্খলশাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কৃষিকার্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ভূম্যধিকারীবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেই তখন বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্বত্বাধিকার পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা রাজসরকারে যে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তাহা আপন আপন অধিকারের সমগ্র ভূমির উপর ধার্য্য ছিল। ভূমিতে চাষ আবাদ দ্বারা শস্যোৎপাদন ভিন্ন রাজস্ব প্রদানের অন্য কোন উপায় বর্ত্তমান ছিল না। তখন কৃষিকার্য্য সম্পাদনোপযোগী শ্রমজীবীর সংখ্যাও অতি সামান্য ছিল। অর্থনীতির দিক দিয়া বলিতে গেলে ঐ সময়ে ভূম্যধিকারী-বর্গের সহিত প্রতিযোগিতায় ঐ শ্রমজীবিগণই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ তাহাদের মনোনীত না হইলে তাহারা তখনই কার্য্য পরিত্যাগ করিত; কারণ, তখন অন্যত্র কার্য্যের যোগাড় করা সহজসাধ্য ছিল। কাজেই ভূম্যধিকারীগণ সর্ব্বদা'ই উহাদের মনস্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। আবার শ্রমিক যাহাতে অন্যায়রূপে লাভবান না হইতে পারে, তৎপ্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল; নতুবা ভূম্যধিকারীবর্গের ক্ষমতার হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে শ্রমিকগণও বিপদে আপদে রক্ষা পাইবার আশায় ভূম্যধিকারী-বর্গের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইত। এইরূপে বিবিধ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ার দরুণ কালক্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের বিভাগ যথোপযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়।

ভূম্যধিকারী উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ গ্রহণ করিত, তাহাকে খাজনা বলা যাইতে পারে, এবং এই খাজনাকে ভূম্যধিকারীর পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযোগ্য বিভাগ বলা যায়। পূর্ব্বে এই প্রকার পাওনা সাধারণতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারাই দেওয়া হইত। এই প্রথা অবলম্বনে খাজনা পরিশোধ করা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে উৎপাদনের লাভ ও ক্ষতি ভূম্যধিকারী ও কৃষক তুল্যাংশে ভোগ করিয়া থাকে। এই নিয়মে খাজনা আদান-প্রদানের সময় শস্য মাড়াই করিবার স্থানে ভূম্যধিকারীর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার অংশ বিভাগ করিয়া লইত; কিন্তু নানা কারণে এই প্রণালী বিরক্তিকর এবং অসুবিধাজনক বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই

ইহার পরবর্ত্তী সময়ে এই নিয়ম যথাযথ-ভাবে প্রতিপালিত হইত না।

তুলা চাষের বিষয় আলোচনা করিলে, এই প্রথার অসুবিধার বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। গাছের সম্পূর্ণ তুলা একেবারে চয়নোপযোগী হয় না, কয়েকমাস ব্যাপিয়া তুলার চয়নকার্য্য চলিতে থাকে। পূর্ব্ব নিয়মে প্রতি বার চয়নের পরেই ভূম্যধিকারী তাঁহার অংশ বিভাগ করিয়া লইতেন; কিন্তু একটি কালের জন্য পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাগ বণ্টন নিতান্ত অসুবিধা ও বিরক্তিজনক মনে করিয়া ভূম্যধিকারী ফসলের অবস্থা অনুযায়ী অনুমানে মোটের উপর তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়া লইতেন। কিন্তু এই প্রকার বণ্টন স্পষ্টতঃ যথাযথরূপে হইতে পারে না। ইহার কিছুকাল পরে এইভাবে খাজনার আদান-প্রদান উঠিয়া গিয়া, ফসলের মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহার অংশ ভূম্যধিকারীবর্গ লইতে আরম্ভ করেন। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান প্রথা অনুযায়ী খাজনা আদান-প্রদানের প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে।

ইংরাজ আমলে শাসনপ্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল প্রকার অবস্থাই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। ভূম্যধিকারীকে এখন প্রজা-রক্ষার ভার লইতে হয় না; ইহা রাজসরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আর ভূম্যধিকারীগণকে প্রজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয় না; কারণ, তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর প্রজার সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন নাই। বিবাদ-বিসম্বাদের শান্তি হওয়াতে দেশের অধিবাসীবর্গ নিরাপদে কালযাপন করিতেছেন এবং লোকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জমিতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়াতে, ভূম্যধিকারীর পক্ষে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের সুবিধা হইয়াছে। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু জমির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ফলে কোন প্রজা খাজনা প্রদানে অস্বীকৃত হইলে, তাহাকে উৎখাত করিয়া তৎস্থলে অন্য প্রজা পত্তন করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। প্রজার স্বত্ব-রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভূম্যধিকারীর কোন প্রকার ক্ষতি বা ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রজার স্বত্ব রক্ষার জন্য নূতন আইনের প্রচলন হওয়া আবশ্যক। কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ ভোগ করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে কৃষকগণের কার্য্য করিবার উৎসাহের সহিত কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে। অন্যথা, উন্নতি দূরে থাকুক, বরং কৃষিকার্য্য ক্রমেই অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে। কার্য্য করিয়া যদি তাহার আশানুরূপ ফলভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কদাচ সে কার্য্যে উৎসাহ থাকিতে পারে না।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় শ্রম ও মূলধন

পরিশ্রম উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায়। এ দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য শারীরিক পরিশ্রম প্রচলিত আছে। শারীরিক পরিশ্রম দুই প্রকার। এক প্রকার—পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রমলব্ধ ফল নিজে ভোগ করা, এবং অন্য প্রকার—পরিশ্রমলব্ধ ফলাফলের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট মজুরী গ্রহণ করা। কৃষিজীবী শ্রমিকগণ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিক পরিশ্রম করিলে অধিক ফসল লাভ করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে। এবং সেই জন্যই তাহারা পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যে সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত।

ভূমি একপ্রকার বস্তু। ইহার মূল্যও আমদানী এবং চাহিদা নিয়মের বিষয়ীভূত। অর্থাৎ চাহিদার বৃদ্ধির সহিত ইহার মূল্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য পণ্যের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে, ইহার আমদানী নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না; অর্থাৎ ইহা স্থানান্তর হইতে সরবরাহ করিবার উপায় নাই। এ দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির আমদানী চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। কাজেই প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার প্রতিযোগিতা কঠোরতর হওয়াতে ভূমির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভূমির উৎপন্ন সম্পূর্ণ ফসল বিক্রয় দ্বারাও উহার মূল্যের সংকুলান হয় না। কৃষক অধিক পরিশ্রম দ্বারা ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদন করিতে পারে সত্য; কিন্তু শস্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভূমাধিকারী খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। প্রজা ঐ বর্দ্ধিত খাজনা প্রদানে অস্বীকৃত হইলে তাহার উৎখাতের সম্ভাবনা আছে। এই উৎখাতের ব্যবস্থা থাকাতে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রম হিসাবে যদিও সে নিজে লাভের জন্য কার্য্য করিতেছে, তথাপি তাহার অবস্থা দৈনিক মজুরের অনুরূপ; কারণ, অধিক পরিশ্রম ও যত্নলব্ধ ফল সে স্বয়ং ভোগ করিতে পারে না। এজন্য সে পরিশ্রম বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য শ্রেণীর শ্রমিক অর্থাৎ দৈনিক মজুরগণের পক্ষে, আপন পরিশ্রমের জন্য একমাত্র মজুরা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্বার্থের আশা নাই বলিয়া, তাহাদের অধিক পরিশ্রম রিবার জন্য প্রলোভন জন্মে না। স্থল-বিশেষে, প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হৌক, কোন কোন মজুর আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু, ঐরূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকগণ পরিশ্রম করা সত্ত্বেও যখন তাহার কেবল কোন প্রকারে পেটে-ভাতে থাকিবার মত অবস্থা হয়, তখন তাহারা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করে না কেন, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপস্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, কৃষকেরা অন্যান্য ব্যবসায় করিতে অক্ষম। এই অক্ষমতার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে। তন্মধ্যে আপন গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে বিঘোরে চলিয়া যাওয়ার অনিচ্ছা—এবং তথায় নানাপ্রকার বিপদ-আপদের আশঙ্কা অন্যতম। এই কারণেই কৃষিকার্য্যের মজুরী অন্যান্য কার্য্যের মজুরী অপেক্ষা কম এবং কৃষি-শ্রমিকের বাজার কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

উৎপাদনের তৃতীয় উপায় মূলধন। এখন মূলধনের সহিত কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। যে কোন প্রকার উৎপাদনের জন্যই অল্প-বিস্তর মূলধনের প্রয়োজন। কাষ্ঠ-বিক্রেতার কুঠার, করাত ও দাঁড়িপাল্লা ভিন্ন ব্যবসায় চলে না। সামান্য ঘাস-বিক্রেতারও একখানা

খুরপীর প্রয়োজন। এখানে কাষ্ঠ-বিক্রেতা অপেক্ষা ঘাস-বিক্রেতার মূলধনের পরিমাণ কম। এখন দেখা যাইতেছে—এই কুঠার, করাত, দাঁড়িপাল্লা, খুরপী, এইগুলি মূলধনের মধ্যে গণ্য। এই সকল মূলধন ক্রয় করিবার নিমিত্ত কিছু সম্পদ ব্যয় করা আবশ্যক হয়। এই সকল মূলধন কাষ্ঠ-বিক্রেতার পক্ষে অরণ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন সম্পদকে বাস্তব সম্পদে এবং ঘাস-বিক্রেতার পক্ষে পতিত ভূমিস্থ প্রচ্ছন্ন সম্পদকে বাস্তব সম্পদে পরিণত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পক্ষান্তরে, বৃহৎ বৃহৎ কারখানার উৎপাদন ব্যাপারে নানা প্রকার কলকব্জা এবং দালান কোঠার প্রয়োজন হয়। সকল কল-কারখানার কার্য্য অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের জন্য অল্প মূলধনের প্রয়োজন হইলেও, উহা অতি প্রয়োজনীয়। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় মূলধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। চাষের জন্য কোদাল, খুরপী এবং কাস্তের প্রয়োজন। জমির পরিমাণ অল্প হইলে এই কয়টির সাহায্যেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা চাষের কার্য্য চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাণ এত অল্প নহে বলিয়া কেবল কায়িক পরিশ্রমে, চাষের কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য লাঙ্গল, মই, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়। ঐ সকল যন্ত্র পরিচালনের জন্য বলদের প্রয়োজন হয়। এই সকল দ্রব্যও একশ্রেণীর মূলধন। কারণ, এইগুলি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই বাঞ্ছনীয়। কৃষকের এই সকল সম্পত্তি অস্থাবর এবং ইহা পুর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূলধন মধ্যে গণ্য। এইগুলি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা কৃষকের আপন বিবেচনা এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আর এক প্রকার সম্পত্তি আছে, তাহাও মূলধন; কিন্তু তাহা হস্তান্তরের অযোগ্য। কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে স্থানীয় আবহাওয়ার আনুকূল্য ও প্রতিকূলতায় শস্যের পরিমাণ ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। শস্যোৎপাদন জমির স্বাভাবিক সরসতা ও আর্দ্রতার উভয় নির্ভর করে বলিয়া, যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়, সে বৎসর ফসল পাওয়া যায় না; কিন্তু কিছু অর্থব্যয়ে কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিলে, অল্প বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির বৎসরেও ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পুষ্করিণী খননের জন্য যে সম্পদ ব্যয়িত হয়, তাহাও মূলধন; কারণ, এই সম্পদ অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য বা এই ব্যয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়, তাহা জমিতে জলসেচন করিয়া এবং জলসেচন না করিয়া যে অধিক ও অল্প ফসল পাওয়া যায়, তাহার বিভিন্নতা (Difference) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূমির সহিত অন্যান্য সম্পদের পার্থক্যের ন্যায় এই শ্রেণীর মূলধন পুর্ব্বোক্ত মূলধন হইতে স্বতন্ত্র। পুষ্করিণী বা কূপ স্থাবর সম্পত্তি। পুষ্করিণী ভূমিতে খনিত হয় বলিয়া ভূমির কার্য্যকারিতার ন্যায় পুষ্করিণীর কার্য্যকারিতাও উহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির ভোগস্বত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে, সে এই শ্রেণীর মূলধন আবশ্যক অনুসারে ব্যয় করিতে পারে। এই প্রকার ব্যয় সাধারণ প্রজার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, যে কোন সময়ে ভূমি হইতে উৎখাত হইলে কূপ অথবা পুষ্করিণী লইয়া যাইতে পারে না। অথবা এই ব্যয়ের দরুণ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে না। উচ্চ নীচ ভূমি কাটিয়া ভরিয়া সমতল করা এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণ করাও ঐ শ্রেণীর ব্যয়েরই অনুরূপ। এই সকল কার্য্য ভূম্যধিকারীরই করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাঁহার স্বত্ব চিরস্থায়ী। সুতরাং এই সকল কার্য্যে ব্যয়ের দরুণ ভবিষ্যতে যে লাভ হইবে, তাহার এক প্রজা উৎখাত হইলে অন্য প্রজা তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

কৃষিজাত দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার সুবিধার জন্য খাল খনন কি রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, উহাও পূর্ব্ব শ্রেণীর ব্যয়ের অনুরূপ। এই ভাবে জলপথে এবং স্থলপথে কৃষিজাত দ্রব্য চালান দেওয়ার সুবিধা হইলে, যে স্থানে ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে, তথায় চালান দিয়া লাভবান হওয়া যায়। ভূম্যধিকারীর ভূমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকিলেও, এই সকল কার্য্যের জন্য যে মূলধন ব্যয়ের আবশ্যক হয়, তাহা ব্যয় করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই সকল উন্নতির জন্য রাজসরকারের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

এখন তৃতীয় শ্রেণীর মূলধনের বিষয় আলোচনা করা যাক্। ইহার সহিত কৃষকগণের সুখ-সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে জড়িত। ব্যাধি, অজন্মা, অথবা বিবাহ ইত্যাদির দরুণ অবান্তর ব্যয়ের মধ্যে ভূমির খাজনা পরিশোধ করিবার পর যদি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এইরূপ কমিয়া যায় যে, উহাতে কৃষক ও তাহার পরিবারবর্গের পরবর্ত্তী ফসল কাটিবার কাল পর্য্যন্ত খোরাকীর অকুলান হয়, তাহা হইলে তাহাকে খাদ্যদ্রব্য ধার করিতে হইবে; কারণ, তাহা হইলে অনাহারে বা অল্পাহারে উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহা সে করিতে সমর্থ হইবে না। এতদ্ভিন্ন অনাহারে জীবন ধারণ করাও অসম্ভব। এই প্রকারে কৃষকের যে মূলধন ধার করিতে হয়, তাহা অন্য প্রকার মূলধন অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কারণ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এ অবস্থায় প্রয়োজন হইলে সে তাহার হালের বলদ ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল জিনিস কৃষিকার্য্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়; তথাপি পেটের দায়ে সে ঐগুলি বিক্রয় করিয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দিন-মজুরের ন্যায় শস্যোৎপাদন করিতে বাধ্য হয়।

এই সকল কারণে কৃষকের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকে না; কারণ, যে ব্যক্তির খাদ্য-দ্রব্যের উপর অধিকার বা প্রভাব আছে, তাহার সহিত কৃষক লাভে ব্যবসায় করিতে পারে না। খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষককে তাহার চুক্তি বা সর্ত্ত মানিয়া লইতে হয়; নতুবা, তাহাকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। এই সকল অবস্থাতে বাজারের আমদানী ও চাহিদার ন্যায় একের অন্যের উপর ক্রিয়া সহজ ভাবে হইতে পারে না। আমদানী ও চাহিদার একের অন্যের উপর ক্রিয়া সহজ ভাবে থাকিলে মূল্য একটা গণ্ডীর বাহির হইলেই চাহিদা একেবারে কমিয়া যায়। যেখানে প্রাণ রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, সেখানে খাদ্য পাইবার ইচ্ছা অসীম। এই স্থলে ক্রেতার মূল্য নিরূপণ করিবার কোন শক্তিই থাকে না, মহাজন আপন ইচ্ছানুসারে উহা ধার্য্য করিতে পারে ও করে। তখন ঋণের বা ধারের মূল্যও অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সকল প্রকার

সুযোগই মহাজন পায় ; এবং সর্ব্বদাই অতিরিক্ত সুদের হার দাবী করে। প্রতিবেশীর দুরবস্থার সুযোগ পাইয়া তাহার নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জনের লালসা নিতান্ত অন্যায়। এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি দমন করা নৈতিক বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এই নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানব, এমন কি আদালত পর্য্যন্ত অনুমোদন করেন না।

কৃষিকার্য্য এবং কৃষিকার্য্যের সহিত যাহাদের স্বার্থ জড়িত এতদুভয়েরই যে মূলধনের প্রয়োজন, ইহা এখন হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। রাজসরকারের বড় কার্য্যের জন্য, ভূম্যধিকারীর তদপেক্ষা ছোট কার্য্যের জন্য এবং কৃষকগণের চাষের কার্য্যের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। রাজসরকারের ও ভূম্যধিকারীর ঋণ গ্রহণ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। সুদের হার অধিক হইলে তাহারা ঋণ গ্রহণে বিরত থাকিবে। এখানে মূলধন সম্বন্ধে বাজারের আমদানী ও চাহিদার অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ আমদানী ও চাহিদা পরস্পর পরস্পরের উপর সহজ ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু কৃষকগণের পক্ষে সেই সুবিধা নাই। পূর্ব্বে লিখিত আলোচনা দ্বারা চাহিদার কারণ এবং তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা গিয়াছে ; কিন্তু আমদানী সম্পর্কেও কিছু অবগত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—সহরে মূলধনের বাজার আছে ; কিন্তু গ্রামবাসী কৃষকের পক্ষে সহরে যাইয়া মূলধন ধার করিয়া আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তাহাদের যে সামান্য ঋণ দরকার হয়, তাহা তাহারা সত্বর ও সহজে পাইতে চেষ্টা করে। গ্রামের মহাজনই গ্রামে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে গ্রামের মহাজনগণ গ্রামের জন্য একটি বিশেষ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কৃষকগণের বলদ মরিয়া গেলে কি অন্যান্য বিপদ আপদে টাকার প্রয়োজন হইলে এই মহাজনই উহা ধার দেয় ; এবং ধার পরিশোধ বিষয়ে কৃষকের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে। অবশ্য সকল সময়ে এবং সকল ক্ষেত্রে মহাজনগণের এরূপ সহৃদয়তা দৃষ্ট হয় না,—কোন কোন নীচ প্রবৃত্তির মহাজন খাতকের রক্ত শোষণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে ত্রুটি করে না। এখানে কৃষিকার্য্যের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ এক ব্যক্তির অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতি বিষয়ে গ্রাম্য মহাজনও এক প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সে ইচ্ছা করিলে তাহার ক্ষমতার অপলাপ করিতে পারে ; এবং বর্ত্তমান সময়ে বহু স্থানে মহাজনগণের এইরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা কৃষকগণ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। কুশীদ-গ্রহণ প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জমির মূল্য ও জমির খাজনার বৃদ্ধি বিষয়ের প্রতিযোগিতাতে পার্থিব অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কুশীদ-গ্রহণ-প্রথা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বর্ত্তমান কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে চারি প্রকার স্বার্থ বিশিষ্ট লোক (রাজসরকার, ভূম্যধিকারী, কৃষক ও মহাজন) জড়িত রহিয়াছে ; এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্বারা প্রত্যেক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লাভবান হইবে। কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক পরিমাণ শস্যোৎপাদন করা এই উন্নতির মূল ভিত্তি। ভূমি কর্ষণকারী কৃষকের উপরেই এই উন্নতি প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে কৃষক তাহার কার্য্যলব্ধ ফলের লভ্যাংশ এত অল্প পায় যে, তদ্দারা তাহার কার্য্য করিবার আগ্রহ এবং আসক্তি হ্রাস হইয়া যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে কৃষিকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কৃষকগণের আগ্রহ ও আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ দেশে প্রায় শতকরা ৮০জন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ; সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি কোন কালেই সম্ভব হইবে না। অন্ন-সমস্যা প্রতিদিন যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কৃষির উন্নতিকল্পে দেশবাসী সকলেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, নতুবা দেশের দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীনরেন্দ্রমোহন রায় এম-এ

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগকে অনুবাদের যুগ বলা যাইতে পারে। চারি শতাব্দীব্যাপী এই প্রথম যুগে ধর্ম্মপ্রচারকগণ অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যৎ প্রচারকগণের জন্য এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় চীন দেশবাসিগণ বৌদ্ধসংঘে যোগদান না করিলেও বৌদ্ধধর্ম্ম-মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কুমারজীবের আগমনের কিছুকাল পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এত অধিক বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে কনফ্যুশীয়গণ এই নবধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইল। স্থানে স্থানে বৌদ্ধগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। নূতন দেবমূর্ত্তি গঠন ও মন্দির নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইল। অনেক ধর্ম্ম-পুস্তক নষ্ট করা হইল এবং বহু ভিক্ষুর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পীড়নের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার নূতন উদ্যমে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উপর নিগ্রহ অথবা অনুগ্রহ অবশ্য বিভিন্ন সময়ের সম্রাট ও প্রাদেশিক রাজগণের ব্যক্তিগত রুচি ও মতের উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করিত। সুতরাং চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে যেমন রাজনিগ্রহের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, তেমন অসীম রাজানুগ্রহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। একাধিক সম্রাট ও বহু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বরণ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুধু চীন দেশেই ছয় সহস্রাধিক ভারতীয় ভিক্ষু এবং ত্রয়োদশ সহস্র বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

কনফ্যুশীয় ও বৌদ্ধগণের বিচার ও তর্কের যে একটা সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুং বংশের ইতিহাসের জীবনচরিত শাখায় বিবৃত আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই,—

বৌদ্ধগণ বলেন, "কনফ্যুশিয়স্ তাঁহার উপদেশগুলিতে ইহজীবনের কথাই বলিয়াছেন, পরজীবনের কথা কিছুই বলেন নাই। তাঁহার মতে পাপের শাস্তি ইহজীবনেই হয়। পুণ্যের পুরস্কার ঐহিক সম্মান ও সুখসম্ভোগেই পর্য্যবসিত হয় এবং পাপের ফল কেবলমাত্র ইহজীবনের দারিদ্র্য এবং নির্য্যাতনেই শেষ হইয়া যায়, এইরূপ ভ্রমপূর্ণ মত বাস্তবিকই

করুণোদ্দীপক। শাক্যমুনির শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য অসীম। তাঁহার ধর্ম্ম অন্তরের সব চিন্তা ও গ্লানি দূর করে এবং মানুষকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করে। তাঁহার মতে লোককে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত নরক আছে, মানুষকে পুণ্যকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে স্বর্গ আছে, এবং অবশেষে আত্মার চরম পরিণতি নির্ব্বাণ।" কনফ্যুসীয়গণ ইহার উত্তরে বলেন, "স্বর্গসুখভোগের লিপ্সায় প্ররোচিত হইয়া সৎকর্ম্ম করা অপেক্ষা সৎকর্ম্মে প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সৎকর্ম্ম করা অনেক শ্রেয়ঃ। নরকের ভয়ে অসৎকর্ম্মে নিরত থাকা অপেক্ষা কর্ত্তব্যবোধে সৎপথে বিচরণ অনেক ভাল। পাপ-ক্ষালনের জন্ত যে আরাধনা তাহা কপট, তাহাতে প্রাণের টান নাই। নির্ব্বাণের প্রশংসা করিলে আলস্ত ও অকর্ম্মণ্যতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। জীবমাত্রেই যে পশুভাব আছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই; সুদূর ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিলে এই পশুভাবের দমন হইতে পারে না।" বৌদ্ধগণ ইহার উত্তরে বলেন, "তোমরা ভুল বলিতেছ। মানুষকে সৎপথে লইতে হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন; ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা হইতেই এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। কোন প্রকার সুখের আশা না থাকিলে মানুষ কখনও আপনা হইতে সৎকর্ম্ম করিবে না। চাষী শস্তের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ক্ষেত্র কর্ষণ করে।"

কুমারজীবের আগমনের কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অনেক জটিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংখ্যা দুই সহস্রেরও অধিক দাঁড়াইয়াছিল। এত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মপুস্তকে মতের বিভিন্নতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সকল বিভিন্ন মতের ঐক্য হওয়া সম্ভব কি না, ধর্ম্মের মোটামুটি সার সত্য কোন্‌গুলি, এবং সেই সার সত্য কি ভাবে সাধারণের অধিগম্য করা যায়, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে যে তিনটী মতবাদের আবির্ভাবে এই সকল সমস্তা পূরণের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা এই—(১) ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাপুরুষ বোধিধর্ম্মের মত; (২) তাঁহার কিছু পরবর্ত্তী কালের চি-ই প্রবর্ত্তিত মত; এবং (৩) অষ্টম শতাব্দীর তান্ত্রিক মত। এই তিনটি মতবাদের ফলেই চীনে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে।

বোধিধর্ম্ম (পু—তি—তামো) দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক সুখভোগে বিরক্ত হইয়া ভিক্ষু হন এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতীয় বৌদ্ধসংঘের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। তিনি ভারতের অষ্টাবিংশতিম এবং শেষ বৌদ্ধ মহাগুরু। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নিজ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই বিরক্ত হইয়া তিনি সমুদ্রপথে চীন যাত্রা করেন এবং ৫২৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে উপস্থিত হন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার বৈদান্তিক মতের জন্ত বৌদ্ধগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং এই কারণেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। বোধিধর্ম্মের আকৃতিতে এবং চরিত্রে এমন একটা অসাধারণত্ব ছিল যে তাঁহার সম্মুখে যে কেহ আসিত, সেই মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থান করিত। আজ পর্য্যন্ত চীনের প্রত্যেক শ্রমণের নিকট তিনি আদর্শ মহাপুরুষ। জাপানে দেবমন্দির ও চায়ের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া তরবারির মুষ্টিতে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। জনৈক জাপানী লেখক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "জনসাধারণ খুব সাদরে গ্রহণ করিতে পারে, এমন ধর্ম্মপ্রচারক তিনি ছিলেন না। আজকালকার মিশনরী হইতে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। মিশনরীগণ যেমন প্রত্যেকের সঙ্গেই স্মিতমুখে আলাপ করেন বা করিতে চেষ্টা করেন, তিনি তেমন করিতেন না; তিনি নির্ব্বাকভাবে তাঁহার বিশাল নয়নের জ্যোতিষ্মান্ দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেন। আধুনিক ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যেমন অতি যত্নের সহিত সুষ্ঠু ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা রচনা করিয়া তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন, তিনি তাহার কিছুই করিতেন না। তিনি সিংহের স্থায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন এবং কেহ অবান্তর কথায় তাঁহাকে বিরক্ত করিলে পদাঘাতে তাহাকে দূর করিতেন *।

বোধিধর্ম্ম অল্পকাল পরে ক্যাণ্টন হইতে লয়াং নগরে আসেন। এখানে তিনি একটী প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া নয় বৎসর কাল ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

বোধিধর্ম্মের চীনে আগমনের অল্পকাল পরেই তাঁহার সহিত সম্রাট উ-টি'র তৎকালীন রাজধানী কিয়েন-কাং নগরে সাক্ষাৎ হয়। সম্রাট এই অদ্ভুত-দর্শন তেজস্বী আগন্তুককে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পর জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবন্, আমি অনেক ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছি, বহু ধর্ম্মগ্রন্থ বিদেশ হইতে আনাইয়াছি, এবং লোকে যাহাতে বৌদ্ধসংঘে যোগদান করে, তাহার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কি আমার অনেক পুণ্যসঞ্চয় হয় নাই?" স্বল্পভাষী বোধিধর্ম্ম উত্তর করিলেন, "কিছুমাত্র না।" সম্রাট বলিলেন, "কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক সমূহে কি এ কথা লিখিত নাই যে এইরূপ কার্য্যে যথেষ্ট পুণ্য লাভ হয়?" বোধিধর্ম্ম উত্তর করিলেন, "সবই অসার,—পবিত্র বলিয়া কিছুই নাই।" সম্রাট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আপনি স্বয়ং কি একজন যোগীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ নন?" উত্তরে বোধিধর্ম্ম বলিলেন, "জানি না।" সম্রাট পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তবে আপনি কে?" পরমজ্ঞানী মহাপুরুষ সেই একই উত্তর দিলেন "জানি না।" সম্রাট উ-টি পরে সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধশ্রমণ হইয়াছিলেন।

একবার একজন কনফ্যুসীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু বোধিধর্ম্মের নিকট আসিয়া নীরবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু যোগীবর তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আগন্তুক ফিরিয়া গেলেন এবং পরদিন আসিয়া এইভাবে অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। এই ভাবে সপ্তাহ চলিয়া গেলেও যখন বোধিধর্ম্ম কিছু বলিলেন না, তখন আগন্তুকের মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল; তিনি নিজেকে

---

* K. Nukariya—The Religion of the Samurai, PP. 5-6.

মহাপাপী মনে করিয়া, সেই স্থানেই একখানি তরবারি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের একখানা বাহু ছেদন করিলেন। তখন বোধিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কাজ কেন করিলে?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "ভগবন্, আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে; কৃপা করিয়া আমাকে শান্তি দিন।" বোধিধর্ম্ম বলিলেন, "শান্তি কোথায় আছে?" আগন্তুক বলিলেন, "শান্তি কোথায় আছে জানি না। বহুবৎসর যাবৎ আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও শান্তির সন্ধান পাই নাই।" বোধিধর্ম্ম আগন্তুকের শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এই লও, তোমাকে আমি শান্তি দিলাম।" তখন যে সত্য ভগবান বুদ্ধদেব দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ যে সত্য বহুকাল যাবৎ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সে সত্য সেই ভাগ্যবান্ আগন্তুক উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন। বোধিধর্ম্মের মৃত্যুর পর এই ব্যক্তিই শাং কোয়াং (ছিন্ন বাহু) নামে পরিচিত হইয়া চীন বৌদ্ধসংঘের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব ধর্ম্মের যে সরল ও সহজ আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতেই সেই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সম্পর্কে মহাযান ও হীনযান শাখাদ্বয়ের উদ্ভব এবং বিভিন্ন সময়ে আহূত ধর্ম্মসঙ্গীতিগুলি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেবের পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল বৌদ্ধ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম ও মতের আদর্শের সঙ্গে বুদ্ধদেব-প্রচারিত আদর্শের ঐক্য খুব অল্পই ছিল। বোধিধর্ম্মের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মে বেদান্তের ভাব ও আদর্শ স্থানলাভ করিয়াছিল। বোধিধর্ম্মের শিক্ষার মধ্যেও বেদান্তের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সুতরাং চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মেও বৈদান্তিক ভাব ও চিন্তা প্রবেশ করিয়াছিল। বোধিধর্ম্ম সম্রাট উ-টির রাজসভায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ চীনদেশীয় ত্রিপিটকের পরিশিষ্টভাগে রক্ষিত আছে। সেই উপদেশের সারাংশ এই,—"তোমার নিজের মধ্যে বুদ্ধ-প্রকৃতি দর্শন কর; তুমি স্বয়ং বুদ্ধ, এবং তুমি পাপকার্য্য করিতে পার না, এই জ্ঞান লাভ কর।...তুমি বুদ্ধ নও, এইরূপ অজ্ঞতাই মহাপাপ। এই অজ্ঞতার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়।...হে জীবাত্মন্, তুমি এত বৃহৎ যে, তুমি সমগ্র জগৎকে তোমার আবেষ্টনীতে বদ্ধ করিতে পার, আবার তুমি এত ক্ষুদ্র যে সূচ্যগ্রও তোমায় স্পর্শ করিতে পারে না।"

বোধিধর্ম্ম-প্রচারিত মত ক্রমে চীনদেশে চান্ (ধ্যান) এবং জাপানে জেন্ মত নামে পরিচিত হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে চান শাখা হইতে আরও পাঁচটী শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। বোধিধর্ম্মের চি-ই নামক একজন শিষ্যও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। চি-ই তাঁহার গুরুর শুষ্ক জ্ঞান-মতের মধ্যে ভক্তিরস মিশ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই সময়ে চীনদেশে কেহ ছিলেন না। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে ও সংঘে যথেষ্ট শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের মধ্যে তাঁহার অপরিমিত প্রভাব ছিল। ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে চি-ইর মৃত্যু হয়। বোধিধর্ম্মের শিষ্যানুশিষ্যগণের মধ্যে পর পর পাঁচজন সমগ্র চীনদেশের বৌদ্ধসংঘের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে মতভেদের সৃষ্টি হইল এবং সংঘ বহুভাগে বিভক্ত হইল। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে শেষ অর্হতের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে শিষ্যপরম্পরায় প্রাপ্ত বোধিধর্ম্মের ভিক্ষাপাত্রটীও তাঁহার দেহের সঙ্গে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল।

কালক্রমে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের যে পার্থক্য উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছিল, তাহা আসঙ্গের যোগাচার মতের প্রাবল্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই হিন্দু তান্ত্রিকধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আর কোন পার্থক্যই রহিল না, বৌদ্ধ নাম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইল। যাহা হউক, যে তান্ত্রিকধর্ম্মের আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া বোধিধর্ম্ম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া চীনবাসী হইয়াছিলেন, সেই তান্ত্রিক মতবাদ তাঁহার মৃত্যুর দুইশত বৎসর পরে চীনদেশেও আবির্ভূত হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারত হইতে শুভকার, বজ্রবোধি এবং অমোঘ নামক তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে গিয়া এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন।

মহাজ্ঞানী বোধিধর্ম্ম ও চি ই প্রবর্ত্তিত মত সাধারণ লোকের উপযোগী ছিল না; এবং সেইরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছাও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং শিক্ষিত লোক ব্যতীত খুব অল্প লোকেই তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরল তান্ত্রিক মত অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এমন কি তৎকালীন চীন-সম্রাটও এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সম্রাট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অমোঘ সংস্কৃত পুস্তক আনিবার জন্য আবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, এবং পাঁচ বৎসর পরে চীনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ যে সকল দেবতার পূজা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈরোচন, ভৈষজ্যরাজ, বজ্রপাণি এবং ক্ষিতিগর্ভ প্রধান। এক সময়ে বৈরোচন অমিতাভ বুদ্ধেরও উপরে স্থান পাইয়াছিলেন। এই সকল দেবতার পরিকল্পনা চীনের ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিল। যাহা হউক, এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমত নানাবিধ বাধা ও অত্যাচার সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। অবশেষে অল্পে অল্পে ইহা 'চান' মতবাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অবিচ্ছিন্ন রাজানুগ্রহ অথবা রাজনিগ্রহ লাভ করে নাই,—সম্রাট ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের ব্যক্তিগত মতের উপরই এই বিষয় নির্ভর করিত। কনফ্যুশীয়গণের চেষ্টায় ৭১৪ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগণের উপর যথেষ্ট নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। ফলে ১২০০০ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়; বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ধর্ম্মগ্রন্থ লিখন এবং মন্দির নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট সু-সুং ও টে-সুং বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধগণের উপর অত্যাচারের অবসান হয়। সম্রাট হিয়েন সুং (৮১৯ খৃঃ অঃ) বুদ্ধদেবের একখণ্ড অস্থি অত্যন্ত সমারোহ করিয়া রাজধানীতে আনিয়াছিলেন। ইহাতে হান্‌উ নামক তাঁহার এক মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, "সম্রাট, বহুকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, সেই ব্যক্তির অপবিত্র একখানা অস্থি রাজপ্রাসাদে আনাইয়া কি লাভ? বুদ্ধ কে? আমি তাহাকে মানি না, বা কোনপ্রকার ভয় করি না।" হান্‌উ

সম্রাট কর্তৃক নির্বাসিত হইলেন। কিছুকাল পরে অনুতপ্ত হইয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগণের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার তুলনা চীনদেশের ইতিহাসে নাই। সম্রাট উ-সুংএর আদেশে ৪৬০০টী বৌদ্ধমঠ এবং ৪০,০০০ বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করা হইল, বৌদ্ধসংঘের সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং মন্দিরের তাম্রমূর্ত্তি ও ঘণ্টাগুলিকে গলাইয়া তাম্রমুদ্রা করা হইল। ২৬০,০০০এরও অধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইল। কিন্তু অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও এই অত্যাচার বৎসরাধিককাল স্থায়ী হয় নাই! পরবর্ত্তী সম্রাট বৌদ্ধদিগের সম্পত্তি যথাসম্ভব প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। ই-সুং নামক সম্রাট (৮৬০ খৃঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং কনফ্যুশীয়গণের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বৌদ্ধশ্রমণগণের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতেন। তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যহ সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেন। তিনিও বুদ্ধদেবের একখানি অস্থি রাজপ্রাসাদে আনাইয়াছিলেন। অস্থিখানা যখন প্রাসাদদ্বারে আনা হইয়াছিল, তখন সম্রাট ভাবাবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ই-সুংএর রাজত্বকালে ভারতবর্ষ, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে বহু শ্রমণ চীনদেশে আসিয়াছিলেন।

সুং বংশীয় সম্রাট শিন সুং (১০৬৮) এবং হোয়েই সুং (১১০১) বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাও ধর্ম্ম একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্রাট কাও সুংএর (১১৪৩) সময় বৌদ্ধ সংঘ এক অভাবনীয় অধিকারলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে সম্রাটের অনুমতিপত্র লইয়া লোকে ভিক্ষু হইত কাও সুং অনুমতিপত্র দেওয়া বন্ধ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। সংঘের প্রাচীন শ্রমণেরাই অনুমতিপত্র দিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে সংঘের উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল।

চীনের প্রথম মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ (১২৮০) বৌদ্ধধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অনেক কনফ্যুশীয় মন্দির বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং তাও মতবাদীদের উপরও নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। জাপান বৌদ্ধদেশ বলিয়া কুবলাই খাঁ জাপান আক্রমণ করিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে আনুরক্তির কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। মোঙ্গলজাতি সেই সময় অর্দ্ধসভ্য ও রূঢ় প্রকৃতি ছিল। কুবলাই আশা করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মোঙ্গলজাতির মধ্যে সভ্যতা ও একতা বৃদ্ধি পাইবে। তিনি একজন বৌদ্ধশ্রমণকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রজাগণের উপর আদেশ ছিল যে স্বয়ং সম্রাটের অনুজ্ঞার ন্যায় এই ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুজ্ঞা পালন করিতে হইবে। কুবলাইখাঁর সময় চীনদেশে ২১৩১৪৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ৪২৩১৮টী মন্দির ছিল। দ্বিতীয় মোঙ্গল সম্রাট চিং সুং (১২৯৫) স্বর্ণাক্ষরে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসকল লিখিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশে বৌদ্ধগণের মধ্যে, মৈত্রেয় বুদ্ধ (মি লো-ফো) শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত হয়। এক শতাব্দীরও অধিককাল মোঙ্গল-পদানত থাকিয়া চীন জাতির স্বভাবসুলভ উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতা এক প্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উক্ত আন্দোলনের ফলে সুপ্ত চীন জাতির মধ্যে নববলের সঞ্চার হইল এবং শীঘ্রই চীনে মোঙ্গল আধিপত্যের অবসান হইল *।

মোঙ্গলবংশের পতনের পর মিং বংশ চীন শাসন করেন। মিং বংশের শাসনের প্রথমভাগে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু বৌদ্ধসংঘের ভূসম্পত্তি দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে নিয়ম করা হইল যে, কোন মঠের ৬০০০ বর্গফুটের অধিক ভূসম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। এই নিয়মের দ্বারা যে ভূসম্পত্তি উদ্বৃত্ত হইল, তাহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

মাঞ্চু সম্রাটগণের মধ্যে প্রথম কয়েকজন সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। সম্রাট শুন্-চির (১৬৪৪) বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র সম্রাট কাংহি কনফ্যুশীয় ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম্মের প্রতিই বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার কয়েকটী অনুশাসনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর নিন্দা আছে। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম বা উৎসাহ ছিল না; বৌদ্ধগণ ক্রমেই নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক খৃষ্টান মিশনরী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধভাব চীনজাতির এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে, এই ভাব খৃষ্টান মিশনরীগণের কত যুগের সাধনার ফলে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে বলা যায় না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পর হইতে যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রীতি লক্ষিত হইতেছে। নব্যচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে বর্ত্তমান কালোপযোগী সজ্জায় সজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার বৌদ্ধগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃস্থাপন-কল্পে জাপান একটী সমিতি গঠন করিয়াছিল; সন্দিগ্ধ চীনও পিকিংএ একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিল; ফলে কিছুই হয় নাই।

বৌদ্ধ ও কনফ্যুশীয়গণের বিবাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বিবাদ সত্ত্বেও উভয় ধর্ম্মের প্রভাব সমানভাবে চীনের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। ওয়েনলি নামক বিখ্যাত চীন লেখক বলেন, "কনফ্যুশিয়সের মত এবং শাক্যমুনির মত চীনের দুইটী পক্ষস্বরূপ; চীনের উন্নতির পথে এই দুইটীরই সমান প্রয়োজন ("The way of bonfucius and the way of Sakyamuni are two wings; without which China cannot fly.") তারপর, এই বিবাদ অতি অল্প সংখ্যক

* 'Largely under the impetus of the enthusiasm thereby aroused (by the expectation of Maitreya Buddha), the Mongol power fell before the revival of Chinese nationalism.'—Clennell-Religion in China, P. 175.

লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল ; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব ছিল না। সাধারণে প্রচলিত তিনটী ধর্ম্মের অনুশাসনই মানিয়া চলিত। আজ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ও মুসলমান ব্যতীত চীনবাসীদের মধ্যে কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। চীনবাসিগণ নিজেদের একই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করে। ফুহ্-সি নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত একবার বৌদ্ধ শ্রমণের বস্ত্র, তাওদের উষ্ণীষ এবং কনফ্যুশীয়দের পাদুকা পরিধান করিয়া চীন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি পর পর তাঁহার উষ্ণীষ, বস্ত্র এবং পাদুকার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরস্পরের উচ্ছেদ না করিয়া এইরূপ তিনটী ধর্ম্মের শতাব্দীর পর শতাব্দী একত্র অবস্থান একমাত্র চীন ব্যতীত অপর কোন দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। এখন এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, একটী ধর্ম্মকে অপর দুইটী হইতে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আজ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সুদূর চীনে ভারতবর্ষজাত এই ধর্ম্ম আজও সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। এই ব্যাপারের কয়েকটী কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ চীনে পূর্ণ একটী ধর্ম্ম ছিল না। ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝা যায়, কনফ্যুশীয় মতকে সেইরূপ ধর্ম্মের বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তাও মতবাদের মধ্যেও উচ্চ আদর্শের একান্ত অভাব ছিল। সুতরাং চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় একটী পূর্ণাবয়ব ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন তান্ত্রিকধর্ম্ম বিশেষে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ বহুবিধ অনাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিল, চীনদেশে সেই প্রকার অনাচারের অনুষ্ঠান হয় নাই। কনফ্যুশীয় শিক্ষার ফলে চীনবাসিগণ অনাচারের প্রশ্রয় দিত না। চীনের বৌদ্ধধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত অনাচার-বর্জ্জিত হইয়া আভ্যন্তরীন পবিত্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ কোন তর্ক বা বিবাদ উপস্থিত হয় নাই। চীনবাসিগণ ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রকার মৌলিক চিন্তা করিত না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসকল বিদেশীয় ভাষায় ছিল বলিয়াও ঐরূপ কোন তর্কের সুবিধা হয় নাই। এইরূপ আরও কয়েকটী কারণে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থায়ী হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট চীনের জাতীয় জীবনের ঋণ অপরিমিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষজাত অপূর্ব্ব ভাব সম্পদ্ এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ সম্পদ্ দান করিয়া চীন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। চীনদেশের নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র ভারতীয় দর্শনের ন্যায় উন্নত নয় ; বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাও চীনদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তার পর শিল্পকলায়ও বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট চীনের ঋণ অপরিশোধ্য। এক সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে চীনের চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্প সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। সে যাহা হউক, কেবলমাত্র বৌদ্ধ কল্পনার দ্বারাই চীন শিল্প উপকৃত হয় নাই, এক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু শিল্পী চীনে গিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, এইরূপ প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে ঐতিহাসিক ক্লেনেলের ভাষায় বলিতে হয়,—"Buddhism did for China almost what Christianity in the same ages was doing for the West."

দুঃস্বপ্ন

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

(১)

সুরেশ ধনীর সন্তান। সে তাহার জীবনের বাইশটা বৎসর বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এম-এ পরীক্ষার মাস দুই পূর্ব্বে, তাহার বাবা দেশের বাড়ীতে গিয়া হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরাইয়া ফেলিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে পরলোকের মহামান্য পরোয়ানা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন। দুর্ঘটনাটা এমনি হঠাৎ ঘটিয়া গেল যে, সুরেশ প্রথমে কিছু অনুভবই করিতে পারিল না ; শুধু তাহার মনটা ও মাথাটা কেমন একরূপ হইয়া গেল। পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব জানিয়া কলিকাতায় না ফিরিয়া সে দেশের বাড়ীতেই রহিয়া গেল। সংসারে থাকিবার মধ্যে রহিল শুধু এক বিবাহ-যোগ্যা ভগিনী সুশীলা।

জগতে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয় ;—সুরেশ ও সুশীলা একদিন সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহারা অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা হইয়াছিল। সে দুঃখটা তাহাদের অনেক দিন পূর্ব্বেই সহিয়া গিয়াছিল।

ইহারই কিছুদিন পরে, সুরেশদের কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট হইতে পত্র আসিল। তাহাতে ম্যানেজার জানাইয়াছে যে, ব্যবসার 'গতিক' সুবিধার নয়। উপরন্তু, যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে, তাহারও অবস্থা খারাপ। বাজারে

গুজব যে ব্যাঙ্ক দু একদিনের মধ্যে 'ফেল' পড়িতে পারে। সর্ব্বশেষে সুরেশকে শীঘ্র কলিকাতায় যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সুরেশকে সবটা পড়িতে হইল না। তাহার মাথাটা দুশ্চিন্তায় ভয়ানক ঘুরিয়া উঠিল। তাহার মায়ের মাথার (brain) দোষ ছিল। সেই সূত্রে সুরেশেরও মাথার দোষ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু, পরীক্ষা দি'তে না পারা, ব্যাঙ্ক 'ফেলে'র ও ব্যবসার বেগতিকের কথা প্রভৃতি নানা দুশ্চিন্তায় সে মাথার ঠিক্ কিছুতেই রাখিতে পারিল না। দিন কয়েকের মধ্যে পাগলের লক্ষণ রীতিমত প্রকাশ পাইল।

একজন বলিল, "আহা, সুরেশ বেচারা একবারে পাগল হ'য়ে গেল হে?"

অন্যজন বলিল, "না হওয়াই ত' আশ্চর্য্য! ও'র মায়েরও এই দোষ একটু ছিল কি না! তা'ছাড়া উপরি উপরি এত-গুলো আঘাতেও কি মানুষের মাথার ঠিক্ থাকে? কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, দুঃখ যখন আসে, তখন কিরূপভাবে একেবারে সব আসে?"

সুরেশের বন্ধু অমর উত্তর দিল, "কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এমন জগতে অনেক দেখা যায়। কিন্তু সব চেয়ে ভাবনার বিষয়—আপনার ব'লে দেখ্‌বার কেউ রইল না। সুশীলা একে ছেলে মানুষ, তার উপর একাই বা সে কি ক'রে!"

* * * *

একদিন পরের কথা। অমর এবং একজন ডাক্তারের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখ্‌ছেন ডাক্তারবাবু?" ডাক্তার উত্তর দিল, "সবই ত' পাগলের লক্ষণ। দেখুন অমরবাবু, বল্‌তে লজ্জা নাই, এতে আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার হ'বে না। আমার মনে হয়, খুব যত্নের সহিত ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতে পারিলে সারিয়া যাইবে।"

"কিন্তু যত্ন ক'রে, ঠাণ্ডা ক'রে রাখে কে? একা শুধু আমি আছি, কিন্তু আমার অবস্থা ত' জানেন? চাকরিটী বজায় রাখিতে হইবে। আমি কি ঠিক্ ক'রেছি, জানেন?—হর্ষপুরের তারকবাবু সুরেশের বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং সুরেশকে ছেলের ন্যায় স্নেহ ক'রেন। সেইখানে সুরেশকে রাখিয়া আসিতে পারিলে যত্নও হইবে, চিকিৎসাও হইবে।" "তারই একটা ব্যবস্থা করুন" বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া গেল।

* * * *

তিনদিন পরের কথা। অমর ও তারকবাবুর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশের বাবার সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?"

তারকবাবু বলিলেন, "বহুদিনের। খুব ছোটবেলা হইতেই সুরেশ আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করিত। এখানে এ'নে খুবই ভাল ক'রেছেন; আমরা বাপ মায়ের চেয়ে কিছু কম যত্ন করিব না। এখন শীঘ্র সেরে উঠলেই মঙ্গল।" "সেই জন্যই ত' এখানে আনা। শুনেছিলাম—"

"বাবা, আজ যে এখনো বেরোওনি" বলিতে বলিতে উষা ঘরে প্রবেশ করিল।

"এই যে—এর পর বেরোব। এইটি আমার মেয়ে, অমরবাবু। তারপর— সুরেশ এখন রয়েছে কেমন?"

"তেম্‌নি,—কাকাবাবুর কথা আর ব্যবসার কথাই বেশী বক্‌ছেন। আমাকে প্রথমে চিন্‌তেই পারেন নি। মাঝে মাঝে এক আধটু স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তাও বল্‌ছেন।"

"ও ঠিক্ শীঘ্র সেরে যাবে! ভয়ের কিছু কারণ নাই। আচ্ছা এখন আমি উঠি" বলিয়া চেয়ার হইতে তারকবাবু উঠিলেন।

* * * *

সাতদিন পরের কথা।

সকালে তারকবাবু পিয়নের নিকট হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি পত্র পড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন। উষা পাশে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা?"

"সুরেশের ম্যানেজারের পত্র। ব্যাঙ্ক 'টিকে' গে'ছে, ব্যবসারও কোন ক্ষতি হ'বার ভয় নাই।"

"কৈ, দেখি" বলিয়া উষা পত্রখানা লইয়া একনিঃশ্বাসে পড়িয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল।

তারকবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

"সুরেশদা'কে খবরটা দিতে।"

"না, না, হঠাৎ খবরটা দিলে বরং খারাপ হ'তে পারে।"

"আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু একটু ক'রে খবরটা দিব।"

"আচ্ছা যা।"

উষা সুরেশের কক্ষে গিয়া প্রথমে তাহার একটু উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর,

সুরেশ শান্ত হইয়া বসিলে এক একটু করিয়া সমস্ত কথা সুরেশের নিকট প্রকাশ করিল।

"এই দেখ তোমার ম্যানেজারের পত্র" বলিয়া উষা পত্রখানা বাহির করিয়া দিল। সুরেশ পত্রখানা পড়িয়া "আঃ! তাহ'লে আমি পথের ভিখারী নই" বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। পরে একবার পাগলের মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ঘুমাইয়া পড়িল। উষা বাতাস করিতেছিল; সুরেশ ঘুমাইয়া পড়িলে সে দেখিল আজ সেই ঘুমন্ত মুখে অনেকটা সহজ, শান্ত ও স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। উষা তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল।

ঠিক্ সেই সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গেটের সাম্‌নে থামিল। গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটি কি তারকবাবুর বাড়ী?" তারকবাবু বাহিরে আসিয়া উত্তর দিলেন, "আমিই তারকবাবু।" আগন্তুক বলিলেন, "আমি সুরেশের ছোট বোন সুশীলাকে লইয়া আসিয়াছি।"

উষা ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গেল। বাল্যসখী দুইজন পরস্পরের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। উষা বলিল, "নেমে এ'স। তিনি আজকাল বেশ ভাল আছেন।"

সেইদিন রাত্রে সুরেশ সুশীলার সহিত বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা বলিল; রাত্রে বেশ সুস্থ ও শান্তভাবে ঘুমাইল এবং দিন দুই ক্রমাগত ঘুমাইয়া একদিন সকালে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিল।

(২)

উষাকাল। নক্ষত্রগুলি এক একটি করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। কুমুদবন্ধু ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পশ্চিমাকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ভোরের বাতাস বুঝি বা কোন বিরহিণীর কাতর প্রার্থনাতে গলিয়া গিয়া, তাহার প্রবাসী বঁধুর কেশপাশ হইতে সুরভি কস্তুরির বাস লুটাইয়া আনিতে চলিয়াছে। সুদূর দিগন্ত বেলায় আকাশ যেখানে শ্যামল বসুমতীকে মৃদু চুম্বনে স্পর্শ করিয়াছে, সেই উষা আকাশের তরল নীলিমা হৃদয় বাহিয়া দুই একটি করিয়া রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঠিক্ এমনি সময়ে, হর্ষপুরের ধার দিয়া যে বিচিত্রা নদীটি মন্দ কলস্বনে, বিচিত্রভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কূলে কূলে উষা, সুরেশ ও সুশীলা পদচারণা করিতেছিল। তিন জনেরই মন একটু ভারাক্রান্ত; কারণ, সেটা সুশীলা ও সুরেশের বিদায়ের দিন। কোথা হইতে একটা অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেই সুশীলা বলিল, "এখানে নিশ্চয় কোথাও ভাল ফুলের গাছ আছে।" তারপর এধার ওধার চাহিতেই একটা উঁচু জায়গার উপর ফুলে-ফুলে-ভরা একটা বন-চামেলির গাছের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই "তোমরা দাঁড়াও, আমি গোটাকতক ডাল ভে'ঙ্গে আনি" বলিয়া সুশীলা উপরে উঠিয়া গেল।

পূর্ব্বদিগন্তের বিভাসিত উষা-আকাশ তখন তপন-প্রসব-ব্যথায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া উষা বলিল, "এই সময়টা কি সুন্দর!"

"বিশেষ ক'রে নামটার জন্য" বলিয়া ফেলিয়াই সুরেশ থামিয়া গেল। উষা বালিকা নহে, সে ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। কথাটার মধ্যে কি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া উষা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সুরেশ কথাটাকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিল, "চল না, আমাদের বাড়ী দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বে?"

উষা বলিল, "বাবা না বল্লে, কি ক'রে যাই!—কিন্তু, তোমাদের কি আজ না গে'লেই নয়?"

মাত্র গোটা চার কথা! কিন্তু বিশ্বের যত মধু কি এই কয়টি কথায় সুরেশের কাণে ঢালিয়া দিল! 'আজ না গেলেই কি নয়!' এই কয়টা কথা সে অনেক যায়গায় বিদায়ের সময় অনেকের নিকট হইতেই শুনিয়াছে, কিন্তু আজিকার যত দেহের শিরায়-উপশিরায়, হৃদয়ের অন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন করিয়া পুলকের বান ডাকাইয়া দেয় নাই!

কণ্ঠস্বরে দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবার ভয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুরেশ বলিল, "আজ অনেকদিন বাড়ী-ছাড়া। তা'ছাড়া ব্যবসার একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য শীঘ্র একবার কলিকাতা যাইতে হইবে। তোমাদের কাছে আমি চিরঋণী রহিলাম। এই রকম সেবাযত্ন না পাইলে, আরও মাথা গরম হইয়া, হয়ত আত্মহত্যাই করিয়া ফেলিতাম। তোমার এই যত্নটি আমি কোন দিন ভুলিব না। আমার ছোটবেলার অসুখের কথাও মনে আছে। তখনও তোমার—"

বাধা দিয়া বিনয়ের সুরে উষা বলিল, "না, না, সে আর কি! আচ্ছা, সুশীদি'র বিয়ের কি ক'চ্ছেন?"

সুরেশ বলিল, "বিয়ে ত' এইবার দিলেই হয়; কিন্তু বিয়ে দিলেই ত' পরের বাড়ী চ'লে যাবে। তখন একবারে একা থাকা যে কি কষ্টকর হ'বে সেই ভেবেই—"

"চল দাদা, এইবার ফেরা যাক্।" বলিয়া সুশীলা দুই হাতে একরাশি ফুল লইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলা ও উষা গল্প করিতে করিতে চলিল। সুরেশ শান্ত, শুদ্ধ, মৌন বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সে দৃষ্টি কিছু ম্লান ও ব্যথাতুর। তাহা যেন ভাষা হইয়া, অন্তরের অন্তস্থলের কোন্ রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কাহারও নিকট নিবেদন করিতে চায়।

সন্ধ্যা সাতটার সময় একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তারক বাবুর দরজায় দাঁড়াইল। উষা সুশীলার হাত দুটি নিজের হাতে লইয়া বলিল, "এস তবে সুশীদি, সময় হ'য়েছে। কতদিন পরে দেখা হ'ল, আবার কবে হ'বে, কে জানে! পত্র দিও।" তারপর, বাল্যসখী দুইজন একবার পরস্পরের প্রতি চাহিল; গোটা কতক অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। পরস্পর পরস্পরকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠে নিবিড় অনুরাগ ঢালিয়া দিল। সুরেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

কোচম্যান হাঁকিল, "গাড়ীতে উঠুন বাবু, ট্রেণের দেরী নাই।" তারকবাবু বলিলেন, "হাঁ বাবা সুরেশ, গাড়ীতে ওঠ। আটটায় ট্রেণ। তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজ্‌ল দেখ দেখি।"

সুরেশ তাহার হাত-ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিল, সাতটা কুড়ি! এবার নেহাৎই যাইতে হইয়াছে। হাঁ, সাতটা কুড়িই বটে!

হায়রে, বেদরদী ঘড়ি! এতকাল সুরেশের দেহের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াও আজ সুরেশের মনের কথাটা বুঝিতে পারিলি না? ইহারই মধ্যে সাতটা কুড়ি বাজিয়া বসিয়া রহিলি? সুরেশ যে তো'কে কত ভালবেসে পঞ্চাশ টাকা 'স্মিথ' কোম্পানীকে গুণিয়া দিয়া তাহাদের অন্ধকার দোকান ঘরের বদ্ধ বাক্সর ভিতর হইতে তোকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল, তাহার জন্য একটা কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত দেখাইলি না? দূর, অকৃতজ্ঞ ঘড়ি!

সুরেশ তাহার ব্যথাতুর দৃষ্টি ঘড়ি হইতে ফিরাইয়া লইয়া বাহিরের প্রতি চাহিতেই দেখিল সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন যেমন প্রভাতের সোণালি আলো, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রৌদ্র, গোধূলির লালিমা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া একটির পর একটি বিদায় লয়, আজও তাহারা তেম্‌নি করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আজও অন্য দিনের মত পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়া, তাহার সমস্ত রশ্মি একত্র করিয়া পশ্চিম পারাবারে ডুবিয়া গিয়াছে। আজও অনুপল বিপলে, বিপল পলে, পল দণ্ডে, দণ্ড প্রহরে, প্রহর দিনে পরিণত হইয়া, সময়-সাগরের কোন্ অসীম কোলে মিশিয়া 'অতীত' হইয়া গিয়াছে। সুরেশের দীর্ঘনিঃশ্বাসের কেহ কোন মর্য্যাদাই রাখে নাই!—এ কি, এ যে সাতটা বাইশ! সুরেশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

(৩)

সুরেশের বাড়ীতে সুরেশ ও তাহার বন্ধু অমরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

"ব্যবসা কি রকম দে'খে এলে সুরেশ?"

"হুঁ।"

"হুঁ কি হে?"

"ওঃ, কি বল্‌ছ, ব্যবসা? ম্যানেজারের দোষেই অমনটা হ'য়েছিল, আমি একজন ভাল লোক রেখে এ'সেছি।"

"বাড়ীটা যে ভাল ক'রে করবে ব'লছিলে?"

"কি বল্‌ছ? বাড়ীটা? কি হ'বে ক'রে? এই বছরই সুশীর বিয়ে দিব ঠিক ক'রেছি। সে চলে গেলেই ত একেবারে একা। কি হ'বে আর ভাল বাড়ী ক'রে?"

"একা থাকবে কেন হে? বিয়ে ক'র না?"

"বিয়ে, ওঃ!"

"আচ্ছা সুরেশ, কি ভাব্‌ছ বল দেখি? অনেকক্ষণ হ'তেই তোমাকে অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি। কি ব্যাপার বল, নইলে ছাড়ছি না!"

তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সুরেশ যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি বিবাহ করিতেই হয়, তবে উষা ভিন্ন আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। এখন ইহা সম্ভবে পরিণত করা যায় কি উপায়ে?

"এ আর অসম্ভব কথা কি? কিন্তু ও'রা ত' তোমাদের চল্‌তি ঘর নয়!"

"নাই হোক্, আমি ওসব মানি না, আর তারকবাবুও অত গোঁড়া নন্ যে সব ছেড়ে শুধু 'চল্‌তি ঘর' কি না তাই দেখবেন। আমি জানি তিনি অমত করবেন না; কিন্তু—"

"তবে আর কিন্তু কি ?"

"অতবড় মেয়ে, তার মন জানি না—আমার কাছে এ'লে সুখী হ'বে কি না ?"

"ওসব ডেঁপোমি। তা'ছাড়া—"

"থাম, থাম। তুমি কি বল্‌তে চাও তা আমি বুঝেছি। সেটা আট বছরের গৌরীদান হ'লে আমার বলবার কিছু নাই। কিন্তু এতটা বয়স পর্য্যন্ত যখন রাখা হ'য়েছে—তারও ত' একটা স্বতন্ত্র পছন্দ এবং মন আছে। এটার উপর ত' কারও জোর খাটে না। উষা মনে মনে—"

তারপর এ বিষয়েই অন্যান্য অনেক কথার পর সুরেশ বলিল, "দেখ অমর, এ দেশের মেয়েদিগকে দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়—সমাজের উপর ভয়ানক রাগ হয়। কোথায় অবাধে, স্বচ্ছন্দে অহেতুক দ্বিধা-সঙ্কোচহীন হ'য়ে,—হাস্‌ছ, তা হাস,—কিন্তু আমার কেবলই 'শ্রীকান্তর' কথা মনে পড়ে, বর্ম্মায় নে'মে যখন বলেছিল, 'এই ত চাই, এই নইলে আবার জীবন! এই যে মেয়েরা চতুর্দ্দিকে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, এ কি অবহেলার জিনিস ? রমণীদের স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের (বর্ম্মার) পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরা মেয়েদিগকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া, তাহাদের জীবনগুলাকে ব্যর্থ, পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি!'—সমাজ আমাদের একেবারে জগতের শীর্ষস্থানটি অধিকার ক'রে বসেছে, দেখ্‌ছ না ? সমাজ মানে যে মানুষের সমষ্টি এটা ত' স্বীকার কর ?"

"ও সব কথা এখন থাক্, তোমার নিজের কথা বল।"

"ভাল ক'রে তার মন না জান্‌লে—"

"তবে উষাকে যেয়ে জিজ্ঞাসা কর,—'তোমার হৃদয়-সিংহাসনের কেহ অধিকারী আছেন কি ? না থাকিলে তাহা দাবী করিতে পারি কি ?'"

"ফাজ্‌লামি ক'রো না অমর। তা' বুঝি পারা যায় ?"

"তবে তারকবাবুর বাড়ীতে বেড়াবার ছলে আবার যাও। সেখানে দিনকয়েক থেকে আলাপ জমিয়ে—"

"তা' হয় না। কোন কারণ নাই—হঠাৎ গিয়া যদি উপস্থিত হই, তবে কি মনে করবেন ? তা'ছাড়া সেটা ত' বেড়াতে যাবার মত জায়গা নয় ?"

"কিছুই যদি পারবে না, তবে আর কি হবে ? না হয়, আবার পাগল সে'জে চল। সেবার ভার ত উষার উপর পড়বেই।"

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। অমরের মুখখানা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখ সুরেশ, যদি একটা কাজ করতে পার, তবে একটা চূড়ান্ত রকমের 'রোম্যাণ্টিক' ব্যাপার হয়। পাগল সেজে চল,—আমি রেখে আস্‌ছি। তখন রাতদিন উষাকে ত' খুব কাছে পাবে, বেশ ক'রে আলাপ জমিয়ে—"

অমরের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে সুরেশ হাসিয়া ফেলিল। অমর হাসিয়া বলিল, "একবার পাগলই না হয় সাজ্‌লে। ভেবে দেখ।—এখন ক'টা বাজ্‌ছে ? সাড়ে ন'টা ? আচ্ছা, আমি ওপাড়া থেকে একবার ঘুরে আসি। আমি ঠিক্ দশটার সময় আস্‌ছি।" অমর বাহির হইয়া গেল। সুরেশ একটা আরাম-কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া অমরের অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা ভাবিতে লাগিল।

* * * *

তারকবাবুর দরজার সম্মুখে গাড়ীতে উপবিষ্ট সুরেশ শুনিতে পাইল, অমর হাঁকিতেছে—তারকবাবু আছেন ?

তারকবাবু বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অমর বাবু যে, হঠাৎ ?"

অমর অতি কষ্টে হাসি গোপন করিয়া, বার দুই কাসিয়া, রীতিমত গম্ভীর হইয়া বলিল, "সুরেশের মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেছে; তারজন্য, আবার আপনার নিকট নিয়ে এলাম।"

"সে কি, আবার এমনটা হ'ল কেন ?—কোথায় সে ?"

"ওই যে গাড়ীর মধ্যে বসে আছে।"

"নামিয়ে নিয়ে আসুন।—তাই ত, আমি ভেবেছিলাম একবারে সেরে গেল। কোন দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে ?"

"না—তেমন ত' কিছু ঘটে নাই।"

অমর গাড়ীর দরজার নিকট আসিতেই সুরেশ বলিল, "ছিঃ ছিঃ, আমার মরতে ইচ্ছে কচ্ছে ! কেন এমন কুকর্ম্ম করতে গেলাম। ফিরে চল, ভাই, তোমার পায়ে পড়ি।"

"দূর, এখন কি আর তা হয়; এতদূর যখন এগিয়ে আসা

হয়েছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখ। দিনকয়েক কাটিয়ে আবার ভালোটি সেজে ফিরে যেয়ো।"

"যাই কি ক'রে? আমার যে বড় হাসি পাচ্ছে।"

"হাসি পায় ত হাস্‌বে। লোকে ভাব্‌বে পাগলে হাস্‌ছে।"

* * * *

উষা বলিল, "সরে এস সুরেশদা'—তেলটা মাথায় দিয়ে দি।"

সুরেশ বলিল, "আমার মাথায় তেল দেবার কিছু দরকার নাই—আমি পাগল নই। শুধু—"

"পাগল হ'বে কেন? কে বল্লে পাগল? তুমি ওসব কিছু ভেবো না।—সরে এস, মাথায় তেলটা দিয়ে দিই।"

"দেখ, ও বদ্ গন্ধ আর সহ্য করতে পারি না। বাস্তবিক বল্‌ছি, আমার তেলের কিছু দরকার নাই। তুমি বস—একটা কথা আছে।"

"পাগলামি ক'রো না। বস, তেলটা দিই। কি, দিতে দিবে না? আচ্ছা, বাবাকে ডাকি।"

উষা যাইয়া তারকবাবুকে ডাকিয়া আনিল। তিনি জোর করিয়া মাথায় তেলটা মাখাইয়া দিলেন; এবং জানাইয়া গেলেন যে, এর পর সুরেশের হাতে পায়ে বাঁধবার প্রয়োজন হইবে।

তারকবাবু চলিয়া গেলে উষা সুরেশের মুখের নিকট একটা গ্লাস ধরিয়া বলিল, "এইটুকু খেয়ে ফেল।"

মিনতির সুরে সুরেশ বলিল, "দেখ, আমি পাগল নই। একটা কারণে শুধু নকল পাগল সেজে এসেছি। বিশ্বাস কর—"

"না, না, পাগল হবে কেন?—এখন এইটুকু খেয়ে ফেল!"

"দেখ উষা, ওসব ঠাণ্ডা সরবতের আমার কিছু দরকার নাই। একে আমার বুকে সর্দ্দি বসেছে—"

"খাবে না? আচ্ছা, বাবাকে ডাকি?"

সুরেশ নিঃসন্দেহে বুঝিল, এখনই তারকবাবু আসিয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিয়া যাইবেন। নিজের উপর তাহার এত রাগ হইতেছিল যে, নিজের মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

"তোমার বাবাকে বল, আজ আমি বাড়ী যাব।"

"বেশ, যেও—কিন্তু এটুকু এখন খেয়ে ফেল।"

হায়রে কপাল! এ কথাটাও পাগলের কথা ভাবিয়া উড়াইয়া দিল। কি করিয়া সে বিশ্বাস করাইবে!

"দেখ উষা?"

"কি?"

"এমনটা যে হ'বে তা ভাবি নি,—সত্য কথাটা বলি, তোমাকে আমি ভালোবেসে—"

উষা বলিল, "চুপ্ ক'রে ঘুমোও।"

"আর দুটো কথা। তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আলাপ করবার ইচ্ছা হয়; কিন্তু তোমার বাবা যদি কোন সন্দেহ করেন, এই ভয়ে হঠাৎ তোমাদের বাড়ীতে উঠ্‌তে পারি নি। ভাবলাম মাথা খারাপ হয়েছে ব'লে অমর আমাকে তোমাদের বাড়ী রেখে যাবে—তখন তোমার সঙ্গে দেখা হ'বেই। সেই জন্যই—"

উষা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ একটু পরে শুনিল, উষা তাহার মাকে বলিতেছে, "সুরেশদার মাথাটা খুবই খারাপ হইয়াছে।"

... ...

সুরেশ শুনিল, উষা বলিতেছে, 'দেখ বাবা, সুরেশদা বাহিরে বেড়াতে যাবার জন্য বড় ঝোঁক ধরেছে।'

তারকবাবু উত্তর দিলেন, "না না, বাহিরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। কি জানি, কি করবে—তখন তুই সাম্‌লাতে পারবি না।—আচ্ছা দুজন চাকর সঙ্গে নিয়ে যা।"

সুরেশ উষা ও দুজন চাকরের সহিত বেড়াইতে বাহির হইল। কতকটা দূর যাইয়া বলিল, "উষা!"

"কি?"

"আমার কথাগুলো শু'ন। তোমাকে শুধু—"

"চুপ কর। ওই দেখছ নদীটাতে কি বান্ বইছে?"

হায়রে! কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না;—সবই পাগলের কথা ভাবিয়া উড়াইয়া দেয়! সুরেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি ফিরে যাও। আমি সোজা ষ্টেশনে চল্‌লাম্; সন্ধ্যের ট্রেণ ধরে বাড়ী যাব।"

শঙ্কিত হইয়া উষা বলিল, "বাড়ী ফিরে চল সু—"

"আমি কিছুতেই যাব না, তুমি যাও" বলিয়া সুরেশ ষ্টেশনের পথ ধরিল।

উষা চাকরগুলোকে হুকুম করিল, "ওরে, তোরা জোর

ক'রে বাবুকে ধরে নিয়ে বাড়ী চ'ল্। মাথাটা বোধ হয় খুব গরম হ'য়ে উঠেছে।"

চাকর দুইটা ছুটিয়া যাইয়া সুরেশের হাত দুটো চাপিয়া ধরিল। সুরেশ মনে মনে মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিল।

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া তারকবাবুর খাম ও কাগজ লইয়া অমরকে একটা পত্র লিখিতে বসিল—

—"যে অবস্থায় কাটাইতেছি তাহাতে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কাল তোমাকে যদি সাম্‌নে পাইতাম তবে তোমার মাথাটা গুঁড়া করিয়া দিতাম। কি দুর্ব্বুদ্ধিই আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিলে! উষার ধারণা—আমি সত্যই পাগল। যাহা বলি তাহাই উড়াইয়া দেয়। পত্র পাবামাত্র চলিয়া আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

দিন দুই অপেক্ষার পর, সুরেশ যে ঘরে শুইয়া ছিল সেই ঘরে ঢুকিয়া অমর ডাকিল, "এই সুরেশ, সুরেশ!"

... ...

আরাম-কেদারায় শায়িত সুরেশকে ঠেলা দিয়া অমর ডাকিল, "এই সুরেশ, সুরেশ, ওঠ! ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে না কি?"

সুরেশ চোখ রগড়াইয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা বেজেছে?"

"ঠিক্ দশটা। আমি ত' বলে গেলাম—ওপাড়া হ'তে ঠিক্ দশটার সময় ফিরব।—হাস্‌ছ যে?"

এতক্ষণে সুরেশ অবস্থাটা বুঝিল। "উ, কি দুঃস্বপ্নই দেখ্‌ছিলাম!"

"দুঃস্বপ্ন?—কি স্বপ্ন হে শুনি?"

সুরেশ স্বপ্নটা বিবৃত করিয়া বলিল, "তা বেশ পরামর্শ দিয়েছিলে! তোমার মতলবে গেলে এই দুর্দ্দশাই ঘটত দেখ্‌ছি।"

দুইজনেই অত্যন্ত হাসিতে লাগিল।

ইহার এক বছর পরে অমরের ঘটকালীতে সুরেশ ও উষার বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশয্যার রাত্রিতে উষা ও সুরেশের, এই স্বপ্নের কথা লইয়া, বেশ একটু নূতন রকমে কাটিয়াছিল।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এ

যখনকার কথা বলিতেছি তখন সবেমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুপলাইন আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলে তখন তিনটি পাকা রাস্তা—বৈদ্যনাথ হইতে রাণীগঞ্জ—দুমকা হইতে ভাগলপুর—অপর দিকে সিউড়ী। এই সময় কুলী-মজুরদের কাজের অভাব ছিল না। প্রায় অধিকাংশ কুলী-মজুর রেললাইনে খাটিয়া বেশ রোজগার করিত। এখনকার মত তখন দেশে এত আকাল পড়ে নাই। কোন দ্রব্যই অগ্নিমূল্য ছিল না। চাল ধান খুবই সস্তা ছিল। তখন সোণার দেশ ছিল। এই সময়ে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় অসংখ্য সাঁওতালের বাস ছিল।

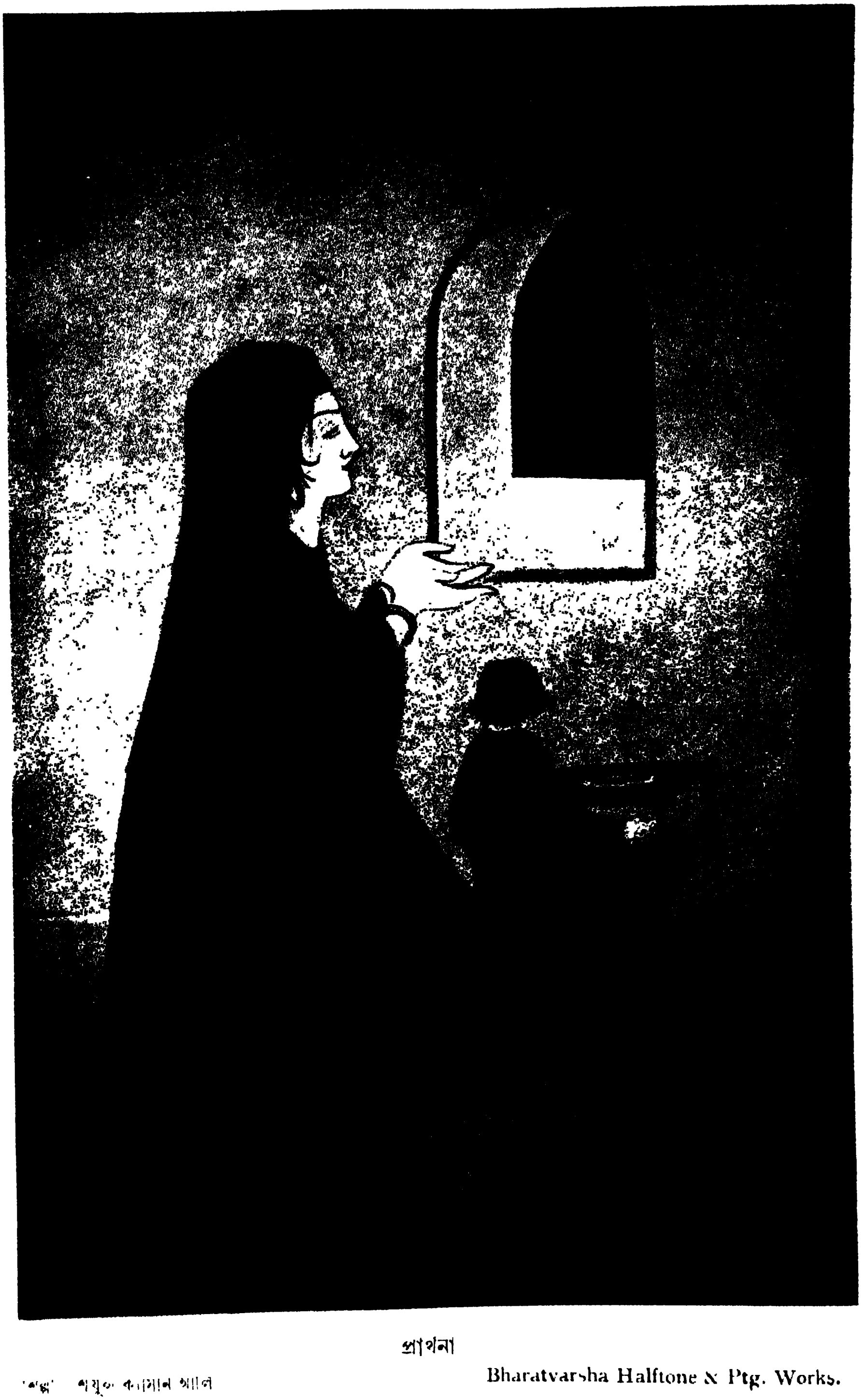
সাঁওতালেরা অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক; কিন্তু ক্ষেপিলে রক্ষা নাই। তাহারা বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ের নীচে ঘর বাঁধিয়া প্রকৃতির কাছে কাছে থাকিয়া মন প্রাণ খুলিয়া গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহারা শাক ভাত মাড় খায়; তাহাতেই তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা নাই। তাহারা পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ কাটিয়া তাহাকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া তোলে। তাহাদের কর্ম্মের গুণে পার্ব্বত্য প্রদেশ আশাতিরিক্ত শস্য প্রদান করিয়া থাকে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাহারা যে শস্য উৎপাদন করিত, তাহার দ্বারা স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া পর বৎসরের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিত এবং কিয়ৎ পরিমাণ ফসল বিক্রয়ও করিত। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে তাহারা তাহাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কাঁসা পিত্তলের গহনা ক্রয় করিত। তাহাদের অধিকাংশ ঘরেই একপাল করিয়া গরু বাছুর থাকিত। সুতরাং সে সময়ে তাহাদের বিশেষ কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তাহাদের এই সুখের সংসারে অচিরেই বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল।

হিন্দু বণিকগণ তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত শস্য ভুলাইয়া

হস্তগত করিবার জন্য তাহাদেরই বাসস্থানের নিকটে-নিকটে গুদাম বা আড়ত খুলিয়া বসিল। নানারূপ প্রলোভনের দ্রব্যে আড়ত পরিপূর্ণ করিল। সাঁওতালগণ তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। নিম্নশ্রেণীর বণিক এবং গোলদারগণ (ভোজপুরিয়া) প্রতারণা-পূর্ব্বক তাহাদের কৃষিলব্ধ দ্রব্য হস্তগত করিতে লাগিল। শকটপূর্ণ শস্য ও কলসীপূর্ণ ঘৃতের পরিবর্ত্তে সাঁওতালেরা অতি অল্প-মূল্যের লবণ ইত্যাদি দ্রব্য পাইতে লাগিল; একজোড়া বলদের পরিবর্ত্তে একজোড়া পায়রা পাইতে লাগিল। ছিদ্রতল পাত্রে ঘৃত মাপিয়া, গুরু ওজনের মণ সেরে চাল ধান ওজন করিয়া বণিকেরা প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই মহাজনদের মত সাঁওতালদের কুটিল বুদ্ধি ছিল না। তাহারা শিশুর ন্যায় সরল ছিল। এই সরল-হৃদয় সাঁওতালগণ মহাজনদের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারিত না। ফলতঃ ব্যবসায়ীরা এইরূপ কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া নিষ্ঠুরতার মাত্রা দ্রুতগতি বাড়াইয়াই চলিল। এইরূপ ভাবে প্রতারণা করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। অন্য উপায়ে সাঁওতালদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা করিল। সরল-প্রকৃতি সাঁওতালগণ এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের স্বোপার্জ্জিত সমস্ত দ্রব্যই হারাইয়া বসিল। শেষে ব্যবসায়িগণ তাহাদের এমন দুরবস্থা করিল যে, সাঁওতালদের ঋণ গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। তাহারা সাঁওতালদের অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, টাকার দরকার না থাকিলেও গায়ে পড়িয়া টাকা ধার দিত। নির্ব্বোধ সাঁওতাল তাহাই লইত। দশ টাকা ধার দিয়া মহাজন সুদসমেত পনর বিশ টাকা লিখাইয়া লইত এবং টাকা গ্রহণ কালে ঐ সুদসমেত টাকা আসল বা মূল ধরিয়া পুনশ্চ তাহার সুদ আদায় করিত। না দিলে আদালতের সাহায্যে আদায় করিত এবং টাকা লইবার সময় ভুল করিয়া বেশী গণিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। এই ঋণই সরল-প্রাণ সাঁওতালদের কাল হইল। তাহারা সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না বলিয়া উত্তমর্ণেরা তাহাদের উর্ব্বরা ক্ষেত্র, গরু বাছুর, থালা বাটি সমস্তই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। পুলিসের বেশ ধরিয়া ঘরবাড়ী তল্লাস করিয়া সমস্তই লইয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, তাহাদের পরিবারবর্গেরও দেহ হইতে কাঁসার গাত্রাভরণও খুলিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি সাঁওতাল ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আবার কতকগুলি উত্তমর্ণের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও তাহারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না; বরং ঋণ আরও বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ ভাবের ঋণ কি সহজে পরিশোধ হয়? প্রভুর কাজ করিয়া অন্য কাজে অর্থো-পার্জ্জনের চেষ্টা করিলে প্রভু সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আদালতের আশ্রয় লইত। কি করিবে—মূর্খ, অজ্ঞ ও সরল-প্রকৃতি সাঁওতালগণ পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে ধরা দিল।

সাঁওতালদের এইরূপ অসহনীয় কষ্টের কোনরূপ প্রতি-বিধান হইল না। আদালতে হিন্দুদের সমর্থন হিন্দুরাই করিত। কে এই নীচ অসভ্য জাতিদের দয়া দেখাইবে—কে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে? তাহারা প্রত্যেকবার পরাজিত হইয়া মলিন ও শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিত। সাঁও-তালদের মাথা রাখিবার তিলমাত্র স্থান রহিল না। মহাজনেরা তাহাদিগকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে! মানুষেরই ত শরীর! আর কত সহিবে বা সহিতে পারে! তাহাদের সরল প্রাণ বজ্রের মত কঠিন হইয়া উঠিল। ইংরাজী ১৮৫৪-৫৫ সালে সমগ্র সাঁওতালদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। এই চাঞ্চল্যের কথা বীরভূমের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। সাঁওতালগণ প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা আর হিন্দু কর্ত্তৃক প্রতারিত বা অত্যা-চারিত হইবে না—হিন্দুদের দাসত্ব করিবে না।

সমগ্র সাঁওতালজাতির মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তাহাদের নেতার অভাব হইল না। রাজমহল মহ-কুমার অন্তর্গত ভগ্নাডিহি গ্রামনিবাসী সীদু, কানু, চাঁদ, ভৈরব—এই চারি ভ্রাতার মধ্যে প্রথম ভ্রাতৃদ্বয় প্রচার করিয়া দিল যে, সাঁওতাল দেবতা "মরাংবুরু" স্বয়ং তাহা-দিগকে উপর্য্যুপরি সাতবার সাতরকমে—প্রথমে মেঘরূপে, তাহার পর অগ্নিরূপে, টোপরবিশিষ্ট মানুষরূপে, ছায়ারূপে, পর্ব্বতরূপে, শালবৃক্ষরূপে এবং শেষে শ্বেতবস্ত্রাবৃত সাঁওতাল-রূপে দেখা দিয়াছেন। এবং দেবতা তাহাদিগকে একখানি পবিত্র পুস্তক দিয়াছেন। এই পুস্তকে কিছুই লেখা ছিল না। পাতাগুলি সমস্তই সাদা ছিল। তাহারা ঐ পাতাগুলি ছিঁড়িয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সাঁওতালদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। সীদু কানুকে



প্রার্থনা

'শিল্পী' শ্রীযুক্ত কামাল আলি

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

(সুভবাবুকে) সকলে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইল এবং সকলে ঘটি ঘটি দুগ্ধ উপহার দিল। চারি পাঁচ মাস ধরিয়া তাহারা অস্ত্রশিক্ষাও করিল। তখন তাহাদিগকে নিষেধ করিবার কেহই ছিল না বা নিষেধ করিলে হয় ত তাহারা শুনিতও না। তাহারা সকলেই মনে করিল, ইংরাজরাজ তাহাদিগকে এই অত্যাচারীর হাত হইতে মুক্ত করিবেন; কিন্তু কিছুই হইল না দেখিয়া কমিশনর সাহেবের নিকট আবেদন করিল। আবেদন-পত্রে লিখিয়া দিল যে তাহারা আর অপেক্ষা করিবে না। ইংরাজরাজ ইহাদের এইরূপ ব্যাপারের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না বলিয়া তাহাদের আবেদন-পত্র বিফল হইল। পুনঃ পুনঃ আবেদনের ফলে কিছুই হইল না দেখিয়া তাহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল; এবং ভাবিল উদ্ধারের উপায় নিজেদেরই করিতে হইবে। তখন তাহারা তাহাদের রণচিহ্ন "শালবৃক্ষশাখা" গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দূত পাঠান হইল। সঙ্গে সঙ্গে তীরধনুকসহ অসংখ্য সাঁওতাল সীদু কানুর বাড়ী ভগ্নাডিহি এবং পরে বারহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমবেত সাঁওতালগণ জানিল না—বুঝিল না যে, তাহারা কি জন্য সমবেত হইয়াছে,—"ডাকে" আসিতে হইবে, তাই আসিয়াছে। এইভাবে সীদু কানু স্বজাতীয়বর্গকে সমবেত করিয়া লাট সাহেবের নিকট এবং বীরভূম ও ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিল। আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ ছিল—"সুদের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সাঁওতাল প্রদেশস্থ অত্যাচারী মহাজনদিগকে দূরীভূত বা নিহত করিতে হইবে।" সকলেই জমিদার মহাজন প্রভৃতির মৃত্যু-কামনা করিল। এইভাবে যেরূপ প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের সূচনা হইয়াছে, তাহার গতিরোধের কোন আশু সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে নেতৃদ্বয় সাঁওতাল-বাহিনীকে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিল। শুধু নেতৃদ্বয়ের শরীর-রক্ষার জন্য ত্রিশহাজার সাঁওতাল ছিল; সুতরাং ঐ প্রকাণ্ড দলে কত সংখ্যক সাঁওতাল ছিল তাহার ধারণা করা কঠিন হইবে না। সাঁওতালেরা আপন আপন বাড়ী হইতে যে খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছিল, তাহা অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। যতদিন খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না, তত দিন বিশেষ কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই। তাহাদের প্রত্যেকের আহার্য্য ফুরাইয়া গেলে, সাঁওতালগণ ক্ষুধার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা বনের গাছের পাতা খাইতে লাগিল। বর্ব্বর অসভ্যজাতি ক্ষুধিত হইলে যেরূপ অন্যায়, অত্যাচার করে, ইহারাও তদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু নেতৃদ্বয়ের এই-ভাবে লুণ্ঠন ইত্যাদি অত্যাচার করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে আহার্য্য সংগৃহীত করিবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সাঁওতালগণের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ঐ বৎসরেরই ৭ই জুলাই বারার (বর্ত্তমান লুপ লাইনের পিরপোঁতি ষ্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে) নিকট মহেশপুরের দারোগা সাহেব মহেশ লাল (লালাকায়স্থ) শুনিলেন যে, বহুসংখ্যক সাঁওতাল তীর ধনুক লইয়া তাঁহার সীমানার দিকে আসিতেছে। হিন্দু মহাজনেরা দারোগা সাহেবকে উৎকোচ দিয়া বলিল যে, তাহাদিগকে ধরিয়া যেন চুরীর অপরাধে জেলে দেওয়া হয়। লোভে পড়িয়া দারোগা সাহেব সাঁওতাল ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দারোগা সাহেব আসিলে সীদু কানু নেতৃদ্বয় বলিল যে, আমাদের লোকজনের খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। তুমি প্রত্যেক ধনবান লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিয়া আমাদিগকে সাহায্য কর। কিন্তু হঠাৎ নেতৃদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল যে, দারোগা সাহেব অন্যায় ভাবে তাহাদিগকে চুরীর অপবাদ দিয়া ধরিতে আসিয়াছে। দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঐ কথা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বলিলেন—"আমি অন্য কাজে যাইতেছি", কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি সমস্তই স্বীকার করিয়া ফেলেন যে, হিন্দু-মহাজনেরা তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। নেতৃদ্বয় ধীর ও শান্তভাবে বলিল—"যদি আমাদের কোনরূপ চুরীর প্রমাণ পাও ত ধর।" দারোগা সাহেব বুঝিলেন না যে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কি দশা হইবে। তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে ঐ বিশাল সাঁওতাল বাহিনী ধরিবার আদেশ দিলেন। যে মুহূর্ত্তে দারোগা সাহেবের মুখ হইতে এই আদেশবাণী বাহির হইল, তন্মুহূর্ত্তেই সীদু স্বহস্তে নিজ হস্তধৃত বলুয়া অস্ত্র দ্বারা দারোগা সাহেবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। এক

আঘাতেই দারোগা সাহেবকে পাঁচ-কোঠের রাথণী থানে বটবৃক্ষতলায় (বৃক্ষটি এখনও বর্ত্তমান আছে) সূর্য্যের উদ্দেশে বলিদান করিল এবং অপরাপর সাঁওতালদের হাতে পুলিসের নয়জন লোকও প্রাণ হারাইল।

এই সর্ব্বপ্রথম সাঁওতালগণ রক্তের আস্বাদ পাইয়া যেন ব্যাঘ্রের মতই রক্ত-লোলুপ হইয়া উঠিল। একপক্ষকাল কোনরূপ বাধা-বিপত্তি না পাইয়া মাঝিরা পথে পথে লুট-পাট, খুন-জখম করিয়া সিমড়ার নিকট রাঙামেটেয়ার পাহাড়ের তলদেশস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া জমা হইল। তাহার পর তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকের ঘরবাড়ী লুট-পাট করিতে লাগিল। তাহারা এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত মহাগামার রাজবাটী লুঠ করে। পরে লাহাটির (পিরপৌতি ষ্টেশনের ২৪ মাইল দক্ষিণে) অপর ধারে পালারপুরে করম গাছের তলায় (গাছটি এখনও বর্ত্তমান আছে) আসিয়া জমা হয়। পরে এখান হইতে দুই মাইল মধ্যে গামরিয়া গ্রাম লুট করে। তৎপরে দুই মাইল মধ্যে বারকূপ গ্রাম লুঠ করিতে যায়। এইস্থানে সাঁওতালেরা গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশুসন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে। এখানে দারোগা সাহেবেরা আসিলে, সীদু কানু তাঁহাদিগকে এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের নিকট আসিতে বলে। সাঁওতালেরা আপন ভাষায় কথা কহিতে থাকিলে, দারোগা সাহেবেরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে সীদু হুকুম দিল যে, তাঁহাদিগকে ধরিয়া যেন অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা হয়। তখন বেলা অবসান—সকলে চীৎকার রবে "দারগাটিকে ত নিলাম—এবার ঐ দারোগার গাঁকে লুট করিব" ইত্যাদি শব্দ করিয়া বাবার নিকট পয়লাপুরে আসিল। ইহার পর তাহারা পাথর-গাওয়া লুট করিতে যায়। এদিকে সীদু কানু ভগ্নাডিহিতে ফিরিয়া আইসে। পাথর-গাওয়ার ধামসাই থানার (এখন থানা নাই) দারোগা সাহেব তাহাদের নিকট আসিলে তাঁহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলে। (এই স্থানে লীলানাথ মহাদেব বর্ত্তমান)। ইহার পর তাহারা পালারপুরে ফিরিয়া আইসে। ইতিমধ্যে ভাগলপুর হইতে পিরপৌতি হইয়া এক সহস্র সৈন্যের এক পল্টন আইসে। পয়লাপুরে লড়াই হয়। বন্দুকে ভালরূপ আওয়াজ হইল না। তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বেকার বন্দুক এখনকার মত ছিল না। বারুদ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল বলিয়া বন্দুকের ভালরূপ কাজ হয় নাই। এই জন্য সাঁওতালেরা অনেক সিপাহী মারিবার সুবিধা পাইয়াছিল। একজন সাহেব আহত হইয়া ভাগলপুর পলাইয়া গেলে, তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া উঠে। এবং উন্মত্ত হইয়া তাহারা মহাদেব-বাথানে আইসে। এদিকে সীদু কানু সালখান পরগণাইতকে পরওয়ানা দিল—"পরগণাৎ বারে বারে তোমাকে যে হুকুম দিয়াছি সে সমস্ত শেষ করিয়া অবিলম্বে হাজির হও। তুমি কিছুতেই শুনিতেছ না কেন? আমি অগ্রে গিয়া তোমাকে কাটিব, পরে অন্য কথা।" ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৭০ বৎসর বয়স্ক নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে এই পরওয়ানা পাঠ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের পিতা পরগণাইতকে যাইতে উপদেশ দেন। পরগণাইত নিজে না গিয়া আপন ভাই ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে সুভবাবুর (সীদু কানু) নিকট প্রেরণ করেন।

ইত্যবসরে সাঁওতালেরা পল্টন দেখিয়া সুন্দরা নদী পার হইয়া লাহাটি গ্রামে আইসে। পল্টন বেলা ১১টার সময় এই গ্রামের ধারে সুন্দরা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং করমগাছ সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিম প্রান্তরে তাঁবু ফেলে। সাঁওতালেরা নদীর অপর তীরে বসিয়া পল্টনের কার্য্যকলাপ দেখিতে থাকে। গোড্ডা সবডিভিসনের কুসুমবাটি নিবাসী চাঁদসিপাহী (পাহাড়িয়া) * ক্যাপটেন কোপি (Captain Copy) সাহেবের আদেশে অপরতীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিয়াছিল—"কেন তুঁই নড়ছে? কেন তুই হুলমাল (হাঙ্গামা) করছি? আপনার বুতুরু বাতরা (ছেলেপিলে) ঘরে থাক।" কিন্তু তাহারা এই চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া কেবল তরবারি ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিল। ইহার পর সাহেব ছেলেদিগকে রশি দুই পশ্চিমে ভাগার ডাঙ্গায় লইয়া যান। তখন বেলা দুইটা। সাঁওতালেরাও নদীর তীরে তীরে পল্টনের সঙ্গে গিয়াছিল। সাঁওতাল-

* চাঁদ পাহাড়িয়া যৌবন অবস্থায় এই বিদ্রোহের সময় ইংরাজের পক্ষে সিপাহীরূপে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে বহুস্থলেই যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদসিপাহির বয়স যখন সত্তর বৎসর তখন আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় বীরভূমের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন জন্য এই প্রত্যক্ষদর্শী চাঁদ পাহাড়িয়ার নিকট হইতে এক আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লন। সেই বিবরণ হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে বহুল পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—গৌরীহর

দিগকে আবার বোঝান হইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা শোনে নাই ; বরং বলিয়াছিল—"পুড়খানা (সাদা, সাহেবদের শ্বেতবর্ণ উদ্দেশ করিয়া) সব কাট"। সাঁওতাল সর্দ্দার একহস্তে ঢাল লইয়া ও অপর হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া অপর সাঁওতালদের সহিত সমস্বরে বলিয়াছিল—"পুড়খানাকে সব কাটব নদীর গর্ভে।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব গুলি চালাইতে আদেশ দেন। ইহাতে ১৬।১৭ জন সাঁওতালের প্রাণ নষ্ট হয়। সাঁওতালেরা "সাড়রা", "নাগরা" বাজাইতে বাজাইতে ৪ মাইল দক্ষিণে চুণাখানিতে পলাইয়া যায়। তৎপরে পল্টন পালারপুরের তাঁবুতে ফিরিয়া আইসে।

ইতিমধ্যে সাঁওতালেরা চুণাখানিতে লুটপাট করিয়া পাথরুলের রাজার ১০টি হাতী লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখে। পালারপুরে দুইদিন অবস্থান করিলে পর পল্টন তৃতীয় দিবসে এক গোয়ালার নিকট চুণাখানির লুটের সংবাদ পাইয়া বেলা ১২টার সময় সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হয় এবং নিকটস্থ পাহাড়ের নিকট বন্দুকে বারুদ পুরিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাঁদসিপাহী তাহাদিগকে অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু কিছুই হয় নাই। তখন ক্যাপ্টেনের আদেশ মত তাহাদের উপর গুলি নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে প্রায় দেড় সহস্র সাঁওতাল ধরাশায়ী হয়। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এইরূপ ভীষণ কাণ্ড চলিয়াছিল ; পরে অবশিষ্ট সাঁওতালেরা প্রাণভয়ে এই স্থানের ১৬ মাইল পশ্চিমে সংগ্রামপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহীরা চুণাখানির উত্তরে পাঁচগাছিতে ফিরিয়া আইসে। সংগ্রামপুরে সাঁওতালদের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় সিপাহীরা সেখানে গিয়া, তীর-ধনুকধারী সাঁওতালদিগকে গোলাকার ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। ক্যাপ্টেন যখন দেখিলেন যে, সাঁওতালেরা কিছুতেই বুঝিতেছে না, তখন তিনি তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দেন। এই স্থানে বহুসংখ্যক সাঁওতালের মৃত্যু হয়। মোটে ৪০।৫০ জন জীবিত সাঁওতাল প্রাণভয়ে অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছিল। চুণাখানির ব্যাপারের তিন দিন পরে সংগ্রামপুরের এই ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই স্থলে পল্টন তিন দিন অবস্থানের পর ক্যাপ্টেনের আদেশমত ভাগলপুরে ফিরিয়া যায়।

সিধু মাঝি এক দল সাঁওতাল লইয়া বীরভূমের সদর সিউড়ীর দিকে আসিয়াছিল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সকলেই ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেল। ডাক বন্ধ হইয়া গেল। দেওঘর হইতে সিউড়ীর ডাক লুট হইয়া গেল। ডাকবাহিক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একটি শালবৃক্ষেরশাখা লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাঁওতালেরা গ্রামকে গ্রাম পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। প্রায় ৩০টি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। বিদ্রোহীরা কাঁচা শস্য সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল। জমিদার মহাজনদের প্রাণ ত গেলই, উপরন্তু তাহাদের জন্য ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুও রেহাই পাইল না। এই সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ ও নারীর প্রাণ বিনষ্ট হইল। এতদঞ্চলে তখন সাহেবদের নীল ও রেশম ইত্যাদির অনেকগুলি ফ্যাক্টরী বা কুঠী ছিল। সেখান হইতে সাহেবরা প্রাণভয়ে নৌকাযোগে পলাইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিল। জমিদার প্রাণভয়ে পলাইয়া জল-মধ্যে আশ্রয় লইলেও, তাহার সর্ব্বশরীরে তীর বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। পরে জল হইতে তাহার মৃত দেহ উঠাইয়া পাথরে রাখিয়া চারি খণ্ডে কাটিয়া ফেলিল। কাটিবার সময় বলিল, এই জাড়ুই (শীতকালে দেয় সুদ), এই রোদাড়ী (রৌদ্র বা গ্রীষ্মকালে দেয় সুদ)। হতভাগ্য নারায়ণপুরের জমিদারকে বরাকর নদীতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে তাহার হাঁটু হইতে পা দুইটি কাটিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"এই চারিআনা" অর্থাৎ সিকিভাগ সুদ দেওয়া হইল। পরে কটিদেশ কাটিয়া ফেলিয়া ঐ ভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"এই আট আনা" অর্থাৎ অর্দ্ধেক সুদ দেওয়া হইল। তাহার পর বাহুযুগল কাটিয়া "বার আনা" অর্থাৎ বার আনা সুদ দেওয়া হইল। শেষে দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিয়াছিল—"ফরকতি" অর্থাৎ সুদ সম্পূর্ণরূপ পরিশোধ হইল। কুটিল মহাজনের কৃতকর্ম্মের উত্তেজনায় সাঁওতালগণ কর্তৃক যে ভীষণ নরহত্যার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে !

এমন সময় এই বিদ্রোহের কথা গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে মেজর ভিন্‌সেণ্ট জারভিসের সহিত এক দল সৈন্য নব-চালিত রেলপথে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রেরিত হইল। তারপর বৃষ্টিতে ভিজিয়া সৈন্যদল সিউড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রাবণ মাসের প্রথমেই গভর্ণমেণ্ট অত্যাচারীর প্রবল

প্রতাপের কথা শুনিয়া লয়েড জর্জ্জের সহিত আরও সৈন্য প্রেরণ করেন। হিন্দু মহাজনেরা ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করিল—সহযোগী কর্ম্মচারীরূপে কাজ করিতে লাগিল এবং সৈন্যদের রসদ বা খোরাকী যোগাইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের মহারাজা একদল শিক্ষিত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ষাকালে সৈন্য যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। সাঁওতালগণ শিক্ষিত সৈন্যদের সম্মুখীন হইতে পারিল না—ময়ূরাক্ষী নদীর অপর পারে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইল। সে সময় বর্ষাকাল নদীতে প্রখর স্রোত বহিতেছিল। ইংরাজেরা প্রথমতঃ বন্দুকেব ফাঁকা শব্দ করিল। সাঁওতালেরা তাহাতে সাহস পাইয়া তীর ছুড়িল; কিন্তু তীর বেশী দূর আসিল না। পরে যখন তাহারা নদী পার হইয়া আসিবার জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের উপর প্রচণ্ড গুলি-বৃষ্টি করা হইল। তাহাতে বহু সংখ্যক সাঁওতাল প্রাণ হারাইয়া নদীর বন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পলাইয়া গিয়া নিজেদের প্রাণ-রক্ষা করিল; আর কতকগুলি ইংরাজের হাতে ধরা পড়িল। প্রথমে কানুর ফাঁসি হয়। পরে সাদুকে তাহার গ্রামে ধরিয়া লইয়া গিয়া, বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও অপরাপর জাতির সম্মুখে পোটেণ্ট (Mr. Potent) সাহেব তাহার ফাঁসি দেন। অপরাপর সাঁওতালদিগকে সিউড়ীর দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দানে সর্ব্বজন-সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সাঁওতালগণ কলিকাতা গিয়া লাট সাহেবের নিকট তাহাদের কষ্টের প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহারা পদব্রজে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু অশিক্ষিত সাঁওতালগণ তাহাদের সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সমগ্র দেশব্যাপী যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল মাত্র। এই বিদ্রোহের ফলে 'সাঁওতাল পরগণা' সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জন্য ইংরাজগণ স্বতন্ত্র আইন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিয়াছেন। ১৮৫৫ সালের এই বিদ্রোহের পর আরও দুইবার এই সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত করা হয়। ১৮৫৫ সালে এই অত্যাচার ও উৎপাতের কথা অনেক গ্রাম্য কবি গান ও ছড়ার আকারে লিপিবদ্ধ করেন। নীচে নমুনা স্বরূপ এতদুপলক্ষে রচিত পল্লী-কবিদের একটি ছড়া বা গান প্রদত্ত হইল—

শুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে।
সুভ বাবুর (১) হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে॥
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজারে হাজার।
কখন এসে কখন লোটে থাকা হ'ল ভার॥
হলো সব দুর্ভাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে।
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোঁতে কখন নিবে এসে॥
বলে ভাই, রাখব কোথা, হেথা সেথা, এইকথা শুনি।
রাখতে মুলুক সলাসুলুক ভাবতেছে কোম্পানী॥
বেটাদের শক্তি শুনে, প্রজাগণে, কইছে ধীরে ধীরে।
জিনিষ ছেড়ে পালাওনা ভাই সবাই থেকো ঘরে॥
আমাদের আছে গোরা, সঙ্গীন চড়া, জামাজোড়া গায়।
বন্দুকেতে গুলি পোরা তুড়ুক সোয়ার তায়॥
বেটারা থাকে কোথা, সত্য কথা, সুধাই তোমাদেরে।
কেহ বলে দেখে এলাম ময়ূরাক্ষীর ধারে॥
আছে সব জড় হয়ে, পূর্ব্ব মুয়ে, তীর মারিছে গাছে।
কত শত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এসেছে॥
তীরে ফলা বনাতে (২) বরাত মতে, যখন যেমন কয়।
হাতে হাতে যোগায় ফলি পাছে টান হয়॥
বেটাদের পোষাক চড়া কপ্নী পরা, লইয়ে (৩) বেড়াবুকে।
ভাঁড়ের উপর পূজা করে কুক্ ছাড়িছে মুখে॥
আগেতে নাগরা পিটে, কাটে ছাটে, মদে মাসে ভরা।
প্রথমে বাঁশ কুলি দিয়ে পাড়লো গা যে ডেরা॥
দেখে সব লোক পালাছে, টোকা পেছে, লয়ে লাটাইথান।
কেহ বলে রাঁধা রইল বড় মাছের খান॥
বলে ভাই পালা পালা, এ কি জ্বালা, ক'রে কলরব।
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্তমুখো সব॥
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেলে সোজা।
সাদিপুরে লুটলে গিয়ে কাপড়ের বোঝা॥
যথা উচিত, বোচকা বেন্ধে, নিল কাঁধে, যত মনে ছিল।
রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষ্টেকে গেল॥
সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগড়া, অহর্নিশি পিটে।
খাবার বেলায় সাঁওতালদের মেয়েছেলে জোটে॥

(১) সুবাদার শব্দের অপভ্রংশ; এখানে সীদু কানু।
(২) প্রস্তুত করিতে। (৩) ঘরবোনা কাপড়।

বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়া মন্ত্রণা।
দু'দিন বাদে পোড়াইল গিয়া লাঙ্গলের থানা॥
এই কথা শুনে, সিপাইগণে, বন্দুক নিল হাতে।
দারগা মুন্সীর সহিত দেখা হইল পথে॥
মনেতে ভয় পেয়ে পশ্চিম মুয়ে (৪) অগ্নি গেল ফিরে।
পড়ের পুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে॥
যত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গি তালা, সব বার করিল।
মরা পেটে চড়া দিয়ে থিটন যে লইল॥
তখন সিপাইয়েরা, সঙ্গীন চড়া, কাপ্তান সহিত।
নদীর উপান্তে আসি হইল উপনীত॥
যত সব সিপাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে সার সার।
দেখে শুনে ময়ূরাক্ষী উভয়ে না হয় পার॥
তীর বর্ষা তৈয়ার আছে, আপন সাজে, রণনাইথ বাজে।
নদীর ধারে সাঁওতালেরা নাগরা বাজায় নাচে॥
সেখানে সাধ্য কার, পারাবার, দুকুল বহে বান।
হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিচে কাপ্তান॥
দেখিয়া বহুত সেনা, কি মন্ত্রণা, করে দুই জনে।
বন্দুক তৈয়ার রাখ কহে সিপাইগণে॥
দণ্ড পাঁচ ছয় পরে, কহে হাবিলদারে, সুবাদারের প্রতি।
নির্ণয় করিতে দূরবীন্ আন শীঘ্রগতি॥
ব'লে উঠল গজে, হাওদা মাঝে, নয়নে দূরবীণ।
ঝাড়ে ঝোড়ে (৫) আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন॥
কিছুদূর পিছা (৬) হাট, বলে ঝাট, সাহেব গেল চলে।
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালাও পালাও বলে॥
করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল নদীর জলে।
সাঁতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে॥
বলে সব মার মার, ধর ধর, এইমাত্র রব।
আজ সিউড়ী জেলা লুটবো গিয়ে করে পরাভব॥
যাব সব জেহেলখানা, দিব থানা, মুক্ত করব চোরে।
সুভা বাবু রাজা হবেন জজ সাহেবকে মেরে॥
আমরা ঘুচবো মাঝি, কাজের কাজি, মস্তব করবো বসে।
কৃষ্ণ সৌ'র দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব কসে॥
বলে শীঘ্রতর, আশু ধর, আর বিলম্ব কেনে।
কর্ম্মপাকে পড়ল সাঁওতাল সিপাইর মাঝখানে॥

(৪) মুখে। (৫) ঝোপ ঝাপে। (৬) পশ্চাৎ।

বেটারা তুচ্ছ জাতি, নাইথ বুদ্ধি, কিবা জানে টের।
আচম্বিতে হুকুম হাঁকে বলিয়া ফায়ের॥
আলি হুকুম পেয়ে সিপাহি যেয়ে, বন্দুক হাতে তোলে।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গুলি মারে এক এক কালে॥
যেমন তারা খসে, আসে পাশে, তেমনি গুলি ছুটে (৭)।
পৃষ্ঠেতে বাজিয়া (৮) কারু পার হইল পেটে॥
অন্য সাঁওতাল যত, কতশত, পলাইয়া গেল।
কুড়ি আট নয় সাঁওতাল তারা সেই দিনেতে মোল (৯)॥
তখন যত সাঁওতাল, করিয়া বিকল (১০) পিছে নাহি চায়।
সলাখ পাহাড়ে গিয়া সুভকে জানায়॥
শুনে সবে দুঃখ মনে, পরদিনে, কৈল একাকার।
জব্দী হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার॥
নাহিক মৃত্যুভয়, সদা রয়, ধেনুকেতে চড়া।
নগর (১১) মোকামে গিয়া বাজায় নাগেড়া॥
শুনে সব লোক পালাল, বিষম হ'ল, তামলী পুদ্দার।
সদ্গোপ গোয়ালা পালায় কাঁধে লয়ে ভার॥
পালায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাতে লয়ে লড়ি (১২)।
মুসলমান ফকীর পালায় মুখে পাকা দাড়ী॥
মুখেতে বলে আল্লা, বিশমোল্লা, এককি বেটাদের তীর।
এ বিপদে রক্ষা করহে সত্যপীর॥
বলে প্রাণ যায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল।
কালুসেখের মা কান্দে বলে আমার দুরগী কোথা গেল॥
যত সব মাথায় ঝুড়ি, কেঁথা ধুকড়ী (১৩) উর্দ্ধমুখে ধায়।
হোঁজট খেয়ে পড়ে কেহ গড়াগড়ি যায়॥
ঐ সাঁওতাল এল, সাঁওতাল, কাটলয়ে সাঁওতালে।
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে॥
তখন হৃষ্ট মনে, সাঁওতাল গণে রাজবাড়ী সোন্দায় (১৪)।
মানুষ কাটা পড়ল সেদিন কুড়ি দু' আড়াই॥
পরে সাঁওতালগণ হৃষ্টমন, দেয় টাঙ্গিতে শান।
লাও জোড়ে নাড়া বেটাকে দিল বলিদান॥
গেল কুমড়াবাদে, সকল ফৌজে, হইল একাকার।
ঘরে অগ্নি দিল বেটারা করিল ছারখার॥

(৭) নিক্ষেপ করে (৮) আঘাত লাগিয়া
(৯) মরিল। (১০) বিকলি, আর্ত্তনাদ।
(১১) বীরভূমের পুরাতন রাজধানী। (১২) ছড়ি।
(১৩) বোঝা। (১৪) চুপি চুপি প্রবেশ করে।

পোড়াইল ধানের গোলা, তিল জোল্লা (১৫) সরিসা আদি যত।
গরু মহিষ ছাগল ভেঁড়া পুড়ল কত শত ॥
পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, যেমতে পোড়ায়।
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতালে বেড়ায় ॥
ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাস, তার সঙ্গে জনা চারি।
সিউড়ী আসি জজের কাছে বল্‌ছে বিনয় করি ॥
আর ত প্রাণ বাঁচে না, কি মন্ত্রণা, করছেন হুজুর বসে।
ঘরকন্না পুড়িয়ে আমার ভাইকে কাটল শেষে ॥
শীঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ।
টাঙ্গীর চোটে মুলুক কেটে পতিত করলে বন ॥
সাহেব তুষ্ট মনে, সিপাইগণে, বলয়ে বচন।
অতি শীঘ্র যাও তোমরা কর গিয়ে রণ ॥
কথা শুনে তখন, যত সিপাইগণ, বন্দুক হাতে নিল।
রাতারাতি সিপাইগণ কুমড়াবাদকে গেল ॥
যুদ্ধ যেইমতে, বিস্তারিতে, হবে বহুক্ষণ।
আকাশের চাঁদ কোথা ধরয়ে বামন ॥
বেটারা ধনুক ধরে, তীর মারে, করে মার মার।
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার ॥
সাহেব হুকুম দিলে, ফায়ের বলে, শুনে সিপাইগণ।
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ ॥
অমনি ভাগেড়া (১৬) হায়, পূর্ব্ব মুলয়, পলাইয়া যায়।
পাট জোড় মোকামে আসি নাগেড়া বাজায় ॥
নাগেড়ার শব্দ শুনে, সর্ব্বজনে, পলায় সত্বরে।
জনা দশবার গড়ে সেইদিনেতে মরে ॥
লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্ছনা, করলে সাঁওতালে।
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে ॥
এমনি সর্ব্বস্তরে, লোট করে, বেড়ায় সাঁওতাল।
মনুষ্য কা কথা দেবতা পলান গোপাল ॥
ভাণ্ডিরবন ছেড়ে, পলান দৌড়ে, পূজারির মাথায়।
বীরসিংহের কালীমায়ের বলিহারি যায় ॥
বারশ বাষট্টি সাল, বর্ষাকাল, বানের বড় বৃদ্ধি।
আব্বারপুরে মানুষ কেটে করলে গাদাগাদি ॥
কাটলে বিষ্ণুপুরে, হরা তাঁতিরে, পিয়েশুলার মাঠে।
বিপিন গোপকে তিরিয়ে মারলে মুখুরের ঘাটে ॥

(১৫) ভুট্টা। (১৬) দলচ্যুত।

লুটিয়ে ফুলকুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, নাগড়াদের শেষে।
দেবুরায়কে তেড়ে ধর্ল্লে আখবাড়ীতে এসে ॥
পাছাতে দেয় বাড়ি, বস্ত্র কাড়ি, উলঙ্গ করিয়ে।
যাদুমাঝি চেস্তপ (১৭) ছিল তাই দিল ছাড়িয়ে ॥
ধর্ল্লে চল্যা মাঠে, পুখুর ঘাটে, দাসী গোয়ালিনী।
কাটের (১৮) ভিতরে মাগি হারাল পরাণি ॥
যত সব সাঁওতালগণে, কাটের মেহোমে যত মাটি ছিল।
ওখাড়িয়া সকল মাটি চাপাইয়া দিল ॥
পরে ধনুক ধরে, তার উপরে, নাচিতে লাগিল।
কুল্যাইপুরের ডাঙ্গালেতে সিপাই দেখতে পেল ॥
অগ্নি কোক্ ছাড়িয়ে, পশ্চিম মুয়ে, পলাইয়া গেল।
আলানচকের নন্দদাসের গরু ঘেরে নিল ॥
তখন নন্দদাস, করে হুতাশ, মাথায় ঘা মারে।
ব'লে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আস্‌ব ফিরে ॥
তখন বস্ত্র ছাড়ি, কপ্নি পরি, সাঁওতাল সাজিল।
চূণ গুখান পাতে ভরি কড়চে (১৯) গুঁজিল ॥
হাতে ধনুর্ব্বাণ, টাঙ্গীখান, কাঁধেতে লাগিয়ে।
সাঁওতালের বুলি (২০) জানি, এই সাহস করিয়ে ॥
সাঁওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে।
জল খাওয়াবার ছল করি আনিল ছাড়িয়ে ॥
রায় কৃষ্ণদাসে ভণে সংক্ষেপনে, কিছু লেখা হ'ল।
বিস্তার লিখিতে হ'লে অনেক বাহুল্য ॥
কায়স্থকুলে জন্ম মোর রায় কৃষ্ণদাস।
ফুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় যে নিবাস ॥
জেলা বীরভূম তাহে ননী পরগণা।
লাট রাম তাহে লাঙ্গলের থানা ॥
আমি ভাবি মনে, সাঁওতালগণে, রাখিল যে সুখ্যাতি।
যে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ত সত্যি ॥
কথা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, এই যে বিবরণ।
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ ॥
১২৬২ সাল, এই গোলমাল, বড় ভাবনা মনে।
ফুলকুড়ি লোট হয় ২৩শে শ্রাবণে ॥ (২১)

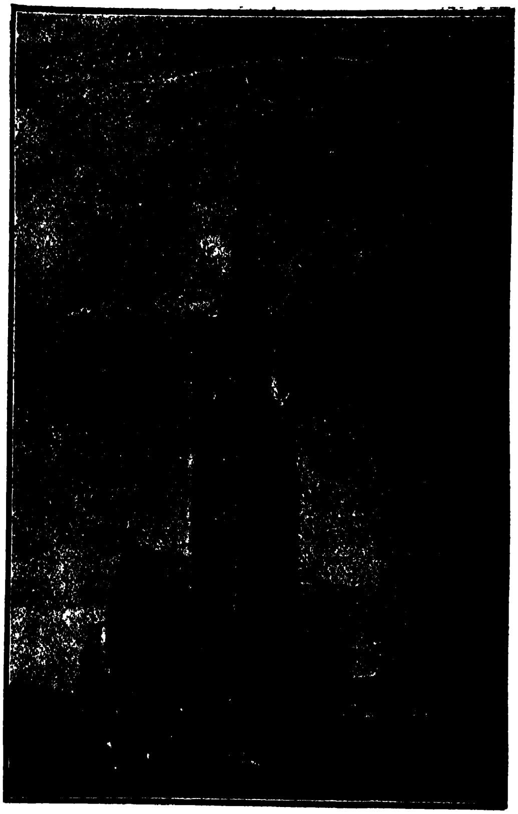
(১৭) পরিচ্ছদ। (১৮) মাঠে জল বাহির হইবার নর্দমা।
(১৯) টেঁকে। (২০) ভাষা।
(২১) বীরভূম "রতন"-লাইব্রেরী পুথি নং ২০৯৬

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র, বি-এস্‌সি, এফ্‌-সি-এস্ (লণ্ডন)

বৎসরাধিক পূর্ব্বে ব্রহ্ম-প্রবাসের কয়েকখানি চিত্র লইয়া 'ভারতবর্ষের' পাঠক-মণ্ডলীর চিত্তবিনোদনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলাম। সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল জানি না, তথাপি ব্রহ্মের নানাস্থানে ঘুরিয়া আবার কতকগুলি চিত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছি। এগুলি যে পাঠক-পাঠিকার বিশেষ মনোরঞ্জন করিবে সে আশা না করিলেও, লেখকের প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহারা একযোগে বিরক্ত বা বিমুখ না হইলেই লেখক তাঁহার শ্রম সার্থক মনে করিবেন।

রত্নগর্ভা ব্রহ্মভূমিতে কত কি যে লুকান রত্ন নিহিত আছে, এখনও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার সঠিক হিসাব-নিকাশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্রহ্মের খনিজ তৈল তন্মধ্যে অন্যতম। এই খনিজ পদার্থকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রসিদ্ধ নামটু সহর কয়েক বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইনাঙ্গং প্রাচীন সহর, তাহারও উৎপত্তি এইভাবে। ব্রহ্মদেশে সেখানেই নাকি প্রথম কেরোসিন তৈলের খনি আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানের নামানুসারে ব্রহ্ম ভাষায় কেরোসিন তৈলের "ইনান্—জি" নামকরণ হইয়াছে। ব্রহ্ম ভাষায় 'সি' (স্থান বিশেষে 'জি') অর্থে তৈল। বাণিজ্য-জগতে এই তৈলের খনিগুলি মহামূল্য রত্নের ন্যায়ই আদৃত। এই খনিগুলির অধিকারী সকলেই ইংরাজ; এবং ইণ্ডো-বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম (Indo-Burma Petroleum), বর্ম্মা অয়েল (Burma



রেঙ্গুনের ক্যাথিড্রাল গির্জ্জা



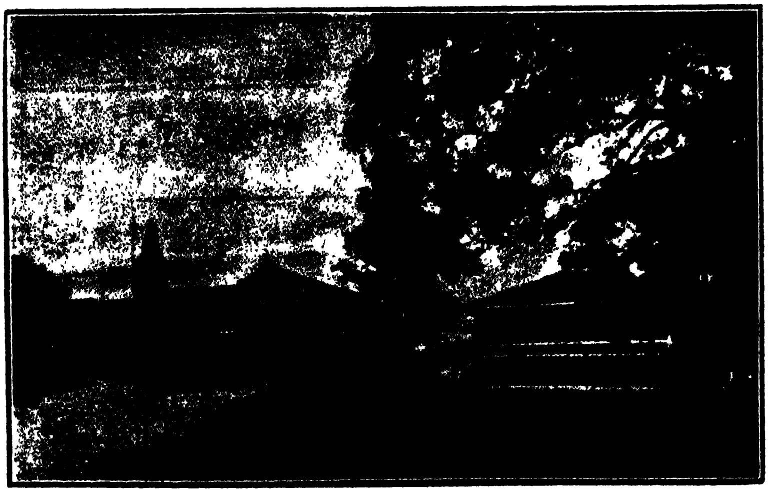
ইউরোপীয়ান বালিকা বিদ্যালয়—মেমিও

Oil) প্রভৃতি খ্যাতনামা খনিগুলি সবই ইঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত।

এই সব তৈলের খনি সমুদ্রকূল হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অপরিষ্কৃত তৈল প্রধানত: বহুক্রোশব্যাপী নলের মধ্য দিয়াই সমুদ্র উপকূলস্থ স্থানে নীত হয়। সেখানে উহা Refineryতে পরিষ্কৃত হইয়া পেট্রল, মোবিল অয়েল (mobile oil), ক্রুড অয়েল, কেরোসিন, ঔষধে ব্যবহৃত Liquid Paraffin, ভ্যাসেলিন, মোমবাতি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী সিরিয়াম (Syriam) সহরে এইরূপ অনেকগুলি Refinery আছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়ামে কোনও Refineryতে এই সব সুবৃহৎ তৈলের চৌবাচ্চায় আগুন লাগিয়া যে বিরাট দাবানলের সৃষ্টি হয়, তিন দিনেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।



ব্রহ্মের "জ্যা" পোয়ে

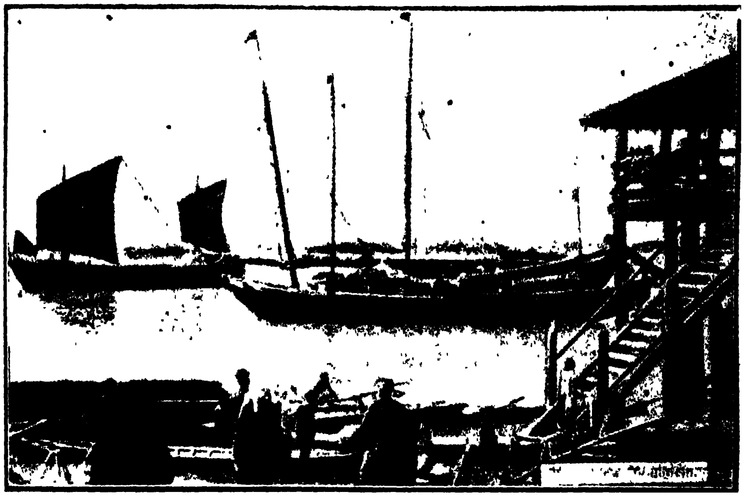


রেঙ্গুন কলেজ

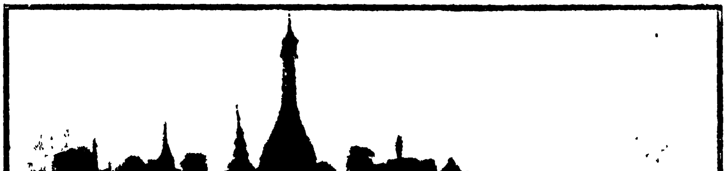
মৌলমিন ব্রহ্মদেশের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহা এই প্রদেশের অন্যতম বিখ্যাত নদী সেলুইনের (Salween) মোহানায় অবস্থিত। এই বন্দর হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল ও সেগুন কাঠ ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঠ জন্মায় বলিয়া কাঠ এখানে খুব সস্তা এবং প্রধানত: সেই কারণেই রন্ধন কার্য্যে সহরে কাঠ কয়লার বেশী প্রচলন। মৌলমিনে উৎকৃষ্ট কাঠ কয়লা তৈয়ারি হইয়া রেঙ্গুনে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। সাধারণত: ঐ কয়লা রেঙ্গুনে অন্যান্য কয়লা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। উহার বাজার-দর প্রতি মণ ২৲ হইতে ৩৲ টাকার মধ্যে।

ব্রহ্মদেশে "জ্যা পোয়ে" অর্থে জীবন্ত মানুষের নাচ-গান। আর ছবির নাচ-গান অর্থাৎ বায়স্কোপকে ব্রহ্মবাসীরা—"ইয়োসিন্ পোয়ে" বলে। ব্রহ্মের নাট্যোৎসবের নাম "পোয়ে"। ইহার

সহিত আমাদের দেশের খেমটা বা বাইনাচের কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে। এখানে প্রতি নগরে এমন কি পল্লীগ্রামেও কোন উৎসব উপলক্ষে পোয়ে নাচ হইয়া থাকে। উৎসব মাত্রেরই পোয়ে একটী প্রধান অঙ্গ। রঙ্গমঞ্চের ন্যায় কোন উচ্চ স্থানের উপর নাচগানের সহিত সামান্যরূপ অভিনয়—ইহাই এখানকার পোয়ে। অভিনয়ের ভঙ্গী অনেকটা আমাদের দেশের "তরজা"র ন্যায়। সে যাহাই হউক, পোয়ে এ দেশের লোকদের অতিশয় প্রিয় এবং সত্যই এই সব ব্রহ্মললনার নৃত্য-কৌশলে যথেষ্ট ব্যায়ামশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, বিদেশীয় কোন কোন গুণগ্রাহী রসজ্ঞ



নদীবক্ষের একটী দৃশ্য—মৌলমিন্ বন্দর



মৌলমিনের বিখ্যাত "চাই—তা—হাঁ" প্যাগোডা

লোকের চক্ষে এই সব নৃত্যশীলা ব্রহ্মবালাদের প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীর ভিতর ললিত-কলার সুন্দর অভিব্যক্তি বেশ ফুটিয়া উঠে। তবে সত্য কথা বলিতে কি, উহা কোন দিনই লেখকের মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই; পরন্তু উহার সহিত চতুষ্পদ জন্তুবিশেষের নৃত্যভঙ্গীর সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কলাবিদ্যায় লেখকের অনভিজ্ঞতাই সম্ভবতঃ উহার কারণ।

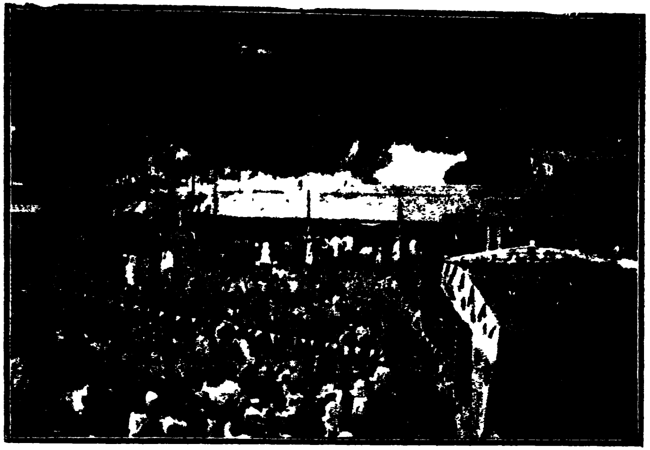
রেঙ্গুনের হারকোর্ট বাটলার স্বাস্থ্য-বিদ্যালয়টী এখানে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মের লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এবং গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার নামানুসারেই ইহার নাম-করণ। এই সুবৃহৎ এবং অত্যাবশ্যক বিদ্যামন্দিরটী কলিকাতার School of Tropical Medicine and Hygieneএর আদর্শে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও বর্ত্তমান সুযোগ্য পরিচালক (Director) মেজর জলি সাহেব (Major G. G. Jolly, C. I. E., M. B., Ch. B., D. P. H., D. T. M. and



স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী: পর দৃশ্য



সিরিয়াম তৈলাধার। (তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল।)



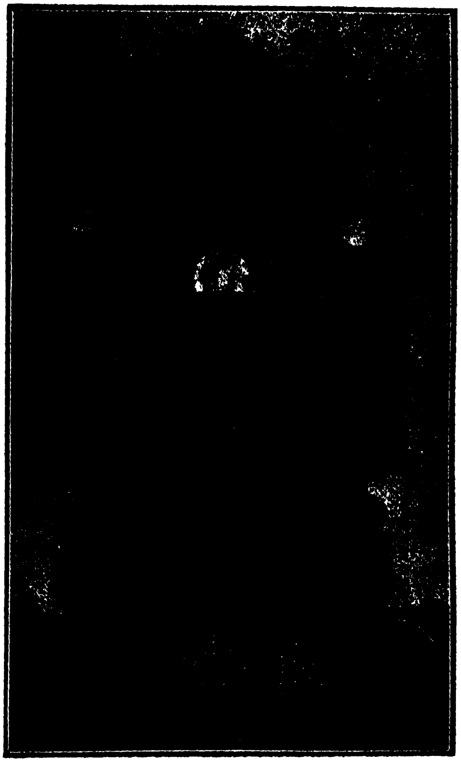
কার্ট ।টলার স্বাস্থ্য-বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর একটী দৃশ্য



প্রদর্শনীর অপরাংশ

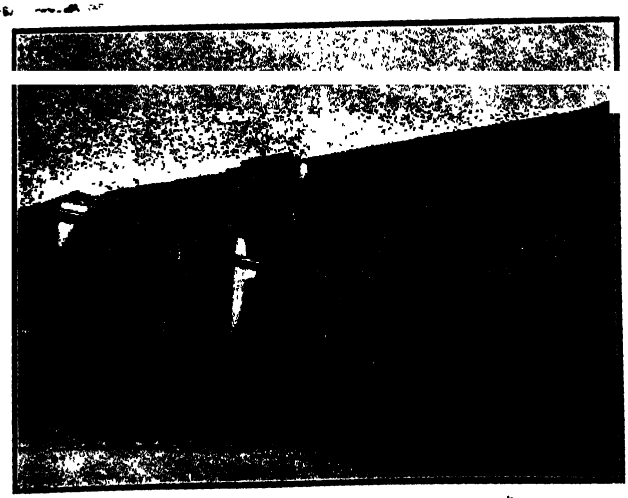


ব্রহ্মের অপ্সরা নর্ত্তকী



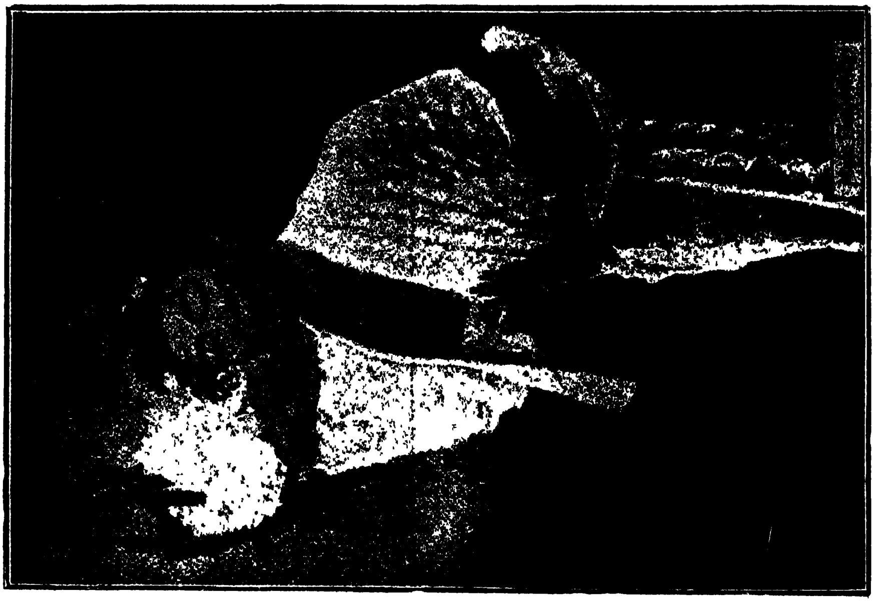
মোয়েবো যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন স্মৃতি

H., I. M. S.) স্বয়ং কলিকাতার School of Tropical Medicine and Hygiene এবং বিলাতের নানা-স্থানের ঐরূপ প্রতি-ষ্ঠানের নির্ম্মাণ-কৌশল ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারই ঐকা-ন্তিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বস্ত-তঃই উহা আজ ব্রহ্ম-দেশের একটী গর্ব্বের জিনিস হইয়াছে। উপস্থিত এই বিদ্যালয়ে Public Health Inspectorদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে D. T. M. এবং D. P. H. পরীক্ষার্থী ছাত্রদেরও শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।



হারকোট বাটলার স্বাস্থ্য-বিদ্যালয়—রেঙ্গুন

গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় রেঙ্গুনেও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর



ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—মা ধিন্ দে



ফ্রান্সের বিখ্যাত নর্তকী—মা সিন্ ড

অধিবেশন হইতেছে। গত দুই বৎসর উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ জুবিলী হলেই (ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৩৩) উক্ত প্রদর্শনী খোলা হইত; এ বৎসর নব-প্রতিষ্ঠিত "স্বাস্থ্য-বিদ্যালয়ে" উক্ত প্রদর্শনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং এবার উহা সাধারণের অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছিল। স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ যে এই প্রদর্শনীর ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উপকারিতা স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসীকে বুঝাইতে হইলে তাহাদের প্রদর্শনীতে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-কল্পে এখানে যে কয়েকটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে বিনামূল্যে পানীয় জল (সোডা, লেমনেড ইত্যাদি) বিতরণ তন্মধ্যে অন্যতম। মেলার সহিত নিয়মিত "পোয়ে" নাচের বন্দোবস্ত করাও অপর উপায়। ব্রহ্মবাসীদের নিকট 'পোয়ে' নাচ যে কত আদরের তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমোক্ত উপায়ের সহায়তাকল্পে সহৃদয় স্কট্ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকার জল বিতরণ করিতেছেন। অনেকে হয়ত শুধু মেলা ও পোয়ে দেখিয়া এবং এক বোতল লেমনেড বা আইস-ক্রিম পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই আসেন; কিন্তু প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিক একবার প্রদক্ষিণ করিলেই স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনও না কোনও জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁহাদের জানা হইয়া যায়। তাহার ফলে পর বৎসর আর তাঁহারা শুধু নাচ বা পানীয়ের আকর্ষণেই আসেন না; আরও কিছু জানিবার আগ্রহও সেই সঙ্গে লইয়া আসেন।



রেঙ্গুনের ঘোড়-দৌড়ের মাঠের প্রান্তে রেস-ষ্ট্যাণ্ড



উচ্চ স্থান হইতে রেঙ্গুনের সাধারণ দৃশ্য

পাণিগ্রহণ

শ্রীপ্রমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্ব্বতী যখন সত্যই পার্ব্বতীর রূপ নিয়ে দুলের ঘরে জন্মগ্রহণ কর্‌লে, তখন ইতর-ভদ্র সকলেই বেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

দুলেপাড়ার পিছন দিকের সীমানা যেখানে শেষ হবো-হবো হয়েছে, সেইখানে চারি ধারে বাঁশঝাড়-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীখানি ছিল দুকড়ি দুলের। সুন্দর তকৃতকে মেটে বাড়ীখানি নিকিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখাই ছিল দুকড়ির স্ত্রী কামিনীর কাজ। কিছু দূরের বড় রাস্তা থেকে একটা সরু পায়ে-চলা পথ বাঁশঝাড়ের বুক চিরে তাদের উঠানের বুকের উপর এসে পড়েছে। কামিনী সেই পথটিকে পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তো। দুলের মধ্যে তা'রা স্বামী-স্ত্রীই একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো।

দু'কড়ির কোন ছেলেপিলে ছিলো না। কিন্তু একদিন এক প্রভাতের আলোক জাগার সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতী তাদের ঘরে এসে জন্ম নিলে। মেয়ের রূপ দেখে তাদের আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌লো—বর্ষাকালের নদীর মত জীবনের দুকূল প্লাবিত হ'য়ে গেলো।

বামুনপাড়া থেকে যারা দেখ্‌তে এসেছিলো, তারা মেয়ে দেখে কামিনীকে বল্‌লে—ওরে, এ পার্ব্বতী শাপভ্রষ্টা হ'য়ে তোদের ঘরে এসেছেন। ওর পার্ব্বতী নাম রাখ্‌, আর কোনদিনও ভুলেও ওর অযত্ন করিস্‌নে।

কামিনী সদ্যপ্রসূত মেয়ের দিকে একবার চেয়ে আনন্দে ও লজ্জায় মৃদু হেসে উত্তর কর্‌লে—না মাঠা'ন, তা কর্‌বো না। তোমরা যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো। আশীর্ব্বাদ করো ও বেঁচে থাক্।

হিমালয় ও মেনকার কোলে পার্ব্বতী যেমন পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই দুকড়ি ও কামিনীর যত্নে পার্ব্বতীও বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। দু'কড়ি ও কামিনী প্রাণপণে মেয়ের আব্‌দার অত্যাচার সহ্য কর্‌তো; এক দিনের জন্যও মেয়ের ইচ্ছাকে কোথাও এতটুকুও বাধা দেয় নি, তা ন্যায়ই হোক, আর অন্যায়ই হোক। তা'র অত্যাচারে আব্‌দারে তা'রা আনন্দই পেতো বেশী। এ কথা তাদের মনে একদিনও হয়নি যে, তাদের মত ঘরের মেয়েকে অতখানি স্বাধীনচেতা ক'রে তুল্‌লে ফল কি রকম দাঁড়াবে। আর ফলাফল বোঝ্‌বার মত বিদ্যা-বুদ্ধিও তাদের ছিলো না; থাক্‌লে হয় তো সকল দিকে সামঞ্জস্য রেখে পার্ব্বতীকে মানুষ কর্‌তো। মরুভূমির মধ্যে যে গাছ আপন সৌন্দর্য্য নিয়ে জন্মায়, সকলেই তা'কে আনন্দ ও আশ্রয় ভেবে নিজের প্রাণ দিয়ে আগ্‌লায়। পার্ব্বতী দুলের ঘরে অপরূপ রূপ নিয়ে এসে জন্মে' দুকড়ি ও কামিনীর স্নেহের গণ্ডী ভেঙে দিলে। সুন্দর হ'য়ে না জন্মালে হয় তো তাদের স্নেহের একটা গণ্ডী থাক্‌তো। পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য তাদের স্নেহকে সীমাহীন ক'রে তুল্‌লে, আর সেই স্নেহের কাছে ভালোমন্দ বিচারশক্তি পরাজিত হ'লো। তাদের ঘরে যে-সব ছেলে-মেয়ে জন্মায়, সেগুলো নিতান্তই একঘেয়ে মামুলী ধরণের—কালো, খাঁদা, পেট-ডাগ্‌রা। এই দেখ্‌তেই তাদের চক্ষু অভ্যস্ত। কিন্তু কালো মেঘের কোলে বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পার্ব্বতী তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলে।

ক্রমে মেয়ের জন্যে দু'কড়িরা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ালো যে, সংসার তাদের অচল হ'য়ে উঠ্‌লো। তবু মেয়েকে কষ্ট দিতে পার্‌লে না। দু'কড়ি খেটেখুটে যা আন্‌তো, তা'র বেশীর ভাগই যেতো পার্ব্বতীর জামা-কাপড়ে। নিজেরা কোনো দিন একবেলা খেতো, কোন দিন উপোস করতো; কিন্তু তবু মেয়েকে এক দিনের জন্যেও বলে নি যে, তা'র কোনো আব্‌দার অন্যায়। তা'রা নিজের সমস্ত রস নিঃশেষ ক'রে পার্ব্বতীকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে লাগলো।

কেউ যদি কোনো দিন তাদের বল্‌তো—হ্যাঁরে, দুলের ঘরের মেয়ের অতো কেনো? যা রয় সয় তাই কর্।

দুকড়ি কামিনী হেসে বল্‌তো—তোমাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম ক'রে চালিয়ে মেয়েটাকে রেখে যেতে পার্‌লেই হয়। ওর আর কি-ই বা এমন বেশী কর্‌ছি। ইচ্ছে তো করে অনেক, কিন্তু অবস্থায় কুলোয় কই।

* * * *

এমনি ক'রেই বাধাহীন জীবন ফেনিয়ে তুলে, পার্ব্বতী নিজের সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় স্নান ক'রে বেড়ে উঠতে লাগলো। বাধাহীন জীবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে পার্ব্বতী বিয়ের বয়সে এসে পৌঁছলো। পার্ব্বতীর রূপের খ্যাতি পাঁচ ছ'খানা গ্রামে প্রচার হ'য়েছিলো। তা'র সম্বন্ধ আস্তে লাগলো। দুকড়ি কিন্তু সকলকে বিমুখ ক'রে ফিরিয়ে দিলে। সে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো। পাছে মেয়ের সাধারণ ঘরে বিয়ে দিলে মেয়ে কষ্ট পায়, এই ভেবে কোথাও সে বিয়ের মত কর্‌তে পার্‌ছিলো না।

শেষকালে একদিন হাসিমপুরের মতি ঢুলে নিজে এসে তা'র ছেলের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ের প্রস্তাব কর্‌লে। মতিকে দেখে দুকড়ি খুশী এবং ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কারণ হাসিমপুরে এবং আসে-পাশের গাঁয়েতে মতির বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থার একটু খ্যাতি ছিলো। তা'র চার পাঁচখানা লাঙল, গরু, জোত জমা প্রভৃতি বেশ-ই ছিলো। সেখানে পার্ব্বতী নিশ্চয় সুখে থাক্‌বে এই ভেবে দুকড়ি বিয়েতে সম্মতি দিলে। আর তা ছাড়া মতির ছেলে শ্রীপতিও দেখতে-শুন্‌তে মন্দ ছিলো না। কাজেই দুকড়ি সকল ভাবনার হাত থেকেই একরকম রেহাই পেলে।

সমস্ত ঠিক-ঠাক হ'য়ে যাবার পর একদিন শুভলগ্নে পার্ব্বতীর বিয়ে হ'য়ে গেলো।

পার্ব্বতী বিয়ে জিনিসটাকে ঠিক না বুঝে, বোঝা-না-বোঝার মধ্যের আনন্দে মেতে উঠ্‌লো। কিন্তু বিয়ের পরদিন যখন তা'কে পাল্‌কীতে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চড়িয়ে দিলে, অথচ তা'র বাপ মা কেউ সঙ্গে এলো না, তখন সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লো। শেষকালে বাধ্য হ'য়ে দুকড়িকে সঙ্গে যেতে হ'লো।

শ্বশুরবাড়ী এসে পার্ব্বতীর ইচ্ছা প্রথম বাধা পেলে। তাই সে-বাধা সে সহজ ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে না। কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে দিলে। এতদিন সে নিজের ইচ্ছাকে অপ্রতিহত ভাবে চালিয়ে এসেছে, আজ সেই ইচ্ছা এখানে এসে প্রতিহত হ'লো। পার্ব্বতী বিষম রেগে গেলো। যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান তা'কে পালন কর্‌তে হ'লো, সেগুলো সে নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্পন্ন কর্‌লে। এবার সে বেশী বিদ্রোহ কর্‌লে না; কারণ দুকড়ি তা'কে বুঝিয়েছিলো যে, মাত্র সাত দিন তা'কে এখানে থাক্‌তে হবে। তা'তেই সে ওর-ই ভিতর একটু চুপ ক'রে থাক্‌তে চেষ্টা করতো। কিন্তু সব সময় পার্‌তো না। এক এক সময় বোমার মত ফেটে উঠ্‌তো—সকলকে নাস্তানাবুদ ক'রে দিতো।

সেবারকার মত বাপের বাড়ী এসে পার্ব্বতী যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। আবার নিজের মনে বনে-বনে, পাড়ায়-পাড়ায় ইচ্ছামত খেলিয়ে বেড়াতে লাগলো। কোনো মুক্ত-প্রাণ জন্তুকে কিছুদিন বেঁধে রেখে, তার পর একদিন ছেড়ে দিলে সে যেমন কিছুক্ষণ উদ্দাম আনন্দ-গতিতে উড়ে দৌড়ে নিজের বন্ধন-মুক্তির আনন্দকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রাণ দিয়ে অনুভব করে, পার্ব্বতীও তেমনি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। দুকড়ি ও কামিনী যদিও বুঝ্‌তে পার্‌লে এ অন্যায়, তবুও বারণ কর্‌তে পার্‌লে না।

এমনি করেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবছর কেটে গেলো। পার্ব্বতীর আবার শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় এলো। পার্ব্বতীর বয়স যদিও এক বছর এগিয়ে গেলো, মন কিন্তু মোটেই এগুলো না।

তার পর একদিন পার্ব্বতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার তাকে নিজের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ীর গণ্ডীর ভিতর যেতে হ'লো। এবার পার্ব্বতীকে একলাই যেতে হ'লো এবং সেইটাই হ'লো আরও বিপদ। সে কেঁদে মাকে বল্‌লে—আমি ওদের কাউকে চিনিনে, কেমন ক'রে ওদের সঙ্গে থাক্‌বো।

কামিনী এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বিচ্ছেদ-কাতর কণ্ঠে বল্‌লে—ওরে, দুদিন কষ্ট ক'রে থাক্‌গে। ওরাই পরে তোর সবার চেয়ে আপনার হবে।

পার্ব্বতীর মন কিন্তু সে কথায় ভুল্‌লো না। সে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—ছাই হবে।

পার্ব্বতীকে সব কিছু পরিচিত ছেড়ে যেতে হ'লো। এখানে সে ছিল বনের পাখীর মত মুক্ত, স্বাধীন, চিরচঞ্চল, আনন্দের প্রস্রবণ। সদাই আনন্দের কল-কাকলীতে সকলকে ভরপুর ক'রে রাখতো। তার পর হঠাৎ একদিন এক নিষ্ঠুর ব্যাধ এসে তা'র সেই স্বাধীনতাটুকু হরণ কর্‌লে। তা'র সমস্ত আনন্দটুকু সে নিঃশেষে ব্যর্থ কর্‌তে চায়।

পার্ব্বতী অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ী এলো বটে, কিন্তু তা'কে বশ করা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রথম প্রথম পার্ব্বতীকে বিশেষ কিছু কর্‌তে হ'তো না। দিনগুলো এক-রকম ইচ্ছা

অনিচ্ছার ভিতর দিয়ে কেটে যেতো। তার পর মাসখানেক এমনি ক'রে কাটবার পর, তা'র উপর সংসারের খুঁটি-নাটি কাজের ভার পড়লো। তখন সে মরিয়া হ'য়ে তা'র ইচ্ছাকে অপ্রতিহত রাখবার চেষ্টায় লেগে গেলো।

সেদিন যখন তাঁকে একটা মাটির কলসী দিয়ে একলা জোর ক'রে জল আনতে পাঠিয়ে দিলে, পার্ব্বতী খানিক দূর এসে পথের মাঝে দুম ক'রে কলসীকে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে মুখ হাঁড়িপানা ক'রে ঘরে ফিরে এলো।

তা'কে খালি হাতে ফির্‌তে দেখে তা'র বড় ননদ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার কলসী কি হ'লো?

পার্ব্বতী গম্ভীর ভাবে উত্তর করলে—রাস্তায় ভেঙ্গে ফেলেছি।

—কেন?

—জল আমি কোনো দিনও আনিনি, আজও পারবো না, তাই ভেঙ্গে ফেলেছি। আমায় দিয়ে ও-কাজ হবে না।

যে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো, সে মূঢ়ের মত স্তব্ধ হ'য়ে তা'র মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পার্ব্বতী যতই যাই করুক, শ্রীপতি কিন্তু তাকে খুব ভালোবাস্‌তো। সৌন্দর্য্যের জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক তা'র ভালোবাসার গভীরতা ছিলো। শ্রীপতি ধীর, স্থির,—কোন দিন বেশী কথা কওয়া তা'র স্বভাব নয়। প্রতিদিন সকালে বাপের সঙ্গে মাঠে যেতো, বিকালে ফিরে আসতো। দিনের বেলায় পার্ব্বতীর সঙ্গে তা'র দেখা হ'তো না। সে সমস্ত দিন কাজের মধ্যেও উৎসুক হ'য়েথাক্‌তো—কখন গিয়ে পার্ব্বতীকে দেখবে।

পার্ব্বতী কিন্তু শ্রীপতিকে প্রতি পদে উপেক্ষা কর্‌তো। যদিও ভালোবাসা বোঝবার মত বয়স তা'র হয় নি, তবু সে শ্রীপতির আন্তরিকতার টানও বুঝতে চাইতো না। কত রাত্রে শ্রীপতি পার্ব্বতীকে তা'র আচরণ সংশোধন করবার জন্যে বুঝিয়েছে, সে গোঁ-ভরে চুপ ক'রে থেকেছে, নয় তো তা'র সঙ্গে এমন চীৎকার ক'রে ঝগড়া সুরু করেছে যে, বাধ্য হ'য়ে শ্রীপতিকে চুপ কর্‌তে হয়েছে। আবার শ্রীপতির চুপ ক'রে থাকাও পার্ব্বতী সহ্য কর্‌তে পার্‌তো না। তাতে যেন সে নিজেকে পরাজিত মনে কর্‌তো। শ্রীপতিকে আঁচড়ে কামড়ে পর্য্যন্ত দিতো। তাতেও শ্রীপতি কোনো কথা বল্‌তো না, শুধু হাস্‌তো। পার্ব্বতী তা'তে আরো জ্বলে যেতো। শ্রীপতি যদি তার সঙ্গে সমানে ঝগড়া কর্‌তো, তা হ'লে বোধ হয় সে কথঞ্চিৎ শান্ত হ'তে পার্‌তো।

সেদিন রাত্রে শ্রীপতি পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কলসী ভাঙ্‌লে কেন?

পার্ব্বতী মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বিরক্তির স্বরে বল্‌লে—আমার ইচ্ছে।

শ্রীপতি একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—ছিঃ, সব সময় কি নিজের ইচ্ছে খাটায়। জল আন্‌তে পারবে না বল্‌লেই পার্‌তে।

পার্ব্বতী শ্রীপতির দিকে ফিরে চোখ লাল ক'রে বল্‌লে—কতবার তো বলেছি যে ও-সব আমাকে দিয়ে হ'বে না, তা কি তোমরা শোনো!

শ্রীপতি বল্‌লে—আমাদের ঘরে সব কাজই তো সবাইকে কর্‌তে হয়, তুমি না করলে চল্‌বে কেন?

পার্ব্বতী ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে—আমি পার্‌বো না, তা'তে আমায় রাখ্‌তে হয় রাখো, না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এ কথা তো তোমাদের কতবার বলেছি। তোমাদের কি হায়া আছে।

শ্রীপতি পার্ব্বতীর মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে ধীর স্বরে বল্‌লে—থাক্‌তে পার্‌বে সেখানে গিয়ে?

পার্ব্বতী চীৎকার ক'রে বল্‌লে—ওগো, হাঁ, হাঁ, হাঁ,—কতবার বল্‌বো,—পার্‌বো, পার্‌বো, পার্‌বো। যেমন তুমি তেমনি তোমার বাপ,—পাঠিয়ে দেখো না, থাক্‌তে পারি কি না।

শ্রীপতি আহত হ'য়ে কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না, শুধু বল্‌লে—ছিঃ, ও-কথা বল্‌তে নেই।

* * * *

এমনি ক'রেই ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও অত্যাচার-অনাচারের ভিতর দিয়ে পার্ব্বতী এমন বয়সে এসে উপস্থিত হ'লো, যখন সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, সে একটা কিছু প্রিয়কে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, আর অন্য দিকে তা'র এই বাধাহীন মুক্ত ইচ্ছা সেই প্রিয়কে পেতে বাধা দিচ্ছে। এখন সে প্রতি কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছে, কোন্‌টা ন্যায় ও কোন্‌টা অন্যায়। তবু তা'র জন্মগত স্বাধীন ইচ্ছা প্রতি কর্ম্মে মনে সংকোচ এনে দিচ্ছে; কিছু কর্‌তে চাইলে বা পেতে ইচ্ছা কর্‌লে বাধা দিচ্ছে। এই ইচ্ছার বাধা এখন

তা'র অজ্ঞাতসারেই আস্‌ছিলো। ইচ্ছার কাছে মাথা নত কর্‌তে কোথায় যেন বাধা পেতো, আর সেই বাধার মূল খুঁজে পেতো না ব'লে তা'র কোনো সমস্যারই সমাধান হ'তো না। কাজেই এখন সে এমন একটা দোটানায় এসে পৌঁছলো, যেখান হ'তে সে এগুতেও পার্‌ছে না, পিছতেও পার্‌ছে না। এই অবস্থা তা'কে পীড়নও কর্‌ছিলো খুব, তবু সে এই ইচ্ছার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পার্‌ছিলো না। এখন কলের মত নিজের অজ্ঞানতে সব কাজ ক'রে যাচ্ছিলো এবং সংসারের সব কিছু হতে ক্রমশঃ পিছিয়েই পড়্‌ছিলো।

পার্ব্বতীর শ্বশুরবাড়ীর সকলেও ক্রমশঃ বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম প্রথম তা'র সৌন্দর্য্যের মোহে তা'কে কেউ কিছু বল্‌তো না। কিন্তু বারংবার তা'র অনিচ্ছার জিদ্‌কে ক্ষমা কর্‌বার মত ধৈর্য্য সৌন্দর্য্যের মোহে আটক রইলো না। এমন কি, মধ্যে মধ্যে সহিষ্ণু, পার্ব্বতীর-একান্ত-অনুরক্ত শ্রীপতিও নিজের অশিক্ষিত মনকে সংযত রাখ্‌তে পার্‌তো না। পার্ব্বতী সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলো। তবুও যে অদম্য ইচ্ছা তা'কে সমস্ত হ'তে অবুঝ ক'রে তুলেছিলো, তা'কে নিজের ইচ্ছাধীন কর্‌তে পার্‌ছিলো না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পার্ব্বতীর উপর ভার পড়েছিলো গরুর গোয়াল পরিষ্কার করবার ও গরুকে জাব দেবার। পার্ব্বতী ইদানীং মুখে কোন কাজের প্রতিবাদ কর্‌তো না। কারণ তা'তে বিশেষ ফল পেতো না। কিন্তু কাজে প্রতিবাদ সে কিছুতেই দমন কর্‌তে পারতো না।

গোয়ালে ঢুকে পার্ব্বতী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লে। পরে সমস্ত গরুগুলোকে খুলে গোয়াল থেকে তাড়িয়ে দিলে এবং আস্ত বিচুলী নাদাগুলোতে দিয়ে ঘড়া কতক জল ঢেলে দিলে।

সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীপতির বড় বোন গোয়ালে সাঁজাল দিতে এসে গোয়ালের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। তার পর চীৎকার ক'রে সকলকে পার্ব্বতীর কীর্ত্তি জানিয়ে দিলে।

পার্ব্বতী ঘরের ভিতর চুপ ক'রে ব'সে সব শুনছিলো। তা'কে তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে বোধ হয় নিজের এই কাজের ঠিক কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌তো না।

সেদিনকার ঘটনা বাড়ীর সকলের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম কর্‌লে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, এইটাই স্থির হ'লো।

শ্রীপতি মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে সব শুনে কাউকে কিছু না ব'লে বরাবর ঘরে এসে দেখ্‌লে, পার্ব্বতী চুপ ক'রে ব'সে রয়েছে। শ্রীপতি তা'কে কোন কথা না জিজ্ঞাসা ক'রে কঠোর স্বরে বল্‌লে—তোমার অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

পার্ব্বতী শ্রীপতির এমন স্বর ও ভঙ্গী আর কোনো দিনও শোনেনি বা দেখেনি। সে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে শ্রীপতির মুখের দিকে চাইলে। পরে চুপ ক'রে থাক্‌লে পাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হয় এইজন্যে সেও দৃঢ় স্বরে উত্তর কর্‌লে—আমিও তো তোমাদের অনেকদিন থেকে সহ্য কর্‌তে বারণ কর্‌ছি।

বেশ, তার ব্যবস্থা কর্‌ছি—ব'লে শ্রীপতি ঘর থেকে বের হ'য়ে গেলো।

আজ কে জানে কেনো পার্ব্বতীর কণ্ঠে কান্না উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। শ্রীপতি কোনোদিনই তা'র সম্বন্ধে বেশী কথা বলে না, আজও বলেনি,—তবু কেনো পার্ব্বতীর অন্তর কি একটা অহেতুক ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু প্রাণ খুলে কাঁদ্‌তেও পার্‌লে না, পাছে নিজেকে হেয় হ'তে হয় এই ভয়ে।

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীপতি পার্ব্বতীকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলো। পার্ব্বতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। দুকড়ি তা'র স্নেহপ্রবণ বাপের প্রাণ নিয়ে পার্ব্বতীর শ্বশুরবাড়ীর ব্যবহার বিচার কর্‌তো—কেনো তা'রা পার্ব্বতীকে যত্ন করে না। এখন পার্ব্বতীর আগমনে সেও যেনো নিশ্চিন্ত হ'লো।

পার্ব্বতী আবার সেই পূর্ব্বতন বাধাহীন জীবনের মধ্যে এসে পড়্‌লো; কিন্তু এবার যেনো সে প্রাণ-খোলা আনন্দের তীব্র আস্বাদ পেলে না। কি একটা অবুঝ বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা তা'কে খোঁচা দিতে লাগ্‌লো। জোর ক'রে সে এই সবকে উপেক্ষা কর্‌তে চাইতো; কিন্তু পার্‌তো না ব'লেই কিছুই যেন ভালো লাগতো না।

পার্ব্বতীকে বিদায় দিয়ে শ্রীপতিও সুস্থির হ'তে পার্‌লে না। মাসখানেক কোনো রকমে কাটিয়ে শেষে আর থাক্‌তে না পেরে, লুকিয়ে লুকিয়ে পার্ব্বতীকে দেখবার জন্যে পার্ব্বতীর বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। কোনদিন পার্ব্বতীর দেখা পেতো, কোনদিন পেতো না।

যেদিন পেতো সেদিন হয়তো পার্ব্বতী মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বিরক্তিভরে দ্রুত চ'লে যেতো। কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখাতেই শ্রীপতি অসীম তৃপ্তি পেতো।

এখানে এসে পার্ব্বতীও শ্রীপতির জন্যে যে ব্যাকুল হয় নি এমন নয়। দেখা হ'লে তা'র ইচ্ছে হ'তো শ্রীপতির সঙ্গে কথা কয়; কিন্তু পারতো না। তা'র অজান্তে বিরক্তি এসে মুখের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

দুকড়ি পার্ব্বতীর আবার নিকে দেবার যোগাড় দেখ্‌তে লাগলো। কিন্তু পার্ব্বতী দৃঢ়ভাবে অমত জানিয়ে সকলের বিস্ময় বাড়িয়ে দিলে।

ওদিকে শ্রীপতির নিকেরও যোগাড় চল্‌তে লাগলো। প্রথমে সে মত দেয়নি, শেষে কি ভেবে রাজী হ'লো।

পার্ব্বতী যখন শ্রীপতির নিকের খবর পেলে তখন তা'র প্রাণে কে যেন তা'র অজান্তে একটা খোঁচা দিল। সে কান্না আর চেপে রাখ্‌তে পারলে না। সকলের চোখ এড়িয়ে নির্জ্জনে গিয়ে আজ প্রাণ খুলে কেঁদে এতদিনের সকল গ্লানি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হ'তে মুক্ত হ'লো। মন হাল্‌কা হ'লে দুকড়িকে এসে বল্‌লে—আমি নিকে কর্‌বো।

নিকের দিন যত নিকট হ'য়ে আস্‌তে লাগলো, পার্ব্বতী তত মুষড়ে পড়তে লাগলো। অননুভূতপূর্ব্ব বেদনায় প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেদিন সকাল হ'তে দুর্য্যোগের অন্ত নেই;—যেমন ঝড়, তেমনি জল। দুকড়ির বাড়ীর পাশের বাঁশঝাড়গুলো আভূমি নত হ'য়ে আবার সজোরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনায় শ্বসছে। সন্ধ্যা হ'য়ে গেল তবু বিরাম নেই।

দুকড়ি ও কামিনী ঘরের ভিতর ছিলো। পার্ব্বতী তাদের নিষেধ না মেনে একলা অন্ধকারে দাওয়ায় ব'সেছিলো। দু'চোখে বাদলের ধারা ব'য়ে চলেছে, আর হৃদয়েও ঝড়ের অন্ত নেই।

হঠাৎ কার মৃদু সন্তর্পণ পদক্ষেপ পার্ব্বতীর কাণে এলো। ভাবলে, হয় তো শেয়াল কুকুর। কিন্তু বিশ্বাস হ'লো না,—এত দুর্য্যোগে কি তা'রা বের হয়? আবার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। পার্ব্বতী ভয়ে চীৎকার কর্‌বে কি, কি কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলো। লোকটা উঠানে এসে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ ঠিক সেই সময় আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কালো। পার্ব্বতী বিস্ময়ান্বিত হ'য়ে দেখ্‌লে, উঠানে শ্রীপতি। সর্ব্বাঙ্গ তা'র বাদলধারায় অভিষিক্ত, ঝড়ে বসন স্রস্ত।

পার্ব্বতীকে কে যেন তীব্র ধাক্কায় সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলে। কোথা হ'তে আনন্দের বান এসে তা'র হৃদয় প্লাবিত ক'রে দিলে। এই লোকটির আগমনই যেন সে প্রার্থনা করছিলো। তা'র মনে হ'লো যেনো আজ তা'র হৃদয়দেবতা ঝড় জল উপেক্ষা ক'রে তা'র হৃদয়ের ঝড়ের সমাধান করতে এসেছেন। তা'র প্রতি শ্রীপতির একনিষ্ঠতা পার্ব্বতীকে আজ সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে দিলে। সে এগিয়ে বৃষ্টির ভিতরই শ্রীপতির সামনে এসে দাঁড়ালো। তা'র কণ্ঠ থেকে কথা বের হ'লো না।

শ্রীপতি পার্ব্বতীর হাত দুটো চেপে ধ'রে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—তোমায় নিতে এসেছি, চলো।

পার্ব্বতী আজ প্রথম শ্রীপতির পায়ে অসীম ভক্তিতে আভূমি নত হ'য়ে প্রণাম কর্‌লে।

আহমদনগরের চাঁদবিবি

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ

যে সমস্ত পূতচরিত্রা, স্বদেশপ্রেমিকা ও পুণ্যবতী রমণীর কাহিনী ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, তাঁহাদের মধ্যে চাঁদবিবি অগ্রগণ্যা। মুসলমানদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠন-প্রথার প্রচলন সত্ত্বেও যে চাঁদবিবি, সুলতানা রিজিয়া ও নূরজাহান প্রভৃতির মত তেজস্বিনী ও রণনিপুণা নারী আমরা মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাই, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। চাঁদবিবির নাম সুলতানা রিজিয়া অথবা নূরজাহানের মত এত সুপরিচিত না হইলেও, তাঁহাকে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন প্রকারেই নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। যখন মোগল রাজকুমার মুরাদ আহমদনগর রাজ্য জয় করিয়া তাহা মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস করিতেছিলেন, তখন চাঁদবিবি যে অসীম বীরত্ব,

বুদ্ধিমত্তা, স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। সেই সময়ের নিজামশাহি রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন ঐ রাজ্যের অবস্থা কি ভয়ানক শোচনীয় ছিল! এক দিকে রাজ্যের ভিতরে ভীষণ অশান্তি, বিশৃঙ্খলতা ও যুদ্ধবিগ্রহ বর্ত্তমান ছিল, আবার অপর দিকে দিল্লী-সৈন্যদল আহমদনগর আক্রমণ করিল;—ভিতরে ও বাহিরে, চতুর্দ্দিকেই শত্রুর সমাবেশ হইল। যেন সমস্ত দিক হইতেই শত্রুগণ দলে দলে ভীষণ রাক্ষসের মত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া এই রাজ্যকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এইরূপ অবস্থাতেও একজন নারী অবিচলিত চিত্তে ও নির্ভীক হৃদয়ে কিরূপে প্রায় পাঁচ বৎসরকাল ইহাকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

এই তেজস্বিনী রমণী নিজামশাহি রাজবংশের তৃতীয় রাজা হোসেন শাহের কন্যা ছিলেন; এবং বিজাপুর রাজবংশের পঞ্চম রাজা আলি আদিল শাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিধবা হন; এবং তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার (আলি আদিল শাহের) ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ বিজাপুরের রাজা হন, তখন তিনি কিছুকাল সেই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করেন। পরে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আহমদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। ইহার প্রায় এগার বৎসর পরে (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) আহমদনগরের অষ্টম রাজা ইব্রাহিম নিজাম শাহ বিজাপুরের সহিত এক যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্যের ভিতরে মহা অশান্তি, বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হইল। ইব্রাহিম শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া চাঁদবিবি স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম শাহের মন্ত্রী মিয়ান মঞ্জু এবং আরও কয়েকজন আমীর বাহাদুরকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না এবং চাঁদবিবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। মিয়ান মঞ্জু আহমদ নামক এক ব্যক্তিকে নিজাম-শাহি-রাজবংশ-উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং বাহাদুরকে চাউন্দ্ দুর্গের ভিতরে আবদ্ধ করিলেন। চাঁদবিবিকেও রাজপ্রাসাদের ভিতরে প্রহরী-দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন যেন তাঁহার নিকটে কেহ যাতায়াত করিতে না পারে অথবা তাঁহার (মিয়ান মঞ্জুর) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ না পায়। অবশেষে মন্ত্রী চাঁদবিবির প্রাণবধ করিবারও সঙ্কল্প করিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আহমদ শাহ যে এই রাজবংশ উদ্ভূত নহে তাহা প্রতিপন্ন হওয়াতে, ইখ্লাস খাঁ প্রভৃতি অনেক আমীর, যাঁহারা পূর্ব্বে মিয়ান মঞ্জুকে সহায়তা করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ দর্শনে মিয়ান মঞ্জু তাঁহাদিগের উপরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার পুত্র মিয়ান হাসানকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু মিয়ান হাসান যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আহমদনগর দুর্গের ভিতরে পলায়ন করিলেন। পুত্রের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া পিতাও প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গের ভিতরে আশ্রয় লইলেন। ইখ্লাস খাঁ দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং মোতি শাহ নামে এক ব্যক্তিকে নিজামশাহি রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। মিয়ান মঞ্জু দুর্গের ভিতরে এইরূপভাবে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া অবশেষে শত্রু-ভয়ে নিতান্ত ভীত ও নিরুপায় হইয়া মোগল সম্রাট আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

সেই সময়ে আকবরও দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৫৯১ খৃষ্টাব্দে) খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন করিবার জন্য ইহাদের প্রত্যেক স্থানেই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন খান্দেশের রাজা আলি খাঁ ভিন্ন অপর কেহই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ইহার পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবারই কল্পনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সুযোগ পাইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার পুত্র মুরাদ মির্জ্জা ও আবদুর রহিম খাঁ খানানকে আহমদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরণ

করিলেন। কিন্তু মুরাদ আহমদনগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন ইখ্‌লাস খাঁ এইরূপভাবে মিয়ান মঞ্জুকে দুর্গের ভিতরে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মিয়ান মঞ্জুর সহিত যোগদান করিল। এক্ষণে মিয়ান মঞ্জু সাহসে নির্ভর করিয়া দুর্গের বাহিরে আগমন করিলেন; এবং ইখ্‌লাস খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মোতি শাহকে বন্দী করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মুরাদ মির্জ্জা ও আবদুর রহিম খাঁ খানান খান্দেশের রাজা আলি খাঁকে সঙ্গে করিয়া প্রায় ৩০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ আহমদনগরের নিকটে আগমন করিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

ইতিমধ্যে, মুরাদ দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া, মিয়ান মঞ্জু নিতান্ত ভীত ও অসহায় হইয়া পড়িলেন; এবং কেন যে তিনি মোগলদিগকে তাঁহার সহায়তার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া অনেক দুঃখ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মুজাহিদ্-উদ্দীন-শমসের খাঁ নামক একজন আমীর তাঁহাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য বলিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য প্রয়াসী না হইয়া এইরূপভাবে শত্রুসেনাকে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিবার ও দেশবাসীর উপরে অযথা অত্যাচার করিবার সুযোগ দিয়া পলায়ন করা নিতান্ত কাপুরুষতার কার্য্য।"

মিয়ান মঞ্জু উত্তর করিলেন, "শত্রুসেনা আমাদের অপেক্ষা অনেক প্রবল এবং তাহাদের তুলনায় আমরা নিতান্ত মুষ্টিমেয়; সুতরাং এই মুষ্টিমেয় সেনাসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য এবং তৎপরে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সাহায্যে মোগল সেনাকে পরাস্ত করিয়া দেশ উদ্ধারের প্রয়াসী হইব।"

এই বলিয়া তিনি শমসের খাঁকে আমির-উল্‌-ওমরাহ উপাধি দিয়া আহমদনগরের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন এবং আনসর খাঁ নামে আর একজন আমীরকে ইহার কোতয়াল পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজে বিজাপুরের উদ্দেশে রওনা হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ইখ্‌লাস খাঁ মোতি শাহ নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া একটী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এ দিকে আভঙ্গ খাঁ নামক আর একজন আমীর বুরহান্ নিজাম শাহের পুত্র মিয়ান শাহ আলিকে প্রকৃত রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া আর একটী দলের সৃষ্টি করিলেন এবং ভীদ্ নামক স্থানে একটী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

যখন আমীরগণ এইরূপে স্ব-স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রত্যেকেই এক একটী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী, কেহই স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য তেমন ব্যাকুল বা উৎকণ্ঠিত নন, তখন চাঁদবিবি স্বয়ং রাজ্যের ভিতরে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ও মোগলদিগের আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর হইলেন। তিনি একাকী নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সকলকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ও নিজামশাহি রাজবংশের মর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি তাঁহার নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিয়া শুধু এই কঠিন কর্ম্মব্রতই অবলম্বন করিলেন। বিপুল শত্রুসেনা দর্শনে তিনি কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইলেন না; বীরের মত নির্ভীক হৃদয়ে বিপুল মোগল সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমীরদিগকে আত্মকলহ ভুলিয়া স্বদেশ-রক্ষার্থ আহ্বান করিলেন। মহম্মদ খাঁ ও আফজল খাঁ নামক দুইজন আমীরকে আনসর খাঁর হস্ত হইতে আহমদ দুর্গ উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ খাঁও অতি অল্পদিনের ভিতরেই আনসর খাঁকে নিহত করিয়া আহমদনগর দুর্গ শত্রু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। মুজাহিদ-উদ্দীন-শমসেরও চাঁদবিবির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া রাজ্য-রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। চাঁদবিবির এইরূপ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শনে আভঙ্গ খাঁ, ব্যানকোজি কুলি ও সদৎ খাঁ প্রভৃতি আমীরগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির আশা জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মোগলবাহিনীকে রণে পরাজিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

যখন চাঁদবিবি এইরূপে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে

ব্যস্ত ছিলেন, তখন মুরাদ মির্জ্জাও আহমদনগরের নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। যাহাতে নিকটবর্ত্তী কোন নগরের অথবা গ্রামের অধিবাসীদিগের উপরে মোগল সেনাদল কোনপ্রকার অযথা অত্যাচার অথবা উৎপীড়ন করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি খাঁ খানানকে একদল সৈন্যসহ চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া আহমদনগর ও বুর্‌হানাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভীষণ অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিয়া এই সমস্ত স্থানগুলি প্রায় জনমানবহীন মরুভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিল।

ইহার পরে মুরাদ মির্জ্জা চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং সমস্তদিক হইতেই মোগলবাহিনী উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে তরঙ্গে মহোল্লাসে গভীর নিনাদ তুলিয়া দুর্গ অধিকারে প্রবৃত্ত হইল। অপরদিকে চাঁদবিবিও অমিততেজে মোগলবাহিনীর আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন ও ব্যান্‌কোজি কুলি ও সদৎ খাঁ দুর্গের বাহিরে থাকিয়া মোগলদিগের উপরে নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেন। এমন কি তাঁহারা মোগলদিগের যাতায়াতের পথও নিতান্ত বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিলেন। মুরাদ সৈয়দ রাজু নামে একজন আমীরকে ব্যান্‌কোজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই ব্যানকোজির হস্তে নিহত হইলেন। সেই সময়ে সৈয়দ আলম নামক একজন মোগল আমীর গুজরাট হইতে অনেক অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধের নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতেছিলেন; সদৎ খাঁ তাঁহাকেও নিহত করিয়া তাঁহার সমস্ত জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিলেন। অপরদিকে মুরাদ মির্জ্জা তাঁহার সমস্ত বলবিক্রম প্রয়োগ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না দেখিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। প্রতিদিন প্রত্যুষে কত আশা ও উদ্দীপনা লইয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু প্রতিদিন সায়ংকালে আবার ক্ষুণ্নমনে ও হতাশ হৃদয়ে আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ অনিশ্চিতভাবে আর কতদিন চলিবে! আবার তাঁহাদিগের নিজেদের মধ্যেও আত্মকলহের সূত্রপাত হইল। তাঁহার সহিত খাঁ খানানের কলহ ও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হওয়াতে, তাঁহাদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। খাঁ খানান দুর্গ অধিকার করিবার জন্য পূর্ব্বের মত ব্যস্ত না হইয়া অত্যন্ত শিথিলতা অবলম্বন করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, মিয়ান মঞ্জু বিজাপুরের উদ্দেশে রওনা হইয়াছিলেন। এখন তিনি সমস্ত বাদ-বিসংবাদ ও আত্মকলহে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলদিগের আক্রমণ হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন; এবং সাহায্যের জন্য বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের শরণাপন্ন হইলেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ নিজামশাহি রাজ্যকে এই ঘোর সঙ্কটকালে সহায়তা করাই ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন এবং প্রায় পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সুহাইল খাঁ নামক একজন আমীরের নেতৃত্বে আহমদনগরে প্রেরণ করিলেন। গোলকোণ্ডার সুলতানও আহমদনগরকে সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; তিনিও প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী ও কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য চাঁদবিবির নিকটে প্রেরণ করিলেন। এমন কি, ইখ্‌লাস খাঁও এক্ষণে অতীতের সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ভুলিয়া মিয়ান মঞ্জুর সহিত যোগদান করিয়া বৈরি-হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

এই বিপুল শত্রুসেনা আহমদনগরের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছে জানিতে পারিয়া মুরাদ মির্জ্জা আরও ভীত ও চিন্তিত হইলেন; এবং তাহারা আহমদনগরে আগমন করিবার পূর্ব্বেই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত খাঁ খানানের মনোমালিন্য হওয়াতে এবং অপরদিকে চাঁদবিবির সুপরিচালনায় ও অসীম বীরত্বে কোন প্রকারেই তিনি আহমদনগর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। একবার বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে দুর্গের প্রাচীরগাত্র কতকাংশ ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও দুর্গ অধিকার করা গেল না।

দুর্গের প্রাচীরগাত্র ভগ্ন হইতে দেখিয়া প্রথমে অনেকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নোদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু যখন চাঁদবিবি স্বয়ং নির্ভীক চিত্তে একটী নিষ্কোষিত অসি করে

ধারণ করিয়া শত্রুসেনার সম্মুখে অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিপুল বিক্রমে সেই ভগ্নস্থান রক্ষা করিবার জন্য মোগলবাহিনীর সহিত যুঝিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার এইরূপ অদম্য বিক্রম ও অসীম সাহস দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়া গেলেন; তাঁহাদিগের হৃদয়েও নূতন বলের সঞ্চার হইল। এইবার তাহারা সকলেই পলায়নে বিরত হইল এবং সকলেই মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জন্মভূমির জন্য সহাস্যবদনে বীরের মত শোণিত দান করিতে প্রস্তুত হইল। মোগলগণ বারিধারার ন্যায় তাহাদের উপরে অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, শত শত সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল না। সমস্তদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ চলিল; আহতের আর্ত্তনাদ, কামানের ভীষণ গর্জ্জন এবং রণভেরীর গম্ভীর নিনাদে সেই স্থানটী যেন পিশাচের ক্রীড়াভূমিরূপে পরিণত হইল। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুরাদ মির্জ্জারও সমস্ত আশা-ভরসা সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত কোথায় মিলাইয়া গেল। সেদিনকার মত যুদ্ধের অবসান হইল; কিন্তু দুর্গ অধিকার করা হইল না। অবশেষে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে ও হতাশ হৃদয়ে মুরাদ আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং চাঁদবিবিও সেই রাত্রেই আবার ভগ্নস্থান নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সংস্কার করিয়া ফেলিলেন।

আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত এইরূপে অবরোধ চলিল; কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে দুর্গের ভিতরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল; অথচ বাহির হইতে কোন জিনিস সরবরাহ হইবার কোন প্রকার আশা নাই। মিয়ান মঞ্জু ও সুহাইল খাঁ কবে আহমদনগরে আসিয়া পৌছিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। যদি তাঁহারা প্রচুর আহার্য্য সঙ্গে করিয়া শীঘ্র না পৌছান, তাহা হইলে সকলকেই অনাহারে ও অনশনে শত্রুর হস্তে নিপতিত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই সব চিন্তা করিয়া চাঁদবিবি অত্যন্ত ভীত ও নিরুপায় হইয়া পড়িলেন এবং এইরূপ ভয়ানক শোচনীয় অবস্থাতে পতিত হওয়া অপেক্ষা সন্ধি স্থাপন করাই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

অপরদিকে মোগলদিগেরও খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল। সময় মত সমস্ত জিনিসপত্রের সরবরাহ হইতেছে না। আবার যাহা হইতেছে, তাহাও অনেক সময়ে ব্যান্‌কোজি কুলি ও সদৎ খাঁ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সুতরাং একদিকে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, আবার অপর দিকে দুর্গ অধিকৃত হইবারও কোন আশা দেখা যাইতেছে না; কাজেই মুরাদও সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

যখন উভয় পক্ষই সন্ধি স্থাপনের জন্য এইরূপ ব্যস্ত, তখন আর বৃথা বিলম্ব হইবার কোন কারণ রহিল না। ফলে কয়েক দিনের ভিতরেই তাঁহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া গেল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে চাঁদবিবি বেরার প্রদেশ মোগল-দিগের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং মুরাদ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া বেরারের অভিমুখে গমন করিলেন।

কিন্তু এই সন্ধি স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরেই আবার নিজামশাহি রাজ্যের ভিতরে ভীষণ কলহ, ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূতনভাবে আরম্ভ হইল। মুরাদ আহমদনগর পরিত্যাগ করিবার তিন দিন পরেই মিয়ান মঞ্জু ও ইখ্‌লাস্ খাঁ প্রভৃতি বিজাপুরের ও গোলকোণ্ডার সৈন্যসহ সেখানে আসিয়া পৌছিলেন; এবং মোগলগণ সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে দেখিতে পাইয়া আবার তাঁহারা তাঁহাদের ঝগড়া ও কলহ নূতন আকারে আরম্ভ করিলেন। মিয়ান মঞ্জু এক্ষণে পুনরায় আহমদশাহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন এবং চাঁদবিবির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। চাঁদবিবি অনন্যোপায় হইয়া ইব্রাহিম আদিল শাহের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং ইব্রাহিম শাহও তাঁহাদের কলহের মীমাংসা করিবার জন্য মুস্তাফা খাঁ নামে একজন আমীরকে আহমদনগরে প্রেরণ করিলেন ও মিয়ান মঞ্জুকে কলহ হইতে বিরত হইয়া বিজাপুরে গমন করিবার জন্য আদেশ করিলেন;—সেখানে গমন করিলে তিনি আহমদ শাহের বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ লইবেন যে তিনি নিজামশাহি রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না; এবং যদি তিনিই প্রকৃত রাজা বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন, নচেৎ নয়। মিয়ান মঞ্জু তাঁহার আদেশানুসারে যুদ্ধে বিরত হইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন; কিন্তু সেখানে আহমদশাহ নিজামশাহি রাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন না হওয়াতে, তিনি আর আহমদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া বিজাপুর সুলতানের অধীনে একটী উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন সেখানেই

অভিবাহন করেন। আহমদশাহও সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে চাঁদবিবি বাহাদুরকে পুনরায় আহমদনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহম্মদ খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে তাঁহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না; এই মন্ত্রী মহম্মদ খাঁও আবার ঝগড়া ও কলহের সূত্রপাত করিলেন। অল্পদিনের ভিতরে তিনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন এবং কোন কার্য্যে মতামতের জন্য বাহাদুর শাহ অথবা চাঁদবিবির প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি এমন ভাবে চলিতে লাগিলেন, যেন তিনিই নিজামশাহি রাজ্যের সুলতান। তিনি প্রত্যেক কার্য্যে চাঁদবিবির বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আভঙ্গ খাঁ ও শমসের খাঁ প্রভৃতি আমীর-দিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার নিজের আত্মীয়স্বজনকে রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন তিনি এইরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বশীভূত করা অথবা তাঁহাকে মন্ত্রীপদ হইতে বিচ্যুত করা চাঁদবিবির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া আবার বিজাপুর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং ইব্রাহিম আদিল শাহ পুনরায় সুহাইল খাঁকে আহমদনগরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহম্মদ খাঁ তাঁহার গতিরোধ করিয়া তাঁহার আহমদনগর দুর্গের ভিতরে আগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং সুহাইল খাঁও বাধ্য হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং প্রায় ৪ মাসকালব্যাপী অবরোধ চলিল। অবশেষে মহম্মদ খাঁ নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায় হইয়া মোগলদিগকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন। মহম্মদ খাঁ এইরূপে পুনরায় মোগলদিগকে নিজামশাহি রাজ্য আক্রমণ করিতে আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া প্রায় সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং অচিরেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া চাঁদবিবির নিকটে প্রেরণ করিল।

তখন মুরাদ মির্জ্জা ও খাঁ খানান বেরারে অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং মহম্মদ খাঁর আহ্বানে আর বৃথা সময়াতিপাত না করিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আহমদনগরের বিরুদ্ধে রওনা হইলেন।

চাঁদবিবি এই সংবাদ পাইয়া আবার গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর সুলতানের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং তাঁহারাও প্রত্যেকেই কয়েক হাজার সৈন্য আহমদনগরের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। সুহাইল খাঁ এই বিপুল সেনাসহ মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রস্থান করিলেন এবং গোদাবরীর তীরে সুপ (Supa) নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে মোগলদিগের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী দুই দিবস সেই স্থানে উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হইল; কিন্তু অবশেষে জয়শ্রী মোগল পক্ষেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন; সুহাইল খাঁ রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। এবার মুরাদ আহমদনগরের বিরুদ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে খাঁ খানানের সহিত এই বিষয়ে তাঁহার মতভেদ হওয়াতে, তখন আর তাঁহার সেইদিকে যাওয়া হইল না এবং অন্যান্য অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি খাঁ খানানের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতা সম্রাট্ আকবরের নিকটে তাঁহাকে (খাঁ খানানকে) দাক্ষিণাত্যের সেনাধ্যক্ষ পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপর একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন এবং আকবরও তাঁহার কথামত খাঁ খানানকে দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করিয়া আবুল ফজলকে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন।

আরও দুই বৎসরের অধিককাল আহমদনগরের সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ চলিল; কিন্তু আহমদনগর জয়ের আশা তখনও সুদূর পরাহত রহিল। অবশেষে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মুরাদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সম্রাট্ আকবর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ডেনিয়েলকে খাঁ খানানের সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন এবং কিছুদিন পরে তিনি নিজেও সেখানে গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে খান্দেশের রাজা মিরান বাহাদুর (আলি খাঁ সুপের যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মিরান বাহাদুর খান্দেশের রাজা হন) মোগলদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। আকবর স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং ডেনিয়েল ও খাঁ খানানকে আহমদনগর জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

অপর দিকে আহমদনগরে আবার কলহ ও ষড়যন্ত্র অবাধে চলিতে লাগিল। চাঁদবিবি সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ও

জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দরিয়াও মাতৃভূমিকে মোগলের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজ্যের সকলেই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাকুল। কেহ বা আত্মগরিমায় ও দাম্ভিকতায় আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে, আবার কেহ বা ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে,—তিনি একাকী কি করিতে পারেন? একজনের পর আর একজন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল; কিন্তু তথাপি তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। তিনি অবিচলিত চিত্তে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অবশেষে হামিদ খাঁ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল।

হায়! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? তিনি দেশের জন্য কিরূপভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না, তাই তাঁহার পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল। আর তাঁহার অপেক্ষা শোচনীয় হইল নিজামশাহি রাজবংশের অবস্থা। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই মোগলসেনা আহমদনগর অধিকার করিয়া বাহাদুর শাহ ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই চিরকালের জন্য বন্দী করিল (আগষ্ট, ১৬০০ খৃঃ অঃ)। মোগলেরা বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া বাহাদুর ও অন্যান্য সকলকে লইয়া আহমদনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাহাদুর একবার বিষণ্ণ নয়নে চিরকালের জন্য আহমদনগর নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন; পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করা হইল।

কিন্তু এইখানেই আহমদনগর রাজ্য একেবারে লোপ পাইল না; যদিও বেরার, আহমদনগর প্রভৃতি স্থানগুলি মোগলদিগের হস্তগত হইল, তথাপি তখনও এই রাজ্যের অনেকগুলি স্থান সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল এবং আরও ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তাহারা তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গাল্‌সোয়ার্দ্দি

গাল্‌সোয়ার্দ্দির 'The Mob' বা 'ইতর সাধারণ' নাটকখানি তেমন লোকপ্রিয় হ'তে পারেনি, কারণ এ নাটকখানির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর যে আদর্শ খাড়া করে' তুলবার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে প্রাণের সহজ স্ফূর্ত্তি নেই।

ষ্টিফেন্ মোর এই নাটকের নায়ক। তাঁরই একান্ত অনুগত অনুচরবর্গ একদিন তাদের এই চাঁই বা গুরুকে অবিশ্বাস ক'রে হত্যা করেছিল এবং পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে তারা ষ্টিফেন্ মোরের এক মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল!

এই নাটকখানির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হ'চ্ছে যেখানে উন্মত্ত জনতা তাদের নেতা ষ্টিফেন মোরকে আক্রমণ করে। মোরের মৃত্যু-দৃশ্যও অতি চমৎকার অঙ্কিত হয়েছে। জনতার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে গাল্‌সোয়ার্দ্দির সমকক্ষ নাট্যকার বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না!

'A. Bit o' Love' বা "একটুখানি ভালবাসা' গাল্‌সোয়ার্দ্দির আর একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। নাট্যোক্ত স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে এই নাটকে স্থানমাহাত্ম্যটাই সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'ডেভন শায়ার' গ্রামখানি যেন এই নাটকের একটা প্রধান অঙ্গ! এই গ্রামের নানা চরিত্রের লোক তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের চেয়ে 'ডেভন্ শায়ার' গ্রামের বিশেষত্বটাই যেন বেশী করে প্রকাশ করেছে। আমরা দেখতে পাই এ গ্রামখানি যেমনি কঠোর, তেমনি মধুর! যেমনি নির্ব্বোধ তেমনি গোঁয়ার! মাকড়সার জালের মতো অল্প বাতাসেই নড়ে ওঠে, আকাশে-উড়ে-যাওয়া বলাকা-শ্রেণীর মতো চঞ্চল এদের গতি! এক কথায় গ্রামখানি বেশ হুজুগে!

গাল্‌সোয়ার্দ্দি এই নাটকে এইটেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে—স্থানের প্রভাব মানুষের মনের উপর কতখানি শক্তি বিস্তার করে! এই নাটকের নায়ক হ'চ্ছেন মাইকেল ষ্ট্রাণ্ডওয়ে! গ্রামের ইনি ধর্ম্ম-যাজক পুরোহিত। অতি সজ্জন লোক। স্বভাবটি এঁর বড় মধুর। ইনি বাঁশী বাজিয়ে গান করেন। পশুপক্ষীর প্রতি এঁর অপরিসীম মায়া। ইনি ধর্ম্মমূলক নাটকাভিনয়েরও আয়োজন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি 'সেণ্ট্‌ ফ্রান্সিস্‌' তুল্য মহাত্মা, অথচ এঁর চরিত্রে ফ্র্যান্সিস্‌কান্‌দের স্বভাবগত রূঢ়তা বিন্দুমাত্রও নেই।

মাইকেলের স্ত্রী কিন্তু স্বামীর পরিবর্ত্তে অন্য একজনকে ভালবেসেছিল; এবং পাছে তার প্রেমাস্পদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি গুপ্ত প্রেমের কলঙ্ক প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয় সেই জন্য তিনি প্রকাশ্য আদালতে মাইকেল যাতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা না আনেন এই মর্ম্মে স্বামীর কাছে কাতরভাবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছিল। সদাশয় মহামতি মাইকেল তাঁর পথভ্রষ্টা পত্নীর এই করুণ আবেদন গ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের গেজেট্‌ একটি মেয়ে এ ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। মাইকেল একবার এই মেয়েটির বড় আদরের একটি পোষা-পাখীকে পিঞ্জরমুক্ত ক'রে আবার আকাশের কোলে বনের বুকে তাকে ফিরে যাবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই মেয়েটির মাইকেলের উপর একটা ভীষণ আক্রোশ ছিল। কাজে কাজেই তার মুখ থেকে এ কথা দেখতে দেখতে সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল! সারা গ্রাম এই মূঢ় ধর্ম্মযাজকের প্রতি ঘৃণায় বিমুখ হ'য়ে উঠল।

তারপর ব্যাপারটা একেবারে চরমে গিয়ে দাঁড়াল' যদিন একটা হোটেলের পানশালাতে একজন লোক এই যাজী সাহেবের পত্নীর গুপ্তপ্রেমের কাহিনী ব'লতে ব'লতে মাইকেলের স্ত্রীর সম্বন্ধে দু'এক'া কটু মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফল্‌লে। মাইকেল স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য স্ত্রীর মর্য্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্নকারী সেই মত্তপায়ীকে বেশ দু' ঘা' উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলেন। মাইকেল এই কাণ্ড করাতে সমস্ত গ্রাম একেবারে ক্ষেপে উঠল তাঁর বিরুদ্ধে! য কথা তারা এতদিন চুপি চুপি নিঃসাড়ে আলোচনা করতো, সেই প্রসঙ্গ আজ প্রকাশ্য ভাবে সকলের মুখেমুখে ফিরতে লাগল! গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁকে একঘ'রে করে রাখলে এবং পথে ঘাটে বিদ্রূপ করতে লাগল।

মাইকেলের পক্ষে এ সব ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। প্রতিদিন আর এ অপমান সইতে না পেরে—নিদারুণ মনঃক্ষোভে এবং নিজের জীবনের অসীম রিক্ততায় উত্যক্ত হ'য়ে মাইকেল যেদিন যে মুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হ'ল, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে একটি শিশু এসে তাকে এই পাপ থেকে রক্ষা করলে "একটুখানি ভালবাসা" দেবার লোভ দেখিয়ে!

এই হ'ল নাটকের আখ্যানভাগ। বলাই বাহুল্য যে, এর রচনাভঙ্গী এত সুন্দর যে পড়তে পড়তে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না। না জানি এর অভিনয় আরও কত সুন্দর হয়। নৃত্যগীতে, হাস্য-পরিহাসে এবং মর্ম্মস্পর্শী করুণ কোমলতায় এই নাটকের এক একটি দৃশ্য যেন রংমশালের আলোর মতো রঙীন ও উজ্জ্বল!

এর পর গাল্‌সোয়ার্দ্দির আর দুখানি নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"The Pigeon" ও "The Little Dream" শেষোক্ত খানিকে একটি রূপক নাট্য এবং প্রথম খানিকে একটি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন বলা চলতে পারে। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তিনটি অধঃপতিত পথভ্রষ্ট জীবনের শোচনীয় কাহিনী এবং তাদের উদ্ধার করবার জন্য যারা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তাদেরই অকৃতকার্য্যতার কথা এই নাটকে আছে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রাণীর মধ্যে টিমশন্‌ ছিল দুর্দ্দান্ত মাতাল, শ্রীমতী মেগান ছিল দুনিয়ার লোকের প্রণয়িনী। সে এত আমুদে আর এমন স্ফূর্ত্তিবাজ মেয়ে যে, জলে ডুবে মরতে ব'সেছে যখন—তখনও তার নাচবার ইচ্ছে হ'চ্ছে! আর ছিল ফেরাণ্ড, সে এক হতভাগা ভবঘুরে! যত উল্টো রকম সব দার্শনিক মতবাদ ছিল তার। এরা তিন জনেই একেবারে উদ্ভট চরিত্রের লোক। এদের জীবনের অন্ধকার দিকটা,—যেটা মানুষকে দুঃখে ও সমবেদনার কাতর ক'রে তোলে গাল্‌সোয়ার্দ্দি সেটাকে হাসি তামাসা ও রঙ্গ রসের পর্দ্দার অন্তরালে এমন অস্পষ্ট ক'রে রেখেছেন যে সেদিকটার কথা লোকের আর মনেই পড়ে না!

"The Little Dream" নাটকখানিতে প্রাণের তেজ ও আনন্দের সন্ধানে আত্মার অজ্ঞাত লোকে বিচরণের ব্যাপারটা

'রূপকের' ভিতর দিয়ে ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন। শীলচে একটি পার্ব্বত্য বালিকা—সে দু'জনার বাঁশীর ডাক শুনেছে। একটি 'সুরার বেণু' (Wine Horn) অর্থাৎ জগতের ডাক—শহরের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-লালসার মধ্যে নিয়ে যাবার জন্ম ; আর একটি 'ধেনুর বেণু' (Cow Horn) অর্থাৎ তার সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য গৃহের অনাবিল আনন্দের মধ্যেই ভুলে থাকবার আহ্বান ! কিন্তু এই দুই বিভিন্ন ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিণাম প্রায় একই রকম ! মোহ কেটে যাবার পর সেই অতৃপ্তির বেদনা ও অনুতাপের জ্বালা ! এই সময় কেবল একমাত্র 'গুরু বেণুর' (Great Horn) সুরই পিছন হ'তে এমন একটা কিছুর সন্ধান জানায় যেটা সব চেয়ে শ্রেয় ও সুন্দর !

এই নাটকখানি থেকে গালসোয়ার্দ্দির অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতো সুললিত ভাষার সম্পদ অতি অল্প লেখকের মধ্যেই আছে। সুমধুর ও প্রাণস্পর্শী শব্দ-যোজনায় গালসোয়ার্দ্দি একেবারে সিদ্ধহস্ত। গীতি-কবিতায় তাঁর অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার বিকাশ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে সে বইখানি পড়লে তাঁকে কবি বলে যতটা না জানতে পারা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রে তাঁর কবি-পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর গীত-কবিতা ও একাধিক নাটকের মধ্যে !

ঔপন্যাসিক হিসাবেও গালসোয়ার্দ্দির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তবে নাট্যকার হিসাবে তিনি যতটা যশস্বী হ'য়েছেন ঔপন্যাসিক হিসাবে ঠিক ততটা প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেন নি। সামাজিক সমস্যা, নীতিবিধান, রাষ্ট্রীয়তত্ত্ব ও লোকরহস্য প্রভৃতি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ থাকায় তাঁর নাটকগুলি এত আদর পেয়েছে ঠিক সেই সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকার জন্যই তাঁর উপন্যাস জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়নি! যেসব জিনিস নাটকের উপযোগী তাকে উপন্যাসের মালমশলা স্বরূপ ব্যবহার করলে যে কৃতকার্য্য হ'তে পারা যায় না, তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই গালসোয়ার্দ্দির উপন্যাসের জনরঞ্জনের অক্ষমতা ! অথচ রচনা হিসাবে তাঁর উপন্যাস অতুলনীয়ও বলা যেতে পারে।

যে উপন্যাস পড়'তে ব'সে মাথা ঘামাতে হয়, যা অনায়াসে গিয়ে অন্তরকে স্পর্শ করে না, হৃদয় দিয়ে যাকে অনুভব করা যায় না, কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারাই যা বোধগম্য, তা কোনও দিনই সেই গ্রন্থ-বর্ণিত বাস্তব জীবনের চিত্রগুলিকে সজীব ও প্রাণস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে না। মানব হৃদয় আকৃষ্ট করতে পারে এমন কিছু পদার্থ না থাকলে সে উপন্যাস প্রায় অপদার্থ বলেই গণ্য হয়! সেই জন্য ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে তাঁর বর্ণিত আখ্যায়িকার চরিত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব জীবন্ত করে সৃষ্টি করা! নাটকে যেমন ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই নাট্যকারের একটা প্রধান কাজ, উপন্যাসে তেমনি ঘটনাকে সম্ভাব্য সত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখতে পারলে তা একেবারেই অবাস্তব হ'য়ে ওঠে! উপন্যাসে আরও একটা বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার যে, বর্ণিত চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক নির্দ্দোষ হ'য়েছে কিনা এবং তাদের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি যথাযথ দেখানো হ'চ্ছে কি না ?

গালসোয়ার্দ্দির উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র "কালো ফুল" (The Dark Flower) ছাড়া প্রায় সব বইগুলিতেই আমরা পাই একেবারেই তৈরি মানুষ। উপন্যাসের প্রারম্ভকালে যে লোকগুলিকে আমরা যেমন ভাবে দেখতে পাই, উপন্যাসের উপসংহার পরিচ্ছেদে এসেও তারা ঠিক সেই একই রূপে একই ভাবে চোখে এসে পড়ে। তাদের মধ্যে আর কোনও পরিবর্ত্তনই দেখতে পাওয়া যায় না।

চরিত্রের ক্রমপরিণতি দেখতে না পাওয়া গেলেও গালসোয়ার্দ্দির উপন্যাসের প্রত্যেক পাত্রীটি এক একটি বিশেষ 'টাইপের'। এবং এইটেই হ'চ্ছে তাঁর চরিত্র-সৃষ্টির বিশেষত্ব। কিন্তু অনেকে বলেন যে, বিশেষ ধরণের মানুষগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থকারের কল্পনালোকেই বসবাস করে, বাস্তব জগতে তাদের অস্তিত্ব বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না! এ অভিযোগ হয় ত আংশিক সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কোনও কোনও চরিত্র যে তাঁর অসাধারণ এ কথা অস্বীকার করা চলে না বটে ; কিন্তু "দি প্যাট্রিশিয়ান" (The Patrician) উপন্যাসে লর্ড মিল্টাউনের চরিত্র বা "ফ্রেটারনিটি" (Fraternity) উপন্যাসের মিঃ স্টোন্ প্রভৃতি এমন একাধিক চরিত্রও আছে যারা একেবারে সজীব মানুষ! তবে এ কথা ঠিক বটে যে তাঁর নাটকে আমরা কথোপকথনে (Dialogue) যে অপূর্ব্ব রচনা-বিন্যাস দেখতে পাই, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সেইটের একান্ত অভাব।

গালসোয়ার্দ্দির সমস্ত উপন্যাসগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলা

যায় না। তাদের মধ্যে বেশ একটা তারতম্য চ'খে পড়ে। "দি আইল্যাণ্ড অফ্ ফ্যারিসিজ্" (The Island of Pharisees) উপন্যাসখানি যেমন তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট রচনা, তেমনি "দি ম্যান অফ্ প্রপার্টি" (The man of property) বা "ফ্রেটার্নিটি" (Fraternity) তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন বলা যেতে পারে।

"দি ম্যান অফ্ প্রপার্টি" বা 'বিষয়ী লোক, উপন্যাসখানি সার্ব্বজনীন্ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে। সমাজের যে বিশেষ স্তরের লোকদের নিয়ে এই আখ্যায়িকা রচিত হ'য়েছে, ফরসাইট্ পরিবার তাদের আদর্শ প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। এরা সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ, যাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংগ্রহ ও সঞ্চয়। এই ফরসাইট্রাও অনেক কিছু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছে। এদের কাছে টাকা আছে, এদের গৃহে শিল্প-সম্পদও সংগৃহীত আছে। এদের ঘরবাড়ী আছে, স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গ আছে, এবং এমন কি এদের মধ্যে অনেকের মেধাও আছে। তবে এদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে "এটা আমার জিনিস" এই দাবীর অধিকারী হওয়া। জিনিসটা যেমনই হোক না তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ জিনিসটার বিশেষত্ব তাদের ততটা প্রীত করতে পারে না যতটা প্রীত হয় তারা সেই জিনিসটার মালিক হ'তে পারলে! ফরসাইট্ পরিবারকে লক্ষ্য ক'রে বেশ বলা যায়—"আমার আমার করি মত্ত এরা অনিবার!"

তা ব'লে এদের হৃদয় নেই এমন কথা বলা চলে না। এরা কেউ ভণ্ডও নয়। যে কোনও জিনিসের অধিকার ও স্বত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকলে যেমন মানুষের মধ্যে একটা সাহস—একটা দৃঢ়তা আপনি জেগে উঠে, তেমনি এদেরও মধ্যে সে সদ্গুণগুলি পূরোমাত্রায় বিদ্যমান আছে; তাই এরা বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে।

ফরসাইট্রা সব রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ। তবে বিশেষত্বও যে এদের মধ্যে একেবারে নেই এমন কথা বলা চলে না! দু'টি ভাই এরা; এদের দু'জনেরই কাছে 'বিষয়' যেন ইষ্টদেব! সবারই চরিত্রের মধ্যে কিছু না কিছু মহত্ত্ব আছে! পাড়া-প্রতিবাসীরা অবশ্য এদের ঠাট্টা বিদ্রূপই করে এবং এদের সংগ্রাহী স্বভাবের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করে; কিন্তু এটা অস্বীকার করা চলে না যে জাতীয় আর্থিক উন্নতি ও দেশের বৈষয়িক সম্পদ বাড়াবার জন্যে এই রকম সব লোকেরই দরকার।

ছোট ভাই শোমস্ ফরসাইটের কাছে বিষয়ই ছিল ব্রহ্ম! শুধু টাকাকড়ি ঘরবাড়ীই নয়, সে তার স্ত্রী আইরীণকেও একটা মস্তবড় সম্পত্তি বলেই মনে ক'রতো! পত্নী আইরীণের প্রতি তার এই মনোভাব থেকেই তাকে ঘোর 'বিষয়ী' বলে সবচেয়ে বেশী চেনা যায়! সে স্ত্রীর সঙ্গে বেশ সদয় ব্যবহারই করে, এমন কি তাকে স্ত্রীর একান্ত অনুরাগীও বলা চলে—কারণ অন্য কোনও নারীর প্রতি তার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না! তবে, ত্রুটী ছিল তার ঐখানে যে স্ত্রীকেও সে সম্পত্তি হিসেবেই দেখে! যেমন সুসজ্জিত "রবিন হিল" প্রাসাদখানিকে সে তার একটা দামী বিষয় ব'লে মনে ক'রতো, তেমনি সুন্দরী সুশিক্ষিতা গুণবতী পত্নী আইরীণকেও সে যেন তার একটা উৎকৃষ্ট সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য করতো! আইরীণ সেটা বুঝতে পেরেছিল; তাই স্বামীর প্রতি ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় তার অন্তর বিরূপ হ'য়ে উঠেছিল।

আইরীণের চরিত্র ছিল ফরসাইট্দের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। আইরীণের ভিতর দিয়ে গাল্সোয়ার্দ্দি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। আইরীণের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বেশ সুস্পষ্ট রূপেই ফুটে উঠেছে। এই শান্ত ধীর কোমল প্রকৃতি মেয়েটির মধ্যেও ভালবাসার একটা প্রবল আবেগ এমনিই নিঃসাড়ে সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল যে, রূপদক্ষ বসিনের (Bosinney) মধ্যে সে তার মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে তার প্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ ক'রে দিতে সে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি।

নিজের অবস্থার বিরুদ্ধে, নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই মেয়েটির প্রতি পাঠকদের সমস্ত সহানুভূতিই গিয়ে পড়ে। তবু, কোমল-প্রকৃতির মেয়ে বলে আইরীণ ছিল একটু দুর্ব্বল-চিত্ত। সে কোনও জিনিসকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতো না; তাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত জীবনে ব্যর্থতাই বরণ ক'রে নিতে হ'য়েছিল। কিন্তু আইরীণের ঠিক বিপরীত ছিল 'জুন ফরসাইটে'র চরিত্র। এই মেয়েটি ছিল অসাধারণ দৃঢ়-চিত্ত; তাই জীবনে এর কণ্ঠে সার্থকতার বরমাল্য পড়েছিল। এই সব চরিত্রের মেয়েরা সকল রকম বিরুদ্ধ অবস্থাকে ছাড়িয়ে জয়ী হ'য়ে উঠতে

পারে। এরা অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নেয়! এই শক্তিটুকু জুন ফরসাইটের মধ্যে ছিল বলেই সে বসিনেকে আইরীণের নিবিড় প্রেমের আবেষ্টনের ভিতর থেকেও আকর্ষণ করে নিতে পেরেছিল। তবে এ কথা অবশ্য মানতেই হ'বে যে, গ্রন্থকার এই শিল্পী বসিনের চরিত্রকে তেমন কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক'রে আঁকতে পারেননি। এই রূপদক্ষ বসিনে বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সে তার অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিভা ও পরমায়ু সমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই ব্যয় করে চলেছিল। শেষটা শোমস্ ফরসাইটের প্রাসাদ-চিত্রনেই সে তার জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করছিল। কিন্তু হঠাৎ যেদিন তার এই কথাটা মনে হ'ল, যে, সে যে নারীকে একান্তভাবে তারই নিজস্ব অন্তর-ধন বলে মনে ক'রে, বাস্তবিক পক্ষে সে স্ত্রীলোকটির ন্যায়সঙ্গত মালিক বা অধিকারী অন্য একজন; সে নারী লোকচক্ষে অপরের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য, সেইদিন থেকেই বসিনে একেবারে পাগল হ'য়ে গেল এবং শেষে আত্মহত্যা করলে। বিষয়-বাসনার মোহ বা স্বত্বাধিকারিত্বের এই লোভ এমন সব-ভোলা শিল্পীকেও অবশেষে গ্রাস করে ফেললে!

'বিষয়ী লোকে'র কূটবুদ্ধির কাছে বিদ্রোহী আইরীণকেও শেষটা পরাস্ত ও পর্য্যবসিত হ'য়ে আবার ফিরে আসতে হ'ল!

আগামী বারে গাল্‌স্‌ওয়ার্দির আরও দু' একখানি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করবার ইচ্ছা রহিল।

হাত-দেখা

জ্যোতি বাচস্পতি

বুড়ো আঙুল

প্রসিদ্ধ ফরাসী হস্তরেখাবিদ্ দারপাতিনি বলেন "শ্রেষ্ঠ জীবের নির্দ্দেশক হাতের তেলো, আর ব্যক্তির নির্দ্দেশক বুড়ো আঙুল।" * বুড়ো আঙুলই প্রত্যেক ব্যক্তির "অহং"-কে নির্দ্দেশ করে। তেলো আর হাতে যে প্রকৃতি পাওয়া যায়—বুড়ো আঙুলে জানা যায় সেই প্রকৃতির বিশেষ বা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। আমরা সকলেই জানি যে ব্যবহারিক হিসেবে বুড়ো আঙুলের অন্য সব আঙুলের চেয়ে দাম বেশী। হাতের অন্য আঙুলের মধ্যে যে কোনটা যদিই বাদ যায় তাতে কিছু অসুবিধা হলেও কাজ আটকায় না, কিন্তু বুড়ো আঙুলকে বাদ দিলে হাত একেবারে খোঁড়া। বুড়ো আঙুলই একমাত্র আঙুল যা অন্য সব আঙুলকে স্পর্শ করতে পারে।

হাত-দেখা বিজ্ঞানেও বুড়ো আঙুলের ঠিক এই রকমই গুরুত্ব আছে। হাতের তেলো এবং আঙুল চারটি যে প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশের যে ধারা নির্দ্দেশ করে, তা হচ্চে বীজ স্বরূপ; হাতের অধিকারীর মধ্যে সেই প্রকৃতি এবং প্রকাশের সেই ধারার অঙ্কুর আছে;—বুড়ো আঙুল হচ্চে ক্ষেত্র-স্বরূপ যার মধ্য দিয়া বীজ ও অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হবে। পাঁচটি হাতের তেলো এবং আঙুল একই ধরণের হলেও বুড়ো আঙুলের বিভিন্নতায় তাদের প্রকৃতির পরিণতির তারতম্য হবে। যেমন একই শ্রেণীর পাঁচটি বীজ মাটির প্রভেদে কোনটি বা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্চে, কোনটি বা ফলভারে অবনত পূর্ণ পরিণত বৃক্ষরূপ ধারণ করছে।

ফলিত জ্যোতিষে যেমন জন্মমাস এবং জন্মরাশিতে প্রকৃতির বীজ নিহিত আছে এবং জন্মলগ্ন যেমন সেই প্রকৃতির পরিণতি নির্দ্দেশ করে—হাত-দেখায় তেমনি হাতের তেলো এবং হাতের আঙুলে প্রকৃতির বীজ এবং বুড়ো আঙুলে সেই প্রকৃতির পরিণতি জানা যায়। কাজেই হাতের থেকে জন্মমাস আঙুল থেকে জন্মরাশি এবং বুড়ো আঙুল থেকে

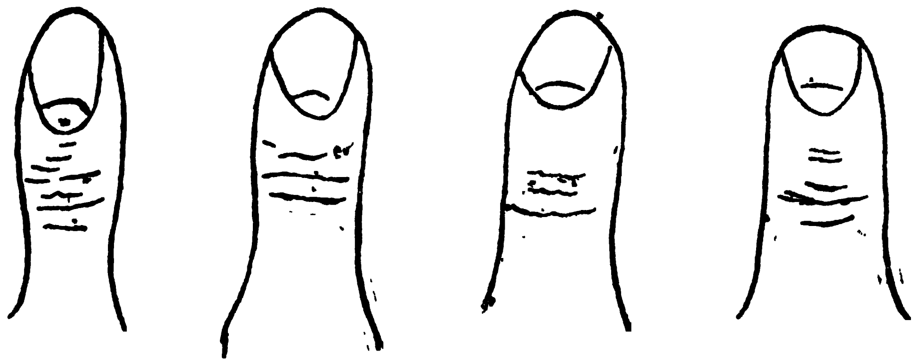
* L'animal superieur est dans la main ; l'homme est dans la pouce,—*La science de la Main* par S. D'Arpeutigny.

লগ্ন নির্ণয় করা যায়। হাত দেখে জন্মমাস, জন্মরাশি এবং জন্মলগ্ন যে নির্ণয় করা সম্ভব, এইটেই ফলিত জ্যোতিষ ও হাত-দেখা এই দুটি বিজ্ঞানের সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করছে। কিন্তু সে কথা অন্যত্র বল্‌ব।

বুড়ো আঙুলের গড়নের বিভিন্নতা এবং তার অর্থবিচার করার আগে বুড়ো আঙুলের যে দুটো প্রধান শ্রেণী আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার দরকার। বুড়ো আঙুলের দুটি পর্ব্ব আছে তা আমরা সকলেই দেখেছি। এই দুটি পর্ব্বের মাঝে একটি গাঁট আছে। কারো বুড়ো আঙুলে এই গাঁটটি উপরের পর্ব্বটিকে নীচের পর্ব্বের সঙ্গে যেন কব্‌জা দিয়ে এঁটে রেখেছে—যাতে আঙুলের পর্ব্ব দুটি ভিতরে বাইরে সমান ভাবে খেল্‌তে পারে। এই রকমের নমনীয় বুড়ো আঙুলের ডগায় চাপ দিলে তা হাতের পিঠের দিকে ধনুকের মত বেঁকে

কমবেশী আত্মত্যাগ না করতে হয়। বস্তুতঃ বুড়ো আঙুলের নমনীয়তা নির্দ্দেশ করে সামাজিক বুদ্ধি এবং অনমনীয়তা নির্দ্দেশ করে স্বার্থবুদ্ধি।

এই দু-রকম বুড়ো আঙুলের প্রত্যেকটির দোষও আছে, গুণও আছে। নমনীয় বুড়ো আঙুল যেমন লোককে সামাজিক, ত্যাগশীল, সহানুভূতি-সম্পন্ন করে তুলতে পারে, তেমনি ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য তাঁর সাংসারিক প্রতিষ্ঠার পক্ষেও যথেষ্ট বাধা উৎপন্ন করতে পারে। যাঁর বুড়ো আঙুল অতি মাত্রায় নমনীয় তিনি নিরীহ ভাল মানুষ বা গোবেচারা লোক হতে পারেন ; কিন্তু তাঁর মধ্যে তেজ বা জোর বলে কিছু না থাকাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি অথবা সৎসাহসের সঙ্গে ন্যায়পথে চল্‌বার ক্ষমতার অভাব দেখা যাবে। বিশেষ করে অপরিপুষ্ট বা ছোট বুড়ো আঙুল যদি বড় বেশী নমনীয়



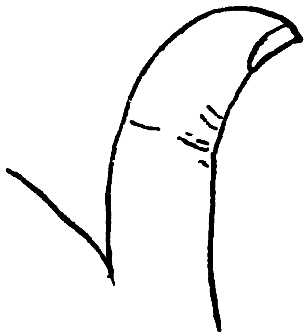
নানা রকমের বুড়ো আঙুল

যায়। (চিত্র দেখুন)। আর এক রকম বুড়ো আঙুল আছে তার ডগায় যতই চাপ দেওয়া যাক, পেছন দিকে এক চুলও হেল্‌বে না। দুটি পর্ব্ব যেন রিবিট (rivet) করে বসানো। এই নমনীয় ও অনমনীয় ভেদে বুড়ো আঙুল অহং-এর নমনীয়তা ও দুর্নমনীয়তা নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ যাঁর বুড়ো আঙুল যত নমনীয় তাঁর মধ্যে স্বার্থত্যাগ করবার শক্তি তত বেশী। বাঁদর বনমানুষ প্রভৃতি জীবের হাতে বুড়ো আঙুলকে সামনে পেছনে কোন দিকেই ভাল রকম নোয়ানো যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন হাত নেই যার বুড়ো আঙুল তেলোর ভিতর দিকে কম-বেশী নোয়ানো না যায়। এমন মানুষও নেই যাকে নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য হোক্‌, সমাজের জন্য হোক্‌, রাষ্ট্রের জন্য হোক্‌,

হয়, তা হলে জাতককে শ্যাওলার মত ভেসে-ভেসেই বেড়াতে হবে ; তাঁর দ্বারা অপরের ক্ষতি হয় ত না-ও হতে পারে এবং তিনি নিজের স্বার্থের দিকে খুব বেশী নজর কথনই দেন না ; কিন্তু তিনি পৃথিবীর বিশেষ কাজেও লাগেন না ;—তাঁর মেরুদণ্ডের এমন জোর নাই যাতে তাঁকে স্বতন্ত্র করে খাড়া রাখতে পারে। নমনীয় বুড়ো আঙুলে সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হতে পারে, যদি তা সুপরিণত এবং সুগঠিত হয়। খাপছাড়া ভাবে বড় কিম্বা মোটা বুড়ো আঙুলে আবার নমনীয়তা উদ্দাম প্রবৃত্তি এবং উদ্ভট কল্পনা রূপে অভিব্যক্ত হয়। যাঁদের এ রকম বুড়ো আঙুল, তাঁরা কোন রকম বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে চান না ; তাঁদের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব থাকে না। যেখানে দশ পয়সা দিলে চলে, তাঁরা সেখানে

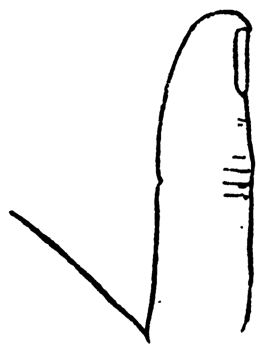
দশ টাকা দেন এবং এই অন্যায় অপব্যয়কে উদারতা, বদান্যতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন।

দুর্নমনীয় বুড়ো আঙুলের অর্থ হচ্চে—ব্যবহারিক-বুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয়। যাঁদের বুড়ো আঙুল এই রকম, তাঁরা খুব সাবধানী ও মিতব্যয়ী। তাঁদের এই মিতব্যয়িতা যে কেবল টাকা-কড়ির ব্যাপারেই প্রকাশ পায় তা নয়;—কাজে, কথায়, ব্যবহারে সব বিষয়েই তাঁরা সংযমী। তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করতে জানেন এবং অবিচলিত ধৈর্য্য ও জিদের সঙ্গে নিজের কাজ সমাধা করে থাকেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ এঁরা খুব বেশী বোঝেন;—যদি হাতের অন্য লক্ষণ প্রতিকূল না হয় তাহলে বৈষয়িক ব্যাপারে এঁরা বেশ চৌকশ প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন। এঁরা নিজের প্রাপ্য পূরো



নমনীয় বুড়ো আঙুল

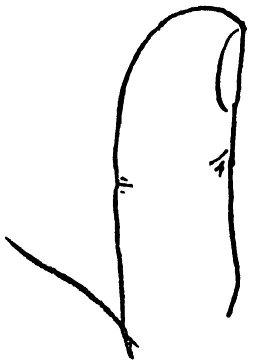
আদায় করে নিতে চান বটে, কিন্তু তেমনি পরের পাওনাও কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ করেন। নমনীয় বুড়ো আঙুলের মত দুর্নমনীয় বুড়ো আঙুলের সদ্‌গুণগুলি পূর্ণ বিকশিত হয় তাঁর মধ্যে, যাঁর বুড়ো আঙুলটি সুপরিণত ও সুপুষ্ট। দুর্নমনীয় বুড়ো আঙুল যদি ছোট ও অপরিণত হয় তা হলে সেই ব্যক্তি অতি কৃপণ এবং একগুঁয়ে হয়ে থাকে। সে সঞ্চয় করে সঞ্চয়ের জন্যই;—যেখানে প্রয়োজন সেখানেও সে খরচ করতে চায় না;—তার মধ্যে সামাজিকতার একান্ত অভাব এবং সহানুভূতি তার মনের দুয়ারে আঘাত করে না। বস্তুতঃ সব রকম বুড়ো আঙুলের মধ্যে এই শ্রেণীই সব চেয়ে অপকৃষ্ট। এঁরা গোপনতা-প্রিয় এবং সমাজে বা সাধারণের মধ্যে মান্যগণ্য হবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষাও এঁদের মধ্যে দেখা যায় না;—এঁদের দ্বারা কারো বিশেষ উপকার কখনই হয় না, বরং সমাজের বহু ক্ষতি এঁরা করে থাকেন। দুর্নমনীয় বুড়ো আঙুল যদি প্রকাণ্ড এবং বেয়াড়া রকম মোটা হয় তা হ'লেও তার ফল ভাল হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা অধিক মাত্রায় প্রভুত্বপ্রিয় ও আত্মম্ভরী হয়ে থাকেন। এঁরাও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক এবং নিজের মতবাদকেই সব চেয়ে সত্য বলে মনে করেন। এঁরা সমাজে এবং রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব করতে চান এবং সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিজেরা কামনা করেন। এঁরা চান যে, অন্য সকলে এঁদের পদানত হয়ে থাক্। এঁদের হৃদয়হীনতা খুব বেশী—নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে পায়ের তলায় পিষে ফেল্‌তে এঁদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই। এই রকম বুড়ো আঙুল যাঁদের তাঁদের মধ্যে বড় সৈন্যাধ্যক্ষ, বড় রাজনৈতিকও দেখা যায়, আবার হত্যাকারী দস্যুর মধ্যেও এ রকম বুড়ো আঙুল বিরল নয়।



অনমনীয় বুড়ো আঙুল

বুড়ো আঙুল ব্যক্তিত্বের সূচক! কাজেই যাঁর হাতের বুড়ো আঙুল যত ছোট ও যত অপুষ্ট, তাঁর ব্যক্তিত্ব তত কম; এবং যাঁর হাতে বুড়ো আঙুল যত বড় ও যত পরিপুষ্ট, তাঁর ব্যক্তিত্ব তত প্রবল। বুড়ো আঙুলের দুটি পর্ব্ব আছে। তার মধ্যে ডগার পর্ব্বটিই প্রধানতঃ ব্যক্তিত্ব সূচনা করে। কেন না অহমিকা আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি যে মনোবৃত্তিগুলির অভিব্যক্তি আমরা ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি, তাদের সূচক বুড়ো আঙুলের উপরের পর্ব্বটি। কাজেই বুড়ো আঙুল বড় ও সুপুষ্ট হলেও যদি ডগার পর্ব্বটি সুপরিণত না হয়, তা হলে জাতকের ব্যক্তিত্ব তেমন ফুটতে পারে না। তেমনি অপেক্ষাকৃত ছোট বা মাঝারি গড়নের বুড়ো আঙুলের ডগার পর্ব্বটি যদি পরিপুষ্ট হয়, তা হলে জাতকের ব্যক্তিত্ব প্রবল হয়। এক এক হাতের বুড়ো আঙুলের ডগার পর্ব্বটি বেমানান বা বেয়াড়া

রকম মোটা হয় ;—এই শ্রেণীর বুড়ো আঙুলকে বিলিতি হস্তরেখাবিদেরা clubbed thumb (মাথা-মোটা বুড়ো আঙুল) বলে থাকেন। এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, মানবতার অভাব। এই শ্রেণীর বুড়ো আঙুল যার, তার মধ্যে হৃদয় বা সহানুভূতি বলে কিছু নেই। সে বিনা উত্তেজনায়, বিনা দ্বিধায়, হাস্‌তে হাস্‌তে লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। লোকলজ্জা, সমাজ-শাসন, দণ্ডবিধি, কিছুতেই তার সহানুভূতির উদ্রেক করতে, কি বোধ-শক্তি জাগাতে পারে না। বিলিতি গ্রন্থগুলিতে বুড়ো আঙুলের দুটি পর্ব্বের মধ্যে ডগার পর্ব্বটিকে "ইচ্ছাশক্তির" নির্দ্দেশক এবং নীচের পর্ব্বটিকে "যুক্তি"র নির্দ্দেশক বলা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। হিন্দু যোগীদের মতে ডগার পর্ব্বটি কেতুর



মাথা মোটা বুড়ো আঙুল

ক্ষেত্র এবং নীচের পর্ব্বটি রাহুর ক্ষেত্র। এ দুয়ের অর্থ কি, তা ক্ষেত্র-বিচারের সময় বল্‌ব। হিন্দু যোগীদের কথা যে ঠিক, তার প্রমাণ ফলিত জ্যোতিষ থেকে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত আমি যত ব্যক্তির মাথা-মোটা বুড়ো আঙুল দেখেছি, তাঁদের প্রত্যেকের কোষ্ঠীতেই কেতুগ্রহ প্রবল।

রেখা-বিচার

এতদূর পর্য্যন্ত যা লিখেছি তা হাত-দেখার একটা অঙ্গ বটে এবং তাতে কৌতূহল-বৃত্তি কতকটা তৃপ্তি হয় বটে ; কিন্তু সাধারণ লোকে হাত-দেখা বল্‌তে যা বোঝেন অর্থাৎ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য প্রভৃতির পরিমাণ ও সুখকর বা দুঃখজনক ঘটনার সময়-নির্দ্দেশ, তার উল্লেখ উপরে কোথাও নেই। উপরে যা লেখা হয়েছে হাত-দেখায় তার গুরুত্ব আছে, কেন না একই রেখার বাইরের রূপ একই রকম হলেও তার প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি প্রকৃতি হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু হাতের বা আঙুলের গড়ন দেখে জীবনে কোন্ সময় কি ঘটবে, তা বলা যায় না। তা বল্‌তে হলে হাতের তেলোর মধ্যে যে রেখাগুলি আছে, তার অর্থ বোঝা দরকার।

একটা হাত যদি চিৎ করে ধরে তেলোটা কেউ লক্ষ্য করেন, তা হলে দেখ্‌তে পাবেন যে, তাতে নানা রকমের সোজা বাঁকা কতকগুলি রেখা আছে ; আর তেলোর মাঝখানটা সমতল বা নীচু হলেও চার পাশে ছোট-বড় ঢিপির মত উঁচু কতকগুলো জায়গা আছে। রেখাগুলির মধ্যে চারটি রেখা সাধারণ হাতে গভীর ও স্পষ্টভাবে আঁকা থাকে। অবশ্য এমন হাত দেখা যায়, যাতে তিনটি এমন কি দুটি মাত্র রেখা গভীর ; আবার পাঁচ-ছটি রেখা গভীর এমন হাতও যে দেখতে না পাওয়া যায় তা নয়। কিন্তু সেগুলি অসাধারণ গত। এই প্রধান চারটি রেখার মধ্যে দুটি তেলোতে লম্বালম্বি ভাবে আঁকা, আর দুটি এড়োভাবে। এড়োভাবে আঁকা রেখা দুটির নাম বিজ্ঞান-রেখা ও শক্তিরেখা বা প্রাণরেখা ; লম্বালম্বিভাবে আঁকা রেখা দুটির নাম অনুভূতি রেখা ও বাস্তবরেখা। এই চারটি রেখার কথা আগেই বলেছি। (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার চিত্র দেখুন)

তেলোর চার পাশে ঢিপির মত যে জায়গাগুলি আছে, তাকে ক্ষেত্র বলে। এই ঢিপির মত ক্ষেত্র আটটি—

(১) তর্জ্জনীর নীচে যে জায়গাটি সেটি **বৃহস্পতির** ক্ষেত্র

(২) মধ্যমার নীচের ঢিপিটি **শনির** ক্ষেত্র

(৩) অনামার নীচেরটি **রবির** ক্ষেত্র

(৪) কনিষ্ঠার নীচে বিজ্ঞান-রেখার উপরের ঢিপিটি **বুধের** ক্ষেত্র

(৫) কনিষ্ঠার নীচে বিজ্ঞান-রেখা আর শক্তি-রেখার মধ্যের ঢিপিটি **প্রজাপতির** ক্ষেত্র—

(৬) প্রজাপতির ক্ষেত্রের নীচে থেকে কব্জি পর্য্যন্ত উঁচু জায়গাটি **শুক্রের** ক্ষেত্র

(৭) বুড়ো আঙুলের নীচে অনুভূতি-রেখা দিয়ে ঘেরা সব চেয়ে উঁচু ঢিপিটি **চন্দ্রের** ক্ষেত্র

(৮) বুড়ো আঙুলের নীচে ঠিক বৃহস্পতির ক্ষেত্রের

তলাতেই আর একটি ছোট্ট ঢিপি আছে, সেটি **বরুণের** ক্ষেত্র

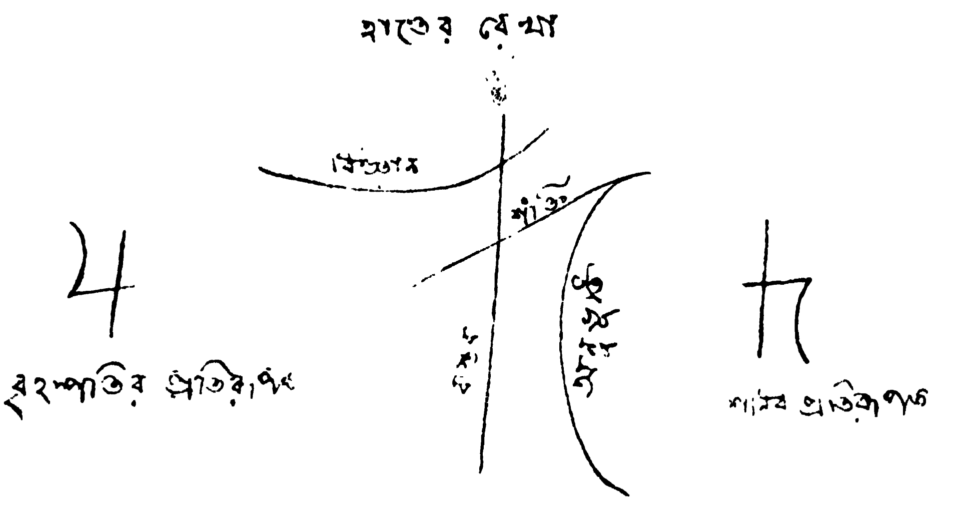
তেলোর মাঝখানে যে সমতল জায়গাটুকু আছে, তার মধ্যেও দুটি ক্ষেত্র আছে—

(১) বিজ্ঞান-রেখা ও শক্তি-রেখার মাঝখানে প্রজাপতির ক্ষেত্র থেকে বৃহস্পতির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত চৌকো জায়গাটুকু **মঙ্গলের** ক্ষেত্র

(২) শক্তি রেখা ও অনুভূতি-রেখার মাঝখানে যে তিনকোণা জায়গাটুকু, যার এক দিকে চন্দ্র আর এক দিকে শুক্র, তা **পৃথিবীর** ক্ষেত্র

এ ছাড়া হিন্দু যোগীরা বুড়ো আঙুলের পর্ব্ব দুটিকেও দুটি ক্ষেত্র বলেন—

যেটা চন্দ্রের ক্ষেত্র—প্রাচ্য মতে সেটা শুক্রের; এবং পাশ্চাত্য মতে শুক্রের ক্ষেত্রকে প্রাচ্য যোগীরা চন্দ্রের ক্ষেত্র বলে মনে করেন। বুধের ক্ষেত্রের নীচে, আমি যাকে প্রজাপতির ক্ষেত্র বলেছি, পাশ্চাত্য গ্রন্থকারেরা তাকে বলেন Upper Mount of Mars; বৃহস্পতি ও চন্দ্রের ক্ষেত্রের মাঝখানে যে ঢিপিটিকে আমি বরুণের ক্ষেত্র নাম দিয়েছি, পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদেরা তাকে বলেন Lower Mount of Mars—প্রাচ্য যোগীরা যাকে বলেন মঙ্গলের ক্ষেত্র পাশ্চাত্যেরা তাকে Plain of Mars-এর অন্তর্ভুক্ত বলেন বটে, কিন্তু তার নাম দিয়েছেন "The Quadrangle" বা চতুষ্কোণ। তেমনি যেটা প্রাচ্য-মতে পৃথিবীর ক্ষেত্র, সেটা পাশ্চাত্য মতে Triangle of Mars বা মঙ্গলের ত্রিকোণ।



(১) বুড়ো আঙুলের ডগার পর্ব্বটি **কেতুর** ক্ষেত্র

(২) বুড়ো আঙুলের তলার পর্ব্বটি **রাহুর** ক্ষেত্র

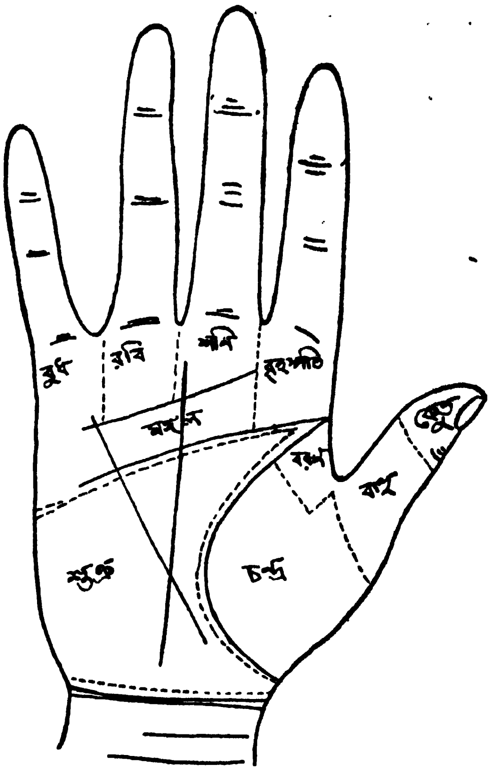
হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত এই যে ক্ষেত্রের নাম ও রেখার নাম, এগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য হাত-দেখার গ্রন্থগুলিতে দেওয়া নামের অনেক জায়গায় তফাৎ দেখতে পাওয়া যাবে। বিলিতি বইয়ের অনুকরণে বাংলা ভাষায় হাত-দেখার যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে, সেগুলিতে ইংরেজী-বইএরই হুবহু নকল করা হয়েছে। যদি কেউ সে সব বই পড়ে থাকেন, তা হলে তিনি লক্ষ্য করবেন যে, বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ এই চারিটি ক্ষেত্র মাত্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় মতেই এক; কিন্তু শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্র ঠিক উল্টো। পাশ্চাত্য মতে বুড়ো আঙুলের প্রথম পর্ব্বে পাশ্চাত্যেরা Willএর বিচার করেন এবং দ্বিতীয় পর্ব্বকে যুক্তি বা বিচার-শক্তির নির্দ্দেশক বলেন। এ দুটিকে কোন গ্রহের ক্ষেত্র বলে স্বীকার করেন না; কিন্তু হিন্দু যোগীরা বুড়ো আঙুলের প্রথম পর্ব্বকে বলেন কেতুর ক্ষেত্র, দ্বিতীয় পর্ব্বকে রাহুর। যদিও আমি নামগুলিতে সাধারণতঃ হিন্দুযোগীদের অনুসরণ করেছি, তা হলেও কেবল দুটি নাম আমি অন্য রকম দিয়েছি। আমি যাকে বরুণের ক্ষেত্র বলেছি, হিন্দু যোগীদের মতে তা-ও রাহুর ক্ষেত্র; এবং আমি যাকে প্রজাপতির ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছি, প্রাচ্য সন্ন্যাসীদের কাছে তা-ও কেতুর ক্ষেত্র বলে পরিচিত। ঐ দুটি ক্ষেত্রের যা লক্ষণ, তা রাহু কেতুর চেয়ে প্রজাপতি

বরুণের কারকতার সঙ্গে বেশী মেলে বলে আমি এদের নামেই ক্ষেত্র দুটির নাম দিয়েছি।

জন-কয়েক হিন্দু সন্ন্যাসী এবং দু-চারজন উৎকলবাসী জ্যোতির্ব্বিদের কাছে হাত দেখার যে রীতি লুকানো আছে তা এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় গ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। আমি যে এক জনের কাছ থেকেই ঠিক এই রকম শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই সব পেয়েছি, তা-ও নয়। এঁদের মধ্যে মতভেদও অনেক আছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা তাকে যে স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক আকার দিয়েছি, তাই আমি প্রচার করছি। বিজ্ঞানের মূল আমি পেয়েছি প্রাচ্য হস্তরেখাবিদ্‌গণের কাছ থেকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আকারটি আমার নিজের দেওয়া। এর গুণ যত কিছু সব সেই প্রাচীন মনীষীদের, এর ত্রুটী ভুল-চুক আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির।

সে যা-ই হোক্, হাত-দেখার প্রাচ্য-রীতি যে পাশ্চাত্য-রীতির চেয়ে ঢের বেশী যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান-সম্মত, তার কোন ভুল নেই। প্রাচ্যমতে রেখা ও ক্ষেত্রের নাম ও অবস্থান থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার চিত্রে রেখার নাম এবং বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রে ক্ষেত্রের অবস্থান দেখুন)। বিজ্ঞান রেখার একপাশে বুধ অপর পাশে বৃহস্পতি, মধ্যে রবি। শক্তি-রেখার এক দিকে প্রজাপতি, অপর দিকে বরুণ, মধ্যে মঙ্গলের ক্ষেত্র। বাস্তব রেখার এক-মুখে শুক্র, আর এক মুখে শনি, মধ্যে পৃথিবীর ক্ষেত্র। অনুভূতি রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে রয়েছে এবং চন্দ্রের ক্ষেত্রে উপরে আছে, বুড়ো আঙুল যার দুটি পর্ব্ব, রাহু ও কেতুর ক্ষেত্র। ফলিত জ্যোতিষে গ্রহের কারকতা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রবি আত্মা বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের কারক, মঙ্গল প্রাণ বা শক্তির কারক, চন্দ্র মন বা অনুভূতির কারক এবং পৃথিবী (যা ফলিত জ্যোতিষে লগ্ন নামে পরিচিত) দেহের কারক। ফলিত জ্যোতিষে রবি, বুধ ও বৃহস্পতি যে বিজ্ঞান-ময় স্তরের, গ্রহ, চন্দ্র, রাহু, কেতু যে মনোময় স্তরের, মঙ্গল, প্রজাপতি, বরুণ যে প্রাণময় স্তরের এবং পৃথিবী শনি ও শুক্র যে অন্নময় বা স্থূল স্তরের গ্রহ, তা মৎপ্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রে" দেখিয়েছি।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা স্বীকার করছেন যে, এক-একটি ক্ষেত্রের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে; অথচ কতক-গুলি ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যে রেখাটি চলেছে, তার গুণাগুণ বা লক্ষণের সঙ্গে ক্ষেত্রগুলির কোন সম্বন্ধ এঁরা লক্ষ্য করেন নি। যে রেখা বুধ, রবি, বৃহস্পতি এই তিন বিজ্ঞান-ময় গ্রহের ক্ষেত্র আশ্রয় করে, সে রেখা কি করে বিজ্ঞান-ময় না হয়ে পারে? হাতের রেখাগুলির এই অর্থ যে গতযুগে ভারত ছাড়া অন্য দেশেও জানা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশর হ'তে প্রাপ্ত গ্রহের প্রতিরূপকগুলি লক্ষ্য করলে। আমরা হাতের রেখাগুলি যদি লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে



হাতের মধ্যে গ্রহের স্থান

পাব যে, বিজ্ঞান ও অনুভূতি এই রেখা দুটি সাধারণতঃ বৃত্ত-ভাবাপন্ন এবং শক্তি ও বাস্তব এই দুই রেখা সাধারণতঃ সোজা। এই শেষের রেখা দুটি পরস্পর কাটাকাটি করে বজ্রের অর্থাৎ একটি ক্রুশের আকার ধারণ করেছে। গ্রহের মিশরীয় প্রতিরূপকগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তা হ'লে আমরা দেখতে পাব যে, সেগুলি ভেরী-বৃত্ত, অর্দ্ধ-বৃত্ত এবং বজ্র বা ক্রুশের সমবায়ে। প্রতিরূপকগুলি বিলিতি জ্যোতির্ব্বিদ্ মাত্রেই এখন ব্যবহার করে থাকেন এবং ভারতেরও

যে সব জ্যোতির্ব্বিদ্ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁদেরও এই প্রতিরূপকগুলির সঙ্গে পরিচয় আছে। এগুলির অর্থ যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলবেন যে, ঐ প্রতিরূপকগুলির মধ্যে বৃত্ত বা অর্দ্ধ-বৃত্তের অর্থ হচ্চে অন্তর্দ্দেহ, এবং বজ্র বা ক্রুশের অর্থ হচ্চে বহির্দ্দেহ। হাতে বিজ্ঞান ও অনুভূতির অর্থাৎ অন্তর্দ্দেহের সূচক যে রেখা দুটি, তারা অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং তারা দুটি দুপাশে আছে—মধ্যে বহির্দ্দেহের সূচক শক্তি ও বাস্তব এই দুটি রেখার বজ্র বা ক্রুশ। এ যেন অন্তর্দ্দেহের পূর্ণ চৈতন্য জড়বস্তু ও জড়-শক্তির ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। হাতের এই রেখাগুলি যদি লক্ষ্য করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব বাস্তবরেখা, শক্তিরেখা এবং অনুভূতি-রেখা, এই তিনটি মিলে যে মূর্ত্তি ধারণ করেছে তা শনির প্রতিরূপক, (চিত্র দেখুন)। ফলিত জ্যোতিষে শনি পরিপূর্ণ বন্ধনের সূচক এবং বৃহস্পতি হচ্চেন গুরু, যিনি প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলন করে মুক্তি দিয়ে থাকেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে শনির প্রভাবই বেশী, সেই জন্য হাতে শনির প্রতিরূপকটি স্পষ্ট আঁকা। এ বিষয় এত বিস্তারিত করে বল্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু বাংলা দেশে বর্ত্তমান সময়ে যাঁরা হাত-দেখার চর্চ্চা করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই শিক্ষা ইংরাজি বই থেকে; কাজেই পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে প্রাচ্য রীতির পার্থক্যের কারণ এবং প্রাচ্য রীতি যে ঢের বেশী বিজ্ঞান-সম্মত তার একটু প্রমাণ দেওয়া দরকার।



শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] পূজারিণী



উপনিষদের যুগে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

বৈদিক ধর্ম্ম-প্রভাব দ্বারা যে সমাজের সূচনা হইয়াছিল সেই সমাজ দীর্ঘকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে সাহিত্য, কলা ও শিল্প দ্রুতগতিতে সৃষ্ট হইতেছিল। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধেও মূল ভারতীয় আর্য্য-ধারা অবলম্বন করিয়াই নানা মতবাদের সৃষ্টি হইতেছিল, দল গড়িতেছিল ও ভাঙ্গিতেছিল। এই যুগ যখন শেষ হইয়াছে, তখনই সমস্ত আচার, ব্যবহার ও মতবাদের বিতর্কের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের সৌম্য আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেবের সময়কার আচার, নিয়ম, ধর্ম্ম ও রাজনীতির অনেকাংশ পালি বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্র বৎসরের গঠন ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাওয়া যায় না—তাহার আভাস অনুমান করা যায় মাত্র। এই সুদীর্ঘকালের সমাজের বহুমুখী পরিবর্ত্তনের যে চিহ্ন পরবর্ত্তী সাহিত্য ও গ্রন্থে আছে সেইটুকুই সমস্ত বলিয়া অথবা সম্পূর্ণ বলিয়া মানিয়া লইলে ভুল হইবে। হয়ত তাহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল মতবাদ মাত্র—এমন মতবাদ যাহা কখনও বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় নাই। আবার হয়ত সামাজিক জীবনের এমন সুস্পষ্ট পরিচয়ও আছে যাহা নিখুঁত এবং অত্যন্ত খাঁটি। আচার-ব্যবহারের ক্রম-পরিণতির মধ্যে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ আচার নীতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আর্য্য-চিন্তা-ধারা যে মুখে চলিয়াছিল পরবর্ত্তী যুগেও সে ধারা যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারতবর্ষে রাজধর্ম্মের আদর্শ

ভারতবর্ষেরই রাজনীতিক্ষেত্রে রাজধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তাহার আদর্শ রাজা ছিলেন রাজা জনক ও রামচন্দ্র; এবং সেই প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্তও তাঁহারাই রাজার আদর্শ রহিয়া গিয়াছেন। যদি মনে করা যায় যে, তাঁহারা কেবল কবির কল্পনা-সৃষ্ট, যদিও সেরূপ মনে করিবার কোনোই হেতু নাই, তথাপি তাঁহারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন এবং সমাজকে নিজেদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সত্যই হউন আর কল্পিতই হউন, তাঁহাদের অপরিসীম প্রভাব উপেক্ষা করিবার নহে।

জনক ছিলেন বিদেহের রাজা। চরিত্র ও জ্ঞানে তিনি

ঋষি ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা হইয়াও তিনি তাঁহার দীনতম প্রজার ন্যায়ই ছিলেন। রাজ-সভায় অথবা পণ্ডিত-সভায় যেখানেই যখন তিনি থাকুন না কেন, তাঁহার মন ছিল সর্ব্বদাই ব্রহ্মাভিমুখী। রাজার এতবড় অনাসক্তির দৃষ্টান্ত খুব কচিৎ কোনও যুগে পাওয়া যায়।

আগুন লাগিয়া রাজপুরী দগ্ধ হইতেছে—রাজর্ষি জনকের উদ্বেগ মাত্র নাই। আগুন নির্ব্বাপণের যাহা কিছু ব্যবস্থা তাহা অবলম্বিত হইয়াছে। কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। জনক তাহা জানিয়াই নিশ্চিন্ত। মনুষ্যের হাতে যতটুকু করিবার তাহা করা হইতেছে; সুতরাং উদ্বেগও সম্পূর্ণ নিরর্থক। বস্তুতঃ বৃথা আক্ষেপ করিবার বৃত্তিই তাঁহাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার ভিতর হা-হুতাশ বা আক্ষেপ উপস্থিত হইবার কথাও নহে।

আর এক আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বক্ষণে যখন তিনি জানিলেন যে তাঁহাকে বনে যাইতে হইবে তখন তাঁহার কি অপার্থিব আনন্দ! রামচন্দ্র পিতার কাতর অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতেছেন যে, এই তুচ্ছ কারণে এবম্প্রকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা সঙ্গত নহে। এ ত এমন বেশী কিছু নয়। মাত্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য তিনি বনে যাইতেছেন—আবার ফিরিয়া আসিবেন। যে বনে বাস করা সৌভাগ্য, পিতার আদেশে মায়ের সম্মতিতে সেই বনে গমন করিবেন, তাহাতে আবার শোকের অবকাশ কোথায়? মুনি ও ঋষিগণ বনে বাস করেন, তাঁহাদের পুণ্য-সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া ত অতিশয় শ্লাঘ্য।

রাজা রাম ভারতবর্ষের প্রাণের রাজা, রাজ-সংস্কারের আদর্শ। আজও রাজা বলিতে রাজা রাম, রাজত্ব বলিতে রাম-রাজত্ব বুঝায়। রাম রাজত্বই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের জন্য এই ইচ্ছাই গান্ধীজী পোষণ করেন।

সকল প্রজার মঙ্গল-ইচ্ছা যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বগুণের অধিপতি, তিনিই রাজা। যিনি নিজের ইন্দ্রিয় সকলকে বশে আনিতে পারেন নাই, তিনি প্রজা বশে আনিবার কথাও ভাবিতে পারেন না। আদর্শ রাজা রামচন্দ্র দেশে রাজ-ভক্তির যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, প্রত্যেক আর্য্যভারতীয়ের ভিতরেই সে ভাব আজও বিদ্যমান। ঋষিদের কল্পনায় রাজা বিষ্ণুর প্রতিভূ। আর রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু। রাজা বলিতে মনে যে উচ্চ ধারণা জাগে, রাজার স্মৃতির সহিত যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিজড়িত তাহার সূচনা হয় রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সময়ে। পিতা যেমন স্নেহবশতঃ ও দায়িত্ববশতঃ নিজ পরিবার পালন করেন ও রক্ষা করেন, রাজাও তেমনি রাজা বলিয়াই স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে প্রজা-পালন ও প্রজার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবেন এই ছিল কল্পনা। রাজার প্রতি পিতৃভাবের আরোপ যেমন রাজা ও প্রজার সুখের হেতু হইয়াছিল, তেমনি অধর্ম্মাশ্রয়ী রাজার দ্বারা অশুভও কম হয় নাই। যখন অত্যাচারী রাজা সিংহাসনে বসিয়াছে, রাজ-কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তখন তাহা সহ্য করিবার একটা স্বাভাবিক বৃত্তি প্রজার ভিতর বর্ত্তমান থাকায়, রাজা অপ্রতিহত অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইয়াছে। রাজদ্রোহ যে হয় নাই তাহা নহে। রাজদ্রোহ হইয়াছে, প্রজার দাবীতে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এ সব হইলেও রাজদ্রোহ পিতৃদ্রোহেরই সামিল, এই সংস্কার থাকিয়া গিয়াছে। রাজা দেবতা, রাজা বিষ্ণু, রাজা পিতার স্বরূপ, এই সংস্কার সহস্র সহস্র বৎসরের আচরণে দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়াই বিদেশীয় শাসন সম্ভবপর হইয়াছিল। যখন পশ্চিম দেশীয় আততায়ীগণ লুণ্ঠন অবসানে ভারতবর্ষের সিংহাসন অধিকার করে, তখনও সংস্কার-বশেই আর্য্যাবর্ত্ত নূতন রাজাকে মানিয়া লইয়াছে। তারপর ইংরাজ রাজা হইয়াও হিন্দুদের নিকট হইতে এই রাজভক্তি পাইয়া আসিয়াছে। ইহাতে ইংরাজেরা এই ভুল বুঝিয়াছে যে, ভারতবাসীরা ইংরাজ-শাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যে সময় ইংরাজ আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, সেই সময় অন্য যে-কোনো জাতিই হউক না সিংহাসন দখল করিলে রাজ-সম্মান পাইত। ভারতবাসীর রাজ-ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাসই রাজ-শক্তির আশ্রয়। রাজভক্তির সহিত রাজ-শক্তির জন্য ভয়ও যে মিশ্রিত ছিল না এমন নহে। হিন্দুস্থানে বৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই রাজ-ভক্তির স্থলে রাজ-ভয় বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ভয় ও ভক্তির বাহ্য চিহ্ন এক। সমস্ত ভক্তি দূর হইয়া কেবল রাজ-ভয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার বাহ্যরূপ অবিকৃত থাকে। কর্ম্মের দ্বারাই জানিতে পারা যায় যে বন্ধনটা ভয় অথবা ভক্তির। রামচন্দ্র অথবা জনকের সহিত প্রজার ভয়ের যোগ ছিল না, শুদ্ধা ভক্তির যোগ ছিল।

আদর্শচ্যুতি ও প্রক্ষিপ্ত মতবাদ

ভারতবর্ষের রাজ-আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ থাকিলেও আদর্শ-চ্যুতি ও বিপর্য্যয় অনেকবার অনেক স্থানে হইয়া থাকা সম্ভব। মানুষ দুর্ব্বলতায় ঘেরা, তাই আদর্শচ্যুতি পুনঃ পুনঃ হয়। কিন্তু আদর্শ বজায় থাকিলে পুনরায় আদর্শ-লাভের পথ ফিরাইয়া পাওয়া যায়। আর্য্য-গণ্ডী যতই বর্দ্ধিত হইয়াছে, সমাজে জ্ঞান ও বিশ্বাস যতই নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে, নানা রুচির নানা মতের লোকও ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যাঁহারা রাজ-আদর্শ বা ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও নির্ভয়ে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ সমাজে বিভিন্ন মতবাদ শুনিবার মত মনোবৃত্তি ও ঔদার্য্য ছিল। কোনও কোনও বিরুদ্ধ মত লোকপ্রিয় হইয়াছে এবং নূতন মত আশ্রয় করিয়া নূতন দলও গঠিত হইয়াছে। এই বিরুদ্ধবাদীদের কাহারও কাহারও মতবাদ ও মনোবৃত্তির পরিচয় আজও পাওয়া যায়। কেহ বা সরলপথে, নিজ নামে নিজ দায়িত্বে মত প্রচার করিয়াছেন, আবার কেহ বা সমাজ ও ধর্ম্মকে আঘাত করিবার জন্য ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ বৈদিক ও উপনিষদের যুগের কোনো গ্রন্থই বিদ্যমান নাই। অনেক গ্রন্থই মানুষের স্মৃতিতে ছিল; এবং যাহা লিখিত ছিল তাহার যে অংশ তৃতীয় যুগে পুনর্লিখিত হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় যুগ বলিতে সাধারণতঃ উপনিষদের সময় হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুঝায়। দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থ না পাইলেও পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় যুগের অবস্থা যথাসম্ভব বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা কোনও বিশেষ মত পোষণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ মতবাদ অধিক লোকের মধ্যে চালাইয়া দিবার জন্য কোনও সুপরিচিত গ্রন্থের মধ্যে স্ব-মত প্রক্ষেপ করিতেন। দ্বিতীয় যুগের অনেক মত পরবর্ত্তী যুগের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মতবাদ মাত্রেই পুরাতন এই বিশ্বাস উৎপাদন করিলে সাফল্যের আশা বেশী বলিয়া গ্রন্থকে বহু পুরাতন আবরণ দেওয়ার চেষ্টাও বিদ্যমান ছিল। এই সকল কারণে তৃতীয় যুগে লিপিকৃত দ্বিতীয় ও প্রথম যুগের গ্রন্থাদির কতটা খাঁটি ও কতটা যে প্রক্ষিপ্ত তাহা স্থির করা দুরূহ। দ্বিতীয় পর্ব্বে মহাভারত রামায়ণ রচিত হয়। কিন্তু যে রামায়ণ ও মহাভারত প্রচলিত আছে উহার অনেক অংশই প্রাথমিক রামায়ণে ও মহাভারতে ছিল না। কতকগুলি স্থানে প্রক্ষেপকের অঙ্গুলির ছাপ সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। কতক-গুলি আবার সন্দেহজনক, প্রক্ষেপ হইতেও পারে—নাও পারে।

দ্বিতীয় যুগে যে রাজ-ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র ও জনকের চরিত্রে উজ্জ্বল, সেই রাজ-ধর্ম্মের বিকারও রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতার প্রক্ষেপে বিদ্যমান। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্বে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে অতি-বিস্তারের সহিত ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি আলোচিত হইয়াছে। আর এই পর্ব্বেই প্রক্ষেপকার তাঁহার বিকৃত নীতি সকল প্রবেশ করাইবার উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এমন সকল হেয় উপদেশ দিতেছেন যে, আদি মহাভারত-কারের কল্পনায় তাহা থাকিতে পারে না। এই সকল নির্লজ্জ প্রক্ষেপের কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সমস্ত মতবাদের দ্বারা আমাদের অতীত ইতিহাসে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি যে কুটিলতা-মলিন ছিল এমন ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ ও অত্যন্ত নীচবৃত্তি সমর্থিত হইয়াছে। এক পাতায় যাহা বরেণ্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, অপর পৃষ্ঠায় তাহাই অকার্য্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। মহাভারতের মূলে যে আদর্শ তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহা সর্ব্বলোক-বিদিত। যে সকল কদাচার সমর্থিত হইয়াছে ও দুর্নীতি ধর্ম্মনীতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু আলোচনা করিব। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, তাহার একস্থানে ভরদ্বাজ নামক কাহারও মত বলিয়া ভীষ্ম যাহা উপদেশ দিতেছেন তাহা এই :—

"শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার (নির্ধন রাজার) অতীব কর্ত্তব্য।" "মঙ্গলার্থী ব্যক্তি (রাজা) অঞ্জলি-বন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু-মোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যতদিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে ততদিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন ও

সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর-নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে।" (মহাভারত ১২ পর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়)। আবার কোনও ঋষির বা শাস্ত্র-প্রণেতার দোহাই না দিয়া প্রক্ষেপকারী কতকগুলি নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মের উপদেশ ভীষ্মের মুখেই দিয়াছেন। ১৩০ অধ্যায়ে দুরবস্থায় পতিত রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সকল উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে তাহার কদর্য্যতা এত বেশী যে, যিনি প্রক্ষেপটি করিয়াছেন, তিনিও কৃপাপূর্ব্বক এইটুকু ভূমিকা না করিয়া পারেন নাই যে, "তুমি (যুধিষ্ঠির) এক্ষণে আমাকে (ভীষ্ম) অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত। এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া যে সকল উপায় বিবৃত হইয়াছে তাহাতে না সমাজ না ধর্ম্ম টিকিতে পারে। হিংসাই এস্থলে পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। স্বার্থ-রক্ষাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ-সাধনের জন্য ধন আবশ্যক, অতএব রাজা যে কোনও প্রকারে ধন সংগ্রহ করিবে। বলপূর্ব্বক, ছল পূর্ব্বক, অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, কেন না কোষই রাজার বলের মূল, বল ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। অথবা প্রজা-পালন করিতে হইলে ধর্ম্ম-রক্ষা করা চাই, তজ্জন্য বল চাই, বলের জন্য কোষ অর্থাৎ ধন চাই। "অতএব ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে।"

এই সকল উক্তি হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, কুপরামর্শ দিবার এবং অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া সমাজ নষ্ট করিবার মত লোক এখনকার ন্যায় আলোচ্য যুগেও ছিল। এমন কি তাঁহারা বহুল প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থের মধ্যেও কৌশলে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সকল দুর্নীতি-পূর্ণ বাক্য প্রবেশ করাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই সকল দুর্নীতিই যে রাজনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। ভারতবর্ষে যাঁহারা দুর্নীতিকে শাস্ত্রের রূপ দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৌটিল্যই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। সুতরাং কৌটিল্য পরবর্ত্তী যুগের লোক হইলেও এইখানে তাঁহার অর্থশাস্ত্রের একটু আলোচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

কৌটিল্যের রাজনীতি

যাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে নিজ মত ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়াছেন তদপেক্ষা কৌটিল্যকে অধিক সাহসিক ও অপেক্ষাকৃত সৎ বলা যায়। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে শাস্ত্র মনে না করিয়া উপন্যাস বলিয়া গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে নানাপ্রকার কল্পিত অবস্থার সূচনা করিয়া তাহার প্রতিকার-কল্পে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থা, বিধি ও নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই গ্রন্থের নীতিই কূটনীতি। যাহা সহজ নহে, যাহা সরল নহে, যাহা কুটিল পথ, সেই পথেরই সুবিধার কথা কৌটিল্যের আলোচ্য। "যদি সুনীতি ও ধর্ম্মাচরণের কথা জানিতে চাও তবে অন্যত্র যাও। আমার নিকট ঐ দ্রব্য নাই। যদি কূট পথ চাও, অধর্ম্ম-পথে স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে চাও, স্বার্থবশে রাজা হইতে চাও, রাজা হইয়া পর-রাজ্যে লোভ করিতে চাও, তবে কি কি উপায়ে অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পার তাহার বিবরণ আমার কাছে শিখিতে পার। পর-রাজ্যের প্রতি লোভ করিলেই তাহা জয় করা যায় না। কোথায় কোথায় আমার কূটনীতিও খাটিবে না, তাহাও আমার নিকট জানিয়া লইতে পারিবে। মনে কর, তোমার প্রতিবেশী রাজার রাজ্যের প্রতি তোমার লোভ হইল। তুমি কি তখনই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বুকে তাল ঠুকিয়া যুদ্ধ করিতে যাইবে? না, অমন কাজও করিবে না। আগে বিবেচনা করিবে তাহার জোর কত। যদি জোর বেশী থাকে তবে লড়াইয়ে মাতিও না। অপেক্ষা কর, চর লাগাও, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি কর; তারপর মিত্রতার ভান কর, সুযোগের অপেক্ষা কর, সুযোগ উপস্থিত হইলে ঘাড় ভাঙ্গ। কৌটিল্য এই কূটবুদ্ধি জানেন—যাঁহার ইহাতে আবশ্যক তিনি আসুন, অঞ্জলি ভরিয়া কুটিলতার বিষ পান করুন, চাই কি স্বার্থ সিদ্ধও হইতে পারে।"

আমি একবার একটা ডাকাইতি মোকদ্দমায় জুরীতে বসিয়াছিলাম। পুলিশ ডাকাইতি প্রমাণের জন্য একজন পুরাতন ডাকাইতকে সাক্ষী মানিয়াছে। সে সাক্ষ্য দিল—হাঁ অমুক এবং অমুক আমার বাড়ীতে ডাকাইতির জন্য লোক চাহিতে আসিয়াছিল। তখন আসামী পক্ষের উকীল জেরা আরম্ভ করিলেন—"তুমি ডাকাইতি করিতে?" "হাঁ"।

"মানুষ খুন করিয়াছ ?"—"আজ্ঞে হাঁ"। "জেল খাটিয়াছ কয় বৎসর ?"—"১২ বৎসর।" "কতবার জেলে গিয়াছ ?" —"অনেকবার; ঠিক কত বার মনে নাই।" "তা তোমারই কাছে লোক চাহিতে আসামী গেল কেন ?"—এই প্রশ্নে ডাকাইতের সর্দ্দার বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিল—"এ কেমন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আমি নামজাদা ডাকাইত। ও অঞ্চলে আমাকে সকলে জানে—মান্য করে। ডাকাইতির জন্য লোক চাহিতে আমার কাছে না আসিয়া তবে কি ভট্টচার্য্যের বাড়ী যাইবে ?" এ ডাকাইতটি যেমন নিজের গুণ সম্বন্ধে সরল ধারণা পোষণ করে, আমাদের কৌটিল্য মহাশয়ও তেমনি। তিনি নামে ডাকে কুটিল, কুটিলতার নামাবলী গায়ে দিয়া বেড়ান, লিখিয়াছেন অর্থশাস্ত্র অথবা কৌটিল্য শাস্ত্র। সোজাসুজি বলিতেছেন, কুটিল পথে রাজ্যলাভ ও ভোগ করিতে চাও ত আমার কাছে আইস, আর যদি সাধু পথে রাজ্য-শাসন করিতে চাও তবে যুধিষ্ঠিরের কাছে যাও। এমন সাফ মার্কা থাকিলেও আজকাল ঐ শাস্ত্রখানার প্রতি অনেকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই জন্য কৌটিল্যের সহিত পরিচয় করিয়া দ্বিতীয় যুগের রাজধর্ম্ম আলোচনা শেষ করিব।

রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌটিল্যের প্রধান পরিকল্পনাই এই যে, রাজার ভোগের জন্য রাজ্য। সে রাজ্য রাখিতে হইলে মামুলী ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, ধর্ম্মের আবরণ রাখিতে হইবে। প্রজা রক্ষাও করিতে হইবে—কেন না প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে রাজার অসুবিধা। সেইজন্য আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে প্রজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবে। মালাকরের মত ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ মালাকার যেমন প্রতিদিনই গাছে যে ফুল ফোটে তাহা তুলিয়া লয়, অথচ গাছে জল দিতেও ত্রুটি করে না— তেমনি প্রজার যাহাতে অর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে এবং অর্থ হইলেই তাহা সংগ্রহ করিবে। অঙ্গারকের মত করিবে না। কেন না—অঙ্গারকের ন্যায় বৃক্ষ পোড়াইয়া ফেলিলে আর প্রতিদিন প্রজারূপী বৃক্ষ হইতে ধনরূপ পুষ্প সংগ্রহ করা চলিবে না। রাজকার্য্যের মূল তত্ত্বই হইতেছে স্বার্থ—রাজধর্ম্ম নহে রাজস্বার্থ। এই মালাকার ও অঙ্গারকের দৃষ্টান্তগুলি কূটশাস্ত্রবিদদের এতই প্রিয় ছিল যে মহাভারত ও মনুসংহিতার সর্ব্বত্রই ইহার উল্লেখ পাই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে আমি উপন্যাস বলিয়াছি। দুই একটি বিষয় উদ্ধৃত করিলে ইহার হেতু স্পষ্ট হইবে। রাজা স্বীয় স্বার্থেই রাজত্ব করিবেন—কিন্তু পুত্ররূপ শত্রু যদি জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাকে লইয়া কি করা যায় ? এই বিষম সমস্যায় পূর্ব্বেকার রাজনীতি-বিশারদেরা কি কি বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া পরে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া কৌটিল্য এই পুত্র পালনরূপ বিষম সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্র—রাজা ও রাজপুত্র

"রাজা প্রথমে স্বীয় স্ত্রীগণ ও পুত্রগণ হইতে নিজেকে নিরাপদ করিয়া তৎপর অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষায় ব্রতী হইবেন। পুত্রদের জন্মের পর হইতেই রাজা তাহাদের বিশেষ যত্ন লইবেন।

(১) এই বিষয়ে ভরদ্বাজ বলেন:—"কাঁকড়ার ন্যায় রাজপুত্রদের স্বীয় জনককে নাশ করিবার প্রবৃত্তি আছে। তাহাদের যখন পিতৃভক্তির অভাব হইবে তখন তাহাদিগকে গোপনে দণ্ডিত করিবে।"

(২) বিশালাক্ষ বলেন—"এই কার্য্য (ভরদ্বাজ নির্দ্দিষ্ট) নিষ্ঠুর, স্বার্থদ্বেষী এবং ক্ষত্রিয়-বীজ-ধ্বংসকারী। সেইজন্য রাজপুত্রদিগকে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখাই ভালো।"

(৩) পরাশর বলেন—"ইহা (বিশালাক্ষের নির্দ্দেশ) সর্প-ভীতের মত ব্যবস্থা। কেন না রাজপুত্র মনে করিতে পারে যে, তাহার পিতা আশঙ্কা বশতঃ তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং নিজের পিতাকে সুযোগ পাইলেই সে দংশন করিবে। সেইজন্য রাজপুত্রকে রাজ্য-সীমার প্রহরীদের হাতে অথবা কোনও দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিবে।"

(৪) পিশুণ বলেন—"ইহা মেষ মধ্যে ব্যাঘ্র রাখার মত। কেন না রাজপুত্র তাহার বন্দী দশার হেতু জানিয়া সীমান্ত-প্রহরীদের সহিত যোগ দিতে পারে। সেইজন্য তাহাকে কোনও ভিন্নদেশীয় রাজার দুর্গে নিক্ষেপ করাই ভালো।"

(৫) কৌণপদন্ত বলেন—"এই কার্য্যটি গো-বৎস বন্ধনের মত ব্যবস্থা। কেন না লোকে যেমন বৎসের দ্বারাই গাভী দোহন করে, তেমনি ভিন্ন দেশের রাজা ঐ রাজপুত্রের সাহায্যে

তাহার পিতাকে দোহন করিতে পারে। সেইজন্য রাজপুত্রকে তাহার মাতুলালয়ে বড় হইতে দেওয়াই ঠিক।"

(৬) বাতব্যাধি বলেন—"ইহা ধ্বজা-দণ্ডের মত কার্য্য। যেহেতু অদিতি ও কৌশিকের মত রাজপুত্রের মাতুলবংশ এই ধ্বজা লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারেন। রাজপুত্রদিগকে ইন্দ্রিয়াসক্তি দ্বারা নষ্ট হইতে দেওয়াই ঠিক—কেন না ব্যসনাসক্ত পুত্রেরা প্রশ্রয়দাতা পিতাকে অপছন্দ করে না।"

কৌটিল্য বলেন—"ইহা জীবন্মৃতবৎ ব্যবস্থা। কেন না রাজপুত্রেরা ব্যসনাসক্ত হইলে ঘুণে-ধরা কাঠের মত সে বংশ নষ্ট হয়।"

অতঃপর কৌটিল্য পুত্রের জন্মের পর যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানেই তিনি রাজপুত্রকে নিষ্কৃতি দেন নাই। কৌটিল্যের রাজকার্য্য পরিচালনার প্রধান উপকরণ চর, নট, নটী, ভণ্ড-সন্ন্যাসী ও গুটিকত সৈন্য। রাজপুত্রকে একটু চরের সঙ্গ না দিলে অবিচার হইবে ভাবিয়া রাজপুত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন:—"সহপাঠীরূপ চর দ্বারা" তাহাকে নানা রকমে ভুলাইয়া রাখিবে। আবার কখনও বা দুষ্টা স্ত্রী-চর দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি হইতে তাহাকে বিরত করিবে। কখনও বা তিনি ডাকাইত চর দ্বারা রাজপুত্রের মনে ব্যসনভীতির উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি রাজপুত্র রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছা করে—তখন চর দ্বারা তাহার ইচ্ছা ব্যর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ সহপাঠীবেশে, মোহিনী স্ত্রীবেশে, ভৃত্য ও অনুচরবেশে ও বয়স্যবেশে চর বেচারা রাজপুত্রের পিছনে লাগিয়াই থাকিবে।

এইরূপে রাজপুত্রের ব্যবস্থা করিয়াও কৌটিল্য নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় পুনরায় সোজা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। "রাজার একমাত্র পুত্র যদি বিষয়ে আসক্ত না হয় অথবা জন-প্রিয় হয় তবে রাজা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।"

অর্থশাস্ত্রের কৃত্রিমতা

আশা করা যায়, অতঃপর ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কৌটিল্যের বহিখানিতে সত্যই রাজপুত্র পালন বিষয়ে এমন উপদেশ নাই যাহা হইতে সত্যিকার কোনও রাজা পুত্র পালনের বিষয় অবগত হইতে পারেন। এসব নীতির দ্বারা রাজপুত্রকে অবলম্বন করিয়া কোনও লেখক উদ্ভট মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। কোনও রাজা কৌটিল্যের উপদেশানুযায়ী পুত্র পালন করিয়াছেন ইহা মনে করিলে বাতুলতা হইবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রখানা পাওয়ার পর হইতে নানা গবেষণা চলিতেছে। যাঁহারা অর্থশাস্ত্রী তাঁহারা বিশেষজ্ঞের চক্ষু দ্বারা এই শাস্ত্রখানা দেখিয়া ইহাতে নানা লুপ্ত রত্ন আবিষ্কার করিতেছেন। কৌটিল্য অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর রাজধর্ম্ম আলোচনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিচার করিলে বইখানার গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা অন্তর্হিত হয়; একখানি উদ্ভট উপন্যাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় যুগের রাজনীতি কৌটিল্য-নীতি ছিল না। দ্বিতীয় যুগে কেন, কোনও কালেই ভারতীয় রাজনীতি কৌটিল্য-নীতি ছিল না। পরন্তু রাজনীতি ও রাজধর্ম্ম একই ছিল। কৌটিল্য আলোচনার ফলেও এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়।

কৌটিল্য কোনও কোনও বিষয়ে স্বমত স্থাপনের পূর্ব্বে চারি পাঁচটা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা কৌটিল্যের প্রদত্ত নাম ও মতগুলি সত্য বিবেচনা করিয়া তাহার উপরেও গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল নাম যে কাল্পনিক ব্যক্তির এবং বিভিন্ন মত-প্রদানকারী পূর্ব্বতন অর্থশাস্ত্রকারগণ সকলেই যে কৌটিল্যের মানস-প্রসূত সন্তান তাহা ত স্পষ্টই বোঝা যায়। উদ্ধৃত রাজপুত্র-রক্ষা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানে ভরদ্বাজাদি প্রমুখ যে নামগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে একে অপরের বাক্যের সমালোচনা করিয়া নিজ মত প্রকট করিয়াছেন। ঠিক যেন বত্রিশ সিংহাসনের পুতুল, একের পর অপরে একই বিষয় বলিয়া যাইতেছে। ভরদ্বাজের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডন করিয়া বিশালাক্ষ, বিশালাক্ষের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডন করিয়া পরাশর ইত্যাদি ক্রমে গল্পের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এমনটি হওয়া, এক শাস্ত্রকারের পক্ষে অপরের বাক্য এমনি করিয়া উদ্ধৃত করিয়া পরিণতির দিকে অর্থাৎ কৌটিল্যের মতের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া কখনও বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর বিভিন্ন লোক নহেন—তাঁহারা সকলেই কল্পিত। কৌটিল্য নিজ মত উত্তমরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি কল্পিত



বাউল

শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নাম দিয়া একই প্রশ্নের শৃঙ্খলিত যুক্তি যোজনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত নিজের নামে দিয়াছেন।

অন্য একটি উদাহরণ দ্বারা কৌটিল্যের কপট নাম ব্যবহারের পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে। মন্ত্রীসভার কথা ধরা যাক্। মন্ত্রিসভার মন্ত্রণা ও মন্ত্রগুপ্তি বিষয়ে কি প্রকার ব্যবস্থা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য কৌটিল্য যেন আর একটা মন্ত্রণা-সভা ডাকিয়াছেন। তাহাতেও যথাক্রমে ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুণ উপস্থিত আছেন এবং নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে একের মত পরবর্ত্তী ব্যক্তি খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেছেন। রাজপুত্র-পালন ব্যাপারেও এই ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুণের ক্রম বর্ত্তমান। আশা করি, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কৌটিল্যের ভরদ্বাজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কোনও মাননীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্র গ্রন্থকার নহেন। তাঁহারাও গ্রন্থকারেরই ন্যায় কল্পিত ব্যক্তি। গ্রন্থকার নিজের ও গ্রন্থের নাম যেমন কৌটিল্য দিয়াছেন, তেমনি গ্রন্থের ভিতরেও সুন্দর ছলনার প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন, পূর্ব্বতন অর্থশাস্ত্র সংগৃহীত করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত, গ্রন্থ শেষেও এই কথারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। উপরন্তু এই টীকা করিয়াছেন যে, যে সকল স্থানে "অমুকে বলেন" লেখা হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তাঁহাদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে জানিবে। যথা "মনু বলেন" —এ স্থানে জানিবে উহা মনুর উক্তি। কাজেই ভরদ্বাজাদি গ্রন্থকার কল্পনা করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই, তাহাদিগকে লইয়া পাঠকের সহিত শেষ পর্য্যন্ত ছলনাও করিয়াছেন।

কৌটিল্য মহাশয় স্বার্থবুদ্ধির উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অধর্ম্মাশ্রয়ী স্ত্রী, চর, নট ও নটী এবং সৈন্যাদির উপকরণে তাঁহার অর্থশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। শাস্ত্রখানি সার্থকনামা। কূট-কল্পনাকে অবাধগতি দেওয়া হইয়াছে। 'Journey to the Moon'এর ন্যায় উদ্ভট অথচ যেন সত্যমূলক কল্পনায় গ্রন্থখানি পূর্ণ। অবরুদ্ধ নগর হস্তগত করিবার জন্য অন্যান্য উপায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি উপভোগ্য :—

"শত্রুর প্রাচীর-গাত্রস্থ বাসা হইতে শকুনি, কাক, তোতা, ময়না, পায়রা প্রভৃতি পাখী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের লেজে দাহ্যমান বারুদাদি সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দুর্গাভিমুখে ছাড়িয়া দিবে।"

"অবরুদ্ধ দুর্গাভ্যন্তরবর্ত্তী চরগণ, বাঁদর, বেজী, বিড়াল, কুকুরের লেজে দহনশীল গুঁড়া বাঁধিয়া তাহাদিগকে খড়ো ঘরের উপর ছাড়িয়া দিবে। শুক্না মাছের পেটের ভিতর আগুণ দিয়া তাহাও বানরের হাতে দেওয়া যাইতে পারে"— ইত্যাদি।

দুর্গজয়ের পক্ষে এ উপায়গুলি যেমন হাস্যকর তেমনি যে অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। হয়ত হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধ করার গল্প গ্রন্থকার ভুলিতে পারেন নাই এবং নিজের উপন্যাসেও তাহা কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসেও যেমন সত্যিকার আচার ব্যবহার তাহার কাল্পনিক আচরণের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি কৌটিল্যের উপন্যাসের মধ্যেও তৎকালীন রাজধর্ম্ম মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তৎকালীন রাজধর্ম্মকে গৌরব দিবার উদ্দেশ্যে এগুলি কৌটিল্য লেখেন নাই, নিজের প্রতিপাদ্যের সঙ্গেই এমনভাবে চিরাচরিত প্রথা জড়িত আছে যে, তাহা সহজেই তাহাদের অন্তর্নিহিত নির্ম্মলতায় কূটনীতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পুঁথিখানি গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, মিথ্যা ব্যবহার, ধর্ম্মের ভান, ভণ্ড সন্ন্যাসী প্রয়োগ, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ, সমূহীকৃত আহার্য্যে বিষ নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির সবিস্তার বর্ণনা মাত্র। রাজ্যলোভে এই সকল পাপই অনুষ্ঠেয়। কিন্তু এমনি করিয়া রাজ্যলাভ করিবামাত্রই অন্য সুর আরম্ভ হইয়াছে।

"বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রজার দ্বারা পূর্ণ দেশ জয় করিয়া 'রাজ-কর্ত্তব্য' অনুযায়ী প্রজা পালন করিবে"। সে রাজকর্ত্তব্য কি ছিল তাহার বিবৃতিও কৌটিল্য দিয়াছেন।

রাজ কর্ত্তব্য—"রাজা যে-সমস্ত কার্য্যই করুন তাহার মূলে এই দৃষ্টি থাকিবে যে, প্রজার সুখেই তাঁহার সুখ, প্রজার শুভে রাজার শুভ। রাজার যাহা রুচি তাহা না করিয়া প্রজা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহাই করিবেন।"

স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে রাজার কর্ত্তব্য—"প্রজার দৈন্য উপস্থিত হয়, লোভ হয় বা অসন্তোষ হয়, এমন কোনও কার্য্য রাজা করিবেন না। যে রাজা অপর রাজাকে নিহত করিয়াছেন তিনি নিহতের ভূমি, দ্রব্য, পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি লোভ করিবেন না। মৃত রাজার আত্মীয় সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শত্রু-দুর্গ জয় করিয়া আহত, ভীত, অস্ত্রত্যাগী, আত্মসমর্পণ-কারী শত্রুবর্গকে কৃপা করিবেন।"

বিজিত দেশে শান্তি স্থাপনা—"যে রাজা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে সে অবিশ্বাস-ভাজন হয়, জাতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে বিজিত জনগণের বিশ্বাসেরই রাজা অনুবর্ত্তন করিবেন।"

বৈদেশিক শাসনের সীমা—"কোনও রাজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিলে বৈদেশিক শাসন (বৈরাজ্য) সূচিত হয়। পর-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী তাহাই যাহাতে এদেশ আমার নহে এই প্রকার জ্ঞান নিহিত আছে, যাহা দেশকে দৈন্য-পীড়িত করে, তাহার ধন হরণ করে, সমস্ত দেশটাই পণ্যস্বরূপ গণনা করে। যখন পরতন্ত্র শাসন-প্রণালী বিজিত দেশের অনুরাগ-বর্জ্জিত হয় তখনই উহার ধ্বংস হয়।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র লইয়া রাজনীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিক-দিগের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রধান হেতু গ্রন্থ-প্রণেতার মর্য্যাদা। চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম চক্রবর্ত্তী রাজা, তাঁহার মন্ত্রী চাণক্য। চাণক্যের কূটবুদ্ধির কথা সাহিত্যে ইতিহাসে নানাস্থানে উল্লিখিত আছে। সংগ্রহ মাত্রই যেমন ব্যাসের লেখা, কূটবুদ্ধি মাত্রেই তেমনি চাণক্যের। সেই চাণক্যের নিজের লিখিত রাজ-নীতিশাস্ত্রের একটা বিশেষ মূল্য আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রখানা যদি চাণক্যের লেখা না হয়, যদি উহা দায়িত্ব-হীন কোনও ঔপন্যাসিকের হয়, তাহা হইলে বিষয়টি অন্য আকার ধারণ করে। তাহা হইলে চাণক্যের নামহীন অর্থশাস্ত্রের নিজের মূল্য যেটুকু তাহার বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করিবার কারণ থাকে না।

"যিনি নন্দের নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করেন তিনিই" অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকার, এই উক্তির উপরে জোর দিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছেন যে অর্থশাস্ত্র চাণক্যের লেখা। কিন্তু গ্রন্থকার সর্ব্বত্র যে কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং সত্যের অমর্য্যাদা করিয়াছেন, নাম-সম্পর্কেও তাহার অন্যথাচরণ করা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার যিনিই হোন্—চাণক্যের নামে বইখানা চালাইয়া দিবার ইচ্ছায় এই যৎসামান্য মিথ্যাচরণ করা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যে গ্রন্থে মিথ্যাচারের ও বিশ্বাসঘাতকতার মনোহারী দোকান খোলা হইয়াছে, সে গ্রন্থের উক্তি অনুসারে গ্রন্থকার যে স্বয়ং চাণক্য, এ মত গ্রহণ না করাই সঙ্গত। নিজের পরিচয় ত গ্রন্থকার তিন রকমে দিয়াছেন। ভনিতায় "কৌটিল্য বলেন" বলিয়া গ্রন্থকার "কৌটিল্য" সাজিয়াছেন। তারপর "নন্দ হইতে পৃথিবী উদ্ধার-কারী" বলিয়া গ্রন্থকার "চাণক্য" হইয়াছেন। আবার "বিষ্ণুগুপ্ত" কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত ও টীকাকৃত বলিয়া গ্রন্থশেষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বিষ্ণুগুপ্তই হোন্ আর কৃষ্ণগুপ্তই হোন্, তিনি যে চাণক্যের নামে এই মেকী মাল চালাইয়া গিয়াছেন, এ প্রকার অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কোনও সত্যিকার রাজমন্ত্রী এই প্রকার উপন্যাসের পিতৃত্ব স্বীকার করিতে পারেন না।

সুবিধাবাদ ও কূটবাদ কোনও কোনও রাজার জীবনকে হয়তো মলিন করিয়াছিল, কিন্তু এইটুকুর বেশী আর কিছু স্বীকার করা যায় না। যে সকল হীন উক্তি কৌটিল্যে আছে, ঠিক সেই সেই বাক্য অথবা অনুরূপ উক্তি মহাভারত ও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতেও পাওয়া যায়। যে অজ্ঞাত লেখক কৌটিল্য নাম দিয়া অসদাচরণের শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারই মত মনোবৃত্তি যাঁহাদের, সেইরূপ লেখকেরাই যে দুর্নীতিপূর্ণ বাক্য মনুসংহিতায় ও মহাভারতে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহার প্রমাণ, এই সকল দুর্নীতি আবার মহাভারত ও মনুর দ্বারাই অস্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুগ যে সকল মহৎ রাজার জীবন্ত দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল, সে সকল জীবনের দৃষ্টান্তের কাছে কূটবাদীদের মসী মলিন হেয় মনোবৃত্তি সমাজকে পীড়িত করিতে পারে নাই। ভোগী ও সুবিধাবাদী দুর্নীতি-পরায়ণ রাজা উপযুক্ত নিন্দা ও তাচ্ছিল্যেরই পাত্র ছিল। বরঞ্চ ইহাই দেখা যায় যে, রাজাদের ভিতর দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া ছিল না—দ্বন্দ্ব ছিল—কে কত অধিক উন্নত আদর্শ অবলম্বনে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারে তাহাই লইয়া। কাশী ও কোশল-রাজের মধ্যে কে অধিকতর গুণবান্ ও প্রজারঞ্জক, ইহা লইয়া মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী কোন্ শিক্ষিত ভারতবাসী না জানেন?

রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন কৌটিল্যাদি ভোগের অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সমাজমধ্যে তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের পুণ্য-প্রবাহ দূষিত করিবার চেষ্টাও পরিলক্ষিত

হয়। মনুসংহিতার মধ্যেও প্রক্ষেপের আবরণে সমাজ-দেহ দূষিত করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান। দ্বিতীয় যুগের অত্যুজ্জল জ্ঞানালোকের প্রভায় এই সকল কুৎসিত চেষ্টা অন্ধকারে অজ্ঞাত লোকের মনোবৃত্তির ভিতরেই লুক্কায়িত ছিল। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল ভাব লেখার ভিতর প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তখন হইতেই পুরাতন প্রথার নামে সমাজ পীড়িত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। এই সকল দুষ্ট মনোবৃত্তির ফল দ্বিতীয় যুগে সম্পূর্ণভাবে দেখা না দিলেও বিপদের সূচনা যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সত্য।

ভারতবর্ষের বর্ণ-ধর্ম্ম

মনুসংহিতায় বৈদিকযুগের প্রথম পর্ব্বের যে ছাপ আছে তাহাতে দেখিতে পাই যে, এক বিরাট কল্পনা লইয়া বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। তখন এবং দ্বিতীয় যুগেও প্রধানতঃ এই বর্ণবিভাগ গুণানুগ ছিল। তবে দ্বিতীয় যুগেই মিশ্রভাব দেখা দেয়। বর্ণভেদের তেমন বাঁধাবাধি না থাকিলেও একদল ব্রাহ্মণ সাংসারিক মর্য্যাদা ও ভোগের প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ণবিভাগকে কঠিন করিয়া গুণানুবর্ত্তী করা অপেক্ষা বংশগত করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। অর্থশালী যজমান-বহুল ব্রাহ্মণ, ধনী গৃহস্থদের যজ্ঞ করিয়া বেড়াইতেছেন—ইহা দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে, বুদ্ধের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক রকমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইঁহারা রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়া কতকটা আজকালকার অসাধু মোহান্তদেরই আদর্শ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যের মর্য্যাদা দ্বারা ঐহিক ভোগবৃদ্ধির দিকেই ছিল ইঁহাদের চেষ্টা। ইঁহারা নিজেদের জীবনে যেমন সুখভোগ করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ইঁহাদের উত্তরাধিকারিগণও যাহাতে সেই ভোগ-সুখ স্বচ্ছন্দে প্রাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য নজীর, প্রমাণ ও শাস্ত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থের ভিতরে নিজেদের দূষিত মনোবৃত্তি গুপ্তভাবে প্রক্ষেপ করিতেছিলেন। গুণ-কর্ম্মানুযায়ী যে বর্ণ-বিভাগ তাহা যদি বংশানুক্রমিক হয়, তবে তাহার আর আদর্শ স্থির থাকে না, নির্গুণ ব্যক্তি ও গুণীর অধিকার ভোগ করিবার জন্য নির্লজ্জ চেষ্টা করে। প্রথম যুগে দেখিতে পাই যে, সমাজে যাহার যত অধিক দায়িত্ব, অপরাধ করিলে তাহার তত অধিক দণ্ড। কিন্তু লোভী ও অবনত ব্রাহ্মণের চিত্ত-বৃত্তির দ্বারা কলুষিত সেই মনুতেই আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ যদি চুরি করে, ব্যভিচার করে, নরহত্যা করে—তবে তাহার নামমাত্র শাস্তির বিধান। উচ্চবর্ণ যদি নিম্নবর্ণের প্রতি অসদাচরণ করে তবে তাহার কম শাস্তি, আর বিপরীত হইলে অর্থাৎ নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের প্রতি অপরাধ করিলে অধিক শাস্তি—অর্থাৎ প্রথম কল্পনার ঠিক বিপরীত কল্পনা বিদ্যমান।

"ব্রাহ্মণকে 'তুমি চোর' বা 'দস্যু' ইত্যাদি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে ক্ষত্রিয়ের ১০০ পণ, বৈশ্যের ১৫০ পণ দণ্ড হইবে। শূদ্রপক্ষে বিধি অঙ্গচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে তাহার শাস্তি ৫০ পণ, বৈশ্যকে বলিলে ২৫ পণ এবং শূদ্রকে বলিলে ১২॥০ পণ।" আবার ব্রাহ্মণ যদি ব্যভিচার করে তবে তাহার নামমাত্র দণ্ড, শূদ্র করিলে অবশ্যই প্রাণদণ্ড হওয়ার বিধান।

এই প্রকার মানসিক বৃত্তি তখনই হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, যখন বর্ণ-বিভাগের গুণাশ্রয়ী ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ণ-বিভাগের প্রথম পরিকল্পনায় বর্ণমধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের ভাব পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল না।

"পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ-বর্জ্জিত একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি স্বকর্ম্মে অশক্ত হইয়া প্রথমে শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহাতেও অশক্ত হইয়া বিত্তোপার্জ্জন-ক্ষম বৈশ্য জাতি সৃষ্টি করিলেন, তাহাতেও অশক্ত হইয়া শূদ্র, অর্থাৎ পূষণ, অর্থাৎ পৃথিবী যাহাদিগকে পুষ্ট করে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১১ ইত্যাদি।)

এই সূত্র কয়টিতে ব্রহ্ম আর ব্রাহ্মণ এক ধরা হইয়াছে। সমাজ আদিতে বিভাগ-বর্জ্জিত একমাত্র পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। সমস্ত লোকই ছিল ব্রহ্ম অথবা ব্রাহ্মণ। তাহাতে কাজ চলে না বলিয়া সমাজকে একে একে বলবান্ ক্ষত্রিয়, অর্থ-সংগ্রাহক বৈশ্য, ও ভূমিকর্ষণ এবং পরিচর্য্যাকারী শূদ্রে বিভক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র একই সমাজ দেহ, যাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ভূত। একটিকেও বাদ দিলে সমাজ চলে না। বর্ণ-বিভাগের এই উৎপত্তির বিবরণের মধ্যে ছোট-বড়র কথা নাই। সকলেই আবশ্যকতার তাড়নায় উৎপন্ন। কাহারও উদ্ভব শ্রেষ্ঠ, কাহারও উদ্ভব নিকৃষ্ট নহে। সকলেই একই স্থান হইতে উদ্ভূত—সে স্থান হইতেছে সমাজ-দেবতার হৃদয়। যতক্ষণ

না চারি বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছিল অর্থাৎ যতক্ষণ না কর্ম্ম ভাগ হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজ-দেবতা কার্য্য পরিচালনে অক্ষম ছিলেন।

কিন্তু বর্ণভাগ করিয়াই ব্রহ্ম নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। "ব্রহ্ম চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াও স্বকার্য্যে অসমর্থ হইয়া একটি কল্যাণময় উৎকৃষ্ট পদার্থ উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি? তাহাই হইতেছে ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম দ্বারাই অবলীয়ানেরা বলবান্‌কে আশংসা অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে।" (বৃঃ ১।৪।১৪) ব্রহ্ম চারি বর্ণ সৃষ্টি দ্বারাও স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্ম সৃষ্টি করাতে আমরা বুঝি যে, বর্ণ-বিভাগের সফলতা ধর্ম্মাচরণের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মাশ্রিত হইলেই বর্ণ-বিভাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অধর্ম্মাশ্রয়ী সমাজের জন্য বর্ণ-বিভাগ কল্পিত নহে। সমাজ-স্রষ্টা কত বড় আশ্বাসের কথা এই একটি বাক্যে রাখিয়া গিয়াছেন—"অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ।"

সমাজ হইতে যখন যে পরিমাণে ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে বর্ণ-ভাগও ব্যর্থ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এই বর্ণভাগ সৃষ্টি সম্বন্ধে যে স্বার্থপর অধর্ম্ম্য কল্পনা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা মনুসংহিতায় পাই।

"আদি পুরুষ ব্রহ্ম ভূলোকে প্রজা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, ও পাদ হইতে শূদ্র—এই বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন করিলেন।" কেবল ইহাই নহে—যেহেতু শূদ্র পাদ হইতে সৃষ্ট সেই হেতু তাহারা অতীব নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট বলিয়া বুদ্ধিমান্ মুখ ও বাহু পাদকে পঙ্গু করিবার যতই চেষ্টা করিয়াছে সমাজ-দেহকে এবং ধর্ম্মকে ততই পীড়া দিয়াছে। ধর্ম্মনীতি বিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণ যে স্থান নিজের জন্য গ্রহণ করেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়কেও অংশ দিতে হয়। যে আর্থিক সম্পদে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত লোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, রাজন্যগণ যে তাহাতে সমধিক আকৃষ্ট হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্নমুখী গতিবেগে রাজা পর-রাজ্য জয় করিয়া ধন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে। যদি কেহ আক্রমণ করে তবেই আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করণীয় ছিল। কিন্তু সে রকম প্রয়োজন তো নিত্যই হয় না। অথচ ধনবৃদ্ধির জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক। লোভী রাজার সঙ্গে লোভী ব্রাহ্মণ যুক্ত হইল। তাহার ফলে 'শত্রু' শব্দের এই সংজ্ঞা প্রস্তুত হইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী রাজা মাত্রেই স্বাভাবিক শত্রু এবং তাহাদের সম্বন্ধ হইল অহি ও নকুলের সম্বন্ধ। রাজ্যসীমার পরেই যাঁহার রাজ্য, তিনি যতই নির্ব্বিরোধ ও ধর্ম্মপরায়ণ হোন্ না কেন, এইরূপে তিনিই 'শত্রু' পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। রাজ্য-বৃদ্ধির ইচ্ছায় পর-রাজ্য আক্রমণ করিবার বিধান দেওয়ায় যে অহিত হয় তাহা কেবল লোভী রাজা ও লোভী ব্রাহ্মণেই আবদ্ধ থাকে না, পর-রাজ্যের প্রতি রাজার লুব্ধতা সমাজকেও সংক্রামিত করে। তাহাতে একে লোভপরায়ণ হইয়া অন্যের সম্পদ্ হরণ করিবার স্বাভাবিক আসুরিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-গৌরব, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দেওয়া প্রশংসিত ছিল। কিন্তু এই কর্ত্তব্য-স্পৃহা এতদূর ফাঁপাইয়া তোলা হয় যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই শ্লাঘ্য ও স্বাভাবিক বলিয়া কল্পিত হয় এবং রোগ-শয্যায় ব্যাধিতে ভুগিয়া মৃত্যু নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। যত ক্ষত্রিয় আছে সকলেই কি করিয়া যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে মরিতে পারে যদি অনুক্ষণ যুদ্ধের অবকাশ না থাকে? কাজেই রাজার মনে যেমন ধন-সংগ্রহের জন্য পর রাজ্য আক্রমণ অর্থাৎ দস্যুতা করার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, তেমনি ক্ষত্রিয়ের মনেও যুদ্ধে মৃত্যু-লিপ্সা উদ্রিক্ত হইয়া মণি-কাঞ্চন যোগের সৃষ্টি করে। এইরূপে সমাজের শত উচ্চ প্রেরণার মধ্যেও হিংসার দানব এক এক দিক দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার পথ করিয়া লয়। দ্বিতীয় যুগের অধর্ম্ম-যুদ্ধ সংঘটনের জন্য লোভী ব্রাহ্মণ ও লোভী রাজাই দায়ী।

দ্বিতীয় পর্ব্বে ব্রহ্ম-জ্ঞান

দ্বিতীয় যুগের এই যে লোভাশ্রয়ী মনোবৃত্তি, উহা একটা প্রতিঘাতমূলক ব্যাপার। একটা বিরাট বস্তুর অপরিসীম পবিত্রতার বিরুদ্ধে স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা ও কুটিলতার যুক্তি তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সেই বিরাট জিনিষটির পরিচয়ই দ্বিতীয় যুগের সত্য পরিচয়। আর্য্যদিগের ভাব-প্রবণ মনে যখন যে উন্নত ও বৃহৎ শক্তির সত্তা সাড়া দিয়াছে, তখনই তাঁহারা সেই মহত্ত্বের কাছে নত শিরে স্তুতি করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহারা আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, অগ্নিতে বিদ্যুতে সর্ব্বত্র দেবতা দেখিয়াছেন এবং এই শক্তিসমূহের তুষ্টির জন্য ও নিজেদের স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য

তাঁহাদের পূজা করিয়াছেন, যজ্ঞ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের মন তৃপ্ত হয় নাই। নানা শক্তির মধ্যে বৃহত্তর কিছু একটা পাইবার জন্য তাঁহাদের চিত্ত উদ্‌গ্রীব ছিল। সাধনার পর সাধনার ফলে এই নানা শক্তির অন্তস্থ ঐক্য তাঁহাদের সম্মুখে ধরা পড়ে। তাঁহারা অনুভব করেন যে, সেই শক্তি—যাহা তাঁহারা সর্ব্বত্র দেখিয়াছেন, সেই প্রকাশ—যাহা নানারূপে প্রকটিত হইয়াছে—সেই নানা শক্তি ও নানা প্রকাশ এক বৃহত্তর ঐক্যেরই অভিব্যক্তি। পৃথিবী তাঁহাদের এই নূতন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতায় স্বর্গলোকে পরিণত হয়। তাঁহারা গভীর প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বাসে ব্যক্ত করেন যে, সেই দেবতা যিনি বনস্পতি, ওষধি এবং বিশ্বভুবনে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি এক। তিনিই সেই এক যিনি স্রষ্টা, পাতা ও ধাতা। তিনি কেবল এক নহেন তিনি অদ্বিতীয়—তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপ্ত বিশ্বশক্তির অনুভূতিতেই তাঁহারা তৃপ্ত হন নাই; তাঁহারা আরও বিশেষ জানিবার জন্য চিন্তা করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া অপার আনন্দবশে অন্তরের প্রেরণায় তাঁহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন।

দেবতার স্তুতি ও যজ্ঞের সৃষ্টিতেই প্রাথমিক আনন্দের বিকাশ হইয়াছিল। যজ্ঞ যতই সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যজ্ঞের নিয়ম যতই মার্জ্জিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে একদল ভাবুক ততই অসন্তুষ্ট হইয়া ভাবিয়াছেন যে, এ নয়—এ ত কেবল স্বার্থের অনুসন্ধান করা হইতেছে; ইহকালে ভোগ এবং পরকালে সুখ এই কথা, এই ইচ্ছা লইয়াই মন ভোলানো হইতেছে—ইহা ত ঠিক নহে। এই প্রকারের ভাবনা হইতেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সেইজন্য যজ্ঞ-পদ্ধতি যে সকল "ব্রাহ্মণ" নামক বিধানখণ্ডে বিবৃত, সেই ব্রাহ্মণের ভিতরেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার বিরাট ভাবনা উপনিষদ নামে গ্রথিত হইয়া আছে। উপনিষদ্ সকল ঈশ্বরের, পরম ঈশ্বরের, জগৎ সৃষ্টির ও সৃষ্টির আদি-কারণের আলোচনায় পরিপূর্ণ।

বস্তুতঃ ভৌতিক জগতের ভিতর বৃহদ্দেবতার ঐক্য দেখিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা অন্তর খুঁজিয়া অন্তরের দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। যেদিন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রিয়তমা স্ত্রী মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় চাহিয়াছিলেন, সেদিন যেন দিক সকল প্রকাশের বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ভাবটিই বাক্যে প্রকাশিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, যে-ভাব ঋষিদের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহত্যাগকালে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—মৈত্রেয়ী, সপত্নী কাত্যায়নীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করাইয়া, তোমাদের বিত্ত ভাগ করিয়া দিয়া আজ আমি ঊর্দ্ধ আশ্রমে যাইব। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে মৈত্রেয়ী বলিলেন—তুমি আমাকে বিত্তের লোভ দেখাইতেছ। কিন্তু এই বিত্তপূর্ণা বিপুলা পৃথিবী যদি আমার হস্তগত হয়, তাহা হইলেই কি আমি অমৃত পাইব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, তাহা পাইবে না। উপকরণবান্‌দিগের যেমন ভোগময় জীবন হয়, তোমারও তেমনি হইবে। বিত্তের দ্বারা অমৃতের আশা কি প্রকারে মিটিবে?

মৈত্রেয়ী সেই অমৃতেরই প্রার্থী হওয়ায় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে অমৃতের স্বাদ দিবার জন্য যে ভোগবতী গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই গঙ্গা হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি অমৃত পান করিয়া জগতের লোক অমর হইয়া আসিতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে প্রথমেই আত্মার পরিচয় দিলেন। এই আত্মা সেই—যাহার প্রীতির জন্য অপর সকলে আমাদের প্রিয়। পুত্র বা বিত্ত আমাদের নিকট প্রিয় মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা তাহাদের জন্য আমাদের প্রিয় নহে, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্র ও বিত্ত আমাদের প্রিয়। পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়তর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সেই আত্মাকে জানা চাই। তাহাকে জানিলে সমস্ত জগৎকে জানা যায়।

আত্মা ও পরমাত্মা

"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"। জগৎকে আত্ম-স্বরূপে গ্রহণ করিবার উপদেশে এবং আপ্তকাম হইবার উপদেশে উপনিষদ্ পূর্ণ। মনুষ্যদেহে যেমন আত্মা আছেন যিনি বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রবণ করেন, দর্শন করেন ও ভোগ করেন, তেমনি এই বিশ্বজগতেরও আত্মা আছেন যিনি পরম আত্মা। সেই পরমাত্মা নেতি নেতি বলিয়া কথিত। (বৃঃ ৪।২।২)। সেই আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহা অশীর্য্য—কোনও প্রকারে শীর্ণ হয় না, অসঙ্গ ও অমিত—কিছুতে অবরুদ্ধ হয় না। মনুষ্য-হৃদয়াধিষ্ঠিত এই

আত্মা এবং পরমাত্মা একই বস্তু। (বৃঃ ২।৫।১৪)। তিনিই সর্ব্বভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। রথের নাভিরন্ধ্রে, রথের চক্রনেমিতে যেমন চক্রশলাকা-সমূহ সন্নিবেশিত থাকে, ঠিক তদ্রূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণ এবং উক্ত সমস্ত আত্মা এই আত্মায় সন্নিবেশিত।—'তদ্‌যথা রথা নভৌচ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেব।'

আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য-সম্পর্কের কথা বলিলেই সমস্ত বলা হইল না। আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই যে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, তাহার অনুভূতি আবশ্যক। সেই একই নিয়ম, বিশ্ব নিয়ম, যাহাতে নক্ষত্রলোক নিয়ন্ত্রিত, সূর্য্য যাহার আদেশ মানিয়া চলিতেছে, ভূতগণ যে নিয়মের অধীন থাকিয়া জীবন-ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, যে অমোঘ নিয়মে কার্য্য ও কারণ শৃঙ্খলিত, সেই নিয়মেই আত্মা ও পরমাত্মা একসূত্রে গ্রথিত। সে নিয়মের বাহিরে কোনও সৃষ্ট পদার্থ নাই, এবং স্রষ্টা স্বয়ং সেই নিয়মানুগ। সেই নিয়মেরই আর এক নাম ধর্ম্ম—তোমার ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম এবং বিশ্ব-ধর্ম্ম। প্রাণের স্পন্দনে যে গতি লীলায়িত, বিশ্বলোকও সেই একই নিয়মানুষ্ঠিত স্পন্দনে স্ব স্ব স্থানে স্ব-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। সেই এক, আনন্দরূপ এবং ভীতিপ্রদ নিয়ম তাঁহারা জানিয়াছিলেন।

"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠ—৬।৩

আত্মাকে ও পরমাত্মাকে এক বলিয়া ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মকে এক বলিয়া জানিতে হইলে ঐকান্তিক ইচ্ছার উদ্রেক হওয়া চাই। পুঁথি পাঠ করিলে ত ইহা জানা যায় না। মূঢ়েরা মনে করে ইষ্টাপূর্ত্তই হইতেছে বরিষ্ঠ—ইষ্টলাভের জন্য যাগাদি কর্ম্ম অথবা লোকহিতকর পূর্ত্তকর্ম্ম বাপী-কূপ খননাদি কর্ম্মই প্রধান কর্ম্ম। এই প্রকার যাহারা জানে তাহারা মূঢ়। বিরজাঃ-গণ, যাঁহাদের মন হইতে বাসনার রজঃ দূর হইয়াছে, তাঁহারাই সেই অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন যেখানে পরমাত্মা বাস করেন। 'প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষংব্যয়-মাত্মা।' কোনও অনুষ্ঠান দ্বারাই সে স্থান—সে অমৃত পাওয়া যায় না। যে পথে পাওয়া যায় তাহার প্রথম পাথের তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়াছেন যাঁহারা তপঃ ও শ্রদ্ধা সম্বল করিয়াছেন। 'নাবিরত দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ'—যাঁহারা দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই, যাঁহারা অশান্ত বা অসমাহিত, 'না শান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ,' যাঁহারা মন অচঞ্চল করেন নাই, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারাও ইহাকে প্রাপ্ত হন না। নানা ভাষায়, নানা উপমায় ঋষিরা সমাজকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, যোগ দ্বারাই ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে হয়। সে যোগ কি? তাহার প্রবেশ-দ্বারের সঙ্কেত হইতেছে—"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহঃ"। সে অহিংসা আবার কেমন? প্রাণী-বধে বিরতিতেই সে অহিংসার তৃপ্তি হয় না। অহিংসার পাঠ তিনিই লইয়াছেন যিনি স্থাবর অথবা জঙ্গম, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না, কাহারও ব্যথার সৃষ্টি করেন না, যাঁহার সম্মুখে যাঁহার প্রভাবে হিংস্র জীব-জন্তু পর্য্যন্ত হিংসা ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় যুগের যে ঋষিরা জ্ঞানাগ্নিতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাঁহারা কোনও অল্প ফলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; একেবারে শেষ পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছিয়াছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের তৃপ্তি ছিল না। ব্রহ্মকে যদি পাইতে হয় তাহা হইলে অকস্মাৎ জ্ঞানালোকে মুহূর্ত্তমাত্র উপলব্ধি নয়, একেবারে ব্রহ্মভূতি—ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াই ছিল তাঁহাদের সাধনা। ব্রহ্মের সহিত এক হইবার পথ পাইয়াই তাহা আকাঙ্ক্ষীয় সম্মুখেও তাঁহারা উপস্থিত করিয়াছিলেন। দুঃখের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহারা দুঃখান্ত করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু অল্প-স্বল্প দুঃখান্ত করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হয় নাই—সে প্রকার ক্ষণস্থায়ী দুঃখান্ত তাঁহাদের কাম্যও ছিল না। দুঃখান্ত বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন, একেবারে শাশ্বতকালের জন্য দুঃখান্ত—এমনি ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি যে, কোনও প্রকারের দুঃখ কোনও কালে আর উপস্থিত হইতে না পারে। মনুষ্য-জন্মকে অত্যন্ত শ্লাঘ্য জানিয়া তাই তাঁহারা ঐকান্তিক সুখ-প্রাপ্তির ও ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির প্রচুর আয়োজন করিয়া গিয়াছেন। তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য যে জলাশয়ের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাহা মাটির গড়া কোনও কূপ, বাপী বা তড়াগ নহে; তাহা প্রকৃতির সৃষ্ট মানস-সরোবর। সেই জ্ঞান-হ্রদের অমৃত পান করিয়াই আবহমান কাল মানুষ তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছে।

সমাজের ভিত্তি

ঋষিরা অলৌকিক আদর্শে যে-সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এতই প্রেমে প্রশস্ত, জ্ঞানে গভীর ও

ধর্ম্মে দৃঢ় যে, সে ভিত্তি লোপ পাইবার নহে। বিশ্ব-নিয়মের অনুবর্ত্তী করিয়া ঋষিরা সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা এত প্রলয় ও অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়াছে। সে ভিত্তির উপরিস্থ মন্দির বিদীর্ণ হইয়াছে, জীর্ণ হইয়াছে, আবার নূতন রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে, কিন্তু সে ভিত্তি কখনো নষ্ট হয় নাই। যে জ্ঞান সর্ব্বলোকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে সত্য, সেই জ্ঞান ভারতীয় আর্য্য-সমাজ ও ধর্ম্মের মূলে ছিল। সেই জ্ঞানের অধিকারীরা তাঁহাদের সম্পদ আমাদের জন্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মবৃত্তিই সেই সম্পদ।

ধর্ম্ম জিনিসটা তাঁহাদের কাছে 'নিঃশ্বসিতমিব' ছিল। উহা আর্য্য-ধর্ম্ম-স্রষ্টাদিগের সর্ব্বথা সঙ্গী ছিল। তাঁহারা এমন সম্পদ পাইয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহাদের মন সর্ব্ববিদ্যার অধিকারী হইয়াছিল। তাঁহাদের সে সম্পদ সমাজ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। যে পরিমাণে অসমর্থ হইয়াছে সেই পরিমাণেই বিক্ষেপ দ্বারা দুঃখ-ভাগী হইয়াছে, ইষ্টবস্তু ত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়ন ও বাপী কূপাদি খননই কাম্যজ্ঞান করিয়াছে, সেই পরিমাণেই আদর্শচ্যুত হইয়া রাজ্য ভোগ ও দেহ-ভোগের জন্য তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছে, বৈষয়িক বুদ্ধির ক্ষণিক মোহে ভ্রান্ত হইয়াছে। এই মোহের অভিব্যক্তির বিষয়ই কৌটিল্যাদির প্রসঙ্গে উত্থাপিত ও বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অভিব্যক্তি দ্বিতীয় পর্ব্বের আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত—উহা দ্বিতীয় পর্ব্বের ব্যতিক্রম মাত্র। তন্নিম্নে অপরা ও পরা বিদ্যার অমল জ্ঞান বিদ্যমান। "তত্রাপরো ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বেদঃ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতীষমিতি তথা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" দ্বিতীয় পর্ব্বে অপরা ও পরা বিদ্যার পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যাঁহারা সমাজ-রক্ষার জন্য ধর্ম্মাশ্রিত কামের স্তুতি করিয়াছেন, যাঁহারা বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক বিবাহে ধর্ম্মাচরণের জন্য ধর্ম্ম-পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভগবদর্পিত চিত্তে মৃত্যুকে জয় করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। তাঁহারা কর্ম্মফলের অমোঘত্বের কথা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, একটি চিন্তা—একটি বাক্য—একটি কর্ম্মও ব্যর্থ যায় না। কর্ম্ম ফল-প্রসব করিবেই। লোষ্ট্র ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে যে বিশ্ব-নিয়মে তাহার ভূতলে পতন অবশ্যম্ভাবী, সেই নিয়মেই কৃত-চিন্তা বাক্য ও কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যিনি বিশ্বের নিয়ন্তা তিনিই এই নিয়ম। নিয়ম এবং নিয়ামক অভিন্ন। তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন, মানুষ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল এ-জন্মে ভোগ করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ-ফল-প্রসবকারী কর্ম্মের সূচনা করিতেছে। ইহাই কর্ম্ম-বন্ধন। এই বিশ্বাস থাকিলে নরক ও শাস্তির ভয় দ্বারা সমাজ-বন্ধনের আবশ্যকতা থাকে না, স্বর্গে পরী প্রাপ্তির প্রলোভন আবশ্যক হয় না, utilitarian-বাদের কষ্ট-কল্পনা দ্বারা প্রমাণ করার আবশ্যক হয় না যে, সৎকার্য্যে সুখ, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুখার্থে সৎপথে থাকা আবশ্যক। কৃত কর্ম্মের ফল অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান করিয়া কেবল সেই বিশ্বাসে কেবলমাত্র স্বার্থবশেই সমাজ সকল রকম শাস্তির দুস্তর কল্পনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সৎকর্ম্মের জন্যই সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মই তাহার অধ্যাত্ম সন্তান। কুসন্তান কামনা না করার বৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি কর্ম্মফলে বিশ্বাসবান্ সমাজ স্বভাবতঃই কুকর্ম্মে বিরত হইয়া সাত্বিক ভাব অমলিন রাখিতে প্রয়াস পায়। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মবাদই দ্বিতীয় যুগের বিশেষ সামাজিক সম্পদ। এই বিশ্বাস ও বাদের ভিতরেই যত বৈদান্তিক ও বৈজ্ঞানিক, সাংখ্য ও দার্শনিক মতবাদের বীজ উপ্ত ছিল। সুতরাং শাস্ত্রের কথার ফাঁকে ফাঁকে যে সব কৌটিল্য-নীতির কথা পাওয়া যায়, তাহা কোনো কালেই ভারতের রাজনীতির আদর্শ ছিল না। তাহা কতকগুলি বিকৃত-রুচি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকের খেয়ালের ফলমাত্র। শাস্ত্রের ভিতর সেগুলি তাঁহারাই প্রক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতের ধর্ম্মাশ্রিত সমাজ ও ধর্ম্মাশ্রিত রাজ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের রাজনীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাই সে যুগের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে রাজনীতির কোনোখানে কোনো বিরোধই ছিল না। উপনিষদের যুগে ধর্ম্মনীতির উপরেই ভারতের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

—পক্ষধর মিশ্রের মত বড় নৈয়ায়িক ভারতবর্ষে কেউ নাই; তাঁর নামে মিথিলা গৌরবান্বিত, রাজ-সম্মান তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত, আর দেশ-বিদেশ-ব্যাপী খ্যাতি ও কীর্ত্তির গৌরবে তাঁর ললাট মণ্ডিত।

—নানা দেশ হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসে পক্ষধরের সঙ্গে তর্ক করিতে। পক্ষধর সভায় উচ্চ মঞ্চে বসিয়া থাকেন, তাঁর আসনের তলে ধাপে ধাপে বসে তাঁর শিষ্যগণ। তর্ক-যুদ্ধপ্রার্থী সকলে প্রথমে বিচার আরম্ভ করে সবার নীচু ধাপের শিষ্যের সঙ্গে। সেই বিচারে জয়ী হইলে সে, তার চেয়ে উঁচু ধাপে যে শিষ্য, তার সঙ্গে তর্ক করে; এমনি ধাপে-ধাপে সকল শিষ্যকে পরাজিত করিবার সৌভাগ্য যার হয়, সেই পক্ষধরের সঙ্গে বিচারের অবসর পায়। যাঁরা পর্ব্বত-প্রমাণ অভিমান লইয়া মিথিলায় আসেন, তাঁদের মধ্যে অল্প লোকই শেষ ধাপে পৌঁছিতে পারেন—পক্ষধরের কাছে গিয়া কেহই কোনও দিন জয়মাল্য কাড়িয়া লইতে পারেন না।

—যখন বিদেশী কোনও পণ্ডিত তাঁর কোনও শিষ্যের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হয়, তখন পক্ষধরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অন্য সময়ে তাঁর অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে তাঁর শিষ্যদের দিকে চাহিয়া। একটা উদাস ব্যথা তাঁর হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি রাজাকে বলেন, "শিষ্যের মত শিষ্য আমি পাইলাম না, আমার সারা জীবনের সাধনা বৃথাই গেল।"

—রাজা বলেন, "সে কি কথা পণ্ডিতবর, আপনার এক এক শিষ্য যে ভুবন বিজয় করিতে পারে। বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সব যে তাঁদের কাছে পরাজিত হয়!"

—পক্ষধর বলেন, "তা হয়, কিন্তু সে কেবল তারা আমার পাদপীঠের তলায় বসিয়া থাকে বলিয়া;—আমাকে ছাড়িয়া ওরা কিছুই নয়। ওরা আমার সুধু শিষ্য—শিষ্যই ওরা চিরদিন থাকিবে; আমার বিদ্যায় ওদের বিদ্যা, তার বেশী তো কোনও দিন হইবে না।"

রাজা হাসিয়া বলেন, "আকাশে এক রবি থাকে, তাতেই পৃথিবীতে আলো হয়। এমন যে শরতের চন্দ্র, তারও সূর্য্যের ধার-করা আলো বই তো নাই।"

পক্ষধর বলেন, "আমার বিশ্বাস যে, ওই চাঁদের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বুঝি সূর্য্যের প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার চেয়ে একবিন্দু একটা প্রদীপ, যে একটু নিজের আলো ছড়ায়, তাকে দেখিলেও বুঝি সূর্য্য তৃপ্ত হইয়া ওঠে। আমার মনে হয়, সূর্য্য বুঝি চাঁদের দিকে যুগযুগান্তর ধরিয়া আলো বর্ষণ করিতেছেন; আর সুধু এই আশায় তার মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন যে, কোনও দিন এই আলোর ঝরণার মাঝে হঠাৎ দপ্ করিয়া চাঁদের ভিতর তার নিজস্ব এক ফোঁটা আলো জ্বলিয়া উঠিবে! আমি তো তাই করি। শিষ্যের পর শিষ্য আসে, আপনাকে উজাড় করিয়া তাদের ভিতর আপনার বিদ্যা ঢালিয়া দিই—আশায় তাদের মুখ চাহিয়া থাকি,—তাদের ভিতর এককণা আগুনের ফুল্‌কি, একটু নিজস্ব বিদ্যা দেখিবার আশায়। এত দিন গেল মহারাজ, সে শিষ্য পাইলাম না।"

* * * *

—সে দিন পক্ষধরের মন ছিল ভয়ানক শ্রান্ত।—নবদ্বীপ হইতে এক মহাপণ্ডিত সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি পক্ষধরের সমীপবর্ত্তী শিষ্যের কাছে তর্কে পরাজিত হইয়াছেন। জয়মাল্য পক্ষধর-শিষ্য পাইয়াছেন। কিন্তু জয়লাভ করিয়া আনন্দ করা দূরে থাকুক, পক্ষধর তাঁর শিষ্যদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন,—সকলকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন।

রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, জয়মাল্য তো আপনারই আছে, তবু আপনার এ অসন্তোষ?"

পক্ষধর বলিলেন, "মহারাজ জয়মাল্য তুচ্ছ; হীনের সহিত সমরে জয়-পরাজয় সমান অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমার শিষ্যগণ আজ বিচারে যে অপটুতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে, তাতে আমার অন্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিপক্ষ পরাজিত হইয়াছে, সে সুধু ইহাদের চেয়ে বড় মূর্খ বলিয়া।"

দারুণ ক্রোধে ও ক্ষোভে পক্ষধর সভা ত্যাগ করিয়া গৃহে

গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার পথে দেখিতে পাইলেন—দ্বারদেশে এক সুদর্শন নগ্নশির যুবক বসিয়া আছে।

তাঁহাকে দেখিয়া যুবক বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া, সুললিত কণ্ঠে অনবদ্য উচ্চারণের সহিত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। সেই শ্লোকের দ্বারা যুবক নবদ্বীপবাসী রঘুনাথ শর্ম্মা নামে আপনার পরিচয় দিয়া বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পক্ষধর মিশ্রের পাদপ্রান্তে শিক্ষার্থী বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিল।

যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া পক্ষধর বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, এ শ্লোক কি তুমি স্বয়ং রচনা করিয়াছ?"

রঘুনাথ মন্দাক্রান্তার আর একটি শ্লোক সদ্যঃ রচনা করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিল।

আনন্দের সহিত পক্ষধর তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

* * * *

কিছুদিন পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আপনার চিত্ত কিছুদিন হইল অতি প্রফুল্ল দেখিতেছি। ইহা পরম আনন্দের বিষয়।"

পক্ষধর হাসিয়া বলিলেন, "সকল বস্তুর ন্যায় ইহারও কারণ আছে।"

"জানিতে পারি কি?"

"অবশ্য। কথাটা এই যে, এতদিনে মনে হইতেছে—বুঝি বা আমার জীবন সার্থক হইবে—যোগ্য শিষ্য পাইয়াছি।"

"যোগ্য শিষ্য পাইয়াছেন সে আনন্দের কথা। আপনার আনন্দে আমারও আনন্দ। কিন্তু তাহা না হইলে কি আপনার জীবন এতই অসার্থক হইত?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পক্ষধর বলিলেন, "তুমি বুঝিতে পার না মহারাজ—এ কি আনন্দ! এতদিন আমি আমার বুদ্ধির লৌহখণ্ড দিয়া শিষ্যদের মনে আঘাত দিয়া আসিয়াছি;—কাদার মত তাদের মন,—সে লোহার দাগ তাদের ভিতর বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এ শিষ্য তেমন নয়—ইহার মন চকমকি পাথর—ঠোকা মারিলে আগুন ঠিকরিয়া পড়ে। আমি যা দিই সে সুধু তাই গ্রহণ করে না, তার প্রতিঘাত করে। এমন শিষ্য না পাইলে গুরুর জীবনই বৃথা।"

রাজা বলিলেন, "আপনার মুখে এমন প্রশংসা যে লাভ করিতে পারিয়াছে তার জীবন ধন্য! তাহাকে একবার আমাকে দর্শন দিতে বলিবেন।"

পক্ষধর বলিলেন, "কাল বিচার-সভায় সে বিচারের আসনে বসিবে।"

* * * *

সেদিন সভায় আসিয়াছিলেন বারাণসীর এক শ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপক। পক্ষধর অভ্যাসমত শিষ্যবেষ্টিত উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করিলেন। সবার নীচু ধাপে বসিলেন নূতন শিষ্য রঘুনাথ।

বিচারের বিষয় হইল—শব্দ নিত্য কি না? সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহা ভারতীয় দর্শনের একটা গুরুতর জটিল সমস্যা—বহু বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইহা লইয়া মাথা-ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়াছেন।

বারাণসীর পণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিলেন—শব্দ অনিত্য। রাশি রাশি যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণাদি দিয়া তিনি তাঁর বক্তব্য এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, সভাস্থ সকলের মনে হইল, ইহার উত্তর কিছুই নাই। পক্ষধরের শিষ্যগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাহারা এ বিষয়ে যে সব যুক্তি দিতে অভ্যস্ত ছিল, এই পণ্ডিত সে সব যুক্তি উপস্থিত করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহা এমন সুনিপুণভাবে খণ্ডন করিলেন যে, তাহারা ভাবিতে লাগিল—এ সব নূতন কথার কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে। যদি তারা সদুত্তর দিতে না পারে, তবে একদিকে সভায় লাঞ্ছনা, আর একদিকে গুরুর তিরস্কারের ভয়ে তাহাদের অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বপক্ষ স্তব্ধ হইলে সভাস্থল উৎকণ্ঠিত চিত্তে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যখন পক্ষধরের মঞ্চের পাদপীঠে বসিয়া রঘুনাথ ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠে তার উত্তর দিতে আরম্ভ করিল, তখন তার মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বরে পুলকিত হইলেও, সভাস্থ সকলে কল্পনা করিতে পারিল না যে এই ক্ষুদ্র বটু ঐ প্রকাণ্ড পণ্ডিতের অতুলনীয় যুক্তি-পরম্পরার কি উত্তর দিতে পারে। কিন্তু ক্রমে যখন রঘুনাথ পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্ম তর্কাঘাতে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন সমস্ত সভা অবাক্ বিস্ময়ে

চাহিয়া রহিল। পুলকে পক্ষধরের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তিনি তাঁর শিষ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অবিরল ধারায় সুললিতকণ্ঠে বাগ্মী রঘুনাথের বাক্য-লহরী যতক্ষণ বহিয়া গেল, সভাস্থলে ততক্ষণ ছিল শূন্য গভীর নিস্তব্ধতা;—সকল চক্ষু,সকল কর্ণ পড়িয়াছিল রঘুনাথের মুখের উপর—সকল কণ্ঠ ছিল স্তব্ধ। যখন রঘুনাথ নীরব হইল, তখন শতকণ্ঠে "সাধু সাধু" রবে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। পক্ষধর তাঁর মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁর পাগড়ীতে বাঁধা ফুলের মালা খুলিয়া রঘুনাথের মাথায় পরাইয়া দিলেন। রঘুনাথ নতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়া গুরুর পাদবন্দনা করিল।

তার পর পূর্ব্বপক্ষ তার উত্তর দিলেন। একটা বালকের হাতে তাঁর যুক্তিজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া তিনি এত মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁর আর শান্ত-ভাবে তর্ক করিবার বা নূতন যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তিনি করিলেন সুধু ব্যঙ্গ ও পরিহাস—শীলতাবিরুদ্ধ গালাগালি। অর্ব্বাচীন বালক, পরান্নপুষ্ট, পরোপজীবী ভিক্ষুক বলিয়া রঘুনাথকে গালি দিলেন; শিশুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া বিচারে পরাঙ্মুখ বলিয়া পক্ষধরকে ব্যঙ্গ করিলেন এবং অল্পবিস্তর সকলকেই গালিগালাজ করিলেন। বিচার শেষ হইল, রাজা রঘুনাথকে জয়মাল্যে ভূষিত করিলেন।

* * * *

পক্ষধরের আজ আনন্দের সীমা নাই। তিনি রঘু-নাথকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া গলদশ্রুলোচনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "দেব, আপনি মিথ্যা বলেন নাই; আপনার শিষ্য আপনার গৌরব রক্ষা করিবে।"

আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পক্ষধর বলিলেন,"সুধু রক্ষা করিবে না মহারাজ—আমার গৌরব এ শিষ্য মলিন করিয়া দিবে।"

বিনীত ভাবে রঘুনাথ বলিল, "দেব, এ আপনার স্নেহের অত্যুক্তি! এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই।"

কপট রোষে পক্ষধর বলিলেন, "সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি তোমার না থাকে বালক, তবে আমি তোমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দিব। জানো না মূঢ়,

সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ!

তোমার কাছে সে পরাজয় আমার কাম্য।"

আনন্দাশ্রু রঘুনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। সে পক্ষধরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া হাসি মুখে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য!"

* * * *

রঘুনাথের ভবিষ্যৎ লইয়া পক্ষধর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে পথে চলিয়াছিলেন স্নানার্থ!

হঠাৎ শুনিতে পাইলেন তাঁর সম্মুখে দুইজন সেদিনকার সভার কথাই আলোচনা করিতেছে।

একজন বলিল, "জীবনে এমন বিচার দেখি নাই। এমন অপূর্ব্ব বাক্‌চাতুরী, এমন অপরূপ ভাষার ছটার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির এমন গাঁথুনী কোনও দিন কারও দেখি নাই। এ যুবক ক্ষণজন্মা।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "আমার মনে হয় কি জান? রঘুনাথ যদি না থাকিত, তবে আজ পক্ষধরের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইত। ওই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এমন সুন্দর উত্তর পক্ষধর দিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "পারিতেন কি না জানি না, কিন্তু গত দশ বৎসর তাঁর অনেক বিচার শুনিয়াছি, কোনও দিন এমন যুক্তির উত্তর দিতে দেখি নাই।"

পক্ষধর চাহিয়া দেখিলেন, ইহারা দুইজন রাজার সভারই পণ্ডিত।

ঘন-কৃষ্ণ মেঘে পক্ষধরের চিত্ত সহসা আচ্ছন্ন হইয়া গেল—নিদারুণ জ্বালায় অন্তরের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিল। দন্তে অধর দংশন করিয়া দৃপ্ত পদবিক্ষেপে তিনি ঘাটে গিয়া স্নান সমাধা করিলেন। সন্ধ্যা করিতে গিয়া মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। আহার করিতে বসিয়া খাইতে পারিলেন না।

সে দিন যখন রঘুনাথ পাঠ লইতে আসিল, তখন গুরু সুধু নূতন গ্রন্থের আদ্য ও অন্ত্য অংশ পড়িয়া তাহার হাতে ফিরাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ তিনি রঘুনাথের সঙ্গে বিচার করিয়া পড়াইতেন।

* * * *

রঘুনাথের অশ্রুতপূর্ব্ব সম্মান লাভে পক্ষধরের শিষ্য-মণ্ডলীর মন তার উপর নিদারুণ হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল।

এতদিন যারা গুরুর বড় বড় চেলা বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছিল, তাহারা আপনাদিগকে অযথা লাঞ্ছিত বোধ করিল।

আপনা-আপনির মধ্যে তাহারা পরস্পরের কাছে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিল যে, তাহাদের যে কেহ রঘুনাথের চেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তর দিতে পারিত—এবং রঘুনাথের যুক্তির ভিতর রাশি রাশি ভুল বাহির করিয়া ফেলিল। কিন্তু তবু প্রত্যেকে আপনার মনের ভিতর নিদারুণ জ্বালার সহিত অনুভব করিল যে, রঘুনাথ যাহা করিয়াছে তারা কেহই তাহা পারিত না; - কাজেই রঘুনাথের উপর তাহারা আরও বেশী চটিয়া উঠিল।

* * * *

পক্ষধরের শিষ্য সভাপণ্ডিত সৃষ্টিধর আসিয়া গুরুর কাছে রঘুনাথের কথা পাড়িলেন। প্রথমে তিনি শতমুখে রঘুনাথের মেধার প্রশংসা করিলেন। পক্ষধর শুধু বলিলেন "হুঁ।"

আর এক মাত্রা চড়াইয়া প্রশংসা করিতে পক্ষধরের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি নীরব রহিলেন। তখন সৃষ্টিধর সন্তর্পণে বলিলেন, "কিন্তু ওই যুবক বড় দাম্ভিক—দম্ভটা একটু দমন করিতে না পারিলে উহার মেধা নিষ্ফল হইতে পারে।"

পক্ষধর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সৃষ্টিধরের দিকে চাহিলেন—একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "প্রতিভা থাকিলেই লোকে দাম্ভিক হয়। যার দম্ভ নাই সে কখনও বড় হয় না।"

সৃষ্টিধর সেদিনকার মত চুপ করিয়া গেল।

তার পর আর একদিন আসিয়া অপর এক শিষ্য শশধর বলিল, "রঘুনাথ বলিয়াছে, মিথিলায় পণ্ডিত নাই—মিথিলার পণ্ডিত আর বন্ধ্যার পুত্র একই কথা।"

পক্ষধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিলেন। শশধর আরও অনেক কথা বলিয়া গেল। শেষে পক্ষধর বলিলেন, "রঘুনাথ ঠিক বলিয়াছে—আমার অভাবে মিথিলার পণ্ডিত বন্ধ্যাপুত্র বা শশবিষাণের তুল্য হইবে।"

আর একদিন একটি ছাত্র আসিয়া বলিল, আজ রঘুনাথের এক পুঁথির ভিতর একটি শ্লোক লেখা দেখিলাম—

"খদ্যোতোদ্যুতিমাধত্তে সতি রবিচন্দ্রমসি
কথং ন পক্ষধরীচ্চ—"

পক্ষধর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ লিখিয়াছে এই শ্লোক। এত অক্ষম সে নয়। তোরা কি আমাকে এত মূর্খ ভাবিস মূঢ়, যে তোদের এই শঠতা আমি বুঝিতে পারিব না?"

কিন্তু, তবু দিনের পর দিন এমনি সব কথা শুনিয়া শুনিয়া পক্ষধরের মনের ভিতর একটা নিদারুণ জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বালা তাঁর অন্তরেই ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল—বাহিরে তাহা কেহ জানিল না।

শেষে একদিন রঘুনাথ আসিয়া বলিল, "দেব, আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, বিদায় প্রার্থনা করি।"

পক্ষধরের অন্তরে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। তিনি অযথা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "স্পর্দ্ধিত যুবক, ইহারই মধ্যে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে কর!"

রঘুনাথ দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করুন।"

"উত্তম, পরশ্ব প্রভাতে সপ্তশলাকা করিয়া তোমার উপাধি দান করিব।"

"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া রঘুনাথ প্রস্থান করিল।

* * * *

পরীক্ষার জন্য পক্ষধরের সকল প্রবীণ শিষ্য প্রাণপণে প্রস্তুত হইল। পক্ষধরের পরীক্ষার প্রণালী এই ছিল যে, পরীক্ষার্থীকে সকল শিষ্যের সহিত বিচার করিতে হইত। সকলকে বিচারে পরাস্ত করিলে তবে উপাধি। তাই সকল শিষ্য প্রাণপণ সঙ্কল্প করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল, কিছুতেই যেন রঘুনাথ জয়ী না হয়।

পক্ষধর তাঁর উচ্চ মঞ্চের উপর বসিলেন, নিম্নে ধাপে ধাপে তাঁর শিষ্যগণ।

রঘুনাথ একে একে শিষ্যদের সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিল। একে একে সকলে পরাস্ত হইতে লাগিল। পক্ষধর উত্তরোত্তর বিচলিত হইতে লাগিলেন।

কেবলি তাঁর মনে হইল, অসাধারণ দাম্ভিক এই যুবক,—কাহাকেও যেন তৃণতুল্য জ্ঞান করে না!

এত স্পর্দ্ধা সে মিথিলা হইতে অনায়াসে বহন করিয়া নবদ্বীপে লইয়া যাইবে?

শেষ শিষ্যের সঙ্গে বিচারের সময় পক্ষধরের ললাট স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁর আসনের সীমাদেশে

আসিয়া অগ্রসর হইয়া বসিলেন—একবার হঠাৎ আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁর শিষ্যকে উৎসাহদানচ্ছলে উত্তরের ইঙ্গিত করিয়া দিলেন।

তবু রঘুনাথ জয়ী হইল।

রঘুনাথ তখন গুরুদেবকে বলিল, "দেব, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি—আশীর্ব্বাদ করিয়া উপাধি দান করুন।"

সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল, পক্ষধর তাঁর আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। ত্রস্ত পদক্ষেপে তিনি মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া বিচারের আসনে বসিয়া বলিলেন,

"দাম্ভিক যুবক, তোমার পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, আমার সঙ্গে বিচার করিতে হইবে।"

রঘুনাথ গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "উত্তম, আমি প্রস্তুত।"

সকল শিষ্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সংবাদ পাইয়া বাহির হইতে লোক আসিয়া জমিল। অন্তঃপুরিকারা দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। পক্ষধরের সহিত রঘুনাথের বিচার আরম্ভ হইল।

পক্ষধর পূর্ব্বপক্ষের প্রস্তাব করিলেন। তাঁর অলোক-সামান্য প্রজ্ঞা, সীমাহীন পাণ্ডিত্য ও লোকপ্রথিত বাগ্মিতায় সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তিনি নীরব হইলে রঘুনাথ স্মিত-হাস্যে গুরুর সকল যুক্তি বিচূর্ণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিল। তার স্পর্দ্ধা ও পাণ্ডিত্য সকলকে সমান মুগ্ধ করিল।

পক্ষধর দীর্ঘ প্রত্যুত্তর দিলেন ; সবাই ভাবিল—ইহার পর আর রঘুনাথের বলিবার কিছু নাই—তার সকল যুক্তি নিঃশেষে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনাথ অবলীলাক্রমে সে যুক্তির অরণ্য ভেদ করিয়া এমন সব নূতন নূতন সমস্যা পূর্ব্বপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিল, যাহার কোনও উত্তর উপস্থিত কোনও পণ্ডিত ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু পক্ষধর তাহাতে বিচলিত হইলেন না। উত্তরে তাঁর বক্তৃতার অন্তে বেলা গড়াইয়া পড়িল, সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রহিল।

পরের দিন আবার বিচার আরম্ভ হইল। আজ আর মিথিলায় লোক বাকী ছিল না, সকলে আসিয়া পক্ষধরের গৃহে ও প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।—এমন একটা তর্কযুদ্ধ হইল, যাহার তুলনা কাহারও মনে পড়িল না।

পক্ষধর উত্তরোত্তর অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ ধীরভাবে তাঁর সমক্ষে উত্তরোত্তর অধিক কঠিন ও অসমাধ্যেয় সমস্যা উপস্থিত করিতে লাগিল।—পক্ষধর অনুভব করিলেন আর তাঁর যুক্তি চলে না।

রঘুনাথের শেষ উত্তরের পর পক্ষধর হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে তাহাকে গালাগালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মূর্খ, শাস্ত্রের মর্ম্ম জান না। তোমার উত্তর উত্তরই নয়—তুমি পরাজিত। কোনও উপাধি তুমি পাইবে না,—দূর হও।"

সভাস্থ সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তর্কের শেষ অবস্থায় যে সকল সূক্ষ্ম অভিনব নৈয়ায়িক যুক্তি লইয়া উভয় পক্ষে নাড়াচাড়া হইতেছিল, অতিবড় পণ্ডিত যাঁরা তাঁরাও তার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই—পরস্পরের কথা বুঝিতেছিলেন কেবল রঘুনাথ ও পক্ষধর। সুতরাং প্রকৃত জয়ই বা কার হইল, পরাজয়ই বা কার হইল, কেহ বুঝিল না। কিন্তু যখন পক্ষধর বলিলেন রঘুনাথ পরাজিত, তখন সকলে পরম স্বস্তির সহিত বুঝিল—রঘুনাথ সত্য সত্যই হারিয়াছে।

রঘুনাথ বুঝিল সে জয়ী, তার গুরু অন্যায় করিয়া তাহাকে জয়ের ফলে বঞ্চিত করিলেন। একটা ভীষণ আক্রোশ অন্তরে বহিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্র দৃষ্টিতে সে পক্ষ-ধরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়া গেল—তার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। পথে চলিতে চলিতে সে শুনিতে পাইল, নাগরিকের দল এই তর্ক-যুদ্ধের কথা আলোচনা করিতেছে।

কেহ বলিতেছে "বাবা, ঘাগী বুড়োর সঙ্গে ডেঁপোমী! পক্ষধর মিশ্র—সে তোমার মত দশটা রঘুনাথকে গেঁতলে নস্য বানিয়ে দিতে পারে।"

একজন বলিল, "তবু বলি, ছেলেটা বাহাদুর—পক্ষধর মিশ্রের সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক কেউ কখনও করে নি।"

উত্তর হইল, "আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ—ও কেবল মাছ মারার আগে খেলিয়ে তোলা! পক্ষধর ইচ্ছা ক'রলে ওকে এক দণ্ডে টিপে মেরে ফেলতে পারতেন। যে সে নয় বাবা, পক্ষধর মিশ্র।"

আর একজন বলিল, "আর বেটার কি বক্তিমে—কি

তেজ”—বলিয়া রঘুনাথের বক্তৃতা বিকৃত করিয়া ভেঙ্গাইতে লাগিল—“কিন্তু ও-সব চালাকী এখানে চলে, বাবের ঘরে ঘোগের বাসা! এটা নদে' নয়, এ মিথিলা—পক্ষধরের মিথিলা।”

অপর একজন বলিল, “জোনাকীর স্পর্দ্ধা রবির সঙ্গে পাল্লা দিবে।”

এই সব আলোচনার প্রত্যেকটি কথা তপ্ত শলাকার মত রঘুনাথের অন্তর বিদ্ধ করিতে লাগিল—সে অক্ষম রোষে দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল।

সারাদিন সে নির্জ্জন পথে পথে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইল। দারুণ জিঘাংসায় চিত্ত ভরিয়া উঠিল, মূঢ় অধর্ম্মাচারী গুরুর উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে ব্যাকুল হইল—কিছুতে মন শান্ত হইল না, যোগ্য প্রতিহিংসার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইল না। গভীর রাত্রে সে উন্মত্তের মত অবস্থায় পক্ষধরের গৃহে ফিরিল।

* * * *

পরের দিন প্রভাতে পক্ষধরের ছাত্রেরা জটলা করিয়া উৎসাহের সহিত পূর্ব্বদিনের কথার আলোচনা করিতেছিল। রঘুনাথের লাঞ্ছনায় তাদের আনন্দ তারা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

তাহাদের আলোচনার ফলে সাব্যস্ত হইয়া গেল, রঘুনাথ একটা দাম্ভিক মূর্খ—তার স্পর্দ্ধার উচিত শাস্তি হইয়াছে।

অনেকগুলি পণ্ডিত ও নাগরিক সেখানে উপস্থিত ছিল; নানা বিষয়ে পক্ষধরের উপদেশের আকাঙ্ক্ষায়—এমন রোজ থাকিত। তা ছাড়া বহু পণ্ডিত আজ বিশেষ নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে পক্ষধরের শিষ্যদের সঙ্গে একমত হইয়া রঘুনাথের স্পর্দ্ধার নিন্দা করিতে লাগিলেন।

সহসা সকলে চমকিত হইয়া দেখিল—অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন পক্ষধর, তাঁর পার্শ্বে রঘুনাথ।

মঞ্চের উপর তাঁর আসন গ্রহণ করিয়া পক্ষধর রঘুনাথকে পার্শ্বে বসাইলেন—সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

পক্ষধর নতমস্তকে ধীরভাবে বলিলেন, “কা'ল বিচার-সভায় ঈর্ষা ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। কা'ল তর্কে জয়ী হইয়াছেন রঘুনাথ, আমি স্বুধু বাগাড়ম্বর করিয়া আমার পরাজয় ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—শেষে পরাজয়ের লজ্জা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়াছি। আমি সর্ব্বজন-সমক্ষে আমার অপরাধ স্বীকার করিয়া আজ তাকে উপাধিমণ্ডিত করিতেছি।”

কৃতজ্ঞতায় প্রশংসায় রঘুনাথ পক্ষধরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন

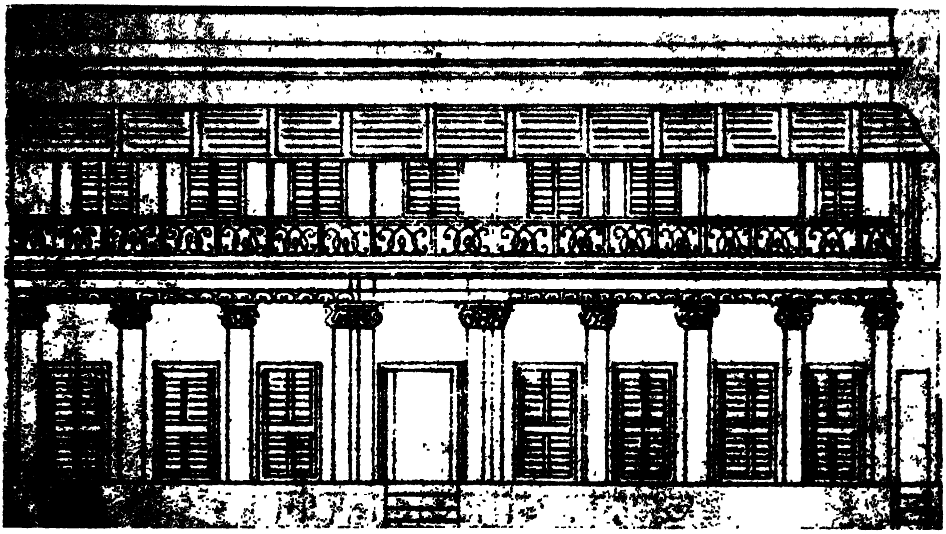
শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ভারতের যে একটা বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল, ইয়োরোপীয়েরা, যে কোন কারণেই হউক, তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, রাজনীতি সমাজনীতি, নৌবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—এ সকলই তাঁহাদের মতে,—ধার করা এবং আধুনিক। ইয়োরোপীয় সমালোচকেরা ভারতীয় সভ্যতার যে কোন অঙ্গেরই আলোচনা করিতে বসুন না কেন, তাহা যে নিতান্ত খেলো জিনিস, এবং তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও ভারতের নিজস্ব নহে—ধার করা—এইটী প্রমাণ করিবার জন্যই যেন তাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার এইরূপ সমালোচনা আমরা প্রধানতঃ ইংরেজ লেখকদের লেখা হইতেই জানিতে পারি। অর্থাৎ ইংরেজ লেখকদের মূল রচনা, এবং অপর দেশীয় লেখকদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ বা reference বা উদ্ধৃতাংশ আমাদের প্রধান সম্বল। এই সকল সমালোচক প্রথমতঃ নিজেদের দেশের সভ্যতাকেই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে সমুৎসুক। আর, যেখানে হালে পানি পায় না, অর্থাৎ যুক্তি, তর্ক, ঐতিহ্য—কোন কিছুর দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশী সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতার উপরে দাঁড় করাইতে পারেন

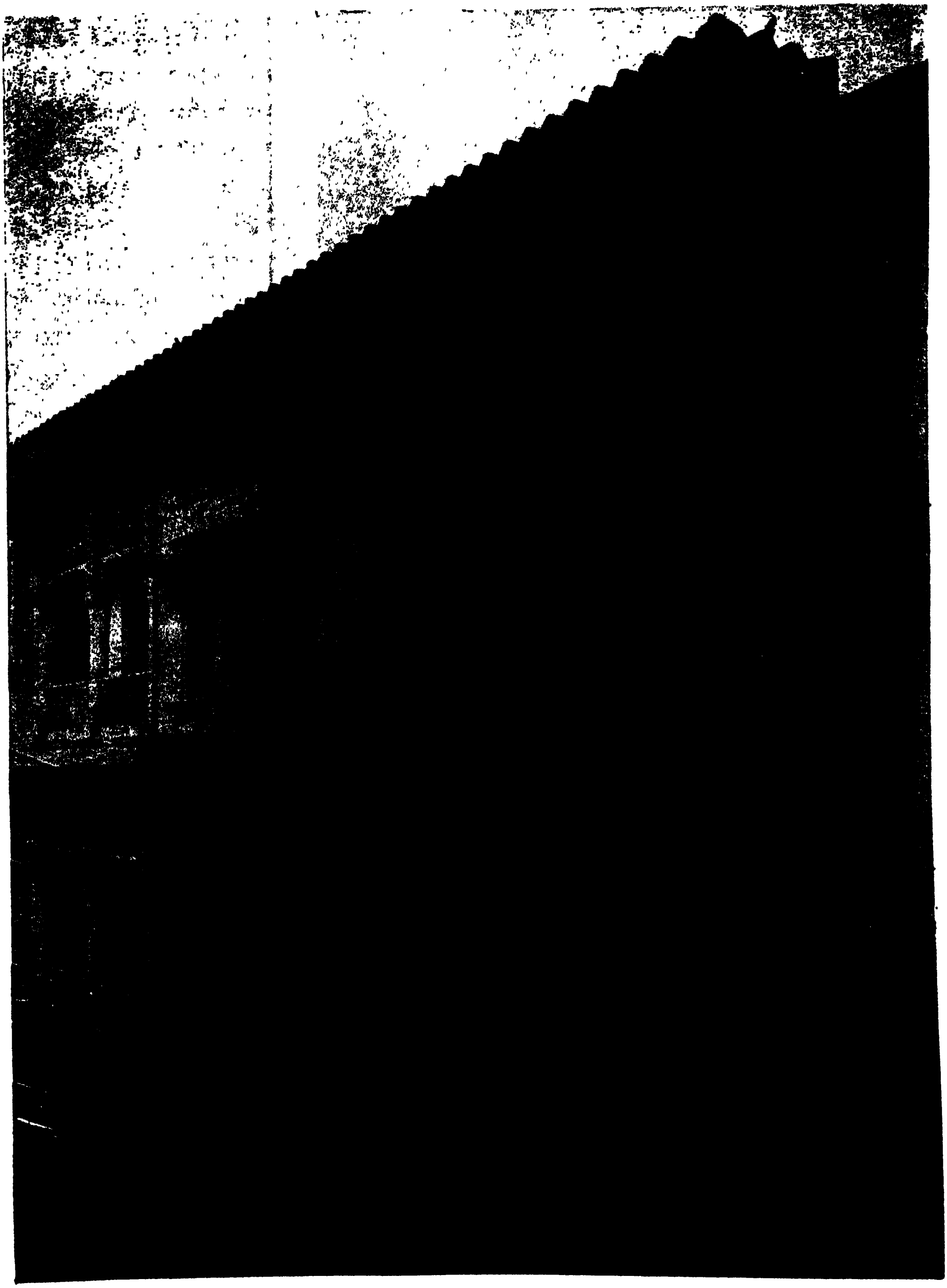
না, সে সকল স্থলেও—কেবল ভারতীয় সভ্যতাকে খাটো করিতে হইবে বলিয়াই যেন—প্রাচীন গ্রীক, রোমক, এমন কি মিশরীয়, চৈনিক বা আরবী সভ্যতাকেও ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ বলিয়া খাড়া করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন।

ইহা গেল বিদেশীদের কথা। এ সম্বন্ধে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকের আচরণ দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই শ্রেণীর শিক্ষিত ভারতীয়েরা চটকদার ইয়োরোপীয় সভ্যতার মোহে এমনই আত্মবিস্মৃত যে, স্বদেশের কোন কিছুরই সন্ধান না লইয়াই তাঁহারা ইয়োরোপীয় সমালোচকদের সিদ্ধান্তেই অম্লান বদনে সায় দিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় সমালোচকেরা নিজেদের সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধে একটু আধটু অনুসন্ধানের ভানও অন্ততঃ করিয়া থাকেন, এবং বিকৃত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সে সকল বালাই কিছুই নাই। নিজেদের হীন বলিয়া ধারণা করিবার পূর্ব্বে, সে হীনতা কিসে এবং কোথায়, তাহার অনুসন্ধানের কোনই প্রয়োজন তাঁহারা দেখিতে পান না। যেহেতু তাঁহাদের ইয়োরোপীয় গুরুরা ভারতীয় সভ্যতাকে খাটো করা বলিয়াছেন, অতএব তাহার অন্যথা কিছুতেই হইতে পারে না। তাঁহাদের এই যে অন্ধ বিশ্বাস, ইহা শুধু তাঁহাদের লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান করে মাত্র।

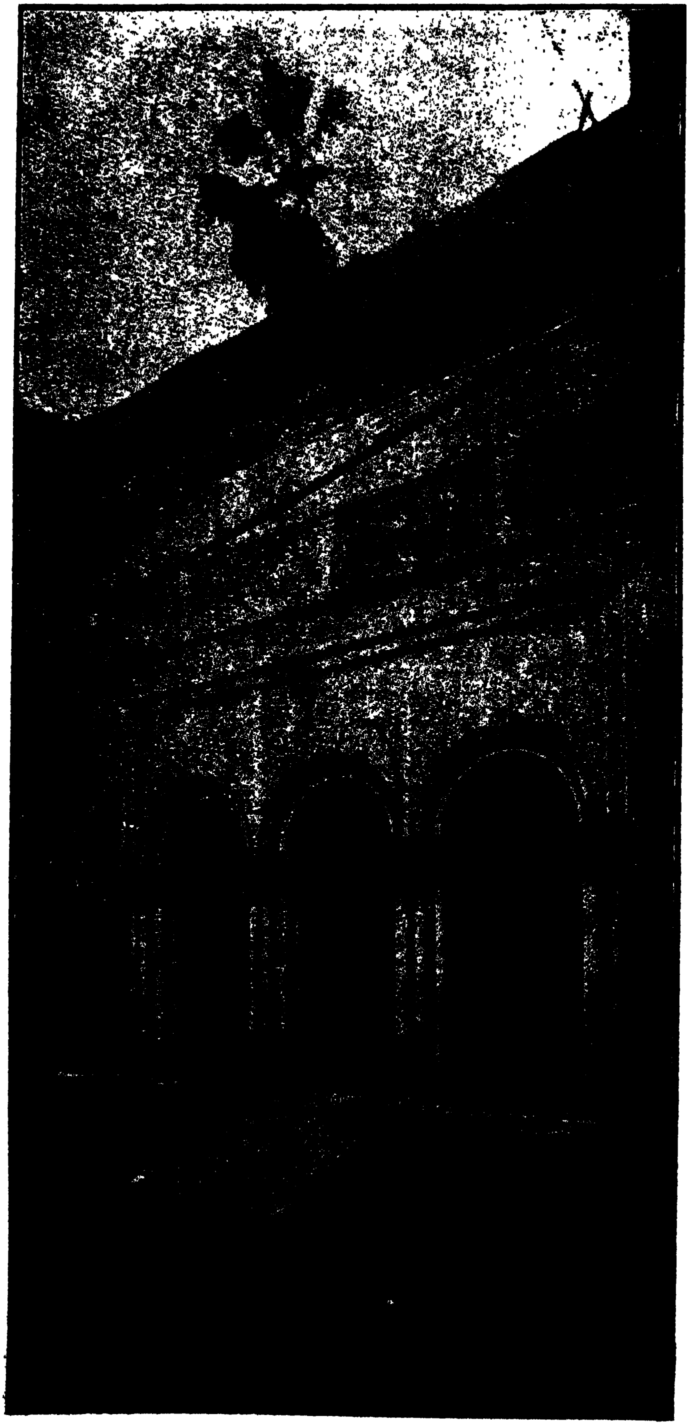
এই শ্রেণীর লোকে কেবল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতীচ্য সভ্যতার অনুসরণ করিয়া চলেন। ভারতীয় যাহা কিছু তাহাই মন্দ, সুতরাং বর্জ্জনীয়, এবং যাহা কিছু প্রতীচ্য তাহাই গ্রহণীয়—ইহাই তাঁহাদের জীবনের মূল নীতি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অশনে বসনে, চাল চলনে, ভাবে ভঙ্গীতে, কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে প্রতীচ্যের অনুকরণ করিয়া চলেন। তাঁহাদের জীবনটাই যেন আগাগোড়া প্রতীচ্যের তর্জ্জমা। ইয়োরোপীয়েরা ছলে বলে কৌশলে যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চান—এই ভারতীয়েরা তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিবার জন্যই যেন with vengeance নিজ নিজ জীবন প্রতীচ্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু, যিনি যাহাই বলুন, সত্য কখনও ঢাকা থাকে না। কালক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই—ইহাই বিশ্বের চিরন্তন নিত্য সনাতন নিয়ম। অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীই পাশ্চাত্যের মোহমুগ্ধ হইলেও, দুই চারিজন এমনও আছেন, যাঁহারা সেই মোহের আবরণ ভেদ করিয়া সত্য প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতাকে তাহার যথাযোগ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা আমার নমস্য।



প্রথম চিত্র—বাটীর পূর্ব্বেকার দৃশ্য



দ্বিতীয় চিত্র—বাটীর বর্ত্তমান দৃশ্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থাপত্য-শিল্পী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত



তৃতীয় চিত্র—ঠাকুরদালানের পূর্ব্বেকার দৃশ্য

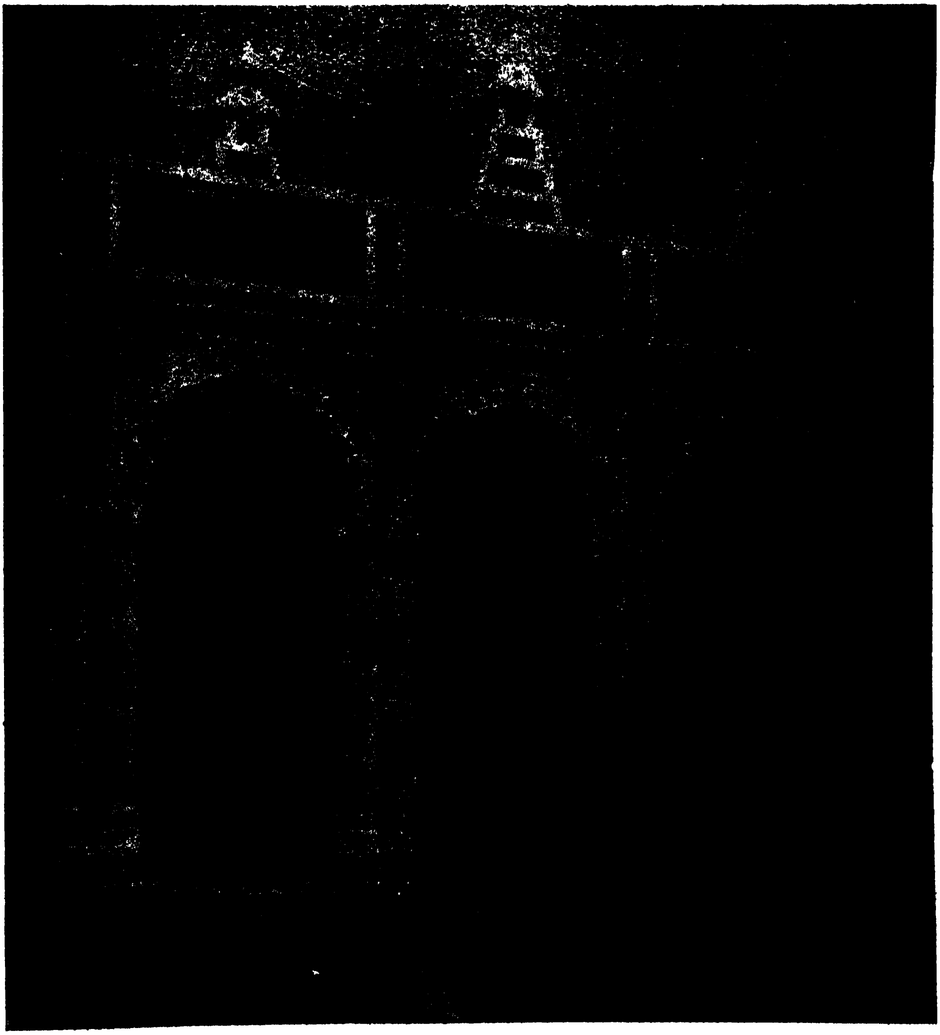
ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আজ আমি মাত্র একটী বিষয়ের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সেটী ভারতীয় স্থাপত্য।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় সভ্যতার অপরাপর অংশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একটা নিজস্ব স্থাপত্য-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ইহাকেও তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। তাঁহাদের মতে এই স্থাপত্য-শিল্প ভারতের নিজস্ব নয়—হয় হয় গ্রীক্‌, না হয় আরব, আর না হয় সারাসেনিক—এই রকম একটা কিছু স্থাপত্য-শিল্পের নকল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় ভূগর্ভ খনন করিয়া ভারতের প্রাচীন নগরাদির যে সকল ধ্বংসাবশেষ বাহির হইতেছে, তাহাদের বয়সও অল্প নয়, এবং তাহাদের স্থাপত্য-রীতিও অনন্যসাধারণ। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ উড়াইয়া দেওয়া কিছু কঠিন। সেই জন্য ভারত-স্থাপত্যের প্রতীচ্য সমালোচকগণকে কিঞ্চিৎ মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, আধুনিক ভারতে যে সকল হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা ঠিক ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির অনুযায়ী নহে। মুসলমানী আমলে ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে পাঠান ও মোগলের স্থাপত্য-রীতি প্রবেশ করিয়াছিল। তার পর ইংরেজের আমলে এখন ইংরেজী ঢং প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং আধুনিক হর্ম্ম্য-গুলিতে ভারতীয়, মুসলমানী ও

ইংরেজী এই তিন রীতির একটা জগা খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্থপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির পুনরুদ্ধার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার পরামর্শে নির্ম্মাণের একান্ত স্থানাভাব। প্রায় সমস্ত জমির উপরই মিশ্র রীতির গৃহ বিরাজমান। সুতরাং কলিকাতায় প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত অধিক সংখ্যক গৃহ আপাত-দৃষ্টিতে দেখিবার আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রীশবাবু ইহারও উপায় বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরাতন গৃহ-



চতুর্থ চিত্র—ঠাকুরদালানের বর্ত্তমান দৃশ্য

ও তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-রীতি অনুযায়ী যে কয়েকখানি হর্ম্ম্য কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক পাঠিকারা বোধ হয় পূর্ব্বেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় এখন নূতন গৃহ-গুলিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছেন, যাহাতে তাহার সম্মুখভাগ এবং অভ্যন্তরের কিয়দংশে ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা পুরাতন গৃহের সংস্কার সাধন করিয়া তাহাতে

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য রীতি ফুটাইয়া তোলা যে কঠিনতর কাজ, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সুনিপুণ স্থপতি এই দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত চিত্র কয়খানি হইতেই বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে।

৩২ নং বিডন রো-স্থিত বাড়ীখানির বহির্ভাগ পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা চিত্রে দেখুন। শ্রীশবাবু ইহার কিরূপ রূপান্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাও অপর একখানি চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েকমাস মাত্র পূর্ব্বে এই বাড়ীখানি দেখিয়া গিয়াছেন, তার পর আর দেখেন নাই—এখন তাঁহারা আর কিছুতেই তাহাকে সেই পূর্ব্বের পুরাতন বাড়ী বলিয়া চিনিতে পারিবেন না।

নূতন রূপে বাড়ীখানি যে অধিকতর সুন্দর দেখাইতেছে, তাহা না বলিলেও চলে। ইহার জালি বা জাফরীগুলি, থামগুলি, ব্রাকেট, প্রভৃতি সকল কাজই চমৎকার দেখাইতেছে। ছাদের উপর গম্বুজ ও চূড়া নির্ম্মাণ এখনও বাকী আছে। সেগুলি নির্ম্মিত হইলে ইহার সৌন্দর্য্য যে আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। নূতন সংস্কৃত বাড়ীর দ্বার ও জানালাও নানা কারুকার্য্যে ভূষিত হইয়াছে। দরজার পেনেলে নৃত্যপরা অপ্সরা বাদ্যনিরতা। দরজার মাথায় মুরলীবাদনে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, সঙ্গে গোপিনীগণ ও ধেনুসকল। পার্শ্বে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা। এই রূপ দেখিলে সেকালের ধনী হিন্দু-গৃহের কথা মনে পড়ে না কি? দোতলার বারাণ্ডায় ঝরোকা রাজপুত রাজপ্রাসাদের দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

বাটীর অভ্যন্তর-ভাগও যথাসাধ্য প্রাচীন রীত্যনুযায়ী রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। উপরের বৈঠকখানার দেওয়াল ও ছাদের নিম্নভাগে চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। দ্বারের উপর হংস-মিথুন, কমল প্রভৃতির খোদিত চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বারের উভয় পার্শ্বে মঙ্গল-কলস ও অন্যান্য বস্তু দৃষ্ট হয়। তার পর ঠাকুরদালানের পুরাতন ও নূতন রূপ দেখুন। পুরাতন ঠাকুরদালান সহরের যত্র তত্র দেখা যায়। নূতন ঠাকুরদালানে পুরাতনের আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই ঠাকুরদালানটি দেখিলেই মধ্যযুগের ভারতীয় দেবমন্দিরের চিত্র মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠে।

আপাত-দৃষ্টিতে এই রূপান্তরের কাজটির গুরুত্ব সহসা উপলব্ধ হয় না। পুরাতন গৃহের সংস্কারের সময় অনেকেই অনেক রকম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে অসাধারণত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু চিন্তাশীল স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিগণের চক্ষে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ইহাতে এক দিকে পুরাতন অট্টালিকার শ্রী-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, অপর দিকে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের পুনরুদ্ধার—এই দুই মহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতেছে। এই প্রাসাদময়ী কলিকাতা—এই City of Palaces—এখানে যদি ধীরে ধীরে অধিকাংশ দেশীয় অট্টালিকার এইরূপ রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা হইলে দশ পনের কিম্বা বিশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র কলিকাতা সহরেরই রূপান্তর ঘটিয়া, নব্য প্রতীচ্য সভ্যতার প্রতীক কলিকাতা প্রাচীন ভারতীয় নগরের রূপ ধারণ করিতে পারে। তখন বিদেশী ভ্রমণকারীরা কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে আসিয়া মধ্যযুগের কোন ইতিহাস-বর্ণিত নগরীতে আসিয়াছেন, মনে করিবেন।

এই রূপান্তর সাধন যে খুব সহজ কাজ নয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই কার্য্য সাধনার্থ কেবল শিল্পী বা কেবল স্থপতি বা কেবল এঞ্জিনীয়ার হইলে চলিবে না; ইহার জন্য শিল্পীকে ঐতিহাসিক, কল্পনাপ্রিয়, স্বদেশপ্রেমিক এবং সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি হইতে হইবে। কল্পনায় তাঁহাকে সুদূর ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় নগরীর স্বপ্ন দেখিতে হইবে; সেই স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিয়া কলা-সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিতে হইবে; তারপর তাহাকে বাস্তব জগতে আনিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। গৃহ-নির্ম্মাণ কালে বর্ত্তমানে যে সকল মাল মশলা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কুলাইবে না, প্রাচীনকালোপযোগী গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আবার, এখন যে সকল রাজমিস্ত্রীরা গৃহনির্ম্মাণ করে, তাহাদের দ্বারা সকল কাজ হইবে কি না সন্দেহ। এজন্য চাই সাবেক ধরণের মিস্ত্রী। এই মিস্ত্রী সংগ্রহ করা কঠিন—ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। এত সব উদ্যোগ আয়োজন করিয়া না লইলে এই রূপান্তর সাধন সহজ নহে। অতএব ইহার গুরুত্ব কত অধিক তাহা বিবেচ্য।

কলিকাতায় যাঁহাদের নিজেদের অট্টালিকা আছে, তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন, ইহা বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে ইচ্ছুক হইলেও, ইহাতে অত্যধিক ব্যয়ের আশঙ্কা করিয়া পশ্চাৎপদ

হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীশবাবু এ সমস্যারও সমাধান করিয়াছেন। আধুনিক গৃহের প্রাচীন রূপ দিতে গেলে যাহাতে ব্যয়াধিক্য না হয়, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং আতঙ্কিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।

আর একখানি চিত্রের পরিচয় দিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। নারায়ণের অনন্তশয্যা চিত্রখানি একটু লক্ষ্য



পঞ্চম চিত্র—কৃত্রিম প্রস্তরের নারায়ণের সৃষ্টি-তত্ত্বের—তক্ষণশিল্প

করুন। জগৎ সৃষ্টির পর নারায়ণ অনন্ত নাগের মস্তকের উপর বিশ্রাম করিতেছেন। এই চিত্রটি ঠাকুর দালানের মাঝখানকার থিলানের উপরে অবস্থিত।

শ্রীশবাবু কেবল স্থাপত্য শিল্পের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন; কিন্তু আরও নানা দিকে প্রাচীন ভারতীয় প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। সকল বিষয়েই শ্রীশবাবুর ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মীর প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে—প্রতীচ্যের মোহ কাটাইতে হইবে—Slave mentality হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্য আজকাল বেশ পুষ্টিলাভ করিতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই তাহা প্রায় আগাগোড়া প্রতীচ্য সাহিত্যের অতি হীন অক্ষম তর্জ্জমা। কথা-সাহিত্যে প্রতীচ্য আদর্শ, ভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার ভারতীয় ছদ্মবেশে উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। এমন কি, ভারতীয় দর্শন—গীতা, উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনাতেও প্রতীচ্য লেখক ও সমালোচকদের ভাবাদর্শের তর্জ্জমা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। শ্রীশবাবুর প্রচেষ্টায় স্থাপত্য শিল্পের একটা সদ্গতির আশা না হয় করিলাম; কিন্তু অন্যান্য শ্রীশবাবুরা কোথায়? পরিবর্ত্তন, সংশোধন, পুনরুদ্ধার যে সকল দিকেই দরকার। সে না হয় পরের কথা; কিন্তু গোড়ার কথা যে মানসিক পরিবর্ত্তন, তাহা যিনি সাধন করিবেন, সেই শ্রীশবাবুকেই আমি সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

ক্ষীরোদ-প্রয়াণ

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাণী-নিকুঞ্জের পিক-কণ্ঠ কবি, মরমী দরদী প্রাণ,
জাতির ব্যথায় জেগেছিলে তুমি, জাগাতে জাতির মান।
বলিতে বলিতে র'য়ে গেল কথা, বলা যে হ'ল না শেষ,
প্রভাত-কাকলী গাহিলে নিশীথে, এখনো জাগেনি দেশ।

ঘন বনমাঝে ওই যে যশোর কাঁদিয়া তোমারে ডাকে,
"প্রতাপাদিত্যের" উদাত্ত সে স্বরে কে বল জাগাবে মাকে?
সুধার পিয়ালা হাতে লয়ে দেখে শিয়রে দাঁড়ায়ে সাকী,
অরুণ অধরে বিষাদের ছায়া ছল ছল নত আঁখি॥
এখনো যে তার মেটেনি পিয়াস, আকুল শুনিতে গান;
ক্ষীরোদ-সাগর অকালে শুকাল—কেন এত অভিমান?

বয়-কট্

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদল লোক গর্বভরে বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কলিকাতা-সহরে বন কাটিয়া বাস করিয়াছিলেন। আজিকার এই আজব-সহর, হর্ম্যনগরী কলিকাতা কোন এক সুদূর অতীতকালে কেবলমাত্র ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি বন্যপশুর আবাস-স্থল ছিল, তাঁহাদের পিতামহ-প্রপিতামহগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া, বনজঙ্গল সাফ করিয়া ইহার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং আভিজাত্যের দাবী যদি কাহারো থাকে তবে তাঁহাদেরই আছে।

আমাদের আখ্যায়িকা-বর্ণিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা সহরের বন-কাটিয়া-বাস-করা বাসিন্দা না হইলেও সহরতলীর এক অরণ্যখণ্ড সাফ্ করাইয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারাও গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। স্থানটির নাম গোপন করিতে আমরা বাধ্য। কারণ, এই গল্পের নায়ক-নায়িকা যে-ভাবে বর্ত্তমান বাঙলার একটা দুরূহ সমস্যা সমাধান করিয়াছেন, তাহা পাঠে তাঁহাদের আসল-পরিচয় গ্রহণ করিবার এবং গ্রহণান্তে আলাপ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা পাঠক পাঠিকার—বিশেষ করিয়া কন্যাদায়-নিপীড়িত গৃহস্থগণের—জন্মিবেই, তাহা আমার মনশ্চক্ষুতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আমরা অনূঢ় 'পুত্রবানদিগের' ক্ষতির কারণ ঘটাইতে অক্ষম। 'ত্রুটী মার্জ্জনীয়।'

সহরতলীর কাটা-বনের বাসিন্দারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন :—

(১) তাঁহারা 'আদর্শ প্রতিবাসী' হইবেন না।

অর্থাৎ প্রতিবেশীর হাঁড়ীর খবর লইয়া আলোচনা আন্দোলন করিবেন না।

(২) তাঁহারা পর্দার প্রভুত্ব মানিবেন না। তবে জুতা-মোজাকেই সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

অর্থাৎ বাবুরা কাজে কর্মে বাহির হইয়া গেলে, মেয়েরা প্রমীলার-রাজ্য বসাইবেন এবং মাঝে মিশেলে কচিৎ-কখনও কেহ জুতা-মোজা পরিবেন এই মাত্র। এক কথায় তাঁহারা মধ্যপন্থী।

(৩) মেয়েদের লেখাপড়া গানবাজনাও শিখাইবেন আবার 'প্রাপ্তেতু ত্রয়োদশ বর্ষে' পাত্রস্থা করিতেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহারা সুবিধাবাদী।

নিত্য নূতন প্রস্তাব উত্থাপন ও পাশ করাইতে ধনেশবাবু অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আভিজাত্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি যখন এই পাড়ায় আসিয়াছিলেন, তখন সব বন কাটাই হয় নাই। তখন তাঁহার গৃহ-সম্মুখের রাজপথটি নৈশবিহারী ও বিহারিণীদের মুখ ও তাঁহার প্রাচীর পশ্চাতের রেল-লাইনে ধাবমান ট্রেণের কামরায় নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। ধনেশবাবু মার্চেণ্ট-আফিসে কর্ম করেন; সংসারে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, গুটি চারেক পুত্র-কন্যা। ছোট খাট বাড়ীটি, গুছান-গাছান। বাড়ীর উঠানে নারিকেল গাছ,—অজস্র নারিকেল ফলে; পেঁপে বৃক্ষের শীর্ষদেশ ফল ভারে সমৃদ্ধ। পাড়ার লোকে বলে, ধনেশ বাবুর ফলভাগ্য ভাল। কথাটা অপ্রাকৃত নহে। চার বৎসরের পূর্বে যখন তিনি পাড়ায় ঘর বাঁধেন, তখন একটি পুত্র, একটি কন্যা ছিল; ঈশ্বরেচ্ছায় দুইটি 'ফল' বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধনেশ বাবু কিন্তু ভাগ্যের প্রতি আদৌ প্রসন্ন নহেন; প্রশ্রয় দিতেও নারাজ। তাই কনিষ্ঠা কন্যাটির নামকরণ করিয়াছিলেন, শ্রীমতী থাক্। প্রতিবেশীরা শেষাক্ষরে হসন্ত বর্জন করিয়া শব্দটিকে ওকারান্ত উচ্চারণ করিলে, ধনেশ বাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু হায়! হসন্ত ভোগের অন্ত করিতে পারিল না।…যথাসময়ে ধনেশচন্দ্র চতুর্থ কন্যার জনক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন।

একটা নূতন রেজোলিউসান পাশ হইল—আমরা যেমন সহরকে ডোণ্ট্-কেয়ার করিয়া, নিজেরাই এইখানে সহর বসাইতেছি, তখন আমরা সাধ্যপ্রকারে সকল বিষয়েই সহরকে

কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ আমরা পরস্পরের ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত করিয়া বাঙালী জীবন ও জনমের সব চেয়ে বড় দুর্ভাবনার দায় এড়াইব।

শুনিয়াছি, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে কথায় কথায় মিটিং, আর মিটিংএ মিটিংএ রেজোলিউসানের ধূল-পরিমাণ হইয়া থাকে। লেখকের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা নাই; বাঙলা দেশে ঘর বাড়ী, বাঙালীর ছেলে, বাঙলা-দেশের খবরটা আসটা জানা আছে—তাহা হইতেই বলিতে পারা যায় যে, মিটিঙ ও রেজোলিউসানের ব্যাপারে বাঙলা দেশ ও বাঙালী-জাতি পৃথিবীর যে কোনো দেশ ও জাতির সহিত তাল-ঠুকিয়া 'চল্ আও' বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। ধনেশ বাবুর রেজোলিউসান পাশ হইয়া গেল এবং আজও তাহা বেফাঁস হয় নাই। অস্যার্থ যে আজও সকলেরই পুত্র-কন্যা নিঃসংশয়ে ছোট আছে।

পুত্রের পিতাগণ পুত্রদিগকে পাঠশালে অথবা স্কুলে পাঠাইতেছেন; কন্যার মাতারা কন্যাগণকে স্কুল পাঠশালে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—বাড়ীতে হারমোনিয়ম ও স্বরলিপি শিক্ষা লইয়া ধ্বস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ উভয় পক্ষই যথাসাধ্য ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

নিশীথ বাবু এ পাড়ায় সব্বের শেষে আসিলেও, তাঁহার বড় মেয়েটি বয়সে সব ছেলে ও সব মেয়ের বড়। সে নাকি দশমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় তাহারই হার-মোনিয়াম জোরে বাজিত এবং তাহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সেই পাড়ার মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিত। নিশীথ বাবুর অন্তঃপুরে যখন সুরে ও বেসুরে হারমোনিয়মের হাসি কান্না একাকার হইত, বাহিরের ঘরে প্রতিবেশী মজলিসে তখন স্বরাজ্য ক্রীড হইতে চীনের বিপ্লব ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিত। তাঁহার বাড়ীর চায়ের বর্ণ ও গন্ধ ছিল সুন্দর ও মনোরঞ্জক। তাঁহার গড়গড়ায় নিত্য ছিঁচকা প্রবিষ্ট হইত,'বালাখানার' সুবাস টিকার আগুণ-তাতে ছুটিয়া গিয়া সারা পাড়া বিভোর করিয়া তুলিত। বনমালী বাবু পুলিস কোর্টের মক্কেলদের না দেখা মূর্ত্তিগুলার উপর চটিয়া এই গড়গড়ার প্রণয়ালাপে মাতিয়া যাইতেন। জনৈক কবিযশঃপ্রার্থী কাব্যের উৎস ছুটাইতেন; ইঞ্জিনীয়ার নীরেন বাবু এক একদিন তাঁহার বিলাত-প্রবাসের গল্প বলিয়া সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া ফেলিতেন; হোমিও-প্যাথী ডাক্তার গজেন বাবু, সরিষাভোর গ্লোবিউলের জোরে পোষ্ট মর্টেমের রোগীও কিরূপ বিস্ময়করভাবে বাঁচিয়া উঠে, তাহারই বিশদ বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেন; ধনেশ বাবু পল্লীর হিতচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া প্রায়ই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন এবং ব্যস্তোত্থিত হইয়া মুখে মুখে একটা নূতন রেজোলিউসান উত্থাপন করিয়া বসিতেন; গাঙ্গুলী মহাশয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতে দিতে শীতের রাত্রে মুখ দিয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া সকলের ভীতির সঞ্চার করিতেন। মোদ্দা কথা এই যে অর্দ্ধরাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইত। টলষ্টয় পল্লীর অনুসরণে এই পল্লীটির প্রতিষ্ঠাতার সম্মানার্থ আমরা ইহার নামকরণ করিলাম, ধনেশপল্লী।

ধনেশপল্লীর পল্লীরাণীরা কি ভাবে মধ্যাহ্ন অতিবাহন করেন, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা না বলিলে আমাদের অভিমানিনী পাঠিকারাণীরা লেখককে পক্ষপাতিত্ব দোষে অভিযুক্ত করিতে পারেন। সুতরাং প্রমীলা রাজ্যের কথা বলিতেই হইবে। 'ভক্তিতে না ভজি, ভয়ে ভজি ত বটেই।'

মহিলা মজলিস্ বসিবার নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই, ইহাকে ভ্রাম্যমান বা ঘূর্ণায়মান বলিলেই ঠিক হইবে। পাড়ায় সাত খানি বাড়ী, বারও সাতটি; তাই আজ যাহার বাড়ীতে মজলিস বসিল, অষ্টমদিবসের পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে আর বসিবে না। নিয়ম এই, যাহার বাড়ীতে যেদিন এই সভার অধিবেশন হইবে, তাহাকে শ'দুই পাণ সাজিয়া, চুণ দোক্তা গুছাইয়া রাখিতে হইত। দু'হাত গ্রাপু অথবা গোলাম চোর খেলিয়া, কিম্বা মিনি-সুতায়-মালা গাঁথার মত, বিনা বাজনায় দুইটা প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া, বেলা পড়িলে সভা ভঙ্গ করা হইত।

বলা বাহুল্য, পাড়াটা বেশ। সহরের খাস-মহল নয় বলিয়া ধূলা ধোঁয়ার দৌরাত্ম্য নাই; অথচ কলের জল আছে, ঘরে ঘরে বৈদ্যুতী আলো জ্বলে; কল টিপিবামাত্র পাখাও চলে; কাহার কাহার টিপয়-রক্ষিত টেলিফোনের ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিয়া উঠে। কোন বাড়ীর কোন বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-আত্মীয়া আসিয়া, ফিরিবার সময় অযাচিত প্রশংসাপত্র দিয়া যাইতেন—"পাড়াটি বেশ।"

একদিন পুরুষ সভাটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। বনমালী বাবু যথারীতি ছিলিমের পর ছিলিম ভস্ম করিয়া অসার

খলু সংসার প্রতিপন্ন করিতেছেন; গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সবেমাত্র ব্রহ্মণ্য তেজের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হাঁ টি করিয়াছেন, নিশীথ বাবুর অন্তঃপুরে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। নিশীথ, তস্যভ্রাতা প্রবোধ শশব্যস্তে সভা ত্যজিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কলিকালে ব্রহ্মণ্য-দেবের উপাসনায় এতাদৃশ বিঘ্ন দেখিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পৃথিবীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অন্যান্য সভাসদগণ অল্পবিস্তর ব্যস্ত হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর দেখিলেন না। কেবল বনমালী বাবু মুখলগ্ন নল হইতে অনর্গল ধূম ত্যাগ করিয়া বিশ্বজগৎ যে কিছুই না, ধোঁয়ার মতই মায়া, তাহাই সশব্দে সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দুই ভ্রাত ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—ও কিছু না।—নিশীথ বিশ্বম্ভর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে কহিলেন—ব্রাহ্মণ as a class নষ্ট হয়ে ·

বিশ্বম্ভর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন; বনমালীর মুখনল গড় গড় করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, কবিবরঃ প্রাপ্তিটি মাসিক-পত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ধনেশবাবু একপাশে বসিয়াছিলেন, নিশীথ বাবুর তর্ক-জাল ছিন্ন করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন—ব্যাপারটা কি হয়েছিল নিশীথবাবু? কাঁদলে কে?

"নিপু,—আবার কে!" নিপু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

"পড়ে টড়ে যায় নি ত?"

"না। ও গান শিখ্‌তে নারাজ; ওরাও ওকে ছাড়তে নারাজ!"—ওরা অর্থে ওঁরা; অর্থাৎ বাড়ীর মধ্যের উঁরা—গৌরবে বহুবচন।

ধনেশবাবু জিজ্ঞাসিলেন—দু'ঘা হোল বুঝি?

নিশীথ হাসিয়া বলিলেন—তা হ'ল বৈ-কি! হ্যাঁ, দেখুন গাঙ্গুলি মশায় ··

গুরুগম্ভীরস্বরে ধনেশ কহিলেন—বড় অন্যায় নিশীথবাবু!

নিশীথচন্দ্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া ধনেশবাবুর উক্তি সমর্থন করিলেন না, অথবা করিতে সাহস পাইলেন না। ধনেশ বলিলেন—ছেলেমেয়েদের মারা বড়ই অন্যায়।

বনমালী বলিলেন—আজকালকার আইনে corporal punishment বে-আইনী হ'য়েছে।

তর্কযুদ্ধে বহু বিঘ্ন দর্শনে গঙ্গোপাধ্যায় রুষ্ট হইয়া উঠিতে-ছিলেন, তীব্রস্বরে বলিলেন—তবে কি ছেলেমেয়েদের বাপকে মারলেই ন্যায় হ'বে?

ধনেশ বলিলেন—তা'ও বড় বাদ যায় না। কি বলেন নিশীথবাবু! নিশীথ হাসিমুখেই প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লইলেন। ধনেশ বলিলেন—নিপু গান শিখতে রাজী নয় কেন?

নিপুর কাকা প্রবোধ কহিলেন—নিপু নেহাৎ অন্যায় বলে না। ও বলে, শেখাবার লোক নেই, নিজে নিজে কি শেখা যায়?

ধনেশবাবু কহিলেন—ঠিক বলেছে! সত্যি আমাদের পাড়ার ওটা একটা মস্ত অভাব। তপেনবাবু যখন পাড়ায় এলেন, তখন আশা হয়েছিল যে ও অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু তিনি ত পাড়ায় বেরুতেই চান্‌না। আশ্চর্য্য youngman কিন্তু, পাড়ায় বাস করেন অথচ 'অসূর্য্যম্পশ্যা'!

ইঞ্জিনীয়ার নীরেনবাবু বলিলেন—তপেনবাবুকে বলাও হয় নি বোধ হয়।

ধনেশ ও নিশীথ এক সঙ্গে ইহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বলা আবার হয় নাই? সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছে, কিন্তু বৃথা! তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেই চান্ না, শিখান ত দূরের কথা।

নীরেনবাবু বলিলেন—বেশ ত, তাঁর বাড়ী গিয়েও ত শেখা চলতে পারে।

তিনি তা'তেও নারাজ! বলেন, বিদ্যার অভাব।

তপেন্দ্র নামধারী ব্যক্তিটি বাস্তবিক এক অদ্ভুত সৃষ্টি। পাড়ার সপ্তরথীর এক রথী হইলেও, তাঁহার দর্শন পাওয়া অন্য রথীবৃন্দের পক্ষেও দুর্লভ। লোকটি যুবাবয়স, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথাও লোকমুখে শুনা যায়, যদিচ পরিচয়-প্রাপ্তির সৌভাগ্য এ পাড়ার কাহারও হয় নাই। তপেন্দ্রের দুই দাদা এবং দুই বৌদিদি বলেন, তাঁহারাও কখন তাহার গান শুনিতে পান্ নাই। পীড়াপীড়ি করিলে বলে, গাহিবার মত বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই।

ধনেশবাবু বলিলেন—আমার খুড়তুত একটি শালী তাদের পাশের বাড়ীর একটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে এমন সুন্দর বাজাতে গাইতে শিখেছে যে সেবার কলেজের প্রাইজের দিন বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েরাও তার গান শুনে অবাক্ হয়ে গেছল। এখন তাদের পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা তার

কাছেই এসে শিখে যায়। অনেক দূর যে, নইলে একদিন নিয়ে এসে শুনিয়ে দিতাম।

প্রবোধ জিজ্ঞাসিলেন—তাঁদের বাড়ী কোথায়?

ওঃ, সেই বেলেঘাটায়!

একটা শনিবার দেখে নিয়ে এলেই ত হয়।

আচ্ছা, আসচে শনিবারে আনব! কিন্তু তপেনবাবুকে আমাদের ছাড়া উচিত নয়। সকলে মিলে একদিন ডেপুটে-সনে যাই চলুন। তাঁর তপ ভঙ্গ করতেই হ'বে।

গড়গড়া হইতে বহু আকর্ষণেও ধূম নিষ্কাশিত হয় না দেখিয়া বনমালী হতাশভাবে নলটি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, একটা রেজোলিউসান পাশ করা যাক্ আসুন, ধনেশবাবু!

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

বনমালীবাবু কলিকার মানভঙ্গ করিতে না পারিয়া হতাশভাবে নলটি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, তবু যদি তপেন না ভেড়ে, আমরা তা'কে বয়কট্ করব।

ধনেশ বাবু এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন। বয়কট মানে ত ধোপা নাপিত হুঁকা বন্ধ! তাহা হইলেই ত পাড়াগাঁয়ের আদর্শ প্রতিবাসী হইয়া যাওয়া গেল। তাঁহাদের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? কিন্তু অন্য সকলে বয়কটের প্রস্তাবে সম্মত; মেজরিটির জোরে প্রস্তাব পাশও হইয়া গেল। বিপক্ষে শুধু একটি ভোট—তাহা ধনেশ বাবুরই।

গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন, নিশীথ বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ as a classকে……

অন্য সকলে প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ১১টা বেজে গেছে। এখন ব্রাহ্মণের চর্চ্চা করতে গেলে, ব্রহ্মদৈত্যের ভয় আছে। অতএব it is resolved যে ওটা আরেকদিন আলোচিত হ'লে কারও ক্ষতি হ'বে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐ মেয়েটির কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাহার শিক্ষাও অসম্পূর্ণ নহে। যে শনিবারে ধনেশ বাবুর গৃহে এস্রাজ বাজাইয়া মেয়েটি উপর্য্যুপরি কয়েক খানি গান গাহিল, সেদিন পথচারী পথিক হইতে মোটরবিহারী সাহেব মেমকেও ক্ষণেকের জন্য গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। যাহাদের কাজের তাড়া ছিল না, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেও কষ্টবোধ করিল না। অনুমান হয়, তপোবন হইলে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুরা হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া মেয়েটির পায়ের কাছে শুইয়া পড়িত। এটা তপোবন নহে, নরপল্লী। পাড়ার মানুষ যতগুলি ছিল—তপেন্দ্র ছাড়া—সকলেই ধনেশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া আগার নিদ্রার কথা ভুলিয়া, রাত্রি ১টা বাজাইয়া ঘরে ফিরিলেন।

মেয়েটির বয়স কত হইবে? চৌদ্দ, খুব বেশী হয় ত পনেরো। ধনেশ বাবু বলেন, না অত হইবে না। মেয়ে-কেটে তেরো হয় ত ঢের। নাম সরোজবাসিনী। দেখিতে মন্দ না! যাঁহারা ক'নে দেখিতে আসিতেন, মেয়ের বাপের ক্যাস-বাক্সটি যথেষ্ট ভারী নহে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা মেয়েটির রূপহীনতার কৈফিয়ৎ দিয়াই চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা তেমন কোন সদুদ্দেশ্য-সহ না আসিতেন, তাঁহারা এস্রাজ পাণি সরোজবাসিনীকে দেখিয়া অম্লানকণ্ঠে তাহার রূপের ও গুণের প্রশংসায় শতমুখ হইতেন।

মেয়েটি বড় ও বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার পিতামাতা বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে দিতেন না। জামাতা ধনেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একদিনের জন্য ছুটি দিয়াছিলেন; ধনেশ বাবু সেই কড়ারেই সরোজকে আনিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর রহিল না। পল্লীর ছয়টি গৃহস্থ উপরোধ করিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে একদিন করিয়া সরোজকে থাকিতেই হইবে। উপরোধে লোকে ঢেঁকী গিলে, ধনেশও খুল্লশ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলেন। তবে রবিবার দিন একবার বেলেঘাটায় গিয়া অবস্থাটা বলিয়া আসিলেন। খুড়-শ্বশুর বাড়ী ছিলেন না; শাশুড়ী জামাতাকে বিমুখ করিতে অক্ষম।

তখন শ্বশ্রূ জামাতায় এইরূপ কথোপকথন হইল।

শ্বশ্রূ। তোমাদের পাড়াটি ত বেশ হয়েছে শুনিছি বাবা, ওখানে গেরস্ত-ঘরের একটি ভাল ছেলে নেই?

জামাতা। একটি ছেলে আছে খুড়ীমা, দারোগার ছেলে।

শ্বশ্রূ। পুলিসের দারোগা ত? না বাবা, পুলিসের সঙ্গে কাজ করা ইচ্ছে নয়। পুলিস নাকি ভাল হয় না।

জামাতা। (সহাস্যে) বলা শক্ত খুড়ীমা। পুলিস হ'লেই যে বদমাইস্ হবে তার মানে কি?

শ্বশ্রূ। মানে আমি জানি নে বাবা, তোমার খুড়োমশাই

বলেন। সেবার এক ইনিস্‌পেক্টারের ভাইয়ের সঙ্গে—সেও রাইটার না কি—হয়েছে, সম্বন্ধ এসেছিল···

জামাতা। এ ছেলেটি কিন্তু পুলিস নয় খুড়ীমা; ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে।

শ্বশ্রূ। (মনে মনে প্রজাপতির পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়া) তা দেখিস্ না বাবা, কথাটা পেড়ে।...শ্রাবণ মাসের মধ্যেই যাতে ··নইলে আবার সেই অগ্রান ..

সরোজকে সাতদিন স্ব-গৃহে রাখিবার অনুমতি লইয়া ধনেশ ফিরিয়া আসিলেন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে গান হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে দুইটি ভৃত্যের মস্তকে হারমোনিয়াম বাঁয়া তবলা চাপাইয়া, ধনেশ, শ্রীকৃষ্ণ, সরোজ ও কতকগুলি বালক বালিকাসহযোগে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আষাঢ়ের আসন্ন-বৃষ্টি আকাশের পানে চাহিয়া তপেন্দ্র জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, ইহাদের দেখিয়া স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিল—এ যে একেবারে অপেরা-পার্টি নিয়ে চলেছেন ধনেশ বাবু! আজ কোথায়?

ধনেশচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে আজ বায়না আছে। আপনিও আসুন না!

চলুন আপনারা—বলিয়া তপেন্দ্র সরিয়া গেল। এক পশলা বৃষ্টিও ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল, ইঁহারা দ্রুতপদে গন্তব্য গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যদিচ তপেন্দ্র আসিবে তেমন কথা বলে নাই, তথাপি 'আপনারা চলুন' শুনিয়া স্বতঃই মনে হয়, আমি আসিতেছি ইহা যেন ওতঃপ্রোতভাবে উহ্য আছে। ইঁহারাও আশা করিয়াছিলেন, সে আসিবেই; কিন্তু দশটা বাজিয়া গেল, তবুও আসিল না দেখিয়া ধনেশ ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন ডাকিয়া আনিবার জন্য। সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাবু পড়িতেছেন। অর্থাৎ আসিবেন না। বলা বাহুল্য ধনেশপল্লীর সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহাদের মনগুলি দুরন্ত অভিমানে ভরিয়া উঠিল। সেদিনকার সঙ্গীত-সম্মেলন-শেষে অভিমানক্ষুব্ধ প্রতিবেশীগণ রেজোলিউসান পাশ (ধনেশ বাবুর প্রস্তাবমত) করিলেন যে, তপেন্দ্রের তপ ভঙ্গ করিতেই হইবে।

সোমবার বাবুরা আফিস আদালতে বাহির হইয়া গেলেন। ধনেশ-জায়া যন্ত্রপাতিসহ সরোজকে লইয়া দারোগা বাবুর গৃহে অধিষ্ঠান করিলেন। উত্তাল সঙ্গীতালোচনার মধ্যেও খুড়ীমার প্রস্তাবটি আলোচনা করিয়া বুঝিলেন, আশাটা কেবল দুরাশাই নহে, একেবারে নিরাশা! ছেলেটি এখনও কাজ-কর্ম সংগ্রহ করিতে পারে নাই বলিয়াই কর্তৃপক্ষ পাঁচহাজারে সম্মত আছেন; অন্যথা ছয় অঙ্কের নীচের কথা কাণেই তুলিতেন না। ছেলেটির বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারে যে ব্যয় তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার কতকাংশ তিনি উঠাইয়া আনিতে চাহেন এই মাত্র!—ইহাতে আপত্তি করা কাহারও উচিত নহে।

"যদি হইত"—ইত্যাদি কল্পনা করিয়া ধনেশ-পত্নী মনে মনে যে সুখচিত্রটি গড়িয়াছিলেন, তাহা ধূলিসাৎ হওয়ায় কিয়ৎকালের জন্য ম্রিয়মানা হইয়া পড়িলেন। সংসারে নিরানব্বইটি স্ত্রীলোক কাহারও কন্যার বিবাহে এতটুকু সহায়তা করিতে পারিলেও ধন্য মানেন। অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়েটা "যদি হয়"—ইত্যাকার চিন্তা করিতে এবং চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যতখানি চেষ্টা করা দরকার, তাহা করিতে ঐ নিরানব্বইটি কোমলহৃদয়া নারীই বিরত নহেন। ধনেশ-জায়া ঐ নিরানব্বইয়ের একটি!

রাত্রে ধনেশচন্দ্র স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনিয়া শুধুই বিস্ময়-প্রকাশ করিলেন না, এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যাহা কোন দেশের কোন বরের বাপ শ্রবণ করিলে সুখানুভব করিতেন না। স্বামীকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত দেখিয়া দয়িতা বলিলেন—কাকীমা চেষ্টা করতে বলেছিলেন, চেষ্টার কসুর ত আমরা করিনি, তা হ'লেই হো'ল। আর, তাঁরা ত শুধু আমাদের উপরই নির্ভর ক'রে বসে নেই। তবে হ্যাঁ, হ'লে বেশ হোত বটে! মেয়েটা বড্ডই নেটি-পেটি, এই ত দু'দিন এসেছে মোটে, পাড়াটা শুদ্ধ লোক সরোজ বলতে অজ্ঞান। এমন লেখাপড়া-জানা, গাইয়ে-বাজিয়ে বউ ক'রে আন্‌তে পারা ভাগ্যের কথা, কিন্তু পোড়া দেশের লোক টাকা টাকা ক'রেই পাগল। হ্যাঁগা, মিত্তিরদের তপেন বিয়ে করবে না?

কে জানে! ওদের খবর পাড়ার কেউ-ই বল্‌তে পারে না। তপেনের দাদা রণেনকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, খাই দাই, চাকরী করি, সংসারের খবর জানিনে। কিন্তু তা আমি তোমাকে বলে রাখছি দেখো, দারোগা বাবুকে ছেলের বিয়ে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হ'তে হ'বে। না হয় ত আমার কাণ মলে দিও।—বলিয়া ধনেশচন্দ্র পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

হ্যাঁগা, তোমরা নাকি ওকে বয়কট্ করেছ?

ধনেশ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ।

সন্ধ্যা বলিলেন—বয় মানে ত ছেলে; কট্ মানে ধরা—অর্থাৎ তাকে ধরতে হ'বে, এই ত মানে!

বলা ভাল, সন্ধ্যা বাল্যকালে ফার্ষ্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ধনেশের জিহ্বা শব্দ করিল, হ্যাঁ!

সন্ধ্যা ভাবিতে লাগিলেন, আহা ও ছেলেটিকে ধরিতে পারিলে ত খুবই ভাল হয়!

ধনেশের নাসা বিকট গর্জনে জানাইয়া দিল যে ভাল হয় বটে কিন্তু, রাত্রি অধিক হইয়াছে—জাগিয়া থাকা উচিত নহে।

ধনেশজায়া সন্ধ্যার চক্ষে নিদ্রা নাই। সরোজকে দুইটি দিন বাড়ীতে পাইয়া মেয়েটার উপর এমনই মায়া পড়িয়াছে, তাহাকে পাড়ায় বিবাহ দিয়া, কাছে কাছে রাখিতে পারিলেই যেন সুখবোধ করেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া তপেন নামক তারকাটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভদ্র মহিলাটি এ-পাশ আর ও-পাশ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা রণেন বাবুদের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া ডাকিলেন—কৈ গো গিন্নি বান্নিরে, সাড়াশব্দই নেই যে!

বধূ দুইটি সবেমাত্র আহারাদি সারিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপরে আসিতে বলিলেন।

—আসুন, আসুন দিদি, একি সৌভাগ্য! আজ কার মুখ দেখে···

তার মুখই রোজ দেখো ভাই। কিন্তু কোথায় বসা হ'বে? সঙ্গে অপেরাপার্টি রয়েছে যে! ওরে সরোজ, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন তোরা—ভিতরে আয় না।

অপেরাপার্টি কি দিদি?

বলিতে বলিতে, এস্রাজ হস্তে সরোজ প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা বলিলেন—তোমার দেওর যে আমাদের নাম দিয়েছেন, অপেরাপার্টি!

ঐটি আপনার বোন! শুনেছি খুব ভাল গাইতে পারে। একদিনও ত শুনতে যাও নি ভাই।

কি করে যাই দিদি বলুন! দু'দুটো কচি কাচা তার ওপর সংসারের সমস্ত ভার ঘাড়ে, চণ্ডীপাঠ থেকে··· জুতো শেলাই পর্য্যন্ত। রণেন বাবু ওঁকে তাই বলেছেন শুনলুম বটে—বৌয়েরা ত আসতে পারে না; তা বৌ-দিদি যদি দুপুর বেলা কষ্ট করে আজ অপেরাপার্টিটা আমাদের ওখানে বসান, বৌ দু'টো শুন্তে পায়।

রণেন্দ্রের স্ত্রী সাহ্লাদে কহিলেন, সত্যি বড় ভাল করেছে দিদি। বসুন, বসুন।

কিন্তু তিনি মনে-মনে স্বামীর প্রতি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। এমন ভুলো-মানুষ তিনি আর একটি দেখেন নাই। ইহাঁদের আসিতে বলিয়াছেন, বেশ ত; খবরটা তাঁহাকে জানাইয়া গেলে তিনি গোটা-কতক পাণ সাজিয়া, গুছাইয়া গাছাইয়া রাখিতে পারিতেন।

সে রাত্রে রণেন্দ্র ভর্ৎসিত হইয়াও নীরব রহিলেন; কারণ অপেরা-পার্টীকে আমন্ত্রণ দিয়াছেন ইহা অনেক চেষ্টা করিয়াও স্মরণে আনিতে পারিলেন না। ছোট বৌ-কে বড় ঘরটা পরিষ্কার করিয়া বড় সতরঞ্চটা পাতিয়া আসর সাজাইতে পাঠাইয়া দিয়া, রণেন্দ্র-রমণী নিজে ক্ষিপ্রহস্তে পাণ সাজিতে বসিলেন।

"একলা কেন ভাই, এইদিকে আন-না, দুজনে চট্‌পট গোটা কতক সেজে নিই। আমি আবার পাণটা একটু বেশী খাই, জান-ত! না, তুমি আর জানবে কোত্থেকে বল—মেলামেশা ত বড় নেই। ওরে ও অন্তা, দোক্তার কৌটোটা এনেছিস্ ত?"

ফ্রক-পরা একটি ষষ্ঠ-বর্ষীয়া বালিকা বলিল—এই যে মা।

রণেন্দ্র রঙ্গিণী বলিলেন—সত্যি দিদি, মাঝে মাঝে প্রাণটা বড্ড হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু জানেনই ত সব। নিজের আঁতুড়টি উঠ্‌তে না-উঠ্‌তে জা ঢুকলো আঁতুড়ে—সংসারে তৃতীয় প্রাণী নেই—দেখ্‌ছেনই ত!

পাণ দোক্তা খাইয়া, আসরে বসিয়া সন্ধ্যা বলিলেন—একটি কাজ কিন্তু করতে হ'বে ভাই। তোমার দেওর শুনিছি মস্ত গাইয়ে, তাঁর দু'টো গান শোনাতেই হ'বে।

তা'হলেই হয়েছে দিদি! এ বাড়ীতে আমারও ত এই পাঁচবছর হোলো, একদিন হাঁ করতেও দেখি নি।

এ কি রকম আশ্চর্য্য ভাই! লোকে ত বলে মস্ত গাইয়ে! "বিশ্ব-সঙ্গীত" কাগজে তপেনবাবুর 'গানের কথা' লেখাগুলো আমরাও ত পড়েছি, তাতেও ত বড় গাইয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু, না গাইবার কারণ কি?

কি জানি দিদি; কিছু বুঝিনে। কত কাকুতি-মিনতি করেছি, হাসিমুখে সেই এক জবাব—আমি গাইতে জানিনে বউদিদি! আমরা বলি, লোকে তবে বলে কেন ভাই! তা কি বলে জানেন, দিদি? বলে—

লোকের কথায়
কভু না করো প্রত্যয়।

কোথায়?

ঘরেই আছে।

এক-কাজ করো ভাই। আমাদের নাম ক'রে তুমি আজ একবার অনুরোধ করে এস। ঘরের কথার চেয়ে পরের কথার দাম কখনও কখনও বেশী হয়, জান ত!

"জানি"—বধূটি হাসিয়া উঠিয়া গেলেন। দেবরের দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—জয় হোক মহারাজ!

দেবর হাসিয়া কহিল—ভুল হ'ল বৌ-দি! মহারাজ এখন His Majesty's Mintএর খাতায় টাকার হিসেব কষছেন।—রণেন্দ্র ট্যাঁকশালে কর্ম্ম করেন।

বৌদিদি সলজ্জ-হাস্যে কহিলেন—ছোট মহারাজের কাছে আবেদন আছে। ভয়ে ক'ব না নির্ভয়ে কব?

তপেন বলিল—ব্যাপার গুরুতর তা'তে সন্দেহ নাস্তি। অধিকক্ষণ ধোঁকায় না রেখে আদেশ করে ফেল, অধীন হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক।

ধনেশবাবুর স্ত্রী এসেছেন...

উত্তম।

সঙ্গে...

অপেরা পার্টি! বেশ! তারপর?

তোমাকে গাইতে হ'বে।

অতি পুরাতন সে কথা।

আমাদের কাছে পুরাতন; কিন্তু তাঁর পক্ষে নূতন। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বড় মুখ ক'রে তিনি আজ...

তপেন্দ্র অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল—বৌদি, এ অন্যায়ের মূল তোমরা। তোমরাই তাঁকে অপ্রস্তুত করলে। আমি গাইতে জানি-না, কম ক'রে লক্ষবার এ-কথা তোমাদের বলেছি, তবু যে...

বাধা দিয়া বৌদিদি বলিলেন—লোকে যে বিশ্বাস করে না ভাই! যাক্ ভাই, বলতে বল্লেন, বলা হয়েছে—আমি চল্লুম।—বলিয়া তিনি ও ঘরে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা বলিলেন—রহস্য বুঝলুম না ভাই। কিন্তু আর এক কথা, আমরা এখানে চেঁচামেচি করলে তিনি বিরক্ত হবেন না ত?

বৌ-দিদি লজ্জিতভাবে কহিলেন—ও কি কথা দিদি! বিরক্ত হবে কেন? এ কি বিরক্ত হ'বার জিনিষ?

সন্ধ্যা আর কিছু বলিলেন না।

সরোজ একখানি গান শেষ করিয়া, দ্বিতীয়খানি ধরিয়াছে মাত্র, তপেন্দ্র দ্বার সন্নিধানে আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—মাপ করবেন বৌ-দিদি-রা! আমি অরসিক তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রস-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এক গণ্ডূষ পান না ক'রে পারছিনে। এমন নির্দোষ তানলয়, এমন সুললিত কণ্ঠ কোনদিন শুনি-নি!

তপেনের বৌদিদি বলিলেন—তবে ভাই, তোমার একটি...

তপেন বলিল—আপনার কথার উত্তর দিতে হলে আমাকে আরও দু'মিনিট দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমার আগমনেই ওঁর গান বন্ধ হ'য়েছে, আমার অবস্থিতিতে তা যে চল্‌বে সে আশাও কম। সুতরাং আমি রণে ভঙ্গ দিলেই আপনাদের ও আমার সকলেরই লাভ।—সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

সন্ধ্যা অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—না, আপনার অবস্থিতিতে গান থেমে থাক্‌বে না। গা সরোজ গা...

—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে"

সরোজ লজ্জারুণ মুখে গান ধরিল—অবশ্য ও-গান নয়; কিন্তু গানে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিল না। সুর তাল লয় অক্ষয় রাখিয়া যেন যন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তপেন্দ্র বলিল—আমি গান গাইতে পারিনে বটে, কিন্তু গান বুঝি! আমি থাক্‌তে ওঁর গানে প্রাণ আসবে না। আমি দূর থেকেই শুন্‌বো।

ততক্ষণে সরোজের জড়িমা কাটিয়া গিয়াছিল; সঙ্গীত পরদায় পরদায় উঠিয়া প্রাণবন্ত হইতেছিল। সন্ধ্যা বলিলেন—আপনাকে যেতে হ'বে না।

তপেন্দ্র সহাসকণ্ঠে কহিল—অনুমতি দিয়ে ভালই করলেন। নতুবা হয় ত অবাধ্যই হ'তে হ'ত। সুধার জন্য দেবগণ—riot বলবো না, কথাটা বড্ড আধুনিক, লড়াই পর্য্যন্ত করেছিলেন, আমি একটু অবাধ্য হ'লেও দোষের

হ'বে না।—সে নিম্নকণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গীতনিমগ্না কিশোরীর কাণে পশিয়া মুখখানা নিমেষে আরক্ত করিয়া দিল।

গানের শেষে তপেন্দ্র বলিল—তবে সত্য কথাটা বলি বৌদি! গাইতে জানি-নে বটে, কিন্তু দোষগুণ ধরিতে পারি বলে লোকে সঙ্গীত-সমালোচক বলে সম্মান দেয়। অর্থাৎ টিয়া পাখি আর কি! গাইতে পারে না, কিন্তু খুব ভাল রকম ছিঃ ছিঃ করতে পারে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসিলেন—সরোজের গান আপনার ভাল লাগলো?

সেই কথাই বল্‌ছি বৌ-দি: শুধু ভাল লাগলো বল্লে অনেক কম বলা হ'বে বৌ-দি! বাজীকরের বাঁশী সাপের কি শুধু ভাল লাগে বৌ-দি?—না তার অনেক বেশী কিছু লাগে?

গায়িকার সর্বাঙ্গে লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল। ইহা যে সঙ্গীতসরস্বতীর পাদমূলে ভক্তের অকপট শ্রদ্ধা-নিবেদন, তাহা বুঝিয়াও সে সর্বদেহের সহিত মুখখানা যেন আর তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্তর আকাশ বর্ষা নিশীথিনীর জ্যোৎস্নার মত অপূর্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা সরোজের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—আর একখানা গা'না সরোজ! অত প্রশংসা পেলি, কৃতজ্ঞতা দেখা পোড়ামুখি!

তপেন্দ্র কহিল—দোহাই বৌ-দি, অন্যায় বল্‌বেন না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমরাই করব—উনি ত আনন্দ বিতরণ করছেন।

তাই না হয় আর একটু বিতরণ করুক।

দয়ার ওপর জবরদস্ত চলে না বৌ-দি! ডোনেসানে নালিশ চলে না। পীড়নে গান বার হয় না।

আদরে হয় ত! তা'ও ত বড় কম পেলিনে সরোজ! গা, গা!

সরোজ লজ্জানতমুখে, অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—এখন আর নয় সেজদি!

তপেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বৌ-দি, আপনার এই বোন্‌টির মত বোন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যেদিন তৈরী হ'বে সেদিন বাঙলাদেশের সংসারের অনেক ব্যাধি, অনেক পাপ ঘুচে যাবে; বাঙলার সংসার এক নূতন শ্রী ধারণ করবে।

সন্ধ্যা বলিলেন—কি জানি ভাই, আমরা ওসবের কি-ই বা বুঝি! তবে যেটুকু বুঝছি সেটুকু এই যে, আপনি যার গুণের অতো সুখ্যাতি করছেন, সে গুণ দেখেও কেউ ত তা'কে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। সবাই খবর নিচ্ছে, বাপের ক্যাস কত আছে? কত দেবে-থোবে? পাঁচ সাতহাজারের নীচে কেউ কথাই কয় না। কোথায় পাবেন ভাই পাঁচ সাত দশ হাজার! কেরাণী-চাকরী করেন, কোন গতিকে সংসার চলে।—সন্ধ্যার শেষের কথাগুলা যেন আর্দ্র হইয়া আসিল।

তপেন বলিল—তার জন্যে ওঁর গুণ দায়ী নয় বৌ-দি! আমাদের দেশের নিয়মই এই দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যা কহিলেন—হ্যাঁ ভাই ঠাকুর পো, তোমাকে আর আপনি বলব না, 'তুমিই' বলি। এই যে এত সভা-সমিতি হচ্ছে, এত বক্তৃতা, লেখালেখি হচ্ছে, এই কসাই-বৃত্তিটে ওঠাবার কোন চেষ্টা কেউ করছে না কেন বল ত? গান্ধী মহারাজ এত ভাল লোক, মুচি-মেথর-মুদ্দফরাসের জন্যে কত কি করছেন, পোড়া বাঙলাদেশের পোড়া মেয়ের বাপ-মা'র দুঃখু কি তাঁর প্রাণে লাগে না?

তপেন বলিল, লাগলেই বা কি হ'ত বৌদি। তিনি উপায় বলে দিতেই পারতেন। পালন করা না করা ত বাঙালীর হাত। বাঙালী তাঁর সব পরামর্শ যেমন মেনেছে, এটাও তেমনই মানত!

তা ঠিক—বলিয়া সন্ধ্যা উঠিয়া পড়িলেন। "আজ বেলা গেছে, চলি ভাই!"

তপেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিল, বৌদি! ১৯১৯ সালের কথা আপনার মনে আছে ত? মহাত্মা বলেছিলেন, তোমরা যদি দেশশুদ্ধ লোক স্বদেশী কাপড় পর, বিদেশী জিনিষ না ছোঁও—আমি একবছরে তোমাদের স্বরাজ এনে দোব। ক'জন—শতকরা ক'জন লোক স্বদেশী কাপড় পরেছিল? এখন তাঁকে পাগলা বলে ঠাট্টা করে অনেকে। তাঁর কথা মেনে বিফল হ'য়ে ঠাট্টা করতো যদি—ত বুঝতুম! এ জাতের কখন ভাল হয়!

সে ত ভাই, হাড়ে হাড়েই বুঝছি! পয়সা কম ব'লে এমন বিদুষী বোনের বিয়ে দিতে পারছি নে; নিজেরও ত

শত্রুর মুখে রসগোল্লা দিয়ে চার চারটি কন্যা, অবস্থাও ঐ— কি যে হ'বে ভাই, ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না। আচ্ছা ভাই, আসি!

নমস্কার বৌদি!—নমস্কার!

দ্বিতীয় নমস্কারটা সরোজের উদ্দেশে, কিন্তু সরোজ তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল না; লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া সেজদি'র পাশে লুকাইয়া পড়িল। সন্ধ্যা বলিলেন—ঐটুকু মেয়েকে নমস্কার করা কি ভাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞজন বলেন, যে-সব ছেলে ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকে, কোন সুযোগে ফাঁক পাইলে তাহারা না করিতে পারে এমন কাজই নাই। ভাল ছেলেরা যত দ্রুত খারাপ হয়, এমন আর কেহ নয়। যাহারা কখনো কাহারো সহিত মিশে না, দৈবাৎ যদি কাহারো সহিত আলাপ হয়, তাহাদের কাছে ইহাদের 'না,' 'নাই' থাকিতে পারে না—এমনই হইয়া দাঁড়ায়।

কথাটা সত্য। তপেন সেইদিনের পর হইতে নিত্য নিয়মিত ধনেশ বাবুদের বাড়ীতে ত আসিলই; উপরন্ত যেখানে যখন অপেরা-পার্টি বসিল, সেইখানেই তপেন্দ্র সকলের আগে একটা আসন দখল করিয়া বসিয়া যাইত। তাহার কাজ কম, অবসর বেশী, বৈকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য ল' কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতে হয় মাত্র, বাকী সমস্তক্ষণই তাহার ছুটি, তাই সে মধ্যাহ্নে মহিলা ও সায়াহ্নে পুরুষ মজলিস দুই-ই জমাইতে পারিত। পাড়ার লোক ইহাতে যে সুখী হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দাতিশয্যে বনমালী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার ওকালতী জীবনের প্রথম 'উপার্জ্জন'টি (আহা, যেদিন হইবে) তিনি এই স্মৃতির সম্মানার্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া ইহাদিগকে 'পরিতোষপূর্ব্বক' ভোজন করাইয়া দিবেন। বলা বাহুল্য পরিতুষ্ট হইবার আশা কোন অর্ব্বাচীনই পোষণ করেন না।

তপেনকে মস্ত একটা দেশবিখ্যাত গায়কজ্ঞানে যাঁহারা এতকাল মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিলেন, সে ধারণা বিদূরিত হইতে, তাঁহারা একটু মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাকে দলভুক্ত হইতে দেখিয়া সেটুকু ভুলিতে বেশী সময় লাগিল না।

আজ শনিবার। সরোজের সাতদিনের ছুটী ফুরাইয়াছে। কথা আছে, ধনেশ বাবু অফিস হইতে ফিরিয়া, বিশ্রামান্তে তাহাকে লইয়া কলিকাতায় তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন। আজ দুপুরে আসর খুবই জমিয়াছে, তপেন্দ্রও উপস্থিত। বেলা তিনটা বাজিতে, সন্ধ্যা সরোজকে বলিলেন—চ' রে চুলটুল বেঁধে নিবি চল্, এখনই এসে, জল খেয়েই তো'কে নিয়ে যাবেন, বলে গেছেন।

তপেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—কোথায় যাবেন?

ও যে আজ বাড়ী যাবে! সাতদিন হয়ে গেল, খুড়ীমা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাল রবিবার, চাঁপাতলা থেকে কারা নাকি দেখতে আসবে। তাই আজ না গেলেই নয়!

তপেন্দ্র চিন্তাযুক্তস্বরে কহিল—তাই ত! আমি আবার একটি বন্ধুকে যে আজ সন্ধ্যেবেলায় আস্‌তে বলেছিলুম— ছেলেটির বিয়ে হয়নি।

সন্ধ্যা সাগ্রহে কহিলেন—তাই না কি ঠাকুর পো?

হাঁ বৌদি, সেদিন তোমার মুখে শুনে পর্য্যন্ত আমার মনে সুখ ছিল না। বিয়ের পণকেই মোক্ষ জ্ঞান করেনা, পৃথিবীতে তেমন ছেলে অনেক আছে বৌদি, আজ তাঁদেরই একজন ..

সন্ধ্যা উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই।

তপেন্দ্র কহিল, তাই বলছিলুম, আজকের দিনটে···

সন্ধ্যা আগে-ভাগেই বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা উনি আসুন, বলি ..

তপেন্দ্র চলিয়া যাইতে, সন্ধ্যা সরোজের পিঠে দুম্ করিয়া একটি কিল্ বসাইয়া দিয়া ফুল্লকণ্ঠে কহিলেন, শীগগির আমায় পেরণাম কর, পায়ের ধূলো নে পোড়ারমুখি—অমন সমঝদার বর পাচ্ছিস্!

প্রতিবেশী একটি বধূ বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ওঁর বন্ধুও যে সমঝদার হ'বেন, তা তুমি জান্‌ছ কি ক'রে ভাই!

জান্‌ছিরে জান্‌ছি। আমি মনে-মনে সব জান্‌ছি— বলিয়া তিনি সরোজকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিলেন—চাঁপাতলার মিছে-বাবুদের ক'নে দেখতে আসার কথাটা খুবই ভাল হ'য়েছে। তোমরা দেখে নিও, তপেনের সে বন্ধু আর কেউ নয়—ঐ, ঐ, ঐ, এই আমি তিন সত্যি ক'রে রাখলুম।

প্রতিবেশী বধূ বলিলেন—কিসে বুঝলে ভাই !

বুঝলুম, বলিয়া একমিনিট গম্ভীরভাবে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যা কহিলেন—যদিও অনুমান, হবে সত্যি অনুমান। ঠাকুরপো যদি অন্য কাউকে দেখতে আসতে বলে থাকত, তখনি ফিরে এসে আমাদের খবরটা দিয়ে যেত ! এতো তা নয়, হঠাৎ বিচ্ছেদাশঙ্কায় অধীর হ'য়েই বন্ধুর নামটা বলে ফেলতে হয়েছে। তা হোক, ও মিথ্যেয় দোষ নেই। আমিও চাঁপাতলার মিথ্যে বাবুদের কথাটা বলেছি, পাপ ত নেই ই, আর যদিই থাকে, চারহাত এক হ'লে খণ্ডে যাবে'খন।

এই সময়ে ধনেশচন্দ্রবাবু ঘর্মাক্তকলেবরে, ছাতি বগলে, খাবারের ঠোঙা হস্তে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন। সন্ধ্যা ছুটিয়া গিয়া, ছাতি ঠোঙা কাড়িয়া লইয়া এমনই-নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে টানিতে টানিতে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া, এমন সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল যে, সরোজের মত স্বল্পভাষিণী মেয়েও মন্তব্য না করিয়া পারিল না যে মাগো, দিদি বুড়মাগী কি বেহায়া !

প্রতিবেশী-বধূ সরোজের চুল বাঁধিয়া, কপালে টিপ পরাইয়া, একটি প্রণাম লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। সরোজ ছোট-ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নি'টিকে লইয়া রোয়াকে বসিয়া আছে, সন্ধ্যা রেকাবে করিয়া খাবার সাজাইয়া সরোজের সামনে রাখিয়া বলিলেন—খারে, বেলা গেছে, কত ক্ষিদে পেয়েছে, তার ঠিক নেই। ছেলেমেয়েগুলিকেও খাবার বণ্টন করিয়া দিলেন।

সরোজ বলিল—আমার কিন্তু অতো ক্ষিদে পায় নি সেজদি, অতো খেতে পারবো না।

নে-নে, ন্যাকামী রাখ, আজ তোর যা ক্ষিদে, তাতে তপেনের মাথাটাও তুই গিলে খেতে পারিস্ !

ধনেশ ঠিক পিছনটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; তিনি বলিলেন—আহা, বুঝতে পারলে না সরোজ ! তোমার সেজদি যেমন করে এই মাথাটি—মায় মগজ, হজম ক'রে বসে আছেন ! বলিয়া তিনি নিজের মস্তকটি নির্দেশ করিলেন।

সরোজ হাসিয়া বলিলেন—ধন্যি তোমার হজম ভাই, ঐ অতো বড় চুলশুদ্ধ মাথাটা হজম কি করে কর ভাই সেজদি !

সেজদি বলিলেন—সে তোকে তখন শিখিয়ে দোব রে। নে খা, এখনি আবার তপেনবাবু এসে গান শুনতে চাইবে।

আজ আর আমি গাইব না কিন্তু।

সে তখন দেখা যাবে—বলিয়া সন্ধ্যা গৃহকর্ম শেষ করিতে গেলেন।

অন্য কাহারও গৃহে আজ আর 'বায়না' ছিল না—কারণ সরোজ চলিয়া যাইবে ইহাই স্থির ছিল। সুতরাং ধনেশবাবুর বাড়ীতেই আসর বসিল এবং যথাকালে সুকেশ সুবেশ তপেন্দ্রনাথ আসিয়া আসরে অধিষ্ঠান করিলেন। সন্ধ্যা ধনেশবাবুকে ডাকাইয়া কাণে-কাণে কি বলিয়া দিতে, ধনেশবাবু বাহিরে আসিয়া তপেনকে একপাশে লইয়া গিয়া বলিলেন, তপেন, তোমার কথামত সরোজকে আজ ত আটকে রাখলুম ভাই। বৈকালে খুড়শ্বশুর মশায় অজয়বাবুদের বাড়ীতে ফোন করে আমায় ডেকে বল্লেন, কাল মাণিকতলা—না না, চাঁপাতলা থেকে এক ভদ্রলোক দেখ্‌তে আস্‌বেন ঠিক আছে, সরোজকে পৌঁছে দিতে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা নাকি একরকম হয়েই গেছে, বিশেষ খাঁই নেই, অল্পেই হ'বে, সরোজকে তাঁরা আগেই দেখেছেন, পছন্দও আছে, কাল বোধ হয় একেবারেই পাকা দেখে', আশীর্বাদ করে যাবেন। তা' আমি তোমার বৌদির কাছে যেমন শুনেছিলুম, তেমনই বল্লুম। বিশেষ তোমার বন্ধু, সবরকমে desirable (বাঞ্ছনীয়) না হ'লে তুমি কখনই সম্বন্ধ করতে না, সে ত আমরা জানিই কি না। খুড়শ্বশুর ম'শায় ভয় পেতে লাগলেন, দেনা-পাওনায় বনবে কি-না, তোমার বন্ধুর বাপ-মা কি বলবেন—আমি তাঁকে বল্লুম, আপনি কিছু ভাববেন না, আমাদের তপেন যখন হাত দিয়েছে, তখন সোনা ফল্‌বেই। শুনে বল্লেন, কাল খুব ভোর টেলিফোঁ করব। যেন সুখবর পাই। ধনেশবাবু এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন—তোমার বন্ধুটি কখন আসবেন ভাই ?

সরোজ তখন এস্রাজের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছিল—

"আমার নয়ন ভুলানো এলে !

আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !...

তপেন অপরাধীর মত নতমস্তকে কহিল, ধনেশ দা, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে।

ধনেশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, কি ব্যাপার—বল ত ?—তাঁহার স্বর উদ্বেগ-কাতর !

তপেন্দ্র কহিল—আমাকে মাপ করবেন ধনেশ দা, আমি বৌ-দির কাছে মিছে কথা বলেছি।

ধনেশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, তোমার বন্ধু আসবেন না ?

না!

শুনিয়া ধনেশ রোয়াকটায় বসিয়া পড়িলেন। আর এক প্রাণী বারান্দায় অন্ধকারে থাকিয়া সব কথাই শুনিতেছিল, কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া ছুটিয়া নীচে আসিল; কিন্তু বাহিরে পা দিবার উপায় নাই। গৃহমধ্যে প্রতিবেশী বধূগণ ও বাহিরে পাড়ার ছেলেবুড়োরা জমিয়া বসিয়াছেন। সরোজ গাহিতেছে—

শিউলিতলার পাশে পাশে

ঝরা ফুলের রাশে রাশে ফুলের রাশে-রাশে

শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ

রাঙাচরণ ফেলে—

ধনেশ অনেকক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন—তাই ত ভাই! কোন্ মুখে যে তাঁদের সামনে দাঁড়াব, তাই ভাবছি আমি। তাঁরা কত আশাই ক'রে আছেন—সারারাত্রি হয়ত এই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনাও করছেন, কাল সকালে যখন বলব যে···

সে কথা বলবার দরকার নেই ধনেশ দা!

ঠিক ঐ কথা না বল্লেও বলতে ত হ'বে যে মেয়ে দেখতে আসে নি।

তা'ও না।

ধনেশ আকুল বিস্ময়ে বলিলেন—তবে?

তপেন্দ্র এক মিনিট নীরব রহিল; তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল—ধনেশ দা, আমাকে কি তাঁরা পছন্দ করবেন না?—কি জানি কেন, লাজুক ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

ধনেশ বলিলেন, কাকে পছন্দ করার কথা বলছ তপেন?

তপেন নতচক্ষে অধিকতর মৃদুকণ্ঠে কহিল—আমার কথাই বলছি।

ধনেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, তপেনের হাত দুইটা টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, একি সত্যি কথা তপেন?

সত্যি কথা ধনেশ দা'। বৌ-দির কাছেও আমি এই কথা বলতে চেয়েছিলুম, কিন্তু লজ্জা করছিল—বলতে পারি নি। বন্ধুর নাম নিয়ে একটু মিথ্যে বলতে হয়েছে। তার জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

ধনেশ খুব জোরে গোটা দুই ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন—হ্যাঁ-হে তপেন, এ কি সত্যি? Honor bright না-কি বলে, তাই?

তপেন আর কথা কহিল না; কিন্তু ইহা যে সত্য তাহা তাহার মুখ, তাহার চক্ষু, তাহার সকল অঙ্গ সমস্বরে প্রচার করিতেছিল।

সরোজের গান সমস্বরেই চলিতেছিল—

আমার নয়ন ভুলান এলে!

ধনেশ তপেনকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে আসরের মাঝখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নয়ন ভুলানোই এলেন বটে! এই দেখ—সত্যিই নয়ন ভুলানো!

বলা বাহুল্য, গান থামিয়া গেল; ভিতরে বাহিরে একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল; সকলের মুখে-চোখে "হিপ্ হিপ্ হুররে" ভাব—কেবল দুইটি প্রাণী নীরবে, নতমুখে বসিয়া! তাহাদের মনের ভাব বুঝাইবার ক্ষমতা এ লেখকের নাই।

কোলাহল থামিলে ধনেশ বাবু বলিলেন, আমাদের ধনেশ-পল্লীর সে রেজোলিউসান্টা কি ছিল বনমালী বাবু?

বনমালী বাবু বলিলেন, বল্ছি। একটা কল্কে আনতে বলে দিন আগে; বল্ছি।

কখন্ কলিকা পাইবেন, কখন্ তাঁহার ফুরসৎ হইবে, দাদার আশায় বামে ছুরী দেখিয়া, ধনেশবাবু নিজেই বলিলেন, আমাদের প্রস্তাব ছিল, বিবাহাদি ব্যাপারও আমরা পাড়ার মধ্যেই করিব। এই না?

বনমালী বাবু চাকরটাকে ধৃত করিয়া, কলিকায় অত্যাবশ্যকীয় তাওয়াতত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন, বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ!

* * * *

বিবাহ-রাত্রে ধনেশ বাবু বরের ঘরের মাসী ও ক'নের ঘরের পিসী হইয়া কি খাটুনীই খাটিলেন! নিশীথ বাবু, শ্রীকৃষ্ণ বাবু, মহাদেব বাবু, গজেন বাবু, বিশ্বম্ভর বাবু—ধনেশপল্লীর সকল বাবুই চর্ব্ব-চুষ্য লেহ্যপেয় করিয়া আসিলেন। বনমালী বাবু বাড়ার ভাগ একখানি পাখা, একটা থেলো হুঁকা ও দুইটা সাজা কলিকা পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বম্ভর বাবু নিশীথ বাবুর সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শিকায়-তোলা তর্কটা গাড়ীর ভিতরেই মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইলেন; নিশীথ বাবু গুরু-ভোজনের পর গুরু-গম্ভীর নাসা-গর্জ্জনে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া ব্রহ্ম রোষাগ্নিতে ইন্ধন দান করিতে লাগিলেন।

ধনেশবাবু বর ক'নেকে বাসরে সুখাসীন দেখিয়া, তপেনকে কহিলেন, ওহে তপেন, ধনেশ-অপেরা-পার্টি তখন ভাল জমে নি; তবলচী জুটেছে, এইবার জমবে! কি বল?

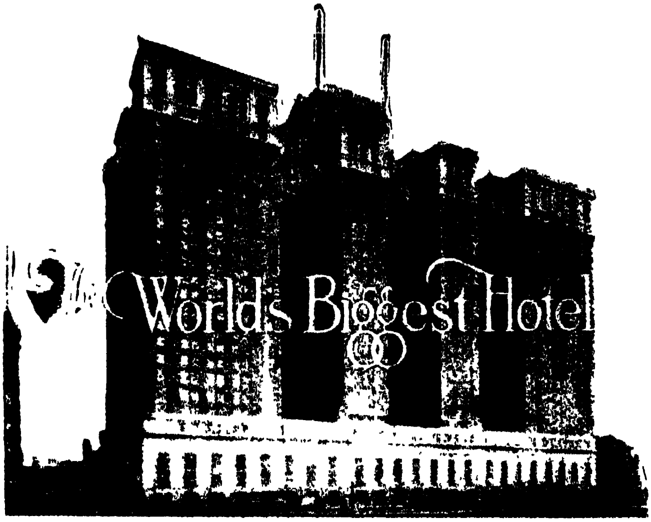
বর-ক'নে হাসিল। যে হাসিতে সরসীবক্ষে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, যে হাসিতে হাস্‌না হানা ফোটে, যে হাসিতে নদীর জলে রূপের তরঙ্গ উত্থিত হয়—এ সেই হাসি!

যুব জন ছাড়া এ হাসির মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে 'যুব' না হইলেও একজন বোধ হয় বুঝিল। যে জন—'বয়' অর্থাৎ ছেলে, 'কট' অর্থাৎ ধরা করিয়াছিল, সে হাসিয়া অত্যন্ত কুরুচি সম্মতভাবে তপনের কাণটা মলিয়া দিল—সে সন্ধ্যা!

নিখিল-প্রবাহ

বৃহত্তম হোটেল—

আমেরিকা বৃহত্তম দ্রব্য তৈয়ার করিবার কাজে সমগ্র বিশ্বের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। যত কিছুর বৃহত্তম যেন এক আমেরিকাতেই বসবাস করিবে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ৮১,০০০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি ২৫ তলা হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। মাটির নীচে হোটেলটির চারিটি তলা আছে। হোটেলের কতকগুলি সাজসরঞ্জামের সংখ্যার নমুনা দেখুন—চেয়ার ৭০০০, ১৩৪,০০০ প্লেট; অন্যান্য পাত্রাদি যাহা আছে, তাহাতে ৫০টি মালগাড়ি বোঝাই করা যায়; ১৩৮,০০০ টেবিল-ক্লথ, ৩০০,০০০ ঝাড়ন, ৪৮,০০০ পানপাত্র, ৫০০০ ডজন তোয়ালে। কারপেট যাহা আছে, লম্বালম্বি ভাবে তাহা রাখিলে ৬০ মাইল হইবে।

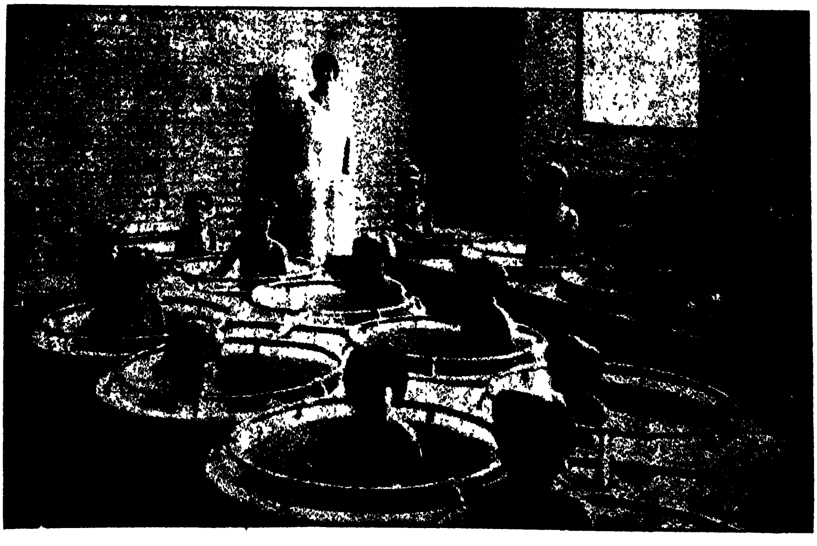


বৃহত্তম হোটেল

এক-একটি তলার নাচঘরে এক সঙ্গে আরামে ৩০০০ লোক নৃত্য করিতে পারে। আহার করিবার হলঘরগুলিতে ৫১৮৪ জন লোক এক সঙ্গে খাইতে পারে। হোটেলের পুস্তকাগারে ১০,০০০ বই আছে। হোটেলের নিজস্ব টেলিফোন সুইচবোর্ড আছে—ইহাতে মোট ৩৮০০ লাইন আছে। ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭২,০০০ 'কল' রিসিভ করা যায়। হোটেলের কর্ম্মীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০। একজন লোক যদি প্রত্যহ ঘর বদল করিয়া ঘুমায়—তবে হোটেলের সব কটি ঘরে ঘুমান শেষ করিতে তাহার ৮ বৎসর সময় লাগিবে।

অভিনব স্নানাগার—

সুইডেনের এক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে তাহাদের স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে। স্নানাগারটি অভিনব-



অভিনব স্নানাগার

ভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। প্রত্যেকের জন্যে একটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট টব ঠিক করা আছে। কোন্ সময় কোন্ দল স্নান করিবে, তাহাও ঠিক করা আছে। টবে হাত পা চালাইবার স্থান আছে—এবং গলা পর্য্যন্ত ডোবে। স্নান শেষ হইলেই টবের জল কলের সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বালক বালিকারা যখন স্নান করে, তখন তাহাদের বস্ত্রাদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করা হয়।

মোটর-টিউবের তৈরী বল—

এক জন মার্কিন আবিষ্কারক পুরান মোটর টিউব কাটিয়া



মোটর-টিউবের তৈরী বল

এক প্রকার চমৎকার বল তৈয়ার করিয়াছেন। বলগুলি নানা আকারের হয়—এবং খুব শক্ত হয়। এই সকল বল লইয়া বেশ খেলা চলে। ছবিতে বলের নমুনা দেখুন।

জ্যোতিষ্মান টুপি—

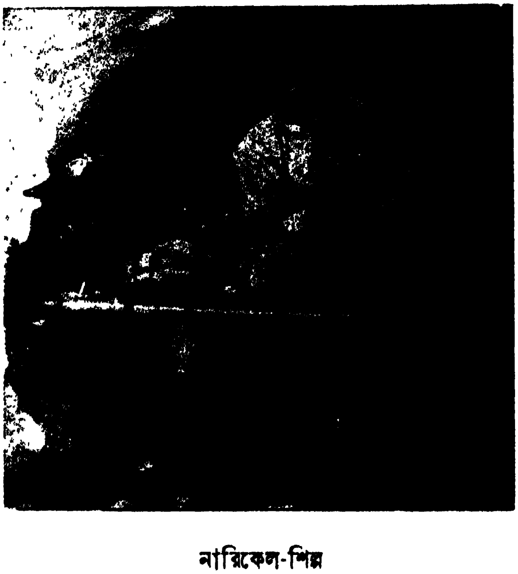
লণ্ডনে রাত্রিকালে মোটর চাপা পড়িয়া বহু নর-নারী হতাহত হয়। ইহা কমাইবার জন্য একপ্রকার টুপীর আবিষ্কার হইয়াছে। টুপীর উপর এমন কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যাদির দ্বারা আঁকা দাগ থাকিবে—যাহা দূর হইতে জলজল করিতেছে দেখা যাইবে। অন্ধকারে উহা অধিকতর স্পষ্ট হইবে। মোটর-চালক দূর হইতে ইহা দেখিয়া গাড়ী সাবধানে চালাইবে। যে স্থান খুব বেশী আলোকিত সে স্থানে টুপীর "আলো" দেখা যাইবে না।



জ্যোতিষ্মান টুপি

নারিকেল-শিল্প—

মিঃ কাথকার্ট নামক একজন মার্কিন ভদ্রলোক গত ২৬ বৎসর ধরিয়া নারিকেলের খোলার উপর নানা প্রকার চিত্রাদি খোদাই করিতেছেন। এই সকল খোদাই-করা নারিকেল সভ্য জগতের প্রায় সকল স্থানের ভ্রমণকারীরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মিঃ কাথকার্ট অতি তৎপরতার সহিত এই খোদাই-কার্য্য করিতে পারেন। একটি পরিষ্কার-করা নারিকেলের খোলাকে অতি অদ্ভুতদর্শন মনুষ্য-মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে তাঁহার মাত্র ৪।৫ মিনিট সময় লাগে। খোদাই



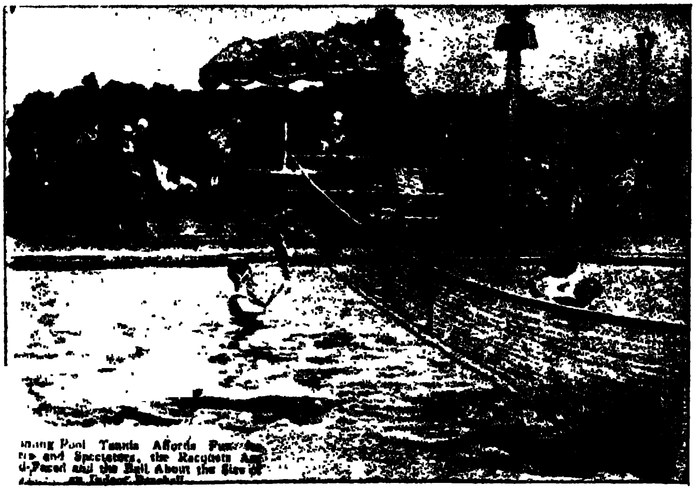
নারিকেল-শিল্প

দাগে-দাগে করিয়া, খোদাইএ নানা প্রকার রং বুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে মূর্ত্তিগুলি দেখিতে চমৎকার হয়।

নারিকেলের খোসা ছাড়াইয়া খোলাটিকে সাফ করা অতি পরিশ্রমের কাজ। খুব ধারাল ছুরি দিয়াও ইহা সময় সময় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাহেবের হাতদুটিতে কাটাকাটির দাগ যে কত আছে তাহা বলা যায় না।

জল-টেনিস—

আমরা ওয়াটার-পোলো খেলা দেখিয়াছি। সম্প্রতি ওয়াটার-টেনিস খেলারও প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ওয়াটার- টেনিসের বলগুলি সাধারণ টেনিস খেলার বল অপেক্ষা সামান্য বড়—র‍্যাকেটগুলি একেবারে কাঠের—তাঁতের বোনা কোনো অংশ ইহাতে নাই।



জল-টেনিস

নৌকার অপরূপ সাজ—

ফরাসী দেশের একটি বিশেষ জল-উৎসব উপলক্ষে মানুষ এবং নৌকা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। নৌকাগুলিকে নানা প্রকার জলজন্তুর ছদ্মবেশ পরান হয়। ছদ্মবেশ পরিবার পর নৌকাগুলিকে আর নৌকা বলিয়া মনে হয় না—সত্যিকার কোনো বিকটাকার জলজন্তু বলিয়াই মনে হয়।



নৌকার অপরূপ সাজ

ঘোড়ার গাড়ীর ব্রেক—

উঁচুতে উঠিবার সময় অনেক ক্ষেত্রে ঘোড়ার এবং গরুর গাড়ী পিছলাইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে। ঘোড়া বা গরুকে এই সময় দ্বিগুণ জোর দিয়া গাড়ীকে আবার টানিয়া

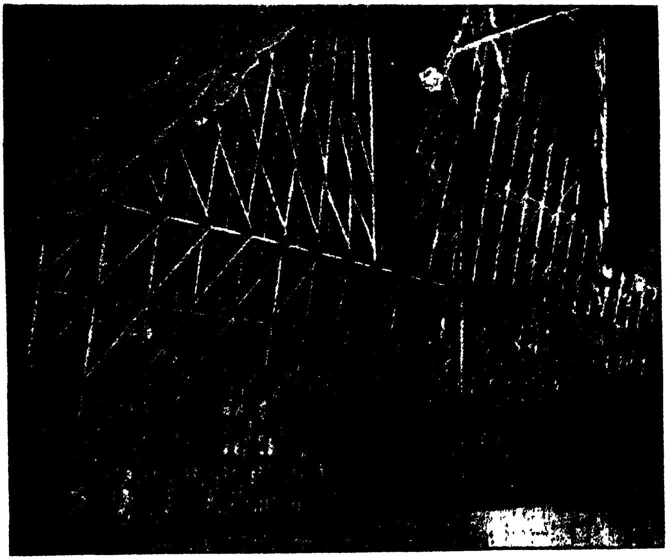
উপরে তুলিতে হয়। গাড়ী যাহাতে পিছলাইয়া না পড়ে এবং উপরে উঠিবার সময় যাহাতে মাঝে মাঝে ঘোড়া বিশ্রাম পায়, তাহার জন্য গাড়ীর পিছনে একপ্রকার ঘোঁটা ব্রেক লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গাড়ী-চালক যখন ইচ্ছা তাহার সিট হইতে এই ঘোঁটা ব্রেক ছাড়িয়া দিতে পারে। ব্রেক খোলা পাইলেই মাটিতে গিয়া লাগিবে এবং গাড়ী পিছলাইয়া নীচে নামিয়া যাইবার আর কোনো ভয় থাকিবে না।



ঘোড়ার গাড়ীর ব্রেক

কাঠের তৈরী ২০০ ফিট উচ্চ পুল—

ওয়াশিংটনে সম্প্রতি নদীর উপর দিয়া কাঠ চালান করিবার সুবিধার জন্য একটি কাঠের পুল নির্ম্মিত হইয়াছে।

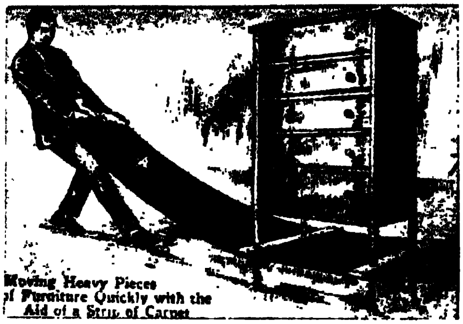


কাঠের তৈরী ২০০ ফিট উচ্চ পুল

কাঠের তৈরী এত উচ্চ পুল পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। পুলটি নদীর জল হইতে ২০০ ফিট উচ্চ। লম্বাতে পুলটি ৮৯৩ ফিট। পুলটি তৈয়ার করিতে মোট ৮৩৬,০০০ কাষ্ঠ-খণ্ড লাগিয়াছে।

গৃহের ভারী দ্রব্য সরাইবার সহজ উপায়—

আলমারি, ভারী দেরাজ, ইত্যাদি ঘরের এক দিক হইতে আর এক দিকে সরাইবার এক সহজ উপায় আছে।



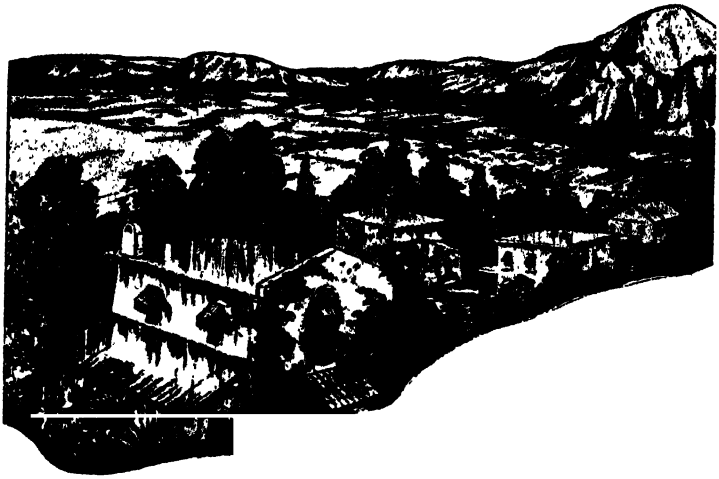
গৃহের ভারী দ্রব্য সরাইবার সহজ উপায়

একটি শক্ত কারপেট বা দরির উপর দুইখণ্ড পাতলা তক্তার উপর সরাইবার দ্রব্যটিকে ঠিক করিয়া বসাইতে হইবে। তার পর একজন লোকেই দরির প্রান্ত ধরিয়া সামান্য জোরেই ভারী ভারী দ্রব্যকে ঘরের যে কোনো দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে।

মরুভূমিতে গৃহ ঠাণ্ডা রাখিবার উপায়—

যুক্তরাজ্যের পশ্চিম দিকের এক মরুভূমির মধ্যে কতকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হয়। গরমের জন্য সেই বাড়ীগুলিতে কোনো লোক বাস করিতে পারে না।

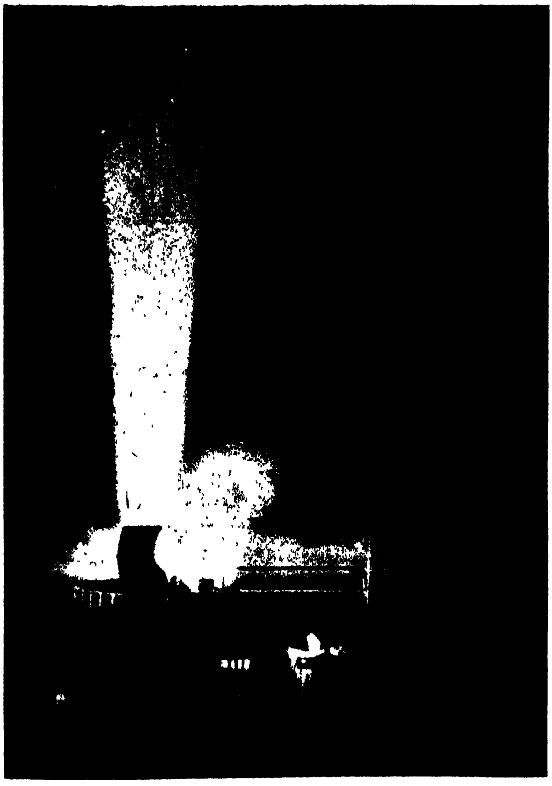
তার পর একজন ইঞ্জিনিয়া প্রত্যেক বাড়ীর উপর একটি করিয়া ফোয়ারা তৈয়ার করিয়া দিলেন। দিনের প্রায় সকল সময় এই ফোয়ারা দিয়া বাড়ীর ছাতে জ পড়ে এবং তাহার ফলে বাড়ীগুলিও বেশ ঠাণ্ডা থাকে। গরমকালেও এখন এই সকল বাড়ীতে লোকজন আরামে বাস করে।



মরুভূমিতে গৃহ ঠাণ্ডা রাখিবার উপায়

বৃহত্তম আলোক—

প্যারিসের নিকটে মণ্ট ভালেরিয়েনে একটি লাইট-হাউস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানে যে আলোটি আছে, তাহা ৯০ মাইল দূর হইতে দেখা যাইবে। রাত্রির অন্ধকারে আকাশ-জাহাজকে তাহার পথ চিনাইবার জন্যই এই অতি বৃহৎ আলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। বাতির জোর ১০০০,০০০,০০০, ক্যাণ্ডেল পাওয়ার।



বৃহত্তম আলোক

এমডেন-ডোবার দৃশ্য—

মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে "এমডেন" জাহাজ বঙ্গোপসাগরে মহা প্রলয় সুরু করিয়াছিল। ছোট একটি জাহাজ যে কাণ্ড করে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিছুদিন পরে অবশ্য জাহাজখানি ইংরেজ জাহাজের হাতে মারা যায়। সম্প্রতি জার্ম্মানিতে এমডেন জাহাজ ডোবার ছবি বায়স্কোপে দেখান হইতেছে। এই ছবিতে এমডেন সেনানায়কদের দেখা যাইতেছে। দূরে এমডেন্ শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে আহত হইয়া ধীরে ধীরে জলে নিমগ্ন হইতেছে। শত্রুর জাহাজে দাঁড়াইয়া এমডেনের কর্ম্মচারীরা তাহাই দেখিতেছেন। তাঁহাদের মুখ অতি বিষাদে পূর্ণ। জাহাজটিকে তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন।



এমডেন জাহাজ শত্রুপক্ষের ১৭খানি জাহাজ করিয়া অবশেষে মারা যায়।



এমডেন-ডোবার দৃশ্য

চীনের ছবি—

চীনে বর্ত্তমানে গৃহযুদ্ধ চলিয়াছে। বিদেশীদের অবস্থাও বিপদজনক। এখন হইতে একমাত্র ব্যবসায়ী ছাড়া আর বোধ হয় কোনো ভাবে তাহাদের চীনে থাকা চলিবে না। এমন কি বিদেশীদের চীনাদের পরম উপকার করিবার ইচ্ছাও দমন করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। ছবিতে দেখুন—একজন চীনা বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড হইতেছে। অপরাধীকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধা হয়। তাহার পর তাহাকে বন্দুকধারীর দিকে পিছনে ফিরাইয়া হাঁটু-গাড়িয়া বসাইয়া গুলি করা হয়। পিছনে দেখুন—বন্দুকধারী গুলি ছুঁড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।



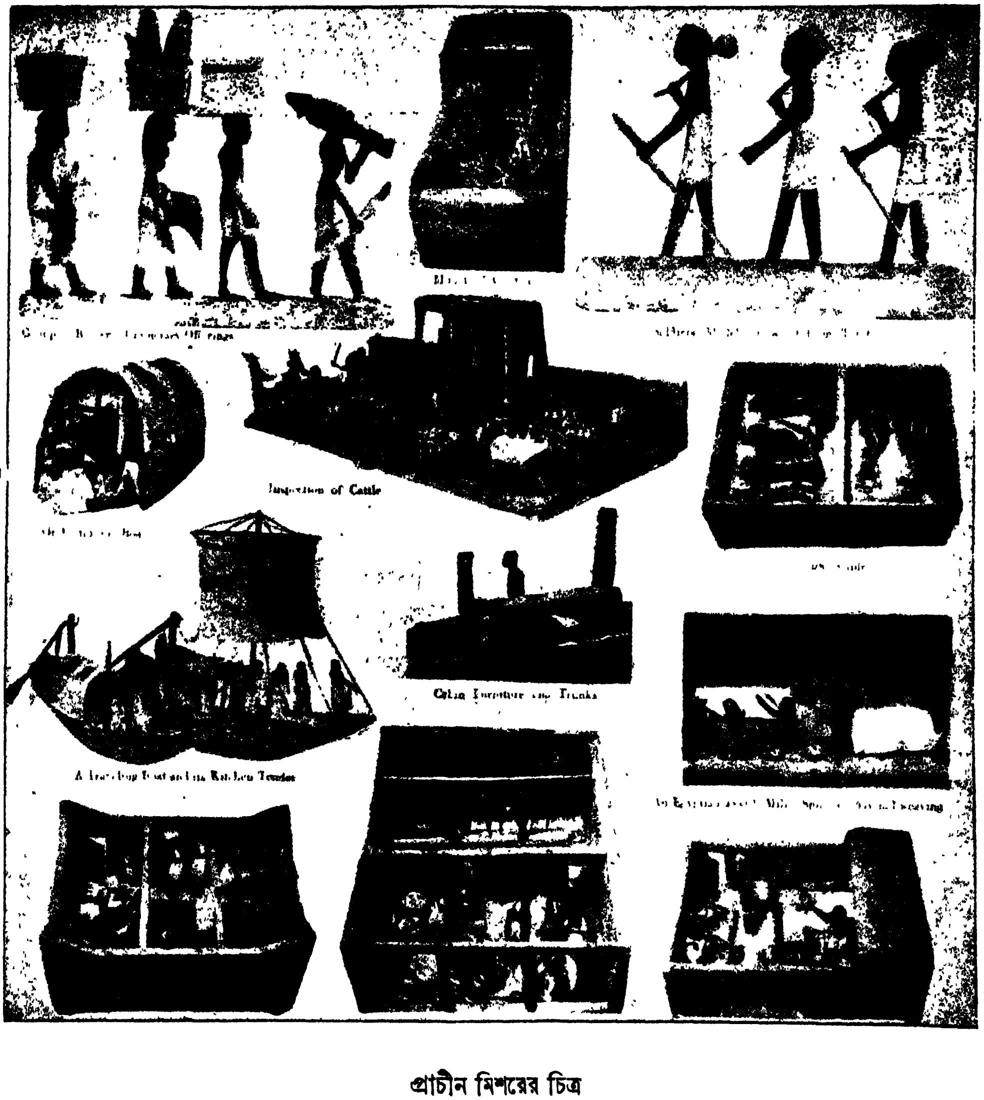
চীনের ছবি

প্রাচীন মিশরের চিত্র—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিশরে থিবাসের কবর খুঁড়িতে খুঁড়িতে কতকগুলি প্রাচীন

"মডেল" পাওয়া যায়। এই মডেলগুলিতে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের মিশরীয়দের জীবনযাত্রার অনেক চিত্র পাওয়া যায়।

কবর খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক পাশে একটি ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্ত্ত বড় করিয়া কাটাইবার পর তাহার মধ্যে এই সকল মডেল পুতুলগুলি পাওয়া যায়। মডেলগুলি ৮।৯ উচুঁ। মডেলের ছবিগুলির নীচে ইংরেজি নাম পড়িয়া ছবিগুলির পরিচয় পাইবেন।



প্রাচীন মিশরের চিত্র



কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসাহানা দেবী।

দেশী আশাবরী যৎ (বিলম্বিত লয় বা ঠাঁয়ে)

মাঝি ! এবার তোমার আপন হাতে বেয়ে চল দাঁড় !
তোমার হাতেই কাণ্ডারী গো ! দিলাম সকল ভার !

এখন ইচ্ছা তোমার ফ্যালো ধরো,
দুঃখ দেখে আদর করো,

আমি শুধু চাইব তোমার চরণ-পারাবার !
বইব তোমার দণ্ড-সুধা,—ঝরুক অশ্রুধার !
কূলের কথা ভুলল যে মন ভাস্‌ল অকূলে !
তুমি এবার বাও গো তরী, হালটী নাও তুলে !

এবার তোমার স্নেহ-পিযূষ-ধারায়
সিক্ত কর রিক্ত আমায়

না হয় কেড়ে নিয়ে সকল বালাই মারো বারম্বার !
জানব এই তোমারি পারের কড়ি—নিলে কর্ণধার !

I II সা ঋা | গা মা | মমা -া | মমা পা | গমা -া | পমপা ণদা |
মা - ঝি - এবা র্‌ তোমা র্‌ আ- - প- - ন্‌

পপা -া | দপা দমা | সমা গমা | মণদা ণদা | -া পমা | পমা মগা |
হাতে - - - বে- - য়ে - - - - চল

গমা পমা | গমা গমা | গা ঋা | সা -া | II
দাঁ - - - - - - ড় -

পা পদা | নর্সা -া | সর্সা -া | নদা -া | পদনর্সা ঋর্সনা | দা পা |
তো মা - য় হাতে - কা - ণ্ডা - - রী গো

-া দপা | দা পমা | গমা গমা | ণা দা | -া পদা | পদা পমা | -া গমা |
- - - - দি - - লা - - - - ম্ সক ল্ ভা-

পমা গমা | গমা গা | ঋা সা | II
- - - - - র্

০　১　০　৩　[র্সা নদা | পদনর্সা ঋর্সা]
{ মা -া | মা পা | ণদা ণদা | না না | র্সনা দা | র্সনা র্সা |
এখ ন্ ই চ্ছা তো- - মার্ ফ্যা লো- - - -

না র্সা | -া -া | র্সনা র্সা | জ্ঞর্ঋা জ্ঞর্ঋা | ঋর্া র্সা | -া নর্সঋা |
ধ রো - - দুঃ- - খ - - দে খে - আ - -

র্সনা পদনর্সা | ঋর্সনা দা | পা -া | দপা দমা | } { মদা দা |
দ - - - য় ক র - - - - আ- মি

পা দা | পদণা দণা | দপদা পমদা | দপা মগা | -া মগা | মা
শু ধু চা-ই ব- তো - মা র চ - র - - - ণ

[মপা মগা]
পদা | :পা -া } { -া সমা | গমা মা | মমা -া | পমা পা | গমা গমপা |
পারা বার ব ই - - ব তোমা - - র দ - ণ্ড - -

ণদা -া | পা দপা | দা মা | } গমা গমা | মণা দা | -া পদা | পদা
- - সু ধা - - - ঝ - - রু - - - ক্

পা | মা -া | গমপমা গমগমা | গা ঋা | -া সা | II II
অ শ্রু - ধা - - - র

-া | ঋঋা -া | সঋা গা | ঋা সসা | ন্‌সঋা সঋগা | ঋমগমা -া |
কূলে র্ কথা - ভু- ল্ ল যেমন ভা-স্ ল-- অ---

গমা -া | -া -া | মমা মমা | -া পমগমা | মসঋা মগমা | মা মমা | -া
কূলে - - - তুমি এবা - - র্ বা-- - ও গো তরী -

পগমা | গমপণা দণদপা | মগমা -া | পদা পা |
- - হা - ল্ টী -- না -- ও তু - লে

০ ১ ২´ ৩ [র্সা নদা পদনর্সা ঋর্সা]
{ া মমা | মা পা | ণদা ণদা | না না | র্সনা নদা | র্সনা র্সা |
এবার্ তো মার স্নে- - হ পি যূ- - - ষ.

না না | -া -া ' র্সনা র্সা | র্জ্জা ঋর্া | ঋর্া র্সা | -া নর্সঋা |
ধা রা য় - সি- - ক্ত - ক র - রি--

সনা পদনর্সা | ঋর্সনা দা | পা -া | (দপা দমা) } মগা মা |
ক্ত- - - - - আ মা য় - - না- হয়

০ ১ ২´ ৩
{ মদা দা | পা দা | -া পা | পদণদা পদা | পা দা | পদপদা দমা
কে- ড়ে নি য়ে - স ক- -ল্ বা লা - - -ই

মগা মগা | -া মগা | মা -া | পদা পা | (-া -া) | -া -া | }
মা- য়ো- - - - - - বার স্বা র্

[মপা মগা]
মা মা { -া সমা | গমা মা | মমা -া | পমা পা | গমা গমপা |
জা নব এই -- তো মারি - - - পা- রে--

ণদা -া | পা দপা | দা মা | } গমা গমা | নণা দা | -াপদা | পদা
- র্ ক ড়ি- - - নি- - লে - - - -

পা | মা -া | গমপমা গমগমা | গা ঋা | সা -া | II II
ক র্ণ - ধা-- -- - - র্ -

একটী গল্প

হুমায়ুন কবির

Passionate Friends ইংরাজি সাহিত্যে ওয়েল্‌সের অমূল্য দান। যখন চিন্তার সহিত আবেগ এক হইয়া যায়, বুদ্ধির সহিত অনুভূতির কোন দ্বন্দ্ব থাকে না, তখনই ললিত-কলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। বুদ্ধি ও আবেগের পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে মানুষের জীবন গড়িয়া ওঠে; সাহিত্য সেই জীবনেরই অভিব্যক্তি। তাই যখন জীবনের পূর্ণপ্রকাশ আমরা সাহিত্যে দেখিতে পাই, তখনই আমরা তাহাকে মহত্তম সাহিত্য বলিয়া বরণ করি।

ওয়েল্‌সের বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে। তাঁহার সাহিত্যে মানুষের মানস ও অন্তর উভয় জগৎই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার নরনারী কেবল কামনার উদ্দাম স্রোতেই ভাসিয়া চলে না। তাহারা তাহাদের সকল কাজকেই বিচার করিয়া দেখিতে চায়, আপনাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করে। বাস্তব জগতে আমরা বুদ্ধি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই,—হয় ত সকল সময় সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারি না। সময় সময় আবেগের আন্দোলনে আমাদের জীবন এমন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে যে, বুদ্ধির সতর্ক বাণী তখন আর স্মরণ থাকে না; তখন দেশ, কাল, পাত্র ভুলিয়া গিয়া আমরা আমাদের হৃদয়ের পিপাসাকে পূর্ণ করিতে চাই। কিন্তু তাই বলিয়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে কখনই বুদ্ধি ও অনুভূতি পরস্পর বিরোধী হইয়া প্রকাশ পায় না। জীবনের এই দুইটী উপাদানের মধ্যে যখনই একটী অন্যকে ছাপাইয়া ওঠে, তখনই জীবনের সহজ প্রকাশ ব্যাহত হয়, সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। যে জীবনে অনুভূতি ও আবেগকে স্বীকার করিতে চাহে না, তাহার জীবন সুখ-দুঃখ-বোধ-রহিত জড়ত্ব লাভ করে। যে কেহ বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া যখন তাহার মনে যে ইচ্ছা জাগরূক হয় তাহাই পূর্ণ করিতে চায়, তাহাকে আমরা বলি খেয়ালী। অধিক পরিমাণে খেয়ালী হইলেই সে উন্মাদ।

ইচ্ছা, আবেগ ও জ্ঞান লইয়াই মানুষের জীবন। প্রথমতঃ কোন একটী বিষয়কে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ গ্রহণ করে, আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি। এই জ্ঞানের ফলে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, তাহাই আবেগের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করে। সুখ আমরা পাইতে চাহি, দুঃখ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি, তাই সেই সুখ-দুঃখ অনুভূতির ফলে আমাদের ইচ্ছার জন্ম। আমরা যাহা পাইতে চাহি তাহা না পাইলেই আমাদের দুঃখ; তাহা লাভ করিলেই আমাদের সুখ।

একান্ত আপনার করিয়া পাইতে চাওয়ার নামই প্রেম। যখন দুইটী নরনারী পরস্পরের সাহচর্য্য এত আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করে যে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছেদের মতন বেদনা আর কিছুই নাই, তখনই আমরা তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত বলিতে পারি। প্রীতিকর অভিজ্ঞতা আমরা পাইতে চাহি, প্রীতির বস্তু একান্ত ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহি, তাই প্রণয়াস্পদের সঙ্গে ব্যবধান আমাদিগকে বেদনা দেয়। তাই প্রেমকে ঘিরিয়া মানবজীবনের নিগূঢ়তম মধুরতম, নিষ্ঠুর-কঠিনতম সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে,—মানুষের আবেগের ইতিহাস প্রেমেরই সুখ-দুঃখ-কাহিনী।

Passionate Friends দুইটী নরনারীর পরস্পরের মিলনের আকাঙ্ক্ষার ও ব্যর্থতার ইতিহাস। আমাদের আবেগসমূহ যদি সহজ এবং সরল হইত, তাহা হইলে মানুষের জীবনে এত বেদনা জমিয়া উঠিত না; এত কান্নায় পৃথিবীর আকাশ বাতাস ম্লান হইয়া যাইত না। সমাজের বন্ধন ও নিষেধ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষুণ্ণ করে, সংহত করে বলিয়াই জীবনের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে না। সকল দেহমন যাহার জন্য কাঁদিতেছে, যে বাঞ্ছার পরিতৃপ্তির উপরে জীবনের সকল সুখ নির্ভর করিতেছে, তাহার সহিত যখন বাহিরের কোন বাধার সংঘাত লাগে, তখনই জীবনে ট্র্যাজেডী জমিয়া ওঠে। সে বাধা লঙ্ঘন না করিতে পারিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল, অথচ সকল সময়ে সে বাধা লঙ্ঘন

সহজসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এই যে বাহিরের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, তাহারই মধ্যে জীবনের বেদনার মূল গ্রথিত।

আমাদের কামনার স্বরূপ এই বেদনার সম্ভাবনাকে আরো জটিল করিয়া তোলে। নরনারীর মধ্যে যে প্রেম, তাহা কামনায় উদ্বেল,—সকল অন্তর, সর্ব্ব অবয়ব দিয়া তাহা বাঞ্ছিতকে পাইতে চাহে। অনেক সময়েই আকাঙ্ক্ষার সে উগ্রতায় প্রীতির কোমলতা শুকাইয়া গিয়া মরুভূমির কঠিন তৃষ্ণার মতন একটী জ্বালার প্রকাশেই তাহা রূপান্তরিত হয়। নরনারীর প্রেমের এই যে আকাঙ্ক্ষার দিক, তাহা ওয়েল্‌সের চোখে কেমন করিয়া ধরা দিয়াছে, সেই সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা বলা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ওয়েল্‌স বলিতে চাহেন যে, সমকক্ষ নরনারীর মধ্যে মিলনের যে বাসনা, তাহাই মানুষের পক্ষে একমাত্র স্বাভাবিক প্রেম। নারীকে দুর্ব্বলা, নারীকে রক্ষণীয়া ভাবিয়া যে প্রেম তাহাকে পুরুষের প্রীতিসম্পাদনের উপায় বলিয়া মনে করে, তাহা দৈহিক লালসার রূপান্তর মাত্র। পরস্পরকে অধিকার করিবার প্রবৃত্তি নরনারীকে বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র স্বাধীন ইচ্ছায় পরস্পরের সান্নিধ্যলাভের যে ব্যাকুলতা, তাহাই প্রেমের যথার্থ প্রকাশ। তাহার মধ্যে প্রভুত্বের দাবী নাই, ঈর্ষার বিষে তাহা কণ্টকিত হইয়া ওঠে নাই।

ষ্ট্র্যাটন ও মেরী পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল। শৈশব হইতে তাহারা খেলার সাথী, শৈশব হইতে তাহারা পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া ভাবিয়াছে; পরস্পরের সকল চিন্তা, সকল আবেগ, সকল অভিজ্ঞতা সমান ভাবে বহিয়াছে। যৌবনের তরুণ আবেগে এই বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হইল। ইহার মত স্বাভাবিক প্রেম বোধ হয় মানুষের জীবনে আর হইতে পারে না। কিশোর-প্রেমের সেই সলজ্জ আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের জীবন রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নবীন-যৌবনের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লাগিয়া এ সংসার তাহাদের চোখে সোনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। প্রেমে যে বিচ্ছেদ থাকিতে পারে, আকাঙ্ক্ষা করিয়া না পাইলে বেদনায় জীবন যে উদ্বেল হইয়া ওঠে, এ সম্ভাবনার কথা সেদিন তাহাদের মনে হয় নাই। আপনার অন্তরের আলোকে ধরণীকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহারা ভাবিল এ আলোক বুঝি ধরণীরই আলো।

মেরী ধনীর কন্যা, ষ্ট্র্যাটন দরিদ্র। আজন্ম বিলাস-পালিত মেরী তাহাকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিলেও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া জীবনের দুঃখ-বেদনার বোঝা বহিতে সাহস পাইল না। এইখানে তাহার জীবনের সকলের চেয়ে বড় ভুল। আপনার দুর্ব্বলতার ফলেই তাহার জীবনে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইল। সমাজ ও পরিবারের অনুরোধে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল জাষ্টিনকে, অথচ জাষ্টিনকে সে ভালবাসে নাই,—তাহার সকল জীবনের দেবতা ষ্ট্র্যাটন। মেরী ভাবিল যে এ বিবাহের ফলে ষ্ট্র্যাটনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ মানুষ যে আকাঙ্ক্ষার নিবিড়তম ব্যাকুলতায় কেবল প্রণয়াস্পদের প্রেম পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তাহার হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহকেও কামনা করে, সে কথা মেরী ভাবে নাই। সে ভাবিয়াছিল সকল জীবন কালই সে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিবে, ষ্ট্র্যাটন বা জাষ্টিন কাহারো কাছেই সে আত্মসমর্পণ করিবে না। এই আত্মসমর্পণে যে কোন দৈন্য নাই, কোন লজ্জা নাই, এ কথা মেরী বুঝিতে পারে নাই। নারী যখন আপনার প্রণয়াস্পদের কাছে দেহমনে আপনাকে সমর্পণ করে, সে আত্মদানে তাহার গৌরববৃদ্ধিই হয়, দুর্ব্বলতার কোন সন্দেহ সেখানে নাই।

ষ্ট্র্যাটন এ বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করিল; তাহাতে ব্যর্থ-কাম হইয়া মেরীকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়া তাহার জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিল—মেরীর ছবি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু স্মৃতিকে মানুষ কেমন করিয়া বর্জ্জন করিবে? মেরীর দৃষ্টিপথ হইতে সে দূরে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার সকল জীবন, সকল হৃদয়, সকল চিন্তা, আবেগ তখন মেরীময়। যুদ্ধে যোগ দিয়া সে এ বেদনা ভুলিতে চাহিল; কিন্তু যে বেদনা একেবারে মর্ম্মের মূলে বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাকে ভোলা কি এমনি সহজ? কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে বেদনার তীব্রতা যখন কমিয়া আসিয়াছে, তখন দেশে ফিরিয়া র‍্যাচেলের সঙ্গে তাহার পরিচয়। র‍্যাচেল তন্বী কিশোরী, প্রথম যৌবন-উন্মেষের মাধুর্য্যে তাহার দেহ-মন তখন সৌরভে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই অতি সুকুমার অসহায় বিশ্বাসপরায়ণ হৃদয়টীর সংস্পর্শে আসিয়া ষ্ট্র্যাটনের মনে বেদনার রেখা বিলোপ পাইতে সুরু করিল। মেরীর ছবি মুছিয়া গিয়া আর একখানি হাসিমুখ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

র‍্যাচেলের প্রতি ষ্ট্র্যাটনের এই যে প্রেম, তাহা সমকক্ষের পরস্পরকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা নহে, কামনার উগ্র দাহ সেখানে নাই। ইহা নির্ভরশীল একটী শিশু হৃদয়কে সংসারের সকল ঝঞ্ঝা আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য করুণার কোমল স্পর্শ। র‍্যাচেলকে ষ্ট্র্যাটন অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল। মানুষ যেমন করিয়া দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তার সন্ধান করে, তেমনি সন্তর্পণে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করিবার ইচ্ছাতেই সে র‍্যাচেলকে ভালবাসিয়াছে। মেরীর প্রতি তাহার যে প্রেম তাহাতে সহজ বন্ধুত্ব ছিল। নরনারী পরস্পরের সাহচর্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, বিপদের দিনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আঘাত সংঘাত সহ্য করিবে, পরস্পরের হৃদয়ের আনন্দভাণ্ডারের সুধা বণ্টন করিয়া লইবে।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে যখন ষ্ট্র্যাটন র‍্যাচেলের হৃদয়ের সান্নিধ্যলাভ করিতেছিল, এমন সময় মেরীর সঙ্গে তাহার আবার দেখা। কোথায় রহিল তাহাদের অতীতের শুভ সংকল্প, কোথায় রহিল ভীরুহৃদয় র‍্যাচেলের দুর্ব্বল প্রীতি। মেরীকে লাভ করিবার কামনায়, আকাঙ্ক্ষার উগ্র অনলে র‍্যাচেলের ছবি জ্বলিয়া গেল, ষ্ট্র্যাটনের স্বপ্নজাগরণ কর্ম্ম-অবসরের একমাত্র ধ্যান হইল মেরীর সাহচর্য্য লাভ। মেরীর হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমও আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। উদ্বেল আকাঙ্ক্ষার স্রোতে এবার সমাজ ও নীতি ভাসিয়া গেল। সকল বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া মেরী ও ষ্ট্র্যাটন পরস্পরকে আত্মদান করিল। কিন্তু যে সমাজের নিষেধ তাহারা লঙ্ঘন করিল, তাহারি ভয়ে এ বিদ্রোহ লুকাইয়া চলিতে তাহারা বাধ্য হইল,—তাহাদের প্রেম পূর্ব্বের মতন সহজ স্বাধীন রহিল না। প্রেমের সম্বন্ধে যখনই কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই প্রেমের অবসান। মেরী ও ষ্ট্র্যাটনের প্রেমেও তাই লজ্জা ও ভয়ের আবির্ভাবে তাহাদের আনন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল।

তাহাদের এ গোপন প্রেমের কথা যেদিন জাষ্টিন জানিতে পারিল, সেদিন তাহাদের সম্বন্ধের সকল দুর্ব্বলতা নূতন করিয়া ধরা পড়িল। সমাজকে লুকাইয়া যাহারা সমাজ-বিরোধী কিছু করিতে চাহে, তাহাদের গুপ্ত প্রয়াস প্রকাশিত হইয়া পড়িলে লজ্জা বেদনায় সমাজের শাসন মানিয়া চলা ব্যতীত তাহাদের আর কোন উপায় থাকে না। জাষ্টিনের ইচ্ছায় মেরী ও ষ্ট্র্যাটন পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল—ষ্ট্র্যাটনের স্বদেশে রহিবার অধিকারও রহিল না। সমাজ আসিয়া তাহাদের প্রেমের প্রকাশের পথে নূতন অন্তরায় গড়িয়া তুলিল; তাহারা যে সে বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবে, ঘটনার সংস্থানে সে উপায়টুকুও তাহাদের রহিল না।

জগতের নানা কাজের মধ্যে ষ্ট্র্যাটন আপনাকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিল; মেরীকে ভুলিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিল। কিন্তু ভোলা কি এতই সহজ? যে আকাঙ্ক্ষা বেদনার মতন তীব্র,—আঘাত সহিয়া সকল হৃদয় যখন ব্যথায় টলিতে থাকে, কাহাকেও যখন অসহ্য আবেগে সকল হৃদয় কামনা করে, তখন কি কেহ কোথাও কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়? "O the longing, the longing that is like a physical pain, the hunger of the heart for one who is intolerably dear." নিষ্ঠুর প্রিয়ের জন্য হৃদয়ের সেই বুভুক্ষু ক্ষুধা—তাহা কি কেবল স্বপ্ন গাঁথিয়া মিটানো যায়?

বহু দেশবিদেশ ঘুরিয়া জার্ম্মাণীতে আবার র‍্যাচেলের সঙ্গে ষ্ট্র্যাটনের দেখা হইল। সেদিনের কিশোরী আজ নারী—যৌবনের গভীরতা তাহার সারল্যকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। অন্তর্গূঢ় বেদনায় তাহার সকল জীবনে স্নিগ্ধ ছায়া পড়িয়াছে। ষ্ট্র্যাটনকে সে আজো ভুলিতে পারে নাই। আবার ষ্ট্র্যাটনের দেখা পাইয়া তাহার নিদ্রিত প্রেম জাগিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করিয়া ষ্ট্র্যাটনও বিচলিত হইল—র‍্যাচেলকে সে আপনার জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস খুলিয়া বলিল। সে যখন দেখিল যে সকল জানিয়া-শুনিয়াও র‍্যাচেল তাহাকে বরণ করিতে কামনা করে, তখন ষ্ট্র্যাটন র‍্যাচেলকে বিবাহ করিল। ধীরে ধীরে তাহার স্নিগ্ধ প্রেমের স্পর্শে তাহার হৃদয় জ্বালা জুড়াইল—আপনার গৃহকোণ ও আপনার জীবনের কাজ খুঁজিয়া পাইয়া ষ্ট্র্যাটনের ক্ষুব্ধ অন্তর শান্তিলাভ করিল।

বহুদিন পরে সহসা একদিন মেরীর চিঠি পাইয়া ষ্ট্র্যাটন চকিত হইয়া উঠিল। মেরী লিখিয়াছে, কেন এ নর-নারীর বৈষম্য? কেন এ কামনার সম্বন্ধ? মানুষ সমাজ গড়িতে চাহিয়াছে, রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু নারীকে আপনার জীবনের প্রকাশ হইতে সে বঞ্চিত করিতে চাহে। তাহারই ফলে নারী পুরুষের কামনার প্রতীক হইয়া

দাঁড়াইয়াছে; তাহারই ফলে নারীর সংস্পর্শে যে কামনার অনল জ্বলিয়া ওঠে, তাহাতে পুরুষের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। নরনারীর সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, নারী সম্পূর্ণভাবে বাঁচিবার অধিকার না পাইলে, মানুষের সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে না। নারী ও শ্রমিকের দাসত্বের উপরই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা; শ্রমিকের দাসত্ব দূর করিবার জন্য অনেকের প্রাণই কাঁদিয়াছে, কিন্তু নারীর দাসত্ব কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

মেরীর জীবনের অবসান তাহার সকল জীবনের মতনই করুণ। এ সংসারে মাঝে মাঝে দু-একটী লোক জন্মগ্রহণ করে, সমস্ত জীবনকাল দুঃখভোগের জন্যই যেন তাহাদের জন্ম। বিদেশে ঘটনাক্রমে সহসা তাহার ষ্ট্রাটনের সঙ্গে দেখা। বহুদিনের বহু সুখ-দুঃখ-কাহিনী বলিয়া একটী দিন বড়ই সুখে তাহাদের কাটিল। কিন্তু নিয়তির বোধ হয় তাহা সহ্য হইল না;—এ কথা জাষ্টিনের কানে পৌঁছিল। ষ্ট্রাটন ও মেরীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনিয়া সে মেরীকে প্রকাশ্য-ভাবে পরিত্যাগ করিতে চাহিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনা-সংস্থানে জাষ্টিনের মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হইবার উপক্রম দেখিয়া ষ্ট্রাটন ও তাহার পুত্র কন্যাকে অপমান, লজ্জা হইতে বাঁচাইবার জন্য মেরী প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইল—মেরীর আত্মহত্যায় জাষ্টিনের প্রতিশোধ-স্পৃহাও পরিতৃপ্ত হইল। সমস্ত জীবন ভরিয়া একটী ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেদনার অনলে দহিয়া দহিয়া দুঃখদগ্ধ মেরী নিঃস্বার্থ প্রেমের আহ্বানে আপনাকে মুছিয়া ফেলিল। সকল জীবন ভরিয়া তাহার যত দৈন্য যত অভাব ছিল, মরণে সে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল। মেরীর শবদেহের পাশে দাঁড়াইয়া জাষ্টিন ও ষ্ট্রাটন পরস্পরের বেদনায় সহানুভূতি বোধ করিতে শিখিল; তাহারা যে আপনার সুখের সন্ধানে মেরীর জীবনকে দীর্ণ করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া তাহাদের সকল হৃদয় বেদনাপ্লুত হইয়া উঠিল—শোকের অশ্রুজলে ঈর্ষা দ্বেষের আগুন নিবিল।

এই যে মানুষের সুখ দুঃখ বেদনার ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা ও অতৃপ্তির ক্ষোভের কাহিনী, তাহারই রঙে সমস্ত গ্রন্থখানি রঞ্জিত। আবেগের গভীরতায় ঘটনা-সংস্থান ভাসিয়া চলিয়াছে। বাস্তব জগতে মানুষ যেমন করিয়া হাসে কাঁদে, সুখের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ওঠে, আদর্শের সন্ধানে সকল জীবন বিলাইয়া দিতে চাহে—জীবনের সেই সত্য ছবি ইহার পাতায় পাতায় ফুটিয়াছে। তাই মেরীকে আমরা আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করি, ভালবাসিয়া তাহাকে অন্তরে বরণ করিয়া লই।

ওয়েলসের রচনা কেবলমাত্র ছবি আঁকিয়া শেষ নহে—আলোক চিত্রে তাঁহার সাহিত্য পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার সকল রচনাই উদ্দেশ্যমূলক। যে আদর্শের আলোকে তাঁহার সকল জীবন উদ্ভাসিত, তাহারি প্রকাশ তিনি জীবনে দেখিতে চান। তাই দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া যে মহত্তর জীবনের ছায়া তিনি মানুষের অন্তরে নিহিত দেখিতে পান, তাহারি প্রকাশে তাঁহার সকল রচনা মহিমান্বিত। মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের গৌরবে এ পৃথিবীতে স্বপ্ন-স্বর্গপুরীর প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। তাই বেদনা-আনন্দের রঙে তিনি যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা এই জগতের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দৈন্যকে ছাপাইয়া মহত্তর জীবনের আভাসে পরিপূর্ণ।

আর একটী কথা বলিয়াই আজ এ প্রবন্ধ শেষ করিব। পিতা পুত্রকে নিজের জীবনের ইতিহাস বলিতেছেন, ইহাই Passionate Friendর মূল গল্পাংশ। আপনার জীবনের সুখদুঃখ অভিজ্ঞতার ইতিহাস পিতা পুত্রকে বলিবেন,—প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মত স্বাভাবিক আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু বাস্তব জীবনে কি ইহা সর্ব্বত্র সম্ভবপর? তাহাতে পুত্রের পক্ষে জীবনের গতি-নির্দ্দেশ সহজ হয়। পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রীতির আকর্ষণ আরো গাঢ় হয়। কিন্তু সে প্রীতি বন্ধুত্বের রঙে রঞ্জিত। পিতা-পুত্রের মধ্যে কি সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়, ওয়েলস এইভাবে তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। সকল দোষগুণ ও দুর্ব্বলতা জানিয়াও তাহার জন্য প্রীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ভক্তির আতিশয্যে এ সম্বন্ধ সম্ভব হইয়া ওঠে না; সেখানে চলিয়া আসে পূজার প্রবৃত্তি। কিন্তু পূজার প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষণীয় নহে, কারণ যখনই পূজনীয়ের কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি বাহির হইয়া পড়ে, তখনই পূজার অবসান হইয়া যায়। পূজার প্রতিক্রিয়ায় তখন অশ্রদ্ধারই উদয় হয়। পিতা আপনার প্রেম এবং বেদনার কাহিনী পুত্রকে বলিতেছেন, ইহা ভাবিতেও অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে লজ্জা

পাইবার কিছু নাই। মানুষের জীবনে প্রেম হীন নহে, ঘৃণ্য নহে। আমরা মনে মনে তাহাকে লজ্জাকর মনে করি বলিয়াই তাহাকে লুকাইতে চাহি। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে লজ্জাকর ভাবার মধ্যে নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পুরুষত্বের প্রতি অপমান নিহিত রহিয়াছে। এই মনোভাব দূর না করিলে মানুষের জীবন সহজ হইবে না। পিতা যদি আপনার জীবনের নিবিড়তম গভীরতম প্রকাশকে পুত্রের কাছে লুকাইতে চাহেন, তবে পিতাপুত্রের মধ্যে বিপুল ব্যবধান থাকিয়া যাইবে, পিতা বা পুত্র কাহারো পক্ষেই তাহা মঙ্গলকর নহে।

পুস্তক-পরিচয়

দরিদ্রের ক্রন্দন।—ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি এইচ-ডি প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

'দরিদ্রের ক্রন্দন' আজ দিকে দিকে ধ্বনিত, এ সময়ে এখানি ঠিক যুগোপযোগী গ্রন্থ। বাঙলাদেশে এখন উপন্যাস ও কবিতার অপেক্ষা এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা এবং উহার বহুল পঠন পাঠন ও প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এই মরণোন্মুখ জাতিকে তাহাদের শোচনীয় ভবিষ্যতের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই "দরিদ্রের ক্রন্দন" তাহাদের কর্ণে পৌছাইয়া দিয়া স্বজাতিকে সময় থাকিতে সতর্ক করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। অতীতের বিলুপ্ত মহিমা গর্ব্বে আমরা এমনিই সমাচ্ছন্ন যে আমাদের বর্ত্তমানের দুর্দ্দশার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি নাই।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই "দরিদ্রের ক্রন্দন" পুস্তকখানিতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃত শোচনীয় চিত্রটি তাঁহার গভীর সহানুভূতির তপ্ত অশ্রুজলে অঙ্কিত করিয়াছেন,—এবং আমাদের ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তিনি প্রকৃত দেশ প্রেমিকের ন্যায় জাতীয় আসন্ন বিপদোদ্ধারের জন্য পরিত্রাণের কাতর আহ্বান-সূচক ঘণ্টা সঘনে ধ্বনিত করিয়াছেন! দেশবাসী যদি এই আহ্বানে সচকিত হইয়া না উঠে, যদি তাহাদের আশে-পাশের উপস্থিত দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিকারের জন্য অবহিত না হয়, তাহা হইলে এই অভাগা জাতিও যে অচিরেই বাবিলন আসুরীয় মিশরীয় প্রভৃতি বিলুপ্ত জাতির ন্যায় একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা যে কতবড় নিদারুণ সত্য, ইহা যে কেবলমাত্র ভাবুকের কল্পনা নহে—"দরিদ্রের ক্রন্দনের" প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি অধ্যায়ে এই চিন্তাশীল অধ্যাপক নানা দিক হইতে তাহা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। জাতির পরমায়ুর ক্রমশঃ হ্রস্বতা, তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞানের সাহায্যে পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া দুরবস্থার সঙ্গে বিলাসিতার অসামঞ্জস্য, কুটীরশিল্পের সঙ্গে কলকারখানার প্রতিযোগিতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি যেমন এদেশের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তেমনি আবার শিল্পপ্রণালী, পল্লীচর্য্যা, বর্ত্তমান কৃষক ও বণিকের আধিপত্য প্রভৃতির সম্যক আলোচনা করিয়া কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে সমবায়, সমাজ-সেবা প্রণালী, পল্লী-সেবা স্বদেশী ও স্বরাজ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া ও কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেশের ও জাতির সর্ব্বনাশের প্রতিকার নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাধাকমল বাবুর এই সাধু প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

রস-জলনিধি।—(or Ocean of Indian Chemistry and Alchemy)। রসাচার্য্য কবিরাজ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। মূল্য ৬৲ টাকা। পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে ও ইংরাজিতে ঐ সংস্কৃতের সরল অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি আলোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা যে ভারতীয় রসশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রসশাস্ত্র বা Chemistry র উৎপত্তি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই হইয়াছিল ও এই দেশেই অতি প্রাচীনকালে ঐ বিদ্যার চর্চ্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপে Paracelsus জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রসবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিলেন ও রসবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপে রসবিদ্যার উল্লেখযোগ্য চর্চ্চা এই Paracelsus হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক Franz Hartmann লিখিয়াছেন যে Paracelsus অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন ও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই তিনি এ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চর্চ্চা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান রাজত্বের কালে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে এই বিদ্যার আলোচনা অত্যন্ত ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে এই বিদ্যার চর্চ্চা ভারতবর্ষে ২।১ জন সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন—দেশের অধিকাংশ লোকই এই বিদ্যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহেন, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের ইংরাজি ভাষায় লিখিত ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি এক সাধু পুরুষের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেক সাধনা ও পরিশ্রমের পর লুপ্তপ্রায় রসবিদ্যার উদ্ধার সাধন

করিয়াছেন। সমগ্র আলোচ্য পুস্তকের বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে এস্থলে লিখিত হইল—(১) ইহাতে পারদের অষ্টাদশ সংস্কার অতি সুন্দররূপে ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত কোনও রসগ্রন্থে এই বিষয়টি এমন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই। (২) পারদ কিরূপে স্বর্ণাদি ধাতুকে গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিতে পারে তাহার প্রণালী অতি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। আধুনিক কবিরাজ ও বৈজ্ঞানিকগণ মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ-প্রস্তুতকালে পারদের সহিত স্বর্ণ মিশাইতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা স্বর্ণ পারদের সহিত chemically মিশ্রিত হইতে পারে না। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, পারদের সহিত স্বর্ণাদি ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হইতে পারে। পারদ কিরূপে স্বর্ণাদি ধাতুর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যাইতে পারে তাহার নানাবিধ প্রণালী এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। (৩) রাঙ্গ, সীসক প্রভৃতি হীন ধাতু হইতে পারদ সংযোগে কিরূপে বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার নানাবিধ প্রণালীও এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যে অসম্ভব নহে, তাহা সম্প্রতি জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক Dr. A Gaschler ও Dr. A. Miethe এবং জাপানী বৈজ্ঞানিক Dr. H. Nagaoke প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা অর্থাৎ alchemy বা কেমবিদ্যা অতি প্রাচীনকালে হিন্দু ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যা যে সকলেই শিক্ষা করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না। (৪) এই পুস্তকে পারদ ভস্ম প্রভৃতি ঔষধের সাহায্যে কিরূপে সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করা যায় তাহাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন খ্যাতনামা ও যশস্বী চিকিৎসক। সম্ভবতঃ আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত ঔষধ সকলের সাহায্যেই তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। দেশের চিকিৎসকগণ এই পুস্তকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

আশমানতারা।—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত। মূল্য ২৲। আলোচ্য উপন্যাসখানি প্রাচীন গৌড়েতিহাসের একাংশ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—জাতীয় উত্থানের প্রধান অন্তরায় হিন্দু-মুসলমান-অনৈক্য—তাহারই সমস্যা সমাধান সূচক কোন দৃষ্টান্ত দাখিল করা। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, নবীন লেখক যে মহাদৃষ্টান্ত দাখিল করিয়াছেন তাহার দ্বারা সুফল প্রসূত হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের এই যে অন্তর্বিরোধ দেশমধ্যে আজকাল সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে উহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতির স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরকে বন্ধনের প্রচেষ্টা থাকা চাই। যদুনারায়ণ (জালালুদ্দীন) বাঙ্গলার মসনদে বসিয়া কি ভাবে এই সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যমধ্যে এই দুই পরাক্রান্ত জাতিকে শান্তিতে রাখিতে পারিয়াছিলেন—তাহার যথেষ্ট উপকরণ এই গ্রন্থে আমাদের নবীন গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি যে সকল চিত্র দ্বারা তাঁহার আখ্যানবস্তুটিকে পুষ্পিফ্‌ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। তাঁহার যদুনারায়ণ, আশমানতারা ও কাসেমের চরিত্র সৌন্দর্য্য ও নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের লিখিবার ভঙ্গী ও ভাষার উপর অধিকার প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, আজকালকার এই অশান্ত বঙ্গে এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে।

স্বপ্নসাধ।—হুমায়ুন কবির প্রণীত ; মূল্য একটাকা। এখানিতে এই নবীন কবি কয়েকটি কবিতা একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন। হুমায়ুন কবিরের নাম এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত নহে। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার সুন্দর কবিতা ও নানা সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মুসলমান লেখক বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কবির তাঁহাদের অন্যতম। এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে কয়েকটী কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রথম কবিতা 'পদ্মা' হইতে শেষ কবিতা 'নমস্কার' আমাদিগকে সত্যসত্যই মুগ্ধ করিয়াছে ; এমন সুন্দর, এমন স্বচ্ছ, এমন প্রাণস্পর্শী কবিতা পাঠের সৌভাগ্য অতি কম হয়। আরও আনন্দের কথা এই যে, এই মুসলমান যুবকটীর কোন কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই। আমরা এই মুসলমান কবিকে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পরিমল।—পরিমল দেবী প্রণীত ; মূল্য আট আনা। এই ছোট কবিতার বইখানি আমরা বড়ই আনন্দের সহিত পড়িলাম এবং পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। কবিতাগুলি যেমন ছোট, তেমনই সরল ও মনোহর। ভূমিকা লিখিতে গিয়া সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন 'অল্প বয়সে যেমন আশা করা যায়, তেমনি ভাবা—বুড়োমী নাই, জ্যেঠামী নাই।" ইহার অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি দেওয়া যাইতে পারে। পরিমল দেবী নিজেকে 'শ্রী'হীন করিলেও আমরা তাঁহাকে সত্যসত্যই 'শ্রীমতী' দেখিতে চাই।

বৈষ্ণব সাহিত্য।—শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থখানির নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার ইহাতে বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যালোচনা অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্মালোচনাই বেশী দেখিলাম। তাহা না হইয়াই পারে না ; বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বালোচনা না করিলে উক্ত সাহিত্যের রসাস্বাদন কিছুতেই সম্ভবপর নহে এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। গ্রন্থকার চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সুপণ্ডিত, তিনি যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম আলোচনার অধিকারী, তাহা এই পুস্তকখানির সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যে বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসসাগরে অবগাহন করা যায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তাহা আছে ; তাই তাঁহার এই পুস্তকখানি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মরসপিপাসু মাত্রেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

প্রবাল।—শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। লেখিকা মহোদয়া বাঙ্গালার কথা সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার এই 'প্রবাল' উপন্যাসখানি ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ইহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইল। শ্রীযুক্তা বসু মহাশয়ার চরিত্র চিত্রন ও বর্ণনা-কৌশল অতি মনোরম। যাঁহারা বিধবা-

বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারাও মতভেদ সত্ত্বেও লেখিকার রচনার প্রশংসা করিবেন। প্রবালের চরিত্রটী তিনি অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন; আধা-পল্লী আধা-সহরের ভদ্রনামধারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র না হইলেও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেবার চরিত্রও অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।—শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত; মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নাম, যশঃ অর্থের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; এখন তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীমৎশঙ্কর পরমানন্দতীর্থস্বামী। তিনি যখন সংসারাশ্রমে ছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অমূল্য; সকল পিতার পুত্রদিগকেই এই অমূল্য উপদেশগুলি গ্রহণ করিতে আমরা অনুরোধ করি। এমন সুন্দর, এমন শিক্ষাপ্রদ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

বুদ্ধবাণী।—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত; মূল্য চারি আনা। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম নীতি-প্রধান। তিনি তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহ বেশ ভালই হইয়াছে।

পরের বৌ।—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা। 'পরের বৌ'য়ের পরিচয় দেওয়া ভদ্র-রীতিবিরুদ্ধ। তবে যিনি এই 'বৌ'য়ের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কথা বলা যাইতে পারে। পরের বৌ হইলেও মূলেখক তাঁহাকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত পরিচিত করিয়াছেন এবং কোথাও কোন প্রকার রুচি বিরুদ্ধ আলোচনা করেন নাই, বেশ শান্ত ও সংযত ভাবে পরিচয় দিয়াছেন।

বাগান।—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। এখানি সচিত্র গীতিকাব্য; শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য-সমাজে শুধু পরিচিত নন, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহার এই বাগানের পুষ্পরাজি যে দেখিতেই সুন্দর তাহা নহে, ইহার সুগন্ধে দশদিক আমোদিত। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার ঋতেন্দ্র বাবুর আছে। তাঁর এই বাগানে অনেক ফুল ফুটিয়াছে; আর সেগুলি সবই দেব-পূজার উপযুক্ত। ইহাই এই বাগানের পরিচয়।

ভারতীয় স্মৃতি—কথা ও চিত্র।—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত; মূল্য পুস্তকে লেখা নাই। গ্রন্থকার ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ উপলক্ষে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণিত স্থানগুলির ঐতিহাসিক বিবরণই বেশী আছে এবং সে সমস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রন্থকার মহাশয়কে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখানিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত না বলিয়া ইতিহাস বলিলেই ঠিক বলা হয়। সকল স্থানের আলোক-চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও সুন্দর হইয়াছে। বাঁধাই, ছাপা, কাগজ যতদূর ভাল হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকারের লিপি-কৌশলও প্রশংসনীয়। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং অনেক স্থান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যও জানিতে পারিয়াছি।

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহ কাল গত হইয়াছে। দিন দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সমস্ত দিনই মাঝে মাঝে জল পড়িয়া অপরাহ্ণের দিকে খানিক ক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় সুরু হইয়া যাইতে পারে এম্‌নি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা তাহার বৈকালিক ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোষ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মনোরমা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাওনি, আজ যে আমাদের সহরের বাইরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল?

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা'হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাতা ধরে। তুই একটুখানি ঘুরে আয়গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিক পত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

কন্যা একাই বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, আমার দেরি হবে না বাবা, ফিরে এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনবো কিন্তু। এই বলিয়া সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ী ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হ'ল? কে লিখেচে?

কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিলনা, শুধু নমস্কারের পরিবর্ত্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগলো?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা'হলে আমি নিয়ে যাই, প'ড়ে এখুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। এই বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড় ছাড়া, হাত মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন্ গল্প, কে লিখিয়াছে কিম্বা কেমন লিখিয়াছে।

এই ভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, এক সময়ে বেহারা আলো দিতে আসিলে সে চকিত হইয়া ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল তাহার এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছেন?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন্ গেলেন?

সে জবাব দিল, বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা পার্শ্বের জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি সুরু হইয়াছে কিন্তু বেশি নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারি-পতনের সূচনা দেখা দিয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জানো এসব আমি ভালোবাসিনে।

এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছো কি আমি বল্‌চি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথ বাবুর মত একজন দুর্ব্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্চো?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোনে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপাকার করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাব বশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেই দিকে চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সম্বাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল। শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলনা। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলামনা আশুবাবু। এখন তা'হলে চল্‌লাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেননা, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে?

শিবনাথ কহিলেন, তা' হোক্। ও বেশি নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সে জন্যে আপনি লজ্জিত হবেননা। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে আপনি বলেননি। অত নির্দ্দয় আপনি কিছুতে ন'ন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন আমি যেন একটা মৎলব নিয়ে এ বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন ঘটনার যা চোখে পড়ে সেও তার

সবটুকু নয়, এও আর একটা কথা। কিন্তু কথা যাই হোক্, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিলনা, আজও নেই। আশুবাবু, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশি দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধুলো দেবেন, আমি খুসিই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেননা। আশু-বাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলনা। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন-না, শিবনাথবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, চা আমার জন্যে নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি,—ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী-মেয়েদের মত কাপড় পরা,—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে বাবুটি এই মাত্র গেলেন তিনিই কি না। কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে তো?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথ বাবুকে ডেকেই আসুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা' বটে মণি, কিন্তু আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ বাড়ীতে সঙ্গে আনতে পারেননি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এই সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল এ বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দুজনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এসো। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাকচে, আমার নাম কোরো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি কাজটা হয় ত ঠিক হলনা।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক্, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,—তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু নীচু আমরা হয় ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায়না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু কোরব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিলনা। বারকয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্চিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা' আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার যাঁরা সম-শ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জানো। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দোষ, কিন্তু এ হল,—

কি জানো মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী,—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্চে শিবনাথ যেন না আর আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আস্‌চেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, বেশ যাহোক্ শিবনাথ বাবু,—ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল,—তা' আমার চেয়ে ইনিই ভিজেছেন ঢের বেশি। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইহাঁরাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেননা।

বস্তুতঃ, মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা কাপড় ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জল-ধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে,—পিতা ও কন্যা এই নবাগত রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। আশু বাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্ব্ব-কালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয় ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারম্বার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত না-ই হোক, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দুটি নর-নারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না প্রস্ফুটিত হইয়াছে! আর পরমাশ্চর্য্য এই যে-দেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যে-দেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয় সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সন্ধান পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্তকালের অধিক সময় লাগিলনা। চকিত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড় জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সম-বয়সী। এবং সিক্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইলনা। রূপ ইহার যত বড়ই হোক, শিক্ষা-সংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে এসো বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ করিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেম্‌নি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিদি, আসুন। এই বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইহাঁকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফর্সা ধোপার বাড়ীর কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাথা-সাবান গায়ে মাখিনে ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান

আছে। কিন্তু শুনচেন দিদিমণির স্নানের ঘর। তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, মাগো, সে আমি পারিনে, আমার ভারি ঘেন্না করে। তাছাড়া যার তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

ঝি মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল! মনোরমার মুখও আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই নির্ম্মল হাসির ছটায় তাঁহার দুই চক্ষু ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখবো? আমার কাছেই কত মেয়ে শিখে যেতে পারে।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা'হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাৎ মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুণ, সাবান টাবান মেখে আগে তৈরি হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল-ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা ইহার জবাব দিলনা, আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺যোগীন্দ্রনাথ বসু

গত ৪ঠা শ্রাবণ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার গোয়াবাগানস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। যৌবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত লিখিয়া তিনি যশস্বী হন; তৎপরে এ যাবৎ তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার গদ্যের ভাষা আধুনিক লেখকদের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল; প্রসাদগুণবিশিষ্ট, ভাব প্রাচীন আর্য্য-আদর্শের অনুগামী। ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব-সম্মিলনে তাঁহার রচনা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। শিবাজী প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াও তিনি যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম-জীবনে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন ও যখন দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে বৃত হন, তখন আচার্য্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া সাহিত্য সাধনায় মনোযোগী হন। রাজনারায়ণ বাবুর শিক্ষা-দীক্ষায় যোগীন্দ্র বাবু জীবনে যেমন নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, সাহিত্য-সাধনায়ও তেমনই তিনি উৎসাহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দেওঘর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ উদারচেতা ধনী স্বর্গগত কালীকৃষ্ণ



৺যোগীন্দ্রনাথ বসু

ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেও আজ প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ দুই বৎসর যাবৎ তিনি নানাবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, উদারচেতা, বাল-স্বভাব সরল ব্যক্তি বাঙ্গলায় ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের কিছু উপর হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে চারিজন বেশ কৃতী। ডাক্তার শ্রীমান্ সুধীরকুমার, শ্রীমান্ সুশীল কুমার প্রভৃতিকে আমরা কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিব তাহা জানি না। তবে তাঁহাদের সান্ত্বনার কারণ এই যে, বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীরা তাঁহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের জন্য আজ দুঃখ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সহানুভূতি জানাইতেছেন। ভাষার গাম্ভীর্য্য, সৌকুমার্য্য ও শ্লীলতা সংরক্ষণশীল স্বর্গগত যোগীন্দ্রনাথের নাম বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর নিকট চিরদিন সমাদৃত থাকিবে। জীবন-চরিত রচনায় তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও যে পদ্ধতিতে তিনি জীবন-চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, আজিও সেই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা কবিভূষণ মহাশয়ের পুত্রগণকে ও পরমারাধ্যা জননীকে আমাদের একান্ত সহানুভূতি জানাইতেছি।

সাময়িকী

এবারের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, এখনকার অনেকে হয় ত তাঁহাকে জানেন না, কিন্তু এমন এক সময় ছিল এবং সে সময়ও বহু-দূরও নহে, যখন এই মহাত্মার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র ছিল; তখন আজ-কালকার ন্যায় বৃহৎকায় দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রের অস্তিত্বও ছিল না। এই মহাত্মার নাম পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ইনি ১২২৭ সালে কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। গ্রামের পাঠশালায় কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া দ্বারকানাথ নিজ গ্রামের একজন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে সামান্য বেতনে কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর ইনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পরেই উক্ত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। ২৮ বৎসর কাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে দ্বারকানাথ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতা একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ এই ছাপাখানা হইতে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস এবং তৎপরে নীতিসার, ভূষণসার ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক কৃতবিদ্য বধির যুবকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য 'সোমপ্রকাশ' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় উক্ত কার্য্য স্থগিত থাকে। ইহার কিছুদিন পরে দ্বারকানাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাসে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত করেন। দ্বারকানাথ ঐ পত্রের সম্পাদক হন। কিছুকাল পরে সোমপ্রকাশের সমস্ত ভার দ্বারকানাথের উপরই পড়ে। দ্বারকানাথও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের পরিচালনা করেন। সে সময় সোমপ্রকাশ সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র ছিল এবং দ্বারকানাথ নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন (Vernacular Press Act) বিধিবদ্ধ করিলে দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশের সম্পাদন জন্য মুচলেকা দিতে অসম্মত হইয়া সোমপ্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন; এমন অপমানকর কার্য্যে তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা সম্পাদক স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। পরে উক্ত আইন রহিত হইলে

সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' ব্যতীত 'কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্রও ইনি প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও কখন কাহারও নিকট বিদায় বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। যাহাতে তাঁহার স্বাধীনতা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কার্য্যে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ-প্রবরের সাহচর্য্য পাওয়া যাইত না। শেষ অবস্থায় ইঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে; সেই জন্য স্বাস্থ্যলাভার্থ ইনি সাতারায় গমন করেন। সেইখানে ১২৯১ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে বিস্ফোটক রোগে দ্বারকানাথের দেহ বিসর্জ্জন হয়। আমরা এবার এই সুপণ্ডিত, তেজস্বী, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রবরের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা দেশের সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সম্পাদকের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিলাম।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেণ্ডারী শিক্ষাবোর্ড কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্ট্রারের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাবের আভাস দিয়াছেন:—সরকার পর্য্যাপ্ত স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সেকেণ্ডারী বোর্ড গঠনের পক্ষপাতী; কিন্তু যদি বোর্ড নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বা ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে সরকারের তাহাতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকিবে। সরকার যে সমস্ত আইন কানুন তৈয়ার করিবেন, উহা সিনেটের সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে ও প্রকাশ্যভাবে উহার সমালোচনা করা হইবে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রে সরকার ও সিনেট এক মত না হইতে পারিলে সরকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গৃহীত হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও পাঠ্য পুস্তকাদি নির্ব্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা সিনেটেরই থাকিবে; কিন্তু স্কুল পরিদর্শন করা, স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেওয়া ও সাহায্য মঞ্জুর করা প্রভৃতি ক্ষমতা বোর্ডের থাকিবে। এবম্বিধ সাহায্য দান সম্পর্কীয় আইনাদি সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে। সাহায্য মঞ্জুর বা বন্ধ করা সম্বন্ধে বোর্ডের সহিত সিনেটের মতের অনৈক্য হইলে চ্যান্সেলারের সিদ্ধান্ত সে ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হইবে। বোর্ডের ১৮ জন সদস্য থাকিবেন—১০ জন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত, ১ জন বাঙ্গলা কাউন্সিলের বে-সরকারী সদস্যদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ও ৭ জন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গৃহীত হইবেন।

—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগে একজন শিল্পজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় শিল্পীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতে পারিবেন; তজ্জন্য কোনরূপ ফি দিতে হইবে না—১। (ক) ছোটখাট ফ্যাক্টরীর কল ও কারখানা বাড়ীর নক্সা তৈয়ারী। (খ) আধুনিক কল-কব্জা ও তাহা চালাইবার উপযোগী মোটর, ইঞ্জিন্, বয়লার প্রভৃতি নির্ব্বাচন ও ক্রয় করা। (গ) আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বনে কিরূপে ফ্যাক্টরী-উদ্ভূত পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য কমান যায়। (ঘ) চল্‌তি কল-কব্জার যদি কিছু দোষ থাকে তাহার নির্ণয় ও সংশোধন। (ঙ) কাঁচা মাল বা যন্ত্রের দোষে শিল্পকার্য্যপ্রণালীর যে সমস্ত অসুবিধা বা সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার সমাধান করা। ২। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দ্রব্যোৎপন্নের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া যাহাতে বিদেশীয় ও অন্য প্রদেশ হইতে আনীত মালের প্রতিযোগিতায় বাজারে অবাধে বিক্রয় করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত বিনামূল্যে পরামর্শের ব্যবস্থা করা হইল। ৩। সাহায্যপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে—ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ইঞ্জিনিয়র, বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ, ৪০।১।এ, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

—

একশত বৎসর পূর্ব্বে চরকার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যা মিটিয়াছে, আর চীনের এখনও মিটিতেছে; সুতরাং চরকার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও হয় তো তাহা অন্যায় হইবে না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে—চরকার দ্বারা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে গেলে, তাহাতে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বাড়িবে না কমিবে? ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে প্রতি বৎসর ৩০।৩৫ লক্ষ গাঁট তূলা জন্মে, সে দেশে যে বাড়িবে তাহাতে তো সন্দেহ নাই-ই; কিন্তু যে সব দেশে তূলা জন্মে না, সে দেশেও যে বাড়ে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন ঐতিহাসিক Townyend Warner। "Land marks in English Industrial History"তে তিনি লিখিয়াছেন,

"তাঁতের কাজের সঙ্গে যে উপার্জ্জনের যোগ রহিয়াছে, তাহা গৃহস্থ এবং কৃষকদের পক্ষে একটা খুব বড় আশ্রয়স্থল। একজন তাঁতীর কাজের উপযুক্ত পরিমাণ সুতা যোগাইতে হইলে ৬ জন হইতে ৮ জন লোকের সুতা কাটা দরকার। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দেশের লোকের কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের কতবড় একটা সুবিধা এখানে রহিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিহীন এবং অঙ্গ-সঞ্চালনে অক্ষম না হইলে ৭ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বয়সের যে-কোনো লোক এই উপায়ে প্রতি সপ্তাহে ১ শিলিং হইতে ২ শিলিং (৸০ আনা হইতে ১৸০ টাকা) পর্য্যন্ত রোজগার করিতে পারে এবং অযথা তাহাদের অনাথাশ্রমের শরণাপন্ন হইতে হয় না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলের হাহাকার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দিন কতক খুব বেশী ছাত্র পাশ হইত। বর্ত্তমানে পাশের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। এবারকার পাশের সংখ্যা কমার দরুণ একদল লোক বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারকে দোষী করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় এই ব্যাপারগুলো জানিলে দেশের সাধারণ বুঝিতে পারিবেন ব্যাপারটা কি! ১৯২১ সনে অ-সহযোগের বছরেই পাশের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয় দেখা যাইতেছে। তার পরে আবার পাশের সংখ্যা কম হইতে থাকে। পাশের সংখ্যা কমের জন্য যদি ভাইসচ্যান্সেলারকেই দোষী করিতে হয় তবে ১৯২১—২৬ পর্য্যন্ত যাঁহারা পরীক্ষার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহারাই দোষী। বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সরকার বিগত আগষ্ট মাসে চার্জ্জ নেন, তার আগেই সিণ্ডিকেট পরীক্ষক প্রশ্নকর্ত্তা প্রভৃতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে অধ্যাপক সরকার সিণ্ডিকেটের সভ্য হন। সিণ্ডিকেটে তিনি ছাড়া আরো ৬ জন সভ্য আছেন। কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা এই সভ্যগণের হস্তেই ন্যস্ত। ভাইস চ্যান্সেলর একজন সভ্য মাত্র। ১৯২৭-২৭ সালের সিণ্ডিকেট সভ্য ছিলেন—মিঃ ই-এফ্ ওটেন, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মৌঃ আসানউল্লা, সার নীলরতন সরকার, মিঃ এস্, সি মহলানবিশ, মিঃ বিরাজমোহন মজুমদার, মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, রেঃ ডব্লিউ, এস্ আরকোহার্ট, (বা মিঃ জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জ্জি) ডাঃ কেদারনাথ দাস, ডাঃ এফ্ এ এফ্-বার্ণার্ডো। পাশ ফেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমানে কম হইতেছে এবং কোন্ স্বার্থের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে এ ধারা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সিণ্ডিকেটের সকল সভ্য মিলিয়া নিবেদন করিলে ভাল হয়। শুধু একা ভাইসচ্যান্সেলর কি বলিবেন—কারণ কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা সিণ্ডিকেটের হস্তেই ন্যস্ত—এবং সিণ্ডিক্ একা ভাইস চ্যান্সেলরই নহেন।

বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও গুরুমহাশয়দিগের দুরবস্থার কথা আমরা বহুবার বলিয়া আসিয়াছি। সুখের বিষয় এই যে, এতদিনে শিক্ষা-বিভাগের নায়কগণের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে। সেদিন কলিকাতা রোটারী ক্লাবের অধিবেশনে বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা অর্থাৎ ডিরেক্টর মিঃ ওটেন 'বঙ্গে শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়গণের সম্বন্ধে বলেন—গত বৎসর সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ৫০৯২৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৬৷৷০ লক্ষের উপর। ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে গড়ে ১২২৲ টাকা করিয়া বৎসরে খরচ হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতি বালকের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে ৩৵০ ব্যয় করা হইয়াছে। ইহাই হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থা। তাই আজ একটি বায়ুহীন মাটির গৃহে বিদ্যালয় বসিতেছে এবং উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার জন্য অনুপযুক্ত বেতনে শ্রমবিমুখ ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কলিকাতার বাবুর্চীগণ যে বেতন পাইয়া থাকে তাহার এক তৃতীয়াংশের কম বেতন পাইয়া থাকে। কাজেই অনেককে শিক্ষকতার কার্য্য ছাড়া অন্যান্য কার্য্যও করিতে হয়। আর যাহাদের অন্য কোন কাজ জোটে না তাহাদের ঐ মাহিনাতেই কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে হয়।

হাই স্কুল সম্বন্ধে মিঃ ওটেন বলেন যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালার হাই স্কুলের সংখ্যা ৯৭৮ এবং সেই সকল স্কুলে সাধারণতঃ ১৬৷১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়া

থাকে। এই সকল স্কুলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রথম গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব, দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-পুষ্ট ও তৃতীয় বিনা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে পরিচালিত। বাঙ্গালার অর্দ্ধেক হাই স্কুল গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্য পায় না। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকগণ একটু ভাল বেতন পাইয়া থাকেন; কিন্তু বিনা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে পরিচালিত স্কুলসমূহের শিক্ষকগণ গড়ে ৩৮৲ টাকার বেশী বেতন পান না। বর্ত্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে যদি কোন স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন একটী নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে সেই স্কুলকে বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রাহ্য করেন না। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যদিও বিশ্ব-বিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট বেতনের অনেক কম বেতন পাইয়া থাকেন, তথাপি পাছে স্কুলটী উঠিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহারা প্রাপ্তি বইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইলেন বলিয়াই সহি করিয়া থাকেন।

অবশ্য অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এত অল্প বেতনে শিক্ষকগণের কিরূপে চলে? ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, এই সকল স্কুলের শিক্ষক দুইবেলা ছেলে পড়াইয়া যাহা কিছু রোজগার করেন, তাঁহাতেই তাহাদের চলে। অথচ দুইবেলা এইরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার দরুণ তাঁহারা স্কুলের কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন না, যাহার জন্য স্কুলের ছাত্ররা উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত হইতে পারে না। অথচ অভিভাবকগণ যদি গৃহ-শিক্ষককে না দিয়া এই টাকাটা স্কুলে ছেলেদের মাহিনা হিসাবে দেন. তাহা হইলে স্কুলের পরিচালনা আরও যে ভালো ভাবে হইতে পারে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

অবৈতনিক শিক্ষা সম্বন্ধে মিঃ ওটেন বলেন, বাঙ্গালার লোকেরা করবৃদ্ধি না করিয়া বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রচারের অভিলাষী। তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা ভারত সরকার কিম্বা বাঙ্গালা সরকার সরবরাহ করিবেন। অথচ ভারত সরকার এই অর্থ নূতন কর ধার্য্য না করিয়া দিতে পারেন না, তাহা কেহই বুঝেন না। মিঃ ওটেনের মতে বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা দিতে হইলে, নূতন কর ধার্য্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবস্থা উন্নত না করা হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই বাঙ্গালায় উপযুক্তভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে পারে না। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা খুবই বেশী। যদি এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমেই শিক্ষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং উপযুক্ত বেতনে প্রকৃত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

বিগত বৎসর ভীষণ জল-প্লাবনে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বজরপুর, জলামুঠা, ভুঞামুঠা ও সুজামুঠা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তৎপূর্ব্বেও উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে ঐ সকল স্থানে ভাল চাষ হয় নাই। তাহার উপর বন্যার কবলে পড়িয়া নিরন্ন, গৃহহীন সহস্র সহস্র নরনারী নানাস্থান হইতে দয়ার্দ্রহৃদয় দেশবাসীগণের প্রেরিত এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাময়িক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন মতে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং বহু কষ্টে ভগ্ন গৃহ স্তূপের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালাঘর তুলিয়া তাহাতেই কোন মতে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান করিয়া লইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের চাষ আবাদের উপরেই তাহাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল; কিন্তু বিগত জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির ফলে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র চালাঘরগুলি প্রায় অধিকাংশই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং তাহারা বহু কষ্টে যে বীজ ধান্য সংগ্রহ করিয়া বুনিয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। এখনও মাঠে এত অধিক জল দাঁড়াইয়া আছে যে বর্ত্তমান বৎসর চাষের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। অনেকের ভাগ্যে দৈনিক একমুষ্টি অন্ন জুটিয়া উঠিতেছে না। ধান চাউল অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অনেকে এখনও ঘটী, বাটী গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতেছে; কিন্তু অচিরেই ঐ সকল স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। উক্ত স্থান সমূহের অন্নহীন বিপন্ন ব্যক্তিগণকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে কাঁথিতে একটী "কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি" (Central Relief Committee) গঠিত হইয়াছে। আপাততঃ উক্ত সমিতি ধান্য ক্রয় করিয়া ঐ সকল স্থানে সরবরাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সকল

কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্য সহৃদয় বদান্য দেশবাসীগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে দৈন্য পীড়িত, নিরুপায় ও আশ্রয়হীন নরনারীগণের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা পারেন, উক্ত সমিতির 'সভাপতি' বা 'সম্পাদকের' নিকট প্রেরণ করিয়া দেশের গরীব ভাই-বোন্‌দের জীবন রক্ষা করুন।

হিমালয় অভিযানের চলচ্চিত্র।—১৯২৪ সালে যে হিমালয় অভিযান হয়, তাহাতে ম্যালরী ও আরভিন্ নামক দুইজন আরোহণকারী গৌরী শৃঙ্গে উঠিবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁহারা উচ্চতম শিখরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাদিগকে আর দেখা যায় না। তুষার ঝটিকায় তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সেই অভিযানের সঙ্গে ক্যাপটেন নোয়েল বায়স্কোপের ফিলম্ তুলিতে গিয়াছিলেন। হিমালয় আরোহণের চলচ্চিত্র সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী হইয়া সেই ২৩০০০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে দার্জ্জিলিং আসিত। সেখানে ফিলম-গুলি প্রস্তুত হইয়া অনতিবিলম্বে বিলাতে প্রেরিত হইত। তাহাতে সেখানকার লোকেরা বুঝিতে পারিত হিমালয় অভিযানকারিগণ কখন কোন স্থানে কিভাবে আরোহণ করিতেছেন। ক্যাপটেন নোয়েলের কঠোর পরিশ্রম ও অদ্ভূত নৈপুণ্যে এই সকল ফিলম তৈয়ারী হইয়াছে। ইউরোপের লোকেরা তাহাদের ঘরে বসিয়া হিমালয় আরোহণের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রায় শ্রীজলধরসেন বাহাদুর প্রণীত উপন্যাস—"তিন-পুরুষ"—১॥০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কুজ্ঝটিকা"।—২৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি "গীতিমঞ্জরী"—২৲
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "ষোড়শী"—১॥০
শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত "হিজলীর মসনদ্ ই-আলা"—২৷৹
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্-এ প্রণীত "বিবিধ-প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় পর্য্যায়, ২॥০
শ্রীবিজনবালা কর প্রণীত "নিগৃহীতা"—১॥০
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত "পূজা-প্রদীপ"—২।০
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী সিরিজের "বাজ্‌বা জাল" ও "মুখোসধারী যাদুকর" প্রত্যেকখানি—৸৹
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত নাটক "প্রকৃতি-বিয়োগ"—১৲
শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যসাংখ্যতীর্থ প্রণীত "পতি-পরমগুরু", ১।০
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "স্ত্রী"—১।০
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত "বুদ্ধবাণী"—।০
শ্রীমতী সুলেখা দেবী প্রণীত উপন্যাস "প্রজাপতির খেলা"—১।০
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত উপন্যাস "সতীর মুক্তি"—১৲
শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ব্যঙ্গনাট্য "রামায়ণ আর্ট"—৷৹

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আগামী আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষ' ২৬শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষ" পূজার পূর্ব্বে আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগেই প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে আশ্বিনের বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্রের পূর্ব্বে এবং কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপন ২রা আশ্বিনের পূর্ব্বে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। আশ্বিনের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ও কার্ত্তিকের পরিবর্ত্তন ২রা আশ্বিনের মধ্যে হস্তগত হওয়া প্রয়োজন।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
Of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



অন্তঃপুরিকা

শিল্পী— শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতিলিপিকারিণী— মিসেস দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ



আশ্বিন, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

সভ্যতার মহাজন ও খাতক

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ইতিহাস, বিশেষতঃ ভাবাভিব্যক্তি ও সমাজাভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কত সতর্ক হইয়া, কতদূর অধিকারী হইয়া, এবং কত দিকে অন্যথাভাব ও অন্যথাসিদ্ধির কত সম্ভাবনা মনে আঁচ করিয়া লইয়া চলিতে হয়, সে সম্বন্ধে পুরাবিদ্যার পূজক ও পুরোহিতবর্গের একটা সংস্কার মোটামুটি বাহাল থাকিলেও, সে সংস্কার সকল সময়ে যথেষ্ট-রূপ সজাগ থাকিতে দেখা যায় নাই। ইতিহাসের খাঁটিতথ্য এবং বিকৃত, আংশিক তথ্য বা তথ্যাভাস—এ দুয়ের মধ্যে সতর্কভাবে বাছাই করার প্রয়োজন একরূপ স্বতঃসিদ্ধের মতনই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এটাও মনে রাখিতে হইবে যে, তথ্য ও বৈতথ্য—দুয়ের মাঝে নানান্ "ধাপ" (grade) আছে। কেবল তথ্য বলিয়া নয়, যেটা মাত্র সম্ভাবিত (probable), তারও নানান্ ধাপ আছে। যেমন, ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যেরা সোমলতার রসকে "ভৌতিক" রস ভাবিয়া স্তবস্তুতি করিতেন, যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন এবং "সেবন" করিতেন—শুধু এই কথাটা বলিলে, তথ্যও হইল না, বৈতথ্য(মিথ্যা)ও হইল না। কথাটা সাবধানে, খোলসা করিয়া বলিতে হয়। আর্য্যেরা সত্য সত্যই সোমবল্লীর রস নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়া যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন এবং নানা রকমের "মন্ত্র তন্ত্র" সহযোগে তাহা সেবন করিতেন। যাঁরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বা অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষপাতী, তাঁরা তথ্যের একদেশদর্শী। যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি কোনো কালেই একেবারে রূপক বা প্রতীক ছিল না; অথবা এক বুঝাইবার ভঙ্গী করিয়া সেটা আদৌ

না বুঝাইয়া, অপর একটা কিছু বুঝাইত না। সত্য সত্যই যজ্ঞ ছিল, এবং মন্ত্র আওড়াইয়া, নানা রকমের "তুক্ তাক্" করিয়া যজ্ঞের "আগুণে ঘি ঢালার" ব্যবস্থা সত্য সত্যই ছিল। শ্রুতি কামদুঘা; শ্রুতি দোহন করিয়া নানা রকমের "তাৎপর্য্য" বাহির করা খুবই চলে। নানা স্তরের "তত্ত্ব" চিরদিনই বিশ্বমানবের চিন্তার ভাণ্ডারে মজুদ রহিয়াছে। ঋষিরা, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে, নানা স্তরের তত্ত্ব শ্রুতিসুরভি দোহন করিয়া পাইয়াছিলেন, এবং অধিকার বিচারে "সেবন" করিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ এইটাই হইল তাঁহাদের দাবী। এই জন্য, স্পষ্ট আধিভৌতিক "ব্যাখ্যাটা" যেমন সত্য, প্রচ্ছন্ন আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ব্যাখ্যাও তেমনি-ধারা সত্য; এবং খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এ সকল ব্যাখ্যা যে আমাদেরই বা পরবর্ত্তীদের "মন গড়া" এমন নয়। বাহ্য অগ্নিহোত্র এবং অন্তর (বা আধ্যাত্মিক) অগ্নিহোত্র—এ দুই-ই গোড়াগুড়ি প্রচলিত ছিল। যাঁরা বাহ্য অগ্নিহোত্র করিতেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের রহস্য অবগত হইতে সচেষ্ট থাকিতেন। বাহিরে ও ভিতরে দুই অগ্নিহোত্রের মিলন ঘটাইতে না পারিলে, তাঁরা কৃত-কৃত্য নিজেদের কখনই মনে করিতেন না।

আগে বাহিরের অনুষ্ঠানটাই ছিল, পরে তার ভিতরে একটা "রহস্য" ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে—বিলাতী পণ্ডিতদের সাধারণ এ মত অপসিদ্ধান্ত। বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে সকল সময়ে "শিশু" আর আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে "প্রবীণ" মনে করিয়া, অথবা এ "থিওরি" লইয়া বেদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে সমূহ বিপদ্। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক এ দুই অনুষ্ঠানই যুগপৎ, পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। কোনো কোনো অনুষ্ঠাতা হয় ত রহস্যটির দিকে খেয়াল কিছু কম রাখিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানটার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকিবেন; তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া, অথবা চেতাইয়া দিবার জন্য শ্রুতি নানা "ফন্দি" অবলম্বন করিয়াছেন। কঠ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি সকল উপনিষদের আসল লক্ষ্যই হইতেছে এই দিকে—যেন অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিকেরা অনুষ্ঠান-বাহুল্যের মাঝেও তত্ত্বের সূত্রটি হারাইয়া দিশেহারা হইয়া না যান। অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান কোনো খানেই তাঁরা উড়াইয়া দেন নাই। কেহ কেহ রহস্যবিৎ হইয়া এবং রহস্যের সত্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বাহ্য অগ্নিহোত্রাদিতে নিরীহ ও অব্যবসায়শূন্য হইতেন বটে; কিন্তু শ্রুতি, যে ব্যক্তি বাহ্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত করে নাই, তাহাকে আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রাদির অনধিকারী সাব্যস্ত করিয়াও গিয়াছেন। বাহ্য অনুষ্ঠানটিকে পূর্ণ ও অবিকল ভাবে সম্পাদন করার দিকে শ্রুতির বিধি ছিল। কেন না, পূর্ণ ও অবিকল ভাবে কোনও অনুষ্ঠান করার চেষ্টা না করিলে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা-রূপ ব্রতের প্রতিষ্ঠা হয় না; এবং সে ব্রতের প্রতিষ্ঠা না হইলে, বীর্য্য বা তেজঃ লাভ হয় না; এবং বীর্য্য লাভ না হইলে আত্মলাভ হয় না।

মৈত্র্যুপনিষৎ গোড়াতেই বলিতেছেন—"ব্রহ্মযজ্ঞো বা এষ যৎপূর্ব্বেষাং চয়নং, তস্মাদ্ যজমানশ্চৈতানগ্নীনাত্মানমভিধ্যায়েৎ।" পূর্ব্বগামীরা অগ্নি চয়ন করিয়া যে যজ্ঞ করিতেন, সে যজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ; অতএব যজমান এই সকল অগ্নি চয়ন করিয়াই আত্মাকে ধ্যান করিবেন। সে যজ্ঞও আবার পূর্ণ ও অবিকল ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক—"স পূর্ণঃ খলু বা অদ্ধাংবিকল সংপদ্যতে যজ্ঞঃ"। পূর্ব্বগামীদের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছিলেন এমন কথা শ্রুতিতে নানা যায়গায় থাকিলেও, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে এও বলিতেছেন:—"অতোঽনগ্নিহোত্রানগ্নিচিদজ্ঞানভিধ্যায়িনাং ব্রহ্মণঃ পদব্যোমানুস্মরণং বিরুদ্ধং তস্মাদগ্নির্য়ষ্টব্যশ্চেতব্যঃ স্তোতব্যোঽভিধ্যাতব্যঃ"। যাঁরা যথাবিধানে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অগ্নিচয়ন প্রভৃতি করেন না, তাঁরা ব্যোমবৎ শুদ্ধ, নিরঞ্জন "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হন। সুতরাং অগ্নির চয়ন প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্য (৭।২১), (৭।২৬।২), এবং অন্যান্য শ্রুতিও নিবৃত্তি মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেও সত্ত্বশুদ্ধি-বিধায়ক অগ্নিহোত্রাদির পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—ইহাই তাঁদের পূর্ব্বমীমাংসা এবং "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—ইহা তাঁদের উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা "নাকচ" করিয়া দিয়া উত্তর-মীমাংসা নয়। পূর্ব্বমীমাংসা পূর্ব্বভূমি বা অধিকার, উত্তর-মীমাংসা উত্তরভূমি বা অধিকার। শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসার (১।২।১) "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং"—এই নীতির খণ্ডন করিয়াছেন (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৪)। কিন্তু সে খণ্ডনের মূল কথা এই যে ব্রহ্মাববোধও ব্রহ্মজ্ঞান "ক্রিয়া" বা "ক্রিয়াজন্য" নহে। "নমুজ্ঞানংনামমানসী

ক্রিয়া। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তু স্বরূপ নিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষ চিত্তব্যাপারাধীনা চ"। যথা 'যস্মৈ দেবতায়ৈ হবি র্গৃহীতং' × × × 'সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েত' ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানং তু প্রমাণ-জন্যম্। প্রমাণং চ যথা-ভূত-বস্তু-বিষয়ং, অতো জ্ঞানং কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুমশক্যম্।"—ইত্যাদি বিচারে ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়া সমুৎপাদ্য বলিয়া শঙ্করাচার্য্য মনে করিতে পারেন নাই। আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই আরম্ভসূত্রের "অথ" পদটির ব্যাখ্যায় তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—"তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ ভোগবিরাগঃ শমদমাদি সাধন-সম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধন সম্পত্ত্যানন্তর্য্য মুপদিশ্যতে।" বলা বাহুল্য যে, অহেতুকরূপে এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নতা আসিতে পারে না; তার জন্য রীতি মত "সত্ত্বশুদ্ধি" চাই, এবং সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি চাই। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, এই ভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে, অগ্নিহোত্রাদি বাহ্য অনুষ্ঠানের চরমফল উৎপাদনের পক্ষে উপযোগিতা খাঁটি বেদান্তের আচার্য্যগণ মানিয়া গিয়াছেন।

অধিকন্তু অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের আকার প্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা, ব্যতিরেকমুখে একটা এবং অন্বয়মুখে দুইটা সিদ্ধান্ত—এই তিনটা সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই মনে করার হেতু দেখিতে পাই। ১ম—অনুষ্ঠানগুলি গোড়ায় অর্থহীন "ম্যাজিকের তুক্‌তাক্" অথবা ঐ ধরণের একটা কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না; অর্থাৎ পশ্চিমের অনেক পণ্ডিত এগুলির যে নিদান দেখাইয়া থাকেন, সে নিদান অনেক স্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। ২য়—বরং এক একটা "রহস্য" (প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ও অর্থ) লইয়াই এগুলি চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৩য়—অনেক যায়গায় পরে হয় ত সে "রহস্য" একেবারেই লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই বাহ্যতঃ সে সব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানগুলি অনেকটা অথবা সম্পূর্ণ রূপে, অর্থহীন "তুক্‌তাকেই" পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এ কথা প্রমাণসহ যে, এখনকার বর্ব্বর সমাজে প্রচলিত অনেক অনুষ্ঠানের মূল এই প্রকার রহস্য-বিস্মৃতির মধ্যেই ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে "বুনো"রা এমন অনেক অনুষ্ঠান এখনও শুধু অন্ধ বিশ্বাসে করিয়া যাইতেছে, যে গুলি হয় ত, এক সময়ে তাদেরই সভ্যতর "পূর্ব্ব-পুরুষেরা" (আমরা সভ্য জাতিরও, অধঃপতনের ফলে বা অন্য কারণে, বর্ব্বরতা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি) "সজ্ঞানে" প্রতিপালন করিত; অথবা যেগুলি, এমন সভ্য-জাতির অনুদিকীর্ষার ফলে, দীক্ষার প্রসাদে, প্রাপ্ত, যারা "সজ্ঞানে" (উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিয়াই) প্রতিপালন করিত।

ভারতবর্ষে "আদিম অসভ্য"দের অনেক আচার অনুষ্ঠান, এই দুই রকমে বুঝা যাইতে পারে। কতকগুলি তাদের নিজস্ব; হয় ত সুদূর অতীত কালে যখন তারা সভ্য ছিল, তখন তারা সেগুলির রহস্য জানিত ও বুঝিত; পরে বর্ব্বরতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্য তারা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রহস্য ভুলিলেও, অন্য রকম বিশ্বাস লইয়া, সেগুলি এখনও তারা পালিয়া যাইতেছে। আবার কতকগুলি অনুষ্ঠান হয় ত তাদের নিজস্ব নয়; দ্রাবিড় সভ্যতা, আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও প্রভাবে দীর্ঘকাল থাকিয়া, তারা সে অনুষ্ঠানগুলি (রহস্য না বুঝিয়াই বা বোঝার অধিকারী না হইয়াই) নিজেদের ভিতরে "শোষণ" করিয়া লইয়াছে।

এটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনো সভ্য সমাজই সর্ব্বস্তরে সমভাবে সভ্য নয়; সুতরাং, এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের (practiceএর) সূত্র (theory) অথবা রহস্য (spirit), সে সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানের অনেক রকম ব্যবহার আমরা এই বিজ্ঞানযুগে প্রায় প্রতিনিয়তই করিতেছি; কিন্তু আমরা অনেকেই সে সব ব্যবহার কেন, কিভাবে করিলাম, তা বুঝি না; দুচারজন রহস্যবিৎ থাকেন, যাঁরা Theory বা Principles জানেন; অনেকে থিওরির চেহারাটা ওপর-ওপর দেখিয়াছেন মাত্র; বেশীর ভাগ লোকে, থিওরি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই রাখে না, এমন কি, ধারণা করিবার মতন সামর্থ্যও রাখে না। অথচ, ফল পাইবার বিশ্বাসে, শ্রেষ্ঠেরা আচরণ করিতেছে দেখিয়া, অন্ধ-ভাবে, তারাও বিজ্ঞান-সংহিতার বিধিগুলি যথাসম্ভব পালিয়া যায়। এ কথা দৃষ্টান্ত দিয়া খোলসা করার আবশ্যকতা নাই। বিজ্ঞান-বিস্তার বেলা যেমনটা হয়, সামাজিক নীতিবিদ্যা ও

ধর্ম্মকর্ম্মের বেলাতেও তেমনটা হইয়া থাকে। দুচারজন রহস্যবিৎ, মর্ম্মজ্ঞ, রসজ্ঞ থাকেন। সকল দেশে এবং সকল কালেই ঐ রকম। বাকি সকলে এ বিষয়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে অজ্ঞ। সমাজের—এমন কি খুব উন্নত সমাজ, যেখানে সকলেই লিখিতে, পড়িতে শিখিয়াছে, "ভোটের" অধিকার পাইয়াছে, সেখানেও—পনের আনা লোক ধর্ম্মকর্ম্ম, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, আচার আচরণের তত্ত্ব বা রহস্য সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞ। অথচ, তারা গতানুগতিকভাবে কতকটা, এবং কতকটা "অন্ধ" ইষ্টসাধনতা জ্ঞানে, সেগুলি পালিয়া যাইতেছে। গীতার ভাষায়—সমাজের পনের আনা লোকই "অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী"। এটা করিলে পাপ, ওটা করিলে পুণ্য; এটায় অমুক দেবতা তুষ্ট হবেন, ওটায় অমুক রুষ্ট হবেন;—এই রকমের বিশ্বাস (সব সময়ে যে অমূলক তা না হইতে পারে) তাদের অধিকাংশ প্রবৃত্তির মূলে। তত্ত্ব বা রহস্য বোঝে না এবং বোঝার সামর্থ্যও সচরাচর ধরে না বলিয়া, "বিদ্বান" যিনি, তিনি সত্য (কি না, মোটের উপর লোক-কল্যাণকর) অনুষ্ঠানগুলি (স্বয়ং অনুষ্ঠানের অন্তর্বিধ প্রয়োজন না থাকিলেও) "যুক্ত" হইয়া আচরণ করিবেন; অন্যথা, সাধারণ্যে "বুদ্ধিভেদ" উপস্থিত হইবে। আর, বুদ্ধিভেদ হইলে, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সুতরাং অধ্যবসায়-তৎপরতা, —কিছুই থাকে না।

একটা সুসভ্য সমাজের ভিতরেই এই রকম বিদ্যা উপরের স্তরগুলির কোথাও কোথাও থাকে, বাকি যায়গাতে থাকে না। ভূতপূর্ব্ব সভ্যতাভ্রষ্ট অসভ্যসমাজে সকল স্তরেই না বুঝিয়া "পালিয়া যাওয়া" থাকে, কিন্তু বিদ্যা লুপ্ত হইয়া যায়। আর, সভ্য-সমাজের পাশে থাকার দরুণ, সে সমাজের আচরণ ও সংস্কারগুলি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া, অসভ্য-সমাজ, অবিদ্যা পূর্ব্বক, অনেক সত্য ও তত্ত্ব জীবনের "কাজে খাটাইয়া" যায়, এবং আখেরে, তাদের ফলভাগীও হইয়া থাকে। "পাশে থাকা" বলিতে বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বর্ত্তমান যুগের "প্রতিবেশিত্ব" (neighbourhood) বুঝিলে বড় ভুল হইবে। ধরাপৃষ্ঠে জল স্থল বিভাগ কতবার ঠাঁই বদলাইয়াছে তার ঠিকানা নাই; আর জাতিগুলিও যে কত সময়, কত বার কাছাকাছি হইয়াছে, আবার দূরে ছাড়া-ছাড়ি হইয়া গিয়াছে, তারও ঠিকানা নাই। সাঁওতাল, ভীল, কোল এখন আমাদের প্রতিবেশী; কাজেই আমাদের প্রভাব তাদের উপর যতটা বা তাদের প্রভাব আমাদের উপর যেটুকু, তা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের মালেনেশিয়া, পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বর্ব্বরেরাও যে কোন দূর অতীতে আমাদের বা অপর কোনো সভ্য জাতির প্রতিবেশী ছিল বা থাকিতে পারে,—এ কথা শুনিলে আমরা ম্যাপের দিকে তাকাইয়া অবিশ্বাসে শিরঃসঞ্চালন করি। ওয়ালেস, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রাণিজগতে "জ্ঞাতিকুটুম্ব" খুঁজিতে গিয়া কিন্তু আবশ্যকমত "সাগর ডিঙ্গাইতে" ভয় পান নাই। ভয় পান নাই বলিয়াই ওয়ালেস সাহেব না হউন, ডারউইন সাহেব, মানুষকে, হনুমান না হউক "জাম্বুবানের", গোষ্ঠীভুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, পৃথিবী-পৃষ্ঠে জাতিগুলির বর্ত্তমান সমাবেশটিকে সনাতন ভাবিবার কোনই কারণ নাই; বায়ু-মণ্ডলে বায়ুর নানা দিকে গতির মতন, বিশ্ব-মানব-সমাজে নানান দল নানা দিকে ছড়াইয়াছে ও ছড়াইতেছে। একবার নয়, বারবার। আর্য্যজাতি যদি আর্কেটিক দেশেরই আদিম অধিবাসী বলিয়াই সাব্যস্ত হন (স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি ঠিক ততদূর নয়), তা হইলে, এইটা ভাবিয়াই বসিয়া থাকিলে চলিবে না যে, সে জাতি "শেষ" গ্লেসিয়ার যুগেই হউক, আর যখনই হউক, একবার মাত্র ভারতবর্ষ বা ইরাণের দিকে অভিযান করিয়াছিলেন, বাস্—আর না। জাতির দেশ ছাড়িয়া বাহিরে অভিযান যে কেন হয়, তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নানা কারণে হইয়া থাকে। তবে, যদি অন্যরূপ মনে করার বলবৎ প্রমাণ উপস্থিত না থাকে ত', এইটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, সে কারণগুলি আচম্বিতে দেখা দিয়া আচম্বিতে মিলাইয়া যায় না; যে কুটিল রেখা (curve)র ইতিহাস ও অভিব্যক্তির বর্ত্ম অঙ্কিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই রকম curve-এর ভঙ্গীতে তারা কাজ করিয়া থাকে; সুতরাং, তাদের ক্রিয়াও আকস্মিক ও ক্ষণিক নহে। যদি ইতিহাস অন্য রকম মনে করার সঙ্গত কারণ না দেখাইতে পারে ত', ইহাই ভাবিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির মেরু-নিবাস হইতে প্রবাস-যাত্রার স্রোত একবার নয়, বারবার ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের দিকে চলিয়াছে।

এইভাবে আর্য্যাভিযান স্রোতের (Streams of Aryan Emigrationএর) একটা পর্য্যায় (Series) আমাদের

মানিতে হয়। প্রথম স্রোত কবে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল (অবশ্য,—"এমিগ্রেশন" থিওরি মানিয়া এই কথা বলিতেছি), তা কে বলিবে? হয় ত প্রথম স্রোত আসা ও দ্বিতীয় স্রোত আসার মাঝে শত সহস্র বৎসরের ব্যবধান ছিল। হয় ত এমন হইতে পারে যে, প্রথম ধারাটি ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুদিন পরে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল; এমন কি হয় ত চারিধারের অনার্য্য সভ্যতার প্রভাবে বিকৃত ও স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্রভাবে না হইলেও, আংশিকভাবে, তার প্রভাব ও নিদর্শন-চিহ্ন কিন্তু ভারতে রহিয়া গেল। তার পর হয় ত শত শত বৎসর পরে, দ্বিতীয় স্রোতটি আসিয়া উপস্থিত হইল। এটি আসিয়া প্রথম বারের ক্ষীণ আর্য্য-প্রভাবটিকে একটু চেতাইয়া ও জাঁকাইয়া দিল। কিন্তু এ দ্বিতীয় বারের "ধাক্কা" (Stimulus or Impetus)তেও হয় ত ভারতবর্ষ "আর্য্য" (Aryanised) হইল না। তার পর, তৃতীয় স্রোত (Aryan Stimulus) আসিল; চতুর্থ, পঞ্চম, ইত্যাদি। আলাদা আলাদা ভাবে এ প্রভাবগুলি যা করিতে পারে নাই, সমুচ্চয়ে ("Summation of Stimuli" নিয়মে) বহু দিনে হয় ত তারা সে কাজ করিল। ভারতে আর্য্য প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অনার্য্য প্রভাব, একেবারে অস্তমিত না হইলেও, আর্য্য প্রভাবের দ্বারা অভিভব-গ্রস্ত হইল।

অবশ্য ঋষিরা শ্রুতিতে জগতে যে "অন্ন-অন্নাদ" "অগ্নি-ষোমীয়" সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর্য্য-অনার্য্যদের ভিতরেও সেই অগ্নিষোমীয় সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। আর্য্যেতর সভ্যতা (সভ্যতা অল্পবিস্তর, একভাবে না হয় অন্যভাবে, সকল সমাজেই ছিল এবং আছে; আমরা যাদের বর্ব্বর আখ্যা দিই, তাদের ভিতরেও আছে; "ঐতিহাসিক"-দের মতে, আর্য্যজাতির আগমনের আগে ভারতবর্ষে, এমন কি ইউরোপেও, কেবল বন্য বর্ব্বরেরাই বাস করিত না; কোনো কোনো সুসভ্য ও সমৃদ্ধ আর্য্যেতর জাতি বাস করিত) বিজেতা আর্য্য-সভ্যতার কাছে "অন্ন" বা "সোম"-রূপে গৃহীত হয়। ইহার ইংরাজি নাম—assimilation। তবে, আর্য্য খাইয়াই যান, আর অনার্য্য তার খোরাক যোগাইয়াই যান, এমন নয়। দুয়ের মধ্যে দস্তুর মত "খাওয়াখাওয়ি" চলে। ফলে, দুইটাই বেশ বদ্‌লাইয়া যায়। বিজেতা আর্য্য সভ্যতার আকৃতি প্রকৃতিই মোটামুটি বাহাল থাকিয়া যায়। সভ্যতা বস্তুটাকেই আর্য্যেরা নিজে-দের ধারণা মত "গড়ন" দিতে থাকেন, আর্য্যদের সংস্কারমত সভ্যতার একটা যথার্থ আকৃতি আছে; যে সভ্যতার আকৃতি সেই আদর্শের সঙ্গে মেলে না, সে সভ্যতা "অসভ্যতার" সামিল হইয়া যায়, কাজেই শিষ্টজন-পরিগৃহীত আর থাকে না; অনার্য্যজুষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেই কেবল যে বাহির হইতে "স্রোত" আসিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে কোনো স্রোত বাহিরে যায় নাই, এমন মনে করাও উচিত নয়। আর্য্যেরা আসিবার আগে (আমরা এখানেও প্রচলিত বিলাতী মতের অনুসরণ করিয়াই কথা বলিতেছি), যে সকল জাতি ভারতে বাস করিত, তারাও ভারতের বাহিরে গিয়া থাকিবে; এবং আর্য্যেরা "উপনিবেশ" স্থাপন করার পরও, এরূপ অভিযান একাধিক বার হইয়াছে। প্রাগ্‌দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, আর্য্য—এ ভাবে ইতিহাসের "থাক্" করিয়া লওয়া বড়ই মোটা হিসাব। প্রাগ্‌দ্রাবিড়ের যুগে আর্য্যেরই একটা স্রোত ভারতে আসিয়া থাকা অসম্ভব নয়; আমরা যখন হইতে "আর্য্যযুগ" বলিয়া গণনা করি, তখন হয় ত আর্য্য স্রোতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারাগুলি অভিনব ধারায় মিশিয়া সংহত ও উপচিত হইয়া প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু ঠিক সেদিন হইতেই আর্য্যেরা ভারতের আসরে আসিয়া দেখা দিলেন, এটা, অন্বয়মুখে বলবৎ হেতু না মিলিলে, মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। তার আগে যে স্রোতগুলি আসিয়াছিল, তারা ভাষায়, ভাবে, আচারাচরণে "অনার্য্য-প্রধান" ভারতে কি কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, এটা অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয়। এত দূরবর্ত্তী যুগ যে, অনুসন্ধান সহজ নয়; কিন্তু চলিতে থাকুক। প্রমাণ না মিলা পর্য্যন্ত, যেখান হইতে "নিশানা" পাইতেছি, সেইটাইকে গোড়া মনে করিতে হইবে, এমন কোনো ন্যায়ের জরুরি "গরজ" নাই। স্বাভাবিক নিয়মে, জাতিদের গতি-বিধি কি ভাবে হইয়া থাকে, সেটার খেয়াল রাখিলে, আমরা এখন যেখানটায় কোনো জাতির প্রথম পদচিহ্ন দেখিলাম, সেইখানটাতেই তার প্রথম পদক্ষেপ, এরূপ মনে করিব না।

সভ্যতা স্বরূপে বা প্রকৃতিতে আর্য্য সভ্যতা; জগতের নানান সভ্যতা তারই অপভ্রংশ বা বিকৃতি—"তত্ত্বদর্শী"দের অনেকে এই রকম একটা কথা বলিয়া থাকেন। আমরা এখন যেটাকে আর্য্য-সভ্যতা বলিয়া জানিতেছি, সেইটাই

দেখি কত বিচিত্র,—ভারতে ও ভারতের বাহিরে। সেই বৈচিত্র্যগুলার যদি একটা অভিন্ন মূল বা আদর্শ তুলনামূলক সমালোচকের রীতিতে কল্পনা করিয়া লই, তবে সেটাও যে, তত্ত্বদর্শীদের প্রজ্ঞালোচিত "মূল সভ্যতা," এমন মনে করিতে পারা যায় না। সুতরাং, সে মূল সভ্যতাটিকে "আর্য্য" নাম দিলে গোল হইতে পারে। কেন না, "আর্য্য" নামটির আসল লক্ষণ বা অর্থ আমরা নানা জটিলতা, গোলযোগের ভিতরে হারাইয়া বসিয়া আছি। যেমন হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ধর্ম্মই, তার আর হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাকার রকমারি হয় না, সভ্যতার বেলাও তেমনি। সভ্যতা সভ্যতাই; তার আর আর্য্য-অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ নাই। ভেদ যাহা হইয়াছে, বিকৃতিতে; প্রকৃতিতে বা মূলে সভ্যতা একই। তবে এমন হইতে পারে যে, আর্য্য সভ্যতারই বর্ত্তমান বা প্রাচীন কোনো কোনো শাখাতে সেই প্রকৃতি বেশী বজায় রহিয়াছে, অথবা ছিল; কাজেই, "লক্ষণায়," সভ্যতা-বিশেষকে আর্য্য-সভ্যতা বলা চলিতে পারে। সে যাহা হউক, সভ্যতার কোন্‌টা প্রকৃতি, কোন্‌টা বিকৃতি তাহা লইয়া এক্ষেত্রে বিচার করিয়া লাভ নাই, কেন না, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা লইয়া একটা আপোশ হবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে তত্ত্বদর্শীদের ও কথার একটা দিক্ এখানে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

ধরা যাক্ ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে "প্রাগৈতিহাসিক" যুগে ঐ আসল, মূল (আর্য্য) সভ্যতা বিরাজিত ছিল। ভারতবর্ষেই সে সভ্যতা আবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাহিরে মেরু প্রভৃতি দেশেও সে সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। যে সকল জাতি (races and peoples) সে সভ্যতার অধিকারে বাস করিত, তাদের শারীর গঠন মোটের উপর এক ছিল কি না, এবং ভাষাও একই মূল ভাষার শাখা ছিল কি না, সে প্রশ্নের আলোচনা করিয়া কাজ নাই। জাতি বা ভাষার দিক্ দিয়া মূল আমরা আপাততঃ খুঁজিতেছি না। তার পর, ধরা যাক্, কখনো কখনো কোনো কোনো আভ্যন্তরীণ অথবা আগন্তুক কারণে, সে সভ্যতা ভারতবর্ষে সঙ্কুচিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ও গিয়াছে। প্রাগদ্রাবিড় যুগের কোনো কোনো ভাগে হয় ত ভারতীয় সভ্যতা এই ভাবেই সঙ্কোচ-প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে—সেই সেই সময় বন্য বর্ব্বরদের (সম্ভবতঃ Proto Austroloid ও Proto Negroidদের আমোল। পরে দ্রাবিড় প্রভৃতিদের আমোলে, সে সঙ্কোচ অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কোনো কোনো দিকে হয় ত সভ্যতার এমন সব "হ্রাস বৃদ্ধি" ও বৈকল্য ঘটিয়াছে যে, সে সভ্যতাকে আর মূল ভারতীয় সভ্যতার খাঁটি চেহারা মনে করা যাইতে পারিত না। সেটা তখন বিকৃতি। ভাষাবিদ্ (Philologist)গণ এবং এন্‌থ্রোপোলজিষ্টগণ আদিম বন্যদের ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্য্যদের তেমন কোনো মিল দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া ভড়্‌কাইলে চলিবে না। ভাষা আর্য্য সেমেটিক প্রভৃতিদের মধ্যে এবং শারীর গঠন ব্র্যাসিসেফালিক ডলিকেফাসেফালিক মেজোসেফালিক প্রভৃতিদের মধ্যে আলাদা আলাদা হবার কারণ যাই হউক না কেন, সভ্যতার বিকাশ ও পরিণতি সর্ব্বপ্রকারে ভাষা ও শারীর গঠনের সূত্র ধরিয়াই চলিয়াছে, এমন মনে করার কারণ নাই। "টাওয়ার অফ্ ব্যাবেল ঘটনার" পর মানুষ নানা দলে নানা ভাষা কহিতে সুরু করিলেও, তাদের সভ্যতার আত্মীয়তা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন মনে করার জরুরৎ নাই।

এ বিচারে এখানে আর অগ্রসর হইব না; তবে একই মূল ভারতীয় সভ্যতা-সঙ্কোচের ফলে আদিম "দস্যু"দের সভ্যতা, কথঞ্চিৎ বিকৃত অস্বাভাবিক বিকাশের ফলে দ্রাবিড় সভ্যতা, এবং পুনশ্চ, কথঞ্চিৎ স্বাভাবিক বিকাশের (অথবা স্বপ্রতিষ্ঠিততার) ফলে আর্য্য সভ্যতা, পরে আবার বিকৃতির ফলে বৌদ্ধ সভ্যতা, এবং আবার যথাসম্ভব স্বভাবে ফিরিয়া আসার চেষ্টায় হিন্দু সভ্যতা—এই ভাবে সঙ্কোচ-বিকাশ, বিকার স্বভাব, এই দ্বৈধের মাঝখান দিয়া তরঙ্গায়িত ভাবে হেলিয়া দুলিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথা মনে করিলে, ফিলোলজিষ্ট বা এন্‌থ্রোপোলজিষ্টের বা এথনোলজিষ্টের তরফ হইতে কোনো মারাত্মক আপত্তি উঠিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। খুব প্রাচীন যুগে, যখন ভারতের সভ্যতা ভারতেও ছিল, ভারতের বাহিরেও কোথাও কোথাও ছিল, তখন সে সভ্যতার বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে "রক্ত"-চলাচল যেমন স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি, তেমনি যখন ভারতে, আভ্যন্তরীণ বা আগন্তুক কোনো কারণে, মূল সভ্যতার সঙ্কোচ বা বিকার ঘটিয়াছে, তখন, বাহির হইতে (মেরু প্রভৃতি দেশ হইতে),

সেই সভ্যতারই এক একটা "ঢেউ" আসিয়া হয় ত তাকে স্বাস্থ্য ও সবলতা পুনঃ প্রদান করিয়াছে। হৃদয়ে বা অন্য কোনো অণ্ডরসে তাজা রক্তের অভাব হইলে, হস্ত-পদাদির ধমনী বহিয়াও যেমন তাজা রক্ত সে সে অণ্ডে আসিতে পারে, অনেকটা সেইরূপ। এরূপ হইয়া থাকিলে, মেরুপ্রদেশ হইতে "বৈদিক" সভ্যতা ভারতে নূতন আমদানি হয় নাই; ভারতে যা ছিল (এবং মেরু প্রভৃতি দেশেও যেটা ছড়াইয়া ছিল), সেইটা, কতকগুলি কারণে ভারতে তার "টান" বা "চাহিদা" উপস্থিত হইলে, বাহির হইতে ভারতে সরবরাহ হইয়াছিল। ভারতে সঙ্কোচ বা বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এই চাহিদা। গৌড়দেশে বৌদ্ধ বিপ্লবের পর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আগমন ব্যাপার যেরূপ, এও অনেকটা সেইরূপ। পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌড়ে হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি নূতন পত্তন করিয়া গেলেন, এমন কেহ মনে করে না।

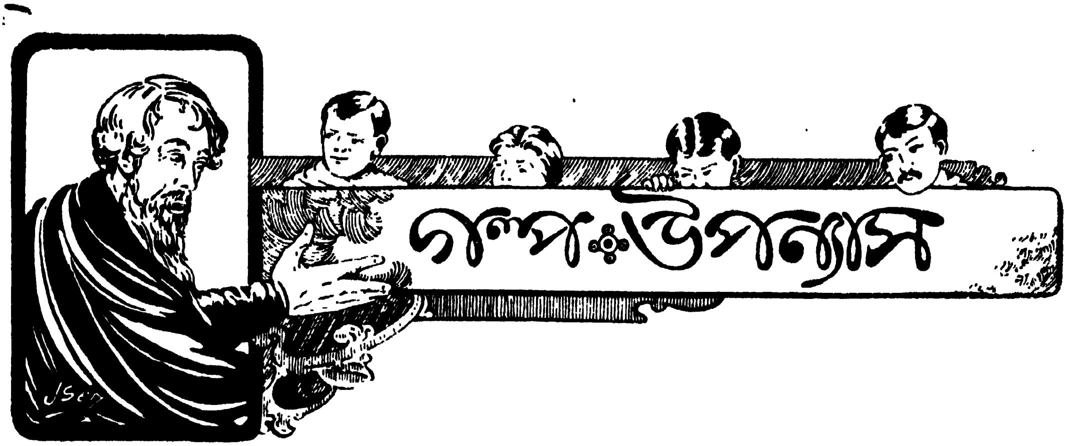
তার পর, আগেই আমরা বলিয়াছি যে, বাহির হইতে ভারতবর্ষে তাজা রক্তের প্রবাহ একদিন একবার বহিয়াই থামিয়া গিয়াছিল, এটা ভাবা উচিত হইবে না। ধাক্কা বারবার আসিয়াছিল; আসিয়া সমুচ্চয়ে, সংহতিতে, কাজ করিয়াছিল; ভারতীয় সভ্যতার সঙ্কোচ ও বিকার দূর করিয়া দিয়াছিল। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"—এ ভাগবত-আত্মা নানা কলেবর ধারণ করিয়া আসিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ রাম-কৃষ্ণ রূপেই যে তিনি অবতীর্ণ হন, এমন নয়; এক একটা সমষ্টি বিগ্রহ অথবা জাতি রূপ ধরিয়াও তিনি কখন কখন আসিয়া থাকেন। প্রাচীনেরা অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন ("মন্থন") করিতেন, আবার আবশ্যকমত অগ্নি "চয়ন"ও করিতেন। ভারতবর্ষে অরণি ক্ষীণ হওয়া বশতঃ, অথবা মন্থনকারীর হস্ত বলহীন হওয়া প্রযুক্ত মন্থনে বিষ্ণারূপ অগ্নি যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন ভারতের বাহিরে, যেখানে যেখানে সে হোমাগ্নি তখনও জীবিত ছিল, সেখান সেখান হইতে সে অগ্নি চয়নের উপায় হইয়া থাকিবে। এ যেন আত্মাই আত্মাকে চেতাইয়া দিতেছে। এ দৃষ্টিতে "বৈদিক সভ্যতা" ভারতে আগন্তুক, আপতিত কোনো একটা জিনিষ নয়,—যেটা আদৌ অবৈদিক সভ্যতার মাঝখানে পড়িয়া লড়াই করিয়া তাহাকে ফতে করিয়াছিল, এবং "শূদ্র" বানাইয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল। এ দৃষ্টিতে ভারতের ভিতরে মূলে সে সভ্যতা ছিল, ইহাই মনে করা হইতেছে; বাহির হইতে একাধিকবার সেইটাই আবার আসিয়াছে, যখন যখন ভারতীয় সভ্যতার বিপ্লব ও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আসিবার কালে ভারতের বাহিরের (মেরু প্রভৃতি দেশের) অনেক "অভিজ্ঞান" ও "নিদর্শন" অবশ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; বৈদিক সাহিত্যে সেই সব নিদর্শন দেখিয়া আমরা সাব্যস্ত করিয়া ফেলি—বৈদিক ঋষিদের আড্ডা মেরুপ্রদেশে ছিল; মঙ্গোলিয়ায় ছিল; গোবি মরুভূমি সেকালে জলপূর্ণ সাগর ছিল, তখন তারই চারিধারে ছিল; ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কল্পনা জল্পনার কূল-কিনারা নাই। দুই চারিটা মেরুর নিদর্শন পাইলে মেরুদেশে, দুই চারিটা ককেশিয়ার নিদর্শন পাইলে ককেশিয়ায়,—এই রকম ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া তুলসীদাসের সেই প্রসিদ্ধ বচনটাই—"নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি পাওত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হৈ" আমরা সোদাহরণ করিয়া দিতেছি। মূল আর্য্য বা বৈদিক সভ্যতার ডালাপালাগুলো সম্ভবতঃ উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের গিরি-প্রাচীর ডিঙ্গাইয়াও দূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু মেরুশাখায়, মিড্-এশিয়াটিক শাখায়, পারস্য-শাখায়, ককেশিয়া-শাখায়, শাখামৃগত্ব করিতে করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, এ অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটা কোথায় রহিয়াছে। দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে যে "আর্য্যপ্রভাব" দেখিতে পাই, সেটা উত্তরকালে আগন্তুক আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের ফলে দেখা দিয়াছে, এমন মনে না করিয়া, এমনটাও ত মনে করা যাইতে পারে যে, একটাই আদিম মূল সভ্যতা নানা কারণে রূপান্তরিত হইয়া "দ্রাবিড়" আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল; পরে, সেই মূল সভ্যতারই "প্রবাসী" একটা শাখার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে এবং তার সংঘাতে সেটা তার "দ্রাবিড়" রূপ বা খোলস যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং আর্য্যবস্তুটিই তার "শাঁস" (Essence), দ্রাবিড় বস্তুটি, সে শাঁসের তুলনায় "খোসা" (Accident)। ভাষা-বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান, আপাততঃ আপত্তি তুলিতে না হয় বিরত হউন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে অনেক মামলা সহজ হইয়া আসিবে। বৈদিক আর্য্যেরা "জাতি" মানিতেন না, দ্রাবিড়দের কাছ হইতে শিখেন;

প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে শিখেন; লিঙ্গপূজা শিখেন; আরও কত কি শিখেন যার "নাম গন্ধও" তাঁদের খাঁটি ঋগবেদাদিতে নাই;—এ সকল কথা শাখাবিচারী পল্লবগ্রাহীর কথা। বেদে যা যা স্পষ্টতঃ রহিয়াছে (প্রচ্ছন্নভাবে নাই এমন কিছু দেখি না), তার সঙ্গে এ সব "ধার করা" বিদ্যার কোনই অসামঞ্জস্য নাই; অসামঞ্জস্য থাকিলে মিস খাইত না, সমন্বয় হইত না। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যেও বিরোধের "আভাস" আছে; সত্যকার বিরোধ নাই; থাকিলে, এমন সুন্দর সমন্বয় হইত না। পূর্ণ করিয়া দেখিলে বিরোধ নাই।

জাতিদের ভাবের আদান প্রদান ব্যাপারে কে যে মূল মহাজন, আর কে বা কাহারা তার খাতক, এটা নিরূপণ করা যে কত শক্ত, তাহা আমরা এই সামান্য আলোচনার মধ্যেই দেখিতে পাইলাম। আমরা যে সকল সম্ভাবনা উপস্থাপিত করিয়াছি, সে সকল সম্ভাবনার মধ্যে সত্যের কতকটা ভিত্তি রহিলে, এইটা মনে করাই যুক্তিযুক্ত হইবে যে, প্রধান প্রধান ভাব, বিশ্বাস বা চিন্তাগুলির (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুষ্ঠানের) বীজ গোড়া হইতেই মানবীয় সত্তার ভিতরে রহিয়াছে; দেশে, কালে ও পাত্রে সে বীজ-সমূহের বিকাশ, সঙ্কোচ, পুনর্বিকাশ, বিকৃত-পরিণতি, অন্যথা বিকাশ, তাহা হইতে আবার পূর্ব্বাবস্থার দিকে প্রতিক্রিয়া—এইভাবে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বীচি-বিক্ষোভভঙ্গিমায় চলিয়া যাইতেছে। এইটা হইল তাদের পরিণতির curve। এ curveএর নিয়ামক (determining) equationএ, আমাদের কাছে অভিব্যক্ত ও প্রতীত "দেশ, কাল ও পাত্র"ই কেবল যে "terms" এমন নয়। অতীন্দ্রিয় ও "লোকোত্তর" শক্তিগুলিও নানা ভাবে এ curveএর গতির নিয়ামক হইয়া থাকে। সাধারণ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা curveটির অংশ বা খণ্ড (segments বা elements) গুলি কিছু কিছু ধরিতে বুঝিতে পারা যায়; ইহাকে সমগ্রভাবে ধারণায় পাইতে হইলে ইনটুইশন বা তত্ত্বদৃষ্টি ছাড়া উপায় নাই।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগীর চৈতন্য



পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

উপেন্দ্রনাথ চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া। আজ মাসখানেকের কথা—একদিন স্নানান্তে ঘাট হইতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এখন জ্ঞান ফিরিয়াছে; কিন্তু নিজের পা নিজে নাড়িবার সামর্থ্য নাই। প্রকাশের ভগিনী সেদিন ডাক্তার আনিয়া দেখাইয়াছিলেন; ডাক্তার প্যারালিসিস্ বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।

দেবী প্রাণপণে রুগ্ন শ্বশুরের সেবা যত্ন করিতেছে; কিন্তু সেও যে আর পারে না। কোনদিন আহার, কোনদিন অর্দ্ধাহার, কোনদিন অনশনে তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল। ইহার উপর এ বৎসর বর্ষায় ম্যালেরিয়ার দারুণ আক্রমণ সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখন সে দু চারদিন ভাল থাকে, আবার খুব কাঁপিয়া জ্বর আসে।

আজ তিনদিন তাহার খুব জ্বর। আগের দুদিন অল্পই হইয়াছিল; আজিকার প্রকোপ বড় বেশী। আজ সকাল বেলায় প্রকাশের ভগিনী তারা যে দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জাল দিতে দিতে তাহার জ্বর আসিতেছিল। প্রাণপণ শক্তিতে সেই কম্প প্রশমিত করিয়া কোনক্রমে দুধ জাল দিয়া শ্বশুরকে খাওয়াইয়া, তাঁহার কাছে জল দুধ সব ঢাকিয়া রাখিয়া একখানা কাঁথা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্ত দিনটা কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। তারা তিন-চার বার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাজের মানুষ,—বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি না রাখিলে একদণ্ড চলে না, সেইজন্য একেবারে থাকিতে পারেন নাই।

সন্ধ্যার দিকে খুব ঘাম হইয়া দেবীর জ্বরটা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। দেবী অনেকবার উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু হায়রে, উঠিতে তো সে পারিল না। আজ এই ভীষণ জ্বরে তাহাকে একেবারেই শক্তিহীনা করিয়া দিয়া গিয়াছে। ও-ঘরে চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ সকাল হইতে সেই একভাবেই পড়িয়া আছেন, সারাটা দিন কেউ তাঁহার মুখে একটু জল দেয় নাই, একটু দুধ সুযী খাওয়ায় নাই।

হতাশয় দেবী ছটফট করিতে লাগিল,—নারায়ণ, দামোদর, এইরূপেই কি পরীক্ষা করিতে হয় প্রভু? যাহার কেউ নাই তাহাকে এমন ভাবে বিড়ম্বিত করিতে হয় কি? আর

যে ভক্তি আসে না গো, আর যে শ্রদ্ধা থাকে না; শ্রদ্ধা-ভক্তির উৎস যে নির্দ্দয় ব্যবহারে তুমিই শোষণ করিতেছ। এ সংসারে কি শুধু নির্য্যাতন সহিবার জন্যই পাঠাইয়াছ? সংসারে সব দিয়া আবার একে একে সবই কাড়িয়া লইলে, বিশ্বাস—ভক্তি—শ্রদ্ধাটুকুও কাড়িয়া লইলে ভগবান, ইহাতে কি কিছু সান্ত্বনা পাইয়াছ প্রভু? সকল দিয়া সকল কাড়িয়া লইয়াছ—বেশ করিয়াছ, লও! তাহাতে তাহার লোকসানের ব্যথা বুকে বাজে নাই, জোর করিয়া সে সকল ব্যথা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে; তাই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিবার জন্যই কি অটুট স্বাস্থ্য কাড়িয়া লইলে? ওগো, স্বাস্থ্য কেন তাহার তেমনিই অটুট রাখিলে না? তাহা হইলে অতীতের কোন কথা, কোন ব্যথাই তো তাহার মনে আজ জাগিয়া উঠিত না? পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটী বৃদ্ধের ভার যে তাহারই মাথায় চাপাইয়াছ,—সে এই বৃদ্ধের সেবায় অপারগ জানিয়াও বেদনা দিয়া তাহাকে পারগ করিয়াছ,—যে শক্তিতে সে শক্তিমতী ছিল—ওগো, ওগো নিষ্ঠুর, সে শক্তিটুকুও কাড়িয়া লইলে? আজ তোমায় ডাকিবার প্রবৃত্তি আর যে হইতেছে না! না, তোমার দেবী আর ডাকিবে না, দেবী কাল সকালেই—ওগো দামোদর, তোমার সিংহাসনসুদ্ধ নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে।

"মাগো,—মা—"

দেবী আর্ত্তকণ্ঠে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া একবার নিজের স্বর্গগতা জননীকে ডাকিল,—শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারার মত তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

মায়ের নামে এবার বুঝি সে বল পাইল,—প্রাণপণ শক্তিতে সে উঠিয়া বসিল। দুই হাতে ললাটের ঘর্ম্মধারা মুছিতে মুছিতে মুক্তকণ্ঠে সে বলিল, "আঃ"—

"বাড়ীতে কেউ আছেন কি?"

কে ডাকে? দেবী উৎকন্ঠিত হইয়া বাহিরের পানে চাহিল।

নারীকণ্ঠে কে বলিল, "এই যে দরজা খোলা রয়েছে, চল আমরা ভেতরে যাই। ঠাকুর দা বোধ হয় বাড়ী নেই। বেড়াতে গেছেন,—কাকীমা একা মাত্র বাড়ীতে আছেন, উত্তর দেবেন কি করে?"

বীথি ও শঙ্কর অন্ধকার প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবী লজ্জা করিল না; কেন না, এ সময় তাহার লজ্জার নহে। ব্যগ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তোমরা?"

"আমি বীথি।"

বীথি বারাণ্ডায় উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে বারাণ্ডায় শুয়ে আছ কে?"

দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "বীথি? তুমি এসেছ মা,—আঃ, আমি বাঁচলুম, আমি কে সে পরিচয় কেমন করে দেব মা?"

বীথি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি—আর বল্‌তে হবে না। তুমি এখানে পড়ে রয়েছ যে, জ্বর হয়েছে বুঝি?"

দেবীর চোখে জল আসিতেছিল। সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "জ্বর হয়েছিল; এখন ছেড়ে এসেছে। আমায় তোমার দেখতে হবে না মা। ওঘরে তোমার ঠাকুরদা পক্ষাঘাতে অচল হ'য়ে পড়ে আছেন। আজ সারাদিন আমি তাঁকে দেখতে পাইনি। আমার হাতখানা একটু ধর, আমি উঠে একবার তাঁকে দেখি গিয়ে।"

বীথি তাহাকে ধরিয়া উঠাইল, বলিল, "আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল কাকিমা, নইলে পড়ে যাবে।"

দেবী বলিল, "না—পড়ে যাব না, এবার বেশ চলতে পারব। তুমি এসো আমার সঙ্গে।"

শঙ্করকে আসিতে বলিয়া দেবীর সঙ্গে বীথি অগ্রসর হইল। সন্ধ্যার সময় তারা আসিয়া গৃহমধ্যে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সামান্য তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পলিতাটী এখনও টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহা জ্বলিতেছে মাত্র; কেন না সে আলোকে অন্ধকার দূরীভূত না হইয়া আরও ঘনীভূত বোধ হইতেছে। একপাশে মেজেয় একটী ক্ষুদ্র বিছানার উপর পড়িয়া আছেন উপেন্দ্রনাথ।

দেবী স্খলিত পদে গৃহে প্রবিষ্ট হইল। প্রদীপে তৈল দিয়া সলিতা বাড়াইয়া দিল। এবার গৃহের চারিদিকে আলো পড়িল। সে আলোকে এই গৃহের দৈন্যদশা বীথির চোখে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

কি ভীষণ দৈন্য! আহা, দেখিতেও যে চোখে জল আসে! অথচ এইটাই বীথির পিতার পবিত্র জন্মস্থান, তীর্থ

বিশেষ। এই যে বৃদ্ধ দীনভাবে বিছানাটীর উপর পড়িয়া আছেন, ইনিই লক্ষপতি জিতেন্দ্রনাথের পিতা। অদৃষ্টের পরিহাস! যাঁহার অমন দুই পুত্র বর্ত্তমান, নাম বলিতে যাঁহাদের সকলেই চিনিবে, তাঁহাদের পিতার এই অবস্থা? বীথির পিতা ইচ্ছা করিলে যে নিজের পিতাকে ত্রিতল হর্ম্ম্যে দাসদাসী দিয়া রাখিতে পারিতেন।

দরজার উপর দণ্ডায়মানা বীথি, সাহস করিয়া সে গৃহের মধ্যে পা বাড়াইতে পারিতেছিল না। গৃহের আলোকের দীপ্তি স্পষ্টরূপে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। পিছনে তাহার নিকষ-কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোকোজ্জ্বল তাহার মুখপানে তাকাইয়াই উপেন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিলেন, বিকৃত ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ও কে—কে বউমা,—ও কে?"

ঘুমের ঘোর তখনও তাঁহার চোখে, হঠাৎ ভয় পাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, ভয় পাইয়া তাহা আরও বিকৃত হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিয়া দেবী তাড়াতাড়ি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তাঁহার কঙ্কালসার বুকখানার উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "ওকে চিনতে পারছেন না বাবা? ও যে আপনার বীথি,—অসুখের খবর পেয়ে আপনাকে দেখতে এসেছে।"

একটা শব্দ মাত্র বৃদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইল।

দেবী মুখ তুলিয়া আড়ষ্টপ্রায় বীথির পানে চাহিয়া রহিল, "ঘরে এসো বীথি, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখানে এসো, এঁর কাছে একটু বসো। তোমার ঠাকুরদার আর তেমন শক্তি নেই মা, যে, [illegible] তোমার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা বলবেন। কথা [illegible]বারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই দু'তিন দিন হ'তে এমনি করে গেঙিয়ে যা দু'এক কথা বলছেন। আর বৃথা আশা মা,—যে মানুষের হাল হয়েছে, বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না। এরকম অবস্থায় না থেকে শীগগীর যান—যদিও তাতে আমারই কষ্ট হবে—তবু ওঁর জন্যে আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

তাহার চোখ বুঝি জলে ভরিয়া আসিল। তাই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

উপেন্দ্রনাথ কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার ঠোঁট দুখানা বৃথাই কাঁপিতে লাগিল, একটা শব্দও বাহির হইল না। দেবী তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দুধ খাবেন বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে কি?"

সে দুধের বাটি কাছে আনিতে, উপেন্দ্রনাথ মাথা নাড়িলেন। দেবী বলিল, "জল খাবেন? আচ্ছা—, হাঁ করুন, আমি আপনার মুখে দিচ্ছি।"

উপেন্দ্রনাথ হাঁ করিলেন, একটা ঝিনুকে করিয়া দেবী অতি সন্তর্পণে তাঁহার মুখে জল দিল। তৃপ্তির সহিত জল পান করিয়া উপেন্দ্রনাথ বীথির পানে চাহিলেন। তাঁহার চোখের পাতা দুইটী জলে ভিজিয়া চকচক করিয়া উঠিল।

বীথির বুক বড় ভারি হইয়া উঠিয়াছিল। পাপ-পুণ্য, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব তাহার মনে এই সময়টায় একবার জাগিয়া উঠিল। সে যতদূর জানে—যতদূর পরিচয় পাইয়াছে—তাহার ঠাকুরদা যথার্থ ধার্ম্মিক,—সৎ—মহান। তবে তাঁহার এত কষ্ট কেন? ধার্ম্মিকের এত দুঃখ, এত কষ্ট দেখিলে ভগবানের উপরই যে অবিশ্বাস আসে।

একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার সমস্ত দেহটাকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে শান্তির আশায় আসিল কোথায়? সে যে ব্রহ্মচর্য্য শিখিবে বলিয়াই এখানে আসিয়াছে, দিদিমার কাছে সেই জন্যই সে যায় নাই। সে কি ভাবিয়া আসিল, এখানে আসিয়া কি দেখিল।

রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া দিয়া সকালে বীথি গৃহের বাহিরে আসিয়া চারিদিককার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেল। সে জীবনে যাহা কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, আজ তাহাই সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। রন্ধনগৃহখানা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, পয়সার অভাবে লোক ধরাইয়া একটা খুঁটি কেহ ঠেকো দিতে পারে নাই, চালায় খড় দিতে পারে নাই। বারাণ্ডার অর্দ্ধেকটা বৃষ্টিতে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। উঠানে একহাঁটু করিয়া জঙ্গল, তাহার মধ্যে বড় বড় কতকগুলি ঝোপও বাঁধিয়াছে। এই বাড়ীখানা—যাহার চারিদিক ধ্বসিয়া পড়িয়া গলিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে—এই তাহার পিতা—বিখ্যাত ধনী ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথের জন্মস্থান। তাঁহার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনেরও প্রথম সময় এইখানেই কাটিয়াছে। হায় রে, সে যেন আজ উপকথা বলিয়াই মনে হয়।

নিজের পিতার পরেই সে কাকার কথা ভাবিল। এই যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের, এ মানুষকে বড় করে না ছোট

করে ? ওই কিশোরী তরুণীটি প্রাণপাত করিয়া কাহার সেবা করিতেছে,—সত্যর পিতার নহে কি ? রাগে দুঃখে বীথির হৃদয়খানা জ্বলিয়া যাইতেছিল। এই সময়ে একবার সে সত্যর দেখা পায়,—আঃ, মনের ক্ষোভ মিটাইয়া সে অনেকগুলা চোখা চোখা কথা তাহা হইলে সত্যকে শুনাইয়া দিতে পারে।

শঙ্করকে সে ডাকিয়া বলিল, "তোমার তো এখনই যাওয়া হতে পারে না শঙ্কর। যা সব বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে, এর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাওয়া চাই তো।"

গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইয়া শঙ্কর বলিল, "সে ঠিক কথা দিদিমণি. এ রকম অব্যবস্থার মধ্যে আপনাকে রেখে গেলে মা আমায় আর আস্ত রাখবেন না। টাকা দিন, এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

একশত টাকার একখানা নোট আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বীথি বলিল, "এই টাকা নাও। রান্নাঘরখানা আগে তুলতে হবে, এ বারাণ্ডাটা তৈরী করাতে হবে, চারিদিকে বেড়া দিতে হবে; এ টাকাতেও যদি না কুলায় আরও টাকা দেব এখন। কিন্তু তুমি তো এখানে কাউকেই চেন না শঙ্কর, কি করে কাজ করবে আমি তাই ভাবছি।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "সে জন্যে আপনার একটু ভাবতে হবে না দিদিমণি। জানেন তো—শঙ্কর না পারে এমন কাজই নেই; কারও সঙ্গে আলাপ করে আমি এখনই সব ঠিক করছি।"

শঙ্করকে পাঠাইয়া বীথি কোমরে কাপড় জড়াইয়া গৃহ পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সঙ্কুচিতা দেবী সাহায্য করিতে আসিতেছিল, বীথি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমার সাহায্যের একটু দরকার নেই কাকিমা, অসুখ শরীর নিয়ে তোমায় আর কোন কাজে আসতে হবে না। আমার কাছে তোমার অত লজ্জা করবার তো কোন কারণ নেই, এ তো আমারই বাপের বাড়ী, আমারও পরিষ্কার করার কথা। তুমি বসো না চুপ করে, দেখ—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

দেবী নিজের অসুখে—শ্বশুরের অসুখে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই জন্যই ঘর দুয়ার অপরিষ্কার অবস্থায় পড়িয়া ছিল। বীথি এক ঘণ্টার মধ্যে ঝাড়িয়া মুছিয়া চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; ধুলায় তাহার গা মাথা ভরিয়া উঠিল।

দেবী করুণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "এ সব কি তোমার সাজে মা? আমাদের ভাঙ্গা ঘরে রাজলক্ষ্মী তুমি,—এসেছ যে এই আমাদের বড় সৌভাগ্য! তোমার ঠাকুরদা যদি আজ ভাল থাকতেন তবে—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে চুপ করিয়া গেল, একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা, সকল আনন্দই ফুরিয়ে গেছে মা। আমার এই বিরাট দৈন্য, বিরাট তৃষ্ণা, বিরাট ক্ষুধা মিটাতে একটি মাত্র বস্তু পেয়েছিলুম;—সকল দুঃখকষ্ট ভুলে যাচ্ছিলুম এই কর্ত্তব্য পালনের মাঝখানে। কিন্তু আমি নিজেই যে অভাগিনী মা, এ ছোট্ট সুখের ধারাটীও কেন আমার শুষ্ক প্রাণে বইবে, তাই এ শুকিয়ে উঠল। ছিল নিজের অটুট স্বাস্থ্যটা, ভেবেছিলুম কাজ করব, কিন্তু তাও হারালুম।"

"কই গা বউ মা, শুনলুম তোমাদের বাড়ী কে না কি এসেছে গা—"

বলিতে বলিতে দক্ষবালা উঠানের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পানে চাহিয়াই বীথি হাসিয়া ফেলিল, আঁচলখানা মাথায় তুলিয়া দিয়া সে দেবীর পানে চাহিল।

দক্ষবালা সরাসর ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্র দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, কাল তুমিই আসছিলে. না?"

বীথি বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

দক্ষবালা ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'তোমায় কিছু দিন আগে আর কোথায় দেখেছিলুম, না?"

বীথি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সেই ট্রেণে দেখা হয়েছিল। একটী মেয়ে আপনার গায়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, মনে পড়ছে কি?"

গালে হাত দিয়া নিষ্পলকে দক্ষবালা তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, "অবাক্ করলে বাছা,—তুমিই সেই খিষ্টেনী? ওমা, মা,—ঢং এক্কেবারেই বদলে এসেছ যে বাছা? তখন এক্কেবারে মেমসাহেব সেজেছিলে. এখন পাকা হিঁদু-ঘরের মেয়ে সেজে এসেছ?"

গম্ভীর ভাবে বীথি বলিল, "এখনকার এইটেই স্বাভাবিক নিজের বেশ গো, তখন পোষাক বদলেছিলুম বই তো নয়।"

"ও মা আমি কোথায় যাব, চোটপাট কথা দেখ একবার। হ্যাঁগা বউ মা, এ যে খিষ্টেনী গো,—এ—"

দেবী ধীরকণ্ঠে বলিল, "এ আমার ভাসুরের মেয়ে বীথি—কাকি মা।"

"অ্যাঁ, জিতেনের মেয়ে—"

দক্ষবালা এতখানি হাঁ করিয়া বীথির পানে তাকাইয়া রহিলেন। গল্পই শুনিয়াছেন, চোখে কখনও দেখিতে পান নাই।

বীথি কথা কহিল না, নত দৃষ্টিতে ধরার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল—জগৎ এখনি ছি ছি করিয়া উঠিবে; যে-হেতু যে পুত্র পিতাকে এমন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজে সুখভোগ করিতেছে, সে সেই পুত্রের আদরের কন্যা।

"হ্যাঁ গা, হাতে লোহা নেই সিঁথেয় সিঁদুর নেই, বিয়ে হয় নি বুঝি ?"

দেবী মলিন হাসিয়া বলিল, "হয়েছে বই কি ?"

দক্ষবালা খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া উভয়কেই নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে বীথি বলিল, "একটা সত্যি কথা বলব কাকিমা, আমি আর সধবা শ্রেণীভুক্তা নই, আমি আজ বাংলার বিধবা।"

দেবী বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বিধবা—?"

বীথি শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, সত্যিই আমি তাই। দুনিয়ার সেরা জিনিস বিসর্জ্জন দিয়ে—রিক্তা নিঃস্বা আমি, ভিখারিণীর মত এই দুয়ারে ভেসে এসেছি কাকি মা, ধনীর প্রাসাদে যেতে পারি নি। আজ আমার কিছু নেই কাকিমা, আজ আমার সব গেছে। বলতে বুক ভেঙ্গে যায়—, কিন্তু না; থাক এখন সে সব কথা কাকিমা, এর পর সব বলব। এখন কোথায় স্নান করতে হবে আমায় দেখিয়ে দাও, আমি এ রকম ধুলোর মধ্যে আর থাকতে পারছি নে।"

দেবী বলিল, "পুকুরে স্নান করতে হবে যে,—"

বীথি বলিল, "যে ঘাটে লোকজন নেই সেই ঘাটে আমায় নিয়ে চল। আমি মোটেই পছন্দ করিনে কাকিমা যে আমায় এঁর মত কারও চোখে পড়তে হয়।

সে হাসিল, দেবীও হাসিল; কিন্তু বুকে তাহার বড় ব্যথা বাজিয়া উঠিতেছিল। বড় বিস্ময়ে সে ভাবিতেছিল বীথি বিধবা,—আহা, কি করিয়াছ ভগবান, এমন সোনার প্রতিমাকেও জ্বলন্ত আগুনে ফেলিলে ?

(২৫)

শঙ্কর কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

বীথির স্বামী-গৃহ ত্যাগ, আবার প্রত্যাবর্ত্তন, অনিলের শোচনীয় মৃত্যু—এসব কথা সরলা বা আর কেহ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রমা ফিরিয়া আসিয়া অনিলের চরিত্র সম্বন্ধে সব কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, বীথির সাবধানতা তাহাকে ঠেকাইতে পারে নাই।

সরলা সব শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। একদিন মায়ার সহিত দেখা করিয়া তিনি দুঃখিত কণ্ঠে বলিলেন "মায়া, আমার ওপর রাগ করে মেয়েটার এমনি করেই সর্ব্বনাশ করলি, তাকে হাত পা ধরে জলে ফেলে দিলি ?"

মায়া আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "কার কথা বলছো ?"

সরলা বলিলেন, "বীথির কথা বলছি। অনিল তার ওপর কি রকম অত্যাচার করছে—রমার কাছে শোন দেখি। তারপর ভেবে দেখ তুই যা করেছিস সেটা ভাল হয়েছে কি না ?

রমা আগাগোড়া সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া গেল, শুনিতে শুনিতে মায়ার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল, ললাটের শিরগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল।

চোখ মুছিতে মুছিতে সরলা গাঢস্বরে বলিলেন, "বীথি তোর নিজের মেয়ে মায়া—তাই বুঝি মা হয়ে তার এই সর্ব্বনাশটা করলি। সন্তানের বুকে চিরদিনের জন্যে মায়ের আসন পাতা; সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে সে তো কই,—আর কারও নাম নিতে পারে না, মা বলেই ডেকে থাকে। মার কথা মনে করতে সন্তানের চোখের ওপর ভেসে ওঠে স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি! তোর মেয়ের মুখে যে মা ডাকটী তুই ফুটাতে পারলি নে মায়া, তোর মেয়ের বুকে মায়ের সেই পবিত্র মহান ছবিটী তুই আঁকতে পারলি নে? এই অত্যাচারে আহত হয়ে সে কি ভাবছে না—তুই ই তার এই সর্ব্বনাশ করলি,—কেবল আমাকে জব্দ করবার জন্যেই অনিলের চরিত্রের বিশেষভাবে পরিচয় না নিয়ে তার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিলি? বীথিকে তুই চিনিস নি মায়া—নিজের মেয়েকে তুই চিনতে পারলিনে। সেও এমনি দুর্ভাগিনী যে, তোকে স্নেহময়ী মা বলে চিনতে পারলে না। তোকে সে দেবীরূপে না ভেবে স্নেহহীনা নির্ম্মমা রাক্ষসী বলে ভাবছে। এর বেশী মর্ম্মান্তিক কষ্ট তোর আর কিছুতেই নেই মায়া, তারও নেই।"

রুদ্ধকণ্ঠে মায়া বলিলেন, "হয়েছে মা, আগুনে আর ঘি ঢেলে দিয়ো না। সত্যিই আমি, তোমার অত্যধিক আদরে বীথি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে' তাকে এমনিভাবে তোমার কোল হতে ছিনিয়ে নিয়েছি। আমায় মাপ কর মা। তোমায় বরাবর বড় আঘাত দিয়ে এসেছি, সেই জন্যেই আমায় আজ এতটা কষ্ট পেতে হল। আমি আজই তোমার জামাইকে বম্বে পাঠাচ্ছি, তিনি বীথিকে নিয়ে আসবেন। এ কি কখনও কেউ সইতে পারে মা? সে যা সহ্য করতে পারেনি, তার মা হয়ে আমি তা সহ্য করব তাই কি ভাবছ? আমার মেয়ে যে সে রাত্রে এমনভাবে চলে এসেছে এর জন্যে আমি নিজেকে গর্ব্বিতা মনে করছি। আমার মেয়ের শিক্ষা তোমার কাছে, তাই মা সে এই শক্তিটুকু পেয়েছে। নইলে, আমার কাছে থাকলে কি ভাবে শিক্ষা নিত কি করে বলব?"

সেই দিনই তিনি আসিয়া জিতেন্দ্রনাথকে ধরিলেন। জিতেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন—"নাও নাও, কোথায় কি তার ঠিক নেই, একটা উড়ো কথা শুনে অমনি আমায় সেখানে পাঠাচ্ছো। সত্যি কখনও এ রকম ঘটতে পারে,—কেউ নিজের স্ত্রীকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে?"

মায়া জোর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, পারে। অনেক এ রকম পশু আছে যারা প্রতিপত্তি, অর্থ পাওয়ার প্রত্যাশায় আপনার জীবন দান করতে পারে, সতীর সতীত্ব এদের কাছে কিছুই নয়, খেলার জিনিস মাত্র। তুমি তোমার ধর্ম্মপত্নীর মান সব জায়গায় অটুট রেখে চলছো বলে অনিলও যে তোমার ধারায় চলবে এমন কোনও কথা নেই। এত বড় একটা কথাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে তুমি পার; কিন্তু আমি তো পারছিনে। আজ দু তিন বছর বিয়ে হয়েছে; এর মধ্যে বীথি আমাদের একখানি পত্র দেয়নি, এর মূলে রয়েছে তার মনের দারুণ বিতৃষ্ণা। সে ভাবছে, আমরাই তার সর্ব্বনাশ করেছি। আমি মা হয়ে তার অন্তর হতে বিতাড়িতা হয়েছি, সে আমায় ঘৃণা করছে, সে জানছে তার কেউ নেই।"

আবেগে মায়ার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, "অনিল যখনি পত্র দেয় তাতে লেখে, তারা ভাল আছে সুখে আছে। জানিনে তো—সে এ-রকম ধর্ম্মবিগর্হিত নির্য্যাতন করছে আর চিরশান্ত মেয়েটী আমার মুখ বুজে তাই সয়ে যাচ্ছে। মার কাছে কুশিক্ষা পায় বলে আমি কতদিন তাকে কত রকমে আঘাত দিয়েছি। সে একটী উত্তর দিত না, সজল চোখ দুটি শুধু মুখের উপর তুলে ধরত। তার নিজের নারীজন্মের ওপরেই ঘৃণা এসেছে, সে কাউকে তার মনের ব্যথা জানাবে না। ওগো, চিরদিন তোমার কাছে মাথা তুলেই দাঁড়িয়েছি, আজ মাথা নোয়াচ্ছি, তোমার কাছে হাত জোড় করে ভিক্ষা চাচ্ছি—তুমি যাও, বীথিকে এনে আমার কাছে দাও।"

অগত্যা জিতেন্দ্রনাথকে সেইদিনই রওনা হইতে হইল। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া বীথিকে দেখিতে পাইলেন না। শুনিলেন, বীথি 'মায়ের কাছে যাইতেছি' বলিয়া গিয়াছে। হাওড়ায় নামিয়া সে কোথায় গিয়াছে তাহা অনিল বলিতে পারে না। অনিল তখনও বীথির অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে সে সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

জিতেন্দ্রনাথ জামাতাকে গোটাকত কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া ফিরিলেন। বীথি কোথায় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া মায়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, সরলাকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সুবিনয়বাবু কন্যার মুখে শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সংবাদ দেওয়া হইল—বীথির সন্ধান যে দিতে পারিবে সে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবে।

এমনি সময়ে শঙ্কর ফিরিল। ব্যাকুল সুবিনয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীথির কোনও খবর পেয়েছ শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিল, "পেয়েছি।"

বীথির কথা সে আগাগোড়া বলিয়া গেল। অনিলের মৃত্যুর পর বীথির অবস্থা বর্ণনা করিতে তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সরলার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সুবিনয়বাবু আড়ষ্টভাবে বসিয়া উদাসভাবে একদিকে চাহিয়া রহিলেন।

চোখ মুছিতে মুছিতে সরলা বলিলেন, "সে আমার কাছে না এসে সেখানে কেন গেল শঙ্কর? তুমি তাকে আমার কাছে কেন জোর করে ধরে আনলে না? এখানে এলে তার সকল দুঃখ সকল ব্যথা আমি যে আমার বুকখানা দিয়ে মুছে নিতে পারতুম শঙ্কর।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি কি

...নবার চেষ্টা করি নি মা, দিদিমণি যে কিছুতেই এলেন না। তিনি আমার হাত দুখানা ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি ঐক কাজের জন্তে এখানে আসিনি শঙ্কর, কয়েকটা কাজ করব বলেই এসেছি। এখন আমি কারও নই,—বাপ মায়ের নই, দাদা দিদির নই, স্বামীর নই, এখন আমি আমার। আমার স্বামী আমার হাতে আমায় দিয়ে গেছেন। বাবা কাকা জেনে শুনে যে পাপ করেছেন, আমি তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বাপের ঋণ সন্তানে শোধ করে থাকে,—দেখি, আমি আমার বাপের ঋণ যদি শোধ করতে পারি।' আরও বললেন—"

শঙ্কর থামিয়া গেল, সে কথাটা সে হঠাৎ বলিতে পারিতেছিল না। উৎকণ্ঠিতা সরলা বলিলেন, "সে আর কি বললে আমায় বল শঙ্কর, তার সব কথা আমায় বল, আমায় কিছু গোপন করো না।"

শঙ্কর গলা ঝাড়িয়া বলিল, "না মা, গোপন করব কেন? দিদিমণি আপনাকে সব বলতেই বলেছেন। তিনি বললেন, 'দেখ শঙ্কর, চিরদিন বিলাসে কাটিয়েছি,আজীবন সুখভোগেই দিন গেছে—দুঃখ যে কি, তা কখনও জানতে পারি নি। চিরদিন যা করেছি, আজ তো তা করলে চলবে না শঙ্কর! এখন যে আমি বিধবা হয়েছি। আমায় এখন রীতিমত সংযত হতে হবে, সংযমী হতে হবে। অসংযমী, অসংযত হলে তো চলবে না। দিদিমার কাছে গেলে আমার কিছু হবে না। আমি প্রথম একাদশী করতে যাব, তাতে খুব কষ্ট হবে। সে কষ্ট দিদিমা সহ্য করতে পারবেন না, কেঁদে-কেটে আমার সঙ্কল্প হতে আমায় বিচ্যুতা করবেন। আমি তাই মাস পাঁচ ছয় এখানে থেকে সব অভ্যাস ঠিক করে নিয়ে তার পরে সেখানে যাব।"

সুবিনয়বাবু বেদনার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সেই ভাল শঙ্কর, সে ঠিক কথাই বলেছে। জ্ঞানহীনা নয় সে, ঠিক তার জ্ঞানের পরিচয়ই দিয়েছে। হিন্দু মেয়ের আদর্শ হতে চায় সে, তাই হোক, তার কর্ত্তব্য হতে তাকে বিচ্যুত করলে আমরাই দোষী হব।"

সরলা একটা নিঃশ্বাস সজোরে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "থাক—আমার তাতে আপত্তি করবার মত আর কিছু নেই। সে যা ভালবাসে, তাই করুক। আশীর্ব্বাদ করছি, তার ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা সফলতা লাভ করুক।"

স্বামীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এ খবর এখনই তুমি নিজে গিয়ে মায়াকে দিয়ে এসো, সে ভারি কান্নাকাটি করছে। হাজার হোক,—মায়ের প্রাণ তো।"

পিতার মুখে কন্যার সংবাদ পাইয়া মায়ার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি পিতার সহিত ভাল করিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। কন্যার বিকৃত মুখখানার পানে চাহিয়া সুবিনয়বাবু বিদায় লইলেন।

পরদিন সত্য ফিরিবে—জিতেন্দ্রনাথ মহাব্যস্ত। কালই সন্ধ্যায় তিনি একটা মিলন-ভোজের আয়োজন করিবেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কে কে কাল ইভনিং পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইবেন, সেই সব ভাবনায় তিনি মহাব্যস্ত। হঠাৎ মায়ার "ওগো শুনছো—" কথাটা তাঁহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি টেবলে দুই হাতের কনুই রাখিয়া করতলে মুখ ঢাকিয়া দারুণ চিন্তায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, মায়ার কথা শুনিয়া সচকিতে মুখ তুলিলেন। স্ত্রীর বিকৃত মুখখানার পানে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি বলছো?"

যথাসম্ভব মুখের ভাবটা পরিবর্ত্তনের বিফল প্রয়াস করিয়া মায়া সহজ সুরে বলিলেন, "বীথিকে পাওয়া গেছে।"

ধীরস্বরে মাথা দুলাইয়া জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, পাওয়া তো যাবেই; সে তো এতটুকু মেয়ে নয় বা অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে নয় যে হারিয়ে যাবে। কোথায় আছে সে?"

মায়া তেমনি সহজ সুরে বলিলেন, "তোমার বাপের কাছে।"

"আমার বাপের কাছে?" জিতেন্দ্রনাথ এত অধিক পরিমাণে চমকাইয়া উঠিলেন, যাহা মায়ার চোখেও লাগিল।

তীব্রস্বরে মায়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো, তোমারই বাপের কাছে। অনিল অনেক দেনা রেখে মারা গেছে; সব জিনিস-পত্র বিক্রি করে, সমস্ত দেনা শোধ দিয়ে বীথি—এখানে আসেনি—বরাবর তোমার বাপের কাছে চলে গেছে। শুনছি সে নাকি সেখানে পাঁচ ছয় মাস থাকবে, হিন্দু-বিধবা যে রকম ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সেই রকম-ভাবে সব শিখে অভ্যাস করে তারপরে এখানে আসবে।"

তাঁহার বাপের কাছে—কথাটা জিতেন্দ্রনাথের মনটাকে যে একটা প্রচণ্ড দোলা দিয়া গেল, তাহাতে বর্ত্তমান নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া অতীত অনেকগুলা চিত্রসহ উপরে ভাসিয়া উঠিল। এতকাল ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিতেছিল, পিছন

পানে ফিরিয়া তো তিনি চান নাই! বিলাস-বিভবের মধ্যে অবিশ্রান্ত মনকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাকে একটীবার ভাসিয়া উঠিতে তো দেন নাই। আজ মনে পড়িয়া গেল সেই পুরাতন স্মৃতি,—সেই ঘর, সেই উঠান, সেই পেয়ারা গাছ, গ্রামের পথ, পুষ্করিণী, নদী, প্রতিবাসীগণ, সকলের কথাই এক সঙ্গে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মা যখন মারা যান—সে আজ অনেক কালের কথা, আজ স্বপ্নের মতই সে কথা মনে পড়ে, তখন কোথায় ছিল এ দিন—এই প্রাসাদ, দাস দাসী, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা? পিতা তাঁহাদের তিনটী ভাই-বোনকে কি ভাবে বুকের মধ্যে টানিয়া লন, কি করিয়া কতকষ্টে তাঁহাদের তিনটিকে লালন-পালন করেন। ছেলে দুটিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে তাঁহার কি সে ব্যগ্র বাসনা! তাঁহার সে বাসনা সার্থক হইয়াছে বড় বেদনার মাঝখান দিয়া। ছোটবোনটা তখন এতটুকু ছিল, তাহাকে রাখিতে হইত জিতেন্দ্রনাথকে; কেন না, সত্য তখন শিশুমাত্র, ভবানীকে সে মোটে কোলে লইতে পারিত না। আধ আধ স্বরে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া বোনটী তখন কচি হাত দুখানা তুলিয়া দাদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তখন যে দাদার বুকখানায় আনন্দের তুফান উঠিত, এই কি সেই দাদা, এই কি সেই জিতেন্দ্রনাথ? আজ সে কত বড়টী হইয়াছে! তখন যে দাদার নাম মুখে আনিতে তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত, আজ সেই দাদার নাম মুখে আনিতে ঘৃণাতেই কি তাহার সেই হৃদয়খানা ভরিয়া উঠে না?

পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়খানা আলোড়ন করিয়া যাইতেছিল,—জিতেন্দ্রনাথ অন্যমনাভাবে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার নীরবতা দেখিয়া মায়ার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, তীব্রকণ্ঠেই তিনি বলিলেন, "চুপ করে ভাবছ কি বল দেখি?—শুনে বোধ হয় ভারি খুসি হয়েছ,—না?"

তাঁহার অজ্ঞাতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না—খুসিও হইনি, দুঃখিতও নেহাৎ হইনি। সে স্বেচ্ছায় বাবার ওখানে গেছে, এতে কথা বলবার মত তো কিছুই নেই মায়া।"

"না—কথা বলবার মত কিছুই নেই—"স্বামীকে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে মায়ার কান্না আসিতে লাগিল। বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কথা বলবা মত কিছু নেই, তাই তুমি দেখছ; কিন্তু আমি ত দেখছিনে। একে সে স্বভাবতঃই সেই একধরণের মেয়ে যেটা করতে বারণ করব ঠিক সেই কাজটা করবে। তোমা বাবা হচ্ছেন গোঁড়া বৈষ্ণব,—নাকে মুখে সর্ব্বাঙ্গে তিলক গলায় তুলসীর মালা,—দেখলে হাসি পায়। ঠিক দেখে তুমি—বীথিও খেয়ালে পড়ে গলায় মালা পরে সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ দিয়ে একদিন এসে দাঁড়াবে। সেটা বড় ভাল লাগবে দেখতে,—কেমন?"

নিরুপায়ভাবে জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল যে লাগবে না সে ত জানা সত্য কথা; কিন্তু আমি তার এখন কি করব, কি করতে বল আমায়?"

মায়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি সেখানে যাও, গিয়ে তাকে যেমন করে হোক বুঝিয়ে—ভয় দেখিয়ে নিয়ে এসো। সেখানে থাকলে সে যা হবে, তা তাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলো। বলো—যদিও তার মনের জোর থাকে সে এসব কিছু করবে না—কিন্তু সে জোর থাকবে না; কেন না পারিপার্শ্বিকের আকর্ষণ আছে। সৎসঙ্গে কাশীবাস হয়, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ হয়—এ কথাটা যে আমাদের দেশে চলে আসছে, সেটা খুব সত্যি কথা। অসৎসঙ্গে থাকলে মন উন্নত হলেও অবনত হতে হবেই; কেন না একটা শক্তি বহু-শক্তির সঙ্গে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে না। তুমি আজই যাও। এই তো কয়েকঘণ্টার রাস্তা,—স্বচ্ছন্দে গিয়ে তাকে আনতে পারবে।"

মাথা দুলাইয়া জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ কোন ক্রমেই হতে পারে না মায়া। কাল সত্য আসবে, সন্ধ্যায় কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করব ভাবছি, আজ গেলে কি চলে? ভেবেছিলুম, সত্য শ্বশুরবাড়ীতে উঠবে; কিন্তু সে টেলিগ্রাম করেছে—আগে এখানে আসবে। আমায় তাকে আনতে যেতে হবে; নইলে সে ভারি কষ্ট পাবে। আসছে সপ্তাহে চেষ্টা দেখা যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বীথি খারাপ হয়ে যাবে না, সে ভয় নেই।"

অগত্যা মায়াকে তাহাতেই রাজি হইতে হইল। [ক্রমশঃ]

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

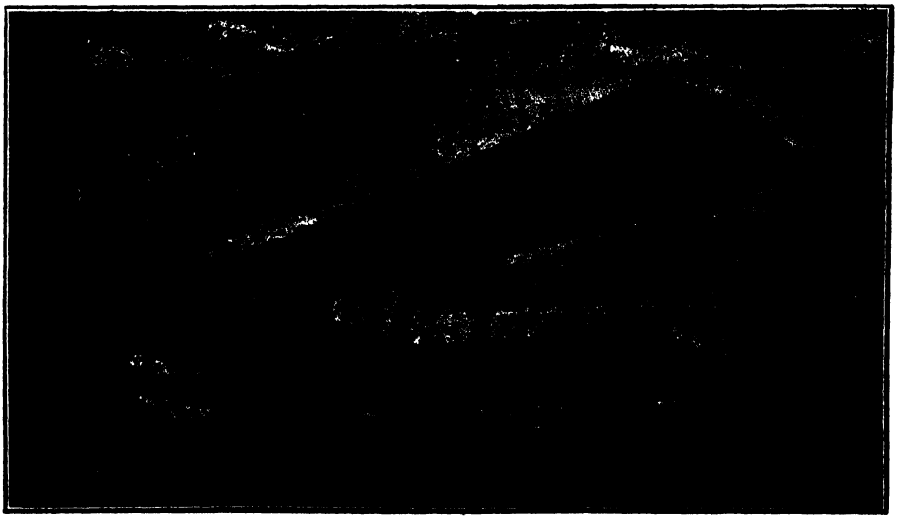
হঠাৎ মনে হ'ল ওড়া মন্দ নয়। অন্ততঃ একটা অভিজ্ঞতা ত বটে!

শুভার্থী একজন বন্ধু বারণ করলেন। কারণ বিমান-যানে না কি উদরস্থ বস্তুগণের উদরস্থ থাক্‌বার বিশেষ অনিচ্ছা দেখা যায়। অপর একজন বল্‌লেন: "পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা কিছু নয়।" মনে একটা বীরত্বের ভাবও এলও বটে। কী! ম্লেচ্ছ লীণ্ডবার্গ আমেরিকা থেকে পারিস একদমে উড়ে এসে জগতের বরেণ্য হ'য়ে পড়ল মাত্র তেত্রিশ ঘণ্টায়, আর আমি কি না সনাতন হিন্দুবংশধর হ'য়ে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে আকাশচারী হ'তে পারব না! সভায় সমিতিতে লীণ্ডবার্গের স্তুতিবাদ, বায়স্কোপে তাঁর আনন দেখা দিলেই দর্শকবৃন্দের জয়ধ্বনি, সব সংবাদপত্রেই কেবল একমাত্র জ্ঞাতব্য তথ্য:—তিনি কার পানে চেয়ে হেসে-ছিলেন, কার দিকে চোখ চেয়েছিলেন, ও কাকে য়ুরোপের কুয়াশা সম্বন্ধে কি বলেছিলেন। এ-সবে কোন্ রক্তমাংসের শরীর স্থির থাক্‌তে পারে! (য়ুরোপে এলে মানুষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তার সনাতন বৈরাগ্য পরিহার ক'রে যে হঠাৎ বীর হ'য়ে পড়তে চায়, এটা বোধ হয় তার হাওয়ার গুণ!)

পূর্ব্বোক্ত শুভার্থী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন তাঁর এক বান্ধবী না কি পারিস থেকে লণ্ডন বিমানারূঢ় হ'য়ে পরে ব'লেছিলেন যে তিনি ফ্রান্সের রাজত্ব পেলেও আর বিমান-যানে অধিরূঢ়া হবেন না।

মনটা তাই বীরত্বের জল্পনা সত্ত্বেও দুরু দুরু করছিল—বিশেষ যখন দেখা গেল যে আকাশে মেঘ গুরু গুরু করতে সুরু ক'রে দিল।

মনে হ'ল ফিরি। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও আমার এক ফরাসী-বান্ধবী See off করতে এসেছিলেন যে! উপায় কি? বিশেষতঃ য়ুরোপীয় ললনার সাম্‌নে?—কখনই না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—বীজমন্ত্রটা জপ করতে করতে কোমর বেঁধে উড্ডীয়মান হব সঙ্কল্প ক'রে বসলাম।



বিমান-যান (লেখক এই যানেই বিমান-যাত্রা করেছিলেন)

এখন মনে হয় গীতার কথা—"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।" (অর্থাৎ জ্ঞানবান জানবান হয় শুধু সেইটাই তার প্রকৃতি ব'লে; অর্থাৎ কি না চেষ্টায় কিছুই হয় না) আর মনে মনে হাসি পায় হিন্দুসন্তানের এ ঘোড়া-রোগ কেন? যাদের প্রকৃতি পুঁটিমাছ ও শাকচচ্চড়ির উপাদানে গঠিত তাহা শূকর-গো-মৃগ মাংস-পুষ্ট বিরোচন-সন্তানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়ার এ বিড়ম্বনা কেন?

উত্তরে মন শুধু হেসে বলে, যে মানুষ মাঝে মাঝে নিজের প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে না ছুটলে তাকে বেশি ক'রে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই কথায় বলে ঠেকে-শেখাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় শেখা। অন্ততঃ ঠেকে না শিখ্‌লে আমি যে বুঝতে পারতাম না যে আমি লীণ্ডবার্গের ছোট সংস্করণ নই এটা ধ্রুব! ··তাই ত এই বিড়ম্বনা।

হঠাৎ হাওয়া একটু বেশি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে আরম্ভ করল ও আকাশ কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—সেই "বায়ু বহত পূর'বৈয়াঁর" মাতাল-পদক্ষেপে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে বীরত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ শিখাটিও যেন টলমল ক'রে উঠ্‌ল।

তবু বিমানযানটি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম না কেন এই প্রশ্নই আজ মনোমাঝে জাগে।

বোধ হয় বন্ধুবান্ধবীদের see off করতে আসার দরুণ। এমার্সন ব'লেছেন, সব দুর্ভাগ্যেরই একটা শুভদিক অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ থাকে। আমি ভাবলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলতেও পারতেন যে বন্ধুবান্ধবদের উচ্চধারণা পাওয়া-রূপ সৌভাগ্যেরও উল্টোদিকে একটা অশুভ দিক্ থাকে। কারণ তা না থাক্‌লে আমার সেদিন পশ্চাৎপদ হওয়া ঠেকায় কে?

যাক্ "দুর্গা ব'লে" অসহায়ভাবে ত বিমানের মধ্যে প্রবেশ করা গেল।

কিন্তু হায়, প্রবেশ ক'রেই চক্ষু স্থির। মনে হ'ল ছেলেবেলায়-পড়া সেই আরব্যোপন্যাসের আকাশকুসুম-বিলাসীর কথা, যে কয়েকটি মাত্র বাসন বেচে রাজেন্দ্র হবার আশাটিতে লুব্ধ হ'য়ে বাস্তবকে—অর্থাৎ বাসনগুলিকেই পদাঘাতে ভেঙে ফেলেছিল। আমিও ব্যোমচারী হবার স্বপ্নে মর্ত্ত্যচারণরূপ একমাত্র সম্বলটিকে হারিয়ে ব'সেছিলাম। মনে হ'য়েছিল যে, কোথায় জলদবিহারী মন্দারসৌরভবিলাসী ধরণীর-প্রতি-অনুকম্পা-পরায়ণ পুষ্পকরথের পরিকল্পনা, আর কোথায় সঙ্কীর্ণপরিসর, স্যাঁৎসেতে, মস্তক-ঠোকা-সহায়ক জঘন্য অন্ধকূপ!

মনে পড়ল প্রভাতকুমারের একটা গল্প। কাব্যরাণী, অমৃতনিঃস্যন্দিনী-লেখনী-ঈশ্বরী শ্রীমতী বীণাপাণির লেখা প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কোনও ভক্ত লেখিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেছিলেন স্থূলকায়া, লোলচর্ম্মা, পলিতকেশা, স্খলিতদন্তা শ্রীমতী জগদম্বাকে। বাস্তব ও স্বপ্নের সেই চিরন্তন বিরোধ! ··

হায়, তখনও যদি দুত্তোর ব'লে অবতরণ করতাম!··· কিন্তু কে জান্‌ত তখন সবে কলির সন্ধ্যা! ··

আমার সঙ্গে মাত্র দুজন আমেরিকান ছিলেন। তাঁরা অতি "উত্তম নাবিক" শুন্‌লাম। তাই একটু ভরসা পাওয়া গেল। ভাবলাম, তাঁদের আনন্দ সংক্রামক হবেই হবে। কিন্তু হায়! বাস্তবে স্বাস্থ্য বড় একটা সংক্রামক হয় না—রোগই হয়; স্থৈর্য্য সংক্রামক হয় না—অস্থিরতাই হয়।

যাহোক্ চেয়ারে সঙ্কুচিত ভাবে কোনোমতে ত বস্‌লাম ও মনে মনে auto-suggestion চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম যে "বড় সুরম্য স্থান এ, বড় সুরম্য স্থান এ, বড় সুরম্য স্থান এ!" এহেন সময়ে পাশে দেখা গেল "for-air-sickness" লেখা কাগজের ঠোঙ্গা ভারে ভারে মনোলোভা ভাবে সাজানো। মুহূর্ত্তে auto-suggestionএ সুরম্যের স্থলে ক্রমাগতই "জঘন্য" কথাটি উঁকি মারতে লাগল, কোনোমতেই মাত্রা মান্‌ল না। আর মন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—শেষে কি ঐ ঠোঙ্গাই সকালবেলাকার মনোরম প্রাতরাশের গন্তব্যস্থান হবে? মনে হ'ল "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে।" আমার কেন বিমানচারণের এ বিড়ম্বনা! মনে মনে দার্শনিক হবার চেষ্টা করলাম "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" প্যারিসে ও নীসে যথেষ্ট আনন্দে ও সমাদরে বক্তৃতা গানাদি বিলাসে কাটানো গেছে। এখন দুঃখকে বরণ করাই পন্থা। বিশেষতঃ যখন লণ্ডনে ইংরাজ বান্ধবীর আতিথ্যে কয়েকদিন পরম সমারোহে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তিনি যে অতি চমৎকার hostess ও অতি সুরসিকা ও সুপাচিকা, এ চিন্তা তখন—কেন জানি না—মনকে বেশ একটু আশ্বস্ত ক'রেছিল মনে আছে!···মানুষের সান্ত্বনা পাবার পদ্ধতি বিচিত্র!

কিন্তু হায়, যদি তখনো জান্‌তাম কী সে দুঃখ! মনে হ'ল পিতৃদেবের দুর্গাদাসে দিলীর খাঁর কথা "দুর্গাদাস, জান্‌তাম তুমি মহৎ, কিন্তু এত মহৎ তা জান্‌তাম না।" পরে ক্লিষ্ট মন বিমর্ষভাবে আক্ষেপ ক'রেছিল: "বায়ুপীড়া! জান্‌তাম তুমি দুঃসহ, কিন্তু এত দুঃসহ তা জান্‌তাম না।"

বাস্তবিক সামুদ্রিক পীড়াও তখন কাম্য বোধ হ'য়েছিল। অর্ণবপোতে অন্ততঃ নড়াচড়া যায়। বিমানযানে যে পাশ ফেরাও চলে না!

যাই হোক্, বায়ুযান ত উঠ্‌ল। উঃ কী সে শব্দ! সঙ্গে কিছু ছিন্ন বস্ত্রের পুঁজি ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল যে বাল্যকালে বহুদিন আগে যখন "ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি রে মোর" ব'লে একটি গান শুন্‌তাম, তখন বড় আশ্চর্য্য মনে হ'ত যে এ হেন বস্তুর জন্যেও মানুষ এতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে কি ক'রে? কিন্তু সেদিন প্রাণপণে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি হ'তে ন্যাকড়ার ছিপি কানে গুঁজে মনে হ'ল গানটার মানে এতদিনে বোঝা গেল বটে! কেন না যদি সে পুঁটুলিটি না থাক্‌ত, তাহ'লে সার্দ্ধ চার ঘণ্টাব্যাপী শব্দ-ভূমিকম্পের অন্তর্দ্দাহে যে আমার কর্ণযুগলের অবস্থা কি হ'ত তা ভাব্‌তেও হৃৎস্তম্ভন হয়!...

"বায়ু বহত পুরবৈয়া বটে। কিন্তু মনে হ'ল সেদিন এতটা না বইলেও চল্‌ত। কেন না এজন্য দুঘণ্টার স্থলে আমার লণ্ডনে পৌছতে প্রায় পাঁচঘণ্টা লেগে গেল! যাহোক্ আমার বিড়ম্বনার কাহিনীটা একটু বলি।

মাত্র প্রথম ১৫মিনিট আমার চেতনা স্বস্থানে ছিল। সেই সময়টুকুই যা একটু বসুন্ধরার শোভা একটু উপভোগ ক'রেছিলাম।

এখন মনে হয় হংসের মতন জল থেকে দুধটুকু মাত্র আহরণ করাই যখন সাধুসম্মত, তখন এই পনর মিনিটের স্মৃতিটিকেই উজ্জ্বল ক'রে ধরা যাক্। বাকি সময়টাকে বৈদান্তিক হ'য়ে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেওয়া প্রশস্ত।

তবু মনে হয় যে "বায়ুপীড়া" না হ'লে দৃশ্য মন্দ লাগত না বা সংসারকে মায়াপ্রপঞ্চময় বলে মনে হ'ত না।

কেন না অনুভূতিটা বড় বিচিত্র সন্দেহ নেই। পদতলে ফরাসীদেশের শ্যামল তৃণ-তরু, সবুজ উপত্যকা, সরু রূপালি সূতার মতন নদনদী-প্রবাহ, পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ মনুষ্য-আকৃতি, লালরঙের হর্ম্ম্যরাজি ও শেষে অশান্ত সাগরের বীচিমালা—এ একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য বটে!

বিশেষতঃ স্থল হতে মেঘ-দেখার অভিজ্ঞতার এটা হচ্ছে ঠিক উল্‌টো অভিজ্ঞতা। অতএব এর মধ্যে একটা বৈচিত্র্য ছিলই।

কিন্তু বৃথা। পনর মিনিট বাদেই বোঝা গেল বিধাতা কেন মানুষকে খেচর ক'রে গড়েন নি। মাটির দৃশ্য তখন মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন স্বর্গের দৃশ্য ও মেঘের লঘু আবাহনও তখন যেন মনে হ'তে লাগ্‌ল ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন। মুহূর্ত্তে মেঘের মতন লঘু সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ঝালরও যে এমন অকবিত্বভরা বস্তুতার বিষে পরিণত হ'তে পারে, তা কালিদাস কখনো কল্পনা ক'রেছিলেন কি না জানি না। কেন না, করলে, তিনি আর যাই লিখুন না কেন, মেঘদূত যে লিখতেন না এটা ধ্রুব। মনে পড়্‌ল একটা ইংরাজী কথা Distance lends enchantment to the view. ভাগ্যে কালিদাস মেঘের অধর-সুধা কখনও পান করবার অবকাশ পান নি! কেন না মেঘের উপর কবিতা লেখাই ভাল। মেঘের মধ্যে একবার বিচরণ করলে—বিশেষতঃ বিমানযানে—মেঘের সম্বন্ধে রঙীন কল্পনার খুব যে উন্নতি হয় তা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বিমানযানে চড়ার পর মেঘের নিকট-আলিঙ্গন সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন কি না জান্‌তে ইচ্ছে হয়।

অবিলম্বে মনে মনে আবার auto-suggestion আরম্ভ করলাম যে "আমি বড়ই আনন্দ পাচ্ছি, বড়ই আনন্দ পাচ্ছি, বড়ই আনন্দ পাচ্ছি।" কিন্তু হায় বৃথা। মনের অগোচর পাপও নেই, স্নায়ুবিকারের মধ্যে জপের বীজমন্ত্রও নেই। আমরা তিনজনেই ঠোঙা হাতে ক'রে কার্য্যে রত হ'য়ে গেলাম। সে বর্ণনা না ক'রে এখানেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম, কেন না, অলঙ্কার শাস্ত্রমতে সে চিত্র ললিত সাহিত্যের বিষয়ীভূত হ'তে পারে না। (যদিও আজকালকার রিয়ালিষ্ট্‌দের মত অন্যরূপ)।

কেবল এইটুকু না ব'লে থাক্‌তে পারছি না যে আমার উত্তম নাবিক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ঠোঙা হঠাৎ উল্‌টে গিয়ে পদতলে যে তরল স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি কর্‌ল তার মধ্যে আমাদের তিনজনকেই সেই সার্দ্ধ চার ঘণ্টাকাল নিতান্ত দার্শনিকের মতনই ব'সে থাক্‌তে হ'য়েছিল। শুনেছি শুচি অশুচি দুয়েই সমজ্ঞান অর্জ্জন করা ব্রহ্মজ্ঞান্ লাভের প্রধান

সোপান। তাহ'লে বলতে পারি অন্ততঃ একটা কথা যে সে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে আমরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি পেয়েছিলাম। এ কথায় যদি সংশয়ীর বিশ্বাস না হয় তাহ'লে তিনি মাত্র একবার যেন চার ঘণ্টাকাল ধ'রে বিমান-পথে বিচরণ করেন।

সে যা হোক্, ব্রহ্মজ্ঞান হোক্ বা না হোক্, সেদিন পাকস্থলীর নিরন্তর উর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপের চেষ্টার ফলে একদিকে যেমন দেহের উত্তমাঙ্গ গরম হ'য়ে উঠল, অপরদিকে তেমনি অধমাঙ্গ মেঘের বরফশীতলতায় জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। ভাবলাম ক্রয়ডনে নেমেই দেখা যাবে যে নিউমোনিয়া আমাদের তিনজনকেই আশ্রয় ক'রেছে।

হু—হু—হু—হু—মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, বিমানযানটি ধরণীর আলিঙ্গনের জন্যে উন্মত্ত প্রেমিকের মতনই ছুটেছে। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি—হু—হু—হু—হু—বেপরোয়া উর্দ্ধগতি। মনে হ'ল তার আকাঙ্ক্ষিত মত-পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ—ত্রিদিবের গোলাপবাগানের মধ্যে অপ্সরাদের নৃত্য আসরের নোটিস হঠাৎ জলধর-পটলের মধ্যে দিয়ে মন্দার সৌরভের বার্ত্তাবহ নিজে বহন ক'রে এনেছে। কেবল দুঃখ হ'তে লাগল যে এ রেটে আর খানিকক্ষণ তার উর্দ্ধগতি বজায় থাক্‌লে ইন্দ্রসভায় হয় ত পৌঁছন যেতে পারে, কিন্তু সশরীরে যে নয় এটা নিশ্চিত।

তবে সান্ত্বনা ছিল এই যে শরীরের তখনকার শৈত্য-উষ্ণতা ও ক্লেদবসাসিক্ত অবস্থা এমন কিছু লোভনীয় ছিলনা যাতে মনে করা যেতে পারে যে পথে এ দেহটা বদলে দেবপুরীতে পৌঁছনর প্রস্তাবে মুমূর্ষু জীবাত্মা আপত্তি করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠতেন।

খানিকক্ষণ বাদে কোনোমতে আরাম-কেদারাটিতে এলায়িত হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা গেল নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে। হঠাৎ মনে হ'ল তাহ'লে বিমান-যানে এসে লাভ কি? তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে আবার নীচের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। তখন সমুদ্র তার নীলশোভার আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে—পায়ের তলায়। সে অপূর্ব্ব শোভা!

মনে হ'ল পদতলে ঐ দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুর উপরে ভাসমান হওয়াও বোধ হয় ছিল ভাল। (এটা সত্যই অতিরঞ্জন নয়। সহৃদয় পাঠকপাঠিকা যদি বিশ্বাস না করতে চান তবে যেন একবারমাত্র পুষ্পকরথচারী হন।)

বাকী সময়টা কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে কোনওমতে এলায়িত হয়ে প'ড়ছিলাম মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শুভার্থী বন্ধুর কথা মনে হচ্ছিল যখন আমার একটি আমেরিকান সহচর বললেন যে কেউ হাজার ডলারের লোভ দেখালেও তিনি জীবনে আর কখনো খেচর হ'তে রাজি হবেন না।

যখন ক্রয়ডনে পৌঁছে ইংরাজ বান্ধবীর অভিনন্দন লাভ করলাম, তখন বীরত্বের হাসি হেসে বললাম: "What a glorious experience—you know its like this, from this time forth I would never cross the channel in a boat when the aeroplane is there."

তিনি কিন্তু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন: "কিন্তু তোমার চক্ষু কোটরগত, দেহ সিক্ত (ঠোঙার ভিতরকার জলীয় পদার্থে এটা তিনি জানতেন না অবশ্য) কেশদাম অসম্বদ্ধ, স্বর ভগ্ন—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম: "ও কিছু নয়, আমার চোখ, দেহ, কেশ, স্বর জন্মাবধি এই রকমই।" ব'লে মেঘনাদ-লজ্জাদায়িনী হাসি হাসলাম।

ভুপাল-চিত্র

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

১

ভুপাল রেল ষ্টেসন; ভোর পাঁচটা বাজে। সবে-মাত্র পূর্ব্বাকাশে ক্ষীণালোকের সঞ্চার হইয়াছে। চতুর্দ্দিক বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, স্থানে স্থানে এখনো জমাট অন্ধকার।

বৈশাখ মাস, তথাপি বিলক্ষণ ঠাণ্ডা। দ্বিপ্রহরে প্রায়শঃ লু ছুটিলেও মধ্যভারতের প্রভাত বড়ই মনোরম।

জি, আই, পি, রেলওয়ের পঞ্জাবগামী মেলট্রেণ প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিতে না থামিতে প্রথম শ্রেণীর আরোহী, খাকিসার্ট ও ওপ্‌ন্‌-ফ্রাণ্ট-স্মার্ট-কলার যুক্ত সাদা টুইল-সার্টের উপর গল্‌ফ কোট পরিহিত বেত্র পাণি এলাহাবাদের তরুণ ব্যারিষ্টার প্রশান্ত চৌধুরী টপ্‌ করিয়া নামিয়া সঙ্গী অতুলকে বলিল, "কুলি ডেকে লাগেজ চট্‌পট্‌ নামিয়ে ফেল, ট্রেণ দশ মিনিটের বেশী থামবে না। আমি দেখি, গোটা দুই ভাল দেখে রবার টায়ার টাঙ্গা ঠিক করে দখল নিয়ে ফেলি, এর পর হয় ত মেলা ভার হবে। আমার এটাচি-কেশ আর হ্যাণ্ডব্যাগ সাবধান—"প্রশান্ত বায়ুবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অতুলের চোখ-মুখের সন্ত্রস্ত ও ইতস্ততঃ ভাব দেখিলে বেশ বোঝা যায়, তাহার এ-প্রকার ভ্রমণে অভ্যাস নাই। বিশেষ প্রশান্তের ব্যস্তবাগীশ ভাব তাহাকে আরও যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আস্তে-ব্যস্তে কুলি ডাকিয়া সে মালপত্র নামাইতে লাগিল। সমস্ত নামান হইলে একবার গুণিয়া গাঁথিয়া দেখিয়া স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এধার-ওধার দেখিতে লাগিল,—তখনো প্রশান্তের দেখা নাই।

কুলিদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল, "কাঁহা জানে হোগা হুজুর?"

অতুল বলিল, "হোটেলমে—"

কুলি দুইজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৌন্‌ হোটেল?"

প্রশান্তের বিলম্বে অতুল বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই বিলক্ষণ গরম হইয়া বলিল, "তোম্‌ হামারা বাৎ সমজাতে পারতা নেই হ্যায়? হামলোক ভুপাল হোটেলমে জানে মাংতা হ্যায়। ও কাঁহা হ্যায়, তুম্‌ নেই জানতা হ্যায়?"

হোল্‌ড্‌-অল, সুট -কেশ, টিফিন-বাস্কেট, সোডা-ওয়াটার-কেশ, হ্যাট-বক্স, ফ্লাস্ক, প্রভৃতি রাশিকৃত আসবাবের সহিত একটী এক্‌স্‌প্রেস রাইফল্‌, দুইটী স্মুথ-বোর বন্দুক প্রভৃতি শিকারের এবং ক্যামেরা ও ফোটো তোলার নানা সরঞ্জাম দেখিয়া চারি দিকে ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। রেলওয়ে রেস্তোরাঁর খানসামা আসিয়া চা' আবশ্যক কি না খোঁজ লইতেছিল। অতুলের কথায় তাহারা হাসিয়া ফেলিল। খানসামা মৃদুস্বরে পার্শ্ববর্ত্তী কুলিকে বলিল,—"বাঙ্গালীয়ে াকে সাত্‌-ভেজ্‌ড়ি জবান।"

সহসা বেত্র-সঞ্চালন করিতে করিতে প্রশান্ত আসিয়া উপস্থিত,—সঙ্গে টাঙ্গাওয়ালার তাঁবেদার ছোকরা।

"সব ঠিক ঠিক নেমেছে তো? এ কুলিয়ো, চারো আদমি সামান উঠাও, ইস্‌ লেড়কে-কে সাথ যাও। তাঙ্গেপর চড়ানা।"

প্রশান্তের ভাবগতিক দেখিয়া ও 'দুরস্ত্‌ উর্দ্দু জবান' শুনিয়া কুলিরা বিনা বাক্যব্যয়ে চট্‌পট মালপত্র তুলিয়া লইল। ট্রেণও দেখিতে দেখিতে ছাড়িয়া দিল।

ষ্টেসন-কম্পাউণ্ডে বিদ্যুতালোক নিষ্প্রভ করিয়া তখন বেশ আলো হইয়াছে। একখানি টাঙ্গায় মালপত্র তুলিয়া দিয়া ও অপরখানিতে উভয়ে উঠিয়া প্রশান্ত হুকুম করিল, "চলো, গেষ্ট হাউস্‌—।"

কুলিরা আশাতিরিক্ত বখসিস্‌ পাইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। টাঙ্গাওয়ালা বলিল, "গেষ্ট হাউস্‌মে

দশ রূপায়া রোজ হ্যায়, সাব,, আগর আপ্ ডাঁকবাংলেমে ঠ্যায়রেঙ্গে তো ফি-কস্ চার রূপীয়া হোঙ্গে।"

প্রশান্ত ঝাঁঝিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে সে মাথা-ব্যথায় তাহার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে যেখানে যাইতে বলা হইয়াছে, সেইখানেই যাইতে হইবে।

"বহুত খুব হাজুর" বলিয়া টাঙ্গাওয়ালা গাড়ী চালাইয়া দিল।

অতুলের মুখে বিরক্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তুই যে বড় চুপচাপ? কি হয়েছে রে?"

কুলিদের বিদ্রূপের কথা বিবৃত করিয়া অতুল বলিল, "তোমাকে আমি বলেছিলুম, শান্ত-দা' একটা লোক সঙ্গে নাও। এদিকে রাশিকৃত লাগেজ নিয়ে ফার্ষ্ট-ক্লাশে নবাবি করে ঘোরা হচ্ছে, অথচ সঙ্গে একটা আর্দ্দালী নেই,—Ridiculous! রাত দুপুরে ইটারসিতে ট্রেণ বদ্‌লে ভোর না হতে নামা,—একটা লোক নেই যে লাগেজ সামলায়। এ কি বরদাস্ত হয়?"—

প্রশান্ত একচোট হাসিয়া লইয়া বলিল, "তোকে তো বলেইছি, নতুন লোক নিয়ে প্রতি পদে অস্থির হওয়ার চেয়ে লোক না থাকা ভাল। নতুন লোক কেয়ার যা নেবে তা আমিই জানি, উল্টে তাকে সামলে বেড়াতেই আমার জান যাবে। তারাদৎ ঠিক বেরুবার মুখে জ্বরে পড়েই তো সব মাটি করলে। যাই হোক, সে সেরে উঠলেই তো এসে হাজির হবে। এই কটা দিনের জন্যে যদি নিজেরা সামলাতে না পারি তো রুস্টাতে বেরনই অন্যায়।"

উভয় বন্ধুকে লইয়া টাঙ্গা মৃদুমন্দ-গতিতে চলিল। ভূপালের রক্তবর্ণ মৃত্তিকার রাস্তা, পরিষ্কার তক্‌তকে, কোথাও ধূলা বা ময়লা নাই, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। দেখিয়া অতুল বলিল, "তোমার এলাহাবাদের চেয়ে ঢের ভাল, বাপু। সিভিল লাইন্‌সের ধূলোর কথা মনে হলে আর জ্ঞান থাকে না।"

প্রশান্ত বলিল, "সহরের ভেতর কখনই এতটা পরিষ্কার হবে না; এটা Cantonment কি না, তাই এত ঝর্‌ঝরে।"

দূরে একটী মিনারেট দেখিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করায় টাঙ্গাওয়ালা উত্তর দিল, "উয়ো শুহর্ কি অন্দর হ্যায়, জুম্মা মস্‌জিদ্‌কি মিনার।"

পাহাড়ে জায়গা, চারিদিক অল্পাধিক উচু-নীচু। টাঙ্গা আস্তে আস্তে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া মোড় ফিরিতেই সম্মুখে ভূপালের বিখ্যাত হ্রদের অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়া গেল। বাঁধে জল আট্‌কাইয়া রাস্তার নীচে দিয়া জলের over-flow (অতিরিক্ত জল) কৃত্রিম জলপ্রপাতের ন্যায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর পার্শ্বে গিয়া জল সশব্দে গভীর খাতে পড়িতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য রেলিং; হ্রদের অগাধ জলরাশির পরপারে গাছপালায় ঘেরা পাহাড়; পাহাড়ের উপর সাদা সাদা বাড়ী,—সব শুদ্ধ যেন ছবিখানি।

ছোট কোতোয়ালীর সামনে আবার মোড় ঘুরিয়া প্যারেড-গ্রাউণ্ড ও ঘোড়-দৌড়ের মাঠের পার্শ্বে সুবিন্যস্ত বাগানের মধ্যে ধপ্‌ধপে চুণকাম-করা অধুনা "ভূপাল হোটেলে"-রূপান্তরিত State Guest houseএ আসিয়া টাঙ্গা থামিল। তখন পার্শ্ববর্ত্তী সেনানিবাসের বিউগ্‌লে ছয়টা বাজিবার সঙ্কেত ধ্বনিত হইতেছিল। সম্মুখেই পাহাড়, পাহাড়ের উপর কারাগার।

তাড়াতাড়ি ঢিলা পায়জামার উপর ফ্রক কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে লাল ফেজ মাথায় একটি মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া বন্ধু যুগলকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক অশুদ্ধ ইংরাজীতে আপনাকে Resident Manager মিষ্টার আব্দুল মজিদ বলিয়া পরিচয় দিল।

মৃদু হাসিয়া প্রশান্ত বলিল যে, বৈদ্যুতিক পাখাযুক্ত দুইখানি পাশাপাশি ঘর তাহাদের আবশ্যক। ইহার জন্য দৈনিক চার্জ্জ কত।

ম্যানেজার ছাপান তালিকায় মাথা পিছু দৈনিক ১০৲ দেখাইলে, প্রশান্ত বলিল, "But you should make some reduction in your charges. This is your off-season, and I presume not a soul is staying here now." (কিন্তু আপনার দাবী কিছু কমানো উচিত; এখন অসময়—আমার বোধ হয় এখন এখানে কেউই নেই।)

ম্যানেজার ইংরাজী-উর্দ্দুর খিচুড়িতে বুঝাইল যে, উভয়ে যদি একই "কামরায়" থাকে তো চার্জ্জ ১৭৲ হইবে, নচেৎ নিয়ম—প্রতি "Single-seated কামরায়" ১০৲ করিয়া। প্রশান্ত নাছোড়বান্দা। অনেক কসা-মাজার পর অবশেষে মাথা-পিছু ৯৲ রফা করিয়া দুইটী পছন্দমত ঘর দখল

হইল। সহর ঘুরিবার জন্য বিকালে বেলা চারিটায় আসিবার আজ্ঞা পাইয়া টাঙ্গাওয়ালারা চলিয়া গেল।

ম্যানেজার খানসামাকে চা বিস্কুট ও স্যাণ্ডউইচ্ আনিবার হুকুম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "Sir, you like food European or Moglai?" (আপনারা সাহেবী খানা, না, মোগলাই খানা পছন্দ করেন?)

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, "Let us try your moglai dishes for a few days, please." (দিনকতক আপনার মোগলাই খানাই চাকিয়া দেখা যাক না!)

বেলা দশটা বাজিতে-না-বাজিতে গরম বাড়িয়া উঠিল। প্রভাতের সে শীতল বায়ু কাহার যাদুমন্ত্রে মিলাইয়া গেল। প্রখর রৌদ্রে চোখ ঠিকরাইয়া যাইতেছে।

বন্ধু-যুগল ব্যতীত "মুসাফের" হোটেলে আর কেহ ছিল না। তাই সমস্ত ঘরই তালাবন্ধ। প্রশান্ত ক্লোরোফিল সান্-গ্লাস্ চোখে দিয়া কয়েকখানি পত্র হোটেল সংলগ্ন ডাকবাক্সে ফেলিয়া ফিরিতেছিল,—বাইসিক্লের ঘণ্টা শুনিয়া চাহিয়া দেখিল। পুলিসের খাকি ইউনিফরম-পরিহিত এক ব্যক্তি আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাহার নামধাম ও ভূপাল আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনার তাহাতে কি আবশ্যক?"

আগন্তুক ধীর ভাবে বলিল, "আপনি বিরক্ত হইবেন না, আমাদের এখানে নূতন কেহ আসিলে পুলিসে রেকর্ড করিবার রীতি আছে। বিশেষ খবর পাইয়াছি যে, আপনাদের সহিত দুই তিনটী বন্দুক আছে —"

"বন্দুক তিনটী তো আপনার চরে দেখিতে পাইয়াছে; তাহা ব্যতীত একটী 'মাউজার অটোম্যাটিক পিস্তল'ও আমার পকেটে আছে। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না, এই দেখুন,—"

প্রশান্ত পকেট হইতে আপন নামের কার্ড ও একখানি চিঠি বাহির করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টরের হাতে দিল। উপরে ভূপাল ষ্টেটের কোট-অফ্-আরম্-অঙ্কিত পুরু কোয়ার্টো সাইজ নীলাভ কাগজে টাইপ করা, "Dear Mr. Chowdhury" সম্বোধনে ডেমি-অফিসিয়েল চিঠিতে স্বয়ং ভূপাল ষ্টেটের "চিফ্ এড্‌মিন্‌ষ্ট্রেটর" স্যর ইস্‌রার খাঁ প্রশান্তকে শিকার করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, ও আবশ্যকমত অস্ত্রাদি আনিতে অনুমতি দিয়াছেন।

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর চিঠি প্রত্যর্পণ করিয়া কার্ডখানি মাত্র লইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বাইসিক্লে প্রস্থান করিল। প্রশান্ত পাইপ ধরাইয়া আপন ঘরে আরাম-কেদারায় শরীর এলাইয়া দিল।

(২)

বেলা সাড়ে চারিটা; তখনো বিষম রৌদ্র, গরমও খুব। টাঙ্গাওয়ালা আসিয়া "হাজুরে" হাজির হইল। চা পানের পর প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। অতুল বলিল, "ইস্‌রার খাঁর কাছে যাবে তো? ও খাকি সার্ট না পরে dress করলে না কেন?"

প্রশান্ত বলিল, "কে আজ ইস্‌রার খাঁর কাছে যাচ্ছে? দুপুর বেলা শুন্‌লি, কাল থেকে আমি মোটরের বন্দোবস্ত করলুম। মোটর আসুক, সে তখন কাল-পরশু যাওয়া যাবে। মোটেই আমি টাঙ্গা চড়ে ইস্‌রার খাঁর কাছে যাব না।"

"না, না—সে ভাল হবে না। পুলিস থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের আসবার খবর পেয়েছে। এর উপর তুমি চিঠিখানা acknowledge পর্য্যন্ত করলে না। কি ভাববে?"

"তুই থাম তো,—ভাববে আবার কি? আমার খাতির যা কিছু, তা তো Col. Greenএর জন্যে; যে যা ভাবে ভাবুক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না।"

সেনানিবাস ছাড়াইয়া পাহাড়তলি ঘুরিয়া রাস্তা দুইটী হ্রদের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ বাঁধের উপর দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। উভয় পার্শ্বে পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ বড় ও ছোট হ্রদের জল পৃথক করিয়াছে। বড় হ্রদের জল হইতে ছোট হ্রদের জল (water level) অন্ততঃ ৭০।৮০ ফিট নীচে। বড় হ্রদের অতিরিক্ত জল (over-flow) "পানি চক্কির" (water mill) চাকা ঘুরাইয়া ছোট হ্রদে পড়িতেছে। ছোট হ্রদের অপর প্রান্ত ষ্টেসনের পথে গেষ্ট হাউসের নিকট,—প্রভাতেই বন্ধুযুগলের তাহা দর্শন হইয়া গেছে।

ছোট হ্রদের জলের ধারে ধারে সাবেক কালের দেওয়াল, "শহর্—পনা" বা "দিওয়ার", স্থানে স্থানে জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। রাস্তা পুরাতন "দরওয়াজা" ভেদ করিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। দরওয়াজার কপাটে বৃহৎ বৃহৎ

লোহার পাত ও কাঁটা মারা, সম্পূর্ণ সেকেলে। উপরে অলিন্দ, সংস্কারাভাবে তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে।

দরওয়াজার পরই বস্তি; বস্তি ছাড়াইয়া একটী মস্‌জিদ—প্রায় বিংশ ফিট উচ্চ চত্বরের উপর রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত। শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরের গম্বুজ ও স্বর্ণবর্ণ চূড়া সমেত মসজিদ্‌টি ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন না হইলেও উভয় বন্ধু টাঙ্গা থামাইয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

পার্শ্বেই একটী ফকির ভিক্ষায় বাহির হইয়া হাঁকিতেছিল, "আল্লাহো, নবীজি, রোজি ভেজো—।" উভয় বন্ধুকে টাঙ্গা থামাইতে দেখিয়া অলাবু পাত্র বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কেঁও জনাব, বম্বাইমে অ্যাসি মস্‌জিদ হ্যায়?"

প্রশান্ত হাসিয়া একটী আনি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ন্যাহি ফকিরজি।—জানিস্ অতুল, এখানে বার-আনা লোক সহর বল্‌তে বম্বে-ই জানে। কলকাতার খবর বড় রাখে না। কিন্তু বাকি চার-আনার মধ্যে আবার এমন লোকও আছে, যাদের কাছে কলকাতা স্বর্গের সামিল একটা কিছু।"

বামদিকে রাজপ্রাসাদের সারি, মধ্যে ফটক। ফটকে সশস্ত্র শাস্ত্রী পাহারা। ভিতরে চৌক, সকলেরই পক্ষে অবারিত-দ্বার। চৌকের ডা'ন দিকে শিশমহাল; বামে পুরাতন দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়া হ্রদ দেখিতে পাইয়া উভয়ে টাঙ্গা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দিকে গমন করিল।

ভাঙ্গা ইট পাথর ও পুরাতন দেওয়াল টপ্‌কাইয়া অনেকখানি উৎরাইয়ের পর উভয়ে হ্রদের জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, হ্রদের জলে তাহার রক্ত-রঞ্জিত স্বর্ণবর্ণের প্রতিচ্ছবি ঝলসিত। চারিদিকেই খালি ভগ্নাবশেষ, পুরাতনের স্মৃতি মাত্র। দুর্গ-প্রাকার ও রাজপ্রাসাদে নানা আগাছাকে আশ্রয় দিয়া বৃহৎ বৃহৎ ফাটল।

জলের ধারেই প্রাসাদ-সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র ত্রিতল বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। প্রাসাদ-সংলগ্ন হইলেও, দেখিলেই বোঝা যায়, বাড়ীটার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ পৃথক। বাড়ীটার পাদদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তররাজির মধ্যে একটী সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এই সুড়ঙ্গ কৌশলে গুপ্ত ছিল; এখন সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়া প্রশান্ত বলিল, "এটা কোথায় গেছে, আয়—একটু Explòre করে দেখা যাক্।" অতুলের বোধ হয় সাহসে কুলাইল না, সে অসম্মত হইল।

এমন সময় উপর হইতে কে বলিল, "বাবু সা'ব, ইস্কে অন্দর যাবেন না, সাঁপের ভয় আছে।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিল, অর্দ্ধ-ভগ্ন উচ্চ "চবুতারার" উপর বসিয়া ভদ্রবেশী একটী বৃদ্ধ মুসলমান তাহাদের সম্বোধন করিয়াছে। বৃদ্ধের হস্তে তস্‌বী-মালা, আবক্ষ-লম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু চামরের ন্যায় সান্ধ্য সমীরণে দোলায়মান।

উভয়ে নিকটে গিয়া বলিল, "বাঃ! আপনি তো বড় সুন্দর বাংলা বলেন, মিঞা সাহেব,—এমন কোথায় শিখলেন?"

বিষাদের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল, "পঁচাশ বরষ কলকাতায় থেকেছি, ক্যানিং ইষ্টিট, মুর্গীহাট্টায় আমার কারবার ছিল। শেষ চার সাল পর পর দুই জওয়ান বেটা আর বিবিকে সিখানেই মাটি দিয়ে আর থাকতে দিল্ হল না। আজ আট বরষ কারবার তুলে দিয়ে ইথানে বেটীর কাছে এসে রয়েছি। এখন খোদার মর্জ্জি, কবে আপনি যাব তাই ভাবি।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আপনারা তো কলকাত্তা থেকে আসছেন? বসেন বাবুসা'ব, ঐ গর্ত্তর কথা বলি। এ আপনার হিষ্টি কেতাবে পাবেন না, তাই তারিখ জানা নেই; কিন্তু তখনো আংরেজ এখানে আসেনি। ইথানে অনেক আদমীর মুখে শুনতে পাওয়া যায়।"

প্রশান্ত ও অতুল বৃদ্ধের পাশে বসিয়া পড়িল।

(৩)

নবাবের প্রিয় পার্শ্বচর, খাস মজলিসের মোসাহেব, মহম্মদ ইব্রাহিমের একমাত্র পুত্র সুলতান আহ্‌মদ,—বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। লেখাপড়ায় ওস্তাদ,—স্বভাব-চরিত্রে, কথায়-বার্ত্তায় নাকি তার মত ছেলে দুর্লভ। ধপ্‌ধপে ফর্শা রঙ, উন্নত নাসিকা, বড় বড় চোখ,—সুচেহারা দেখিলে সকলেই চাহিয়া থাকে। ভূপাল সহরে তাহাকে চেনে না এমন লোকই নাই। সকলেরই সহিত তাহার সদ্ভাব; সকলেই তাহাকে স্নেহ করে। নবাব-সরকারে পিতা-পুত্র উভয়েরেই সমান প্রতিপত্তি। স্বয়ং নবাব সাহেব ও প্রধানা বেগম সাহেবা সুলতান আহ্‌মদকে পুত্রতুল্য ভালবাসেন।

প্রিয়পাত্র ইব্রাহিমের বাসের জন্য নবাব এই ক্ষুদ্র বাড়ীটী প্রাসাদ-সংলগ্ন করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। ইব্রাহিম এইখানেই তাহার তিনটী বিবি ও পুত্র-কন্যা লইয়া থাকিত। আর থাকিত—পুত্রের জন্য নিযুক্ত,তাহার অভিভাবক-স্থানীয়, আগ্রানিবাসী প্রৌঢ় মৌলবী আবদুর রহমান। মৌলভী সাহেব ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা সুলতান আহম্মদের সঙ্গে থাকেন; যুবক ছাত্র তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোনও কাজ করে না।

সেদিন বৈকালে এমনই গরম, শিক্ষক ও ছাত্র ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছে, সঙ্গে দুইটী অনুচর। ঘোড়া কদমে কদমে চলিতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু পরিচিতের সহিত দেখা হইতেছে। কাহাকেও স্মিত অভিবাদন, কাহাকেও বা তাহার সহিত দুই চারিটী কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিতে করিতে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জুম্মা মসজিদ ছাড়াইয়া বাজার; বাজারের পর একটু মাঠের মত; মাঠের অপর পার্শ্বে মুসাফেরখানা। মাঠে পড়িয়া শিক্ষক ও ছাত্র তাহাতে চক্রাকারে ঘোড়া ছুটাইতে লাগিল।

হঠাৎ মুসাফেরখানার দ্বারে একটী পর্দ্দাঘেরা বয়েলগাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে নামিল, জীর্ণ বেশে একটী বৃদ্ধ ও তাহার সহিত বোরখা-ঢাকা একটী তন্বী কিশোরী। ছিন্ন বোরখার অন্তরালে দুইটী ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু ও গোলাপ ফুলের পাপড়ীর ন্যায় অধরোষ্ঠ দেখা যাইতেছে। চাঁপা ফুলের মত রঙ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদযুগলে দিল্লীর মলিন নাগরা জুতা।

সুলতান আহম্মদ মোহাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া আছে দেখিয়া মৌলভী সাহেব মৃদু হাস্যে তাহার কর্ণে কি বলিলেন। যুবক চকিতে এদিক ওদিক একবার দেখিয়া লইল। তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, মুখ লাল হইয়া গেল। মৌলভী সাহেব সোজা আগন্তুক বৃদ্ধের নিকট গিয়া কথা পাড়িলেন।

বৃদ্ধ সৈয়দবংশোদ্ভব দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; বাদশাহের কোপে পড়িয়া অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দেশত্যাগী,—ভূপাল দরবারে আশ্রয়ের আশায় আসিয়াছেন। সঙ্গিনী তাঁহার একমাত্র সন্তান। স্ত্রী পরিবার আর কেহই জীবিত নাই।

মৌলভী সাহেব সুলতান আহম্মদের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধকে অন্ততঃ সেই দিনের জন্য মহম্মদ ইব্রাহিমের বাড়ী অতিথি হইতে অনুরোধ করিলেন; বলিলেন, তাহা হইলে পরদিন অতি সহজেই তিনি নবাব-দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন। বৃদ্ধ সহজেই রাজি হইয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। মুসাফেরখানার লোক বড় কেহ সেখানে ছিল না,—এ-সকল কথা কেহই জানিল না, কেহই শুনিল না। কত লোক আসে, কত লোক যায়, কে কার খবর রাখে? বৃদ্ধ ও কন্যাকে বয়েল গাড়ীতে উঠাইয়া মৌলবী আবদুর রহমান পথ দেখাইয়া মহম্মদ ইব্রাহিমের বাড়ী তাঁহাদের লইয়া আসিলেন। মৌলবী সাহেবের ইঙ্গিতে সুলতান আহম্মদ অনুচরদ্বয়ের সহিত অন্য পথে ফিরিল।

তাহার পর কি হইল, কেহ জানে না; তবে সে বৃদ্ধের দেখা আর কেহ পায় নাই। কিছুদিন পরে সুলতান আহম্মদের বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। সকলে শুনিল, কোনও সদ্বংশজাতা অনাথা কন্যার সহিত মহম্মদ ইব্রাহিমের একমাত্র রূপবান গুণবান পুত্রের বিবাহ হইতেছে। অন্তঃপুরিকারা বলিতে লাগিল, নববধূর রূপে বেহেস্তের পরীও বুঝি হার মানে। নববধূ নামেও মেহের, রূপেও বুঝি-বা দ্বিতীয় মেহেরউন্নিসা নুরজহাঁ। গুণেরও তাহার সীমা নাই,—এমন শান্তশিষ্ট সুশীলা কন্যা আর হয় না। সুলতান আহম্মদের মাতৃতুল্যা প্রধানা বেগমসাহেবা বলিলেন, রাজযোটক হইয়াছে। দিনে দিনে নববধূ নবাব ও বেগমের অতি প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, তখন মেহেরের একটী পুত্র জন্মিয়াছে।

সুলতান আহম্মদের বিশ্বস্ত খাস্ বাঁদি হালিমা ছাতে কি করিতে উঠিয়া বেকায়দায় হঠাৎ একেবারে নীচে পড়িয়া গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে সকলে অন্দরে লইয়া গেল। হাকিম আসিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারা গেল না। করুণাময়ী মেহের স্বয়ং আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা করিল,—এমন বুঝি আপনার লোকেও পারে না।

মৃত্যু স্থির জানিয়া হালিমা মেহেরের দুই হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মেহের তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছু বলিতে চাহে কি না।

হালিমা ইঙ্গিতে অপর সকলকে ঘর হইতে বিদায় দিয়া মেহেরকে বলিল, "মা, এমন সেবা বোধ হয় আমার পেটের মেয়েও করিত না। আজ তোমাকে যদি সকল কথা না বলিয়া যাই, আমার পাপের সীমা থাকিবে না। প্রত্যক্ষ

ভাবে আমি কিছু করি নাই বটে, কিন্তু সমস্ত জানিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকায় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। খোদা আমায় মাফ করুন।"

হালিমা মৃদুস্বরে তাহার পর যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া মেহের আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ইহার অব্যবহিত পরেই হালিমার মৃত্যু হইল।

হালিমার কবরের ব্যবস্থা হইয়া গেলে, মেহের ধীর-পদে প্রাসাদের হারেমে বেগম সাহেবার নিকট গিয়া স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিল। বাড়ী প্রাসাদ-সংলগ্ন, অন্তঃপুর হইতে হারেমে যাইবার পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। বৃদ্ধা বেগমসাহেবা তাঁহার স্নেহের পাত্রী মেহেরের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, কোনও বিশেষ অঘটন ঘটিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতান আহম্মদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মেহের কোনও দিনই অপর কাহারও সামনে স্বামীর নিকট মুখ খুলিয়া দাঁড়ায় নাই, আজও খুলিল না; কিন্তু তাহার ফিরোজা রঙের সূক্ষ্ম ওড়নার অন্তরাল হইতে দীপ্ত চক্ষুর ভাব দেখিয়া সুলতান আহম্মদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। মেহের ধীরস্বরে বলিল, "পাঁচ বৎসর যে রহস্য ভেদ করিতে আমি পারি নাই, আজ তাহা জলের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যে পিতা আমায় না বলিয়া কোনও কাজ করিতেন না, একদণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন, সেই পিতা আমার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গেলেন, এটা চিরদিনই আমার প্রহেলিকার মত ঠেকিত। যেদিন সন্ধ্যাবেলা প্রথম তোমাদের বাড়ী আমরা পদার্পণ করি, তাহার পরদিন প্রাতে তোমার মা যে আমার পিতার লিখিত পত্র আমায় দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি আমাকে তোমায় বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়া মক্কা-সরিফ্ যাত্রা করিবার কথা লিখিয়াছিলেন, আজ জানিলাম তাহা জাল-পত্র। আজ জানিতে পারিয়াছি, সেই রাত্রে তোমরা তাঁহাকে আমার বিবাহ সম্বন্ধে কিছুতেই রাজি করিতে না পারিয়া, পাষণ্ড আবদুর রহমানকে দিয়া কাপুরুষের ন্যায় নিরাশ্রয় অক্ষম বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া সুড়ঙ্গের গুপ্ত-পথে তাঁহার দেহ গোপনে স্থানান্তরিত করিয়াছিলে। আজ জানিতে পারিয়াছি, সে চিঠি তোমরা তাঁহার খাতার লেখা দেখিয়া জাল করিয়াছিলে। আজ জানিতে পারিয়াছি, আমার এ দেহ আমার পিতৃহন্তার ভোগের বস্তু মাত্র,—যে সন্তান আমি গর্ভে ধরিয়াছি, তাহার শরীরেও সেই পাষণ্ডের রক্ত প্রবহমান। আজ জানিতে পারিয়াছি, তোমরা পিতা-পুত্রে শত সহস্র অপকর্ম্ম করিবার জন্যই আবদুর রহমানের পরামর্শে ঐ সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়াছিলে। ঐ সুড়ঙ্গ-পথেই কাজি নুরুদ্দিনের কন্যা সায়দাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, অবশেষে ঘটনা প্রকাশ হইবার ভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়া ঐ সুড়ঙ্গ-পথেই তাহার দেহ হ্রদের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। আরো কত কি করিয়াছ, জানি না; কিন্তু হালিমা অনুতপ্ত চিত্তে মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া ঐ দুইটী ঘটনার কথা আমার কাছে স্বীকার করিয়াছে। এ ঘৃণিত দেহ আমি আর রাখিব না; কিন্তু চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে অমায়িকতার মুখসে ঢাকা ভণ্ড পিতা-পুত্রের স্বরূপ বেগম সাহেবার কাছে প্রকাশ করিয়া দিলাম।"

বিদ্যুৎবেগে মেহের হারেম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইব্রাহিমের বাড়ী হইতে সুড়ঙ্গ-পথেই বাহির হইয়া হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল। তিন দিন পরে তাহার দেহ বহুদূরে ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

নবাব সাহেবের আজ্ঞায় প্রকাশ্য কিছুই ঘটে নাই বটে, কিন্তু পরদিন হইতে মহম্মদ ইব্রাহিম সপরিবারে নির্ব্বাসিত, তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। আবদুর রহমানের কোনও সন্ধান কেহ পাইল না; জনশ্রুতি—গুপ্তঘাতকের হস্তে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

সেইদিন হইতে এই বাড়ী পরিত্যক্ত, আর কাহাকেও এখানে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তার পর কালের প্রভাবে পুরাতন প্রাসাদের সহিত ইহাও আজ ধ্বংসোন্মুখ।

* * * *

"বাবু সাহেব, এই হল ঐ গর্ত্তর হিষ্টিরি; গুনাহ্ হলে খোদা কখনো তার মাফি দেন না। আমার সাতাত্তোর বরষ উমর হল, এই তো এক্‌সাই দেখে আসছি।

"চলিয়ে জনাব, আঁধার হয়ে এল, আপনাদের পৌঁছুনে দের হয়ে যাবে, বহুত তক্‌লিফ্ হবে।"

দেরাদূন

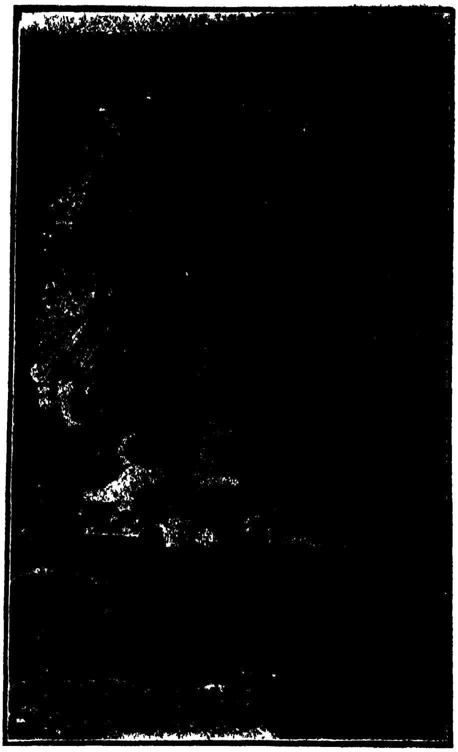
শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

কান টানলেই মাথা আসে—এ তো জানা কথা। কিন্তু পারিবারিক আবেষ্টনের সঙ্গে বাঙালীর মনের সম্বন্ধ যে কানের সঙ্গে মাথার সম্বন্ধের চাইতেও গুরুতর, তার পরিচয় পেলুম বিগত পূজোর ছুটিতে। পূজোর কিছুদিন আগেই অসুখ বিসুখের পাল্লায় পড়ে বাড়ীর সবাইকে দেরাদূনে পাঠিয়ে দিতে হ'য়েছিল। সেখান থেকে এমন টানেই তাঁরা মনটাকে টান্‌তে সুরু কর্‌লেন যে, পূজোর ছুটি আস্‌তে-না-আস্‌তেই হাজার মাইল পথ অতিক্রম কর্‌বার জন্যে আমাকেও ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। তবে এইখানে এ কথাটাও ব'লে রাখা সঙ্গত মনে করি যে, হিমালয়ের এই অঞ্চলটা ভালো ক'রে দেখার লোভও আমার আর কোনো লোভের চাইতে কম ছিল না।

ষষ্ঠীর দুপুরে কল্‌কাতা ত্যাগ করি। ভিড় সে দিন একটু অতিরিক্ত রকমেই মাত্র ছাড়িয়ে উঠেছিল। সুতরাং যে কাম্‌রায় ৪০ জনের বস্‌বার কথা, সে কাম্‌রা ১৬০জন দখল কর্‌লেও, নতুন লোক-সমাগমের সম্ভাবনায় আরোহীদের আশঙ্কা ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কোনো রকমে এই ভিড়ের ভিতরেই একটু স্থান ক'রে নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু বার বার ক'রে মনে হচ্ছিল, আজকার এই দিনটে বাদ দিয়ে কাল গাড়ীতে চাপ্‌লে সেইটেই হয়তো সুবুদ্ধির কাজ করা হ'তো।

ভিড়টা সমান ভাবে বারাণসী পর্য্যন্ত তার জের টেনে চল্‌লো। খোঁড়ার খানা পথের মাঝেও থাকে। হঠাৎ কোথায় একখানা ট্রেণ লাইন-চ্যুত হ'য়ে 'ডেহ্‌রী-অন-সোন'এর কাছে একটা ষ্টেশনে আমাদের ট্রেণটা প্রায় ঘণ্টা চারেক আট্‌কে রেখে দিলে। সুতরাং যে ভোগটা ৪ ঘণ্টা আগে মিটবার কথা, তার মেয়াদ আরো ৪ ঘণ্টা বেড়ে গেল। অর্থাৎ পরের দিন যেখানে সাড়ে আটটায় কাশীতে পৌছাব, সেখানে পৌছাতে বেজে গেল বেলা সাড়ে বারোটা। ভেবেছিলুম একটা দিন কাশীতে কাটিয়ে বাকি পথটা পাড়ি দেবো। কিন্তু পথের এই সব বিভ্রাটে মন এত বেশী খিঁচে গেল যে, হাঙ্গামা আর বাড়াতে ইচ্ছে হ'ল না; মনকে দেরাদূন পর্য্যন্ত একেবারে একটানা লম্বা পাড়ি জমাবার জন্যেই প্রস্তুত ক'রে তুল্‌লুম।

অবশিষ্ট রাস্তায় গাড়ীতে ভিড় ছিল না। সুতরাং



দেরাদূনের দুর্গা প্রতিমা

হিন্দুস্থানী 'পুরি' আর খোট্টাই লাড্ডু খেয়ে আরামে না হোক্ সোয়াস্তিতে বাকি পথটা কাটিয়ে দিলুম। ট্রেণটা পথে সেই যে চার ঘণ্টা 'লেট' হ'য়ে গেছল—ই-আই রেলওয়ের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড়েও 'দেরাদূন'-এক্‌স্‌প্রেস্' তার সে ঘাট্‌তিটা বিশেষ শুধ্‌রে নিতে পার্‌লে

না। আটটার যায়গায় বেলা বারোটায় দেরাদুনে পৌঁছে সে তার শেষ নিঃশ্বাস টেনে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

বেণারসের পর হ'তে পথের চেহারাটা প্রায় একই রকমের,—দু'ধারে জোয়ারী ও ভুট্টার ক্ষেত। যেখানে ক্ষেত নেই সেখানে রৌদ্রের তাপে মাটি ফেটে চৌচীর হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পল্লী—কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাক্‌বার মতো কুটীরে পরিপূর্ণ;—মাটির দেয়াল হয় তো তার ধ্বংসে পড়েছে; অথবা দেয়ালই শুধু খাড়া আছে, চাল যে কোথায় উড়ে গেছে, তার কোনোই পাত্তা নেই। কচিৎ কোথাও দু'একটা আম-জামের বাগান বা আগাছার জঙ্গল।

আগের রাত্রিটা একেবারে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবার জন্য পরের দিন রাত ৯টার সময়েই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। ক্ষতি-পূরণটা মন্দও হ'ল না। সমস্ত রাত্রির ভেতর একবারও জাগি নি। একেবারে ভোরে জেগে দেখি ট্রেণ লক্সারে পৌঁছে গেছে। এই লক্সারের পর থেকেই হিমাচলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সুরু হয়। দূরে দূরে পাহাড়ের স্তূপ আকাশের বুক ভেদ ক'রে অপরিমাণ ব্যোমকে পরিমাপ করবার চেষ্টায় যুগ-যুগান্ত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে;—মেঘের প্রাচীরের মতো তাদের চেহারা। দেখে মনে হয়, ওদের পেছনেই রয়েছে ময়-দানবের রাজ্য—রহস্যের কুহেলীতে ঘেরা। কিন্তু হরিদ্বারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এই দূরত্বের ব্যবধানও একেবারে ঘুচে যায়—ময়-দানবের রাজ্য চোখের ওপর মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য মায়াবীর মতো মনকে দোলা দেয়। এ দোলা যে কি প্রবল উন্মাদনায় ভরা তা নিজে অনুভব না করা পর্য্যন্ত বোঝা যায় না।



মসি জলপ্রপাত

হরিদ্বার থেকেই গাড়ীর পেছনে আর একখানা এঞ্জিন জুড়ে' দেওয়া হয়—চড়াইয়ের পথ বলে'। একখানা এঞ্জিন ট্রেণটাকে টেনে তুলতে পারে না—তাই দু'খানার ব্যবস্থা। হরিদ্বার হ'তে দেরাদুন পথ খুব বেশী নয়। কিন্তু উঁচুতে উঠ্‌তে হয় বলে ট্রেণের গতি অত্যন্ত মন্থর। সে যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে তা মালুম হতেও বেশী দেরী হয় না। পথে দু'টো 'টা:নল' আছে। হঠাৎ দেখ্‌লুম দিনের আলো নিভে গেল। ঘন গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গাড়ী তার পথ কেটে চলেছে। মাথার ওপর গুম্‌ গুম্‌ শব্দের একটা

বিরাট হল্ল। বিস্মিত হ'য়ে জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালুম। এক ঝলক ধোঁয়া এবং কয়লার গুঁড়ো এক সঙ্গে এসে চোখে এবং মুখে লোধ্র-রেণু ছড়িয়ে দিয়ে গেল। যন্ত্রণায় মুখ টেনে নিতেই দেখি, 'টানেল' পেরিয়ে ট্রেণ আলোকোজ্জ্বল সমতল ভূমির ওপরে এসে পড়েছে।

চারিদিকেই প্রায় পাহাড়ের প্রাচীর—মাঝখান দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে। ছোট বড় বন জঙ্গল, শস্য-শীর্ষ চাষেরজমি, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীদের পল্লী, রৌপ্যরেখাবৎ নির্ঝর-ধারা—এগুলো বায়োস্কোপের ছবির মতো চোখের সম্মুখ দিয়ে ছুটে চল্‌তে লাগল। প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব গৃহ কল্পনা ক'রে মন খুসীতে ভ'রে উঠ্‌ল। ই-আই রেলওয়ের Puja pamphletএ দেখেছিলুম, দেরাদুন সমুদ্র-সমতল হ'তে প্রায় আড়াই হাজার ফিট ওপরে। সুতরাং দেরাদুনও পাহাড়ের ওপরের একটা যায়গা হবে, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু মিনিট দশ পনেরো পরে যখন গাড়ী ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো, তখন দেখ্‌লুম, পাহাড়ের সঙ্গে তার কোনোই সম্বন্ধ নেই—ষ্টেশনের চারদিক ঘিরে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের ওপর ঘর-বাড়ী রাস্তা-ঘাট গ'ড়ে উঠেছে। পাহাড় মায়াবী—মরুভূমির মরীচিকার মতো সেও দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করার কম ওস্তাদ নয়। যে পাহাড়টাকে এক মাইলের বেশী



[সহস্রধারা

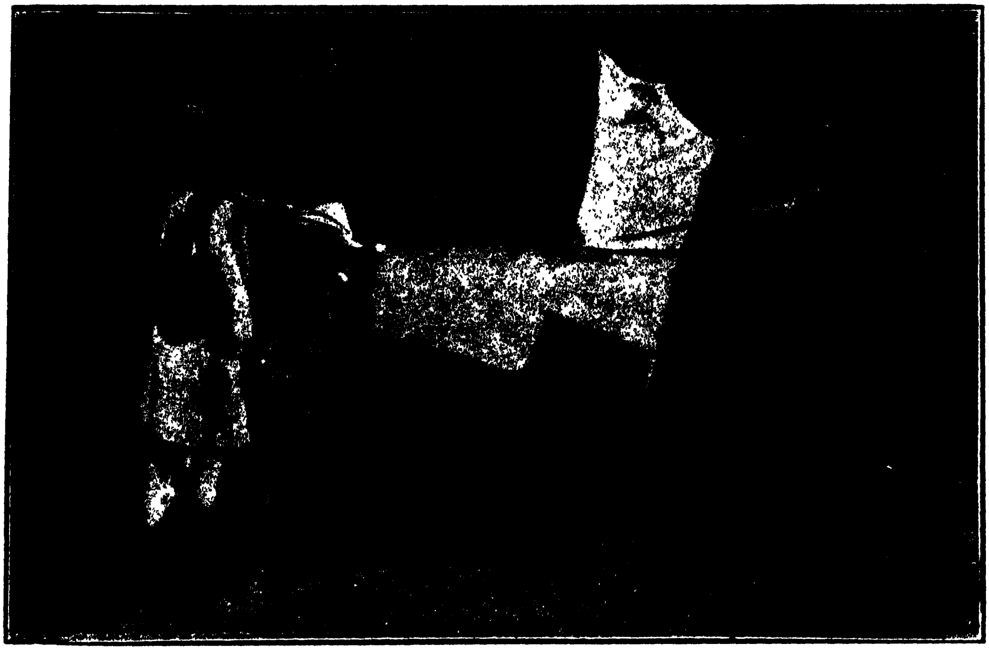
রূপের প্রলেপে মনের ভেতর দীর্ঘ পর্য্যটনের যে ক্লান্তি, অবসাদ ও বিরক্তি ঘন হ'য়ে জেগে উঠেছিল, কখন যে তা মিলিয়ে গেল, টেরও পেলুম না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর গোটা চারেক ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেলুম—এর পরের ষ্টেশনটাই দেরাদুন। একটা মোড় ঘুরতেই দেখি—পাহাড়ের গায়ে গায়ে অসংখ্য সাদা সাদা চিহ্ন। চিহ্নগুলো যে কি তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু দেখেই মনে হ'ল, ওগুলো ঘর-বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাবলুম, ঐ বুঝি দেরাদুন। পাহাড়ের ওপরে একখানা দূরের মনে হয় না, তার কাছে যেতে গেলেও পা অবসাদে ভেঙে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তার দূরত্ব আট দশ মাইলের কম হয় না। পরে জান্‌তে পেরেছিলুম—পাহাড়ের উপর ঘরবাড়ী দেখে যে স্থানটিকে আমার দেরাদুন ব'লে ভ্রম হ'য়েছিল, আসলে সে স্থানটা মুশৌরী এবং তার দূরত্ব দেরাদুন থেকে অন্ততঃপক্ষে তেরো চৌদ্দ মাইল।

দেরাদুন একটা মস্ত মালভূমি। এই মালভূমির ওপরেই প্রকাণ্ড সহরটা গ'ড়ে উঠেছে। এর চারদিকই পর্ব্বতে ঘেরা। মহাভারতে জরাসন্ধের রাজ্য গিরিব্রজপুরের যে বর্ণনা পাওয়া

যায়, কতকটা তারই মতো। ভারতবর্ষে যতগুলো দেখ্‌বার মতো সহর আছে, দেরাদুন তাদের অন্যতম—ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তা-ঘাটগুলো সবই প্রায় চওড়া—পত্র-বহুল গাছের ছায়ায় ঢাকা। এ সহরটায় ইউক্যালিপ্টাস গাছের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। একটা রাস্তার তো আগাগোড়াই দুধারে ইউক্যালিপ্টাস গাছের বীথি। তাই তার নামও দেওয়া হয়েছে ইউক্যালিপ্টাস রোড। এ গাছ অনেক গৃহেরও শোভা বর্দ্ধন করেছে। ঘরবাড়ীগুলিও মোটেই ঘিঞ্জি নয়—বেশ ফাঁকা ফাঁকা। গোটা সহরটা তাই অনেকটা ছবির মতো দেখায়।

বাস করেন। তা ছাড়া বাংলা ধরণের গৃহেরও অভাব নেই। প্রায় সব বাংলার সামনেই একটি ক'রে বাগান আছে। এই সব বাগান নানা রকমের ফুলের ও ফলের গাছে ভরা। এক-একটি বাংলা একেবারে পটের মতো সুন্দর—শ্রীতে সৌষ্ঠবে সমুজ্জ্বল। সাহেব-সুবা আছে; তাই তাদের রুচি-মাফিক আমোদ-প্রমোদ বিলাস-ব্যবস্থার উপকরণেরও অভাব নেই। বায়োস্কোপ সেখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড়েও ঘোড়া দৌড়ায়। রাত্রে নাচের আসরও জমে ওঠে। যান-বাহনের তো অন্তই নেই। এত পর্য্যাপ্ত মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী



ডাণ্ডি ও ডাণ্ডিবাহক

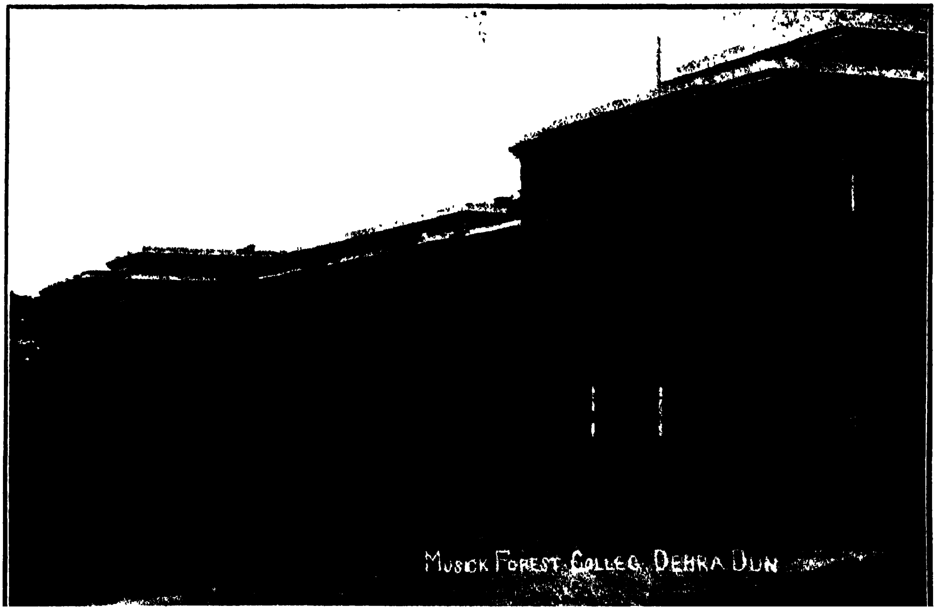
সহরটাতে অনেকগুলো শ্বেতাঙ্গের বাস। গবর্মেণ্ট কয়েকটি বড় বড় দপ্তরখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং শ্বেতমুখের আধিক্য স্বাভাবিক নিয়মেই এত বেশী হয়েছে। তা ছাড়া মুশৌরী এর খুব কাছে। ভারতবর্ষে মুশৌরী সাহেবদের একটা বড় আড্ডা। এখানে শ্বেতাঙ্গ-সমাজ-প্রতিষ্ঠার সেও একটা বড় কারণ। সহরে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ভালো হোটেল আছে। অনেক সাহেব, এবং অনেক পদস্থ দেশী লোকও এই সব হোটেলে

ও-অঞ্চলের আর কোনো সহরে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ঘোড়ার গাড়ীর নাম এখানে টোঙ্গা। অনেকটা একার মতো—কিন্তু চড়ে আরাম আছে। ঘোড়াগুলো যেমন তাজা, গাড়ীতে চড়্‌লে গাড়ীর গুণেই হোক্‌, অথবা রাস্তার গুণেই হোক্‌, দেহেও তেমন ঝাঁকুনী লাগে না।

যায়গাটার নাম দেরাদুন হ'ল কেন—এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণ এসে 'ডেরা' পেড়েছিলেন, সেই জন্যই এর নাম 'ডেরা দ্রোণ'।

'ডেরা দ্রোণ' শব্দটা লোকের মুখে ফিরতে ফিরতে অবশেষে 'দেরাদুনে' পরিণত হয়েছে। অনেকে আবার এ মতকে তেমন শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন না। তাঁরা দেরাদুন নামের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি পেয়ে তারই ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন—এর দেরাদুন নাম 'দুন' প্রদেশ ও 'গুরুদেরা' এই দুটো জিনিসের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে। শিখগুরু রামরায় যখন এখানে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত করেন, তার আগে থেকেই এ প্রদেশটার নাম ছিল দুন প্রদেশ। সুতরাং 'গুরুদেরা'র শেষ ভাগ 'দেরা'র সঙ্গে দুন প্রদেশের 'দুন' শব্দটি যুক্ত হ'য়েই এর নাম হয়েছে দেরাদুন। সব দেরাদুন নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। এখানে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটার উল্লেখ করা হয় তো অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হবে না।

গুরু রামরায় শিখগুরু হরগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র এবং গুরু হররায়ের পুত্র। গুরু হররায় ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্রের সময় দারার পক্ষ অবলম্বন ক'রেছিলেন। ঔরঙ্গজেব কখনো কাকেও ক্ষমা করতে জানতেন না। সুতরাং ভ্রাতৃ-রক্ত-কলঙ্কিত সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই মুসলমানদের এই আদর্শ সম্রাটটি গুরু হররায়কে সপরিবারে দিল্লীর প্রাচীরের ভেতর আবদ্ধ ক'রে রাখবার

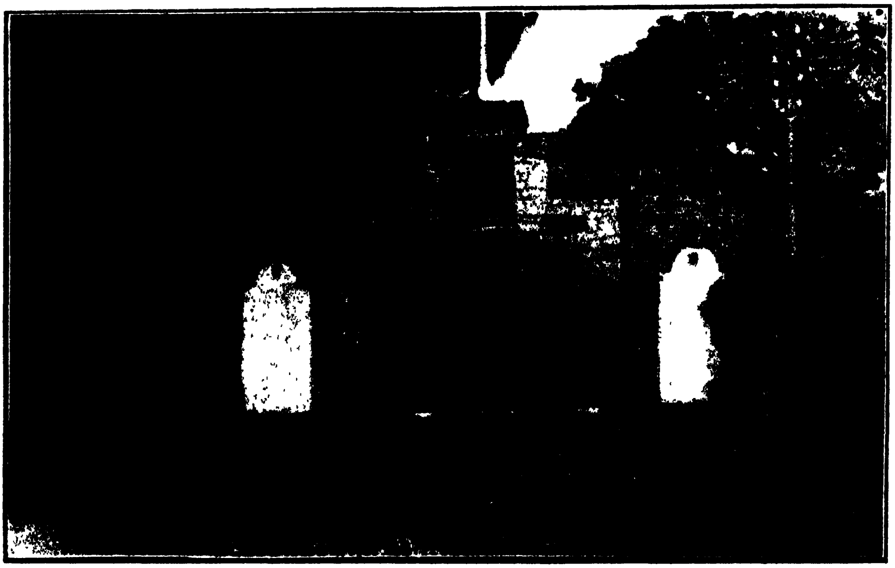


ফরেষ্ট কলেজ—দেরাদুন

দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে, এই শেষোক্ত যুক্তির ওপর জোর দেওয়া অন্যায় ব'লেও মনে হয় না। গুরু রামরায়ের প্রতিষ্ঠিত গুরুদ্বারটি প্রায় সোয়া দু'শ বৎসরের পুরাতন। এর অধিকারীরা বর্ত্তমানে মোহান্ত নামে পরিচিত। তাঁদের প্রতিপত্তি আজ সমস্ত সহরের ওপরে পরিব্যাপ্ত—প্রকাণ্ড জমিদারীর মালিক হ'য়ে তাঁরা ব'সে আছেন। সহরটিও সম্পূর্ণ আধুনিক। প্রাচীনত্বের বিশেষ কোনো চিহ্নও এর কোনোখানে নেই—অন্ততঃ আমার চোখে পড়েনি। সুতরাং গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠা থেকে সহরের গোড়া পত্তন ও ব্যবস্থা করলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে হররায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতেও পুত্রের অন্তরায়িত অবস্থার শেষ হ'ল না। ওদিকে শিখেরাও মোগল সম্রাটের আওতায় পরিবর্দ্ধিত রাম রায়ের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং নতুন গুরু বরণ ক'রে নেবার সময় তাঁকে উপেক্ষা করেই তারা অন্য লোককে গুরুপদে বরণ ক'রে নিলে। রাম রায় কয়েকবার গুরুপদ লাভের জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের অবরোধে পুষ্ট ব'লেই শিখেরা তাঁর দাবী কখনো স্বীকার করেনি। বস্তুতঃ তখন শিখেদের পক্ষে যেরূপ

তেজস্বী, নির্ভীক, বীর অধিনায়কের প্রয়োজন ছিল, গুরু রাম রায় তার উপযুক্তও ছিলেন না। স্বনামধন্য তেগ বাহাদুর তাঁর স্থলে গুরুপদে অভিষিক্ত হ'য়ে মুসলমানদের অসির আঘাতে প্রাণ দিলেন। মুসলমানদের যে অত্যাচার শিখদের মতো একটা ধর্ম্মপ্রাণ জাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত ক'রেছিল, তেগ বাহাদুরের মৃত্যু তাতেই আবার নতুন ক'রে ইন্ধন জোগালে। প্রতিহিংসার আগুনে জ্ব'লে উঠে এবার শিখেরা যাঁকে গুরুর পদে বরণ ক'রে নিলে তিনিই হচ্ছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ—ভারতের ইতিহাস যাঁর গৌরবে আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

দেরাদুনে এই গুরুদ্বারটি বিশেষ দেখ্‌বার জিনিস। হিন্দুর দেব-মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব কম। আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মুসলমান সম্রাটদের সমাধি স্থানগুলি যে আদর্শে গ'ড়ে উঠেছে, দেরাদুনের গুরুদ্বারও অনেকটা সেই আদর্শে গড়া। বস্তুতঃ গুরুদ্বার সমাধি মন্দির ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকাণ্ড একটা স্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে গুরু রাম রায়ের ভক্তেরা তাঁর সমাধির ওপর এই মন্দিরটি গ'ড়ে তুলেছে। প্রধান মন্দিরের চারিধারে কিছু দূরে দূরে আর চারিটি সমাধি-স্তম্ভের দ্বারা তাঁর চার স্ত্রীর স্মৃতি সুরক্ষিত। ফটক পেরিয়েই সাম্নে



গুর্খা ক্যাম্প—দেরাদুন

এর পরে গুরু রাম রায়ের মনের ভেতর হ'তে শিখ জাতির অধিনায়কত্বের ইচ্ছাটাও লোপ পায়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর ভেতরে ক্ষাত্র-শক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মের ভাবটাই বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। তাই শান্তির অন্বেষণে তিনি কিছুদিন পরেই দিল্লী পরিত্যাগ ক'রে এই নির্জ্জন গিরিপাদমূলে এসে গুরুদ্বারের প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু রাম রায় সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পার্‌লেও, তাঁর ভক্তের সংখ্যা আজ ভারতবর্ষে খুব অল্প নয়। তিনি একটি নতুন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁর শিষ্যেরা উদাসী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

খানিকটা খোলা প্রাঙ্গণ—পাথর দিয়ে বাঁধানো ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। সেই প্রাঙ্গণের মাঝেই একটা পুকুর—একেবারে কানায় কানায় জলে ভরা। প্রধান মন্দিরটির কারুকার্য্য ভারি চমৎকার। এতদিনের পুরানো; কিন্তু কালের প্রভাব কোথাও তার সৌন্দর্য্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ কর্‌তে পারেনি। মন্দিরের ভেতর নানা মহার্ঘ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত সমাধি। তার সুমুখে প্রত্যহ গুরুগ্রন্থ পাঠ করা হয়।

আমরা প্রথম দিন সকালে প্রায় আটটার সময় গুরুদ্বার দেখতে গেছলুম। গিয়ে দেখি, বর্ত্তমান মোহান্ত নগ্নপদে মন্দির প্রদক্ষিণ কর্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল।



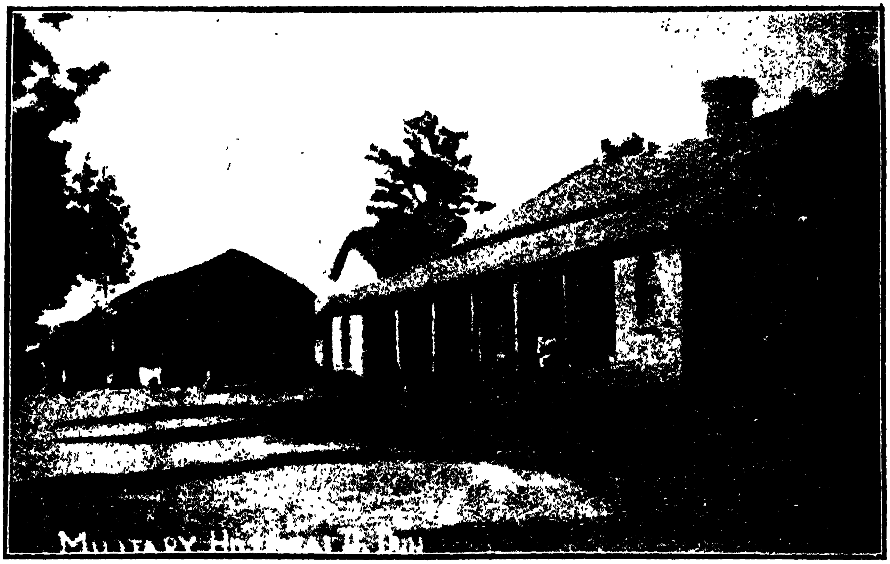
সিদ্ধিদাতা

শিল্পী শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

দীর্ঘ উন্নত দেহ; বয়স চেহারা দেখে মনে হয় ৪৪।৪৫ বৎসরের কম হবে না। বেশ ভদ্রলোক। তিনি আমাদের কাছে গুরুদ্বার-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রাম রায়ের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণিত ইতিহাসের ভেতর রাম রায়ের অনেকগুলি অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তিরও উল্লেখ ছিল। আমরা সেগুলি বিশ্বাস না করতে পারলেও দেখ্‌লুম, তাঁর বলার ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে তাঁর অকপট বিশ্বাসের ছবিটাও ফুটে উঠেছে। তিনি একটি লোক আমাদের সঙ্গে দিলেন—সব যায়গাটা আমাদের সঙ্গে ঘুরে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখিয়ে দেবার জন্য। বাইরের সব জিনিস দেখে-শুনে আমরা পার্শ্বে রামেশ্বর মন্দিরের সাম্নে যে বিরাট সমারোহের সৃষ্টি করেছিল, তেমন সমারোহ আমাদের বাংলা দেশের বিজয়াতেও খুব অল্প স্থানেই চোখে পড়ে। কিন্তু এ মিছিলের কথা পরে বল্‌ব।

পূর্ব্বেই বলেছি—দেরাদুনে অনেকগুলি বড় বড় সরকারী দপ্তরখানা আছে। এই দপ্তরখানার একটি হচ্ছে Trigonometrical Survey Office। ভারতবর্ষের সার্ভে আফিস-গুলোর ভেতর এইটিই নাকি সব চেয়ে সেরা। বহু বাঙালী এর অনুগ্রহে বাংলা মা'র শ্যামল অঞ্চল ছেড়ে ভারতের এক সীমান্তে পাহাড়ীদের ভেতর এসে বাসা বেঁধেছেন।



মিলিটারী হাসপাতাল—দেরাদুন

অবশেষে তাঁর বৈঠকখানায় হাজির হলুম। বৈঠকখানাটি অত্যন্ত আধুনিক ভাবে সজ্জিত। মোহান্তের নিজের অনেকগুলি ছবি, ঔরঙ্গজেবের দরবারে গুরু রাম রায়ের একখানা তস্‌বির ও অন্যান্য নানা প্রকারের আধুনিক বিলাসোপকরণে ঘরটা পরিপূর্ণ। এ বৈঠকখানা ধর্ম্মগুরুর পরিচয় তো দেয়ই না; বরং বড় জমিদারের ঐশ্বর্য্যের অহমিকার ছবিটাই চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলে।

আমরা যখন দেরাদুনে ছিলুম, সে সময়টা রামলীলার সময়। বিজয়া-দশমীর দিন আমাদের দুর্গাপূজার মিছিল এবং রামলীলার মিছিল এক সঙ্গে মিশে গুরুদ্বারের অপর দু' একটি সহৃদয় বন্ধুর কল্যাণে এ আফিসটা বেশ ভালো ক'রেই দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলুম। যে জিনিসগুলো ঘোরালো রকমের technical তার অনেকগুলোই বুঝতে পারিনি। কিন্তু যা বুঝতে পারা গেল, আমার পক্ষে তাও কম বিস্ময়ের বস্তু ছিল না। সার্ভে আফিসের মিউজিয়ামটাতে অনেক নতুন ধরণের জিনিস চোখে পড়্‌ল। সূর্য্যের ভেতরে মাঝে মাঝে কালো চিহ্ন পড়ে। খালি চোখে সে চিহ্ন আমরা দেখতে পাইনে। তবে নতুন একটা কিছু যে ঘটেছে—শৈত্যের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে উঠে' সে সম্বন্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মনকে খানিকটা সচেতন ক'রে তোলে। কারণ,

অনুসন্ধান করতে গিয়ে শুনেছি, সূর্য্যমণ্ডলেও মাঝে মাঝে ঝড় হয়। এই ঝড়ে সূর্য্যের এক একটা অঙ্গের আগুন একেবারে নিবে গিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্তের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তার তেজও কমে যায়। সূর্য্যের সেই চীর-খাওয়া দেহের চেহারা দেখ্‌বার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। দেরাদূনের এই সার্ভে আফিসের মিউজিয়ামে প্রথম দেখ্‌লুম তার ফটো। ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেরাদুনেই এটা গৃহীত হয়। এর চেয়ে বড় দাগ সূর্য্যের দেহে এ পর্য্যন্ত নাকি আর কখনো ধরা পড়েনি।

নির্ণয়ের কাজ চলে। আজ পকেট-ঘড়ির যুগ ফুরিয়ে হাত-ঘড়ির যুগ চলেছে। দু'দিন পরে আবার হয়তো দেখব—হাত ঘড়ির যুগও পুরানো হ'য়ে গেছে—যুগ চলছে পা-ঘড়ির। সুতরাং বালু ঘড়ি যে আজ আমাদের কাছে প্রায় প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু সে খুব বেশী দিন নয়—যখন বালু ঘড়িতেই আমাদের সময়ের হিসাব নিকাশের অধিকাংশ কাজ চল্‌ত!

এ আফিসের ঘড়ির ব্যবস্থাটা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। ঘড়ির ওপরে বহু জিনিসের গবেষণা নির্ভর করে



মেস কোর্ট—দেরাদুন

বালু-ঘড়ির নাম অনেক দিন আগে শুনেছিলুম; কিন্তু চোখে কখনো দেখা হয়নি। এখানে সে জিনিসটাও প্রত্যক্ষ হ'ল। আদতে এ একটি বালুর আধার। আধারটি দুই অংশে বিভক্ত। ওপরের অংশে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বালু সঞ্চিত ক'রে রাখা হয়। সামান্য ছিদ্রপথে এই বালি পাত্রের নিম্নাংশটিতে ঝ'রে পড়ে। ছিদ্রটি বালু-ঝরার কাজটাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে তা ঝ'রে নিঃশেষ হ'তে ঠিক একঘণ্টা সময় লাগে। তারপর আবার নিচের ভাগটার মুখ ওপরের দিকে তুলে দিতে হয়। এমনি ক'রে ঘণ্টা

ব'লে, সময়ের একচুল যাতে ব্যতিক্রম না হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেজন্য এঁদের চেষ্টা ও ব্যবস্থারও অন্ত নেই। ঘরের উত্তাপের পার্থক্যে পাছে সময়ের তারতম্য ঘটে, সে জন্য ঘরের উত্তাপ সারাক্ষণ ৮০" ডিগ্রিতে স্থির রাখা হয়। বাইরের উত্তাপ যখন বেশী, তখন ঘরের উত্তাপ স্থির রাখার ব্যবস্থা হয়েছে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া চালিয়ে; আবার বাইরে যখন ঠাণ্ডা, তখন ঘরে যাতে সেই ঠাণ্ডা সংক্রামিত না হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে Radiator বসিয়ে। উত্তাপ এবং শৈত্য

যখন যেটুকু দরকার—যন্ত্র-দেবতার সাহায্যে তখনই তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যান্ত্রিকেরা এই ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন Electrc-magnetic ব্যবস্থা। ঘড়ি ঠিক চল্‌ছে কি না, তার পরিচয় নেবার জন্য এঁরা বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন একেবারে নক্ষত্র-লোকের সঙ্গে। নক্ষত্রের অবস্থান দেখে ঘড়ির অবস্থা—সঠিক চল্‌ছে কি বেঠিক চল্‌ছে—নির্ণীত হয়।

আমার দেরাদুনে থাকার সময়েই Longitudeএর দিক দিয়ে বে-তার-বার্ত্তার শক্তি-পরীক্ষার চেষ্টা চল্‌ছিল Trigonometrical Survey আফিসের Hunter Observatoryতে। বোরডোঁ, স্যালগণ, এনোপলিস, হোনোললু, মালাবার প্রভৃতি স্থান থেকে তারহীন যন্ত্রের মারফৎ খবর লেন দেনের কারবার চল্‌ছিল এঁদের দিনে এবং রাত্রে অনেক বার করে। শুনলুম, কারবার যে ব্যর্থ হবে না তার স্পষ্ট প্রমাণ না কি তাঁরা এরই মধ্যে অনেকটা নিশ্চিত রকমেই বুঝতে পেরেছেন। তা ছাড়া এই দপ্তরখানাতে আরো এমন অনেক জিনিস দেখেছিলুম, যা তখন মনকে যথেষ্ট নাড়া দিলেও, এখন আর মনের ভেতর ধরে রাখ্‌তে পারিনি।

এখানকার অরণ্য-বিভাগের দপ্তরখানাটাও নানা রকমের দর্শনযোগ্য জিনিসে পরিপূর্ণ। অরণ্য-জগতের ব্যাপার নিয়ে সেখানে যে কত বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা চল্‌ছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সব পরীক্ষার জন্য যে সব বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সংখ্যাও বড় অল্প নয়। কোনো বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কাঠের শক্তির পরিমাপ ক'রে দেখার কাজ চলেছে; কোনো বিভাগে চলেছে নানা কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজন অনুসারে কাঠ পাকিয়ে শক্ত বা নরম করবার কাজ; কোনো বিভাগ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন বাঁশ বা অন্যান্য হাল্কা কাঠ হ'তে কাগজের উপাদান তৈরী হ'তে পারে কি না; কোন্ কাঠের দ্বারা কি রকমের দ্রব্য তৈরী হ'তে পারে—কোনো বিভাগ বা রীতিমত কারখানা বসিয়ে তারি পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। উদ্ভিদ-জগতের বিচিত্র সৃষ্টিসমূহের নমুনায় এর এক-একটি বিভাগ পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাননের বিভিন্ন ধরণের অঙ্কুর নিয়ে পরীক্ষা করা, কোন্ ব্যাধির দ্বারা কি ভাবে আক্রান্ত হ'য়ে গাছের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে তা পর্য্যবেক্ষণ করা, গাছের জাত বিচার ক'রে তাদের নানা শ্রেণীর ভাগ করা, বনের সমস্ত রকম কীট সংগ্রহ ক'রে তাদের কাজের ধারা ও জীবনযাত্রার ইতিহাস নির্ণয় করা—এমনি ধরণের একান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও চলেছে এর নানা বিভাগে। ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসে এখানে একটি শিক্ষায়তনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শিক্ষায়তনে ভারতীয় বন-বিভাগে প্রবেশার্থীদিগকে বন-বিভাগের কাজে শিক্ষিত

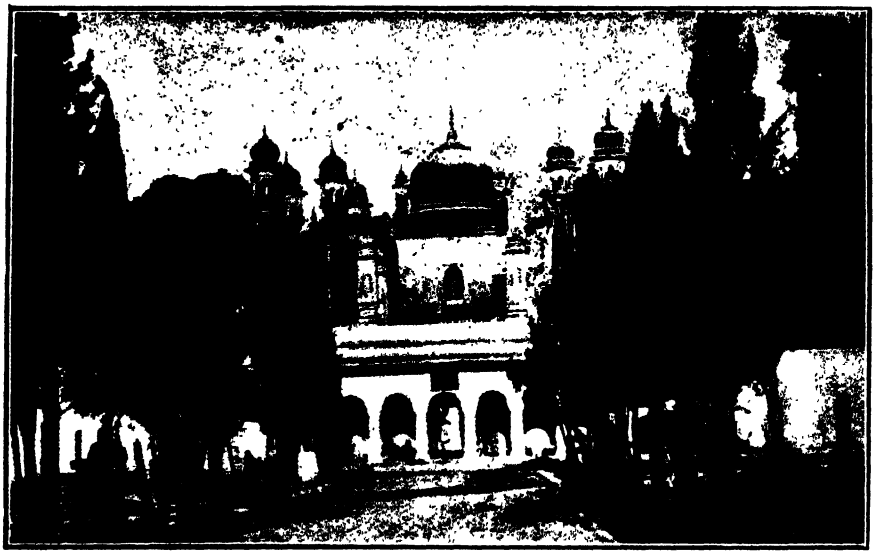


রামেশ্বর মন্দির—দেরাদুন

ক'রে তোলা হয়। সাভে অফিসার সার্ভে সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা কানন সম্পর্কীয় নানা জটিল বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করেন। প্রাদেশিক 'ফরেষ্ট সার্ভিসে'র শিক্ষা ব্যবস্থাটাও এখানে ছিল। কিন্তু সে বিভাগটা সম্প্রতি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে যে কয়জন শিক্ষার্থী আছেন, তাঁদের শিক্ষা শেষ হ'লেই এর দরজায় তালা চাবি পড়্‌বে।

দেরাদুন পল্টনদেরও একটা মস্ত আড্ডা। সহরে ৪টি গুর্খা Infantry unitএর বন্দোবস্ত আছে। Pack Battery সব সময়ের জন্য দু'টো ক'রে তো এখানে লেখালেখি হ'য়েছে, ডেপুটেশন বসেছে; অবশেষে দেরাদুনে সেদিন একটা কলেজ ক'রে ভারতবাসীদিগকে Commissioned অফিসার হবার জন্য পিত্তি রক্ষার মতো প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এঁরা একটা করেছেন। কলেজটাতে দু'জন বাঙালী ছাত্রও আছেন।

ক্বচিৎ কখনো শিকারে বেরিয়ে বড়লাট যদি এখানে এসে পড়েন, তারি জন্য একটি প্রকাণ্ড বাংলোই তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে। বিস্তৃত মাঠের ভেতর 'গৌরী সেনের পয়সায়' তাঁর চমৎকার বাংলোটা নানা রকমের ফুলের কেয়ারি, লতাকুঞ্জ, কৃত্রিম পাহাড় প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।



গুরুদ্বার—দেরাদুন

থাকেই; একটি Transport unit ও থাকে। গুর্খাদিগকেও সময়ে সময়ে পল্টনে রিক্রুট করা হয়। পথে ঘাটে মাঠে প্রান্তরে এদের কুচ্‌কাওয়াজ লেগেই আছে। তা ছাড়া বছর চার-পাঁচ আগে এখানে ভারতবর্ষের স্যাণ্ডহার্ষ্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব্বে ভারতবাসীদের ভেতর হ'তে সেনা বিভাগের Commissioned অফিসার নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না—ভারতবাসীদের অধিকার ছিল সাধারণ সৈনিকের হুকুম তামিলের দায়িত্বটুকু মাত্র। তাদের তোপের মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবার ও তাঁবেদারী করবার অধিকার ছিল একচেটিয়া; কিন্তু বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের মালিক ছিলেন সব ইংরেজ। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ঢের বাংলোর ওপরের ছাউনিটে খড়ের। কিন্তু অনেক প্রাসাদও এই খড়ের বাংলোর কাছে দাঁড়াতে পারে না—এমনি অপূর্ব্ব এর ভেতরের ঐশ্বর্য্য এবং চারিদিকের সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া। দেরাদুন বড় লাটের বডিগার্ডদেরও একটা আস্তানা। শুন্‌ছি, এই অনর্থক হাতীর খোরাকটার বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে আন্দোলন চল্‌ছে; কিন্তু তার ফলে দেরাদুন হ'তে এর অস্তিত্ব দূর হবে কি না, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একদিন দেরাদুনের এক প্রান্তে ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে ভরা মাঠের ভেতর দু'টো সাদা স্তম্ভের চূড়া চোখে পড়্‌ল। কৌতূহলের অঙ্কুশ তৎক্ষণাৎ মনকে খোঁচা দিলে। যেয়ে দেখি—স্তম্ভই বটে, কিন্তু

স্মৃতিস্তম্ভ। একটি স্তম্ভগাত্রে মেজর জেনারেল স্যার রবার্ট জিলিস্পাই-প্রমুখ কয়েকজন যুদ্ধে-নিহত ইংরেজ সেনানীর নাম ও মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা। অন্য স্তম্ভটিতে লেখা আছে—

This is inscribed
As a tribute of Respect for our adversary
BULBUDDER
Commander of the Fort
And his Brave Gurkhs
Who afterwards
While in the service of RANJIT SING
Shot down in their Ranks to the last man
By Afgan Artillery.

ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছুই মনে ছিল না। এই স্মৃতিস্তম্ভ দু'টি দেখে কলুঙ্গার যুদ্ধের বিবরণ জান্‌বার জন্য যে কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল, তা মিটাতে গিয়ে দেখি—সে এক অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী। সে কাহিনী এমন যে, অন্য দেশ হ'লে, যে স্থানের সঙ্গে সে কাহিনী জড়িত, সে স্থান স্বদেশ-প্রেমিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ত। ইংরেজদের সঙ্গে নেপালীদের যুদ্ধের কথা স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসের কল্যাণে আমাদের ছেলেদের কাছেও পরিচিত। কিন্তু এই ইংরেজ গুর্খার সংঘর্ষে কলুঙ্গা দুর্গের সেনানায়ক বলভদ্র এবং তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল যে সাহস, সহিষ্ণুতা, দেশ-প্রেম ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছিলেন, তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ তারা কখনো পায় না। দেশের ইতিহাস দেশের ছেলে-মেয়েদের আর সমস্ত জিনিসই জানিয়ে দেয়,—



দূর হইতে মুশৌরী পাহাড়ের দৃশ্য

হঠাৎ ইংরেজের তৈরী স্মৃতিস্তম্ভে দেশী লোকের বীরত্বের প্রশংসা দেখে মনটা খুসীতে ভ'রে গেল—বিস্ময়ও কম হ'ল না। এই স্তম্ভটারই অন্য পার্শ্বের লেখা দেখে বুঝতে পারলুম—দুটিই কলুঙ্গার যুদ্ধের স্মৃতি-ফলক। কলুঙ্গা নামটা পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সাগর মন্থনের সময় নামটা পেয়েছি। কিন্তু কেবল নাম

জানায় না কেবল তাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের কথা, কীর্ত্তি-কাহিনী, শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। তাঁদের বিরাট বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে এসে দেরাদূনের সমতল ক্ষেত্রে সমবেত হ'ল। কিন্তু দেরাদূনেই যে বল-পরীক্ষার একটা বড় ক্ষেত্র তৈরী হ'য়ে

আছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। দেরাদুন থেকে মাইল তিনেক দূরে নালাপানির পাহাড়ের ওপর বলভদ্র সিং সামান্য একটি দুর্গ তৈরী ক'রে বাস কর্‌ছিলেন! এই দুর্গের নামই কলুঙ্গার দুর্গ। ইংরেজ সেনাপতি দেরাদুনে পৌঁছেই তাঁকে আত্মসমর্পণ কর্‌বার জন্যে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নির্ভীক বলভদ্র সে পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন তোপের মুখে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য। সামান্য একটা দুর্গের সামান্য একজন সেনানায়কের স্পর্দ্ধা যে এত বেশী হবে, ইংরেজ সেনানায়ক তা কল্পনাও কর্‌তে পারেন নি। সুতরাং যুদ্ধের দামামা অতি সহজেই বেজে উঠল। ইংরেজের তোপের ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে গেল। পাহাড় কেঁপে উঠে তাদের প্রতাপের পরিচয় প্রদান কর্‌লে।



কেমটি-জলপ্রপাত

যে কলুঙ্গার দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান, সেখানে কিন্তু দুর্গ ব'লে বিশেষ কোনো স্বতন্ত্র জিনিস ছিল না। দুর্গম পথ, খাড়া চড়াই, দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল—এই গুলিই ছিল তার শত্রুর গতিরোধের পরিখা। আর এই প্রাকৃতিক পরিখার অন্তরালে ছিল একটি অদম্য অদ্ভুত রকমের দুঃসাহসী জাতি—যারা মৃত্যুকে হাতে তুলে দিতেও ভয় করে না, হাতে তুলে নিতেও ভয় করে না।

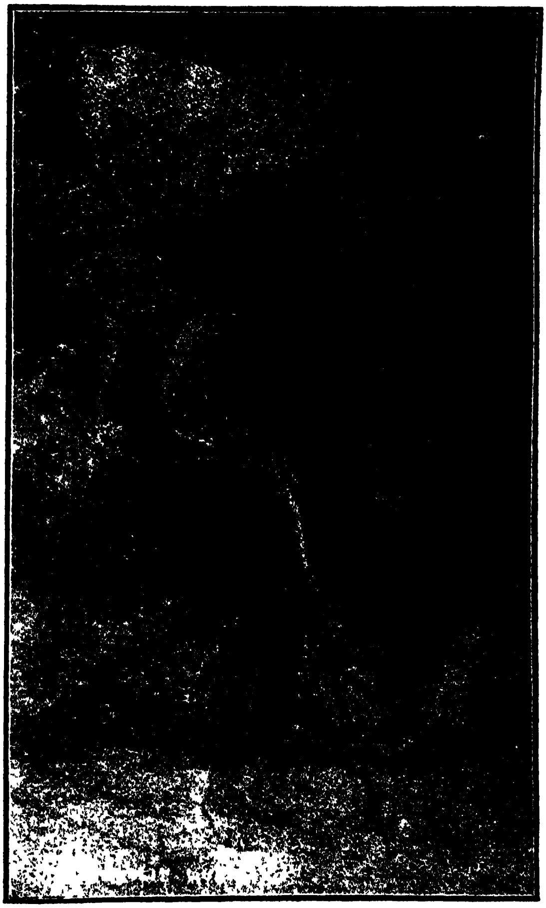
স্যার রবার্ট জিলিস্পাই ছিলেন এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের সেনানায়ক। এই পার্ব্বত্য ভুঁইএ্যাকে পরাজিত ক'রে তাঁর স্পর্দ্ধাকে লাঞ্ছিত করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে দাঁড়িয়ে তিনি সৈন্য-চালনার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল না। হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্যের তপ্ত রক্তে দুর্গের তলদেশ রঞ্জিত হয়ে গেল। দুর্গ-প্রাচীর অতিক্রম কর্‌তে গিয়ে লেফটেন্যাণ্ট এলিস গুর্খা সৈন্যের গুলির আঘাতে প্রাণ দিলেন। অবশেষে আর একটি গুলির আঘাতে মেজর জেনারেল জিলিস্পাই-এর প্রাণহীন দেহও ভূতলে লুটিয়ে পড়্‌ল।

সেদিনকার মতো যুদ্ধ বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু এর পর চল্‌ল দুর্গাবরোধের পালা। এক মাস ধ'রে সে অবরোধ। তার পর হঠাৎ আবার একদিন কামান গর্জ্জে উঠ্‌ল। ঝাঁকে ঝাঁকে ইংরেজ সৈন্য এসে দুর্গ আক্রমণ কর্‌লে। দুর্গের ভেতর হ'তে গুর্খাদের বন্দুকও সমানভাবে গর্জ্জাতে লাগ্‌ল। বাইরে ইংরেজ সেনার মৃত দেহে আবার পাহাড়ের ওপর পাহাড় তৈরী হ'ল। কিন্তু এবার কামানের তোড়ে দুর্গের এক অংশ ভেঙে পড়্‌ল। ইংরেজ সেনানায়ক সেই ভগ্নাংশের অভিমুখে তাঁর বাহিনীকে পরিচালিত কর্‌লেন। কিন্তু স্থানটি গুর্খারা এমনভাবেই রক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, সেদিনও ইংরেজ-সৈন্য দুর্গ-প্রবেশের পথ খুঁজে পেলে না।

কিন্তু এর পর দুর্গরক্ষা যে আর সম্ভব হবে না, সে কথাটা

ধরা পড়্তেও দেরী হ'ল না। ইংরেজের তোপ সমান ভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল। দুর্গের অনেকগুলি স্থান ভেঙে পড়ে ইংরেজ সৈন্যদের প্রবেশের পথ আরও সহজ ও সুগম ক'রে দিলে। এমনি সময়, দুর্গের ভেতর যে সামান্য সঞ্চিত জল ছিল, তাও ফুরিয়ে গেল। এমনি ক'রে দুর্গের ভেতর কোনো রকমে বেঁচে থাক্‌বার শেষ উপায়টি পর্য্যন্ত যেদিন নষ্ট হ'য়ে গেল, সেইদিন মাত্র ৭০ জন সৈন্য নিয়ে গুর্খাবীর বলভদ্র বিপুল বিক্রমে ইংরেজ-বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। তার পর অসির সাহায্যে সুসজ্জিত সৈন্যের সেই প্রাকার ভেদ ক'রে বলভদ্রের সেই ক্ষুদ্র বাহিনীটি বিদ্যুৎ গতিতে পাহাড়ের ভেতর অন্তর্হিত হ'য়ে গেল—অত বড় ইংরেজ-বাহিনী অত কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও তাদের গতি রোধ কর্‌তে পার্‌লে না। বলভদ্র দুর্গ ত্যাগ করার পর দেখা গেল, মাত্র ৫০ জন আহত ও মৃত সৈন্য দুর্গের ভেতর প'ড়ে রয়েছে। এই মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে যারা এক মাস ধরে হাজার হাজার সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিয়েছিল, তাদেরি ইতিহাস এই কলুঙ্গা দুর্গের ইতিহাস। অথচ এ ইতিহাস আমাদের শিক্ষিত সমাজের হাজার-করা একজনও জানে কি না সন্দেহ। কলুঙ্গা দুর্গের আজ চিহ্নও নেই। ইংরেজের কামান তাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে গেছে।

এখানে বহু বাঙালী কাজের হিড়িকে এসে ঘরবাড়ী তৈরী করে একরূপ এইখানকারই বাসিন্দা ব'নে গেছেন। করণ-পুর অঞ্চলটা এই সব বাঙালী ঔপনিবেশিকদের আড্ডা। এঁদের কেউ বন বিভাগে কাজ করেন, কেউ বা সার্ভে আফিসের চাকুরে। কারো চাকুরীর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, অথচ স্থানের মোহের মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি; তাই ঘরকে বাহির ক'রে এবং বাহিরকেই ঘর ক'রে নিয়ে সেইখানেই র'য়ে গেছেন। তাঁদের ছেলেপিলেগুলোও দেখ্‌লুম—ক্রমেই চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে দেরাদুনী হ'য়ে উঠ্‌ছে। এখানকার বাঙালী-সমাজের যে একটা জিনিস এখানে এলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এঁদের নিজেদের ভেতরকার সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্যের চিত্র। দেখে মনে হয়, সকলেই যেন এক পরিবারের লোক—পরস্পরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরস্পরে সমান ভাবে জড়িত। আমার বন্ধুকে দেরাদুনে থাক্‌বার জন্য মাসখানেকের মতো একটা ভালো এবং ফাঁকা বাড়ী ঠিক কর্‌তে লিখেছিলুম—কারণ, আমার দেরাদুন যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য অনেকগুলো লোকের স্বাস্থ্যান্বেষণ। মুশৌরীতে শীত নেমে পড়ায় তখন দেরাদুনে সাহেব মেম ও বড় বড়



মাল-বাহক—কুলি

চাকুরেদের ভারি ভিড়। দু'এক মাসের জন্য ভালো বাড়ী পাওয়া যায় না। তবু বাঙালী পরিবার বেড়াতে আস্‌ছেন শুনে সকলে মিলে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে বিস্তর চেষ্টায় এমন একটা চমৎকার বাড়ী ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, যা স্বদেশেও সচরাচর মেলে না। ফুল-ফলের বাগানে ঘেরা ছবির মতো সুন্দর এই বাড়ীটির কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে—

এবং অপরিচিত বাঙালীর প্রতি বাঙালীর আন্তরিক টানের এই নিদর্শনের কথাও ভুল্‌তে পার্‌ব না।

দূর এবং দীর্ঘ প্রবাসে থেকেও বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের কথা এঁরা ভুলে যাননি। শুন্‌লুম, খুব ধুমধামের সঙ্গেই প্রতি বৎসর এঁরা দুর্গোৎসব করেন; এবং তার পরিচয় নিজেও পেলুম পূজোর বিধিব্যবস্থা দেখে। তিন দিন ধরে মহাসমারোহে এঁদের উৎসব চল্‌ল। এ তিন দিন ছোট বড় জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল দর্শককেই মিষ্টিমুখ করানো হয়। নবমীর দিন সকল বাঙালী একসঙ্গে ব'সে পংক্তি-ভোজন করেন—এ নিমন্ত্রণ থেকে মেয়েরাও বাদ পড়েন না। এবার এই উপলক্ষে দু'দিন নাটক হয়েছিল। অনেকের বাংলা উচ্চারণের ভেতরেও দেখ্‌লুম বিদেশী টান এসে পড়েছে। জিনিসটা একটু নতুন ধরণের। হাসি এল; কিন্তু শুন্‌তেও নেহাৎ মন্দ লাগল না। দেবী-প্রতিমার বেশভূষা সমস্তই বাংলা দেশের মতো; কিন্তু মুখের ধাঁচে বাঙালী মূর্ত্তির ছাপ নেই। প্রতিমার একটা ফটো তোলা হয়েছিল,—ছাপিয়ে দিলুম। তার থেকেই মূর্ত্তির নমুনা কতকটা পাওয়া যাবে।



জ্বালানি-কাঠ-বিক্রেতা

বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। স্থানীয় সমস্ত বাঙালীই এই শোভাযাত্রাতে যোগদান করেন। এবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে বন্যা সমস্ত ভারতে কূল ছাপিয়ে জেগে উঠেছে, দেরাদুনও দেখ্‌লুম তার ঢেউ থেকে মুক্তি পায়নি। এখানের মুসলমানেরা বায়না ধরেছে, মস্‌জেদের সাম্‌নে বাজনা বাজাতে দেওয়া হবে না। শোভাযাত্রার রাস্তা মসজিদের পাশ দিয়েই ছিল; সুতরাং একটা দাঙ্গার আশঙ্কা যে না ছিল তাও নয়। তাই দশ বৎসরের কম যাদের বয়স এবার তাদিগকে বিশেষ ভাবে শোভাযাত্রীদের দল হ'তে বর্জ্জন করা হয়েছিল। পথের মাঝে রামলীলার 'প্রসেসন" এসে বাঙালীদের সঙ্গে যোগ দিলে। সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বিক্ষুব্ধ প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সেই জনতা তখন মস্‌জেদের সুমুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে নাম কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে চলে গেল।

প্রতিমা প্রতি বৎসর রামেশ্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ দীঘিতেই ডুবানো হয়। দীঘিটি বেশ বড়। বিসর্জ্জন দেখ্‌বার জন্য এর চারধারের বাড়ীর ছাদগুলো দেখ্‌লুম নারীমূর্ত্তিতে ভ'রে গেছে। রাস্তায় এত ভিড় যে এক জায়গায় স্থির হ'য়ে একমুহূর্ত্ত দাঁড়ানো যায় না। কোনো রকমে প্রতিমার কাছে একটু যায়গা ক'রে নিয়ে দীঘির ধারে দাঁড়ালুম। মোহান্ত রামলীলার জন্য যে সব আতসবাজী ও ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রদর্শনী চল্‌তে লাগল। দৃশ্যগুলির ভেতর একটা জিনিস বেশ উপভোগ্য ছিল।

তার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি। দৃশ্যটির বিষয় ছিল রামের লঙ্কা অধিকার। দীঘির ভেতর এক-খানা ঘর তুলে লঙ্কাদ্বীপ তৈরী করা হয়েছে। পার থেকে সেই লঙ্কা পর্য্যন্ত কাঠ দিয়ে সেতু বাঁধা। রাম সীতা-উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁর বানর কটক নিয়ে সেতু পেরিয়ে সেই ঘরটার কাছে এসে তাঁবু ফেল্‌লেন। হনুমান তার লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়ে এল। দাউ দাউ ক'রে ঘরটা জ্বলে উঠ্‌ল। কতকগুলো পট্‌কা ফুটে' ঘর-পোড়ানোর কাজটা আরও একটু ঘোরালো ক'রে তুল্‌লে। তারপর সীতাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে রামচন্দ্র সেই সেতু দিয়ে দীঘি ক'রে নিয়ে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘাড় ধ'রে পরের হাতে তুলে দেয়নি। লোকগুলোর পরিশ্রম করবার শক্তিও বেশ। গায়ে মাংস খুব বেশী নেই; কিন্তু জোর যথেষ্টই আছে। কুলী-মজুর শ্রেণীর লোকদের শক্তি দেখ্‌লে তো অবাক্ হ'তে হয়। দু'মণী, আড়াই-মণী বোঝা হাজার দু'হাজার ফিট উঁচু চড়াই এরা অনায়াসেই ঘাড়ে ক'রে তুলে নিয়ে যায়। বিলাতী সভ্যতার খপ্পরে প'ড়ে সিগারেট এরা প্রায় সকলেই ধরেছে; কিন্তু বিলাতী সভ্যতার আর একটা জিনিস এখনও এদের কাছে পৌঁছয়নি। এরা এখনও যথেষ্ট সরল আছে; এবং মনের ভেতর হ'তে লোভটাকেও ঠেকিয়ে রেখেছে।



মুশৌরী পাহাড় হইতে চির-স্থায়ী বরফ-স্তূপের দৃশ্য

পেরিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। রামলীলার এই Practical demonstrationটা সত্যই ভারি চমৎকার হ'য়েছিল। রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে আমরাও যে-যার বাড়ীতে ফিরে গেলুম।

বাংলার দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্ত্তি সেখানে একদিনও চোখে পড়েনি। হয় তো সহর ব'লেই পড়েনি, পল্লী হ'লে পড়্‌ত। কিন্তু তাহ'লেও এখানকার সাধারণ অবস্থা ভালো হবারই কথা। কারণ স্থানীয় লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে ব্যবসার ক্ষেত্রগুলি জুড়ে' ব'সে আছে—চাকুরীকে সম্বল একটা কুলীকে ডেকে কোনো জিনিস দিয়ে ঠিকানা দিয়ে দাও—ঠিক পৌঁছে দেবে,—যত দামী জিনিসই হোক্ না কেন নিয়ে পালিয়ে যাবে না। পালিয়ে যাবার সুবিধে নেই ব'লে যে এরা সাধু তা নয়। চারদিকেই পাহাড়, পালিয়ে গেলে ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কিন্তু এদের স্বভাব-সুলভ সাধুতাই এই সব দুষ্কার্য্য হ'তে এদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে ইউরোপীয় সভ্যতা যে মাত্রায় এদের ভেতরেও ঢুকে পড়্‌ছে, তাতে এ অভ্যাস আর দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়।

খাবার জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই এখানে কলকাতা হ'তে সস্তা। খাঁটি দুধ টাকায় চার সের মেলে। খাঁটি ঘির সের ১৸৹। আটা টাকায় সাত আট সের। কেবল চালের দর বেজায় চড়া। ভালো চালের মণ ১৪৷১৫ টাকার কম নয়। কিন্তু সে চালও ভারি উৎকৃষ্ট—যেমন সরু তেমনি সুগন্ধি। তেমন চাল বাংলায় সাধারণতঃ পাওয়াই যায় না; এবং পাওয়া গেলেও ১৭৷১৮ টাকার কম তার মণ বিকাবার সম্ভাবনা নেই।

সহরটা ভারি ফাঁকা। দূরে দূরে পাহাড় এবং খোলা মাঠে তার শোভা ভারি চমৎকার খুলেছে। প্যারেডের মাঠে দাঁড়িয়ে একদিন রাত্রিতে তার যে সৌন্দর্য্য দেখেছিলুম, সে কখনো ভোল্‌বার নয়। সে যেন স্বপ্নে ভেসে আসা রূপের বন্যা। চাঁদের জ্যোৎস্নার ধারা ঢেউএর ওপর ঢেউ তুলে, আকাশ ছাপিয়ে, বনের বুক ভাসিয়ে, মনের ওপর ঢলের মতো করে নেমে পড়েছে। দূরে মুশৌরীর পাহাড়ের ওপর লক্ষ দীপের মালা—স্থির উজ্জ্বল; যেন তারার দল আকাশ ছেড়ে পৃথিবীর পানে খানিকটা নেমে এসে থেমে গেছে। পাহাড়ের স্তূপগুলো জ্যোৎস্নার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে অপূর্ব্ব এক মায়ালোকের রচনা করেছে। নগরের সজ্জিত সৌন্দর্য্যের ওপর প্রকৃতির অসজ্জিত সৌন্দর্য্যের জয়ের সে এক অপূর্ব্ব নিশানা! এই জয়ের পরিচয় দেরাদূনের দূরে কাছে আরো অনেক জায়গায় পেয়েছি। পাহাড়ের বুকে, বনের অন্তরালে, ঝরণার ধারে ধারে তার অজস্র ছাপ ছড়িয়ে পড়ে আছে। গুচ্ছপানি, সহস্রধারা, মুশৌরী, নালাপানির পাহাড়, কালসী মসি ও কেম্‌তি জলপ্রপাত প্রভৃতির অপরূপ রূপ দেখেছি, আর মনে হ'য়েছে, মানুষের সৌন্দর্য্যের কল্পনা কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ,—তার সৌন্দর্য্য রচনার শক্তি কত পরিমিত।

দ্বন্দ্ব

শ্রী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৫

ড্রয়িংরুমে কৌচের উপর কুশনে মুখ ঢাকিয়া লীলা পড়িয়া ছিল; কিরণ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

অনিবার্য্য হৃদয়ের আবেগে সে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। অরুণের নিকট সে যে কিরূপে এতক্ষণ সহজ ও সংযত ভাবে কথা কহিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইতেছিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বের আকাশ ধীরে ধীরে রঙিন আলোর আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিল। বাগানের উচ্চশীর্ষ বৃক্ষগুলি তখন আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্য হইতে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমগাছের ঘন পাতার ফাঁকের মধ্যে বসিয়া একটা কোকিল কেবলই অশ্রান্তভাবে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখনো অন্যান্য পাখীরা জাগিয়া তাহাদের প্রভাতের সঙ্গীতে যোগ দেয় নাই।

গভীর বিষাদে অবসন্ন ও মুহ্যমান হৃদয়ে কিরণ কিছুক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। লীলার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তাহাদের উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অরুণের উপস্থিতি, তাহার ফলে তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ—সমস্তই যেন আলোকচিত্রের দৃশ্যাবলীর মত একে একে তাহার মনশ্চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লীলার সহিত তাহার বিচ্ছেদের ফলে সে নিশিদিন কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছে, সে কথা কিরণের মনে পড়িল। সেই সামান্য অল্পদিনের ঝগড়ার ফলে লীলা হইতে অন্তরে থাকিয়া সে কিরূপে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়াছিল, কেমন করিয়া সংসারের সকল শোভা-সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ-উৎসব তাহার চোখের উপর হইতে নীরস হইয়া নিবিয়া গিয়াছিল, সে সব কথা আবার নূতন করিয়া মনে পড়িল। সেদিন তবু আশা ছিল, যেমন

করিয়াই হোক, সে লীলাকে ফিরাইবে, এ ভুল তাহাকে সে কোনদিন করিতে দিবে না; তাহার লীলা আবার একদিন তাহারই হইবে। কিন্তু আজ? আজ আর লীলাকে ফিরিয়া পাইবার কোন আশাই রহিল না; আজ সে নিজের হাতে লীলাকে অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া সকল আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া আসিয়াছে। যে তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল, আজ সে তাহার কাছে পরস্ত্রী—বন্ধুর পত্নী! ইহার পর আর তাহার কাঁদিয়া ফল কি?

মর্ম্মাহত হৃদয়ে কিরণ একবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। লীলা তখনো তেমনি নির্ব্বাকভাবে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল। নিস্তব্ধ রোদনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে এক একবার তাহার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

কল্যাণপুরের মহারাজার বাড়ীর উৎসবের দিন সেই উজ্জ্বল আলোকমালাভূষিত, বহুজনাকীর্ণ আনন্দ ও শোভা-ময়ী রজনীর কথা কিরণের মনে পড়িয়া গেল। সেদিনও লীলা সেই প্রমোদ-গৃহের অসংখ্য আমোদ-আহ্লাদের সব সুযোগ উপেক্ষা করিয়া আজিকার মত এমনিই একান্তে বসিয়া এমনি নীরবে কাঁদিয়াছিল! কিরণ তাহার উপর রাগ করিয়াছিল, সে সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিতে পারে নাই। কিরণ অভিমান করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে ছিল, সে সেই ব্যথায় অধীর হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিল। আর আজ? আজ কিরণ স্ব-ইচ্ছায় তাহার সহিত সব সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! আজ এ দুঃসহ বেদনা হইতে লীলাকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই নাই! এমনি নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পূর্ণ করিয়া, এমনি দুঃসহ ব্যথা অন্তরে চাপিয়া, এই ভাবে লীলা জীবন কাটাইতে বাধ্য হইবে; তাহার জন্য কিরণের কিছুই করিবার উপায় নাই! লীলার সহিত সকল সম্বন্ধই তাহার মুছিয়া গেল!

বহুক্ষণ পরে কিরণ হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া লীলার কম্পিত কোমল হাত দুটি ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—আমি ভেবে দেখলুম, অরুণকে তোমার ছাড়বার কোন উপায় নেই লিলি! সে বড় দুঃখী, বড় অসহায়! তুমি না হলে চলবে না তার!

'আমি যখনই তার কথা শুনেছি তখনই জানি।'

কিরণ বলিল—এর পরে আর আমার কিছু বলবার নেই! এখন থেকে তুমি আমায় তোমার প্রকৃত বন্ধুর মত, বড় ভাইয়ের মত মনে করো। আমি এবং আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার—যতদিন আমি বেঁচে থাকবো আমায় এইভাবে মনে রেখো! মনে থাকবে ত?

লীলা বিদীর্ণ হৃদয়ে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল!

—যদি কখনো কষ্ট পাও, যদি কোনদিন জীবনে বিপদে পড়, আমি যত দূরেই থাকি, আমায় খবর দিও! কোন দিন এ কথা ভুলে যেও না। আমি দূরে থাকলেও, জেনো, প্রয়োজনের দিনে আমি তোমার পাশেই চিরদিন আছি।

লীলা কষ্টে বল সঞ্চয় করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, সে কথা আমি খুব ভাল করেই জানি কিরণ!

কিরণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! একদিন লীলা নিজেকে কিরণের প্রতি অনুরক্ত জানিয়াও, নিজের ন্যায়নিষ্ঠ চিত্তের সততা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, কিরণের সমস্ত অনুনয় বিনয় যুক্তি উপেক্ষা করিয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়াছিল; কিরণের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আশা সবই এতদিন নিষ্ফল হইতে চলিয়াছিল। যেদিন লীলা নিজে হইতে গিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিল, সেই দিনই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া এ ঘটনার সব দিকই নির্ম্মূল করিয়া দিল! নদীর মধ্যপথে বিস্তর ঝড় তুফান কাটাইয়া আনিয়া তীরের কাছে আসিয়া ভরা ডুবি হইয়া গেল!

'অরুণ বড় হতভাগ্য; আমার চেয়ে তারি তোমাকে দরকার বেশি! কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা করো! তাকে সুখী করবার জন্য চেষ্টা করো! আমি জানি, কেবল তুমিই তাকে সুখী করতে পার্ব্বে!

লীলা বলিল—আমি তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবো!

বিদায়, তবে লীলা! এখন কিছুদিনের মত বিদায়!

লীলা অশ্রুর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার কুশনের উপর লুটাইয়া পড়িল!

ঊষার অস্পষ্ট ধূসর আলোক-রেখার মধ্য দিয়া কিরণ মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

পরদিন যখন অরুণ নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। শরীর ও মনের একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া সে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল!

সে জাগিয়া উঠিয়াই প্রতিদিনের অভ্যাসমত লাফাইয়া

বিছানা হইতে নামিতে গেল ; কিন্তু তখনি তাহার পূর্ব্বদিনের সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িয়া গেল ! সে জানিল, এ জীবনে সে আর কোন দিনই চোখে দেখিতে পাইবে না।

বাগান হইতে পাখীদের সুমিষ্ট কলরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল ; নানা পরিচিত গৃহকর্ম্মের শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ ; জানলা হইতে রৌদ্রের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে—সে সবই অনুভবে বুঝিল, সবই জানিল—কিন্তু সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না ! এই শয্যা যদি তাহার মৃত্যুশয্যা হইত, তাহা হইলে হয় তো সে মনে শান্তি পাইত !

মর্ম্মান্তিক বেদনায় ও নিরাশায় সে আবার অবসন্ন দেহে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল ! তাহার সমস্ত অবস্থা নিমেষের মধ্যে তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। আবার উঠিয়া নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করিতে আর তাহার কোন উৎসাহ রহিল না !

এক সময় তাহার আশা ছিল, নষ্টদৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসিতেও পারে, কিন্তু এবার আর তাহার কোন আশাই নাই !

যাহাতে এ দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য তাহাকে যথেষ্ট সতর্ক করা হইয়াছিল ; কিন্তু যে সময় তাহার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। ফলে চিরদিনের জন্য আবার সে অন্ধ হইয়া গেল।

এখন আবার তাহার সেই পূর্ব্বের অসহায় অবস্থা। সকল বিষয়ে সকল কাযে চিরদিন অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। একবার অন্ধত্বের সমুদায় দুঃখ জানিয়া, ভোগ করিয়া, দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া—আবার সেই দুঃখে পড়া দ্বিগুণ অসহনীয় যাতনা। যৌবনের সকল শক্তি, উৎসাহ, কর্ম্মদক্ষতা—সব থাকা সত্ত্বেও, এই অসহায় অকর্ম্মণ্য জীবন কত কত দীর্ঘ দিন বহন করিতে হইবে ! জীবনে তাহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে !

তাহার অন্ধত্ব আজিকার মত আর কোনদিন এত দুঃখময়, এত হতাশায় পূর্ণ বলিয়া মনে হয় নাই ! লীলা তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নী ; সে হয় ত তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিবে ; কিন্তু সে কি শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরেই নয় ? যেখানে ভালবাসার জন্য হৃদয় জলিয়া যাইতেছে, সেখানে নীরস কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় কে প্রাণে শান্তি পাইতে পারে ? এ চিন্তা ছুরির মত তাহার হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল ! তাহার নিজের প্রয়োজন ও সুবিধার জন্য কেন আর অন্য একজনের জীবন সে নষ্ট করিবে ? তাহার আর এ জগতে কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই ! এবারের মত তাহার সবই ফুরাইয়াছে !

একজন ভৃত্য চা ও খাদ্যপূর্ণ ট্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, কিন্তু অরুণ আর সে দিকে মনোযোগ দিল না !

ভৃত্য চলিয়া গেলে, সে যখন আবার আহত হৃদয়ে ও অকথ্য নিরাশার সাগরে মগ্ন হইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, লীলা সেই সময় আসিয়া বাহির হইতে তাহার দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল – অরুণ ! অরুণ !

সেই পরিচিত সুমিষ্ট স্বরে অরুণের মনের কুয়াসা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল ! অবাধ প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল ! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার তাহার মনে পড়িল, লীলার প্রিয় সুন্দর মুখ, তাহার সেই উজ্জ্বল হাস্যময় চক্ষু সে আর কখনও দেখিবে না !

অরুণ ! এত বেলা হলো, এখনো তুমি ওঠো নি ? লীলা আবার বাহির হইতে তাহাকে ডাকিল।

আমি আজ বড় কুড়ে হয়ে গেছি—লীলা ! অরুণ তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিতে নামিতে বলিল।

এখনো বিছানায় ? বেশ যা হোক্ ! আমি ভিতরে যাব ? লীলার এই প্রেম ও মাধুর্য্যে ভরা হৃদয়ের পরিচয়ে অরুণের মনে হইল—তাহার অন্ধকার জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল ! তাহার হতাশ জীবনে আবার আশার সঞ্চার হইল !

ভিতরে এসো—লীলা ! বলিবার পরই অরুণ লীলার ঢাকাই শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। খাটের কাছে আসিয়া সে শব্দ থামিতেই অরুণ হাতড়াইয়া হাত বাড়াইল।

লীলা তাহার হাত ধরিল—একটি কোমল বাহু তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া তাহার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া আনিল। স্নেহ ও আদরভরা সুরে লীলা বলিল—আবার না কি তুমি অনিয়ম করে এই কাণ্ড বাধিয়েছ ? যাহোক, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না ! আমরা দুজনে ঠিক আগের মতই সমান আনন্দে সময় কাটাব ! কেমন ?

অরুণ কোন কথা বলিতে পারিল না ! আনন্দে তাহার

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল! সে অবশভাবে লীলার কাঁধে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল!

লীলা তাহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার জন্য বলিল—একটা ভাল খবর শুনেছ? আজ সকালে উঠে মায়ের কাছে শুনলুম, হপ্তার শেষে আমাদের বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে। তার পরে আমরা আমাদের বাড়ী যাব! তুমি অনেক দিন ধরে বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছ! বাড়ী যেতে তোমার খুব ইচ্ছা করে—নয়?

অরুণ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিল—তোমার সঙ্গে আমি যেখানেই থাকি, সে আমার কাছে স্বর্গ।

তাহার অন্তর তখন অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ভরিয়া উঠিতেছিল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন অশথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

[গাছটী বহু প্রাচীন, অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশঃ অজয় সরিয়া আসে। গাছটী প্রতিষ্ঠা-করা; সেইজন্য লোকের ভালবাসা ও ভক্তির পাত্র ছিল। অল্পদিন হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।]

গুল্ম তৃণের রাজ্যে একাকী
উচ্চে তুলিয়া শির,
প্রথম নমিলে প্রভাত-সূর্য্যে
সপ্ত শতাব্দীর।
ঊষর ভূমিতে এলো শ্যামলিমা,
এলো ছায়া সুশীতল,
এলো ভ্রমরের মধু-গুঞ্জন,
বিহগের কলকল।
প্রথম তোমায় দেখিয়া কেহই
পায়নি তখনো টের,
তুমিই বহাবে মরুর মাঝারে
জোয়ার বসন্তের।
শাখে শাখে হল পাখীদের বাসা,
তলে বিশ্রাম বেদী,
দেশের চক্ষু দেখে বিস্ময়ে
আকৃতি অভ্রভেদী।
বরষের পর বরষ করিলে
আলো ছায়া লয়ে খেলা,
পাপিয়া পিকের কাকলী শুনিলে,
সন্ধ্যা-সকাল বেলা।
দুপুরে বাজিত রাখালের বেণু,
জুটিত পথিক কত,
কৃষক-শিশুর সোহাগ চলিত
নৃত্য অসংযত।
মন্বন্তর কতই সহেছ,
ভীম ঝঞ্ঝার কোপ,
ক্ষুধিত বিদেশী পঙ্গপালের
দারুণ উপদ্রব।
নবাবের হাতী ভাঙ্গিয়াছে ডাল
তলায় যেপেছে রাত,
হীন কাঠুরিয়া অঙ্গে করেছে
গোপনে কুঠারাঘাত।
সাধু সন্ন্যাসী তব পাদমূলে
জ্বালায়েছে কত ধুনী,
বিশাল ছায়ায় পেলে আশ্রয়
ফণির সঙ্গে খুনী।
তব মমতার মুক্ত সত্রে
অবারিত ছিল দ্বার,
বাছিত না হায় শত্রু মিত্র
হৃদয় মহাত্মার।
গ্রামের বৃদ্ধ পিতামহদের
বৃদ্ধ প্রপিতামহ,
তোমার তলায় শিবিকা নামানো
বরণের বধূ সহ।

টোডরমলের জরিপী আমিন
নিশান গেড়েছে তলে,
নিম্ন শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়াছে
নিঠুর বর্গী দলে।
অদূর মেদুর 'কেঁদুলীর' হাওয়া
বুকে লেগেছিল ঠিক,
শ্রীচৈতন্য বাবা নানকের
তুমি সমসাময়িক।
চলে গেছ তুমি ধূ ধূ প্রান্তর
ধূ ধূ করে অনিবার ;
চারি দিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ষ
দীনতা বাড়ায় তার।
আছে ঝটিকার প্রবল স্বনন
রোদের তীব্র জ্বালা,
নাহি আর নাই ধূসর বেলায়
তোমার ধর্ম্মশালা।

যাও তরু তুমি—তোমার লাগিয়া
ঝরে পড়ে আঁখি-নীর ;
যাও মঙ্গল চামর ছত্র
কানন রাজশ্রীর।
যাও তাপিতের দয়াল বন্ধু,
সবল সরল প্রাণ ;
যাও অতীতের স্তম্ভ অরুণ
প্রকৃতির মহাদান।
যাও সুন্দর সাক্ষী সুহৃদ
চিরবরেণ্য ধন,
যাও মহাযোগী, যাও আশুতোষ,
হে চিত্তরঞ্জন।
তরুর মধ্যে অশ্বথ যিনি
বড় যাঁর কেহ নাই—
তাঁরি সাথে তুমি মিশে যাও পুন
তাঁরি বুকে হ'ক ঠাঁই

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬২

জগতে একটা কিছু লইয়া থাকা। কখন কি যে সেই "একটা-কিছু" হইয়া দাঁড়ায়—তাহার স্থিরতা নাই।

গণেন বাবু তিন বৎসর নানা অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া—আজ দেশে যাইতেছেন। আমরাও ফিরিবার আসামী ;—মনটা সকাল থেকেই উদাস। বুঝিলাম—গণেনবাবুই সম্প্রতি আমাদের সেই "একটা-কিছু" ছিলেন।

আমাদের বাসা আর ধর্ম্মশালা - ইষ্টেসনের পশ্চাতেই, একটা রাস্তার ব্যবধান মাত্র। ট্রেন্ এখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং তাড়া ছিল না।

বাসায় কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলাম না,—ধর্ম্মশালায় গেলাম। দেখি—তাঁরাও প্রস্তুত। এখনো আধ-ঘণ্টা সময় আছে, কিন্তু সকলেরই ভাব—এখানে আর কেনো, চলুন ইষ্টেসনেই যাই।

আজ আর কাহারও কথায় আগ্রহ দেখিলাম না। মালের মোট্ও নাই। নীরবেই সব বাহির হইয়া পড়িলাম।

জয়হরি দুর্গা দুর্গা বলিয়া অগ্রসর হইল। কথার মধ্যে শুনিলাম,—টিকিট্ কিনতে হবে।

ইষ্টেসনে গিয়াও সেই ভাব। গণেনবাবু একলা একান্তে অন্যমনস্ক ; জয়হরি দূরে দূরে—বগলে ছোট একটি বিছানার বাণ্ডিল, এক হাতে গলায়-দড়িবাঁধা একটি ভাঁড় ঝুলিতেছে, অন্য হাতে - মাঝারি একটি হাঁড়ি।

বীরেনের সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীরেন বাবুকে দেখছি না।"

"তিনি একটা কাজে গেছেন—একেবারে ইষ্টেসনেই আসবেন বলেছেন।"

জয়হরি ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিয়া বলিল—

"যশেডি পর্য্যন্তই যাই ;—গণেন-দাকে কলকেতার গাড়িতে বসিয়েই দিয়ে আসি,—ওঁরা আবার কি ভুলচুক করে ফেলবেন। কি বলেন।"

মনে মনে হাসিলাম,—ওঁদের চেয়ে হুঁসিয়ার লোক বটে! আমার এ সন্দেহটা ছিল। কিছুই বিচিত্র নয়—ভাবের ঝোঁকে নিজেও সেই গাড়িতে উঠিয়াও পড়িতে পারে।

যাক্, একটু বেড়ানও হবে। বলিলাম—তোমার আমার দুজনেরই রিটার্ন্-টিকিট্ নিও।

প্রসন্ন মুখে,—"আমি জানি—আপনি কি না গিয়ে"—বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া গেল।

ভিড় বাড়িতে লাগিল। একটু তফাতেই ছিলাম, দেখি কম্পাস্ টাউনের পার হইতে লাইনের উপর দিয়া—বিমলির-মা আসিয়া আমার সমুখেই উঠিল! সর্ব্বনাশ,—আবার কি ঘটায়!

আমাকে দেখিয়াই জোড়হাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"রক্ষা করো বাবা—আমি কিছু জানিনা ;—আমাকে এরা নিয়ে যাচ্ছে,—আমি চুরি করিনি বাবা, আমার কাছে তারা রাখতে দিয়েছিলো। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা।"

পা ধরে আর-কি!

পশ্চাত হইতে—খাকি কোট্-প্যাণ্ট পরা, হ্যাট্ মাথায় এক বলিষ্ঠ মূর্ত্তি ধমক্ দিয়া উঠিল,—"চুপ্ কর্, উনি আমাদের আপনার লোক,—ওঁর কাছে"—

মুহূর্ত্তে মুখ একদম মেঘ-মুক্ত! তখন তাড়াতাড়ি হাসিমুখে নিম্নকণ্ঠে বলে—"না বাবা—ও-সব মিছে কথা গো,—এখানে ওই রকম বলতে হয় কিনা! আমি যেমন,—হ্যাঃ—তুমি কি আর বোঝোনা! তা—এই এঁর কৃপায়,—প্রাতঃবাক্যে রাজা হোন্, চন্দর সুয্যির মত পেরমাই হোক্,—সেই খাসিখাগীর মুখ একেবারে আধ-পয়সানে ভিজেল-পারা করে দিয়েছেন! এই দেখনা—এই হার, এই টাকা, এই মাইনে! হুঁঃ—বাপ বাপ করে বের করে দিতে পথ পায় না।"

ঝুৎ করে সব পেট্-কাপড়ে বাঁধা!

আরো নিম্ন স্বরে—"মাগীর বায়োগণ্ডা বয়েস, হিঁদুর মেয়ে বলে,—ছ'টা করে মোল্লা পাখির ডিম্ খায় গো—থুঃ-থুঃ! আবার—টম্ টম্ লাগিয়ে চুল বাঁধে,—মরণ আর কি!" (বোধ হয়—পমেটম্ হবে।) "আহা বাবা—কি ভুলই করলে! আমার প্রাচিত্তির করবার টাকাটা যদি চাইতে বাবা,—মাগী সুড়সুড় করে বের করে দিত। এখনো"—

বীরেন বিরক্তভাবে বলিল—"চুপ চুপ।"

"হাঁ বাবা—তাইতো। যমের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে এনেছ, তাকি আমি এ জন্মে ভুলবো! না—তাই বলছিলুম,—তা থাকগে,—আমার আর কিছু চাইনা বাবা, কেবল গিয়ে যেন বিমলিকে আমার ভালো দেখি।"

এই বলিয়া আমাদের পদধূলি লইল,—অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, কতকটা স্তম্ভিতের মতই বীরেনের দিকে চাহিলাম। সে হাসি মুখে বলিল—"যশেডি পৌঁছে শুনবেন।"

শুনিবার সুযোগও হইত না।

ধূলি-ধূসরিত ক্যাম্বিসের ছেঁড়া জুতা জোড়াটির উপর ক্রুয়েল্টি করিতে করিতে দ্রুতবেগে অমর আসিয়া উপস্থিত!—

"বেশ লোক্ তো! আমি সাত-দেশ খুঁজে মরচি—বাসায় নেই, ধর্ম্মশালায় নেই,—এখানে যে বড়? তোমাদের কোনো কাজের হুঁস থাকে না!"

"গণেন বাবু আজ যাচ্ছেন"—

"কে গণেন বাবু?—সেই খয়রাতি খদ্দের?"

তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া তফাতে গেলাম। "কেনো? কে তিনি? বার্ণ কোম্পানীর ফোরম্যান্ না জেসপ কোম্পানীর বড় সাহেব যে, গাড়িতে তুলে দিতে আসতে হবে! তোমাদের যে সব বাড়াবাড়ি। মালদার?"

"না—শিক্ষিত ভদ্রলোক, বাঙ্গালী,—পীড়িতাবস্থায় বিদেশে"—

"আর বলতে হবেনা। অমন কত চাও? ওটা চিরকালই শুনে আসছি। ও পীড়িতাবস্থাটা তাঁর নয়—তোমাদের। বলনা—অমন অপয়া আসামী রোজ বিশজন হাজির করে দিচ্ছি,—সামলাবে? কেবল—বনের মোষ তাড়ানো!—দেশে গিয়ে করবেন কি,—চাকরির দরখাস্ত!"

"ওকালতি করবেন।"

"উকীল!"

একটু নীরব থাকিয়া,—"বেশ, ঠিকানাটা নিয়ে রেখ তো,—ভুলনা। আমার তো মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। উপকৃত লোক ত বটে। ওরা দুটো কথা কইলেই—দু'মুঠো চাই,—আমাদের ওপর যায়! আচ্ছা—পরে হবে,—এখন চলো—মন্ত্র দাও। তোমাকে মাইন্ড ষ্টীলের যে দর্ বাতলে দেবো, তুমি কেবল গম্ভীর ভাবে বলবে—"এখন কলকেতার বাজারে এই দর্ চলছে।" আর কিছু বলতে হবেনা। বলে এসেছি—দাঁ মশায়ের ভাই হাওয়া বদলাতে এসেছেন, আমার বিশেষ বন্ধু,—তাঁর মুখেই কলকেতার বাজার ওঠে-বসে।—আলাপ করবার জন্যে সকলেই উৎসুক। তুমি সেই দাঁ মশায়ের ভাই,—বুঝলে। এসো—তুমি গেলেই ফতে।"

সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিল! বলে কি!

"শুধু হাতে ফিরতে হবেনা,—বুঝলে? এমন কাজ শর্ম্মা করেন না। হাতে হাতে সাকার দেবতা!"

একমুখ বীভৎস হাসি—হিঃ হিঃ হিঃ!

বলিতেই হইল—"ভাই—আমাকে মাপ করো,—টিকিট কেনা হয়েছে—যশেডি পর্য্যন্ত যাচ্ছি।"

মানুষের মুখেই 'বিশ্বরূপ'। পলকে এমন পরিবর্ত্তন বোধ হয় মনেও সম্ভব নয়। চক্ষু নত করিতে হইল।

অমর মিনিটখানেক স্তম্ভিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"আমি তা জানতুম,—আচ্ছা চললুম।"

দুটি কথার শব্দকল্পদ্রুম!

"কিছু মনে ক'রনা ভাই",—কথা আর যোগাইল না!

যে কারণেই হউক, সে ফিকে হাসি হাসিয়া—"আমিই ভুল করছিলুম" বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। একবার পিছন ফিরিয়া বলিল—"উকিলের ঠিকানাটা।"

অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইষ্টেসনের গোলমাল কি ফার্ষ্ট বেল কানে পৌঁছে নাই।

সহসা গায়ে হাত পড়ায় চমকিয়া চাহিয়া দেখি ডাক্তারবাবু।—

"তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলেন,—গণেনবাবু কোথায়?"

জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"আসুন—গাড়ি যে ছাড়ে।"

ডাক্তারবাবু দোষীর মত বলিলেন—"আমার বড় দেরি হয়ে গেল,—এমন কাজ করি—ইচ্ছা সত্বেও কথা রাখতে পারিনা,—গণেনবাবু কই।"

"কি আর বলব—কথা কতটুকু প্রকাশ করতে পারে,—নীরবেই চললুম। কোথায় যে যাচ্ছি তাও জানিনা,—বাড়ীতে যাচ্চি কি বাড়ী থেকে যাচ্চি, তাও বুঝতে পারছিনা। একটি ভিক্ষা,—সংসার যদি থাকে,—অনাথের উপনয়ন দিতে যাবেন—পায়ের ধুলো যেন পাই।"

এইটুকু বলিয়া গণেনবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

"যাব বইকি—নিশ্চয়ই যাব" বলিতে বলিতে সেকেণ্ড বেল্ পড়িল। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে ওঠা গেল।

আমাকে গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনিও নাকি?"

"আজ এই যশেডি পর্য্যন্ত।"

বীরেন ও বন্ধু নমস্কার করিল।

"তাইত—তোমরাও—"

ট্রেন্ ছাড়িল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে;—সরে পড়—সরে পড়" বলিতে বলিতে ট্রেন্ প্ল্যাট্‌ফরম্ পার হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবু তখনো অন্যমনস্ক দাঁড়াইয়া।

দুনিয়ার ছাড়াছাড়িটে—নিত্য এবং এই রকমই।

৬৩

কেহ যেন কাহারো পরিচিত নহি—এইভাবে গাড়ির বাহিরে চাহিয়া পথ কাটিল।

খোলা মাঠ, সুনীল আকাশ কি সুদূর পাহাড় যে কেহ উপভোগ করিতেছিলাম তাহাও নহে। মানুষের মনটা কি দুর্ব্বল!

যশেডিতে নামিয়া কথা ফুটিল। বীরেন বলিল—"এই নিরাভরণ দেশটা এত ভালো লাগে যে কেনো—বুঝতে পারিনা।"

বলিলাম—"বাধা কম্, ফাঁক্ বেশি, চোখ কি মন ধাক্কা পায় না। প্রকৃতি এখানে অবাধ ছাড়-পত্র দিয়ে রেখেছেন। এই স্থানগুলাই—হাঁপছেড়ে বাঁচবার জায়গা। ভেবনা,—বড় বড়দের যখন নেক্ নজর পড়েছে—এও 'বড়বাজার' বনে যাবে। সিভিলিজেসন্ এ-সব সইতে পারেনা,—এ ফাঁক্ বুজিয়ে দেবে। এখন যে-হাওয়াটা গায়ে লাগলে, এ বয়সেও একটা অব্যক্ত স্ফূর্ত্তি এনে দেয়—বল্ যোগায়,—প্রকৃতির ঐ

উলঙ্গ বালকদের সঙ্গে, ছুটে গিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে হয়,—তখন 'সোফায়' শুয়ে যুবকেরা বিজলী-বাতাস খাবে আর ইঞ্জেক্‌সন্ নেবে। প্রকৃতির এ দৃশ্যটা হটে তখন পটে গিয়ে দাঁড়াবে।"

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা ছিলনা। মনে হইল—কি কতকগুলা অবান্তর বকিয়া যাইতেছি। চুপ করিলাম।

গণেনবাবু উদাস ভাবে বলিলেন—

"হ্যাঁ—ঠিক্‌ই বলেছেন, সহর মানেই তাই—স্বভাবের অভাব!"

"আমি বলছিনা গণেনবাবু,—সিভিলিজেসন্ বলছে।"

গণেনবাবুর মুখে একটু হাসির রং না-ধরতেই মিলিয়ে গেল!

বীরেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কই—বিম্‌লির মার কথাটা যে শোনা হলনা।"

বীরেন হাসিয়া বলিল—"সে আর কি শুনবেন, আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হয়নি,—সব বাহাদুরিটাই ওর। যা যা বলে দিয়েছিলুম তার এমন নিখুঁৎ অভিনয় করেছে—দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছি!—

"সে-বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে গিন্নির এক বিলিতি-ফ্রেম্-আঁটা ব্রাদার থাকেন। তাঁর খাকি হাপ্ প্যাণ্ট—খাকি সার্টের আধখানা গিলে রয়েছে, নীল রংয়ের 'টাই' ঝুলছে, আস্তিন কনুয়ের ওপর গোটানো। কামার মুড়ির আশায় পাঁটার সামনের পা ঘেঁশে কোপ মারে, নাপিত যে কি আশায় ঘাড়ের চুলে ঝেড়ে কোপ্ চালিয়েছে জানিনা। তাতে ঘাড়ের শির দুটো যেন কোল্-হিলে স্বইচ-ব্যাক্ রেল পাতার মত সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসে 'ইংলিস ম্যান্' দেখছিলেন।—

"বিমলির মা পাশের ঘর পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ঝাঁটা ফেলে—সাহেবের পা দুটো ধরে—"দাদাবাবু আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমাদের আশ্রিতা,—ভালোমানুষের মেয়ে, দুঃখী বলে—চোর নই। ওকে বলো এখানে কেউ নেই।" এই বলেই বাড়ীর মধ্যে দ্রুত পলায়ন,—একদম গিন্নির খাটের নীচে!—

"সাহেব হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—ব্যাপার কি! আমিও হাজির। বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনতে পাচ্ছি—"আমাকে রক্ষে করো মা—আমি চুরি করিনি, আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলো। ওগো কেনো মরতে রেখেছিলুম, কেনো ভালো করতে গিছলুম! তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচাও,—চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাকবো মা। তুমি ওকে বলে দাও এখানে কেউ নেই।" ইত্যাদি—

"আড়োংছাটা সাহেব ভ্রাতা ভ্রূ কুঁচকে আমাকে বললেন—"কে আপনি—কাকে খোঁজেন?"—

ভাবটা—"চলা যাও"।

বললুম—"ব্যাটরা থেকে আসছি। মানদা বলে একটি বিধবা স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ী কাজ করত',—তাকে গ্রামের সবাই বিমলির-মা বলেই ডাকে। সাত মাস হ'ল সে আমার ভগ্নীর হার আর পঁচিশ টাকা নগদ নিয়ে ফেরার হয়েছে। হার-ছড়াটি ভগ্নীর শ্বশুরদের দেওয়া জিনিস।—

"খুঁজে হায়রাণ হয়ে শেষ খবর পেলুম—আপনাদের সঙ্গে পালিয়ে এসে এখানে আছে। ধর্ম্মশালায় থেকে—সন্ধান নিচ্ছিলুম। কাল তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে সঙ্গ নিয়ে এই 'সদনে' ঢুকতে দেখে যাই।

"সে যদি স্বমানে হার আর টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আসে,—বাবা তাকে মাপ করবেন বলেছেন। নচেৎ আমি পুলিসের মার্ফৎ যা করবার করতে বাধ্য হব। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনাদের—সম্ভবতঃ মহিলাদের, কোর্ট পর্য্যন্ত যেতে হয়। বিমলির-মা আমাকে চেনে,—তার কোনো ভয় নেই। সে যদি আমার সঙ্গে গিয়ে বাবার কাছে মাপ চায়, আমি বলছি—তাকে জেলে যেতে হবে না। এখন আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন।"

"গিন্নি পাশের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—সকল কথাই শুনেছেন। ব্রাদারকে ডেকে বললেন,—অবশ্য আমি যাতে শুনতে পাই এমন মৃদুকণ্ঠে,—"কবে মরবো—কেবল তাই জানি না! বরাবর বলে আসছি—মাগী চোর, তা না তো মাইনে দিতে গেলে নেয় না, বলে—থাক্, রাজার বাড়ীতে আছি—মাইনের ভাবনা! থাক্—এর পর একসঙ্গে দিও—তোমাদের কৃপায় জগবন্ধু দর্শন হয়ে যাবে।" মিচ্‌কেপোড়া মাগি—তোর জগবন্ধু জেলে বসে আছে, দেখে আয়! তাই তো বলি,—বলিনি 'ডিক্'—মেয়েমানুষের এতো চিটি আসে কোথা থেকে! আবার—পড়েই পুড়িয়ে ফেলে! ভালো মানুষে কে কোথায় আবার চিটি পোড়ায়!—

—"আমার মন কিন্তু বলে দিত—কাজ ভালো হচ্ছে না।

কর্ত্তা যে আমাকে বলেন—তোমাকে দয়াতেই খেয়েছে, তা ঠিক্। এই তো সাপ পোষা হচ্ছিলো।

'আয় তো ডিক্, ও পাপ এখুনি বিদেয় করে' দে ভাই,—খাটের নীচে কাঁদছে আর কাঁপছে—বেরুবে না। উনি বলেন—নিষ্পাপ মনে সব পষ্ট পষ্ট দেখা দেয়, আমি পষ্টাপষ্টি জেনে শুনেই নিজে মরেছি, দয়াই আমার শত্তুর। বাবা তাই করুণাময়ী নাম রেখেছিলেন—মুখে আগুন করুণাময়ীর! আয় ডিক্—পাপ বিদেয় কর্ ভাই।"

বললুম—আপনারা যে রকম ভদ্রলোক দেখছি,—ওর পাই পয়সা হিসেব করে চুকিয়ে বিদেয় করে দিন,—আমি সাক্ষী রইলুম। মাগী না কোনো ছুতোয় কোর্টে কি কোথাও আপনাদের নাম করতে পারে, ওদের বিশ্বাস নেই। আমি চাই না—আপনাদের আদালতে টানাটানি হয়। যা দেবেন—ওর হাতেই দিন, আমি বামাল সুদ্ধু নিয়ে যেতে চাই,—তা হলেই আপনারা খোলসা।"

"এক্ষুনি বাবা এক্ষুনি।"

"তার পর বিমলির-মার কি কান্না আর পায়ে ধরাধরি! কিছুতে আসবেনা—করুণাময়ীর পা ছাড়বে না! অনেক আশ্বাস আর অভয় দিয়ে বার্ করে আনি।

তখন—"এই হার, এই সাত মাসের মাইনে—সাত সাত্তে বুঝি উনোপঞ্চাশ হয়, আবার বাবা এ জন্মে হিসেব এলোনা—এই পুরো পঞ্চাশই দিলুম,—আর ও যা তেইশ টাকা রেখেছিল। তুমি বলছো পঁচিশ,বলতো তাইদি,—পাপ ছাড়লে যে বাঁচি! এ ধম্মের ঘরে আর কতদিন থাকবে!

বললুম—"তা কেনো দেবেন—ওর তো টাকা রয়েছে,—আপনি অত' হাবা কেনো!

মৃদুহাস্যে বললেন—"উনিও ওই কথাই বলেন! বাবা যে মস্তো মোক্তার ছিলেন, মথুর বাবুর নাম শোনোনি বাবা,—টাকার তো হিসেব ছিলনা। ইত্যাদি

"বিমলির মা সে সব আঁচলে বাঁধে আর কাঁদে—বলে এসব আমার কিচ্ছু কাজ নেই—আমাকে জেলে দিওনা।"

ইত্যাদি অনেক কাণ্ড আর অনেক কথার পর—দ্রুত ইষ্টেসন মুখো হই। বেরিয়ে এসে একটা মোড় ফিরেই—আবার তার কি হাসি! বলে—"মাগী যেমন কুকুর তেমনি মুগুর তুমি বাবা! হুলো-মুগী আমার হার হজম করবে,—হার তো আর খাসীর মাংস নয়লো রাক্কুসি!"

"তার পর পাগলের মত হাসি আর পায়ের ধুলো নেওয়া। এইভাবে ইষ্টেসনে এসেছি। এখন ওকে ওর মেয়ের কাছে পৌছে দিয়ে ছুটি।"

নির্ব্বাক অপলক বীরেনকে দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনের উপর দ্রুত বহিয়া চলিল!

গণেনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মানুষই তাঁর চরম সৃষ্টি! একাধারে দেব-দানবের এমন সংমিশ্রণ, এমন স্ফুরণ আর কিছুতে নাই।

জয়হরি একটু দূরে দূরেই থাকিতেছিল; হঠাৎ নিকটে আসিয়া বলিল—"গাড়ি এসে গেল।"

সত্যইত। বীরেন বিমলির-মাকে মেয়েগাড়িতে বসাইয়া দিতে গেল।

গণেনবাবু প্রণাম করিলেন, বলিলেন—"কোথায় যাচ্ছি জানিনা,—আশীর্ব্বাদ করুন"—

বলিলাম—'সেটা ভগবানের কাছ থেকে এসে গেছে। আপনি তাঁর ইচ্ছাতেই বন্ধুর ডাকে যাচ্ছেন—সর্ব্বাগ্রে তাঁর কাছেই যাবেন। সেখানে দু-এক দিন থাকলেই—তাঁর মুখ থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক্ হয়ে যাবে, আপনাকে কিছু করতে হবেনা! কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ রাখবেন না।"

জয়হরির তাড়ায়—নীরবে একখানি ইণ্টার ক্লাস গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। জয়হরি ইতিপূর্ব্বেই বীরেনের বন্ধুর হাতে বৈদ্যনাথের প্রসাদী পেঁড়ার হাঁড়িটি দিয়া—গণেনদাদার ছেলে মেয়েকে দেওয়া চাই—বলিয়া দিয়াছে। এখন দড়ি-বাঁধা ভাঁড়টি গণেনবাবুকে দিয়া বলিল—বাবার এই চরণামৃত রোজ সকালে খাবেন, ভুলবেননা।

গণেনবাবুর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

জয়হরির আলিঙ্গন মধ্যে গণেনবাবু আজ সত্যই কাঁদিলেন।

ট্রেণ ছাড়িল। আমি ডাকায় জয়হরি চক্ষু মুছিতে মুছিতে মোসনেই নাবিল। গণেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া—দীননেত্রে হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তাহার ভাষা—কথায় বা লেখায় ধরা দেয়না।

* * * * *

বৈদ্যনাথে ফিরিবার পথটা নীরবেই কাটিল।

বাসায় ঢুকিবার পূর্ব্বে জয়হরি বলিল—"চলুন, আর নয়,—মা'র জন্যে মন কেমন করছে!" [ক্রমশঃ

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(৬)

সেকালের বাঙ্গলা সাময়িকে রস-রচনা

সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেকালের ব্যঙ্গ, কৌতুক, রহস্যাদির যে প্রকাশ ছিল, তাহার আলোচনা বা সমালোচনা এ প্রবন্ধের



শ্রীযুক্তা মহারাণী যমুনা বাইকে
হীরকবলয় উপহার দেওয়া হইতেছে। বসন্তক

উদ্দেশ্য নহে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাময়িকের উষাকালে উহা কিরূপ ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্যের মধ্যাহ্নে নব্য বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখানই আমার উদ্দেশ্য। মাত্র এই পঞ্চাশ বৎসরে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর রস রঙ্গের ধারার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা উপভোগ্য।

কৌতুক-কণা

একদিন গরাণহাটায় এক খোলার ঘরে একজন পাদরি, মুটে মজুর ও সামান্য লোকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন "সময় বহুমূল্য।" তৎশ্রবণে একজন বৃদ্ধ শাঁখারি বলিল "হাঁ, সময় বহুমূল্য হলে আমার ৭২ বৎসরের দামে আমি রাজা হয়ে যেতুম।"

কোন সুকবিকে একজন ধনাঢ্য লিখেন, "আমি একখানি কাব্য প্রকাশে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি একখানি নাটক রচনা করিলে আমিও তাহাতে দুই চারি পংক্তি দিব এবং নাট্যালয়ে আমার নিজ ব্যয়ে যথেষ্ট সমারোহের সহিত উহার অভিনয় করাইয়া উভয়েই যশোলাভ করিব।" কবি ইহার উত্তরে লিখেন "মহাশয়, আপনার প্রলোভনে আমি ভুলিতে পারি না। যেহেতু অশ্বকে গর্দ্দভের সহিত যোজন ধর্ম্মসিদ্ধ নহে।" ধনাঢ্য ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিলেন "তোমার সাহঙ্কার পত্র আমি পাইয়াছি; কিন্তু কি সাহসে তুমি আমাকে অশ্ব বলিয়াছ?"

রহস্য সন্দর্ভ ৭২ খণ্ড সন ১২৭৯



দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতে পারেন নাই।
বসন্তক



লালমুখো রাঙ্গাটা বরের মত যেন।
ওর দিকে তোর দিদী চেয়ে রৈল কেন॥

"আধুনিক ভারতচন্দ্র"

বর বরণ না কোনে বরণ।

সংবাদপত্রে "আমাদের কর্ম্মালয়ে লৌহ খাট ও বিছানা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে" ইতি বিজ্ঞাপন দর্শনে কোন ব্যক্তি বলিলেন "লৌহ চাদর ত আছে, গদি কৈ তো শুনি নাই ?"

আমাদিগের নাটকাভিনয়—কোন অভিনয় মন্দিরে আমরা একজন সম্ভ্রান্ত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কোন ব্যক্তির অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "চোতাধারকের, কারণ সকলের অপেক্ষা তাহাকে অল্প দেখিয়াছি কিন্তু অধিক শুনিয়াছি।"

রহস্য-সন্দর্ভ ৬৮ খণ্ড সন ১২৭৯

কোন এক সুকবি পথে চলিতেছিলেন এমন সময় ভোলানাথ নামক একজন পথিক অপর এক পথিকের সম্মুখে পড়াতে সে তাহাকে বলিল "তুই তো বড় বেল্লিক"। তৎশ্রবণে কবির দিকে ফিরিয়া ভোলানাথ বলিল "মহাশয় দেখলেন বেল্লিক ব্যাটা আমায় বেল্লিক বল্লে" কবি কহিলেন "বাপু তুমি ওকে কি বলিলে ?" তাহাতে ভোলানাথ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "আমি ওকে বেল্লিক বল্লুম" এতৎশ্রবণে কবি কহিলেন "বাপু তোমরা উভয়েই সত্য বলিয়াছ।"

রহস্য-সন্দর্ভ ৬৭ খণ্ড সন ১২৭৮

ভণ্ডামি—কোন পণ্ডিত এক ভণ্ডকে কহিলেন "হে ভদ্র, চিরকাল ভণ্ডতাই করিবে ? কিছু জপতপ কর, যাহাতে পরকালে নরক যন্ত্রণায় নিষ্কৃতি পাইবে।" ভণ্ড কহিল, "ভাই সেও এক প্রকার ভণ্ডামি।"

অবোধ প্রহরী—কোন লোক মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথ-পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, ইত্যবসরে রাজপ্রহরী আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করত কহিল "ওরে, মত্ত, চল্, তোকে কারাগারে যাইতে হইবেক।"

মত্ত উত্তর দিল "হে নির্ব্বোধ ; যদি আমার চলচ্ছক্তিই থাকিত, তবে আমি আপন ঘরে যাইতাম, পদব্রজে তোমার সহিত কি প্রকারে যাইব ?"

উদ্বাহের অভিনয়

কোন চিত্রাগারে নানাবিধ অপর ছবির মধ্যে তিনখানি ছবি এক স্থানে ছিল। তাহার একখানিতে এক ব্যক্তি আপন শিরঃ জানুদ্বয়োপরি স্থাপন করত অতিশয় চিন্তান্বিত আছে।

দ্বিতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতিশয় শোকাকুল হইয়া আপন কেশ উৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করিতেছে।

তৃতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতি আহ্লাদে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছে।

কোন দর্শক তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জনৈক পণ্ডিত



কার্ত্তিক পূজা

সন্নিধানে প্রশ্ন করিল "এই তিন প্রকার ছবির একত্র থাকার কারণ কি?" বিচক্ষণ কহিলেন "ইহার কারণ শ্রবণ কর;"



আমাদের গৌর মুদী সবে বাটীর দ্বারটি খুলিয়া কি দেখিলেন! বসন্তক।

"প্রথম ব্যক্তি মনে মনে বিবেচনা করিতেছে যে বিবাহ করিয়া সংসার করিবেক কি না।"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করতঃ সংসারে আবদ্ধ হইয়া শোক করিতেছে যে হায়! কেন এ দুষ্কর্ম্ম করত নানা দায়ে বিবৃত হইয়া আপন পদে শৃঙ্খল দিলাম।"

"তৃতীয় ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়োগ হওয়ায় সে সংসার যাতনা হইতে আপনাকে মুক্ত মানিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে!"

রাজমুখ দর্শনের ফল।

একদা প্রাতে কোন রাজা মৃগয়ার্থে যাত্রা করণ সময়ে কদাকার ও অঙ্গহীন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিলেন "এটা বড় অকুশল দর্শন হইল। অদ্য মৃগয়ায় প্রতুল হইবেক না। অতএব এ ব্যক্তিকে বিহিত শাস্তি দিয়া কারারুদ্ধ কর।" পরে মৃগয়ায় যাইয়া মনোভিলষিত মৃগাদি প্রাপ্ত হওনানন্তর বাটী আসিয়া মনে করিলেন আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে; এক্ষণে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়াই বিধেয়। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে সম্মুখে আনাইয়া রাজপ্রসাদ প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মনুষ্য, আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে, অতএব অধুনা তুমি আপন ঘরে যাও।" কদাকার পুরুষ কহিল "মহারাজ আপনার আজ্ঞাই বলবতী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অদ্য প্রাতে আপনি এই দুর্ভাগ্য অকিঞ্চনের মুখদৃষ্টি করাতে পরম সুখ উপলব্ধ হইলেন, কিন্তু আমি অদ্য প্রাতে মহারাজের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া সমস্ত দিবস অনাহারে কারাগার সম্ভোগ করিলাম।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহ, শকাব্দ ১৭৭৪, ফাল্গুন।

কার্ত্তিক পূজা।

কর্ত্তা ও গৃহিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার বালিকা-পৌত্রী দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পিতামহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পিতামহ সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বক্ষে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি দিদি কি মনে কোরে?"

পৌত্রী সৌৎসুক্যান্তে কহিল—"দাদা মশাই! আমি কার্ত্তিক পূজা কোর্ব্বো।"



বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন। ইণ্ডিয়ান লিগ।
ছি-ছি-ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে হয়।

বসন্তক

দাদা মহাশয় হাসিয়া পৌত্রীর গাল টিপিয়া কহিলেন,—"কেন কার্ত্তিক পূজা করিতে সাধ গেল কেন? এর পর যদি আবশ্যক হয় তো কোরো।"



উলা Railway শান্তিপুর

শান্তিপুর ভাষে, এস মম পাশে; দিব মনোমত শাড়ী।
উলা বলে যত, শস্য নানামত, দিব পুরে পুরে গাড়ী॥

গৃহিণী কহিলেন,—"যা বালাই যাঃ, কার্ত্তিক পূজোর সাধ আর কোত্তে হবে না।"

পৌত্রী কহিল,—"বাঃ! দিদি পূজো কোর্ব্বে, আর আমি বুঝি কোর্ব্বো না।"

দাদা মহাশয় কহিলেন,—"তোমার দিদির ছেলে হয় নাই; তাই ছেলে হবার জন্য পূজা কোর্ব্বে।"

পৌত্রী আগ্রহের সহিত কহিল—"আমারও তো ছেলে হয় নাই, আমিও তবে কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"দূর পাগলী, তোর খরচা দেয় কে, তোর বর কোথায়।"

পৌত্রীর মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল, নাকীসুরে কহিল, "তবে আমার বিয়ে দেওনি কেন?"

দাদা—"রোস, আগে একটি বর খুঁজি, তবেত বিয়ে দেব।"

পৌত্রী—"বাঃ! তা হবে কেন, রোজ সকাল বেলা যে আমার বর হও, আজ কার্ত্তিক পূজো কত্তে দিতে হবে বোলে বুঝি বর খুঁজতে যেতে হবে। না, আমাকে একটি কার্ত্তিক এনে দিতেই হবে।"

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—"এইবার, বড় যে বর হোতে যাও।"

(পৌত্রীর প্রতি) বেস বোলেছিস, ছাড়িসনে, নিদেন খরচাটা নিস।

দাদা হাসিয়া কহিলেন,—"খরচা দেবার ভয় কি, তোমার মতন কোনে পেলে আমি অমন সাতটার খরচা দিতে পারি। তবে কথাটা কি জান; এত কার্ত্তিক কোথায় পাব, কার্ত্তিক একটি বৈত নাই.। তাতে একটু প্রবীণ হয়েছে; কজনের মন রাখ্‌বে।"

পৌত্রী—"বাঃ! কার্ত্তিক বুঝি একটি, আর জোড়া কার্ত্তিক কি?"

দাদা—"তা হোলেও ত বোন হয় না, একটি তোমার দিদি পূজো করিবেন, আর একটি কার্ত্তিক যদিও একটু বুড়োসুড়ো, তোমার ঠাকরুণদিদি একচেটে কোরে রেখেছেন।"

পৌত্রী—"তা হোক্‌গে, বুড়োসুড়ো, আমি তবুও পূজা কোর্ব্ব।"

দাদা—"তবে তোমার ঠাকুরুণদিদিকে জিজ্ঞাসা কর, কিন্তু বাবু কড়াই-ভাজা খেতে দিও না, আর যদি আট ভাজা দাও তা হলে, তার আগে একটা হামানদিস্তা দিও।"

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে ধেড়ে কার্ত্তিকেয় পূজা-পদ্ধতি-দ্রব্যাদি নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বসন্তক ২য় পর্ব্ব। ষষ্ঠ সংখ্যা।

পূর্ব্বকালে ভাট চারণ বন্দী প্রভৃতি এদেশস্থ রাজা রাজড়াদিগের পূর্ব্বপুরুষের কুলজী, গুণ-কীর্ত্তন ও ইতিবৃত্ত লিখিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া লোকরঞ্জন ও স্বীয় ভরণ-পোষণ দুই কার্য্যই সমাধা করিত। এক্ষণে ইংরাজী কেতার আবির্ভাবে তাহা প্রায় এক প্রকার লোপ হইয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লোকেরা পূর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত রাখিবার এই সময় স্থির করিয়া একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিতেছেন। অস্মদ্দেশস্থ সংবাদপত্র লেখকেরা অস্মদ্দেশস্থ ভাটের কবিতাচয় সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ এক্ষণকার ভাটদের মৃত্যু হইলে সমস্ত লুপ্ত হইয়া যাইবেক। কিন্তু আমরা ইহাতে এক-

বিন্দুও ভাবনা করি না, ভাটেরা যে শেষ হইতেছে তাহা আমরা এক দিনের জন্যও মানি না ও গ্রাহ্য করি না। আমি বসন্তক কি? কেবল বেশ পরিবর্ত্তন বৈত নয়। সময় গুণে সমস্ত দ্রব্যেরই বিভিন্নতা জন্মে, এক্ষণে ভাটদের কার্য্যও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যথা—

"ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" শোভাবাজারের রাজাদের ভাট, ইহাতে তাঁহাদেরি গুণকীর্ত্তন হয়।

"হিন্দুপেট্রিয়ট" ঠাকুব গোষ্ঠীর ভাটবাদ গ্রহণ করিয়া সাত শিরোপা পাইতেছেন।

"নসিরাম পেপার" নত ব্রাহ্মদের ভাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দিনযাপন করিতেছেন।

মিরর ও সুলভ পত্রিকা উন্নত ব্রাহ্মদের ভাট। সেন বংশের গুণকীর্ত্তক।

এজুকেসন গেজেট ডাইরেক্টর অফ্ পবলিক ইনষ্ট্রক্‌শনের ভাট।

'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের ভাট।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের ভাট।

আর বসন্তক স্বয়ং আপনারই ভাট, ভাঁড়, চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

সুতরাং ভাটের যে লোপাপত্তি হইতেছে, ইহা অজ্ঞ লোকের কথা।

বসন্তক ২য় পর্ব্ব। দশম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন অর্থাৎ নোটীস

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে নমোবিষ্ণু, সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাঁহাদের লাঘবমানের হয়, সুতরাং পাঠকবৃন্দকে কেবল দেওয়া যাইতেছে। সমস্ত পাঠকবৃন্দকে নহে, কারণ তাহা হইলে যাঁহারা এ বৎসরের মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা রাগ করিতে পারেন। সুতরাং যে সকল পত্র-গ্রাহক পত্র গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি মূল্যপ্রদান করেন নাই, অর্থাৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাঁহারা মূল্য প্রদান করিয়া আপনাদের স্মরণ শক্তির গুরুতা গুণের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতাবৎকাল ঘরের কড়ি দিয়া বনের মোষ চরাইয়াছি। আমরা ভরসা করি এবং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাদিগকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে আর হবে না। অধিক বলা বাহুল্য; ইতি তারিখ দিবার আবশ্যক নাই, যিনি যবে পাঠ করিবেন, সেই তারিখ।

বসন্তক ২য় পর্ব্ব দশম সংখ্যা।

বাজীমাৎ

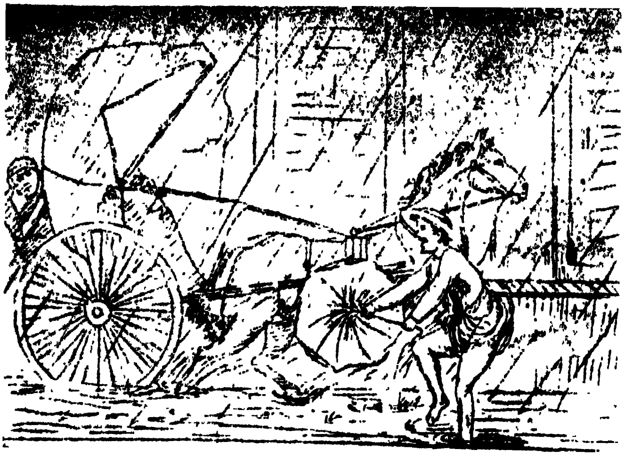
সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়॥
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাসে ইংরাজে॥
কোথায় কেশবদল, বিদ্যাসাগর কোথা।
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥



ভারতবর্ষ সমভূমি করিবার জন্য নূতন মেকেঞ্জর "রোলার"—বসন্তক

ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই।
সস্তাদরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে কতশত মেয়ে॥
কালো, ফিকে, গৌর, সোনা—হাতে গুয়া পান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আসবে রাজা, রাজ পারিষদ, লাটসাহেবের মেয়ে।
মারবেল মারা গিল্টি হ'লে, একবার দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন্।
বিষ্ণুপুরে মিন্‌সের দেখ বোড়ে টেপার গুণ॥

ছি ! রাজেন্দ্র ! কাল্ কাটালে পুথি ঘেঁটে ঘেটে ।
আইন পেসার পেস্কারিতে মন্‌টা গেল ঘেটে ॥
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই ।
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্, আই ॥"
হেদে ও সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি রেড়ো ব'লে ।
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব ।
নাড়ী টেপা ফেয়ার সাহেব, বারুটেল নায়েব ॥
আর কেন লো ঘোম্‌টা খোল কবির কথা রাখো ।
লাইট পেয়ে রাইট্ হয়ে পার হওলো সাঁকো ॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি ।
দেখলে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কবজা তুলে দেখ বে বাজু দেখবে কাণের দুল ।
দেখ্‌বে কণ্ঠি কণ্ঠহার পিঠের ঝাপা ফুল ॥



ড্রেনেজ হওয়াতে ছাতার নূতন ব্যবহার—বসন্তক

আয় এয়োগন কর্‌বি বরণ প'রে চরণ চাপ ।
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এসো বুড় ঠাক্‌রুণ সাৎপোয়াতির মা ।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ॥
সোণার থালে হীরার মালা তাতে ঢাকাই ধুতি ।
নজর দিয়ে দেখাও খুলে বউ বিয়লো পুতি ॥
বাহবা বুক বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে ।
রাজ পূজাটি কল্লে ভাল ফুলের মালা নিয়ে ॥
কোন শাস্ত্রে লেখে বল বামনের মেয়ে হয়ে ।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥
এখন দাঁড়াও স'রে বুড় দিদি হাসিল হলো কাজ ।
দেখবো আমি ভাল ক'রে আর এয়োদের সাজ ॥

আয়না লো সব একে একে গোলাপী কাঞ্চন ।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন ॥
ভয় কোরোনা একলা আমি দেখতে নাহি চাই ।
রাজার ছেলের আবডালেতে উকি মারবো ভাই ॥
আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে ।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে ॥
বল্‌তে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড় ।
ঘেল্লো আসি রাজকুমারে ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥
হীরার ঝলস্ সোণার কলস্ হাতঝুম্‌কার বোল্ ।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁকের গণ্ডগোল ।
বারাণসীর খস্‌খসানি উঠলো মহা ধুমে ।
মারবেলেতে মলের টমক্ বাজলো রুমে রুমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিন্দুর পর্দ্দা ফাঁক ।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গলার বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন ।
বাঙ্গালী কুল-কামিনী হইল স্বাধীন ॥

* * * * * *

প্রিন্সঅব্ ওয়েলসের আগমন সময় রিসেপ-সন কমিটির বর্ণনা ।

হিন্দু ।

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর গোষ্ঠী ।

কায়স্থ, শোভাবাজারের দেবেরা ।

নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি বাবু কৃষ্ণদাস পাল ।

মুসলমান ।

আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর আর একজন ঢাকাই মুসলমান ।

পাড়াগেয়ে জমীদার ।

রাজা প্রমথনাথ ।

রাজা রমানাথ ঠাকুর ।

অর্দ্ধ বৃদ্ধ ।

বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র ।

নব্য সম্প্রদায় ।

রাজা যতীন্দ্রমোহন বাহাদুর ।

বালক ।

পাইকপাড়ার কুমারেরা ।

কানা ।

সেখ আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর ।

কালা ।

বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল ।

কমিটি দেখিয়া কাহার না ভক্তি জন্মে । মাছিটি অবধি এড়ায় নাই । বসন্তক ২য় পর্ব্ব । অষ্টম সংখ্যা

অভিমান

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল

১

বর্ষা সুরু হইয়াছে মাত্র, ভাল করিয়া পড়ে নাই। সুতরাং গ্রীষ্মের কষ্টের উপর বর্ষার দুঃখ যোগ দিয়াছে। কাদার জন্য রাস্তা চলা কঠিন; এবং অল্প বৃষ্টির অবকাশে যে প্রখর রৌদ্র উঠে তাহাও প্রাণান্তকর।

কাশীর ঘাটে আর তেমন ভিড় নাই। যাহারা স্বাস্থ্য লাভের জন্য গঙ্গাস্নান করিত, তাহারা আসে না; শুধু পুণ্য-প্রত্যাশীগণ কোনও প্রকারে স্নানাহ্নিক সারিয়া পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করে মাত্র।

এবং তাহার পক্ষেও বিঘ্ন কম নয়। কখনও বৃষ্টি, কখনও রৌদ্র এবং কচিৎ বা হাওয়ার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করায় মন বিক্ষিপ্ত হয়; সুতরাং তাহারও একটা উপায় না করিলে চলে না। কিন্তু সঙ্কল্প যেখানে দৃঢ়, সেখানে উপায় আসিতে বিলম্ব ঘটে না; এবং সে উপায় এইরূপ।

বাঁশের চেটাইয়ে বোনা এক একটা প্রকাণ্ড ছাতা বাঁশের সাহায্যে জলের মাঝখানে পুঁতিয়া তাহারই তলায় দাঁড়াইয়া আহ্নিক করা। এমনি এক একটা ছাতার নীচে, পাঁচ সাত দশজন দাঁড়াইয়া, নির্ব্বিঘ্নে এবং স্বচ্ছন্দে পূজা করিতেছেন, বর্ষার এ দৃশ্য কাশীর ঘাটে অত্যন্ত সুলভ। যে পুণ্য-কামী ছাতা দান করিয়া সুলভে পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন, পাছে যথাস্থানে এবং যথাসময়ে তাঁহার নামটি ভুল হইয়া যায়, বোধ করি এই ভয়েই, ছাতার উপরে মোটা মোটা হরফে তাঁহার নাম লেখা।

আষাঢ়ের এমনি এক বর্ষার দিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে এক ছাতার তলায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ যুবক বিজয়কৃষ্ণ তিলাঞ্জলি দান করিতেছিল। তাহার অশৌচ হইয়াছিল, সেইজন্য মস্তক এবং বদন মুণ্ডিত। কিছু বেলা হইয়াছিল, সুতরাং ছাতার তলায় ভিড় নাই, যুবকই একমাত্র স্নানার্থী। ছাতার উপরে মোটা মোটা বাঙ্গলা হরফে লেখা শ্রীমতী কৈবল্য-কামিনী দেবী।

একমনে তর্পণ চলিতেছে, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী কাহার উচ্ছৃঙ্খল স্নানের উচ্ছলিত জলবেগে যুবকের হস্তস্থিত তিল ধুইয়া গেল, এবং মুখে চোখে প্রচুর জলের ছিটা আসিয়া লাগিল।

কোন দুষ্ট বালকের এই কাণ্ড মনে করিয়া, কঠিন কণ্ঠে বিজয় কহিল, কেমনধারা লোক হে! বলিয়া তিরস্কার-পূর্ণ চোখে তাহার দিকে চাহিতেই, তাহার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। তাহার পর খানিকটা অনুশোচনার স্বরে কহিল—ও, আপনি,—মাপ করবেন; আমি মনে করেছিলাম, কোন দুষ্ট ছেলে।

দুষ্ট বালক নয়—সে এক অপরিচিতা যুবতী। মাথার কাপড় সরিয়া গিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অলক-দাম হইতে জল ঝরিতেছিল, এবং লজ্জায় গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

যুবতী সামলাইয়া লইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, একটা সিঁড়ি থেকে পা ফস্কে নীচের সিঁড়িতে পড়ে যাচ্ছিলাম; মাপ করবেন। আপনার বড় ব্যাঘাত হ'ল।

বিজয় মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না—ও এমন কিছুই নয়।

কিন্তু তিল যে সব ধুয়ে গেল—কি হবে! আমি বরং পাণ্ডা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু তিল নিয়ে আসছি।

বিজয় সস্নেহ কণ্ঠে কহিল, না—আপনার আনতে হবে না। তা ছাড়া, আমার মা'র তর্পণ ব্রাহ্মণের আনা তিল হ'লেই ভাল হয়।

যুবতী হাসিল; কহিল, আপনি কি করে জানলেন যে আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা নই। তা ছাড়া, তিল আনার আবার ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আছে না কি! যে মাটিতে তিল জন্মায় সেও ব্রাহ্মণ নাকি? আর যে বিক্রী করে—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয় তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তা বটে, তবু—

তবু আবার কি—বলিয়া যুবতী হাসিতে লাগিল।

বিজয় উপরে উঠিয়া গিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের কাছ হইতে খানিকটা তিল সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার তর্পণ আরম্ভ করিল। মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; আবার তাহাকে সংযত করিয়া, আহ্নিকাদি সারিয়া যখন সোৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখন যুবতী চলিয়া গিয়াছে।

২

গ্রীষ্মের গুমট সন্ধ্যাবেলায় যেমন একটা দমকা বাতাস বলা নয় কহা নয়, হঠাৎ একটা ক্ষণিক তাণ্ডবে প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝাঁকুনি দিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়, এও যেন তেমনি। কিছুই নয়, অথচ ভোলাও যায় না। বিজয় বেদান্তে পড়িয়াছিল—জগৎ মায়া মাত্র। কোথাও এতটুকু স্থায়ী সত্য নাই। এমন কি ঐ যে কৈবল্যকামিনী দেবীর ছাতাটি, যাহা ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাহাকে কৈবল্যের পথে আগাইয়া দেয়—তাহাও নহে! এবং এই যে একটা সামান্য ঘটনা, এও নিশ্চয়ই একটা অত্যন্ত সুগভীর মায়া; কিন্তু বিজয় ভাবিতছিল, এ কথা ঠিক যে, এ একটা অত্যন্ত তাজা সুস্পষ্ট মায়া।

মায়া সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সুতরাং এই মায়াবিনীর ভয়ে বিজয় তাহার পরদিন সময় বদলাইয়া দেরী করিয়া আসিল। পাছে আবার মায়াবিনীর ঢেউ-এ তিল ধুইয়া যায়, এই ভয়ে সে সন্ত্রস্ত হইয়া, এবং মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে, আজ সে কিছুতেই তাহার আহ্নিকে কাহাকেও বাধা দিতে দিবেনা।

ঘাটে নামিতেই কিন্তু বাধা। স্নান সমাপ্ত করিয়া একখানি লালপাড় গরদের শাড়ী পরিয়া কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা দিয়া, যুবতী তাহারই প্রতীক্ষায়। বিজয় আসিতেই হাসিমুখে কহিল, আজ আপনি আমার ভয়েই এত দেরী করেছেন, কিন্তু আমি নাছোড়-বান্দা। কালকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, আর কোন পাপিষ্ঠা আপনার আহ্নিকে ব্যাঘাত করতে পারবেনা।

বলিয়া একটা রূপার তিল-রাখা হাতে-বাধা কৌটা বিজয়ের সম্মুখে ধরিল।

বিজয় সভয়ে পিছাইয়া গিয়া কহিল—এ কি?

যুবতী হাসিয়া উঠিল, কহিল, ভয় পাচ্ছেন কি, এ সাপ নয় খোপ নয়,—দেখতে পাচ্ছেন না? এর ভেতরকার তিলগুলো না হয় ধুয়ে নেবেন।

বিজয় দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, কিন্তু আপনার দান আমি নোব কেন?

যুবতী হাসিয়া কহিল, মানুষের দান মানুষে নেবে না ত কি জন্তু-জানোয়ার নেবে? আপনি কি কারুর দান কোনও দিন নেন নি?

বিজয় ভাবিল, কহিল, মনে নেই, হয়ত' বা নিয়েছি।

যুবতী কহিল, আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। ওই যে বড় ছাতাটা, যা আপনাকে বর্ষা আর রোদ্দুর থেকে বাঁচাচ্ছে, ওটা যে কৈবল্যকামিনী দেবীর দান, আর সে দান গ্রহণ করছেন আপনি রোজ!

বিজয় কহিল, সে কথা ঠিক। কিন্তু ওটা ত' আর আমাকেই দান করা হয়নি। ওটা ত' সাধারণকে দান করা হয়েছে।

যুবতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, খুব যুক্তি যা হ'ক। বেশ, ঐ কৈবল্যকামিনী ছিলেন আমার দিদিমা। আমি না হয় একক আপনাকেই ঐ ছাতাটা দিলাম।

বিজয় গম্ভীর হইয়া কহিল, তিনি আপনার দিদিমা? শুনেছি তিনি ভারী পুণ্যবতী ছিলেন।

যুবতী আবার হাসিয়া কহিল, আমি পাপিষ্ঠা বলে আর কারুর কি পুণ্যবতী হ'তে নেই?

আপনাদের বাড়ী তা হ'লে—

হাঁ—কলকাতায়। আমার নাম শুনবেন? শ্রীমতী উষারাণী দেবী। আমাকে আর আপনি বলবেন না—তুমি বলবেন। এই নিন,—বলিয়া কৌটাটা হাতের কাছে ধরিল।

বিজয় বলিল—কিন্তু—

দুই চোখের ভিতর স্নেহের ভৎর্সনা জাগিয়া উঠিল। উষা কহিল, মানুষের কাছে থেকে স্বেচ্ছার দান নোবনা—এত বড় কুৎসিত দম্ভ রাখবেননা,—মানুষকে এত অপমান করবেন না। এই নিন—

বিজয় উষার চোখের দিকে চাহিল। মনে হইল, তাহার আশ্চর্য্য গভীরতার কাছে, সে অত্যন্ত ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া গেছে। হাত পাতিয়া কৌটা গ্রহণ করিল।

৩

তাহার পর আর দিন-পনর দেখা হয় নাই। গোড়ায় দু' একদিন অবাধ্য মন তাহাকে খুঁজিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর বিজয় ঠিক করিল যে, বহুবিধ মায়া-পূর্ণ এই পৃথিবীতে এও একটা ক্ষণিক মায়ার খেলা; এবং চুকিয়া গেছে ভালই হইয়াছে। কিন্তু উষার মুখ স্মরণ হইলে, এ কথা নিশ্চিত মনে হয় না যে, সে মায়াবিনী। বরং তাহার আশ্চর্য্য সরলতার কথাই সব-চেয়ে আগে মনে পড়ে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িবার মত হয়, এবং হাতে-বাঁধা তিলের কৌটার দিকে চাহিয়া বিজয় ভাবে, আর যাই হ'ক, অন্ততঃ এই বস্তুটি আমার ভারী কাজে লেগেছে।

কিন্তু হঠাৎ দেখা হইল বিশ্বনাথের গলিতে। উষার দুই হাত ও আঁচল-ভরা একরাশ পুতুল, পিতলের সাজি, লোটা, সিঁদুর-কৌটা ইত্যাদি। সদ্য স্নানের পর চূড়া করিয়া মাথার উপর চুল বাঁধা; পরণে বহুমূল্য শাড়ী।

বিজয়কে দেখিয়া উষা কহিল, ঠাকুর, ভালই হয়েছে যে দেখা হ'ল; নইলে আজ একবার আপনার বাড়ী যেতে হ'ত।

বিজয় কহিল, কেন?

আজ আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

কলকাতাতেই থাকা হয় বুঝি?

উষা কহিল, হাঁ। তবে মাঝে মাঝে কাশীতেও আসি।

দেখা না হ'লে আমার বাড়ী আপনি—ইয়ে—তুমি চিনতে কি করে?

উষা হাসিয়া কহিল, আপনার বাড়ী আর আমি চিনিনে? আমি কাশীর সব চিনি।

বিজয় খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল যে, সেই তিলের কৌটার জন্য তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বোধ হয় ভদ্রোচিত হইবে; কিন্তু লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিয়া ফেলিল, হাঁ—ইয়ে—ওই কৌটোটা —ওটায় আমার ভারী উপকার হয়েছে—

উষা হাসিতে লাগিল, তবুও ত, ওটা কিছুতেই নিতে চান্‌নি। ঠাকুর, কলকাতায় চলুন না।

বিজয় গম্ভীর হইয়া কহিল, বোধ করি যাব। ওখানকার সংস্কৃত কলেজের নাম শুনেছি, সেখানে পড়ব মনে করেছি।

—যাবেন নাকি, কবে?

বিজয় কহিল, সেখানে থাকার একটা ব্যবস্থা করেই যাব।

উষা হাসিয়া কহিল, ঠাকুর, আমার দিদিমা অন্ততঃ খুব পুণ্যবতী ছিলেন; তাঁর খাতিরে প্রথম দিনটা আমার বাড়ীতে উঠবেন,—তার চেয়ে বেশী আমার মত পাপিষ্ঠা আর কি বলতে পারে? আপনাকে আমার ঠিকানাটা না হয় পাঠিয়ে দোবো।

ইহার কি উত্তর যে সঙ্গত হইবে, না বুঝিয়া বিজয় হাসিতে লাগিল।

হাতের জিনিষগুলা মাটিতে রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া উষা বিজয়কে প্রণাম করিতে করিতে কহিল, ভুলে যাবেন না ঠাকুর, অনেক জ্বালাতন করেছি। কলকাতায় গেলে দেখা যেন হয়।

সমস্ত অখিল-ব্রহ্মাণ্ডই যখন মায়াময়, তখন কেন যে তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, এবং চোখ দুইটা ঝাপ্সা হইয়া আসিল—তাহা বিজয় ঠিক বুঝিতে পারিল না। কোন কথাও বলিতে পারিল না, শুধু বোধ করি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল।

৪

তাহার পর বছরখানেক কাটিয়াছে। মাস-ছয়েক হইল বিজয় কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছে। অবস্থা সুবিধার নয়,—দুই তিনটি ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইয়া, কোনও রকমে মেসে থাকিয়া দিন চলে। মেসটিতে সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থীরাই থাকে। বিজয় উষার ঠিকানা জানিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিয়াই দেখা করে নাই। খানিকটা স্বাভাবিক সঙ্কোচও আছে, তাহা ছাড়া ভয়ও করে।

সেদিন থিয়েটারে ছিল জয়দেবের পালা; সুতরাং এই মেসের ছেলেরা ঠিক করিল যে তাহারা থিয়েটার দেখিয়া আসিবে। এ একেবারে নিছক স্বদেশী ধর্ম্ম-মূলক পালা; সুতরাং ভয়ের বিশেষ কারণ নাই।

আট আনার বেশী টিকিট কিনিবার সাধ্য নাই; সুতরাং যে যায়গাটিতে স্থান পাইল, তাহাতে বিজয়ের মন দমিয়া গেল। মাথার দেড়হাত উপরে কাঠের ছাত, তাহার উপর অবস্থাপন্ন দর্শকদিগের বসিবার স্থান; কাঠের মঞ্চে সাবধানে বসিতে হয়। সঙ্গী-দর্শকেরা কলিকাতার নিম্নশ্রেণীর

লোক, তাহাদের কদর্য্য ঠাট্টা-পরিহাসে মন অবসন্ন হইয়া আসে। বিড়ির গন্ধে ও ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম; এবং তাহার উপর দেশী মদের গন্ধ। পয়সা খরচ করিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলেনা, তাহা না হইলে, বিজয়ের আর এক মুহূর্ত্ত থাকিবার ইচ্ছা ছিল না।

অভিনয় আরম্ভ হইলে মন সেই দিকে ফিরায় কথঞ্চিৎ যেন স্বস্তিবোধ হইতে লাগিল। বিজয় পূর্ব্বে কখনও অভিনয় দেখে নাই; সুতরাং এই আশ্চর্য্য রূপ ও রঙ্গের খেলা তাহার কাছে একেবারে নূতন। দেখিয়া দেখিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল,—বিশেষ করিয়া নায়িকার অভিনয়ে। আশ্চর্য্য তার অভিনয়, এবং আশ্চর্য্য তার রূপ। যতই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ততই যেন বিজয়ের মনে হইতে লাগিল, এ মুখ চেনা, ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি। অবশেষে সে তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, এইঅদ্ভুত নায়িকাটি কে?

সঙ্গী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে জানেনা।

ছোট ছোট করিয়া ঘাড়ের চুল ছাঁটা, আধ-ময়লা একটা চুড়িদার জামা-পরিহিত, বিড়ি-পায়ী পাশের হিন্দুস্থানী দর্শক জবাব দিল,—

সিটি হচ্ছে উষারাণী, তুমি জানেনা? বড় জবর এক্‌টর, সারা কলকাতা সহর উয়ার নাম—বলিয়া মুখে একটা আওয়াজ করিল।

উষারাণী?—বিজয় ভাবিতে লাগিল, সেই উষারাণী নয় ত, যাহার সহিত তাহার কাশীতে পরিচয় হইয়াছিল? মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে লাগিল, সেই ত বটে!

সেই শুদ্ধশীলা গঙ্গাস্নানকারিণী উষা এই? বিজয় চুপ্ করিয়া ভাবিতে লাগিল। মাথার ভিতর যেন গোলমাল হইয়া গেল,—বিকট দুর্গন্ধ এবং বিড়ির উৎকট ধোঁয়া যেন তাহার দম বন্ধ করিয়া দিবে মনে হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে মনে হইল, যেন অভিনয় ও প্রশংসমান দর্শকের স্তুতিধ্বনি দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে—তাহার পর আর মনে নাই।

৫

তাহার পরদিন যখন বিজয় চোখ খুলিল, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কোন্ যায়গা? অত্যন্ত কোমল শয্যায় সে শুইয়া আছে, উপরে পাখা ঘুরিতেছে—এ কি? এখানে কেমন করিয়া সে আসিল? অনেক কষ্টে স্মরণ হয় থিয়েটার দেখা,—তাহার পর আর কোন কথা মনে নাই।

সম্মুখে চোখ চাহিতেই হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, উষা—?

করুণ শান্তদৃষ্টিতে উষা কহিল, ব্যস্ত হবেন না—হাঁ আমি।

বিজয় আবার চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, আমি এখানে এলাম কি করে?

উষা আরও কাছে আসিয়া কহিল, সে অনেক কথা—পরে হবে। এখন একটু কিছু খান্। দুধ দোবো কি?

বিজয়ের মনের ভিতরটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল—থিয়েটারে যে অভিনয় করে, তাহার ছোঁয়া বস্তু সে কেমন করিয়া খাইবে? অথচ এত স্নেহ!

উষা কহিল, আমি এনে দি,—অসুখ শরীরে কোন দোষ হবেনা।

বিজয় তাহার চোখের দিকে চাহিয়া কহিল—দাও।

* *

দিন দুয়েক পরে বিজয় নিজেকে অনেকটা সুস্থ অনুভব করিতেছিল। এই দুইদিন সে যে অবিরত স্নেহ ও সেবা পাইয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া—অভিনেত্রী উষার সহিত এই অকপট-সেবা-পরায়ণা নারীর কেমন করিয়া মিল হয়, তাহাই ভাবিতেছিল। দিনশেষে সূর্য্যের শেষ আলোকটুকু নিভিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার ম্লানিমা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। যাহার সহিত একদিন অকস্মাৎ পরিচয়—দৈবযোগে কেমন করিয়া আজ তাহারই আশ্রয়ে তাহাকে আসিতে হইল, এই কথা ভাবিয়া বিজয় মনে যেন খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। এবং লোকে যদি শোনে সে অভিনেত্রীর ঘরে কয়দিন কাটাইয়াছে, ত তাহাই বা কেমন হইবে?

সন্ধ্যাস্নানের পর একখানি পরিষ্কার কালা পেড়ে শাড়ী পরিয়া উষা আসিয়া কহিল, কি ভাবছ?

কয়দিনের পরিচয়ে সে আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিয়াছিল।

বিজয় কহিল, এবার ত' ভাল হয়েছি, কাল আমার মেসে ফিরে যাব মনে করছি।

উষা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, তা হবেনা,—এখনও বড় দুর্ব্বল। কেন, এখানে থাকতে তোমার কিসের অসুবিধে?

বিজয় উষার মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া কহিল, এখানে—এখানে থাকব কেন ?

উষা হাসিয়া উঠিল, থাকতে ত' কোথাও হবেই—হাওয়ায় ঘর করা চলেনা ত! তা এইখানেই থাকনা। মেসের চেয়ে কি এখানে বেশী দুঃখ ?

বিজয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হয় না।

কেন ?

আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তুমি অভিনেত্রী—তোমায় আমায় সম্বন্ধ কি ?

উষা চুপ্ করিয়া রহিল। তাহার হাস্যোচ্ছল মুখে মুহূর্ত্তে যেন একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল। কহিল, তুমি ব্রাহ্মণ, নমস্য—কিন্তু অভিনেত্রীও কি মানুষ নয় ?

বিজয় চুপ করিয়া রহিল।

উষার মুখে আবার অল্প হাসি দেখা দিল। কহিল, ঠাকুর, চেয়ে দেখনা, আমারও ত' মানুষের মত হাত-পা-মুখ-চোখ, যেমন তোমার ও আর পাঁচজনের! মানুষকে এত ছোট করে দেখোনা ঠাকুর—দুঃখ পাবে। আমি অভিনেত্রী—এই বয়সে অনেক পোড় খেয়েছি, অনেক শিখেছি,—আমার মত অভাজনের কাছ থেকে অন্ততঃ এইটুকু শিখে রেখো,—ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

বিজয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। উষা কহিল, এই আশ্চর্য্য জগতে সবাই নিজের নিজের কাজ করছে। তুমি পড়ছ সংস্কৃত, আমি করছি অভিনয়। সবারই উদ্দেশ্য এক—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা; আর সুবিধে পেলে পরকেও বাঁচাবার কিছু চেষ্টা করা। কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। বড় ছোট হয়—মনে, কর্ম্মে নয়। তুমি যখন সে-দিন অজ্ঞান হয়ে সেই কাঠের গ্যালারী থেকে পড়ে গেলে, আর চারিদিকে একটা হৈ হৈ উঠল, তখন এই তুচ্ছ অভিনেত্রীরই ত তোমার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল—কোথায় রৈল তোমার সংস্কৃত-পড়া বন্ধুরা!

বিজয় উষার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আর তার পর কি সেবাই না করলে!

উষা কহিল, সেবা আর ছাই করেছি। কিন্তু এ কথা কেন মনে করো যে, অভিনেত্রী বলেই আমি নরকের কীট? মানুষটাকে চেনো, তার পরে যদি ইচ্ছে হয় ত' না হয় ঘৃণা ক'রো।

বিজয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

উষা হাসিয়া কহিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন সম্বন্ধ নেই, এত বড় দম্ভের কথা ব'লতে নেই, ঠাকুর। তারা মানুষ—এই ত তাদের সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ।

কথাগুলো তাহার দীর্ঘ-সঞ্চিত সংস্কারের একবারে বিরুদ্ধে; কিন্তু তবুও যেন মনে হইতেছিল যে, ইহার ভিতর অনেকখানি সত্য আছে। ভাল করিয়া মনের ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিজয় দেখিল যে, মানুষ-হিসাবে সে যে উষার চেয়ে বড়, এমন পরিচয় দিবার নিজের তাহার কিছুই নাই।

উষা কহিল, ঠাকুর, কি ভাবছ ?

বিজয় কহিল, উষা, তুমি হয়ত সত্য কথাই বলেছ। এমন ক'রে আমি ত কোনও দিন এ সব কথা ভাবিনি। ভাল ক'রে ভেবে দেখব।

খানিকক্ষণ পরে কহিল, কিন্তু কালই আমাকে যেতে হয়।

উষা কহিল, যেতেই যদি হয় ত যেও!

তাহার পরদিন বিজয় মেসে ফিরিয়া গেল।

৬

তাহার পর আরও মাস ছয়েক কাটিয়াছে।

একদিন বিকাল বেলা উষা মনে মনে গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল, আর সেলাইএর কলে পরিষ্কার ছোট ছোট জামা সেলাই করিতেছিল। এইগুলি সে দুঃস্থ প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের দিবে।

এমন সময় বিজয় আসিয়া ডাকিল, উষা।

উষা মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, এসো বিজয় বাবু, বসো।

এই নূতন সম্ভাষণে বিজয় একটু বিস্মিত হইয়া আসন গ্রহণ করিল।

উষা হাসিয়া কহিল, অনেক দিন পরে দেখা, বোধ করি বা মাস ছয়েক হবে। খবর সব ভাল ?

বিজয় একদৃষ্টে জামাগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, বাঃ—বেশ জামা তোয়ের করেছ ত'—তুমি এও পার ?

উষা হাসিয়া কহিল, আমাদের মত যাদের একেবারে দুনিয়ার ধুলো-মাটিতে আশ্রয়,তাদের কত কি না শিখতে হয়।

বিজয় কহিল, কিন্তু এ সব কার ?

উষা আবার হাসিল, যে নেবে তার। আমার এই বাড়ীর চারিদিকে দেখবে—জামা নেই এমন কত ছেলে আছে। এ সব তাদেরই জন্তে। তারা সব আমাদেরই ছোট ছোট ভাই বোন ত।

বাইরের বড় জগতের এ আর একটা মধুর আলোক-রশ্মি মনের ভিতরটা যেন অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

তার বাঁধা সংস্কৃত বইয়ের স্থত্রের সঙ্গে এর মিল পাওয়া শক্ত, তবু যেন মন অভিভূত হইয়া যায়! বিজয় কহিল বাঃ—বেশ ত।

উষা কহিল, তোমার পড়ার কতদূর ?

বিজয় কহিল, এখানে আর থাকার স্থবিধে হ'চ্ছেনা। আমি কিছু কিছু কবিরাজী পড়তে স্থরু করেছি; মনে করছি, কবিরাজী শীঘ্রই শিখব। কাশীতে বিদ্যাধর ওঝা একজন মস্ত কবিরাজ। তিনি আমাকে তাঁর ছাত্র করতে রাজী হ'য়েছেন। মনে করেছি যে, কাশীতে গিয়ে তাঁর কাছে পড়ব।

উষা কহিল, ভাল কথা। কতদিনে যাবে ?

যাওয়া স্থিরই করেছি, বোধ হয় কাল পরশু যাব।

উষা চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় গদগদ কণ্ঠে কহিল, উষা, ফিরে যাবার আগে তোমার দয়ার কথা আমার বার বার মনে হচ্ছে। তুমি না থাকলে সে-দিন যে আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত বলা যায় না। তার পর কি সেবা কি স্নেহই না করেছ! এর প্রতিদান দিই, এমন শক্তি আমার নেই!

উষা দুই হাত কপালে ঠেকাইল। তাহার পর হাসিবার মত করিয়া কহিল, প্রতিদান ত' দেওয়া হ'য়ে গেছে!

ভাল বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিজয় বিস্মিত হইয়া গেল। বাহিরের হাসির নীচে মনে হইল যেন অশ্রুর প্রবাহ—এমনি করুণ উষার মুখের চেহারা।

বিজয় কহিল,—উষা, যদি কোনও দিন কাশী যাও ত' দেখা যেন হয়।

উষা পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিল, কোন উত্তর দিলনা।

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, উষা, আসি তবে।

উষা গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে গড় করিয়া কহিল, যেখানে থাক ভাল থাক। গলার আওয়াজ ভারী—যেন কতদূর হইতে কে কথা কহিল।

৭

তাহার পর ছয় বছর কাটিয়াছে।

বিদ্যাধর ওঝার নিকট বছর তিনেকে কবিরাজি আয়ত্ত করিয়া লইয়া বিজয় এখন কবিরাজ। সে বিদ্যাধরের প্রিয় ছাত্র ছিল। স্থতরাং স্বনামধন্য কবিরাজ মহাশয় তাঁহার এই শিষ্যকে শিক্ষাদানে কোন কার্পণ্য করেন নাই। তিনি যাহা অকাতরে দান করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে বিজয়ের কাছে শুধু এই অঙ্গীকারটুকু মাত্র লইয়াছিলেন, যে, তিনি নিজে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের রোগীদিগকে বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা করেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বিজয়ও যেন তেমনি করে,—এ কর্ত্তব্যে যেন কোনও দিন কিছুমাত্র অবহেলা না হয়।

বিদ্যাধর কবিরাজ বৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত যশ ও রোগীও যেন বিজয়কে দান করিয়া গেছেন।

গুরুর নিকট এই প্রতিশ্রুতিকে বিজয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, এবং শুধু কর্ত্তব্য হিসাবেই নয়, পরন্তু প্রীতি ও আন্তরিকতার সহিত গুরুর এই আদেশ সে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে।

জীবনে সে আরও একটা জিনিস ভুলে নাই, সে উষার কথা। গঙ্গার পবিত্র ধারার মধ্যে তাহাদের প্রথম পরিচয়। আজ বহুবর্ষ গত হওয়ার পর তাহার স্মৃতিও গঙ্গার ধারার মতই স্থনির্ম্মল। একদিন সে তাহাকে অভিনেত্রী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল; কিন্তু আজ চোখের সে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি খসিয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া মিলাইয়া তাহার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, হয়ত' সেই একদিনকার ঘৃণিত অভিনেত্রী তাহার চেয়ে সর্ব্বাংশেই বড়। কতবার মনে হইয়াছে দেখা করিয়া আসে,—বলিয়া আসে, উষা, তোমার দুর্ভেদ্য দূরত্ব অপসারণ কর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমার সত্যকার হৃদয়ের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। কিন্তু সাহস হয় নাই, আরও এই কথা মনে করিয়া যে—উষা নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কাশী আসিয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহার সহিত দেখা করে নাই।

৮

আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে লঘু-শুভ্র-মেঘ-সঞ্চারণে, শিউলির গন্ধে দিগ্বিদিকে শরতের আবাহন সুরু হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার চিরন্তন আনন্দের দিন আসিতেছে। বাঙ্গলার আনন্দময়ী জননী এক বৎসর পরে আবার ঘরে আসিতেছেন, এই আনন্দে বাঙ্গালীর প্রতি গৃহ চঞ্চল। যশে মানে অর্থে মানুষ বাড়িয়া উঠিলেও হৃদয় যেখানে স্তম্ভিত, সেখানে আর সকলই ব্যর্থ। তাই বিজয় মনে করিয়াছে এই শরতের সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধ দিনে সে একবার উষার সহিত দেখা করিয়া আসিবে; বলিবে যে তাহার অপরাধের যে ক্ষমা হইয়াছে এ কথা না জানিতে পারিলে তাহার শান্তি নাই।

* * *

যাইবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বিজয় আশ্রমে রোগী দেখিতে গিয়াছিল। কয়দিন থাকিবে না। যাহারা তাহার চিকিৎসায় আছে তাহাদের এই কয়দিনের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে এবং যথাবিহিত পরামর্শ ইত্যাদি দিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে একজন রোগিনীর কাছে গিয়া বিজয় বলিল, এঁকে আজ নূতন দেখছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ একান্তে কহিলেন, আশ্চর্য্য রোগিনী। আমাদের আশ্রমে দিয়েছেন দশহাজার টাকা—অথচ তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঔষধ খেতে চান না; এবং পরমায়ুও যে বেশী, এমন ত মনে হয় না!

ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বিজয় চমকিয়া উঠিয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে কহিল. আপনি যান্।

বিছানার পাশে বসিয়া রোগিনীর মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত দিয়া, বিজয় ডাকিল—উষা।

উষা চোখ খুলিয়া অনেকক্ষণ দেখিল। মনে হইল, দুই চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর কহিল,—ভালই হ'য়েছে।

বিজয় কহিল, এ কি উষা?

উষা উপরের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

বিজয় কহিল, এমন রোগ—আমাকে একটা খবর দিলে না? এখানে এসেও একটা খবর দিতে নেই!

দিনশেষে রৌদ্রের মত ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উষা কহিল, তুমি পুণ্যবান্; আমি পাপিষ্ঠা অভিনেত্রী;—তোমায় আমায় সম্বন্ধ?

বিজয় তাহার দুই হাতের ভিতর উষার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এখনও ক্ষমা করোনি—এত অভিমান!

উষা চুপ্ করিয়া রহিল।

বিজয় তাহার আরও কাছে গিয়া কহিল, উষা, আমি ভাল ভাল ওষুধ জানি,—বলো, তোমার চিকিৎসা আমি করি!

উষা ঘাড় নাড়িল।

বিজয় কহিল, উষা, তুমি যদি দেখতে পেতে আমার বুকের ভেতর কি হ'চ্ছে।

আবার সেই ক্ষীণ হাসি!

তুমি কি চাও উষা?

উষা কহিল, কিছু না। শুধু যাতে শান্তিতে মৃত্যু হয় তাই চাই!

একটা কিছু বল উষা, আমি কি করতে পারি তোমার—

উষা তাহার স্নিগ্ধ সজল দুটি চক্ষে বিজয়ের পানে চাহিয়া কহিল, এখন আর কিছু নয়,—ইহজগতে কিছু করবার রাখিনি। তবে একটা প্রার্থনা। সেই প্রথম দিনের দেখার কথা মনে হয়? তেমনি ক'রে আমার তর্পণ ক'রো আমায় দেওয়া সেই কৌটার তিলে। ইহজগতে হ'লোনা, পর-জগতে যদি বা একটা সম্বন্ধ দাঁড়ায়!

খানিকটা সামলাইতে চেষ্টা করিয়া বিজয় বালকের মত হা—হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চতুর্থী

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

১

আর দেখা হবে কি না, তাই ভাবি মনে,
কবে হ'ল ছাড়াছাড়ি, জানিব কেমনে
তোমার আমার মাঝে কোন ব্যবধান
এতদিনে হয় নি রচিত, পরিধান
একখানি বস্ত্রের সমান, ছিনু দোঁহে
যম আসি কাঁচির মতন, কোন্ মোহে
কেটে দুইখান করি দিল ভিন্ন করে,
অশান্ত আত্মার মত একা ঘরে ঘরে
ঘুরে মরি, হাতে আর নাই কোন কাজ ;
সব আয়োজন নিলে সাথে, ত্বরা ব্যাজ
নিরর্থক আমার জীবনে, স্নেহ প্রেম
সেবা যত্ন রতন মাণিক আর হেম
বিফল সকলি ; কা'র, আর কোন্ আশে
এ বোঝা বহিয়া চলি এত অনায়াসে ?

২

পূর্ণচ্ছেদ পড়ে কি কখনো এ জীবনে ?
কাল ছিল, আজ গেছে, হয় তবু মনে
প্রাণ-শক্তি হয়নি নিঃশেষ একেবারে।
কন্যা তার 'মা' বলে' ডাকিছে বারে বারে,
পরিচিত প্রিয়নাম করে উচ্চারণ
মাতা, ভগ্নী, পতি, বন্ধু, নহে অকারণ
আপন অজ্ঞাতে এই নিত্য মনে পড়া,
এ অবাধ স্রোতোধারা, পড়ে যদি চড়া
থেকে থেকে দূরে দূরে, থামে না প্রবাহ,
জীবন সিন্ধুর বুকে, যত খানি চাহ
যেতে পার তরী বাহি অপার, অকূলে,
যা' চাহ দেখিবে, যদি মন রাখ খুলে ॥

৩

তবুও সংশয় জাগে, চোখে দেখা এমন অভ্যাস
সায় দেয় না ক মন, অগোচরে হয় না বিশ্বাস,
দোলে মন সংশয়-দোলায় যেন তবু বারে বারে।
পারে না নামায়ে দিতে পুরোপুরি পুরাতন ভারে,
রহে সে আগেরি মত, কালাকাল তবু কাছে তার,
হয় না ক ঠাঁই-ছাড়া, আজকাল, আগামী যে যার
মানবের মনোভূমে পেতেছে যে অচল আসন,
নিজ নিজ দাবী তার সহজে সে ছাড়ে না কখন।
আজ যে সান্ত্বনা হ'য়ে উঁকি দেয় সচেতন মনে
কত কথা বলে চুপে চুপে, সেইকাল এ জীবনে,
নামাইয়া কালো যবনিকা, ঢেকে দেয় সব ছবি,
অতীত পড়িয়া থাকে, লুকায় যে ভবিষ্যের সবি !

৪

কেন যে এমন হয় তার সমাধান
পারিবে কি করিবারে মন, সে বিধান
কোথা পাব, সকল রহস্য যার কাছে
হবে অবারিত অন্ধকার যার পাছে
রবে না ক, চোখে দেখি যেমন ধরণী—
কুসুম কুন্তলা কান্তি হরিৎ বরণী,—
মনে সেই মত, যাহা দেখি না ক চোখে,
আজন্ম সঞ্চিত স্নেহে, স্মৃতির আলোকে,
অন্তর মন্দির মাঝে হ'বে দীপ্যমান
অতীতের ছায়া পথে নিশি দিন মান
নবীনের দিব্য ছবি অপূর্ব্ব সৃজন,
নয় ত উদয় পথে বিনা আয়োজন
পুঞ্জীভূত তপোবলে চিরন্তন ভানু,
করে যার উদ্ভাসিত অণুপরমাণু।



দিন মজুর

শিল্পী—শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

চোরের বৌয়ের কান্না

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলোকগঞ্জের জমিদারের তহশীলদার নটবর বিশ্বাস জঙ্গলহাটি ডিহিতে থাকে। জঙ্গলহাটি বললে যে জায়গাটাকে বোঝায় সেটাকে গ্রাম বলা চলে না, সেটার চেহারা গ্রামের চেয়ে জঙ্গলের সঙ্গেই বেশী মেলে। জঙ্গলহাটি ডিহিটা জঙ্গল-মহালের বন-কর আদায় করবার একটা ঘাটি মাত্র। ঢুধুয়া নদীর ধারে ভালুকজোড়া নামের প্রসিদ্ধ ঘন বন; নদীর ধারে খানিকটা জঙ্গল সাফ ক'রে জমিদারের ডিহি বসানো হয়েছে; উঁচু ডাঙা জমির উপর ডিহির কাছারী-বাড়ী, সেই বাড়ীর লাগাও তহশীলদারের বাড়ী—খড়ে ছাওয়া চারখানি ঘর। ডিহির কাছারির সাম্‌নে জঙ্গল সাফ ক'রে খানিকটা জমি ময়দান করা হয়েছে; তার উপরে খান-কতক চালা ঘর, বেড়াশূন্য চারটে কাঠের খুঁটির উপর খড়ের দোচালা; সেই ময়দানে মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে হাট বসে। সেই হাটখোলার এক পাশে নদীর পাড় ঘেঁসে আর দুটি গৃহস্থের বাস, এক ঘর কামার, আর এক ঘর ময়রা; আর সেই হাটখোলার অপর পাশে এক ঘর চামার-মুচির বাস; জঙ্গলহাটি গাঁয়ের কুল্লে এই চার ঘর বাসিন্দা। যে-সব লোক ভালুকজোড়া জঙ্গলে এসে কাঠ বাঁশ মধু সংগ্রহ করে, তারা আট দিনের সঞ্চয় নিয়ে মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে জঙ্গলহাটির হাটে এসে উপস্থিত হয়; কেউ কেউ পাখী হরিণ ভালুক বাঘও মেরে আনে; সেই-সব সামগ্রী কিনে নেবার জন্যে একদিন দুদিনের পথ বেয়ে দূর-দুরান্ত গাঁয়ের লোকেরা নৌকা ক'রে সেই জঙ্গল-হাটির হাটে আসে। তারা কাঠ, বাঁশ, মধু, হরিণের মাংস আর হরিণ-বাঘ-ভালুকের চাম্‌ড়া কিনে নেয়; কেউ কেউ বা ফাঁদ পেতে পাখী হরিণ ছানা বাঘ-ভালুকের বাচ্চাও ধ'রে আনে, আর তাও বেশ সহজেই বিক্রী হয়ে যায়। যারা সওদা কিনতে আসে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্যাপার করতেও আসে—তারা কাপড়, গামছা, গেঞ্জি, ছাতা, লণ্ঠন, দেশলাই, তামাক, সিগারেট, বিড়ি, ইত্যাদি দ্রব্য কিছু কিছু নিয়ে আসে; আর যারা বনে বনে বেড়ায় তারা নিজেদের আবশ্যকমতো সামগ্রী এই হাটে সংগ্রহ ক'রে নেয়। বনেচর লোকেরা এই হাট থেকে আরো কয়েকটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করে,—তাদের বন্দুকের জন্য বারুদগুলি ছর্‌রা কিনে নেয়, আর কুড়ুল দা বাণী বল্লম কামারের দোকান থেকে পাঁজিয়ে শানিয়ে শিলিয়ে নিয়ে যায়।

কামার যেমন বনচরদের অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে দু-পয়সা উপার্জ্জন করে, ময়রাও তেমনি করে। ময়রা দোকানে চিঁড়ে মুড়ি মুড়কি বাতাসা তৈরি রাখে; মুদির দোকানের জিনিসপত্রও রাখে; আবার মণিহারী দোকানের জিনিসও অল্প স্বল্প রাখে। এই ময়রার দোকানটিই জঙ্গলহাটির একমাত্র জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার। মুচির রোজগার খুব বেশী না হলেও তার সংসার চ'লে যায়; বন থেকে যে-সব জন্তু জানোয়ার লোকে মেরে আনে, সেইগুলির চাম্‌ড়া ছাড়িয়ে শুকিয়ে দিয়ে সে কিছু পয়সা পায়, আর যারা বনে যায় তাদের কারো কারো জুতোও থাকে এবং সেই জুতো বনের কাঁটায় খোঁচায় জখম হয়ে মুচির কাছেই মেরামত হতে আসে।

মঙ্গলবার মঙ্গলবার হাটের দিনে নটবর বিশ্বাস হাটের তোলা আদায় করে, হাটুরেদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে, আর জঙ্গলমহালের বন-করও সংগ্রহ ক'রে নেয়। আদায় তহশীলের টাকা বেশী জমলে সে হয় নিজে গোলোক-গঞ্জে গিয়ে সদর কাছারীতে জমা দিয়ে আসে, নয় তো জমিদারের খাজাঞ্চী মাঝে মাঝে এসে আমানত টাকা উসুল ক'রে নিয়ে যায়।

এক মঙ্গলবারের হাটে নটবর অনেক টাকা আদায় করলে—সাল্‌তামামীর পর সেদিন নূতন বৎসরের পুণ্যাহ ব'লে আদায়টা বেশী হলো। এই টাকা নিয়ে তার নিজেরই গোলোকগঞ্জে যাবার কথা। প্রত্যেক বৎসর সে এইরূপই ক'রে থাকে। কিন্তু সেই দিনই সে খবর পেলে তার গ্রামে তার ভাই হঠাৎ মারা গেছে। সুতরাং তার বাড়ী যাওয়া নিতান্ত দরকার। নটবর স্থির করলে চট্‌ ক'রে একবার

বাড়ী থেকে ঘুরে এসে তার পর সে সদরে খাজনা জমা দিতে যাবে; দু দিনেই সে ফিরে আস্‌তে পার্‌বে, এবং এই দুদিন বিলম্বের ত্রুটি সে যা হোক একটা কিছু ওজর জানিয়ে মুনিবের কাছ থেকে মাপ করিয়ে নিতে পার্‌বে।

নটবরের স্ত্রী নেই। তার পরিবারের মধ্যে মাত্র দুটি মেয়ে। ছোটো মেয়েটি বিধবা, তাই সে বাপের বাড়ীতেই থাকে; বড়ো মেয়েটি সধবা, কিন্তু তাকে তার স্বামী নেয় নি, তাই সেও বাপের বাড়ীতেই থাকে। বিপত্নীক বেচারাকে দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকও তো চাই, তাই সে দুটি মেয়েকে গলগ্রহ মনে না ক'রে সযত্নেই বাড়ীতে রেখেছে। নটবর দেশে যাবার সঙ্কল্প স্থির করে' মেয়েদের বল্‌লে—দেখ্ নীরু শৈল, আমি একবার চট্ ক'রে বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। তোরা একটু সাবধানে হুঁশিয়ার হয়ে থাকিস; রাত্রে একটু সজাগ হয়ে ঘুমোস, অনেক টাকা-কড়ি ঘরে রইলো।

নীরজা বড়ো। সে বল্‌লে—এম্‌নি জঙ্গলের মধ্যে থাকৃতেই আমাদের ভয় করে, তাতে আবার আমাদের দুটি মেয়েলোকের একলা থাকতে হবে; তার উপরে আবার বাড়ীতে তুমি টাকা রেখে যাচ্ছো। আমাদের তো ভারি ভয় হচ্ছে……

নটবর নিজের মনের আশঙ্কা সাহসের ও অবজ্ঞার হাসি দিয়ে ঢেকে বল্‌লে—ভয় কি রে বোকা মেয়ে! ঘরে বন্দুক রইলো, তোদের দুজনকেই বন্দুক ছুড়্‌তে শিখিয়েছি। তার পর সুদাম কামার আর কানাই ময়রাকে ব'লে যাবো, তারা তোদের খোঁজ খবর নেবে। আর এই বনে জঙ্গলে বিজন বেভুঁইয়ে কেই বা চুরি ডাকাতি কর্‌তে আস্‌বে?

শৈলজা হেসে বল্‌লে—এম্‌নি হয় তো আমাদের ততো ভয় কর্‌তো না; কিন্তু তুমি সাবধান হয়ে থাক্‌তে ব'লে আর চোর-ডাকাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাদের বেশ একটু ভয় পাইয়ে দিচ্ছো!

নটবর উচ্চস্বরে হেসে বল্‌লে—তোরা আমার মেয়ে হয়েই রইলি, ছেলে হতে পার্‌লি নে!

পিতার স্নেহ লাভের সুখে এবং নিজেদের অক্ষমতার লজ্জায় নীরজা ও শৈলজার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লেও পিতার সাহায্যকারী পুত্রসন্তান না থাকার দুঃখের ইঙ্গিতে ব্যথিত হয়ে তারা নীরব হয়ে রইলো।

নটবর বাহিরে যেতে যেতে ব'লে গেলো—দেখি গে নৌকো এলো কি না।

সন্ধ্যার সময় নটবর যাত্রা ক'রে বেরুবে, এমন সময় একজন বুনো তার নিজেরই মতন কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড-কায় একটা কুকুর সঙ্গে ক'রে নটবরের বাড়ীর ভিতরে এসে ঢুক্‌লো এবং নটবরকে সম্মুখে দেখেই বল্‌লে—পর্‌ণাম হই কত্তা মশায়। শুন্‌লাম তুই নাকি কুথাকে যেছিস? দিদিরা ঘরে এক্‌লাটি থাক্‌বেক? সেই লেগে হামি হামার বাঘাকে লিয়ে আস্‌ছি—তোর ঘর পাহারা দিবেক।

বুনো নটবরকে এই কথা ব'লেই নটবরের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তার বাঘা কুকুরকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—দেখ বাঘা, ভাল্লো ক'রে চিন্‌হে রাখ—এ কত্তা মশায়, আর এই দুই দিদি—ইদেকে কিছু বল্‌বি না—বুঝ্‌লি? আর কেউ যদি রাত-বিরাতে এই বাড়ীতে এসে, তো তার টুঁটি ছিঁড়ে লিবি—হামি না আসা তক্ তাকে ছোড়্‌বি না—বুঝ্‌লি?

বুনো এই বলিয়া বাঘার মাথায় গোটা-কতক চাপড় মার্‌লে এবং কালো মুখের ভিতর থেকে, বড়ো বড়ো সাদা সাদা দাঁত বাহির করে হাস্‌তে লাগলো—আর বাঘাও জিভ বার করে হাঁপাতে লাগলো।

নটবর হেসে বল্‌লে—আর তুই যদি নিজে চুরি কর্‌তে আসিস বিদেশী?

বিদেশী বুনো বাঘার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হেসে বল্‌লে—হামি এলে বাঘা হামাকে কিছু বল্‌বেক নাই। তুই খাতির-জমা থাক্ কত্তা মশায়, তোর বাড়ীতে কেউ আস্‌তে নার্‌বে।…আর দিদি, তোরা হামার বাঘার সাথে চিন্‌পহ্‌চান ক'রে লে……

নীরজা শঙ্কাতে দ্বিধান্বিত হয়ে বাঘার দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টিপাত কর্‌লে। শৈলজা ভয়ার্ত্ত স্বরে ব'লে উঠ্‌লো—না, ও কাম্‌ড়াবে! যে ওর চেহারা! চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে!

বিদেশী সাহস দিয়ে বল্‌লে—না না, তোধের কিছু বল্‌বেক নাই।

নটবর বল্‌লে—শৈল, বাঘাকে কিছু দুধভাত এনে দে, আর তার সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে দিস, ওরা নিমক্‌হারামী কর্‌বে না।

শৈলজা পিতার উপদেশ অনুসারে বাঘাকে খেতে দিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে উদ্যত হলো।

বিদেশী নটবরের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে বাঘাকে ব'লে গেলো—খবরদার বাঘা, বোস্, বোস্ ঐ ঠাঁইয়ে……

বাঘা সেইখানে সামনের দুই পায়ের উপর ভর রেখে মাটিতে ব'সে হ্যাঃ হ্যাঃ ক'রে হাঁপাতে লাগলো এবং তার সাদা সাদা লম্বা লম্বা দাঁতগুলো তার গায়ের কালো রঙের পাশে খুব উজ্জ্বল চক্চকে দেখাচ্ছিলো।

নীরজা আর শৈলজা তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, তারা একলা এই বিকট হিংস্র জানোয়ারের কাছে থাকতে আর সাহস পেলে না।

নটবর নৌকায় উঠতে যাবার সময় কানাই ময়রা আর সুদাম কামারকে ব'লে গেলো—আমি দু দিনের জন্যে দেশে যাচ্ছি, মেয়ে দুটো রইলো, একটু দেখো শুনো, খবরদারী কোরো……

কানাই আর সুদাম আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে—কোনো ভাবনা নেই নায়েব মশায়; মা ঠাক্রুণদের দেখবো তার জন্যে আবার আপনি বলতে এসেছেন?

নটবর বললে—হ্যাঁ তা তোমরা তো দেখবেই, তবু ব'লে গেলাম, কালকের হাটের আদায়টা তো সদরে পাঠানো হয় নি…

সুদাম কামার বল্‌লে—তারই বা ভয় কি? এই জঙ্গলের মধ্যে চুরি করতে আসবে এমন লোকই বা কোথায়?

নটবর মেয়েদের কাছে যা বলে আশ্বাস ও সাহস দিয়ে এসেছিলো ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি সুদাম কামারের মুখে শুনে আশ্বস্ত হয়ে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লো।

নৌকা ছেড়ে দিলে।

সুদাম কামার নদীর জলের ধারে দাঁড়িয়ে কোমর পর্য্যন্ত নুইয়ে জোড়হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে—নায়েব মশায়, অবধান।

নটবর নৌকার ছইয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলো, সে আশীর্ব্বাদ করলে—জয় হোক!

নটবরের আশীর্ব্বাদ শুনে সুদামের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো।

*

* *

গভীর রাত্রি। চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। নিস্তব্ধ; একটা ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাক পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার। কালো হয়ে আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসন্ন। নীরব বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। নটবরের বাড়ীতে নীরজা আর শৈলজা মাত্র দুটি মেয়ে, এক কাঁড়ি টাকা আগলে একলা রয়েছে। তাদের পাহারা দিচ্ছে একটা বিকটাকার কালো মিশ্‌মিশে কুকুর; সেটা আবার তাদের অজানা অচেনা। এই রক্ষকের কথা মনে হলেই তাদের গা ছমছম করছে; এমন ভয়ঙ্কর রক্ষক না থাক্‌লে হয় তো বা তারা এর চেয়ে গা মেলে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে থাকতে পারতো। নীরজা আর শৈলজা নিশ্চিন্ত হয়ে চেপে ঘুমাতেও পারছিলো না; একবার একটু ঘুম আস্‌ছে, আর ছ্যাঁক করে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙবা মাত্রই ও সম্পূর্ণ চেতনা হবার আগেই না জানি এই ঘুমের অবসরে কী কাণ্ড ঘ'টে গেছে জান্‌বার আগ্রহে ও ঔৎসুক্যে একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে তাদের মন ভ'রে উঠ্‌ছে; আর ভালো ক'রে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস ক'রে রক্তের ঢেউ আছাড় খাচ্ছে। নীরজার ঘুম ভাঙ্‌লে সে বোনকে ডেকে সাহস সঞ্চয় করছিলো—শৈল, ঘুমুলি না কি? আবার শৈলজার ঘুম ভাঙ্‌লে সে দিদিকে সচেতন ক'রে দিচ্ছিলো—দিদি, একটু জেগে থাকো না ভাই, আমার যে বড়ো ভয় ভয় করছে।

এম্‌নি ভাবে পরস্পরকে সজাগ ক'রে রাখবার চেষ্টা করতে করতে কখন দুই বোনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ত্রাস-তরল তন্দ্রার ঘোরে শৈলজা স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লো যেনো বিদেশী বুনো পা টিপে টিপে তাদের ঘরের দরজার ওপারে এসে দাঁড়ালো, আর তার বাঘা কুকুরটাও নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো; তারা দুজনেই খানিকটা ঘন অন্ধকার দিয়ে তৈরি; তাই তারা বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে গ'লে ঘরের মধ্যে চ'লে এলো যেমন ক'রে স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো এসে ঘরে পড়ে। তারা যেখানটায় এসে দাঁড়ালো সেখানে যেনো ঘরের অন্ধকারটাই এক জায়গায় জমা হয়ে একটু ঘন হলো; সেই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে চক্‌চক করতে লাগ্‌লো তাদের সাদা সাদা বড়ো বড়ো দাঁতগুলো, আর জলজল করতে লাগলো তাদের গোল গোল চারটে চোখ।

শৈলজা ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো, সে ঘুমের ঘোরে ভয়ার্ত্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—দিদি…দিদি…চো·· চো···

নীরজার তন্দ্রা চট্ ক'রে ভেঙে গেলো। সেও ভয় পেয়ে ব্যস্ত হয়ে তন্দ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—শৈল, শৈল..... কি...কি হলো......?

ঠিক এই সময় তাদের বাড়ীর হাতা-ঘেরা রাং-চিতে আর কচা-ভেরেণ্ডার বেড়ার আগড় খোলার শব্দ হলো—ক্যাঁচ .. কোঁও......

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাঘা কুকুরটা মোটা গম্ভীর গলায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—ঘোঁাং ঘোঁাং ঘোঁাং...

নীরজা আর শৈলজা দুজনেই ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লো। তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, তারা উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে—অন্ধকার ভেদ ক'রে যদি কিছু দেখ্‌তে পায় কি শুন্‌তে পায়।

আর কিছু শোনা গেলো না; কেবল থেকে থেকে বাঘার গম্ভীর ঘংঘঙে আওয়াজ বনে জঙ্গলে প্রতিধ্বনি তুলে নৈশ আকাশ কাঁপিয়ে তুল্‌ছিলো।

নীরজারা চম্‌কে উঠে দেখ্‌লে খোলা জান্‌লার কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে! তার মাথায় পাগড়ী, আর পাগড়ীর ঝোলা লেজটা ঘুরিয়ে, মুখ ঘিরে গাল-পাট্টা বাঁধা; এতে তার মুখের অধিকাংশই আবৃত হয়ে গেছে। চোখ নাক আর কপালের যে কিয়দংশ অনাবৃত আছে তাতে ভুষা কালী লেপা। সেই কালোর মধ্যে থেকে তার চোখ দুটো যেনো দু খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন জ্বল্‌ছে।

শৈলজাদের বিছানার পাশেই টোটা-ভরা বন্দুকটা প'ড়ে ছিলো। সেটার কথা তাদের মনেও পড়্‌লো না, এবং সেটার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে তারা দুই বোনে সমস্বরে "ওরে বাবা রে!" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, এবং ধড়মড়িয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে তারা তাড়াতাড়ি কপাট খুলে চোঁ চাঁ ছুটে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলো।

যে লোকটা জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো তার কালীমাখা মুখ আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো এবং বিদীর্ণ মুখ-বিবরের মধ্য থেকে দাঁতগুলো প্রকাশ পেয়ে যেনো অন্ধকারের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে রইলো।

যেদিকের জান্‌লায় লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো তার বিপরীত দিকে দরজা ছিলো ব'লেই নীরজা আর শৈলজা পালাতে সাহস পেয়েছিলো; কিন্তু এ দিকেও যে ঐ লোকটার সঙ্গী কেউ থাকতে পারে, অথবা এই দিকেই যে বাঘা কুকুরটা বিকট গর্জ্জন কর্‌ছে এ-সব কথা তখন আর তাদের মনে জাগে নি; ঐ ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শন ডাকাত লোকটার উল্টা দিকে পালিয়ে তারা আত্মরক্ষা কর্‌তে যাচ্ছে এই বোধটাই তখন তাদের মনে প্রধান হয়ে অপর সকল চিন্তা ও ভয়কে চাপা দিয়ে ফেলেছিলো।

নীরজা আর শৈলজা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খিড়কী-পথ দিয়ে সুদাম-কামারের বাড়ীতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়্‌লো, এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাক্‌তে লাগ্‌লো—কামার-খুড়ী, কামার-খুড়ী, চট্ ক'রে দরজাটা খুলে দাও...

একবার ডাক্‌তেই কামার-বৌ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো; সে এতো সত্বর ও সহজে বেরিয়ে এলো যে নীরজা ও শৈলজার মন তখন স্থির থাক্‌লে তারা বুঝ্‌তে পার্‌তো যে কামার-বৌ তখন জেগেই ব'সে ছিলো ও ঘরের দরজা কেবল মাত্র ভেজিয়ে রেখে সে কারো আহ্বান বা আগমনের প্রতীক্ষাই কর্‌ছিলো।

কামার-বৌ বাইরে বেরিয়ে এসে এমন অসময়ে নীরজা ও শৈলজাকে অমন ত্রস্ত রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় তার বাড়ীতে আস্‌তে দেখে একটুও যে বিস্মিত বা ব্যস্ত হলো তা মনে হলো না, বরং তার মুখখানা আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো; সে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে—কে নীরু-মা, শৈল-মা? ভয় পেয়েছো বুঝি? তা এসো ..ঘরে এসো......

নীরজা ও শৈলজা ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে সন্ত্রস্ত স্বরে বল্‌লে—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে কামার-খুড়ী। মাথায় পাগড়ী বাঁধা... মুখে কালী মাখা ..

কামার-বৌ হেসে সহজ স্বরে বল্‌লে—দূর ভয়-তরাসে মেয়ে। ডাকাত কি চুপি চুপি আসে? ডাকাত পড়্‌লে চেঁচিয়ে হেঁকে হাট ক'রে তুল্‌তো না? মশাল জ্বল্‌তো... রৈ রৈ শব্দে হাঁক পাড়্‌তো...

শৈলজা বল্‌লে—তা হলে চোর হবে! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম বিদেশী বুনো চুরি কর্‌তে এসে ঘরে ঢুকেছে...

কামার-বৌ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্‌লে—এই হয়েছে! স্বপ্নের ঘোরে আচম্‌কা ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে, তাইতে ঐ রকম ভ্রম দেখেছো......

নীরজা বল্‌লে—না কামার-খুড়ী, আমরা দুজনে দেখ্‌লাম ......শৈল স্বপ্ন দেখেছে, আমি তো দেখিনি......

কামার-বৌ নিশ্চিন্ত শান্ত স্বরে বিজ্ঞের মতন বল্‌লে—

তা এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাক্‌লে একজনের স্বপনে আর-একজনের মনেও ভয় ঢোকে।····· তোদের একটা মজার গল্প বলি' শোন্‌······

নীরজা ও শৈলজার মনের অবস্থা তখন গল্প শোনার অনুকূল ছিলো না। নীরজা বল্‌লে—কামার-কাকা কই? তাকে তো ঘরে দেখ ছি নে?

কামার-বৌ হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে থতোমতো খেয়ে অপ্রতিভ ভাবে বল্‌লে—এই বাইরে গেলো···তাইতে তো আমি পিদ্দিম জ্বেলে জেগে ব'সে ছিলাম······

মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিলো। এখন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ হলো। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি অজস্র ধারার নূপুর বাজিয়ে যেনো উন্মত্ত নৃত্য জুড়ে দিলে।

শৈলজা বল্‌লে—কামার-খুড়ী, বৃষ্টি এলো, কামার-কাকা তো কৈ ফির্‌লো না ·····?

কামার-বৌ বল্‌লে—বোধহয় বৃষ্টিতে হাটখোলার কোনো চালার তলায় মাথা গুঁজে দাঁড়িয়েছে···জল একটু ধর্‌লেই আসবে······

শৈলজা আবার বল্‌লে—কামার-কাকার তো আস্‌তে তা হলে দেরী হবে ·····এ বৃষ্টি তো শীগ্‌গির থাম্‌বার নয়······ ময়রা-কাকাকে ডাক্‌লে হতো······স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেই যে ভীষণ-মূর্ত্তি দেখেছি······

কামার-বৌ শৈলজার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—যে বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি, এতে তো চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও ময়রা-বাড়ীর কেউ শুন্‌তে পাবে না······নিশুত রাত······তারা সব ঘুমোচ্ছে······স্বপ্নের কথা যদি বল্‌লি মা, তো সেই গল্পটা শোন্‌······

নীরজা আর শৈলজা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে ভাব্‌ছিলো এখন এই অবস্থায় কী উপায় করা যেতে পারে···এতোক্ষণ হয় তো সেই দুষ্‌মন ডাকাতটা নির্ব্বিঘ্নে তাদের সর্ব্বনাশ ক'রে চ'লে গেলো······

কামার-বৌ নীরজাকে ও শৈলজাকে নীরব দেখে হাসিহাসি প্রফুল্ল-মুখে গল্প বল্‌তে লাগ্‌লো—দুই বন্ধু ছিলো। দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছে। এ-দেশ সে-দেশ বেড়িয়ে তারা যেতে যেতে পথের মাঝে এক সরাইয়ে আশ্রয় নিলে। সেই সরাইয়ে মাত্র একখানি খাটিয়া। সেই খাটিয়ায় শুলো এক বন্ধু; আর খাটিয়ার ঠিক নীচেই বিছানা বিছিয়ে শুলো আর-এক বন্ধু। গভীর নিশুত রাত। খাটিয়ার বন্ধু স্বপ্ন দেখ্‌ছে যে পথের মাঝখানে এক ডাকাত তাদের তাড়া করেছে। আর নীচের বন্ধু স্বপ্ন দেখ্‌ছে যে একটা প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘ তাদের তাড়া করেছে। ঠিক সেই সময় একটা ইঁদুর ঘরের চালের বাতা বয়ে ছুটে যেতে পা পিছলে নীচে পড়্‌লো; আর পড়্‌বি তো পড়্‌ সেই খাটিয়ার বন্ধুর গায়ের উপর। অম্‌নি সেই খাটিয়ার বন্ধু চম্‌কে উঠে গোঁ-গোঁ কর্‌তে কর্‌তে দড়াম ক'রে গড়িয়ে পড়্‌লো নীচের বন্ধুর ঘাড়ে। সেই বন্ধু মনে কর্‌লে আর কিছু নয়, বাঘ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে জাপ্‌টে ধরেছে। এ মনে করে তাকে ডাকাতে ধরেছে, ও মনে করে তাকে বাঘে ধরেছে; এই দুজনে একেবারে ঝুটোপুটি লড়াই। কাছেই ছিলো এক হাঁড়ি কোৎরা গুড়। পড়্‌বি তো পড়্‌ গিয়ে দুজনে সেই হাঁড়ির উপর। হাঁড়ি ফেঁসে দুজনে একেবারে গুড়-মাখামাখি। তাদের হুটোপুটি শুনে সরাই-ওয়ালা লাঠি-সোঁটা লণ্ঠন নিয়ে এসে দেখে ঐ কাণ্ড! আলো দেখে আর সরাইওয়ালার হাঁক-ডাক শুনে দুই বন্ধুর হুঁস হলো। তখন সবাই হেসেই কুটপাট! ····

এই ব'লে কামার-বৌ হিহি-হিহি ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু নীরজা ও শৈলজার মন তখন গল্পের দিকে ছিলো না; তারা হাস্‌লোও না; অথবা গল্পের এই অসঙ্গতিও তাদের মনে লাগ্‌লো না যে বন্ধুরা যদি ডাকাত ও বাঘের স্বপ্ন দেখেই ভ্রম ক'রে থাকে তবে তো তারা একে অপরের কাছ থেকে পালাতেই চেষ্টা কর্‌তো, দুজনে জড়াজড়ি ক'রে হুটোপুটি কর্‌তো না।

কামার-বৌয়ের হাসি থাম্‌তেই নীরজা বল্‌লে—কামার-খুড়ী, কামার-কাকা তো এখনো ফিরে এলো না···?

কামার-বৌ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—কী জলটাই ঢাল্‌ছে দেখ্‌ছো তো মা; কেমন ক'রে আসে? কোথাও আশ্রয় নিয়েছে,······কিম্বা বাড়ীতে ফিরে এসে কামার-শালে ঢুকে ব'সে আছে··· ·

শৈলজা বল্‌লে—আমরা তাহলে ময়রা-বাড়ীতে যাই, ময়রা কাকাকে ডেকে জাগাই গে······

কামার-বৌ ব্যস্ত বিব্রত হয়ে বল্‌লে—এমন বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাইরে বেরুবি কী ক'রে, ভিজে একেবারে······

শৈলজা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—তা ভিজি ভিজবো··· ওদিকে বাড়ীতে হয় তো একটা সামগ্রী আর রইলো না···

শৈলজার সঙ্গে সঙ্গে নীরজাও উঠে দাঁড়ালো।

তখন কামার-বৌও অগত্যা ধীরে ধীরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে—নিতান্তই যাবি যদি তো যা···আমি ঘর খোলা ফেলে তো যেতে পারি নে···ঘরে কুলুপ দিয়েও যেতে পারি নে, যদি কামার মিন্‌সে ভিজে টিজে ফিরেই আসে······

নীরজা ও শৈলজা আর কোনো কথা না ব'লে কামারের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো। তারা বাইরে বেরিয়ে দেখ্‌লে বৃষ্টি ধ'রে এসেছে এবং পূবে ফর্‌সা হয়ে উঠেছে।

তারা দিনের আলো দেখে খুশী হলো, সাহস পেলে। কিন্তু তাদের মন এই চিন্তাতেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো যে এতোক্ষণে ডাকাত তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে চ'লে গেছে।

তারা দ্রুতপদে ময়রা-বাড়ীর দরজায় গিয়ে ব্যস্ত স্বরে ডাক্‌লে—ময়রা-কাকা, ময়রা-কাকা······

কানাই-ময়রা তখন তামাক সেজে ফুঁ দিয়ে আগুন স্বচ্ছে তুলে কল্‌কে হুঁকোর মাথায় বসাতে যাচ্ছে, শৈলজার ডাক শুনে সে তাড়াতাড়ি হুঁকো কল্‌কে মাটিতে রেখে দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কী মা শৈল, কী হয়েছে...?

নীরজা ও শৈলজা সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে ময়রা-কাকা······

এই সময় ময়রা-বৌ দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো আর ব'লে উঠ্‌লো—ওমা! বলিস কি তোরা?

কানাই আর কোনো কথা না ব'লে ঘরের কোণ থেকে মাছ ধরবার একটা খোঁচা নিয়ে এসে ছুটে যেতে যেতে বল্‌লে—তোমরা এইখানে থাকো, আমি কামার-দাদাকে ডেকে নিয়ে দেখ্‌ছি গিয়ে······

শৈলজা চেঁচিয়ে বল্‌লে—আমরা এই কামার-বাড়ী ঘুরে আস্‌ছি, কামার-কাকা বাড়ী নেই......

কানাই দূর থেকে হেঁকে ব'লে গেলো—আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি······

*   *   *   *   *

উদ্বেগ অস্বস্তি বুকে পুষে নীরজা আর শৈলজার সময় আর কাটে না। বেশ ফর্‌সা সকাল হয়ে গেছে; বৃষ্টিও থেমে গেছে। কিন্তু কানাই তো এখনও ফির্‌ছে না। ময়রা-বৌ চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লো—ও একলা গেলো ডাকাতের মুখে·····

দিনের আলোর আশ্বাস পেয়ে শৈলজা বল্‌লে—চলো না খুড়ী আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি, কী ব্যাপার·····?

ময়রা-বৌ চিন্তিত মুখে উৎকণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—তাই চল্ মা দেখি······

তারা তিন জনে চল্‌লো।

বর্ষণ-স্নাত গাছ-পালার ধূলিলেশ-শূন্য নির্ম্মল শ্যামলিমার উপর নবোদিত সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে ধরণীর মুখশ্রী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য কর্‌বার মতন মনের অবস্থা তখন কারও নেই।

তিন জনে দ্রুতপদে যেতে যেতে দেখ্‌লে কামার-বৌ তাদের বাড়ীর সাম্‌নে উদ্বিগ্ন মুখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারি দিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে কাকে খুঁজ্‌ছে।

তাকে দেখেই নীরজা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কামার-খুড়ী, কামার-কাকা এসেছে?······তাকে বলেছো······?

কামার-বৌ চিন্তাকাতর স্বরে বল্‌লে—না মা, কোথায় যে গেছে এখনও তো ফির্‌লো না, সাপে-খোপেই কাম্‌ড়ালে, না বাঘেই নিয়ে গেলো .....

ময়রা-বৌ চ'লে যেতে যেতে বল্‌লে—আমরা নায়েব মশায়ের বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, আয় না দিদি, বেশী লোক সঙ্গে থাক্‌লে সাহস বাড়ে·····

কামার বৌ তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য হাঁটতে আরম্ভ ক'রে বল্‌লে—চ।

সকাল-বেলার স্নিগ্ধ বাতাসে বাঁশ ঝাড়ের ঝালর পাতার মধ্যে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে; একটা দোয়েল একটা নিম-গাছের ডালে ব'সে মধুর মিহি শিসের গিট্‌কিরিতে আর গমকে সুরের মোহ রচনা কর্‌ছে; আর একটা দোয়েল মাটিতে ঘাসের মধ্যে ফড়িং খুঁজে বেড়াচ্ছে আর থেকে থেকে লেজটা একবার পিঠে তুলে খাড়া ক'রে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ঝপাস ক'রে নামিয়ে মাটির উপর আছড়ে গুটিয়ে নিচ্ছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে ডানা দুটো ঝুলিয়ে মাটিতে ঠেকাচ্ছে। চারি দিকে প্রকৃতির রাজ্যে স্নিগ্ধ শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিরাজ কর্‌ছে। কিন্তু তারই মধ্যে চারটি রমণীর মন চিন্তায় উৎপীড়িত হচ্ছে।

তারা চার জনে হাটখোলার মাঝামাঝি গেছে, দেখ্‌লে

কানাই ময়রা দৌড়ে আসছে। কানাইকে আসতে দেখেই ময়রা-বৌয়ের মন আশ্বস্ত হলো, তার মুখ থেকে চিন্তার 'কালিমা দূর' হয়ে গেলো এবং সেই স্থান অধিকার কর্‌লে কেবলমাত্র কৌতূহল; নীরজা ও শৈলজার মন আশা ও আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠ্‌লো; কামার-বৌয়ের মুখও কৌতূহলে উৎসুক হয়ে উঠ্‌লো।

কানাই দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কামার বৌদি, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে······

কামার বৌ শুষ্কমুখে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কী হয়েছে ময়রা ঠাকুরপো······?

কানাই মেয়েদের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে—কামার-দাদার এমন কাজ। মুখে কালোঝুল মেখে সিন্দুক খোলার যন্ত্র-পাতি নিয়ে চুরি কর্‌তে গিয়েছিলো; বিদেশী বুনোর বাবা কুকুরটা তার টুঁটি কাম্‌ড়ে ধ'রে বুকে ব'সে গোঁ গোঁ কর্‌ছে,······কামার-দা মরে চিতপটাং হয়ে প'ড়ে আছে······আমি তো কিছুতেই ছাড়াতে পার্‌লাম না ····· যাই বিদেশীকে ডেকে আনি গে······

নীরজা শৈলজা ও ময়রা-বৌ অবাক্ হয়ে কামার-বৌয়ের মুখের দিকে তাকালো।

কামার বৌ আছ্‌ড়ে মাটির উপর প'ড়ে চেঁচাতে লাগ্‌লো—ওরে সর্ব্বনাশী শতেকখোয়ারী—নীরো শৈল, তোরা বাড়ীতে বাঘা কুকুর রেখে এসেছিলি আমাকে তো ঘুণাক্ষরেও এ কথা বলিস নি,······আমি জান্‌তে পার্‌লে মিন্‌সেকে সাবধান কর্‌তে ছুটে যেতাম······ওরে আমার কী সর্ব্বনাশ কর্‌লি রে তোরা সয়তানী······

সকলে অবাক্ হয়ে কামার-বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বিলাপ শুন্‌তে লাগ্‌লো, কেউ একটা সান্ত্বনার কথা মুখে উচ্চারণও কর্‌তে পার্‌লো না।

প্রসূতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

প্রথম মায়ের প্রথম শিশুটি আসিয়াছে দিন কয়—
বুক হ'তে চোখে ফুটায়ে মাতার জীবনের বিস্ময়;
তরুণী হিয়ার যত সঙ্কোচ, মুকুলিত ভালবাসা,
বধূপদ হ'তে ঘরণী পদের গোপন স্বপন আশা;
ভয়লাজ-ভরা তনুর বৃন্তে ফুটায়ে ব্যথার দান,
স্বামীর অঙ্কে এয়োতী নারীর অভিনব সম্মান;
শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজন পাশে অধিকার-ভরা স্নেহ,
গৃহিণী গৃহের নূতন দাবীর সবেদন সন্দেহ—
এক হয়ে আজি নবনীনিন্দী ঐ টুকু দেহ মাঝে
বুকের কামনা চোখের সমুখে ব্যথা হয়ে যেন বাজে!

খেলার পুতুল প্রসাধন-পেটী, আস্‌মানী নীলা সাড়ী
অটুট নবীন যৌবন সাথে কোথা গেল কোল ছাড়ি,
বুকে-বুকে রাখা প্রবাসী প্রিয়ের প্রণয়পত্ররাজি
ঝড়ে-ঝরে'-যাওয়া পত্রেরই মতো কোথা সে ঝরিল আজি?

ঝিনুক বাটী ও চুষণি কাঁথায় নিল কি তাঁদের ঠাঁই!
রুদ্ধ দুয়ারে কোথায় আজিকে কাঁদে বসন্ত জয়!
সারা অঙ্গের ভরা লাবণ্য পুঞ্জিত করি, মরি,
চাঁদেরে চাহিয়া রাত্রি কাটায় পূর্ণিমা বিভাবরী!
নয়ন-ভুলান' নয়ন আজি সে অনিমেষে হেরে কারে?
মন্দির-চূড়া অবনত হয়ে পরশিছে দেবতারে!

চোখের তড়িৎ লুকায়ে মরিল সজল কাজল স্নেহে,
বুকের শোণিত দুধের ধারায় দাহটি ভুলিল দেহে;
জননীর মাঝে রমণীর মন পলকে ব্যথায় ভরা—
করুণার পায়ে বিদ্রোহ যেন সাধিয়া পড়িল ধরা!
সুন্দর আজি শিবের সঙ্গে হইল দুঃখভাগী,
কালিকার ভোগ ভুলিয়া নিমেষে আজি সে সর্ব্বত্যাগী!
কাঙালের মত তাই সে নয়ন ব্যথাতুর নিশিদিন,
পূর্ণ অন্ন থাকিতে আবাসে নিজে উপবাসে ক্ষীণ;
মলিন বসন রিক্ত ভূষণ, মনে সদা ভয় ভয়—
শিবেরে স্মরিতে তাই সে কেবলি স্মরে মৃত্যুঞ্জয়!

রোথেনবুর্গ

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

জার্ম্মাণীতে বাভেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম অংশে রোথেনবুর্গ বলে একটি পাহাড়-নদী-বন-ঘেরা স্বপ্নের সহর আছে। ইয়োরোপের অতি পুরাতন সব সহরের মধ্যে রোথেনবুর্গ একটি। এখানে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা আট্‌কা পড়ে আছে। ইয়োরোপের মধ্যযুগের একটি পরম সুন্দর টুকরো কালের শাসন এড়িয়ে জেগে আছে বলে, এই সহরের এত খ্যাতি ও সৌন্দর্য্য। তা-ছাড়া, রোথেনবুর্গের ইতিহাস পুরাতনকালে বিকশিত হয়ে থেমে গেছে, নতুন যুগের ইতিহাস-ধারার বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মত কল্লোলধ্বনি সেখানে শোনা যায় না। তাই ইয়োরোপের অন্য সব পুরাতন বৃহৎ সহরে নবীনের মধ্যে প্রাচীনকে যেমন খুঁজে বাহির করতে হয়, এখানে তার দরকার হয় না। এখানে যেন সময়ের চলা থেমে গেছে; অতীত কালের সহরটি তার পুরানো ঘরবাড়ী, তার পুরানো তোরণদ্বার, পরিখা, দেওয়াল, গির্জ্জার চূড়া, দুর্গের ধ্বজা, তার আঁকাবাঁকা পথ ও মধ্য-যুগের শান্তি ও রহস্য নিয়ে অম্লান স্বপ্নের মত জেগে আছে।

এই পুরাতন সুন্দর সহরটিকে দেখবার জন্যে ন্যুরেনবর্গ থেকে যাত্রা করলুম। ডম্‌বুল্‌ বলে একটি ষ্টেসনে নেমে ছোট ট্রেনে করে যেতে হয়।

শরতের মধুর স্নিগ্ধ রৌদ্রালোকিত অপরাহ্ণ। ছোট ট্রেন উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলান পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বার্চ্চবন পাইন-বনের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চল্ল। দুধারে সবুজ ঢেউ-খেলান মাঠ। কোথাও শুকনো বড় ঘাস (hay) কাটা হচ্ছে; কোথাও হয়ে গেছে। ঘাসের গাদা একটি সোনালী গম্বুজের মত ঘাস-কাটা উদাস মাঠের ওপর বসে। যেখানে ঘাস কাটা হচ্ছে, সেখানে ছোট ছেলেমেয়ের দল ঘাসের ছোট গাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাদের সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে বন-প্রান্তরের শান্তি আকুল হয়ে উঠছে,—স্তব্ধ দীঘির জলে এক গাদা পাথর ছুঁড়লে যেমন হয়। কোন বড় খড়ের গাদার আড়ালে কোন তরুণ-তরুণীর ক্ষণিকের প্রেমালাপ হচ্ছে। বুড়ো চাষার ক্রুদ্ধ আহ্বানে আবার সবাই কাজে লাগল; কেউ কাঠছে, কেউ ঘাস জমা করছে, কেউ গাড়ীতে তুলছে। একগাড়ী ভরা হয়ে গেল; সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু সাদা পথ ধরে গাড়ীটি চল্ল,—যেখানে রঙীন ছবির মত পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট গ্রাম জেগে আছে; মনে হচ্ছে, যেন সবুজ মখমলের ওপর রক্তমণির মালা ঝোলান। গাড়ীটি বড় মজার,—একদিকে একটি গরু, আর একদিকে একটি ঘোড়া টানছে। একটি চাষার ছেলে ঘাস-পাতার অতি নরম গাদায় আধ-শুয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। আমাদের ট্রেন ওই গরু-ঘোড়া-টানা গাড়ীর মতই ধীরে স্বপ্নের ঘোরে চলেছে। কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও হলদে ঘাস; কোথাও ঘাস-কাটা শূন্য মাঠ যেন আগুনে পুড়ে গেছে। কোথাও মাটি চষা হয়েছে; মাটির কালো রং ওই নীল সবুজ হলদে রংএর মাঝে। একটি মেয়ে ঘাস কাটছে, তার নীল রংএর এপ্রণ, লাল রংএর জ্যাকেট, মাথায় খড়ের মত সোনালী রংএর রুমাল জড়ান। মনে হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার যুগ পেরিয়ে এক স্বপ্নের দেশে চলেছি;—অতীতের রূপকথা-লোকে।

একটি ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে ট্রেন উঠছে। এক ধারে পাইন-বনের ঘন রহস্য; আর এক ধারে প্রান্তর দীর্ঘবিস্তৃত হয়ে দিগন্তে এক পাহাড়ের সারির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের সারি খুব উচু নয়; মনে হয়, ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাংলার স্নিগ্ধতা, শ্যামলতা মেশান। কাটা ঘাসের গন্ধ-আমোদিত বাতাসে শরৎ-বাংলার সুমধুর স্মৃতিভরা।

একটি ছোট ষ্টেসনে আমাদের ট্রেন থামল। অদূরে একটি গির্জ্জার চূড়া ঘিরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর লাল-টালি-ছাওয়া; অনেক ঘর পাথর বা ইটের তৈরী; তার ওপর মাটির প্রলেপ; তার ওপর সাদা রং দেওয়া। ছাদগুলি ঠিক তিন-কোণা নয়, একটু হেলে গড়িয়ে পড়েছে। দূরে আর একটি গ্রাম শ্যামল তরুবেষ্টিত,—নীল সবুজের পটে কে যেন লালমণির মালা দুলিয়ে দিয়েছে। চারিদিক শান্ত স্নিগ্ধ। গ্রামগুলি

দেখলে বাংলার গ্রামের কথা মনে জাগে;—শুধু বাড়ীগুলি খড়ের ছাওয়া নয়, লাল টালি দিয়ে ছাওয়া, ঝরেঝরে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর; বনের ও আগাছার বাহুল্য নেই।

পাহাড়-বনের আড়ালে গ্রামের গির্জ্জার চূড়া মিলিয়ে গেল,—ট্রেন রোথেনবুর্গের দিকে চলেছে।

সহসা যেন পাহাড়-বনের সবুজ পর্দ্দা ছিঁড়ে কোন রূপকথার পুরী বাহির হয়ে এল,—দূরে রোথেনবুর্গ দেখা গেল। একটি সবুজ পাহাড় থাকে-থাকে নীলাকাশের দিকে উঠে গেছে। তার তলায় টাউবার নদী রূপালি হারের মত এঁকে-বেঁকে জড়ান। তার মাথায় রঙীন স্বপ্নের মত জিনিস দিয়ে গড়া। গাড়ী ধীরে ধীরে রোথেনবুর্গের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। মনে হতে লাগল, শিল্পী রাফ আলের আঁকা কোন রূপকথা পুরীর চিত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি।

এইখানে রোথেনবুর্গের একটু ইতিহাস বলি। টাউবার নদী পাহাড়ের মালার তলা দিয়ে রূপালি সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে এখানে এসে ঘোড়ার খুরের নালের মত বেঁকে গেছে। সেই বেঁকের মধ্যে একটি পাহাড়ের লম্বা কোণ সিংহের তৃষিত জিহ্বার মত প্রবেশ করেছে; পাহাড়ের সামনে ও দুপারে নদীর জলধারা পর্য্যন্ত বন নেমে গেছে। পাহাড়ের পেছনে উঁচু সমতল জমি। সেই পাহাড়ের



রোড়ার-ফটক

রোথেনবুর্গ। তার লাল-টাইলে-ছাওয়া বাড়ীর সারি, তার মন্দির-চূড়া, তোরণ দ্বারগুলি, তার প্রাচীন স্তম্ভের সারি রঙীন মেঘে ভরা গোধূলির আলোময় সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যারাগের মত, রঙীন মেঘস্বপ্নের মত দেখাল—যেন আগুনের শিখা জ্বলজ্বল করছে, যেন সবুজ পেয়ালাতে রাঙা মদ গলিত স্বর্ণের মত টলমল করছে।—সন্ধ্যার রাঙা আলোয় নীলাকাশের পটভূমিতে পাহাড়ের মাথায় এই রাঙা সহর সত্যই অপরূপ দেখায়। মনে হয়, এ বুঝি রঙীন মেঘদলের একটা লীলার চিহ্ন,—এখুনি চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। তোরণের মালা, গৃহের সারি যেন শূন্যে ঝুলছে, মেঘের মত হাল্কা চূড়া ও সমতল জমি জুড়ে রোথেনবুর্গ সহর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে।

এই স্বাভাবিক পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় স্থানটি অতি প্রাচীন কালে হয় ত কত ভ্রাম্যমান জাতির দলের আশ্রয়স্থান ছিল। আত্মরক্ষা করতে ও শত্রু হটাবার পক্ষে এ জায়গাটি খুব প্রশস্ত; সেজন্য এখানে কোন কোন কেল্টিক দল হয় ত তাদের কিছুদিনের আবাসভূমি গড়েছিল। তবে সে সময়কার কোন সঠিক ইতিহাস জানা নেই।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে আমরা রোথেনবুর্গের সঠিক ইতিহাস জানতে পারি। প্রায় চোদ্দশ বছর আগে এক জার্ম্মাণ

ডিউক এখানে তাঁর দুর্গ তৈরী করেন। মহারাজ সার্লামেনের সময় আমরা রোথেনবুর্গের কাউণ্টেদের নাম শুনতে পাই,—তাঁরা টাউবার নদীর উপত্যকার ওপর রাজত্ব করতেন। তার পর এ যায়গা জার্ম্মাণ রাজার অধিকারে আসে, এবং তাঁর অধীনে ৯১১খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কনের ডিউক এখানে বাস করতেন। ১১০৮খৃঃ অব্দে রোথেনবুর্গের কাউণ্ট-বংশ শেষ হয়ে যাওয়াতে, জার্ম্মাণ-রাজ এ সহর হোয়েনষ্টাউফেন কনরডকে (Hohenstaufen Konrad) দেন। এঁর বংশ ডিউক অফ রোথেনবুর্গ নাম নিয়ে রাজত্ব করেন। তাঁদের সময় থেকে রোথেনবুর্গ বাড়তে আরম্ভ করে। প্রথমে বাসের জন্য এখানে আশ্রয় নিল। সহরের আয়তন, শক্তি ও সম্পদ দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। সেই সময়কার সহর ঘিরে সহর রক্ষার জন্য যে দেওয়াল ছিল তার কয়েকটি তোরণ-দ্বার এখনও আছে। সহরটির আকৃতি ellipseর মতন ছিল। তার মাঝখানে এক দিকে ডিউকের দুর্গ, আর এক দিকে বাজার।

নতুন নতুন লোকের দল এসে সহরে আশ্রয় খুঁজতে লাগল। জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে পুরাতন সহরের দেওয়ালের গণ্ডিতে আর লোকের যায়গা হল না। তাঁতি, কুমোর, কামার এইসব কারিগরেরা সহরের দেওয়ালের বাহিরে তাদের



জ্যাকব চার্চ্চ

পাহাড়ের চূড়ায় ডিউকদের দুর্গ ছিল। সে দুর্গের পেছনে ডিউকদের vassals বা অধীনস্থ জমিদারগণ এসে তাঁদের বাড়ী নির্ম্মাণ করলেন। তার পর পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে কারিগর, মজুরেরা তাদের দরিদ্র কুটীর তুল্ল। ১১৭৮ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণ মহারাজ বারবারোজা এ সহরকে মিউনিসিপাল অধিকার দিলেন। অধিবাসীগণ নিজ নিজ ব্যবসা অনুসারে নিজেদের মধ্যে করপোরেশন, গিল্ড্ করবার ক্ষমতা পেল। রোথেনবুর্গ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাধীন প্রধান সহর হয়ে উঠল। অনেক ধনী, কারিগর ও বণিক সুরক্ষিত শক্তিসম্পন্ন নগরের প্রাচীর মধ্যে শান্তিতে বসবাড়ী দোকান তুল্লে। দেওয়ালের বাহিরের সহর যখন বেড়ে উঠল, তখন পুরাতন দেওয়াল ভেঙে, সহরের বাহিরের অংশ পুরাতন সহরের ভেতর নেবার জন্যে নতুন দেওয়াল তোলা হল। এখন সহর ঘিরে অনেক যায়গায় সেই তেরো শতাব্দীর দেওয়াল রয়েছে।

রোথেনবুর্গ বুঝতে হলে ইয়োরোপের মধ্যযুগের জীবন বোঝা চাই। সে সময় ইয়োরোপ শত খণ্ড-রাজ্যে ভাগ করা ছিল। দেশের রাজার ক্ষমতা ও শাসন প্রতি নগর-গ্রামে অনুভব করা যেত না। নানা দস্যু ও দস্যু-জমিদারের ক্ষমতা প্রবল ছিল। গ্রামের, ছোট নগরের জীবন, সম্পত্তি

আজকালকার মত পুলিশ-রক্ষিত বা দস্যু-ভয়হীন ছিল না। সেজন্য প্রত্যেক নগর পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও রক্ষিত ছিল। নগরে প্রবেশ করবার কয়েকটি দ্বার ছিল। সে দ্বার সাধারণতঃ দিনের বেলায় খোলা থাকৃত ও রাতে বন্ধ থাকত। দ্বারের প্রহরী প্রবেশের অনুমতি দিলে তবে লোক প্রবেশ করতে পারত। কোন কোন নগরে রাতে প্রবেশ করবার হুকুম ছিল না। কোন নগরবাসী যদি সন্ধ্যার পর নগরের প্রাচীরের বাহিরে থাকত, তাহলে তাকে সমস্ত রাত প্রাচীরের বাহিরে গাছের তলায় বা শূন্য মাঠে কাটাতে হত,—সকালে যখন দ্বার খুলত তখন প্রবেশ করতে পারত। অনেক সময় নগরের ভেতরের বাসিন্দারা এসে প্রাচীরের বাহিরের বিপন্ন লোকদের দেখে হাস্য-পরিহাসও করত। নগরের প্রাচীরের বাহিরে থাকা তখন বিপদজনক ও ভীতিকর ছিল। সে জন্য মধ্যযুগের নগরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রোথেনবুর্গে সেই মধ্য-যুগের প্রাচীরের বেড়া সুন্দর দেখা যায়। প্রাচীরের ভেতরও মধ্য-যুগ আটকা পড়ে আছে।

কিন্তু এ পুরাতন সহরকে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে একটা রফা করতে হয়েছে। সহরের প্রাচীরের পাশে কলদৈত্যের নূতন সহর বসেছে; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তোরণের পাশে উনবিংশ শতাব্দীর কলের চিমনী জেগে উঠেছে। দিনের বেলা রাঙা টালির ওপর তার কালো ধোঁয়া দেখা যায়। এ সহরের আইন অনুসারে কোন পুরাতন বাড়ী ভেঙে পড়লে, তাকে সারাতে বা নতুন বাড়ী গড়তে হলে, ঠিক পুরান আমলের বাড়ীর ধরণে তাকে গড়তে হবে। নতুন সহরের বাড়ীগুলিও পুরান ধরণে গড়া। তা হলেও তার কলের চিমনী প্রথমে চোখে পড়ে।

পুরান সহর তার প্রাচীর বাড়িয়েও নতুন সহরকে আপনার মধ্যে টেনে নেয়নি; কারণ, মধ্যযুগের যুদ্ধের রীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে পাথর ইটের দেওয়ালে নগর সুরক্ষিত করা যেতে পারত। কিন্তু বর্ত্তমান কামান এয়ারোপ্লেনের যুগে, নগরের চারিদিকে দেওয়াল গড়া বৃথা। এখন বোধ হয় সমস্ত নগরের মাথায় ছাদের মত লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরতে হবে।



সেণ্টমার্কের তোরণ

তেরো শতাব্দীর শেষে আবার নতুন প্রাচীর গড়ে সহর বাড়াবার দরকার হল। সহরের দক্ষিণ কোণের শেষে যে হাস্পাতাল গড়ে উঠেছিল, নগরবাসীরা সে অংশ নগরের মধ্যে জুড়ে নিতে চাইলে। নগরের এই অংশের পুরাতন

নাম হচ্ছে kappenzuppel বা টুপির কোণ। এই নামকরণ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। নগরবাসীরা রাজার কাছে আবেদন করলে যে এই হাস্পাতালের অংশ নগরের প্রাচীরের মধ্যে নেওয়া হোক। রাজা প্রথম আপত্তি করলেন, কারণ এ রকম ভাবে নগরের প্রাচীর বাড়িয়ে গেলে শত্রু আক্রমণ করলে নগর রক্ষা করা বড় শক্ত হবে। কিন্তু নগরবাসীদের বার বার আবেদনে শেষে বল্লেন, আচ্ছা বেশ, তোমাদের সহর ত দেখতে একটা ঘুমোবার-টুপির মত,—সে টুপির যদি একটা লম্বা কোণ তোমরা চাও, তা বেশ তার সঙ্গে জুড়ে দাও।

করলেন। উচ্চবংশীয় ধনী জমিদারদের নিয়ে মন্ত্রণাসভা করলেন; কারিগরদের নিয়ে নানা গিল্ড বা সংজ্ঞের সৃষ্টি করলেন; সাহসী যুবাদের নিয়ে সৈন্যদল করলেন; বিদ্বান ধর্ম্মযাজকদের হাতে চার্চ্চ হাস্পাতাল দিলেন; সকলের শক্তি একত্রীভূত করে, সহরের যশ ও শক্তিকে সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুল্লেন। কিন্তু ক্ষমতা ও সফলতার জন্য শত্রুরও সৃষ্টি হল। বিশেষতঃ উচ্চবংশীয় ধনীরা, জমিদারেরা তাঁকে জনসাধারণের বন্ধুরূপে দেখতে লাগল। ধনীদের উচ্চবংশীয়দের ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাবে,—তাঁর প্রভাবে ও শাসনে জনসাধারণের



পুরান একটি বাড়ি

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সেই ellipse আকৃতি সহর বাড়তে বাড়তে লম্বা-কোণওয়ালা ঘুমাবার টুপির মত হয়ে দাঁড়াল। এখনও ম্যাপে ওই রকম দেখায়।

চোদ্দ শতাব্দী হচ্ছে রোথেনবুর্গের সব চেয়ে গৌরবময় সময়। ওই সময় তার শক্তি ও সম্পদ উছলে উঠেছিল। বিশেষতঃ শেষ অর্দ্ধ শতাব্দীতে বুর্গোমাষ্টার বা মেয়র টপলারের (Burgomaster Topler) সময় রোথেনবুর্গের সোনার যুগ গেছে। টপলার সমস্ত নগরবাসীকে তাদের শিক্ষা, কর্ম্ম ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন দলে সংগঠিত

ইচ্ছাই জয়ী হবে,—এই ভেবে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হল। রোথেনবুর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হিতৈষী সেবক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কারাগারে বন্দী হলেন, এই কারাগৃহে (১৪০৮খৃঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

রোথেনবুর্গে জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবীর সংগ্রাম টপলার তাঁর জীবন দান করে আরম্ভ করে গেলেন,—তাঁর মৃত্যু বৃথা হল না। ধন ও পদমর্য্যাদার সঙ্গে দিন মজুরীর সংগ্রাম সুরু হল। ধীরে ধীরে কারিগরের দল ধনী ও অভিজাতদলের শক্তি হরণ করে নগর-শাসনে তাদের দাবী

ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করল। পনেরো শতাব্দীতে মধ্য সময়ে জনসাধারণের শক্তি জয়ী হয়ে উঠল। ১৫২৫ খৃঃ অব্দে যখন চাষারা ধনী, অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল, তখন এ সহর তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু এ যোগদানের ফল ভাল হল না। আউস-বাসেয়ারের (Ausbacher) কাউণ্ট এসে বিদ্রোহীদের রক্তে সহর রঞ্জিত করে বিদ্রোহ দমন করলেন!

নগরের অভিজাতবংশীয় শাসকেরা এখন থেকে জন-সাধারণকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা আরম্ভ করলে। লুথারের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীনতা, অন্ধসংস্কার ও অন্যায় জুলুমের প্রতি অসম্মান ও বিদ্রোহের আগুন আছে বলে, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম যাতে রোথেনবুর্গে না আসে, তার জন্যে তারা চেষ্টা করলে। কিন্তু বেশীদিন তা আটকে রাখতে পারলে না। ১৫৪৪ খৃঃ অব্দে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের আগুন রোথেনবুর্গে এস ও তা জয় করলে।

তারপর ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হল। জার্ম্মাণীর ত্রিশবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের (Thirty years' war) রক্তের আবর্ত্তে রোথেনবুর্গ বিক্ষিপ্ত, ক্লান্ত, পরাজিত হয়ে ভেঙে পড়ল। একবার টিলি (Tilly) (১৬৩১ খৃঃ অব্দে) তাকে জয় করল; তার চোদ্দ বৎসর পরে সে Turenneর হাতে পড়ল। তার কত বাড়ী আগুনে পুড়ল, তার কত সন্তান যুদ্ধে মরল, কত ধনী পথের ভিখারী হল। যুদ্ধের শেষে, রোথেনবুর্গ হতশ্রী, বিগতশক্তি, দীন, পরাজিত; তার স্বাধীনতা লুপ্ত, তার গৌরবময় ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। রাজবংশীয় জমিদারদের একচ্ছত্র প্রভুত্বময় শাসন আরম্ভ হল। ১৮০২ খৃঃ অব্দে রোথেনবুর্গকে বাভেরিয়ার একটি প্রাদেশিক সহর বলে গণ্য করা হল। বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে তার কোন স্থান নেই; মধ্যযুগের সাক্ষীরূপে তার সম্মান ও সৌন্দর্য্য।

এই ছোট সহরের ছোট ইতিহাস সমস্ত ইতিহাসের বিবর্ত্তন-ধারার একটি সুন্দর রূপকের মত। এই ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় শত শত বৎসর আগে কোন দলপতি এসে, তার ছোট আশ্রয়দুর্গ নির্ম্মাণ করল। তার পর তার দুর্গ ঘিরে তার আশ্রিতদের ছোট গ্রাম হল। সে গ্রাম বেড়ে সহর হল। সে সহরে শক্তি, সম্পদ,

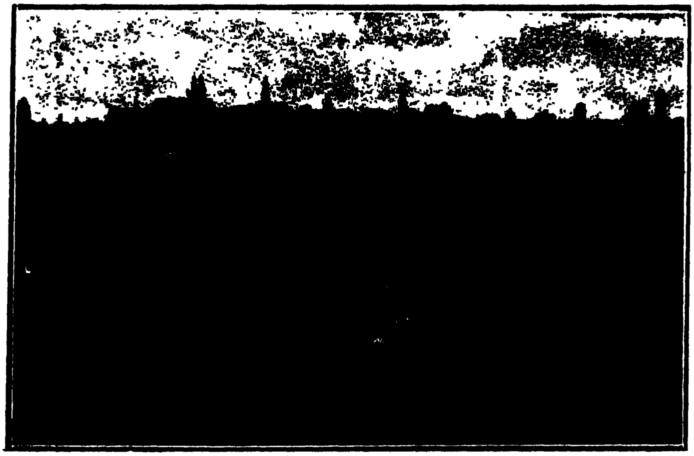


সেণ্টজর্জ্জের ফোয়ারা

সৌন্দর্য্য উপছে উঠল। তার পর সে নগরের শ্রেষ্ঠ সন্তান-সেবকের রক্ত দিয়ে ধনের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত দরিদ্রের সংগ্রাম সুরু হল; রক্তের প্লাবনে ধন ও বংশমর্য্যাদার শক্তি জনসাধারণের দাবীকে ব্যর্থ করলে; কিন্তু আগুন নিভল না। তার পর ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, জাতির সঙ্গে জাতির,

দলের সঙ্গে দলের ক্রূর নিষ্ঠুর সংগ্রাম সুরু হল। সে সংগ্রামে এ ছোট সহরের শক্তি ও বিকাশ শেষ হয়ে গেছে বটে; কিন্তু পুরাতন সহরের পাশে নতুন সহরে যন্ত্রের গর্জ্জনে ও ইঞ্জিনের ধূমে মানবইতিহাসদেবতা তাঁর নব-জয়যাত্রার পথে চলেছেন। সে কালো-চিমনীর তোরণ-শোভিত পথের কথা থাক। ষ্টেসন থেকে নেমে নতুন সহর পার হয়ে পুরাতন সহরে প্রবেশ করবার যে তোরণ দ্বারটি দেখলুম তার কথা বলি।

Rodertor বা রোডার দরজা পুরান স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, দেশবিদেশের পথিকদের অভ্যর্থনা করছে। প্রথমে পাথরের একটি সুন্দর খিলান; তার দুপাশে দুটি প্রহরী-গৃহ লাল-টালি-ছাওয়া, ছোট তাঁবুর মত। তার পর



রোথেনবুর্গ

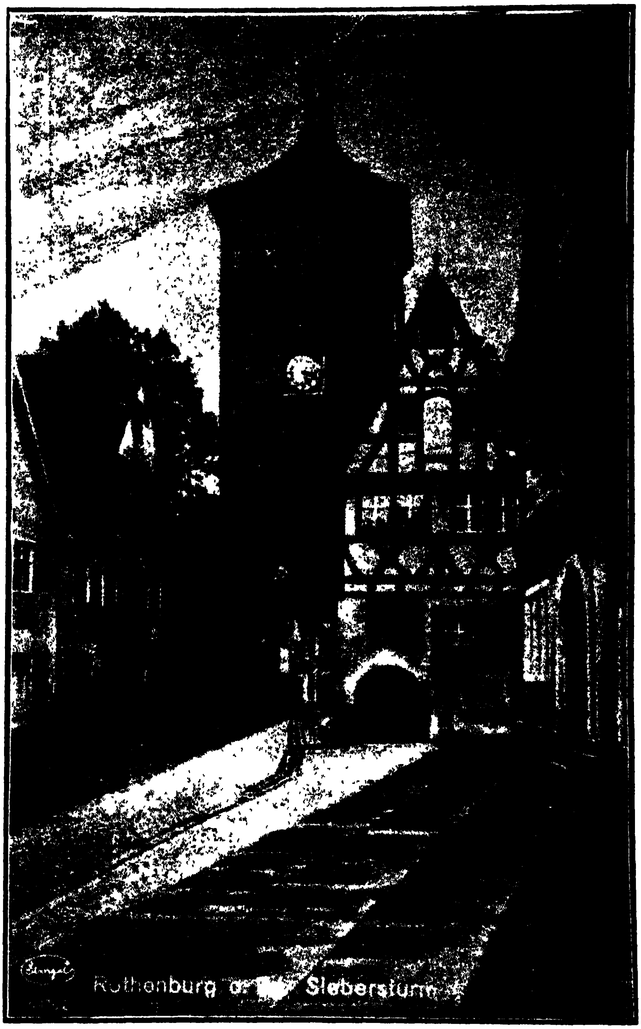
একটি ছোট সাঁকো পেরিয়ে দ্বারের তোরণ। মধ্যযুগে এই সাঁকোর যায়গায় লোহার টানা-সেতু বা draw-bridge ছিল। সে সেতু ইচ্ছামত টেনে তোলা যেত। সেতুটি সহরের চারিদিকের খাদের ওপর ছিল। সুতরাং শত্রু আক্রমণ করলে, সেই সেতুটি তুলে খাদে টাউবার নদীর জল ভরে প্রবেশ-দ্বারের বড় দরজা বন্ধ করে দিলে নগরটি একটি সুরক্ষিত দ্বীপের মত হত। তোরণটি ছোট; কিন্তু বড় সুন্দর। 'ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধে'র নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এটি বেঁচে আছে।

এই তোরণ পেরিয়ে পুরাতন রোডর ষ্ট্রীট দিয়ে আর একটি তোরণের সামনে এসে পড়লুম। এটি আরও পুরাতন তোরণ,—নগরের প্রথম দেওয়ালের স্মৃতি। এটির নাম Markus turm বা সেণ্টমার্কের দরজা। সহরের লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন এখান থেকে সহরের দেওয়াল ও দ্বার দূরে নিয়ে যেতে হল। ৬।৭ শত বৎসর আগেকার ছোট তোরণটি দেখে মন দুলে উঠে। কত পথিক, কত বণিক এর তলা দিয়ে প্রবেশ করেছে। কত বিবাহিত বধূ, কত শবদেহ এর তলা দিয়ে সমারোহে গেছে। কত নগর-সৈন্যদল, কত বিজয়ী শত্রুসেনার পদভরে এ তোরণ কেঁপে উঠেছে। কত শতাব্দীর সুখ-দুঃখের এ সাক্ষী। সেই ধূসরবর্ণের ইট-পাথরের ছোট তোরণটি দেখলে মনে হয়, এ যেন কোন থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের তোরণ! ঘরবাড়ী—এ যেন বায়স্কোপের চিত্র তোলবার জন্যে একটি সহর তৈরী করা হয়েছে। বস্তুতঃ, সেই ছোট তোরণ, সরু রাস্তা, বৃহৎ তাসের ঘরের মত ঘরবাড়ী, বড় আশ্চর্য্যকর লাগে। কি সুন্দর এ জায়গাটি! সুন্দর রোমান আর্কের তোরণের গায়ে দুধারে পুরান বাড়ী ঢলে পড়েছে। সামনে সন্ধ্যার আলোভরা gabled বা ত্রিকোণছাদ-ওয়ালা বাড়ীর সারির মধ্যে সরু পথ কোন রহস্যপুরীর ইসারার মত। তাসের ঘরের মত লাল ত্রিকোণ ছাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বড় রহস্যময় সুন্দর লাগে। ধূসর, হলদে দেওয়ালে কালো কাঠের ফ্রেমের জালকাটা, তার মাঝে মাঝে জানলার সাদা ফ্রেম। দূর থেকে সন্ধ্যার আলোয় কোন বাড়ী দেখলে মনে হয়, যেন ডোরাকাটা নানা রংএ ছোপান কাপড় জড়িয়ে কে পথের ধারে কোন সুদূরের পথিকের আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। Hafengcesse বা বন্দরের রাস্তা দিয়ে সহরের মাঝে মার্কেট-প্লেসে এসে পড়লুম। একটি ছোট পাথর-বাঁধান খোলা স্কোয়ার; তার চারদিকে বাড়ীর সারি যেন যায়গাটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তাদের মধ্য দিয়ে চারদিক হতে পাঁচ ছ'টা সরু পথ মার্কেটে এসে পড়েছে। একদিকে Rathause বা মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ী,—শালবৃক্ষের মত সরু লম্বা স্তম্ভটি চিরজাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। অপর

দিকে Rats-Trinkstube, পাঁচশ' বছরের বেশী পুরাতন,—একটি সুন্দর হাল্কা বাড়ী যেন থাকে-থাকে সরু হয়ে ওপরে উঠে গেছে; মাথায় একটি ছোট ঘণ্টা-স্তম্ভ। বাড়ীর ওপরের ত্রিকোণ অংশের মাঝে একটি গোল ঘড়ি,—যেন কপালে একটা চোখ জ্বলজ্বল করছে। পুরান কালে এ বাড়ী মদ খাবার আড্ডা ছিল। কত সন্ধ্যায় কত নগরবাসী, কত কাউন্সিলার এখানে বসে গল্প করেছে; নগরের শাসন নিয়ে তর্ক বাগ্‌যুদ্ধ করেছে। তার পরে মদের গেলাসে তাদের মিলন হয়েছে। এখন বাড়ীটি পোষ্টাফিস। রাট্‌-হাউসের সামনে চার-পাঁচখানি বাড়ী পাশাপাশি সাজান; তাদের ত্রিকোণ ছাদের সারি গায়ে-গায়ে লাগান। দেখলে মনে হয়, সাদাখোপওয়ালা বড় বাক্সের ওপর কে রাঙা তাসের ঘর সাজিয়েছে,—বুঝি ক্ষণিকের খেলা, এখনি পড়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এই বাড়ীগুলি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী জেগে আছে, তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

রাট্‌হাউসের দিকে কোণে পথের ধারে একটি ছোট ফোয়ারা আছে—St. Ceorgs-Brunnen বা সেণ্ট জর্জ্জের ফোয়ারা। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তৈরী। কারুকার্য্যময় পাথরের রিনেসাঁ বেসিনের মাঝখানে একটি ছোট স্তম্ভ। তার ওপর সেণ্ট জর্জ্জের মূর্ত্তি। তিনি অশ্বপদতলের ড্রাগনটি বর্শা হস্তে বধ করছেন। ফোয়ারাটি রোথেনবুর্গের সবচেয়ে সুন্দর ফোয়ারা ও রেনেসাঁ আর্টের একটি গৌরবময় সৃষ্টি। ধূসর সিংহের মত বৃহৎ রাট্‌হাউসের পাশে হাস্যময়ী বালিকার মত এই ছোট ফোয়ারাটি সমস্ত যায়গাটা ভরে একটি সহজ আনন্দের ছন্দ জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের পুকুরের ঘাটে যেমন মেয়েদের সভা বসে, এখানেও তেমি আগে মেয়েদের আড্ডা হত,—কত তরুণ-তরুণীর চোখে চোখে মিলন ঘটত।

ফোয়ারাটির পেছনের বাড়ীটি ছিল Tauz House বা নাচবার বাড়ী। এখন সেটি ওষুধের দোকান। এ বাড়ীর কোণের oriel-windowটি বড় সুন্দর দেখতে, যেন ছোট



সিবার-তোরণ

একটি স্তম্ভের টুকরো বাড়ীর কোণে লাগান ঝুলছে, তার তলায় রক্ষাকারী দেবতার মত একটি সেণ্টের মূর্ত্তি।

Rathauseর পাশে Rats Keller হোটেলে আমার ছোট ব্যাগটা রেখে সহর দেখতে বাহির হলুম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু এদেশে গোধূলির আলো অনেকক্ষণ

থাকে। আমাদের দেশে সন্ধ্যার রক্তরাগ বড় ক্ষণিক,—দিনের আলো হঠাৎ নিভে যায়, কালো পর্দ্দা পড়ে যায়, রাত্রির অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ফেলে। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ উত্তর-ইয়োরোপে সূর্য্যাস্তের পর অনেকক্ষণ গোধূলির আলো থাকে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে রাত ১০টা ১২টা পর্য্যন্ত বেশ আলো পাওয়া যায়। শরৎকালে অবশ্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে না।



টপলারের ছোট্ট বাড়ী

গোধূলির মায়ালোকভরা পথে বাহির হলুম। এঁকে-বেঁকে সরু পথ চলেছে। তার দুদিকে ছোট বাড়ীর ছাদগুলি ঝুঁকে পড়েছে। ত্রিভুজের মত এই ছাদের কত বৈচিত্র্যময় মূর্ত্তি। কোথাও লাল ছাদ বরাবর সোজা নেমে এসেছে; কোথাও কিছুদূর গড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে; মাঝে জানলার খুপুরি কাটা। কোথাও ছাদগুলি গায়ে গায়ে লাগান,—ঢেউএর পর ঢেউ; কোথাও পথের দিকের ছাদ হেলান চতুর্ভুজের রূপ; তার মধ্যে রঙীন চোখের মত দুটি জানলা। বাড়ীর সারির মধ্যে সহসা একটি তোরণ-স্তম্ভ বা গির্জ্জার চূড়া প্রহরীর মত জেগে। সুন্দর শীতল বাতাস বইছে। পুরাতন বাড়ীগুলির গন্ধভরা এই বাতাস যেন আজকার নয়,—যেন বহুযুগের দ্বার খুলে এ বাতাস এল।

সবচেয়ে সুন্দর পথের শান্ত জীবনধারা। বাড়ীর দরজার সামনে বসে বুড়োবুড়ীরা গল্প করছে। এক কোণে কোন যুবক-যুবতীর প্রেমালাপ চলছে। চার পাঁচটি তরুণী হাতে হাতে ধরে সমস্ত পথ জুড়ে হাস্তে, গল্পে চারিদিক মাতিয়ে চলেছে।

একটি নির্জ্জন ছোট পথে এসে পড়লুম। সামনে তেতোলা বাড়ীর লাল কাঠের ফ্রেমে আঁটা ত্রিভুজ অংশটিতে দু'সারে চারটি সাদা জানলা,—কাচের সার্সি খোলা। তেতোলার জানলায় এক বুড়ো মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার তলায় জানলায় একটি কুকুর মুখ বাহির করে। আর একদিকের জানলায় একটি ছোট মেয়ে লাল ফিতে মাথায় জড়িয়ে। তার ওপরের জানলা শূন্য। অন্ধকার ঘরের স্নিগ্ধ কালো দেখা যাচ্ছে। মনে হল, কাঠের ফ্রেমে বাঁধান একটি হলদে পটে একটি বুড়ো, একটি কুকুর ও একটি মেয়ের মুখ আঁকা,—শান্ত, স্নিগ্ধ, স্তব্ধ, সুন্দর ছবি। মানব মুখের বিচিত্র মূর্ত্তিময় রাস্তার পর রাস্তা চলেছি,—যেন কোন রূপ-কথার বইএর ছবির পাতার পর পাতা উল্টে চলেছি। প্রত্যেক পথ প্রত্যেক বাড়ীর বিশেষত্ব, অপরূপ রস আছে।

ঘুরতে ঘুরতে সহরের পশ্চিম দিকের এক দ্বারে গিয়ে পৌছালুম। Burgtor! বুর্গটোর বা দুর্গদ্বার হচ্ছে রোথেন-বুর্গের সবচেয়ে পুরাতন প্রবেশ দ্বার। প্রথমে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ, তারপর ছোট সেতু পার হয়ে পাথরের গেট। তার

দুদিকে প্রহরীদের দুটি ঘর লাল তাঁবুর মত, গায়ে জড়ান। ঘাস বোঝাই একটি ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে সমস্ত দ্বার জুড়ে ঢুকছিল। সেটি প্রবেশ করলে আমি ফটক পার হয়ে নগরের বাহিরে গেলুম। সামনে বুর্গ-গার্ডেন বা দুর্গের বাগান। এইখানে বারো শতাব্দীতে হোয়েনষ্টাইফেন ডিউকরা তাঁদের দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন। চোদ্দ শতাব্দীতে সে দুর্গ ভূমিকম্পে ভেঙে যায়। এখন এক গির্জ্জার একটু ধ্বংসাবশেষ আছে।

পশ্চিম প্রান্তে এইখানে পাহাড়ের কোণ বকের তৃষিত কণ্ঠের মত টাউবার নদীর দিকে নেমে গেছে। নদীটি সাপের মত ঘুরে চলে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে এক দিকে টাউবার উপত্যকা ও দূর পাহাড়ের সারি; অপর দিকে তোরণ-স্তম্ভ-মণ্ডিত রঙীন সহর বড় সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ যে ছোট পুরাতন প্রাচীরটি তোরণদ্বার দিয়ে সহর ঘিরে চলে গেছে, তার রং, তার মূর্ত্তি দেখলে মন মুগ্ধ, বিচলিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের কোন যুদ্ধের দৃশ্য ভাবলে প্রাচীরটা রহস্যময় বিচিত্র হয়ে ওঠে। নদী পেরিয়ে, পরিখা ডিঙিয়ে শত্রুরা প্রাচীর আক্রমণ করেছে,—বীর নগররক্ষীরা প্রাণপণে শত্রু হটাচ্ছে। কোথাও গরম তেল ঢালছে, কোথাও বর্শা ছুঁড়ে মারছে, কোথাও হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে। একজন শত্রুসেনা প্রাচীর থেকে পড়ে গড়িয়ে নদীর জলে ডুবে গেল। দূরে লৌহবর্ম্মাবৃত নাইটদের অসির ঝঞ্ঝনা ও গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। এই প্রাচীরে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত মৃত্যু হয়েছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। দুর্গতোরণ আরও রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। সরু স্তম্ভটি সজীব হয়ে উঠল। পুরাকালের সকল কাহিনী যেন তার বুকে লেখা আছে। যখন তার ওপর নীলাকাশের তারাগুলি ঝলমল করবে, বনের অন্ধকারে বাতাস উতলা হয়ে উঠবে, তখন বুঝি সে সব পুরান গল্প বলতে সুরু করবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুর্গদ্বারের বাক্যহারা রূপ আমি ভুলব না।

পরদিন সকালে প্রথমে রাটহাউস দেখতে গেলুম। গোধূলির আলোয় সহরটিকে যেমন মায়াময় অতীত স্বপ্নভরা লেগেছিল, প্রভাতের প্রখর আলোয় তার তেমি সুন্দর রূপ রয়েছে দেখলুম,—স্বপ্ন টুটে যায়নি।



রাটহাউসের পুরাতন দরজা

রাটহাউসের বাড়ীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে তৈরী। ইয়োরোপীয় স্থাপত্যশিল্পের তিনটি বিভিন্ন যুগের ধারা এখানে মিলিত হয়েছে। বাম দিকের স্তম্ভমণ্ডিত অংশটি হচ্ছে

গথিক আর্ট। তেরো শতাব্দীর পুরাতন রাটহাউসের অংশ গথিক চার্চ্চের মত—স্তম্ভটি সুদূর শূন্যে উঠে গেছে। ষোল শতাব্দীতে সামনের অংশটি আগুনে পুড়ে যাওয়াতে, সে অংশ নতুন করে রিনেসাঁ স্থাপত্যকলা অনুসারে তৈরী করা হয়। কোনের criel windowটি সুন্দর; পুরাতন অংশের



তরওয়াল-ফটক

দ্বারের মত সম্মুখের রিনেসাঁ দ্বারটি আমাদের মন মুগ্ধ করে। সামনে লম্বা ঢাকা বারান্দা কটা পাথরের তৈরী Barock শিল্পের নমুনা। বাড়ীটি তিনরকম বিভিন্ন স্থাপত্য-শিল্পের নীতিতে তৈরী হলেও, সমস্ত বাড়ীটি জুড়ে একটি সুন্দর সমতা ও ঐক্য আছে। বাড়ীর ভেতর বিশেষ দেখবার জিনিস হচ্ছে প্রাচীন অস্ত্র ও ঢালের সারি। ১২৩০ খৃঃ অব্দ হতে সকল বুর্গোমাষ্টারদের পারিবারিক চিহ্ন-লাঞ্ছিত ঢাল-তলোয়ার এখানে সাজান আছে। তাছাড়া দোতোলায় Kaiser-sall বা রাজ-সভাগৃহ বলে বৃহৎ সুন্দর হলটি দেখবার জিনিস। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ হতে প্রতি বৎসর Whitsuntideর সময় নগরবাসীরা এই হলে Meistertrunk বা শ্রেষ্ঠ মদ্যপায়ী বলে একটি উৎসব নাট্যের অভিনয় করে। তিনবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের সময় ১৬৩১ খৃঃ অব্দে টিলি (Tilly) যখন নগর অধিকার করেন, তখন কি করে নগর রক্ষা করা হয়, সেই ঘটনা নিয়ে এক রোথেনবুর্গবাসী দ্বারা এই নাট্যটি রচিত।

নাট্যটি এইরূপ। প্রথম দৃশ্যে রাটহাউসের কাইজারসালে নগরের কাউন্সিলার, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন। বুর্গোমাষ্টার বেজোল্ড্ (Bezold) এলেন,—তাঁর সঙ্গে নগররক্ষী সেনার দল। বাহিরে টিলি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে নগর অবরোধ করেছেন। এ নগর আক্রমণ করে জয় করা শক্ত; তাই তিনি অবরোধ করে নগরবাসীদের গমনাগমন, আহার আসবার পথ বন্ধ করে নগর জয় করতে চান। নগরের খাবার ফুরিয়ে গেছে। তখন কি করা যায়, সেই পরামর্শ করতে কাউন্সিলাররা সব জমেছেন। বাহিরে স্কোয়ারে ক্ষুধিত নগরবাসী, রমণীগণ, ছেলেমেয়েরা। খবর এল, টিলির সেনা নগরের পূর্ব্ব ও উত্তর দিক আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। রাটহাউসের ঘণ্টা-তোরণে ঘণ্টা বেজে উঠল,—নগরবাসী সব সচকিত হয়ে উঠল। নগররক্ষী সৈন্যেরা প্রাণ দিয়ে নগররক্ষা করবে বলে শপথ করলে। তার পর তারা জ্যাকব-চার্চ্চে চল্ল। সেখানে পুরোহিত ঈশ্বরের কাছে তাদের জয়ের জন্য প্রার্থনা করলেন, তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তার পর গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি-মুখরিত পথ দিয়ে তারা নগর-প্রাচীরের দিকে ছুটে চল্ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। কাউন্সিলাররা সব টাউনহলে বসে আছেন যুদ্ধের খবর শুনবার জন্যে। দূতের পর দূত এসে খবর

দিচ্ছে। খবর সব মোটেই ভাল নয়। প্রথমে খবর এল, টিলির সৈন্য ভীমবেগে আক্রমণ করেছে,—দেওয়ালের এক দিক ভেঙে পড়ছে। তারপর খবর এল Klingentor বা তলোয়ার-দরজার বারুদশালাতে আগুন লেগে সব বারুদ পুড়ে গেছে, ঘরদোর উড়ে গেছে। তার পর খবর এল, সেনাপতি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন।

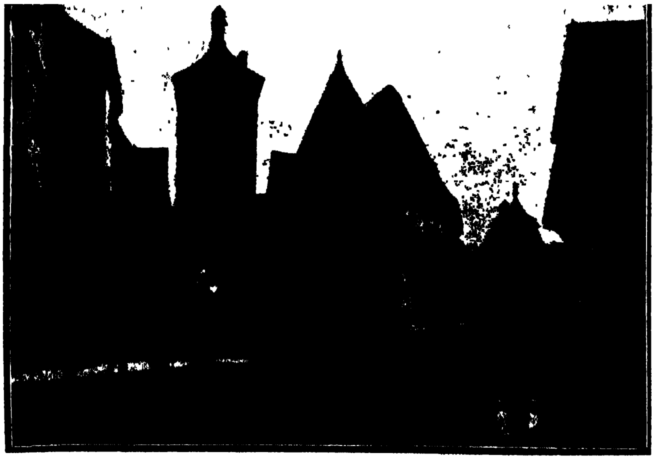
তার পর নারীদের আর্ত্তনাদ-মুখর শঙ্কিত নগরে অস্ত্রের ঝঞ্চনা শোনা গেল,—বিজয়ী টিলি তাঁর বলদৃপ্ত সৈনিকদের নিয়ে প্রবেশ করলেন।

রাটহাউস দখল করে তিনি সকল কাউন্সিলারদের, সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মেয়েরা তাঁর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল, সবাই তাদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাঁর সামনে এসে ক্ষমাভিক্ষা চাইলে। কিন্তু টিলির মন টল্ল না।

এমন সময় মদের ভাণ্ডার-রক্ষকের মেয়ে আনার (Anna) মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে তার বাবাকে বলে এক বৃহৎ ভাণ্ডে উৎকৃষ্ট মদ টিলির সামনে এনে হাজির করলে। রোথেনবুর্গের মদের তখন খুব নাম। টিলি প্রথমে সে মদ আস্বাদন করলেন। তার পর তাঁর সাত সেনাপতিকে দিলেন। তাঁদের মধ্যে মদ খাওয়ার ধুম পড়ে গেল; কিন্তু গেলাসের পর গেলাস খেয়ে যখন তাঁরা আর খেতে পারলেন না, তখনও অর্দ্ধেক ভাণ্ড খালি হয়নি। টিলি তখন পরিহাসের সুরে বল্লেন, আচ্ছা, এই পাত্র যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এক নিশ্বাসে খেয়ে শেষ করতে পার, তাহলে আমি নগরকে ক্ষমা করব, সবাইএর জীবন দান করব।



বুর্গদ্বার বা দুর্গদ্বার



প্লোন-লাইন

তখন বৃদ্ধ মেয়র নুস (Nusch) শঙ্কিত হৃদয়ে এগিয়ে এলেন, করযোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। তার পর এক নিশ্বাস টেনে মদের বৃহৎ পাত্রে মুখ দিয়ে এক নিশ্বাসে মদের পাত্র শূন্য করে দিলেন।

সবাই অবাক্ হয়ে দেখল, মদের ভাণ্ড খালি হয়ে গেছে। টিলি বল্লেন, আমি আমার কথা রাখব,—আমি নগরকে ক্ষমা করলুম,—কারুর কোন দণ্ড হবে না।

এই শুভবার্ত্তা নিয়ে লোকেরা বন্দী বুর্গোমাষ্টারের নিকট ছুটল। চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠল। তারা যে যায়গায় তাঁকে খুঁজে বাহির করে এ খবর দিল, সে যায়গাটির

নামকরণ হল, Street of Joyful Tidings—শুভ-বার্ত্তার পথ।

নাট্যটি সত্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির চিহ্ন, সেজন্য কোন রঙ্গমঞ্চ তৈরী করতে হয় না। সমস্ত সহরটি অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ হয়।

এখন Rathauseটিকে কেন্দ্র করে সহরের চারিদিক ঘোরা যাক। রাটহাউসের দক্ষিণদিকে বড় রাস্তা Herren Street বা বড়লোকদের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকে বরাবর গেলে আমরা বুর্গটোর বা দুর্গের তোরণে গিয়ে পড়ি। এই রাস্তায় তেরো শতাব্দীর একটি পুরাতন গির্জ্জা আছে।



রাটহাউস্

রাটহাউস থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে Schmied Strasse বা কামারপাড়ার রাস্তা দিয়ে আমরা Siebers turm পার হয়ে হাস্পাতালের রাস্তা (Spitalgasse) দিয়ে Spitaltor হাস্পাতালের তোরণে গিয়ে পৌছাই। সহরের এ অংশ পরে ঘিরে নেওয়া হয়। হাস্পাতাল-চার্চ্চ-তোরণ দ্বারা সম্মিলিত এ যায়গাটি। হাস্পাতাল তোরণের ওপর লাটিনে লেখা Pax intrantilus, Salus exeuntilus! 'যে পথিক নগরে প্রবেশ করছ তার শান্তি কামনা করি, যে নগর থেকে চলে যাচ্ছ, তাকে মঙ্গল সম্ভাষণ জানাচ্ছি।'

রোথেনবুর্গের অনেক পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে বা দরজার ওপর ছোট ছোট কবিতা লেখা আছে। কোনটি সম্ভাষণ-সূচক, কোনটি একটু ব্যঙ্গব্যঞ্জক, কোনটি ধর্ম্ম-বিষয়ক। কয়েকটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ দিচ্ছি।

একটি বাড়ীর দরজায় লেখা আছে

Who never sorrow nor pain has felt in his time,
I give him leave to rub at this rhyme.

একটি কসাই এর দোকানে লেখা আছে

Through the butcher's art can even swine
Find their way into company fine.



'শ্রেষ্ঠ মদ্যপায়ী'

একটি রুটিওয়ালার দোকানে লেখা আছে

Bread for your daily food
This house supplies
Bread for your immortal soul
In God's words lies.

জার্ম্মাণীতে অনেক পুরাতন বাড়ীতে এরূপ নীতিমূলক কবিতা বা ব্যঙ্গোক্তি বা প্রার্থনা লেখা আছে। বাভেরিয়ার লোকেরা ক্যাথলিক বলে' তাদের বাড়ীতে কোন সেণ্ট বা সাধুদেবতার প্রতি প্রার্থনা লেখা থাকে। প্রতি বাড়ীর কোন বিশেষ

সেণ্ট বা দেবতা থাকে। একটি বাড়ীর দরজায় একটি মজার লেখা দেখেছিলুম। সেণ্ট ফ্লোরিয়ান অগ্নির দেবতা; সে বাড়ীর দরজার ওপর লেখা আছে, হে সেণ্ট ফ্লোরিয়ান, তুমি এ বাড়ীতে এসনা, তুমি অন্যলোকের বাড়ীতে যাও, এ বাড়ী তুমি পুড়িও না।

রাটহাউস থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে Klinger Strasse বা তরবারি-পথ। এ রাস্তার গোড়ায় জ্যাকব চার্চ্চ, শেষে Klingertor বা তরবারি-দ্বার।

এই দুয়ার দিয়ে বাহির হয়ে পুরাতন দেওয়ালের উপর দিয়ে খাদের ওপরের রাস্তা ধরে নগরের পূর্ব্বদিক প্রদক্ষিণ করতে বাহির হলুম। কি সুন্দর বিচিত্র তোরণের শ্রেণী, ধ্বজার বাহার।

তলোয়ার-ফটক দিয়ে কৃপাভিক্ষার তোরণের সারি পার হয়ে বারুদ-তোরণ, জল্লাদের তোরণ, বিষাদ-কোণ, ফাঁসি-কাঠের ধ্বজা, ঘুরে ভুর্স নগরদ্বারের মধ্য দিয়ে সেণ্ট টমাসের তোরণ, স্ত্রীদের তোরণ, রোডার-ফটকের ধ্বজা, অলস-তোরণ ইত্যাদি তোরণ-সারির মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাস্পাতালের ফটকে এসে পড়লুম। তোরণদ্বারগুলিতে যে উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গ প্রবাহিত হত, আজ তা নেই,—সব শান্ত। শুধু নামের স্মৃতিগুলি পড়ে আছে।

সে দিন সন্ধ্যায় রোথেনবুর্গ ছেড়ে চল্লুম। ট্রেনের জানালা দিয়ে সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলোয় রঙীন মেঘস্বপ্নের মত যখন রোথেনবুর্গ অন্ধকার পাহাড়-বনের অন্তরালে মিলিয়ে গেল, তখন বুর্গ-তোরণের মত আমার মন স্মৃতির জালে ভারী হয়ে উঠ্‌ল। তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালুম, হে মধ্যযুগের রোমান্সময়ী সুন্দরী নগরী, তোমার তোরণদ্বারের মায়া, তোমার পুরান দেওয়ালের সৌন্দর্য্য, তোমার আঁকা-বাঁকা পথের শান্তি, তোমার রঙীন বাড়ীর মাধুর্য্য চির অক্ষুণ্ণ, চির অম্লান থাক, কোন শতাব্দীর কোন কলদৈত্য এসে যেন তা গ্রাস না করে।

রাজ্য-হারা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সে একটা কি ছুটীর বার। কলেজ বন্ধ ছিল। ধীরু দুপুর বেলা বাইরের ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে কিসের হিসেব দেখছিল।

হঠাৎ ঝড়ের মতো তার বিধবা ভ্রাতৃজায়া রাণী সে ঘরে এসে প্রায় রোরুদ্যমানা হ'য়ে বললে—ছোটো, আজই তুমি আমাকে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন যেখানে হোক্ কোথাও পাঠিয়ে দাও। আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকবো না!

রাণী ধীরুকে ছোট-ঠাকুরপো না বলে বরাবর 'ছোট' বলেই ডাকে এবং ধীরু তাকে 'বউদিদি' না বলে শুধু বলতো "বউ!"

রাণীর এই ভাবগতিক দেখে ধীরু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—"সেকি বউ! কি হ'য়েছে? পাড়ায় কারুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হ'য়েছে নাকি?

—না।

—তবে? হঠাৎ এ বাড়ী ছেড়ে একেবারে কাশী বৃন্দাবন যাবার সখ হ'ল কেন? এখনও তো তীর্থ-ধর্ম্ম করবার মতো বয়স হয়নি তোমার!

—সেই জন্যই তো আরও আমায় এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে! এই বয়সটাই তো সবার চক্ষুশূল হ'য়ে উঠেছে। তীর্থ-ধর্ম্ম করতে যাবার মতো যদি আমার বয়সটা প্রাচীন হ'তো তাহ'লে কি আর আমার নিন্দেয় এমন ক'রে আজ পাড়াটা ছেয়ে পড়তো! তাদের কাছে আমার প্রধান অপরাধই তো হ'চ্ছে আমার এই অল্প বয়স!

—তাঁরা কি তবে তোমার বয়সী মেয়েদের সব পাড়া থেকে নির্ব্বাসিত করবার অভিলাষ জানিয়েছেন?

—না, সবাইকে নয়। যাদের বাপ মা আছে, ভাই বোন আছে, স্বামী পুত্র আছে, তাদের নয়; কিন্তু যে অভাগীর কেউ নেই, তার নাকি এ বয়সে আইবুড়ো সমর্থ

দেবরের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করা ব্যভিচারেরই নামান্তর!

ধীরু কথাটা শুনে চমকে উঠল!…অনেকক্ষণ চুপটি ক'রে কি ভেবে বললে—তোমার কি তবে কাশী বৃন্দাবন গিয়েই বাস করবার ইচ্ছে বউ?

এ প্রশ্নের উত্তরে একটু নিরুত্তর থেকে রাণী বললে—

ইচ্ছে না থাকলেও মানুষকে অনেক কাজই ক'রতে হয়; আমাকে ওরা যা খুশী অপবাদ দিক্ আমি তা গ্রাহ্য করতুম না, কিন্তু, তোমার দেবচরিত্রের উপরও যে সন্দেহ ক'রছে—এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে ছোট!

—আর তোমার কলঙ্কটা বুঝি আমার কাছে খুব সহনীয় বউ?

—তা জানিনি ভাই, কিন্তু তোমার এই বিয়ে না ক'রে ভীষ্মদেব হ'য়ে থাকবার ইচ্ছেটাই যত গোল বাধিয়েছে।

—কেন? আমি তো আজ পর্য্যন্ত কোনও কাশীরাজের কন্যাদের হরণ ক'রে আনতে যাইনি?

—সেই জন্যই ত পাড়ার কাশীরাজরা তোমার উপর কেউ সদয় নন এবং তাঁরা বলেন তোমার এই বিবাহে একান্ত অনিচ্ছাটা নাকি আমারই ষড়যন্ত্র-প্রণোদিত। ওটাতে তোমার কোনও স্বাধীন হাত নেই!

—বুঝিছি বউ, তাদের এই কুৎসার উৎস আজ কোন্ বিদ্বেষের ছিদ্রপথে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে।… কিন্তু আমি তো কিছুতেই তোমাকে কাশীতে কিম্বা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবোনা ভাই!

—তাই যদি সত্যি হয় ছোট, তাহ'লে তুমি আমার কাছে কথা দাও যে এই কার্ত্তিকমাসটা গেলেই, অগ্রহায়ণে তুমি বিয়ে করবে—আমি ইতিমধ্যে একটি বেশ ভাল' মেয়ে দেখে শুনে ঠিক ক'রে ফেলি—!

ধীরু এর কোনও উত্তর না দিয়ে নতমুখে কি ভাবতে লাগল।

রাণী ব্যাকুল মিনতির কণ্ঠে ব'ললে—দোহাই তোমার ছোট'! লক্ষিটি ভাই, আর অমত কোরনা।

ধীরু কাতর হ'য়ে বললে—কিন্তু এই এতকাল ধরে বিয়ে করবোনা বলে—আজ আমি কোন্ মুখ নিয়ে আবার বিয়ে ক'রতে যাবো বউ! না—ভাই, সে আমি পারবোনা!

—তোমায় পারতেই হবে।

—আমি তাহ'লে লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে?—

—বেটাছেলেরা বুড়ো বয়সে পাঁচবার বিয়ে করলেও এদেশের এ সমাজে তাদের কোনও দিনই মুখ হেঁট হয় না ছোট, তা তুমি তো ছেলে-মানুষ! কিন্তু, এ কথা স্থির জেনো যে এই বিয়ে না করার দরুণই হয়ত শীঘ্রই একদিন তোমার এবং আমার দুজনেরই মুখ দেখানো ভার হ'য়ে উঠবে ভাই!

—সেকি বউ! সত্যকে চাপা দিয়ে—মিথ্যা কলঙ্কটাই কি শুধু বড় হ'য়ে উঠবে বলতে চাও?

—এই তেইশ বছরের অভিজ্ঞতায় সংসারে সেইটেই হ'তে দেখে আসছি ছোট! এরা তো কেউ ভিতরটা দেখে না ভাই, এরা শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার করে!…কিন্তু সে যাই হোক্, তোমার যদি বিয়ে করবার একান্তই অনিচ্ছা থাকে তাহ'লে আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্যে তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে সে কাজে বাধ্য করাবোনা। তবে আজ আমি এইটুকু শুধু তোমায় বুঝিয়ে বলে যেতে চাই, যে আমার এ বিড়ম্বিত জীবনের বিপুল ব্যর্থতাকে এই মিথ্যা দুর্নামের কালী মাখিয়ে আমি আর বেশী অন্ধকার করে তুলতে চাইনি, আর সে করবার সাহসও আমার নেই, কারণ সে দুর্ব্বহ ভার বইবার মতো এক কাণা কড়িও পাথেয় আমার সম্বল নেই ভাই। আমায় ছুটী দিতেই হবে এই বলে গেলুম—

রাণী যেমনি অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো চলে গেল। ধীরু কিন্তু আর তার হিসাবে মনঃ সংযোগ করতে পারলে না।

ধীরুর মনে পড়তে লাগল, আরও একদিনের কথা। আজকের মতো এতটা অধীর ভাবে না হ'লেও সেদিনও বউ তাকে বিয়ে করবার জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধই করেছিল।

বিবাহে ধীরু তার দৃঢ় অসম্মতি জানানোতে বউ প্রায় কাঁদ'-কাঁদ' হয়ে বলেছিল—আচ্ছা 'ছোট,' তুমি কি আমার মুখ চেয়েও বিবাহ করতে পারোনা? তুমি বিয়ে না করলে আমি কি নিয়ে থাকি বলোতো? আমার কি একটি সঙ্গিনীর দরকার হয় না? একলা যে আর টেঁকতে

পারছিনি? বাড়ীতে একটা কচি-কাচা ছেলেপুলেও নেই যে তাদের বুকে ক'রে নিয়ে মানুষ করবো? আচ্ছা, তোমার কি বাপ হবারও সাধ যায় না?

ধীরু এ কথার উত্তরে জানিয়েছিল যে যদি কখনও সে বিবাহও করে তবু একপাল ছেলেমেয়ে সে কখনই সহ্য করতে পারবে না!

বউ শুনে অবাক্ হয়ে বলেছিল—বলো কি ছোট? আমি যে বড় আশা করে আছি ভাই, তোমার বিয়ে দিয়ে বউ আনবো ঘরে। তোমার ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করবো। আমাকেই তাদের 'মা' বলতে শেখাবো—

ধীরু হেসে উঠে বলেছিল—ওটাতে তাদের 'মা' হয়ত আপত্তি করতো বউ!

বউ সে কথা শুনে ভ্রূকুটি ক'রে বলেছিল—হ্যাঁ, আপত্তি অমনি করলেই হ'ল, তাহ'লে তার সঙ্গে এমনি ঝগড়া করবো যে সে আর কথাটি কইতে পারবে না!

ধীরু বলেছিল,—তা তুমি হয়ত পারবে! আমারই সঙ্গে যখন দিনে দশবার কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসো, তখন তাকে তো অস্থির ক'রে তুলবেই—!

বউ এ কথায় কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বলেছিল—বাপ্‌রে! কী দরদ! না হ'তেই যখন এত টান, তখন হ'লে না জানি কী করবে!

ধীরু সে কথা পাল্টে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু, বউ! হঠাৎ তোমার 'ধাইমা' হ'য়ে ছেলে-পুলে মানুষ করবার এমন উদ্ভট সখ হ'ল কেন?

অধরপ্রান্তে একটু ম্লান হাসি হেসে বউ তাকে বলেছিল—তুমি কি সে কথা বুঝতে পারবে ছোট? তোমরা পুরুষ মানুষ, জানোনা তো—মেয়েমানুষের 'মা' হবার সাধ তাদের বেঁচে থাকবার সাধের চেয়েও বড়!

সেদিনও ধীরুকে নির্ব্বাক হ'য়ে অনেক কথাই ভাবতে হ'য়েছিল। আজ সেই কথাগুলোই ঘুরে-ফিরে আবার তার মনে পড়তে লাগল! কিন্তু সকল কথাকেই চাপা দিয়ে একটা কথা তাকে সকলের চেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগল—তার এই সাধ্বী ভ্রাতৃবধুর নামে পাড়ার লোকের মিথ্যা কুৎসা রটনা!

২

কয়েক মাস পরের কথা। মহাসমারোহে রাণী ধীরুর বিবাহ দিয়ে একটি সুন্দরী বউ ঘরে এনেছে। সে কী তার আনন্দ! রেবাকে সে নিজে দেখে পছন্দ ক'রে ধীরুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। রোজ সে নিজের হাতে তার চুল বেঁধে দেয়, মনের মতো ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়,—যত্ন ক'রে দু'বেলা খাওয়ায় দাওয়ায়। রাণী যেন রেবার শাশুড়ী, কে বলবে যে সে তার জা'!

রেবা যে শুধু শাশুড়ীর মতো যত্নই পাচ্ছিল রাণীর কাছে তা নয়, রাণী তাকে শাশুড়ীর মতো শাসনও করতে সুরু ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু রেবার এ কথা বুঝতে বাকী ছিলনা যে এ বাড়ীতে তার যথার্থ স্থানটুকু কোথায়? আর রাণীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটাই বা কি? এই জন্যই বোধ হয় সত্যকার শাশুড়ীর চেয়ে কঠোর না হ'লেও তবু রাণীর এই শাসন ও মুরুব্বিয়ানা রেবার একটুও ভাল লাগছিল না? তাই সে প্রাণ গেলেও নিজের কোনও দরকারে কখনও বড়জা'র শরণাপন্ন হ'তো না। রাণীর কাছে সাহায্য নিতে তার ভারি সঙ্কোচ বোধ হ'তো!

রাণী দেখে শুনে ধীরুর জন্যে একটি বড়-সড় মেয়েই ঠিক করেছিল। রেবা তার চেয়ে মাত্র পাঁচ-সাত বছরের ছোট হবে! কিন্তু রাণী তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রতো এমনভাবে যেন সে রেবার ঠাকুরমার বয়সী। রেবার সেটা মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। সে এখন থেকেই মনেমনে বিদ্রোহ করবার সঙ্কল্প স্থির ক'রে সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

আরও কিছুদিন যেতে না যেতেই রাণীর স্বভাবের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যেতে লাগল! আর তার সেই সদা-প্রফুল্ল চঞ্চলতা ও প্রসন্নমুখে অফুরন্ত হাসি ঠাট্টা লেগে নেই! সে যেন আজকাল একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল। মেজাজ তার এখন খুবই খারাপ! স্বভাব বড়ই খিট্‌খিটে হ'য়েছে! কারুর একটা কথাও সে আর সহ্য ক'রতে পারেনা!

ধীরু কলেজ থেকে ফিরলেই রাণী গিয়ে তার কাছে ঘণ্টাখানেক ধরে ফিস্ ফিস্ করে রেবার বিরুদ্ধে রাজ্যের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে বসতো! সে কথা-গুলো এতই যৎসামান্য ও এমনিই অপ্রয়োজনীয় যে রাণীর বক্তৃতা শেষ হ'লে ধীরু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো!

শুধু মাঝে মাঝে সে বল্‌'তো—বউ, তুমি এত চুপি চুপি কথা কইতে সুরু করলে কেন? রেবাকে কি তুমি ভয় ক'রে চলবে?

রাণী শুনে চম্‌কে উঠ্‌তো। তরুণী রেবার নবীন সৌন্দর্য্য, তার উচ্ছ্বসিত যৌবন, তার ডাগর-আঁখির সলজ্জ কটাক্ষ যে অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ীর এই কর্ত্তাটিকে, সর্ব্বরকমে আপন পদানত ক'রে ফেলবে—এরই নিশ্চিত সম্ভাবনাটা কল্পনা ক'রে কে জানে কেন রাণী মনে মনে শিউরে উঠতো!

একদিন রেবাকে ডেকে রাণী বললে—'ছোট'র জল-খাবারের মোহোনভোগটা আজ তুমিই তৈরী ক'রে রেখে দাও! দেখো যেন ঘী-মিষ্টি কম হয়না। ঠিক আমি যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছি, তেমনি ক'রে তৈরী করবে!

রেবা বললে—ঘরে ঘী নেইত' দিদি! রাণী এ কথায় একেবারে চ'টে আগুন হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—ঘী নেই কিরকম! এইত' সেদিন একটা পাঁচসেরা ছোট টিন এনে দিয়েছিলেন! এরমধ্যেই সেটা উড়িয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে বসে আছো?

সেদিন কলেজ থেকে এসে ধীরু রাণীর মুখে যা শুনলে তা'তে সেও একটু অবাক্‌ হয়ে ভাব্‌তে লাগল, "তাইত, রেবা কি তবে গোপনে ঘীয়ের অপচয় সুরু করেছে!"

আর একদিন ধীরুর গলায় ব্যথা হ'য়েছিল, সে রাত্রে লুচি খেতে পারবেনা, তাই রাণী তার জন্য রেবাকে সুজির পায়েস ব্যবস্থা ক'রতে বলেছিল! কিন্তু ধীরু সে সুজির পায়েস একটুখানি মুখে দিয়েই আর খেতে পারলেনা। খাবার কাছে ব'সে রাণী যখন তাকে অনেক পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগল সবটুকু খেয়ে ফেলবার জন্য, তখন ধীরু বললে—সংসারের কিছু তো আর নিজে তুমি দেখছ'না' বউ, আজকাল, সবই ওই নতুন লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছ'!—এ কি সুজির পায়েস হ'য়েছে? একেবারে—উর্‌শুনি পুকুরের জল! না আছে' মিষ্টি'—না আছে গন্ধ—না আছে স্বাদ'! ও আমি খেতে পারবোনা! ব্যস্‌, আর যাবে কোথা! রাণী একেবারে রেবার ঘাড়ে গিয়ে পড়'ল!—বলি হাঁলা ছোটবউ, বাপের বাড়ী থেকে কি সুজির পায়েসটুকুও রাঁধতে শিখে আসিস্‌ নি? তা' কোন্‌ আমাকে ডেকে বল্‌লি একবার—যে, দিদি, আমি ত' জানিনি ভাই, তুমি আমায় দেখিয়ে দাও! এই যে লোকটার আজ খাওয়া হ'লনা এর জন্য দায়ী কে? রাত-উপোসে হাতী কাবু হয়ে পড়ে! ও কাজের মানুষ, এমন করে' ওর ওপর' অত্যাচার হ'লে—ক'দিন বাঁচবে? ভাল' মেয়ে এনেছিলুম বাপু!

রেবা রান্নাঘর থেকে বললে—ভাঁড়ারে যাদের মোটে চিনি নেই, দুটো এলাচ লবঙ্গ নেই, ঘরে যাদের একফোঁটা গোলাপ-জল নেই, তাদের সুজির পায়েস ওর চেয়ে ভাল হতে পারেনা! অত যদি দরদ, তো নিজে এসে তৈরি করলেনা কেন দিদি!

এমনিই খুঁটি-নাটি নিয়ে তাদের দুই জা'য়ের মধ্যে আজ-কাল প্রায়ই কলহ বাধছিল! ধীরু নেহাৎ ভালমানুষ বেচারী। সে কোনও কিছুর মধ্যেই থাকতোনা! রোজ সকালে উঠে নিয়মিত চা' পান ও খবরের কাগজ পাঠ শেষ ক'রে স্নানাহারান্তে সে কলেজ যেতো এবং কলেজ থেকে ফিরে এসে দীনেশের আড্ডায় 'ব্রিজ' খেলতে চলে যেতো। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায় সেখান থেকে ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তো! সংসারের যা কিছু ভার সে সমস্তই চাপানো ছিল রাণীর উপর। এই কুঁড়ে' লোকটিকে এবং তার সংসারটিকে রাণী সমানভাবেই এতদিন চালিয়ে আসছিল!

কিন্তু ধীরুও বুঝতে পারছিল যে রাণীর কী যেন হয়েছে! সে যেন আর আগের মতো সব ঠিক চালাতে পারছেনা! তাছাড়া বাড়ীতে আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। অষ্ট প্রহর ওই একঘেয়ে চেঁচামেচি—খুনসুটি—ঝগড়া ধীরুর আর সহ্য হচ্ছিল না!

'বউ' সুখী হবে, একটা সঙ্গী পাবে, শান্তিতে থাকবে—এইসব ভেবেচিন্তেই না এই যৌবন সীমান্তে পৌঁছতে পৌঁছতেও সে বিয়ে ক'রে এনেছে! কিন্তু কই, 'বউ' তো সুখী হ'লনা? উল্টে' সংসারে তার আগে যে শান্তিটুকু ছিল, আজ তাও হারিয়ে গেছে! ধীরু কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারেনা যে রেবার উপর বৌ'য়ের এত রাগ কিসের? সেই তো ওকে দেখেশুনে পছন্দ ক'রে ঘরে এনেছে, তবে কেন রেবা ওর এমন চক্ষুশূল হ'য়ে উঠ্‌ল! রেবার উপর বাস্তবিক বৌয়ের একটু অত্যাচার করা হ'চ্ছে! ও বেচারীর কি দোষ? বউই তো ওকে এ বাড়ীতে আদর ক'রে—আহ্বান করে নিয়ে এসেছে! একেইতো এই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এমন এক

বিগত-যৌবন স্বামী পেয়েছে সে—তার উপর যদি দিনরাত তা'কে এইরকম মুখ-ঝাপ্‌টা সইতে হয় তাহ'লে একটু কেমনরকম অন্যায় করা হয় যে এই নিরপরাধ লোকটির উপর। বৌয়ের এটা বোঝা উচিত এবং এ বেচারীর উপর একটু দয়া করা উচিত!

ধীরুর মনের এই ভাবান্তর রাণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলেনা। ন' বছরের মেয়ে সে এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছিল। বছর ফিরতে না ফিরতে কবে যে সে বিধবা হয়েছিল সেকথা তার মনেই নেই! আজ সে তেইশে এসে পৌঁছেচে! এই চৌদ্দটা বছর সেই শৈশবের বিস্মৃত-স্বামীর এই কনিষ্ঠ সহোদরটিকে আদর যত্ন করেই তার দিন কেটেছে। ধীরুর মনের গোপন কোণে এমন কোনও দুর্ভাবনার ক্ষীণ রেখাটুকু পর্য্যন্ত একদিন লুকিয়ে থাকতে পারতোনা যা রাণী একবার তার মুখের পানে চাইবামাত্র না বুঝতে পারতো!

রেবার প্রতি ধীরুর এই গোপন সহানুভূতি ক্রমে ক্রমে যত প্রকাশ হ'য়ে পড়'তে লাগল, রাণী যেন ততই রেবার প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠতে লাগল! এই নিয়ে ধীরুর সঙ্গেও রাণীর একদিন বচসা হ'য়ে গেল! রাণী রাগের মাথায় ধীরুকে—নেমকহারাম—স্বার্থপর—বিশ্বাসঘাতক—কত কি বলে ফেললে! ফলে, তাদের দু'জনের মধ্যে যে একটা অপূর্ব্ব মধুর প্রীতির বন্ধন ছিল, সেটা ক্রমে শিথিল হ'য়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের ব্যবধান যেন দিনদিন বেড়েই যেতে লাগল!

ধীরুর সঙ্গে বচসা হবার পরদিন থেকে রাণী আর ধীরুর কাছে রেবার বিরুদ্ধে কোনও নালিশই জানাতে আসেনা।

রেবা ব'লে যে কেউ একজন এ বাড়ীতে আছে এ কথা যেন সে জানেই না এমনিই ভাব দেখিয়ে সে এবার চ'লতে লাগল।

এরই দু'একদিন প'রে একরাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে সশব্দে কবাট বন্ধ ক'রে হুড়কো এঁটে দিয়ে রেবা এসে ধীরুকে চোখ রাঙিয়ে বললে "আমি কি সত্যিই তোমার স্ত্রী, না ওই রাজরাণী ঠাকরুণের দাসী, আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলে দাও দেখি? যদি ওঁর দাসীবৃত্তি ক'রে লাথী খেয়ে আমাকে এখানে থাকতে হয়, তাহ'লে কালই আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি আর একদণ্ডও এ বাড়ীতে থাকতে চাইনি!"

ব্যাপারটা কি?—আবার নূতন কি হাঙ্গামা হ'ল?—এই সব প্রশ্নের অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে রেবার কাছ থেকে যখন উত্তর পাওয়া গেল, তখন ধীরু জানতে পারলে যে,—যাকে আদর যত্ন করবার আগ্রহে 'বউ' এমন ব্যাকুল হ'য়ে তাকে বিয়ে করবার জন্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছিল সেই আজ এ বাড়ীতে তার কাছে সকলের চেয়ে অযত্ন-ভাগিনী! কী আশ্চর্য্য! বউ, আর রেবার কোনও খবরই রাখছেনা। আজ দু'দিন হ'ল এ বেচারি একটু জলখাবার পর্য্যন্ত খেতে পায়নি!

পরদিন সকালে উঠেই ধীরু রাণীকে ডেকে ব'ললে—"বউ, আজকাল বাড়ীতে যখন জলখাবার কিছু থাকেনা তখন দোকান থেকে কিছু আনাও না কেন?

রাণী একথায় একেবারে যেন অগ্নিশিখার মতো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল! এ যে কার প্রতি নিবিড় দরদে ধীরু আজ তাকে এই সর্ব্বপ্রথম সংসার পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসবার স্পর্দ্ধা ও সাহস করেছে—নিমেষে সেটা বুঝতে পেরে রাণী একেবারে অধীর হ'য়ে উঠল! ধীরুর এই মুরুব্বিয়ানা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারলেনা, তার চোখ মুখ সব রাগে অভিমানে রাঙা হ'য়ে উঠল। সে ব'সে ছিল—সর্পদষ্টের মতো চকিতে উঠে ধীরুর প্রতি বজ্রগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে—ঘাট হ'য়েছে আমার! হুজুরের কাছে না হয় মাপ চাইছি! আজ চৌদ্দ বচ্ছর সংসার চালিয়ে এসেছি একদিনের জন্যেও কোনও কথা ওঠেনি—আর আজ আমি অকেজো হ'য়ে পড়লুম। তা, বেশ—বেশ—বেশ—এইটুকুই আমার শোনবার বাকী ছিল বোধ হয়। এখন তো আমার কোনও কাজই তোমার মনে ধরবেনা, পছন্দও হবেনা—এ আমি জানতুম! এখন আর একজনের হাতের কাজই তোমার সব চেয়ে মিঠে লাগবে বটে,—আচ্ছা তবে তাই হোক, আমি আর এসব আটকে রেখে মিছে অনধিকার সুবিধা ভোগ করি কেন? এই নাও তোমার সিন্দুক বাক্স আলমারী দেরাজের চাবী নাও—এই নাও তোমার ঘরদোর রান্না-ভাঁড়ারের চাবী। টাকাকড়ি কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি বাসনকোসন যা কিছু জিনিসপত্র আছে তোমাদের সব দেখে শুনে হিসেব করে মিলিয়ে নিয়ে

আমায় ছুটী দাও, আমি আর এ পরের বোঝা বইতে পারছিনি, এই বেলা সব বুঝিয়ে দিয়ে মানে মানে সরে যাই!

আঁচল থেকে রিঙ্‌শুদ্ধ চাবীর গোছা খুলে নিয়ে ঝণাৎ করে ধীরুর সামনে ফেলে দিয়ে—রাণী তার নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিলে!

ধীরু অবাক্! যে ভয়ে সে এতদিন সশঙ্কিত হ'য়ে ছিল, সেই বিপদটাই যে আজ এমন অতর্কিতভাবে এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে এসে দেখা দেবে এটা সে কোনও দিন কল্পনাও করেনি!

সে চাবীর রিঙ্‌ ধীরু কিছুতেই কুড়িয়ে নিতে পারলেনা। সারাদিন দালানে চাবীর গোছা পড়ে রইল। রাত্রে চুরি চামারীর ভয়ে মরিয়া হ'য়ে চাবীর রিংটা ধীরু তুলে আনলে বটে, কিন্তু রেবার আঁচলে কোনমতেই বেঁধে দিতে পারলেনা! আস্তে আস্তে নিজের মাথার বালিশের নীচেয় চাপা দিয়ে রেখে দিলে। দুর্ভাবনায় তার অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হলনা! তাইত! 'বউ' যদি কিছু না দেখে তাহ'লে সংসার চলবে কি ক'রে এই হ'ল তার প্রধান ভয়।

সকালে উঠে কিন্তু ধীরু তার প্রতিদিনের অভ্যাস মতো নিজের কাজে চলে গেল। চাবীর কথা তার আর কিছু মনেই ছিলনা। বিছানা তোলবার সময় রেবা সে চাবির রিং নিয়ে নিজের আঁচলে বেঁধে রাখলে।

প্রতিদিন যেমন করে ধীরুর সংসার চলতো সেদিনও ঠিক তেমনি করেই চলে গেল, কোথাও এতটুকু গোলমালের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া গেলনা! ধীরু জানলে ''বউ'ই সব ক'রছে, নিশ্চয় তার রাগ পড়ে গেছে; তার ছোট খাটো সংসারটির সমস্ত কাজই যে এখন রেবা করছে, গৃহস্থালীর শাসন ও পরিচালন ভার যে রাণীর হাতে আর কিছুই নেই, একে একে সবই যে এখন রেবার করতলগত—ধীরু তা বুঝতে পারেনি!

কিছুদিন পরে এ খবরটা সে হঠাৎ যেদিন জানতে পারলে সেদিন কিন্তু তার আর অনুতাপের সীমা ছিল না!

গৃহিণী পদের সঙ্গে সঙ্গে তার যা কিছু সম্মান যা কিছু মর্য্যাদা ছিল তাও রাণীর কাছ থেকে ঐ চাবীর রিঙের সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গিয়ে রেবাকেই আশ্রয় করেছিল। সংসারের চিরপ্রচলিত নিয়ম দেখতে দেখতে বাড়ীর ঝী চাকর বামুন পাড়ার বউ ঝীয়েরা আত্মীয় বন্ধু ও জ্ঞাতি কুটুম্বেরা পর্য্যন্ত সকলেই রাণীকে অবহেলা করে রেবাকেই খাতির করতে সুরু করে দিলে! রাণী যেন আজ আর এবাড়ীর কেউ নয়! সে যেন আজ তারই নিজের রাজত্বের মধ্যেই হৃতসর্ব্বস্ব গতগৌরব সিংহাসনচ্যুত হ'য়ে নতশিরে বাস করছে! এখন তার সম্বলের মধ্যে কচিৎ কারুর অযাচিত সহানুভূতি ও নিত্য নিজের অবিশ্রান্ত অশ্রুজল!......

কিন্তু এ অবস্থা সে অভিমানিনী বেশীদিন সহ্য করতে পারবে কি? ...

ষষ্ঠীতলা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

গ্রামের শেষে অশথবটে জড়ায়ে দোঁহে দোঁহার গলা,
গাঁয়ের তীর্থ উহার তলে, ওটা মোদের ষষ্ঠীতলা।
গাঁয়ের মায়ের দেবতা সেথায়, সিঁদুরমাখা পাথরখানি,
উহায় ঘিরে 'কমলকলি' রচে হাজার কোমল পাণি।
রচে 'সবুজ-গণ্ডী' উহায় মটর কলাই ছোলার চারা,
গন্ধে ভরায় ওর মাটীরে সচন্দনা সলিলধারা।
বো'লছ, 'ওদের দেবতা পাথর'. 'ওটা বর্ব্বরতার প্রথা',
পাথরকে যে গলিয়ে ফেলে মায়ের প্রাণের তপ্ত ব্যথা।
গভীর হিয়ার আকিঞ্চনে রেখেছে যে রাঙিয়ে ওকে,
মোদের চোখে পাষাণ বটে, 'ননীর-খনি' ওদের' চোখে।
কতটুকু দেখবে বলো গর্ব্বেঘোলা মোদের আঁখি?
দেহের চোখে এড়ায় ব'লেই স্নেহের চোখে এড়ায় তা'কি?
দেব-প্রতিমায় হেরি মোরা খড় দড়ি আর পাথর দারু,
জ্যোতির্ব্বলয় দূরে থাকুক—দেখি না তার গঠনচারু।
ত্রিনয়নীর অংশ যারা দেখে তারা যে রূপ খানি,
দ্বিনয়নের দ্বিধায় বোধে তার কী মোরা খবর জানি?
হাজার হাজার মায়ের দরদ প্রাণ গলান' বৎসলতা,
বন্ধ্যা মৃতবৎসা নারীর ব্যথায় রঙীণ প্রাণের কথা।
বাছায় যারা বাঁচাতে চায় আপন জীবন বিনিময়ে,
তুলসী বনের তপস্বিনী যারা নিখিল কাম্যজয়ে।

তাদের প্রাণের আকুতি ধন, নিষ্ঠাসুধা, ভালবাসা,
তাদের প্রাণের ভক্তিকরুণ বেদনাময় ভরসা আশা।
গাছের তলে তিলে তিলে ঐ শিলাতে কী রূপ গড়ে,
স্বর্গে কাহার আসন টলায়, বুঝবে কী তা' অন্তে পরে ?
কেন্দ্রীভূত যুগে যুগে যেথায় হাজার মায়ের মায়া,
মহামায়া জগন্মাতা সেথায় ধরেন অমনি কায়া।
পাষাণী মার স্নেহের ধারা যাহার প্রাণের ধমনীময়,
পাষাণী রূপ ধরতে তাহার লোভ হবে, তা' বিচিত্র নয়।
ছয়টি মুখের ক্ষুধার টানে গল্‌ল তাহার হৃদয় যবে,
শত শত মায়ের ডাকে ষষ্ঠী তাহায় হতেই হবে।

নেইক দেউল, নেই পূজারী, নেই আরতি সকাল সাঁঝে,
নিত্যভোগের নেই আয়োজন, ঘণ্টা সানাই ঢোল না বাজে।
নেই লোকালয় আশে পাশে, পাণ্ডারো নেই গুণ্ডাপনা,
যে'মা' আসে প্রাণের টানে লাগে কি তার উপাসনা ?
জাঁকজমকে ভড়ং ক'রে মা'র করে কে খোসামুদী ?
মার কাছে কার চাই সুপারিশ, কে রাখে তার দুয়ার রুধি,
সবারই ভার যে মা বহে বইতে কি হ'য় তাহার বোঝা ?
সবায় নিতি খাওয়ায় যে মা, মিছে তাহার খাবার খোঁজা,

ডালে ডালে পাখীর বাসা, সর্প পেচক কোটর ফাঁকে।
দুপুর বেলা ঘুমায় কুকুর রাতে শেয়াল প্রহর হাঁকে,
ঐ শিলারে বালিশ ক'রে বাছুরগুলি শোয় আরামে,
কাঠবিড়ালী সিঁদুর চাটে, গিরগিটিরা ওঠে নামে,
উইএর টিপি আশে পাশে ছাগল হোথায় বিয়ায় ছানা,
জগন্মাতার কোলের কাছে আস্‌তে কারো নেইক মানা।
নিখিল জীবের জন্য হোথা মায়ের সোহাগ আঁচল পাতা,
ষষ্ঠীতলায় বিরাজ করেন বিশ্বশিশুর ধাত্রী মাতা।

স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীনির্ম্মল দেব

সেদিন প্রাণমোহন থিয়েটারে "শূর্পনখা"র প্রথম অভিনয়-রজনী। সাড়ে-পাঁচটায় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত ঠিক স-পাঁচটার সময় বিনয় বাল্য-বন্ধু যোগেশের বাড়ী আসিয়া দেখিল, যোগেশ তখনও বৈঠকখানা-ঘরে একটা ইজি-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া, বেশ নিশ্চিন্ত-চিত্তে মোকদ্দমার নথি-পত্র উল্‌টাইতেছে।

বিনয় ঘরে ঢুকিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল—"বাঃ, বেশ ত যোগেশ-দা'! ছুটির দিনেও কি ওকালতী ছাড়বে না, ওই-সব বাজে কাগজ নিয়ে প'ড়ে আছ! আজ ম্যাটিনী, সেটা বুঝি ভুলে গেছ ?"

যোগেশ উঠিয়া বসিয়া কাগজগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল—"না রে, ভুলবো কেন! এই উঠি, সিট্ তো বুক্ করা আছে, ভয় কি!"

বিনয় বলিল—"বুক্ করা আছে ব'লে বুঝি প্লে আরম্ভ হ'য়ে গেলে যেতে হবে?—যাও, আর দেরী কোরো না, এতক্ষণে বোধ হয় কন্‌সার্ট বাজতে আরম্ভ হ'য়ে গেছে!"

যোগেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শিথিল কাছা ঠিক করিতে করিতে বলিল—"আচ্ছা, তুই একটু বোস, আমি চট্ ক'রে খেয়ে আসছি।"

বিনয় বলিল—"আঃ, কী পেটুক তুমি! দশটার মধ্যে তো প্লে শেষ হ'য়ে যাবে, তখন বাড়ী ফিরে তো খেতে পার!"

যোগেশ বলিল—"তা' তো পারি। তাই ব'লে এখন গিন্নির রাঙা হাতের তৈরী গরম খাবারটা তো ছেড়ে যেতে পারি না। তুই একটুখানি বোস না, আমার বেশী দেরী হবে না।"

বিনয় হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, কী ছোটলোক তুমি! আমি হাঁ ক'রে ব'সে থাকবো, আর তুমি যাবে খেতে।"

যোগেশ বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"তুইও চ'না, আমি কি বারণ ক'রছি?"

বিনয় বলিল—"না, আজ থাক, দু'জনে খেতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে। তা'র চেয়ে আমি অপেক্ষা করি, তুমি চোঁ ক'রে খেয়ে এসো। আর তা' ছাড়া আজ বড় বেলায়

ভাত খাওয়া হ'য়েছে, খিদে কিছু নেই। বরং বৌদি'র হাতের সাজা পান আমায় গোটাকতক পাঠিয়ে দিও।"

যোগেশ "আচ্ছা" বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

* * * *

যোগেশের একবিংশ-বর্ষীয়া স্ত্রী অনিলা রান্নাঘরে বসিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে কড়াইশুঁটির কচুরী ভাজিতেছিল। মিনি পাশে বসিয়া কচুরীগুলি বেলিয়া দিতেছিল।

মিনি অনিলার মানুষ-করা ঝিয়ের মেয়ে। জাতিতে কৈবর্ত্ত, বয়স ষোল-সতেরো, বাল-বিধবা। তাহার রং ফর্‌সা এবং গড়নটা বেশ গোলগাল। অনিলার বাপের বাড়ীতেই সে বরাবর বড় হইয়াছে। ভদ্রবংশে এবং ভদ্র আবহাওয়ার মধ্যে আজন্মকাল মানুষ হওয়ার দরুণ তাহার হাবভাব ও আচরণ সম্ভ্রান্ত ঘরেরই ন্যায়। মাস-কয়েক পূর্ব্বে তাহার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে। গতবারে বাপের-বাড়ী হইতে আসিবার সময় অনিলা তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে। শিশুকাল হইতেই মিনি অনিলাকে দিদি বলিয়া ডাকে এবং অনিলাও করুণা করিয়া তাহাকে ঠিক ছোট বোনেরই মত আন্তরিক স্নেহ-যত্ন করে।

বৈঠকখানা হইতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে সটান্ রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া চৌকাটের উপরে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া যোগেশ বলিল—"দ্যাখ দিকিন কত দেরী ক'রেদিলে,—দাও, দাও, শীগগীর দাও, ব্যাণ্ড্ বাজ্‌তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে!"

অনিলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"বাঃ, বেশ মজার লোক ত! আমি দেরী ক'রে দিলুম? আমি ক'বার ডেকে পাঠিয়েছি, সে খেয়াল আছে? আমার তো সব তৈরী, তুমি কেবল ব'সলেই হয়!"

যোগেশ বলিল—"আচ্ছা, দাও। কিন্তু আমি একলা নই, বিনয়-ছোঁড়া বাইরের ঘরে ব'সে আছে। আগে তা'কে কিছু পাঠিয়ে দাও, নইলে গাল দেবে।—এই মিনি, দিদি যা' দেয় নিয়ে যা', বৈঠকখানা-ঘরে যে বাবু ব'সে আছে, তা'কে দিয়ে আয়।"

অতিথি সম্বর্দ্ধনার প্রস্তাবে অনিলা হৃষ্ট চিত্তে বলিল—"বেশ ত!" তা'রপর মিনির দিকে চাহিয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, কি ময়লা চিরকুটি কাপড় প'রেছিস! আমি ততক্ষণ খাবারগুলো সাজাই, তুই যা', শীগ্‌গীর ও কাপড়-খানা ছেড়ে একখানা ফর্‌সা কাপড় প'রে আয়।"

মিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ফর্‌সা কাপড় তো নেই দিদি, সবগুলো কাচ্‌তে গেছে, ধোবা এখনও দিয়ে যায়নি।"

অনিলা বলিল—"পোড়া ধোবার জ্বালায় আর পারি না! কুড়ি দিন হ'য়ে গেল, এখনও কাপড় দেবার নাম নেই! আমারও ছাই একখানা ফর্‌সা কাপড় বা'র করা নেই। আচ্ছা যা', আমার ময়ূরকণ্ঠি শাড়ীখানা আল্‌নায় কোঁচান আছে, সেইখানাই তাড়াতাড়ি প'রে আয়।"

অনিলা একখানা বড় রেকাবীতে নানা খাবার সাজাইল। মিনি কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইলে রেকাবীখানা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—"আস্তে আস্তে নিয়ে যা', ফেলে দিস্‌নি যেন!—যাবার সময় দালানের কুঁজো থেকে কাঁচের গেলাসটা ক'রে এক গেলাস্ জল গ'ড়িয়ে নিয়ে যাস্। তা'রপর ফিরে এসে পান নিয়ে যাবি।"

মিনির বেশ দেখিয়া যোগেশের মাথায় এক দুষ্ট মতলব ঢুকিল। সে মিনিকে বলিল—"আর দ্যাখ্, খাবার দেবার সময় ব'লবি—দিদি পাঠিয়ে দিলেন, আপনি না খেলে তিনি বড় দুঃখিত হবেন। সব না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বি না, বুঝলি?"

মিনি সরল মনে "আচ্ছা" বলিয়া খাবারের রেকাবীটা লইয়া চলিয়া গেল।

এই অদ্ভুত আদেশে পাছে স্ত্রীর মনে কোনো কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাই যোগেশ বলিল—"ও-কথা না ব'ললে বাবুর পায়া ভারী হবে, ব'লবেন—খিদে নেই। কিন্তু তোমার নাম ক'রলে আর ফেল্‌তে পারবে না।"

* * * *

চেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের উপরে পা-দুইটা তুলিয়া দিয়া কোলের উপরে একখানা মোটা কেতাব লইয়া বিনয় অলসভাবে তাহার পাতা উল্‌টাইতেছিল। সহসা পশ্চাতে এক মৃদু পদ-ধ্বনিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—ময়ূরকণ্ঠি-শাড়ী-পরা একটি লজ্জা-নম্রা তরুণী এক-রেকাবী খাবার লইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিনয় সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি পা-দুইটা টেবিল্ হইতে নামাইয়া লইয়া খাড়া হইয়া বসিল।

বিনয় মুখ ফিরাইতে মিনি খাবারের রেকাবীটা তাহার সম্মুখে টেবিলের উপরে সযত্নে রাখিয়া কুণ্ঠিত-কণ্ঠে কেবলমাত্র

কহিল—"দিদি পাঠিয়ে দিলেন।" লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারিল না।

বিনয় একটিবার মিনির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া চোখ দুইটা নত করিয়া কিছু না বলিয়া একখান কচুরী তুলিয়া লইয়া কামড় দিল।

মিনি চলিয়া গিয়া একটা ছোট রূপার ডিবা ভরিয়া পান লইয়া আসিয়া দেখিল—বিনয় সেই একখানি কচুরী শেষ করিয়া নিস্পন্দ দেহে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। সে যোগেশের নির্দ্দেশমত বলিল—"ও সবগুলি আপনাকে শেষ ক'রতে হবে, একটিও ফেলতে পারবেন না।"

বিনয়ের বুকখানা একটা অপূর্ব্ব পুলকে নাচিয়া উঠিল। ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী পড়িয়া অমন মোহন-বেশে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কেহ তো কোনো দিন অমন স্নিগ্ধ-কণ্ঠে তাহাকে কোনো অনুরোধ করে নাই! পরিপূর্ণ আবেগে তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। সে শুধু মুখ নীচু করিয়া একটির পর একটি খাবার উঠাইয়া লইয়া নিঃশব্দে শেষ করিতে লাগিল।

বিনয়ের খাওয়া শেষ হইলে পানের ডিবাটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া শূন্য রেকাবী ও গেলাস্‌টা লইয়া মিনি চলিয়া গেল। বিনয় চকিতে আর একবার মিনিকে দেখিয়া লইল।

* * * *

কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহিরে আসিয়া যোগেশ দেখিল বিনয় নিতান্ত ভালো-মানুষটির মত বসিয়া আছে।

যোগেশ বলিল—"কিরে, তোর না ক্ষিধে ছিল না? এক রেকাবী খাবার তো বেমালুম উড়ে গেল! আরও কিছু হ'লে হ'তো, নারে?"

বিনয় বলিল—"খাবারগুলো বেশ হ'য়েছিল, তাই ফেল্‌তে পারলুম না।—আচ্ছা, খাবারগুলো সবই কি বৌদি'র হাতের তৈরী?"

যোগেশ কেবলমাত্র বলিল—"বৌ কি আর সব একলা ক'রেছে!" কিন্তু আর যে কাহার হাতের পরশ খাবার-গুলির মধ্যে ছিল, সে-কথা কিছুই বলিল না। বিনয়ও লজ্জায় মুখ ফুটিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

দু-একটা একথা-ওকথার পর নিতান্ত নিস্পৃহভাব দেখাইয়া বিনয় বলিল—"উনি তোমার কে হন গা, যোগেশ-দা'?"

কাহার কথা বিনয় জিজ্ঞাসা করিতেছে যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া যোগেশ বলিল—"কা'র কথা ব'লছিস?"

বিনয় বলিল—"ওই মহিলাটি—যিনি আমার খাবার দিয়ে গেলেন?"

বিনয়ের প্রশ্নের সসম্ভ্রম ভঙ্গীতে যোগেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল—"আমার তাঁ'কে উনি দিদি বলেন, তা' হ'লে উনি আমার কিনি হন ঠিক ক'রে নাও।"

বিনয় পরম বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ও! তাই ব'লেছিলেন দিদি পাঠিয়ে দিলেন।"

যোগেশ বলিল—"কি রে, তখন তো ব্যাণ্ড্‌ বাজছিল, এখন কি সানাই বাজছে? ওঠ্‌বার লক্ষণ তো দেখছি না! ক'টা বেজেছে সে খেয়াল আছে?"

বিনয় মনে-মনে লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, চল, বড্ড দেরী হ'য়ে গেল!"

দুই বন্ধুতে বাহির হইল।

* * * *

পথে চলিতে চলিতে বিনয় কিছু বলিল না, অন্যমনস্কের মত যোগেশের সঙ্গে চলিল।

খানিক পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনয় বলিয়া ফেলিল—"আচ্ছা, যোগেশ-দা', তোমার শালী কি বিধবা? মাথায় সিঁদুর দেখলুম না ত!"

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বাহ্যতঃ সহজভাবে যোগেশ বলিল—"বালাই, ষাট! বিধবা হ'তে যাবে কেন! ওর বিয়েই হ'লো না, আর তুই বলিস কি না বিধবা!"

বিনয়ের কৌতূহল বাড়িল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, এতদিনেও বিয়ে করেননি কেন, বিয়ের বয়স তো হ'য়েছে?"

যোগেশ গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া কহিল—"আর বলিস কেন ভাই! ওর ঠিক তোর মতন খেয়াল! ও বলে মনের মতন বর না পেলে যা'র-তা'র গলায় মালা দেবে না। মনের মতন বর ও খুঁজে পাচ্ছে না, তাই মালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা কেমন যেন উদাসিনীর মতন দেখলি

না? সাজ-সজ্জা কিছুই নেই,—শুধু ওই কি একখানা শাড়ী প'রে আছে?"

বিনয় বলিল—"ওঁর প্রাণটা বোধ হয় কবিত্বে ভরা।"

যোগেশ মুচকিয়া হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছিস।"

আবার খানিকটা পথ বিনয় নীরবে চলিল,—যোগেশ আড়চোখে বিনয়ের চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানা একবার দেখিয়া লইল, কিছু বলিল না।

বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার শালীর নাম কি গা যোগেশ-দা'?"

যোগেশ বলিল—"মিনি।"

বিনয় বলিল—"মিনি তো ডাক-নাম, ভাল নাম কি,—মৃণাল?"

যোগেশ একটু ফাঁপরে পড়িল,—মিনির কোনো পোষাকী নাম সে জানিত না। সে মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী, ঝিয়ের মেয়ের আবার ভাল নাম! কিন্তু বিনয়কে বলিল—"ও নাম হ'লে মন্দ হ'তো না, কিন্তু ওর ভাল নাম হ'চ্ছে—মিনতি।"

বিনয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর চাপিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল—"বাঃ, চমৎকার নামটি তো! সার্থক ওঁর নাম, তাই মুখখানিতে কেমন যেন একটা কুণ্ঠা মাখানো!"

যোগেশ আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, অতি কষ্টে বলিল—"তোর নামটাও তো বেশ—বিনয়! বিনয় ও মিনতি—এ দু'টো কথারই মধ্যে বেশ একটা নম্র অর্থ আছে, মনে হয় যেন এ কথা দু'টোর বাইরে আলাদা হ'লেও ভেতরে এক। বিনয় ছাড়া মিনতি হ'তেই পারে না।"

যোগেশের কথায় বিনয়ের বুকের মধ্যে একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল। প্রগাঢ় আনন্দে তাহার মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। যখন তাহারা থিয়েটারের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন অভিনয় সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। তাহারা তাড়াতাড়ি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিল।

* * * *

আধুনিক আর্টে অভিনয় হইতেছিল। দর্শকের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া ছিল। লক্ষ্মণকে দেখিয়া শূর্পনখার প্রেম-সঞ্চার, শূর্পনখার কাতর প্রেম-নিবেদন, লক্ষ্মণের রূঢ় প্রত্যাখ্যান, শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, ছিন্ন নাসিকার যন্ত্রণায় শূর্পনখার উচ্চ আর্ত্তনাদ—প্রভৃতি এবং আরও কত কি অভিনয় হইতে লাগিল। বিনয়ের দৃষ্টি কিন্তু এদিকে একেবারেই ছিল না। তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল একখানি ময়ূরকণ্ঠি শাড়ীর শিথিল অঞ্চল-প্রান্ত. আর তাহার দুই কাণে আশোয়ারী সুরে বাজিতেছিল একটি সরম-জড়িত অনুরোধ—"ও সবগুলি আপনাকে শেষ ক'রতে হবে, একটিও ফেলতে পারবেন না!"

যোগেশ বিনয়কে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—"কি রে, কেমন দেখছিস্?"

বিনয় চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"বেশ।"

যোগেশ হাসিয়া বলিল,—"উঃ, শূর্পনখার নাকটা কেটে যেন রক্ত-গঙ্গা বইছে!"

বিনয় সহানুভূতির স্বরে বলিল,—"শূর্পনখা বেচারীর জীবনটা বড় করুণ। অতোখানি প্রেম কী ব্যর্থ হ'য়ে গেল!"

যোগেশ বলিল, "যা' না, তুই সার্থক ক'রে দিয়ে আয় না, তাহ'লে বেচারীর নাক-কাটার যন্ত্রণাটা একটু কমে!"

যোগেশের প্রচ্ছন্ন কৌতুকে বিনয় হাসিয়া ফেলিল।

পৌনে-এগারোটায় অভিনয় শেষ হইল। দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর কাছে আসিয়া যোগেশ বিনয়কে বলিল,—"যা'ক্, থিয়েটারের দোহাইএ তবু আজ গরীবের বাড়ী বাবুর পায়ের ধূলো প'ড়লো!"

বিনয় বলিল—"কেন দাদা, আমি কি কখনও আসি না? আচ্ছা বেশ, তুমি যদি খুসী হও, এখন থেকে রোজ আসবো।"

বিনয়ের এখন হইতে রোজ আসিতে চাওয়ার আগ্রহের কারণ যে কোথায়, তাহাতে যোগেশের সন্দেহ ছিল না। তবু অন্য ভাব দেখাইয়া বলিল,—"না, তুই নিজে যদি না খুসী হো'স, আমায় খুসী করবার জন্যে অনিচ্ছা ক'রে রোজ আসতে হবে না। তুই যেমন ন'মাসে ছ'মাসে আস্‌তিস, সেই রকমই আসিস!"

বিনয় বলিল—"ওগো, নাগো, খুসী হ'য়েই আসবো। তুমি খুসী হ'লেই আমিও খুসী।"

যোগেশ একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—"ওঃ, দেখিস! একেবারে যে এক-প্রাণ হ'য়ে উঠেছিস! এইবার রেলে তোর সঙ্গে এক টিকিটে ট্রাভ্‌ল্ ক'রবো।"

"গুড্ নাইট" বলিয়া দুই-জনে বিদায় লইল।

* * *

বাড়ী ফিরিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বিনয় একখানা কোচের উপর হাত-পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। আজ যেন তাহার আনন্দ রাখিবার যায়গা ছিল না। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল আজকার তারিখটা লাল কালী দিয়া দেওয়ালে-মেজে, চেয়ারে-টেবিলে, জামায়-কাপড়ে, উঠানে-ছাতে সর্ব্বত্রই লিখিয়া রাখে। এ শুভদিন যে হঠাৎ একদিন এমন করিয়া আসিবে, তাহা সে কোনোদিন ভাবিতেই পারিত না। তাহার এতদিনকার মানসী-মূর্ত্তি যেন অকস্মাৎ আজ তাহার নিভৃত অন্তর হইতে বাহির হইয়া ব্যাকুল বাহু মেলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাগজ কলম লইয়া অক্ষর মিলাইয়া মিলাইয়া একটা মস্ত বড় কবিতা লিখিয়া ফেলিল। নিজের উপরে তাহার ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল—কেন সে ছবি আঁকা শেখে নাই; তাহা হইলে তো আজ রাত্রের মধ্যেই সে সেই ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী-পরা প্রতিমাখানির এক অপূর্ব্ব সুন্দর ছবি আঁকিয়া ফেলিতে পারিত!

তা'রপর কল্পনার বেগ একটুখানি কমিলে, সে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইয়া, আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িল; এবং নিদ্রা গিয়া কত রকম স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

বিনয় এক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত বলিয়া তাহার খুব নাম-ডাক। আজ একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত তাহার লেক্‌চার ছিল। সে অন্য দিনের মত কলেজে গেল; কিন্তু লেক্‌চার দিতে দিতে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল ঘড়িটার দিকে,—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল কখন লেক্‌চার শেষ হইবে, কখন বিকাল হইবে!

কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি সারিয়া পাঁচটা বাজিতেই সে সাজিয়া-গুজিয়া যোগেশের বাড়ী ছুটিল!

যোগেশ তখনও আদালত হইতে ফেরে নাই। বিনয় তাহার বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া বসিল। সাড়ে-পাঁচটা বাজিল, ছ'টা বাজিল, সাড়ে-ছ'টাও বাজিল,—বিনয় তখনও যোগেশের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। টং টং করিয়া সাতটা বাজিতে বিনয়ের মনে হইল—আর এ ভাবে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না! নিতান্ত অনিচ্ছায় যখন সে উঠি উঠি করিতেছে, তখন যোগেশ আসিয়া হাজির হইল।

সে দিন আদালতে একটা বড় মান-হানির মামলার জন্য যোগেশের ফিরিতে দেরী হইয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়াই সদর দরজায় দরোয়ানের কাছে সে শুনিয়াছিল—বিনয় বৈঠক-খানা-ঘরে পাঁচটা হইতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। বিনয়ের দুর্দ্দশায় মনে মনে তাহার প্রতি করুণা করিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া, যেন কিছু জানে না এইভাবে যোগেশ বিনয়কে বলিল—"কি রে, কতক্ষণ?"

বিনয় একটু লজ্জা পাইয়া বলিয়া ফেলিল—"এই খানিকক্ষণ!"

যোগেশ মনে মনে হাসিয়া একটা স্বস্তির ভাব দেখাইয়া বলিল—"যাক্, তাহ'লে তোকে বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখিনি!"

বিনয় বলিল—"তা'পর, তোমার আজ এত দেরী কেন?"

যোগেশ বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল—"আর বলিস কেন ভাই, ফ্যাসাদের কথা! কোর্ট থেকে গেছলুম পার্ক ষ্ট্রীটে সাতৃরামদাসের ওখানে। আসছে সোমবার মিনির বার্থ-ডে কি না, তাই তা'কে প্রেজেন্ট্ দোবো ব'লে কিছু আনতে গেছলুম। তা ব্যাটারা বেশ ফ্যান্সী কিছু দেখাতে পারলে না। মিনিটা ভারী সৌখীন মেয়ে, তা'কে যা'-তা' কিছু একটা দেওয়া যায় না ত'!—দেখি, কাল একবার হ্যামিল্টনের বাড়ী যাবো।"

বিনয় উৎসুকভাবে বলিল—"আমিও যাব'খন তোমার সঙ্গে!"

যোগেশ বেগতিক বুঝিয়া বলিল—"তোর আর কষ্ট ক'রে গিয়ে কি হবে! আমি কোর্ট থেকে কখন বেরোতে পারবো জানি না। কাল আবার একটা বড় মোকদ্দমা আছে,—বেরোতেই পারব কি না তা'রই ঠিক নেই।" তা'রপর বাড়ীর ভিতর যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল—"একটু বোস্, খোলসটা ছেড়ে এখনই আস্‌ছি।"

পোষাক ছাড়িয়া, হাত-মুখ ধুইয়া খানিক পরে যোগেশ আসিয়া বিনয়কে বলিল—"কিরে, জলটল খেয়ে এসেছিস?"

বিনয় বলিল—"হ্যাঁ, কলেজ থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে তা'রপর এসেছি।"

যোগেশ বলিল—"একেবারেই কিছু খাবি না ?"

বিনয় একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"এক কাপ চা হ'লে মন্দ হয় না।"

যোগেশ হাসিয়া বলিল—"এই ছাখ, আমি হাত গুণ্‌তে জানি কি না! তুই বল্‌বার আগেই আমি জান্‌তুম—তোর চা দরকার।"—যোগেশ এই বলিতে বলিতে বিনয় চাহিয়া দেখিল, দুই হাতে দুই কাপ্‌ গরম চা লইয়া মিনি প্রবেশ করিতেছে।

মিনির অতর্কিত আবির্ভাবে বিনয়ের বুকখানা উন্মাদ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। নিবিড় আনন্দে তাহার হাত-পা খানিকক্ষণ নড়িল না। তা'রপর পরম অনুরাগ-ভরে চায়ের কাপ্‌টিকে সুধা-পাত্রের ন্যায় উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে পান করিতে সুরু করিয়া দিল।

চা শেষ করিয়া খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর এক সময় বিনয় বলিয়া ফেলিল—"আচ্ছা যোগেশ-দা', মিনতি যখন তোমার শালী, তখন সেই সম্পর্কে আমিও যদি তা'কে একটা বার্থ্‌-ডে প্রেজেন্ট্‌ দিই, তা' হ'লে কি কিছু অন্যায় হবে ?"

যোগেশ বলিল—"না, না, অন্যায় কেন হবে! তুই প্রেজেন্ট্‌ দিলে সে নিশ্চয়ই মনে-মনে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যাবে। কিন্তু সে যা' লাজুক মেয়ে, তোর হাত থেকে সে কিছু নিতেই পারবে না।"

বিনয় উৎসাহিত হইয়া বলিল—"বেশ, তা'তে আর কি! আমি প্রেজেন্ট্‌টা এনে তোমার হাতে দোবো, তুমি আমার নাম ক'রে তা'কে দিও। তা'তেই হবে'খন।"

যোগেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"বহুৎ আচ্ছা!"

* * * *

দিন-দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা আসিয়া যোগেশের হাতে একটা ছোট ভেল্‌ভেটের কৌটা দিয়া বিনয় বলিল—"এই নাও যোগেশ-দা', জন্ম-দিনে মিনতিকে এক দরিদ্র বন্ধুর সামান্য উপহার!"—এই বলিয়া উৎফুল্ল-মুখে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

কৌটাটা খুলিতেই এক-জোড়া হীরার দুল ঝকঝক করিয়া উঠিল।

বিস্মিত যোগেশ বলিল—"কত দাম নিলে ?"

বিনয় অবলীলাক্রমে বলিল—"বেশী না, সাড়ে সাত-শ'।"

তিরস্কারের সুরে যোগেশ বলিল—"এ পাগলামীর কী দরকার ছিল! এত টাকা খরচ ক'রলি কেন ?"

বিনয়ের ইচ্ছা হইল বলে—যাহাকে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া দিয়াও মন তৃপ্ত হয় না, তাহাকে মাত্র সাড়ে সাত-শ' টাকার জিনিস দিয়া তো অমর্য্যাদা করাই হয়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া এতগুলা কথা বলিতে পারিল না; কেবলমাত্র বলিল—"কী আর এত বেশী টাকা খরচ ক'রলুম!"

যোগেশ বলিল—"যা'ক, তুই যখন এত সাধ ক'রে এনেছিস, তখন এটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এতগুলো টাকা অনর্থক খরচ করাটা আমি অনুমোদন ক'রতে পারলুম না!"

যোগেশের তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিনয় বলিল—"তুমি অনুমোদন না ক'রলে তো বড় ব'য়েই গেল! তবে, যাঁ'র জন্যে আনলুম, তিনি এটাকে সামান্য ব'লে যদি গ্রহণ না করেন তো সে একটা কথা বটে!"

এ বিষয়ে আর কথা-কাটাকাটি না করিয়া যোগেশ কৌটাটা পকেটে রাখিয়া দিল।

ইহার পর দুই বন্ধুতে নানা বিষয়ে গল্প চলিতে লাগিল। কখন এক সময়ে অন্য-একটা কথার মাঝখানে বিনয় বলিল—"কিন্তু ভাই যোগেশ-দা', প্রেজেন্ট্‌টা দেবার সময় আমার নামটা ভাল ক'রে বোলো।"

বিনয়ের এই উদ্ভট অনুরোধে যোগেশ হাসি সামলাইতে পারিল না; হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাল ক'রে কি ক'রে নাম ব'লতে হয়, তা' তো জানি না। নামটা কি বানান ক'রে ব'লবো ?"

আনন্দের আতিশয্যে এই বেফাঁস কথাটা বলিয়া ফেলায় লজ্জা পাইয়া বিনয় বলিল—"না, তা' নয়! বললে যে তোমার বন্ধু এই সামান্য উপহার দিলে,—তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারেন কে দিলে।"

যোগেশ বলিল—"আচ্ছা।"

আরও খানিকক্ষণ গাল-গল্প করিয়া বিনয় বিদায় লইলে যোগেশ ভাবিতে লাগিল—এখন এই দুল জোড়াটা লইয়া কি করা যায়! মিনিকে তো সত্য-সত্যই এটা দেওয়া যায় না। স্ত্রীকে এ আজগুবি ব্যাপার জানাইলে সমস্ত রহস্য ফাঁস হইয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে সে ঠিক করিল—উপস্থিত এটাকে চুপচাপ রাখিয়া দেওয়া যাক,



ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী নিখিল পাত্র ভ'রে
কোটী বুদ্বুদ উঠিছে ফুটিয়া ফেনিল সে নির্ঝরে।
তোমার আমার মতো কতশত সেই স্রোতে সদা ভাসে।

বিনয়ের বিবাহ হইলে তাহার স্ত্রীকে সে ইহা উপহার দিবে।

এই ভাবিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া গোপনে লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া যোগেশ কৌটাটা সিন্দুকের এক কোণে রাখিয়া দিল।

* * * *

যে-দিনকে মিনির বার্থ্-ডে বলিয়া যোগেশ উল্লেখ করিয়াছিল, সেদিন বিকালে আসিয়াই বিনয় প্রশ্ন করিল—"প্রেজেণ্টটা ঠিক দিয়েছিলে তো, যোগেশ-দা' ?"

যোগেশ বলিল—"নিশ্চয়ই !"

বিনয় সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব'ললেন তিনি ?"

যোগেশ বলিল—"ব'লবে আর কি ? তোর নাম ক'রতেই তা'র কাণ-দু'টো রাঙা হ'য়ে উঠলো। তারপর খানিক বাদে তোয়ালেটা আনতে ওপরে গিয়ে দেখি দুল-দু'টো প'রে কোণের ঘরে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে! আমি আচম্‌কা গিয়ে প'ড়তে সে যেন লজ্জায় পালাবার পথ পায় না !"

বিনয় ঠিক এই রকমই একটা কিছু আশা করিয়াছিল ; তাই যোগেশের এই কাহিনীকে নিঃসন্দেহ সত্য মনে করিয়া, উচ্ছ্বসিত পুলকে তাহার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরিপূর্ণ আনন্দে তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না ; সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেশ বলিল—"ছাখ্‌, বিনয়, তোকে দেখে অবধি মিনির মনের যে-রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে, তোকে না পেলে সে যে একটা কী কাণ্ড ক'রে বসবে, তা' ভেবে ঠিক করা যায় না। তবে তা'কে যদি তোর পছন্দ না হয়, তা' হ'লে তো আর কিছুই বল্‌বার নেই !"

এবার আর বিনয় তাহার আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। অধীর আবেগে লাফাইয়া উঠিয়া যোগেশকে গাঢ় আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"ভাই যোগেশ-দা', কি ব'লে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না! এতখানি সৌভাগ্য যে আমি কোনো দিন আশাও করিনি! আমার পছন্দ হবে কি না ব'লছো,—বরং আমিই তাঁ'র যোগ্য কি না, আমি তাই ভাবছি !"

বিনয়ের উন্মাদ বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া যোগেশ বলিল—"আরে দাঁড়া, আরও অনেক কথা ভাব্‌বার আছে।"

যোগেশের কথায় বিনয় দমিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া শঙ্কিত চিত্তে যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা ?"

যোগেশ বলিল—"এখনও কর্ত্তৃপক্ষের তো মত নেওয়া হয়নি, সেটা না হ'লে তো কিছুই হ'তে পারে না !"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি ?"

যোগেশ বলিল—"না, শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতির কোনো প্রয়োজন হবে না। আমার তিনিই এখন মিনির সম্পূর্ণ অভিভাবিকা, তাঁ'র অনুমতি হ'লেই হ'ল। তিনি মত ক'রলে শ্বশুর-শাশুড়ী কোনো অমত ক'রবেন না।"

বিনয় আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তা' হ'লে তো কোনো হাঙ্গামাই নেই,—তুমি তো বৌ'দিকে ব'লে অনায়াসে তাঁ'র অনুমতি নিতে পারো।"

যোগেশ বলিল—"দূর পাগল! আমি ব'ললে সে বিশ্বাসই ক'রবে না,—মনে ক'রবে,—আমি তামাসা ক'রছি। তোকে নিজে ব'লতে হবে, না হ'লে কোনোই আশা নেই।"

বিনয় ক্ষুব্ধ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি হঠাৎ গিয়ে এ কথা বৌদি'কে কি ক'রে বলি ?"

যোগেশ বলিল—"আচ্ছা বেশ, এক কাজ করা যাক! কাল বিকেলে একটা ছোট টি-পার্টি করা যা'ক, অন্য কেউ থাকবে না—শুধু তুই, আমি আর তোর বৌদি। চা খেতে খেতে সেই সুযোগে তা'কে ব'লবি। তোর নেমন্তন্ন রইল, কাল ছ'টার মধ্যে আসবি। বুঝলি ?"

উৎফুল্ল-মনে বিনয় বলিল—"আচ্ছা।"

যোগেশ বলিল—"কিন্তু মনে থাকে যেন—আমি কিছু ব'লবো না, যা' বল্‌বার তোকেই বলতে হবে।"

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে যোগেশ অনিলাকে বলিল—"শুনেছ ? বিনয়ের যে বিয়ে !"

অনিলা বলিল—"তা'ই নাকি ? কই, তুমি তো আমায় কিছু বলোনি !"

যোগেশ বলিল—"ব'লবো কোত্থেকে,—সে যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে আমিই কি জানতুম!"

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটি কে?"

যোগেশ বলিল—"তা' কিছু ভেঙে বলেনি। মেয়েটিকে দেখে তা'র নাকি ভারী ভাল লেগেছে,—তা'কে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। আসছে সোমবার বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেছে। সে নিজে কাল তোমায় নেমন্তন্ন, ক'রতে আসবে। সে বলেছে, তুমি না গেলে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবে। কাল বিকেলে আমি তা'কে চায়ে নেমন্তন্ন ক'রেছি, কিছু খাবার-টাবার কোরো, সে কথা তো তোমায় বলাই বাহুল্য।"

অনিলা খুসী হইয়া বলিল—"তা' বেশ! কিন্তু একটা ভাল উপহার তা'র বৌকে দিতে হবে। কি দেওয়া যায় ব'ল ত?"

যোগেশ বলিল—"এক জোড়া হীরের দুল দিও।"

অনিলা বলিল—"বেশ, দুল আজকাল খুব চ'লছেও দেখি!"

* * * *

সারাদিনটা আশা-আশঙ্কার দোলায় দুলিয়া পরদিন পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই বিনয় যোগেশের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই যোগেশ বলিল—"কি রে, এত দেরী ক'রলি আসতে!"

বিনয় অবাক হইয়া বলিল—"বাঃ, দেরী ক'রলুম বুঝি! তুমি তো ছ'টার সময় আসতে ব'লেছিলে, আমি তো বরং একঘণ্টা আগেই এসে প'ড়লুম!"

যোগেশ বলিল—"আচ্ছা বেশ। তুই বোস, বাড়ীর ভেতরে কতদূর হ'লো দেখে আসি।" এই বলিয়া যোগেশ বিনয়কে বসাইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

খানিকপরে ফিরিয়া আসিয়া যোগেশ বলিল—"চায়ের জল চাপাতে ব'লে এলুম।—মিনিটা বোধহয় আজকের চায়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে,—তা'র মুখে আহ্লাদ আর ধ'রছে না।"

বিনয়ের মনের মধ্যে একটা পুলক-শিহরণ বহিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর হইতে ডাক আসিলে যোগেশ বিনয়কে ভিতরে লইয়া গেল। উপরের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে ঘেরা ছাদে চেয়ার-টেবিল পাতিয়া আজকার চা-পান-সভার আয়োজন হইয়াছিল। টেবিলে কারু-কার্য্য-খচিত আবরণের উপরে নানা প্রকার সুভোজ্য আহার্য্য সজ্জিত ছিল। আজ সারা দুপুর ধরিয়া এই আহার্য্যগুলি অনিলা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিল। আজ একটা বালক-ভৃত্যের উপরে পরিবেশনের ভার ছিল,—বিনয়ের ন্যায় এক অবিবাহিত যুবা-পুরুষের সম্মুখে মিনিকে যখন তখন বাহির করাটা অনিলা পছন্দ করিত না।

অভ্যর্থনা করিয়া বিনয়কে বসাইয়া অনিলা ভৃত্যের পানে ফিরিয়া চায়ের পাত্র ভরিয়া গরম জল আনিতে আদেশ করিল। সেই অবসরে যোগেশ বিনয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিয়া লইল—"ঠিক ক'রে গুছিয়ে ব'লবি সব—গুলিয়ে ফেলিস্‌নি যেন!"

অনিলা একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলে বিনয় অনেকক্ষণ ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে নির্ভীকভাবে বলিয়া ফেলিল—"বৌদি', কাঙাল আমি আজ, ভিক্ষার ঝুলি হাতে আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি।"

যোগেশ অতি নিরীহভাবে একখানা সিঙাড়া উঠাইয়া লইয়া খাইতে সুরু করিয়া দিল।

বিনয়ের এই বিনয়-ভঙ্গীকে তাহার নিমন্ত্রণের ভূমিকা মনে করিয়া অনিলা বলিল—"হ্যাঁ, তোমার দাদার মুখে সব শুনেছি। যা'ক, এতদিনে তোমার সুমতি হ'য়েছে শুনে সত্যিই খুব সুখী হ'য়েছি! তুমি যে ধনুক-ভাঙ্গা পণ ক'রে ব'সেছিলে, আমি তো তোমার বিষয়ে হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম।"

বিনয় হাসিয়া বলিল—"খুব বড় সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ছিল ব'লেই এতদিন এ সুমতি হয়নি! এখন আপনার নিজের মুখ থেকে আপনার অনুমতি পেয়ে ধন্য হ'তে এসেছি!"

অনিলাও হাসিয়া বলিল—"অনুমতি দেবার মালিক যিনি তিনিই অনুমতি দেবেন, সে মালিক তো আমি নই!—আমরা তো মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

বিনয় বলিল—"অনুমতি দেবার মালিক তো আপনিই, বৌদি'। আপনিই তো আপনার বোনের সম্পূর্ণ অভিভাবিকা। তবে, আমায় যদি তাঁ'র অযোগ্য মনে করেন, তবে—"

বিনয়ের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিস্মিতা অনিলা

বলিল—"আমার কোন্ বোনের কথা ব'লছো, ঠাকুরপো? আমার তো একটী মাত্র বোন; তার তো অনেক দিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে।"

বিনয় বলিল—"তবে কি মিনতি আপনার নিজের বোন নন্?"

অনিলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মিনতি কে?"

এত কথাতেও বিনয়ের মনে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইল না; সে মনে করিল অনিলা তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে। তাই অনিলার প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিল—"ইংরিজীতে একটা কথা আছে—খুব মেশামিশি থাকলে আর টান থাকে না। আপনারও তা'ই হ'য়েছে দেখছি,—যে বোন দিন-রাত আপনার সঙ্গে র'য়েছে, তা'রই নাম ভুলে গেছেন!"

সমস্ত ব্যাপারটা অনিলার কাছে বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল, সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যোগেশ ভাল-মানুষটির মত পরম নির্ব্বিকার-চিত্তে সিঙ্গাড়া-কচুরীর সদ্গতি করিতে করিতে অন্যদিকে চাহিয়া অনিলা ও বিনয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। অনিলা তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মিনতি আবার আমার কোন্ বোন?"

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া নিতান্ত নিরীহভাবে যোগেশ বলিল—"বুঝতে পারছ না? মিনি গো, মিনি!"

অনিলা যেন আকাশ হইতে ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। বিস্ময়াভিভূত-কণ্ঠে বলিল—"ওমা, সে কি গো ঠাকুরপো! মিনি যে আমাদের ঝিয়ের মেয়ে, তা'র আবার বিধবা! ওকে দেখে তুমি মুগ্ধ হ'য়েছ!"

অনিলার কথার ভঙ্গীতে বিনয় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। তথাপি ইহাকে কৌতুক মনে করিয়া পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"কেন মিছিমিছি ছলনা ক'রছেন বৌদি! আমি সব শুনেছি।"

অনিলা বলিল—"কী পাগল তুমি ঠাকুরপো! সত্যিই ব'লছি ও আমাদের ঝিয়ের মেয়ে! বিশ্বাস না হয় তো বলো আমি তা'কে ডেকে দিই, তা'র মুখ থেকেই শোনো!"

এবার আর অনিলাকে সন্দেহ করিবার যো রহিল না। বিনয় অভিভূতের ন্যায় যোগেশের দিকে চাহিয়া বলিল—"তবে কেন মিছিমিছি ব'লেছিলে ও তোমার শালী হয়?"

উচ্ছ্বসিত হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া ক্রোধের ভাব দেখাইয়া যোগেশ বলিল—"খবরদার, আমায় মিথ্যাবাদী বলিসনি! আমি কখ্খনো বলিনি মিনি আমার শালী হয়! তুই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলি মিনি আমার কে হয়, আমি শুধু ব'লেছিলুম আমার এঁকে সে দিদি বলে। সত্যি কিনা তোর বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর্!"

সমস্ত রহস্যটা এইবার অনিলার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল—"সে কথা সত্যি, ও ছেলে বেলা থেকেই আমায় দিদি ব'লেই ডাকে! তা'তেই তুমি একেবারে ধ'রে নিলে ও আমার বোন; আর বিয়ে করবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠলে! পাকা দার্শনিক বটে, ঠাকুরপো!"

লজ্জায় ঘৃণায় বিনয় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে মুখ তুলিয়া অনিলার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইল এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কোথাও অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে!

মুচকিয়া হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া অনিলা বলিল—"তোমার দুষ্টুমী কোনো দিনই যাবেনা!"

সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনিলার পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া কাতর-কণ্ঠে বিনয় বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন বৌদি! আপনার বোন ভেবেই ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম। না হ'লে—"

অনিলা হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিল—"আচ্ছা, তোমায় ক্ষমা ক'রবো যদি আমায় সত্যিই একটি বোন এনে দাও! এখন বসো, এই খাবারগুলোর দিকে একটু স্নেহ-দৃষ্টি দাও, সারাদিন ধ'রে অনেক খেটে এগুলো তোমার জন্যে তৈরী ক'রেছি!"

নিরুপমা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কে জানিত তুমি রাজেন্দ্রানী !
আজি তাই জুড়ি দুই পাণি
নতজানু তোমার সম্মুখে
গভীর আক্ষেপে মনোদুখে
চাহিতেছি ক্ষমা।
ওগো নিরুপমা,
ফিরায়ে লইতে চাই আজি মোর সব অঙ্গীকার ;
আজি আর লজ্জা নাই এই লজ্জা করিতে স্বীকার
নহি নহি তব যোগ্য আমি ;
তবু যে আমিই তব স্বামী
বিধাতার এই ভুল
অন্তরে বিঁধিছে শূল
নিত্য দিবা যামী !
অসহ যাতনা তার,
অনুতাপ গুরুভার
মনঃক্ষোভ নিদারুণ দহিছে আমায় !
যে বেদনা অকস্মাৎ উৎসবের উল্লসিত বাঁশরী থামায়
যে ব্যথা অব্যক্ত সুরে
হৃদয়ের অন্তঃপুরে
মর্ম্মভেদী তোলে হাহাকার—
অতুলনা হে প্রিয়া আমার
সেই বেদনার তীব্র সুতীক্ষ্ণ ফলক
আমার সুখের স্বপ্ন করি অমূলক
ব্যর্থতায় ভরেছে হৃদয় ;
নয়, নয়, তুমি তো সে নয় !
হায়, এতদিন আমি
হে অনামি
পাইনি তোমার পরিচয় ;
ছিল তা' গোপন এতকাল !
তোমার ও অন্তরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের আবেগ
সংসারের শত রুক্ষ দুর্য্যোগের বজ্র-বহ মেঘ
সঙ্গোপনে করি অন্তরাল

স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাতের বিচ্ছুরিয়া যে অরুণ-আলো
আমারে বাসিয়াছিল ভালো
আপনারে নীরবে নিঃশেষে নিবেদিয়া
পূর্ণ করি দিয়াছিল ক্ষুব্ধ মোর বুভুক্ষিত হিয়া—
সে যে কভু মোর প্রাপ্য নয়
এ কথা যেদিন আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিনু নিশ্চয়,
হে চির-রহস্যময়ী নারী,
আর কি তোমারে আমি প্রেম-সম্ভাষণে
অপমান করিবারে পারি ?
আপনার অযোগ্যতা আচম্বিতে অন্তরেতে স্মরি
সলজ্জ সঙ্কোচে শুভে, সেইক্ষণে উঠিনু শিহরি !
সহসা হেরিনু যেন লয়ে দীপ্ত বিদ্যুতের স্তূপ
উৎকীর্ণ করেছে বজ্রে ওই তব অপরূপ রূপ
রূপ-দক্ষ সে কোন্ ভাস্কর ;
তোমার আঁখির নীলে তরঙ্গিত সিন্ধু যেন
মহানন্দে চুমে নীলাম্বর,
সৃষ্টি-নাশা কী অপূর্ব্ব দৃষ্টি তাহে ঝরে,
উন্মত্ত পুরুষ-চিত্ত পতঙ্গের মতো ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ হ'য়ে মরে !
ওই তব অকলঙ্ক অধরের আগে
মদনের পুষ্প-ধনু নিশিদিন হিল্লোলিয়া জাগে ;
হৃদি-উৎসে উদ্ভাসিত কামনার উৎপল-মুকুল
মেখলার নৃত্যছন্দে চিত্ত-হারা জনে জনে,
মদমত্ত ভুবন দোদুল,
চরণ-মঞ্জীরে বাজে বরণে আহ্বান-করা বাসনার ব্যাকুলিত সুর
অনুপম বিচিত্র মধুর !
কী অজের আকাঙ্ক্ষার তীব্র আকর্ষণে
করেছ' আনত আজি পদপ্রান্তে তব
দুরন্ত এ বিশ্বের যৌবনে !
তোমারে হেরিয়া দেবী সে কি মোর বিপুল বিস্ময় !
নয়, নয়, এ তো কভু নয়
আমার সে প্রিয়া,

ছোটখাটো সংসারের এক কোণে যারে সাথে নিয়া
একান্তে যাপিব এই দু'দিনের ক্ষণিক জীবন
এ তো নহে সামান্ত সে ধন !
এ যে বিশ্ব-প্রিয়া !
এরই লাগি কেঁদে ফিরে দেশে দেশে নিখিলের হিয়া
যুগে যুগে চির-কাল।
এরই রূপ-রস-সুধা স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিত্য ওগো, করেছে মাতাল !
নাহি এর আদি অন্ত জন্ম জরা জীবন মরণ
শাশ্বত এ—কালজয়ী ; এরই দুটি রাতুল চরণ
শরণ লইতে চায় সমগ্র ধরণী !
তারে আমি আমার ঘরণী
কোন স্পর্দ্ধা লয়ে বলো অসঙ্কোচে করিব স্বীকার ?
তুমি যে গো মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তি প্রতিভার—
সকল সৃষ্টির মাঝে মহিয়সী—তুমি নিরুপমা !
ত্রিলোকের তৃপ্তি যে গো তোমারই মাঝারে
কালে কালে হ'য়ে আছে জমা !
মনের মানুষ তুমি নহ শুধু মর্ত্ত্য-মানবের
তোমারি কারণে দেবী, দেবতার সনে চিরদিন দ্বন্দ্ব দানবের !
কবি-কল্পনার তুমি স্বপন-মানসী
আনন্দ সিন্ধুর উৎস, উৎসবের দীপ,জীবনের বাঞ্ছিতা প্রেয়সী !

নহ তুমি গৃহলক্ষ্মী, প্রণয়িনী কারো, তুমি শুধু লীলার সঙ্গিনী,
হে বিচিত্রা রূপসী রঙ্গিণী !
লোক হ'তে লোকান্তরে অনাদি এ কাল-স্রোত নীরে
ভাসিয়া চলেছে জীব তোমারই ও পাদপদ্ম ঘিরে ;
প্রেমার্ত্ত হৃদয় যত তোমারে চাহিয়া চিরদিন
অনুরাগ আবেশে রঙীণ !
স্বার্থ কণ্টকিত এই জীবন-বনের পঙ্কিল পিচ্ছল পথ 'পরে
নিত্যকাল চিত্ত-লোকে নির্ব্বিচারে দৃপ্ত পদভরে
ত্যাগের পতাকা বহি চিরন্তন জয়-যাত্রা তব
অপূর্ব্ব অদ্ভুত অভিনব !
তোমার নিবিড় স্নেহ ছায়া
ল'য়ে তার অশরীরি মায়া
অজ্ঞাতে কেমনে সঙ্গোপনে
প্রণয়ের পুণ্য তপোবনে
আমারে করেছে আজি দেহাতীত নিষ্কাম তাপস !
যে মন মানে না কভু বশ
তারেও করেছো তুমি হেলায় আপন পদানত !
ভুজঙ্গে নির্ব্বিষ করা তোমার এ সর্ব্ব-জয়া-ব্রত
আমার সকল ত্রুটী জন্মে জন্মে করিয়াছো ক্ষমা—
প্রেম-স্বপ্ন-রাজ্যে মোর ওগো মহারাণী,
তাই তুমি চির নিরুপমা !

উইল

[এক দৃশ্যের কথা-নাট্য]

—মন্মথ রায়, এম-এ

—ডাক্তার ডেকে আনি…

—না মুখার্জ্জি !…অনর্থক ডাক্তারকে মিছিমিছি টাকা দেওয়া কিছু নয়। এ যন্ত্রণাটুকু আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব।

—মুখে বলছেন বটে সহ্য কর্ব্বেন, কিন্তু, যন্ত্রণা সে কথা মেনে নিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না। দেখুন, আপনি আর টাকার মায়া কর্ব্বেন না। চিরটাকাল চির-কুমারই থেকে গেলেন ; স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আপনার অবর্ত্তমানে আপনার এ অগাধ সম্পত্তি বারো ভূতে লুটে খাবে… অথচ আজ ডাক্তারের ওষুধটুকু খেতে আপনার টাকার মায়া ! ছিঃ—

—টাকার মায়া কর্ব্বনা আমি !…তুমি জানোনা মুখার্জ্জি, যে যত কষ্টে টাকা রোজগার করে, টাকা খরচ করা তার পক্ষে তত কষ্ট ! ও যে আমার কষ্টের ধন… আর কষ্টের ধন বলেই ওর ওপর আমার মায়া মমতার অন্ত নেই !…উঃ কী দিনই গেছে !…জন্মে অবধি মা বাপের মুখ দেখতে পাই নি, জীবনে দুটো স্নেহের কথা শুনতে

পাই নি, মামার বাড়ীতে মামার গলগ্রহ হয়ে ছিলুম, মামী তাড়িয়ে দিলেন···এক বস্ত্রে চলে এলুম রাণীগঞ্জে···কুলীর কাজে যোগ দিলুম···তার পর···তার পর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধীরে ধীরে তোমাদের কারবারের বড়বাবু হয়ে আজ কেমন করে আমি লক্ষপতি হয়েছি সে ইতিহাস তোমরা না জানো এমন নয়।···আমার সেই রক্তজলকরা টাকা! ···তারি মায়ায় বিয়ে করি নি, তারি মায়ায় স্ত্রীপুত্রের মায়া ত্যাগ করেছি!

—কিন্তু আপনার অভাবে এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ কর্ব্বে কে, সে কথা অন্ততঃ আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

—এসেছে,···শুধু আমার নয়···আরো বহু লোকের। ···নীচের ঘরে সেই ভাবনা নিয়ে কত মহাত্মাই না বসে রয়েছেন খবর পেলুম!···কী হবে এই সম্পত্তির, আমি মর্লে কী হবে এই সম্পত্তির···এই ভাবনায় আজ দেখছি দেশের লোকের ঘুম নেই।···দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের তো কথাই নেই, আবার শুনছি কংগ্রেসের লোক, সভাসমিতির সভ্য···তাঁরাও এ কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলেন!

—আপনার মামাতো ভাই আজকে সকালের ট্রেনে এসেছেন। আপনার অসুখের সংবাদে তিনি বড়ই চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছেন···

—এসেই আমায় কি বলে জানো? বলে "ঘুমের ভেতর নাকি দৈব স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ মেলে, মা বলে দিয়েছেন।" আমি বললুম হাঁ ভাই, সেইটে একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি। বড় সুবোধ আমার ভাইটি! কখনও কথার অবাধ্য নয়। ···ছুটে চলে গেল ঘুমুতে।···ঐ শুনছ না ওঘরে তার নাকের ডাক!···সে যাক্। একটু জল দিতে বল দেখি!

—দিচ্ছি···

—না, তুমি না।···তুমি আপিসে যাও···বড় কর্ত্তারই না হয় অসুখ, কিন্তু ছোটকর্ত্তাও সেই সঙ্গে আপিসে না গেলে কাজ চলবে না মুখার্জ্জি!

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাজ শেষ করেই এসেছি।···এই নিন জল···

—আঃ, লখিয়া কোথায়?

—লখিয়া কে?

—আঃ, সেই কুলি মেয়েমানুষটা!

—তাকে দিয়ে কি হবে?

—আমাকে জল দেবে।···ওরাই যে আমায় দেখছে শুনছে!

—কেন, আমিই জল দিচ্ছি—

—না মুখার্জ্জি, তুমি আর দেরী ক'রোনা···আপিসে যাও···তাকে যদি ডাকতে পার ডেকে দাও···না হয় চলে যাও—

—হাঁ, সে বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে।···এই যে সর্দ্দার-কুলি!···ডেকে দাও তো লখিয়াকে···

—সর্দ্দার এসেছে?···মুখার্জ্জি! তুমি ভাই নীচে গিয়ে ভদ্রবৃন্দকে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় দাও তো ভাই!··· ওঁদের চাঁদার খাতাগুলি আমার মানসপটে ভেসে উঠছে··· আর আমার মাথা ঘুরছে!

—বেশ, আমি যাচ্ছি।···কিন্তু আপনার জ্বরটা কি আবার বেগ দিল?···একবার ডাক্তারকে খবর দিলে···

—আমার হার্টফেল কর্ব্বে···বুঝলে মুখার্জ্জি! ডাক্তারকে ষোল মুদ্রা দর্শনী দিতে গেলেই আমার হার্ট ফেল হবে ···বড় হিতৈষী দেখছি তোমরা আমার!

—আমি চললুম।···নমস্কার।

—সর্দ্দার!

—মহারাজ!

—ডাক্তার চলে গেছে, না?

—হাঁ মহারাজ।

—আমায় জল দেবে কে?

—কেন, লখিয়াকেই তো পেয়েছেন!

—ওকে দেখলুম। ও নয়।···সে যে কোথায় জানিনে, হঠাৎ যদি এক মিনিটের জন্যও একটিবার দেখতে পেতুম, চিনতুম, নিশ্চয়ই চিনতুম···কিন্তু, কোথায় সে!

—কে?

—আমার চোখের ঘুম।...ঘুম নেই, ঘুম নেই, আমার চোখে ঘুম নেই, আজ একটি মাস ব্যারাম হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু এক মিনিট ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না!

—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পাচ্ছি নে মহারাজ!··· কি চান আপনি?

—শান্তি ভাই শান্তি।...জানো, আমার কত টাকা?

—লাখ লাখ…

—প্রায় দশ লাখ।…আমি আর দু একদিনের মধ্যেই মরব…এই দশ লাখ টাকা আমায় ধরে রাখতে পার্ব্বে না… কিন্তু…তার পর? তার পর?

—মহারাজ!

—যখের কথা শুনেছ সর্দ্দার?…আমাকে সেই যখ হয়ে আমার এই দশ লাখ টাকা আগ্‌লাতে হবে!…আমার মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। আমার কি হবে সর্দ্দার?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ!

—ঘুম নেই, চোখে ঘুম আসে না।…এই টাকা… আমার বোঝা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে আমায় পিষে মারছে…

—কিছু না হয় বিলিয়ে দিন…

—বিলিয়ে দেব! বিলিয়ে দেব!…কাকে বিলিয়ে দেব?…তোমাকে?…ওরে হারামজাদা…তোকে?

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে?

—গান্ধী মহারাজকে দিয়ে দিন…

—তোকে আমি জেল দেব পাজী!

—তবে কি হবে মহারাজ?…যখ হলে তো বড়ই মুস্কিল হবে…

—যখ হতে হবে ভয়েই তোরা সব বিয়ে করিস, না? .. তোরা মর্লে তোদের ছেলেরা বিষয় পায়..তোদের আর ভাবনা থাকে না…আঃ…এ কথাটা তখন মনে হয় নি…তাই আজ…আঃ, গলাটা শুকিয়ে গেল…জল দেবে কে?

—দেব?

—খবরদার…

—…লখিয়াকে ডাকব?

—না।

—তবে?

—তোদের পাড়ার আর কে আসে নি আমার কাছে?

—কেউই আর আসতে চায় না!

—আসতে চায় না সে বহুদিন শুনেছি। কিন্তু… টাকা পেয়েও আসতে চায় না সে কথা আজ শুনছি!

—টাকা পেয়েও আসতে চায় না। আগে এমন ছিল না। তখন যাকে বলেছি সেই উপরি রোজগারের লোভে আসতে চাইতো, . এসেও ছিল কয়েকজন…কিন্তু…

—কিন্তু?

—কিন্তু…এখন তারা সন্দেহ করে! মেয়েমানুষ কিনা…ওদের সন্দেহটা একটু বেশী!

—আমি তো ওদের কোন অনিষ্ট করি নে…শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখি .।…থাকে…হাওয়া করে, জল দেয়…একদিন থেকেই চলে যায়…এই তো যত কাজ!… এতেও আপত্তি?

—হাঁ মহারাজ…

—ঐ লখিয়া তো এল!

—সবার মানা না মেনে এসেছে!

—এসে আবার ঘুমুচ্ছে!…ওকে তুলে আন সর্দ্দার!

—এই হারামজাদী!!

—চুপ হারামজাদা!…এসো লখিয়া, আমার সম্মুখে এস।…কোন ভয় নেই…হাঁ…এসো…এগিয়ে এস…

—আমার লাল টুকটুকে শাড়ী?

—দেব লখিয়া দেব।…সর্দ্দার…আমি চোখেও আর ভালো দেখি নে…তুমি দেখ তো…লখিয়ার চোখের মণি দুটি কেমন?

—কালো!…আলকাতরার ফোটা!

—তিল নেই? ও মণিতে তিল নেই?

—না।. যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার…তিল থাকলেও হারিয়ে গেছে!

—তিল নেই! . তবে তো ওর চোখ ভালো নয়!… তবু ওর গরবের অন্ত নেই! হারামজাদী আবার শাড়ী চায়!…সর্দ্দার! ওকে পাঁচজুতি মেরে তাড়িয়ে দে—

—মহারাজের জয় হোক্।…চল হারামজাদি!…আবার শাড়ী পড়তে সাধ!…চল পেত্নী!…আরে, তিল কি সবার চোখের মণিতে থাকে!…তিল দেখবি তো আমার মেয়ের চোখ দেখগে যা…হাঁ…চোখ বটে!…পুটুপুটু করে যখন চেয়ে থাকে!…তখন—

—সে কি সর্দ্দার! তোমার মেয়ের চোখের মণিতে তিল আছে?

—আছে মহারাজ!

—সেই খুকী?

—মঙ্গলী!

—অতটুকু মেয়ের……

—সাত বছর বয়স হ'ল মহারাজ!

—একটু জল দাও সর্দ্দার!…লখিয়া পালিয়েছে?

—ছুটে পালিয়েছে মহারাজ।

—তুমিই দাও…

—নিন্।

—আঃ…জুড়িয়ে গেল!…কি তেষ্টাই পেয়েছিল!…আঃ

আচ্ছা সর্দ্দার! তুমি এমন বাঙলা কথা শিখলে কোথায়?

—আমি যে মহারাজ কলকাতায় ছিলুম!…

—কবে?

—সে অনেক দিন হবে।…বিয়ে করে নাকি আমি বৌ-পাগলা হয়ে গেলুম…বাবা একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল…বৌকে বললুম চল্…কিন্তু গেল না। একাই গেলুম কলকাতায়…সেইখানেই আমার কাজকর্ম্ম শেখা… তাইতো আজ মহারাজের দয়ায় আমার এই উন্নতি!

—বৌ গেল না কেন?

—বাবার ভয়ে।· ভারী ভীতু ঐ মঙ্গলীর মা!

—মঙ্গলীকে ফেলে কলকাতায় মন টিক্তো?

—তখন মঙ্গলী হয়নি মহারাজ!· ফিরে এসে দেখি দুবছরের একটি মেয়ে… তখন আরো ফুট্‌ফুটে ছিল… যেন গোবরে পদ্মফুল।…বাবা বললেন তোর মেয়ে মঙ্গলবারে হ'ল…তাই নাম রেখেছি মঙ্গলি!…এই বলে আমার কোলে তুলে দিলেন!

—মঙ্গলিকে দেখেছি, বেশ মেয়ে!…সর্দ্দার…কিন্তু, মঙ্গলির মাকে কি আমি কোনও দিনই দেখিনি!

—সে যদি আগে দেখে থাকেন! আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর তার যা দেমাক হ'ল মাটিতে পা পড়ে না আর কি!…বলে আমি খাটতে পার্ব্বনা ·· আমি মঙ্গলিকে নিয়ে শুধু খেলে দিন কাটাব!

—তবে মঙ্গলিকে বড্ড বেশী ভালোবাসে সে!

—হাঁ মহারাজ!…আমি জ্বালাতন হয়ে উঠেছি!·· মেয়ে নিয়ে এমন অস্থির…যে · আমার দিকে তার তাকাবারও ফুর্সৎ নেই!

—তাই বুঝি আর ঘরেরও বের হয় না…

—ঘরের বের তো আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই হয় না…! যার অবস্থা ভালো…সেই তার বৌঝি ঘরেই রাখে। কয়লার খনির বাবুদের স্বভাব চরিত্রির তো আর সুবিধের নয়…!

—নয়ই বটে!…হাঁ, সে কথা বুঝি।··কিন্তু, সর্দ্দার, তোদের দেশের মানুষদের মনে দয়ামায়া নেই।…হাঁ, নেই, নইলে…

—নইলে?

—এই আমি বিদেশের একটা মানুষ…মর্ত্তে বসেছি,… কেউ তো একবার উঁকিও দিয়ে যায় না যে আমার কি লাগবে…একফোটা জল…কি…এক দাগ ওষুধ…কি একটু পথ্য—!

—কেন, আপনার দাসদাসীরা তো রয়েছে…

—সে তো আমার রয়েছে…কিন্তু · তোদেরও তো একটা কর্ত্তব্য…আছে…

—আমি তো রাত্তির দিন হাজির…

—কিন্তু তোর বৌ

—না মহারাজ!

—তবেই দেখ!…আমাদের দেশে ওটি হ'তনা। অমন স্নেহ অমন মায়া অমন মমতা · তোদের ওরা ভাবতেও পারে না! সে যাক্। সর্দ্দার, আমার জ্বরটা খুবই বাড়লো! সর্দ্দার, আর বুঝি বাঁচি নে!· সর্দ্দার! আমার কাছে কেউ নেই! কেউ নেই! একটা ছেলে নেই যে জড়িয়ে ধর্ব্বে…স্ত্রী নেই যে সেবা কর্ব্বে…আমার ভালো লাগবে!∴সর্দ্দার, তোর বৌ আর মঙ্গলিকে আমার এখানে একবার নিয়ে আসবি? শুধু দেখব · চোখের দেখা দেখব! ওদের দেখলেও আমি শান্তি পাব!…আজ এই বিদেশে মর্ত্তে বসে আমার দেশের কথা মনে পড়ছে ·· · মেয়েদের কাজল চোখের কালো ছায়ায় ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে!…কোথায় পাব? আমি তা কোথায় পাব?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ!

—কাকে দেব? আমি আমার এই অগাধ সম্পত্তি দশলাখ টাকা…কাকে দেব?

—গান্ধিজী…

—খবরদার সর্দ্দার। রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে যে টাকা রোজগার করেছি...সে টাকা দান কর্ত্তে পার্ব্বনা...খয়রাত কর্ত্তে পার্ব্বনা। সে টাকা আমি নিজে ভোগ কর্ত্তে কষ্ট পেয়েছি···পরকে দিতে পার্ব্বনা···না—না—না—কখ্‌খনো না ··

—কিন্তু, আপনারও তো আর কেউ নেই!

—তা ঠিক্।·· কেউ নেই·· তবু···

সর্দ্দার, টাকা নেবে?

—মহারাজ আপনি ভালো হয়ে উঠুন—

—না সর্দ্দার, আমি জানি আমি মলে তোমরা খুশী হবে · আমি যে কৃপণ!···কিন্তু সর্দ্দার, খুশী আমি বেঁচে থেকেই তোমাকে করে যাচ্ছি ··এই দেখ আমার হাতে হাজার টাকার নোট···নেবে?

—মহারাজ!

—নেবে সর্দ্দার?···শুধু একটি কাজ কর্ত্তে হবে!

—কি মহারাজ?

—ঐ মঙ্গলির কথা আমার আজ বড় বেশী মনে পড়ছে!...কি সুন্দর মেয়েটি!···ঝাকড়া ঝাকড়া চুল···কালো দুটি চোখ···মুখে আধ আধ বুলি।···ওকে একটিবার আমার এখানে নিয়ে আসবে?···আমি ওকে বুকে নেব!

—মঙ্গলির মা মঙ্গলিকে ছেড়ে দেবে না···

—বেশ তো!...তাকেও সঙ্গে আনো!

—আমাদের দশের নিষেধ আছে!

—দশের নিষেধ কি আমার আদেশের চাইতেও বেশী ভজন সর্দ্দার?

—মহারাজ!

—আসবে না সে?

—না।

—না?

—.........

—শোন সর্দ্দার···আমার আদেশ···কয়লার খনির মালীকের হুকুম···তাকে তুমি এখানে এখনি আনবে··· বুঝলে?

—.........

—সর্দ্দার! সর্দ্দার!

—সর্দ্দার তো নেই দাদা!···সর্দ্দার যে এইমাত্র ছুটে বের হয়ে গেল!

—কে? বিমল?

—হাঁ দাদা।···এত চেষ্টা করলুম · স্বপ্নও দেখলুম··· কিন্তু অযুধ পেলুম না!

—টাকার স্বপ্ন কোনদিন দেখেছ?

—দেখেছি।

—কত টাকা পর্য্যন্ত স্বপ্নে একসঙ্গে দেখেছ?

—এক হাজারো একবার দেখেছিলুম কিন্তু···

—কিন্তু?

—কিন্তু সেই সঙ্গে জেলে চাবুক খাচ্ছি সেটাও দেখা বাদ যায় নি ..

—বেশ।···চাবুক খেতে হবে না···হাজার টাকাই মিলবে ..যদি একটা কাজ কর্ত্তে পার ··

—বলুন, · আমি তো আপনার এই শেষ দশায় শেষ কাজ কর্ত্তেই এসেছিলুম···

—হাঁ ভাই, আমার শেষ দশায় শেষ কাজ কর···ঐ জানলা দিয়ে নীচে দেখতে পাচ্ছ কুলী-সর্দ্দারদের কুটীর-পল্লী। দেখছ?

—ঐ তো দেখছি!

—কাছে এস···আরো কাছে।···পরিহাস নয় ভাই··· যা বলব এর চাইতে গুরুতর কথা আমি জীবনে বলি নি! যদি টাকা চাও···যদি এই হাজার টাকার চকচকে নোটখানি চাও···তবে...

—তবে?

—তবে ঐ কুটীর-শ্রেণীতে এই মুহূর্ত্তে আগুন দিয়ে এস!...আর আগুন যখন দাউ দাউ করে জলে উঠবে, তখন আগুন নেভাবার ছল করে চেঁচিয়ে বলবে·· যদি বাঁচতে চাও ···ছেলে পেলে নিয়ে বড়কুঠীতে যাও···বুঝলে?

—দাদা সত্যি?

—সত্যি...সত্যি...সত্যি! এই নোটখানি যেমন হাজার টাকার সত্যি···তেমনি সত্যি।

—হাজার টাকা! ··কিন্তু দাদা···একখানা মটর গাড়ীর বড় সখ ছিল আমার!

—বেশ···যদি আমার মনস্কামনা পোরে...তাও হবে··· তাও হবে···

—মটর! মটর! মটর! ভ্যাস্···ভ্যাস্···ভ্যাস্···

—মটরের শব্দ মুখে করে আর কি কর্ব্বে···মটর নিজেই

ও শব্দ করবে!···তুমি আর বিলম্ব করো না···কোন ভয় নেই·· যাও···

—গেলুম।···ভ্যস্···ভ্যস্···ভ্যস্···

—বিমল!

— * * * *

—বিমল!

—বিমলবাবু আমাদের ঘরে আগুন দিতে ছুটে গেল···

—কে? তুমি কে?

—আমি সর্দ্দার। ··আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলুম।··· আমিও চললুম বিমলবাবুকে বাধা দিতে···কিন্তু যাবার পূর্ব্বে বলে যাই···যদি এই আগুনে আমার বৌ কি মঙ্গলি পুড়ে মরে···তবে···

—তারা পুড়ে মর্ব্বে কেন! মর্ব্বে না···মর্ব্বে না···শুধু ঘর থেকে বের হয়ে এসে আমার কুঠীতে এসে সবাই আশ্রয় নেবে ..আমি তাদের শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব···

—মঙ্গলিকে বুকে নিয়ে মঙ্গলির মা ঘুমিয়ে আছে। সেই ঘরেই যদি আগুন আগে পড়ে · তবে আচ্ছা, সে ফিরে এসে হবে—

—সর্দ্দার! সর্দ্দার!

— * * * * *

—সর্দ্দার ছুটে চলে গেল মহারাজ!...কিন্তু আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই?

—কে? লখিয়া?

—হাঁ লখিয়া!···আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই মহারাজ?

—ওরে লখিয়া! দেখ দেখি···তোদের পাড়ায় কি আগুন লেগেছে?

—আগুন! সে কি মহারাজ!···আগুন নয়, আমি চাই সেই লাল টুকটুকে শাড়ী! হাঁ, আগুনের মত লাল টকটকে!

—বড়কর্ত্তা! বড়কর্ত্তা!

—কে? মুখার্জ্জি? এসো...শীগগীর এস ..

—কি হয়েছে বড়কর্ত্তা?...সর্দ্দার কুলী বিমলবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে! কি হয়েছে বড়কর্ত্তা?

—কুলীপাড়ায় কি আগুন লেগেছে?

—কই, না।

—সর্দ্দার কুলীকে তবে এখানে নিয়ে এস···

—আমি এসেছি মহারাজ।

—বিমল কোথায়?

—নীচের ঘরে পড়ে আছেন।

—সর্দ্দার! তোমায় আমি এই হাজার টাকার নোট দান কর্লুম।·· নাও—

—কেন? আমি তো আর মামলা মোকদ্দমা কর্ব্ব না! তবে কেন এই ঘুস?

—ঘুস নয়। আমি খুশী মনে তোমায় দিলুম—তোমার মঙ্গলী বেঁচেছে, মঙ্গলীর মা মরে নি · সেই আনন্দে দিলুম—

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে তোমার মঙ্গলিকেই দিয়ো···

—সেও নেবে না। তার মা তাকে নিতে দেবে না—

—আচ্ছা সর্দ্দার!···মঙ্গলির মার চোখ দুটি কেমন? তার চোখের মণিতেও কি একটি তিল আছে?

—সে তো আমি অত ভালো করে দেখি নি! আর তাতে আপনার কি?

—আমার আছে কি না, তাই।

—কই? দেখি?

—এই দেখ—

—হাঁ, তাই তো!

—দয়া কর···দয়া কর সর্দ্দার ..

—মঙ্গলিকে একটিবার আমার বুকে এনে দাও—

—লখিয়া তোর মেয়েটা কই? · মহারাজের বুকে তুলে দে—

—না·· না সর্দ্দার ..আমি কাউকে চাইনে···আর কাউকে চাইনে চাই মঙ্গলিকে!

—হাঃ হাঃ হাঃ কুলীপাড়ার কোন মেয়ে আপনার কাছে আসবে না!...আপনি তাদের ঘরে আগুন দেওয়াচ্ছিলেন... সে কথা আর যেই ভুলুক···আমি ভুলব না!

—মুখার্জ্জি!···সর্দ্দারকে ডিসমিস কর···এই মুহূর্ত্তে···

—তাই হবে বড়কর্ত্তা। সর্দ্দার · তুমি অন্যপথ দেখ—

—মুখার্জ্জি!...আমার যেন কেমন কচ্ছে!

—ডাক্তার ডাকি?

—ডাক্তারকে পয়সা দিতে পার্ব্বনা!

—আচ্ছা,আপনি না দিলেন···

—না, ও কিছুতেই হবে না। নীচের ঘরে বড় গণ্ডগোল হচ্ছে—

·· তাঁরা সব চাঁদার খাতা নিয়ে আবার এসেছেন!

—তাড়িয়ে দাও···তাড়িয়ে দাও ওদের!

—বেশ, আমি যাচ্ছি ··কিন্তু ··ডাক্তার ··

—ডাক্তারকে পয়সা দেব না। ওদের বলে দাও··· ওঁদেরও আমি একটি পাই পয়সা দেব না···আর শুনিয়ে দাও যে ··আমি এখনি আমার সম্পত্তির উইল কর্ব্ব—

—কি উইল কর্ব্বেন বড়কর্ত্তা?···বিমল বাবুকে বুঝি···

—বিমল বাবুকে নয়। একলা কাউকেই নয়। যাকে দিতুম, আমি যে খুঁজে তাকে বের কর্ত্তে পার্‌লুম না! সর্দ্দার চলে গেছে?...

—হাঁ চলে গেছে।

—মঙ্গলি কোথায় রে লখিয়া?

—ওরা সব ভিন্ গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে ধরে এনেছিস খবর শুনে মরদরা সব মাগীদের ভিন্‌গাঁয়ে চালান দিয়েছে। ..আমি পড়ে আছি আমার লাল টুকটুকে শাড়ী নেব বলে—

—মুখার্জ্জি! হল না! হল না!···আমার অমনি এক মঙ্গলী ..অমনি এক মঙ্গলীর মা · ঐ কুলী পল্লীর মাঝে লুকিয়ে ছিল, এখন হারিয়ে গেছে, খুঁজে আর বের কর্ত্তে পার্লুম না। উইল লেখো মুখার্জ্জি আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ঐ কুলীদেরই দিয়ে গেলুম . যদি আমার মঙ্গলী বেঁচে থাকে জনগণের মধ্য দিয়ে সে তা ভোগ কর্ব্বে···লখীয়া! একটু জল! আঃ···আর ভালো কথা···ঐ লখীয়াকে একখানা লাল টুকটুকে শাড়ী দিতে হবে · উইলে লিখতে ভুলো না!

চীন-সমস্যা

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

১৯২৬ সাল হইতেই চীনের নানাপ্রকার গোলমালের খবর আমাদের কানে আসিতেছে। সকল সময় খাঁটি খবর পাওয়া যায় না। 'বিশ্বদূত' রয়টার তাহার সুবিধামত যে সকল সংবাদ পাঠায়, তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল রয়টার-প্রেরিত সংবাদে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ পরিচয় লাভ করা অসম্ভব।

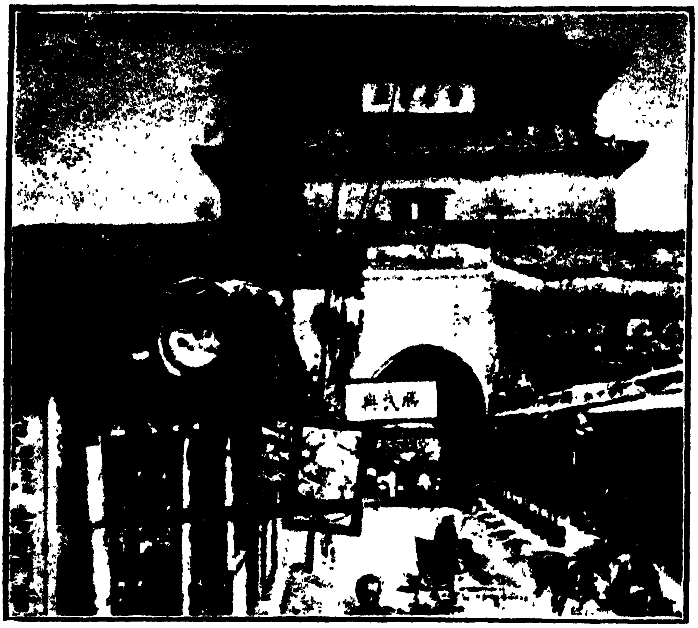
১৯১৪ হইতে ১৯ ৮ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে যে মহাসমরের অনল জ্বলে, তাহার ফলে সভ্য-জগতে নানা প্রকার বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই মহাসমরের চোট অল্প-বিস্তর পৃথিবীর সকল দেশকেই ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সময় চীন মহাদেশেও এমন কতকগুলি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহার ফলে চীনের ইতিহাস হয় ত আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

কিন্তু ১৯২৬ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের এই দিকে দৃষ্টি দিবার বিশেষ অবকাশ হয় নাই। সকলেই নিজ-নিজ ঘর-সংসার সামলাইতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালে চীনদেশের ব্যাপার এমন হইয়া উঠিল যাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান শক্তিরা চীনদেশে নানা প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও এমন কতকগুলি সুবিধা এবং অধিকার তাঁহারা চীনের নিকট জোর করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, যাহা তাঁহারা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতিকে নিজেদের দেশে প্রাণ থাকিতে দিবেন না। চীন দুর্ব্বল বলিয়া তাহাকে শক্তিশালী জাতিদের এই আবদার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু চীনে রাজশক্তির পতন এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাই চীনের চিন্তাধারা এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা প্রথম চীনদেশে আগমন করেন। সেই সময় যে ভাবে এবং পদ্ধতিতে চীনদেশ শাসিত হইত, তাহা পাশ্চাত্য জাতির

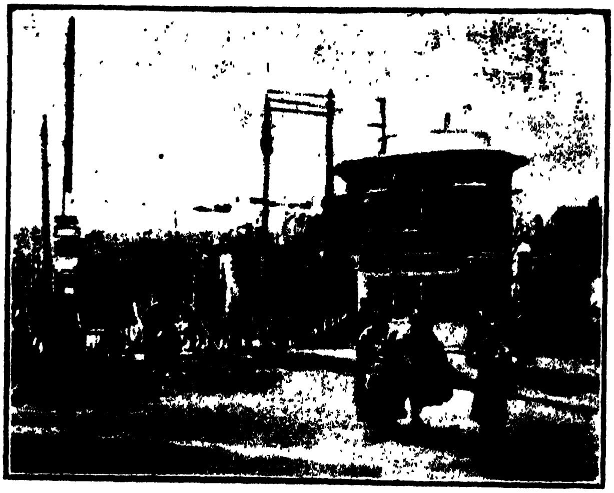
লোকেরা কল্পনাও করিতে পারিত না। চীনের লোকেদের চরিত্র এবং মনোভাবও তাহারা বুঝিতে পারিত না। এই অজ্ঞানতার ফলে চীনে পাশ্চাত্য জাতিদের অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। এই কারণে বহু যুদ্ধবিগ্রহও হইয়া গিয়াছে।



পিকিং সহরে প্রবেশ করিবার একটা ফাটক। গেট বন্ধ করিয়া দিলে সহরে প্রবেশ করিতে হইলে দেওয়াল টপকান ছাড়া অন্য উপায় নাই।

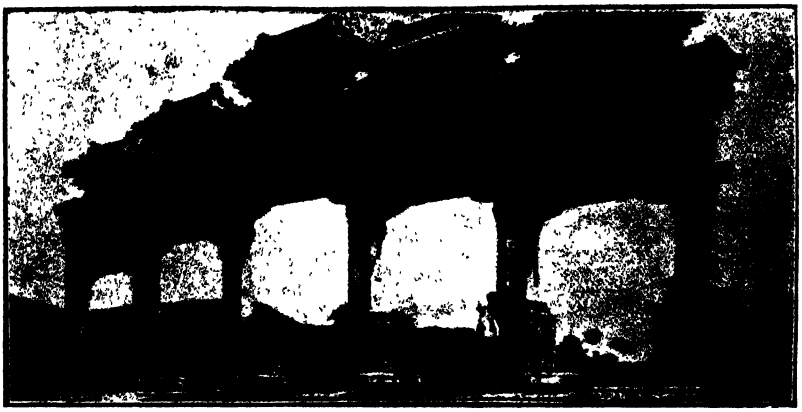
পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা মনে করিত সমগ্র চীনদেশ এক রাজার অধীন; সেই কারণে পিকিং সহর হইতেই সমস্ত দেশ শাসিত হয়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল ছিল। চীন মহাদেশ অনেকগুলি প্রদেশ এবং সুবাতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বৎসরান্তে পিকিং সহরে ন্যায্য খাজনা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। আভ্যন্তরিক শাসনব্যাপারে পিকিং হইতে সম্রাট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রাদেশিক সকল প্রকার গোলমাল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই মিটাইত; সেই জন্য তাহাদের সকল সময় যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত তৈয়ার রাখিতে হইত।

এই সময় চীনদেশের লোকেদের অবস্থা ছিল ভাল। কিন্তু চীনাদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা শ্বেতাঙ্গগণ ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। চীনারা মনে করিত যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য এবং সকল বিদ্যার একমাত্র অধিকারী চীনারা। জগতে যে তাহাদের অপেক্ষা সভ্য অন্য কোনো জাতি থাকিতে পারে, ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। এই সময়ের একজন চীনা পণ্ডিত তাঁহার রচিত এক পুস্তকে লিখেন, "জগতের অসভ্য জাতিরা জন্তুর মত—তাহাদের মানুষের (অর্থাৎ চীনাদের) মত করিয়া দেখিলে এবং সেই ভাবে শাসন করিলে জগতের নানা অকল্যাণ এবং গোলমাল হইবে। জন্তুকে জন্তুর মতই দেখা উচিত।" বলা বাহুল্য যে, জগতের চীনজাতি ছাড়া অন্য সকল জাতিই ছিল অসভ্য; অন্ততঃ চীনারা তাহাই মনে করিত।



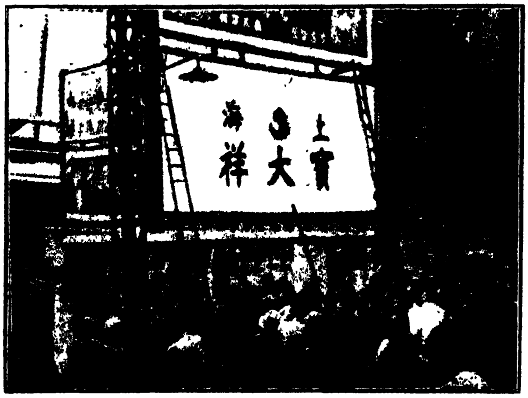
সাংঘাইএর ফ্রেঞ্চ এলাকা। চীনা আক্রমণ রোধ করিবার আয়োজন এবং সাজসজ্জা হইতেছে।

চীনারা তাহাদের দেশের সভ্যতা, বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষার কল্পনাতেই মশগুল হইয়া থাকিত। জগতে যে গতি বলিয়া একটা জিনিষ আছে এবং সভ্যতা ইত্যাদিও কালের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছে, তাহা চীনারা ভাবিত না। চীনাদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে গর্ব্ব এবং অহঙ্কার



মিং-কবরস্থানে প্রবেশ করিবার ফাটক।

ছিল প্রচুর; কিন্তু দেশকে শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার প্রধান উপকরণ সৈন্য সামন্ত ইত্যাদি ছিল নাম-মাত্র। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা যেদিন হইতে চীনাদের এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের লোভ এবং রাজ্যবিস্তারের কল্পনাও বাড়িয়া চলিল। শ্বেতাঙ্গরা যখন চীনে দুর্ব্বল ছিলেন, তখন তাঁহারা চীনের সকল শাসন এবং দাবী মানিয়া চলিতেন। কিন্তু, যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন চীন শক্তিহীন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা চীনকে পদানত জাতির মত দেখিতে লাগিলেন।



ষড়যন্ত্রকারীর মাথা একটি কাঠের খাঁচায় ঝুলিতেছে। সাইন বোর্ডে ষড়যন্ত্রকারীর পরিণাম লেখা রহিয়াছে। সাংঘাই-এর পথের দৃশ্য।

নেপোলিয়নের সময় হইতে শ্বেতাঙ্গ-জগতে এক নতুন ভাবের উদয় হইল। এই সময় ইয়োরোপের পুরান সভ্যতা যেন ধ্বসিয়া গিয়া তাহার স্থানে এক নতুন সভ্যতার জন্ম হইল। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন জগতের অন্য সকল দেশের সকল সভ্যতাকে গ্রাস করিবার মতলব করিল।



ন্যানকিং সহরের মিং কবরস্থানে যাইবার হস্তিমূর্ত্তি শোভিত পথ

ইয়োরোপের সকল জাতিই বাণিজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। চীন মহাদেশকে তাঁহারা ভারতবর্ষের মত অতি লোভনীয় বাণিজ্য ক্ষেত্ররূপে পাইলেন। এই সময় তাঁহারা চীনে রাজ্য বিস্তারের কথা ভাবেন নাই। চীনদেশ হইতে কাঁচা মালের সরবরাহও প্রচুর হইতে লাগিল।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনাদের সহিত শ্বেতাঙ্গদের কয়েকটি লড়াইও হইয়া গেল। প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধেই চীনারা পরাজয় লাভ করে। ইয়োরোপীয় সমর পদ্ধতি এবং কামান বন্দুকের সহিত চীনদেশের আদিকালের



সাংঘাইএ জাপানী সেনাদলের কুচ কাওয়াজ। ইহারা জাপানী স্বার্থ রক্ষার্থে সাংঘাইএর জাপানী এলাকায় আসিয়াছে।



বিখ্যাত চীনা অভিনেত্রী অডানা-মে ওয়ং



পথিকের খানাতল্লাস।

(বিপ্লবের সময় সৈন্যেরা পথে পথে পথিকদের ধরিয়া খানাতল্লাস করিয়া দেখিতেছে তাহাদের কাছে বিপ্লবমূলক কাগজপত্র আছে কি না।)

অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরপদ্ধতি পারিয়া উঠিল না! চীনের পরাজয়ের ফলে শ্বেতাঙ্গরা চীনদেশে কয়েকটি অধিকার



হ্যাঙ্কোর কুমিংট্যাং নারী সমিতির একজন প্রধান কর্ম্মচারী

আদায় করিয়া লইলেন। বাণিজ্য-ইতাদির বিস্তার সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা চীনের পক্ষে অপমানজনক কয়েকটি



জাতীয়দলের নেতা শ্রীযুক্ত বোরোডিনের সহধর্ম্মিণী গ্রেপ্তার হইতেছেন।

সন্ধিও করাইয়া লইলেন। শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা মনে করিয়াছিলেন, চিরকাল তাঁহারা এই সকল সুখ-সুবিধা



জেনারেল চ্যাং-কাই-সেক। ইনি জাতীয় দলের নেতা

চীনের ঘাড়ে বসিয়া ভোগ করিবেন। চীনারাও এই ব্যবস্থাকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া প্রায় মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কালের গতি যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা চীনাদের মত শ্বেতাঙ্গেরাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

চীনে শ্বেতাঙ্গ বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা এবং শিক্ষারও বিস্তার হইতে লাগিল। খ্রীষ্টান পাদরিরাও আশা করিলেন, কালে তাঁহারা চীনদেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তাড়াইয়া তাহার স্থানে খ্রীষ্ট পূজা বসাইবেন। অনেকে খ্রীষ্টান

ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; কিন্তু ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আমাদের দেশের অধিকাংশ খ্রীষ্টানদের মত দেশকে বিদেশ বলিয়া মনে করিতে শিখিল না। এই সময় নব্য চীনের বীজ বপন হইল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ইহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা চোখের সামনে



সমুদ্রতীরের দৃশ্য



চীনে বালকের পক্ষীপ্রীতি

বিষয়ে জাপান পাশ্চাত্য জাতিদেরও ছাড়াইয়া গেল। জাপানের এই প্রকার রূপান্তর রাতারাতি হইতে দেখিয়া পাশ্চাত্য জগৎ চমৎকৃত হইল। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জাপান চীনকে পরাভূত করিয়া চীনের সমুদ্র-উপকূলের

চীনাদের অধঃপতন দেখিয়া মনে করিলেন, ১৯শ শতাব্দী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চীনকেও তাঁহারা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিবেন।

চীনের যে সকল লোকে এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিল, তাহারা দেখিল যে, দেশকে শ্বেতাঙ্গের গ্রাস হইতে বাঁচাইতে হইলে, দেশের জনগণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা সকল বিষয়ে বিস্তার করিতে হইবে। দেশের যাহা আছে তাহা থাক; তাহাকে না দূর করিয়াও অন্য দেশের শিক্ষা গ্রহণ করার পথে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়, এই হইল এই নব্য দলের মন্ত্র।

ঠিক এই সময় জাপান তাহার শিক্ষার দীক্ষায় সকল বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইল। ইহা জাপানের পক্ষে শ্বেতাঙ্গ-গ্রাস হইতে মুক্তির কারণ হইল। অনেক

কতক অংশ দখল করে। তারপর ১৯০৫ সালে রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান বিশ্বরাষ্ট্র-ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে নিজের স্থান করিয়া লইল। এই জয়লাভের পর হইতেই জাপান



সার সিডনি বারটন ও কমাণ্ডার গ্যালাটি চিনের পররাষ্ট্র আফিস হইতে বাহির হইতেছেন।

জগতের প্রধানতম শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একটি হইল ; জাপানকে নগণ্য বলিয়া দেখা আর চলিল না।

জাপানের নিকট পরাজিত হওয়ার পর হইতেই চীন একেবারে ইংলণ্ড, রাশিয়া, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইটালি, যুক্ত রাষ্ট্র ইত্যাদি শক্তিদের করতলগত হইল। সকলেই নিজের নিজের সুবিধামত চীনের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। চীনের ভাগ্যে এত বড় দুঃখের এবং দৈন্যের দিন পূর্ব্বে আর কখনও বোধ হয় হয় নাই। কিন্তু মহাচীনকে



চীনা কৃষক পরিবারের স্ত্রীলোকেরা চরকায় সুতা কাটিতেছে।



উত্তর-চীনের সৈন্যগণের দ্রুত পলায়ন। পিছনে দক্ষিণ চীনের সেনারা তাড়া করিয়া আসিতেছে!

শ্বেতাঙ্গ জাতিরা গিলিয়া খাইবার ব্যবস্থা যাহা করিলেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ সুবিধার হইল না। চীনের বর্ত্তমান অবস্থাতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

পাশ্চাত্য জাতিরা এই সামান্য কথাটি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, মৃত জাতির কঙ্কাল হইতেও নবজীবনের আবির্ভাব হইয়া দেশে বিপ্লব ঘটাইতে পারে। চীনের ইতিহাসে ইহা বার বার দেখা গিয়াছে যে, বিদেশী শক্তির নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছে ; কিন্তু চীনের যে প্রাণ এবং সভ্যতা তাহা কোনো বিজয়ী জাতিই মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, বিজয়ী জাতি ক্রমশঃ চীন জাতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। মোঙ্গোলিয়ান এবং মাঞ্চু জাতিরা চীন জয় করে, কিন্তু তাহাদের সভ্যতা চীন মহা-সভ্যতার ভিতর তলাইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সময় চীনের উপর তাহার বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সময় মাঞ্চু-বংশ চীনের সিংহাসনে। তাহার শেষ সময় নিকট হইয়া আসিতেছিল। Tz'w-Hsi নামক বিখ্যাত মহিলার জন্যই মাঞ্চু-বংশের পতনের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই রাজবংশীয়া



পরিত্যক্ত রুষ সৈন্যগণ। (উত্তর চীনের সেনাগণ ট্রেনে চড়িয়া পলায়ন করে। তাহাদের সাহায্যকারী রাসিয়ানরা ট্রেনে উঠিয়াছিল—চীনারা তাহাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়াছে।)

মহিলাকে রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণের সহিত তুলনা করা চলে। ইঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে মাঞ্চু-বংশের অনেক কল্যাণ হয়; কিন্তু তাহা উক্ত বংশকে শেষ পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।



চীনা বোম্বেটে চিউ য়াও (ক্যাণ্টন গবর্মেণ্ট ইহাকে ধরিয়া গুলি করিয়া মারিয়াছে।)

চীন-জাপান যুদ্ধের পর হইতেই কয়েকজন চীন নেতা বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহারা সকলেই প্রায় দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টন সহরের লোক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায়



সাংঘাই রাজপথের আর একটি দৃশ্য। দেশদ্রোহীর মাথা টেলিগ্রাফের থাম্বায় লট্‌কান।



সম্ভ্রান্ত চীনা পরিবারের গার্হস্থ্য-জীবন

শিক্ষিত। অনেকে বিদেশে গিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া আসিয়া দেশের কল্যাণ-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন জগতবিখ্যাত ডাঃ সান্‌-ইয়াট্‌-সেন। এই দল দেখিলেন, চীনকে যদি বিদেশীর কবল হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে বিশ্ব-রাষ্ট্র সম্বন্ধে চীনের ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অন্যান্য নানা বিষয়েও চীনের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এবং সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, কল্যাণকর সকল প্রকার সংস্কারের পথে প্রধান বাধা মাঞ্চুরাজ-বংশ এবং দেশের অতি-রক্ষণশীল দল। রাজবংশকে সরাইতে পারিলে রক্ষণশীল দলও লুপ্ত হইবে। এই জন্য সংস্কারক দলের অনেকে বলিলেন যে

রাজবংশকে দূর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেকে বলিলেন যে, রাজবংশের সংস্কার করিয়া তাহার দ্বারাও দেশের বহু কল্যাণ সাধন করা যায়, এবং রাজবংশ লোপ না



উত্তরী সেনানায়ক চুয়ান চাঙের সাংঘাই রক্ষী-দল। ইহারা দক্ষিণাদলের আক্রমণে বানের মুখে কুটার মত ভাসিয়া গিয়াছে।

করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে, কারণ এক রাজবংশ লোপ পাইলে তাহার স্থানে অন্য অধিকতর অকল্যাণকর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইতে দেরী নাও হইতে পারে। এই সময় নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া চীন সংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে থাকে।

চীন রাজবংশও এই সময় আত্মরক্ষা করিবার শেষ চেষ্টা করে। নাবালক সম্রাট ১৮৯৮ সালে সাবালকত্ব পাইলেন। এই সময় কাং-ইউ-উই শাসন-পদ্ধতির নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজমাতা তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া শাসন-সংস্কারের সকল চেষ্টা বন্ধ করিয়া মাঞ্চু-রাজবংশের পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

১৯০০ সালে চীন জাতীয় দল বলপ্রয়োগে দেশকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার আন্দোলন আরম্ভ করে। বিদেশীদের সকল প্রভাব লোপ করাই এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং রাজমাতাও গোপনে এই দলকে বহু সাহায্য করেন। এই আন্দোলনের ফলে হয় বক্সার যুদ্ধ। যুদ্ধে চীনের পরাজয় হইল; এবং বিদেশী শক্তিপুঞ্জ চীনের উপর ক্ষতিপূরণ করিবার দাবীর পাথর চাপাইয়া দিয়া মনে করিল যে চীন জব্দ হইল; বিদেশীদের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় আর তাহাদের কোনো কালেও হইবে না।

১৯১১-১২ সালে মাঞ্চু-রাজবংশের পতন হইল। বিদ্রোহে লোকক্ষয় বিশেষ হইল না, কেবল সিয়ান্‌ফুতে কয়েক সহস্র মাঞ্চু নিহত হয়।



কারাগারে চীনা বোম্বেটে নরনারী। (ডাইনের ঐ মহিলাটী চীনা দেবী চৌধুরাণী! তাঁর অধীনে তিনশো ডাকাতনী ছিল!)

চীন-গণতন্ত্রের প্রধান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সান্-ইয়াট-সেন্; কিন্তু তিনি অল্পকাল পরেই বিখ্যাত ইয়ান্-সি-কাইকে প্রেসিডেণ্টের পদ দান করিয়া নিজে পদত্যাগ করেন। ইয়ান সি-কাই যদিও প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিলেন,

কিন্তু অন্তরে তিনি কোনো কালেই গণতন্ত্রবাদী ছিলেন না। রাজবংশের প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনি দেশশাসন-কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র এবং মানসিক বলও ছিল অসামান্য। ইয়ান সি-কাইএর প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের কিছুদিন পর হইতেই তাঁহার সহিত দক্ষিণ চীনের কুম্ভ-মিং-টাং দলের নানা প্রকার কলহ আরম্ভ হইল। কিন্তু কোনো দলের হাতেই যথেষ্ট পরিমাণে টাকা না থাকায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতে পারে নাই। চীনের এই আত্ম কলহের সুযোগে রাশিয়া তাহার রাজ্য এবং প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা এবং মতলব উত্তর চীনে করিতেছিল।

১৯১৩ সালে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জাপান ইয়ান-সি-কাইকে ২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। এই টাকা রাজ্য-সংস্কারের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইল্‌সন এই ঋণদান কার্য্যকে গর্হিত এবং অতি নিন্দনীয় বলাতে মার্কিন ইহাতে যোগ দেয় নাই। এই ঋণদানের উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ এবং সাধু। চীনের অধঃপতনে পাশ্চাত্য শক্তিরা অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা চীনের কল্যাণকল্পে এই ঋণ দান করিতেছিলেন। যে সর্ত্তে ঋণ গ্রহণের কথা হয়, তাহা যে-কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে অপমানজনক। দক্ষিণা দল প্রেসিডেণ্ট ইয়ান্‌কে এই ঋণগ্রহণ করিতে বাধা দেয়; কিন্তু ইয়ান্ তাহাদের ন্যায্য বাধা-দান



"কমরেড্ বেরোডিন"
কাণ্টনের বলসেভিক পরামর্শ-দাতা। ইংরেজ বলিতেছে ইনি নাকি চীনে ইংরেজ-বিদ্বেষ মন্ত্র প্রচার কার্য্যে প্রথম।



সাংঘাইএর বিদেশী এলাকা। ইহার কতক অংশ দক্ষিণাদল দখল করিয়াছে। হং কং সাংঘাই ব্যাঙ্কের বাড়ীটিও চীনাদের দখলে পড়িয়াছে।

অগ্রাহ্য করিয়া অতি হীন সর্ত্তে এই ঋণ গ্রহণ করিলেন।

হাতে প্রচুর টাকা পাইয়া ইয়ান-সি-কাই'র ক্ষমতা



মিস্ ডলি লিম্। ইনি সাংঘাই হইতে বেতারে যুদ্ধ-বারতা প্রেরণ করেন। ভদ্রমহিলাদের এই সকল কার্য্যে যোগদান করাতে চীনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার বিপক্ষ দলকে দমন করিয়া নিজে চীনের সম্রাট হইয়া নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার



চীনে পাঞ্জাবী সেনাদল

সাধু সংকল্প করিলেন। এই সময় হইতে উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীন দুইটি স্পষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া গেল।

শক্তিপুঞ্জের ইয়ানকে টাকা ধার দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এই অর্থের দ্বারা দেশের গণতন্ত্রী এবং সংস্কারক দলকে দমন করিয়া দেশে পুনরায় রাজশক্তি স্থাপন করিয়া তিনি রাজা হইবেন। ইয়ান রাজা হইলে, তিনি ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের চাপে শক্তিপুঞ্জের করতলগত হইয়া থাকিবেন, কারণ এত টাকা ঋণশোধ করা সেই সময়কার



একজন রাসিয়ান ও একজন চীনা সৈনিক কর্ম্মচারী

চীনের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। বিদেশী শক্তিরা মনে করিয়াছিল যে, চীনে পূর্ব্বে বিদ্রোহাদিতে যেমন রাজ-শক্তির পরিবর্ত্তন মাত্র হইয়াছিল, ১৯১১ সালের বিদ্রোহেও তাহাই হইবে। তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, এই বিদ্রোহ চীনের জাতীয় মনোভাব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

১৯১৬ সালে ইয়ান নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবামাত্র চারিদিকে তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন

আরম্ভ হইল। ইয়ান হয় ত আন্দোলন এবং জনমতকে দমন করিতে পারিতেন; কিন্তু জাপান এই সময় ইয়ানের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। জাপান দেখিল যে, চীনে শক্তিশালী কোনো সম্রাট থাকিলে চীনের উপর তাহার প্রভাব কোনো দিক দিয়াই বিস্তার করা সুবিধা হইবে না। ইয়োরোপীয়

ইয়ান এই সময় নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এক ইস্তাহার জারি করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার কৃত কর্ম্মকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্রাট হইবার দাবী ত্যাগ করেন। ইয়ান তার পর হঠাৎ ১৯১৬ সালের জুন মাসে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে চীনের লাভ হইল কি লোকসান

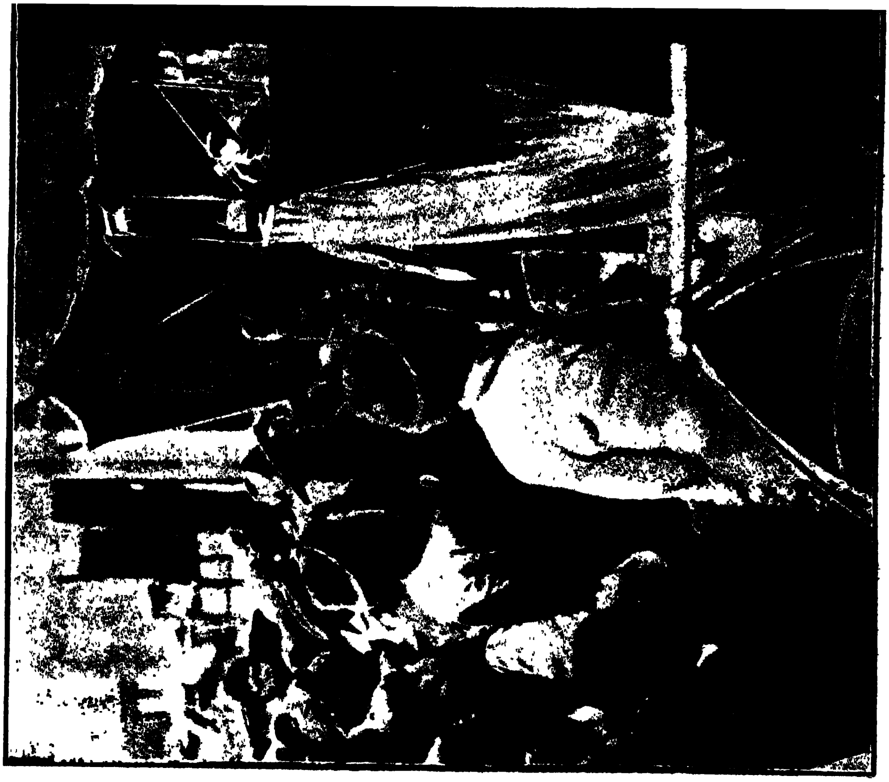


ক্রুদ্ধ নাগরিকেরা সান্-চুয়াং-কাংয়ের দলের একজন সৈনিককে লুঠের অপরাধে শাস্তি দিতেছে।

সকল শক্তিই মহাযুদ্ধে আপন আপন ঘর সামলাইতে ব্যস্ত ছিল। জাপান মনে করিল, এই সুযোগে সে চীনকে খোলাখুলি ভাবে না হউক প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রভাবে আনিবে। কিন্তু সমগ্র চীনকে গিলিবার মত হাঁ জাপান করিতে পারে নাই। সামান্য খানিকটা চাকলা সে কাটিয়া লইল মাত্র।

হইল, তাহা বলা শক্ত। হয় ত তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আজ দক্ষিণী এবং উত্তরী দলের এই কলহ থাকিত না; উভয় দল "স্বাধীন-চীন" নাম লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে পারিত!

বর্ত্তমান চীনদেশের দুইটি প্রধান দল দক্ষিণী এবং



চীনে যুদ্ধ-স্থানের দৃশ্য



সেনাপতি চিয়াং-কাই-সেক

উত্তরী—পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছে। যুদ্ধ চালাইতেছে বলিলে ভুল হয়, কারণ প্রকৃত যুদ্ধ খুব কমই হইতেছে। বিদেশী সংবাদওয়ালাদের খবর পড়িয়া অবশ্য মনে হয় যেন সমস্ত চীনদেশে রক্তের নদী বহিতেছে। দেশের কোথাও শান্তি নাই। কাহার মাথা দেহের উপর কতক্ষণ থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই। এখনও এতটা হয় নাই। দুই দলে হয় ত প্রাধান্য লইয়া বিবাদ থাকিতে পারে; কিন্তু বিদেশীদের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কোনো দলেরই মতের অমিল নাই। এমনও হইতে পারে যে, দরকার হইলে উভয় দল হঠাৎ মিলিত হইয়া বিদেশী-দমন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

বিদেশী শক্তিরা ইয়ানকে টাকা ধার দিবার পর হইতে নিজেদের উত্তরী দলের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। ইয়ানের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ এখন বিদেশী শক্তিরা মনে করিতেছেন, তাঁহারা উত্তরী দলের বন্ধু এবং সাহায্যকারী। উত্তরী দল যে বিদেশীদের সম্বন্ধে কি মনে করে, তাহার খোঁজ কেহ রাখে না। বিদেশী শক্তিপুঞ্জ মনে করিয়াছিলেন, এখনও চীনদেশ উনবিংশ শতাব্দীতে পড়িয়া রহিয়াছে। চীন যে এদিকে ১৯২৭ সালের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে, তাহার সংবাদ পাশ্চাত্য জগত অল্পদিন হইল পাইয়াছে। চীনাদের কামান ব্যবহার এবং যুদ্ধ-পদ্ধতির মারফৎ এই সংবাদ সকলের কানে আসিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিরা চীনকে যে চালে চালাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ১৮৯০ সালে হয়ত কাজে লাগিত। এখন তাহা বাতিলের সামিল।



ক্যানটন সহরের নদীর উপর একটি সাঁকো। বর্ত্তমান সময়ে এই সাঁকোর চারিপাশের গৃহগুলিতে "বলসেভিক"দের আড্ডা হইয়াছে। এই দৃশ্যটির সহিত ভেনিস সহরের হুবহু মিল আছে; কেবল চীনাদের দেখিয়া ইহাকে চীনদেশ বলিয়া মনে হয়। এই সাঁকোর উপর অনেকগুলি খণ্ড-যুদ্ধ সম্প্রতি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে চীনের যে মহা জাগরণ হইয়াছে, তাহার প্রথম জন্মলাভ হয় নব্য চীনের ভাব জগতে। কিছুকাল পূর্ব্বে যাহা ছিল নব্য-চীনের কল্পনার কুসুম, আজ তাহা তাহার একনিষ্ঠ সাধকদের গভীর আত্মত্যাগ এবং মহাপ্রাণতার ফলে বাস্তব জগতে ফুটিয়াছে। চীনের এই মহাজাগরণ হেলার জিনিস নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার স্থান অতি উচ্চে হইবে। ইয়োরোপের মধ্যযুগের গোড়ার দিকের renaissance-এর অপেক্ষা এই জাগরণ কোন দিক দিয়া কম নহে।

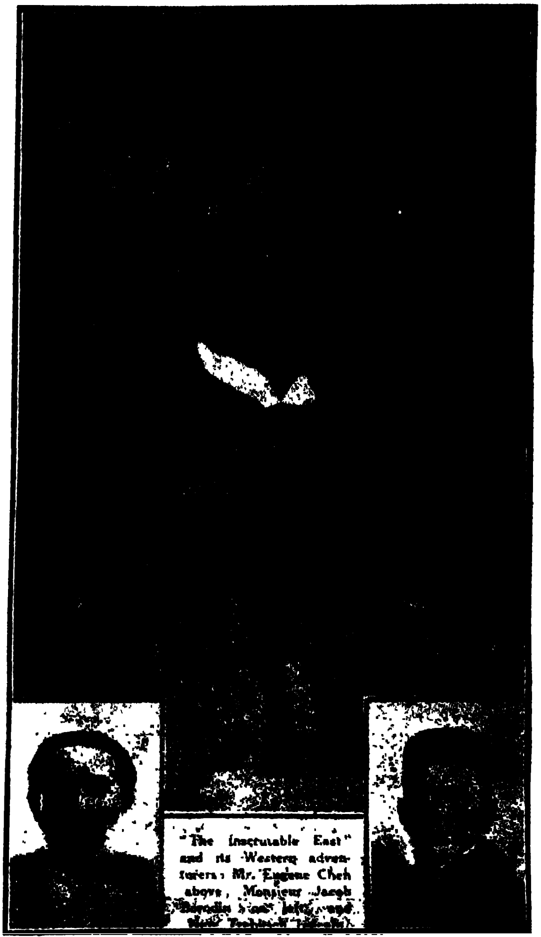
চীনের জাতীয় দলের ক্ষমতা-বৃদ্ধির পরিচয় ১৯১৬ সালে জাপান এবং রাশিয়া প্রথমে বুঝিতে পারে। এই সময়

হইতে তাহারা পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলেও এমন কোনো কার্য্য চীনে করে নাই, যাহাতে চীনের দক্ষিণী দল তাহাদের প্রতি বিরূপ হইতে পারে! জাপান চীনের আভ্যন্তরিক কোনো ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করে নাই এবং হস্তক্ষেপ ব্যাপারে কাহাকেও সাহায্য করে নাই। এই জন্যই বোধ হয় "বিদেশী পণ্য বয়কটে" জাপান পড়ে নাই।

রাশিয়া খোলাখুলি ভাবে চীনের সাহায্য করিতেছে। তাহাদের লুকোচুরি করিবার কোনো দরকারও নাই। রাশিয়া পৃথিবীর সকল রাজশক্তি এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের শত্রু। রাশিয়া চায় সকল দেশ নিজ নিজ ভাগ্যের নিয়ন্তা হইবে। এই জন্য সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বহু অত্যাচারিত জাতিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিতেছে। চীনকে রাশিয়া যত রকমে সম্ভব সাহায্য করিতেছে। রাশিয়ার স্বার্থান্বেষণের কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বর্ত্তমানে চীনদেশের দু-একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও বিদেশীরা নাই। সাংঘাই বিদেশীদের প্রধান আশ্রয়স্থল হইয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিদের দু-এক শক্তি নিজ নিজ প্রজারক্ষা করিবাব জন্য সাংঘাই বন্দরে যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করিয়াছে। ইংরেজও সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। মার্কিন চীনের অবস্থা দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়। জাপান বহুপূর্ব্বেই তাহা করিয়াছে। ফ্রান্সের চীন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ ইচ্ছা নাই। বাকী পড়িয়াছে কেবল ইংরেজ।

নব্য চীন এখন বলিতেছে—"বিদেশীরা যদি আমাদের দেশে থাকিতে চায়, তাহারা থাকুক। তাহাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আমরা লইব। আমার দেশে বসিয়া, আমার দেশের অংশবিশেষকে তাহারা এলাকা করিয়া লইবে—ইহা চলিবে না। চীনদেশে বাস করিতে হইলে চীন নিয়ম পালন করিতে হইবে, চীনাকে সম্মান করিতে হইবে। এখানে আমরা তোমাদের দয়ার পাত্র নই—যদি দয়ার পাত্র কেহ থাকে—সে তোমরা। বিচারকার্য্যের ভারও আমরা লইব। মোটের উপর তোমাদের দেশে আমাদের যে রকম স্থান এবং স্বাধীনতা তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে দাও, আমরাও তোমাকে তাহাই দিব। তাহার বেশী কিছু পাইবে না; কারণ চীনদেশের মালিক চীনারা। এই কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে।"



"The Inscrutable East" and its Western adventurers: Mr. Eugene Chen above, Monsieur Jacob Borodin ...

উপরে—মিঃ ইউজিন চেন
নিম্নে দক্ষিণে—মিঃ জেকব বোরোডিন, বামে—মিঃ হার ট্রেবিস লিনকন্

বিদেশীরা যে চীন সমুদ্রে এবং বন্দর-সমূহে যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি রাখিতে চায়, নব্য চীন তাহাও দিবে না। ইংলিশ চ্যানেলে যেমন ইংরেজের বিনা অনুমতিতে চীনাযুদ্ধ-জাহাজ যাইতে পারে না, চীনদেশেও ঠিক সেই ব্যবস্থা—চীনারা ইহাই বলিতে চাহে।

দক্ষিণীদলের কাছে উত্তরীদল প্রায় হারিয়া গিয়াছে। অতি অল্পকাল পরেই বোধ হয় পিকিং সহর দক্ষিণীদলের অধীন হইবে। তাহা হইলেই দক্ষিণীদল সমগ্র চীন শাসন করিবে।

বর্ত্তমানে চীনের ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, চীনের অন্তর্যুদ্ধ প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে। অদূরে দেখা যাইতেছে চীন আবার পূর্ব্বগৌরব এবং সমৃদ্ধি উদ্ধার করিয়া জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী হইয়াছে।

আধুনিকী

শ্রীভূপতি চৌধুরী বি-এ

আমাদের মেসে ললিতকুমারকে সকলেই চিনত। আমি মানুষটাকে চেনার কথা বলছি না, সে বড় সোজা কাজ নয়। আমি বলছি এই লোকটার আকৃতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত ছিল। এমন সুন্দর ধরণের চেহারা বাঙালীর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। অনেকটা এই কারণেই বোধ করি সে সকলের পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল।

মানুষ আর ঘড়ির কাঁটা যে সমানে তাল ফেলে পাশাপাশি যেতে পারে, ললিতকুমার ছিল তার একটা বড় উদাহরণ। দিনের সময় তার কাজ ঠিকমতো ঘণ্টা মিনিটে জোড় বাঁধা ছিল। ফলে আমাদের মতো বেহিসাবী লোক যখন কাজ আর সময়কে শেষ পর্য্যন্ত মুখোমুখী জোড় মিলাতে পারতাম না, তখন দেখতাম, এই নির্ব্বিকার লোকটা নির্ব্বিকার ভাবে তার কাজের জুড়ী সময়ের সঙ্গে চালিয়ে চলেছে। তার মধ্যে না আছে ব্যস্ততা, না আছে উদ্বেগ।

এই ধরণের একটা কঠিন অথচ ঋজু নিয়মানুবর্ত্তিতায় পথে চলে, আপিসে যাবার সময়ও সে যেভাবে যেত, আপিস থেকে ফিরে আসার পরও তার সে ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা যেত না। চেঁচামেচি হাঁকডাক তার স্বভাবের বাইরে। অথচ আমরা যে সব সুবিধা ভোগ করতাম তার প্রত্যেকটাই শুধু তার পক্ষে প্রাপ্য ছিল নয়—সুপ্রাপ্যই ছিল। এদিকে কখনও তার ফাঁক পড়েনি।

আমরা ভাবতাম এই লোকটার কাজ আর সময়ের হিসাবে গরমিল হয় না! সেদিন আকাশের বর্ষণোন্মুখ মেঘের দিকে চেয়ে অন্ততঃ এই কথাটাই বোধ করি সকলের মনে জেগেছিল।

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির জল পেয়ে গাছের ফুল না ফুটলেও বিয়ের ফুল অত্যন্ত বেশী রকম ফুটতে আরম্ভ করেছিল। ফলে এমন হয়েছিল যে, আমাদের মেসে পাকা একটী হপ্তা বিকেলবেলা রান্নাঘরে হাঁড়ী চড়ান বন্ধ ছিল। মাঝে একটী সপ্তাহ বিয়ের বাজার যেন একটু বেচাল হ'য়ে, শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে এমন কাণ্ড সুরু হল যে, মনে হল, বাংলা দেশে বোধ করি এর পর আর বিবাহযোগ্য ছেলে বা মেয়ে পাওয়া যাবে না।

সকাল থেকে সানাইয়ের বেখাপ্পা আওয়াজ শুনে, হরদম বৃষ্টিতে ভিজে, আর পথে লাল-রঙে-ছোপান কাপড়-পরা চাকর-বাকরের বহর দেখে মন ত ক্ষেপে যাবার যোগাড় হয়েছিল। ফলে এমন হয়েছিল যে, যে নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য আগে উৎসুক হ'য়ে থাকতাম, এখন সেই নিমন্ত্রণের নাম শুনলে, মনে বিবমিষার উদ্রেক না হলেও, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হত। কিন্তু তবুও নিমন্ত্রণের অভাব ঘটত না। নিমন্ত্রণ খাবার একটা ফুরসৎ পেলে ছেড়ে দিতাম না বলে, নিমন্ত্রণে না যাবার একটা অজুহাত না দিয়ে ভগবান বোধ করি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন অবস্থায় আকাশে মেঘের সঞ্চয় দেখে মনে আশার সঞ্চার হচ্ছিল। তাহলে বোধ হয় একটা অছিলা পাওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও মনে হয়েছিল যে, আজ আর ললিতের নিমন্ত্রণ রাখা হবে না।

ঠিক এই সময়টিতে দেখা গেল, ললিতকুমার কলঘর থেকে সাবান আর গামছা নিয়ে বার হচ্ছেন। নেহাৎ গায়েপড়াভাবে প্রশ্ন করলাম—কোথাও বার হবে নাকি?

ললিত কোন রকম ভণিতা না করে বললে—হ্যাঁ, আজ সরোজের বৌভাত। তোমরা যাবে না?

—এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে? ক্ষেপেছ না কি? Weather report যে কাল বেরুবে না; হলে দেখাতাম।

—আচ্ছা, সেটা না হয় কাল দেখা যাবে। বলে ললিত সামান্য হেসে চলে গেল।

নেহাত না গেলে ভাল দেখায় না বলে ললিতের সঙ্গ নিলাম।

আমাদের মেস থেকে ট্রামের রাস্তা মিনিট সাতেকের পথ; আর এই পথটুকুর মধ্যেই গোটা-পাঁচেক বাড়ীর ছাতে তোগলা বাঁধা। সেই সব বাড়ীর উচ্ছিষ্টের স্তূপ তখনও পর্য্যন্ত পথের দুধারে জায়গা জুড়ে ছড়ান। জলে ভারী বাতাস এই উচ্ছিষ্ট গিলে আর ওপরে উঠতে না পেরে হাঁসফাঁস করছিল।

পথটুকু কোনো রকমে পার হবার পর ট্রাম ধরামাত্রই ঝমঝম্ শব্দে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে এসে পড়ছিল বলে ললিত জানালার কাঁচটা তুলে দিলে। ঠিক এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে তার পাশে জায়গা নিয়ে, ভিজে ছাতিটা মুড়তে মুড়তে আমাদের গায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জল দিয়ে বললেন—কি হে ললিত, চিনতে পার?

ললিত তার স্বাভাবিক শুষ্ক স্বরে বললে—চিনতে না পারবার কোনো কারণ আছে কি?

যারা ললিতের সঙ্গে ক'দিন চলাফেরা করেছে, তারা জানে, তার এ ধরণের কথার মধ্যে বিরাগের কোনো ভাব নেই; কিন্তু যারা জানে না তাদেরই মুস্কিল। তারা দস্তুরমতো ভড়্‌কে যায়। আগন্তুক ভদ্রলোক ললিতের ভাব দেখে একটু দমে গেলেন। কিন্তু ললিত তার কিছু লক্ষ্য না করেই প্রশ্ন করলে—কেমন আছেন আজকাল।

ভদ্রলোক একটু সাহস পেয়ে বল্লেন—আর আমাদের থাকাথাকি! দশটা পাঁচটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তার ওপর সকাল-বিকেল ছেলেমেয়েদের ক্ষিদের চ্যাচানি। সংসারে ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই। আয় আর ব্যয় দুটোকে তো সমান সমান করা গেল না।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ললিতের কোন কথা শোনা গেল না।

মানুষের এই নীরব উত্তরের অর্থ বোঝা বড় মুস্কিল।

ভদ্রলোক নেমে যেতে বললাম—দেখ, অনেক জিনিস বুঝি—কিন্তু বুঝতে পারি না তোমার এই ধরণের নীরবতা!

ললিত হেসে বললে—অনেক কিছু যখন বোঝ, তখন এটা না হয় নাই বুঝলে!

জানি—এ লোকের ওপর রাগ করা বৃথা; তাই একটু থেমে বললাম—আচ্ছা, ভদ্রলোক তাঁর দুঃখের কাহিনী বলছিলেন বলে কি বিরক্ত হচ্ছিলে?

—অত্যন্ত সত্য কথার ওপর বিরক্ত হওয়াও চলে না, আর তার ওপর টিপ্পনী কাটাও নিষ্প্রয়োজন। অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়।

ললিতের কথার আর জবাব দেওয়া চলে না। কাজেই পথের শেষ পর্য্যন্ত চুপ করে থাকতে হল।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীর দরজাতেই সরোজ দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে বললে—ঃ, তোরা এসেছিস। আকাশের অবস্থা দেখে ত আমার চোখের জল বার হবার জোগাড় হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সব বোধ হয় ফাঁকি দেবে।

না, ফাঁকি পড়বার ভয় তোমার আর নেই, সে ব্যাপার তুমি চুকিয়ে ফেলেছ—বলে ললিত হেসে ঘরে বসল।

ঘরের মধ্যে আরও কয়েকটী বন্ধু ছিল; আর ছিল একটী হারমনিয়ম ও একজোড়া তবলা। সুধীর হারমনিয়মের সামনে বসে থাকলেও, গান গাইবার উৎসাহ তার বিশেষ ছিল বলে মনে হল না। আমাদের দেখে বললে—এসো হে, তোমাদের বিহনে আড্ডা যেন জম্‌ছে না। আমি আর একা কাঁহাতক চালাই।

আমি বললাম, চলার কথা আর বোল না। বাঙ্‌লায় ও-ব্যাপার বন্ধ হবার জোগাড়।

সত্যি—যা বলেছ। এই কথাটাই এতক্ষণ সরোজকে বোঝাচ্ছিলুম। অমন ফাগুন মাস পড়ে ছিল, দিব্যি শুক্‌নো খট্‌খটে ছিল, বসন্ত কাল, কোকিলের ডাক টাক যা চাও সব পাবে, সে সময় ছেড়ে দিয়ে হতভাগা বিয়ে করতে বসল কি না এই বর্ষার সময়।—

সরোজ বেচারী এ কথার কি রকমে একটা জুতসই উত্তর দেবে ভাবছিল। পাশ থেকে কে যেন টিপ্পনী কেটে বললে—দে না একটা সংস্কৃত নজির দেখিয়ে।

সংস্কৃতের সঙ্গে এদের কারোরই বিশেষ পরিচয় ছিল না; এবং সেই জন্যই বোধ করি নজিরের অভাব এদের ঘটত না।

অকূল সাগরে কূল পেয়ে সরোজ মহাকবি কালিদাসের অত্যন্ত পুরাতন সাবেকি শ্লোকটাকে নজীর মেনে বসল।

ললিত হেসে বল্‌লে—তোমাদের তর্কের সুবিধার জন্যে আর যাই কর, অই জগৎমান্য মহাকবিটীকে জবাই করবার চেষ্টা ক'র না।

সুধীর বললে—ঠিক বলেছ ভাই! নজীর দেবার সময় এদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। এদের ব্যাপার দেখে নজীর প্রহসনের এক শ্লোক মনে পড়ে গেল।

—বৃন্দাবনে বলে গেছেন, রাধাবোষ্টমী,
একাদশীর দিনে এবার জন্মাষ্টমী।

বৃন্দাবনের বোষ্টমটী ভুলক্রমে অষ্টমীর দিন উপবাস করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

এই নজীর প্রহসনের পালা হয় ত আরও কিছুক্ষণ চলত; কিন্তু দরজার কাছে বন্ধুমহলে বিখ্যাত মাণিকজোড়ের মূর্ত্তি দেখে, অভিনয় জমে না উঠতেই যবনিকা পতন। প্রধান অভিনেতা সুধীর আসর জমিয়ে বল্‌লে—কি হরিধন, এই জল-বৃষ্টিতে বেচারী হবেনকে টেনে বার করেছ ত।

অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির হরেন সপ্রতিভ ভাবে বললে —ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক উলটো। আমিই বললাম সরোজের এই ভালোবাসার বিয়েতে সরোজকে—তার কথাটা শেষ হবার আগেই ঘরের মধ্যে একটা বীভৎস রকমের হাসির রোল উঠে হরিধনের কথার শব্দ তলিয়ে দিলে।

ললিত শুধু অত্যন্ত শান্তভাবে যেমন বসেছিল, বসে রইল। সুধীর তার এই বৈরাগ্যকে খোঁচা দিয়ে বললে—আচ্ছা ললিত, তোর হল কি বল্ ত!

—আমার আর হবে কি; আমি দেখছি—তোরা কত মিথ্যে কথার তুফান তুলতে পারিস্।

সুধীর তার কথায় হাসির রেশ রেখে বললে—এর মধ্যে মিথ্যে কথা কোন্‌টা বল?

এই ভালোবাসার বিয়ে, ওটা বাজে কথা। সব বিয়েরই ভালোবাসা আছে; নইলে বিয়ে হয় না। মূলেই কিন্তু দোহাই, আমি তর্ক করতে চাই না—ওই ভালোবাসার কোনো বিশেষ অর্থ আছে কি নেই। আমি বলি কি, বাঙালীর ছেলের মধ্যে ওই বিশেষ জিনিস নেই। আমি—

ললিতের কথায় বাধা দিয়ে সুধীর বললে—তোমার কথা ছেড়ে দাও। সবাই কিছু ললিতকুমার নয়। তোমার বাইরে—

সুধীরের উত্তেজনার মুখে তার কথা শেষ হবার আগেই ললিত অত্যন্ত শান্তভাবে বললে—আমি আর আমাদের মধ্যে ব্যাকরণগত তফাৎ থাক্‌তে পারে; কিন্তু দর্শনগত কোনো তফাৎ নেই। বাঙালীর জীবন কি রকম জানিস—পুকুরের মতো, নদীর মতো নয়। এঘাট ওঘাট সবই এক রকম। আমার জীবন আর তোমাদের জীবন এই একই পুকুরের ঘাট, গেলাস আর ঘড়ার জল মাত্র। কেউ বা সান-বাঁধান ঘাটে তুলেছে; আর কেউ বা তাল-বসান সিঁড়িতে তুলেছে।—

আর তফাৎ ত ঐখানেই। তোমার জীবনে ঐ তাল-বসান সিঁড়ি পর্য্যন্তই হয়েছে—

ললিত হেসে বল্‌লে—অবশ্য তোমাদের এ কথাটা আমি মেনে নিচ্ছি; কিন্তু আমার জীবনেও একদিন সান-বাঁধান ঘাট তৈরি করার সুযোগ এসেছিল।

হরিধন মাঝ থেকে বলে উঠল—যাক, এতক্ষণে যাহোক সুরু হয়েছে।—

গল্প সুরু হয়েছে বহুক্ষণ। এর সুরুও নেই আর শেষও নেই। আমার এই ত্রিশ বছরের জীবনটার একটানা পথ সেদিন সান-বাঁধান হবার কথা হল—গল্প কি আর সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে?

তবে? না হয় তোমার ঐ সান-বাঁধানোর ব্যাপারটাই শোনা যাক্।

শুনবে আর কি—ও ব্যাপার আমার জীবনে ঘটেনি। তোমাদের যে বয়সে মনটা আনচান করে, ঘরের মধ্যে ভাল লাগে না, অথচ বাইরে গেলেও তৃপ্তি হয় না—ঠিক এই সব ব্যাপারগুলো আমার জীবনে ঘটেছিল কি না মনে নেই; কিন্তু তার পরের ব্যাপার আর সকলের ভাগ্যে যেমন ঘটে আমারও তাই ঘটেছিল। অর্থাৎ বাড়ীতে পিতামাতা আমার বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন।

—কিন্তু তুমি বুঝি একেবারে ভীষ্মদেবের মতো প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলে যে, কলিযুগে ছোটখাট ভীষ্মদেবের অভিনয় একটা করে যাবে। বলে সুধীর তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু সুধীরের এই আঘাতটীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে বললে—ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বললে তোমরা অবিশ্বাস কোর না। সত্যি বলছি—বাবা এবং মায়ের উৎসাহ ও চেষ্টা দেখে আমি একটু খুসি হয়ে উঠেছিলুম এবং ভবিষ্যতের

মাথার মণি, অপ্সরাদের মতো সুন্দরী রমণীদের কথা চিন্তা করে মনটা যে রঙীন হয়ে ওঠেনি, এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। টুকটাক করে প্রায় সমস্তই ঠিক্ হয়ে গিয়েছিল—খালি মনের মতো কনে পাওয়ার একটু দেরী হচ্ছিল। আর দেরী যে হবেই এ ত জানা কথা। কারণ বাংলা দেশে বাপমায়ের এক ছেলের উপযুক্ত বধূ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়ে যে এদেশে দুর্লভ তা তোমরা নিশ্চয়ই জান ?

হ্যাঁ তা জানি। কিন্তু তারপর ?

ঘরের সকলেই দেখলাম অত্যন্ত আগ্রহে ললিতের কথা শুনছে।

সকলের দিকে চেয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললে—তারপর ভারী একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল।—এই পর্য্যন্ত বলেই ললিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেন সকলের মনের তারের সুর গল্পের চাবি দিয়ে টেনে পঞ্চম থেকে সপ্তমে চড়িয়ে বেঁধে দিল।

সকলেই চুপ করে রইল। ললিতকে প্রশ্ন করতেও সকলে যেন সঙ্কোচ বোধ কচ্ছিল। হরেন চুপিচুপি অস্ফুট-স্বরে হরিধনকে প্রশ্ন করলে—তারপরই কি ললিতবাবুর মা মারা গেলেন ?

হরিধন মাথা নেড়ে বললে—জানিনা।

সকলের মুখের অবস্থার দিকে চেয়ে ললিতের মুখে অত্যন্ত মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। এই বাঁকা হাসির আঘাতটুকু সুধীরের দৃষ্টি এড়ায় নি। সে গর্জ্জন করে বলে উঠল, সে দুর্ঘটনাটা কি শুনি ? মেয়ে পাওয়া গেল না ত!

না। এ এমন দেশই নয় যে পছন্দ-মতো মেয়ে পাওয়া না গেলেও, অপছন্দ না করবার মতো সযৌতুক মেয়ে পাওয়া যাবে না। মেয়ে হয়তো পাওয়াও যেত, কিন্তু ভারী একটা হাঙ্গাম ঘটল—

সুধীর তার জীবনের অনেক ঘটনার কথা জানতো। তাই ললিতের মুখে হাঙ্গামার কথা শুনে বললে—পুলিশে আর তোকে বাড়ীতে থাকতে দিলে না। টেনে জেলের দেয়ালের মধ্যে পুরে দিলে। আর তারপর কোনো মেয়ের বাপ জেল-ফেরত ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে না। এই ত ?

না। সে রকম পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, এমন বাপের অভাব বাংলা দেশে নেই। অবশ্য পাত্র হিসাবে দর জেলে যাবার পর—

হরেন তার কথার মাঝখানে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা, আপনি জেলে গিয়েছিলেন কবে ?

আমি জেলে গিয়েছিলাম সেই সময়ে, যে সময়ে জেলে না যাওয়াটাই একটা অগৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হরিধন বলে উঠল—কি আশ্চর্য্য! আপনার মতো অতি মাথা-ঠাণ্ডা লোকও তখনকার দিনে মেতে উঠে গরম হয়ে গিয়েছিলেন!

—এইখানে একটু ভুল হল তোমার হরিধন। আমি গরম হয়ে উঠেছিলুম বটে কিন্তু মেতে উঠিনি। আমার শরীরের রক্তের তাপ ৯৮ মাত্রারও নীচে এ খবর তোমাদের অজানা নয় দেখছি। এবং সে যুগেও সে রক্তের তাপ ঐ ৯৮ মাত্রার ওপরে ওঠেনি, তাও বলে দিচ্ছি।

সুধীর বোধ হয় কোন কারণে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল; তাই ললিতকে এক তাড়া দিয়ে বলে উঠল—তুই ভয়ানক ঘোরাচ্ছিস্। ব্যাপারটা কি হয়েছিল তাই বল।

—আমিও ত তাই বলছি। তোরাই ত মাঝপথে বাধা দিয়ে ঘোরাচ্ছিস। তা নয় ত এতক্ষণ বক্‌বক্ করতে আর কার ভাল লাগে ?

হরেন অনুনয়ের সুরে বললে—আপনি এই বললেন যে আপনার গায়ের তাপ ৯৮ মাত্রার কম; সুতরাং রাগ না করে আপনি বলে যান, আমরা আপনাকে বাধা দেব না।

ললিতের মুখে একঝলক মৃদুহাসির রেখা ফুটে উঠল। তারপর সে ভাবটাকে দমন করে শুষ্কভাবে বললে,—ব্যাপারটা হয়েছিল কি, আমি সেদিন দুপুর বেলা কি খরিদ করতে বাজারে বেরিয়েছি। সেদিন ছিল খদ্দরের পিকেটিঙ্। মহিলারা এ কাজে বার হয়েছিলেন। তোমাদের বলতে দোষ নেই, আর পাঁচজন ছোকরার মতো আমিও তাঁদেরই দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছিলাম। এমন সময়ে আমারই চোখের সামনে এক সার্জ্জেণ্ট একটা তরুণীকে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ধাক্কা দিলে।—

হরেন হরিধনকে চুপিচুপি বললে—তা হলে ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছিল।

হরেনের কথা ললিতের কাণে গিয়েছিল; কিন্তু সে তা

গ্রাহ্য না করেই বললে—এ অবস্থায় আমার বাঙালী-সুলভ মনের অহিংসভাব হিংস হ'য়ে এমন একটা কাণ্ড করে বসল, যার সঙ্গে তখনকার দিনের আন্দোলনের বিশেষ মিল ছিল না; বরং ১৯০৫ সালে যে আন্দোলন ঘটেছিল, তার সঙ্গে এর কিছু মিল খুঁজলেও পাওয়া যেত। ফলে পথ থেকে গেলাম থানায় এবং থানা থেকে হাজত ও আদালত ঘুরে একেবারে হাজির হলাম জেলখানার এক কুঠুরিতে। 'কারাগারে তিনমাস বা পাঁচমাস' এই ধরণের বই পড়ে তোমাদের ঐ জেলখানা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে, সে ধারণার ওপরে রঙ্ দিতে পারি এমন বলবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যা বলতে পারি তা হচ্ছে, জেলখানা ঠিক জেলখানাই। তবে সেখানে দুঃখ বলে কোনো জীবের সাক্ষাৎ যে হরদম্ পাবে, এমন কথা বলতে পারিনা।

সুধীর তাকে ব্যঙ্গ করে বললে—না তা পার্ব্বে কেন? তখন তরুণীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে সুখ দুঃখের অতীত হয়ে গিয়েছিলে যে। বেশ জমিয়ে এনেছিস যাহোক—এখন ভালো করে শেষ কর দেখি।

—শেষ এখন করতে পারলে বাঁচি। তবে তা ভালো কি মন্দ হবে বল্‌তে পারি না। জেলের জঠর থেকে ত বার হ'য়ে এলাম।

ললিতের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হ'য়ে এল। কেন সেই জানে; কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাস উপলক্ষ করে হরিধন বললে—বার হ'য়ে এসে শুনলেন সেই তরুণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

—না; সে তরুণীর কি হয়েছে না হয়েছে, তার খোঁজ নেবার কখনও চেষ্টা করিনি। আসলে হয়েছিল কি—জেলের মধ্যে হয় ত বা দু' একদিন সেই তরুণীর কথা মনে করবার চেষ্টা করেছিলাম, যদিচ তাঁর মুখ কখনও মনে পড়েনি; তবে জেলের বাইরে এসে তাঁর কথা আমার মনেই হয়নি। আমি তখন আর এক নতুন নেশায় মেতেছিলুম।

—তুই আবার কোনো দিন নেশা করেছিলি নাকি?—বলে সুধীর তার দিকে একটা কৃপামিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

—হ্যাঁ, তা করেছিলুম বই কি; এবং এখনও করি।

—সে নেশাটা কি?

—বই পড়া। জেলের মধ্যে আমার এক বন্ধু জুটেছিল—তাঁরও ছিল এই একই নেশা। তবে আমি পড়তে ভাল বাসতুম জগতের লোকের খবর; আর তিনি পড়তেন জগতের লোকের মনের খবর অর্থাৎ 'সাইকোলজি'। এই বিষয়ে তিনিই আমাকে দীক্ষা দেন। পড়তে পড়তে দেখলাম লোকের খবরের থেকে লোকের মনের খবর অনেক বেশী বিচিত্র।

সুধীর এবার দস্তুর মতো রেগে উঠে বললে—কিন্তু তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? কোথায় বিয়ে—

ললিত হেসে বললে—আমিও সেই কথাই বলছি। বিয়ের জন্যে মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ দরকার এ কথা কি আর জানিনা। তোমরা সেই মেয়ের কথা শুনতে না পেয়ে ক্ষেপে উঠেছ।

ললিতের এই খোঁচা খেয়ে সুধীর আরও তীব্র ভাবে বলে উঠল,—ক্ষেপে উঠবে না ত কি? বেশ বলছিলি, ননকো-অপারেশন, তরুণী, সার্জেণ্ট, বীরত্ব, প্রেম,—বেশ লাগছিল। এখন সেই তরুণীর প্রতি প্রেমটাকে ঢাকবার জন্যে সে সব কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে যোগী পুরুষের মতো গীতা আওড়াতে বস আর কি? এসব আমরা বিশ্বাস করি না। যে মেয়ের জন্যে জেলে গেলে, তার কথা এত সহজে ভুলে গেলে—চালাকি নাকি?—

সুধীরের ধমকে ললিত এবার হেসে ফেললে। বললে—চালাকি যদি ক'রে থাকি, তা ঐ একটী কথা নিয়ে করেছি—তরুণী। আসলে আমার বলা উচিত ছিল—ভদ্র মহিলা। এবং সে সময়ে যে আমি সার্জেণ্টকে শাস্তি দিতে গিয়েছিলাম, তা হচ্ছে—অত্যাচারিতাকে ভদ্রমহিলা ভেবে, তাঁর বয়স ভেবে নয়।

আজীবন কলকাতা ছেড়ে কখনও বার হইনি; কাজেই জোঁকের মুখে নুন পড়ার প্রবাদটা শুধু শুনেই আসছিলাম,—আজ তার ফলও প্রত্যক্ষ করলাম।

হরিধন মধ্যস্থতা করে বললে—আচ্ছা, থাক্ সে কথা। আপনার বিয়ের কথাই হোক।

বিয়ের কথাই ত বলছি। বিয়ে হচ্ছে—কোন একটি বিশেষ মেয়েকে জানবার উপায়; আর সাইকোলজি হচ্ছে—মেয়ে বিশেষদের জানবার উপায়। এখন আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের মেয়েজাতটাকে জানবার একটা অদম্য ইচ্ছা আছে। অথচ মেয়েজাতটাকে জানতে হলে একটী বিয়েতে

কুলোয় না; আর তার বেশী বিয়ে করতে পয়সায় কুলোয় না। এমন অবস্থায়—

তোর পাঁচ সাতটা বিয়ে করার ইচ্ছে হল। কিন্তু পয়সায় কুলোয় না দেখে ইচ্ছেটাকেই একেবারে সমূলে বিনাশ করলি।—সুধীরের রসিকতায় সকলেই খুব খুসী হল বটে; কিন্তু ললিতের ওপর তার বিশেষ ফল হল না।

সে বললে—'ও এমন ইচ্ছেই নয় যে সমূলে বিনাশ করা যায়। ভালোবাসবার অর্থাৎ মেয়েদের জানবার ইচ্ছে আমার তোমাদের চেয়ে একতিলও কম নয়; কাজেই এমন অবস্থায় আমি আবিষ্কার করলুম যে, এই সেক্স-সাইকোলজি হচ্ছে একমাত্র শাস্ত্র; যা পড়া মেয়েদের সহজে জানবার একমাত্র উপায়।

তারপর?

তারপর আর কি? এই কথাটা, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবাকে একদিন বুঝিয়ে দিলুম। কিন্তু মুস্কিল হল মাকে নিয়ে। তাঁকে এসব কথা ঠিক বোঝান যায় না, আর ঠিকমতো বোঝাতেও পারি না হয় ত। মা আমার কথা শুনে ঠিক করলেন যে, এমন বৌ এনে দেবেন, যার দিকে চাইলে আর আমি চোখ ফেরাতে পার্ব্ব না।

এখন বাংলা দেশে ঠিক সেই রকমটী পাওয়া কত শক্ত তা'ত জানই; এবং আমার চোখ না ফেরে এমন মেয়ে যতই না পাওয়া যেতে লাগল, চিন্তায় মার শরীরও তত ভেঙে পড়তে লাগল।......

ললিতের গলার স্বর একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। সে তার স্বভাবতঃ শুষ্ক গম্ভীরস্বরে বললে,—মায়ের মারা যাবার পর বাবা একরকম গৃহী-সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ও সম্বন্ধে কোন কথাই আর তিনি বলেন না।

সকলের মুখে আর কোন কথা নেই। ব্যাপারটা অত্যন্ত করুণ হয়ে যাচ্ছে দেখে ললিতই নিজে থেকে বললে—আচ্ছা সুধীর, তোর এত তাড়া কিসের বল ত। এখান থেকে শ্বশুরবাড়ী পালাবি ত?

এই সহজ সুরে সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সুধীর হেসে বললে—বিরহে আকাশই চোখের জল রাখতে পাচ্ছে না; আর আমরাই বা মন বেঁধে রাখি কি করে? নিজের চোখের জল থেকে বাঁচতে হ'লে এখন যাওয়াই উচিত।

হরিধন বললে,—বিরহী আকাশের চোখের জলে নিরীহ আমরাই খালি ভিজে মরব।

সরোজ হেসে বললে—ভিজে মরতে হবেনা। জল থেমে গিয়েছে। এখন তোমরা ওঠ।

"তুমি গেছ' যবে"

শ্রীরাধারাণী দত্ত

—১—

তুমি গেছ' যবে তখনো ফোটেনি'
　　প্রভাতী-আলো
শেষ-রজনী'র আঁধার-আঁচল
　　নিকষ-কালো!
নব-অরুণে'র প্রণয়-কাহিনী
আকাশ করিছে সবে কাণা-কাণি,
আধ-ফোটা-ফুল সুপ্ত-কলিকা
　　জাগেনি ভালো!
মিলন-কুঞ্জে কুজেনি বিহগ—
　　'রাত-পোহালো'!

—২—

তুমি গেছ' যবে তখনো যামিনী
　　হয়নি ভোর,
শিথিল-কামিনী ছাড়েনি শাখা'র
　　বাঁধন-ডোর!
পাণ্ডুর-শশী বিদায়-বিভল,
ম্লান-রজনীর আঁখি ছল-ছল,
ঝরে নিভে-আসা জ্যোছনার বুকে
　　ব্যথা-অঝোর!
খোলেনি উষসী উদয়াচলে'র
　　কনক-দোর!

—৩—

না ল'য়ে বিদায় নীরবে গিয়েছ'
পরে'র মত,
কল্পনা-বনে স্বপন-চয়নে
আছিনু রত !
জানিনা এসেছ' গিয়েছ' কখন
মধুর-লগ্ন মঙ্গল-ক্ষণ
চরণ-চিহ্ন না রাখিয়া কিছু
হয়েছে গত !
না ফুটিতে ফুল মোর বসন্ত
মরণাহত !

—৪—

গেলে চলি' যবে মৌনাভিমানে
বাজেনি' প্রাণে,
তব মূক-ব্যথা আজি গো আমার
পরাণে হানে !
তুমিও কি প্রিয়, মোর সমতুল
পেরেছ' বুঝিতে জীবনের ভুল ?
হয়েছ' ব্যাকুল শুধু দু'টি কথা
জানাতে কাণে !
অক্ষমতা'র দুঃখ যে আরো
বেদনা আনে !

—৫—

কি লেখা লুকানো আল্পনা-আঁকা
আকাশ-পুটে ?—
তারায় তারায় আঁখিতারা কা'র
ফুটিয়া উঠে ?
সুনীল-শূন্যে সুরলোক পানে
ছায়াপথ ছেয়ে চন্দ্র-বিতানে
ব্যাকুল-নয়ন কোন্ পলাতকে
খুঁজিয়া ছুটে !
কী না-পাওয়া দুখে সকাতর-হিয়া
গুমরি' লুটে ?

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

রামযাদু সপরিবারে কল্‌কাতায় এসে পরাণবাবুর শিক্‌দার-বাগানের বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছে; বাড়ীর ভাড়া লাগে না, দুধালো গোরু দুবেলায় আট দশ সের দুধ ঢালছে, রামযাদু সপরিবারে দিব্য আরামেই আছে। কর্ত্তা কাশী গেছেন, আপিসে তাঁর এখনও ছুটি, কাজেই রামযাদুর অখণ্ড অবসর। সে সেই অবসরটি কবিখ্যাতি অর্জ্জনের আয়োজনে নিযুক্ত করলে। সে কল্‌কাতায় এসেই সত্যদাসকে চিঠি লিখলে যে সত্যদাস এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সত্যদাসের কবিতা প্রকাশ করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হতে পারে।

সত্যদাস রামযাদুর বাড়ীতে এলো। রামযাদু দেখলে সত্যদাস বুদ্ধির প্রভায় সুশ্রী যুবক, কিন্তু সে দরিদ্র। রামযাদুর মন আশায় প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। রামযাদু সত্যদাসকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারো, এ পর্য্যন্ত কোনো মাসিকপত্রে ছাপ্‌তে দাওনি কেনো? কোনো কাগজে তোমার কবিতা দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না?

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বললে—আমার ইচ্ছা ছিলো যে সাধনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ক'রে তার পর আত্মপ্রকাশ করবো। এই বইখানি যদি কোন রকমে ছাপ্‌তে পারি, আর লোকে আমার কবিতার প্রশংসা করে, আর সম্পাদকেরা নিজে থেকে আমার কবিতা চেয়ে নেন, তবেই মাসিকপত্রে কবিতা দেবো।

রামযাদু সত্যদাসের গর্ব্বিত মনের পরিচয় পেয়ে চিন্তিতও হলো. আবার সত্যদাসের এমন সুরচনার শক্তি যে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও একেবারে অপরিচিত আছে তাতে সে আনন্দিত ও আশান্বিতও হলো। সে সত্যদাসকে বললে

—বেশ! বেশ! আমি খরচ দিয়ে তোমার এই বই ছেপে প্রকাশ ক'রে দেবো।…তুমি এখন কি করো?

—কিছুই করি না। অনেক দিন থেকে একটা চাকরী খুঁজ্‌ছি, কিন্তু আমার কেউ মুরুব্বিও নেই, কারো বেশী খোসামোদও কর্‌তে পারি না,আমার কোনো ডিগ্রি-ফিগ্রিও নেই……

—তোমার লেখার মধ্যে তো গভীর জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয় পেয়েছি—সমস্ত শাস্ত্র আর ইতিহাসে তো তোমার অসাধারণ জ্ঞান! তুমি স্কুল-কলেজে কতোদূর পড়েছিলে…

সত্যদাস রামযাদুর প্রশংসায় প্রফুল্ল এবং তার প্রশ্নে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—আমি আই-এ পাস কর্‌তে পারি নি……

—তুমি আমাদের আপিসে চাকরী কর্‌বে? প্রথমে একশো টাকা পাবে,পরে দুশো আড়াইশো টাকা পর্য্যন্ত যাতে পাও তার আমি চেষ্টা কর্‌বো……

রামযাদু উত্তরের আশায় সত্যদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ কর্‌লে, কিন্তু সত্যদাস আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তখনই কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

সত্যদাসের মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে খুশী হয়ে রামযাদু বল্‌তে লাগ্‌লে—কল্‌কাতায় তোমার মেসে-টেসে থাক্‌বারও দর্‌কার হবে না, আমার বাড়ীতেই স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে… নিজের বাড়ীর মতন থাক্‌বে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না…

সত্যদাস বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে একেবারে অবাক্ হয়ে গিয়েছে, সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না যে তার উপর রামযাদুর এই অনুগ্রহের কারণ কি হতে পারে?

রামযাদু সত্যদাসকে বল্‌লে—তা হলে আপিস খুল্‌লেই তোমাকে কাজে বাহাল ক'রে দেবো। আর তুমি ইচ্ছা কর্‌লে আজ থেকেই আমার বাড়ীতে থাক্‌তে পারো।

সত্যদাস সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—আমি আপনার চিঠি পেয়ে দেশ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, একবার দেশে গিয়ে কাপড়-চোপড় নিয়ে আস্‌তে হবে……

রামযাদু হেসে বল্‌লে—কল্‌কাতায় তো কাপড়-চোপড়ের কিছুমাত্র অভাব নেই; যা দর্‌কার হবে কিনে নিলেই হবে। তুমি আজ থেকেই আমার কাছে থেকে যাও, তোমার সঙ্গে একটু সাহিত্য আলোচনা করা যাবে।

সত্যদাস আনন্দে অভিভূত হয়ে মৌন হয়ে রইলো। রামযাদু সত্যদাসের মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ জেনে উচ্চ চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—ওরে বুনো,……বুনো……

নেপথ্য থেকে বালক-কণ্ঠের সূক্ষ্ম স্বরে জবাব এলো—কি বাবা?

রামযাদু আবার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—শুনে যা……

একটি এগারো-বারো বছর বয়সের ফর্সা রোগা ছেলে গলার উপর কোঁচার কাপড় জড়িয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। তার নাম বনমালী, সে রামযাদুর বড়ো ছেলে।

রামযাদু বনমালীকে দেখেই বল্‌লে—এই সত্যদাসবাবু আজ থেকে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন। তোমার মাকে গিয়ে বলো গে। তোমাদের পড়্‌বার ঘরের পাশে ঘরে ইনি থাকবেন; এঁর বিছানা-টিছানা সেখানে ঠিক ক'রে দিয়ো। আর এখন তোমার সত্যদাদাকে জলখাবার এনে দাও, আর আমাকে ত্রিশটে টাকা এনে দাও……

বনমালী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

রামযাদু তখন সত্যদাসের দিকে ফিরে বল্‌লে—জল খেয়ে একবার বাজার ঘুরে এসো—ধোয়া জামা-কাপড় জুতো ছাতা যা যা দর্‌কার কিনে নিয়ে এসো…একটা ষ্টিল্-ট্রাঙ্কও কিনে এনো, জামা-কাপড় রাখ্‌তে হবে……

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—এ সবের কিছু দর্‌কার ছিলো না, আমি বাড়ী গিয়ে……

রামযাদু হেসে বল্‌লে—তুমি মনে কোরো না যে আমি Charity কর্‌ছি; তোমার কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। আমি অল্প-স্বল্প Research work ক'রে থাকি…

সত্যদাস সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—তা আমি জানি; আপনার নাম ভারতবর্ষে কে না জানে?

রামযাদু সত্যদাসের প্রশংসায় তুষ্ট হয়ে বল্‌তে লাগলো, সেই রিসার্চ্চের কাজে আমাকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে একজন বুদ্ধিমান চতুর সাহিত্যানুরাগী যুবককে আমি খুঁজ্‌ছিলাম। ভগবান তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন; তোমাকে আমি অল্পে অব্যাহতি দেবো না। তোমাকে আমার কাছে রাখ্‌ছি কেনো জানো? তোমাকে আচ্ছা ক'রে খাটিয়ে নেবো……আমার যখন যা দর্‌কার হবে তোমাকে দিয়ে খুঁজিয়ে নেবো; লেখা নকল করিয়ে নেবো; কখনো বা আমি মুখে বলে যাবো তুমি লিখে দেবে; তার পর ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়াটাও তুমি

দেখতে পারবে। বাড়ীতে যখন বাড়ীর লোকের মতন থাক্‌বে তখন কোন্ না মাঝে মাঝে হাট-বাজারটাও ক'রে দেবে ?

এই ব'লে রামযাদু হাস্‌তে লাগলো। এবং রামযাদুর কথা শুনে সত্যদাসের মন থেকে অপরের কাছে দান গ্রহণের গ্লানি দূর হয়ে গেলো। সে নিজের মনে মনে বল্‌লে—এমন সদাশয় সরল লোকের সাহায্যে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে দিতে প্রস্তুত থাক্‌বে।

বনমালী এক থালা জলখাবার ও এক গেলাস জল দুই হাতে নিয়ে ঘরে এলো এবং সত্যদাসের সাম্‌নে নামিয়ে রেখে দিলে; তার পর ট্যাক থেকে ভাঁজকরা নোট বা'র ক'রে বাবার হাতে দিলে।

সত্যদাসের জল-খাওয়া শেষ হলে রামযাদু নোটের ভাঁজ খুলে তিনখানা দশটাকার নোট তার হাতে দিলে। সত্যদাস আবশ্যক সামগ্রী কিন্‌তে বাজারে বেরিয়ে গেলো।

* * * * * *

আপিসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। পরাণ-বাবু কাশী থেকে আজ ফিরে আস্‌বেন। রামযাদু বর্দ্ধমান ষ্টেসন পর্য্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে; পরাণ-বাবুকে আগ-বাড়িয়ে নিয়ে সে কাশীর ট্রেনে কল্‌কাতায় ফির্‌বে। কাশীর ট্রেন ষ্টেসনে এসে প্রবেশ কর্‌তেই পরাণ-বাবু দেখ্‌লেন প্লাট্‌ফর্মের উপর রামযাদু দাঁড়িয়ে আছে। পরাণ-বাবু রামযাদুকে দেখেই হাস্‌লেন এবং রামযাদুও হাসিমুখে পরাণ-বাবুর কাম্‌রার সাম্‌নে পৌঁছাবার চেষ্টায় ক্রমশঃ-মন্থর-গতি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। ট্রেন একেবারে থেমে গেলে রামযাদু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পরাণ-বাবুর গাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালো।

পরাণ-বাবু প্রফুল্ল মুখে বল্‌লেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়। এখানে কি কর্‌তে এসেছিলেন ?

রামযাদু দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে—তীর্থ-প্রত্যাগত পুণ্যাত্মাদের দর্শন ক'রে একটু পুণ্যসঞ্চয় ক'রে নিতে।

পরাণ-বাবু রামযাদুর তোষামোদে তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—সে কর্ম্মটা তো হাবড়া ষ্টেসনেও হতে পার্‌তো ?

—কষ্ট-স্বীকার ক'রে আগ্রহের পরিচয় না দিলে অনায়াসে পুণ্য হয় না।

—আসুন, গাড়ীতে উঠে পড়ুন।

—আমরা কি ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে যাবার যোগ্য লোক। আমরা সামান্য ব্যক্তি সর্ব্বনিম্ন ক্লাসে যাবো।

—না না, এ আমাদের রিজার্ভ্ গাড়ী, আপনি আসুন, একসঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাওয়া যাবে।

রামযাদু আর আপত্তি না ক'রে বল্‌লে—আচ্ছা আমি আস্‌ছি।

এই বলেই সে ছুটে চ'লে গেলো এবং দু টাকার সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে পরাণ-বাবুর কাম্‌রায় উঠ্‌লো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—ও আবার কি আন্‌লেন মুখুজ্জে-মশায়।

পরাণ-বাবু মাতঙ্গিনী ও কৃষ্ণকলি ষ্টেসনের প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকের বেঞ্চিতে ব'সে ছিলেন। আর থাকোহরি ছিলো অপর প্রান্তের বেঞ্চিতে। মাতঙ্গিনী রামযাদুকে দেখেই ঘোমটা টেনে কৃষ্ণকলিকে নিয়ে গাড়ীর অপর দিকে গিয়ে ব'সেছিলেন। থাকোহরি উঠে এসে মাঝের বেঞ্চিতে ব'সেছিলো। রামযাদু গাড়ীতে উঠে মাঝের বেঞ্চির উপর থাকোহরির পাশে সীতাভোগের খাঞ্চাটা রেখে পরাণ-বাবুর দিকে মুখ ও মাতঙ্গিনীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—কৃষ্ণকলির জন্যে একটু সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে এলাম।

থাকোহরি রামযাদুকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে। রামযাদু নীরবে তার মাথায় হাত দিলে।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু নিলেন না ?

রামযাদু বল্‌লে—মা ষষ্ঠীর পরম অনুগ্রহে আমার বাড়ীতে তো একটি পল্টন; তাদের মুখে একটি ক'রেও দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমার নেই। আমার গো-ভাগ্যি নেই, এঁটুলি-ভাগ্যি আছে !

এই সময় গাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে একজন ফেরিওয়ালা মিষ্টান্নের গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো; পরাণবাবু তাকে ডেকে বল্‌লেন—এই, পাঁচ টাকার সীতাভোগ মিহিদানা দাও তো।

রামযাদু একবারও একটু আপত্তি প্রকাশ না ক'রে দন্তবিকাশ ক'রে ব'সে রইলো।

পরাণ-বাবু মিষ্টান্নের মূল্য চুকিয়ে দিয়ে মিষ্টান্নের ঝুড়িটা

রামযাদু্র পাশে রেখে হাসিমুখে বল্লেন—ছেলেদের বল্‌বেন আমি তাদের খেতে দিয়েছি।

রামযাদু বল্লে—আপনিই তো তাদের খেতে পর্‌তে দিচ্ছেন—আপনি বিশ্ববাংলার অন্নদাতা ভয়ত্রাতা!

পরাণ বাবু তুষ্ট হয়ে বল্লেন—আমরা কাশী থেকে মিষ্টান্ন চমচম গুপচুপ আকের মোরব্বা প্রভৃতি আর বেনারসী শাড়ী জোড় এনেছি। কালকে উনি নিজে গিয়ে বৌমাকে দিয়ে আস্‌বেন, আর নতুন বাড়ীতে এসে তাঁরা কেমন আছেন তাও দেখে আস্‌বেন।

রামযাদু একবার মুখ অর্দ্ধেক ফিরিয়ে মাতঙ্গিনীর দিকে নত চক্ষুর দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লে—আপনাদের অসীম অনুগ্রহে আমরা তো চিরকালের জন্য কেনা হয়ে রয়েছি।

পরাণ-বাবু প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এই ছুটিতে কি লিখলেন মুখুজ্জে মশায়?

—কতকগুলো কবিতা বাছাই ক'রে একখানা বইএর মতন ক'রে রেখেছি। মনে কর্‌ছি ছাপাবো।

পরাণ-বাবু বিস্ময়পূর্ণ আনন্দ প্রকাশ ক'রে বল্লেন—আপনি কবিতা লিখ্‌তেও পারেন? পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দুইয়ের সমাবেশ আপনাতে হয়েছে! এমন অসামান্য প্রতিভা আপনার!

রামযাদু যেনো আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হয়ে বিনয়ে সঙ্কুচিত হাস্য কর্‌লে।

পরাণ-বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন—চট্‌পট ছাপিয়ে ফেলুন। ছাপাখানার বিলটা আমার নামে কর্‌তে বল্‌বেন।

রামযাদু পুনঃপুনঃ লাভে প্রফুল্ল হয়ে বল্লে—আমি কিছু কিছু রিসার্চও কর্‌ছি। কিন্তু আজকাল আপিসে যেতে হয়, বেশী তো সময় পাই না, তাই আমাকে সন্ধানে সাহায্য কর্‌বার জন্যে একজন লোক রেখেছি।

—বেশ করেছেন। তাকে কতো দিতে হবে?

—কিছু দিতে হবে না। আমার বাড়ীতে থাক্‌বে খাবে, আর আপিসে একটা কিছু কাজ করে দেবো বলেছি······ ছেলেটি বড়ো গরিব কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান্।

অথচ বুদ্ধিমান্ শুনেই পরাণ-বাবুর মন গ'লে গেলো। তিনি বল্লেন—তা হলে Export Departmentএ বিল্-ক্লার্কের খালি কাজটা ঐ ছেলেটিকে দিলে তো হয়···

রামযাদু খুশী হয়ে বল্লে—কিন্তু সে কাজের মাইনে তো বেশী, একশো থেকে আড়াইশো···

পরাণ-বাবু বল্লেন—তা একটু বেশী মাইনে না দিলে ছেলেটি মন দিয়ে কাজ কর্‌বে কেনো, আর বেশী দিন টিকেই বা থাক্‌বে কেনো?

রামযাদু অভীষ্টসিদ্ধির আনন্দে অভিভূত হয়ে কেবল হাস্‌লে এবং তার পরে কাশীতে এখন কেমন ভিড়, শীত পড়েছে কি না, ইত্যাদি গল্প বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

(ক্রমশঃ)

পূজার সাধ

শ্রীবীরকুমার বধ রচয়িত্রী

১

আবার শরত এল হেসে
মুছায়ে প্রকৃতি-আঁখি-জল—
সোণা-ঢালা তপন-কিরণে,
শুভ্র মেঘে ভরা নভঃস্তল।

২

শেফালী, দোপাটী, শতদল,
আলো করি উঠিল হাসিয়া,
বিশ্ব ছিল যার পথ চেয়ে,
সে'ই আসে আশ্বাস লইয়া!

৩

মা এসেছে বরষের পরে
তাই ছোটে আনন্দের বান,
মা এসেছে কাঙালের ঘরে,
মরুভূমে বহিছে তুফান!

৪

চারিদিকে প্রীতি কলরব,
গেছে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি,
প্রবাসী আসিছে ছুটি বাসে,
দেখিবারে মা'র পা' দুখানি!

৫

ওমা ! তোর এ শুভ-উৎসবে
আমি আছি যেই সাধ নিয়ে
হোক ক্ষুদ্র—অতি অবজ্ঞেয়,
তুই কি দিবি না পূরাইয়ে ?

৬

চেয়ে আছি দুয়ারের পানে—
সে আমার কখন আসিবে,
একটু আমার পানে চেয়ে
নতমুখে একটু হাসিবে।

৭

সে যে তার অন্ধ জনকের
এক মাত্র—প্রাণের সম্বল,
সেই দেয় ক্ষুধায় আহার
সেই দেয় পিপাসায় জল :—

৮

মা এসেছে—তার মত যারা
ছুটিবে নূতন বাস প'রি,
সেই মোর চেয়ে রবে শুধু
চাঁদ মুখখানি ছোট করি ?

৯

না না বাছা ! আয় মোর কাছে,
পরাইব নবীন বসন,
নিবি মুড়ি মুড়কী সন্দেশ,
দেখিব ও প্রফুল্ল আনন !

১০

মহোৎসবে সবাকার পূজা,
মোর পূজা নিরালা কুটীরে,
সবে পূজে ষোড়শোপচারে,
আমি পূজি বুকের রুধিরে।

জাত-অজাত

শ্রীহরিপদ গুহ

অমরেশ তাহাদের বাহিরের রোয়াকে বসিয়া একমনে "মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা" পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। খামের উপরকার লেখাটা দেখিয়া লেখককে সে স্মরণে আনিতে পারিল না ; তখন তাড়াতাড়ি সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল—

"দাদা,

বড় যন্ত্রণা পেয়ে আজ তোমায় কয় ছত্র লিখ্‌তে বসেছি ; —এই প্রথম এবং এইটাই বোধ হয় আমার শেষ পত্র ! দু'একদিনের দেখায়, সামান্য পরিচয়েই তোমার ভিতর যে হৃদয় ও মনুষ্যত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তারই উপর নির্ভর করে তোমায় 'দাদা' বলে ডাক্‌বার ও চিঠি দেবার সাহস কর্‌ছি। জানি না, তুমি আমায় এতে কি মনে কর্‌বে।

সেদিন আমাদের গাঁয়ে কি একটা প্রয়োজনে এসে, তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে তুমি আমার কাছে জল চেয়েছিলে। আমি শঙ্কিত হয়ে, বিনীতভাবে জানিয়েছিলুম—'আমরা নম ; আমাদের হাতে জল খেলে আপনার জাত যাবে।' তুমি সরল হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলে—'ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যার জাত অটল হয়ে থাকে, তার আর যায় না।' তার পর, চাঁড়াল বলে যাদের ছায়া পর্য্যন্ত কেউ স্পর্শ করে না, তার ছোঁয়া জল যখন বিন্দুমাত্র দ্বিধাশূন্য হয়ে পরম তৃপ্তির সহিত পান কর্‌লে, তখন বুঝ্‌লুম—তুমি দেবতা !—মানুষে সত্যই তোমার জাত কেড়ে নিতে পারে না ! তাই ত তোমার পায়ে মাথাটাকে লুটিয়ে দিয়ে ভেবেছিলুম—ঠিক্ আপনার বলে গর্ব্ব কর্‌বার একজনকে বুঝি নিকটে পেয়েছি !

তার পর আর একদিন এসে তুমি আমায় যে ক'খানা বই দিয়ে গিয়েছিলে, সেগুলো আমি কতবার যে পড়ে

শেষ করেছি, তার আর সীমা নেই! থাক্, আবেগে অনেক বাজে কথা বলে ফেল্লুম। জানি না, এতে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বে কি না।

যে জন্য দেশ ছেড়ে যেতে বসেছি, এখন সেই আসল কথাটাই বলি—

সেদিন দুর্য্যোগের রাত্রি। ঘুট্‌ঘুটে আঁধারে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল; আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ অনবরত ঝিলিক্ হান্‌ছিল। আমি মার সঙ্গে আমাদের এক কুটুমবাড়ী থেকে ঘরে ফির্‌ছিলুম। যখন গাঁয়ের রাধা বল্লভজীর মন্দিরের নিকট এসে আমরা উপস্থিত হলুম, তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমে এসেছে। পুরুতঠাকুর ছাতা মাথায় দিয়ে কি একটা কাজে বাইরে আস্‌ছিলেন; গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছি দেখে, তিনি আমাদের মন্দিরের ভেতর এসে দাঁড়াতে বল্‌লেন। আমি জানালুম—আমরা চাঁড়াল। তিনি 'ও, আচ্ছা' বলে দেবালয়ের বাইরে একটা ছোট কুটুরী দেখিয়ে আমাদের সেখানে যেতে অনুরোধ কর্‌লেন; এবং নিজে পথ দেখিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমরাও সরল বিশ্বাসে তাঁর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চল্‌লুম। জানি না, কেন আমার দক্ষিণ অঙ্গটা অকস্মাৎ একবার কেঁপে উঠল।

আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি মাকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঝনাৎ করে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বল্‌ছিল; নাক দিয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। ছদ্মবেশী শয়তানটা এগিয়ে এসে, 'খপ' করে আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে আমায় তার পাপ বাসনা ব্যক্ত কর্‌তে লাগল। ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম। হায়, সকলই বৃথা হলো!—জলের শব্দে, বাতাসের গর্জ্জনে সে শব্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—কেউ শুন্‌তেও পেলে না।

তার পর, সেই পিশাচ পাশবিক বলে আমাকে তার বুকের কাছে টান্‌ছে দেখে, আমি তাকে কত অনুনয়-বিনয় কর্‌তে লাগলুম। কিন্তু, নরাধম তাতে কর্ণপাত কর্‌লে না। তখন মনে হলো, আমরা সাধ করে যে সাপের গর্ত্তে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন আর অনুশোচনা করে ফল কি!

আমি মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে সকাতরে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লুম—'ও গো, ব্রাহ্মণের ঠাকুর! স্বচক্ষে তোমার সন্তানের কুকীর্ত্তি দেখ! সত্যকার হও যদি ভগবান্, তোমার ওই জড় আবরণ ভেদ করে এখানে ছুটে এস!—বাঁশী ফেলে একবার অসি ধর!……'

অকস্মাৎ কে যেন আমার শরীরে মত্ত-হস্তীর বল দিলে; নিকটেই একখানা চেলা কাঠ পড়ে ছিল, আমি বাঁ হাতে সেখানা তুলে নিয়ে সবলে সেই নর-পশুর মাথায় বসিয়ে দিলুম। সে আর্ত্তনাদ করে ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল; তার মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌লুম। এসে দেখি, —মা একদিকে পড়ে গোঙাচ্ছে; তারও মাথা ফেটে সমস্ত রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। আমি কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে মায়ের মাথায় পটি বেঁধে দিয়ে, কোনরকমে তাকে নিয়ে বাড়ী পালিয়ে এলুম।

পরদিন গাঁয়ে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। চারজন পাইক এসে আমাদের জমীদারের কাছারীতে টেনে নিয়ে গেল। পুরুতের বাপ সমাজপতি ন্যায়চঞ্চু ঠাকুর জমীদার বাবুর কাছে হলপ করে ন্যায় কথাই বল্‌লেন—আমরা না কি ব্রাহ্মণদের প্রতি আক্রোশে দেবালয়ে ঢুকে মন্দির অপবিত্র কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম; তাঁর উপযুক্ত পুত্র দেখ্‌তে পেয়ে বাধা দিতে আসায়, আমি তার ওই দুর্দ্দশা করেছি। অম্লান-বদনে অতবড় মিথ্যাটা মুখ দিয়ে বার কর্‌তে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একটুও আট্‌কাল না,—আশ্চর্য্য! লজ্জায় কিন্তু আমার মাথাটা মাটির দিকে নুইয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি সত্য ঘটনা প্রকাশ করে বল্‌তে যাচ্ছি, তখন ভূস্বামী মিত্র-মশায় হঠাৎ এমন একটা হুঙ্কার ছেড়ে উঠ্‌লেন যে, কোম্পানীর রাজত্ব না হলে তিনি বোধ হয় আমাদের, মা ও মেয়েকে তৎক্ষণাৎ শূলেই চাপিয়ে দিতেন। ঠাকুরের শিখাটিও ক্রোধে ঘন-ঘন কণ্টকিত হতে লাগল। তার পর, সকলে মিলে আমাদের এমন ভাষায় গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন,—সত্য বল্‌ছি দাদা, অমন সব কথা জিব দিয়ে উচ্চারণ কর্‌তে নীচ চাঁড়ালদের মুখেও হয় ত বেধে যেত। তাঁরা সব ভদ্রলোক, বড় জাত কি না, তাঁদের কথা বিভিন্ন! বিচারের প্রহসন শেষ হলে, জমীদার-বাবু আমাদের প্রতি আজ্ঞা দিলেন,—তিন দিনের মধ্যে আমরা যেন তাঁর জমী ছেড়ে চলে যাই; নতুবা, তিনি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়্‌বেন।

আমাদের ওপর যা-কতক দেবারও হুকুম হয়েছিল; কিন্তু, খোকাবাবু,—মিত্র-মশায়ের কলেজে-পড়া ছেলে সেখানে এসে পড়ায় সেটা আর কার্য্যে পরিণত হতে পেলে না।

সেই রাত্রেই মায়ের ভীষণ জ্বর হলো। কিন্তু তাকে আর বেশী যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হলো না; পরের দিনই সব শেষ হয়ে গেল।......

শ্মশানে চিতার পাশে বসে ভাবছিলুম,—আজ আমার শেষ সম্বল ফুরিয়ে গেল! এখন যাই কোথায়?—কোথায় গেলে এই সব বড়দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই?...

অকস্মাৎ মনে হলো,—পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে,—জাতহারা দেবতার দেশে;—যেখানে উচ্চ-নীচে প্রভেদ নেই, সেই পুণ্যধামে গেলে ত বেশ হয়! আজ তাই পুরীর উদ্দেশেই আপনাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছি!

সেখানে গিয়ে ঠাকুরকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ব—'বল জগৎনাথ, জাত কি?—যার দর্পে জীব হয়ে জীবকে এত ঘৃণা করে? মানুষে-মানুষে এত প্রভেদ কেন? ছোট হলে মনটাও কি নীচ হয়ে যায়?—তার সতীত্বের কোন মূল্যই আর থাকে না? এই অমানুষিক অত্যাচার, এই ভয়ানক নিপীড়নের সত্যকার বিচার, এর প্রতীকার কি কোন দিনই হবে না?......'

দাদা! তোমার স্নেহস্পর্শে এ শুষ্ক হৃদয়-তরু এক দিন মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল, তাই ঝরে পড়্‌বার আগে তোমারই পায়ে আমার মনের বেদনা নিবেদন করে বিদায় প্রার্থনা কর্‌ছি! বিদায়!—চির-বিদায়! প্রণাম নিও, মাকে দিও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি কখনই এ অভাগী মেয়েকে পায়ে ঠেল্‌তে পারতেন না! এটা জেনেও মায়ের কাছে গেলুম না; কারণ, সেখানেও এই পাপ সমাজ আছে; আর সেই সমাজে মানুষরূপী এমনই নিষ্ঠুর দানবও আছে। তবে আসি দাদা! কখনও-কখনও তোমার নির্য্যাতিতা ছোট বোন্‌কে স্মরণ ক'রো। ইতি—

মন্দভাগিনী—

সনকা

পত্র পাঠান্তে অমরেশের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে দুই হস্তে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল। সহসা মাতার আহ্বানে তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ রে অমু, ও কার চিঠি? মাথায় হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিস্ এত?"

অমরেশ লিপিখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া ধরা-গলায় বলিল—"পড়ে দেখ।"

মাতা পত্র পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি পুত্রকে শুধাইলেন—"এ বিষয়ে কি ঠিক্ কর্‌লি রে?"

"কিছু না!" বলিয়া অমরেশ চুপ করিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী একবার কি ভাবিয়া লইলেন; তার পর অমরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। শীগ্‌গির ঠিক্ হয়ে নে; আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমাদের শ্রীক্ষেত্রে যেতে হবে।" এই বলিয়া তিনি যুক্ত-করে আপনার ললাট স্পর্শ করিলেন।

পুত্র বিস্ময় ও প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার মহিমময়ী মাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

নীলাচলে আসিয়া সনকার অনেক খোঁজ করা হইল; কিন্তু, তাহার সাক্ষাৎ কিংবা কোন সন্ধানই মিলিল না। যতই দিন যাইতে লাগিল, মাতা-পুত্রে ততই হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল,—সনকা সেখানে উপস্থিত নাই।

* * * *

রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ। চন্দ্রকরবিধৌত অনন্ত নীল সমুদ্রের বেলাভূমে মাতা-পুত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সহসা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন একটী রমণী বালুকারাশির উপর পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে। অমরেশ তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ!—এ যে সনকা!

দাক্ষায়ণী সেখানে বসিয়া পড়িয়া পরম যত্নে তাহার মস্তক নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

সনকা অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া অমরেশকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া একবার হাসিল। মনুষ্য-জগতে সেরূপ হাসি আর বোধ হয় কেহ কখনও দেখে নাই। দাক্ষায়ণীর দিকে চাহিয়া সে কি বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না; কিন্তু, তাহার চোখে-মুখে তৃপ্তির একটা উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে অভাগিনীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল।

দাক্ষায়ণী তখন যম-দ্বারের যাত্রী সেই বিসূচিকা-রোগিণীকে কন্যাস্নেহে আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তার পর,—তার পর সব শেষ হইয়া গেল! পরম শুচিতাময়ী ব্রাহ্মণ-বিধবার ক্রোড়ে চণ্ডাল-কুমারীর আত্মা দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিল!

অমরেশ মন্দিরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে দারুব্রহ্ম, হে অচল-নিকেতন, হে আর্য্য-অনার্য্যের দেবতা! বর্ণের অহংকার, ছোটর প্রতি বড়র মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ, জাতিদ্বেষের অলীক সংস্কার দূর কর প্রভু! ভাঙো, ভাঙো, এ পাষাণ-প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দাও! গীতায় তোমার শ্রীমুখের বাণী সার্থকতা লাভ করুক!—আবার গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে নূতন জাতি গড়ে উঠুক! ভারত পুনরায় সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য ও পবিত্র হোক্!"

নতুন পূজা

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ঘুরি' ফিরি' আমরা করি এ এক পূজার আয়োজন—
দাদা-ঠাকুর! তসর ছাড়ো, যদি থাকে পূজায় মন।
রাখো তোমার তিলক-সেবা,—মালার কাঠি বৃথাই টেপা,
শিখার সাথে ফুল বেঁধে আর নাশ ক'রোনা ফুল-বন;
বালাই ববং কেটে'ই ফেল'—বিদ্যুতে নেই প্রয়োজন!

আমাদের এ নতুন পূজা—চাইনে 'অচল-আয়তন'—
'চৌপদী' থাক্ চুপটি করে'ই ঠাণ্ডা হ'য়ে কিয়ৎক্ষণ।
আমাদের এ নতুন পূজা,—চাইনে ক' ভাং, চাইনে ভুজা,
মোদের কালী চান না 'বলি', পাঁঠার মাথা নাহি খান;
শুধু কেবল একটি 'বলি'—সেটি স্বার্থ-বলিদান!

মোদের পূজা কাদায় জলে—বাংলা-দেশে বন্যাদায়;
মোদের পূজা পিতৃদ্রোহ—দরিদ্রেরি কন্যাদায়।
মোদের পূজা—হাত ধরি' হায়, টেনে' তুলি ডোম-'পারীয়া'য়,
মোদের পূজা—শূদ্রে শেখাই বেদান্ত-বেদ-গায়ত্রী;
মোদের পূজা—বাল্-বিধবায় সাজিয়ে ছাড়ি এয়ো-স্ত্রী!

মোদের পূজা—পড়্তে যাওয়া আমেরিকা, লণ্ডনে;
মোদের পূজা—পুঁথির পাতার বিধি-নিষেধ মুণ্ডনে।
টিক্‌টিকি আর হাঁচি ধরে'—প্রেরণ করা দ্বীপান্তরে,
মোদের পূজা—ভেঙে' দেওয়া কুসংস্কারের কুণ্ডলী;
দেশের সেবা—দশের সেবা—'হিতসাধন-মণ্ডলী'!

মোদের পূজা—লড়াই করা অবিচারের সঙ্গে হায়,
'দাবীর চিঠি' পেশ করা আর বিশ্বজনের জন্-সভায়।
মোদের পূজা গ্রামে জেলায়, নিঃস্ব-জনের ন্যায়ের মেলায়,
মন্দিরে নয়—মোদের পূজা পথেতে আর প্রান্তরে;
পুষ্পপাত্র প্রাণের মাঝে, মন্ত্র বাজে অন্তরে!

পাথর

শ্রীপরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

অনীতার ভাঙা বুকে আর একটা নূতন আঘাত লাগিল!··· সে নিজে আসিল না; কিন্তু আসিল ছোট্ট একটি চিঠি। লিখ্ছে—

"তোমার চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের চিঠি পেলে বা না পেলে, তোমাদের সাথে কথা কইলে বা না কইলে, তোমাদের সাথে দেখা হলে বা না হলে আমার যা হয়, সেটা আমার সুখ আর দুঃখের বাইরে। কেন, তা জানোই,—তাই কাগজের বুকে আঁচড় কেটে জানালুম না।

সেদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হওয়ায়ই যে এ চিঠির সৃষ্টি তা বুঝেছি। দেখা না হলেই হয় ত সব দিক দিয়ে ভালো ছিল; কিন্তু যখন হয়ে গেছে, তখন আর কি করা। আশা করি, এতে আর নূতন কোন অপরাধের সৃষ্টি হয়নি।···

ঝোঁকের মাথায় এমন কয়েকটা কথা লিখে ফেলেছ, যার জন্য এখনই হয় ত অনুতাপ হচ্ছে; আর এখনও যদি না হয়ে থাকে, দুদিন বাদে হবেই। তখন হয় ত লজ্জা রাখ্বার ঠাই পাবে না।···

আমার সব কথা জান্তে চেয়েছ। আমার আর কি কথা থাক্তে পারে। তবে দেহ মন সব দিক দিয়েই আমি আজ ক্লান্ত;—যাক্, সে জন্য নালিশ করবারও কিছু নেই।··

জানো, মানুষের মনে যখন অন্যায় আঘাত দেওয়া হয়, তখনই তার মন অস্বাভাবিক ভাবে শক্ত হয়ে উঠে। তাই যা-ই সে করে, তা-ই কঠিন হয়ে বেজে ওঠে। এই সত্যি কথাটা মনে রেখে আমায় ক্ষমা করো। তোমরা সুখী হও—কোন দাগই যেন তোমাদের গায়ে না লাগে। ইতি—

মাষ্টার মশাই।"

পড়া শেষ হইয়া গেলে চিঠিটা হাতে লইয়া অনীতা খানিক যেন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল; ধীরে ধীরে তাহার চোখ দুটা জলে ভরিয়া উঠিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া গেল, প্রফেসার অন্য ক্লাসে চলিয়া গেলেন; কিন্তু অনীতার উঠিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। ঘণ্টার শব্দে শুধু মাথাটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া, চেয়ারটায় হেলান দিয়া বসিয়া, জানালার মধ্য দিয়া খোলা আকাশের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বন্ধু কমলা সেই দিক্ দিয়াই ক্লাসে যাইতেছিল; অনীতাকে তদবস্থায় দেখিয়া, ঘরে ঢুকিয়া অনীতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, তাহার চোখে-মুখে সদ্য ক্রন্দনের চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি ভাই অনু, বসে বসে কাঁদ্‌চিস্ যে! অঙ্কের ক্লাস আজ আর কর্‌বিনে?"

অনীতার পক্ষ হইতে কোনও সাড়া আসিল না।

বন্ধুর এই হৃদয়হীন নীরবতায় কমলা মনে মনে একটু আহত হইল। অনীতার গোপন মনের সুখ-দুঃখের সমস্ত খুটিনাটিই তাহার জানা, এতদিন তাহার এই বিশ্বাসই ছিল; এবং কমলাও তাহার হৃদয়ের অলিগলির সমস্ত পরিচয়ই বন্ধুর নিকট একেবারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল। তাই আজ বন্ধুর দিক হইতে এই গোপনতার পরিচয়ে তাহার মনে একটা অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত দূর করিয়া দিয়া বন্ধুর বুকের কাছে মুখ রাখিয়া চোখের জল আঁচলে মুছাইয়া দিয়া পরম ব্যথা-ভরে সহানুভূতির সমস্ত দরদ ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অনী ভাই! কি হয়েছে, আমায় বল্‌বিনে?"

বন্ধুর এই সমবেদনায় অনীতার দুই চোখে আবার অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; কিন্তু তাহা সযত্নে দমন করিয়া ব্লাউসের ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে কমলার হাতে তুলিয়া দিল।

কমলারও আর ক্লাস করা হইল না। প্রবল ঔৎসুক্যে চিঠিটা একরকম একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"কিছুই ত বুঝ্‌তে পারলুম না ভাই। মাষ্টার মশাইটি কে? কিছুই ত বলিস্‌নি তার কথা কোন দিন! আর তোর সাথে তার পরিচয়ই বা হল কি করে? আর দেখা কর্‌তেই বা বলেছিলি কেন? আবার কেনই বা সে এল না?"

অনীতা মিনিট-খানেক চুপ করিয়া রহিল,—হয় ত বা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা মৃদু নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল—"আজ থাক্ ভাই, আর এক দিন বল্‌ব।"

* * * *

সেদিন শেষের দিকটায় তিন ঘণ্টা কোনও ক্লাস ছিল না। তাই একটা নিরিবিলি যায়গায় অনীতাকে টানিয়া আনিয়া কমলা বলিল—"বল্ না ভাই আজ!"

অনীতা খানিক কি ভাবিল, তার পর বলিল—শুন্‌বি? শোন্ তবে। ··কমল, ভাই তুই ত জানিস্—বছর কয়েক আগে আমি কেমন একরোখা ও খেয়ালী ছিলাম। এর জন্য ত তোদের কাছেও কত দিন কত অনুযোগ শুন্‌তে হয়েছে। আজকে যা বল্‌ব সেও আমার একটা খেয়ালের খেলা; কিন্তু খেলার শেষফল যা হল, তার জন্য আজ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে প্রায়শ্চিত্ত করে আস্‌চি। তোদেরও জান্‌তে দিইনি কিছু।

সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। আমাদের বাসায় এক মাষ্টার মশাই এলেন আমার ছোট ভাই মণ্টুকে পড়াবেন ব'লে। উনি সবে মাত্র ম্যাট্রিক্ পাশ করে আই-এস্ সি ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছেন। থাক্‌তেন আমাদের বাসায়ই; মণ্টুকে পড়াতেন, নিজেও পড়াশুনা করতেন।

আমাদের দেশেও তিনি ছিলেন অনেক দিন, সেখানকার ইস্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। ছুটিতে যখন মাঝে মাঝে বাড়ী যেতাম, তখন ক্লাশের সব চেয়ে ভালো ছেলে বলে তাঁর নাম শুনেছি অনেকবার, কিন্তু কোন দিন চোখে দেখিনি। এবার চাক্ষুষ পরিচয় হল।

দিব্যি ফরসা চেহারা; সাদাসিদে চালচলন। ভয়ানক লাজুক,—মুখ ফুটে বলতেন না কোন দিন কিছু। আমাদের সাথে ত কোন কথাই বলতেন না,—একরকম এড়িয়েই চল্‌তেন। আমরা তিন বোনে এ নিয়ে কত হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপই না করেছি নিজেদের মধ্যে। কোন কোন দিন হয় ত তাঁর কাণেও পৌঁছেচে এ-সব কথা, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তনই দেখিনি।

ওঁর সাথে আলাপ করবার জন্য মনটা মাঝে মাঝে উসখুস করত; কিন্তু ওঁর রকম-সকম দেখে নিজ থেকে এগিয়ে যেতে বড় ভরসা হত না। এম্‌নি করে প্রথম সঙ্কোচের সময় কবে কেটে গিয়ে প্রায় দুবছর শেষ হতে চল্ল; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ আর কাটল না, বিশেষতঃ আমাদের তিন বোনের বেলায়।

মাঝে মাঝে ভারী রাগ হত ওঁর ওপর। আবার ভাব্‌তাম, মেয়েদের সাথে ভালো করে কথা বল্‌বার অভ্যেসই হয় ত নেই, তাই কথা বল্‌তে চান্ না। কিন্তু অন্যান্য চালচলন দেখে ত তাও মনে হয় না। তা' ছাড়া, তাঁর লেখা কবিতা আর গল্পের মোটা খাতা কয়টাও সব দেখতে না পাওয়ায় মনটা আরও কেমন কর্‌ত। চুরি করে যে কিছু কিছু দেখিনি তা নয়; কিন্তু তাতে তৃপ্তি হয়নি মোটেই; বরং আগ্রহই শুধু বাড়ত। কিন্তু তা' মিটাবার কোন উপায়ও হাতে ছিল না।

তাই অনেক দিন ভেবেছি, এই মুখচোরা অতি ভালো-মানুষটাকে বেশ আচ্ছা করে নাকাল করতে হবে এক দিন। কিন্তু কে জান্‌ত—তাঁকে জব্দ করতে গিয়ে নিজের বুকেও একটা ক্ষতের সৃষ্টি করতে হবে!

সেদিন কি উপলক্ষে স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটী হয়ে গেছল। বাসায় ফিরে দেখি, মা ও দিদিরা রাঙাদার বাসায় বেড়াতে গেছেন; বাবাও কোর্টে। বাসায় শুধু চাকর 'মহুয়া'।

খানিক বাদে মাষ্টার মশাইও কলেজ থেকে এলেন। এম্‌নি একটা সুযোগই খুঁজছিলাম। তাই হঠাৎ বিছানায় শুয়ে পড়ে মহুয়াকে দিয়ে নীচে খবর পাঠালাম মাষ্টার মশায়ের কাছে;—আমার ভয়ানক মাথায় বেদনা হচ্ছে, তাঁর আসা চাই এক্ষুনি।

মাষ্টার মশাই এই দু'বছরের মধ্যে ভুলেও কোন দিন ওপরে যান্‌নি, কেউ কোন দিন যেতে বলেও নি। সেদিন আস্‌তে হল। আমার ঘরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। আমি টের পেয়ে শুধু দু'একবার অস্ফুট উঃ আঃ শব্দ করে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ভাব দেখাতে লাগলাম।

আজকে তিনি এই আমার সাথে প্রথম কথা কইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, অডিকোলন কোথায় আছে জানি কি না।

জান্‌তাম, কিন্তু বল্লাম—জানিনে।

তাঁর মুখ একটু মলিন হয়ে গেল—পকেট থেকে একটা টাকা বার করে মহুয়াকে পাঠালেন দোকান থেকে এক শিশি অডিকোলন আন্‌তে।

মন্টুরা চলে গেল।

একটা হাতপাখা কাছেই ছিল, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও আমার অস্থিরতার ভান বাড়ল বই কমল না।

তিনি প্রথম একটু ইতস্ততঃ করলেন; তার পর ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বল্লেন, মাথাটা একটু টিপে দেবো?

সম্মতি জানালুম।

তিনি পরম স্নেহভরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমার এই ছদ্ম ব্যবহার দূর করে তাঁকে জব্দ করে দেই, এই ভাবছিলাম,—হঠাৎ বাবার জুতার শব্দ শুনেই চমকে উঠে বসে পড়লাম। কই, এত সকালে তাঁর আসার কথা নয় ত!

মাষ্টার মশায়ও অপ্রস্তুত হয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। তিনি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই বাবা ঘরে ঢুকে, আমাদের এমন অবস্থায় দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন।

অবাক্ হবার কথাও বটে!—যে মাষ্টার মশাইকে কোন দিন আমাদের সঙ্গে একটা কথা বলতেও কেউ শোনেনি নি, তিনিই আজ ওপরে আমার বিছানায় বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—তার ওপর আবার বাসায় কেউ নেই!

সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল,—বাবার মুখেও একটা ভ্রূকুটী দেখা দিল।

মাষ্টার মশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; বাধা দিয়ে বাবা বল্লেন—নীচে যাও বিনয়। তিনি ধীরে ধীরে নেমে গেলেন।

লজ্জায় যেন একবারে মরে গেলাম। বাবা এমন ভুল বুঝলেন! একটা কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলেন না! সারাটা বিকাল আর ঘর থেকে বার হতে পারলাম না. নির্জীবের মত বিছানায় পড়ে রইলাম। কিন্তু সেই হল আমার মারাত্মক ভুল!

সন্ধ্যার দিকে বুঝলাম, বাবা মাষ্টার মশাইকে বাসা থেকে তাড়িয়েছেন। মিথ্যে অপরাধের গ্লানি নিয়ে তিনি হয় ত নিঃশব্দে চলে গেলেন,—নিজের সাফাই দিতে একটা ছোট্ট কথাও হয় ত তাঁর মুখ ফুটে বেরোয়নি।

বাবা একটা কথাও বল্লেন না; এমন কি, একটা নির্দোষ লোকের মাথায় বিনা-দোষে এমন অপবাদ চাপিয়ে দেবার আগেও, তার অপরাধের সত্য মিথ্যা যাচাই করবার একটা সুযোগও তাকে দিলেন না। আমাকেও তিনি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না; আমার কাছেও তিনি কোন কৈফিয়ৎ চাইলেন না। বাবার ওপর দুর্জ্জয় অভিমানে আমার নিজ থেকেও আর কিছু বলা হল না।

বাসায় ফিরে মা প্রভৃতি জানলেন, মাষ্টার মশাই নিজ থেকেই চলে গেলেন! তাঁদের চোখে তিনি হলেন খাম-খেয়ালী আর অকৃতজ্ঞ; বাবার চোখে হলেন অপরাধী; শুধু আমিই জানলাম তিনি কি!

অনীতার দুই চোখ ভারী হইয়া উঠিল। বলিল, ভাই কমল, বাবার কাছে আঘাত খেয়ে সেদিন প্রথম বুঝলাম—আমি তাঁকে ভালোবেসেছি। তার পর থেকে তাঁর আর কোন খবরই পাইনি—শুধু গেজেটে দেখেছি, প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পাশ করেছেন; আর বি-এস্‌সিতেও ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছেন।······

তার পর এই সেদিন—মাস দুয়েক আগে মন্টু এসে বল্লে, 'দিদি, মাষ্টার মশাইয়ের সাথে তাঁদের মেসের কাছে হঠাৎ দেখা। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তাঁর, চেনাই যায় না ভালো করে। আমায় দেখে আদর করে ডেকে নিয়ে ঘরে বসালেন,—আমার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু সারাক্ষণটা আমার কি রকম অসহ্যই না বোধ হচ্ছিল,—এমনি স্যাঁৎসেঁতে আর অন্ধকার তাঁর ঘরটা। বাপ্ রে বাপ্! এর মধ্যে থাকলে কি আর শরীর ভালো থাকে?······মাষ্টার মশায় কিন্তু বেশ ভালো-মানুষ ছিলেন—না দিদি? অথচ আমাদের এমন ভালো বাড়ী ছেড়ে তিনি কি না গেলেন সেই অন্ধকার খুপ্‌চীতে পচে মরতে।'

চুপ করে সবই শুনলাম। কেন যে পচে মরতে গেলেন, তাও বুঝলাম। বুকের উপর দুঃখের একটা জগদ্দল পাথর চেপে বসল। কেবলি মনে হতে লাগল, আমার এ অপরাধের সীমা নেই। এই যে একটা তরুণ প্রাণ তিল তিল করে তার দেহ মন ক্ষয়িয়ে নিঃশব্দে সব দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, এর জন্ত দায়ী কে? আমিই ত!—আমারই

সামান্য একটা খেয়াল ও মূর্খতার দোষেই ত আজ তাঁর এ নির্ব্বাসন!

সমস্ত মন সেদিন থেকে চাইতে লাগল,—ক্ষুধার্ত্তের অন্ন চাওয়ার মত—একবার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হত! তা হলে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে' আমার চোখের জলে তাঁর মিথ্যা গ্লানি ধুইয়ে দিতুম।

দেখা হলও এই সেদিন। কলেজ থেকে বাসায় ফিরছিলুম। জানিসই ত—বাড়ী থেকে গাড়ী না আসায় হেঁটেই যেতে হয়েছিল। হঠাৎ রাস্তায় জল এল। দাঁড়াবার মত জায়গাও চোখে পড়ল না;—সব যায়গাতেই পুরুষেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভিজেই পথ চল্‌তে হয়েছিল।

মাষ্টার মশাইও সেই পথ দিয়েই উল্টো দিক থেকে আসছিলেন। আমায় অমন করে ভিজতে দেখে, হাতের ছাতাটা আমায় দিয়ে বল্লেন—'ধরো'।

হাত বাড়িয়ে ছাতাটা নিলাম। তিনি হন্‌হন্ করে চলতে লাগলেন। চোখ তুলে তাঁর যাওয়ার দিকে চাইলাম—বাসি ফুলের মত কি নেতিয়েই না গেছেন!

দেখা হলে কত কথাই না বলব ভেবেছিলাম; কিন্তু কোন কথাই বলা হল না। তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে চেঁচিয়ে ডেকে শুধু বল্লাম—'ছাতাটা পাঠাব কি করে? কলেজ থেকে কাল যদি একবার এসে নিয়ে যান!'

কিন্তু তিনি এলেন না—পরদিন একটা লোক পাঠিয়ে দিলেন। বুঝলাম—আমার সাথে আর কোন সূত্রেই দেখা করা তাঁর ইচ্ছে নয়।

নিরাশার ব্যথা বুকে নিয়ে সেদিন কলেজ থেকে বাসায় ফিরলাম। সারারাত কেঁদে কেঁদে কাট্‌ল। ভাবলাম—এমন ব্যথা পাওয়াই আমার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতেও পরিপূর্ণ সান্ত্বনা পেলাম না। তাঁর সেই সীমাহীন দুঃখের তুলনায় আমার এ নিরাশার ব্যথা কতটুকু? কেবলই মনে হতে লাগল—তাঁকে সব কথা খুলে বলা দরকার;—তা সে আমার পক্ষে যত লজ্জারই হোক না। লজ্জার খাতিরে তাঁকে মিথ্যা অপরাধের গ্লানিতে কলঙ্কিত করে রাখ্‌বার অধিকার আমার নেই।

তার পর মেয়েমানুষের পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য, তাই করলাম। নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করে তাঁর কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলাম। তাঁকে যে ভালোবেসেছি, লজ্জার মাথা খেয়ে তার ইঙ্গিত না করেও পারলাম না। কি পাষাণ দেবতা! কোন কিছুতেই তিনি টল্‌লেন না।—

ক্ষমা হয় ত করেছেন, কিন্তু আমার ভালোবাসা স্বীকার করেননি! এ তাঁরই চিঠি!

পাঁকের ফুল

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

সহরের ভদ্র পল্লীর মাঝখানে সন্ধ্যারা থাকে। সন্ধ্যার মা ছিল এক ভদ্রলোকের রক্ষিতা—তিনিই তাকে তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এ বাড়ীখানা কিনিয়া দিয়াছিলেন। এখন সন্ধ্যার মার বয়স হইয়াছে; কিন্তু মেয়ে যৌবনের গৌরবে ভরা। বাড়ীতে সন্ধ্যা থাকে; আরও তিনটি মেয়ে থাকে। পতিতা হইলেও ইহারা হাপ-গেরস্থ। পাড়ার ভদ্র পরিবারের সঙ্গে এদের একেবারে সম্পর্ক নাই এমন নয়। চারিদিককার বাড়ীর জানালা হইতে বউ-ঝিরা এদের দিকে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; গৃহিণীরা ডাকিয়া খুঁজিয়া কথাও কন। আর দুপুর বেলায় যখন কর্ত্তারা বাড়ী না থাকেন, তখন মাঝে মাঝে এরা প্রতিবেশীদের কারও কারও বাড়ী গিয়া গল্প-সল্পও না করে এমন নয়।

*   *   *

সন্ধ্যার বয়স ষোল; রূপে সে ঢলঢল করিতেছে। তার উপর তার পুরুষ-মাতান হাবভাব, চঞ্চলতার অবধি নাই। সেই গর্ব্বে সে ধরাকে সরাজ্ঞান করে,—পুরুষ দেখিলেই তাকে

কটাক্ষ হানে। তার কটাক্ষে ধরা না পড়িবে এমন কে আছে ?

পাড়ার অনেকে পড়িয়াছিল। বেশীর ভাগ ছেলে-ছোকরারা ; যথা, বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর যোগেন, মিত্তিরদের বাড়ীর ললিত। এরা দুজনেই দ্বিতীয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, পরম উৎসাহে তৃতীয় বার সেই ফাঁড়ি উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছে। সে আয়োজনের প্রধান উপাদান সন্ধ্যার বাড়ী গিয়া সময়ে অসময়ে আড্ডা দেওয়া।

ইহাদের সঙ্গে সন্ধ্যার সম্পর্কটা ঠিক ব্যবসার সম্পর্ক ছিল না। সন্ধ্যা তাদের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে ; ছোট বয়সে তাদের অনেকের সঙ্গেই মেলা-মেশা করিয়াছে। যৌবনেও সেই ভাবটা চলিয়াছে,—স্বতন্ত্র রকমে। এরা কালে-ভদ্রে চুরী-চামারী করিয়া তাকে এক-আধটা উপহার দেয়, এই পর্য্যন্ত—তা' ছাড়া তাদের সঙ্গে সন্ধ্যার টাকা-পয়সার সম্পর্ক নাই।

ভাবটা তার যোগেন বাঁড়ুয্যের সঙ্গেই বেশী। ললিত মিত্তির তাহা লইয়া তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না ; কিন্তু তাতে যোগেন ও ললিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধে বাধে না।

যোগেনদের বাড়ীতে একটী গরীব আত্মীয় থাকিয়া লেখা পড়া করিত ; তার নাম সতীশ। ছেলেটি এমন কিছু হীরার টুকরা নয় ; তবে পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যপরায়ণ। যোগেনের সঙ্গে তার খুব ভাব ; কেন না, তারা একসঙ্গে পড়ে, সর্ব্বদা একসঙ্গে শোয়া-বসা করে। তারা দুজনে একসঙ্গেই বাইরের একটা ছোট ঘরে পড়ে ও শোয়। তবে যোগেন গোটা রাত্রিটা সে শয্যায় থাকে না, এই যা তফাৎ।

সতীশকে যোগেন গোপনে সন্ধ্যার কথা সব বলে ;—তার ভালবাসার কথা, আদর-যত্নের কথা, তার রূপ-গুণের কথা, কত কি। সতীশ শুনিয়া কিছু বলে না ; কালে-ভদ্রে একটু আধটু মৃদু আপত্তি করিয়া বলে যে মামা—যোগেনের কাকা—শুনিলে কি বলিবেন। কিন্তু যোগেন সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বেচারা সতীশ বন্ধু-প্রীতির খাতিরে কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলে না।

এক দিন ললিত আসিল যোগেনের কাছে। দুজনে মিলিয়া সেদিন সন্ধ্যার কথা বলাবলি করিতে লাগিল। সতীশ পড়িতেছিল ; তার বইখানা কাড়িয়া লইয়া ললিত বলিল, "আরে এখন রেখে দে বই—এই বসন্ত-সন্ধ্যায় বই পড়াতে সব দেবতার অভিশাপ আছে।" বলিয়া তাকে দলে টানিয়া গল্প আরম্ভ করিল ; এবং ক্রমে দুজনে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল,—সতীশকে আজ একবার সন্ধ্যার কাছে যাইতেই হইবে—দেখিবে সে কি চমৎকার।

সতীশ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল না। তার রাগ যাহা হইল সে মনের ভিতরই চাপিয়া রাখিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা, সকল প্রলোভন ব্যর্থ করিয়া দিল, তার শান্ত দৃঢ়তার বলে। শেষ পর্য্যন্ত সে বলিল, "একবার তোমরা ভেবে দেখছো না—কি অন্যায় ক'রছো তোমরা ? তোমাদের বাবা, খুড়ো তোমাদের পিছনে পয়সা খরচ ক'রছেন, তোমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য ; আর তোমরা তার এই প্রতিদান দিচ্ছ।"

তারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কিন্তু মনের তলায় তাদের এতটুকু লজ্জা ও সঙ্কোচ হইল যে, আজ বাহির হইবার সময় তারা মিথ্যা করিয়া বলিল, তারা অন্যত্র যাইতেছে। কিন্তু গেল তারা সন্ধ্যারই কাছে।

* * *

তাদের কাছে সতীশের কথা শুনিয়া সন্ধ্যা হাসিয়া উঠিল ; কিন্তু তার মনে হইল রাগ।

সন্ধ্যাকে সতীশ না দেখিয়াছে এমন নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া অনেক দিন সন্ধ্যা সতীশকে দেখিয়াছে ; ও নিজের রূপ খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়াছে ; কটাক্ষ হানতেও কসুর করে নাই। তবু সে তাকে এত অবহেলা করে যে, এতটা টানাটানি পীড়াপীড়ি পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিল ! সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল, "একবার কোনও মতে আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পার রাত্রে ? তার পর দেখি আমি—তার কেমন মুরোদ !"

যোগেন সাহস করিল না ; ললিত উৎসাহ দিল। শেষ পর্য্যন্ত সব ঠিক হইয়া গেল। যোগেন বাড়ী গিয়া একবার সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিল।

তখন রাত্রি এগারটা। বাড়ীর লোক সবাই ঘুমাইয়াছে, সতীশ ছাড়া। নিঃশব্দে যোগেন ও ললিত সন্ধ্যাকে লইয়া তাদের বাড়ীতে ঢুকিল। যোগেন দুয়ারে আস্তে আস্তে ঘা দিল। সতীশ পড়িতেছিল, উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

ঝড়ের মত ঘরের ভিতর ঢুকিল সন্ধ্যা। বিশেষ করিয়া আজ সে সাজিয়া আসিয়াছে। মাথার চুল হইতে নখের

ডগাটি পর্য্যন্ত সে শোভামণ্ডিত করিয়াছে ;—কিন্তু তার সজ্জা দেহের রূপ মোটেই আবরণ করে নাই। সতীশ তিন হাত পিছাইয়া গেল। দুয়ার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যা হাসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার উপর তোমার এত রাগ কেন, সতীশ বাবু ?"

সতীশের আঠার বছরের যৌবন তার অন্তরের ভিতর ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ; কিন্তু সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে মাটির দিকে সুধু চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা তাহাকে টানিয়া কাছে আনিল। সতীশ তখন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া করযোড়ে বলিল, "আমাকে দয়া কর"—

সন্ধ্যা বলিল, "দয়া ক'রতেই তো এসেছি। তোমার এই উঠ্‌তি বয়সের এত সুখ,—একে সুধু বই পড়ে পড়ে ঝাঝ্‌রা ক'রে দিচ্ছ ; তাই তো দয়া ক'রে তোমায় উদ্ধার ক'রতে এলাম।" বলিয়া সন্ধ্যা তার কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিল।

সতীশের সমস্ত শরীরে লোমহর্ষণ হইল—বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল ;—সে ধপ করিয়া সন্ধ্যার পদ্মের মত পায়ের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও—আমি—আমি বড় গরীব।"

সন্ধ্যা তাহাকে ছাড়িয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া অভিমান করিয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় বেরসিক ! আমি কি টাকা-পয়সা চাইছি তোমার কাছে, যে, বলছো তুমি গরীব ! আমি সুধু চাই তোমাকে গো তোমাকে।"

এই বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

সতীশ তখন একটা ঝট্‌কা মারিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া তফাতে ছিট্‌কাইয়া দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কণ্ঠে নিঃশ্বাস চাপিয়া সে বলিল, "বেরোও তুমি—এক্ষুনি বেরিয়ে যাও ;—নইলে মামা বাবুকে ডেকে সব ব'লে দেব।"

বলিয়া সে হুড়কা খুলিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। রকম-সকম দেখিয়া সে ভয় পাইয়া বলিল, "চলে আয় সন্ধ্যা, চলে আয়,—মার বাড়াবাড়িতে কাজ নেই।"

সন্ধ্যাও ভয়ানক থতমত খাইয়া গিয়াছিল—সে নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে, সতীশ কম্পমান দেহে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কেন সে এত কাঁদিল তার অন্তর্যামী জানেন।

* * *

তার পর ছ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার চঞ্চলতা কাটিয়া গিয়া সে ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

ললিত মিত্তির মারা গিয়াছে। যোগেন পড়া ছাড়িয়া কালেক্টারীতে কেরানীগিরী করিতেছে। সতীশ পড়া বেশী দূর করিতে পারে নাই। সে মোক্তারী পাশ করিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছে—একরকম চলিয়া যাইতেছে।

যোগেন এখনও সন্ধ্যার কাছে আসে, কিন্তু খুব বেশী নয়।

* * * *

সেবার বসন্তের বড় উপদ্রব।

একদিন যোগেন আসিয়া বলিল, "সতীশকে মনে আছে তোমার ?"

যেন মনে নাই এমনি ভাব দেখাইয়া ভুরু কুঁচকাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ সতীশ ?"

"ওই যে আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়তো—যার কাছে একদিন রাত্রে নাকাল হ'য়েছিলে তুমি।" বলিয়া যোগেন হাসিল।

সন্ধ্যার মুখখানা হঠাৎ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "হাঁ মনে পড়েছে—সে লোকটা পুরুষ নয় !"

"তা যা' ব'লেছ ! সে এখানে মোক্তারী ক'রছে।"

এ খবর সন্ধ্যার অজানা ছিল না। কিন্তু সে খবর সে গোপন করিয়া বলিল, "তাই না কি ?"

"হাঁ—বেচারা বড় বিপদে প'ড়েছে। তার স্ত্রীর হ'য়েছে বসন্ত—আজ পাঁচ দিন—আর এদিকে সে রক্তামাশয়ে ভয়ানক কাবু হ'য়ে প'ড়েছে। তাদের দেখবার একটা লোক নেই।"

মুখটা একটু কঠোর করিয়া সন্ধ্যা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন—তুমি ?"

"আমি কি ক'রে যাই বল, বসন্তের রোগী তার বাড়ীতে—ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি। তা' আমি যাচ্ছি, একবার হাঁসপাতালে ডাক্তারবাবুকে খবর দিইগে,—তিনি যদি ওদের দুটীর কোনও ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।"

সন্ধ্যার মুখটা আর একটু শক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা ক'রবে বই কি। তবে যাও তাই; কি ক'রবে আর।"

সতীশ কি করে, কবে সে বিবাহ করিয়াছে, কোথায় সে থাকে, কি রকম তার আয়, এ সব কোনও কথাই সন্ধ্যার অজানা ছিল না। সে পরোক্ষে নানা উপায়ে এ সব সংবাদ রাখিত। কেন, তা সেই জানে—হয় তো জানেও না।

* * * *

দারুণ রক্তামাশয়ে সতীশ ভুগিতেছে, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে—সর্ব্বদা তার শুশ্রূষার দরকার; অথচ থাকিবার মধ্যে আছে একটা চাকর-সে এখনও ছাড়ে নাই। ওদিকে স্ত্রী নিদারুণ বসন্ত রোগে কাতরাইতেছে। চাকরটা কেবল ঘর বাহির করিতেছে। ডাক্তার ডাকিতে যায় সে—ডাকিলে কেহ আসে না।

ভাবিয়া ভাবিয়া সতীশের চিত্ত ভয়ে দুঃখে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এ বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনও উপায়ই সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

তখন সতীশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল; তার পিছনে দুয়ারটা ভেজান ছিল। চাকর গিয়াছে ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনিতে। ডাক্তারবাবু আসেন না; কিন্তু চাকরের মুখে অবস্থা শুনিয়া ওষুধ দেন।

দুয়ারটা একটু খুলিতে সে শব্দে সতীশের মোহ একটু ভাঙ্গিল, সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল, "রামু এসেছিস—বিছানাটা নোংরা হ'য়ে গেছে, দে বাবা একটু পরিষ্কার ক'রে।" বলিয়াই আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যে আসিয়াছিল সে যত্নের সহিত বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিল। তার পর সে ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া ছিম-ছাম করিয়া ফেলিল। তার পর আবার বিছানা পরিষ্কার করিতে হইল। তার পর সে সতীশের স্ত্রীর ঘরে গেল।

সেখানে গিয়া ঘর দ্বার যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া, যথাসাধ্য রোগিনীর আরামের ব্যবস্থা করিয়া গা ধুইতে গেল।

ঔষধের গুণে সতীশ সারারাত্রি ঘুমাইল। তার শিয়রে বসিয়া কে বাতাস দিতেছিল, তাহা সে দেখিতে পাইল না।

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন তার শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া সে ঘরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মেঝের দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পাইল, কে একটী নারী সুধু মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইতেছে। তার মুখ ফেরান ছিল; কিন্তু সতীশের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, মেয়েটি সুন্দরী। কে এ?

ক্ষীণকণ্ঠে সতীশ ডাকিল "রামু!"

মেয়েটির নিদ্রা চট্ করিয়া ছুটিয়া গেল। সে ধাঁ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, কি চাই?"

সতীশ অবাক্ হইয়া বলিল—"তুমি! সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা—বেহায়ার শিরোমণি সে—কি এক অজানা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

তার একটু পরে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "খুব আশ্চর্য্য লাগছে, না? কি ক'রবো, কাল শুনলাম যোগেনের কাছে—তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের অসুখ—দেখবার লোক নেই—তাই এলাম। এখন কিন্তু রাগ করো না সতীশ বাবু। তোমরা ভাল হ'লেই চ'লে যাব।"

এ কথার উত্তরে সতীশ কিছু বলিল না, বলিতে পারিল না। তার বুক ভরিয়া উঠিল, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা আস্তে আস্তে তার খাটের পাশে আসিয়া বসিল—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর সসঙ্কোচে সে তার আঁচল দিয়া সতীশের চোখ মুছাইয়া দিল। তার পর সে উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাই, দিদিকে দেখে আসি একবার।" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন তার চোখেও স্রোত বহিতেছে।

* * * *

জীবনটাকে তুচ্ছ করিয়া সন্ধ্যা দুই রোগীর শুশ্রূষা করিল। এত পরিশ্রম, দিন রাত সমান করিয়া এমন প্রাণপাত সেবা সে যে করিতে পারে, এ কথা সে নিজেই আগে বিশ্বাস করিত না।

তিন সপ্তাহ বাদে যখন স্বামী স্ত্রী দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যা বিদায় লইতে গেল।

সতীশের স্ত্রী বলিল, "দিদি, তুমি আমাদের জীবন দিয়েছ, তোমাকে আর কি বলবো। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ জন্মে হোক আর-জন্মে হ'ক, তোমার ঋণ শোধ ক'রতে পারি।"

বালিকার ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যা তাহাকে চুম্বন করিল। তার পর সে চক্ষু মুছিল।

সেখান হইতে সে বাহিরের ঘরে গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সতীশ একলা চুপ করিয়া বাহিরের ঘরে ফরাসে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে;—অন্ধকার সে ঘর, বাতি জ্বালার কথা তার মনে নাই।

সন্ধ্যা আসিয়া নিঃশব্দে তাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এখন যাই সতীশবাবু।"

সতীশ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল। সে বলিল "যেয়ো না, ব'সো।"

সতীশের পদপ্রান্তে বসিয়া সন্ধ্যা তার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

সতীশ উঠিয়া বসিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "যাবার দরকার কি সন্ধ্যা? থাক না তুমি এখানেই।"

হাসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "সে কি গো বাবু, আমার বাড়ী-ঘর-দোর প'ড়ে র'য়েছে, লোকজন আছে—আমি এখানে থাকবো কি?"

সতীশ কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "কিছুতেই কি তোমায় রাখা যায় না সন্ধ্যা? যদি—যদি—"

সন্ধ্যা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সতীশ বলিল, "তুমি ছ' বছর আগে যা চেয়েছিলে সন্ধ্যা, আজ তা' আমি স্বেচ্ছায় তোমায় দিচ্ছি—তুমি আমাকে নেও—আর গিয়ে কাজ নেই।"

"ছিঃ", বলিয়া সন্ধ্যা আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটু সরিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "যাই আমি সতীশবাবু।"

বলিয়া অতি ধীর পদে দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশের মনের মধ্যে একটা নিদারুণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিল। আবার সতীশের পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া বলিল, "আমার উপর রাগ ক'রো না সতীশবাবু। ভুল বুঝো না। আমি যে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি সে অভিমান ক'রে নয়—দেমাক ক'রেও নয়। তুমি আজ আমায় যা দিতে চাইলে, তোমার কাছ থেকে আমি তা কোনও দিনই নিতে পারবো না। সে এই জন্য যে, আমার জন্য তুমি খাটো হ'বে, এ আমি সইতে পারবো না। তা' ছাড়া, আমি যত মন্দই হই—তোমার কাছে মন্দ দিকটা আমার কিছুতেই দেখাতে পারবো না।" তার পর সে একটু হাসিয়া বলিল, "জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাটি তো দিনরাত ক'রছি। একটা মানুষ থাক আমার!"

বলিয়া সতীশের পায়ে তিনবার মাথা ঠুকিয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল।

বিশ্বাসঘাতক

(Prosper Merimee)

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

"পোর্তো—ভেকৃচিও" হইতে বাহির হইয়া, উত্তর-পশ্চিম দিকে ফিরিয়া, দ্বীপটার ভিতর দিকে, দেখিতে পাইবে—ডাঙাজমি হঠাৎ "তেড়ে-ফুঁড়ে" উঠিয়া পড়িয়াছে; এবং বড় বড় শৈলখণ্ডে রুদ্ধ ও কখন বা স্রোত-খাতের দ্বারা বর্ত্তিত, ঘোর-ফেরে একটা পথ দিয়া ৩ ঘণ্টা কাল চলিয়া সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল-দেশে আসিয়া পড়িবে– সেখানকার লোকেরা যাকে "মাকি" বলে। এই ঝোপ-পল্লি কর্সিকাবাসী মেষপালকদিগের বাসস্থান; এবং যারা পুলিস্ হাঙ্গামে পড়ে, তাহারাও এইখানে আসিয়া বাস করে। বোধ হয় জানো যে, কর্সিকার চাষারা জমিতে সার দেবার কষ্ট এড়াইবার জন্য, জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দেয়। দগ্ধতরুর ভস্মে-উর্ব্বরা জমির উপর বীজ বপন করিলে তাহা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ফসল উঠাইয়া লইবার

পর, দগ্ধতরুর যে মূল থাকিয়া যায় তাহা হইতে,—পর বৎসরের বসন্ত কালে, মোটা মোটা ডাল পালা গজাইয়া উঠে, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ৭।৮ ফিট উচ্চতায় উপনীত হয়। এই প্রকার নিবিড় জঙ্গলই "মাকি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ চলিতে হইলে একটা কুড়ালী হাতে করিয়া যাইতে হয়। এক-একটা জঙ্গল এত নিবিড় ও ঝোপ ঝাড়ে আচ্ছন্ন যে, বুনো ছাগলরা তার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

তুমি যদি কোন মানুষ খুন করিয়া থাক, তাহ'লে পোর্ত্ত-ভেক্‌চিয়োর জঙ্গলে যাও। একটা ভাল বন্দুক ও বারুদ-গুলি থাকিলে তুমি সেখানে বেশ নিরাপদে থাকিতে পারিবে। একটা 'হুড্‌'-ওয়ালা ক্লোকও যেন সঙ্গে থাকে। তাতে দুই কাজ হবে—গাত্রাবরণ ও গদি। মেষপালকেরা তোমাকে দুধ দিবে, পনির দিবে, চেষ্টনট্‌-বাদাম দিবে। তোমার আইনের ভয় থাকিবে না; মৃতব্যক্তির আত্মীয়দের ভয়েও থাকিতে হইবে না—শুধু এক ভয়ের কারণ, যদি গুলি-বারুদ কিনিতে তোমাকে কখনও বাহিরে যাইতে হয়।

আমি যখন কর্সিকায় ছিলাম, মাতেয়ো ফাল্‌কোনের বাড়ী জঙ্গলদেশ হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ছিল। পল্লীগ্রামের সে একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক। সে কোনও কাজ করিত না; মেষপালকেরা যে সব মেষ সেখানে চরাইত, তাহারই উৎপন্নে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। যে ঘটনার কথা তোমাকে আমি বলিতে যাইতেছি, তার দুই বৎসর পরে, যখন আমি তাকে দেখিলাম, আমার মনে হইল তখন তার বয়স হদ্দ ৫০। কল্পনা কর—একজন লোক বেঁটে-খেঁটে, গ্যাটা-গোঁটা, খুব কালো কোঁকড়া চুল, বড় বড় চঞ্চল চোখ; আর তার মুখের রং জুতোর চামড়ার মতো কালো। যেদেশে সুদক্ষ শিকারীর অপ্রতুল নাই, সে দেশেও সে একজন অসাধারণ শিকারী বলিয়া খ্যাত। তার দৃষ্টান্ত, মাতেয়ো বুনো-ছাগল কখনো ছর্‌রা গুলি দিয়া মারিত না,—মাথার কিংবা ঘাড়ের উপর নিশানা করিয়া, বড় গুলির দ্বারা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিত। কি রাত্রি, কি দিন, সকল সময়েই তার লক্ষ্য অব্যর্থ হইত। একটা নিপুণতার দৃষ্টান্ত দিই। যারা কর্সিকায় কখনো ভ্রমণ করে নাই, তাহারা এ কথা সহসা বিশ্বাস করিবে না। ৮০ কদম দূরে একটা প্রজ্জলিত বাতী একটা স্বচ্ছ কাগজের পিছনে রাখা হইল; একটা প্লেট যত বড়, কাগজটা তত বড়। বাতীটা নিবাইয়া দেওয়া হইল। এক মিনিট্‌ পরে, সেই নিছক্‌ অন্ধকারের মধ্যে, সে বন্দুক ছুঁড়িল। ৪ বারের মধ্যে ৩ বার তার গুলি কাগজটাকে বিদ্ধ করিল।

এই অসাধারণ ক্ষমতার দরুণ, দেশে তার খুব খাতির হইয়াছিল। কিন্তু লোকেরা বলিত, সে যেমন ভালো বন্ধু, তেমনি আবার ভীষণ শত্রু। সে লোকের উপকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, এবং মুক্ত-হস্ত; পোর্ত্তো-ভেক্‌চিও পাড়ার সকলেরই সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল। তবে লোকে বলে, পোর্ত্ত-নগরে যখন এক নারীকে বিবাহ করে, সেই সময় তার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে ধরাধাম হইতে বলপূর্ব্বক সরাইয়া দেয়! তার স্ত্রী গিউসেপার গর্ভে তিনটি কন্যাসন্তান পর-পর জন্মগ্রহণ করে—তাহাতে মাতেয়ো রুষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সে-ই তাহার বংশের আশা ও নামের উত্তরাধিকারী;—তাই তার নাম রাখিল "ফর্টুনাতো"—অর্থাৎ —"ভাগ্যধর"। মেয়েদিগেরও বেশ ভাল ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে তার জামাতাদিগের নিকটেও বন্দুক চালাইবার জন্য সাহায্য পাইতে পারিত। পুত্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। ইহারই মধ্যে সে বেশ একটু আশাজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

কোন এক শরতের দিনে, খুব সকাল সকাল, মাতেয়ো ও তার স্ত্রী জঙ্গলের আবাদী জমিটা দেখিবার জন্য যাত্রা করিল। বালক "ভাগ্যধর"ও তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল। কিন্তু সেই আবাদী জমিটা অনেক দূরে ছিল। তাছাড়া বাড়ী আগ্‌লাইবার জন্য বাড়ীতে একজন কাহারও থাকা দরকার। বাপ অসম্মত হইল। ইহার জন্য বাপকে পরে পরিতাপ করিতে হইবে কি না তাহা দেখা যাইবে।

মাতেয়ো কয়েক ঘণ্টা কাল দূরে চলিয়া গিয়াছিল; ইত্যবসরে "ভাগ্যধর" বেশ শান্ত ভাবে রৌদ্রে গা-পা ছড়াইয়া দিয়া, নীল পর্ব্বতগুলা দেখিতেছিল; আর ভাবিতেছিল, আগামী রবিবারে সে তার কাকা "কর্পোরালের" বাড়ী ডিনার খাইতে শহরে যাইবে। এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তাহার পর মধ্যে মধ্যে আরও বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। এবং এই আওয়াজ ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর হইল। অবশেষে, মাঠ হইতে মাতেয়োর বাড়ীর দিকে যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে একজন লোক দেখা গেল,—মাথায় পাহাড়ীদের

মত ছুঁচালো টুপি, শ্মশ্রুল, ছিন্নবস্ত্র,—বন্দুকের উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে হেঁচড়াইয়া-হেঁচড়াইয়া চলিতেছে কিছু আগে তার উরোতে একটা গুলি লাগিয়াছে।

লোকটা দস্যু; বারুদ আনিবার জন্য রাত্রে শহরে যাত্রা করিয়াছিল; পথিমধ্যে গুপ্ত কর্সিকান "লঘু পদাতিক সৈন্যের" সম্মুখে আসিয়া পড়ে। খুব বীর্য্যের সহিত আত্মরক্ষা করিয়া সে পলাইতে সমর্থ হইল। পদাতিকেরা গুলি করিতে করিতে তাহার পিছনে ছুটিল। সৈনিকদিগকে সে বেশীদূর এগাইয়া যাইতে পারে নাই—সুতরাং ধরা পড়িবার আগে জঙ্গল-ভূমিতে পৌঁছানো তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সে ভাগ্যধরের নিকটে আসিয়া বলিল :—

"তুমি মাতেও-ফাল্‌কোনের ছেলে ?"

—"হাঁ"।

—"আমি জিয়ানেতো-সামপিয়েরো। সৈনিকেরা আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে। আমাকে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখো, আমি আর চল্‌তে পার্‌ছি নে।"

"যদি বাবার বিনা-অনুমতিতে আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখি তা হলে বাবা কি বল্‌বেন ?"

"তিনি বল্‌বেন,—ভালই করেছ।"

"কে জানে, তা বল্‌বেন কি না।"

"চট্‌ করে আমাকে লুকিয়ে ফ্যালো। ঐ ওরা আস্‌ছে।"

"আমার বাবার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর"।

"অপেক্ষা! চুলোয় থাক্‌ অপেক্ষা! তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে। চল, আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখো—নৈলে তোমাকে খুন করব।"

ভাগ্যধর যারপরনাই শান্ত ভাবে উত্তর করিল—

"তোমার বন্দুকে ত গুলি ভরা নেই, আর তোমার থলেতেও ত বন্দুকের টোটা নেই।"

"আমার কিরীচ আছে।"

"কিন্তু তুমি আমার মত কি দৌড়তে পারবে ?" এই বলিয়া সে এক লাফে, দস্যুর নাগালের বাহির হইয়া পড়িল।

—"তুই তবে মাতেয়ো-ফালকোনোর ছেলে নোস্‌। তোর বাড়ীর সাম্‌নে আমাকে গেরেফ্‌তার হতে দিবি ?"

বালকের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে দস্যুর আরও নিকটে আসিয়া বলিল :—

"তোমাকে লুকিয়ে রাখলে তুমি আমাকে কী দেবে ?"

দস্যুর কোমর-বন্দে একটা চামড়ার থলে ঝুলিতেছিল; সেই থলেটার ভিতর হাতড়াইয়া দস্যু একটা টাকা বাহির করিল। সে সেই টাকাটা বারুদ কিনিবার জন্য রাখিয়াছিল। রূপার চাক্‌তিটা দেখিয়া বালকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে খপ্‌ করিয়া টাকাটা লইয়া জিয়ানেতোকে বলিল :—"কোনো ভয় নেই।"

সে তৎক্ষণাৎ, তাদের বাড়ীর কাছে যে শুক্‌নো-ঘাসের গাদা ছিল, তাতে একটা বড় রকম ছিদ্র করিল। জিয়ানেতো তাহার ভিতরে ঢুকিয়া উবু হইয়া বসিল। বালক একটু নিঃশ্বাসের পথ রাখিয়া তাহাকে এমন করিয়া ঢাকিল যে, এখানে কাহাকেও যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না। আর একটা ফন্দিও তার মনে হইয়াছিল। সে কতকগুলা বাচ্চা সমেত একটা বিড়ালকে সেইখানে স্থাপন করিল,—এই জন্য যে, লোকের বিশ্বাস হইবে যে, ও-জায়গায় কিছুকাল লোক-চলাচল হয় নাই। বাড়ীর নিকটস্থ পথে রক্তের দাগ দেখিতে পাইয়া সে খুব সাবধানে ধুলা দিয়া উহা ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর সে আবার বেশ শান্তভাবে রৌদ্রে শুইয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে, সৈনিকের উর্দ্দি-পরা ৬ জন লোক, তাহাদের সর্দ্দারের সহিত মাতেয়োর বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈনিকদের সর্দ্দার মাতেয়োর সহিত কুটুম্বিতা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। (এ কথা সবাই জানে যে, কর্সিকায় আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে) সর্দ্দারের নাম—তিয়োদোরো-গাম্বা। লোকটা খুব তেজালো; দস্যুরা উহাকে খুব ভয় করে। ইতিপূর্ব্বে তাহার হাতে অনেক দস্যুই পাক্‌ড়াও হইয়াছে। ভাগ্যধরকে অভিবাদন করিয়া সে বলিল :—

"কেমন আছ ক্ষুদে মিঞা ? এরই মধ্যে অনেকটা বেড়ে উঠেছ দেখছি! এইখান দিয়ে কোন লোককে যেতে দেখেছিলে কি ?"

বালক সাদাসিধা ভাবে বলিল;—"এখনো আমি তোমার মত বড় হইনি দাদা।"

—"শীঘ্রই হবে। কিন্তু এখন বল দিকি, একজন লোককে এখান দিয়ে যেতে দেখেছিলে কি না ?"

"আমি যেতে দেখেছি কি না ?"

"হাঁ, তার মাথায় ছুঁচোলো টুপি, আর ফতুয়ার লাল হল্‌দে রং।"

"মাথায় ছুঁচোলো টুপি, আর ফতুয়ায় লাল হল্‌দে রং?"

"হাঁ; শীঘ্র উত্তর দাও।"

"আজ সকালে, পাদ্রিমশায় তাঁর 'পিয়োরো' ঘোড়ায় চড়ে' আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কেমন আছেন—আমি বল্লুম…"

"বদমায়েস ছেলে, তুই এখন বোকা সাজ্‌চিস্? বল্ এখনি, কোন্ দিক দিয়ে জিয়ানেত্তো গিয়েছিল। আমরা তাকেই তল্লাস করছি। আমার বেশ মনে হচ্চে, সে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল।"

"কে জানে?"

"কে জানে?—আমি জানি তুই তাকে দেখেছিস্।"

"যে ঘুমিয়ে থাকে সে কি তবে পথ-চল্‌তি লোকদের দেখতে পায়?"

"বদমায়েস, তুই তখন ঘুমচ্ছিলিনে। বন্দুকের আওয়াজে জেগে পড়েছিলি।"

"দাদা, তুমি তাহলে কি মনে কর, তোমার বন্দুকের এতই আওয়াজ? আমার বাবার বন্দুকে আরও বেশী আওয়াজ হয়।"

"হতভাগা বদমায়েস্! আমি নিশ্চয় জানি, তুই জিয়ানেত্তোকে দেখেছিস! আমার এমনও মনে হয় তুই তাকে লুকিয়ে রেখেছিস্। এসো ভাই সকল, এই বাড়ীটায় খানাতল্লাস করা করা যাক; দেখা যাক্ সে এখানে আছে কি না। সে তখন এক পায়ে চল্‌ছিল; পাজি লোকটার নিশ্চয় এটুকু মনে ছিল যে, সে কখনো খোঁড়াতে খোঁড়াতে জঙ্গল দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। তা ছাড়া, রক্তের দাগ এইখানে এসে থেমেছে।"

ভাগ্যধর চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে—"তাহলে বাবা কি বল্‌বেন? যখন তিনি শুন্‌বেন, তাঁর অবর্ত্তমানে, তাঁর বাড়ীতে লোক ঢুকেছিল, তখন তিনি কি বল্‌বেন?"

সর্দ্দার গাম্বা বালকের কান পাক্‌ড়াইয়া বলিল—

"পাজি! জানিস্, ইচ্ছা করলে আমি তোর সুর বদ্‌লে দিতে পারি? এই তলোয়ারের ভোঁতা দিক্‌টা দিয়ে যদি ঘা কতক বসিয়ে দি, তা হলে বোধ হয় তুই সব খুলে বল্‌বি।"

তখনও বালক হাতে মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

সে খুব জোর দিয়া বলিল:—"মাতেয়ো-ফাল্‌কোন আমার বাবা।"

—"জানিস ছোঁড়া, তোকে আমি জেলখানায় ধরে রাখ্‌তে পারি? সেখানকার কয়েদ-ঘরে, পায়ে বেড়ি দিয়ে, তোকে খড়ের উপর ফেলে রাখব;—আর, জিয়ানেত্তো কোথায়,—যদি না বলিস তা হলে তোর মাথা কেটে ফেল্‌ব।" এই হাস্যজনক ভয় প্রদর্শনে বালক খল্‌খল করিয়া হাসিয়া বলিল, "মাতেয়ো ফাল্‌কোন্ আমার বাবা।"

একজন সৈনিক চুপি চুপি সর্দ্দারকে বলিল—"মাতেয়োর সঙ্গে বিবাদ করলে বিপদে পড়তে হবে।"

স্পষ্ট দেখা গেল, গাম্বা এই কথায় একটু থতোমত খাইল। যারা খানাতল্লাস করিতেছিল, তাহাদিগকে সর্দ্দার কি কথা বলিল। খানাতল্লাস করিতে বেশীক্ষণ লাগে নাই। কারণ, কর্সিকান কুটীরে একটিমাত্র চৌকো ঘর থাকে; আর ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে, একটা টেবিল, বেঞ্চি, সিন্দুক, ঘরকন্নার সরঞ্জাম, আর শিকারের হাতিয়ার। ইত্যবসরে বালক বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতেছিল, আর সেই সব সৈনিকদের, আর তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে কেমন ঠকাইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া সে মনে মনে বেশ মজা অনুভব করিতেছিল।

একজন সৈনিক সেই শুক্‌নো ঘাসের গাদার কাছে আসিল। বেড়ালটাকে দেখিতে পাইয়া, ঘাসের গাদায় সঙ্গীনের একটা খোঁচা দিল। কিছুই নড়িল-চড়িল না। এবং বালকের মুখের ভাবেও আসল কথার কোন আভাস প্রকাশ পাইল না।

সর্দ্দার ও তাঁহার লোকেরা নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, সর্দ্দার একটা শেষ চেষ্টা করিবে মনে করিল। এবার ভয়প্রদর্শন নহে—এবার আদর ও উপহারে কোন কাজ হয় কি না, তাহাই দেখিবে মনে করিল।

"দুষ্ট ছেলে, তুই বড়ই হুঁসিয়ার। কিন্তু তুই একটু বেশী দূর যাচ্ছিস্। ভাখ্, এর দরুণ তুই বিপদে পড়বি। মাতেয়ো ভায়া পাছে বিরক্ত হন তাই কিছু তোকে বল্লুম না—নৈলে তোকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে যেতুম।"

"হুঃ!"

"ভায়া ফিরে এলে আমি তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা বল্‌ব; তখন মিথ্যা কথা বল্‌বার জন্য তোকে এমন চাবুক বসিয়ে দেবেন যে গা দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে' রক্ত পড়বে।"

"কি করে' জান্‌লে ?"

"দেখতে পাবি⋯কিন্তু এই ভ্যাখ্⋯যদি ভাল ছেলে হোস্, তোকে একটা জিনিস্ দেব।"

"আমি কিন্তু একটা কথা বলি, যদি তোমরা এখানেই টাল-বাটাল ক'রে সময় কাটাও, ততক্ষণে জিয়ানেতো জঙ্গলদেশে পৌঁছে যাবে; আর সেখানে একবার পৌঁছলে, তাকে ধরা তোমাদের কর্ম্ম নয়।"

সর্দ্দার তার পকেট হইতে একটা রূপার ঘড়ি বাহির করিল। ঘড়িটা দেখিয়া ভাগ্যধরের চোখ্-দুটো ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া সর্দ্দার চেনে-ঝুলানো ঘড়িটাকে দোলাতে লাগিল; তার পর বলিল:— "ভ্যাখ ছোক্‌রা! তোর গলায় যদি এই ঘড়িটা ঝোলে তাহলে তুই খুসী হোসনে কি? তাহলে তুই ময়ূরের মত বুক ফুলিয়ে সহরের রাস্তায় বেড়াতে পারবি। লোকেরা তোকে জিজ্ঞাসা করবে, 'ঘড়িতে কটা বেজেছে?'—তখন তুই তাদের বল্‌বি—আমার ঘড়িটা দেখ্।"

"আমি বড় হলে, আমার কর্পোরাল কাকা আমাকে একটা ঘড়ি দেবে।"

"হাঁ! তোর কাকার ছেলে এরই মধ্যে একটা ঘড়ি পেয়েছে · এর মত এত ভাল নয় বটে⋯আর সে তোর চেয়ে ছোটো।"

বালক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল।

"আচ্ছা, এই ঘড়িটা চাস্ কি তুই ?"

ভাগ্যধর, ঘড়ির দিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বেরালের সম্মুখে একটা গোটা মুর্গির শাবক ধরিলে, বেরালটা যে ভাবে তাকায় এ সেই রকম। বেরাল তার উপর থাবা মারিতে সাহস করে না, পাছে লোভে পড়ে; এই জন্য মাঝে মাঝে চোখ্ ফিরাইয়া লয়। কিন্তু ক্রমাগত ওষ্ঠ লেহন করে—আর যেন, তার মনিবকে বলে আমার সঙ্গে এ নিষ্ঠুর তামাসা কেন ?

কিন্তু গাম্বা তামাসা করিতেছিল না, সত্য সত্যই ঐ ঘড়িটা বালককে দিতে চাহিতেছিল। ভাগ্যধর একটু তিক্ত হাসিমুখে আসিয়া বলিল—"আমাকে দেখে হাস্‌ছ কেন ?"

"সে কি! আমি ত হাস্‌ছিনে। তুই আমাকে শুধু বল্, জিয়ানেতো কোথায়—তা হলেই এই ঘড়িটা তোর হবে।"

ভাগ্যধর একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তার পর, সর্দ্দারের মুখের দিকে তাকাইয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহার কথা সত্য কি না।

সর্দ্দার বলিল—"ঐ সর্ত্তে যদি ঘড়িটা আমি তোকে না দি, তাহলে আমি যেন জাহান্নমে যাই। আমার লোকেরা সাক্ষী রইল—পরে আমি আর 'না' বল্‌তে পারব না।" এই কথা বলিয়া, সর্দ্দার ঘড়িটাকে ক্রমেই কাছে—আরও কাছে আনিল;—এত কাছে আনিল যে, উহা বালকের পাংশু গালে আসিয়া ঠেকিল। বালকের মুখের ভাবে বেশ বুঝা যাইতেছিল,—তার মনের ভিতর লোভ ও আতিথ্য-ধর্ম্মের কিরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তার অনাবৃত বক্ষ ঘন ঘন নিঃশ্বাসে প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতেছিল; তার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইত্যবসরে, ঘড়িটা তার সম্মুখে ঝুলিতেছিল, দুলিতেছিল, চেনে পাকাইয়া যাইতেছিল; এবং দুলিতে দুলিতে কখনো বালকের নাকের ডগাটি স্পর্শ করিতেছিল। অবশেষে, একটু একটু করিয়া, তার ডান হাতটা ঘড়ির দিকে উত্থিত হইল। সে আঙ্গুলের ডগা দিয়া উহা স্পর্শ করিল। ক্রমে গোটা ঘড়ির ভারটা সে তাহার হাতে অনুভব করিল;—তখনও সর্দ্দার চেনের শেষ প্রান্তটা ছাড়িয়া দেয় নাই। ..ঘড়ির মুখ-ভাগটা নীলবর্ণ⋯ ঘড়ির গাত্র সম্প্রতি বার্ণিস্ করা হইয়াছে⋯রৌদ্রে ঝিক্‌মিক করিতেছে প্রলোভনটা একটু বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ভাগ্যধরও ঊর্দ্ধে হাত উঠাইয়া, কাঁধের পিছন দিকে বুড়ো-আঙ্গুল বাড়াইয়া যে ঘাসের গাদার উপর সে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই ঘাসের গাদাটা দেখাইয়া দিল। সর্দ্দার তখনই সব বুঝিতে পারিল। ভাগ্যধর দেখিল, এখন সে-ই ঐ ঘড়ির অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক। সে হরিণের মত চটুলভাবে এক লাফ্ দিয়া ঘাসের গাদা হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দারের অনুচরেরা খানাতল্লাসি আরম্ভ করিয়া দিল।

শীঘ্রই উহারা দেখিতে পাইল, ঘাসের গাদার ভিতর একটু নড়া-চড়া হইতেছে। একজন মানুষ বাহির হইয়া আসিল;—তার গা দিয়া রক্ত ঝরিতেছে, তাহার হাতে একটা ছোরা। সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, রক্ত-জমাট ক্ষতের দরুণ সে খাড়া হইতে পারিল না। সে পড়িয়া গেল। সর্দ্দার তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছোরাটা তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। এবং প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল। রজ্জুবদ্ধ কাঠির

বাঘিনীর মত, জিয়ানেত্তো মাটিতে শুইয়াছিল। ভাগ্যধর এখন নিকটে আসায়, জিয়ানেত্তো তাহার দিকে মাথা ফিরাইল। রোষ অপেক্ষা ঘৃণার ভাবে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "অমুকের বাচ্চা!"

ইতিপূর্ব্বে যে টাকাটা তার নিকট হইতে পাইয়াছিল, সেই টাকা ছেলেটা জিয়ানেত্তোর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল—সে মনে করিল, সে এই দামের যোগ্য নয়। কিন্তু দস্যু সেটা লক্ষ্য করে নাই। সে শান্ত ভাবে সর্দ্দারকে বলিল;—

"ভাই গাম্বা, আমি হাঁটতে পারিনে। আমাকে তোমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

নিষ্ঠুর বিজয়ী পাণ্টা জবাব দিল—"এই কিছু আগে তুমি ছাগ-শিশুর চেয়েও ত ছুটে চল্‌ছিলে। যাই হোক্, এখন নিশ্চিন্ত হও; আমি তোমাকে পাকড়াও করে এত খুসী হয়েছি যে, দেড় ক্রোশ তোমাকে পিঠে ক'রে নিয়ে যেতেও আমি ভার বোধ করব না। যাই হোক্ স্যাঙ্গাৎ, গাছের ডালপালা ও তোমার ক্লোক দিয়ে তোমার জন্য একটা ডুলি বানিয়ে নেব; তার পর 'ক্রেসপলি' ক্ষেতবাড়িতে পৌঁছলে ঘোড়া পাওয়া যাবে।"

বন্দী বলিল, "বেশ। আরামের জন্য ডুলির উপর একটু খড় বিছিয়ে দেবে ত।"

সৈনিকেরা খুব ব্যস্ত। গাছের ডাল-পালা দিয়া কেহ বা একপ্রকার ডুলি তৈয়ারী করিতেছে; কেহ বা জিয়ানেত্তোর ক্ষতে পটি বাঁধিতেছে। ঠিক এই সময় জঙ্গল-মুখী রাস্তার বাঁকে, মাত্তেয়ো-ফাল্‌কোন ও তার স্ত্রী হঠাৎ দেখা দিল। রমণী সম্মুখভাগে,—চেষ্টনট্ বাদামের একটা প্রকাণ্ড বোঝার ভারে অবনত। এবং তাহার স্বামী সদর্পে খট্‌খট্ করিয়া চলিয়াছে—একটা বন্দুক তাহার হাতে এবং আর একটা বন্দুক তাহার পিঠে ঝুলিতেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝা ছাড়া অন্য বোঝা বহন করা পুরুষের পক্ষে হীনতা।

সৈনিকদিগকে দেখিয়া মাত্তেয়োর প্রথমেই মনে হইল, উহারা তাহাকে গেরেফ্‌তার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এ কথা তার কেন মনে আসিল? মাত্তেয়ো ইতিপূর্ব্বে কি কোন আইন লঙ্ঘন করিয়াছিল?—আদৌ নহে। তাহার খুব সুনাম ছিল। কিন্তু সে কর্সিকাবাসী এবং একজন পাহাড়িয়া; এবং কর্সিকার পাহাড়ীর বংশে একটা কোন দাঙ্গা-হ্যাঙ্গামা, খুনাখুনি ব্যাপার কোন না কোন সময়ে হয় নাই—এ কথা কেহ-শপথ করিয়া বলিতে পারে না। তবে অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা এই সম্বন্ধে তাহার স্মৃতি অনেকটা সাফ্। কেন না, ১০ বৎসর পূর্ব্বে, সে একজনের উপর বন্দুক চালাইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সে দূরদৃষ্টির সহিত কাজ করিয়াছিল; এবং আবশ্যক হইলে, সে আত্ম-সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল। তার স্ত্রীকে সে বলিল,—"দেখ্, তোর বোঝাটা রেখে দিয়ে প্রস্তুত হ"। আজ্ঞাবহ স্ত্রী তখনই আদেশমত কাজ করিল। মাত্তেয়ো কোমর হইতে বন্দুকটা খুলিয়া লইয়া স্ত্রীর হাতে দিল—পাছে ঐ বন্দুকে তাহার কাজের ব্যাঘাত হয়। যে বন্দুকটা তার হাতে ছিল, তার "ঘোড়া" উঠাইয়া সে আস্তে আস্তে তার বাড়ীর দিকে চলিল। পথের ধারে ধারে যে গাছ ছিল, সেই গাছের পাশ দিয়া চলিল। ঠিক্ করিয়াছিল, যদি শত্রুতার লেশমাত্র চিহ্ন দেখিতে পায় তাহা হইলে, সব চেয়ে যে গাছ বড়, সেই গাছের আড়ালে গিয়া সেইখান হইতে গুলি ছুঁড়িবে। তাহার স্ত্রী, অনাবশ্যক বন্দুকটা ও টোটার বাক্স হাতে লইয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল। যুদ্ধের সময়, স্বামীর বন্দুকে গুলি ভরা ভালো স্ত্রীর কাজ।

এদিকে সর্দ্দার, মাত্তেয়ো বন্দুকের 'টিপ্'-কলে আঙ্গুল রাখিয়া ধীর পদক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বড়ই চিন্তিত হইল। সে মনে করিল, যদি দৈবক্রমে মাত্তেয়ো জিয়ানেত্তোর আত্মীয় বা বন্ধু হয় এবং তাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে, ডাকের চিঠির মত তার দুইটা বন্দুকের গুলি আমাদের দুজনের কাছে নিশ্চিত এসে পৌঁছবে !"

এইরূপ মুস্কিলে পড়িয়া সে একটা সাহসের কাজ করিবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইল। পুরাতন আলাপীর হিসাবে তাহাকে অভিবাদন করিয়া, একাকী মাত্তেয়োর কাছে গিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে, স্থির করিল। যদিও পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বেশী ছিল না, তবু পথটা খুবই দীর্ঘ বলিয়া সর্দ্দারের মনে হইল। সে বলিয়া উঠিল—"এই যে, কেমন আছ স্যাঙ্গাৎ?—আমি তোমার মামাতো ভাই গ্যাম্বা।" মাত্তেয়ো উত্তরে একটা কথাও বলিল না। সর্দ্দার যখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিল, সেই সময় মাত্তেয়ো আস্তে আস্তে বন্দুকের নলীটা ঊর্দ্ধে উঠাইতেছিল। সর্দ্দার যখন একেবারে মাত্তেয়োর কাছে আসিয়া পড়িল, তখন দেখা গেল বন্দুকের মুখটা আকাশের দিকে।

সর্দ্দার বলিল,—"নমস্কার ভায়া! অনেক দিন পরে দেখা হ'ল।"

"নমস্কার ভায়া।"

"আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করে' যাব মনে করলেম। আজ আমরা অনেকটা পথ চলেছি। ক্লান্ত হয়েছি বলে দুঃখ নেই; কেন না আমরা আজ একটা বড় রকমের শিকার করেছি। আমরা এইমাত্র জিয়ানেতোকে পাক্ড়াও করেছি।"

মাতেয়োর স্ত্রী বলিয়া উঠিল—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! গত সপ্তাহে সে আমাদের একটা দুধোলা ছাগলী চুরী করে নিয়ে গিয়েছিল।"

এই কথায় গাম্বা খুব খুসী হইল।

মাতেয়ো বলিল—"গরীব বেচারা,—সে ক্ষুধিত ছিল।"

সর্দ্দার একটু বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল—"চোট্টাটা কিন্তু সিংহের মত আত্মরক্ষা করেছিল। সে আমার একজন লোককে খুন করলে;—শুধু তাতেই সন্তুষ্ট না—কর্পোরাল শার্দোর হাতটা ভেঙ্গে দিলে; কিন্তু সেটা বিশেষ কিছু ক্ষতির কথা নয়—কেন না, সে হচ্চে জাতিতে ফরাসী।...তার পর সে এমন ভাবে লুকিয়েছিল, যে কারও সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বের করে। ভাগ্যধর ছেলেটি না থাক্‌লে আমরা কখনই তাকে বের করতে পারতেম না।"

মাতেয়ো বলিয়া উঠিল—"ভাগ্যধর"!

মাতেয়োর স্ত্রী ঐ কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল:—"ভাগ্যধর!"

"হাঁ। জিয়ানেতো ঐখানে ঐ ঘাসের গাদাটার নীচে লুকিয়েছিল। ঐ ছোট ছেলেটি চালাকিটা ধরিয়ে দেয়। আমি তার কাকা কর্পোরালকে বলে পাঠাব, সে যেন এর জন্য তাকে একটা ভাল জিনিস উপহার দেয়। আর আমার সরকারী বিবরণীতে তার ও তোমার নাম থাক্‌বে—সেই বিবরণীটা সরকার-উকীলের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

মাতেয়ো খুব মৃদুস্বরে বলিল:—"মোলো যা!"

উহারা সৈনিকদিগের নিকটে আসিল। জিয়ানেতোকে তখন ডুলির উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—যাত্রার জন্য প্রস্তুত। গাম্বার সহিত মাতেয়োকে দেখিয়া জিয়ানেতোর মুখে একটা অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তার পর, বাড়ীর দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া, সে চৌকাটের উপর থুথুকার করিয়া বলিল:—"বিশ্বাসঘাতকের বাড়ী"।

মরিতে প্রস্তুত না থাকিলে, কোন ব্যক্তি সাহস করিয়া "বিশ্বাসঘাতক" এই নাম মাতেয়োর প্রতি প্রয়োগ করিতে পারিত না; তৎক্ষণাৎ ছোরার এক আঘাতেই এই অপমানের প্রতিশোধ হইত। কিন্তু, মাতেয়ো আর কিছু করিল না—কেবল বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া শুধু হাতটা কপালে রাখিল।

বাপ আসিয়াছে দেখিয়া ভাগ্যধর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল। শীঘ্র একবাটি দুধ লইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। নতনেত্রে দুধের বাটিটা সে জিয়ানেতোর সম্মুখে ধরিল। দস্যু বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিল—"দূর হ' তুই!" তার পর একজন সৈনিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"স্যাঙ্গাৎ, একটু জল দেও।"

সৈনিক চামড়ার বোতলটা তাহার হাতে দিল।

যাহার সহিত কিছুপূর্ব্বে সাঙ্ঘাতিকভাবে গুলি-চালাচালি হইয়াছিল, সেই সৈনিকের প্রদত্ত জল পান করিয়া সে পিপাসা মিটাইল। তারপর সে অনুরোধ করিল, পিঠের উপর দিয়া তাকে না বাঁধিয়া, বুকের উপর দিয়া তাকে বাঁধা হয়। সে বলিল—"আমি একটু আরামে শুতে চাই।"

উহারা যথাসাধ্য তাহার তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিল। তার পর সর্দ্দার যাত্রার জন্য সঙ্কেত করিল, মাতেয়োর প্রতি বিদায় সম্ভাষণ করিল। মাতেয়ো কোন উত্তর না করিয়া দ্রুতপদে ময়দানের অভিমুখে চলিল।

দশ মিনিট পরে মাতেয়োর মুখ হইতে কথা বাহির হইল। ছেলেটি কাতরভাবে, একবার মায়ের দিকে, একবার বাপের দিকে তাকাইতেছিল। বাপ বন্দুকের উপর ভর দিয়া, একটা তীব্র রোষের সহিত তাহাকে দেখিতেছিল। অবশেষে, শান্তস্বরে (কিন্তু যারা মাতেয়োকে জানিত তাহাদের নিকট এই কণ্ঠস্বর অতীব ভীষণ) বলিল—"আরম্ভটা বেশ করেছিস্!"

ছেলেটি আরও কাছে আসিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়া উঠিল—"বাবা!"

মাতেয়ো হাঁক্ দিয়া বলিল—"দূর হ' আমার সম্মুখ থেকে"।

ছেলেটি বাপ হইতে কয়েক পা দূরে, নিশ্চলভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতেয়োর স্ত্রী এই সময় আসিয়া পড়িল। সে একটু

আগে লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার কামিজ হইতে একটা ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে। মা ছেলেটিকে কঠোরভাবে বলিল—"কে তোকে এই ঘড়ি দিলে ?"

মাতেয়ো ঘড়িটা লইয়া একটা পাথরের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল—পাথরে লাগিয়া ঘড়িটা চুরমার হইয়া গেল। মাতেয়ো বলিল :—"নারী ! এই ছেলেটা কি আমার ?" স্ত্রীর শ্যামবর্ণ গাল ইঁটের মত লাল হইয়া উঠিল। "মাতেয়ো, তুমি বল্‌ছ কি ? তুমি জান তুমি কাকে এই কথা বল্‌ছ ?"

"যাই হোক,—বংশের মধ্যে এই ছেলেটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতক।"

ভাগ্যধর আরও ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতেয়ো বরাবর একদৃষ্টে তাকে দেখিতেছিল। অবশেষে বন্দুকের কুঁদো দিয়া ভূমিতে আঘাত করিয়া, বন্দুকটা কাঁধের উপর ঝুলাইয়া আবার সেই জঙ্গল দেশের পথ ধরিয়া চলিল ; ছেলেকে তাহার পিছনে পিছনে আসিতে আদেশ করিল।

মাতেয়োর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া মাতেয়োর হাত ধরিল। স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সে কম্পিতস্বরে বলিল—"ও তোমার ছেলে।"

মাতেয়ো বলিল—"আমাকে ছেড়ে দে'—আমি এর বাপ।"

মা ছেলেকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরে ফিরিয়া গেল ; "কুমারী" দেবীর বিগ্রহের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মাতেয়ো অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছিল ;—একটা খোঁয়াড়ের ভিতর আসিয়া তবে থামিল। বন্দুকের কুঁদো দিয়া মাটিটা পরোখ করিয়া দেখিল ; দেখিল, মাটিটা বেশ নরম, সহজে খোঁড়া যায় ; তার যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যের ঠিক্ উপযোগী।

"ভাগ্যধর ! ঐ বড় পাথরটার উপর উঠে দাঁড়া।"

ছেলেটি বাপের কথামত তাহাই করিল এবং তার পর নতজানু হইল।

"তোর প্রার্থনাগুলো পাঠ কর।"

"বাবা, বাবা, আমাকে মেরোনা বাবা।"

ভীষণ কণ্ঠস্বরে আবার ঐ কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া মাতেয়ো বলিল—"পাঠ কর্ তোর প্রার্থনা।"

ছেলেটি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে অস্ফুটস্বরে "পাতের্" ও "ক্রেদো" আবৃত্তি করিল।

"শুধু ঐ গুলিই জানিস্ ? আর কিছু জানিস্ নে ?"

"বাবা, আমি "আভে-মারিয়া"ও জানি, আর আমার কাকিমা যে প্রার্থনা-মন্ত্র আমাকে শিখিয়েছিলেন তাও জানি।"

"সেটা বড় লম্বা—তা হোক্।"

রুদ্ধকণ্ঠে ছেলেটি প্রার্থনা-মন্ত্র শেষ করিল।

"শেষ হয়েছে ?"

"বাবা আমার উপর দয়া কর, আমাকে ক্ষমা কর ; আর আমি কখনও করব না !"……

মাতেয়ো বন্দুকে ঘোড়া উঠাইয়া, তাহার দিকে তাক্ করিয়া বলিল—"ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন !"

বাপের জানুদ্বয় জড়াইয়া ধরিবার জন্য, ছেলেটি প্রাণপণ চেষ্টা করিল ; কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। মাতেয়ো বন্দুক ছুঁড়িল, ভাগ্যধরের মৃতদেহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

মৃতদেহের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, ছেলের কবর খনন করিবার উদ্দেশ্যে একটা কুড়ালী আনিবার জন্য মাতেয়ো বাড়ীর অভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই মাতেয়োর স্ত্রী, বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। এবং বলিয়া উঠিল :—"কি করলে তুমি ?"

"ন্যায় বিচার।"

"কোথায় সে ?"

"খোঁয়াড়ের ভিতর। আমি তাকে গোর দিতে যাচ্ছি ! সে খৃষ্টান-ভাবেই মরেছে। আমি তার উদ্দেশে একটা কীর্ত্তন দিতে চাই। আমাঃ জামাই তিয়োদোর-বিয়াঙ্কিকে যেন বলে পাঠানো হয়—সে এসে আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে।"

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়, তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু,—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য-পালনীয় বিধি বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিতনা। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিতনা। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভাল-বাসিতেন তাহার সীমা ছিলনা; স্ত্রী বিয়োগের পরে আর যে বিবাহ করেন নাই সেও এই মেয়ের মুখ চাহিয়াই, অথচ, বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে তিন মন ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন, সে তো জানি, সেই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ কথা আমার সয়না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত-কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বারো বছরের মেয়ে, জানিস্ ত সব। বাঁদরের গলায় মুক্তোর-মালা পড়েছিল সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু-চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই, এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ গৃহের সর্ব্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশ-বাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ, আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি কোরে? যারা দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষও দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি মণির মায়ের যায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশ বাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলেছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাষ্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে, বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুসি হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন্ চল্‌তে হার্ট ফেল্ করে তার ঠিকানা নেই,—মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেছে অবিনাশ, মরেছে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি শার্শি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবি-নাশের বাটীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না, মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেক্‌চে।

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এসো, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দুটোর যায়গায় দুশোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন এটুকুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেননা সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ী পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া যেমন করিয়াই হৌক আশু বদ্যির নির্ব্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার যো ছিলনা। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্ব্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ—এ সকল কি কিছুই নয়? তবে, কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছিলেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূরে করিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা' কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। তাঁহার নিজের জীবনও ত যৌবনে এ অপরাধ কম করেন নাই,—তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ত্রুটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জ্জনা করিবার দিকেই তাঁহার হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়াই তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই লইয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেননা বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেননা। অবিনাশ কহিত, কিন্তু এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোক এ কাজ পারলে কি কোরে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত, ভিতরে কি একটা রহস্য আছে,—হয়ত,—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বল্‌তে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দ্দোষ এ কথা সে তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা' করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজে এ দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য, হয়ত,—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিক্রী দিলে কি কোরে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বল্‌তে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়,—তবে, আপনার কথাও যে অসত্য তাও বল্‌তে পারিনে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জানো অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেননা।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইতনা।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সব চেয়ে বেশি। মুখে সে বিশেষ কিছুই বলিতনা, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার দিন দুই পর্য্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজেও নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় গরহাজির হইতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের তীব্র যাতনা ভুলিয়া আরাম কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে

অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন রূপ কখনো দেখিনি। মনে হ'ল এদের দুজনকে ভগবান যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি!

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেননা তা' বলে রাখলাম অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা সুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকেনা আশুবাবু। এ সকল কথাগুলো আপনার একটু সাবধানে নেওয়া প্রয়োজন।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেননা এর সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডান দিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্ব্বের পরিহাসের ভঙ্গিও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তাহলে অকারণ দম্ভ প্রকাশ করেনি বলুন। রূপের জন্যে এই মেয়েটিকে গ্রহণ করেছে এ কথা সত্য?

আশুবাবু গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, হাঁ সত্য, এবং সম্পূর্ণ সত্য।

অবিনাশ প্রশ্ন করিলেন, পরিচয় হ'ল কি কোরে?

আশু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে আনতে সাহস করেননি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হোলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড় বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুসি হতে পারেনি। ওরই সম-বয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন,—মেয়েটি যথার্থই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ, সে যে আমাদের ভদ্র-সমাজের নয় তাতে আর সন্দেহ নেই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক'রে জানা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে-কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখনি ফর্সা কাপড় চেয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন তিনি কারও ব্যবহার করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না,—ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেননা ইহার মধ্যে ভদ্র-সমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গির মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায়না। তা'ছাড়া মেয়েদের চোখ কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্য্যন্ত বুঝতে না কি বাকি ছিল না যে মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নিচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয় এঁরও ঠিক তাই হয়েছে।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি ভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে না কি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার কোন বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, যায়গাটা ভাল লাগচে কি না,—প্রশ্ন করার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার কোন চিহ্ন দেখলাম না, না কথায় না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেননা?

আশুবাবু কহিলেন, না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা' বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বোললাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলেনা? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ীর দাসী চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারবোনা, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারবনা। নিজেদের বাড়ীতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেননা, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয়

যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেছেন। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু বলিলেন, তা তো বটেই।

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও এই। সে তো জানে সবই, তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, কহিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেননা, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আশু-বাবু, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন।

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেননা, তেমনি অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন একটা ব্যথার মত লেগেছে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমন ছটফট্ করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির,—শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি কথাও শুনিনি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, না। কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাননা? আমি যে কেউ আছি এ কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, এ তো খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু?

আশুবাবু বলিলেন, না। তার কথা শুনে মনে হল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে। কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেছে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সে সত্যই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, বলুন। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, আমারও তাতে সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে তাকেই বিশ্বের চোখের উপর অনাবৃত করে প্রকাশ করায়? অবিনাশ বাবু আপনি ত অক্ষয় নয়, এ তো আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনি।

অবিনাশ বাবু লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে। তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁহার শেষ হইতে পাইলনা, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্চি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবেনা?

না, মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবেনা মনোরমা?

মনোরমা কহিল, নিশ্চয় পারবো,—চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে, এবং বোধ হয় একসপ্তাহের পূর্ব্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

(৫)

দিন দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা,—বৈকালে নিশ্চয় আসিবেন। আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসি দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল না কি, আসতে না আসতেই জরুরি তলব পাঠিয়েছে যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যে মশাইকে গিলে খেতে চায় না কি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোট গিন্নি কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোট গিন্নী, অমৃত-ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বই কি।

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা'হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত-ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবেনা,—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বেনা।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবেনা মুখুয্যে মশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখ্‌বো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্ম্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত,—ইতিমধ্যে অধীনের দশ দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একেবারে দশ দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

আশুবাবু বলিলেন, প্রথম দশায় আমার ঠ্যাং দুটো শুধু সোজা হয়েছে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপরে, এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন সুরু করেছে।

অবিনাশ কহিলেন, অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে আজ কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা কূলে সমবেত হয়েছেন, এবং হরেন্দ্র অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

অবিনাশ কহিলেন, এবার তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

আশুবাবু বলিলেন, দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করছেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশ্ব উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামতি কার্য্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্ত-প্রায়, এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসি মুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজী কে আশুবাবু? এর কথাই কি একদিন বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বল্‌তে, অন্ততঃ, আপনাকে বল্‌তে কোন বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম হিন্দুমতেই হয়। যথা সময়ে, অর্থাৎ বছর চারেক পূর্ব্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হোতও তাই, কিন্তু হ'লনা। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে সেও এক বিচিত্র ব্যাপার,—বিধিলিপি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন, আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়ে হলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়ীতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়িমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বল্‌লেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারেনা। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে এখন বিবাহ হলে তিনবৎসর তিনমাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থূল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিন্‌তাম্‌, বুঝলাম এর আর নড়-চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড়লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ি ছাড়া সংসারে কেউ ছিলনা। তিনি ভয়ানক রাগ করলেন, অজিত দুঃখে, অভিমানে ইন্‌জিনিয়ারি পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জান্‌লে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হোলাম, হলনা শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বল্‌লে বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এম্‌নিই কি বেশি সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে তো জানি। বোল্‌লাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু, এ সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বল্‌লে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচলা বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোন দিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জান্‌তো। এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্যেও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার যো নেই। কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবেনা। অজিত সর্ব্বাগ্রেই খুড়োমহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতনা।

অতঃপর উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলাত চলে গেলে বছর দুই পর্য্যন্ত তার কোন সম্বাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে না করিনি তা' নয়। কিন্তু মণি হঠাৎ জান্‌তে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বল্‌লে, বাবা, এ চেষ্টা তুমি কোরোনা। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করোনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বোল্‌লাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা, কিন্তু তাই বলে কি—কিন্তু মেয়ের দু চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বল্‌লে, হয়না বাবা। শুধু কথা-বার্ত্তাই হয়, কিন্তু তার বেশি,—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা' লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি কোরোনা বাবা। দুজনের চোখ দিয়েই ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো, বোল্‌লাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর্।

অকস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেননা. তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি, এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেননা, কহিলেন, কিসের?

অবিনাশ কহিলেন, এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে মেম-সাহেব হয়ে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তাদের হৃদয়ে স্থান পায়না। কত-বড় ভ্রম বলুন ত?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু ত জ্ঞান নয়, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অভাব অপরের স্কন্ধে আরোপ কর্‌লেই গোল বাধে। এই যে অজিত। মণি কই?

বছর ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়ে জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য কর্‌ছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেছে তাই বদ্‌লে ফেল্‌তে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সাম্‌নে আন্‌তে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু, শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মণির আস্‌তে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগবেনা। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখবার সময় পাওয়া যাবেনা। তাজমহল দেখে যেন আমার আর সাধ মেটেনা।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ তোমারই দেরি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকি।

ছেলেটি নিজের পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদ্‌লাতে হবেনা, এতেই চলে যাবে।

এই কালি সুদ্ধ ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক্। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে সকল কথা শুনিতেছিলেন তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্ব্বচনীয়,যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাধা-সিধা পোষাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোন খানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা অপরিচিত ক্লান্তি তাহার চোখের দৃষ্টিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল পিতৃ-স্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটর-যানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্য-লুব্ধ নারী ও রূপ-লুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই তাহাদের সাজ-সজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্ব-খ্যাত,অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তাজের সিংহ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

যমুনা কূলে যাহা কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দল-বল ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেক দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে,তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বাত-ব্যাধি-পীড়িত আশু বদ্যি অতি গুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর ন্যস্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ - বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ করগে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগম সাহেবাকে কুর্ণিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাঁকে দিয়ে হবেনা।

মনোরমা ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, সে হবেনা বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারবনা।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবেনা।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন ?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেননা। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ বলিলেন, তা' যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে বস্তুর মর্য্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হোতোনা।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, মনোরমা বলিল, সে হবেনা বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখ্‌তে পেলে এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েই থাক্‌বে। যিনি যত খবরই দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি বাবা, কেউ বেশি জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধই করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল, আশু বাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে !

আশুবাবু উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন্ এলেন শিবনাথ বাবু ? এদিকে আসুন।

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু

তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেননা আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীরও পরিচিত। বোসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না?

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বই কি। উনি আমার, —উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিনকয়েক হল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখ্‌তে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখ্‌লে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা'হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেননা, এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে এখনো দেখেনি, এইবার দেখ্‌বে। কিন্তু আলো কমে আস্‌চে, আর ত দেরী কর্‌লে চল্‌বেনা অজিত।

মনোরমা বলিল, দেরী ত শুধু তোমার জন্যেই বাবা। ওঠো?

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্যে যে আয়োজন করতে হয়।

তা'হলে সেই আয়োজন কর বাবা?

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হল?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইলনা। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে বাবা, ওঠো এইবার।

উঠি, মা। এই বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করা ওঁর সহজও নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এই-খানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিলনা, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা সে হবেনা। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্ম্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন এক মুহূর্ত্তেই তাহাদের কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে।

অবিনাশের চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবেনা। মনোরমার বিশ্বাস, ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করা যাবেনা।

কমল সরল চোখদুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই,—সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিওনে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্ম্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশ-জনকে বাস্‌তেন। হয়ত কিছু বেশি হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিলনা।

তাহার এই ভয়ানক অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিম্বা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থ ই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুননা, মানুষের অন্তরে সে শ্রদ্ধার আসন আর থাকবেনা। চোখে এ একেবারে ছোট হয়ে যাবে।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মূঢ়তা ও অন্ধ-বিশ্বাসের ফল। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভাল বেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম্মকে স্বাভাবিকও ঠেকেনা, সুস্থ সুন্দর বলেও মনে হয়না।

মনোরমার বিস্ময়ের সীমা নাই। ইহাকে মূর্খ দাসী-কন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তিতে তাহার ক্রোধের সীমা রহিলনা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলনা, অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি, মা।

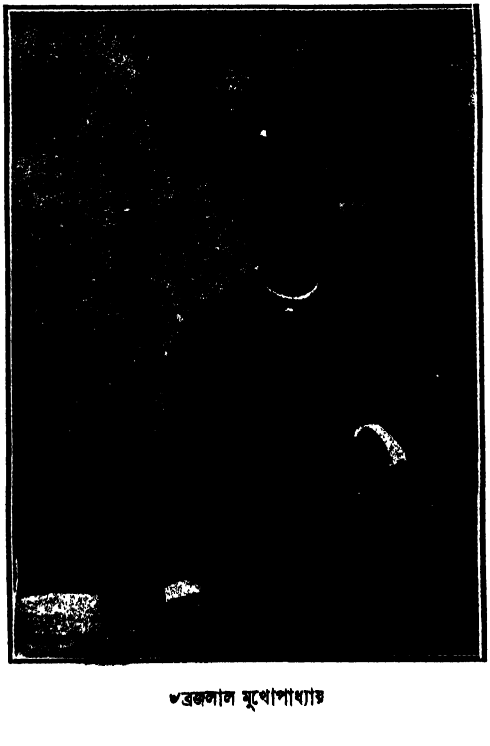
কমল রাগ করিলনা, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারেনা। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যে দিন জানবো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝবো এর শেষ হয়েছে,—এ মরেছে। এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিত বাবুকে তৎক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসিগে।

আশুবাবু খুসি হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি। কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয়, কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

[ক্রমশঃ]

শোক-সংবাদ



৺ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

৺ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, হাইকোর্টের সুযোগ্য ব্যবহারাজীব, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। ব্রজলাল বাবু কিছুদিন হইতেই নানা পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; কিন্তু এত শীঘ্রই যে তাঁহার দেহাবসান হইবে, এ কথা কেহই ভাবিতে পারেন নাই। তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টের এটর্ণী হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট প্রসার হয়। আইন-ব্যবসায়ে নিবিষ্ট হইলেও তিনি তাঁহার অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই। বেদ সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিচয় অনেকেই 'ভারতবর্ষে' পাইয়াছেন; তাঁহার লিখিত 'সোমরস' সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ অনেক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ব্রজলাল বাবু হাইকোর্টের জজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উড্রফ সাহেবের 'শক্তি শাক্ত' নামক বহুগবেষণাপূর্ণ ইংরাজী গ্রন্থের বহুতথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুধী সুপণ্ডিতের পরলোক গমনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি; ভগবান তাঁহার আত্মীয়-স্বজন-গণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

বিগত ১লা ভাদ্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গুরু-ভ্রাতৃবর্গের সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; এবং তদবধি বরাহনগর মঠ, কাশী, হিমালয় প্রভৃতি স্থানে সাধন-ভজন ও তপস্যায় নিরত থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে লণ্ডনে যান। পরে তথা হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর তথায় দক্ষতার সহিত বেদান্ত প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে বেলুড় মঠ স্থাপনে, ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক পদে বৃত হইয়া উহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে, বিশেষ সহায়তা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রারম্ভ হইতেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার পরিচালনা ও প্রসার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নতি ও প্রসার তাঁহারই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল। বিগত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বাংলা মুখপত্র "উদ্বোধনের" সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার গুরুদেবের জীবনের দার্শনিক বিশ্লেষণাত্মক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ নামক জীবন-চরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিগত ৬ই আগষ্ট ১৯২৭ শনিবার সন্ধ্যা ৮৷৷০ ঘটিকার সময় তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়েন ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, দুর্গাপদ ঘোষ এবং শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় অল্পক্ষণ পরে আসিয়া উগ্র সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ একেবারে পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা চলিতে থাকে। কিন্তু কবিরাজী ঔষধ গলাধঃকরণ করা অসম্ভব হওয়ায়, চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়দ্বয় পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে থাকেন।



স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

বিগত শুক্রবার একটু চেতনার লক্ষণ দেখা যায়; কিন্তু বুধবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় পুনরায় ১০০ ডিগ্রি জ্বর উঠে এবং ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইয়া বৃহস্পতিবার ১৮ই আগষ্ট ১লা ভাদ্র রাত্রি ১২টার সময় ১০৫ ডিগ্রি হয়। ক্রমে জ্বরের উপশম কালে রাত্রি ২—৩৫ মিনিটের সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। তৎপর দিন শুক্রবার বেলা ১০টার সময় পুষ্পমাল্যে শোভিত করিয়া সংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহার দেহ বরাহনগর হইয়া নৌকাযোগে বেলুড় মঠে আনা হয় এবং মঠের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে তাঁহার পূত দেহ ভস্মীভূত করা হয়।



পরশুরাম রচিত :: নারদ বিচিত্রিত

চাটুয্যে মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন—রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তিঃ। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন ত সবে সন্ধ্যে।

বিনোদ উকীল বলিলেন—তাই ত, বাসায় ফেরা যায় কি ক'রে।

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন—বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা কোরো। আপাতত এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, বলে আয় ত বাড়ীর ভেতর।

চাটুয্যে বলিলেন—মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—তা' ত হ'ল, কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে। চাটুয্যে মশায়, একটা গল্প বলুন।

চাটুয্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—আর বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম।

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—দোহাই চাটুয্যে মশায়, বাঘের গল্প আর নয়।

চাটুয্যে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের?

—এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল। একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।

—গল্প আমি বলি না। যা বলি, তা সমস্ত নিছক সত্য কথা।

—বেশ ত, একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।

নগেন বলিল—তবেই হয়েচে, চাটুয্যে মশায় প্রেমের কথা বলবেন! বয়স কত হ'ল চাটুয্যে মশায়? ষাট পেরিয়েচে নয়?

—পেরিয়েচে ত হয়েচে কি? এখনো আমি আট গণ্ডা লুচি, আধ সের সন্দেশ খেতে পারি তা জানিস?

নগেন বলিল—অত খাবেন না, ব্লড-প্রেশার বাড়বে।

আপনার উচিত সকালে একটু নিমঝোল, সন্ধ্যেবেলা একটু হরিনাম। প্রেমের আপনি জানেন কি? সব ভুলে মেরে দিয়েচেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো?

—তরুণ কি রে বাপু? সোজা বাংলায় বল চ্যাংড়া। তিন কুড়ি বয়েস হ'ল, কেদার চাটুয্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!

বিনোদবাবু বলিলেন—আঃ হা, কেন ব্রাহ্মণকে বিরক্ত কর, শোনোই না ব্যাপারটা।

চাটুয্যে বলিলেন—বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েচে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুয্যে। যথা, বঙ্কিম চাটুয্যে, শরৎ চাটুয্যে।

—আর?

—আর এই ক্যাদার চাটুয্যে। কেন বলব না? তোমাদের ভয় করব নাকি?

—যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।

চাটুয্যে মশায় আরম্ভ করিলেন—আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলুম।

নগেন বলিল—এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?

বিনোদ বলিলেন—একই কথা।

চাটুয্যে বলিলেন—ওরে মুখ্যু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মুঙ্গেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুণ্ডলার এদিকে। যাক, ঘটনাটা শোনো।—

গেল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বল্লে তার ছোট মেয়েটিকে টুণ্ডলায় রেখে আসতে,—জামাই সেখানেই কর্ম্ম করে কিনা। সুবিধেই হ'ল, পরের পয়সায় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটাকে ত নির্ব্বিবাদে পৌঁছিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুণ্ডলা ষ্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলার্দ্ধ যায়গা নেই, আগ্রার ফেরৎ একপাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস বেঞ্চি দখল করে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গার্ডকে বলে' কয়ে আমায় এক ফার্ষ্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে। গাড়িও তখনি ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াসায় চারদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা। কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি করে' দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিৎপাত হয়ে চোখ বুঁজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি বলচে। দু বেঞ্চির মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মুখ গুঁজে ঘুমুচ্চে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্চে। এধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামী বিছানা পাতা, তার ওপর একটা অপরূপ পোষাক,—বোধ হয় ভাল্লুকের চামড়ার,—আর নানা রকম অদ্ভুত জিনিষ-পত্র ছড়ান রয়েচে। গাড়ি চলচে, পালাবার উপায় নেই। বেঞ্চির শেষদিকে একটা চেয়ারের মতন যায়গা ছিল, তাইতে বসে' দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনো গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু করে' মনে সাহস এল।

হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্ত্তি। দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেচি, কিন্তু এমন সামনা-সামনি দেখবার সুযোগ কখনো ঘটেনি। মুখখানি দুধে-আলতা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মার্ব্বেলে কোঁদা আজানু-লম্বিত দুই বাহু। গোস্ত ঘাড় ছাঁটা, কেবল কাণের কাছে শণের মতন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়-হাতি গামছা—

বিনোদবাবু বলিলেন—গামছা নয় চাটুয্যে মশায়, ওকে বলে স্কার্ট।

—কাঠ-ফাঠ জানিনে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঘিপোতার গামছা খাটো করে' পরা, তার নীচে নেমে এসেচে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েচি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম,—হাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচা ছোলা, কোথাও একটু উঁচু-নীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একবারে জ্বলন্ত হাউইয়ের কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হ'ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্লুম—সেলাম মেমসায়েব।

ফিক করে' হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বল্লেন—গুড্ মর্ণিং।

মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতন চঞ্চল ভঙ্গিতে এসে বেঞ্চে বসলেন, আমি কাঁচু-মাচু হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বল্লেন --সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েচেন, আর আমায় মারে কে। ইংরিজি ভাল জানি না, হিন্দি ইংরিজি মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকার-প্রবেশ করেচি, অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে; মেমসায়েব যেন কসুর মাফ করেন। মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের বসে' পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসায়েব আমার পাশে বসে' একটু দাঁত বার করে' আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কেদার চাটুয্যেকে সাপে তাড়া করেচে, বাঘে পেছু নিয়েচে, ভূতে ভয় দেখিয়েচে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েচে, পুলিস-কোর্টের উকীল জেরা করেচে, কিন্তু এমন অবস্থা কখনো ঘটেনি। ষাট বছর বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয়নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে' লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনী করে দিলে। থাকতে না পেরে বল্লুম—মেম সাব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু ক'রে হেসে বল্লেন—কুছ নেহি, নো অফেন্স। তুম কোন্ হায় বাবু?

আমার আত্মমর্য্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সং না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে' বল্লুম,—আই কেদার চাটুয্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু হু করে হেসে বল্লেন—বেঙ্গলী?

আমি সগর্ব্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাষ্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার করে' বল্লুম—সি? আপ কোন হায় ম্যাডাম?

বিনোদবাবু বলিলেন—ছি চাটুয্যে মশায়, মেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ওটা যে এটিকেটে বারণ।

—কেন করব না? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই বা ছাড়ব কেন। মেম মোটেই রাগ করলেন না, জানালেন তাঁর নাম জোয়ান জিল্টার, নিবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্ব্বেও ক'বার এসেছিলেন, ইণ্ডিয়া বড় আশ্চর্য্য যায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা কারা?

মেমটি বড়ই সরলা। বেঞ্চির উপরের ঢ্যাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বল্লেন—ঘ্যাট চ্যাপি হচ্চেন টিমথি টোপার, নিবাস কালিফোর্ণিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্চেন, উনি হচ্চেন কুংফার কলম্বস ব্লটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এঁরও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বল্লেন—সে অন্য লোক। এঁরা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। দেশটা একদম শুখিয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া কিছুই মেলে না। তাই এঁরা দেশত্যাগী হয়ে খাঁটি জিনিসের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্চেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিষ্ট?

মেম বল্লেন—ভেরি।

এমন সময় ঢ্যাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কট্‌মট্ করে চেয়ে আমার দিকে ঘুঁসি তুলে বল্লে—ইউ-ইউ গেট আউট কুইক। বেঁটেটাও হঠাৎ হাত পা ছুঁড়তে সুরু করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ঠক ঠক করে' ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালক-মোড়া চটি জুতো তুলে নিয়ে ঢ্যাঙার দুই গালে পিটিয়ে আদর করে বল্লেন—ইউ পগ্, ইউ পগ্। বেঁটেটাকে লাথি মেরে বল্লেন—ইউ পিগ, ইউ পিগ। দুটোই তখনি আবার হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বুকের ওপর এক-এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বল্লেন—ভয় নেই বাবু।

ভরসাই বা কই? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দুকে পূরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বুকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্তুর জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেচে রে। এই মেমসায়েব দু-দুটো দৈত্যের ঘাড়ে চড়ে বেড়াচ্চে, এখনি নিশ্চয়ই আংটির মালা গ্রহণ করবে।

যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই। আমার হাতে একটা

পো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বল্লেন—হাউ লভ্‌লি! দেখি বাবু কি রকম আংটি।

হরে রাম! এ যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি, —হায় হায়, এই ম্লেচ্ছ মাগী সেটাকে অপবিত্র করে দিলে! আমার চোখ ছল ছল করে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব



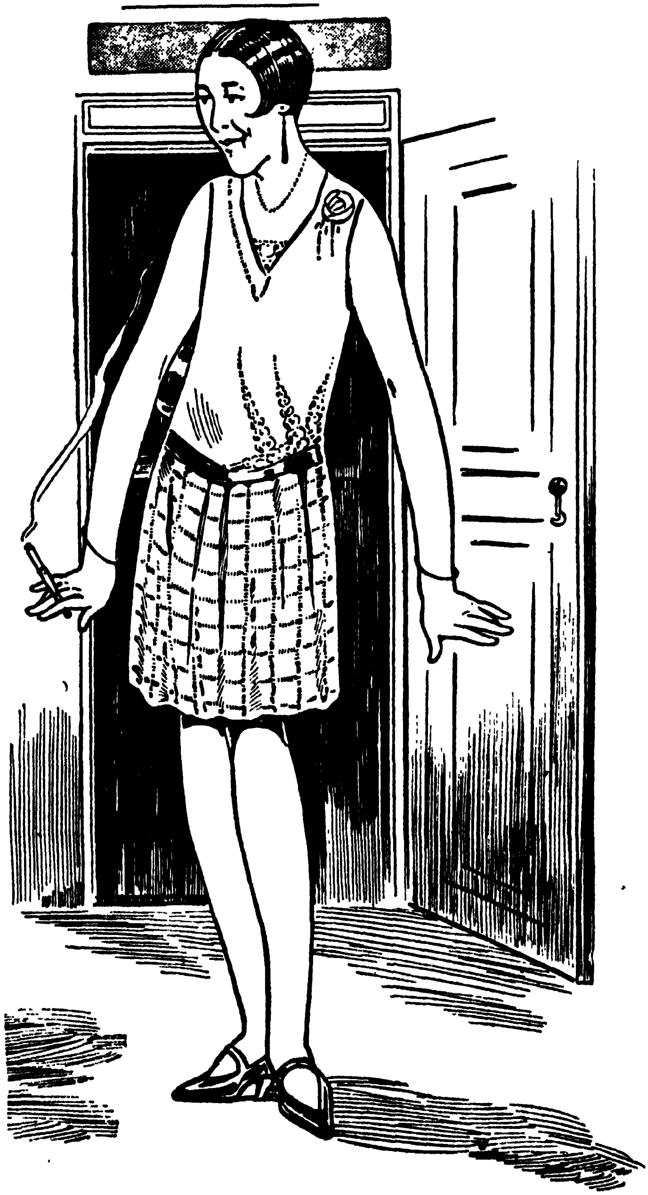
দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেচি

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুল-হাড়া অন্তর করাচ্ছি। মেম ফস করে আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বল্লেন—বিউটিফুঃ!

হ'ল। বল্লুম—মেমসায়েব, আপকা আর কয়ঠো আংটি হ্যায়? নাইন্টিনাইন?

মেম বেঞ্চির তলা থেকে একটি তোরঙ্গ টেনে এনে তা

থেকে একটি অদ্ভুত বাক্স খুলে আমাকে দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেরাজের পর দেরাজ, কোনোটায় গলার হার, কোনোটায় কাণের দুল, কোনোটায় আর কিছু।



কিন্তু এমন সামনা-সামনি—

একটা আংটির ট্রে,—তাতে কুড়ি-পঁচিশটা হবে,—আমার সামনে ধরে' বল্লেন—বেটা খুশী নাও বাবু।

আমি বল্লুম—সে কি কথা। আমার আংটির দাম মোটে ন-শিকে। আমি ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেরি হোলি আংটি।

মেম বল্লেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার। কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নি, আমার উপহারও তোমার ফেরৎ দেওয়া উচিত নয়। এই বলে' একটা চুনীর আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বল্লুম—থ্যাঙ্ক ইউ মেমসায়েব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট। মনে মনে বল্লুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণি, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

ট্রেন এটাওয়ায় এসে পৌঁছুল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখম নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেঁটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বল্লেন—গেট অপ টিমি, গেট অপ ব্লটো। তা'রা বুনো শূয়ারের মতন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি বল্লে শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম এখনো তাদের ওঠবার অবস্থা হয়নি। মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি, তুমি খাবে? আপত্তি নেই ত?

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটাও খুব পড়েচে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্ঠে বসে' শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ নাস্তি। বল্লুম—ম্যাডাম লক্ষ্মি, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক।

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলি-গোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালী তেমনি চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চাটুয্যে তরিবৎ করে' চা খেতে শেখেন নি, সর্দ্দি-টর্দ্দি হলে আদা-নুন দিয়ে খেতেন,—তাতেই লিখতে পেরেচেন বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেচে,—ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল,—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে, তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই,—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটু ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, আর দুধারে দুই তরুণ-তরুণী। ভাগ্যিস বয়েসটা ষাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম।

মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসায়েব, এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্চেন, এঁরা দুজনেই ত আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন্ ভাগ্যবানটিকে বরণ করবেন?

মেম বল্লেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনো মনস্থির করতে পারিনি। কখনো মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র, বেশ লম্বা সুপুরুষ, আমাকে ভালও বাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ ব্লটো, যদিও বেঁটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েচে, কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর বড় নরম মন। একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মুস্কিলে পড়েচি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হোক এখনো ক'ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পৌঁছবার আগেই স্থির করে ফেলব। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত।

বল্লুম—মেমসায়েব, আপনি এঁদের স্বভাব চরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধ হয় দুটিই অতি সুপাত্র। তবে কিনা এঁরা যে রকম বেহুঁস হয়ে আছেন—

মেম বল্লেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আমি বল্লুম—আপনার নিজের যদি কোনোটির ওপর বেশী ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না?

মেম বল্লেন—আমার বাপ-মা নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ করে' দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরায়ে নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুঁড়ে চিৎ-উপুড় দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েচ তখন তার দরকার নেই।

ব্যবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্য্যন্ত বিস্তর বর কনে ঠিক করে' দিয়েচি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র-দেখার ভার কখনো পাইনি। দুজনেই ক্রোরপতি, দুটোই পাঁড়-মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েচে। বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েচি তা শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মি, মাথা যখন আগেই মুড়িয়েচ, তখন বাকী কাজটুকুও সেরে ফেল।—এই দু ব্যাটা ভাবী স্বামীকে ঝেঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হয়ে এল। এর পরেই একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা ছোট হাজরি খেতে খানা-কামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাওর হয়নি, এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুঝলুম রংটি কাঁচা। মেম একটি সোণার কৌটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরসি, একটি লাল বাতী, একটি পাউডারের পুঁটুলি। লালবাতী ঠোঁটে ঘসে' নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত করে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বল্লেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাষ্ট খেতে চল্লুম। টিমি আর ব্লটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন! প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন। ততক্ষণ মরি আর কি! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

ঢ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেচে। হাই তুল্লে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকালে। আমার দিকে একবার

কট্‌ মট্‌ করে চাইলে, কিন্তু কিছু বল্লে না। টলতে টলতে বাথরূমে গেল।

তখন ঢেঁটেটা তড়াং করে' উঠে কোলা ব্যাঙের মতন

আমি সাহস পেয়ে বল্লুম—সেলাম হুজুর।

—আমার দশকোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়—



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

থপ করে' আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বল্লে—গুড মর্ণিং সার, আমি হচ্ছি কৃষ্টকার কলম্বস ব্লটো।

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

ব্লটো আমার বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বল্লে—লুক হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিস দেবো।

—কেন হুজুর?

—মিস জিলটারকে তোমার রাজি করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেচি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্ট্রাকর্ত্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও অতি পাজী লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাঁড়-মাতাল, পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে মিস জিল্‌টার মনের দুঃখে মারা যাবেন।

এই বলে' ব্লটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বল্লে—বাবু, তুমি জন্মান্তর মানো?

—মানি বৈ কি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি। আমরা দুটিতে—

এমন সময় বাথরুমের দরজা নড়ে উঠল। ব্লটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইসারা করেই ফের নিজের যায়গায় শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ঢ্যাঙা সায়েব—মেম যাকে টিমি বলে,—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাট হয়ে বসল। তখন ব্লটো জেগে ওঠার ভাণ করে' হাই তুল্লে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। ব্লটো ঘরে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি আগে থাকতেই বল্লুম—গুড মর্ণিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বল্লুম—উঃ।

টিমি বল্লে—তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

ভয়ে ভয়ে বল্লুম—ইয়েস সার।

—তোমার থেঁৎলে জেলি বানাবো।

—ইয়েস সার।

—মিস জোয়ান জিল্‌টারকে আমি বিয়ে করবই। আমি সমস্ত শুনেচি। যদি আমার হয়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানী, পঁচিশটা শুঁটকী শুয়োরের কারখানা। ব্লটোর কি আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকায়। ব্লটো একটা হতভাগা মাতাল বেঁটে বজ্জাত—

ব্লটো বোধ হয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুঁসি তুলে বল্লে—কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বেঁটে বজ্জাত?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগাল হিন্দিতেই ভাল রকম জমে। হিন্দি গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশী তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিতি গাল শুনো,—বিশেষ করে মার্কিনি গাল। এক-একটি লবজ যেন তোপ, কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরিজি আমি ভাল জানি না, সব গালাগালের অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছুমাত্র বাধা হয়নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্ব্বল,—তারা বাক্‌যুদ্ধ বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। দু মিনিট যেতে না যেতেই হাতাহাতি আরম্ভ হল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলুম, গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাইনি।

হন হন করে মেমসায়েব এসে পড়ল। এই গজকচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ? বল্লে—টিমি ডিয়ার, ডোণ্ট্‌—ব্লটো ডারলিং, ডোণ্ট্‌—প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট্‌। কিছুই ফল হ'ল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফাষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনো খানা খাচ্চে। কাকে বলি? ওই যে—একটা সাদা ফ্লানেলের পেণ্টুলুন-পরা সায়েব প্লাটফর্মে পাইচারি করে শিস দিচ্চে। হন্ত-দন্ত হয়ে তাকে বল্লুম—কম্‌ সার, লেডির মহাবিপদ। সায়েব হুশ্‌ করে একটি জোর শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু ব্যাটাকেই পিটছিলেন। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানে ঝুটোপাটি করচে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হেলো জোয়ান, ব্যাপার কি? মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন। সায়েব টিমি আর ব্লটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ্‌, কি ঘুঁসির বহর! টিমি ঠিকরে গিয়ে দরজায় মাথা

ঠুকে পড়ে’ চতুর্দ্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগল। ব্লটো কোঁক করে’ বেঞ্চির তলায় চিৎপাত হয়ে পড়ল। বিলকুল ঠাণ্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বিখ্যাত মিষ্টার বিল



হাতাহাতি আরম্ভ হ’ল

বাউণ্ডার, খুব ভাল ঘুঁসি লড়তে পারেন। আর ইনি মিষ্টার চ্যাটার্জি, ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড।

সায়েব আমার মুখখানা দেখে বল্লে—সম্ বিয়ার্ড!

মেম বল্লেন—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সায়েব আমার হাতটা খুব করে’ নেড়ে দিয়ে বল্লে—হা-ডু-ডু। বেশ শীত পড়েছে নয়?

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেম-সায়েবকে চুপি চুপি বল্লুম—দেখুন মিস জোয়ান, অত গোল-মালে কাজ কি? টিমি আর ব্লটো দুজনেই ত কাবু হয়ে পড়েচে। আমি বলি কি—আপনি এই বিল সায়েবকে বিয়ে করুন। খাশা লোক।

মেম বল্লেন—রাইটো! আমার একথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি। আই সে বিল, আমার বিয়ে করবে।

বিল বল্লে—র‍্যাদার! কে বলে আমি করব না? রাধামাধব! সায়েব জাতটা ভারি বেহায়া। বিলকে



ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক

বাধা দিয়ে বল্লুম—রোসো সায়েব, এক্ষুনি ও-সব কেন। আমি হচ্ছি কন্যাকর্ত্তা—ব্রাইড মাষ্টার। তোমার কুল-শীল আগে জেনে নি, তারপর আমি মত দেবো।

বিল বল্লে—আমার ঠাকুর্দ্দা ছিলেন মুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন। আমি বল্লুম—তাতে কুলমর্য্যাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিসেব করে বল্লে—মিনিটে দশ হাজার,

বণ্টায় ছ লাথ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তাঁর পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভর্ত্তি,তাতে তিমি মাছ কিলবিল করচে।

বল্লুম—থাক, আর বলতে হবে না, আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্ব্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু ষ্টাইল।

কিন্তু ধান-দুর্ব্বো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশী মদ টদ খেও না, তা হ'লে ব্রহ্ম-শাপ লাগবে। সায়েব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বল্লুম—মা লক্ষ্মি, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক। বীরপ্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা,—ও আশীর্ব্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যেই তোলা থাক। তুমি আর গরীব



নাচ সুরু করে' দিলে

বল্লুম—এই কুলি, জল্‌দি থোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পয়সা মিলেগা।

ইংরিজি আশীর্ব্বাদ ত জানি না। বল্লুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সায়েবের মাথায় এক মুঠো ঘাস দিয়ে বল্লুম—বেঁচে থাক। ধন ত যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সঙ্গে দিলুম। কালা আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,—গুটিকতক শান্ত শিষ্ট কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু করে' আমার সেই পাঁচ-দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর—

বিনোদবাবু বলিলেন—আ ছি ছি ছি।

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—হুঁ, দেবী চৌধুরাণীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।

—আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, আপনার কাণের ডগাটি তখন কি রকম বর্ণ ধারণ করলে ?

—স্নিগ্ধ শ্যাম। আরে, ঐ হ'ল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম করেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে।

চাটুয্যে মশায় বলিতে লাগিলেন—তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর বেঁটে মুখ চুণ করে' নেমে যাচ্চে, জন-দুই কুলি তাদের মাল-পত্র নামাচ্চে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোয়ান হাত ধরাধরি করে' নাচ সুরু করে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

জোয়ান বল্লে—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গুম্ হয়ে বসে থেক না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বল্লুম—মাদার লক্ষ্মি, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি।

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে—। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এই রকম চল্ল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বল্লে কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিনদিন পরে গ্রাণ্ড হোটেলে অতিঅবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যাণ্ড, বিস্তর অনুরোধ, তারপর নেমে কাশীর গাড়ি ধরলুম।…পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।

বিনোদবাবু বলিলেন—আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, গিন্নি সব কথা শুনেচেন ?

—কেন শুনবেন না। সতী লক্ষ্মী, তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েচে। তোমাদের নবীনাদের মতন অবুঝ নন যে অভিমানে চৌচির হবেন। আমি বাড়ী ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেচি।

—চাটুয্যে-গিন্নি শুনে কি বল্লেন ?

—তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বল্লেন—দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা করে' চেঁচে! তারপর সেই চুনীর আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন।

—বৌভাতের ভোজটা কি রকম খেলেন ?

—সে দুঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানসামা বল্লে—বিয়ের পরদিনই মেম পালিয়েচে, সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।

আমার তীর্থ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

চাকুরি করি কলিকাতার বে-সরকারী স্কুলের হেড-মাষ্টারী। মাইনে এখন—এই চার বৎসর হোলো নব্বই টাকা পাচ্ছি। এর আগে সাত বৎসর সত্তর টাকাতেই কাটিয়েছি। তখন কতবার স্কুলের কর্ত্তাকে মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য কত আবেদন নিবেদন করেছিলাম। তখন তাঁর দয়া হয় নাই। চার বছর আগে আমাদের স্কুলের একটী ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। স্কুলের কর্ত্তা মহাশয় সেই সংবাদ পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে একেবারে দাতাকর্ণ হয়ে পড়েছিলেন, তাই এক দমে আমার মাইনে কুড়ি টাকা বেড়ে গেল। কিন্তু, তখন আর আমার মাইনে বেশীর দরকার ছিল না—এখনও নেই। সে দরকার, সে অভাব আজ চার বছর হোলো মিটে গিয়েছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে আমার বাড়ী,—ভাড়াটে বাড়ী নয়, নিজের বাড়ী। সংসারে এখন আমি আর আমার সহধর্ম্মিণী। চার বছর আগে আরও একজন আমার ছিল; সে আমার একমাত্র ছোট ভাই নরেশ।

নরেশ আমাদেরই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাকে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলাম। আমার আয় তখন সত্তর টাকা মাত্র। তাতে কি চলে? নরেশের কলেজের বেতন বারো টাকা দিতে হোতো; একটী ফণ্ডে মাসে এগার টাকা

দিতাম,—আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবেন মাসে ত্রিশ টাকা পাবেন ব'লে এই টাকা দিতাম—এখনও দিই। বাড়ীখানি নিজের তাই রক্ষা। তা হ'লেও মিউ-নিসিপাল ট্যাক্স্ প্রতি তিনমাস অন্তর পনর টাকা দিতে হোতো—এখন আরও বেড়েছে। এতেই আটাশ টাকা বেরিয়ে যেতো; অবশিষ্ট চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকায় সংসার চালাতে হোতো। বাড়ীতে চাকর কি ঝি রাখবার সঙ্গতি ছিলনা, আমরা দুই ভাইয়েই হাট-বাজার করতাম, আমার স্ত্রী সংসারের সব কাজ করতেন। দুই ভাই এই কাশীপুর থেকে প্রত্যহ হেঁটে কলিকাতায় যেতাম আস্তাম, গাড়ী-ভাড়া দেবার সামর্থ্য ছিল না।

নরেশ আই-এ পাশ করল প্রথম বিভাগে; প্রবেশিকা-তেও বৃত্তি পেল না, আই-এ পাশও তেমন ভাল হয়ে করতে পারল না। তবুও আমি তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজেই রাখলাম। যত কষ্টই হোক না, এক বেলা যদি খেতে হয় সেও স্বীকার, তবুও নরেশকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য কলেজে দেব না। যে আশা করে এত কষ্ট স্বীকার করেছিলাম, ভগবান সে আশা আমার পূর্ণ করেছিলেন; বি-এ পরীক্ষায় নরেশ ইংরাজী সাহিত্যে অনারে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। তখন আর আমায় পায় কে? আমি স্থির করলাম, আর দুটো বছর গেলেই নরেশ এম-এ পাশ করবে; সে পরীক্ষাতেও সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার নিশ্চয়ই করবে। তখন সে অনায়াসে একটা ভাল প্রফেসারী জুটিয়ে নিতে পারবে। তার উপার্জ্জনের টাকা আর খরচ করব না,—জমিয়ে রাখব। বাড়ীটা বড় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকলের আগে হয় বাড়ীটা একেবারে ভেঙ্গে ফেলে আর একটা ঐ রকম ছোটখাটো বাড়ী তৈরী করব, আর না হয় এই বাড়ীটাকেই বেশ ভাল করে জীর্ণ-সংস্কার করব। বাড়ীটা ছোট;—তা হোক না। আমার ত সন্তানাদি নেই। বাড়ী ঠিক হয়ে গেলে নরেশের বিয়ে দেব। মনের আনন্দে এই সব কল্পনা করে আমার তখনকার দৈন্য ঢেকে দিতাম।

দু বছর কেটে গেল—এত কাল যেমন করে কেটেছে, তেমনই করেই কেটে গেল। রমেশ এম-এ পরীক্ষা দিল। সে বলল, তার ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট নেয় কে? শুনে প্রাণে বড়ই আনন্দ হোলো। যাঁর প্রিয়তম একমাত্র ছোট ভাই আছে, তিনিই বুঝতে পারবেন, আমার মনে তখন কি আনন্দ হয়েছিল। রমেশ যখন তিন বছরের তখন আমাদের বাবা মারা যান। মা যে কি কষ্টে আমাদের মানুষ করে-ছিলেন, তা আমি জানি। আমি যে বছরে বি-এ পাশ করলাম, সেই বছরেই মা মারা গেলেন। আমি মাষ্টারী নিলাম, বন্ধু-বান্ধবের আগ্রহে বিবাহও করলাম। তার পর কি ক'রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেছি, রমেশকে পড়িয়েছি, সে কথা আগেই বলেছি।

এম-এ পরীক্ষা শেষ হবার তিন দিন পরেই রমেশের জ্বর হোলো। প্রথমে সামান্য জ্বর। মনে করলাম দুই এক দিনেই সেরে যাবে। তৃতীয় দিনে জ্বর খুব বেড়ে উঠ্‌ল। ডাক্তার নিয়ে এলাম। ডাক্তার বল্‌লেন ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে—অবস্থা খুব খারাপ। সেই রাত্রেই প্রলাপ আরম্ভ হোলো; আর কোন কথা সে বলে না, সুধু বলে "আমার ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট নেয় কে?" তাড়াতাড়ি সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লাম। তিনি পরীক্ষা করে বল্‌লেন, আর কোন উপায় নেই—কেস হোপলেস্!

তাই হোলো। রাতটা পোহাতেও পারল না—শেষ রাত্রিতেই জীবনের সম্বল, আমার দরিদ্রের আশ্রয়-দণ্ড, আমার পিতামাতার গচ্ছিত রত্ন, আমার সোণার রমেশ চির-নিদ্রায় অভিভূত হোলো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পনর মিনিট পূর্ব্বেও ধীরে ধীরে বলেছিল—"দাদা, ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট!"

নরেশের এই অকাল-মৃত্যুতে আমার সকল আশা-ভরসা নির্ম্মূল হয়ে গেল; আমার স্ত্রী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন; তাঁর শরীরের তিনভাগ বল যেন কমে গেল। বিবাহের পর থেকে এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের জন্যও তাঁর মাথা পর্য্যন্ত ধরে নাই—অন্য অসুখ ত দূরের কথা। এমন যে তাঁর স্বাস্থ্য, তার চিহ্নমাত্রও তাঁর দেহে থাকল না, তিনমাসের মধ্যে তাঁর বয়স যেন দশ বছর এগিয়ে গেল। আগের মত সংসারের সমস্ত কাজ করবার তাঁর শক্তি রইল না। আমি তখন তাঁকে বল্‌লাম "তোমার যে রকম শরীরের অবস্থা হয়েছে, তাতে সংসারের সব কাজ যদি তুমি আগের মত করতে থাক, তাহলে তোমাকেও আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না। আমি বলি কি, একটা বামুন আর একটা চাকর রাখি। তুমি বিশ্রাম কর।"

তিনি বল্‌লেন "তা কি করে হবে? দুটী লোক রাখা কি

সহজ কথা? তাদের মাইনে আর খেতে দিতে কম করে হলেও মাসে চল্লিশ টাকার কমে হবে না।"

আমি বল্‌লাম "তা হোক্। আমার নব্বই টাকা মাইনেতে কুলিয়ে যাবে।"

আমার স্ত্রী বল্‌লেন "না, না, অত খরচ করে কাজ নেই। দুটী মানুষের সংসার, আমি চালিয়ে নিতে পারব। আমার জন্য এত খরচ করে কাজ নেই; বিশেষ, জানা নেই শোনা নেই, গলায় একগাছি পৈতে দেখেই তার হাতে খেতে আমার প্রবৃত্তি হবে না। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, আমার মরণ নেই; অদৃষ্টে আরও অনেক ভোগ আছে।"

আমি বল্‌লাম "আচ্ছা রাঁধবার লোক না হয় নাই রাখলাম; একটা চাকর রেখে দিই; হাটবাজার করা আমার আর ভাল লাগে না। কার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে যাব? একটা চাকরই রেখে দিই। আর সে সুবিধাও হয়েছে। আমাদের এই বিপদের সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চাকর নিমাই আপনা হতে এসে আমাদের কত কাজ করে গিয়েছে। সে দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বল্‌ছিলেন, তিনি আর এখানে থাক্‌বেন না, বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এই মাসেই কাশীবাস করতে যাবেন। নিমাইকে তিনি কাশী নিয়ে যেতে চান না, তাঁর অবস্থায় কুলোবে না। আমি বলি নিমাইকেই রাখি। মাসে নয় টাকা মাইনে দিতে হবে, আর খেতে দিতে হবে।"

আমার স্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। নিমাইকে বল্‌তে সেও স্বীকার করল। কিছুদিন পরেই আমাদের বাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হোলো। দু দশ দিন যেতেই বুঝতে পারলাম, তার মত বিশ্বাসী ও অনুগত লোক সহজে মেলে না। এই চার বছর তাকে দেখে আস্‌ছি, সে কোন দিন একটী পয়সাও উপরি উপার্জ্জন করে নাই। এমন লোক যে আছে, তা আমি জানতাম না!

নিমাই আমার ভৃত্য; কিন্তু কোন দিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই তার বাড়ী কোথায়, তার কে আছে, তার সংসার চলে কি করে; অথচ সে আমাদের জন্য প্রাণপণে খাটে।

কিন্তু, আমি কোন দিন এ সব কথা জিজ্ঞাসা না করলেও আমার স্ত্রী সব কথা শুনেছিলেন। তিনি যে গৃহলক্ষ্মী; আমাদের মত হৃদয়হীন তাঁরা হতে পারেন না। লোকের সুখ দুঃখে সহানুভূতি তাঁরা যেমন দেখান, আমরা তার সামান্য এক অংশও পারিনে। আমার স্ত্রীই একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, নিমাইয়ের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, ঝাড়গ্রামের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে। বাড়ীতে তার স্ত্রী আর একটী মেয়ে আছে। তার বিঘে পাঁচ-ছয় জমি আছে। সে ত বিদেশেই বারো মাস থাকে। তার এক খুড়োর ছেলে আছে; সে দেশেই থাকে। অন্ন পৃথক হলেও সেই নিমাইয়ের জমিটুকু দেখে-শোনে, চাষ করে; যা ধান হয়, তার কিছু বেচে জমিদারের খাজনা দেয়; যা অবশিষ্ট থাকে তাইতে কোন রকমে একবেলা খেয়ে চলে। নিমাই মাসে মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠায়; বছরে একবার দুবার যায়। এই বিবরণ বর্ণনা করে আমার স্ত্রী বল্‌লেন "শুনেছি, যেবার অজন্মা হয়, সেবার নিমাইয়ের বৌ, মেয়ের ভারি কষ্ট হয়। গরীব মানুষ, উপায় কি?"

* * * *

ভাদ্র মাসে একদিন বিকেল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হোলো—সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। আমাদের পাড়ার সব রাস্তা জলে ডুবে গেল। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। রাস্তায় যে সব আলো ছিল, তারও অনেকগুলো নিবে গিয়েছে; দুটো একটা অমনি কোন রকমে জ্বল্‌ছে।

আমি আমার বাইরের ঘরের জীর্ণ তক্তপোষের উপর একটা মলিন বালিস আশ্রয় করে আধা-বসা আধা শোয়া অবস্থায় সুদীর্ঘ জীবনের সুখ দুঃখের কথা ভাবছি; গৃহিণী তখনও রন্ধনশালায়। এমন সময় নিমাই এসে আমার তক্তপোষের সম্মুখে চুপ করে বসল। তার বস্‌বার ভাব দেখেই আমি বুঝতে পারলাম সে যেন কি বল্‌বার জন্য এসেছে।

আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "নিমাই, অমন করে বস্‌লে যে? কোন কথা আছে?"

নিমাই মাথা নিচু করে বল্‌ল "বড় বাবু, আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে।"

আমি বল্‌লাম "কি তোমার কথা।"

নিমাই বল্‌ল "আমাকে দিন পনেরোর ছুটি দিতে হবে; একবার বাড়ী যেতে হবে।"

আমি বল্‌লাম "কবে যেতে চাও। পনেরো দিনের ছুটী! এর আগে ত কখন এত বেশী দিন বাড়ীতে থাক নেই।"

নিমাই বল্‌ল "অনেক দিন দেশে যাইনি, তাই। আর

একটু দরকারও আছে। এই মাসের দুই এক দিন থাকতে যেতে চাই।"

আমি বললাম "তাই ত, আমাদের শরীর ভাল নেই; মনে করেছি এই পূজার ছুটীতে ওঁকে নিয়ে একটু পশ্চিমের দিকে বেড়াতে যাব।"

নিমাই বলল "কবে যাবেন বাবু?"

"এই আশ্বিন মাসের তেরই চোদ্দই যাব মনে করেছি।"

নিমাই বলল "তেরই চোদ্দই যাবেন ত? তার দুই এক দিন আগেই আমি যে ক'রে হোক কাজকর্ম্ম সেরে চ'লে আসতে পারব।"

আমি বললাম "বেশ। বাড়ীতে কথাটা বলেছ নিমাই?"

নিমাই বলল "আজ্ঞে এখনও বলি নাই। আপনার হুকুম হোলো, এখন মা ঠাকরুণকে বলব।" এই কথা বলেই সে চুপ করে আঙ্গুলে কি যেন গণনা করতে লাগল। তার পর বলল "আপনারা ত তেরই চোদ্দই যাবেন। আমি দশ তারিখে এসে হাজির হব। অন্যবারে দেশে গিয়ে পাঁচছয় দিনের বেশী থাকি নাই; সুধুই মনে হোতো মা-ঠাকরুণের শরীর খারাপ, তাঁর কষ্ট হচ্চে; তাই তাড়াতাড়ি আস্‌তাম। এবার একটু কাজে আটক হ'তে হবে, সেই জন্যই দিন কয়েক বেশী ঘরে থাকৃতে হবে। আমি দশ তারিখে ঠিক আস্‌ব।"

আমি বললাম "তাই কোরো। তুমি এলে তবে আমরা যাওয়ার ব্যবস্থা করব। তা হ'লে কবে তুমি যাবে?"

নিমাই বলল "আজ হোলো মাসের কুড়ি তারিখ। ও-মাসের তিন তারিখে দিন ঠিক হয়েছে। আমি এই মাসের তিন চার দিন থাকৃতে গেলেই হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কিসের দিন ঠিক করেছ?"

নিমাই বলল "বাবু, আমার একটী মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে আসছে মাসের তিন তারিখে দেব মনে করেছি।"

আমি বললাম "তোমার মেয়ের বিয়ে! আশ্বিন মাসে কি বিয়ে হয়?"

নিমাই বলল "আমার ভাই পো নসীরাম লিখেছে যে, মেয়ে বড় হোলে সকল মাসেই বিয়ে হ'তে পারে, পুরুত মশাই সেই কথাই বলেছেন। নসী লিখেছে, আশ্বিন মাসের তিন তারিখে কাজ না করলে ছেলের বাপ অন্যখানে ছেলের বিয়ে দেবে। আমি ত আর ঘরে যাইনি, নসীরামই সব ঠিক করেছে।"

"তোমার মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হবে নিমাই?"

নিমাই বলল "আমি গরীব মানুষ, সে কথা তারা জানে। তারা দয়া করে মেয়েটা নিচ্ছে; তারা কিছুই নেবে না। তা হ'লেও আমার ত আর ছেলেমেয়ে নেই, তাই নসী লিখেছে, যেমন করে হোক, কিছুও যদি না করি, তা হোলেও দেড়-শ টাকার কমে হবে না।"

আমি বললাম "এত টাকা কি তুমি জমাতে পেরেছ?"

নিমাই আমার মুখের দিকে চেয়ে সজল নয়নে বলল "বাবুজি, কি করে টাকা জমাব। মাসে নয় টাকা মাইনে পাই। তাতে এখন আর দুটো মানুষের চলে না। এই তিন বছর জমিতে যে ধান হয়েছে, তা বেচে জমিদারের খাজনাটাও কুলোয় নেই। সবই কিনে খেতে হয়েছে। কোন রকমে একবেলা আধপেটা খেয়ে দুটো মানুষের চলছে; টাকা জমাব কোথা থেকে বাবু?"

আমি বললাম "তা হ'লে এ দেড়-শ টাকা পাবে কোথায়?"

নিমাই বলল "নসীরাম সে ব্যবস্থা করেছে। আমার যে ছয় বিঘে জমি আছে, তার পাঁচ বিঘে নসীরামই কিনে নেবে। সে বলেছে, আমার কন্যাদায়, তাই সে দয়া করে ঐ পাঁচ বিঘের জন্য দেড়-শ টাকাই দেবে। এখন কি আর জমির দর আছে। আমি তাতেই স্বীকার করেছি।"

আমি বল্‌লাম "এ ব্যবস্থা অতি সুন্দর হয়েছে নিমাই। মেয়ের বিয়ে ত হয়ে যাবে; তার পর?"

নিমাই বল্‌ল "বড় বাবু, আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, তার পর চল্‌বে কি করে। যে কয়দিন আমার শরীর বইবে, সে কয়দিন আমার পরিবার একমুঠো অন্ন পাবে। আমি চ'লে গেলে আমার মত আর দশজন গরীবের যা হয়, তাই হবে—পরের দুয়োরে দাসীগিরি করবে, আর না হয় ভিক্ষে করবে। ভিক্ষে না মেলে গাছতলায় পড়ে মরবে। আমাদের মত গরীবের অদেষ্টে এতকাল যা হয়ে আস্‌ছে তাই হবে।"

বড় কষ্টেই নিমাই এই কথা কয়টি বল্‌ল। আমার চক্ষের সম্মুখে নিমাইয়ের দুরবস্থার চিত্র যেন জলন্ত হয়ে উঠল। নিমাই যা বলেছে সবই ঠিক। আমাদের দেশের গরীব দুঃখী লোকের যা পরিণাম হয়, নিমাইয়েরও তাই হবে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লাম "দেখ নিমাই, আমি একটা কথা বলি। তোমার ঐ সামান্য সম্বল কয়েক বিঘা জমি অমন করে বেচে ফেলো না। তা হ'লে যে তোমার

স্ত্রীকে একেবারে পথে বসানো হবে; সে কথা ভেবে দেখেছ ?"

নিমাই বল্‌ল "সব ভেবেছি বড় বাবু। এ ছাড়া আমার মত দীনদুঃখীর আর পথ নেই।"

আমি বল্‌লাম "এই সব ব্যবস্থা করবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে পারতে নিমাই ?"

নিমাই ছলছল নয়নে বল্‌ল "বড় বাবু, আমি কি বুঝতে পারিনে যে, আপনি বেঁচে নেই। যেদিন অমন রাজার মত ছোটবাবু চলে গিয়েছেন, সেই দিন থেকে এই চার বছর আপনি কি বেঁচে আছেন বড় বাবু! আপনি যে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছেন, তা আমি জানি। তাই আপনাকে আর আমার কথা বলে কষ্ট দিতে চাইনি বড় বাবু।"

নিমাইয়ের এই কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। চার বছর আগে যাকে বিসর্জ্জন দিয়ে দুর্ব্বহ জীবন যাপন করছি, আর কেহ না বুঝলেও আমার ভৃত্য নিমাই তা বুঝেছে।

আমি তখন বল্‌লাম "শোন নিমাই, আমি তোমার ওসব ব্যবস্থার মত দিতে পারছিনে। তুমি তোমার ঐ পাঁচ বিঘে জমি বেচতে পারবে না। তোমার মেয়ের বিয়ের সব খরচ আমি দেব। তারপর তোমার মেয়ে যখন স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে, তখন তুমি তোমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে এসো। আমার কেউ নেই নিমাই; তোমার স্ত্রীকে আমি আমার মেয়ের মত প্রতিপালন করব। আমার কথার প্রতিবাদ কোরোনা নিমাই।"

নিমাই অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—কি যে সে বলবে, কি যে তার বলা উচিত, তা সে ভেবে পেল না।

আমি তার মনের ভাব বুঝে বললাম "না, নিমাই, তুমি আমার কথা অস্বীকার কোরো না। দেখ, ডাকঘরে আমার সাড়ে তিন-শ টাকা জমা আছে। মনে করেছিলাম, সেই টাকা কয়টা নিয়ে আমরা এই পূজায় তীর্থভ্রমণ করে আসব। কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করে যদি মনে একটু শান্তি পাই। আমি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। ঐ সাড়ে তিন-শ টাকা আমি কালই ডাকঘর থেকে তুলে এনে তোমাকে দেব। তুমি আর বিলম্ব না করে দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাও। সব টাকা খরচ করে তোমার সাধ মিটিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসো। তেশরা আশ্বিন তারিখে এখানে বসে আমরা দিব্যচক্ষে তোমার হরগৌরী মিলনের ছবি দেখব, আমাদের বিশ্বনাথ দর্শনের শতগুণ বেশী ফল হবে; আমার টাকার সার্থক ব্যয় হবে—ঘরে বসে তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য আমার সঞ্চয় হবে।"

আমি তখন এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার স্ত্রী কখন এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, তা জানতেও পারিনি। আমার কথা শেষ হ'তেই তিনি এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন "বিশ্বেশ্বর কি কাশীতে থাকেন নিমাই, এই দেখ আমার বিশ্বেশ্বর, আমার কাশীশ্বর সম্মুখে রয়েছেন। এই আমার তীর্থ নিমাই! এই তীর্থেই আমি জীবন কাটাব, আর কোথাও যাব না।"

নিমাই তখন প্রথমে আমার স্ত্রীর, তার পর আমার পদধূলি গ্রহণ করল—একটী কথাও তার মুখ দিয়ে বের হোলো না। তার সেই নীরব বাণী আমার হৃদয়ে যে শান্তি বারি বর্ষণ করল, শত তীর্থেও তা দিতে পারে না।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

এ মাসের প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, সেই বাঙ্গালী-বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস নদীয়া জেলার এক সামান্য গ্রামে ১৮৬১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভবানীপুরে মিসনরি স্কুলে কিছুদিন পড়িবার পর ১৭ বৎসর বয়সে এক জাহাজে সামান্য কার্য্য লইয়া বিলাতে যান এবং এক সারকাসের দলে প্রবিষ্ট হন। তাহার পর ইউরোপের নানা স্থান ঘুরিয়া আমেরিকায় গমন করেন। পরে সারকাসের চাকরী ত্যাগ করিয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ঐ বিভাগের এক চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রেজিলের নৌ-সেনা বিদ্রোহী হইয়া যখন নাথেরয় নগর আক্রমণ করে, তখন সুরেশ ৫০টী মাত্র সেনার অধিনায়ক হইয়া শত্রুগণকে পরাভূত করেন এবং তাঁহার পদোন্নতি হয়। ক্রমে ইনি কর্ণেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ অব্দে রাই-ও ডি-জেনেরা নগরে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার আত্মনির্ভরতা, বীরত্ব ও যুদ্ধকার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়।

কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি-এল্ প্রণীত "আহুতি"—৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রূপছায়া"—২৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্যলহরী সিরিজের "ডাক্তারের ডিগবাজি" ও "চীনের চালবাজি"—প্রত্যেকখানি ৸৹
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম এ প্রণীত "নেশার ঘোরে"—১৶৹
শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিষপান"—১।৹
শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয় প্রণীত "আরতি"—২৲
শ্রীনির্ম্মলা দেবী রত্নপ্রভা প্রণীত "পূজারিণী"—১৲
শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজার ছেলে"—১৲
শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গোজাতি"—।৹
পরমহংস মূল চৈতন্যভারতী প্রণীত "সনাতন সাধনার পক্ষোদ্ধার"—১৲
শ্রীবি. প মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা"—১৲
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ"—২৲
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পাহাড়ী গোয়েন্দা"—।৹
শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, প্রণীত "সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ"—৸৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারতবর্ষ



কার্ত্তিক, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বজ্রের কথা

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বেদের অনেক যায়গায় গল্প আছে যে, বৃত্র বা অহি জলরাশিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিল,—চলিতে বা পড়িতে দেয় নাই। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্র বা অহিকে সংহার করিয়া জলরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তারা অবাধে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানে প্রশ্ন দুইটি—প্রথম, সে জলরাশির রোধকারী অসুরটি কে? দ্বিতীয়, ইন্দ্র যে বজ্র দ্বারা সে অসুরটিকে সংহার করিয়াছিলেন, সে বজ্রই বা কি? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না। অথচ মেঘ অগণিত জলবিন্দুর সমষ্টি, শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটু জমাট বাঁধিয়া মোটা মোটা দানা বা ফোঁটা হইয়া পড়িতে তাদের বাধা কি? অথচ পড়ে না কেন? কোন একটা নৈসর্গিক শক্তি তাদিকে যেন ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, পরস্পর আলাদা করিয়া রাখিয়াছে; সংহত হইতে ও জমাট বাঁধিতে দিতেছে না। সেই নৈসর্গিক হেতুটিই হইতেছে বৃত্র। এ কথা আগের "বেদ ও বিজ্ঞানে" সবিস্তার বলিয়াছি। মেঘে মেঘে যখন বিজলি খেলিয়া যায়, তখন তার ফলে যে কেমনধারা মেঘের দানাগুলি মিলিয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে—সে বিবরণ বৈজ্ঞানিক আমাদের অনেক দিন হইল শুনাইয়া রাখিয়াছেন। বেদের ভাষায় বলিতে গেলে বৃত্রাসুর যেন মেঘের জলরাশিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে, চলিতে বা পড়িতে দিতেছে না; বজ্রায়ুধ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা সে অসুরকে নিহত করিয়া মেঘরূপী জলরাশিকে যেন মুক্ত করিয়া দিতেছেন, সে জলরাশির চলিবার বা ভূতলে পড়িবার বাধাটি দূর করিয়া দিতেছেন। এ'ত গেল আধিভৌতিক স্তরের ব্যাখ্যা। "Nature myth," "Vegetation myth" ইত্যাদির পাণ্ডারা অনেকটা এই ভাবেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

বৃত্র যে কেবল মেঘের মধ্যে লুকাইয়া আছে, এমন নয়। বজ্র যে কেবল জলদ-পটল-বিহারী বৃত্রাসুরের প্রতি উদ্যত হয় এমন নয়। বৃত্র নিখিল পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং নিখিল পদার্থের ভিতরেই বৃত্র সংহারের অভিনয় আবহমান-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। একটা ধূলিকণার ভিতরেও বৃত্র, ইন্দ্র ও বজ্র এই ত্রিতত্ত্বই রহিয়াছে। জীব কোষে অথবা আমাদের অন্তঃকরণে এ ত্রিতত্ত্ব যে রহিয়াছে, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ করা চলে না। যে শক্তিটি বাধা বা চাপ দিয়া ধূলিকণাটিকে সামান্য একটা ধূলিই করিয়া রাখিয়াছে, তার চাইতে বড় একটা কিছু হইতে দিতেছে না, সেই শক্তি হইতেছে বৃত্র, এবং সে বৃত্র যে তপঃশক্তির বিরোধী শক্তি তাহাও আমরা সহজে বুঝিতে পারি। মজার কথা এই যে, বৃত্রের উদ্ভবও একটা তপস্যা হইতে। তপস্যা হইতে জন্মিয়া সে তপস্যার বৈরী হইতেছে। যে তপস্যা হইতে তার উদ্ভব, সে তপস্যার মন্ত্রতন্ত্র এক হইতে গিয়া আর এক হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং শক্তি-ব্যূহরূপ যন্ত্রটিও এক না হইয়া আর এক হইয়া পড়িয়াছিল। সাদা কথায়, বেচাল বা বেতাল তপস্যা হইতে তপস্যার অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য পুরাণকার সেই "ইন্দ্রশত্রুর" আখ্যায়িকা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রের উপর রাগ করিয়া কোন এক ঋষি ইন্দ্রের একজন প্রবল শত্রু সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প পূরণের জন্য তাঁকে অবশ্য যজ্ঞ করিতে হইল। কর্ম্মের কৌশলকে যেমন যোগ বলে, তেমনি আবার প্রাচীনেরা তাকে যজ্ঞও বলিতেন। কৌশল ছাড়া কোন কর্ম্মেই সিদ্ধি হয় না। যজ্ঞে সেই কৌশলটির নাম মন্ত্র-তন্ত্র। কৌশলটি ঠিক হইলে মন্ত্র-তন্ত্র অবশ্য ঠিক হইল; মন্ত্র তন্ত্র ঠিক হইলে যন্ত্র বা শক্তিব্যূহ ঠিক হইল; আর যন্ত্র বা শক্তিব্যূহ ঠিক হইলে, ফল বা সিদ্ধি না হইয়া যায় না। কিন্তু কৌশলের কলটি যদি বিগড়ায়, তবে উল্টা উৎপত্তি হইতে পারে। বৃত্রাসুরের জন্মে তাই হইয়াছিল। ঋষি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য যজ্ঞরূপ কৌশলটি ত' করিলেন; কিন্তু সে কৌশলের ফল বিগড়াইয়া বসিল; মন্ত্র-তন্ত্র ঠিক না হইয়া বেঠিক হইয়া পড়িল। ঋষি "ইন্দ্রশত্রু" বলিয়া যজ্ঞে হোম করিতে লাগিলেন, কিন্তু "ইন্দ্রশত্রু" এই কথাটি যেখানে যেমন স্বর দিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক, তেমন স্বর দিয়া তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। "ইন্দ্রশত্রু" এ শব্দটি তৎপুরুষ সমাস, আবার বহুব্রীহি সমাসও হইতে পারে—ইন্দ্রের শত্রু, এই এক রকম,—ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যার, এই আর এক রকম। বলা বাহুল্য, বৈদিক শিক্ষার নিয়মানুসারে এই দুই স্থলে শব্দটির স্বর বিন্যাস দুই রকমে করিতে হয়,—তৎপুরুষের বেলায় যেখানে জোর দিয়া শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়, বহুব্রীহির বেলায় সেখানে জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে দোষ হয়। এমন কি, কোথায় জোর পড়িয়াছে, সেইটি দেখিয়াই বুঝিতে হয়, শব্দটি তৎপুরুষে নিষ্পন্ন অথবা বহুব্রীহিতে নিষ্পন্ন। এখন, ঋষি যজ্ঞে আহুতি দিবার কালে "ইন্দ্রশত্রু" এই কথাটি এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাতে ইন্দ্রের শত্রুর বধ হউক এ না বুঝাইয়া, ইন্দ্র যার শত্রু তার বধ হউক, ইহাই বুঝাইতে লাগিল। ঋষি ভাবিলেন এক, উৎপত্তি হইল আর এক। স্বরের অপরাধ বশতঃ এইরূপ উল্টা উৎপত্তি হইয়া বসিল। ইহারই নাম কৌশলের কলটি বিগড়াইয়া যাওয়া। যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্রের স্বর-বৈকল্য ঘটিলে সে মন্ত্র বাগ্‌বজ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে বহু স্থলে) রূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং অনুষ্ঠাতার অভীষ্ট সাধন না করিয়া সংহার করিয়া থাকে। এইরূপ একটা বাগবজ্র হইতেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি। তপঃশক্তি হইতে জন্মিয়া বৃত্র যে কেন তপঃশক্তির বিরোধী হইয়াছে, তার রহস্যটি এই উপাখ্যানের ভিতরে রহিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, একটা ধূলির ভিতরেও ঐ ত্রিতত্ত্ব বিরাজ করিতেছে। কথাটা শুনিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। আমরা বৃত্রকে যে ভাবে চিনিয়াছি, তাতে এ ভুল আমাদের হইবে না যে, বৃত্র কোন এক মান্ধাতার আমলের অসুর, প্রবল হইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল,—তার পর বজ্রের আঘাতে কোন্ দিন পঞ্চত্ব পাইয়াছে। বৃত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের লড়াই এখনও চলিতেছে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র। জড়, প্রাণ, মন—এ সবের কোন এলেকাতেই সে লড়াই বাদ যায় নাই। সৃষ্টিতে এমন কোন কিছু ছোট নাই, যার সত্তার ভিতরে ঐ ত্রিতত্ত্বের খেলা অহরহঃ না চলিতেছে। আর বড়র ভিতরে, খোদ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও ঐ খেলা খেলিয়া যাইতে হইতেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে মধুকৈটভকে লইয়া যে খেলাটি খেলিলেন, সে খেলাটি প্রত্যেক ধূলিরেণুর ভিতরে,

এমন কি, প্রত্যেক এটমের ভিতরেও অবিরত চলিতেছে। আচার্য্য জগদীশ বসুর ক্রেস্‌কোগ্রাফ্ প্রভৃতি যন্ত্রে প্রাণি-জগতের সূক্ষ্ম ঘটনাকে বহুলক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখানর ব্যবস্থা হইয়াছে; পুরাণকার আমাদিগকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মধুকৈটভ, অথবা ইন্দ্র এবং বৃত্রের সংঘর্ষের যে বিরাট্ চিত্রখানি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, সে চিত্রখানি আর কিছুই নয়, ঐ ধূলিকণা অথবা এটমের ভিতরের ত্রিতত্ত্বের সূক্ষ্মাভিনয়টিকে বিরাট্ বিপুলাকারে আমাদিগকে দেখানো।

যদি কোন দিন সৃষ্টি বলিয়া-একটা কিছু হইয়া থাকে, তবে সে দিন অবশ্য বৃত্রাসুর সংহারের পালার মত একটা পালার অভিনয় হইয়াছিল। রাত্রি বা তমের মত একটা অবস্থা হইতে এই বিশ্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে—এই রকম একটা কল্পনা আমরা প্রায় সকলেই করিয়া থাকি। সৃষ্টির আগে তাই একটা মহাবজনী। সেই মহারজনীতে বৃত্রসংহার বা মধুকৈটভ সংহারের পালার অবশ্য অভিনয় হইয়াছিল। এক অজানা আসরে, এক অজানা বন্দোবস্তে সে অভিনয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সে অভিনয়ের প্লাকার্ড ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল কি না, তা আমরা বলিতে পারি না। পুরাণকার সে অভিনয়ের রিপোর্ট আমাদিগকে কিছু কিছু শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন রিপোর্টেই এটা দেখি না যে, সেই রজনী অভিনয়ের শেষ রজনী হইয়াছিল। সৃষ্টিরও যেমন বিরাম নাই, সৃষ্টির মূল তত্ত্বগুলির খেলারও তেমনি বিচ্ছেদ নাই। যে ত্রিতত্ত্বের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছি, সে ত্রিতত্ত্ব সৃষ্টির মূল তত্ত্বের সামিল। সুতরাং সে ত্রিতত্ত্বের খেলারও বিচ্ছেদ নাই; এখনও চলিতেছে। একটা অণুর ভিতরেও চলিতেছে। এ কথা শুনিলে আনাড়ী লোক হয় ত হাসিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর হাসিবেন না। বিশ ত্রিশ বৎসর আগে এক এক রকম অণুকে এক এক জন অক্ষয় অব্যয় অজর অমর সত্তা ভাবা হইত। একটা অক্‌সিজনের অণু চিরকালই তাই রহিয়াছে, তাই থাকিবে; তার আর মার নাই, অদলবদল নাই। এই দৃষ্টিতে একটা অণু জড়ত্বের পূর্ণ বিগ্রহ। আমরা বৃত্রাসুরের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাতে বলিতে পারি যে, এক একটা জড়পরমাণুতে বৃত্র যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে। এক একটা জড় বস্তু বৃত্রের যেন অভেদ্য কারা বা দুর্গ; কোন কিছু দ্বারা সে কারা বা দুর্গের ভেদ হয় না। সাবেক বৈজ্ঞানিকেরা ভাবিতেন, এমন কোন শক্তি, এমন কোন বজ্র নাই, যে বজ্র এটমের ভিতরে বৃত্রের ঐ কারা বিদ্ধ করিতে পারে। "এটম্" কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে,—এর ভাগ হয় না, অথবা ছেদ হয় না।

হালের বৈজ্ঞানিক কিন্তু বৃত্রের ঐ দুর্গটিকে তেমন পাকা মনে করিতেছেন না। ও দুর্গের ভিতরে বৃত্রই বাস করে, ইন্দ্র অথবা তার আয়ুধ বজ্রকে আদৌ আমোল দেয় না,—এ কথাটা আর হালের বৈজ্ঞানিক মানিতে চান না। সে দুর্গের ভিতরেও ঐ ত্রিতত্ত্ব বিরাজ করিতেছে; ইন্দ্র ও বৃত্রের অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে। সুতরাং, এটম্ আর আজকালকার দিনে ঠিক এটম্ নয়; তার ঘরে ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তার ভিতরে এই ব্রহ্মাণ্ডের ষোলআনা বন্দোবস্তটাই এক রকম বাহাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ফলে এটম্ আর অক্ষয় অব্যয় অজর অমর সত্তা নহে। অন্য জিনিষের মত সেও ভাঙ্গিতেছে চুরিতেছে,—এক ভাঙ্গিতেছে, আর এক গড়িয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলিকে "রেডিও একটিভ্" বস্তু বলেন, সেই বস্তুগুলির ভিতরে অবশ্য এই বিপ্লবের সাড়া আমরা বেশী পাইতেছি; কিন্তু এটা আমরা যেন মনে না করিয়া বসি যে, বিপ্লব কেবল মাত্র ঐ দুই চারিটা বস্তুতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাকি সব জিনিষ একেবারে ঠাণ্ডা, চুপ্ চাপ্। আমরা অন্যত্র শিষ্ট প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই বিপ্লবরূপী অগ্নিকাণ্ড নিখিলবস্তুর অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যেখানে শুধু বৃত্রই বিরাজ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ও বজ্র হাজির নাই। শুধু বৃত্রের এলেকা হইলে, বস্তু সেই সাবেক এটমের মত হইয়া থাকিত। তবে এ কথা ঠিক যে, জড়ের রাজ্যে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বৃত্রই যেন প্রবল, ইন্দ্র অথবা অগ্নি থাকিলেও, যেন কতকটা গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছেন।

প্রাণের ও মনের রাজ্যে আসিয়া আমরা ইন্দ্র অথবা অগ্নিকে সদরে বসিতে দেখিতে পাই। সময় সময় মনে হয় যেন বৃত্র সেখানে হাজির নাই। এটা অবশ্য আমাদের দেখার ভুল। সেখানেও অবশ্য বৃত্র একটু আড়ালে থাকিয়া লড়াই চালাইতেছে। জড়ের রাজ্যে বাধা বা "চাপই" যেন

সব হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়, আসলে কিন্তু তা নয়। প্রাণে ও আত্মায় স্ফূর্ত্তি বা বিকাশই যেন সব বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু আসলে তাও নয়। জড়ে বাধার সঙ্গে সঙ্গে বাধা সরাইবার একটা বন্দোবস্ত যেমন কিছু না কিছু দেওয়া আছে, প্রাণে ও আত্মায় সেই রকম স্ফূর্ত্তি বা বিকাশের পথে অল্পবিস্তর বাধাও দেওয়া রহিয়াছে। এ সব কথার মানে এই যে, জড় প্রাণ ও আত্মা এ তিন ক্ষেত্রেই ঐ ত্রিতত্ত্বের খেলা চলিতেছে। মাত্রায় বেশি কমি আছে বই, আর কিছুই নয়।

সৃষ্টির নিখিল পদার্থে ত্রিতত্ত্বের পরিচয় আমরা লইলাম; তপঃশক্তির সঙ্গে এ ত্রিতত্ত্বের যে সম্পর্ক, সাধক অথবা বাধক, সেটাও আমরা মোটামুটি বুঝিয়া লইলাম। এখন যে কথাটায় আমরা বিশেষভাবে খেয়াল করিতে চাই, সে কথাটা এই—বজ্রই হইতেছে তপঃশক্তির মূর্ত্তি অথবা প্রতীক। বজ্র বলিতে এমন একটা জিনিষ আমরা বুঝি, যার চাইতে দৃঢ় বা কঠিন আর কোন জিনিষ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানে বস্তুগুলি নরম গরম সব রকমই হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। 'ক'য়ের চাইতে 'খ' দৃঢ়; দৃঢ় বলিয়া 'খ' 'ক'কে ভেদ করিতে পারে; যেমন লোহা কাঠকে ভেদ করিতে পারে। আবার দেখি 'খ'য়ের চাইতে 'গ' বেশি দৃঢ়; সুতরাং 'গ''খ'কে ভেদ করিতে পারে। এইভাবে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর, তা হইতে আরও দৃঢ়তর, এই রকম সব জিনিষ আমরা অনুভবে পাইতেছি। পাইয়া একটা কল্পনা করিয়া থাকি—এমন একটা বস্তু হয় ত আছে, যার পর দৃঢ় আর কোন বস্তু নাই; সুতরাং সে বস্তু আর সকল বস্তুকেই ভেদ করিতে পারে। সেই নিরতিশয় রূপে দৃঢ় ও ভেদক বস্তুটি হইতেছে বজ্র। কাচ এক হিসাবে খুব শক্ত জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু হীরার ধারে কাচও কাটে। আবার হীরা বা অন্য মণিমাণিক্য হার করিয়া গাঁথিতে হইলে, তাদের ভিতরে ফুটা করিয়া লইতে হয়। যে জিনিষের দ্বারা মণিকেও উৎকীর্ণ করিয়া লইতে হয় সে জিনিষকে আমরা সাধারণ কথায় বজ্র বলিয়া থাকি—"মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ—কালিদাসের মুখেই এই কথা আমরা শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য, জহুরিদের এই বজ্র আমাদের লক্ষণ মাফিক বজ্র নয়; কেন না তার চাইতেও শক্ত কোন কোন বস্তু আছে বা থাকা সম্ভব।

'শক্ত' কথাটাকে আমরা যেন চলিত অর্থে না লই। অপর জিনিষের জমাট ভাঙ্গিয়া যেটি তার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, সেটিকে আমরা তার তুলনায় শক্ত বা সমর্থ বলিতেছি! সপ্তরথীতে মিলিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে একটা ব্যূহ রচিত হইয়াছিল; বালক অভিমন্যু সে ব্যূহটি ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারিয়াছিলেন; কাজেই সে ব্যূহটির পক্ষে অভিমন্যু অবশ্য শক্ত বা সমর্থ। কিন্তু অভিমন্যু আগম নিগম এ দু'য়ের কৌশল জানিতেন না; সুতরাং তিনি সে ব্যূহটা সম্বন্ধে আধখানা বই পুরা শক্ত হইতে পারেন নাই। বাতাস কাচ বা জলের ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি অবাধে চলিতে পারে; অতএব আমরা বলিতে পারি যে, ঐ সব পদার্থ সম্বন্ধে আলোক-রশ্মি শক্ত বা সমর্থ। অথচ আলোক-রশ্মি, যাকে কঠিন দ্রব্য বলে, তা'ত মোটেই নয়। কাঠের ভিতর বা হাড়ের ভিতর সাধারণ আলোক-রশ্মি ঢুকিতে পারে না, কিন্তু "এক্‌সরে" উহাদের মধ্যে ঢুকিতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে সাধারণ আলোকের চাইতে এক্‌সরে বেশী শক্ত বা সমর্থ। এই রকম সাধারণ আলোকে বিদ্ধ হয় না, অথচ অদৃশ্য কোন কোন আলোকে বিদ্ধ হয়, এমন সব জিনিষ রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিষই এক একটা দুর্গ বা গুহার মত। সকলে তাহার ভিতর ঢুকিতে পারে না। যে ঢুকিতে দেয় না, তাকে বেদ অনেক জায়গায় পণিঃ, বৃত্র, অহি ইত্যাদি বলিয়াছেন। যে, অথবা যে শক্তি, সে গুহাটি বিদীর্ণ করিতে পারে, সে, অথবা সেই শক্তি, সে গুহাটির পক্ষে বজ্র। বাতাস কাচ বা জলের পক্ষে সাধারণ আলোক-রশ্মি বজ্র বটে, কিন্তু কাঠ পাথর মাটি ইত্যাদির পক্ষে বজ্র নয়। এক্‌সরে কিন্তু এ সবের পক্ষে বজ্র। কালের বিজ্ঞান আমাদের শুনাইয়াছেন যে, একটা এটমের ভিতরেও একটা জগৎ রহিয়াছে; বিপুল শক্তি সেই আণবিক জগতে খেলা করিতেছে; কখনও কখনও বা সেই বিপুল ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু শক্তি বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে (যে ব্যাপারটির নাম রেডিও একটিভিটি); এক কথায়, অণুর ভিতরে অনবরত একটা বিপ্লব চলিতেছে। কিন্তু তাপ, আলোক, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি যে সব শক্তি লইয়া আমরা সচরাচর এই সব সাধারণ কারবার করিতেছি, সে সব শক্তির কোনটাই (যতই প্রবল হউক না কেন) ঐ অণুর গুহা বিদীর্ণ করিতে সমর্থ নয়। তাহা হইলে আমাদের

বলিতে হয় যে, অণুর পক্ষে এই সকল শক্তি বজ্র নয়। আমরা যদি কোন শক্তিবিশেষের দ্বারা ঐ সকল অণুর গুহা বিদীর্ণ করিয়া তাদের ভিতরকার বিপুল শক্তিরাশিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে, সেই শক্তি-বিশেষ অণুর পক্ষে বজ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। অধ্যাত্ম-বিদ্যা সে শক্তিবিশেষটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন; হয় ত কালে বিজ্ঞানাগারেও সে শক্তিবিশেষটি ধরা পড়িলে পড়িতে পারে। সে যাহাই হউক, অণুর পক্ষে বজ্র যে কি হইতে পারে, তার পরিচয় আমরা লইলাম।

প্রাণের রাজ্যে আসিয়াও এই বজ্র বস্তুটিকে আমরা নানা আকারে দেখিতে পাই। জীবদেহ নানা রকম আহার গ্রহণ করিতেছে। এমন কোন কোন আহার আছে যেগুলি উদরস্থ হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রায় অবিকৃত আকারেই বাহির হইয়া যায়; আমাদের দেহের পেশীগুলি সে সব জিনিষ শোষণ করিয়া লইতে পারে না; অথবা অন্যরূপে বলিতে গেলে, সে সব জিনিষ আমাদের দৈহিক কোষগুলির গুহা যেন বিদীর্ণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, এমন অনেক আহার আছে, যেগুলি খুব সামান্য মাত্রায় দেহস্থ হইলেও দেহের সকল কোষগুলিতে, সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়বে ঢুকিয়া ছড়াইয়া পড়ে; যেমন কর্পূর, রসুন, তীব্র বিষ ইত্যাদি। সুতরাং এই সব জিনিষ আমাদের দেহের কোষগুলির পক্ষে বজ্র। ভাইজম্যান সাহেব ও তাঁহার শিষ্যদের মতে আমাদের দেহের মধ্যে জনন-কোষটি (Germ plasm) এক রকম দুর্ভেদ্য গুহা বলিলেই হয়। আমাদের ভিতর দিয়া পুরুষানুক্রমে একটি বীজসত্তা প্রায় অক্ষুণ্ণ ভাবেই যেন চলিয়া আসিতেছে (ইহাকে বলে Continuity of the Germ plasm); আমাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে সেই কুলক্রমাগত বীজসত্তাটির তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই; অর্থাৎ আমাদের নিজেদের আচার ব্যবহার দ্বারা উপার্জ্জিত ধর্ম্মগুলি (Acquired characters) সে বীজসত্তাটির সম্বন্ধে সাধক অথবা বাধক এক রকম হয় না বলিলেও চলে। অবশ্য এ কথা লইয়া পণ্ডিতেরা এখনও বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু সে যাই হউক, এটা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সে বীজসত্তাটি একেবারে অভেদ্য না হইলেও, অনেকটা দুর্ভেদ্য বটে। বর্ত্তমানে আমাদের দেহের মধ্যে কয়েকটা গ্রন্থির লীলা-রহস্য কতকটা উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে; যেমন আমাদের কণ্ঠদেশে থাইরয়েড্ গ্রন্থি ইত্যাদি। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এই সকল গ্রন্থির ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং অদৃশ্য রসস্রাব আমাদের দৈহিক বীজসত্তাটির উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। জীব যে অতিকায় হয়, অথবা বামন হয়, তাদের দৈহিক গঠন এবং মানসিক স্ফূরণ যে স্বাভাবিক হয়, অথবা অস্বাভাবিক হয় (normal or abnormal)—এ সকল ব্যাপারের মূলে আমাদের ঐ সব ছোট ছোট গ্রন্থিদের হাত রহিয়াছে। সেই গ্রন্থিগুলি এক একটা রহস্য-ভাণ্ডার। সে রহস্য-ভাণ্ডার এখনও আমরা যেমন খুসি তেমন করিয়া পুরা ব্যবহার করিতে শিখি নাই; তার চেষ্টা চলিতেছে। যে দিন কোন উপায়বিশেষের দ্বারা আমাদের এই দৈহিক গ্রন্থিগুলির গুহা আমরা ভেদ করিতে সমর্থ হইব, সে দিন সেই উপায়বিশেষ এই গুহাগুলির পক্ষে বজ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। এখনও সে বজ্রের হদিশ আমরা পাই নাই। কোন কোন রকমের খাদ্য (যথা ভাইটামিন্) এই সকল গুহার ভিতরে কাজ করিতে সমর্থ দেখা যাইতেছে; যদি তা হয়, তবে এরা ঐ গুহাগুলির পক্ষে বজ্র। আমাদের দেশে যোগীরা যে ষট্‌চক্রের কথা বলিয়া থাকেন, তাদের সঙ্গে এই গ্রন্থিবর্গের যে কি সম্পর্ক তা আমাদের খুঁজিয়া দেখা উচিত। সম্ভবতঃ যোগীদের চক্রগুলি সূক্ষ্ম গ্রন্থি, স্থূল গ্রন্থি নয়। কিন্তু আসল জায়গাটায় চমৎকার মিল রহিয়াছে। যোগীদের চক্রগুলিও এক একটা রহস্য-শক্তির ভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার লুটিতে পারিলে ভূতজয় এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আমাদের নাকি করায়ত্ত হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন বলিতেছেন যে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের কাজটা কিছু গোছাইয়া দিতে পারিলে বুড়া মানুষ আবার যুবা হইতে পারে, কুরূপ সুরূপ হইতে পারে, বামন দীর্ঘাকৃতি হইতে পারে, সেই রকম ধারা যোগীও বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেহের কোন কোন চক্রে বা কেন্দ্রে "সংযম" করিতে পারিলে জরা, রোগ, অঙ্গ-বৈকল্য, এমন কি মৃত্যু—এ সকলই জয় করিতে পারা যায়। তন্ত্র শাস্ত্রের পুঁথিগুলিতে এ রকম ফলশ্রুতি বারবার খুব জোরের সহিত আমাদের শোনান হইয়াছে দেখিতে পাই। আজকালকার ডাক্তারেরা যেমন আশা করিতেছেন যে, গ্ল্যাণ্ডগুলির সুব্যবস্থা

করিয়া দিয়া তাঁরা মানসিক ব্যাধিও (উন্মাদ প্রভৃতি) আরাম করিতে পারিবেন, যোগীরাও সেই রকম, ঠিক গ্রাণ্ড না হউক, চক্রগুলির কাছ হইতে সকল রকম মানসিক ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি দোহন করিতে পারিবার ভরসা আমাদের বহুদিন হইতে দিয়া রাখিয়াছেন। তফাৎ এই যে, ডাক্তারেরা এখন পর্য্যন্ত গ্রন্থিগুলি ভেদ করার পক্ষে সমর্থ তেমন কোন উপায় বা শক্তি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বজ্রায়ুধ এখনও তাঁদের তরে নির্ম্মিত হয় নাই। যোগীরা সে আয়ুধ লাভ করিয়াছেন—যে আয়ুধের প্রসাদে ষট্‌চক্রভেদ হইয়া থাকে। সকলেই জানেন, সে আয়ুধটি আর কিছুই নয়—জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যে শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টন-পূর্ব্বক মূলাধার-চক্রে সচরাচর নিদ্রিতা হইয়া রহিয়াছেন। এই শক্তিটিকে জাগাইতে পারিলেই, সেটি ষট্‌চক্রের পক্ষে বজ্র স্বরূপ হইল। সে যাহাই হউক, ডাক্তারেরা সম্প্রতি গ্রন্থিগুলির ভিতরে যে শক্তিটিকে ধরিতে পারিয়াছেন, সে শক্তিটি আমাদের বীজসত্তার পক্ষে যে অনেকটা বজ্রেরই মত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়াও বজ্রকে আমাদের চিনিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ফলে প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণ এমন একটা গুহা হইয়া রহিয়াছে, যে গুহার ভিতরে অন্য কোন জীব সরাসরি ঢুকিতে পারে না। তোমার মনে কি রহিয়াছে বা হইতেছে, তার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আমার কোন জ্ঞান নাই। তোমার কথা শুনিয়া, অথবা তোমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া, তোমার মনের ভাব আমাকে আন্দাজ করিয়া লইতে হয়। আমার মনের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রত্যেকেরই মন এই রকম এক একটা দুর্ভেদ্য গুহা। অভেদ্য না বলিয়া দুর্ভেদ্য বলিলাম এই কারণে যে, কোন কোন উপায়বিশেষ দ্বারা হয় ত অপরের মনটিকে আমি নিজেরই সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতরে টানিয়া লইতে পারি। পরকায়-প্রবেশের মত পর-মনঃ-প্রবেশও যোগীদিগের একটা বিভূতি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। আজকালকার অনেক পরীক্ষিত সত্য এ বিষয়ে নূতন করিয়া প্রমাণ হাজির করিতেছে। এক আমারই ভিতরে হয় ত একাধিক চৈতন্য-সত্তা পরস্পরকে আড়ালে রাখিয়া কাজ করিতেছে। আমার অবশ্য একটা সাধারণ চৈতন্য-সত্তা আছে, যেটাকে আমি "আমি" বলিয়া জানি; এ "আমির" এলেকা আমার বাস্তব জীবনের কতকটায়, সবটায় নয়। আমার বাস্তব জীবন হয় ত একাধিক আমির মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া রহিয়াছে; প্রত্যেক আমির ইজারা আলাদা,—একজন ইজারাদার আর একজন ইজারাদারের খোঁজ রাখে না; কেহ কাহারও সঙ্গে সল্লা পরামর্শ করিতেছে না; অথচ মোটের উপর আমার জীবনযাত্রাটি এক রকম নির্ব্বিবাদেই চলিয়া যাইতেছে। রোগবিশেষে অথবা হিপ্‌নটিক্ অবস্থায় এই সকল আলাদা "আমি" হয় ত একটু অসাধারণ রকমে নিজেদের জাহির করিয়া বিচারকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ আমাদের কারবারি "আমি"টাই সদর-কাছারীতে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেছে; বাকি "আমি"গুলা মফঃস্বলে গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে, সদর-কাছারীতে হাজির হইতে নারাজ। এই গেল সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু রোগবিশেষে অথবা হিপ্‌নটিজমে এ অবস্থার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। একজন "আমি" কাছারীতে বসিয়া কিছুক্ষণ কাজকর্ম্ম করিলেন; তারপর তিনি সরিয়া পড়িলেন। আর একজন "আমি" আসিয়া গদিতে বসিলেন এবং কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ বাদে তিনিও সরিয়া পড়িলেন। এ দুই "আমির" কোনটাই অপরটাকে আমোল দিতে চায় না; এক নম্বর "আমির" দস্তখৎ দুই নম্বর আমি আসিয়া নিজের বলিয়া সনাক্ত করিতে নারাজ হয়। এ রকম ঘটনা কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ সকল "আমি" যেন এক একটা গুহা; একের গুহার ভিতরে অপরের প্রবেশ নিষেধ। যোগীরা তাড়াতাড়ি ভোগক্ষয়ের জন্য কায়ব্যূহ ধারণ করিয়া থাকেন; একই সময়ে অনেক কায়া ধারণ করিয়া সেই সকল কায়াতে নানাবিধ ভোগ এক সময়ে করিয়া থাকেন। অবশ্য বিভিন্ন কায়াতে আলাদা আলাদা অন্তঃকরণ থাকে। কিন্তু সেই বিবিধ কায়ায় এবং বিবিধ অন্তঃকরণে বিবিধ ভোগ যে একজনেরই হইতেছে, এবং সে একজন যে আমিই—এ বোধ অবশ্য যোগীর অটুট থাকে। তা না হইলে কায়ব্যূহ ধারণ নিষ্প্রয়োজন। অপরের ভোগে আমার ভোগক্ষয় হইবে কিরূপে? এই জন্য কায়ব্যূহে বর্ত্তমান সকল অন্তঃকরণের নিয়ামক একটা অন্তঃকরণ আমাদের স্বীকার করিতে হয়। যোগী সেই নিয়ামক অন্তঃকরণটি বজায় রাখিতে পারেন বলিয়াই কায়ব্যূহের ভিতর দিয়া এক

সময়ে নানাবিধ ভোগ করিয়া ভোগক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহা হইলে, যোগীর কাছে কায়ব্যূহস্থিত ঐ সকল আলাদা আলাদা অন্তঃকরণগুলির কোনটাই দুর্ভেদ্য গুহা নহে। সে সকল গুহা বিদীর্ণ করার হাতিয়ার তাঁর মজুদ রহিয়াছে। সে হাতিয়ারটি হইতেছে বজ্র।

আমাদের আটপৌরে মানসিক জীবনেও এই হাতিয়ারের প্রয়োগ কিছু না কিছু হামেসাই আমাদের করিতে হইতেছে। কোন একটা জিনিষ ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না; কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি; অমনি সে জিনিষটি আমাদের মনে পড়ে। এখানেও একটা গুহা আমরা বিদীর্ণ করিলাম;—যে বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলাম, তার নাম মনঃসংযোগ, যেটিকে আমরা তপঃশক্তির প্রতিনিধি রূপে সহজেই চিনিতে পারি। কোন একটা জিনিষ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না; চঞ্চল মনটিকে স্থির করিয়া কিছুক্ষণ গাঢ় ভাবে ভাবিয়া দেখিলে, সে জিনিষটি বুঝিতে পারি। এখানেও গুহা ভেদ হইল—বজ্রশক্তিতে। বৈজ্ঞানিক তাঁর মাথা হইতে নূতন একটা তত্ত্ব বাহির করিলেন, অবশ্য অনেক গবেষণা ও চিন্তার পর। এখানেও বজ্রশক্তিতে অজানার একটা গুহা ভেদ হইয়া গেল। কবি তাঁর অনন্য-সাধারণ প্রতিভায় এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেন; বেসুরার মধ্যে সুরটিকে বাছিয়া বা'হর করিয়া ফেলিলেন। যে কাজটি তিনি করিলেন, সে কাজটি আসলে গুহা-ভেদ, এবং কবির প্রতিভা আমাদের সেই বজ্রশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আর বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আমরা জড়, প্রাণ ও মন এ সকল ক্ষেত্রেই বজ্রকে এক না এক আকারে চিনিতে পারিলাম।

এ সকল কিন্তু বজ্রশক্তির কারবারি রূপ। বাজারে কারবার চালাইতে গিয়া নানান্ কারবারীকে অবশ্য নানান্ বাট্‌খারা লইয়া কারবার করিতে হয়। এ সকল বাটখারা মোটামুটি এক ওজনের সন্দেহ নাই; কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে এক কারবারীর বাট্‌খারার সঙ্গে অপরের বাট্‌খারার ওজনে একটু গরমিল হইয়াই থাকে। এমন কি একই জনের বাট্‌খারা অবস্থা-বিশেষে ওজনে কম বেশী হইতে পারে। এই সকল বাট্‌খারা লইয়াই কারবার চলিতেছে। কিন্তু বিলাতের কোন সরকারী ভবনে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধাতুখণ্ড কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সেই প্লাটিনাম-খণ্ডটির ওজনই হইতেছে আদর্শ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড। যেখানেই মাপ লইয়া কারবার, সেইখানেই নানা জনের নানান্ মাপের গরমিলগুলি সারিয়া লইবার জন্য, একটা আদর্শ আমাদের নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হয়। সময়ের হিসাবেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের অপেক্ষা রহিয়াছে। না থাকিলে কার ঘড়িটিকে আমরা প্রমাণ বলিব? যে বজ্রশক্তির কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, সে শক্তির কারবার আমরা সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইতেছি সন্দেহ নাই—কিন্তু সে শক্তি নানা আকারে নানা ভাবে কাজ করিতেছে। 'ক'য়ের পক্ষে 'খ' বজ্র, কিন্তু 'গ'য়ের পক্ষে নয়—এই রকম সব দেখিতেছি। এই জন্য বজ্রশক্তির একটা আদর্শ লক্ষণ আমাদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। মোটামুটি যে শক্তি কোন কিছুর গুহা ভেদ করিতে সমর্থ, সেই শক্তিকেই আমরা এতক্ষণ বজ্র বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু বজ্র আসলে কি? দিল্লীশ্বরকে লোকে আগে "জগদীশ্বরো বা" বলিত। কোন অসাধারণ পণ্ডিতকে লোকে এখনও "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া থাকে। কিন্তু দিল্লীশ্বর যেমন জগদীশ্বর ছিলেন না, পণ্ডিত মহাশয়ও সেই রকম সর্ব্বজ্ঞ নহেন। আমরা মুনি-ঋষিদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া থাকি; কিন্তু পাতঞ্জল-দর্শনে স্পষ্টতঃ সূত্র করিয়া বলা হইয়াছে যে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, আর কেহই না। একমাত্র পরমেশ্বরেই সর্ব্বজ্ঞতা নিরতিশয় ভাবে রহিয়াছে; আর সকলে সর্ব্বজ্ঞের অনুকল্প বা কাছাকাছি একটা কিছু থাকিতে পারে মাত্র। এই ভাবে মুনি-ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ-কল্প, সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যে বস্তুতে মণি-মুক্তাও ফুটা করিতে পারা যায়, সেই বস্তুকে বজ্র বলার দস্তুর রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক দস্তুর মত বজ্র জিনিষটা কি?

আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনার গোড়াতেই এক কথায় বজ্রের লক্ষণ দিয়া রাখিয়াছি। এখন সেই কথাটা আবার বলি। জড়ে হউক, প্রাণে হউক অথবা মনে হউক, যেখানে যত সূক্ষ্ম অথবা সুদৃঢ় গুহা থাকুক না কেন, যে শক্তিতে সে সব গুহাই ভেদ করিতে পারা যায়, কোন কিছুতেই সেটি পরাহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, সেই শক্তিটি হইতেছে বজ্র। অন্য রকমে দেখিলে, সেইটাই শ্রীভগবানের নৃসিংহ রূপ বা নারসিংহী শক্তি। সে শক্তিটির আসল চেহারা ধরিয়া ফেলা শক্ত; কিন্তু সে রকম একটা শক্তি আমরা

কল্পনা করিতে পারি। শুধু কল্পনা করিতে পারি কেন, সে রকম একটা শক্তি সত্যসত্যই থাকা সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক যাহাকে তাড়িত-শক্তি বলেন, সেইটাই কি বজ্র? জীবে যে শক্তি প্রাণরূপে খেলা করিতেছে, সেইটাই কি বজ্র? আমাদের ভিতরে যে শক্তি তৈজস অন্তঃকরণ রূপে অহরহঃ কত চিন্তার জগৎ গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, সেইটাই কি বজ্র? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। শক্তি মূলে এক; জড়শক্তি, প্রাণশক্তি ও চিৎশক্তি বলিয়া আলাদা আলাদা ভাগ করা আমাদের কারবারি বাতিক বই আর কিছুই নয়। সে যাই হউক, যে শক্তিটি জড়ের ক্ষেত্রে এটম্, কর্পাস্‌ল্ ইত্যাদি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম গুহাগুলিও ভেদ করিতে সমর্থ; প্রাণের ক্ষেত্রে জীব-কোষ, গ্রাণ্ড, চক্র এ সকল কোন ব্যূহ হইতে পরাহত হইয়া যে শক্তি ফিরিয়া আসে না; মনের ক্ষেত্রে, অন্তঃ-করণের ক্ষেত্রে নিখিল বুদ্ধির গুহা, অথবা কোষের মধ্যে সঞ্চারী সত্তাটিকে, যে শক্তি গিয়া স্পর্শ করিতে পারে, আত্মীয় করিয়া লইতে পারে,—সেই শক্তির নাম বজ্র।

পুরাণাদিতে গল্প আছে (ঋগ্বেদ-সংহিতায় তার "মূল" আছে) যে ইন্দ্র বৃত্রকে সহজে দমন করিতে পারেন নাই। এমন একটা আয়ুধ তাঁহার পাওয়া আবশ্যক হইল, যে আয়ুধ সকলকেই বিদ্ধ করিতে পারে, এমন কি বৃত্রের মত মহাবল অসুরকেও। দেবতাদের পরামর্শে তাঁহাকে দধীচি ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কেন না, দধীচি তাঁহার অস্থি না দিলে নাকি বজ্র তৈয়ারি হইতে পারে না। দধীচি তাঁহার অস্থি দান করিলেন; বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই বজ্রে বৃত্র সংহার হইল। আমরা বজ্রের যে লক্ষণ এতক্ষণ দিয়া আসিলাম, তাতে দধীচি ঋষি এবং তাঁর অস্থির স্থান কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের দিতে হইবে। তার আগে একটা কথা আমাদের স্মরণ করা দরকার। বজ্র সবই ভেদ করিতে পারে, কেবল একটা জিনিষকে পারে না। সে একটা জিনিষ হইতেছে অমৃত; অর্থাৎ, অক্ষয় অব্যয় অজর যে সত্তা, সেইটি। অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরগুলি কিরাতরূপী শিবের অঙ্গে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া আসিয়াছিল, বিদ্ধ হয় নাই। কেন না, শিব সাক্ষাৎ অমৃত-স্বরূপ; মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং, কোন কিছুতে বিদ্ধ হওয়ার বস্তু তিনি নহেন। অর্জ্জুনের শর বলিয়া কেন, সাক্ষাৎ বজ্রও ওখানে হার মানিয়া আসে; ওই একটা মাত্র বস্তুতে, আর কিছুতে নয়। অমোঘ শক্তির নাম বজ্র; কিন্তু এমন একটা বস্তু অথবা ধাম আছে, যেখানে এই অমোঘ শক্তিও পরাহত হইয়া আসে। সেই বস্তু বা ধামটিকে আমরা "অমৃত" বলিতেছি। অথবা সেটিকে আমরা বজ্রও বলিতে পারি। তাহা হইলে বজ্র এমন একটা বস্তু হইতেছে, যেটা কোন শক্তিতেই বিদ্ধ হয় না; সুতরাং যেটা নিরতিশয় রূপে দৃঢ়—যেমন কিরাতরূপী শিবের কলেবর। বজ্রকে শাস্ত্র অন্য আকারেও কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যু বজ্রের একটি রূপ, কেন না, মৃত্যু সকল বস্তুকেই বিদ্ধ করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। কেবল একটি মাত্র বস্তুকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না—সেই বস্তুটিই হইতেছে অমৃত। বজ্রকে কালরূপে অথবা কালাগ্নি-রুদ্র রূপে শাস্ত্র কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শিবের হস্তে ত্রিশূল রূপে অথবা বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন রূপে বজ্র বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু কৃত্রিম অথবা ক্ষয়শীল, তাহাই এই বজ্রের অধীন। অথর্ব্ববেদসংহিতার (১৯।৫৩) কাল—"স এব সংভুবনান্যাভরৎ, স এব সংভুবনানি পর্য্যৈত। পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং, তস্মাদ্বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ॥" পরমতেজঃ কাল = বজ্র।

তপঃশক্তি কার্য্যকরী হইতে হইলে, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া লইতে হয় এবং একতান অথবা একাগ্র করিয়া লইতে হয়। শক্তি ছড়াইয়া থাকিলে কাজ হয় না; আবার শক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে প্রবণতা না থাকিলেও কাজ হয় না। জড়ে, প্রাণে, মনে সর্ব্বত্র আমরা এই সত্যের পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দধীচির উপাখ্যানের মধ্যে আসল কথা তিনটি। প্রথম, দধীচির অস্থি; দ্বিতীয়, দেবতাদের কল্যাণে দধীচির নিজ দেহাস্থি ত্যাগ; তৃতীয়, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বৃত্র বধের জন্য সেই দেহাস্থির বজ্ররূপে নির্ম্মাণ। এখন, যে সত্যটির কথা পূর্ব্বে আমরা বলিলাম, সেই সত্যেরই তিনটি দিক্ এই তিনটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেহ অবশ্য রস রক্তাদি নানা ধাতুতে নির্ম্মিত। এই সকল ধাতুর মধ্যে সব চাইতে দৃঢ় ও ঘনীভূত ধাতু হইতেছে আমাদের দেহের অস্থি। অস্থির কাঠামোখানাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের এই দেহ-যন্ত্রের সকল কল কব্জা রহিয়াছে এবং চলিতেছে। অস্থির কাঠামো হইতেছে

অথর্ব্ববেদবিশ্রুত (১০।৭) সেই স্কন্দদেবতার প্রতিমূর্ত্তি! সুতরাং অস্থি বলিতে দৃঢ় এবং ঘনীভূত একটা বস্তু বুঝায়। অতএব দধীচির দেহাস্থি তপঃশক্তির ঘনীভূত অবস্থার প্রতীক। এই গেল প্রথম কথা। তার পর দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের দেহাস্থি ত্যাগ করিলেন। এ কথার মানে এই যে, ঘনীভূত তপঃশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে একতান অথবা একাগ্র হইল। ত্যাগ মানে যা, প্রত্যাহার মানেও তাই। অমুকের উদ্দেশে কোন কিছু বলি দিলাম বা ত্যাগ করিলাম—এ কথার মানে এই যে, যেটা আগে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অথবা অন্য লক্ষ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিল, সেটাকে একটা নূতন লক্ষ্যের দিকে একাগ্র করিয়া দিলাম। বলি বা ত্যাগ কথার এইটাই হইল আসল মানে। অথর্ব্ববেদ (১০।৭।৩৯) কোষীতকি উপনিষৎ (২।১) প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন একজন মহাদেবতার উদ্দেশে অন্য সকল দেবতারা প্রতিনিয়ত বলি আহরণ করিতেছেন। সে মহাদেবতাটি আমাদের প্রাণ অথবা আত্মা; আর বলি সংগ্রহকারী অপর দেবতাগণ হইতেছেন আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাম। অন্যত্র এই ব্যাপারটিকে প্রাণাগ্নিহোত্র বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রে যেমনধারা অগ্নিতে আজ্যাহুতি নিক্ষেপ করিতে হয়, আমাদের প্রাণরূপী অগ্নিতে তেমনিধারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সদাসর্ব্বদা রূপ-রসাদি আহুতি দান করিতেছে। এ অনুষ্ঠানেও চক্ষুরাদি দেবগণকে প্রত্যাহার ও সংযম, এ দুইই করিতে হয়। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ আমাকে দেখাইতে হইলে, চক্ষুকে আর পাঁচটা রূপ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া লইতে হয়, এবং একটা রূপেই নিজেকে একাগ্র করিতে হয়। চক্ষু সম্বন্ধে যে কথা, শ্রবণ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা। দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের অস্থি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথাটার মানে আমরা এইভাবে বুঝিয়া লইতে পারি।

খানিকটা শক্তি রহিয়াছে। অথচ আমি দেখিতেছি যে আমার অভীষ্ট কাজটি হইতেছে না। এখানে বুঝিতে হইবে যে শক্তিটা এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে; ঘনীভূত হয় নাই এবং আমার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হয় নাই। কেবলমাত্র ঘনীভূত হইলে হয় না, একাগ্র হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেহে মূলাধার-চক্রে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন, সে শক্তি ঘনীভূত শক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি সাধারণতঃ লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকেন বলিয়া, তাঁর কল্যাণে আমাদের কোনো সিদ্ধি লাভ হয় না। উপযুক্ত উপায়ে সেই ঘনীভূত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে একাগ্র করিয়া তুলিতে পারিলেই, সে শক্তির দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল চক্রভেদ হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সিদ্ধি আমাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের দেহের মধ্যে দধীচির অস্থি রহিয়াও কার্য্যকরী হইতেছে না এই জন্য যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সে অস্থির ত্যাগ অথবা বিনিয়োগ হইতেছে না। সুতরাং আমরা বৃত্র বা কাল বা মৃত্যুর অধিকারেই রহিয়া গিয়াছি। সে অধিকার অতিক্রম করিতে হইলে, যে বজ্রাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, সে অস্ত্রের উপকরণ (অস্থি) আমাদের ভিতরে থাকিলে কি হইবে, বিশ্বকর্ম্মা সে অস্থিটিকে এখনও গড়িয়া পিটিয়া বজ্র বানাইয়া লইতে পারেন নাই। কাজেই আমরা কালকে অথবা মৃত্যুকে জয় করিতে পারিতেছি না।

তন্ত্রশাস্ত্র শক্তির একান্ত ঘনীভূত অবস্থাটিকে বিন্দু বলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র (বৌদ্ধ ও হিন্দু) বজ্র তত্ত্বটিকেও বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছেন। যাই হউক, বিন্দু শক্তির এমন একটা অবস্থা, যার চাইতে বেশী ঘনীভূত, সুতরাং কার্য্যকরী, অবস্থা শক্তির আর হইতে পারে না। এ বিন্দুর কথা আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব। এখানে বক্তব্য এই যে, পুরাণকার যে বস্তুকে দধীচির অস্থি বলিতেছেন, আরও সূক্ষ্মভাবে লইয়া সেই বস্তুটিকে আগম বলিতেছেন বিন্দু। দুইই শক্তির ঘনীভূত অবস্থা—বিক্ষিপ্ত, বিরল, বিমুখ অবস্থার বিপরীত অবস্থা। তন্ত্রশাস্ত্র এই বিন্দুকেই সৃষ্টির গোড়ায় বসাইয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র দধীচির অস্থি বিদ্যমান থাকিলে হইল না, কোন এক উদ্দেশ্যে সে অস্থির ত্যাগ হওয়া আবশ্যক। দধীচি তাই ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। শুধু যে ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি এমন নয়, সংযমেরও প্রতিমূর্ত্তি। আমরা দেখিয়াছি যে সংযম ছাড়া ত্যাগ হয় না; যে রিক্ত, সে দাতা হইবে কিরূপে? শ্রেষ্ঠ ত্যাগের মূলে শ্রেষ্ঠ সংযম অবশ্য রহিয়াছে। এই সংযমকে আমরা শক্তির ঘনীভূত অবস্থা বলিতেছি। বাতাসে জলীয় বাষ্প সর্ব্বদাই কিছু না কিছু

রহিয়াছে, সচরাচর সেটিকে আমরা দেখিতে পাই না। সে জলীয় বাষ্পের বৃষ্টিরূপে অথবা শিশির রূপে ত্যাগ হয় কখন? যখন বাতাসে বিক্ষিপ্ত সেই জলীয় বাষ্পরাশি শৈত্য অথবা অন্য কোন কারণে ঘনীভূত হইয়া ছোট ছোট জল বিন্দুতে পরিণত হয়, তখনি। যতক্ষণ ঘনীভাব নাই, ততক্ষণ ত্যাগও নাই। পৃথিবীতে তাড়িত শক্তি রহিয়াছে, মেঘেও রহিয়াছে। মেঘ তার তাড়িত-শক্তি পৃথিবীর দিকে ত্যাগ করে কখন? যখন মেঘের সেই বিক্ষিপ্ত তাড়িত-শক্তি ঘনীভূত হইয়া থাকে, তখনই। একটা ইলেকট্রিক্ ব্যাটারি এবং অপর একটা ইলেকট্রিক্ ব্যাটারির মধ্যে তাড়িত শক্তির আদান-প্রদান হবার আগে উভয়ের শক্তি কতকটা ঘনীভূত (condensed) হওয়া আবশ্যক। আমরা দুটা একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। জড়ের রাজ্যে বহু দৃষ্টান্ত লইয়া এটা দেখান যাইতে পারে যে, শক্তির ঘনীভাব না হইলে বিশেষ কোন কাজ হয় না।

প্রাণের রাজ্যেও এই কথা। পুং-জীব স্ত্রী-জীবের দেহে নিজের বীর্য্য ত্যাগ করিয়া থাকে, বিন্দুর আকারে। সেই বিন্দু হইতেই নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। এখন এই যে ত্যাগ, এর পশ্চাতেও শক্তির ঘনীভাব রহিয়াছে। বীর্য্য অথবা বিন্দু অস্বাভাবিক রকমে তরল হইয়া গেলে, ধাতুদৌর্ব্বল্য হইল। সে ক্ষেত্রে ত্যাগ নিষ্ফল। তা ছাড়া, আমাদের দেহের শুক্র ধাতু সকল ধাতুর সার। আমরা যা কিছু আহার করিয়া থাকি, সে সকলের শক্তির চরম পরিণতি ও ঘনীভাব হইতেছে ঐ বিন্দু। আমাদের মনে কাম অথবা জননেচ্ছা হইলে, সর্ব্বদেহে ওতপ্রোত ওজঃশক্তি ঘনীভূত হইয়া বিন্দুরূপে শুক্রকোষে আসিয়া সঞ্চিত হয়। বাতাসে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রভাবে ঘনীভূত হইয়া যেমন মেঘরূপে জমাট বাঁধে এবং বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, অনেকটা যেন তেমনি-ধারা। এই কথাটি স্মরণ করিয়া বেদের ঋষিরা বর্ষণকারী দেবতাটিকে বৃষভ বলিয়া গিয়াছেন। অন্য অনেক প্রাচীন দেশেও বটে—ঈজিপ্টের Apis Bull একটা মাত্র নজির। সে দেবতাটি কেবল যে বৃষ্টিই বর্ষণ করেন এমন নয়, সৃষ্টিতে যা কিছু অন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই তিনি বর্ষণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে দেবতাটি বৃষরূপে এই বিশ্বের নিখিল ঘনীভূত শক্তি বীর্য্যরূপে নিজের দেহে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ যে দধীচির অস্থির কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছি, সে অস্থি বীর্য্যরূপে সেই বৃষ-দেবতার দেহে বিরাজ করিতেছে। এই পৃথিবী অথবা সৃষ্টি হইতেছে গাভী। বৃষরূপী দেব এই গাভীতে নিজের বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ৯।৪ ইত্যাদিতে এই প্রাচীন ঋষভ-দেবতার প্রশস্তি-বাণী রহিয়াছে। তার ফলে গাভী সবৎসা হইয়াছে, এই নিখিল প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। এই বৃষ-দেবতাটি প্রাচীন যুগে সকল দেশেই পূজিত হইতেন দেখিতে পাই। এ বৃষ যে কার প্রতীক, তা এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম। ইনি স্বয়ং ইন্দ্র, প্রজাপতি অথবা বিশ্বকর্ম্মা। দধীচির অস্থিকে এই বিশ্বকর্ম্মাই বজ্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তবে না বৃত্রের সংহার হইয়াছিল। তপঃশক্তির বিরোধী শক্তিটি যে বৃত্র, তা আমরা আগেই বলিয়া রাখিয়াছি। এ বিরোধী শক্তিটিকে ক্ষয় করিতে হইলে তপঃশক্তি ঘনীভূত হওয়া আবশ্যক এবং একাগ্র হওয়া আবশ্যক। দধীচির অস্থি, তপঃশক্তির ঘনীভূত অবস্থা; দধীচির অস্থি ত্যাগ এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সেই অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ঘনীভূত তপঃশক্তির একতান, একাগ্র অবস্থা। ঘনীভূত শক্তি একাগ্র হইলেই সেটি বজ্র হইল; কেন না তখন সেটি গুহা বা ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ।

আমরা মেঘে মেঘে অথবা মেঘে-পৃথিবীতে তাড়িত-শক্তির যে আদান প্রদান দেখিয়া থাকি, তার নাম সচরাচর দিয়া থাকি বজ্র; কেন না, বজ্রের কয়টা মোটামোটা লক্ষণ এখানে আমরা দেখিতে পাই। প্রথম, আমাদের বাহিরে শক্তিকে আমরা নানা আকারে খেলিতে দেখিতেছি—যেমন মাধ্যাকর্ষণ, ঝড়, বাতাস প্রভৃতির বেগ, তাপ, আলোক, ইত্যাদি। এ সকল শক্তির মধ্যে তাড়িত-শক্তিকে আমরা মুখ্য বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি; অর্থাৎ, বাহিরে আমরা শক্তিকে যত আকারে দেখিতেছি, সে সবের ভিতর তাড়িত হইতেছে শক্তির আসল রূপ। বলা বাহুল্য, জড় বিজ্ঞান এ কথাটিতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিবেন। দ্বিতীয়, যখন মেঘ হইতে পৃথিবীতে বাজ পড়ে, তখন শক্তির মূল চেহারা খানিই যে শুধু আমরা দেখি এমন নয়, তখন আমরা শক্তিকে যারপর নাই তীব্র ও ঘনীভূত একটা মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। শক্তির ঘনীভাবের এর চাইতে স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি আমরা আর বড় একটা দেখি না। তৃতীয়, সে তীব্র এবং ঘনীভূত বৈদ্যুতিক শক্তি সকল পদার্থই ভেদ করিতে সমর্থ বলিয়া আমরা

দেখিতে পাই ; যে বস্তুর উপর বাজ পড়ে, সে বস্তুটি যেমনই হউক না কেন, উহার দ্বারা সে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ হইয়া যায়। বাজে মোটামুটি এই সকল লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা বাজকে সচরাচর বজ্র বলিয়া থাকি ; বজ্র বলিলে ঐ বাজকে আমাদের মনে পড়ে। আসলে কিন্তু বজ্র শক্তির নিরতিশয় ঘনীভূত অবস্থা এবং একাগ্র অবস্থা।

দেবতারা বৃত্রের ভয়ে দধীচির তপস্যাশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অস্থি ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন ; বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন ; ইন্দ্র সেই বজ্রায়ুধে বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন ;—এ সকল কথার তাৎপর্য্য আমরা এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিলাম। বজ্র সৃষ্টির কথা আর বিন্দু সৃষ্টির কথা একই কথা। বজ্র অথবা বিন্দু এ দুয়ের মধ্যে একটা না হইলে সৃষ্টি মোটেই হয় না। সৃষ্টি হইতে হইলে শক্তিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে সংহত করিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া লইতে হয়। ইহার বিরোধী অবস্থাটির নাম বৃত্র। বজ্র বৃত্রের সংহারক এবং সেই বজ্র তপঃশক্তির নিরতিশয় ঘনীভূত এবং একাগ্র অবস্থা। প্রজাপতিকে সৃষ্টির সূচনায় এই তপস্যাটি অবশ্যই করিতে হইয়াছিল। এখনও প্রত্যেক খণ্ড সৃষ্টিতে অথবা নিত্য সৃষ্টিতে এই তপস্যা চলিতেছে—জড়ে, প্রাণে, মনে, সর্ব্বত্র।

বৃত্রের সংহার এই কথাটিকে আমাদের সাবধানে লওয়া উচিত। বৃত্রের সংহার হয় এ কথার মানে এ নয় যে, বৃত্রের লোপ হইয়া যায়। বৃত্রের সত্তা শক্তির সত্তা। শক্তির ধ্বংস নাই। শক্তি এক আকার হইতে অন্য আকারে রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র। আমরা এঞ্জিনে যে কয়লা পোড়াইয়া থাকি, তার শক্তি ডাইনামো যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত শক্তিতে পরিণত হয়, সেই তাড়িত-শক্তি আবার ইলেক্‌ট্রো-মোটর যন্ত্রের সাহায্যে অন্যরূপে পরিণত হইয়া ট্রাম চালাইয়া থাকে, আমাদের মাথার উপরে পাখা ঘুরাইয়া দেয়। এই ভাবে শক্তির রূপান্তর অহরহঃ চলিতেছে। শক্তি এক আকারে অন্তর্হিত হয়, অন্য আকারে আবির্ভূত হয়। মোটামুটি হিসাবে শক্তির জমা খরচে গরমিল না হওয়াই দেখিতে পাই। এ কথাটা অনেক দিন হইতে বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষিত সত্য হইয়া রহিয়াছে। বৃত্র যখন আসলে শক্তিস্বরূপ, তখন আমাদের মানিতে হইবে যে বৃত্রের ধ্বংস নাই। বজ্রের প্রভাবে বৃত্রের ধ্বংস হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। সে রূপান্তরের নামই মৃত্যু। বন্য হস্তী অথবা মহিষ বেজায় দুর্দ্দান্ত পশু ; ছাড়া থাকিলে তারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। কিন্তু উপায়-বিশেষের দ্বারা যদি তাদের পোষ মানাইয়া লইতে পারা যায়, তবে তাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত ইষ্ট সাধন হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে বন্য হস্তী বা মহিষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল না ; অথচ, তাহাদের বন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাবটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। যে শক্তি বন্য উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় থাকিয়া আমাদের উপর উপদ্রব করিতেছিল, সে শক্তি আমাদের বশে আসিয়া আমাদের উপকারক হইয়া দাঁড়াইল। পোষ মানাইয়া আমরা শক্তিটির মোড় ফিরাইয়া দিই মাত্র। যে শক্তি আগে আমাদের প্রতিকূল ছিল, সে শক্তিকে আমরা অনুকূল করিয়া লই। শক্তি প্রতিকূল থাকিলে, তার নাম আমরা দিই দৈত্য অথবা দানব। বৃত্র এই হিসাবে দৈত্য বা দানব। শ্রুতি অনেক জায়গায় "অসুর" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। এক ঋগবেদ-সংহিতায় প্রায় সত্তর জায়গায় অসুর শব্দটির প্রয়োগ আছে দেখিতে পাই। প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মশাস্ত্রে (জেন্দ অবেস্তায়) এই অসুর, "অহুর" হইয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য এ দুই পর্য্যায়েই অসুর শব্দের প্রয়োগ আমরা বেদে দেখিতে পাই। যাস্ক, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যেরা 'অসুর' কথাটির যে নিরুক্তি দিয়াছেন, তাতে মনে হয় যে, বলবান্ অথবা প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন সত্তাকে অসুর বলিয়া অভিহিত করার দস্তুর এককালে ছিল। এইজন্য দেবতারাও অসুর, আবার দৈত্যেরাও অসুর। অসুর শব্দে কেবল দৈত্য বুঝাইবে, দেবতা বুঝাইবে না—এ নিয়ম করিতে গেলে আমাদের বলিতে হয় যে, শক্তির প্রতিকূল অবস্থাই অসুরত্ব। শক্তি অনুকূল হইলে সেটিকে আর আমরা অসুর বলিতেছি না।

অনুকূল অথবা প্রতিকূল এ সকল কথা ব্যবহার করিতে হইলে সৃষ্টির মূলে কোন একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে ইহা আমাদের বলিতে হয়। লক্ষ্য ছাড়া অনুকূল বা প্রতিকূল এ কথা দুইটির কোন মানে হয় না। সৃষ্টির গোড়াকার সেই লক্ষ্যটি যে কি তার বিচার করা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। আমরা বৃত্রকে যে অসুর বলিতেছি, তার ভিতরে মতলব রহিয়াছে দুইটি। প্রথমতঃ, বৃত্র বল বা শক্তি স্বরূপ ; ইন্দ্র অথবা অগ্নি যেমন বলের পুত্র বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন,

বৃত্রকেও আমরা সেই রকম মনে করিতে পারি। বৃত্রকে অসুর বলার এই একটা মতলব। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি অনুকূল হইতে পারে, অথবা প্রতিকূল হইতে পারে, এই ভেদটি মনে রাখিয়া আমরা বৃত্রকে শক্তির প্রতিকূল অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি ভাবিতেছি। যে উপায়-বিশেষের দ্বারা সেই প্রতিকূল অবস্থাটিকে লক্ষ্যের অনুকূল করিয়া লওয়া যায়, সেই উপায়-বিশেষের নাম দিয়াছি তপস্যা এবং বজ্র। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বন্য উচ্ছৃঙ্খল হস্তী পোষ মানিলে যেমন হয়, বজ্রের দ্বারা বৃত্র সংহার হইলে বৃত্রেরও তেমনি অবস্থা হয়; অর্থাৎ যে শক্তিটি প্রতিকূল ছিল, সেটি অনুকূল হয়, যেটি বাধক ছিল সেটি সাধক হয়। আসলে বৃত্ররূপ শক্তির একটুখানিও অপচয় বা ধ্বংস হয় না।

জড়ে, প্রাণে, মনে সর্ব্বত্র শক্তির খেলা চলিতেছে। এ খেলায় শক্তি-বিশেষের হার জিত আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি মাত্রেই অমর। যে শক্তিটি হারিয়া গেল, সে শক্তিটি চেহারা বদলাইয়া ফেলিল মাত্র; তার মোড় ঘুরিয়া গেল। ইস্পাত লোহা চুম্বকের সংসর্গে আসিয়া চুম্বকত্ব পাইয়া থাকে; সে চুম্বকত্ব অবস্থা-বিশেষে স্থায়ী হইতে পারে, অথবা স্থায়ী না হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুম্বকের প্রভাবে, অথবা তাড়িত-শক্তির প্রভাবে লৌহের নিজস্ব শক্তি কিছু কালের জন্য অথবা কায়েমী ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়; কিন্তু এ কথা মনে করা চলে না যে, সে ক্ষেত্রে লৌহের নিজস্ব শক্তিটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগুনে পোড়াইয়া অথবা অন্য উপায়ে লৌহে আগন্তুক চৌম্বক শক্তি তাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তখন আবার যে লোহা সেই লোহাই হইল। বেশী উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই,—আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, শক্তি বিজিত হওয়া মানে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া নহে। বরং তপঃশক্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে যে শক্তিটি কোন মতে বাগ মানিতেছিল না, এবং আমাদের লক্ষ্যের সাধক হইতেছিল না, তপঃশক্তির প্রয়োগের ফলে, সেটিকে আমরা বাগ মানাইয়া লইতে পারি এবং লক্ষ্যের সাধক করিয়া লইতে পারি। প্রজাপতিকে সৃষ্টির সূচনায় তাহাই করিতে হইয়াছিল। তখন বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ এমন একটা অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় সেটি থাকিলে বিশ্বের সৃষ্টির আনুকূল্য না হইয়া বরং বাধাই হইয়া থাকে। সেই বাধা বা অন্তরায়ের ভাবটিকে কখনও "রাত্রি" কখনও বা "তমঃ" ইত্যাদিরূপে বলা হইয়াছে। সেই বাধা বা অন্তরায়টি দূর করার জন্যই প্রজাপতির তপস্যা। তপস্যা যেমন যেমন সফল হইতে থাকে, গোড়াকার সেই বাধা বা অন্তরায়টিও তেমন তেমন তাহার বৈরিভাব পরিহার করিয়া সাধক ও সহায় ভাবে পরিণত হইতে থাকে।

এইভাবে দেখিতে গেলে আমরা বলিতে পারি যে, গোড়াকার সেই অসুরের ধ্বংস হইবার পর তার দেহটা সৃষ্টির উপাদান অথবা উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে। কেবল আমাদের দেশে বলিয়া নয়, সকল দেশেরই পুরাণকারেরা সৃষ্টির কথাটিকে এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। গোড়ায় যেন একটা মহাদৈত্য এই বিশ্বটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল; আদিদেবতা বজ্র অথবা ঐ রকম কোন একটা আয়ুধ দ্বারা সেই দৈত্যটাকে সংহার করিলেন, এবং সেই দৈত্যটার দেহপিণ্ড লইয়াই এই বিশ্বের কাটামো-খানা তৈয়ারি করিলেন। গোড়াতে যেটি ছিল বৈরী, পরে সেইটিই হইল সৃষ্টির আসল উপাদান বা উপকরণ। সৃষ্টির যাহা উপাদান বা উপকরণ তার একটা স্বাভাবিক বাধা দিবার শক্তি আছে। সেই শক্তিটাকে আমরা কখনও বলি বস্তুর জড়তা, কখনও বলি দৃঢ়তা ইত্যাদি। মাটি হইতে ঘট কলস তৈয়ারি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মনে করিলেই হয় না। তার জন্য মাটিকে ভাল করিয়া ছানিয়া নরম করিয়া লইতে হয়। নরম না করিয়া লইলে, তাতে কোন রূপ বা আকার দেওয়া যায় না। মাটির একটা স্বাভাবিক জড়তা আছে বলিয়াই আমাদের এই কর্ম্মটি করিতে হয়। মৃত্তিকার ভিতরে জড়তার আড়ালে বৃত্রাসুর বাস করিতেছে, কুম্ভকারকে ইন্দ্রের মত সেই বৃত্রাসুরটিকে বধ করিয়া লইতে হয়; করিতে পারিলে মৃত্তিকাই নিজের জড়তা পরিহার করিয়া কুম্ভকারের সৃষ্টির উপাদান বা উপকরণ হইয়া থাকে। কুম্ভকার সম্বন্ধে যে কথা, সূত্রধর অথবা ভাস্কর প্রভৃতি শিল্পী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কাঠ হইতে নানা রকম আসবাব তৈয়ারি হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা চরিত্র করিবার পর। করাত, বাটালি, রঁ্যাদা প্রভৃতি হাতিয়ারের সাহায্যে কাঠের স্বাভাবিক জড়তা ও বৈরূপ্য দূর করিয়া লইতে হয়; তাতে মেহন্নৎ বড় কম হয় না, কম কৌশলের আবশ্যকতা হয় না। ভাস্কর পাথর খুদিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে; মূর্ত্তি পাথরের

ভিতরেই রহিয়াছে বটে, কিন্তু তার আবরক অংশগুলি বাদ দিয়া তাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ভাস্করকে কম যত্ন করিতে হয় না। সকল ক্ষেত্রেই এই রকম সব দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব কেমন করিয়া প্রজাপতি সৃষ্টির সূচনায় সৃষ্টির অন্তরায় স্বরূপ দৈত্যটির সংহার করিয়া তার দেহটিকেই আবার সৃষ্টির উপাদান বা উপকরণ রূপে পাইয়াছিলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন, চীন—এই সকল দেশেরই পুরাণ-কথায় এই রকমের একটা গল্প চলিয়া আসিয়াছে; নাম হয় ত আলাদা, আলাদা, কিন্তু বস্তুতত্ব এক। কোথাও বা দেখিতে পাই পরাজিত টাইটানের দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া বিশ্বকর্ম্মা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিতেছেন; কোথাও বা টাইটানের স্থলে টিয়ামাট্‌, কোথাও বা আর কিছু।

আমাদের মধুকৈটভের উপাখ্যানের মূলেও এই তত্ব নিহিত রহিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইয়াছে কেন? মধুকৈটভের সংহারের পর তাহাদের মেদোদ্বারা বিধাতা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এর নাম হইয়াছে মেদিনী। ব্রহ্মার সৃষ্টির উপক্রম এবং মধু-কৈটভের আবির্ভাব সম্বন্ধে রহস্যটি আমরা অন্য প্রসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে রহস্যের যে অংশটি আমরা দেখাইতে চাই, সেটি এই। যোগ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ হাজার বছর ধরিয়া দৈত্য যুগলের সঙ্গে লড়িলেন; কিন্তু কাহারও হার জিত হইল না। তখন ভগবানের যুদ্ধে প্রীত হইয়া দৈত্যযুগল তাঁহাকে বর দিতে চাহিল। ভগবান্ বর চাহিলেন—তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও। দৈত্যযুগল বলিল, তথাস্তু; কিন্তু একটা সর্ত্ত তোমাকে পালন করিতে হইবে; "আবাং জাহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা"—এ সমস্তই জলময় দেখিতেছি; জলে আমাদের মরিতে সাধ নাই; যে জায়গাটায় জল নাই, সেইখানে তুমি আমাদের উভয়কে বধ কর। মূলে "বধ" কথাটি নাই, "জাহি" অর্থাৎ, জয় কর, এই কথাটি আছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শক্তি-বিগ্রহ মধুকৈটভের আসলে বধ বা ধ্বংস হয় না; পরাজয় হয় মাত্র; যেমন বন্য হস্তী বা মহিষের পোষ মানার ফলে পরাজয় হয়, তেমনিধারা। পুরাণকার যে সময়ে এই লড়াইয়ের রিপোর্ট লিখিতেছেন, সে সময়ে এই নিখিল জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল; জল ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না। এ জল মানে যে জগতের একটা একাকার নির্ব্বিশেষ অবস্থা, তা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। আমরা যেটিকে জল বলি, সেইটিই সত্য সত্য যে সব ছাইয়া ফেলিয়াছিল, এমন নয়। সে যাই হউক মধুকৈটভ সর্ত্ত করিলেন—আমাদিগকে তুমি জলে মারিতে পারিবে না। এ অতি মজার সর্ত্ত। জল ছাড়া যেখানে কিছুই নাই, সেখানে জলে মারিতে পারিবে না, এ কথা বলায় প্রকারান্তরে অবধ্য রহিবারই সর্ত্ত করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু মধুকৈটভের হিসাবে ভুল হইয়াছিল; এবং সেই ভুলেই তাহাদের মৃত্যু অথবা পরাজয়।

বিশ্ব তখন জলময় সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, সেই পরম পুরুষ মহাবিষ্ণু স্বয়ং ত' জল হইয়া ছিলেন না। পুরাণে দেখিতে পাই, তিনি জলের উপর শেষ-শয্যায় শুইয়া ছিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বের লয়ে, অর্থাৎ, একার্ণবীভূত অবস্থায়, তাঁর লয় হয় না, তিনি নিজে জল অথবা জলের মতন একটা কিছু হইয়া যান না। আমার সামনে খানিকটা জল রহিয়াছে। সেই জলকে আমি উপায়-বিশেষের দ্বারা কখনও বা বরফের চাপ বানাইতে পারি, কখনও বা অদৃশ্য বাষ্প বানাইতে পারি; বরফের চাপকে ইচ্ছা করিলে গলাইয়া আবার জল করিতে পারি। এ খেলায় জল নানা আকারে রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু আমি যে খেলিতেছি, আমার ত রূপান্তর হইতেছে না; আমি যে সেই-ই আছি। এ জগৎ সম্বন্ধেও সেই কথা। এ জগতের সূক্ষ্ম উপাদানটি (প্রকৃতিই হউক, আর ঈথারই হউক)-কখনও বা চাপ বাঁধিয়া বিশ্বের এই বিচিত্র অবয়ব নির্ম্মাণ করে, কখনও বা আবার সে চাপ গলিয়া গিয়া সব "জলময়" হইয়া যায়। যাঁর এই খেলা এবং যিনি এই খেলা করিতেছেন, তিনিই তাঁর পূর্ণ সত্তায়, কখনও চাপও বাঁধেন না, আবার কখনও গলিয়া জলও হইয়া যান না। এ জগতের সত্তাটিকে তাঁর সত্তা হইতে তফাৎ করিতেছি না; তফাৎ করিলে, তাঁর সত্তা পূর্ণ সত্তা হয় না। কিন্তু যেমনধারা দেহের মধ্যে লোমকূপ, কিন্তু লোমকূপের ভিতরে দেহটা নয়, তেমনি তাঁর পূর্ণ সত্তার এক অংশে এই জগতের সত্তা। এই মহা সত্যটি ঋগ্বেদের এবং অথর্ব্ববেদের পুরুষ সূক্তে, গীতায় এবং আরও নানা জায়গায় অতি সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—আমি এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশে

ব্যাপিয়া রহিয়াছি। পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।৯০, অথর্ব্ববেদ ১৪।৬) বলিতেছেন—আমি এ চরাচর বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ করিয়াও ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছি। কেবল সৃষ্টির সময়ে নয়, প্রলয়ের সময়েও তিনি এই প্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। থাকেন বলিয়াই সৃষ্টি হয়, প্রলয় হয়। কুম্ভকার নিজেই মৃৎপিণ্ড হইলে কুম্ভকারের সৃষ্টি হয় না; উপাদান বা উপকরণ হইতে, যিনি কর্ত্তা বা নির্ম্মাতা, তাঁহার আলাদা হওয়া চাই। মাকড়সার মত নিজের শরীর হইতেই সৃষ্টির উপকরণ বস্তুটি তিনি হয় ত বাহির করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু বাহির করিয়া, পৃথক করিয়া না দিলে, তা লইয়া কোন কিছু সৃষ্টি করা যায় না। প্রলয়ের সময়ে তাঁরও যদি প্রলয় হয়, তবে সে প্রলয়ের আর ভঙ্গ হয় না; সে প্রলয় প্রলয়ই রহিয়া যায়। মহাবিষ্ণু মানে যে সত্তা নিরতিশয় রূপে সর্ব্বব্যাপী। এ ব্রহ্মাণ্ড খুবই প্রকাণ্ড সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাবিষ্ণুর পূর্ণ সত্তার এটি একাংশ, অথবা একটি কলা মাত্র। এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডের যখন জলময় অবস্থা হয়, তখন মহাবিষ্ণু নিজে তাঁর পূর্ণ সত্তাতে জলময় হইয়া যান না। জলের উপরে একটা কিছু থাকে—যেটি বিশ্বে ওতপ্রোত থাকিয়াও বিশ্বাতীত ও বিশ্বাতিগ। সেই বস্তুটি আভাষে বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কারণ-সলিল উপরি, অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুকে শয়ান করাইয়াছেন। শয়ন এই জন্য যে, বিশ্বের সম্পর্কে তখন তিনি কিছুই করিতেছেন না; তখন লয়ের অবস্থা কি না। শেষ শয্যা এই জন্য, এবং সে শেষ সাক্ষাৎ অনন্ত নাগ এই জন্য যে, তখন মহাবিষ্ণুর মহাশক্তি বিশ্বের সম্পর্কে যেন প্রসুপ্ত হইয়া থাকে—একটা মহানাগের মত যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। শক্তির প্রসুপ্ত অবস্থা বুঝাইতে নাগের কুণ্ডলী অবস্থা কল্পনা করা প্রাচীনদের দস্তুর ছিল, কেবল আমাদের দেশেই নয়, অপরাপর অনেক দেশেই।

মধুকৈটভ এই তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পায় নাই, সুতরাং ভাবিল বুঝি জলছাড়া আর কিছুই নাই। তারা ভুলিয়া গেল যে, ব্রহ্মসত্তা জল, স্থল, অন্তরীক্ষ নানা আকারে বিরাজ করিয়াও, ওই সকল আকারের উর্দ্ধে রহিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী জলরাশি অথবা কারণ-সলিল সেই ব্রহ্মবস্তুর একদেশ অথবা একটি কলামাত্র। সেই একটি মাত্র কলাকে সব দেখিয়া ও ভাবিয়া মধুকৈটভ ভুল করিল, এবং সেই ভুলে মরিল। মধুকৈটভের সর্ত্ত পালন করিতে এ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কেহ অবশ্য পারগ হইত-না; এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও পারগ হইতেন না; কেন না ব্রহ্মারও ব্রহ্মাণ্ডের মত উদ্ভব ও বিলয় আছে; তিনিও এই ব্রহ্মাণ্ডের সামিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, নিখিল জীববর্গ—এ সকলই তখন কারণ সলিলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং, মধুকৈটভের সর্ত্ত মানিয়া চলিবার অধিকারী তখন ব্রহ্মাণ্ডে কেহই ছিলেন না। একা মহাবিষ্ণুই অথবা ব্রহ্মসত্তাই মধুকৈটভের সেই সর্ত্ত পালনে পারগ; কেন না, আমরা দেখিলাম যে, তিনি একটি মাত্র কলায় জলময় হইয়াও, অপরাপর কলায় সে জলরাশির উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন, মধুকৈটভের ফাঁকি সুতরাং এ শক্ত পাল্লায় টিকিল না। তাদের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া বিষ্ণু তাহাদিগকে সংহার করিলেন। কোথায়? জলময় ব্রহ্মাণ্ডের কোন খানেও নয়, নিজের জঘনদেশের উপর তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া। এ জঘন-দেশ বলিতে কি বুঝায়? বিষ্ণুর এমন এক ধাম অথবা কলা, যে ধাম বা কলা প্রলয়ের সময়েও মহার্ণবে বিলীন হইয়া যায় না, বা যায় নাই। কারণ-সলিল যেন তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিল; বিষ্ণু যেন কারণ-সলিলে অবগাহন করিতে যাইয়া, তাঁহার পদতল ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এতখানি জল কোথাও দেখিতে পান নাই;—স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল কিন্তু তখন সব সেই জলে তলাইয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুর জঘন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তমাঙ্গ পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ সেই জলরাশি হইতে উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছিল।

শুধু মধুকৈটভ বধের বেলায় নয়, হিরণ্যকশিপু বধের বেলাতেও (নরসিংহাবতারে) তাঁকে এই খেলাটি খেলিতে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বর লইয়াছিলেন—তিনি যেন জল স্থল অন্তরীক্ষ এ তিনের কোন জায়গাতেই বধ্য না হন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, জল স্থল অন্তরীক্ষ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের একটা কলা বই আর কিছু নয়; সুতরাং তাঁর লব্ধ বরে তিনি ব্রহ্মের একটা মাত্র কলায় অবধ্য হইতে পারিয়াছিলেন; ব্রহ্মের যে অপরাপর কলা আছে, এবং সে সকল কলায় তাঁর যে লয় হইতে পারে, এ কথাটি তিনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। গাছের ডালপালার হিসাব লইতে গিয়া তিনি গাছের গুঁড়িটা ও মূলটাকেই হিসাবে বাদ দিয়াছিলেন। তাই মধুকৈটভের মত বিষ্ণুর ক্রোড় দেশে স্থাপিত হইয়া তাঁর সংহার হইল। এ কথার অধিক বিস্তার এ ক্ষেত্রে আমরা আর করিব না।

হিসাবের এই ভুলের জন্য মধুকৈটভের সংহার হইল, তা আমরা দেখিলাম। কথাটা আর একটু স্থূল ভাবেও দেখা যাইতে পারে। মধু ও কৈটভ যে তমঃ ও রজঃ গুণ সে কথা স্বয়ং পুরাণকারই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। প্রলয়ের অবস্থায় বিশ্ব যখন জলময়, তখন বিশ্বে তমের আধিপত্য। সেইটাকেই বলা হইয়াছে রাত্রি। অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করিয়া অন্ধকারকে তাড়ান যায় না। একটা দীপ জ্বালিবা মাত্রই হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এক নিমেষেই সরিয়া যায়। তমের দ্বারা তমের ধ্বংস হয় না। সত্ত্বের দ্বারা তমের ধ্বংস হইয়া থাকে। সত্ত্ব প্রকাশক, তম আবরক; প্রকাশ হইলে আর ঢাকা থাকে না। মধুকৈটভ ভাবিয়াছিল এখন রাত্রি বা তমঃ ছাড়া ত' আর কিছু নাই দেখিতেছি, রাত্রি বা তমঃ ত আমরাই; আমরা নিজেদেরই বধ্য হইব কিরূপে? অতএব সর্ত্ত করা যাক্—যেখানে তমঃ বা জল নাই, সেইখানে আমরা বধ্য হইব। সর্ত্ত করার সময় ভুলিয়া গেল যে, সত্ত্বরূপী বিষ্ণু তখনও রহিয়াছেন, এবং তিনি আর যোগ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াও নাই। সত্ত্ব উদ্রিক্ত হইলেই রজস্তমের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। সবই তমোময় অথবা জলময়, সত্ত্বশক্তি বিদ্যমান নাই, সুতরাং, তাদিকে পরাভব করার মত কোন কিছু নাই—এইটাই হইল মধুকৈটভের হিসাবের ভুল।

যাহা হউক, মধুকৈটভের সংহার ত হইল। এ সংহার-লীলায় আরও কিছু কিছু রহস্য আছে, সে সকল আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিব। যেমন মধুকৈটভের বিষ্ণুকে বর দিতে চাওয়া, বিষ্ণুর সেই বর অঙ্গীকার করা; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে আমরা বলিতে চাই যে, মধুকৈটভের দেহটা সৃষ্টির উপাদানরূপে কল্পিত হইয়াছিল। মধুকৈটভকে রজঃ ও তমঃ গুণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এ কথাটা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সত্ত্বগুণ জাগরিত না হইলে, এবং সত্ত্বগুণের অধ্যক্ষতা না থাকিলে ছন্দোবদ্ধ ভাবে সৃষ্টির সম্ভাবনাই হয় না। এইজন্য তমঃ ও রজঃ গুণ সত্ত্বের অধীনে আসা দরকার। এরই নাম মধুকৈটভের পরাভব। কিন্তু তমঃ ও রজঃ গুণ একেবারে বিলুপ্ত হইতেও পারে না; হইলে, সৃষ্টি-ব্যাপারও নির্ব্বাহ হয় না। খাঁটি সত্ত্বগুণ একা থাকিতে পারে না, থাকিলেও তা দ্বারা কোন কাজ হয় না। এইজন্য সৃষ্টির সূচনায় প্রবল তমঃ ও রজঃগুণকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল করিয়া সত্ত্বগুণের অধীন করা হইয়াছিল; সত্ত্বগুণের অধীন ভাবেই ইহারা বিশ্বের বিচিত্র গঠনে বাধক না হইয়া সাধক হইয়াছে। সেই বন্য হস্তী বা মহিষ পোষ মানার ফলে যেমন হয়, তেমনই হইয়াছে। এইভাবে মধুকৈটভের দেহ এই বিশ্বের নির্ম্মাণে উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে মধুকৈটভের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিলেন। সুদর্শন হইতেছেন সত্ত্বগুণোপেত কালশক্তির প্রতিমূর্ত্তি; চক্র দ্বারা খণ্ডিত শরীরের কতক কতক ভাগ সচল বা অস্থাবর; সেইগুলি বায়ু প্রভৃতি; আর কতকগুলি ভাগ যেন অচল বা স্থাবর, সেইগুলি হইল মধুকৈটভের মেদঃ ও অস্থি—যাতে এই জগতের কলেবরে গুরুত্ব, কাঠিন্য, জড়তা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। এই মেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের এই লোক মেদিনী আখ্যা পাইয়াছে।

বেদে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে ঐ একই কথা বারবার আমরা দেখিতে পাই—প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তপস্যা করিয়া এ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজাপতির তপস্যা যে জ্ঞানময়, এ কথা স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন। এ কথাটি খোলসা করিয়া না বুঝিলে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার শ্রম একপ্রকার পণ্ডশ্রমই হইবে; সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পুরাণ আখ্যায়িকার রহস্য আমরা মোটেই বুঝিতে পারিব না। যাঁরা সেই সব আখ্যায়িকাগুলি কেবল উপর-উপর বুঝিতে চান, তাঁরা প্রাচীন যুগের বিদ্যার প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রাচীন যুগে স্মরণাতীত কালে একটা সত্য ও পরিণত বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সে বিদ্যার মর্ম্মলোকের প্রদীপটি নিভিয়া যাইবার ফলে, সে বিদ্যা উত্তরকালে অনেকটা প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াছিল; অনেকানেক গল্প এবং রূপকের অন্তরালে সে বিদ্যা যেন আত্মগোপন করিয়াছিল। এই কথাটি মনে রাখিলে, আমরা অতীতের প্রতি সহসা আর অবিচার করিতে যাইব না। আমরা যে অনেক সময় অতীতের পুরাণ কাহিনীগুলিকে "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাই, অথবা তাদের ভিতরে নিতান্ত মোটা রকমের তথ্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না, তার কারণ এই যে, আমরা অতীতের বিদ্যাটিকে ধারণার এবং কল্পনার এক প্রকার তুচ্ছ করিয়া রাখিয়াছি। বড় বড়

এবং গভীর যে সকল তত্ত্ব, সে তত্ত্বগুলি যেন বর্ত্তমান যুগেরই স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় একটা নূতন সূত্রের বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অগ্রসর হইবে হইবে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতিতে মানব-মনের যে প্রতিকৃতি আমরা পাইয়া থাকি, সে প্রতিকৃতি যে শিশুর প্রতিকৃতি, অথবা "বর্ব্বরের" প্রতিকৃতি, এ ধারণা লইয়া চলিতে নারাজ হইতে হইবে। প্রাচীন মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যানে এবং প্রাচীন গল্প-রূপাদির রহস্যোদ্ঘাটনে আমরা তাই কোনরূপ সঙ্কোচ, কুণ্ঠা অথবা কার্পণ্য লইয়া আসি নাই। যে সকল ঋষিরা বৈদিক ইন্দ্রের হস্তে বজ্রায়ুধ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁরা যে ইন্দ্রকে বর্ষণ-কারী দেবতা, বৃত্রকে বৃষ্টির প্রতিবন্ধক এবং বজ্রকে কেবলমাত্র সাধারণ বাজই ভাবিয়া গিয়াছেন, তার বেশী আর তাঁদের চিন্তার দৌড় ছিল না, অথবা সম্ভব হয় নাই—হালের বেদ-ব্যাখ্যার এ ধারায় সম্মতি দিতে আমরা অপারগ হইয়াছি। হালের সমালোচকদের সদাই ভয়, পাছে তাঁরা তাঁদের প্রবীণ ও উন্নত চিন্তা প্রাচীন যুগের সেই সব সরল "চাষাকবি"দের মাথায় চাপাইয়া দিয়া বসেন। আমাদের মনে হয় যে, ভয়ের কারণ উল্টাদিকে রহিয়াছে। সে কালের বিদ্যা, আর এ কালের বিদ্যার মধ্যে বড় বেশী মিল নাই। সে কালের বিদ্যায় মানুষের জ্ঞাতব্যের যে দিক্‌টা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এ কালের বিদ্যার সে দিকটা এক রকম অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে, এ কালের বিদ্যায় জ্ঞাতব্যের যে দিক্‌টা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কে জানে, সে কালের বিদ্যাতেও সে দিক্‌টা ঠিক এমন ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল কি না। একালে প্রধানতঃ জড় বিদ্যার "মরসুম" দেখিতেছি। অধ্যাত্ম-বিদ্যা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্পষ্ট ভাসা ভাসা, আন্দাজী রকমের; সেটাকে ঠিক বিদ্যা অথবা "সায়েন্স" বলা যায় না। সেকালে কিন্তু এ বিদ্যাটিকে "সায়েন্সের" আকারেই অনুশীলিত হইতে দেখিতে পাই। যিনি স্বয়ং প্রমাতা না হইয়া প্রমাণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি গায়ের জোরে কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, প্রাচীন যুগের সে অধ্যাত্ম-বিদ্যা আদপে সায়েন্সই ছিল না, তার বেশীর ভাগই অনাবশ্যক এবং মিথ্যা জঞ্জালে ভরা? তপস্যা এবং বজ্র সম্বন্ধে এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে মর্ম্ম ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে মর্ম্ম ব্যাখ্যা যে আমাদেরই স্ব-কপোল-কল্পিত, অথবা পরবর্ত্তী কালের দার্শনিকদের মস্তিষ্কে উদ্ভাসিত, এ কথা আমরা মানিতে নারাজ।

দেনা-পাওনা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

কি তোমারে বোলেছিনু—দ্রুত ক্রোধভরে
সেদিন যে গেলে চলি বাঁকাইয়া মুখ!
তুমি কি ভাবিয়াছিলে তোমারি অধরে
আছে বিষ, আর কারো নাহি এতটুক্?
তুমি ভুলেছিলে বঁধু প্রেম-অভিনয়ে
কেবলি আঘাত নাহি, আছে প্রতিঘাত;
দিয়েছ বেদনা বহু—আজ, বিনিময়ে
পেয়ে থাকো ব্যথা যদি, কেন এত তাত?
তুমি কোরেছিলে মনে সুখে—বুক পাতি
নীরবে সহিব শুধু তব অহঙ্কার!
হায় মূঢ়! বোঝো নাই মোহমদে মাতি
দিতে পারি ফিরাইয়া শত গুণ তার!
দেখা যদি নাহি পাই, বোলে রাখা ভালো-
এসো না করিতে আর এ জীবন কালো।



পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৬)

বীথি হাতের চুড়ি খুলিয়া ফেলিল, থান কাপড় আনাইয়া পরিতে লাগিল, একান্ত নিষ্ঠার সহিত একাদশী ব্রত পালন করিতে লাগিল। দেবী মুগ্ধবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া থাকিত; দুই একদিন সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিল, "তুমি এত কষ্ট সইতে পারবে না বীথি, এত কষ্ট কি আয়ত্তে আনতে পারবে?"

বীথি হাসিয়া বলিয়াছিল, "খুব সহ্য হবে কাকিমা। কথায় আছে, দেহকে যত সুখে রাখিবে, সে ততই সুখে থাকিতে চাইবে; যত কষ্ট দেবে, সে ততই কষ্টে অভ্যস্ত হবে। কেউ বা পড়ে গিয়েও তখনি পরের সাহায্য ব্যতীত উঠে দাঁড়ায়, কেউ বা পড়ে গিয়ে অন্যের সাহায্যে উঠে ও ছয়মাস বিছানায় পড়ে থাকে। এইটেই হচ্ছে শরীরকে সন্তর্পণে রাখা আর কষ্ট সওয়ার ফল। আমার পানে চাচ্ছো কাকিমা,—দেশে এই যে হাজার হাজার বিধবা রয়েছে, এদের পানে একবার চাও দেখি। ওদের কষ্টটা কল্পনা করে আমার পানে তাকিয়ো। ওদের থেকে আমি তো পৃথক নই কাকিমা, আজ আমিও যা ওরাও তো তাই। আজন্মকাল হতে ওরাই কি বৈধব্যকে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে? এই তোমাদের প্রতিবাসী চৌধুরীদের মেয়ে লীলার কথা ভাব দেখি কাকিমা,—আহা বড় কষ্ট হয় ওর কথা ভাবলে। ছোট্ট মেয়েটী, পাঁচ সাত বছরে তার বিয়ে না দিলে কি জাত যেত কাকিমা? বিয়ের পরেই মেয়েটী বিধবা হয়েছে; অথচ সে জানে না কবে তার বিয়ে হল, কবে সে বিধবা হল। মাত্র তার এগার বছর বয়েস এখন, কিছু বোঝে না। লোকের কাছে শুনছে সে বিধবা। সেও সগর্ব্বে লোকের কাছে নিজের পরিচয় দিচ্ছে 'আমি বিধবা'। হতভাগী জানে না—এই বিধবা কথাটার মধ্যে কতখানি অর্থ আছে। সেদিন একটী বিবাহিত বর-কনে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার হাত ধরে মেয়েটী চেয়ে দেখছিল; একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার পানে তাকিয়ে বললে, 'আমারও বিয়ে করতে বড্ড ইচ্ছে করে দিদি, কিন্তু মা বলেছে আমার বিয়ে এ জন্মে আর হবে না। কেন না আমি বিধবা।' কথাটা শুনে—সত্যি কাকিমা, আমার যেন চোখ ফেটে জল এল; ভাবলুম—হায় রে সমাজ, তোমার কঠোর আইন এই শিশুটীর ওপর পর্য্যন্ত সমানভাবে চলছে। সমাজ-সংস্কারের দিক হতে অনেকে বিধবাদের আবার বিয়ে দিতে চাচ্ছেন; কিন্তু সমাজ-সংস্কারের জন্যে নয়,—যারা এমনি ছোট বয়সে বিধবা হয়, তাদের দিক চেয়ে

তাদের আবার বিয়ে দেওয়া আমি খুব উচিত বলেই মনে করি।"

বীথির কণ্ঠ আবেগে কাঁপিতে লাগিল। এই সব ছোট মেয়েদের জীবন তাহাদের অজ্ঞাতে কিরূপ ব্যর্থতায় দেশের লোক পূর্ণ করিয়া দিয়াছে তাহাই সে ভাবিতেছিল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "যাঁরা আজকাল বিধবা বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন—অনেক সময় তাঁদের কথা ভাবলে আমার এখন হাসি পায়। অবশ্য এককালে আমিও সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখেছি; কিন্তু এখন আর সেভাবে দেখতে পারছি নে। দেশে হাজার হাজার বিবাহযোগ্যা কুমারী রয়েছে,—পাত্রাভাবে বিয়ে হচ্ছে না,—তাদের উদ্ধার করা দূরে গেছে,—বিধবার বিয়ে দেবার জন্যে অনেকে উঠে-পড়ে লেগেছেন। আমি বিধবা বিয়ের পক্ষপাতিনী নই; কেন না, আমি নিজেকে দিয়ে বুঝছি—বিধবার কর্ত্তব্য কি। দুঃখের কথা—বিধবা সংসারে লাঞ্ছিতা হয়ে থাকেন। অনেকের দৃষ্টি সেইজন্যেই এঁদের ওপর পড়েছে। তা হলেও—দু-চারজন বিধবা ছাড়া আর কেউই আবার বিয়ের ইচ্ছে মনে রাখেন না। দু-চারজন ছাড়া সকল বিধবাই—সংসারে অপমানিতা লাঞ্ছিতা হয়ে নিয়ত মরণ প্রার্থনা করলেও, আবার বিয়ের কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারেন না। কারণ তাঁদের মনে স্বামীর ছবি জেগে থাকে; আর মরণান্তে স্বামীর সান্নিধ্য যে তাঁরা লাভ করবেন এ আশা রাখেন। তবে এই-সব ছোট মেয়ে—যারা বিয়ে বোঝে নি, বৈধব্য বোঝে নি—এদের বিয়ে দেওয়া আমার মতে উচিত বলেই মনে হয়। যাঁরা আগাগোড়া বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁদেরও এটা ভেবে দেখা খুবই উচিত।" দেবী বিমুগ্ধনেত্রে বীথির পানে চাহিয়া ছিল। সে বীথিকে যতই দেখিতেছিল ততই মুগ্ধ হইতেছিল।

দেবী যে বীথিকে কতখানি নিজের পানে আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে নাই। বীথি দেবীকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার কাকা যে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে এমন দেবীর মতই স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, দেবীর আসনে সংসারের মানুষ ইলাকে কেমন করিয়া বসাইল, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এই স্ত্রীকে চিনিয়া, ইহার অসাধারণ গুণপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া, সে যে ভুলিয়া গেল—ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে বীথি ভাবিল মানুষ আশার মোহে ভুলিয়া সবই করিতে পারে। নিজের পিতা ও কাকার উপর তাহার কেমন একটা ঘৃণার ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "তুমি যাই বল কাকিমা, বাবা আর কাকার এ রকম ব্যবহার দেখে তাঁদের মানুষ বলতে আমার ইচ্ছে করে না। উচ্চশিক্ষা কি তাকে বলে যা মানুষকে কর্ত্তব্যচ্যুত করে, না উচ্চশিক্ষা সেই—যা মানুষকে কর্ত্তব্যে অবিচল রেখে দেয়? ছিঃ, এতে বাপ কাকাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

দেবী হাসিমুখে বলিল, "মানুষের দোষ গুণ দেখে বিচার করে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে গেলে তো চলে না মা,—তুমি তোমার কর্ত্তব্য-পালন করে যাও, তা হলেই হল। তোমার শিক্ষার সার্থকতা করে যাও তোমার গুরুজনের ওপর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভক্তি অটুট রেখে; তাঁরা কি করেছেন বা করছেন, তা তোমার দেখবার তো কোন দরকার নেই মা।"

বীথি মাথা দুলাইয়া বলিল, "কাকিমা, ঠিক গুরুর মতই উপদেশটা দিয়ে ফেললে। গুরু শিষ্যের অন্তরের খবর কিছুই রাখেন না,—বাহ্যিক মন্ত্র দিয়ে যান; তার পর উন্নতি হোক—চাই না হোক। এটা ঠিক যে, সকলের মনই সমান হয় না। কারও মন-জমি উর্ব্বর থাকে, বীজ ফেলবামাত্র চারা জন্মায়; কারও অনুর্ব্বর থাকে। বীজ পড়লে শুকিয়ে মরে যায়। চাষারা কিছু বুনবার আগে জমি চাষ করে, কত সার দিয়ে তার উর্ব্বরতা-শক্তি বাড়িয়ে তোলে, তা তো জানো? তুমি তো দিব্য কথা বলে গেলে, বীজ তো বুনলে—কিন্তু আমার হৃদয় যে অনুর্ব্বর তা বোধ হয় জানো না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার সামনে থাকতে—সত্য আমার মনে থাকতেও আমি সব উড়িয়ে দেব—বলব, ও-সব সত্যি নয়, সব মিথ্যে? এও কি একটা কথা হতে পারে কাকিমা, যে কেউ দেখে শুনে গলা টিপে সত্যিকে মেরে ফেলবে? বাপ যদি দুষ্ট হন, চরিত্রহীন হন, মা যদি দুর্ম্মুখী, বিবাদপরায়ণা হন, সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সে সব দোষ সংশোধন করে ফেলা উচিত। সন্তান অনুকরণ করবে কার, তার বাপ মায়ের স্বভাব চরিত্রের নয় কি? বাপ মা যেমন চলবেন, যেমন কথা বলবেন—সন্তানও ঠিক তেমনি চলবে, তেমনি

বসবে, তেমনি কথা বলবে; কারণ বাপ মা কায়া—সন্তান ছায়া। অসৎ বাপ মায়ের সন্তান অসৎই হয়ে থাকে। কচিৎ কখনও সৎসঙ্গ যদি তারা পায়, যদি ভালমন্দ বুঝবার শক্তি তাদের হয়, তখন তারা মাপকাঠি দিয়ে ভালমন্দ মেপে দেখে;—তখন কি তারা বাপ মাকে সে রকমভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে পারবে বলে মনে কর? নিজের বাপের ওপর আমার বাপ যে এত অবহেলার ভাব দেখাচ্ছেন, তাঁর কি এটা মনে করা উচিত হয় নি, তাঁর সন্তানও তাঁর দৃষ্টান্ত নিয়ে তাঁকেও এমনি করতে পারে? আমি যা করব আমার পরে কেউ তা করতে পারবে না—এ কথা ভাবে মূর্খে; কেন না, সে এটা ভাবলেই ভাবতে পারত—একজন যা করে দশজনে তার সেই দৃষ্টান্ত নেয়। আমার বাপকে আমি ভক্তি করব, শ্রদ্ধা করব কি করে কাকিমা? আমার বাপ যখন আমায় উপদেশ দিতে আসবেন—বাপ মাকে ভক্তি কর, সেবা কর,—তখন আমার মনে কি ভাব জাগবে সেটা একবার ভেবে দেখ। প্রত্যক্ষ সত্য আমার সামনে দাঁড়িয়ে, প্রমাণ আমার হাতে,—আমি কেমন করে সত্যকে মারব, প্রমাণকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেব? তোমার উপদেশটা মিথ্যে হয়ে গেল কাকিমা,—আমি পারব না। আর কেউ পারলেও পারতে পারে; কিন্তু আমার ক্ষমতার বাইরে বলেই আমার দ্বারা হবে না। তোমায় জিজ্ঞাসা করি কাকিমা, সত্যি কথা বল দেখি—সত্যি তুমি কাকাকে এখনও তেমনি ভক্তি কর, তেমনি শ্রদ্ধা কর? শ্রদ্ধা, ভক্তি, আর ভালবাসা এক নয় কাকিমা,—সেটা তোমায় আগেই জানিয়ে রাখছি। এ জিনিস দুটোতে অনেক পার্থক্য আছে,—সেটা বুঝে তবে উত্তর দিয়ো। ভালবাসতে পারা যায় অনেককেই; তা বলে ভক্তি শ্রদ্ধা দেওয়া যায় না। বাবা কাকাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি আর করতে পারি নে। স্বামী বলে তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করে যাবে; কিন্তু বল দেখি—বুকে কি তোমার ব্যথার সুর বেজে উঠবে না, সে ব্যথার সুরে তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি কি কেঁপে উঠবে না?"

দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু মাথাটা কাত করিল।

বীথি বলিল, "এটা যে স্বাভাবিক নিয়ম কাকিমা, এর মধ্যে অপ্রাকৃত একটু কিছু নেই। আমি আমার স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসতুম। এখন আমার বাইরেরটা অন্তরে গিয়ে তাকে আরও গভীর করে তুলেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি হারিয়েছিলুম কাকিমা, তা আর ফিরে পাই নি। ভালবাসা প্রাণে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা জাগায়; আর শ্রদ্ধাভক্তি প্রাণে বিশ্বাস এনে দেয়। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করতে সবই করছ, সবই করবে; কিন্তু সত্যিকার সে বিশ্বাস কিছুতেই তোমার প্রাণে আর আসবে না।"

হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িল, "যাক, বড্ড বেশী বকেছি, না কাকিমা? বেশী বকলে বড্ড মাথা ঘোরে, আর ভাবতেও পারি নে।"

দেবী বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল, "তুমি যে রকম কষ্ট করছ—"

বাধা দিয়া বীথি বলিল, "আবার সেই কথা বলছ? কষ্টটা আমার কি বল দেখি? যে চুল হয়েছে মাথায়, মাথা ঘোরার আর অপরাধটা কি?"

দেবী বলিল, "তেমনি রুক্ষ স্নানও করবে। এখানে এসে পর্য্যন্ত একটী দিন তো তেল মাখ নি।"

বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "বিধবার আবার তেল মেখে চুলের পারিপাট্য? আমার অন্তরে বাইরে আমি বিধবা, আমি রিক্তা, আমি নিঃস্বা; আমার পারিপাট্যের কি দরকার কাকিমা? একটা উপকার—না, একটা কাজ করবে কাকি মা?"

ব্যগ্র হইয়া দেবী বলিল, "কি?"

বীথি আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ এলাইয়া দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া কাঁধের উপর দিয়া সামনে আনিয়া বলিল, "এই গুলো কেটে দেবে কাকিমা? বড্ড অসহ্য লাগে এই চুলগুলো বাপু! দুটি দিন যদি মাথায় চিরুণী না পড়ে—অমনি জটা বেঁধে যায়। লক্ষ্মী কাকিমা, কাঁচিখানা দিয়ে বেশ করে কেটে দাও না।"

দেবী হাঁ করিয়া বীথির পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বীথি বলিল, "অমন করে চেয়ে আছ যে?"

দেবী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না চুল কাটতে হবে না। চুল কাটলেই বুঝি ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়, চুল থাকলে হয় না। কত বিধবা রয়েছে যারা চুল কাটে নি, হাত খালি করে নি।"

বীথি রাগ করিল, "তাদের প্রাণে সখ আছে; কিন্তু

আমার প্রাণে নেই। যার সবই যায়, তার তুচ্ছ হাতের গহনা, তুচ্ছ মাথার চুল কাকিমা,—যা গেছে তার মত তো কিছু নেই। কাকিমা, অন্তর চাচ্ছে কিছু চাইনে—বাইরে চাই বললেই কি চলে? আমার অন্তরে সব জড় হোক—বাইরে খালি হয়ে যাক। দাও কাকিমা, কেটে দাও।"

দেবী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল—চুল কাটা হইবে না।

এক সময় সে ঘাট হইতে ফিরিয়া দেখিল বীথি তাহার ব্যাগ হইতে মোড়া ছোট আয়না ও কাঁচি বাহির করিয়া চুল কাটিতে বসিয়া গিয়াছে। সেই সুদীর্ঘ কৃষ্ণকুঞ্চিত চুলগুলি সে হাসিমুখে গুচ্ছে গুচ্ছে কাটিয়া মাটিতে ফেলিতেছে। সজল নেত্রে দেবী শুধু চাহিয়া রহিল, কক্ষের কলসীটাও নামাইবার কথা মনে ছিল না।

ত্রস্তহস্তে সব চুলগুলা কাটিয়া ফেলিয়া বীথি মুখ তুলিতেই সম্মুখে আড়ষ্ট ভাবাপন্না দেবীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল; হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল, 'আঃ, সত্যি বাঁচলুম কাকিমা, মাথাটা এমন ভার হয়েছিল যে কি বলব;—মনে হচ্ছিল, মাথা দিয়ে আগুণ ছুটে বার হচ্ছে। বাবাঃ, এতগুলো চুল মাথার রাখা কি সহজ কথা? আচ্ছা কাকিমা, এমন মজার কাণ্ডটা দেখে হাসবে,—না কেঁদেই ভাসালে যে।"

"তুমি এ সব কাণ্ড কলকাতায় করতে পারবে না বলেই যে এখানে এসেছ বীথি, তা আমি বুঝতে পারছি।"

দেবীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে কলসী নামাইতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

(২৭)

সত্য আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিবার পর কয়েকটা দিন খুব আনন্দ উৎসবের মাঝখান দিয়া কাটিয়া গেল।

গোলমাল ক্রমেই মিটিয়া আসিল। ইলার পিতা জামাতার জন্য নূতন বাড়ী ঠিক করিতে লাগিলেন। ততদিন নিজের বাড়ীতে সত্যকে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্বেও সত্য থাকিল না, দাদার বাড়ীতে গিয়া রহিল।

মায়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনছো, এবার তাকে আনতে যাও, গোলমাল তো সব মিটে গেল।"

জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি যেতে পারব না মায়া, তুমি অন্য কাউকে পাঠাতে পার।"

অকস্মাৎ চটিয়া উঠিয়া মায়া বলিলেন, "তুমি পারবে না কি? পার যদি তুমিই পারবে, আর কেউ পারবে না, সে শোনে যদি তোমার কথাটাই শুনবে, আর কারও কথা শুনবে না।"

জিতেন্দ্রনাথ শান্তভাবে বলিলেন, "তোমার বাবাকে বল, তিনি যাবেন।"

বিষাদে হাসিয়া মায়া বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল, তা কি আমি বলি নি? বাবা মা তো ওই চান, ওঁদের বায়ান্তরে ধরেছে বুড়ো হয়ে। তাঁরা আগে কি ছিলেন আর এখন কি হয়েছেন, সে কথা ভাবতে গেলে আজ আমার জ্ঞান থাকে না। বীথিকে আনবার কথা বললুম, বাবা উদাস ভাবে বললেন—'থাক না দুদিন, সেখানে সব শিখতে গেছে শিখে আসুক। এ সব ম্লেচ্ছ সংসারে এলে তার কোন নিয়ম পালন করা হবে না, এ সব জায়গায় উন্নতি না হয়ে অধোগতিই হয়ে থাকে।' মা আমায় বুঝাতে লাগলেন—যেন আমি কিছু বুঝি নে, ছোট একটী অবুঝ মেয়ে। তাঁরা বুঝছেন না যে তাঁদের চেয়ে আমি ঢের বেশী বুঝি। বীথির পরিচয় দিতে গেলে তাঁদের নাম দিয়ে তো পরিচয় দেওয়া হবে না, নাম হবে তোমার আমার। ওই মেয়েটীর জন্যে প্রতি পদে সমাজের লোকের কাছ হতে হাসি টিটকারী সহ্য করতে হচ্ছে, এখনও ঢের সইতেও হবে। ব্রহ্মচর্য্য শিখতে গেছে সেখানে,—কেন, আমাদের এখানে কি সে শিক্ষা হতো না?"

"কে বউদি, কার কথা বলছো?"

নূতন বিলাত-প্রত্যাগত কাকাবাবুকে পাইয়া মায়ার ছেলেমেয়েগুলি তাহার কাছছাড়া হইতেছিল না,—এই ছেলেমেয়েগুলির দৌরাত্ম্যে সত্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কোনরকমে তাহাদের হাত ছাড়াইয়া সে পলাইয়া আসিয়াছিল। ভাইয়ের পাশে চেয়ারখানা সে দখল করিয়া বসিল।

মায়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "অদৃষ্টের কথা বলব কি ভাই, বীথির কথা বলছি। ওকে নিয়ে আমার হয়েছে বিষম জ্বালা। কে জানে অনিলের সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল, পালিয়ে কোথায় কোন্ স্কুলে গিয়ে টিচার হয়ে কিছুদিন ছিল। তারপর অনিলের মারা যাওয়ার সময় বয়ে যায়,—সব বিক্রি করে দেনা শোধ দিয়ে রওনা হয়ে আসে। এ সময় মানুষ কোথায় নিজের আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেয়, আত্মীয়ের কাছে আসে,—সে মেয়ে আমাদের তো খবর

দেয়ই নি, তার পরে আমাদের কাছে পর্য্যন্ত আসে নি। এত জায়গা থাকতে গেছে তোমাদের সেই গাঁয়ে,—না কি তোমার বাবার কাছে ব্রহ্মচর্য্য শিখবে। পাগলামি শোন দেখি একবার, ব্রহ্মচর্য্য শিখাবার লোক সে আর পেলে না—তাই গেছে তোমার বাবার কাছে,—কথাটা শুনলেও হাসি পায়। ছি ছি, এসব কথা লোকে শুনলে বলবে কি,—সবাই যে ঠাট্টা করবে, হাসবে। তোমার দাদার আর কি, উনি তো মান অপমান সবই সমান করে বসে আছেন! মুস্কিল যে আমারই, কথা যে আমাকেই শুনতে হবে।"

"ঠিক কথা বউদি, দাদার ভারি অন্যায় যে—"

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ সত্য থামিয়া গেল। কাহার বিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিতেছে সে? সেই পিতা,—সেই হতভাগ্য বৃদ্ধ স্থবির পিতা—

মায়া তাহার অর্দ্ধোক্তিতেই ভারি খুসি হইয়া উঠিলেন, "তুমিই বল দেখি ভাই, বল না একটু তোমার দাদাকে বুঝিয়ে! এতে কি তোমারই কথা শুনতে হবে কম, তোমার শ্বশুরবাড়ীতেই কি কম নিন্দে করবে? সবাই যখন হাসবে, তখন তোমার মনেই কি আঘাত লাগবে না, সে কথা বল। চাই কি—কোনও হুজুকপ্রিয় লোক হয় তো ব্যাপারটাকে বেশ রংচং দিয়ে কাগজে বার করে দিতে পারে, তখনকার কথা ভাবতে গেলে—"

সে কথা ভাবিতেই মায়ার সমস্ত মুখ-কান শুদ্ধ লাল হইয়া গেল।

জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমায় সেখানে পাঠানর কি দরকার? একখানা পত্র লিখে দেখ সে আসে কি না,—তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। সে এখন সাবালিকা মেয়ে, তার বিবাহ হয়েছিল, আমাদের জোর তো কিছু নেই,—এখন তার ইচ্ছার ওপরেই যে সব নির্ভর করছে তা তো জান।"

"জানি গো জানি, তাই হবে, তোমার যেতে হবে না। আর যদি কখনও যেতে বলি তখন আমায় বলো।" যেন উদ্বেলিত অশ্রু গোপন করিতে করিতেই মায়া চলিয়া গেল।

জিতেন্দ্রনাথ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "মেয়ের জন্তে ভাবনা চুলোয় গেছে,—লোকে নিন্দে করবে এই ভাবনাতেই অস্থির! আমি সেখানে যাব না, সেখানে যাওয়ার মত সাহস আমার নেই। সেখানে গেলেই আমার জ্বর হবে—তখন—"

সত্য ধীরকণ্ঠে বলিল, "না—গেলেই জ্বর হবে না। চিরকাল আমিও তো ওখানে কাটিয়েছি দাদা, কই—জ্বর তো কোন দিনই হয়নি। আপনার বেশী ভয় হয় যাবেন না, তবে গেলেও জ্বর যে হবে না এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

কেন যে যাইতে পারিবেন না—জিতেন্দ্রনাথ সে কথা বলিতে পারিলেন না। সত্যও তাহা অন্তর দিয়া বুঝিতেছিল; তথাপি সেও সেই স্পষ্ট কারণটার উল্লেখ করিতে পারিল না। আজ দুই ভায়ের অন্তর একই ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনেরই আজ অতীতের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নাই। প্রাণ টানিলেও সেখানে যাইবার অধিকার দুজনেই হারাইয়াছে।

সুদূর প্রবাসে থাকিয়া যখনই অবসর আসিয়াছে—দেশের কথা, সেই ছোট বাড়ীখানির কথা, দুর্ভাগা জনকের ও দুর্ভাগিনী ভগিনীর কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন এক একটা রাত্রি আসিয়াছে, যে রাত্রিতে সত্য মোটে দুই চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই; চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়া নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছে।

পিতার দুঃখ পিতার কষ্ট তাহাকে নিপীড়িত করিতেছিল বড় কম নয়। বহুদূরে সমুদ্র-পারের একটি দেশে একটী গৃহ-কোণে বসিয়া অন্তর দিয়া সে পিতার অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিত, অধীর হইয়া উঠিত। তাহার কানে বাতাস আসিয়া দীর্ঘশ্বাসের মত শ্বসিয়া যাইত—"সত্য সত্যরে, তোর মনেও কি এই ছিল, তুইও আমায় ফেলে পালালি?" উন্মাদ অধীরতায় সে মাথাটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিত—বাবা!

অনুতাপে সে জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিত, সময় সময় পড়ায় তাহার মন বসিত না। যখন সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখন ধীরে ধীরে আশা আসিয়া তাহাকে প্রবোধ দিত। সে একটা মানুষ হইয়া দেশে ফিরিতে পাইবে, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিবে, পিতাকে সে সুখী করিবে। পিতাকে গঙ্গাতীরে আনিয়া রাখিবে—যেন তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে পান। মনে পড়ে গঙ্গাতীরে বাস করিবার পিতার প্রবল ইচ্ছা—কিন্তু তাহা নিতান্ত অসঙ্গত জানিয়াই তিনি

মলিন হাসিতেন। সত্য তাঁহার সে বাসনাকে পূর্ণ করিবে, পিতার মলিন মুখে হাসি ফুটাইবে। সে তাহার বড় দাদা নয় যে, আত্মসুখে তন্ময় হইয়া থাকিবে। কত টাকা তুচ্ছ বিলাসে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তবু জিতেন কখনও প্রাণ ধরিয়া পাঁচটা টাকা পিতাকে পাঠাইতে পারেন নাই। বড় দুঃখে বড় কষ্টে সত্যর হৃদয় দৃঢ় হইয়াছে; তাই সে যথার্থ মানুষ হইবার জন্য—প্রচুর অর্থ উপায়ের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে কত আশার ছবি আঁকিতেছিল। বাগান পুষ্করিণী সব বন্ধক আছে—সেগুলা আলাদা করিয়া লইতে হইবে,—পিতার বড় আদরের দামোদরের সিংহাসনটী সোণার করিয়া দিতে হইবে এবং একটী ছাতা করিয়া দিতে হইবে। দামোদরের সামান্য ভোগ দিতে হয়, সে জন্য পিতার মনে বড় ক্ষোভ আছে;—সত্য দামোদরের জন্য প্রচুর ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বাড়ীটাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। একটা ইঁদারা করাইতে হইবে; তাহা হইলে পানীয় জলের জন্য মেয়েদের দূরবর্ত্তী নদীতে যাইতে হইবে না। পিতা এইগুলি দেখিবেন, জানিবেন—তাঁহার সত্য, তাঁহারই আছে, সে বিলাতে গিয়া তাহার দাদার মত বদলাইয়া যায় নাই।

আর দেবী—

হায় সতী, তোমার কথা কি সত্য ভুলিতে পারিয়াছে, কখনও কি ভুলিতে পারিবে? তোমার মধ্যে সত্য যাহা দেখিতে পাইয়াছে, তাহা কচিৎ কোন মেয়ের মধ্যে থাকা সম্ভব। নিজের যথাসর্ব্বস্ব এমন করিয়া স্বামীকে ধরিয়া দিয়া নিঃস্বা ভিখারিণী হইতে—জানি না একালের আর কোন মেয়ে পারিয়াছেন কিনা। সত্য তোমার সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য ভূষণে মণ্ডিত করিয়া দিবে। সত্য জানাইবে—সে তোমাদেরই জন্য তোমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; তাহা বলিয়া যথার্থই সে বিশ্বাসঘাতক নহে।

কিন্তু ইলা—?

সত্যর হৃদয়টার উপর কে যেন হাতুড়ি দিয়া ঘা মারিল।

তা থাক। ইলাকে সে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে, ইলা নারী,—নারীর বেদনা সে অবশ্যই বুঝিবে, সত্যকে সে নিশ্চয়ই তাহার প্রবঞ্চনার জন্য ক্ষমা করিবে, দুর্ভাগিনী সর্ব্বস্বত্যাগিনী দেবীকে সে নিশ্চয়ই আদরের সহিত গ্রহণ করিবে।

আজও সত্য তাহাই ভাবিতেছিল; ইলার কাছে প্রথমটায় কেমন করিয়া সে-কথাটা সে তুলিবে তাহাই ভাবিয়া ঠিক পাইতেছিল না।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল—প্রকাশের কাছে পিতাকে দিবার জন্য সে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। সেদিন ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় প্রকাশকে সে পার্শ্বে পাইয়াছিল; কিন্তু ব্যস্ততার জন্য এ কথা তাহার মোটে মনেই পড়ে নাই। আজ কয়দিন প্রকাশ আসে নাই; টাকা পিতা লইয়াছেন কি না, সে তাঁহার ক্ষমা পাইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই।

অত্যন্ত চঞ্চলভাবে সে উঠিয়া পড়িল।

জিতেন্দ্রনাথ একখানা সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন, সত্যকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাচ্ছো নাকি?"

"হ্যাঁ—একটা দরকার আছে,—"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রকাশের কলেজে সেদিন কিসের একটা মিটিং ছিল; সেইজন্য প্রকাশের ফিরিতে অনেকটা দেরী হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর সে শ্রান্ত ক্লান্তভাবে বাড়ী ফিরিতেই বাহিরের ঘরে সত্যকে দেখিতে পাইল।

"এই যে, মেঘ না চাইতেই জল! জলজ্যান্ত বিলেত-ফেরত একটী সাহেব আমার বাড়ীতে—কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! জানিনে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম; তাই আজ সন্ধ্যেবেলা মিষ্টারের দেখা পাওয়া গেল। কালা বাঙ্গালীর বাড়ী-ঘর বড় নোংরা সাহেব, টেবল চেয়ারগুলোও ঠিকমত সাজান থাকে না,—ছেলেমেয়েগুলো দুপুরবেলায় চেয়ারে বসে গাড়ী চড়ার সখ মিটায়। অদৃষ্ট-ক্রমে ছট্‌কে এসে পড়েছ—এখন দুরবস্থা দেখেও টেঁকে বসতে পারলে হয়।"

তাহার দুই হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া সামনের একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া কুণ্ঠিত হাসিয়া সত্য বলিল, "অত ঠাট্টা কেন। আমি বিলেতে গিয়েছিলুম, তুমি কলকাতায় আছ—চামড়ার পার্থক্য যে এতটুকু নেই সেটা বরং একজামিন করে দেখ। ভেতরেও পরিবর্ত্তন ঘটেছে বলে যদি মনে করে থাক, জেন, ভুল ধারণা করেছ; কেন না যে আমি সেই আমিই রয়েছি।"

প্রকাশ হাসি চাপিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "চেহারার

বদল হয়েছে বই কি। শীতের দেশে থেকে তোমার গায়ের রংটা যে বেশ সাদাগোছের হয়ে এসেছে সেটা লক্ষ্য করনি বুঝি?"

সত্য হাসিয়া বলিল, "ওটা ক্রিমের দৌলতে।"

প্রকাশ জোর করিয়া বলিল, "তবুও ভাই তুমি সাহেব। লোকে বিলেতে না গিয়ে এদেশে থেকেই সাহেব হয়ে যায়। তুমি তো বিলেতে গেছ; কাজেই সাহেব না বলে পারছি কই? আমাদের কপাল হচ্ছে পাথর-চাপা যে, হাজার গণ্ডা বিয়ে করলেও পাথর নড়বে না; বরং যাঁরা আসবেন, তাঁরা পাথরের ওপরেই ভর দিয়ে বসবেন। যাই হোক—তোমার নতুন স্ত্রীটি বেশ হয়েছে,—দিদিমণি এঁর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে? এঁর দাসীর যে শিক্ষাটুকু জ্ঞানটুকু আছে, আমার পাড়াগাঁয়ের দিদিমণির সে শিক্ষাবোধটুকু নেই। ওরা জংলাভূত, না বলতে জানে গুছিয়ে দুটো কথা, না জানে সভ্যতা; জানে শুধু রাঁধতে, বাসন মাজতে, ক্ষার কাচতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে। ছিঃ, শিক্ষিত ভদ্রলোকের কখনও অমন স্ত্রী নিয়ে পোষায়? বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা, হাণ্ডসেক করা দূরে থাক—সামনেই আসবে না। আসেও যদি—তিনহাত ঘোমটা টেনে কলা-বতীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে। এ কিন্তু ঠিক তোমার মনের মত হয়েছে ভাই,—সত্যি, তোমার স্ত্রীকে সেদিন দেখে, তার সঙ্গে গল্প করে আমি ভারী খুসি হয়েছি। এবার যেদিন দেশে যাব, দিদিমণিকে বলব তোমার বাপু বেঁচে থাকাই ঝকমারী,—তুমি জলে ডুবে মর বা বিষ খেয়ে মর।"

সত্য ব্যাকুলভাবে দুই হাত কচলাইতেছিল, মলিন হাসিয়া বলিল, "আঃ কি বলছ প্রকাশ, মাথা নেই মুণ্ড নেই বকে গেলেই হল।"

প্রকাশ বলিল, "কেন, আমি তো ঠিক কথাই বলছি। এ কথাগুলো ঠিক কি না, তা তুমিই যথার্থ বিচার করে বল। আচ্ছা, তার বেশী দিন বেঁচে থেকে লাভটাই বা কি? রুগ্ন শ্বশুর যে কয়টা দিন বেঁচে থাকে, নেহাৎ সেবা করবার জন্যেই সে কয়টা দিন সে বেঁচে থাক। স্বামী ত্যাগ করুন, বিয়ে করুন, তাকে তাঁর বোঝা বইতেই হবে—এ হিন্দু মেয়ের ললাট লিখন। শ্বশুরটা মরে গেলে তখন আর তার বেঁচে থেকে ফলটা কি,—অতএব মরাই মঙ্গল।"

সত্য গুম হইয়া বসিয়া রহিল,—তাহার ললাট ঘামিয়া উঠিতেছিল। প্রকাশ ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ দিল—"দুজনের খাবার করতে বলে দিয়ে আয়।"

তাহার পর সত্যর পানে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমার সেই টাকাটা আমার কাছে আছে বটে, সেটা তোমায় দিয়ে দিই, এর পরে আবার ভুলে যাব।"

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ টাকা?"

প্রকাশ উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া নোটগুলি বাহির করিয়া আনিল। সেগুলা সত্যর সামনে টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "এ সেই টাকা, যা তুমি বিলাত হতে তোমার বাবাকে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলে।"

সত্যর বুকের মধ্যে রক্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একটা নিঃশ্বাস সজোরে টানিয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি নেন নি?"

প্রকাশ বলিল, "না, তিনি বললেন আমার দুইটী ছেলে ছিল বটে—এখন তারা মরে গেছে; আমি পরের টাকা নেব না।"

সত্য আড়ষ্টভাবে নোটের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

প্রকাশ বলিল, "আমার কর্ত্তব্যে আমি অবহেলা করি নি। এর পর আমি দিদিমণিকে দিতে গেলুম, কিন্তু তিনিও বললেন আমাদের কেউ নেই, আমরা পরের টাকা নেব না। বাপ যিনি—তিনি যখন ছেলের টাকা স্পর্শ করলেন না, সে স্ত্রী হয়ে কেন সে টাকা স্পর্শ করবে? বাপের চেয়ে স্ত্রীর আসন ওপরে যে হতে পারে না, এবং সে যে তোমার বাপের আদেশ প্রতি রক্তবিন্দু দিয়েও পালন করবে, তাই জানালে। সে তাঁর জন্যেই তাঁর সেবা করছে, স্বামীর বাপ বলে নয়। তোমার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে; কারণ, তুমি তাকে ত্যাগ করেছ। সে কোন্ অধিকারে তোমার টাকা নেবে, তার তো স্ত্রীর অধিকার নেই।

ঠিক কথা, এ নারীর উপযুক্ত কথা। সত্য তাহাকে যে-দিন স্ত্রীর অধিকার দিয়াছিল, সেদিন সে তাহার সকল জিনিসই নিজের বলিয়া জানিয়াছিল। আজ সে সত্যকে শুধু এড়াইতে চায় না, সত্যর সব জিনিসকেই এড়াইতে চায়। সত্য কাহার অর্থ কাহাকে দান করিয়াছে, দেবীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কাহাকে সাজাইয়াছে?

কি কষ্টে সে এই টাকাগুলি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা

আজও তাহার মনে পড়ে। কত রকমে সে নিজেকে নিপীড়িত করিয়াছিল,—অর্থ-সঞ্চয়ের দিকে তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। টাকাগুলি পাঠাইয়া সে বড় শান্তিতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। পিতা যে গ্রহণ করিবেন না, তাহা সে কল্পনাতেও মনে করিতে পারে নাই। আজ তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল পিতার নিকট হইতে সে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে,—পিতার কাছাকাছি যাইবার অধিকার আর তাহার নাই।

নীরবে সে নোটগুলি পকেটে রাখিল; একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা কেমন আছেন সে খবরটা বোধ হয় দেবে, তাতে বিশেষ বাধা হবে না সম্ভব?"

প্রকাশ বলিল, "শুনেছি তোমার বাবার অবস্থা ভারি খারাপ। বিছানায় পড়ে আছেন, উঠবার ক্ষমতা নেই। আমার বোনের একখানা পত্রে আজ জানতে পারলুম, যে কয়টা দিন তিনি বেঁচে আছেন, সে কয়টা দিন এমনিই থাকতে হবে,—একটা হাত নাড়বার ক্ষমতাও তিনি পাবেন না। তাইতেই মনে হয়, তাঁর প্যারালেসিস্ হয়েছে; সুতরাং আর বাঁচছেন না। দিদিমণি খুব জ্বরে ভুগছেন, মাসের মধ্যে কুড়িদিন বিছানায় পড়ে থাকেন!"

সত্য উঠিবার উদ্যোগ করতেই ব্যস্তভাবে প্রকাশ বলিল, "ও কি, উঠছো যে?"

সত্য মলিন হাসিয়া বলিল, "বাড়ী যাব না?"

প্রকাশ বলিল, "গরীবখানায় পদার্পণ করেছ যদি—চা, খাবার একটু খেয়ে যাও।"

সত্য বলিল, "ওইটে এখন মাপ করতে হবে। এখানে আসার সময়ে বেশ খেয়ে এসেছি,—আর এখন কিছুই চলবে না।"

প্রকাশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আর পীড়াপীড়ি করিল না। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে সত্য বলিল, "তোমায় অনেক কথা বলবার আছে প্রকাশ। সেইগুলো বলতেই এসেছিলুম; কিন্তু কি জানি কেন, কোন কথাই বলতে পারলুম না। এর পর ভগবান যদি দিন দেন, একদিন সব কথা বলব, আজ সব চাপা রইল।"

তাহার সহিত চলিতে চলিতে প্রকাশ বলিল, "একদিন দেশে চল না কেন? এই সামনে ছুটি আছে তিনদিনের—দুই বন্ধুতে যাওয়া যাক।"

সত্য মলিন চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "একটীবারের জন্যে যাব; কিন্তু এখন নয়। জানি, সেখানে গেলে আমায় আঘাত সইতে হবে। এখন বড় দুর্ব্বল বুক বন্ধু, সে আঘাত পেয়ে দাঁড়াতে পারব না। যখন দেখব আমার বুকে শক্তি এসেছে, আমি আঘাত সইতে পারব—তখন যাব। জানি নে, ততদিন বাবা আমার বেঁচে থাকবেন কি না, তাঁর পায়ের ধুলো নিতে পারব কি না?"

দুই বিন্দু জল উপছাইয়া পড়িতে পড়িতে সে সামলাইয়া লইল। (ক্রমশঃ)

সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর প্রতি নিবেদন

অধ্যাপক শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ওস্তাদেরা মনে করেন যে, গান বাজনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতা; এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় বিবেচনা করেন যে, ওস্তাদের 'সাহিত্যিক' রচনা ঘোর মূর্খতা। সাধারণেরও ধারণা এই যে, ওস্তাদ নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে শিক্ষিত হবেন না; এবং শিক্ষিত ব্যক্তি ওস্তাদ হতেই পারেন না। এই ধারণাটির মধ্যে খানিকটা সত্য নিহিত রয়েছে; কারণ বর্ত্তমানে বিশ-বৎসর-ব্যাপী সার্গম সাধনের ধৈর্য্য এবং প্রয়োজন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নেই; অথচ ওস্তাদরা স্বীকার করবেন না যে, বিশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে কোন জীব স্বর উচ্চারণ ক'রে পরকে সঙ্গীতের বিমল আনন্দ দিতে পারে। সুর-শিক্ষা, স্বরোচ্চারণ নিশ্চয়ই সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু কেবল মাত্র সময়-সাপেক্ষ নয়, শিক্ষার্থীর শক্তি-সাপেক্ষও বটে। এই শক্তিকে ওস্তাদেরা নেহাৎ এক প্রকার অদ্ভুত একান্ত বস্তু ভাবেন। কিন্তু এই ভাবনাটির পিছনে কতখানি সত্য এবং কতখানি সুবিধা রয়েছে জানি না। বিশ্লেষণের ফলে সঙ্গীত শেখবার শক্তিকে বৈশিষ্ট্য

দিলেও স্বীকার কোরতে হয় যে অন্য বিষয় শিক্ষা-দীক্ষার উপরও এই শিক্ষার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। গায়ক-বাদক যখন মানুষ, তখন সুরের মধ্য দিয়ে তার মনুষ্যত্বটুকু বিকাশ হবেই হবে। যে যত বড় আর্টিষ্ট সে তত বড় মানুষ; এবং সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সে ততটুকু আত্মপ্রকাশ করে। একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা শক্ত হয় না, কোন ওস্তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম আছে কি না; কিম্বা যদি থাকে, তা হলে সেটি কতখানি দৃঢ়। অনেকে বলেন যে, তাঁরা খুব বড় গুণীকেও মানুষ হিসাবে অত্যন্ত নীচ দেখেছেন। শিল্পীর ব্যবহারগত নীচতা কিম্বা অন্যান্য দোষ খণ্ডন কোরতে চাই না, যদিও তা করা যায়। একধারে সমাজের অযত্ন, পৃষ্ঠপোষকের অভাব, অন্যধারে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে অত বড় বিদ্যার সীমাবদ্ধতা—এই দুই জাঁতার মধ্যে মানুষের উদারতা নিষ্পেষিত হওয়াই স্বাভাবিক। আমার বলবার কথা এই যে, বড় শিল্পীকে নীচ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, ভাল রকম গান-বাজনা কেবল অর্জ্জিত একান্ত শিক্ষারই বিকাশের বাহাদুরী। তাও যদি মনে করা যায়, তা হলেও মানতে হবে যে বিকাশের বস্তু এবং মূলধন বাড়ালে সে বিকাশ-পদ্ধতির কিছু ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ উপকারই হয়। কারণ অর্জ্জিত বিদ্যার হুবহু বমন গ্রামোফোনের কার্য্য—মানুষের নয়। মানুষের মন আছে, চরিত্র আছে; এবং সেই মন এবং চরিত্রের সমাবেশ, অর্থাৎ ধর্ম্ম, শিক্ষার বিষয়কে নিয়মে গ্রথিত করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে। আমি সামাজিক ধর্ম্মের কথার উল্লেখ করছি না। ভগবানে বিশ্বাসের কথাও বলছি না। কিন্তু আমি জানি, এই ব্যক্তিগত মন ও চরিত্রের ধর্ম্মকে শিক্ষার দ্বারা গড়ে তোলা যায়; এবং সে শিক্ষা গান-বাজনার অতিরিক্ত। অবশ্য যদি ইচ্ছা না হয়, সে অন্য কথা। বয়সের সঙ্গে অনিচ্ছা বেড়ে যায়, সেই জন্যই বৃদ্ধ ওস্তাদ্‌রা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েন। তাঁদের ধর্ম্ম গড়ে তুলতে চলা বৃথা।

কিছু দিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় সুরের প্রতি মনঃসংযোগ করেছেন। আমি এই মে ও জুন মাসের মধ্যে এমন তিন চার জন শিক্ষিত যুবকের গান-বাজনা শুনেছি, যাঁরা উত্তর কালে বাংলার মুখরক্ষা করবেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই রীতিমত সুর শিক্ষা কোরেছেন, এঁরা প্রত্যহ সাধেন এবং বিধিমত পথেই চলেন। এঁরা প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা 'রিয়াজ' কোরতে গিয়ে জীবনের অন্যান্য শক্তিকে অবমাননা করেন নি। আমার সুরজ্ঞান যৎসামান্য; তা হলেও বলতে পারি যে এঁদের সুরজ্ঞান অনেক তথাকথিত ওস্তাদের অপেক্ষা ন্যূন নয়, বরং বেশী। না হলে এঁদের একজনের মুখে ভিন্ন মল্লারের ভিন্ন রূপ এবং অন্য এক-জনের হাতে কল্যাণের বৈশিষ্ট্য কি কোরে অত স্পষ্ট করে বুঝতে পারলুম, যা পূর্ব্বে পারিনি? অল্প দিনের মধ্যে এই প্রকার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তির কথা শুনে অনেকে হয় ত আশ্চর্যান্বিত হবেন। আমি হইনি; কারণ, আমি জানি, এঁদের আয়াস মোটেই অল্প নয়। যে পরিশ্রম কোরে এঁরা অন্য বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েছেন, তাকেও গণ্য করতে হবে। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁদের সঙ্গীত-শিক্ষার ফল অত মনোহর হয়েছে। আমি তরুণ শিল্পীদের নাম করতে চাই না, অন্য বৃদ্ধ ওস্তাদরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন, এবং মাসিক পত্রিকায় নাম বাহির হলে তাঁরা আত্মম্ভরী হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু জোর কোরেই বোলতে ইচ্ছা হয় যে, রসের দিক্ থেকে ইতিমধ্যে তাঁরা অনেক ওস্তাদের অপেক্ষা বড় হয়ে উঠেছেন। শিক্ষার দ্বারা রুচি মার্জ্জিত হয়; এবং একমাত্র রুচির সাহায্যেই শুষ্ক স্বরগুলি রাগিণীর প্রকৃত রূপে বিন্যস্ত হয়। কোটালের ছেলে হাড়গুলি একত্র কোরতে পারে; কিন্তু একমাত্র রাজার ছেলেই সেই হাড়গুলিকে রক্ত মাংস দিয়ে প্রাণবন্ত কোরতে সমর্থ হয়। কোন্ সুর দ্রুত গাইতে হয়, কোন্ সুর বিলম্বিত গাইলে ভাল শোনায়, কোথায় বিরাম দিতে হবে, কোন্ অক্ষরের উপর মীড়, গমক দিতে হয়—এ সব বিদ্যা সাধারণ ওস্তাদে জানেন না; কিম্বা জানলেও, যা শেখান, তাও রুচি-সঙ্গত নয়। সদ্ গুরুর যখন অত অভাব, তখন শিষ্যের নিজে হতেই ওজন-জ্ঞান শিখতে হবে—নিজের মাথা খাটিয়ে, না হয় ওস্তাদের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে। সুরকে অলঙ্কৃত করবার জন্য দুটি জিনিষ প্রয়োজনীয়,—এক হচ্ছে, সুরেলা গলা কিম্বা মিষ্টি হাত; এবং অন্যটি হচ্ছে, প্রয়োগের সংযত শক্তি অর্থাৎ রুচি। ছোট ঘরে চেঁচিয়ে গাওয়া পাপ, আবার যেখানে সেখানে অজস্র তান বর্ষণ করাও পাপ। সেইজন্য ছোট আসরে ওস্তাদী মতে শিক্ষিত গলাকেও কমিয়ে দিতে হয়। অবশ্য গলা তৈরী করা, কিম্বা যন্ত্রের বোল সাধা গোড়ার কথা, বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সাধা জিনিষকেও বদ্‌লাতে হয় এবং মধুর কোরতে হয়। বদ্‌লান যায় এবং মধুর করা যায়; না হলে, একই আসরে মার্জ্জিত-রুচি শিষ্যের

তারিফ গুরুর চেয়ে বেশী হত না। এই পরিবর্ত্তন এবং মধুর করবার ক্ষমতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী আশা করা যায়। শিক্ষিত শিষ্যের ওজন-জ্ঞান এবং ঔচিত্য-বোধ অশিক্ষিত ওস্তাদের অপেক্ষা বেশী দেখেছি। শিক্ষা মানে আমি শুধু বি-এ, এম-এ পাস বলছি না; আমি বলছি শিষ্টতা, ভদ্রতা, শীলতা,—এক কথায়, কামশাস্ত্রে যাকে বৈদগ্ধ্য বলা হয়েছে, আর্ণল্ড যাকে Sweetness and light অর্থাৎ Culture বোলেছেন।

জন-কয়েক ওস্তাদ ছাড়া অধিকাংশ ওস্তাদই মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিতে অক্ষম। এ-রকম ওস্তাদ আমি দেখেছি যাঁর হৃদয় উন্নত, কোন প্রকার গোঁড়ামি নেই,—যিনি কোন প্রকার কার্পণ্য না কোরে শিক্ষা দেন,—যিনি নিজের গুরু, গুরু-ভাই এবং শিষ্যবৃন্দ ছাড়া, অন্যেও যে গাইতে বাজাতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই প্রকার স্বভাব-সুলভ বিনয়ের জন্য ইঁনি বিখ্যাত হতে পারলেন না। এঁর যোগ্য ওস্তাদ হয় ত দেশে আছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অল্প। বাকী ওস্তাদের একই অবস্থা, সে অবস্থার জন্য যেই দায়ী হোক না কেন। এক Indologists ছাড়া বোধ হয় অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন্ কি কংগ্রেস দলের মধ্যেও এমন জঘন্য পরশ্রীকাতরতা নেই। এই অনুদারতার জন্য আর্টের যে ক্ষতি হয় তাই বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, অনুদার লোকে আলাপ কোরতেই পারেন না। আলাপের জন্য চিত্তের স্থৈর্য্য এবং শান্ত ভাব একান্ত আবশ্যক। তান করা খুব শক্ত নয়, কিন্তু মুৎসই কোরে তান উচ্ছৃঙ্খল লোকের দ্বারা অসম্ভব; যে লোকের সংযম নেই, সে সৃষ্টিকে সংযত কোরতেই পারে না। হাত কিম্বা গলা তৈরী কোরতে সকলেই পারে; কিন্তু গলায় কিম্বা হাতে দরদ দেখাতে হলে রসিক হতেই হবে। জীবন বড় কি আর্ট বড়, ধর্ম্ম বড় কি আর্ট বড়, এ সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না; কেন না, এ প্রকার প্রশ্ন আমার মনে ওঠে না। কিন্তু আর্টিষ্টের আর্ট সংক্রান্ত একটি ব্যক্তিগত ধর্ম্ম আছে নিশ্চয়ই, এবং সে ধর্ম্মের অবমাননা কোরলে আর্ট হয় না, ওস্তাদী হয়ত হতে পারে; এবং সাধারণ ওস্তাদের ঐ প্রকারের ধর্ম্ম নেই—এ সব কথা ধ্রুব সত্য। এক একজন ওস্তাদ যে কত বড় বদরসিক হন, বলা বাহুল্য। প্রোফেসারকে গানের আসরে নিয়ে যাওয়াও যা, আর সাধারণ ওস্তাদকে ভদ্র আসরে গাইতে বাজাতে বলাও তা। দুই প্রকার জীবই বদ-রসিক, শিক্ষাভিমানী এবং বৈদগ্ধ্য-বর্জ্জিত।

এই শিক্ষাভিমান যে কত দুরন্ত তা ওস্তাদ কিম্বা প্রোফেসারগণের একটি আচরণ থেকেই বোঝা যায়। কোন সোজা কথাকে পুঁথি ও নজিরের সাহায্যে দুর্ব্বোধ্য কোরতে পণ্ডিত-মূর্খেরা অদ্বিতীয়। তাও সহ্য করা যেত, যদি তাঁরা ঐ সব পুঁথিগুলি নিজে পড়তেন। পড়লেই পড়ার অসার্থকতা ধরা পড়ে। সেই জন্য যখন আমাদের দেশের ওস্তাদ পণ্ডিতগণ নিজ মত সমর্থন করবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দেন, তখন বোধ হয় যোগনিদ্রায় মগ্ন আর্য্য ঋষিদেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। সঙ্গীত-বিষয়ক শাস্ত্রের রচয়িতা সকলেই কিছু আর্য্য ঋষি ছিলেন না। কিন্তু যা সংস্কৃতে লেখা তাই শাস্ত্র এবং প্রত্যেক শাস্ত্রকারই ঋষি, এ ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। অতএব ঐতিহাসিক মূল্য নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সংস্কৃত-লেখা সঙ্গীত-বিষয়ক পুস্তকই বর্ত্তমান সঙ্গীত পদ্ধতির শেষ বিচারক হবে—এই সিদ্ধান্ত স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বোলেই গণ্য হয়। ফলে হিন্দুরা নারদের ঘাড়ে এবং মুসলমানরা মিঞা তানসেনের ঘাড়ে সুর-সৃষ্টির সমস্ত বাহাদুরী চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করেন। কিন্তু নারদ মুনি কিম্বা মিঞা তানসেনের কাছে আজকালকার ওস্তাদরা কতটুকু ঋণী, তা কেউ ভেবেও দেখেন না।

সেই জন্য তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, যেন তাঁরা নিজেরা শাস্ত্র পড়েন; কেন না, আমার বিশ্বাস যে, তখন এ কথা অত্যন্তই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পুরাতন শাস্ত্রের academic interest ছাড়া আর্টের পক্ষে তার অন্য কোন উপকার নেই। ওস্তাদরা যে রকম ভাবে গান বাজনা করে থাকেন, তাই শুনে নতুন শাস্ত্র গড়ে তুলতে হবে। তখনই বোধ হয় পুরাতন শাস্ত্রকারদের বাহাদুরী, উদারতা, সূক্ষ্ম-বিচারশক্তি, রসানুভূতি সবেরই তারিফ কোরতে পারব। কেবলমাত্র এই জন্যই আমি শাস্ত্রপাঠ কোরতে প্রত্যেক সঙ্গীতানুরাগী যুবককে অনুরোধ করি। তাঁরা শিক্ষিত এবং বৃদ্ধদের তুলনায় স্বাধীনচেতা; সেইজন্য আশা করি, শাস্ত্রালোচনায় তাঁদের শিক্ষার সুফল ফুটে উঠবে।

ওস্তাদের কাছে আমাদের শিখতেই হবে। অবশ্য সব ওস্তাদের চাল কিম্বা ভঙ্গী সকলের হৃদয়গ্রাহী নয়,

হতে পারে না,—কেন না হৃদয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ভিন্ন। দেশে-বিদেশে ভাল চালের গান এখনও প্রচলিত রয়েছে। যেখানে নেই, সেখানে গ্রামোফোনের দ্বারা কায চলতে পারে; কিন্তু মানুষের কণ্ঠে কিম্বা হস্তে সুর যে রকম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, কলে তা হতে পারে না। সেই জন্য তরুণদের প্রতি আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন মাত্র একপ্রকার সঙ্গীত-পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সঙ্কীর্ণ না হন। অবনীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অন্ততঃ তিন-চার রকম অঙ্কন-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও কোন হিসাবেই ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু তাই ব'লে কৃচ্ছ্রসাধন আর্টের অন্তরায়, এ কথা বালসুলভ অসহিষ্ণুতা ছাড়া কোন সত্যকার আর্টিষ্টের প্রাণের কথা নয়। সেইজন্য প্রত্যেক ওস্তাদের কাছ থেকে তাঁর পদ্ধতি শেখবার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের অন্য উপায় নেই। এখানে গুরুবাদ মানতেই হয়। কিন্তু গুরু অনেক রকমেরই আছেন,—শিষ্যের নির্ব্বাচন-শক্তিও অল্প। অতএব প্রত্যেক শিষ্যকে শেখবার সময় ভাবতে হবে যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করাও তার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। শিষ্যের উদ্দেশ্য, গুরুর অপেক্ষা বড় আর্টিষ্ট হওয়া। সেজন্য গুরু-বিদ্যা (technique) আয়ত্ত করা চাই। বিদ্যা আয়ত্ত হবার পর আর্টের কথা উঠিবে। সেইজন্য চোখ, কান, মন সজাগ রেখেই সাধনা কোরতে হবে।

যে যাই বলুক, অনেক শুনে এ ধারণাতে সকলেরই পৌঁছতে হবে যে, গান-বাজনা রসের জিনিষ,—অঙ্ক কিম্বা হিসাবের জিনিষ মোটেই নয়। অথচ এখনও ওস্তাদের দল অঙ্ক নিয়েই ব্যস্ত। এই সব ওস্তাদ যখন শিক্ষার্থীর কোন নিকট আত্মীয় হন, তখন বিপদ আরো বেড়ে যায়। সুরের প্রাণটুকু নিয়ে পালান দায় হয়ে ওঠে। আত্মীয় বোলেছেন এই আমাদের ঘর, এর তুল্য আর style নেই। শিষ্য বাল্যকাল থেকে এই কথা শুনে আসছে,—গুরুভক্তির সঙ্গে বংশ-মর্য্যাদা মিশে গেল। আবার আত্মীয় বোলছেন, 'বাছা, আমি অনেক দেখেছি,—এই ওস্তাদই আমার ওস্তাদ ছিলেন; এর মত গুণী আর নেই'—বালক শিক্ষার্থী তাই মাথা পেতে নিতে বাধ্য। আবার কোন আত্মীয় নিজে গান-বাজনা করেন নি, অথচ অনেক শুনেছেন। শিক্ষার্থী বেশ তৈরী হয়েছেন। বাজাবার সময় হুকুম হল, অমুক ওস্তাদের হরফ গুলি তোল, অথচ তখন সে হরফের কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রকার পণ্ডিত-গুরু এবং আত্মীয় গুরুর নাগপাশ হতে মুক্ত হওয়ার জন্যই আমি তরুণ শিল্পীদের অনুরোধ করছি। আশা করি, আমার কথা তাঁদের কানে এবং মরমে পৌঁছবে। আমার আশার কারণ এই যে, এঁরা সকলেই ইংরাজী জানেন। এবং ইংরাজী শিখলে ভক্তি কমে যায়, এ কথা প্রত্যেক পিতা-মাতাই জানেন। অতএব এঁরা আমার কথা বুঝবেন, মনে মনে, যদিও হাতে-কলমে কিম্বা মুখে আপত্তি করবেন। কিন্তু আমি জানি. সে আপত্তি মিথ্যা; কেন না, গুরু-ভক্তির অন্তরালে তাঁদের এ জ্ঞানটুকু আছেই আছে যে, গলা দিয়ে গাওয়া এবং হাত দিয়ে বাজানর অপেক্ষা, গলা, হাত ও মস্তিষ্কের সংযোগে সুরের প্রকাশ করলেই রস-সৃষ্টি বেশী সম্ভবপর হয়। আমার প্রবন্ধ পড়ে অসৎ গুরুরাই রাগ করবেন, সদ্‌-গুরুরা আনন্দিত হবেন; কারণ, সদ্‌-গুরু যথাসময়ে শিষ্যকে নিজের কবল থেকে মুক্তি প্রদান করেন, যেমন পুরাতন কালে আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মচারীকে গৃহী হতে আজ্ঞা দিতেন।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৬

মিঃ ঘোষের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পরে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট চিত্ররেখার ন্যায় সেই বৃহৎ শোকাচ্ছন্ন পুরী স্থির নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। একজনের অভাবে সমস্ত বাড়ী যেন শূন্য, ভীতিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। চারিদিক নীরব। মানুষের চলাফেরা, কথাবার্ত্তা কিছুরই আভাস নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে কেবল মাঝে মাঝে পিসীমার মৃদু রোদনের ও বিলাপের ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ড্রয়িংরুমে টেবিলের ধারে একখানা চৌকিতে নির্ম্মলা বসিয়া ছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসিত।

টেবিলের উপরে এক তাড়া কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, নির্ম্মলার নত দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত।

অসিতের মুখ ম্লান, গম্ভীর; মূর্ত্তি রুক্ষ ও মলিন; ললাটে চিন্তা ও বেদনার গভীর রেখা। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, দুদিনের মধ্যেই যেন তাহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে!

সে বলিল, আমি আজ কদিন থেকেই আসব, আসব মনে করছি; কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছিলুম না! সে দিন যে অবস্থায় তোমাকে ফেলে চলে যেতে হলো, তাতে কি মন স্থির থাকতে পারে? এ কদিন একলাই ছিলে তো?

নির্ম্মলা বলিল, না,—খবর পেয়ে কিরণ বাবু এসেছিলেন। তিনিই তখনকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলেন। এখানে পিসীমার কাছে তিনি ছিলেনও দুদিন। তিনি চলে যাবার পর আমার বন্ধু লীলা এসে এ কয়দিন আমার কাছে ছিল, আজ বিকেলে সে বাড়ী গেছে। আমায় একলা থাকতে বা কোন দিক দেখতে হয় নি ওদের জন্যে।

অসিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ভালই হয়েছে! ওঁরা তোমায় দেখা-শুনা করেছেন, দরকার হলে পরেও করতে পারবেন জেনে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হলো। আমার দ্বারায় তো তোমার কোন উপকার হওয়াই সম্ভব নয়; বরং আমি এখানে থাকলে তোমার বিপদ ঘটতে পারে!

নির্ম্মলা তাহার ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া অসিতের দিকে চাহিল। সে কথাটা বিশেষ বোঝে নাই দেখিয়া অসিত আবার বলিল, আজ তোমার মনের অবস্থা ভাল নেই নির্ম্মলা! দারুণ পিতৃশোকে তুমি কাতর; আর আমার নিজের অবস্থা—সেও তদ্রূপ! আমি আজ যে শোকের ব্যথা ভোগ করছি, সে কেউ বুঝতে পারবে না; সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল। তাই বলছিলুম, আজ আমাদের দুজনেরই যে অবস্থা, তাতে কোন গুরুতর কথা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আজ দু' একটা কথা সংক্ষেপে তোমায় বলে না গেলে চলবে না। আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোথায় কত দূরে যে যাব, কত দিনের জন্য, আর কখনো ফিরতে পারবো কি না—কিছুরই স্থিরতা নেই! তাই একবার ওরই মধ্যে একটু সময় করে তোমার কাছে চলে এসেছি!

নির্ম্মলা তাহার সজল বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, তুমিও চলে যাচ্ছ? আজই? আমার তবে কি হবে?

অসিত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—সত্যি! তোমার কথা মনে হলে আমি আর কোন রকমে মন স্থির করে আমার কাজ-কর্ম্মে হাত দিতে পারি না। মন আমার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমার নিজের জীবন যে এমন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তার জন্য আমার আর কোন দিনই কোন দুঃখ বোধ হয় না; কিন্তু তোমার জীবনটা যে এমন ভাবে আমার মত একটা নিতান্ত হতভাগা ভবঘুরের জন্য মাটি হতে বসেছে, এ চিন্তা আমায় সর্ব্বক্ষণ বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে নির্ম্মলা! আমি ত জানি, আমরা দুজনে পরস্পরের কথা যেমন করেই নিই না কেন, আর সবাইয়ের মত আমরা কখনো পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবো না! ঘটনাচক্রে পড়ে যে পথে আমি আজ দাঁড়িয়েছি, সে দিক থেকে ফেরা আমার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। তা ছাড়া, আমার গায়ের রক্ত তোমার আর আমার মধ্যে দুর্ল'ঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলে দাঁড়িয়ে আছে! সে ব্যবধান কোন দিনই দূর হতে পারবে না! তবে তুমি কেন চিরদিন আমার জন্য কষ্ট পাবে?

নির্ম্মলা এতক্ষণ নতমুখে অসিতের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথার শেষাংশ শুনিয়া সে মাথা তুলিয়া চাহিল। বলিল,—এই খানেই তোমাদের একটা মস্ত বড় ভুল থেকে গেছে। তোমাদের সমস্ত কষ্ট, অপমান ও ব্যর্থতার জন্য আমার বাবা দায়ী, এ কথা আমি স্বীকার করছি। তিনিও আজীবন ধরে নিজেকেই সর্ব্ব দোষে দোষী ভেবে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন; তাঁর আকস্মিক ও-ভাবে মৃত্যুর কারণও তাই। কিন্তু তবু তোমরা যা তাঁর সম্বন্ধে ভেবে আসছ, সে অন্যায় তাঁর দ্বারায় হয় নি—তিনি তোমাদের বংশের অপমান করেন নি।

অসিত এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি এ সব কথা জানলে কোথা থেকে? মিঃ ঘোষ কি তোমাকে—

নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল, না! তিনি আমাকে কোন কথাই মুখে বলেন নি। বোধ হয় যখন এই সব কথা ভেবে ভেবে বড় কষ্ট পেতেন, তখন হয় ত আমার কাছে সব কথা বলে মনটা হাল্‌কা করবার ইচ্ছা হতো; কিন্তু তাঁর মধ্যে যে

অত্যন্ত ভদ্রতা ও কুণ্ঠা ছিল, তারি জন্য কোন দিন তিনি এ কথা মুখে আনতে পারেন নি। যে-দিন বৈকালে হঠাৎ তিনি মারা যান, সেই দিন দুপুর বেলা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর আমাকে বলবার যা কিছু ছিল, সে-সব তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে লেখা আছে। তাঁর যদি এই অসুখে মৃত্যু হয়, তা হলে আমি যেন পরে সেই কাগজগুলি দেখি। এতদিন লীলা ছিল বলে আমি আর এ-দিকে আসি নি। আজ সে চলে গেলে, এ ঘরে এসে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখলুম।

নির্ম্মলা টেবিলের উপরের কাগজগুলি গুছাইয়া অসিতের হাতে দিতে গেল; বলিল, তুমিও একবার এগুলি পড়ে দেখ!

অসিত একটু কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—ওটা কি আমার দেখা ভাল হবে নির্ম্মলা? তিনি তাঁর যা-কিছু মনের কথা বা গোপনীয় বিষয় তোমাকে জানিয়ে গেছেন তার মধ্যে—

নির্ম্মলা বলিল, সে সব কথা কিছু ভেব না! ওতে যা কিছু আছে, সে কেবল তোমাদেরই কথা। আর তোমারও সে সব কথা ভাল করে জানা উচিত।

নির্ম্মলা উঠিয়া একখানা চৌকি অসিতের দিকে আগাইয়া দিল। অসিত বসিয়া মিঃ ঘোষের লিখিত কাগজগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

নির্ম্মল মা আমার! প্রথম যৌবনে বুদ্ধির দোষে একদিন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলুম; সারা জীবন তার স্মৃতির দংশনে অসহ্য জ্বালা ভোগ করে এসেছি। অবশিষ্ট দিন কয়টাও যে তা থেকে অব্যাহতি পাব না, তা স্থির জানি।

কিছুদিন থেকে আমার কেমন সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে যে, বোধ হয় আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোন্ এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে যে সেই শেষ ডাক এসে পৌছবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তাই দিন থাকতে, আমার যা কিছু বলবার আছে, সব লিখে রেখে গেলুম। যে দিন আমার নাম এ সংসার থেকে মুছে যাবে, সেই দিন এ অনুতপ্ত বৃদ্ধের শোচনীয় কাহিনী পড়ে তোমরা আমায় ক্ষমা করো; অন্যায় করে তার যে শাস্তি আজীবন ধরে ভোগ করে গেলুম, তা ভেবে আমার উপর কোন রাগ বা অভিমান রেখো না। তোমাদের কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ।

বাবার মৃত্যুর পর যেদিন আমি বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়ে বাড়ী এসে বসলুম, তখন আমার বয়স অত্যন্ত অল্প। হয় ত চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের বেশি হবে না। সুবিধা পেয়ে জন-কতক হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব এসে চারপাশে জুটলো। তাদের প্রভাব এড়াতে না পেরে শীঘ্রই আমি তাদের বশে চলতে সুরু করে অবাধ আমোদে গা ঢেলে দিলুম।

এ সব বন্ধুদের মধ্যে হরনাথই ছিল আমার সব চেয়ে শত্রু; অথচ সে এমন ব্যবহার করে আমায় হাত করে রেখেছিল যে, আমি সে সময় ভাবতুম, তার মত সুহৃদ বুঝি আমার আর কেউ নেই। আমাদের পুরানো কর্ম্মচারী, যিনি আমাদের বিষয়-কর্ম্ম সব দেখতেন,—আমার এই সব অন্যায় ব্যবহার দেখে দেখে তিনি প্রায়ই আমার এ সব সংসর্গ ছাড়বার জন্য, নিজের বিষয় নিজে দেখা-শুনা করবার জন্য অনুরোধ করতেন। আমার তখন সে সব কথা ভাল লাগতো না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তাঁর মনান্তর হয়ে যেতো।

একদিন এই রকম একটু গুরুতর বচসা হওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দিলেন। আমিও দ্বিতীয় বার অনুরোধ না করে তখনি হরনাথকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে বললুম।

হরনাথ এই ঘটনায় একবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়াল। সে আমাকে বিষয়-সংক্রান্ত কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে দিত না। কারণে অকারণে বলতে না বলতেই অজস্র টাকা এনে যোগাত। আমি খুব খুসি হয়ে ভাবতুম, হরনাথ আছে বলেই কোন বেগ না পেয়ে আমার এমন স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটছে!

আমার জমিদারীর স্থানে স্থানে প্রজাদের মধ্যে হাহাকার উঠলো। আমি অবশ্য তখন এ সব কিছুই জানতুম না; পরে সন্ধান করতে করতে সব শুনেছি। আমার প্রজারা ভাবলে, আমি একটা ভয়ানক নৃশংস অর্থ-পিশাচ,—জমিদারীর ভার হাতে পেয়েই অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছি।

এই সময়ে মণ্ডলগড় পরগণা আমি আমার পাশের অন্য জমীদারের কাছ থেকে কিনে নিই। হরনাথ তার নূতন সব বন্দোবস্ত করতে সেখানে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে সে কি যে সব করলে, তা আমি জানি না। ফিরে এসে আমায় বল্লে, মণ্ডলগড়ের প্রজারা অত্যন্ত বদমাস ও অবাধ্য; তারা তাদের আগের জমীদারের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত। তারা বলে, আমাদের খাজনা দেবে না—সেই জমীদারকেই সব কিস্তীর খাজনা দেবে। তাদের সায়েস্তা

করবার জন্য কিছুদিন তাকে সেইখানে গিয়ে থাকতে হবে। আর জনকতক মাতব্বর লোক, যারা প্রজাদের এই সব কুমন্ত্রণা দিয়ে ক্ষেপাচ্ছে, তাদের সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করে তাদের জব্দ করতে হবে।

আমি এ কথায় আপত্তি করবার কোন কারণ দেখলুম না। ঘরের পয়সা খরচ করে যখন পরগণাটা কিনেছি, তখন যে রকম করেই হোক্ তাকে দখলে আনতে হবে ত? তার জন্য জোর-জবরদস্তি না করলে যদি বিদ্রোহী প্রজারা বশে না আসে, তা হলে অগত্যা তা কর্‌তেই হবে। হরনাথকে সে কথা বলাতে সে খুব খুসি হয়ে সেখানে চলে গেল।

এই ঘটনার প্রায় তিনমাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ীর ভিতরের বাগানে বসে ছিলুম, কাছে তখন আর কেউ ছিল না। হঠাৎ দেখলুম, একটা গাছের পাশ থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল! তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

আমি প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। কে তুমি? এখানে কেমন করে এলে?—এই রকম একটা কিছু বলে লোক-জন ডাকবার উপক্রম করতেই, সে লোকটা এগিয়ে এসে বল্লে—ভয় পাবেন না মশায়! আমি কেবল দুটো কথা বলেই চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি; কোন রকমে সে সুযোগ না পাওয়ায়, আজ অগত্যা এই পন্থা অবলম্বন করতে হলো। আমি হুজুরের মণ্ডলগড় পরগণার প্রজা—রামগোবিন্দ দত্ত।

মণ্ডলগড় শুনেই আমার হরনাথের কথা, সেখানকার বিদ্রোহী প্রজাদের কথা সব মনে পড়ে গেল! সেই সব দুষ্ট বদমাইসদের এত সাহস যে, আমার বাড়ীতে পাঁচিল টপ্‌কে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের ভিতর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! এর মতলবটা কি?

রাগ করে কড়া সুরে বল্লুম, কথা কিছু থাকে ত কাল সকালে সদরে এসো—শোনা যাবে! তোমরা সেখানকার প্রজাদের সব আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো—আমি আমার নায়েবের কাছে তোমাদের বদমাইসির কথা সব শুনেছি!

সে বল্লে, কিছুই শোনেন নি আপনি! আমি বরাবর সেই সন্দেহই করে আসছি যে প্রকৃত কথা হয় ত কিছুই আপনার কাণে যায় না! হয়েছেও তাই! আমি সেই বিশ্বাসে আপনার কাছে সত্য কথাটা বলে সুবিচার প্রার্থনা কর্‌তে এসেছি।

তার কাছে শুনলুম, হরনাথ আমার কাছে যা বলেছে, তা না কি সর্ব্বৈব মিথ্যা! জমিদারীটা কেনা হবার পর, কিছু দিন পূর্ব্ব-জমিদারের দখলেই ছিল। সেই সময় প্রজারা প্রথম কিস্তীর খাজনা তাদের নায়েবের কাছেই দেয়। হরনাথ সেখানে গিয়ে সেই কিস্তীর খাজনা আমাদের প্রাপ্য বলে দাবী করে। তা ছাড়া, জমীর খাজনার হার বাড়িয়ে নতুন নতুন নিয়ম জারী করে। যারা তার আদেশমত বেশি খাজনা দিতে অক্ষম বলে প্রার্থনা জানায়, সে বেওজর তাদের কাছ হতে সে জমী কেড়ে নিয়ে বেশী খাজনায় অন্যত্র বিলি করে দেয়। প্রজারা প্রথম কিস্তীর খাজনাটা দুবার করে দিতে পারবে না ব'লে মাপ চায়; কিন্তু হরনাথের উৎপীড়ন ও জুলুমে তারা বাধ্য হয়ে সে টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন সে বেশি বেশি সেলামি নিজে নিয়ে একজনের জমী অন্য জনকে বিলি করে দিচ্ছে। গ্রামের দু একজন গরিব প্রজার মেয়েদের সম্বন্ধেও সে অন্যায় আচরণ করেছে। জন-কয়েক প্রধান লোক একত্র গিয়ে তার এ সব ব্যবহারের প্রতিবাদ করায়, সে সবাইকে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রজারা সকলেই তার অত্যাচারে উত্যক্ত। এর উপর সামনের মাসে তার ছেলের না কি অন্নপ্রাশন, সেইজন্য সে এ খরচটা মণ্ডলগড় থেকে তুলবে বলে সবাইকে ডেকে কাল জানিয়েছে। এই কথা শুনে তারা সব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পরামর্শ কর্‌ছে, এ অন্যায় তারা সহ্য করবে না। নজর দিতে হয় জমীদারকে দেবে। ওই যে লোকটা গিয়ে অবধি তাদের উপর এত অত্যাচার কর্‌ছে, তার এত আবদার আর তারা সহ্য করবে না।

আমি তাই আপনাকে সব জানাতে এসেছি—আপনার নায়েবের উপর একেবারে সমস্ত ভার ছেড়ে না দিয়ে, নিজে একটু একটু দৃষ্টি রাখবেন। মণ্ডলগড়ের প্রজারা বদমাইস বা বিদ্রোহী কিছুই নয়। তবে যদি কেবলই তাদের আঘাত করে করে উত্তেজিত করে তোলা হয়, তা হলে শেষে কি দাঁড়াবে, তা কে জানে। তার ফল রাজা প্রজা কারুর পক্ষেই ভাল হবে না। আপনি যদি একবার দুদিনের জন্যও সেখানে যান—যাদের জমী-যায়গা কেড়ে নিয়ে অন্নহীন করে রেখেছে, যাদের বাড়ী থেকে মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে অপমান করেছে, —তাদের ডেকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেন, তা হলেই

সব অসন্তোষ মিটে যাবে। আর তা যদি একান্তই না পারেন, তো আপনার নায়েবকে ডেকে ধমক দিয়ে এ সব জুলুমবাজি বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবেন। আর এ দুটোর যদি কিছুই না হয়, হরনাথের প্রতাপ যদি এমনি অক্ষুণ্ণ ভাবেই চলতে থাকে, তা হলে এর ফল বিশেষ ভাল হবে না। প্রজাদের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে প্রত্যেক স্থানে এর প্রতিবাদ করবো—জানবেন। কথা শেষ হতেই, লোকটা যে দিক দিয়ে এসেছিল, আর এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়িয়ে সেই দিক দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল!

আমি খানিকটা অবাক্ হয়ে বসে রইলুম! তার চোখে মুখে এমন একটা তীব্র তেজ ছিল, তার কথার মধ্যে কি যে অদ্ভুত জোর ছিল, যাতে আমায় একেবারে অভিভূত করে দিয়েছিল!

রাত ভোর কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো! সকালে উঠেই সর্ব্বপ্রথমে হরনাথকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিলুম! কি ব্যাপারটা, সব জানতে হবে!

হরনাথ খবর পেয়েই সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির! আমি তাকে নিভৃতে ডেকে সব কথা খুলে বল্লুম!

সে প্রথম কিছুক্ষণ অবাক্ হতবুদ্ধি হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; কোন কথাই বল্লে না!

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লুম—কি, হলো কি? এ সব কথা কেন আমায় শুনতে হলো? কি ঘটনা সত্য সত্য সেখানে ঘটেছে, আমি সব শুনতে চাই। কথা কও না যে?

সে বল্লে,—কথা বোলবো কি? তোমার কথা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে গেছে! সে ব্যাটা এখানে পর্য্যন্ত সত্যি সত্যি ধাওয়া লাগিয়েছিল? তবে তো নিমাই আমায় যা বলেছিল, সবই যথার্থ কথা! আমি না বিশ্বাস করে তাকে বকে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম! এখন দেখছি—সে একটা কথাও মিছে বলে নি।

আমি বল্লুম—কথাটা কি, তাই আগে বল না ছাই! সে বল্লে, কথাটা এই—ওরা সবাই তোমাকে যো পেলে খুন করবে বলে পরামর্শ কচ্ছিল! মণ্ডলগড়ের বুড়ো জমীদারের সঙ্গে তোমার বাবার চিরদিনের শত্রুতা—তাঁর সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করে করেই ওরা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে! ঘুরে ফিরে ওদের অমন ভাল জমিদারীটা তোমার হাতেই পড়লো—এই এখনকার ছোকরা জমিদারের রাগ আর কি? রামগোবিন্দ ব্যাটা ওদেরই পেটাও লোক,—ওরই পরামর্শে প্রজারা সব বিগড়ে যাচ্ছে! ওরা সব একদিন জটলা করে এই সব কথা বলাবলি কর্‌ছিল। রামগোবিন্দ বলে যে, যত রকমে পারা যায়, ওকে নাকাল করে মারতে হবে! অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন. যত টাকা লাগে লাগুক্—কিছুতেই ওকে দখল নিয়ে বসতে দেওয়া হবে না!

আর একজন বল্লে, শুধু নাকাল কেন? বাবু একবার হুকুম দিন্ না—বাছাধনকে ছটি মাসের জন্য ঘোল ভাত খাইয়ে দেব এখন! আর উঠে জমিদারীর দখল নিতে হবে না!

আমার চাকর নিমাই কোথা থেকে এ খবর পেয়ে আমায় এসে বল্লে। আমি বল্লুম—দূর! এ কি কখনো হতে পারে? নীলামে সম্পত্তি কিনেছেন বাবু, তাতে দোষটা হয়েছে কি? তিনি না কিনলে অন্য লোকে কিন্‌তো—তার জন্যে তাঁকে খুন করবে? এ হতেই পারে না! আমরা হলুম সরল লোক—কি করে জানবো বল? তবে সেই সর্দ্দার বদমাস ব্যাটা যখন এতদূরে এসে তোমারি বাড়ীতে ঢুকে তোমাকেই এমনি করে শাসিয়ে গেছে—তখন ঐ সব ব্যাপার মিথ্যা না হতেও পারে বলেই ত আমার মনে হচ্ছে।

আমি এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! জমিদার হয়েছি বটে, তবে জমিদারীর চালচলন কিছুই জানি না! সামান্য কারণে বা অকারণে এমন অহেতুক হিংসা লোকে করতে পারে—এ আমি জানতুম না।

আমায় নীরব দেখে হরনাথ বল্লে—আর তুমিও ত আচ্ছা লোক! তোমার বাড়ীর ভিতরে জোর করে ঢুকে এসে একটা লোক তোমায় যা-তা বলে শাসিয়ে গেল, আর তুমি চুপ করে তার এই সব কথা শুনলে? ধরতে পাল্লে না তাকে? লোকজন কেউ ছিল না কি সে সময়?

আমারও তখন রোখ চেপে গেল! তাই ত! আমি কি করে তার এত চোটপাট কথা শুনে অত সহজে তাকে ছেড়ে দিলুম? আমার কাপুরুষত্ব প্রমাণ হয়ে যেতে, অকস্মাৎ আমি রেগে উঠলুম!

বল্লুম, যেমন করে পার, ওদের সায়েস্তা করতেই হবে!

টাকার জন্ম ভেবো না। আর আমি কিছু শুনতে বা বলতে চাই না! ওদের দলবলকে জব্দ করা চাই-ই!

হরনাথ মুখ ভার করে বল্লে—না ভাই! তোমার বরঞ্চ একবার সেখানে যাওয়া ভাল! এসব বজ্জাত লোকদের জব্দ করতে হলে, ন্যায়-অন্যায় অনেক রকম চাল চালতে হয়। শেষ আবার কে এসে আমার নামে তোমায় কি বলে যাবে—তখন আবার তোমার মন ভার হয়ে উঠবে! যাহোক্ পরামর্শটি দিয়েছে ভাল—এখানে তুমি তোমার এলাকায় আছ; চারদিকে লোকজন, গোলমাল—এখানে ত বাগে পাওয়ার সুবিধা হবে না? তার চেয়ে তাদের সীমানার মধ্যে চল—বেশ গল্পগুজব করতে আসাও চলবে! জমিদারী দেখাও হবে, দরকার হলে মাথাটা ফাটানও সহজে হয়ে যাবে! ঐ রামগোবিন্দ ব্যাটাই খুনে বদমাস্! চোখ দেখেছ—ব্যাটার?

আমি মণ্ডলগড় সম্বন্ধে হরনাথকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে আবার আগের মত নিশ্চিন্ত আরামে গা ঢেলে দিলুম। হরনাথের সঙ্গে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে রামগোবিন্দের মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে লাগলো।

এক বৎসর এই ভাবে কাটলো! তার পরে একটা মামলায় আমাদের হার হলো!" রামগোবিন্দের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? হরনাথ বল্লে—সে না কি তার দলবল নিয়ে আমাদের মণ্ডলগড়ের কাছারীবাড়ীর পথ দিয়ে খুব বাজনা বাদ্য করে ঘটা করেছে; আর আমাকে ও হরনাথকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে।

বিষম রাগে ও আক্রোশে হরনাথ যেন পিঁজরের পোরা বাঘের মত গর্জ্জে বেড়াচ্ছিল! তার মুখে ক্রমাগত এই সব শুনে শুনে আমিও রাগে অন্ধ হয়ে উঠলুম! এ দুর্জ্জয় লোকটাকে কি করে জব্দ করা যায়?

অনেক রাত্রে হরনাথ আমার বৈঠকখানায় এসে বসলো! তখন আর-সব বন্ধুবান্ধবরা উঠে গেছে—আমি একা!

হরনাথ একটা নূতন বোতল বার করলে! আমার অবস্থা তখন খুব শোচনীয়—তবু সে আবার একগ্লাস পূর্ণ করে আমার সামনে ধরে বল্লে—দেখ! সন্ধ্যে থেকে ভেবে ভেবে সে ব্যাটাকে জব্দ করবার একটা চমৎকার মতলব বার করেছি! আর সব ব্যাটার বিষদাঁত ভেঙেছি—এখন এই ব্যাটাকে বাগে আনতে পারলেই হয়। কিন্তু ও যেমন দুঁদে বদমাইস, তেমনি ওর আঁতে ঘা দিতে হবে—তবে না ওষুধ ধরবে?

আমি নির্ব্বিবাদে গ্লাসটি শেষ করে বল্লুম, কি—মতলবটা কি? তার বোধ হয় কথাটা বলতে কুণ্ঠা হচ্ছিল—সে ইতস্ততঃ করে করে আমায় আরও দু চার গ্লাস খাওয়ালে। শেষ খুব চুপি চুপি বল্লে—দেখ! ও ব্যাটার স্ত্রী বড় সুন্দরী। শুনেছি না কি তাকে ও ভারি ভালবাসে! আমি বলি কি—সুবিধামত একদিন তাকে ধরে এনে কাছারিবাড়ীতে ঘণ্টা দুই আটকে রেখে ছেড়ে দি। ব্যাটা গাঁয়ের লোকের কাছে যা জব্দ হবে তা'হলে! কোথাও আর মুখ দেখাতে পারবে না। তার পরে নিজেই গাঁ ছেড়ে পালাবে তখন! কি বল? ঠিক হবে না?

আজ এসব কথা লিখতে লজ্জা ও ঘৃণায় আমার মন ধিক্কারে ভরে উঠেছে—কিন্তু তখন আমি খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠলুম। আমার তখন মাথার কোন স্থিরতা ছিল না। হরনাথ যা বল্লে, আমি তাতে সায় দিতে দিতে সেইখানে অচৈতন্য হয়ে পড়লুম!

তার পরদিন সকালেই কলকাতা থেকে মামার এক টেলিগ্রাম পেলুম! কি একটা বিশেষ দরকারি কাজে টেলিগ্রাম পাবামাত্র তিনি আমায় কলকাতায় যেতে লিখেছেন। তখনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ী ফিরে আসতে চার পাঁচ দিন দেরি হলো! এসে দেখি, হরনাথ মণ্ডলগড়ে ফিরে গেছে। সেদিন রাতে অচৈতন্য অবস্থায় নেশার ঘোরে আমি তাকে কি বলেছিলুম, তা আমার কিছুই মনে ছিল না। কাজেই এ বিষয়ে আমি কোন খোঁজ খবর করিনি।

তখন আশ্বিন মাস! ৺পূজা আগতপ্রায়! ঠাকুর-দালানে প্রতিমা গড়া আরম্ভ হয়েছে! সামনের মাঠে যাত্রা হবে বলে আটচালা বাঁধা হচ্ছে!

সন্ধ্যার সময় যে যার কাজ সেরে চলে গিয়েছে—আমি একলা ঘুরে ঘুরে আটচালাটা কেমন বাঁধা হলো, দেখছিলুম। কাছে বেশি লোকজন ছিল না।

হঠাৎ মাঠের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘকার লোক দানবের মত আমার দিকে তীরের ন্যায় ছুটে এলো! তার হাতে একটা বড় ছোরা—আলো লেগে ঝকমক করে উঠলো!



রাসলীলা

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

লোকটাকে অমনভাবে ছুটে আসতে দেখে আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলুম! তখনি দুজন পাইক ছুটে এসে তার ছোরাসমেত উদ্যত হাত ধরে ফেল্লে!

সে যখন তাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, আমি তখন একটু হাঁপ ছেড়ে চেয়ে দেখি—সে সেই মণ্ডলগড়ের সর্দ্দার বদমাস্—রামগোবিন্দ!

তার কাপড় ময়লা—মাথার চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল—চোখের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে!

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম! সে আমার দিকে চেয়ে ভগ্ন রুক্ষকণ্ঠে বল্লে—পাষণ্ড! নরপিশাচ! আজ বেঁচে গেছ বলে মনে করো না যে, তোমার বিপদ কেটে গেল! আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তোমার রক্তপানের তৃষ্ণা আমার যাবে না! আমি তোমার ভালর জন্য তোমায় যে যে সুপরামর্শ দিতে গিয়েছিলুম, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমায় এই এক বৎসর ধরে ছন্নছাড়া করে তুলেছ। আজ আমার এমন অবস্থা, ঘরে এক মুঠা অন্ন নেই—জীবনধারণ করবার কোন অবলম্বন নেই। তবু তাতেও তোমার তৃপ্তি হলো না—তুমি আমার বুকে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ? এর ফল তোমায় একদিন না একদিন পেতেই হবে! রামগোবিন্দকে বন্ধু-ভাবে নিতে পাল্লে না, শত্রুভাবে নিয়েছ;—বেশ—তাই ভাল! আবার দেখা হবে!

তার গায়ে কি অসীম ক্ষমতা! একবার দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে একটি ধাক্কা দিতেই—যে তার হাত ধরেছিল, সে ঘুরে পড়ে গেল! চোখের নিমেষে আর একটাকে এক-ঘা লাথি কসিয়ে দিয়ে সে যে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল, আর তাকে কেউ দেখতে পেলে না।

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলুম! হরনাথ তবে যা যা বলেছিল, সবই সত্য! বিনা কারণে আমার সত্য সত্যই খুন করবার জন্য অপূর্ব্ব মিত্তির এদের লাগিয়ে রেখেছে! কিন্তু ও-লোকটা আরও যে-সব কি কতকগুলো কথা হড়বড় করে বলে গেল, সে গুলোরই বা মানে কি? আমি ঘরের পয়সা দিয়ে যে সম্পত্তি কিনেছি, তাকে দখলে রাখবার চেষ্টা না করে নিরীহের মত ওদের হাতে তুলে দিতে হবে না কি? আবদার মন্দ নয় দেখছি! আজই এদের নামে পুলিশে ডায়েরী করিয়ে আসতে হবে! দিন দিনই বাড় বেড়ে চলেছে!

পাইক্ দুটো তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের একটাকে ডেকে বল্লুম, এ কি কাণ্ড রে নফ্‌রা? এ লোকটা শুধু শুধু আমায় তেড়ে খুন করতে এলো কেন?

তারা দুজনে মাথা হেঁট করলে! মনে হলো—তাদের যেন কিছু বলবার আছে! আবার জিজ্ঞেস কল্লুম; বল্লুম—জানিস কিছু ত বল্ না?

নফর বল্লে—আজ্ঞে, ওনার ইস্তিরী এই তিন দিন আগে ঐ পুকুরটায় ডুবে মরেছে।

আমার সর্ব্বশরীর যেন কেমন কেঁপে উঠলো। রাম-গোবিন্দের স্ত্রী? কি এই রকম একটা অস্পষ্ট কথা যেন মনে পড়ছিল—অথচ ঠিক ধরতে পাচ্ছিলুম না। বল্লুম,—কেন মরলো তোরা জানিস?

তারা আবার ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বল্লে—আজ্ঞে—গোমস্তা মশায়রা সব জানে।

যা! ডেকে নিয়ে আয়! আমার বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিবি! এখনি!

তারা ছুটে চলে গেল। আমিও ঘরে এসে বসলুম। শশিভূষণ আমলার কাছে শুনলুম, আমি কল্‌কাতায় চলে যাবার পর হরনাথ একদিন আমার সব পাইক আর লোকজন নিয়ে রামগোবিন্দের ঘর ভেঙ্গে ঢুকে তার স্ত্রীকে এখানে ধরে আনে। এই ঘরটাতেই তাকে এক রাত আট্‌কে রেখেছিল। রামগোবিন্দ তখন অন্য কাজে গ্রামান্তরে গিয়েছিল। সকালে তার স্ত্রীকে হরনাথ ছেড়ে দিতেই, সে আর কোন দিকে না গিয়ে সোজা পিছনের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈকালে তার দেহ ভেসে উঠতে সবাই দেখতে পায়। হরনাথকে এজন্য দু একজন অনুযোগ করাতে, সে বলে যে বাবুর হুকুমেই সে এ কাজ করেছিল, নিজের মতে করে নি। তাই শুনে আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস করে নি।

এবার আমার সব কথা মনে পড়লো। আমার সম্মতি যে হরনাথ কি করে' আর কি অবস্থায় নিয়েছিলো, তাও ক্রমে ক্রমে মনে হল! লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল! আমি এ কি করলুম! আমার জন্য একটি নিরপরাধিনী নারী এমনভাবে নির্য্যাতিত

হয়ে প্রাণ দিলে! আমিই এ স্ত্রীহত্যার কারণ! রামগোবিন্দের সঙ্গে আমার যতই কেন শত্রুতা থাক্—সে বোঝাপড়া আমার তার সঙ্গে হবে! তার স্ত্রী আমার কাছে কোন্ অপরাধ করেছিল যে, আমি তাকে এত বড় দণ্ড দিলুম? আমি নিজে যতই অধঃপাতে যাই—আমার দ্বারা কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হয়নি। আর সেদিন হরনাথের প্ররোচনায় আমার মাথায় এ কি শয়তানি বুদ্ধি যোগাল, যে, আমি অনায়াসে এত বড় একটা অন্যায় কার্য্যে সম্মতি দিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটালুম?

সমস্ত রাত শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় কাটলো! ভোর হতে না হতেই কারুকে কিছু না বলে সোজা মণ্ডলগড়ে চলে গেলুম। এ সুবুদ্ধি যদি আর কিছুদিন আগে হতো, তা হলে আর এত বড় মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটতো না!

হরনাথ আমায় এত সকালে বিনা সংবাদে সেথানে হঠাৎ দেখেই কেমন থতমত খেয়ে গেল!

আমি কোন ভূমিকা না করে একেবারে এই কথাই পেড়ে তাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলুম।

সে বল্লে,—তা—তুমি যা শুনেছ—সে সব সত্যই বটে। সেদিন রামগোবিন্দ মামলা জিতে যে কাণ্ডটা করলে, তাতে কেমন রোখ চেপে গেল—তাকে শাস্তি দিতে হঠাৎ একটা কাজ করে ফেল্লুম, এখন দেখছি—কাজটা ভাল হয় নি। আমারও বড় মন খারাপ হয়ে গেছে! মেয়েটাই যে খামকা অমন একটা কাণ্ড করবে, তাই বা কেমন করে জানবো বল? আমি ত তাকে চোখেই দেখি নি! পাইকরা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল; ছেড়ে দিতেই এই ব্যাপার!

হরনাথের কথা আমার বিশ্বাস হলো না! তার স্বরে বা চেহারায় তার স্বাভাবিক ভাব কিছু ছিল না! আমার বোধ হল—সে ভয় পেয়ে সবই মিথ্যা কথা বলছে!

খানিক চুপ করে থেকে সে বল্লে,—কথাটা তোমাকেও তো বলেছিলুম! তুমিও যদি সে সময় বারণ করতে, তা হলেও এমন কাণ্ড হতো না! তা তোমারও সে সময় মাথায় এলো না!

আমি তাকে ধমক দিয়ে উগ্রভাবে বল্লুম,—বাজে কথা কতকগুলো বোল না। তোমার নিজের বরাবর এই সব বদমাইসি বুদ্ধি ছিল,—শুধু দোষ কাটাবার জন্য আমার মুখ থেকে একটা কথা নেবার তোমার দরকার ছিল। তাও যে রকম করে' আর যে অবস্থায় বার করে নিয়েছিলে, তুমি নিজে সে কথা ভাল করেই জান। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না।

হরনাথকে কাছারী-বাড়ীতে বসতে বলে আমি বেরিয়ে পড়লুম। পথেই সে গ্রামের কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়ে গেল! তাঁরা আমার পরিচয় পেয়ে সবিনয়ে ও সাদরে আমায় তাঁদের ঘরে নিয়ে বসালেন। তখন কথায় কথায় এক এক করে সব কথা প্রকাশ হয়ে গেল।

হরনাথ এখানে এসে নিরীহ প্রজাদের উপর নানা জুলুমবাজি ও অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। রামগোবিন্দ ও আর জনকতক ভদ্রলোক তার কাযের প্রতিবাদ করায় সে প্রজাদের ছেড়ে এঁদের উপরে উৎপীড়ন অত্যাচার করতে থাকে। অবশেষে সকলে উত্যক্ত হয়ে তার কাযের উপর কথা বলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তারা সকলেই নির্ব্বিরোধী সংসারী লোক, নিজেদের সংসার ছেলে পিলে নিয়ে বিব্রত—নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিও দেখা শোনা করতে হয়—কত দিন আর পরের কথা নিয়ে ঝগড়া করে বেড়াবে? কিন্তু রামগোবিন্দ ছিল বড় তেজী ও ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতি—আর তেমনি একরোখা; যা ধরবে—তার শেষ পর্য্যন্ত সমান অধ্যবসায় ও জোরের সহিত বুঝবে। সে হরনাথের সামান্য অন্যায়টি পর্য্যন্ত মেনে নিয়ে চলতো না। ফলে দুজনে বচসা, মনান্তর ইত্যাদি হতে হতে ক্রমশঃ বিষম শত্রুতা বেধে উঠলো। হরনাথ দেখলে, রামগোবিন্দকে সরাতে না পারলে তার এখানে জমিয়ে বসবার আশা বৃথা। তখন সে নানা হাঙ্গামার মধ্যে, নিত্য নূতন মিথ্যা মামলার মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেলে, একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করে তুললে। রামগোবিন্দ মধ্যে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করেছিল, সে কথাও এঁদের মুখে শুনলুম।

রামগোবিন্দ আমার কাছ পর্য্যন্ত তার নামে নালিশ করতে গিয়েছিল শুনে, হরনাথ আরও জাতক্রোধ হয়ে উঠলো। তার উপরে আমাকে রাগিয়ে তোলবার জন্য সে অনেক মিথ্যা গল্প রচনা করে আমায় শোনালে। আমায় খুন করার পরামর্শ, অপূর্ব্ব মিত্রের আমার উপর আক্রোশ—প্রজাদের বিদ্রোহী করবার জন্য রামগোবিন্দের চেষ্টা—থেকে আরম্ভ করে, মামলা জিতে রামগোবিন্দের ঢাক ঢোল বাজান ও আমায় গালাগালি পর্য্যন্ত সবই হরনাথের রচা

গল্প। সে নিজের কু-প্রবৃত্তির জন্য ও রামগোবিন্দকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দেবার জন্য শেষোক্ত কাণ্ডটি করেছে।

কাছারী বাড়ী ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পেলুম না। আমায় আসতে দেখেই সে তার সব কারসাজি বেরিয়ে পড়বে জেনে—চোঁচা দৌড় দিয়েছে।

রামগোবিন্দের অনেক সন্ধান করলুম; কিন্তু সে যে তার শিশু পুত্র অসিতকে নিয়ে সেই রাত্রে কোথায় পালিয়েছে, তার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

আমি বুঝলুম, প্রথমে সে জানতো—এ সব অন্যায় অত্যাচার হরনাথের কীর্ত্তি; তাই যাতে আমি নিজে সব বিষয় তত্ত্বাবধান করে এ সব গোলমাল, বিরোধ মিটিয়ে ফেলি, সেই জন্য আমার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তার পরে আমি মণ্ডলগড়ে গেলুম না, উপরন্তু হরনাথের বদমাইসি ক্রমেই আরও বাড়তে লাগলো, তখন তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো, যে, হরনাথ আমার নিয়োজিত লোক মাত্র। সে স্বাধীনভাবে কোন কায করে না; আমার আজ্ঞা ও উপদেশ মতই সে সব কাজ করে। হরনাথ ইচ্ছা করে' আমার ঘাড়ে সব দোষ ফেলবার জন্য, আমার বাড়ীর লোকজন নিয়ে গিয়ে রামগোবিন্দের ঘর ভেঙ্গে তার স্ত্রীকে টেনে আনে। মণ্ডলগড়ের কাছারিবাড়ীতে রাখলে তার নামে চাপ পড়তে পারে, তাই তিন চার ক্রোশ পথ ভেঙ্গে তাকে আমার বাড়ীর ভিতর আমারই বসবার ঘরে আটক করে রেখেছিল। ছাড়া পেয়ে স্ত্রীলোকটি আমারই বাড়ীর পিছনের পুকুরে ডুবে মরেছে। এই সব কারণে তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এ সবই আমার কীর্ত্তি। আমি যে তখন কল্‌কাতায় ছিলুম, এ খবরটা সে পায় নি।

এতক্ষণে সব ব্যাপারটা আমার স্পষ্টরূপে বোধগম্য হলো। কেন যে সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে শাণিত ছোরা নিয়ে আমায় তেড়ে এসেছিল, সে সবই এবার ভাল করেই বুঝলুম। তবে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, বুঝে কোন ফল হল না।

এবার আর মণ্ডলগড় পরগণার বিরোধ মিটতে দেরি হলো না। সেখানকার সব সুবন্দোবস্ত করে আমি অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

আমি তার পর থেকে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ, আর আমোদ-প্রমোদ—সবই ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালুম। তখন থেকে নিজে সমস্ত বিষয় দেখা-শোনা, জমিদারীর স্থানে স্থানে গিয়ে কর্ম্মচারীদের কাজ কর্ম্মের তদারক করা, প্রজাদের অবস্থার সন্ধান করা—ইত্যাদি সব বিষয়েই মনঃসংযোগ করলুম। কিছুদিন পরে তোমার মা ঘরে এলেন, আরও কিছুদিন পরে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তুমি এসে আমার শূন্য নিরানন্দ গৃহ আনন্দের কলকাকলীতে পূর্ণ করে তুললে।

সবই হলো, কিন্তু আমি আর আমার মনের শান্তি ফিরে পেলুম না। দারুণ আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় আমার অন্তর দগ্ধ হয়ে যেত,—আমারই দোষে উদারচেতা, মহানুভব রামগোবিন্দ অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হয়ে, ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় দেশান্তরী হয়ে গেছে, এ কথা আর আমি কিছুতে ভুলতে পাচ্ছিলুম না। তোমার মায়ের হাসিভরা সুন্দর, পবিত্র মুখখানির দিকে চাইলেই, আমার রামগোবিন্দের সুশীলা পত্নীর কথা মনে পড়তো; তোমায় বুকে চেপে আদর করতে গেলেই আমার শিশু অসিতের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উদাস হয়ে যেত। সেই ছোট কুসুম-সুকুমার শিশুকে নিয়ে তার উন্মাদ পিতা কোথায় পথে পথে আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরছে! আর তখন কোন দিকে, কোন কাজে আমি মন দিতে পারতুম না।

দিনের পর দিন আমার এই মানসিক ব্যাধি ও অশান্তি বাড়তে লাগলো। গভীর রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে আমি ভয়ে চীৎকার করে জেগে উঠতুম,—স্বপ্নে যেন রামগোবিন্দ ছোরাহাতে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তেড়ে আসছে! ঘামে সর্ব্বশরীর ভিজে যেত! আমি উঠে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকতুম! ক্রমান্বয়ে একই কথা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শেষে জাগ্রতে স্বপ্নে সব সময়ই দেখি—তার সেই রুক্ষ দীর্ঘ আকৃতি,—সেই কালাগ্নি-শিখার মত অগ্নিময় চক্ষু—হাতে সেই শাণিত অস্ত্র—সে উল্কার মত তীব্র বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে! জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো! তখন অগত্যা উপযুক্ত লোকের হাতে বিষয়-কার্য্য ছেড়ে দিয়ে আমি তোমাদের নিয়ে দেশত্যাগ করলুম!

মা নির্ম্মল! এই আমার কলঙ্কিত জীবনের শোচনীয় দীর্ঘ ইতিহাস। এর পর থেকে আর আমার জীবনে লুকোবার বা লজ্জা পাবার মত আর কোন বিষয় নেই। প্রথম বয়সে

বুদ্ধির দোষে একদিন যে অন্যায় করেছি, সারা জন্ম তারই জের টেনে কাটলো, আজও শান্তি পেলুম না।

এখানে এসে সম্পূর্ণ নূতন দেশ, নূতন সঙ্গ ও সবই নূতনের মধ্যে পড়ে আমার সব মানসিক রোগ অনেক কমে গিয়েছিল, তবে মনের ভিতর থেকে একেবারে যায় নি। আমি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে গিয়ে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে আসতুম। রামগোবিন্দের যে সব সম্পত্তি মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য, ঋণের দায়ে ও হরনাথের চক্রান্তে নষ্ট হতে বসেছিল, সে সবের পুনরুদ্ধার করে যোগ্য লোকের হাতে ভার দিয়ে এসেছি—পঁচিশ বৎসরে তার সে সম্পত্তি ও নগদ টাকা—একটা রীতিমত বড় বিষয়ে দাঁড়িয়েছে! তার গৃহ প্রতি বৎসর সংস্কার করিয়ে অভগ্ন নূতন অবস্থায় ভাল লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছি—যদি কোন দিন অসিতকে খুঁজে পাই, সে এসে তার সব ভোগ করবে বলে! হরনাথ আমার ভয়ে তার টাকা-কড়ি সব নিয়ে দেশে পালাচ্ছিল,—পথিমধ্যে ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে সে মারা গিয়েছে, খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু রামগোবিন্দ ও অসিতের অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান পেলুম না।

পঁচিশ বৎসর এমনি করেই কেটে আসছিল। তাদের সন্ধান পাবার আশা যখন মন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, সেই সময় একদিন পাটনার জঙ্গলে অতর্কিত ভাবে অসিতের সঙ্গে দেখা হলো! আমার পরিচয় পেতেই তার চোখে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তাতেই আমি বুঝলুম, রামগোবিন্দ সারা জীবনেও আমার প্রতি সে প্রতিহিংসা ভুলতে পারে নি,—অসিতকে সে জ্ঞানের উদয় থেকে এ সব কথা ভাল করেই বুঝিয়ে গেছে,—তার সেই ভীষণ প্রতিহিংসার জ্বালা তার সন্তানের মর্ম্মে মর্ম্মে দেগে দিয়ে গেছে! তার সে শিক্ষা, সে উপদেশ কখনো ব্যর্থ হবে না!

সেই দিন থেকে আবার আমার মনে সেই দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি নূতন করে জেগে উঠেছে! সেই অশান্তি, সেই বিভীষিকাময় মৃত্যুর ছবি আমি আর কিছুতে ভুলতে পারছি না! আমি জানি, হয় ত কোন এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে অসিতের হাতেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত! কিন্তু তবু এ জন্য আমি কারুকে দোষী করতে চাই না! আমি জানি, এ দণ্ড আমার ন্যায্য প্রাপ্য! আমি কি তাদের সুখ ও শান্তিময় গৃহে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিই নি?

যার হাতে বহু লোকের সুখ-দুঃখের ভার থাকে, সে যদি তার নিজের অযোগ্যতা ও আলস্যের জন্য সে কর্ত্তব্য পালন করতে না পারে, তবে তার উচিত নিজেকে সে পদ, সে ঐশ্বর্য্য থেকে অপসৃত করা! সেইখানে চেপে বসে সে সম্পত্তি, সে বিষয় ভোগ করা তার উচিত নয়! আমি ত তা করি নি মা! আজ হরনাথের দোষ দিয়ে নিজেকে নির্দ্দোষ বলে মনে সান্ত্বনা কি বলে নিই? হরনাথকে আমি অন্যায় করবার অবসর ও সুযোগ দিয়েছিলুম, তবে ত সে করতে পেরেছে? অপরাধ সবই আমার! আমার মনে স্থির বিশ্বাস যে, এইবার আমার দণ্ড গ্রহণ করবার সময় এসেছে! না হলে এতদিন পরে আবার তার সঙ্গে কেন দেখা হলো? সে আমাকে তার পরম শত্রু বলে জানবার শিক্ষাই আজীবন পেয়ে এসেছে; তাই আমার বিরুদ্ধে তার মনের সমস্ত ক্রোধ, ঘৃণা, বিরক্তি ও প্রতিহিংসা উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে যদি জানতো, আজ এই দীর্ঘ দিন ধরে আমি কত আগ্রহে, কত আশায় তাদের সন্ধান করেছি!

ভাগ্য যদি অন্যরূপ না হতো, তা হলে আমার একমাত্র কন্যার বিনিময়ে তাকে পেয়ে আমি পুত্রের অভাব ভুলতে পারতুম; এই শেষ বয়সে সে আমার জীবনের অবলম্বন ও আশ্রয় স্বরূপ হতে পারতো! কতদিন মনে মনে এই কথা আলোচনা করেছি; কিন্তু সে ত হবার নয় মা! বিধির বিধানে আমাদের সম্বন্ধ যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়ে এসেছে, কার্য্যক্ষেত্রে তাই ত দাঁড়াবে!

কিন্তু তবু আমার তার সঙ্গে দেখা করবার বা তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবার সাহস নেই। সে যে কোথায় আছে, তাও আমি জানি না। তাই সব কথাই লিখে রেখে গেলুম মা! যদি কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাকে এই পত্র দেখিও, তার নিজের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাকে বুঝে নিতে বলো! আর বলো—যদি সে পারে, তবে যেন এই অনুতপ্ত বৃদ্ধকে মন থেকে ক্ষমা করে। তোমার পিতার সব কথা জেনে তুমিও তাকে ক্ষমা করো মা! ভগবান তোমাদের কল্যাণে রাখুন—আমি তাকে ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

সামোয়া দ্বীপবাসীদের কথা

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সামোয়ান দ্বীপাবলীকে ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে লুই এ্যান্টোনি নামক একজন ফরাসী "The Navigator's Islands" নামে অভিহিত করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে "সাউথ সি"র এই দ্বীপগুলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং লোকজনদের স্বভাব-চরিত্র যে প্রকার ছিল, বর্ত্তমানে অতি-সভ্যতার কবলে পড়িয়া তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বেও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত এই সকল দ্বীপের লোকেরা সকল বিষয়েই ছিল শিশু; তাহারা হাসিয়া খেলিয়া মনের আনন্দে এবং খেয়ালে যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া দিন গুজরান করিত। বর্ত্তমান সভ্যতার কঠিন আশীর্ব্বাদ দ্বীপবাসীদের ঘাড়ে কোনো দিন পড়িবে বলিয়া মনে হইত না। "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন কাটান" কাহাকে ব'লে, এই দ্বীপবাসীরা তাহা জানিত না।

এখন ক্রমশঃ এই দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার প্রসার হইতেছে এবং সেই সঙ্গে এই স্থানের লোকেদের আনন্দের এবং অভাবহীনতার দিনগুলির আয়ুও কমিয়া আসিতেছে। এখনও অবশ্য পুরান দিনের সব-কিছুই বিলুপ্ত হয় নাই। যাহা এখনও আছে—সেইটুকুও টিকিয়া থাকিলে সামোয়ান্ দ্বীপের লোকের পক্ষে তাহা পরম ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

সামোয়া দ্বীপটিতেই বিশেষ করিয়া পুরান দিনের অনেক-



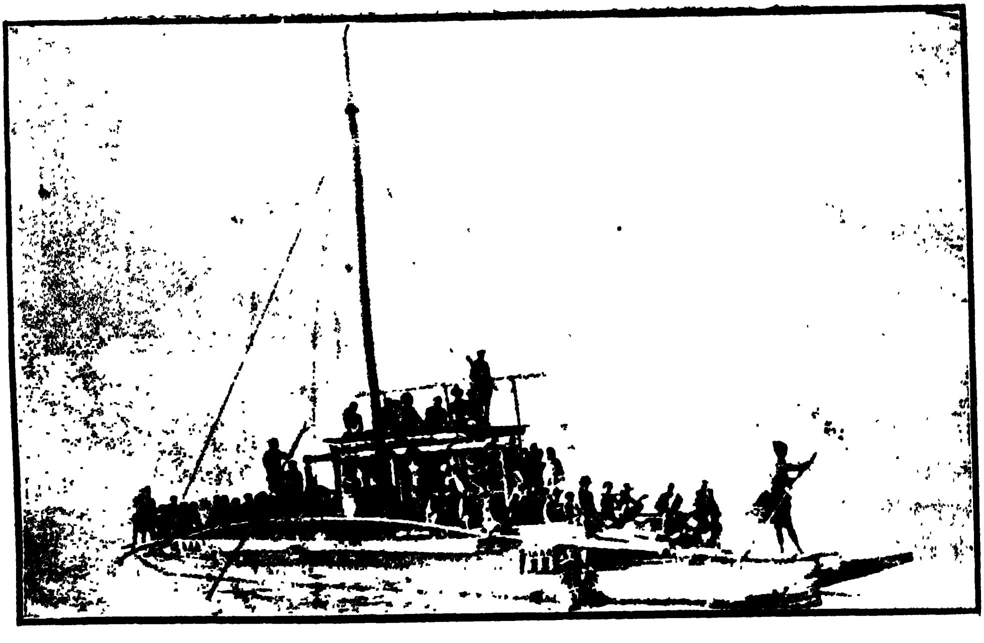
সামোয়ান 'বর-কনে'

কিছুই এখনও বাঁচিয়া আছে। এই দ্বীপটিকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা মানুষের "আদি পিতামাতা" আডাম ও ইভের উদ্যান! মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, দ্বন্দ্ব, চারিদিকে কলকব্জা, চিমনির ধোঁয়া ইত্যাদি এখনও এই দ্বীপে শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই।

সামোয়ার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন



সামোয়ার শিশু নাবিক—জলক্রীড়ার সূচনা



সামোয়ানদের নির্ম্মিত সমুদ্রগামী তরণী

তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি এইখানে কাটাইয়া যান। দ্বীপের উপকূলে আসিয়া যখন জাহাজ ভিড়িল, সেই সময় তিনি বলেন "জলে নঙ্গর ডুবিল—সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং আমার কয়েকজন সহচর সামোয়া দ্বীপের সৌন্দর্য্যে চিরকৃতদাস হইলাম।"

সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ দুইভাগে বিভক্ত—এক-ভাগ ইংরেজের অধীনে, অপর ভাগ আমেরিকার। ইংরেজদের অধীন অংশ নিউজিল্যাণ্ডের দ্বারা শাসিত হয়। আমেরিকান অংশের রাজধানীর নাম "পাগো পাগো"—ইংরেজ অংশের রাজধানী "এ্যাপিয়া।"

সামোয়া দ্বীপে ওলন্দাজরা প্রথমে আসে (১৭২২ খৃঃ অব্দে)। তাহার পর আসে ফরাসীরা (১৭৬৮ খৃঃ অব্দে)। কিন্তু এই দুই শ্বেতাঙ্গ জাতি এইখানে পাকাপাকি বসবাস করিবার মত কিছু করে নাই। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কয়েকজন পাদরী প্রথমে এই দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপে আসে এবং দ্বীপের জরীপ এবং অনুসন্ধান করে।



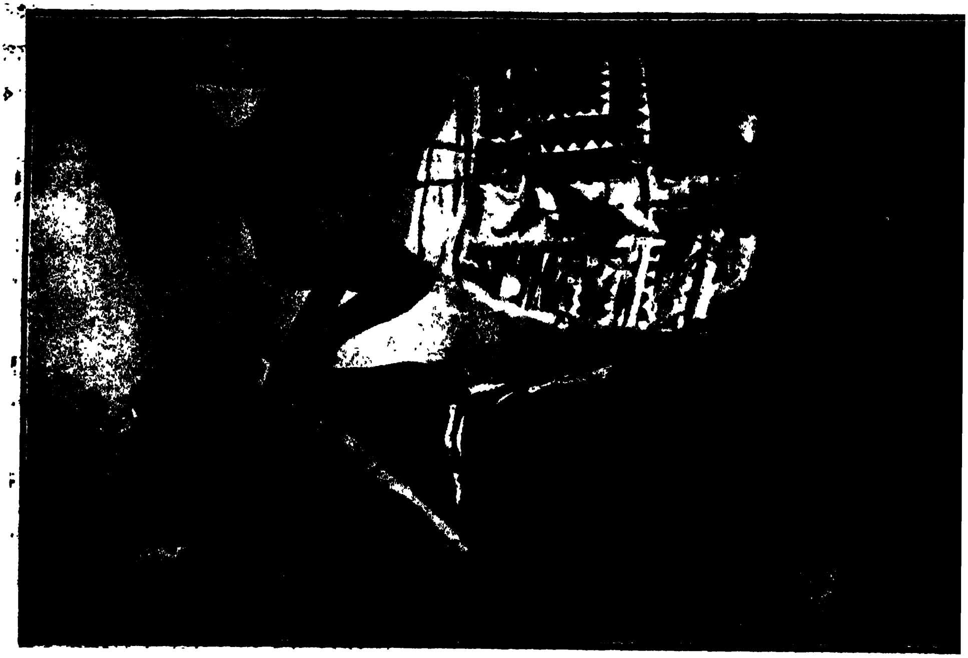
সামোয়ান কুটীর



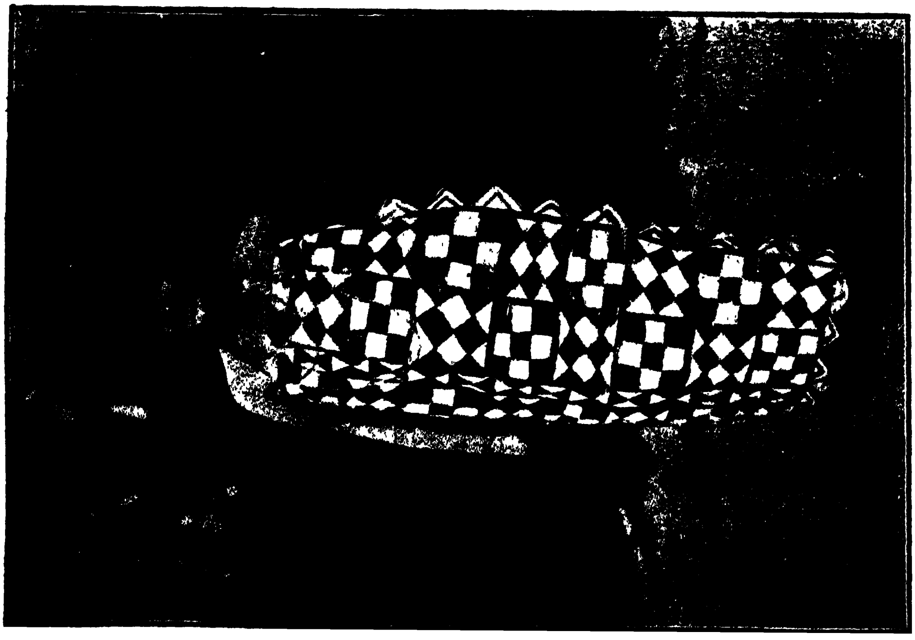
সামোয়ান নর্ত্তকী

১৯ শতাব্দীর মাঝামাঝি সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ, ইংরেজ, আমেরিকান এবং জার্ম্মান এই তিন শক্তি শাসন করিতে থাকে। শাসনকার্য্য অবশ্য নামমাত্র হইত। পাকাপাকি ভাগ-বাঁটোয়ারা কিছু হয় নাই।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে একজন আমেরিকান নৌ সেনাপতি পাগো পাগোতে একটি নৌ-ঘাঁটি বসাইবার অধিকার লাভ করেন এবং সামোয়ান জাতির সহিত একটি সন্ধি করেন; কিন্তু এই সন্ধি আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন নাই। ইহার পরে কয়েক বছর উক্ত তিন শ্বেতাঙ্গ শক্তি সামোয়া দ্বীপে যথেচ্ছাচার চালাইতে থাকে। সকলেই নিজ নিজ

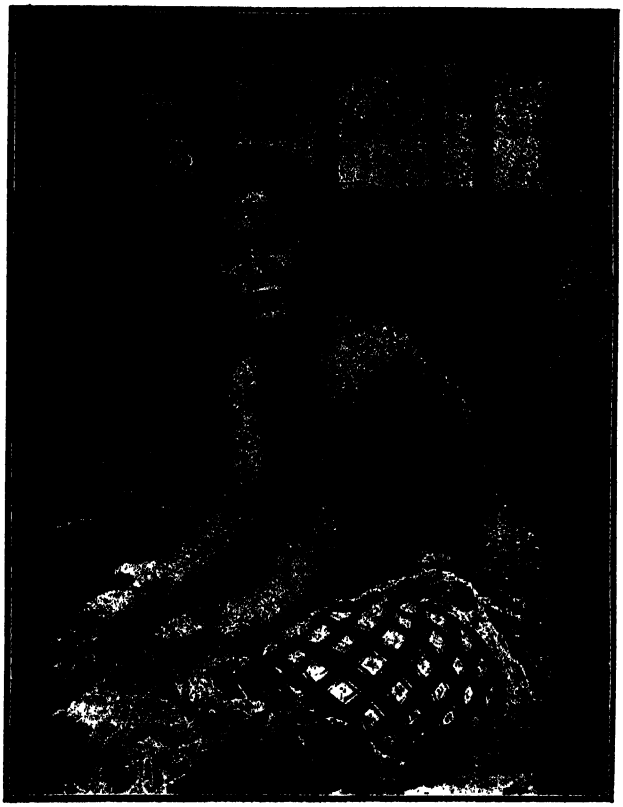


সামোয়ান-সুন্দরী



সুসজ্জিতা সামোয়ান গৃহিণী

সুবিধা বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। ১৮৭৩ সালে একজন মার্কিন নিজেকে সামোয়ার প্রধান শাসনকর্ত্তা বলিয়া



শিল্পকর্ম্ম-নিরতা সামোয়ান নারী

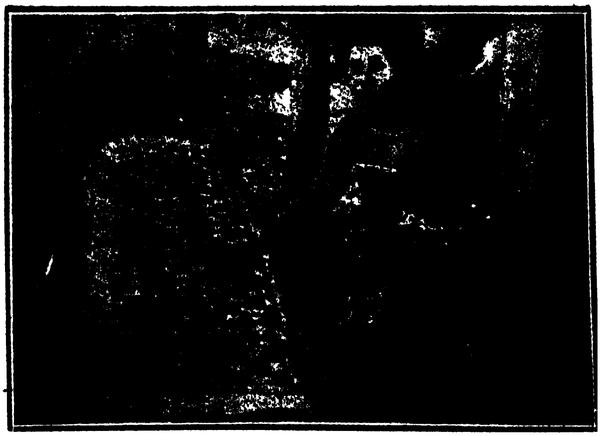
ঘোষণা করিলে, ১৮৭৬ সালে ইংরেজরা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিল। ইহার পরের বছর জার্ম্মানরা সামোয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদের এক রাজাকে তাড়াইয়া অন্য একজনকে রাজা করিল। এই সময় ইংরেজ এবং আমেরিকানরা নিজের নিজের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সামোয়াতে নিজের নিজের যুদ্ধ-জাহাজের সমাবেশ করিল।

এই সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। শ্বেতাঙ্গদের সামোয়া দ্বীপে আগমন প্রকৃতি দেবীর সহ্য হইল না—১৮৮৯ সালে এক ভীষণ ঝড়ে ইংরেজদের "ক্যালিপো" নামক জাহাজটি ছাড়া—আমেরিকার ও জার্ম্মাণির সকল জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ইংরেজদের জাহাজখানি ঝড়ের প্রারম্ভেই খোলা সমুদ্রে দৌড় দিয়া আত্মরক্ষা করিল।

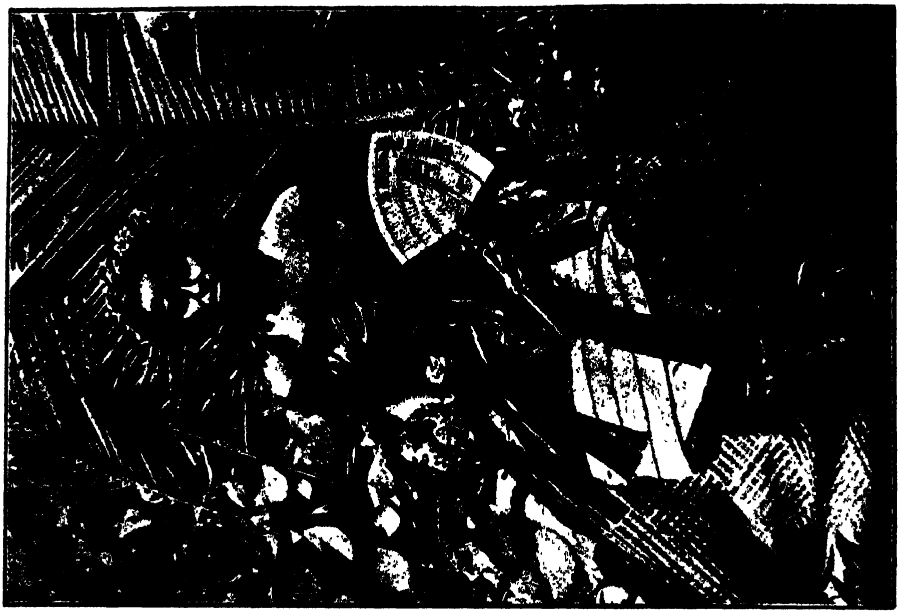
এই মহা-ঝড়ের পর সামোয়াকে বার্লিন সহরের এক সন্ধিতে স্বাধীনতা দান করা হইল। এই স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বে এবং শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পূর্ব্বে অবশ্য ইহারা কাহারো অধীন ছিল না। তিন শক্তির প্রতিনিধি হইয়া কেবল একজন "প্রধান বিচারপতি" সামোয়াতে থাকিবেন ইহাই স্থির হইল। কিন্তু এই সন্ধি টিকিল না। কিছুকাল পরেই জার্ম্মানি এবং আমেরিকা সামোয়ান দ্বীপ তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। ইংলণ্ড আর একটি দ্বীপে তাহার অধিকার স্থাপন করিল।

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণি সামোয়া দ্বীপের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ১৯১৪ সালের ৩রা আগষ্ট হইতে সামোয়া পুরাপুরিভাবে মার্কিণ এবং ইংরেজের অধীনে রহিয়াছে।

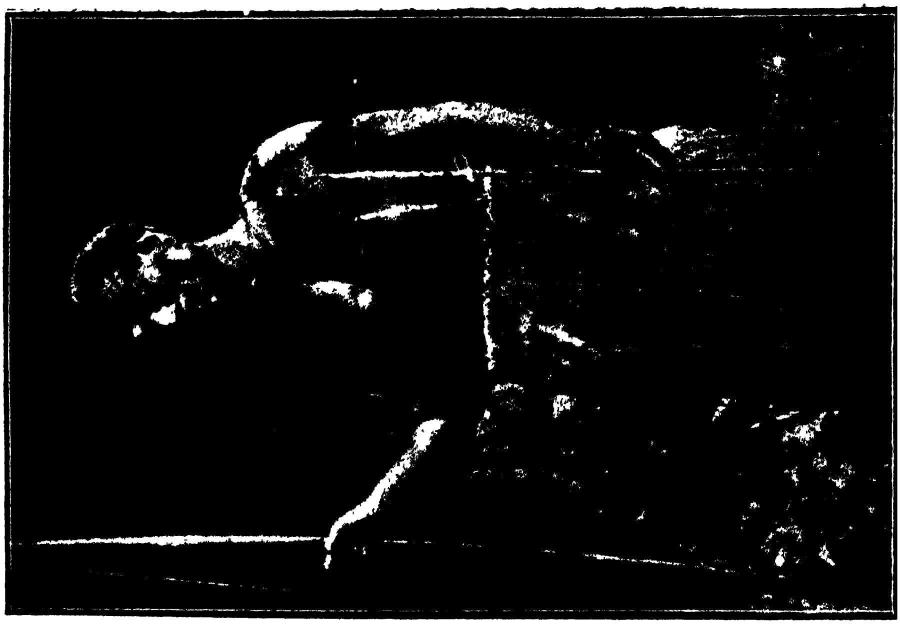
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে যত



সামোয়ান নারী-রচিত পাটী



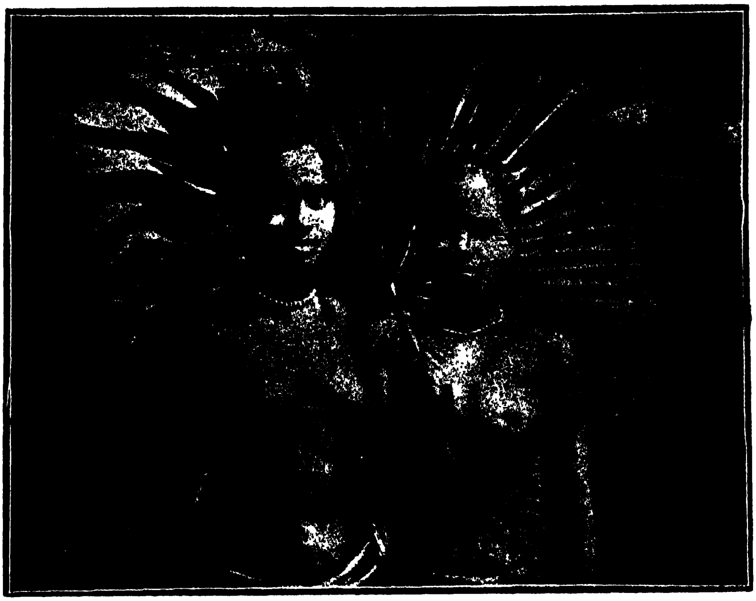
মোয়ার ভূতপূর্ব রাজবংশীয়া মহিলা



সামোয়ান যোদ্ধা

জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে সামোয়া জাতিরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শরীরের দৈর্ঘ্যেও ইহারা অন্যান্য পলিনেসিয়ান জাতি অপেক্ষা সুন্দর। সামোয়ান নারীরাও তাহাদের দেহের গঠনে এবং মুখশ্রীতে সত্যসত্যই অতি সুন্দর। তাহাদের দেহের বর্ণ অবশ্য একটু তামাটে। কিন্তু বর্ণের জন্য তাহাদের সৌন্দর্য্যের কোনো প্রকার হানি হয় নাই। সামোয়ান নারীরা তাহাদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহে। বেদানা ফুল এবং অন্যান্য নানা প্রকার রংবেরঙের নানা প্রকার ফুলের মালার অলঙ্কার পরিয়া তাহারা নিজেদের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার চেষ্টাও করিয়া থাকে।

পুরুষেরা কোমরে একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া রাখে। নারীরা বাকল নির্ম্মিত একপ্রকার ঘাঘরা মাত্র পরিধান করিত। কিন্তু বর্ত্তমান শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা নানা প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে নারীরা যে প্রকার বন্য ফুলের মালা ইত্যাদিতে দেহ শোভিত করিত, তাহা বর্ত্তমানে প্রায় লোপ পাইবার পথে আসিয়াছে।



সামোয়ান তরুণী



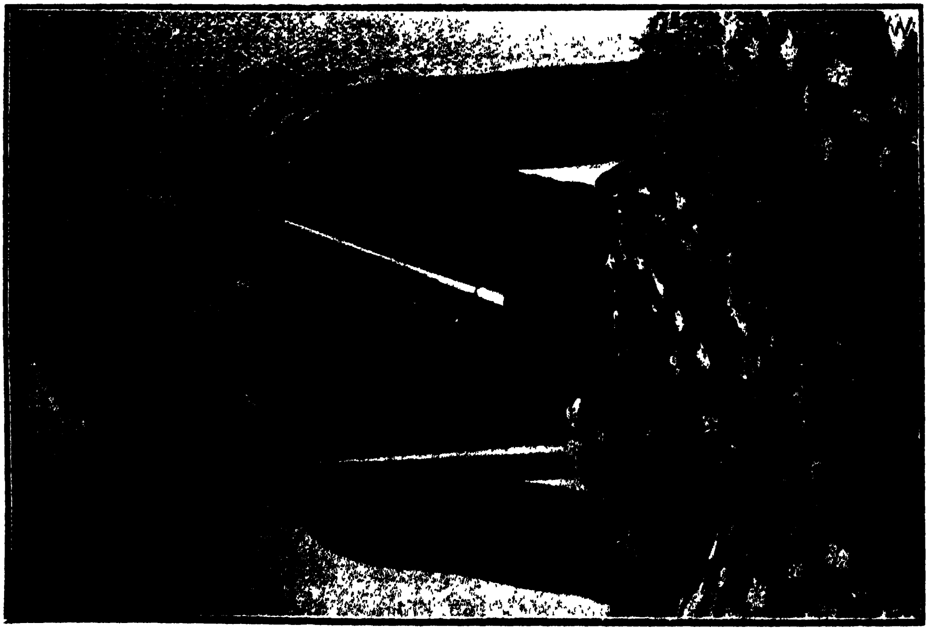
শিব-নৃত্য অভ্যাস

সামোয়ানরা ভদ্র এবং আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন। তাহাদের প্রাচীন জীবনযাপন-প্রণালী খুব সরল এবং সহজ ছিল। সম্পত্তি লইয়া কোনো প্রকার গোলমাল হইত না; কারণ, একখানা কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর সম্পত্তি বলিয়া কারুর কিছু ছিল না। খাদ্যের কোনো অভাব ছিল না—প্রকৃতি তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়াই দান করিত। খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোনো পরিশ্রম প্রায় কাহাকেও করিতে হইত না।

গ্রামের সর্দ্দারেরা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিল। তাহাদের কথাই ছিল আইন। সর্দ্দারের কথা অমান্য করার শক্তি কাহারো ছিল না; যদিও বা কেহ তাহা করিত, তবে তাহার জন্য তাহাকে ভয়ানক দণ্ডলাভ করিতে হইত।



পালে পালে দ্বীপের উৎসব-বেশে সজ্জিতা সামোয়ান সুন্দরী



সামোয়ার পেশাদার "বক্তা" (বহু সাধনার ফলে সামোয়ার "বক্তা" হওয়া যায়।)

অসভ্য জাতিদের ভাষার মধ্যে সামোয়ানদের ভাষাকে অপেক্ষাকৃত শব্দ-সম্পদ-বহুল বলা যায়। বনে জঙ্গলে যত প্রকার ফলমূল পশু পক্ষী ইত্যাদি পাওয়া যায়, প্রায় সকল জিনিষেরই একটি করিয়া বিশেষ নাম আছে। কথাবার্ত্তায় সামোয়ানরা এত ভদ্র যে, ইহারা পরের ঘরবাড়ী ইত্যাদি সকল জিনিষকেই রাজবাড়ী বলে; কিন্তু নিজের ঘরবাড়ী ইত্যাদিকে কুটীর, অতি দীনহীন ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করে।



সামোয়ান কুমারী (ইঁহাদের উপাধি "টাউপো।" গ্রামে ইঁহাদের সম্মানের সীমা নাই। গ্রামের মাননীয় অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা ও সমাদরের ভার ইঁহাদের উপর।)

সামোয়ানদের বিশেষ বিশেষ উৎসবে যে সকল ভোজ হয়—তাহা কোনো অংশে এবং কোনো দিক দিয়াই আমাদের বড়লোকদের বাড়ীর ভোজ অপেক্ষা কম নহে। তাহার বাঁধা পদ্ধতি এবং নিয়ম-কানুন আছে। কোন্ ভোজে কি খাওয়ান হইবে, কাহার আসন কাহার পর হইবে ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়ম-বাঁধা আছে। ইহার কোনো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। যাহার বাড়ীতে ভোজ, তিনি সকল সমাগতের ভৃত্য এবং বন্ধু। তাঁহার কোনো ত্রুটি হইবার জো নাই; কিন্তু অভ্যাগতের কাহারো কোনো ত্রুটি হইলে তাহা মারাত্মক নহে।

যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, কি ভাবে, কোথায়, কতক্ষণ, কি অস্ত্র ইত্যাদি লইয়া যুদ্ধ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য দুই বিরুদ্ধ দল মিলিত হইয়া আলোচনা হইত। আলোচনা সময়ে সময়ে এত দীর্ঘ হইত যে, যুদ্ধ করা স্থির হইবার পর যুদ্ধ করিবার মত প্রবৃত্তি:কাহারো থাকিত না। দুই চারিবার হোই হাই করিয়াই যুদ্ধ শেষ হইত। সময় সময় এমনও হইত যে, আলোচনার পর সকল দ্বন্দ্ব লোপ পাইত এবং যুদ্ধের পরিবর্ত্তে মহা ভোজের ব্যবস্থা হইত।

নিজের বিষয় গর্ব্ব করিয়া কিছু বলা সামোয়ান মতে অভদ্রতা। কিন্তু নিজের বন্ধুর বিষয় বলিতে হইলে তাহা শতগুণ বাড়াইয়া বলাতেও কোনো দোষ নাই। সামোয়ান জাতির লোকেরা পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ভদ্র; তাহারা অতিথিপরায়ণ এবং মহৎ-হৃদয়। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে সকল নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিয়াছেন, তাহারাও সেই সকল নিয়ম কানুন, আচার-ব্যবহারের সম্মান রক্ষা করিয়া চলে। তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ—পরধর্ম্মের প্রতি নয়, নিজ ধর্ম্মের প্রতি। সন্তানদের প্রতি মমত্ববোধ ইহাদের অসাধারণ। হাজার দোষ করিলেও ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তোলা বা ধমকানো ইহাদের স্বভাব নহে।

শ্বেতাঙ্গদের আসিবার পূর্ব্বে সামোয়ানদের ধর্ম্ম ছিল পৌত্তলিক। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে সকল আচার ব্যবহার ইহারা বরদাস্ত করিতে পারে নাই, তাহা সযত্নে পরিহার করিয়াছে। প্রতি গৃহে সকালে এবং সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। এ্যাপিয়া শহরের চারিদিকে বহু গির্জ্জা, মিশন-ঘর, এবং ধর্ম্মশিক্ষালয় দেখা যায়।

এ্যাপিয়ার রোমান্ ক্যাথলিক গির্জ্জাটি দেখিবার জিনিষ। এত বড় এবং সুন্দর গীর্জ্জা সামোয়াতে বোধ হয় আর নাই। প্রতি রবিবার সকল প্রকার কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে। এই দিন গীর্জ্জায় উপাসনার দিন।

সামোয়া দ্বীপে নানা প্রকার ফল জন্মে। রুটিফল, ইয়ামফল, এবং টারাফল প্রচুর পরিমাণে হয়। নারিকেলের গাছ চারিদিকে জন্মে। প্রায় কোনো প্রকার ফলের গাছেরই চাষ করিতে হয় না। "কাভা" নামক গাছের মূল হইতে ইহারা একপ্রকার মদের মত পানীয় প্রস্তুত করে। সমুদ্র হইতে মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। খাদ্যের ছড়াছড়ির জন্যই বোধ হয় সামোয়ান জাতি পরিশ্রমী নয়। তাহারা ভাল শিকারী —কিন্তু শিকারও তাহারা খেয়ালমত করে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য করে না। কোনো কাজ ভাল লাগিলে, তাহার জন্য বহুক্ষণ কঠিন পরিশ্রম করিতেও তাহারা বিরত হইবে না; কিন্তু নিয়ম করিয়া কোন প্রকার কাজ করা তাহাদের কুষ্ঠিতে লেখা নাই। খেয়ালই এই জাতির সকল পরিশ্রমের মূল। মানুষ যে কেন দিনের পর দিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাহার অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে, তাহা সামোয়ানরা বুঝিতে পারে না।

সামোয়ানদিগকে নিয়মিত ভাবে কোনো কাজে লাগাইয়া রাখা যায় না বলিয়া দ্বীপের ব্যবসা চালাইবার জন্য চীনা কুলির আমদানি করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের সুবিধার জন্যই করা হইয়াছে; সামোয়ানদের কল্যাণ ভাবিয়া করা হয় নাই। চীনা কুলির আমদানিতে এবং শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার অতি প্রসারে সামোয়ানজাতির যে বহু বিষয়ে অকল্যাণ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের পবিত্র এবং কোমল ভাব ইতোমধ্যেই নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যতার অন্যান্য নানা প্রকার পাপও তাহাদের সমাজে প্রবেশ করিতে সুরু করিয়াছে।



"কাভা"-মূল চূর্ণ হইতে উত্তেজক পানীয় প্রস্তুতকারিণী

আশঙ্কা হয় যে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানা প্রকার আবেষ্টনের চাপে পড়িয়া সামোয়ান জাতি কিছুকাল পরেই হয় ত তাহাদের সকল বিশেষত্ব এবং সৌন্দর্য্য হারাইয়া এক অদ্ভুত জাতিতে পরিণত হইবে।

ধোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

* *

সত্যদাসের চাকরী হয়ে গেছে। সে অপ্রত্যাশিত অধিক বেতনের চাকরী পেয়ে রামযাদুর কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে তার অনুরক্ত আজ্ঞাধীন হয়ে পড়েছে।

রামযাদু একদিন সত্যদাসকে বল্‌লে—সত্যদাস, এইবার তোমার বইখানা প্রেসে দেবো। খুব ভালো ক'রে ছাপাতে হবে।

সত্যদাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রামযাদু বল্‌তে লাগলো—কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। আপিসের সাহেবেরা ইচ্ছা করে না যে তাদের কর্ম্মচারীরা আপিসের কাজ ছাড়া আর কিছু করে; বিশেষতঃ লেখকদেরকে ওরা দেখ্‌তে পারে না। তবে যদি আমার কথা বলো সে স্বতন্ত্র; আমি লেখক ব'লে খ্যাতি লাভ করার পর ওদের আপিসে ঢুকেছি।

সত্যদাস শঙ্কাকুল হতাশ নিরুপায় দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

রামযাদু বল্‌তে লাগলো—কিন্তু আমি ভেবে চিন্তে একটা উপায় স্থির করেছি······

সত্যদাসের মুখ আবার আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রামযাদু বল্‌তে লাগলো—তুমি একটা ছদ্মনাম নিলেই তো চুকে যায়। শেষে সেই ছদ্মনামেই লেখকের খ্যাতি জড়িয়ে যায়। জর্জ্ ইলিয়ট, মার্ক্ টোয়েন, জর্জ স্যাণ্ড্ তাঁদের ছদ্মনামেই প্রসিদ্ধ। বাংলাতেও সুরেশ্বর শর্ম্মা, বীরেশ্বর গোস্বামী এক সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন, কিন্তু ঐ দুটিই ছদ্মনাম। বীরবল তো স্বনামপ্রসিদ্ধ। এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুও কমলাকান্ত আর রাম শর্ম্মা নাম নিয়ে লিখে ছদ্মনাম দুটিকেও অমর ক'রে রেখে গেছেন। তাই আমি বলি কি, তুমি বঙ্কিম বাবুর ছদ্মনাম রাম শর্ম্মা নামেই বই ছাপো, কাগজে লেখো। বঙ্কিম বাবুর ঐ ছদ্মনামটির কথা বেশী লোকে জানে না, অথচ অমর বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমার সাহিত্যক্ষেত্রে বিজয়-অভিযান হবে। কি বলো?

সত্যদাস বঙ্কিম-চন্দ্রের অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ লাভের সৌভাগ্যে ও আনন্দে কৃতার্থ হয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে সে খুব ভালো হবে।

সত্যদাস মনে মনে ভাবলে পরম ভাগ্যবলে সে রামযাদুর ন্যায় একজন পরমহিতৈষী বন্ধু মুরুব্বি পেয়ে গেছে। তার মন ভক্তিতে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় গদ্গদ হয়ে উঠলো।

এই ব্যবস্থা অনুসারে সত্যদাসের কবিতার বই ছাপা হলো; তার পরিচয়-পত্রে ছাপা হলো শ্রী রাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শিক্‌দার বাগান লেন হইতে প্রকাশিত; এবং ভূমিকায় লেখা হলো, এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত রামযাদু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমার পরমস্নেহভাজন বন্ধু শ্রীমান্ সত্যদাস দত্ত আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার জন্য আমি উভয়ের নিকটেই বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইতি শ্রী রাম শর্ম্মা শিকদার-বাগান লেন, কলিকাতা, শ্যামাপূজা কার্ত্তিক ১৩—।

এই ভূমিকা দেখে সত্যদাস খুব কৌতুক অনুভব কর্‌লে, যে রামযাদু-বাবু বেশ কৌশল ক'রে তার নামটাও বইয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তার মুখের ভাব দেখে চতুর রামযাদু তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে বল্‌লে—তোমার নামটাও এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম, রাম শর্ম্মা যে কে, তা লোকে শীঘ্রই সনাক্ত কর্‌তে পার্‌বে।

সত্যদাসের কৃতজ্ঞতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়ে রামযাদুর প্রতি অন্ধ ভক্তিতে পরিণত হতে চল্‌লো।

কিন্তু লোকে রাম শর্ম্মা নামটিকে রামযাদুরই নাম-সংক্ষেপ ব'লেই সহজেই বুঝে নিলে। রামযাদু ব্রাহ্মণ, সুতরাং রাম শর্ম্মা সে তো বটেই; তার উপর আবার সেই

প্রকাশক, রাম শর্ম্মা পুস্তকের ভূমিকায় নিজের যে ঠিকানা দিয়েছে তা রামযাদুরই বাড়ীর ঠিকানা; অতএব রামযাদুই যে রাম শর্ম্মা এ সম্বন্ধে কারও একটুও সন্দেহ রইলো না।

খবরের কাগজে পুস্তকের প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগলো। এক কাগজে লিখ্‌লে—এই রাম শর্ম্মা যে কে তা বুঝ্‌তে কোনো পাঠকেরই একটুও কষ্ট হবে না; লেখক যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন সেটি যেনো মাকড়সার জালের পর্দ্দার আড়ালে জালি কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা। অন্য এক কাগজে লিখ্‌লে—যিনি অকস্মাৎ পুরাতত্ত্বের গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত ক'রেছিলেন, তিনিই আবার অকস্মাৎ কবি রূপে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিভা সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন স্বতন্ত্র কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব বঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্যই সূচনা কর্‌ছে। এই কবিতাগুলি অক্ষম শিক্ষানবিসের প্রথম উদ্যম নয়, এ একেবারে পাকা হাতের লেখা; ছন্দ অনবদ্য, ভাষা ললিত মার্জ্জিত, ভাব পাণ্ডিত্যলব্ধ গভীর ও নূতন। এতো বিচিত্র গুণের একত্র সমাবেশ খুব অল্প রচনাতেই দেখা যায়। কবি একটি নূতন বাণী, নিজস্ব মেসেজ্‌ শোনাতে আবির্ভূত হয়েছেন।

রামযাদু দাঁত বা'র ক'রে হাস্‌তে হাসতে সত্যদাসকে বল্‌লে—খবরের কাগজওয়ালারা কী মূর্খ! তারা মনে কর্‌ছে এ বইখানাও আমারই লেখা! যেনো বাংলা দেশে ভালো রচনা আমি ছাড়া আর কেউ কর্‌তে পারে না। তা এতে তোমার ভালোই হলো; আমার লেখা মনে ক'রে সকলেই খুব প্রশংসা কর্‌ছে, সহজেই তোমার যশ প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌লে। এর পরে যা লিখ্‌বে তাই সমাদর লাভ কর্‌বে।

সত্যদাস আনন্দোৎফুল্ল লজ্জিত মুখ নত ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

পরাণ-বাবুর বাড়ীতে রামযাদু যাওয়া মাত্রই পরাণ-বাবু এক ঘর লোকের সাম্‌নে ব'লে উঠেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি এতো উঁচু দরের কবি তা তো আমরা জান্‌তাম না!

একজন উমেদার ব'লে উঠ্‌লো—কোনো কোনো বিষয়ে ইনি রবি-ঠাকুরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

অপর একজন বল্‌লে—রামযাদু-বাবু হচ্ছেন বিস্ময় মূর্ত্তিমান্‌! ইতিহাস লিখে তাক্‌ লাগিয়ে দিলেন; লোকে বিস্ময়ভাব সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে আর এক বিস্ময় এসে উপস্থিত! এর পরে আবার যদি অঙ্কশাস্ত্রে নূতন কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেন তাতেও আর আশ্চর্য্য হবার কিছু থাক্‌বে না!

রামযাদু হাসিভরা মুখে বিনয় মাখিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ আমি আর এমন কি লিখ্‌তে পেরেছি! গবেষণার পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ককে একটু অন্যমনস্ক কর্‌বার জন্য মাঝে মাঝে যে কবিতা রচনা ক'রে থাকি তারই গোটা কয়েক এক জায়গায় ক'রে বা'র করেছি।

—এবার আপনাকে আমরা আর দীর্ঘকাল নীরব হয়ে থাক্‌তে দিচ্ছি নে। আপনাকে মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় কবিতা দিতে হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আর আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা থাক্‌বে না। সম্পাদকেরা বাড়ীতে চড়াও হয়ে আদায় ক'রে নিয়ে যাবে!

রামযাদুর মুখ কৃতার্থতার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো।

বাস্তবিক পরাণ-বাবুর কথাই সত্য হলো। রামযাদু সম্পাদকদের লিখিত ও বাচনিক তাগাদায় উদ্বাস্ত হয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম হলো। এবং সে সত্যদাসের নূতন নূতন কবিতা তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের নাম-ঠিকানা ছাপা কাগজে চিঠি লিখে সেই চিঠির সঙ্গে বিভিন্ন কাগজে পাঠাতে লাগলো। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠ্‌লো যে রামযাদুই রাম শর্ম্মা, এবং রামযাদুর সম্মুখে এই কথা উত্থাপিত হ'লে সে প্রতিবাদ তো করেই না, বরং এমন ভাব দেখায় যে সে যে কথা লুকাতে চেয়েছিলো সেটা বড়োই স্পষ্ট রকমে ধরা প'ড়ে গেছে।

*

* *

রামযাদুর সাহিত্যসাধনার কৃতিত্ব যতো সুখ্যাতি অর্জ্জন কর্‌তে লাগলো, ততোই রামযাদুর কাছে নবীন ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারপ্রার্থী বহু সাহিত্যিক নিজেদের রচনা যাচাই কর্‌বার জন্য, রচনা কোনো সম্পাদকের নিকট সুপারিশ ক'রে দেবার জন্য, রচনার পরিচয় স্বরূপ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে আসা-

যাওয়া করতে লাগলো। রামযাদুর বাড়ী সাহিত্যসেবীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠলো; কবি ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সমালোচক সকল প্রকারের সাহিত্যিক সকাল বিকাল রামযাদুর বৈঠকখানায় সমবেত হয়ে সাহিত্যের সকল বিভাগের আলোচনা করে, রামযাদুর অভিমত উৎসুক হয়ে শোনে। রামযাদুর কাছে যে-সব সাহিত্যযশপ্রার্থী নিজেদের রচনা দেখতে দিয়ে যায়, রামযাদু সেইগুলি প'ড়ে তার মধ্যে কোনো নূতন ভাব, সুন্দর আখ্যান বা নূতন তত্ত্ব পেলে সেগুলিকে লিখে রাখে এবং সেইগুলি সত্যদাসকে ব'লে কবিতায় বা নিজে গদ্যে লিখে নিজের নামে চটপট প্রকাশ করে।

একদিন একজন প্রৌঢ় বয়সের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামবাবুর কাছে এসে বিনীতভাবে বললে—আমি তেরো বৎসর নিরন্তর অনুসন্ধান ক'রে প্রাচীন বঙ্গের রীতিনীতি সম্বন্ধে এই বইখানি লিখেছি; ইতিহাস সাহিত্য ছড়া ব্রতকথা রূপকথা কিম্বদন্তী এ পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু লিখিত সংগৃহীত হয়েছে তা তো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছি, আবার নিজেও জেলায় জেলায় ঘুরে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করেছি। আমার অল্প কয়েক ঘর শিষ্য আছে; মাঝে মাঝে আমাকে বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়; কাজেই আমার অনেক সুযোগ জুটেছে। বইখানি অনেক দিন থেকে লিখে রেখেছি কিন্তু অর্থাভাবে ছাপাতে পারি নি। কোনো পুস্তক প্রকাশকই এই বই পয়সা খরচ ক'রে ছাপতে চায় না, বলে—উপন্যাস ছাড়া বাঙালী পাঠকপাঠিকারা আর কিছু পড়ে না। এখন আপনি যদি একটু সুপারিশ ক'রে ব'লে দেন তা হলে আমার এতো দিনের পরিশ্রম সার্থক হয় আর আমি আপনার কাছে চিরক্রীত হয়ে থাকি।

রামযাদু ব্রাহ্মণের সকল কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে তার খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলো যে পুস্তকখানিতে কি আছে ও তার মূল্যই বা কি। সমস্ত কথা ব'লে ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হয়ে রামযাদুর অভিমত জানবার জন্য রামযাদুর মুখের দিকে উৎসুক আশান্বিত অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালো।

রামযাদু ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হতে দেখে খাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়ের নাম?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবনমালী বিদ্যাবাগীশ, আমরা মুখোপাধ্যায়।

—আপনার নিবাস?

—এই ঝাঁপড়দা মাকড়দা।

রামযাদু বিদ্যাবাগীশের পুস্তকের হস্তলিপির পাতা পাল্টাতে পাল্টাতে বললে—আমি ঠিক এমনি একখানি বই লিখে ছাপতে দিয়েছি। ছাপা প্রায় হয়ে এসেছে, আর দিন দশ পনেরোর মধ্যে বই বাজারে বেরিয়ে যাবে। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে খাতা রেখে যেতে পারেন, আমি একবার প'ড়ে দেখবো; যদি কিছু নতুন বিবরণ থাকে তবে নিশ্চয় সুপারিশ ক'রে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ আনন্দিত হয়ে বললে—তেরো বৎসরের কঠিন পরিশ্রম যে বিষয়ে করেছি, তাতে কিছু হয়তো নূতন তত্ত্ব থাকতে পারে।

রামযাদু পরম গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মতন মুখ ক'রে বললে—হ্যাঁ, দেখছি তো, আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন। নিশ্চয় আপনার কিছু নূতনত্ব আছেই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে আপনার এই বই প্রকাশিত হয়। কোনো প্রকাশক প্রকাশের ভার না নিতে চাইলে আমি নিজে খরচ দিয়ে ছাপিয়ে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ খুশী হয়ে বললে - ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ! তাতে আবার আমরা সাহিত্যের একই ক্ষেত্রের সমকর্ম্মী। আপনার সহৃদয় সাহায্য যে পাবোই তা আমি জানতাম।

রামযাদু বললে—আপনি দিন পনেরো পরে আসবেন, আমি এর মধ্যে প'ড়ে রাখবো। আমার হাতে এতো কাজ যে অবকাশ পাই না; একটু বিলম্ব হবে; ক্ষমা করবেন।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুর সৌজন্যে ও বিনয়ে তুষ্ট হয়ে বললে—যে বই প্রকাশের জন্য তেরো বৎসর অপেক্ষা ক'রে আছি তার কাছে পনেরো দিন তো কিছুই নয়। তবে আপনার শেষ অভিমত জানবার আগ্রহে আমার কাছে এক পক্ষ এক কল্পের তুল্যই দীর্ঘ মনে হবে। আচ্ছা, আজ তবে আসি, আপনার বহুমূল্য সময়ের আর অপব্যয় করবো না।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলো।

রামযাদু তৎক্ষণাৎ খাতার উপরের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে, সেখানে বনমালী বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা ছিলো। তার পর একবার খাতার আদ্যোপান্ত তাড়াতাড়ি উল্টে দেখে নিলে আর কোথাও বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা আছে কি না। যখন দেখলে যে আর কোথাও নেই, তখন সে

চারজন লোক ভাড়া ক'রে নিয়ে এলো এবং তাদের বল্লে—এই বইখানা আমি তেরো বচ্ছর পরিশ্রম করে উপাদান সংগ্রহের পর লিখে শেষ করেছি। এখন ছাপ্তে দোবো। প্রেসে যদি কপি হারিয়ে ফেলে তবেই সর্ব্বনাশ! একটা নকল ক'রে দিতে হবে। খাতাখানা চার পাঁচ ভাগ ক'রে চার পাঁচ জনে নকল কর্লেই চট্ ক'রে হয়ে যাবে।

এই ব'লে রামযাদু খাতাখানা ছ খণ্ড ক'রে ফেললে এবং ভাড়া-করা চারজন লেখক, সত্যদাস ও নিজে মিলে এক দিনেই বইখানা নকল ক'রে নিলে। তার পর দপ্তরীকে দিয়ে খাতাখানা বাঁধিয়ে আবার সম্পূর্ণ ক'রে রেখে দিলে।

রামযাদু কুড়িটা প্রেসে পুস্তকের কুড়িটা পরিচ্ছেদ ভাগ করে ছাপ্তে দিলে। এবং প্রেসের নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দ্বিগুণ দিয়ে ১০ দিনেই বই ছেপে দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে বাহির ক'রে ফেল্লে এবং বিদ্যাবাগীশের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্লো।

পনেরো দিন পরে বিদ্যাবাগীশ ফিরে এলে রামযাদু বল্লে—আমার বইএর সঙ্গে আপনার বইয়ের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখ্লাম না। কাজেই আমি দুঃখিত হচ্ছি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পার্‌ছি না। এই আমার বই বেরিয়েছে। একখানা আপনি নিয়ে যান। আপনার খাতাখানা আমার ছেলে ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমি বাঁধিয়ে দিয়েছি; কিছু মনে করবেন না।

বিদ্যাবাগীশ ক্ষুণ্ণমনে চলে গেলো, এবং সে কৌতূহলী হয়ে রামযাদুর বই পড়্তে আরম্ভ ক'রে দেখ্লে রামযাদুর বই হুবহু তার খাতার নকল এবং রামযাদুর বইয়ে পত্রাঙ্ক নেই।

খবরের কাগজে রামযাদুর নূতন বইয়ের যশ বিঘোষিত হতে লাগ্লো।

রামযাদু কয়েক দিন পরে খবর পেলে যে সেই বনমালী বিদ্যাবাগীশ পাগল হয়ে গেছে। এতে রামযাদুর আনন্দটা একটু বিষাদে ও ভয়ে দ'মে গেলো। (ক্রমশঃ)

কার্ত্তিকের মা

শ্রীমানকুমারী বসু

১

দিদি!—
এই যে এল দুর্গাপূজা গোপালের মা দিদি!
কই এল মোর সোণার কাতু দীন আঁচলের নিধি;
সারা বছর রইচি চেয়ে,
আস্‌বে বাছা সুযোগ পেয়ে,
জুড়িয়ে দেবে "মা মা" বোলে মায়ের দগ্ধ হৃদি,
কই এল মোর সোণার কাতু, বল্ গো তোরা দিদি।

২

বাবা আমার ঘর করেছে সহর মাঝে গিয়ে,
অভাগিনী রইছি হেথা গাঁয়ের ভিটা নিয়ে;
এই ভিটাতে শ্বশুর গেল.
শাশুড়ী মা বিদায় হ'ল,
সেও ঘুমালে—মা বাপ দিলেন যাহার হাতে দিয়ে।
ছোট্টো মেয়ে সোণার "ফুলী"
পোড়্লো হেথায় ঘুমে ঢুলি,
হেথায় আছি অভাগিনী সে-সব স্মৃতি নিয়ে,
এই ভিটাতে সব ব্যথা যে আছে জড়াইয়ে।

৩

বিষয়-আশয় বেচে দিলাম বাছার পড়ার তরে,
বাছা আমার সহর থেকে এম্-এ পাশ তো করে!
খুঁজলেন তিনি কাতুর তরে
হাকিম উকীল সবার ঘরে,
মনের মত একটী মেয়ে, বৌ আনিবেন ঘরে,
খুঁজে খুজে ফাগুন মাসে,
মা লক্ষ্মী-টি এল বাসে,

সোণার বরণ চাঁদের মতন নয়ন জুড়াল রে!
যার সে বধূ এল হায়,
পোড়্‌লো সে যে বিছানায়,
ঘুচ্‌লো আমার সীঁথির সিঁদুর সেই নিদারুণ জ্বরে,
মায়ে পোয়ে কেঁদে মরি দু'টি চরণ ধ'রে!

৪

এখন আমার অবোধ কাতু কিছুই বোঝে না
বলে "পাড়া গাঁয়ে বোয়ের ভাল-ই লাগে না"
তাই দিদি! সহরে গিয়ে,
আছে সে বৌমা-কে নিয়ে,
সাত-পুরুষের ভিটায় হেথা পিদীম জ্বলে না।—
দেখ্‌ বাগানে সাজ্‌ছে তারি
আম জাম কাঁঠালের সারি,
তাল সুপারি তেঁতুল গাছ—ফিরে দেখে না!
পুকুরে তার কাতলা রুয়ে,
খেল্‌ছে জলে মুখটী থুয়ে,
আমার কাতু একটী-বারও দেখ্‌তে আসে না!
সে যে আমার অবোধ ছেলে কিছুই বোঝে না!

৫

এই যে সাধের দুর্গাপূজা—কতই বছর আগে
কোর্‌তো বাছা ছুটোছুটি মনের অনুরাগে!
সাজা'ত মা'য় ডাকের সাজে,
বোধনতলায় বাজ্‌না বাজে,
পাড়ার ছেলে আস্‌তো ছুটে সেই আনন্দ-যাগে;
মিলে কাতু সবার সাথে
কলা বউ-কে আনতো মাথে,
মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত কি রাগে!—
বিলাইত মুড়্‌কী চিঁড়ে নাড়ু সবার আগে!

৬

পূজাও এল জ্বরও এল গোপালের মা দিদি!
বাবার তরে উঠ্‌ছে কেঁদে তাই এ পোড়া হৃদি!—
তখন আমার এম্‌নি জ্বরে
থাক্‌তো বসে কপাল ধ'রে,
মাথায় দিত জলের পটি—আমার মাণিক নিধি!—
"মা! মা!" বলে আকুল স্বরে
ডাক্‌তো পড়ি মুখের 'পরে,
জুড়িয়ে যেত রোগের জ্বালা, বুঝ্‌বি কি তা' দিদি?—
আজ্‌কে যদি যাই বা ম'রে,
তার সোণামুখ নয়ন ভ'রে,
দেখ্‌বো না যে জনম মত—ওরে নিঠুর বিধি!
এম্‌নি করে গোড়্‌লে কেন মায়ের পোড়া হৃদি!

হাফ্‌লঙ্গ

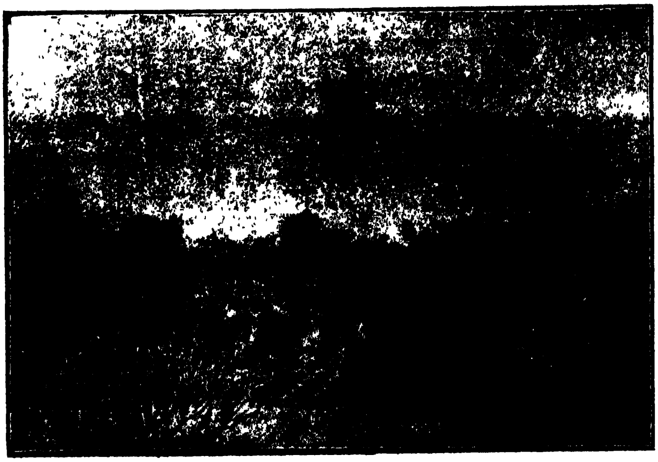
অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কা'ার সন্ধানে দূরে যাও

এ কথা কয়টি অনেক সময়েই জীবনে যথার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। আমরা অনেক সময় কাছের জিনিষ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দূরের সন্ধানে ঘুরিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি। আমি এ সত্যটিকে এবার বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। অবকাশের সময় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগের জন্য চিত্তের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আসে। বিগত বৎসর ছুটির সময়টা কোথায় কাটাইয়া আসি, তাহা লইয়া একটা মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং, মুশৌরী, শিলং, পুরী, রাচি, কাশী—সে ত অনেকেই যান; আর সে নাম কয়টা ত সকলেরই জপমালা! প্রাণ নূতনের সন্ধানে ব্যাকুল হইল। সাত বৎসর আগে একবার আসাম বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম। সেইবার ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভাসিয়া, আসামের ছোট-বড় এমন সহর ছিল না—ইস্তকনাগাদ ডিব্রুগড়-সদিয়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। কয়েকখানা রেলওয়ে গাইড্‌ পড়িয়া পড়িয়া মনে হইল—ভাল কথা, সেবার এক যানে আসাম ঘুরিয়াছি; এইবার আবার ভিন্ন যানে যাত্রা

সুরু করিলে ত মন্দ হয় না! কিন্তু একটা লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে ত? হঠাৎ চক্ষু পড়িল হাফ্‌লঙ্গের দিকে। রেলওয়ে গাইডে পড়িলাম—২৪০০ ফিট্ উপরে উত্তর-কাছাড়ের বারাইল পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে হাফ্‌লঙ্গ অবস্থিত। দুই একজন বন্ধুবান্ধব বলিলেন, স্থানটি বেশ ভাল। দেখিতে সুন্দর; আর পাহাড়ের শোভা—সে না কি অনির্ব্বচনীয়। ব্যস্—আর ত দেরী করা চলে না! একদিন রাত্রির গাড়ীতে আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় Hill-section ধরিয়া হাফলঙ্গ যাইবার জন্য ঢাকা ছাড়িলাম। গ্রীষ্মকাল, সেদিন আবার আকাশ মেঘে ঢাকিয়াছিল। গাড়ীর ভিতর অসহ্য গরম বোধ হইতেছিল। শুক্লা ত্রয়োদশী নিশি হইলেও 'ঢালে শশধর রাতিধারা'—সে ধারায় শীতল হইবার সৌভাগ্য একেবারেই হয় নাই। ভোরের বেলা ভৈরববাজার পৌঁছিয়া, সেখানে এক বন্ধুর বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্নে হাফ্‌লঙ্গের দিকে রওনা হইলাম। পথে আখাউড়াতে গাড়ী বদল করিয়া আসাম মেলে উঠিলাম। আজ আকাশ পরিষ্কার—দুইদিকে ত্রিপুরা রাজার রাজ্য—দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আম কাঁঠালের বন আর ক্রমশঃ চা-বাগানের পর চা-বাগান দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ইংরাজ কোম্পানীর বাগানগুলির আকাশস্পর্শী চিম্‌নীর পাশে দেশী চা বাগানের দু'একটী চিম্‌নী দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইতেছিল—"উঠ্‌বো মোরা উঠ্‌বো মোরা বিধির আদেশ-বাণী"—আমরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে, শ্রম-শিল্পে পেছনে পড়িয়া থাকিব না—উঠিবই—তবে ধীরে ধীরে।

বদরপুর জংসন বড় ষ্টেসন। এখান হইতে নানা দিকে লাইন চলিয়াছে। এখানে বহু পরিচিত প্রিয়জনের মুখ দেখিলাম। তাঁহারা বলিলেন, হাফ্‌লঙ্গ—সে ত আর কয়েক ঘণ্টার রাস্তা মাত্র—দু'একদিন থাকুন না। থাকিয়াই গেলাম। লাগিলও বেশ। বদরপুরের দৃশ্য সুন্দর। ছোট্ট সহরটি; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; সুন্দর পথঘাট। নানাদেশীয় লোক এখানে রেলের নানা বিভাগে কাজকর্ম্ম করে। হৈ চৈ দিন-রাত লাগিয়াই আছে। সেকালের শ্যামের বাঁশরী গোপিনীর হৃদয়ে ব্যাকুলতা জন্মাইত—উন্মাদিনী হইয়া তাহারা যমুনার নীল সলিলে অবগাহন করিতে চলিত; একালে রেলের বংশীধ্বনি যখন ষ্টেসন-কুঞ্জবনে বাজিয়া আহ্বান করে, তখন ভ্রমণ-ব্যাকুল তরুণ-তরুণী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; ত্রস্তে ব্যস্তে আপনাদিগকে সাম্‌লাইয়া ছুটিয়া চলে পাছে কুল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে হয়! আমি বদরপুরে চার পাঁচ দিন ছিলাম। নবপরিচিত বন্ধুদের সহ ষ্টেসনে আসিতাম; কত দেশের কত লোক আসিতেছে যাইতেছে; কত পরিচিত বন্ধুজনের মুখ দেখিতাম! তারপর বাসায় ফিরিয়া জানালার পাশে বসিয়া দেখিতাম, পাহাড়ের নীল শোভা। নীলের তরঙ্গ-লীলা। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি—কোথায় কোন্ দূর দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। কবি যে গাহিয়াছেন To me high mountains are a feeling' ইহার মধ্যে এতটুকু অসত্য নাই। এ বাণী সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।



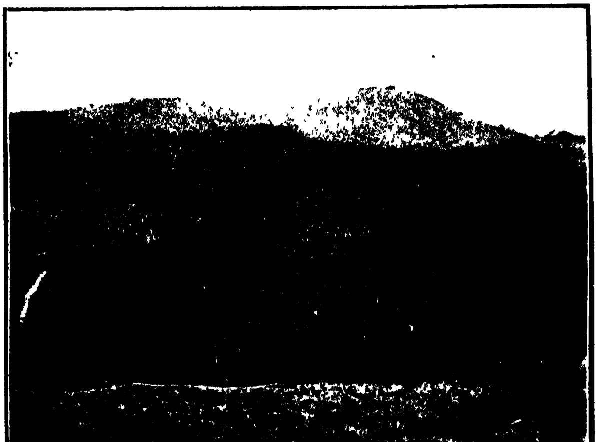
হাফলঙ্গের পথে

বদরপুর ছোট নগর হইলেও এখানকার বাঙ্গালীর প্রাণ আছে। প্রাণের পরিচয় দলাদলিতে নাই,—আছে ক্লাবে, আছে লাইব্রেরীতে, আছে থিয়েটারের অভিনয়ে,—বালিকা-বিদ্যালয়, বালক-বিদ্যালয় ও সর্ব্ববিধ খেলাধূলার মধ্যে।

এ পথে যদি কেহ কখনও কোথাও বেড়াইতে যান, তাহা হইলে বদরপুরের প্রাণ ডাক্তার সুবিনয়প্রসাদ দত্ত গুপ্তের সন্ধান লইবেন,—কোন বিপদে পড়িবেন না। সেই দীর্ঘদেহ

গৌরকান্তি প্রৌঢ়, যষ্টিহস্তে ষ্টেসনের গেটেই গাড়ীর সময় দাঁড়াইয়া থাকেন। যে কোন দিক্‌ দিয়াই তাঁহার সাহায্য চান,—পাইবেন; তাই এই পথিক-বন্ধুটির নাম বলিয়া দিলাম।

একদিন বেলা নয়টায় পাহাড়ের পথে হাফ্‌লঙ্গের দিকে রওনা হইলাম। সৌভাগ্য আমার, আজ নবঘননীল মেঘমালা আকাশ ঢাকিয়া নাই। বাঁশী বাজিল, গাড়ী চলিল। বদরপুর ঘাট ছাড়িয়া বরাক নদীর পুল পার হইলাম। বরাক নদী শিলচরের দিক্‌ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কি তার তীব্রস্রোত-বেগ! পাহাড়িয়া নদী যে কেমন করিয়া পাষাণ-বন্ধন টুটিয়া ছুটিয়া চলিতে পারে—এখান হইতেই তাহা বেশ বোঝা যায়। শিলচরে নিয়মিত ভাবে



হাফলঙ্গ হইতে দূরবর্ত্তী পাহাড়ের দৃশ্য

ষ্টীমার চলাচল করে। বদরপুর হইতে বন্ধুগণ একটা তারের খবর সেখানকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ সেন মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন; কাজেই মনে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না,—যাত্রাটা বেশ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ মনে হইতেছিল।

বদরপুর হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দুই দিকে ঘনবিন্যস্ত বন আর দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ ও মাঝে মাঝে জলাভূমি চক্ষে পড়িতেছিল। চাষবাস তেমন নাই। এ-সব মাঠে বড় বড় বুনো ঘাস রাজত্ব করিতেছে। এই বন ধ্বংস করিয়া চাষবাস করা,—বিশেষ বাঘ-ভালুকের রাজ্যে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাজ করা বড় সোজা কথা নয়। শুনিলাম অনেকেই সুযোগ মত জমি সংগ্রহ করিয়াছেন, অল্প-বিস্তর চাষবাসও আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু সেদিক্‌ দিয়া সাফল্য লাভ করা সময়-সাপেক্ষ। তবে যাঁহারা এখন কাজে হাত দিয়াছেন, একদিন যে তাঁহারা সোণা ফলাইবেন, তাহা বলিতে পারি। চা-বাগান পথের দুইদিকেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। দূরের পাহাড় ক্রমশঃ কাছে আসিয়া লজ্জায় নীচু হইয়া মাথা অবনত করিতেছে—এইভাবে তাহারা ক্রমশঃ ক্রমন্নোত শ্রেণীকে পথ ছাড়িয়া দিয়া দূরে অদৃশ্য হইতেছে। বিহারা (Bihara) ষ্টেসন পার হইবার পর hill-section রীতিমত আরম্ভ হইল। সমতল-ভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া এইবার আমরা স্বর্গের উঁচু সিঁড়ি ধরিলাম। একখানি এঞ্জিন কোন্‌ ষ্টেসনে আসিয়া যে আমাদের পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিল, সে কথা আমার স্মরণ নাই।

হিল-সেক্‌সান্‌টি পৃথিবীর মধ্যে একটা দর্শনীয় বস্তু বলিয়া নানা দেশবিদেশের যাত্রী এই পথে ইচ্ছা করিয়া শিলং যান। হিল সেক্‌সনের প্রথম জরিপ হয় ১৮৮২—১৮৮৭ খ্রী: অ:। ১৮৯৪ খ্রী: অ: প্রথমতঃ কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০৪ খ্রী: অ: প্রথম যাত্রী-গাড়ী এই পথে চলাচল করিয়াছিল। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতবর্ষের ভাইসরয় ছিলেন, তখন ১৯০৪ খ্রী: অ: ১৪ই ফেব্রুয়ারী এই লাইন খোলা হয় এবং গাড়ী-চলাচল সুরু হয়। এই লাইন তৈয়ারী করিতে যে কিরূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে, প্রাণহানি ঘটিয়াছে, এবং এঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইয়াছে, তাহা, যাঁহারা এ পথে কোন দিন আসেন নাই, তাঁহারা চক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এখন আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। দুইদিকে কেন—চারিদিক ঘিরিয়াই পাহাড় চলিয়াছে। দুই দিকে পাহাড়—পাহাড়ের মধ্য দিয়া রেলের লাইন চলিয়াছে। Tropical forest বলিতে যাহা বুঝা যায়, এ পথে আসিলে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। কত জাতীয় গাছ যে এ-সকল পাহাড়ের গায়ে শোভা পাইতেছে, তাহা বলিয়া বোঝান চলে না। পাহাড়ের গায়ে বাঁশ বন,—দূর হইতে মনে হয় যে, শ্যামল দূর্ব্বাদল,—কাছে আসিলেই সেই ভুলটা দূর হয়। পথে যাইবার সময় দক্ষিণ দিকে এবং ফিরিবার সময় বাম দিকে অসংখ্য ঝরণা ও নদী দেখিতে পাওয়া যায়। উঁচু পাহাড়ের

গা হইতে নামিয়া কেমন বেগে আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহারা নীচের দিকে বহিয়া চলিয়াছে। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দ, শিলারাশিতে আপতিত হইয়া তাহারা উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে নীচে পাহাড়িয়াদের দু'একখানা গ্রাম, শস্য পরিপূর্ণ মাঠ ও মহিষের দল মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ আসিতেছে যাইতেছে,—কোনটি বড় কোনটি ছোট। ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইলে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দে বিস্মিত হইতে হয়। কবির কথা মনে পড়ে—"ঝিল্লী মুখরিত বন পরিপূরিত, কলয়তি জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।" এখানে জাহ্নবী না হইলেও যটিঙ্গা প্রভৃতি পাহাড়িয়া নদীর কলধ্বনি শ্রবণ-বিবরে আসিয়া ধ্বনিত হয়!

দূরে উঁচু পাহাড়ের গায়ে খানিকটা যায়গা পরিষ্কার দেখিয়া গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐখানটার ঐরূপ কেন? বলিতে ভুলিয়াছি, একজন মুসলমান ভদ্রলোক আজ এ গাড়ীর গার্ড ছিলেন, আমাকে নানারূপে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। এঞ্জিনের বয়লার হইতে গরমজল লইয়া প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসনেই চা-তৈরী করিয়া খাওয়াইয়া পাহাড়ের উচ্চতা, বিশেষত্ব এ সব আমাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। গার্ড বলিলেন যে, ও- সব যায়গায় নাগা, কুকিরা জুম করিয়াছে;—মানে পাহাড়িয়া নাগা, কুকি, খাশিয়ারা পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার কতকটা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একসঙ্গেই ধান, ভুট্টা, আরও কয়েকটি শস্যের বীজ বপন করিয়া ফসল উৎপাদন করে। মাটির অত্যধিক উর্ব্বরশক্তির গুণে ফসলও প্রচুর ফলে। তার পর হয় ত বা এক বৎসর বা দু'বৎসর সেখানে বাস করে; আবার কোন উঁচু পাহাড়ে চলিয়া যায়। এই ভাবেই তাহারা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া জীবন কাটায়।

দিগোক্‌চেরা ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইলে দেখিলাম, খুব একটা উঁচু পাহাড়ের দিকে একটা সরু পায়ে-চলার পথ চলিয়া গিয়াছে। একজন সহযাত্রী—তিনি লামডিংএ থাকেন—এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখেন, বলিলেন—ঐ উঁচু পাহাড়ের উপর নেংটা কুজিরা বাস করে। তারা বড় ভীষণ প্রকৃতির। মাঝে মাঝে নীচে নামিয়া আসে—তবে পাহাড় ছাড়িয়া তাহারা কোথাও বড় একটা যায় না। অনেকে তাহাদের আবাস স্থানে যাইয়া নাকি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। এ পাহাড়ের পথটি দেখিলাম বড়ই দুর্গম। দুইদিকে ঘনবিন্যস্ত গগনস্পর্শী শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত তরুশ্রেণী, বাঁশ বন, বুনো ঘাস, কন্টকগুল্ম ও বেতসীকুঞ্জ দলবদ্ধ হইয়া উপরের দিকে চলিয়াছে। এখানে নানা জাতীয় পাখীর কূজনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

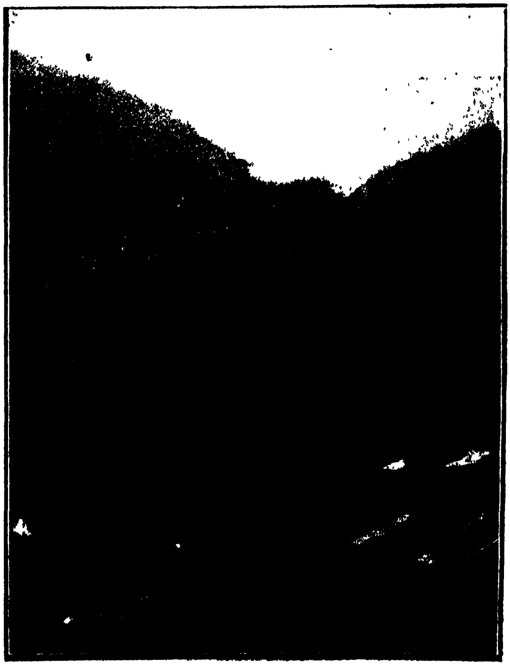
দূরে উঁচু পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘ জড়াইয়া আছে। এই আবার অদৃশ্য হইতেছে। এমনি ভাবে মেঘে মেঘে লুকোচুরী ও পাহাড়ের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় হাফলঙ্গ হিল্-ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ছোট ষ্টেশনটি। মাত্র মিনিট পাঁচেক গাড়ী দাঁড়ায়। সদাশয় গার্ড সাহেব বলিলেন—আপনি জিনিষপত্র লইয়া নিশ্চিন্ত মনে নামুন। Hill-sectionএ গাড়ী বড় সময় মানিয়া চলিতে



হাফলঙ্গ—লাভার্স লিপ্

পারে না,—আমার সুবিধা মত গাড়ী ছাড়িতে পারি; কারণ, পথে কখন কি বাধা আসিয়া পড়ে ঠিক থাকে না ত। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। নামিয়াই ডাক্তার সত্য বাবুর প্রেরিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানে স্ত্রীলোকেরা কুলির কাজ করে। তাহারা অবলীলাক্রমে ত্বরিত পদে মাথায় মোট লইয়া পাহাড়ের পথে ছুটিয়া চলে। হাফলঙ্গ হিল্ ষ্টেসন হইতে হাফলঙ্গ টাউন্ প্রায় দুই মাইল। বদরপুরে দুপুর বেলা বেশ গ্রীষ্ম বোধ হইয়াছিল, আর এখানে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল যেন আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের শীত। পাহাড়ের গা কাটিয়া পথ

তৈয়ারী হইয়াছে। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই মনে হইতেছে, এই দেশটি একেবারেই পাহাড়ের দেশ। পাহাড়ের সারি ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে হাফলঙ টাউনে আসিয়া পৌঁছিলাম। উচ্চ শৃঙ্গের উপর সবুজ সুন্দর সমতল ভূমি। এ-পাহাড়ে ও-পাহাড়ে দুই একটী সুন্দর বাংলো। বাড়ী ঘরের তেমন প্রাচুর্য্য নাই। আশে পাশে কমলার বাগান। বেলা দেড়টায় ডাক্তার সত্য বাবুর বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। সত্যবাবু সুদর্শন তরুণ যুবক। অতি সমাদরের



মহাদেও পাহাড়—হাফলঙ

সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। হাফলঙ হিলের শোভা এমন ভাবেই আমাকে প্রথম দর্শনে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, আমি এখানে পৌঁছিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। সত্য বাবু যেরূপ ভাবে অভিনন্দিত করিলেন এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই তাঁহার অতিথি হইবার লোভ হইবে।

স্নান আহারের পর সত্য বাবুর বাংলোর বারান্দায় বসিয়া বসিয়া পাহাড়ের শোভা দেখিতে লাগিলাম। বাংলোটি খুবই বড়। সম্মুখে সুন্দর বাগান। ডালিয়া ফুটিয়া লাল গোখে চাহিয়া আছে। কমলার গাছে ছোট ছোট কমলা হইয়াছে। বনাক গাছ সার বাঁধিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। বাংলোর সম্মুখের সমতল ভূমিতে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ—বাঙ্গালী রেল-কর্ম্মচারীদের ক্লাব। এখানে রেলের একটি হাসপাতাল আছে—সত্যবাবু তারই ডাক্তার। রেলের এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের আফিস আছে—পোষ্ট আফিস, ফরেষ্ট আফিস, সাবডিভিসনাল অফিসারের কাছারী—ইহাই হইতেছে হাফলঙের একমাত্র নাগরিক সমৃদ্ধি। সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ ছাব্বিশ জন বাঙ্গালী মাত্র এখানে বাস করেন।

সন্ধ্যার পর সমতল ভূমিতে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া সেদিনকার সন্ধ্যাটি আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম। সত্যবাবু, একজন নবাগত অতিথির আমদানি হইয়াছে—এ কথাটা বন্ধুগণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন; তাই সকলেই তাঁহাদের একঘেয়ে কর্ম্মজীবনের মধ্যে একজন অপরিচিত বন্ধুর সহিত আলাপে তৃপ্তি পাইবেন বলিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি; আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া বেশ আরামে গল্প করিয়া, নানা কথার আলোচনা করিয়া সময়টা বেশ কাটিল। কেহ এখানকার পূর্ব্বের ইতিহাস বলিলেন—কি ভীষণ বন ছিল এখানে। বাঘ ভালুক বিচরণ করিত। কেহ শিকারের কথা তুলিলেন। কেহ এখানকার নির্জ্জন কারাবাসে যে হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন, সে কথা বলিলেন। এখানেও ছোট-খাট ক্লাব আছে, লাইব্রেরী আছে; ইঁহারা থিয়েটারও করেন। আমি বলিলাম,—অভিনয় ত করেন, কিন্তু দর্শক মিলে কোথায়? উত্তর হইল—যত সব কুলি মজুরের দল, আর আমাদের মেয়েরা। এ বেশ ভাল কথা। একঘেয়ে কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে এমন ভাবে আনন্দের ধারা টানিয়া আনার মধ্যেও অনেকটা হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

হাফ্‌লঙ কাছার জেলায় একটী মহকুমা। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুমার সৃষ্টি। হিল সেক্‌সান তৈরী হইবার সময়েই হাফ্‌লঙের দিকে সাহেবদের দৃষ্টি পড়ে। তদবধি অতি অল্প দিনের মধ্যে এই সহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে।—পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া ছায়ায় ঢাকা পাখীর গানে মুখরিত বন্য-কুসুম-সুবাসিত পথে বেড়াইতে বেড়াইতে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মিশনারী হিল (Missionry Hill), লাভার্স লীপ (Lovers' Leap), আরও কয়েকটী শৃঙ্গ হইতে চারিদিকের দৃশ্য ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়। রাবি এবং দয়াজ নদী হাফ্‌লঙের নিম্নবর্ত্তী ঘনবনশ্রেণী-বেষ্টিত

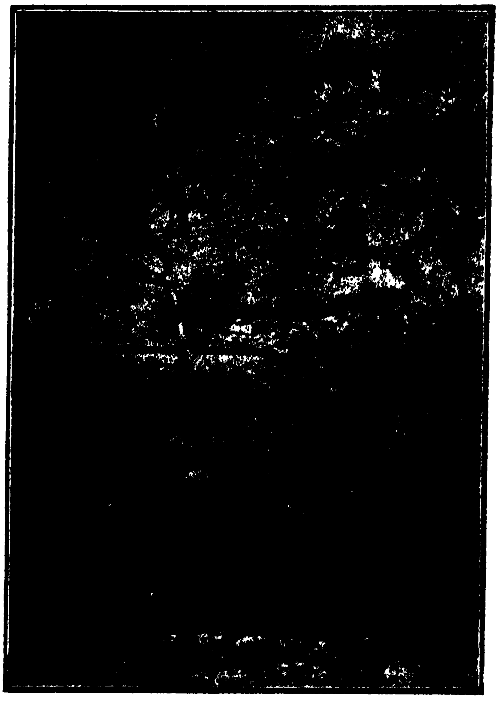
উপত্যকার অন্তরাল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। লাভার্স পিকে বসিয়া অপরাহ্নটা উপভোগ করিলে দেহে ও মনে নবীন উৎসাহের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে। বরাইল পর্ব্বতশ্রেণীর শেষ ভাগে মহাদেও শৃঙ্গটি আপনার মাথা মেঘের উপর দিয়া গৌরবের সহিত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাহাড়টির উচ্চতা ৬০০০ ফিট। সর্ব্বদাই ইহার চূড়ার নিম্ন ভাগে সঞ্চরমান মেঘের নৃত্য-লীলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সারকিট্ হাউস হইতে অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় দেখিতে বড়ই মনোরম। আমাকে আমার নবপরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত-ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অতি প্রত্যূষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তখনও সূর্য্য উঠে নাই, আকাশে ঊষার পিঙ্গল দীপ্তি মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আঁকা বাঁকা পথে বনাক্ তরুর ছায়ায় ছায়ায় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সারকিট্ হাউসের বারান্দায় যাইয়া বসিলাম। আমার চোখের সম্মুখে এক রূপের যবনিকা খুলিয়া গেল। এমন সুন্দর শোভা খুব কমই দেখিয়াছি। নিম্নে—বহু নিম্নে প্রায় পাঁচশত ফিট নীচে—বহুদূর-বিস্তৃত অধিত্যকা প্রদেশ চলিয়াছে,—দুই দিকে পাহাড় দেয়ালের মত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে,—মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে,—পাহাড়ের পিছু পাহাড় চলিয়াছে,—বনের পর বন চলিয়াছে। সোণার মেঘে আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠিল—চারিদিক হাসিল। মহাদেও পাহাড়ের নীল উচ্চ চূড়ায় আলো ঝলমল্ করিতে লাগিল। কবির কথা আজ আমার নিকট জীবন্ত ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিল। মনে পড়িল—

'সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনক-কিরণ-জ্বালা।'

ধীরেন্ বাবু বলিলেন যে, যাঁহারাই হাফ্লঙ্গ বেড়াইতে আসিয়াছেন—তাঁহাদেরই চক্ষে সার্কিট হাউসের নিকট হইতে এই উন্মুক্ত মহিমময় দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইয়াছে।

চার দিন আমি এখানে ছিলাম। কি আনন্দে ও উৎসাহে পাহাড়ের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে দিনগুলি যে কাটিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। এখানে একটি ছোট বাজার আছে; সেখানেও মাড়োয়ারী বণিক্ রাজত্ব করিতেছেন। একটী দেব-মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা মিলিয়া ছোট ছোট মেয়েদের জন্য একটী প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গভর্মেণ্টের একটী Agricultural farmও এখানে অছে। সেখানে একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কমলায়ে চাষ চলিতেছে; ভুট্টা জন্মিয়াছে। ফার্ম্মের কর্ম্মচারী যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন! হাফ্লঙ্গ টাউন হইতে অনেকটা নীচে নামিয়া যাইতে হয়। অতি সুন্দর, অতি নির্জ্জন। সে পথে কত সুন্দর বন-ফুল, কত



হাফলঙ্গ হ্রদের একটী দিক

অর্কিড্; কত পাখীর গানই না শুনিয়াছিলাম। আশে পাশে পাহাড়ে নাগা, কুকি, কালো খাসিয়া, গারো, মিকিরি—এ-সব নানা জাতীয় পাহাড়িয়ারা বাস করে। নাগাদের একটা পল্লী হাফলঙ্গ হইতেই দেখা যায়; অন্ততঃ তাহাদের বড় নাচঘরটা ত চোখে পড়িল। পাহাড়িয়ারা প্রায়ই 'কানি' অর্থাৎ আফিং-এর নেশায় মস্গুল। আজকাল ইহারা খ্রীষ্টান হইতেছে। পাহাড়ের এ-সকল পার্ব্বত্য জাতিদের প্রতি হিন্দু সমাজ ও

ব্রাহ্ম সমাজের একটা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করি। হাফ্‌লঙ্গ চা-কর সাহেবদের গ্রীষ্মাবাস। এখানে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে জমি বিলি করা হয় না। আমরা এমন করিয়াই 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'। রেলওয়ে গাইডের কথা—Haflong is rapidly becoming popular as a sanitarium amongst the planting Community of the Assam and Surma Valleys." অক্ষরে অক্ষরে সত্য। চা-কর সাহেবরা অনেক বাংলো তৈয়ারী করিয়াছেন। কাছারের ডেপুটি কমিশনার—বাঙ্গালী, আসামী—এক-কথায় কোন ভারতবাসীর নিকট জমি বিলি করেন না। কতক জমি রেল কোম্পানীর, কতক গভর্মেণ্টের খাস। অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জমিসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না।

শিলংএ যেমন ওয়ার্ড লেক্ আছে, এখানেও তেমনি একটী কৃত্রিম হ্রদ অধিত্যকার নিম্ন ভাগ বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। দূর পাহাড়ের নির্ম্মল নির্ঝর-ধারা পাইপে করিয়া আনিয়া এখানে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ইয়োরোপীয়ানদের ক্লাব, হোটেল, রোমান্ ক্যাথলিকদের গীর্জ্জা, প্রোটেষ্টাণ্ট গীর্জ্জা, ওয়েলস্ মিশনারীদের স্কুল, গীর্জ্জা, কন্‌ভেণ্ট সবই আছে! ইয়োরোপীয় ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ও আছে। সাহেবরা প্রায়শঃ জটিঙ্গা নদীতে মৎস্য শিকার করিতে এবং দয়াঙ্গি ও কপিলা নদীর তীরে তীরে বন-জঙ্গলে শিকার করিতে যান্।

এখানে খাদ্য দ্রব্য ভাল মিলে না। সমতল ভূমি হইতে আনাইতে হয়। ঘৃতটা খুব ভাল মিলে। শাক্‌সব্জি তরি-তরকারিও পাওয়া যায়; তবে মৎস্য ইত্যাদি বড় পাওয়া যায় না। রেলের কৃপায় জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে তেমন বেগ পাইতে হয় না। স্থানটি অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। যদি কেহ এখানে বেড়াইতে যান, তাহা হইলে স্থানীয় এক্‌জি-কিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার আফিসের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি থাকিবার ও অন্যান্য সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালীরা ত অনা-য়াসে ক্লাব হাউসে থাকিতে পারেন। ভ্রমণ ও অধ্যয়ন সবই চলিতে পারে। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নাই।

এখানে আসিয়া চারি দিকের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া মনে হইতেছিল—যাহারা প্রিয়জন তাহারা ত সঙ্গে কেহই নাই—নেহাৎ স্বার্থপরের মত আসি-য়াছি। শুনিলাম, এ স্থানের শোভা ও সৌন্দর্য্যের কথা জানিয়া কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ এখানে আসিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এখানে আসিলে হাফ্‌লঙ্গের নাম হয় ত বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কবিতার মূর্ত্তিতে অমর হইয়া থাকিত! বাঙ্গালী আমরা পরের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলি—আসামে এমন অনেক সুন্দর পাহাড় আছে, যেখানে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা দ্বারা একটী স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া উঠিতে পারে; কিন্তু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি কোথায়? যাঁহারা অনেক সময় বেড়াইতে ভালবাসেন, তাঁহারা একবার হাফলঙ্গ বেড়াইতে আসিলে মুগ্ধ হইবেন, এ কথা আমি বলিতে পারি। এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত ফোটোগ্রাফ-গুলি শ্রীমান্ প্রবোধলাল ধর ভৌমিক বি এ তুলিয়া দিয়া-ছিলেন। যে দিন হাফলঙ্গ ছাড়িলাম, সে দিন সত্যবাবু, ধীরেনবাবু প্রভৃতি বন্ধুগণের সদয় ব্যবহারের কথা স্মরণ হইয়া হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে"

শ্রীরাধারাণী দত্ত

"ঝুপ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্"—অশ্রান্ত-ধারা অঝোরে ঝরে চলেচে। অপূর্ব্ব রহস্যময় এই আঁধার-ঘন নিবিড় শ্রাবণ-সন্ধ্যা! মূকের প্রাণের ভাষা আজ যেন মুখর হ'য়ে উঠেচে! মৌনের নীরব বাণী আজ যেন নিঃশব্দে ব্যক্ত হ'তে চাইচে!

"ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্—" আকাশ-বীণা উদার-তারে কোন্ জলতরঙ্গ যন্ত্রের মধুর নিক্কণ ঝঙ্কৃত করে চলেচে!—কে গো অদৃশ্য গুণী! মেঘের মৃদঙ্গে মূর্চ্ছনায় দ নিপুণ তাল দিয়ে চলেছো!

মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে দীপ্ত বিদ্যুতের বিচিত্র লেখা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে এই বর্ষণ-অলস আসরে উঁকি মেরে যেন তীব্র উপহাসের হাসি হেসে চলে যাচ্চে—

চুপ করে শুয়ে আছি ঘরের ভিতর। বিছানার পাশের জানালার বন্ধ শার্সিগুলোর ভেতর দিয়ে আঁধার-ঘন বর্ষণ-সিক্ত বাইরেটার কিছুই দেখা যাচ্ছে না! শুধু আবছা-আবছা চোখে পড়ছে প্রাঙ্গণের পেঁপেগাছগুলো বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে ঘন পাতার গোল ছাতাটি মাথায় খুলে এক-পেয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজচে।

বিদ্যুতের চকিত আলোয় জানালার বাইরের আগাছা ও কাঁটা-জঙ্গলে ভরা কবেকার জীর্ণ ফুল-বাগানের খানিকটা অংশ—আর আঁকা-বাঁকা রাস্তার ওপারে শস্যক্ষেত্রের দিগন্ত-বিশ্রান্ত সবুজ আঁচলখানি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে!…

…চুপ করে চেয়ে থাকতেই ভালো লাগে শুধু। মনে হ'চ্চে ম্লান মেদুর শ্রাবণ-আকাশ অনন্তকাল ধরে' আমার কাণে তার ধারাযন্ত্রের এই স্নিগ্ধ মধুর করুণ-রাগিণী বাজিয়ে চলুক,—বৃষ্টি সিক্ত পুবে-হাওয়া অন্ধকারে পথ হারিয়ে অস্ফুট অজানা ভাষায় তার গোপন-হিয়ার ব্যথা-প্রচ্ছন্ন আকুল দীর্ঘশ্বাস নিয়ে এই পথ দিয়েই গুমরে গুমরে চলে যাক্—আঁধার মেঘপুঞ্জের গভীর গুর গুর রব নিখিলের নিবিড়-বেদনা জাগ্রত ক'রে তুলুক—

এই অপূর্ব্ব আনন্দ-বেদনার মাঝখানে এই মিলন ও বিরহের যুগপৎ-লীলা-সমন্বয়ের উৎসব-অঙ্গনে আমার চিরবন্দী আঁখিতারা আজ নির্নিমেষ হ'য়ে থাক্! চির-তৃষিত শ্রবণদ্বয় মেলে দিয়ে মর্ম্মের অনুভূতি-পুটে অঞ্জলি ভরে সবটুকু রস সঞ্চয় করে নিই! যদি ডুবে যাই, যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ক্ষতি কি? সেই হারানোই তো নিজেকে নূতন ক'রে পাওয়া!!

—দিদি, অ' দিদি—

—থাম্—ডাকিস্‌নে, ঘুমিয়েচে বোধ হয়—

—বাতিটা কমিয়ে দেব কি?

—হ্যাঁ। গায়ের বালাপোষটা ভাল করে' টেনে দে। ঠাণ্ডা লাগবে।—আস্তে—ঘুম না ভাঙ্গে—

—ডাক্তার আজ কী বলে' গেলেন মা?

—কী আর বল্‌বে—রোজ যা' বলে তাই—

—ওর বেঁচেই বা কি হবে মা? বরং—

—ওরে! চুপ্—চুপ্,—ও'কথা আমার কাছে বলিস্‌নে তোরা! ও যে আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন,—আমার প্রথম সন্তান!

—ও যদি বেঁচে থেকে এই ভীষণ দুঃখভরা অপমানিত জীবন বহন করে, তাতেও কি তুমি শান্তি পাবে মা?

—ওরে! সংসারে যে সকলেই স্বার্থপর!—'রেণু'র মুখেই যে আমি প্রথম 'মা' ডাক শুনেচি। 'মা' হওয়ার সুখ, 'মা' হওয়ার আনন্দ 'রেণু'ই প্রথম আমায় দিয়েচে। ওর চলে যাওয়া তো আমি সইতে পারবো না বেণু!

—হ্যাঁ মা! সমীর বাবুকে এই অবস্থা জানিয়েছো কি?

—চুপ্ কর্ মা! যদি জেগে থাকে শুনতে পাবে। দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আয়, ও ঘুমুক একটু।

আঃ—মাগো—আমার মুখে 'মা'-ডাক শোনার সাধ এখনও তোমার মেটেনি? আমারও যে 'মা'-বলার সাধ মেটেনি মা! তাই তো আমি জানি—আমি কোথাও যাবোনা, কোথাও হারাবোনা—তোমার বুকের ভেতরে স্থির হ'য়ে জেগে থাকবো—বেণু'র গলার ভেতর দিয়ে বার বার তোমায় 'মা' বলে' ডাকবো! আমি তোমায় আরও গভীর করে' ঘিরে থাকবো,—এর পরে তখন হয় ত বুঝতে পারবে!

পৃথিবীটা কি সত্যই দুঃখে ভরা? সত্যিই কি সে অসুন্দর? না—না—তা' নয়গো তা' নয়—তা হলে এই ধারা-মুখর গভীর রস-ঘন শ্রাবণসন্ধ্যা আঁধার-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে এমন সৌন্দর্য্য-শতদল মেলে ধরলো কী করে' আমার মর্ম্ম-মুকুরে?……

সবার চেয়ে গভীর-বাণীর প্রকাশ কি মৌনতায়? যে কথা বুকের, সে কি মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলে?

…সব চেয়ে যে কালো, সেই হয় তো সব চেয়ে সুন্দর? …হ্যাঁ তাই তো—ঠিক তাই। দুঃখই যে সব চেয়ে বড় সুখ,—এ কথা তো আজ আমায় স্বীকার ক'রতেই হবে। নিবিড় দুঃখের ভিতরে নিবিড়তম সুখ! অঝোর-কান্নায় অশেষতর তৃপ্তি!

'—আমার যাবার বেলার পিছু ডাকে' এই কাঁচা-মাটীর নশ্বর বুকের নব-নব শোভা, এই বিচিত্র প্রকৃতির নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য, এরা এ কি নূতন স্বর্গলোকের স্বপ্ন-দুয়ার আমা

চোখের সামনে উন্মুক্ত করে' দিলে আজ!........ ওগো! ওদের পানে তাকিয়ে কিছুতেই যে স্বীকার ক'রতে ইচ্ছে হচ্চেনা—এ পৃথিবী নিরানন্দ, এখানে অসুন্দর আছে—অকরুণা আছে—

—কে বলে গো মানুষে'র প্রেম নেই? প্রেম নইলে কি মানুষ বেঁচে থাকতে পারতো?···

আমাকে আমার সমীর আর ভালোবাসে না, এ কি কথনও সত্য হ'তে পারে!··· এরা শুধু একটা ভ্রান্তি, একটা মিথ্যাকে সত্যে'র ছদ্মবেশ পরাতে চাইচে!

যে সমীর চিরদিন চিরকাল আমায় ভালবেসে এসেচে,—যার ভালবাসা দিনের আলোর মত সত্য, হাওয়ার মতো সহজ, সাবলীল, সে ভালবাসা 'আর নেই' বল্লেই অমনি তা বিশ্বাস করবো? ·····ঐ সবুজ-মাঠের ওপারে ঘন-শালবন-শ্রেণী, দূরের ঐ ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—আমার জানালার বাইরের ঐ কাঁটা-ঝোপের জঙ্গলগুলো—ওরাও মাত্র এই ক'দিনেই আমায় ভালোবেসেচে। ওদের নীরব ভালবাসার মৌন ভাষা, ওদের অলক্ষ্য আঁখির গভীর দৃষ্টি আমি সব সময়ে অনুভব ক'রচি! ওরা যদি আমায় মনে মনে ভালো না বাসতো—তা' হলে আমার বুকে ওদের প্রতি এত স্নেহরস, এত প্রীতিধারা জেগে উঠতোনা······সমীর রেণুকে আর ভালবাসে না—এ কথা পৃথিবী-শুদ্ধ লোক বললেও আমি সত্য বলে মানতে পারবোনা—সমীর নিজে বল্লেও নয়—যে পর্য্যন্ত না আমার মন আমায় সে কথা শোনাবে!· কৈ? আজও তো আমার মন দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হ'য়ে অস্বীকারই করছে—এ বাণী মিথ্যা—মিথ্যা—ভ্রান্তি!—তবে কেন আমি অন্যের কথা বিশ্বাস করবো?

সমীরের মধ্যে আমি সুন্দরকে দেখতে পেয়েচি, তাই সমীরকে ভালোবেসেচি। সমীর আমার ভালবাসা ভুলেচে, আর আমায় সে চায়না—এটা একেবারেই মিথ্যা—এবং সেই প্রকাণ্ড মিথ্যাটাকে দিয়েই সমীর আজ নিজেকে শুধু প্রতারিত করছে মাত্র।

সবাই বলে সমাজে অত্যন্ত নিন্দা উঠেচে এতদিনের বাগ্‌দত্তা ভাবী-বধূকে সমীর বিয়ে ক'রবেনা বলায়। আমার নাকি সহজে আর অন্য কোনও ভাল জায়গায় বিবাহ হবেনা!

······মা আমার সেই দুঃখেই চোখের জলে অন্ধ হ'চ্ছেন! বেণুর মুখে আষাঢ়ের কালো-ছায়া।

আমার খালি হাসি পায়! অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ায় সম্ভাবনা থাকলেও কি আমি আবার অন্য একজনকে বিয়ে ক'রতুম?··· · বিবাহটা কি? কতকগুলো মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, লোক সাক্ষী করে একটা শুধু সামাজিক বন্ধন? অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ এঁরা সাক্ষী হ'লেই মানুষের সত্যিকারের অন্তরের বন্ধন কি সম্ভবপর হ'য়ে উঠে? না—এইটেই সত্যিকারের সবচেয়ে বড়?...···বিবাহের মন্ত্রের মূল অর্থ হিসাবেই যদি বিবাহকে স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে তো আমরা বহুদিন পূর্ব্বেই বিবাহিত হ'য়েছি! প্রেমই যদি বিবাহের প্রধান বন্ধন ও মূল প্রতিষ্ঠা হয়, সে বাঁধন তো আমার আজও অক্ষয় হ'য়ে রয়েচে!...

মনে মনে যাকে প্রতিনিয়ত কামনা করা যায়, অহরহ চিত্তের মধ্যে নিবিড়ভাবে যার সান্নিধ্য অনুভব করা যায়, যার স্পর্শ, সঙ্গ, প্রেম, কল্পনায় প্রাণ পাত্র পূর্ণ করে রেখে দেয়, তাকে বাহিরে না দেখা, না ছোঁওয়া, না মেশাটাই কি তা হলে মানুষকে বিশুদ্ধ করে রাখতে পারে?···মন্ত্রোচ্চারণ হয়নি বলেই আমি কুমারী?···সমাজ এতবড় মিথ্যাকে যদি মেনে নিতে চায়—নিক! নিয়ে সে উচ্ছন্নয় যাক্!—কিন্তু আমি তার সঙ্গে সায় দিতে পারবোনা!...

যদি বেঁচে উঠি, আমার কোনও দুঃখ নেই, যদি না'ও বেঁচে উঠি তাতেও দুঃখ নেই। সমীরের ভালোবাসা হারিয়েচি বলে নয়—পেয়েচি বলেই! আমি যে তাকে ভালোবেসেচি—সেই তো আমার পাওয়া, সেই ত আমার পরিণয়!

'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে—
তাই, রব উঠেছে ভুবনে!
নইলে, ফুলে কিসের রং লেগেছে
গগনে কোন্ গান জেগেছে
কোন্ পরিমল পবনে—'

সমীর আমার সামনে আসতে চায়না, লজ্জা পায়, কুণ্ঠিত হয়। আমার এই রোগ-শীর্ণ কু-রূপ তার দৃষ্টিকে পীড়িত করে,—এই সংক্রামক ব্যাধি তাকে ভীত করে' তোলে!...... তাকে বাবা আসতে লিখেছিলেন, কিন্তু সে আসেনি!

তার উপরে আমার একটুও রাগ হয় না, বা ঘৃণা হয় না,—বরং তার জন্যে দুঃখই হয় বেশী! যদি কেউ পথ ভুলে ভ্রান্ত পথে চলে, সেই অভাগা পথিকের উপরে কি কেউ রাগ ক'রতে পারে? তার জন্য মনে বেদনাই জাগে!…… যখন সে নিজের ভুল বুঝবে,—তখন কি তা'র সেই ভুলে-চলে-যাওয়া সুদীর্ঘ পথটি চিনে সে আবার নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে পারবে? তার সময় তার সুযোগ আর কি জীবনে মিলবে তার?

সবাই বলে, সে তার গানের ছাত্রী লীলার রূপে মুগ্ধ হয়েচে! আমার জন্য আছে তার শুধু লজ্জা বেদনা কুণ্ঠা! কিন্তু আমি যে আমার আপন-প্রেমের উজ্জল-বাতি নিয়ে, আমার ভালবাসার আলোয় তার অন্তরের সবটুকুই তন্ন তন্ন করে' দেখতে পেয়েচি! ……তার মর্ম্মের কোনও স্থানটুকুই তো আমার অজানা নেই!……ক্ষণিক রূপের তৃষ্ণা—দেহের মোহ,—সে কি প্রেম হ'তে পারে?……

ওগো আমার প্রিয়! আমি হাসিমুখে তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্চি;—কিন্তু তোমার মুক্তি কোথায়? তোমার অন্তরের প্রেম একদিন যার পানে চেয়ে সর্ব্বপ্রথম আঁখি মেলেছিল, একদিন যার স্পর্শে তার মুদিত দলগুলি প্রথম বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল—তাকেই যে তোমার অতৃপ্ত মন জন্ম-জন্মান্তরে যুগে যুগে চিরদিন সন্ধান ক'রে ঘুরবে! কত লীলার মাঝেই সে প্রতি জীবনেই তার হারানো রেণুকে খুঁজে ফিরবে!

তুমি যাকেই বিবাহ করোনা কেন, কিছু আসে যায় না—তাদেরই মাঝে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে পেতে চাইবে একমাত্র তোমার এই রেণুকেই,—এ আমি বেশ জানি।

কিন্তু—ওগো পথ-ভোলা! প্রেম যে বড় সঙ্গোপনের ধন, বড় যতনের সামগ্রী! তাকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে নেই, বাইরের আলোয় সবার দৃষ্টির সামনে ধরে ম্লান ক'রতে নেই! মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে' একান্তে তার আরাধনা ক'রলে, তবেই সে তার আপন আলোয় তোমার জীবনের ভিতর-বাহির আলোকিত করে তুলবে;—সেই আলোর জ্যোতিতে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য তোমার চোখে ফুটে উঠবে!—আর প্রেমকে যদি তোমার মলিন করের কলুষ স্পর্শে চূর্ণ করে ধূলায় ছড়িয়ে ফেলো,—তা'হলে না জানি কত যুগ-যুগান্ত তোমাকে প্রেমহীন ব্যর্থ জীবন বয়ে' বেড়াতে হবে,—তার চেয়ে কঠিনতর শাস্তি, তার চেয়ে শোচনীয় দৈন্য, তার চেয়ে ভীষণতম রিক্ততা বুঝি আর কিছুতেই নেই! মৃত্যুর চেয়েও নির্ম্মম মরণে ভরা সেই প্রেমহীন জীবন!

—হ্যাঁ দিদি—কি ভাবচো?

—কি আর ভাববো ভাই?

—আচ্ছা, ঐ পাহাড় আর শালবনগুলো দেখে দেখে কি তোমার অরুচি হয়না?

—যা' সুন্দর, তাতে কি কখনও অরুচি ধরে বেণু?—

—আমার তো ধরে বাপু!

—তা' হলে নিশ্চয় তুই সুন্দরের সন্ধান পাস্‌নি!

—দিদি, তুমি এ দেশে এসে ভাবুক হয়েচ দেখচি! চেঞ্জের পক্ষে হয়তো দেশটা ভালো হ'তে পারে, কিন্তু ভাই বারোমাস থাকা'র পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

—কেন বল্ দেখি?

—ছাই,—কিচ্ছু পাওয়া যায় না—কিচ্ছু দেখা যায় না—খালি পাহাড় আর শালবন!

—পাহাড় আর শালবন কি দেখবার মতো কিছু নয়?

—ও' তো দু'দিনেই পুরোনো হ'য়ে যায়! আমি এই ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেচি যেন!

—আমার কিন্তু এ দেশ থেকে আর কোথাও ফিরতে ইচ্ছা হয় না। তোরা ফিরে গেলেও আমি থাকবো—চিরকালের মতো!

—দিদি! তুমি কি পাষাণ মেয়ে দিদি!—

—না বোন্—তোরা সকলেই আজ আমায় ভুল বুঝিস্‌নে—

—আমি এই বলে দিচ্চি দেখো—তোমার জীবন যে নিষ্ঠুর এমনি ভাবে নষ্ট করে' দিলে,—তার কখনও ভাল—

—চুপ্—বেণু, চুপ্—

—কেন, চুপ্ ক'রবো কেন?—

—বেণু, এখনও তোর বুঝবার ঢের বাকী। অসহিষ্ণু হ'স্‌নে বোন্—

—অত সহিষ্ণুতা আমার নেই। তোমার অত ক্ষমাশীলতা আমার ভাল লাগে না—

—তোর ভাল না লাগে তুই আমার প্রতি দয়া করে চুপ কর্ ভাই—

—আমার যে দিন-রাত্রি মন পুড়ে যাচ্ছে!

—কেন? তুইও কি তবে সমীরকে ভালবেসেছিলি নাকি?

—ঠাট্টা ভাল লাগেনা দিদি! জীবনে আমি আর পুরুষ জাতকে বিয়ে ক'রবোনা—

—তবে কি মেয়ে-মানুষকে বিয়ে ক'রবি?

—সম্ভব হ'লে ক'রতুম।

—সে কি রে?

—দিদি, তোমার গলা শুখিয়ে গেছে, একটু বেদানার রস দেব?

—দে। মুখ আঁধার করিস্‌নি বেণু! আমার যাবার বেলাটা হাসি দিয়ে উজ্জ্বল করে দে বোন্!—

—দিদি,—হাস্‌বো কি করে ভাই?—

—চুপ! কাঁদিস্‌নে দিদি! তোদের সমীর বাবুর উপরে তোরা অভিমান করিস্‌নে, রাগ করিস্‌নে—সে তোর দিদির চেয়েও দুঃখী, অভাগা—

—রাগ-অভিমান যোগ্য লোকের উপরেই করা চলে, নীচ ক্ষুদ্রর উপরে করা চলে না!

—তুই কেবলি রাগছিস বেণু! হয়তো আমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা একদিন তোরও আস্‌বে,—যে দিন বুঝবি তোদের সমীরবাবু সত্যিই কৃপার পাত্র!

—সে অভিজ্ঞতা আমি চাইনে! কিন্তু আমি অবাক্ হ'চ্ছি, লীলা কি বলে সমীর বাবুকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'ল?

—তার কিছু দোষ নেই!

—না, কারুর দোষ নেই, যত দোষ সব তোমার—

—দোষ না হ'ক্ ত্রুটি আমারই। এটা জেনে রাখিস্ বেণু,—পুরুষ শুধু নারীর অন্তরের প্রেমেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না!—সে রূপ-পিপাসু; তাই রূপও চায়; সে গুণাকাঙ্ক্ষী, তাই গুণও খোঁজে;—কিন্তু নারী প্রেমাস্পদের প্রেমের মাঝেই তার সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু খুঁজে পায়। তার সকল পিপাসা তৃপ্ত হয়, সকল কামনা সার্থক হয়—একমাত্র ভালবাসায়!—যেখানে তার হৃদয় আপনার প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েচে সেইখানে!

—পুরুষ জাতটা বড় ভোগলিপ্সু, কপট—

—তা' নয় বোন্, ওরাও ভালবাসে, ওদেরও প্রেম আপনাকে উৎসর্গ করে' দগ্ধ হয়, কিন্তু সে কেবল রূপের অনলে!

—মেয়েরা তো কেউ অমন হয় না!

—তা'হলে কি আজ তারা 'মা' হ'তে পারতো রে!—হ্যাঁ ভাল কথা বেণু, সমীরকে এইবার আমার জবানী দিয়ে একখানা চিঠি লেখ!

—না, কক্ষনো না—

—হ্যাঁরে, এইবার লেখবার সময় হয়ে এসেচে। আমার জন্য ডাকা নয়, তার জন্যই তাকে ডাকা!

* * * *

খোলা-জানলার ফাঁকটুকু দিয়ে আকাশ, মাঠ, ক্ষেত, পাহাড়, আর মরা-নদীর শাদা বালির রেখাটুকুর পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে তৃষ্ণা আর মিটছে না! প্রাণের গোপন অমৃতরসটুকু আজ ওরাই সোণার কাঠী ছুঁইয়ে জাগিয়ে দিয়েচে যেন!......পারের নৌকায় পা দিয়ে মরণ-পথের যাত্রী আজ জীবন-রস-সুধায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েচে!......

লোহার সরু সরু রেলিং-টানা একটি ছোট জান্‌লা—তার ফ্রেমে আঁটা ফাঁকটুকু ঠিক যেন চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট! ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ছবি নব নব রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেচে!... একখানি ছোট জান্‌লার ফাঁকে এত যে অফুরন্ত রূপলীলা লুকানো থাকতে পারে,—মরণের স্পর্শ না পেলে জীবন কি আমায় এ অভিজ্ঞতা দিতে পেরেছিল?

নিশি-শেষে স্বর্ণরঞ্জিতা উষার প্রথম পাদক্ষেপ হ'তে গোধূলির আবীরমাখা সন্ধ্যার অন্তরাগ,—নিশীথের আঁধার আকাশে নিস্তব্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ, পূর্ণিমা'র উল্লসিত জ্যোৎস্না হাসি, সবই যেন কত বিচিত্র অভিনব বেশে এসে দাঁড়াচ্ছে!—এই একই আকাশ প্রভাতে ঘন-নীল অরুণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে—সন্ধ্যায় সিঁদুর-মাখা রক্ত-রাঙা হ'য়ে উঠেচে,—উষায় শুভ্র-স্ফটিক, দ্বিপ্রহরে দগ্ধ-তাম্রবর্ণ হ'য়ে উঠেচে। কখনও পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আড়ালে সারা আকাশ লুকিয়ে প'ড়ছে—কখনও অশ্রান্ত-ধারা বর্ষণে ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে—কখনও বা জ্যোৎস্না-রাতে হাল্‌কা মেঘশিশুদের সাথে লুকোচুরি খেলচে!

ভোরের বেলা সদ্য-ঘুমভাঙা পাখীর তাজা গলার মিষ্টি কাকলি এই বাতায়নে ভেসে এসে শ্রবণকে বিহ্বল করে' দেয়! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গান আর চাকার আর্ত্তনাদ—

বাইসাইকেলের ক্রিং—ক্রিং—সন্ধ্যাবেলা সাঁওতাল-বধূদের ঝুমুরের সঙ্গে মাদলের আওয়াজ—পথ-চলা পথিকদের গল্পের সাড়া—কচিৎ বা দুর্ব্বোধ্য ভাষার গানের একটা লাইন্।—

দূরে পাহাড়তলীর গ্রাম-সীমানায় মেলা বসেচে! দলে দলে সকল বয়সের পুরুষ ও নারী বিচিত্রবেশে সেজে চলেচে। সামনের সরু রাঙা রাস্তাখানি পার হ'য়ে তারা ঐ পোড়া কালো রংয়ের ছোট পাহাড়টার কোল-ঘেঁষে ধব্‌ধবে শাদা কাঁচা মাটীর রাস্তাটি ধূলোয় ঘোলাটে করে চলে যাচ্চে! পরনে তা'দের হলুদ-ছোপানো শাড়ী, কুসুমী রংয়ের ধুতি,—শাদা রাঙা হল্‌দে রঙের ফুল তাদের খোঁপায় কিম্বা কাণে,—তৈল-নিষিক্ত কালোচুল সযত্নে আঁচড়ানো।

ওদের প্রত্যেকের চলার ভঙ্গী বিভিন্ন, গতির ছন্দ বিচিত্র। দূর হ'তে মাদলের আওয়াজ ওদের পথ-চলা পা' দু'খানাকে নাচের ছন্দে দুলিয়ে দিতে চাইচে!—

বেণু আমায় বলেছিল—'দিদি, তুমি পরপারের পরওয়ানা এত শীগ্‌গির পেয়ে গেছ বলেই আজ এত বড় প্রকাণ্ড আঘাত এমন সহজে অবহেলা করে যেতে পারলে, নইলে পারতে না।'

হয়তো তা সত্যি। জীবন আমাদের শুধু জীবনের উপরকার ভাসা-ভাসা হাল্‌কা ছবিগুলোই দেখিয়ে যায়; মানব-জীবনের অতল গভীর রস, বিশ্ব-প্রকৃতির আনন্দ-বীণার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা,—জগতের গোপন অন্তরের অনবগুণ্ঠিত রূপ, সে শুধু বোধ হয় মরণই আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত করে' দিয়ে যায়! তাই জীবনে যেটা হয়তো প্রকাণ্ড ক্ষতি বলে' মানুষের মনে হয়, মৃত্যুর দুয়ারে পা দিয়ে সেই মস্ত ক্ষতিটাই নিতান্ত সহজ এবং তুচ্ছ হয়ে যায়! আবার—জীবনে যাদের অতি অকিঞ্চিৎকর—নিতান্ত সাধারণ বলেই মনে হ'তো—মরণের বেলাভূমে তারাই অনেকে কত মহত্তর, সুন্দরতর ও বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠে।

—বেণু—বেণু—ঝড়ে আমার জানলার শার্সি ভেঙে গেল—

—যাই দিদি! আঃ সমস্ত বিছানা যে ধুলোয় ভরে' গেল! দেখি,—খড়খড়িটা বন্ধ করে' দিই!

—না না, ওটা একটু খোলা থাক্। ওরা আমায় ডাকচে!—ওরা আজ জানালা ভেঙে আমার ঘরে এসে আমাকে আলিঙ্গন করেচে! এই ধূলো বালির কাঁকর উড়িয়ে আমার গায়ে কে আজ আবীর কুঙ্কুম ছুঁড়ে মারচে।

* * * *

—ঠিক এই জানলাটির পাশে ঐ চৌকীর উপরে পাতা বিছানায় দিদি শুয়ে থাকতো—

—বেণু—বেণু—আমিই বোধ হয় তাকে মারলুম?

—সে আপনাকে ক্ষমা করে গেছে!

—না না, ও'কথা বোলোনা। বলো সে আমায় অভিশাপ দিয়ে গেছে। তার মর্ম্মান্তিক বেদনার অশ্রুজল, তার অন্তরের নিদারুণ যাতনা-বহ্নি আমার চারিদিকে বাড়বানল হ'য়ে ঘিরে থাকুক।

—সে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে' আপনার শুভ কামনাই করে' গেছে সমীরবাবু। না—না ভুল বল্‌চি—সে আবার ক্ষমা ক'রবে কি, সে তো আপনার অপরাধই কিছু দেখতে পায়নি!

—সে আমায় অপরাধী ভাবেনি?

—না।

—কিন্তু সে যে চিরদিন বড় অভিমানিনী ছিল!

—না, তা' নয়। সে আর সে-মানুষ ছিলনা। মরণের বাতায়ন-পথে সে নতুন জগৎ দেখতে পেয়েছিল। তার নয়নে শুধু আনন্দ, শুধু মাধুর্য্য, শুধু সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল!

—আমি কিছু বুঝতে পারছিনি! সত্যিই কি সে আমার নেই?—না না, এ' তুমি বোধ হয় পরিহাস ক'রছো বেণু!—বলো—কোথায় তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখলে?

—ঐ যে নদীর শাদা বালিচর দেখা যাচ্চে—ঐ ছোট পাহাড়টার নীচে মহুয়া গাছগুলোর বাঁ পাশে তার নির্ব্বাণ-পীঠ! সে নিজে ঐ জায়গাটি পছন্দ করে গেছল!

—সত্যিই তবে পালিয়েছে? ক্ষমা চাইবার অবকাশও দিলেনা? একটিবার দেখতে পেলুম না,—একটি কথা শুনতে পেলুম না!—

—যাবা'র আগে সে একটা কথা বলে গেছে সমীরবাবু! বেশ জোর করেই বলে গেছে যে, লীলাকে বিয়ে ক'রলেও আপনি লীলার মধ্যে তাকেই খুঁজবেন শুধু!

—সে ভুল তো আমার ভেঙেছে বেণু—

—দিদিও এ'কথা বলেছিল! কিন্তু আপনার দেরী হ'য়ে গেল যে!

ইন্দ্রজাল

শ্রীআশুতোষ দে এম-এ, বি-এল্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

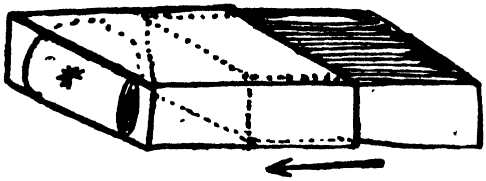
আমি প্রারম্ভেই আভাস দিয়াছি, যে, যদি কেহ আমার নিবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যদ্ভুত, লোমহর্ষক, এবং বিশেষ চমকপ্রদ খেলা আয়ত্ত করিবার আশা রাখেন, তাহা হইলে নিরাশ হইবেন। সামান্য মাসিক প্রবন্ধে তাহা অসম্ভব; এবং সম্ভব হইলেও আমার তাহা উদ্দেশ্য নয়। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য,—সহজসাধ্য উপায়ে মনোরঞ্জন করা। গান গাহিয়া, আবৃত্তি করিয়া, যেরূপ ভাবে কিছুক্ষণের জন্য দর্শক বা শ্রোতাকে মুগ্ধ করা যায়, কয়েকটি ছোট ছোট খেলা দেখাইয়া ঠিক সেই একই ফল পাওয়া যাইতে পারে,—যদি সেগুলি নিপুণতার এবং রসিকতার সহিত সম্পাদন করা যায়। যাঁহারা ম্যাজিক সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে চান, তাঁহারা খোঁজ করিলে অনেক পুস্তকের সন্ধান পাইবেন। তবে বঙ্গভাষায় কোনো ভালো পুস্তক এ সম্বন্ধে আছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চেষ্টা করিবেন যে প্রত্যেক Trickএর সহিত তাহার পরের Trickএর যেন কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকে। অ-প্রস্তুত (Impromptu) Trickএর এইটি প্রধান অঙ্গ। যে বস্তু লইয়া একটি Trick দেখাইলেন, পরের Trickএ সেই বস্তুটিকে কোনো ব্যবহারে লাগাইলে দেখিতে মনোরম হয়। যথা, আমার গত প্রবন্ধে কাগজের ফিতা অথবা ফালির (Robbin) ব্যবহার হইয়াছে। যে কাগজের ফালির ব্যবহার হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরো দুই চারিটি অতিরিক্ত ফালি টেবিলে অথবা চেয়ারে ফেলিয়া রাখিবেন। লম্বায় ২ হাত হইলেই চলিবে। প্রত্যেকটি বিভিন্ন রঙের হইলেই ভালো হয়। এইবার প্রথমে খেলাটির বর্ণনা করিব, এবং তাহার পর তাহার প্রণালী বুঝাইয়া দিব।

একটি ফালি তুলিয়া লইয়া লম্বায় আধা-আধি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। পুনরায় আধা-আধি করিলাম। ফলে আধ হাত লম্বা ৪খানি ফালি হইল। এই সময়ে একবার দুই হাত দেখাইয়া দিলাম, যে, তাহার মধ্যে কিছুই নাই। তার পর, টেবিল হইতে একটি দেশলাইয়ের বাক্স লইয়া একটি কাটি বাহির করিয়া জ্বালাইলাম ; এবং বাম হাতে কাগজের ফালির এক অংশ ধরিয়া অপর প্রান্তে আগুণ লাগাইলাম। ইতস্ততঃ নাড়িবার ফলে সমস্ত কাগজ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। যখন প্রায় মুটির কাছাকাছি আগুণ পৌছিয়াছে, সামান্য এক ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চি কাগজ বাকি আছে, তখন দুই হাতে সমস্ত ভস্ম একত্র করিয়া ঘষিতে লাগিলাম। ঘষিতে ঘষিতে দুই হাত আলাদা করিয়া টানিয়া বাহির করিলাম—একটি সেই একই রঙের ফালি, তবে কাগজের নয়, রেশমের—যাহা দিয়া আজকাল বালিকারা চুলে বাঁধে,—লম্বায় ঠিক্ দুইহাত, চওড়াও ঠিক্ পূর্ব্বেকার মত, এক ইঞ্চি, বা তাহার কিছু কম। এক কথায় কাগজের ফালি পোড়াইয়া ছাই করিয়া তন্মধ্য হইতে রেশমের ফালির আবিষ্কার।

এইবার প্রণালী। অত্যন্ত সহজ উপায়ে এ Trick দেখানো যায়। উপকরণের মধ্যে অদ্ভুত কিছুই নাই,—শুধু একটি দেশালাইয়ের বাক্স, এবং যে কাগজের ফালি ব্যবহার করিবেন, ঠিক সেই রঙের এবং সেই মাপের একটি রেশমের ফালি। আর কিছুই চাই না,—অঙ্গভঙ্গী এবং বাক্যবিন্যাস ছাড়া। প্রথমে রেশমের ফালিটি পাকাইয়া ছোট করিয়া ফেলুন, অর্থাৎ যেরূপভাবে তাহারা দোকানে রাখা থাকে। তার পর দেশলাইয়ের বাক্সটি খুলুন। পুরা খুলিবেন না, ঠিক্ মাঝামাঝি রাখুন। ফলে বাক্সের ঢাকনীটির অর্দ্ধেক খালি রহিল, এবং ডালাটির অর্দ্ধেক বাক্সের বাহিরে রহিল। এই ঢাকনীর খালি জায়গাটিতে পাকানো ফালির Rollটি

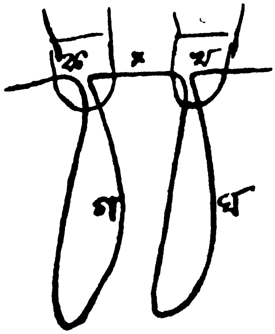
পুরিয়া দিন। এখন বাক্সটি বন্ধ করিলে কি ফল হইবে? ফালির rollটি বাহিরে পড়িয়া যাইবে। এই বাক্স বন্ধ করাই এ Trickএর গূঢ় সঙ্কেত। দুই হাত খালি দেখাইবার পর বাম হাতে বাক্সটি ধরিলাম। হাতের পিঠ দর্শকের দিকে। তাহার পর একটি কাটি বাহির করিয়া লইলাম,—এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটি বন্ধ করিয়া দিলাম। ফলে ফালির rollটি বাম হাতের মধ্যে রহিয়া গেল। ইহাকে



দিয়াশলাইয়ের বাক্স

ইংরাজীতে বলে palming। একটু চেষ্টা করিলেই হাতের চেটোতে এইরূপ ছোট জিনিস লুকানো যায়। হাতটি সহজ ভাবে রাখিলে হাতের মধ্যভাগে একটি খাঁজ পড়িয়া থাকে। টাকা, রুমাল, ডিম, ইত্যাদি জিনিস এই খাঁজে লুকানো থাকে। টাকা, ডিম ইত্যাদির তুলনায় এই ফালির roll রাখা অনেক সহজ। তাহার কারণ এই যে, ফালিটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ হাতেই ছিন্ন কাগজের ফালিগুলি তুলিয়া লইলাম। ফলে হাত সঙ্কুচিত করিতে হইল এবং ঐ সঙ্গে রেশমের ফালি ঢাকিয়া রাখিবারও সুবিধা হইল। হাতের পিঠ বরাবর দর্শকের দিকে। অবশ্য ফালিগুলি তুলিবার পূর্ব্বে দেশলাইটি জ্বালিয়া লইতে হইবে। ইহাতে একটা বিশেষ সুবিধা হয় এই যে, দর্শকের চিত্তও হঠাৎ আগুন জ্বালাতে একটু চমকিত হইয়া যায়, এবং সন্দেহজনক স্থানে নজর পড়ে না। বাম হাতে কাগজের ফালিগুলির এক প্রান্ত ধরাইয়া ডান হাতে দেশালাই ধরান। বাকিটুকু অতি সহজ। যখন প্রায় সমস্ত কাগজ ভস্মীভূত হইয়া আসিবে, সেই সময়ে দুই হাত একত্র করিয়া ঘষিতে আরম্ভ করুন। ভাব দেখাইতে হইবে, যেন ভস্ম হইতে রেশমের ফালির পুনরাবির্ভাব হইতেছে। বাহির করিবার সময়ে হঠাৎ সজোরে টান দিবেন। ইংরাজীতে ইহাকে Flourish বলে। ইহাতে ফল বড় ভালো হয়। আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করার চেয়ে হঠাৎ একটানে সমস্ত ফালিটা খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে বেশী সুন্দর হয়। সমস্ত Trickটিতে ১॥ মিনিট অথবা ২ মিনিটের বেশী সময় লাগা উচিত নয়,—কথাবার্ত্তা, হাস্য-পরিহাস সমেত।

এইবার এই রেশমের ফালি লইয়া অন্য খেলা দেখান। ফালি আধাআধি কাটিয়া পুনরায় জোড়া লাগানো—এই খেলার মর্ম্ম। প্রথমে ফালিটি দর্শকের হাতে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লউন। সঙ্গে সঙ্গে দু-একটি সময়োচিত রঙ্গরস করিতে থাকুন। তার পর সেটি ফেরত লইয়া বাম হাতে এক প্রান্ত ধরিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ধীরে ধীরে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘষিতে থাকুন। একবার সমস্ত ফালিটি এইরূপে ঘষিয়া পুনরায় আবার ঐরূপ করুন—অত্যন্ত আলগাভাবে, অন্যমনস্কভাবে।—এইরূপ করিতে করিতে একজন দর্শককে কাঁচিটি তুলিয়া লইতে বলুন। এবং সেই সঙ্গে ফালিটিকে নিম্নে অঙ্কিত উপায়ে ধরিয়া থাকুন—



ফালি ধারণ

ক স্থানে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী, এবং খ স্থানে বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী এইভাবে টিপিয়া ধরিতে হইবে। × চিহ্নিত স্থানটি ফালির মধ্যস্থল। এইস্থানে যদি বাস্তবিক ছিন্ন করা যায়,—এবং দর্শকেরা তাহাই মনে করিবেন—তাহা হইলে ফালিটি সত্যই দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হইবে না। কাটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটু কৌশল করিতে হইবে।

বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ক চিহ্নিত স্থান হইতে ফালির গ অংশটুকু ছাড়িয়া দিন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঘ অংশের উপরিভাগটি ঐ দুই অঙ্গুলী দিয়া টিপিয়া ধরুন। এক মুহূর্ত্তে সমাধা করিতে হইবে। ডান-

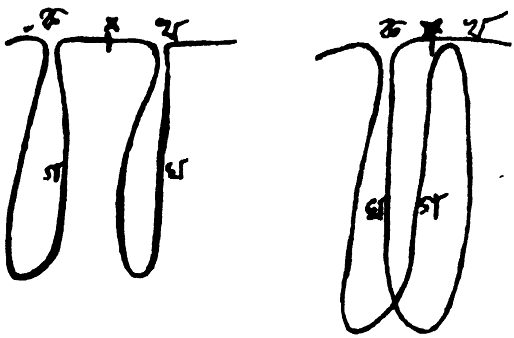


বন ফুল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

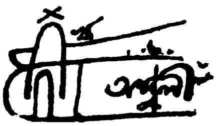
হাতে কিছুই করিতে হইবে না, যেমন খ চিহ্নিত স্থানে টিপিয়া ধরিয়া ছিলেন, ঠিক্ সেইরূপই ধরিয়া থাকুন। ঠিক্



ফালি কাটা

ঐ খ স্থানের নীচে হইতেই ঘ অংশটি বাম হাতের দুই অঙ্গুলী দ্বারা ধরিতে হইবে। ফলে উপরের ছবিটির আকার হইবে। দর্শক ভাবিবেন ঠিক্ মধ্যস্থলে কাটিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক এক প্রান্তের এক ইঞ্চি বা তাহারও কম কাটা হইবে। কাটা হইবার পর পূর্ব্বেকার মতই টিপিয়া ধরিয়া দুই হাত একটু পৃথক করিয়া দেখান যে, বাস্তবিক ঠিক্ কাটা হইয়াছে। তার পর ক এবং খ একত্র করিয়া বাম হাতের অঙ্গুলী দ্বারা ধরুন এবং ডান হাত দিয়া ফালির বাম প্রান্ত হইতে কর্ত্তিত প্রান্তের দিক্ পর্য্যন্ত টানিয়া যান্। ফলে কাটা টুকরাটুকু ডান হাতে থাকিয়া যাইবে। এটি কৌশলে লুকাইতে হইবে। ইহার অনেক উপায় আছে। একটি সহজ উপায়,—টেবিলের উপর একখানি রুমাল ফাঁপাইয়া ফেলিয়া রাখা। টানিতে টানিতে যখন ফালির প্রান্তে পৌছিবেন, তখন সেই প্রান্তটি যেন রুমালের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা টুকরাটি রুমালের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় ফালির একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত ঐরূপে ঘষিতে থাকুন।

কাটা ফালি জোড়া লাগাইবার আরো একটি সুন্দর উপায় আছে। সেটি উপরিউক্ত প্রণালীর পর করিলে অনেক সুবিধা হয়। দর্শককে বলুন যে সন্দেহের কোনো কারণ নাই; যতবার ইচ্ছা কাটিতে পারেন, ফল একই হইবে। একটি মাপিবার ফিতা লইয়া ফালিটি মাপিয়া লইতেও পারেন, জোড়া লাগিবার পর একচুলও কম পড়িবে না। সে উপায় এই। যে টুকরাটি Trickএর পর রুমালের পিছনে পড়িয়া আছে, সেইটি কৌশলে বাম হাতে রাখুন। তাহার একটি খুব সহজ উপায়, রুমালটি তুলিয়া লইয়া মুখ মোছা, এবং তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ফালির টুকরাটি হস্তগত করা। এইবার দর্শককে বলুন,—ফালিটি নিজে হাতে লইয়া আধা-আধি পাট করুন। তার পর সেই পাট-করা অবস্থাতেই আপনি বাম হাতে ধরুন, এবং ঠিক্ মধ্যস্থলের এক ইঞ্চি নীচে দুই আঙ্গুলে টিপিয়া ধরুন।—দর্শক ভাবিবেন, ঠিক্ মাঝামাঝি ধরা হইয়াছে। এইখানেই কৌশলের অবতারণা। দর্শকের সম্মুখে ধরিবার ঠিক্ আগেই লুকানো ফালির টুকরাটি মুষ্টিমধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহারই মধ্যভাগ তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পার্থক্যটুকু চাপিয়া রাখিতে হইবে।



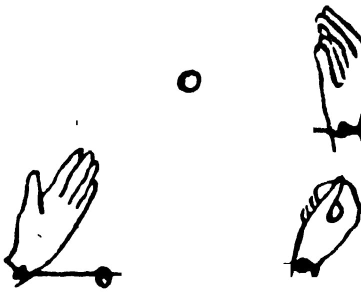
ফালির খেলা

ক হইতেছে আসল ফালি। খ পুরাতন ফালির টুকরা, × চিহ্নিত স্থান তাহার মধ্যস্থল। দর্শক ক এর মধ্যস্থল না কাটিয়া খ এর মধ্যস্থল কাটিতেছেন। অঙ্গুলী দুইটি দ্বারা দুই ফালির সন্ধিস্থল ঢাকা পড়িয়াছে। কাটা হইয়া গেলে 'খ' দুই টুকরা হইয়া যাইবে। 'ক' এর কিছুই হইবে না। 'খ' এর দুই টুকরা লুকানো শক্ত হইবে না। সমস্ত ফালিটি দুই হাতে পাকাইতে পাকাইতে ডান হাতের দুই অঙ্গুলীর মধ্যে কাটা টুকরা দুইটি লুকাইয়া রুমাল তুলিবার অছিলা করিয়া রুমালের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অথবা পূর্ব্বেকার মত, ফালির একপ্রান্ত ধরিয়া অন্য হাত দিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া একেবারে রুমালের পিছনে সেই প্রান্ত পৌছিলে—টুকরা দুটি সেইখানে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা রুচির উপর নির্ভর করে।

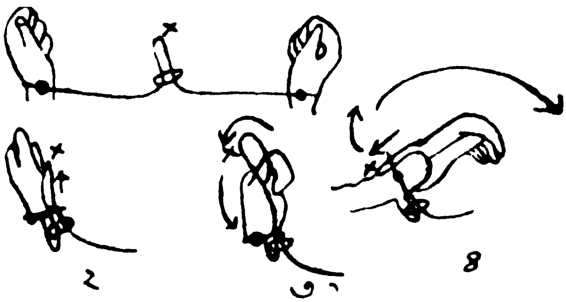
"এই ভৌতিক ফালি একটি অদ্ভুত বস্তু!" ইত্যাদি

বাক্য-বিন্যাস সহকারে এইস্থলে ফালিটি লইয়া একটি ক্ষুদ্র ধাঁধার অবতারণা করিলে মন্দ হয় না। ধাঁধা এবং ম্যাজিক এক জিনিষ নয়। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের সময়ে এই দুই বস্তুর পার্থক্যে বড় একটা আসে যায় না। বিলাতের বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক David Derant এবং অন্য আরো অনেকে এ কথা বলিয়াছেন—এবং আমি স্বয়ং এই উপদেশ কাজে লাগাইয়াছি। ধাঁধাটি এই। ফালির দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া একটি গ্রন্থি দিতে হইবে,—কিন্তু ধরিবার পর একবারও ফালিটি ছাড়িতে পারিবেন না। যাঁহারা কৌশলটি পূর্ব্বে হইতে জানেন না, তাঁহারা কিছুতেই পারিবেন না। সাধারণতঃ, ইহা অসম্ভব। ইহার উপায়, ফালি ধরিবার পূর্ব্বেই দুই হাতে একটি গ্রন্থি দেওয়া। এক হাতের মধ্যে আর এক

এইবার দর্শকদিগকে অনুরোধ করুন যে, কব্জির গ্রন্থি না খুলিয়া আংটিটি ফালির মধ্যে চালাইয়া দিতে। সকলেই বলিবে, ইহা অসম্ভব। উভয় প্রান্ত হাতে বাঁধা, কেমন করিয়া আংটির মধ্যে ফালি প্রবেশ করিবে? "অতি লোমহর্ষক ব্যাপার,—রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়,—আপনারা সকলে বোধ হয় সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইহা পশ্চাৎ ফিরিয়া করা ছাড়া উপায় নাই। তার আগে গ্রন্থিগুলি একবার শেষবার পরীক্ষা করিয়া লউন, -ইচ্ছা হয় আরো দু'একটি গ্রন্থি দিতে পারেন—শীল-মোহর করিলেও ক্ষতি নাই—কারণ গ্রন্থি আমি স্পর্শ করিতে পর্য্যন্ত চাহি না।" বাস্তবিকই তাই। গ্রন্থির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। নীচেকার ছবি দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝিতে পারিবেন।



হাতের কৌশল (১)



হাতের কৌশল (২)

হাত চালাইয়া অর্থাৎ যে ভাবে মল্লবীর অথবা ব্যায়াম-বীরগণের ছবিতে দেখা যায়—সেইভাবে বুকের উপর দুই হাত মুড়িয়া রাখিতে হইবে। তারপর ঐ অবস্থাতেই ফালির এক প্রান্ত এক হাতে এবং অপর প্রান্ত আর এক হাতে ধরিয়া হাত দুইটি দুই দিকে টানিয়া লইলেই ফালির মধ্যে আপনা-আপনি গ্রন্থি পড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক Trick স্বহস্তে করিয়া দেখুন। শুধু পড়িয়া গেলে কিছুই হইবে না।

এইবার একটি অঙ্গুরী চাহিয়া লউন। যেরূপ অঙ্গুরী লইবেন, ঠিক সেই জাতীয় আর একটি অঙ্গুরী আপনার নিজের থাকা চাই। একেবারে এক রকমের না হইলেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকা দরকার। পাথর বসানো হইলে পাথর বসানো অঙ্গুরী লইতে হইবে,—শুধু সোনার হইলে সোনার অঙ্গুরী লইবেন। এই সাদৃশ্যের প্রয়োজন ইহার পরের Trickএ হইবে। আপাততঃ ফালিটি লইয়া কাহাকেও বলুন—দুই প্রান্ত আপনার দুই হাতের কব্জিতে খুব আঁট করিয়া বাঁধিয়া দিন।

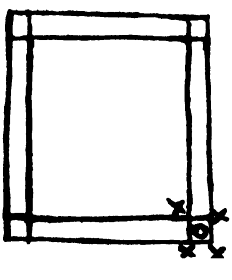
পশ্চাৎ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফালির মাঝখানটি ধরিয়া টানিয়া তার মধ্য দিয়া আংটিটি গলাইয়া দিন। তার পর × চিহ্নিত স্থানটি ধরিয়া টানিতে টানিতে বাম হাতের বন্ধনের নীচে দিয়া কব্জির কাছে গলাইয়া লউন। বন্ধন খুব শক্ত হইলেও ফালিটুকু প্রবেশ করানো অসম্ভব হইবে না। তার পর পুনরায় × চিহ্নিত স্থানটি ধরিয়া টানিয়া ঐ বাম হাতের উপর দিয়া একেবারে সমস্ত হাতটি তার মধ্যে গলাইয়া দিন। তার পর পুনরায় × চিহ্নিত স্থানটি বাম হাতের বন্ধনের পশ্চাৎ দিক দিয়া গলাইয়া লউন।

শেষ কাজ—ফালিটি পুনরায় বাম হাতের উপর দিয়া গলাইয়া টানিতে হইবে। টানিলে দেখিবেন, আংটিটি শুধু ফালির মধ্যে প্রবেশ করে নাই,—তাহাতে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া গেছে। শুধু লেখা পড়িয়া অত্যন্ত অসম্বদ্ধ এবং অসাধ্য বোধ হইবে। কাহারও দ্বারা দুই কব্জি বাঁধিয়া গোপনে আংটি লইয়া অভ্যাস করিলে শিখিতে ৫ মিনিটের বেশী

সময় লাগিবে না। দেখাইবার সময়ে আধ মিনিটের বেশী পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকা চলিবে না, ইহারই মধ্যে সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

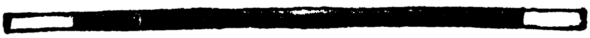
আংটি খুলিয়া লইতে হইলে উপরিউক্ত প্রণালীর ঠিক বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। এবং তাহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। বাঁধা আংটিটি দর্শকদের পরীক্ষা করাইয়া, কাহাকেও বলুন, কাঁচি দিয়া ফালি কাটিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিন। "প্রাণায়াম ছাড়া এই দুঃসাধ্য ব্যাপার অসম্ভব। উপর্যুপরি দুইবার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করা আমার স্বাস্থ্যে কুলাইবে না। অতএব দয়া করিয়া আমাকে মুক্ত করুন" এইরূপ অদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাঁচিটি কাহারও হাতে দিলে—কেহই কিছু বলিবেন না। অথবা নিজেই কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিন। এইসঙ্গে ফালির ব্যাপার শেষ হইল।

এইবার দর্শকের আংটি লইয়া একটি খেলার বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধার-করা আংটির মতন আর একটি আংটি চাই। একটি রুমাল লউন। রুমালের চারিদিকে Hem stitch border চাই। তাহারি এক কোণে নিজের আংটি প্রবেশ করাইয়া সেই কোণ সেলাই করিয়া দিন অর্থাৎ × × × ×



রুমালের খেলা

এই চারিদিক একেবারে বন্ধ থাকিবে। রুমালটি এক বর্গ হাতের কম যেন না হয় এবং কোনো ঘন রঙীন রেশমের রুমাল হইলেই ভালো হয়। আর একটি যষ্টি চাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের কথা সকলেই জানেন। ইহার মধ্যে কোনো ভৌতিক গুণ থাকে না, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার গুণ অনেক। এই দণ্ডে কোনো বিশেষ কারুকার্য্য থাকার প্রয়োজন নাই, ১১।১৪ ইঞ্চি লম্বা এবং কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সমান পরিধি, কোনো হাল্কা কালো কাঠের তৈয়ারী দণ্ড হইলেই চলিতে পারে। অথবা প্রথমে ঐ মাপের দণ্ড তৈয়ারী করাইয়া পরে কালো রং করিয়া লইলেই চলিবে। ইহার দুই প্রান্তে দেড় ইঞ্চি সাদা রঙ করাইয়া লইতে হইবে। আমি এই দেড় ইঞ্চি খুব ভালো সাদা কাগজ জুড়িয়া ব্যবহার করি, তাহাতে কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। নীচের ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।



কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দণ্ড বা মায়াযষ্টি

খেলাটি এই। দর্শকের আংটি রুমালে জড়ানো অবস্থায় অন্য একজন দর্শক স্বহস্তে ধরিয়া থাকিবেন। তৎপরে মায়াযষ্টির দুই দিক ধরিয়া থাকা সত্ত্বেও আংটিটি যষ্টির মধ্যে চলিয়া যাইবে। উপরিউক্ত ফালির মধ্যে আংটি চালানোর পরই এই খেলা দেখাইলে ফল বিশেষ ভালো হয়। "পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রাণায়াম করিলাম, কিম্বা জুয়াচুরী করিলাম, এ সম্বন্ধে আপনাদের বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছে। এবং তাহা অন্যায় সন্দেহও নহে। আচ্ছা, এইবার ঐ একই জিনিষ আপনাদের সম্মুখেই করিতেছি। শুধু তাই নয়। ফালির পরিবর্ত্তে শুষ্ক কর্কশ কঠোর কাষ্ঠের তৈরী এই যষ্টিটি ব্যবহার করিব। এবং আপনারা স্বয়ং ধরিয়া থকিবেন। কেমন, তাহা হইলে তো আর অকারণ সন্দেহ করিবেন না?"

এইবার প্রণালীটির বর্ণনা। খুব সাবধানে এবং মনোযোগ সহকারে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি আরম্ভ করুন। প্রথমে রুমালটির দুই কোণ ধরিয়া তুলিয়া ঝাড়িয়া দেখান যে, রুমালে কিছুই নাই। দুই হাত খুলিয়া দেখান, হাতে কিছুই নাই। তৎপরে দর্শকের আংটিটি লইয়া রুমালে জড়ান। বাস্তবিক ব্যাপার কিন্তু অন্যরূপ। বাম হাতের উপর রুমালটি ফেলা থাকিবে। ডান হাতে দর্শকের আংটি লইয়া যখন রুমালের মধ্যস্থলে আনিবেন, ঠিক্ সেই সময়ে রুমালের যে কোণে আংটি বাঁধা আছে, সেই কোণটিও ডান হাতে টানিয়া ঠিক রুমালের মধ্যস্থলে লইয়া আসুন। এবং দর্শকের আংটি এবং বদ্ধ আংটিটি ডান হাতে ধরা অবস্থায় বাম হাত দিয়া রুমাল

চাপা দিন। ফলে ডান হাত রুমালের নীচে ঢাকা পড়িল। এই অবস্থায় দর্শকের আংটিটি ডান হাতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বাঁধা আংটির কোণটি রুমালের উপর হইতে বাম হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরুন। দর্শক দেখিলেন যে, বাম হাত দিয়া রুমালে জড়ানো দর্শকের আংটি রহিয়াছে। এই অবস্থায় রুমালে জড়ানো আংটিটি কাহাকেও ধরিতে দিন। যে দর্শকের আংটি লওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে নয়,—অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিন। ডান হাতের চেটোতে দর্শকের আংটি লুকানো রহিয়াছে। এইবার ঐ হাতে যষ্টিটি তুলিয়া লউন, তাহার এক প্রান্ত যেন ঠিক্ আংটির উপর পড়ে। তার পর বাম হাতে অপর প্রান্ত ধরিয়া ডান হাতের আংটিটি গলাইয়া দিন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত চাপা অবস্থায় আংটিটি যষ্টির মধ্যস্থলে লইয়া আসুন। এই সমস্ত ক্ষণ আংটিটি ডানহাতের মুষ্টির মধ্যে চাপা আছে। তার পর মধ্যস্থলে আংটিটি পৌঁছিলে,বাম হাতে দর্শকের হাত হইতে রুমাল ঢাকা আংটিটি লউন, এবং ঐ দর্শককে বলুন যে, যষ্টির উভয় প্রান্ত ধরুন। সঙ্গে সঙ্গে রুমালটি ঠিক যষ্টির উপর ধরুন। ফলে রুমালের দ্বারা যষ্টির আংটিটি ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এখন ডানহাত অনায়াসে তুলিয়া লইতে পারেন। দর্শকেরা দেখিতেছেন যে, ধার-করা আংটিটি রুমালে বাঁধা, ঐন্দ্রজালিকের বাম হস্তে, এবং যষ্টিটি অন্য এক দর্শক উভয় হস্তে ধরিয়া আছেন। ইতিমধ্যেই যে আসল কাজ শেষ হইয়া গেছে,—নিপুণতার সহিত সমাধা করিলে, সে কথা কেহই সন্দেহ করিবেন না। বাকিটুকু অতি সহজ। রুমালটি যষ্টির উপর রাখিয়া এক প্রান্ত ধরিয়া এক, দুই, তিন—বলিয়া একটি টান দিলেই সকলে দেখিবেন, দর্শকের আংটিটি যষ্টির মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে। শেষবার রুমালের এক কোণ ধরিয়া সজোরে ঝাড়িয়া দেখাইয়া দিন যে, তার মধ্যে কিছুই নাই। যে দর্শক আংটি দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং যষ্টি হইতে আংটি খুলিয়া লইবেন এবং নিজের বলিয়া সনাক্ত করিবেন। বহুকাল এই খেলা দেখানো হইতেছে,—কিন্তু আজও অনেক বিখ্যাত যাদুকর বৈঠকখানায় তামাসা দেখাইবার সময়ে এই খেলা দেখাইয়া থাকেন। খেলা পুরাতন হইতে পারে,—কিন্তু দেখাইবার গুণে মান্ধাতার যুগের খেলাও নিপুণ কৌশলীর হাতে অভিনব হইয়া উঠে।

এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই এক কথাই বলিতে থাকিব যে, খেলাটা কিছুই নয়, দেখানোর নৈপুণ্যই আসল। মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হওয়া চাই, সর্ব্বদা সস্মিত মুখ চাই, এবং কখনো কাহাকেও বিরক্ত করা চলিবে না। সহজ, সরল, সরস ভাব বৈঠকখানার আমোদের প্রাণ।

উপরিউক্ত খেলা কয়টি অভ্যাস করিলে সুফল পাইবেন আশা করি। ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত বড় খেলার অবতারণা করিবার মানস রহিল,—যদি তৎপূর্ব্বে পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে।

আনন্দ-বোধন

শ্রীরামেন্দু দত্ত

আজ কি এমন পাগল হ'বে
মনের আনন্দে?
জীবন-কুসুম মুঞ্জরিছে
মাতাল সুগন্ধে!
সকল ছায়া, সকল আলো
আজকে এমন লাগ্‌ছে ভালো!
নয়ন জল আর হাসির লীলা
মিলায় সুছন্দে!

রঙীণ তোরণ উদ্ভাসিছে
পুষ্প-শোভাতে!
উজল এ কোন্ ক্ষেমের আভাস
জীবন প্রভাতে!
যেদিকে চাই, মঞ্জুলতা—
রূপের রসের চঞ্চলতা!
সুখের জোয়ার উচ্ছ্বসিছে
মধুর বসন্তে।

মচ্ছগিরির পাদমূলে *

(পেগোডার দেশে)

শ্রীপরেশচন্দ্র সেন বি-এ

বড়-দিনের ছুটির হপ্তা-খানেক পূর্ব্বে আমার ধুরন্ধর ছাত্র-শিষ্য শ্রীমান্ মঙ বা-হান্ (Mong Ba Han) ওরফে 'স্যান্ডো' (Sandow) এসে জানালে, ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে পাহাড়িয়া-বাবাদের একটা মহা-মেলা হবে। ব্রহ্ম দেশের হরেক রকম পার্ব্বত্য জাতের নমুনা দেখতে হলে এই সুবর্ণ সুযোগ। বেশী দূর নয়, জায়গাটা আমাদের বাসস্থান —(ইরাবতী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত)—এনান্জাঙ্ থেকে মাইল পঞ্চাশেক পশ্চিমে। স্থানটীর নাম সিদ্ধতোয়া—ইঙ্গ-অনুবাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে Saidhotoya (সেইধটয়া); উচ্চব্রহ্ম প্রদেশস্থ মিন্‌বু, জেলার একটী মহকুমা। স্থিতি—মচ্ছ-গিরি বা আরাকান পর্ব্বত-মালার পাদমূলে।

বা-হান্ ছেলেটী যেন অষ্ট- ধাতুতে গড়া! গান-বাজনা, ক্রীড়া-কৌতুক সব বিষয়ে চতুর্ভুজ অর্থাৎ স্কোয়ার'। এ দেশের অন্যান্য তরুণ যুবকদেরই মতো বা-হানের হাস্য-রসে এমন একটা আন্ত-রিকতা ও গভীরতা আছে, যা' অন্তরের অন্তরে ঢুকে গুম্-ধরা গম্ভীর প্রকৃতির লোককেও হাসিয়ে নাচিয়ে তোলে! ছেলেটীর বয়স সবে আঠারো, কিন্তু সে খবর রাখ্‌তে চায় গোটা দুনিয়ার। তা' ঐ অরণ্যবাসীদের মহামেলার খবরটা সে কি ক'রে পেলে, সেটা আমাকে বেশ একটুখানি ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু পরে জান্‌তে পারলুম, তার দাদা না কি 'অরণ্য-বিভাগে' অর্থাৎ 'ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে' ঠিকাদারের কাজ করেন।……

এ দিকে আর একটা সুসমাচার কাণে এলো—আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ……লা, বি-এ, বর্ত্তমানে 'মিউক' অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেজে ঐ মহকুমাতেই রাজত্ব কচ্ছেন। এতো সুবিধে থাকা সত্ত্বেও আরাকান্ পর্ব্বতের নাম শুনে প্রথমটা আমার মন বিগ্‌ড়ে গেল। এই সে-দিন এড়ুইন্ রোলাণ্ডসের প্রবন্ধে পড়েছি, ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সপ্তাহে ১৫০-টী করে নিরীহ গৃহপালিত পশু বৃকো দরের উদরে যায়; আর ১১০-টীকে কাটে সাপে!—নেহাৎ সখ করে পিতৃ-প্রদত্ত প্রাণ কে হারাতে যাবে?……

তবু, শেষটায় নানা রকম 'উপায়ং-অপায়ং' চিন্তা করে



দু'জন অশ্বারোহী। শ্রীপরেশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ মঙ বা-হান্ (ওরফে স্যান্ডো)

ঠিক হলো—যাবো। তবে মোটর, সাইকেল বা জাহাজে যাতায়াতের তেমন সুবিধেজনক বন্দোবস্ত নেই। থাকলেও—ভাঙ্গা-চুরা। দুমাইল গিয়েই আবার পদাতিক সাজাতে হয়। P. W. D.র হাঁকে-ডাকে প্রাণ কাঁপে; তার উপর রাস্তাঘাটের অসদ্ভাব। এক আছেন ঐ পুণ্য-সলিলা ইরাবতী —The High road of Commerce—বাণিজ্যের সু-প্রশস্ত রাস্তা!……নানা রকম অসুবিধে ও অসহযোগের কথা ভেবে চিন্তে ঠিক করা গেলো—আমরা দু'জন

* 'মচ্ছগিরি'—আরাকান্ পর্ব্বতমালার প্রাচীন নাম; গড়ন—মৎস্যাকৃতি।

অশ্বারোহী সেজেই বেরিয়ে পড়বো। আর এ দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ উচ্চ-ব্রহ্ম প্রদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণই প্রশস্ত।

ইরাবতী নদীর ও-পারেই বা-হানের কাকাকে খবর দেওয়া হোলো—তিনি তাঁর দু'টী ঘোড়া আমাদের জন্যে ঠিক করে রাখবেন। বা-হানের হুকুম গেলো ঘোড়া দু'টী সাদা হওয়া চাই।

কারণ?

—শ্বেত জীব-জন্তু মঙ্গল সূচনা করে!

আমাদের ঘোড়া দুটী শান্-জাতীয় টাট্টু। বেশ মজবুত। সহনশীল; জল-কাদা, রোদ-বিষ্টি কিচ্ছুকে পরোয়া করে না। বা-হান্ তার ঘোড়ার নাম রাখলে "বাণ্ডুলা"—ব্রহ্মবীরের নামানুকরণে। আর আমার ঘোড়াটীকে ভারত-ইতিহাস খুঁজে একটা নাম দেওয়া গেলো—"চৈতক"; অর্থাৎ রাণাপ্রতাপের ঘোড়ার namesake……হাস্যাস্পদ বটে!

আমাদের সঙ্গে জবড়-জঙ্গী মোট-ঘাট কিছুই ছিল না, থাকতেও পারে না। পথে খাওয়া ও শোয়ার ভাবনা আমরা মোটেই করিনি। বা-হান্ বল্লে, "ব্রহ্মদেশে গ্রামে গ্রামে ফুঙ্গি চাং-ও (বৌদ্ধ-ভিক্ষুর আশ্রম) আছে। চোর ডাকাত, সাধু, সন্ন্যাসী, দিশী বিলিতী এমন কি সওদাগর থেকে ভ্রমণকারী অবধি তথায় রাত্রিবাস করতে পারেন। আর সুজলা, সুফলা সুবর্ণ-ভূমি ব্রহ্মদেশের পেট-মোটা শেঠ থেকে কৃষিজীবী অবধি অতিথি-পরায়ণ……তবে আর ভাবনা কিসের?"

অবশ্য আমরা এক দিনের ভেতরেই সিদ্ধতোয়ায় পৌঁছুতে পারতুম। যথা, বাবর অশ্বারোহণে এক দিনে ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। যাক্, আমাদের ভেতরে বাবরের "ব"-ও নেই। আর শক্তি থাকলেও আমরা সে-কর্ম্ম করিনি। কারণ, ঘোড়া দু'টীও তো জীব………গুরু বলেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি!" তা' ছাড়া আমাদের তেমন জরুরী কাজও ছিল না। দু'-একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখে, এক-আধ দিন পথে দেরী করে যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল। স্রেফ্ অরণ্য-বাসীদের মেলা দেখলেই বা পোষায় কি করে। তাই স্থির হোলো, আমরা এনান্জং থেকে 'পুঁইম্বিউ' ও 'শেলিন্' হয়ে সিদ্ধ-তোয়ায় পৌঁছুবো। পথে গ্রাম শহর ইত্যাদি সবই পাওয়া যাবে।



'চৈতক' ও 'বাণ্ডুলা'

২৪ শে ডিসেম্বর। সকাল ৬-টার সময় আমি ও শ্রীমান মঙ্ বা-হান্ 'পেট্রোলিয়াম'-য়ের জন্মভূমি এনান্জং থেকে যাত্রা করলুম। ঘর থেকে পাঁচ মিনিটের পথ চ'লে তীরে এসে, ইরাবতী নদী খেয়া নৌকোয় পার হতে হলো। নদীর আঁক-বাঁক্ ঘুরে ও-পারে যেতে আমাদের আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগলো না। তীরে উঠে দেখি, দু'জন বর্ম্মা ছোঁড়া ঘোড়া দু'টীকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে। আমাকে ধড়া-চূড়া-পরা দেখে লজ্জা-নতা পল্লীবালিকারা থমকে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিলো, "পালা, পালা, ঐ 'তাপ-খিন্' (সায়েব) যাচ্ছে।"—শ্বেতাঙ্গের পোষাকধারীকে রূপসী পল্লীবাসিনীরা জুজুর মতো ভয়ের চক্ষে দেখে!

বা-হান্ কোনো কথায় কাণ না দিয়ে, "বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি" ব'লে ঘোড়ার পিঠে উঠে বস্‌লো। আমিও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করে চৈতকের পিঠে চেপে বস্‌লুম।

খোলা মাঠ। যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই শাক্-সব্জী হাসছে। আক, তামাক ও ধানের ক্ষেত চারদিক ঘিরে আছে। ভোরের মেঠো-হাওয়া এসে পাকা সোণালী ধানের গাছের ওপর ঢেউয়ের তালে তালে ঢ'লে পড়ছে! মাঠের বুকের ওপর দিয়ে গো-চারণভূমি চলে গেছে……

রাখাল বালকগণ মনের সুখে তান ধরে গান গাইছে—টুং টাং টুনাটন্, টান্ন টা টু-উ-উ!

খোলা মাঠ পেয়ে, বা-হান্ আমার সঙ্গে 'রেস্' (race) দেবে জেদ্ ধরলে। কিন্তু 'বাগুলা'-কে আমার ঘোড়া 'চৈতকের' কাছে নেহাৎ হার মানতেই হোলো। আমি বল্লুম, 'কেমন'?

সে বল্লে, 'নমঃ টপ্ত'!

আমরা 'রেস্' দিয়ে যখন 'থাঁঙ্-গাইন্' গাঁয়ে (৪ মাইল) এলুম, তখন সকাল ৭½-টা। গ্রামখানির চারদিক বাঁশের বেড়ায় ঘেরা। একটী-মাত্র প্রবেশদ্বার। একজন পাহারা-ওয়ালা আছে। ফটকের পাশে একখানা ছোট ঘরে পথিকদের জন্যে হাঁড়ি-ভরা জল রয়েছে।···কি সুন্দর ব্যবস্থা! কথিত আছে রাজা 'পিয়দসী অথোকা' (অশোক) ৬৪-হাজার ধর্ম্মমন্দির ও পানীয়-জলের ঘর তৈরি করবার জন্যে হুকুম জারি করেছিলেন।—তারই অনুকরণে, আজও ব্রহ্ম-বাসীরা গ্রামে গ্রামে জল ঘরের বন্দোবস্ত করে থাকে।

গাঁয়ের ভেতরে আরো চমৎকার দৃশ্য। কোথাও এক-দল গ্রাম্য ছেলে ঢোল, করতাল আর বাঁশী বাজাচ্ছে। কোথাও ছোট ছোট মেয়েরা নাচছে। কৃষকদের এ-মাসে এখনো ধান কাটা সুরু হয়নি;—অবসর সময়ে মাদুর, ঝুড়ি, ছাতা এবং নানারকম বাঁশের কাজ কচ্ছে। মেয়েরা ঘরের কাজ কচ্ছে, সুতো কাটছে, ধান কুটছে—আবার ছেলে মেয়েদের দোলনায় দোল খাওয়াচ্ছে। তরুণীরা খাটো—আরব মেয়েদের মতো মোটা-সোটা। নাক খ্যাঁদা হোলেও, লাবণ্য আছে। রঙ ফর্সা · অন্যান্য সবদেশের মেয়েদের মতো রূপের গরব রাখে। মুখে, হাতে, পায়ে 'তানাখা'র (চন্দনের) প্রলেপ দেয়। পরণে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চিত্র-বিচিত্র সিল্ক অথবা সুতোর লুঙ্গি। গায়ে 'এঞ্জি' (জ্যাকেট্); পায়ে চটি (Burmese slipper)। মেয়েরা ঘোম্টা পরে না। মাথার তালুর ওপরে চুলকে গোল-আকৃতি করে রাখে। চুলের ভেতর থোপা থোপা ফুল গুঁজে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের চেষ্টা, এমন কি ঝি-চাক্‌রাণীটীও করে থাকে। পুরুষরা ৪ হাত প্রমাণ সিল্কের কাপড় মাথায় জড়িয়ে রাখে। কৃষিজীবীরা তেমন বলিষ্ঠ নয়—লম্বা ছিপ্-ছিপে। অনেকেই আফিং-তাড়ি-সেবী। মেয়েরা পুরুষ-গুলোকে হাতের মুঠোয় আয়ত্ত করে রাখতে চায়। কি শহরে কি গাঁয়ে, ব্রহ্ম-দেশীয় মেয়েরা পাকা-গিন্নী। ঘরের ভেতরটাকে তারা বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে তক্-তকে ঝক্-ঝকে করে রাখে। দোকান-পাট, হিসাব-পত্র সবই তাদের হাতে। সাধারণ মেয়েরা শতকরা ১৫-জন ব্রহ্ম ভাষা পড়তে জানে—যদিও তাদের মধ্যে দু'-চার জন লিখতে পারে না।

গাঁয়ের ধনী সম্প্রদায়ের তরুণ যুবকগণ কুঁড়ের বাদশা! কাজের মতো কাজ কিছুই তাদের করবার নেই। ফুল-বাগিচার পাশে, ঘরের সাম্‌নে আড্ডা জমিয়ে "মুরগীতে মুরগীতে লড়াই" (Cock-fight) বাধিয়ে জুয়া খেলে।



'এমারেল্ড লেক্'

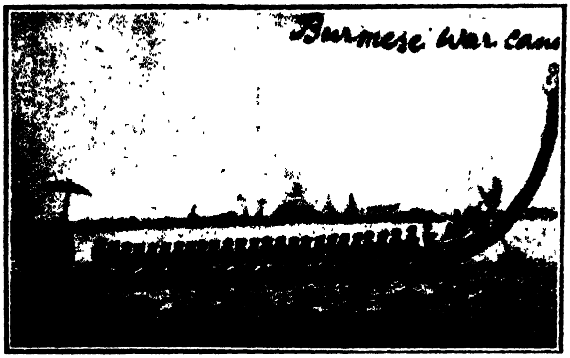
কেউ-বা বেহালা, বেন্‌জো, মিন্‌ডোলিন্ ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে প্রাণকে তাজা করে। চারদিকে যেন আনন্দ আর উৎসব। কোনো ভাবনা নেই—কোনো দুঃখ নেই। 'খাও, দাও, ফূর্ত্তি করো'—এই হোলো জীবনের সার বস্তু। 'কাল্‌কের ভাবনা' চুলোয় যাক্, আজ অন্ততঃ "বাজিয়ে চলো প্রাণের বাঁশী!"

আমরা গাঁয়ের 'থুজী'র বাড়ীতে ফল-ফুলারী ভেট্ পেয়েছিলুম। মোড়ল-মশায় আমাদের প্রায় ১-হাত লম্বা

এক-একটী দিশী সিগার (শেভ'লে) এনে অগ্নি-সংযোগ করে দিয়েছিলেন। তার কড়া গন্ধে কাস্‌তে কাস্‌তে আমার কোমর-বন্ধ একদম্ খুলে গেছলো! বা-হান্ বেশ আরাম ক'রে সিগার ফুঁকছিলো। শ্বেতাঙ্গদের মতো বাপ-বেটাতে একত্র ধূম-পান করতে ব্রহ্ম-বাসীরা এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করে না। অন্যে পরে কা কথা!

মোড়ল মশায় মিনি-পয়সায় আমায় "পাক্কা সেপাই" খেতাবটী দিয়েছিলেন। বা-হান্ তাঁর কথায় সায় দিয়ে জাহির ক'রে দিলে, "হাঁ। ইনি মেস্-পট্ ফের্তা"।...... কিন্তু হায়! আমরা তখনো যে তিমিরে, এখনো সে তিমিরে!

তখন সকাল ৯-টা আমরা যখন (১০-মাইল) 'পুঁইন্‌ডিউ'



রণতরী!

নামক স্থানে এসে পৌছুলুম। চার দিকে আকের ক্ষেত আর পানের বাগান। অনেক হিন্দু-স্থানী শ্রমজীবীর অহৈতুকী সেলাম পাওয়া গেলো। ভয়ে তারা তটস্থ! আমি তাদের কাছে সায়েব নাম ফলিয়ে আত্ম-গোপন না ক'রে বল্লুম,—হাম্ হিন্দু হ্যায়! বাঙ-গালি! ঘাপারাও মাৎ।

—হিন্দু? বাঙ-গালি?

—আচ্ছা হ্যায় বাবু?

—বাল্-বাচ্ছা ক্যাইছা হ্যায়?

—হিন্দুস্তান্‌কা হাল্ চাল্ বাতলাইয়ে, বাবু। সে যে কত শ্রমজীবীর কত রকমের প্রশ্ন! তার উত্তর দিয়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি ও দিয়েছি!!

বেলা প্রায় ১২½ টার সময় আমরা (২২ মাইল) 'শেলিন্' (Salin)-এ গিয়ে পৌছুলুম। অনেক খুঁজে তো একজন বাঙালী বে'র করা গেলো। (অবশ্য ব্রহ্মদেশে এমন শহর নেই, যেখানে অন্ততঃ একজন ক'রে বাঙালী নেই।)

শেলিন্ শহরের এই বাঙালী ভদ্রলোকটীর নাম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কচু। বাঙলা দেশে নকরীর বাজার গরম দেখে তিনি আর দশজনের মতোই সুবর্ণ-ভূমিতে শুভ পদার্পণ করেছেন। ব্রহ্ম-দেশীয় 'উন্‌থান্‌' বা খদ্দরের ব্যবসায়ী তিনি, পাঁচকুড়ি টাকা তো হেসে-খেলে উপায় করেন। ভদ্রলোক আমাদের এই দুপুরে স্বহস্ত-রচিত অন্ন-ব্যঞ্জন ইত্যাদি খাইয়ে দিলেন। বলা-বাহুল্য, বা-হান্ আমাদের বাঙালী-খানা খেয়ে তেমন সুবিধে পায় নি। কারণ, তাদের একটু 'নাপ্পি' (পচা-মাছের চাট্‌নি) চাই। ঐ-রসটুকুন্ থেকে বঞ্চিত হোলে, তাদের খাওয়ার অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক 'গব্যহীন কুভোজনের' মতো!

কচু-মহাশয়ের অনুরোধে রাতটা শেলিনে-ই কাটাতে হয়েছিল। তিনি আমাদের ভ্রমণের মতলব শুনে বল্লেন, "আপনারা মশায় কেউ 'মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা' করেন; কেউ-বা সাইকেলে গিয়ে 'দিল্লীর লাড্ডু' খেয়ে আসেন; কেউ বা দিব্যি সেপাই সেজে, ঘোড়ার পিঠে চেপে, পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সন্ধি কোর্‌তে যান। আপনাদের কি! খোলা প্রাণ—গড়ের মাঠ!"—(উচ্চ-হাস্য)

আমি কথাটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বল্লুম, "আপনি তা'হোলে বাঙলা মাসিক-পত্রগুলো মায় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ আগা গোড়া প'ড়ে থাকেন। এই সু-দূর ব্রহ্মদেশের এক কোণে থেকেও আপনার মাতৃ ভাষার প্রতি টান আছে দেখে আহ্লাদিত হলুম।"

—"বলেন কি! নবীন সেনের দেশ,—চট্টলে আমার বাড়ী! আমার তো ভাষা-জননীকে ধূপ-দীপ জ্বেলে পূজা করা উচিত। আমার শ্যালক নলিন্ রেঙ্গুন থেকে আমাকে (অবশ্যি, তার পড়া হোয়ে গেলে) সব মাসিক-পত্রগুলিন্ পাঠিয়ে দেয়। আমার পড়া হোয়ে গেলে, খোকার মায় নামে ও-সব দেশে পাঠিয়ে দিই।"—ভদ্রলোকের অর্থ-নীতির পুরো-পুরি জ্ঞান আছে দেখে, আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলুম না। বল্লুম, "আপনার এ নব উদ্ভাবনের জন্য মাসিকপত্রের গরীব পাঠক-সমাজ নিশ্চয়ই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, এবং আমিও আপনার পথ অনুসরণ করবো!"

কচু-মশায় নিতান্ত সরল, অথচ হিসাবী সওদাগর ধরণের লোক। কথাগুলো অনেক সময় মিঠে-কড়া। (বাঙ্‌লা-ভাষার বিশেষ অনুরাগী ব'লে, এখন তিনি আমাদের নিকট বন্ধু-স্থানীয় লোক।)

শেলিন্ শহরটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন। একটী হ্রদ আছে; নাম 'এমারেল্ড লেক্' (Emerald lake)। রাজা 'চিঁয়া-ছঁ' (১২৩৪) এই হ্রদ খনন করান। তিনি ইহাতে নানারকম জল-ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। রাজ-হাঁস, ডাহুক ইত্যাদি জলচর এনে পুষেছিলেন। এখনো ফুল ফোটে, – জলচররা কেলি করে। এই হ্রদেই তিনি হস্তী, অশ্ব, কুম্ভীর, রাজ-হংস ও ড্রেগণের মতো আকৃতির রণ তরী ভাসিয়ে নৌ চালনা শিক্ষা দিতেন। এখনো রাজা 'বেয়িনঙ'য়ের তৈরি রণ-তরীর অনুকরণে দু'খানা 'Burmese war-canoe' 'গ্রীন্ ইচ্ রয়েল নভেল মিউজিয়ামে' আছে।

শহরের আঁচল ঘিরে একটা বেগবতী নদী ছল্ ছল্ কল্ কল্ করে বয়ে যাচ্ছে—নাম শেলিনা। এই নদী থেকে জল সেচন (Irrigation)এর জন্য প্রায় একশ' খাল আছে। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মদেশীয় রাজারা আসাম, মণিপুর, কামরূপ ও শ্যাম-রাজ্য থেকে যে-সব বন্দী ধরে নিয়ে আস্‌তেন, তাদের দিয়ে 'ইরিগেশন কেনেল' কাটানো হতো।

বেসিন্,আরাকান্ ও চাউবের মতো শেলিন্ অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। সায়েস্ত-খাঁর রাজত্ব সময়ে যেমন টাকায় ৮ মণ চাউল ছিল, ব্রহ্মদেশেও ১৭৭৫ সাল অবধি টাকায় ৮½ মণ চাউল পাওয়া যেতো। কিন্তু, এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আছে শুধু—"মরম-ভেদি হা-হা-কার!" হায়! আজ ব্রহ্মবাসীরাও বাঙালীর সুরে সুর মিশিয়ে গাইছে,—

"ছিল ধান গোলা-ভরা,
কল্-ইঁদুরে করলে সারা"…

কচু-মশায়কে নিয়ে আমরা শেলিন্ থেকে ৬ মাইল দূরে "সিনবু-জোন্" নামক স্থানে যাই—"উন্‌থান্" বা খদ্দরের তাঁত দেখ্‌তে। বিরাট প্রতিষ্ঠান! মহাত্মা গান্ধী ব্রহ্মদেশের এই সুদূর পল্লীতে খদ্দর-প্রচারের বক্তৃতা দিয়ে এদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন কি না, আমাদের জানা নেই। তবে এখানে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ—সকলে খদ্দর পরে!

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, শেলিন্ শহরে মান্দালয় থেকে নবাগত একটা বড় নাম-জাদা দলের 'পোয়ে'-নাচ ছিল। আমরা দেখতে গিয়েছিলুম। অনেক রকম নাচ হয়েছিল। সবের চাইতে "বারমিজ এ-ইন্ পোয়ে (Dull dance) অর্থাৎ ঢিমা নাচটাই বেশী মন-মোহকর। আমরা যে নাটক দেখেছি, তাতে দু'জন লোককে "পরস্ত্রী, পরধন ও পরজীবন হরণের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ" করা হয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দু'-ই ছিল। নারী শ্রোত্রীদের মধ্যে একদল 'ফ্যেশিয়ান্' সুলভ হাব-ভাব-ময়ী বিলাস-চাতুরী-লীলা



সিন্ধ ও উন্‌থানুর তাঁত

(Having Elizabethan Coquetry!) তরুণী দেখা গেলো, যাদের পা অবধি চুল ছোঁয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে শৈশবে পড়েছি, —সওদাগর-পুত্র সাত ডিঙ্গি নিয়ে রাজ-পুত্রী 'কেশবতী'র সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। জানি না, তাঁর ডিঙ্গি এই সু কেশী ব্রহ্ম-কেশবতীর তীরে এসে ঠেকেছিল কি না।·· পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন-সমাজ বলেন, "রূপকথাতেও সত্যিকার জিনিষ আছে।" হয় তো ঐ উপকথাও কিছু-কিছু সত্য হতে পারে।

২৫-শে ডিসেম্বর। কচু-মশায়ের ওখানে খুব ভাল করে খেয়ে দেয়ে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, আমরা সকাল ৮টার সময় আবার অশ্বারোহী সেজে ভ্রমণ সুরু করবার চেষ্টা দেখলুম। সত্যি, তাঁর মতো এতো ভালো-মানুষ আমাদের ভ্রমণ-পথে আর দ্বিতীয়টী জোটেনি।

শেলিনের পর থেকে পাঁচ মাইল জুড়ে ঘোর অরণ্য। তাল, শাল, সেগুণ, এমন কি, কাঁটা-বেগুণ অবধি অরণ্যকে আঁধার করে রেখেছে। চারদিকে লতা-পাতা, ফুল আর মৌমাছিকুল। তখন দ্বিজু-বাবুর গানের দু'লাইন মনে হোলো, "গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে, তা'রা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।"—শুধু তাই নয়। সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে' সবুজ রঙয়ের সাপ ও ফড়িঙ। হল্‌দে ছাটের প্রজাপতি—পাখার ওপরে লাল ও কালো রঙয়ের খেলা। গাছের ওপরে ব'সে হনুমানজী। কত যে রামের চেলা তার লেখা-যোখা নেই। বড়ই মনোরম, অথচ ভয়াবহ স্থান। আমাদের মাথায় 'প্রাকৃতিক বিশেষজ্ঞে'র (Naturalist-এর) গবেষণা-শক্তি, ও দেখবার মতো চোখ থাকলে বোধ হয় ব্রহ্মদেশীয় অরণ্য সম্বন্ধে নানা রকমের নূতন তথ্য সংগ্রহ করে সর্ব্বসাধারণকে বিস্মিত, চমৎকৃত ও অবাক করে ফেলতে পারতুন।

বা-হান্ ছায়া-ঘন মৌন-গম্ভীর অরণ্যে, বোধ হয় ভয় খেয়ে, গর্দ্দভ-রাগিণীতে একটা গান ধরলে। তার ছ-বহু অনুবাদ হচ্ছে—

নাইকো বনে আলো;
জ্বালো জ্বালো, জ্বালো, পিদীম্ জ্বালো।...

—'পিদীম্ জ্বালো'-র লাইনটা সে নেহাৎ কম করে দশ রকম সুর ধরে গেয়ে ফেল্লে। শেষটায় শিস্ দেওয়া সুরটাও ছাড়লে না।

অরণ্যের পরেই খোলা মাঠ। তার পর একটু গেলেই বাঁশের বেড়া ঘেরা একখানি বর্দ্ধমান গ্রাম।

সকাল বেলায় শীত, আর দুপুর বেলায় মাথা-ফাটা রোদ। 'চৈতক' আর 'বাণ্ডুলী' তো ঘাঁড় বেঁকে 'নন্-কো-অপারেশন্' করে বসেছেন। আহা! আমাদের বেচারা জানোয়ার বন্ধু দু'টী,—সহনশীল হোলেও, সব-তা'তেই একটা সীমা আছে—অতই বা সইবে কেন? —আর আমাদের অবস্থা? তা'ও তো বড় সুবিধেজনক ছিল না। জলের তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটে ফাটে; কোথাও ভালো জল নেই। গাঁয়ের পাশে যে একটী মাত্র পাত্-কুয়ো আছে, তার জল "কালা-পানী"-র চাইতেও বেশী লোণা। বা হানের ব্যাগ থেকে তার অমূল্য সম্পত্তি,—দু'-একটা লজেন্-জুস্ চুষে কিছু সোয়াস্তি পাওয়া গেলো। তার পর একটা গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর শুয়েছিলুম, বোধ হয় একঘণ্টা কাল। স্বাস্থ্যবান্ বা হান্ (ওরফে স্যান্ডো) ৫-মিনিটের ভেতরেই ঘুমিয়ে প'ড়ে ঘোঁ-ঘোঁ নাক-ডাক্‌তে সুরু করে দিল। আমার কিন্তু, নাক চোখ দু'-ই সজাগ ছিল!

বেলা তখন ৩-টা, যখন আমরা শেলিন্ থেকে আনুমানিক ২০ মাইল দূরে একটা গাঁয়ের সামনে হাজির



বারমিজ্ এ-ইন্ পোয়ে-নাচ (Dull dance)

হলুম। অতি অদ্ভুত তার নাম,—"চেঁঙ কোঁ" (Cheng-know.)—বাসিন্দারা (প্রবাসী) চীন্‌-দেশীয় লোক। (এখানে বলে রাখতে হবে যে, ব্রহ্মদেশীয় অরণ্যবাসী 'চিন্' বা 'কাচিন্'-দের সঙ্গে এই প্রবাসী চীনাদের কোনো সম্বন্ধ নেই।)

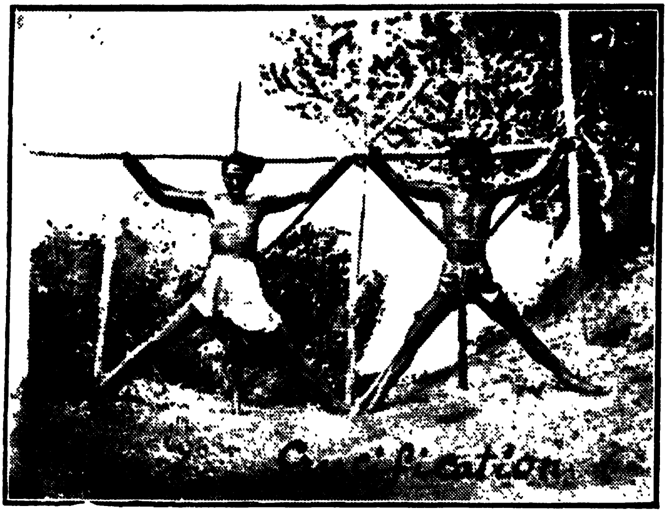
এ অঞ্চলে প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। শাক-সব্‌জী, তরি-তরকারী প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান, ভুট্টা, কলা, তরমুজ পেয়ারা, আম ইত্যাদি যথেষ্ট। চীন্‌দেশীয় লোক এখানে এসে কেন বসতি স্থাপন করেছে, তা' যে আমরা ধারণা করে উঠতে পারিনি তা' নয়। তবু অনুসন্ধানে আরো জান্‌তে পেরেছি, এই 'চীনা বস্তি'র মতো মচ্ছগিরি বা আরাকান্ পর্ব্বত মালার পশ্চিম অঞ্চলে 'চট্টগ্রামের মুসলমান বস্তি,' 'মণিপুরী বস্তি,' 'মেথলী-বস্তি' এমন কি শেক্ষপীর-বর্ণিত সুদ-খোর শাইলক এর মাস্‌তুতো ভাই 'কাবলী ওয়ালাদের বস্তি' ও না কি আছে। মচ্ছগিরির পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উর্ব্বর ভূমিই বোধ হয় কষ্ট-সহিষ্ণু বিদেশবাসীকে এ হেন বিপদসঙ্কুল স্থান টেনে এনেছে।

বেলা ৩½টা থেকে আমরা খুব আস্তে আস্তে চলেছি। দশ-বারোটা পল্লী ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একখানা ছবির মতো দৃশ্য আমাদের চোখে পড়লো। আমরা সে-দিকে গেলুম। তার পাশেই একটা পল্লী। বর্মা ও শান্ তার বাসিন্দা। সকলেই কৃষিজীবী। লোকগুলো নিরীহ প্রকৃতির। পল্লীবাসী শান্‌রা পশু-পালন করতে বড্ড ভালোবাসে। পশুই তাদের গৌরব ও অহঙ্কারের সম্পত্তি। গরু ও মোষের দুধ তাদের অতি প্রিয়। 'শান্-বধূ' ও শান্ মেয়েদের মিঠা হাসি। কিন্তু তাদের পানে কেউ সন্দেহ-জনক আঁখিপাত করলে, কিম্বা অসম্মানের বাক্যি প্রয়োগ করলে আর কোনো কথা না,—সপাং সপাং 'ফণা'র অর্থাৎ চটি-জুতোর ঘা!

ব্রহ্মদেশে ১০ জন লোকের ভেতরে ৭ জন কৃষিকার্য্য ক'রে জীবনধারণ করে; এ অঞ্চলে বোধ হয় ১০ জনের ভেতরে ১০ জনই কৃষিজীবী।—মেয়েরা ধান-বোনা থেকে সুরু করে ধান-কোটা অবধি সুচারু-রূপে সম্পন্ন করে থাকে। তারা যেমন পরিশ্রমী, তেমন স্বাস্থ্যবতী।

আমরা এই শান্-পল্লী থেকে প্রায় ৯ মাইল পথ অতিক্রম করে, সন্ধ্যার প্রাক্-কালে সিদ্ধতোয়ায় পৌঁছুলুম। 'চৈতক' ও 'বাগুলা' হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। আমরাও সারাদিনের পরিশ্রমের পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লুম।

বা-হানের দাদা শ্রীযুক্ত বা-ঠ্ আমাকে দেখে পরম সন্তুষ্টির ভাব দেখালেন। ইংরেজী মার্জ্জিত আদব-কায়দায় তিনি আমায় সেলাম ঠুক্‌লেন না, একটুখানি সস্মিত হাসি হাস্‌লেন। তাঁর হাসিতেই 'শুভ-সায়ং-কাল', 'স্বাগতম্' 'নমস্কার', 'আসুন বসুন' ইত্যাদি এক-কালে সব প্রকাশ পেলে।



পরস্ত্রী, পরধন ও পরজীবন হরণের জন্য ক্রুশবদ্ধ!

কথায় কথায়, "ধন্যবাদ, প্রিয় মহাশয়" অথবা অন্য কোনো মৌখিক ভদ্রতার তিনি ধারই ধারলেন না।...প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদব-কায়দায় এই তফাৎ দেখা যায় যে,—প্রতীচ্য চায় মুখের মামুলী কথায় যা-হোক্ করে ভদ্রতার ভাসা-ভাসা ভাবটা প্রকাশ করতে; প্রাচ্য চায় ভাবের অভি-ব্যক্তিতে অন্তরকে প্রকাশ করতে। বা-হানের দাদারও এই বিশেষত্ব দেখলুম যে, তিনি শব্দাড়ম্বরহীন ও নির্ব্বাক্ থেকেও বিনয় সৌজন্য, ইচ্ছা অনিচ্ছা ব্যক্ত করে থাকেন। 'হাঁ'—'না' ছাড়া তিনি বড় বেশী কথাই ক'ন্ না। এই তরুণ-যুবকটী সুপুরুষ—মুখখানি দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক। তারুণ্য সুলভ চাঞ্চল্য নেই।



কেশবতী

আমরা আস্‌ছি—এই সংবাদ পেয়ে, পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত বা-ঠু একজন মণিপুরী (পোঙনা) ব্রাহ্মণ ঠিক করে রেখেছিলেন,—আমার রন্ধনাদির জন্যে। আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার বিশেষ কারণ,—অহিংসা পরম ধর্ম্মের অনুসরণকারী হয়েও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ হিন্দুর অভক্ষ্য গো-মাংস, শূয়োরের-মাংস ইত্যাদি নির্ব্বিকারচিত্তে ভক্ষণ করেন বলিয়া। আমার পাচক, বেচারী, আহা! মণিপুরীর রান্না, সে-কথা আর বল্‌বো কি!

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত লা, বি-এ, বর্ত্তমানে 'মিউক' অর্থাৎ ডেপুটী, যাঁর নাম সূচনাতেই করে রেখেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করবো ভেবে খেয়ে-দেয়েই বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য ক্রমে দেখা হয়নি। সিদ্ধ-তোয়ায় অনেক শ্যামাঙ্গ (এমন কি শ্বেতাঙ্গ) রাজ-কর্ম্মচারী আছেন যাঁরা বেশ মোটা মোটা মাইনে পান। বড় বড় ঠিকাদার আছেন, যাঁদের বেশ দু'পয়সা আছে।

শুনতে পাওয়া গেলো, মহাজনদের অনুকরণে, "পল্লী-বাসীদেরও রান্না-ঘর থেকে শোবার-ঘর অবধি পার্ব্বত্য-কাচিন··। বিবাহিতা কি অবিবাহিতা কে জানে?"··· বাড়ী ফিরে এসে আজকের তরে বিশ্রামের চেষ্টা দেখলুম। শুয়ে শুয়ে মন্দর ভালো গোচের একটা যুক্তি উদ্ভাবন করে ফেল্লুম,—ব্রহ্মদেশে আসুরিক উপায়ে বহু বিবাহ প্রথাটা পূর্ণ মাত্রায় সচল না থাক্‌লেও, এখনো অচল কিংবা একেবারে ধুয়ে মুছে যায় নি; সুতরাং এ-সব দুর্ব্বলতা দেশ কাল-পাত্রভেদে ক্ষমার্হ।

২৬-শে ডিসেম্বর ভোরে খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেলো। বাঙলা-দেশের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান"—নয়। একেবারে চেরা-পুঞ্জীর আকাশ চেরা—ঝম্‌-ঝমা-ঝম্‌, নাইকো বিরাম—গোচের বিষ্টি। এমন ধারা জল হ'তে ব্রহ্মদেশে আর কোথাও দেখিনি। কত ইঞ্চি জল হয়েছিল তা জানি না; তবে মচ্ছগিরি বা আরাকান্ পর্ব্বত অঞ্চলে ২০০ ইঞ্চি অবধি জল হয়, এটা আমাদের বেশ জানা আছে। বিষ্টির পরে চারদিকে যেন জলের নদী। পাহাড়ের ওপর থেকে জল গড়িয়ে পড়ে', অতি অল্প সময়ের মধ্যে, কত যে নতুন জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ব্রহ্ম বাসীদের ধারণা, সিদ্ধার্থ পরলোক থেকে সিদ্ধিজল বরিষণ করে থাকেন। তাই এ-স্থানের নাম রাখা হয়েছিল সিদ্ধতোয়া। (সিদ্ধি+তোয়া ?)

এখানে যেমন বিষ্টি, তেমন শীত। ব-স্থানের একটু



শান্‌-বধূ

জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল। সে ভোলে নি আজ ২৬-শে ডিসেম্বর—পাহাড়িয়া বাবাদের মেলা। জ্বরই আসুক আর জরাই আসুক শ্রীমান্ স্যান্ডো চোখ-মুখ বুজে শুয়ে থাক্‌বার ছেলে নয়। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠেই শ্রীমান্ ব্রহ্ম-ভাষায় ছন্দে যা' বল্লে, তা বাঙালায় এই রকম দাঁড়ায় :—

লে-আও খানা গরম গরম,
জ্বরকে আজি করবো নরম!

জ্বরের সঙ্গে লড়াই!—খাসা ছেলে বটে!

বেলা ৩-টার সময় আমরা সিদ্ধতোয়া থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে অরণ্যবাসীদের মেলা দেখতে চল্লুম। আমাদের ঘোড়া দু'টী—'বাগুলা' ও 'চৈতক' ঘরেই রইল। সঙ্গে চল্লো দশজন লাঠিয়াল। শ্রীযুক্ত বা-ঠু তাঁর বন্দুকটাও সঙ্গে নিলেন।

আমাদের পথ চলে গেছে অরণ্যের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে। দু'পাশে তার সারি সারি গাছ। গাছের পাতা ঘন সবুজ। ছায়া-শীতল বনপথ। সূর্য্যি-ঠাকুরের আলোর যেন এ-পথে যাওয়া-আসা মানা। এত গভীর, এত নিবিড় অরণ্য!

অনেক দূর থেকে হিল্লি-কিল্লি আর হট্ট-গোল শোনা যাচ্ছিল। কাড়া-নাকড়া, সিঙগা ও ব্যাগপাইপের বাজনা আমাদের কাণে এসে ঠেক্‌ছিলো। দূর থেকে মেলার স্থান-নির্দ্দেশক নিশান দেখা যাচ্ছিল।

মেলার স্থানটী অতি মনোরম। দু'টী পাহাড়ের মাঝ-খানে বিস্তৃত সমতল ভূমি; তার চারদিকে ছোট ছোট আদিযুগের ঘরের মতো গোল-আকৃতির অস্থায়ী বিরাম বাস। আমি ভেবেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা উঁচু জায়গায় ঝোঁপে-ঝাঁপে বসে পাহাড়িয়াদের মেলা দেখতে হবে। কিন্তু আমরা পৌঁছুবার পূর্ব্বেই প্রায় তিন শ' দর্শক মেলার মাঠের চারদিক ঘিরে ছিল। দুর্দ্দম পচাই তাড়ি খেলেও, আজ উৎসব ও মহা-উল্লাসের দিনে অরণ্যবাসীরা ভীষণ-দর্শন না হ'য়ে, দর্শকগণের প্রিয়-দর্শনই হোলো।



সিদ্ধতোয়ায়—মচ্ছগিরির পাদমূলে

নৈশ-মেলা ও উৎসব। আসরের মাঝখানে খুব প্রকাণ্ড একটা অগ্নি-কুণ্ড জ্বালা হয়েছিল। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে নাচতে নাচতে ঐ অগ্নি-কুণ্ডটাকে প্রদক্ষিণ কচ্ছিল। একটু বাদে একজন পুরোহিত কিম্বা সর্দ্দার গোচের ভীম-পুরুষ আসরে দাঁড়িয়ে 'টুং টাং টুনা টুন্' ব'লে তড়-বড় করে কত কি 'পাঠ' শোনালেন। তার পর স্ত্রী পুরুষ দু'সার হয়ে দাঁড়ালো। একজন তরুণী এসে বার-পাঁচেক ডিগবাজী খেয়ে গেলো;

ধীরে-ধীরে 'মল্লযুদ্ধ' হলো ; লম্ফ-ঝম্ফ চেঁচামেচি এমন কি 'মূকাভিনয়ে' প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমানের পালাও বাদ গেলো না। 'কৃত্রিম-যুদ্ধ' (mock-fight) অনেকটা হিন্দু-মোছলমানের লড়াই বলেই মনে হলো। গগন-ভেদী 'হর-বোলার ডাক' (mimicries) আমাদের কাণ ঝালা-পালা করে দিচ্ছিলো।

মুখোস্-পরা নর-ব্যাঘ্র ও কেলো-ভালুকের নাচ থেমে যেতেই, আবার ঐ অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ধিন্ ধিন্ হে-ই হে-ই করে 'মোটা-নৃত্য' (coarse-dance) সুরু হোলো। অঙ্গটাকে হিন্দোল খাইয়ে পুরুষগুলোকে ভেড়া-কান্ত বানিয়ে দিল।

এর পরে নাচ-গান যা' হোলো সবই মেয়েদের। সঙ্গে ছিল একজন মাত্র বয়স্য (বিচিত্র ভাঁড়)। গান যা' হোলো, প্রায় সবগুলোই নাকি-সুরে। গানের অক্ষরগুলোতে ভ, ৺, থ এবং ভোঁ যেন বেশী শোনা গেলো। তবে এদের কথাবার্ত্তা যা' আমাদের কাণে ঠেক্‌ছিলো, তা' "তিরু-কল্‌ড়ি-কুণ্ড্রম্" ইত্যাদির উচ্চারণের চাইতে বেশী মোলায়েম। অরণ্যবাসীদের লিখিত ভাষা থাকুক বা না



নিখিল ব্রহ্ম-পার্ব্বত্যজাতির কুম্ভমেলা

এর পরে একজন সুন্দরী সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত করে ফুর্-ফুরে হাওয়ার মতো ঝটিতে এসে, আসরে দাঁড়ালেন। 'চিকন্-নাচ' (Fine-dance) সুরু হোলো! অতি করুণ সুরে ব্যাগ-পাইপের বাজনার মতো একটা মিঠে আওয়াজ আমাদের কাণে এসে ঠেক্‌লো। সুন্দরী প্রথম আস্তে আস্তে পা ফেলে, একবার এ-দিকে আবার ও দিকে হাত তুলে, মন্থরগতিতে হেলে-দুলে নাচছিলো। হঠাৎ তুরন্ত বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহলতাখানা লাফিয়ে উঠলো। অতি দ্রুত একবার এ-দিকে, আবার ওদিকে নীচ- থাকুক, অন্ততঃ কথা-বার্ত্তায়—কিচিমিচি—অর্থাৎ কোমল শব্দ আছে।

ঐতিহাসিক Hervey বলেন, "ব্রহ্মদেশের অরণ্য-বাসীদের প্রধান পূজা 'Ancestor worship' ; অর্থাৎ পূর্ব্ব-পুরুষদের পূজা। মেলার দিনের নাম 'Homage Day' —শ্রদ্ধা বা শ্রাদ্ধের দিন। এরা পরীর (Thirtyseven nat spirits-এর) পূজা করে। Nat spirits অর্থ অতি-মানব। প্রকৃতির জীব-জন্তর মধ্যেও যাদের শক্তি আছে (Shakti figures), তাদের নানা রকম পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট

রাখে। বছরে দু-বার করে মেলা হয়।* বিবাহ, উৎসব, পূজা-পার্ব্বণ, এবং পূর্ব্বপুরুষদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সবই মেলার দিনে হয়ে থাকে। 'নাগা'-সর্পকে এরা দেবতা বলে সম্মান করে। নাগা ও চিন্ জাতীয় অরণ্যবাসীদের মধ্যে উৎসবের দিনে নর-বলি দিবার প্রথা আছে। শক্তি-শালী সর্দ্দারের পত্নীত্ব লাভের জন্য মেয়েদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলে। সর্দ্দারের বহু পত্নী ও বৃহৎ গুষ্টি। মেলার দিনে সেরা সুন্দরী (Queen of beauty) সর্দ্দারকে পতিত্বে বরণ করেন। মেলা-ই পার্ব্বত্যদিগের ঐহিক ও পারত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মের স্থান।"

আমরা এই মহা-মেলার নাম দিতে চাই—নিখিল ব্রহ্ম-পার্ব্বত্যজাতির কুম্ভমেলা। ভারতের কুম্ভমেলাতে যেমন জটা-বাবা, ত্রিশূল-বাবা এবং নেংটা-বাবা ইত্যাদি মহাপুরুষের আগমন হয়, এদের এ মেলাতেও প্রত্যেক পাহাড়িয়া জাত থেকে ক'জন করে সর্দ্দার বা মুখ-পাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে আসেন। কাচিন্, চিন্, শান্, পডঙ্, পলঙ্, কুকী, নাগা, ফোন্, মেইজ্ঙ্, লিছ-অ ও আরো কত কি! বিভিন্ন শ্রেণীর হোলেও এদের সাধন-ভজন এক রকম। অবশ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে বিশেষ না হোক্, একটুখানি তারতম্য আছে।

আমরা যখন সিদ্ধাতোয়ায় ফিরে এলুম, তখন রাত বারোটা। 'টর্চ্চ লাইট' ছাড়া আমাদের সঙ্গে বড় বড় মশালও ছিল। বলা বাহুল্য, শীতের প্রাচুর্য্যে সকলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো···এমন কি আমিও।

মেলার পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর আমরা আবার অশ্বারোহী সেজে প্রাতর্ভ্রমণে বেরুলুম। মচ্ছগিরি দূর থেকে দেখতে ঠিক যেন একখানা ছবি। অপূর্ব্ব দৃশ্য! পর্ব্বতমালা ঢেউয়ের মতো উঁচু নীচু হয়ে দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করে, দূরে অতি দূরে চলে গেছে—পাট্কাই, লুসাই ও মণিপুর হয়ে সুদূর হিমালয়ে। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে,—বনস্পতি শাল, সেগুণ আর চন্দন। বাঁশের ঝাড়—তার তো কথাই নাই। বনফুল! কে যেন মস্ত বড় আসরে ফুল-আঁকা রঙ-বেরঙয়ের ইরাণী গালিচা পেতে রেখেছে। সাদা, কালো, সবুজ, সোণালী কত রকমের পাখী। ঝাঁকে ঝাঁকে ময়না আর টিয়া।

মচ্ছ-গিরিতে বাঘ, চিতা, হরিণ, বন্য কুকুর ও অজগর সর্প বাস করে। সাধারণ হস্তী ছাড়া, দু'একটী শ্বেত-হস্তীও মচ্ছ-গিরিতে বাস করেন। তা' হোলেও ব্রহ্মদেশকে ঠিক শ্বেত-হস্তীর দেশ বলা চলে না। ইয়োরোপবাসীরা শ্যাম-



পডঙ-সুন্দরীদের সাজের বাহার

রাজ্যকেই—"The land of the white elephants." বলে নির্দ্দেশ করে থাকেন। শ্যাম-রাজ্য থেকে আনীত শ্বেত-হস্তী ব্রহ্মরাজগণের বড়ই প্রিয় ছিল;—ফুল-মালা দিয়ে, এবং 'পোয়ে'-গান শুনিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখা হ'তো।

মচ্ছগিরির শাখা-পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তর্গত 'নাফে' (Ngape) নামক গিরিপথের অনতিদূরে একটা হাতি ধরবার খাদ্ আছে। সিদ্ধতোয়া থেকে 'নাফে' ও 'এন্' (An) গিরিপথের দিকে পাহাড়িয়া পথ চলে গেছে।

পূর্ব্ব-ঘাট যেমন ব্রহ্মদেশকে চীনরাজ্য থেকে চির-বিচ্ছিন্ন

* আজকাল বছরে দুবার মেলা হয় কি না ঠিক বলা যায় না। তবে দু'-চার বছর পরে পরে অরণ্যবাসীদের কোথাও কোথাও সমাগম হয়। দক্ষিণ শান্ বিভাগে (S. S States) অর্দ্ধ-সভ্যদের শিল্প-প্রদর্শনীর মেলা বছরে দু'বার করে হয়ে থাকে। মিনবু জেলার অরণ্য-প্রদেশে অবস্থিত 'শ্বোয়ে সত্ত' (শ্রীপাদ) তীর্থের মেলাতেও নানা জাতীয় অরণ্যবাসীকে দেখতে পাওয়া যায়; এমন কি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের 'টিপ্‌রা' ও 'নকমাই' শ্রেণীর লোকও আমাদের চোখে পড়েছে।

করে রেখেছে, পশ্চিম ঘাটও ঠিক তেমনই বাঙলা দেশকে "কাছে কাছে, তবু দূরে" করে রেখেছে। এ যেন চিরন্তন প্রাচীর!……দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর থাকা সত্বেও 'এন্' কিম্বা 'টং-আপ' (Taung-up) রাস্তা ধরে মচ্ছগিরির ভেতর দিয়ে, আরাকান্ হয়ে চট্টগ্রামে যাওয়া যায়। ব্রহ্ম-রাজ অনহুথ এন্-গিরিপথ দিয়ে গিয়েছিলেন—'The Indian Land of Bengal'এ অর্থাৎ চট্টগ্রামে।

ব্রহ্মদেশ থেকে বঙ্গ দেশে যে রেলপথ খোল্‌বার প্রস্তাব চল্‌ছে, তা' এন্-গিরি পথ দিয়েই খুলতে হবে। তবে এখানে একটা সুদূর ভবিষ্যৎ-বাণী কাণের কাছে ঝঙ্কার দিতে চায়। ১৯২৫ সালের Sea passengers' billএর হুজুগকে তো চাপা দেওয়া গেছে; রেল-পথ খুল্‌লে ভারতবাসীর সঙ্গে



বৌদ্ধ-মন্দির (সেনেনাম্ পেগোডা)

'land passenger' billএরও বুদ্ধং দেহি বলে মুলাকাৎ হবে কি?—যাক্-গে, ব্রহ্মদেশ যখন ভবিষ্যৎকে মানে না, আমরাই বা কেন তার দুর্ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে মরি!

তবে সুভাবনার দিক থেকে বলতে হোলে, আমার ব্যক্তিগত হিসাবে একটা কথা বল্‌বার আছে। সিদ্ধ-তোয়ায় যে তিন দিন ছিলুম, সে তিন দিন আমার মানস-পটে কেবলি থেকে থেকে ভবিষ্যৎ বারমা বেঙ্গল রেলওয়ের দৃশ্য চিত্রিত হয়ে উঠেছিলো।……আঃ, কি আরাম! ধাঁ করে দেশে ফিরে যাবো …..প্রবাসী বাঙালী আমি,—বিদেশে থেকে বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি স্নেহ-মমতা যেন স্বতঃই জেগে ওঠে! সোণার বাঙলার মাঠ-ঘাট ভাই-বন্ধুদের একবারটী দেখে আসতে ইচ্ছা করে……ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে সেই চিরপরিচিতা নারিকেল-সুপারী-বেষ্টিতা পল্লী-জননীর চরণ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ি।……

থাক্,—সে তো সৈনিকের স্বপন! সে কথা চাপা দিয়ে, এবার পরের কথা দিয়েই উপসংহার করি।……সিদ্ধতোয়ার উপকণ্ঠে যে সব পল্লী আছে, সে সব চিন্ ও কাচিন্‌দের পল্লী। তীর-ধনুকের পূজারী তারা—পার্ব্বত্য কুকুরের মাংস তাদের অতি উপাদেয় খাদ্য। এক একটা কুকুরের বদলে দশ দশ সের হল্‌দি! জিনিষের বদলে জিনিষ নেওয়া তাদের চির-আচরিত প্রথা।

চিন্‌মেয়েরা দেখতে পরমা সুন্দরী। কিন্তু আহা! গায়ে তিলধারণের যায়গা নেই। কেবল উল্কি—আর উল্কি। তাদের উল্কি পরার ইতিহাস বড়ই দুঃখের ইতিহাস। হেলেনের মতো সৌন্দর্য্যই ছিল তাদের প্রধান শত্রু। তাই নিজেদের কুৎসিতা দেখিয়ে, ব্রহ্মরাজগণের আক্রমণ ও অত্যাচারের হাত এড়াবার জন্যে চিন্, কাচিন্, মণিপুরী, আসামী ও কামরূপী মেয়েদের উল্কি পরা!—সে প্রথা চিন মেয়েদের মধ্যে এখনো চলে আস্‌ছে। ব্রহ্ম-বাসীরা, কি সভ্য কি বুনো, সকলেই পুরোদমের রক্ষণশীল (Conservative)—দাদা র-কালের আধা-টুকরা ঢালও সহজে ছাড়তে চায় না।

পুরুষদের গায়েও উল্কি পরার রীতি ছিল, এখনো আছে। পূর্ব্বে বন্দীদের ডান্ হাতে নাম, ধাম ও পদবী (উল্কিতে) লিখে রাখা হতো। ব্রহ্মদেশের অনুকরণে, গ্রাম-রাজ্যের সৈন্যদলও হাতে একটী হস্তী ও ক্রমিক-সংখ্যা (Serial number) ছাপ মেরে (Having tatooed) রাখতো, এখনো রাখে।

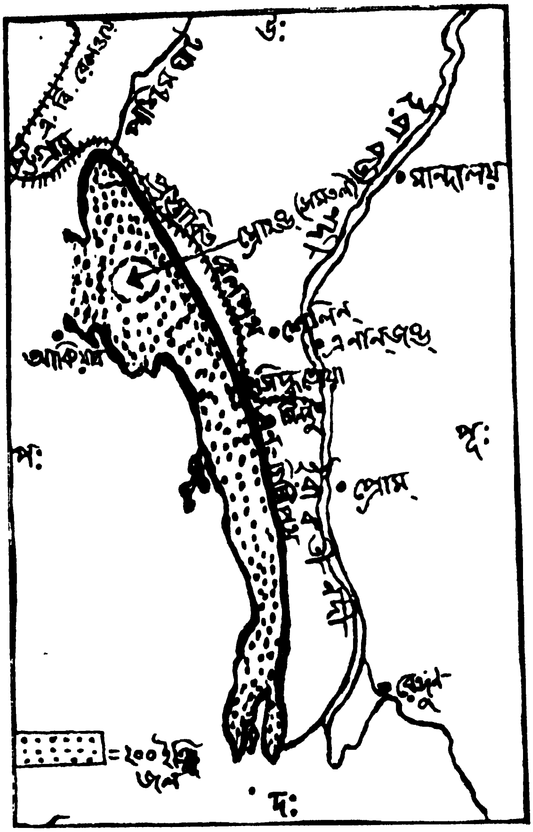
চিন্ ও কাচিন্‌দের বিবাহ-পদ্ধতি আদিকালের মনুষ্য-সন্তানদের মতো। সৎ-মা, সৎ-মায়ের কন্যা, মামাতুতো ও পিসাতুতো বোন্‌দের জীবন সঙ্গিনী করাই এদের সাধারণ রীতি। (সিংহলের 'ভেদ্দা' ও আফ্রিকার নানা অসভ্য-জাতের মধ্যেও এ প্রথা আছে।)

সিদ্ধতোয়ার আশে পাশে বেশীর ভাগ বাসিন্দা চিন্ ও কাচিন্ হলেও, বর্ম্মী যে নেই তা' নয়। সহর-বাসীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বর্ম্মা। সিদ্ধতোয়ার ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর আকাশস্পর্শী বৌদ্ধ-মন্দিরগুলির দৃশ্য অতি চমৎকার। শহরের চারদিকে মন্দিরগুলি যেন মাথা উঁচু করে মৌনী- ভিক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন! বড় বড় ফুঙ্গিচাং ও (বৌদ্ধ ভিক্ষুর আশ্রম);—চাংওয়ের প্রাচীর গাত্রে নানারকমের চিত্তাকর্ষক কাষ্ঠ-খোদাই। খোদাইয়ের মধ্যে হস্তী, ময়ুর, পরী ও দেব-দূতগণের আকৃতিই উল্লেখযোগ্য। চমৎকার নৈপুণ্য! চমৎকার কারিগরী!

সিদ্ধতোয়া থেকে এনান্জঙয়ে ফিরে এসেছি,—সেও হয়ে গেলো অনেক কাল। কিন্তু এখনো ভুলতে পারিনি আশ্রমে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীর, উপাসক-উপাসিকার সমস্বরে সান্ধ্য প্রার্থনা :—(তি সারণ)—

বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি ;
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি ;
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি······তার পর—

·· থাডু, থাডু, থাডু! (সাধু, সাধু, সাধু!) সে কি মধুর ধ্বনি! সে কি মধুর সুর! না,—এখনো ভুলতে পারি না সে সুর—এখনো সে সুর প্রাণকে দোলায়!



মচ্ছগিরি—(গড়ন মৎস্যাকৃতি)

বাপের কাণ্ড

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৌষ মাস। আকাশ নীলাভ। ঘরে বাহিরে কোথাও কোনও শব্দ নাই। গৃহসংলগ্ন আম্রবৃক্ষের ঘনপত্রান্তরালে একটি ঘুঘু কেবল "ঘোঁক্—ঘাঁঘর্ ঘর্—ঘোঁ" "ঘোঁক্—ঘোঁঘর্ ঘর্—ঘোঁ" রবে মধ্যে মধ্যে নিঝুম দ্বিপ্রহরটিকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল। অলস রৌদ্রখানি নিদ্রাকাতর দুষ্ট শিশুর মত এলায়িত দেহে আড় হইয়া গৃহগাত্রে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার ঘড়িতে বাজিল ঢং ঢং ঢং চারিটা।

আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে রায় বাহাদুর শয্যা উঠিয়া বসিলেন। স্বামীর লম্বা হাইতোলার আওয়াজ সংলগ্ন হল্ হইতে গৃহিণী আসিয়া মেঝেয় দাঁড়াইতেই, ছুটবিহা জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুব ঘুমিয়েছি, না?" গলা ভার।

গৃহিণী কহিলেন—"তা' ঘুমুবে না? কা'ল যে সারা রাত্তিরটা একবারে ঠায় বসে' কেটে গেছে! চুরুট এনে দিই?"

"নাঃ, চুরুট এখন থাক্। তুমি শোও নি?"

"শুয়েছিলুম, আমার ঘুমই এলো না।"

"কেন?"

"কে জানে?"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। হাই তুলিতে তুলিতে মুটবিহারী কহিলেন—"এইবার রজনীর চিঠিখানা নিয়ে এস—দেখি বাবাজী কি লিখেচেন!"

গৃহিণীর মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আয়না-দেরাজের মধ্য হইতে পত্রখানি আনিয়া স্বামীর হস্তে দিয়া, বিছানার উপর পা' ঝুলাইয়া বসিলেন।

মুটবিহারী বলিলেন—"তুমিই পড়;—আমার চোখ এখানে নেই; কা'ল রাত্রে গোলমালে কোথায় ফেলেচি, মনে নেই।"

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন—

কলিকাতা

১৩ই পৌষ ১৩৩৩

শ্রীচরণেষু—

মা, কয়েকদিন হইল আপনাদের কোনও সংবাদ না পাইয়া আমরা চিন্তিত আছি। আশা করি, আপনি ও বাবা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

গত পরশ্ব মণি আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন এবং রাত্রে এইখানেই ছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল শীঘ্রই বাহির হইবে। আমরা গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মণি এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ-তে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। এ খবর এক রকম নিট্ খবরই। বোধ হয়, মণিও এ কথা আপনাদিগকে জানাইয়াছেন।

এইবার তো মণির পড়াশুনা সাঙ্গ হইল; বিবাহের উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে। এতদিন তাঁহার বিবাহ দিতে বাবার অমত ছিল এবং মণিও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; এখন আশা করি, আর বাবার অমত হইবে না এবং মণিও বিবাহে স্বীকৃত। এমন কি মণি স্বয়ং তাঁহার বধূও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি ও সুলতা গত কল্য দুপুরে গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া আসিয়াছি।

মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী; যেমন অপূর্ব্ব গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী। বয়স প্রায় পনের বৎসর। গৃহকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে ও লেখাপড়াতেও মেয়েটি অতি চমৎকার। আপনার কন্যা তো ইঁহাকে ভ্রাতৃবধূ করিতে অত্যন্ত উৎসুক। মেয়ের নাম মাধবী। আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, আপনারা এই মেয়ের সঙ্গেই মণির-বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিয়া, যাহাতে আগামী মাঘ মাসের মধ্যেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহারই ব্যবস্থা করেন।

মেয়ের বাপের নাম শ্রীরামকমল চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; নন্‌কোঅপরাশেনের সময় চাকরী ছাড়িয়া এখন স্বরাজ্যপন্থী। আপাততঃ তিনি কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। বর্ত্তমানে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল না। ইঁহার নিবাস কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়। ইনি বরপণ কিছুই দিবেন না,—শুনিলাম, ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। আর দিবার মত তাঁহার অবস্থা বলিয়াও বোধ হইল না। মাধবীই জ্যেষ্ঠা কন্যা; ইঁহার পরে আরও তিনটি অনূঢ়া কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়াটিও বিবাহযোগ্যা। বোধ হয়, অর্থাভাবেই ইনি কন্যাদের বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

তবে রামকমলবাবু অতি ভদ্র ও মহাশয় ব্যক্তি। তিনি নিজে যেমন সুশিক্ষিত, কন্যাগুলিকেও তেমনি সকল রকমে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। ধনী না হইলেও, তিনি নীচ বা কদাচারী যে নহেন—তাহা তাঁহার সহিত সামান্য দু' একটি কথাবার্ত্তা কহিলেই বুঝা যায়।

মোটের উপর এ সম্বন্ধ অবাঞ্ছনীয় নয়। মেয়ের দিক্ হইতে ধরিলে, এমন মেয়ে পাওয়া বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। বিশেষতঃ মণির যখন এই মেয়েকেই একান্ত পছন্দ এবং ইঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মণি যখন বিবাহ করিবেন না বলিয়াছেন, তখন আশা করি, আপনাদেরও এ সম্বন্ধে কোনও অমত হইবে না।

আপনারা আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আজ ১০।১২ দিন হইল অনু এখানে আসিয়াছে। সে পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। আমরা ভাল আছি; শীঘ্র আপনাদের কুশল সহ পত্র দিবেন। ইতি—আপনাদের স্নেহের রজনী।

পত্র পাঠ করিয়া গৃহিণী স্বামীর অভিমতের জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন।

হুটবিহারী গম্ভীর মুখে কহিলেন—"দাও তো একটা চুরুট। শরীরটা বড় ম্যাজ-ম্যাজ করচে, মাথাও ধরেচে—জ্বরে না পড়ি আবার।"

গৃহিণী চুরুট, দিয়াশলাই ও ছাইদান দিতে দিতে কহিলেন—"নাঃ—ও সব মনে করো না! তোমার ও-রকম রাত টাত জেগে অত্যাচার করা তো অভ্যেস নাই। শরীর একটু খারাপ হবে বৈ কি?"

গতকল্য রাত্রে হুটবিহারীর বিশিষ্ট বাল্যবন্ধু ঢাকার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট জগন্নাথবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, উভয়েরই তাঁহার গৃহে রাত্রি জাগরণ হইয়াছে; তজ্জন্য দুইজনেরই শরীর ও মন দুই-ই তত ভাল নাই।

কর্ত্তা নীরবে জানালা দিয়া বাগানের পানে চাহিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। গৃহিণী সবিনয়ে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা'হলে বল, তোমার মত কি? জামাই এত খুঁটিয়ে যে ছ'পাতা একখানা চিঠি লিখেছেন, তার কিছু উত্তর দিতে হবে তো?"

কর্ত্তা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন—"বাবাজী হাইকোর্টের উকীল কি না? তাই মুশোবিদেটা ভালই করেচেন। কিন্তু তাঁর কেস্ যে বড় খারাপ।"

এই বলিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীকে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইলেন। গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার মুখবর্ণ পাংশু হইয়া গিয়াছিল। সকাতরে জিজ্ঞাসু-ভাবে স্বামীর মুখপানে নীরবে কেবল চাহিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর আত্মপ্রসন্নভাবে কহিলেন—"এ বিয়ে হতে পারে না; অন্ততঃ আমি বেঁচে থাক্‌তে তো নয়ই।"

গৃহিণী সভয়ে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

"কেন? তবে শোন। প্রথমতঃ—আমি এ পীরিতের বিয়েতে নিতান্ত নারাজ। তার কারণ, একে তো আজকাল-কার ছেলে, তাতে উপন্যাসের নায়িকা বউ—অবশেষে নিজের ছেলেটি পর্য্যন্ত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে? আর, বউ যে পরের মেয়ে সেই পরের মেয়েই র'য়ে যাবেন। দ্বিতীয়তঃ—বেয়াই হচ্ছেন কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক, স্বরাজী,—নিশ্চয়ই খুব খদ্দর-টদ্দর পরেন, সভা-টভায় বক্তৃতা দেন,—নন্‌কোঅপারে-শনের একজন পাণ্ডা; গবর্ণমেণ্টের একজন প্রকাশ্য শত্রু। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌তে গেলে এই ছাব্বিশ বছরের ১২০০৲ টাকা বেতনের চাকুরীটির গায়ে জল দিয়ে, বাকী দিনগুলি পুত্র-পুত্রবধূর প্রেমালাপ শ্রবণ করেই কাটাতে হবে। তাতে আমি একবারেই প্রস্তুত নই। তৃতীয়তঃ—এমন ঘরে বিয়ে কর্‌লে মণিরও ভবিষ্যৎটি বেশ ঝর্‌ঝরে হয়ে যাবে; অর্থাৎ সরকারী চাকরী আর তার হবে না। তখন পুত্র বধূকে খাওয়াবেন কি? চতুর্থতঃ—কায কর্‌তে হয় সমানে সমানে। কোথায় আমি, আর কোথায় সেই লক্ষ্মীছাড়া ভ্যাগাবণ্ড, হা' ঘরে'—ঘরে যার অন্নভক্ষ্যোধনুর্গুণ! শুধু ছেলের লভ্ দেখলে ত' চল্‌বে না—একটা সমাজ ও লোকাচার আছে ত? লোকে আমায় বল্‌বে কি? পঞ্চমতঃ—আমার ঐ এক ছেলে। তার বিয়েতে কিছুই নেব' না? কেন? পাঁচ পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিলুম,—যথাসর্ব্বস্ব পুঁজি ভেঙে গড়ে' ফী মেয়ে পিছু পাঁচ পাঁচ হাজার করে' খরচ কর্‌লুম—জানো তো? ছেলেকে এত পয়সা খরচ করে পড়ালুম—কেন, তার কিছুও উশুল কর্‌ব না? কোন্ বরের বাপ টাকা না নেয়? এমন নয় যে আরও ২।৩ টা ছেলে আছে, একটার বিয়ে না হয়, অমনিই দিলুম। রজনী আজ শালার হয়ে ছ'পাতা চিঠি লিখেছেন,—কৈ, তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন নিজের বাপকে এম্‌নি একটু ধর্ম্মকথা শোনাতে পারেন নি? আমার মেয়ে কিসে হীন ছিল? তার পর, ক'ল্‌কাতার সব লোকদের বিশ্বাস নেই—ওরা না পারে এমন কার্য্যই নেই। আমি জানি—একজন নমঃশূদ্র একবার বামুণ সেজে এক বামুণের মেয়ে বিয়ে করেছিল। তাই নিয়ে খুব একচোট মকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার কিন্তু ক'লকাতার বামুণের হাতে জল পর্য্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হয় না! হিঁদুয়ানী ওদের কিছুমাত্র নেই।"

যুক্তিগুলি গৃহিণীর মনে লাগিলেও, তিনি প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল—সেই যে সুন্দর মুখখানি, যাহা তাঁহার একমাত্র পুত্র এত ভালবাসে, তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়? পুত্র যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে, সে তো পুত্রবধূ হইয়াই গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কল্‌কাতায় কি তবে বামুণ নেই? এ যে তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। শুন্‌লে গা' জ্বলে যায়।"

রায় বাহাদুর হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্—পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের ডেপুটি-পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল। হাকিম—মেজাজ কড়া। চিরকাল পোষ্ট আফিসের মেষপালের

উপর হাকিমী করিয়া তাঁহার মেজাজটাই হইয়া গিয়াছিল অন্য রকমের। অপরাপর উচ্চপদস্থ হাকিমেরা অনেক সমালোচনা, প্রতিবাদ তর্ক সহেন; তাঁহাদের কৃত কার্য্যের অপ্রীতিকর সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে বিপন্নও করিয়া তোলে; কিন্তু ডাকঘরের হাকিমদের এসব বালাই নাই। তাঁহাদের কথাই আইন, ইচ্ছাই বিধি, বিচারই ন্যায়। চোখ রাঙাইয়াই তাঁহারা কার্য্য লইতে অভ্যস্ত। কাজেই জামাতার পত্রে যে বিরক্তি ধূমায়িত হইয়াছিল, পত্নীর রূঢ় প্রতিবাদে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কারণ, কতক স্বভাবে কতক অভ্যাসে কাহারও প্রতিবাদ রায় বাহাদুর সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল, কর্ণমূল রাঙিয়া উঠিয়াছিল, নাসাগ্র স্ফীত হইয়াছিল; রুক্ষ কর্কশ স্বরে কহিলেন—"তুমি মূর্খ মেয়েমানুষ, হিন্দুশাস্ত্রের কথা কি ছাই জান কিছু? ক'ল্‌কাতার বাসিন্দা বামুণরা সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না, খেতে বসে' গণ্ডুষ করে না, শৌচে বসে' কাণে পৈতে দেয় না, শিখাও ধারণ করে না। তারা ময়রার দোকানের পকান্ন খায়, বাজারের শিঙ্গাড়া-কচুরী খায়, কশাইয়ের দোকানের মাংস খায়, কলের জলে ঠাকুর-দেবতার সেবা-পূজো করে, ঐ জলে ভোগ পর্য্যন্ত দেয়। তারা এনামেলের বাসনে সয়ে, ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া কাপড়েই সব কাজ করে, ঘুম থেকে উঠেই মুখ না ধুয়ে চা' খায়, ছত্রিশ জাতের জল সুদ্ধ দোকানের খিলি পাণ খায়, সোডা লেমনেড্ খায়, গঙ্গা নেয়ে মুসল্‌মানের গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফেরে—এমন কি, বামুণের ছেলে পৈতে গ্রন্থি দিতে পর্য্যন্ত জানে না! এই তো ক'ল্‌কাতার বামুণ! ছিঃ—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে মোটে দুইটি প্রাণী, কর্ত্তা ও গৃহিণী—অবশ্য ঝি-চাকর বাদে। কর্ত্তার বয়স ৫৩, গিন্নির ৪৫ বৎসর। বয়স হইলে কি হয়, গুটুবাবুর স্বাস্থ্য এত সুন্দর, সবল ও পুষ্ট যে, তাঁহাকে দেখিলে সহসা কেহ পঁয়তাল্লিশের অধিক অনুমান করিতে পারিত না। শক্ত সতেজ উন্নত বপু, দীর্ঘ অবয়ব, পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, নিত্য-ক্ষৌর-মসৃণ প্রশস্ত গণ্ডযুগলের নীচে বিস্তৃত মুখমণ্ডলের সীমানির্দ্দেশক উভয়দিকস্থ স্থূল যুগ্ম-অস্থি, রায় বাহাদুরের নিটোল স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দিত। মাথা-জোড়া চক্‌চকে টাঁকখানির নীচে, পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িয়াছে একটি নাতিস্থূল শিখা।

তিন দিন-রাত্রি ধ্বস্তধ্বস্তি করিয়াও স্বামীর মত ফিরাইতে না পারিয়া, গৃহিণী আর এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া, সারাদিন মৌন বিরসভাবে কাটাইতেছিলেন। তবুও নিস্তার নাই। যতই মনে করিতেছেন যে, উগ্রপ্রকৃতি, কোপনস্বভাব, মদগর্ব্বিত স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কোনই সুফল ফলিবে না, বা একবার যাহা 'না' হইয়াছে, তাহা আর 'হাঁ' হইবে না—তবু তাঁহার মন কিছুতেই শান্ত হইতেছিলনা। একদিকে একগুঁয়ে পতির অমত, অন্যদিকে একমাত্র পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যের দোটানায় তাঁহার মনটা আকুল হইয়া উঠিল। আজ ৩২ বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া এই প্রৌঢ় বয়সে গৃহকর্ত্রীর স্বর্ণসিংহাসনে একছত্রাধিষ্ঠাত্রী হইয়াও তিনি কি জানেন না যে তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য নাই, তাঁহার কোনও কার্য্যে স্বাধীনতা নাই, তিনি এ বাড়ীর কেহই নহেন? তিনি জানেন, তবু মন মানে না। স্বামীর ঈদৃশ দুর্বিনীত অনধিকারে তাঁহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে না পাইয়া, কখন কখনও তিনি বিদ্রোহী হইতেন বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। কাজেই এই আসন্ন বার্দ্ধক্যেও পত্নীর প্রীতির পিছনে ভীতির একটা ঢেউ লাগিয়া', মধুর দাম্পত্য রসধারাটিকে কখনই অবাধ, সহজ এবং সহৃদয় হইয়া উঠিতে দেয় নাই।

রাত্রি সাড়ে আটটা। রায় বাহাদুর সাতটা হইতে সন্ধ্যায় বসিয়াছেন, নয়টায় উঠিবেন। গৃহিণী নিঃসঙ্গ-বিরূপ মনটি লইয়া কেবলই চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক—একবার রান্নাঘর, একবার ভাঁড়ার-ঘর করিয়া মিছে কাজে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, কোনও রকমে সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই—ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" বলিতে বলিতে রায় বাহাদুর আহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া গায়ে শাল জড়াইয়া পায়ে কাষ্ঠপাদুকা দিয়া বাহিরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চা ভিজাইতে দিয়াছিলেন, চা ও দুইটি সন্দেশ দিয়া জায়গা করিয়া দিলেন।

চা পানান্তে গরদ ছাড়িয়া সূতী কাপড় পরিয়া পাণ

চিবাইতে চিবাইতে রায় বাহাদুর উপবেশন কক্ষে বসিলেন। ভৃত্য তাওয়া দেওয়া তামাক দিয়া গেল।

গৃহিণী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া—ম্লান মৌন বিষণ্ণ গম্ভীর।

উভয়েই নীরব। গৃহিণী কহিলেন—"তা' হ'লে রজনীকে লিখে দিই যে ওখানে বিয়ে হবে না।"

মুটবিহারী কহিলেন—"হাঁ, তাই দিও।"

"কিন্তু ছেলেটা এতে একবারে মুষ্‌ড়ে যাবে। বড় আশা ভঙ্গ হবে।"

কর্ত্তা বিচক্ষণ ভাবে মাথা দোলাইতে দোলাইতে কহিলেন—"এখন তাই বল্‌চ' বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার তুমিই অন্ত-রকম বল্‌বে। যখন, আপাদ-মস্তক সোনা হীরেয় মোড়া রাঙা টুকটুকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত একটি বৌ এনে দেব, তখন কোথায় থাকবে তোমার ছেলের এই লভ্‌, আর কোথায় বা থাক্‌বে ছেলের মায়ের আজ্‌কের এই খেদোক্তি।"

গৃহিণী সম্বৃত অশ্রু-রুদ্ধ অভিমানে কহিলেন—"হাঁ, তা' কর্‌বে বটে, তবে আমি দেখতে পাব' না। কবে জগন্নাথ-বাবুর স্ত্রীর মতন অম্‌নি পুট্‌ করে মরে' যাব, এত সাধের ছেলের বোয়ের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাব না।"

কর্ত্তা কিঞ্চিৎ উষ্ণ ভাবে কহিলেন—"কি বিপদ! ছেলের বিয়ে কি পালিয়ে যাচ্ছে? মেয়ের বিয়ের জন্তেই লোকে উতলা হয়, জানি, কিন্তু ছেলে যে অরক্ষণীয় হয়, তা তো জান্‌তুম্‌ না।"

গৃহিণী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—"আমার কেবলি মনে হচ্ছে যে, শীগগির মণির বিয়ে না হলে, তার বৌ দেখা আমার অদেষ্টে ঘট্‌বে না! আমি আর বেশী দিন বাঁচব না—"

মাথার উপরে একটি টিক্‌টিকী করিল—টক্‌ টক্‌ টক্‌।

গৃহিণী কহিতে লাগিলেন—"ঐ দেখ, সত্যি সত্যি! ঠিক জানি আমি, এই স্বামীপুত্তুর সাজানো গোছান ঘর-গেরস্থালী ফেলে জগন্নাথবাবুর স্ত্রীর মত আমায় যেতেই হবে—মণির বৌ দেখা আমার ভাগ্যে নাই; কথায় টিক্‌টিকী পড়েচে, দেখলে ত?"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন "টিক্‌টিকী তো মণির মামা নয়? যার যেখানে ভবিতব্যতা, তার সেখানে ঠিক সেই দিনে বিয়ে হবেই—বৃথা চিন্তা গিন্নি, বৃথা চিন্তা।"

এমন সময় ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া প্রভুর হস্তে দিয়া দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুর টেলিগ্রাম পড়িয়া কহিলেন—"মণি তার কর্‌চে, গেজেট বের হয়েচে—রজনীর খবরই ঠিক। কিন্তু রজনী বড় কাহিল।"

গৃহিণী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বিস্মিত আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি গো? রজনী কাহিল কি?" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

মুটবিহারী বাধা দিয়া কহিলেন—"কেঁদ'না—তুমি চোখের জল ফেল্‌লে মেয়ে জামাইয়ের অমঙ্গল হবে।"

"ও গো আমায় কলিকাতায় রেখে এস—আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করচে। হে মা কালীঘাটের কালী, হে বাবা ধর্ম্মরাজ, বাবা বুড়োরাজ, তোমাদের সাড়ে ষোল আনার পূজো দেব' বাবা—আমার রজনীকে শীগগির নীরোগ করে দাও"—বলিয়া আকুল হইয়া গৃহিণী বারম্বার দেব-দেবীর উদ্দেশে যোড় হস্ত কপালে স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা গৃহিণীকে নানা প্রবোধ দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বিফলকাম হইলেন, তখন অগত্যা কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রক্ত-চাপ (Blood pressure) বাড়িয়া অকস্মাৎ সেদিন কাছারীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাওয়া অবধি, রজনী শয্যাশায়ী। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি নাই। রোগী বিপন্মুক্ত, তবে বড় দুর্ব্বল।

তিন দিন পরে রায় বাহাদুর ঢাকায় ফিরিয়া গেলেন। গৃহিণী কন্যা জামাতার গৃহে রহিয়া গেলেন; ইচ্ছা—ইঁহাদিগকে লইয়া তিনি একসঙ্গেই ঢাকায় ফিরিবেন; কারণ,—ডাক্তারেরা রজনীকে অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দিন বাহিরে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন।

এক সপ্তাহ কাটিল। রজনী অনেক সুস্থ। দ্বিপ্রহরে রজনীর ঘরের মেঝেয় সুলতা, গৃহিণী ও রজনীর কন্যা অনুপমা বসিয়া, রজনীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন।

গৃহিণী সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' এ বিষয়ে মণিকে তুমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবা ?"

রজনী। হাঁ মা ; কাল সকালে আমি তাকে হাস্‌তে হাস্‌তে একটু আভাষ দিয়েছিলাম ; কিন্তু তাতে সে কোনও উত্তর দেয়নি। তবে তার মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া বেশ স্পষ্টই দেখা গেল।

গৃহিণীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল হঠাৎ মসীময় হইয়া গেল। শ্বশ্রূকে নীরব দেখিয়া রজনী কহিলেন—"দেখুন মা, বাবার যখন এ বিষয়ে অমত, তখন আপনি এ বিষয় বেশী পীড়াপীড়ি করবেন্ না। তাতে ফল ভাল হবে বলে' বোধ হয় না। শেষে এই নিয়ে আপনাদের তিন জনের মধ্যে দুটো ভাগ হবে, আর এতে করে' সংসারে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে উঠবে। তাতে কেউ সুখী হতে পার্‌বেন্ না।"

গৃহিণী অশ্রুভারাবনত নয়নে কহিলেন—"তা'তো বুঝ্‌লাম বাবা; কিন্তু আমি দাঁড়াই কোথা ? এক দিকে উপযুক্ত ছেলে, অন্য দিকে স্বামী। দুইজনের গোঁ দুই দিকে—আমি কোন্ দিক্ সাম্‌লাই ? আমার মরণটা হয় তো আমি বাঁচি।"

সুলতা। তুমি একবার মণিকে সব বুঝিয়ে বলে' দেখ না, মা! যদি মত বদ্‌লায়—

রজনী বাধা দিয়া কহিলেন - "তেমন ত মনে হয় না। এ যে বড় মুস্কিল। যে কথা টথা বেশ কয়, তার মনের একটা ঠিকানা মেলে ; কিন্তু যে অত্যন্ত অল্পভাষী, তার মনের ভাব বোঝা যে ভগবানেরও অসাধ্য। আমার বিশ্বাস, কম কথা-কওয়া লোক বড় সঙীন্ হয় ; তাদের মত ফেরানো দুঃসাধ্য। তবে আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আর আপনি যখন এসে গিয়েচেন তখন আমাদের ছুটি—যা' কর্‌তে হয়, আপনিই করুন।"

গৃহিণী হতাশ ভাবে কহিলেন—"তবেই তো বেশ মুস্কিলে ফেল্‌লে, বাবা !" গৃহিণী বুঝিলেন, জামাইয়ের কথা রক্ষিত না হওয়ায়, অভিমান হইয়াছে।

অনুপমা এই ফাঁকে কহিল—"কৈ,তুমি মামীকে একবার দেখ্‌তে যাবে না, দিদিমা? রোজই বল' যাব ; কিন্তু তোমার অবসর আর হয় না বুঝি ? এ সবে এত গরিমসী কর্‌লে হয় ?"

রজনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"এ মেয়েটা একটা আস্ত পাগল! গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! কোথায় তোর মামার বিয়ে, যে মামীকে দেখতে যাবি ?"

ভাবী বধূকে দেখিতে আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগের কৌতূহল নিতান্ত স্বাভাবিক। গৃহিণীরও মেয়েটিকে দেখিতে খুব ইচ্ছা হইলেও, এরূপ স্থির অনিশ্চিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। কিন্তু দৌহিত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি মেয়েটিকে একদিন দেখিয়া তবে ঢাকায় ফিরিবেন, স্থির করিয়াছেন। অনুপমাও তাহার ভাবী মাতুলানীকে দেখে নাই ; অথচ তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী টুনী ও বেলার যে সে সৌভাগ্য হইয়াছে, ইহাতে সে তাহার ভগিনীদের কাছে খুবই ছোট হইয়া আছে। কতবার সে তাহার জননীকে বলিয়াছে ; কিন্তু সুলতা এই গর্ব্বিণী কন্যাকে বাহিরে যাইতে দিতে নিতান্ত নারাজ। এখন মাতামহীর অভয় পাইয়া সে একদিনও বিলম্ব করিতে পারিতে ছিল না। যতই হউক্, এখনও সে বালিকা—বয়স তো পনের বৎসর।

পিতার শ্লেষ বাক্যে অনুপমা দমিল না। কহিল—"আচ্ছা দিদিমা, আমাদের দেখ্‌তেই বা দোষ কি ? বিয়ের আগে যে হাজারটা কনে' দেখা হয়, বিয়ে তো একটারই সঙ্গে হয়। আমাদের সব্বারি যদি মেয়ে পছন্দ হয়, তবে আর দাদামণির আপত্তি কিসের ? তুমি না পার, বাবা না পারেন,—আমি বল্‌লেই দাদামণি মত দেবেন।"

দৌহিত্রীর সরলতায় গৃহিণী না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন—"মোগল পাঠান হদ্দ হল' ফার্‌সী পড়্‌বে তাঁতী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীকে দেখিয়া অবধি গৃহিণীরও ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন নয়—উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন রামকমল বাবুর বাড়ী গিয়া, মাধবীকে আদর করিয়া, কোলে বসাইয়া, কত শিখাইয়া কত কল্পনা করিয়া, তাঁহার আশা যেন মিটিতেছিল না।

দ্বিপ্রহরে রামকমলবাবু প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন না ; কাজেই ভাবী বৈবাহিকার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা তামাসা করিয়া গৃহিণীর দুপুরগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। অনুপমাও মনের মত একটি সঙ্গিনী পাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল ; কারণ, পিত্রালয়ে আসিলে তাহার সঙ্গী বড় জুটে না। কালে-ভদ্রে ছাদে উঠিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ীর দুই একজন মেয়ের সঙ্গে দুই একটি আলাপ করে ; কিন্তু তাহাতে কি সাধ মেটে ?

এখন যে তাহার অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যেরই বয়স। বাহুল্যই যে যৌবন।

গৃহিণী পরিচয় লইয়া অবগত হইলেন, রামকমলবাবু ইঁহাদের পাল্টা ঘর। ইনি ইতিপূর্ব্বে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; অসহযোগ-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া চাকরী ও এম্-এ উপাধিটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ জন্য, মেনকা-রাণী স্বামীর উপর অগ্নিশর্ম্মা এবং তাঁহার যে উনচল্লিশ বৎসর বয়সেই দ্বিসপ্ততিতম বৎসর বয়সোপযোগী বুদ্ধি লাভ হইয়াছে, ইহা তিনি সকলকেই যেমন বলিয়া থাকেন, ভাবী বৈবাহিকা ঠাকুরাণীকেও তেমনি জানাইতে ভুলিলেন না।

রামকমলবাবু দিবা রাত্রি সভাসমিতি, চরকা, খদ্দর, সূতা, খাতাপত্র, হিসাব প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। গৃহে আসেন খাইতে,—তাহাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না—এবং শয়ন করিতে, যদিও মাসের মধ্যে পনের দিন তিনি থাকেন হয় চট্টগ্রামে, নয় দার্জ্জিলিংএ, কিম্বা শবরমতী আশ্রমে। কাজেই সংসারের সমস্ত ভার পত্নী মেনকারই উপর।

মেনকার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মাঝপুরের জমীদার। রামকমলবাবু অতি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জয়গোপাল বাবুর আশ্রয়ে আসিয়াই মানুষ হয়েন; এবং তাঁহারই অর্থসাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পটলডাঙ্গার এই ভাঙা একতাল বাড়ীটি রামকমলবাবুর পৈত্রিক ভিটা।

ইদানীং, স্বামীর ঈদৃশ স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণে তিনি স্বামীর উপর অত্যন্ত বিরূপ। মেনকা স্বামীকে তাঁহার পিতার অন্নে পালিত বলিয়া চিরকালই একটু নেক্‌নজরে দেখিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার পিতার তাবৎ অর্থ ব্যয়ের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া রীতিমত শাসন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রামকমল বাবু পত্নীকে চিনিতেন, তিনি নির্ব্বিকার। মেনকা বকিত, রাগিত, কাঁদিত; আবার আপনা-আপনিই চুপ করিত।

সেদিন হেস্ত-নেস্ত একটা সদুত্তর লইবেনই স্থির করিয়া ভোজনরত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, বাইরে এত বক্তিমে করে' বেড়াও, আর ঘরে এলেই মুখে অমন গুয়ো দাও কেন?"

সহাস্যে রামকমল কহিলেন—"কারণ, বাইরে আমি কর্ত্তা, ভিতরে যে আমি কর্ম্ম।"

মেনকা কি বুঝিল জানা গেল না; উষ্ণভাবে কহিল—"আর কর্ত্তা সাজতে হবে না! দু'পয়সা আন্‌বার ক্ষ্যামতা নেই,—কর্ত্তা! বাবা যে পয়সাগুলো তোমার পেছনে খরচ করেচেন, সেগুলো যদি এমন অপব্যয় না করে' আমার হাতে দিয়ে যেতেন, তা'হলে আমার আজ এত কষ্ট হ'ত না!"

রামকমলবাবু জানিতেন ইহা ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ; তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কোনও রকমে আহার সারিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচেন।

মেনকা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে ধরা-গলায় কহিলেন—"নিজে একখানা ভাল কাপড় কি গয়না কখনও চোখেও দেখ্‌লাম না, তার জন্যে দুঃখু করি না, কিন্তু মেয়েগুলোকে নিয়ে পর্য্যন্ত যে কখন একটু সাধ-আহ্লাদ করতে পেলাম না, এ কষ্ট আমার ম'লেও যাবে না।—মেয়েমানুষ কাপড়-গয়না পর্‌বে না, কেবল বই পড়লেই, জাকাপড়া শিখ্‌লেই স্বগ্‌গে যাবে। মেয়েরা যেন দর্জ্জির দোকান করবে, আর নয় আপিসে চাকুরী করতে যাবে।"

মাধবী পিতার ভাতে হাওয়া করিয়া মাছি খেদাইতেছিল; ছোট মেয়ে তিনটি স্কুলে গিয়াছে। রামকমল দেখিলেন, বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী। তাই বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, কি বল্‌বে তাই সোজা করে' বল্‌লেই ত' হয়! ভূমিকা ছেড়ে, এখন কি বল্‌বে তাই শীগগির বলে ফেল।"

মেনকা বিপত্নীক ধনী পিতার আদরিণী কন্যা ছিলেন। পিতার নিরতিশয় গোঁড়ামির দরুণ মেনকার নৈতিক, সামাজিক বা ব্যবহারিক শিক্ষা কিছুই হয় নাই। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিবার সুযোগ হয় নাই; কারণ, জমিদার-কন্যার পক্ষে, যাহা চাকর-দাস-দাসীর কর্ত্তব্য, এমন কোনও কার্য্য, জয়গোপাল বাবু অত্যন্ত গর্হিত বিবেচনা করিতেন। এমন কি, রামকমলবাবু ডেপুটি হইয়া প্রথম স্ত্রীকে বিদেশে লইয়া যাইতে চাহিলে জয়গোপাল বাবু বড় প্রসন্ন মনে সম্মতি দেন নাই। পরে কন্যাকে সেমিজ পরিতে ও চা পান করিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময় চটিয়াছিলেন। তার পর নিরক্ষরা পত্নীকে কিঞ্চিৎ বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত জামাই যখন একজন খৃষ্টান মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিলেন, তখন আর জয়গোপালবাবু স্থির থাকিতে পারেন নাই। নিশ্চিত জাতিভ্রংশ ঘটিবার আশঙ্কায় কন্যাকে গৃহে আনাইয়া রাখিয়া

দিয়াছিলেন। রামকমল শ্বশুরের ঈদৃশ আচরণে মনে মনে যথেষ্ট ব্যথিত হইলেও, প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করেন নাই—কেবল সর্ব্বদা স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য ও শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার খাতিরে। জয়গোপাল বাবু আজ আট বৎসর মারা গিয়াছেন।

মেনকা একটা প্রচণ্ড ঝাঁজের সহিত কহিল—"বল্ব আবার কি, দেখ্তে পাচ্ছ না? শ্যামবাজার থেকে রোজ রায়-বাহাদুর-গিন্নী আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসেন; তুমি নিজে মেয়ের বিয়ের কিছু কর্‌চ না;—অথচ, ভগবান্ যদি একটা সুপাত্র মিলিয়ে দিলেন, তা'ও বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। তিনি ভাববেন কি? এমন হাবাতে ঘরের মেয়ে যে গায়ে গয়না তো এক টুক্‌রো নেই-ই, পরণে একখানা ভাল কাপড়ও কি জোটে না? ঐ চট পরে' কি লোক-জনের সাম্‌নে মেয়ে বার করা যায়? তাই বল্‌ছিলাম, একজোড়া ভাল দেশী ঢাকাই কি ফরাশডাঙ্গাই শাড়ী, লেস্-বসানো ভাল দু'টো সেমিজ, আর খান দুই ভাল গন্ধ সাবান্ আজ এখুনি এনে দিয়ে তবে বেরিয়ো।"

রামকমল বাবু মাধবীর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তস্থিত ডিবার একটি বাটি হইতে কিছু সুপারি মশলা লইয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খদ্দর পর্‌তে কি তোমার বিশেষ কষ্ট হয়, মা? সত্যি বল, তা'হলে অন্য ব্যবস্থা করি।"

মাধবী পিতার প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া কহিল—"না বাবা, কোনও কষ্ট নেই। মা'র কথা শোনেন কেন?"

এই প্রিয়ভাষিণী স্বল্পবাদিনী মাধবীকে নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে রামকমল বাবু বহুদিন হইতে সচেষ্ট। কন্যাও পিতার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত বুঝিত এবং পিতৃ-ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইত।

পিতা-পুত্রীর মনের গোপন কথাটি উভয়েই বুঝিল। রামকমল বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে যথানিয়ম বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মেনকা রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে কহিলেন—"বাপ-সোহাগী মেয়ে, যাও, বাপের কাছেই যাও। মেয়ে যেন দিন দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্‌চেন্। আ-মর—'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!' আমি গেলাম ওরই ভাল কর্‌তে, বলি মর্‌চে চট্ টেনে টেনে; ওমা, আমারই উপর তাল? এইবার হ'তে তুই মরে' গেলেও আর আমি তোর জন্যে কিছু বল্‌ব না, বল্‌ব না, বল্‌ব না—এই তিন সত্যি কর্‌লাম।"

মাধবী মায়ের রাগ জানিত। এ প্রকার তিলকে তাল পাকাইয়া প্রগাঢ় দাম্পত্য-প্রেমালাপ পিতামাতার সাক্ষাৎ হইলেই হইত; এবং শেষ গদাঘাত গিয়া মাধবীর উপরেই পড়িত। মাধবী ইহাতে চিরদিন অভ্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক কাল নানা অকারণ সকারণ স্বগত খেদোক্তি করিয়া মেনকা দালানে আসিয়া বসিতেই, দুয়ারে ঘোড়ার গাড়ী আসার শব্দ হইল।

"কই গো বেয়ান্ কোথায়" বলিয়া রায়বাহাদুর-গৃহিণী, সুলতা ও অনুপমার সঙ্গে সহাস্যমুখে পান চিবাইতে চিবাইতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, মেনকা তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে লইয়া গিয়া বসাইল।

গৃহিণী কহিলেন—"আজ আমরা রাত্রের গাড়ীতে ঢাকা যাচ্ছি, ভাই; বেশীক্ষণ আজ আর বস্‌তে পাব না। এক্ষুনি যাব।"

মেনকা পানের ডিবা ও জর্দ্দার কৌটাটি আনাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, হঠাৎ?"

গৃহিণী মুখে পান দিতে দিতে উত্তর করিলেন—"হঠাৎ কোথা, ভাই? রজনীর শরীর খারাপ, তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই তো আমি বসে'। এতদিনে বাবাজীর হাতের কাজ ফুর্‌লো বলে' আজই যাচ্ছি। ওদিকে তোমার বেয়াইয়েরও তো অনেক অসুবিধা হচ্ছে"—

মেনকা "তা' বটে" বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কহিল—"আপনি ছেলের মা হয়ে এতদিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন; আর আমি মেয়ের মা, একদিনও আপনার কাছে যাবার অবকাশ কর্‌তে পার্‌লাম না। যে আমাদের বাড়ীর লোক! এই দেখুন না—এই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—"

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"এতে আর 'কিন্তু' কি বোন্? তুমি একা মানুষ, ছেলে-পিলে নিয়ে ফুর্‌সুৎ কর্‌তে পার না, যাও না;—আমার কাজকর্ম্ম নেই, আমি আসি। এতে আর লজ্জা কি?"

মেনকা আপ্যায়িত হইল; তাহার মনে একটা খট্‌কা

বাজিত, সেটা গৃহিণীর সহৃদয়তায় নিঃশেষে বিনষ্ট হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"বেয়াই মশায়ের পত্র পেলেন? তিনি মত করেচেন?"

গৃহিণী সতেজে কহিলেন—"না, এ সম্বন্ধে কিছুই তিনি লেখেন নি; তবে, তোমার মেয়েকে আমি নেবই, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

মাথার উপরে টিক্‌টিকী শব্দ করিল। মেনকা ও গৃহিণী উভয়েই মাটিতে তিনটি টোকা দিয়া হাতটি কপালে ঠেকাইলেন। মেনকা কহিল "সত্যি সত্যি। তবে দু'টোর হাত যতক্ষণ এক না হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না, বেয়ান্। প্রজাপতির ইচ্ছে—তিনি যা' করেন—" সুলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

গৃহিণী ডাকিলেন—"মাধবী, কোথায় গেলে মা? এক-বারটি এখানে এস তো?"

কক্ষান্তরে মাধবী ও অনুপমা গল্প করিতেছিল। গৃহিণীর ডাক শুনিবামাত্র দুইজনেই দরদালানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী কহিলেন—"এস মা, এইখানে একটু বস।" বলিয়া নিজের দক্ষিণ দিকের স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। মাধবী আস্তে আস্তে সেইখানে গিয়া বসিল।

"কবে যে আমার ঘরে আস্‌বে মা, তাই হয়েচে আমার এখন দিবারাত্রের চিন্তা" বলিতে বলিতে গৃহিণী তোয়ালে-জড়ানো একটা পুঁটুলি হইতে একটি ঝক্‌ঝকে চাম্‌ড়ার কৌটা বাহির করিলেন; সেটি খুলিয়া একগাছি হীরকখচিত নেক্‌লেস্ বাহির করিয়া মাধবীর গলায় পরাইয়া দিয়া সস্নেহে ভাবী পুত্রবধূকে চুম্বন করিলেন।

মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। একটু সাম্‌লাইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ভাবী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

মেনকা অবাক্ হইয়া এই সব দেখিতেছিল; তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা ফুটিতেছিল না।

সুলতা মাতা-পুত্রীর আচ্ছন্ন ভাবটা ভাঙাইবার জন্য পরিহাস করিল—"আচ্ছা, মাধবী, তুই কি বেইমান্! আমি হচ্ছি তোর বড় ননদ, আর আমাকে তোর গেরাহ্যি হচ্ছে না? দাঁড়া—" বলিয়া সজোরে তাহার সুগৌর মসৃণ গণ্ড দুইটী টিপিয়া দিয়া রক্ত-গোলাপের মত রাঙাইয়া দিল। মাধবী সুখের আবেশে এবং লজ্জার আতিশয্যে মন্ত্র চালিতের ন্যায় ননদিনীর পাদবন্দনা করিল। সুলতা মাধবীকে কোলে টানিয়া লইল। মাধবীর কপালে বিন্দু-বিন্দু স্বেদকণা ফুটিয়া উঠিল; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ সব বিলুপ্ত হইল; এই বিশ্ব-সংসার সব মুছিয়া গেল। অসহ্য পুলকে কুমারী মাধবী তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল,—জগতে মণীশ ও সে—শুধু দুইজন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় আটটা। মেনকা মেয়েদিগকে খাওয়াইয়া দরদালানে রামকমল বাবুর খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া কলতলায় হাত-পা ধুইতেছে,—এমন সময় অর্গলাবদ্ধ বহির্দ্বারে কড়া নড়ার শব্দ হইল। মেনকা কিয়ৎক্ষণ কাণখাড়া করিয়া শুনিয়া বুঝিল যে, তাহাদের দরজার কড়া ই কে নাড়িতেছে, অথচ কোনও কণ্ঠস্বর নাই। চঞ্চল হইয়া সে আট বছরের কন্যা বেলাকে সঙ্গে করিয়া দুয়ার-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দুয়ার না খুলিয়াই বেলা জিজ্ঞাসা করিল—"কে কড়া নাড়্‌চে?"

মৃদু স্বরে উত্তর হইল—"আমি বেলা, আমি—মণীশ।"

দড়াম্ করিয়া খিল্ খুলিয়াই বেলা কহিল—"মণিবাবু, আমি মনে করি কোনও চোর বুঝি!"

মেনকা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল—"এস বাবা, বাড়ীর মধ্যে এস, বাইরে কেন? বাড়ীর সব খবর ভাল তো?"

মণীশ যেখানে ছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই উত্তর দিল— "না, আমি আর ভিতরে যাব না।—"

বাধা দিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল—'এই ঠাণ্ডায় আপনি খালি পায়ে যে, মণিবাবু?"

মণীশ তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া ভারী গলায় নেপথ্যবর্ত্তিনী ভাবী শাশুড়ীকে জানাইল যে, আজ চারি দিন হইল তাহার জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

"হ্যাঁ! বেয়ান্ নেই! সে কি গো?" বলিয়াই মেনকা কাঁদিয়া ফেলিল। দেখাদেখি বেলার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

মণীশ কহিল—"আমি এখনি চল্লুম। দিদিদের নিয়ে এই

রাত্রেই আমি ঢাকা যাচ্ছি। আপনাদের তাই সংবাদ দিতে এসেছিলুম মাত্র।"

আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মণীশ ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেল। মেনকা দরজার বাহিরে আসিয়া সাশ্রুনয়নে মণীশের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চুল রুক্ষ, খালি পা গায়ে একখানা শাল জড়ানো মাতৃহীন মণীশ আস্তে আস্তে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মেনকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে দুয়ারে খিল দিয়া গলদশ্রু লোচনে দরদালানে আসিয়া বসিলেন। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হল মা, কাঁদচ কেন?"

মেনকা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বেলা কহিল—"মণিবাবুর মা আজ চার দিন হ'ল মারা গেছেন। তাঁরা আজ সবাই ঢাকা যাচ্ছেন, তাই বল্‌তে মণিবাবু এসেছিলেন।"

মাধবী দাঁড়াইয়া ছিল, ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। অন্য ভগিনী দুইটি শুইয়া ছিল, তাহারা লেপ ছাড়িয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সকলেই নীরব। মাধবীর মুখখানা হঠাৎ কাগজের মত শাদা রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল; তাহার অন্তরে বেদনার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল।

বহুক্ষণ যাবৎ মৃতার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার বাঞ্ছিত সতী-লোক-প্রাপ্তির সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ মেনকার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিল। কহিলেন—"এ খণ্ড-কপালে মেয়ের অদেষ্টে এমন ঘর বর সইবে কেন? এমন ছেলে, এমন বংশ লোকে লক্ষ টাকা দিয়ে পায় না; তা এ রাক্ষুসীর জুটেছিল অমনি। যেমন কথাটা পাকাপাকি হল, অম্‌নি হতভাগী অমন শাশুড়ীকে একবারে ডব্‌করে খেয়ে ফেল্‌লি?"

বলিয়া নিজের হাত দুইখানি আপনার মুখের কাছে লইয়া গিয়া, তাড়াতাড়ি মুখবন্ধ করিয়া কন্যার শাশুড়ী ভক্ষণের অভিনয় অনুকরণ করিয়া, কহিলেন—"এইবার থাক্‌ আবার থুব্‌ড়ো হয়ে আরেক বছর! আর, একবছর বাদ কি আর রায় বাহাদুর এই অপয়া মেয়েকে নেবেন? রুখ্‌খলো না! আ মর্‌! ছুঁড়ীকে দেখলে আমার গা সুদ্ধ জ্বলে যায়।"

মাতার গাত্রদাহ নিবারণ-কল্পেই হউক্‌, অথবা আত্ম-রক্ষার্থেই হউক্‌, মাধবী ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ঘড়িতে বাজিল এগারটা।

রামকমল বাবু বাড়ী ফিরিলেন। মাধবী দরজা খুলিয়া দিতেই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এগারটা বাজে, আজ এখনও তুমি শোওনি' মা?"

মাধবী মৃদুস্বরে কহিল—"যাই, এইবার শুইগে।"

ঘরে ঢুকিয়াই শ্রাবণের সজল মেঘভারাবনত গম্ভীর আকাশের মত পত্নীর মুখমণ্ডল দেখিয়া রামকমল বাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, আজ ব্যাপার কি? এত রাত্রি অবধি বাড়ীসুদ্ধ সবাই যে জেগে বসে'—ব্যাপার কি?"

মেনকা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাপার আর কি? তোমার বড় মেয়ের বিয়ে।"

রামকমল বাবু নীরব, হতভম্ব! মাধবীর মুখ পানে চাহিতেই, সে সরিয়া গেল।

মেনকা কহিতে লাগিলেন—"মণির মা আজ চার দিন হল' মারা গেছেন যে? সে খবর কিছু কি রাখ?—"

রামকমল বাবু সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া কহিলেন—"তাই না কি? বড়ই দুঃখের কথা—আহা, ছেলেমানুষ, এই বয়সে মাতৃহীন হল? মণি কি খুব কাতর হয়েচে? তুমি কি রজনী বাবুদের বাড়ী গেছলে না কি?"

মেনকা ঝাঁজের সহিত কহিলেন "আমি কি সে ভাগ্যি করেচি যে কোথাও একদণ্ড বেরুব? তাহলে দুবেলা এমন হাঁড়ি ঠেল্‌বে কে? মণি এয়েছিল, বলে গেল! এখন কি কর্‌বে, কর! এক বছরের মধ্যে তো আর বিয়ে হচ্ছে না। কোনও রকমে যদিও একটা সম্বন্ধ হল, তা'ও কপাল-গুণে পণ্ড হয়ে গেল। মেয়ে যে ষোলয় পড়ল! হুঁস্‌ আছে?"

রামকমল বাবু শান্তভাবে কহিলেন—"মেয়ে ষোলয় পড়্‌ল কি সতেরয় পড়ল, আমি তা ভাবচি না—আমি ভাবচি, মণির কথা।"

মেনকা হাত পা ছুঁড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"না, তা ভাববে কেন? কল্‌কাতায় তো আর সমাজ নেই, থাক্‌লে বুঝতে! আমাদের দেশ হলে ধোবা নাপিত বন্ধ হয়ে একঘরে করে' কোন্‌ দিন তোমায় জাতে ঠেল্‌ত! ধন্যি তুমি বাপ মা' হোক্‌—বিশ বছুরে মেয়ে ঘরে, তোমায় গলা দিয়ে ভাত নামে কি করে?—"

রামকমল বাবু কঠোর স্বরে কহিলেন—"দেখ, তোমার ব্যবহার দিন দিন এমন বিশ্রী হচ্ছে যে, তোমার ভদ্রমহিলা মনে করতে অপমান বোধ হয়। নিজের অসভ্যতার দরুণ তুমি এ সংসারের শান্তি, শৃঙ্খলা, শিক্ষা সব নষ্ট করেচ। তোমার মত স্ত্রীর মুখদর্শন করলে পর্য্যন্ত পাপ হয়। তুমি থাক্‌তে এ বাড়ীর আর মঙ্গল নাই।"

আজ প্রায় বিশ বৎসর কাল মেনকা স্বামীর সংসার ও তাঁহার সঙ্গে কলহ করিতেছেন, কিন্তু ঈদৃশ পরুষ কণ্ঠ ও ভাষা কখনও শোনেন নাই। কাজে প্রথমটা তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন।

রামকমল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মাধবী আস্তে আস্তে পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, শুয়ে পড়্‌লেন যে? উঠুন্, খাবেন।"

রামকমল লেপের ভিতর হইতেই উত্তর করিলেন—"শরীরটা ভাল নেই, মা, আজ আর খাব না।"

মাধবী ইহা পিতার ছল মনে করিয়া লেপের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া পিতার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল, ভয়ানক উত্তপ্ত। মাধবী সবিস্ময়ে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওমা, তাই ত! এ যে জ্বরে গা' পুড়ে যাচ্ছে, বাবা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পত্নীবিয়োগের পর রায় বাহাদুর কলিকাতায় বদ্‌লি হইলেন। ভবানীপুরে একখানি অতি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া মুটবিহারী বাবু একটি মাত্র ভৃত্যের সঙ্গে নূতন সংসার স্থাপন করিলেন। এক বেলা নিজে রাঁধিয়া হবিষ্যান্ন করেন, রাত্রে ফলমূলাদি খান। অবসরকাল পূজা, জপ ও হরিনাম করিয়া কাটান।

মাত্র তিন মাস কাল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে; ইতিমধ্যে রায় বাহাদুরের শয়নকক্ষে দুইখানি ও বসিবার কক্ষে একখানি গৃহিণীর এন্‌লার্জমেণ্ট ঝুলিয়াছে। একেই তো তিনি নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া ব্রাহ্মণ; তদুপরি ঈদৃশ বিপত্নীক অবস্থায় তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। হবিষ্যান্ন, স্বপাক, কম্বল আসনে উপবেশন, মৃগচর্ম্মে শয়ন, আহারান্তে হরিতকী চর্ব্বণ, নিত্য গঙ্গাস্নান, সর্ব্বদা নামাবলীর আবরণ, কণ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ—কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি রহিল না। পিতার এতাদৃশ বৈরাগ্যে ও ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় কন্যা জামাতা আত্মীয় বন্ধু সকলে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

কন্যা সুলতা রজনীর সহিত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়; রায় বাহাদুরের সায়ং সন্ধ্যায় বসিতে বেশী বিলম্ব নাই।

সুলতা কহিল—"না বাবা, তা' হতে পারে না। এমন করলে শরীর টিক্‌বে কেন? আপনার এত কি সহ্য হবে, এই বুড়ো বয়সে?"

পিতা কতক প্রসন্ন কতক বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। বামুণের বিধবাদের সয় কি করে? আর, বুড়োমানুষই তো, না সইলেই বা কি তোমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি?"

শেষের কথাগুলিতে যে প্রচ্ছন্ন ঝাঁজটুকু ছিল, সুলতা ও রজনী উভয়েই তাহা লক্ষ্য করিল। পত্নীকে বিব্রত দেখিয়া রজনী কহিল—"আপনার শরীরের ভাল মন্দে আমাদের ছাড়া আর কার বেশী লাভ-লোক্‌সান্, বাবা? এই যে মা গেলেন, এ তো আমাদেরই গেলেন!"

মুটবিহারী কহিলেন—"আর বাবা, সংসারের সব সুখই ত খুব ভোগ করলাম; পরমেশ্বর আমায় কিছুই কম করে দেন নি! তবে ভেবেছিলাম, শেষটা শান্তিতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে আশ্রয় নেব—সেইটে ঠিক হল না! গিন্নি পুণ্যবতী ছিলেন, স্বর্গে চলে গেলেন—তার', তোমারি ইচ্ছ' মা—"

সুলতার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে কাশী যাওয়া কি আপনার একরকম ঠিকই, বাবা?"

রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন—"হাঁ মা, আমার সব বন্দোবস্তই ঠিক, কেবল টিকিট করে গাড়ীতে চড়লেই হয়। দেরী কেবল যা' আমার বেরুতে। পৃথিবীতে শুভকার্য্যে বিঘ্ন তো বড় কম হয় না? এখন আমার পেন্‌সন্‌টা মঞ্জুর হওয়া আর মণির বিয়েটা দিলেই ব্যস, আমার সংসার থেকে একেবারে ছুটি।"

আসন্ন-বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় কন্যা ও জামাতা উভয়েই মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাটিল। রজনী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে কালই বিকেলে রামকমল বাবুর মেয়েটিকে দেখতে যাওয়া ঠিক ত ?"

রায় বাহাদুর। হাঁ নিশ্চয়ই। তোমার শাশুড়ীর—বড্ড যখন ইচ্ছে ছিল, একবার তখন মেয়েটিকে দেখাই যাক্। তিনি যেমন ঝোঁক ধরেছিলেন, তা'তে বেঁচে থাক্‌লে, এই মাঘ মাসে তো বিয়ে দিতেই হ'ত। এখন অবিশ্যি একবছর তো আর বিয়ে হচ্ছে না !"

সুলতা সজলনেত্র মুছিতে মুছিতে কহিল—"হাঁ বাবা, বছর ঘোরা মাত্রই যেন বিয়েটা হয়। মা আমার এই মেয়েটিকে আমাদের ঘরে আন্‌তে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে গেছেন। তাঁর এ ইচ্ছেটা যেন পূর্ণ হয়। আর, রামকমল বাবু মারা গিয়ে অবধি ওদের বড্ড কষ্ট হয়েছে, অথচ চারচারটি আইবুড়ো মেয়ে গলায়—বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক; কি করে যে কি হবে, তা' ভগবানই জানেন।"

রায় বাহাদুর অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"দেখি। তা'হলে এইবার উঠলাম আমি, আমার সন্ধ্যার সময় হ'ল।"

* * * *

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভয়ানক গুমোট। বেলা প্রায় চারিটা। গলিতে কুল্‌ফী বরফ হাঁকিয়া গেল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিষণ-ভোগ, ল্যাংড়া, ফজলী আমওয়ালাও বিচিত্র সুরে ডাকিয়া গেল। মাধবী দালানে ভগিনী তিনটিকে অঙ্ক কষাইতেছিল। মেনকা বারান্দায় বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ খোলা-দরজা ঠেলিয়া সুলতা ও অনুপমাকে প্রাঙ্গণমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মেনকার তন্ময় চিন্তা বাধা পাইল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে "এস মা, এস, এস"—বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। মেয়েরাও বইশ্লেট ফেলিয়া একবারে উঠানে আসিয়া হাজির হইল।

অনুপমা কহিল—"বাবা আর দাদামশায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁরা মেয়ে দেখতে এসেচেন।"

"ও মা, তাই না কি ? ওগো খুদি, শেফা, ও বেলি মুখপুড়ী—ও মাধবী—" বলিয়া মেনকাকে সন্ত্রস্তভাবে কম্পিত চরণে হাঁকডাক ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া, সুলতা কহিল—"আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না মা—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

মেনকার উত্তেজনা কিছু মাত্র কমিল না। অসম্বদ্ধ ভাবে কহিলেন—" তা কি করে হবে—মা—তা—"

সুলতা বুদ্ধিমতী, সে এ চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিয়াছিল। কহিল—"আপনি স্থির হয়ে বসুন্ দেখি, মা। অনু বাবাকে ডাক্। এই যে মাদুর পাতাই আছে।" মাধবী ইতিমধ্যে রান্নাঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

রজনী ও ছুটবিহারী বাবু আসিতেই, সুলতা কহিল—"বসুন বাবা, এখানে বসুন। মাধবী কোথায় লুকোলি, আর বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির।"

মাধবী আসিল না। সুলতা রান্নাঘরে ঢুকিয়া আড়ষ্ট বিহ্বল মাধবীকে গলবেষ্টন করিয়া আনিয়া পিতা ও স্বামীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল—"এইখানে বাবার কাছে বস্। লজ্জা কি ?"

মাধবী উভয়কে প্রণাম করিয়া শ্বশুরের পার্শ্বে লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল। গোধূলির রক্তিম আকাশের ন্যায় তাহার মুখখানি সন্ধ্যামণির মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

মোটা আধময়লা খদ্দরের শেমিজ ও শাড়ী পরিহিতা নিরভরণা এই গৌরীকে দেখিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না। আকর্ণ-বিশ্রান্ত বড় বড় ঢল্‌ঢলে চক্ষু দুইটি ভাবাবেশে কেবলি মুদিয়া আসিতেছিল; বিপুল অজগরের মত অবেণীসম্বদ্ধ চিক্কণ কালো কেশদামভারে পৃষ্ঠদেশ যেন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল; সমুন্নত সরল নাসিকার রন্ধ্রপথে লজ্জা ফুঁসিতেছিল—কি অপরূপ! কি সুন্দরী এই কন্যা! রায় বাহাদুর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, মুখের বিবর—কোথাও কোনও খুঁৎ নাই! তিনি মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"তোমার নামটি কি ?"

মৃদু অথচ মধুর সেই লজ্জাভারাবনম্র অধর-যুগল ভিন্ন হইয়া শব্দ হইল—"মাধবী দেবী।"

"এখন কি পড় ?"

"কুমার-সম্ভব, মেঘনাদবধ, Palgrave, Help's essays, আর পারিবারিক প্রবন্ধ।"

"রান্না-বান্না জান ?"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জানে।

স্বলতা দালান ও বারান্দার মধ্যবর্ত্তী দুয়ারের মাঝে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল—"আজকাল মাধবীই তো রান্না করে—মা তো আঁস ছোঁন না!"

"আচ্ছা যাও, ঘরে যাও, বড় লজ্জা লাগচে—কেমন?" বলিয়া রায় বাহাদুর মাধবীকে বিদায় দিলেন। সে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। রায় বাহাদুর তাহার গমন-ভঙ্গিটিও নিরীক্ষণ করিতে ছাড়িলেন না।

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জিজ্ঞাসা কর তো মা, মেয়ের কোনও টিকুজী-কোষ্ঠী আছে কি না?"

স্বলতা একবার ভিতরে চাহিয়া উত্তর দিল—"আছে, আপনি চান্?"

রায় বাহাদুর কহিলেন—"হাঁ, চাই বই কি? আমায় একবার সেখানা দিতে বল, মা। মিলিয়ে দেখতে হবে—"

বলিয়া রজনীর মুখে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রজনী শ্বশুরের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কহিল—"নিশ্চয়। এই মিলই তো আসল মিল।"

স্বলতা একখানা আধময়লা ন্যাকড়ায় জড়ানো গোলাকার লম্বা একটা পদার্থ আনিয়া পিতার হাতে দিল; পিতা সেটি পকেটে পূরিলেন।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে কেমন দেখলেন।"

রায়বাহাদুর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন; হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া কহিলেন—"মেয়ে বেশ তা'তে আর সন্দেহ কি? তবে এইবার ওঠা যাক্—"বলিয়া রায় বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইতেই রজনীও শ্বশুরের অনুকরণ করিয়া কহিল—"হাঁ, চলুন। অনু, এস মা—তোমার ছেলে কাঁদচে হয়ত এতক্ষণ।"

নিষ্ক্রমমান পিতা ও স্বামীর পিছু পিছু আসিতে আসিতে স্বলতা কহিল—"মা দুঃখ কর্‌চেন্ যে একটু মিষ্টি-মুখ না করে' যেতে নাই। কোনও খবর না দিয়ে আসার জন্যে তিনি কিছু বন্দোবস্ত কর্‌তে পারেন নাই—"

রায়বাহাদুর বহির্দ্বারে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। পরে কত খাব'—ভাবনা কি? তোমরা এস মা—অনু কৈ?"

অনু তখনও মাধবীর সঙ্গে গৃহ-কোণে গল্প করিতেছিল। রজনী ডাকিল—"অনু—অনু—"

দ্বার-অন্তরালে সরোদনে নাতিনিম্নস্বরে মেনকা স্বলতাকে বলিতেছিলেন—"তুমি তো সবই জান মা, তাঁর অসুখের সময় সব বেচেও যখন কুলুতে পার্‌লাম না, তখন ভদ্রাসনখানা পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হল। এখন আমাদের দু'মুঠো পেটের ভাতের সংস্থান পর্য্যন্ত নেই—তার উপর এই চা'র চা'রটে আইবুড়ো মেয়ে!……"

রায় বাহাদুরও কথাগুলি সব শুনিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাস। সকালে ছোট এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা।

মণীশ ঢাকায় প্রোবেশনারি পোষ্টাল স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। মুখ্য উদ্দেশ্য—পিতা পেন্সন্ লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা। স্বলতা ও মণীশ রায় বাহাদুরের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, পিতা পার্শ্বোপবিষ্ট একজন কুদর্শন লোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা কহিতেছেন।

লোকটির পরিধানে আধময়লা একখানা থান্ ধুতি, গায়ে ঘর্ম্মসিক্ত স্থানে স্থানে সোঁদালাগা ততোধিক অপরিষ্কার তালি-দেওয়া একটা সার্ট, হাতে বোতাম নাই, সুতা দিয়া বাঁধা; গলায় একখানা ময়লা কোঁচান চাদর; পায়ে ধুলি-মলিন একজোড়া চটি জুতা—সেটা কালো কি কটা চামড়ার তাহা ধুলার ভারে বোঝা যায় না; পাশে একটা ভাঙা ছাতা। লোকটার কাঁচাপাকা চুল; ছয় দিন মুখে ক্ষুর পড়ে নাই। কপাল রেখাবহুল। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র ও বর্ত্তুলাকার; তাহাতে দস্তার ফ্রেমের একখানা চস্‌মা। অধরোষ্ঠ পাত্‌লা। ক্ষীণ কৃশ তনু; দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিতে রূপার তারের দুইটি আংটি; মাথায় একটা হৃষ্টপুষ্ট শিখা। কপালে শ্বেতচন্দনের একটা ফোঁটা।

অপ্রত্যাশিত ভাবে অসময়ে কন্যা ও পুত্রকে দেখিয়া রায় বাহাদুর, যেন কোনও কুকার্য্যে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, এমনি ভাবে চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ রক্তহীন হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া, ঐ

লোকটিকে কহিলেন—"আচ্ছা, আপনি তা'হলে এখন আসুন্। অন্য সময়ে আসবেন্।"

আগন্তুক "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিল। সুলতা এতক্ষণ তাহার পানে সন্দিগ্ধ ভাবে চাহিয়া ছিল, কহিল—"এ কে বাবা ?"

রায় বাহাদুর কন্যার কথা যেন শুনিতেই পাইলেন না; পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে মণি, তুই যে হঠাৎ? কখন এলি ?"

মণীশ সবিনয়ে নতমুখে উত্তর দিল—"এই আজই সকালে।"

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—"কবে আপনার যাত্রার দিন করলেন বাবা ?"

রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন—"১২ই শ্রাবণ। এখনও প্রায় এক মাস বাকী।"

মাতার শোকে পিতা যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে-ছিলেন, তাহাতেই কন্যার দুঃখের সীমা ছিল না। তাহার উপর এই বার্দ্ধক্যে পেন্সন লইয়া একাকী তিনি যে চির-জীবনের মত কাশীবাস করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে সুলতা আর অশ্রুবেগ দমন করিতে পারিল না। সে ঝরঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রায় বাহাদুরের মুখে এতক্ষণ যে একটা অপ্রসন্নতার মেঘ লুকোচুরি খেলিতেছিল, সেটা এইবার নিঃশেষে কাটিয়া গেল। তিনি কন্যাকে বহু সান্ত্বনা, প্রবোধ দিয়া, সংসারের অনিত্যতা, জীবনের ক্ষণ-স্থায়িত্ব, মায়া, পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, পরকাল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এক নিঃশ্বাসে বহু উপদেশ দিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়া হাঁপাইয়া পড়িলেন।

বেলা দশটা বাজে। পিতাকে ইহার পর স্নানাহ্নিক করিয়া স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে জানিয়া সুলতা উঠিল।

রায় বাহাদুর মণীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সময় বেশী অনুপস্থিত থাকলে কাজকর্ম্ম শিখতে পারবে না, পরীক্ষার ক্ষতি হবে; মনে থাকে যেন, আমি আর নাই; এখন থেকে তোমায় নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াতে হবে। আগে পাশ কর, কাজে পাকা হয়ে বস', তার পর অন্যদিকে মন দিও।" কণ্ঠস্বর কঠোর।

মণীশ নীরব; টেবিলস্থিত গীতাখানির যেমন পাত উল্টাইতেছিল, তেমনিই পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ঠিকুজীর কি হল ?"

রায় বাহাদুর উত্তর করিলেন—"না, এখনও জানতে পারি নি। যেখানে দিয়ে এসেচি, সেখানে আর যাওয়া হয় নাই।"

সুলতা কহিল—"সেখানে একবার অবসর-মত যাবে তা'হলে, বাবা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুটবিহারী বলিলেন—"হঁ যাব। (মণীশের প্রতি) এবার তোমার মহাগুরু নিপাতের বছর। তুমি তাঁর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র, তোমার উচিত—একটা বৎসরও অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী সংযমী হয়ে থাকা। কোনও রকম অনুচিত চিন্তা করা এ সময় তোমার মোটেই কর্ত্তব্য নয়।" স্বর তিক্ত ও স্নেহহীন।

মণীশ পিতৃবাক্যের নিগূঢ় শ্লেষটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সুলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি গোপন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। মণীশও দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিল। রায় বাহাদুর ব্রহ্মচর্য্যের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন।

বেলা প্রায় চারিটা। দরদালানে সুলতা দৌহিত্রকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে। অনুপমা পাশের বাড়ীতে বধূর সঙ্গে তাস খেলিতে গিয়াছে। পাশের ঘরের দুয়ারে মণীশ ও রজনী দুইখানি চেয়ারে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা-বার্ত্তায় ব্যাপৃত।

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া সকলেই আলাপ বন্ধ করিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। অকস্মাৎ বেলার সঙ্গে মেনকাকে দেখিয়া সুলতা যুগপৎ চমৎকৃত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া—"আসুন্ আসুন্ মা, কি ভাগ্যি—আপনার পায়ের ধূলো—"

মেনকাকে প্রণাম করিয়া, বেলাকে আদর করিয়া সুলতা আসন পাতিয়া বসাইল।

মেনকা কহিলেন—"মা, বড় বিপদে পড়ে' এয়েচি! বেই-মশার পরশু মাধবীর ঠিকুজী ফেরৎ দিয়ে ঘটক ঠাকুরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, মণির সঙ্গে কিছুই মেলে নাই; এমন কি, এ বিয়ে হ'লে তিন মাসের মধ্যেই নাকি মাধবীর কপাল

পুড়বে। তাই তিনি এ সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েচেন। এখন কি করি মা—"

মেনকা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সুলতা এ সংবাদে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল; কারণ, আজ প্রাতেই সে তার পিতার নিকট শুনিয়াছে যে, ঠিকুজী এখনও জ্যোতিষীর কাছ হইতে ফেরৎ পর্য্যন্ত আনা হয় নাই, কাজেই মিল হইয়াছে কি না তাহাও জানা যায় নাই। অথচ, এ কি? তবে কি পিতা মিথ্যা বলিয়াছেন? সুলতার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। রজনী ও মণীশও এ সংবাদে একেবারে বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল সকলেই নির্ব্বাক্। রজনী দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ঠিকুজীখানা ঠিক ফেরৎ পেয়েছেন্ ত?"

মেনকা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে উত্তর দিল—"হাঁ বাবা, পরশু ঘটক এসে দিয়ে গেছে; এই দেখ' এনেছি। যদি কোনও ভাল জ্যোতিষীকে তুমি দেখাতে চাও তো একবার দেখিয়ো।"

সুলতার চক্ষু-দু'টি দুঃখে ও সমবেদনায় যেমন ভরিয়া উঠিল, পিতার এই মিথ্যা কথাটার জন্য তেমনি তাহার পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ মনটা পিতার উপর অত্যন্ত বিমুখ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সুলতা ভাবিতেছিল, তাহার স্বর্গগতা জননীর প্রতিজ্ঞা, কনিষ্ঠের একান্ত আগ্রহ ও একমাত্র প্রণয়াস্পদকে না পাওয়ার জন্য মর্ম্মভেদী বেদনা এবং মাধবীর ন্যায় লক্ষ্মী প্রতিমাকে ভ্রাতৃবধূরূপে পাইয়া হারানোর কথা! সে যে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

মেনকা গলাটা সাফ্ করিয়া লইয়া কহিলেন—"আমি গরীব, বেইমশায় বড়-লোক—তাই তিনি চালাকী করে' এ সম্বন্ধটা ভেঙে দিলেন, মা! কারণ, তিনি ভেবেচেন্, তাঁর একটি ছেলে—ছেলের বিয়ের সাধ আহ্লাদ হবে না। তা' সোজা বল্লেই ত হ'ত'! বেয়ানের মুখেও শুনেছি ত—তাঁর খুব মত থাকলেও বেই মশায়ের এ সম্বন্ধে গোড়াগুড়িই অমত। আমার ভাগ্যে নেই—"

মেনকা আর বলিতে পারিলেন না। দুঃখে ও হতাশায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুলতা' পিতার ঈদৃশ রহস্যপূর্ণ ব্যবহারে কেবল যে বিস্মিতই হইয়াছিল তাহা নহে, মনে মনে বাস্তবিকই চটিয়াছিল। তবু পিতৃনিন্দায় সুলতা একটা উচ্চ প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না; কহিল—"এতে আর বাবা আপনার সঙ্গে চালাকী কি কল্লেন, মা? যদি ঠিকুজী কোষ্ঠীর মিল না হয়, তাহ'লেও কি আপনি এ বিয়ে দিতে চান? বাবা যেমন ছেলের দিকে চাইচেন, আপনারও তেমনি মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে চাওয়া উচিত তো? শুধু মেয়েকে কোনও রকমে একটা বিয়ে দিয়ে বিদেয় কর্‌তে পার্‌লেই তো বাপ মায়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না?"

মেনকা অশ্রু মুছিয়া ধরা-গলায় কহিলেন—"লক্ষ্মী মা আমার, আমার উপর রাগ করো না—আমরা বড় দুঃখী। সব কথাগুলো একটু তলিয়ে যদি দেখ'—তা' হলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তোমার বাবার চালাকীটা কি রকম। আমার যদ্দূর মনে হয়, তাতে ও ঠিকুজী-কুষ্ঠীর মিলটিল সব মিছে কথা। কেবল তোমাদের মনরাখা করে ক'নে দেখ্‌তে এসেছিলেন; এঁচেই এসেছিলেন যে, কোনও একটা ওজর করে' এ বিয়ে যাতে না হতে পায়, তাই কর্‌তে হবে। কাজেই ঠিকুজী চাইলেন, আমিও সরল মনে বের করে দিলাম। তাঁর এতে সুবিধেই হ'ল—সাপ মরল অথচ লাঠি ভাঙ্‌লো না। গিন্নি স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা, তোমাদের সব্বারই কথা, মণিরও কথা সব রক্ষা হ'ল—অথচ বিয়েও দিতে হল না। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। বুদ্ধিমান্ লোক কি না, তাই এই কৌশল কর্‌লেন; সোজাসুজি যদি বিয়ে দেব না বলেন, তা'হলে মেয়ে জামাই ছেলে সবাই মনে দুঃখু কর্‌বে। কাজেই এমন উপায় ঠাওরালেন্ যে, আর কারও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌বার মুখ রইল না।"

সুলতা পিতার পক্ষ সমর্থনের আশা ছাড়িয়া দিল।

মেনকা দুঃখ ভুলিয়া কতকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন—"মেয়ে দেখার দিনেই আমি তোমার বাবার মতলবের কতকটা আঁচ পেয়েছিলাম। তোমরা লক্ষ্য করেছিলে কি না জানি না, মা, ভাবী পুত্রবধূকে, না হয় পুত্রবধূ না-ই হ'ল, একজন পরের মেয়েকে দেখ্‌তে গিয়ে—"মা" বলেও কি একটা সম্বোধন কর্‌তে হয় না? কোথায় বিয়ে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু একজন ভদ্রকন্যাকে "মা" বলে সম্বোধন কর্‌লে, তাঁর মানের কোনও হানি হ'ত না! এসব সবাই করে, হোন্ না তিনি বড়মানুষ"—

এই ছোট্ট ঘটনাটি সেই দিনই সুলতাও লক্ষ্য করিয়াছিল,

কিন্তু কাহারও সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। এই বিস্মৃত প্রায় ব্যাপারটি সুলতার মনে পড়ায়, তাহার মাথা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল!

মেনকা নীরবে সুলতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সুলতা অধোমুখিনী। সকলেই নির্ব্বাক্।

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণীশের পৃষ্ঠে হাত রাখিতেই মণীশ চমকিয়া উঠিল। রজনী কহিল—"এস, মণি, ছাদে একটু বেড়াইগে, বড্ড গরম নীচে—উঃ একটু যদি হাওয়া আছে!—"

মনীশ কক্ষান্তরে উঠিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে মণীশ ঢাকায় ফিরিয়া গেল। ভ্রাতার এই অকস্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগের মূলে যে নিদারুণ মনস্তাপ ও নিরাশ প্রণয়ের অকথিত বেদনাভার লুক্কায়িত, ভগিনী সুলতার নিকট তাহা অগোচর রহিল না।

তিন চারি দিন ধরিয়া রজনী ও সুলতা কেবলি তর্ক পরামর্শ করিল; কিন্তু রায়বাহাদুরের এ রহস্য অথবা মনোভাবের কোন কূল কিনারাই করিতে পারিল না। অগত্যা মেনকা-কথিত উপসংহারই মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

রজনী কহিল—"এ-ই বা কেমন জিদ, তা তো বুঝ্লুম না। এতে তিনি যে নিজের ছেলেকে পর করে ফেল্বেন তা' বুঝ্তে পার্লেন না?"

সুলতা একমাত্র মাতৃহীন কনিষ্ঠ সহোদরের দুঃখে সমব্যথিনী হইয়া কহিল—"কে জানে? ভীমরতি হয়েছে! অকারণ কতকগুলো মিছে কথা বলে একটা তৈরি জীবন এমন করে নষ্ট করে দিচ্ছেন—এতে পাপ হয় না? বুড়ো হয়েচেন, ষাট বছর বয়েস হতে চল্ল, উনি কি বোঝেন না? খুব বোঝেন, তবে ঐ জিদ্! জিদেরও পোড়া কপাল, ব্রহ্মচর্য্য পালনেরও পোড়া কপাল!"

রজনী। এতে মণি ধাঁ করে' একটা কোনও শক্ত অসুখ করে' এমন কি হাটফেল্ করে মারাও যেতে পারে।

সুলতা সজলনয়নে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"হাঁ, তা' পারে বৈকি! আমি ভাবচি অন্য কথা। মণি যদি বাপের কথা না রাখে, যদি জোর করে ঐখানেই বিয়ে করে? কিম্বা যদি খৃষ্টান হয়? সন্ন্যাসী হয়ে চলেও যেতে পারে ত?"

তেমন বয়াটে একালের ছেলেদের মত ছেলে যদি মণি হ'ত, তা'হলে তো এতদিন বাবাকে থোড়াই কেয়ার কর্ত। মণি তো সে-রকম নয়, তাই বাবার ভাগ্যি যে এমন মুখচোরা ছেলে পেয়েচেন—যা' কর্চেন, যা' বল্চেন, তাই শোভা পাচ্ছে।"

রজনী কহিল—"বাস্তবিক!"

উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব রহিল। হঠাৎ অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পাইয়া ক্ষীণ হাসির রেখাপাতে অশ্রুপ্লুত মুখখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়া সুলতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল —"আচ্ছা, একটা কাজ কর্লে হয় না? বাবা যাই বলুন্, আমরা দাঁড়িয়ে যদি ঐখানে মণির বিয়ে দিই—তাতে ক্ষতি কি? এ দু'টি জীবনকে তো সুখী করা হবে। বাবা না হয় রাগ কর্বেন। তা' কর্বেন—তাতে এমন কি আস্বে যাবে?"

রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল,—"হাঁ, কোষ্ঠীর মিল্-ফিল্ যখন ঝুট্ বাত, তখন এ কায কর্লেই বা কি হয়? না হয় তোমার বাবা আমাদের উপর রাগ কর্বেন্ —কেমন? খুব রাগ হয়, তো মণিকে ত্যজ্যপুত্র কর্বেন। তাতেই বা মণির ক্ষতি কি? সে লেখাপড়া শিখেচে, ভাল চাক্রীও হয়েচে—তার অভাব কি! যদি মনের মত স্ত্রী নিয়ে সংসার ফাঁদা যায়, তাহ'লে দুঃখও যে সুখ হয়ে ওঠে। মনে শান্তি সুখ থাক্লেই, সর্ব্বত্র শান্তি সুখ। মনে যদি সুখ না থাকে, তা'হলে রাজপ্রাসাদ ও রাজৈশ্বর্য্যেও সুখ নাই। মণি এতে, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই রাজী হবে—কি বল?"

সুলতা কহিল—"আমার তো তাই মনে হচ্ছে।—"

সুলতার কথা শেষ হইতে না হইতেই ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম লইয়া আসিল। সুলতার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; উদ্গ্রীব হইয়া। স্বামীর মুখপানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

রজনী টেলিগ্রামখানি পড়িয়া জানাইল—"মণির ঢাকায় পৌঁছিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে; আমাদিগকে যেতে লিখেচে।"

সুলতার মুখখানা প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল, আবার মেঘাচ্ছন্ন হইল। রজনী কহিল—"এক্ষুনি বল্‌ছিলাম, এ-রকম ক্ষেত্রে একটা শক্ত ব্যারাম না হয়ে প্রায়ই যায় না।"

স্থির হইল, আগামী প্রত্যূষের গাড়ীতে ঢাকা যাত্রা

করিয়া রজনী ও সুলতা মণীশকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে এবং বিবাহ দিয়া সস্ত্রীক তাহাকে কর্ম্মস্থানে পাঠাইবে।

* * * *

প্রায় ১৫ দিন কাটিয়া গিয়াছে। মণীশ এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত; তবে বড় দুর্ব্বল। হার্টের দুর্ব্বলতাই বেশী। চলাফেরা, শ্রমসাধ্য কায, চিন্তা—মণীশের এখন সব বন্ধ। চিকিৎসা ও ঔষধ রীতিমত চলিতেছে। মণীশ কলিকাতায়।

আষাঢ়ের শেষাশেষি, মাসের ২৮শে। কলিকাতায় বেশ বর্ষা নামিয়াছে। এবার মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা নয়; কয়েক দিন হইতেই সূর্য্যদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। হাওড়া ও শিয়ালদহের ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল সকাল-সন্ধ্যা হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া, ছাতামুড়ি দিয়া, হাতে জুতা তুলিয়া, খালি পায়ে চলিতে চলিতে মনিবকে ও বৃষ্টিকে তুল্যরূপে গালি বণ্টন করিয়া ও চলতি মোটরের উৎক্ষিপ্ত কাদায় যখন জামা কাপড় কর্দ্দমাক্ত হয়, তখন রোষে শ্লীলতার সীমা রক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে না।—তবুও বর্ষণের ক্ষান্তি নাই। নূতনবাজারে ও জগুবাবুর বাজারে ইলিশ মাছের সের দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; তরকারীর বাজার খালি বলিলেই হয়। কলিকাতায় মহাদুর্য্যোগ। কলিকাতার আদিম অধিবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা পাঁচ ছয় পেয়ালা চা' ও গরম গরম ফুলুরি এবং খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খাইয়া কোনও মতে কষ্টে সৃষ্টে দিন গুজরাণ করিতেছে।

বৈকালে একটু জল ছাড়িয়াছিল। ট্যাক্সি চড়িয়া রজনী, সুলতা ও মণীশ রায় বাহাদুরের বাসার দিকে চলিয়াছে। উদ্দেশ্য, পিতাকে মণীশের আরোগ্য সংবাদ দেওয়া। কারণ, ঢাকা হইতে তাঁহাকে ৩।৪ খানি পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

রায় বাহাদুরের বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি দাঁড়াইল। রজনী নামিয়াই দেখিল, দোতলার বারান্দার রেলিং হইতে দড়ি দিয়া বাঁধা একখানা কাগজ ঝুলিতেছে, তাহাতে লেখা আছে—"এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবেক।" নীচের দুইটি দুয়ারেও বাঙ্গলায় উক্ত বাক্য এবং ইংরাজীতে "To let" লেখা কাগজ আঠা দিয়া আঁটা। পাশে একটা পানের দোকান। দোকানদারকে রজনী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বাড়ীওয়ালা আজ ১৪।১৫ দিন হইল কাশী চলিয়া গিয়াছে; অন্য বাড়ীর বাসিন্দারাও ইহার বেশী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

সুলতা শুনিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইল; কারণ, সে আজ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহাদিগকে বা মণীশকে কোনও সংবাদ না দিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনের এত পূর্ব্বে অকস্মাৎ কাশীযাত্রার সংবাদে সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

সুলতা কাঁদ' কাঁদ' হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি বাবা সন্ন্যেসী হয়ে গেলেন? বুড়ো বয়সে এই পত্নীবিয়োগ-দুঃখ সইতে না পেরে বাবা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে এমন লুকিয়ে পালিয়েচেন্।"

মণীশ ও রজনী সুলতাকে অধীর হইতে নিষেধ করিয়া, বহু প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া তবে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিল। মণীশের প্রস্তাবে নিকটস্থ ভবানীপুর পোষ্ট আফিসে গিয়া রায় বাহাদুরের বর্ত্তমান ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাঁহার চিঠি-পত্র বেনারসের পোষ্ট মাষ্টারের কেয়ারে পাঠান হয়। ট্যাক্সি বাড়ী ফিরিল—সকলেই রায় বাহাদুরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সন্ন্যাস-গ্রহণের আশঙ্কায় বড় ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত।

তৎকালীন্ আকাশের ন্যায় সকলের মুখই শোকে গম্ভীর এবং চিন্তায় কালো। ঘরে ঢুকিয়াই রজনী দেখিল, কয়েকখানি পত্র টেবিলে রহিয়াছে। নিজের পত্রখানি রাখিয়া, মণীশের একখানি ও সুলতার একখানি পত্র তাহাদের হাতে হাতে দিয়া, রজনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মক্কেলের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। মণীশকে তাহার ঢাকার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছে। সুলতা পত্র পাইয়া কহিল—"এ আবার কার চিঠি?" পত্র পড়িয়াই সুলতা নিকটস্থ সোফায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রজনী ও মণীশ তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল' কি হল'? কার চিঠি?—"

সুলতার মুখখানা তখন মড়ার মত ফ্যাকাশে। ইঙ্গিতে স্বামীর হাতে পত্রখানা ঠেলিয়া দিল।

রজনী ও মণীশ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সশঙ্ক কৌতূহলী চিত্তে পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এইরূপ—

ওঁ

২১৪ ভেলাপুরা
বেনারস।
২৫শে আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন

আপনাকে আজ কি বলিয়া সম্বোধন করিব ঠিক করিতে না পারিয়া, উক্ত পাঠ দিলাম; ঠিক হইল কি না জানি না, এবং জানিবারও আর সুবিধা হইবে না—কারণ এ পত্র যখন আপনার হস্তগত হইবে, তখন আমি আর এ পৃথিবীর কেহই থাকিব না।

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। তাঁরই অমোঘ শাসনের বলে আমি আজ আপনার ভ্রাতৃজায়া না হইয়া, আপনার মাতৃ-স্থানীয়া অর্থাৎ আপনার পিতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ছুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল মহাশয়ের বিবাহিতা পত্নী। গত ২৩শে আষাঢ় এখানে আমাদের শুভ (?) বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ আমাদের ফুলশয্যা!! আমারও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। সকলেরই শোক দুঃখ নিবারণ করিতে যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার শোকজীর্ণ পিতার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যার অবসান হইয়াছে; আমার মাতারও নয়নাশ্রু শুকাইয়াছে। তিনি কলিকাতার বাড়ীটি ঋণমুক্ত করিয়াছেন; আমার ছোট ভগিনী তিনটির বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকাও মায়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে—আর ভাবনা কি? সকলকেই সুখী করিয়াছি, ইহাই আমার সান্ত্বনা! এইবার আমার ছুটি। আমার কাজ ফুরাইয়াছে!! আমার ব্যথা কেহই বুঝে নাই—আমার সুখের জন্য কেহই ব্যস্ত নয়! আপনার পিতা চাহিয়াছিলেন আমায় বিবাহ করিয়া সুখী হইতে; আমার গর্ভধারিণী চাহিয়াছিলেন কন্যার বিবাহের বিনিময়ে দারিদ্র্য নিবারণ করিয়া নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে;—উভয়ের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে! ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন্। মণি-কর্ণিকার স্বচ্ছ শীতল কালো জলে আজ আমার ফুলশয্যা হইবে!!

আমি আপনার পিতার বিবাহিত স্ত্রী; কিন্তু তাঁর ধর্ম্মপত্নী হইতে না পারায়, ধর্ম্মরাজের কাছে হয় ত দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে দণ্ডভোগ করিতেছি, তার তুলনায় সে দণ্ড নিশ্চয়ই কোমল; আর যদি কঠোরতরও হয়, তবু আমি তার জন্য প্রস্তুত।

এ মর্ত্ত্যভূমিতে আর আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে না; তাই এই শেষ বিদায়ের বেলায় আমার মিনতিভরা প্রণাম লউন। আপনার ভাইকে আমার জন্ম জন্মান্তরের কামনাপূর্ণ প্রণতি দিয়া বলিবেন যে, তাঁর মাধবী সর্ব্বান্তঃ-করণে মরণে ও পুনর্জনমে তাঁরই, শুধু তাঁরই।

আপনাদের স্নেহমুগ্ধা
মাধবী।

পত্র-পাঠান্তে রজনীর চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মণীশ মাতালের মত টলিতে টলিতে যাইতে যাইতে পড়িয়া গেল। অনুপমা তাড়াতাড়ি মাতুলকে উঠাইতে গিয়া বলিল—"বাবা, পড়ে মামার ফিট্ হয়ে গেছে!"

জগদীশ্বর জানেন, মণীশের পড়িয়া ফিট্ হয় নাই, ফিট্ হইয়াই সে পড়িয়াছিল।

ছোটর দাবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ছোট যে হায় অনেক সময়
বড়র দাবী ছাপিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটর গমন—
বড় ধরা কাঁপিয়ে চলে।

বড়র আহা তুচ্ছ যাহা
ভালবাসি আমরা তাহা;
বড় বহে দাপিয়ে আকাশ—
ছোট যে বুক ব্যাপিয়ে চলে।

তরুরে তার হয় না স্মরণ
কুসুমটীকে ভুল্‌তে নারি,
ভুলে ত যাই হোলির রাতি
ফাগুয়ার কদ্ ভুল্‌তে নারি।
ভুলি সাগর,—মুক্তাটী তার,
করে রাখি হার যে গলার,
ছোটর অনুরাগের রাখী
আয়াস করে খুলতে নারি।

মহামায়ায় যেমন মানায়
সিংহ এবং সিংহাসনে,
'রামপ্রসাদের' বেড়ার ধারে
দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্যঘটা, লক্ষ বলি
অলক্ষ্যেতে আমরা ভুলি;
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের
মিষ্ট হাসি বিম্বাননে।

রামায়ণের অনেক ভুলি
রাবণ রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন
গুহক-গৃহে মিতার সাথে।
ভুলি ঘটা অযোধ্যারি,
অশোক-কানন ভুলতে নারি;
'সরমার' সে সদয় প্রীতি
অভাগিনী সীতার সাথে।

ভুলতে পারি সারনাথ এবং
নালন্দারি ধ্বংসটীকে;
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের
বুকে তাপিত্ হংসটীকে।
লক্ষ কোটী মূর্ত্তি তাঁহার,
ইহার কাছে মানছে যে হার,
পূর্ণতা দেয় বিরাট করে
ক্ষুদ্র তাহার অংশটীকে।

ভুলি শ্যামের ব্রজের লীলা,
কংস-বধের গৌরব হে,
ভুলায় কুরুক্ষেত্র গোটা
'বিদুর' ক্ষুদের সৌরভ হে।
বাঁশরী আর শিখীর পাখা,
'সুদর্শনে' দেয় যে ঢাকা,
'সুদামা'রি সৌখ্যেতে ম্লান
পাণ্ডব এবং কৌরব হে।

আদর করি শিখীর চেয়ে
চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
সারা রসাল কানন চেয়ে
ঘটের ছোট আমের শাখা।
খনি রেখে মণিই তুলি,
মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি,
কৃপার ছোট অপরাজিতায়
কৃপাণ পড়ে তিমির ঢাকা।

পিতামহ-সন্দর্শনে

রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর বি-এল

দীননাথের চাস অনেক। ফসল তেমন হয় না। চেষ্টা করিলেও ব্যর্থ হইয়া যায়। কলা, কাঁঠাল আম্র, জাম্র, ধান্য, মুগ, কলাই, আলু, সীম, মানকচু, বরবটী, ঝিঙ্গা, পটল, লাউ কুমড়া, সকলেরই মন্দ অবস্থা। বিশেষতঃ ধানের ও পাটের।

দীননাথের মন দমিয়া যাইতেছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে ভাবিত 'পৃথিবীর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে আস্‌ছে।'

স্কুলের হেড্‌মাষ্টার প্রবোধ বাবু 'দৈব' বিশ্বাস করিতেন। তিনি বুঝাইতেন, 'বাবা দীননাথ, হতাশ হয়োনা। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। তবে সকলের মঙ্গল এক সঙ্গে ও এক সময় হয় না।'

দীনু। একসঙ্গে হ'লে ভাল হত'। আমার ছেলেপুলে-গুলো খাবে কি? যদি একসঙ্গে সব ছেলেপুলে হয়ে যেত' তাহ'লে ব্যাপারটা কত দূর গড়াবে বুঝ্‌তে পার্‌তেম। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে বিধাতা পুরুষকে ডেকে এই সৃষ্টির আগাগোড়া বুঝে দিন-কতকের জন্য নিশ্চিন্ত হই।

হেডমাষ্টার দীনুর ব্যাকুলতা দেখিয়া নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন। দীনু আবার বলিল 'এই বিধাতা পুরুষকে পাওয়া যায় কোথায়?'

হেডমাষ্টার। তোমাদের গ্রামের মাঠের শেষে সেকালে এক বিধাতা-পুরুষের মন্দির ছিল শুনেছি, সেটার অবস্থা এখন কি রকম?

দীনু। শুনেছি ধন্না দিলে অনেক খবর পাওয়া যায়।

হেড্‌মাষ্টার। একবার চেষ্টা ক'রে দেখনা। অনেক সময় আশ্চর্য্য দৈবঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

ধন্না দিতে মজবুত ছিল দীনুর গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্র হইয়া ধন্না দিয়া বসিল।

তিন রাত্রি কাটিয়া গেল, ভগ্নমন্দির হইতে একটা শব্দ বাহির হইয়া পড়িল—যেন করুণ ভাষায় কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তোমাদের মনের কথা কি বল, আমি দ্বারের সম্মুখে উপবাসী জীব দেখিলে কষ্ট পাই।'

দীনু। বাবা তুমি কে?

শব্দ। পিতামহ ব্রহ্মা, যাকে তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বল।

দীনু। আপনিই বিধাতা-পুরুষ?

পিতামহ। অনেকটা।

দীনু। আপনিই হরি ঠাকুর? ঈশ্বর? সৃষ্টিকর্ত্তা?

পিতামহ। সেটা তোমরাই ঠিক কর। তোমাদের শাস্ত্রে বলিয়া থাকে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা। হরি ঠাকুর ভক্তদের ভগবান। অন্য দেশে বলে ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তারা সৃষ্টির খবর রাখে বেশী। তোমরা রাখ ভবযন্ত্রণা হ'তে মুক্তির খবর। কাজেই আমার সঙ্গে তোমাদের বড় আলাপ-পরিচয় নাই।

দীনু। আপনার শরীর দিয়েই ত ছত্রিশ জাতি বেরিয়েছিল?

পিতামহ। তাই ত বোধ হয়। তবে যতদূর মনে পড়ে, ব্রাহ্মণ মুখ হতে' বেরিয়েছিল।

দীনু। আপনাকে নমস্কার!

পিতামহ। কল্যাণ হউক! এখন বক্তব্যটা কি?

দীনুর গৃহিণী এই অবসরে আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

পিতামহ। ব্যাপারখানা কি?

দীনু। ওর ভয়, পাছে আপনি আমাকে লইয়া চলিয়া যান।

পিতামহ আশ্বাসবাক্যে বুঝাইলেন যে, তিনি যমরাজ নহেন; কিংবা আসামের কুলি সংগ্রহও করেন না।

দীনু। আমি একজন গরীব চাসা। এই সৃষ্টিটার মর্ম্ম বুঝ্‌তে এসেছি। যদি অনুগ্রহ ক'রে বুঝিয়ে দেন, তবে এই মানব-জন্ম হ'তে মুক্ত হই।

পিতামহ। মুক্তি যদি চাও, তবে আমার প্রধান কর্ম্মচারী বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে দিই, ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন এখন।

বিশ্বকর্ম্মা পুরুষ সেই ভগ্নমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। উভয়কে উপবাসী দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা আগে চারটি মুড়ি খেয়ে নেও।'

দীনু দেখিল, সম্মুখে একধামা মুড়ি। গৃহিণীকে বলিল, 'ছেলেপুলেদের দেও গে, আর, তুমিও একমুঠো খেও। আমি বৈকালে গিয়ে খাব।'

গৃহিণী চলিয়া গেলে, দীনু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। সম্মুখে একটি খর্ব্বাকৃতি দিব্যমূর্ত্তি। খুব সুচতুর ভাব ও হাস্যমুখ।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'হে কৃষক! ব্রহ্মা তোমার স্তবে তুষ্ট হয়েছেন। এই মন্দির বহু পূর্ব্বকালের। তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরও পূর্ব্বে যাঁরা এই দেশে বাস ক'র্‌তেন, তাঁরা পিতা-মহকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।'

দীনু। বাবা, আপনি ত একজন দেবতা?

বিশ্বকর্ম্মা। আমি দেবতাদের আর্টিষ্ট; অর্থাৎ, সৃষ্টিটা কি ক'রে সুন্দর হয়, সেইটের তত্বাবধান করি। এখানটা ভেঙ্গে, ওখানটা গ'ড়ে সব গুছিয়ে নিই।

দীনু। আমাদের সমাজও ত আপনি ভাঙ্গেন গড়েন?

বিশ্বকর্ম্মা। কাজেই।

দীনু। নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, সবই?

বিশ্বকর্ম্মা। নিশ্চয়।

দীনু। এ মন্দিরটা যদি গড়িয়ে দিতে পারতেন, তবে এত দুর্দ্দশা হ'ত না আমাদের।

বিশ্বকর্ম্মা। গড়ান' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

দীনু। তার ত চিহ্ন দেখ্‌ছিনে।

বিশ্বকর্ম্মা। আমাদের এক মুহূর্ত্ত তোমাদের হাজার বৎসর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

দীনু। আমি চাসী, চাসের ভাষায় আমাকে এই তত্বটা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'বাবা, সৃষ্টিতত্বটা খুব সাধারণ তত্ব। তবে দৃষ্টিটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। পিতামহ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। সকল দেশেরই সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি। তিনি তপস্যা করেন। সেই তপের ফলে এই সৃষ্টি। সেটাকে যজ্ঞ বল্‌তে পার। চাসও বল্‌তে পার।

দীনু। তপস্যা করেন কেন?

বিশ্বকর্ম্মা। সেটা তাঁর স্বভাব। ফলে তাঁর ছাঁচের অসংখ্য ছেলেপুলে দেখ্‌তে পান। সেগুলোকে আমরা বলি মানস-পুত্র। তাঁর এই তপস্যাকে সন্ন্যাসীরা বলেন, হংস-মন্ত্র-জপ। সেইটাই বীজমন্ত্র। তারই ফলে বিশ্বের বীজ, কিংবা যাকে তোমরা ব্রহ্মাণ্ড বল। এই একটা বীজ হ'তেই অসংখ্য বীজ। ক্ষেত বিশেষে সেগুলো জন্মায় এক একরূপে। তার মধ্যে মানস-পুত্র বেরিয়ে পড়বার জন্য হাঁসফাস্ করে, ও ক্রমে এক এক ক'রে বেরোয়। তারাও ক্রমে তপস্যা আরম্ভ করে অবশেষে পিতামহ চারিদিকেই ব্রহ্মাণ্ডের দর্পণে নিজের মূর্ত্তি দেখে খুসি হন, যেমন তোমরা নিজের মনের মতো ছেলেপুলে দেখে খুসি হও। তিনি যেমন তাঁর যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরিকে দেখেন, এদেরও আত্মদৃষ্টি হয়ে সেই রকম দেখে। কিন্তু আবার মনে ক'রে দিই,—তাঁর একটা নিঃশ্বাস, তোমাদের একটা যুগ। তাঁকে অনেক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসের লাঙ্গল টান্‌তে হয়। সেই ক্ষেতের মধ্যে, লাঙ্গলের টানে, আগাছা ও পোকামাকড়গুলো উচ্ছন্ন যায়। তুমি ত চাসী—ভেবে দেখ, এক বছরের মেহনত কত। এই রকম একটা যুগের মেহনত তাঁর একটা প্রাণায়াম। স্বয়ং আদ্যাশক্তি এই তপস্যার অনুকূল। দেবতারা সহকারী সম্পাদক। এইটুকু মোটের মাথায় সৃষ্টির আধ্যাত্মিক ইতিহাস।

দীনু। এতগুলো বীজ থাকে কোথায়?

বিশ্বকর্ম্মা। এটা খুব জ্ঞানীর কথা। পৃথিবীর মাটীই ত ক্ষেত না। সৃষ্টির মধ্যে জল, উত্তাপ, বায়ু, আকাশ সবই ক্ষেত। এদের মধ্যে আসল ক্ষেতটা হচ্ছে মনের ক্ষেত। সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলী। এর নীচে হচ্ছে উত্তাপের ক্ষেত, ও স্থলের ক্ষেত। সকলের উপর আকাশের ক্ষেত। সেটা হচ্ছে মনের বাক্, অর্থাৎ কথা। ব্রহ্মাণ্ডের বীজ থাকে মনের ক্ষেতে। ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে সেগুলো উড়ে গিয়ে জলের ক্ষেতে পড়ে। উত্তাপ সেই জলকে বাষ্প ক'রে আকাশের দিকে আনে। সেখানে মেঘ হয়ে বৃষ্টি হলে সেগুলো স্থলের ক্ষেতে উপস্থিত হয়। তুমি যে বীজ সঞ্চয় করে মাটীতে বুনে দেও, সেগুলো পৃথিবীর বীজ। ব্রহ্মা যে বীজ দেন, সেটা পৃথিবীর বীজগুলো খেয়ে মানুষের মন হয়ে দাঁড়ায়। তার শরীরের মধ্যে যে সব বায়ু গজায়, যাকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়, সেইটে হচ্ছে বায়ুর ক্ষেত। এই ইন্দ্রিয়গুলো যেখানে মিলে গিয়েছে, তাকে বলি মাথা। এই মাথাটায় যত সন্দেহ হয়, যেমন তোমার হয়েছে। তার সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্‌তে গেলে কথার দরকার। সেই কথাগুলো দোরস্ত হয়ে পড়লে তোমরা বলে থাক 'সাহিত্য'। আমি, অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা নিযুক্ত হয়েছি সেই মাথাগুলো ঠিক করবার জন্য।

দীনু। ব্রহ্মার বীজ যদি না গজায় ?

বিশ্বকর্ম্মা। বুঝতে হবে পৃথিবীর বীজগুলো পোকাধরা বীজ। চাস্ না হ'লে, অনাবৃষ্টি হ'লে', ক্ষেত জলে ডুবে গেলে, বীজ খেয়ে ফেল্লে. মেহনত ক'রে বীজের উদ্ধার না করলে তোমাদের বীজগুলো নষ্ট হয়ে যায়। অসংখ্য বীজ নষ্ট হচ্ছে, বংশলোপও হচ্ছে; কিন্তু তাতে কি? রাক্ষসগুলো মানুষ খেত, দেবতারা মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই কর্‌ত। কখনো হেরেও গিয়েছে; কিন্তু মানুষ তার মধ্যে মাথা গজিয়ে উঠেছে।

দীনু বলিল, 'বাবা! এত কথা বল্লেন, কিন্তু নিজেকে কিসে বাঁচাই ও ছেল-পুলে কিসে মানুষ হয়, সেটুকুর ব্যবস্থা ত এর মধ্যে পাচ্ছিনে।'

বিশ্বকর্ম্মা। মানুষ কি খেলে বাঁচে, ও কি করলে মানুষ হয়?

দীনু। তা কি আপনি জানেন না?

বিশ্বকর্ম্মা। আমি যেটুকু জানি তার সংবাদ এই। মানুষ হনুমানের মত হ'লে মানুষ হয়। অর্থাৎ বীর হলে হয়। ভক্ত হ'লে হয়। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র মানুষের সঙ্গে লড়াই ক'রলে হয়। চতুর্দ্দিকে ধুপধাপ ক'রে বেড়াবে। বেশীভাগ ফলমূল, শাক, ডাঁটা, লতা, পাতা খাবে; দরকার হয়, কিঞ্চিৎ চাস ক'রবে, না হয় না করবে। দরকার হয়, চরখার জোরে একখানা ধুতি পরবে, না হয় লেঙ্গট মেরে থাকবে। অথচ জ্ঞান হবে' টন্‌টনে. লেখাপড়া শিখে যাবে বেমালুম; কবিতা লিখবে, প্রেম করবে, হেসে খেলে বেড়াবে। বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম পছন্দ না হয় সন্ন্যাসী হবে। যিনি তপস্যা করে মানস পুত্র সৃজন ক'চ্ছেন, তাঁর চোখের সম্মুখে মায়ামৃগ ও সোনার লঙ্কাপুরী নাই। মানুষের বল উপেক্ষা করে শ্রীরামচন্দ্র এইজন্য বানরকেই মানুষের চেয়ে বড় দেখেছিলেন। মানুষ, যাকে তোমরা বল 'নরগণ' তাদের ও রাক্ষসগণের মধ্যে ব্যবধান বড় কম। সেটা কেবল ইন্দ্রিয় নিয়ে। নরগণ দেবগণের সঙ্গেও মিশ্ খায়, রাক্ষসগণের সঙ্গেও মিশে যায়। সেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রথমে তাকে দেশের আবহাওয়া সওান' চাই। যেটা অনায়াসে জোটেনা তেমন অন্নবস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা দূর করতে হবে। নিজেই দেখবে শক্তি বেড়েছে। তার পর আমি তাদের মাথাটা ঠিক করে দেব। বিজ্ঞান শেখাব। ক্রমেই মহাবীর হয়ে দাঁড়াবে।

দীনু বলিল 'বাবা! আমিও ভেবেছিলেম এক সময় যে কোন রকমে বেঁচে বর্ত্তে' থাকলে, গরিবের মতো কাটালে, দিনগুলো যে চলে না তা নয়; কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো এখন লেখাপড়া শিখেছে, সখ বেড়েছে অষ্টগুণ; তারা খেতে চায় চা' সিগারেট, পরতে চায় সরুপেড়ে ধুতি ও পাঞ্জাবি আস্তীন, থাকতে চায় কোঠাবাড়ীতে, স্ত্রী চায় সুন্দরী, বেড়াতে চায় দেশে দেশে। এ দিকে জমিদার চায় খাজনা, ডাক্তারে চায় ভিজিট, পঞ্চায়েত চায় টেক্স।"

বিশ্বকর্ম্মা। খুব স্বভাবসিদ্ধ কথা ও মঙ্গলের কথা। তোমাকে আরও বুঝিয়ে দিই। মনের বীজ মানুষের মধ্যে গজালে তার দুটো মাথা বেরোয়। আমাকে দুটো মাথার সামঞ্জস্য করতে হয় বলেই একটু অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা মাথা "আর্য্য", আর একটা মাথা 'অনার্য্য'। আর্য্য মাথা হচ্ছে আদিম মাথা, ও শেষকালে সেই মাথা থেকে যায়। অনার্য্য মাথা হচ্ছে সাময়িক ইতিহাসের মাথা, দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মাথা। আমি যে ছবিটি তোমার চোখের সম্মুখে ধরেছিলেম সেটা ত্রেতাযুগের মাথা। সত্যযুগ হ'তে আরম্ভ হয়ে দ্বাপরে গড়িয়েছিল। তার আদর্শ হচ্ছে তপোবন। ঈশ্বর তপস্যা। দেবতা মন্দির। ভক্ত গৃহস্থ। গোচারণের মাঠ। রাখালদের দল। বনের ফলমূল। চাস, পাট, বিষয়, বাণিজ্য, টাকাকড়ি ও ব্যক্তিগত স্বত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বল্লেও হয়। এতে, মনের মানুষ বনের মধ্যেই থাকলে, তার স্বাস্থ্য বন্য জন্তুদের মতোই ভাল থাকবে। জীবন ফুটে উঠবে; বনের ফুলের মতন তাদের মনের ফুলের সৌরভ বিকীর্ণ কর'বে। বনের বৃক্ষ ও ওষধির মতো বাঁচবে অনেক দিন। জমিগুলোকে পতিত ফেলে রাখ। যদি চাস কর কিছু, ফসলটা চট করে খেয়ে ফেল। খুব জঙ্গল বাড়ুক। ছাগল ও গরুর বংশ বাড়ুক সেই জঙ্গলের পাতা, ঘাস খেয়ে। অপর্য্যাপ্ত দুধ হবে, তার সঙ্গে ছানা হবে, ঘি হবে, মাখন হবে। যেমন তৈরি তৎক্ষণাৎ উদর-সাৎ। বনের পরিসর যত বাড়বে বৃষ্টিও বাড়বে। ঘোর জঙ্গল হয়ে পড়লে পুলিশ পঞ্চায়েত জমিদার সব বেকার হয়ে পড়বে! তোমরা বলবে 'টাকা নেই খাজনা দিব কোথেকে?' রাজা বল্‌বে 'তাই ত! বনমানুষ আবার খাজনা দেবে কি দিয়ে!'

বিশ্বকর্ম্মা আবার বলিলেন, 'এই যে সংযমের পথ, অমরত্বের ও অমৃতের পথ, চিরযৌবনের পথ, আনাড়ি

লোকের বেশী দিন সহ্য হবে না। মনে হবে—এই যে মানব-জীবন, সেটা কি জঙ্গলেই কেটে যাবে বনমানুষ ও কাঠুরিয়াদের সঙ্গে? রেখে দে তোর তপস্যা ও মুক্তি!

ব্রহ্মার উল্‌টা নিঃশ্বাসে এই ভাব হয়। কিন্তু তখনো সামলান' যায়, নিজে মেহনত ক'রে সখ্‌ মিটাতে চেষ্টা ক'রলে। নিজে বুদ্ধি উপার্জ্জন ক'রে জঙ্গলের মধ্যে থেকেও তারা কোঠা-বাড়ী, গানবাজনা, হাতী-ঘোড়া, উপন্যাস-কবিতা সকলই যোগাড় করতে পারে। বিজ্ঞান জানলে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী তৈয়ারি করতে কতক্ষণ? কিন্তু বিপদটা কি শোন! যাঁহাতক সখের বৃদ্ধি, তাঁহাতক শ্রমজীবী দলের সৃষ্টি ও ব্যক্তিগত স্বত্ব ও রিপুপরতন্ত্রতা আরম্ভ। সব টাকাগুলিই আমার ঘরে আসবে, সুন্দরী যুবতীগুলো আমারিই ভোগে লাগবে, যারা লাঠি ধ'রে ফোঁস্ করতে পারেনা তারা আমার দাস্যবৃত্তি করবে ও মজুরি খাট্‌বে, সাহিত্য কাব্য ইতিহাস আমারই গুণগান করবে; আমি শয্যায় চিৎপাত হয়ে পেয়ালাটা নূতন করে ভর্ত্তি কর-বার জন্য প্রিয়তমাকে ইসারা ক'রব। এই অনার্য্য মাথা বেরিয়ে পড়লে জগতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যাকে তোমরা বল ধর্ম্ম-সংস্থাপন। এই দ্বন্দ্বসংগ্রামে আত্মীয় স্বজনের জন্য মায়া করাও অনার্য্য। এই ভারতবর্ষেই আর্য্যদের যখন অনার্য্য মাথা বেরিয়েছিল, তখন আপোসের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। সেটার নমুনা গ্রামের দলাদলির মধ্যে এখনো দেখা যায়। অনার্য্য মাথা কচুরি-পানার মতো বেরুতে থাকে। দেশী লোকে সেটা নিবারণ করতে না পারলে বিদেশী লোকে তাদের দমন করতে আসে। তখন আমার কাজ যে সকলের মাথা একত্র করে সাহিত্যে দিয়ে সামঞ্জস্য করা। ব্রাহ্মণেরা বহুসহস্র বৎসর ধরে স্মৃতি ও শ্রুতির বাঁধন আওড়ে সেটা চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তারাও কচুরিপানার তীব্রগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

দীনু। বাবা! আমাদের দেশেই যত দলাদলি ও জাতিভেদ। অন্য দেশে কি এত আছে? ব্রহ্মা কি আমা-দের দেশেরই জন্য ছত্রিশ জাতি করেছিলেন?

বিশ্বকর্ম্মা। ভারতবর্ষ বিরাট ও বিচিত্র বীজের ভাণ্ডার। ব্রহ্মার বর্ণাশ্রম পুরুষপরম্পরা চিরকাল বজায় থাকবে এমন কথা শাস্ত্রে নাই। বর্ণসঙ্করত্ব অবশ্যম্ভাবী। আর্য্যরা পৃথিবীর চারিদিকে ছেয়ে পড়েছিল। যারা যথার্থ আত্মদর্শী ও যাদের নিরেট আর্য্যমাথা, তারাই সবদেশে ব্রাহ্মণ। যারা আর্য্য মাথাটা বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধব্যবসায়ী, তারাই ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে আর্য্যভাব থাকলে, সেটা বৈশ্যের ভাব। যারা সেবা করে, আর্য্যদের বাঁচায়, সেই পিতৃতুল্য জাতি শূদ্র। এই যে ছত্রিশ জাতির কথা বলছ, এটা পেশানুক্রমে পরে ঘটেছে। যেমন গরুর পেশা দুধ দেওয়া, মৌমাছির পেশা চাক্ তৈয়ারি করা। কিন্তু মনের বীজ বড় চঞ্চল, ক্রমাগতই ভেঙ্গে-গড়ে' আত্মার রূপে পরিণত হচ্ছে। এখন একটা মনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ছত্রিশ জাতির বীজ। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, অহিন্দু, নিরাকার ও সাকার ভাব একজনেরই মনের মধ্যে পাবে। এটা এক দিকে জাতি-বিভাগ ধ্বংসের লক্ষণ, আর এক দিকে মুক্তির লক্ষণ। ফলে ক্রমশঃ আবার পুরানো আর্য্য মাথা দাঁড়াবে। যে দেশের যে জাতিই হ'ক না কেন, যাদের ব্রাহ্মণের মাথা আছে, তাহারাই ক্ষত্রিয় মাথাওয়ালাদের জুটিয়ে, 'ধর্ম্ম' ব'লে যে খাঁটি জিনিষটা আছে সেটা রক্ষা ক'রতে চেষ্টা ক'রবে। সেই মাথাটা ঘামানোর নাম কর্ম্ম; আর জেনে-শুনে সেটারে পায় ঠেলে ফেলার নাম দুষ্কর্ম্ম। প্রত্যেকটারই ফলাফল আমরা একটু চেষ্টা করলে বুঝে নিতে পারি। তার মূলে' হচ্ছে প্রাণের সংযম। বাকিটুকু অকর্ম্ম; যেমন মলমূত্রত্যাগ, শিং দিয়ে গুতাগুতি, গণ্ডায় গণ্ডায় বংশবৃদ্ধি।

দীনু। বাবা বিশ্বকর্ম্মা! এ ত আমাদের হাত না। আমরা ত মুক্তিই চাচ্ছি এ সংসার থেকে। বিধাতা কি সেটা দেখেন না?

বিশ্বকর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা দীননাথ! যারা মুক্তি চায় তারাই বেশী বদ্ধ। অন্য দেশে মুক্তির জন্য এত ব্যাকুলতা নাই। ভারতবর্ষের দুটো বিশেষত্ব আছে। একে ত অলস, তাতে কামিনীপরায়ণ। এটা যে সত্য তা তোমাদের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজের প্রথা দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি বলতে পার 'দেশটা বেজায় গরম'। কিন্তু আর্য্যেরাই প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই গরম দেশে মাথাটা কি করে ঠাণ্ডা রাখলে কাম-প্রবৃত্তিটা দমন থাকে, আর বীর্য্যটার শক্তি দিয়ে বুদ্ধিবলে ও কায়িক পরি-শ্রমে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। এইজন্যই উপবাস, তিথি-নক্ষত্র পালন ও ব্রহ্মচর্য্য। সকল দেশেই, মাথাটা অনার্য্য হয়ে গেলে সেই নিয়ম পালন করে। অন্যদেশেও কি চরিত্র-

গত দোষ নাই? নিশ্চয় আছে; কিন্তু পরস্পরের অনুপাত কতটা, আত্মশক্তি কার কতখানি, সেটুকু সাময়িক ইতিহাসে জেনে নিতে পারবে। মুক্তি কি সোজা কথা? একজন মুক্ত হ'তে পারলে তার সঙ্গে দশজন মুক্ত হয়ে যায়। পাড়ায় একজন বীরপুরুষ থাকলে পাড়ার লোকের সাহস হয়, অগ্রসর হয়ে বিপদে আত্মরক্ষা করে। না থাকলে স্ত্রীর আঁচল ধ'রে কাঁপে। এইটুকু হচ্ছে অবরোধ-প্রথার মূল। স্ত্রীলোকই এদেশে পুরুষের বিপদ-আপদের সহায়। কোনো বিপদ হ'লে তারা অন্তঃপুর হইতে চেঁচিয়ে উঠতো, এমন কি, বঁটিখানা নিয়ে ছুটে আসত। তারাই ছিল গৃহকর্ম্মের মুটে-মজুর, রন্ধনশালার কুকার, তালবৃন্ত হস্তে মশা-মাছির যম, বাতগ্রস্ত ঘুমন্ত কর্ত্তার আরাম, ভববন্ত্রণার আশ্বাসপ্রদায়িনী। এখনও মাতৃশক্তি ও সতীর তেজ তাদের মধ্যে বজায় আছে; তবুও অবরুদ্ধ না ক'রলে চলে না, পাছে অন্ধ যষ্টিহারা হয়। কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি যদি বীর-পুরুষ হও, পত্নীও বীরপত্নী হ'তে চাবে। স্বাধীনতা পেয়েও তোমারিই সহধর্ম্মিনী হবে।

দীনু। বাবা বিশ্বকর্ম্মা! তাহলে' কি সব একাকার অনাসৃষ্টি হয়ে প'ড়বে?

বিশ্বকর্ম্মা। এক এক জাতি একাকার হয়। যেমন, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি। সহবাসে মানুষগুলো একাকার হয়ে যায়। মাথাগুলো মানুষের একাকার; কিন্তু মনের মাপকাঠি দিয়ে মাপলে বহু আকার। ব্রহ্মার তপস্যার ফলে এক একবার একাকার হবার উদ্যোগ হয়। গুণ-বিভাগ বলে' একটা জিনিষ আছে, যার জন্য সৃষ্টির বহু আকার। তুমি যখন লাঙ্গল দিয়ে চাস কর, তখন মাটী-গুলো ভেঙ্গে একাকার হয়। ঘাস, আগাছাগুলো উথড়ে যায়। ক্রমে তারা সূর্য্যের তেজে দগ্ধ হয় কিংবা বৃষ্টির জলে পচে। এইটুকু হল মনের চাস। বায়ুমণ্ডলে চেষ্টা হচ্ছে অহরহ যে, মনের বীজ আর্য্যসংস্কারাপন্ন হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান। ব্রহ্মা করেন চাস। এখন দেখতে হবে পৃথিবীর ক্ষেতে তুমি সেই বীজের খোরাকের জন্য কি রকম বীজ তৈয়ার ক'রেছ। মনের বীজ হচ্ছে' ব্রহ্মার মানসপুত্র। পৃথিবীর বীজ হ'চ্ছে মাতৃগর্ভ-প্রসূত মানব-মূর্ত্তির বীজ। তোমার বীজ পুরুষানুক্রমে তোমার শরীরের রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে। চন্দ্র মাতৃগর্ভে হাপর তৈয়ারি করে। সেটা তোমার বীজের ক্ষেত। ভাল ক'রে সার দিয়ে, ময়লাগুলো বের করে' ফেলে, হাপরটার সংস্কার না ক'রলে, যে ভ্রূণ জন্মাবে, সেটা মানস-পুত্রের বসতির ও খাদ্যের উপযোগীই হবে না। অর্থাৎ মানুষ একটা জন্মাবে বটে, কিন্তু ভগবানের অংশ, যেটাকে আমরা জীবাত্মা বলি, তার মধ্যে হয় ত প্রবেশই ক'রতে পারবে না। মনের যে সব সদ্‌গুণ দেখে আমরা ভগবৎ-প্রেমের পরিচয় পাই, সেগুলো অচৈতন্য অবস্থায় থেকে যাবে।

দীনু। বাবা! এ সব ব্যাপার শুনে সংসারে জন্ম নিতেই ভয় হয়।

বিশ্বকর্ম্মা। ওটা কেবল মুখের কথা। জন্মাবার সময়ও যন্ত্রণা পাও না, মরবার সময়ও না। যতদিন বেঁচে থাক, ততদিন কেবল অভাবের যন্ত্রণা। নিতান্ত পক্ষে রোগের যন্ত্রণা। কেউ মর্‌তে চায় না ইচ্ছা ক'রে। মা গর্ভযন্ত্রণা পেয়েও মর্‌তে চায় না। সৈনিকও মরবার সময় ম'র্‌তে ইচ্ছা করে না। আত্মহত্যার শেষ মুহূর্ত্তে অনুতাপ হয়। ফাঁসিকাঠেরও সেই দশা। কাজেই যারা মর্‌তে চায় না, জন্ম তাদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। জন্মটা কর্ম্মভোগ, কিছু কড়া আইন, কেন না কর্ম্মক্ষেত্রে ঠেকে না শিখলে জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না। দুটোই মনের সংস্কারের জন্য। বায়ুক্ষেত্রে একটী অদ্ভুত রাসায়নিক সংযোগ হয়। তার ফলে সকলে দল বেঁধে ও কোমর বেঁধে জন্মের জন্য ব্যস্ত হয়। দল বেঁধে ম'র্‌তে সবদেশ রাজি নয়; কিন্তু জন্মাতে রাজি। ইন্দ্রিয়ের যে মজাটুকু ইহলোকে, সেটুকু পরলোকে নাই। কাজেই মোটের মাথায় জন্ম হয় বেশী, মৃত্যু হয় কম। সংসার-যোগশাস্ত্রে রেচকের চেয়ে পূরকের মাত্রাটাই বেশী। আজীবন কষ্টটা কুম্ভকের। সেইটে মনে হলে দীনদুঃখীদের ভয় হয়। কিন্তু ভয় পেও না। পূর্ব্বেই বলেছি, যত জীবই জন্মাক্ না কেন, তার খাদ্য সঙ্গে সঙ্গে। যাদের পছন্দসই খাদ্যের দরকার, তাদের মেহনত না ক'রলে চলবে না। হয় ত অন্যদেশে বেরিয়ে প'ড়বে। তোমার ছেলে দুটো যদি দেশ ছেড়ে চলেই যায়, তোমার ভয় কিসের?

দীনু। সেইটেই ত এখনো বুঝতে পাচ্ছি না। বৃদ্ধ বয়সে দাঁত সিঁটকে পড়ে থাকব, পিণ্ডি দেবারও কেউ থাকবে না। অন্যদেশে কি পিণ্ডি দেয়?

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বাবা দীননাথ, কেউ যদি পিণ্ড না



চিন্তা

শিল্পী- [illegible] হোসেন

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

দেয়, ভগবানই পুত্র স্বরূপ হয়ে তার পিণ্ড দিতে থাকেন। দ্যুলোকে ব্রহ্মাণ্ডের শ্রাদ্ধ হচ্ছে' প্রত্যহ ; কেবল এক পুরুষের নয় চতুর্দ্দশ পুরুষের। যে ছেলে দেশ ছেড়ে গিয়ে আবার জয়ী হয়ে স্বদেশে ফিরে না আসে, বিদেশের লোকেই তার পিণ্ড চটকে দেবে। তুমি সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত থেক'। যদি কর্ম্মিষ্ঠ হয়ে উপার্জ্জন ক'রে, দেশে ফিরে, দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করে, সেই ছেলে ত পিণ্ডের অধিকারী। যদি অকর্ম্মণ্য হ'য়ে ঘরে ব'সে সিগারেট ফোঁকে, তবে তার হাতের পিণ্ড গ্রহণ না করাই ভাল। তোমার দেশটা যে অকর্ম্মণ্য সেটা চরখা-সূত্রেই প্রমাণ হয়েছে। যে দেশে হাজার লোকের মধ্যে দু'জনও চরখা হাতে ক'রতে নারাজ,সে দেশের ধ্বংস সন্নিকট। বিজ্ঞান শিখলেই কল চলবে না; দর্শন শিখলেই চরিত্র শোধরাবেনা। কিন্তু এটাও মনে থাকে যেন, তোমাদের দেশের বীজ পুরাতন পাকা বীজ। ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে চট ক'রে। একবার সুবৃষ্টি হলে ও ক্ষেতের সংস্কার হ'লে তার পুরাতন শক্তি জেগে উঠবে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে, আর্য্যমাথা নিয়ে, নূতন আকারের জাতি বেরুবে। এখন যে ছেলেদের দেখ্‌ছ বেয়াড়া বয়াটে চরিত্রহীন ও বোম্বেটে, তারা চট করে ব'দলে যাবে। যাদের পেছুনে তারা দৌড়ুচ্ছে, সেই মেয়েছেলের দলই তাদের সোজা ক'রে দেবে। পৃথিবী জুড়ে একটা বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। টাকার মূল্য গেছে ক'মে ; পরিশ্রমের মূল্য হয়েছে বেশী।

দীনু। বাবা! টাকা কিছু জমা না থাকলে, দুর্বৎসরে যে অনাহারে ম'রে যাব। মেয়ে কটার বিয়ে হবে না। রোগ হলে ডাক্তার পাব না।

বিশ্বকর্ম্মা। আমি যে চিরকালটা মেহনত ক'রে পৃথিবী গ'ড়ছি তার জন্য টাকা পাই কত, আর দেয় কে ? প্রথমতঃ টাকা থাক্‌লে সে নির্ঘাত বাজে খরচে উড়িয়ে দেবে ; অর্থাৎ দেশী ও বিদেশী অনার্য্য শ্রমজীবীদের পুষ্টিসাধন করবে। মনে কর না হয় তুমি খুব হুশিয়ার। কিছু টাকা জমা করেছ অসময়ের জন্য। যদি সেই পরিমাণে খাদ্য জমা থাকে তবেই টাকা কাজে লাগবে। যদি খাদ্যই জমা থাকে, তবে তোমাকে তার মালিক ধারও দিতে পারে। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস নাই। তুমি অলস ও অকর্ম্মণ্য! সেই জন্য টাকা একটা জাঁকড়। গহনাপত্রও তাই। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ও ব্যক্তিগত স্বত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য টাকা। দেশে খাদ্য না থাক্‌লে অন্য দেশ থেকে টাকা দিলে খাদ্য আস্‌বে, এই আশায় রেলগাড়ী, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য। কিন্তু এই টাকার কারবারে কারও কি সুবিধা হ'চ্ছে ? পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করে দিলেও সেটা টেকে না। এদিকে টাকার লেনদেন কারবার না হ'লেও "সভ্য সমাজ" গ'ড়ে উঠে না। একটা বড় দেশ সম্প্রতি চেষ্টা ক'রেছিল টাকার কারবার তুলে দিতে ; কিন্তু চাষী, শ্রমজীবী, ও টাকার মহাজনের মধ্যে গোলমাল আরম্ভ হ'ল। শ্রমজীবী, অর্থাৎ শূদ্রের বিপ্লবে ভারতবর্ষও তটস্থ। কিন্তু ভেবে দেখ, এগুলোর আসল কারণ হচ্ছে আর্য্যদের মধ্যে অনার্য্য জাতি-বিভাগ। এখন পৃথিবী শুদ্ধ দাঁড়িয়েছে চারটে জাতি। অনার্য্য শাসনকর্ত্তা, অনার্য্য মহাজন ও বৈশ্য, অনার্য্য চাষী, ও অনার্য্য শ্রমজীবী। ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ পরপারে গিয়ে সাহিত্যের টেলিফোনের মধ্যে তাদের দিকে আশ্বাসবাণী প্রচার ক'রছে। আসল কথাটা হয় ত এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছ। আর্য্য ব্যবস্থার কাঠামে অনার্য্য সমাজের মাথা দাঁড় করানো সমূহ বিপজ্জনক,যেমন যোগ-পথে রিপুচরিতার্থ। তার চেয়ে ভাল সভ্যতার বন্যার সঙ্গে ভেসে পড়া। যে কটা থাকে থাক্‌বে, যে কটা মরে মরবে। মেয়ের বিয়ে নাই বা হ'ল ? মেয়ের দিকে কুনজরে কেও তাকালে তাকে আচ্ছা ক'রে ঠুকে দেবে। সংসারটা কি রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছে সেটুকু তারা দিনকতক লেখাপড়া শিখে, দেখে-শুনে বুঝে নিক।

দীনু। বাবা বিশ্বকর্ম্মা! আপনি হচ্ছেন বিশ্বের কর্ম্মী। আমি হচ্ছি একজন অকর্ম্মা। এখন আপাততঃ এই দীনহীন অকর্ম্মা চাসী কি ক'রে শেষ বয়সটা নিশ্চিন্তে কাটায়, সেটার একটা সৎপরামর্শ দিতেই হবে। আমি সেই জন্যই ধন্না দিয়েছিলেম।

বিশ্বকর্ম্মা। বেশ কথা, সেজন্য দুঃখ ক'রো না। দেবতা-রাও এক সময় আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলে, এখন সুখে দিন কাটাচ্ছে। প্রথমে আমি যখন স্বর্গপুরী গড়াই, তখন আহারের বন্দোবস্তটা অপর্য্যাপ্ত হয়েছিল। ইন্দ্ররাজ ও তাঁহার দলবল খেতেন আটার রুটী ; কেন না, তাঁকে বজ্র চালাতে হ'ত। ঐরাবত খেতে আখ্‌। চন্দ্র খেত সেই আখের রস। বরুণ কেবল নারিকেল ও ডাবের সরবৎ। দৈত্যগুরু শুক্র খেতেন গোলআলু ও পাঁঠার ঝোল। বৃহস্পতি খেতেন কাঁচকলা। মঙ্গল খেতেন

পল্‌তার ঝোল ও সাবুদানা। বুধ খেতেন লাউডগা ও কুমড়া। অশ্বিনীকুমার খেতেন অশ্বগন্ধার আরখ্‌। অগ্নি খেতেন ঘি। বায়ু খেতেন তেলে-ভাজা বেগুনী। ব্রহ্মা কেবল দুধ খেয়ে থাক্‌তেন। বিষ্ণু কেবল ক্ষীর। মেয়ে-ছেলেরা খেত আমড়া চচ্চড়ি ও সজনে খাড়া। জোর দুটো একটা সন্দেশ কি রসগোল্লা। চাস কর্ত্তেন তাঁরা নিজেই। যক্ষরাজ ধনকুবের অত ঐশ্বর্য্য সত্বেও কেবল বাবুলি খেয়ে থাক্‌তেন। আমার প্রিয় খাদ্য শাঁকালু। বস্ত্রের ত দরকারই ছিল না, কেন না সকলেরই দিব্যদেহ, সম্পূর্ণ আর্টিষ্টিক্‌ অর্থাৎ কলাময়। ক্রমে দেখা গেল যে, চাস্‌ ও রান্নার পাট না তুলে দিলে পরিশ্রমের বোঝাটা সকলেরই স্কন্ধে পড়ে। সুতরাং কেবল একটী ফলের বাগান ফেঁদে ফেল্লুম। মেহনত কম। একটা না একটা ফল বছরে ফল্‌বেই। গরুগুলো খেয়ে বাঁচবে। দেবতারাও কাঁচা ও পাকা ফল খেয়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করে দিলে। এখন ইন্দ্রপুরী দেখবার উপযুক্ত।

দীনু। ভাত কেউ খেতেন না?

বিশ্বকর্ম্মা। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে ওঁছা জিনিষ ভাত। ভাত খেলে অকর্ম্মের নেশা হয়ে পড়ে। বেরি বেরি হয়। ম্যালেরিয়া হয়। কালাজ্বর হয়। কাঁচা কিংবা ডাঁশা ফলই চমৎকার। যদি দাঁত না থাকে ত পাকা। এই জন্যই গীতায় ভগবান বলেছেন কর্ম্মের পাকা ফল ভগবানকে অর্পণ করবে। তিনি দেবতাদের সঙ্গে বেঁটে খাবেন। তার সঙ্গে দুধ ঘি ছানার ত কথাই নাই। ফল সইয়ে নিতে হবে, পাছে না পেটের অসুখ হয়। চাস হচ্ছে অনার্য্য প্রথা। কৃষ্ণ চাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। বলরাম লাঙ্গল নিয়ে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেন নাই। চাসের গোলমালেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধল। 'সূচ্যগ্র ভূমি'র স্বত্বের জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিচার করতে এই কাণ্ড। উদ্যান, অন্ততঃ বনজঙ্গলই সুপ্রশস্ত। একটা না একটা ফলমূল ফল্‌বেই। তাই প্রাণ-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আর, খাজনার কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি। গরু বাছুর কেউ ক্রোক করে নিয়ে যাবেনা। খদ্দের কোথায়? খেতে দেবে কে? সেই অরণ্যবাসী! গাছ কেটে, বাঁশ কেটে উঁচু কাঠের ঘর তৈয়ারি করবে। নিতান্ত ইচ্ছা হয় শাঁকালু ও আখের চাস কর্ত্তে পার। পুষ্করিণীটা যেন দোরস্ত থাকে, নচেৎ একটা কূপ। গ্রামের দেবমন্দির সংস্কার কর ও বৎসর বৎসর মায়ের পূজোটা দিও। দরকার হলে আমাকে ডেক। আমি আপাততঃ শাঁকআলু ছেড়ে মুখ বদলাবার জন্য পেঁপে ধরেছি। একটু মেহনত করে, স্ত্রী-পুরুষ ও পুত্র-কন্যা মিলে বাগান ফাঁদ, দেখ কার ফল কে খায়। অনর্থক হাহাকার করে লাভ নাই। এখন আসি। আস্‌ছে বৎসর আবার দেখা হবে। আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, আনারস, কলা ও ক্ষীর,—ফলাহার জন্য এই কটা তৈয়ারি করে রেখ। দেবতাদেরও সঙ্গে ডেকে আন্‌ব।

দীনু। নমস্কার।

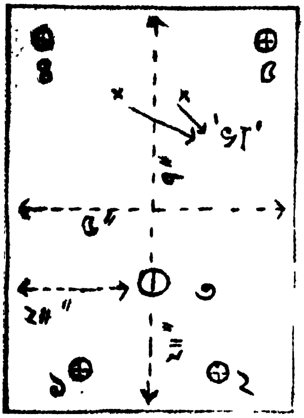
ঘরে তৈরি 'বেতার'

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

ক'লকাতায় Broad-Casting Station খোলবার পর, পূজোর বাজারে 'বেতারের' সখটা যে বাঙ্গালীর একটু বেড়েই যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ঘরে বসে' নিজের হাতে বেতারের 'গ্রাহক যন্ত্র' (Receiving Apparatus) তৈরী করে 'ভারতবর্ষের' উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা যা'তে পূজোর সখটা ভাল করেই মেটাতে পারেন, তারই জন্যে এই প্রবন্ধ লেখা। এই যন্ত্রটী সাধারণ ছোট খাট Crystal setএর মধ্যে বেশ ভাল এবং এতে ২০।২৫ মাইল দূরের গান-বাজনা বেশ চমৎকার শোনা যাবে। যন্ত্রটী ব্যবহার কর্ত্তে কোন গোলমালই নেই; শুধু Condenser ("ক") এর হাতলটী ঘুরিয়েই tune করা চল্‌বে। যন্ত্রটী তৈরীর খরচাও বেশী নয়, মাত্র ১৫৲; কিন্তু বাজারে কিন্‌তে এ রকম যন্ত্রের দাম ৩০৲।৪০৲ টাকার কম নয়।

যন্ত্রটী তৈরী কর্ব্বার জন্যে প্রথমেই দরকার একখানা

৫″×৭″ আবলুশ কাঠের (Ebonite) টুকরো বা সেলুলয়েড্ কি অন্য কোন জিনিষ দিয়ে তৈরী বেতারের জন্যে যে panel ব্যবহার হয় তাই। এর ওপর ৫টী গর্ত্ত কর্ত্তে



১ নং চিত্র

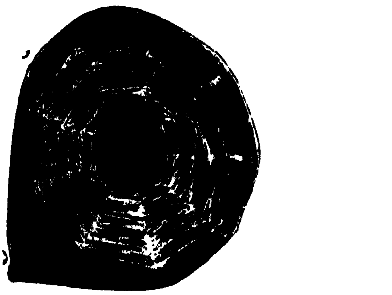
হ'বে; কোন্ কোন্ জায়গায় গর্ত্তগুলো হবে সেটা ১নং ছবিতে দেখান হ'ল। গর্ত্ত কর্ব্বার সময় মাপজোপ অতটা ঠিক না রাখ্‌লেও চল্‌বে;—তবে যতটা সম্ভব ঐ রকম জায়গায় যাতে হয়। অন্যান্য অংশগুলি সেইজন্যে গর্ত্ত কর্ব্বার আগে কিনে নেবেন, যাতে গর্ত্ত খুব কাছে না হ'য়ে যায়।

যন্ত্র তৈরীর জন্যে আর যা দরকার তার নাম

'ক'—·0003 mfd Variable Condenser,

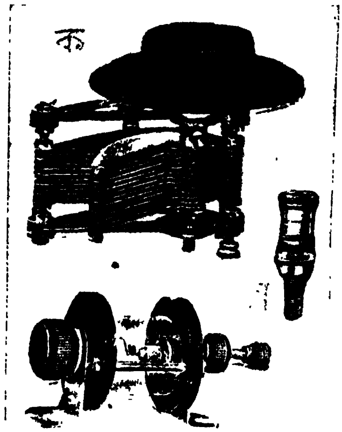
'খ'—Crystal detector (Glass enclosed),

'গ'—Terminals ৪টী ও তিন আউন্স



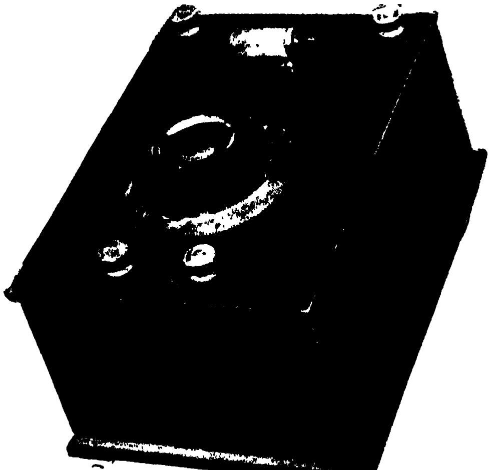
৩ নং চিত্র

24. (S. W. G) insulated তার Coil কর্ব্বার জন্যে। জিনিষগুলি পাছে কোন পাঠক-পাঠিকা না বুঝ্‌তে পারেন—২নং ছবিতে সেইজন্য প্রত্যেকটী অংশ স্পষ্ট ভাবে দেখান হ'ল। ছবি দেখ্‌লেই যে কোন বেতার যন্ত্রবিক্রেতার দোকান ও-গুলি দিতে পার্‌বে। যন্ত্রগুলি কেনা হ'য়ে গেলে (৩) গর্ত্ততে 'ক' অংশ এঁটে ফেলুন; আর Terminal ৪টী



২ নং চিত্র

('গ') ১,২,৪,৫ গর্ত্তগুলিতে ভাল করে' এঁটে দিন। এবার স্ক্রু দিয়ে (৪) ও (৫) এর মাঝখানে Crystal detector ('খ') বেশ করে' জুড়ে দিন। এখন বাকী রৈল Coil তৈরী করা, আর প্রত্যেক অংশকে প্রত্যেকটীর সঙ্গে insulated তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া।



৪ নং চিত্র

Coil তৈরীর জন্যে আমাদের চাই একখানা পুরু গোল কার্ডবোর্ড, তার ব্যাস হ'বে ৪″। একটী ধারাল কাঁচি বা

ছুরী দিয়ে—৩নং ছবিতে যেমন দেখান হ'য়েছে,—কার্ডবোর্ড খানিকে সেইরকম ভাবে কাটতে হ'বে। তার পর যে 24. S. W. G. insulated তার কিনেছেন, সেই তার নিয়ে, ছবিতে যে ধাঁজে তার জড়া'তে দেখান হয়েছে, সেই ভাবে ৬০ পাক তার কার্ডটার উপর জড়িয়ে ফেলুন। এইবার ২০ ও ৪০ পাকের এক এক জায়গায় তারের ওপরকার insulation চেঁচে ফেলে দুটী ৬ ইঞ্চি লম্বা তার এঁটে নিন্। এখন তা' হ'লে Coilটির চার জায়গা থেকে ৪টী তার বেরিয়ে রইল, Coilএর আরম্ভ থেকে একটা, ২০ পাক থেকে একটা, ৪০ পাক থেকে একটা, আর Coilএর শেষটা।

সব-শেষে হ'চ্ছে প্রত্যেকটী অংশের সঙ্গে প্রত্যেকটীকে তার দিয়ে যোগ করা। এই কাজটাই একটু মন দিয়ে কর্ত্তে হ'বে। আর এই জোড়া-তাড়ার কাজের সময় এইটে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবেন যে, কোন জায়গায় যেখানে জোড়ের কোন দরকারই নেই, সেখানকার তারের insulation যেন না উঠে যায়, আর জোড় যেন কোথাও আল্‌গা না হয়,—কারণ তা হ'লে কল ভাল কাজ কর্ব্বে না। কোথায় কি জুড়তে হ'বে, সেটা এই জায়গাটা ভাল করে পড়ে, মিলিয়ে নিয়ে করবেন ;—

প্রথমে coil এর ৪০ পাক থেকে যে তার এসেছে সেটা (৪) গর্ত্তের terminalএ যোগ করবেন ; তারপর ২০ পাকের তারটী (৫) terminalএ জুড়ে দেবেন। এ দুটি জোড়বার পর 'ক' অংশের ওপরের হাতলটী ঘুরিয়ে দেখে নেবেন যে কোন্ দিকের 'পাতগুলি' ঘোরে। যে দিকের 'পাতগুলি' ঘুরল, তা'তে যে স্ক্রু লাগান আছে, তার সঙ্গে Coilএর যে শেষ দিকের তার, সেইটী জুড়ে দেবেন। আবার এই তারটীর সঙ্গেই 'খ' অংশের একদিকের স্ক্রু থেকে একটী তার এনে জুড়ে দেবেন। 'খ' অংশের অপর স্ক্রুটি একটুখানি তার দিয়ে (২) terminal এর সঙ্গে এঁটে দিতে হ'বে ; তার পর (১) terminal থেকে একটী তার নিয়ে গিয়ে 'ক' অংশের যে 'পাতগুলি নড়ে না, তাতে যে স্ক্রু আছে, তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হ'বে।

এইখানেই জোড়াতাড়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেল। জোড়বার সময় মনে রাখবেন যে, সমস্ত জোড়ের তার যেন কাঠের নীচের দিক দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়। এখন এমন মাপের একটী ছোট বাক্স তৈরী কর্ত্তে হ'বে যাতে, এই যন্ত্রগুলি লাগান ৫" × ৭" কাঠখানি তা'র ওপর ঠিক ডালার মত এঁটে দেওয়া যায়। কলটী তা'হলে ৪নং ছবির মত দেখতে বেশ সুন্দর একটী "বেতার গ্রাহক" যন্ত্র হ'বে।

কলটী তৈরী শেষ হ'য়ে গেলে (৪) Terminalটীর তলায় "আ" এই অক্ষরটী ও (৫) Terminalটীর তলায় "মা" এই কথাটী লিখে রাখ্‌লে ভারী সুবিধে হয়। কেন, তার কারণ বল্‌ছি।

বেতারে গান পাঠান হয় আকাশে (Ether) বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সৃষ্টি ক'রে। এই ঢেউগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখন ঐ ঢেউয়ে যে গান আছে তাকে ঘরে বসে শুনতে হ'লে খানিকটা ঢেউকে কোন রকমে ধরে নিজের কলের মধ্যে আনা চাই, তার পর তাকে যন্ত্র দিয়ে আবার গানে পরিবর্ত্তিত করে' শুনতে হ'বে। এই বৈদ্যুতিক ঢেউকে ধরা হয়, "আকাশ-তার" (aerial) দিয়ে। একটু মোটা ৬০।৭০ ফিট লম্বা তামার তার (7-20 Copper wire) খানিকটা উঁচুতে দুটো বাঁশে আটকে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়,—এমন ভাবে, যাতে ঐ তার কোন রকমে মাটির সংস্পর্শে না আসে। এই যে "আকাশতার" টাঙ্গান হোল—কলটী যখন ব্যবহার করা হয়, তখন এইটে থেকেই একটা insulated তার এনে "গ্রাহক যন্ত্রের" "আ" অক্ষর-লেখা Terminalএ যোগ করা হয়। আর "মা" অক্ষর লেখা Terminal থেকে আর একটী insulated তার মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—বা সব চেয়ে ভাল হয় কলের জলের নলের সঙ্গে এঁটে দিলে।

এখন বেতারে যখন গান পাঠান হচ্ছে, সেই সময় বেতারে ব্যবহারের উপযোগী একটী টেলিফোনের (দাম ১২॥০ থেকে ২৫্ পর্য্যন্ত) তার দুটী বাকী যে দুটা Terminal আছে, যাতে কোন চিহ্ন দেওয়া নেই, তাইতে আটকে দিয়ে, "ক" (Condenser) অংশের হাতলটী ঘোরালেই হাতলটী এমন একটা জায়গায় আসবে যখন বেশ সুন্দর গান শোনা যাবে।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যিনি এই প্রবন্ধ পড়ে কল তৈরী কর্ব্বেন বা যাঁরা এ বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইবেন, তাঁরা দয়া করে লেখকের নামে, বেহালা, ঠিকানা দিয়ে পাঠালেই সব খবর পাবেন। *

---

* 'বেতার' ব্যবহার কর্ত্তে হলে G P.O. থেকে ১০্ দিয়ে একটা লাইসেন্স কিনতে হয়।

মেয়ে-ফটোগ্রাফার

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

ফণিভূষণ কয়েক দিন হইল কানপুরে আসিয়াছে। সহরটি তাহার সম্পূর্ণই অপরিচিত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে তাহার বাড়ী। তাহার পিতা যেমন উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই ব্যয় করিতেন। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন, তখন ঋণও যেমন ছিল না, সঞ্চয় ও তেমনি মোটেই ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল একখানি ছোট বাড়ী; লোকের মধ্যে ছিল ফণীর মা, আর তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

ফণী কলিকাতায় একটা সওদাগরী আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী লইল। মাস পাঁচ ছয় পরেই তাহার মনিব তাহাকে কানপুরে বদলী করিলেন; বেতনও আশী টাকা করিয়া দিলেন। পরিবার তখনই সঙ্গে লইয়া যাওয়া সঙ্গত মনে না হওয়ায় সে একলাই কানপুরে গিয়াছিল। একে নূতন স্থান, তাহাতে বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই;—ফণী বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন আফিসের কাজ শেষ হইলে ফণী বেড়াইতে বাহির হইত। এক দিন অপরাহ্ণে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া সে লোকজনের গতিবিধি দেখিতেছিল, এমন সময় পথের অপর পার্শ্বের দোতালার বারান্দায় একটা সাইন-বোর্ডের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল! সে পড়িয়া দেখিল,—সেখানে ইংরাজীতে লেখা আছে—"মিস্ এস্, এস্ দেবী, মেয়ে ফটোগ্রাফার।" ফণিভূষণ দূরদেশে বাঙ্গালী মেয়ে-ফটোগ্রাফারের নাম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; এবং তাহাকে দেখিবার এবং তাহার সহিত পরিচিত হইবার তাহার ইচ্ছা হইল।

নীচের দোকানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, মেয়ে-ফটোগ্রাফার বাঙ্গালী; এবং পার্শ্বের সরু গলিতে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। ফণী সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে ধীরে ধীরে সেই দ্বারের কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

ফণী বলিল, "মেয়ে-ফটোগ্রাফার কে? আমার তাঁর সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে।"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"আমিই ফটোগ্রাফার। আপনার কি প্রয়োজন?"

ফণী বলিল—"আমাদের বাড়ীর মেয়েরা শিগ্‌গীরই আস্‌বেন, তাই ফটো তোলারও দরকার হবে। আপনার সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় থাক্‌লে বেশ সুবিধা হবে মনে হোলো; তাই দেখা কর্‌তে এসেছি।"

মেয়ে-ফটোগ্রাফার বলিল—"আসুন, ভিতরে আসুন।"

ফণী যে কক্ষে প্রবেশ করিল, সেইটি বসিবার ঘর। সেই কক্ষে বহু চিত্র শোভা পাইতেছিল। ঘরটি বেশ সুন্দর ভাবে সাজান-গোছান। দ্বারে ও জানালায় সুন্দর পর্দ্দা ঝুলান ছিল। কৌচের উপরে একটা কাবুলী বেড়াল নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল। একটা মেহ্‌গ্নি আল্‌মারির ভিতরে কয়েকখানা "স্লাইড্" কয়েকটী ঔষধের শিশি এবং দুই একটী ক্যামেরা বেশ গোছান ছিল।

মেয়ে ফটোগ্রাফার তখন তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিল। ফণী একখানি সোফায় বসিলে, মেয়েটী তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। অবশেষে ফণী বলিল—"বাড়ীর মেয়েরা এলেই আপনাকে সংবাদ দেব; আপনি তাদের ফটো তুলবেন।"

তাহার পর আরও দুই-চারিটী কথার পর ফণী সে-দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল।

২

যুগলকিশোর আচার্য্য মনোহরপুর গ্রামের মধ্যে খুবই নিরীহ প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে ছিল একটী মেয়ে এবং একখানা পৈতৃক বাড়ী। সেই বাড়ীর এক অংশ একজনকে ভাড়া দিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে দুইটী প্রাণীর কোন রকমে দিনগুজরাণ হইত। মেয়েটী দেখিতে দেখিতে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনের দ্বারে

পদার্পণ করিল। যুগলকিশোর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত অবস্থার ছেলে পাইতেন; কিন্তু, তাঁহার খেয়াল হইল অন্যরূপ। তিনি একটী অবস্থাপন্ন ছেলের সহিত তাঁহার মেয়েটীর বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহ উপলক্ষেই বসতবাটী বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, বৈবাহিকের হস্তে তিন হাজার টাকা তুলিয়া দিয়া, বাকী যৎকিঞ্চিৎ সম্বল লইয়া কাশীতে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু বিবাহের পরদিনই অলঙ্কার লইয়া যুগলকিশোরের সহিত তাঁহার বৈবাহিকের ঘোর বিবাদ হইল। বৈবাহিক মহাশয় রাগ করিয়া সৌদামিনীকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন না। বলিয়া গেলেন, তিনি পুনরায় ছেলের বিবাহ দিবেন। যুগলকিশোর অনেক অনুনয় করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণের রাগ পড়িল না। তখন মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"চল্ মা সেই শান্তিধামে,—বাবা বিশ্বনাথের চরণে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখানে আর নিষ্ঠুর বৈবাহিকের অত্যাচার, অবিচার নাই।" সৌদামিনী তার বাপের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩

ফণিভূষণের স্ত্রী, কন্যা সাত দিন হইল কানপুরে আসিয়াছে। স্ত্রী আসিয়াই তিন দিনের মধ্যে বসন্তরোগে মারা গিয়াছে। কন্যা সুধাকে লইয়া ফণী এই দূর-দেশে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ফণিভূষণের সঙ্গে মেয়ে ফটোগ্রাফারের বিশেষ আলাপ-পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ফণী সর্ব্বদাই মেয়েটীর বাসায় যাইত; এবং অনেকক্ষণ গল্প করিয়া বাসায় ফিরিত। মেয়েটীও তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

সেদিন সুধার গা খুবই গরম হইয়াছিল; দুই-একটা গুটিও দেখা দিয়াছিল। ফণী মহা বিপদে পড়িয়া, কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। স্ত্রীর বসন্ত হইলে তাহার একবার মনে হইয়াছিল, মেয়ে ফটোগ্রাফার মিস্ মুখার্জ্জিকে সংবাদ দেয়; কিন্তু নানা কথা ভাবিয়া সে সংবাদ দেয় নাই। তাহার পর যখন সুধাও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল, তখন মিস্ মুখার্জ্জিকে সংবাদ দিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে সংবাদ পাঠাইবে, এমন সময় মিস্ মুখার্জ্জির গাড়ী আসিয়া ফণিভূষণের বাটীর দরজায় উপস্থিত হইল। উপরে আসিয়া সুধার কথা শুনিয়া মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় সে সুধাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। সুধা তখন তা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া 'মা' 'মা' রবে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; বলিল, —"মা, তুই আর আমাকে ছেড়ে যেতে পাবি না।"

সুধা মিস্ মুখার্জ্জির যত্নে আরোগ্য লাভ করিল। কিন্তু কয়েক দিন পরেই সেই সেবাপরায়ণা দেবী সেই ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ফণী এ সংবাদ পায় নাই; হঠাৎ সেদিন সুধাকে লইয়া মিস্ মুখার্জ্জির বাড়ীতে যাইয়া দেখে, মিস্ মুখার্জ্জি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সুধা 'মা', 'মা', বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেই, মিস্ মুখার্জ্জি তাহাকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ফণীকে বলিল।

তাহার পর, অতি কাতর স্বরে ফণীকে বলিল "আমার যাবার সময় হয়েছে। মনে করেছিলাম, আমার পরিচয় আর তোমাকে দেব না; কিন্তু আমার সঙ্কল্প আমি স্থির রাখতে পারলাম না। আমি মিস্ মুখার্জ্জি নহি। আমার নাম সৌদামিনী। আমিই যুগলকিশোর আচার্য্যের কন্যা—তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বাবার কাশী-প্রাপ্তির পর আমি আমার ভরণপোষণের অন্য উপায় না দেখে ফটোগ্রাফী শিক্ষা করি। কাশীতেই কাজকর্ম্ম করতাম; কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় এখানে এসেছিলাম। আমি আর বেশী কথা বল্‌তে পার্‌ছি নে। একটী কথা মাত্র বলি,—আমি কোন দিন সতীত্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই নাই। তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছিলে। সেই বিবাহের রাত্রিতে তোমাকে একবার মাত্র দেখেছিলাম। তার পর এই এত দিন ধরে সেই এক দিনের দেখা মূর্ত্তিই আমি ধ্যান করে এসেছি;—এক দিনও তোমার কথা ভুলি নাই। তুমি কি করে আমাকে চিন্‌বে? আমি তোমার পরিচয় পেয়েই চিন্‌তে পেরেছিলাম। আর আমি কথা বল্‌তে পারছি নে। তুমি একবার আমাকে পায়ের ধূলো দেও—আমার সকল আশা পূর্ণ হোক।"

ফণী চীৎকার করিয়া বলিল "সৌদামিনী, এ-কথা এত দিন বল নাই কেন?"

সৌদামিনী বলিল "বল্‌বার প্রয়োজন মনে করি নাই। কিন্তু, এই শেষ মুহূর্ত্তে আর চুপ করে থাক্‌তে পারলাম না। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর তুমি।"

সৌদামিনী আর কথা বলিতে পারিল না। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সাধ্বী অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

নিখিল-প্রবাহ

মার্কিণ চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্র—

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উইলিয়াম ডানা নামক বিখ্যাত মার্কিণ চিত্রকর ৯৪ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বোষ্টন সহরে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কিছুকাল নাবিকের কার্য্য করিয়া ইনি প্যারিসে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার চিত্রগুলি সাধারণকে দেখাইবার জন্য একটি প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে "Solitude" নামক ছবিখানিও দেখান হয়। এই ছবিখানি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের চিত্র-প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে ছবিখানি ভিয়েনার কাউণ্ট পাল্‌ফীর সম্পত্তি। Solitude" চিত্রখানির নমুনা এইখানে দেওয়া হইল।

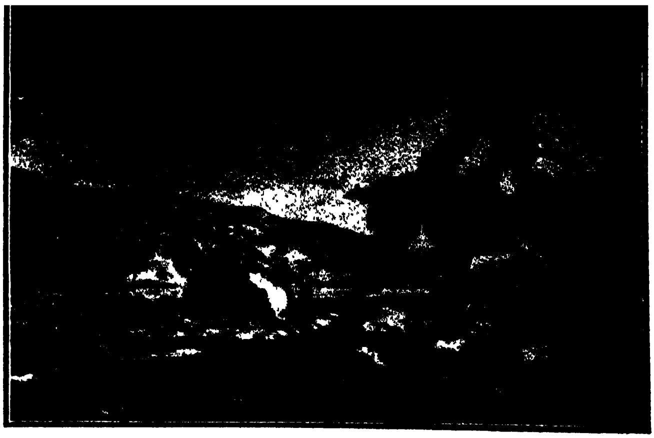


মার্কিণ চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্র

চিত্রের দাম—

M. Paul Daumier নামক চিত্রকরের বহুসংখ্যক চিত্র প্যারিসে সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়াছে। এক একটি চিত্র এত দামে বিক্রয় হইয়াছে, যে, তাহা আমাদের কাছে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। এইস্থানে কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া হইল।

"Don Quicholte et Sancho" নামক চিত্রখানি বিক্রয় হইয়াছে ১০,৩০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৩৩,৯০০ টাকা।



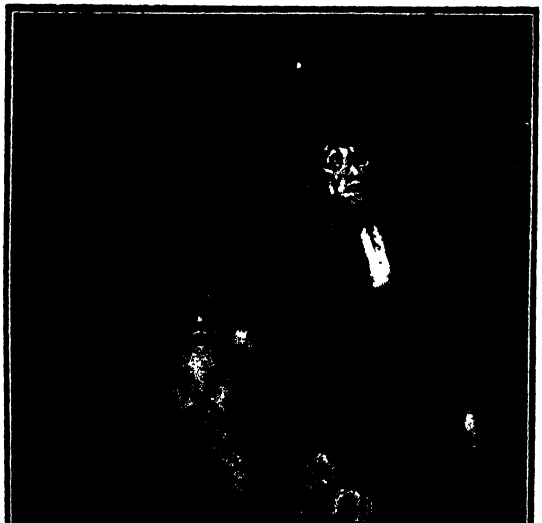
মার্কিণ চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্র

আরো কতকগুলি ছবি প্রায় এই প্রকার দামেই বিক্রয় হইয়াছে। অনেক বিখ্যাত চিত্রকরদের মত Paul Daumierএর এই চিত্রগুলির তুলনা নাই।

এই বিখ্যাত চিত্রকর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে অন্ধ হইয়া যান। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।



মার্কিণ চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্র



মার্কিণ চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্র

শিশু শ্রমিক—

ছবিতে দেখুন—তিন বৎসরের শিশু তাহার পিতার সহিত চিম্‌নি সাফ করিবার কাজে বাহির হইতেছে। শিশুটি বার্লিনের অধিবাসী। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন

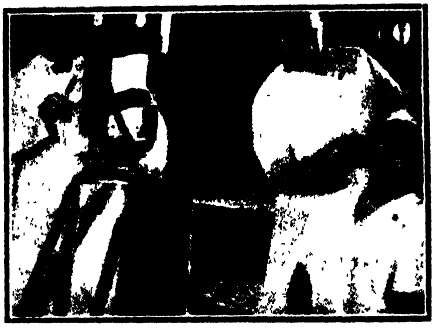


শিশু শ্রমিক

কাটান কাহাকে বলে, তাহা এই বয়স হইতেই শিশুটি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

চিকিৎসকের কেরামতি

ডাঃ রেমণ্ড প্যাসট নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক তাঁহার আবিষ্কৃত অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীতে



চিকিৎসকের কেরামতি

মানুষের মুখের গঠন পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বিলাতে তাঁহার আবিষ্কার পণ্ডিত-মহলকে দেখাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন।



চিকিৎসকের কেরামতি

গত মহাযুদ্ধ না হইলে বোধ হয় অস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত উন্নতি হইতে আরো বহু সময় লাগিত। যুদ্ধে যে সকল সৈন্যের অঙ্গ-বিকৃতি হইতে লাগিল, তাহাদের লুপ্ত অঙ্গাদি এবং মুখের উপর কাটাকুটির দাগ মিলাইয়া দিবার বহু চেষ্টার ফলেই আজ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

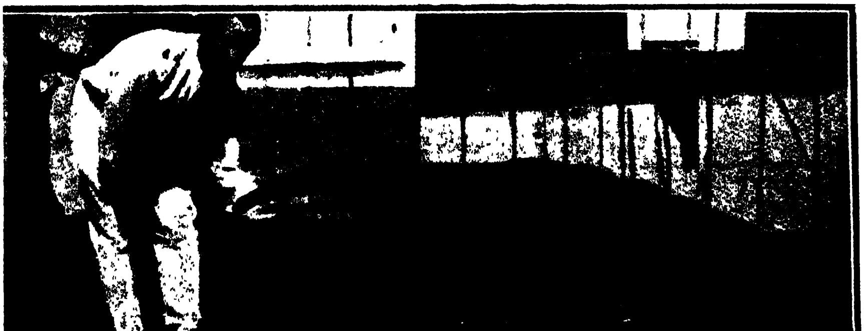
যে প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতিতে এই নাক-মুখের গঠন ইত্যাদির পরিবর্ত্তন করা হইতেছে, তাহাকে অস্ত্র-চিকিৎসা না বলিয়া "Plastic Surgery" বলা উচিত। ফ্রান্সে আবার ইহাকে অনেকে "Aesthetic Surgery" বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু এই বিদ্যার জন্ম হয় ফ্রান্সেই। অধ্যাপক মোরেষ্টিন সর্ব্বপ্রথম এই চিকিৎসা-পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। ইনি ডাঃ প্যাসটের গুরু।

সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতিটি সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য বায়স্কোপের ফিল্ম তোলা হইয়াছে। এই পণ্ডিত চিকিৎসক মনে করেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্যার এত উন্নতি হইবে যে, যে-কোনো নারী বা নরের সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইবে। পৃথিবীতে কুৎসিত এবং অসুন্দর বলিয়া হয় ত আর কিছুই থাকিবে না।

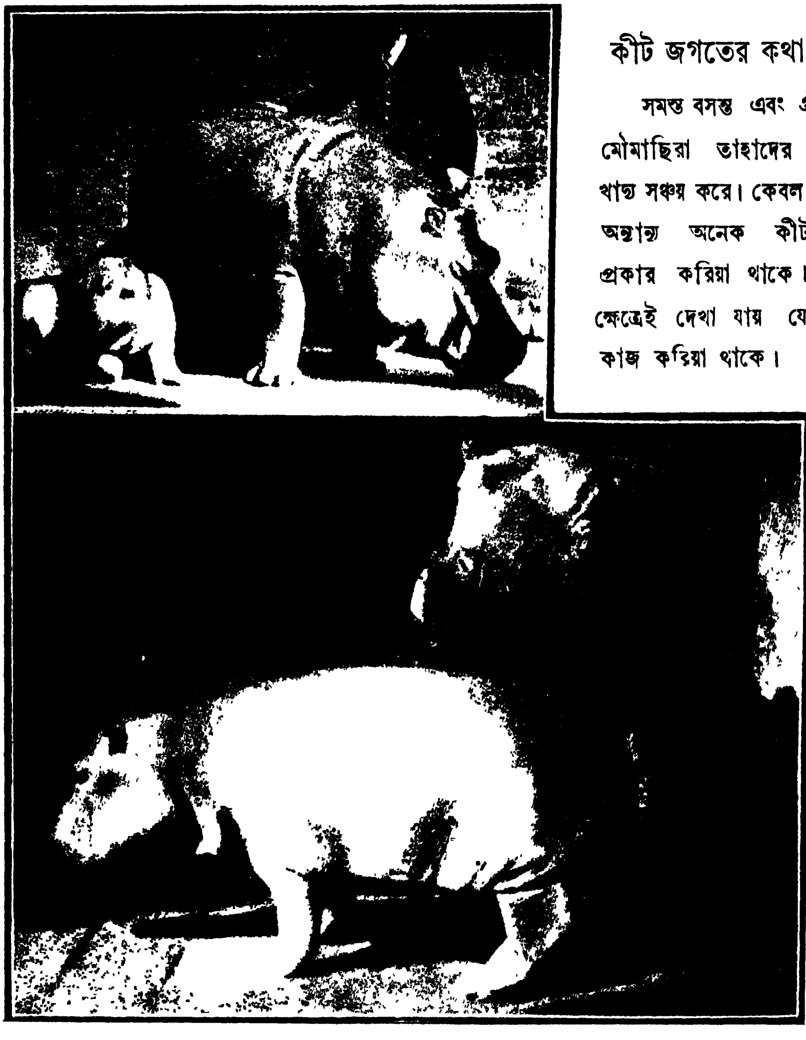
সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত প্রাণী—

চিত্রে যে একটি অদ্ভুত জীব দেখিতেছেন, উহা দক্ষিণ আমেরিকার এক জঙ্গলে পাওয়া যায়। ইহারা পিঁপড়া খাইয়া



সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত প্রাণী

জীবন-ধারণ করে; এই জন্য ইহাদের ইংরেজিতে Ant killer বলে। এই অদ্ভুত জীব, মানুষের সঙ্গে অতি সহজেই বন্ধুত্ব করে। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে ইহাদের কোনো প্রকার বুদ্ধি আছে বলিয়া মনে হয় না।



শিশু হিপোর ছবি

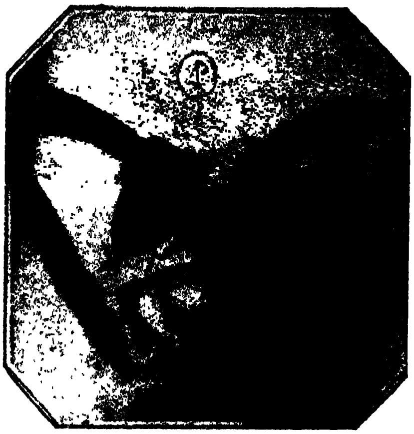
শিশু 'হিপোর' ছবি—

মাতার পাশে শিশু হিপোটির বয়স সাত মাস;—ওজন প্রায় সাত মণ! এতদিন শিশুটি তাহার গর্ভেই বাস করিতেছিল। যেদিন প্রথম সে পৃথিবী দেখিতে বাহিরে আসে—এই ছবি সেইদিন তোলা হয়। শিশুটি বাহিরে আসিয়া একবার চারিদিকে চোখ মেলিয়া দেখিল। তার পর ঘুমাইয়া সারা দিন কাটাইয়া দিল। হিপোটি রিজেণ্ট পার্কের শিশুদের অতি প্রিয়।

কীট জগতের কথা—

সমস্ত বসন্ত এবং গ্রীষ্মকাল ধরিয়া মৌমাছিরা তাহাদের অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে। কেবল মৌমাছি নয়—অন্যান্য অনেক কীট-পতঙ্গও এই প্রকার করিয়া থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে স্ত্রী-কীটেরাই কাজ করিয়া থাকে। পুং-কীট বসিয়া বসিয়া খাদ্য ধ্বংস করে। বংশ-বৃদ্ধি করাই বোধ হয় ইহাদের একমাত্র কাজ।

মৌচাকে এখন দেখা যায় যে স্ত্রী-মৌমাছিরা পুরুষ-মৌমাছিদের গ্রাস হইতে খাদ্যভাণ্ডার বাঁচাইবার জন্য হয় তাহাদের দূর করিয়া তাড়াইয়া ছায়;—এবং যদি তাহারা দূর



জাপানী গুবরে পোকা



মাণ্টিস্

হইতে না চায়,—তবে তাহাদের হত্যা করা হয়। এই প্রকার ঘটনা যে কদাচিত হয়, তাহা নয়; প্রায়ই এই প্রকার হইতে দেখা যায়। কীট-জগতের অন্যান্য কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও প্রায়ই এই প্রকার প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হত্যাকাণ্ড দেখা যায়। জগতে কাহারো বসিয়া থাকিবার যো নাই, সকলকেই পরিশ্রম করিয়া খাইতে হইবে। পরিশ্রম করিতে যে অনিচ্ছুক, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কীট-জগৎকে নারী-রাজ্য বলা চলে। পুরুষ কীটদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা এক প্রকার নারীদের ক্রীতদাস।



রোভ্ বিটল পতঙ্গের ডিম চুরি



কীট জগতের গণ্ডার

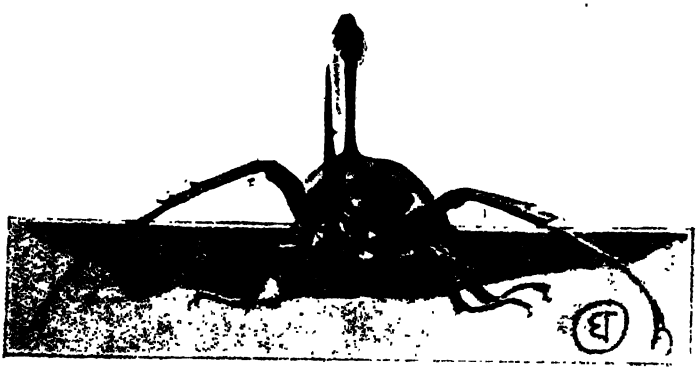
জগতে প্রায় ২০০,০০০ রকমের কীট-পতঙ্গের কথা মানুষ জানে। হয় ত ইহার বেশী কীট-পতঙ্গ আছে; তাহারা এখনও মানুষের চোখে পড়ে নাই। আকাশে, মাটিতে, মাটির নীচে এবং সমুদ্রের জলে, সর্ব্বত্রই অসংখ্য কীট-পতঙ্গের বাস; এবং সবখানেই ইহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রবল যুদ্ধ এবং মারামারি চলিয়াছে।

কীট-পতঙ্গদের মধ্যে চোর, ডাকাত, রাক্ষস সবই আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের আবার মানুষের মত বুদ্ধি-

বিবেচনা এবং স্নেহ-প্রবণতাও আছে। সন্তানদের জন্য ইহারা প্রাণ দিতেও ভয় করে না।

(ক) জাপানী গুব্‌রে পোকা। ইহার এই পরম সুন্দর মুখ এবং মাথা দেখিয়াই অনেক পোকামাকড় মূর্চ্ছা যায়। বীভৎসতাই ইহার আহার যোগাড়ের প্রধান অস্ত্র।

(খ) "রোভ্‌-বিটল"—একটা মাছিকে আক্রমণ করিবার সময় এই ছবি তোলা হয়।



আফ্রিকার গুবরে পোকা



শ্যামদেশের চাষীর দেবতা

(গ) একটি পতঙ্গ ডিম চুরী করিতেছে।

(ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া এক অদ্ভুত গুব্‌রে পোকা। লম্বা ঠ্যাংএর সাহায্যে ইহা অতি দ্রুত দৌড়াইতে পারে।

(ঙ) "নাণ্টিস" কীট। হাত দুইটি তুলিয়া স্থির হইয়া থাকে; মনে হয় যেন ভগবৎ-প্রেমে মশগুল! কিন্তু যেই কোনো কীট-পতঙ্গ তাহার দুই হাতের মধ্যে আসে, অমনি হাত দুইটি তাহাকে নাগ-পাশের মত বন্ধন করে।

(চ) দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাপ্ত। কীট-জগতের গণ্ডার বলা যায়। ইহা লম্বায় ২॥০ ইঞ্চি—ল্যাজ হইতে শিং পর্য্যন্ত লইয়া। ইহার স্বভাব অতি হিংস্র।

শ্যামদেশের চাষীর দেবতা—

চিত্রে যে বিকটাকার একটি জন্তু দেখিতেছেন, উহা পাথরের। উত্তর-শ্যামের চাষীরা তাহাদের

ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বন্য হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই দেবতার নিকট পূজা দিয়া থাকে। এই প্রদেশে কেবল বুনো হাতী নয়—অন্যান্য নানা প্রকার বন্য জন্তুর বাস।

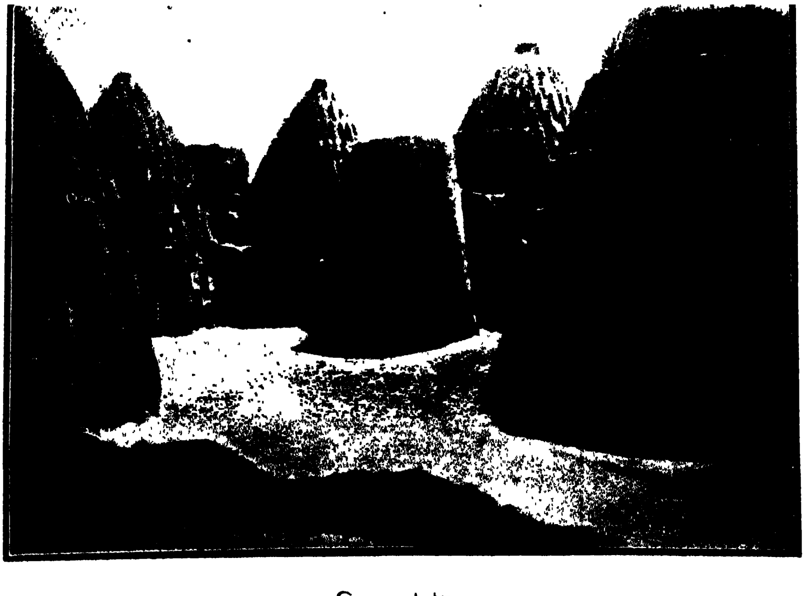
উত্তর শ্যামদেশের এক বালিকা "জল মহিষের" পিঠে চড়িয়া জঙ্গল পার হইতেছে। বাঘও এই মহিষকে আক্রমণ করিতে ভয় পায়। এই মহিষ কিন্তু মানুষের অতি বাধ্য।



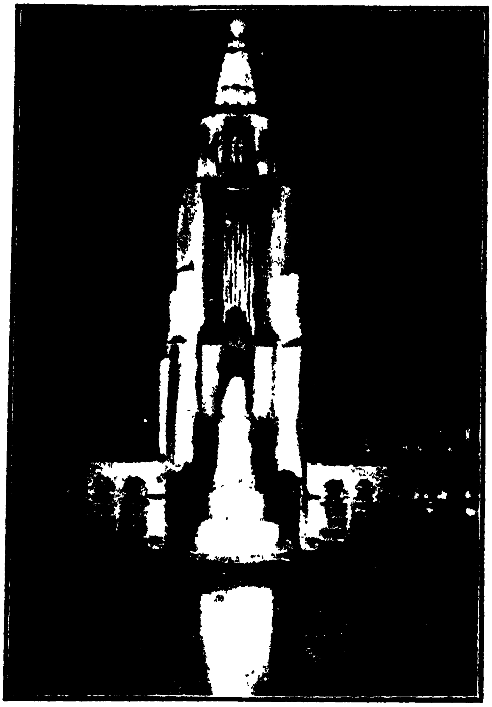
জল-মহিষের পৃষ্ঠে বালিকা

অভিনব আবাস—

মধ্য আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যস্থ গ্রামে "মাসা" নামক এক জাতি বাস করে। ইহাদের গৃহ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অতি অদ্ভুত। গৃহগুলি দেখিতেও অতি অদ্ভুত। গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে এই অসভ্য জাতির কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। ইহাদের এক একটি গ্রাম দেখিলে মনে হয় যে, নক্সা করিয়া খুব ভাল এঞ্জিনিয়ার দ্বারা সকল কার্য্য করা হইয়াছে। "মাসা" জাতির লোকেরা একেবারে অসভ্য। মাছ ধরিয়া এবং শিকারাদি করিয়াই ইহাদের দিন চলে।



অভিনব আবাস



অপরূপ স্তম্ভ

অপরূপ স্তম্ভ—

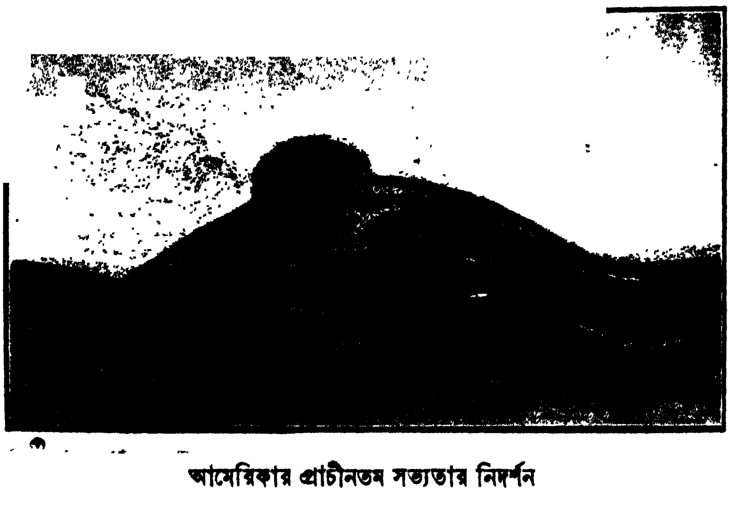
জাপানের ওসাকা সহরে কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে বিশেষ করিয়া জাপানে মানুষের বিবিধ কাজে তাড়িত-শক্তির ব্যবহার দেখান হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বাতি, পাখা ইত্যাদি বহু শত দ্রব্যাদি এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। এই সময় একটি স্তম্ভকে বৈদ্যুতিক বাতির দ্বারা অতি চমৎকার করিয়া সাজান হয়। রাত্রের অন্ধকারে যখন স্তম্ভের ভিতর সমস্ত বাতি জ্বলিয়া উঠিল, তখন এই ছবি তোলা হয়।

আমেরিকার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন—

যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের নিকট একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল। এই স্তূপে নানা প্রকার বিষধর সর্পের বাস ছিল। সম্প্রতি কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত এই স্তূপ খনন করিয়া কতকগুলি জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে চলিত-ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে। স্তূপের মধ্যে পাথরের তৈরী জিনিষ-পত্র, হাড়, এবং তামার দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি শাঁকও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বোধ হয় অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। স্তূপটি বোধ হয় মৃত ব্যক্তিদের কবরস্থান রূপে ব্যবহৃত হইত। এবং যে জাতির লোকেরা এই স্তূপে মৃতদের সৎকার করিত, তাহারা বোধ হয় আমেরিকার সর্ব্ব প্রথম মানুষ অধিবাসী। লাল মানুষেরা তাহাদের অনেক পরে আমেরিকায় আগমন করে।

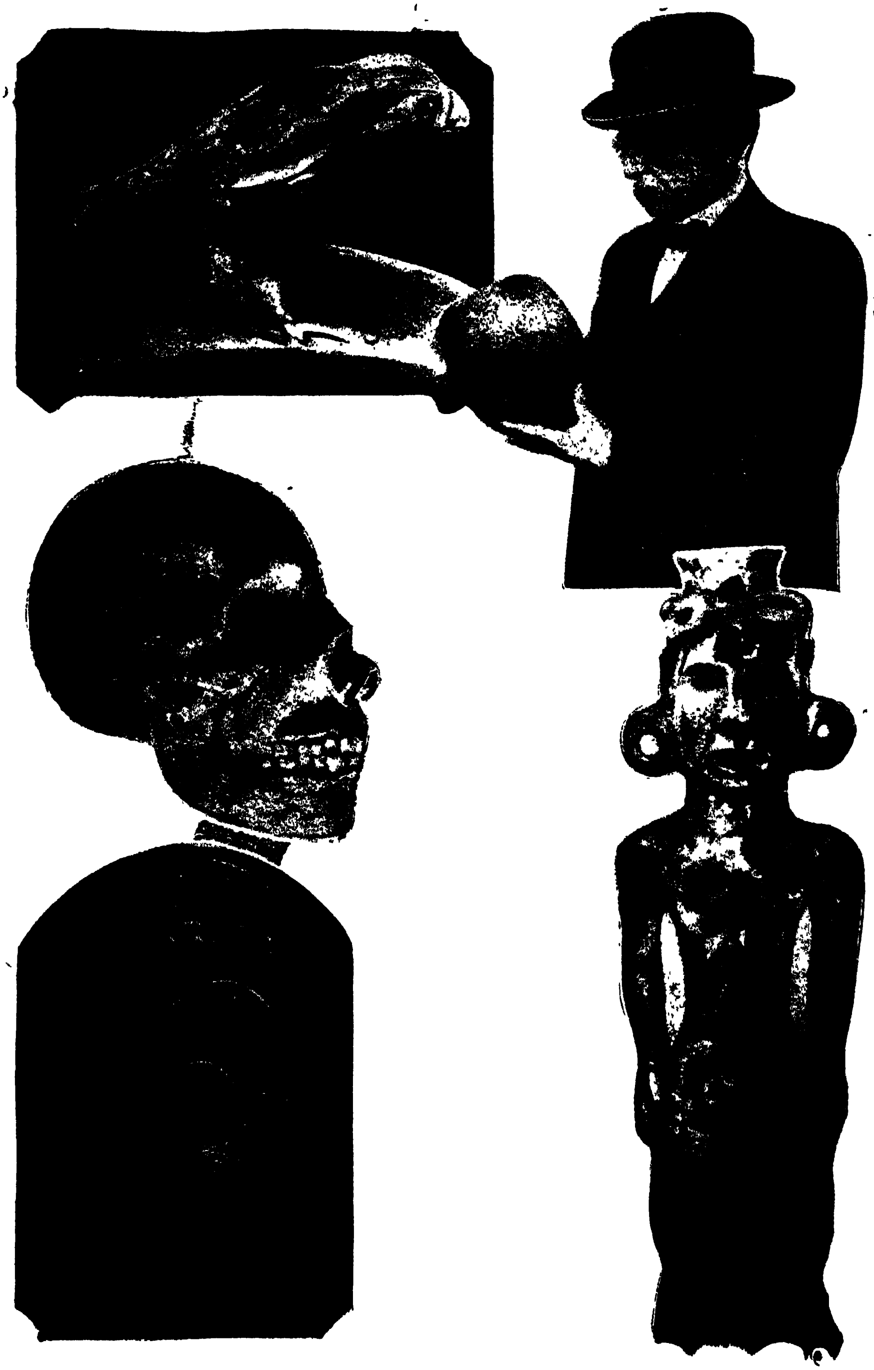
এই অতি আদিম লোকেরা সভ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। তামার তৈরী চমৎকার নানা রকম গয়না পাওয়া গিয়াছে। ইহা শিল্পজ্ঞানহীন অসভ্য লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে না। শাঁক, হাড় এবং পাথর-খোদাই কার্য্যে ইহাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল। নানা প্রকার সুন্দর বস্ত্রাদিও ইহারা বয়ন করিত। মৃতের সৎকার করিবার সময় ইহারা নানা প্রকার ক্রিয়া-কার্য্য করিত। অনেকে মৃতের স্বর্গযাত্রার পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য মুক্তা আদি দামী জিনিষও কবরে দিত। একটি স্তূপের কবরে, মুক্তার বিছানায় শোয়ানো এবং অতি সুন্দর নক্সাওয়ালা বস্ত্রে ঢাকা একটি দেহ পাওয়া গিয়াছে। দেহের দেহত্ব অবশ্য বিশেষ কিছুই নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহা সেই অতি-আদি কালের কোনো রাজা বা রাজকুমারের কবর।

একটি কবরে পাঁচটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহা বোধ হয় কোনো গরীব লোকের পারিবারিক কবরস্থান।



আমেরিকার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন

এই স্তূপ-নির্ম্মাণকারী জাতিদের সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা গেলেও, ইহারা কোথা হইতে আসে এবং ইহাদের পরিণাম কি হইল—কোথায় গেল, তাহা এখনও বলা যায় না।



একটি কবরে পাঁচটি কঙ্কাল

বহুরূপী

এক দৃশ্যের কথানাট্য

মন্মথ রায়, এম-এ

[মৃত্যুশয্যায় শয়ান সুধীর রায়। সুধীর অচেতন। পার্শ্বে ডাক্তার। শিয়রে সুধীরের স্ত্রী তরলা। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।]

তরলা॥ কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার॥ শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন কারণেই যেন মনে এতটুকু আঘাত উনি না পান···ওঁর খেয়াল মত চলবেন, যখন যা চান ..দেবেন...।

তরলা॥ যখনি জ্ঞান হচ্ছে তখনি শুধু জিজ্ঞেস করছেন, মা কই, খোকা কোথায়? রাণীকে আসতে লিখেছ? বিরজা কি ভুলেই গেল?···এই সব। ..কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার॥ খোকাকে নিয়ে আপনার শাশুড়ীর আজ রাত্রেই তো পৌঁছবার কথা ছিল · এখনো এলেন না কেন?

তরলা॥ ট্রেণ ফেল হয়েছেন হয় তো!...কিন্তু সে কথা ওঁকে এখনো জানাইনি।···রাত দুটোর গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছি।

ডাক্তার॥ খোকা বুঝি আপনাদের ঐ একই সন্তান?

তরলা॥ হাঁ ডাক্তার বাবু, সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেশের বাড়ীতে থেকে পাঠশালায় পড়াশুনা করে, ওরা দুজনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। শাশুড়ীও বাড়ী ছেড়ে এখানে আসতে চান না···দেশে গৃহদেবতা ঠাকুর-সেবা নিয়ে পড়ে আছেন!

ডাক্তার॥ রাণী কে?

তরলা॥ ওঁর দেশের বাড়ীর এক প্রতিবাসিনীর মেয়ে। সে অনেক কথা।···ছোটবেলার খেলার সাথী।..দুজনে বর-কনে সেজে খেলতেন।···কিন্তু ..পরে আর সত্যি করে বিয়ে হওয়া ঘটল না···।···রাণীর বাবা টাকার মায়ায় ভুলে এক বুড়ো জমিদারের হাতে রাণীকে সঁপে দিলেন। ···আর···উনি রাগ করে বিনাপণে বিনা যৌতুকে এক কালো মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আমি ওঁর সেই বৌ!···কিন্তু সেই রাণী বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল।···উনি চাকুরি নিয়ে পাটনায় চলে এলেন।

ডাক্তার॥ আর ঐ বিরজা?

তরলা॥ জানিনে ডাক্তার বাবু, জানিনে···[ক্ষণেক থামিয়া]·· জানি ডাক্তার বাবু জানি! ··কিন্তু ঐ যে··· আবার বুঝি জ্ঞান হচ্ছে ··

সুধীর॥ তরলা!

তরলা॥ [সুধীরের হাত দুখানি হাতে লইয়া সস্নেহে] ····· কি?

সুধীর॥ ও কে?

তরলা॥ ডাক্তার বাবু।

সুধীর॥ আমি ওষুধ খাবো না।···ডাক্তার, তোমার ওষুধ আমি ফেলে দিয়েছি।···তুমি এখান হতে পালাও বলছি ··

ডাক্তার॥ [বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন]

সুধীর॥ মাকে ডাক···

তরলা॥ এখনো তো দুটো বাজে নি···

সুধীর॥ কত বাকী?

তরলা॥ আরো আধ ঘণ্টা।···এখন না হয় ঘুমাও··· ঘুম হতে জেগে উঠলেই তাঁদের দেখতে পাবে···তাঁরা এলেন বলে···

সুধীর॥ ··তারা?

তরলা॥ মা আর খোকা···খোকার কথাটি বুঝি ভুলেই গেছ?

সুধীর॥ আমার দুষ্টু খোকা · আমার পাজী খোকা··· আসবে?···সেও আসবে?

তরলা ॥ বাঃ···সে আসবে না ? বল কি ?

সুধীর ॥ ওরে···সে যদি ট্রেনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চল্‌তি গাড়ী হতে ছিট্‌কে নীচে পড়ে যায় !···সে যেন আসে না...সে যেন আসে না···না···না . না ··

তরলা ॥ মা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছেন ···কোনো ভয় নেই··। তাকে কিন্তু চুমু খাবো আগে··· আমি।···হাঁ—

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা...আমার পাজী খোকা ...ছুটে এসে লাফিয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ! তুমি তখন মাকে প্রণাম করতে ব্যস্ত থাকবে···পাবে না ··পাবে না···খোকাকে পাবে না !

তরলা ॥ ···কিন্তু মাকে তবে আমিই আগে প্রণাম করছি···তুমি পাচ্ছ না...

সুধীর ॥···সেই ফাঁকে,...যদি রাণী আসে ..তবে, সেই ফাঁকে···রাণী আমারি কাছে আগে চলে আসবে··· আসবে কি না ?...

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন।]

সুধীর ॥ কি ?···রাণী কি তবে আসছে না ?

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন।]

সুধীর ॥ রাণীকে তবে আসতে লেখো নি ?

তরলা ॥ লিখেছি।

সুধীর ॥ তবে সে আসবে। আসবে, সে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। আসবেই আসবে। হাঁ...সে···না এসে পারে না !

তরলা ॥ একটু বেদানার রস দি ?

সুধীর ॥ ওরে রাণী···ঘোষেদের বাগানে লিচু যা পেকেছে···!···দেখলে তোর মুখ জলে ভরে যাবে···কথাটি কইতে পার্ব্বি নে...আয়...আয়...চলে আয়···

তরলা ॥ [পাখা করিতে লাগিলেন।]

সুধীর ॥ আর তোর জন্য এই জামরুল এনেছি।··· পদ্ম ? আজ পারি নি ভাই···কাল যাব। দীঘির মাঝখানে নীলপদ্ম আছে স্বপ্ন দেখেছি···নিবি ভাই নিবি ? যাবি তাই যাবি ?···আয় রাণী আয়। চল রাণী চল ! ছুটে আ—য়। ছুটে আ—য় ! [বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িলেন।]

ডাক্তার ॥ [কক্ষান্তর হইতে প্রবেশ করিয়া] ঘুমিয়েছেন ?

তরলা ॥ বুঝছিনে !

ডাক্তার ॥ থাক্। কিন্তু···আপনি একলাটি আর কত রাত জেগে রইবেন ?

তরলা ॥ এ তো আজ নতুন নয় ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার ॥ দুটো বাজতেও তো আর বিলম্ব নেই ··যাব আমি ষ্টেসনে ?

তরলা ॥ কেউ গেলে ভালো হ'ত...., কিন্তু আপনাকে তাই বলে যেতে বলতে পারি নে···যেতেও দিতে পারিনে···

ডাক্তার ॥ তার মানে আপনার বড় ঈর্ষা। আপনার স্বামীকে আর কেউ ভালোবেসে সেবা করুক···বা তার বিপদে তার কাজে লাগুক এটা আপনি সহ্য কর্ত্তে পারেন না !···কিন্তু দেখুন···সুধীর আমার প্রতিবাসী বন্ধু···আপনার সঙ্কোচের কোনই আবশ্যক নেই।···আমি চললুম। ·· আলোটা কমিয়ে দিন · ওঁর চোখে ওটা বড্ড বেশী লাগে। নমস্কার—

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ··তরলা উঠিয়া প্রদীপটি খুব ছোট করিয়া দূরে রাখিয়া আসিলেন। একটা জানলা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না মেজেতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আলো-ছায়ার আবছায়াতে মৃত্যু-শয্যা রহস্যময় হইয়া উঠিল।···তরলা আর একটা জানলার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানটা অন্ধকার। তরলাকে ভালো করিয়া দেখাই যাইতেছিল না।]

সুধীর ॥ কে···বিরজা ?···এসেছ ?···এসো !···কিন্তু ·· কেন এলে তুমি ?···তরী যে এখনো ঘুমোয় নি।···তার ওপর মা এসেছেন ! ..পালাও তুমি পালাও !···না গো না ···ভালোবাসি···সত্যি···এই মর্ত্তে বসেও সে কথা বলছি। ···কিন্তু···তরী কি বলবে ··কি ?···চুমো ?···শুধু একটি চুমো ?···তবে চট্ করে চলে এস...তরী ও-ঘরে রয়েছে··· এই ফাঁকে···এই ফাঁকে...দাও ··একটি চুমো দাও···মরণের পথে ঐ একটি চুমো আমার বড় ভালো লাগবে ..হাঁ আমার চোখে তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটে একটি ছোট্ট চুমো দাও···

[চুম্বন শব্দ] আঃ · আঃ · আমার চোখ জুড়িয়ে গেল ! ···একি ! তুমি কি কাঁদছ ?···কেঁদো না···শব্দ ক'রো না··· পালাও ..পালাও · শীগ্‌গীর পালাও...

[ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।]

.. ঐ ছুটো বাজ্‌ল ! মা ! মা !···কোথায় আমার মা ! ওগো আমার মা !·· কোথায় মা, তুমি কোথায় ? শীগ্‌গীর এস...কোলে নাও আমায়···আমার হয়ে এসেছে···বড় জ্বালা ···কোথায় তুমি !···একটি চুমো দাও মা···একটি চুমো দাও। ···কই ?···কোথায় তুমি ?...আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে !···গেলুম মা, গেলুম ! তোমার একটি চুমো পেলে আমি বেঁচে যাব···আবার বেঁচে উঠ্‌ব আবার সারব···আবার হাসবো···আবার আপিস কর্ব্ব···আবার টাকা রোজগার কর্ব্ব ··আবার তোমার পায়ে টাকা ঢেলে দেব। কোথায় তুমি···তবে কি তুমি আসো নি ! ..তবে কি·· তবে কি··· আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি···ও—গো—হো ..কোথায় তুমি··· কোথায় তোমার হাত ছুখানি···কোথায় তোমার মুখখানি··· কোথায় তোমার ঠোঁট্‌ ছুটি·· কোথায় তোমার আদরের একটি চুমো ? [চুম্বন শব্দ] আঃ···ওগো আমার লক্ষ্মী মা ! একটি চুমু দিয়ে ··তুমি আমায় আজ বাঁচালে ··আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! আমার ঘুম পাচ্ছে···খোকা আসে নি ? ···দেখো···তাকে সামলে রেখো...ঘরের নীচেই পুকুর · কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে ! ··ত—র—লা ! আমি ঘুমুলুম ··তুমি শুধু খোকাকে নিয়েই থেকো না ··মার কাছে এস···ওরে খো—কা !···তুই এখন ঘু—মি—য়ে পড় · কাল সকালে জেগে দুজনে গল্প করব · বাঘের গল্প···চোরের গল্প··· তেপান্তরের মাঠে ডাকাতের গল্প ··সাত ভাই চম্পার গল্প · আমার রাণীর গল্প ..সেই ঘু—মি—য়ে প—ড়া রা—জ— রাণীর গ—ল্প ! [আবার অচেতন হইলেন।]

* * *

[দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। আলো বাড়াইয়া দিয়া তরলা দরজা খুলিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকিলেন।]

তরলা। ॥ খোকা কই ? মা কই ?

ডাক্তার ॥—বলছি···

তরলা ॥ বলুন···শীগগীর বলুন—

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ আপনি বলুন শীগগীর···তাঁরা কোথায় ?

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ জেগেছিলেন···কিন্তু···তবে কি তাঁরা এ ট্রেণেও আসেন নি ?

ডাক্তার ॥ সুধীর জেগে কি তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?

তরলা ॥ ডাক্তার বাবু ! ডাক্তার বাবু !

ডাক্তার ॥ তারা আসে নি !

তরলা ॥ আসে নি ?

ডাক্তার ॥ না—!

তরলা ॥ সর্ব্বনাশ ! তবে উপায় ? এবার জাগলে··· কিম্বা···ভোর হলে···কি বলব ?···আমি কি বলব ?

ডাক্তার ॥ এর পরের গাড়ী ক'টায় ?

তরলা ॥ সকাল বেলায় !···ডাক্তার বাবু···আপনি এই মুহূর্ত্তে আপনার বাড়ী ফিরে যান। ··আমার কথা রাখুন। ...যদি আপনার রোগীকে অন্ততঃ এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান ··তবে আপনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যান...

ডাক্তার ॥ সে কি !···আপনি একলা !

তরলা ॥ হাঁ ··আমি একলা...একাকী···ঐ মুমূর্ষুকে শান্তি দিতে পার্ব্ব · আপনি তাতে বাধা দেবেন না · আপনি যান···আমি আলো নিবিয়ে দিলুম...[দীপ নির্ব্বাণ]

ডাক্তার ॥ [আর তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন। তরলা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিলেন]

সুধীর ॥ মা !

[উত্তর হইল "এই যে আমি !"]

মীনা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সেণ্ট্রাল-এভিনিউয়ের যেখানটা বৌবাজার পেরিয়ে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে মোড় ফিরেছে, তারি কাছে একটা খালি যায়গা দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকের ভিড়ে ভ'রে উঠ্‌ল। ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম। সুতরাং ব্যাপারটা যে কি দেখ্‌বার জন্যে যায়গাটাতে একটা 'ঢুঁ' মেরে যাওয়ার লোভও সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লুম না।

সারা রাত্রি ধ'রে বিপুল বর্ষণের পর ভাদ্রের রৌদ্র একটা অত্যন্ত স্নিগ্ধ হাসি দিয়েই প্রভাতকে বরণ ক'রে নিয়েছিল। সুতরাং বেলা আটটা বেজে গেলেও মাথার ওপরকার দাহটা আটটার মতো ছিল না। রাত্রের বুক-ভাঙা কান্নার পর দিনের এই মুখ-ভরা হাসির ভেতর মাদকতাও ছিল প্রচুর। তাই পথের খেলা কাজের মনকেও ভুলিয়ে দিলে।

ভিড়ের ভেতর ঢুক্‌তেই দেখ্‌লুম, একটা জিপ্সীর দল ভোজবাজির কসরৎ দেখাতে সুরু ক'রে দিয়েছে। দলটা বেশ ভারি—অনেকগুলো ছেলে-মেয়েতে ভর্ত্তি। কিন্তু এদের ভেতর আর সবাইকে পেছনে ফেলে সম্মুখের দিকে এগিয়ে এসে একেবারে আলাদা হ'য়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ের দীপ্ত-শ্রী। জিপ্সীদের চেহারা যে অত সুন্দর হয় এই মেয়েটিকে দেখার আগে তা কখনো কল্পনাও কর্‌তে পারিনি।

মেয়েটাই কসরৎ দেখাচ্ছিল। একখানা তাসকে চারখানা করা, চারটি গুলির একটি রেখে বাকিগুলো উড়িয়ে দেওয়া, একগাছা দড়ি থেকে জ্যান্ত সাপ গড়া, কয়লার গুঁড়ো ভিজিয়ে তাকে চিনির সরবৎ ক'রে তোলা, গাছ পুত্‌তে-না-পুত্‌তেই তাতে ফুল ধরানো—এমনি ধরণের সব কসরৎ। কসরৎ দেখানোর ভেতর কোনোখানে কোনো খুঁৎ ছিল না। কিন্তু তার কসরতের চাইতেও যা আমার মনকে দোলা দিলে তা তার চলা ফেরার স্নিগ্ধ ভঙ্গি। তার কোনোখানে এতটুকু বাহুল্য নেই, অথচ অনাবশ্যক আড়ম্বরের ভারেও তা ভারি নয়।

ভেবেছিলুম একটু 'ঢুঁ' মেরেই চ'লে যাব। কিন্তু মনটা যে কখন আট্‌কে গেল এই মায়াবী মেয়েটির অদ্ভুত লীলা-নৈপুণ্যের ভেতর তা খেয়াল কর্‌তে পারিনি। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত কসরৎগুলো দেখ্‌তে লাগলুম।

এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেক চ'লে গেল এবং বিস্মিত দর্শকদের ভেতর থেকে অজস্র তারিফ কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি তার খেলাও শেষ কর্‌লে। এইবার চ'লে যাব ভাব্‌ছি, এমন সময় দলের ওস্তাদ উঠে দাঁড়ালো। নানা ভনিতার পর সে যা বল্‌লে সাদা কথায় তার অর্থ এই যে, এবারে যা দেখানো হবে সেইটেই শেষ খেলা এবং খেলাটা এমনি আশ্চর্য্য যে এ-রকমের যাদু দেখ্‌বার কল্পনাও আমরা কখনো কর্‌তে পারিনে। এই যে আউরৎ, যে এতক্ষণ ধ'রে এত খেলা দেখালে, এইবার সে তাকেই আশ্‌মানের মেঘের মধ্যে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য এ-কথাও যেন আমরা ভুলে' না যাই যে, আকাশের হুরীকেই সে মন্ত্রের বলে খেলা দেখাবার জন্যে মর্ত্ত্যের মাঝখানে টেনে এনেছিল।

ভনিতা শেষ হবার পর মেয়েটাকে হিড়্‌-হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে মাঝখানের খালি যায়গাটাতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল একটা মোটা কাপড়ের পর্দা ঢাকা দিয়ে। তারপর আরম্ভ হ'ল আত্মারাম সরকারের হাড়ের স্তুতি-গান। এমনি ভাবে মিনিট পনেরো কাট্‌বার পর দেখা গেল—সেই কাপড়ের ঘেরা-টোপের ভেতর থেকে একটা পায়রা ওপরের দিক উঠে' যাচ্ছে।

পাখীটাকে উড়্‌তে দেখেই ওস্তাদ একেবারে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল; বল্‌লে—ঐ যে আমার দিলের দোস্ত্‌ আশ্‌মানের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে। ও তো চিড়িয়া নয়, চিড়িয়ার ছদ্মবেশে আকাশের হুরী। তারপর বিনিয়ে বিনিয়ে সে কি কান্না তার।

কান্নার বহর শুনে' আমরা সকলে হেসে উঠ্‌তেই সে বল্‌লে—হুজুর আপনারা বিশ্বাস কর্‌ছেন না, কিন্তু এই

দেখুন আমার কলিজা—আমার জান পর্দ্দার আড়ালে নেই। ব'লেই সে কাপড়ের ঢাকনাটা তুলে' ফেললে। চেয়ে দেখ্লুম মেয়েটা সত্যি সত্যি পর্দ্দার ভেতর থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

অদ্ভুত কান্নার সুর ভেঁজে ওস্তাদ আবার বল্লে—হুজুর, আপনারা যদি মেহেরবাণী করেন তবে আপনাদের দিলকে যে এতক্ষণ ধ'রে খুসী করেছে তাকে আবার ফিরিয়ে আন্তে পারি। তবে সে জন্য জীনকে শীর্ণী দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি ভারি গরিব।—পয়সা নেই। শীর্ণীর পয়সা আপনারা সকলে মিলে আমাকে কিছু কিছু যদি ভিখ্ দেন………

খেলা দেখে বাস্তবিকই খুসী হ'য়েছিলুম। তাই দ্বিধা না ক'রে মণি-ব্যাগটা খুলে' ঝণাৎ ক'রে একটা টাকা ওস্তাদের সায়ে ফেলে দিলুম। তার পরেই চারদিক থেকে পয়সা, একআনি, দোয়ানি প্রভৃতি বৃষ্টির ফোঁটার মতো তার সায়ে ঝ'রে পড়্তে লাগল। লাভ নেহাৎ মন্দ হ'ল না। কারণ দেখ্লুম, ওস্তাদের মুখের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে ভেতরের আনন্দের আভাসটা তার ছোট ছোট চোখ দু'টোর মধ্যেও স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠেছে।

এইবার টাকা-পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে অবোধ্য ভাষায় কি সব মন্ত্র পড়্তে সুরু করলে—বল্লে জীন-দেবতাকে শীর্ণী মানছে। এমনি ভাবে খানিকক্ষণ বিড়্-বিড়্ ক'রে ব'কে একবার আপনার মনেই হেসে উঠ্ল। তার পরেই, ভিড়ের লোকদের দুহাতে সে সেলাম বাজাতে সুরু ক'রে দিলে। সেলাম ও হাসি সমান ভাবে খানিকক্ষণ চালিয়ে অবশেষে সে আবার ব'লে উঠ্ল, জীন-দেবতা তার ডাকে প্রসন্ন হ'য়েছেন এবং তার আওরৎ ফের দুনিয়ার ফিরে' এসেছে। এই ভিড়ের ভেতরেই সে আছে। আমরা যে তাকে লুকিয়ে রেখেছি, আর দেরী না ক'রে যেন দয়া ক'রে বের ক'রে দিই। এই বলে' সে ভিড়ের চারদিকে ঘুরে' বেড়াতে লাগ্ল। তারপর খানিকটা ঘুরে' ফিরে' চট্ ক'রে আমার কাছে এসে থেমে গিয়েই বল্লে —এই যে বাবু, আমার বিবিজানকে পেয়ার ক'রে আপনিই লুকিয়ে রেখেছেন।

আশ্চর্য্য হ'য়ে পাশে চেয়ে দেখি মেয়েটা আমারি পিঠের ওপর মুখ লুকিয়ে আগা-গোড়া বোর্খা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওস্তাদ তার দেহ হ'তে বোর্খাটা টেনে নিতে নিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—বাবুর বয়েস অল্প কি না, তাই পরের জেনানার ওপর লোভটা এখনো মরেনি। ব'লেই সে হা' হা' করে হেসে উঠ্ল। সঙ্গে সঙ্গে, জনতার ভেতরেও হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। তার পরেই ভিড় ভেঙে যে যার পথে পা বাড়ালে।

ঘরের ভেতর পড়ে ছিলুম।

দুপুরের রৌদ্র কল্‌কাতা সহরের সাদা দেওয়ালগুলোর গায়ে প'ড়ে মরার মুখের বীভৎস হাসির মতো জল্‌ছিল এবং মানুষের দেহেও জ্বালার সৃষ্টি করছিল। অসহ্য গরমে ঘরের ভেতরেও কারো সোয়াস্তি ছিল না। এম্‌নি সময় আকাশে মেঘের মাদল বেজে উঠ্ল। খুসী হ'য়ে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখ্লুম, কালো কালো মেঘের দৈত্যগুলো শাঁ শাঁ ক'রে ছুটে' আসছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পথের ধূলো ও কাঁকর কুড়িয়ে পাল্লা দিয়ে ছুটে' চলেছে ঝড়ের মতো মত্ত ও ক্ষিপ্ত বাতাস।

হঠাৎ বিদ্যুতের দীপ্তি তার চোখ্-ঝল্‌সানো তরবারিতে আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরে' দিয়ে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধ-ভাঙা ঝর্ণার ধারার মতো ক'রেই নেমে এল মোটা মোটা বৃষ্টির ধারাগুলো।

এই অতি-ঈপ্সিত ধারার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় কে একজন দৌড়ে সদর দরজা গলিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে' রোয়াকের ওপর উঠে' দাঁড়ালো।

মুখ তুলে' চাইতেই দেখি, সেদিনের সেই কস্‌রৎওয়ালা জিপ্সী মেয়েটি হাত যোড় করে বলছে—কসুর মাপ করো বাবুজি। জলের ছাটে দেহটা একেবারে ভিজে গেছে এবং চোখেও এত ধূলো ঢুকেছে যে তাকাতে পারছিনে। ব'লেই সে জোরে জোরে চোখের পাতা দু'টো দু'হাত দিয়ে রগ্‌ড়াতে সুরু ক'রে দিলে।

আমি বল্লুম—আমার কুঁড়েতে এসে যখন দাঁড়িয়েছ তখন আমার একটা পরামর্শও শোনো। চোখ্ অমন ক'রে রগ্‌ড়িও না—ওতে ব্যথা আরও বাড়্বে। তার চেয়ে ঐ ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে চোখ্ দু'টো ধুয়ে' ফেলো।

জলের পাত্রটা হাতে নিয়ে রোয়াকে দাঁড়িয়েই সে চোখে

মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলে। তার পর জলের ঝাপ্‌টায় চোখ যখন পরিষ্কার হ'য়ে গেল, পাত্রটি পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে একটু মিষ্টি হেসে সে বল্‌লে—বাবুজি, আমি তোমাকে চিনি।

হেসে বল্‌লুম—সত্যি না কি?

সে বল্‌লে—হ্যাঁ চিনি বই কি। সেদিন কসরৎ দেখাবার সময় আশ্‌মান থেকে নেমে আমি যে তোমার পিঠেই মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

বল্‌লুম—আজ তোমার সঙ্গে সেদিনের সেই বাচাল ওস্তাদটিকে তো দেখ্‌ছিনে।

সে বল্‌লে—ওস্তাদের শেষ কথার খোঁচাটা বুঝি এখনো তোমার বুকে বিঁধে' আছে। কিন্তু আজ তো কস্‌রৎ দেখাতে বেরুইনি যে সে সঙ্গে থাক্‌বে। আজ বেরিয়েছি সওগাত ফিরি কর্‌বার জন্য। ব'লেই সে তার পিঠের ওপরকার প্রকাণ্ড ঝুলিটার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ কর্‌লে।

বৃষ্টিতে ভিজে' ঝুলিটে আরো ভারি হ'য়ে তার দেহের সঙ্গে এঁটে ধরেছে। অতখানি ভার ঐ হাল্কা মেয়েটি যে কি ক'রে বয় ভেবে ঠিক কর্‌তে না পেরে বল্‌লুম—তোমার বোঝাটা ঐখানে নামাও;—কি আছে ওর ভেতরে?

সে বল্‌লে—বহুৎ ভারি ভারি জিনিষ আছে বাবুজি—দেখ্‌বে?

বল্‌লুম—হ্যাঁ দেখ্‌ব।

ধীরে ধীরে বোঝাটা নামিয়ে আমার সম্মুখেই ব'সে প'ড়ে তার ধন-দৌলতগুলো সব খুলে' খুলে' সে আমাকে দেখাতে লাগ্‌ল। ধনেশ পাখীর তেল, বাঘের নখ, মৃগনাভি কস্তুরী, উট পাখীর ঠোঁট, এমনিতর আরো কত জিনিষ যে দেখালে তার ইয়ত্তা নেই। সব দেখানো শেষ হ'য়ে গেলে বল্‌লে—কই বাবুজি, তুমি তো আমার কাছ থেকে কোনো একটা জিনিষও সওদা কর্‌লে না।

আমি বল্‌লুম—হ্যাঁ কর্‌ব বই কি। তোমার সব জিনিষ আমাকে একটা একটা ক'রে দিয়ে তার দাম হিসেব ক'রে বলো দেখি কত হয়।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপর সেই হাসির ঝলকটা চোখের কোণে আট্‌কে রেখেই আবার বল্‌লে—থাক্ বাবুজি, কিছু কিন্‌তে হবে না তোমাকে। ব'লেই সে তার জিনিষ-পত্রগুলো গোছাতে সুরু ক'রে দিলে।

আমি বল্‌লুম—উঠছ যে এক্ষুনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বল্‌লে—বৃষ্টি ধ'রে গেছে, এইবার যে ডেরায় ফির্‌তে হবে। এ-সব জিনিষের তো তোমার দরকার নেই। এর পর যেদিন আস্‌ব এমন সব জিনিষ নিয়ে আস্‌ব যা তোমার কাজে লাগতে পারে।

মেয়েটির যে সহজ সরল ভঙ্গি, দৃঢ়তার সঙ্গে মিশিয়ে তার যে স্নিগ্ধতা সেদিন আমার মনে দাগ কেটেছিল, আজও অনেকক্ষণ ধ'রে তারি মোহ যেন আমার চার পাশ ঘিরেই জেগে রইল। চেষ্টা করেও তাকে মুছে ফেল্‌তে পারলুম না।

'পাইল্‌সের' ব্যামোটা হঠাৎ যেন জেদাজেদি ক'রেই বেড়ে উঠল। এইমাত্র খানিকটা তাজা টাট্‌কা রক্ত ঢেলে দিয়ে ফিরে' এলুম। শ্রান্ত দেহটাকে কোনো রকমে বিছানার ওপর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছি। হঠাৎ এমনি সময় দোরের কাছ থেকে কে ডাকলে—বাবুজি!

চেয়ে দেখি সেই জিপ্সী মেয়েটি। হেসে বল্‌লুম—এস।

তার চিরন্তনী হাসির পর্দ্দাটা মুখের ওপরে আরো একটু গাঢ় ক'রে টেনে দিয়ে সে ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ঢুকে' তার মুখের সেই অপূর্ব্ব হাসির রেখাটি মিলিয়ে যেতেও দেরী হ'ল না। চোখের পাতা দু'টো একটা করুণ বেদনায় ভিজিয়ে তুলে' সে বল্‌লে—তোমার অসুখ করেছে বাবুজি—ভারি যে কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে?

বল্‌লুম—হ্যাঁ করেছে একটু—কিন্তু তুমি ব'সো। আজ আবার আমার দরকারের জিনিষগুলো নিয়ে আস্‌তে ভোলনি তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি অসুখ তোমার?

আমি বল্‌লুম—অসুখের খোঁজ না-ই বা নিলে। তার চেয়ে বরং দু'টো সখের কথা বলো, যা তোমারও ভালো লাগবে, আমারও ভালো লাগবে।

সে বল্‌লে—কিন্তু আমি যে না শুনে' মোটেই শান্তি পাচ্ছিনে। ব'লেই সে ধীরে ধীরে আমার মাথার কাছটিতে

ব'সে পড়্‌ল। তারপরে অকস্মাৎ আবার জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌ল—বাবু, তুমি যে একলা থাকো—তোমার আপনার জন কেউ নেই?

—আছে, কিন্তু আমি তাদের আপনার ব'লে মনে কর্‌লেও তারা করে না।

ব্যারামের সময় একলা নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথাটা হয় তো সেই দু'টো কথার ভেতর দিয়েই ঝ'রে প'ড়্‌ল। ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বল্‌লে—আচ্ছা সে কথা থাক্‌। এইবার তবে তুমি ঘুমোও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

আমি বল্‌লুম—ঘুম আস্‌ছে না। তার চেয়ে বরং এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি আমাকে তোমার জীবনের কথা বলো। কিন্তু তার আগে বলো, তোমার নাম কি?

সে বল্‌লে—দলের সকলে আমাকে মীনা ব'লে ডাকে।

—বাঃ বেশ মিঠে নাম তো। এইবার বলো তোমার জীবনের কথা।

—বল্‌বার মতো তো আমার কিছু নেই। সেই একটানা জীবন, কথনো কসরৎ দেখাই, কখনো ফিরি ক'রে জিনিষ বিক্রি করি এবং বিক্রী ক'রে যা পাই সর্দ্দারকে ধ'রে দিই।

বল্‌লুম—তোমাকে তো মোটেই জিপ্সীদের মতো দেখায় না—রূপেও নয়, কথাবার্ত্তাতেও নয়!

হেসে সে বল্‌লে—তুমি হয় তো তোমাদের দেশের বেদেদের সঙ্গে জিপ্সীদের ঘুলিয়ে ফেল্‌ছ বাবুজি! খাস ইউরোপের জিপ্সী যারা তাদের ভেতরে আমার চাইতেও ঢের বেশী সুন্দরীর সন্ধান মেলে। তবে সহবতের কথা যা বল্‌ছ, সেটা হয় তো যে পাদ্রির কাছে আমি মানুষ হয়েছিলুম তারি শিক্ষার ফল।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তুমি পাদ্রির কাছে ছিলে!

—শুধু ছিলুম না, জীবনের সাত আটটা বৎসর আমার তারি আশ্রয়ে কেটে গেছে। পাদ্রিটা যে আমাকে খুব বেশী ভালোবাসত তা নয়, তবে কর্ত্তব্যের দিকে তার মন অসাধারণ রকমে কড়া ছিল। তাই অনুগ্রহের আশ্রয়েও শিক্ষাটা মন্দ হয় নি। তারপর এরা আমাকে জিপ্সী ব'লে জান্‌তে পেরে তার কাছ থেকে চুরি ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

আবার তাকে কি প্রশ্ন কর্‌তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এবার সে আমার ঠোঁঠের ওপর দু'টো আঙুল চাপা দিয়ে বল্‌লে—কিন্তু তুমি এইবার থামো, দুর্ব্বল শরীরে আর অত কথা বল্‌তে হবে না।

তারপর এই মমতাময়ী রমণীটির স্পর্শ, তার সেবা আমার বুভুক্ষু দেহ-মনের ওপর ঝর্ণার জলের মতো করে ঝ'রে পড়্‌তে লাগল। সেই ঝর্ণার তলে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো চোখ্‌ বুঁজে' আমি স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে' রইলুম।

কতক্ষণ যে ও-ভাবে পড়ে ছিলুম মনে নেই। যখন চোখ মেল্‌লুম তখন শরীরের গ্লানি ঢের হাল্কা হ'য়ে গেছে। চেয়েই দেখি, আমার মুখের ওপর ভোরের শুক-তারাটির মতো তার দু'টি চোখের দীপ্তি মেলে দিয়ে সে তখনো ব'সে আছে।

চোখের সঙ্গে চোখ মিল্‌তেই ফাগের রেণুর মতো রাঙা হ'য়ে উঠে' মীনা বল্‌লে—বাবুজি, এইবার তুমি তবে থাকো, আমি যাই। ব'লেই আমাকে বাধা দিবার অবকাশ না দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার চোখ বুঁজে' চুপ ক'রে প'ড়ে আছি। মনের ভেতর দোলা দিচ্ছে এই অদ্ভুত মেয়েটির রূপ—তার সেবা—তার কথা। মনের অতল গহ্বরটিতে তলিয়ে এর রহস্য ভেদ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু দুর্ব্বল মাথা সে অনুসন্ধানে সাড়া দিলে না। কেবল ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তার ভেলা নিজেদের খেয়াল মতো এখানে ওখানে সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল।

ঘণ্টা খানেক পরে দেখি মীনা আবার হঠাৎ এসে আমার ঘরে ঢুক্‌ল। এবার সে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বল্‌লে—আমার কথা এর পরে ভাব্‌লেও চল্‌বে বাবুজি,—তার আগে এই ওষুধটুকু জল দিয়ে খেয়ে ফেলো।

বল্‌লুম—তোমার কথাই যে ভাব্‌ছিলুম, কে বল্‌লে?

মীনা হেসে উত্তর দিলে—জিপ্সী যে গুণ্‌তে জানে তাও বুঝি জানো না। কিন্তু কথা ক'য়ে আর দেরী ক'রো না। নাও—মুখে জল নাও।

বেদের ওষুধ মুখে দিতে মনের ভেতরটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লুম—ওষুধ ঢের খেয়েছি মীনা—কিছুই হয়নি। সুতরাং ও থাক।

হেসে মীনা উত্তর দিলে—বুঝেছি বাবুজি, অজানা লোকের ওষুধ খেলে পাছে উপকারের চাইতে অপকার বেশী হয়, তাই সাহস পাচ্ছ না। কিন্তু এ ওষুধ যে তোমাকে খেতেই হবে। বিশ্বাস ক'রে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণটা না হয় আমার হাতেই ছেড়ে দিলে। ক্ষতি যদি তাতে একটু হয়, না হয় হ'লই। তার পর একটু থেমে আবার বল্লে—বেইমানী ক'রে আমার তো কোনো ফয়দা নেই। বেদেদের হাতেও এমন অনেক জিনিষ থাকে যা আবিষ্কার কর্‌তে তোমাদের পণ্ডিতদের এখনো ঢের দিন লাগ্‌বে।

লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লুম—আচ্ছা দাও।

জল দিয়ে ওষুধটা গিলে ফেল্‌তেই মীনা আবার বল্লে—আই বুড়ী এ ওষুধে অনেককে ভালো করেছে। চোখের ওপর তাদের ভালো হওয়া দেখেছি, তাই তো তোমাকে জোর করে খাওয়ালুম। নইলে জান থাক্‌তে তো তোমাকে যে সে ওষুধ খাওয়াতে পার্‌তুম না।

এই অভিনব মেয়েটির পানে চেয়ে এইবার আমার চোখের কোলে জলের রেখা চক্ চক্ ক'রে উঠ্‌ল।

* *
*
* *

জানালায় ব'সে পথের পানে চোখ্ দুটো ফেলে দিয়ে মীনার প্রতীক্ষা কর্‌ছি। রোদের ঝাঁঝ আজও আবার আগুনের ঝাঁঝের মতোই কড়া হ'য়ে উঠেছে। বাতাসে তেতে দূরের মাঠটা ধোঁয়ার মতো ধূ ধূ কর্‌ছে। মরুভূমি হ'লে ও জিনিষটাকে অনায়াসে মরীচিকা ব'লে চালিয়ে দেওয়া যেত।

এই দুপুরেই মীনা আসে, আর সেই সন্ধ্যার নাগাদ উঠে' যায়—এমনি ভাবে এ কয়দিন কেটেছে। কিন্তু আজ এতক্ষণও তার দেখা নেই।

কি হ'ল তাই ভাব্‌ছি, আর এলে কথার শাণিত বাণ-গুলো একটার পর একটা ক'রে কেমন ক'রে তার গায়ে ছুঁড়ে' মারব তারি তালিম দিচ্ছি, এমন সময় দূরে পথের মোড়টাতে একটা মানুষের ছায়া পড়্‌ল। এতদূর হ'তেও চিন্‌লুম যে সে মীনা ছাড়া আর কেউ নয়।

ধীর কাতর পা দু'টো সে কোনো রকমে টেনে তুলে' যেন এগিয়ে আস্‌ছে। তার মন্থর গতিটাও আমার ভালো লাগ্‌ল না। তাই ঘরে এসে ঢুকতেই অভিমানে সুরটা ভারি ক'রে বল্‌লুম—এলে যে, এতক্ষণে মনে পড়্‌ল?

উত্তরে সে শুধু একটু হাস্‌লে, সে হাসিটাও এত ম্লান যে তা যেন তার কান্না ব'লেই মনে হ'ল। চোখের কোণেও জলের রেখা যেন লেগে রয়েছে। পদ্মের ওপর শীতের দিনের শিশির পড়লে যেমন দেখায় তাকে দেখাচ্ছে সেই পরিম্লান শতদলের ঝ'রে পড়া পাপড়িগুলোর মতো।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কি হয়েছে তোমার, এত ম্লান দেখাচ্ছে যে তোমাকে?

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সে শুধু পিঠের কাপড়টা তুলে' ধর্‌লে। দেখ্‌লুম, সোণার পাতের ওপর কে যেন নীল কালীর কতকগুলো বিশ্রী বীভৎস রেখা টেনে দিয়েছে। ত্রস্তে তার দেহটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লুম—এ কি! এ যে চাবুকের দাগ—চাবুক মার্‌লে কে তোমাকে?

মীনা বল্লে—সর্দ্দার।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কেন?

—এ'ক-দিন স্রেফ কিচ্ছু কামাই না ক'রে আড্ডায় ফিরেছি ব'লে। আজও যাতে আবার খালি হাতে না ফিরি সেই জন্য পিঠের ওপর এই লাঞ্ছনার চিহ্নগুলো লাভ করেছি।

ধীরে ধীরে সেই লাঞ্ছনা-বিদ্ধ পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লুম—তবে ও-রকম ডাকাত সর্দ্দারের কাছে থাকো কেন?

সে উত্তর দিলে—তা ছাড়া আমাদের আর থাক্‌বার স্থান কোথায়? সব সর্দ্দারই যে একই ছাঁচে ঢালা বাবুজি!

মীনাকে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লুম—আমি যদি স্থান দিই নেবে?

প্রশ্নটার ভেতরের অর্থটা ধর্‌তে না পেরেই হয় তো সে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য না ক'রেই বল্লুম—আমি তোমাকে ভালোবাসি মীনা, আমি তোমাকে সাদি কর্‌তে চাই।

চেয়ে দেখ্‌লুম—তার মুখে অকস্মাৎ আনন্দের এমন একটা উচ্ছ্বসিত দীপ্তি জেগে উঠ্‌ল যে, মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তেই বুঝি তা তার সমস্ত দেহটাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরেই সে দীপ্তি ম'রে

গিয়ে সমস্তটা মুখ তার ব্যথার দুঃসহ আঘাতে যেন মরা-মানুষের মুখের মতো রং হারিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

তার সে মুখের পানে চেয়ে আমি আর একটি কথাও বল্‌তে পারলুম না। আপনাকে ধীরে ধীরে সম্বরণ ক'রে নিয়ে মীনাই বল্‌লে—বাবুজি, আমি পথের ভিখারী। কিন্তু তবু আমাকে এ-রকমের নিষ্ঠুর ঠাট্টাটা না কর্‌লেও পারতে। এতে তো তোমার কোনো গৌরব নেই।

তার হাতটাকে হাতের মুটোর ভেতরে ধরে রেখেই বল্‌লুম—ঠাট্টা নয় মীনা, সত্যি কথাই বলেছি। দেখ্‌ছ তো সংসারে আমি ভারি একা। মনের দিক দিয়েও আমি তোমাদেরই মত কতকটা বে-পরোয়া লোক। সমাজের বাঁধনকেও আমি মানিনে। সুতরাং তোমার সংশয়ের কারণ কি আছে? তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বল্‌লুম—আমার দিক থেকে এ বিবাহে তো কিছু বাধে না, তবে যদি তোমার হৃদয় এর আগে আর কোথাও বিকিয়ে গিয়ে থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। আমি জানি, এ-সব ব্যাপার নিয়ে জোর-জবরদস্তি করা চলে না।

এবারেও মীনা কোনো কথা বল্‌লে না। কেবল তার মুখটা ধীরে ধীরে আমার বুকের ওপর নেমে আস্‌ল। এবং সেই বুকের ওপরেই তার চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝরে প'ড়ে যে বন্যার সৃষ্টি কর্‌লে তাতে বুক তো ভেসে গেলই, মনের মাঝিও সেই অথই পাথার দরিয়ায় তার তরী ভাসালে। এ বন্যা যে মানুষের দুঃখের অশ্রু দিয়ে তৈরী হয় না তা বুঝ্‌তে আমার এতটুকুও দেরী হ'ল না।

ভোরের আকাশে প্রভাতের শুকতারাটা তখনও জ্বল্‌ছিল। শিয়রের দিকের জানালাটা খুলে' দিতেই সেই শুকতারা হ'তে খানিকটা আলো ঠিক্‌রে পড়ে আমার ললাটে চুম্‌ খেয়ে যেন বল্‌লে—গৃহলক্ষ্মী ঘরে আস্‌ছে, কিন্তু তোমার আয়োজন যে এখনো অসম্পূর্ণ হ'য়েই রইল।

তাড়াতাড়ি বিছানা হ'তে লাফিয়ে উঠে' নিজের মনে মনেই ব'লে ফেল্‌লুম—তাই তো। মীনা আস্‌ছে কিন্তু এখনও যে তার ঘর সাজাবার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি!

হাত মুখ ধুয়ে, কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ব'সে গেলুম কি-স জিনিষ চাই, তারি ফর্দ্দ কর্‌বার জন্যে। ফর্দ্দ শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লুম। তার পর কতক প্রয়োজনীয়, কতক অপ্রয়োজনীয় জিনিষে গাড়ী ভর্ত্তি ক'রে যখন বাড়ীতে ফির্‌লুম তখন বেলা একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে'ই দেখি মীনা আমার বালিশটা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌চে এবং সেই কান্নার বেগে তার দেহটা তেমনি ক'রে ফুলে' দুলে' উঠ্‌ছে যেমন ক'রে জোয়ারের জল বেলা-ভূমির বাঁধের ওপর বাধা পেয়ে ফুলে' দুলে' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

বিস্মিত হ'য়ে তার মাথাটা তাড়াতাড়ি কোলের ওপর তুলে' নিয়ে বল্‌লুম—ব্যাপার কি—অমন ক'রে কাঁদ্‌চ যে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে মীনা বল্‌লে—ও কিছু নয়—অম্নি! কিন্তু এই রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ নিয়ে এত রৌদ্রে কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি? তোমার নাওয়া-খাওয়া হয়েছে তো!

আমি বল্‌লুম—না—নাওয়া খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। কারণ এ-ঘরে যে লক্ষ্মীর আগমন হবে তারি ঘর সাজাবার সওগাত করতে বেরিয়েছিলুম। জিনিষগুলো কেমন হয়েছে দেখবে এসো।

মনে হ'ল চোখ্‌ দু'টো তার আবার একটা আকস্মিক ব্যথায় যেন ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—ও-সব রেখে তুমি চট্‌ ক'রে স্নান সেরে খেয়ে নাও দেখি। তোমার খাওয়া শেষ হবার আগে আমি আর তোমার কোনো কথা শুন্‌ছিনে। ছিঃ ছিঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি। দেহের ওপর এতটুকু মায়া নেই তোমার। এই সে-দিন অত বড় একটা অসুখ গেছে—এরি মধ্যে আবার অনিয়ম সুরু ক'রে দিয়েছ। ব'লেই জোর ক'রে আমাকে স্নানের ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে সে বাইরে থেকে দোর ভেজিয়ে দিলে।

স্নানের ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বল্‌লুম—খাইনি জন্য তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না মীনা! অনিয়মের মুখে যে নিয়মের লাগাম পরিয়ে দিতে পারবে দু'দিন বাদেই সে যখন আস্‌ছে তখন এ দু'দিনের অনিয়মে কোনো ক্ষতি করবে না।

স্নান সেরে বস্‌বার ঘরে পা দিতেই দেখি মীনা আমার খাবার সাজিয়ে ব'সে আছে।

হেসে বল্‌লুম—গৃহিণীর পদটা এরি মধ্যে অধিকার ক'রে

বসেছ দেখছি। কিন্তু নববধূর পক্ষে আমাদের সমাজে এটা যে ভারি নির্লজ্জতার কথা তা জানো ?

ম্লানকণ্ঠে মীনা বল্লে—সুযোগ ছাড়তে নেই। কে জানে ভাগ্যে আর কখনো তোমার খাবার কাছে বস্‌বার সুযোগ হবে কি না ! তা ছাড়া নববধূ এখনো তো হইনি।

আমি বল্লুম—তা বটে, তোমার কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু তার তো আর দেরীও নেই।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়েই সে আমার খাবার খবরদারী কর্‌তে লাগল। তার পর খাওয়া শেষ হ'লে হাতে জল ঢেলে দিয়ে, গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে—এইবার চলো—আমার যা বল্‌বার আছে তোমাকে ব'লে যাই

আমি বল্লুম—আজ এত সকাল সকাল তোমার যাবার তাড়া যে !

সে বল্‌লে—ডাক যখন আসে তখন যত শীগগির বেরিয়ে পড়া যায় তাই ভালো। তোমার সঙ্গে ভাগ্যটা মিলাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তা যখন হ'তে পারেই না, তখন মায়া বাড়িয়ে তো আর লাভ নেই।

অত্যন্ত হাল্‌কা ভাবেই সে কথাগুলো ব'লে গেল। কিন্তু দেখলুম—তার সে হাল্‌কা ভাবটা ঝড়ের আগে আকাশে যে থম্‌থমে একটা গুমোটের ভাব জেগে ওঠে কতকটা তারি মতো। ঝড় যদি জাগে তবে তার বুকটা ফেটে টুটে' চৌচির হ'য়ে যেতেও হয়তো দেরী হবে না।

ধীরে ধীরে মীনাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্লুম—এ আবার কি ঠাট্টা মীনা ! কোনো কারণে কি আমার ভালোবাসার ওপর তুমি আস্থা হারিয়েছ ?

আমার বুকের ওপর আপনাকে এলিয়ে দিয়েই সে বল্‌লে—না গো না, তাহ'লে তো বাঁচতুম। কিন্তু এ যে ভগবানের অভিশাপ !

কথাটা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বল্‌লে—আই-বুড়ীর কাছে আমাদের অদৃষ্ট গোণাতে গিয়েছিলুম। শুণে সে বল্‌লে—এ বিয়ের ফল কখনো ভালো হ'তে পারে না।

আমার বুকের ভেতর হ'তে মস্ত একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস নেমে এল। হেসে বল্লুম—এই কথা ! আমি ভাবছিলুম, না জানি আর কি ! তারপর স্বরের ভেতর উপহাস এবং অবিশ্বাস একসঙ্গে মিশিয়ে বল্লুম—কার অমঙ্গল হবে—তোমার না আমার ?

মীনা বল্‌লে—আমার অমঙ্গল হ'লে সে তো আমি গ্রাহ্য কর্‌তুম না, কিন্তু আই-বুড়ী যে দেখ্‌তে পেলে, তোমার দেহটাই রক্তের স্রোতের ওপর ভাস্‌ছে।

আমি বল্লুম—ছিঃ মীনা, এ-সব কথাও তুমি বিশ্বাস করো। মানুষের ভাগ্য মানুষে গুণ্‌তে পারে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ছাপ যাদের ললাটে পড়েছে এ ধরণের কথা শুনে' তারা যে কেবলি হাস্‌বে।

মীনা বল্‌লে—হাসুক, কিন্তু তাতে তো সত্যের কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তোমাদের সভ্যতা কতটুকু সত্যেরি বা সন্ধান পেয়েছে। চোখের ওপর ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ ক'রেই তো জিপ্সীরা ভাগ্য-গণনা করে। তাইতো তাদের গণনা কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না। তা ছাড়া যদি ভেবে দেখো তবে এ গণনা যে মিথ্যা হবে না তার যুক্তি তোমার নিজের মনেও ধরা পড়্‌বে। জিপ্সীদের প্রতিহিংসা পৃথিবীর শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষকে ধাওয়া করে চলে। সর্দ্দারের গ্রাস থেকে যদি তুমি আমাকে কেড়ে নাও তবে তোমার বুকের রক্ত ছাড়া তার প্রতিহিংসার আগুন যে নিববে না সে কথা তুমি না জান্‌তে পারো কিন্তু আমি তো জানি। তোমার ভালোবাসা আমাকে' অন্ধ ক'রে না রাখ্‌লে এ কথা আমি অনেক আগেই বুঝ্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু যে অপরাধ করেছি তার জের টেনে চলায় তো কোন লাভ নেই।

যুক্তির পর যুক্তির জাল রচনা ক'রে চল্লুম মীনার মনের কুসংস্কারটাকে ভাঙ্‌বার জন্যে। কিন্তু সে বুঝবে না ব'লেই বেঁকে বস্‌ল এবং এই বাঁকা মীনাকে কিছুতেই সোজা কর্‌তে পার্‌লুম না। অবশেষে অসহিষ্ণু হ'য়েই ব'লে বস্‌লুম—আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হ'তো তবে এই বাজে যুক্তিগুলো কখনো এমনভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌তে পার্‌তে না। প্রেমের পানপাত্রটা ঠোঁঠের আগে তুলে' ধর্‌বার আগেই যদি শুকিয়ে যায় তবে সোজাসুজি সেই কথাটা বলাইতো ভালো। মিথ্যা ছল খুঁজে' কৈফিয়ৎ রচনা কর্‌বার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার কথা শুনে মীনার দেহটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল—মনে হ'ল আগ্নেয়-গিরির গহ্বরটা এই মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আস্‌বে। কিন্তু তার

কিছুই হ'ল না। ধীরে ধীরে আপনাকে শক্ত ক'রে তুলে' মীনা বল্‌লে—সত্যি বাবুজি, বুনো জিপ্সী বুনো ঘোড়ার মতোই বেয়াড়া। বাঁধা পড়্‌বার ভয়েই সে আঁৎকে ওঠে। সুতরাং ঘরের ভেতর তাকে বাঁধ্‌বার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। কয়েকটা দিনের জন্য এই বিড়ম্বনা যে তোমাকেও ভোগ কর্‌তে হ'লো সেজন্য আমাকে মাফ ক'রো। ব'লেই সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অভিমানে আমার সারাদেহ তখন কাঠ হ'য়ে উঠেছে। তাই বাধা দিলুম না, বাধা দেবার শক্তিও ছিল না। ঘরের চারদিক ঘিরে' যখন আগুন লাগে হতবুদ্ধি গৃহস্বামী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে তার সর্ব্বস্ব ধ্বংসের ছবিটা দেখে যায়—বাধা দিতে পারে না।

*　　*

*

*　　*

সন্ধ্যার সীমন্তের সিন্দূরের রেখাটা খানিক আগেই অন্ধকারের আঁচলে ঢাকা পড়ে গেছে। কেবল বহুদিনের শুকানো ফুলের মালার মতো তার ছায়াটা পশ্চিমের দিগন্তে তখনও একটু ঝুলে' ছিল।

ঘরের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি। চাকরটা আলো নিয়ে এল। দরকার নেই ব'লে তাকে ফিরিয়ে দিলুম। মনের যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় হাহাকারে মরুভূমিটা যেন হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে।

উৎসবের আলো জ্বল্‌ল, বাঁশী বাজ্‌ল, চিত্তের শেষ প্রান্ত অবধি অজানা সুরের পুলকে দুলে' উঠ্‌ল, অবশেষে উৎসবের দেবতার রথও এসে পৌছালো। কেবল রথের ভেতরকার দেবতাকে মন্দিরের ভেতর প্রতিষ্ঠা করতে পার্‌লুম না!

আজ চারদিন ধ'রে সহরের রাস্তায় রাস্তায় মীনার খোঁজে ছন্নছাড়ার মতো ঘু'রে বেড়িয়েছি—কিন্তু খোঁজ পাইনি। ব'সে ব'সে জীবনের এই দু'টো দিনের স্বপ্নের কথাই ভাব্‌ছিলুম, এম্‌নি সময় হঠাৎ উল্কার মতো মীনা ঘরে ঢুকে' আমার বুকের ওপরে একেবারে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

চোখের কোল দু'টো জলে জলে ভিজে উঠ্‌ছিল—আর্দ্র-কণ্ঠে ডাক্‌লুম—মীনা!

চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো দিয়ে আমার মুখ চেপে ধ'রে মীনা বল্‌লে—চুপ্‌। তারপর আর একটা আঙুল তুলে' পথের দিকে নির্দ্দেশ কর্‌লে।

চেয়ে দেখি কয়েকটা ঘোড়ার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে জিপ্সীর দল রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে। দলের শেষ লোকটা পর্য্যন্ত যখন রাস্তার অন্ধকারে মিশে গেল, মীনা বল্‌লে—এ সহরে আমাদের বাসের মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—ওরা কোথায় যাচ্ছে?

মীনা বল্‌লে—ডেরা ফেল্‌বার এক মুহূর্ত্ত আগেও তো জিপ্সীরা জানে না, কোথায় তাদের তাঁবু পড়্‌বে।

দু'হাতে মীনাকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে বল্‌লুম—ওরা যায় যাক্‌ মীনা, কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না। ভাগ্য-গুণে কে কি বলেছে তাই শুনে' আমাকে এমনি ক'রে দুঃখের পাথারের ভেতর ভাসিয়ে দিয়ে যাবে!

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে মীনা আমার বুকের কাছটাতে আরো নিবিড় হ'য়ে ঘেঁসে এল। তারপর তার নিজের বুকের ভেতর হ'তে একটা আংটি বের ক'রে প্রথমে কপালে ঠেকালে। তারপর আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—মা'র কাছ থেকে আংটিটা পেয়েছিলুম; মন্ত্র-পড়া আংটি, এটা কাছে থাক্‌লে কোনো বিপদ কাছে ভিড়্‌তে পার্‌বে না। আমার শপথ রইল, আংটিটাকে কখনো কাছ-ছাড়া ক'রো না। ব'লেই দু'টো ঠোঁট দিয়ে আমার চোখে মুখে বুকে যেখানে সেখানে একেবারে পাগলের মতো চুমোর পর চুমোর বৃষ্টি বর্ষণ কর্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

একটা অজানা আবেশে দেহটা শিথিল হ'য়ে এল এবং হাত দু'খানাও এলিয়ে পড়্‌ল। সেই সুযোগে আল্‌গা পেয়েই যেমন উল্কার মতো মীনা ঘরে ঢুকেছিল তেমনি উল্কার মতো ক'রেই ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে' পথে বেরিয়ে ডাক্‌লুম মীনা। সাড়া পেলুম না। ছুটে' জিপ্সীদের দলটার ওপরেও চোখ্‌ বুলিয়ে এলুম—সেখানেও সে নেই।

কেবল সাপের হিম-দেহ বিরাট অজগরের মত রাস্তাটা হাত তুলে' আমাকে হাত-ছানি দিলে। জানি না এ রাস্তা কোথায় শেষ হ'য়েছে! হয়তো পাতাল ফুঁড়ে রসাতলের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্তই নেমে গেছে। তবু এই রাস্তা ধরেই ছুটে' চল্‌লুম ঐ জিপ্সীদের দলটার মতো যারা জানে না কোথায় চলেছে—কবে তাদের যাত্রা শেষ হ'বে। স্বর্গে তো পৌঁছাতে পার্‌লুমই না, যদি রসাতলের শেষ প্রান্তটা ছুঁয়ে' আসা যায় সেই বা মন্দ কি!

শ্রান্ত দেহটা পথের পাশে অবসাদেই হয়তো এলিয়ে পড়েছিল। যখন জাগ্‌লুম ভোরের প্রথম আলোটা আমার মুখের ওপরে তখন মীনার মৃদুস্পর্শের মতোই লুটিয়ে পড়েছে। সেই ভোরের আলোতে মীনার আংটিটি চোখের সাম্নে তুলে' ধর্‌তেই মনে পড়্‌ল—বুকের ওপরে লুটিয়ে পড়া মীনার চুমোর কথা। সে তো চুমো নয় চুমোর ঝড়। প্রলয়ের ভেতর দিয়েই যেমন নতুন সৃষ্টির প্রসবের ব্যথা জেগে ওঠে, চিরবিচ্ছেদের ভেতর দিয়েই তেমনি আমাদের চির-মিলনের সেতুটা গ'ড়ে উঠ্‌ল।

ঋতুমালা

শ্রীসাহানা দেবী

ধরণীর বুকে দেখি যুগ যুগ ভরি'
ঋতুমালা করে খেলা নব রূপ ধরি,
কত না অরূপ বহি তারে দেয় আনি,
কত বর্ণ, কত গন্ধ, কত নব বাণী,
কত হাসি, কত গান, কত অশ্রুধার,
অসহ বিরহ-ব্যথা, মিলন-সম্ভার,
কত আসা-যাওয়া, এরই সাথে তার,
কখনো জ্বলিছে আলো, কভু অন্ধকার!
পান্থ লাগি চিরদিন যেন পথ চাহি,
চলিয়াছে যুগে যুগে এ জীবন বাহি!
কত খেলা যাত্রী সবে পেলে বুকে তার,
সবারে বরিয়া লয় দিয়ে বাহু-হার!
কেবা শুধাইছে তারে—ওগো কার লাগি,
শত যুগ বর্ষ ধরি' প্রতীক্ষায় জাগি,
চলেছ তোমার সুখ-দুখ তরী বেয়ে,
অভিসারিকা সাজে কত গান গেয়ে!—
যে আসে তোমার পথে, কতই যতনে
বসাও অঞ্চল পাতি হৃদি-সিংহাসনে!
ভাবো কি গো, আসিছে সে নানা রূপ ধরি,
তব হৃদয়ের পাশে? তাই সবে বরি'
করো কি আগ্রহে তার পূজা-আয়োজন
দেখিয়া সে দানে তার ছবিটী মোহন?
শুধু তব মিলনের লাগি এই খেলা
যুগে যুগে চলিয়াছে? তাই ঋতু-মেলা
নানা রং বুকে করি দেয় আলিঙ্গন
তোমারে শেখাতে শুধু আত্ম-নিবেদন!
বার বার ওই বক্ষে এই যাওয়া-আসা,
কত বার সে ক্রন্দন, কত বার হাসা,
কত বার অতিথিরে রক্ত নিঙাড়িয়া
তব শ্রেষ্ঠ ধন তুমি দিতেছ আনিয়া!
ধন্য তুমি! প্রেম তব, সকলের মাঝে
অবিচল চিতে শোনে তারি বাঁশী বাজে!
তোমার বাঞ্ছিতে, তুমি এ সবের প্রাণে,
খুঁজিছ কখনো হেসে, কভু অশ্রু-গানে!
কেমনে বুঝিব বল, সে আনন্দ কত
উছলি' উথলি' তোমা তোলে অবিরত;—

শুধু জানি, এই মতো ঋতু-উৎসব
ধ্বনি' তোলে জীবনে বন্দন নব নব!
দেহ মাঝে এর গান একবার বাজে,
মন মাঝে এর দান নিয়ত বিরাজে!
তব তালে মনের এ চলা দিবানিশি
চলিতেছে হে প্রকৃতি! তব সুরে মিশি
রচিতেছে মরমের অভিনব ভাষা!
তোমারে দেখিয়া জাগে মোর বিশোরাসা'
নিরাশার বুক ফাটা তৃষাতুর প্রাণে,
আপনারে নেহারি যে নিদাঘের গানে!
কত তীব্র ব্যথা সে যে, কত হা-হুতাশ,
বুক ছাপি' ঝরে কত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস!
থেকে থেকে ঝড় দোলা, হৃদি মাঝখানে,
কি প্রচণ্ড ব্যথা হানে নিরমম বাণে!
রহিয়া রহিয়া সে বিপুল অট্টহাসি,
বক্ষ বিদারিয়া ঢালে ক্ষিপ্ত অশ্রুরাশি!
প্রমত্ত বায়ুর বেগ, বেড়া ভেঙ্গে দ'লে,
গ্রাসিয়া ছুটিয়া ফেরে তাণ্ডবের রোলে,
মনে হয়, গেল সব—শেষ এইখানে,
আর না উঠিবে তান জীবনের গানে!
তোমার উষ্ণের তাপ কত যে প্রখর
দলিত বেদন তাপে, ওগো বন্ধু মোর
করি অনুভব! প্রতি বিন্দু ব্যথা তার,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে চাহি বুঝিবার!
এই গ্রীষ্ম জীবনেতে কতবারই আসে,
টুটায়ে ধৈর্য্যের বাঁধ চলে সে উল্লাসে!
তারপর থরে থরে অন্তর-আকাশে,
পুঞ্জীকৃত বেদনার কালো মেঘ ভাসে,
ক্রমে মেঘ জমে' জমে' আর যবে নারে
রাখিতে চাপিয়া তারে বর্ষণের ধারে
অশ্রুসিক্ত করি দিয়া এ জনমটারে,
শ্রাবণ প্লাবন বহে অবিরল নীরে!
প্রাবৃট জীবনে নামে সান্দ্র শ্যাম কোলে,
আঁধার মর্ম্ম কাননে কেঁদে কেঁদে দোলে!
অশ্রুধারে ভাসাইয়া বেদনার তরী,
লয়ে যায় অকূলেতে কোন্ পথ ধরি!

বিপন্ন অশ্রুর গতি যত বেড়ে ওঠে,
তরণীটি সে তরঙ্গে উছলিয়া ছোটে!
কূল পানে চেয়ে চেয়ে যত কাঁদে প্রাণ,
পাল তুলে চলে তরী অকূলে উজান!
নিরুপায় ত্রাস বলে—"কোথা নিয়ে যাও?
কূল লাগি কাঁদে হিয়া, কূলেতে ভিড়াও!
সীমারে চিনি যে আমি, বন্ধু তারে জানি!
অজানা অসীমে হেরি ভীত ত্রস্ত মানি!"
তবুও না হয় ফেরা, শঙ্কিত প্রাণ
অনন্তে আঁকড়ি' ধরি করে সব দান!
আশা নাহি রহে যবে লভিবার ত্রাণ,—
তখনি দুঃখের দেখি হয় অবসান!
অকূলের মাঝে দীপ্ত কূল দেখা যায়
সুবর্ণ আলোয় ঘেরা স্বপ্ন সম প্রায়,
বহুকাল মেঘে ঢাকা আকাশের পারে
সোণার বীণাটি বাজে বেদনার তারে;
ব্যথাতুর বক্ষ হ'তে উৎসারিত আলো,
শরতের হাসি সম বড় লাগে ভালো!
জীবনে বরষা আনে শারদ প্রভাত
মাঙ্গলিক স্পর্শপূর্ব সিদ্ধ আশীর্ব্বাদ!
ছড়াইয়া শুভ্রহাসি আলো ঝলমল,
সরাইয়া অশ্রুরাশি, রচে নিরমল
ইন্দ্রধনুজাল! পুনঃ হৃদয়-আকাশ,
ঢাকে সর্ব্ব তনুটীরে দিয়ে স্বর্ণবাস!
সবুজের নেশা জাগে তারি পরশনে
শিহরি' শিহরি' ওঠে থেকে মন-বনে!
যেন কি লাগিয়া সব ভুলে অবিরত
সাজাইয়া দীপমালা, প্রতীক্ষায় রত
থাকে নির্নিমেষে পথে দিঠি বিছাইয়া,
পুলক চন্দনে দোল দেয় দোলাইয়া!
সব সমর্পণ তরে যবে ব্যগ্র মন,
আভাসে জানায়—এলো হেমন্ত লগন!
আশা-নিরাশার বাণী কোথা ডুবে যায়,
স্থির হয়ে আসে যেন ব্যথা বৃদ্ধ প্রায়,
বৈরাগ্যের সুর বাজে উদাসীন মনে
নামে ধীরে ধীরে শীত শ্বেত-পদ্মাসনে!
বিতরিয়ে রিক্ত হয়ে যবে স্থির চিতে
বসে ধ্যান-মগ্ন মনে, ভুলিয়া অতীতে,
—কাহার পরশে যেন হিয়া থরথরি'
কাঁপি ওঠে কী আবেশে! ওঠে সে মর্ম্মরি'
নব শাখে পত্র মেলি হৃদয়-বল্লরী,
নব নব পুষ্পভারে দেয় তারে ভরি!
আসে মূর্চ্ছনায়ে বহি দখিণের বায়,
শুষ্ক মনে লাগে কম্প্র নব প্রত্যাশায়!
আকাশে বাতাসে বাজে কার আবাহন!
মাঠে বাটে ভাসে নব পদচিহ্ন কোন্?
রিক্ত দেহ মন মাঝে, অচিনের বাঁশী
বাজায় কুহক গান,—সুদূর পিয়াসী
চঞ্চল চরণে চিত্ত, চলে উল্লসিয়া,
বিবশ বিভল এবা পড়ে মুরছিয়া
বিস্ময় বিহ্বলে সেই অজানার পায়,
লভিবারে চির সঙ্গ, মুগ্ধ পিপাসায়!
তখন চকিতে ঢালে সুগন্ধ সুবাস
বায়ুর হিল্লোলে, উচ্ছ্বসিত প্রতি শ্বাস
ধায় মত্ত হয়ে যেন কোন্ ইসারায়,
বিপুল ব্যাকুল বেগে নব ভঙ্গিমায়!
কবে সেই ব্যথাভরা অশ্রুবর্ষা-জলে
করেছিল বপন হৃদয় বীথিতলে
কোন্ অঙ্কুর - ইয়ে নব তরুপরে'
মুকুল স্তবক হাসে অধীর বিভোরে!
রঙে রঙে ভরে যায় হৃদয়-গগন,
অরূপ আভাবে চিত্ত হয়রে মগন!
নব গানে, নব তানে, নব নব ভাবে
মর্ম্মরিত মুখরিত মৃদু মধুচ্ছ্বাসে
গুঞ্জরিয়া তোলে কত মহিমার কথা!
দিকে দিকে প্রকাশে যে নবীন বারতা!
কত ব্যথা, আঁখি লোরে, দোল দিয়ে তবে
হৃদয় চয়ন করে বসন্ত-বিভবে!
ওগো ঋতু! তব খেলা প্রকৃতির সনে
রহে শুধু, পলে পলে মানবের মনে,
কত নব গরিমার সৃষ্টি আলিম্পন
রচিতেছে বসি' নিত্য করিয়া মন্থন
সুখ-দুঃখ বারিধিরে! পরিশেষে জ্বলে
গুপ্ত তব মণিমালা সে অতল তলে!
মানবের বক্ষে তব নিত্য যাওয়া-আসা
নিত্য কাল ধরি' সৃজে অপরূপ ভাষা!

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী বি-এ

কলকাতায় লোকসংখ্যা বেড়েছে। মাঠে আগাছাও বাড়ে। কিন্তু এই সঙ্গে কলকাতায় টাকাও নাকি বেড়েছে। কথাটা শোনা যাচ্ছে; কিন্তু টাকার ত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না; অর্থাৎ টাকার সন্ধান যেই পা'ক, সত্য পায় নি। তাই সে বেলা সাঁতটা অবধি তক্তাপোষ আঁকড়ে পড়ে ছিল।

মেসের ম্যানেজার বাবু বলে গেলেন—সত্যবাবু, আপনার কাছ থেকে অনেক মাস কিছু পাওয়া যায় নি।

সত্য একটা মুখভঙ্গি করে বললে—আঃ মশায়, সকাল বেলা থেকেই তাগাদা দিতে সুরু করলেন। টাকা পেলেই আপনার দেনা চুকিয়ে দেবো।

— তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলাম। সকাল বেলা অপ্রিয় প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে তিনি একটু হেসে চলে গেলেন। হাসির হুলের তীক্ষ্ণতা নাকি সব চেয়ে বেশী;

সত্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

কলকাতার রাস্তায় জনসংখ্যা তখনও জনতা হ'য়ে ওঠেনি। কোন্ দিকে যাওয়া যায় স্থির করবার জন্যে সত্য একবার তার মেসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অপর ফুটপাথের ফ্রী রীডিং রুমটাতে কাগজওয়ালাটাকে কাগজ দিতে দেখে, সে ধীরে ধীরে লাইব্রেরীতে গিয়ে কাগজটা দখল ক'রে বসল।

কাগজটাতে অনেক রকম 'কাজে'র জন্য লোকের দরকার ছিল, কিন্তু, ঠিক যে রকম কাজের জন্য সে নিজেকে উপযুক্ত মনে করে, এমন কোন কাজের সন্ধান সে পেলে না।

ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি খালি ছিল দেখে, সে পড়ে দেখে—সে-কাজের জন্যে হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। সে কাগজটাকে ঠেলে ফেলে লাইব্রেরী থেকে বার হয়ে এল।

পথে তখন পথিকের ভিড় বেড়ে উঠেছে। খুব খানিকটা হন্ হন্ করে চলার পর, একটা মোড়ের মাথায় তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

সত্য কোনো রকম সম্ভাষণ না করেই বল্লে—দশটা টাকা দিতে পারিস্। পরশু দিয়ে দেব।

সত্য জানত যে টাকা পাওয়া যাবে না। কাজেই বন্ধুর মুখে তার আশা-মত উত্তর পেয়ে সে নিরুৎসাহ হল না।

এইবার আলাপের বাজে কথা সুরু হল। খানিক পরে সত্য মাঝপথে আলাপের সূত্র ছিন্ন করে বললে, যাই—টাকা কটার যোগাড় করতে হবে।

আবার হন্ হন্ করে চলা সুরু হল।

পথের দু'ধারে বস্তি ভেঙ্গে বাড়ী হওয়া সুরু হয়েছে। মিস্ত্রির দল কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এই সমস্ত বাড়ীর মধ্যে একটা নতুন বাড়ীর বারান্দা থেকে একটা কাগজ ঝুলছে—একজন মাষ্টার চাই। কাগজটা হাওয়ায় ঘুরছে। সত্য একটুখানি ভেবে স্থির করলে—আচ্ছা, ভাগ্য পরীক্ষা করেই দেখা যাক।

সত্য বাড়ীর দরজায় এসে হাঁক দিলে। মিনিট পাঁচেক দাঁড়াবার পর চাকর এসে তার প্রয়োজন জেনে গেল। তার মিনিট পনের পরে কর্ত্তা নামলেন।

কর্ত্তা একবার আপাদমস্তক সত্যকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি নাম আপনার?

সত্য অত্যন্ত নীরস ভাবে তার নামটা বলে গেল।

এর আগে কখনও মাষ্টারি করেছেন?

সত্য কি ভেবে বললে—মাষ্টারি ঠিক করি নি; তবে বাঙালীর ছেলে—বাড়ীতে ছোট ছেলেদের পড়িয়েছি।

ও। আমারও বাড়ীতে ছোট ছেলেদেরই পড়াতে হবে। সকালে ঘণ্টাখানেক আর দুপুরে ধরুন বারোটা থেকে তিনটে। এই ক'ঘণ্টা! তা কি রকম মাইনে হ'লে আপনার সুবিধা হবে।

সত্য পড়ানর সময় যোগ করে মনে মনে একটা হিসেব করে বললে—দেখুন, মাষ্টারি ত এর আগে করি নি,—আপনি এর পূর্ব্বে মাষ্টারকে যে মাইনে দিতেন, আমাকেও নয় তাই দেবেন।

তবুও আপনার কত হলে—

সত্য অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল—ত্রিশ টাকা।

সত্যের কথায় কর্ত্তা একটু হাসলেন। তার পর সে হাসি একেবারে মিলিয়ে যেতে বললেন—এর আগের মাষ্টার বি-এ পাশ ছিলেন—তাঁকে আমি ঐ মাইনেই দিতাম।

কর্ত্তা একটু থামলেন। মিনিটখানেক চুপ করে থাকবার পর সত্য বিরক্ত হয়ে বললে—আচ্ছা, আমি তাহ'লে চললাম।

সত্য ঘর থেকে বার হবার পূর্ব্বেই কর্ত্তা বললেন—তবে দেখুন, আপনাকে আমি ঐ মাইনেই দেব। তখন ছেলেরা ছোট ছিল, এখন বড় হয়েছে; সুতরাং পড়ার সময়টাও একটু বাড়া উচিত নয় কি?

সত্য একবার কর্ত্তার দিকে চেয়ে বললে, অতটা সময় এই টাকার জন্যে আমি নষ্ট করতে পারব না।

সত্য রেগে বাড়ী থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে সুরু করে দিলে। কর্ত্তার কথাবার্ত্তায় তার মন চটে উঠেছিল।

চাকরীর সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা' এমনি বিশ্রী। খানিকটা হাঁটার পর রোদের তাপ আর লোকের ভিড় অসহ্য মনে হওয়ায়, সে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

কয়েকটী গাছের ছাওয়ায় ও জলের হাওয়ায় স্থানটী তখনও বেশ শীতল ছিল। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর তার মনটা আপনিই নেমে এল। মনে হল—উপস্থিত-মতো মাষ্টারিটা নিলেই হত। হাতে যা হোক কিছু টাকা হত ত। এখন যে হাতে কিছুই নেই।

যার কাছে টাকা পাওয়া যেতে পারে, তার নামটী বাদ দিয়ে, সত্য আর সকলের নাম মনে করতে লাগল। এরা সকলেই সত্যের দলের; অর্থাৎ স্থায়ী আয় বলে এদের কিছুই নেই। কিন্তু যখন কিছু এদের কাছে থাকে, তখন তার থেকে দান-খয়রাৎ করতে এদের বাধে না।

এই রকম লোকেদেরই নাকি দিল্‌দার বলে!

সত্য বেঞ্চি ছেড়ে আবার চলতে সুরু করে দিল। আবার তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সত্য প্রশ্ন করলে—কি রে, কোথায় চলেছিস।

—কিছুই ঠিক নেই, একটু ঘুরছি। পাশেই একটী পাণের দোকান ছিল। সেখান থেকে দু'পয়সার পাণ কিনে বন্ধুপ্রীতি রঙিন করে তোলা হল।

বন্ধু প্রশ্ন করলে,—তুই কোথায় চলেছিস।

একটা বৈরাগ্যের খোলস চড়িয়ে সত্য উত্তর দিল—এমনি।

আলাপ জমল না। দুজনেই চলতে সুরু করে দিলে। পথের মোড় পর্য্যন্ত দুই বন্ধু নিঃশব্দে এসে, কোনো কথা না বলে, দুইজনে দুই পথ ধরে চলে গেল।

নিজের অজ্ঞাতসারে সত্য বিনয়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। একমনে চলতে চলতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন শুনে সত্য দেখে, বিনয় জিজ্ঞাসা করছে—সত্য, কোথায় চলেছ?

সত্যর গলা থেকে গ্রামোফোনের অনুরূপ সুরে কথা বার হল—দশটা টাকা দিতে পার?

'চল'—বিনয় আর কোনো কথা না বলে' তার বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করে দিলে। বিনয়ের ছাতিটা ডান হাত থেকে বাম হাতে এসে সত্যের মাথাটা আচ্ছাদন করলে।

ছেলেবেলা থেকে এই দুটী বন্ধু বরাবর একসঙ্গে পড়ে আসছে। মনের মিল এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে মতের মিল আছে ভাবলে ভুল করা হবে।

বিনয় অনেকদিন সত্যকে বলেছে—সত্য, যা হোক একটা কাজ কর!

সত্য জবাব দিত, কাজ করতে রাজী আছি; কিন্তু যা-হোক কাজ করতে রাজী নই।

বিনয় খুব গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করত—কি রকম কাজ তুমি চাও!

সত্য তার আদর্শের কথা বলে যেত।

বিনয় খুব নিবিষ্ট মনে তার বড় বড় কথা শুনে যেত। তার বলা শেষ হলে খুব স্বল্প কথায় সে তার জবাব দিত—আকাঙ্ক্ষা আর আকাশের চাঁদ একই জিনিস। এদের দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না।

আবার একচোট তর্ক ওঠে—উপমা আর যুক্তি এক জিনিস নয়। সত্যর সমস্ত কথা অত্যন্ত সহিষ্ণুর মতো শুনে বিনয় খুব শান্ত ভাবে বলে—কল্পনার আদর্শকে ব্যবহারিক

জগতে আনবার চেষ্টা করলে, তা ভেঙেচুরে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। এতে লোকসান বই লাভ নেই।

—লোকে এতদিন লাভের পথের হিসেবই করে এসেছে; আমি না হয় লোকসানের পথের পথিকই হব।

একটা গর্ব্বে সত্যর বুক ফুলে ওঠে। বিনয় তার এ ভাব দেখে হাসে। কিন্তু কোনো কথা বলে না।

মানুষ যা নয়, সে তাই দেখাতেই চায়। তাই মিথ্যা অভিমান ও আড়ম্বর সত্য স্বরূপকে ঢাকা দিয়ে ফেলে। এই আবরণকে রাখতেই মানুষ প্রাণপণে যত্ন করে।

সত্য বিনয়কে কথা না বলতে দেখে চোখ তুলে দেখে, সে হাসছে। সত্য অস্থির হয়ে বলে—হাসছ যে।

বিনয় তেমনি হাসির সুরেই বললে—সত্য কথাটা বলতে ভয় পাই। যারা রাক্ষস সেজে অপরকে ভয় দেখায়, তাদের মুখোসটাকে কেউ যদি অস্বীকার করে' তার স্বরূপ দেখতে চায়, তাহলে তারা অখুসী বই খুসী হয় না।

সত্য মুখখানা গম্ভীর করে বল্লে—তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।

—মানুষের আসল রূপকে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু অভিনয়ের রূপটাকে বাহবা দিতে পারি না।

সত্য বিনয়ের কথা শুনতে শুনতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

আকাশে সাদা মেঘ উড়ে যায়; কিন্তু তার গভীরতা ধরা পড়ে না।

খানিক বাদে সত্য মুখ ভার করে' কোন কথা না বলে' উঠে চলে' যায়।

এমনি কত দিন ঘটেছে। কিন্তু বন্ধু-প্রীতির কাচে কখনও চিড় খায় নি।

তাই পূর্ব্বেও বিনয় যেমন করে তার সঙ্গে চলত, আজও তার সে ব্যবহারের ব্যত্যয় ঘটে নি। রাস্তার রোদ্রের হাত এড়িয়ে বিনয়ের ঘরে আসতেই সত্যর বোধ হল যে, ঘরটা ভারি স্নিগ্ধ।

এর পূর্ব্বেও এ-ঘরে সে বহুবার এসেছে; কিন্তু আজ যেন বিশেষ করে এই ঘরটাকে তার রমণীয় বলে মনে হল।

ঘরের সমস্ত জিনিস অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান। ছোট টেবিলটার ওপর একটা চীনে-মাটীর ফুলদানীতে তাজা ফুল অত্যন্ত সযত্নে গোছান।

এই ঘরটার সঙ্গে তুলনায় তার নিজের ঘরের দৈন্য কুশ্রীতা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

বাগানের গাছের ছায়ার শীতলতায় সে তৃপ্ত হয়েছিল; কিন্তু এই ঘরের স্নিগ্ধতায় সে মুগ্ধ হল।

তার মনে হল—স্নিগ্ধতার মধ্যে শীতলতার সঙ্গে স্নেহের পরশ আছে বলে' তা এত মধুর।

বিনয় অত্যন্ত সংযত স্বরে ডাকলে—মাধুরী।

মাধুরী তার স্ত্রী।

মাধুরী ঘরে আসতেই সত্য একটা নমস্কার করে বললে—আসুন।

বলেই তার মনে হল, এটা ভদ্রতার বাহুল্য। এটা তাদেরই ঘর এবং সেই অভ্যাগত। বিনয় ও মাধুরীর মধ্যে এইবার খানিকটা অভিনয় হয়ে গেল। সত্য নির্ব্বাক্ দর্শকের মতো শুধু চেয়ে রইল।

বিনয় বললে,—একবার আলমারীর চাবীটা দাও ত।

মাধুরী তার আঁচল থেকে চাবির তাড়াটা খুলে বিনয়ের হাতে দিলে।

সেই তাড়ার মধ্যে থেকে আলমারীর চাবিটা চিনে, আলমারী খোলা বেশ শক্ত ব্যাপার। গোটাকতক চাবি পরখ করতে দেখে, মাধুরী বললে, দাও আমি খুলে দিচ্ছি।

—না, আমিই খুলতে পার্ব্ব। বলে' বিনয় তাড়া থেকে চাবিটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

—বাজে চাবি পরখ করে আমার কল খারাপ করতে হবে না। দাও দেখি—আমি খুলে দিচ্ছি।

মাধুরী বিনয়ের কাছে গিয়ে চাবিটা চাইলে। 'আচ্ছা দেখ' বলে বিনয় চাবিটা মাধুরীকে না দিয়ে, তার টেবিলের কাছে গিয়ে একটা নোট-বই থেকে আলমারীর চাবির নম্বর মিলিয়ে আলমারিটা সে খুলে ফেললে।

মাধুরীর চোখে একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠল।

সত্য বলল—সাংঘাতিক!

বিনয় কোন উত্তর না দিয়ে, আলমারী থেকে একখানা নোট বার করে পকেটে রাখলে।

তার পর আলমারীটা বন্ধ ক'রে, চাবিটা যার, তার হাতে ফিরিয়ে দিলে।

সত্য একটা লোলুপ ব্যগ্রতায় বিনয়ের দিকে চেয়ে ছিল। বিনয় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে,—সত্য, আজ আর

মেসে ফিরে গিয়ে কি হবে। আজ আমার ছুটী আছে—সকালটা এখানেই কাটিয়ে যা।

সত্য কোনো উত্তর দেবার পূর্ব্বে একটু ভাবছিল যে, সকালে না ফিরলে মেসের ম্যানেজার হয় ত কি ভাববে। কিন্তু তখনি তার মনে পড়ল যে, তার না ফিরে যাওয়ার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। এমন ব্যাপার বহুদিনই ঘটেছে।

মাধুরী বললে,—বাইরে এখন ভয়ানক রোদ উঠেছে। এ রোদে আপনার ফিরে গিয়ে কাজ নেই।

মাধুরীর কথার সুরে একটা স্নেহের আবেদন তাকে মুগ্ধ করলে। বাঙালীর গৃহে এই ভগিনীর মূর্ত্তির স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করার মতো নির্ম্মমতা তার ছিল না।

একটা ভারী সুন্দর ভাব তার মাথার মধ্যে একটা রূপ সৃষ্টি করবার উদ্যোগ করলে। সে বললে,—আপনাদের কথা ঠেলবার মতো রূঢ়তা আমার নেই।

বিনয় ঈষৎ কৌতুক-ঈর্ষা মিশ্রিত স্বরে বললে—সত্য, তোমার 'আপনাদের' গৌরবটা যে একবচনের উদ্দেশ্যে, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি কিন্তু ভগবান আমায় দিয়েছেন।

কথাটা শেষ হতে সত্য এবং বিনয় দুজনেই হেসে উঠল।

—'আমার দিক থেকেও ঐ একই কথা বলা যায়', বলে' মাধুরী একটা খুসীর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

বিনয়ের জীবনের এক অংশের এই ছোট্ট ছবিটি তাকে উন্মনা করে তুলেছিল। সত্য খালি এই কথাটাই ভাবছিল।

বেশ হাসি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে দুপুরটা কেটে গেল।

বিনয় বলছিল—সত্য একটা চাকরী কর।

—করব। সত্য চুপ করে রইল।

বিনয় সত্যর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। আজ আর যেন তার স্বরে তর্কের ছোঁয়াচ ছিল না। অত্যন্ত একটা অনুগত ভাব।

বিনয় বললে—টাকা যাট-সত্তর মাইনে। কাজটা মন্দ নয়। তুই যদি করিস, তা হলে না হয় চেষ্টা করি।

—চেষ্টা কর।

সত্য সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে মেসে ফিরে আসতেই একটা চিঠি পেল। তার মা লিখেছেন।

সত্য বহুদিন দেশে আসে নি। দেশে আসবার জন্যে মা তাকে লিখেছেন।

মায়ের এমন আহ্বানের অর্থ কি, তা সত্য জানত। কিন্তু মায়ের মতের সঙ্গে তার মত মিলত না বলে' মা কত কান্নাকাটী করতেন। এবার কিন্তু তাঁর কথার উত্তরে সে আর জোর করে প্রতিবাদ করতে পারলে না। তার চোখের সামনে বিনয় ও মাধুরীর ছবিটা রঙীন হয়ে ফুটে উঠত। তার সমস্ত যুক্তির গোড়া যেন কেমন আলগা হ'য়ে যেত।

নিজের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করে পাছে তার দুর্ব্বলতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতেও ভয় পেত।

অবশেষে একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল।

বেদুঈনরাও মাঝে মাঝে মরুদ্বীপে আশ্রয় নেয়।

সত্য তার ভিতরকার কবি-মানুষটাকে নিয়ে জীবন উপভোগ করবার চেষ্টা করত।

তার স্ত্রীর নাম বিধুমুখী;—গ্রামেরই একটী সাদাসিধা সরলা বালিকা। তাকে ঘিরে তার কবিত্ব-উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। নিখিলের সমস্ত কবি যে ভাষায় যে ভাবে তাদের প্রিয়ার স্তুতি গেয়ে গেছে, আজ সত্যর কাছে তার সমগ্র রূপটা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তবুও তার মন তৃপ্ত হত না। তার মনে হত—ভাষায় তা পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না।

বিনয় চিঠি লিখেছে—সে তার জন্যে কাজের ঠিক করেছে। সে যেন শীঘ্র চলে আসে।

সত্য বিরক্ত হল। একবার মনে হল, লিখে দি যে, চাকরী করা পোষাবে না। হঠাৎ তার মনে কি খেয়াল হল। তখনকার মতো তার উত্তর দেওয়া স্থগিত রইল। সে ভাবল, একবার বিধুকে জিজ্ঞাসা করে দেখি—সে কি বলে।

অত্যন্ত চিন্তার ভান করে চিঠিটাকে নিয়ে সে হারিকেন ল্যাম্পের সামনে বসে ছিল। তখন অনেক রাত হ'য়ে গেছে। বাড়ীর সমস্ত কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। মায়ের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তিনি শোবার উদ্যোগ করলেন। বিধুমুখী তার শাশুড়ীর পা দুখানি নিজের কোলে তুলে নিয়ে, তাঁর পদসেবা সুরু করেছিল। শাশুড়ী বললেন—যাও মা, অনেক রাত হয়েছে, তুমি শোও গে। সারাদিন খেটেছ—তোমার ঘুম পেয়েছে।

বধূ বললে—না মা, আমার ঘুম পায় নি। আপনি ঘুমুন, আমি পা টিপে দিচ্ছি।

অগত্যা শাশুড়ীকে ঘুমের ভান করতে হল।

অতি সন্তর্পণে পা নামিয়ে বধূ ধীরে ধীরে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

সত্য তখন নিবিষ্টচিত্তে চিঠি পড়ছে।

বধূ বেচারী প্রথমতঃ পাণের ডিবা ও জলের গেলাস যথাস্থানে সশব্দে রেখেও যখন সত্যর ধ্যান ভাঙাতে পারলে না, তখন নিরুপায় হয়ে জড়সড় ভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সত্যকেও তার চিঠি পড়ার ভান ত্যাগ করতে হল। সত্য মনে মনে যে মায়াজাল রচনা করে রেখেছিল, বিধুমুখীর কার্য্য-কলাপে তা ছিন্ন হ'য়ে গেল। চিঠিখানা মুড়তে মুড়তে সত্য বললে—আমায় কাল কলকাতায় যেতে হবে। আর ত ঘরে বসে থাকা যায় না। একটা চাকরী বাকরী করতে হবে ত।

বধূর মুখ হ'তে কোন উত্তর এল না। সে শুধু বিছানার ওপর উঠে বসল।

সত্য তখন প্রগল্ভ ভাবে তার মতামত ব্যক্ত করে যেতে লাগল। সত্যর সমস্ত কথা শুনে বিধুমুখী বললে—সংসারে যখন লোক বেড়েছে, তখন চাকরী করা ছাড়া আর উপায় কি?

সত্যর মোহ একটা রূঢ় আঘাত পেলে; তার সমস্ত উচ্ছ্বাসের এই উত্তরে সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, ঠিক এই নারীকে সে চায় নি! কিন্তু তখনি আবার সে মনকে প্রবোধ দিলে,—না, এ স্নেহময়ী দরদী,—সরলতার প্রতীক। কিন্তু তবু মনে একটা অতৃপ্তির ছোঁয়াচ লেগে থাকে। প্রশ্ন ওঠে—মানুষ কি চায়?—নারীর সারল্য; না বিচিত্র ছলনা?

বিনয়ের সঙ্গে দেখা হল; কিন্তু চাকরী হল না। বিনয় বললে—তুমি চাকরীর জন্যে বসে থাকতে পার; কিন্তু চাকরী তোমার জন্যে বসে থাকবে না।

সত্য বিনয়ের কাছ থেকে ঠিক এই ধরণের কথা প্রত্যাশা করে নি। বিনয়ের চিঠির জবাব দিতে ও তার সঙ্গে দেখা করতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সে জন্যে বিনয় যে এতটা রূঢ় ভাবে আঘাত করবে, তা সে কল্পনায়ও আনতে পারে নি।

সত্য নীরবে তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

—যাক্, আবার সন্ধান করা যাবে। তুমিও দেখ, আমিও দেখি। বিনয়ের গলার সুরে সহানুভূতির প্রসন্নতা সত্যর মনের উষ্ণতাকে অনেকটা শীতল করে দিলে।

বিনয় অতি সহজ শান্ত স্বরে বললে—দেখ সত্য, এতদিন তুমি যে ভাবে চলে এসেছিলে, আজ তা বদলাবার সময় এসেছে। মানুষ তার শরীরটা নিয়ে যেমন ভাবে ছুটতে পারে, বাইরের একটা বোঝা নিয়ে ঠিক সেই ভাবে চলা কি সম্ভব?

মাধুরী কি একটা কাজে সেই ঘরে এসেছিল। বিনয় তাকে অতটা লক্ষ্য করে নি। মাধুরী শুধু তার শেষের লাইনটাই শুনতে পেয়েছিল। তার মনে হল, এই বন্ধু-যুগলের কথার মধ্যে গিয়ে পড়া ঠিক হবে না। কিন্তু মানুষ মুখভার করে থাকে, এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। তাই তার পরিহাসের স্রোত দুটী বন্ধুকে নাড়া দিলে—আমরা কি তোমাদের বোঝা না কি?

বিনয়ও পরিহাস তরল সুরে বললে মতটা আমার নয়—শাস্ত্রকারের। আমি ঠিক ও-মতের—

মাধুরী হেসে বললে—সাফাই আর না গাইলেও চলত।

মাধুরী হেসে চলে গেল।

সত্য ভাবছিল—তার জীবন ত কই এমন ভাবে যায় না।

ক্ষণিকের এই ছোট্ট উচ্ছ্বাসগুলি কি মধুর! এদেরই সমষ্টি জীবনকে মধুময় ক'রে তোলে।

তার সমস্ত চিন্তা ডুবিয়ে এই কথাটাই তার মনের মধ্যে জাগছিল। তার নিজের কথাই আজ ফিরে এসে তাকে আঘাত করলে—তোমার পথ লাভের হতে পারে, আমি না হয় লোকসানের পথেই চলব। যে কশা দিয়ে নিজের ঘোড়া চালাই, সেই কশা যখন ঘোরাবার দোষে নিজেরই ওপর লাগে, তখন চমকে উঠতে হয় তার আঘাত করবার ক্ষমতা দেখে।

দেশ থেকে চিঠি এসেছে। সত্য খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে লাগল। অত্যন্ত সরল সাদাসিধা চিঠি। এর মধ্যে পরের বই থেকে টোকা ভাবার ঝঙ্কার নেই; মুখস্থ করা প্রেমের বাঁধি গৎ নেই; যা আছে, তা প্রাণের অনুভূতি। অতি তুচ্ছ কথার স্মৃতি নিয়ে আলোচনা,—পথে কষ্ট হয়েছিল

কি না, যাবার দিন পড়ন্ত রোদের প্রকোপে মাথা ধরেছিল কি না; এমনি সব ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যাপারে ভরা ছ-পাতার চিঠি।

শেষে সে লিখেছে—চাকরীর কি হল। মা ঠাকুর-বাড়ীতে পূজো মানৎ করেছেন। ঠাকুর কবে এমন দিন দেবেন? ইত্যাদি।

খুব ধীরভাবে সেই চিঠিখানি পড়ে সে একটা ভারি তৃপ্তি বোধ করলে। চিঠির মধ্যে আন্তরিকতার পরশটুকু তাকে মুগ্ধ করলে।

সে স্থির করলে, চাকরী একটা খুঁজতে হবে। সংসারের ভার, সাংসারিক শান্তি প্রভৃতি অনেক কথা তার মাথায় এল। কিন্তু মনে ভাবলেই ত হয় না। তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা চাই। আজ ঝোঁকের মাথায় যে পথে চিন্তা-প্রবাহ ছুটেছে, কাল যদি অন্য ভাবের ধাক্কায় সে ধারা ভিন্ন পথে ছোটে, তা-হলে আর যাই হোক, কার্য্য-সিদ্ধি হয় না।

প্রতিদিন ব্যর্থতার আঘাতে তার মনে হত—এ পথে বৃথা চেষ্টা,—তার পথ লোকসানের।

রাজপথে অত্যন্ত ভিড়। গাড়ী, মোটার ছুটেছে। পথিকেরা একটা ভ্রান্ত আতঙ্কে নিজেদের বাঁচিয়ে চলেছে। দিন চলে যায়।

সত্য ভাবে পথের ভিড় বাড়িয়ে কি হবে?

তার কথায় মেসের লোকেরা হাসে। তারা বলে, লোকটার চাকরী না পেয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

সত্য কিছু বলে না। রোজ লাইব্রেরীতে গিয়ে দিনের কাগজ পড়ে—পয়লা পাতা থেকে শেষ পর্য্যন্ত।

রোজ কত লোক মরছে রোগে আর অপঘাতে—সে তার হিসাব দেখে।

বিনয় শুনে বললে—তোর হল কি?

সত্য হেসে বললে—অপেক্ষা করছি।

—কিসের? বিনয় তার মুখের দিকে তাকায়।

—মড়কের!

সত্যর কথা বিনয়ের কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হয়। সে বিস্ময়ের মাত্রা চড়িয়ে বলে—মড়ক কিসের জন্যে?

সত্য হাসে। বলে—একটা জায়গায় একটার বেশী ছুটো 'এটম্' থাকতে পারে না, তা মানুষ! জগতে এত লোক ধরবে কি করে'।

বিনয় তার মুখের দিকে চেয়ে শোনে।

সত্য বলে যায়—পৃথিবী ত আর বাড়েনি; অথচ মানুষ বেড়ে চলেছে; তার সংসার বেড়ে চলেছে; তার সাক্ষী—যানবাহন বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে এদের ধ্বংস না হ'লে জায়গায় কুলোবে কেন? তাই ত রোজ কাগজ পড়ি,—পৃথিবীর ধ্বংস আসবে কবে তারই খোঁজ করি?

—আমাদের বাঁচতে হবে ত?—

সত্যর মুখে একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

বিনয় ভাবে—এরা কেন এমন করে ধার-করা বুলি আওড়ায়। একবার ইচ্ছে হয় বলে—এ-সব হচ্ছে দার্শনিক-দের চিন্তার বিলাস। কিন্তু আবার মনে হয়—খুব গভীর একটা চিন্তার প্রকাশকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? তার নিজেরই মনে সংশয়ের দোলা লাগে।

বিনয় শান্ত সমাহিত স্বরে বললে—আচ্ছা, তুই ঘর থেকে বার হ' দেখি। চল্, একটু বেড়িয়ে আসি।

'চল'। সত্য কোনো আপত্তি করলে না।

দুই বন্ধু অনেকক্ষণ এক সঙ্গে ঘোরে। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হয়ে অন্ধকার রূপে দেখা দিলে। আলোর মায়ায় নবলোকের সৃষ্টি হ'ল। কর্ম্মরথের চক্রের শব্দ অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হচ্ছে। দিনের শেষে সে কর্ম্মের সমাপ্তি হয়েছে; রাত্রির আরম্ভে আবার তারই সূত্রপাত। বিচ্ছেদ নেই। এমনি ভাবেই পৃথিবী অগ্রসর হচ্ছে।

সত্য ভাবছে—পৃথিবীর বুকে স্থান হয় না বলেই ত মানুষ পঞ্চাশ-তোলা অট্টালিকা তুলছে। পথে স্থান নেই—তাই ত মানুষ আকাশে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ ক্রমাগতই উঠছে।

সে আরও কত উঠবে। চলতে চলতে সত্য মানুষের ওঠার স্বপ্ন দেখছিল।

তার সে স্বপ্ন টুটিয়ে বিনয় বললে—সত্য, বাড়ীর খবর কি?

তখনও সত্য ভাবছে—এই বিমানচারীরাই মানুষের মুক্তি-পথের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বিনয়ের প্রশ্নের ধাক্কা খেয়ে তার এই মোহ ছুটে গেল। সত্য, তার কথার উত্তরে পকেট থেকে একটা পুরানো চিঠি বার করে দিলে।

চিঠি সত্যর স্ত্রী লিখেছে।

বিনয় চিঠিটা হাতে নিয়ে একবার চোখের কাছে তুলে অমনি সেটাকে সত্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—সত্য, পরের বৌয়ের প্রেমপত্র পড়ার বয়স অনেক দিন পার হয়েছি। এক কথায় কি হয়েছে বল দেখি? প্রেমের অভিমান?

সত্য বললে—ও ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসে না।

বিনয় চুপ ক'রে রইল। কী যে হতে পারে, তা সে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

সত্য ঈষৎ তিক্তস্বরে বললে—এ আমি বুঝতে পারি না, তোমাদের ভগবানের নিয়ম। যাদের ঘরে অন্ন প্রচুর, তাদের গৃহে লোকাভাব। আর যাদের দিনে দু'মুষ্টি জোটা মুস্কিল, দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি হচ্ছে তাদেরই।

ব্যাপারটা বিনয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। এতক্ষণে সে যেন কথা কইবার কিছু পেলে। বললে—সত্য, এই শুভ ব্যাপারটাকে, তুই এমন বেয়াড়া ভাবে দেখছিস। এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে।

সত্য তার কথার কোন জবাব দিলে না। একটা মুখভঙ্গী করলে মাত্র।

বিনয় বললে—এমন সু-খবরটা একটু আগে দিতে হয়। চল আমার ওখানে।

সত্য তার অনুগামী হল।

বিনয়ের বাড়ীর এই ঘরটার মধ্যে এলেই সত্যর মনে হত—সে যেন ভিন্ন-লোকে এসে পড়েছে। বিনয়ের সহানুভূতি, প্রীতি, মাধুরীর স্নেহ, যত্ন, মমতা,—এর মধ্যে যেন একটা মন্ত্র আছে। সে তার দুঃখদারিদ্র ভুলে যেত।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে বন্দর আছে, তাই রক্ষা।

মাধুরী বললে—আমার না-দেখা সইয়ের সঙ্গে এবারে দেখা করে আসব।

সত্য লক্ষ্য করলে—মাধুরীর গলার স্বরে ভারী একটা মিষ্ট করুণ স্নেহের ছোঁয়াচ। সে কোন কথা বললে না।

বিনয়ের দিকে ফিরে মাধুরী বললে—আচ্ছা, একবার ওঁদের দেশে গেলে হয় না?

—যাওয়ার পথে ত কোনো বাধা দেখি না। বিনয় দেখলে সত্যর মুখ যেন কেমন ম্লান হ'য়ে উঠল।

মাধুরী বললে—তবে চল না একদিন! বিনয় তার কথা শেষ হবার আগেই বললে—ব্যস্ত হবার কি আছে এতে। ধীরে সুস্থে না হয় একটা দিন স্থির করা যাবে। তাছাড়া যার বাড়ীতে যাবে তার মতামত ত একটা নেওয়া চাই! কি বল সত্য?

—আপনার সইয়ের খোঁজ নিতে যাবেন আপনি, তাতে আর আমার অমত কি? তবে তার আগে পথের খোঁজ নেওয়া দরকার। সে পথে একদিন গেলে আপনাদের কলকাতার লোকেদের তিন দিন যাবে পথের শ্রান্তি কাটাতে।

এইবার পল্লীগ্রাম ও কলকাতার বাসিন্দাদের চিরন্তনী বিবাদ চলল—কারা বেশী কষ্টসহিষ্ণু ইত্যাদি। হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে চিত্তের সমস্ত কালিমা মুছে গেল।

সত্য এই কথাটাই ভাবছিল—এ তার কী দুর্ব্বলতা? মনের এই অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখে সে ভাবে—মানুষ কি চায় অলক্ষ্যের পিছনে ছোটা, না, নিশ্চিন্ত নিরালায় আনন্দ উপভোগ!

একবার সে বিনয়ের কথা ভাবে—কেমন শান্ত সুশৃঙ্খল জীবন সে যাপন করে; আবার নিজের কথা ভাবে—স্নেহ-মমতায় ঘেরা নিরালা গৃহকোণ তার অসহ্য বোধ হয়।

দিন এগিয়ে চলে।

রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়ে বই কমে না। তারি মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে। উপায় কি?

চাকরী পাওয়া গেল,—বিনয়ের চেষ্টায় এবং নিজের ইচ্ছায়ও বটে।

যে ঘোড়া 'রেসে' ছোটে, তাকে দিয়ে কি গাড়ী টানান যায়? পশুরাজ্যের এ তত্ত্ব মানুষের রাজ্যে খাটে কি?

—সত্য নিয়মিত আপিসে যায়, কাজ করে; অবশেষে এক দিন কাজের অভাবে আপিসই বন্ধ হ'য়ে গেল!

সত্য ভাবলে—যাক্, মুক্তি পেলাম! কিন্তু কোথা থেকে!

দেশ থেকে চিঠি এসেছে, সত্যর একটী ছেলে হয়েছে। ঘরে খরচের একটী পয়সা নেই।

সত্যর মনে হ'ল—দারিদ্র্যের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে জন্মেছে, অর্থের অভাবে কোনো দিন তার মৃত্যু হবে না।

ধার করবার জন্তে এখনই ছুটতে পারি না।

কিন্তু বসে থাকা আর হ'ল না। মরুদ্বীপ ছেড়ে বেদুঈন ছোটে সাহারার বুকে বালি উড়িয়ে।

সত্য টাকা সংগ্রহ করতে বার হয়ে পড়ল।

মরণ-বেলার উপকূলে

শ্রীহরিধন মিত্র

অই যেখানে সাদায় নীলে খেয়ে গেছে মিশ,
নৃত্য-চপল ঢেউয়ের খেলা চলে অহর্নিশ ;
অই যেখানে ধোঁয়ার মত দেখছো যে গাছপালা,
চারদিকেতে কিসের যেন রঙীন্ আলো জ্বালা :—
আমার প্রাণের লক্ষ্য উহাই, উহাই সে যে চায় ;
অনেক-কিছু জড়িয়ে আছে হোথার বালুকায় !

আমি কি ভাই হেথায় ছিনু চিরদিনের তরে,
অইখানে যে আমার গৃহ আজকে খাঁ খাঁ করে ;
প্রিয়ার সাথে ছিলাম হোথা বড্ডো মনের সুখে—
একদিন তার হঠাৎ কেমন মন পড়্লো ঝুঁকে,
বল্লে সে,—তার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এই দেশ—
"চল না-গো,—অই দেশেতে আস্‌বো ঘুরে বেশ !"

প্রিয়ার সাথে, খেয়াল মনে চলে এলাম হেথা ;
সে যাত্রা যে নয় কো শুভ—জান্‌তো ওগো কে তা !
হেথায় এসে কোন্‌খানে সে হারিয়ে গেল প্রিয়া,
আর কিছুতে পেলাম না ক—খুঁজে, জীবন দিয়া।

কত কাঁদোন কেঁদেছি যে সারা জীবন ভ'রে,
যাবার দিনে সে সব যে আজ যাচ্ছে মনে প'ড়ে !

তোমরা আজি চোখের জল ফেল্‌বে কেন ভাই ?
এ যে আমার সুখেরই দিন, দুঃখ কিছু নাই।
তাহার চেয়ে তোমরা সবাই এই কামনা কর,—
আবার যেন তাকে পাই— এই বিদায়ের পর।
জানি, আমার প্রাণের প্রিয়া অইখানেতে গেছে ;
প্রাণ জুড়াবে হোথায় গেলে—মরেই যাবো বেঁচে !

এই যে আমার চোখে মুখে ছড়িয়ে আসে কালো,
প্রাণে তবু উজল হ'য়ে জ্বল্‌চে কিসের আলো ;
পাচ্ছি যেন কাহার আভাষ এই মরণের কুলে,
পুলকেতে প্রাণটা আমার উঠ্‌চে দুলে দুলে ;
একটু তবু রইলো ব্যথা—কোন উপায় নাই ;
ক্ষমা কোরো—যাবার সময় কাঁদিয়ে গেলুম ভাই !



রাখাল



কৌতূহল

শিল্পী— শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

বিজয়িনী

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

অন্দর ও বাহিরের মাঝে ছোট উঠান; তাহা ছাড়াইতে পারিলেই গলার আওয়াজ কাণে আসে। শুনিতেও পাই অনেক কথা। হাসি পায়, দুঃখও হয়। শুনিবার ইচ্ছা বড় নাই; তবু অলস সময়টুকু কাটাইবার জন্য কাণ পাতিয়া বসিয়া থাকি সারা দিন। কাহারও দুর্ব্বলতাটুকু উপভোগ করিতে বেশ লাগে।

চাকরের নাম সুন্দর, দাসীর নাম জানি না; জানিবার ইচ্ছা হয় ত হয় নাই। দুজনের মধ্যে বনিবনাও বড় নাই; হয় ত একদিন ছিল। আদায় আর কাঁচকলায় বৈরীভাবটুকু যে কোথায়, ভাবিবার চেষ্টা করি।

ঠিক দাসী বলা যায় না; হয় ত আমারই ভুল—চাকরটার কথা বিশ্বাস করি কেন? মেয়েটি ঘরও ঝাড়ু দেয় না, বাসনও মাজে না; গৃহিণীর মত দেখাশোনা করিয়া বেড়ায়, আর সর্ব্বদা পরিপাটি হইয়া থাকে। দেখিতেও চমৎকার। দাসী বলিলে রাগ হয়,—আমারও। সুন্দর রাগিয়া নালিশ করে—ঝিয়ের এত কথা সহ্য হয় না মাষ্টার মশাই।

ভাবি—ঝি আবার কে? বেশী জোরে বলে না, তবু দাসী ঠাকরুণ সব শুনিতে পায়। ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া বলে—ঝি কি বলেচে শুনি? সকাল বেলাই যে থানা-পুলিশ সুরু কর্‌লে। না হয় বলিচি—মাষ্টার মশাই হয় ত এতক্ষণ উঠেছেন সুন্দর,—মুখ হাত ধোবার জলটা দিয়ে ঘরটা একবার ঝেঁটিয়ে দাও গে,—বাসন কখানা আমিই না হয় মেজে দিচ্চি। তা ত শুনবে না—তিনখানা থালা তিনঘণ্টা ধরেই মাজবে, আবার বল্‌লে রাগ, নালিশ...। বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া হাসে। এবং ঝাড়ু লইয়া নিজেই সব ঝাড়িতে সুরু করে।

বচসা এইখানেই শেষ হইতে চায় না। কাজে কথায়, কারণে অকারণে এর জের চলিতে থাকে সারা দিন। করিবার বিশেষ কিছুই নাই; তাই, এই দুইটি প্রাণীর অনুক্ষণ অন্তরের সংঘর্ষ যে খুব মন্দ লাগে তা নয়; বরং ইহার মধ্যে অনেকখানি আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি অনুভব করি। নিজের অস্তিত্বটুকু এক অভিনব সুরে হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিতে থাকে।

সুন্দর আমায় ভালবাসে। তাই আমার প্রতি তাহার অবহেলার খোঁটা তাহার সহ্য হওয়া অসম্ভব। দাসী ঠাকরুণের অনুরোধের বহুপূর্ব্বেই যে সে আমার পরিচর্য্যা করিয়া বসিয়া থাকে, এইটুকু প্রকাশের বাজেখরচ তাহার সেবার আনন্দ, গর্ব্ব ও সার্থকতা নষ্ট করিয়া দেয়। তাই সেদিন যখন মেয়েটি তাহার পরিচর্য্যার উপর পরিচর্য্যা করিয়া যত্নের পরিহাসটুকু করিয়া গেল, সুন্দর ত হাসিয়া অস্থির। আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। কেন এ দুর্ব্বলতা?

জানি, সুন্দর আমার ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখে। কোথায় কোনটি রাখিলে—বইগুলি বড়র উপর ছোট, না ছোটর উপর বড়—কিরূপ ভাবে সাজাইলে দেখিতে সুসভ্য হয়, এ বিষয়েও হয় ত তার দৃষ্টি-শক্তি আছে; কিন্তু আমি যে ফুল ভালবাসি, সন্ধ্যার ধূপধুনার সৌরভ না পাইলে যে সে-রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় না, এতবড় অযাচিত অন্তর্দৃষ্টি সত্যই যে ঐ নিরক্ষর প্রাণীটির মধ্যে থাকিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করিতে বাধে। কিন্তু এই ঘরের প্রতিটি সৌন্দর্য্যের সমাবেশে কোথায় যেন দুইটি সুচারু হস্তের পরশ এখনও লাগিয়া রহিয়াছে,—এ অনুভূতির অনিশ্চয়তার মধ্যেও যে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় এ কথা স্বীকার করিতে বাধে না।

গাছে সেদিন ফুল ফোটে নাই। তবু প্রকৃতির এই উদাসীনতার উপরও যাহার প্রয়োজন হইয়া উঠে, সে যে পুরুষ নয়, নারী—এ কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বচসা সেদিন ফুল লইয়াই চলিতেছিল। সুন্দর বলিতেছিল—গাছে আজ ফুল নেই তা কি করব।

—একবার এগিয়ে গিয়েও কি দেখেছ—মধু মালীর দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে কি না।

দোকান ওঠে নাই সত্য; কিন্তু সুন্দর দোকানে যায় নাই। প্রকৃতির কৃপণতাকেও যাহার প্রয়োজনের তাগিদ মানিতে চায় না, তার কাছে সুন্দরের সেবার সার্থকতা ও গর্ব্ব যে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে অনেক দিন, এ কথা আজ সুন্দরের কাছে যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন কেবল যে জিদের মাথায়ই সে ফুল আনিল না, এ কথা যতবড় সত্যই হোক্, একটা বৃহত্তর সত্য যে ধরা পড়িয়া গেল, তাহা উপলব্ধি করিয়া এই কথাটাই তখন মনে পড়িতেছিল—হে নারি, বৃথাই গেল তোমার ফুলের প্রয়োজন! মিথ্যা তোমার রূপের স্পর্দ্ধা! তোমার হাসির গুলাবী ছুরি, কটাক্ষের অগ্নিবাণ এ পাষাণ বুকে কোন দাগই রাখিয়া যাইবে না। তুমি একজন দাসী, এ কথা ভুলিও না, নারি!

বিবাহ করিব না এই ভান করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। মায়ের অশ্রুজলের দাম দিই নাই; একটা সামান্য গৃহশিক্ষকের হীনতা স্বীকার করিতে বাধে নাই একদিন। আর আমার সেই বংশমর্য্যাদা, পুরুষত্বের দম্ভ নারীর কেবল দুটা চোখের আগুনে কি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে! স্পর্দ্ধা দেখিয়া হাসি পায়, নারি!

নারী সম্বন্ধে বড় বেশী বিস্ময় ও আগ্রহ আমার নাই। বন্ধুরা আমাকে বেরসিক পাষাণ বলিয়া উপহাস করে। কিরূপ হইলে নারীকে ভাল লাগে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বিশেষ ইচ্ছাও হয় নাই কোন দিন। বন্ধু সুকুমার ছেলে-বেলায় কবিতা লিখিত; কিন্তু বিয়ে করিয়া সে বদভ্যাস ছাড়িয়াছে। এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন হাসিয়াছিলাম। মনে পড়ে, সে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিল—ভাই, নারীর আসল পরিচয়টুকু কখনও পাবার সুযোগ পাওনি বলেই তাকে এত সস্তা ভাবতে পার। বাইরে থেকে তাকে যাচাই করে দেখ্‌তে গেলে পদে পদে ঠক্‌তেই হয়; কিন্তু নারী যেখানে রহস্যময়ী, যেখানে তার অশ্রু হাসি হয়ে বেরয়, যেখানে সে ব্যথা উপেক্ষা মাথায় করে রত্নের মত চিরজীবন ঘরে বয়ে বেড়ায়, সেখানে তোমার পরিচয় কতটুকু সময়? নারীকে চিন্‌তে হলে তাকে শ্রদ্ধা করতে হয়, এ কথা ভুল না ভাই···! উত্তরে শুধু একটু হাসিয়াছিলাম সেদিন।

সেদিনও এই কথা ভাবিয়া হাসি পাইতেছিল—হায় নারি, আজও তেমনি নির্ম্মমই ত রহিয়া গেলাম। আমার দম্ভের হিমালয় ত তেমনি মাথা উঁচাইয়াই টিঁকিয়া গেল—অশ্রু-নদীর দুর্ম্মদ প্রবাহে তাহাকে গুঁড়া করিবে কবে?

কিন্তু ভাঙিয়া দিয়া গেছে আজ।···তাহার দুটি ছোট কথার আঘাতে আমার দম্ভের মিথ্যা পক্কা কেল্লা যে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এ সত্য লুকাইব কোথায়? হে রহস্যময়ি, তোমায় নমস্কার! হে বিজয়িনি, আজ পরাজয় স্বীকার করিলাম।

সুকুমারকে শুধু লিখিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর ভাই। কিন্তু সে হয় ত বুঝিবে না, আজ তার এই পলাতক বন্ধুর ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া কেন! কেন, আমিও হয় ত জানিনে।

সুন্দর আমায় ছাড়িতে চায় না। তার সেবার অত্যাচারে আমি প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। কিছুতেই তাহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারি না যে, বাড়ীতে আমার কখনও দশ-বিশটা চাকর ছিল না। বড়মানুষের গৃহশিক্ষককেও যে বড়মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে, এ অনুমান একান্ত ক্ষতিকর। তবু সে শুনে না। গা হাত পা ডলিয়া দিবে, এমন কি বাতাস পর্য্যন্ত করিবে। ভাবি, মিথ্যা হিংসা করিস্‌, সুন্দর, এ বধির কাণে তাহার চুড়ির 'রুণুঝুনু' পৌঁছায় না।

রাত্রে পাশে বসিয়া সে অনর্গল বকিয়া মরে। এ বাড়ীর কথা, তাহার দেশের কথা এবং নিজের কথা। মনে হয়, সব বাজে। ভাবি, তার নামটা জানা না থাকায় এত অসুবিধাই হয়। তেরো-চৌদ্দবার সে এদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। ছোট দুটা কথা কহিয়াছে কি কহে নাই; মৃদু হাসিয়াছে কি হাসে নাই; কিন্তু উত্তরে কি ছাই একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে নাই? ডিটেক্‌টিভের অব্যর্থ সন্ধানে ডাকাতটা কি ঠিক তখনই মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিল! আরও একবার ত আসিবেই সে, তখন দেখাইয়া দিব আমি লাজুক নই। কিন্তু সমস্যা এই যে, কি বলিয়া ডাকি। সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করে; তাই ঘুরাইয়া বলিলাম—হ্যাঁ রে, এ বাড়ীতে কে কে থাকেন? চাকর, বামুন, ঐ মেয়েটি, আর খোকাবাবু—এ-ছাড়া আর কাউকেই ত দেখ্‌লুম না। কর্ত্তা থাকেন কোথায়? গিন্নীমা?

উত্তরে সুন্দর অনর্গল বকিয়া মরে।—কর্ত্তাবাবুর ঐ কেমন দোষ মাষ্টার মশাই। সব ভাল,—ও-রকম মেজাজ বড়

দেখা যায় না; কিন্তু ঐ যে বোতল আর ইয়ার-বকসি নে' বাহিরে বাহিরে থাকেন, বাড়ীতে আর মাথা গলান না! এখন মধুপুরে না কোথায় আছেন। কিন্তু যখন বাড়ীতে আসেন, একেবারে অন্য মানুষ। জপ., তপ, দান, ধ্যান—যেন স্বয়ং মহাদেব। আর ঐ যে বামুন আমাদের রাঁধে,—বেটা ভয়ানক নেশাখোর। পৈতা দেখিয়ে বেটা কত যে কামিয়ে নেয়—বাবুর নন্দী-ভৃঙ্গি যেন ঐ···।

বামুনটাকে নেশাখোর বলিয়াই বোধ হয়; সুতরাং সে যে কর্ত্তার প্রিয় হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বেশী কথা কয় না; চোখ বুজিয়া, মুড়ি-শুড়ি দিয়া যাতায়াত করে; এবং সুযোগ পাইলেই ঘুমাইয়া পড়িতে দুমিনিটও তর লাগে না। সময়ে-অসময়ে পাশের ঘর হইতে নাসিকা-ধ্বনি শুনিতে পাই।

লোকটার আরও অনেক গুণ আছে। রাঁধে বটে, কিন্তু তাহার ধারণা – মালমশলা জলে ফেলিয়া ফুটাইয়া লইলেই বুঝি খাদ্য হইয়া উঠিবে। এই লইয়া দুবেলা মেয়েটি তাহাকে সদর দরজা দেখাইয়া দেয় এবং রাগিয়া নিজেই রাঁধিতে বসে; কিন্তু বামুন মুখ বা চোখ খুলিয়া নেশা নষ্ট করিবার পক্ষপাতী নয়। সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছে, মেয়েটিই এই বাড়ীর গৃহিণী। আমার সহিত যখনই দেখা হয়, তখনই তার 'প্রাতঃপ্রণাম' করিতে ইচ্ছা হয়। বোধ করি তাহার একটা কারণও আছে। ধার করা ও ধার লইয়া শোধ দিতে ভুলিয়া যাওয়া লোকটার একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অনেক টাকা তাহাকে ধার দিয়াছি; কিন্তু আমি জানি—তাহা দান করিয়াছি।

এমনি ভাবে সুন্দর অনেক গল্পই করিয়া যায়। অন্দর-মহলের উপরের সবচেয়ে শেষের ঘরটা দেখাইয়া বলে—ওটা গিন্নীমার ঘর।

যখন কাছে কেহ থাকে না, তখন প্রায়ই ঐ ঘরটার দিকে চাহিয়া থাকি। স্বামী একজন চরিত্রহীন মাতাল; আর স্ত্রী এত বড় বাড়ীর ছোট একটা ঘরে দিনের পর দিন কাসিয়া চলিয়াছেন—খক্ খক্ খক্। ঘরের তিনটে জানালা পাশাপাশি প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটা জানালার কয়েকটা ঝিলিমিলি খুলিবার শব্দ হয় ত কখনও শুনিতে পাই। হয় ত তখন উঠানে মুখ ধুইতেছি;—খড়খড়ির দিকে চাহিয়া কিছু আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। দেখি, দুটা বড় বড় দীপ্ত চোখ, চুড়ি-সমেত শীর্ণ দুটি হাত, আর সুশুভ্র কপালের খানিকটা। খড়খড়িগুলা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।

ইহারই রুগ্ন আট-নয় বৎসর বয়সের ছেলেটিকে পড়াই। ছেলেটিও যেন বাতাসের ভর সহিতে পারে না,—প্রায়ই অসুখে ভোগে। ছেলেটি অতি সুকুমার,—মায়েরই মত এ জগতের নয়। আব্দার করিয়া বলে—মাষ্টার মশাই, আমি বল খেল্‌ব।

বলি—খেল। কিন্তু তাহার বুকটা চাপিয়া ধরি, যদি পড়িয়া যায়।

ছেলেটি আসিয়া বলে—মা বই চাইলেন মাষ্টার মশাই, পড়বেন, দিন। বই দিই; কিন্তু পড়া হইয়া গেলে খুলিয়া দেখি, গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে আমার নাম লেখা। বই-এ নাম লেখা আমার অভ্যাস নয়, বোধ হয় তাই!···আশ্চর্য্য,—আমার নাম জানিলেন কি করিয়া?

শয্যায় শুইয়া শুইয়া এই-সব কথাই ভাবিতে থাকি। ভাবি—রহস্যময়ী কে? এ, না, ও? সুকুমার একবার বুঝাইয়া দিয়া যাও। এবার কিন্তু চেষ্টা করিয়াও হাসি আসে না।

সুন্দর চুলের মধ্যে হাত পুরিয়া দিতে দিতে বলে, মাষ্টার মশাই ঘুমুলেন?

—না।

—তবে কথা কইচেন না যে? তাহার অভিমান হয়। কি কথা বলিব তাই ভাবি। এমনি জিজ্ঞাসা করি—সুন্দর, তোর দেশে কে আছে,—বে' করেচিস?

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সুন্দর বলে—না—কেউ নেই।

অবাক হইয়া বলি—সে কি?, তবে টাকা পাঠাস কার জন্যে?

হঠাৎ সুন্দর অত্যধিক প্রফুল্ল হইয়া বলে—টগরকে পাঠাই।

—টগর কে?

—এই পাঁচু যেমন আপনাকে ফুল দেয়, সেও আমাকে দিত। বলিয়া হাসে।

নিজে নিজেই বলে;—জিজ্ঞাসা করি না কিন্তু। তবু চমকাইয়া উঠি। সুন্দরের চোখেও তাহা হইলে সব ধরা পড়িয়াছে। ফুল যে শুধু ঘরের বাহারের জন্য, এ কথা সুন্দরও বিশ্বাস করিতে চায় না। কি বিশ্রী! পাঁচু? কি কার্য্য

নাম! হাজার হোক ঝি তো বটে। কি স্পর্দ্ধা এই নারীর! শেষে চাকরের কাছেও আমার সম্মান রহিল না। আজই গর্ব্বিতাকে জানাইয়া দিব, ফুল যেন সে আমার ঘরে আর না দেয়। বলিব, পূর্ব্বে তো চাকর-বামুনদের উপহার দিবার চেষ্টা করিও,—নারি! কিন্তু ঐ কদর্য্য নামে তাহাকে ডাকিব কেমন করিয়া?

সুন্দর আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলে, বাবু কিন্তু ঝিকে পাঁচু বলে ডাকেন না, কামিনী বলেন। আপনিও তাই বলে ডাক্‌বেন। টগরকে আমি ত খেঁদি বলে ডাক্‌তেই পারিনে।

কিন্তু একটু পরে শুষ্কস্বরে ধীরে ধীরে সুন্দর বলে—আপনি বাবু; আর ও ঝি,—ওর ফুল আপনি নেন কেন মাষ্টার মশাই? লোকটা সরল; তবু তার ছেলেমানুষীতে রাগ হয়। ক্ষেপেছে নাকি? কথাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলি—টগরকে বে' করিস নি কেন?

মেয়েটি কখন যে দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতেছিল, জানিতেও পারি নাই। ছিঃ ছিঃ! হয় ত অনেক কথাই শুনিয়া থাকিবে। কড়িকাঠে একটা টিকটিকি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহাই দেখি। খানিক আগে যে কড়া কথা তাহাকে শুনাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তা' বলিব কবে! পাঁচু হাসিয়া কহিল—মাষ্টার মশাই, আপনি যেমন গুরু, আপনার চেলাটিও তেমনি। সারাসন্ধ্যে কি যে বক্ বক্ করেন,—রাতে কি খাবেন না ঠিক করেছেন? আর ঐ যে টগরের কথা বাঙালটা বড়াই করে সকলকে জানিয়ে বেড়ায়, তিনি কেমন জানেন? উনি এখানে টগর টগর করে প্রাণ বার করেন, আর তিনি সেখানে আর একজনকে বিয়ে করেছেন। আবার হ্যানো পাঠাও, ত্যানো পাঠাও। সাধে কি বলি, ঢাকার বাঙাল। বলিয়া পাঁচু ভয়ানক হাসে।

টগরের সম্বন্ধে কোন আঘাতই ছোঁড়াটা সহ্য করিতে পারে না। হোক্ সে পরস্ত্রী, তবু আজও সে তার জন্য প্রাণ বাহির করিয়া ফেলে। আজ বুঝিলাম, তার বাক্সে থরে থরে কেন এসেন্স সাবান চিরুণী প্রভৃতি সাজানো থাকে। সুন্দর একদিকে যেমন সরল, তেমনি চটিলে যা তা বলিয়া ফেলে। রাগিয়া বলিল—তুমি পয়সা খরচ করে ফুল কেন না? দুকুরে লুকিয়ে কাপড় কুঁচিয়ে রাখ না? তার বেলায় কি?

মেয়েটি হাসিয়া বলে—বাঁদর কি আর লেজ থাকলেই হয়? হেঁ, বাঁদর বই কি। দেখ্‌লেন ত মাষ্টার মশাই শুধুমুধু ঝগড়া।

দুজনের 'খুনসুটি'র এই হাল্কা হাওয়া উপভোগ করিবার জিনিষ; কিন্তু মাথাটা তুলিতে পারি না। চুপ করিয়া থাকাও আর চলে না। চাকরটা যা নয় তাই সুরু করিয়াছে—আমাকে কি এতই দুর্ব্বল ভাবিয়াছে এরা? চোখ তুলিয়া কোন রকমে বলিয়া গেলাম—কামিনী, আমার ঘরে আর ফুলটুল দিও না বাপু।

ছিঃ ছিঃ! এই কি আঘাত দিবার গর্ব্বিত ভাষা! নিজেই যে নিজেকে এমন করিয়া অপমান করিব, ভাবি নাই। উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলাম—মাথাটা বড় ধরেছে, আজ আর খাব না, ঠাকুরকে বলে দিস সুন্দর।

কামিনী তেমনি হাসিয়া কহিল—ও নাম কোত্থেকে শুন্‌লেন মাষ্টার মশাই! বাঁদরটা বলেছে বুঝি? না মাষ্টার মশাই? পাঁচু বলেই আমাকে ডাক্‌বেন, বড্ড লজ্জা করে। বসে আছ কেন সুন্দর! একটা জলপটি দিয়ে দাও না কপালে—বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে তোমার? মাথাটা ছেড়ে গেলেই খাবেন, কেমন? ও কিছু নয়। আপনার খাবারটা এইখানেই আমি রেখে যাচ্ছি।

বলিয়া বোধ করি হাসিতে হাসিতেই কামিনী চলিয়া গেল। ভাবিতেছিলাম, লজ্জার আর শেষ রইল কোথায়? বোধ করি দুফোঁটা অশ্রুও বাহির হইয়া আসিল। সুন্দর আমার চোখের দিকে চাহিয়া কহিল—দেখ্‌লেন ত মাষ্টার মশাই, আপনারই মুখের ওপর কথা কয়—তা আমরা কোথাকার কে।

তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কর্ত্তাবাবুই ত ওকে এখানে এনে রেখেচেন; তাই ত ওর অত তেজ। আপনি ওকে খুব ধমকে দেবেন।

লোকটা যে একটা পাগল, এইবার তাহা টের পাইলাম। তাহার অনেক দুষ্টামি সহ্য করিয়াছি; আর সহ্য হইল না। উঠিয়া খুব ঘা-কতক বসাইয়া দিলাম—এ-সব কথা কি তোর কাছে শুন্‌তে চেয়েচি আমি?...রাস্কেল, ন্যাকামি পেয়েছ?

সেদিনকার পালা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। লজ্জা করিতেছিল—কেন মারিলাম? কিন্তু কাহারও নামে যা তা

বলা কি সহ্য করা উচিত? মাথা ধরে নাই সত্য, কিন্তু খাইবার ইচ্ছাও ছিল না। সে রাতে অভিমান করিয়া সুন্দর বামুনের ঘরে শুইল। আর আমি ভাবিতে লাগিলাম, ও-কথা যদি সত্যই হয়, ত কি আমার এমন ক্ষতি হইল?

* * * *

কাল্‌কের ব্যাপারের পর আজ ভোরে উঠিয়াই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সত্যই গৃহশিক্ষক হইয়া ত আর চিরকাল চলিবে না। একটা চাক্‌রির সন্ধান করিতেই হইবে; কলিকাতায় ত ঐ জন্যই আসা। আশ্চর্য্য, এমন অলসভাবে দিনগুলা কাটিয়া গেল, অথচ চাকরির কথা মনেও আসে নাই একদিনও! একটা পুরুষ-মানুষ ঘরের কোণে দুটা ফুল শুঁকিয়া, ঘুমাইয়া, বসিয়া, চাকরের সহিত গল্প করিয়া এমন দিনের পর দিন যে নির্ব্বিবাদে কাটাইয়া দিতে পারে, এ কথা কেহ শুনিলে, বলিবে কি! নিজেরই মাথা কাটা যাইতেছিল!

সুন্দর আসিয়া বলিল,—এখনও চুপ করে বসে আছেন মাষ্টার মশাই, নাওয়া খাওয়া কর্‌বেন না?

সরল লোকটার মনেও কিছু থাকে না। কবে যে কিছু হইয়াছে, তাহাকে দেখিলে বুঝা যায় না। এমন সদাহাস্যময় সে, তাই তাহাকে বড় ভাল লাগে। বলিলাম—দ্যাখ, কাল থেকে কিন্তু দশটার মধ্যেই আমার ভাত চাই। বামুনটা পার্‌বে ত? একটু কাজ পড়েছে, রোজ বেরুতে হবে।

সে কোন কথা কহিল না। বুঝিলাম, মনটা তাহার ভারি হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিনের সঙ্গসুখের মোহটুকু যে কি, হয় ত আমিও তাহা বুঝি; কিন্তু তবু··· পলাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাই।

পাঁচু এদিকে বড় আসে না, তবু দশটায় ভাত পাই। শুনি, বামুনকে রাঁধিতে আর হয় না। যখন খাইতে বসে, একেবারে সে ঘুম থেকে উঠিয়া প্রাতঃপ্রণাম জানায়। অত সকালেও খাদ্যের সে বহর দেখিয়া বুঝাই যায় পাঁচুই রাঁধে। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আমি বামুনের ছেলে, ঝিয়ের হাতে যে খাইতে নাই, এ কথা জানাইয়া দিব নাকি?

সেদিন পাঁচু কথা কহিল—দেখুন, মাষ্টার মশাই, এত খাটাচ্ছেন; কিন্তু পূজোয় ভাল বক্‌শিশ দিতে হবে।

চমকাইবার কথা নয়, তবু চম্‌কাইয়া উঠিলাম। কিছুই উত্তর দিই নাই। কিন্তু বলা উচিত ছিল—কেই বা তোমায় খাটিতে বলিয়াছে! আচ্ছা কি চাও, কাপড় না টাকা।

পাঁচু মুচকাইয়া হাসে। তাড়াতাড়ি সরিয়া পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে; কিন্তু সে জোর করিয়া খাওয়ায়; বলে—ঝি-চাকরের কাছে লজ্জা কর্‌লে মাষ্টার মশাই, দুর্গতির আর আপনার শেষ থাক্‌বে না। মা বিশেষ করে আপনার যত্ন নিতে বলেন; কিন্তু আপনি যা লাজুক। এত যে রাঁধলুম, একটু ত চেকেও দেখবেন সব।

লজ্জা করিতেছি না দেখাইতে গিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া রাস্তায় বমি করিতে হয়; কিন্তু শেষে চিনাবাদাম ও 'গুলাবী গাণ্ডারী' খাইয়া দিনটা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করি। কোথায় বা যাইব? তবু সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা চলিবে না। কোন আপিসেই বিশেষ চেনা-শুনা নাই; তাই বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কোন পার্কে জাগিয়া, ঘুমাইয়া সময় কাটে। সেদিন হঠাৎ এক পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল—কলেজে একসঙ্গে পড়িতাম।

—একটা চাকরি বাক্‌রি জোগাড় করে দাও ভাই। ৩০।৪০ টাকা যা হয়—আর পারি না।

—বেশ, সাহেবের কাছে চল; বোধ হয় একটা কাজ খালি আছে বলে যেন শুনেছি। এত শীঘ্র সুরাহা হইবে আশা করি নাই; বলিলাম—আজ থাক্, কাল আস্‌বখন।

বন্ধু অবাক্ হইয়া বলিল—সে কি! এসব বিষয়ে আজকাল কর্‌তে নেই। বলিলাম—শরীরটা ভাল নেই, ভাই।

শুনিল না—ধরিয়া লইয়া গেল সাহেবের কাছে,—যেন তাহারই দায়। সাহেব বেশ ব্যাংলা বলে। বলিল—কোঠাও আগে কাম করিয়াছ? বলিলাম—করিনি বটে কিন্তু বি-এ পাশ করেছি 'মিষ্টার'। এবার সাহেব ইংরাজীতে কহিল—বেশ, ৫০ টাকা মাইনে এবং দশটাকা করিয়া বছরে বাড়িবে। কাল হইতেই হাজির হইতে হইবে কিন্তু।

তথাস্তু। কিন্তু এখন সাহেবের ইংরাজী স্রোত আর বন্ধুর বন্ধনী হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বাঁচি। পরদিন বাহির হইবার সময় জানাইয়া দিলাম—শরীরটা বড় খারাপ সুন্দর, আজ বেরুব না, বলে দিস। কিন্তু তার পর দিনও যখন শরীরটা খারাপ বোধ হইতে লাগিল,—সুন্দর আনন্দ প্রকাশ করিলেও—পাঁচু চিন্তিত হইয়া বলিল—ঠিক এই সময়েই

অসুখ করে, এ ত সুবিধের নয় মাষ্টার মশাই। ডাক্তার টাক্তারকে একবার দেখান। বলিয়া হাসে।

—মিথ্যে বল্‌চি কি, যাই না যাই তোমার এত মাথা ব্যথা কেন বল দিকি। ঝিয়ের··।

পাঁচু চলিয়া গেল। ভাবিলাম, দাম্ভিকাকে একটা কথার মত কথা বলিয়াছি আজ। ভাবিয়াছে কি? কিন্তু মুখের হাসিটা তার মিলাইল না কেন? আও কত কটু করিয়া বলিলে তাহাকে বেশ লাগে, তাহাই ভাবিতে-ছিলাম। কিন্তু না বলিলে চলিত না কি? আঘাত দিতে গিয়া কোথায় যেন হারিয়া বসিয়া আছি।

ফুলদানীটা কদিন খালিই পড়িয়া ছিল। হাসিতাম,—আহা, কত যত্নেই না সাজাইত। এই টুকুতেই এত আঘাত পাইলে নারী! কিন্তু আজ দুপুরে আমার চোখেরই সামনে পাঁচু ফুল সাজাইয়া কহিল—ফুল পছন্দ করেন না, অতি অদ্ভুত। এখন ঘরটা কেমন মানিয়েছে দেখুন দিকি।

এমন করিয়া হারাইয়া দিয়া যায়। পারিয়া উঠি না।···

বিকারের সহিত সুন্দরের সেদিন জ্বর আসিয়াছিল খুব। আহা, কত আমায় সে ভালবাসে। সমস্ত দিনটা বসিয়া তাহার সেবা করি। পাঁচুও রাত্রদিন যাওয়া-আসা করে; কিন্তু সুন্দর তাহাকে পছন্দ করে না। টগরের সম্বন্ধে সে নানারূপ ভুল বকে।—

টগরের স্বামী 'সেধো'কে এবার দেশে ফিরিয়া নিশ্চয়ই সে খুন করিবে। খাওয়াতে পরাতে পারে না, আবার মারধর! টগরের ছেলের নামও সুন্দর। কেমন হইয়াছে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। সেই যে দেশ ছাড়িয়াছে, আর ফেরে নাই।

টগরের কি দোষ? সংসারে একমাত্র দিদিমা ছিল তার আপন জন। সুন্দর আসিয়াছে কলকাতায় রোজগার করিতে; টগরকে সুখে রাখিবে এই তার বাসনা। কিন্তু ইতিমধ্যে বুড়ি মরিয়া গেল; আর পাড়ার যত হিতকামীগণ টগরকে মাতালটার হাতে তুলিয়া দিল। এবার দেশে গিয়া সব বেটা আপনার জনকে একবার দেখিয়া লইবে।···এমনি ধারা সুন্দর অসর্গল বকিয়া যাইতেছিল। পাঁচু বিছানায় বসিয়া বাতাস করিতেছিল। কাপড় দিয়া একবার সে চোখ দুটা মুছিয়া লইল,—চোখে কাঁকর পড়িয়াছে বোধ হয়।

ডাকিলাম—সুন্দর।

একটু চেতনা আসিল। চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া সুন্দর আমার দিকে ফিরিয়া কহিল—পাঁচু টগরের কথা শোনেনি ত মাষ্টার মশাই?

বলিলাম—না। জলপটি দিবার জন্য পাশের ঘরে পাঁচু ওডিকলোন আনিতে গিয়াছিল। বলিয়া গেল—উঠ্‌লে আমার নাম কর্‌বেন না যেন মাষ্টার মশাই, তাহলে আবার ভুল বক্‌বে। আমি শুধু বসিয়া তদারক করি; সেবা করে পাঁচু। কিন্তু সুন্দর জানে আমিই বুঝি তাহার সব করি; তাই আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। সুন্দর ঘুমাইয়া পড়ে; কিন্তু সে জানে না, কে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। পাঁচু কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করিতে চায় না। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া বলে—খেটে খেটে গেলুম বাবা, কি যে রোগ নিয়ে এলেন, প্রাণ গেল! এ বাধ্য হইয়া সেবা করার প্রয়োজন কি? দুটা যে চুলোচুলি করিয়া মরে—এখানেও কি তার জের চলিবে? ভাবিতে চেষ্টা করি, পাঁচু সুন্দরকে প্রাণ দিয়া সেবা করে না। যাহাকে ভাল লাগেনা তাহার প্রতি এ বুজরুকি কেন?

কাহাকে ঠকাইবে নারি! তোমার ঐ যে অনর্গল যাতায়াত, রোগীর শুশ্রূষা—ইহারই মিথ্যা ছদ্মবেশে তোমার দুর্ব্বলতাটুকু চাপা দিবার চেষ্টা করিও না। সুন্দর তোমাকে সহ্য করিবে না, তোমাকে এখানে আসিতে দিবে না, তাইত তোমার অস্তিত্বটুকু এমন করিয়া লুকাইতে চাও, এ সত্য ঢাকিবে কিসে? হাসিবার চেষ্টা করি, পারি না কিন্তু।···

সে রাত্রে পাঁচুকে বুক ঠুকিয়া বলিলাম—দেখ, রাতটা আমিই কাটিয়ে দেব'খন, তোমায় দরকার হবে না। তোমার দুর্ব্বলতার কোন দাম দিব না, নারি! বলিয়া ত বসিলাম। যদি সত্যই চলিয়া যায় ত হাঙ্গামার শেষ থাকিবে না। একটু উপেক্ষার মত করিয়া বলিলাম—খালি ঐ ওডিকলোনটা আর প্যানটা হাতের কাছে রেখে যেও, আর মধ্যে মধ্যে খাওয়াতে উঠো। বাতাসটা আমার হাত দিয়ে তত ভাল হয় না—এছাড়া আর কিছুই আট্‌কায় না, সবই নিজে করে নেব'খন। বলিয়াই তাহার মুখের দিকে চাহিলাম;—তাহাকে না হইলেও যে সেবা আমার চলে, এ কথা সে ভাল করিয়াই বুঝুক।

ভাল করিয়াই বুঝিল এবং হাসিয়া পাঁচু বলিল—বাস্,

তাহলেই নিশ্চিন্তে আমি ঘুমুতে পারব'খন। আপনি মেয়ে নন, সেটা ভুলছেন কেন মাষ্টার মশাই। পুরুষের দ্বারা সেবা হয় না।

একটু চুপ করিয়া তেমনি হাসিয়া পুনরায় বলিল—আর আপনি বল্লেই কি চলে যাব? আপনি শুতে যান, মাষ্টার মশাই, রাতে রুগীর কাছে থাকা আপনার চল্‌বেই না, যান।

এ অনুরোধ না আদেশ! আমার সেবার উপর কটাক্ষ করিলে বটে, কিন্তু আমারই শরীরের জন্য তোমার মাথা ব্যথার যে অন্ত নাই, এ কথা স্পষ্ট করিয়াই ত বলিতে পারিতে। একটা রাতের অনিদ্রায় কি এমন আমার দেহ অসুস্থ হইয়া উঠিত যে, তাহারই শঙ্কায় এমন সঙ্গসুখটুকুর মমতাও পরিত্যাগ করিতে পারিলে। তবু এ সব কথা ভাবিতে ভাল লাগে না।

সুন্দর সে-যাত্রা রক্ষা পাইয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল—পাঁচু বড় বিরক্ত হত না মাষ্টার মশাই?

বলিলাম—হ্যাঁ! কেউ বলুক দেখি—আমি মিথ্যা বলিয়াছি! না হয় একটা রাত জাগিয়া কাটাইয়াছে, না হয় সমস্ত দিন একবারও বসে নাই; তবু সে কি নিজে মুখেই অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই সেদিন?

শরীরটা সেদিন খারাপ হইয়াছিল। ভাবিতে ভাল লাগে। আমারও বুঝি সুন্দরের মত অসুখ করিবে; কিন্তু অসুখ করে না। তবে পাঁচু তেমনি ফুল দিয়া যায় রোজ। তেমনি করিয়া হাসে। আর সুন্দরের সহিত ঝগড়াও করে ঠিক তেমনি করিয়া। সে দিন আবার বচসা সুরু হইয়াছিল। পাঁচু বলিতেছিল—মাংস কে আন্‌তে বল্লে?

সুন্দর সোজা জবাব দেয়—কে আবার বল্‌বে? রোজ ত মাছ খান। মাষ্টার মশাই মাংস ভালবাসেন।

—তুমি সবজান্তা, আমি কি জানিনে তিনি কি ভালবাসেন না বাসেন। নিজের হাতে ইচ্ছে-মত ভাল করে একদিন খাওয়াব, না উনি সর্দ্দারী কচ্ছেন। আমার সব কাজে এমন করে তুমি বাধা দাও কেন, বল দিকি? দেখ্‌তে ভাল হবে বলে ঘরে ফুল রাখি, তুমি যা'তা' বল। মাংস আমি রাঁধি না জান, তবু এমনি করে আমায় আতান্তরে ফেল। তুমি চাইলেও কনের বৌটি হয়ে এ-বাড়ীতে থাকা ত চল্‌বে না আমার।

সুন্দরও রাগিয়া বলে—না পার, আমি নিজেই রাঁধব'খন। টগরকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পার, আর আমি পারি না? কেন, আমি কি মাষ্টার মশাইয়ের ঘর পরিষ্কার করি না, গুছাই না?

এমনি-ধারা ঝগড়া চলে। বড় মজা লাগে মাঝে মাঝে; কিন্তু কেহ শুনিলে বলিবে কি? সুন্দরের চাওয়া অচাওয়া যে পাঁচুর কাছে এত বড়, এ অসত্যের পরিহাসটুকুই উপভোগ করিয়া হাসি পায়। এত রহস্যই জান নারি! তুমি আমাকে যাহা দাও, তাহাতে সুন্দর ভ্রূক্ষেপও করে না; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা দিই, তাহাতেই তাহার লোভ ও হিংসা। কিই বা দিলাম তোমায়!

পূজার সময় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সুন্দর তাহার পুঁজি উজাড় করিয়া রঙ-বেরঙের পোষাক ও জিনিষপত্র লইয়া আসিয়া হাজির। কত আমোদ করিয়াই না সে আমায় সেগুলা দেখায়, বলে—টগরকে এসব বেশ মানাবে, না মাষ্টার মশাই? হাতির দাঁতের এ শাঁখা দুটো বেশ সস্তায় পাওয়া গেল। আর এটা তার খোকার জন্যে, কেমন হয়েছে বলুন ত? কিন্তু এসব পাঠাবার ভার এবার আপনাকেই নিতে হবে, শেষে মারাটারা যাবে।

পোষ্টাপিসে পার্শ্বেল বুক করিয়া আসিয়া মনে পড়িল, পূজার বাজারে আমারও কিছু খরচ আছে। মা ভাইদের জন্য কাপড় চোপড়, বৌদির জন্যে একখানি ভাল শাড়ি—এ ত আছেই, এ ছাড়া চাকর আছে বামুন আছে, পাঁচুকেও কিছু না দিলে চলিবে না—সে মুখ ফুটিয়াই চাহিয়াছিল। কত দিব—আট আনা? ধর্ম্মে এত আঘাত সইবে কিছুতেই, মোটাসোটা দেখিয়া একযোড়া কিনিয়া দিলে কেমন হয়?

বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সুন্দর পুঁটলি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু বড় গরম লাগিতেছে; এত ঘাম ঝরিতেছে কেন? সুন্দর বলিল—এ যে বেশ ভাল ভাল জিনিষ মাষ্টার মশাই। বলিলাম—পূজার সময় বাঙ্গালীদের কিছু খরচ আছে বই কি,—ছোট সব ভাই। ওহো! একটা কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। দেখি দেখি, ও কাপড়টা ত নয়, বৌদির জন্যে অন্য একটা কিনেছিলুম যে, এই দেখ।

—বাজে ত নয়। বেশ ভাল ঢাকাই যে!

—তা হোক্ বেশি দাম নয়; কি মুস্কিলেই পড়্‌লুম—এক কাজ কর্‌তে পার?

সুন্দর আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। বাঁদরটা খালি হাসে আজকাল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইতে গেলাম ;—দোকানে এখনই যেতে হবে রে ; নইলে ফেরৎ নেবে না।

আসিয়া দেখিলাম, পরিতে বলি নাই অথচ পরিয়াছে। বোকাটা যে সত্যই বোকা নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পাঁচু কাপড়খানা হাতে লইয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল—মাষ্টার মশাই, করেছেন কি ! এ যে ঢাকাই শাড়ী। বাবু আস্‌ছেন,—পরে বেরুব কি করে ? ঝি-চাকর আমরা—মোটাসোটা দেখে একখানা দিতে হয়।

—ওটা, ওটা ভুল হয়ে গেছে, ঐ হতচ্ছাড়া পাজীটা···

তেমনি হাসিয়া পাঁচু কহিল—ভুল করে এত টাকা খরচ করে ফেল্‌লেন ? তা'হোক বাবুর সামনে পরে বেরুব না, কেমন ?

সুন্দরকে তখন সামনে পাইলে মারিয়া ফেলতাম হয় ত। কে তাহাকে কাপড়টা পাঁচুকে দিতে বলিল ? ঝি আবদার করিয়া রাখিয়া দিল—ও কাড়িব কেমন করিয়া ? ইস, অত টাকা জলে গেল ! সুন্দরকে কিছুই বক্‌সিস দিলাম না। তাহার টাকাটাও ঠাকুরকে দিয়া দিলাম। বামুন লোক নেহাৎ মন্দ নয়, একটু নেশা করে এই যা। আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বামুন বলিল—মা, আপনাকে এইটে দিলেন বাবু। নিজেরই হাতে বোনা, বুঝলেন না। বলিয়া হাসিয়া ফেলিল। যাইবার সময় আর একবার প্রণাম করিয়া বলিল—চার আনা সঙ্গে আছে কি ? চোপর দিন নেশা কর্‌তে পাইনি, মাইরি পেট ফুল্‌ছে। একটু নির্লজ্জ, তবু সুন্দরের চেয়ে লোক ভাল। একটা আধুলি বাহিরে আসে।

হাতে বোনা একখানা রুমাল, তাহাতে আমার নামের হরফ। কি আর এমন ?—সব মেয়েতেই বুনিতে পারে। উপরে জানালার দিকে তাকাই,—দেখি, চোখ দুইটা আর কপালের আধখানা। জানলা এবার বন্ধ হয় না কিন্তু। চোখ দুটা আমারই নামিয়া আইসে।

এ জগতে অনেক কষ্ট পাইয়া গেলে, নারি ! তবু হাসি পায়। কাসির আওয়াজ থামে না। তার পর রুমালটা কোথায় যে গেল আর খুঁজিয়া পাইলাম না—যাক্ গে !

দুএকদিন পরে সুন্দর মুখখানা এতটুকু করিয়া জানাইল—কি হবে মাষ্টার মশাই, টগর যে লিখেচে শাঁখা দুটো সে পায় নি। সব চেয়ে ঐ দুটোই যে ভাল জিনিষ ছিল। বেচারা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে আর কি। আহা, অনেক কষ্টের উপহার।

—সে কিরে, ভাল করে প্যাক করেছিলি ত ?

—সেটা ত আপনিই কর্‌লেন মাষ্টার মশাই ?

তাই ত, পাঠাবার ভার আমিই লইয়াছিলাম ; কিন্তু শাঁখা দুটো পুরিয়াছিলাম কি না মনে পড়ে না ত। যাইবে কোথায় ? লইবেই বা কে ? বামুন ? জিনিষগুলা হাত-বাক্সে আগের দিন রাত্রে রাখিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু···। বলিলাম—এখন দাম দিচ্চি—আর একজোড়া কিনে নিগে যা। পরে দেখ্‌তে হবে গেল কোথায়।

তা নিতে পারব না, আপনার দেওয়া নোব কেন ?

তা সত্যি। কেউ হয় ত ভালবাসে আমায়, আমি ভালবাসি না। একজন দেয়, আমি দিই না। অথচ এই একটা নিরক্ষর লোক কিছুই পায় নাই ; কিন্তু দিবার মমতাটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে সমস্ত হৃদয় দিয়া। সুন্দর ঠকিয়াছে কি না, কে বলিবে ? হয় ত সুন্দরকে টগর ঠকাইয়াছে ; তবু এই শঠকেই প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া ঠকিবার সৌভাগ্য কবে হইবে ভগবান ! আমার এই নির্ম্মম অনুভূতির কষ্টিপাথরে নারীকে যাচাই করিবার দুর্ভাগ্য শেষ হইবে কবে ? আজকাল এমনি অনেক কথা মনে জাগে। উপরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখি একবার। ফুলগুলা যে শুকাইয়া গিয়াছে তাহা কাহারও চোখে পড়ে না।

সেদিন সকালে আবার সহসা ঝগড়া সুরু হইয়াছিল। সুন্দর চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ও শাঁখা দুটো তুমি কোত্থেকে পেলে ?

—যেখান থেকেই পাই না, তুমি ত দাওনি।

—টগরের জন্যেই ঠিক ঐরকম দুটো কিনেছিলুম ; কিন্তু সে দুটো হারিয়েছে।

—হারিয়েছে, আমি তার কি জানি। পৃথিবীতে কি টগরই শাঁখা পরতে জানে—আমরা কি জানিনে ?

—না—নিশ্চয়ই তুমি কেন নি ; সে দুটোই চুরি করেচ। মাষ্টার মশাই জানেন সব, যাচ্চি বলতে।

—মাষ্টার মশাইকে ভয় না কি ? ইচ্ছে হয়েছিল না হয় নিয়েচি। তা'বলে' এ রকম অপমান সহ্য কর্‌ব না। নিয়ে যাও তোমার জিনিষ ; টগরকে দিয়ে দাওগে, চাইনে আমি।

তার পর পাঁচুর ভিজে গলার আওয়াজ পাইলাম। সত্যি—মানুষকে 'হাতে নাতে' চোর ধরিবার—রূঢ়তায় সুন্দরের উপর ভয়ানক রাগ হইতেছিল। কিন্তু শাঁখা দুটা চুরি করিবার মত মূল্যবান কি? কে জানে! দুটো চোখের বজ্রবাণে যে আমার দম্ভের হিমাচলকে গুঁড়া করিয়া দিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহার এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিকে প্রশংসা করিতে পারিলাম না। হায় দাসি!

সুন্দর যখন সোল্লাসে খবরটা দিতে আসিল, তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলাম—ছাখ্, ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাস্‌নি। ওটা আমিই দিয়েছিলাম ওকে—বুঝ্‌লি না। এ টাকা কটা নে, আর এক জোড়া কিনে নিগে যা।

সুন্দর আর এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। আর একটু খেলো হইয়া গেলাম চাকরটার কাছে; কিন্তু উপায় কি? মিথ্যা কহিলাম বটে, কিন্তু মিথ্যারই উদারতা-টুকু ঐ নারীর স্পর্দ্ধাকে অনেকটা সংযত করিয়া আনিবে না কি? বড় আত্মপ্রসাদ বোধ হইল।

বাহির হতে পাঁচু ডাকিল—মাষ্টার মশাই। সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে সে দীপ্তকণ্ঠে কহিল—আপনার দয়ার এই মিথ্যেটা আমি ত আপনার কাছে ভিক্ষে কর্‌তে যাইনি, মাষ্টার মশাই। দয়ার শরীর আপনার জানি; কিন্তু সব চোরের চুরিকেই দয়া করে ঢাক্‌তে যাবেন না। শাঁখা দুটো আমি চুরি করেছিলুম, এ কথা নিজে মুখেই আমি বল্‌ছি। এ দুটো দয়া করে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। সুন্দর চাইলে ফেরৎ দেবেন।

চোখ দুটা তাহার জলে ভাসিতে লাগিল। আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রেমের এ আবার কোন নূতন অভিনয় কে জানে! শুনিয়াছি, তরুণ-তরুণীর মধ্যে মান-অভিমানের পালাটা বুঝি কতকটা এই রকমই। ইচ্ছা ছিল বলি—তোমার উপর কথনও বড় ধারণা ছিল না; তাই তোমার এ লজ্জার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু বলি নাই। এ লজ্জা না দম্ভ? সুন্দরের জিনিষ চুরি করিয়া আমার উপর ঝাল ঝাড়িবার এ প্রচেষ্টা কেন? অভিমান? প্রেমের আইনে উপকারও কি বেআইনী? হইবেও বা! কিন্তু শাঁখা দুটা লজ্জায় ফেরত দেওয়াও হয় নাই।

*   *   *   *

সুন্দর কাল রাত্রের গাড়িতে দেশে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া গেল—টগরের ভয়ানক অসুখ মাষ্টার মশাই, এ যাত্রা বোধ হয় আর তাকে দেখ্‌তে পাব না। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, হাকিমের কাছে নালিশ কর্‌লে হয় না?—'সেধো' টগরকে কেড়ে নে গেছে বলে?

হাসি পায়; কিন্তু কোন রূঢ় উত্তর দিতে বাধে। লোক-টার দুঃখ, ব্যথা যতই মিথ্যা ও অপ্রয়োজন হউক, এ পাষাণ বুকটাকে সময় সময় ভারি করিয়া তোলে। সুন্দর চলিয়া গেল।

ভাবিতে ভাল লাগে—এবার আমার পরিচর্য্যা করিতে তোমার কেহ দোসর রহিবে না। এমনি মনে হয়, সুন্দরের জিনিষও আর বোধ হয় চুরি যাইবে না। সুন্দর হয় ত দেশ হইতে আর ফিরিবে না। না আসুক গে। উহার অসুখ করে, উহার চুরি যায়, আর আমার বুঝি কিছুই একটা হইতে নাই!

ফুল আর গাছে ফোটে না কিন্তু; দোকানটাও বুঝি উঠিয়া গিয়াছে। পাঁচুর বুঝি শরীর খারাপ, এদিক সে মাড়ায় না। বামুনই অখাদ্য রাঁধে। ঘরটা যে অপরিষ্কার থাকে, খাওয়া যে আমার ভাল হয় না, এ যদি কাহারও চোখে না পড়ে, তবে সাধিয়া জানাইতে যাইব না কি? নাকে মুখে গুঁজিয়া বাটী হইতে আবার বাহির হইয়া যাই। পার্কে বসিয়া বসিয়া ভাবি, ফুলদানীটা হয় ত এতক্ষণে ভরিয়া উঠিয়াছে। বন্ধুটির সহিত দেখা করিতে এবার সত্যই ইচ্ছা হয়; কিন্তু শীঘ্রই বাড়ী ফিরি। ঢুকিয়াই কিন্তু আবার চলিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়।

সেদিন ভোরে কাহার সুতীব্র ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। —অমরবাবু, মাষ্টার মশাই, আরে উঠুন; এতবেলা পর্য্যন্ত ঘুমোয় না। উঠুন, উঠুন···।

বিরক্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। ভদ্রলোক বিশ্রী চীৎকারে ঘর ভরাইয়া বলিলেন—আরে আপনার ঘুম ত ভয়ানক মশাই, নেশা-টেশা করেন না বুঝি। রাত বারোটায় ঢুকেছি মশাই; আর চারটে থেকে জেগে ছট্‌পট্ করছি। ছোঃ! এ সব জায়গায় কি মানুষ থাকে! এই ক' ঘণ্টায় হাঁফিয়ে উঠেছি মশাই। শুক্‌নো ডেঙায় জলের মাছ, —বুঝলেন না? বলিয়া ভদ্রলোক 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মদের গন্ধে ও হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরটা ফেনিল হইয়া উঠে। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ইনিই এ বাড়ীর মালিক। পূজার কটা দিন ইঁহার ধর্ম্মভাব জাগিয়া ওঠে, তাই দেশে পদধূলি দেন। লোকটার বয়স ৩০এর বেশী নয়; কিন্তু দেখায় ৪০।৪৫। মুখটা ফুলো; অত্যাচারের কালিমা সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। দাড়ি নাই.শুঁয়ার মত সরু সরু গোঁফ। কাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়া যে হাসি উছলাইয়া পড়িতেছে, তাহা এত বীভৎস যে, কল্পনা করা যায় না। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কবে এলেন ?

—আর বলেন কেন মশাই! ষ্টেশনে গাড়ী থেকে নাবতেই এক বন্ধু কাল পাক্‌ড়াও কর্‌লেন বিকালে—বাগানে তাঁর গান-বাজনা ছিল। কি করি—বন্ধুর অনুরোধ। সরবৎটা কিন্তু কাল কিছু জেয়াদাই পেটে পড়েছিল; তাই বন্ধুরাই রাতে বাড়ীতে রেখে গেলেন,—বুঝলেন না ? তবে কামিনী ছিল, বিশেষ কিছুই কষ্ট হয় নি কাল।

বলিয়া লোকটা ভয়ানক হাসিয়া উঠিল। ইহাকে ঠিক যেন চেনা যায় না। মাতাল অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এমন নির্লজ্জ ভাবে নিজেরই গুণকীর্ত্তন করিতে কাহাকেও দেখি নাই। কর্ত্তাটি বলিতেছিল—তার পর অমরবাবু, কেমন আছেন বলুন। কোন কষ্টটষ্ট হয় না বোধ হয়। কত বয়েস আপনার ? চব্বিশ ?

—না বাইশে পড়েছি।

—ওঃ, তবে আর ভাব্‌না কি! ও বয়সে কেউ ত কষ্ট পায় না। কেউ না কেউ দেখ্‌বার থাক্‌বেই—বুঝ্‌লেন না ? কামিনীকে কেমন লাগছে ?—খুব খারাপ নয় কেমন ? বেশ বেশ, এই ত চাই!

এমনি করিয়া পরিচয় সুরু হয়। লোকটা ভাল হোক, মন্দ হোক, সবই নির্ব্বিবাদে বলিয়া যায়। কবে সে প্রেমে পড়িয়াছিল, কবে সে মদ ধরিল, নারীর সহিত কিরূপভাবে ব্যবহার করিলে শীঘ্রই তাহার মনকে জয় করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনর্গল সে আলোচনা করে। এড়াইবার চেষ্টা করি; কিন্তু জোর করিয়া সে শুনাইয়া দেয়,—বলে

—ভয় নেই মাষ্টার, ভাগ বসাতে যাব না; সে শক্তি আমার নেইও, একদিন ছিল বটে। এমনি করিয়া দুঃখ জানায়।

কর্ত্তা রোজ গঙ্গাস্নান করিতে যায়, আর কারণে অকারণে বামুন ঠাকুরকে ডাক পাড়ে। দেখা হইলেও বামুন আর আজকাল প্রাতঃপ্রণাম করে না, কিন্তু পয়সা শোধ দিতে ভুলিয়া যায় তেমনি। দেখা হইলে কর্ত্তা বলে—বছরে একটা দিন গঙ্গা স্নানটা কর্‌তিই হয়, বুঝলেন না ? পাপের ত আর শেষ হল না কোন দিন! ওগুলো যেন অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গেছে, বুঝলেন না ?

লোকটার ধারণা, আমি কিছুই বুঝি না। ভাবে, আমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন; তাই তাহার সামনেই উপরের জানালাটার দিকে তাকাই। কর্ত্তা হাসিয়া বলে—আমার স্ত্রীকে দেখেন নি ? নিশ্চয়ই দেখেছেন, এ বয়সে দেখবেন না ত কবে দেখ্‌বেন ? তবে কি জানেন, যক্ষ্মায় একেবারে শুকিয়ে গেছে, কিছুই নেই আর। সাধে কি বাইরে বাইরে রয়ে গেলাম, মশাই। পুরুষের চরিত্তির ত!...তার পর চোখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলে—রুমালটা পছন্দ হয়েছে ত মাষ্টার ? ··কিছু নয়, কিছু নয়! তোমার স্ত্রীই বা কি, আর আমারই বা কি!

বামুনটার অনেক গুণ আছে দেখিতেছি। কর্ত্তার অশুচি প্রবৃত্তি দেখিয়া লজ্জা করে কিন্তু। এ উদারতার মধ্যে মহত্ত্ব আছে কি ? কিন্তু উপরের ঐ ঘরটা হইতে আজকাল সময় সময় মাতালটার উন্মত্ত গর্জ্জন শুনিতে পাই। বৌটি আজকাল বেশীই কাসে। তাহার কান্নার চাপা আওয়াজ পাই কি পাই না। ছাত্রটি কিন্তু বলে—বাবা মাকে মারে, মাষ্টার মশাই।···

* * * *

সেদিন সকালে কর্ত্তা নানারূপ প্রলাপ বকিতেছিল। লোকটাকে বিশ্রী ঠেকে; কিন্তু উঠিতেও চায় না। হঠাৎ সুন্দর আসিয়া হাজির। যেন বাঁচিয়া গেলাম; কিন্তু সুন্দর আমাকে যেন চিনিতেই পারিল না। টলিতে টলিতে আসিয়া কর্ত্তাকে প্রণাম করিল। আশ্চর্য্য! এই কটা দিনেই তার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! চোখ দুটা যেন জবাফুল, শরীর মড়ার মত শুষ্ক—চিনিবার জো নাই। কি বিশ্রী তাড়ির গন্ধে ঘরটা ভরিয়া উঠিল! সুন্দরও কি মদ খায় ? ব্যাপার কি, টগর কি মরিয়াছে ? লোকটা কি পাগল হইয়া গেল ?

কর্ত্তাও বিস্ময় দমন করিতে পারিল না।—এ-রকম

মাতাল হলি কোত্থেকে? টগর কি মরেছে? তার ছেলে?

সুন্দর লাফাইয়া উঠিল। মাতালের মত বিকৃত স্বরে বলিল—মরবে? মাগী যে এত শয়তান কে জানত, কর্ত্তা? পাঁচুর কথা তখন বিশ্বাস করিনি! অসুখ বিসুখ সব মিথ্যে, ঐ সেধো শালার কারচুপি। বেটাকে যে খুন করিনি এই ঢের!

—তার মানে?

—মাগি, সেধোকে বে করেনি, এমনই তার কাছে থাকে। খেঁদির সাথে দুকথা হতেই, শালা বেরিয়ে এল লাঠি নিয়ে। দিলুম ইঁট মেরে মাথাটা তার থেঁতলে। পাঁচদিন হাজতে থেকে ফিরে আস্‌ছি; মাগি ফিরিয়ে দিলে সব। সতীত্ব জানান হল! তবু যদি বে করা মিন্‌সে হত, আর মারধর খেতিস্ নি।...যাক্‌গে!

মানুষও পশু হইয়া উঠে, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। হে ভগবান, এ আবার কোন নূতন রহস্যময়ীর সৃষ্টি করিলে! টগর ভাল কি মন্দ বুঝিতে ত পারিলাম না! কেবল কর্ত্তা সব বুঝিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—অমন কত খেঁদি গড়াগড়ি যাচ্ছে, সুন্দর, দুঃখু কি! হেঁ হেঁ, মন্দ মজা নয় ত!

দুই মাতালে বেশ মিলিয়া গেল। শেষে দেখি সুন্দরটাও হাসিতে সুরু করিয়াছে। বামুনটাকে সে দেখিতে পারিত না; কিন্তু আজকাল দুজনে বড় ভাব। আমাকে দেখিলেই সুন্দর পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে। ডাকি—সুন্দর শুনে যা। আস্‌ছি, বলিয়া আসে না। যদিই বা আসে, আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলে—আজ আর খাই নি মাষ্টার মশাই! বাবু যা দিয়েছেল—বামুনটাই সব মেরেছে। গন্ধে দাঁড়ানো যায় না কিন্তু। ধমকাইয়া বলি—মরগে যা, কে তোকে জিজ্ঞেস করছে ওসব কথা।

লোকটা কাঠ হইয়া যায়। শেষে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে—সেই শাঁখা দুটো, আমি ত চাইচি না মাষ্টার মশাই। বেশ মানিয়েছে, দেখ্‌লুম তার হাতে। আজ আপনার কত কথাই পাঁচু বল্‌ছিল। কত বল্‌ছিল...।

ধমক খাইয়া চুপ করে। লোকটার অবনতিতে—বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি। ভাবি, তাহার কল্পনার দৌড়টা একবার চুপ করিয়া দেখি না কেন! কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না। লোকটা এ-রকম হইয়া গেল কেন? একদিন আমাকে ভালবাসিত; কিন্তু আজ আমাকে ঠকায়!

কিন্তু আজ সুন্দরের সাহস ও হীনতা দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আমার নাম, আমার মর্য্যাদা লইয়া সে যে এমন জুয়াচুরি করিবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। কাছে পাইলে লোকটার কি দশা হইত জানি না। তার দুর্ব্বলতা নিজেই সে প্রকাশ করুক, আমার নামের সহিত জড়াইতে চায় কেন? ঐ সামান্য নারী যে আজও আমার দুর্জ্জয় মনে একটুও রেখাপাত করে নাই, এ সত্য জানাইব কি করিয়া? শাড়ীটা কি সেদিন আমি তাহাকে যাচিয়া পাঠাইয়াছিলাম? অনেকদিন পরে পাঁচুর গলার আজ আওয়াজ পাইলাম। এই যে এতদিন তাহার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহাতে আমার কতটুকু ক্ষতি হইয়াছিল? শুনিতে পাইলাম পাঁচু দীপ্ত কণ্ঠে বলিতেছে,—মাষ্টার মশাই পাঠিয়ে দিলেন? টগরের জিনিষ মাষ্টার মশাই পেলেন কোত্থেকে? তিনি কিনেছেন? মিথ্যা কথা বল্‌তে লজ্জা কর্‌ল না? মদ ধরেছ, গাঁজা ধরেছ—এইবার পরের নামে দোষ চাপিয়ে নিজে একটা অসতী মেয়েকে ঘুষ দিতে সুরু করেছ! বয়ে যাবার আর বাকি কি রইল? তুমি জান আমি ভাল নই; বাবুর সঙ্গে এ বাড়ীতে এসেছি—তবু টগরের জিনিষ আমাকে দিতে লজ্জা কর্‌ল না তোমার? টগর ত পাঁচু নয় যে একটা মাতালকে সে ভালবাস্‌বে!..

—তা, তা সব যদি জান, তোমার জন্যেই যে এত কষ্ট করে এসব নিয়ে এসেছি, কামিনী!

তারপর কি একটা ছুঁড়িয়া ফেলার আওয়াজ কানে আসিল। সুন্দর ধরা গলায় বলিল—বেশ ভেঙে ফেল, ছিঁড়ে ফেল সব! আমি ত মাষ্টার মশাই নই,—আমি যে গরীব চাকর!

তার পর সব চুপ চাপ। খুব একটা হৈ চৈ হইয়া হঠাৎ সব থামিয়া গেলে যেন চারিদিক বেসুরো বাজিতে থাকে। কানটা আমার 'ভোঁ ভোঁ' করিতে লাগিল। স্তব্ধ হইয়া খাটে শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

হে নারি, তুমি ঐ চাকরটার জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিয়াছ; কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্ব্বে যে আমারও প্রতারণা ধরিয়া ফেলিয়াছিলে, এ কথা ত মিথ্যা নয়! কিন্তু অমনি করিয়া

আমাকে ত তিরস্কার কর নাই। ঐ ক্ষুদ্র চাকরটার প্রতি তোমার ঐ যে বাক্যবাণ, তাহা আজ আমারও বুকে সহে না যে! উহারই পাশে বসিয়া একদিন সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া দিয়াছ, উহারই অতি সামান্য দুইটা শাঁখা চুরি করিবার লাঞ্ছনাও একদিন সহিয়াছ; আর আজ উহারই দুর্ব্বলতাটুকু দুপায়ে মাড়াইয়া যে তাচ্ছিল্যটুকু দেখাইলে, আমার জীবনে তার যদি কণামাত্রও সঞ্চিত হইত, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতে আজ যে বাধে না, নারি! কেন তাহা হইলে আমাকে একদিন ফুল দিয়াছিলে? এই সামান্য চাকরটাকেই কি ঈর্ষানলে জর্জ্জরিত করিয়া জয় করিবার জন্য? হে বিজয়িনী, এমনি করিয়াই কি আমার পুরুষত্বের দম্ভ চূরমার করিয়া দিতে হয়!

একটা সামান্য কুলকলঙ্কিনীর কাছে আজ আমি হারিয়া গেলাম। সুকুমারকে শুধু লিখিয়াছি—আমাকে ক্ষমা ক'র, ভাই।

* * * *

সেদিন বিকালে পাঁচু চলিয়া গেল। কে জানে, কোথায়! কাপড়টা ফিরাইয়া দিতে ভুলে নাই, কিন্তু। বলিল—এ কাপড় নিতে পারব না,—ঝি চাকর মানুষ আমরা—মাপ করবেন মাষ্টার মশাই।

খানিক চুপ করিয়া ভিজা গলায় পুনরায় কহিল—আচ্ছা, সেই শাঁখা দুটো কি ওকে দিয়ে দিয়েছেন?

যাহার মধ্যে তোমার একদিনের উপেক্ষা ও অপমানের স্মৃতিটুকু মুছিবে না কোনদিন, তাহার জন্য তোমার যে এই সকাতর ভিক্ষা, ইহাকে ভুল বুঝিবার আজ আর আমার দম্ভ নেই। শাঁখা দুটা দিবার সময় বুঝি হাতটা আমার কিছু বেশীই কাঁপিয়া থাকিবে, তাই সে বলিয়া গেল—অনেক কষ্ট দিয়ে গেলুম, মাষ্টার মশাই। কিন্তু একটা সামান্য ঝিকে ভুলতে আর কদিন লাগবে? তবে শাঁখা দুটোর কথা তাকে যেন বলবেন না, এইটুকু দয়া আপনার কাছে চাচ্ছি।

যদি বলিতে পারিতাম—কবেই বা তোমায় মনে রাখিয়াছিলাম, যে, আজ ভুলিতে পারিব না।…কিন্তু হাসিতে গিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ঘরে আসিয়া Time table দেখিলাম—আজ রাতেই কোন গাড়ি নাই কি?

উপরের সব কটা জানালাই আজ বন্ধ; তবু কাসির আওয়াজ পাইতেছি। জানালা কি আর খুলিবে না? রুমালটা আর একবার খুঁজিয়া দেখিলাম, পাইলাম না। কিন্তু রুমালটার জন্য আজ সত্যই বড় ব্যথা বোধ হইতেছিল।

কর্ত্তা তিন দিন কোথায় উধাও হইয়াছেন। পাশের ঘর হইতে চাকর বামুন দুটার নাসিকা-ধ্বনি শুনিতেছি। জীবনের কোন বিচ্যুতিই উহাদের নাকের কলকে বিগড়াইতে পারে না। কেন, তাই ভাবি!

চিতার স্মৃতি

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

নীলাম্বরে লক্ষ চিতা উঠিল জ্বলিয়া।
ছায়াহীন শব্দহীন নীল বায়ুস্তর
অনন্ত শ্মশানসম আছিল পড়িয়া—
সেই পথহীন ঘোর আকাশ প্রান্তর
কম্পিত তারকাবহ্নি জ্বালাইয়া বুকে
লক্ষ মরণের স্মৃতি চক্ষেতে ধরিল,
কোটি কোটি বিশ্বলোক যেন মোর দুখে
কোটি কোটি চিতা জ্বালি পুড়িয়া মরিল।
জাগ্রত কালের দীপ্ত মুহূর্ত্ত সকল,
ছিন্ন-সূত্র মালিকার কুসুমের প্রায়,
একেবারে হারাইয়ে সকল সম্বল
খণ্ড জীবনের মত পড়িল চিতায়।
নীলাকাশ স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া
ব্যর্থ হৃদয়ের মত রহিল জাগিয়া।



মানবেন্দ্র সুর রচিত — চক্রপাণি চিত্রিত

[রাজসভা]

১

—মহারাজ !

—কি মন্ত্রী ?

—এই হুকুম-নামাটায় সই করে দিন।

—আঃ ! সবেতেই আমাকে সই করতে হবে যদি তবে তুমি আছ' কি করতে মন্ত্রী ?

—আজ্ঞে, আমিইত সবেতে সই করি, কেবল এই অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলোর আমি নিজের কোনও দায়িত্ব রাখতে চাইনে !......কি জানেন মহারাজ ! অর্থ ই সকল অনর্থের মূল ! ওর মধ্যে থেকে কি এই বৃদ্ধবয়সে শেষ একটা দুনাম হবে ? টাকা-কড়ির সম্পর্কে থাকলেই ও লোকগুলো সন্দেহ করে মহারাজ, এবং মিথ্যা চোর অ দেয় !

—তা, কথাটা মিথ্যে নয়। দেখনা, আগে যিনি এ রাজ্যের দেওয়ানজী ছিলেন, রাজ্যের লোক তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে তাড়ালে। তাঁর অপরাধ কি ? না তাঁর সেই পালোয়ান আত্মীয়টা—মনে আছে তো তাকে ? সেই যে আগে যে আমার কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে তার মামাকেও রাজকোষ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য ক'রেছিল, তাও,

দান নয়—ঋণ! সে বেচারী হয়ত পরিশোধ করতে পারতো, কিন্তু, কি একটা অপরাধে শুনিছি তার কারাদণ্ড হওয়াতে, সে আর টাকাগুলো পরিশোধ করবার সুযোগ পায়নি!

—আজ্ঞে, মহারাজ যদি কথাটা তুললেন তাহ'লে বলি, সেই মাতুলটী বড় সাধারণ লোক ছিলেন না! তাঁর চেহারা দেখেছিলেন তো! সেই সুদীর্ঘ শাল্মলী তরু তুল্য ক্ষীণকায় ব্যক্তির গগনস্পর্শী মাথায় বিশাল জুয়াচুরি বুদ্ধির প্রতিবসতি ছিল। তিনি যদি কারাগারের বাহিরে থাকতেন, তাহ'লে রাজ-কোষ এতদিনে কপর্দ্দক-শূন্য হ'য়ে প'ড়তো!

—আহাঃ, সে কি আর আমি জানি নি? তাইত আমার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেওয়ানজীকে পদচ্যুত করতে হয়েছিল। কিন্তু, একথা তোমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে মন্ত্রী যে দেওয়ানজী নিজে খুব ভাল লোক ছিলেন। তা' স্বর্গীয় দেওয়ানজী মহাশয় তো সে টাকা হিসেব করে নিজেই সব দণ্ড দিয়েছিলেন, রাজকোষের ক্ষতি হ'তে দেননি!—তবু তো লোকে তাঁর বদ্‌নাম দিতে ছাড়লে না! সেই লম্বা আর চওড়া আত্মীয় দুটীর জন্যই তাঁর উঁচু মাথা হেঁট হয়েছিল। দেওয়ানজী আমার সেই অভিমানেই অতশীঘ্র দেহত্যাগ করলেন!

—বর্ত্তমান দেওয়ানজী কি মহারাজের রাজকোষ বেশ সুপরিচালনা ক'রতে পারছে না?

—সে কি? তোমার জামাই সে, শ্বশুরের মতই অতি বুদ্ধিমান ছেলে! চমৎকার কাজ করছে!—তাকে দেওয়ানজীপদে বাহাল ক'রে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি।

—আজ্ঞে, সে আপনার একান্ত অনুগ্রহ মহারাজ! আমার' জামাই বলে নয়, কাজের লোক বলেই সে যে আপনার সুনজরে পড়েছে এইটেই তার পরম ভাগ্য; তাই তো প্রজারা সব তাদের বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ, এমন কি, কারুর কারুর না-খেয়ে না-প'রে জমানো টাকা দিয়ে তারা যে একটি আদর্শ শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটির সম্পূর্ণ ভার তুলে দিয়েছে আমার ঐ জামাইটির উপর।

—তবে যে, আমি শুনেছিলুম, প্রজারা ভার দিয়েছিল তোমার উপর মন্ত্রী, এবং তুমি সেটা তোমার জামা'য়ের ঘাড়ে চাপিয়েছো?

—আমি বুড়োমানুষ কি অত' ঝঞ্ঝাট্ পোয়াতে পারি মহারাজ?......তা জামাই আমার কি রকম কাজের লোক সেত' আপনি জানেনই, আর প্রজারাও কোনও আপত্তি করলেনা, তাই' ওটাতে তাকেই বসিয়ে দিয়েছি!

—তা বেশ ক'রেছো মন্ত্রী, কিন্তু ওটাতে সে বেশী মনোযোগ দিলে রাজকোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে কি করে?

—আজ্ঞে মহারাজ, সে জন্য আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না! রাজকোষের প্রতি আমাদের শ্বশুর জামা'য়ের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি আছে! তা ছাড়া—বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ অতি যোগ্য লোক। আমাদের একান্ত অনুগত!

—বেশ, বেশ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম! কিন্তু, তোমার কোষাধ্যক্ষটির ওই কেমন যেন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত চেহারা দেখেই আমার বড় ভয় হয়েছিল, বুঝিবা রাজকোষও এইবার ওরই আকৃতির মতো ক্রমশঃ ক্ষয় পেতে থাকবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

—কিন্তু সে ভয় বোধ হয় আর আপনার নেই! রাজ-কোষে আগে-আগে উদ্বৃত্ত অর্থ প্রায় কিছু থাকতো না বললেই হয়! কিন্তু বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ রাজকোষের সে অভাব দূর করেছে! প্রজাদের ঐ শিল্পশালার প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা আমার জামাই রাজকোষে তার জিম্মাতেই রেখে দিয়েছে! কি জানি, রাজ্যে কখন কি অর্থের প্রয়োজন হবে, তখন শূন্য রাজকোষ বলে আর আমাদের আপশোস্ বা অনুতাপ ক'রতে হবেনা! ওঁই টাকাতেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন সুসম্পন্ন হ'তে পারবে!

—ঠিক বলেছো মন্ত্রী! ঐ বেঁটে-সেঁটে রোগা বাঁকা ক্ষয়া-ক্ষয়া কোষাধ্যক্ষটির গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি আছে দেখছি!

—আজ্ঞে, মহারাজ, আপনি আরও শুনলে খুশী হবেন, ওই লোকটি তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় ব্যবসায়ী যে যেখানে ছিল সকলকে দেশের কাজে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের সারাজীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ বার করে এনে রাজকোষে জমা করেছে!—

—এঁ্যা! বল কি' মন্ত্রী? এ যে দেখছি খুব ওস্তাদ!—তোমার জামা'য়ের চেয়েও ধড়ীবাজ!—বেশ! বেশ! আমায়

যদি মেয়ে থাকতো তাহ'লে আমি একেই জামাই করতুম!—কিন্তু, কে যেন বল্‌ছিল মন্ত্রী, যে—আমার ঐ কোষাধ্যক্ষটি নাকি "উর্ব্বশী নাট্যশালা'র—একজন প্রধান পাণ্ডা!

—মহারাজ ঠিকই শুনেছেন!

—তবেই তো! আবার একটা দুর্ভাবনা হ'লো, মন্ত্রী!

—কেন মহারাজ?

—যদি ঐ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কোষাধ্যক্ষটি নাট্যশালার



দাও, সই করে দিই!

কোনও নর্ত্তকীর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে—তাহ'লে তো রাজকোষ গেল!

—আজ্ঞে মহারাজ, সে ভয় আপনি একেবারেই রাখবেন না! ওসব ছেলেরা একমাত্র ঐ 'রূপচাঁদ বিবি' ছাড়া জগতে আর কারুরই প্রেমে কখন পড়ে না!

—'রূপচাঁদবিবি!' হাঃ হাঃ হাঃ! মন্ত্রী বেশ কথা বলে!

—মহারাজের কি এই হুকুম নামাটায় এখন সই ক'রে দেবার সুবিধে হবে?

—নিশ্চয় হবে!—কিন্তু কিসের হুকুম তাতো এখনও কিছু বললে না মন্ত্রী?

—আজ্ঞে, ওটা সেই 'শোষণ নদীর' সেতু মেরামতের বার্ষিক ব্যয়!

—ও বাবা! 'শোষণ' নদী আবার কি?—'শোন' নদী একটা আছে বটে শুনেছি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে অন্য রাজ্যে, আমাদের রাজ্যের এ নদী তার চেয়ে ঢের বড়! এটার উপর ঐ পোল বাঁধাতে স্বর্গীয় মহারাজারা অকাতরে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। পাছে তাঁদের এই কীর্ত্তি ধ্বংস হ'য়ে যায় এই আশঙ্কায় তাঁরা—প্রতিবৎসর ঐ 'শোষণ-সেতুটি' মেরামতের ব্যবস্থা করে গেছেন! যন্ত্ররাজ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে সেতুর মেরামতী কার্য্য পরিদর্শন করেন। তার সমস্ত ব্যয়ভার রাজকোষ থেকেই দেওয়া হয়!

—উত্তম! কত টাকা পড়ে দেখতো মন্ত্রী! আমার

আফিমের নেশাটা বড্ড ধরেছে—চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিনি।

—আজ্ঞে, বাহান্ন হাজার-টাকা!

—এঁ্যা! বলো কি? মেরামতী খরচ এত টাকা?

—আজ্ঞে, তা হবে বৈকি মহারাজ! আপনিই কেন বুঝে দেখুন না—শোন নদীর চেয়েও বড় নদী যখন—তার উপরে সেতু—সে বড় সোজা সেতু নয়! 'শোষণ-সেতু' মেরামতে প্রতি বছরেই এইরকম ব্যয় হয়! হিসাব আমি সব মিলিয়ে দেখিছি, বাহান্ন হাজারই হয়েছে বটে।

—বাস্! তবে আর কি? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! দাও সই করে দিই!

মহারাজ হুকুমনামা সই ক'রে দিতেই, মন্ত্রীমহাশয় বেশ প্রফুল্ল মুখে সেটা নিয়েই চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আফিমের নেশায় মুদিত-চক্ষু মহারাজ আবার ডাকলেন—

—মন্ত্রী!

—আজ্ঞে?

—বৈদ্যরাজ আমার রাজধানীর আরোগ্য-নিকেতনের জন্য যে আরও দু'লক্ষ টাকা প্রার্থনা করে আবেদন জানিয়েছিলেন সেটা আমি মঞ্জুর করেছি জানো?—

—আজ্ঞে হাঁ্যা, পীড়িত আর্ত্ত আতুরদের উপর আপনার অসীম অনুকম্পার কথা বিশ্ববিদিত!

—আহা! তারাইত যথার্থ দয়ার পাত্র মন্ত্রী! দেশের ঐ ষণ্ডামার্ক, হোঁৎকা জোয়ান ছেলেগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনি! কখন কি ফ্যাসাদ বাধায় কে জানে? হাঁ্যা, সে টাকাটা পাঠিয়েছো?

—আজ্ঞে হাঁ্যা।

—আর বৈদ্যরাজ নিজে আরও একবৎসরের জন্য আরোগ্য-নিকেতনের অধ্যক্ষ পদে বাহাল থাকবার জন্য মিনতি জানিয়েছেন, সেটাও আমি মঞ্জুর করিছি—বুঝলে!

—আজ্ঞে, অতি উত্তম কার্য্য করেছেন! কিন্তু, শিক্ষা-পরিষৎ থেকে গুরুরাজ যে পাঁচলক্ষ টাকা বহুদিন হ'ল বিদ্যা মহাপীঠের জন্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন, সে সম্বন্ধে তো আজও কোনও আদেশ দিলেন না? আর্থিক ব্যাপারে আমি একেবারেই নির্লিপ্ত আছি বলে আপনাকে সে কথা প্রত্যহ স্মরণ করিয়ে দিতে পারিনি; গুরুরাজ কিন্তু আবার তাঁর আবেদন জানিয়েছেন!

—দেখো মন্ত্রী, তোমায় স্পষ্ট কথা বলি শোনো—ওই শিক্ষা ব্যাপারে লোকগুলোকে বেশী উৎসাহ দেওয়া ভাল নয়! যত তারা লেখাপড়া শিখবে তত চালাক হ'য়ে উঠবে—চোখ কান ফুটবে—এরপর আর কাউকে মানতে চাইবে না—বুঝলে?—বরঞ্চ, শহর-কোটাল যে আরও তিরিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি করে দেবার জন্য আবেদন করেছে, সেটা বাড়িয়ে দাও! রাজ্যে 'শান্তি-রক্ষা' আগে দরকার।

—আজ্ঞে, এ যা বললেন—এ অতি যথার্থ কথা মহারাজ!

—আচ্ছা, বিন্ধ্যাচলে গ্রীষ্মকালটা কাটাবো ব'লে যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়েছিলুম সেটা কি সম্পূর্ণ হয়েছে?

—আজ্ঞে হাঁ্যা, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার গ্রীষ্মে আপনি সপরিবারে সেখানে যেতে পারবেন।

—কত খরচ পড়ল মন্ত্রী?

—আজ্ঞে যৎসামান্য! মাত্র আটাশ লক্ষ টাকার পাহাড়ের উপর অতবড় মর্ম্মর-প্রাসাদ আজকালকার দিনে তৈরি হওয়া বড় কঠিন!

—তা বটে,—আচ্ছা যাও!

(২)

যন্ত্র-রাজের বৈঠক

—যন্ত্ররাজ!

—কে! স্থপতি?

—হাঁ্যা।

—কি সংবাদ?

—দুঃসংবাদ! বড়ই দুঃসংবাদ! 'শুভঙ্কর' আসছে!

—কি? কি? শীঘ্র বলো, এমন সন্দেহে রেখোনা!

—আরে—সন্দেহে রেখোনা বললেই কি সন্দেহ থেকে এড়াতে পারবে মনে করেছো? বছর বছর 'শোষণ সেতু'র মেরামতী খরচ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আদায় ক'রছো, এবার রাজার সন্দেহ হয়েছে! সেতু কি রকম মেরামত হচ্ছে দেখবার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন এবার। হিসেবের খাতা হাতে করে শুভঙ্কর স্বয়ং আসছেন সরে-জমীনে তদারক করতে!

—তাহ'লে উপায়!

—কিছু কবলাও। ভাগ দিলেই গোল চুকে যাবে!

—তুমি তাহ'লে শুভঙ্করকে চেনো না! ও বেটা কি রাজকোষের হিসাব-নবীশের মতো সুবোধ ছেলে? বেটা বড় পাজী! নগদ দু'চার লাখ টাকা পাওয়ার চেয়ে—হিসেবে দু'চার লাখ টাকার ভুল বা চুরি ধরে দিতে পারলে তার ঢের বেশী আনন্দ হয়! তাইত' দেশ বিদেশ থেকে তাকে সমস্ত খরচ দিয়ে লোকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে—হিসেব দেখে দেবার জন্য! তা মহারাজ হঠাৎ একে আনালেন কেন?—

ওগুলোকেও ফাঁকি দিয়ে বার ক'রে নিতে গেছল, তাইত রাণীর টনক নড়েছে! প্রজাদের শিল্প-শালার তিরিশ লক্ষ টাকা যে রাজকোষে জমা আছে এ খবরটা মহারাজ বোধ হয়/তাঁকে নেশার খেয়ালে বলে ফেলেছিলেন! তাই তিনি মন্ত্রী মহাশয়কে সন্দেহ ক'রে একেবারে শুভঙ্করকে আনিয়েছেন।

—তারপর? শুভঙ্কর এসে যখন দেখবে যে 'শোষণ' নামে রাজ্যে কোনও নদীই নেই—



দুঃসংবাদ! বড়ই দুঃসংবাদ! 'শুভঙ্কর' আসছে!

—মহারাজের ব'য়ে গেছে! তিনি আফিম খেয়ে বুঁদ হ'য়ে আছেন। এ মহারাণী আনিয়েছেন।

—কেন, তাঁর এত মাথাব্যথা কিসের?

—ঐ ব্যাটা বুড়ো মন্ত্রীর দোষে! রাজ-বাড়ীর হীরে জহরৎ মণি মাণিক্যের অলঙ্কার গুলোর লোভ সে কিছুতে ছাড়তে পারলে না! রাজকোষের জন্য হঠাৎ প্রয়োজন বলে

—নেই কি রকম? বরং শুভঙ্কর এসে দেখবে যে রাজ্যে শুধু একটা নয় অনেকগুলো 'শোষণ' নামে নদী প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে—

—আহা, তা তো হ'চ্ছেই! কিন্তু, তার কোনওটার উপরই তো সেতু নেই! আমরা যে একটা সেতু করেছি! ধরা পড়লে মেরামতী বাবদ এই

ক'বছরের টাকাটা ত' উগরে দিতে হবেই—উপরন্ত কারাদণ্ড……

আরে না না, ভয় নেই, হয়ত খাতাপত্র দেখেই খুশী হ'য়ে 'শুভঙ্কর' ফিরে যাবে। 'সেতু' দেখতে আর চাইবে না। আমরা তো আর বৈদ্যরাজের মতো নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিনি! আর যদি নিতান্তই যেতে চায়—বলবেন পথ বড় দুর্গম, ভারী কষ্ট হবে।

আরে,—সে যা হোক্ একটা কিছু ধাপ্পা দিলে চলতো, কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে যে ঐ বৈদ্যরাজের চুরিটা ধরা পড়ে! এই সেদিন রাজকোষ থেকে দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, একবৎসরের জন্ত তাঁর চাকরীর মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—তা বৈদ্যরাজ যে একেবারে 'পুকুর-চুরি' করছিলেন তা কি ছাই জানতুম!

—তা—ওখানে চুরির যে অনেক সুবিধে রয়েছে! লক্ষ লক্ষ রুগী আসছে—চলে যাচ্ছে! খাতায় জমা-খরচ ক'রে গেলেই হ'লো! ধরবার উপায় নেই!

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক বটে! আমাদের চেয়ে ওদের অনেক সুবিধে ছিল! আমাদের এই ইট কাঠ পাথরগুলো যে বৈদ্যরাজ্যের রুগীর মতো চলে যায় না! থেকে যায়! বৈদ্যরাজ তাই জানতো যে তার কীর্ত্তি-কলাপ কখনও ধরা পড়বে না, কিন্তু—

—কিন্তু, আর কি? সববিষয়ে ফাঁকি দিতে গেলে কি চলে? খাতাপত্র ঠিক রাখতে পারেনি—তাই ধরা পড়ে গেল! এদিকে যেমন হাত চালাচ্ছিল, তেমনি ওদিকে হিসেবটা দোরস্ত রাখা উচিত ছিলতো? শুভঙ্কর এসে ধাপ্পামেরে কসে' একটু চাপ দিতেই সব কথা ফাঁস হ'য়ে গেছে!

—তা যাক্, কিন্তু 'বৈদ্যরাজ' বেঁচে গেছেন! মহারাজ বরং বৈদ্যরাজের বেতন আরও হাজার টাকা বৃদ্ধি ক'রে দিয়েছেন!

—সে নেহাৎ নিজেদের মান-মর্য্যাদা বাঁচাবার জন্তে! বৈদ্যরাজ নাকি মহারাণীর কি রকম জ্ঞাতি-ভাই হ'ন, তাই রক্ষে পেয়ে গেলেন!…আরে তুমিও তো ভাই দূর সম্পর্কে মহারাণীর আত্মীয় হও; যদি নেহাৎ ধরাই পড়ো, তবু হয়ত বেঁচে যাবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ, বিপদে পড়বো দেখছি আমি! এ গরীব স্থপতি বেচারাই মারা যাবে!

—না না, তুমি কিছু ভয় পেও না, আমি কাল রাজধানীতে গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসবো!…হ্যাঁ, তোমাকে ব'লতে ভুলে গেছলুম, কাল রাত্রে একটা সংবাদ পেয়েছি যে দেওয়ানজী, আর কোষাধ্যক্ষ মশাই কি একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসবেন—

—প্রয়োজন আর কি?—'শোষণ-সেতুর' মেরামতী খরচের টাকার ভাগটা এ বছর তাদের দাওনি ব'লে, আদায় করতে আসছেন!

—কেন দেবো? ওঁরা যে শ্বশুর-জামা'য়ে গরীব প্রজাদের রক্ত উঠা পয়সায় তৈরি ওই শিল্পশালার প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা হজম করেছেন—আমাদের কি তার ভাগ দিয়েছেন?

এই সময় রাজপথ দিয়ে এক পাগল গান গাইতে গাইতে চলেছিল। এই পাগলকে রাজ্যের সবাই চেনে, এর নাম ছিল প্রাণধন শেট্। এককালে সে একজন সওদাগর ছিল, আজ দেনার দায়ে দেউলে হ'য়ে গিয়ে তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। সে গাইছিল—

"(শেষে কি) পড়নু ফাঁকি শুধুই আমি!
(সখী গো!) যত বারো ভূতের বারন্দরে
করলে তোমায় অধোগামী!

কত কেঁদে গেছি তোমার দ্বারে
প্রাণের দায়ে বারে বারে,
হয়নি দয়া অভাগারে
তাড়িয়ে দেছে তোমার স্বামী!

ওই যে বেঁটে, ওই যে বোকা
দিয়েছিল আমায় ধোঁকা,
কে জানে গো লুটছে খোকা
ওরাই মজা দিবাযামী!

—ভগবান করেন, ও বেটাদের চুরীটাও ধরা পড়ে যায়!… এই যে ওঁরা এসে পড়েছেন দেখছি! একেবারে নাম করতে না করতেই, অনেক দিন বাঁচবে—

—হ্যাঁঃ, তা নইলে এ রাজ্যটাকে দেউলে করবে কারা?…

* * * *

এই যে,—আসুন! আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক্—প্রণাম হই দেওয়ানজী মশাই, নমস্কার কোষাধ্যক্ষ মশাই!

দেওয়ানজী ও কোষাধ্যক্ষ নিঃশব্দে প্রতি নমস্কার ক'রলেন। তাঁদের মুখ আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো অন্ধকার!

একটু পরে কোষাধ্যক্ষ বললেন—যন্ত্ররাজ, বড় বিপদে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হ'য়েছি! জানেন তো, প্রজাদের শিল্পশালার দরুণ প্রায় তিরিশ লক্ষ

দেওয়ানজী—উপায় যা হোক্ একটা কিছু করতেই হবে, তোমাকে সে জন্যে আমি একলক্ষ টাকা দেবো!

কোষাধ্যক্ষ—আর খাতাপত্র ঠিক থাকলেই বা কি হবে? আমরা তো রাজকোষের হিসাব-নবীশকে মোটা টাকা ঘুস্ দিয়ে হাত করিছিলুম; কিন্তু তাতেই বা রক্ষে পাচ্ছি কই? এদিকে শুভঙ্কর যে তোমাদের 'সেতু'টা স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে দেখতে আসছে যন্ত্ররাজ!

যন্ত্ররাজ—এই দেখুন দেখি! এই বিপদের উপর আবার



আসতে আজ্ঞা হোক্!

টাকা রাজকোষে জমা ছিল, মহারাজ শুভঙ্করকে বলেছেন সেই টাকাটার একটা ব্যবস্থা কর'তে, শুভঙ্কর সেই টাকার খোঁজ করাতে আমরা তাকে ব'লেছি যে সে টাকাটা যন্ত্ররাজের হাতে দেওয়া হয়েছে তাঁর লাভবান স্থাপত্য ব্যবসায়ে সেটা নিয়োগ করে মূলধনের সঙ্গে রাজ্যেরও আয় বৃদ্ধি করবার জন্য!

যন্ত্ররাজ—সর্ব্বনাশ! এ ক'রেছেন কি? আমার খাতা-পত্র সব কেতা দোরস্ত রাখা হ'য়েছে, তার মধ্যে ওই তিরিশ লক্ষ টাকার জমাখরচ তো আর ঢোকাবার উপায় নেই!

এক বিপদ আপনারা ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন! আপনাদের—ইচ্ছে কি তবে আমাকেই ফাঁসানো?—

কোষাধ্যক্ষ—মোটেই না, বরং আপনাকে বাঁচানো এবং সেই সঙ্গে নিজেরা বাঁচা—

স্থপতি—সেটা কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে তাতো আমার বোধগম্য হচ্ছে না!—

কোষাধ্যক্ষ—মাপ করবেন। আপনার মাথায় কেবল চুন সুরকী পোরা কিনা, তাই বুঝতে পারছেন না—আপনি

আজই রাজধানীতে সংবাদ পাঠান যে শোষণ নদীতে ভীষণ বন্যা হয়েছে, এবং সেই বন্যার বেগে সেতুটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে গেছে—

যন্ত্ররাজ—সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

দেওয়ানজী—সে ভার আমার! রাজ্যের সমস্ত সংবাদ-পত্রে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে আমি ব্যবস্থা করিছি যে কাল-সকালে এই বন্যার শোচনীয় কাহিনী ও সেতু ভেঙে যাওয়ার বিবরণ প্রকাশ হবে!

কোষাধ্যক্ষ—দু' একখানি পত্রিকাতে ভগ্ন সেতুর চিত্র দিয়ে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছি!

যন্ত্ররাজ—এঁ্যা! বলেন কি? আপনারা দেখছি সব করতে পারেন! তাহ'লে তো শুভঙ্করকে কলা দেখাবার ব্যবস্থা বেশ ভালরকমই হয়েছে! ওঃ বলিহারি যাই আপনাদের বুদ্ধি!

দেওয়ানজী—এ-সব কি আর আমাদের মাথায় এসেছিল?—না আস্‌তো!—শুভঙ্করের আতঙ্কে আমাদের মাথা ঘুরে গেছল! এ সমস্তই মন্ত্রীমহাশয়ের প্যাঁচ!

স্থপতি—তাইতো বলি! পাকামাথা না হ'লে এমন গোড়া বেঁধে কাজ করতে জানে কে? মন্ত্রীমশাই স্বয়ং ছিলেন এই 'শোষণ সেতুর' জন্মদাতা! তাঁরই পরামর্শে একদিন এটার নিরাকার অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছিল! আজ আবার তিনিই তাকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর এই অকৃত্রিম ভক্তদের উদ্ধার ক'রলেন!

কোষাধ্যক্ষ—এখনও করেননি! তবে ক'রবেন, যদি যন্ত্ররাজ তাঁর জামাতাকে রক্ষা করেন!

যন্ত্ররাজ—কি করলে তিনি রক্ষা পেতে পারেন আমাকে আদেশ করুন, যদি অসাধ্য না হয় আমি অবশ্য প্রতিপালন করবো!

কোষাধ্যক্ষ—কালকে রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্রে সেতু ভেঙে যাওয়ার বিবরণের সঙ্গে এ খবরও থাকবে যে যন্ত্ররাজ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে সেতুটি রক্ষা ক'রতে গিয়ে বন্যাপ্লাবনে কোথায় যে ভেসে গেছেন, তার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না! বন্যায় দেশবাসীর এবং বিশেষ করে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের কাছারী-বাড়ীটি একেবারে নদীর তীরে স্থাপিত থাকায় বন্যার প্রথম বেগেই তা ধ্বংস হ'য়ে গেছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের বহুমূল্যবান কাগজপত্র হিসাবের বই খাতা ও রাজকোষের প্রায় অর্দ্ধ-কোটী টাকা ক্ষতি হয়েছে!

স্থপতি—চমৎকার! চমৎকার! দিন—পায়ের ধুলো দিন! কী মতলবই ভেঁজেছেন! বলিহারী! বাঃ!

কোষাধ্যক্ষ—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাকে অপ-রাধী করবেন না! এ সমস্তই সেই মন্ত্রী মহাশয়ের সুব্যবস্থা—

যন্ত্ররাজ—সুব্যবস্থা কি করে বলি বলুন! আমাকে যে একেবারে বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন!···হ্যাঁ, কোথায় ভেসে যেতে হবে? আর কি ফিরে আসবার সম্ভাবনা থাকবে না?—

দেওয়ানজী—বিলক্ষণ! আপনার সন্ধানের জন্য রাজ-কোষ থেকে লক্ষটাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে! চারিদিকে লোক ছুটবে! কেবল শুভঙ্কর এ রাজ্য থেকে বিদায় না নেওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে একটু আত্মগোপন ক'রে থাকতে হবে! যেখানে গিয়ে আপনার থাকতে ভাল লাগে সেই-খানেই থাকবেন। কিন্তু কেউ টের না পায়! আপনার খরচপত্র বাবদ আগাম আপনাকে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি···তারপর শুভঙ্করের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্ত্রীই প্রথম রাজ-সরকারে আপনার সন্ধান দেবেন, দিলেই, ওই লক্ষটাকা পুরস্কারও আপনার ঘরেই গিয়ে উঠবে!—

যন্ত্ররাজ বাহবা! দাদা বাহবা! ভগবান আপনাদের শ্বশুর জামাতাকে দীর্ঘজীবী করুন! আমি আজই বন্যায় ভেসে চললুম!

* * * *

এই সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে কোটাল প্রভু এসে হাজির হ'লেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সকলের হাতে হাতকড়ী দিয়ে বন্দী ক'রে ফেললেন!

দেওয়ানজী রোষকষায়িত নেত্রে জিজ্ঞাসা করলেন—কার হুকুমে তুমি আমাদের বন্দী করতে সাহস ক'রছো কোটাল?



দোহাই, কোটাল প্রভু! আমার কোনও দোষ নেই

কোটাল—(সবিনয়ে) আজ্ঞে রাজ-আদেশে দেওয়ানজী! আপনাদের সমস্ত কীর্ত্তি-কলাপই যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে! শুভঙ্কর এসে—যন্ত্ররাজের 'শোষণ-সেতু' থেকে আরম্ভ করে আপনার ঐ শিল্প-শালার ও অন্যান্য কারবার বাবদ রাজকোষের যা কিছু টাকা চুরি—সমস্তই গোপনে সন্ধান ক'রে ধরে ফেলেছেন!

কোষাধ্যক্ষ—(সকাতরে) দোহাই, কোটাল প্রভু! আমার কোনও দোষ নেই, সব ঐ মন্ত্রীমশাই আর দেওয়ানজী মশাইয়ের কাজ!

যবনিকা।

বাঙ্গালী যুবকের সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্, বি-সি-এস্, এম-আর-এ-এস্

সারা বাঙলার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া বাইসিক্লে ভূ-প্রদক্ষিণ মানসে যে চারিজন বাঙালী যুবক (বিমল মুখার্জ্জি, অশোক মুখার্জ্জি, আনন্দ মুখার্জ্জি, মন্মথ বসু) ১৯২৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর টাউনহলের জয়ধ্বনির মধ্যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গত ৮ই আগষ্ট নিরাপদে য়্যাঙ্গোরা পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হইতে করাচীর পথে তাঁহাদের বিপদ ও সম্বর্দ্ধনার সে এক বিচিত্র কাহিনী। করাচী হইতে ষ্টীমারযোগে বসরা ও তৎপরে বরাবর সাইক্লে বাগদাদ, সিরিয়া, আলেপ্পো, দোরীতোয়েল, আদানা ও য়্যাঙ্গোরা।

বিমলের পত্রে জানিতে পারিলাম, বসরা হইতে বাগদাদ (৫ শত মাইল) পৌঁছিতে ৯ দিন লাগিয়াছিল—সারাপথ সাইক্ল চলে নাই, অনেকটা হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। আরবেরা দেখিতে সুন্দর; কিন্তু বড় নোংরা। নদীর ধারে বাস, অথচ স্নানের ভক্ত নহে। ধনীরা ব্যয়সাধ্য Turkish Bath উপভোগ করিয়া থাকেন। পথিমধ্যে Ctesiphon, Tree of knowledge, Ezra's Tomb বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; টাইগ্রিস নদীতীরে উক্ত সমাধির High Priest ইঁহাদের বিশেষ আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন—অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়াছিলেন।

ইরাকের লোকেরা খুব ফ্যাসনেবল্—সৌখিন। বর্ণ কাঞ্চনগৌর। বোরখা বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহাদের নারীসমাজ পাশ্চাত্য short skirtএ ("পরশুরামে"র কথায় দেড়হাতি গামছা!) মনোনিবেশ করিয়াছে। বাগ্দাদের Indian Association (ভারত সভা) এই চারিজন সাইক্লবিহারীকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। পথে ইঁহারা দুরন্ত বেদুইন রাজ্যে পড়িয়া আশার অতীত সাহায্য ও আনন্দ পাইয়াছিলেন। তাহাদের কুটীরে বাস, তাহাদের ঘোটকা-



বালির ওপর সাইকেল ঠেলে যখন চলেছি

রোহণ, তাহাদের সহিত একত্র কফি খাওয়া ও একত্র ফটো তোলার বিচিত্র বিবরণ একান্ত উপভোগ্য।

৭ই জুন আলেপ্পো পৌঁছিয়া ইঁহারা "সমস্ত কষ্টের শোধ তুলেছে ভাল হোটেলে দুটি দিন পুরো ঘুমিয়ে।" "আলেপ্পো



বেদুইনদের সঙ্গে একরাত্তির



শিরিয়ার একটি দৃশ্য

"বেদুইনের সহিত একরাত্রি" ও "বেদুইনের কফির ডাড্ডায়" নামক দুইখানি ফটো হইতে ইহাদের আনন্দের রিমাণ পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

পথে অনেক কষ্ট হয়েছিল; জনমানবহীন প্রান্তরে পনের দিন একটা জায়গায় ব'সে থাকতে হয়েছিল—খাবার যোগাড় করতে খুব কষ্ট হোত। গাছপালা কোথাও ছিল না.

পশুপক্ষী ত নেই ই। মরুভূমির ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল—জল পাবার উপায় নেই, অথচ দারুণ গ্রীষ্মে জলতেষ্টার অভাব ছিল না; উটের মত অভ্যাস হয়ে পড়েছিল—আগে একপেট জল খেয়ে তবে যাত্রা সুরু।" যোধপুরের পর ক্রমে ক্রমে তিনটি মরুভূমি পার হয়ে তবে আলেপ্পোর দর্শনলাভ ঘটিল।

২৫।৬।২৭ তারিখে দোরীতুয়েল—তুর্কীরাজ্যের সীমান্তে প্রথম গ্রাম। আলেপ্পোর পর হইতে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশ বোঝা যায়। ভাষারও পরিবর্ত্তন অধিক নমাজ নিষিদ্ধ—একটা নূতন জীবন নূতনভাবে নূতন ছাঁদে গড়িয়া উঠিতেছে।

দোরীতুয়েলে ইহাদের বন্দুক ও রিভলভার তুর্কী পুলিশ কাড়িয়া লইয়াছে—কনষ্টান্টিনোপল পৌঁছিলে ফিরাইয়া দিবে।

তারপর আদানা। এইখানে পাশপোর্টের গোলযোগে প্রায় একমাস নজরবন্দীভাবে কাটাইতে হইয়াছে। সৌভাগ্যের, বিষয় কোন শারীরিক কষ্ট বা নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই।



কাফির আড্ডায় সৈনিকদের ঘাটিতে

হইল—এতদিন ইহারা আরবী ভাষায় কথা বলিয়াছিল, কিন্তু দোরীতুয়েলে তুর্কীভাষা ও আরবী ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণ।

তুর্কীতে আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নূতন লাগিয়াছিল হঠাৎ সবুজ মাঠ ও গাছপালার সমাবেশ। কামাল পাশার হুকুমে 'ফেজ' বাজেয়াপ্ত; সবাই হ্যাট পরে। সুন্দর রংএর উপর এই টুপি পরা দেখিয়া ইহাদিগকে ভারতীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণ থাকে না। বৃদ্ধেরা অনিচ্ছায় নাইট ক্যাপ পরিতেছেন—কামালপাশার নিয়মে এক ঘণ্টার

তারপর অ্যাঙ্গোরা—তুরস্কের নূতন রাজধানী। সবে মাত্র গড়িয়া তোলা হইতেছে। রাস্তার একান্ত অভাব, দুর্গম পার্ব্বত্য পথে সাইকেল ঘাড়ে করিয়া অনেক হাঁটিতে হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য। স্থানীয় পকার ভোজ্য বাঙালীর পক্ষে অখাদ্য। তাই ইহারা স্বপাক ব্যবস্থা করিয়াছে। জুলাই মাসে পর্ব্বতরাজি তুষারমণ্ডিত। উপত্যকায় চাষ হইতেছে। ক্ষুদ্র গ্রামগুলি পাহাড়ের সানুদেশে নীরবে ঘুমাইতেছে।

অ্যাঙ্গোরা হইতে ইঁহারা কনষ্টান্টিনোপলের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

হিতে বিপরীত

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

বার্টন কোম্পানীর আফিসের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বড় বাবু রমানাথ মজুমদার বলে উঠলেন, "ওরে, হাজরি কেতাব উঠিয়ে নিয়ে আয়।"

লেজার কিপার রমেন দত্ত সেই মাত্র হুড়তে পুড়তে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে সই করছিল; উড়ে বেহারা তাকে এক হাতে সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে চিলের মত ছোঁ মেরে খাতা তুলে নিলে। রমেন করুণ সুরে বল্লে, "দে-বাবা রত্না, আর্দ্ধেক নামটা লিখেছি, বাকি আর্দ্ধেকটাও লিখে ফেলি।"

রত্না মাথা দুলিয়ে বল্লে, "আরে না বাবু, দেরি হউচি তো বড় বাবুর কাছে যাও। তোমার জন্তে কি আমি গালি খাব? নেট করে আস কাঁই?"

রমেন রত্নার পিছু পিছু এসে বড় বাবুর কাছে মুখটা কাঁচু-মাচু করে দাঁড়াল। বড় বাবু হাজরি খাতায় লাল দাগ টানবার উপক্রম করে বল্লেন, "কি? আজও দেরি করে এসেছ? আজ নিয় তোমার তিন দিন হল মনে থাকে যেন। আর একদিন late mark হলেই পুরো একটী দিনের মাইনে যাবে, জানত?"

"আজ্ঞে আমার আজ দেরি কি হল, বলুন,—দশটাও বাজছে, আমি সই করছি,—রত্না বই কেড়ে নিয়ে এল। দেখুন,—আমার নাম আর্দ্ধেক লেখা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে"—

বড় বাবু ডেস্কের ভিতর থেকে নীল পেনসিলে "Babus are expected to be in their seats by 10 o'clock' (বাবুদের দশটা বাজবার আগেই নিজের নিজের জায়গায় বসতে হবে)—লেখা এক টুকরো কাগজ বার করে দেখিয়ে বল্লেন, "জোন্স সাহেবের হুকুমটা দেখছ তো? তোমাদের জ্বালায় আমার যে প্রাণান্ত হবার যোগাড় হয়েছে।"

রত্না উড়ে বড়বাবুর টেবিলের উপর দুই হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল, ট্যাক করে বল্লে, "আমিও সেই কথা বলি,—দেরি কর কেন? আমি যে সেই কোন্ ন'টার সোময় আস্‌ছি। বড়বাবু, সাহেবকে বোলে সব বাবুর ন'টায় আসবার আডার দেওয়াও। আমি ন'টায় আসতে পারি আর বাবুরা আসবে না কাঁই?"

এমন সময় ম্যানেজার সাহেবের খাস চাপরাসি সোনাউল্লা দরজার কাছ থেকে হাঁক দিলে, "বড়োবাবু, সাহেব তোমা বোলাচ্ছে, জলদি এসো—"

তাড়াতাড়ি উঠে রমেনের হাতে খাতা দিয়ে বড়বা বল্লেন, "যাও রমেন, সই করে কাজ করগে। রোজ রো এ রকম দেরি কোর না, কাঁহাতক আমি সামলাব জোন্স সাহেবকে জান ত? All these bearers an chaprasis are his informers." (যত চাপরাসী আ বেয়ারা, সব তার চর)।"

"আজ্ঞে আপনার অনুগ্রহ থাকলেই হল" বলে' রমে খাতা সই করে নিজের সীটে চলে গেল। বড়বাবু ততক্ষ সাহেবের ঘরে পৌছেছেন।

রত্না বল্লে, "বড়বাবু কুছ কামকা নেই,—বাবুদের সায়ে করতে জানে না।"

সতীশ টাইপিষ্ট একটু গরম হয়ে বল্লে, "তোর বড় বা বেড়েছে, না? মুখ সামলে কথা বলিস্। বেয়ারা আছি বেয়ারার মতন থাকবি।"

"মুখ সামলাতে হয় তুমি সামলো। আমাকে তু বলবার কে বট? ওঃ ভারি আমার টাইপবাবু। যা না, আমার নামে সাহেবের কাছে রিপোর্ট করতে, ম দেখবে এখন।"

রমেন সতীশকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, "রত্না, তোকে বাবু করে দিলে ঠিক-ঠিক কাজ হয়; হারে?"

"হয় তো। জান না, সেদিন সোনাউল্লা বল্‌ছি সাহেব গোসা হয়ে বড় বাবুকে বলেছে 'তোমার চেয়ে তো বেয়ারা ভাল কাম জানে'।"

এদিকে বড় বাবু সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখলেন, দু মাড়োয়ারী উপস্থিত। টেবলের উপর একরাশি কাপ টুক্‌রা (স্যাম্পল্) ছড়ান। বড় বাবুকে দেখেই সাহেব উত্তো

রে বলে উঠলেন, "Now look here র‍্যাম ন্যাট্, what lly ass that Sample Babu is! I can't make ut what has he done with ডিউয়্যান্ চ্যাড্স্ ıttings (ভাবার্থ:—দেখ রমানাথ, স্যাম্পল্ বাবুটা কি াধা, দেওয়ান চাঁদের টুকরো স্যাম্প্‌ল্‌গুলো সে যে কি রেছে আমি বুঝতে পারছি না)। (মাড়োয়ারিদের দিকে রিয়া) আপ্‌ বোলটা কাটিং আপ্‌ হিঁয়া পৌঁছে ায়াটা?"

"বাঃ—অপহিকো হাথ মে তো মর সাম্পিল্ ঔর কলর ড কার্ড উয়ো রোজ দে গিয়া; আপ্‌ মেরে সামনে ওহি াজ কি অন্দর রাখখা—"

সাহেব ড্রয়ার টানিয়া বড় বাবুকে বলিলেন, "You ar! Bring that man to me at once, I'll :k him (শুনছ তো? সে লোকটাকে এখনি আমার াছ নিয়ে এসো, আমি তাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ব)।"

বড় বাবু আস্তে আস্তে বল্লেন, "But sir, none of except your chaprasi সোনাউল্লা is allowed to ddle with your honour's desk (কিন্তু মহাশয়, াপনার চাপরাসী সোনাউল্লা ছাড়া আর কারুর তো ারর টেবল ঘাঁটবার অধিকার নেই)।"

সমস্ত শরীরের রক্ত মুখে জমা করে সাহেব টেবলে ঘুসি ।বল্লেন, "I don't want you to plead for him, ou. Go to your seat, and I know how to l with him (বাবু, আমি তোমাকে তার হয়ে লতি করতে বলি নি। যাও নিজের জায়গায়, ় যা শাস্তি দেবার তা আমি দেব)।"

বড় বাবু ফিরে এলেন। কষ্ট-ক্লার্ক প্রসাদদাস ঘোষ াসা করলে, "কি ব্যাপার রমানাথ বাবু, সাহেবের নি যে এখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল!"

"ব্যাপার আর কি,—দেওয়ানচাঁদ মাড়োয়ারির ার-কাটিংগুলো নিজে কোথায় রাখতে কোথায় রেখে দরকারের সময় খুঁজে পাচ্ছে না, কাজেই তাদের র আর কি বলবে, ধীরেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে হচ্ছিল। (ধীরেনকে শশব্যস্তে উঠে আসতে) ভয় নেই হে, কিছুই হবে না, দেওয়ানচাঁদও যাবে, নিজেও চুপ হয়ে যাবে এখন। (চুপিচুপি —নিম্নস্বরে) ঐ সোনাউল্লাটা নিশ্চয় এর ভেতর আছে। দেখনি, দেওয়ানচাঁদের সরকার এলেই তার সঙ্গে সলাপরামর্শ, ফুস্‌ফুস্, গুজগুজ চলতে থাকে! নিশ্চয় টাকা খেয়ে ও—বেটা সই-করা কাটিংগুলো সরিয়ে দিয়েছে, এখন দেওয়ানচাঁদ সিপমেণ্ট স্যাম্পলের রঙ ওদের ইনডেণ্টের মতন হয়নি বলে নির্ঘাৎ পাঁচ পার্সেণ্ট অ্যালাউয়েন্সের জন্যে চেপে ধরবে! মাড়োয়ারির বাচ্ছা কি কম!"

বুককিপার হরিপদ সান্যাল বল্লে, "মরুক গে যা খুসি করে,—আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে দরকার কি। কিন্তু আমাদের পূজোর মাইনের দরখাস্তটা আজই দেবেন তো? দেখুন, ওতে একটু অদল-বদল করে দিলে হয় না? সেপ্টেম্বরের শেষে তো দেড়মাসের মাইনে যেমন চিরকাল পাওয়া যায় মিলবে। কিন্তু ঐ যে আধ মাসের মাইনেটা আগাম দিলে, সেটা অক্টোবরের মাইনে থেকে পুরোপুরি না কেটে, অক্টোবর নভেম্বরে দু কিস্তিতে কাটলে সুবিধে হয় না?"

হরিপদর প্রস্তাব শুনে অনেকেই উঠে এল। রেকর্ড ক্লার্ক শিবু ভট্টাচার্য্য বল্লে, "হাঁ—বড়বাবু, ওটা deduct ঐ রকমেই করবার কথা লিখে দরখাস্তটা এবার দিন।"

"তবেই হয়েছে। সেই আশাতেই থেকো তোমরা! প্রত্যেক বছর এই advance pay'র দরখাস্ত যায় আর আমার বুক ধড়ফড় করতে থাকে—বুঝি বা এতদিনের Privilegeটা বন্ধ হয়। তার উপর আবার ঐ সব Favour চাওয়া,—জোন্স সাহেবের কাছ থেকে,—গেছি আর কি। ছেলেমানুষ তোমরা, পূজোর আর খরচ কি তোমাদের। দেড় মাসের মাইনে না পেলে আমায় চোখে অন্ধকার দেখতে হবে:—তিন-তিনটে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী তত্ত্ব করা কি অমনি হয়—"

টাইপিষ্ট সতীশ মিনতি করে বল্লে, "দিন, বড়বাবু, দরখাস্তটা বার করে, আমি বদলে ফের টাইপ করে দিই। ঐ রকম হলে বড়ই ভাল হয়।"

"আচ্ছা সবাই বলছ, নে যাও; কিন্তু শেষ তাল সামলাতে বাপু আমি পারব না। শেষে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন না হয়।"

দরখাস্ত নূতন করে টাইপ করা, সই করা হয়ে গেল। সাহেব টিফিন খেতে বেরিয়ে যাবার পর, বড়বাবু আস্তে আস্তে দরখাস্তখানা সাহেবের টেবলে চাপা দিয়ে রেখে এলেন।

সোনাউল্লা ঝাড়ন দিয়ে টেবল ঝাড়ছিল, বল্লে. "ওটা বুঝি তোমাদের তন্‌খার পিলিক্‌সান্? দেখ বাবু, সাহেব হুকুম দেচে—সাহেব না থাকলে যদি ঘরে ঘোস, আমার সামনে ঘুসবে। আমি যদি না থাকি তো এসো না যেন।"

পেটের দায়ে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার অন্ত নেই; বড় বাবুও তাই নিঃশব্দে সবই হজম করে নিজের সীটে এসে বসলেন।

সওয়া পাঁচটা বেজে গেছে। অন্য দিন বাবুরা এতক্ষণ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন; আজ আর কারো গা নেই; দরখাস্ত মঞ্জুর না দেখে আর কারো উঠবার ইচ্ছে নেই। সাড়ে পাঁচটার পর সোনাউল্লা সাহেবের সই-করা একরাশি চিঠিপত্র আর দরখাস্তখানা বড় বাবুকে দিয়ে গেল। সবাই তখন বড়বাবুর ডেস্ক ঘিরে দাঁড়িয়ে।

বড় বাবু দরখাস্ত তুলে দেখলেন, নীল পেনসিলে বড় বড় করে লেখা "Granted" (মঞ্জুর)। তখন সেই আধ-পেটা-খাওয়ার উপর সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে পাংাস মুখগুলোয় হাসি ফুটল।

সতীশ বল্লে, "সাহেব বাইরে যেমনই হোক, ভেতরে লোক খুব ভাল।"

রমেন বল্লে, "যতই হোক না, মানুষ তো, আমাদের অভাবগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।"

শিবনাথ বল্লে, "কাজের জন্যে যে ভাড়া দেয়, সে তো দেবেই। ব্যবসা করতে এয়েচে, কাজ ফাঁকি দিলে তো চলবে না।"

ধীরেন বল্লে, "আর তা ছাড়া এটা গরম দেশ কি না, তাই মেজাজটা চড়ে ওঠে চট্ করে। এটা বিলেতের মতন ঠাণ্ডা হলে ও রকম হোত না।"

প্রসাদ বল্লে, "দেখুন, এক কথাতেই হয়ে গেল; আর রমানাথ বাবু কি না রাজি হচ্ছিলেন না। আমাদের কিন্তু এ নিয়ে একটা Special thanks দেওয়া খুব উচিত। চলুন, রমানাথ বাবু, সবাই মিলে গিয়ে দাঁড়াই;—আপনি সকলের হয়ে thanks দেবেন।"

বড়বাবু ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, "চিরকাল তো বাবু লিখে thanks দেওয়া হয়েছে,—এবার আবার এ-সব ফন্দি কেন?"

পরিতোষ বল্লে, "এমন kind master এর কাছে যেতে ভরাচ্ছেন, মশাই, special favour এর জন্যে special thanks না হলে মানাবে কেন?"

ক্যাসঘর থেকে খবর পেয়ে কেসিয়ার রজনী হালদার এসে এক-গাল হেসে বল্লেন, "পাস হয়েছে তো? দিন রমানাথবাবু, নিয়ে যাই।" Special thankএর আলোচনা শুনে বল্লেন, "তা সবাই গেলে মন্দ হয় না; সাহেবকে honour করলে, সে খুসিই হবে এখন। চলুন রমানাথবাবু, উঠুন,—আর দোনামোনা করে দেরি করবেন না, আবার বাড়ী ফিরতে হবে তো।"

দিনের কাজ শেষ করে সাহেব সোনাউল্লাকে কাগজ গোছাবার হুকুম দিয়ে পাইপ ধরাচ্ছিলেন,—বড়বাবু আর কেসিয়ারবাবুকে অগ্রণী করে বাবুর দল এসে উপস্থিত।

চোখ-মুখ পাকিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "What brings you all here like a herd of black buffaloes, Babu? (এক দল কালো মহিষের মত তোমরা এখানে সব কি করতে এসেছ?)"

বড়বাবু এগিয়ে এসে বল্লেন, "Sir, we have come to thank your goodself for the special favour granted to us this year in connection with the usual puja advance (মহাশয়, আপনি যে এবার আগাম মাইনে সম্বন্ধে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আমরা হুজুরকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি)।"

"Special favour? What nonsense are you talking র‍্যামন্যাট্? Is there anything new in that dirty application (বিশেষ অনুগ্রহ? কি পাগলের মত বকছ রমানাথ? ঐ নোংরা দরখাস্তখানাতে কি নতুন কিছু লিখেছ না কি?) (কেসিয়ার বাবুর হাতে দরখাস্তখানা দেখ্‌তে পেয়ে) Let me see it র‍্যাজনী (দেখি রজনী)।" (পড়তে পড়তে) "No—of course not. I didn't notice all this when I signed. How dare you send me such a silly proposal? And it is a dirty trick you have played. You pay the penalty for this Babus—no advance in wages will be granted to you henceforth (না, একেবারেই না। আমি এ-সব লক্ষ্য না করেই সই করেছিলুম। কোন্ সাহসে তোমরা এ-রকম প্রস্তাব আমার কাছে করতে পার? কোন

সাহসে আমার উপর এমন জঘন্য চাল চালতে চেষ্টা করেছ ? এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। এবার থেকে আগাম মাইনে দেওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল)।”

হতভম্ব বাবুর দলের সামনে দরখাস্তখানা সাহেব যখন ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেললেন, তখন পিছনে দাঁড়িয়ে সোনাউল্লা বাবুদের একচোখ দেখিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল।

“Now clear out—don't suffocate me with your bad smell (এখন সব বেরোও এখান থেকে, তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে)।”

শরৎ-বরণ *

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রথম শিশির-স্নাত সুনির্ম্মল ধরণীর কোলে
যেদিন আসিলে তুমি, ঝরে-পড়া শেফালীরে দ'লে,
সেদিনও ব্যাকুল হ'য়ে কোটী মৌন যাত্রী সেই পথে
মনের মানুষ কোথা—খুঁজিয়া ফিরেছে মনোরথে !

কে জানে সে কত যুগ যে বারতা হেথা সংগোপনে
গুপ্ত ছিল নিশিদিন ভাষা-হীন মানবের মনে,
যে কথা বলিতে চেয়ে চিরদিন নর-নারী হিয়া
নিজ অক্ষমতা স্মরি উঠেছিল সরমে রাঙিয়া !

সেই নিরুপায় দেশে তুমি এসে দিয়েছ' হে আশা
শুনায়েছো কণ্ঠে তব অকথিত অন্তরের ভাষা
যৌবনের স্বপ্ন রাজ্যে কামনার যে রহস্যধনি
গরল-আধার বলি এতকাল এসেছিনু গণি

তুমি ঘুচায়েছো আজ সেই ভুল, সেই মিথ্যা ভয়,
দেহের দেউল নহে লালসার পঙ্কিল-নিলয়,
আছে, আছে—তারি মাঝে জীবনের আনন্দ-বিগ্রহ !
বিষ-বিভীষিকা ভ্রমে বৃথা করি অমৃতে নিগ্রহ !

দেখায়েছো তুমি আজ পরিপূর্ণ নারীত্বের ছবি,
তোমার নবীন সুরে থেমে গেছে অকাল-পূরবী !
মোদের অঙ্গনে তব মনীষার কিরণ সম্পাত
এনে দেছে কোজাগরী শুক্লানিশি, শারদ প্রভাত !

অন্তর্লোকের ঋষি, তপঃসিদ্ধ তব মন্ত্রোদক
বিকশিত করিয়াছে শতদলে মানস কোরক,
তোমার সাধন লব্ধ সত্য আজ হ'য়েছে প্রচার,
মানুষের বন্ধু তুমি, তব পদে নমি বার বার !
তোমারি আলোকে আজ তোমারে চিনেছি অকস্মাৎ,
অসামান্য রস-শিল্পী, লহ শ্রদ্ধা, লহ প্রণিপাত !

---

* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে শিবপুর সাহিত্য সংসদ্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মিলনে পঠিত।



কথা, সুর ও স্বরলিপি :— শ্রীসাহানা দেবী

সিন্ধু কাফি—৫

কাটে না দিন্ আর একাকী।
তোমার লাগি রয়েছি জাগি'
(তোমার) আসতে সময় হয় না কি !

তোমা যে মোর প্রদীপ জ্বালা, তোমার তরে গাথনু মালা
সাজানো সারা, বরণ ডালা (এখন) শুধু তোমার আসা'র বাকি !

আছে পূজার সব আয়োজন (শুধু) বাকি তোমার চরণ পতন,
এসো আমার মরম-মোহন ! (আমি) বাঁধি তোমায় হৃদয় রাখী !

বারে বারে এমনি বৃথায় (বল) যাবে লগন শুধু হেলায় ?
বঁধু তব আসা'র আশায় আর কতকাল দেবে ফাঁকি !

॥ ॥ গা গা | -া গা | গমপা মপমা | গা মা | রগা -া | রা গা |
কা টে - না দি - - - ন্ আ - - র্ এ
মা পা | -া -া |
কা কী - -

মা ধা | -া ধা | ণধা ণা | পা -া | -া পা | পা পধণর্সা | ণর্সণা ধা |
তো মা র্ লা গি - - - - র য়ে ছি - - জা
পা মগা | মা পা | র্সা -া | ধর্সণা ধপা | মা গা | গা -া | গা গমা |
গি তো- মার্ আ স্ - তে - - স ময় হ য় না কি

২´ ৩ ০ ১´ ২´ ৩
পধা পধা | পমা গমা | পমা পমা | গরা গমা | গমা গরা | সা -া | II II

II { [গা গমা পমা গমা গা রা] ৩ ০ ১
গা মগা | মা গা | রা -া | -া রা | গপা ধা | পধমর্সা ধনা |
হো ল - - যে মো র্ - প্র দী প্ জা লা - - - -
আ ছে - পূ জা র্ - সব আ য়ো জ - - - ন্
বা রে - - বা রে - - এ ম্ নি র্ পা - - - য়

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
-া -া | পা না | না র্সা | র্সা না | র্সনা র্সধা | ধা না |
- - ও গো তো মার্ ত রে - - গাঁথ মু
- - শু ধু বা কি তো মা - -র চ রণ্
- - ব ল যা বে ল গ - -ন্ শু ধু

০ ১ ২´ ৩
[পধা | নর্র্ সনা | ধপা মগা | -া -া |] ০
ণা ধণর্সা | -া ণর্সণা | ধা পা | মা গা | } মা ধা |
মা লা - - - - - - - সা জা
প ত - - - - - - ন্ এ সো
হে লা - - - - - - য়্ ব ধু

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
-া ধা | ণধা ণা | পা -া | -া পা | পা পধণর্সা | ণর্সণা ধা | পা মগা |
নো সা রা - - - - - - ব র - - - ণ ডা লা এ -
আ মা - - - - - র্ - ম র - - - ম্ মো হন্ আ -
ত ব - - - - - - - আ সা - - - য়্ আ শা -

মা পা | র্সা -া | ধর্সণধপা মা
থন্ শু - - ধু - - তো
মি বাঁ - - ধি - - তো
য়্ আ - য্ ক - - ত

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
গা -া | গা গা | গা গমা পধা পধা | পমা গমা | পমা
মা য়্ আ মার্ বা কি- - - - - - - - - - -
মা য় হৃ দয় রা খী
কা ল্ দে বে ফাঁ কি

১ ২´ ৩
পমা | গরা গমা | গমা গরা | সা -া | II II
- - - - - - - -

শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৬)

অজিত ও মনোরমা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা তাঁহাদের মনেও নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয় রব তিনি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া উর্দ্ধভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন, অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল-জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া,—কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসৎ পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেম্নিই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন কিছুই দেখিতেছেনা,—কিছুই শুনিতেছেনা। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কতদূরেই যেন চলিয়া গেছে।

আশুবাবু শুধু বলিলেন, বোস। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিম্বা বসিল কি না সে দেখিবার সময় পাইলেননা।

অবিনাশ বোধকরি অক্ষয়ের যুক্তি-মালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক্, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্ব্বলের মত শাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা,—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিলনা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটিও ছিলনা,—জানি ত সব,—কিন্তু এ কথা উনি ভাবতেই পারলেননা তাঁর মৃত স্ত্রীর যায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন. এখন এ আলোচনা থাক্।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিলনা,—সেই উদাস শান্ত চোখ দুটির অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিলনা, জানিবার চেষ্টাও করিলনা।

কমল কহিল, ও—এম্‌নিই। তোমার বাড়ী যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়ীটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইলনা,—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া,—যেন দেখিতেও পায়না, শুনিতেও পায়না।

অবিনাশের দেরি সহিতে ছিলনা, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে। তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেননা, কহিলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবেনা। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুমতি দিচ্চি তুমি বলো।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি

ভালবেসেছি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝ্‌তে পার্‌চি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, বলিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠা বোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশুবদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ, কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেছ, আরও দিন দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল,—এসব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এই জন্যেই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বল্‌তে বাধচে যে নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেননা, কিন্তু কি মানেন একটু শুন্‌তে পাই কি ?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায়না, দুঃখ দেওয়াও যায়না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই কথাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ লালন করে জীবন যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু যেন আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায় কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবা জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানোনা ?

কমল বলিল, না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায়না আশুবাবু। এই ভাবে এ দেশের বৈধব্য-জীবন কাটে এই কথা বলুন। বলুন একটা মিথ্যে বস্তুকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে, এসব আমি স্বীকার করে নেবো।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে,—না থাক্‌, ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর তুলবনা,—কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবন-যাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্য্যাদা দেবনা ?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্য্যাদা পেয়ে পেয়ে এম্‌নি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে তার আর স্থান কাল কারণ অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশি নয় এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয় আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ করে দিতে হয়।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি ?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না ?

কমল জবাবও দিলনা, রাগও করিলনা, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেননা তিনি আশুবাবু। অথচ, কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সব চেয়ে বেশি।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ সব কদর্য্য ধারণা আমাদের ভদ্র সমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেম্‌নি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্র সমাজে অচল হয়েই ত আছে।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল। পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্যে বল্‌ছিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারি নে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েছি মানি, কিন্তু

সেদিন ত বুড়ো ছিলামনা। কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারিনি।

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো-মন নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। সেই বুড়োর শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত-যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো মন খুসি হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ। হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই,—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্ব-কথা। তার কত রকমের কত ভালো ভালো বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ ক'রে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দ-লোকের বিসর্জ্জনের বাজনা এ কথা সে জানতেও পারেনা।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়া প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া উন্মাদ-যৌবনের এই নির্লজ্জ স্তব-গানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও সহসা কেহ খুঁজিয়া পাইলেননা।

তখন আশুবাবু মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে। এ সত্যিই সেই কিনা।

কমল কহিল, মনের বার্দ্ধক্য আমি তাকেই বলি, আশুবাবু, যে মন সম্মুখের দিকে চাইতে পারেনা, যার অবসন্ন জরা-গ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই,—অনাগত তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অর্থহীন। অতীতই তার সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ তার বেদনা,—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকি দিন ক'টা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময় মত একবার দেখবো বই কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিলনা, বলিয়া উঠিল,—আমার একটা প্রশ্ন,—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস্ কিসের জন্যে? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না!

অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল,—না না, সে কি,—সে কেমন ধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমন ধারা নয়। বাপ মা আমার নাম রেখেছিলেন আমাকে ডাকবার জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা,—তাই বলে যদি আমি ডাকি আপনি রাগ করেন না কি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, রাগ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন, আশুবাবু ত কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয় কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায় বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না, রাজারা তাদের নামের আগে-পিছে কতগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে কতগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়। নইলে তাদের গৌরব হানি হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এই যেমন ইনি। কখনো কমল বলতে পারেননা,—বলেন শিবানী। অজিত বাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাও ছোট বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ, আমি ত বুঝ্ব বই।

কিন্তু কি যে হইল এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিলনা, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া হেমন্তের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে সুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েছেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, শিবনাথ নয়, উনি। এই বলিয়া তিনি একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করাবার জন্তে যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বসিয়া বার দুই তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন ?

অক্ষয় বলিলেন, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞেসা করি,—শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু, শিবনাথ বাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল ?

আশুবাবু মুখ কালীবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু ?

অবিনাশ কহিলেন, আপনি কি ক্ষেপে গেলেন ?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট !

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাসার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু ? আমি বল্‌চি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা' নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বল্লেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়,—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন, বিবাহ হ'ল শৈব মতে। আমি বোল্‌লাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈব মতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাব্‌বার কি আছে !

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব-বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলেনা কি না, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িতে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন ?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিলনা, তেমনি উদাস গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট ! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাবো তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে ? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুট্‌বেনা না কি ?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবেনা। আমি আত্মহত্যা করতে যাবো এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেননা।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গীতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার আর আমি যাবো তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে ? ধর্ম্ম যাবে আর তার অনুষ্ঠানের দড়ি দিয়ে ওঁকে বেঁধে রাখবো ? আমি ? আমি কোরব এই কাজ ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল !

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানি, সংসারে ধর্ম্ম সত্য বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়, এ কথাটি ভুলোনা।

কমল বলিল, ভোলবার যো নেই ত। এই যেমন প্রাণও সত্য দেহও সত্য,—কিন্তু প্রাণ যখন যায় ?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারি হিম পড়বে, এখন না উঠ্‌লেই যে নয়।

এই যে মা উঠি।

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানি, আর দেরি কোরোনা, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল যেন কেবল তর্ক করবার জন্তেই। কিছু মনে করবেননা।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে, শিবানি, শিখলেনা কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চেনা তো।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইলো। পারো যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো-মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই। চল।

এই বলিয়া তাঁহারা পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আশুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য্য !

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺রামপ্রাণ গুপ্ত



৺রামপ্রাণ গুপ্ত

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, প্রবীণ সাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের অধিবাসী ছিলেন এবং অঋণী অপ্রবাসী হইয়াই সমস্ত জীবন সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনও তিনি নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু বিধাতার কি বিধান, তিনি তাঁহার সেই প্রিয় জন্মভূমিতে দেহরক্ষা করিতে পারেন নাই। শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই খানেই অকস্মাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। রামপ্রাণ বাবু নীরবে পল্লীভবনে বসিয়া জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন; মোগল যুগের ইতিহাসের আলোচনাতেই তিনি বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার রিয়াজ-উস্-সালাতিনের বঙ্গানুবাদ, তাঁহার হজরত মহম্মদের জীবন-কথা, তাঁহার পুরাতন হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন; নির্জ্জনবাসই তাঁহার প্রিয় ছিল। ঢাকা নগরীতে যেবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেবার রামপ্রাণ বাবু ইতিহাস শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকের পরলোকগমনে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

প্রচ্ছদ-পট-পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী গ্রামে বশিষ্ঠ দেবের বংশে ১২৩৭ সালের ২৮শে ভাদ্র মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে চারি পুত্র রাখিয়া যান। বিমলা দেবী ও হরমোহিনী দেবী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নী বিমলার গর্ভে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম হয়। তারাচরণ তর্করত্ন ও অন্নদাচরণ তর্কভূষণ নামে তাঁহার আরও দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। হরমোহিনীর গর্ভে অভয়াচরণ

বিদ্যারম্ভের জন্ম হয়। তারাচরণ তর্করত্ন ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীনরেশের সভাপণ্ডিতরূপে ৺কাশীধামে বাস করিতেন। তিনি কাশী পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। অভয়াচরণ ও অন্নদাচরণ স্মৃতিশাস্ত্রে উপযুক্ত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদরগুলি ইঁহার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া উনবিংশ বর্ষ বয়সে ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক যদুরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিচার-সভায় ইঁহাকে দেখিলে অনেক জিগীষু পণ্ডিতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশের আটজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপককে ঐ উপাধি দ্বারা প্রথমে ভূষিত করেন। জয়পুরের মহারাজ, হাতুয়ার মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপসাহী প্রভৃতি ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ইনি ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে কাশীধামে গিয়া বাস করেন। হাতুয়ারাজ ইঁহার কাশীবাসের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিতেন। কাশীধামেও ইনি ছাত্রবৃন্দকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দান করিতেন। ইনি অদ্বৈতবাদখণ্ডনম, মায়াবাদনিরাসঃ, তত্ত্বসারঃ, শক্তিবাদরহস্যপ্রকাশঃ, গদাধরন্যূনতাবাদঃ, বিধবোদ্বাহখণ্ডনম্, জীবতত্ত্বনিরূপণম্, প্রভৃতি অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনেক দ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ইঁহার অদ্বৈতবাদখণ্ডনের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইহা দর্শনের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরে বারাণসীস্থ দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের বহু চেষ্টায় উহা পাঠ্য-তালিকা হইতে অপসারিত হয়। ১৯১৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারিগণের জন্য বার্ষিক এক শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলে ইনি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বারাণসীস্থ সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট নতমস্তক ছিলেন। ইনি সুরসিক, অমায়িক ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি কবিত্বপূর্ণ ও সরস। বাঙ্গালাতেও ইনি অনেকগুলি লালিত্যপূর্ণ পদ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবনে শোকের নিদারুণ আঘাত বিস্তর পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে শোক তাঁহার মহৎ হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়. জ্যেষ্ঠা কন্যা নবম বর্ষ বয়সে বিধবা হয়। ৭০ বৎসর বয়সে পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশেষে ১৩১৩ সালে একমাত্র পুত্র হরকুমার শাস্ত্রী পরলোক গমন করেন। পুত্রের মৃত্যুকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় অবিচলিত হৃদয়ে তাহার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অটল গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেন। ১৩২১ সালে ৩০শে কার্ত্তিক এই ঋষিতুল্য পণ্ডিত-চূড়ামণি কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে ইনি আপনার সমগ্র সম্পত্তি গৃহদেবতার নামে অর্পণ করিয়া যান। বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভবসুন্দরী ও কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী প্রণীত কবিতা-গুচ্ছ "অংশু"—মূল্য ৸৹

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সেকালের সৎকথা"—মূল্য ১।৹

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন"—মূল্য ২।৹

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নবপদ্ধতি সেতার শিক্ষা"—মূল্য ৸৹

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "হালুম বুড়ো"—মূল্য ।৶০

শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মুস্কিল আসান" (সচিত্র) ; মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত স্বরলিপি সংগ্রহ "ভোরের পাখী"—মূল্য ৸৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.



সাধু হরিদাস

শিল্পী— শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ



অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালার সঙ্গীত

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম-এ

বাঙ্গালা দেশ যে একদিন কাব্য ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যে কাব্যসম্পদ্ রহিয়াছে, তাহার তুলনা অন্য কোনও প্রদেশেই পাওয়া যায় নাই। এই কাব্য-সম্পদের প্রভাবেই বাঙ্গালা ভাষা অচিরকালের মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীশালিনী হইয়া জগতের দরবারে গৌরবমণ্ডিত আসন লাভ করিয়াছে। ভাবের বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিতে মানব যে চেষ্টা করে, তাহা হইতেই ভাষার সৌষ্ঠব বাড়ে। বাঙ্গালা ভাষা যতই নূতন হউক, ইহার মধ্যে দেখিতে দেখিতে ভাবের বান ডাকিল। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, পৌরাণিক—নানা ভাব বাঙ্গালা ভাষার সীমা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া দিল। ভাষার তরল বক্ষে বিচিত্র ভাবরাশি কলকল্লোল তুলিল। সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষার দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল।

বাঙ্গালা কবিতার অবস্থা আজ-কাল যাহাই হউক, পূর্ব্বে এই কবিতার মধ্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল সঙ্গীতে। কবিতার মধ্যে ছন্দের যে সঙ্গীত আছে, যে ঝঙ্কার আছে, তাহা ব্যতীত গীতের সুরেই অনেক কবিতার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক কবিতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে সঙ্গীতের জন্যই সেগুলি রচিত হইয়াছিল এবং সঙ্গীতেই সেগুলি সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। জয়দেব বাঙ্গালা সংস্কৃতের অসি-বরুণার সঙ্গমে তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলী

রচনা করিয়াছিলেন। 'পদাবলী' অর্থে গীত। জয়দেবের কবিতা যে গীত হইত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 'গীতগোবিন্দ' বর্ত্তমান আকারে কবে বা কিরূপে গ্রথিত হইল, তাহা বলা যায় না। তবে প্রায় প্রত্যেক পদের শেষে ভনিতা দেখিয়া মনে হয় যে ঐ পদগুলি এক একটি খণ্ড খণ্ড সঙ্গীত। পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় এই গীতগুলি গান করিয়া বিশেষজ্ঞ শ্রোতমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করা হইত।

জয়দেবেরও পূর্ব্বে বৌদ্ধ দোহা ও পদাবলী গীত হইত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে প্রাচীন পুঁথি আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি পদের উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং সেগুলি যে গীত হইত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে নানা প্রকারের সঙ্গীত বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহার মধ্যে অনেকগুলি কথা-মাত্রে দাঁড়াইয়াছে। আর কিছুদিন পরে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার ফুল, বাঙ্গালার ফল সবেতেই একটা বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালার সুরেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য আছে। খাঁটি বাঙ্গালার জিনিষ যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার বৈঠকখানায়, মজলিসে নহে, বাঙ্গালার ঘাটে মাঠে পল্লীবাটে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। আমরা যেমন বাঙ্গালার পদ্য, বাঙ্গালার ছড়া, বাঙ্গালার হেঁয়ালি সংগ্রহ করি, তেমনি করিয়া বাঙ্গালার সুরগুলিও সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। অন্ততঃ প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপে সে গুলিকে রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। খাম্বাজ, হাম্বীর বা আশাবরীর যে মিষ্টত্ব, তাহার আস্বাদন কতজনে পায়? কিন্তু বাঙ্গালার নদীতে নৌকার মাঝিরা যখন উচ্চকণ্ঠে 'সারি' গাহিয়া তালে তালে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে যায়, তখন তাহার সেই মধুরতায় মুগ্ধ না হয় এমন বাঙ্গালী খুব কমই আছে। নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে, জলের কল্লোলের সঙ্গে, দাঁড়ের ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দের সঙ্গে সে সুর যে কি অপূর্ব্ব ভাবে মিশে, তাহা না শুনিলে কল্পনা করা যায় না।

এই সারিগানের জন্য একদিন নদীর গতি ফিরিয়া ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। যশোহর জেলায় নিম্ন দিয়া ভৈরব প্রবাহিত। এই নদীর কূলে একজন তপঃপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী একদিন স্বামীকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে মাঝিরা সারি গায়িতে গায়িতে ব্রাহ্মণের কুটীরের নিকট দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণী সেই গানের অপূর্ব্ব সুরে অন্যমনস্ক না হইয়া পারিলেন না। এ কি জ্বালা! এমন করিয়া মানুষকে পাগল করিতে আছে? গান গায়িবার কি আর সময় পায় না লোকে? ব্রাহ্মণী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে ধরিলেন, 'নদীর কূল হইতে অন্যত্র চল। আমি আর এমন যায়গায় থাকিব না যেখানে গানের সুরে পাগল করিয়া দেয়!' ব্রাহ্মণীর জিদ দেখিয়া ভট্টাচার্য্য জপে বসিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে নদীর স্রোত বহুদূরে চলিয়া গেল, যেখানে সারিগানের কোমল করুণ সুর আর অবলার প্রাণে গিয়া না বাজিতে পারে! সেই হইতে আমাদের দেশে এই ভট্টাচার্য্যের বংশ 'গাঙ্গ ফিরানো ভট্টাচার্য্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

'ভাটিয়াল' সুর যে কত মধুর, তাহা অনেকে জানেন। নদীতে যখন ভাটা আসে, এবং নৌকা অলস স্বচ্ছন্দ গতিতে সেই স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিতে থাকে, তখন মাঝিরা দাঁড় ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া গান ধরে। তাহাই 'ভাটিয়াল' সুর নামে খ্যাত। বৈঠকী গানে যে 'ভাটিয়ারি' রাগিণী আছে, তাহা এই ভাটিয়াল সুর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'বারাসে' সুরও বাঙ্গালার পল্লী-জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা। 'বারাসে' বা বার-মাসিয়া সুর বার মাসেই মিষ্ট লাগে। দিন দুপুরে, সকাল সাঁঝে, শীত বর্ষায় সমান উপভোগ করা যায়, এমন সুরের সন্ধান বাঙ্গালা দেশেই ছিল!

কবির গান বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট সম্পত্তি। কোনও কোনও দেশে ইহাকে বোধ হয় ঝুমুর গানও বলিত। এ অঞ্চলে 'হাফ আখড়াই,' 'তরজা' প্রভৃতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও কচিৎ, কদাচিৎ। 'কবি'র নাম আর বড় শুনিতে পাই না। উপস্থিত আসরে উত্তর প্রত্যুত্তর তখন তখনই রচনা করিয়া গায়িতে হইত বলিয়া ইহাতে কবিত্ব শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এক বা একাধিক ওস্তাদ শুধু গীত রচনা করিবার জন্য এক এক দলে থাকিত। ওস্তাদ গীত রচনা করিয়া দিলে 'সরকার' তাহা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-

শিক্ষিত গায়ককে বলিয়া বলিয়া দিত। অনেক সময় 'বাঁধা' বা 'বান্ধুটী' কবিও হইত। বান্ধুটী অর্থে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ওস্তাদের রচিত সুরতালের উৎকর্ষ-সমন্বিত পুরাতন পদ। এই সকল পদ এখনও খুঁজিলে পাওয়া যায়। কোনও কোনও পদ শ্যামা-বিষয়ক, কোনও কোনও পদ রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। প্রথমোক্ত পদকে বলিত ভবানী-বিষয়; দ্বিতীয় প্রকারের পদের নাম ছিল সখি-সংবাদ। 'কবি' শুনিতে অনেকে মনে করেন যে বোধ হয় যাবতীয় অশ্লীলতা ইহার অঙ্গ। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমাদের দেশে কোনও গানই ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আমল পায় নাই। কবির গানেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে গ্রাম্য লোকের রুচির বিপর্য্যয়ে অনেক সময়ে 'বেড়া' (প্রশ্ন) ও 'উত্তর' (প্রত্যুত্তর) এবং 'পালটে' (প্রতি-প্রশ্ন) অশ্লীল গালাগালির অবসর থাকিত। ইহাতে পল্লী-জীবনের নিম্নস্তরের একটি নিখুঁত ছবি মুদ্রিত হইয়া আছে। উচ্চস্তরের সমাজ-জীবনে এই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ সখি-সংবাদ ও ভবানী-বিষয়ের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি মানের পদের নমুনা দেখুন:

প্রভাতী সুর

তুলি যূথী—জাতি কুটরাজ বেলি
গন্ধরাজ আর কৃষ্ণকলি
নব কলি সদ্য বিকশিত;
যাতে বনমালী হরষিত।
সাজায়ে রাই ফুলের বাসর
আসবেন বলে রসিক নাগর
সেই আশাতে হয় যামিনী ভোর
হিতে হ'ল বিপরীত॥

ছন্দটিও কি সুন্দর তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সকল সুর ও কবিতার মধ্য দিয়া সেকালের পল্লী-জীবনের স্রোত নানাভঙ্গে বহিত।

কবির গানের সঙ্গে তরজার লড়াই থাকিত। কবির গান প্রায় উচ্চ সুরে গীত হয়; লোকে সহজে গানের সুর হইতে কথা পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারে না। প্রশ্ন কি হইল এবং তাহার উত্তরই বা কি হইল, ইহা সাধারণ লোকের বুঝিতে কষ্ট হইত। এজন্য প্রত্যেক দলেই এক-একজন ছড়াদার থাকিত। ছড়াদারের প্রথম কর্ম্ম ছিল সহজ-বোধ্য ছড়ায় গানের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই সকল ছড়া মুখেমুখেই রচিত হইত। অনেক সময়ে এই সকল উপস্থিত বোলের (Extempore) মধ্যে এত কবিত্বশক্তি থাকিত যে, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। অনেক দলে ছড়াদার এবং ওস্তাদ (যে গান বাঁধে) একই ব্যক্তি হইয়া থাকে। ছড়াদার এবং ওস্তাদ উভয়েরই পুরাণগুলি জিহ্বাগ্রে থাকা আবশ্যক। মনে করুন, একদল গানের মধ্য দিয়া প্রশ্ন করিল:—তুমি কে প্রভু, তাই আমায় বল। তোমার শক্তির ত সীমা পরিসীমা নাই দেখিতেছি, কিন্তু মাথার উপরে অনর্থক মাথা বহন করিতেছ কেন, প্রভু? লোকের ঘাড়ে একটি মাত্র মাথা থাকে, তোমার ঘাড়ে চারিটি। হে চতুর্ম্মুখ, চারিটি মাথা ঘাড়ে চাপাইয়াও কি তোমার সাধ মিটে নাই? অপর দলকে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বলিতে হইবে কবে শিব ব্রহ্মার একটি মাথা কাটিয়া নিজ মস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় উত্তর না দিতে পারিলেই লোক হাসিবে, টিট্‌কারী দিবে এবং ছি ছি করিবে। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর সাধারণ লোকে সব সময়ে বুঝিতে পারে না। কাজেই ছড়াদারের প্রয়োজন হয়। ছড়াদার উত্তর দিবার সময়ে অপর পক্ষকে দুই একটি গালাগালি দেয়। অপর পক্ষের ছড়াদার সুদ সহ সেই গালাগালি ফিরাইয়া দেয়। এই সকল সাময়িক জয় পরাজয়ে পল্লীজনগণের মধ্যে এরূপ উন্মাদনা দেখা যায় যে অনেক পূজা বারোয়ারিতেও তাহা হয় না। ছড়াদারদের কবিতার উত্তর-প্রত্যুত্তর 'তরজা' নামে পরিচিত। এই সকল ছড়াদার ও ওস্তাদ প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান-দিগের মধ্যে বেশী পাওয়া যাইত। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও অবশ্য ইহাতে যোগদান করিতেন। গানে শুনিয়াছি কবির গুরু হরু ঠাকুর এবং প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ভোলা ময়রা, কাশীনাথ পাটুনী প্রভৃতি। এখনও কবিওয়ালারা সসম্ভ্রমে ইঁহাদের নাম স্মরণ করে। এণ্টনি ফিরিঙ্গির নামও অনেকের নিকট সুপরিচিত। ইঁহাদের রচিত গান এখনও ওস্তাদী সঙ্গীত বলিয়া আদৃত হয়।

কীর্ত্তনের আবিষ্কার বাঙ্গালার সঙ্গীতের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। কীর্ত্তনে সাধারণ রাগরাগিণীর প্রচুর ব্যবহার থাকিলেও, ইহার রীতিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। জগতের আর কোনও সঙ্গীতে

তাহার তুলনা আছে কি না আমি জানি না। তবে আমাদের দেশের কোনও সঙ্গীতে যে সে রীতি নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা-স্পৃহা তাহার নিজস্ব সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাল সম্বন্ধে অন্য সঙ্গীতে একটু আধটু স্বাধীনতা থাকিলেও, কীর্ত্তন-সঙ্গীতে সে স্বাধীনতার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। মনে করুন, গায়ক চৌতালে বা ধামারে একখানি খেয়াল আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে প্রায়শঃ ঐ চৌতাল বা ধামারেই গান শেষ করিতে হইবে। দুন্ বা চৌদুন্ করিয়া তাহার ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিবার রীতি আছে বটে, কিন্তু কীর্ত্তনে তাল ফেরতা করিয়া ছন্দো-বৈচিত্র্য সম্পাদন করিবার অবাধ স্বাধীনতা আছে,—যদিও তালকে ছাড়িয়া উধাও হইয়া যাইবার কোনও ব্যবস্থা নাই। যে তালেই গান গায়িবেন, সে তাল-মাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, কিন্তু ছন্দের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া গানকে মিষ্ট করিবার স্বাধীনতা কীর্ত্তনে যেমন আছে, তেমন আর কোনও সঙ্গীতে নাই। কীর্ত্তনে আলাপের যথেষ্ট অবসর আছে, আবার তার সঙ্গে নূতন কথা (আঁখর) জুড়িয়া দিয়া গানের ভাব-সম্পদকে পরিস্ফুট করিবার যে স্বাধীনতা আছে, তাহা অন্য কোনও সঙ্গীতে দেখিতে পাই না।

কীর্ত্তনে যে উদ্ভাবনী-শক্তি দেখা যায়, অন্যত্রও তাহার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। বাউলের সুর একদিন বাঙ্গালার লোকের মন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। 'কবি', 'বাউল' ও 'কীর্ত্তন' অনেক সময় সুর হিসাবে বড় কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। তথাপি তাহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সহজেই ধরা পড়ে। 'বাউল' শব্দ বাতুল হইতে উৎপন্ন। আমাদের দেশে অনেক বাউল সম্প্রদায় হইয়াছিল, এখনও আছে। তাহারা আপনার মনে গান গায়িয়া যায়; সে সকল গানের সুর সাধারণ সুরতালের অনুগামী নহে এবং তাহার মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা নিহিত থাকে, তাহাও সাধারণ মতের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করে না। এইজন্যই বোধ হয় ইহাদিগকে বাউল বলিত। বাউলের সুর বড়ই কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী। রবিবাবুর রচিত বাউলের গানের অনেকগুলি খাঁটি বাউলের সুর নহে; তাহা হইলেও, সেই মিশ্রিত বাউল গানগুলি কিরূপ জমে, তাহা নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমার মনে হয় 'বাউল' সুর হইতেই রামপ্রসাদী সুরের জন্ম হইয়াছে। শ্যামামায়ের অঞ্চলের নিধি রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতে যে সরল, মধুর, স্বাভাবিক সুর সংযোজন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রতিভার সুন্দর নিদর্শন।

বাউল হইতে যেমন 'প্রসাদী' সুরের উদ্ভব, আমার মনে হয় ঢপ্ তেমনি কীর্ত্তন হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বহুদিনের কথা নহে, কিন্নর বা কান বংশীয় মধুসূদন যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই ঢপের স্রষ্টা। ইঁহার পূর্ব্বে মোহন দাস নামে একজন বৈষ্ণব ঢপ্ গান করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বস্তুতঃ ঢপ্ গানের সৃষ্টি ঠিক কোন্ সময়ে হইয়াছিল এবং কেনই বা ইহাকে ঢপ্‌গান বলে,তাহা জানা যায় না। ঢপ্‌গানে অনুপ্রাসের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঢপ্‌গায়ক বা গায়িকারা—ছোট ছোট বক্তৃতার সাহায্যে বিভিন্ন গানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া পালা সাজাইয়া থাকে। মধুকানের বংশের অনেক রমণী ঢপ্‌গানে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। কানেরা সপরিবারে গানের ব্যবসা করে। যে মূল গায়িকা সে হয় ত কন্যা বা পুত্রবধূ। মাতা বা শ্বাশুড়ী তাহার সঙ্গে সুর দিতেছেন, শ্বশুর খোল এবং জামাই বেহালা বাজাইতেছেন! ইহাদের সঙ্গীতের দরদ, ও মীড় মূর্চ্ছনা এত সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্য-পূর্ণ যে তাহার তুলনা বিরল। এই ঢপ হইতে মেয়ে গায়িকারা আর একটি স্রোত আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নাম ঢপ্-কীর্ত্তন। 'ঢপ্-কীর্ত্তন' বলিতে কি বুঝায়, তাহার সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। মোটামুটী আমরা বলিতে পারি যে, ঢপ্-কীর্ত্তনে আসল খাঁটি কীর্ত্তন যাহাকে বলে, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ঢপের প্রণালীতে গাওয়া হয়। দ্রুত লয়ে মিষ্ট সুরে আখরের আতিশয্যে ঢপ্-কীর্ত্তন অনেক সময়ে সুশ্রাব্য ও সহজবোধ্য হয়।

নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেও সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল। সেকালে পল্লীগ্রামে 'গাজির গীত', ও 'জারি' শুনিতে দলে দলে হিন্দু মুসলমান ছুটিত। এই সকল গীত সাধারণতঃ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গীত হইত। সঙ্গীত লইয়া তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। উভয়ে উভয়ের সঙ্গীত শ্রদ্ধার সহিত শুনিত। উভয়ের আনন্দোৎসবে উভয়ে মন খুলিয়া যোগদান করিত। ময়মনসিং অঞ্চলে অনেক

মুসলমান কবির রচিত হিন্দু দেবদেবীর গীত পাওয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনের পদাবলীতে মুসলমান কবির রচিত পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদাসের সংকলিত পদকল্পতরুতে নসির মামুদের যে পদ আছে, তাহা বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের পদ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভান রি।
আগম নিগম বেদ সার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥

এই পদটির অন্ত ভণিতাও শুনিয়াছি; কিন্তু সে ভণিতা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কীর্ত্তনিয়াগণ এখনও এই গান করিবার সময় নসির মামুদের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন।

গাজির গীতেও হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ থাকিত। এই সকল সঙ্গীতের দ্বারা এমন একটি স্বচ্ছন্দ মৈত্রী-ভাব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা শত Unity Conference-এ হয় না। সঙ্গীত কানের ভিতর দিয়া মরমের অন্তস্তলে প্রবেশ করে। প্রাণে প্রাণে মিলন ঘটাইতে সঙ্গীতের অদ্বিতীয় ক্ষমতা।

সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে বেহুলার গান বা 'মনসার ভাসানের' বেশ পসার ছিল। ইহাতেও হিন্দু মুসলমান উভয়ে নির্ভয়ে যোগদান করিত। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই গায়ক হইত। গানের বিষয় বেহুলার সতীত্ব কাহিনী এবং মনসার পূজার প্রচার। মূল গায়কেরা নুপুর পায়ে দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান গায় এবং তাহার সঙ্গে 'দোহারেরা' যোগদান করিয়া সুর জমাট্ করিত। ইহাদের সুরেরও নূতনত্ব ছিল। মনসার ভাসান শুনিলেই ইহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত গায়ক যখন গলা খুলিয়া গাহিত—

জল বিনে চাতকের প্রাণ বাঁচে কেমনে।
ও চাতক চা'য়ে (চেয়ে) আছে জলপানে॥

তখন পল্লী রমণীদের চক্ষু বিরহের এই সহজ সুরে আর্দ্র হইয়া উঠিত।

রামায়ণ, চণ্ডী প্রভৃতিকে আমরা গান হিসাবে দেখি না। কিন্তু রামায়ণ-গান এক সময়ে খুব চলিত। আমি ভাল ভাল গায়ককে রামায়ণ গান করিতে দেখিয়াছি। তানপুরা লইয়া কালোয়াতী গান করা যাঁহার অভ্যাস, এমন লোকেও নুপুর পায়ে দিয়া চামর ঢুলাইয়া রামায়ণ গান গাহিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ইহার সুর-বিন্যাসাদি অনেকটা বৈঠকীরই মত।

এখনও অনেক স্থলে চণ্ডীর গান বা 'চণ্ডী-মঙ্গল' শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডী-মঙ্গলের বিষয় দুর্গা বা কালীর মহিমা-কীর্ত্তন। ইহার অনুকরণে 'কৃষ্ণ-মঙ্গল', 'চৈতন্য-মঙ্গল' গানেরও সৃষ্টি হইয়াছে। 'চৈতন্য-মঙ্গল' অনেকটা কীর্ত্তনের অনুরূপ। তবে ইহাতে যেরূপ নূপুর পায়ে নাচিবার প্রথা আছে, কীর্ত্তনে তাহা নাই। ইহাতে যেরূপ 'পয়ার' (সুরে) আবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও কীর্ত্তনে নাই। সাধারণতঃ লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত অবলম্বনেই এই গীত হইয়া থাকে।

কীর্ত্তনের ন্যায় চৈতন্যমঙ্গলে খোল করতাল বাজে। কবির গানে প্রায়শঃ ঢোল ও কাঁশি বাজে। উহার সুর এত চড়া যে কাঁশি ঢোল নহিলে উহা খোলে না।

পাঁচালীর গান এক সময়ে খুব প্রচলিত ছিল। দাশু-রায়ের পরে ভদ্র-সমাজ পাঁচালী আর তেমন করিয়া উপভোগ করিয়াছে কি না আমি জানি না। অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে দাশু রায়ের কবিত্ব অনেক স্থলে চাপা পড়িলেও, তিনি যে যথেষ্ট মৌলিকতার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে সকল সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ, আমি তাহাদের কথাই কিছু আলোচনা করিয়াছি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। যাত্রা ও থিয়েটার

এদেশে বহু লোকের আনন্দ জোগাইয়া থাকে। তবে যাত্রার পরিবর্ত্তন বড় দ্রুত হইয়াছে। এখন যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙ্‌ আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে আবার থিয়েটারে যাত্রার ভাব প্রবেশ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও যাত্রার যে পসার ছিল ক্রমশঃ তাহা লোপ পাইতেছে। জনসাধারণের শিক্ষার বাহন স্বরূপে যাত্রা বঙ্গদেশে এক দিন অনেক কিছু করিয়াছিল। পল্লীবালকদের মধ্যে যাহাদের কণ্ঠ মিষ্ট হইত, অভিনয়ের দিকে যাহাদের ঝোঁক থাকিত, তাহাদিগকে লইয়া সহজেই একটি যাত্রার দল গঠিত হইয়া উঠিত। ইহাতে এক দিকে যেমন আনন্দের ধারা বহিত, অপর দিকে অনেকগুলি লোকের অন্নের সংস্থান হইত। এখন লোকের মধ্যে সে আনন্দ নাই, যাত্রায়ও আর তেমন মন উঠে না। যাত্রার দলকে বৎসর বৎসর অর্থ না দিয়া, একটি কল কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলেই চলে। কলের গানের প্রসাদে আহম্মদ খাঁ, ছুটি মিঞা, পটলবালা, আপেলবালা প্রভৃতি নানা ওস্তাদ ও অভিনেতার সঙ্গীত ঘরে বসিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কণ্ঠের সঙ্গীত কলে গিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতের রুচি ক্রমেই দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। সহরে থিয়েটারের প্রতিপত্তি কিছুদিন অপ্রতিহত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু বায়োস্কোপের ছায়াবাজিতে থিয়েটারের অবস্থা সঙ্গীন্ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়।

শারদ-অশ্রু

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

অবেলায় গিয়াছ চলিয়া,
খেলাঘর পারনি সাজাতে;
তারে তারে বাঁধিয়া সেতার
একবারো পাওনি বাজাতে!

শিশু তব হয়েছে বালক;
খুঁজে খুঁজে জনকে তাহার,
ম্লানমুখে কেবলি সুধায়—
দে'য়ালের ছবিটী কাহার?

তোমার সে বাঁধা-তারে আর
একা একা করি প্রাণপণ
সুর মোর পারি না ফুটাতে;
ভাষা মোর পায় না জীবন।

তবু যেন মনে হয় আজো,
তুমি মোর আছ সাথে সাথে;
নতশিরে ন'মিলে তোমায়
তোমার পরশ লভি মাথে!

শ্রাবণের বাদল-নিশায়
আধ-ঘুম আধ-জাগরণে
মাঝে মাঝে তব ডাক শুনি'
ছুটে যাই চকিত চরণে!

নিশি-শেষে একাদশী রাতে—
আলো-ছায়া আঙিনার তলে;
মনে হয় দেখেছি তোমায়
ছায়া-কায়া ভাসি আঁখি জলে!

জনহীন বনপথে যবে
একা একা ঘাটে আমি যাই;
তুমি মোরে আগুলিয়া চল;
পথে যেতে পাছে ভয় পাই!

শিশু মোর পড়িলে ঘুমায়ে
ধ্যানে বসি' মুদি যবে আঁখি—
তুমি আসি শিয়রে যাদুর
বসে' থাক শিরে হাত রাখি!

খোকা তব গেছে খালি গায়
শুধু পায়—দেখিতে ভাসান;
মৌন মুখ একা গৃহতলে
বসে আছি হৃদয় পাষাণ!

অশরীরী হে মোর দয়িত!
আজি কেন তব দেখা নাই?
নিশিদিন আভাসে ইঙ্গিতে
বার বার সঙ্গ শুধু পাই।



পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৮)

উপেন্দ্রনাথের জীবনী-শক্তি ধীরে ধীরে অপসৃত হইল; দেশের সুসন্তান, প্রকৃত জ্ঞানী, বিদ্বান উপেন্দ্রনাথ বিকলাঙ্গ অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

দেবী চৈতন্যহীনার ন্যায় এক পাশে পড়িয়া ছিল; কি হইবে, সে কি করিবে, সে ভাবনা তাহার মাথায় প্রথমটায় জাগে নাই। যখন জাগিল, তখন সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। বীথি প্রকাশের বাড়ীর সাহায্যে সকল বন্দোবস্ত ঠিক-ঠাক করিয়া তাহার নিকট আসিল।

হঠাৎ গায়ে হাত লাগিতেই দেবী চমকিয়া উঠিল। মুখ উঁচু করিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বীথি তাহাকেই ডাকিতেছে।

"কাকি-মা ওঠো, এ-রকম ভাবে পড়ে রইলে কেন?"

দেবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি যে আর উঠতে পারছি নে বীথি, আমার হাত পা যেন ভেঙ্গে গেছে।"

বীথি জোর করিয়া বলিল, "উঠতে পারছি নে বললে তো চলছে না কাকি-মা। জোর করে তবু তোমায় উঠতেই হবে যে। আবার সংসারের কাজ করে খেতে হবে, লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, হাসতেও হবে। যে যায় সেই চলে যায় কাকি-মা। যারা থাকে তাদের বুক খালি হয়ে গেলেও আবার সবই করতে হয়।"

দেবী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল। দুই হাতে বিস্রস্ত মাথার চুলগুলো জড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সব শেষ হয়ে গেছে বীথি?"

গম্ভীর ভাবে বীথি বলিল, "সব শেষ হয়ে গেছে কাকি-মা। এমনি করে সবারই শেষে হচ্ছে, সবারই শেষ হবে। জগৎ দেখছ কোন্ চোখ দিয়ে কাকি-মা? অন্তরের যে চোখটী আছে, সেইটী মেলে দেখ, সবই ধ্বংসের পথে চলেছে। জগৎ গড়ে ওঠে, দিনে দিনে তিলে তিলে আপনার বৃদ্ধি করে—শেষকালে সব ডালি দেয় মরণের পায়ের তলায়।"

কান্না-ভরা সুরে দেবী বলিল, "সবই জানি মা, সবই বুঝি; কিন্তু এ সময় যে মন মানতে চাচ্ছে না বীথি। আমার যে আজ আপনার বলতে এ জগতে কেউ রইল না মা। আমি কার দিকে চেয়ে জীবন ধারণ করব? আমার একটীমাত্র ভাই ছিল, আজ একমাস মাত্র আগে সেও যে চলে গেছে। বাপের বাড়ীতে সন্ধ্যে দিতে আজ কেউ নেই। সে শোক সহ্য করেছিলুম, কান্না এসেছিল চেপে রেখেছিলুম

শ্বশুরের পানে তাকিয়ে। আমার দুঃখকে পরিপূর্ণতা দিতে আজ তিনিও চলে গেলেন, আমি কি নিয়ে থাকব মা,—কি নিয়ে বাঁচব ?"

তাহার সে স্বর শুনিয়া বীথির বুকের মধ্যে কান্না গুমরিয়া উঠিতেছিল। সামলাইয়া লইয়া স্তব্ধকণ্ঠে সে বলিল, "কেউ কাউকে উপলক্ষ্য করে কয়দিন বেঁচে থাকে কাকি-মা ? ঠাকুরদাকে উপলক্ষ্য করে তুমি বেঁচে ছিলে, এ কথাটা মনে করাই ভুল। মূল যিনি, সেই ভগবানকে উপলক্ষ্য করে' তাঁর পানে চোখ রেখে চল ; যতদিন তাঁর ইচ্ছা তিনি এখানে তোমায় রাখবেন, তার পর নিজের কাছে ডেকে নেবেন। এতদিন যেমন কাজ করে যাচ্ছিলে, এখনও তেমনি কাজ করে চল, ভগবানের রাজ্যে কাজের কি অভাব আছে কাকি-মা ? খুঁজেও নিতে হবে না, সামনে এসে সব কাজ আপনা হতেই জড় হবে। আচ্ছা, আমিই তোমায় কাজ দেখিয়ে দেব, তুমি এখন ওঠ।"

হু হু করিয়া কোথা গিয়া যে দশটা দিন কাটিয়া গেল, তাহা বুঝা গেল না। তাহার সাহায্য লইয়া বীথি ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের যোগাড় করিয়া দিল। দেবীর সে দিন খুব জ্বর, তাহা সত্বেও তাহাকেই শ্রাদ্ধ করিতে হইল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবী বলিল, "এইবার সব শেষ হয়ে গেল বীথি। মানুষটার আর কিছুই বাকি রইল না।"

তখন শীত বেশ পড়িয়াছিল, চারিদিক কুয়াসায় ভরিয়া গিয়াছিল। একটু বেলা হইতে কুয়াসার ফাঁকে সূর্য্যের মলিন মূর্ত্তিখানা আকাশের গায়ে দৃষ্ট হইল।

প্রাতঃস্নানান্তে বীথি পূজার ঘরে বসিয়া এতক্ষণ গীতা পাঠ করিতেছিল। বেলা নয়টার সময় তাহার প্রাত্যহিক পাঠ সাঙ্গ হইল। সে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গীতা যথাস্থানে রাখিয়া ঘরের বাহির হইল :

মুখখানা তখন তাহার দীপ্তোজ্জ্বল ; চোখের পাতা দুটি তখনও সিক্ত, চক্ চক্ করিতেছে। ললাটে প্রণামের ধূলা কতকটা লাগিয়া রহিয়াছে।

দেবী কতকগুলা শুষ্ক কাঠ রান্না-ঘরে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল ; মাঝামাঝি থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে বীথির মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার বিহ্বল ভাব দেখিয়া বীথি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল, "আচ্ছা কাকি-মা, তুমি সব সময়ে বেশ থাক,—কেবল মাঝে মাঝে ও-রকম পাগলের মত হাঁ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাক কেন বল তো ?"

দেবী চোখ নামাইয়া বলিল, "কি দেখি, তা তোমায় কি বলব মা! আমার মায়ের মত তোমার মুখে সময় সময় কি একটা জ্যোতিঃ দেখতে পাই। দেখ মা, আমি আজ হতে তোমায় মা বলে ডাকব, বীথি বলে ডাকব না। তোমার রাগ হবে না তো ?"

সকৌতুকে বীথি বলিল, "বেশ কথা তো! মা বলে ডাকবে তাতে আমি রাগ করব কেন ? সত্যিই তো আমি তোমাদের মা—সৎমা পর্য্যন্ত নই, আপন মা। আমাকে মা বলাই তো উচিত তোমাদের। আমারই এতদিন খেয়াল ছিল না বলে, অত নজর দিইনি। সত্যি কাকি মা, মা বলে ডাকলে আমি ভারি খুসি হব।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবী বলিল, "ঠাকুরঝির দুর্ভাগ্য ভেবে বড় কষ্ট পাই। তোমায় দেখবার তার যে কি প্রবল ইচ্ছে ছিল মা, তার সে আশা আর মিটল না।"

"থাম—থাম কাকি-মা, ও-সব কথা থাক। যত ভাববে ততই মন আরও খারাপ হবে। উঃ, কি রকম ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ ? ঘরের মধ্যে ছিলুম—শীতে যেন জমিয়ে ফেলছিল। বাইরে রোদে এসে তবে প্রাণটা বাঁচল। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, রান্নাঘরে যাও, উনানটা ধরিয়ে দাও, আমি গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি কাকি-মা,—মসলাটা আমায় পিষে দাও বাপু ; সব অভ্যাস করতে পারলুম, মসলা পিষতে কিছুতেই শিখতে পারলুম না। যাক, দুদিন অমনি করে নাড়াচাড়া করতে করতেই শিখে যাব, কি বল কাকি-মা ? অমনি তো কেউ শিখতে পারে না। আজ মাছ আনতে দিয়েছ তো ? 'না' বললে চলবে না বাছা, আজ একাদশী সেটা বোধ হয় মনে আছে ? আর একাদশীর দিন আমি তোমায় বার বার করে বলে দিয়েছি—অন্য দিন যা হয় আলুসিদ্ধ বেগুন-পোড়া খেয়ে কাটালেও একাদশীর দিন বাপু মাছ খেতেই হবে। দেশে ঘরে যখন একটা কথা আছে—স্বামীর অকল্যাণ হয়, তখন সেটা মেনে নিতে হয় বই কি। দেখছি তুমি ভারি অবাধ্য মেয়ে হয়েছ,—মায়ের কথা অবহেলা কর। এর পর এর জন্যে তোমায় শাস্তি পেতে হবে জেনো।"

দেবী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আচ্ছা, মাছ না হয় আনতে দিচ্ছি; কিন্তু সত্যি কথা বলছি মা, মাছ আমার একটুও ভাল লাগে না। আর তুমিই তো বল মা—মঙ্গল অমঙ্গল কিছুতেই কিছু হয় না,—ভগবান যার যা সব ঠিক করে রেখেছেন, কিছুতেই কেউ তা খণ্ডাতে পারে না।"

বীথি একটু ভাবিয়া বলিল, "সে কথা সত্যি, তবু দুর্ব্বল মানুষের মন,—অন্য সব জায়গায় কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কাকি-মা, প্রাণের টান যেখানে আছে সেখানে উড়ানো যায় না। এখানেও তাই হয়েছে কাকি-মা। সেইজন্যে কিছু নয় জেনেও মেনে নিচ্ছি। তুমি যাও, আর দাঁড়িয়ো না।"

দেবী অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "আজ একাদশীর দিনটাতেও তুমি কেন মা রাঁধতে আসবে? আমি আর ওই রাখালটা খাব বই তো নয়, যা হোক একটা মাছের তরকারী ভাত আমিই করে নিচ্ছি। তোমার আজ ছুটি, রান্নাঘরের দিকে আজ পা বাড়াতে পারবে না, বুঝলে, এই আমার হুকুম।"

বীথি হাসিয়া তাহার হুকুমই মানিয়া লইল।

"চিঠি আছে।"

পোষ্টম্যান এনভেলাপ বন্ধ পত্রখানা বীথির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বীথি পত্রখানা কুড়াইয়া লইল। উপরে লিখিত তাহার নামটা চেনা হাতের। উল্টাইয়া সে ডাকঘরের মোহরটা দেখিল—কলিকাতা হইতে আসিতেছে।

পত্র মায়ার। তিনি রাগের মাথায় দীর্ঘ পত্রখানি লিখিতে তাঁহার অমূল্য সময় অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক কটুকথা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, সেগুলা বেশ নরম স্নেহসিক্ত করিয়া লিখিয়া গেলেও তাহাতে ঝাঁজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বীথির অদৃষ্টটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে তিনি লিখিয়াছেন—'এখনও তুমি নিজের অবস্থা ভাল করে প্রণিধান করতে পার নি। আর তোমার মত বয়সে সেটা পারবারও কথা নয়; কারণ, তুমি এখন নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করলেও যথেষ্ট ছেলেমানুষ রয়েছ, সংসার চিনতে এখনও অনেক দেরী। ওখানে থেকে তোমার যে কি লাভ হবে তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনে। আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো সন্দেহ জেগে উঠেছে। তুমি কি যথার্থই এবার উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হবে, গেরুয়া পরবে, ফোঁটা-তিলক কাটবে? তোমার জন্যে আমার সুখ শান্তি সবই গেছে, আমার স্নানাহার বন্ধ হয়েছে, আমি রাত্রে ঘুমাতে পারছিনে। যে ঠাকুরদাকে তুমি চেন না, জান না, তাঁর বাড়ীতে তুমি অনাহূতার মত উঠলে কি করে? এতে কি তোমার আত্মসম্মান ক্ষয়ে যায় নি? আমি ভেবে বড় আশ্চর্য্য হচ্ছি যে শিক্ষিতা মেয়ে তুমি—শিক্ষিত সভ্য-সমাজে এতকাল থেকে এখন সেই কুসংস্কারপূর্ণ পল্লীতে বাস করছ কি করে? ওখানে সকলে তোমায় ছুঁয়েছে কি, ঘরে উঠতে পেরেছ কি? ছিঃ, এ রকম ভাবে ঘৃণিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকা—তাই কি তোমার বাঞ্ছনীয়? পত্র পাঠ মাত্র চলে আসবে, যেন এক মুহূর্ত্ত দেরী না হয়। জেনো এ তোমার মায়ের আদেশ—অনুরোধ নয়।'

পত্রখানা শেষ করিয়া বীথি একটু হাসিল। তখনি তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। পত্রখানা লইয়া সে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখছ কাকি-মা, মা পত্র দিয়েছেন। এই নাও, পড়ে দেখ।"

পত্রখানা পড়িয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া দেবী বলিল, "তোমার এখনই চলে যাওয়া উচিত মা। তোমার মাকে সত্যি এ রকম নিগৃহীতা করা উচিত নয়। তোমার এখানে থাকায় তোমার বাপ মা কাকার মুখ হেঁট হবে, সকলে তাঁদের ঠাট্টা করবে—এটা তোমার হতে দেওয়া উচিত কক্ষনো নয়।"

উত্তেজিত হইয়া বীথি বলিল, "উচিত যে কিছুই নয় তা আমি জানি। আমি কাল যাব কাকি মা। মাকে একবার দেখাতে হবে তাঁর রোমাঞ্চকর মালা-তিলক পরি নি, গেরুয়াও নেই নি। কিন্তু তোমার জন্যেই যে ভাবনা কাকি-মা।—"

উদ্বিগ্ননেত্রে সে দেবীর পানে চাহিল।

দেবী একটু হাসিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমার এতটুকু ভাবনা করতে হবে না মা। ভগবান আমার বুকে অটুট সাহস, অটুট বল দিয়েছেন। বড় ধাক্কাটা যখন সামলাতে পেরেছি, তখন জেনো আর পড়ব না।"

বীথি বলিতে গেলে,—"একেবারে একলা—"

দেবী দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "এতকাল যিনি আমায় রক্ষা করে আসছেন, তিনিই বরাবর রক্ষা করবেন মা। যদি যথার্থ সতী হই, স্বামীকে যদি নারায়ণ বলে জেনে থাকি—তবে ঠিক

জেনো আমার কিছুতেই ভয় নেই। আমি একা হলেও কারও সাধ্য নেই যে আমার অনিষ্ট করে।"

বীথি সজল নেত্র দুটি দেবীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ধন্য তুমি কাকি-মা, এখনও এত মনের জোর তোমার,—এখনও সেই স্বামীকেই তুমি পূজা করছ। বড় কষ্ট হয় এই ভেবে—কাকা এমন রত্ন হাতে পেয়েও হারালেন, চিনতে পারলেন না।"

দেবী সংযতকণ্ঠে বলিল, "না মা, তিনি আমার ত্যাগ করেন নি। বাইরে ছিলেন, এখন বাইরের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে মনে এসেছেন। নইলে আমি বাঁচতুম কি করে মা? বাইরে তিনি আচারভ্রষ্ট—ধর্ম্মত্যাগী, অপরের স্বামী; অন্তরে তিনি আমার স্বধর্ম্মানুরাগী সেই স্বামী। বাইরের সকল সম্পর্ক চুকে গেছে, অন্তরের সম্পর্ক নিগূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বীথি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, সত্যি কথা বল কাকি-মা,—কাকা যদি এখন ক্ষমা চাইতে আসেন, তুমি ক্ষমা করবে না কি?"

দেবী বলিল, "ক্ষমা কিসের করব মা? তিনি সকল দোষ-গুণের অতীত, কোন দোষই করেন নি,—তবে ক্ষমা কিসের?"

বীথি তাহাকে চাপিয়া ধরিল, "এটা তোমার একেবারে মিথ্যা কথা হল কাকি-মা। সত্যিকে কখনও কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে? তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তাই তোমার গলা কেঁপে উঠছে, তোমার দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে। সত্যি কি তুমি মনে প্রাণে বলতে পারছ—তিনি কোন দোষ করেন নি, তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ? আমি বলছি, মুখে তুমি জোর করে বললেও তোমার মন কখনই এ কথার সমর্থন করছে না। সত্যি বল কাকি-মা, আমি ঠিক কথা বলছি নে কি?"

বীথি হাসিতে গেল, কিন্তু হাসিতে গিয়া চোখে জল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহা উপছাইয়া পড়িয়া তাহার আরক্তিম গণ্ড দুটি ভাসাইয়া দিল। সে কি বলিতে গেল, একটা কথাও ফুটিল না।

বীথি শান্তকণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ—আরও কাঁদ,—কেঁদে বুকের ভেতরকার জমাট ব্যথাটাকে কমিয়ে ফেলে দাও। সত্যিকে চাপবার চেষ্টা করলেই কি তা চাপা যায় কাকি-মা,—এক ফাঁকে সে যে বেরিয়ে পড়বেই। এটা ঠিক জেনো—তোমায় কাকাকে ক্ষমা করতেই হবে, জোর করে—করব না বললে চলবে না। যার অন্তর বশ্যতা স্বীকার করেছে, মুখে সে কতক্ষণ আপনাকে অটুট রাখতে পারে কাকি-মা? তাকে যে নুইয়ে পড়তে হবেই। ভালবাসা মানে হীনতা স্বীকার! যে ভালবেসেছে সে নিজেকে নত করে ফেলেছে। নিজেকে তুমি কাকার কাছ হতে দূরে রাখতে পার, ধরা না দিলেও দিতে পার; তা বলে সামনে এলে ঘৃণা করে দূরে তাড়াতে পারবে না কাকি মা। আমি ফিরে গিয়ে কাকাকে বড় কম কথা শুনাব না, ইলা কাকিকেও সব কথা বলব,—দেখি তাঁরা দুজন কি বলেন।"

দেবী ব্যগ্রভাবে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "না মা, অমন কল্পনা মনেও এন না; এ কথা কাউকে বল না, আমার মাথা খাবে। ছিঃ, যদি এ সব কথা তাঁদের বল—সত্যি আমি আত্মহত্যা করব,—তোমার কাকি-মার মরা খবরই তুমি একদিন পাবে। তাঁরা আমায় কতদূর ঘৃণার চোখে দেখেন তা ভেবে দেখেছ কি? তোমার কাকা যে কাউকে কিছু না বলে বিয়ে করেছেন, আমার কথা প্রকাশ হলে তিনি সকলের কাছে অপদস্থ হবেন, সবাই তাঁকে ঘৃণা করবে—এ কথা অনেককাল আগে তুমিই তো আমায় লিখেছিলে মা। এর জন্যে তোমার বাপ মাকেও বড় কম অপমান সইতে হবে না, সে কথাও তো জানছি। একদিন তুমি আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলে, সেই ছয় বছর আগেকার পত্রের প্রত্যেক কথাটী এখনও আমার মনে গাঁথা রয়েছে। স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তুমি আমায় যা বলেছ, তা আমি ভুলি নি; ঘটনার আঘাতে আত্মবিস্মৃতা হয়ে তুমি তা ভুলে গেছ। যাঁকে আমি সত্যনারায়ণ জ্ঞানে পূজা করি, তিনি যে এই হীনা ঘৃণ্যা নারীর জন্যে সকলের ঘৃণার্হ হবেন, এ আমি কোন্ প্রাণ নিয়ে সহ্য করব মা? দেবতা চিরদিন উঁচুতেই থাকেন, ভক্ত কত দূর হতে তাঁকে পূজা করে। আমার দেবতা চিরদিন দূরেই থাকুন, আমি আমার জীবন তাঁর আরাধনা, সাধনায় এখানে কাটিয়ে দেব।"

এতগুলা স্পষ্ট কথা একসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়া দেবী হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। সে বীথির দিকে তাকাইতে পারিল না।

বীথি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, বলব না। তুমি যখন তোমার মনকে এত উঁচু সুরে বাঁধতে পার, এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পার, তখন আমি কেন বলতে যাব

কাকি-মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কোন কথাই বলব না।"

দেবী তথাপি মুখ তুলিতে পারিল না।

(২৯)

বীথি চলিয়া গেল।

সব শূন্য—সব শূন্য; গৃহ শূন্য—হৃদয়ও শূন্য। এই শূন্যতার মাঝে দেবী বাস করে কি করিয়া?

গৃহে দামোদরও নাই। উপেন্দ্রনাথের যখন ব্যারাম, তখন পূজার জন্য দামোদরকে পার্শ্বের রায়-বাড়ী রাখা হইয়াছে, শূন্য ঠাকুর-ঘর হাহাকার করিতেছে।

সেই শূন্য ঘরে শূন্য সিংহাসনের পানে তাকাইয়া দেবী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—"ঠাকুর, এ কি করিলে? দেবী কি এমনই অদৃষ্ট লইয়া আসিয়াছিল তাহার আপনার বলিতে কেহই রহিল না,—কেহ মৃত্যু-পথের যাত্রী হইল, কেহ বহুদূরে সরিয়া গেল যেখানে তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না। ঠাকুর, সকলের সঙ্গে তুমিও চলিয়া গেলে, তুমিও বিরূপ হইলে? তুমি কেন রহিলে না ঠাকুর, তুমি কেন চলিয়া গেলে? ওগো, পূজারী তোমার নাই, কে আজ তোমায় আনিয়া এই শূন্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে, কে তেমন করিয়া অন্তর ঢালিয়া দিয়া তোমায় পূজা করিবে, তাই কি এতদূরে তুমি স্বেচ্ছায় সরিয়া গেলে গো?"

দেবী অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উঠিয়া বসিল। কাঁদিয়া তাহার মনটা তখন হালকা হইয়া গিয়াছে। সে চোখের জল মুছিয়া ভাবিতে লাগিল।

প্রথম যে দিন সে এ সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল, কি আনন্দ সে দিন দেখিতে পাইয়াছিল! জগতে নিজের সমান সুখ-সৌভাগ্যবতী আর কাহাকেও সে দেখিতে পায় নাই। তাহার মহাদেবের মত শ্বশুর, জ্ঞানে বিদ্যায় তিনি দেশপ্রসিদ্ধ। চিরস্নেহময়ী ননদিনী ভবানী, শত দোষ হইয়াছে,—সে তিরস্কার না করিয়া মিষ্ট কথায় সব সংশোধন করিয়া লইয়াছে। অনেক সময় দেবীর কৃত অপরাধ সে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া তিরস্কার সহিয়াছে, দেবীকে বাঁচাইয়াছে। দেশে প্রবাদ আছে—ননদিনী রায়বাঘিনী,—দেবীর অদৃষ্টে এ প্রবাদের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভ্রাতৃবধূকে এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে কখনও কোন ননদিনী পারে কি না সন্দেহ। আর তাহার স্বামী? দেবীর ন্যায় স্বামী-সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন মেয়ে লাভ করে। জ্ঞানে, শিক্ষায়, দয়ায়, চরিত্রে তাহার স্বামী শতর মধ্যে একজন ছিল। হায় রে হায়, স্বপ্ন টুটিয়া গেল! দেবী ভাবিয়াছিল, সে চিরসুখিনী হইবে, এমনি করিয়া সংসারসমুদ্রে হাসিয়া খেলিয়া ভাসিয়া বেড়াইবে! নিষ্ঠুরা নিয়তি ভ্রূভঙ্গি করিলেন—মোহজাল ছিঁড়িয়া গেল। দেবী সুখের আবেশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল—দেখিল, তাহার সবই গিয়াছে, একা সে পড়িয়া আছে। আজ সে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া মরিলেও সান্ত্বনা দিতে কেহ নাই—কেহ নাই।

তবু এখানেই দেবীকে থাকিতে হইবে। সে যাইবে কোথায়, যাইবার যোগ্য আশ্রয় তাহার কই? এই নির্জ্জন ঘরে একা সে থাকিবে, এ পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া—থাকার স্থান থাকিলেও সে কোথাও যাইবে না। শ্বশুরের কথা—"মা, ভিটেয় যেন সন্ধ্যে জ্বলে—" এ যে অহরহ মনের মধ্যে জাগিয়া আছে।

বীথির হাতে আর বেশী টাকা ছিল না; নিজের যাওয়ার ভাড়াটা রাখিয়া আর যাহা কিছু ছিল সবই সে দেবীকে দিয়া গিয়াছে; বলিয়া গিয়াছে, সুবিধা পাইলেই টাকা পাঠাইবে।

কয়েকটী টাকাতে কয়দিন চলে? দেবী অতি কষ্টে একটা মাস চালাইল। বীথির নিকট হইতে টাকা আসার প্রত্যাশায় ছিল, বীথির কোন খবরই পাওয়া গেল না। দেবী ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেল। সে একটা মানুষ হইলেও খরচ তো আছে।

শূন্য ঘর, শূন্য সিংহাসন, তবু তাহার মনে বিশ্বাস আছে—ঠাকুর যেখানেই থাকুন না কেন, তাহার প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনিবেন। তাই সে সেদিন সকাল হইতে সমস্তটা দিন অনাহারে ঠাকুরঘরে পড়িয়া রহিল। সে দিন ঘরে একটী চাল ছিল না, হাতেও একটী পয়সা ছিল না। তারা কয়দিন নিজে উপযাচিকা হইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অসুখ হওয়ায় তিনি আজ আসিতে পারেন নাই, দেবীও নিজের অভাবের কথা নিজে জানাইতে পারে নাই। আজ সে পরীক্ষা করিতে চায় সত্যই দেবতা আছেন কি না। এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে আজ চরম পরীক্ষা।

"দিদি,—দিদিমণি,—"

প্রকাশ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিল।

প্রথম আহ্বান ধ্যান-নিরতা দেবীর কাণে পৌঁছায় নাই। দ্বিতীয় আহ্বানে সে সজাগ হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"

"আমি প্রকাশ; একবার বাইরে এসো।"

প্রণাম করিয়া দেবী উঠিল; চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া সে দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখিল, সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে।

প্রকাশ বাহির হইতে আবার ডাকিল,—"দিদিমণি—"

"এই যে, যাচ্ছি দাদা—"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া পড়িল। বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া প্রকাশ,—তাহার পার্শ্বে ও কে?

পশ্চিম আকাশের লাল আভা ছুটিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে! মুগ্ধ বিস্ময়ে সে ও অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেবীর মুখপানে।

দেবীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট একবার—দাদা বলিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে, হঠাৎ সমস্ত শক্তি এক করিয়া সে সটান ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ব অভ্যাসবশে মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না, সে তো এখন স্ত্রী নয়! তবে কিসের জন্য কাহাকে দেখিয়া গুণ্ঠা টানিয়া দিবে? এখন যে কথা বলিতে হইবে তাহাকেই—শ্বশুরের আদেশবাণী তাহারই মুখ দিয়া উচ্চারিত হইবে যে! কুণ্ঠিতার কুণ্ঠা যতদিন ছিল, গুণ্ঠার মর্য্যাদা ততদিন সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ তো সে গোপনতার আড়াল নাই! কুণ্ঠার আড়াল ভাঙ্গিয়া তাহাকে আজ প্রকাশ হইয়া পড়িতে হইয়াছে! আজ সকলের সম্মুখে সে সঙ্কোচহীনা নির্লজ্জার মত দাঁড়াইবে।

চকিতে তাহার মনের স্তিমিত ভাবটা কাটিয়া গেল। তাহার লুপ্ত সাহস আবার ফিরিয়া আসিল।

প্রকাশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, সে সম্মুখে সত্যকে দেখিয়া কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল; তখনি কতটা শক্তি আনিয়া সে আবার সোজা হইতে পারিল, মনকে স্থির করিতে পারিল।

"একটু অপেক্ষা কর দিদিমণি, বাড়ীতে কে যেন আমার ডাকছে, আমি মিনিট পাঁচের মধ্যে ঘুরে আসছি।"

সত্যকেও একটু দাঁড়াইতে বলিয়া চতুর প্রকাশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। দেবী তাহার সম্মুখে সত্যর সহিত কথা কহিতে পারিবে না—সে তাহা বেশ বুঝিয়াছিল।

সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া স্বামী ও স্ত্রী, কেহ কাহারও পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। দারুণ লজ্জায় সত্যর মাথাটা আপনা হইতেই নুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মাথায় কে যেন পাঁচমণ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। কয়টা বছর আগে—হায় রে, সে কথা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়,—কয় বছর আগে কি দিন ছিল, আজ কোথায় সে দিন চলিয়া গেল? সত্য নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছে। সে ভুলের পথে চলিয়াছে, বুঝিতে পারিয়াও আর কি সত্য পথে আসিতে পারিবে না, আর কি এ ভুলের সংশোধন হইবে না?

বীথির সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। বীথি দেবীর কথা রক্ষা করিয়াছিল, দেবীর প্রসঙ্গ তাহার কাছে উত্থাপন করে নাই। সত্যও জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। প্রাণপণ যত্নে সে বীথিকে এড়াইয়া চলিতে চাহিত—পাছে বীথি সেখানকার কোনও কথা বলিয়া বসে।

প্রকাশের মুখে পিতার ব্যারামের কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। চিত্তবেগ কিছুতেই প্রশমিত করিতে না পারিয়া সে গোপনে পিতাকে একবার দেখার জন্য প্রকাশের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

দেবী আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মনেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার সেই দিনগুলার স্মৃতি স্পষ্ট জাগিয়া উঠিয়াছিল। মাঝে কয়েকটা বৎসর গিয়াছে। এই কয়েকটা বৎসর তাহাদের দুইজনের মাঝখানে কতটা ব্যবধান সৃজন করিয়া দিয়াছে। একদিন যাহারা বড় আপনার ছিল, আজ তাহারা বড় পর। অতীত, হায় অতীত, তুমি কি লইয়া চলিয়া গিয়াছ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কি রাখিয়া গেলে বন্ধু? তোমার পানে চাহিয়া বর্ত্তমানের পানে দৃষ্টি পড়িলে মনে হয় আছড়াইয়া পড়ি,—একবার চীৎকার করিয়া বলি—ফিরাইয়া দাও, ওগো, অমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া সব লইয়া যাইয়ো না, কিছু রাখিয়া যাও।

দেবী চোখ ফিরাইয়া সত্যর উপর রাখিল। অপরাধী সত্য তখন দূর আকাশের কোলে দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখখানার উপরে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দেবী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। স্বামী যাহাই হোন, তাঁহার প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে। মনটা দুই একবার সন্দেহদোলায় দোল খাইয়াছিল। দেবী বিমুখ মনকে শাসন করিল।

পায়ের কাছে সে নত হইয়া পড়িতেই, সত্য চমকিয়া উঠিয়া খানিকটা পিছাইয়া গেল! যেখানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, দেবী সেখানকার মাটী লইয়া মাথায় দিল।

গদগদকণ্ঠে সত্য ডাকিল, "দেবী—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেবী সহজস্বরে উত্তর দিল, "কেন?"

বড় ক্ষীণ স্বর,—যেন সে উত্তর দিতে চায় না,—কর্ত্তব্য তাহাকে জোর করিয়া উত্তর দিতে বাধ্য করিতেছে।

"বাবা চলে গেলেন দেবী, আমায় ক্ষমা করে গেলেন না?"

হতভাগ্যের দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, উত্তর দিল না। উত্তর দিবার শক্তি তখন তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

"দেবী আমি বড় অপরাধে অপরাধী। বাবার কাছে যেমন অপরাধ করেছি, তোমার কাছে তার চেয়ে বড় কম অপরাধ করি নি। বাবা মরণকে বরণ করে নিয়ে সকল জ্বালা জুড়িয়েছেন। জীবন্তে তিনি বড় কম যাতনা তো পান নি। সব পেয়েছিলেন, আবার সবই গেল। তাঁর নিষ্ঠাকে তবু আঁকড়ে ধরে তিনি পড়ে ছিলেন, সব ছেড়েও নিষ্ঠাকে তিনি ছাড়েন নি,—মৃত্যু এসে তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চলে গেছে। এ মরণ নয় দেবী, এই-ই প্রকৃত জীবনলাভ। মরণের মাঝে তিনি বড় শান্তি পেয়েছেন। মরণ তাঁকে যথার্থ সুখ দান করেছে। তিনি বেঁচেছেন; কিন্তু তুমি তো আজও বাঁচতে পারলে না দেবী। তিলে তিলে তোমায় আমি এখনও যে পোড়াচ্ছি।"

শান্তকণ্ঠে দেবী বলিল, "ভুল বুঝেছ। আমিও মরেছি; মরে এখন নতুন জীবন পেয়েছি। তিলে তিলে আর তুমি আমায় পোড়াতে পার না। তোমার কোনও ব্যবহার আর আমায় যন্ত্রণা দিতে সমর্থ হয় না। পুড়িয়েছিলে এক দিন, তাতে আমি নতুন জ্ঞান পেয়েছি, আমার একটা নতুন চোখ খুলেছে। সেই জ্ঞান দানের জন্য তোমায়—স্বামী বলে নয়,—মহাগুরু বলে প্রণাম করছি। সত্যি আমায় এমন জ্ঞান যে পেতে হবে, তা আমি কখনও ধারণা করি নি। ত্যাগের মাঝখানে যে এমন আশ্চর্য্য পাওয়া মিলতে পারে, তা আমি আগে কখনো জানতে পারি নি। তোমায় কোটী প্রণাম, তুমি আমায় তা জানিয়েছ, তুমি আমায় তা দিয়েছ। পাওয়ার প্রচুর আনন্দ পেতে তুমি আমায় বঞ্চিতা কর নি।"

অবাক্ হইয়া গিয়া সত্য বলিল, "এই ত্যাগের মধ্যে তোমার কোন কষ্ট নেই দেবী?"

দেবী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কিছুমাত্র নেই। মাঝে মাঝে তোমরা দয়া করে বীথিকে শুধু আমার কাছে আসতে দিয়ো। আমার সকল কামনার নিবৃত্তি হলেও ওই একটী মাত্র কামনা মনে জেগে আছে। তাকে মাঝে মাঝে একটুখানির জন্যেও কাছে পেলে আমার সকল চাওয়া—সকল পাওয়ার শেষ হবে। তাকে একেবারেই তোমাদের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করে ফেলো না, আমায় তাকে একটুখানি দিয়ো।"

তাহার গলার স্বরটা ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সে চোখ ফিরাইয়া অন্যদিকে রাখিল—যেন ধরা না পড়িয়া যায়। সত্যর কাছে সে কিছুতেই নিজেকে দুর্ব্বলা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না, এখানে তাহার জোর চাই। জগতে আর সবস্থানে সকলের কাছে সে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও, এখানে তাহার অটুট থাকা চাই।

সত্য রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা করবে না দেবী? আমি দোষ করেছি, তা বলে সে দোষের কি মার্জ্জনা মিলবে না?"

দেবী বলিল, "তোমার দোষ ক্ষমা করেছি। মুখে নয়, অন্তরের সঙ্গে আমি এ কথা বলছি, বিশ্বাস কর। যদি তোমার দোষ আমি গ্রহণ করতুম, তবে তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারতুম না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতুম না।"

"দেবী,—দেবী—"

সত্য দেবীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল। নিজের বুকের উপর সে হাতখানা টানিয়া লইতেছিল; কিন্তু দেবী ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইল। পাংশুমুখে শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "মাপ কর, আমায় তুমি আর স্পর্শ কোরো না।"

অত্যন্ত আহত ভাবেই সত্য পিছাইয়া গেল,—"কেন দেবী?"

"আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবনে কখনও তোমায় স্পর্শ করব না।"

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ দেবী?"

দেবী তাহার ব্যথাভরা দুইটী চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলিল, রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "বাবার কাছে।"

সত্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

চোখের দৃষ্টি নামাইয়া সত্যর মুখের উপর রাখিয়া দেবী বলিল, "হ্যাঁ, বিশ্বাস কর—সত্যিই আমি বাবার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছি। তুমি এখন অপর নারীর স্বামী। তোমার সে স্ত্রী বর্ত্তমান। স্ত্রীর কাছ হতে স্বামীর যা প্রাপ্য, তা তুমি তার কাছ হতেই পেতে পারবে। তোমার ওপরে আমার যা দাবী ছিল আমি সব ত্যাগ করেছি। তুমিও আমায় আর কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। তোমার স্ত্রী আমাদের মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেটা জেনেই আমি এই প্রতিজ্ঞা করে সে ব্যবধানের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করে দিয়েছি। আমি তবু জোর করে বলছি—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,—তোমার বিলাস-সঙ্গিনী নই,—তোমার প্রবৃত্তিতে ইন্ধনদায়িনী নই। আমি তোমায় আর বাইরে দেখতে চাই নে, আমি তোমায় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বাইরে আমি তোমায় প্রাণপণে এড়িয়ে চলব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। সংসারের সকল সাধই আমার মিটে গেছে প্রভু,—এখন তোমার কাছ হতে বহু দূরে থেকেও আমি যেন তোমার পায়ে আমার অটুট ভক্তি রাখতে পারি—ভগবানের কাছে এই শুধু প্রার্থনা করি। আমায় অপরাধিনী ভেব না। মনে বুঝে দেখ, আমি যা করেছি এ তোমার পক্ষেই ভাল হবে। আমি আমার হৃদয়বৃত্তিকে জয় করতে পেরেছি বলেই আজ তোমার স্পর্শ এড়াতে চাচ্ছি,—তোমার জিনিস তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। মনে কর—তুমি যে-দিন যাও, সেদিন আমায় ত্যাগ করেই গেছ। যদি আমার প্রতি যথার্থ ভালবাসা তোমার মনের এক কোণে জেগে থাকত, তা হলে আর একটী কুমারীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিতে পারতে না। কি জানি কেন—আবার তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ, আবার আমায় নিতে চাইছ, যখন এ সংবাদ সে নারী পাবে—তখন—মনে ভাব দেখি, তার হৃদয়ের অবস্থাটা কি রকম হয়ে যাবে? তুমি নারীর হৃদয়ের বেদনা বুঝতে পারবে না স্বামী, আমি বুঝি—কেন না আমি নিজে একদিন সে রকম আঘাত পেয়েছিলুম। সে আঘাত পেয়ে আমার মনে হয়েছিল আমি কোথায় ছিলুম—সেখান হতে ধুপ্ করে কত নীচে পড়ে গেলুম। ভেবেছিলুম আর উঠতে পারব না, আর হাসতে পারব না—কিন্তু আবার পেরেছি উঠতে, আবার পেরেছি হাসতে। কিন্তু কতখানি কষ্ট দুঃখের মধ্যে দিয়ে এখানে এসেছি,তা তো তুমি বুঝতে পারবে না স্বামী,—তুমি জানতেও তো পারবে না, যেখানে এসেছি এখানে আসতে গেলে নিজের সবটা বিসর্জ্জন দিয়ে কতখানি বেদনার পথ বেয়ে আসতে হয়। না, এ হয় না, আমায় আর ফিরে পাওয়া তোমার হবে না। সে কিছুতেই আমায় সইতে পারবে না। সে জানে তোমার আর তার মাঝখানে কেউ নেই—তার সে ধারণা অটুট থাকতে দাও। তোমার শান্ত-সুনীল জীবনাকাশে অশান্তিরূপ ধূমকেতু আমায় টেনে নিয়ে যেয়ো না। আচ্ছা, একটী সত্যি কথা বল, তুমি যে পূর্ব্বে বিবাহিত, তোমার স্ত্রী যে এখনও বর্ত্তমান—এ কথা কি সে জানে, একদিনও এ কথা বলেছ তাকে?"

মন্ত্রচালিতের ন্যায় সত্য উত্তর দিল, "না, সে জানে না।"

দেবীর মুখের উপর কয়েকটা রেখা জাগিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে বলিল, "তোমার নিজের এখনও এ কথা তাকে জানাতে সাহস হয় নি; অথচ আমায় গ্রহণ করতে এসেছ, আমায় তুমি স্পর্শ করতে চাও?"

অভিভূত ভাবটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সত্য বলিল, "ঠিক কথা বলেছ দেবী,—এ কথা তাকে জানানো আমার দরকার। প্রতারণা অনেক করেছি, আর করবার ইচ্ছে নেই। আমার ভেতরের আসল মানুষটাকে এবার বার করে ফেলে দিয়ে আমি খালাস হব। তার পরে আর আমার কোনও দায়িত্ব থাকবে না।"

তাহার কথার মধ্যে গোপন ব্যথার সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। দেবী দুই পা সরিয়া ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সজল চোখ দুটি তাহার মুখের উপর রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার কথায় ব্যথা পেয়েছ? আমায় ক্ষমা কর। আমার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে,—কাকে কি বলি তার কিছু ঠিক নেই। তাকে কোনও কথা বলো না,

তোমার পায়ে পড়ি—জীবনের মাঝখানে আর অশান্তি বয়ে এনো না। এ কথা যেমন গোপনে আছে, তেমনি গোপনে থাক। সে আমার চেয়ে তোমায় বেশী ভালবাসে, সে তোমায় জীবনকে পূর্ণ করে রেখেছে, নিজেকেও ধন্য জ্ঞান করছে,—ওগো, আমার জন্যে সে জীবনটাকে নষ্ট করো না, নিজেও ব্যর্থ হয়ো না। আমি বেশ আছি—সত্যি আমি বড় সুখে আছি, আমার তো কোন কষ্টই নেই দেবতা। তোমায় আমি ভগবানের আসনে বসিয়ে পুজো করছি,—তোমার অভাব আমার তো এতটুকু নেই।"

সত্যর দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে দুটি ফোঁটা জল কখন ঝরিয়া পড়িয়া গেল, দেবী তাহা দেখিতে পাইল না।

বাহির হইতে প্রকাশ ভারি গলায় ডাকিল,—"সত্য"—

"আজ তবে আসি দেবী। কাউকে কিছু বলে আসিনি। সবাই ভাবৰে আমি কোথায় গেছি; আমার জন্যে খোঁজ করবে। তোমার ক্ষমা আমি পেয়েছি, আমার মনে এই বড় সান্ত্বনা থাকবে। যদি বল—তবে আবার আমি আসব কি?"

ব্যগ্রকণ্ঠে দেবী বলিয়া উঠিল, "না—না, তুমি আর এখানে এস না,—তোমার—"

কাতরভাবে সত্য বলিল, "সে আমি শুনেছি। বাবা তাঁর অপদার্থ দুই ছেলেকেই এ ভিটেয় পদার্পণ করতে বারণ করে গেছেন; কিন্তু আমি সেই দেবাদেশ অগ্রাহ্য করে—একটী দিন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে এ ভিটেয় পা দিয়ে এ মাটি কলঙ্কিত করেছি, পবিত্র বাতাসকে অপবিত্র করেছি,—যাওয়ার বেলায় বাবার স্বর্গগত আত্মার কাছে সে জন্যে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি।"

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার ক্ষুব্ধ বুকের অন্তরে লুকাইত চোখের জল উপছাইয়া কয় ফোঁটা সেখানকার শুষ্ক ধূলাকে আর্দ্র করিয়া দিল কে জানে।

শুষ্ক কণ্ঠে দেবীর মতই আদেশের সুরে দেবী বলিল, "এর মধ্যে আর এখানে এসো না। যদি পার—যে দিন আমি মরব সেই দিনে সেই মুহূর্ত্তটীতে এসো—আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ো। আমার জীবনকালে আর যেন তোমায় আমায় না দেখা হয়—তোমার কাছে এই আমার প্রার্থনা জেনো।"

শেষের দিকটায় কঠোরতা সুর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। উদ্বেলিত অশ্রু কোন মতে চাপিতে চাপিতে দেবী ছুটিয়া অন্ধকার গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে মাটীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"ঠাকুর, এ কার পাপে?"

(ক্রমশঃ)

জন্মভূমি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে জননি জন্মভূমি
আজি তব স্মৃতি চুমি
　　বলি কম্প্র স্তবে:
তোমারেই এ জীবনে
ভালবেসেছি মা মনে
　　অশ্রুতে, উৎসবে।
আজি এ ম্লানিমা সাঁঝে
যবে হেরি নানা কাজে
　　বিদেশী জনতা,

বাহিরে বধির স্বরে
রটায় শান্ত অম্বরে
　　পণ্যের বারতা,—
তখন তোমার মাটি,
গেহাঙ্গন, অমা কাটি
　　কল্পনায় কোল
দেয়; তব স্নেহবাণী
আজি মা অমরারাণী
　　সুরার হিল্লোল।

হয় ত বা এ জীবনে
আর মাগো, তোর সনে
দেখা নাহি হবে,
তব তরে কী বেদনা
জানিবি না কী লাঞ্ছনা
এ হৃদি নীরবে
স'হেছে যখন ওমা,
যে তুই বরদা-সমা
তাহার নিন্দনে
অপবাদে প্রতীচির
উৎসাহে হেরেছি শির
কম্পিত সঘনে!
শুনেছি জগতহাটে
যবে জাতীয়তা-ঘাটে
গর্ব্ব-অট্টরব,
তখন ব্যথায় মোর
খুঁজিত এ চিত্ত তোর
চরণ-বৈভব।
স্বদেশে উৎসব-রোলে
কভু ত' মা তোর কোলে
হেন নিবেদনে
এ সন্তান আপনারে
বিলায় নি ভক্তি-ধারে
যে পূত বন্দনে
আজি কম্প্র প্রাণ মোর
তার অর্ঘ্য—আঁখিলোর—
সঁপি ধন্য গণে,
বারে বারে ও বেদীর
তলে ভক্তি-নত শির
ছোঁয়াই বিজনে।
মুগ্ধ হৃদি স্নেহ-ভরে
যারে বাল্যে প্রেমে বরে
তার ঋণ কবে
শুধিয়াছে মর্ত্ত্য জনে
তাই সেই ঋণ মনে
বহি সগৌরবে।

তবু স্বদেশেতে তোমা
চিনিনি ত' কভু ওমা!
হেন অসংশয়ে?
'সর্ব্বদেশ মাঝে তুমি
মাত্র অন্যতম ভূমি'
—ঘোষেছি নির্ভয়ে!
কিন্তু আজি এ কী হেরি!
মুহূর্ত্তেকে তোরে ঘেরি
জ্যোতি নীহারিকা
জ্বালে এই সুদূরের
তটে তোর অর্চ্চনের
সামস্তোত্রশিখা!
শুধু শঙ্কা জাগে চিতে
তোর সাথে মা বাঞ্ছিতে!
আর নাহি দেখা
হয় ত বা হবে মোর
এ জনমে নেশাঘোর
কাটি স্বর্ণলেখা
ফাটে বুঝি হৃদিতটে
তাই ও জ্যোতিষ্কপটে
তোমার মূরতি
নিখিল ছাপিয়া হৃদি
লঙ্ঘি' 'চ্ছ্বাসিত বারিধি
লভিছে আরতি।
মোদের দুর্ব্বল মন
স্নেহামৃতে অনুক্ষণ
লভে তার বল,
সেই স্নেহ-স্তন্য দানি
তুই মা অমরা-রাণী,
উদ্ভাসি সকল
তুলেছিলি সে শৈশবে;
আজি সে স্মৃতির স্তবে
ওঠে ভরি প্রাণ
পলকেতে মনে হয়
বাল্যের দোলার জয়
পবিত্র, মহান্।

জীবনের শেষক্ষণে
যেই বাণী মন্ত্রস্বনে
ওঠে মুগ্ধ রণি'
তাহা কভু মিথ্যা নহে;
সত্য কভু গুপ্ত রহে?
তব গীতিধ্বনি
আজি তার দূর তানে
মোর এই শ্রান্ত প্রাণে
ঝরায় সুবাস,
মৃত্যুরে যে স্নিগ্ধ করে
তারে কোন্ যুক্তি বরে
সর্ব্বদেশপাশ
একাকার করি দিবে?
ভালবাসা বিছাইবে
রক্তে সান্দ্র ফুল!
হৃদয় যেখানে নাই
সেথায় যুক্তিরে চাই
প্রেমে তারা ভুল
স্বদেশের চেনাকাশে
যে বিচিত্র রূপে ভাসে
কভু কি তেমন
যুক্তিবলে বিদেশের
ছাইয়া সে গগনের
রূপেরে বরণ
করিতে মা পারে? বল্!
যে অনিন্দ্য শতদল
বাল্যের স্মৃতিতে
পরতে পরতে খচা
তার পাশে গন্ধ রচা
যুক্তির গীতিতে?
তাই আজি ক্ষোভ জাগে
যদি বা মা আর রাগে,
ছন্দে, কাব্যে তব
মালা-গাঁথা অসম্ভব
হ'য়ে ওঠে—এ নীরব
হৃদি পরাভব

মানিবে কি কালপাশে?
আমার হৃদয়াকাশে
ভাতিবি না আর?
তোর কুসুমের গন্ধ
তোর নীরদ আনন্দ
অঝোর সুধার
ধারা পুন নবধারে
স্নিগ্ধিবে না?—অচেনারে
চেনাতে আবার?
নবরূপে পুন ভাসি
উঠিবে না তোর হাসি
স্নেহ করুণার?
তোর ও মাটিতে স্নেহে
বন্য বীথিকার গেহে
শশী তারকায়—
দয়িতার প্রেম-গীতি
বুঝিবে না মুগ্ধ প্রীতি
সান্দ্র শুভ্রতায়?
আজি যদি অকস্মাৎ এ
জীবন কুলিশঘাতে
হরিতে বাসনা
লয়ে কোনো হিংসা রাজে
তাহার ক্রুরতামাঝে
কোথায় সান্ত্বনা?
যদি এ প্রাণের যোগ
এ হাটের কর্ম্মভোগ
এ জীবনে আজি
অকস্মাৎ সমাপন
হয় মা,—তোর তর্পণ
অসম্পূর্ণ বাজি
থেমে যাবে এই দুখ
জাগে হৃদে; তোর সুখ
তোর ও গৌরব
কত পূত ছিল তায়
কেহ না জানিবে হায়!
হেথা পরাভব

মানিতে বস্তুর পায়
অগৌরব প্রাণ ছায়
কেমনে মোচন
হবে বল্ সে কালিমা ?
এ গ্লানির পরিসীমা
আছে কি ?—সান্ত্বন্ ?
নহে নহে কভু নহে
ব্যর্থতার বোঝা বহে'
প্রেমের নির্ঝর
সার্থকতা নাহি লভে
জন্ম পুন মোর হবে
তোরই উর্ব্বর
শ্যামলতাঢালা বুকে ;
তোর আলো সুখে দুখে
রচিবে মন্দার,
মিটায়ে মরত ক্ষুধা
করিবে ও স্তন্যসুধা
জীবন-সঞ্চার।
পুনরায় মা মা' ব'লে
জন্ম তোরি চেনা কোলে
লভিব আবার
আবার তোরি উষার
অনবদ্য হাস্য-ধার
পিয়িব ; অপার
পুলকে লতা ও তৃণে
পত্র পুষ্পে অমলিনে
প্রত্যূষে, নিশীথে,
সার্থকতা খু জিব মা;
দৈন্য মাঝে তোরে ওমা !
অর্চ্চিব নিভৃতে !
যাহা হেথা অসমাপ্ত
পরজীবনেতে প্রাপ্ত
হব মা নিশ্চয়,
তখন তোরই শিব
মাঝে মোরে হারাইব
উচ্ছল, নির্ভয় !

রবে মা এ প্রাণ শত
দুঃখ মাঝে সদাব্রত
তোর ব্যথা সুখ
মোর কাছে কত বড়
ছিল মা, করিয়া জড়
উদ্ভাসিব দুখ।
কত আশা ছিল হৃদে
তোর তরে, ধ্যান নিদে
কত না স্বপন
রেখেছিনু রচি গূঢ়
মর্ম্মতলে সুমধুর
অশ্রু ও মূর্চ্ছন
কত না বুনিয়া জালে
রাখিতাম ছন্দ তালে
আশার ছবিতে ;—
মোদের ক্ষুদ্র জীবনে
তোর তরে প্রাণপণে
কেমনে সঁপিতে
হয় স্বার্থ ও চরণে
বৃহতের নিমন্ত্রণে
কেমনে বা সাড়া
দিতে হয় ? সার্থকতা
ত্যাগে লভে ভাস্বরতা
কিসে ?—ধ্রুবতারা
কিবা ? যদি এ জীবনে
সাধনার উদ্‌যাপনে
দেখাতে না পাই,
পরজন্মে যেন মোরে
ভুলিস্ না এই তোরে
প্রার্থনা জানাই।
জীবনে আলোর মাঝে
যে সত্য সহস্র কাজে
সদাই হারাই,
তিমিরের ছায়াপাতে
ধরা দেয় কম্পনাতে
উদ্ভাসি হিয়াই

তাই আজ দেখি ওমা !
যে প্রীতি পীযূষসমা
স্বত-উৎসারিতা
তাহারে যুক্তির ছলে
মূঢ়ে অবজ্ঞের বলে
জ্যোতিষ্কমণ্ডিতা
ধরণী প্রেমের বলে
জ্যোতি প্রদক্ষিণ করে,
নহিলে শূন্যতা
গরভে বিলীন হ'ত
সৃষ্টি উপহাস স্রোত
সন্নিভ রিক্ততা
কঙ্কালেতে প্রতিভাতি
এ নয়নে দিনরাতি
শুষ্ক হাহাকারে
কক্ষচ্যুত তারাসম
ব্যর্থতায় নিরমম
ভরিত আঁধারে।
শুধু প্রেম প্রীতিচ্ছায়ে
প্রিয়স্নেহের কুলায়ে
অসহায় মোরা

পাই খুঁজে অমারাতে
পথ, এ পথচলাতে
তাই বিশ্বজোড়া
বাজে অমর্ত্ত্য সঙ্গীত
যাহে এই ভয়ভীত
হৃদি ভুলি তার
দীনতা আশার লোকে
কল্পনায় স্বর্গ চোখে
রচে বার বার।
সে-স্বরগ এ ধরাতে
শুধু মাগো প্রতিভাতে
তোর গূঢ় বরে,
স্নিগ্ধ জন্মভূমি চেয়ে
কি আছে ? হৃদয় ছেয়ে
অক্ষয় নির্ঝরে
ঝরে নিতি নিরমল
দ্যুলোক-আলো-উচ্ছল
অন্তর্গূঢ় তান,
স্বপ্ন-স্মৃতি-দিয়ে-ঘেরা
সকল দেশের সেরা
জনমের দান।

৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৭
হাঁসপাতাল, বার্মিংহাম।

অস্তিত্ব

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাস্তব সংস্রব যখনই আমরা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তখনই বুঝিতে পারি, সাধারণ চক্ষের বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানস-বিশ্বের অন্তরতর প্রকৃতির কতটা প্রভেদ। আমাদের উপলব্ধির কেন্দ্রীভূত শক্তির সঙ্গে উপলব্ধ্য বস্তুর কেন্দ্রীভূত শক্তির যে বিরাট ব্যবধান, সেইটাই প্রথম আমাদের প্রধান সমস্যা হইয়া পড়ে। অন্তর্জগতের সঙ্গে জড়-জগতের সম্বন্ধটা আমরা কোনমতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচারে, আরও পূর্ব্বেই আমাদের যে ধাঁধা লাগিয়া যায়—সেই ধাঁধা না কাটাইলে, তর্ক ও প্রমাণের দ্বারা বিশ্ব-জগতের বাস্তব অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত আমরা অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি। এমন কি, "আমি আছি কি না" ইহাই আমার পক্ষে সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে।

এই প্রাথমিক অবস্থাতেই যদি আমাদের এরূপ বোধ-

সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিকট আমরাই বাধ্য হইয়া একটা অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য বিরাট প্রহেলিকা হইয়া পড়ি। প্রথমতঃ 'আমি জাগ্রত কি সুপ্ত' ইহারই মীমাংসা করিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি—আমাদের বাস্তব অস্তিত্ব কতটা সন্দেহজনক। অতীত ও ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, বর্ত্তমানই আমাদের পক্ষে সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। 'আমি লিখিতেছি' ইহা মাত্র আমি আমার বর্ত্তমান কর্ম্ম ও অবস্থার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু 'আমি লিখিতেছি' এই কর্ম্ম বা অবস্থার কোন সত্য প্রমাণ আমি দিতে পারি না। আমার পক্ষে আমার বর্ত্তমান কর্ম্ম বা অবস্থার উপলব্ধি স্বপ্নেও সম্ভব। আমি স্বপ্নাবিষ্টও হইয়া থাকিতে পারি। হয় তো আমার বর্ত্তমান অবস্থাটী স্বপ্নের মধ্যেই সাধিত হইতেছে। প্রকৃত জাগ্রত যে কখন হইব, এবং তখন যে আমি আমাকে কোন্ কর্ম্ম বা অবস্থায় ব্যাপৃত দেখিব, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এই সকল প্রহেলিকার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইতে হইলে, আমাদের প্রধান কর্ম্ম ও একমাত্র উপায় সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কার। সে আবিষ্কার বৈদান্তিক সূক্ষ্ম দর্শন ভিন্ন অসম্ভব।

বর্ত্তমানে প্রাচ্য বেদান্তের এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা পাই না, যাহাতে আমরা আমাদের এই প্রাথমিক সংশয়গুলির হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারি। প্রাচ্যের উচ্চতর স্তরগুলি যে ভাবে সজ্জিত, তাহাতে প্রাথমিক অবস্থাটা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া যাইতে হয়। তাহার প্রমাণ ও সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সেই সকল উন্নত সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আমাদের জানিয়া লওয়া দরকার। তাহা না হইলে প্রাচ্য দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য বেদান্তে বিভিন্ন মতের টীকা ও ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহা অনেক সময় আমাদিগকে ওই সকল প্রহেলিকার আরও গভীরতর তলদেশে লইয়া যায়।

"কলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে ফাল্গুণে বালকাঃ ইব।"

এই সকল রূপান্তর বর্ত্তমানের ফাল্গুনের ক্রীড়ারত বালকবৎ বৈদান্তিকগণেরই বেদান্ত-ক্রীড়ার ফল। এরূপ স্থলে যদি আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করি—তাহা হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে মূল বিষয়টী অনেকাংশে সরল ও সহজবোধ্য হয়; এবং অনেকটা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

যাহাই হউক, পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শনের সরল সিদ্ধান্তগুলির সাহায্যে আমরা আমাদের এই সন্দেহমূলক অস্তিত্ব-সমস্যার হস্ত হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত হইতে পারি। আমাদের প্রথম ও প্রধান অন্তরায়—'জাগ্রত কি সুপ্ত' 'আমি আছি কি না,' প্রভৃতি প্রহেলিকা, আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিক Descartes-সংগৃহীত প্রমাণ হইতে অনেকটা দূর করিতে পারি। এই সকল সন্দেহের মীমাংসায় উপনীত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—* "Say, I doubt every thing. I doubt the present world. I doubt any thing and every thing behind it, and even I doubt my own existence. But, can I doubt any more that I doubt all these things, i. e., can I doubt my doubting? No. Therefore by "Cogito ergo sum" I am bound to admit my existence as a 'thinking being'. though not in shape and size. I think, therefore, I am (as a thinking being)." * এক্ষণে যদি সুপ্ত কি জাগ্রতের কোন প্রশ্ন আসে, তাহাতে বিশেষ বাধা উপস্থিত করিতে পারে না। কারণ, স্বপ্নেই হউক বা জাগ্রতেই হউক, "আমি যে আছি" ইহা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু বাহিরের বাস্তব জগৎ যে আছে, তাহা এখনও আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারি না। আমার পার্থিব অস্তিত্বও আমি স্বীকার করিতে পারি না। বাস্তব জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'জাগ্রত কি সুপ্ত' এই প্রশ্ন বিশেষ বাধা উপস্থিত করিতে পারে।

পুনরায় এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ি। আমার সম্মুখীন বিশ্ব-জগৎ স্বপ্নের ছবি না বাস্তব

---

* সকল অস্তিত্বই যখন সন্দেহমূলক—তখন আমি উহা অবিশ্বাস করিলাম। অর্থাৎ—বিশ্বজগৎ ও তাহার অন্তর্নিহিত যাহা কিছুর, এমন কি, আমার নিজের অস্তিত্বকেও আমি অবিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এই অবিশ্বাস করাটুকুকে তো আর অবিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং অন্ততঃ অবিশ্বাস করিবার অর্থাৎ চিন্তা করিবার কোন শক্তিরূপে যে আমি আছি, ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করিতে পারি।

অস্তিত্বযুক্ত কোন পদার্থ (Substance) ইহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

Descartes ইহার মীমাংসা করিয়া গেলেন (Perfect & Infinite) সম্পূর্ণ ও অসীম এর idea ধারণা লইয়া।

আমার অস্তিত্ব যখন আমি উপলব্ধি করিতে পারি, তখনই আমি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি যে—আমার অস্তিত্ব আমাকে লইয়াই গণ্ডীবদ্ধ; অর্থাৎ ইহা সসীম ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু অসীম ও সম্পূর্ণের ধারণা ব্যতীত সসীম ও অসম্পূর্ণের ধারণা আসিতে পারে না। অন্ধকার ভিন্ন আলোকের বা আলোক ভিন্ন অন্ধকারের ধারণাও যে প্রকারে অসম্ভব, Perfect and Infinite ভিন্ন imperfect and finiteএর ধারণাও তদ্রূপ অসম্ভব। সুতরাং যখনই আমার মধ্যে অসম্পূর্ণ ও সসীমের ধারণা আসে, তখনই আমার মধ্যে অসীমের ধারণা পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হয়।

This idea of Infinite and Perfect is innate or inborn, as Descartes says, stored up as if in a store-house from my birth. এই অসীম ও সম্পূর্ণের ধারণা আমাদের জন্মগত। ইহা বাহ্য জগতের পারদর্শিতা লব্ধ নহে; কারণ আমার জীবনে কখনও কোন অসীম ও সম্পূর্ণ বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় পাই না।

এই সম্পূর্ণ ও অসীমকেই তিনি বিশ্ব নিয়ন্তা বা ভগবান বলিয়া স্বীকার করিলেন, যে অসীম জন্ম হইতে তাঁহার ধারণা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন। অনন্তর by 'Principle of Veracity' তিনি প্রমাণ করিলেন যে—অসীম ও সম্পূর্ণ মহাশক্তির মধ্যে সত্যের অভাব হইতে পারে না। সুতরাং (This world which lies wholly in Him and which is a manifestation of Him, can not be false or illusory) তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত এবং তাঁহারই বিকাশ এই বিশ্ব-জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। আমার মধ্যে, বিশ্ব জগতের মধ্যে প্রবাহিত ও প্রকাশিত—সেই মহাশক্তিই অসীম, অনন্ত ও বিরাট সত্য। এই সত্যের আবিষ্কার ও উপলব্ধিই প্রকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন।

Descartesএর প্রমাণের সাহায্যে আমরা ভ্রান্তির হস্ত হইতে কতক পরিমাণে মুক্তি পাইয়া সেই অসীম মহাশক্তিকে কিছু কিছু ধারণা করিতে পারি, যে মহাশক্তি সীমাবদ্ধ বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে থাকিয়া আপনাকে বিকশিত করিতেছেন, এবং যিনি আদি, অন্ত ও মধ্য সকল অবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান আছেন।

"অহমাত্মা……সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ—ভূতানামন্ত এব চ ॥"
(২০॥ ১০ম অঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

"I am the Alpha and I am the Omega, the beginning and the end, the first and the last.
(Bible.)

যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কবীন্দ্র গাহিয়াছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার বিকাশ
তাই এত মধুর।"

Descartes তাঁহার দর্শনের উপলক্ষ্য বিষয় তিনটী বস্তুতে বিভক্ত করিলেন:—(i) Mind (ii) Matter and (iii) God. ১। মন ২। জড়জগৎ ও ৩। ঈশ্বর)।

Descartesএর এই মতবাদ প্রাচ্য দার্শনিক রামানুজের বিশেষ অনুরূপ প্রতিধ্বনি বলিয়াই মনে হয়। রামানুজ তাঁহার দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তুকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে "চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর" এই তিন প্রকার পদার্থ। 'চিৎ' জীববাচ্য, নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপ। নিত্য ও অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত, অচেতন স্বরূপ জড়াত্মক জগৎ 'অচিৎ' পদবাচ্য। আর ঈশ্বর জীব ও বিশ্ব-জগতের নিয়ামক, অন্তর্যামী, অপরিচ্ছিন্ন—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশালী সর্ব্বময় কর্ত্তা। "চিৎ" "অচিৎ" সকলই তাঁহার শরীর স্বরূপ।

মন ও জড় জগৎকে দুইটী বিভিন্ন বস্তু বলিয়া যাওয়ায়, অথচ ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার (action and re-action) কারণ বা কোন প্রমাণ না দেওয়ায় Descartes-এর দর্শন একটা বিশেষ অসম্পূর্ণতার সঙ্গেই সমাপ্ত হইল। জড়জগতের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ও সম্বন্ধ পূর্ব্বের ন্যায়ই অমীমাংসিত রহিয়া গেল। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে এই অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিলেন। Geulenex, Malebranche প্রভৃতি বলিয়া গেলেন—

The action and re-action of mind and matter are being done by 'Occasionalism', i.e., God intervenes at every occasion. অর্থাৎ ভগবান সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধিত করিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারিলেন না। উপরন্তু, ইহাতে আর একটী সমস্যা আসিয়া পড়ে। পাপ পুণ্যের বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব অনেক কমিয়া যায়।

প্রাচ্য দার্শনিক Spinoza সুদূর য়ুরোপে গিয়া তাঁহার "Theory of Parallelism" মতবাদ দ্বারা Descartesএর অসম্পূর্ণ দর্শনে সম্পূর্ণতা আনিয়া দিলেন; তিনি বলিলেন—মন (Mind) ও জগৎ (Matter , একমাত্র পরম পদার্থ ভগবানের দুইটী দিক মাত্র। ইহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে। উভয়ই একের দ্বিবিধ প্রকাশ; সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। Spinozaর এই মতবাদে রামানুজ-দর্শনের শেষ মন্তব্যে উক্ত 'চিৎ' ও 'অচিৎ' সকলই ভগবানের শরীর, ইহারই পুনরাবৃত্তি হইল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

বিশ্বের, আমার ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ এক্ষণে কতক পরিমাণে স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একটী জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িতে পারে এই যে—

'আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং অন্তে অর্থাৎ সংহারের পর আমি অব্যক্ত। কেবল স্থিতিকালে (in life time, সৃষ্টির পরে ও সংহারের পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়) আমি ব্যক্ত বা প্রকাশমান। যাহার আদি অন্ত অব্যক্ত, তাহার মধ্যাবস্থা ব্যক্ত হইতে পারে না। কেন না, যাহার আদি অন্ত নাই—তাহার মধ্যাবস্থাও থাকিতে পারে না। সুতরাং আমি যে মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ জীবনকালে বর্ত্তমান ইহা সন্দেহজনক। এই অবস্থায় আস্থাহীন হইয়াই চার্ব্বাক বলিয়াছিলেন :—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

কিন্তু যাহার মধ্যাবস্থা আছে, তাহার আদি ও অন্ত থাকিবেই থাকিবে। তবে যে আমরা মধ্যাবস্থাকে ব্যক্ত বা প্রকাশমান দেখিতেছি, তাহার কারণ এই যে আমাদের আদি ও অন্তে লক্ষ্য নাই। আদি এবং অন্তে যদি আমাদের লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সকলই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। প্রাণের যে উর্দ্ধাধোগতি তাহার আদি ও অন্ত স্থির; অর্থাৎ অধঃ হইতে উর্দ্ধে যাইবার মুখে স্থির এবং উর্দ্ধ হইতে অধঃ নামিবার মুখে স্থির। সেই স্থিরটুকু অব্যক্ত। ঐ আদি অন্তের স্থিরভাবে আমাদের লক্ষ্য না থাকায়, মধ্যের চঞ্চল ভাবে পড়িয়া আমরা এই জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত দেখিতেছি। কিন্তু যদি আমাদের ঐ আদি অন্তের স্থৈর্য্যে লক্ষ্য থাকিত,তাহা হইলে মধ্যাবস্থাও ব্যক্ত দেখিতাম না। তখন স্থির স্বরূপ অব্যক্তে জগৎ-প্রপঞ্চের লয় হইয়া যাইত। সেই অব্যক্ত ভাবই আত্মভাব। সে অবস্থায় "আমি" থাকে না—সবই আত্মময় হইয়া যায়। সুতরাং এক প্রাণই আদি অন্ত মধ্য। আমরা যদি এই অব্যক্ত ভাবে থাকিতাম, তাহা হইলে মধ্যাবস্থা বা চঞ্চলভাব না থাকায়—সবই আত্মময় দেখিতে পাইতাম। সেই আদি অন্তের অব্যক্ত ভাবে আমাদের লক্ষ্য নাই বলিয়া আমরা "অহং" জ্ঞানে এই জগৎকে ব্যক্ত দেখিতেছি। সাধনার দ্বারা যিনি সেই স্থির ভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহার "আমি" না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে মধ্যাবস্থা নাই। অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত তিনি জগতের পৃথক সত্তা দেখেন না। আর যাহাদের সেই স্থৈর্য্যে লক্ষ্য নাই, তাহাদের "আমি" থাকায় তাহাদের সম্বন্ধে কেবল মধ্যাবস্থা অর্থাৎ জগতের পৃথক সত্ত্বা অনুভূত হয়। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০ম অঃ শ্রীধর-টীকা)। মূলে আত্মা ও তাহার অস্তিত্ব সকল অবস্থাতেই সমান। কারণ, উহা একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বিকাশ মাত্র, যিনি সর্ব্ব অবস্থাতেই সত্য ও সমভাবাপন্ন। "কঠোপনিষদে" বাজশ্রবা-পুত্র নচিকেতার নিকট যমের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আত্মার একত্ব ও পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রেও আমাদের মধ্যে অবস্থিত পরম সত্য আত্মা বা নিজেদের ব্রহ্মস্বরূপকে—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽস্মি নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥"

বলিয়া ধ্যান করা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদের ২য় প্রশ্নেও প্রাণকে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সর্ব্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের বিকাশ-রূপ এই জীবনের আদি ও অন্ত অব্যক্ত হইলেও অস্তিত্ব-যুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক শঙ্করাচার্য্য আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই চরম সিদ্ধান্তে বলিয়া গেলেন—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ

——ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা ——"

তিনি জগতের পৃথক সত্তা স্বীকার করিলেন না। ইহাকে মাত্র মায়া বলিয়া প্রচার করিলেন। আত্মা বা ব্রহ্মকেই তিনি পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সেই ব্রহ্মের স্বরূপ তর্ক ও মীমাংসার অতীত। যাঁহার বিরাট ভাব আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না, তিনি তর্ক ও মীমাংসার গণ্ডীমধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি বিষয়ে আমরা এক সমস্যার মধ্যে আসিয়া পড়ি। Apriori, assumption মাত্র। তাহাকে কোন তর্ক ও মীমাংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্যের "যুক্তি প্রতিষ্ঠানাৎ" মতবাদের প্রতিধ্বনি স্বরূপ বৈষ্ণব-যুগের সাধকগণও বলিলেন—

"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা

মা তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

যে সকল ভাব অচিন্ত্য তাহা তর্কে যোজনা করা যাইতে পারে না।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুংশক্যোন চক্ষুষা।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

উপনিষদ্

তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে মাত্র এই বলা যাইতে পারে যে—তাঁহার অস্তিত্ব আছে; অর্থাৎ তিনি আছেন। কিন্তু সে অস্তিত্বের অসীমত্ব ও বিরাটভাব অব্যক্ত ও অননুভবনীয়। যে বিরাট মহাসত্তার প্রতি লোম-কূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, তিনি কল্পনার অধিগম্য হইতে পারেন না; তিনি ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারেন না। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদির অবোধ্য।

"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ"

উপনিষদ্

"সত্তা" যদি মন ও চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি সকল উপলব্ধির বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে পুনরায় এক ভীষণ সমস্যার মধ্যে আমরা আসিয়া পড়ি। ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির গোচর সকলই সত্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য হইয়া পড়ে। বস্তুর স্বরূপও আমাদের নিকট পুনরায় অবোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। যুক্তির উপরেও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না; কারণ যুক্তিও অনেক সময় ভ্রান্ত পথে লইয়া যাইতে পারে।

এরূপ স্থলে প্রাচ্য বৈদান্তিকগণ নূতন পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন;—"প্রাতিভ জ্ঞান" দ্বারা আমরা সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি; ও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধেও কৃতকার্য্য হইতে পারি।

"প্রতিভাদ্বা সর্ব্বম্"

পাতঞ্জল।

প্রাচ্য দার্শনিকগণ এই প্রাতিভ জ্ঞান দ্বারা 'সত্যে'র বা চরম সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। আমরা অন্তর হইতে সর্ব্ব বিষয়ের যে উপলব্ধি পাই তাহাতে তর্ক বা মীমাংসা থাকে না। আমাদের সেই অনুভূতি অন্তর-লব্ধ; অর্থাৎ বহির্জগতের ইন্দ্রিয়াদি-লব্ধ কোন জ্ঞান তাহাকে বলা যাইতে পারে না। এই অনুভূতির দ্বারা আমরা সৌন্দর্য্য হইতে তৃপ্তি পাই। সত্যের স্বরূপ অনুভব করি। ইহার দ্বারাই আমরা চরম সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি।

পাশ্চাত্যের Intuitionalismকে এই প্রাতিভজ্ঞানের শ্রেণীমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। তবে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁহাদের Intuitional Investigationএর প্রাথমিক অবস্থা হইতেই প্রায় বিজ্ঞানের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল সিদ্ধান্ত ও মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশেই প্রাচ্য মতবাদের অনুরূপ। ইহাতে প্রাচ্য চিন্তার সাফল্যই সমর্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলি প্রাচ্য চিন্তার অনেক মীমাংসাকেই সমর্থন করিয়া দৃঢ়তর করিয়াছে। Darwin প্রভৃতির ক্রমবিকাশ বাদ বা Evolution Theoryর জীব-বিকাশবাদ (Biological Evolution) যে আমাদের দশাবতারবাদের বিশেষ অনুরূপ, তাহাতে কোন ভুল নাই (যথা Amibı etc then ımphibious then beasts and Others—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি)। Cosmological Evolutionএর Dynamical Theoryর আভাষ যে প্রাচ্য দর্শনে বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিভাত হইয়াছিল,তাহার প্রমাণ মাত্র

"জগৎ" শব্দ হইতেই পাওয়া যায়। Dynamical Theoryর মতে জগৎ গতিশীল; আর প্রাচ্যমতে "জগৎ" শব্দের অর্থই গতিশীল পদার্থ (গম্ + ক্বিপ্)।

Dalton যে Atomic Theory দেখাইয়া গেলেন, তাহা বহু পূর্ব্বে প্রাচ্য ঋষি কণাদ তাঁহার 'পরমাণুবাদ' দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। জড়ের শক্তিবাদ বা পরমাণুবাদ প্রাচ্যের কণাদ হইতে আরম্ভ করিয়াই প্রতীচির Dalton পর্য্যন্ত সপ্রমাণ হইয়া আসিয়াছে।

(Nebula) নীহারিকাবাদ বা কোন জ্যোতিষ্ক পদার্থের পুঞ্জ হইতে যে পৃথিবী উদ্ভূত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বলিতে গেলে, আমরা বলিতে পারি যে—সূর্য্য হইতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যের 'সবিতা' নামের অর্থই প্রকাশ করে যে সূর্য্য জনয়িতা বা উৎপাদয়িতা (সু (প্রসব করা) + তৃণ্ ক)।

তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুরী-দম্পতি (R. Currie) যে Electron or Ions Theory আবিষ্কার করিয়া গেলেন, সেই Theoryর প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য দর্শনের Intuitional মতাবলম্বনে বার্গসোঁ প্রভৃতি দার্শনিকগণ চরমে হিন্দু মনীষিগণের ন্যায় সম-সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তের শেষভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথগামী হইয়া পড়িল। তিনি বিশ্বের গতিশীলতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া সমস্তের উপরেই উহা আরোপ করিলেন। এমন কি চরম সত্তাকেও তিনি গতিশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

হিন্দু দার্শনিকগণ বিশ্বের গতিশীলতা প্রচার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু চরম সত্তা বা ব্রহ্মকে তাঁহারা বিরাট, অসীম, অনন্ত, অজর, অমর ও অক্ষর বলিয়াই গেলেন। ব্রহ্মকে পরিবর্ত্তনশীলতার গণ্ডী-মধ্যে বদ্ধ করিলে সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য ও সাধনা সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়। কেন না, সম্পূর্ণ ও অসীম—(Perfect and Infinite) চরম সত্তা পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারেন না।

যাহা হউক, আমাদের অন্তরস্থিত অনুভূতির সাহায্যে সৃষ্টি ও পালনের যে সুশৃঙ্খলা আমরা অনুভব করি; তাহাতে chance combination স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তর্ক ও মীমাংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও এক মহান্ শক্তির অস্তিত্ব যে পরম সত্য বলিয়া আপনা আপনিই আমাদের মধ্যে বাজিয়া উঠে, ইহা আমরা স্পষ্টই স্বীকার করিতে পারি।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭

মিঃ ঘোষের সুদীর্ঘ আত্মকাহিনী শেষ করিয়া অসিত কিছুক্ষণ শুষ্কনেত্রে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলাও এতক্ষণ পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল ভাবে বসিয়া অসিতের পাঠ শুনিতেছিল; পত্রের শেষাংশ শুনিতে শুনিতে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মিঃ ঘোষের শোচনীয় জীবনের স্মৃতি উভয়ের অন্তরেই মর্ম্মান্তিক বেদনা জাগাইয়া তাহাদের আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

নির্ম্মলা আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল—আমার বাবা! আমার অমন দেবতার মত বাবা! কি দুঃখ ও যাতনা ভোগ করেই তাঁর দীর্ঘ জীবনের এক একটি দিন কেটেছে! কোন দোষে দোষী না হয়েও একদিনের জন্য মনে শান্তি পেলেন না তিনি! তাঁর কথা মনে হলেই কেবল আমার বুক ফেটে চোখে জল আসে!

অসিত বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর আমার কারু উপর রাগ বা দুঃখ কিছু করবার নেই নির্ম্মলা? জগতের ব্যাপার দেখে দেখে আমার এখন নিশ্চিত ধারণা হয়ে গেছে, যে মানুষ ভাল মন্দ কোন কাজই তার নিজের ইচ্ছায় বা শক্তিতে করতে পারে না! সে জন্মাবার পর থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন এক অদৃশ্য প্রবল শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তার নিজের কোন স্বাধীন সত্ত্বা নেই।

অনেক দুঃখ পেয়ে পেয়ে, অনেক আশায় বঞ্চিত হয়ে, ঠেকে ঠেকে এখন আমার এ জ্ঞান হয়েছে। কার জন্তে কে দুঃখ পায়, কার আশার বস্তু আর কার হাতে চলে যায়, কেন যায়, কি হয়,—জগতের এ সব দুরূহ সমস্যার আমরা কোন সমাধানই করতে পারি না; কেবল একে ওকে দোষ দিয়ে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে' মরি মাত্র।

এই মিঃ ঘোষের কথাই ধর। তিনি সত্য সত্যই কোন দিন ত আমাদের অনিষ্টের কল্পনা করেন নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা থাকা দূরে থাক্, চাক্ষুস পরিচয় মাত্র ছিল না। তবু দেখ—তাঁকে উপলক্ষ করে' এত দিন ধরে কি সব ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড ঘটে' কটা জীবন একসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল!

আমার মা ইতরের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করে' আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন; আমাদের সংসার, বিষয়-সম্পত্তি সব ছারখার হয়ে গেল; বাবা অসহ্য অপমানে ও ব্যর্থ প্রতি-হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে অশেষ কষ্ট সহ্য করে' পথের উপর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন; আমি বাড়ীতে থেকে মানুষ হলে যে ভাবে আমার জীবন গড়ে উঠতো, তার কিছু না হয়ে, পথে পথে ঘুরে একটা কেমন জীব হয়ে দাঁড়ালুম। মিঃ ঘোষ সারা জীবন দারুণ মনঃকষ্টে ভুগে ভুগে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন; আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে তুমি মাঝ থেকে আমাদের এই সব জালে জড়িয়ে পড়লে। যাদের কোন কালে দেখ নি, যাদের নাম পর্য্যন্ত কখনো কাণে আসে নি তোমার, তাদের জীবনের ঘটনার মধ্যে পড়ে তোমার ভাগ্যও নিরূপিত হয়ে গেল। তোমার এই নূতন মুকুলিত জীবন আরম্ভ হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

মোটামুটি ধরতে গেলে হয় ত মিঃ ঘোষকেই এর জন্ত দায়ী করা যায়; কিন্তু সত্যিই কি কোন দিন তিনি এ সব চেয়েছিলেন? এ সব বিষয়ে আমরা যেমন নির্দ্দোষ, তিনিও কি তাই নয়?

উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর অসিত আবার বলিল—আর আমারও বড় মন্দ ভাগ্য, নির্ম্মলা! শিশুকাল থেকে—মা মারা যাবার পর থেকে কত দুঃখ, কত বড় বড় ঝড়ই যে আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে বলে বোঝান যাবে না। কিন্তু সব চেয়ে আমার বড় দুঃখ এই ছিল, আমি কোথাও একটু, এতটুকুও স্নেহ বা ভালবাসা পাই নি। বাবা হয় ত ভাল বাসতেন; কিন্তু তাঁর সে ভালবাসার বাহ্যিক কোন প্রকাশ ছিল না। নানা দুঃখে কষ্টে তাঁরও বোধ হয় মনটা পাথর হয়ে গিয়েছিল! তাঁর কাছে কেবলই শিক্ষা আর উপদেশ, বিরক্তি ও তিরস্কার—এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাই নি। তবু তিনি যতদিন ছিলেন, একটা অবলম্বনও ছিল। তিনি যাবার পর থেকে একবারে পথ সার। কেবল পথে পথে ঘুরে যাদের জীবন কাটে, যাদের স্নেহ বা ভালবাসা পাবার কোথাও একটু উপায় না থাকে, সে সব লোক যেমন হয়ে ওঠে, আমিও দিন দিন সেই রকম শুষ্ক ও নীরস হয়ে উঠেছিলুম।— শুধু কাজ আর কাজ। শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছাড়া আর আমার জীবনে কিছুই ছিল না। তোমায় দেখবার পর থেকে নির্ম্মলা, আবার যেন আমার জীবন নূতন পথের আলো দেখতে পেলে; আবার আমি নূতন করে সব কথা ভাবতে, বুঝতে আরম্ভ করলুম! আমার জীবনের গতি নূতন পথে প্রবাহিত হলো!

কিন্তু তবু দেখ! আমার মত হতভাগ্য সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত ভবঘুরের জন্তও এক স্থানে স্নেহের এমন উৎস লুকানো ছিল, অথচ, আমি জীবনে তার কোন সন্ধানই পেলুম না। সবই হতে পারতো, সবই পেতে পারতুম; ধন ঐশ্বর্য্য, বিলাস সুখ, অগাধ স্নেহ-যত্ন, আর সকলের চেয়ে প্রিয় ও বাঞ্ছিত—আমার কাছে একমাত্র কাম্য বস্তু—তুমি—তোমাকেও সহজেই পেতে পারতুম,—আর পারতুমই বা বলি কেন—এখনো তো পেতে পারি; কিন্তু তা তো আর হবার নয়—নির্ম্মলা! তোমার বাবা কিছু না করেও আমার মায়ের—আমার বাবার—সব দুঃখ ও অপমানের কারণ; আর আমি মন থেকে মিঃ ঘোষের প্রতি সব রাগ ও হিংসা বর্জ্জন করলেও, কার্য্যতঃ আমিই তাঁর হত্যাকারী! আমরা দুজনে কোন দিন কি এ কথা ভুলতে পার্ব্ব? আমাদের উভয়ের মিলন, আমাদের উভয়ের সান্নিধ্য কি প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে এই দুঃখময় ঘটনার স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত থেকে পরস্পরের জীবন বিষাক্ত করে তুলবে না? তাই বলছিলুম, যে সৌভাগ্য সময়ে এলে জীবন হয় তো ধন্ত হতে পারতো, আজ আর তা কোন কাজেই লাগবে না। আজ আমাদের জীবনের পথ জটিল, দুর্গম, নানা সমস্যায়

পূর্ণ। আজ আর তার মাঝে সমাধান বা মীমাংসার চেষ্টা বৃথা!

নির্ম্মলা নীরবে নতমুখে কাঁদিতেছিল—সে কোন কথা বলিল না।

অসিত কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল, মানুষের মন অন্য মনকে কি আশ্চর্য্য ভাবে টানে, নির্ম্মলা? আমি তাই ভেবে অবাক্ হচ্ছি। আজ আমি মিঃ ঘোষের লেখা পড়ে যেন সব ঘটনা বুঝলুম; কিন্তু যখন এই সব কিছুই জানতাম না, যখন আমাদের সর্ব্ব দুঃখের জন্য তাঁকেই দায়ী করতুম, তখন অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি কিছুতে রাগ বা হিংসার ভাব আনতে পারতুম না। এজন্য নিজেকে কত ধিক্কার দিয়েছি, কাপুরুষ বলে নিজের উপর ঘৃণা জন্মে গেছে; কিন্তু তবু তাঁর সেই স্নেহ ও বাৎসল্যে ভরা সদানন্দময় মুখ মনে হলেই আমার হিংসা ক্রোধ কোথায় ভেসে যেত; মনে হত—এমন লোকের দ্বারা কি এ রকম নৃশংস কাণ্ড হওয়া সম্ভব? মনে মনে তাঁর উপর আর আমার বিশেষ বিরাগ ছিল না; কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি জেনে গেলেন—আর কতকটা সত্যও বটে—যে, আমিই তাঁর হত্যাকারী! সেদিন আমি ভেবেছিলুম, প্রবল জ্বরে তিনি হার্টফেল হয়ে মারা গেছেন; কিন্তু আজ বুঝছি, তা নয়; তিনি আমার সম্বন্ধে যে সংশয় ও আতঙ্কে সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন, তাতে সেদিন তাঁকে ধরবার জন্য আমায় ছুটতে দেখে ভয়েই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে! কি আশ্চর্য্য দুঃখময় ঘটনা!

সহসা ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অসিত চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল যে! আমাকে আজ রাত্রের ট্রেণে অনেক দূরে যেতে হবে। এখন তবে আসি নির্ম্মলা? এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারলেই, আবার যেমন করে হোক তোমায় খবর দেব!

নির্ম্মলা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবার চিঠিতে ত সব দেখলে; —তোমার নিজের ত অনেক টাকা রয়েছে,বাড়ী ঘর রয়েছে,—আর কেন এমন করে পথে পথে কষ্ট করে ঘুরবে? সেগুলো সব বুঝে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকলেও তো হতো?

অসিত একটু হাসিয়া বলিল—সে সব আর হয় না, নির্ম্মলা। এমন দিনও গিয়েছে, যখন একসঙ্গে দশ বিশ টাকা হাতে পড়লে ভাগ্য বলে মানতুম; কিন্তু এখন? এখন নিজের জন্য টাকা আর কি হবে? তা ছাড়া সেদিন তোমায় যে কথা বলে গিয়েছিলুম, মনে আছে ত? আমাদের দল থেকে আমরা সমস্ত দেশব্যাপী একটা বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলুম। দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সে কথা পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের কাণে ওঠায় ব্যাপারটা ফেঁসে গেছে। এখন চারদিকে গ্রেপ্তারের ধুম! আমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই ধরা পড়েছে। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের ফাঁসী হয়ে গেছে! আমি আর দু' চার জন এখনও জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আত্ম গোপন করে আছি! তাও পুলিশ সর্ব্বক্ষণ ঘরে, বাইরে, মাঠে, জঙ্গলে শিয়াল কুকুরের মত আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে! আমাদের এখন দাঁড়াবার স্থান নেই। দল থেকে তাই যে কয়জন এখনো বাইরে আছে, তাদের নিরাপদ রাখবার জন্য অনেক দূরে গুপ্তভাবে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই জন্য আজ রাত্রে যেতে হবে।

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল, তুমি এনার্কিষ্টদের দলে মিশেছ—তা হলে? কেন এমন সাংঘাতিক কাজ করলে?

অসিত বলিল—গবর্ণমেণ্ট আমাদের ওই নামই দিয়েছে বটে, তবে সত্য সত্যই আমরা সে সব কিছু নই। আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই। আরো অনেক বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকে অন্য অন্য উপায়ে সে চেষ্টা করছেন। আমাদের কাছে যে পথ শ্রেয়ঃ বলে মনে হয়েছে, আমরা সেই পথই বেছে নিয়েছি। দল থেকে এতদিন অন্য অন্য নানা কাজই হচ্ছিল; তবে এ-রকম একটা বড় বিদ্রোহের আয়োজন করে তোলা—এটা এই প্রথম হয়েছিল; তা সবই পণ্ড হয়ে গেল! কত দীর্ঘ দিন ধরে, কত লোকের মিলিত শক্তির সাহায্যে, কত ভয়ে ভয়ে, সংগোপনে তিল তিল করে এই বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল; কাজ আরম্ভ হবার দু'দিন আগে এক নিমেষে এক জনের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে গেল! এ ব্যর্থতা, এ আশাভঙ্গ যে কতদূর গুরুতর—অসিত কথাটা শেষ না করিয়াই একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তাহার বিষণ্ণ ম্লান মুখ ও কথা নির্ম্মলার হৃদয়ে আঘাত করিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, তা হলে এখন তোমরা আবার কি কর্ব্বে?

তার ত এখন কিছুই ঠিক নেই নির্ম্মলা! এখন এ-সব গোলমাল চুকতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমরাও আবার একটু স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পেলে, তখন আবার ভেবে

দেখব—কি করা সম্ভব, কি-ই বা করতে পারা যায়। তুমি টাকার কথা বলছিলে—নিজের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন নেই; তবে দেশের কাজে টাকার বিস্তর প্রয়োজন আছে। স্থির হয়ে বসে কোন উপায় স্থির করতে পারি যদি, তবে এই সব টাকার দরকার হবে। তবে এটা ঠিক যে, আমরা যে পথে নেমেছি, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সেই একই পথ। বিদেশীয় শাসনের ফলে দিন দিন আমাদের যে রকম অধঃপতন হচ্ছে, দিনের পর দিন সকল স্থানে, সকল কাজে, প্রতি পদে পদে দেশের উপর দিয়ে যে লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তা দেখে আমরা মাথা হেঁট করে এ সব মেনে নিতে পারছি না; কাজেই আমাদের এ পথ ছাড়া উপায় কি? যতদিন বাঁচি, এই চেষ্টাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

নির্ম্মলা বলিল, আমি দেশের কথা কিছু জানি না, কখনো কিছু ভেবেও দেখি নি। তবে ভাল হোক্, মন্দ হোক্—তোমার যে গতি, যে পথ -আমারও তাই। টাকা আমার অনেক আছে; তাতেই বা আমার দরকার কি? আমার সব টাকা তুমি নিয়ে দেশের কাজে ব্যয় করো। আর আমায় তোমাদের কোন একটা কাজের ভার দিও; আমি দূরে থেকে তোমার কাজে লেগে থাকবো। না হলে আমিই বা কি নিয়ে থাকবো?

অসিত প্রফুল্লচিত্তে বলিল, বেশ তো নির্ম্মলা! সে দিন আর সে সময় আবার আসুক। তখন তুমি যা বোলছো, সেই মতই কাজ হবে। তবে এখন আসি? সুধীরকে বলে যাচ্ছি -সে মাঝে মাঝে এসে তোমার খোঁজ খবর নেবে। আমারও সব খবর তার কাছেই তুমি পাবে। রাত অনেক হয়ে গেল আমি এবার উঠি।

অসিত যাইতে উদ্যত হইলে নির্ম্মলা অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলিল—আর একটা কথা—একটু দাঁড়াও! বল—আবার কত দিনে দেখা হবে?

অসিত ফিরিয়া দাঁড়াইল। একবার নির্ম্মলার অশ্রুপ্লাবিত কাতর মুখের দিকে চাহিল; বলিল কেঁদো না নির্ম্মলা আমাদের ভাগ্যলিপিই এই। মন দৃঢ় করে এ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? কত দিনে দেখা হবে, সে তো এখন ঠিক করে বলতে পাচ্ছি না। তবে এটা ঠিক—যদি এ সব গোলযোগ কাটিয়ে বেঁচে থাকি, তা হলে শীঘ্রই দেখা হতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব তোমার খবর নেব! অসিত আর দাঁড়াইল না। বাহিরে আসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নির্ম্মলা অবসন্ন চিত্তে অবশ শরীরে চৌকির উপর লুটাইয়া পড়িল।

(সমাপ্ত)

জাহাঙ্গীরের অনুষ্ঠান

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

জাহাঙ্গীর বাদশাহের অনাচার সকল বর্ণন করিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের স্বভাব তাঁহার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। (১) ডাঃ বেণীপ্রসাদের জাহাঙ্গীর নামক পুস্তক পড়িলেই উক্ত ধারণা যে কত অমূলক তাহা বোঝা যায়। বস্তুতঃ এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, মুগল সাম্রাজ্যে ব্যক্তিগত অনিয়ন্ত্রিত শক্তি প্রকাশ করিবার সুযোগ বাদশাহদিগের যথেষ্টই ছিল। তথাচ তাঁহারা সাম্রাজ্যের কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না, কেবল সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ মুগল বাদশাহদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাবরের সময় হইতে অকবরের সময় অবধি ধর্ম্মসম্বন্ধে এই নিরপেক্ষতার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। বাবর নিজে হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার বাবরনামায় রাণা সঙ্গের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। (২) তাঁহার

(১) Lane Poole, Mediaeval India p. 297. 'The Emperor Selim entitled Jehangir, 'World-Graper' formed a striking contrast to his father,

(২) Babar-Nama by Mrs. Beveridge, p. 483.

সন্তান হুমায়ুন বাদশাহ রাজপুতদিগের সহিত বাবর অপেক্ষা অধিক আন্তরিক ভাবেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন; যথা তাঁহার চিতোর রাজবংশের সহিত সখ্যতার বিবরণ টড লিখিত রাজস্থানে দ্রষ্টব্য। (৩) তাঁহার পুত্র অকবর বাদশাহের সম্বন্ধে কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অকবর নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধি-বলে ভারতবর্ষে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর বাদশাহ হিন্দু প্রজাগণের নিকট ভগবানের প্রতিনিধি রূপে উপাস্য হইয়াছিলেন। 'দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর' প্রবাদটি এই সময়কার, এবং দরশনিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাতে রাজদর্শন-রীতি মুগল সম্রাটের উপর হিন্দুদিগের ভক্তিরই স্পষ্ট উদাহরণ। (৪) জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরঙ্গজীব অবধি এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবের অবনতি লক্ষিত হয়। জাহাঙ্গীর পিতার মতাবলীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শাহজাহান নিজ পিতা-পিতামহের মতেরই পোষণ করিতে গিয়া জিজিয়া নামক শুল্ক স্থাপন হইতে বিরত হন। তবে তিনি নিজ পিতা অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের অধিক অনুরাগী ছিলেন। তাই তাঁহার সময়ে ধীরে ধীরে হিন্দু-নির্য্যাতনের পথ প্রসারিত হইতেছিল এবং ঔরঙ্গজীবের সময়ে এই দুষ্ট নীতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার কিরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছিল পাঠক মাত্রেই জানেন।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য জাহাঙ্গীর বাদশাহের সিংহাসন আরোহণের সময়ে যে অনুষ্ঠানগুলি তিনি প্রজার কল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রচার করেন, সেইগুলিরই আলোচনা করা। এই নিয়মাবলী এলিয়ট (Elliot) ছেলেমানুষী বা তপোগণের কাণ্ড বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। (৫) এবং ভিন্সেন্ট স্মিথও (Vincent Smith) এলিয়টের মতগুলির সমর্থন করেন। (৬) অবশ্য ইঁহাদের বিদ্রূপ-পূর্ণ যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতে পারা যাইবে না; কারণ, যে সকল নজীর থাকিলে তাঁহাদের কথাগুলির অসারতা দেখাইতে পারা যাইত, আমাদের নিকট সে সকল নাই; তবুও যে আমরা এই নিয়মাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়েছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সম্বন্ধে আমাদের দেশেও সাধারণ মতাবলী বিদেশী ঐতিহাসিকের ভ্রমাত্মক মতেরই অনুরূপ।

এই অনুষ্ঠানগুলি মূল ফারসী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ নিজেই নিজের রাজত্বের প্রথম বার বৎসরের ঘটনা সকল লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকের একটি নাম তুজুক ই জাহাঙ্গীরি। এই পুস্তকখানি আলিগড়ের মুসলমান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সার সাইয়দ আহমাদ খাঁ বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক সম্পাদন করেন। আমরা এই পুস্তকখানিকেই মূল ফারসী গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

এই নিয়মাবলী সংখ্যায় দ্বাদশটি। প্রায় সকলগুলিই প্রজার মঙ্গল উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। এইগুলি হইতে আর কিছু নূতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারিলেও, ইহা যে বাদশাহ-চরিত্রের একটি জলন্ত চিত্র,—তাহা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারা যায়। এবং জাহাঙ্গীর যত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মানুষ হউন না কেন, তিনি যে নিজ পিতার উচ্চ আদর্শগুলি হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহা এই নিয়মাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রথমটির কথাগুলি এই—মানা-ই-জাকাত অজ তম্‌গা ও মির-ই-বহরি ও সারের তকালীফে কি জাগীরদারান-এ-হর সুবা ও হর সরকার বা জেহেত এ নাফাএ খুদ ওয়াজা নমুদা—

এস্থলে তিনটি কথার একটু ইতিহাস না দিলে এই ফারসী কথাগুলির মর্ম্ম যথাযথ গ্রহণ করিতে অসুবিধা হইবে। কথাগুলি জকাত, তম্‌গা ও মির ই বহরি। নিজের আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাহা দান করা যায় তাহাকে জকাত বলা হয়। মুসলমানদিগের নিকট সরকার

'Rana Sanga who in these latter days had grown great by his own valour and sword.'

(৩) Tod's Rajasthan Vol. I, p. 251, 'Humayun proved himself a true knight and even abandoned his conquests in Bengal when called on to redeem his pledge and succour Chitore and the widows and minor sons of Sanga Rana.'

(৪) V. Smith : Akbar p. 383.

(৫) Sir H. Elliot : History of India as told by its own Historians Vol. VI Appendisc note C. p. 493.

(৬) V. Smith : Oxford History of India p. 375, 'But, as Sir Henry Elliot has shown, such orders had little practical effect'.

যে শুল্ক লইতেন তাহার পরিমাণও তদনুরূপ এবং উহা যেন দানের আর এক রূপান্তর। ফলে, এই শুল্কের নামও জকাত রাখা হইল। তমগা শব্দের বহু অর্থ। পুরস্কার স্বরূপ যে পদক দেওয়া হয় তাহাকে তমগা বলে। কিন্তু তমগার এই অর্থটি আধুনিক। ইহার প্রাথমিক অর্থ কোনও প্রকারের ছাপ। ইহা হইতে অন্য অর্থগুলি বাহির হইয়াছে, যে শুল্ক জাহাজ বা নৌকা পূর্ণ মালের উপর লওয়া হইত ও যাহার জন্য রাজকর্ম্মচারীর মোহর-সংযুক্ত রসিদ দেওয়া হইত, তাহাও তমগা নামে অভিহিত হইত। সেইরূপ মির-এ-বহরিও এক প্রকারের শুল্ক; অর্থাৎ মির বা আমির (noble) সাহেব নিজের লাভের জন্য জবরদস্তি জাহাজ বা নৌকার মালের উপর যে শুল্ক নির্দ্ধারিত করিতেন তাহাকে মির-এ-বহরি বলা হইত। এটা অনেকটা ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভকালের সায়েরের (Sayer) মতন ছিল (৭) এবং রাজদরবারের এ-গুলির প্রতি কথনও সুনজর ছিল না।

এখন উল্লিখিত ফারসী নিয়মটির অনুবাদ করা যাউক:—তমগা বা মির-ই-বহরি বা ঐরূপ অন্য কোনও পীড়নকারী শুল্ক যাহা সুবা বা সরকারের জাগীরদারেরা নিজ লাভের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেগুলি যেন ভবিষ্যতে না লওয়া হয়।

এখন, যে যুগের কথা এ স্থলে বলা হইতেছে, সে সময়ের নদীগুলিই বাণিজ্যের প্রধান পথ ছিল। (৮) কিন্তু জাগীরদারেরা বণিকদিগকে নানা প্রকারের শুল্কের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই প্রথম নিয়মটির অবতারণা করেন। অবশ্য কার্য্যতঃ সকল স্থলে রাজাজ্ঞা পালিত হইত কি না তাহা অনুমান করা যায় না। বাদশাহের স্বার্থের দিক হইতেও এই সৎ সঙ্কল্পের একটি বেশ সমীচীন কারণ দেখান যাইতে পারে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ সমসাময়িক লেখকগণের উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, আক্‌বর, তাঁহার মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ বাণিজ্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; নিজেদের অনেক টাকা বাণিজ্যে খাটাইতেন ও বৎসরের শেষে লাভ লোকসান ভাল রূপে হিসাব করিতেন। (৯) জাহাঙ্গীর বাদশাহ এ স্থলেও আক্‌বর বাদশাহের অনুকরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে পণ্যদ্রব্য সকল দূর দেশেও সুলভ দরে বিক্রয় হয় অথচ লাভের অংশ কমিয়া না যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এই নিয়মটি হয় ত অন্ততঃ কতকটাও পালিত হইত; কারণ, বাদশাহ সুবা বা সরকারের জাগীরদারদিগের উদ্দেশ্যেই এ নিয়মটি করিয়াছিলেন। জাগীরদার সচরাচর তাঁহাকেই বলা হইত যিনি রাজ-দরবার হইতে রাজ-কার্য্য উপলক্ষ্যে নিজ পদানুসারে ব্যয় করিবার জন্য জমি বা সম্পত্তি পাইতেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিত; কাজেই তাঁহারা বাদশাহের আদেশ বা ইচ্ছা অবহেলা করাটা বড় সুবিধাজনক মনে করিতেন না। আর যদি বা কেহ অবহেলা করিতেন, তাহা হইলে কঠোর শাস্তি ভোগ না করিয়া অব্যাহতি পাইতেন না। মুগল বাদশাহদিগের ন্যায়ের মাপকাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল। দোষ করিলে তাঁহারা এমন কি নিজ পুত্রদিগকেও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দিতেন না। অন্যান্য বাদশাহের মত জাহাঙ্গীর বাদশাহও বিচার-কার্য্যে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। (১০)

(২) দর রাহহায় কি দুজদি ও রাহজনি ওয়াকা শাওয়াদ ওয় আঁ রাহ পারা অজ আবাদানি দূর বাশদ

(৭) Hobson Jobson নামক কোষে Sayer শব্দটি দেখিলেই ইহার অর্থ বুঝা যাইবে।

(৮) Moreland : India at the death of Akbar p. 167, 'The river systems of the Ganges and the Indus certainly carried a much heavier traffic than they carry now.' ২২৭—৩৯ পৃষ্ঠাগুলিও দ্রষ্টব্য।

(৯) V. Smith :—Akbar p. 411. Commentary of of Father Monserrate, Oxford University Press p, 207. 'Akbar also engages in trading on his own account and thus increases his wealth to no small degree.

(১০) Beni Prasad: Jehangir pp. 116-7 V. Smith : Oxford History of India p. 388, "Jehangir prided himself especially on his love of justice and his reputation for that quality still endures in India. When recording the capital sentence passed by himself on an influential murderer he remarks, 'God forbid that in such matters I should consider princes and far less that I should Consider Amirs."

See Sir Thomas Roe's opinion in Purches : His Pilgrimes Vol. IV pp. 328, 335 and 372.

জাগীরদারান-এ-নওয়াহ সরায়ে ও মস্‌জিদে বিনা নেহেন্দ ওয় চাহে ইংদাস কুনান্দ তা বাইস-এ-আবাদানি গয্‌তা জময়ে দরাঁ সরা আবাদ শওয়ন্দ ওয় অগর বা মেহেল-এ-খালিসা নজদিক বাশদ মুতসদ্দী-এ-আঁজা সর অনজাম নুমায়েদ ও দর রাহগ বার-এ-সৌদাগরান রা বে ইজন ও রাজা এ এশান ন কুশায়েদ। অর্থ—

যে সকল পথে চুরি বা ডাকাতি হয়, যদি সেই স্থানগুলি বস্তি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলের জাগীরদারদিগকে তাকিদ করা যাইতেছে যে তাঁরা যেন ওস্থলে মুসাফিরখানা, (১১) মস্‌জিদ নির্ম্মাণ বা কূপ ইত্যাদি খনন করাইয়া ওই স্থানগুলি বাসোপযোগী করিয়া তোলেন; এবং এই সরাইগুলিকে যেন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। যদি এ স্থানগুলি বাদশাহের এলাকাধীন হয়, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী এলাকার মুত-সদ্দির (১২) উপর ওইগুলির নির্ম্মাণ-ভার থাকিবে। সদাগরদিগের পণ্য-দ্রব্য যেন পথে তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন খুলিয়া দেখা না হয়।

এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহকে এই দ্বিতীয় নিয়মটির জন্য শেরশাহের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। যেরূপ শেরশাহ চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহকে দায়ী করিয়াছিলেন, (১৩) জাহাঙ্গীর বাদশাহেরও এই চেষ্টা সেই প্রকারের। কেবল তাহাই নহে, এই বস্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা যেমন বাদশাহের নিজ প্রজার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, তেমনি অর্থনীতির দিক হইতেও ফলদায়ক হইয়া থাকিবে। প্রথমতঃ চৌর্য্য বৃত্তি বন্ধ করিয়া এবং গ্রামবাসীগণকে বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করিয়া বাদশাহ সমাজের এক মহৎ উপকার করিয়াছিলেন। রাজ্য-মধ্যে ধন-দৌলতের বৃদ্ধি করিয়া এই নিয়মটি লৌকিক সচ্ছলতায় সাহায্য করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ—পথে বণিকগণকে নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সঙ্কল্প যে সাধু ছিল, তাহা বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই কস্‌টম্‌স হাউস এর (customs house) কবলে পড়িবার সময়ে বুঝিতে পারিবেন। মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় বণিক এই অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন প্রথম নিয়মটিকে জলপথ রক্ষা সম্বন্ধীয় বলিতে পারা যায়, সেইরূপ দ্বিতীয়টি স্থলপথের উদ্দেশ্যে রচিত। তৃতীয়তঃ—এইটা বেশ বুঝা যায় যে এই নিয়মের প্রথম অংশ বা দ্বিতীয় কোনটাই তেমন কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। মুরল্যাণ্ড (Moreland) সাহেবের India at the death of Akbar পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দু-একজন ইয়োরোপীয় বণিক ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা সন্তোষজনক বলিলেও, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ পরিব্রাজকই প্রধান প্রধান রাজপথগুলির পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের নিন্দা করিয়াছেন। এই গ্রামগুলির অধিবাসীগণকে তাঁহারা দুষ্টমতি ও চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ ইত্যাদি বলিয়াছেন। অবশ্য এ সকল উক্তির একটি স্বার্থপূর্ণ কারণও দেখান যাইতে পারে। হকিন্স (Hawkins) ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়গণ যখন বাদশাহের নিকট রিক্ত হস্তে উপস্থিত হন ও দরবারের নিয়মানুসারে উপঢৌকন দিতে অসমর্থ হন, তখন নিজেদের দীনতা ঢাকিবার জন্য এই দেশের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া থাকিবেন। হকিন্স (Hawkins) অত্যন্ত লম্বা-চওড়া কথা কহিতেন; বলা বাহুল্য, তাহাতে অলীক বর্ণনা বা উক্তি যথেষ্ট থাকিত। তাঁহার কথাগুলিও মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে ইচ্ছা হয়; বিশেষতঃ এই কারণে যে, অন্য দুইজন ইয়োরোপীয়ের উক্তি ভারতের অনুকূল। এই দুই একজন ছাড়া আর প্রায় যত পরিব্রাজক সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন, সকলেই ভারতবর্ষের রাস্তা-ঘাট বিপজ্জনক বলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল দুইজনের নাম এস্থলে উল্লেখ

(১১) সরায়ের অর্থ বাটী বিশেষ। কারওয়াঁ সরায় অর্থাৎ বহু বণিকগণের থাকিবার স্থল। মধ্য এসিয়ার বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেক লেখক এই সরায়গুলির বৃহৎ আকার ও জনপূর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সরাইগুলিও ওইরূপ।

(১২) অর্থাৎ যে হাকিমের সম্মুখে আসিয়া কার্য্যের সাহায্য করে; যেমন পেশকার। মুতসদ্দিরই অপভ্রংশ মুচ্ছুদ্দি।

(১৩) Elliot and Dawson Vol. IV. Abbas Sorwani pp. 432-3. 'Travellers and wayfarers during the time of Sher Shah's reign were relieved from the trouble of keeping watch nor did they fear to halt even in the midst of a desert. They encamped at night at every place, desert or inhabited, without fear; they placed their goods and property on the plain and turned out their mules to graze and themselves slept with minds at ease···and the zemindars for fear any mischief should occur to the travellers and that, they should suffer or be arrested on account of it, kept watch over them.

করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ পিটার মাণ্ডি (Peter Mundy)। ইনি চোর মিনারের উল্লেখ করিয়াছেন ও তাহার নক্সাও নিজ ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে দিয়াছেন। (১৪) এই স্তম্ভগুলি, যে চোর বা ডাকাতদের শিরচ্ছেদন করা হইত, তাহাদের মুণ্ড লইয়া গ্রথিত। এগুলি সংখ্যায় অনেক ছিল; কাজেই দেশের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মাণ্ডি ভারতে ১৬৩০ – ৩ খৃঃ ছিলেন; অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদশাহের মৃত্যুর পর তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ঘটনা সকল লিখিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইবার কথা নয়। তাহা হইলেও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়েও চুরি ডাকাতি বিলক্ষণ হইত বলিতে হয়। দ্বিতীয়, ব্যার্নিএ (Bernier)। তিনি যদিও বণিকরূপে আগমন করিবার বা রাজপ্রতিনিধি হইবার ভান করেন নাই, তবুও তিনিও দেশের রাজপথগুলির নিন্দা করিয়াছেন ও বঙ্গ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় বলিয়াছেন। তবে ব্যার্নিএর সম্বন্ধে এ আপত্তিও উঠিতে পারে যে, তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের পরের কথা লিখিয়াছেন; কাজেই তাঁহার কথাগুলি জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

(৩) দর মুমালিক-এ-মেহেরুসা অজ কাফির ও মুসলমানান হর কাস কি ফৌত শওয়দ মাল ও মিনাল—ই—উ ব ওরসা-এ-উ ওয়া গুজারন্দ হো কস দরাঁ মদখল না সাজদ ওয়া অগর ওয়ারিস না দাস্তা বাশদ ব জেহেত-এ-জবত-এ আঁ অমওয়াল মুশ্রিফ ও তহওঈলদার অলেহদা তায়াইউন নুমায়েন্দ তা আঁ ওয়জহ ব মশারিয়া-এ-শরঈ কি সাখ্‌ত-ন-এ মস্‌জিদ ও সরাহা ও মরম্মত এ-পুলহা-এ-শিকস্তা ওয় ইহদাস-এ-তালাব-হা ও নহ্‌হা বাশদ সর্ফ শওয়দ। অর্থ—

আমার বিশাল সাম্রাজ্যে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও মৃত্যু ঘটিলে সম্পত্তি যেন তাহার উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত হন; এ বিষয়ে যেন কেহ তাহাদিগকে কোনওরূপ বাধা না দেয়। যদি কোনও স্থলে এরূপ হয় যে, মৃত ব্যক্তির কোনও উত্তরাধিকারী জীবিত নাই, তাহা হইলে ওই সম্পত্তিগুলি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (১৫) বা খাজাঞ্চী (১৭) এই কার্য্যেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকিবেন। এই প্রকারের অর্থ ধর্ম্ম-কার্য্যে (ও পরোপকারে) ব্যয়িত হইবে, যথা মস্‌জিদ ও সরাই নির্ম্মাণ, কূপ খনন বা নদীর উপর ভগ্ন সেতুর মেরামত ইত্যাদি।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, এই নিয়মটি হিন্দু মুসলমান সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযুক্ত ছিল যে, কাহারও সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে না। আকবরের পুত্রের নিকট হইতে এইরূপ হিন্দু-মুসলমানদিগের প্রতি সমভাবে ব্যবহারের আশা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই আদেশটি মনসবদারদিগের প্রতি প্রয়োগ করা হইত না; কারণ, তাঁহাদের জাগীর সরকারেরই সম্পত্তি, কেবল বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কিয়ৎকালের জন্য মনসবদারদিগকে প্রদত্ত হইত। মনসবদারের মৃত্যু ঘটিলে ওই সম্পত্তিটি সরকার আবার অন্য কোনও আমীরকে নূতন সর্ত্তে দান করিতেন। এই নিয়মটি যদি মনসবদারদিগের প্রতিও খাটিত, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হইত; কারণ, ভবিষ্যতে সম্পত্তি ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতা বাদশাহদিগের আর থাকিত না, কেবল দান করিবারই থাকিত। এই ক্রোক-করা সম্পত্তির পৃথক হিসাব রাখা হইত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই তাহা রাখিতেন, যাহাতে কোনও অবিচার বা আত্মসাৎ করিবার স্পৃহা তাঁহাদের না হয়। সে সময়ের কর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে আইন-এ-অকবরীতে লিখিত আছে যে, (১৮) পঞ্চ হাজারীর ওম্রা ত্রিশ হাজার টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। আর ইউজবাশী অর্থাৎ এক শত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ—অতি নিম্নস্তরের আমীর—তিনিও ৫০০ হইতে ৭০০ টাকা অবধি বেতন পাইতেন। তাঁহারও হস্তী, উষ্ট্র, ঘোটক ইত্যাদি থাকিত। ইহাও মনে হয় যে, এই বেতনগুলি আজকালের বেতনের তুলনায় দশগুণ; যেহেতু সেকালের সামগ্রী দশগুণ সুলভ ছিল (১৯)।

(১৪) V. Smith's Oxford History of Indiaতে এই চোর মিনারের নক্সা দেওয়া আছে।

(১৫) মুশ্রিফ, one who is exalted, যিনি অন্য কেরাণীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন; অর্থাৎ supervisor, inspector.

(১৭) আইন এ-অকবরীতে নানা প্রকারের খাজাঞ্চীর তালিকা দেওয়া আছে। আইন ২ দ্রষ্টব্য।

(১৮) মূল ফারসীতে দেখিতে হইলে Newal kishore Press Editionএর ১২৪-৩১ পৃঃ ব্লকম্যানের ইংরাজী অনুবাদ প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৪৮-৯ দ্রষ্টব্য।

(১৯) V. Smith : Akbar pp. 390-4. স্মিথ আকবরের মূল্যগুলি ১৯০১ সালের মূল্যের সহিত তুলনা করিয়া সে কালের অবস্থা

যে অর্থের কথা তৃতীয় নিয়মে বলা হইয়াছে, তাহা জনহিতকর কার্য্যেই ব্যয়িত হইত। মসজিদ ছাড়া অন্য সকলগুলি হইতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিরপেক্ষভাবে উপকৃত হইত। আর মসজিদ নির্ম্মাণেরও তাৎপর্য্য আছে। মধ্যযুগে সকল কার্য্যই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই সম্পন্ন হইত। মসজিদ না হইলে এ শুভকার্য্যের ব্যবস্থাটাও যেন অঙ্গহীন থাকিয়া যাইত। ইহার আর একটা কারণও আছে। আকবর বাদশাহের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পৌত্র খুসরু জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হন। আর খুসরুর পক্ষে জয়পুরের প্রতাপশালী সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ মানসিংহ ও তাঁহার (খুসরুর) শ্বশুর খাঁন-এ-আজম আজিজ কোকা সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। সেই বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত্তে জাহাঙ্গীর নিজেকে মুসলমান ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে ঘোষণা করেন ও অন্যান্য মুসলমান ওম্রাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহারই ফলে তিনি রাজ্যলাভ করেন। এই যে মসজিদ নির্ম্মাণের কথা বলা হইতেছে, ইহা কতকটা নিজ মুসলমান ওম্রাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিবার আছে। সেকালে মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া লোকে চতুর্দ্দিকে এক একখানি নূতন গ্রামের সৃষ্টি করিত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ইস্লাম যদিও ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক (Defender of Islam) হওয়ায় হিন্দুদিগের পৌত্তলিক উপাসনায় প্রকাশ্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তথাপি তিনি কতকটা তাহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ওর্চ্ছা (Orchha) রাজ্যের বীরসিংহ বুন্দেলাকে মথুরায় কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন; এবং কেহ কেহ বলেন যে অর্থ দিয়া সাহায্যও করিয়াছিলেন। বীরসিংহ তেত্রিশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া এক বিরাট দেবালয় নির্ম্মাণ করান। ইহা সে-সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ঔরঙ্গজীব ইহার সৌন্দর্য্য ও গগনস্পর্শী উচ্চতায় বিরক্ত হইয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই জাহাঙ্গীর বাদশাহের মহাপ্রাণতা বুঝা যায়।

(৪) শরাব ও দরবহরা ওয় উন্‌চে অজ কিস্ম-এ-মুস্কিরাৎ-এ-মনহিয়া (২০) বাশদ না সাজন্দ ওয় না ফারোশন্দ। ব আঁকি খুদ ব খুর্দন-এ-শরাব ইর্তিকাব (২১) মি নুমায়েম ওয় অজ হজদহ সালাগি তা হাল কি উম্র-এ-মন সি ও হাস্ত রসিদা হামিশা মদাও মত (২২) ব আঁ কর্দা অম। দর অওয়াএল চুঁ ব খুর্দন এ-আঁ হরিস বু দম গাহে তা বীস্ত পিয়ালা অর্ক-এ-দো-আতিশা তনাওয়ল মিশুদ। চুঁ রফ তা রফ্‌তা দর মন অস্র-এ-তমাম কর্দ দর মুকাম-এ-কম-শুদন-এ-আঁ শুদম। দর আর্জ দর আর্জ-এ-হফ্‌ত সাল অর্জ পাঁজদশ পিয়ালাবা পাঞ্জ শশ রসানিদম···দরিঁ আইয়াম খুদ মেহেজ বরাএ গাওয়ারিশ-এ-তোয়াম (২৩) মিখুরম। অর্থ—

যেন শরাব, দর বহরা বা অন্যান্য নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য আমার সাম্রাজ্যে প্রস্তুত বা বিক্রয় না হয়। আমার যখন ১৮ বৎসর বয়স ছিল তখন হইতে আমি শরাব ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি আর আজ আটত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে উহা সেবন করিয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম যখন মদের লালসা অত্যন্ত প্রবল ছিল বিশ পেয়ালা দুইবার চুয়ান মদ (double distilled arak) (২৪) সেবন করিতাম। যখন অধিক মাত্রায় ব্যবহার করায়

সাতগুণ সুলভ পাইয়াছেন। ১৯২৭ সালের সহিত তুলনা করিলে দশ গুণ সুলভ পাইতেন।

(২০) মুস্কিরাৎ-এ-মনহিয়া অর্থাৎ যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইসলাম ধর্ম্ম নিষেধ করিয়াছে। কথাগুলি যেন একটু অসতর্কে লেখা হইয়াছে; কারণ, মুসলমানেরা কোনও মাদক দ্রব্যের ব্যবহারই অনুমোদন করেন না। উদাহরণ স্বরূপ Islam in India by Jafar Sharif edited Crookes p. 316 পুস্তকখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২১) ইর্তিকাব নমুদলেতে যেন একটা পাপ করা (Commission of sin এ)র ভাব আছে। অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদশাহ প্রজার হিতের জন্য সাধারণ মধ্যে উহার ব্যবহার মানা করিতেছেন। নিজেকেও উহার সেবনে দোষী মনে করেন।

(২২) মদাওমতএর অর্থ ঔষধ করা। একটু পরেই জাহাঙ্গীর বলিতেছেন যে মদকে তিনি হাজমীক (digestive agent) মনে করেন।

(২৩) গাওয়ারিশ-এ-তোয়াম—যাহা খাদ্য পরিপাক করায়। গাওয়ারিশ এই মর্ম্মে এই সেরটিতে ব্যবহৃত হইয়াছে

খুস্রিশ রা গাওয়ারিশ মি কর্দুঁ কুনাদ
জে দিল দর্দ ও অন্দুহ বে রুঁ কুনাদ

(২৪) আরকের প্রাথমিক অর্থ কোন পদার্থের নির্য্যাস (essence), পরে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে মদ বা অন্য কোনও তরল পদার্থ যাহা চিঁড়িল করিয়া বা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে।

শরীরের ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল, তখন তৃষ্ণা কমাইবার চেষ্টায় রত হইলাম। ৭ বৎসরের মধ্যে ১৫ হইতে ৫ বা ৬ পেয়ালায় কমাইয়া আনিলাম ..আজকাল মদ কেবল খাদ্য পরিপাকের সাহায্য করিবার জন্য সেবন করি।

এইটি জাহাঙ্গীর বাদশাহের চরিত্রের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জাহাঙ্গীর প্রজার মঙ্গলের জন্য অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন (২৫)। ঔরঙ্গজীবের অভিষেকের সময় প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানগুলি (coronation ordinances)ও এই প্রকারের ছিল। তিনি নগরে নগরে মোহতসিব (censer of morals) নিযুক্ত করেন, যাহাতে এই সকল কর্ম্মচারী জনসাধারণকে ধর্ম্ম ও চরিত্র সম্বন্ধে সজাগ করিয়া রাখে। অবশ্য দুইজনের মধ্যে কেহই সাফল্যলাভ করেন নাই।

এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, যেমন বাদশাহ নিজ জীবনীতে অন্য লেখকদের মত সাধুতার ভান করেন নাই, প্রকাশ্য রাজনিয়মেও তাঁহার সারল্য ও সততা ক্রূর রাজনীতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৈমুরও নিজ জীবনী স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহা ছল-কপটতায় পরিপূর্ণ। জাহাঙ্গীর বাদশাহকে সে সকল বিষয়ে দোষী করা যায় না। তিনি স্বীকার করেন যে তিনিই আবুল ফজলকে নিহত করাইয়াছিলেন। নিজ পুত্র খুরমকে নিজ হস্তে পাত্র দিয়া সুরাপানে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন ইত্যাদি। এরূপ সত্য-বাদী লেখক বড় একটা দেখা যায় না (২৬)। নিজ সম্বন্ধে তিনি বড় স্পষ্ট-বক্তা। তিনি এই তৃতীয় নিয়মটির আলোচনায় লিখিয়াছেন যে সুরাপানে তিনি আঠার বৎসর বয়স হইতে অভ্যস্ত (২৭)। সকলের পক্ষে অধিক আমোদজনক বিষয় এই যে, তিনি সুরাপানকে খাদ্য পরিপাক সম্বন্ধে উপকারী মনে করিতেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সুরার উপকারিতায় তিনি নিজেই যদি বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে প্রজাদেরই বা কেন এই ঔষধ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। সম্মতি কি এই ভয়ে দেন নাই যে তাহারা মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিবে ও নিজের ক্ষতি করিয়া বসিবে? তাঁহার নিজেরও ত পরে তাহাই ঘটিয়াছিল। নুরজাহানই ত পরে এক সময়ে মদিরা সেবনের মাত্রা কমাইয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা নহিলে ত তাঁহারও দশা নিজ কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার অনুরূপই হইত (২৮)।

(৫) খানা—এ—হিচ কস রা নুজুল ন সাজন্দ। এটির অনুবাদ রজার্স ও বেভারিজ সঠিক করেন নাই (২৯)। নুজুল শব্দের অর্থ অধিকার করা (to possess) নয়, ইহা অবতীর্ণ হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ফারসীটির অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়:—

যেন কোনও ব্যক্তি (রাজকর্ম্মচারী) কাহারও বাটীতে বলপূর্ব্বক অতিথি না হয়।

ভারতবর্ষের মত অতিথিপরায়ণ দেশে লোকে বিপদে পড়িয়াও অতিথি-সেবা হইতে বিমুখ হন না। এ স্থলে অতিথি যদি সেই অঞ্চলেরই কোনও রাজকর্ম্মচারী হন, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। বাটীর কর্ত্তা ধনে প্রাণে মারাই যাউন বা বৃক্ষতলে আশ্রয় লউন, অতিথির বাসের উপযুক্ত আয়োজন হইবেই। তাই যেমন প্রথম চার্লসের (Charles 1) সময়ে লণ্ডনবাসীরা billetingএর বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভারতেও উহা বন্ধ করিবার এই চেষ্টা। তবে ইহার জন্য আন্দোলন করিতে হয় নাই, বাদশাহ নিজগুণেই প্রজার কষ্ট দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

(৬) মনা নমুদম কি হিচ কস গোশ ও বিনি-এ-শখসে রা ব হিচ গুনাহে ন বরদ ওয় খুদ নীজ ব দরগাহ-এ-ইলাহি

(২৫) ইহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত হস্তীদিগের স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ইহার জন্য কতই না বাহাদুরী লইয়াছেন। Rodyers and Beveridge: Tuzuk i-Jehangiri p. 410 দ্রষ্টব্য। বাদশাহের ধারণা যে হস্তীদিগের মা বাপ এক তিনি ছাড়া আর কে হইতে পারে? কাজেই তাঁহার দায়িত্ব।

(২৬) এই জীবনী তিনি কেবল নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য লেখেন নাই। তিনি নিজের প্রত্যেক প্রিয় সভাসদকে এক একখানি পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। মূল ফারসী পুস্তকের ২২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২৭) জাহাঙ্গীর অন্য স্থলে লিখিয়াছেন পনের বৎসর বয়স হইতে R. and B, P. 307 দ্রষ্টব্য। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, অনেক সময় মদ তাঁহার পিতার নিকট হইতে আনীত হইত। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এইরূপ উক্তি সকল হইতে অনুমান করেন যে আকবরও মদ খাইতেন।

(২৮) মুরাদ ও দানিয়াল দুজনেরই মৃত্যু অধিক সুরা পানের জন্য ঘটিয়াছিল।

(২৯) ৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

নজর (৩০) নমুদম কি হিচ কম বা বর্দি সিয়াসত মাইয়ুব ন সাজম।

অর্থ—

আমি আজ্ঞা দিতেছি যে ভবিষ্যতে যেরূপ গুরুতর দোষই কেহ করুক না কেন, তাহার কর্ণ বা নাসিকা যেন কোনও কারণে ছেদন না করা হয়। আমি ভগবানের দরবারে শপথ করিতেছি যে আমার কোনও প্রজাকে এরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অঙ্গহীন করিব না।

এইরূপ আর একটি সাধু চেষ্টার কথা তিনি নিজ জীবনীতে লিখিয়াছেন। সে সময়ে নপুংসক (eunuch) করার প্রথা অতি প্রবল ছিল। যে প্রজারা খাজনা দিতে পারিত না তাহারা নিজেদের পুত্রদিগকে খোজা করিয়া সরকারে বিক্রয় করিত। এই প্রথাটিও জাহাঙ্গীর বাদশাহ অনেকটা বন্ধ করিয়া দেন। (৩১) কিন্তু এই ষষ্ঠ নিয়মটির সম্বন্ধেও এলিএট ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। এই নিয়মটির উপকারিতা স্বীকার করিয়াও তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে উহা কতটা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, তাঁহারা কেবলমাত্র অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অঙ্গহীন করার প্রথাটা রহিত হয় নাই। তাঁহাদের যুক্তিটা কতকটা এইরূপ—যে ব্যক্তি খুসরুর অনুচরবর্গকে শূল-দণ্ডে নৃশংসরূপে বধ করিতে পারে, যে দোষীদিগকে অম্লান বদনে হস্তি-পদতলে চাপিয়া মারিতে পারে, সে যে ইহা অপেক্ষা লঘুতর দণ্ড অঙ্গহীন করাকে পাপ মনে করিবে, তাহা কি সম্ভব? এই কথাগুলি কতটা যুক্তি-সাপেক্ষ, তাহা পাঠক মাত্রেই বিচার করিবেন।

(৭) হুকুম কর্দম কি মুতসদ্দিয়ান-এ-খালিসা ও জাগীর-দারান জমীন-এ-রেয়ায়া রা ব তায়াদ্দি ন গিরন্দ ওয় খুদ-কাশু এ-খুদ ন সাজন্দ। অর্থ—

আমি আজ্ঞা দিতেছি যে সরকারি পেশকার বা জাগীর-দারগণ রৈয়তের জমি ক্রোক করিয়া নিজে যেন আবাদ না করেন।

ভারতীয় রৈয়ত চিরকালই দুঃখী ও দুর্ব্বল। রৈয়ত শব্দটির অর্থ হইতেও ইহা বুঝা যায়—অর্থাৎ যাহার উপর অনুগ্রহ (রেয়ায়ত) করা হয় সেই রৈয়ত। এখন যেমন প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রজার হিত-কল্পে নানা প্রকারের আইন ইংরাজ বাহাদুর প্রত্যেক প্রদেশে চালাইতেছেন, তেমনি বাদশাহী আমলেও এ সম্বন্ধে চেষ্টা হইত। তবে সে সময়ে প্রজার কতকগুলি সুবিধা ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহে বা রোগে এত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইত যে, সচরাচর জমিদারেরা প্রজা সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। এখন লোক-সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, জলাপূর্ণ বন ইত্যাদি আবাদ করিতে জমিদারদিগকে বেগ পাইতে হয় না,—চাষারা নিজ হইতেই জঙ্গল কাটিয়া ভূমি চাষ করিতে উদ্যোগী। কিন্তু ইংরাজী আমলের আরম্ভ পর্য্যন্ত জমিদারেরা প্রজাদিগকে নিজ জমিতে বসাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেন, (৩২) এবং যাহাতে একবার জমিদারের কবলে আসিয়া আবার পলাইয়া না যায় তাহার বিবিধ উপায় করিতেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই নিয়মটি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি রাজ কর্ম্মচারী-দিগকে কখনও অধিক কালের জন্য এক স্থলে থাকিতে দিতেন না। ডাঃ বেণীপ্রসাদ সুবেদারদিগের তালিকা হইতে দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ তাঁহারা দুই বা তিন বৎসরের অধিক এক স্থলে থাকিতেন না (৩৩)।

(৮) আমিল-এ-খালিসা ও জাগীরদার দর পরগণা কি বাশদ ব মর্দুমান বেহুক্ম খেশী ন কুনন্দ। অর্থ—

রাজভূমির কর্ম্মচারী (৩৪) জাগীরদার বাদশাহের বিনা অনুমতিতে যেন বিবাহাদি দ্বারা নিজ পরগণা মধ্যে কোনও লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন না করেন।

(৩০) নজরএর চলিত অর্থ রাজা বাদশাহকে ভেট স্বরূপ মোহর বা টাকা দেওয়া। ইহার মূল অর্থ নিজের কর্ত্তব্য করা। ভগবানের নিকট শপথ করা ছাড়া আর কি কর্ত্তব্য হইতে পারে?

(৩১) R. and B. ১৫০-১ পৃঃ।

(৩২) Monckton Jones: Warren Hastings in Bengal p 9, 'Mere economic gravity secured the ryot; for if he fled and left the land untilled, the lord's only chance of revenue vanished from him The peasant could commonly find a fresh holding or at least occupation.'

(৩৩) Beni Prasad: Jehangir pp. 104-7.

(৩৪) আমিল, কারিন্দা, কারকুন এই শব্দগুলি প্রায় একই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরা প্রত্যেকেই civil official ও ইহাদের প্রধান কার্য্য সরকারের খাজনা আদায় করা।

এটা অনেকটা আলাউদ্দিন খিলজীর পুরাতন sumptuary law-এর অনুরূপ। তবে জাহাঙ্গীর বাদশাহের উদ্দেশ্য উদার। আলাউদ্দিন যখন নিজ আমীরগণকে রাজ অনুমতিদ্বারা বিবাহাদি করিতে নিষেধ করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে ওম্রার ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করা। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সে সকল ভাবনা ছিল না। তিনি এত সহজে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিতেই পারিতেন না যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ওম্রারা বিদ্রোহের পতাকা সহজে উড্ডীয়মান করিবে। আকবর বাদশাহের সময় হইতেই রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত; শান্তি ও শৃঙ্খলা সমগ্র দেশে বিরাজিত ছিল। তবে আকবর ও তাঁহার পুত্র জানিতেন যে পরগণার সামান্য কর্ম্মচারীও প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে ছাড়ে না (৩৫)। আর যদি সে নিজ অধিকার মধ্যে জনকতক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে অত্যাচারের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়।

(৯) দর শহরহা-এ-কলান দার-উশ শফা সাখতা অতিব্বা ব জেহেত এ-বিমারান তায়াউন নুমায়েন্দ ও উন্‌চি সর্ফ ও খরচ মি শুদা বাশদ অজ সরকার-এ-শরিফা মি দাদা বাশন্দ। অর্থ—

প্রধান প্রধান নগরে চিকিৎসালয় স্থাপিত হউক ও রোগীদিগকে আরোগ্য করিবার জন্য হাকীম নিযুক্ত করা হউক। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যয়িত হইবে তাহা যেন রাজকোষ হইতেই দেওয়া হয়।

আকবরের পুত্র যে এই নিয়ম প্রচলিত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। জাহাঙ্গীর বাদশাহ নিজ পিতার দয়ালু প্রকৃতি পাইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই জাগীরদারের উপর ব্যয় বহন করিবার আদেশ করিতে পারিতেন; কিন্তু সমস্ত ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। ইহার তুলনায় মনে হয় আজকালকার রাজারা যেন জমিদার বা তালুক্‌দারদিগকে দোহন করিবার জন্যই সতত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

(১০) কোন্ কোন্ দিন কোনও জীব হত্যা করা হইবে না বাদশাহ তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। এ স্থলেও তিনি তাঁর পিতার অনুসরণ করিতেছিলেন। আকবর বাদশাহ রবিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ঐ বারকে সূর্য্যের বার বলিয়া গণ্য করিতেন। এই দুই কারণে ঐ বারে তাঁহার সময়ে কোনও জীব-হত্যা করা হইত না। জাহাঙ্গীর বাদশাহও ঐ নিয়মই বজায় রাখিয়াছিলেন এবং নিজ সিংহাসনে আরোহণের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারেও ওই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

(১১) জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইবার পর নিজ পিতার পুরাতন কর্ম্মচারী সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে বাহাল রাখিয়াছিলেন ও তাহাদের মাসিক বৃত্তি কিঞ্চিৎ মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার বেগমেরা এই বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হন নাই। যাঁহারা দান স্বরূপ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন ও যাঁহারা অধিকারের প্রমাণ স্বরূপ রাজ-ফর্মান্ দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাদের জমি বাহাল রাখিবার আজ্ঞা দেন। (৩৬)

(১২) বাদশাহ বিস্তর কয়েদীকে মুক্তি দেন।

এই অনুষ্ঠানগুলি হইতে জাহাঙ্গীর বাদশাহের চরিত্রের যে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপায়ী, অলস জাহাঙ্গীরের সাধারণ চরিত্র হইতে কিছু ভিন্ন নয় কি?

---

(৩৫) এখনও কি পাটওয়ারী বা পুলিসের প্রতাপ কমিয়াছে? কোনও লেখক এই সকল দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, 'India will ever be the land of despotism.

(৩৬) R. and B. 'ইয়ক কলম' এর অর্থ ভুল বুঝিয়া 'by one stroke of pen' অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার সঠিক অর্থ 'সম্পূর্ণ' 'সমস্ত'; এ স্থলে 'সকলকে'।

বরাত

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবলরামকে লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও অলক্ষ্মী তা'কে ত্যাগ করেন নি। তিনি পরম স্নেহে কেবলরামকে জন্মের প্রথম দিন থেকেই কোলে তুলে নিয়েছেন। তা'র উপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীদেবী তা'র প্রতি কৃপা করলেন। লক্ষ্মীর অকৃপার ক্ষোভ অলক্ষ্মী ও ষষ্ঠীদেবীতে ষোল আনা মিটিয়ে দিলেন।

কেবলরাম বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে। সেইজন্যে তাঁরা তা'র নাম রেখেছিলেন কেবলরাম। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কেবলরামের মা মারা গেলেন। কিছুদিন পরে বাপও তা'কে একলা ফেলে সরে পড়্লেন। কিন্তু "রাখে হরি মারে কে?" কেবলরাম এক দূর সম্পর্কের খুড়োর আশ্রয়ে গিয়ে পড়লো। সেখানে খুড়ো এবং খুড়ীর অনাদরে বেশ দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলরামের কাজও জুটলো অনেক। খুড়্তুত ভাই-বোনেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তা'র উপরই পড়লো; এবং যে চাকরটা এই কাজের ভার পেয়েছিলো, সে লাভের মধ্যে পেলে জবাব; এবং আড়ালে কেবলরামকে অভিসম্পাত করতে করতে অন্যত্র কাজের চেষ্টায় চ'লে গেলো। ছোট ছেলেপিলেদের খবরদারী করবার মতন বয়স কেবলরামের তখনো হয়নি এটা সকলেই মান্তো; মান্তেন না কেবল কেবলরামের খুড়ো-খুড়ী। তাঁরা বল্তেন যে, ছেলেবেলায় বাপ-মাকে খেয়েও না কি কেবলরামের ক্ষিদে কমেনি, বরং অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। এইটুকু ছেলের না কি এত ক্ষিদে সচরাচর দেখা যায় না। কেবলরাম না কি অনায়াসে দু'জন জোয়ান লোকের খোরাক অম্লান বদনে খায়। কাজেই, যে এতোগুলো খোরাকের সদ্ব্যবহার ক'রে, সে কেন না তা'র সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে। কাজেই তা'র উপর ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়লো।

কিন্তু কেবলরামের দুর্ভাগ্য—সে সে-ভার বইতে পারতো না এবং সেই জন্যে তাকে খুব-ই শাস্তি পেতে হ'তো—মার থেকে আরম্ভ ক'রে খাওয়া বন্ধ পর্য্যন্ত। মারে কেবলরামকে বড় কাবু করতে পারতো না, যত কাবু করতো না খাওয়াতে। না খেতে পেলেই কেবলরাম কেঁদে কেঁদে অনর্থ করতো। কিন্তু সেই কান্না বিফলেই যেতো। খুড়ো-খুড়ীর মন তাতে টল্তো না। তাঁরা বরং তা'রই সামনে তা'কে দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য ছেলেদের খাবার দিতেন।

এমনি ক'রেই কেবলরামের দিনগুলো হতশ্রদ্ধা ও অনাদরের ভিতর দিয়ে কেটে যেতে লাগলো। এতো অনাদর পেয়েও বয়স তা'র ক্রমশঃ বেড়ে উঠলো—সযত্ন রোপিত গাছের চেয়ে আগাছার বৃদ্ধির মতো।

খুড়ো কেবলরামকে দয়া ক'রে স্কুলে পড়্তে দিলে। এই দয়া যে একেবারে নিঃস্বার্থ ছিলো তা নয়। স্কুলে কেবলরামের মাইনে একপয়সা দিতে হ'তো না। বাপ-মা-মরা ছেলের অজুহাতে খুড়োমশায় তা'র বিনা বেতনে পড়্বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং বইও এর ওর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে দিলেন।

স্কুলে গেলেও কেবলরাম বাড়ীতে পড়বার সময় মোটেই পেতো না। রাত্রে তা'র পড়া বারণ ছিলো। রাত্রে পড়লে চোখ খারাপ হয়। চোখ যতো খারাপ হোক বা না হোক, তেল খরচের জন্যেই তা'র পড়া বারণ ছিলো। সকালে বিকালেও পড়ার অবসর ছিলো না। কারণ দু'বেলাই ছেলে সাম্লাতে হ'তো। এই ছেলে সাম্লানোর ফাঁকে সে একটু পড়ার অবসর ক'রে নিতো। কিন্তু যদি দৈবাৎ সেই ফাঁকি খুড়ীর চোখে পড়ে যেতো তো তার লাঞ্ছনার অবধি থাক্তো না।

এতো বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কেবলরাম প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কোন রকমে উঠলো; কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়া ডিঙানো তা'র আর হ'য়ে উঠলো না। বার বার তিনবার চেষ্টা করেও কিছু হ'লো না। খুড়ো তাকে স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন। সে যে পড়ার সময়াভাবে পাশ করতে পারলে না, এ কথা

তিনি মান্‌তেন না। লোক বুঝে কাউকে বল্‌তেন, ছেলেটার মাথায় একেবারে গোবর পোরা, বুদ্ধি একটুও নেই, পাশ কর্‌বে কোথা থেকে। আর কাউকে বল্‌তেন য়ুনিভারসিটির কর্ত্তারা কেবলরামের মেধা বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সেইজন্যে য়ুনিভারসিটির থামগুলো শুধু বাইরে থেকে দেখিয়ে বার ক'রে দিলে, ভিতরে প্রবেশাধিকার দিলে না। কেবলরামের পড়া সেই খানেই খতম হ'য়ে গেলো।

বাঙ্গালীর ছেলে মূর্খ এবং কানা খোঁড়া হ'লেও বিয়ে আট্‌কায় না। কেবলরামেরও আট্‌কালো না। যথাসময়ে শুভলগ্নে সালঙ্করা ও স-পণা এক কন্যার সঙ্গে কেবলরামের বিয়ে হ'লো। খুড়োমশায় পণের টাকাটি আত্মসাৎ কর্‌লেন এবং গহনাও যতদূর পার্‌লেন নিজের সিন্দুকজাত কর্‌লেন। কতক বা ভেঙে স্ত্রীর গহনা গড়িয়ে দিলেন।

বিয়ে হওয়ার পর কেবলরাম প্রথম প্রথম ভাব্‌লে, বাঃ, এ তো মন্দ নয়। ঐ ছোট্ট নোলকপরা মেয়েটি কেমন তা'র আজ্ঞাধীন,—সে যা বল্‌ছে কর্‌ছে। দুজনের কতো গল্প গুজবের ভিতর দিয়ে দিন কাট্‌ছে। এ বেশ একটা নূতন এবং উপলব্ধি কর্‌বার মতন স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছে সে। রঙিন স্বপ্নের নেশায় কেবলরাম মশ্‌গুল হ'য়ে পড়্‌লো। তবে মধ্যে মধ্যে সে-নেশার মৌতাত ছুটে যেতো খুড়ো-খুড়ীর তিরস্কারে। এখন দুজনে মিলে যে অন্ন ধ্বংসাবে, এ খুড়ো-খুড়ী সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। জীবনের প্রথম থেকে এই অনাদরের আবহাওয়ায় বড়ো হ'য়ে উঠাতে, তা'র এখন আর এই সব বকুনি বড়ো গায়ে লাগতো না। ক্রমাগত অধীনতায় আজ্ঞা পালন ক'রে ক'রে মনুষ্যত্বের চেতনা কেবলরামের লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খুড়ো-খুড়ী তা'কে ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে ক্রমশঃ সচেতন ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর একদিন সত্য সত্যই তাকে বিশেষ ক'রে সচেতন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, তোমার আর এখানে থাকা চল্‌বে না,—পথ দেখো।

*   *   *

পদ্মার ধারে ছোট্ট গ্রামখানি—হাঁসমারি। এইখানেই কেবলরামের পৈতৃক বাড়ী। কেবলরামের বাপের আমলে না কি তাদের অনেক জমি-জমা ছিলো। এখন বাড়ীখানি ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্ব্বগ্রাসী পদ্মা এক এক ক'রে সবই প্রায় গ্রাস ক'রেছেন। তাঁর গ্রাস হ'তে যেটুকু রক্ষা পেয়েছিলো, সেটুকু কেবলরামের খুড়োর গ্রাস হ'তে রক্ষা পায় নি,—তিনি সর্ব্বশেষটুকু গ্রাস ক'রে কেবলরামকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌বার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি তাঁর ভুল হ'য়েছিলো। তিনি কে জানে কেনো বাড়ীখানি গ্রাস কর্‌তে পারেন নি। আর এইটুকুর জন্যেই কেবলরামের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ বাধা পেলে। কেবলরামের খুড়ো কিন্তু কেবলরামের কাছে সর্ব্বদাই বল্‌তেন—পদ্মাই না কি সব গ্রাস করেছেন; আর অবশিষ্ট যা দু'এক বিঘা আছে, তা' তাঁর একান্ত নিজের।

কেবলরাম নিরুপায় হ'য়ে পৈতৃক বাড়ীতে বাস কর্‌বার জন্যে সস্ত্রীক এলো। কিন্তু বাড়ীখানির অবস্থা দেখে কেবলরামের চক্ষুস্থির হ'য়ে গেলো। পদ্মা বাড়ীখানিকে প্রায় ঠোঁটের উপর তুলে রেখেছেন,—সময় বুঝে গর্ভাধঃকরণ কর্‌বেন। এক-হাঁটু জঙ্গল ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুক্‌তে হ'লো। দু'চারটে শেয়াল এতোদিন নির্ব্বিঘ্নে সেখানে বাস কর্‌ছিলো; এখন মনক্ষুণ্ণ হ'য়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে গেলো। দু'একটা সাপও না কি জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হ'য়ে গেলো দেখা গেলো।

কেবলরামের স্ত্রী বিরূপা এই বাড়ীতে থাক্‌তে একেবারে বিরূপ হইয়া উঠ্‌লো। সে নাক সিঁট্‌কে ব'লে উঠ্‌লো—মাগো, এই বাড়ীতে আবার মানুষ থাকে না কি,—প'ড়ো ভূতের বাড়ী।

কেবলরাম হেসে বল্‌লে—আমি অদ্ভুত কি না; তাই এ বাড়ীতে ভূত তাড়িয়ে থাক্‌তে এসেছি।

কথাটা বিরূপার মনের মতো হ'লো না। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো।

বিরূপা কেবলরামের প্রতি যতোই বিরূপ হোক না কেনো, গত্যন্তর না দেখে বাধ্য হ'য়েই তাকে সেই বাড়ীতে থাক্‌তে হ'লো। তবে বিরূপা তা'র নামের সার্থকতা ক'রেই সেখানে বাস কর্‌তে লাগলো।

কেবলরামের সংসার যখন ক্রমশঃ ছেলেমেয়ের বন্যায় প্লাবিত হবার উপক্রম হলো, ঠিক এমনি সময় তা'র খুড়ো মশায় ঋণের অজুহাতে কেবলরামের বাড়ী ক্রোক ক'রে নিলামে খরিদ ক'রে নিলেন। অবশ্য কেবলরামকে ঋণ-শোধ-ক'রে-উদ্বৃত্ত বাবদে গোটা ত্রিশ টাকা দিলেন। কেবলরাম তাতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে গেলো; কারণ, পদ্মা বাড়ীখানিকে গ্রাস কর্‌বার মানসে বসে ছিলেন। তিনি

গ্রাস কর্‌লে কিছুই দিতেন না; বরং তাদের শুদ্ধ বাড়ীর সঙ্গে গ্রাস কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। এ বরং কিছু পাওয়া গেলো।

কেবলরামের সংসার ক্রমশঃ অচল হ'য়ে পড়্‌লো। কেবলরাম কোনো দিকে কূল-কিনারা দেখ্‌তে পেলে না। থাক্‌বার স্থানটুকুও গেলো। কেবলরামের মাথায় চাকরি কর্‌বার ইচ্ছা এলো। সেই ইচ্ছাকে বলবতী রেখে, বিরূপাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে চাকরীর উদ্দেশ্যে কেবলরাম কল্‌কাতা রওনা হ'লো।

* * *

কলকাতায় এসে সে প্রথমে খুবই ভেব্‌ড়ে গেলো। কলকাতা সম্বন্ধে তা'র যা জ্ঞান ছিলো, এখানে এসে দেখ্‌লে যে, তা'র চেয়েও ঢের বেশী জ্ঞান থাক্‌লে তবে কলকাতা আসা চ'লে এবং চাক্‌রী জোগাড় সম্বন্ধেও সেই মত সম্পূর্ণ খাটে। এখানে তা'র পরিচিত কেউই ছিলো না। কাজেই থাক্‌বার এবং খাবার খুবই অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হ'লো। এক বাড়ীর রোয়াকের বারাণ্ডার নীচে শুতো; এবং যে দু' একটা টাকা সঙ্গে এনেছিলো তাই ভাঙিয়ে কোন দিন যৎসামান্য কিছু খেতো, কোনো দিন বিনা খরচায় কোম্পানির কলের জল আকণ্ঠ পান ক'রে ক্ষিদে নিবারণ কর্‌তে লাগ্‌লো; আর দিনের বেলায় আপিসপাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সর্ব্বত্রই—চাকরী খালি নেই—বিজ্ঞাপন ঝোলোনো। আর কোথাও খালি থাক্‌লেও, তা'র চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের বহর দেখে, চাকরী দেওয়া দূরে থা'ক্‌, তাকে আপিসেই কেউ ঢুক্‌তে দিতো না। দরওয়ান প্রভুরাই তা'কে বিতাড়িত ক'রে দিতো।

রোদে ঘুরে আর আকাশ-চন্দ্রাতপ-তলে শুয়ে রং তা'র শ্যামলবর্ণ থেকে কয়লার রংয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। পরণে তা'র শতচ্ছিন্ন মলিন ধুতি। গায়ে একটা ময়লা চিরকুট সার্ট, বোতাম অভাবে বোতামের ঘরগুলো সুতো দিয়ে বাঁধা। তার উপর একটা হাত-ঢল্‌ঢলে ঝুল-বড়ো ছিটের কোট। চুল লম্বা লম্বা, এক-মুখ দাড়ি। এই অদ্ভুত পোষাকে ও চেহারায় কোথাও সে প্রবেশাধিকার পেতো না। কিন্তু এর জন্যে যে সে কতটুকু দায়ী এ কেউ দেখ্‌তো না।

এমনি ক'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক আপিসের বড়বাবু দয়া-পরবশ হ'য়ে তা'কে চাকরী দিলেন। প্রথম ছ'মাস তা'কে বিনা বেতনে শিক্ষানবিশি কর্‌তে হবে; তার পর পাকা চাকরী হ'লেও হ'তে পারে; এবং মাইনে তখন দশ-পনেরো হয় তো হবে। কেবলরাম কিন্তু এতেই খুব সন্তুষ্ট হ'লো। যা হোক একটা তবু হিল্লে তো হ'লো। সে খুশী মনে চাকরীতে বাহাল হ'য়ে গেলো। শোয়া খাওয়া কিন্তু তেমনিই চল্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুদিন পরে অনেক কষ্টে কেবলরাম এক মুদির দোকানে থাক্‌বার এবং খাবার সংস্থান ক'রে নিলে। তাদের সকালে বিকেলে খাতা লিখে দেবে এবং এরই বিনিময়ে সে খাওয়া থাকা পাবে। কেবলরাম এই ব্যবস্থা বহু ভাগ্য ব'লে মেনে নিলে।

কেবলরাম আপিসে সকলের আগে যেতো এবং সকলের পরে ফির্‌তো। কারণ ফিরেই বা কর্‌বে কি। আপিসে সে নিজে ইচ্ছুক হ'য়ে সকলের কাজ ক'রে দিতো। এর পিছনে তার উদ্দেশ্যও ছিলো। সমস্ত রকম কাজ সে আয়ত্ত ক'রে নিতে চায়। কিন্তু তার সমকর্মীরা তার গোপন উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পেরে, তাকে বোকা মনে ক'রে, যত কাজ তা'র কাছেই ফেলে দিতো। এই জন্যেও কেবলরাম সকালে সকালে ফির্‌তে পার্‌তো না।

কেবলরামের আপিসটা খুব বড়ো। অনেক বিভাগে বিভক্ত। সে সকলকে চিন্‌লো না। আর চেন্‌বার মত মনের অবস্থাও তা'র ছিলো না। নিজের অবস্থায় কুণ্ঠিত হ'য়ে সে চোরের মত আপিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে ব'সে ঘাড় গুঁজে কাজ কর্‌তো এবং বিকেল হ'লে সকলের পর বাড়ী ফির্‌তো। কেবলরামের সঙ্গে বড়বাবুর ভাগনেও শিক্ষানবিশরূপে ছিলো। সে কিন্তু কোন কাজই কর্‌তো না।

শুধু খাওয়া এবং থাকাতেই মানুষের সমস্ত প্রয়োজনীয় অভাব মেটে না, কেবলরামেরও মিট্‌তো না। যে কাপড় জামা সম্বল ক'রে সে কল্‌কাতা এসেছিলো, তা ক্রমশঃ কেবলরামকে ত্যাগ কর্‌তে লাগলো, যদিও কেবলরাম তাদের ত্যাগ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। কেবলরাম যতোই তাদের আবরণে নিজের লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা কর্‌তো, তা'রা ততই তা'কে অনাবৃত ক'রে লজ্জা দিতে লাগলো। কাপড়খানা সেলাইয়ের বাইরে চ'লে গেলো। তখন সেলাই ক'রে সংস্কার করা ছেড়ে দিয়ে সে গ্রন্থি দিয়ে পর্‌তে লাগ্‌লো। সুতো কিনে সেলাই কর্‌বার অবস্থা না

থাকায়, মুদির দোকান থেকে সূচ চেয়ে নিয়ে কাপড়ের পাড়ের সুতোয় সেলাই হ'য়ে হ'য়ে, সার্টটা ক্রমে কোটের মতো মোটা এবং এক বিচিত্র পরিধেয় হ'য়ে উঠলো। কোটের অবস্থাও তথৈবচ। সর্ব্বপ্রকারে অবস্থা যখন চরম সীমায় উঠলো, তখন আবার বিরূপা পুরো-দস্তুর বিরূপ হ'য়ে উঠলো। সে চিঠির উপর চিঠি লিখে টাকার তাগাদা করতে লাগলো। কেবলরাম বাড়ীবেচা টাকার যে-কটি তা'কে দিয়ে এসেছিলো তা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। কেবলরাম কিন্তু অসীম ধৈর্য্যে সমস্ত অভাবের অভিযোগ মুখ বুজে সহ্য করতে লাগলো।

কেবলরামের এই অবস্থা দেখে আপিসের সকলে হাসতো এবং বিদ্রূপ করতো। কেবলরাম নিরুপায় হ'য়ে সেই সব অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করতো; এবং ঘাড় গুঁজে নিজের কাজ তো করতোই, উপরন্তু অন্যের কাজও করতো।

ইতিমধ্যে আপিসে একটা পদ খালি হ'লো। কেবলরাম ভাবলে, এইবার নিশ্চয়ই তা'র বরাত সুপ্রসন্ন হবে। কিন্তু অলক্ষ্মী যার সহায়, তা'র বরাত সহজে ফেরে না—কেবলরামেরও ফিরলো না। কেবলরাম কাণা-ঘুষায় শুনতে পেলে যে, বড়বাবুর ভাগনেকে সেই পদে বাহাল করা হবে। কথাটা শুনেও কেবলরাম বিশ্বাস করতে পারলে না। কারণ সে এতদিন কাজ শিখছে এবং শিখেছেও সব। আর তা' ছাড়া, বড়বাবু বরাবর তা'কে স্তোক দিয়ে এসেছেন যে, কাজ খালি হ'লেই প্রথম অধিকার দেওয়া হবে কেবলরামকে। বড়বাবু কি এতোটা অন্যায় করবেন।

কিন্তু কেবলরামের হিসাবে এইখানেই একটু ভুল হলো। আপিসের বিশেষতঃ সওদাগরী আপিসের এই বড়বাবুগুলি একটি অদ্ভুত জীব। অনেকেই কথার সঙ্গে কাজের কোন সম্পর্ক রাখেন না। মুখে বলেন এক, কাজের বেলায় করেন আর। কাজ করবার সময় সম্পূর্ণ ভুলে যান যে, এর পূর্ব্বে মুখে অন্য রকম বলেছেন। এই ভুল ধরিয়ে দিলে রেগে ওঠেন এবং যে ধরিয়ে দেয় তা'র সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেন। কাজেই ভুল ধরাতে কেউ সাহস করে না। আপিসের বড় সাহেবের চেয়ে বড়বাবুরা ভীতিপ্রদ! পদের গরমে তাঁদের মাথা বোধ হয় ঠিক থাকে না।

তার পর কেবলরাম এটাও ভুলে গিয়েছিলো যে, নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রবৃত্তি সকলের থাকে না,—এই বড়বাবু দলেরও সেই অবস্থা। নিজের আত্মীয়দিগকে ছেড়ে অন্য লোককে চাকরীতে বাহাল করবেন, এ কিছুতেই সম্ভবে না। কেবলরামের নেহাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই এই শিক্ষানবিশি যোগাড় হয়েছে; এর উপর আবার স্থায়ী চাকরী—ধৃষ্টতা বটে। হ'লোও তাই।

কেবলরাম বড়বাবুকে সভয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—শুনছি একটা চাকরী খালি হয়েছে, ঐ পদে কি আমায় বাহাল করবেন?

বড়বাবু প্রথমে যেন কিছুই বুঝতে পারেন নি এমনিভাবে বিস্ময়ে কেবলরামের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন—বল কি হে কেবল, তুমি এখনও কাজই ভাল ক'রে শিখলে না—এরই মধ্যে চাকরী! আর তা ছাড়া, ওটা তো তোমায় দিতে পারবো না। ওটা ভাগনেটাকে দিতে হবে—সে অনেকদিন ব'সে রয়েছে। তুমি আরো ভালো ক'রে কাজ শেখগে যাও, তার পর হবে। যাও।

কেবলরাম দ্বিরুক্তি না করে নিজের জায়গায় এসে বসলো।

সেদিন বিকেলে সবাই আপিসের ছুটির পর বাড়ী চ'লে গিয়েছিলো। এমন কি বড়বাবু পর্য্যন্ত। কেবল কেবলরাম তখনো যায় নি। নিজের কাজ সেরে অপরের কাজে বেগার খাটছিলো। সেদিন বড় সাহেবও কি কাজ থাকায় তখনও যান নি এবং বড় সাহেব যান নি ব'লে তা'র আরদালীও যেতে পারেনি। সে সাহেবের ঘরের দরজায় একটা টুলে ব'সে ছিলো। কেবলরাম যেখানে ব'সে কাজ করতো, তা'রই ঠিক সামনে বড় সাহেবের ঘর।

কিছুক্ষণ পরে আরদালীটা এসে কেবলরামকে বললে—বাবু, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি; যদি সাহেব ডাকে তো বলবেন বাইরে গেছি। আমি এক্ষুনি এলাম ব'লে, আর আপনি আছেন ব'লেই যাচ্ছি। দেখবেন। ব'লে আরদালী চ'লে গেল। কেবলরাম হেঁট হ'য়ে কাজ করতে করতেই বললে—আচ্ছা। আবার নিজের মনে কাজ করতে লাগলো।

খানিকক্ষণ পরে পায়ের শব্দে কেবলরাম মুখ তুলে চাইলে। প্রথমে সে ভেবেছিলো যে, আরদালীটা ফিরে এলো। কিন্তু দেখলে তা নয়। অন্য একটা লোক বরাবর সাহেবের ঘরে ঢুকে গেলো। লোকটা যখন তা'র সামনে দিয়ে গেলো তখন সে বিস্ময়ে তা'র দিকে চেয়ে রইলো।

যে লোকটা গেলো, তা'র খালি গা, ধুলা কাদায় ভর্ত্তি। এক-মাথা রুক্ষ উস্কো খুস্কো বড় বড় চুল। দাড়ি গোঁপ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। পরনের কাপড়খানা এমন ছিন্ন ও মলিন যে, তাকে আর কাপড় বলা তো চলেই না; এমন কি কৌপীন বলা চলে কি না তাও সন্দেহ।

কেবলরাম লোকটাকে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ঘাড় গুঁজে কাজ করতে লাগলো।

লোকটা সাহেবের ঘরে ঢোক্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেব চীৎকার ক'রে আর্দালীকে ডাকতে লাগলেন। আর্দালীও সেই সময় আস্‌ছিলো। সে দৌড়ে সাহেবের ঘরে গেলো এবং পর মুহূর্ত্তেই লোকটাকে মারতে মারতে নীচে নামিয়ে দিলে।

তার পর আর্দালী কেবলরামকে বল্‌লে—সাহেব ডাক্‌ছেন।

কেবলরাম এই সব ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলে না। আর তা ছাড়া ঘটনাটা এতো চট্‌ ক'রে হ'য়ে গেলো যে, সে বোঝবার সময়ও পেলে না। বড় সাহেবের ডাক শুনে কম্পিত অন্তরে আর্দালীর পিছন পিছন সে সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

সাহেব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আর্দালীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন সে কোথায় গিয়েছিলো এবং এই লোকটাই বা কি করে তাঁর ঘরে ঢুক্‌লো।

আর্দালী ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—হুজুর, এই বাবু ছিলেন ব'লে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। তার পর এসে এই দেখলাম, এর বেশী আমি জানি না।

সাহেব তখন কেবলরামকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি এই লোকটাকে আস্‌তে দেখেছিলে?

কেবলরাম ভীতস্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ হুজুর।

—তুমি দেখেও এই পাগলকে আস্‌তে বাধা দেও নি কেন?

—আমি ওকে পাগল ভাবি নি। ভেবেছিলাম যে, ও আমারই মতো আর একজন শিক্ষানবিশ। পোষাক দেখে বুঝলাম যে, ও আমার চেয়েও পুরোনো। কারণ আমার ছ' মাস শিক্ষানবিশ অবস্থায় কাজ ক'রে আমার কাপড় এবং চেহারার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে;—সে আরও হয়তো ছ' বছর শিক্ষানবিশ আছে—তাই ওর অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছে। এই ভেবেই আমি ওকে বাধা দিই নি। বরং ওকে দেখে নিজের মনে একটু সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

সাহেব ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে কেবলরামের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্বর কিছু মোলায়েম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা'র মানে?

কেবলরাম সাহস পেয়ে নিজের কাহিনী বল্‌তে লাগলো। সাহেব সব শুনে কেবলরামকে বিশেষ কিছুই বল্‌লেন না; শুধু বল্‌লেন—আচ্ছা, আজ বাড়ী যাও।

পরদিন সকালে বড়বাবু আপিসে এসে সাহেবের আর্দালীর মুখে সব শুনে কেবলরামকে খুব এক চোট্‌ বক্‌লেন; এবং কড়া হুকুমে জানিয়ে দিলেন তার আর এখানে চাকরী চল্‌বে না—এখুনি চ'লে যেতে হবে।

কেবলরাম কিছু না ব'লে আস্তে আস্তে উঠে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে, এমনি সময় বড় সাহেব আপিসে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের আর্দালী এসে খবর দিলে, সাহেব বড়বাবু এবং কেবলরামকে ডাক্‌ছেন।

বড়বাবুর পিছনে কেবলরাম সাহেবের ঘরে ঢুক্‌লো। সাহেব বড়বাবুর হাতে একটা লেখা কাগজ দিয়ে কেবলরামকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই বাবু আজ থেকে স্থায়ীভাবে এখানে কাজ করবে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। আর ঐ হিসাবে যে ছ' মাস শিক্ষানবিশি কাজ করেছে, সেটাও আজই বাবুকে দিয়ে দেবে।

বড়বাবু কি বল্‌তে যেতেই সাহেব বাধা দিয়ে বল্‌লেন—আমি সব শুনেছি। আমাদের আপিসে শিক্ষানবিশ নেবার নিয়ম নেই; তা সত্বেও তুমি আমার অমতে নিয়েছো। যাই হোক, তোমার ভাগ্নেকে কাল থেকে আস্‌তে বারণ করে দিও। আর তুমি অনেকদিন কাজ করছো—তোমায় আর কিছু বল্‌তে চাই না। তবে ভবিষ্যতে তোমায় যেন এ বিষয়ে আর সতর্ক করতে না হয়। এই বাবুর সম্বন্ধে হুকুম এই কাগজে আছে, যাও।

বড়বাবু কিছু না ব'লে অপ্রসন্ন মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কেবলরাম নিজের এতবড়ো ভাগ্য-পরিবর্ত্তন বিশ্বাস করতে না পেরে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর আভূমি নত হ'য়ে সাহেবকে সেলাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।



ছ'তিন ন

শিবপুরী (গোয়ালিয়র)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী

অগণন দৃশ্য-সমাকীর্ণ সিন্ধিয়া রাজ্যের রাজধানী লস্কর সহরের বিবরণ একাধিক ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ-প্রাসাদ, মোতিমহাল (সেক্রেটারিয়েট্) ও ফুলবাগ, ভিক্টোরিয়া কলেজ্, জেনারেল হাসপাতাল, এল্‌গিন্ ক্লাব, মিউজিক্যাল্ মার্কেট, জেনারেল পোষ্টাফিস্, ছত্রী, পার্ক্ ও পশুশালা, লস্কর হোটেল, জিন্সি, গোয়ালিয়র দুর্গ, তানসেনের সমাধি প্রভৃতির পরিচয় বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে সাধারণের অজ্ঞাত থাকিলেও, আজ বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে নব্য লেখকদিগের কল্যাণে অনেকের নিকটই সুপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল বাঙ্গালী ভ্রমণকারী গোয়ালিয়র দেখিতে যান, তাঁহারা সাধারণতঃ লস্কর দেখিয়াই ফিরিয়া আইসেন। বস্তুতঃ বিশাল সিন্ধিয়া রাজ্যের আরও যে কত প্রদেশে কত গ্রাম ও নগর ঐতিহাসিক তথ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে সকলের সন্ধান অতি অল্প লোকই লইয়া থাকেন। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী বা প্রাচীন অবন্তি দেশ, নৈষধ-রাজ নলের রাজধানী নরবর, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাতত্ত্বের আকর স্বরূপ ভেলসা ও বাগ গুহা, ভীমসিংহের সোহদ, রাজপুত শৌর্য্যের শেষ কীর্ত্তি মেদিনী রায়ের শোণিত-রঞ্জিত চান্দেরী, সিন্ধিয়ার বর্ত্তমান দ্বিতীয় রাজধানী শিবপুরী প্রভৃতি বহু স্থানের প্রাচীন ও আধুনিক কাহিনী আজিও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি কেবল শিবপুরী সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিব।

শিবপুরী লস্কর হইতে বাহাত্তর মাইল দূরবর্ত্তী, সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন আগ্রা-বম্বে রোডের উপর অবস্থিত। আবুল্ ফজল্ এবং টাইফেন্‌থেলার (Teifenthelar) উভয়েই ইহাকে শেওপুরী (Scheopori) বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই নামেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে শিবপুরী বা শিপ্রী বলা হয়। ঐতিহ্যে শিবপুরী উজ্জয়িনী বা চান্দেরীর তুল্য না হইলেও, গোয়ালিয়রের বৃত্তান্তে জানা যায় যে, ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর মাণ্ডু (Mandu) হইতে ফিরিবার পথে হস্তী-শিকার মানসে এই নগরে অবস্থিতি করেন ও এই স্থানেই একটি বৃহৎ হস্তীযূথ ধৃত হয়। আরও জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নগর জায়গীর রূপে নরবর সুবার কাছিবাহ রাজপুতগণের হস্তগত হইয়াছিল। পরে ঐ বংশের সর্দ্দার অমরসিংহ কাছিবাহ সম্রাট শাহ-জাহানের বিরুদ্ধে খসরুর সহায়তা করায় পরাজিত ও অধিকারচ্যুত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিবপুরী সিন্ধিয়া-রাজের অন্তর্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি ক্যান্টন্‌মেণ্ট্ বা ছাউনী ছিল বলিয়া তথায় কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করিতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে ছাউনীর দুই দল সিপাহী বিদ্রোহী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারীগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিবপুরীর ছাউনীটিও উঠিয়া গিয়াছে। *

শিবপুরীর বর্ত্তমান সম্পদ প্রভূত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিবপুরী সিন্ধিয়ার দ্বিতীয় রাজধানী। মাধোসরোবর, চাঁদপাটা প্রভৃতি সমেত ইহার সৌন্দর্য্য সিমলা কিম্বা দার্জ্জিলিং অপেক্ষা বড় কম নয়। লস্কর হইতে শিবপুরী পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র লাইট রেলওয়ের একটি শাখা লাইন থাকিলেও গ্রীষ্মাধিক্য হেতু আমরা মোটরকার-যোগেই রওনা হইয়াছিলাম। সারথি বড়কুটুম্ব স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার। পার্টিতে ছিলাম আমরা সর্ব্বসমেত ছয় জন। দেখিতে দেখিতে কার লস্কর ছাড়িয়া চলিল। আমরাও বাম দিকে প্যালেস্ এবং দক্ষিণে মান্দ্রেমাতা, ভুরামাতা প্রভৃতি পাহাড় ও মন্দির রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে একেবারে সখায়াবিলাসের নিকট বড় রাস্তায় মিলিত হইলাম। সুপ্রশস্ত ছায়াবহুল রাজপথ একটি উচ্চ পাহাড় ঘেঁসিয়া উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে; অপর পার্শ্বে জি, আই, পি রেলওয়ের দিল্লী-বম্বে

---

* Gwalior Gazetteer, Vol. 1 (1908) দ্রষ্টব্য।

লৌহবর্ম্ম। এ স্থলে আমরা সূর্য্যোদয় দেখিলাম। একটি প্রশস্ত অগ্নিগোলক যেন ধীরে ধীরে পর্ব্বতপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। সদ্যঃ-নিদ্রোত্থিত কয়েকটি ময়ূর এই সময়ে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; হঠাৎ মোটরের সাড়া পাইয়া যেন অনিচ্ছার সহিত নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। অনতিবিলম্বে আমরা ঝাঁসি রোড পার হইয়া খাস আগ্রা-বম্বে রোডে উপনীত হইলাম। পথ এবার বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিমগামী। দক্ষিণে সুবিস্তৃত লোকালয়হীন গোচারণ-ভূমি, উত্তরে দূর-বিস্তৃত গিরিরাজি, নিমেষে কখনও নিকটে, কখনও বা দূরে সরিয়া যাইতেছিল। এই গিরিশ্রেণীই লস্করের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহারই দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব-কথিত শিবপুরীর রেল-লাইন। ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিলাম। চতুর্দ্দিকেই ছোট বড় পাহাড়, কদাচিৎ লোকালয়, মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য নদীর শুষ্ক খাত। বর্ষাঋতুতে এই সকল স্থান বৃক্ষলতায় সবুজ ভাব ধারণ করে এবং নদীর স্রোত তীব্র হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেটা জুন মাস। একমাত্র পার্ব্বতী নদী ব্যতীত আর কোন নদীতেই জলের সম্পর্ক ছিল না। সর্ব্বত্র শুষ্ক শষ্পের আবরণে ধূসর ও সূর্য্যতাপে ধূমায়িত বোধ হইতেছিল। সিন্ধিয়ার "রিজার্ভ" বা রক্ষিত বন বলিয়া এই সকল স্থানে ব্যাঘ্রভীতিও প্রবল; সময় সময় অরক্ষিত পথিকের প্রাণ নাশের কথাও শুনা যায়। পূর্ব্ব দিবস মোটর অ্যাটেণ্ড্যান্টের কথায় নিশ্চিন্ত থাকার ফলে পথে দুই জায়গায় নামিয়া চক্রের "পঙ্কোদ্ধার" করিতে হইয়াছিল। ভায়া কলকব্জার কাজে সিদ্ধহস্ত; তথাপি দ্বিতীয়বার বহু ক্লেশে দুই জন সহকারীর সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। টায়ার টিউব মেরামত ও পরীক্ষার পর চাকা যুড়িয়া আমরা যখন দ্বিতীয়বার রওনা হইলাম, তখন বেলা সাড়ে নয় ঘটিকা; মিটরে দেখা গেল রাস্তা মাত্র বত্রিশ মাইল আসা হইয়াছে।

ইহার পর আর বাধা পাইতে হয় নাই; কার বায়ুবেগে ধাবিত হইল, চড়াই উতরাই কিছুই মানিল না। সম্মুখে এক একবার এক-একটা বড় পাহাড় যেন দৈত্যের মত ছুটিয়া আসে, আর নিমেষে অন্তর্হিত হয়। আবার আমরা সমতল ভূমিতে অবতরণ করি; মাঝে মাঝে ষ্টেশন, বস্তি ও ডাক্ বাঙ্গলো দেখিতে পাই। সকল ডাক্‌বাঙ্গলোই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছায়াযুক্ত। এইরূপ একখানি বাঙ্গলোতে নামিয়া আমরা পনের মিনিট বিশ্রাম করিয়াছিলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতর ছায়াযুক্ত কূপের ধারে কয়েকটি গৃহস্থ বধূ ও বালক বালিকা জটলা করিতেছিল। চৌকিদারের ইঙ্গিত-মত একটি বালক এক বাল্‌তি শীতল জল ও লোটা লইয়া উপস্থিত হইল; আমরাও হাত মুখ ধুইয়া পুনরায় মোটরে উঠিলাম। এই যায়গার নাম চোরকোঠী; শুনিলাম, এখানে চোরের ভয় বেশি। আরও আধ ঘণ্টা; তৎপরেই দূরে সিন্দূর-রেখার ন্যায় শিবপুরী পাহাড়ের রক্তরাঙ্গা পথ দেখা গেল। বর্দ্ধমানের মত রাঙ্গা মাটী শিবপুরীর বিশেষত্ব। এখানকার সকল রাস্তাই, এমন কি বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত লাল রংয়ের। সুখের বিষয় এই যে, এই স্থানের উত্তাপ গোয়ালিয়রের ন্যায় অসহ্য নয়। পাহাড়ে চড়িতেই হঠাৎ শীতল বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিলাম।

সহরের উপকণ্ঠে সদর রাস্তার ধারে একটি বড় অট্টালিকার সম্মুখে ভায়া ঘন ঘন "হর্ণ" দিলেন; কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। যে আত্মীয়টির বাসায় উঠিবার কথা ছিল, তিনি স্থানীয় ওভারসিয়ার; তখনও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরেন নাই; এবং পরে জানিলাম যে, লস্কর হইতে লিখিত আমাদের আগমনবার্ত্তা-সূচক পত্রখানি তখনও পৌছায় নাই। অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য আসিয়া আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল এবং সৌভাগ্যক্রমে ওভারসিয়ারও আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আমাদিগকে হঠাৎ শিবপুরীতে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ইনিই বর্ত্তমানে শিবপুরীর একমাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী। *

আহারাদির পর স্থির হইল যে, সর্ব্বপ্রথম আমরা চাঁদপাটা দেখিতে যাইব; পরে অবসরমত সহর দেখা হইবে। বেলা চারিটার সময় চা' পানান্তে পুনরায় মোটরে চড়া হইল। ওভারসিয়ারকে লইয়া এবার আমরা সাতজন। বড় রাস্তার বামদিকে একটি সরু গলি-

---

* ওভারসিয়ারের সহিত তাঁহার পিতৃবন্ধু কুমারপালির "কবিরাজ মহাশয়" আপাততঃ অজ্ঞাতবাসে আছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তিনি এক সময়ে "ভারতবর্ষ" সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের "লোটা কম্বল"-জীবনের সাথী ছিলেন।—লেখক।

পথে কিয়দ্দূর যাইতেই মনে হইল, আমরা যেন কোন ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করিতেছি। উভয় পার্শ্বেই অসংখ্য লাল পথ শাখা-প্রশাখা-ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। ওভারসিয়ার প্রদর্শক না হইলে রাস্তার গোলকধাঁধা ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান কষ্টকর হইত। যাহা হউক, যে শোভার কথা বলিতেছিলাম,—প্রত্যেক রাজপথের সংযোগস্থলে এক-একটি সযত্ন-রক্ষিত পার্ক বা উপবন এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের স্তম্ভ, লতা-মণ্ডপ ও বসিবার আসন। ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে কিছুক্ষণ বসিয়া সেই অরুণরাগরক্ত বিহঙ্গ-মুখরিত সান্ধ্যশোভা উপভোগ করি। সময়ের অল্পতা হেতু বাসনা পূর্ণ হইল না।

গুহা; তথায় এক জটাজূটধারী সাধুকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। ছোট বড় বহু মৎস্য কুণ্ডের স্বচ্ছ সলিলে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। পার্ব্বত্য তরুলতা, আম্র ও আমলকী বৃক্ষের শাখা-পল্লবে সমস্ত খাদটি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এরূপ নির্জ্জন তপোবন-শোভা আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই ঝরণাই প্রসিদ্ধ "শিপ্রী-স্প্রাং"; ইহার স্থানীয় নাম, ভাদৈয়া কুণ্ড। "স্প্রীং"এর জলের আশ্চর্য্য পরিপাক শক্তি বলিয়া এখানে মহারাজের একটি Ærated water factory বা সোডা ওয়াটারের কারখানা ছিল। কারখানা বাড়ী এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

স্প্রীংএর উপরিস্থিত পাহাড়ের পথ ধরিয়া চাঁদপাটার পথে



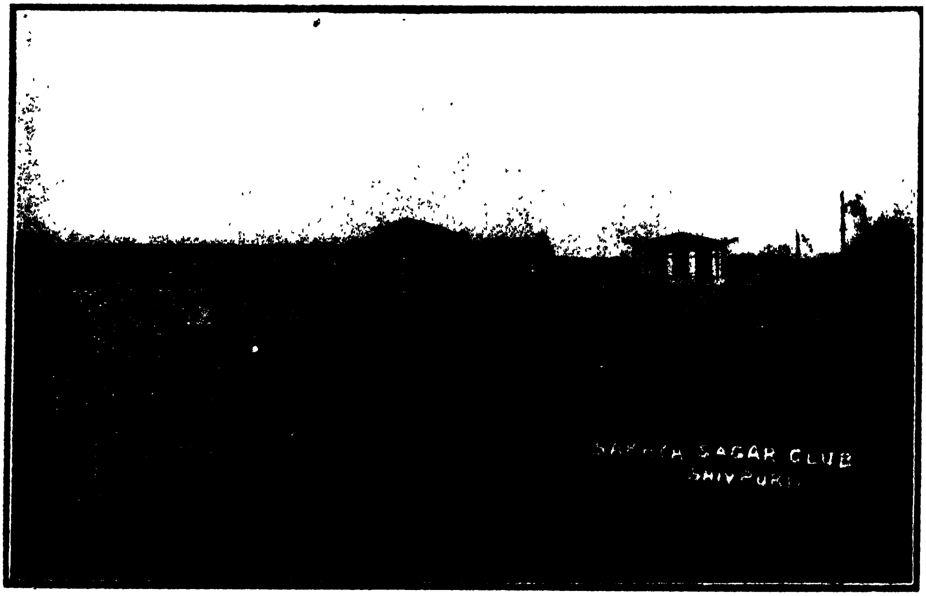
শিপ্রী ঝরণা

প্রথমেই আমরা যে স্থানে উপনীত হইলাম, সেটি একটি ঝরণা। পাহাড়-কাটা বৃহৎ খাদের নীচে এক স্থান হইতে অতি সুস্বাদু স্বচ্ছ বারিধারা কুল কুল রবে নিঃসৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সৃষ্টি করিয়াছে। যে স্থান হইতে ঝরণা বাহিঃ হইয়াছে, তাহার উপরে এবং উভয় পার্শ্বে পাকা ইমারত; নিম্নে সোপানাবলী একটি কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। এক দিকের পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি ছোট

আমরা আর দুইটি দৃশ্য দেখিলাম। উহাদের একটি রবার্ট্‌সন্ রোড, অপরটি যাদোসাগর। রবার্ট্‌সন্ রোড একটি পার্ব্বত্য নদীর উপর দিয়া গিয়াছে। সেতুর উপর হইতে উভয় দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম। যাদোসাগর যাদোসাহেব ইংলের নামে অভিহিত। ইহা অত্যুচ্চ পাহাড়-বেষ্টিত একটি হ্রদবিশেষ। সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত খিলান-করা ঘাট; তাহার নিম্নে প্রশস্ত হল্ ও প্রস্তরাসন;

পশ্চাতে সুপ্রশস্ত সোপানাবলী ক্রমশঃ হ্রদের জলে প্রবেশ করিয়াছে। সমস্ত হলটি রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং সেই আলোকরশ্মি হ্রদের কাল জলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব লীলাবিভঙ্গের সৃষ্টি করে।

যাদোসাগর হইতে আঁকা-বাঁকা আর কয়েকটি লাল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চাঁদপাটায় উপনীত হইলাম। চাঁদপাটা সত্যই চাঁদের পাট। চন্দ্রলোকে হাসিতে থাকে। ইহার সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রকৃতির সহিত মনুষ্য-কলা-কৌশলের এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কুত্রাপি দেখি নাই। চাঁদপাটার অপর নাম সখায়া সাগর। কয়েকটি পার্ব্বত্য নদীর সম্মিলনে ইহার উৎপত্তি। ইহার তীরে বিলাতী "সেলিং ক্লাবের" (Sailing club) অনুকরণে একটি ক্লাব নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ীবারাণ্ডাযুক্ত একটি গৃহের অভ্যন্তরে বিরাম ও বিলাসের বিবিধ উপকরণ সজ্জিত। ক্লাব-গৃহের পশ্চাদ্দিকে পোর্টিকোযুক্ত একটি ওভার-ব্রীজ বা সেতু পার হইয়া সাগরের তলদেশ হইতে গঠিত একটি চত্বরে যাওয়া যায়। এই চত্বরই জাহাজের জেটীরূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার রেলিংএর ধারে কয়েকটি নরনারীর প্রস্তরমূর্ত্তি বৈদ্যুতিক আলোক-স্তম্ভের কার্য্য করে। চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত একটি করিয়া অপ্সরা সুন্দরীর পার্শ্বে বিকটাকৃতি কাফ্রিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সাগর-জলে ছোট বড় কয়েকখানি বাষ্পীয় পোত। প্রধান তিনখানি জাহাজের নাম, "রাজা", "কাশ্মীর" এবং "লণ্ডন হাউস্।" যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন "লণ্ডন হাউস্" নামক জাহাজখানি তীর-সংলগ্ন ছিল। অনুমতি লইয়া আমরা এই জাহাজের ভিতর এবং বাহির সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিলাম। ইহার অভ্যন্তরে ড্রয়িং-রুম্, ডাইনিং হল্, ড্রেসিং রুম্, কুক্ রুম্ এবং আস্‌বাবপত্র সমস্তই আধুনিক প্রণালীতে গঠিত ও সজ্জিত। তিনখানি পোতই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মহারাজের জলভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হইত। কখনও কখনও তিনি জাহাজে থাকিয়াই রাজকর্ম্ম এবং কর্ম্মচারিগণের সহিত দেখা করিতেন। এই তিনখানি জাহাজ ব্যতীত "লোটাস্", "ডেইসী" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি বোট্ সর্দ্দারদিগের জন্য আছে। সখায়া সাগরের আর এক প্রধান দৃশ্য, প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধ (dam)। ইহার একধারে অর্থাৎ সাগরের দিকে গভীর জল, অপর দিকে তদ্রূপ গভীর শূন্য নদী-বক্ষ। বাঁধের উপর দিয়া লোক চলাচলের পথ আছে, কিন্তু উপর হইতে খাতের



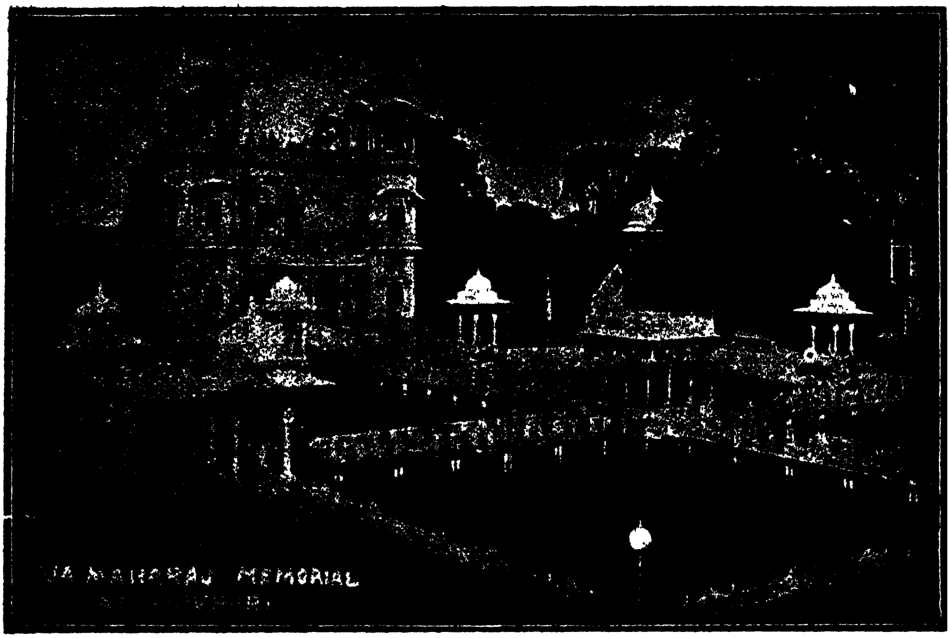
সখায়া সাগর বা চাঁদপাটা

দিকে চাহিলেই কম্প উপস্থিত হয়। নদীর এবং বর্ষার জল আবদ্ধ রাখাই এই বাঁধের কার্য্য। সমস্ত জলভাগের পরিসর আটাশ বর্গমাইল। জলের গভীরতা ১৪ হইতে ৪৩ ফিট। সাগরের অপর তীরে পাহাড় এবং মাঝে মাঝে "ল্যাণ্ডিং ষ্টেশন্" (landing station)। শুনা যায় যে সখায়া সাগরের বাঁধ তৈয়ার করিতে নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। অধুনা আড়াই লক্ষ টাকার চুক্তিতে ইহার সংস্কার হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত 'সেলিং ক্লাবের' বিপরীত দিকে পথের ধারে একটি ঘড়ি-ঘর (clock tower) এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে মহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ক্লাব ও "টেনিস্ গ্রাউণ্ড"। পথঘাট, গৃহ, সমস্তই বিদ্যুতালোকে বিভূষিত।

সখায়া সাগর দেখার পরদিন আমরা মাধো হ্রদ (Madho Lake) ও রাজমাতার ছত্রী দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থির ছিল যে, হ্রদের জলে স্নান এবং তীরে পিক্নিক্ করিয়া অপরাহ্নে ছত্রী দেখিয়া বাসায় ফিরিব। ওভারসিয়ার ভায়া বন্দোবস্তের ভার লইলেন। প্রাতে বেলা নয় ঘটিকার সময় আমরা সদলবলে "লেক্" দেখিতে যাই। সখায়া সাগরের রাস্তায়ই যাইতে হইল, সুতরাং নূতন কোন দৃশ্য চোখে পড়িল না। মাধো হ্রদ মহারাজ মাধোরাও সিন্ধিয়ার নামে অভিহিত। ইহা সখায়া সাগরের নিম্নাংশ এবং তাহা হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। এখানেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বাঁধ দিয়া নদীর জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে। জল স্বচ্ছ কাচ সদৃশ এবং অসংখ্য মৎস্যে পরিপূর্ণ; শুনিলাম, দুইটি কুম্ভীরও এখানে দেখা যায়। সখায়া সাগরের ন্যায় মাধো-লেকেরও উভয় তীরে পাহাড়। বাঁধের দৈর্ঘ্য তের চেইন্ বা সাড়ে আট শত ফিটেরও অধিক; এবং ইহাতে একটি লক্ গেট (Lock Gate) আছে। ইহার জলে "তানসেন্", "স্পাইডার" প্রভৃতি কয়েকখানি ষ্টীম্ ও পেট্রোল লঞ্চ্ এবং জলী বোট্ দেখিলাম। লকে'র বাহিরে নদীগর্ভে খাল কাটিয়া প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী ভাগোরা "রিজার্ভার" নামক একটি জলাশয়ের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গেটের দরজা খুলিয়া দিলে হ্রদের সঞ্চিত জলে খালটি পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে লঞ্চ্ ও বোট্ কয়খানি হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাগোরা পর্য্যন্ত গমন করে। খালের ধারে পাহাড়ের নিম্ন দিয়া পাকা রাস্তা ও ইলেকট্রিক্ লাইট্; পাহাড়ের উপরে একটি "লাইট্ হাউস্" (Light house) এবং অপর তীরে পাহাড়ের চূড়ায় "জর্জ্ কাসল্" দুর্গ। জর্জ কাসলের স্থানীয় নাম, বাঁকড়া কুঠী। গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ পাহাড়ে চড়িয়া "কাসল্" দেখা হইল না; তবে শুনিলাম যে, উহা অতি অভিনব উপায়ে সজ্জিত এবং উহার ঘরের মেঝেগুলি গোয়ালিয়র "পটারী"র চিত্রিত টাইল্ দ্বারা গঠিত। ভারতের এক সুদূর আরণ্য প্রদেশে পাশ্চাত্য অনুকরণে নৌ-বিহারের এমন সুব্যবস্থা স্বর্গীয় মহারাজের কল্পনাশক্তির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, "লেকে"র জলে সন্তরণ, মৎস্য শিকার, বোটে ভ্রমণ ইত্যাদি আমাদের কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী হয় নাই।

এইবার ছত্রী দেখিবার পালা। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় লেক্ ত্যাগ করিয়া ছত্রীর অভিমুখে রওনা হইলাম। ছত্রাটি মাধো মহারাজের মাতা স্বর্গীয়া জীজা মহারাণীর; এবং লস্করের অপরাপর ছত্রী হইতে স্বতন্ত্র। ইহার ভিন্নতা কালেরই ধর্ম্ম-সাপেক্ষ। মহারাষ্ট্রীয় ছত্রী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ছত্রীগুলি রাজ-পরিবারের স্মৃতি চিহ্ন। ইহাতে একদিকে যেমন বংশস্থ প্রধান পুরুষের অথবা প্রধান নারীর প্রতিমূর্ত্তির দর্শনলাভ হয়, অপর দিকে তেমনি তাঁহাদের প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকতায়ও ছত্রীর মূল্য যথেষ্ট; কারণ, প্রত্যেক ছত্রীই সমসাময়িক ঘটনাবলী, সভ্যতা এবং রুচির পরিচায়ক। ইহাদের গঠন-প্রণালী ও শিল্পকলা সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শৈব ধর্ম্ম যে সিন্ধিয়া পরিবারের কুলধর্ম্ম, তাহাও ছত্রী হইতে প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক ছত্রীতেই একলিঙ্গ শিব ও বৃষের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সকল জাতির মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পর স্মৃতিস্তম্ভ অথবা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় রাজগণের ছত্রীতে যেমন পিতৃপুরুষের মূর্ত্তির নিয়মিত পূজা হয়, এমন আর কোথায়ও হয় বলিয়া জানি না। সিন্ধিয়ারাজের প্রত্যেক ছত্রীরই পৃথক ভবন, পৃথক সেবা এবং পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে।

জীজা মহারাণীর ছত্রী আধুনিকতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার মন্দির, মন্দিরের অঙ্গন, অঙ্গনস্থিত জলাশয় ও সেতু, ফোয়ারা ইত্যাদি সমস্তই মর্ম্মর-নির্ম্মিত এবং বৈদ্যুতিক আলোক-সমন্বিত। প্রধান মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশমাত্র আর্শিমণ্ডিত প্রাচীর-গাত্রে স্বীয় অবয়বের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; তৎপরেই দৃষ্টি পতিত হয় শিলাসনে উপবিষ্টা মহারাণীর স্ফাটিক মূর্ত্তির প্রতি। তাঁহার মুখাবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই

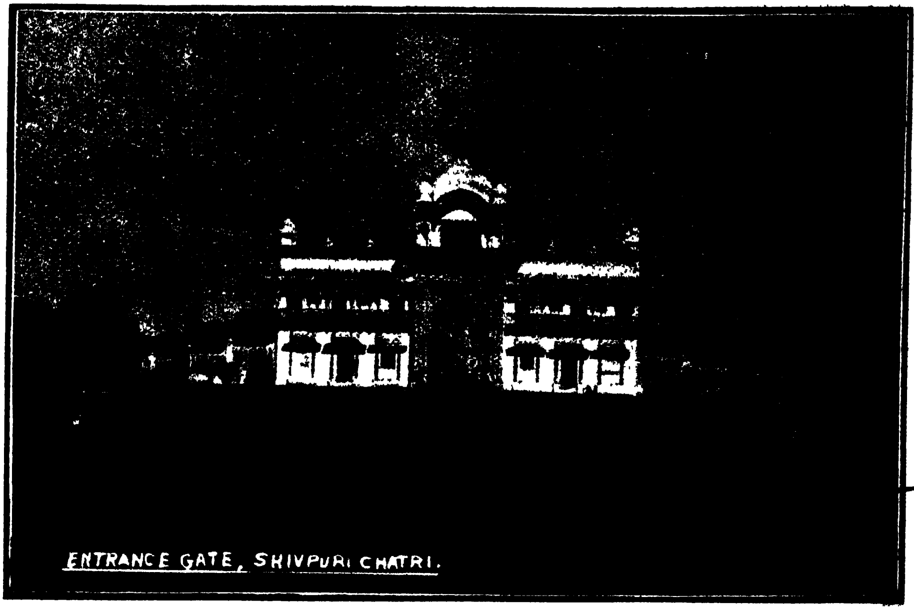


ছত্রী

স্বাভাবিক ; হঠাৎ দেখিয়া নির্জ্জীবতার কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না। মুখের ও ললাটের প্রত্যেক রেখা, অক্ষিপুট, অধর ও ওষ্ঠ হইতে যেন প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত হয়। রাজমাতার পরিধানে সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র, প্রকোষ্ঠে তারের সুবর্ণ-বলয়, বক্ষে হার। কর্ম্মচারী ও রক্ষিবর্গ ব্যতীত কয়েকজন বাঁদী এবং বৈতালিক সর্ব্বদাই ইঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। গ্রীষ্ম-নিবারণকল্পে গৃহের ভিতর কয়েকখানি বৈদ্যুতিক পাখা সংযুক্ত। বাহিরের দেওয়ালগুলি খসের পরদায় ঢাকা ; তদুপরি ছিদ্রযুক্ত নল হইতে অবিরাম কৃত্রিম বৃষ্টিপাত হইতেছে। ছত্রী-সংলগ্ন বহুদূর বিস্তৃত উদ্যানের ভিতর অসংখ্য সমান্তরাল পথ, বৃক্ষবাটিকা, লতামণ্ডপ, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড় এবং ঝরণা, সেতু, ফল ও ফুলের বাগান। সমস্ত উদ্যানই বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত। ছত্রীর প্রবেশ-পথে অভ্রভেদী তোরণদ্বার। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিলাম, সেই দিকেই মহারাজের অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস! যাঁহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত এই বিরাট ছত্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সাতবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে সেই মাতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখেই মহারাজের নিজের ছত্রী নির্ম্মিত হইতেছে।

বাহিরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। ছত্রী দেখা শেষ করিয়া মোটরে উঠিবামাত্র একজন সিপাহী "ভিজিটার্স বুক্" লইয়া ছুটিয়া আসিল। ইহাতে ছত্রী সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। লিখিলাম,—"A charming picture of beauty! Everything is in order." তাহার পর মহারাজ এবং রাজমাতার প্রতি উদ্দেশে ভক্তি জানাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে যে সামান্য বেলা ছিল, তাহাতেই শিবপুরী সহর দেখা হইল। সহর ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদর রাস্তা একটি মাত্র এবং তাহা আগ্রা বম্বে রোডেরই অংশ। রাস্তায় রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত ইলেক্ট্রিক্ লাইট্ জ্বলে। উভয় পার্শ্বেই ছোট বড় পাকা বাড়ী। ডান দিকের অপর একটি রাস্তার মোড়ে "মার্কেট্" বা সরকারী বাজার। ইহাতে দুই বেলাই আবশ্যক শাক সব্জী, ফলমূল আমদানি হয়। কয়েকখানি মুদিখানা, বস্ত্র, বাসন, মেঠাই ও মেওয়ার পাকা দোকানও আছে।



ছত্রীর প্রবেশ পথ

এখানকার তৈয়ারী মেঠাইর মধ্যে বালুসাই অতি উপাদেয়। খাঁটী দুধ টাকায় আটসের এবং ভাল ঘি তিন পোয়া, তের ছটাক হিসাবে বিক্রয় হয়। মৎস্য এ-অঞ্চলে কেহ পয়সা দিয়া কেনে না বলিয়া বাজারে তাহার আমদানিও হয় না। বাজার ছাড়াইয়াই টাউনহল্ বা হার্ডিঞ্জ ক্লাব, প্যালেস্ বা রাজ-প্রাসাদ, সেক্রেটারিয়েট বা খাস দপ্তর, সুবার



সেক্রেটারিয়েট্

কাছারী, স্কুল, হাসপাতাল, গ্রাণ্ড হোটেল্, রাজ এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের দুইটি পোষ্টাফিস কাষ্টমস্ ও খাজা ইত্যাদি সরকারী বাড়ী। প্যালেস্ ও সেক্রেটারিয়েট্ বাড়ীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্যালেসেই শেষ বয়সে জীজা মহারাণী বাস করিতেন। প্যালেসের ভিতরে যাইতে পারি নাই, বাহির হইতে দেখিলাম, ইহার গঠন-প্রণালী আধুনিক। প্রশস্ত কম্পাউণ্ডের চতুর্দ্দিকে উচ্চ রেলিং দেওয়া এবং সম্মুখ-ভাগে প্রকাণ্ড ফটক। সেক্রেটারিয়েট্ বাড়ী একতলা হইলেও



শিবপুরী ষ্টেসন

তাহার গঠন বড় সুন্দর এবং সচরাচর এরূপ ধরণের বাড়ী বড় দেখা যায় না। সরকারী বাড়ীগুলি সমস্তই লালবর্ণ।

সহরের বাহিরে রেলওয়ে ষ্টেশন। লস্কর হইতে শিবপুরী প্রত্যহ একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যায় এবং শিবপুরী হইতে একখানি আইসে। এতদ্ব্যতীত "শিপ্রীসিজনে" (Sipri season) অর্থাৎ যে সময় গভর্ণমেণ্ট শিবপুরীতে অবস্থান করে, তখন একখানি "মেল" ট্রেণও দেওয়া হয়। লস্করের স্থায় শিবপুরীতেও টাঙ্গা-সার্ভিস্ আছে। সম্প্রতি শিবপুরী হইতে ঝাঁসি এবং গুণা (ষাইটমাইল করিয়া) দুইখানি মোটর লরীও চলিতেছে।

তৃতীয়দিন প্রত্যূষে সামান্য জলযোগের পর সকলে লস্কর যাত্রা করিলাম। এবার পথে কোথাও বিশ্রাম করিতে হয় নাই। পথে দুই একটি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উপসংহারে বক্তব্য, যাঁহারা অতঃপর গোয়ালিয়র দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন শিবপুরী দেখার সুযোগ ত্যাগ না করেন। শিবপুরী না দেখিলে লস্কর দেখা সম্পূর্ণ হয় না। *

* এই প্রবন্ধে শিবপুরীর যে ছয়খানি ফটোগ্রাফ সংযুক্ত হইল তাহার "কপিরাইট" স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীযুক্ত আর এল্. দেশাই। ইনি গোয়ালিয়রের একজন প্রসিদ্ধ ফটো আর্টিষ্ট্। ফটোগুলি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। —লেখক।

আশার মরণ

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী, বি-এ

হোষ্টেলের একটা কামরায় প্রায় রোজই যে-চারজনের আড্ডা বস্‌ত, তাদের নাম ছিল,—সোমেশ, রমেন, শীতল আর মাধব। সোমেশ ছিল অল্প-বিস্তর কবি—জগতের যত কারুণ্য-ভাব তার কবিতায় স্থান পেত। মাসিক পত্রিকায় তার কতকগুলো ছাপা হয়েছে; বাকী-গুলো সম্পাদকবৃন্দ ধন্যবাদ সহকারে ফেরৎ পাঠিয়েছেন—কারণ টিকেট দেওয়া ছিল।

রমেন ছিল মস্ত আর্ট-ক্রিটিক। মাঝে মাঝে সে দৃশ্য-ছবিও আঁকত—যাতে বেশীর ভাগ থাকতো বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ, খণ্ড খণ্ড মেঘদল, আর একখানা সুনীল আকাশ। শীতল তার নামের মহিমা সার্থক রেখেছিল। সে ছিল ঠাণ্ডা প্রকৃতির; গদ্য পদ্য সব সমান ছিল তার কাছে। মাধবকে এ তিন প্রকৃতির সমষ্টি বলা যেতে পারে। সে ছিল একাধারে কবি, রসিক, ভাবুক; আর অবস্থা-বিশেষে ভয়ানক গম্ভীর,—একটা পরম পদার্থ।

কবি সোমেশ হঠাৎ একদিন তার প্রতিভার একটা বড় পরিচয় দিয়ে ফেল্‌লে। তার নিজের ও আর দু'জনের নামের আদ্যাক্ষর সংযুক্ত করে' সে মাধবের নামকরণ কর্‌লে সো-র শী অর্থাৎ ষোড়শী। সোমেশকে সেদিন দু'কাপ চা বেশী দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। কামরার ভিতর কেট্‌লী-শোভিত ষ্টোভ বাইরের হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। হঠাৎ হাতের বইখানা বিছানায় রেখে' মাধব বল্লে,—"না, আর ভাল লাগে না।"

সোমেশ বালিশ আঁকড়িয়ে শুয়ে ছিল; বল্লে,—"এর আগে নিশ্চয়ই তা'হলে একটা কিছু ভাল লাগ্‌ত। জানতে পারি কি—সেটা কি?"

রমেন ভ্রূটা টেনে বললে—"বোধ হয় Bachelor life" মাধব ঠোঁট কামড়ে জবাব দিলে—"ঠিক তা নয়। তোমরা কি মনে করবে, জানি না,—কিন্তু আমি নভেল পড়া ছেড়ে দেব ভাব্‌ছি। ও-সবে আর মোটেই রস পাইনে।"

শীতল এইবার একটু গরম হয়ে' বললে—"কি রকম?"

মাধব আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে' নিয়ে' বললে,—"এই বইগুলোর ভেতর adventure আর Romanceএর রং-বেরংয়ের কাহিনী পড়ে' পড়ে' মাথা খারাপ হয়ে' গেল, কিন্তু theoreticalএ· বেস্না ধরে' গেছে ভাই।"

রমেন চট্ করে' বলে উঠ্‌লো—"Practical করে' নিলেই পার।"

মাধব একটু হাসলে, "চেষ্টা কি কম করেছি ভাই। সুযোগ মেলেনি। কতদিন বিকেল-বেলা রেড রোড্ আর গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি। একদিনও এমনটী হল' না যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ নারী-কণ্ঠে—'কে আছেন, রক্ষা করুন' শব্দ শুনে ছুটে' গিয়ে দেখি যে একটা মোটরে একটী তরুণী—"

সোমেশ ঝাঁ করে' বলে' উঠ্‌ল—"চূর্ণ-কুন্তলা, সীমন্তে সিন্দুর-হীনা—"

রমেন বল্লে, "আহা, শেষ করতেই দাও না ছাই। তরুণী বিপন্না—আর তুমি কি না ওকে আটকে রাখছ।"

মাধব বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বল্‌লে,—"আর বলেই বা কি হবে? এ জন্মে তো ও-সব কিছু হল' না! এই শুধু,—তরুণী মোটরে—"

সোমেশ বল্লে—"Sedan. নয় নিশ্চয়ই" মাধব বলে যেতে লাগলো,—"তরুণী মোটরে দাঁড়িয়ে' ভয়ে কাঁপছেন; আর দুষমন চেহারার একটা লোক ছোরা হাতে ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছে গয়না চাইছে। বলা বাহুল্য সোফার আগেই সট্‌কান দিয়েছে। আমি যাওয়া মাত্র তরুণী বললে 'আমায় বাঁচান।' আমার মনে হল, তরুণী একান্ত নির্ভর করে' আমার উপর তার সমস্ত মান-সম্ভ্রম ছেড়ে দিলে। আমি গিয়ে পেছন থেকে লোকটার মাথায় এক ঘুসী লাগালুম। সে ছোরা বাগিয়ে ধরবার অবসর পেলে না।"

রমেন এইবার বল্‌লে—"কিন্তু ভাই, তোমার যা শরীরের অবস্থা তাতে—"

সঙ্গে সঙ্গে মাধবও বলে' উঠ্‌ল—"আরে, শরীরে কি করে। তখন বৈদ্যুতিক শক্তি—"

সোমেশ বল্‌লে—"মোটরে দাঁড়িয়ে। তার পর বাকীটা বলে' ফেল।"

"তার পর আর কি। এক ঘুসীতেই বেটা তো হতজ্ঞান। তরুণী নেমে এসে আমার বল্‌লে—'আপনি আমার বাঁচিয়েছেন।' ভয়ে তখনও তার স্বর কাঁপছিল। বিনয়ে মাথা নীচু করে' জবাব দিলুম, 'ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন—আমি উপলক্ষ মাত্র।' চার দিক চেয়ে তরুণী করুণ-নেত্র পাতে বল্‌লে—'আমার সোফার তো পালিয়েছে—। আপনি কি—' বাধা দিয়ে বললুম—'আপনি ভাববেন না। আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।'"

রমেন বল্‌লে—"দেখছি, ও রকম ক্ষেত্রে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত জানা থাকে—।"

মাধব বল্‌লে—"নিশ্চয়ই। না জানলে চলবে কেন? তারপর তরুণী কোমল কণ্ঠে বল্‌লে 'আমার প্রাণদাতার নাম জানতে পারি কি?' জবাব দিলুম—'নামে কি হবে আপনার। একজন পথের পথিক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার কাছে একটু লেগে গেল। এইটাই কি মনে রাখবার মত যথেষ্ট নয়?'

সোমেশ বলে' উঠ্‌ল,—"ও-রকম ক্ষেত্রে তোমার বলা উচিত যে,—নাম ষোড়শী, তিনিও তরুণী; দুয়ে' মিলে' ষোড়শী তরুণী হয়ে' যেত। আচ্ছা তার নাম—"

"তার নামে আমার প্রয়োজন কি? বাসায় পৌঁছে দিয়ে তার দিকে একটীবার চেয়ে কোন কিছু না বলে' আস্তে আস্তে চলে' আসছি, এমন সময় সে ছুটে এসে' আমার হাত ধরে' বল্‌লে—'আপনি কিছু না বলে' এমনি ভাবে চলে' যাচ্ছেন—এতে আপনার গৌরব বাড়ে, কিন্তু আমার যে কতখানি ছোট করা হয়, এ কি আপনি বুঝবেন না? আপনার হাতে এ ভাবে অপমান হওয়ার চেয়ে আমার রাস্তায় অপমান যে ভাল ছিল!'—ব্যস্‌"

সোমেশ বল্‌লে—"এই! আর কিছু না? বাসায় নিমন্ত্রণ, ঘন ঘন যাতায়াত, প্রাণের পরিচয়—তার পর একদিন—"

বাধা দিয়ে' মাধব বল্‌লে—"আহা! সেটা তো understood থাক্‌লো। সেটা বললে তো গল্প বলা হল' না। সেটা হল' গল্প।"

শীতল এইবার একটু রসিকতা করে' বল্‌লে—"নভেল পড়ার বাতিক আমার নেই। কিন্তু তোমার মুখে এ রকম একটা মুখ-রোচক সম্ভাবনার কথা শুনে' বুড়ো বয়সে নভেল ধরব দেখছি। অবস্থা-বিশেষে কি করতে হবে, সেটা অন্ততঃ জানা যাবে।"

সোমেশ সুর করে' বল্‌লে—"ষোড়শী, তোমার স্বপ্ন সফল হোক্—।"

কিন্তু এই আলোচনার ঠিক তিন মাস পরে—দার্জ্জিলিংএ বার্চ্চ হিলের ঢালু রাস্তায় ষোড়শীর কপালে যে accident বা তথাকথিত adventure জুটে' গেল,—সেটা ঠিক উল্টো। বিকাল বেলা অশ্বপৃষ্ঠে বার্চ্চ হিল থেকে নীচে নামতে গিয়ে' ঘোড়া হোঁচট্ খাওয়ায় মাধব ছিটকে রাস্তায় পড়ে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের ভয়ার্ত্ত স্বর শুন্‌তে পেলে। মাথায় আঘাত পাওয়ায় সে উঠতে পারছিল না। এমন সময় যে যুবকটী ছুটে এসে তাকে ধরে' তুল্‌লে, চোখ মেলে তাকে দেখতে গিয়ে দেখ্‌লে—তার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়-ব্যাকুল-নয়নে একটী প্রৌঢ়া মহিলা, একটী তরুণী, ও তাঁকেই আঁকড়ে ধরে' একটী ছোট মেয়ে। কিন্তু তখন তার এসব চিন্তার সময় ছিল না। সমস্ত গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা—কয়েক জায়গায় কেটে গেছে। মাথা ঘুরছিল। আবার শুয়ে' পড়লো। যুবকটী জিজ্ঞেস করলে "আপনি কোথায় থাকেন?" মাধব চোখ্ বুজেই বল্‌লে—"স্যানিটোরিয়ামে"। যুবকটী মেয়েদের বল্‌লে,—"মা, হাসি, তোমরা এঁকে দেখো। দেখি যদি রাস্তায় কোথাও রিক্শ কি ডাণ্ডি পাই। আমি শীগ্‌গীরই আসছি।"

আর একবার মুখ তুলে' মেয়েদের দিকে চাইতে গিয়ে,' জীবনে প্রথম মাধব বুঝতে পারলে যে, দেহের ও পরিচ্ছদের এ রকম বিকৃত অবস্থা নিয়ে অপরিচিতা মেয়েদের সাম্‌নে পড়ায় কতখানি লজ্জা রয়েছে।

স্যানিটোরিয়ামের ডাক্তার শিশির বাবুর যত্ন ও সেবায় মাধব ৪।৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। এ কয়েকদিন

রোজই যুবকটী মাধবকে দেখ্তে আস্ত। প্রথম দু'দিন একটু জর ছিল বলে' মাধবকে দুধ আর ফলমূলাদি দেওয়া হত। এসব জিনিস কোথা থেকে কি করে' তার টেবিলে আস্ত, মাধব তা ভাববার অবসর পায় নি'। সে জানুলে যে, যুবকটী স্যানিটোরিয়ামেরই ২নং কটেজে থাকেন এবং তাঁর নাম শৈলেন। চার দিনের দিন যুবকটী যেদিন মাধবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দুধ খেতে অনুরোধ করে' বল্লে—"এটুকু দুধ না খেলে চল্‌বে কেন। ডাল ভাত তো আর পেটে যাচ্ছে না। বিশেষ মা যত্ন করে নিজের হাতে গরম করে' পাঠিয়ে' দিয়েছেন"—সেদিন অতি-বড় বিস্ময়ের সঙ্গে তার পথ্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছিল। বিদেশে একটি অপরিচিত ছেলের জন্য একটী বাঙ্গালী মায়ের এই স্নেহ করুণার কথা ভাবতে গিয়ে' মাধবের চোখে জল এল। নিজকে সংযত করে' সে বল্লে—"শৈলেন বাবু, আপনাদের এখনো কিছুই বলা হয় নি'। কিন্তু এই অযাচিত স্নেহ-যত্নের স্বীকারোক্তিটাতেও আমার কুণ্ঠায় বাধে বলে', বলার মত কিছু খুঁজে পাই নি'। আমি জানি, স্নেহের ঋণ কখনও শোধ করা যায় না—তাই চুপ করে' আছি। আপনার স্নেহময়ী মাকে আমার প্রণাম দিয়ে বলবেন, এ ক'দিন তাঁর দেওয়া যে জিনিসগুলো খেয়ে আমার অসুখের সময়টা কেটেছে, তাতে অসুখের বাকী ২।১ দিন না খেলেও চল্‌বে।"

শৈলেন বাবু একটু হেসে মাধবের বিছানায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লে "মাধব বাবু, আপনি একটু Sentimental,—নয় কি?"

মাধব সে কথায় কাণ না দিয়ে কি ভেবে বল্লে—"শৈলেন বাবু, আমার আর একটা নাম আছে—ষোড়শী!"

শৈলেন্ হো হো' করে' হেসে উঠ্‌ল—"ঠিক্, আপনি শুধু Sentimental নন্, সুরসিক; আর কবিও বোধ হয়!"

মাধব মাথা নেড়ে বল্লে—"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আপনার? ব্যাপারটা শুনুন তবে—"

শুনে' শৈলেন বল্লে—"তাই না কি। দিব্যি নাম বের' করেছে যা' হোক্। আপনার কোন বিবাহিত বন্ধুকে এই নাম দিয়ে পত্র লিখ্‌বেন না যেন। বেচারার দাম্পত্য প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটবে।"

সুযোগ বুঝে মাধব জবাব দিলে,—"আপনিও বেশ সুরসিক আর কাব্য-গ্রস্ত। এর মধ্যে আর 'বোধ হয়' নেই।"

কিন্তু সেরে উঠে যেদিন মাধব রাস্তায় বেরুলো, সেদিন দুপুর বেলা থেকে রাত্রি আটটা অবধি কয়েকটী বন্ধুর বাসায় গল্প করে' আর তাস খেলে সে কাটিয়ে' দিলে। বাসায় ফিরেই দেখে, দরজার তালার সঙ্গে একটা কাগজ লাগানো। খুলে দেখে শৈলেন লিখেছে—

"দু বার এসে ফিরে' গেছি। আর যাই করুন—আর যেন ঘোড়ায় চড়ে' ভাল Rider হওয়ার সাধ কখনো মনে না আনেন। নেহাৎ ইচ্ছে হলে', জিনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখবেন। তার আগে ঘোড়ার মালিককে ঘোড়ার lifeটা Insure কর্‌তে বলে দেবেন।" পত্র পড়ে' প্রথমতঃ তার এই কারণে লজ্জা হল' যে, শৈলেনদের বাসায় গিয়ে তাদের ধন্যবাদ কি কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নি'।

পর দিন সকাল-বেলা শৈলেনই তাকে বাসায় ধরে' নিয়ে গেল। বস্‌বার ঘরে শৈলেনের মা ঢুকতেই শৈলেন বল্লে—"এই নাও মা, মাধব বাবুকে ধরে' নিয়ে' এসেছি। উনি তো এদিকে আসতেই চান্ না। আজ-কাল আবার রোজই ঘোড়ায় চড়ছেন কি না, তাই সময় পান না।"

মাধব চেয়ে দেখ্‌লে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক শান্ত-সুন্দর মাতৃ-মূর্ত্তি। কাছে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌তেই, তিনি বল্লেন,—"থাক্ বাবা, প্রণাম কর্‌তে হবে না। অম্‌নিই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। এখন সেরেছ তো?"

পরিপূর্ণ অন্তরে মাধব বল্লে—"হাঁ, সেরে উঠেছি। যেখানে এমন মা আছেন, সেখানে ছেলের আপদ বিপদ ঘটবে কেন?"

শৈলেনের মা বল্লেন—"আমরা আর তোমার কি করেছি বাবা। বিদেশে একলাটী রয়েছ। অসুখের সময় সবাই সবাইকে এ-রকম দেখেই থাকে। তোমরা গল্প কর শৈলেন, আমি চা পাঠিয়ে দিই গে।"

কিছুক্ষণ পরে একটী ৬।৭ বছরের হাস্যমুখী বালিকা, একহাতে এক গ্লাস জল ও আর এক হাতে এক প্লেট্ খাবার নিয়ে' এসে মাধবের সামনে রেখে দিলে। বল্লে—"মা আপনাকে খেতে বল্লেন।"

মাধব মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়ে' বল্‌লে, "আমার কি বলে' ডাকবে খুকী ?"

মেয়েটী বল্‌লে—"বা রে, আমি বুঝি খুকী ?"

মাধব হো হো করে' হেসে উঠ্‌লো—"না—তুমি বুড়ী। তোমার নাম কি ?"

শৈলেন বল্‌লে—"ওর নাম সুধা। আমার ছোট বোন্।" তার পর কি মনে করে' চেঁচিয়ে মাকে ডাক্‌লে। মাধব কিছু বুঝতে পারলে না।

শৈলেনের মা এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"তোমরা যে এখনো কিছু খাও নি'। সুধা! চা ঢেলে রেখেছি নিয়ে আয়।"

বাধা দিয়ে শৈলেন বল্‌লে—"একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মা; মাধব বাবুর আর একটা নাম আছে—ষোড়শী—ওঁর বন্ধুদের দেওয়া।"

মা একটু হাসলেন। মনে হল' দরজার পাশে একটা চাপা হাসিরও আওয়াজ শোনা গেল। মাধব আরক্তিম হয়ে' উঠ্‌লো।

শৈলেনের মা বল্লেন্ "যা—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস্। তুমি কিছু মনে করো' না বাবা, ও আমার পাগল ছেলে।" সুধা, কি ভেবে বল্‌লে—"হ্যাঁ মা, ওঁকে কি ষোড়শী দাদা' বলে' ডাকব ?" এবার একসঙ্গে সকলে হেসে উঠ্‌লো। মাধবের সলাজ ভাবটা কেটে গেল। মৃদু হেসে বল্‌লে, "হাঁ, সুধা, তুমি আমায় তাই বলে' ডেকো'।"

সেদিন এই আনন্দ-পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আনন্দের আতিশয্যে তার মনে পড়ে' গেল—

> কত অজানারে জানাইলে তুমি
> কতজনে দিলে ঠাঁই—।
> দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু—
> পরকে করিলে ভাই ॥"

শৈলেনকে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসছিল, তখন মাধব দেখলে কে যেন ধীরে ধীরে দরজার কাছ থেকে সরে' গেল।

শৈলেনদের গভীর আন্তরিকতা ও অনাবিল প্রীতি মাধুর্য্য দু'এক দি নর ভিতর মাধবের সঙ্কোচটাকে দূর করে দিলে। এমন সহজ সরল সুন্দর মা-ভাই-বোনদের অযাচিত স্নেহ-প্রীতি গ্রহণে সে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলে।

সুধাকে সঙ্গে নিয়ে' এক দিন সে বায়স্কোপে গেল। ফিরবার পথে তাকে টফি, চকোলেট্, কেক্ প্রভৃতি কিনে' দিলে।

শৈলেনের মা এ সব দেখে বল্‌লেন—"এ কি বাবা! এ সবের তো দরকার ছিল না। অত জিনিসে ওর কি হবে।"

মাধব বল্লে, "আপনি কিছু বলতে পাবেন না মা। শৈলেন যদি সুধাকে এসব কিনে' দিতে পারে, তাহলে' আমারও কিনে দেওয়ার অধিকার আছে বলে' মনে করি। তবে, নিজের ছেলে আর পরের ছেলে বলে' যদি আপনার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে, তা'হলে' সেটা অন্য কথা।"

শৈলেনের মা বল্লেন "এ কি কথা বাবা! আমি কি তাই বল্‌ছি? তুমিও দেখ্‌ছি, শৈলেনের মত ক্ষ্যাপা ছেলে।"

আরও কয়েকবার যাওয়া-আসার ফলে দার্জ্জিলিংএর একটী ছেলের সঙ্গে মাধবের সৌহার্দ্দ হয়েছিল। সেদিন বিকালবেলা শৈলেনদের বাসায় সে আর শৈলেন গরম লুচি আর চায়ের সদ্ব্যবহার করছে, এমন সময় সেই ছেলেটী ঘরে ঢুকতেই শৈলেন বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে—"হেল্লো, বিনয়। কবে এলে।" বিনয় কিন্তু মাধবকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। শৈলেন তাড়াতাড়ি বল্লে—"উনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র—" বিনয় কিন্তু তার আগেই বল্লে—"আরে এ কি ব্যাপার! তুমিই বা কবে এলে মাধব? আর, এখানে?" মাধব বল্‌লে—"আমি এসে তোমার খোঁজ করেছিলুম। তুমি দেশে গিয়েছিলে বুঝি? তার পর, ফিরলে কবে?"

বিনয় বল্‌লে—"কাল ফিরেছি। পুজোর ছুটীর ক'দিন আগেই দেশে চলে যাই। শৈলেন, তোমরা সব ভাল ত? বাসায় ফিরেই কাল তোমার চিঠি পা'ই—মাসীমা কই?"

শৈলেন ডেকে বল্লে—"মা, কে এসেছে—দেখ্‌বে এস।"

বিনয় বল্লে—"তোমাদের কি করে' আলাপ হল?"

শৈলেনই জবাব দিলে—"সে এক ব্যাপার। পরে শুনো।"

শৈলেনের মা আসতেই বিনয় ছুটে গিয়ে পায়ের ধূলো নিলে। তিনি বল্লেন—"বিনু, কবে এলে বাবা? কলকাতায় তো আসার আগে দেখাই পাই নি। দেশে গিয়েছিলে বুঝি?"

শৈলেন বল্‌লে—"মা, এইবার তিনটী ছেলে জুটলো—

ব্রহ্মস্পর্শ। বিনয়ের সঙ্গে মাধববাবুর আগে থেকেই আলাপ ছিল। মাধববাবু, বিনয় Scottishএ আমার class friend.

চা-পর্ব্ব হয়ে গেল। বিনয় বল্লে—"মাধব, একখানা গান গাও ভাই।"

শৈলেন একরকম লাফিয়ে উঠ্‌লো—"তাই না কি, এ তো জানতুম না! এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু মাধববাবু। এতদিন মিথ্যে"

বাধা দিয়ে মাধব বল্লে—"কই, এতদিন সত্যি মিথ্যে কিছুই বলিনি' তো। গান আমি জানি নে—ভাল জানি নে।"

বিনয় বল্লে—"ভণিতা রেখে দাও—আমরা অ-ভালই শুনব।"

কিছুক্ষণ এইভাবে বিনয়-প্রকাশ ও কথা-কাটাকাটির পর মাধবকে ৪।৫খানা গান গাইতে হল। সুধা কাছে এসে বল্লে—"ষোড়শী দা,—আপনি বেশ সুন্দর গান।"

মাধব বল্লে -"তাহ'লে একটা মেডেল দিয়ে দাও। কেমন?"

সুধা বল্লে—"আমি মেডেল কোথায় পাব? দিদির ছুটো মেডেল আছে। দিদি খুব ভাল গান গায় কি না!"

মাধব বল্লে—"আমরা তো আর সে গান শুনতে পাব না।"

বিনয় এইবার বল্লে—"হাসি কই, মাসীমা? অনেক দিন ওর গান শুনি নি।"

মাসীমা বল্লেন—"সে বুঝি ও-ঘরে। ও কি আর গাইবে? ওর যা লজ্জা!"

বিনয় বল্লে, "লজ্জা আর কিসের। যে গান জানে, তার উচিত গান-না-জানাদের শুনিয়ে দেওয়া—কি বল শৈলেন?"

শৈলেন বল্লে—"ওর দোষ ওকে গাইতে বল্লে গায় না।"

বিনয় গিয়ে হাসিকে পাকড়াও করে নিয়ে এল। মাধব দেখলে, মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে' কোনদিকে না চেয়ে হাসি ধীরে ধীরে এসে শৈলেনের পাশে বস্‌ল। বিনয় বল্লে—"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ'টা গাও।"

কল্‌কাতায় অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে ও সঙ্গীত-সম্মিলনীতে ভাল গান শোনবার সুযোগ-সৌভাগ্য মাধবের হয়েছিল। কিন্তু তাকেও স্বীকার করতে হল' এমনটী বুঝি সে শোনে নি। প্রাণের দরদ দিয়ে গানকে মূর্ত্ত করবার এ যেন হাসির একটা নিজস্ব ক্ষমতা। গান শেষ হতেই, প্রশংসমান দৃষ্টিতে হাসির দিকে চেয়ে "বেশ" বলতেই হাসির সঙ্গে মাধবের চোখাচোখি হয়ে' গেল। হাসি উঠে গেল।

তিন বন্ধুতে পথে বেরুলো!

কয়েকদিন পর স্যানিটোরিয়ামে মাধব টেনিস্ খেলছে—এমন সময় বিনয় এল। খেলার পর দু'জনে কামরায় গিয়ে' বসলো। তখন একটু বৃষ্টি নেমেছে। অনেক কথার পর বিনয় বল্লে…"শৈলেনদের familyকে তোমার…কেমন লাগে?"

ভাবের আতিশয্যে মাধব বল্লে, "খুব চমৎকার। এমন সুন্দর যে আমি অনেক সময় অবাক্ হয়ে যাই।"

বিনয় বল্লে, "হ্যাঁ হে, হাসির গান তোমার কেমন লাগে? চমৎকার গায় কিন্তু ও। তুমি এর আগে হাসিকে দেখনি'?"

মাধব হেসে জবাব দিলে, "এক রকম না দেখেছি বল্লেই চলে। তবে তারা সকলে আমায় প্রাণ ভরে' দেখেছিলেন একদিনবার্চ্চ হিলের পথে। কারণ সেদিন কিছুক্ষণের জন্য আমি একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে' পড়েছিলুম।"

বিনয়ও হেসে বল্লে—"ও সেই accidentএর কথা। তা, হাসিকে তোমার কেমন লাগে?"

মাধব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে' পড়্‌ল। বল্লে—"তার মানে?"

বিনয় তাড়াতাড়ি উত্তর কর্‌লে—"বলছি কি যে, হাসি খুব simple আর charming।" মাধব জোর করে' মাথা নেড়ে' বল্লে—"ওরা সবাই তাই।"

বিনয় বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর মাধব অনেকক্ষণ কি ভাবলে—

আজকাল প্রায় রোজই বৈকালিক চা পানটা শৈলেনদের বাসায়ই হয়। ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল হাসিই নিজের হাতে চা তৈরী করে' দেয়। মাঝে মাঝে হাসির গানও হয়। মাধবকেও অনুরোধে পড়ে গাইতে হয়। কিন্তু একটা বিষয় মাধব লক্ষ্য কর্‌লে যে

হাসি যেন স্বভাবতঃই ভয়ানক রকম গম্ভীর। বাঙ্গালীর ঘরে হাসি অরক্ষণীয়া হ'লেও, এতটা গাম্ভীর্য্য ও শান্তভাব যেন তার শোভা পায় না। একদিন চা খাওয়ার পর মাধব দেখলে যে তার chesterfieldটা নেই। খোঁজ পড়্লো। সুধা এসে বললে, "আমি ওটাকে লুকিয়ে' রেখেছি। আপনি যদি গান না গেয়ে চলে' যান তাই।" গান গাইতে হল। কিন্তু সে দিন রাস্তায় চল্‌তে কোট সার্টের সমস্ত পকেট খুঁজেও মাধব তার একখানা সাদা ময়লা রুমাল পাচ্ছিল না।

তিন চারদিন পরে। রবিবার বিকালে ব্রাহ্ম-সমাজে কি একটা মিটিং থেকে বের হয়ে' মাধব ও শৈলেন অক্ল্যাণ্ড রোডের পথ ধরলে। আঁকা-বাঁকা নির্জ্জন পথটা। একটা মোড় ঘুরতেই তারা দেখ্‌লে—দুটী তরুণ-তরুণী হাত-ধরা-ধরি করে'—এগিয়ে আস্‌ছে। এদের দুজনকে দেখে, যুবকটী মেয়েটীর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সরে' দাঁড়াল। মাধব ও শৈলেন এক পাশ দিয়ে চলে গেল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মাধব বল্‌লে, "আচ্ছা শৈলেন বাবু, আপনার কি মনে হয়। দার্জ্জিলিংএ এই সব দম্পতি আনন্দ পাবার আশায় এসে থাকেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, দুজনে ঠিক সমান আনন্দ পাচ্ছে না, বা দুজনকে দিতে পারছে না। তা ছাড়া—"

বাধা দিয়ে শৈলেন বল্লে—"মাপ করুন। আমি মনস্তত্ত্ববিদ্ নই। বিশেষ, ঠিক এ রকম ভাবে এক তরুণীকে পাশে নিয়ে' কখন পথ চলিনি। কাজেই ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। তবে আমারও মনে হয় যে, এমনি ভাবে আনন্দ সৃষ্টি করায় সার্থকতা আছে। আর আপনার ধারণা অভ্রান্ত নাও হতে পারে। আপনি বিবাহিত নন্। যদিও আপনার মত ভাবুক লোকের পাশে একটী সজীব 'কবিতা' না থাকলে শোভা পায় না। কি বলেন?"

বিদ্যুতের মত মাধবের মনের প্রান্তে কয়েকদিন আগের একটা কথা প্রকাশ পেলে। এক সঙ্গে অনেক সংশয়-সন্দেহ তাকে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌লে। বিশ্বের দরবারে মানুষ অনেক সময় নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে আনন্দ সঞ্চয় করতে চায়; কিন্তু এতে যে কতখানি বিড়ম্বনা, সেটা সে ভাববার প্রয়োজন মনে করে না। ভাব-রাজ্যের সঙ্গে যাদের কারবার, তাদের অনেকেই বাস্তবকে যে কেবল এড়িয়ে চলে তা নয়, সেটাকে মেনে চলতেও চায় না।

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে', শেষ কথাগুলোকে যেন সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে এই ভাব দেখিয়ে মাধব বল্‌লে—"বিয়ে হয়নি সত্যি। কিন্তু আমি এক রকম Betrothed। আর যিনি আপনার মতে আমার সজীব কবিতা হবেন, তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ দু'এক পা এ ভাবে পথ চলবার সুযোগ আমার ঘটেছে।" এই বলে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শৈলেনের মুখের দিকে চাইলে। এ যেন সত্য মিথ্যা বিচার করবার একটা experiment.—নিজের বিচার-শক্তির একটা পরিচয়।

কথাটা শুনেই শৈলেন কি রকম হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে' সে বল্‌লে—"কিন্তু বিনয় বলেছিল" এই বলেই সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে, pleasant surprise মাধববাবু! এ কথা তো আগে আমাদের বলেন নি। শুভ কাজটা কবে হচ্ছে?" মাধব এতটা আশা করেনি। একটু শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দিলে, "শীগগীরই হবে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লে—"অনেকদূর আসা গেছে—চলুন ফেরা যাক্।" আর যেন কথা বলবার তার মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সন্দেহটা সত্যে পরিণত হয়েছে দেখে' কি ভেবে মাধব দু'দিন শৈলেনদের বাসায় গেল না। একদিন দুপুর বেলা শৈলেন এসে ধরেছিল। উত্তরে মাধব অপরাধীর মত বলেছিল,—"আজকে এখুনি এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। কাল সকালে ঠিক গিয়ে হাজির হব।" কিন্তু সে যেতে পারলে না। কারণ—প্রথমটা সঙ্কোচ; দ্বিতীয়টা অপরাধগ্রস্ত মনের দুর্ব্বলতা। আরও দু'দিন গেল। শৈলেনও আর এল না। কয়েকদিন পরে শৈলেন একদিন সকালবেলা এসেই বল্লে—"মাধববাবু, আমরা পরশু চলে' যাচ্ছি। তাই মা আপনাকে বিশেষ করে' দেখা করতে বলেছেন। কতকগুলো জিনিস কিনতে হবে—সেই জন্যে বাজারে যেতে হচ্ছে। আমি চললুম—আপনি সময় করে' যাবেন কিন্তু।" শৈলেন চলে গেল; কিন্তু মাধবকে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। পূজার ছুটী শেষ হয়ে এল প্রায়। শৈলেনরা যে কলকাতায় ফিরবে, এটা তার জানা ছিল। কিন্তু এ ভাবে হঠাৎ চলে' যাওয়ার সঙ্গত-অসঙ্গত অনেক কারণ ভাবতে গিয়ে সে এতটা তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, যখন টের পেল, তখন বিকাল হ'য়ে এসেছে।

পরদিন দুপুর-বেলা মনের অস্বস্তি ও অস্থিরতা নিয়ে সে শৈলেনদের বাসায় গেল। সুধা ছুটে এসে বল্‌লে—

"ষোড়শীদা, আপনি এতদিন আসেননি যে বড়। আমরা কাল চলে' যাচ্ছি, জানেন্?" উত্তর দেবার কিছুই ছিল না। সুধা তাকে টেনে নিয়ে গেল—তার মায়ের কাছে। যেতেই মাধব দেখ্লে, হাসি উঠে আস্তে আস্তে চলে গেল। শৈলেনের মা বিষণ্ণস্বরে বললেন,—"ক'দিন আসনি যে বাবা। শুনলুম তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে। আমরা তো কাল ফিরছি। তুমি কিছুদিন আছ তো?"

হায়, মানুষের আত্ম-প্রবঞ্চনা! এই আনন্দ-পরিবারের কাছে নিজের অপরাধকে সে যে কি ভাবে কত বড় করে' তুলেছে, সেটা ভাববারও তার সাহস হচ্ছিল না। স্বাভাবিক স্বরে সে জবাব দিলে,—"আমিও বোধ হয় ও-হপ্তায় যাব। আপনারা এত শীগগীর চলে যাবেন, জানতুম না।" মা উত্তর দিলেন—"সামনের হপ্তায় তো যেতেই হত। তা ছাড়া শৈলেন আর হাসি বলছে যে তাদের আর ভাল লাগছে না। হাসির আবার বুকে একটু ব্যথা হয়েছে। হঠাৎ নিউমে নিয়া না হয়ে পড়ে। আজ রাত্রে তুমি এখানে খাবে বাবা। আর কাল সকালে কষ্ট করে' ষ্টেশনে যেতে হবে।"

মাধবের বুকে কে হাতুড়ী মার্লে। একটু চুপ করে' থেকে বললে—"কষ্টের কথা কেন তুলছেন মা। আপনারা চলে যাচ্ছেন—এ ক'দিন খুব খারাপ লাগবে।" অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলো—"আপনারা এখন জিনিস-পত্র গুছাতে ব্যস্ত—এখন যাই।" মা বল্লেন—"রাত্রে আসবে, মনে থাকে যেন।"

সেদিন মাধব আর কোথাও গেল না। কিছু ভাল লাগছিল না তার। বিনয়ও ছিল না। কয়েকদিন হল সে জলপাইগুড়ীতে তার মামা-বাড়ী গিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা একাই বায়স্কোপে গেল; কিন্তু ইণ্টারভেলের সময় বেরিয়ে এসে শৈলেনদের বাসায় চলে এল। সে রাত্রে কোন কিছু কথা হ'ল না। হাসিকে তো সে দেখতেই পেলে না। মাধবও তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে।

পরদিন সকালে বিদায়-বেলা আসন্ন হ'য়ে এল। বাসা থেকে অবনত মস্তকে বের হয়ে আর আর সকলের সঙ্গে হাসি নিঃশব্দে ট্রেণের কামরায় এসে বসেছিল। কেবল সুধা মাধবের হাত ধরে' আপন মনে কত কি বকে যাচ্ছিল। হাসি গায়ে র‍্যাপার জড়িয়ে ওদিকে মুখ করে' বসেছিল। সকলের সঙ্গে এ যেন কেমন খাপছাড়া রকমের বিদায়-পর্ব্ব। কোথায় যেন কি বেসুরো বাজছে। মাধব অস্থির হয়ে উঠ্ল। ঘণ্টা বাজল। শৈলেনের মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে ভরা গলায় মাধব বল্লে,—"ছেলেকে ভুলে যাবেন না মা, দোষ করে' থাকি তো ক্ষমা পাই যেন।" অবরুদ্ধ-কণ্ঠে মা বল্লেন—"দোষ আবার কি বাবা। আশীর্ব্বাদ করছি চিরজীবী হও।" সুধা নেমে এসে প্রণাম কর্‌লে। মাধব দু'হাতে ধরে তাকে গাড়ীতে তুলে দিলে। গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠলো। এইবার সে হাসির দিকে তাকাতেই দেখ্লে—সে কখন থেকে অপলক প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখোচোখি হল; কিন্তু আজ হাসি মুখ ফেরালে না। মাধব দেখলে—বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় চোখ দুটীতে বেদনা-অশ্রু যেন জমাট হয়ে আছে। তার সব গোলমাল হয়ে গেল। চীৎকার করে' কি বলতে গেল, কিন্তু কে যেন গলা টিপে ধরলে। পাগলের মত মুখ তুলে' তাকাতেই দেখে, গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে; আর সুধা রুমাল নেড়ে 'ষোড়শীদা' বলে ডাকছে।

একটা কথা ভেবে মাধব বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল যে শৈলেনরা তাদের বাসার ঠিকানা দিয়ে গেল না। কেন? এটা কি ইচ্ছাকৃত? সেও এটা জেনে রাখবার অবসর পায়নি। কারণ এতদিন এটার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু বিধাতা তাকে আরও অধিকতর বিস্ময় এনে দিলে যখন সে কলকাতায় ফিরবার দু'দিন আগে অপরিচিত হাতের লেখা একখানা পত্র পেলে। খুলে দেখে—লেখা রয়েছে,—

"আমার এ পত্র পেয়ে আপনি কি ভাববেন জানি না; হয় তো বা আমায় বেহায়া মনে করবেন। কিন্তু এটা আমার নিজের একটা কথা—কৈফিয়ৎ নয়—যদিও এটা আপনি চান্ নি' বা প্রত্যাশা করেন নি'। কিন্তু আমার এ প্রয়োজনের আজই প্রথম ও আজই শেষ। অপরাধ নেবেন না।

"বার্চ্চ হিলে আপনার প্রতি যে স্বাভাবিক সহানুভূতি ও করুণা মনে জেগেছিল, আপনার সঙ্গে ক'দিনের আলাপ-পরিচয়ে সেটা নিতান্ত আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছিল। তার পর যখন একদিন শুনলুম যে আমাকে আপনার হাতে দেবার জন্য মা আর দাদা চেষ্টিত, সেদিন আমার এই কুমারী হৃদয়ে যে আশা-আনন্দের রক্ত-রেখা পড়েছিল, সেটাকেই নারী-জীবনের পরম বস্তু বলে মনে করে' পলে পলে তাকে বাড়িয়ে তুলেছিলুম। কিন্তু দাদা একদিন এসে মাকে যখন

বললে যে আপনি নাকি আর একখানে বিয়ের অঙ্গীকারে আবদ্ধ, সেদিন মা কি ব্যথাটাই না পেয়েছিলেন। আপনি বলবেন যে আপনার দোষ কি? কিন্তু দোষ কি মোটেই নেই?

"আমি কিন্তু আপনার কথাটা বিশ্বাস করিনি। আমি বুঝেছি এর যথার্থ কারণ কি। বিদেশে এ ভাবে আমায় গ্রহণ করায় আপনার অগৌরব হবে। আপনার ভাবী পত্নী এতটা সহজ-লভ্য হবে,—এটা আপনি চান্ নি'। তাই বিয়ের প্রস্তাবের আগেই আপনি একটা মিথ্যা কথায় আমাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করেছিলেন, এবং আমাদের বাসায় আসাও বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল আপনার? আমি এটা বুঝেছিলুম। তাই শুধু দাদাকে বলেছিলুম যে এর পর যদি তিনি কি বিনয়দা আপনার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তা' হলে আমি আত্মহত্যা করবো। এ ভাবে আপনার কাছে যাওয়ায় আমারও যে সব গৌরব ও স্পর্দ্ধা ক্ষুণ্ণ হয়ে' যেত। তাই তাড়াতাড়ি দার্জ্জিলিং ছেড়ে চলে' এসেছি। আর সেই জন্যই আপনাকে বাড়ীর ঠিকানা দেওয়ার বিপক্ষে আমি ছিলুম। কিন্তু আর না—

"আমার বুকের ব্যথা বেড়েছে। খুব কাসিও হয়েছে। হয় তো বা যক্ষ্মার লক্ষণ। কিন্তু আপনাকে ভালবেসে, নিজেকে আপনার কাছে জোর করে' গছিয়ে' দেওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাটাকে প্রশ্রয় দিয়ে', সে ভালবাসার অবমাননা করি' নি'। কিন্তু এখন আশা ও ভয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার সমস্ত চিন্তা এখন একটা কথাকে কেন্দ্র করে' আছে। সেটা এই যে, আমি যা করেছি, এ ছাড়া কি অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু আজ সে কথা নয়—আজ শুধু—বিদায়! হাসি"

মাধব স্তব্ধ হ'য়ে' রইল। তার মনে হল সে এ জগতে নেই। পরদিনই সে যখন দার্জ্জিলিং ত্যাগ করলে, তখন তার গায়ে জ্বর ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—।

সুদীর্ঘ দেড় বছর কেটে গেছে। শৈলেনদের খোঁজ সে ক'রেছিল; কিন্তু পায় নি। কিন্তু খোঁজ পেলে বাসায় যেত কি না সেটা তখন ঠিক করে নি'। বিনয়ের সঙ্গে একদিন দেখা হওয়ায় তার কাছে জেনেছিল যে, শৈলেনরা কিছুদিন থেকে কলকাতায় নেই। কোথায় গেছে সেও জানে না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা নিউ মার্কেটের একটা দোকানে একজনকে দেখে সে আনন্দ-বিস্ময়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না সে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে—"মাধববাবু আপনি! অনেকদিন পর দেখা। ভাল আছেন তো?" মাধবের কথা বলবার শক্তি তখন লোপ পেয়েছে; বললে—"হ্যাঁ, ভাল, আপনি ভাল তো? মা—সুধা—"

মুখ নীচু করে' শৈলেন বল্লে "এই আছি এক রকম। আমরা পুরী গিয়েছিলুম। আজ দু'মাস হ'ল হাসি আমাদের ছেড়ে চলে' গেছে। হ্যাঁ—আপনার addressটা আমায় দিন তো। একটু প্রয়োজন আছে।"

মাধবের মনে হ'ল তার বুকের স্পন্দন সহসা থেমে গেছে—দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। সে দাঁড়াতে পারছিল না।

শৈলেন তার ঠিকানা নিয়ে বললে—"আমি একটু ব্যস্ত আছি। ঠিকানা রইলো আমার কাছে। পারি তো দেখা করবো।"

কিন্তু সে এল না। এল ডাকে একখানা ভারী খাম। খুলতেই চোখে পড়লো একখানা সাদা রুমালে নানা রঙের রেশমী সুতো দিয়ে আঁকা ফুল-কুঁড়ি, লতা পাতা, আর চার ধারে মাধবের নাম।

সহসা স্মৃতি-মন্দির-দুয়ার খুলে গেল। তার মনে পড়লো, বহুদিন আগে দার্জ্জিলিংএ শৈলেনদের বাসায় সে এই রুমালখানা হারিয়েছিল। সেখানার মূল্য তার কাছে সামান্য ছিল বলে' সেটার খোঁজ সে আর করেনি। কিন্তু আর একজনের কাছে সেটার মূল্য এত বেশী হয়ে পড়েছিল যে, সে তার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত রঙীণ আশা-আনন্দ এরই বুকে বিচিত্র বর্ণে এঁকে রেখেছে। মরণে সে নিয়ে গেছে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর একটা দুর্নিবার অভিমান। আর মরণের পর তার জীবনের হাসি-কান্নায় এই একটী মাত্র নিদর্শন মাধবের হৃদয়-প্রান্তে নীরবে ফেলে রেখে গেছে।

সমস্ত অন্তর মথিত করে' বেদনা-অশ্রু মাধবের দু'চোখ বেয়ে ঝরে' পড়তে লাগল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

নারীর শিক্ষা

শ্রীহরিহর শেঠ

আমাদের দেশে নারীর শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন এমন লোকের সংখ্যা এখন আর অধিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ সহর অঞ্চলে আর অধিক নাই। সেখানে অনেকেই এক্ষণে মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংসারিক জীবনে সর্ব্ববিধ উন্নতিলাভের মূলে নারীর শিক্ষা প্রয়োজন এ কথা এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন এবং অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। মেয়েদের শিক্ষা আমাদের অনর্থের আকর, এখনও যাঁহারা মনে মনে এ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুদূর পল্লীবাসী।

স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা যে দেশ উপলব্ধি করিয়াছে এ কথা কতকটা সঙ্কোচশূন্য ভাবে বলা যায়। এখন মতভেদ, শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি বা ব্যবস্থা লইয়া। এক শ্রেণীর মত, মেয়েদের শিক্ষা সংসারের কাজ চলা মত হইলেই হইল। অন্য শ্রেণীর মত, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ হওয়াই আবশ্যক। কাহারও মত, নারীদের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পুরুষদের শিক্ষার অনুরূপ হওয়াই উচিত। আবার এক সম্প্রদায় বলেন, আমাদের সমাজ ও সংসারের উপযোগী যে সব শিক্ষার প্রয়োজন, মেয়েদের তাহাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা তাহাদের সাংসারিক জীবনে বিশেষ কাজে না লাগে, এমন সব বিষয় শিক্ষণীয় করা আবশ্যক নাই। এই উপযোগী শিক্ষা যে কি সে সম্বন্ধে ঠিক একটা কিছু কথা তাঁহাদের কাছে প্রায়ই পাওয়া যায় না। রমণীরা সহায়হীনা হইলে, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে গৃহশিল্প সাহায্যে যাহাতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, এমন শিক্ষার আবশ্যকতাও এক্ষণে অনেকেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সামান্য বিভিন্নাকারের অন্য মতও দেখা যায়।

শিক্ষাহীন মানুষ অনেক ত্রুটী-সম্পন্ন এবং অপূর্ণ এ কথা যেমন সত্য, শিক্ষা যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তাহার ফল বহুক্ষেত্রে বিষময় হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই সত্য। সেই কারণ কি পুরুষ কি নারী, উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা ঠিক যাহা হওয়া উচিত তাহা বিজ্ঞ বুধজন কর্ত্তৃক প্রথমেই স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য করিয়া দেশ সমাজ ও নিজের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বিষয়ে যাহাতে কল্যাণ আনয়ন করিতে পারে, কি নর কি নারী সকলের পক্ষেই শিক্ষা আমাদের তেমনই হওয়া উচিত। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানালোক দীপ্ত হইয়া মনকে উন্নত ও দীপ্তিশালী করাই যদি শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রকৃত যে শিক্ষায় তাহা হয়, তাহাই বাছিয়া লওয়া দরকার। এ পর্য্যন্ত নর এবং নারীর শিক্ষায় তেমন কোন ভেদের কথা আসিতেছে না। তা বলিয়া এ কথা কোন মতেই বলা যায় না যে, যে শিক্ষা এক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমাদের ছেলেরা পাইতেছে, তাহার দ্বারাই আমাদের মেয়েদের মনুষ্যত্বগুণসম্পন্ন বা যেমন আবশ্যক তেমনই পাওয়া যাইবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া আমরা সময় সময় বিবিধ গুণ-সম্পন্ন মহামানবের উদ্ভব দেখিলেও, আজ শতাধিক বৎসরের নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা হইতে যাহা পাইয়াছি ও পাইতেছি, তাহাতে এ কথা বুকে হাত দিয়া বলা যায় না যে, এই শিক্ষাই মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃষ্ট শিক্ষা ; ইহাই আমাদের উপযোগী ; এবং ইহাই আমাদের ভাব-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার এ কথা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক।

শিক্ষা আমাদের কল্যাণের নিদান বলিয়াই এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে উহাকে কি করিয়া অর্থকরী করা যায়, সে দিকে যেমন আজকাল অধিকতর লক্ষ্য হইয়াছে, সেইমত শিক্ষার দ্বারা কি করিয়া শিক্ষিতের প্রথম গুণ সকল অর্জ্জন করা যায়, অর্থাৎ এক কথায়, বিবিধ জ্ঞান, বিদ্যা, বিনয়াদি ভূষিত প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়, সে কথা সে চিন্তা ভুলিয়া থাকিলে চলিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য সাধনার্থ পুরুষ ও নারীর শিক্ষায় এমন বিশেষ কোন পার্থক্য করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের সামাজিক বা জাতিগত বিধি-ব্যবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষার সময়ের অল্পতা, সুবিধার অভাব, তাহাদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন প্রভৃতির কথা ভাবিলে বুঝা যায়, তাহাদের শিক্ষার বিষয় এবং প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই পরিবর্ত্তন বলিতে প্রধানতঃ পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ হইতে কোন কোন বিষয় বর্জ্জন বা সংযত করা এবং অপেক্ষাকৃত সত্বর যেরূপে শিক্ষাকার্য্য অগ্রসর হইতে পারে, সেই সব প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার কথাই বলিতেছি।

উক্ত উভয় বিষয়েই সমান মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক ; বরং শেষোক্ত বিষয়টিতে অধিক। কেন না মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচনকালে ছেলেদের শিক্ষণীয় বিষয় হইতে যেমন কয়েকটি ত্যাগ করা যায়, তেমনই ছেলেদের আবশ্যক নাই এমন কতিপয়

স্বতন্ত্র বিষয় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এমন কি তাহার মধ্যে সন্তান পালন প্রভৃতি কতকগুলি সকল শিক্ষার অগ্রে আবশ্যক। সুতরাং সেই সব ধরিয়া শিখিবার বিষয় তাহাদেরও যখন কম হইতেছে না, অথচ শিক্ষার কাল যখন নিতান্ত সীমাবদ্ধ, তখন স্বল্প সময়ে যাহাতে তাহাদের আবশ্যক অথচ পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া যায়, বা যতটা দেওয়া যায় তাহা করিতে হইবে। এ জন্য শিক্ষার প্রণালীর প্রতিই অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য যে সব প্রণালী ক্রমে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই ভাল বলিয়া মনে করি।

কি শিক্ষা দেওয়া হইবে অর্থাৎ শিক্ষার বিষয় কি, এই বড় প্রশ্নটির ঠিক মত একটা মীমাংসা এখনও হয় নাই। সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে কখনও হইবে কি না জানি না। মেয়েরা কি শিখিবে তাহা ঠিক করিতে হইলে, যে দেশের মেয়ে সেইখানকার শিক্ষিত নর নারী মিলিত হইয়াই তাহা করিতে হইবে। কি করিয়া এবং কবে ইহা হইবে তাহা এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু তা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ আর আমাদের জাতীয় উন্নতির বিপরীত পথ অবলম্বন করা, আমার মনে হয় একই কথা। পুরাকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়া বহু প্রমাণ পাওয়া যাইলেও, মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন আমাদের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত রমণী সমাজে লেখাপড়া শিক্ষা লজ্জার বিষয় ছিল। ফরাসী পরিব্রাজক আবে দুবে (Abbe J A Dubois) তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী মধ্যে বলিয়া গিয়াছেন, (১) তখন কেবল বারনারী ও নর্ত্তকীরাই লিখিতে পড়িতে শিখিত। ভগবানের কৃপায় পূর্ব্বের সে সংস্কার বা অজ্ঞতা এক্ষণে তিরোহিত হইয়া জগতের সকল সভ্য জাতির ন্যায় এখন এ দেশও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছে। শুধু বুঝিতেছে নয়, কতিপয় বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ এবং নারীজাতির উন্নতিকল্পে যে জাগরণের লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে, তাহাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার যে কিছু সরল সুগম পথ আছে, তাহার সন্ধানে এখনই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের সমাজ ও সংসারের কল্যাণকর নারীজাতির শিক্ষার অনেকটা অংশ পরিজনপূর্ণ আদর্শ সংসারের ভিতর গৃহগণ্ডীর মধ্যে যেমন হইতে পারে, অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষামন্দিরের মধ্যেও তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। সেবাপরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, গৃহকার্য্য ও গৃহশৃঙ্খলা-নিপুণতা অথবা গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য গৃহই উপযুক্ত শিক্ষাক্ষেত্র এবং গৃহস্থ পরিজনবর্গই যোগ্য শিক্ষক। শুধু বিদ্যালয়ের পুস্তকগত শিক্ষায় অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থাকে। পুরুষরা বাহিরে দেখিয়া শুনিয়া, পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, তাঁহাদের বিদ্যালয়লব্ধ বিদ্যাকে জীবনের কাজে নিয়োজিত করিয়া, নিত্য সফলতা নিষ্ফলতার মধ্যে অর্জ্জিত জ্ঞানকে যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ পায়। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা নারীর পক্ষে সে সুযোগ নাই। এ জন্যও অন্তঃপুর মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া যদি হাতে কলমে সব শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহাই ভাল। কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই সম্ভবপর নহে এবং সেরূপ বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষার কেন্দ্র আদর্শ অন্তঃপুরও সুলভ নহে।

যখন দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি পঠিতব্য বিষয় সকল বা কলাবিদ্যা দ্বারা মণ্ডিত হইবার জন্য উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষালয় ভিন্ন গতি নাই আবার সমাজ ও সংসারশ্রী রক্ষার্থ অন্য বিবিধ শিক্ষার জন্য শ্রীসম্পন্ন শুদ্ধ গৃহাভ্যন্তরই প্রকৃষ্ট স্থান, তখন উভয়ের সমন্বয় ঘটাইতে পারিলে নারী-শিক্ষা-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সে মত সর্ব্বশিক্ষাক্ষেত্র অন্তঃপুর বিরল বা দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেবল নারী চরিত্রের গঠন ও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধনোদ্দেশ্যে সাংসারিক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের উপযুক্ত যুগ্মশিক্ষালয় উপযুক্ত ছাত্রীনিবাস সহ বিদ্যালয়। কিন্তু এ কাজ নানা দিক দিয়া বড়ই কঠিন। এক দিকে আমাদের সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালী সংসারের অবস্থা চিন্তা করিয়া যেমন মেয়েদের গৃহ হইতে কতিপয় বৎসর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার কোন কোন অসুবিধা দেখা যায়, অন্য দিকে এরূপ নারী পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার লোক, বিশেষতঃ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনের যোগ্যা ত্যাগশীলা শিক্ষিতা মহিলা খুবই বিরল। তদ্ভিন্ন দেশমধ্যে এসব কার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য যে অর্থ সচ্ছলতা আবশ্যক তাহারও অভাব। এ অবস্থায় এখন সুনিয়ন্ত্রিত সর্ব্ববাদিসম্মত সুনির্ব্বাচিত বিষয় ও পাঠ্য সম্বলিত নারী শিক্ষালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাই ভাল। যতদিন তেমন কোন একটা সর্ব্ববাদিসম্মত পাঠ্য বা শিক্ষণীয় নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন যে সব শিক্ষার মধ্যে বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব নাই তাহা বা যাহা ঠিক বা যথার্থ উপযোগী বলিয়া উদ্যোগী বা প্রতিষ্ঠাতৃগণের মনে হইবে তাহাই বিজ্ঞ ও বুধগনের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে।

ভাল হোক মন্দ হোক, উপযোগী হোক আর অনুপযোগী হোক, যুবকদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহা গতানুগতিক। সুতরাং সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে প্রতিষ্ঠাতাদের যে দায়িত্ব জ্ঞানের অনুভূতি না জন্মে স্বকৃত ব্যবস্থায় পরের মেয়েদের লইয়া কোন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িবার দায়িত্ব তদপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না। দুর্ব্বলতা পরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব বিবেক-বুদ্ধিসহ বিজ্ঞ জনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে নবীনের সহিত প্রবীণের যে সংঘর্ষ ঘটিবে তাহা অনিবার্য্য; এবং সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। উহা সহ্য করিবার বল হৃদয়ে ধারণ ব্যতীত উপায় নাই।

সামাজিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার কালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রমণীদের শিক্ষার জন্য কি কি বিষয় নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার, তাহা স্থির করিবার জন্য সকল শ্রেণীর বিশেষ শিক্ষিত শিক্ষিতা ও সামাজিকগণ একত্র হইয়া একটা সার্ব্বজনীন শিক্ষিতব্য ও পাঠ্যাদির নির্ণয় বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অচিরে আবশ্যক। একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়াদি যেরূপই হোক, তাহা পূর্ণ না হয় অংশতই হোক তাহাতে

---

(১) Hindu Manners Customs and Ceremonies by Abbe J. A. Dubois.

ক্ষতি তত নাই, যত ক্ষতি শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে। যে শিক্ষা নরনারীর ভূষণ, যাহাতে নারী জীবনকে মহিমান্বিত ক'রে, শিক্ষা প্রকৃত যেন সেইরূপ হয়। উহা সর্ব্বতোভাবে বিল সবর্জ্জিত হওয়াই উচিত। অহঙ্কার বা তমঃতে যে শিক্ষার পরিণতি তাহা অবাঞ্ছনীয়। শিক্ষা হইতে জাত যে মদ, ধন-মদ বা আভিজাত্য মদ অপেক্ষা তাহা অল্প অনিষ্টকর নহে।

ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষাও ঠিক আমাদের ধাতুগত নহে। যে, যে ধর্ম-বিশ্বাসীই হোক, তাহার নিজ ধর্ম্মে যাহাতে আস্থা থাকে ও যাহাতে ধর্ম্মে অধিকতর বিশ্বাসী করে এমন শিক্ষাই উপযোগী। কিন্তু শুধু ধর্ম্ম-বিষয়ক বিদ্যালয় ভিন্ন সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা কোন গোঁড়ামির স্থান না থাকে সে দিকে দেখা আবশ্যক। পূজাদির পদ্ধতি বা বারব্রত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য গৃহই উপযুক্ত স্থান। তবে শিক্ষালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার নামে কেবল কতকগুলি স্তোত্রাভ্যাস করাইতে বা শিবপূজা শিখাইতে মন দেওয়াই খুব আবশ্যক ব্যবস্থা মনে করি না। আর একটি কথা, অন্য ধর্ম্মের বিধি অবগত নহি; যদি হিন্দু ধর্ম্মের পূজাদি বিষয় শিক্ষা দিতে হয় তাহা নামে শিক্ষা দিলেই হইবে না। যথাবিহিত পবিত্রভাবে ও শুচিতার সহিত শুদ্ধান্তঃকরণার দ্বারা সে শিক্ষা দিতে না পারিলে কোমলপ্রাণা বালিকা ও কিশোরীদের সে বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা না করাই ভাল। মনে হয় শুধু ধর্ম্মের মূল নীতিগুলি ও বিবিধ ধর্ম্মের সার কথা সকল ছাত্রীদের বয়স ও বুঝিবার সামর্থ্যানুযায়ী;— যাহাতে তাহারা নিজ জীবনে লাগাইতে পারে এরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। এ বিষয় শিক্ষয়িত্রীদের ধর্ম্মভাব ও উপযুক্ত পারদর্শিতার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীরা ধর্ম্ম বিষয়ে যে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, সাধারণ বিদ্যালয়ে এমন কোন শিক্ষার স্থান যেন না থাকে।

শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে মনে হয়, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সকল গৃহ শিল্পের দ্বারা ঘরে বসিয়া নিজ চেষ্টায় অন্ন সংস্থান, এমন কি কিছু অর্থ সংস্থান হইতে পারে, এমন কোন কোন সহজ শিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য কেবলমাত্র চারু বা সৌখীন শিল্পই উপযোগী নয়, যে সব সামগ্রী নিত্য ব্যবহার্য্য এবং যাহাদের বিক্রয় অধিক, এমন সব দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়া শিক্ষা না দিলে হইবে না। যে সকল মেয়েদের এদিকে আগ্রহ অধিক এবং পারদর্শিতা আছে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক বা চিত্রশিল্পাদির শিক্ষা দিতে পারিলে উপকারেরই সম্ভাবনা। সীবন ও কাট ছাঁট শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রকৃত শিল্পীর দ্বারা হওয়াই ভাল। তুলির কাজ ও মাটির কাজ (clay modelling) ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ভাল।

ছাত্রী নিবাস সম্বলিত শিক্ষালয় ভিন্ন সাধারণ বিদ্যালয়ে রন্ধন শিক্ষার অনেক অসুবিধা থাকিলেও, যাহাদের বাড়ীতে সে শিক্ষার সুবিধা নাই, তাহাদের ভাল করিয়াই এ শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং ইহার সহিত পরিবেশন, পরিচ্ছন্নতা, পরিমাণ নিরূপণ ও আনুষঙ্গিক মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিতে হইবে। সাধারণ পাঠ্য বিষয় মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্য, ব্যবহারিক গণিত, বিজ্ঞান, ভারত ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ভূগোলে বিশেষ জ্ঞান এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসে মোটামুটি জ্ঞান যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইংরাজি ও সংস্কৃতের অন্ততঃ কতকটা কাজ চলার মত শিক্ষাদান আবশ্যক। আর যতটা সম্ভব রোগী পরিচর্য্যা, সন্তান পালন, প্রাথমিক প্রতিবিধান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষা দিতে হইবে। এই সব বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

এই গার্হস্থ্যনীতি বলিতে অনেকটা ব্যাপার বুঝায়। শুধু গৃহ-ধর্ম্মের কতিপয় নীতি পড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই চলিবে না। এই সকল নীতিবোধ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা যাহাতে জন্মে তাহা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এ নীতিশিক্ষার কোন সার্থকতা নাই। সংসারে সুখ শান্তি শৃঙ্খলা আনিতে না পারিলে সকল শিক্ষাই ব্যর্থ। শান্তিহীন সংসারের সমষ্টি লইয়া যে সমাজের সৃষ্টি, সে সমাজের কখন শ্রী থাকিতে পারে না। যে জাতির সমাজ শ্রীহীন সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। সুতরাং সাংসারিক মানুষ—কি স্ত্রী কি পুরুষ—তাহাদের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যই শান্তি, শ্রী ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যে শিক্ষায় তাহার সহায়তা না হয়, গৃহস্থ নারীর পক্ষে সে শিক্ষার কোন মূল্য নাই। শিক্ষিতের মধ্যে এ সব গুণ ও জ্ঞানের বিকাশ না দেখিতে পাইলে সাধারণ শ্রেণীর কাছে স্ত্রীশিক্ষা কোন দিনই আদর লাভ করিতে পারিবে না। বঙ্গ-অন্তঃপুর মধ্যে কতই অহেতুক অশান্তি না নিত্য দেখা যায়। শিক্ষা-হীনতা বা অশিক্ষাই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? শিক্ষিতা নাম-ধেয়া শিক্ষিতাভিমানিনী রমণীগণের মধ্যেও উক্ত দোষ কোন কোন ক্ষেত্রে যে না দেখা যায় তাহা নহে। সেও অপূর্ণ বা বিকৃত শিক্ষার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সাংসারিক বিবাদ, বিসংবাদ, খুঁটিনাটি প্রভৃতি যাহা অনেক সংসারে নিত্য দেখা যায়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন অতি তুচ্ছ বিষয় বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত। সুখশান্তিই মানুষের কাম্য। ইহা লাভ করিতে হইলে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা একান্ত দরকার। এ সকল নীতি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পালন করা কর্ত্তব্য। গৃহিণীগণ যাহাতে অভাবকে ডাকিয়া আনিতে না শিখিয়া বরং যতটা পারা যায় অভাবকে হাসিমুখে ভুলিয়া আয়-মত ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে শিক্ষা করে তাহার চেষ্টা নারী-শিক্ষা-মন্দির হইতেই করিতে হইবে।

যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষায় সাধারণ ভাবে তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা না যাইলেও উহা ভাল বলিয়াই মনে করি। ছাত্রীর শিক্ষার পারদর্শিতা ও অভিভাবকদের অভিমত বিবেচনা করিয়া ইহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও ব্যায়াম একটি অতি আবশ্যক বিষয়। কিন্তু রমণীদের উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যে বেশ সুবিধা ও হিতজনক মনে হয় না। ইহার জন্য উপযুক্ত সময় করিয়া লইতে না পারিলে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত, বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যে যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা সম্ভব, তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।

উক্ত সকল বিষয় ভিন্ন উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে মেয়েদের সময় সময় শিক্ষা-মন্দিরের বাহিরে অন্যত্র লইয়া যাইয়া, যাহাতে দেখিয়া শুনিয়া বিবিধ বিষয় তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। যাহাতে মহিলাবর্গ জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নাগরিকের কর্ত্তব্য ও দেশের কথা চিন্তা করিতে শিখে, শিক্ষাদানকালে সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

শিষ্টাচার ও ভব্যতা শিক্ষা দেওয়া একটি অবশ্য কর্ত্তব্য। আজকালকার শিক্ষিতাদের মধ্যে অনেকের যে শিষ্টাচারের আধিক্য দেখা যায় তাহা অবশ্য শোভনীয় নহে। কামিনীর ভূষণ কমনীয়তা। যাহাতে তাহা ম্লান না হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, চরিত্রে পৌরুষভাব না জন্মাইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিবাহের পর সাধারণ গৃহস্থের মেয়েদের আর শিক্ষালয়ে যাওয়ার প্রায় সুবিধা হয় না। এই কারণে ছয় সাত বৎসরের মধ্যে যতটুকু এবং যে যে বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর মনে হয়, তাহাই এখানে লিখিত হইল। যাহাদের অধিক দিন শিক্ষা পাইবার সুবিধা আছে, তাহারা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারূপ মাপ কাঠিতে মাপিয়া উত্তীর্ণা করিবার জন্য ব্যস্ততা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অথবা ছেলেদের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হওয়াই নারীদের শিক্ষার চরমোদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় নহে। নারীদের জন্য যেমন তাঁহাদের আবশ্যকোপযোগী পাঠ্য নির্ব্বাচন দরকার, তেমনই অচিরে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হওয়া একান্ত উচিত। আমার মনে হয় দেশের মনীষিবৃন্দ উদ্যোগী হইলে ইহা হওয়া আদৌ কঠিন হইবে না।

তৎপরে দেশের অবস্থানুযায়ী কি উপায়ে শিক্ষা অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-সাধ্য করা যাইতে পারে ইহা একটি অতি আবশ্যক সমস্যা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গৃহশিক্ষা ভাল ; কিন্তু সে শিক্ষার বর্ত্তমানে সুযোগের অভাব। সুতরাং শিক্ষালয়ের উৎকর্ষ সাধন ও সুবিধা বিষয়েই মনোযোগী হইতে হইবে। এই শিক্ষালয় সাম্প্রদায়িক ভাবের না হইয়া সাধারণ হওয়াই আবশ্যক। এই সব নারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা যথেষ্ট, ব্যয়ও অধিক ; অথচ দেশের অবস্থার দিকে দেখিলে উহা সর্ব্বাংশে সুলভ হওয়াই দরকার। ছেলেদের বিদ্যালয় স্থাপন তুলনায় অনেক সহজ। মেয়েদের শিক্ষালয় মধ্যে পুরুষ শিক্ষকের এমন কি সম্ভব হইলে পুরুষ তত্ত্বাবধায়কের স্থান না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা।

আজকাল হেথায় সেথায় অনেক শিক্ষিতা রমণীকে শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে দেখা যাইলেও, যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া বড়ই দুরূহ। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের চেষ্টার সহিত এই অভাবটাই সর্ব্বোপরি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন স্থান হইতে আনীত কোন দুষ্প্রাপ্য বা আয়াসলব্ধ ফলের গাছ ফলিলে, তাহার প্রথমবার ফল ভক্ষণের লোভ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যেমন বীজ রাখা হয়, রমণীর শিক্ষা বিষয়েও তেমনই প্রথম যত দিন না শিক্ষা দিবার মত রমণীর সংখ্যা যথেষ্ট হয়, ততদিন নারীর শিক্ষার অন্য সুযোগ গ্রহণের কথা ভুলিয়া কেবল ভাল শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার দিকে লক্ষ্য রাখাই বিধেয়। সাধারণতঃ যে সকল রমণীকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখা যায়, তাহাদের সকলের হস্তে নিঃসঙ্কোচে বালিকাদের সমর্পণ করা অনেক সময় সুবিধাজনক হয় না। অল্প সংখ্যক ভাল শিক্ষয়িত্রী যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের জন্য পুরুষ শিক্ষকের তুলনায় ব্যয় অনেক অধিক করা দরকার হয়। এ ব্যয় স্বীকার করিয়াও স্ত্রীশিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করিতে হবে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় একটি আবশ্যক ব্যয়ের অন্যতম পদ, অভিভাবকদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষের স্বতন্ত্র স্বার্থ ধরিলেও মনে হয় বুঝি শিক্ষা প্রাপ্তিতে নারীদের স্বার্থ যত পুরুষদের তদপেক্ষা কম নহে। কারণ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া তাহাদের জীবন উন্নত হয় সত্য, কিন্তু, পুরুষের একটা উপরন্তু লাভ—নারীকে শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানমণ্ডিতা করিতে পারিলে তাঁহাদের নারী সম্পর্কে যে দায়িত্ব তাহার অনেকটা লাঘব হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের সাহায্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভারবহ না হইয়া অনেক সহজ হয়।

ব্যয়ের কথায় বলিতে হয়, স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক আবরু বা পরদা তাহাদের শিক্ষার পথে একটি অন্তরায়। শিক্ষালয়ে যাইবার জন্য বড় বড় মেয়েদের যান ভিন্ন উপায় নাই। এই যান ব্যবহারের ব্যয়ই বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার অন্য ব্যয়ের সমান বা কখন কখন অধিক। বিদ্যালয় অধিক দূর না হইলে, মেয়েরা যাহাতে পদব্রজে যাইয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে, সে দিকে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার মনে করি। অত্যধিক আবরুর জন্য আমাদের নারীদের স্বাস্থ্যহানিও হইতেছে। এ বিষয় সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই পর্দা—পল্লী অপেক্ষা সহর অঞ্চলেই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। পল্লীগ্রামে প্রতিবেশীর বাড়ী বা নিকটস্থ স্থান সমূহে অথবা পূজাপার্ব্বণ বা মেলাদি দর্শনার্থ চলিয়া যাওয়া বা বিদেশে যাইয়া অবাধে বেড়াইয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে কোন আপত্তি হয় না, সহরেই আপত্তির এমন কোন কারণও দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় দেশে নিজগ্রামে বহু পরিচিত জনের মধ্যে আপত্তি। বিষয়টা এখানে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সুবিধা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক হইতে এ বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার সময় যে আসিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যে দিক হইতে ইহার বিপক্ষবাদীরা কথা তুলিয়া থাকেন, সেই দিক হইতে ভাবিয়াই মনে হয়, যে, এই পর্দা তিরোহিত হইলে আমাদের দলমাদের দুর্ব্বলতা অপসারণ বিষয়ে অধিকতর সহায়তা করিবে।

স্ত্রী-শিক্ষা সুপ্রচলিত করিবার জন্য দেশবাসী জনগণের উহাতে লিপ্সা বা আসক্তি যাহাতে জন্মে, সে বিষয় উদ্যোগী হওয়া দরকার। সুতরাং শিক্ষা সুলভ এবং স্থল বিশেষে অবৈতনিক করিতে হইবে ; অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে অবৈতনিক ছাত্রীর স্থান অধিক থাকে, তাহা করা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যাহাতে পল্লীর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উহা ব্যতীত শিক্ষায় অন্ততঃ কতকটা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রথমে সর্ব্বত্র ছোট ছোট পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ো

সৃষ্টি না হইলে নিতান্ত জন-বহুল সহর ভিন্ন তাহার উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ছাত্রী পাওয়াই কঠিন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে, বালিকাদের বিবাহ বা অপর কোন বাধা না উপস্থিত হইলে, যাঁহারা কন্যাদের শিক্ষা দিতে যান, তাঁহাদের নিরস্ত না হওয়াই কতকটা স্বাভাবিক। অন্যদিকে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা না দিয়া উপায় নাই। এমন কি যে পল্লীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিধা নাই, সেখানে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যাহাতে জনপ্রিয় হয় তাহার দিকে প্রথর দৃষ্টি থাকা দরকার।

পুরাতনপন্থী বা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিগণ যাহাতে শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার জন্য যাহা কিছু করিবার তাহা করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়কে অপব্যয় মনে করেন,—যাহাতে ব্যয়ের দিক দিয়া তাঁহাদের অসুবিধা না থাকে, আপাততঃ তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে নারীদের শিক্ষা একদিকে যেমন সুলভ হওয়া দরকার, অন্য দিকে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা সুপ্রণালীমত শিক্ষার ব্যবস্থা করা তেমনই ব্যয়সাধ্য। ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের জন্য এ ব্যয় যেমন করিয়াই হোক করিতেই হইবে। ছাত্রী-বেতনের উপর নির্ভর করিয়া কি ছোট কি বড় মেয়েদের কোন ভাল বিদ্যালয়ই চলিতে পারে না। উহার পরিচালন ব্যয় অন্য রূপে অর্থাৎ সরকারি সাহায্য বা চাঁদা অথবা দানের উপস্বত্ব হইতে হওয়া চাই। আমার এমনও মনে হয়, অন্য উপায়ের অভাব ঘটিলে এজন্য অধিবাসীদের স্ত্রীশিক্ষা ব্যয় বাধ্যতামূলক করাও অর্থাৎ তাহাদের উপর স্বতন্ত্র কর স্থাপন করাও দোষের নয়।

প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলিতে ভুলিয়াছি,—উহা স্বতন্ত্র হওয়াই উচিত। একত্র শিশু ও কিশোরী বা যুবতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে, শিশুদের দেখিতেই, তাহাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান, শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ ও বিদ্যালয়ে আনিবার ব্যবস্থা করিতেই অনেকটা সামর্থ্য ব্যয়িত হয়। অর্থ ও অন্যান্য অভাববশতঃ উচ্চ শ্রেণীগুলিতে বা বড় বড় মেয়েদের প্রতি আবশ্যক মনোযোগ দিবার ক্ষমতা থাকে না। তদ্ভিন্ন বিবাহিতা বা বড় বড় মেয়েদের ছোট ছোটদের সহিত অধিক মেলা মেশা ঠিক নহে।

নারী শিক্ষালয়ের সময় ও স্থান সম্বন্ধে, স্বল্পকালমধ্যে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির কথা ভাবিলে মনে হয়, নারী শিক্ষালয়ে শিক্ষার সময় ছেলেদের শিক্ষালয় অপেক্ষা কিছু অধিক হইলে ভাল হয়। প্রাতে ও বৈকালে দুইবেলা সময় করিলে সে বিষয় কিছু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু যাওয়া আসা প্রভৃতিতে অসুবিধা অধিক। সুতরাং সাধারণতঃ এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত থাকাই ভাল। ছোট ছোট মেয়েদের একসঙ্গে এতটা সময় শিক্ষামন্দিরে আবদ্ধ থাকিয়া পাঠরতা রাখিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানী হইতে পারে। এজন্য মধ্যে মধ্যে পাঠ ও হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা ও মাঝে কিছু সময় অবসর দেওয়া উচিত। নারী জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালের স্বল্পতা হেতু উহাদের শিক্ষালয়ের ব্যবস্থামধ্যে যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তন্মধ্যে একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার, যে ছাত্রী যে বিষয়টিতে অপরিপক্ব তাহাকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা এবং কেহ কোন বিষয় অধিকতর পারদর্শী হইলে তাহার সে বিষয় অগ্রসর হইতে যাহাতে বাধা না পায়, ইহার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সুতরাং তাহা ব্যয়সাধ্য।

ছাত্রীনিবাস সহ বিদ্যালয়ে উক্ত সকল বিষয়েই সুবিধা সমধিক, কিন্তু গৃহস্থের ঘরে সাংসারিক কাজের দ্বারা অনেক বালিকাকে তাহার মাতা বা অভিভাবিকাদের সাহায্য করিতে হয়। এই সময় হইতে গৃহকর্ত্রীর সহিত গৃহকর্ম্ম করার ফলে ও সকল বিষয় দেখা-শুনায় অভিজ্ঞতা লাভের অনেক সুযোগও হইয়া থাকে। এই সব দিক বেশ করিয়া দেখিলে ছাত্রী-নিবাস সহ শিক্ষালয়ে যদি সাংসারিক কাজকর্ম্ম সকল ও গৃহধর্ম্মের নীতি কর্ত্তব্য শিক্ষার সুযোগ তেমন না থাকে, তাহা হইলে বাটীতে পরিজনবর্গের সহিত থাকিয়া বিদ্যালয়ে যতটা হয় সেই মত শিক্ষা দেওয়াই ভাল বলিয়া মনে হয়। তবে একটি কথা, এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা মেয়েদের শিক্ষাটা নিতান্ত অবসরমত যতটা হয় হইবে এরূপ মনে করিয়া মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান। সেটা ঠিক নহে। শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা মনে করাই উচিত। ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়। উচ্চ শিক্ষার পক্ষে এখানে অনেক সুবিধা আছে ইহা সত্য; তাহা হইলেও একটু ভাবিবার আছে। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখিবার জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি বিধাতার একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহাদের প্রেম ভক্তি-স্নেহ ভালবাসা-মূলক কর্ত্তব্য পালনে সংসার সুখ-নিকেতন হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের যে শিক্ষাই দেওয়া হউক, তাঁহাদের নারীত্ব ও নারীজাতিসুলভ কোমলতা ও প্রেম-প্রবণতা যাহাতে একটুও ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কতকগুলি বাঁধা ধরা বিধি ব্যবস্থার ভিতর, পারিবারিক স্নেহ-মমতা হইতে দূরে রাখিতে সেই জন্য আশঙ্কা হয়। কোন ব্যবস্থায় প্রকৃত ভাল ফললাভ হয়, তাহা আমি এখনও ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

শিক্ষালয়গুলি পল্লী-সান্নিধ্যে হইলেও উহার স্থান বেশ মুক্ত প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। উহার প্রাচীর বেষ্টিত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে যাহাতে ছাত্রীরা অবাধে নিঃসঙ্কোচে খেলা করিতে ও বেড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিদ্যালয় আবাস প্রাসাদসম অট্টালিকা হইবার প্রয়োজন নাই, ঘরগুলি পরিষ্কার প্রশস্ত আলো বাতাস পূর্ণ এবং স্থানটি বৃক্ষাদি দ্বারা মনোরম হওয়া দরকার। মোট কথা, উহা যথাসম্ভব সর্ব্বাংশে ছাত্রীদের আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিতে হইবে। অসুবিধা না হইলে সময় সময় উন্মুক্ত স্থানে বা বৃক্ষতলেও পড়াইতে পারা যায়। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উহা ভাল বই মন্দ নহে।

শিক্ষার ভয় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষিতার সহিত ব্যবহারে সাধারণ মহিলাদের একটা সঙ্কোচ ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিক্ষা আবশ্যক, শিক্ষাহীন জীবন ব্যর্থ জীবন, এ কথায় সংশয় নাই। তাহা হইলেও মেয়েদের শিক্ষার নামে এখনও যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, শিক্ষিতা রমণীর সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞা গ্রাম্য রমণীরা, এমন কি জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্না প্রাচীনা মহিলাগণও যে বিশেষ

রূপ সঙ্কোচ বোধ করেন, এ উদাহরণ বিরল নহে। যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন অথবা সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের এরূপ হওয়া কি নিরর্থক ? এ কথা সকলে স্বীকার করিবেন না। মনে হয় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা বা লেখাপড়া শিক্ষিতা রমণীর মনের পাশ্চাত্য হাবভাব পরিচ্ছদাদিতে অথবা সাধারণ রমণীদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব তাঁহাদের চরিত্রে বিদ্যমান থাকা প্রযুক্তই তাঁহারা সঙ্কুচিতা থাকিয়া নিজেদের পৃথক করিয়া রাখিতে যত্নবতী হন। এই যে ত্রুটীর কথা লিখিত হইল, ইহা পল্লীগ্রামের অনেক স্থানেই প্রায় একটা সাধারণ অভিযোগ। অনেক বিচক্ষণ লোকও ইহা লেখাপড়া শিক্ষারই ফল মনে করিয়া মেয়েদের শিক্ষা দিতে বিরত থাকেন। অবশ্য ইহা দেখিয়া শিক্ষাকে যাঁহারা দোষী করেন তাঁহাদের ভুল। প্রকৃত শিক্ষা কাহাকেও এসব বা কোন দোষ-দুষ্ট করে না। ইহা শিক্ষার নামে অশিক্ষা। মনুষ্যত্বলাভ যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে ছেলেদেরও এমন শিক্ষা পরিত্যাজ্য।

শিক্ষা বলিতে এখন পাশ্চাত্য শিক্ষাই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন এখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এমন কি ইংরাজি শিক্ষার প্রারম্ভিক যুগে অপরাপর উদ্দেশ্যের মধ্যে চাকুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন শিক্ষার একটি প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালার একটা কথা আছে—"যে গরু দুধ দেয় তার চাট্‌ সহ্য হয়" ; সেই রূপ পুরুষের পক্ষে উপার্জ্জন-ক্ষমতার জন্য উপরিউক্ত দোষ কতকটা সহিয়া গিয়াছে বা না সহিলে উপায় নাই। কিন্তু নারীর বেলা তাহা নহে। নারীর বিদ্যা শিক্ষা অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে। যে হেতু পরাধীন অথবা পুরুষের অধীন নারীর বিদ্যা শিক্ষা শিক্ষারই জন্য, মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণতা সাধন জন্য ; সে হেতু বিদ্যার যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানা আছে, তাহাদের চরিত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আর রক্ষা নাই। পুরুষ শাসিত সমাজ তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। অবশ্য যে শিক্ষা নারীর পক্ষে উপযুক্ত নহে, সে শিক্ষা পুরুষের পক্ষেও কখন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

আমাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া বাবু হইয়া বা বিবি বনিয়া যাইবে, এ কথা অনেকে মনে করেন। অবশ্য উহা হওয়া যে ভাল নহে, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক, বিলাসিতা ও বাহাড়ম্বর যেমন আমাদের চক্ষে ভাল নয়, বিবিদের জাতির চক্ষেও তাহাই। অবশ্য বিলাসিতা চান না কেহই। তবে বিলাসিতা বলিতে সময় সময় ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ভিন্ন ভিন্নরূপ বুঝিয়া থাকেন ; এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের কেহ কেহ ক্ষেত্র ও অবস্থা বিশেষে পরিহিত আবশ্যক বেশ এবং পরিচ্ছন্নতাকেও বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লন। অবশ্য শিক্ষার দোষে বিলাসিতা আসে একথা মিথ্যা নহে ; কিন্তু সে শিক্ষা আমাদের উপযোগী নহে, তাহা ত্যাজ্য। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, যে শিক্ষার প্রভাবে কামিনী-হৃদয় কোমলতর না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের মনে অহঙ্কার ও গর্ব্বের উদয় হয়, তাহা নারী-চরিত্রে অবাঞ্ছনীয়। দেশের যে সব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সবগুলির মধ্যে এসব বিষয়ে যতটা দৃষ্টি যতটা সাবধানতা আবশ্যক, তাহা যে আছে তাহা বলা যায় না।

স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সব ছাত্রীদের জুতা বা আর কিছু ব্যবহার আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহাদের উহা ব্যবহারে কোন দোষ হয় না বটে, তাহা বলিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে জুতা না হইলে বা বৈকালিক মস্‌লিন্‌ শাটী ও ব্লাউস্‌ অথবা মোজা জ্যাকেট্‌ টুথ্‌ ব্রাস্‌ ভিন্ন চলিবে না, ইহা যদি ব্যবস্থা হয়, তবে সে বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদের বিলাসবর্জ্জিতা বা মিতব্যয়ীরূপে পাইবার আশা কি কতকটা দুরাশা নহে ? কলিকাতার কোন খ্যাতনামা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-নিবাসের নিয়মাবলী মধ্যে দেখিলাম, প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য কেবল শাটী ব্লাউস্‌, গাউন্‌, পেটিকোট্‌, বডিস্‌ প্রভৃতি পরিধেয় মোট ৯৩ দফা ; তন্মধ্যে কয়েক দফা মূল্যবান শাটী ও জামা এবং তোয়ালে জুতা, বিছানার চাদর, চিরুণী, ব্রুস্‌, টুথ্‌ব্রস্‌ প্রভৃতি মোট ৩৯ দফা ব্যবহার্য্য জিনিষ না রাখিলে চলিবে না। অথচ বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিয়মাবলীর পুস্তিকায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, উহা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। উহার অন্যত্র মেয়েদের মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এমনও লিখিত হইয়াছে যে, শিক্ষার্থিনীদের অবশ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহাদের পিতামাতা তাহাদের টাকা যোগাইবার কল নহে। এখানকার ছাত্রীদের স্কুলে বেতন দিতে হয় মাসিক ৬৲ টাকা এবং যাহারা ছাত্রীনিবাসে থাকে তাহাদের মাসিক ছত্রিশ টাকা। জানি না কোন্‌ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে এই বিদ্যালয় উপযোগী এবং কি করিয়া কোমলমতি বালিকা ও কিশোরীরা এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া মিতব্যয়ী বা বিলাসবর্জ্জিতা হইতে পারিবে। এখানে থাকিয়া মেয়েদের স্বাবলম্বীরূপে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। আমার মনে হয়, সাদাসিদা পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ভিন্ন অনাবশ্যক সাজসজ্জাভূষিতা হইয়া ছাত্রীদের শিক্ষামন্দিরে আসা নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। বেশ ভূষার পার্থক্যের সহিত ছাত্রীদের মনের মধ্যে একটা পার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং সুসজ্জিতাদের মনে একটা বড়মানুষী ভাব উপস্থিত হওয়া সম্ভব।

নারীদের শিক্ষার ভার কাহাদের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত এবং তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার লোক কাহারা, এ কথারও একটা আলোচনা এক্ষণে আবশ্যক হইয়াছে। অধুনা এক সম্প্রদায় শিক্ষিতা নারীর মত—নারীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় উৎকর্ষসাধক ব্যবস্থাদি বা সেজন্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যাহা গড়া আবশ্যক তাহার ব্যবস্থাকর্ত্তা বা নির্ম্মাতা হইবেন নারী। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো এমনও অভিমত, যে, নারী সম্পর্কীয় উন্নতি বিষয়ক ব্যবস্থার একমাত্র নারীই অধিকারী ; সে বিষয় পুরুষের চিন্তা বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা নারীদিগের মধ্যে, স্বাধীনচেতা মহিলাগণের অনেকের মধ্যে এই ভাবের কথা সময় সময় শুনিতে পাওয়া যাইলেও, সাধারণের মধ্যে এই মতের পরিপোষক বেশি দেখা যায় না।

শক্তিসম্পন্না শিক্ষিতা নারী যেমন নারী-চরিত্রের সব দিক বুঝিবেন, তাহাদের আবশ্যক প্রতিকার, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি বুঝিবেন, অনেক শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে তেমন করিয়া বুঝা সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু

জাতির অর্দ্ধেক নারীর কল্যাণও তাঁহাদের স্বার্থ বুঝিতে এবং তাঁহাদের করণীয় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এমন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সুধীব্যক্তি অনেক আছেন। মনে হয়, নারীদের এই পুনরভ্যুদয়ের কালে এ হেন মনীষিগণের যুক্তি পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার সহায়তা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। ইহাদের ছাড়িয়া শুধু নারীদের দ্বারা এই গুরুতর বিষয় সমাধা হইতে পারে না। সহরের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সমগ্র দেশের এই নারী-শিক্ষা-সমস্যা পুরুষদের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া এক্ষণে নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা বলা যায় না। মায়েদের উপর সন্তানের শুভাশুভ যখন বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তখন জাতীয় উন্নতির মূলে নারী-শিক্ষা কতটা প্রয়োজন তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ হেন গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার যোগ্য নরনারী মিলিত হইয়া নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এই কয় বৎসরের মধ্যে নারী জাগরণের যে সব লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলন বিশেষরূপে প্রবলাকার ধারণ করিবে বলিয়া ধারণা হয়। এই সময়েই নারীদের শিক্ষার বিষয়, ব্যবস্থা, উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ জন্য পূর্ণ মিলিত শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলি, স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধকগুলি সমাজ হইতে অপসারিত করিবার কথাও চিন্তা করা কম আবশ্যক নহে। ইহার মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং অযথা অবরোধপ্রথা তিরোহিত হওয়া দরকার। বিবাহের বয়স বাড়ান এবং অবরোধ প্রথা শ্লথ করা স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও খুব বেশি পরিমাণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে বিবাহের পরও কন্যারা আর কিছুদিন শিক্ষার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সকল সংস্কার বা ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক বাঙ্গালীর মেয়েদের সাধারণ পরিধেয় এবং পরিধান-রীতি প্রভৃতির কিছু কিছু সংস্কার আবশ্যক মনে করি।

অন্যান্য কথার মধ্যে নারীর শিক্ষা সর্ব্বক্ষেত্রেই নারীর দ্বারা হওয়া উচিত এবং এজন্য যাহাতে অধিক সংখ্যক রমণী যোগ্য শিক্ষা পাইয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারেন তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। আমাদের কন্যাদের শিক্ষা অন্ধভাবে কাহারও অনুকরণের বিষয় নহে বা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই রমণীদের শিক্ষার চরমোদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় নহে। অথবা গাদা গাদা পাঠ্য পুস্তক বাড়াইয়া তাহাদের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। কথকতা, ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারাও সহজে তাহাদের অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ও বহুল প্রচার করিতে হইলে, যেখানে উপায় আছে সেখানে পুরনারীদের শিক্ষার যাহাতে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে পারা যায় সেদিকেও যত্নবান হওয়া দরকার।

পরিশেষে নিবেদন, নারী শিক্ষা বিষয়ে বা শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নহি বা এ বিষয়ে আমার বেশি কিছু জ্ঞান আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমি নারী শিক্ষার পক্ষপাতী এবং প্রয়াসী ও মাতৃজাতির একজন কল্যাণকামী মাত্র। অনেকদিন হইতে এ বিষয় আমি চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া এবং কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়টির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় আমার অতি সামান্য অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম মাত্র। আমার সকল কথাই যে গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা মনে করি না।

ভগবান জরথুস্ত্রদেবের দ্বৈতবাদ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

অতীতের চির বিস্মৃতি-গর্ভে আর্য্যজাতির প্রথম অবতার, প্রাচীন ইরাণ দেশের ধর্ম্মসংস্থাপক—ভগবান জরথুস্ত্রদেবের এক অখণ্ড অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে, পরন্তু আবেস্তার মহা ঐশী বাণী যে পরবর্ত্তীকালে মানব-মনের ধারণা শক্তির বিপর্য্যয়ে পুরোহিতদিগের বিসদৃশ বিকৃত ব্যাখ্যার কল্যাণে, অধিকন্তু সেমিটিক জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে, কল্পিতরূপে রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড দ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছে, তাহার সংশোধনই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান জরথুস্ত্রদেব, সর্ব্বশক্তিমান অহুরমজদার যে একটা অখণ্ড একত্বের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তিনি যে নিরন্তর চিরন্তন শৃঙ্খলার' (অশা) পথে, একটা বিরাট পূর্ণতার দিকে সমগ্র ধরণীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছেন, আবেস্তার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে যে উদাত্ত ছন্দ বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দ্বৈতবাদের ছায়ামাত্রও পতিত হয় নাই।

তবে কথা হইতেছে জগতের এই দুঃখবাদ লইয়া। দুঃখ, সুখ, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তাড়নায় মানবের প্রাণে সকল যুগে ও সকল দেশে যে একই চিন্তা জাগরিত হইয়া উঠে, মায়াবাদের অন্তরালে বিহ্বল প্রাণে প্রাণে ভগবানের দ্বারে যে বিপুল নিত্য-প্রশ্ন প্রকট হয় (১) অপারশক্তি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড বীর্য্যে বিশ্বাস যে আপাত দৃষ্টিতে পাপের তীব্রালোকে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহারই সমাধানে যুগে যুগে মনীষীগণ আপনাদিগের ধ্যান ধারণা নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমাধান-চেষ্টার দুইটী দিক আছে; কেহ মানসিক জগতে চিন্তাধারায় প্রসারণে ও পরিবর্ত্তনে আবার কেহ বা ব্যবহারিক জগতে কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বাস্তবতার মধ্যে এই সমস্যা-তর্পণে অগ্রসর হইয়াছেন। ভগবান জরথুস্ত্রদেব এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এই সমাধানের প্রচেষ্টায় তিনি যে ধারণায় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে পরবর্ত্তীযুগে তাহাকে দ্বৈতবাদীরূপে অভিহিত হইতে হইয়াছে—কিন্তু সে

---

(১) ..."How can it be that Brahm would make a world and keep miserable, since, if, all powerful, he leaves it, so, He is not good, and if not powerful, He is nct God ?"

—Light of Asia BK III

হিসাবে তাঁহাকে দ্বৈতবাদী বলিতে হইলে খৃষ্টকেও সেই আখ্যাই দেওয়া চলে (২)। আমরা ক্রমশঃ সেই অভিব্যক্তি-বাদের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিব।

ভগবান জরথুস্ত্রদেব আদিতে দুইটী যমজ শক্তির উদ্ভব পরিকল্পনা করিয়াছেন, আমরা 'গাথা' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।



ভগবান্ জরথুস্ত্রদেব

"অৎচা হৎহা হেম্ মইস্থ,
যস এতেম্ পওউর্ বিম্।
দজ.দে গায়েম চা অজ্যা ইতিম্ চা
যথ চা অংঘহৎ অপেমেম্ অংঘহস্,
অচিস্তো দ্রেগ্বতাম্।
অৎ অশা উনে বহিস্তে মনো।"

ইহার আক্ষরিক সংস্কৃতানুবাদ,—

অথ চ হৎ (যদা) তৌ সমং মন্যু অগচ্ছতাম্ পৌর্ব্বী
বিদধে জাতিম্ চ অজাতিম্ চ,
যৎ চ অন্তবৎ অপেমেম্ অবমে আয়ুঃ লঘিষ্ঠ দ্রোহবতাম্
অথ অশাবতী জনে (ধর্ম্মবতী জনে) গরিষ্ঠ মনঃ।

* * * * * * and now when these two spirits together came, they in the beginning created li'e and Non-life.

এইরূপে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উদ্ভব হইল; একটীর উদ্বোধন প্রাণ-শক্তির প্রতিষ্ঠায়, অন্যটীর বন্দনা, ধ্বংসলীলায় আবর্ত্তনে। অহুরমজ.দা হইতেই এই ব্যবহারিক সত্তাহীন দুইটী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে (৩) এবং পরবর্ত্তীকালে আবার সেই পরম সত্তায়ই বিলীন হইবে (৪)। ইহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত শক্তির চিরন্তন বিকাশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। স্বয়ং অহুরমজ.দা যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে আবার সেই একই বিরাট শক্তিধারায় বিলয় হইতে হইবে, সে কি কোনও মতে সেই স্রষ্টার অপরাজেয় বীর্য্যের সমকক্ষ হইতে পারে? আমরা গীতায়ও এই দ্বৈতধারার প্রতিধ্বনি পাই।

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে,
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।

—গীতা অষ্টম অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

আলোক ও অন্ধকার জগতের চিরন্তন পথ। যিনি আলোকের পথে অগ্রসর হয়েন তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না; আর যিনি অন্ধকারের পথে পদসঞ্চালন করেন তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

এখানেও যেমন জগতের সম্মুখে একটা

(২) Early religious poetry of Persia —Moulton, P 64.

(৩) Now I will speak to those who desire (to hear) about these Two who are created by Mazda, which (teaching) is indeed for the wise. Yasna XXXI.

(৪) "There are important passages in gathas to show that in Ahura Mazda were united Both Spento Mainys and Angra Mainys." —Wadia—p 90.

"Do not exist independently but each in relation to the other; they meet in higher unity of Ahur Mazda" —Jackson—

বিরাট তথ্য-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া পন্থা নির্দ্দেশ ও মনোনয়ন করিবার কথা মনে জাগাইয়া দেয়, ভগবান জরথুষ্ট্রদেবও এই মনোনয়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। (৫) সুখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি, আনন্দের সঙ্গে বিষাদের যে বিশিষ্ট সংযোগ, একটী বৃত্তির অন্তরালে যে আর একটী প্রতিবৃত্তির গতানুগতিক বাস্তব পরিকল্পনা তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই এই দার্শনিকতার সৃষ্টি ও পুষ্টি; আর এই দ্বৈতভাবের পরপারে যে এক পরম অখণ্ড একত্বের অসীমতা বর্ত্তমান, এই দ্বন্দ্ব-নদীর পরানিবৃত্তি যে সেই অদ্বৈত সাগরের মহাকল্লোলে, আর এই জাগতিক উৎপত্তি, স্থিতি, ও প্রলয় যে সেই সাগর সলিলের বুদ্বুদ সমান, সে কথা ভগবান জরথুষ্ট্রদেবও যেমন বলিয়াছেন, গীতায়ও তাহার তেমনি প্রতিধ্বনি হইয়াছে (৬)। এই মহাসাগরের অতলান্তে দ্বিত্বের স্থান কোথায়? বাইবেলেও আমরা এই কথার উক্তি দেখিতে পাই—সেখানেও ভগবানের এই অপরিজ্ঞেয় বিশিষ্টতা, ও অপরিসীম শক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি সেখানে বলিতেছেন, "I form the light and create darkness; I make peace and create evil; I the Lord do all these things." [আমিই আলোক সৃজন করি, আবার অন্ধকারের উদ্বোধন করি—আমিই শান্তি সৃষ্টি করি, আবার আমিই অশান্তির ধাতা; পরমেশ্বররূপে এ সকল কার্য্য আমারই।]

এই পরিকল্পিত দুইটী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরন্তন (৭)। আবেস্তায় একটীকে স্পেন্তামন্যু (Holy spirit) ও অপরটীকে অংগ্রমন্যু (Enemical Spirit) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জগতের আদিম কাল হইতে স্পেন্তামন্যুর সহিত একদিকে যেমন অংগ্রমন্যুর কায়া ও ছায়া।

(৫) ". Choice of good will bring us life—Eternal life etc" —Moulton p. 20

(৬) তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥
নবম অধ্যায়—১৯ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! আমিই বৃষ্টি আবার আমিই উষ্ণতা, আমিই অমরত্ব আবার আমিই মৃত্যু, আমিই স্থিতি আবার আমিই অস্থিতি।

[যে সৎ ও অসৎ দ্বৈতবাদের পরপারে এক অখণ্ড অদ্বৈত বিরাজমান আমি তাই - Gita Anne Besant p 126]

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধঃ।
—গীতা দশম অধ্যায় ৫ শ্লোক।

অহিংসা, সমতা, তৃপ্তি, প্রভৃতি মানবের সমস্ত বৃত্তিই আমা হইতে উদ্ভব হয়।

(৭) "I will speak of the twains at the first beginning of the world, of whom the Holier thus spake to the Enemy; 'neither thought nor teaching nor will nor belief nor words nor deeds nor Selves nor souls of us twain agree" —Yasna XLV. 2.

সম্পর্ক তেমনি আবার, বাক্যে, কাজে, চিন্তায়, ধারণায়, শিক্ষায় সকল বিষয়েই তাহাদের অমিল।

এই স্পেন্ত ও অংগ্র মন্যুকে সৎ ও অসৎ বৃত্তি রূপে অভিহিত করা চলে। আমরা ক্রমে এই বৃত্তিদ্বয়ের সত্তা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। এই বৃত্তিদ্বয় সদাসর্ব্বদা বিসম্বাদে মগ্ন থাকে। ভগবান জরথুষ্ট্রদেবের মতে এই দ্বন্দ্বের শেষ হইবেই (৮) এবং এই দ্বন্দ্ব-শেষে সতের জয় অবশ্যম্ভাবী (৯)।

এই দুইটী শক্তিকে আমরা হিন্দু দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে লক্ষ্য করিতে পারি। পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই দুইটী বিশিষ্ট শক্তির সামঞ্জস্য বিকাশে যেমন পৃথিবীর স্থিতি নিয়ন্ত্রণ হইতেছে, খণ্ড শক্তিদ্বয়ের একত্র সংমিশ্রণে যেমন এক অব্যাহত অদ্বৈতের পরিকল্পনা হইতেছে, একের আলোকচ্ছটায় যেমন অন্যের প্রতিকৃতি শক্তিময় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তেমনি অহুর মজদা-সৃষ্ট এই দুইটী যমজ শক্তির অভিব্যক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির বিকাশ ও বিবর্ত্তনবাদ পরিপুষ্ট হইতেছে। এই দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অ্যানী বেসাণ্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইহারই প্রতিচ্ছবি। ..."not of good and evil, but is of spirit and matter, of reality and non-reality, of light and darkness, of construction and destruction, the two poles between which the universe is woven and without which no universe can be." (১০)

প্রভাতের আলোকচ্ছটার সত্তাবিকাশের জন্যই সায়াহ্নের অস্ত ব্যথা—আলোকের রূপঝলকের জন্যই অন্ধকারের উদ্বোধন—আনন্দের পরিপুষ্টির জন্যই বেদনার সম্বর্দ্ধনা—স্মৃতির চিত্রলেখার জন্যই বিস্মৃতির বন্দনা—কে ইহা অস্বীকার করিবে? এই দ্বৈতভাবের সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়াই যে জগৎ একটা বিরাট শক্তির আরাধনা করিতেছে—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রয়ীর বিকাশ সংসাধন করিতেছে—সনাতন নিয়ম শৃঙ্খলার দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "from antagonistic social tendencies there always results not a medium state but a *rythm* between opposite states."

[দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধানে একটী মাঝামাঝি অবস্থার উদ্ভব হয় না, একটা গতিচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে।] এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির

(৮) Tarapurwalla. p. 50.

(৯) Good and evil are not Co-eternal and Co-ordinate Powers for him any more than for us. The superiority of Good is manifested throughout and the triumph of Good at the last is as complete as it is in the Bible eslpatology.

—Moulton p. 64.

(১০) Four great Religions p. 75.

সামঞ্জস্য বিধানে যে মহান ছন্দগতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড তালে তালে এক অসাম শক্তির পানে ছুটিয়া চলিয়াছে—এই বিচিত্র সম্মেলনের সৃষ্টি-রেখা তাহার বক্ষে যুগান্তরের শক্তি-বিকাশের অঙ্কুর উপ্ত করিয়া দিয়াছে।

মনুর 'দ্বন্দ্ব' সমস্যায়, প্লেটোর প্রতিবৃত্তির পরিবর্ত্তনবাদে (alteration of opposites) নিউটনের ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মে, রাস্কিনের বিষমবাদে, ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কীর আলো ও ছায়ার বিসম্বাদে এই জরথুষ্ট্রদেবের যমজ শক্তিরই বিকাশ ও উক্তি যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে (১১)। গীতার শ্লোকে, ধম্মপদের ছন্দে, গাথার অক্ষরে অক্ষরে, বাইবেলের প্রতিপদে প্রতিযুগে, দর্শনের পাতায় পাতায় এই সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হইয়া আসিতেছে, মানবের মনে মনে যুগে যুগে, সুখে, দুঃখে, ব্যথায়, আনন্দে, জীবনে, মৃত্যুতে হাস্যে, ক্রন্দনে এই একই চিন্তার বন্দনা হইয়া চলিয়াছে।

এই বিরাট সংজ্ঞাদ্বয়ের পরিকল্পনা কালক্রমে বিকৃত ব্যাখ্যায় এক বিভিন্ন ও বিসদৃশ রূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি, এই অংগ্রমন্যু অহুরমজ্দা হইতে উদ্ভূত; কাজেই আর তাহার সমকক্ষতার ভাব মনে আনাও অস্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভেন্দিদাদে আমরা যে অহ্‌রিম্যান Ahriman Angra Mayo)কে পাই, সে অহুরমজদার সমকক্ষ সমশক্তিশালী পাপশক্তি। ভেন্দিদাদের প্রথমেই আমরা অহুরমজদার অনুগতজনের জন্য ষোড়শ সুন্দর দেশ সৃষ্টি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অহ্‌রিম্যানের সেথায় তাহাদের উৎপাতের জন্য প্লেগ, মহামারীর উদ্ভাবনা পাইয়া বিস্মিত হই। গাথার পরবর্ত্তীকালে, নয়ও যে সৃষ্টির একটী অঙ্গ বিশেষ, উভয়ই যে পরমেশ্বরের কর্ম্মশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত, বিশিষ্টভাবে যে একটীকে অন্যটীর অপেক্ষা করিতে হয়, পরন্তু অকর্ম্মণ্য ও গতিহীন জীর্ণের পরিসমাপ্তিতেই যে নবীন, কর্ম্মঠ, গতিমান ও সজীবের উদ্ভব সম্ভব, আর তাহার উপরই যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও গতি বিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত, সে কথা পুরোহিতগণ ও জনসাধারণ একেবারে ভুলিয়া গিয়া, অতি সাধারণ ও ক্ষীণ চিন্তাধারার উপর এই বিকৃত ব্যাখ্যার প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে, আর এই পরবর্ত্তী কালের ক্ষুদ্র শক্তির ধারণার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হইয়া অনেকে ভগবান জরথুষ্ট্রের উপর অন্যায়রূপে দ্বৈতবাদের আরোপ করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে সার্সেনিয়ান যুগে (Sassanian time) এই উভয় বৃত্তির স্থানে অহুরমজদা ও অহ্‌রিম্যানের স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে—এই বিকৃতির উপর যে সেমিটিক জাতির ধর্ম্মের এমন কি বুদ্ধধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যার যে প্রভাব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই (১২)।

ঐশী বাণীর এই বিকৃত ব্যাখ্যার ব্যপদেশে, পরমেশ্বরের অপরিমেয় শক্তির পার্শ্বে এই পাপশক্তির সমকক্ষতা পরিকল্পনায়, মানসিক চিন্তার এই প্রকৃষ্টতার অভাবে, ক্রমশঃ ধর্ম্মের মর্ম্মানুসরণে মন ব্যাহত হয় এবং ক্রমাগত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধোগতি পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

সৎ, অসৎএর সামঞ্জস্য সংসাধনের পূর্ব্বে তাহাদের সংজ্ঞার্থ নির্দ্ধারণ একান্ত দরকার। কামালউদ্দীন তাঁহার গ্রন্থে এই সৎ ও অসৎএর সংজ্ঞার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৩) এই দুইটী শক্তির উদ্বোধন কাল হইতেই তাহারা যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই তাহাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় লওয়া যাইতে পারে; একজন প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটাইয়াছে, অন্যজন তাহার অন্তরায়ে মূর্ত্ত হইয়াছে (১৪)। এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে, এই মনে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত না এই শক্তি মহাশক্তির চিরাধারে বিলয়প্রাপ্ত হইবে, ততদিন তাহার প্রতিশক্তি নিয়ত ছায়ারূপে প্রতিভাত হইয়া শুধু অসৎ আখ্যায় ভূষিত হইবে। (১৫) অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, অসৎএর কোনও ব্যবহারিক সত্ত্বা নাই। শুধু সৎ বৃত্তির পরিকল্পনা, বন্দনা, ও তাহাতে একনিষ্ঠার জন্যই এই প্রতিশক্তির আবরণ; বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব কায়ার স্থিতির মধ্যে।

Dr. Haug বলিয়াছেন, The Beneficent spirit appears in the blazing flame; the presence of the hurtful one is marked by the wood converted into charcoal [অগ্নিশিখার উজ্জ্বলতার মধ্যে সৎশক্তির বিকাশ, আর কাষ্ঠের অঙ্গাররূপে পরিবর্ত্তনে প্রতিবৃত্তির চিহ্ন বিরাজমান।]

কর্ম্মযোগের ভিতরেই ভগবান জরথুষ্ট্রদেবের ধর্ম্মনীতি গ্রথিত—সনাতন শৃঙ্খলা পথের দিকেই তাঁহার ঐকান্তিক লক্ষ্য। এই কর্ম্মযোগে যে সকল বিষয় মানবকে এই আশা পথের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, তাহাই সৎ; আর যাহা যে কোনও ভাবে, যে কোনও প্রকারে তাহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় তাহাই অসৎ। এই দ্বিতীয়টীর পৃথক কোনও সত্ত্বা বা অস্তিত্ব নাই—শুধু মানবের ব্যক্তিগতভাবে এই 'আশা' পথের কতটুকু সন্নিহিত বা তাহা হইতে কতটুকু বিচ্ছিন্ন, তাহারই সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে উহা বর্ত্তমান।

সুখ ক পরিপূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে দুঃখকে নির্ব্বিচারে বরণ করিতে হইবে—তৃপ্তির আনন্দলাভ করিতে হইলে আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে-মুক্তির বিরাট কল্লোলকে হৃদয়ের পরতে পরতে উপলব্ধি করিতে হইলে, বন্ধনের সম্মোহনে জীবনকে ক্লিষ্ট রাখিতে হইবে—এ যে জগতের চিরন্তন সত্য—বিশ্বজগতের মর্ম্মকথা! অসৎকে নির্ব্বিচারে পরিত্যাগ করিয়া শুধু সতের সংস্পর্শেই জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় না জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে ভুলের মধ্য দিয়া অকল্যাণের জ্বালার ভিতরে; সংস্কার শুদ্ধির বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, অনন্ত অন্যায়ের সংস্পর্শে ন্যায়ের শুভ্রধবল মন্দিরের প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে—তবেই তো জীবনের সার্থকতা, তাহাতেই তো জীবনের প্রাণশক্তির উদ্বোধন।

---

(১১) —Wadia p. 89.

(১২) Tarapurwala p 55.

(১৩) Islam & Zoroastrianism—Kamaluddin p. 63.

(১৪) Yasna XXX 4

(১৫) Tarapurwalla p. 59.

মানবের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ সম্বরণে চির প্তন প্রকৃতির প্রতিকূলতায়—আধ্যাত্মিক জগতের কোনও উন্নতি সংসাধিত হয় কি না সন্দেহ ; কর্ম্মযোগী জরথুস্ত্রদেব সে সন্ন্যাসবাদের উপর নির্ভর করেন নাই। স্বাভাবিক ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সহজ সরল ধর্ম্মে যে মহাশুদ্ধির বিপুল উদ্বোধন বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অতুলনীয় ; আর এই অচিন্ত্যনীয় নীতি-সূত্র প্রকৃতপক্ষেই আর্য্য ধর্ম্মের একান্ত গৌরব বিশেষ।

এই বিরাট দ্বন্দ্বসূত্রের উপরই বিশ্বজগত প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সকল দিকের পরিপূর্ণতা ও বিশিষ্টতা এই দুইটীর সামঞ্জস্যে। আমরা একে একে তাহাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

এই যে সাধারণ জল দেখিতে পাইতেছি, তাহাও দুইটা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। রাসায়নিক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এই দুইটী গ্যাস পরস্পরের সদৃশ নহে—তড়িৎশক্তিতে জলকে বিশ্লেষণ করিলে, দুইটী গ্যাস দুইটী বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে আহরিত হইবে। এই যে মাটী অবিরত চক্ষে পড়িতেছে—জড় জগতের ভিত্তি যাহাকে বলা চলে, তাহারও সৃষ্টি এই সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের সম্মেলনে ! সাদৃশ্যে অসাদৃশ্যে সংযোগ ও সাদৃশ্যে সাদৃশ্যে বিচ্যুতি ঘটে ; এই চিরন্তন সূত্র-সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপনা করিয়া, জগতের এই অণু, পরমাণু, তেজরশ্মি, ইলেকট্রন, প্রভৃতির স্থিতি গতি সংযোগ ও বিয়োগ সমস্যার যথাযথ ও প্রকৃষ্ট সমাধান চলে। এই যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অনুকণা হইতে ধূলিকণা হইতে এই বিরাট বিশ্বজগতের গতি একবার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবিত, আবার পরক্ষণেই প্রতিধাবিত হইয়া পরম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে—এই যে জন্মতত্ত্বে একদিকে জন্ম-সূত্রের আবদ্ধনে, অন্যদিকে স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তনের বিশাল গতিশীলতার আবর্ত্তে প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশে বিবর্ত্তনবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—এই যে মানসিক ও কর্ম্মজগতে নিউটনের ঘাত ও প্রতিঘাতের বিপুল সংঘর্ষের মাঝখানে একটা অনন্ত সমতার পরিপোষণ সম্ভব হইতেছে—সকলেরই তো ভিত্তি এই দ্বৈতবাদের উপর। Ruskin বলিয়াছেন, That what one person has, another can not have [যাহা একজনের আছে—তাহা অন্যজনের থাকিতে পারে না।] কথাটার ভিত্তিও সেই সামঞ্জস্য বিধানের উপর। একদিক হইতে বিয়োগ না করিয়া আনিলে অন্যদিকে যোগ সম্ভবপর হয় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসক সর্ব্বপ্রকার আইন কানুন সংরক্ষণে যত্নবান—শাসিত সে বিধিবন্ধে আবদ্ধ হইতে নারাজ ; সমাজক্ষেত্রে প্রভুর প্রভুত্ব ও দাসের আনুগত্য পরস্পর-দ্রোহী—কিন্তু এই দুইএর সামঞ্জস্য স্থাপন হেতুই রাজনীতিও অচল হয় না, সমাজও বিকৃত হইয়া পড়ে না।

সংসার যদি শুধু হাসি, আনন্দের একটা বিরাট ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইত, তবে লোকের মুখে হাসি থাকিত কি না সন্দেহ—যদি অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা না থাকিত, তবে লোকের মনে অভিলাষের বন্দনা হইত না—যদি, যৌবন, প্রেম, লালিত্যের স্বপ্নসাগরে মানব দিবানিশি হাবুডুবু খাইত, তবে দুদণ্ডেই প্রেম, যৌবনলিপ্সা ত্রাহি ত্রাহি রব করিত, এটা নিশ্চিত।

একদিকে যেমন মহাসাগরের উপযোগিতা অতি সুস্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি মহাবালুকান্তরও বিশ্বজগতের পক্ষে কল্যাণকর। এই বালুকার সূক্ষ্মবক্ষেই অতিক্ষুদ্র জলকণা সঞ্চিত হইয়া ক্রমে মেঘের সৃষ্টি করে—এই বালুকণার জন্যই সূর্য্যের আলোকরশ্মি বিশ্বজগতে ঠিকরিয়া শোভাসম্পদ ছড়াইয়া দেয়।

গানে, ছন্দে, কবিতায়, ঝঙ্কারে, স্থাপত্য-বিদ্যায়, চিত্রে, কলাশিল্পে সর্ব্বত্রই এই দ্বন্দ্ববাদের জয়টীকা। বিশ্ব যদি কেবল সুখের আগার হইত—কবি ছন্দে যে স্বপ্ন-বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাদের এই দুঃখ, ব্যথার ধরায় যদি সে সৃষ্টি সম্ভব হইত—তবে কবি ঐতিহাসিকে পর্য্যবসিত হইতেন (১৬)। বেদনার ঝঙ্কার ব্যতীত গান জাগে না—দুঃখের ভিতর দিয়াই কবিতার স্ফুরণ হয়, অতৃপ্তির সংঘাতেই চিরকল্যাণময়ী স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয়। প্রফেসার Knight সত্যই বলিয়াছেন, "Suppose that we inhabited a world of beauty all Compact,' a world from which all discordant element was absent we might rest in a passive contemplation of its loveliness but we would be without poetry." এ কথা প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গানে যদি লঘু, গুরু পঞ্চম সপ্তম না থাকিত, ঝঙ্কারে যদি শান্ত ও উদাত্ত স্বর না থাকিত, চিত্রে যদি আলো ও ছায়ার একত্র সমাবেশ ও সংমিশ্রণ না থাকিত, তবে সে গান, ঝঙ্কার বা চিত্র একটা বিরাট ব্যর্থতায় আত্মনিবেদন করিত।

বাধা পাইলেই নদীর উন্মত্ততা বৃদ্ধি হয়, ছন্দে অমিলের মধ্য দিয়াই মিলের সার্থকতা উপলব্ধি হয়—বীর ও করুণ রসের একত্র সমাবেশে চিত্রিত প্রাণবন্দনাই মানসপটে অঙ্কিত থাকে। (১৭)

সাহিত্যে এই সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব—এই আলো ও ছায়ার সমাবেশ অনেকেই দেখাইয়াছেন ; কিন্তু যে যত বেশী ভাল করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহার কৃতিত্বই তত বেশী। ভ্রমরের উজ্জ্বলালোক রোহিনীর কালো আবরণের সংঘাতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে - মহিমের একান্ত অবজ্ঞার ভিতর দিয়াই সুরেশের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। Stevenson এ বিষয়ে অত্যধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একটী মানুষের ভিতরকার এই আলো ও ছায়াকে বিশিষ্ট দুইটী মানুষে পরিবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত ব্যাপারটীর একটা অসাধারণ অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও এই দ্বৈতবাদের লীলা সৃষ্টি করিয়াছেন। (১৮)

এই যে সুখের জন্য মানবের একান্ত আগ্রহ, এ কি দুঃখের বেদনা-বোধের জন্য নহে ? এই যে পুণ্যের প্রতি মানবের সাধারণ ও স্বাভাবিক আসক্তি, তাহার মূলে কি এই পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা নহে ? (১৯) জীবন-

(১৬) Wadia—106.

(১৭) প্রমীলাচিত্র—মেঘনাদবধ।

(১৮) Dr. Jekyee & Mr. Hyde.

(১৯)...that we did but love and desire the good because of the evil etc,

—Wadiar p 149.

ধারণের জন্য যে একটা বিপুল আকুতি, এ কি মরণের কারণ্য ও নিশ্চয়তা স্মরণ করিয়া নহে?

আবেস্তায় দেখিতে পাই, দেব (Daeva) গণ এই ছায়ার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন (২০)। কিন্তু এই দেবগণ কে? ভারতবর্ষের 'দেব' এই একই কথা। এই কথা হইতেই ল্যাটিন dus ও আমরা ক্রমে deity ও divine পাইয়াছি। তবে এই দেবগণকে সত্যপথ বিচ্যুত কেন বলা হইয়াছে? আমাদের Moultonএর মতকে সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ধারণাশক্তির বিপর্য্যয়ে ও বিকৃত ব্যাখ্যায় বহু দেবের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। পারসিক ও ভারতীয়দের একই পূর্ব্বপুরুষগণ যে বেদের প্রকৃত বন্দনার অন্তরালে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেন তাহা কালক্রমে নিম্নজাতির স্থূল ধারণার সংস্পর্শে বহু দেবতায় পরিণত হইল। তাহারা অত্যাচারের অনাচারের পূর্ব্বেও সে সকল দেবতার আশীস্ প্রার্থনা করিত। এই সময়ে ভগবান জরথুষ্ট্রদেব ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। তিনি যে এই ভীতিবাদ কামনাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া অমন উক্তি করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? (২১) আর তাই তিনি সর্ব্বসময়ে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুইটী সংজ্ঞা ব্যবহার না করিয়া, উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি ভগবান জরথুষ্ট্রদেব কর্ম্মযোগী—তিনি বাস্তব জগতে বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এই বিপুল সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন। তিনি 'অশা' পথকে লক্ষ্য করিয়া এই বিশ্বজগতের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চান।—তাঁহার মতে প্রত্যেক প্রাণীর ব্যক্তিগত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে এই সাধনার বীজ উপ্ত আছে, কেহ কাহারও কর্ম্ম বা আচরণের জন্য দায়ী নহে। তাঁহার মতে কর্ম্মের দ্বারা এই অশুভের ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। (২২)

বিশ্বে এই চিরন্তন ব্যক্তিগত সংগ্রামে তাঁহার অস্ত্র তিনটী। শুদ্ধ বাক্য, শুদ্ধ চিন্তা ও শুদ্ধ কার্য্য; এই তিনের সংমিশ্রণে যে একটা বিরাট শক্তি গড়িয়া উঠে; প্রাণে, মনে, আত্মায়, কর্ম্মে যে একটা উদাত্ত ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে; তাহার রুদ্রতালের পদাঘাতে সমস্ত অশুভের বিলয় অতি অবশ্যম্ভাবী।

(২০) Between these two spirits the Dævas also those not aright for infatuation came upon them as they took counsel together, so that they chose the worst thought. Then they rushed together to violence, that they enfeeble the world of men, Yasna XXX 6,

(২১) Moulton, Teachings of Zarathustra p, 24,

(২২) We must fight and never stop fighting, till Evil lies prostrate and slain beneath the feet of God.
Moulton p, 28,

প্রায় প্রতি ধর্ম্মেই এই তিনটী সংজ্ঞায় অত্যন্ত কদর্থ হইয়া মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের সাতিশয় সঙ্কোচসাধন করিয়াছে। শুদ্ধ কার্য্য বলিতে অনেকাংশে এবং অনেক স্থলেই মাত্র বিচারহীন বলি ও পূজা বুঝা যায়; শুদ্ধ বাক্য বলিতে শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও প্রাণহীন মন্ত্র উচ্চারণই নির্দ্দেশ করে; আর শুদ্ধ চিন্তা খানিকক্ষণ অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অথবা নিরর্থক বিষয়ের ধ্যানেই পর্য্যবসিত।

কর্ম্মযোগী জরথুষ্ট্রদেবের মতে এগুলি অত্যন্ত ভ্রষ্টাচার;—ইহাদের সহিত মানবের মনোবিকাশের বা আধ্যাত্মিক জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাঁহার মতে একবার জমি কর্ষণে যে সাধু কাজ সাধিত হয়, অন্য কোনও বলিকার্য্যে তাহা হয় না; ব্যথাতুরকে একটী মাত্র সান্ত্বনা বাক্যে যে শুদ্ধ বাক্য বলা হয়, অন্য কোনও মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে তাহার সমতুল্য নহে। আর বাস্তবজগতের মাঝখানে মানব হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় ও মহত্ত্বের পথ চিন্তাতে পরমেশ্বর যত সন্তুষ্ট হয়েন, তত আর যোগী ঋষিদের ধ্যান ধারণায়ও হয়েন না। (২৩)

আধুনিক এই বস্তুতন্ত্রতার দিনে, মানবের কাছে এই নীতিসুধা কত মূল্যবান—এমন আর্থিক ও পারমার্থিক ভাবের একত্র সমাবেশ সুদুর্লভ—এই মহাপ্রাণের ধর্ম্মসাধনা মানবের প্রাণে প্রাণে আশার বাণী জড়াইয়া আনে—কর্ম্মে প্ররোচনা জন্মায়—সর্ব্বভাবে সকলকে সকল যুগে, সাধনায় ও জ্ঞানে মানুষ নামের উপযোগী করিয়া জীবন সার্থক করে।

এই অসৎবৃত্তি মানুষকে চিরদিন জগতের বৈভব ও সুখচিত্রের ব্যপদেশে ছলনা করে। সর্ব্বদেশে, যুগে যুগে ঋষি মহর্ষিদিগকে টলাইতে চেষ্টা করে; মহাত্মা বুদ্ধদেব মহাত্মা খৃষ্ট, ভগবান জরথুষ্ট্রদেব কাহাকেও বিচলিত করিতে সে কম প্রচেষ্টা করে নাই;—কিন্তু সকলই ব্যর্থ! সত্যের নিকট চিরদিনই অসত্যকে মস্তক নোয়াইতে হয়, ধর্ম্মের পদে অধর্ম্মকে চিরদিনই অবনত হইতে হয়।

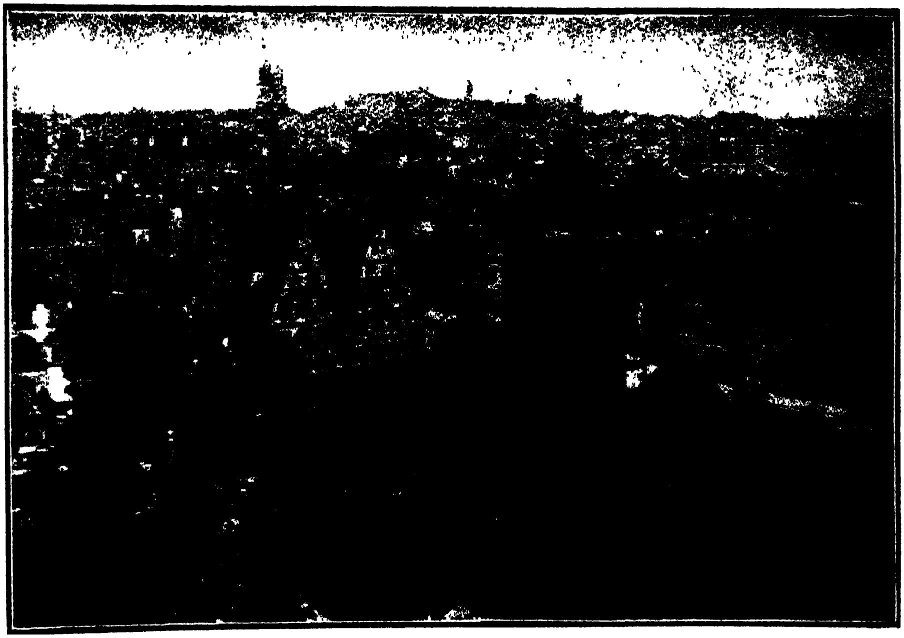
তাই নদীর উত্তাল তরঙ্গকে সংযত করিয়া কলকব্জার প্রভাবে যেমন বিদ্যুতের একটা সংহত শক্তিলাভ করা যায়, তেমনি এই বিরাট প্রবৃত্তির তরল গতিকে সংযত করিয়া, সেই গতিরোধ-উৎসারিত একটা প্রচণ্ড শক্তিকে সত্যের দিকে অগ্রসরে সাহায্য করিতে দিতে হইবে, নিরন্তর সাধনার দ্বারা বিকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়তা ও পঙ্গুতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া সার্ব্বজনীন সনাতন শৃঙ্খলার পথে সত্যের আলোকাশ্রয়ে শুদ্ধি ত্রয়ীর সংরক্ষণে অগ্রসর হইতে হইবে, আর তাহাতেই এই দ্বৈতবাদের সমাধান হইয়া এই দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের অতীত, দ্বৈতধারায় পরস্পরে যে অখণ্ড এক একত্বের ও অদ্বৈতের সুপ্রকাশ, তাহার দিকে সমস্ত জগত পরিচালিত ও আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

(২৩) Moulton p, 29,

ন্যুরন্‌বেয়ার্গ (Nurnberg)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ইয়োরোপের প্রাচীন নগর সমূহের মধ্যে ন্যুরন্‌বেয়ার্গের একটি বিশেষ স্থান আছে। মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁসের সময় ইয়োরোপের মধ্যে তার যে গৌরবময় প্রধান স্থান ছিল, এখন তার সে-রকম প্রাধান্য নাই বটে, কিন্তু এ যুগের ন্যুরন্‌বেয়ার্গের নাম পৃথিবী-পরিচিত। ন্যুরন্‌বেয়ার্গের খেলনা, ন্যুরন্‌বেয়ার্গের পেন্সিল, ন্যুরন্‌বেয়ার্গের নানা যন্ত্রপাতি পৃথিবীর চারিদিকে পণ্যদ্রব্যরূপে ছড়ান। রোথেনবুর্গের মত ন্যুরন্‌বেয়ার্গে মধ্যযুগের সহরের পূর্ণ রূপ দেখা যায়



ন্যুরন্‌বেয়ার্গ—রমণী দরজা

না বটে, কিন্তু এখানে প্রাচীন ও নবীনের সম্মিলনে সহরটি বড় সুন্দর। তার প্রাচীন দেওয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে; তার ওপর দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গেছে; তার পুরাতন খাত অনেক জায়গায় মাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পুরাতন গির্জ্জা, পুরাতন বাড়ীর সারি, পুরাতন দেওয়ালের ভাঙা অংশ, পুরাতন তোরণ-দ্বার, আর পুরাতন স্মৃতিজড়িত হয়ে সহরটি পরম রহস্যময়।

ডুরার (Durer) ও হান্স সাক্‌সের এই সুন্দর সহর মধ্যযুগে ও রেনেসাঁসের সময় ইয়োরোপের আর্টের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু ব্যবসার প্রধান স্থান বলেই তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হয়। জার্ম্মানীতে একটি প্রাচীন বচন আছে, "Nurnbergs Hand geht durch alle Land." অর্থাৎ ন্যুরন্‌বেয়ার্গের হাত সকল দেশে যায়। ন্যুরন্‌বেয়ার্গের জিনিষ দেশবিদেশে রপ্তানি হত। উত্তর ইয়োরোপের সহিত দক্ষিণ-ইয়োরোপের, জার্ম্মাণীর সহিত ভেনিস ও এসিয়ার পণ্য বিনিময়ের প্রধান ব্যবসায়ের পথ ছিল ন্যুরন্‌বেয়ার্গ।

ন্যুরন্‌বেয়ার্গের অতি প্রাচীন ইতিহাস সঠিক কিন্তু জানা যায় না। এগারো শতাব্দীর সময় থেকে তার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায়। তখন পেগনিৎস (Pegnitz) নদীর ধারে নিবিড় বনের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর এক দুর্গ-প্রাসাদ ও তাহার তলায় ছোট নগর গড়িয়া

উঠিয়াছে মাত্র। এই সময় জার্ম্মাণীর কাইজার তৃতীয় হেনরী মুরনবেয়ার্গকে ব্যবসার বাজার বসাইবার, শুল্ক তুলিবার ও মুদ্রা তৈরী করিবার অধিকার দেন। এই ব্যবসার কেন্দ্র হইবার অধিকার পাইয়া নগরের বৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত হইতে লাগিল। দেশ-বিদেশের মহাজন ব্যবসাদারেরা এখানে বসবাস আরম্ভ করিল। পাহাড়ের ওপর দুর্গ-প্রাসাদের কোন প্রাধান্য রহিল না; পাহাড়ের তলায় নদীর ধারে সেণ্ট সেবল্ডের গির্জ্জা ঘিরিয়া যে ব্যবসার নগর গড়িয়া উঠিল, তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধনসম্পদে শক্তিতে ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর হইয়া উঠিল।

একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে থাকিতেন। বারবারোজা হোয়েনজোলারেন বংশীয় এক কাউণ্টকে এই পদে নিযুক্ত করেন। এই দুর্গাধিপতি দুর্গরক্ষক ও সৈন্য-শাসনকর্ত্তারূপে থাকিতেন; নগরের ওপর তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিলনা। বারবারোজার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডরিক মুরনবেয়ার্গে তাঁহার প্রথম রাইস্‌টাগের অধিবেশন করেন। সেই সমারোহের সময়, মুরনবেয়ার্গ সম্রাটের নিকট হইতে স্বাধীন নগররূপে সনদ (charter) প্রাপ্ত হয় (১২১৯)। এই সনদ অনুসারে, নগর সম্রাটের অধীন হয়, নগর-শাসনের জন্য তিনি এক



পেগনিস

প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই প্রতিনিধি ও নগরের কাউন্সিলের হাতে নগরের শাসনভার অর্পিত হয়। কার্য্যতঃ নগরের কয়েকটি ধনী অভিজাতবংশের মধ্যে (Patrician families) নগর-শাসনের সকল শক্তি আবদ্ধ থাকে। নগরের কাউন্সিলের সভ্য হওয়া তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার হয়। কয়েকটি ধনী ব্যবসাদার-বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী নগর শাসন করিয়া আসিয়াছেন। নগরের সকল ব্যবসাসংঘের (civic guilds) প্রতিনিধিদের ক্ষমতা তাঁহারাই কাড়িয়া লইয়া একছত্র আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। চোদ্দ শতাব্দীতে এই ধনীবংশীয়দের একছত্রাধিপত্যের

বারো শতাব্দীতে যখন মুরনবেয়ার্গ হোয়েনষ্টাউফেন রাজবংশের অধিকারে আসিল, তখন এ নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। হোয়েনষ্টাউফেনবংশীয় জার্ম্মাণ সম্রাটগণের এ সহর অতি প্রিয় ছিল। সম্রাট কনরডের সময় সহরের আয়তন বাড়াইতে হয়, পুরাতন দেওয়াল ভাঙিয়া নূতন দেওয়াল গড়িতে হয়। প্রসিদ্ধ সম্রাট বারবারোজা মুরনবেয়ার্গের দুর্গ-প্রাসাদে মাঝে মাঝে বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পুরাতন দুর্গের যে অংশ দেখা যায়, তার অনেক অংশ তাঁর গড়া বলিয়া কথিত।

মুরনবেয়ার্গের 'দুর্গাধিপতি' (burggraf) নামে

বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ হয়; কিন্তু সম্রাটের সাহায্যে সে বিদ্রোহ দমন করিয়া অভিজাত-ব্যবসাদারবংশেরা আবার নগরের শাসন-শক্তি অক্ষুণ্ণভাবে প্রাপ্ত হন। ১২১৯ হইতে ১৮০৬ পর্য্যন্ত নুরন্‌বের্য়াগ সম্রাটের স্বাধীন সহর রূপে ছিল। ১৮০৬তে নেপোলিয়নের আদেশ অনুসারে তাহা বাভেরিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া বাভেরিয়ার রাজার অধীন হয়।



লোরেন্‌জ গির্জ্জা

চোদ্দ শতাব্দীতে সম্রাট চতুর্থ চার্লস এই নগরে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্বর্ণ-খণ্ড-লাঞ্ছিত ঘোষণাপত্র (Golden Bull) প্রচার করেন। এই শতাব্দীতে নুরন্‌বের্য়াগ আরও অনেক স্বত্ব-শাসনের অধিকার লাভ করিল। নগরের কাউন্সিলের হাতে বাজার-শাসন, শান্তিরক্ষা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি সকল ক্ষমতা আসিল। পনেরো শতাব্দীর প্রথমে নুরন্‌বের্য়াগের 'দুর্গাধিপতি' ব্রানডেনবুর্গের মার্কগ্রাফ হওয়াতে, দুর্গ নগরকে বেচিয়া দিয়া যান; কিন্তু তিনি নগরের ওপর কতকগুলি অধিকার ছাড়িলেন না। এই বিষয় লইয়া পরে তাঁহার বংশধরদের সহিত নুরন্‌বের্য়াগের বিরোধ ও যুদ্ধ হয়। ইহাতে নগরের ক্ষতি হইলেও, নগরের শ্রী ও শক্তিসম্পদ বাড়িয়া যাইতেছিল। পনেরো ও ষোল শতাব্দী নুরন্‌বের্য়াগের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। এই সময় তাহার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল। যেমন ব্যবসায়ে তেম্নি আর্টে তাহার খ্যাতি ইয়োরোপ জুড়িয়া হইয়াছিল। সম্রাট মাক্সিমিলিয়ন ও তাঁহার বংশধরদের সময় নুরন্‌বের্য়াগের গৌরব-রবি মধ্য-গগনে। চিত্রশিল্পী ডুরার, ভাস্কর আডাব এক্রাফট, দারু-শিল্পী ষ্টস, তাম্র-শিল্পী ফিসার, মুচি-কবি হান্স সাক্স—সকলেই এই সময়ের।

ষোল শতাব্দীর প্রথমে লুথার নুরন্‌বের্য়াগে আসেন; নুরন্‌বের্য়াগ লুথারের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তারপর কৃষকদের যুদ্ধ (Peasants' War) ও ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ (Thirty years' War) আসিল। কৃষকদের যুদ্ধে নুরন্‌বের্য়াগ রোথেনবুর্গের মত কৃষকদের পক্ষ লয় নাই; কৌশল করিয়া অর্থ দিয়া নুরন্‌বের্য়াগ কৃষকদের আহ্বান ও ধ্বংসলীলা হইতে বাঁচিল। কিন্তু ত্রিশবৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের পর নুরন্‌বের্য়াগ ভগ্ন শক্তিহীন হইয়া পড়িল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও প্রথমে নুরন্‌বের্য়াগবাসীরা প্রটেষ্টাণ্ট নগর ও রাজাদের লাগে যোগ দিতে, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজী হইল না। যুদ্ধে যোগ দিলে তাহাদের ব্যবসার ক্ষতি হইবে বুঝিয়া তাহারা কোন পক্ষে থাকিতে চাহিল না। প্রটেষ্টাণ্ট সহর হইলেও জার্ম্মান সম্রাট ১৫৪১ অব্দে এখানে তাঁর রাইসটাগের অধিবেশন করেন। নগরবাসীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে এবং তাঁহাকে অর্থও দেয়। এদিকে প্রটেষ্টাণ্ট রাজারা যখন নুরন্‌বের্য়াগকে তাহাদের দলে আসিতে, তাহাদের সাহায্য করিতে আহ্বান করে, নুরন্‌বের্য়াগ তাহাদেরও গোপনে প্রচুর অর্থ পাঠায়। কিন্তু অর্থসাহায্য ব্যতীত, প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যাইতে সৈন্য দিতে রাজী হইল না। অর্থ দিয়া সে সম্রাটকে ও প্রটেষ্টাণ্ট রাজাদের দু'পক্ষকেই

সন্তুষ্ট রাখিতে কিছুদিন চেষ্টা করিল; কিন্তু বেশী দিন এ নীতি চলিল না। নুরনবেয়ার্গের পুরাতন শত্রু ব্রানডেনবুর্গের মার্কগ্রাফ প্রটেষ্টাণ্টের দলের। তিনি বলিলেন, যে আমাদের দলে যোগ না দিবে সে আমাদের শত্রু। তিনি নুরন্‌বেয়ার্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। তাহাতে নুরন্‌বেয়ার্গ প্রটেষ্টাণ্টদের দলে যোগ দিতে রাজী হইল।

কিন্তু ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে নুরন্‌বেয়ার্গের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। নুরনবেয়ার্গ প্রথমে যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ দিতে রাজী হইল না। গষ্টভস্ অডলফসকে প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া যুদ্ধ যোগ না দিবার চেষ্টা করিল। সম্রাটের শত্রুতা করিতে রাজী হইল না। কিন্তু যখন গষ্টভস্ অডলফস (Gustavus Adolphus) জানাইলেন, নিরপেক্ষ থাকিলে তিনি নুরন্‌বেয়ার্গকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন, তখন নুরনবেয়ার্গকে গষ্টভসের দলে যোগ দিতে হইল। যেদিন তিনি সহরে প্রবেশ করিলেন (১৬৩২) সেদিন সমস্ত সহর জুড়িয়া আনন্দ-উৎসব পড়িয়া গেল, তাঁর ছবি ঘরে ঘরে ঝুলিতে লাগিল।

কিন্তু কয়েক মাস পরে নুরনবেয়ার্গের পরম দুর্দ্দিন আসিল। ক্যাথলিক সেনাপতি ভালেনষ্টাইন্ বোহেমিয়া হইতে আসিয়া প্রটেষ্টাণ্ট নৃপতিকে নুরন্‌বেয়ার্গে অবরোধ করিয়া বসিলেন। গষ্টভসের বিশ হাজার সুইডিস সৈন্য ও নগরের জনসংখ্যা ৬৫ হাজারের ওপর। অবরোধের ফলে খাদ্যদ্রব্য শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। দুর্ভিক্ষ, মহামারি আরম্ভ হইল। দুই মাস ব্যাপী অবরোধে নুরন্‌বেয়ার্গে অনাহারে, রোগে দশ হাজারের ওপর লোক মরিল,—পথে ঘাটে মৃতদেহ পচিতে লাগিল। অবশেষে খাদ্যাভাবে গষ্টভসকে নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল।

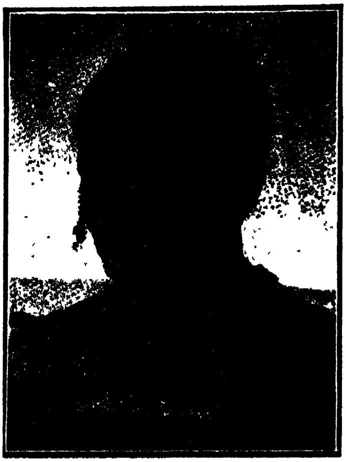
ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ যখন ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধিপত্রে গষ্টভসের দলের জয়ে শেষ হইল, তখন নুরন্‌বেয়ার্গের রাট হাউসে এক প্রকাণ্ড ভোজ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সহরের আর পূর্ব্ব শ্রী-সম্পদ নাই। তাহার বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ; তার ওপর ঋণভার চাপিল। তাহার গৌরবের দিন শেষ হইয়া আসিল। ১৬২২ অব্দে তাহার জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার, ১৮০৬ অব্দে তাহা পঁচিশ হাজার মাত্র। যুদ্ধের সময় তাহার ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার পর এসিয়ার সহিত জলপথে বাণিজ্য করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে, ভেনিসের মত নুরন্‌বেয়ার্গেরও বিশেষ ক্ষতি হইল।

বর্ত্তমান সময়ে নুরন্‌বেয়ার্গ বাভেরিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়



ক্লাইস ব্রুকে

সহর। তার জনসংখ্যা ৩৬০ হাজার। নুরনবের্য়ার্গ হইতে ফুর্থ রেললাইন ১৮৩৫ অব্দে খোলা হয়। এইটি জার্ম্মাণীর



তরুণী (ডুরার)

মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন রেললাইন। নুরনবেয়ার্গ জার্ম্মাণীর অপর নগরের সহিত সমানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নূতন নগর নয়, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন জড়িত সেই মধ্যযুগের নগর, ডুরার, হান্স সাক্সের নগর দেখিতেই দেশবিদেশ হইতে ভ্রমণকারীরা নুরনবেয়ার্গে আসে। তাহার চারিদিকে ট্রাম লাইন ঘিরিয়াছে; তাহার পাশে কল-কারখানার চিমনী উঠিয়াছে। তাহা হইলেও নুরনবেয়ার্গের অতীতের মায়া, মধ্যযুগের স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য যায় নাই।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইলেই সহরের রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। সম্মুখে এক বৃহৎ খাত, প্রায় পঞ্চাশ ফিট গভীর ও একশত ফিট চওড়া। এই বৃহৎ খাত পুরাতন সহর ঘিরিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাইল ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। এ খাতটি পনেরো শতাব্দীতে তৈরী। এক প্রাচীন নুরনবেয়ার্গবাসী ১৪৫২ অব্দে লিখিয়াছিলেন, এই বৎসর আমাদের নগর ঘিরিয়া খাতটির তৈরী শেষ হল। ইহা গড়িতে ২৬ বৎসর লাগিল। শত্রুদের এ খাত পার হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। এখন অবশ্য এ খাত ইঁট বাঁধান সুন্দর বেড়াবার রাস্তা; তার গায়ে সবুজ ঘাস ভরা, রঙীন নানা ফুল ফুটিয়াছে।

খাতের পরে ফ্রাউয়েন টার (Frauen Tor) বা রমণী-দরজা, পুরাতন নগরের প্রবেশদ্বারগুলির মধ্যে একটি বড় দ্বার, প্রাচীন দেয়ালের কিছু অংশ ও একটি কালো গম্ভীর-মূর্ত্তি তোরণ শত শত বৎসরের বৃদ্ধ প্রহরীর মত জাগিয়া রহিয়াছে। কালো বৃহৎ তোরণটি একটা বৃহৎ হস্তীর মত; তার বেড় ২০০ ফিটের অধিক। এখন সেখান হইতে কোন কামান গর্জ্জন করে না, বন্দুক হাতে প্রহরীরা জাগিয়া নাই বটে, কিন্তু তাহার ভীম-গম্ভীর রূপ দেখিলে কত শত যুদ্ধের নিদারুণ স্মৃতি জাগিয়া ওঠে।

সহর-ঘেরা খাতটি কিরূপ ভাবে তৈরী হইয়াছিল, তাহার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২৭ অব্দে সহরের কাউন্সিল এক নিয়ম প্রচার করেন যে, সহরের এক নূতন খাত



মেরীর গির্জ্জা

কাটিতে হইবে। তাহার জন্য প্রত্যেক নগরবাসী পুরুষ ও নারীকে তাহাদের বার বৎসরের অধিক বয়স্ক সকল পুত্র কন্যা ও সকল দাস দাসী, পরিবারের লোক লইয়া, বৎসরের মধ্যে একদিন করিয়া কাজ করিতে হইবে। যে কাজ করিতে পারিবে না, তাহাকে কাহাকেও বদলী দিতে হইবে। অবশ্য ধনীরা অথবা ধনীদের স্ত্রীরা মজুরদের মত কাজ



সুন্দর ফোয়ারা

করিতে রাজী হইল না। সুতরাং পরে ঠিক হইল, যে কাজ করিবে না তাহাকে দশ ফেনিং করিয়া দিতে হইবে।

তোরণ-দ্বার পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। লাল টালির ছাদওয়ালা ত্রিকোণ ছাদের (gabled) বাড়ীর সারির পর সারি। রোথেনবুর্গের মত একটা স্বপ্নের সহর মনে হয় না বটে, কিন্তু বাস্তবতার ওপর অতীত যুগের মায়া প্রাচীনদিগের গন্ধ মেশান বলিয়া চারিদিক চাহিয়া অন্তর দুলিয়া ওঠে। কোথাও একটি বারো শতাব্দীর তোরণ, কোথাও একটি তেরো শতাব্দীর গির্জ্জা, কোথাও একটি চোদ্দ শতাব্দীর বাড়ী, কোথাও একটি পনেরো শতাব্দীর ফোয়ারা, কোথাও একটি ষোল শতাব্দীর সেতু—এম্নি সব পুরান দিনের জীবন ও আর্টের সব স্মৃতিচিহ্ন মন উদাস করিয়া তোলে।

একটি সুন্দর পুরাতন গির্জ্জার সম্মুখে আসিলাম। সেণ্ট লোরেঞ্জ চার্চ্চ (St. Lorenz Kirche) তেরো শতাব্দীতে তৈরী আরম্ভ হইয়াছিল। সম্মুখের তোরণ-দ্বার চোদ্দ শতাব্দীর। আড়াই শ' ফিট উঁচু তাম্রমণ্ডিত তোরণ-দ্বার উর্দ্ধে নীলাকাশের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; সূর্য্যের আলোয় ঝকমক করিতেছে। চোদ্দ শতাব্দীর তৈরী বাইবেল-দৃশ্য-খোদিত পাথরের দরজার ওপর একটি সুন্দর গোল জানলা; তাতে বৃহৎ রঙীন চিত্রিত কাচ লাগান, তার ব্যাস ৩৩ ফিট। দরজার গায়ে খোদিত চিত্রগুলি দেখিলে বোঝা যায়, মধ্যযুগে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কি নিবিড় গভীর সম্পর্ক ছিল। দরজার মাঝখানে একটি ছোট স্তম্ভে শিশু-কোলে মাতা মেরীর মূর্ত্তি। তার দুপাশে যিশুর জন্ম, শিশু-সন্তানদের হত্যা ইত্যাদি ছবি। তার ওপরে মাঝে ক্রুশে যিশুখৃষ্ট ও দুপাশে পাইলেটের সম্মু'খ যিশু, যিশুর সমাধি, ইত্যাদি ছবি। মূর্ত্তিগুলি গভীর ভক্তি ও নিপুণতার সহিত খোদিত। কত শান্তিহারা ধর্ম্মপিপাসু নর-নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী গির্জ্জার এই দ্বারের সুন্দর রূপ দেখিয়া মনে শান্তি পাইয়াছে। শুধু ধর্ম্মের দিক দিয়া নয়, আর্টের দিক দিয়াও চার্চ্চটি সুন্দর; জার্ম্মাণ গথিক স্থাপত্য-শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

গির্জ্জা ছাড়াইয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িলাম। পেগনিৎস নদীটি একটি খালের মত; পুরাতন সহরকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া মাঝখান দিয়া গিয়াছে। নদীর দুই ধারের বিভিন্ন অংশ, দুটি প্রধান গির্জ্জার নামে বলা হয়,

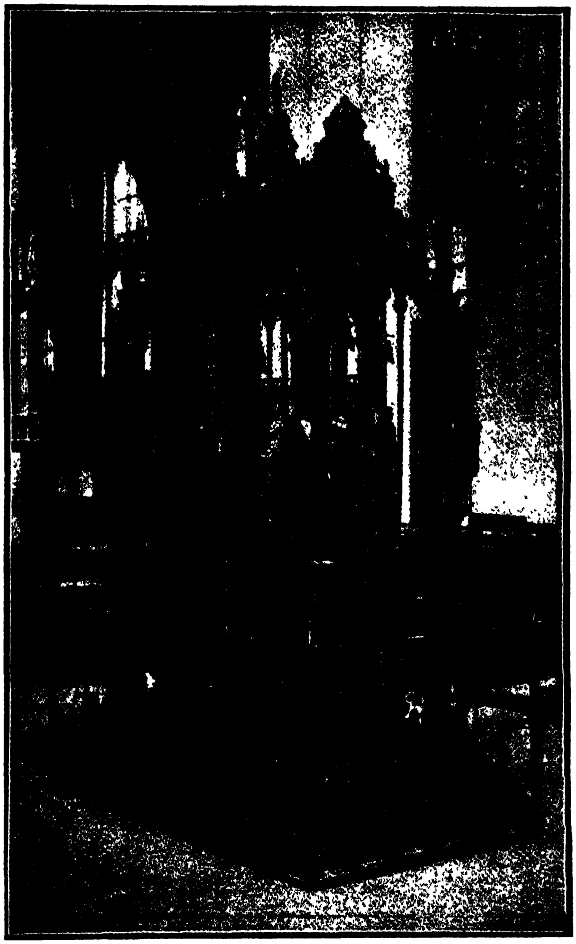
—এক দিক লোরেনৎস-পাড়া, অপর দিক সেবাল্ড-পাড়া। সেবাল্ড পাড়াই হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন অংশ। সেণ্ট সেবাল্ড হচ্ছেন ন্যুরনবের্গের অধিষ্ঠাতা দেবতা, নগর রক্ষক সাধু। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত যে চার্চ্চ আছে তার কথা পরে বলিব।

নগরের দুই অংশ যোগ করিয়া ছোট্ট নদীর ওপর যে কয়েকটি ছোট পোল আছে, তার মধ্যে ফ্লাইস ব্রুকে (Fleisch brucke) বা মাংস সেতু খুব সুন্দর। এ সেতুটি ভেনিসের রায়াল্টো-সেতুর অনুকরণে তৈরী। সেতুর নিকট একটি গেটের ওপর একটি বৃহৎ বৃষের মূর্ত্তি আঁকা আছে। তার তলায় লাটিনে একটি হাস্য-বচন লেখা,—সব জন্তু ছোট হইয়া জন্মে, তার পর বাড়িয়া ওঠে; কিন্তু দেখ, এই বৃষ কখনও বাছুর ছিল না।

পোলের উপর দাঁড়াইয়া দুধারে পুরান রহস্যময় বাড়ীর সারি ও স্তব্ধ জলে তাদের শান্ত ছায়া বড় সুন্দর লাগিল। লালটালির (gabled) ছাদওয়ালা হলদে সাদা ধূসর কালো বাড়ীগুলি কাচের মত স্বচ্ছজলের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বারান্দার তলা দিয়া জল ঝিকমিক করিতেছে। বাড়ীর ছায়ার সঙ্গে নীলাকাশের সাদামেঘের ছায়া মিশিয়া গিয়াছে। কত শতাব্দীর কত পরিবারের সুখ দুঃখের জীবনধারার স্মৃতিজড়িত এক একটি ধূসর বাড়ী যেন অতীত কালের একটি টুকরা স্থির আট্‌কা পড়িয়া আছে। তার পাশ দিয়া অনন্ত কালের চিরবহমান ধারা টলমল করিয়া চলিয়াছে।

পোল পার হইয়া অতি পুরাতন সহরে গিয়া পড়িলাম। হাউপ্ট-মার্কট্‌ বা বাজার বসিবার বৃহৎ প্রাঙ্গণটি যেমন জনবহুল, তেমি প্রাচীন কালের গন্ধভরা।

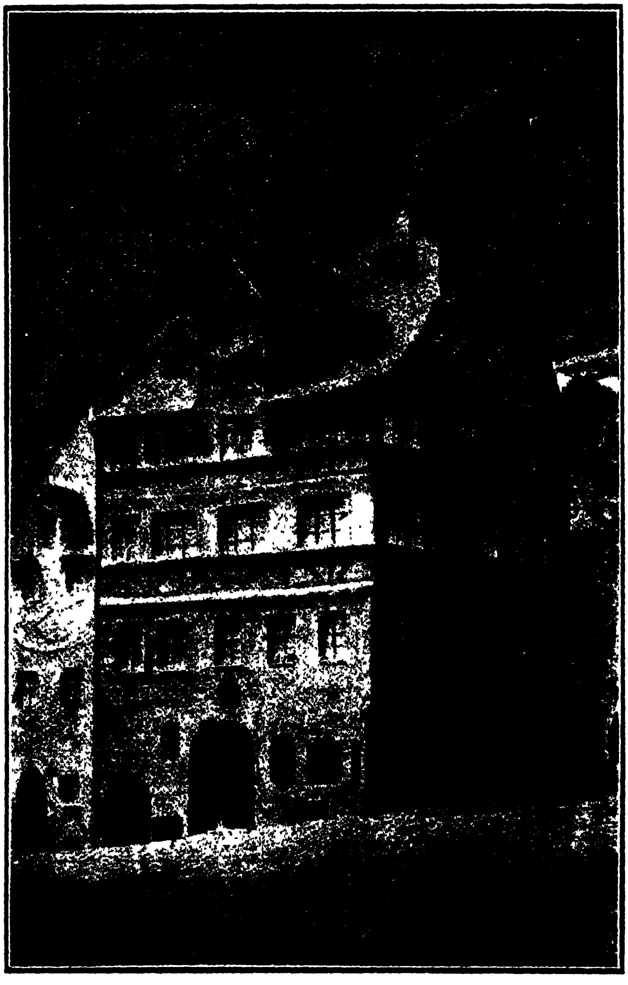
বাজারের একদিকে ফ্রাউয়েন কির্‌সে (Frouen kirche) বা মেরীর চার্চ্চ, একটি ছোট সুন্দর গথিক চার্চ্চ। এই জায়গায় আগে ইহুদীদের একটি ধর্ম্মমন্দির ছিল। তাহা ভাঙ্গিয়া চোদ্দ শতাব্দীতে এই চার্চ্চ তৈরী হয়। চার্চ্চের দরজার অংশ পাথরের ওপর সুন্দর কাজ করা। লোরেনজো চার্চ্চের দরজায় দেখিয়াছি যিশু-জীবনের ঘটনা খোদাই করা: এই চার্চ্চের দরজায় মেরীর জীবনের নানা ঘটনা খোদাই করা। দরজার ওপরে একটি সুন্দর আশ্চর্য্যকর ঘড়ি আছে। এ ঘড়ির কথা সহরের সকল ছেলেমেয়েদের জানা। সম্রাট চতুর্থ চার্লস ন্যুরনবের্গে তাঁর প্রসিদ্ধ Golden bull প্রচার করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মরণ-চিহ্নরূপে এই ঘড়িটি তৈরী হয়। প্রতিদিন যেই বারটা



সেণ্ট সেবাল্ডের অস্থির আধার

বাজে, বন্দীরা (heralds) আসিয়া তাদের trumpets বাজায়; সম্রাট আসিয়া রাজসিংহাসনে বসেন; তাঁর রাজদণ্ড তোলেন, আর সাতজন Electors একে একে বাহির হইয়া সম্রাটের সম্মুখে মাথা নত করিয়া চলিয়া যায়। এই পুরান আমলের ঘড়িটি ষোল শতাব্দীতে বেশ ভাল করিয়া তৈরী হয়।

এইখানে বলি, মুরন্‌বেয়ার্গেই ঘড়ির প্রথম সৃষ্টি হয়। এক মুরন্‌বেয়ার্গবাসী প্রথম ঘড়ি তৈরী করেন। ঘড়িকে সেইজন্য আগে ইয়োরোপে 'মুরনবেয়ার্গের ডিম' (Nurnberg's egg) বলিত। শুধু ঘড়ি নয়, এয়ার গান্



ডুরায়ের বাড়ী

(air gun) গ্লোব, তামা (brass) ইত্যাদি অনেক জিনিষ মুরন্‌বেয়ার্গবাসীদের প্রথম উদ্ভাবিত।

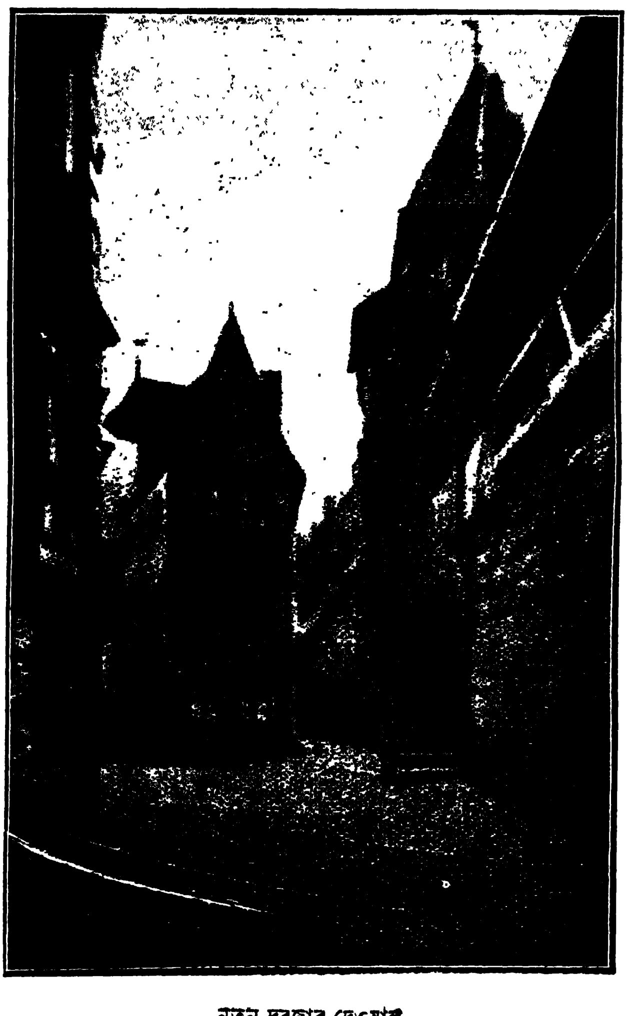
গির্জ্জার জানালাগুলিতে চিত্রিত রঙীন কাচগুলি সুন্দর। কাচের ওপর নানাবর্ণের ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র আঁকা। সাধুদের মূর্ত্তি আঁকা মধ্যযুগের এক বিশেষ আর্ট ছিল। এই আর্টেও মুরন্‌বেয়ার্গ বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু এই বাজার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইহুদী নির্য্যাতনের এক কলঙ্কের ইতিহাস। তেরো শতাব্দীতে মুরন্‌বেয়ার্গে অনেক ইহুদী ছিল। যখন জেরুজিলাম-জয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) আরম্ভ হয়, তখন ইহুদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়িয় যায়। তাহাদের বিশেষ বেশ পরিতে হইত; তাহারা লম্বা দাড়ি রাখিতে পারিত না। তাহারা সম্রাটের প্রজা বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের রক্ষার জন্য সম্রাটকে বিশেষ কর দিতে হইত। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইহুদী-সম্প্রদায় খুব ধনী হইয়া উঠিতেছিল। সুদে টাকা ধার দেওয়া তাহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল। বর্ত্তমানে যেখানে খোলা বৃহৎ বাজারের জায়গা, সেখানে তাহাদের গির্জ্জা বাড়ীর সারি, দোকানের সারি ছিল। সহরের মাঝখানে ইহুদীদের এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকা, নগরবাসীদের মোটেই পছন্দ হইত না। তা'ছাড়া অধিকাংশ লোকই ইহুদীদের নিকট টাকা ধারিত; তাহার সুদ বাড়িয়াই যাইতেছিল। গোপনে সম্রাটের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, নগর-বাসীরা ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের সব বাড়ীঘর ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করিল। সেণ্ট নিকোলাস ইভেতে তাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া অনেক ইহুদীকে পোড়াইয়া মারা হইল। তাহাদের বাড়ীঘর ভাঙিয়া পোড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানে খ্রীষ্টানদের বাজারের জায়গা হইল। ইহুদীদের সিনেগগ ভাঙিয়া সে জায়গায় খ্রীষ্টান চার্চ্চ উঠিল। চার্চ্চ, ফোয়ারা ও পুরাতন সুন্দর বাড়ীঘেরা এই জায়গাটির ইতিহাস নির্ম্মম ইহুদী-নির্য্যাতনের ইতিহাস। এই নির্য্যাতনের পরে ইহুদীরা কিছুদিন মুরন্‌বেয়ার্গে শান্তিতে বসবাস করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্রাট ও নগর কাউন্সিল সুবিধা পাইলেই তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। কিন্তু পনেরো শতাব্দীর শেষে তাহাদের প্রতি ঘৃণা অতি প্রবল হইয়া উঠিল, তাহাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

তাহারা সংখ্যায়ও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের ধন-সম্পদ প্রভূত হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের নিকট ঋণে বাঁধা। নগরবাসীদের ঘৃণা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, নগর কাউন্সিল জার্ম্মান সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন, সকল ইহুদীকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। সম্রাট সম্মত হইলেন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে সকল ইহুদীকে তাহাদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া নুরন্‌বের্গ হইতে চলিয়া যাইতে হইল। কেবল বহনযোগ্য সম্পত্তি তাহারা লইয়া যাইতে পারিল। সম্রাট তাহাদের বাড়ীঘর নগর-কাউন্সিলকে বেচিয়া দিলেন। তাহাদের সমাধি-ক্ষেত্রের ওপর বাড়ী উঠিল। তাহাদের সমাধিস্তম্ভের মালমসলা লইয়া শস্যের বাজার-বাড়ী (Corn Exchange) তৈরী হইল। বেশীর ভাগ ইহুদী ফ্রাঙ্কফোর্টে আশ্রয় লইল। নুরন্‌বের্গে কোন ইহুদীর বসবাসের অধিকার রহিল না। গত শতাব্দীতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর আবার ইহুদীরা নুরনবের্গে বসবাসের অধিকার পাইয়াছে।

বাজারের উত্তর দিকে যে 'সুন্দর ফোয়ারা' আছে, (Schoner Brunnen) তার কথা বলি। ফোয়ারাটি সত্যই সুন্দর; নুরন্‌বের্গের আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চোদ্দ শতাব্দীর তৈরী এই ফোয়ারাটি একটি আট কোণা গথিক স্তম্ভ; থাকে-থাকে ষাট ফিট উঠিয়া গিয়াছে। মাথায় একটি ছোট ক্রুশ। পাথরের এই সুন্দর ফোয়ারা যেন পৃথিবীর বুক হইতে এক জলোচ্ছ্বাসের মত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার খোপে খোপে নানা সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি সাজান। প্রথম স্তরে জার্ম্মানীর সাতজন Electors ও সার্লামেন, ডেভিস, সীজার প্রভৃতি নয়জন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর। দ্বিতীয় স্তরে মোজেস ও সাতজন ভবিষ্যৎ-বক্তা সাধু (prophets)। এই সুন্দর ফোয়ারা নগরবাসীদের জীবনের সহিত জড়িত। এই ফোয়ারার তলায় যে কূপ আছে, তার জলের বিশেষ গুণ ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহা ঘিরিয়া কত মহিলা মজ্‌লিস, কত সান্ধ্যবৈঠক বসিত। এখনও ইহা সহরের ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রিয়।

বাড়ীতে কোন শিশু জন্মিলে, সে কোথা হইতে আসিল এ বিষয়ে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসু হইলে, তাহাদের বলা হয়, তাহাদের নূতন ভাই বা বোন, বাজারের সুন্দর ফোয়ারার এক উপহার।

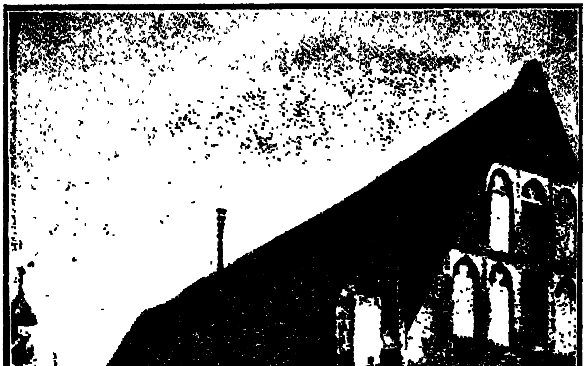


নূতন দরজার দেওয়াল

'সুন্দর ফোয়ারা' ছাড়িয়া রাটহাউসে আসিলাম। নগরের হর্ত্তাকর্ত্তা নগর-কাউন্সিলের এই লীলা-ভবন চোদ্দ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সতেরো শতাব্দী পর্য্যন্ত

অনেকবার ভাঙিয়া বাড়াইয়া গড়া। চোদ্দ শতাব্দীর সামান্য একটু অংশ আছে মাত্র।

কাউন্সিল প্রথমে গণ্যমান্য নগরবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত। তার পর ধীরে ধীরে নির্ব্বাচনের অধিকার ধনী-সম্প্রদায়, ব্যবসাদার ও জমিদার-সম্প্রদায়ের হাতে আসিল। তার পর ধীরে এই ধনী ব্যবসাদারদের মধ্যের কয়েকটি পরিবারে কাউন্সিল-নির্ব্বাচন-ক্ষমতা বদ্ধ হইয়া গেল। এই ব্যবসাদারদের অভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতে নগর-শাসন-অধিকার থাকিলেও, কাউন্সিল নগরের উন্নতি ও শ্রী ও জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে মনোযোগ দিতেন। তাঁহাদের অনেক নিয়ম ও কাজ সর্ব্বজনের হিতসাধক ছিল। সাধারণ স্নানাগার স্থাপন করা, দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা, সাধারণের সম্পত্তিরূপে মদের কারখানা করা, অশ্বের উন্নতির জন্য সাধারণ stallions রাখা ইত্যাদি নানা সাধারণ হিতকর কার্য্য তাঁহারা করিতেন।



ন্যুরনবের্গের সবচেয়ে পুরাতন রেস্তোরাঁ

রাট-হাউসে কাউন্সিলের অধিবেশনের সভাগৃহ অপেক্ষা, তাহার তলে, মাটির নীচে বন্দী করিয়া রাখিয়া, যন্ত্রণা দিয়া স্বীকারোক্তি লইবার যে ঘরগুলি (Torture chamber) আছে, সেই অন্ধকার গহ্বরগুলি মনকে বিশেষ অভিভূত করে। আলো লইয়া এই কবরের ঠাণ্ডা অন্ধকার বন্দীশালায় নামিতে হয়। ঘরের পর ঘর গহ্বরের পর গহ্বরের মত; এগুলি পরিষ্কার হইত না, বরফের মত ঠাণ্ডা থাকিত। ঘরের দরজার মাথায় নানা রকম জন্তু আঁকা, কোনটায় লাল মোরগ, কোনটায় কালো মোরগ আঁকা। কেহ কাউন্সিলের বিরাগভাজন হইলে বা কোন আইন ভঙ্গ করিলে, এই বন্দীশালায় তাহাদের বিচারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। কয়েকটি ঘর পার হইয়া যন্ত্রণা দিবার ঘরে আসিলাম। ওপরে লেখা—যন্ত্রণা দিবার ঘর (Torture chamber) ১৫১১। এইখানে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া বন্দীদের নিকট হইতে তাহাদের আইন-ভঙ্গ করা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি লওয়া হইত। ন্যুরনবের্গের পুরাতন দুর্গ-প্রাসাদে মধ্যযুগে যন্ত্রণা দিবার নানা প্রকার অস্ত্র দেখিয়াছি। যন্ত্রণা দিবার কতকগুলি ব্যবস্থার কথা বলি। হাতের তলায় জ্বলন্ত বাতি ধরা, গলায় জল ঢালিয়া দেওয়া, পায়ের তলায় জ্বলন্ত অঙ্গার দেওয়া—এ সকল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। যন্ত্র দ্বারা আঙুল বা দেহের কোন অংশ টিপিয়া পেষা, বন্দীকে শোয়াইয়া তাহার ওপর কাঠ ও পাথর চাপান, লোহার যন্ত্রে পা পুরিয়া হাতুড়ির ঘা দিয়া ভাঙা, লোহার তপ্ত ছেঁকে পা মোড়া, গেরো দেওয়া দড়ি দিয়া মাথা বাঁধা ও ঘোরান, বুকের ওপর ধারাল কোণা পাথর চাপান, লোহার শক্ত ছেঁকে বন্দীকে আটক করিয়া দাঁড় করিয়া রাখা ইত্যাদি নানা পৈশাচিক ব্যবস্থা দ্বারা বন্দীর নিকট স্বীকারোক্তি লওয়া হইত। বন্দীকে যন্ত্রণা দিবার ঘরে লইয়া আসিলে তাহার সহিত রাজকর্ম্মচারী

আসিত। সে বন্দীর স্বীকারোক্তি শুনিত বা লিখিয়া লইত। কিন্তু কেবল দৈহিক যন্ত্রণা দিয়া নয়, মানসিক যন্ত্রণা দিয়াও স্বীকারোক্তি লইবার ব্যবস্থা ছিল। বন্দীকে ঔষধ দিয়া না ঘুমাইতে দেবার ব্যবস্থা করা হইত। রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রাহারা হইয়া উন্মত্তের মত হইয়া বন্দী শেষে, তাহাকে যাহা বলিতে বলা হইত, তাহা বলিত। জার্ম্মাণীতে এখন অবশ্য মধ্যযুগের এই অমানুষিক পৈশাচিক ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন দেশ এখনও মধ্যযুগের অবস্থায় রহিয়াছে। বন্দীদের সব সময় ঠিক শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া না হইতে পারে; কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা দিবার ব্যবস্থা দূর হয় নাই।

আগেকার শাস্তির কথা কিছু বলি। পাপ হিসাবে শাস্তি দেওয়া হইত। মুখরা স্বামী-বিদ্রোহিনী স্ত্রীলোকদের মুখে এক প্রকার লোহার লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইত, তাহাতে কাঁটাওয়ালা লোহার পাত ঠিক মুখের ওপর পড়িয়া চাপিয়া থাকিত। চোরদের কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। ফ্রাইসে ক্রুকেতে এই কাণ-কাটা হইত। ধর্ম্ম বিষয়ে নিন্দা করিলে তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইত। মাতালামির শাস্তি মজার রকম ছিল। মাতালের গলা দিয়া এক বৃহৎ পিপে, 'The Drunkard's Clo.k' ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। বাদকেরা ভুল বাজাইলে তাহাদের আঙ্গুল যন্ত্র দ্বারা পেষণ কর হইত। স্বামীকে মারিলে স্ত্রীদের নানা মুখোস পরিতে হইত। দস্যুদের ঝুলান হইত; হত্যাকারীদের মাথা কাটিয়া ফেলা হইত। ভীষণ পাপীদের পাথরের চাকায় পেষা হইত। চার্চ্চের বিরুদ্ধে পাপীদের নগ্নপদে শূন্য মস্তকে চার্চ্চের দ্বারের সম্মুখে দড়িতে ঝুলাইয়া মারা হইত। জার্ম্মাণীর মধ্যে শেষ আগুনে পোড়াইয়া মারা হয় বার্লিনে ১৭৮৬ অব্দে।

মেয়েদের প্রাণদণ্ড হইলে তাহাদের জীবন্ত মাটিতে পোঁতা হইত। তবে জল্লাদ ইচ্ছা করিলে, তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারা হইত।

নুরন্‌বেয়ার্গের জল্লাদের পুরাতন হিসাব-বইতে দেখা যায়, ১৫৭৩-১৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩৬১ জনের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল; ৩৪৫ জনকে লৌহদণ্ড দিয়া মারিয়া কাণ ও আঙ্গুল কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই সব পৈশাচিক বীভৎস শাস্তির কথা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতে পারি; কিন্তু আমরা যদি ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, আমাদের বর্ত্তমান সময়ের আইনভঙ্গের নানা শাস্তির ব্যবস্থা কম অর্থহীন অমানুষিক



স্পিটেল দরজা

নয়। মানব সভ্যতা যখন আরও অগ্রসর হইবে, তখন ভবিষ্যৎ যুগের মানুষেরা বিংশ শতাব্দীর শাস্তির ব্যবস্থা মধ্যযুগের শাস্তিগুলির মত সমান অর্থহীন পৈশাচিক ব্যাপার বলিয়া ভাবিবে।

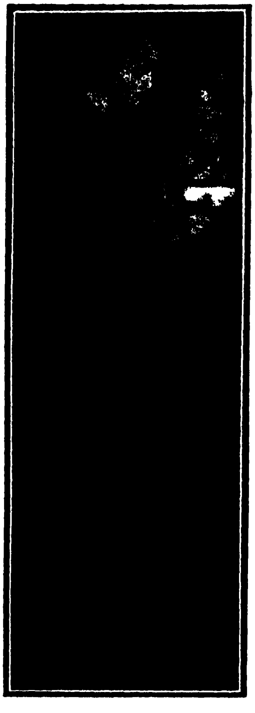
এই পৈশাচিক অত্যাচার-স্মৃতি-বিজড়িত কারা-গহ্বর

হইতে বাহির হইয়া সেণ্ট সেবাল্ডের চার্চ্চের সম্মুখে আসিয়া মন শান্ত হইল। চার্চ্চটি খুব সরল সহজ ভাবে গঠিত, তেরো



ডুয়ার

শতাব্দীর তৈরী। সেণ্ট সেবাল্ড (St. Sebald) হচ্ছেন নগরের বিশেষ দেবতা। তাঁর জীবনী বিশেষ জানা যায় না। তিনি এক রাজার ছেলে ছিলেন; কিন্তু কোথাকার কোন্ রাজার ছেলে ছিলেন, তাহা কেউ ঠিক জানিত না। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্যারীতে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে যান। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে, বাড়ীতে ফিরিলে, তাঁর সহিত এক সুন্দরী তরুণীর বিবাহের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন; গভীর বনের মধ্যে উপবাস, আরাধনা, ঈশ্বরের ধ্যান আরম্ভ করেন। এইরূপ পনেরো বৎসর কাটাইয়া তিনি রোমে যান। রোমে পোপ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। যিশুখৃষ্টের বাণী প্রচার করিতে, দরিদ্রদের সাহায্য করিতে, পৃথিবী হইতে অন্যায় অজ্ঞতা দূর করিতে আদেশ দিয়া পোপ তাঁহাকে বিভিন্ন দেশে পাঠান। ঘুরিতে ঘুরিতে সেবাল্ড জার্ম্মাণীতে আসেন। এবং নুরন্‌বের্গের নিকট এক বনে আশ্রয় নেন। এই সময়কার একটি গল্প আছে। একবার তিনি এক ক্ষুদ্রমনা কারিগরের গৃহে আশ্রয় নেন। তখন শীতকাল; বাহিরে চারিদিক বরফ-ঢাকা, কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছে। তাঁহাকে গরমের জন্য সামান্য একটু কাঠের আগুন দেওয়া হইল। সেবাল্ড কারিগরের স্ত্রীকে আরও বেশী কাঠ আনিয়া বড় আগুন করিতে বলেন,—তাঁহার সমস্ত শরীর জমিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই রমণী এই অজানা ভবঘুরেকে আর বেশী কাঠ দিতে রাজী হইল না। তখন সেবাল্ড বলিলেন, ছাদ হইতে যে বরফ ঝুলিতেছে তাহা আনিয়া আগুনের ওপর দেওয়া হউক। বারবার এরূপ বলাতে কারিগরের স্ত্রী শেষে সেই বরফ আনিয়া আগুনের ওপর দিতে, সবাই অবাক্ হইয়া দেখিল, বরফ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কারিগর-দম্পতী এই আশ্চর্য্যকর অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিয়া বুঝিল, তাঁহাদের অতিথি কোন সাধু হইবেন। তখন তাঁহার আদর-যত্নের ধুম পড়িয়া গেল। বস্তুতঃ এ গল্পটি একটি রূপক মাত্র। সেণ্ট সেবাল্ড ধর্ম্মের আগুন প্রেমের আগুন দিয়া ফ্রাঙ্কোনিয়ানদের বরফের মত ঠাণ্ডা অন্তর কিরূপ দীপ্ত জাগ্রত করিলেন, এ গল্পট তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।



সেণ্টজন ও সেণ্টপিটার (ডুরার)

সেণ্ট সেবাল্ড নুরন্‌বের্গে মারা যান। তাঁর মৃতদেহপূর্ণ বাক্সের গাড়ী দুইটি ষাঁড় দিয়া টানিয়া আনা হইতেছিল। এখন যেখানে সেবাল্ড চার্চ্চ আছে, সেই জায়গায় আসিয়া ষাঁড় দু'টি আর কিছুতেই নড়িতে বা অগ্রসর হইতে চাহিল না। সুতরাং সেখানে সাধুর সমাধি দিবার ব্যবস্থা হইল ও পরে চার্চ্চ উঠিল।

গির্জ্জার মধ্যে যে St. Sebald Shrine বা সেণ্ট সেবাল্ডের পুণ্যস্মৃতিময় অস্থির আধার আছে, তাহা জার্ম্মান আর্টের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রূপে সমস্ত পৃথিবীতে পরিচিত। এটি ব্রঞ্জের। নুরন্‌বের্গের বিখ্যাত শিল্পী পিটার ফিসার (Peter

Vischer) এটি তাঁর পুত্রদের সাহায্যে তেরো বৎসর ধরিয়া করেন (১৫০৮-১৯) এটিতে সাত টনের বেশী ধাতু লাগিয়াছিল, এবং ১৫ হাজার পাউণ্ডের ওপর খরচ হইয়াছিল।

জিনিসটি দেখিলে সত্যই চোখ জুড়ায়; মনে হয়, আর্টের একটি পরম সুন্দর সৃষ্টি দেখিলাম। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য-প্রেরণা হইতে নয়, অন্তরের ধর্ম্ম-প্রেরণা হইতে এই অপূর্ব্ব জিনিসটি গঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর প্রাচীন আর্টের ধারার সহিত রিনেসাঁর ইতালীর আর্টের ধারার মিলন এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে দেখিতে পাই। বারটি শামুকের ওপর স্থাপিত একটি মঞ্চ হইতে আটটি সুন্দর সরু থাম উঠিয়া গিয়া তিনটি গম্বুজে একটি সুন্দর আবরণ তৈরী করিয়াছে। তাহার তলায় উচ্চ মঞ্চের ওপর রৌপ্যমণ্ডিত একটি ওক-কাঠের বাক্স; তাহাতে সাধু সেবল্ডের অস্থি আছে। থামগুলির ওপরে ও তলাতে গ্রীক পুরাণের নানা দেবদেবীর অদ্ভুত সুন্দর মূর্ত্তি; চার কোণে চারটি মৎস্য-কন্যা বাতিদান ধরিয়া আছে। থামের মাঝে মঞ্চের খোপে খোপে বারজন শুভবার্ত্তা প্রচারকের মহাপুণ্যময় মূর্ত্তি। থামের গায়ে দিকপালের মত নানা খৃষ্টান সাধুগণ।

সকলের ওপর মাঝখানের গম্বুজে শিশু যিশু পৃথিবীর গোলক হস্তে; তাঁহাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ তাঁর জয়-ঘোষণা করিতেছে। প্রকৃতির জীবজন্তুগণ, গ্রীক পুরাণের দেবদেবীরা, বাইবেলের পুরাতন টেষ্টেমেণ্টের ঋষিরা ও নূতন টেষ্টেমেণ্টের প্রচারকেরা সাধুরা ইত্যাদি সমস্ত প্রকৃতি ও মানব-ইতিহাস যিশুকে বন্দনা করিতেছে—তাঁহার তলে সেণ্ট সেবল্ডের পুণ্য-অস্থি। সমস্ত জিনিসটি যেমন পরম উচ্চভাবের সহিত পরিকল্পিত তেমি নিপুণতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত গঠিত।

চার্চ্চ হইতে বাহির হইয়া ভাইন মার্কেট পার হইয়া এল্‌বার্ট ডুরার ষ্ট্রীটে আসিলাম। এই রাস্তার কোণে ডুরারের বাড়ী। নুরনবেয়ার্গে ডুরার জন্ম হয় এবং তাঁহার নামের সহিত এই নগর চিরদিনের জন্য জড়িত। অনেক ডুরারভক্ত কেবল তাঁহার বাড়ী দেখিতেই নুরনবেয়ার্গে আসেন।

"Here when art was still Religion,
with a simple reverent heart,
Lived and laboured Albercht Durer,
the evangelist of Art.
Hence in silence and in sorrow,
toiling still with busy hand
Like an emigrant he wandered,
seeking for the Better Land
Emigrant is the inscription on the
tomb-stone where he lies
Dead he is not—but departed—
for the artist never dies,"

Longfellow.

ডুরারের বাড়ীটি পনেরো শতাব্দীর একটি সুন্দর গথিক ফ্রেম-বিল্ডিং। এখন এটি নগরের সম্পত্তি এবং একটি মিউজিয়মরূপে রক্ষিত। বাড়ীর ভিতর ডুরারের অনেক ছবির কপি ও পুরাতনকালের আসবাবপত্র বাসন ইত্যাদি রক্ষিত। ডুরারের ছবি নুরনবেয়ার্গে বিশেষ কিছুই নাই; টাকার লোভে অধিকাংশ ছবিই বাহিরে বিক্রী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ম্যুনসেনের চিত্রশালায় ডুরারের কয়েকটি ছবি দেখিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের ছবি ও 'চার প্রচারকের' ছবি বিশেষভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

চিত্রশিল্পীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া Bratwurst-glockleinএ আসিয়া বসিলাম। সেণ্ট মরিৎস্ চাপেলের সংলগ্ন এই বিয়ার-হাউসটি নুরনবেয়ার্গের সবচেয়ে পুরাতন রেস্তোরাঁ। কত সন্ধ্যায় ডুরার হান্স সাক্স ফিসার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নুরনবেয়ার্গবাসীরা এইখানে সন্ধ্যায় বিয়ারের গেলাসের সম্মুখে আড্ডা জমাইয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করিয়া সকল ভ্রমণকারী এখানে আসিয়া এক গেলাস বিয়ার খায়!

নুরনবেয়ার্গের জার্ম্মাণ মিউজিয়ামের কথা বলিয়া (Germanic National Museum) নুরনবেয়ার্গের কথা শেষ করি। জার্ম্মাণ আর্ট ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখান, বিশেষতঃ নুরনবেয়ার্গের আর্টের ইতিহাস দেখান এই মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য। প্রায় একশত বড় ঘর ও হল জুড়িয়া এক বড় তিনতোলা বাড়ীতে এই মিউজিয়াম।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে দেখিলাম প্রাগৈতিহাসিক যুগের জিনিস ও জীবনলীলার চিত্র। পাথরের যুগে মানুষের কিরূপ বাড়ী ছিল, কিরূপ সমাধি হইত তাহা মডেল করা

রহিয়াছে। তার পর ব্রঞ্জের যুগের, রোমন যুগের যে সব প্রাচীন জিনিস জার্ম্মাণীতে পাওয়া গিয়াছে, তার চিত্র সব রক্ষিত। তার পরে কোন ঘরে ফ্রাঙ্কদের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র, পুরাতন জার্ম্মাণ শিরস্ত্রাণ সজ্জিত; কোন ঘরে পুরাতন ষ্টোভ, ষ্টোভের টালি সব রক্ষিত। কোন বৃহৎ হল চার্চ্চের মত করিয়া পুরাতন চার্চ্চঘরের ভগ্নাংশ, রঙীন মূর্ত্তি আঁকা মধ্যযুগের কাচ ইত্যাদি। কোন ঘরে যন্ত্রণা দিবার সব অস্ত্র সাজান। কোথাও জার্ম্মাণীতে পর্সিলেনের ইতিহাস লেখা। কোন ঘরে নানা সাধুসাধ্বীর প্রস্তর-মূর্ত্তি, মেরী ও যিশুর মূর্ত্তি, মধ্যযুগের তৈরী। এইরূপ ঘরের পর ঘর দেখিতে দেখিতে অতীতকালের ইয়োরোপ জীবন্ত হইয়া ওঠে। একটি বৃহৎ হলে দেখিলাম, অনেকগুলি ছোট ছোট কাঠের ঘর, আসবাবপত্র, বাসন, বিছানা ইত্যাদি সর্ব্বসমেত সাজান। কোন ঘরটি পনেরো শতাব্দীর ঘর, কোন ঘরটি যোল শতাব্দীর নুরন্‌বের্গের ঘর, কোন ঘরটি পুরাকালের সুইস্ ঘর। আর এক হলে পুরাতন সব বাড়ীর মডেল রহিয়াছে। আর এক হলে নানা শতাব্দীর সাজসজ্জা,—তিরোলের চাষাদের কেমন সাজ, সুইজারলণ্ডের পাহাড়ের লোকেদের কেমন সাজ, পনেরো যোল সতরো আঠারো শতাব্দীতে ইয়োরোপে কিরূপ বিভিন্ন সাজসজ্জা ছিল, তাহা নিখুঁতভাবে দেখান। এক গ্লাসকেসে এক যোল শতাব্দীর নারী; অপর গ্লাসকেসে সতরো শতাব্দীর যুবক,—এমি সজ্জার ইতিহাস সাজান।

সবচেয়ে ভাল লাগে যন্ত্রের ঘরে। পৃথিবীর প্রথম ঘড়ি ও পুরান সব ঘড়ি এখানে সাজান। ১৪৯২ অব্দে নুরন্‌বের্গে পৃথিবীর প্রথম গ্লোব তৈরী হয়,—সেটি ও তার পরবর্ত্তী আরও কয়েকটি গ্লোব এখানে আছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি, খেলনা, নানা সুন্দর আর্টের জিনিস সাজান।

একটি ঘরে পুরাতন বাদ্যযন্ত্র সব রহিয়াছে। একটি ঘরে ছাপাখানার ইতিহাস। কাঠের ব্লক হইতে এই ছাপা কিরূপে আরম্ভ হইল, পনেরো শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে বিকাশ লাভ করিল, তাহা মডেল করিয়া দেখান হইয়াছে। ১৪৭০ অব্দে নুরন্‌বের্গে প্রথম ছাপাখানা হয়। পনেরো শতাব্দীর শেষে নুরন্‌বের্গে যে সব বই ছাপা হইয়াছিল, তাহার কোন কোন পাতা সাজান আছে। প্রথম জার্ম্মাণ বাইবেলগুলি ও লুথারের বাইবেলের একখানি প্রথম সংস্করণ সযত্নে রক্ষিত। ছাপা খুবই সুন্দর লাগিল। নুরন্‌বের্গের ছাপাখানার ইয়োরোপ জুড়িয়া নাম ছিল।

কোন ঘরে পুরান জাহাজের মডেল; কোন ঘরে পুরাতন ওজনের সরঞ্জাম; কোন ঘরে পুরাতন ঔষধের দোকান; কোন ঘরে নুরন্‌বের্গের খেলনার মেলা। এইরূপ ঘরের পর ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে হয়, যেন কোন অপূর্ব্ব রূপকথার পুরীতে ঘুরিতেছি।

অবশ্য মুনসেনে যে 'জার্ম্মান মিউজিয়াম' পরে দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় এ মিউজিয়াম অতি ছোট। তবে মুনসেনের 'জার্ম্মান মিউজিয়মে'র মত ওই ধরণের মিউজিয়াম পৃথিবীতে কোথাও নাই।

মিউজিয়াম হইতে বাহির হইতে পেগনিৎসের ওপর ক্লাইস ব্রুকেতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বর্ত্তমান সহরের ওপর অতীতের স্বপ্ন মিলিয়া সহরটি বড় সুন্দর লাগিল।

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

সকলের পথ এক নয়। শুধু কি তাই; ব্যবস্থাও সব সমান নয়।

মিস্ ইভান্স 'বাস্' থেকে নেমে আপিসের দরজার কাছে আসতেই দেখতে পেলে, বড় সাহেব তাঁর মোটার থেকে নামছেন। আপিসের দরওয়ান উভয়কেই সসম্ভ্রমে সেলাম জানালে।

লিফটের কাছে দেখা, বড়সাহেবই আগে বললেন—গুড্ মর্ণিং মিস্ ইভান্স।

মিস্ ইভান্স তার জবাব দিলেন, কিন্তু কথার উত্তরের চেয়ে হাসিটাই তাঁর মুখে ফুটে উঠল বেশী। চটুল চোখের চাহনি কি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি!

হয় ত উঠেছিল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সুশীলের সঙ্গে

ছোট সাহেবের দেখা হতেই, সে ভদ্রতা অনুসারে তার অভিবাদন জানালে। ছোটসাহেব সে অভিবাদন স্বীকার করলেন অত্যন্ত একটা অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি দিয়ে, তারপর 'লিফটে' উঠে পড়লেন।

সুশীল যে এতে ক্ষুণ্ণ হয়নি তা নয়, কিন্তু এর আর প্রতীকার কি? সম্বন্ধ ত একটা নয়, মনিব ও ভৃত্য, তার ওপর শাসক ও শাসিত, কাজেই ওইটুকুই যথেষ্ট, মান অপমানের বিচার এখানে সাজেনা। ঘাটা-পড়া-পিঠে বেতের ঘা সমান জোরেই বাজে; তার পর মনের ওপর দাগ পড়া না পড়া! সে আলাদা কথা।

চারতলার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, সে খুব জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিলে। যারা মোটারে আসে, সিঁড়ি ভাঙতে তাদের কষ্ট হ'তে পারে; কিন্তু শ্যামবাজার থেকে ড্যালহাউসি স্কোয়ার যারা হেঁটে পাড়ি দেয়, চারতলার সিঁড়ি ব'য়ে ওঠা তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। বোঝার ওপর শাকের আঁটী আর কি! এসব ভেবে আর লাভ কি? সুশীল তার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলে।

সামনে আপিসের বড় খাতা খুলে তাতে আর মন দেবার ইচ্ছা হ'ল না। কোটের গোটা দুই তিন বোতাম খুলে সে একটুখানি হাওয়ার পরশ অনুভব করবার চেষ্টা করলে। গরীব কেরাণী বলে ইলেক্‌ট্রিকের পাখাও কি কম হাওয়া দেয়!

প্রতি আটজনের মাথার ওপর একখানি করে পাখা। বাতাসের জন্যে ঐদিকেই তাকাতে হয়—ভগবানের দিকে নয়। তিনি যে জিনিষ মানুষের কাছে সুপ্রাপ্য করে দিয়েছিলেন, মানুষই তার কাছে তাকে দুষ্প্রাপ্য করে তুলেছে। দোষ কার? 'হায় ভগবান' বলা চলে না, বলতে হয় 'হায় বড় সাহেব!' তার মাথার ওপর হয়ত পাখাটা অকারণেই ঝড় বইয়ে দেয়!

তা দিক। কিন্তু সামান্য কেরাণীর সে দিকে নজর পড়ে কেন? তার চোখ পড়া উচিত তার নিজের চারপাশে; যেখানে তারই সমপদস্থ দেবীবাবু নির্ব্বিকার ভাবে বসে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। দেবীবাবুর চেয়ারটা ঠিক তার পাশেই। পাতা ওল্টাবার অবসরে দেবীবাবুর চোখটা এদিকে ফিরতেই তিনি বললেন—কিহে ভায়া কাজ আরম্ভ না করতেই যে নেতিয়ে পড়লে। সুশীল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিলে—বড় গরম।

দেবীবাবু হাসলেন। বললেন—ব্যস্ ঠিক হয়েছে। কাজ আরম্ভ করে দাও।

পরিহাস মনে করে সুশীল তাঁর দিকে তাকাল। দেবীবাবু বললেন—অমন করে চাইলে যে? আমি কি ঠাট্টা করলুম নাকি? আরে, না, না। সত্যি বলছি, গরম না হ'য়ে উঠলে কাজ হয় না। আমি ত সিঁড়ি ভেঙে উঠেই গায়ের তাপ ঠাণ্ডা হতে না হতেই কাজ আরম্ভ করেছি। এ হচ্ছে মহাজনের পন্থা। গরম হয়ে ওঠা চাই, নইলে হবে না। ঠাণ্ডা হয়েছ কি গেছ। দেখনা কাজ করাবার সময় বড় সাহেব গরম হয়েই হুকুম দেন। তখন তার মুখে কখনও মিষ্টি কথাটী শুনেছ কি?

দেবীবাবুর চোখ আবার খাতার পাতায় আটকে গেল। পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী পঞ্চাশ লাখ টাকার হিসাবে লেগে গেল। আর সেই হিসাবের ফাঁকে তাঁর মুখ দিয়ে চাপাস্বর বার হল—বড় বাবু! মেসিন চালাও।

এটা এখানকার চল্‌তি এবং সত্যি কথা। মানুষের মান বাদ দিয়ে যেটুকু থাকে তার সঙ্গে মেসিনের আর তফাৎ কোথায়?

পাকা লোকের খাসা ইঙ্গিত বটে। সুশীল তার কাজ সুরু করে দিলে।

আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, ইংল্যাণ্ড থেকে ইষ্ট এণ্ড জাপান, জগতের সর্ব্বত্রই কোম্পানির কারবার। এদের খবরাখবরের জন্যে চিঠি লিখতে হয় তাকেই। দেশের ভূগোল জেনে দরকার নেই, দেশের বাইরের খবরই হল আসল দরকার—কোথায় নিউক্যাসেল, নিউ ইয়র্ক, এডিনবরা এলজিরিয়া, টকিয়ো, টুম্বাক্টু, জেনেভা, জেনা; এদের খবর জানা চাই। চাকরি রাখতে হবে ত!

কলেজের পাঠ্য পুস্তক মন দিয়ে পড়তে হত—কোথায় বাণিজ্যের কি অবস্থা, আমেরিকাতেই বা সমস্যা বেশী আর ইউরোপেই বা সমস্যা কম কিসের? এ নিয়ে কত তর্ক বিতর্ক উত্তেজনা উৎসাহ। তখন এদের সঙ্গে কাজের যোগ ছিল না বটে, কিন্তু যোগ ছিল মনের, আর আজ কাজের যোগ থাকলেও হৃদয়ের যোগ এতে নেই কেন? এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়? চিঠি লিখতে লিখতে তার আসা উচিত

ছিল হাসি, কিন্তু এসে পড়ল এক স্লিপ্—বড় বাবুর কাছ থেকে।

বড়বাবুর মেজাজ হচ্ছে বালির মতো ;—বড় সাহেব সূর্য্যের চেয়েও তা' গরম। সুশীল হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে গেল। বড়বাবু তখন বড় সাহেবের কাছ থেকে কি 'নোট' এসেছিল তারই জবাব দিতে ব্যস্ত। সুশীল এসে যে দাঁড়িয়ে রইল, তা' তিনি ভ্রূক্ষেপই করলেন না। কাজ শেষ হ'লে তিনি একতাড়া কাগজপত্র সুশীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এগুলোর জবাব চটপট্ লিখে মিস্ ইভান্সকে দিয়ে টাইপ্ করিয়ে নিও। আজই চাই। বুঝলে ?

সুশীল একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—আড়াইটে বাজ্ছে, এত চিঠির জবাব কি আজ দেওয়া সম্ভব হবে ?

—সম্ভব হবে মানে ? হওয়া চাই-ই। বলে এমন ভাবে তিনি সুশীলের দিকে চাইলেন যে তারপর আর কোন কথা বলা সুশীলের পক্ষে সম্ভব হল না।

কাগজপত্র নিয়ে ফিরতেই দেবীবাবু আবার ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—মায়ার বাঁধন ত ?

অগাধ জলের মাছ মাঝে মাঝে 'ঘাই' মেরে একটা আওয়াজ দিয়ে তার অস্তিত্ব জানিয়ে সরে পড়ে। দেবীবাবুরও ঐ একটী কথা—ব্যস্, তারপর আবার তাঁর অগাধ কাজের স্তূপের মাঝে তিনি ডুব মারলেন।

একরকম প্রায় মরিয়া হ'য়ে সুশীল কাজ সুরু করে দিলে।

পাঞ্জাব মেল যেমন এক-একদিন যথাসাধ্য ছুটে এসেও দেরী হয়ে গেছে দেখে একটা বিরাট নিঃশ্বাস ছেড়ে মাঝপথে বর্দ্ধমানে থেমে পড়ে, সুশীলও প্রায় সেইভাবে তার কলের মানুষটীকে খাটিয়ে কিছু কাজ বাকী থাকতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

তখন পাঁচটা বাজতে পনের মিনিট। অন্ততঃ কিছুটাও 'টাইপ' করতে দেবার জন্যে সে উঠে পড়ল।

এই চিঠিপত্র নিয়ে যাবার কাজটা বেয়ারার, কিন্তু বাবুর চেয়ে বেয়ারা দুষ্প্রাপ্য। তার টিকির সন্ধানও সেখানে না পেয়ে সুশীল উঠতেই পাশের চেয়ার থেকে ছোকরা এক বাবু বললেন—নিজেই যে ?

—গরজ বড় বালাই। কি করি, নিজেই যাই। সুশীলের গলায় স্বর অত্যন্ত তিক্ত।

—পৌনে পাঁচটা,এখন আর মেমসাহেব কাজ করবে কি ?

—কাজ পড়লে করবে না কেন ? বলে সুশীল চলে গেল।

যাবার পথে তার কাণে গেল সেই বাবুটী বলছেন—সুযোগ পেলে না ছাড়াই উচিত। যাক্ দাদা, রসালাপের ভাগটা একটু না হয় শুনিয়ে দিও।

একটা ফ্ল্যাটে বাবুদের জন্যে চেয়ার টেবিলের বন্দোবস্ত, কিন্তু মিস্ ইভান্সের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। একটা 'ক্যানভাসে'র পার্টিসান খাড়া করে, তার রাজত্বের একটা গণ্ডী সীমা এঁকে দেওয়া হয়েছে।

'টাইপ-রাইটারে'র আওয়াজ থেমে গেছে। যন্ত্রটাকে ঢাকায় বন্দী করে শ্রীমতী তখন প্রসাধনের দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন স্থির করেছিলেন। ছোট্ট আরসি. রুজের পুটুলি, পাউডারের 'পাফ্' সবই বার হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় সুশীলের আবির্ভাব। নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে নিজের প্রতিফলিত প্রতিকৃতি থেকে তার মোহময় দৃষ্টিটাকে টেনে এনে, কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট উগ্রতার ঝাঁজ মিশিয়ে সে বললে—কি বাবু ?

তার এই ভ্রূভঙ্গির দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে, হাতের কাগজপত্রগুলি দেখিয়ে সুশীল উত্তর দিলে—এগুলি 'টাইপ' করে দিতে হবে, আজই।

মিস্ ইভান্সের হাতে একটী ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িটাকে দেখিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞা-কঠোর সুরে সে বললে—কটা বেজেছে দেখেছ ? তারপর সেকেণ্ড করেক থেমে সে আর একটু জোর করে বললে—পৌনে পাঁচটায় আমি কাজ বন্ধ করি। তারপর সমস্ত গুছিয়ে আমি ঠিক পাঁচটায় বার হ'য়ে পড়ি। এই আমার নিয়ম।

—কিন্তু সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আজ এ কাজ তোমায় করে দিতেই হবে। বড় বাবু বিশেষ করে আজই এটা চান। সুশীল তার কথা শেষ করে কাগজগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

মিস্ ইভান্স একটু বিস্মিতভাবেই সুশীলের দিকে চাইলে। এই ঋজু সরল ছেলেটীর মুখে একটা ভারী সুন্দর দৃঢ়তা আছে। সে ভারী প্রীত হল। যৌবনের যাদু !

হেসে বললে—এই সব সামান্য কাজের জন্যে আমি আমার নিয়ম ভাঙ্গি না। আমার নিয়ম বরাবরের নিয়ম।

এ কথার উত্তরে কি বলা যায় সুশীল তা ভাববার চেষ্টা করছিল। মিস্ ইভান্স তার এই বিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে

নিজেই একটু খুসি হ'য়ে উঠল। তারপর তার প্রসাধনের জিনিষগুলি 'ব্যাগে' ভরতে ভরতে সহাস্যে অত্যন্ত কোমল স্বরে বললে—তুমি বোধ হয় নতুন এসেছ, তাই আমার নিয়ম জান না। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার নাম জানতে পারি কি?

সুশীল আশ্চর্য্যভাবে তাকাল। সে তাকানর অনেক অর্থ হতে পারে এবং তা নিয়ে অনর্থ বাধবার সম্ভাবনাও কম নয়। সে প্রায় অভিভূতের মতো বললে—সুশীল রায়!

—রয়, বড় দেরী করে ফেলেছ; এ আমি আজ করতে পারি না বলে দুঃখিত। ভারী কোমল মিষ্টি গলার সুর।

সুশীলেরও মন ভিজে এল। এবং সেটা স্বাভাবিকই। বললে—কিন্তু দেরী ত আমি করিনি। আমি প্রাণপণ শক্তিতে কাজ করেছি! বড়বাবুই অত্যন্ত দেরীতে কাজ দিয়ে বললেন, আজ শেষ করা চাই। কিন্তু এই সব নয়, এটা অংশ মাত্র—কাজ আরও আছে, সেটা আমার শেষ করতে হবে। তবে ছুটী।

তাহলে তুমি সেটা শেষ করে ফেল। এটার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। এর জন্যে আমি বড়বাবুকে বলছি। সুশীলের দেওয়া কাগজপত্রগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে ইভান্স নৃত্য-চপল ভঙ্গীতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সুশীল ফিরে আসতেই সেই ছোকরাটী বললে—হল না ত?

না—বলে সুশীল একবার চেয়ে দেখলে ইভান্স বড়বাবুর কাছে চলেছে।

মিস্ ইভান্স কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বড়বাবু ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে ইভান্সকে একটা চেয়ার দেখিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকালেন।

মিস্ ইভান্স কোনো রকম ভূমিকা না করে কাটা কাটা কথায় আরম্ভ করলে—তুমি এই অসময়ে আমার কাছে একগোছা কাগজ পাঠালে। সে সব আজ আর হবে না। তোমাকে জানিয়ে গেলাম। 'রয়' বললে আজই চাই; কিন্তু আজকেই শেষ করবার মতো দরকারী কাজ বলে ত মনে হল না। আর তাছাড়া অত দরকারী বলে যদি তোমার মনেই হয়েছিল, তাহলে সেই মতো সকাল সকাল ব্যবস্থা করা উচিত ছিল তোমার। আমি, তোমার এ কী ব্যবস্থা বুঝি না। আমাকে যদি পাঁচটার পরে থাকতে হয়, তাহলে এই অব্যবস্থার কথা মিঃ 'জোন্স' এর কাছে না জানিয়ে আমি থাকতে পারি না।

বড়বাবুর গরম মেজাজ যে কারণেই হ'ক নরম হয়ে গেল। সমুদ্রের তুফানে তেলের ছিটে আর কি!

কথাটাকে ঘুরিয়ে বেশ হাসি মুখেই তিনি বললেন—না, কাজটা সে রকম বিশেষ কিছু দরকারী নয়। তবে একটু শীঘ্র হওয়া প্রয়োজন বটে, সে জন্যে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করিয়ে নেবার অছিলায় ঐ একটা 'চাল' দিয়েছিলাম। তা ছোকরা বুঝি তাই তোমায় গিয়ে জ্বালাতন করেছে। ও কাজ আমার কাল হলেও চলবে।—

—ও, এটা তোমার 'চাল'! ও ছোকরা নতুন এসেছে কিনা তাই বুঝতে পারেনি। ওঃ! পাঁচটা বেজে গেছে। আমি চললাম। মিস্ ইভান্স হেসে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে চলে গেল। বড়বাবু একবার কটমট করে তার দিকে চেয়ে, কি একটু ভেবে অসমাপ্ত কাজে মন দিলেন।

আবার 'স্লিপের' ডাক। সুশীল বিরক্ত হ'য়ে বড়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেদিনের মতো তাঁর কাজ হ'য়ে গিয়েছিল। সুশীলকে সামনে দেখেই বললেন—বলি কাজটা হয়েছে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সুশীল জবাব দিলে—না, একটু বাকী আছে।

—তাহলে ত' আমার মাথা কিনেছ দেখছি। ছিঃ ছিঃ, তোমাদের দিয়ে যদি একটা কাজও একটু তাড়াতাড়ি হয়। একেবারে গাধার দল সব!

বড়বাবু একবার মুখ তুলে সুশীলের দিকে চেয়ে আবার সুরু করলেন—কাজ শেষ হয়নি ত' কি আক্কেলে 'টাইপ' করতে দিতে গেছলে? ওটা আজই শেষ করে ফেলগে। তার আগে যেন ফাঁকি দিয়ে পালিও না। যাও, আমারও হয়েছে যেমন অকর্ম্মার দল নিয়ে কাজ।

কোন কথা না বলে সুশীল ফিরে আসতেই দেবীবাবু বললেন—বলি বাঁধনের মেয়াদ আরও বেড়ে গেল নাকি?

সুশীল কোন কথা না ব'লে ধপ্ ক'রে চেয়ারে বসে পড়ল।

দেবীবাবু তাঁর কাগজ-পত্র গুছোতে গুছোতে বললেন—নাঃ, ছেলের রাগ হয়েছে দেখছি। তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল স্নেহমধুর স্বরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—সুশীল, ঐ

গালাগালিগুলোর কথা মনে রেখে বৃথা কষ্ট পাসনি। ওসব উড়িয়ে দিতে শেখ। বুঝলি না জগতে সবই নশ্বর। বলে, পাথরই উপে যায় ও ত সামান্য কথা। আমরা অপরের বিচার করি, ওপরওয়ালা আমার ওপর রলেই, তার ঘাড়ে আমরা দোষের ভাগ ফেলে দিই; কিন্তু নিজে যেখানে মনিব, সেখানে আমিও কি ঠিক ভাবেই চোখ রাঙিয়ে চলি না?

কথা বলতে বলতে দেবীবাবু বার হ'য়ে গেলেন। ওঁর আবার ট্রেণের তাড়া।

দেবীবাবুর কথাগুলো তার মনকে নাড়া দিয়ে গেল। সে খুব ধীরভাবে ভেবে দেখলে—না সত্যিই ত এতে ক্ষুব্ধ হবার এমন কি আছে।

কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। অতি শ্রমে বা চিন্তায় মাথাটা বড় ভারবোধ হচ্ছিল ব'লে, সুশীল মেসের দিকে না ফিরে মাঠের দিকে পা চালিয়ে দিলে।

বিস্তীর্ণ মাঠ। মনুমেণ্ট, ওয়ার মেমোরিয়াল, পাথরের ঘোড়-সওয়ারের মূর্ত্তিগুলো, মনের গোপন ইচ্ছার মতো অস্পষ্টভাবে অপেক্ষা করছে। চৌরঙ্গীর প্রাসাদের আলোর আভা মাঠের বুকে এসে হানা দিয়েছে। দূরে থেকে বসে এদৃশ্য নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা চলে। তাই হ'ল বেকারের কাজ।

মাঠ ছেড়ে যখন সে রোড়ের মাথায় এসে পৌছাল তখন রাত দশটা। শরীর নেহাৎ ক্লান্ত মনে হওয়ায় সে সেখানে দাঁড়িয়ে 'বাসের' অপেক্ষা কর্‌ছিল। এমন সময় তার চোখে পড়ল, একটী ফিরিঙ্গী মেয়ে কিটন থেকে নেমে সেইদিকে আসছে। তার চলন-ভঙ্গী অনেকটা মিস্ ইভান্সের মতো, কিন্তু মিস্ ইভান্সের যে বেশভূষার সঙ্গে সে পরিচিত, এ বেশের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ।

সে একটু কাছে আসতেই তাকে চেনা গেল। মিস্ ইভান্সই বটে। পথে তখনও যথেষ্ট মোটর চলাচল করলেও ফুটপাথে পথিক প্রায় বিরল হ'য়ে এসেছিল। কাজেই এমন অবস্থায় আলোর কাছে একটা লোককে দাঁড়াতে দেখে মিস্ ইভান্স একটু লক্ষ্য করেই বললে · রয়! গুড্ ইভনিং। এত রাত্রে এখানে যে?

অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিয়ে সুশীল বললে—মাথা ধরেছিল বলে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম! 'বাসের' জন্যে অপেক্ষা করছি।

ও, কিন্তু তোমাকেও ত বিশেষ সুস্থ দেখাচ্ছে না? কি হয়েছে জানতে পারি কি? ইভান্সের স্বরে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য্য।

সুশীলের এটা খুব ভাল লাগল। কিন্তু তখন তার কথা বলবার বিশেষ স্পৃহা না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে জবাব দিল—শরীরটা ভাল নয়। মাথা ব্যথা ও একটু জ্বর জ্বর ভাব বোধ করছি। বোধ হয় বেশী খাটুনির জন্যে হ'য়ে থাকবে।

—বোধ হয় তাই-ই হবে। এক কাজ কর—একটা এস্‌পিরিনের বড়ী আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে ফেল। তাহলেই বেশ সুস্থবোধ ক'রবে।

নাঃ, সব মেয়েদেরই মধ্যে একটী স্নেহশীলা মমতাময়ী, সেবাপরায়ণা প্রিয়া উৎসুক হ'য়ে থাকে।

সুশীল হেসে বললে—ওষুধ হয়ত ভাল, কিন্তু ওদুটো জিনিষ দিয়ে আমায় সাহায্য করতে পারে এমন বন্ধু ত দেখতে পাইনা। আর তাছাড়া এত রাত্তিরে ডাক্তারখানায় যাবার মতো ইচ্ছাও বিশেষ নেই।

—আমাকে বন্ধু ভেবে যদি আমার সঙ্গে আস তাহলে খুব খুসী হব। এ বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব বলে আশা করি। মিস্ ইভান্সের মুখে একটা হাসি।

সুশীল তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলে না।

মেসে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে; খালি প্রিয়বাবু তখনও বই মুখে করে বসে আছেন। জুতোর শব্দ পেয়ে চমকে উঠে সুশীলকে দেখে বললেন—কপালে ওটা কি? ইউ-ডি-কলোর পটী বুঝি? হয়েছে কি?

সুশীল তার তক্তাপোষে বসে পড়ে জুতো খুলতে খুলতে বললে—মাথাটা বড় টিপ টিপ করছে।

—মাথা টিপটিপ করছে বলে পয়সা খরচ করে একটা

bogus ওষুধ লাগিয়েছ। ওসবে কিছু হয় না। এক কাজ কর—দুই রগে দুটী গোটা শুপুরি রেখে একটা ফেটী বেঁধে শুয়ে পড়। ব্যস্। প্রিয়বাবু আবার তাঁর বইয়ের পাতায় চোখ দিলেন।

মাথার যাতনায় নয়, মাথা গরম হয়ে ওঠার জন্যে ঘুম আসছিল না। অথচ চোখে সে আলোও সহ্য করতে পারছিল না। প্রিয়বাবুর দিকে ফিরে দেখে—তিনি আলো জ্বেলে বুকের ওপর বই রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছেন।

সুশীল ডাকলে—ও প্রিয়বাবু ! ঘুমোলেন। এক ডাকেই চমকে উঠে বললেন—না ঘুমুইনি ত একটু চিন্তা করছিলুম। 'সবজেক্ট'টা বড় শক্ত কিনা। যাক্ গে ওর আর কোন কিনারা হ'ল না আজ। কাল দেখা যাবে'খন।

প্রিয়বাবু অতি তৎপরতার সঙ্গে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

শরীরটা ক'দিন থেকেই ভাল নেই; কিন্তু তা বললে আপিস শুনবে না। তাছাড়া নিজেরও একটু স্বার্থ আছে, মাইনে পাবার দিনে গরহাজির হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়।

সকলেরই মনটা খুসী খুসী। কাজের ঠেলাগাড়ী কিন্তু সমানেই ঠেলতে হচ্ছে। সুশীলের কাছে বেয়ারাটা একটা 'স্লিপ' দিয়ে গেল। পাশের ছোকরাটী একবার ঘাড় তুলে বললে—শ্রীমতীর কাছ থেকে নাকি? বেশ জমিয়েছেন যাহোক।

সুশীলের মুখে জবাব এল না বটে—কিন্তু হাসি এল। অসুস্থ শরীরেও একটা অকারণ পুলকের জোয়ার এল। গৃহস্থালী, সত্যি জীবনের না খেলা ঘরের, বেশী আনন্দ দেয়?......

সুশীল কাছে যেতেই মিস্ ইভান্স হেসে বললে—বস। পাশে একটা চেয়ারও ছিল। 'টাইপ রাইটারে'র পাশে একটা হাতে-লেখা কাগজের একটা অংশ দেখিয়ে সে বললে—এটা কি লিখেছ রয়, বুঝতে পাচ্ছি না।

সুশীল কাগজটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে, তার পাঠোদ্ধার করে দিলে।

মিস্ ইভান্স ধন্যবাদ দিয়ে হেসে বললে—তুমি টাইপ-রাইটিং জানো, না?

উত্তর এল শুধু ঘাড় নেড়ে। সে অবাক হ'য়ে তার স্নেহমধুর প্রশ্ন শুনছিল।

—ও, তাই আমাদের মতো 'Poor Soul'দের ওপর তোমার কোন দয়া নেই। হাতের লেখা খারাপ হ'লে আমাদের যে কী অসুবিধে হয় তা কি বলব। মিস্ ইভান্স তার আয়ত চোখের দৃষ্টির রশ্মি তার মুখের ওপর ফেলে দিলে।

সুশীল একটু অপ্রস্তুতভাবে বললে—হাতের লেখাটা বড় খারাপ হয়েছে বটে। সেজন্য আমায় ক্ষমা ক'র। সুশীলের গলার স্বরে একটা সত্যিকারের মিনতি ফুটে উঠল।

—না, না, এতে তোমার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। উজ্জ্বল কৌতুকাবেগ সংবরণ করে হঠাৎ মিস্ ইভান্স গম্ভীর ভাবে বললে—তোমার কাজের ক্ষতি করছি না ত রয়?

কাজ থাকলেও কাজের তাড়া ছিল না। বিশেষ ক'রে তাতে সময় যে এর চেয়ে ভালো কাটবে না, তাও ঠিক। কাজেই সুশীল বললে—না, এখন অনেকটা ছুটীই আছে।

—তাহ'লে অবসরটা একটা দরকারী কাজে ব্যয় কর। টাইপ করতে শেখ। ইভান্স তার অনর্গল বক্তৃতার স্রোতে সুশীলকে প্রায় গ্রাস করে ফেললে। সুশীল তার মুখের দিকে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চাইছিল। বেশীক্ষণ তাকাবার সাহস তার ছিল না; কি জানি যদি অভদ্রতা হয়।

তার মনে হল যেন শরীরের গ্লানি অনেকটা কমে গেছে। আনন্দের নেশার একটা ফল আছে ত!

কর্ত্তব্যবুদ্ধি জিনিষটা বড় বেয়াড়া। অনেক সময়-অসময়ে জেগে উঠে রস ভঙ্গ করে ফেলে। অনেকটা সময় বৃথা আলাপে কেটে গেছে মনে হতেই সুশীল একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

ইভান্সের সতর্ক চোখে তা ধরা পড়ে যেতে, সেই ব্যস্ত হ'য়ে বললে—তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি, না? সেজন্যে আমি ভারী দুঃখিত।

সুশীল চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উদ্যোগ করতেই ইভান্স বললে—হাঁ ভাল কথা, রয়, আমাকে একটু সাহায্য করতে পার?

সুশীল বেশ হাসিমুখেই দৃঢ়ভাবে বললে—নিশ্চয়ই।

—আমার গোটা কুড়ি টাকা বিশেষ দরকার। তুমি কোনো রকমে জোগাড় করে দিতে পার কি ?

টাকার কথা শুনে তার মুখটা একটু শুখিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলাও যায় না। মুখে হাসি টেনে এনে সে বললে—আজ ত মাইনে পা'ব। কাজেই তার থেকে তোমাকে দিতে নিশ্চয়ই পার্ব্ব। পাঁচটায় সময় দিলে চলবে ত ?

—তোমায় আর কি বলব বন্ধু ? আমায় মস্ত বড় একটা চিন্তার হাত থেকে তুমি বাঁচালে।

মীনাক্ষীর চোখের চাহনির আঘাতে অস্থির হ'য়ে সে বার হ'য়ে এল।

পাশের ছোকরা বাবুটী আড়চোখে চেয়ে বললে—রসালাপ খুব জমেছিল নাকি ?

সুশীল তার কথা শুনে হেসে ফেললে।

দেবীবাবু একবার ঘাড় তুলে দেখলেন—সুশীল খাড়া হ'য়ে বসে হিসেবের খাতায় হারমনিয়মের চাবী টিপে যাচ্ছে। চোখ দুটো একবার বড় ক'রে ভালো করে চেয়ে আবার তিনি খাতার পাতায় কালির আঁচড় সুরু করলেন।

হিসাবে ঠিক দিয়েই মানুষ খুসী হয় না, বেঠিক করেও এক এক সময় সুখী হয়।

দেখা গেল পাঁচটায় সময় সুশীল মিস্ ইভান্সের সঙ্গে নামছে—সিঁড়ি দিয়ে নয়, লিফটে।

*

শরীর ভাল ছিল না বটে কিন্তু মনটা ভালই ছিল। এমন অবস্থায় মানুষ হয় গুণ গুণ করে গান করে, নয়ত গল্প করে। কিন্তু সুশীলের পক্ষে কোনটাই সম্ভব হচ্ছিল না। গান গাইতে লজ্জা করছিল, কারণ প্রিয়বাবু বসে;—আর গল্প করতে বাধা ছিল কারণ প্রিয়বাবু পড়ছিলেন। মেসে সেদিন লোকের একান্ত অভাব। বাবুরা সেদিন এমেচার থিয়েটারের পাশ পেয়ে দল বেঁধে বার হয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা কি করা যায় সেই চিন্তায় সুশীল চুপ করে তার বিছানায় বসে রইল।

পড়তে পড়তে একটা জায়গা শক্ত মনে হওয়ায় চিন্তা করতে গিয়ে প্রিয়বাবুর চোখ পড়ল—সুশীলের ওপর। অন্ধকারে ছায়ার মতো সে স্থির হয়ে বসে আছে। প্রিয়বাবু প্রশ্ন করিলেন—সুশীল নাকি ? চুপ করে বসে যে। থিয়েটারে গেলে না কেন ?

গল্প করবার একটা সুযোগ জুটে গেল মনে করে সুশীল বললে—শরীরটা ভাল নেই। সর্দ্দি হয়েছে। কি করা যায় বলুন ত ?

—ভালই হয়েছে। আমারও প্রায় ঐ অবস্থা। একটা খুব ভাল ওষুধ মনে পড়েছে। আমার গুরুদেবের কাছ থেকে শেখা। সুশীল প্রিয়বাবুর কথায় বাধা দিয়ে বললে—আপনার গুরুদেব ? আপনাকে ত নাস্তিক বলে জানতুম।

প্রিয়বাবু বললেন—গুরুদেব মানে আমার কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসার। আঃ ওরকম লোক আমি দেখিনি। সেকালের লোকেরা এই রকম সব লোক দেখেই দেবতাদের কল্পনা করে গেছেন। দেবতা ব'লে আলাদা কিছু ত নেই, মানুষ, কি রকম মানুষ জান ঐ যে রামায়ণে পড়েছিলুম—

আত্মবান কো জিতক্রোধোদ্যুতিমান কোঽনসূয়কঃ

সুশীল বাধা দিয়ে বললে—প্রিয়দা, তোমার কথাটা বেশ বুঝতে পারছি, এখন সংস্কৃত শ্লোকটা থামিয়ে ওষুধটা বল দেখি।

—ওষুধ, ওহো। আচ্ছা একটা কাজ কর দেখি' বলে প্রিয়বাবু তাঁর বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করে দিয়ে বললেন - ঐ দেয়াল আলমারীটা খুলে গোটা ছ'য়েক ধূপ বার করে জ্বালিয়ে দাও, আর কোণে একটা এসেন্সের শিশি আছে দেখবে, ফরসা কাপড় জামা পরে তাতে খানিকটা গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে বই নিয়ে পড়তে বস। একেবারে অমোঘ ওষুধ।

সুশীল খুসী হয়ে আলমারী খুলতে গিয়ে একবার ফিরে দেখলে—প্রিয়বাবু আবার তাঁর বইয়ের পাতায় সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। সুশীল হাস্য-তরল কণ্ঠে ডাকলে—প্রিয়দা।

প্রিয়বাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন - কি ?

—বড় খিদে পেয়েছে। সুশীল অর্থপূর্ণ ভাবে প্রিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

—তা আমি কি করব। ঠাকুরের কাছে যাও। প্রিয়বাবু চোখ বুজে তাঁর অধীত বিষয় ভাববার চেষ্টা করলেন।

সুশীল মাহোজ্জ্বল্যভাবে প্রশ্ন করলে—কিন্তু সর্দ্দির ওপর তাড়াতাড়ি খাওয়া কি ভাল ? কি বল প্রিয়দা।



সুরের টান

শিল্পী — শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

উত্যক্ত হয়ে প্রিয়বাবু বললেন—গরম মুড়ী আর বাতাসা খাও। আর আমায় বিরক্ত ক'র না। 'সবজেক্ট'টা ভারী 'ডিফিকাণ্ট'।—

প্রিয়বাবু তাঁর চিন্তা-স্রোতে ভেসে গেলেন। সুশীল কি ভেবে একবার হাসলে। হয়ত অকারণে!

নেশা জিনিষটা শরীরের না মনের? চট্ করে কেন, সময়-সাপেক্ষা বিচার করেও এর শেষ রায় পাওয়া যায় কি? ভেবে কোন লাভ নেই, জগতের এমন অনেক প্রশ্নের উত্তরই ত সহজ ভাবে পাওয়া যায় না।

সমস্ত ব্যবস্থা উল্টে গেল। আপিস থেকে রঙিন মনে ফিরে এসে চিঠি পেয়েই সুশীল উতলা হ'য়ে উঠল। মায়ের অত্যন্ত অসুখ। তাড়াতাড়ি 'টাইমটেবল' উল্টে নিয়ে সুশীল ফলের দোকানের উদ্দেশে বার হ'য়ে পড়ল। অসময়ের জিনিষ নিউ মার্কেট ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না।

ফলের দোকানগুলো থেকে বেরিয়ে ফুলের 'ষ্টলে'র পাশ দিয়ে আসবার পথে এক রকম হঠাৎ ইভান্সের সঙ্গে দেখা।

অকারণে সুশীল যেন অনেকটা লজ্জিত হ'য়ে পড়ল;—কিন্তু চোখাচোখি হবার পর কথা না কওয়াটা অভদ্রতা হবে ভেবে সে অভিবাদন করতেই ইভান্স বললে—রয়, একেবারে হঠাৎ দেখা; ভারী মজার। কিন্তু ব্যাপার কি?

—আমি দেশে চলেছি, আমার মায়ের বড় অসুখ।

—শুনে ভারী দুঃখিত হলাম, আশা করি তিনি শীঘ্র সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। আচ্ছা চললুম। সে চলে গেল। ইভান্সের হাতে কয়েকটা ফুল। সেদিকে তাকিয়ে অকারণে সুশীল ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। হয়ত ঐ ফুলের একটা তার বুকে ফুটে থাকবে—এই আশা। দুরাশাও ত মানুষ করে!

সুশীল যাবার পথটুকু শুধু ভাবছিল—কোনো রকম অভদ্রতা ক'রে ফেলিনি ত'। ইভান্স অমন করে হঠাৎ আমি কিছু বলবার আগেই নিজের থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন?

শেষে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিল—যাক্ গে। এখন গিয়ে মাকে ভালো দেখতে পেলে বাঁচি।

এ হয় না। কথা ব'লে মানুষের শোককে সান্ত্বনা দেওয়া একটা বিরাট ব্যর্থতার অভিনয় মাত্র। লোকে জানেনা যে তা নয়, তবুও বলে।

রাখাল বাবুও বললেন—আর কি করবে বল। 'জগতে ত চিরদিন কারো' ইত্যাদি অত্যন্ত পুরানো চির-প্রচলিত বাঁধিগৎ।

হরিবাবুর গলায় কণ্ঠি বাঁধা। একটু ভক্ত গোছের। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন—তিনি মঙ্গলময়। অশুভের মধ্য দিয়েই তিনি 'শুভ' ইচ্ছার ইঙ্গিত করেন। অসহ্য নেকামি!

এ সবের কোনো মানে নেই; তবুও লোকে আওড়ায়, কারণ তাতে মানা নেই।

প্রিয়বাবু খালি বসে বসে বই পড়তে লাগলেন। তাঁর কাছে এ সব ছিল না। তিনি পড়ছিলেন—জগতের চলতি খরচের হিসাব; কেমন করে কমে যায় আবার বাড়ে। শুধু রূপান্তর; মোট ঠিকই থাকে।

এ লোকটা সুশীলকে কিছুই বললে না।

যার যা বলবার ছিল, সে সমস্ত পুঁজিপাটা উজোড় করে দিয়ে যখন সকলে চলে গেল, তখন সুশীল অত্যন্ত নীরস স্বরে ডাকলে—প্রিয়দা।

অভিনয়ও মানুষ চায়। হোক তা মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী। প্রিয়বাবু বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—এইখানে আয়, বস।

তাঁর যা কিছু বলবার তা ঐ কটী কথাতেই বলা হ'য়ে গেল।

দরদ জিনিষটার দামও অনেক—ক্ষমতাও অশেষ!

অনেক রাত্রে শোবার আগে প্রিয়বাবু বললেন—কাল থেকে আপিস যেও, অনেক দিন কামাই হ'য়ে গেল।

তা হয়েছে বটে কিন্তু উপায় কি? অতীতের চিন্তা থেকে ভবিষ্যতের ভাবনাই বড়।

সুশীল সেদিন অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল আপিস বার হল।

সেই বড় বড় বাড়ী পাষাণ দৈত্যের মতো অপেক্ষা করছে। আপিসের দরজার পাপোষে পা মুছতে পাটা একটু কেঁপে গেল।

অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে, নিজেকে অনেকটা স্থির করে সে উপরে উঠে গেল। আপিস তখনও ভালো ক'রে বসেনি, কিন্তু তার জায়গায় লোক বসে গেছে। তবুও সুশীল তার চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। পাশের চেয়ারটীর ছোক্‌রা বাবু তাকে দেখে মুচকি হেসে বললে—কি, অনেক দিন পলাতক যে। আপনার জায়গায় যে লোক এসে গেছে। তার পর একটু বা ব্যঙ্গ একটু বা সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—ঐ যে পড়েছিলুম সায়েন্স ক্লাসে—জগতে জায়গা কখনও খালি থাকে না। কথাটা ঠিক। আপিস ত আর জগত ছাড়া নয়।

সুশীলের পা যেন অবশ হ'য়ে গিয়েছিল। সে এক রকম জোর করে নিজেকে টেনে দু'পা এগুতেই দেবীবাবুর সামনে পড়ে থেমে গেল। দেবীবাবু তাকে দেখে প্রথমটা একটু বিস্মিত হয়ে তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বললেন—এই যে সুশীল; তোমার খবর সব শুনেছি। গাড়ীর গেজেটে সবই শুনেছি? কি আর করবে বল।

দেবীবাবু সুশীলের মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু সে মুখে কোন কথা ছিল না।

—একবার না হয় বড় বাবুকে ধরে বস। হয়ত ফের বাহাল করতেও পারেন। একটু খোসামোদ, বুঝলে না? দেবীবাবু হঠাৎ থেমে কি ভেবে বললেন—আর যদি কিছু মনে না কর ত বলি।

অত্যন্ত স্থির ভাবে সুশীল বললে, বলুন।

—তোমার গিয়ে ঐ যে কি বলে—যেন পানের ছিপে গলা আটকে যাওয়ার জন্যে কেশে গলাটা অর্দ্ধ পরিষ্কার করে বললেন—মিস্ ইভান্সকে বলে একেবারে না হয় বড় সাহেবকেই বলে দেখ। ওর কথা ত আর সায়েব ফেলতে পারবে না।

বড়বাবু তাদের পাশ দিয়ে জুতোর শব্দ করে অত্যন্ত গম্ভীর চালে চলে গেলেন। নিম্ন-পদস্থ ক্ষুদ্রজীব তাঁর চোখে না পড়তেও পারে, আর পড়লেও তার সঙ্গে কথা বলে গাম্ভীর্য্য নষ্ট ত করা যায় না।

দেবীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—আমি যাই, তোমাকে যখন দেখে গেলেন তখন না হয় বড় বাবুর সঙ্গেই একবার দেখা কর। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা—বুঝলে না—ঠিক নয়।

দেবীবাবু চলে গেলেন।

সুশীল একবার বড়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমটা তিনি সুশীলকে দেখতে পাননি। যখন সে তার নজরে এল, তখন একটা দরকারী কাগজ দেখবার ভান করতে করতে বললেন—ও তোমার জায়গায় ত নতুন লোক এসে গেছে। চিঠি লিখে কামাই করলে ছুটী হয় না। কি করব বল, সায়েবের Strict order এখন আর কোন চাকরী খালি নেই। পরে খোঁজ কো'র।

এর পর আর কোন কথা বলা আত্মসম্মান-হানিকর।

লিফটের দরজায় দেখা। মিস্ ইভান্স বললে—কি রয় অনেকদিন বাদে যে? ছুটী চাইতে এসেছিলে?

না। ছুটী চাওয়ার জন্যে বড়বাবু বরখাস্ত করলেন। সুশীল একবার আশাপূর্ণ চোখে তার দিকে চাইলেন।

শুনে বড় দুঃখিত হলাম। আর কোথাও দেখ তা'হলে। লিফ্‌ট উপরে উঠে গেল।

সুশীল ভাবলে এর চেয়ে দেখা না হলে ভাল হত। সে সটান মেসে ফিরে এল।

প্রিয়বাবু তখন খেয়ে উঠে সবে বই নিয়ে শুয়েছেন। দেখে বললেন—ভেবন, চাকরী আবার হবে।

কথার সুরে ভারী একটা আশ্বস্তি। সুশীল বসে পড়ল। মনে করলে প্রিয়বাবু যেন কারো জীবনের-বই থেকে পড়ে বললেন।

বইয়ের পাতায় কি তাই লেখা থাকে?

নন্দের বাধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

('নন্দ' ডোমবংশীয় একজন শিক্ষিত যুবক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উকীল। অন্যান্য ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রলোভন থাকিলেও সে তাহার নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে নাই)

হিন্দু আমি ডোমের ছেলে,
নিষ্পেষিত চরণতলে,
ব্রাহ্মণ হতে কম নহি ত
জ্ঞানে কিম্বা বাহুর বলে ;
তবু আমি ঘৃণ্য হেয়,
অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয়,
নিত্য নূতন অত্যাচার আর
সইব কত নানান ছলে।

২

সম্মুখেতে কোরাণ ডাকে
সাম্য আভিজাত্য নিতে,
অত্যাচারী সমাজকে হায়
ইচ্ছা হলে দণ্ড দিতে।
বাইবেল এসে ডাকছে মোরে
আঁধার থেকে আলোয় ওরে,
নিগৃহীতে জয়মাল্য সে
উৎসুক হয়ে সদাই দিতে।

৩

তবু কাহার সবল বাহু
জোরে আমায় রাখ্‌ছে টেনে,
আদরেতে জাপ্‌টে ধরে
স্নেহ প্রেমের আলিঙ্গনে।
জাতি এবং বংশ যে মোর
থাকৃতে ঘরে করতেছে জোর,
দেবের কৃপা আজও আমায়
অত্যাচার যে সইতে বলে।

৪

গুহক মিতা রামকে আমার
পর করিব কেমন করি,
রাখাল-রাজা আমার রাজা,
ডাকৃলে উঠে পরাণ ভরি।
বনের বুড়া ধর্ম্মরাজও
পর ত আমার হয়নি আজও,
আজকেও যে আমার ডাকে
কৈলাসে মার আসন টলে।

৫

আমার জাতির বীর যাহারা
রক্ষা করতে গো ব্রাহ্মণে
রক্ত দিলে, পরাণ দিলে
ভিড় তাহারা করছে মনে।
মহাভারত রামায়ণে
ডাকছে আমায় ক্ষণে ক্ষণে,
পিতামহ পিতামহীর
স্বর্গে আঁখি ভাস্‌ছে জলে।

৬

হিন্দু আমি, হিন্দুর যাহা
আমার তাহা পর ত নহে,
সনাতন সে সভ্যতারই
স্রোত ত আমার বক্ষে বহে।
আমি ত সেই গঙ্গাধারা
হই না ঘোলা সঙ্গছাড়া,
শুক্তি আমি শম্বুক নই
স্বাতীর জলেই মুক্তা ফলে।

৭

যে ধর্ম্ম হায় জাতকে এবং
সমাজকে মোর অপর করে,
পদবী নাম সত্তা ভেঙ্গে
নূতন করে ভিত্তি গড়ে।
অনুষ্ঠানের প্রলেপ দিয়া
ঐতিহ্য দেয় ভুলাইয়া,
হ'ক সে মহান, বাঞ্ছা নাহি
মিল্‌তে মোটেই তাহার দলে।

নিখিল-প্রবাহ

জীবনরক্ষী বেলুন—

সাঁতারীদের সুবিধার জন্য একজন জার্ম্মান সাহেব এক প্রকার বেলুন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বেলুনটির ওজন মাত্র দুই



জীবন রক্ষী বেলুন

আউন্স। সাতারীর পোষাকের কাঁধের কাছে বাঁধা থাকে। বেলুনটি গ্যাস দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। গ্যাসের জন্য একটি পাত্র আছে, তাহাকে গ্যাস-বম্ব বলে। গ্যাস বম্বটি ফাটাইয়া বেলুনের মুখের কাছে লাগাইয়া দিলেই বেলুন গ্যাস-পূর্ণ হইয়া যায়। ২৫০ পাউণ্ড ওজনের একজন লোককে ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাসাইয়া রাখিবার ক্ষমতা এই বেলুনের আছে।

অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র—



অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র

১৮০০ খৃ: অ: পর্য্যন্ত বিলাতি ব্যাণ্ডের দলে এক অদ্ভুত বাদ্য ব্যবহৃত হইত। ইহা দেখিতে ছিল ঠিক একটি প্রকাণ্ড সাপের মত। যন্ত্রটি কাঠের তৈরী এবং ইহার আওয়াজ মিষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে এই অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রটি লোপ পাইয়াছে।

বৃক্ষ-চিকিৎসা—

মানুষের নানা প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা যেমন ইনজেক্‌শন্ দিয়া হইয়া থাকে, সেই প্রকারে বৃক্ষাদির নানা প্রকার রোগের চিকিৎসাও ইনজেক্‌সন্ দিয়া করা সম্ভব হইয়াছে। অকালে গাছ মরিয়া যাওয়া, পোকা ধরা, ফল-না-হওয়া ইত্যাদি নানা প্রকার বৃক্ষ-রোগের চিকিৎসা বৃক্ষের দেহে ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া হইতেছে। ইহাতে সুফলও পাওয়া যাইতেছে। পিচকারীর মধ্যে ঔষধ ভরিয়া তাহা বৃক্ষকাণ্ডের



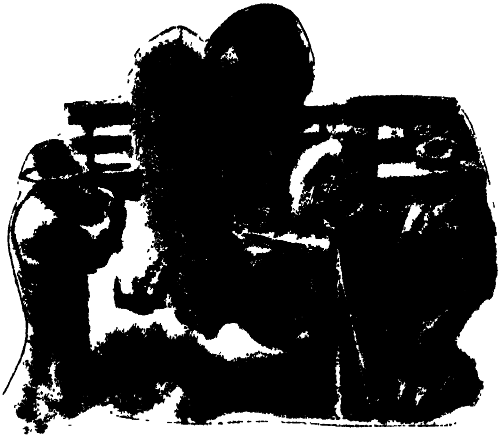
বৃক্ষ চিকিৎসা

মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়। মানুষের দেহে ইনজেক্‌সন্ দিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, বৃক্ষের দেহে অবশ্য তাহাতে চলে না। বৃক্ষে ইনজেক্‌সন্ দিবার জন্য নতুন যন্ত্র তৈয়ার করিতে হইয়াছে।

এক্‌স্-রের নূতন ব্যবহার—

যুক্তরাষ্ট্রে অনেক স্থানে মদ আমদানি এবং বিক্রয় বন্ধ। অবশ্য ইহা আইনতঃ; কিন্তু বহু লোকেই মদের অদম্য পিপাসা সংবরণ পারে নাই বলিয়া তাহারা গোপনে মদ ক্রয় করে। ন্যায্য দাম অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিয়াও ইহারা মদ ক্রয় করে। এই সকল লোকের নিকট মদ বিক্রয় করিবার জন্য নানা প্রকার কলকৌশল করিয়া অনেকে নিষিদ্ধ স্থানে

মদ চালান করে। বুট জুতা, বই, খড়ের গাদা, ইত্যাদি নানা দ্রব্যের মধ্যে দিয়া মদ চালান হয়। সম্প্রতি একস্‌-রের



একস্‌-রের নূতন ব্যবহার

সাহায্যে এই প্রকারে মদ চালান বহু স্থানে ধরা হইতেছে। একস্‌-রে সাহায্যে একগাদা খড়ের মাঝখানে লুক্কাইত মদের বোতল দেখা যায়। চিত্রে দেখুন, একজন পুলিস কর্ম্মচারী খড়ের গাদার মধ্যে মদের বোতল সন্দেহ করিয়া তাহা সত্য কি না পরীক্ষা করিতেছে।

সমুদ্রগামী ট্রাই-সাইকেল—

নিউ ইয়র্কের এক ভদ্রলোক একটি অতি অভিনব সমুদ্রগামী ট্রাই-সাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জল

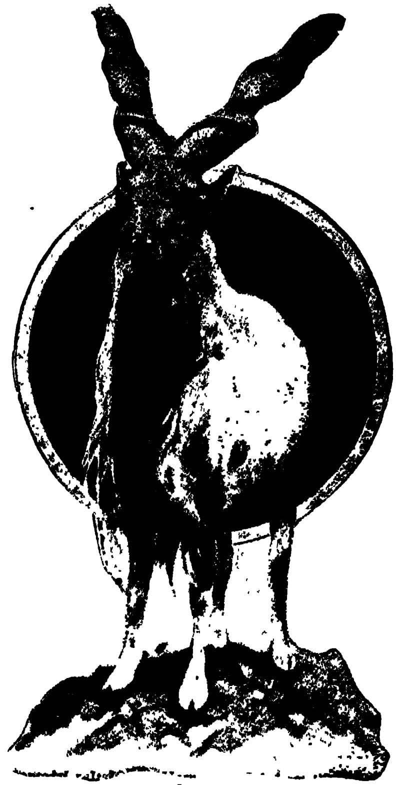


সমুদ্রগামী ট্রাই সাইকেল

ট্রাই-সাইকেলে মোটর লাগান আছে। ঘণ্টায় ইহা ১০ মাইল করিয়া যাইতে পারে। চিত্রে এই বিচিত্র যানের পরিচয় পাইবেন।

অদ্ভুত পাহাড়ী ছাগল—

হিমালয়ের এক অতি উচ্চ শিখরে এক প্রকার ছাগল বাস করে। শিকারীরা এই প্রকার ছাগল জীবন্ত খুব কমই



পাহাড়ী অদ্ভুত ছাগল

ধরিতে পারে। এই ছাগলের লোম অতি বড় বড় এবং ইহার শিং দুইটি সাধারণ ছাগলের শিং অপেক্ষা অনেক বড় এবং পাকান। ছাগলটি দেখিতেও খুব চমৎকার।

ছেলেদের মোটর-বোট—

একটি সুইচ্‌ টিপিয়া চালানো এবং থামানো যাইতে পারে, এই রকম করিয়া এক প্রকার নৌকা তৈয়ার হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই নৌকা সহজেই চালাইতে পারিবে। নৌকার গতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্যও অতি

সহজ উপায় আছে। নৌকার মধ্যেই ব্যাটারি আছে। এই ব্যাটারি হইতে প্রাপ্ত তাড়িত-শক্তিতে নৌকা চলে। ঘণ্টায়



ছেলেদের মোটর বোট

সাত মাইলের বেশী গতি হয় না। ব্যাটারি একবার 'চার্জ্জ' করিয়া লইলে নৌকা ১৪ ঘণ্টা ক্রমাগত চলিতে পারে।

জন্তু-চিকিৎসা—

পশুপক্ষীর রোগ-নির্ণয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করা



জন্তু চিকিৎসা

শক্ত কাজ হইলেও আনন্দদায়ক। চিকিৎসককে নানা প্রকার কলকৌশল করিয়া এই কার্য্য করিতে হয়। অনেক জন্তুকে খেলা দিবার ছলে তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। অপরিচিত লোকে ইহা সহজে পারে না; জন্তুর পালক, যে তাহাকে প্রত্যহ খাইতে দেয়, তাহাকে দেখে শোনে, সেই সহজে তাহার চিকিৎসা করিতে পারে। ছবিতে কতকগুলি জন্তুর চিকিৎসা কেমন করিয়া হইতেছে দেখুন।

প্রথম ছবিতে চিকিৎসক হিপপটোমাসের দন্ত চিকিৎসা করিতেছেন। একটি উখার সাহায্যেই কাজ চলিতেছে। হিপটি পোষ-মানা বলিয়া নিজেই হাঁ করিয়া আছে—দাঁত ঘষাতে বোধ হয় আরামও পাইতেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে দুইটি বড় বড় পাখীর চিকিৎসা হইতেছে। চতুর্থ ছবিতে হাতির পিছনের পায়ের ঘা ধোওয়ানো হইতেছে।

ট্রাফিক পুলিসের পোষাক—

এ্যামসটারডাম সহরের ট্রাফিক পুলিশদের এক-প্রকার নতুন পোষাক তৈয়ার হইয়াছে। পোষাকের



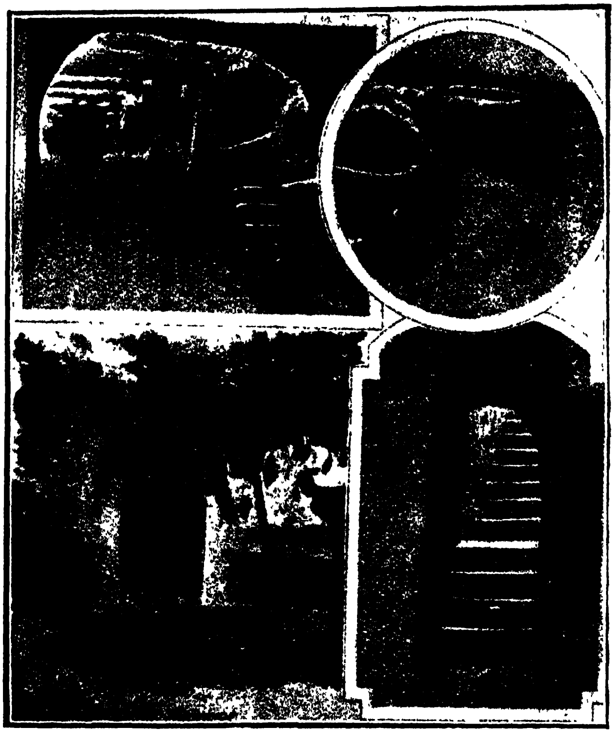
ট্রাফিক পুলিসের পোষাক

রং একেবারে শাদা। চারিদিকের আলোকরাশি ইহাতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া মোটর এবং অন্যান্য

গাড়ীর চালকেরা দূর হইতে সাবধান হয় এবং নির্দ্দেশমত গাড়ী চালাইতে পারে। জামার হাতায় শাদার উপর কালো কালো দাগ থাকাতে হাত তুলিলে সহজেই লোকের চোখে পড়ে।

আধুনিক গুহাবাস—

ক্যালিফোর্ণিয়াতে একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক তাঁহার স্বদেশের পার্ব্বত্যগুহাদির অনুকরণে মাটির নীচে তাঁহার গুহাবাস নির্ম্মাণ বা খনন করিয়াছেন। গুহাবাসকে বাহির হইতে দেখিলে আসল গুহা—সুদূর অতীতের বলিয়া ভ্রম হয়। এই গুহাবাসে বহু প্রকোষ্ঠ আছে; উদ্যান, ঝরণা, পুষ্করিণী ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। গুহাতে প্রবেশ করিয়াই সামনে একটি ভোজনালয় আছে। এই ভোজনালয়ে সহরের বিলাসীরা আসিয়া পান ভোজন করিয়া থাকে। গুহাবাসের প্রবেশ-পথ দিয়া মোটর গাড়ীও আস্তে আস্তে নামিতে পারে। গুহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ ভাবে সিমেণ্ট এবং পাথরই ব্যবহৃত হইয়াছে।



আধুনিক গুহাবাস

“রাবিশের” সদ্ব্যবহার—

বার্লিন সহরের পথ ঘাট ঝাঁট দিয়া পরিস্কার করিয়া যত ময়লা, ভাঙ্গাচোরা দ্রব্যাদি, ভাঙ্গা শিশি বোতল, টিন ইত্যাদি ধাতুর ভাঙ্গাচোরা পাত্র এবং অন্যান্য যাহা কিছু জড় হয়, তাহা সব একসঙ্গে করিয়া গলাইয়া একপ্রকার ইট তৈয়ার করা হয়। এই ইট সাধারণ ইট অপেক্ষা খারাপ নয়—কম শক্তও নহে। রাস্তা পাকা করিবার কাজে বর্ত্তমান সময়ে বার্লিন সহরে এই ইটের বহুল ব্যবহার হইতেছে। “ধাপার-মাঠ” ছাড়া “রাবিশের” যে অন্য গতিও হয়, এ সংবাদ বোধ হয় আমাদের দেশে নূতন। রাবিশ-গলানো-ইটের-তৈরী বার্লিন সহরের একটি রাস্তার ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

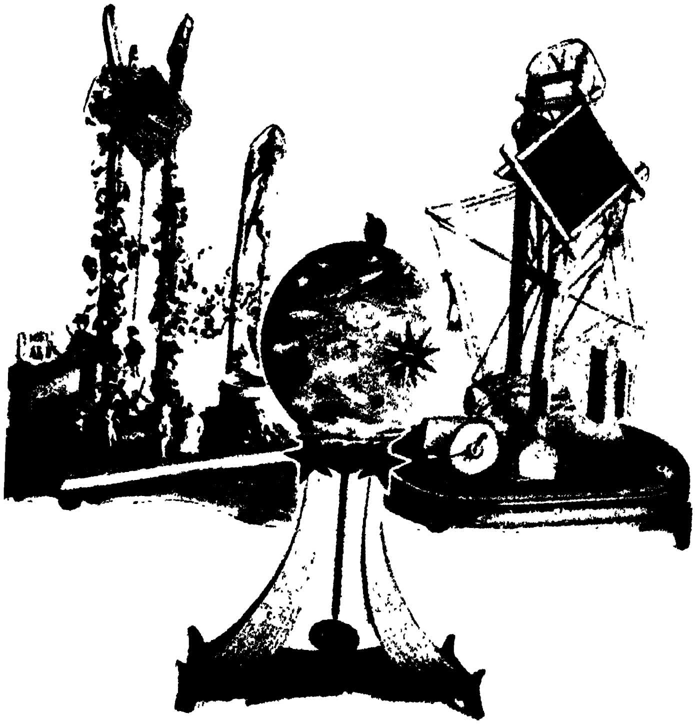


“রাবিশের” সদ্ব্যবহার

ঘড়িওয়ালার কেরামতি—

একজন ফরাসী ঘড়ি-নির্ম্মাতা কয়েকটি অতি অদ্ভুত ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘড়িই জার্ম্মানিকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘড়ির কলকব্জার সহিত

মন কতকগুলি মূর্ত্তি ঠে-নামে-পড়ে—যাহাতে ত্রশক্তির, বিশেষ করিয়া ান্সের জয় ঘোষণা এবং ার্ম্মানির পরাজয়ঘোষিত য়। ঘড়িগুলি দেখিতেও নহাৎ অ-ঘড়ির মত। ়বি দেখিলে ঘড়িগুলির রিচয় পাওয়া যাইবে।



ঘড়িওয়ালার কেরামতি

গাছকাটার প্রতিযোগিতা—

অষ্ট্রেলিয়াতে ওস্তাদ কাঠুরে লোক অনেক আছে। ডিউক অব য়র্ক কিছুদিন পূর্ব্বে যখন অষ্ট্রেলিয়া বেড়াইতে যান, তখন তাঁহার সম্মানার্থে এক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে গাছ কাটিবার প্রতিযোগিতাও হয়। সারি-বন্দি করিয়া বড় বড় গাছ বসান হয়। তারপর ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র প্রত্যেক কাঠুরে তাহার নির্দ্দিষ্ট গাছের উপর চড়িয়া কুঠার দিয়া তাহা কাটিতে আরম্ভ করে। ছবির একেবারে বাঁয়ে যাহাকে দেখা যাইতেছে—সেই এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। কাঠুরেদের গাছে দাঁড়াইবার মঞ্চও নিজে-দেরই বাঁধিয়া লইতে হয়।



গাছকাটা প্রতিযোগিতা

বলহরি রায়

ও অন্যান্য কবিওয়ালাগণ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কবিওয়ালা বলহরি রায় লালু নন্দলালের শিষ্য। ইহার নিবাস বরুল গ্রাম বীরভূমের সদর সিউড়ি হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা মানসিংহের সঙ্গে যে সমস্ত রাজপুত সৈন্য বা কর্ম্মচারী এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই একজন বীরভূমে তুরীগ্রাম ও বরুল প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। বলহরি রায় এইরূপ কোনো রাজপুতের বংশধর। বলহরির পিতার নাম আলমচাঁদ রায়। অনুমান ১১৫০ সালে বলহরির জন্ম এবং ১২৫৬ সালে শতাধিক বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বলহরির কনিষ্ঠপুত্র রাধাচরণও কবির গানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে রাধাচরণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

বরুলে আরো কয়েক ঘর রাজপুতের বাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস রায়ের পুত্র নিতাইদাস ও আনন্দচাঁদ রায়ের পুত্র রাইচরণও বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। ১২৯০ সালে রাইচরণ এবং ১৩০৬ সালে নিতাইদাস পরলোকগত হন। ইঁহারা সকলেই বলহরির শিষ্য। বীরভূমে বলহরি রায় কবিওয়ালাদের গুরু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একটী গান শুনিতে পাওয়া যায়—

'কবির গুরু সেই বলহরি
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি"

ইহাদের সমসাময়িক কবিওয়ালাগণের মধ্যে রাইপুরের রামাই ঠাকুর, বাঁশশঙ্কা গ্রামের রাজারাম গণক, পুরন্দরপুরের কৈলাস যুগী, এবং কুড়মিঠা গ্রামের বনওয়ারী চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কাহার নিকট গান শিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেকালে সাধারণতঃ সন্ধ্যায় অথবা প্রাতে কবির গান আরম্ভ হইত, এবং পরবর্ত্তী প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় ওস্তাদগণের মুখোমুখী পাল্লা গানে তাহার সমাপ্তি। এই সমাপ্তিগান সাধারণত 'বোল' নামে পরিচিত। আসরে দাঁড়াইয়াই মুখোমুখী ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত। আমরা এই কবিওয়ালাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এক একটি গান ও বোল গানের উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবির গান 'ভবানী বিষয়', 'সখীসংবাদ', লহর ও খেউড় এই কয় ভাগে বিভক্ত ছিল। ভবানীবিষয়ের একটী অংশের নাম ছিল আগম, এবং সখীসংবাদ বৃন্দাবন ও মাথুর লীলা এই দুই নামে অভিহিত হইত। বোল গানে আগম, গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, সখীসংবাদ ইত্যাদি সব রকম গানেরই প্রথা ছিল। লহর শ্লেষাত্মক গান এবং খেউড় সাধারণত মোটা (অশ্লীল) গান নামে পরিচিত। বলহরির একটি গান (দাঁড়া কবির গান) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'এ কি শুনি বংশীধ্বনি রাধে বাজে গহন কাননে,
শ্যামের বাঁশীতে ডাকিছে বারেবার চল নিকুঞ্জবনে,
আগুসারি সুকুমারী চল ওগো রাই,
রাধা রাধা রাধা বলে ডাকিছে শ্যামরায়,
তোমা বিনে সে গহন বনে, তোমার পথ
নিরখিয়া আছেন শ্রীহরি।
নিকুঞ্জে চল কিশোরী,
রাইগো হবে মহারাস মনে অভিলাষ
অই বাজিছে সংকেতে বনে শ্যামের বাঁশরী॥
শ্যামের মনোমোহন বেশ কর ওগো প্যারী,
কুলনারী সুমাধুরী শুনে বাঁশীর রব,
ঘরে হ'তে আকুল হ'ল ব্রজের গোপী সব,
ত্যজে লোকলাজ ছেড়ে গৃহ কাজ,
এলো চল ভেটী গিয়া সে বংশীধারী।
রাই জাতী যুথী মল্লিকা মালতী নানা ফুলে,
কমল অপরাজিতা করবী বকুলে,
হার গাঁথ মনোমত আজ কুতুহলে,
শ্যাম গলে দিব কুসুমের হার,
রাই ত্বরিতে কুঞ্জে চল আশা পুরাইতে গোপীকার।
ওগো শীঘ্রগতি রসবতি ছাড়ি কুললাজ
রাসস্থলে ভেটী গিয়া নবীন রসরাজ,

মনের আহ্লাদে ওগো শ্রীরাধে,
নয়নভ'রে হেরব আজ কুঞ্জবিহারী ॥
আর কৃষ্ণ দরশনে বিলম্বে কি কাজ চল নিধুবনেতে,
কি করিবে গুরু গঞ্জনা কি করিবে কুললাজেতে,
কৃষ্ণসনে একাসনে রঙ্গে হবে প্রেমের সঞ্চার,
মনের আনন্দে গোবিন্দে লয়ে মহানিশি করিবে বিহার,
শারদ পূর্ণিমার শশী কিরণ বিলায়,
মনের আনন্দে গোপী কৃষ্ণগুণ গায়,
বলহরি দাস করে প্রতি আশ,
আজ হেরবো দোঁহার রূপ যুগল মাধুরী ॥

কৈলাস ঘটকের নিবাস কচুজোর গ্রাম সিউড়ি হইতে সাত মাইল দক্ষিণে—সিউড়ি-দুবরাজপুর পাকা রাস্তার উপরে। ইঁহার পিতামহ সর্ব্বানন্দ সরস্বতী কুল পরিচয়ে বিশেষজ্ঞ এবং দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মল্লিকপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। কচুজোড়ের জমিদার রাজা রুদ্রচরণ রায় ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সর্ব্বানন্দের পুত্র হরমোহন, হরমোহনের পুত্র কৈলাসচন্দ্র কচুজোড়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ১২০৫ সালে কৈলাসের জন্ম এবং ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। আগমনী, বিজয়া, ডাকনাম, প্রভৃতি গান রচনায় ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। লহরে এবং খেউড়ে সেকালে ইঁহার কেহ সমকক্ষ ছিলনা। কৈলাসের দাঁড়াকবির একটি গান—

'গগনে উঠেছে বেলা দেখ ভাই চিকণকালা
যতসব রাখাল ডাকে,
তুই বিনে ভাই কালিয়ে রতন যত ধেনুগণ
চেয়ে আছে ঊর্দ্ধ মুখে,
তুমি কোন্ ঠাকুরের বেটা একি ঠাকুরাল,
নিতুই নিতুই তোমার কেবা চরাবে ধেনুর পাল,
এমন মিনিকড়ির নফর
তোমার কোন্ রাখাল আছে কেনা।
আর বিলম্ব করোনা, গোষ্ঠে এস কালিয়ে সোনা,
জানিরে ভাই নীলমণি, খেয়েছিলে নবনী,
তোমার যুগল করে বেঁধেছিল জননী,
আমি তাথেই বলি বনমালী মায়ের গরব করোনা ॥
চল চল বিলম্বে কাজ নাই, ওরে ভাই কানাই,
আর তুমি বিনে যায়না বনে তোমার ধবলী সাঙলী গাই ॥
তুমি বিনে বিপিনে ধবলী যায়না,
শিঙ্গা পাঁচনী বাধা আমরা নিব ব'য়ে,
আমরা ফিরাব ধেনু তোমার চাঁদ মুখ চেয়ে,
তোমার মা দিয়েছে নাড় বালা আমরা কোথা পাব,
বনে গিয়ে বনফুলের মালা তোর গলাতে পরাব,
ঐ রাখাল মণ্ডলের মাঝে তোরে নইলে সাজে না ॥
তুমি সব রাখালের শিরোমণি, বট নীলকান্ত মণি,
তাই নিতুই আসি ভাই তোমায় নিতে,
তুমি না গেলে ভাই ওরে কৃষ্ণধন যত রাখালগণ
বাঁচবেনা মরবে প্রাণেতে ॥
আজকের মত গোষ্ঠে চল আসবো নাকো আর,
আমরা কাল হ'তে ভাই ধেনু চরাব আপনার আপনার ॥
কৈলাস কহে জোর করে, এত নফরালী ক'রে
তোমার মনের কথা ভাইরে পেলাম না ॥

কৈলাসচন্দ্রের একটি আগমনী গানও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গিরি পাষাণ হ'যে কি রবে, কবে অভয়া আনিতে যাবে।
হারা হ'য়ে তারাধনে এ ছার প্রাণে নাইকো প্রাণ তারা অভাবে।
মণিহারা ফণী মত নিরখিয়া আছি পথ,
প্রাণ হ'য়েছে উমাগত, যাওহে দ্রুত, গেলে নয়নতারা পাবে।
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র ভণে জীবনশূন্য গৌরী বিনে,
আন গিয়ে উমাধনে, নাই কি মনে দুদিন বই সপ্তমী হবে ॥

একবার বলহরির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া বোল গানে কৈলাস যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন সেই 'চাপান' ও উত্তর উদ্ধৃত করিতেছি।

বলহরি বোল ধরিলেন—

আকুল হ'লাম আমি ঐ বাঁশীর গানে।
শুনে শ্যামের বাঁশী মন উদাসী প্রাণে না ধৈরয মানে ॥
গুরুজনার মধ্যে বসি নাম ধ'রে ডাকে বাঁশী, শুন গো আসি,
ঘরে রৈতে নারি বল কি করি নিষেধ না মানে প্রাণে।
বাঁশীতে কি গুণ জানে গুরু গৌরব নাহি মানে কত সয় প্রাণে,
তোরা কয় গো মানা যেন আর বাজেনা যাই কৃষ্ণ দরশনে ॥

কৈলাস ঘটক ইহার উত্তরে মাথুর বিরহের অবতারণা করিলেন ; বলিলেন "কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে নাই, কে বাঁশী শুনা ইবে ? ও তোমার মনের ভ্রম", ইত্যাদি।

সব গান পাওয়া যায় না, একটি গান এইরূপ—

বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান।
কাজ নাই বেশভূষণে, কৃষ্ণ বিনে এখনি ত্যজিব প্রাণ॥
ব্রজেতে নাই বংশীধারী, নীরবেতে শুকসারী,
শূন্যময় হেরি, যত পশু পাখী মুদে আঁখি সকলে মৃত সমান।
বিনে বাঁকা মদনমোহন শূন্য হেরি বন উপবন, ঝরে দুনয়ন।
আর কি দেখতে পাব সেই মাধব কার কাছে করিব মান।

সৃষ্টি ঠাকুরের নিবাস ছিল বোলপুরের পশ্চিমস্থিত কাঁকুটিয়া গ্রামে। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইঁহারই কোনো পূর্ব্বপুরুষ চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা কবি লোচনদাসকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোচনের সঙ্গে কাঁকুটিয়ার এই সম্বন্ধ-গৌরবে সৃষ্টিধর আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। গৃহবিবাদের ফলে তিনি কচুজোড়ের নিকটবর্ত্তী জামুরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সৃষ্টিধর হিরুঠাকুর নামেই সমাধিক পরিচিত। হিরু বলহরির শিষ্য। কৈলাসের মৃত্যুর পরেও ইনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি হইয়াছিল। হিরুর একটি গান—

বিচ্ছেদ শেল হেনে গেছেন সেই বংশীধর।
তার উপরে পঞ্চমস্বরে কোকিল করে সুমধুর কুহুস্বর।
শুনি কুহুরব যত সখী সজল আঁখি সবে নীরব শবাকৃত সব,
ব্রজে নাই মাধব, কেন্দে কন সেই কেশব বিনে শূন্য এ সব।
এলি হ'য়ে কৃষ্ণের পক্ষ, তুইরে কোকিল পক্ষ,
রাধার পক্ষে কি দুর্দ্দশা তাতো চক্ষে দেখিস না।
এখন বারে যা বিহঙ্গ বৈরঙ্গ রাই অঙ্গ দগ্ধ করিসনা,
সোনার কমলিনী কৃষ্ণ বিরহিণী মণিহারা ফণী শ্যাম কাঙ্গালিনী,
কোকিল এখন কুহুরব যেন ডাকিস না।
দেখে দুখ দয়া হলোনা,
কোকিল পেয়ে মাধবীপ্রিয়ে মত্ত হয়ে পীয়ে সৌরভ,
কর কুহুরব বেড়েছে গৌরব,
আবার ভ্রমর তায় দ্বিগুণ জ্বালায় করি গুণগুণ রব।
সাধের গোকুল শূন্য করি, মথুরায় গেছেন হরি,
আকুল হ'য়ে কাঁদছেন প্যারী জেনে তুই জানিস না॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাই অধরা,
কুহুরব শুনি আকুল কমলিনী চক্ষে বয় সহস্রধারা।
এখন দেখিনা কোনো আধার শ্রীরাধিকার নাই
অন্য বল,
জ্বলছে এই বিচ্ছেদ অনল তাই তাহে দুর্ব্বল।
বলের মধ্যে আছে কৃষ্ণের নামটী সম্বল,
বলে সংকটে প্রাণ রক্ষে করহে মাগি ভিক্ষে,
অনঙ্গ সৃষ্টিধর মনের দুঃখে যা যা হেথা থাকিস না॥

কবিওয়ালা নিতাইদাসের সঙ্গে ইহার একটী বোল-গানের উদাহরণ দিলাম। এই বোল-গানগুলি বৈশাখ মাসে নাম-কীর্ত্তনের কালে ডাকনাম রূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দুপল্লীতে বৈশাখের প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসী হরি-নাম সংকীর্ত্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। অনেকে কবিওয়ালাদের লইয়া গিয়া নূতন নূতন গান বাঁধাইয়া লইত। এই সব গানে আবার পাড়ায় পাড়ায় দুইদলে উত্তর-প্রত্যুত্তরও চলিত। বোল-গানে এই জন্যই দশকুশী, ছোট ইত্যাদি তালের উল্লেখ দেখিতে পাই।

নিতাইয়ের বোল—

কাল অঙ্গে ধূলা কে দিলে বাপধন।
কেন কেঁদে এলি বনমালী মলিন তোমার চাঁদবদন॥
ছল ছল যুগল আঁখি বুক মাঝে ধারা দেখি,
কি দুখের দুখী,
আমার প্রাণ বিদীর্ণ জীবন শূন্য এখনি ত্যজিব জীবন।
মা হ'য়ে কি দেখতে পারি ধূলা ঝাড়ি কোলে করি,
আ মরি মরি,
কার গৃহে গেলে কে কাঁদালে তার হিয়ে ঘটে কেমন॥

সৃষ্টিধর ঠাকুর উত্তর দিলেন—

যশোদে গো রব না আর গোকুলে।
গোপীরা সব ধূলা দেয় কাল ব'লে॥

তোমায় আমি জিজ্ঞাসিলাম, কেন আমি কাল হ'লাম, জিজ্ঞাসিলাম, গৌরী পূজেছিলে তুমি কোন্ ফুলে।

(দশকুশী) গোলোক ছাড়িয়ে এলাম, তোমার ঘরে বিকাইলাম, তবে কেনে অঙ্গে ধূলা দেয়—কেন কাল হ'লাম গো—

(ছোট) ক্ষীরসর নবনীর তরে জনমিলাম তোমার ঘরে,
তুমি কি দিয়েছিলে জবা বিল্বদল গো, সেই গৌরী
পদমূলে ॥

চাকর যুগীর নিবাস পুরন্দরপুর,—সিউড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে তিনক্রোশ। ইনি ছিরুঠাকুরের সাগরেত বলিয়া পরিচিত। চাকরদাসের একটী গান—

গোচারণ জন্যে ছিদাম আনন্দে চল্লেন নন্দালয়।
গিয়ে আঙ্গিনাতে মৃদু বচনেতে যতনে কৃষ্ণ প্রতি কয়;
ভাইরে কানাই দেখরে কত গগনে বেলা হ'য়েচে,
এখনো মায়ের কাছে ননী খাও নেচে নেচে,
দাদা সেই ধেনুর পাছে দাঁড়ায়ে আছে।
তো বিনে সব ধেনুগণে চেয়ে আছে পথ-পানে;
ডাকছে রে দাদা বলাই আয়রে ভাই যাই গোচারণে,
বিনে তোর বেণুর সাড়া ধেনুগণ দেয়না সাড়া,
যায় না রে তার ওরে ও মাখনচোরা,
বলাই দাদা দাঁড়ায়ে আছে শীঘ্র চল রে সেইখানে ॥
এখন মায়েরি কোলে দুগ্ধ পানে আছ মগনে,
দেখ্ রে যত পথের ধূলি উত্তপ্ত হ'তেছে বনে,
একে তোর কোমল চরণ কেমনে করবি গমন,
ঘামবে তোর ও চাঁদবদন রবির কিরণে,
চাকর দাস আজকে পথে থাকবে রে সাথে সাথে
অর্নিবার আতপ বারণে,
(এখন) নে রে বেণু ধরাচূড়া নূপুর পর রে চরণে ॥

বনওয়ারী চক্রবর্ত্তীর নিবাস কুড়মিঠা গ্রাম, গিরিডির পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন চক্রবর্ত্তী। ইনি বাল্যে স্বগ্রামে হরিচরণ ভট্টাচার্য্যের টোলে অধ্যয়ন করিয়া যৌবনে মঙ্গলডিহি নিবাসী বিষ্ণুচন্দ্র চট্যরাজের নিকট কবির গান শিক্ষা করেন।

নিম্নের ছড়াটী বনওয়ারীর রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।

"সীতার সাথে রঘুনাথে পঞ্চবটীর বনে,
জনক-ঝিয়ারী পাশা সারি খেলছে রামের সনে।
দেখ সে দৈবের ঘটন,
দেখ সে দৈবের ঘটন বন ভ্রমণ কত্তে এল চেড়ী,
নাম তার সূর্পনখা চাহন বাঁকা কানে মদনচেরী"।

ইত্যাদিরূপে সুবৃহৎ ছড়াটী বীরভূমের অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

চাকর যুগীর সঙ্গে বনওয়ারীর বোলগানের একটী উদাহরণ দিতেছি।

চাকর যুগী বোল গাহিলেন—

চাঁদ নিব মা, চন্দ্র চাই।
(কপালেতে) চিত্রা দিতে হাতছানিতে ডাকছিলে
যে বলছি তাই।
মণিময় অঙ্গন তলে সমুজ্জলো ঐ যে জলে
আমি মাখবো কজ্জলে,
ভাল করে ডাকলে ভালে দিবে এসে চিৎ পরাই।
ভাল ক'রে ডাক মাগো চাঁদ বিনে আজ
মানবো নাকো শুধু কাঁদবো গো,
না পেলে চাঁদ তেজব জীবন ঝাঁপ দিব যমুনায় যাই।

বনওয়ারী চক্রবর্ত্তী উত্তর দিলেন—

চন্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো দায়।
চাঁদ নিব বলে' দুধের ছেলে ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
চেয়ে দেখ তোর অঙ্গপানে কত চাঁদ তোর নখের কোণে,
চাঁদ কাঁদেরে কেনে,
এ চাঁদ কোথা পাব এনে দিব ঘরে আসুক নন্দরায়।
চাঁদ হ'য়ে চাঁদ চাইলি নিতে চাঁদ কোথা মোর প্রাঙ্গনেতে,
দিব যে হাতে,
ওতো বৃকভাণু রাজনন্দিনী চন্দ্র নয় রে যাদব রায় ॥

রামাই ঠাকুর—রামানন্দ চক্রবর্ত্তী, নিবাস রাইপুর। ইনি সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ; কাহার নিকট কবি শিখিয়াছিলেন জানা যায় না। অনেকে ইহাকেও বলহরির শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

রাধানাথ দাস ইহার সহিত বোল গানে উত্তর গোষ্ঠে গোপালকে আনিয়া যশোদার করে অর্পণ করিলেন—

ওমা নন্দরাণী এই নাও তোমার গৌরী আরাধিত ধন।
গোষ্ঠে যাবার কালে প্রাণ গোপালে ক'য়ে ছিলে দুঃস্বপন ॥
আমরা যত রাখাল মেলি মাঝে ল'য়ে বনমালী
ফিরাই ধবলী,
আমরা ছিদাম সুদাম দাম বসুদাম
গোপালে করি যতন।
গোপালে কে চিত্তে পারে, বনে গিয়ে ফিরি ধরে,

হেরি বাম করে,

কৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে সুধাক্ষরে আপনি ফেরে ধেনুগণ ॥

রামাই ঠাকুর গাহিলেন—

বলরামরে একি দেখি রঙ্গ।
গোচারণে লয়ে গেলি নীল রতনে এনে দিলি
ধূলায় ধূসর অঙ্গ।
শুখায়েছে মুখ ইন্দু অঙ্গে সকল ঘর্ম্মবিন্দু
কুশাঙ্কুরে ক্ষত পদারবিন্দ,
আমার গোপাল দুধের ছাওয়াল
দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে ॥

রাজারাম গণকের নিবাস বাঁশশঙ্কা গ্রাম; সিউড়ির দক্ষিণে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। ইঁহার একটী গান—

কি অপরূপ হেরিও বাপ নয়নে।
থাকতে ক্ষীর ননী ও নীলমণি মৃত্তিকা খাও বদনে।
কোলে আয় বাপ রতনমণি নিরখি তোর বদন খানি
দিব নবনী,
তুমি সর্ব্বস্বধন কাল রতন পেলাম অনেক সাধনে।
ছিদাম বলে মাটী খেলে গোলোক ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলে
বদন কমলে।
দেখে কোটী ইন্দ্র কোটী চন্দ্র অধৈর্য্য হলাম প্রাণে ॥

এই গানের উত্তর পাই নাই। শুনিয়াছি কৈলাস ঘটকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া ইনি কিছুদিন বায়না বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ কবির আসরে নামিয়া কখনো গান করেন নাই; তবে অনেক কবিওয়ালা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শিখিয়া আসিত। তিনি বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহারই রচিত গান আসরে নিজের ভণিতা দিয়া গাহিত; চট্টরাজ মহাশয়ের এইরূপই অনুমতি ছিল। মঙ্গলডিহি গ্রামের অনেক তথাকথিত ইতর জাতীয় লোকে তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিয়াছিল। এইজন্য চট্টরাজ মহাশয় সাধারণত 'মাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। চট্টরাজের একটী গান তুলিয়া দিলাম। এই গানে তিনি স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী শ্যামচাঁদ বিগ্রহের নিকট অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।

এই ক'রো হে বাঁকা শ্যাম রায়।
ব'সে আধ গঙ্গাজলে হরি ব'লে প্রাণ যায়।
ব'সে নারায়ণ ক্ষেত্রে, হরিনাম লিখি গাত্রে,
যখন ঘেরবে ঐ কৃতান্তে রে'খ হরি রাঙ্গা পায়।
পাপে ভারি তনুতরী জীর্ণ হলো ওহে হরি,
তোমার চরণ ধ'রে তরি যেন ভুলোনা আমায়।

কৈশোর প্রশস্তি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কপোল-তলের লাল আভা অই সফল হ'ল, দীপ্ত তেজে,
কলির কচি জীবন-শেষে ফুল-ফুটিবার লগ্ন এ যে!
আজ দখিণা মাতাল নহে, শীতল হ'য়ে-ও বয়না গো সে!
কি এক যেন মধুর বাণী কইতে গিয়ে-ও কয়না ও সে!
আজ পুলকে গায় পাপিয়া, আজ জ্যোছনায় সুধাই ক্ষরে!
সুনীল গগন, চন্দ্র, তপন, অকারণেই আকুল করে!
ধরার বুকের আঁচল আজি টুটুল রে কোন্ উছল বায়ে!
রঙীণ মায়া পড়লো ধরা মোহন মধুর স্বপন-ছায়ে!
এক নিমেষেই ঘুচলো যেন পাপড়ি-পাতার ঢাকনগুলি!
শিল্পী সে কোন্ বুলিয়ে দিলে ইন্দ্রধনুর রঙীণ তুলি!
সোণার কাঠির পরশ পেয়ে জাগলো কানন এক-নিমেষে,
থামলে শিশুর খলখলানি কিশোর মধুর উঠলো হেসে!
এই কিশোরই ধরার ধূলায় আনন্দে তা'র শিরটি লুটায়,
ভাঙ্গা বন্ধ ছোঁয়না এরে, মরুর বুকে এ ফুল ফুটায়!

মন্দাকিনীর স্রোতের ধারা—সকল বাধা এড়িয়ে যায়!
জহ্নু-মুনির জঙ্ঘা ভেদি' বিশাল-সাগর-সঙ্গ চায়!

মানছে নাকো ভাবনা-ভীতি, চোখ-রাঙানি উড়ায় হেসে,
পলকা পাখা মেলছে আপন, হালকা হাওয়ায় চলছে ভেসে!

হাসছে তাহার শরীর, হিয়া, হাসছে তাহার ভিতর, বা'র!
হাসছে শুনে দারুণ দুখের দানব-মুখের হু-হুঙ্কার!

ছিঁড়লো তাহার বসন, মরে অনশনের যন্ত্রণাতে,

হিয়ার মধু-উৎস-ধারায় বেদন হারায়! কিশোর মাতে!

এই জগতের যতেক শোভা, মধু'র, রঙের মালিক এরা;
আনন্দে আর সুগন্ধে হয় কিশোর সবার চাইতে সেরা!

কিশোর রূপে, দুঃখী-জনায় দিলেন দেখা দয়াল হরি।
মদন-মোহন মাধব আমার! কিশোর! তোমার প্রণাম করি ॥

দ্বারকার পথে

শ্রীনীলিমাপ্রভা দত্ত

বিহগ-কাকলি-মুখরিত প্রভাত-বায়ু-সঞ্চারিত প্রভাতে আমাদের দ্বারকা যাইবার দিন স্থির হইয়া গেল। মনে অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। বহু দিন পূর্ব্ব হইতে সমুদ্রে জাহাজ-পথ ছিল ও গরুর গাড়ীরও পথ ছিল; ট্রেন পথ হয় নাই বলিয়া এত দিন আমাদের যাওয়া হয় নাই। গরুর গাড়ীতে পাঁচ দিন পথ চলা যেমন কষ্টকর, আবার সমুদ্রে জাহাজ-পথও তেমনি ভীতিসঙ্কুল।

ইং ১৯২৪ সাল, ১লা অক্টোবর—

আজ আমরা ২১ জন প্রাণী, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়, B. N. W. Ryএর বেনারস ট্রেনে, দ্বারকানাথের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আজ মনের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না; কারণ, আমার কনিষ্ঠা কন্যা রাণীর চারিদিন জ্বর চলিতেছে, —চিকিৎসকেরা যদিও মনে খুবই বল দিতেছেন ও আমাদের যাইতেও বলিয়াছেন। মন খারাপ সত্ত্বেও আমরা সেই অনন্তময়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষাতেই, জ্বররোগগ্রস্তা রাণীকে লইয়া, "জয় দ্বারকানাথ" বলে যাত্রা করিলাম। আমাদের দুইখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ ছিল বলিয়া রাত্রে ট্রেণে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এখন আশ্বিন মাস। গ্রীষ্ম আমাদের মায়া কাটাতে পারেন নাই, বেশ গরম বোধ হচ্ছে।

২রা অক্টোবর।

প্রাতে ৫ ঘটিকায় আমাদের ট্রেণ বদল করিবার কথা। প্রথমে আমাদের এলাহাবাদ যাইতে হইবে। তার পরে এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর, জব্বলপুর হইতে বম্বে এবং বম্বে হইতে দ্বারকা যাওয়া স্থির হইয়াছে। আমাদের গাড়ী রিজার্ভের জন্য আর ট্রেণ বদল করিতে বা নামিতে হইল না। ভাটনি জংশন হইতে একখানা ট্রেণ আসে ও সেই ট্রেণ এলাহাবাদ যায়। সেই ট্রেনে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীখানা কাটিয়া জুড়িয়া দিল। বেলা ১০ টার সময় আমরা এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে হইতেই আমাদের ২।৩ জনকে এলাহাবাদে পাঠান হইয়াছিল। তাহাদের ও আমাদের আত্মীয় ২।৩ জনকে ষ্টেসনে দেখিতে পাওয়া গেল। বেলা ১১ টায় আমরা ২১ জন লগেজ্ সমেত Dr. Boseএর বাসায় উপস্থিত হইলাম। আজও গরমের প্রকোপ খুবই বোধ হচ্ছে। রাণীর জ্বর একশো দুই পয়েণ্ট ছয়। তবে অন্যান্য উপসর্গ কিছু নাই; সোজা জ্বর বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের আহারাদি সমাধা হইতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। তার পর দুইটার সময় আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। রাণী বাড়ীতেই রহিল, আর সকলকে লইয়া গেলাম। অনেক দিন পরে আপনার লোককে পেয়ে, তাঁহারা বড় আনন্দ করিতে লাগিলেন। গল্প আর শেষ হইতে চায় না, মনের আশাও মেটে না; আর তাঁহাদের ছাড়িতেও মন চায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা গল্প-গুজবে কাটিয়ে বেলা পাঁচটার সময় ফিরে এলাম। এসেই আবার ট্রেণে ওঠবার তাড়া। তখনি সব গুছিয়ে নিয়ে, জব্বলপুরের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা গেল। আগে থাকতে প্রস্তুত না হইতে পারিলে পুরুষদের তাড়া দেবার চোটে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। রাণীর জ্বর এখনও সেই সমভাবে রহিয়াছে। সকালে একশো এক হয়, রাত্রি হইলেই আড়াই হয়। এবারে এলাহাবাদে মোটে ৮ ঘণ্টা থাকা হইল। আবার ফিরতি বেলায় বোধ হয় এই পথেই আসিতে হইবে। এত কম সময়ের জন্য এবারে আর প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য কিছুই দর্শন হইল না—যদিচ সে সব পূর্ব্বেই আমাদের দর্শন হইয়াছে। ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান, বটবৃক্ষ দর্শন, এলাহাবাদ গড়, নানাবিধ দেব-দেবী দর্শন ও এলাহাবাদ সহর দেখা, ইত্যাদি—সবই দেখা আছে বলে' এবারে আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা হইল না। এলাহাবাদ ষ্টেসন হইতে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আমাদের জব্বলপুরের উদ্দেশে বহন করতে লাগিল। কত

নদ নদী বন ভূমির মধ্যে দিয়ে রেল গাড়ী অগ্রসর হ'তে লাগল।

৩রা অক্টোবর—প্রাতে উঠেই রাণীর টেমপারেচার দেখা হ'ল। সকালেই আজ একশো আড়াই ডিগ্রি জ্বরের উত্তাপ। মনটা বড় দমে গেল। যদিও আমাদের রওনা হইবার দিন চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই আসা হয়েছে, তবুও মন কিছুতেই বুঝিতে চায় না। আমরা মুখে বলি, "হে ভগবান, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্"; কিন্তু মনে প্রাণে বলি "দোহাই পরমেশ্বর, আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।" আমাদের মন এত দুর্ব্বল যে একটা জিনিষে বিশ্বাস রাখ্‌তে পারি না। আসলকে পশ্চাতে রেখে অলীকের পিছু ছুটিয়া বেড়াই। শেষকালে আমাদের বিশ্বাসের আসল খেইও হারিয়ে যায়। বেলা ১০টার সময় জব্বলপুরে পৌছান গেল। ট্রেণের দুইধারে পার্ব্বত্য দৃশ্য বড় মনোরম বোধ হইল। বেশ নিস্তব্ধ, শান্ত ভাব। প্রকৃতির উগ্র মূর্ত্তি এখানে দেখিতে পাইলাম না। রাত্রে অন্ধকারে ট্রেণ হইতে এ দৃশ্য দেখা যায় নাই। ট্রেণে মধ্যে মধ্যে নেপেনের বৌয়ের কথা মনে পড়ছিল। বেচারার এত লজ্জা যে একটা কথাও কইতে পাল্লে না। জব্বলপুরে মিত্রের বাড়ীতে আমাদের নামা হ'ল। তিনি পূর্ব্বেই আমাদের সংবাদ পেয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। জব্বলপুর সহরটিও বেশ, ওঁদের বাড়ীটিও বেশ। আমাদের হিঁদুয়ানী সুবন্দোবস্তও আছে, আবার এ দিকে সাহেবী ধরণে সাজ্জত। মিত্র-গিন্নি আমাদের বড়ই আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। মিত্র-গিন্নির বৌদিকেও সেখানে দেখিলাম। মিত্র-গিন্নির আদর ও যত্ন এত গুরুপাক হয়েছিল যে, আর আমরা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। পুরামাত্রায় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় উদরস্থ ক'রে সকলে বম্বে মেলে যাত্রা করিবার জন্য জব্বলপুর ষ্টেসনে এলাম। সকলেরই মন উৎকণ্ঠায় অস্থির, রাণীর জ্বর তেমনি ভাবেই চলেছে। কি যে হবে নারায়ণই জানেন। বেলা ৪টার সময়, জব্বলপুর ওয়েটিং-রুমে গিয়ে দেখি, কতকগুলি শ্বেতাঙ্গিনী রমণী চেয়ারে বসে টেবিলে চা, কেক, বিস্কুট, সোডা ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করিতেছেন, আর কয়েক জনেই ঘরটি একেবারে দখল করে ফেলেছেন। তাঁদের বেডিং, ট্রাঙ্ক, বেতের বাক্স ও আদরের পুষি দিয়ে সমস্ত চেয়ারগুলি পরিপূর্ণ। আমাদের বসিবার একেবারেই স্থানাভাব। ওয়েটিং-রুমের আয়া কোথা থেকে আর কয়েকখানি চেয়ার আমাদের এনে দিলে। তবুও আমাদের কম পড়ে গেল। রাণী রোগা মেয়ে, তার জন্য একটা বেঞ্চি দরকার। আয়াকে মেমেদের একটা বেঞ্চি খালি করিয়া দিতে বলিলাম। আমার কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তাই আয়াকে বলিতে বলিলাম। আয়া কটা চামড়া দেখে ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না। অগত্যা আমাদেরই বলিতে হইল যে, আমাদের জন্য স্থান দিতে হইবে; এবং আপনাদের বিড়ালকে ও ট্রাঙ্কগুলি সব মাটিতে নামিয়ে রাখুন। এই কথা বলাতে দুটি তিনটি মেম রাগান্বিত হইল, এবং রাজভাষায় দুই চারিটি কথা বলিতে লাগিল। শেষকালে আমাদের কাছে গুটিকতক মিষ্টি কথা শুনে তবে মেমসাহেবেরা ঠাণ্ডা হ'লেন। এই রকম সময়ে অপর শ্বেতাঙ্গিনী মহিলারা বলিতেছিল যে মহাত্মা গান্ধীজী নাকি আমাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়েছেন। এ কথা শুনে আমাদের ভারি হাসি পেল। বেচারীদের এত গাত্রদাহ যে, আর কিছু না বল্‌তে পেরে, শেষকালে এই কথা বলে ফেল্লে। যাক্‌,এ কথা শুনে আমরা বেশ গর্ব্ব অনুভব করিলাম। আরও কয়েকটি ভদ্র ইংরাজ মহিলার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। মিত্র সাহেব তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রীতিকে নিয়ে ষ্টেসনে এলেন। তাহাকে আমরা তাহার বাড়ীতে দেখি নাই, সে 'কনভেন্টে' পড়িতে যায়। সকাল ৮টায় যায়, বৈকালে ৪টার সময় আসে। আমরা তাকে দেখি নাই বলে' আমাদের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এলেন। মেয়েটি বেশ নম্র, বিনয়ী ও ধীর প্রকৃতির। শিক্ষাও বেশ, চেহারাও বেশ সুশ্রী।

বেলা ৪টার সময় বম্বে মেল সুদূর পথের যাত্রীদের নিয়ে বম্বে অভিমুখে যাত্রা করিল। আমাদের সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট দুখানা রিজার্ভ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু রিজার্ভের মতই খালি ছিল একেবারে—একটি লোকও ছিল না। বিলাতী মেল আজ বম্বে যায় বলে' বম্বে মেলে অন্য কাহাকেও রিজার্ভ দেওয়া রেল কোম্পানীর নিয়ম নহে। মনের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণও নক্ষত্র-গতিতে ছুটেছে। ক্রমেই সন্ধ্যা হয়ে এল; নীল আকাশে অসংখ্য তারকামালা ফুটে উঠল। রাত্রি ১০টার সময় বম্বের পথে প্রথম 'টনেল' পার হ'লাম। তার পরেই নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিলাম।

৪ঠা অক্টোবর—

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্য্য-কিরণ প্রতিভাত হয়ে কামরার ভিতর খুব আলো হয়ে উঠল। ট্রেণ একই ভাবে চলেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বসে বসে প্রকৃতি দেবীর নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ কচ্ছেন। রাত্রিতেও নাকি জ্যোতিষী-ঠাকুরুণ বসে দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেছেন। আমার চোখে রমণীয় দৃশ্য যতই সুন্দর বোধ হউক, নিদ্রাদেবী চোখে আবির্ভূতা হলে আর কিছুই ভাল লাগে না। বোম্বাই মেল ২।৩ ঘণ্টা অন্তর নির্দ্ধারিত ষ্টেসনে থাম্‌ছে। রাণী বেচারী একাদিক্রমে ক'দিন জ্বর ভোগ করিতেছে। হে নারায়ণ, তোমাকে দর্শন করিতে যাওয়ার পথে এত বাধা বিঘ্ন ? দেখা যাক, প্রভু, তোমার কি ইচ্ছা—আমরা তোমার আশাতেই অসীম ভরসা নিয়ে, এই রোগগ্রস্তা মেয়ে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করেছি। বাবা এক ভাবেই রাণীর শিয়রে বসে আছেন, এবং নিয়মিত সময়ে ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাচ্ছেন। বম্বে মেলে উঠে, ট্রেণ এত জোরে যাচ্ছে দেখে, ছোট ছেলেদের আমোদ আর ধরে না। ট্রেণের গতির এত জোর যে কতক্ষণে আমাদের বম্বেতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে, এমনি গতিতে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে ! বম্বে পৌঁছিলে, আমাদেরও আপাততঃ ট্রেণচড়া স্থগিত হয়। সেখানে রাণীর অসুখের অবস্থা দেখে, তবে আমরা আবার দ্বারকা যাত্রা করিব, এইরূপ স্থির হয়েছে। বসে বসে কত রকম স্বভাবের শোভা দেখ্‌ছি। কোথাও নির্ঝরিণী কত এঁকে বেঁকে পার্ব্বত্য পথে বাধা পেয়ে লাফিয়ে চলেছে। আবার কোথাও বা শান্ত ভাবে ঝুরঝুর করে উদাস ভাবে বেয়ে চলেছে। কত রকমের অযত্ন-বর্দ্ধিত বনফুল নয়ন মুগ্ধ কচ্ছে। এমন চমৎকার শোভা যে বর্ণনাতীত, চোখে না দেখ্‌লে বোঝান যায় না। ময়ুর ময়ুরী পাহাড়ের উপর বসে আমাদের ট্রেণের গতি দেখ্‌ছে। কত রকমের পাখী,—দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়া নানা জাতীয় পক্ষী—সেই নির্জ্জন বনভূমি মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত কর্‌ছে। এ দৃশ্য দেখ্‌লে সেই অনন্ত দেবের চরণে আপনি মস্তক নত হয়ে আসে। লীলাময়, তোমার এত রূপ চারি দিকে দেখেও তোমাকে লোকে ধারণায় আন্‌তে পারে না। বেলা ১০টা হইতে ট্রেণ অতি দুর্গম পথ দিয়ে যেতে লাগল। কি ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় কেটে রেল রাস্তা করেছে,—দেখ্‌লে ভয় করে।

ক্রমে রেলগাড়ী এমন স্থানে এসে পড়িল যে, চেয়ে দেখি, তার চতুর্দ্দিকেই পাহাড়ের মালা ;—কোথা দিয়ে যে রেল যাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার পরেই ট্রেণ হুইসিল দিতে দিতে একটা 'টনেলের' ভিতর প্রবেশ কর্‌লে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'টনেল' কি ভয়ানক অন্ধকার দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। এমন সূচীভেদ্য অন্ধকার! জীবনে কখনো দেখি নাই ! কোথায় লাগে অমাবস্যার রাত্রি ! শুনেছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে নাকি জীব মাত্রেই চক্ষে এমনি ঘোর অন্ধকার দেখ্‌তে থাকে ; তার পরে মরণের পারে পৌঁছায়।

'টনেলের' ভিতর পাহাড়ের গা থেকে জল পড়্‌ছে, মনে হ'ল। আমি হাত বাড়াতেই, জল না লেগে, তার ছিটে আমার হাতে লাগল। এই রকম করে ট্রেণ কখন বা পর্ব্বতের শিখর-দেশ দিয়ে, কখনও বা পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে নামতে উঠ্‌তে লাগল। ঝরণার ব্রীজও পার হ'ল ও পার্ব্বত্য সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে ট্রেণ ১১ এগারটি 'টনেল' পার হ'ল। একটা 'টনেল' এত বড় যে ঝড়ের গতি বম্বে মেলেরও সেই 'টনেল' পার হয়ে যেতে আধঘণ্টা সময় লাগল। ট্রেণ আধঘণ্টা লেট্‌ যাচ্ছে শুনছি। তার ক্ষতি পূরণের জন্য রেল নক্ষত্রবেগে ছুটেছে। রেলের ভিতর উঠে দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না। দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে, "পপাত ধরণী তলে" বুঝি এখুনি হব ! আমরা যে কামরায় আছি, তাহাতে, আমার শ্রীমান কনিষ্ঠ পুত্রের "টনেল" দেখে যা ভয় হয়েছে,—যেই টনেল আস্‌ছে, অমনি আমার কোলের উপর বসে আমাকে জড়িয়ে ধর্‌ছে, আর বল্‌ছে, "মা, আমি আর দুতহুমী কল্‌বনা"। আর কেবল চেঁচিয়ে উঠছে। তার ভয় দেখে আমার বড় হাসি আস্‌তে লাগল। আবার একটা মজার কথা মনে পড়ল। খোকা ত ছোট ছেলে—আমার এক প্রবাণা আত্মীয়া—'টনেল' দেখে তিনিও ভয় পাচ্ছেন, তিনিও আবার লিখেছিলেন,

"টনেল ভিতরে যবে গাড়ী প্রবেশয়,
বুঝিলাম এইবার জীবন সংশয়"।

দেখ দেখি, তাঁরও টনেলের ভিতর গিয়ে এত আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, তিনি একেবারে ভাবে ও ভাষাতেও প্রকাশ করে ফেলেছেন ! যাক, আমাদের কিন্তু বক্তব্য

'টনেলের' কাছে রেল গাড়ী আস্‌ছে, ততবারই কেবল আনন্দ হচ্ছে, ও কেবল মনে হচ্ছে যে, যতটা রাস্তা আরও আছে, বম্বে যেতে সবটাই যেন "টনেল" হয়। ক্রমে সব টনেল, পাহাড় অতিক্রম করে ট্রেণ পাহাড়ের সানুদেশে একেবারে নেমে এল। আর আমরা পাহাড়ের উপরে নেই। এখন আবার গরম অনুভব কর্‌ছি। একখানা কামরায় ছেলেরা, আমরা ও বাবুরা আছি। আর একখানাতে বিধবাদের দল ও সধবা একজন আছেন। তাঁদের গল্প বেশ জমে উঠেছে। নানাবিধ গল্প কত রকমের যে ও ঘরে হচ্ছে, যে কি বলব। আজগুবি গল্প ও আইন ব্যবসায়ীর কথাও হচ্ছে। ঘোষ-গিন্নির ট্রেণের উঠলেই মাথা ধরে; তিনি রেল গাড়ীতে উঠলেই শুয়ে পড়েন। জগবন্ধু ও মিত্র-গিন্নি চুপ-চাপ বসে আছেন। আর জ্যোতিষী-ঠাকরুণ, তিনি শুতে ভালবাসেন না। লম্বা ট্রেণ চড়ার সখও তাঁর বড়। যা'হোক, বম্বে আসা—এ খুবই লম্বা ট্রেণে চড়া হ'ল। জ্যোতিষি ঠাকুমা বসে বসে ভাল মন্দ সব দৃশ্যই দেখছেন। আমাদের কামরায় ছেলেদের মৃদঙ্গ বাজছে, আর ও ঘরে গল্প জমে উঠেছে। এখন সাড়ে বারটা; "বম্বে" পৌঁছাতে ১টা হবে। যে বাবুকে 'টেলিগ্রাম' করা হয়েছে, তিনি আমাদের জন্য বম্বেতে তিনশত টাকা দিয়ে চায়নি ষ্টেসনের সামনেই "ফ্ল্যাট" ভাড়া করেছেন। "ফ্ল্যাট" মানে একটা ৭তলা বা ৬তলা বাড়ী ৩।৪ কিম্বা ৫।৬ পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হয়; ও তাহাতে তাদের কোনও অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। এও সেই "ফ্ল্যাট" আমাদের জন্য স্থির করা হয়েছে শুনছি! ট্রেণ ক্রমেই বোম্বাই নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সহরের মধ্যে সমুদ্রের জল, হ্রদের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়ে ধরে রেখেছে, কিসের জন্য যে বুঝতে পারা গেল না। বম্বেতে চাষের কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে কোনও রকম শস্য কিম্বা শাক-সব্জি, কিছুরই চাষ নেই। কেবল অগণিত নারিকেল বৃক্ষ সারি সারি দণ্ডায়মান। সহরের ভিতর যতই অগ্রসর হচ্ছি, পাহাড়ও দেখছি, গ্রীষ্মও বোধ কর্‌ছি! দুধারে শ্রেণীবদ্ধ গাছে অসংখ্য বাবুই-বাসা ঝুলে রয়েছে; ও হরিদ্রারঞ্জিত কত রকমের বনফুল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই দেশে বুঝি বাবুই পক্ষী বেশী জন্মায়; নইলে সারি সারি এত বাসা থাকবে কেন? বাবুই-বাসা দেখে ছেলেরা লাফিয়ে উঠল, 'আমরা বাবুই-বাসা লইব'। ট্রেণ তখন ধীর-গতিতে চল্‌ছে। আমি বল্লাম, পাগলা ছেলে, কি করে বাবুই-বাসা আনা যাবে, ট্রেণ চল্‌ছে যে! (ক্রমশঃ)

পাঁচ অঙ্ক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবামাত্র যতীশ প্লাটফর্ম্মের দেওয়ালে-আঁটা ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, এগারোটা বাজিয়া সতেরো মিনিট। মনে মনে সতেরো মিনিটের সঙ্গে আরো চব্বিশ মিনিট যোগ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! বারোটা বাজিতে আর ক' মিনিট বা বাকী। অফিসে পৌঁছিতে···ওঃ, সে কথা আর ভাবা যায় না।

চটপট্ প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সিতে সে চাপিয়া বসিল; এবং ট্যাক্সি আসিয়া লালবাজারে তার অফিসের সামনে পৌঁছিলে ভাড়া চুকাইয়া এক-লাফে টপাটপ্ তিন-চারিটা সিঁড়ি টপকাইয়া তেতলার নিজের ঘরে আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিবে, এমন সময় তার নজর পড়িল ডেস্কের উপর লেখা একখণ্ড কাগজের উপর। মনিবের নিজের হাতে লেখা, ইংরাজী অক্ষরে—

Jyotischandra Sen to see me immediately.

P. R.

যতীশের চোখের সামনে হইতে সমস্ত পৃথিবীটা এক মুহূর্ত্তে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল! কাগজখানা সে হাতে তুলিয়া লইল। হাত কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপুক! সেই পত্র হাতে লইয়া, আশেপাশে কাহারো পানে না চাহিয়া সে একেবারে মনিব পি, আর-এর খাশ্-কামরার দিকে ছুটিল।

মনিব বাঙালী। পি, আর কথাটার অর্থ পরেশ রায়।

বাঙালী হইলেও তিনি বিলাত-ফেরত। মেজাজ খাসা, মজলিসী লোক, মায়া-মমতা আছে। মনিব হইলেও, অফিসের কর্ম্মচারীদের সুখ-দুঃখে উদাসীন নন্, অফিসের বাহিরে সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত সদালাপ করেন। তবে, কাজ আদায় সম্বন্ধে ভারী কড়া। অফিসে তাঁর মেজাজ পুরাদস্তুর খাস ইংরাজের মতই—কর্ম্মচারীদের হাজিরার দিকে লক্ষ্য তাঁর বেশ তীক্ষ্ণ।

পরেশ রায়ের খাশ কামরার সামনে দাঁড়াইতে চাপরাশি জগা কহিল—এই যে, আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলুম। হুজুর তলব করেচেন। যান্—কথাটা বলিয়া জগা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আর সেই দ্বার খুলিয়া যতীশ সেন গিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তার বুকের মধ্যে তখন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। আজ…বারে-বার তৃতীয় বার—তার উপর দেরী করার দরুণ কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে! কৈফিয়ৎ তলব ছাড়া ঐ চিঠিটুকুর অপর কি অর্থই বা থাকিতে পারে?

মনিবের মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি আরো গম্ভীর। তিনি সেই গম্ভীর-দৃষ্টি যতীশের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—কটা বেজেচে, যতীশবাবু?

যতীশকে মনিব যতীশ বলিয়াই ডাকেন। নামের সঙ্গে সহসা বাবুর যোগ হইয়াছে দেখিয়া যতীশ ভড়কাইয়া গেল। সে মাথা নত করিয়া নীরবে রহিল।

মনিব কহিলেন,—ঘড়িটা দেওয়ালে; মেঝের নয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলুন…

যতীশকে ঘড়ির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে হইল। মনিব কহিলেন,—কটা বেজেচে?

যতীশ কহিল,—বারোটা বেজে সাত মিনিট।

মনিব কহিলেন,—ঘড়িটা বোধ হয় ফাষ্ট নয়?

জবাব দিতেই হইবে। যতীশ কহিল,—আজ্ঞে, না।

মনিব কহিলেন,—অফিসে আপনাদের পৌঁছুনো উচিত বেলা সাড়ে দশটায়। নয় কি?

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে হাঁ! এই অবধি বলিয়া সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধ রহিল, পরক্ষণে কহিল,—কিন্তু…

মনিব কহিলেন,—আমি তা জানি। আরো দু'বার দুটো কৈফিয়ৎ হয়ে গেছে। পাড়ায় কাদের বাড়ী হঠাৎ কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল…সেটা প্রথমবারের কথা। দ্বিতীয়বার, পথ বর্ষার জলে ডুবে গেছলো বলে ঘোরা-পথে ষ্টেশনে আসতে ট্রেণ ফেল হয়ে যায়…এই না…?

যতীশ কহিল,—কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বানিয়ে বলিনি তো…

মনিব কহিলেন,—আমি তো সে বিষয়ে সন্দেহ করিনি। কিন্তু কি জানেন, যতীশবাবু, অফিসের কাজ তো তা বলে বসে থাকতে পারে না…অফিসের যে তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়! সে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থাও তো আপনি কিছু করতে পারেন নি!…যাক, আজ কি আবার পাড়ায় কারো বাড়ী কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল? কলেরা? ডেলিভারী-কেশ্?…

এ বিদ্রূপ যতীশের গায়ে যেন কাঁটার চাবুক মারিল! মনে হইল, হায় রে, গোলামির এতই মায়া…এ টিট্‌কারীর পরও এখানে মুখ গুঁজড়াইয়া চাকরি করিতে হইবে! এর চেয়ে লোটা-কম্বল লইয়া জঙ্গলে বাহির হওয়াতেও যে ঢের সুখ, ঢের আরাম! কিন্তু ঘরে বিধবা মা, আইবুড়ো বোন, ছোট ভাই...সে যে কতখানি নিরুপায়!…যতীশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মনিব কহিলেন,—এবারে এত দেরী হলো কেন? পাড়ায় ব্রাহ্মণ ভোজন ছিল না কি?

যতীশ বাধা দিয়া কহিল,—আপনার কাছে কোনো দিন কোনো মিথ্যা ওজুহাত তুলিনি আমি। যে কারণে দেরী হয়েচে, তা এখনি অকপটে বলচি...আজ…

মনিব কহিলেন,—হাঁ, বলুন—আমার শোনা দরকার, কারণ অফিসে একটা discipline রাখতে হবে তো...

যতীশ কহিল,—আজ ষ্টেশনে এসে দেখি, একটি ভদ্রলোক ব্যায়রামে ভুগছিলেন—তাঁকে নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েরা ট্রেণে করে ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলকাতায় আসছিলেন চিকিৎসার জন্য…তা, ভদ্রলোক ভির্মি যান্—তাঁর লোকজন ভয় পেয়ে বারুইপুর ষ্টেশনে তাঁকে নামান। বিপন্ন দেখে আমি একজন ডাক্তার ডেকে এনে তাঁর পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করতে যাই—তাই…

মনিব কহিলেন,—সকলের প্রতি আপনার এত দরদ, শুধু আমার বেলা সেটার কার্পণ্য দেখলে, আমার পক্ষে তা সহ্য করা একটু শক্ত হয় না, যতীশবাবু…?

যতীশ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ রহিল। কি যে করিবে সে? এই বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ…চাকরি কি আর কোথাও মিলিবে

না? কিন্তু তখনি মনে পড়িয়া গেল, পাঁচ মাস পূর্ব্বেকার কথা! ছোট ভাইটির টাইফয়েড হইয়াছিল, ঔষধ-পথ্য ও ডাক্তারের ভাবনায় সে কতখানি কাতর—মার চোখে জল··· সে সময় এই মনিবই তাঁর মোটরে করিয়া দু'বেলা বড় ডাক্তার পাঠাইয়া ভাইকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন···অফিসের' দিকে তাকে ঘেঁষিতেও দেন্ নাই! এত বড় ঋণে যাঁর কাছে সে ঋণী—তাঁর একটা কঠিন কথার ঘায়ে সে ঋণ অস্বীকার করিয়া, সে ঋণের দায় এড়াইয়া সে পলাইয়া যাইবে, তা'ও অন্যায় করিয়া, দোষ করিয়া···! মন ধিক্কারে ভরিয়া আপন হইতেই বলিয়া উঠিল, এঁর পায়ে এমনিতেই তো মাথা বিকাইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, দোষ করিয়া আবার তর্ক তুলিবার স্পর্দ্ধা রাখো! ছি!

যতীশ কাতর কণ্ঠে কহিল,—এবারটি মাপ করুন, আর কখনো দেরী হবে না!

মনিব কহিলেন—ব্যস—খুশী হলুম। এখন নিজের কাজে যাও,—আর দেরী করো না।

যতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনিব আপনি ছাড়িয়া তুমি বলিয়া কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে এবারও মাপ! আঃ!

যতীশ নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তারপর দু'দিন···সাড়ে দশটার পূর্ব্বেই সে অফিসে হাজিরা দিল।

যতীশের বাড়ী বারুইপুরে। ডেলি প্যাশেঞ্জারি করিয়া তাকে অফিসে চাকরি রাখিতে হয়! ৮-৪৮এর ট্রেণে বারুইপুরে ট্রেণে চাপিয়া বেলিয়াঘাটায় আসিয়া সে নামে ঠিক ন'টা বিয়াল্লিশ মিনিটে। তারপর ট্রাম··দেহ-মনও এ দু'দিন বেশ স্বচ্ছন্দ!

কিন্তু আবার গোল বাধিল তৃতীয় দিনে। ষ্টেশনের কাছাকাছি সে আসিয়াছে,—একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীর মাথায় বিস্তর মোটঘাট চাপাইয়া এক গৃহস্থ তাঁর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ষ্টেশনে আসিতেছিলেন। বারুইপুরের গাড়ী··· তার জীর্ণতার কথা আজো কেন গেজেটিয়ার-বস্তিতে ছাপা হয় নাই, ইহা ভাবিয়া যতীশ বহুবার বহু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে—সেই তো গাড়ী···হঠাৎ একটা মোড় বাঁকিতে গিয়া পিছনের চাকা ভাঙ্গিয়া গাড়ী আরোহীদের পথের উপর উল্টাইয়া দিল। একটি ক্ষুদ্র শিশু গড়াইয়া পাশের ডোবায় গিয়া পড়িল। ধন্-ধন্ চীৎকার···কিন্তু কে ধরিবে? চাকরি-গতপ্রাণ চাকরিজীবীরা তখন চাকরি রাখিতে ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশনে ছুটিয়াছে! যতীশ সরিতে পারিল না—সে গিয়া পরিচর্য্যায় নামিল। একজন স্ত্রীলোকের জখম কিছু বেশী, তা ছাড়া কর্ত্তাটির মাথা কাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে কি আর্ত্ত কোলাহল! দু'জন চাষাকে বহু সাধনায় সঙ্গে আনিয়া তাদের সাহায্যে গৃহস্থ-পরিবারকে পরের ট্রেণে তুলিয়া যতীশ তাদের ক্যাম্বেল হাসপাতালে আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেখানে দেখানো, দেখা-শুনা··তারপর তাদের গাড়ীতে চাপাইয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া—ঘড়ি নির্ম্মম তালে নিজের পথে সমান চলিয়াছে। কাজেই যতীশ আসিয়া অফিসে পৌঁছিল বেলা সাড়ে এগারোটায়। আবার ডেস্কের উপর মনিবের সেই দু' ছত্র লেখা পত্র·এবং যতীশের কম্পিত বুকে মনিবের ঘরে আসিয়া দাঁড়ানো!

পরেশ রায় কহিলেন—কবে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যতীশবাবু যে, আর দেরী হবে না?···

যতীশের বুক ফাটিয়া যেন অশ্রুর জোয়ার বহিয়া গেল। সত্যই তো··তার আর বলিবার কি আছে? বেলা সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা অবধি সময়টুকু·সে যে বিক্রীত হইয়া আছে!

পরেশ রায় কহিলেন—আজ কি পরোপকার-ব্রত সফল হলো, যতীশবাবু?

যতীশ কোনোমতে বিলম্বের কারণ বিবৃত করিল।

শুনিয়া পরেশ রায় কহিলেন—এত বড় দরাজ ছাতি নিয়ে আপনার পক্ষে চাকরি করতে আসা উচিত হয় নি! রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শুনেচেন? সেখানে যান্···

হায়রে, সে উপায় যদি থাকিত! কিন্তু ঐ মা, বোন, ভাই··তারা যে দু' মুঠা অন্নের জন্য তারি মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে! তাদের উপায়? কাজেই...

যতীশ কহিল—এবারের মতও মাপ করুন, দয়া করে···

পরেশ রায় কহিলেন—আজ-কাল কোনো কোনো নাটক তিন অঙ্কের হচ্ছে—নয় কি? তা, আপনার এ পরোপকার নাটক যে চার অঙ্ক ছাপিয়ে চললো·· কিন্তু সাবধান করে

দিচ্ছি, পঞ্চম অঙ্কের পর আর অঙ্ক মিলবে না···পঞ্চম অঙ্কেই যবনিকা···বুঝলেন ?

যতীশ এ কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না ! না বুঝিয়া সে হতভম্বের মত পরেশ রায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরেশ রায় হাসিয়া কহিলেন,—একটু সাহিত্য হয়ে পড়েচে—না ? অর্থাৎ, ফের এ-রকম কারণ ঘটলে আর কৈফিয়ৎ তলব হবে না ! অফিসের কাজে তোমার ইস্তফা দিতে হবে ..বুঝলে ?

এবার যতীশ অর্থ বুঝিল। অতি সরল ও স্পষ্ট কথাটুকু ! বুঝিয়া সে বিদায় লইতেছিল ; পরেশ রায় ডাকিলেন—যতীশ···

যতীশ ফিরিল।

পরেশ রায় কহিলেন—তোমার উপর আমার বিশ্বাস বড় বেশী...তোমার উপর অনেকখানি নির্ভর করি। তুমিও তা জানো। আর তুমি কেরাণীগিরি করবার লোক নও···তা বুঝেই আমি তোমায় একটা ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা করে রেখেচি। কিন্তু নিত্য তোমার লেট্ হলে তোমার অধীনের লোকেরা তোমায় মানবে না, তারাও লেট্ করবে···আর তাতে আমার কাজ অচল হয়ে দাঁড়াবে!···যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁরাও পরোপকার করে থাকেন ..তবে নিজেকে কোনো কৈফিয়তের মধ্যে নিক্ষেপ করে পরোপকার করতে ছোটা বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয় ! এগুলো থেকে তোমার মনের পরিচয় যা পাই, তা ভালোই,—তবে, একজনের উপকার করতে গিয়ে অপরের অপকার যদি করে ফ্যালো, সেটা কি ঠিক logical হয় ?—যাক্, মনে রেখো—এবার হুঁশিয়ার ··কারণ আমার যা কথা, তাই কাজ। তোমায় ছাড়তে আমার কষ্ট হবে—কিন্তু তবু নিরুপায় হয়েই......

পরেশ রায় কথা কন্ কম, সত্য। এই কম কথাটুকুই যথেষ্ট ! যতীশ আসিয়া আপনার চেয়ারে বসিল। মুখ তার বিশুষ্ক ; মনের মধ্যে একটা প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল। সামনে অত-বড় কাণ্ড,—মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি, আর এধারে অফিসের হাজিরা ! কর্ত্তব্য ? কর্ত্তব্য কোন্টা কম ? মানুষের অতখানি অমর্য্যাদা···সেটা করিলেই কি বড় কর্ত্তব্য করা হইত ? সমস্যা ! পাঁচজনে আসিয়া পাঁচ কথা কহিল,—কিন্তু মনের এ মেঘ সে সব কথার ফুৎকারে মিলাইবার নয় ! কাজেই মনের মধ্যে সে মেঘ ক্রমেই দীর্ঘ ছায়া মেলিয়া ধরিল।

তারপর এক সপ্তাহ নিরাপদে কাটিল। চমৎকার ! কোনো কোলাহল নাই ! সমস্যার কোনো খোঁচ্ কোথাও উঠিল না !

সেদিন সোমবার। মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, পথের ধারে ঝোপে-ঝাপে নানা পাখীর কল-কাকলী, রৌদ্র-স্নিগ্ধ প্রকৃতির বুকে কি নিবিড় আরাম ! যতীশ সাইক্‌ল্ চড়িয়া ষ্টেশনে আসিতেছিল। এটা বে-মেরামতে খড়ের গাদার কাছে পড়িয়াছিল ; সম্প্রতি সে সারাইয়া লইয়াছে। ট্রেণ ফেল করার আশঙ্কা ইহাতে কম্। ষ্টেশনে সাইক্‌ল্ রাখিয়া সে কলিকাতায় যায়, আবার ফিরিয়া সাইক্‌ল্ চড়িয়া গৃহে ফিরে।

পথের উপর একটা মস্ত ষ্টীম-রোলার ; রাস্তা মেরামত হইতেছে। নীচে তাহারি পাশ দিয়া একটা আইলের উপর পায়ে-চলা পথ তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছে। সাইক্‌ল্ লইয়া সে সেই পথে আসিল। হঠাৎ সামনে দেখে নব্য কেতায় শাড়ী-পরা এক তরুণী···আইল ভাঙ্গিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। যতীশ ভাবিল, বেল দিয়া তাঁকে সতর্ক করিবে ? না, সাইক্‌ল্ হইতে নামিয়া পড়িবে ? এক মুহূর্ত্তের দ্বিধা ! পরক্ষণেই ওদিক হইতে একপাল গোরু ভয়-চকিত ত্রস্ত গতিতে ছুটিয়া আসিল, এবং তরুণী ভয় পাইয়া ফিরিয়া পিছন দিকে ছুটিলেন। এটা এমন অকস্মাৎ ঘটিল···যে, যতীশের কিছু করিবার পূর্ব্বক্ষণেই সে সাইক্‌ল্-সমেত একেবারে তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিল। তরুণী আইল্ হইতে ছিটকাইয়া নীচের খাদে গড়াইয়া পড়িলেন—যতীশও সাইক্‌ল্-শুদ্ধ গড়াইয়া তাঁরি পাশে।

চট্‌পট্ উঠিয়া যতীশ দেখে, তরুণী তখনো কাতরভাবে পড়িয়া···কুণ্ঠায় লজ্জায় সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল ! সে এখন কি করিবে ?···তরুণী কথা কহিলেন,—আমি উঠতে পারচি না—পা'টা মচকে গেছে ··দয়া করে আমার হাতটা ধরুন···

যতীশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। একে এই নির্ম্মম আঘাত···তার উপর···কোনোমতে তরুণীর হাত ধরিয়া

তাঁকে সে তুলিল। এত বিপদের মধ্যেও সমস্ত দেহে কেমন একটা শিহরণ বহিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত দুনিয়া যেন মুছিয়া গেল! কাণে বাজিতেছিল, শুধু একটা পাখীর কাকলী—পাখীটা কাছেই কোনো গাছের ডালে বসিয়া প্রভাতের এই স্নিগ্ধ দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল, বুঝি!

তরুণী যতীশের কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যতীশ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বেদনার্ত্ত স্বরে কহিল,—আমায় ক্ষমা করুন···

তরুণী হাসিলেন···ঘন কালো মেঘে ভরা আকাশের বুকে সে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক···ভয়ার্ত্ত প্রাণ যে-বিদ্যুতের আভায় আশায় ভরিয়া ওঠে! তরুণী হাসিয়া কহিলেন,—আপনার তো কোনো দোষ নেই,—দোষ আমারি! গোরুগুলো দেখে আচম্‌কা আমিই যে উল্টো মুখে ছুটেছিলুম··· আপনি কি করে বুঝবেন যে···

যতীশ ততক্ষণে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! তার মুখে কোনো কথা নাই!

তরুণী কহিলেন—যাক্, আমায় একটু সাহায্য করুন,—ডাকবাংলায় যদি পৌঁছে দেন দয়া করে! সেখানে আমার গাড়ী আছে, লোকজন আছে···

যতীশ কহিল,—কিন্তু এখন ভালো ডাক্তার একজন···

তরুণী কহিলেন,—বেশ, সেখানে আগে পৌঁছে দিয়ে পরে যা কর্ত্তব্য বুঝবেন, করবেন···

তাহাই হইল। ডাক-বাংলা ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়। তরুণীকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া যতীশ কহিল—লোকজন কাকেও দেখচি না তো···আপনার ড্রাইভার?

ফটকের ধারে একখানি ছোট বেবি-অষ্টিন্ মোটরগাড়ী। তরুণী কহিলেন—বামুন গেছে ঘর তো লাঙল তুলে ধর! ড্রাইভার ছিল না; নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসেচি—তবে ক্লীনার ছিল, আর একজন বেয়ারা ছিল—কোথাও বাবুরা বেড়াতে গেছেন, বোধ হয়! তাহলে···তরুণী যতীশের পানে চাহিলেন। এ চাহনির সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া এমন মোহ ঝরিতেছিল যে যতীশের সাধ্য কি, অফিসের কথা মনে করিয়া সরিয়া পড়ে! তা'ছাড়া এঁর পায়ের জখমও বেশ গুরুতর! তরুণী খোঁড়াইতেছেন!

যতীশ কহিল,—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তাহলে যে ডাক্তার পাই···

তরুণী কহিলেন—কিন্তু যাবেন কিসে? আপনার সাইক্‌ল্··তরুণী হাসিলেন।

ঠিক! সাইক্‌ল্‌টা সেইখানেই পড়িয়া আছে! আনা হয় নাই।

তরুণী কহিলেন,—কিন্তু, সাইক্‌ল্ ঠিক আছে কি?*

যতীশ কহিল—ঠিক করে নেবো এখনি। ও ভারী মজবুত গাড়ী···বলিয়া আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া সে সরিয়া পড়িল। তার কপাল আর কপোল দুই তখন রীতিমত ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে! খানিকটা হাঁটিয়া আসার পর মনে হইল, বেশ বাতাস বহিতেছে তো! বাঃ! এতক্ষণ বহিঃপ্রকৃতি বলিয়া যে কিছু আছে, সে খেয়ালও তার যেন ছিল না!

বিশ মিনিটের মধ্যে ও-পাড়ার বিচক্ষণ ডাক্তার ধনবল্লভকে আনিয়া সে ডাক-বাংলায় হাজির করিয়া দিল। ধনবল্লভ পা দেখিয়া একটা ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কহিলেন—ওষুধ তো সঙ্গে আনিনি!

তরুণী কহিলেন—তার জন্য ভাববেন না···আমি গাড়ীতে বসে এখনি তো কলকাতায় ফিরচি...সেইখানে গিয়ে যে ব্যবস্থা হয়, করবো···এই অবধি বলিয়া যতীশের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন—এঁর ফী? ··

ধনবল্লভ কহিলেন,—তার জন্য ভাববেন না, মা-লক্ষ্মী··· আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক, মোটর চড়ে ডাক্তারী করি না তো, কাজেই পয়সার অত কদর জানি না।

তরুণী ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন,—আমায় ক্ষমা করবেন—তবে professional man বুঝেই···

ধনবল্লভ কহিলেন—কিছু না, কিছু না,—এটা মানুষের কর্ত্তব্য। তা ছাড়া ওষুধ-পত্তর তো কিছুই দিলুম না। কি বলো ভায়া যতীশ···?

ভায়া-যতীশের বলিবার কিছু ছিল না! সে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। যেন পাথরের ষ্টাচু!

তরুণী কহিলেন—দেখুন দিকি, আমার লোকগুলো কি বদ্···এ সময় কোথায় গিয়ে বসে রইলো!

যতীশ কহিল—একটু খুঁজে দেখি···

যতীশ বাহির হইয়া গেল। তবে তাকে বেশীদূরে যাইতে

হইল না। অদূরে এক পুকুরে নামিয়া দুজন লোক সালুক ফুল তুলিতেছিল; লোক দুইটার বেশ-ভূষার পাড়াগেঁয়ে ভাব নাই! ইহারাই...?

তাই বটে! যতীশ কহিল—তোমরা কলকাতা থেকে আসচো তো ওঁর সঙ্গে···? মানে, ডাক-বাংলায় যে মোটর-গাড়ী রয়েচে···

—জী! বলিয়া দুজনেই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

যতীশ কহিল—শীগ্‌গির এসো ···তোমাদের মনিবের পায়ে চোট্ লেগেচে···

লোক দুইটা ছুটিল; ছুটিবার সময় সালুক ফুলগুলা ফেলিয়া গেল। যতীশ সেগুলা কুড়াইয়া লইয়া ডাক-বাংলায় ফিরিল। তরুণী তখন কোনোমতে মোটরে উঠিয়া বসিয়াছেন। লোক দুটা গাড়ীর হুড উঠাইতে ব্যস্ত। যতীশ ফুলগুলা লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে তরুণী হাসিয়া কহিলেন—বাঃ, বেশ তো ..দেবেন আমায় ফুলগুলি?

যতীশ সানন্দে হাত বাড়াইয়া ফুলগুলা আগাইয়া ধরিল। তরুণী কহিলেন—In remembrance···! বলিয়া তিনি হাসিলেন···সেই হাসি—যে-হাসির স্পর্শে সারা দুনিয়া তার দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে!

সেল্‌ফ্‌-ষ্টার্ট গাড়ী। গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইল। তরুণী নিজের হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন,—যতীশ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী কহিলেন—অশেষ ধন্যবাদ··· আপাততঃ তাহলে বিদায়। আজকের এ উপকার কখনো ভুলবো না···

গাড়ী চলিয়া গেল। এক ঝলক বাতাস, আর তার পিছনে খানিকটা ধূলা···

যতীশ যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল! স্বপ্ন টুটিতে তার খেয়াল হইল—অফিস আছে···তাই তো!...হাতে রিষ্ট-ওয়াচ ছিল। চাহিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ···যে সময়টুকুকে নিমেষমাত্র বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা চকিত নিমেষ নয়, দশটা বাজিয়া গিয়াছে!···ইহারি মধ্যে দশটা?···ঘড়ি বন্ধ নয় তো? না—এই যে চলিতেছে! ফাষ্ট···? তাই কি? সাইক্লে করিয়া সে দ্রুত ষ্টেশনে ছুটিল।

ঘড়ি ঠিক আছে। সাইক্‌ল্ রাখিবামাত্র সে শুনিল, ষ্টেশনের ঘড়ি বাজিতেছে, এক, দুই, তিন, চার···বাজিয়াই চলিয়াছে, অবিরাম! সর্ব্বনাশ, দশটা! তাহা হইলে, যোগ করো আরো চব্বিশ মিনিট···অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশটা! আর বারো মিনিট পরে সেই ট্রেণ···যেটা কলিকাতায় পৌঁছিবে এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে! এবং অফিসে পৌঁছিতে···আবার গিয়া ডেস্কে দেখিবে, সেই চিঠি···সমস্ত অফিস-বাড়ীটা তার চোখের সামনে চাকার বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল!...মনিবের সেই বিদ্রূপ-ভরা কথা, সেই টিটকারী···তার ইচ্ছা হইল, ঐ ট্রেণের লাইনে বুক পাতিয়া পড়িয়া থাকে, আর ট্রেণ আসিয়া মড় মড় শব্দে তার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া বাক্য-যন্ত্রণার দায় হইতে তাকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি দেয়!···

ট্রেণ আসিল; কিন্তু তার তলায় না পড়িয়া একটা কামরার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া যতীশ আসিয়া বেলিয়াঘাটায় পৌঁছিল। সেখান হইতে ট্যাক্সি ধরিয়া অফিস!···অফিসে সেই পরেশ রায়ের কামরা!

কামরায় ঢুকিয়া যতীশ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল—আবার দেরী করে ফেলেচি, স্যর!

কঠিন স্থির দৃষ্টিতে পরেশ রায় যতীশের পানে চাহিলেন। তাঁর কথা কহিবার পূর্ব্বেই যতীশ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবার বাসনায় কহিল—আমার অত্যন্ত অনুশোচনা হচ্ছে···কিন্তু একটি মহিলা···বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী মহিলা···অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছিলেন বলেই···

বাধা দিয়া পরেশ রায় কহিলেন—ব্যস, যথেষ্ট হয়েচে। এমনি কথাই আমি শুনবো, ভেবেছিলুম। কেবলি হৃদয়-মাহাত্ম্যের পরিচয়! সাহিত্য-চর্চ্চা আমিও একটু-আধটু করে থাকি, যতীশবাবু···বিশেষ আমাদের এই বাঙলা সাহিত্য! ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস মাসিকে বেরোয়, জানি,—কিন্তু তারো শেষ আছে। আপনার এ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মোদ্দা শেষ আর কোনোদিন দেখবো না! তাছাড়া বাংলা নাটক পঞ্চাঙ্কে শেষ হয়···আপনারো পঞ্চম অঙ্ক হলো আজ। এর পর ষষ্ঠাঙ্ক চলতে পারে না—কারণ, সংস্কৃত নাটকের সে রীতি বাংলাদেশে আজ অচল! পঞ্চম অঙ্কেই যবনিকা! তা, আমি বলেও রেখেছিলুম,—পঞ্চম অঙ্কেই এ নাটকের পরিসমাপ্তি! আপনার কৈফিয়তের আর দরকার হবে না। আজ ২৩শে জুন—জুনের বাকী কটা দিন থাকতে হয় থাকুন, যেতে ইচ্ছা হয় যেতে পারেন···জুনের

পুরো মাহিনা, তাছাড়া জুলাইয়ের মাহিনাও ১লা জুলাই তারিখে পাবেন…। তবে ১লা জুলাই থেকে এ অফিসের সঙ্গে আপনার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অন্যত্র চাকরি দেখতে পারেন। যান্…

জবাব হইয়া গেল। যতীশ টলিতে টলিতে আপনার চেয়ারে আসিয়া বসিল। অফিসের মেঝেটা তার পায়ের তলায় দুলিতেছিল। পৃথিবীটাও বুঝি এই দোলে দুলিতে দুলিতে রসাতলে তলাইয়া যাইবে! যাক তলাইয়া ‥ যতীশ ভাবিল, তা বলিয়া চাকরির মায়ায় যদি তরুণীকে সে ও-ভাবে বিপন্ন রাখিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে আসিয়া অফিসে চাকরি বজায় রাখিত, তো আজ আর তার মর্ম্মদাহের সীমা থাকিত না! আইনের চোখে আজ তার অপরাধ যত বড়ই হোক, বিবেক তাকে বেকসুর খালাস দিবে! কি তুচ্ছ এই অফিস, এই চাকরি, এই মুনিব! আজ সে যে আনন্দ পাইয়াছে আর্ত্তের সেবায়,—সে আনন্দর কাছে দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিবার মত শক্তি তার বিলক্ষণ আছে!—কিন্তু, তাইতো ‥তরুণীর নাম ঠিকানা কিছুই তো সে জানে না! জীবনে কত দীর্ঘ পথ কি ভাবে যে চলিতে হইবে—এ পথে আর কখনো তাঁর দেখা মিলিবে কি না, কে জানে! পথ বড় দীর্ঘ, এ পথে ভিড়ও বড় বেশী ‥মন তার বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আজ যদি এখনি ছুটিয়া গিয়া সে সেই তরুণীকে বলিতে পারিত,—তোমায় আঘাত দিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, সে অপরাধের কত বড় প্রায়শ্চিত্ত করিলাম, তা'ও ছাখো…

কিন্তু এ কথা বলিয়া লাভ? তরুণীর কাছে কিসের বা প্রত্যাশী সে… ?

মনের কোণে তার প্রত্যাশার কোনো সন্ধান মিলিল না। না মিলিলেও মন বলিতে লাগিল, আহা, আর একটু সঙ্গ,…সে-মুখের আর দুটা প্রসন্ন বাণী ‥স্বতঃ উৎসারিত ঝর্ণার তানের মত সেই স্বর-লহরী ·

তিনি থাকেন কলিকাতায়—কলিকাতা হইতে বারুই-পুরে গিয়াছিলেন। কেন? এত দেশ থাকিতে ঐ বারুই-পুরে… ? আর ও-ভাবে তার সঙ্গে আলাপ হওয়া—ষ্টীম-রোলার, আইলের সরু পথ, গোরুর দলে সেই অকস্মাৎ ভীতি ‥সবগুলা মিলিয়া কেমন যেন একটা শৃঙ্খল রচিয়া রাখিতেছিল ‥কিন্তু সে গরিব কেরাণী মাত্র—তা'ও আজ সে কেরাণীগিরিতে জবাব হইয়া গিয়াছে…আর তরুণী? আকাশের চাঁদ ‥গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা! কবি ঠিক কথা লিখিয়াছেন…। এ কি দুরাশার স্বপ্ন সে দেখিতেছে! ওরে ভিখারী, কি স্পর্দ্ধার বশে তুই বাদশাহী মশনদের পানে তাকাইতে চাস! ওরে মূঢ়, ওরে নির্ব্বোধ, ওরে হতভাগ্য…তরুণ বয়সের কি তোর এ দুর্দ্দম খেয়াল!… জবাব পাকা! সম্মুখে বিপদের ঘন অন্ধকার,—তবু আকাশের সেই পাখার গান, স্নিগ্ধ রৌদ্র, পুকুরের কালো জল, সেই মেঠো পথ, আর তরুণীর সেই মিষ্ট কথা, মিষ্ট হাসি মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাই… নহিলে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার তাড়নায় যতীশ চলন্ত বাসের সম্মুখে গিয়া শুইয়া পড়িত, কি, গঙ্গার জলে গিয়া ডুব দিত,—তার বিধাতাও বুঝি তেমন কিছু আশঙ্কা করিয়া থ হইয়া যাইতেন! ‥

আর কটা দিন মাত্র। হাতীর দাঁত আর পরেশ রায়ের বাত…এর মধ্যে কালোর কারচুপি নাই!

মঙ্গলবারে ভারী মন লইয়া যতীশ অফিসে আসিল। দেরী হয় নাই। দেরী করিয়া দিবার জন্য আজ কোনো তরুণী মোটর ছাড়িয়া আইলের পথে নামেন নাই! ভীত-ত্রস্ত পল্লী গাভার দলও…ষ্টেশনে আসিতে একটা গাভীরও দেখা মিলে নাই! তবে কি কালিকার সে ব্যাপার স্বপ্ন? না। বাইসিক্লের মোচড়ানো হ্যাণ্ডেলটা যতীশকে বারবার সচেতন করিয়া দিতেছিল, সে স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়… সত্য—তবে অতি কোমল সত্য, এই যা!

আর তার সঙ্গে একটা অতি কঠিন সত্য এই—চাকরিতে তার জবাব হইয়া গিয়াছে! মন বেদনায় লুটাইয়া পড়িল।

বেলা বারোটা। লেজার খুলিয়া যতীশ কি একটা অঙ্ক মিলাইতেছিল, জগা চাপরাশি আসিয়া জানাইল, হুজুরের তলব!

মনের সংস্কার! যতীশ এ-আহ্বানে একবার চমকাইল —পরক্ষণেই আরাম পাইয়া ভাবিল, আজ তো লেট্ নয়—কিসের ভয় তবে! হয়তো ..

মনিব পরেশ রায় কহিলেন—তোমার কালকের দেরীর কাব্যটা আনুপূর্ব্বিক শোনা হয়নি, যতীশ—কাহিনীটায় একটু আর্টিষ্টিক্ টচ্ দিতে যাচ্ছিলে তুমি, আমি থামিয়ে দিছলুম ··না? তা···

যতীশের বিরক্তি ধরিল। মনের একটা অতি-কোমল বৃত্তি লইয়া এভাবে বিদ্রূপ! বিশেষ একজন ভদ্র মহিলার প্রসঙ্গ ধরিয়া···! তবু উনি মনিব···আর সে···ওঁরই মাহিনা-ভোগী দীন কর্ম্মচারী মাত্র! তা বলিয়া···

পরেশ রায় হাসিয়া কহিলেন—একটি তরুণী মহিলাকে কি বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলে না?

যতীশ কহিল—হাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন—ঘটনাটা শুনি···পরেশ রায় আগ্রহের ভরে যতীশের পানে চাহিলেন।

যতীশ কোনো অলঙ্কার যোজনা না করিয়া সরলভাবে কাহিনীটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। তার নিজের মনে যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে সবের উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না, উল্লেখ সে করিল না! বৃত্তান্ত শুনিয়া পরেশ রায় মৃদু হাস্য করিলেন, এবং সহাস কণ্ঠেই কহিলেন, —সে মহিলাটি বেবি-অষ্টিন্ কার হাঁকিয়ে চলে গেলেন? নিজে হাঁকিয়ে··· ?

যতীশ কহিল,—হাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন,—খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা··· ?

যতীশ কহিল—চেহারায়, আচরণে, সকল দিক দিয়েই খুব সম্ভ্রান্ত।

—হুঁ! বলিয়া পরেশ রায় চুপ করিলেন। পরক্ষণেই কহিলেন—কাদের বাড়ীর মেয়ে?

যতীশ কহিল—তা বলতে পারি না।

পরেশ রায় কহিলেন—পরিচয় নাও নি? আশ্চর্য্য! তাঁর পায়ে জখম হলো···তারপর তাঁর খপর নেওয়াটাও তো একবার দরকার ছিল—কারণ, সে তোমার কর্ত্তব্য নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করোনি?

যতীশ কহিল—আজ্ঞে না···

পরেশ রায় কহিলেন—কারণ?

যতীশ কহিল—নিজের অপরাধের বেদনা মনে তখন এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে পরিচয় নেবার স্পর্দ্ধা হয় নি···

—বটে! বলিয়া পরেশ রায় আবার চুপ করিলেন,—তারপর টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজ টানিয়া তার উপর চক্ষু রাখিয়া কহিলেন—আচ্ছা ..তা নোটিশ যখন হয়ে গেছে, তখন তার নড়চড় হতে পারে না! তবে আশ্চর্য্য এর মধ্যে এই যে, অফিসে এত ছোকরা কাজ করচে, তাদের কারো জীবনে পরোপকারের এমন সুযোগ মোটে ঘটে না, আর তোমারি ভাগ্যে কি যত ··তা, আমি যে এ-সব অবিশ্বাস করচি, তা নয়—তবু···অর্থাৎ, তা—বেশ, অন্যত্র চাকরি করতে হলে আমার কাছ থেকে কোনো সার্টিফিকেট যদি চাও তো বলো, দেবো—a really good testimonial that ought to count for something. আর অন্যত্র চাকরি নেবার ঠিকঠাক কিছু হলে পারো তো আমায় একবার জানিয়ো—I should like to hear about it. তা এসো এখন।

যতীশ চলিয়া আসিল। এত দুঃখে তার হাসিও একটু পাইল এই ভাবিয়া যে, প্রভুর মন একটু যেন নরম হইয়াছে, তবে, গোঁ নাকি ছাড়িবার নয়,···তাই—না হইলে কি প্রয়োজন ছিল, এই বেলা বারোটায় তাকে ডাকিয়া কালিকার সে পুরানো কাহিনী শুনিবার! ··

জবাবের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মনের ভার বাড়িয়া চলিল। গৃহে মার কাছে, বোনের কাছে এ বিপদের কথা কি করিয়া সে বলিবে? এতখানি নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরা আছেন, তার মধ্যে কি করিয়া এত বড় দুঃসংবাদ···বাজের মতই তাঁদের বুকে বাজিবে যে!

শনিবার অত্যন্ত কাতর মন লইয়া অফিসে আসিয়া সে দেখে, টেবিলের উপর খামে একখানা চিঠি, তারি নামে। খামখানার গায়ে বেশ বনিয়াদী ধনী-ঘরের ছাপ···নামটাও ইংরাজীতে পরিষ্কার ছাঁদে লেখা—মেয়েলি হাতের বলিয়া মনে হয়! দ্বিধার সহিত খাম ছিঁড়িয়া সে চিঠি বাহির করিল। তাই তো···এ যেন এক ঝলক দক্ষিণ বাতাস ··খাম খুলিতেই একরাশ ফোটা ফুলের খোশবু ··! চিঠির তলায় ··নাম সই... মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবী—কে?···

চিঠিতে লেখা আছে—

মান্যবরেষু

সেদিনকার উপকার ভুলি নাই। আসিবার সময় পরিচয়ও দিয়া আসি নাই, সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। পায়ের চোট বেশ গুরুতর হইয়াছিল। তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। তাই ধন্যবাদ দিবার এ তুচ্ছ প্রয়াস।

চেষ্টা করিয়া আপনার নাম ও অফিসের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ডাক্তার বাবু আপনার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন; তাহা হইতে বারুইপুর ষ্টেশনে সন্ধান লওয়া হয়। অফিসের ঠিকানায় পত্র লিখিবার কারণ, শীঘ্র পাইবেন, তাই···

যাহা হোক, আমারি বে-হুঁশিয়ারীতে আপনার গাড়ীখানি জখম হইয়াছে। সেজন্য ক্ষমা চাহিতেছি। আপনার করুণার কথা আমার বাপ-মার কাছে বলিয়াছি। তাঁরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

যদি অসুবিধা না হয় তো কাল শনিবার অফিসের ছুটীর পর আমাদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে আসিলে কৃতার্থ হইব। আমার বাবা ও মাও আপনাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আশা করি, আমাদের নিরাশ করিবেন না। ইতি

কৃতজ্ঞ-চিত্তা

মীনাক্ষী দেবী

এ যেন আরব্য-উপন্যাসের বিস্ময় ভরা একটি কাহিনী! সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। কি-বা সে করিয়াছে ··অথচ সেটুকুর জন্য কতখানি কৃতজ্ঞতা! পায়ে জুতা-মোজা-পরা, মোটর-চালানো বাঙালী মেয়েদের উপর তার কি ঘৃণাই না ছিল! বিলাস আর আমোদ লইয়াই এঁরা দিবারাত্র মত্ত থাকেন—দুনিয়ার দুঃখী-গরীবের পানে ফিরিয়া চাওয়া তো দূরের কথা···পায়ে-চলা গৃহস্থ পথিককে যেন তাঁরা মানুষ বলিয়াও মনে করেন না! নিজেদের সখ, হাসি-খুসী গল্প-গুজব, আর যারা গরীব তাদের প্রতি অসহ্য তাচ্ছল্য—দাম্ভিক জীব!···এই ছিল তার চিরদিনের বিশ্বাস আর সংস্কার! কিন্তু এই মীনাক্ষী দেবী···? যতীশ এত বড় অর্ব্বাচীন···না জানিয়া এই মহিলার জাতিটারই অপমান, অসম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছে!···পদে-পদে ভুলের বোঝাই সে জড়ো করিয়াছে! অথচ নিজের মনে কি বিরাট দম্ভ, যেন তার মত বিবেচনা-বোধ আর কাহারো নাই! যেন সে কত বড় ওস্তাদ, সবজান্তা···সব জানিয়া-শুনিয়া দুনিয়ার প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক ব্যাপারের বিচার করিবার কি স্পর্দ্ধাই না সে বুকে বহিয়া আসিতেছে, এত দিন!···হায়রে মূঢ়!

চকিতে তার মনে পড়িল, আজ ২৮শে জুন। কাল-বাদে পরশু ৩০শে। তার পরই এখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক ফুরাইবে! এই চিঠিখানি কি আনন্দ বহিয়া আনিয়াছে··· কিন্তু দু'দিন বাদে ৩০ তারিখে যে বিপদ আসন্ন, তার ভারে বুক যে টন্ টন্ করিতেছে! তবু···যা হয় হইবে, আজিকার এ আনন্দ-মিলনের মাঝখানে সে দুশ্চিন্তা টানিয়া আনিয়া বিঘ্ন-ব্যথার সৃষ্টি করা ঠিক নয়!

ঠিকানা? চিঠির উপরে এই যে নীল হরফে বাঙলায় ছাপা,—কুঞ্জ-কুটীর। ৭৪ নং গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ।

বালিগঞ্জ! ঠিক হইয়াছে! সেইখান হইতেই বালিগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়া সে ট্রেণে উঠিবে। কিন্তু এই পোষাক! উপায় কি? সে যে গরীব, এ কথা গোপন করিতে সে চাহে না তো! গরীব হোক—তবু মানুষ তো সে! তবে ··?

বারোটার পর পরেশ রায়ের ঘরে সহসা তলব পড়িল। পরেশ রায় কহিলেন—আজ তো ২৮শে। কোনো কাজের জোগাড় হলো যতীশ?

যতীশ সবিনয়ে কহিল,—আজ্ঞে না।

পরেশ রায় কহিলেন,—বড় দুঃখের কথা তো তা'হলে! ৩১, জুলাই মাসের মাহিনাটা এখান থেকে পুরা পাবে— জুলাইয়ে একটা জোগাড় করে ফ্যালো!···ভালো কথা, তোমার ছোট ভাইটি এখন ভালো আছে বেশ?

যতীশ কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন—সে বারুইপুরের স্কুলেই পড়চে?

ঘাড় নাড়িয়া যতীশ জানাইল, হাঁ। তারপর কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া ধাঁ করিয়া সে একেবারে বলিয়া ফেলিল,—এ হপ্তায় আমার একদিনও লেট্ হয়নি···আমায় আর একবার সুযোগ দিতে পারেন না দয়া করে? ··মানে ··

পরেশ রায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যতীশের পানে চাহিলেন।

যতীশ কহিল—মানে, আমার মা এখনো এ খপর জানেন না···তিনি এ খপর পেলে···যতীশের চোখে জল ঠেলিয়া আসিল; কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিয়া পরেশ রায় কহিলেন—

জানোই তো, তোমাদের কবি-রবির কথায় বলতে গেলে একটু উল্টে বলতে হয়, অমোঘ আমার দণ্ড, কঠিন বিধান···! তাছাড়া তোমার কাজে একজনকে আমি ইতিমধ্যে বাহাল করে ফেলেচি··লোকটি ভালো। সে পহেলা থেকে জয়েন করবে!

বড় মুখ করিয়াই যতীশ মিনতি জানাইয়াছিল। বড় আশায় বড় আঘাত পাইয়া মুখ তার এতটুকু হইয়া গেল! পরেশ রায় কহিলেন,—আচ্ছা। তা ৩০ তারিখে দেখবো ভেবে, তোমায় অন্ত কোনো জানা অফিসে পাঠানো যায় কিনা ·· এখন যাও···আমি আজ একটু সকাল সকাল চলে যাচ্ছি—কাজেই একটু ব্যস্ত আছি···

যতীশ চলিয়া আসিল; আসিয়া নিজের চেয়ারে বহুক্ষণ চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। সত্যই তো···আর দুটা দিন···তারপর···মাকে নয় এখন কিছু বলিবে না।···আর একটা চাকরির যোগাড় হইলে তখন বলা চলিতে পারে! কিন্তু চাকরি তো গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছামত পাড়িয়া আয়ত্ত করিয়া লইবে! কত বেকার কি মিথ্যা আশা লইয়া ইতস্তত: ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, তার এমন কি ভাগ্য হইবে যে ··

যতীশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ভাগ্যই যদি তেমন হইবে, তাহা হইলে কি আর এত বড় ইজ্জতের চাকরি এভাবে হস্তস্খলিত হয়!

পাঁচটায় অফিসের ছুটী। ছুটীর পর যতীশ বেড়াইতে বেড়াইতে এসপ্লানেডে আসিয়া কার্জ্জন পার্কে গিয়া ঢুকিল। অফিস-ফেরত বাবুর দল, সাহেবের দল ট্রামে চড়িয়া মোটরে চড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে,—কি স্বচ্ছন্দ লঘু মন! সে?···মিছা ভাবা! ভাবিয়া যে সমস্যার মীমাংসা হয় না, হইবার নয় সে ভাবনায় ফল! তার চেয়ে যাওয়া যাক্ বালিগঞ্জে···! সেই হাসি, সেই মিষ্ট আলাপ, .. বুকটা কতক হাল্কা থাকিবে তবু—এ দুর্ভাবনা বুকে যে ক্রমেই ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসিতেছে! যতীশ গিয়া ট্রামে চাপিল। মনোহরপুকুরের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া সে পূর্ব্বমুখে চলিল। দীর্ঘ পথ ··গাছের ছায়ায় ছায়া-করা, স্নিগ্ধ! তেমন ভিড় নাই। চলিয়া চলিয়া বালিগঞ্জের প্রান্তে আসিয়া সে পৌছিল ··

গড়িয়াহাট্ রোড। এই যে, সামনেই! কিন্তু ৭৪ নং বাড়ীটা...কোন্‌দিকে...? এধার ওধার ঘুরিয়া সে দক্ষিণে ফিরিল।···মাঠ ফুঁড়িয়া, বাগান ছিঁড়িয়া, কত বাড়ী-ঘর ভাঙিয়া চারিদিকে নূতন নূতন রাস্তা বাহির হইয়াছে·· মুক্ত প্রান্তরে সহর যেন দশ হাত মেলিয়া শুইয়া প্রচুর আলোর, প্রচুর হাওয়ার প্রচুর আরাম উপভোগ করিতেছে! ··

এই-পথ ধরিয়া যতীশ অনেকখানি আগাইয়া চলিল। অদূরে রেল-লাইন,—এবং রেল-লাইনের বেড়ার এধারে পথের বাঁ-দিকে সদ্য নূতন-তৈয়ারী বাড়ীর ফটক। ফটকের পর ফুলের বাগান—অজস্র রঙীন ফুলে ভরা। ফটকের একধারে কালো পাথরের গায়ে সোনালি হরফে লেখা,—কুঞ্জকুটীর।

এই বাড়ী! যতীশের বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল! এখন বেকুবের মত এই প্রাসাদের কোন্‌খানে গিয়া সে দাঁড়াইবে!···

ফটকের ভিতরে সেই ছোট্ট মোটর-গাড়ীখানি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তার নম্বরটা ঐ · ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া যতীশ বার বার পড়িতে লাগিল, 18604. গাড়ীর কাছে জনপ্রাণীর চিহ্নও নাই! ভিতরে সে ঢুকিবে?···কিন্তু দুই পা যে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে!···

হঠাৎ প্রকাণ্ড এক ভারী সাদা পাগড়ী মাথায় উড়ে বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল,—সাহেবের কাছে এসেচেন আপনি? তা, সাহেব তো বেরিয়েচেন···ভিতরে বসবেন?

যতীশ কি জবাব দিবে? সাহেব ··? কিন্তু কোনো সাহেবের কাছে সে আসে নাই তো! সে আসিয়াছে, মীনাক্ষী দেবীর নিমন্ত্রণে·! তা ..এদিকে বেয়ারা দাঁড়াইয়া আছে, তাকে একটা জবাব দেওয়া চাই···বেহারাটা কি যে ভাবিতেছে!···যতীশ কহিল,—মীনাক্ষী দেবী···মানে, আমায় তিনি এখানে আসতে বলেছিলেন কি না···এইটুকু বলিয়াই সে পকেট হইতে মীনাক্ষী দেবীর পত্র বাহির করিল এবং খামে-মোড়া পত্রখানা বেয়ারাকে দেখাইয়া আবার কহিল,—এই তো কুঞ্জকুটীর···ঠিকই··· তা···

বেয়ারা কহিল,—ওঃ, দিদিমণি···তা, আসুন, দিদিমণি বাড়ী আছেন ··

এ সমাজের সঙ্গে যতীশের কোনো দিনই কোনো পরিচয় নাই! ইহাদের লোকজনের সঙ্গে কথা কহিবার রীতিও যে স্বতন্ত্র, আজ এখন তা সে প্রথম বুঝিল।

আদব-কায়দার কোথায় কি ত্রুটি হইবে…এগুলা শিক্ষা করা যে ভারী দরকার…বি-এ পাশ করার মতই! এই যে, বাড়ীর মালিক সাহেব জানেন না—অথচ দিদিমণির নিমন্ত্রণে সে আসিয়া হাজির হইয়াছে…তাই তো, কোনো গোল বাধিবে না তো? কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া সে বলিল,—তোমার দিদিমণির পায়ে সেই চোট্ লেগেছিল না…? সেই যে সেদিন মোটরে বেরিয়েছিলেন …বারুইপুরের ওদিকে…মানে…অর্থাৎ…

সে নিজেই বুঝিতেছিল, একটা তুচ্ছ উড়ে বেয়ারা… ইহার সঙ্গে কথা কহিতেই তার পদে পদে এমন বাধিতেছে… সহসা সে এমন জানোয়ার বনিয়া উঠিল…অথচ খোদ মালিক যিনি…

—ওঃ—বলিয়া বেয়ারা কহিল,—আপনি সেখানে ছিলেন, বুঝি!… বেয়ারার কৃষ্ণ অধরপ্রান্তে দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত হইল! বিচিত্র তার শোভা!

উড়িয়া হইলেও বিলাত-ফেরতের বাড়ীর বেয়ারা সে, কাজেই চালাক তো! সব খপরই সে জানে। যতীশ কহিল,—হ্যাঁ, তাই তোমাদের দিদিমণি, মানে…

—আসুন। বলিয়া বেয়ারা অভ্যর্থনা করিল।

যতীশ ফটকের মধ্যে পা দিল,—অতিশয় সঙ্কোচে! কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটা স্বর তার কাণে গেল—এই যে আপনি এসেচেন… বয়…

—হুজুর!

অলক্ষিতে স্বর-কাকলী ভাসিয়া উঠিল। এ যেন রূপ-কথায় পড়া সেই স্বপ্নপুরীর মতই! সে গল্পের নায়ক যেমন মায়াপুরীর মধ্যে পা দিবামাত্র অন্তরীক্ষে পাখীর গান ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এ'ও ঠিক সেই রকম! যতীশ ভড়কাইয়া গেল—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র! পরক্ষণেই ক্ষিপ্র পায়ে সেই তরুণী স্বয়ং আসিয়া হাসির ধারায় তাকে অভিবাদন করিলেন! তরুণী কহিলেন,—আমি জানতুম, আপনি আসবেন! তা আসুন…

যতীশ বিবশ, বিহ্বল! এ স্বপ্ন নয় তো? না…

যতীশ তরুণীর সহিত আসিয়া এক সজ্জিত কামরায় বসিল। কি তার সজ্জা…মোটা চিত্র-বিচিত্র-করা কার্পেটে ঘরের মেঝে আগাগোড়া মোড়া। তার পথে-চলা কাদামাখা জুতাজোড়া লইয়া এ কার্পেটের উপর…তাইতো, এ যে মহাবিপদে পড়া গেল! কিন্তু ভাবিয়া জুতাজোড়ার গতি করার আর অবসর মিলিল না, কাজেই…

তরুণী কহিলেন,—আপনি অবাক হয়ে গেছলেন আমার চিঠি পেয়ে…না? সত্যি, বলুন তো! তা দেখুন, আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু আপনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন তো…লোকটার পাখানা গেল কি রইলো, তার কোনো খোঁজ নিলেন না…বেশ মজার তো! কথার পরে সেই হাসির ঝর্ণাধারা!

কিন্তু যতীশ নিশ্চিন্ত ছিল কি এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও এই তরুণীর চিন্তাই যে তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! কিন্তু সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে কেমন যেন বাধিতেছিল! তরুণীর আবার সেই এক কথা…এবারে যতীশ কহিল—আজ্ঞে না, ক'দিন আমার ভারী ভাবনায় কেটেচে! আমার দোষে আপনার পায়ে চোট্ লাগলো, অথচ নাম-ঠিকানা কিছুই জানিনা…আমি বহু সন্ধান করেছিলুম…

তরুণী কহিলেন,—তাহলে তো আপনার কাজের ক্ষতি হয়েচে অনেকখানি…

যতীশ চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তরুণীর চোখে হাসির সেই বিদ্যুৎ! যতীশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—আমার সে চাকরিতে জবাব হয়ে গেছে।

তরুণী বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে যতীশের পানে চাহিয়া কহিলেন,—আমার সন্ধান করে বেড়ানোর জন্য · এ্যাঁ…? বলেন কি!

যতীশ কহিল—না, মানে, তা ঠিক নয়…তবে…

তরুণী কহিল—দেখুন তো, আমি তো মহা অপরাধ করেচি তাহলে…

যতীশ কহিল—আজ্ঞে না—তা নয়…অর্থাৎ আমার আর ও-চাকরি পোষাচ্ছিল না…

তরুণী কহিলেন,—তবে বুঝি আর-কোথাও ভালো চাকরি পেয়েচেন…

যতীশ কহিল—তা ঠিক পাইনি বটে, তবে…মানে, এক রকম সে পাওয়াই বটে!

তরুণী কহিলেন—আচ্ছা দেখুন, আমার বাবা একজন লোক খুঁজছিলেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য—আমি তাই ভাবছিলুম,…তা বাবাকে আপনার কথা বলবো? আপনি আমায় সেদিন যে রকম বাঁচিয়েছিলেন—আপনি

না থাকলে খোঁড়া পায়ে সেই মাঠেই হয়তো পড়ে থাকতুম··· কি যে হতো, জানি না! ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! তা, বাবাও যো সে কথা শুনেচেন···আমি বললে বাবা নিশ্চয়···

যতীশ কহিল—কিন্তু আমার কি সে কাজের কোনো যোগ্যতা আছে যে...

তরুণী কহিলেন,—বাবার সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কথা কবেন একবার···তা হলে খুব ভালো হয় কিন্তু···

তা যে হয়, সে সম্বন্ধে যতীশের মনেও তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই তরুণীর স্নেহ-প্রীতির পরশ পাইয়া···তাঁর এই হাসির আলোর পাশটুকুতে···আঃ!

হঠাৎ বাহিরে একটা মোটর আসিয়া থামিল। তরুণী কহিলেন—বাবা এসেচে···

যতীশের বুকটা ছাৎ করিয়া উঠিল—এবং আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার পূর্ব্বে তার বুকে তীব্রতর স্পন্দন জাগাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিলেন পরেশ রায় এবং তাঁর সঙ্গে এক প্রৌঢ়া মহিলা!

পরেশ রায় কহিলেন—হ্যালো যতীশ···তুমি!··· এখানে···? কি, testimonial নিতে···? তা···

পৃথিবীটা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। যতীশও সেই সঙ্গে·· দেওয়াল, ছবি, সোফা, চেয়ার সমস্তই সে ঘূর্ণির চক্রে ঘুরিতেছিল! পৃথিবীর কি নেশা লাগিয়া গেল না কি? যতীশ হতভম্ব!

পরেশ রায় কহিলেন—মীনা ··যতীশকে তুমি চেনো···?

কথাটা যেন কোন্ বহুদূরের স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিল, তবে যতীশের কাণে তা পৌঁছিল! সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর জবাবটুকুও!

পরেশ রায় কহিলেন,—তোমার উপর আমার লক্ষ্য যেদিন প্রথম তুমি চাকরির দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে আসো, সেইদিন থেকেই। দরখাস্তে তোমার পিতৃ-পরিচয় তুমি দিয়েছিলে · জগদীশ সেনের ছেলে তুমি! জগদীশ আর আমি এক স্কুলে পড়েচি এক সঙ্গে—নাইন্‌থ্ ক্লাশ থেকে এন্ট্রান্স ক্লাশ অবধি! তার পর আমি বিলাত গেলুম ব্যবসা শিখতে,—আর সে গেল মফঃস্বলে স্কুল-মাষ্টারী করতে! দুজনে জীবনে আর দেখা হয় নি!···তার পর হঠাৎ তুমি এলে···বারুইপুরে বাড়ী, বাপ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের টীচার ছিলেন, ঐ নাম। তার উপর, তোমার মুখে তার ছায়া, আশ্চর্য্য মিল···বুঝলুম, আমার বাল্যবন্ধু জগদীশেরই ছেলে যতীশ! চাকরি তুমি অনায়াসে পেলে,—কিন্তু আসল কারণ জানলে না·· জগদীশের ছেলে তুমি, এর চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র আর কারো ছিল না তো! তোমার উপর নজর রাখলুম। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুসীও হলুম··· অল্প দিনের মধ্যে তোমায় একটা ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা করে দিলুম···তোমার সে যোগ্যতাও ছিল—তা ছাড়া জগদীশের ছেলে তুমি,···এই জন্য! আরো প্ল্যান আমার মাথায় জাগছিল...ভগবানও তাতে সায় দিলেন···আমার এই মেয়েটি ভারী খেয়ালী • মোটর চালাতে শেখার বাতিক খুব। মানা করলুম,—বাঙালীর মেয়ে, কাকে কোন্ দিন চাপা দিয়ে কি কোর্টে দাঁড়াবি? তা শুনলেন না...কত কান্নাকাটি, মান-অভিমান—বললুম, শেখো তবে। শিখলেন —আর ঐ মোটর হাঁকিয়ে লম্বা পাড়ি দেওয়া হলো ওঁর সকালের কাজ! পল্লী-দর্শন করচেন···তার পর সেদিনকার ঘটনা···ভাগ্যে তুমি ছিলে। চাকরির মায়া ছেড়ে হৃদয়-মাহাত্ম্য-চর্চ্চার দিকে ঝোঁক তোমার বেশী ··অফিস থেকে ফিরে সোমবার মীনার কাছে সব শুনলুম···সে বললে, ভদ্রলোকটির নাম যতীশ...অবাক হয়ে গেলুম···তুমিও অফিসে বলেছিলে, এক সম্ভ্রান্ত মহিলার বিপদের কথা! তখন ভাবিনি, সে মহিলাই মীনা, আর মীনাকে সে বিপদে রক্ষা করেচো তুমি! তাই পরের দিন আবার তোমায় ডেকে কথাটা পাড়ি, মনে আছে? সেটা অহেতুক কৌতূহল-পরিতৃপ্তি মাত্র নয়···তার পর আজ এই চায়ের নিমন্ত্রণ··· গিন্নীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো বলে।··· তা-ছাড়া ১লা জুলাই থেকে তোমার চাকরি নেই, তারো একটা কিনারা করা চাই তো!···

এই অবধি বলিয়া পরেশ রায় তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলার পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন—এই ছেলেটিই যতীশ,— এরই কথা তোমায় বলতুম, হিরণ···আমার প্ল্যানে বিধাতারো যে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, তা মীনার সোমবার সে বিপদে পড়া আর তা থেকে ও-ভাবে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারেই বেশ বোঝা যাচ্ছে···নয়? কি বলো···তোমার কি মত?

মহিলাটি—অর্থাৎ শ্রীমতী হিরণবালা দেবী কহিলেন— তোমার মতেই আমার মত···!

যতীশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামিয়া উঠিয়াছে! ফ্যানের প্রচুর হাওয়া, তা সত্ত্বেও! তার কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত!

পরেশ রায় কহিলেন—কাল তোমার মার সঙ্গেও দেখা করবো...অর্থাৎ আমার মত কি, জানো যতীশ ··? এই দুরন্ত মেয়েটিকে তোমার হাতে দিয়ে তোমায় দায়িত্ব-বোধ শেখাতে চাই! আর আমার হাতে নতুন একটি অফিস এসেচে—সেটা তোমার চার্জ্জে রাখতে চাই···মাহিনা বেশ···তবে পাঁচ-ছ মাস পরে একবার বিলেতটাও ঘুরে আসতে হবে··· তোমার মার কি অমত হবে তাতে ?···মীনা···

আর মীনা···তার মচকানো পা বেশ আরাম হইয়া গিয়াছে, তাছাড়া এই-সব কথাবার্ত্তা···তার কেমন লজ্জা হইতেছিল। ক্ষিপ্র গতিতে মীনাক্ষী দেবী সে ঘর হইতে কোথায় তখন সরিয়া পড়িয়াছে! হাসিয়া পরেশ রায় কহিলেন—আমার মীনার এতে আপত্তি নেই,—ভাবে-ভঙ্গীতে তার গর্ভধারিণীকেও সে কথা সে এক রকম জানিয়েচে···এখন তোমার মার মত, আর তোমার মত···

যতীশ নির্ব্বাক! বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে পরেশ রায়ের পায়ের কাছে পড়িয়া তাঁকে প্রণাম করিল। বেকুব ছোকরা··· রোমান্সের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নাই! এমন গর্দ্দভও একালে এই রোমান্সের আব্‌-হাওয়ার যুগে ছিল!

মাঝির গান

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দিন রাত ভাসি আমি নদী-মাঝারে ;—
লয়ে মোর সম্বল নাওখানারে,—
কত ক্ষেত কত মাঠ,
কত গ্রাম কত ঘাট,
গাছে ঢাকা কত বাট,
ছোট বড় কত হাট
আগে ছেড়ে পিছে যায় মোর দুয়ারে,
নিতি নদী-কিনারে।
যবে——
জোছনা উছাল পড়ে গাঙের জলে,
ঢেউ 'পরে ঝিক্‌মিক্ জোনাকী জ্বলে,
ভাটি জলে নাও দিয়ে আমি ভাসি রে,—
গান—গাহিয়া ধীরে।
মাঘ মাসে বাঘা শীত যবে গো পড়ে,
ঠক্ ঠক্ কাঁপে হাত বৈঠা 'পরে ;
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে গাঙ্‌ বুকে যাই,
কি করিব ? আমি যে গো নাও বেয়ে খাই!
ঝর ঝর ঝরে যবে বাদলধারা,
মেঘের আঁধারে হয় দুপার-হারা,
আকাশে বাজিয়া ওঠে কাড়া-নাকাড়া,
ঝিলিক্ জ্বলিয়া ছোটে আগুনপারা ;
টোকা মাথে ভরা গাঙে আমি যে গো ধাই,
কি করিব ? দুখী আমি নাও বেয়ে খাই।

যখন পড়ি গো হায় ঝড়ের রাতে,
হুঙ্কারি উল্লাসে রুদ্র মাতে,—
হেরি ভীম তাণ্ডব সোয়ারি আমার—
শঙ্কিত অন্তরে করে হাহাকার।
মরণের সনে যুঝি আমি তরী বাই,
কি করিব, উপায় ত নাই।
যখন কেরেয়া হায় নাহিক মেলে
ছৈ মাঝে বসে থাকি ঝাঁপটী ফেলে।
গত সুখ-কথা যত পরাণে জাগে
কি যেন নেশার ঘোর চোখেতে লাগে ;
কত জন এল গেল মোর নায়েতে,
কত রাত কত দিন, কত প্রভাতে ;
কত খোকা খুকি গেল হাসি ছড়ায়ে,
কত মেয়ে কেঁদে গেল পতি হারায়ে ;
কত নববধূ এল চেলিতে ঢাকা ;
হাতে শাঁখা পায়ে মল হলুদ-মাখা,
সুখী দুখী সবে নিয়ে আমি শুধু বাই ;
চুপি চুপি হাসি কাঁদি নাও বেয়ে যাই।
বয়স পড়েছে মোর ঘাটেরি ঘরে ;
আপনার যারা সব গিয়েছে সরে।
ছাড়া ভিটে মত আমি রয়েছি পড়ে'
বলহীন মুঠে হায় বৈঠা ধরে।
* * * *

কতজনে পারাপার করিনু আমি,—
এবার আমারে পার কর হে স্বামী।



থা, স্থর ও [illegible] — শ্রীসাহানা দেবী

কালেংড়া—কার্ফা

তুমি তো ভোল না আমায়—আমি থাকি সদাই ভুলে!
দিশেহারা ভব-হাটে হই যবে, লও কোলে তুলে!
বড়ই ব্যথা বাজে যবে তবে ডাকি আকুল রবে,
নইলে কি চাই তোমারে আনন্দেরি উছল কূলে?
ভুলি তোমার কৃপাধারা ঝরে হৃদে বিরামহারা!
ভুলি তব আন্তরিকতা ভুলি তব সব হৃদ্যতা!
ভুলি আমি সে সব কথা স্মরি' তোমায় পেলে ব্যথা
ও তোমায় বরি' যবে লও গো মালা অশ্রু-ফুলে!

ll ll { মা গমা ণদা -া | পা -া পা দা | মমা পদা
তু - মি - তো - ভো ল না - - -

দপা মপা | মগা -া -া -া | } সঋা গা -া গা | মা -া -া -া |
আ - - - মা - - - য় } আ - মি - থা কি - - -

গা গা -া মা | গমা পদা -াঃ পঃ | দা পদা ণর্সা না |
স দা ই ভু লে - - - - - দি শে - - - হা

\+ • +
র্সা -া -া জ্ঞর্ঋা | র্সা নর্সাঃ নঃ দা | পা -া -া -া |
রা - - ভ - ব্ - - - হা টে - - -

• + •
পদা দাঃ পঃ মপা | মগা -া -া -া | গা গা -া মা |
হই য - - বে - লও - - - কো লে - তু

\+
গমা পদা -াঃ পঃ | II II
লে - - - - -

• + •
II পা দা -া দা | পদা নর্সা র্ঋা -া | র্সা র্ঋা র্সা না |
ব ড় ই ব্য থা - - - - বা জে - য
ভু লি - আ মি - - - - সে স ব্ ক

\+ • +
র্সা -া -া -া | নর্সা জ্ঞর্ঋাঃ র্সঃ র্মা | র্গর্ঋা -া র্সা -া |
বে - - - ত - বে - - ডা কি - - - -
থা - - - স্ম রি' - তো মা - - য় -

• + •
নর্সর্ঋা নর্সাঃ নঃ দা | পা -া মগা মা | দা দা -া পা |
আ - - কু - ল্ র বে - - - নই লে - কি
পে - - লে - - ব্য থা - - -

\+ • +
মপা মাঃ দঃ পা | মগা -া -া -া | -া -া -া -া |
চাই তো - মা রে - - - - - - - -

সঋা গা -া গা | মা -া -া -া | গা গা -া মা |
আ - ন - ন্দে রি - - - উ ছ ল্ কু

\+
গমা পদা -াঃ পঃ | II II
লে - - - - -

• + •
II ঋা ঋা -া ঋা | ঋা -া -া -া | সা ঋা সা ন্া |
তু লি - তো মা - - য় কৃ পা - ধা

+ • + •
সা -া -া -া | সা দা -া পা | মা -া -া -া | গা মা
রা - - - সু রে - হৃ দে - - - বি রা

+ • +
গা ঋা | সা -া -া -া | মা মা -া মা | মা -া -া মা |
গ্ হা রা - - - ভু লি - ত ব - - আ

• + • +
গা গা -া মা | গমা পদা -া -া | দা দা -া পা | মা -া
ন্ত রি - ক তা - - - - - ভু লি - ত ব -

• +
-াঃ পঃ | মগা মা -া দা | পা -া -া -া | II
- - সব্ হৃ - দ তা - - -

• + •
দা দা -া দা | পা -া পা দা | মপা মাঃ দঃ পা |
শু ধু - তো মা য় ব রি ষ - - - -

+ • + •
মগা -া -া -া | সঋা গা -া গা | মা -া -া -া | গা গা -া
বে - - - - নও গো - মা লা - - - অ শ্রু -

+
মা | গমা পদা -াঃ পঃ | II II
ফু লে - - - - -

য়ুরোপে দিলীপকুমার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

গত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় কর্তৃক লিখিত দিলীপকুমারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও সঙ্গীত-চর্চ্চার কথা প্রকাশ হওয়ার পর, এ কয় মাস তাঁর আর কোন সংবাদ না পেয়ে তাঁর যে সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য, আমি তাঁদেরই জন্য, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় পত্র "ভারতবর্ষে'র মধ্য দিয়ে তাঁর আধুনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু জানাচ্ছি।

লণ্ডনে নানা স্থানে দিলীপকুমারের গান ও বক্তৃতা শোনার পরে জুন মাসে Fellowship Clubএ Theosophical Societyর তরফ থেকে তাঁকে একটী ভোজ দেওয়া হয়। পরে সেখানে সেদিন জনকয়েক সঙ্গীতজ্ঞের অনুরোধে দিলীপকুমার কয়েকটী "রাগ সঙ্গীত" গেয়ে সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। রাগ সঙ্গীত গাইবার সূত্রে তিনি বলেন যে, রাগ সঙ্গীতে গায়কের নূতন তান বিস্তার করার স্বাধীনতা—সঙ্গীত জগতে একটী মৌলিক দান। য়ুরোপে গায়ক বা বাদকের স্থান অল্প; গান বা সুর-রচয়িতার স্থানই প্রধান। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে গায়ক বা বাদককেও রচনা কর্ত্তে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে সৃষ্টি করে;—এইখানেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। নানা জাতীয় শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গ এ কথায় হৃষ্ট হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরে Fellowship Clubএর প্রধান সভাপতি সকলের মুখপাত্র হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে—ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর এই সর্ব্বপ্রথম সত্য শ্রদ্ধা হ'ল, কারণ, এতদিন ইংলণ্ডে ভারতীয় সঙ্গীতের যা নমুনা তাঁরা পেয়ে এসেছিলেন, তা'তে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি—ইত্যাদি।



শ্রীদিলীপকুমার রায়

পরে বার্মিংহামেও তিনি এই ভারতীয় রাগের গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে, বহুসংখ্যক নানাজাতীয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতাভিজ্ঞ ভদ্র মহোদয় ও মহিলার সম্মুখে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় একটী চমৎকার বক্তৃতা দেন। সে আসরে তিনি সেদিন দরবারী কানাড়া, ইমন প্রভৃতি নানারূপ গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন।

অক্সফোর্ডে Musical Eveningএর ছাত্রবর্গ কর্তৃক বারম্বার নিমন্ত্রিত হয়ে অবশেষে তিনি একদিন তাদের অতিথি না হয়েই পারেন নি। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করার বিরাট আয়োজন ও ছাত্রবৃন্দের ভিতর আন্তরিক উৎসাহ দেখে সত্যই তিনি সেদিন বড় আনন্দলাভ করেছিলেন। সে আসরে ছাত্রবর্গ দিলীপকুমারের 'গান' উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ও সঙ্গীতাভিজ্ঞ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন দিলীপকুমার সত্যই প্রাণ খুলে মনের আনন্দে সভাস্থ সকলকে তাঁর সুকণ্ঠের এমন পরিচয় দিয়েছিলেন যে, সকলেই মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর অপূর্ব্ব, দুরূহতম গমক শুনে, গানের ভিতর তাঁর প্রাণস্পর্শী মীড় অনুভব করে ও সর্ব্বোপরি গানের সময় তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের ভাবে। য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক (Caruso) বলেছেন যে, গাইতে হ'বে শুধু গলা দিয়ে নয়—প্রতি অঙ্গ দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, সকল গায়কেরই সেই সঙ্গে মুদ্রাদোষের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

শোনা যায়, য়ুরোপে অনুরূপ দরের গায়ক বা বাদক

সত্যই Envy of Kings; তাই দিলীপকুমার Patronage of Music প্রবন্ধে লিখেছেন যে, উচ্চ সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকতার ভার, অভিজাতের হাত থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের হাতে না এলে, আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। য়ুরোপে যে আজ উচ্চ শিল্পী পূজিত, সেটা অভিজাতের কৃপাবলে নয়-সেটা প্রবুদ্ধ মধ্যবিত্তদের গুণগ্রাহিতার ফলে।...সেদিন সেখানে একটী রুষ মহিলা খুব সুন্দর বেহালা বাজিয়েছিলেন। তিনি দিলীপকুমারের গান শোনার পর আনন্দ সহকারে বলেন "মিঃ রায়, সত্যই আপনার গান শুনে আমার ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।" গান সমাপনের পর দিলীপকুমারকে পরদিন মহা সমারোহে প্রকাশ্য ভোজ দিয়ে যথেষ্ট সম্মানিত করা হয়। সেদিন সেখানে অনেকগুলি য়ুরোপীয় শেষে ভারতবর্ষে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন "যে দেশের সঙ্গীত এত সুন্দর, এত প্রাণস্পর্শী, সে দেশ না জানি কি মনোরম"—ইত্যাদি। বিদেশীর মুখে স্বদেশের এরূপ সুখ্যাতি শুনলে সত্যই মনটা আনন্দে নেচে না উঠেই পারে না।

জুলাই মাসে British Indian Socialএ নিমন্ত্রিত হয়ে দিলীপকুমার বহু ইংরাজ ও কতিপয় ভারতীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলার সম্মুখে তাঁহার সুকণ্ঠের পরিচয় দিয়া সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। Sir Mohammad Rafiqও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। গানান্তে তিনি দিলীপকুমারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দিলীপকুমার জুলাই মাসেই Elwin Hotelএ নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে তাঁর নিজের ও তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব ডি, এল, রায় মহাশয়ের লিখিত অনেকগুলি গান করেন। প্রত্যেক গান গাইবার পূর্ব্বে তিনি সেই গান ইংরাজিতে তর্জ্জমা করে' শ্রোতৃবৃন্দকে আগে বুঝিয়ে দেন। সেদিন অন্যান্য গানের ভিতর যখন তিনি তাঁর পিতৃদেব-রচিত—"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে"—গানটী গেয়েছিলেন, তখন কতিপয় য়ুরোপীয় শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গ বলেন "সত্যই যেন সিন্ধুর ডাক তাঁদের কাণে এসে পৌঁছুচ্ছিল এই গানের ভেতর দিয়ে।" বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। গানান্তে Miss Willoughby, Secretary তাঁর গান সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলেন—"মিঃ রায় যে ভারতীয় সঙ্গীত য়ুরোপে এ রকম ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছেন, তার ফল একদিন না একদিন ফল্‌বেই ফল্‌বে।" দিলীপকুমার সর্ব্বশেষে অল্প দুচার কথায় ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীত কোন্ ধারায় বিকাশ পাচ্ছে, ইত্যাদি সকলকে বুঝিয়ে দেন।

একজন বেলজিয়ান মহিলার সান্ধ্য ভোজের সভায় অন্যূন কুড়ি পঁচিশ জন বিশেষ সঙ্গীতাভিজ্ঞের সম্মুখে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দেন কোথায় ভারতসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। পরে তিনি একটী হিন্দী ভৈরবী গেয়ে তান বিস্তার করে' বোঝান, কোথায় ভারতীয় "সঙ্গীতকারের" স্বাধীনতা। সে সভায় একজন নামজাদা ইংরাজ গায়িকা ইতালিয়ান ও জার্ম্মাণ গান ক'রে, পরে জ্ঞাপন করেন যে, মিঃ রায় সত্যিই ব'লেছেন যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে গায়ক বা বাদকের স্বাধীনতা অত্যন্ত কম। সত্যিই এটা বড় দুঃখের বিষয়। তাঁর কাছে ভারতীয় সঙ্গীতের Outlookটী ভারী ভাল লেগেছে। সেদিন সভাভঙ্গ হ'বার পূর্ব্বেই সকলে অনুরোধ করেন যে, মিঃ রায় যেন আর এক দিন তাঁর গান শুনিয়ে ও বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের সকলকে বাধিত করেন।

বিখ্যাত City Templeএ চার পাঁচ হাজার লোকের সামনে এক ধর্ম্মসভায় মীরা বাইএর "চাকর রাখোজী" গানটী গেয়ে দিলীপকুমার সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করে দেন। ফলে অতিরিক্ত সভা তাতে তাঁকে আবার সেই গানটী গাইতে হয়। পরদিন কাগজে কাগজে মন্তব্যসহ ছবি প্রকাশ হল—Picturesque dress Wonderful devotional song ইত্যাদি।—উক্ত গানটী মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই-সি-এস, ইংরাজিতে অনুবাদ করেন ও দিলীপকুমার গাইবার পূর্ব্বে সেটা আবৃত্তি করেছিলেন।

স্পেনের একজন মস্ত বড় গায়িকা লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সমিতিতে জুলাই মাসে দিলীপকুমারের বাঙ্গলা, হিন্দি, গুজরাটি প্রভৃতি গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মাদ্রিদে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন; এবং তাঁকে কথা দেন যে, তিনি সেখানে দিলীপকুমারের বক্তৃতার সব বন্দোবস্তই কর্‌বেন। দিলীপকুমার আয়ার্ল্যাণ্ড সঙ্গীত-সমাজ ও জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র আপিস কর্ত্তৃকও নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁর অসুস্থতার জন্য যেমন আমেরিকার নিমন্ত্রণ এ বৎসর স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি এ নিমন্ত্রণগুলিও গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন না।

চতুর্দ্দিক থেকেই দিলীপকুমারের এরূপ নিমন্ত্রণ আসছে। কিন্তু তাঁর পক্ষে সকল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। সকলেই তাঁর গান ও বক্তৃতা শোন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। দিলীপকুমার ইচ্ছা করলে, এখানেই তাঁর নিজের ঘরে বসে ছাত্র ছাত্রী-পরিবেষ্টিত হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ওস্তাদ সেজে মহা গম্ভীর ভাবে নানারূপ উপদেশ ও বক্তৃতা দিতে পার্ত্তেন। কিন্তু তা' না করে, তিনি যে তাঁর নিজের শরীরের দিকেও লক্ষ্য না রেখে, এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আশা করি, এটা তাঁর নিজের নাম জাহির করার জন্য নয়; তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যই "ভারতীয় সঙ্গীতের" উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করা। য়ুরোপে একজন ভারতবাসী—বাঙ্গালীর প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীতকে আজ যে য়ুরোপবাসী এত বেশী উচ্চে স্থান দিচ্ছে, তাতে কি আমাদের—সকল ভারতবাসীরই উল্লসিত ও গৌরবান্বিত হওয়া উচিত নয়?

দিলীপকুমার সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র যে সঙ্গীত চর্চ্চাই কর্চ্ছেন, তাই নয়, তাঁর সাহিত্য সেবাও কিছুমাত্র কমেনি। এমন কি তিনি রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়েও একখানি তিন শত পৃষ্ঠার উপন্যাস ও অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। কবিতাগুলি ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও উত্তরায় শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটী প্রবন্ধ অনুবাদ করে Havelock Ellis ও Russelকে দেখান। তাঁরা খুবই সুখ্যাতি করেছেন। Havelock Ellis তাঁকে পত্র লিখে জানিয়েছেন —I would hardly have wished for a more beautiful presentation। আমেরিকায় এটী ছাপান হয়েছে ও এই লেখার জন্য তা'রা তাঁকে দশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক শত পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। সত্যিই বড় আনন্দ হয় এই ভেবে যে, বিলাতেও এ সব জিনিষের এত আদর হয়। দিলীপকুমার নভেম্বর মাসের শেষে কি ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই দেশে ফিরছেন বোধ হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সবল দেহে ও সুস্থ চিত্তে দেশে ফিরে এসে, দীর্ঘায়ু হয়ে চিরকাল এমনই ভাবেই বাণীর সেবক হয়ে চিরকাল বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করেন।

রেল-ইয়ার্ডের বক্ষ-পঞ্জরে

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মাটীর বুকে পাঁজরার হাড়ের মত সারি-সারি রেল আর রেল। ফ্যাস্ ফোঁস্ ইঞ্জিনগুলো দিনরাত্রি হাঁদা মালগাড়ীর দলগুলোকে ঠেলাঠেলি করে' এ-লাইন থেকে ও লাইনে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড রেল-ইয়ার্ড।

ওভারব্রিজ—মাথার উপরকার পুলটা দিয়ে পার হওয়া যায়—দরকার কি? খোঁটায় খোঁটায় চাকা বাঁধা, তার উপর দিয়ে গোছা গোছা তার চলে গিয়েছে, ও—ই দূরের সারবন্দী সিগনালের পাখাগুলো ইষ্টিশান থেকে টেনে নামাবার জন্যে—পায়ে বাধে না। সারি-সারি রেলের উপর খোয়া—হোঁচট্ লাগে না। ইঞ্জিনের ঠেলাতে হাঁদা মালগাড়ী ঘাড়ে এসে পড়্‌বে—পার হবার সময় একবার ডানদিক একবার বাঁদিক দেখে, নতুন যারা আসে। নিত্যি নিত্যি দেখেশুনে চোখ বুজেও তর্‌তর্ করে' সারা ইয়ার্ডখানা পার হওয়া যায়।

ও-পারটায় সাহেবদের বাংলো, পার্ক, তর্‌তরে রাঙা রাঙা রাস্তা—দু' পাশের সবজে ঘাসে মাথার উপরকার ঝোপ ঝোপ কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো ঝরে পড়ে—ফুলঝুরির ঝিকিমিকির মত।

সাহেব? ধব্‌ধবে হ্যাট্‌কোটে কেউ দেখে বেড়ায়, ট্রেণ ছাড়াবার ব্যবস্থা বাবুরা ঠিকঠিক কর্‌ছে কি না; কেউ দেখে, টিকিট কালেক্টার বাবুরা ঠিক ঠিক টিকিট দেখে কি না; ওই ডাকগাড়ীগুলো, যা' কত—ক্ষণ ধরে' চলেছে তো চলেইছে, কোথাও থামে না, তাই চালায় কেউ—ইঞ্জিনের কলটী টিপে ধরে' আর উঁচু উঁচু পাগড়ে' গ্রেডে যখন কালি-ঝুলি মাখা ফায়ারম্যান খালাসী ছোঁড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন-বয়লারের রাক্ষুসে পেট ভরাতে হাঁপিয়ে উঠে, তাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে।

ও-পারটাতেই আছে, ওদের "আপ্টাঘর", রাত্রে সাহেব-

মেমের নাচ হয়, বিকেলে টেনিস্—খিল্ খিল্, হো হো, সাহেব-মেমগুলো হাসে, আর বল কুড়োবার বাচ্ছা বাচ্ছা ছোড়াগুলো বল কুড়ানোর দৌড়ে হাঁফিয়ে একটু দেরী করে' ফেল্‌লেই ঝপাং করে' র‍্যাকেটের ঘা বসিয়ে দেয়—ছেলে-মানুষ কি না, ছোঁড়াগুলো একটুখানি কেঁদে ফেলে. আবার তক্ষুনিই দূরের বলটা আন্‌তে ছুট্টে এসে আবার হাসে।

আণ্টাঘরের বাবু মিনিটে মিনিটে খানসামার হাতে পাঠাচ্ছে, চীনে মাটীর প্লেটে বসানো কাঁচের গেলাসে বরফ-সোডা, লাল লাল পানীয়, পাশে সাদা তোয়ালে—ধবধবে।

ও পারটাতে ফুটবলের মাঠও আছে—শীতকালে খেলা হয় হকি—টেনিস-কোর্টগুলোর পাশেই লোহার তারে ঘেরা প্রকাণ্ড মাঠ।

এ-পারের লোকগুলোর ফুটবল আর হকি খেল্‌তে ও-পারে ডাক পড়ে—সাহেব ত' আর খুব বেশী নেই, খেলায় অত লোক জোটে কোথা থেকে? ম্যাচ্‌ও লেগে আছে ঢের।

এপারে বেশ সারি সারি লাল ইটের ঘরের পর ঘর, সারবন্দী দেশালাই বাক্সের মত সাজানো, ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা-ঢালা ছাই রংএর রাস্তা অভ্যেস থাক্‌লে খালি পায়েও কাঁকর ফোটে না।

এ-সব ঘরেই থাকে ইষ্টিশানের যত ফিটফাট্ তারবাবু, টিকিটবাবু, পার্শেলবাবু, মালবাবু, ট্রেণবাবু, গার্ডবাবু—সব। এ-পাড়াতেই আছে "ডিরাইভার-টোলা", ওই হিন্দুস্থানী আর মুসলমান ড্রাইভারদের কুঠরীগুলো, দরজার পাশে প্রথমেই পাইখানা সাম্‌নে নিয়ে—প্রয়োজনবাদীর মতে তৈরী বুঝি। এই ড্রাইভারেরাই তো ভারী ভারী মালগাড়ীর ট্রেণগুলোকে কতদিনের রাস্তা একটানা নিয়ে যায়—সঙ্গে খাবার বাঁধা থাকে রুটি কি চিঁড়ে। ফায়ারম্যান-খালাসী, পয়েণ্টস্‌ম্যান, পাণি-পাঁড়ে, ঝাড়ুদার, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি, পাহারাওয়ালা—ডিউটির পরে' তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে নিতে আসে ত' এই কুঠরীগুলোতেই।

জগদ্ধাত্রী পূজো, মহরম, কি "কালীমাইকী পূজা" বাবুরা আর এরা একসঙ্গেই করে—এক একটা কলেরা বা বসন্তের মড়ক যখন আসে, তখন তো আর মুসলমান ড্রাইভার, হিন্দুস্থানী পাণি পাঁড়ে, কিংবা বাঙালী পার্শেল-বাবু মান্‌বে না!

এ-ধারে যেখান দিয়ে রেলের জমির সীমা-দেখানো তারের বেড়া চলে গিয়েছে,—গরু থাক্‌বার গোয়ালের মত খুব্‌রী খুব্‌রী কুঠরীতে একপাল শূওর আর কুকুর সঙ্গে কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঝাড়ুদারদের ব্যারাক—তারই পাশে রেল-সীমানার বাইরে বড় একটা অশথ-তলায় মাটী কুপিয়ে "মহাবীরকা স্থান" করা, সেখানে "মেহনৎ" হয়। জফু আলী পয়েণ্টস্-ম্যান, নেপালী লালবাগদুর পাহারাওয়ালা, দামোদর সিং পাণি-পাঁড়ে—সব্বাই হেঁইয়ো, হেঁইয়ো করে' সকাল বেলা ডন দেয়, বৈঠক দেয়, মাটী মেখে ল্যাঙ্গট পরে'।

"খোখাবাবু"ও জুটে গিয়েছিল এখানে। এই পনেরো, ষোল বছর বয়সেই সুদর্শন গৌরকান্তি জোয়ানের মত চেহারা দেখে পাঞ্জাবী মিস্ত্রী দলীপ সিংও স্বীকার কর্‌ত—হাঁ, আলবৎ চেহারা বটে, পঞ্জাবী মহারাজানা ঘরের কুমার যেন, কাপ্‌ড়াতেই শুধু বাঙালী। বাঙালী সন্তান, পালোয়ানী জিহ্বায় খোকাবাবু—"খোখাবাবু"।

বছরে তিনশ' ষাট দিন,—তিনশ' ষাটের কম ডন্ এখানে কেউ দিতে পাবে না;—সোমবার মহাবীরজীর দিন, মহাবীরকা স্থানে সব চেয়ে বেশী ডন্ সেদিন যে দিতে পার্‌বে, সে বাহাদুর! খোখাবাবু বিচার কর্‌বে।

ল্যাঙ্গট্-পরা সারা অঙ্গে মাটী মলে' ডন বৈঠকের পর দু' এক বাজি কুস্তি হ'ত। কোনও পাহ্‌লওয়ান হঠাৎ হয় ত' বিশাল দক্ষিণ উরুতে ফটাস্ করে' এক চড় কসে' তাল ঠুকে হেসে খোখাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে' ফেল্‌লে, —"চলে আও পাঠ্‌ঠে!"

আদ্দির পাঞ্জাবী লোহার চেয়ারটায় নাম্‌ল, ঢাকাই জরিপাড় কাপড়খানা তার পাশে, বার্ণিশ করা পাম্‌সু জোড়া পড়ে রইল—খোখাবাবুর মুখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি। "স্থানে" নেমে চট্ করে' ছুটো ডন দিয়ে কপালে একমুঠো মাটী রগড়ে খোখাবাবুও তাল দিলে—উরুর ঢল্‌ঢলে গৌর পেশীগুলো হঠাৎ যেন তপ্ত সোণার পাতে মোড়া।

প্রভাত-অরুণের সোনালী আলোও অশথপাতার ফাঁকে ফাঁকে অঙ্গে অঙ্গে ঝিলিমিলি খেলা খেল্‌ছে।

"মেহনতে"র শেষে পেস্তা বাদাম, গরুর দুধ, কাঁচা, ঠিক যেন অশথের আঠা—খোখাবাবু টাকাটা খরচ কর্‌ত খুবই।

অবশ্য করা উচিতও;—অত বড় উকিলের ছেলে, রেলের বাইরেকার আসল সহরটায় সদর রাস্তার উপর তিনতলা

প্রকাণ্ড জৌলুসে বাড়ীখানা ত' তাদেরই, ইষ্টিশান থেকেও দেখা যায়। বারো, তেরো টাকা মাইনের পয়েণ্টস্‌ম্যান সরকারী নীল ছেঁড়া কোর্ত্তাখানাই দিনরাত্রি গায়ে দেয়, পেস্তা বাদাম জুটাবে কোথা থেকে।

শীতকালে বড়দিনের কাছাকাছি ও-পারের সাহেবদের বাংলো-পাড়াটা জমে বেশ। সাহেব-বাচ্চাগুলো, মেয়েগুলো দার্জ্জিলিং না শিমলা, শিলং না নৈনীতালের ইস্কুল লরেটো থেকে মা বাপের কাছে আসে।

সকালে জনি, বব্, পিণ্টো, ম্যাকি এ-পাড়ায় আসে, সহর-বাজারে আসে; হাতে এক একটা রবারের গুল্‌তি, বাড়ীর ছাদে ছাদে চড়াই শালিখ্ পাখী মারবে—সঙ্গে থাকে কিটি, অ্যাল্‌সি, অনেক মেয়েও।

রং সবাইকার অবিশ্যি ফর্সা নয়, তবু সাহেব ত'।

কেউ কিছু বল্‌তে সাহস পায় না। দু' একজন চালের, ঘিএর আড়ৎদার মাড়োয়ারী হয়ত' বল্‌লে, "এ ঘরকা চিড়িয়া হ্যায়—সাহেব, মারনা ন চাহিয়ে!"

ম্যাকি ঠোঁট্ কাম্‌ড়ে বলে, "Buggar!"

পিণ্টো সড়াং করে' গুল্‌তি ছুঁড়লে, শালিখ একটা ঘাড় মটকে পড়্‌ল, খিল্‌খিল্ হেসে ছুটে কিটি কুড়িয়ে নিলে, অ্যাল্‌সি ব্যাগের মধ্যে পূরে রাখ্‌লে।

মাড়োয়ারী অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

খোখাবাবু "মেহনৎ" করে' বাড়ী ফির্‌ছিল—সাহেব ছেলেগুলোর মাথা থেকে প্রত্যেকের শোলাহ্যাট্ একে একে খুলে নিলে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে, "চিড়িয়া লোক বাসা বানায় গা—প্যালেস্ (Palace)!"

অনেক লোক জমে ভিড় করেছিল—সবাই হেসে উঠ্‌ল। বব্, পিণ্টো, ম্যাকি কড়্‌মড়্ করে' দাঁতে দাঁত চাপ্‌ল, এত লোকের সাম্‌নে খোখাবাবুর গায়ে হাত তুল্‌তে গেলে কি আর রক্ষা আছে; তা' ছাড়া খোখাবাবু একলাও তো কম নয়, গেল বছরেই চেনা আছে যে!

ম্যাকি কালো মুখ রাগে বেগুনে করে' বল্‌লে, "Come to our Football Ground—খেলার মাঠে এসো, আমাদের পাড়ায়—!"

খোখাবাবু মুচ্‌কি হাস্‌লে, "হাঁ, হাঁ, আজ বিকেলেই যে হকি-ম্যাচ রয়েছে—আমার টীম্ যাবে—

"আচ্ছা,—তোমাদের হ্যাট্ নিয়ে যাও। চিড়িয়াদের প্যালেস্ আমি কিনে দেব!"

কিটিটা ভারী দুষ্টু—সেই এদের মধ্যে একটু চটুকে রংএর, বয়সটাও সবে বছর চৌদ্দ, পনেরো—হঠাৎ হাঁটুর উপরকার গোলাপী ফ্রকটায় দোল খাইয়ে, দুষ্টুমিভরা চোখে কোনরকমে হাসি চেপে, ডালিম-রাঙা গালের উপর সোনালী ঝুরো চুল চট্ করে' একবার সরিয়ে নিলে,—ডান হাতখানা বাড়িয়ে একেবারে খোখাবাবুর সাম্‌নে এসে ঘাড় কাৎ করে' দাঁড়ালো!

গম্ভীরভাবে খোখাবাবু তার হাতখানা ধরে' একটু নেড়ে দিলে—শেক্‌হ্যাণ্ড্ হ'ল।

পিণ্টো, ম্যাকি রাগে কিটির দু'ধার থেকে দু'হাত ধরে টেনে নিলে—কিটি খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল, "আরে, আরে, বুঝলে না, "নিগার"টাকে নিয়ে একটু রগড় করলুম!"

ইংরিজী খোখাবাবু বেশ ভালোই বোঝে—তবু কিন্তু মুখে মুচকি হাসি।

মাড়োয়ারী এতক্ষণে তার বিশাল গোঁফ জোড়ার ভিতর থেকে হেসে বল্‌লে, "সাবাস্!"

খোখাবাবু বাড়ী চল্‌ল,—বাজারটা ছাড়িয়ে একটু নির্জ্জন রাস্তা হ'তেই দেখে ম্যাকি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে আচম্বিতে ম্যাকি বুটসুদ্ধ এক লাথি কসে' দিলে খোখাবাবুর পায়সুর উপরে, পায়ের গাঁটটা কেটে দর্‌দর্ রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল। ম্যাকি ভোঁ দৌড়। ছুটতে পার্‌ত খুব—গেল বছর বড়দিনের খেলায় সব দৌড়েই ফাষ্ট্ হ'য়েছিল ম্যাকি।

ইস্কুলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড্ ছট্টুলালও আজ মেহনৎ কর্‌তে 'স্থানে' গিয়েছিল, এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল, ম্যাকির পাছু নিলে।

খোখাবাবু চেঁচিয়ে বল্‌লে, "ছট্টু ফিরে এস—

"আরে, ওরা সাহেব লোক, ওদের দু' একটা লাথি আমাদের হজম কর্‌তে হয় বৈ কি—"

ছট্টুলাল অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

বড় দিনের খেলা—স্পোর্টস্, সাহেবপাড়ার সেই তার-ঘেরা ফুটবল মাঠটায়। খেলা শুধু সাহেবদেরই।

একধারে একটা বড় তাঁবু খাটানো হ'য়েছে, তার মধ্যে

চেয়ারে বসেছে যত সাহেব মেমের দল—গার্ড সাহেব, ড্রাইভার সাহেব, সবারই আজ ছুটী। লাল, গোলাপী, নীল নানান্ র'এর পোষাক, টুপির বাহার।

পাশেই রদ্দুরে ভিড় করে' দাঁড়িয়ে আছে, ভারত-বাসীর দল - চাপরাশী, পাণিপাঁড়ে, 'ডিরাভার', পয়েণ্টস্‌-ম্যান, গার্ডবাবু, পার্শেলবাবু; তারবাবুও দু' একজন ইষ্টিশানের কাজের ভিড় একটু কম দেখে একবার খেলাটা দেখে যেতে এসেছে, আবার গিয়ে কাজে লাগ্‌বে।

রং-বেরঙের পতাকা উড়ানো. ইউনিয়ন জ্যাক্ ফ্ল্যাগ. তোলা বাহারে সজ্জায় সাজানো মাঠে নানা রকম দৌড়—চোখ বেঁধে, থ্রি লেগেড., ফ্ল্যাটরেস্, লঙ্‌ জাম্প, হাইজাম্প; —, ছেলে মেয়ে সবাই সুন্দর রেশমী মোজা জুতো, সার্টে, ফ্রকে সেজে।

খোখাবাবু তারের ঘেরার মধ্যে ঢোকে নি, দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস্ আছে; কিন্তু ওই চেয়ারগুলোর পাশেই রদ্দুরে দাঁড়াতে হবে, তার কি মানে?

একা একা তারের বেড়ায় হেলান দিয়ে খোখাবাবু দেখ্‌লে,- বাস্তবিক ম্যাকিটার ক্ষমতা আছে, সেদিনের হকিম্যাচে "রঙ্‌ সাইডে" (wrong side) পেয়ে উপরকার একটি দাঁত, আর নীচের ঠোঁটের আধখানা উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে, তাই ব্যাণ্ডেজ করে' সব দৌড়েই ফার্ষ্ট্ হ'ল ম্যাকি!

মেয়েদের মধ্যে কিট্টিটা কম যায় না। সেই ঠিক ঠিক চট্ করে' ছুঁচে সুতোটা পরাতে পার্‌লে বলেই ও দৌড়েও ম্যাকি ফার্ষ্ট্ হ'ল, তা না হ'লে আস্‌বার মুখে পিণ্টোর পায়ে পা লেগে বেচারী পড়ে গিয়ে পেছিয়ে গিয়েছিল ত'।

স্থাল্পি কোনও কর্ম্মের নয়—কালো শুঁটকো চেহারা যেমন, কিট্টি-ম্যাকির দিকেই হিংসুটের মত তাকিয়ে রইল, পিণ্টোর জন্যে তাড়াতাড়ি সুতো পরাবে কে?

"Well, Khokha Babu,—খোখাবাবু—"

কিট্টিটা কখন খোখাবাবুর সাম্‌নে এসে ফিক্‌ফিক্ করে' হাস্‌ছে—ম্যাকিদের তখন 'মাইল রেস' হচ্ছে, মাঠটার চার ধারে সাত পাক।

খোখাবাবু তারের বেড়া ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফুচকি হেসে বল্‌লে, "খোখাবাবু আমার আসল নাম নয়—সত্যকিঙ্কর বোস্, এস্, কে, বোস। হিন্দুস্থানীরা খোখাবাবু নাম রেখেছে।"

"বোস্—তোমার সঙ্গে আমার ভারী ভাব কর্‌তে ইচ্ছে করে—"

মতলব কি—কিট্টির চটুল হাসিমাখা চোখ দুটীর দিকে তাকিয়ে খোখাবাবু কিছুই আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লে না। এইমাত্র ছুটাছুটি করে' এসে গাল দুটী রাঙা, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছে। পিতা তার গরীব গার্ড সাহেব। আজকের দামী রেশমী ঘাগ্‌রাটা কিন্তু তাকে মানিয়েছে বেশ।

খোখাবাবু বল্‌লে, "আমারও ত' ইচ্ছে করে, তোমাদের সঙ্গে ভাব করি—"

"কিন্তু ওই ম্যাকি, পিণ্টোর জ্বালায় তোমার সঙ্গে দুটো কথা বল্‌বারও জো নেই—ভারী হিংসুটে, তুমি নেটিভ্ কিনা—" কিটি ফিক্ ফিক্ করে' দুষ্টু হাসি হাস্‌তে লাগল।

খোখাবাবুও শুধু একটু হাস্‌লে।

"তা' তুমি যদি এক কাজ কর, তোমার সঙ্গে আজ খু—ব গল্প করি—"

তেমনি সহাস্যে খোখাবাবু জিজ্ঞেসা কর্‌লে, "কি কর্‌তে হবে শুনি।"

"আজ ত' বড়দিন, ম্যাকিরা রাত্রে আণ্টাঘরে 'বল-ডান্সে' আস্‌বে, তুমি আমাদের বাড়ীর কাছে যেও।

"আমাদের বাংলোটা চেন ত'? ওই যেখান দিয়ে পশ্চিম যাবার রেল ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গিয়েছে—একটা বড় ইটের খিলেনওয়ালা পুল আছে, বড় নালাটার উপর দিয়ে, আমি সেই পুলের কাছে থাক্‌ব—

"দেখ্‌তে না পাও, ত' শিস্ দিও - যেমন ম্যাকি, পিণ্টো দেয়—"

খোখাবাবুর কি খেয়াল হ'ল, ব'লে, "বেশ, আজ সন্ধ্যের পরে যাব—কিন্তু তুমি 'বলে' যাবে না?"

"না, আমার মায়ের যে অসুখ—তা'হলে তোমার সঙ্গে খু—ব গল্প করা যাবে।"

কিট্টি হাস্‌তে হাস্‌তে, নাচ্‌তে নাচতে তাদের দলের মধ্যে চলে গেল—ম্যাকিদের দৌড়ের সাত পাক শেষ হ'য়ে এসেছিল, ঠণং, ঠণং, ঠণং, ঘণ্টা পড়ল।

কিট্টিটা বেজায় দুষ্টু, কিন্তু তবুও বেশ সুন্দর। তার সঙ্গে গল্প কর্‌তে খুব ইচ্ছে করে। ম্যাকি পিণ্টোর মন রাখ্‌তেই সেদিন ওদের সাম্‌নে খোখাবাবুকে 'নিগার'

বলেছিল. আপনার জাত ত; কি করে? আজ আড়ালে অনেক গল্প কর্‌বে, কি মজা!

শীতের সন্ধ্যের পর অন্ধকারে আকাশের কন্‌কনে কোয়াসা শেড-ঘরের (engine shed) ইঞ্জিনগুলোর গাঢ় ধোঁয়াকে সার সারি রেলের পাঁজরার হাড়ের মধ্যে চেপে ধরেছে—হাঁপানি রোগীর শ্লেষ্মার মত চাপ চাপ ধোঁয়া কিছুতেই উপরে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। ইয়ার্ডের বুকখানাও হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে।

তালগাছের সমান উঁচু লোহার থামে ইলেকট্রিক্‌ আলোর ব্রহ্মদৈত্যের চক্ষু কালো কালো মাল-গাড়ী-শ্রেণীর তলাটার গাঢ় আঁধারে কিছুতেই দৃষ্টি ফেল্‌তে পার্‌ছে না—বরং ঘুর্‌ঘুট্টি অন্ধকার যেন গাড়ীতে গাড়ীতে বাঁধবার 'কাপ্‌লিং' গুলোর কাছে বেশী করে' জমাট্‌ বেঁধেছে।

দূরের উঁচু উঁচু সিগনালগুলোর লাল লাল বাতি ঝাপ্‌সা ধোঁয়ার পর্দা ভেদ করে' যেন স্থিরদৃষ্টি ডাকিনীর আঁখি।

নীচু নীচু এলোমেলো ছড়ানো রেলের পয়েন্টে পয়েন্টে বেঁটে বাচ্ছা সিগনালের সবুজ, সাদা, নীল আলোগুলো যেন প্রেত-শিশু—পয়েন্টস্‌ম্যান্‌ 'লেভার' নেড়ে পয়েণ্ট বদ্‌লালে হুট্‌ করে লাল আলো সবুজে হ'য়ে যাচ্ছে, প্রেতশিশুদের লুকোচুরি খেলা বুঝি।

খোথাবাবু দু'দিকে অফুরন্ত মালগাড়ী শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চলেছে—ও—ই দূরে আঁধারে যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেথা বড় বড় ইঞ্জিন ভ্যাস্‌ ভোঁস, ঝ্যাক্‌, ঝোক শব্দে এক একটা শ্রেণীতে ধাক্কা দিয়ে, এক আধখানা গাড়ী খুলে নিচ্ছে বা লাগিয়ে দিচ্ছে—সারা শ্রেণীর মধ্যে একটা হুড়্‌-হুড়্‌ সাড়া! 'শাণ্টিং' হচ্ছে।

রেলের গেটের কাছে মহাবীর-কা-স্থানের জঙ্গু পয়েণ্ট্‌স্‌-ম্যান হাতের এক-চক্ষু বাতিটা খোথাবাবুর মুখের কাছে তুলে ধরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেসা করেছিল, "অন্ধকারে এ পথে কোথা?"

"কিট্টিদের বাড়ী—এক নম্বর কালভার্টের কাছে।"

"ওভারব্রিজের উপর দিয়ে—রাস্তা ঘুরে যাও, সিগনালের তারে পা বেধে পড়ে' শাণ্টিংএ কাটা পড়্‌বে কি? তা' ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি?"

"ওই এক নম্বরে ঘাস কাট্‌তে গিয়ে পাগ্‌লীটা কাটা গেল, লাল বাহাদুর বল্‌ছিল, সে 'কিচ্চিন্‌' দেখেছে।"

কিচ্চিন্‌—প্রেতিনী।

খোথাবাবু 'হো, হো' হেসে উঠেছিল, "তোমাদের বৃথাই পেস্তা বাদাম খাওয়াই—"

ওই এক নম্বর ইট-খিলেনের পুলটার উপর দিয়েই 'মেন-লাইন' চলে গিয়েছে, এই বিস্তৃত রেল-ইয়ার্ড-বক্ষের পাঁজরাগুলোর মেরুদণ্ডের মত। দিনে কত অগণ্য অজগরের মত বিপুল মাল গাড়ী সারা দেশের মাটীর রস বহন করে' ওই মেরুদণ্ড বেয়ে দেশ বিদেশে চলে যায়, হু হু করে ডাক-গাড়ী আনাগোনা করে সঠিক সংবাদেরই আদান প্রদানে।

এখনই একখানা ডাকগাড়ী আস্‌বে—ইয়ার্ডে জঙ্গু মালী তাই অত ব্যস্ত।

খোথাবাবু রেলের ইয়ার্ড পেরিয়ে একটুখানি হাঁপ ছাড়লে; শাণ্টিং মাল গাড়ীর জোড় বাঁধবার কাপ্‌লিং পার হ'তে কাটা পড়া অতি সাবধানীরও কিছু বিচিত্র নয়। শাণ্টিং জমাদারই বছরে বছরে কত কাটা পড়ছে।

এবার আরম্ভ হ'ল মেন লাইনের উঁচু বাঁধ—এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট ক্রমে প্রায় দু' তলা সমান। বাঁ-দিকে সাহেব পাড়ার শেষ, ডান দিকে ধানক্ষেত, জলা। ওই ডাকিনী চক্ষু ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ সিগনালের কাছেই সাহেবপাড়ার বড় নালাটার পুল—এক নম্বর।

পুলের কাছে কেউ নেই! ঝোঁকের মাথায় এই কষ্টসাধ্য পথে এসে খোথাবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দু'চারবার দেখ্‌লে—অনতিদূরে কিট্টিদের বাংলোর জানালা দিয়ে শুধু একটা আলো। কিট্টির কথামত খোথাবাবু দু'হাতের দুটো দুটো আঙুল মুখে পুরে' সজোরে শিস্‌ দিলে।

ইস্‌! ঘেউ ঘেউ করে কৃতান্তের মত একটা বাঘা কুকুর কোথা থেকে এসে লাফিয়ে তার চোখে মুখে আঁচড়ে নাকে একটা কামড় বসিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌খিল্‌ হাসির কলরব।

কিট্টি বল্‌ছিল, ম্যাকির গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, "দেখ্‌লে ত' 'নিগার'টাকে কেমন জব্দ করে' দিলাম!"

"কুকুরের পিছনে কুকুরই লেলিয়ে দিতে হয়—" বোধ হ'ল যেন পিণ্টোর গলা।

খোখাবাবু চোখ চাইতে পার্‌ছিল না। সেখানে বসে' পড়্‌ল। তারা কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল, আণ্টাঘরের দিকে।

জঙ্গু পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান আর পাহারাওয়ালা নেপালী লাল বাহাদুর দুটো একচক্ষু লণ্ঠনহাতে "খোখাবাবু খোখাবাবু" করে' চীৎকার কর্‌ছিল। খোখাবাবু সাড়া দিলে।

রেলের গেটের কাছে এনে খোখাবাবুকে কোল থেকে নামিয়ে—জঙ্গু মৃদু অনুযোগ করলে, "তখন শুন্‌লে না খোখাবাবু, ওখানে 'কিচ্চিন' আছে—ডাক-গাড়ীটার পয়েণ্ট ঠিক করে' যেতেই তো আমাদের দেরী হ'য়ে গেল।"

পনেরো ষোল বছর কেটে গিয়েছে। ইউরোপের অত বড় যুদ্ধটা এই ক'বছর হ'ল শেষ হ'য়েছে।

খোখাবাবু এখন মেজর এস্. কে, বোস, বিশাল আয়তন সাহেব—ডাক্তারি পাশ করে' যুদ্ধে গিয়েছিল। সেই রাঙা রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় সাহেবপাড়ার মেডিক্যাল অফিসারের বাংলোর ফুলবাগানের গেটে আজ পিতলের পাতে তার নাম লেখা। রেলের হাসপাতাল পাশেই।

পরিবর্ত্তন? এতগুলো বছরে পরিবর্ত্তন হ'য়েছে বৈকি ঢের। জঙ্গু আলি কেমন অথর্ব্ব মত হ'য়ে গিয়েছে, তা' ছাড়া সেবার শাণ্টিং করাতে পিছলে পড়ে' ডান পাটা কাটা গেল—কাঠের পা নিয়ে ইষ্টশান মাষ্টার সাহেবের অফিসটা ঝাড়াঝুড়ি কর্‌তে পারে মাত্র, আজ আর তার কোনও ক্ষমতা নেই।

নেপালী লালবাহাদুর পাহারাওয়ালা বেচারার মাঝে জেল হ'য়ে গিয়েছিল, চুরির অপরাধে। নেপালী বড় ছত্রী ঘরোয়ানার সন্তান সে—সম্ভ্রমে বড় বেজেছে। বয়সকালে লড়াইএ গিয়েছিল; আজ জেল-ফেরত যেন মরার মত। সেবার ইষ্টশান মাষ্টার সাহেব মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে ঘুষ নিতে সে বেচারা জান্‌তে পারে, তার পরেই কতকগুলো হৃত পার্শেলের সঙ্গে সে একদিন সনাক্ত হ'য়ে পড়্‌ল!

তবে, এ-পারে ও-পারে পাড়া দু'টো এখনও প্রায় পনেরো বছর আগেকার মতই আছে। ওপারের পাড়াটার বরং একটু বদল হয়েছে। ওরই মধ্যে আরও সারি-কয়েক লাল ইটের কুটুরি বাড়িয়ে রেলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার-ম্যান্, 'পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান, মালবাবু, গার্ডবাবু কিছু বেড়েছে বৈকি।

পুরোন লোক সব থাকে কি করে? বছরে বছরে যা' মড়ক! আর যুদ্ধের দুর্ম্মূল্যে অল্প-আয়ের লোক ত' অনাহারেই মারা গেল।

মেজর এস্, কে, বোস্ বাল্যস্মৃতির স্থানে ফিরে এসে অনেক সংবাদ পেলে। মনে পড়্‌ল, এখানকার পড়া শেষ করে' ইষ্টিশানে সেই বিদায় নেবার সময়। কতলোকেই গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছিল। আত্মীয়-স্বজন, ইস্কুলের সহপাঠী ছটুলাল, মহাবীর-কা-স্থানের জঙ্গুরা—এমন কি বাজারের দু'একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারীও কি জরুরী কাজের জন্তে হঠাৎ সেই সময়ে ইষ্টিশানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছিল। খোখাবাবু চলে যাচ্ছে শুনে, তাদেরও শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত মুখের হাসি একটুখানি শুষ্ক হ'য়ে আস্‌ছিল।

হাস্‌পাতালে বসে রোগীদের প্রেস্‌ক্রপসন্ লিখতে লিখতে খোখাবাবু পুরোন কথা মনে করে চলেছে। গার্ড সাহেব, ড্রাইভার সাহেব, গার্ডবাবু, তারবাবু, খালাসী, পয়েণ্টস্‌ম্যান, মেমসাহেব, সাহেব, ছেলে মেয়ে—রোগী সব রকম।

একটী মেম আহ্বান করলে, "Major Bose—বোস্ সাহেব!"

"বলুন"।

"আমায় কি আপনি চিন্‌তে পার্‌ছেন না?" আরে, এ যে কিটি—কিটির সেই ডালিমের মত নিটোল গাল, আজ একটু যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে এসেছে। সেখানে রুজ-পাউডারের আবরণ প্রয়োজনের খাতিরেই কিছু বেশী বুঝি। আজও সেখানে সেই ছোট বেলাকার দুষ্টু হাসির অবশিষ্ট রেশ কোথা থেকে চকিতের মত যেন খেলে গেল। ক্রোড়ে তার একটী শিশু।

সকল রোগী চলে গেলে কিটি অনেক কথাই জানালে।

ম্যাকির সঙ্গে অনেক দিন আগে তার না কি বিয়ের ঠিক হয়, অনেক মেলামেশা, বিয়ে হ'ল না। যুদ্ধ বাধ্‌তে ম্যাকি যুদ্ধে চলে গেল,—বুঝি বা মহত্তর কর্ত্তব্যের প্রেরণায়; তাকে কিন্তু চরম লজ্জায় ফেলে রেখে।

কোন্ সার্থক-সত্য প্রকাশের আনন্দে সে উচ্ছৃঙ্খলভাবে তার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলে' যাচ্ছিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোখাবাবু বুঝ্‌তে পার্‌লে না।



প্রসাধন

শিল্পী- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

তারপর নাকি কিট্টির বিয়ে ঠিক হয় পিণ্টোর সঙ্গে। কিন্তু সেও আবার ম্যাকির মত তাকে বিপদে ফেলে সরে' পড়ে। কিট্টি ভেবেছিল পিণ্টোর নামে নালিশ করবে; কিন্তু পিণ্টোর চমৎকার একটা সুবিধা ছিল,—তার মায়ের এক বছরের মধ্যে পতি পরিবর্ত্তন করে' তিনবার বিবাহ,—পিণ্টোর ঠিক কি নাম, পিণ্টো তা' নিজেই জানে না; সুতরাং সে সহজেই নাম বদলে দক্ষিণ-ভারতে পুণা না ত্রিচিনোপল্লী কোথায় রেলের গার্ড হ'য়েছে।

কিট্টি আর কি করে—সন্তানকে নাম তো দিতে হবে, এক বুড়া দোজবরে' মাতাল গার্ডকে পতিত্বে বরণ করেছে।

কিট্টি জিজ্ঞাসা করলে, "Major Bose, তুমি কি সাহেব-পাড়ার বাংলোতেই থাক, না তোমাদের সহরের বাড়ীতে ?"

কি ভেবে মেজর বোস্ উত্তর করলে, "বাংলোতেই থাকি - কেন ?"

"আমি কাল বিকেলে তোমার বাংলোর একবার দেখা করতে আসব।"

পুরাতন মুচকি হাস্যে খোখাবাবু বললে, "বেশ ত'।"

হ'লঘরটার দেয়ালে বহুমূল্যের পেপার, কারপেট-বিছানো মেঝের মেহগ'নি কাঠের কোচ—আৰ্দালির নির্দ্দেশে লুব্ধ মেয়েটীর মত কিট্টি হলের পাশের ঘরে মেজর বোসের সন্ধানে বৈকালে উঁকি মারলে। একটী চেয়ারে বাঙালী পরিচ্ছদে মেজর বোস, সেই ছোটবেলাকার খোখাবাবুর পূর্ণায়তন সংস্করণের মত বসে'; বিশাল ক্রোড়ে তার সতেরো আঠারো বছরের একটী বাঙালী মেয়ে, আল্‌তা-রঞ্জিত পা দু'খানি ঝুলিয়ে! রগরগে সিন্দূর-রাঙা-সিঁথা আর মধুর মুখখানি খোখাবাবুর বক্ষে লুকানো। বাঙালীর মেয়ে সোহাগে, লজ্জায় একেবারে বিপন্না। পলায়নের বিপুল প্রয়াস খোখাবাবুর দুষ্টু মিতরা বাহুদুটীর আবেষ্টনে পরাহত—লজ্জার রাঙা মুখ ছাপাকাটা খদ্দরের শাড়ীর ঘোমটায় ঢাক্‌তে হাতের সরুসরু চুড়ি-গুলি টুনটুন্ করে উঠল। নিরুপায়ে বাঙালীর মেয়ে অত্যাচারীটার বিপুল বক্ষেই লজ্জার আবরণের সন্ধানে আশ্রয় নিয়ে মিশিয়ে গিয়াছে।

কিট্টি স্তম্ভিত হয়ে' বলে উঠল, "My God ! এ কে ?"

"My Life—এটী আমার প্রিয়া গো, আমার প্রাণের নিধি।" দুষ্টুমি করে' বক্ষে লুকানো চিবুকটীর কাছে আর একবার তার মুখ নিয়ে গেল।

কিট্টি আত্মহারা হ'য়ে জিজ্ঞেসা করে ফেললে, "একে কোথায় পেলে ?—"

"যুদ্ধে টুদ্ধে নয়—যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে বুড়ো বাবা আমায় এটী উপহার দিয়েছেন—" খোখাবাবুর মুখে সেই মুচ কি মুচ কি হাসি।

"বস কিট্টি, ওই চেয়ারটায় বস—গল্প করা যাক্—অন্ধকারে তোমাদের সেই এক নম্বর পুলের চেয়ে এখানে বসে গল্প করতে আরাম পাবে, সেদিন পথে যেতে আমারও সত্যি ভয় হচ্ছিল—"

একটা চেয়ারে বসে পড়ে' অকস্মাৎ কিট্টি নিজের কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—কোথাকার নিরুদ্ধ অশ্রু যেন কিছুতেই চোখের পথে রোধ মানলে না। ছলনায় লীলাময়ী কিট্টির অন্তর আপনাকেও ছলনা করেছিল বুঝি।

বাংলোর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—বহু সঠিক সংবাদ বয়ে' সন্ধ্যার ক্রত ডাকগাড়ীখানা মেরুদণ্ডরূপী যেন লাইন থেকে পাঁজরার হাড় বিছানো ইয়ার্ডের বুকে মন্থর গতিতে ঢুকছে।

ব্যাঙ্ক সংগঠন ও পরিচালন

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম-এ

'বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে, আগেই যথেষ্ট মূলধনের যোগাড় কিংবা আফিসের সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করিবার প্রয়োজন হয় না। কোনও প্রকার ব্যবসা আরম্ভ করিলেই যে পসারের সৃষ্টি হয়, তাহার বলেই মূলধনের অভাব দূরীভূত হয়। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, ব্যবসায়ে নিযুক্ত অর্থ মূলধন অপেক্ষা ২০ গুণ বেশী। এক শত টাকার মূলধন লইয়া কারবার করিতে আরম্ভ করিলে মাত্র ১০০৲ শত টাকার মালই পাওয়া যাইবে ও তাহার পুনঃ পুনঃ নিয়োগ (turn over) দ্বারাই লাভ হইবে, ইহা ভুল ধারণা। কিছুদিন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলেই, কারবারের প্রসারের সহিত ব্যবসায়ীর পসারের বৃদ্ধি হইয়া কার্য্য বহুগুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও লাভও বেশী হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের কার্য্য বিশেষতঃ এই প্রকারের। মূলধনের যথেষ্ট যোগাড় না হওয়াতে বঙ্গদেশে কিংবা ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যল্প হইয়াছে, ইহা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাঙ্ক সংগঠন ও পরিচালন বিষয়ে প্রতিকূল, ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, আজ বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী-পরিচালিত, সমগ্র ভারতবর্ষ দূরের কথা, সমস্ত বঙ্গদেশে সুপরিচিত একটী ব্যাঙ্কও নাই। স্বদেশী যুগের যুগল অনুষ্ঠানের একটী Bengal National Bank—আজ ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অকৃতকার্য্যতার প্রমাণ মাত্র; ও অপরটী "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল"—মূলধন অপেক্ষা বেশী "রিজার্ভ" ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও আজ ঋণভারে Imperial Bankএর করতলগত। Bengal National Bank "ফেল" হইবার কারণ অনেকে অনেক প্রকার বলিতেছেন; কোন্ কারণ কি পরিমাণে দায়ী তাহা High Court বিচার করিবেন। তবে এক বিষয়ে সকলেরই মতের ঐক্য দেখা যাইতেছে। সকলেই বলিতেছেন, ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যাপারে যে যে প্রচলিত রীতিনীতি আছে, তাহা অগ্রাহ্য করাই এই ব্যাঙ্কের অধঃপতনের কারণ। Joint Stock Bank কিংবা অন্য কোম্পানী সকলেরই সংগঠন-কাল হইতে একটী Board of Directors থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ব্যাঙ্ক ফেল হইবার সময় কে কে "ডিরেক্টার" ছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চিত জানা গেল না। কার্য্য বন্ধ করিবার দিন পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম সংবাদপত্রসমূহে ডিরেক্টার বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের ২।৩ জন ছাড়া আর সকলেই ব্যাঙ্কের সহিত এই সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছেন। এই ভদ্রমহোদয়গণ কি বলিতে চান যে, তাঁহারা কোনও সংবাদ-পত্র পাঠ করেন না? এই "ডিরেক্টরত্ব" কি পূর্ব্বে অস্বীকার করা যাইতে পারিত না? Auditorগণ ত সম্পূর্ণ নীরব। আর "ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক" আইন অনুসারে যে সকল কাগজপত্র সময়ে সময়ে গভর্ণমেণ্ট কিংবা এ সমস্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দিতে হয়, তাহা যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছিল কি না, সে বিষয়েও কিছু জানা যাইতেছে না। সংবাদ-পত্রে ব্যক্তি বিশেষকে গালাগালি, ও কে কে অন্যায় ভাবে অথবা অসাধারণ ভাবে টাকা লইয়াছিলেন, তাহাদের বিষয়েই আলোচনা হইতেছে। যে যে বিষয় আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে এই প্রকার বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

বড় ব্যাঙ্ক না থাকিলেও, বাঙ্গালাদেশে Loan Company নামে ছোট ছোট অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। একটু যত্ন ও চেষ্টা করিলে এই প্রকার অনেক লোন-আফিস রীতিমত ব্যাঙ্ক হইয়া উঠিতে পারে। এই আফিসগুলি দেশের উন্নতিকল্পে অনেক সাহায্য করিয়া আসিতেছে; কিন্তু দেশের লোকসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুসারে ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট নহে; কিংবা কার্য্যপদ্ধতিও বিস্তৃত নহে। বিলাতি কারদার

পরিচালিত বড় বড় ব্যাঙ্ক অপেক্ষা দেশীয় প্রথায় পরিচালিত এই অনুষ্ঠানগুলির প্রয়োজন বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া চালাইতে না পারিলে, ও বাণিজ্যের উপযুক্ত সাহায্য দান না করিতে পারিলে, তাহাদের মূল্যের অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে। এই "লোন" কোম্পানী-গুলিই দেশের একমাত্র ব্যাঙ্ক নহে। এই প্রকার আফিস ছাড়া, অনেক মহাজন আছেন, যাঁহারা নামে না হইলেও কাজে ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া থাকেন। প্রায়ই কিন্তু এই কাজটী অপর কোনও ব্যবসার অঙ্গীভূত। এমন মহাজন একজনও নাই, যিনি ব্যাঙ্কের কারবারই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহাজনগণের বড় বড় ধান কিংবা পাটের আড়তের কাজের সহিত "তেজারতি" কারবারই আমাদের আদি ও অকৃত্রিম ব্যাঙ্ক। প্রয়োজনমত কৃষক বা গৃহস্থ বা দোকানদারগণকে তাঁহারা টাকা ধার দিয়া থাকেন; ও পরে ধান কিংবা পাটের সময়ে টাকার পরিবর্ত্তে ধান কিংবা পাট আনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখেন। অবশ্য নগদ টাকা পাইলে টাকা লইতেও তাঁহাদের কোনও আপত্তি নাই। সুযোগমত এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাঁহারা আপনাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া থাকেন। কৃষি ও কৃষকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ও বিদেশীয় আদব-কায়দা-বিবর্জ্জিত বলিয়া এই মহাজনী কারবার সহরের বাহিরে লোকপ্রিয়। কৃষিপ্রধান বাঙ্গলা দেশে মহাজনের প্রয়োজন "ব্যাঙ্ক" অপেক্ষাও বেশী।

মহাজন কেবলমাত্র উত্তমর্ণ নহেন। এক দিকে মহাজন প্রয়োজনে অর্থসাহায্যকারী; অপর দিকে তিনি ব্যবসায়ে পরামর্শদাতা, বিপদে আশ্রয়দাতা, মোকদ্দমায় আইন সম্বন্ধে উপদেশক, ও গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যাপারে সালিশ-কর্ত্তা। আধুনিক ব্যাঙ্কগুলিও নামান্তরে কারবারকারিগণের সহিত এই প্রকার বহু সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়; কিন্তু তাহার ভিতর যেন একটা প্রাণের অভাব লক্ষিত হয়। গ্রাম্য মহাজন কখনও বা অধমর্ণের সহিত কাকা, দাদা, মামা প্রভৃতি গ্রাম-সম্পর্কে পরিচিত; কাজেই ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ প্রভৃতি বিষয়েও এই প্রকার সম্পর্ক অনুযায়ী ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালকার প্রচলিত সাধারণ মনোভাব অনুসারে মহাজনের নাম শুনিলেই আমরা কোনও অদ্ভুত নৃশংস জীব কল্পনা করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি; কিন্তু এই শ্রেণীর লোক দ্বারা আজ পর্য্যন্ত দেশের যে কতখানি উপকার হইয়াছে, তাহা স্থির করা অসম্ভব। কতখানি দায়িত্ব লইয়া ও কি কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে নানা উপায়ে টাকা আদায় করিতে হয়, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। টাকা আদায় করা সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম—পাঠকবর্গকে তাহা এই স্থলে উপহার দিতেছি। ইহা হইতে জানা যাইবে, বর্ত্তমান কালের ব্যাঙ্কগুলির টাকা আদায় করিবার প্রণালী এই মহাজনী প্রথা হইতে কত বিভিন্ন।

কোনও কৃষককে টাকা ধার দিয়া "কর্ত্তা" মহাশয় দেখিতে পাইলেন যে, সুদের হিসাব ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু মূলের হ্রাস হইবার কোনও লক্ষণই নাই। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে হয়ত হিতে বিপরীত হইতে পারে। কাজেই তাহাকে ডাকাইয়া অনেক প্রকার বুঝাইয়া কর্ত্তা মহাশয় তাহাকে ভাগে আবাদ করিবার জন্য একখণ্ড জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কথা থাকিল, ফসলের ॥৵০ আনা কর্ত্তা লইবেন ও ।৵০ আনা কৃষক পাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, ফসল বেশী হইলেও, কর্ত্তার ভাগ ক্রমাগতই কমিয়া যাইতেছে। অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, পরবর্ত্তী বৎসরে কর্ত্তা নিজেই শস্য বিভাগের সময় মাঠে হাজির হইলেন; কিন্তু পাছে মধু মনে করে, কর্ত্তা তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাই তিনি আগেই বলিলেন "কি রে মধু—আজ বুঝি ধান ভাগ করবি? তা বেশ ভালই হয়েছে—আমার একটু অজীর্ণ হয়েছিল কি না, তাই বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়্‌লাম্। তা তোদের খবরও ত অনেক দিন পাই নাই"—ইহার পর তিনি মধু ও তাহার পরিবারস্থ সকলের কুশল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন ও সেখানে বসিয়া পড়িলেন। কৃষক মধুও অবশ্য যথারীতি আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিল না। ভাগও ঠিক হইল। কিন্তু মধু কথায় কথায় জানাইল যে, বাড়ীতে তাহার নববিবাহিত কন্যা ও জামাতা আসাতে কিছু খরচ বেশী পড়িতেছে। কথা শুনিয়াই কর্ত্তা বলিলেন, "বিলক্ষণ, এ কথা বলিস্ নাই কেন—মেয়ে এসেছে একটু আমোদ-আহ্লাদও ত কর্‌তে হবে—নে তুই আরও কিছু ধান বেশী নে।" আনন্দিত হইয়া কৃষক অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত আবার জানাইল যে, তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ও সেই মাসেই সাধ দিতে হইবে। কর্ত্তা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, বৌমার সাধ, সে ত আমারই দেওয়া

কর্ত্তব্য। তুই আরও কিছু ধান নে।" এই প্রকারে অন্নপ্রাশন, অশৌচান্ত প্রভৃতি ব্যয় উপলক্ষ করিয়া মধু তাঁহার নিকট হইতে প্রায় ৬|৵০ আনাই লইয়া বসিল। কৃষক এইবার চলিয়া যাইবে—এমন সময় কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন, "তা দেখ্ মধু, তোদের না বল্লে ত চলে না, এবার তোদের মাঠাকুরাণীর সেই ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হ'বে। খরচও অবশ্য হবে। তা আর কি করা—তোরা মনে রাখিস্।" মধু কি করে—পরে বেনী পড়িবে বিচার করিয়া, তখনই কর্ত্তৃঠাকুরাণীর উদ্দেশে কিছু ধান ফিরাইয়া দিল। এবার কিন্তু কর্ত্তার পালা। নানাপ্রকার পারিবারিক খরচের দোহাই দিয়া যখন তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অনেক বেশী আদায় করিলেন, তখন মধু জোড়হাত করিয়া বলিল, "তবে কর্ত্তা, যার যার খরচ তার নিজের ভাগ থেকে করলেই ভাল হয় না?" কর্ত্তা তাহাতেই সম্মতি দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামে এই সকল উপায় গ্রহণ না করিয়া, কড়া তাগিদ, উকীলের চিঠি প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইলে, নিষ্ফলতা বৃদ্ধি পায় ও কার্য্যের সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। শিক্ষার সম্যক প্রসার না হওয়া পর্য্যন্ত, পশ্চিমদেশীয় নিয়মে কারবার করিলে ব্যাঙ্ক লোকপ্রিয় হইবে না। অবশ্য শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতির পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। আজকাল দাঁড়াইয়াছে—দেশের কতক লোক ইংরাজীনবিশ ও কতক একেবারেই নিরক্ষর। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে, ব্যাঙ্ককে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মহাজনী করিতে হইবে ও মহাজনকে আধুনিক ব্যাঙ্কের রীতিনীতি কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের লোন আফিসগুলির আদর্শ অনেকটা এই প্রকার হইলেও, তাহাদের প্রধান দোষ উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবের জন্য অনেকটা "ভাগের মায়ের" ন্যায় অবস্থা হইয়া পড়ে। মহাজন তাহার ব্যবসাকে উপজীবিকা জ্ঞান করিয়া, যাহাতে সফলকাম হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে। আর বাল্যকাল হইতেই পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহার প্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করে। কিন্তু "লোন আফিস"গুলি নামে "লিমিটেড্" কোম্পানী; কাজে কয়েকজন "ডিরেক্টারের" সখের ব্যবসাদারী। মহাজন প্রায়ই সুদ দিয়া "ডিপোজিট" লইতে চাহে না; লোন আফিস চল্‌তি ও স্থায়ী উভয় প্রকার জমাই লইয়া থাকে। অথচ "ব্যাঙ্ক" যে রীতিনীতিতে টাকা নিয়োগ করে তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। আর স্থায়ী জমার কাল পূর্ণ হইয়া আদায় চাহিলেই, আমানতকারীর সহিত ডিরেক্টারবাবুর অথবা ম্যানেজার মহাশয়ের অনুনয় অভিযোগ কিংবা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এই "লোন-আফিস"গুলির কর্ম্ম-পদ্ধতির বিশেষ সংশোধন আবশ্যক। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, অনুষ্ঠানগুলি চালিত হয় এক জন "ডিরেক্টার" দ্বারা। ডিরেক্টার মহাশয়ের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আছে কি না, তাহার বিচার খুব কমই করা হইয়া থাকে। তিনি ডাক্তার কিংবা ব্যবহারাজীব, কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কোনও সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁহার কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা বা যশ লাভ করিয়া থাকিলেই, নির্ব্বিবাদে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, তিনি ব্যাঙ্ক পরিচালন-কার্য্যেও তদ্রূপ সফলতা লাভ করিবেন। চিকিৎসা কিংবা আইন-ব্যবসায়ের সহিত ব্যাঙ্কের জমা, সুদ, বাট্টা ইত্যাদির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না; অথচ বন্দোবস্ত থাকে আবার এইরূপ যে, ব্যাঙ্কের সামান্য কাজকর্ম্মও ডিরেক্টার মহাশয়ের অনুমতি কিংবা স্বাক্ষর ব্যতীত হইবে না। তাঁহার অধীন একজন সেক্রেটারী বা ম্যানেজার থাকেন। তাঁহার বেতন অধিকাংশ স্থলেই ৫০।৬০ টাকা। নামে ম্যানেজার কিংবা Secretary হইলেও তিনি কাজে "হেড্ ক্লার্ক" (Head clerk) বা পেস্‌কার মাত্র। কাহাকেও কোনও প্রকারে টাকা দেওয়া তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। একখানি "চেক" ভাঙ্গান পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। স্থায়ী আমানত সময়কালে উঠাইতে হইলেও, আমানতকারী কিংবা সেক্রেটারীকে দৌড়াইতে হয় ডাক্তার বাবুর সন্ধানে রোগীর বাড়ী কিংবা উকিল বাবুর সন্ধানে হাকিমের এজলাসে—যেন এই টাকা উঠাইবার অনুমতি দান ব্যাপারটীও আমানতকারীর প্রতি একটী বিশেষ অনুগ্রহ। অনেক স্থলে আবার পাশবহিতে পর্য্যন্ত ডিরেক্টারকে সহি করিতে হয়—সামান্য চিঠি-পত্র আদান প্রদানও তাঁহার স্বাক্ষর-সাপেক্ষ। একবার এইরূপ একটী Banking Corporation Ldএর নিকট একখানা চেক পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা টাকাটা আদায় করিয়া ডাকযোগে "ইনসিওর" করিয়া পাঠাইবেন ইহাই বলা হইয়াছিল। একমাসের মধ্যেও কোনও

প্রাপ্তি-সংবাদ না পাওয়াতে, প্রেরক-ব্যাঙ্ক ক্রমাগত তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল। উপর্য্যুপরি তিনখানা তাগাদা করিবার পর জবাব আসিল যে, চেক্‌খানির টাকা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ডিরেক্‌টার মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায় insure করা যাইতেছে না, ও সপ্তাহখানিকের মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিলে যথাসময়ে টাকা পাঠান হইবে। আরও দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ায় আবার তাগাদা করা যাইতে লাগিল। তখন উত্তর আসিল, ভুলবশতঃ টাকা পাঠান হয় নাই; আর সপ্তাহখানিকের মধ্যে নিশ্চয় পাঠান হইবে। ডিরেক্টারের অনুপস্থিতের জন্য পাঠান হয় নাই, ইহা যদিও বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু একটী ভুল সংশোধনের নিমিত্ত এক সপ্তাহ প্রয়োজন কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। চেক্ কিংবা পাশ বহি লইয়া টাকার জন্য ব্যাঙ্কে যাইয়া যদি জানা যায়, ডাক্তার বাবু কিংবা উকীল মহাশয়ের সময়ের অভাব বলিয়া নিজের সময়ের অভাব হওয়া নিষেধ, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের প্রতি কি প্রকার আস্থা জন্মিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ সমস্ত স্থলে depositor অপেক্ষা ঋণ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরই সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা।

এই প্রকার একটী ব্যাঙ্কের উকীল ডিরেক্‌টার মহাশয় স্থির করিলেন যে, যদি ব্যাঙ্কের অনিযুক্ত টাকা দ্বারা জমি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না; অথচ খাজনা স্বরূপ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইবে। কাজেই তিনি জমি ক্রয়ে মনোযোগ দিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল, অধিকাংশ খাজনা অনাদায়; অথচ জমিদারের খাজনা না দিলে জমি হাতছাড়া হইয়া যায়। কয়েকজন কৃষক সুবিধা বুঝিয়া টাকার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্য দিতে স্বীকার করিল। ফলে উকীল মহাশয়ের জমিজমা সম্বন্ধীয় আইনের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটায়, জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইল। ব্যাঙ্কের অর্থনিয়োগ বিশেষজ্ঞের কার্য্য; অথচ আমরা মনে করি, কৃতবিদ্য ব্যবহারাজীবী, চিকিৎসক, গৃহস্থ কিংবা যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই উত্তমরূপে ব্যাঙ্ক চালাইতে পারেন।

আজকালকার সময়ের উপযোগী করিয়া কাজ করিতে হইলে মহাজনকে তাহার পূর্ব্ব-প্রচলিত নীতির অনেক পরিত্যাগ করিতে হইবে; "লোম আফিসকে" অবৈতনিক বা সখের কার্য্যপ্রণালী ছাড়িয়া দিতে হইবে; বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিকে বিদেশীয় আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষা ও আদব কায়দার প্রচলনের সহিত গ্রাম্য সমাজের পূর্ব্বেকার ব্যবহার-নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদুখুড়ো হইয়াছেন যদু'বাবু'; রায়মহাশয় হইয়াছেন "মিষ্টার" রয়। ভক্তি এখন কুসংস্কার; পূজাপার্ব্বণ অতিথিসেবা প্রভৃতি Benthamএর Theory of Utilityর অন্তর্গত না হইলে মূর্খতা মাত্র। এরূপ স্থলে মহাজনের পূর্ব্ব প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সময়ের গতি অনুসারে তাঁহাকে কার্য্য পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ মহাজন জমা লইতে কুণ্ঠিত; কারণ, তাহাতে সুদ দিতে হয় ও লাভের অংশ হ্রাস হয়। এই অনিচ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে। জমা কেহ দিতে আসিলে সুদ স্বীকার করিয়া তাহা লইতে হইবে; ও এই স্বতন্ত্র জমা ও সমষ্টির হিসাব প্রকাশ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জমা উঠাইতে হইলে আমানতকারী পূর্ব্বের ন্যায় আড়তে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে না; কাজেই তাহার টাকা উঠাইবার কিংবা হস্তান্তর করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করিয়া দিতে হইবে। মহাজনকেও 'চেক্' ও পাশ বহির ব্যবহার আরম্ভ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহারা টাকা ধার করিতে আসে, তাহাদের সহিত ব্যবহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আজকাল ব্যয়ের ভাগটা বাড়িয়া উঠিতেছে। কারবারগুলির আয়তন ও কর্ম্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যিনি ২০০৲ টাকা গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় করিতেন, এখন তাঁহার ৪০০০৲ টাকার পাকাবাড়ী না হইলে চলে না। কাজেই মহাজনকেও বেশী টাকা বাহির করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারবারকারীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্য মহাজনী-প্রথা অনেকের মনঃপূত। যাহাতে এই লোকপ্রিয়তা রক্ষা পায়, তাহার জন্য মহাজনকেও বেশী টাকার নিয়োগ করিতে হইবে; এবং নিজে অক্ষম হইলে, কুটুম্বগণের মধ্য হইতে কিংবা বাহির হইতে কারবারে অংশীদার গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক আইনের ৪ ধারা অনুসারে ব্যাঙ্কের কারবার করিতে হইলে ১০ জন পর্য্যন্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া কারবার করিতে পারে। Limited

Company না হইলে তাহাদিগকে কোনও প্রকার সরকারী অনুমতি লইতে হইবে না ও কারবার সম্বন্ধীয় কোনও হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে না। অংশীদারগণ কারবারের দেনা-পাওনার জন্য দায়ী। যে-কোনও পাওনাদার তাহার প্রাপ্যের জন্য যে-কোনও অংশীদারকে দায়ী করিতে পারে—আর অংশীদার কেবলমাত্র কারবারে নিযুক্ত অংশমত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য নহে—তাহার অন্য সম্পত্তির উপরেও পাওনাদারের দাবী থাকিতে পারে—এই সাধারণ নিয়ম স্মরণ রাখিয়া অংশীদারগণ মহাজনী কারবার করিতে পারে।

ইংলণ্ডের নিয়ম অনুসারে ব্যাঙ্কের কাজে অংশীদাররূপে নিযুক্ত হইলে যত ব্যক্তিই থাকুক না কেন কারবার সম্বন্ধীয় কতকগুলি হিসাবপত্র গভর্ণমেণ্টকে দিতে বাধ্য। টাকা লওয়া ও দেওয়ার কাজ করিলেই সাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি হিসাবপত্র প্রকাশ করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় আইন অনুসারে যদি Limited Liability অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট দায়সংযুক্ত কারবার না হয় ও ১০ জনের বেশী অংশীদার না থাকে, তবে গভর্ণমেণ্টকে কোনও হিসাব দিতে হয় না। ব্যাঙ্কের কাজের সহিত অন্য ব্যবসা করাও আইন-বিরুদ্ধ নহে। গ্রামে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই প্রকার Private Bank স্থাপন করিয়া দেশের অর্থ নিয়োগে সাহায্য করিতে পারে। উপযুক্ত পরিচয় ও Unlimited liability বা অনির্দ্দিষ্ট দায়সংযুক্ত হওয়াতে স্থানীয় জমা পাওয়া কঠিন হইবে না। তবে আইন অনুসারে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক না হইলেও অংশীদারগণ একত্র হইয়া যদি Balance Sheet বা উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ করে তবে ভাল হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে ব্যবসায়ের এখনও এমন প্রসার হয় নাই যে, বড় বড় ব্যাঙ্ক কিংবা বড় ব্যাঙ্কের শাখা না হইলে চলিবে না। মহাজনী নিয়মে পরিচালিত Private Bank-গুলিই সেখানকার অভাব মিটাইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইলে, কিংবা অধিবাসীগণ নানাজাতীয় হইলে ছোট কারবারে কাজ চলিতে পারে না, বেশী মূলধনের প্রয়োজন হইবে। আমানতকারী ও সাহায্য-গ্রহণেচ্ছু লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায়, ও তাহাদের অভাব অভিযোগ এত বিভিন্ন হইয়া পড়ে, যে কারবারের গোপনভাব নষ্ট হইয়া যায়। কারবার চালাইতে হইলে মূলধন বেশী করিতে হইবে ও মূলধন বেশী করিতে হইলেই অন্য অংশীদার গ্রহণ করিতে হয়। এদিকে আইন অনুসারে ১০ জনের বেশী অংশীদার লইতে হইলেই "কোম্পানী" বলিয়া কারবার রেজেষ্টারী করিতে হইবে। তবে ১০ জনের বেশী হইলেও অংশীদারগণ আপন আপন অংশ অনুসারে দায় নির্দ্দিষ্ট রাখিতে পারে, ও ৫০ জনের বেশী অংশীদার না থাকিলে পুরাদস্তুর Public Bankগুলিকে যে সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেগুলি অগ্রাহ্য করিতেও পারে। এ প্রকার কোম্পানীকে Balance Sheet বা উদ্বৃত্তপত্র কোম্পানীসমূহের Registrarকে পাঠাইতে হয় না। হিসাব পরীক্ষা করাইবার জন্য কোনও বিশেষ শ্রেণীর সাধারণ হিসাব পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হয় না ও ডিরেক্টার নিযুক্ত করিতে হয় না। এ প্রকার কোম্পানী ব্যাঙ্কের কাজের ঠিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ইহারা না জলে না স্থলে—ইহা অপেক্ষা Public বা 'সেয়ার' বিশিষ্ট সাধারণ Public Company শ্রেষ্ঠ।

পুরাদস্তুর Public Company হইলে অংশ কিংবা অংশীদার সংখ্যার কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। আইনমত রেজেষ্টারী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক আইন এই প্রকার ব্যাঙ্কের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। তবে Bankএর পক্ষে কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে ফেব্রুয়ারী ও আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত "G Form" অনুসারে একটী হিসাব প্রকাশ করিতে হয়। এই ফরম্‌এ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কোনও স্থানে কোনও প্রকার দায়যুক্ত (Mortgage) করা হইয়াছে কি না (হইয়া থাকিলে কত টাকার জন্য), স্থায়ী ও অস্থায়ী জমা কত, অন্য কোনও দায় আছে কি না, কত টাকার কোম্পানীর কাগজ ও কত নগদ টাকা হাতে আছে ইত্যাদি সংবাদ প্রকাশ করিতে হয়। কেবলমাত্র প্রকাশ করিলেই হয় না—ঐ হিসাবটী ব্যাঙ্কের কোনও প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য কোম্পানীর বেলায় অংশীদার-গণের দশমাংশ একত্র হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর কার্য্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা করাইতে পারে; কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য্য পরীক্ষা করাইতে হইলে অন্যূন পঞ্চমাংশ অংশীদারগণ একত্র হইতে হইবে। যাহাতে হঠাৎ কোনও উত্তেজনা বা বিদ্বেষবশতঃ কেহ ব্যাঙ্কের কোনও বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারে, সেই জন্যই অন্যান্য সাধারণ কোম্পানীর সহিত এই প্রভেদ রাখা হইয়াছে।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রুষ-কবিদের কথা

আমরা যখন বলি যে আমরা রুষ-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত, তখন তার মানে—আমরা রুষ কথা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। আমরা রুষ-সাহিত্য গোগল হইতে আরম্ভ করি—ডষ্টয়েভ্স্কী, টলষ্টয়, টুর্গেনিভকে অতিক্রম করিয়া ম্যাক্‌সিম্ গর্কী ও আন্দ্রিভে আসিয়া পড়ি। অধুনা সোলোগভ্ প্রমুখ বোল্‌শেভিক আমলের লেখকদের সঙ্গেও পরিচিত হই। কিন্তু আমরা যে পথ দিয়া রুষ-সাহিত্যে প্রবেশ করি—তাহা একেবারে পুরামাত্রায় কথা-সাহিত্যের। প্রত্যেক রুষ কথা-সাহিত্যিকের অপূর্ব্ব জীবনী সবিস্ময়ে পাঠ করি—এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে রুষ-সাহিত্যের অপর কোনও দিক বুঝি নাই। কিন্তু রুষ-কবিতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে—এবং রুষ-কবিদের জীবনীও তাহার কথা-সাহিত্যিকদের জীবনী থেকে কম বিচিত্র নয়। তাঁহারাও তাঁহাদের কবিতা ও জীবন দিয়া রুষিয়ার স্বাধীনতার স্বরূপকে মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা রুষ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই ইংরাজী অনুবাদের মধ্য দিয়া। অবশ্য তাহাতে পরিচয়ের মধ্যে খানিকটা অন্তরাল আসে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা বহুজাতির সংমিশ্রণের ফলে হওয়ায়—এবং সমগ্র য়ুরোপীয় জাতি একই সভ্যতা ও ধর্ম্মের অধীন বলিয়া, এবং প্রত্যেক জাতির শিক্ষার সমতার নিমিত্ত পরিভাষারও একটা সমতা থাকার দরুণ কথা সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা হয়ত কোনও কোন লেখকের লেখার ভঙ্গীর সৌন্দর্য্যকে হারাই—কিন্তু তাঁহাদের লেখাকে মনে হয় পুরামাত্রায় পাই। এবং রুষ-সাহিত্যিকদের বিশেষ সৌভাগ্য যে তাঁহারা মনোমত অনুবাদক পাইয়াছিলেন। Constance Garnett বা Almyer Maud প্রভৃতিকে স্বয়ং টুর্গেনিভ ও টলষ্টয় প্রশংসা ও তাঁহাদের অনুবাদকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

রুষ কথা-সাহিত্যে'র যে রকম ব্যাপক ভাবে অনুবাদ হইয়াছে—তাহার তুলনায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—রুষ কবিতার অনুবাদই হয় নাই। অবশ্য এ কথা আমরা সবাই জানি যে, এক জাতির কবিতা কখনও অপর কোনও জাতির ভাষায় তাহার সৌন্দর্য্যের প্রভূত হানি না করিয়া—অনুবাদ করা যায় না। কবিতা জাতির অন্তরের পরিভাষা। দুঃখের বিষয় মানব-মনের ভাবের আন্তর্জাতিক কোনও অভিধান নাই—থাকিতেও পারে না। তাই নিতান্ত কুলবধূর মত কবিতা তাহার জাতির অন্তঃপুরেই চিরদিন কল্যাণে বাস করে—বাহিরের সূর্য্যালোকে তাহাকে একেবারে মানায় না। প্রত্যেক জাতির ভাষার এবং ছন্দের এমন একটা ভঙ্গী আছে—যাহা ঠিক অন্ত জাতির ভাষার ও ছন্দের ছাঁচে ঢালা যায় না। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা সংস্কৃত ভাষাকেই মানায়—কোমল বাঙ্গলা ভাষার স্কন্ধে তাহাকে চাপাইলে—সেও পড়িয়া মরিবে—যাহার ঘাড়ে চড়িয়াছে সে তো মরিবেই। কবিতা অনুবাদে এই ছন্দের প্রতিবন্ধক একটা বিশেষ বিপদের জিনিষ। সেইজন্য আজকাল গদ্যের গতির ও স্বেচ্ছাচারিতার সুবিধা লইয়া পদ্যকে গদ্য দ্বারা অনুবাদ করিবার একটা প্রথা প্রচলিত হইতেছে—এবং অনেক সময় তাহা বেশ উপযোগীও হইতেছে।

বহু রুষ কবিতা নানা বিলাতী ও আমেরিকা-পত্রিকায় ইদানীং এই ভাবে অনূদিত হইতেছে। তাহা ছাড়া দুই তিন খানি রুষ-কবিতার সংগ্রহ বাহির হইয়াছে। World-Classic Seriesএ রুষের বিখ্যাত জনগণের কবি Nekrasov-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি রুষিয়ার আদি-কবি—রুষিয়ার La Fontaine—Krylovএর বিখ্যাত শ্লেষাত্মক উপাখ্যান-কবিতার (Fables) ও সম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির হইয়াছে। Russian Songs and Lyrics—Mr.

John Pollenএর অনুবাদে রুষ-সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ ও পরিচয় আছে। The Soul of Russia—Miss. W. Stephenএর বই এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। পুস্কিন ও লারমনটভেরও খণ্ডভাবে অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু রুষ কবি ও তাঁহাদের কবিতার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাভাষী জগতের সত্যকারের একটা পরিচয়ের বন্ধন করিয়া দিয়াছেন—Madame Jarintzov. Madame Jarintzovএর অনুবাদ ও কবিদের পরিচয় সত্য সত্যই রুষ কবিতার অন্তঃপুরে মনকে লইয়া যায়। রুষ-কবিদের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর মধ্যে ও তাঁহাদের লেখার অনুবাদ দিয়া রুষ-কবিদের অপরিচয়ের গণ্ডী তিনি অনেকখানি দূর করিয়া দিয়াছেন। এখানে রুষ কবিদের কয়েকজনের বিষয় সামান্য আলোচনা করিব মাত্র।

ইভান ক্রিলভ—রুষিয়ার বিষ্ণুশর্ম্মা

সংস্কৃতভাষায় পশু পক্ষীর উপাখ্যান লইয়া হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র রচনা হইয়াছিল—প্রাচীন গ্রীসে কৃতদাস ঈশপও পশুপক্ষীর উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। ক্রিলভও রুষ-ভাষায় সেই উপাখ্যানের স্রষ্টা। হিতোপদেশের গ্রন্থকার অথবা ঈশপ মানুষের চরিত্র উন্নত করিবার জন্য পশু-পক্ষীর আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নীতি প্রচার করেন। কিন্তু ক্রিলভের উপাখ্যানের সঙ্গে রুষিয়ার জীবনের একটা সুদৃঢ় যোগ আছে, অথচ তাহার মধ্যে একটা বিশ্ব-জনীনতাও আছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী সুর-হয় ব্যঙ্গের—নয় তো নিদারুণ কশাঘাতের।

ক্রিলভ রুষিয়ায় অত্যন্ত সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছেন। টুর্গেনিভ, টলষ্টয় বা ডষ্টয়েভস্কী সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে কিন্তু ক্রিলভের প্রাপ্য গৌরব দ্বন্দ্বাতীত। রুষিয়ায় বলা হয় যে ক্রিলভই একমাত্র সাহিত্যিক যাহার বিরুদ্ধে রুষিয়ার কেহই নাই।

রুষিয়ায় তাঁহাকে Grandfather Krylov পিতামহ ক্রিলভ বলিয়া লোকে জানে। সত্যই আধুনিক রুষ-সাহিত্যের তিনি পিতামহ। রুষিয়ায় এমন কোনও শিক্ষিত লোক নাই, যিনি ক্রিলভের থেকে মুখস্থ না বলিতে পারেন। বোলশেভিসিমের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন তাঁহার কথায় ও বক্তৃতায় প্রায়ই ক্রিলভের উপাখ্যান থেকে উদাহরণ দিতেন।

ক্রিলভের উপাখ্যান রুষিয়ার প্রথম চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের ভাষায় সর্ব্বসাধারণের জন্ত লেখা হয়। ক্রিলভ পশু ও পক্ষীর আখ্যায়িকার অন্তরালে জাতির সমস্ত দোষ ত্রুটীর উপর বিষম কশাঘাত করিলেন। যে আত্ম-চেতনার দগ্ধ-বাণী পরে রুষ কথা-সাহিত্যিকগণ আপনাদের জীবনের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—এই বোধ হয় তাহার প্রথম সূত্রপাত।

বিখ্যাত ফরাসী উপাখ্যান-লেখক La Fontaineএর অনুবাদ করিতে করিতে রুষ ভাষায় উপাখ্যান লিখিবার বাসনা ক্রিলভের হয়। তাহাও আবার চল্লিশ বৎসর বয়সে। ক্রিলভের উপাখ্যান জগতের একুশটী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ক্রিলভ অত্যন্ত দরিদ্র সংসার থেকে আসেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। মা বহুকষ্টে ও বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পনেরো বছর বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ হয়; কিন্তু অর্থচিন্তার দরুণ রাজধানীতে আসিয়া সামান্য বেতনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। শহরে আসিয়া বই, লাইব্রেরী ও সমস্ত শিক্ষিত মহলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেই সময় তিনি সমস্ত অবসর লেখাপড়া ও পত্রিকাপরিচালন শিক্ষায় নিয়োগ করেন। বিশ বৎসর সাধনার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে ক্রিলভ তাঁহার উপাখ্যান প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জুকোভেস্কী, পুস্কিন প্রভৃতি রাশিয়ার পরিচিত, তদানীন্তন রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ক্রিলভকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং রাজার অনুগ্রহে তিনি Imperial Libraryর প্রধান-কর্ত্তা হইলেন।

ক্রিলভ নিজে বড় বিচিত্র ধরণের লোক ছিলেন। তিনি ভয়ানক কুড়ে ছিলেন। Imperial Libraryর উপরের একটা ঘরে থাকিতেন। ঘরময় কাগজ-পত্র বই ছড়ান—তাহারই ভিতর মেঝের পায়রার খাবার—ঘরে একরাশ পায়রা ও তাহাদের কৃত অনর্থ। ঘরের মধ্যে একখানি কোউচ—তাহার উপর থেকে বড় একটা নড়িতেন না। তাঁহার আর একটী বিশেষত্ব ছিল—তিনি ছিলেন ভয়ানক পেটুক। একবার এত বেশী খাইয়াছিলেন যে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে তিনি মরিয়া যাইবেন। এবং সত্য

সত্যই ছিয়াত্তর বছর বয়সে অতিরিক্ত আহারের জন্ম তিনি মরিয়া যান। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত খরচ স্বয়ং রাজা বহন করেন এবং রাজ্যের প্রধানতম রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার শব-বাহক হইয়াছিলেন। এখানে ক্রিলভের একটী ছোট্ট উপাখ্যান গদ্যে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"মেঘের নীচে একটা ঘুড়ি উড়ছিলো। ওপর থেকে নীচের দিকে চেয়ে ঘুড়ি দেখতে পেলে একটা প্রজাপতি গাছের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গর্ব্বভরে ঘুড়ি প্রজাপতিকে ডেকে বল্লে, "বিশ্বাস করো—তোমায় কোনও রকমে আমি দেখতে পাচ্ছি—সে না দেখারই মত। এত উঁচু থেকে কি নীচের জিনিষ দেখা যায়? আচ্ছা—সত্যি করে বল দেখি—আমার মত উঁচুতে উঠতে পারো না বলে—নিশ্চয়ই তুমি আমায় হিংসে করো।" প্রজাপতি বিস্মিত হয়ে বল্লে, "আমি—তোমায় হিংসে করবো—কেন? তোমাকে এক বিন্দুও হিংসে করি না। তোমাকে দেখে করুণা আসে। যত উর্দ্ধে তুমি উঠ—তোমার সর্ব্বাঙ্গ শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা—আর আমি যতটুকু উর্দ্ধে উঠি না কেন—অঙ্গে আমার কোনও বন্ধনের চিহ্ন নেই।"

জুকোভ্স্কী—প্রথম রোমান্টিক কবি

জুকোভ্স্কীর জীবন-বৃত্তান্তও একটু বিচিত্র। তবে রুষ-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহাকে সব চেয়ে সৌভাগ্যশালী বলা যাইতে পারে। তিনি এক রকম রুষ-রাজার সভা-কবি ছিলেন।

তাঁহার পিতা ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন জমিদার—কিন্তু তাঁহার মা ছিলেন একজন তুর্কী ক্রীতদাসী। অন্য দেশে—এমন কি য়ুরোপের অনেক দেশেও এই ব্যাপার ঘটিলে শিশুর ভাগ্য পথের সাধারণ ছেলেদের অপেক্ষা বিশেষ কিছুই ভালো হইত না। কিন্তু রুষ-সমাজের মধ্যে একটা মস্ত বড় আপোষের ভাব আছে—যাহার ফলে অনেক বড় বড় সামাজিক ব্যতিক্রমও সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সেই তুর্কী ক্রীতদাসীর পুত্র তাহার পিতা বুনিনের ঘরে আসিয়াই তাহার সৎ-মা কর্ত্তৃক লালিত-পালিত হইতে লাগিল। সৎ মার এগারটী সন্তান ছিল—তাহা সত্ত্বেও জুকোভস্কী রীতিমত আদরের সঙ্গে লালিত-পালিত হন। যৌবনে জুকোভস্কী বড়লোকের ছেলেদের কলেজ University Pension for Noblesএ ভর্ত্তি হন এবং সেখানে তাঁহার চরিত্রের রোমান্টিক দিক কলেজের সকলের প্রিয় হইয়া উঠে। কলেজে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে জুকোভস্কী উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি রুষিয়ার সম্রাট প্রথম নিকোলাসের পত্নীর সাহিত্য-শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। পরে তিনি যুবরাজদের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন এবং এক-রকম রাজপরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন।

জুকোভস্কীর জীবদ্দশাতেই রুষ-সাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্যোদয় হইতেছিল। তিনি ১৭৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫২ সালে দেহরক্ষা করেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশ রুষ-কথাসাহিত্যিকই জন্মগ্রহণ করেন।

জুকোভস্কী ছিলেন একজন রোমান্টিক কবি। আপনার জন্ম-কাহিনী জীবনের চারিদিকে একটা ম্লান ছায়াপাত করিয়াছিল। পরে জুকোভস্কী ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন। রুষ-সাহিত্যের বেদনার অশ্রুমতী অন্তর লক্ষ্মী জুকোভস্কীর কবিতায় প্রথম অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন। জুকোভস্কীই প্রথম বহু য়ুরোপীয় ও অন্যান্য দেশের কবির সহিত আপনার দেশের পরিচয় সংঘটন করাইয়া দেন। তিনি একজন ভাল অনুবাদক ছিলেন। তাঁহার রুষ ভাষায় Grayর Elegyর অনুবাদ বিখ্যাত। ইহা ছাড়া তিনি Byronএর The Prisoner of Chillon, Schiller বিখ্যাত কবিতা Maid o Orleans এবং তাঁহার অধিকাংশ ভালো কবিতার অনুবাদ করেন। তিনিই প্রথম রুষ ভাষায় নল ও দময়ন্তীর ও সোরাব-রোস্তামের উপাখ্যান অনুবাদ করেন। জুকোভস্কীর জীবদ্দশাতেই নেপোলিয়ান মস্কোতে প্রবেশ করেন। এবং সেই সময় তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "Bard in the Camp of Russian Warriors" "রুষ সৈনিকদের মাঝে তাদের কবি" রচনা করেন।

"This brimful goblet Love, to thee !
Amid the fighting gory,
Throb, comrades with a sacred glee :
Love is at one with glory."

"এই পরিপূর্ণ পাত্র, হে প্রেম, তোমাকে দিলাম। এই রক্ত-আহবের মাঝে, জাগো বন্ধু, পুণ্য আনন্দে! প্রেম যে পরমাত্মীয় জয়ের।"

ভগ্ন-আশা সৈনিক দেখিতেছে,—

She on the standard flutters high,
She is close to us in battle.

"অন্তরের সে নারী তারই তো কাঁপন ঐ কম্পিত পতাকায়—কে বলে সে দূরে? এই রক্ত মদ-মত্ততায় সে-ই তো নিকটে।"

পুস্কিন—রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি

পুস্কিন রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রুষিয়ার বড় আদরের কবি; কারণ, রুষিয়ার অন্তর—তাহার দেহ—তাহার প্রতিদিনের সুখ ও দুঃখের সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার কবিতায় রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। মুক্ত-বিহঙ্গমের মত পুস্কিন জীবনের আকাশে মুক্ত-পক্ষ হইয়া বেড়াইয়াছেন। জীবনের সমস্ত আবর্ত্ত ও সৌন্দর্য্যকে তিনি একান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করেন—তাঁহার কাব্যেও এই মুক্ত-বিহঙ্গমের সহজ স্বচ্ছন্দতা বিরাজ করিতেছে। রুষিয়ার মাটীর ভাষায়-রুষিয়ার কবি তাহার প্রতিদিনের প্রবাহিত জীবনের মধ্যে সুরের অমর রেশ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্যের বিষয়ও বিচিত্র। কথনও অতীত গৌরবের কাহিনীর মধ্যে—কথনও পাশের বাড়ীর সামান্য দরিদ্র দাসী বালিকার জীবনের মধ্যে—পুস্কিনের লেখনী অনায়াসে সমান প্রভায় যাতায়াত করিয়াছে। পুস্কিন জাতির দুরবস্থায় জাতির অমর জাগরণ-গীতি Ode to Libertyও লিখিয়া গিয়াছেন—আবার সন্ধ্যার আলোয় সাথীদের সঙ্গে জীবনের যে বন্ধন-হীনতার সুর বাজিয়া উঠে—তাহাকেও রূপ দিয়া গিয়াছেন। তিনি একদিকে লিখিয়াছেন,—

"Hark to the Truth, Ye Tsars and kings!
Neither rewards, nor persecutions,
Nor prison's gloom, nor altar's wings
Can shield you, safe from revolutions.—
(Ode to Liberty)

"নির্ম্মম সত্য আজ শোনো—হে জার পুরস্কার নয়—নির্য্যাতন নয়—কারাগারের মৃত্যু-অন্ধকার নয়—ধর্ম্মের আবরণও নয়—বিপ্লবের হাত থেকে আজ তোমাদের রক্ষা করতে এরা কেউই সমর্থ নয়।"

রুষিয়ার অন্তরের এই এক দিক। আর একটা দিক হাসির মত তরল—রুষ-জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা—কথনও রসাল—কথনও কদর্য্য। এই দিক দিয়া পুস্কিনের বিখ্যাত কবিতা—তাঁহার Tenth Commandment. ভগবানকে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন, দশটী অনুজ্ঞা সবই পালন করিতে রাজী আছি—প্রতিবেশীকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতেও পারি—কিন্তু,

"But if his youth-fullest maid-servant
Is pretty—Lord! There I am weak."

এ দুর্ব্বলতা কবির নয়—সমগ্র রুষ-জাতির। রুষিয়ার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বলতার সহিত পুস্কিনের কবিতা একাত্মীয়। তাই পুস্কিন রুষিয়ার বড় আদরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

পুস্কিনের জীবনও বড় বিচিত্র। প্রভাতের অরুণ-আলোর মত সে স্বচ্ছ, পাখীর গতির মত সে মুক্ত, মুক্ত ধারা ঝর্ণার মত সে অপ্রতিহত।

পুস্কিন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাহার উপর তিনি যে সংসারে আসেন, তদানীন্তন অভিজাত-রুষিয়ার সমস্ত দোষ তাহাতে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। রুষিয়ার অন্তর্ভুক্ত বটে—পুস্কিনের পিতা খাঁটী রুষও ছিলেন বটে—কিন্তু তাহা ছাড়া বাড়ীর মধ্যে রুষিয়ার আর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন ফরাসী সভ্যতা, ফরাসী সাহিত্য রুষিয়ার রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া সমস্ত অভিজাত মহলে তাহার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পুস্কিনের পিতা ও কাকা এই ফরাসী আব-হাওয়ায় একেবারে আপনাদের নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। রুষ ভাষা বলা হইতই না—ফরাসী সাহিত্য ও ভাষা ছাড়া সেখানে কিছুই চলিত না; এবং পুস্কিনের পিতা এবং কাকার মনোভাব ও চরিত্র এই আব্-হাওয়ার মধ্যে একেবারে তরল ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। এই ফরাসী আওতার মধ্যে আসিয়া বালক পুস্কিন বারো বছর বয়সেই ফুটিয়া উঠিল—একেবারে শতদলে। বারো বছর বয়সে বালক রুষো, ভলটেয়ার, মোলেয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হয়! এবং সেই সময়ই এই অসীম দুঃসাহসী বালক মোলেয়ারের অনুকরণ করিয়া ফরাসী ভাষায় নাটক লেখে এবং তাহার ভাই বোনদের লইয়া তাহার অভিনয় করে!

দু'বেলা বালকের চোখের সম্মুখে স্যাম্পেন-প্রদেশের আঙুর-ক্ষেতের রসের বিচিত্র রঙ খেলিত—ফরাসী মাদকতায়

নিত্য তাহাদের বাড়ীটা টলিত এবং যত রাজ্যের আর্টিষ্ট, সাহিত্যিক ও কবির অহরহ সেখানে মজলিস চলিত। বালকের চরিত্রও স্যামপেনের রঙের ছায়ায় গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেশে নূতন কবি বা সাহিত্যিক আসিলেই এই মজলিসে টানিয়া আনা হইত। বাহিরে তখন ছিন্নবাসে মুক্ত-দিগম্বরে তুষার-ঝঞ্চার মধ্যে একাকী বসিয়া জাতির অন্তর-লক্ষ্মী মৃত্যু স্বপ্ন দেখিতেছিল—আর রুষিয়ার অন্তরে বসিয়া তখন এই সমস্ত ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফরাসীর দ্রাক্ষাকুঞ্জে পথ হারাইয়া মধু-লোভী মৌমাছির মত অলস রৌদ্র-করে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পুস্কিনের কাকা তো Beranger (বিরেঞ্জার বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক) হাতে করিয়াই মারা গেলেন। এধারে পুস্কিনের বাবা ছেলেটীর দিকে বিশেষ কোনই নজর দিতেন না। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল ছেলের চরিত্রকে সংযত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আবাল্য যাহার নাকে অহরহ শুধু স্যামপেনের গন্ধই গেল—তাহাকে অবশেষে Jesuit Collegeএ ভর্ত্তি করিয়া দিবার মনস্থ করিলেন! পুস্কিনের সৌভাগ্য যে সে মনস্থ আর মন থেকে বাহির হইল না। তখন রুষিয়ায় নানা স্থানে বড়লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্য Lyceum খোলা হইতেছিল। পুস্কিন বারো বছর হইতে সতেরো বছর পর্য্যন্ত Tsarskoyeselor Lyceumএ অধ্যয়ন করেন অথবা জীবনকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেন।

এখানে পুস্কিনের জীবনের একটা মধুর অধ্যায়ের কথা বলা প্রয়োজন। ছেলেবেলা হইতেই তো ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার মাতৃ-ভাষা শিখেন তাঁহার ঠাকুমার কাছে এবং তাঁহার ধাত্রী (Arina Rodionovna) এরিনা রোডিও-নোভনার নিকট। এই ধাত্রী পুস্কিনের জীবনে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্কিন পরে এই ধাত্রী-জননীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"my first muse that rocked my cradle" শৈশবের দোলনায় প্রথম এই কাব্যলক্ষ্মীর দীক্ষা পাই। সেই বিলাসের ও বিজাতীয়তার উপকূলে এই ধাত্রীর মাতৃ-হৃদয় ছিল পুস্কিনের আশ্রয়-নীড়। সন্ধ্যায় সেই বৃদ্ধা অতীত রুষিয়ার গৌরবের সমস্ত কাহিনী—তাহার নানা উপকথা—বালকটীর কাণে ঢালিয়া দিত। ভোলটেয়ার, রুষোর পাশে এই ধাত্রীই পুস্কিনের মনে রুষিয়ার আসন করিয়াদিল। পুস্কিন আজীবন এই মধুর সম্বন্ধকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যখন রুষিয়ায় কৃতদাস-প্রথা উঠিয়া গেল, তখনও এই ধাত্রী পুস্কিনকে ছাড়িয়া যায় নাই—আমরণ পুস্কিনের সঙ্গেই ছিল।

এখন Lyceumএর কথা। এইখানকার জীবন একে-বারে গ্রীক-কাহিনীর Land of the Lotus-Eater—পদ্ম-ভুকের স্বপ্নরাজ্যের জীবনের মত বহিয়া চলিল। এই কলেজে মোটে ত্রিশটী ছেলে পড়িত। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পরিচালক মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া এই ত্রিশটী বড়লোকের ছেলেদের চালাইবার মত শক্ত লোক আর সেখানে মিলিল না। ছেলেদেরও সুবিধা হইল। পুস্কিন বাল্যকালে নীরবে যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন—এখানে তাহা পূরা মাত্রায় পালন করিতে লাগিলেন। বাধাবন্ধহারা ভাবে নিত্য উৎসব চলিয়াছে। মদ্য, প্রেমাভিযান, কাব্য-চর্চ্চা—এই তিনটী সোণার চাকায় জীবনের রথ নিরঙ্কুশভাবে ছুটিয়া চলিল। পুস্কিন দলের Anacreon হইয়া উঠিলেন। প্রত্যহ মদ্যের উপর নূতন নূতন কবিতা! এই সময় এই উৎসব রসের বাসরের মধ্যে পুস্কিনের কাব্য-প্রতিভাও নব-বধূর মত জাগিয়া উঠিতেছিল। এই সময় জুকোভস্কীর উপর তিনি একটী কবিতা লিখেন। তাহাতে তাঁহার কবি-যশ-আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে—বোঝা যায়। জুকোভস্কীর কবিতা সম্বন্ধে বলিতে-ছেন, "When harking to them, youth will sigh for greatness" "সেই সমস্ত কবিতা শুনিতে শুনিতে, যৌবন বিকাশের সু-উচ্চ আশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।" সে যৌবনের দীর্ঘশ্বাস তখন মদ্যের ফেনার অন্তরালে পুস্কিনের হৃদয় মথিত করিতেছিল।

সেই সময় Lyceumএর বাৎসরিক উৎসবে তদানীন্তন রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ও সুবিখ্যাত কবি D'erjavin সভাপতিরূপে অবস্থিত ছিলেন। একে একে Lyceumএর সমস্ত ছাত্র সেই উৎসব উপলক্ষে স্বকৃত রচনা পড়িয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ সভাপতি তখন ঝিমাইতেছিলেন। সহসা বৃদ্ধ চোখ খুলিয়া জাগিয়া উঠিলেন—বৃদ্ধের বিস্মিত নয়নের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন অচিরেই বুঝি মাথার উপর আকাশ

ভাজিয়া পড়িবে। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পাঠ-নিরত তরুণ কবি পুস্কিনকে আলিঙ্গন করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে পুস্কিনের নাম রাজ-পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া রুষিয়ার সমস্ত শিক্ষিত মহলে ছড়াইয়া পড়িল। জুকোভস্কী স্বয়ং ডাকিয়া এই তরুণ কবির সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন। জুকোভস্কী পুস্কিনের এত অনুগত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সমস্ত কবিতা প্রথম পুস্কিনকে শোনাইতেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া তবে মুদ্রিত করিতেন। জীবনের শেষে জুকোভস্কী আপনার একখানি ফটো পুস্কিনকে দেন—তলায় লিখিয়া দেন—"To the victorious pupil from his conquered teacher." "পরাজিত শিক্ষকের উপহার বিজয়ী ছাত্রের নিকট।" রুষিয়ার তখন এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান! কিন্তু পুস্কিন প্রশংসায় বিচলিত হইতেন না; এবং আপনার কাব্য-প্রতিভার প্রতি নিশিদিন সজাগও হইয়া থাকিতেন না। পুস্কিনই রুষ কথা-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক (Gogol) গোগলকে আবিষ্কার করেন এবং গোগল তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত বই—Dead Souls এবং Inspector-General-এর বিষয় পুস্কিনের নিকট হইতে পান। গোগলের লেখা পড়িয়া পুস্কিন বলিয়াছিলেন, "That rascal robs me in such a bewitching way that it is impossible to be angry with him." ইহার সরলার্থ হইতেছে যে পুস্কিনের দেওয়া বিষয় গোগল এত সুন্দরভাবে আত্মস্থ করিতেন যে তাহাতে পুস্কিনের দাবী বড় একটা থাকিতে পারিত না।

সতেরো বছর বয়সে Lyceumএর পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি রুষিয়ার Foreign officeএ Civil Serviceএ যোগদান করেন। এখানে আসিয়া পুস্কিন সমাজের অভিজাত-দিগের সহিত মিশিবার সুবিধা পাইলেন; এবং দুই বৎসর ধরিয়া অনবরত প্রতিদিন জীবনের নিদারুণ মত্ততার উৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু এই মত্ততার মধ্যে বিশ বৎসর বয়সে পুস্কিন তাঁহার প্রথম কাব্য .Ruslan and Ludmila প্রকাশ করেন।

সমস্ত রুষিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে এই কাব্যের কবির দিকে ফিরিয়া চাহিল। কাব্যকে রোমান্টিক আতিশয্যের আকাশ হইতে পুস্কিন প্রতি মানুষের ঘরের দরজায় আনিলেন। এতকাল রুষিয়ার কাব্য আকাশ-কুসুমের মত প্রতিদিনের পৃথিবী হইতে দূরে ফুটিয়া থাকিত; আজ সহসা সে শীত-প্রভাতের তুষার-কণার মত ঘরের চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। অতি সহজ তাহার রূপ—পরিচয় তাহার অনাবশ্যক। সে আকাশের তারা নয়—সে পৃথিবীর ফুল। জীবনের সঙ্গে যে নিবিড়, সহজ ও একান্ত আত্মীয়তার সুর পরে রুষ-কথাসাহিত্যিকগণ য়ুরোপীয় সাহিত্যে দান করিয়া যান—এবং তাহাকে সমালোচকগণ Naturalism অথবা Realism বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—তাহা পুস্কিনের সঙ্গে আসে। পাশের মানুষের কথা, তার প্রতিদিনের তুচ্ছতম হাসিকান্না, তার দীনতম আকাঙ্ক্ষা, তার রাত্রি, তার দিনের কথা পুস্কিন তারই সুরে গাহিলেন।

যেদিন পুস্কিন কাব্যের এই তথাকথিত আভিজাত্য-লোক হইতে জীবনের সাধারণ পথের ধূলার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিন রুষিয়ায় এক দিকে তীব্র আন্দোলন চলিয়াছিল—এই সাহিত্যিক অনাচারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সৃষ্টি সমালোচনার চেয়ে বড়। তাই পুস্কিনের প্রতিভার জ্বলন্ত শিখায় চারিদিকে সমালোচকদের তীব্র উক্তি সেদিন পতঙ্গের মত পুড়িয়া গেল।

এই সময় সমাজের চারি দিকে জারের বিরুদ্ধে গোপন বিদ্রোহের দল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এই সময় রুষিয়ায় বিখ্যাত Decembrist বিদ্রোহী দলের গঠন হয়। পুস্কিন একেবারে আভিজাত্যের বিলাস-ব্যসন হইতে পুরামাত্রায় এই Decembrist দলে যোগদান করেন; এবং এই সময় তাঁহার বিখ্যাত বিদ্রোহাত্মক কবিতা Ode to Liberty লিখেন।

"Looking around I ever face
Whips upon whips and fetters groaning,
Law's peril in a world's disgrace
And helpless slaves for ever moaning."

"যে দিকে মুখ ফেরাই সেদিকেই দেখি আঘাতের পর আঘাত চলেছে; যেদিকে কাণ পাতি সেদিকেই শুনি শৃঙ্খলের ক্রন্দনধ্বনি। বিচার আজ অন্ধভাবে নির্লজ্জতায় আত্মগোপন করেছে; আর অসহায় দাসেরা অনন্ত কাল ধরে শুধুই বিলাপ করে চলেছে।"

এই সমস্ত কবিতা দেখিয়া জার প্রথম আলেকজান্দার হুকুম জারী করিলেন—পুস্কিনকে সাইবেরিয়ায় পাঠানর একান্ত

প্রয়োজন। কি যা তা কবিতা লিখিয়া রুষদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—আর সেই সব কবিতা যুবকদের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কিন্তু অনেকের অনুরোধে অবশেষে সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত না করিয়া সুদূর Bessarabia প্রদেশে এক রাজ-কার্য্যের ভার দিয়া তাঁহাকে সেখানে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখা হইল। এই নির্ব্বাসনের অবসরে কাব্য-লক্ষ্মী পুস্কিনের অন্তরকে নানা কবিতায় পুষ্পিত করিয়া তোলেন। এখানে আসিয়া পুস্কিন বাইরণের কবিতার মোহে পড়িলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার উদ্দামতা আবার জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে তাঁহাকে সেখান হইতে Odessar বন্দরে পাঠান হয়। Odessar অভ্যন্তরে তখন পঙ্গপালের অত্যাচারের দরুণ শস্যহানি হওয়ায় চারিদিকে প্লেগ দেখা দিয়াছিল। পুস্কিনকে তাহার একটা বিবরণ সংগ্রহের জন্য পাঠান হয়। যথাকালে পুস্কিন ফিরিয়া আসিয়া বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন।

Count Vorontzov—যাঁহার উপর এই তদন্তের ভার ছিল—তিনি বিবরণ পড়িয়া স্তম্ভিত। বিবরণটীর পরিপূর্ণ রূপ নীচে দেওয়া হইল,—

"The locust was flitting and flitting
And sitting
And sitting sat, ravage committing,
At last the place quitting."

"দেখি পঙ্গপালেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর বসিতেছে,—বসিয়া বসিয়া মহা শস্য-হানি করিতেছে এবং তাহার পর—সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।" এই বিচিত্র তথ্যপূর্ণ বিবরণ তখনই রাজধানীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সময় আর একটী ঘটনা ঘটে। পুস্কিন তাঁহার এক বন্ধুকে এক চিঠি লেখেন, "বাইবেল পড়িতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু তাহার চেয়ে সেক্‌স্‌পীয়ার ও গ্যেটে ঢের ভাল লাগে। এখানে একজন ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। সে একজন পাকা নাস্তিক। সে আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়াছে।"

এই চিঠি বন্ধুর নিকটে না গিয়া—মাঝপথ হইতে গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়া পড়িল। তখনই গভর্ণমেণ্ট ওডেসা হইতে পুস্কিনকে সরাইয়া দূর Pskov প্রদেশে তাঁহার পিতার জমিদারীতে নির্ব্বাসিত করে। পুস্কিনের পিতা তখন সেইখানে বাস করিতেছিলেন। ছেলের ব্যবহার দেখিয়া তিনি এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে পুস্কিনের জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিলেন। অবশেষে পিতাই সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। এই সময় পুস্কিন তাঁহার বহু বিখ্যাত কবিতা ও কাব্য রচনা করেন এবং একান্তভাবে রুষিয়ার অন্তরের মধ্যে ডুবিয়া যান। তাহার ফলে রুষ প্রকৃতির আসল রূপ—তাহার তুহিন-ভরা তেপান্তরের মাঠ—তাহার শ্বেত-মূর্ত্তি শীতের আবির্ভাব তাহার তুহিন-ঝঞ্ঝা—তাহার নিশীথ নিস্তব্ধতা—তাঁহার কবিতায় মূর্ত্তি ধরিয়া উঠে। এই সময় তিনি তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "Autumn" ও "The Devils" এবং কাব্য Evgini On' egnin রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলার বর্ষার কবি—শেলী যেমন পশ্চিমা বাতাসের কবি—পুস্কিন সেই রকম রুষিয়ার শ্বেতরূপ শীতের সভাকবি। "Autumn" কবিতায় পুস্কিন প্রকৃতির অন্তরের সঙ্গে যে অপূর্ব্ব সহজ পরিচয়ের ও বন্ধনের রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। রুষিয়ার যে তুহিনের রূপ আমরা দূর হইতে শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি—পুস্কিন অপরূপ দৃষ্টি লইয়া তাহারই মধ্যে আনন্দের অমৃত-উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছেন। রুষিয়ার সেই মৃত্যু-ভরা প্রকৃতির মধ্যে রুষিয়ার কবি আনন্দের কি অমৃত স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন! পুস্কিন তাই বলিতেছেন—"বসন্ত আমি চাই না—এই শ্বেত রূপ—এই তো আমার বাঞ্ছিত।"

"হে মৃত্যুরূপা—আমি তোমার অনন্ত-প্রেমিক—তোমার বিষণ্ণ দৃষ্টির আলোয় আমার কল্পনার শতদল বিকশিত হইয়া উঠে এক কোমল আনন্দে।" * * *

"হে প্রিয়া, আমি আজ নত হইয়া এই তোমায় অভিবাদন করি। তুমিও আজ নতমুখী কুমারীর মত আমাকে অভিবাদন করিতেছ।

"হে বন্ধু, তোমার কপালে যে মৃত্যু-লেখা। এখনই হয়ত তোমার জীবনের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া আসিবে। কিন্তু কি নিঃসঙ্কোচ তোমার অধরের শুভ্র হাসিটী! হায় অভাগিনী, তুমি তো জানো না কপালে তোমার কি লেখা!

* * * "তার পাণ্ডুর অধরে মৃত্যু-ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠে। আজ দিনের আলোয় সে জীবিতা—কাল রাত্রের অন্ধকারে সে মৃত শাখীর সহযাত্রী।" * * *

"সে যেন জীবনের সুন্দরতম বিদায় !" * * * *

পুস্কিনের আপন ভাষায় বলিতে হয়, "There Russia breathes ··of Rus'tis smelling." পুস্কিনের কবিতার ইহাই সব চেয়ে বড় পরিচয়।

পুস্কিন জীবনকে ভালবাসিতেন এবং পূরামাত্রায় জীবন সেই ভালবাসার দাম আদায় করিয়া লয়। ইহা তাঁহার জীবনের সহসা নির্ব্বাণের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

নির্ব্বাসনের নিঃসঙ্গতায় ক্লান্ত হইয়া পুস্কিন জারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবং জার তাঁহাকে রাজধানীতে আনিয়া রাখেন।

এই সময় পুস্কিন বিবাহ করেন এবং এই বিবাহই—তাঁহার পক্ষে কাল হয়। পুস্কিনের স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা রূপসী। তাঁহাকে রুষ-অভিজাত সমাজের অধিকাংশই পরিক্রমণ করিয়া ফিরিত। তাহাদের মধ্যে Baron Dantes নামক এক ব্যক্তি খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়। তাহাতে পুস্কিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং তাহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন। রুষিয়ার দুর্ভাগ্য এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নিদারুণ ভাবে আহত হইয়া পুস্কিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুরন্ত ঝর্ণাধারা সহসা মরুপথে অদৃশ্য হইয়া গেল!

মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত জানিয়া মুক্ত জীবনের উপাসক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"জীবন—বিদায়—কি যাতনা।" জীবনের স্বর্গ হইতে এই আকস্মিক বিরহ।

লারমনটভ্—জীবনাতীতের কবি

বিখ্যাত রুষ সাহিত্যিক Merejkovski লারমনটভ্কে Poet of Superhumanity—জীবনাতীতের কবি এই আখ্যা দিয়াছেন। পুস্কিন যেমন ছিলেন এই জীবনের কবি—প্রকৃতির বা চিন্তারাজ্যের সমস্ত কিছু তাঁহার নিকট সুন্দর লাগিত এই জীবনের সঙ্গে যখন তাহাদের আত্মীয়তা স্থাপিত হইত। কিন্তু লারমন্টভ্ যেন এই পৃথিবীর সূর্য্যালোকে প্রবাসী। প্রবাসী হইলেও সে এই পৃথিবীকেই ভালবাসিয়া চিরবাসস্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনের নিশীথ লগনে লগনে উপরের তারার দিকে চাহিয়া সহসা তাহার মনে অনন্তের অতীত মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। পৃথিবীর সমুদ্র-তীরের সৈকতে যত প্রভাত-সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে—আকাশে যত তারা কাঁপিয়া গিয়াছে—সকলই বোঝার মত মনকে পাইয়া বসে। এই অনন্তের বিরহ লারমনটভের কবিতার মূলে রহিয়াছে। এই অনন্ত অপরিমিত কালের ছায়া তাঁহার কাব্যে এতখানি রেখাপাত করিয়াছে যে Merejkovski বলিয়াছেন, "He remembered the future of Eternity"—লারমনটভ অনন্তের ভবিষ্যৎ জীবনও জানিতেন। লারমনটভের জীবনও পুস্কিনের মতই অকালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। লারমনটভের জীবনের আয়ু অত্যন্ত পরিমিত। তিনি ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন—১৮৪১ সালে অকাল মৃত্যুতে পতিত হন। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ।

বাল্যে লারমনটভ্ রীতিমত শিক্ষা-লাভ করেন। কৈশোরেই তিনি বহু য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি তখনই জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার সহিত সম্যক্ পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার পনেরো বছর বয়সে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি তাঁহার ঠাকুরমার সঙ্গে ককেসাস্ পাহাড়ে যান। এই অবাধ নিবিড় সৌন্দর্য্যের মধ্যে আসিয়া বালকের কাব্য-প্রতিভা জাগিয়া উঠিল। ককেসাসের নিবিড় গভীর সৌন্দর্য্য লারমনটভ্কে আজীবন আচ্ছন্ন করিয়া থাকে এবং তাঁহার নানা কবিতায় বারে বারে এই পাহাড় মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য "The Demon" এই পাহাড়ের পাদমূলেই আরম্ভ হয়।

লারমনটভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। এই সময়ই তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "The Demon" প্রকাশিত হয় এবং শিক্ষিত রুষিয়া এই সৈনিকটীকে নিঃসংশয়ে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

১৮৩৭ সালে পুস্কিনের তিরোভাব ঘটে। তখন লারমনটভের যশ শুধু রুষিয়ার শিক্ষিত মহলেই আবদ্ধ। পুস্কিনের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া এবং রাজপুরুষদের অনাচারে ও উদাসীনতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই লারমনটভ পুস্কিনকে উদ্দেশ্য করিয়া এক কবিতা লিখেন। পুস্কিনকে সম্মুখে রাখিয়া সে কবিতা তীব্র ভাবে আঘাত করিল, "those standing, a greedy crowd, round the throne, the hangman of Freedom, Genius and Fame" "ঐ লোলুপ মানুষের দলকে—যারা ভিড় করিয়া সিংহাসনের

চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে—ঐ স্বাধীনতা, প্রতিভা আর যশের ঘাতকদের দল।”

এই কবিতা ছাপা হয় নাই। পুস্কিনের শবানুগমনকারী বিরাট জনতা এই কবিতা সকলেই হাতে হাতে লিখিয়া লইয়াছিল। এই কবিতার জন্য তৎক্ষণাৎ লারমন্টভকে বন্দী করা হয় এবং বিচারে তাঁহাকে ককেসাস পাহাড়ের অন্তরতম দেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই দণ্ড লারমন্টভের নিকট পুরস্কারের মত হইল। তাঁহার সমস্ত মন ককেসাস্ পাহাড়ের নিবিড় ঘন সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। এখানে এই কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যের মুক্ত ধারায় নিত্য অবগাহন করিয়া লারমন্টভের কাব্য-প্রতিভা দীপ্ত তেজে ও সরসতায় জাগিয়া উঠিল।

লারমন্টভ্ নির্ব্বাসন হইতে রাজধানীতে কবিতা পাঠাইতে লাগিলেন। এধারে তাঁহার ঠাকুরমার নানা আবেদনে লারমন্টভ্ নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু ১৮৪০ সালে আবার লারমন্টভের নির্ব্বাসন হয়। এক রাজকর্ম্মচারীর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তিনি তাঁহাকে আহত করেন। এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসনকালে এক অত্যাচারী অফিসারের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই ঝগড়া বাধিত। একদিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তিনি অফিসার কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লারমন্টভের demon (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি) মিলটনের Satan বা Goetheর Mephisto হইতে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। যদিও ইহারা তিন জনেই একই ব্যক্তি কিন্তু তিনটী জাতির তিনটী শ্রেষ্ঠ কবির নিকট বিশ্ব-সাহিত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়কটী বিভিন্নরূপে দেখা দিয়াছেন। Satanএর সে শক্তি ও তেজ লারমন্টভের Demonএর নাই, Mephistoরও সেই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাসনাও নাই। লারমেন্টভের Demon সুন্দর। কবির কথায়—‘He was like lucid summer twilight Nor day, nor night; not sun, nor gloom!”

“সে যেন গ্রীষ্ম-শেষের রক্ত-গোধূলি। দিনও নয়-রাতও নয়। সূর্য্যও নয়—রাত্রের অন্ধকারও নয়।” লারমন্টভের Demon স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত হইয়া পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

এবং বিস্মিত Demon যেদিন তাহার স্বর্গের অশ্রুহীন চোখে জল দেখিল—চমকিয়া উঠিয়া উপরের দিকে চাহিল। Miltonএর Satan বিদ্রোহের বদ্ধ-মুষ্টি লইয়া উপরের দিকে চাহিয়াছিল—লারমন্টভের Demon যখন উপরের দিকে চাহিল তখন তাহার স্বর্গের অশ্রুহীন চোখ মাটীর রসে আর্দ্র হইয়া মৃন্ময়ীর অঙ্গে অশ্রুশিশির বর্ষণ করিতেছে। এই প্রেমে সে মুক্তি পাইল। লারমন্টভ এক মাটীর মেয়ের মধ্যে পৃথিবীর এই প্রেম-বন্ধনকে মূর্ত্তি দিয়াছেন।

স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া Demon এই মাটীর পৃথিবীতে আসিল। যুগের পর যুগ চলিয়া যায়। তাহার চারিদিকে শুধু অনন্ত অতীত। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দেখে—

“The caravan of wandering planets
Thrown into vastness”

অনন্ত অগাধ শূন্যের পথে যাযাবর গ্রহের যাত্রীদল চলেছে। একদিন সে ছিল তাহাদেরই সহযাত্রী।...

* * *

ককেসাস পাহাড়ের তলায় Gruzia প্রদেশে অতীত কীর্ত্তিবাহিনী এক বিরাট প্রাসাদে থাকে সুন্দরী Tamora (তামারা)। তামারা পৃথিবীর সুন্দরী কন্যা। মাটীর মায়া তাহার চোখের কাজল। তামারার প্রিয়তম থাকে দূরদেশে।.... ক্রমে তাহাদের বিবাহের লগ্ন আসিল। তামারার প্রিয়তম দূত পাঠাইয়া জানাইল বিবাহের জন্য সে আসিতেছে।...

প্রবাসী Demon তামারাকে দেখিল—বিবাহের রঙে রঙীন্ হইয়া ঝর্ণার ধারে সখীদের সঙ্গে নাচিতেছে। কাল তাহার প্রিয়তম আসিবে। Demonএর শূন্য মন ভরিয়া উঠিল। তামারার চোখের কাজল Demonএর মনকে বর্ষার মেঘের মত ছাইয়া ফেলিল। স্বর্গের কথা মনে পড়িতে লাগিল। বেদনায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। এ বেদনা সে আগে কোন দিনও জানিত না।......

ককেসাস্ পাহাড়ের মাথায় সূর্য্যোদয়! বরযাত্রীদের আগমনধ্বনি পাহাড়ে বাজিয়া উঠিল। বর আগত।...

সহসা বর দূরে অসহায় কাতর সাহায্যপ্রার্থনা শুনিতে পাইল। মৃত্যুর আবেদন! ঘোড়ায় চড়িয়া বর ব্যাপার কি দেখিতে গেল! ককেসাস্ পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্য নামিয়া গেল!

"Her prince had kept his word, though slain,
And to his bridal feast has come"

"তাহার প্রিয়তম প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল। মরণ আসিল তাহাতে কি? বিবাহের সভার দ্বারে তো সে আসিয়াছিল!"

বিবাহের আসর ভাঙ্গিয়া গেল। তামারার হাতে আধ-গাঁথা মালা তেমনিই রহিয়া গেল। অশ্রুতে তামারা অন্ধ হইয়া আসিল। এমন সময় তামারা শুনিল যেন স্বপ্নে কে কথা কহিতেছে। কে যেন স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া বলিতেছে,—

"In the boundless azure ocean,
Without rudder, without sails,
Gently float in stately motion
Choirs of stars through misty ways."

"অনন্ত নীল শূন্যের সায়রে—দাঁড় নাই—পাল নাই—যেখানে ধীরে গতির গাম্ভীর্য্যে ভাসিয়া চলিয়াছে—অসংখ্য তারার দল"—সেখানে তাহাকে লইয়া যাইবে। ককেসাসের চূড়ায় যখন নিশীথের চাঁদের আলো আসিয়া পড়িবে রাত্রির কুঁড়িতে যখন শিশির ছোঁওয়া লাগিবে—"when the flowers of night find dew," তখন সে অজানা অতিথি প্রতিদিন আসিয়া "Shall guard till dawn thy virgin beauty"—প্রভাত আলোর উদয় পর্য্যন্ত তামারার কুমারী সৌন্দর্য্যের দ্বারে প্রহরী হইয়া জাগিয়া থাকিবে।......

তামারা চমকিয়া উঠিল। রাত্রে স্বপ্নের মায়াজালের মধ্যে কে যেন দাঁড়াইয়া। বিষণ্ণ, ভিখারী! দেবতা তো সে নয়—কি বিষণ্ণ তাহার দৃষ্টি। "সে যেন শেষ-গ্রীষ্মের রক্ত-গোধূলি। দিনও নয়, রাতও নয়।......

প্রতি রাত্রি সেই ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া প্রেম-নিবেদন করে। বলে—মুক্তি দাও!......

তামারা তাহার পিতাকে বলিয়া এক মঠে আসিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করিল। সেখানেও সেই মূর্ত্তি আর সেই কণ্ঠস্বর। ধূপ ধুনার ম্লান অন্ধকারে সহসা সন্ধ্যার তারার মত তাহার মুখ ভাসিয়া উঠিত—"glimmered like a star."

তামারার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কে সে? কি চায় মর্ত্ত্যের মানবীর কাছে। মঠের এক প্রান্তে আসিয়া নিশীথে তামারা কাঁদিত। রাত্রের পথিক সেই আর্ত্তস্বরে ভীত হইয়া ভগবানের নাম লইত।......

* * * *

তামারা বলে, "কে তুমি? তোমার সঙ্গে যে ভয় আসে!"

ডিমন শুধু বলে, "তুমি যে সুন্দর!"

"কিন্তু কে তুমি—বল—বল?"

"আমিই তো তোমার দিন রাত্রিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছি—আমি স্বর্গের অভিশাপ—পৃথিবীর পরবাসী। স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ নেই যে আমাকে ভালবাসে। প্রকৃতির আমি চিরন্তন শত্রু—জগতের দুর্ভাবনা......তবুও এই আমি তোমার পায়ের তলায় তোমার মুখের দিকে মুক্তির আশায় চেয়ে......

"I come to thee in earthly torture—
My first humility of Tears."

আমি আজ এসেছি এই অজানা মাটীর পৃথিবীর বেদনায় অবগাহন করে—এই আমার প্রথম অশ্রুর আত্ম-অপমান। যেদিন, হে মায়াবী, তোমার নয়নের কাজল দেখি, সেদিন আমার অনন্ত, জ্বালাময় হইয়া উঠে। পৃথিবীর মানুষের সামান্য জীবনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।......তোমাকে ছাড়া আমার অনন্তে কি লাভ? "What is eternity without thee!"

তামারা চীৎকার করিয়া উঠিল,"আমি মানবী, হে মায়াবী ছেড়ে দাও আমাকে! তুমি স্বর্গের অভিশপ্ত, তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ......"

"কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে তো কোনও পাপ করি নি!"

"ওরা শুনতে পাবে—চুপ করো!"

"কে শুনবে? আমরা যে এখানে একা!"

"ভগবান?"

"তিনি আমাদের দিকে চাইবেন না—স্বর্গ তাঁর আরও সুন্দর!"

"তবে তুমি কি চাও?"

"আমি চাই মুক্তি—এই অনন্ত বেদনা থেকে মুক্তি—সে মুক্তি আছে তোমার চোখে। একলা আমি ভগবানের ক্ষমা পাব না—তুমি যদি আস স্বর্গের দ্বার আবার মুক্ত হবে।"

"আমি মোহাচ্ছন্ন। কিছু বুঝি না···এতো প্রতারণা নয় ?"

"সৃষ্টির প্রথম উষার নামে শপথ করিতেছি······তোমাকে দেখার প্রথম দিনকে স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি ····· আমি বেদনা দিয়া শপথ করিতেছি···· ··হে আমার মন্দির, আমার সমস্ত সমর্পণ করিলাম, আমি চাই তোমার প্রেম। তুমি দাও একটী মুহূর্ত্ত, আমি দিব অনন্তকে তোমার কণ্ঠহার করিয়া······সন্ধ্যা-তারার মায়া-মুকুট ছিনাইয়া তোমার মাথায় পরাইয়া দিব, আকাশ হইতে যে শিশির পৃথিবীর ফুলে ঝরিয়া পড়ে—তাহা কুড়াইয়া তোমার মুকুটের হীরার পাশে বসাইয়া দিব—সূর্য্যাস্তের শেষ রক্ত-রেখাটুকু লইয়া তোমার কটিদেশ বেড়িয়া পরাইব—রাত্রির সুবাসে তোমার কেশকে সুবাসিত করিব ···...তুমি দাও শুধু একটী মুহূর্ত্ত একটী সঘন চুম্বনের পাত্রে ·····"

তামারার ওষ্ঠ নড়িয়া উঠিল। ছায়া-মূর্ত্তির অধর তামারার অধর স্পর্শ করিল। একটী মুহূর্ত্ত! জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষের মত রহস্যময় শব্দ জাগিয়া উঠিল।

তামারার পৃথিবী-বাস সেই মুহূর্ত্তে ফুরাইয়া আসিল।···

বাহিরে রক্ষী কি এক রহস্যময় শব্দে যেন চমকিয়া উঠিল। লক্ষ পাখীর ডানার ঝাপটের শব্দ হইল। পুরানো মঠের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ ভগবানের নাম লইয়া বুকে ক্রুশের চিহ্ন করিল ·····

টুচেভ্—রুষিয়ার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ

টুচেভ রুষিয়ার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। প্রকৃতির মধ্যে টুচেভ আপনাকে একেবারে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। টুচেভের বিশ্বাস—জীবনের সমস্ত রহস্য, সমস্ত ব্যথিত সমস্যার সমাধান, মানুষের সকল কথার শেষ উত্তর প্রকৃতির চির-রহস্যময় বুকে লুকান আছে। মানুষ যত তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসিতেছে, যতই তাহাকে বাঁধিয়া প্রভুত্বের অহঙ্কার অর্জ্জন করিতেছে, ততই তাহার অসহায়তা বাড়িয়া উঠিতেছে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে,—

"She has a soul, possesses freedom,
Possesses love, possesses speech."

মানুষের আত্মার মত প্রকৃতির আত্মা আছে, তাহারও আপনার স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতির ভাষা আছে—ভালবাসিতেও সে জানে। ইংলণ্ডের কবিকে ব্যথিত করিয়াছিল—"what man has made of man" প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষ মানুষের কত বড় ক্ষতি করিয়া চলিয়াছে—টুচেভও সেই সুরে লিখিয়াছেন,—

"Why, whence has come this fatal clash ?
And why amongst the choir of Nature
Man's songs differ from songs of ocean ?
And why complains the pensive reed ?"

"কেন? কোথা থেকে এলো এই নিদারুণ দ্বন্দ্ব! কেন প্রকৃতির এই বিরাট সুরের সভায় সমুদ্রের সুরের সঙ্গে মানুষের মনের সুর মিলে না? কেন বেতসের ব্যথা—যে কেউ তার মর্ম্মকথা বুঝিল না?" টুচেভের কাছে প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। মানুষ প্রকৃতির স্বপ্নমাত্র—

Our Phantom years are strange to her ;
And facing her, we realise that we
Are but her dreams.

এইখানেই টুচেভের সঙ্গে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রভেদ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি করুণাময়ী, মাতৃ-হৃদয়া। টুচেভের প্রকৃতি নিষ্করুণ, রহস্যময়ী। টুচেভের বিশ্বাস যে প্রকৃতির গহনতম বুকেই সত্য অন্তর্নিহিত আছে। তাই টুচেভের কবিতায় প্রকৃতির গহন ও দুর্য্যোগময় রূপ অধিকতর মূর্ত্তি পাইয়াছে। নিশীথ রাত্রি, অন্ধকার বন, গহনতম নদীর আবর্ত্ত দিনের চেয়ে, প্রকৃতির সহজ রূপের চেয়ে টুচেভের প্রিয়তর! ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আনন্দবাদী; টুচেভ দুঃখবাদী। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ঘনকৃষ্ণ মেঘের চারিদিকে সূর্য্যের আলোর পাড়-বোনা—টুচেভের ঘনকৃষ্ণ মেঘ শুধু অশ্রু-ভরা!

"Tears of humanity ! Tears of humanity !
Flowing at sunset and flowing at morn,
Flowing unknown to us, flowing unseen to us
Tears inexhaustible, numberless, piteous,—
Flowing as flow through the course of eternity
Streams of dense autumn at midnight forlorn."

"বিশ্ব-মানবের অশ্রু-ধারা! বিশ্ব-মানবের অশ্রু-ধারা! নিত্য ঝরিয়া পড়িতেছে—সূর্য্যাস্তে, সূর্য্যোদয়ে। সে তেমনি

ঝরিতেছে—আমাদের জানার বাইরে, আমাদের দেখার বাইরে—অনন্ত, অপরিমিত, সকরুণ। নিঃসঙ্গ নিশীথে নিবিড় ঘন শীতের বায়ু যেমন অনন্ত কালের মধ্য দিয়া চলিয়াছে—তেমনি চলিয়াছে নিবিড় ঘন বিশ্ব মানবের অশ্রু-ধারা।"

নেক্‌রাসভ্‌—রুষিয়ার জনগণের কবি

নেক্‌রাসভ্‌ যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮২১) তখন রুষিয়ায় কৃতদাস-প্রথা ভয়ানক বিশ্রী রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। রুষিয়ার চারিদিকে তখন বীভৎসতা ও ভয়াবহতা মাথা তুলিতেছিল। গ্রামে গ্রামে, নিরন্ন মানব কোনও রকমে পশুর অধম ভাবে দিনযাপন করিয়া চলিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, মহামারী গ্রামকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করিতেছিল। জীবনের চারিদিকে অপমান আর হাহাকার। আর এই অপমানের জীবন হইতে দূরে ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদে জার তাঁহার দলবল লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এই সময় হইতেই রুষিয়ায় একটা আমূল পরিবর্ত্তনের বাসনা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রুষ-সাহিত্যের সম্মুখে তখন এই সব নূতন মানুষের দল—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। সামান্য মানব, মুটে, মজুর, কুলী, গাড়োয়ান রুষ আদর্শবাদীদের কাছে নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া একটা মানবতার কল্যাণ-স্বপ্ন আনিয়া দিল। রুষ-সাহিত্য তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, জীবনের যে কোনও স্তরে, মানব-জীবনের ধারা—একই ভাবে প্রবাহিত। সামান্য মানবের সামান্য জীবনের মধ্য দিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের রসদ্‌ পরিপূর্ণ মাত্রায় পাওয়া গেল।

নেক্‌রাসভ্‌ এই সব নূতন মানুষদের কবি—তাহাদের জীবনের তুচ্ছতম দুঃখের কবি। কুলী, মুটে, মজুর, চাষী, শ্রমিক ইহাদের জীবনের তুচ্ছতম ঘটনার মধ্য দিয়া তখনকার সমগ্র রুষিয়ার একটা ব্যথার রূপ নেক্‌রাসভের কবিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় বিষয়ের প্রতি অধিকতর সহানুভূতির দরুণ কবিতা ম্লান হইয়াছে—কিন্তু রুষিয়ায় ও রুষ-সাহিত্যে তখন সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ ছিল—দরদ ও সহানুভূতি। মানুষের প্রতি এই দরদের জন্য রুষ-সাহিত্যিকগণ অনেক সময় সাহিত্য-রসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দরদ এত বড় ও গভীর যে সাহিত্যিক ত্রুটী তাহাতে ডুবিয়া যায়।

নেক্‌রাসভের জীবন অত্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত হয়। পথের ভিখারীর জীবন তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হয়। রাত্রে রাস্তায় শুইয়া থাকিতে হইত। এই সময় নিম্নস্তরের জীবনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পরে এই পরিচয় তিনি বিখ্যাত পুস্তক "Who lives in mother Russia now quite happily and free?"-এ দিয়াছেন।

একজন সমালোচক নেক্‌রাসভের কবিতার অন্তরের বেদনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "grief which submerges the Russian land deeper than Volga's flood drowns the field" এ দুঃখ ভল্‌গার দুকূল-ভাঙ্গা প্লাবনের চেয়ে সুগভীর ভাবে রুষিয়াকে প্লাবিত করিয়া আছে।

প্রত্যেক রুষবাসী Nekrasovএর Rus' কবিতা শ্রদ্ধায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন,—

"Thou art the barren one,
And the abundant one,
And the ascendant one,
Dear mother Rus'!"

"হে জননী রুষিয়া—তুমি আজ শূন্য—কাল তুমি পূর্ণ হইবে। আজ তুমি নিপীড়িত—কাল তুমি আবার মহীয়সী হইবে—হে জননী রুষিয়া।"

রুষিয়ার বিরাট নব-জাগরণের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে কবিতা ভবিষ্যৎবাণী হইয়া উঠে। নেক্‌রাসভের রুষিয়া আজ বদলাইয়া চলিয়াছে—জগৎ দ্বিধা-ভক্ত হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে।

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাই-ফোঁটার দিন। রামযাদু সকাল-বেলা পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে ঢুক্‌তেই দেখ্‌লে কৃষ্ণকলি থাকোহরির হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখেই রামযাদু হাসিমুখে কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—কি গো কৃষ্ণকলি, তোমার থাকো-দাদাকে ভাই-ফোঁটা দিয়েছো ?

কৃষ্ণকলি লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে চোখ বাঁকিয়ে বল্‌লে—ধ্যৎ ! বরকে কি কেউ ভাই-ফোঁটা দেয় ?

রামযাদুর দৃষ্টির সম্মুখে থেকে যেনো একটা পর্দা উঠে গেলো, অনেক অনির্ণীত সমস্যার মীমাংসা এক নিমেষে হয়ে গেলো · সে এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে যে পরাণ-বাবু কেনো থাকোহরিকে এমন জামাই-আদরে প্রতিপালন কর্‌ছেন। কৃষ্ণকলি অতি কদর্য্য রকমের কুৎসিত মেয়ে; তার ভাগ্যে সৎপাত্র জোটানো কুবেরেরও অসাধ্য; অর্থ-লোলুপ কোনো যুবা কাঞ্চন-কল্প-লতিকার পুষ্প-বৃষ্টির লোভে এই কালো ভোম্‌রার সঙ্গ সহ্য কর্‌বে কেবল ততোক্ষণই যতোক্ষণ পুষ্প সঞ্চয়ে তার নিজের কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়ে না উঠছে। রামযাদুর মনে পড়্‌লো রবি-বাবুর শেষরক্ষা নাটকের বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনীর কথা; আহা বেচারী রূপহীনা ব'লে সে এমনই ভাগ্যহীনা যে তাকে নিয়ে অপর সবার প্রতি দরদী কবিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিষ্ঠুর কৌতুক কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেন নি; যে কবি কাব্যে উপেক্ষিতা বলে উর্ম্মিলার দুঃখের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনিও সেই কাদম্বিনীর প্রতি একটু সহানুভূতি কোথাও দেখান নি; অর্থ-গৃধ্নু ললিত যে কাদম্বিনীকে বিয়ে ক'রে তাকে ফেলে রেখে তার টাকা নিয়ে বিলাতে পলায়ন কর্‌লে, এতোবড়ো নির্ম্মম ব্যবহারটা কবি পরম কৌতুকের মধ্যে ডুবিয়ে লোক-চক্ষুর অগোচরেই রেখে দিয়েছেন। এই রকম কোনো একটা দুর্ঘটনা পাছে ঘটে এই ভয়েই বোধ হয় পরাণ-বাবু থাকোহরির সঙ্গেই নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেছেন; থাকোহরি দেখ্‌তে সুশ্রী, স্বভাব-চরিত্রও ভালো; থাকোহরি দুনিয়ার নিরাশ্রয় হয়ে যখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলো তখন পরাণ-বাবু কেবল তাকে আশ্রয়ই দেন নি, ধনীর আত্মীয়তা দিয়ে তাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রেখেছেন; থাকোহরি এই উপকার লাভের কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে উপকারকের কন্যা কৃষ্ণকলিকেও যত্ন মমতা দেখাবে এবং বহুকাল এই ভাবে একত্র থাকার ফলে থাকোহরির মনের থেকে কৃষ্ণ-কলির কদর্য্যতার প্রতি ঘৃণা অনেকখানি লোপ পেয়ে যাবে; অবশেষে থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহের প্রস্তাব কর্‌লে থাকোহরি আপত্তি কর্‌তে পার্‌বে না, এবং বিবাহ হয়ে গেলেও তার অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না ব'লে সে নিজের কুৎসিত স্ত্রী লাভের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধেও সচেতন হবে না; সে দিব্য আরামে ঘর-জামাই হয়ে কৃষ্ণকলিকে নিয়েই ঘর-কন্না কর্‌বে।

এই-সব কথা মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতেই রামযাদু মনে মনে ব'লে উঠলো—উঃ! বেটা কেওটের কী কূটবুদ্ধি! পাক্কা ধড়িবাজ! চাণক্য-পণ্ডিতের চেলা! আমার চোখেও এতোদিন ধুলো দিয়ে রেখেছে, ঘুণাক্ষরে মৎলবটা ফাঁস করে নি! আচ্ছা, এইবার দেখা যাবে।

রামযাদু এই রকম ভাবতে ভাবতে পরাণ-বাবুর ঘরে গিয়ে উপনীত হলো। পরাণ-বাবু ঘরে তখন একলা ব'সে ছিলেন।

পরাণ-বাবু রামযাদুকে ঘরে আস্‌তে দেখেই বল্‌লেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম হই। আপনার নতুন বইখানার তো খুব সুখ্যাতি হয়েছে। ওটাকে এইবার ইংরেজী ক'রে ডক্‌টরেটের থিসিস্ সাব্‌মিট্ করুন।

রামযাদু উপবেশন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমিও ঐ কথাই ভাব্‌ছিলাম। তা আপনি যদি অনুমতি করেন তো চেষ্টা ক'রে দেখি।

পরাণ-বাবু খুসী হয়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতে আবার আমার অনুমতি কি ?

রামযাদু এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে একটা কথা বল্‌বো বল্‌বো মনে কর্‌ছি, বল্‌বার সুযোগ আর পাই নি; আজ আপনাকে একলা পেয়েছি, যদি অনুমতি করেন তো ব'লে ফেলি…

রামযাদু হাস্যমুখে অপেক্ষমান দৃষ্টিতে পরাণ-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পরাণ-বাবু কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বল্‌লেন—কি বল্‌বেন স্বচ্ছন্দে বলুন।

রামযাদু যেনো পরের উপকারের জন্য অনুরোধ কর্‌ছে এম্‌নি ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি আপনাকে থাকোহরির কথা বল্‌ছিলাম……

রামযাদু যে নিজের জন্য কিছু বল্‌ছে না, এবং থাকো-হরির কোনো কথা বল্‌তে যাচ্ছে, এতে পরাণ-বাবু বিস্মিত ও উৎসুক হয়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, কি বল্‌বেন বলুন…

রামযাদু বল্‌লে—ছেলেটি বড়ো খাসা…

পরাণ-বাবুর মনের মধ্যে একটু আশঙ্কা উঁকি মারছিলো, হয় তো রামযাদু থাকোহরির কোনো দোষের কথাই বা উত্থাপন কর্‌তে যাচ্ছে; কিন্তু তাঁর আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, ছেলেটি সত্যিই খাসা!

রামযাদু বলে যেতে লাগলো আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য কর্‌ছি থাকোহরি আমাদের কৃষ্ণকলিকে খুব ভালোবাসে, আর কৃষ্ণকলিও থাকোহরির খুব নেওটো হয়েছে!…

পরাণ-বাবুর ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, মুখ আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু বল্‌তে লাগলো—কৃষ্ণকলির সঙ্গে থাকোর বিয়ে হলে বেশ হয়; থাকো ঘর-জামাই হয়েই থাকে, তা হলে আমাদের মা-লক্ষ্মীকে আর আমাদের কাছ-ছাড়া কর্‌তে হয় না……

পরাণ-বাবু উৎফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনি কি মনে করেন মুখুজ্জে মশায় যে এই ব্যবস্থা কর্‌লে উত্তম হবে?

রামযাদু গম্ভীরভাবে বল্‌লে—আমার তো মনে হয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

পরাণ-বাবু খুশী হয়ে বল্‌লেন—তবে আপনাকে আমাদের মনের কথাটাও খুলে বলি মুখুজ্জে মশায়,—আমরাও এই রকম সঙ্কল্প মনে মনে এঁচে রেখেছি। এবার কাশীতে গিয়ে বড়ো বড়ো জ্যোতিষীদের দিয়ে ওদের দুজনের কোষ্ঠী বিচার ও গণনা করিয়ে দেখেছি; সবাই বলেছেন এ বিবাহ হ'লে রাজযোটক হবে। কেবল একজন জ্যোতিষী বলেছেন যে এ বিবাহ হলে ভালোই হবে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকলির পতিযোগ এতোই উৎকৃষ্ট যে থাকোহরির চেয়েও গুণান্বিত কোনো পাত্রের সঙ্গেই কৃষ্ণকলির বিবাহ হওয়া সম্ভব। সেইজন্যে আমরা আর বছর কতক অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌বো, ভবিতব্য কি হয়। ওরা দুজনেই এখন তো ছেলেমানুষ। তিন চার বছর অপেক্ষা করা স্বচ্ছন্দেই চল্‌বে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সঙ্কল্প উদয় হয়েছিলো, আপনার মনেও যখন সেইটিরই সমর্থন হচ্ছে, তখন আমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এখন প্রজাপতি আর ভবি-তব্যতার আশীর্ব্বাদ!

রামযাদু বল্‌লে—যার সঙ্গেই বিয়ে হোক কৃষ্ণকলি যে সৎ পতি লাভ করবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমরা কোষ্ঠী দেখ্‌তে না জান্‌লেও এ তো জানি যে পিতৃমাতৃপুণ্যের জোরে সন্তান সর্ব্বথা মঙ্গলাস্পদ হয়।

পরাণ-বাবু পরিতুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—সে আপনাদের দশ জনের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর কর্‌ছে।

এমন সময় ঘরের পাশের কাঠের সিঁড়িতে মানুষ ওঠার ধপধপ পদশব্দ শোনা গেলো। রামযাদু লোক-সমাগমের সম্ভাবনা দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমি এখন আসি। আমাদের দশজনের জ্বালায় আপনার আর আরাম বিশ্রাম কর্‌বার জো নেই।

পরাণ বাবু সন্তুষ্ট হয়ে প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—আপনাদের অনুগ্রহে এই আমার পরম সৌভাগ্য।

পরাণ-বাবুর ঘরে কয়েকজন লোক এসে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লো। রামযাদু সমাগতদের সমবেত ভাবে একটি নমস্কারে অভিনন্দিত ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। সমাগত লোকেদের দৃষ্টি তখন পরাণ-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে উৎসুক ও হস্ত দুটি তাঁর দর্শন লাভ করা মাত্র নমস্কার কর্‌বার উদ্‌যোগে সুরু হয়ে ছিলো, তাই রামযাদুর প্রস্থান ও নমস্কার কেউ বা লক্ষ্য কর্‌লে আর কেউ বা লক্ষ্য কর্‌বার অবকাশ পেলে না। যদিও তারা জানে যে রামযাদু পরাণ-বাবুর প্রধান কৃপাপাত্র, তরাং তাকে তুষ্ট

রাখাতেও তাদের স্বার্থ আছে, তথাপি প্রধান দেবতা ও তাঁর বাহনের মধ্যে কার পূজা আগে কর্‌বে স্থির কর্‌তে পার্‌বার আগেই রামযাদু ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

রামযাদু নীচে নেমে গিয়েই দেখ্‌লে যে থাকোহরি কৃষ্ণকলির হরিণ-ছানাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে কৃষ্ণকলি নেই। থাকোহরিকে দেখেই রামযাদু হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌লো—বেশ্, বাবাজী বেশ্, লাভ্ মি অ্যাণ্ড্ লাভ্ মাই ডগ!

থাকোহরি মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে হাস্‌লে এবং হাতের ঘাস ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে রামযাদুর দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

রামযাদু থাকোহরির কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে কণ্ঠস্বরে আদর মাখিয়ে বল্‌লে—তোমাকে বল্‌বো না মনে ক'রেছিলাম বাবাজী। কিন্তু দেখ্‌ছি কৃষ্ণকলি পর্য্যন্ত যখন জান্‌তে পেরেছে, তখন তোমারও জান্‌তে বাকী নেই··· আর আজ কৃষ্ণকলি তো তোমার সাম্‌নেই তোমাকে বর ব'লে পরিচয় দিয়ে গেলো, যদি বা কথাটা তোমার অগোচর ছিলো তবে তো আজই তা জানা হয়ে গেলো। এখন তোমাকে বল্‌তে আর বাধা নেই·····আমিই কর্ত্তাকে প্রথমে এই কথা বলি যে "থাকোহরি তো আপনাদের স্বজাত আর ছেলেটিও দেখ্‌তে শুন্‌তে স্বভাব-চরিত্রে খুব ভালো, ওর সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণকলির বিয়ে দিলে বেশ হয়।" তাতে কর্ত্তা বল্‌লেন—"থাকোহরির অবস্থা তেমন ভালো নয়, বংশ-পরিচয়ও······" তাতে আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লাম—"থাকোহরির যেমন রূপ-গুণ তাতে সে সদ্‌বংশজাত না হয়ে যায় না; আর তা যদি নাই হয়, তাতেই বা কি? কয়লার খনিতে হীরক পাওয়া গেলে সেই হীরকের সমাদর তো কয়লার দরে হয় না? দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং পৌরুষম্—কর্ণের এই বাক্য একটি মহৎবাক্য! আর থাকোহরির অবস্থা ভালো নাই বা হলো? আপনার অগাধ সম্পত্তি থেকে আপনার কন্যাকে তো আপনি বঞ্চিত কর্‌তে যাচ্ছেন না? আর থাকোহরি যখন আপনার কৃপা লাভ করেছে, তখন সে নিজেও যথেষ্ট রোজগার কর্‌তে পার্‌বে।" এইসব কথা শুনে কর্ত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে চিন্তে বল্‌লেন—"হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু আমার মেয়ে কালো কুচ্ছিত, তাকে যদি থাকোহরির পছন্দ না হয়······" এতে আমি বল্‌লাম—"মানুষের বাহিরটাই কি সব? অমর বঙ্কিমচন্দ্র কি দেখিয়ে যান নি যে ভ্রমরের কাছে শত রোহিণী তুচ্ছ! তা ছাড়া থাকোহরির মনের কৃতজ্ঞতা তার চোখে যে প্রীতির অঞ্জন মাখিয়ে দেবে তাতে জগতের সকল সুন্দরী কৃষ্ণকলির মাধুর্য্যের কাছে পরাজিত হয়ে যাবে!" আমার এই কথা শুনে কর্ত্তা অনেকক্ষণ ভেবে শেষে নিমরাজী হয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা, কিছুদিন ভেবে চিন্তে দেখি আর থাকোহরি আর কৃষ্ণকলির মনের ভাবটাও কিছুকাল লক্ষ্য ক'রে দেখি, তারপর আপনার পরামর্শ-মতো যা হয় কিছু করা যাবে।" আজকে কৃষ্ণকলির কথা শুনে এই কথাটা আমার মনে প'ড়ে গেলো; আজ আবার কর্ত্তার কাছে কথাটা তুলেছিলাম; তিনি বল্‌লেন, "আরও দু-চার বছর লক্ষ্য ক'রে দেখি।" তা দেখো বাবাজী, এই অতুল সম্পত্তি যদি লাভ কর্‌তে চাও তবে কৃষ্ণকলিকে খুব ভালো বাস্‌বে আর খুব শান্ত শিষ্ট হয়ে কর্ত্তা-গিন্নির মন জুগিয়ে চল্‌বে। আমি তোমার জন্যে কুবেরের ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছি, এখন তুমি দখল কর্‌তে পার্‌লেই হয়।

থাকোহরি রামযাদুর বানানো উপন্যাস সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে—আমার সমস্ত শুভাদৃষ্টের মূল আপনি। আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে আমার কর্ত্তব্যের কিছু ত্রুটি হবে না।

রামযাদু নিজের বুদ্ধির কৌশল ও থাকোহরির ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে খুশী হয়ে বল্‌লে—বেশ বাবাজী বেশ! আমি তোমাকে সদা-সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দেবো।

* * * *

রামযাদু কল্‌কাতায় এসে অবধি পরাণ-বাবুর বাড়ীতেই পরাণ-বাবুর গোরুর খাঁটি দুধ দই ক্ষীর মাখন ছানা সর খেয়ে সপরিবারে দিব্য আরামে আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে নেই। রামযাদুর সদাই মনের মধ্যে ভয়-ভয় করে কখন বুঝি বা পরাণ-বাবু বাড়ীটা ছেড়ে দিতে বলেন বা ভাড়াই চেয়ে বসেন, আর কখন বা গোরুটাই ফিরে চান। এইজন্য সে আজকাল পরাণ-বাবুকে পরিতুষ্ট রাখ্‌বার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করে।

একদিন গভীর রাত্রে রামযাদু সপরিবারে থিয়েটার দেখে

বাসায় ফিরছিলো। পরাণ-বাবুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে তার উর্বর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌লো; সে গাড়োয়ানকে বল্‌লে—দেখ, তোকে আট আনা পয়সা বেশী দেবো তুই এই গলির ভিতর দিয়ে একটু ঘুরে চল্‌...... এক জায়গায় একজনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো......

গাড়োয়ানদের স্বভাবসিদ্ধ আপত্তি অমনি রুক্ষ স্বরে বিঘোষিত হলো—না বাবু, কতো দেরী কর্‌বেন, আট আনায় হবে না......

রামযাদু মোলায়েম সুরেই বল্‌লে—না রে বাপু, বেশী দেরী হবে না, বড়ো জোর পনেরো মিনিট। বেশী দেরী হয় তো বেশীই দেবো, তার আর কথা কি?

গাড়ী গলির মধ্যে দিয়ে পরাণ-বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো।

রামযাদুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এতো রাত্রে কর্তার বাড়ীতে কি কর্‌তে এলে?

রামযাদু বল্‌লে—বাড়ীখানা যাতে ফিরিয়ে না চায় তার একটা চেষ্টা করা উচিত তো?

এ সম্বন্ধে রামযাদুর সহধর্ম্মিণীর কিছুমাত্র মতানৈক্য ছিলো না। তবে সে বুঝতে পার্‌লে না যে রাত তিনটের সময় তার স্বামীর সেই সাধু চেষ্টা কি উপায়ে সম্পন্ন হবে। সে ফলেন পরিচীয়তে নীতি অবলম্বন ক'রে মৌন হয়ে রইলো। তাদের ছেলেমেয়েগুলো সব গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামযাদু গাড়ী থেকে নেমে পরাণ-বাবুর বাড়ীর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে মহা চীৎকার ক'রে ডাকা-ডাকি সুরু ক'রে দিলে—দরোয়ানজী, এ দরোয়ানজী! ওরে বোঁচা! রাইচরণ! ......থাকোহরি!......সরকার মশায়!......

তার শোরগোলে বাড়ী শুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে জেগে উঠ্‌লো। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক্ লাইট জ্ব'লে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা-বিজড়িত বিভিন্ন স্বরে প্রশ্ন হতে লাগ্‌লো—কৌন হ্যায়?......কে?......কি চাই?......

রামযাদু প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ডাক্‌লে—দরোয়ানজী জল্‌দি দরওয়াজা খোলো—হাম রামযাদু মুখুজ্জা মশা হ্যায়......

প্রকাণ্ড দরজার প্রকাণ্ড হুড়কা হড়াত ক'রে খুলে গেলো এবং দরোয়ান চাকর সরকার প্রভৃতি চার পাঁচ জনে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ক্যা মুখুজ্জা মশা? ক্যা হুয়া?...কি হয়েছে?......

রামযাদু ব্যগ্র স্বরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কর্তা ভালো আছেন তো?

সকলে রামযাদুর প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—হাঁ্যা, তিনি তো ভালোই আছেন!

রামযাদু পরম স্বস্তি অনুভবের ভাণ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আঃ! বাঁচা গেলো! এতোক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো!......

সকলে রামযাদুর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে না পেরে অবাক্ হয়ে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে যখন আশা কর্‌ছে যে রামযাদু হয় তো রহস্যটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে তুল্‌বে তখন দোতলা থেকে পরাণ-বাবুর গম্ভীর গলার প্রশ্ন শোনা গেলো—বেচা, কী হয়েছে রে? মুখুজ্জে মশায়ের গলা শুন্‌ছি যেনো?

রামযাদুর ডাক-হাঁক শুনে থাকোহরিও ঘুম থেকে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো; সে পরাণ-বাবুর প্রশ্ন শুনে বল্‌লে—হাঁ্যা, মুখুজ্জে মশায়ই এসেছেন।

পরাণ-বাবু আবার প্রশ্ন কর্‌লেন—কেনো? বাড়ীতে কারো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?

রামযাদু পরাণ-বাবুর কথা শুনেই ব'লে উঠ্‌লো—আঃ! প্রাণটা জুড়োলো!.. কী দুর্ভাবনাই হয়েছিলো!......

পরাণ-বাবু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে থাকোহরির উত্তর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে নীচে নেমে এলেন; থাকোহরি অনুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছিলো যে এইবার হয় তো রামযাদু তার অসাময়িক আগমনের কারণ ব্যক্ত ক'রে বল্‌বে; তাই সে অবাক্ হয়ে রামযাদুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলো, সে পরাণ-বাবুকে কিছুই জবাব দিতে পার্‌ছিলো না।

পরাণ-বাবু নীচে এসেই ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কী হয়েছে মুখুজ্জে মশায়? বাড়ীর সব ভালো তো?

রামযাদু আবার আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—যাক্, দুর্ভাবনা ঘুচ্‌লো! বাঁচা গেলো! ধড়ে প্রাণ এলো!...

সমবেত লোকেরা রামযাদুর মুখে কেবল এই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুন্‌তে শুন্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলো, এবং

রামযাদুর দুর্ভাবনাটা যে কিসের তা জান্‌বার জন্যে সকলেই ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো।

পরাণ-বাবুও উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের দুর্ভাবনা মুখুজ্জে মশায়? ব্যাপার কি?

রামযাদু বল্লে—আমার স্ত্রী ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লেন। আমি তাঁকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কি স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠ্‌লে?" জেগে উঠেও তিনি হাপুস-নয়নে কাঁদতে লাগ্‌লেন, কান্না আর থামে না, কথাও বলতে পারেন না। অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার পর তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্‌লেন—"আমি কর্ত্তার অমঙ্গল স্বপ্নে দেখেছি।" আমি তাঁকে অনেক ক'রে বোঝালাম যে আমি তো রাত্তিরে কর্ত্তার বাড়ী থেকে এসেছি, তাঁকে ভালো দেখে এসেছি; কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মান্‌তে চান না। তখন আমি অগত্যা বল্‌লাম, আচ্ছা, তুমি স্থির হয়ে থাকো, আমি গিয়ে কর্ত্তার খবর নিয়ে আস্‌ছি। কিন্তু তিনি এ কথাতেও ধৈর্য্য মান্‌লেন না, বল্‌লেন—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো; তুমি যাবে, ফিরে আস্‌বে, অতোক্ষণ দেরী আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। তখন গাড়ী ডেকে তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে এলাম, ছেলে-মেয়ে-গুলোও সঙ্গ ছাড়্‌লে না!

পরাণ-বাবু খুশীর হাসিতে প্রকাণ্ড বাড়ী ভরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা পাগল তো আপনারা! এতো রাত্রে বৌমাও বুঝি কচি-কাচা কাচ্চা-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে এসেছেন? তিনি গাড়ীতে ব'সে আছেন! যান যান, বাড়ী যান, ছেলেগুলোর রাত জাগ্‌লে হিম-টিম লেগে অসুখ-বিসুখ কর্‌তে পারে।

রামযাদু বল্লে—না না, আমাদের তো ঘুম ভেঙেই ছিলো; না এলে তো দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুমই হতো না। তবে অসময়ে এসে যে আপনাদের জ্বালাতন ক'রে গেলাম এই এখন আমার মনস্তাপ হচ্ছে।

পরাণ-বাবু খুশী হয়ে বল্‌লেন—না না, আমার ওঠবার তো সময় হয়েই এসেছিলো।...যান, আর বিলম্ব করবেন না।

রামযাদু বল্লে—হ্যাঁ যাই, গিন্নি আবার সত্যনারাণের শিন্নি, সুবচনীর পূজো, কালীঘাটের কালীর কাছে কালো-ধলো পাঁঠা আর মা-কালীর জিব সমান উঁচু চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পূজো মানত করেছেন, তার আয়োজন কর্‌তে হবে...

পরাণ-বাবু পরম পরিতুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—দুজনেই আপনারা সমান ক্ষ্যাপা দেখ্‌ছি। থাকো, তোমার মা'র কাছ থেকে একশো টাকা এনে মুখুজ্জে মশায়কে দাও তো...আমার জন্যে ওঁর সুখদণ্ড হয় কেনো?

রামযাদু দন্ত বিকশিত ক'রে বল্‌লে—তা টাকা দেবেন দিন, আপনার দৌলতেই তো আমরা খেয়ে পরে বেঁচে ব'র্ত্তে আছি...অতো বড়ো একটা বাড়ীই অম্‌নি পেয়ে গেছি ...গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হবে...

থাকোহরি ছুটে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে এক শো টাকা এনে রামযাদুকে দিলে। রামযাদু খুশী হয়ে বল্‌লে—তবে এখন আসি।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে বল্‌লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বিলম্ব কর্‌বেন না। কাল আপনার বাড়ীর সঙ্গে টেলিফোন্ কনেক্‌শন্ করিয়ে দেবো, তা হলে আর রাত দুপুরে গাড়ীভাড়া ক'রে ছেলেপুলেদের শুদ্ধ টেনে নিয়ে আসতে হবে না।

পরাণ বাবুর কথাটা রামযাদুর কানে ব্যঙ্গের মতন শোনালো: সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে হা-হা ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লো।

গাড়ী চ'লে কিছুদুর এলে রামযাদু নিজের সহধর্ম্মিণীকে বল্‌লে—শুনেছো তো সব? ক্যায়সা বুদ্ধির কৌশল খাটিয়ে বেটা কেওটকে বোকা বানিয়ে দিয়ে এসেছি! বাড়ীটা আর ফিরে চাইতে পার্‌বে না।

মনোমোহিনী স্বামীর কথা শুনে কেবল বল্‌লে—"হুঁ!" সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'লেও স্বামীর এই মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার কৌশলে সুখী হবে বা দুঃখিত হবে স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না।

পরদিন হতে রামযাদুর বাড়ীতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম লেগে গেলো—অবশ্য পরাণ-বাবুর টাকায়, কিন্তু পরাণ-বাবুর মঙ্গল-কামনায় নয়, পরাণ বাবুর বাড়ীটি যাতে নির্ব্বিঘ্নে করায়ত্ত হয় এই কামনায়। আর রামযাদুর বাড়ী থেকে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে রোজই পূজার প্রসাদ আসে—আজ সত্য-নারায়ণের শিন্নি, কাল সুবচনীর আটভাজা আর কলা, পরশু কালীর প্রসাদ কবন্ধ কালো পাঁঠা আর সের খানেক চিনি! যদিও কালী লোল রসনা পর্য্যন্ত উঁচু চিনির পাহাড়ের নৈবেদ্য পান নি—কারণ রামযাদু মিষ্ট বাক্য যতোটা বাজে খরচ কর্‌তে প্রস্তুত, রজতমুদ্রা বাজে খরচ কর্‌তে তার সিকি পরিমাণও প্রস্তুত ছিলো না।

এর কয়েক দিন পরে পরাণ-বাবুর আপিসের সমস্ত ভারত-বাসী কর্ম্মচারী—বাঙালী উড়িয়া পশ্চিমা মহারাষ্ট্রী মাদ্রাজী গুজরাটী—সকালবেলা একসঙ্গে পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তাদের কারো হাতে ফুল, কারো হাতে চন্দন, কারো হাতে ধুপ, কারো হাতে ধুনা, কারো হাতে শঙ্খ, কারো হাতে ঘণ্টা, আর রামযাদুর হাতে চামর! তাদের দেখেই পরাণ-বাবু চমৎকৃত হয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লেন—এ কি? ব্যাপার কি?

রামযাদু হাস্যমুখে বল্‌লে—আজ আপনার জন্মদিন।

পরাণ-বাবু পরম পরিতুষ্ট হয়ে উচ্চহাস্যে ঘর ভ'রে তুলে ব'লে উঠ্‌লেন—ওহো! তা এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে?

রামযাদু বল্‌লে—এখন আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর্‌তে হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—এ সমস্তই মুখুজ্জে মশায়ের অদ্ভুত খেয়াল বোধ হচ্ছে?

রামযাদু বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষ-পূজার প্রধান পুরোহিত আমিই বটে!

পরাণ-বাবু হাসিভরা প্রসন্ন মুখে মিষ্ট স্বরে বল্‌লেন—এ আপনার ভারী অন্যায় মুখুজ্জে মশায়! এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি!

রামযাদু পূজার আয়োজন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—ভক্তের অত্যাচার ভগবান্‌কে নিত্য কালই সহ্য কর্‌তে হয়।

পরাণ-বাবু আবার সন্তোষের হাসি হাস্‌লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের মাঝখানকার চেয়ার টেবিল স'রে জায়গা সাফ হয়ে গেলো। সেখানে পাতা হলো নূতন আসন ও সম্মুখে সজ্জিত হলো পূজোপকরণ। একজোড়া নূতন গরদের জোড়ও বাহির হলো এবং পরাণ-বাবুকে সেই জোড় পরিয়ে চন্দনচর্চ্চিত ও মাল্যভূষিত ক'রে শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হতে লাগ্‌লো। তারপর ভারতবর্ষের সকল ভাষায় রচিত প্রশস্তি পাঠের ধুম লেগে গেলো। পরাণ-বাবু সেই সব অবোধ্য বন্দনা হাস্যমুখেই শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

অনুষ্ঠান শেষ হলে সকলকেই পরাণ-বাবুর বাড়ীতে প্রচুর রূপে মিষ্টমুখ ক'রে যেতে হ'লো।

দেবতারা এইবার রামযাদুর ঘুষ সত্য-সত্যই খেলেন। একদিন বিকাল-বেলা পরাণ-বাবুর মোটর-গাড়ী এসে রামযাদুর বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌লো আর অম্‌নি রামযাদুর ছেলে বনমালী বোঁ ক'রে ছুটে এসে পিতার দৃষ্টান্তে শিক্ষা পেয়ে হাত জোড় ক'রে পরাণ-বাবুকে বিনীত স্বরে বল্‌লে—বাবা তো বাড়ী নেই।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে গাড়ী থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌লেন—তা জানি রে জানি, সেইজন্যেই তো এখন এসেছি। যা তোর মাকে ব'ল গে যে জেঠা-মশায় এসেছে·· ···

পরাণ-বাবু বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন; মনোমোহিনী এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো; বনমালী এসে বল্‌লে—মা এসেছেন······

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—দেখো বৌমা, আমি এই বাড়ীটার দান-পত্র রেজেষ্টারী ক'রে দিতে এসেছি; মুখুজ্জে মশায়কে দিতে গেলে তিনি হয়তো শূদ্রের দান নিতে আপত্তি কর্‌তেন, তাই আমি দলিলখানা তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এ বাড়ী আমি ছেলেদের দিলাম; আর গোরুটাও তোমার বাড়ীতেই থাক, খোকারা দুধ খাবে।

মনোমোহিনী চাপা গলায় পরাণ-বাবুর শ্রুতিগম্য স্বরে বল্‌লে—বুনো, তুই কর্ত্তাকে বল্‌, আমরা তো তাঁরই আশ্রিত, আমাদের যা অভাব হবে তা তাঁকেই পূর্ণ কর্‌তে হবে।

পরাণ-বাবু হো হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠ্‌লেন।

রামযাদু বাড়ীতে এসে পত্নীর কাছ থেকে দলিল পেয়ে খুশীতে এক মুখ হেসে বল্‌লে—বেটা কেওটকে আচ্ছা ভোগা দিয়েছি।

কিন্তু মহাব্রাহ্মণ রামযাদুর মনে কেওটের দান গ্রহণে এতোটুকু আপত্তিও উদয় হলো না।

রামযাদুর আপিসের সকল কর্ম্মচারী রামযাদুর লাভের সংবাদে মুখে হর্ষপ্রকাশ কর্‌লেও মনে মনে ও পরস্পরে চুপি চুপি বল্‌তে লাগ্‌লো—পূজো কর্‌লাম আমরা সকলে আর দেবতার বর মিল্‌লো একা রামযাদুর ভাগ্যে! আমরা শুধু লেংড়া আম আর মিষ্টান্ন খেয়েই বিদায়!

কিন্তু সকলের মনেই আশা জেগে রইলো যে এই পূজার ফল তারাও কোনো না কোনো আকারে কিছু না কিছু পাবে। কিন্তু রামযাদুর লাভের সমতুল্য যে হবে না এটা নিশ্চিত জেনে তারা রামযাদুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে রইলো।

(ক্রমশঃ)

অষ্ট্রেলেশিয়ার অসভ্যদের কথা

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগর এবং নিউ গায়েনার আদিম অধিবাসীরা তিনটি জাতিতে বিভক্ত। পলিনেসিয়ান, মেলানিসিয়ান এবং মাইক্রোনেসিয়ান।

এই তিন জাতি কোন সময় কোন্ দেশ হইতে যে প্রথম এই সকল দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া তাহাদের বসতি স্থাপন করে, তাহা বলা যায় না। তাহার কোনো ইতিহাস নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে মানুষের বসতিও যে প্রথম কখন হয়, তাহারও কোনো ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত জানা



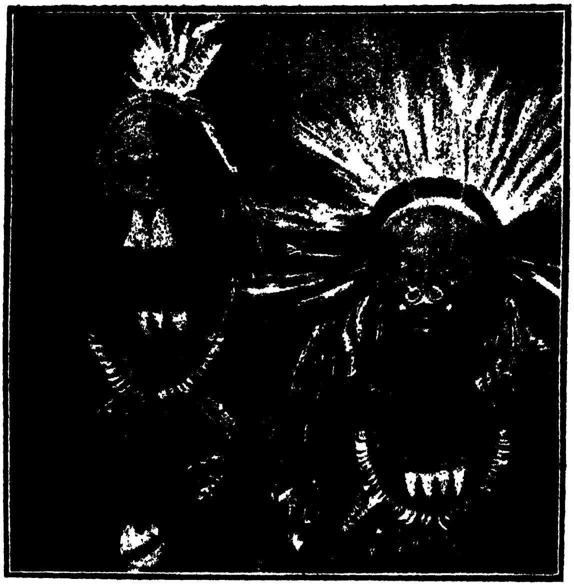
পাপুয়ার এক গ্রামের লোক যখন অন্য গ্রামে প্রতিনিধি হইয়া যায়, তখন তাহারা এই পোষাক পরিধান করে। পঞ্চয়েতে যোগদান করিবার সময়েও এই পোষাক।



নিউ-গায়েনার অংশবিশেষে বালকেরা যখন বালকত্ব ত্যাগ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহাদের এই অপরূপ পোষাক পরান হয়। ইহা যৌবন-উৎসবের পোষাক।



পাপুয়ার 'বাসিলাকি' নামক স্থানের নারীদের শোকের বেশ। নারীরা শাঁকের এবং কাড়ির তৈরী মালা পরিয়া মৃতজনের জন্য শোক প্রকাশ করে। সাদা রং করা বালাও এই সঙ্গে পরিতে হয়। মুখ এবং দেহের অন্যান্য অংশে কালি মাখাইয়া রাখাও শোক-প্রকাশের প্রথা।



পশ্চিম নিউ গায়েনার যোদ্ধাদের ভীষণ যুদ্ধবেশ। এই ভীষণ বেশ পরিয়া তাহারা যখন চীৎকার করিয়া শত্রুদের আক্রমণ করে তখন ভয়ে শত্রুর প্রাণ উড়িয়া যায়।

যায় নাই। তবে পলিনেসিয়ান এবং মেলানেসিয়ানরা মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কাছাকাছি অন্যান্য দ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইহারা পশ্চিম দিক হইতে আগমন করে। ইহার বেশী আর কিছু বলা যায় না। মেলানেসিয়ানরাই প্রথমে আসে। তাহার পর পলিনেসিয়ানরা মালয়ে আসিয়া আরো পশ্চিমের দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে।

নতুন বাসস্থানের খোঁজ করিতে করিতে ইহারা সামান্য নৌকায় চড়িয়া অসীম সাগরে পাড়ি দেয়। খাদ্য এবং জলের অভাবে কি অসীম কষ্ট ইহাদের সহ্য করিতে হয়, তাহাও কল্পনায় বুঝিতে পারা যায়। এই সকল নৌকাতে স্ত্রীলোক এবং শিশুরাও ছিল। এমনও হয় ত হইয়াছে যে নৌকা-ভর্ত্তি সমস্ত লোকজন— আবালবৃদ্ধবণিতা— দারুণ তৃষ্ণাতে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মাতার কোলের উপর শিশু মরিয়াছে, পিতার

সামনে সন্তান মরিয়াছে। অনেক সময় হয় ত নৌকা সমুদ্রের অতলজলে ডুবিয়াও গিয়াছে। নতুন দেশের এই সকল অসহ্য কষ্টের কথা জানিয়াও ইহারা কখনও জানাশোনা দেশ ত্যাগ করিতে বিরত হয় নাই।

মেলানেসিয়াতে পরাজিত শত্রু এবং অপরিচিত লোককে হত্যা করার প্রথা ছিল। হত্যা করিয়া নরমাংস ভোজনের প্রথা ছিল। পলিনেসিয়ানদের দেশত্যাগ করিবার কারণ, তাহারা নিজেদের দেশে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

মাইক্রোনেসিয়ানদের পূর্ব্ব-ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। ইহাদের বিবরণ স্প্যানিয়ার্ড সমুদ্রযাত্রীদের কাছেই প্রথম জানিতে পারা যায়। ইহাদের সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, ইহারা ইহাদের বর্ত্তমান বাসস্থানে প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহাদের স্বভাব এবং জীবন-যাত্রার প্রণালী যেমন ধারায় চলিতেছিল, এখনও প্রায় ঠিক সেই ধারাতেই চলিতেছে। সভ্যতার আলোক ইহাদের স্বভাব-চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ইহাদের চেহারার সহিত মালয় এবং মঙ্গোলিয়ান চেহারার বহু সাদৃশ্য আছে। অন্য জাতির সহিত বিশেষ মিশ খায় নাই বলিয়া বোধ হয় এখনও ইহাদের জাতীয়তা পূর্ণভাবে বজায় রহিয়াছে।



অসভ্য বালকের খেলা। সুতার খেলা সভ্যজগতের সকলেই স্থানেই প্রচলিত। অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার অসভ্যদের ভিতর এই একই প্রকার খেলার বাহুল্য দেখা যায়।



চিত্তচমৎকারী মস্তকাবরণ। কাকাতুয়া, স্বর্গ-পক্ষী, সারস ইত্যাদি বহুবিধ পক্ষীর পালক বেতের সাহায্যে গাঁথিয়া এই টুপী তৈয়ার হয়। পাপুয়া দ্বীপের এক গ্রামের নর্ত্তকেরা ইহা পরে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অসভ্য দ্বীপবাসীদের মধ্যে একমাত্র মাইক্রোনেসিয়ানরাই মদ চুয়াইয়া পান করে। অন্যান্য



পাপুয়ার 'ওরোকাইডা' নামক স্থানের নারীদের ধূমপান। পাইপাদি বাঁশের তৈরী। একটি পাইপেই অনেকে ধূমপান করে।



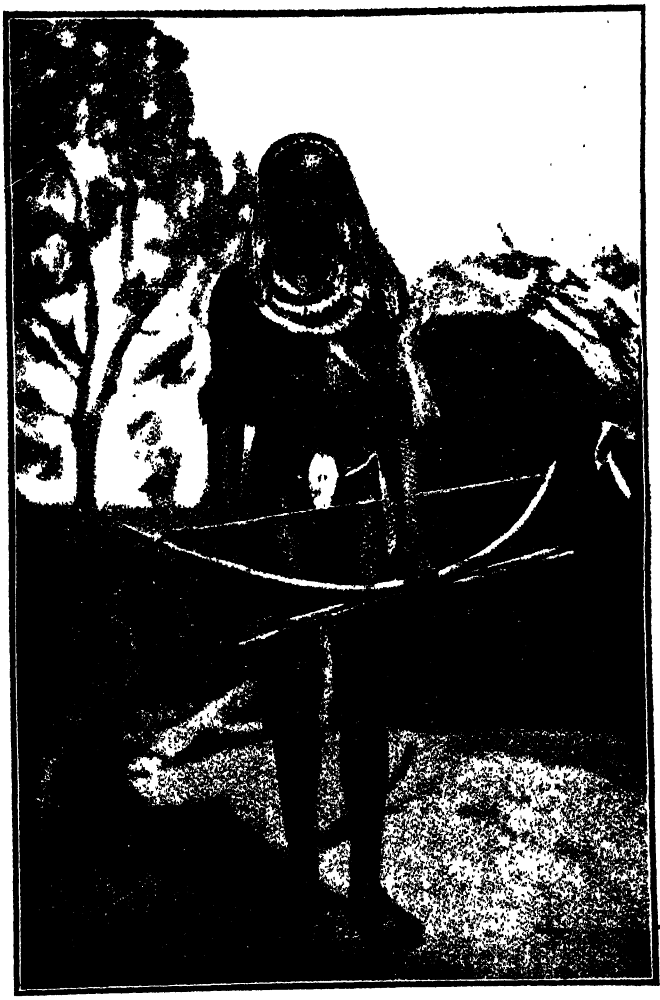
পাপুয়ান নারীর অভিসার সজ্জা। পুঁতির মালা, বেতের বালা, গাছের ছাল এবং শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের ঘাঘরাই ইহাদের উৎসব-বেশ

জাতীয় লোকদের মধ্যে মদ্যপানপ্রবণতা নাই বলিলেই হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না—বর্ত্তমানে সভ্যতার প্রসাদে এই সকল স্বভাব-সরল অসভ্যদেশবাসীরা নানা প্রকার ভোগ-বিলাসের স্বাদ পাইতেছে। ইহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী সেই পরিমাণে বদলাইয়া যাইতেছে। মাইক্রোনেসিয়ানরা যে সকল দ্বীপে বাস করে—তাহাদের লোকসংখ্যা অত্যধিক। জমি অনুর্ব্বর এবং জলাভাব থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্তও ইহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশীরকম বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।

তিনটি জাতির মধ্যে পলিনেসিয়ান জাতির লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহারা লম্বা-চওড়া, দেহের বর্ণ ঈষৎ তামাটে। ইহাদের চুল কোঁকড়ান; বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও রঙ্গ দিয়া লাল করা হয়; এবং ছোট ছোট করিয়া ছাটা। ইহাদের চালচলন ভদ্র; ইহারা যুদ্ধে অসমসাহসী এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর। কিন্তু ইহারা সাধারণতঃ কুঁড়ে এবং সভ্যতার বড়াই করিতে ভালবাসে—যদিও সভ্যতার গৌরব করিবার মত ইহাদের কিছুই নাই।

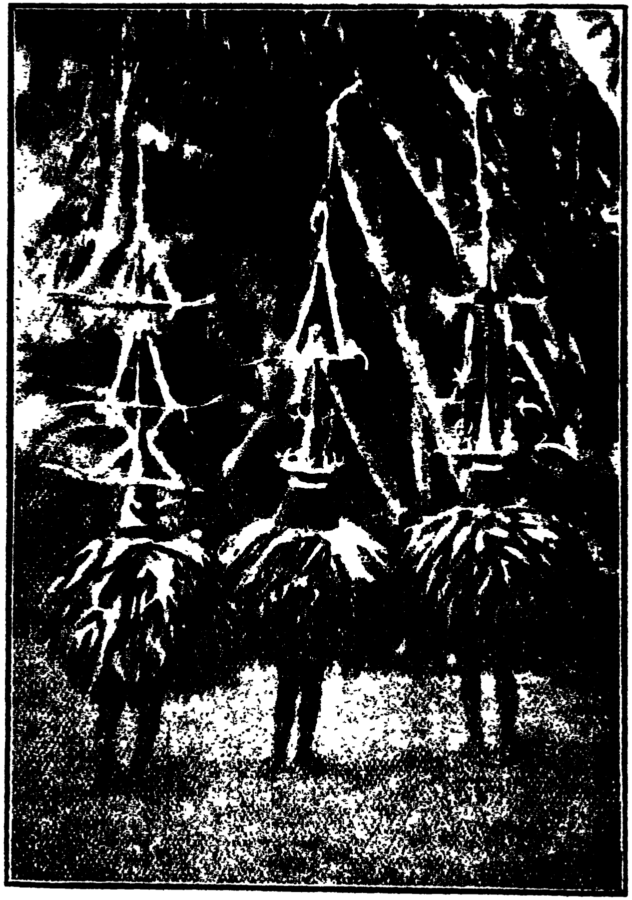
মেলানেসিয়ান জাতির লোকদের মধ্যে নানা প্রকার চেহারার লোক আছে। ইহাদের দেহের বর্ণও ঘোর তামাটে হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণও দেখা যায়। চুলও নানা প্রকারের আছে। পাশাপাশি দুই গ্রামের লোকেদের চেহারায় অমিল এত বেশী যে, দুই গ্রামের লোকেদের দুইটি বিভিন্ন জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা পলিনেসিয়ান জাতি অপেক্ষা মোটা এবং কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের সকল কাজ-কর্ম্মের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে—এবং সব কিছুই ইহারা নিয়মমত করিয়া যায়।

পলিনেসিয়ানদের সর্দ্দার আছে। সর্দ্দারেরা সমাজ এবং গোষ্ঠী শাসন করে। বিচারালয়ের কর্ত্তৃত্বও তাহারাই করিয়া থাকে। মেলানেসিয়ান জাতি গণতন্ত্রের ভক্ত। পলিনেসিয়ান জাতির পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহারের কোনো

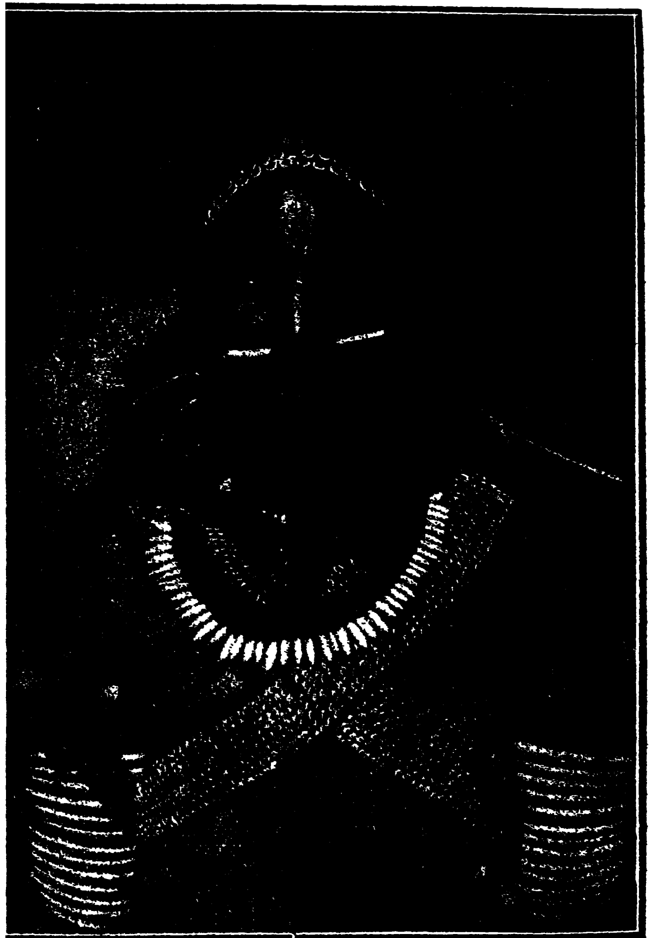


পাপুয়ার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বারিরি ধনুকধারী শিকারী। নিউ-গায়েনার পশ্চিম সীমান্তের লোকদের বারিরি বলা হয়। ইহারা আমাদের দেশের বাবাজিদের মত চুল জটা পাকাইয়া বাবরি করিয়া রাখে। কোমরে একটি হাড়ের টুকরা ছাড়া আর কোনো পোষাকের ধার ইহারা ধারে না।

গোঁড়ামি নাই। মাঝে মাঝে তাহাদের এমন অদ্ভুত সাহেবী পোষাকে দেখা যায়—অতি অসভ্য লোকেরও তাহাতে হাসি



পাপুয়াতে 'ডাকডাক' বলিয়া একটি গোপন সঙ্ঘ আছে। সঙ্ঘের 'সভ্য'গণ এই পোষাক পরিয়া উৎসব করে। ইহা তাহাদের উৎসবের বেশ। এই অপরূপ শিরস্ত্রাণ এবং বেশ লতা, পাতা, পালক, হাড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ার হয়।



নরখাদক জাতির সর্দ্দারের পোষাক। দেখিলেই সর্দ্দার বলিয়া মনে হয়। নানা জীবজন্তুর চামড়া, ল্যাজ, শাঁক, শামুক ইত্যাদি দ্বারা সর্দ্দার মহাশয়ের পোষাক তৈয়ারী হয়।

পায়। ইহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নাই। ছবি আঁকা ইত্যাদির কল্পনাও ইহারা করিতে পারে না।

মেলানেসিয়ান জাতির সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে। তাহাদের বাসনপত্র ইত্যাদিতে নানা প্রকার চিত্রাদি অঙ্কিত থাকে। ঘরের দেওয়ালেও ইহারা নানা প্রকার জীবজন্তু, লতা-পাতার ছবি আঁকিয়া থাকে। ইহারা শ্বেতাঙ্গ জাহাজে কাজ করিবার সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় নিজেদের জাতীয় পোষাক ছাড়া অন্য কোনো প্রকার পোষাক কখনও ব্যবহার করে না। সাহেবি পোষাক পরিধান করিবার সময় ইহারা নেহাত বেখাপ্পা রকমের সাহেব সাজিয়া বসে না।

ফিজিয়ানদের পলিনেসিয়ান এবং মেলানেসিয়ান জাতিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জাতি বলা যায়। আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতেও ইহারা দুই জাতির মাঝামাঝি আছে। মেলানেসিয়ান এবং পলিনেসিয়ান জাতি মিশ্রিত হইয়া ফিজিয়ান জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। অবশ্য কোন্ জাতির কতখানি এই জাতিতে আছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, দুই পাশে দুই জাতির চাপে পড়িয়া ফিজিয়ান জাতি উভয় জাতির পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কার অনেক পরিমাণে আপন করিয়া লইয়াছে। দুই জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ফিজিয়ান জাতিতে হইয়াছে কি না বলা যায় না।

ফিজিয়ানরা অতি কর্ম্মঠ। তাহাদের দেহ পেশীবহুল এবং সুন্দর। দেহ বর্ণের বিভিন্নতা আছে; একই জাতির মধ্যে বহু বর্ণের লোক দেখা যায়। ইহারা চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটে। অনেকে আবার কদম ফুলের মত খাড়া করিয়া রাখে। চুল খাড়া করিবার জন্য চটচটে আঠার সাহায্য লয়। চুল রং করার প্রথাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ফিজিয়ানরা স্বভাবতই অত্যন্ত গোঁড়া; নিজের জাতির সংস্কার এবং স্বভাব সহজে কখনও ত্যাগ করে না। ইহারা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরেজের অধীনে বাস করিতেছে; কিন্তু নিজেদের জীবনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য এখনও ইংরেজ সভ্যতার আলোক গ্রহণ করে নাই। পিতা পিতামহ যে প্রকার পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে বাস করিত, বর্ত্তমান ফিজিয়ানরাও সেই ভাবেই বাস করিতেছে। তাহাদের চাল-চলনও পূর্ব্ববৎ আছে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে প্রায় পূর্ব্ববৎ—কেবলমাত্র দু-একটা ইংরেজি খানা মাঝে মাঝে গ্রহণ করে।



নিউগায়েনার এক অংশে নারীরা গলায় দড়ীর সারি ঝুলাইয়া শোক প্রকাশ করে। এই অংশের বিধবাদের ভয়ানক কষ্টে বাস করিতে হয়। তাহারা ভাল পোষাক পরিতে পায় না, উৎসবে যোগ দিতে পায় না। ইহা ছাড়া ইহাদের অন্যান্য আরো নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহার জাতীয়তা পূর্ব্ববৎ। তাহার কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন এখনও হয় নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে কিন্তু ইহাদের পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে এখন বহু ফিজিয়ান খ্রীষ্টান হইয়াছে। খ্রীষ্টান হওয়ার ফলে হইয়াছে এই—ফিজিয়ানরা তাহাদের নানাপ্রকার দেবতা-পূজা ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু প্রাণের ভয়ে উপদেবতা-পূজা ত্যাগ করিতে পারে নাই। পাদরীর সামনে যে এক ঘণ্টা যীশু ভজন করিয়া গেল; কিন্তু বাড়ী গিয়াই উপদেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য দুইঘণ্টা হয় ত উপদেবতা ভজন করিল। এমনও শুনা গিয়াছে যে, যীশু এবং জাতীয় দেবতার পূজা পাশাপাশি চলিয়াছে। যীশুকে অনেকে তাহাদের বহু দেবতার আর একটি করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই।



গাল্ফ-অব পাপুয়ার উপকূলের অসভ্য জাতিদের মৎস্য ছদ্মবেশ। নৃত্যকালে এই ভীষণ-সুন্দর বেশ পরিধান করা হয়। কি কারণে এই পোষাক ব্যবহার হয়, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ব্রিটিশ পাপুয়ার (নিউ গায়েনা) অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মেলানেসিয়ান জাতির লোক। ইহাদের আচারব্যবহার, ধরণ-ধারণ, সংস্কারাদির সহিত মেলানেসিয়ান জাতির সংস্কারাদির বহু মিল আছে। মেলানেসিয়ানরা ক্রমে আসিয়া পাপুয়া দ্বীপের সমুদ্রের ধারে বাস করিতে থাকে। তাহার পর পাপুয়ার আদিম বাসিন্দাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দ্বীপের অভ্যন্তরে এবং অন্য দিকে তাড়াইয়া দেয়। এই সকল অঞ্চলে আদিম পাপুয়ানদের বংশধরদের দেখা যায়।

ফিজি হইতে সোজা পাপুয়া দ্বীপে গমন করিলে মনে হইবে, যেন ২০ শতাব্দী হইতে এক লাফে একেবারে পিছাইয়া 'প্রস্তর' যুগে আসিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পাপুয়ার লোকেরা লোহার অস্ত্র এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানিত না। তাহারা পাথরের তৈরী হাতিয়ার এবং অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

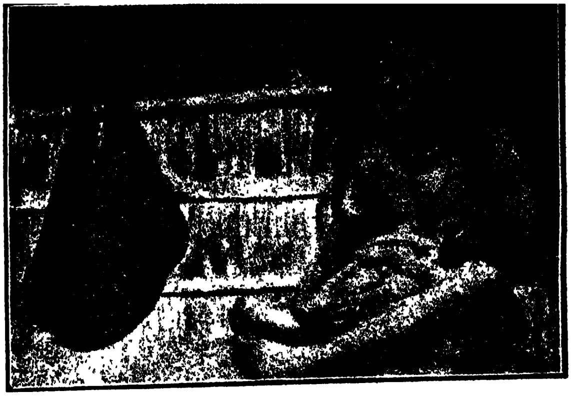
পাশাপাশি গ্রামগুলি সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মাতিয়া থাকিত। ব্যবসা-বাণিজ্য দুই গ্রামের মাঝখানের মাঠেই হইত। হাটের সময় সাময়িক ভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইত। ইহাদের যুদ্ধ ছিল অতি ভয়ানক ব্যাপার! যুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি এমন কি বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হইত না। যুদ্ধে নামিবার পূর্ব্বে যোদ্ধারা প্রাণপণে সাজগোজ করিত। নানা প্রকার রং দেহে লেপন করিত। পাখীর পালক, জন্তুর হাড় ইত্যাদি সাজ-সজ্জায় দেহকে যতদূর

ভীষণদর্শন করা যায়, তাহা ইহারা করিত। তাহার পর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দিকে এমন ভঙ্গী করিয়া তাড়া করিবার ভান করিত, যাহাতে শত্রু অবশ্যই ভয় পাইয়া পলায়ন করিত। শত্রুদল যদি পলায়ন না করিত, তবে আক্রমণকারীর দলই পলায়ন করিত। এই রকম ভয়ানক ছিল ইহাদের যুদ্ধ!

গ্রামের কৃষিকার্য্য স্ত্রীলোকেরা করিত। পুরুষেরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে পাহারা দিত। স্ত্রীলোকদের অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া কেহ কখনও অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। সামান্য সুবিধা পাইলেই পাশের গ্রামের লোকে হয় তাহাদের চুরি করিয়া লইয়া যাইত, না হয় তাহাদের হত্যা করিয়া মাথাটি গৃহ-সজ্জার কাজে লাগাইবার জন্য লইয়া যাইত।

পাপুয়ার কয়েকটি উপজাতির মধ্যে হাড়ের তৈরী এক প্রকার বিশেষ অলঙ্কার পরিধানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই অলঙ্কার কিন্তু যে সে পরিতে পারিত না। অন্ততঃ একটি শত্রুর মুণ্ডপাত যে না করিয়াছে, সে এই অলঙ্কার চোখে দেখিতে পাইত, কিন্তু অঙ্গে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিত। একবার এক সর্দ্দারের এগার বৎসর বয়স্ক বালক-পুত্র এই অলঙ্কার পরিবার আবদার ধরে। সর্দ্দারের একমাত্র পুত্র এবং ভবিষ্যত সর্দ্দার। কি করা যায়?—সর্দ্দার পাশের গ্রাম হইতে ভোর রাত্রে একজন বৃদ্ধকে শত্রু ঠিক করিয়া আনিল এবং প্রাতঃকালে সর্দ্দার-পুত্র গ্রামবাসী সকলের সামনে হাত-পা-বাঁধা সেই বৃদ্ধ ভয়ানক শত্রুর মুণ্ডপাত করিল। সেই মাংসে মহা ভোজ হইবার পর বালক সেই বীরের অলঙ্কার পরিবার অধিকার লাভ করিল।

গত মহাযুদ্ধের পর ইংরেজেরা জার্ম্মান গায়েনা কাড়িয়া লইয়া সমগ্র ব্রিটিশ গায়েনার শাসন ভার অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেন্টের হাতে দিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-গায়েনাতে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিউ-গায়েনাতে কত প্রকার অভিনব জন্তু আদি যে আছে তা বলা যায় না। বহু প্রকার গাছ-গাছড়া এই দ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোনার খনির সন্ধানও মিলিয়াছে। কিন্তু পাপুয়ার জল-হাওয়ার দোষে কোনো শ্বেতাঙ্গ সেখানে বাস করিতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে দ্বীপের স্বাস্থ্য আদিম অধিবাসীদের ছাড়া আর সকলের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণে লোকের প্রাণ-সংশয় হয়। যান বাহনের কোনো প্রকার ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। অসভ্যেরা যে পথ দিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে চলাফেরা করে, তাহা



পাপুয়ান নারীরা তাহাদের শিশু সন্তানদের স্তন দান করিয়া ঘুম পাড়াইয়া এই দোলায় শোয়াইয়া রাখে। ইহা মশারির কাজও করে। শিশু বেশ আরামেই ঘুমায়।

আর কাহারো পক্ষে ব্যবহার করা একেবারে অসম্ভব। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া আর একটি কারণে এখনও প্রায় অসম্ভব। পাশাপাশি দুইটি গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব বলিয়া কোনো জিনিষ কখনও থাকে না—সকল সময়ে যুদ্ধ লাগিয়াই আছে। অপরিচিত এবং তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী।

বাঙালী যুবকের সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণ

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল, বি-সি-এস্, এম-আর-এ-এস্

গত মাসের 'ভারতবর্ষে' যে চারিজন অসমসাহসী বীর বাঙালী যুবক (বিমল মুখার্জ্জি প্রভৃতি)কে আমরা য়্যাঙ্গোরা হইতে কন্‌ষ্টান্টিনোপলের পথে বাইসিক্‌ল যোগে যাত্রা করিতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিরাপদে শেষোক্ত স্থানে পৌঁছিয়াছেন। পেরা কন্‌ষ্টান্টি-নোপলের বিশিষ্ট স্থান, তথাকার খৃষ্টীয় যুবক-সমিতি ইঁহাদের অতি যত্ন সহকারে আশ্রয় দিয়াছেন। বস্‌রা হইতে বরাবর সাইকেলে বাগদাদ্‌, সিরিয়া, আলেপ্পো, দোরীতোয়েল, আদানা ও য়্যাঙ্গোরা পৌঁছিতে দুর্গম গিরিপথ, জনহীন মরুপ্রান্তর, সন্দিগ্ধ পুলিশ, সশস্ত্র দস্যুদল ও বেদুইনের আতঙ্ক



ভূপ্রদক্ষিণকারী বাঙালী

অতিক্রম করিতে যে সাহস, ত্যাগ, সংযম ও উপস্থিত-বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল, করুণাময় ভগবান বুঝি এই অধঃপতিত ও বিশ্বসমাজে অনাদৃত জাতির মুখ চাহিয়া, তাহার মুখোজ্জলকারী এই চারিটী বাঙালী যুবককে প্রভূত পরিমাণে সেই সব দান করিয়াছিলেন।

বাগদাদ হইতে য়্যাঙ্গোরার পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল যে, ইঁহাদের কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে দুইটী সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানি ইঁহাদের জীবনবীমা করিতে সম্মত হন নাই। ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ কালে টাউনহলের জয়ধ্বনির মধ্যে যে শঙ্কা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এখন কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইবে।

এখনও সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকা বাকী রহিয়াছে। দুরন্ত বেদুইন ইঁহাদিগকে যেরূপ ভাবে কোল দিয়াছে, আফ্রিকার বিভীষণ-গোষ্ঠী মরুচরেরা সেরূপ ব্যবহার করিবে কি?

য়্যাঙ্গোরা হইতে কন্‌ষ্টান্টিনোপলের পথে কয়েক স্থানে ব্রীজের কাষ্ঠখণ্ড পর্য্যন্ত চোরেরা বাদ দেয় না,—রাস্তা মেরামতের দ্রব্য চুরি করা সেখানকার একটা বিশেষত্ব; কয়েকটা হোটেল সশস্ত্র চোরদিগের পান্থনিবাস। কন্‌ষ্টান্টি-নোপল পৌঁছিলেই তুরস্কের সকল ভয় কাটিয়া গেল; য়্যাঙ্গোরা নূতন রাজধানী হইতে চলিয়াছে। বন্দুকধারী বিদেশীর পক্ষে লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঐ পথে যাত্রা নিষেধ। দোরীতোয়েলে ইঁহাদের বন্দুক ও রিভলভার তুর্কী পুলিশ কাড়িয়া লইয়াছিল—কন্‌ষ্টান্টিনোপলে ফেরত দিবার কথা; সম্ভবতঃ ফেরৎ দিয়াছে। নতুবা কন্‌ষ্টান্টিনোপল ছাড়িয়া ইঁহারা বুলগেরিয়া যাইতেন না। তুরস্কের নবীন জীবন তাহার স্বাধীন নরনারীর মুক্ত আনন্দে ও মিলিত উল্লাসে পরিস্ফুট। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ইঁহারা কন্‌ষ্টান্টি-নোপলে থাকায় তুরস্কের জাতীয় বার্ষিক উৎসব (গ্রীসকে পরাজয় করায়) দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঘরবাড়ী, রাস্তা, জাহাজ বিচিত্র আলোকে সজ্জিত; অপূর্ব্ব সজ্জায় ভূষিত

নরনারীর জয়ধ্বনির সহিত যুদ্ধপোতের সবিরাম তোপধ্বনি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুর্গাপূজার কয়েকদিন ইঁহারা সাইকল চালানো বন্ধ রাখিয়াছিলেন। মা আনন্দময়ীর আগমনে ইঁহাদের মনে সুদূর প্রবাসে বাংলার সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই সোফিয়া হইতে মহালয়ার দিন (২৬।৯।২৭) বিমল তাঁহার মাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজনকে প্রাণভরা পত্র দিয়াছেন।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখের সংখ্যায় সুবিখ্যাত ফরাসী সংবাদপত্র La Republique ইঁহাদের ৪ জনের ফটো সমন্বিত পরিচয় ও প্রশংসাসূচক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্কুটারি, কান্দিক, পেরা ও ইস্তাম্বুল বিশেষ দ্রষ্টব্য; বহু ইতালিয়, জার্ম্মান, য়িহুদী, আর্ম্মেনিয়ান, হঙ্গেরিয়ান ও রুসিয়ান পেরা ও ইস্তাম্বুল দেখিতে আসিয়া তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে মর্ম্মর উপসাগর ও বস্‌ফোরসের বিচিত্র তরঙ্গলীলা মানবের কল্পনাসাগরে হিল্লোল তুলিয়া সাহিত্যের উর্ব্বর বেলাভূমি নবন্যাস উপন্যাস ও কবিতার বন্যায় ভাসাইয়াছিল, সেই কুহকলীলার প্রত্যক্ষ করিয়া এই চারিটি নিঃসহায় সাবলম্বী বাঙালী যুবকের আনন্দের অবধি ছিল না। দুঃসহ পথক্লেশ ইস্তাম্বুলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য-পুলকে দূর হইয়াছিল।

ইস্তাম্বুল ত্যাগ করিয়া ইঁহারা সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বুলগেরিয়া পৌঁছিয়াছেন। সোফিয়া বুলগেরিয়ার রাজধানী। ইঁহারা বাঙালী বলিয়া তথায় সম্মান পাইয়াছেন। বুলগেরিয়ার লোকেরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত। একটি সভায় ইঁহাদিগকে রবিবাবুর কোন একটি ভাল কবিতা আবৃত্তি করিতে বিশেষ অনুরোধ করা হয়। বিমল "চয়নিকা" হইতে 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটী আবৃত্তি করিয়া সভ্যগণকে আনন্দিত করেন।

প্রচ্ছদপট

শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেবের ত্রিবর্ণ চিত্র অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট অলঙ্কৃত করিল। প্রথম বয়সে ইনি নবকৃষ্ণ মুন্সী নামে পরিচিত ছিলেন। নবকৃষ্ণের পিতার নাম রামচরণ দেব। রামচরণের পিতামহ কামিনীকান্ত মোগল দরবারে "ব্যবহর্ত্তা" বা আইনজ্ঞ কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস মুড়াগাছা গ্রামে ছিল। রামচরণ মুড়াগাছা হইতে গোবিন্দপুর (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে অনুমান ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গোবিন্দপুর গ্রাম গ্রহণ করিলে রামচরণ সুতানুটীতে (বর্ত্তমান শোভাবাজারে) আসিয়া বাস করেন। নবকৃষ্ণ পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হন। পরে লর্ড ক্লাইব নবকৃষ্ণের পারস্য ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কোম্পানীর মুন্সী পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় হইতেই ক্লাইবের মুন্সী বলিয়া তিনি নবকৃষ্ণ মুন্সী নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দূতরূপে উপঢৌকনসহ নবাব-শিবিরে প্রেরিত হন। ক্লাইবের সহিত মীর্জাফরের যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, নবকৃষ্ণ তাহাতে মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য করিয়াছিলেন। মীর্জাফরকে সুবাদার পদে নিযুক্ত করিবার চুক্তিপত্র রচনাকালেও নবকৃষ্ণ মধ্যস্থ ছিলেন। সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে যে সন্ধি হয়, নবকৃষ্ণ তাহাতেও মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় বারাণসী-রাজ বলবন্ত সিংহের সহিত এবং বিহার সম্বন্ধে সেতাব রায়ের সহিত চুক্তি হইয়াছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণের জন্য রাজা বাহাদুর উপাধি, দশহাজারী মন্‌সবদার খেতাব এবং ৩০০০ অশ্বসাদী, পালকী-ঝালরদার ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর নবকৃষ্ণ ক্লাইবের চেষ্টায় সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং চারি হাজার অশ্বারোহী রাখিবার সনন্দ লাভ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নবকৃষ্ণ সুতানুটীর জমিদারী বন্দ লাভ করেন। কোম্পানীর ছয়টি দপ্তরের (department এর) ভার নবকৃষ্ণের হাতে ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে বর্দ্ধমান রাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক ও রাজ-ষ্টেটের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন সুশিক্ষিত ছিলেন, তদ্রূপ বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর নবকৃষ্ণ পরলোকে গমন করেন। আমরা 'ভারতবর্ষে" শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

শেষ-প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৭)

আশ্চর্য্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ, উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া, পর্দ্দার ও-পিঠে না জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল। সকলের মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলা-পাড়া করিতে লাগিল, এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এই জন্যই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেত-মর্ম্মর মায়া-পুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ পড়িল না।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠ্‌লে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা!

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা-ওয়ালায় খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশি ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব, কোনমতে ঠেসা-ঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ। কহিলেন, শিবনাথ মিছে-কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন সামান্য দাসীর মেয়ে হতে পারেনা। অসম্ভব। এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ তো গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝ্‌তে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায়না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকেই ঠকানো! একেবারে monopolyতে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্র-ঘরের culture সিকি পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ সমস্ত শুধু immoral নয় অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায়না অক্ষয় বাবু।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দুই-ই এক অবিনাশ বাবু। দেখ্‌লেননা, বিবাহ জিনিসটা ওঁর কাছে তামাসার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বল্‌লে এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বল্‌লেন তাই নাকি? absolute indifferenceটা আপনারা কি নোটিশ করেননি? এ কি কখনো ভদ্র কন্যার সাজে না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার চমক ভাঙিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর formটার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যাহোক্ কিছু একটা হলেই ওর হলো। স্বামীকে বল্‌লে, ওরা যে বলে বিয়েটা হলো ফাঁকি। স্বামী বল্‌লেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈব মতে। কমল তাই শুনে খুসি হয়ে বল্‌লে শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈব মতে ত সেই ভালো। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগ্‌লো অবিনাশ বাবু।

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা—হাঁ গা, করবে না কি তুমি এই রকম? দেবে না কি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত

তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনো বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া শুধু একটুখানি মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু ? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু ?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিলনা, বলিল, আপনারা অবাক্ করলেন অবিনাশবাবু। তাদের যা' কিছু সমস্তই মিষ্টি মধুর। এমনকি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা নী যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো ?

হরেন্দ্র কহিল শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয়না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাক্‌লেই কি মধু ঝরবে ?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হরেন্দ্র বাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে সহস্র খোঁচা-খুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায়না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকি পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িলেন; সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন একান্ত কদর্য্য পরিহাস করিয়াছে, এবং শিবনাথের শৈব-মতে-বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে গাড়ী আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেলে হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পৌঁছাইয়া দিতে গাড়ী চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ীর মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, না, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিতনা। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বের ধারণা কি আজ বদ্‌লায়নি ?

কিসের ধারণা বাবা ?

এই যেমন,—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা।

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেননা। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর, তেম্‌নি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধহয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনি মাত্রই হোতো তো এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হত না যে সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে ? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কেবল এরই জন্যে আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল,—তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি,—কিন্তু সমস্ত ছলা-কলা, সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিন্‌তে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—কি যে তোরা সব বলিস্ মা ?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি, এর মধ্যে কোথাও

সেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এইখানেই মস্ত মত-ভেদ আছে!

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে তো শিবনাথেরই দোষ কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জানো বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারেনা তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব তো তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি?

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও তো নয় মণি। বরঞ্চ পেলেই তার মিথ্যাচার হোতো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্ব্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই তো ঠিক, এতে ব্যথা পাবার তো কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিতনা, জানিবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা, এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইলনা, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া [illegible] :

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ'লে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হ'লনা। যাই হোক,—না, তার কাছে নেই।

তা'হলে আত্ম-সংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন সে শুধু নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ। আর তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকানো নয়, পৃথিবীকে ঠকানো। তার মুখ থেকে শুনে মনে হোলো কমল এই কথাটাই কেবল বল্‌তে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুন্‌লে ভারি বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল,—বিস্ময় লাগে! সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরেনা? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বল্‌তে পারবেনা? যে যা বল্‌বে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ তো দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষের পরে অবিচার করলে কেবল এক পক্ষই ঠকেনা, অন্য পক্ষও ঠকে। যে সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বলে তার মোট কথাটা বোধহয় এই যে সুদীর্ঘ সংস্কারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। হয়ত সে আমাদের এতকালের পাওয়াকেও ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তারও ত একটা প্রমাণ হওয়া চাই। কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়লেই হবে কেন মণি।

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধ'রে কি সে দিকটা প্রমাণ করবার লোক ছিলনা?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভালো করে জানো যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্ব্ব-গামীরা শেষ-প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারেনা। তাহলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতোনা।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধকরি কিছুই বুঝতে পারচোনা, না?

অজিত ঘাড় নাড়িলে আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোম-কুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন লোকে চেয়ে দেখবে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ খুলতেই পারলেনা। অথচ মজা এই যে আমাদের মামলা হোলো শিবনাথের বিরুদ্ধে আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকুরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ

ক'রে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈব মতে,—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞাসা করা হলো মেয়েটি কি ভদ্র-ঘরের? শিবনাথ বললেন সে তাঁদের বাড়ীর দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হলো মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন শিক্ষার জন্যে বিবাহ করেননি, করেছেন রূপের জন্যে। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনে, অজিত, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়েছে গিয়ে তার পরেই সবচেয়ে বেশি।

মনোরমা কহিল, তাকে কি আমাদের সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজে অক্ষয়বাবুও ত আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধহয়?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেননা, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা?

অজিত বলিল, আশ্চর্য্য এই যে আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয় রাগও হয়। ভাবি, এইবারে গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়েনা, ভয়েরও দাগ লাগেনা। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবেনা। দেবতার দলই আসুক আর দৈত্য-দানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্ত,—শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুসি। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইলনা, আশুবাবু অকস্মাৎ দুইহাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেননা অবিনাশবাবু আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি করেছি না করেছি নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবেনা। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আনবেন। তখন?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেত গিয়েছিলেন না কি?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা যে ব্যারিষ্টার।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি?

আশুবাবু তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন কোরে মেয়ে নিয়ে এখানে-সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন, সমস্ত চিত্ত তলটা একেবারে ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। পাপের কোথাও কিছু বাকি নেই। সে যাই হোক, দয়া কোরে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেননা।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারি ভয়?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মরে যাবো।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

বাবা বলিলেন, অন্যায় হোক্ মা, আত্ম-রক্ষার সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল, মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয় বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে করো?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক্, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে তো হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেছে, মীমাংসা আর হোলোনা।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনো স্পষ্ট কোরে কিছু বলনা। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট কোরে বল্‌বার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি,—সে তোর কপাল। এখন খামোকা আমার ওপর রাগ করলে চল্‌বে কেন বল্‌তো?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে খানিক ঘুরে আসিগে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে? এই অন্ধকারে?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই, একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেরিয়োনা।

না। গাড়ীতেই যাবো।

গাড়ীর ঢাক্‌নাটা তুলে দিয়ো, অজিত, যেন হিম লাগেনা।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা'হলে অবিনাশ বাবুকেও অমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখ্‌চি এখনো যায়নি। এই ঠাণ্ডায় চল্‌লো বেড়াতে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "স্নেহের মূল্য"—২৲

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "সর্ত্তপালন"—১।৹

শ্রীনরহরি রায় প্রণীত নাটক "চাঁদসদাগর"—১৲

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "লগ্নফল"—১৲

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভালবাসার নেশা"—১।৹

শ্রীযুক্ত পঙ্কজভূষণ রায় প্রণীত "যুগসন্ধি"—১।৹

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দামোদরের মেয়ে"—১৲

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত "উলট্‌পালট্‌"—১।৹

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত গীতিকাব্য "পুষ্পাঞ্জলি"—৸৵৹

শ্রীমতী উমা দেবী প্রণীত "বাঙ্গালী জীবন"—।৵৹

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "রূপ-তৃষ্ণা"—১৲

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার প্রণীত "কর্ম্ম-রহস্য"—১।৹ ও পৌরাণিক নাটক "কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা"—।৵৹

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "গিরিশচন্দ্র"—৩৲

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "মাতৃতীর্থ"—৸৹

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "শিক্ষা ও সভ্যতা"—১।৹

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র প্রণীত "যোগতত্ত্ব ও বক্তৃতা—।৹ ও "যোগ ও যে গৈশ্বর্য্য"—৸৹

শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত সচিত্র গীতিকাব্য "বাগান"—১।৹

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "মুক্তির আলো"—১।৹

শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার বি-এ প্রণীত নাটক "বেদ-উদ্ধার"—১।৹

শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী প্রণীত নাটক "সুবজ্র"—১।৹

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত কাব্য "উত্তর"—।৵৹

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সঙ্গীত-লহরী"—৩৲

শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী প্রণীত "সঙ্গীত সুধা"—৩৲

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী প্রণীত "মালা বদল" দক্ষিণা—২।৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকদিগের যিনি টাকা না পাঠাইবেন, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা আমরা পরবর্ত্তী ৬ মাসের জন্য ৩।৵৹ আনার ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠাইব। মণিঅর্ডার করিলে, ৩৵৹ আনা গ্রাহক নম্বর সহ পাঠাইবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.